সিরিজ ॥ নারীর ফাঁদ-১
ঐতিহাসিক উপন্যাস

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

১

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-১

আলতামাশ

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-১
আলতামাশ

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

পরশমণি প্রকাশনা-৭
ISBN-984-8925-04-8

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০১
পঞ্চম প্রকাশ
মে ২০০৬

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার
মালিটোলা, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
কালার সিটি
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৫৬৪১৪১

গ্রাফিক্স
নাজমুল হায়দার
দি লাইট
মোবাইল ঃ ০১৯১-০৩১১৮৪

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

পরিবেশক

এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার (পাঠকবন্ধু মার্কেট)
ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

নিউ রহমানিয়া লাইব্রেরী
৭৩, সাত মসজিদ সুপার মার্কেট
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১-৪৬৪০৭১

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে– বিশেষত মিশর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। ক্রুসেডাররা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয় তারা।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দু:সাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিলো, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দু:সাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হলো সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ কবুল করুন।

বিনীত

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা।

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সূচিপত্র ঃ

* নারীর ফাঁদ..................৭
* সপ্তম মেয়ে..................৬১
* সাইফুল্লাহ................১০৭
* আরেক বউ..............১৬৫
* অপহরণ..................২০১
* ফিলিস্তীনের মেয়ে.......২৫৭

নারীর ফাঁদ

১১৫৭ সালের এপ্রিল মাস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আপন চাচাতো ভাই খলীফা সালেহ-এর গভর্নর সাইফুদ্দীনকে লিখলেন–

'তোমরা খাঁচায় বন্দী রং-বেরংয়ের পাখি নিয়ে ফুর্তি করো। নারী আর সুরার প্রতি যাদের এতো আসক্তি, তাদের জন্য সৈনিক জীবন খুবই বেমানান।'

খলীফা সালেহ আর তার বংশজ গভর্নর সাইফুদ্দীন গোপনে মুসলিম খেলাফতের চিরশত্রু ক্রুসেডারদের চক্রান্তে ফেঁসে গেলেন। খেলাফতের রাজভাণ্ডার– মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত, দিনার-দেহরাম দিয়ে এই দুই শাসক ক্রুসেডারদের প্ররোচিত ও সহযোগিতা করতে লাগলেন সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে। সুলতান আইউবীকে হত্যা করার চক্রান্ত আঁটা হলো।

একদিন ঠিক কাঙ্ক্ষিত সুযোগটি এসে গেলো ক্রুসেডারদের হাতে। তাঁরা মুসলিম শাসকদের মধ্যেই তালাশ করছিলো দোসর। খলীফা সালেহ স্বেচ্ছায় ক্রুসেডারদের সেই ভয়ানক চক্রান্তে পা দিলেন। খলীফা ও ক্রুসেডারদের সমন্বিত চক্রান্তে দু' দু'বার হত্যার উদ্দেশ্যে আইউবীর উপর আঘাত হানা হলো। দু'বারই সৌভাগ্যবশত বেঁচে গেলেন সুলতান সালাহুদ্দীন। তছনছ করে দিলেন ঘাতকদের সব চক্রান্ত। আঘাতে-প্রত্যাঘাতে পরাস্ত করলেন শত্রুদের। ফাঁস হয়ে গেল গভর্নর সাইফুদ্দীনের চক্রান্তের খবর।

গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে ক্রুসেডারদের দোসর গাদ্দার সাইফুদ্দীন ঘর-বাড়ী, বিত্ত-বৈভব ফেলে পালিয়ে গেলো। গভর্নরের আবাস থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ, বিলাস-ব্যসন। গভর্নরের বাড়িতে পাওয়া গেলো দেশী-বিদেশী অনিন্দসুন্দরী যুবতী, তরুণী, রক্ষিতা। এদের কেউ ছিলো নর্তকী, কেউ গায়িকা, কেউ বিউটিশিয়ান, কেউ ম্যাসেঞ্জার। সবই ছিলো সাইফুদ্দীনের মনোরঞ্জনের সামগ্রী ও ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের জঘন্য উপাদান।

সাইফুদ্দীনের বাড়ীতে আরো পাওয়া গেলো নানা রঙের নানা প্রজাতির অসংখ্য পাখি। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলানো ছিলো বিভিন্ন ভঙ্গিমার নগ্ন, অর্ধনগ্ন নারীদের উত্তেজক অশ্লীল ছবি। সুরাভর্তি অসংখ্য পিপা।

সালাহুদ্দীন খাঁচার বন্দী পাখীদের মুক্ত করে দিলেন। গভর্নরের বাড়ীতে বন্দী সেবিকা, নর্তকী, বিউটিশিয়ান ও শিল্পী-তরুণীদের আপনজনদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। তারপর সাইফুদ্দীনকে লিখলেন–

'তোমরা দু'জনে কাফের-বেঈমানদের দ্বারা আমাকে হত্যা করাবার অপচেষ্টায় মেতেছো। কিন্তু একবারও ভেবে দেখোনি, তোমাদের এই চক্রান্ত মুসলিম খেলাফতের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। তোমরা আমাকে হিংসা করো। তাই আমাকে তোমরা ধ্বংস করে দিতে চাও। দু' দুইবার আমাকে হত্যা করার জন্যে লোক পাঠিয়েছো; কিন্তু সফল হতে পারোনি। আবার চেষ্টা করে দেখো, হয়তো সফল হবে। তোমরা যদি আমাকে এ নিশ্চয়তা দাও যে, আমার মৃত্যুতে ইসলামের উন্নতি হবে, মুসলমানদের কল্যাণ হবে, তাহলে কা'বার প্রভূর কসম করে বলছি, আমি তোমাদের তরবারী দিয়ে আমার শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করিয়ে তোমাদের পদতলে উৎসর্গ করতে অসিয়ত করে যাবো। আমি তোমাদের শুধু একটি কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কাফের-বেঈমানরা কখনো মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না। ইতিহাস তোমাদের চোখের সামনে। আমাদের সোনালী অতীতের দিকে একবার ফিরে দেখো। আশ্চর্য, রাজা ফ্রাংক-রেমণ্ডের মত প্রচণ্ড ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম শাসকরা তোমাদের সাথে একটু বন্ধুত্বের অভিনয় করলো, আর অম্নি তোমরা তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস যুগিয়েছো! ওরা যদি সফল হতো, তাহলে ওদের পরবর্তী প্রথম শিকার হতে তোমরা-ই। এরপর হয়তো দুনিয়া থেকে ইসলামী খেলাফত মুছে ফেলার কাজটিও সমাধা হতো।

তোমরা তো যোদ্ধা জাতির সন্তান। সৈন্য ও যুদ্ধ পরিচালনা তোমাদের ঐতিহ্যের অংশ। অবশ্য প্রত্যেক মুসলমান-ই আল্লাহর সৈনিক আর আল্লাহর সৈনিক হওয়ার পূর্বশর্ত ঈমান ও কার্যকর ভূমিকা।

তোমরা খাঁচার পাখি নিয়ে ফুর্তি করো। মদ-নারীর প্রতি যাদের এত আসক্তি, সৈনিক জীবন ও যুদ্ধ পরিচালনা তাদের জন্যে খুবই বেমানান। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা আমাকে সহযোগিতা করো। আমার সাথে জিহাদে শরীক হও। যদি না পারো, অন্তত আমার বিরুদ্ধাচারণ থেকে বিরত থাকো। আমি তোমাদের অপরাধের কোন প্রতিশোধ নেবো না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আমীন।'

–সালাহুদ্দীন আইউবী

গভর্নর সাইফুদ্দীন গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে নতুন চক্রান্তে মেতে উঠলো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর চিঠি পড়ে তার মধ্যে দ্বিগুণ প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠলো। যোগ দিলো ইহুদী হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ঘাতক স্কোয়াডের সাথে। শুরু হলো নতুন চক্রান্ত। হাসান ইবনে সাব্বাহ'র স্কোয়াড দীর্ঘ দিন ধরে ফাতেমী খেলাফতের আস্তিনের নীচে কেউটে সাঁপের মতো বিরাজ করছিলো।

❖ ❖ ❖

হাসান ইবনে সাব্বাহ্ একজন স্বভাব-কুচক্রী। ফাতেমী খেলাফতের শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে সে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে তৎপর। শুভাকাঙ্ক্ষীর পোশাকে সর্বনাশী ষড়যন্ত্রের হোতা সে। অতি সংগোপনে ইসলামী খেলাফতকে ধ্বংস করতে গোপনে গড়ে তোলে ঘাতক বাহিনী। বিস্ময়কর যাদুময়তায় সাধারণ মানুষের কাছে সজ্জন হিসেবে আসন গেড়ে নেয় তার বাহিনী। অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীর মধ্যে। সাধারণ মানুষের মধ্যে জন্ম দেয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাস।

হাসান ইবনে সাব্বাহ'র গুপ্ত বাহিনীতে রয়েছে চৌকস নারী ইউনিট। ওরা যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমত্বী ও বিচক্ষণ। প্রাঞ্জল ভাষা ও বাকপটুতায় দক্ষ তারা। তাদের সংস্পর্শে গেলে যে কোন কঠিন মনের অধিকারী আর আদর্শিক পুরুষও মোমের মত গলে যায়। চক্রান্ত বাস্তবায়নে মাদক, নেশা, আফিম, হাশীশ, নাচ-গান ও ম্যাজিকের আশ্রয় নেয় তারা। এমনকি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে হাসান বাহিনীর নারী গোয়েন্দারা নিজেদের দেহ বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। দীর্ঘ কঠোর প্রশিক্ষণ-অনুশীলনের মাধ্যমে উপযুক্ত হওয়ার পর শুরু হয় তাদের মূল কাজ। হাসান বাহিনী তাদের প্রতিপক্ষ ইসলামী খেলাফতকে নির্মূল করতে এমন একটি ঘাতক বাহিনীর জন্ম দেয় যে, এই বাহিনীর প্রশিক্ষিত গোয়েন্দারা বেশ-ভূষা ও ভাষা বদল করে কৌশলী আচার-ব্যবহার দ্বারা ফাতেমী খেলাফতের শীর্ষ ব্যক্তিদের একান্ত বডিগার্ডের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও হাত করে নেয়। এর ফলে বড় বড় সামরিক কর্মকর্তারা গুপ্ত হত্যার শিকার হতে থাকেন। কিন্তু ঘাতকের কোন নাম-নিশানা খুঁজে পাওয়া যায় না।

অল্পদিনের মধ্যেই হাসান বাহিনীর গুপ্তদল 'ফেদায়ী' নামে সারা মুসলিম খেলাফতে ভয়ংকররূপে আবির্ভূত হয়। এদের প্রধান কাজ রাজনৈতিক হত্যা। এ কাজে এরা বেশী ব্যবহার করে সুন্দরী যুবতী আর মদ। শরাবে উচ্চমানের বিষ

মিশিয়ে আসর গরম করার পর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে তারা। কিন্তু তাদের মদ-নারী সালাহুদ্দীন আইউবীর বেলায় অকার্যকর। অবৈধ নারী সম্ভোগ আর হারাম মদ-সুরায় আইউবীর আজন্ম ঘৃণা। সালাহুদ্দীনকে হত্যা করার একমাত্র উপায় অতর্কিত আক্রমণ। কিন্তু এটা মোটেও সহজসাধ্য নয়। সুলতান সালাহুদ্দীন সবসময় থাকেন প্রহরী-পরিবেষ্টিত। তাছাড়া তিনি নিজেও খুব সতর্ক।

দু' দু'টি আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর সালাহুদ্দীন আইউবী ভেবেছিলেন, আমীর সালেহ ও গভর্নর সাইফুদ্দীন হয়তো তাঁর চিঠি পেয়ে তওবা করেছে। ওরা হয়তো আর তাঁর সাথে দুশমনি করবে না। কিন্তু না, ওরা প্রতিশোধের আগুনে অন্ধ হয়ে আছে। নতুন করে তৈরী করলো সালাহুদ্দীনকে খতম করার সুগভীর চক্রান্তের ফাঁদ।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ক্রুসেডার ও সাইফুদ্দীনের হামলা প্রতিহত করে বিজয়োল্লাসের পরিবর্তে পাল্টা আক্রমণ অব্যাহত রাখলেন। অগ্রণী আক্রমণ করে শত্রুপক্ষের আরো তিনটি এলাকা দখল করে নিলেন তিনি। বিজিত এলাকার অন্যতম একটি হলো গাজা।

গাজার প্রশাসক জাদুল আসাদীর তাঁবুতে এক দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছেন সালাহুদ্দীন আইউবী। মাথায় তাঁর শিরস্ত্রাণ। শিরস্ত্রাণের নীচে মোটা কাপড়ের পাগড়ী।

তাঁবুর বাইরে প্রহরারত দেহরক্ষী দল। আইউবীর দেহরক্ষীরা যেমন লড়াকু, তেমনি চৌকস।

রক্ষী দলের কমাণ্ডার কেনো যেনো প্রহরীদের রেখে একটু আড়ালে চলে গেলো। এক দেহরক্ষী সালাহুদ্দীনের তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিলো। ইসলামের অমিততেজী সিপাহসালার তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন। দু' চোখ তাঁর মুদ্রিত। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন সালাহুদ্দীন। প্রহরী চকিত নেত্রে খাস দেহরক্ষীদের একবার দেখে নিলো। দেহরক্ষীদের তিন-চারজন দেখলো ওই প্রহরীর উঁকি মারার দৃশ্য। চোখাচোখি হলো পরস্পর। তারা বিষয়টি আমলে নিলো না। অন্যান্য প্রহরীদের নিয়ে গল্প-গুজবে মেতে উঠলো। বাইরের প্রহরী এই সুযোগে তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করলো। কোমরে তার ধারাল খঞ্জর। বের করে এক নজর দেখে নিলো সেটা। বিড়ালের মত পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলো চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা সালাহুদ্দীনের দিকে।

ঠিক তখনই পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন আইউবী। খঞ্জর বিদ্ধ হলো সালাহুদ্দীন আইউবীর মাথার খুলি ঘেষে মাটিতে।

এই মুহূর্তে পার্শ্ব পরিবর্তন না করলে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেতো তাঁর খুলি। সালাহুদ্দীন আইউবী বিদ্যুদ্বেগে ধড়-মড় করে শোয়া থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বুঝে ফেললেন, কী ঘটছে। ইতিপূর্বে দু'বার একই ধরনের আক্রমণ হয়ে গেছে তাঁর উপর। কালবিলম্ব না করে ঘাতকের চিবুকে পূর্ণ শক্তিতে একটা ঘুষি মারলেন আইউবী। চিবুকের হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার মট্ মট্ শব্দ শোনা গেলো। পিছনের দিকে ছিট্কে পড়ে ভয়ানক আর্তচীৎকার দিলো ঘাতক।

এই ফাঁকে আইউবী খঞ্জর তুলে নিলেন হাতে। প্রহরীর ভয়ার্ত চীৎকারে দৌড়ে আরো দুই দেহরক্ষী তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করলো। তাদের হাতে খোলা তরবারী। সুলতান বললেন, 'ওকে গ্রেফতার করো'। কিন্তু আইউবীর উপর ঝাপিয়ে পড়লো ওরাও। আইউবী নিজের খঞ্জর দিয়েই দুই তরবারীর মোকাবেলা করলেন। মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী হয়ে গেলো ঘাতক দল।

ইত্যবসরে বাইরের দেহরক্ষী দলের সবাই ঢুকে পড়লো তাঁবুতে। লড়াই বেঁধে গেলো প্রচণ্ড। আইউবী দেখলেন, তাঁর নির্বাচিত দেহরক্ষীরা দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত। বোঝার উপায় ছিলো না, এদের মধ্যে কে তাঁর অনুগত আর কে শত্রুর এজেন্ট। সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে অবস্থা নিরীক্ষণ করলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিপক্ষের তরবারীর আঘাতে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লো উভয় পক্ষের কয়েকজন। আর কিছুসংখ্যক মারাত্মক আহত হয়ে কাতরাতে লাগলো। আহত অবস্থায় পালিয়ে গেলো বাকিরা।

লড়াই থেমে যাওয়ার পর অনুসন্ধানে ধরা পড়লো, আইউবীর একান্ত দেহরক্ষীদের মধ্যে সাতজনই হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ঘাতক সদস্য। যে ঘাতক প্রথম আঘাত হেনেছিলো, তাকে আইউবী নিজেই দেহরক্ষী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। ওই নরাধম তাঁবুতে প্রবেশ করার পর ভিতরের পরিস্থিতি পরিকল্পনার বিপরীত হয়ে গেলো। ওর আর্তচীৎকারে বাকিরাও তাঁবুতে প্রবেশ করলে প্রকৃত প্রহরীরাও ঘটনা আঁচ করতে পেরে দ্রুত প্রতিরোধে এগিয়ে এলো। শত্রুদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেলো। এ যাত্রায়ও বেঁচে গেলেন আইউবী।

ঘাতকের বুকে তরবারী রেখে আইউবী জিজ্ঞেস করলেন— 'কে তুমি? কোত্থেকে কীভাবে এখানে এসেছো? আর কে তোমাকে এ কাজে পাঠিয়েছে?' সত্য স্বীকারোক্তির বিনিময়ে আইউবী ঘাতকের প্রাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঘাতক বলে দিলো, সে ফেদায়ী, আমীর সালেহ-এর এক কেল্লাদার গভর্নর গোমস্তগীন এ কাজে নিযুক্ত করেছে তাকে।

সালাহুদ্দীন আইউবী মুসলিম মিল্লাতের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। খৃষ্টানদের কাছেও কখনোই বিস্মৃত হবার নন তিনি।

সালাহুদ্দীন আইউবীর কীর্তি-কাহিনী ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাসে সংরক্ষিত। তবে তাঁর জীবন ও কর্মের বাঁকে বাঁকে আপনজন ও স্বগোত্রীয়দের হিংসাত্মক শত্রুতা, চরিত্র হনন, চারপাশের মানুষদের দ্বারা বিছানো বহু বিস্তৃত ভয়ংকর চক্রান্তজাল, শত্রুপক্ষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আঘাত আর তাঁর মিশন ব্যর্থ করতে খৃষ্টান-ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও সুন্দরী নারীদের পাতা ফাঁদের কথা ইতিহাসের পাতায় বিস্তারিত বিবৃত হয়নি। সেসব অজানা ইতিহাস আমি বলার ইচ্ছা রাখি।

❖ ❖ ❖

১১৬৯ সালের ২৩ মার্চ। সালাহুদ্দীন আইউবী সেনাপ্রধান হয়ে মিসরে আগমন করলেন। ফাতেমী খেলাফতের কেন্দ্রীয় খলীফা তাঁকে এ পদে নিযুক্ত করে বাগদাদ থেকে প্রেরণ করেন।

মিসরের সেনাপ্রধান ও শাসকের গুরুত্বপূর্ণ পদে আইউবীর মত তরুণের নিযুক্তি স্থানীয় প্রশাসকদের দৃষ্টিতে ছিলো অনভিপ্রেত। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকদের দৃষ্টিতে আইউবী হলেন যথোপযুক্ত ব্যক্তি। বয়সে তরুণ হলেও আইউবী শাসক বংশের সন্তান। বাল্যকাল থেকেই কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে রপ্ত করেছেন যুদ্ধবিদ্যা। অল্প বয়সেই যুদ্ধের ময়দানে প্রমাণ করেছেন নিজের বিরল প্রতিভা ও অসামান্য দূরদর্শিতা।

সালাহুদ্দীন আইউবীর দৃষ্টিতে দেশ শাসন বাদশাহী নয়– জনসেবা। জাতির ইজ্জত-সম্মান, সমৃদ্ধি-উন্নতি এবং সেবার মাধ্যমে নাগরিকদের সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা-ই শাসকদের দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু তিনি ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন মুসলিম শাসকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-অনৈক্য, একে অন্যকে ঘায়েল করার জন্যে আমীর-ওমরার মধ্যে খৃষ্টানদের সাথে ভয়ংকর বন্ধুত্ব স্থাপনের আত্মঘাতি প্রতিযোগিতা।

শাসকদের সিংহভাগ জাগতিক বিলাস-প্রমোদে মত্ত। মদ, নারী আর নাচ-গানে শাসক শ্রেণী আকণ্ঠ ডুবন্ত। জীবনকে জাগতিক আরাম-আয়েশের বাহারী রঙে সাজিয়ে রেখেছে কর্তারা। মিল্লাতের ঐতিহ্য, মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত ও সম্ভাবনাকে শাসক শ্রেণী নিক্ষেপ করেছে অতল-গহ্বরে।

আমীর, উজীর, উপদেষ্টা ও বড় বড় আমলার হেরেমগুলো বিদেশী খৃষ্টান সুন্দরী তরুণীদের নৃত্য-গীতে মুখরিত। শাসকদের হেরেমগুলোকে আলোকিত

করে রেখেছে খৃষ্টান-ইহুদীদের প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা কিশোরীরা। শাসকদের বোধ ও চেতনা সব ওদের হাতের মুঠোয়। খৃষ্টান গোয়েন্দা মেয়েরা মুসলিম শাসকদের হেরেমে অবস্থান করে মদ-সুরা, নাচ-গান আর দেহ দিয়ে শুধু শাসকদের কব্জায়-ই রাখছে না– মুসলিম খেলাফতের প্রাণরস ভিতর থেকে উঁই পোকার মত খেয়ে খেয়ে অসাড় করে দিচ্ছিলো তারা।

খৃষ্টান রাজারা ইসলামী সালতানাতগুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। মুসলিম শাসকদের মধ্যে বপণ করছে সংঘাত ও প্রতিহিংসার ধ্বংসাত্মক বীজ। এ কাজে খৃষ্টানরা এতই সাফল্য অর্জন করলো যে, কিছুসংখ্যক মুসলিম শাসক খৃষ্টান সম্রাট ফ্র্যাংককে বাৎসরিক ট্যাক্সও দিতে শুরু করলেন। পরস্পর প্রতিহিংসাপরায়ণ মুসলিম শাসকদের ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলোতে গোপন সন্ত্রাস ও হামলা চালিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করে নিরাপত্তা চাঁদাও আদায় করছিলো খৃষ্টান রাজারা। প্রজাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলেও ক্ষমতার মসনদ রক্ষা করতে প্রজাদের রক্ত শুষে ট্যাক্স আদায় করে খৃষ্টান রাজাদের বাৎসরিক সেলামী আদায় করছিলো মুসলিম শাসকরা।

সামাজিক সংঘাত, আত্মকলহ ও শ্রেণীগত বিরোধে তখন মুসলমানদের একতা-সংহতি বিলীন। ধর্মীয় দলাদলি, মাযহাবী মতবিরোধে মুসলিম সম্প্রদায় শতধা বিভক্ত। হাসান ইবনে সাব্বাহ নামের এক ভণ্ড ইহুদী-পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভে মিসরের সমাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে আভির্ভূত হয়। গোপনে গড়ে তোলে নিজস্ব গোয়েন্দা, সেনা ও সুইসাইড বাহিনী। এরা জঘন্য গুপ্ত হত্যায় এতই প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, 'হাশীশ বাহিনী' রূপে সারা মিসরে এরা খ্যাত।

এই সাব্বাহ বাহিনীর সাথে সালাহুদ্দীনের পরিচয় বাগদাদে। মাদরাসা নিজামুল মুল্‌কে পড়াশোনাকালীন সময়ে সালাহুদ্দীন জানতে পারেন, সাব্বাহ বাহিনীর গুপ্তঘাতকেরা নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো নিজামিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা নিজামুল মুল্‌ককে।

নিজামুল মুল্‌ক ছিলেন মুসলিম খেলাফতের একজন যশস্বী গভর্নর। সুশাসক ও গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন তিনি। মুসলমানদের সর্বাধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে এবং ইহুদী-খৃষ্টানদের বিপরীতে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতেই গভর্নর নিজামুদ্দীন গড়ে তোলেন মাদরাসা নিজামিয়া। অল্পদিনের মধ্যে নিজামিয়া মাদরাসা বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিতদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং

শিক্ষা-দীক্ষায় খ্যাতি লাভ করে। ওখানকার শিক্ষার্থীরা ইসলাম বিরোধীদের উপযুক্ত মোকাবেলা করার যোগ্য হিসেবে গড়ে ওঠে। মাদরাসা নিজামিয়ায় আবশ্যিক রাখা হয় সামরিক প্রশিক্ষণ ও সমরকলা।

খৃষ্টানদের কাছে এ বিষয়টি মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠে তাদের অস্তিত্বের জন্যে। তাই ওরা চক্রান্ত আঁটে। ওদের যোগসাজশে নিজামুল মুল্‌কের দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয় সাব্বাহ বাহিনী। সাব্বাহ্ বাহিনীকে হাত করে খৃষ্টান চক্রান্তকারীরা হত্যা করে নিজামুল মুল্‌ককে। এ ঘটনা সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্মের প্রায় শত বছর আগের।

নিজামুল মুল্‌কের মৃত্যু হলেও মাদরাসা নিজামিয়া বন্ধ হয়ে যায়নি। অব্যাহত থাকে ইসলামের সৈনিক তৈরীর প্রচেষ্টা। ওখানেই জাগতিক ও ধর্মীয়– বিশেষ করে যুদ্ধ-বিদ্যায় প্রশিক্ষণ নেন সালাহুদ্দীন। রাজনীতি, কূটনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধ কৌশলের উপর আইউবীর গভীর আগ্রহের কারণে নুরুদ্দীন জঙ্গী ও চাচা শেরেকোহ তাঁর জন্যে স্পেশাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষা অবস্থায়ই তাঁকে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয় বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যেতো আইউবীর অসাধারণ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা। অনুপম কর্মকৌশলে মুগ্ধ হয়ে জঙ্গী তাকে মিসরের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেন। এখান থেকেই আইউবীর সংগ্রামী জীবনের সূচনা।

❖ ❖ ❖

সেনাপ্রধান ও গভর্নর হয়ে মিসরে পদার্পণ করলেন সালাহুদ্দীন আইউবী। রাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল তাঁর সম্মানে। স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা করলো জমকালো অনুষ্ঠানের। সার্বিক আয়োজনের নেতৃত্ব দিলেন সেনা অধিনায়ক নাজি।

নাজি মিসরের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান, পঞ্চাশ হাজার নিয়মিত বাহিনীর অধিনায়ক। মিসরে নাজি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি। মুকুটহীন সম্রাট। ভবিষ্যত গভর্নর হিসেবে নিজেকেই একমাত্র ফাতেমী খেলাফতের যোগ্য উত্তরসূরী মনে করেন তিনি। সালাহুদ্দীন আইউবীর নিয়োগে স্বপ্নভঙ্গ হলো তাঁর। তবে দমে গেলেন না তিনি। সালাহুদ্দীন আইউবীকে দেখেই নাজি আশ্বস্ত হলেন, এই বালক তাঁর জন্যে মোটেও সমস্যা হবে না। নিজের দাপট যথারীতি বহাল রাখতে পারবেন তিনি।

আইউবীর আগমনে বড় বড় সেনা অফিসার ও গুরুত্বপূর্ণ আমলাদের অনেকেরই ভ্রু কুঞ্চিত হলো। অনেকেই নিজেকে ভাবছিলো মিসরের ভাবী

গভর্নররূপে। তরুণ সালাহুদ্দীনকে দেখে চোখাচোখি করলো তারা। অনেকের দৃষ্টিতে ছিলো তাচ্ছিল্যের ভাব। তারা জানতো না সালাহুদ্দীন আইউবীর যোগ্যতা। শুধু জানতো, সালাহুদ্দীন শাসক পরিবারের ছেলে। তাঁকে চাচা শেরেকোহ'র স্থলাভিষিক্ত করে পাঠানো হয়েছে। নুরুদ্দীন জঙ্গীর সাথে তাঁর আত্মীয়তা রয়েছে।

এক প্রবীণ অফিসার টিপ্পনী কাটলো— 'ছেলে মানুষ; আমরা তাকে গড়ে নেব।'

অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন আর অফিসারদের সমাবেশে আইউবী প্রথমে কিছুটা বিব্রতবোধ করলেন। নাজির কটাক্ষ চাহনি আর কর্মকর্তাদের বিদ্রূপ আইউবী উপলব্ধি করলেন কি-না বলা মুশকিল। তবে বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ কর্মকর্তাদের ভীড়ের মধ্যে নিজেকে নিতান্তই বালক মনে হচ্ছিলো তাঁর। দ্রুত নিজেকে সামলে অফিসারদের প্রতি মনোযোগী হলেন আইউবী। পিতার বয়সী জেনারেল নাজির প্রতি হাত বাড়িয়ে দিলেন মোসাফাহার জন্যে। তোষামোদে সিদ্ধহস্ত নাজি পৌত্তলিকদের মত মাথা নীচু করে কুর্নিশ করলো আইউবীকে। তারপর কপালে চুমু দিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললো—

'আমার বুকের শেষ রক্তফোঁটা দিয়ে হলেও তোমাকে হেফাজত করবো। তুমি আমার কাছে শেরেকোহ ও জঙ্গীর পবিত্র আমানত।'

'আমার জীবন ইসলামের মর্যাদার চেয়ে বেশী মূল্যবান নয় সম্মানিত জেনারেল! নিজের প্রতি ফোঁটা রক্ত সংরক্ষণ করে রাখুন। ক্রুসেডারদের চক্রান্ত কালো মেঘের মত আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।' নাজির হাতে চুমো খেয়ে বললেন আইউবী।

জবাবে মুচকি হাসলেন নাজি, যেন আইউবী তাকে মজার কোন কৌতুক শোনালেন।

নাজি অভিজ্ঞ অধিনায়ক। মিসরের সেনাবাহিনীর অধিপতি। তার বাহিনীতে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার সুদানী, যারা সবাই প্রশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। নাজির মুচকি হাসির রহস্য আইউবী বুঝতে না পারলেও এতটুকু অনুধাবন করলেন যে, এ কৌশলী ও বিজ্ঞ সেনাপতিকে তাঁর বড্ড প্রয়োজন।

নাজি মিসরেই শুধু নয়— গোটা ইসলামী খেলাফতের মধ্যে একজন ধুরন্ধর প্রকৃতির সেনাপতি। নিজ দক্ষতায় পঞ্চাশ হাজার সুদানী বাহিনী দিয়ে স্পেশাল বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন সে। তার অধীন সৈন্যরাই পালন করতো শাসকদের

দেহরক্ষীর দায়িত্ব। মিসরের গভর্নরের দেহরক্ষীর দায়িত্বও ন্যস্ত ছিলো নাজির স্পেশাল বাহিনীর হাতে। স্পেশাল বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক নাজির অনুগত। তার নির্দেশে অকাতরে জীবন দিতে সামান্যতম দ্বিধা করে না কেউ। বিরাট বাহিনীর কর্তৃত্বের বদৌলতে নাজি মিসর ও আশ-পাশের অন্যান্য শাসকদের জন্য ছিলেন একটি ত্রাস। শক্তিশালী সেনাবাহিনী আর কূটচালে নাজি এ অঞ্চলের মুকুটবিহীন সম্রাট। তাকে চ্যালেঞ্জ করে এমন শক্তি কারো নেই। কূটকৌশলে নাজি এমনই দক্ষ যে, সরাসরি সিংহাসনে আসীন না হলেও তাকে মনে করা হতো মসনদের কারিগর। নিজের কূটচালে নাজি ইচ্ছেমত শাসকদের ক্ষমতায় আসীন করতেন আর ইচ্ছে হলে সরিয়ে দিতো। প্রশাসনে নাজিকে বলা হতো সকল দুষ্টবুদ্ধির আধার। সালাহুদ্দীন আইউবীর কথার জবাবে নাজির মুচকি হাসির রহস্য অন্যরা হয়ত ঠিকই বুঝে নিলো। সালাহুদ্দীন অতসব গভীর চিন্তা না করলেও এতটুকু ঠিকই ধরে নিলেন, এই শক্তিধর সেনাপতিকে তার বড় বেশি প্রয়োজন।

'অনেক পথ সফর করে এসেছেন মহামান্য গভর্নর! খানিক বিশ্রাম করে নিন।' বললো প্রবীণ এক অফিসার।

'আমার মাথায় যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, আমি সে গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্য নই। এই দায়িত্ব আমার ঘুম আর আরাম কেড়ে নিয়েছে। আপনারা আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন, যেখানে কর্তব্যসমূহ আমার অপেক্ষা করছে।' বললেন আইউবী।

'দায়িত্ব বুঝে নেয়ার আগে আহারটা সেরে নিলে ভাল হয় না?' আইউবীর উদ্দেশে বললো নাজির সহকারী।

একটু কী যেন চিন্তা করলেন আইউবী। তারপর হাঁটা দিলেন সামনের দিকে।

বিশাল এক হলরুম। আইউবীর ডানে নাজি, বাঁয়ে নাজির সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড ঈদরৌস। আগে পিছনে সশস্ত্র দেহরক্ষী। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে, গার্ড অব অনার দিচ্ছে নাজির স্পেশাল বাহিনীর নির্বাচিত সদস্যরা। স্পেশাল বাহিনীর সৌকর্য, সুঠামদেহ, উন্নত হাতিয়ার, অভ্যর্থনা আর গার্ড অব অনারের বিন্যস্ত আয়োজন দেখে আইউবীর চোখ আনন্দে চিক্ চিক্ করে উঠলো। এমন একটি সুগঠিত বাহিনীর স্বপ্ন-ই দেখছিলেন তিনি।

কিন্তু হলের গেটে গিয়ে আইউবী স্তম্ভিত হলেন। চিন্তায় ছেদ পড়লো তাঁর। থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

সুরম্য হলঘর। প্রবেশ পথে উন্নত গালিচা বিছানো।

দরজায় পা রেখেই মলিন হয়ে গেলো আইউবীর চেহারা। নেমে এলো বিষাদ। চার উর্বশী তরুণী তাকে দেখেই নৃত্যের ভঙ্গিতে শরীর দুলিয়ে ঝুঁকে অভিবাদন জানালো। তাদের হাতে ঝুড়িভর্তি তাজা ফুল। ফুলগুলো শৈল্পিক ভঙ্গিতে ছিটিয়ে দিতে থাকলো আইউবীর পদতলে, তাঁর যাত্রা পথে।

তরুণীদের পরনে মিহি রেশমের সাদা ধবধবে ঘাগরী। পিঠে ছড়ানো সোনালী চুল। তাদের ঝুলেপড়া জুলফি বাড়িয়ে তুলেছে চেহারার রওনক। তরুণীদের শরীরের দ্যুতি সূক্ষ্ম কাপড়ের বাইরে ঠিক্‌রে পড়ছে যেনো। ওদের নৃত্য-ভঙ্গিমার তালে বেজে উঠলো তবলা। সানাইয়ের সুর। সঙ্গীতের মূর্ছনা।

তাজা ফুল পায়ের কাছে নিক্ষিপ্ত হতেই দ্রুত পা পিছিয়ে নিলেন আইউবী। ডানে নাজি আর বাঁয়ে নাজির সহকারী। আইউবীকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালো তারা।

'মোলায়েম ফুল-পাপড়ি মাড়াতে আসেনি সালাহুদ্দীন।' ঠোঁটে রহস্যময় হাসির আভা ছড়িয়ে দিয়ে বললেন আইউবী। এমন নির্মল রহস্যময় হাসি আর দেখেননি কখনো নাজি।

'আমরা জনাবের চলার পথে আসমানের তারা এনেও বিছিয়ে দিতে পারি মাননীয় গভর্নর!' বললেন নাজি।

'আমার যাত্রা পথে শুধু একটা জিনিস বিছানো থাকলে তা আমাকে সন্তুষ্ট করবে।' বললেন আইউবী।

'আদেশ করুন হুজুর কেবলা!' –গদগদ চিত্তে বললো নাজির সহকারী– 'কোন্ সে জিনিস, যা আপনার পায়ের তলায় ছড়িয়ে দিলে আপনাকে আনন্দ দেয়?'

'ক্রুসেডারদের লাশ।' ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সুরে মুচকি হেসে বললেন আইউবী। নিমিষেই তাঁর চেহারা কঠিন হয়ে গেলো। চোখ থেকে ঠিক্‌রে বেরুতে থাকলো অগ্নিদৃষ্টি। ভর্ৎসনামাখা অনুচ্চ আওয়াজে বললেন–

'মুসলমানদের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয় জেনারেল!'

মুহূর্তের মধ্যে পান্ডুর হয়ে গেলো অফিসারের মুখমণ্ডল।

আইউবী বললেন— 'আপনারা কি জানেন না, খৃষ্টানরা মুসলিম সালতানাতকে ইঁদুরের মত কুরে কুরে টুকরো টুকরো করছে? বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে আমাদের? জানেন কি, কেন সফল হচ্ছে ওরা? যে দিন থেকে আমরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে ফুলের পাপড়ী মাড়াতে শুরু করেছি, নিজেদের যুবতী কন্যাদের

নগ্ন করে ওদের সম্ভ্রম ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছি, সেদিন থেকে ব্যর্থতা-ই হয়ে গেছে আমাদের বিধিলিপি। আমরা মাতৃত্বের মর্যাদা আর নারীর ইজ্জত রক্ষা করতে পারছি না। আপনারা জেনে রাখুন, আমার দৃষ্টি ফিলিস্তীনে নিবদ্ধ। আপনারা আমার পথে ফুল বিছিয়ে মিসরেও কি ইসলামের পতাকা ভূলুণ্ঠিত করতে চান?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দিকটা এক নজর দেখে জলদগম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন আইউবী–

'আমার পথ থেকে ফুলগুলো সরিয়ে নাও। ফুল মাড়িয়ে গেলে ও-ফুলের কাঁটা আমার হৃদয়টাকে ঝাঝরা করে দেবে। আমার পথের তরুণীদের হটাও। আমি চাইনা ওদের রেশমী চুলে আটকে পড়ে আমার তরবারী অকেজো হয়ে যাক।'

'আর আমাকে কখনও 'হুজুর কেবলা' বলে সম্বোধন করবেন না।' কঠোর ঝাঝের স্বরে বললেন আইউবী। তাঁর তিরস্কারে যেন অফিসারদের দেহ থেকে মাথাগুলো সব বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

'হুজুর কেবলা' তো তিনি, যার আনীত কালেমা পড়ে আমরা সবাই মুসলমান হয়েছি। এই অধম তাঁর নগণ্য অনুগত উম্মত মাত্র। আমি তাঁর পয়গাম বুকে ধারণ করেই মিসর এসেছি। তাঁর আদর্শ রক্ষায় আমি আমার জীবন কোরবান করেছি। খৃষ্টানরা আমার বুক থেকে এই পবিত্র পয়গাম ছিনিয়ে নিতে চায়, মদের জোয়ার রোম সাগরে ডুবিয়ে দিতে চায় ইসলামের ঝাণ্ডা। আমি আপনাদের বাদশা হয়ে আসিনি– এসেছি ইসলামের একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক হয়ে।'

নাজির ইশারায় তরুণীরা ফুলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আড়াল হয়ে গেলো। দ্রুতপায়ে হলরুমে প্রবেশ করলেন সুলতান সালাহুদ্দীন।

রাজকীয় দরবার হল। মাঝখানে এক লম্বা টেবিলে থোকা থোকা ফুলের তোড়া। দীর্ঘ চওড়া টেবিলের চারপাশে সাজানো রাজসিক খাবার। আস্ত মুরগী, খাসির রান, দুম্বার বক্ষদেশের মোলায়েম গোশ্‌তের রকমারী আয়োজন। কক্ষময় খাবারের মৌতাত গন্ধ।

টেবিলের এক পার্শ্বে রক্ষিত সালাহুদ্দীনের জন্যে বিশেষ আসন। আইউবী দৃঢ়পদে আসনের পাশে দাঁড়ালেন। পাশের এক অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন–

'মিসরের সব নাগরিক কি এ ধরনের খাবার খেতে পায়?'

'না, সম্মানিত গভর্নর! সাধারণ মানুষ তো এ ধরনের খাবার স্বপ্নেও দেখে না।'

'তোমরা কি সে জাতির সদস্য নও, যে জাতির সাধারণ মানুষ এমন খাবার স্বপ্নেও দেখে না?'

কারো পক্ষ থেকে কোন জবাব এলো না।

'এখানে ডিউটিরত যত কর্মচারী আছে, সবাইকে ডেকে ভিতরে নিয়ে এসো। এ খাবার তারা সবাই খাবে।' নির্দেশের স্বরে বললেন আইউবী।

সালাহুদ্দীন একটি রুটি হাতে নিয়ে তাতে দু' টুকরো গোশত যোগ করে খেয়ে নিলেন। দ্রুত আহারপর্ব শেষ করে নাজিকে নিয়ে গভর্নরের দফতরে চলে গেলেন।

জাঁকজমকপূর্ণ গভর্নর হাউজ। দফতর নয়, যেন এক জান্নাতি বালাখানা। দাফতরিক প্রয়োজনের চেয়ে আয়েশী আয়োজন-উপকরণ-ই বেশী। দফতরের বিন্যাসে মারাত্মক বৈষম্য। গভর্নর হাউজের দাফতরিক পরিস্থিতি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন আইউবী। তাঁর আগেই এখানে চলে আসা আলী বিন সুফিয়ান ততক্ষণে দেখে নিয়েছেন গভর্নর হাউজের খুঁটিনাটি। আইউবী নাজির কাছ থেকে জেনে নিলেন বিভিন্ন বিষয়।

দু' ঘন্টা পর গভর্নর হাউজ থেকে বেরিয়ে এলো নাজি। দ্রুতপায়ে নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। এক লাফে ঘোড়ায় আরোহণ করে লাগাম টেনে ধরলেন। প্রশিক্ষিত ঘোড়া ক্ষিপ্রগতিতে চলে গেলো দৃষ্টিসীমার বাইরে।

নিঝুম রাত। নাজির খাস কামরায় জমে উঠেছে মদের আসর। মদপানে যোগ দিয়েছে নাজির একান্ত সহযোগী দুই কমাণ্ডার। আজকের আসরের আমেজ ভিন্ন। কোন নৃত্যগীত নেই। সবার চেহারা রুক্ষ। গ্লাসের পর গ্লাস ঢেলে দিচ্ছে সাকী। গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে তিনজন।

নীরবতা ভঙ্গ করে নাজি বললেন—

'এসব যৌবনের তেজ, বুঝলে? ক' দিনের মধ্যেই দেখবে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

অভাগা কথায় কথায় বলে— 'কা'বার প্রভুর কসম! ইসলামী সালতানাত থেকে খৃষ্টানদের বিতাড়িত না করে আমি বিশ্রাম নেব না।'

'হু! সালাহুদ্দীন আইউবী!' —তাচ্ছিল্যভরে উচ্চারণ করলো এক কমাণ্ডার— 'সে জানে না, ইসলামী সালতানাতের নিঃশ্বাস ফুরিয়ে আসছে। এখন হুকুমত চালাবে সুদানীরা।'

'আপনি কি বলেননি, স্পেশাল বাহিনীর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সব সুদানী?' –নাজিকে জিজ্ঞেস করলো অপর কমাণ্ডার– 'বলেননি, যাদেরকে তিনি নিজের সৈন্য মনে করছেন, ওরা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না?'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ঈদরৌস! আমি বরং তাকে আশ্বাস দিয়েছি, এই পঞ্চাশ হাজার সুদানী শার্দুল তাঁর আঙুলের ইশারায় খৃষ্টানদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ওদের নিশানা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। অচিরেই ওদের বিশ্বাসের প্রতীক ক্রুশ ভূলুণ্ঠিত হবে। কিন্তু–

থেমে গেলেন নাজি।

'কিন্তু আবার কি?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো উভয় কমাণ্ডার।

নাজি বললেন, কিন্তু সে আমাকে বললো, 'মিসরের নাগরিকদের নিয়ে একটি সেনা ইউনিট গড়ে তুলুন।' বললো, 'এক এলাকার মানুষের উপর সৈন্যবাহিনীকে সীমিত রাখা উচিত নয়।' সে আমাদের বাহিনীর সাথে মিসরীয়দের মিশ্রণ ঘটাতে চায়।

'তা, আপনি কী বললেন?'

'আমি তাকে বলেছি, শীঘ্রই আপনার হুকুম তামিল করা হবে। কিন্তু বাস্তবে আমি কখনই এমনটি করব না।' বললেন নাজি।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর মেজাজ-মর্জি কেমন দেখলেন?' নাজিকে জিজ্ঞেস করলো ঈদরৌস।

'দেখে-ই বোঝা যায়, খুব জেদী।'

'আপনার অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা আর কৌশলের কাছে সালাহুদ্দীন কোন ফ্যাক্টর নয়। নতুন গভর্নর হলো তো, তাই কিছুটা গরম গরম ভাব। দেখবেন, অল্প দিনের মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' বললো অন্য কমাণ্ডার।

'আমি তাঁর মনোভাব বদলাতে দেবো না। আমি তাকে ঘোরের মধ্যেই রাখতে চাই।' ক্ষমতার নেশায় বুঁদ করে রেখেই তাকে শায়েস্তা করবো।' বললেন নাজি।

নাজির খাস ভবনে গভীর রাত পর্যন্ত সুরাপান আর সালাহুদ্দীন আইউবী সম্পর্কে নানা আলোচনা হলো। নাজি সহকর্মীদের নিয়ে ঠিক করলেন যদি সালাহুদ্দীন আইউবী তার কতৃত্বের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে ওঠে, তবে তারা কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হলো।

একদিকে চলছে নাজির চক্রান্ত। অপরদিকে সালাহুদ্দীন আইউবী গভর্নর হাউজে অফিসারদেরকে তাঁর নিয়োগ ও কর্মকৌশলের কথা ব্যাখ্যা করছেন।

আইউবী অফিসারদের জানালেন— 'আমি মিসরের রাজা হয়ে আসিনি আর আমি কাউকে অন্যায় রাজত্ব করতেও দেবো না।'

আইউবী অফিসারদের বললেন— 'সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ছাড়া ইসলামী খেলাফতের দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।' এখানকার সেনাবাহিনীর কাঠামো ও বিন্যাস তাঁর পছন্দ নয়, তা-ও অবহিত করলেন। বললেন— 'পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের স্পেশাল বাহিনীতে সবাই সুদানী নাগরিক। ব্যাপারটি ঠিক নয়। কোন কাজে আঞ্চলিকতার প্রাধান্য থাকা অনুচিত। আমরা সব অঞ্চলের মানুষকেই সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে চাই। সবাই যাতে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের সেবায় কাজ করতে পারে। তাতে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূর হবে। সাধারণ মানুষের জীবন-মানের উন্নতিকল্পে এ পদক্ষেপ ফলপ্রসূ অবদান রাখবে।'

আইউবী অফিসারদের জানালেন— 'আমি জেনারেল নাজিকে বলে দিয়েছি, তিনি যেন মিসরের লোকদেরকে সেনাবাহিনীতে দ্রুত অন্তর্ভুক্ত করেন।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন, নাজি আপনার নির্দেশ পালন করবে?' আইউবীর কাছে জানতে চাইলেন একজন প্রবীণ সচিব।

'কেন? সে আমার নির্দেশ অমান্য করবে নাকি?'

'এড়িয়ে যেতে পারেন'– সচিব বললেন– 'এ ফৌজী কার্যক্রমে তাঁর একক আধিপত্য। তিনি এ ব্যাপারে কারো হুকুম পালন করেন না, বরঞ্চ অন্যকে পালন করতে বাধ্য করেন।'

আইউবী চুপ হয়ে গেলেন। যেনো কথাটি তিনি বুঝতে-ই পারেননি। সচিবের কথায় তাঁর কোন ভাবান্তর হলো না। কিছুক্ষণ ভাবলেশহীন নীরবে বসে থেকে তিনি সবাইকে গভর্নর হাউজ থেকে বিদায় করে দিলেন।

আলী বিন সুফিয়ান খানিকটা দূরে বসে আছেন। আইউবী তাঁকেই শুধু থাকতে ইশারা করলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর তাঁকে কাছে ডাকলেন।

আলী একজন দক্ষ গোয়েন্দা। বয়সে আইউবীর বড়। কিন্তু শরীরের শক্ত গাঁথুনি, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আর দীর্ঘ প্রশিক্ষণ আলীকে যুবকে পরিণত করেছে। নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিশ্বস্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও দূরদর্শী কমাণ্ডার হিসেবে আলীর অবস্থান সবার উপরে। মিসরের স্থানীয় প্রশাসনের দুর্নীতি আর অবিশ্বস্ততার দিকটি বিবেচনায় রেখে জঙ্গী আলীকে আইউবীর সহকর্মী হিসেবে মিসর প্রেরণ করেন সালাহুদ্দীনের অধীনে শুধু আলী নিজেই আসেননি, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন

তার হাতেগড়া সুদক্ষ এক গোয়েন্দা ইউনিট। এরা কমাণ্ডো, গেরিলা অভিযান ও গোয়েন্দাকর্মে পটু। প্রয়োজনে আকাশ থেকে তারকা ছিনিয়ে আনতেও এর দ্বিধা করে না।

আলীর সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয় গুণটি হল, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর একই আদর্শে বিশ্বাসী। ইসলামী খেলাফত ও মুসলমানদের কল্যাণে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে আলী আইউবীর মত সদা প্রস্তুত।

'তুমি কি লক্ষ্য করেছো আলী! ওই অফিসার বলে গেলো, নাজি কারো হুকুম তামিল করে না, অন্যদেরকে সে নির্দেশ মানতে বাধ্য করে শুধু?'

'জী, শুনেছি। আমার মনে হয়, স্পেশাল বাহিনীর প্রধান নাজি নামের এই লোকটি খুবই কুটিল। এ লোক সম্পর্কে আগে থেকেই আমি অনেক কথা জানি। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা নেয়; অথচ প্রকৃত পক্ষে ওরা নাজির ব্যক্তিগত বাহিনী। ব্যক্তিস্বার্থে লোকটি দেশের প্রশাসনিক কাঠামোটিই নষ্ট করে দিয়েছে। প্রশাসনের পদে পদে অনুগত চর বসিয়ে রেখেছে।'

'সেনাবাহিনীতে সব এলাকার লোকের অনুপ্রবেশ ঘটানোর সিদ্ধান্তে আপনার সাথে আমি একমত। অচিরেই আমি এ ব্যাপারে আপনাকে বিস্তারিত জানাবো। সুদানী সৈন্যরা খেলাফতের আনুগত্যের বিপরীতে নাজির আনুগত্য করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেনাবাহিনীর কাঠামোটাই আমাদের বদলে ফেলতে হবে কিংবা এ পদ থেকে নাজিকে সরিয়ে দিতে হবে।'

'আমি প্রশাসনে আমার শত্রু তৈরী করতে চাই না আলী! নাজি আমাদের হাড়ির খবর রাখে। এ মুহূর্তে ওকে অপসারণ করা ঠিক হবে না। নিজেদের রক্ত ঝরাতে আমি তরবারী হাতে নেইনি। আমার তরবারী শত্রুর রক্তের পিয়াসী। আমি সদাচারণ ও ভালোবাসা দিয়ে নাজিকে বাগে আনার চেষ্টা করছি। তুমি ওর সৈন্যদের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে আমাকে জানাও বাহিনীটা আমাদের কতটুকু অনুগত।'

নাজি আনাড়ী লোক নয়। ভালোবাসা আর মমতা দিয়ে ওর দুষ্ট মানসিকতা বদলানোর অবকাশ নেই। নাজি এ-সবের অনেক ঊর্ধ্বে। বেটা একটা সাক্ষাত শয়তান। ক্ষমতা, চালবাজী, দুষ্কর্মই তার পেশা এবং নেশা। লোকটা এত-ই ধূর্ত ও চালাক যে, তোষামোদ দ্বারা সে পাথরকেও মোমের মত গলিয়ে দিতে পারে।

সালাহুদ্দীন আইউবীকেও ঘায়েল করার জন্যে চালবাজী শুরু করলেন নাজী। সামনে কখনো তিনি নিজের আসনে পর্যন্ত বসেন না। 'জী, হ্যাঁ' 'খুব

ভালো,' 'সব ঠিক' রাজ্যের যত তোষামোদ ও চাটুকারিতার উপযোগী শব্দ-বাক্য আছে, সবই তিনি আইউবীর সঙ্গে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। আইউবীর আস্থা অর্জনের জন্যে মিসরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীতে লোক রিক্রুট করতে শুরু করলেন তিনি।

ধূর্তামিপূর্ণ আচরণে আইউবী নাজির প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেন। নাজি আইউবীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, স্পেশাল বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক খেলাফতের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত। সুদানী ফৌজ আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। তারা আপনাকে পেয়ে খুবই গর্বিত। আপনার সম্মানে তারা একটি সংবর্ধনার আয়োজন করার জন্যে আমার কাছে আবেদন করেছে। ওরা আপনাকে সম্মান জানাতে চায়; আপনাকে নিজেদের মতো করে কাছে পেতে ওরা খুব-ই উদগ্রীব।'

সালাহুদ্দীন আইউবী নাজির প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। বললেন— 'আমি আপনার ফৌজের দেয়া সংবর্ধনায় যাবো।'

কিন্তু দাফতরিক কাজের ঝামেলায় আইউবী নাজির অনুষ্ঠানের জন্যে সময় বের করতে পারছিলেন না। তাই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি পিছিয়ে গেলো কয়েক দিনের জন্য।

নিঝুম রাত। নাজি তার খাস কামরায় অধীন দুই কমাণ্ডার নিয়ে সুরাপানে বিভোর। গায়ে হালকা কাপড়, পায়ে নুপুর, চোখে-মুখে প্রসাধনী মেখে অপ্সরা সেজে কামোদ্দীপক ভঙ্গিতে নাচছে দুই সুন্দরী নর্তকী।

নাজির খাস কামরায় যে কারোর প্রবেশাধিকার নেই। যারা নাজির ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আর একান্ত সেবিকা, নর্তকী, সাকি একমাত্র তাদেরই সিডিউল মতো নাজির ঘরে প্রবেশের অধিকার আছে। দারোয়ান জানতো, কখন কাদের প্রবেশের অনুমতি রয়েছে।

হঠাৎ নাজির ঘরে প্রবেশ করে কানে কানে কি যেনো বললো দারোয়ান। নাজি দারোয়ানের পিছনে পিছনে উঠে এলো সঙ্গে সঙ্গে। দারোয়ান নাজিকে পার্শ্বের কক্ষে নিয়ে গেলো।

কক্ষে উপবিষ্ট এক পৌঢ়। সাথে এক তরুণী। যৌবন যেন ঠিক্‌রে পড়ছে মেয়েটির দেহ থেকে। নাজিকে দেখেই তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালো।

চোখের চাহনিতে গলে পড়লো মায়াবী আকুতি। তরুণীর রূপের জৌলুসে তন্ময় হয়ে দীর্ঘক্ষণ অপলক তাকিয়ে রইলো নাজি।

তরুণীর গায়ে ফিনফিনে হালকা পোশাক। খুব দামী না হলেও বেশ আকর্ষণীয়।

নাজি অভিজ্ঞ নারী শিকারী। নিজের ভোগের জন্যই শুধু নয়, নারীকে তিনি ব্যবহার করেন অন্য বহু কাজে। বড় বড় অফিসার, আমীর-উমরাকে নারীর ফাঁদে ফাঁসিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা নাজির অন্যতম কৌশল। সুন্দরী তরুণীদের গোয়েন্দা কাজে ব্যবহার করেও নাজি সৃষ্টি করে রেখেছে নিরাপদ এক জগৎ। এ জগতে আধিপত্য শুধুই নাজির।

কসাই জন্তু দেখেই যেমন বলতে পারে এতে কত কেজি গোশত হবে, নাজিও নারী দেখলেই বলতে পারে, ও কী কাজের হবে, কোন্ কাজে একে ব্যবহার করলে বেশী ফায়দা পাওয়া যাবে।

নারী ব্যবসায়ী, চোরাচালানী, অপহরণকারীদের সাথে নাজির গভীর হৃদ্যতা। ওরা সবসময়ই নাজির জন্যে নিয়ে আসে সেরা চালান। নাজি অকাতরে অর্থ দিয়ে কিনে নেয় তার পছন্দনীয় মেয়েদের। এই পৌঢ় লোকটিও নারী ব্যবসায়ীর মতো। গায়ে আজানু-লম্বিত সুদানী পোশাক। নাজিকে বললো, এই মেয়েটি নাচ-গানে বেশ পারদর্শী। মুখের ভাষা যাদুমাখা। কথার যাদুমন্ত্রে পাথর গলাতে পারে। যে কাউকে মুহূর্তের মধ্যে বশ করতে পারঙ্গম। আর রূপ-লাবণ্য তো আপনার সামনেই। আমি এমন সুন্দরী মেয়ে জীবনে কমই দেখেছি। আপনিই এর যোগ্য বলে সরাসরি আপনার কাছে নিয়ে এলাম।

তরুণীর সৌন্দর্যে নাজি মুগ্ধ। মেয়েটির বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা যাচাই করার জন্যে দু'-চার কথায় তরুণীর ইন্টারভিউ নিয়ে নিলেন নাজি। তরুণীর সাথে কথা বলে নাজির মনে হলো, এ অনেক এক্সপার্ট। এ ধরনের মেয়েই তিনি তালাশ করছেন। সামান্য প্রশিক্ষণ দিলেই একে বিশেষ কাজে ব্যবহার করা যাবে।

দাম-দস্তর ঠিক হলো। মূল্য বুঝে নিয়ে চলে গেলো বেপারী। নাজি খাস কামরায় নিয়ে গেলেন মেয়েটিকে। কক্ষে তখন তুমুল নৃত্য-গান চলছে।

নাজি ঘরে প্রবেশ করতেই ওদের নাচ বন্ধ হয়ে গেলো। নাজি নতুন মেয়েটিকে নাচতে বললেন।

পরিধেয় কাপড়ের পাট খুলে দু' পাক ঘুরে হাত-পা-কোমর দুলিয়ে নাচ শুরু করতেই ওর নাচের মুদ্রা ও মনকাড়া ভঙ্গি দেখে হ্যা হয়ে তোলেন নাজি ও তার

সহকর্মীরা। অনির্বচনীয় এই তরুণীর নাচ। এ যেন নাচ নয়, মরুর বুকে তীব্র ঝড়। সে ঝড়ে মানুষের কামভাব, দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণাকে শুধু একই তন্ত্রে পুঞ্জিভূত করে। মেয়েটির উর্বশী শরীর, কণ্ঠের সুরলহরী আর অঙ্গের পাগলকরা কম্পন মুহূর্ত মধ্যে মাতিয়ে তুললো নাজির কক্ষটিকে।

নাজি এবং তার সাথীরাই অবাক্ হলো না শুধু। দুই পুরাতন নর্তকীর চেহারাও পান্ডুর হয়ে গেলো ওর যাদুময়ী কণ্ঠ আর নাচের তালে। নাজির মনে হলো, খুব বেশী সস্তায় অনেক দামী জিনিস পেয়ে গেছেন তিনি। যোগ্যতা ও সৌন্দর্যের হিসেবে দাম অনেক বেশী হওয়া উচিত ছিলো মেয়েটির।

নাজির প্রতি ঝুঁকে নাচের ভঙ্গিতে কুর্নিশ করলো তরুণী। নাচের ঘুর্ণনে বার বার নাজির গায়ে বুলিয়ে দিচ্ছিলো কোমল অঙ্গের মোলায়েম পরশ। তরুণীর সৌন্দর্যে আনমনা হয়ে পড়লো নাজি।

আচমকা সবাইকে বিদায় করে দিলো নাজি। দরজা বন্ধ। কক্ষে শুধু নাজি আর তরুণী। কাছে ডাকলো তরুণীকে। বসাল নিজের একান্ত সান্নিধ্যে।

'নাম কী তোমার?'

'জোকি।'

'বেপারী বললো, তুমি নাকি পাথর গলাতে পারো। আমি তোমার এই যোগ্যতার পরীক্ষা নিতে চাই।'

'কোন্ সে পাথর, যাকে পানি করে দিতে হবে বলুন?'

'নয়া আমীর ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক আইউবীকে। তাকে পানির মত গলিয়ে দিতে হবে তোমাকে।' বললেন নাজি।

'সালাহুদ্দীন আইউবী?' জিজ্ঞাসা করলো জোকি।

'হ্যাঁ, সালাহুদ্দীন আইউবী। তুমি যদি তাকে বশে আনতে পারো, তবে আমি তোমাকে তোমার ওজনের সমান স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবো।'

'তিনি কি মদপান করেন?'

'না। মদ, নারী, নাচ-গান, আমোদ-ফুর্তিকে সে এমনই ঘৃণা করে, যেমন একজন মুসলমান শূকরকে ঘৃণা করে।'

'আমি শুনেছি, আপনার কাছে নাকি এমন যুবতীও রয়েছে, যাদের দেহের সৌন্দর্য আর কলা-কৌশল নীল নদের স্রোতকেও রুদ্ধ করে দিতে পারে। ওদের যাদু কি ব্যর্থ?'

এ ক্ষেত্রে আমি ওদের পরীক্ষা করিনি। আমার বিশ্বাস, তুমিই এ কাজের জন্য উপযুক্ত। আমি তোমাকে আইউবীর আচরণ-অভ্যাস সম্পর্কে আরো বলবো!'

'আপনি কি তাকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করাতে চান?'

'না। এখনই এমন কিছু করতে চাই না। তার প্রতি আমার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই। আমি শুধু তোমার রূপের জালে তাকে ফাঁসাতে চাই। তাকে আমার পাশে বসিয়ে শরাব পান করাতে চাই। তাকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে সে কাজ হাশীশ গোষ্ঠী দিয়ে আরো সহজেই করান যেতো।'

'তার মানে আপনি তাঁর সাথে মিত্রতা গড়ে তুলতে চান, তাই না?'

জোকির দূরদর্শিতায় অভিভূত হলেন নাজি।

কথার ফাঁকে জোকি নিজের দেহের উষ্ণতায় নাজিকে কাছে নিয়ে এলো। গায়ের সুগন্ধি, সোনালী চুল, মায়াবী চোখের চটুল চাহনী আর মুখের যাদুময়তায় নাজি ক্রমশ এলিয়ে দিচ্ছিলো নিজেকে জোকির দিকে।

জোকির বুদ্ধিদীপ্ত কথায় নাজি তার সোনালী চুলের গোছা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বললেন— 'হ্যাঁ জোকি! আমি তার সাথে দোস্তী করতে চাই। তবে সে দোস্তী হবে আমার আনুগত্য ও মর্যাদার ভিত্তিতে। আমি চাই সেও আমার পানের আসরের একজন অতিথি হোক।'

'এর জন্য আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

নাজি একটু ভাবলেন। বললেন, বলছি তোমাকে কী করতে হবে। তবে তার আগেই তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, সালাহুদ্দীন আইউবীর কথায় রয়েছে আমার চেয়েও বেশী যাদু। তোমার ভাষা, সৌন্দর্য, চালাকীর যাদু যদি কার্যকর না হয়, তবে তোমাকে জীবন্ত রাখা হবে না। সালাহুদ্দীন আইউবীও তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আর আমাকে ফাঁকি দিয়েও তুমি রক্ষা পাবে না। এ জন্যই আমি তোমাকে সব খোলাখুলি বলছি। অন্যথায় তোমার মতো একটি বাজারী মেয়ের সাথে আমার ন্যায় একজন সেনা অধিনায়ক প্রথম সাক্ষাতেই এতো কথা কখনও বলে না।'

'ভবিষ্যতই বলবে কার কথা ঠিক থাকে। আপনি আমাকে শুধু এতটুক বলে দিন, সালাহুদ্দীন আইউবী পর্যন্ত আমি কীভাবে পৌছবো?' বললো জোকি।

'আমি তাঁর সম্মানে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করছি। সেটি হবে রাতের বেলায়। খুবই আড়ম্বরপূর্ণ। ওই রাতে তাঁকে অনুষ্ঠানস্থলে একটি তাঁবুতে

রাখবো। তোমাকে সেই তাঁবুতে ঢুকিয়ে দেবো। শুধু এতটুকু কাজের জন্যই আমি তোমাকে আনিয়েছি।'

'ঠিক আছে। বাকি পরিকল্পনা আমিই ঠিক করে নেবো।'

চক্রান্তের জাল বুনতেই শেষ হলো রাত। রাতের চাদর ভেদ করে বেরিয়ে এলো দিন। আবার রাত। সমতালে চললো দেশপ্রেম আর দেশদ্রোহীতার বিপরীতমুখী স্রোতের ধারা। এক দিকে আলী ও আইউবী। অপরদিকে নাজি ও তার সহযোগীরা। এভাবে পেরিয়ে গেলো আরো কয়েক রাত। সালাহুদ্দীন আইউবী প্রশাসনিক কাজে বেজায় ব্যস্ত। নতুন সৈন্য রিক্রুটমেন্টের ঝামেলায় নাজির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদানের অবসর পাচ্ছেন না তিনি।

ইত্যবসরে নাজি সম্পর্কে আলী যে রিপোর্ট দিলেন, তা শুনে আইউবীর মনে দেখা দিলো গভীর হতাশা। বললেন— 'তার মানে কি তুমি বলতে চাচ্ছো, এ লোকটি খৃষ্টানদের চেয়েও খতরনাক?'

'নাজি খেলাফতের আস্তিনে একটি কেউটে সাপ।' নাজির দীর্ঘ দুষ্কর্মের ফিরিস্তি শুনিয়ে আলী বললেন। নাজি কিভাবে খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও ব্যক্তিদের চক্রান্তের জালে আটকিয়ে নিঃশেষ করছে এবং অন্যদের তার নির্দেশ মান্য ও আনুগত্য করতে বাধ্য করছে তাও জানালেন। বললেন, তার নিয়ন্ত্রিত সুদানী বাহিনীর সিপাহীরা আপনার কমাণ্ড অমান্য করে তার কথা শুনবে তাতে সন্দেহ নেই। আপনি এ ব্যাপারে কী চিন্তা-ভাবনা করেছেন মাননীয় আমীর!

'শুধু চিন্তায় করিনি, কাজও শুরু করে দিয়েছি।' বললেন আইউবী।

'নতুন রিক্রুটমেন্টদের সুদানী সৈন্যদের সাথে মিশিয়ে দেবো। যার ফলে এরা না হবে সুদানী, না হবে মিসরী। নাজির একক আধিপত্য ও ক্ষমতা আমি খর্ব করে দেয়ার ব্যবস্থা করছি। এটি সমাপ্ত হলেই তাকে তার উপযুক্ত জায়গায় সরিয়ে আনবো।

'আমি বিভিন্ন সূত্রে নিশ্চিত হয়েছি যে, নাজি খৃষ্টানদের সাথেও গাঁটছড়া বেঁধেছে। আপনি যে সময়টায় জীবনের তোয়াক্কা না করে ইসলামী খেলাফতের শক্তিবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির চেষ্টা করছেন, ঠিক তখন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আপনার এ প্রচেষ্টাকে বানচাল করার চক্রান্ত করছে নাজি।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'এ ব্যাপারে তুমি কী করছো?'

'প্রতিরোধ কৌশলের ব্যাপারটি আমার উপরে ছেড়ে দিন। আমার কাজের অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা আমি যথাসময়েই আপনাকে অবহিত করবো।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি নাজির চার পার্শ্বে গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে দিয়েছি। ওর চলাচলের পথ ও অবস্থানে এমন দেয়াল তৈরী করে রেখেছি, যে শুনতেও পায়, অনুধাবনও করতে পারে। প্রয়োজনে প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গ্রহণ করবে। আমার গোয়েন্দাদের ব্যারিকেডের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা নাজির নেই।'

আলী বিন সুফিয়ান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিশ্বস্ত ব্যক্তি। শুধু বিশ্বস্তই নন, আলীর কর্ম দক্ষতার উপরও আইউবীর আস্থা অপরিসীম। তাই তাঁর পরিকল্পনার বিস্তারিত কিছু জানার প্রয়োজন বোধ করেননি আইউবী।

আলী বললেন— 'আমি জানতে পেরেছি, নাজি আপনাকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করছে। এ তথ্য সঠিক হলে, আমি না বলা পর্যন্ত আপনি তার সংবর্ধনা সভায় যাবেন না। এটা আমার অনুরোধ।'

উঠে দাঁড়ালেন আইউবী। দু' হাত পিছনে বেঁধে মেঝেতে পায়চারী করতে লাগলেন। পায়চারী করতে করতে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর কণ্ঠ চিরে। হঠাৎ দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে আলীর উদ্দেশে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–

'আলী! জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। উদ্দেশ্যহীন বেঁচে থাকার চেয়ে জন্মকালেই মরে যাওয়া অনেক ভালো। আমার মাঝে মধ্যে-মনে হয়, জাতির ঐসব লোকই ভাগ্যবান, সুখী, যাদের মধ্যে কোন জাতীয় চিন্তা নেই। তাদের কওমের ইজ্জত-সম্মান, ইসলাম ও মুসলিমের অবনতি-উন্নতি নিয়ে কোন উদ্বেগ নেই, মাথা ব্যথা নেই। বড় আরামে তাদের জীবন কাটে। আয়েশের ঘাটতি হয় না তাদের জীবনে।'

'ওরা হতভাগ্য সম্মানিত আমীর!'

হ্যাঁ, আলী! ওদের নির্বিকার জীবন দেখে যখন আমার মধ্যে এসব চিন্তা ভর করে, তখন কে যেন আমার কানে কানে তোমার কথাটিই বলে দেয়। আমার ভয় হয় আলী! আমরা যদি মুসলিম মিল্লাতের অধঃপতনের ধারা ঠেকাতে না পারি, তবে অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম জাতি মরু-বিয়াবান আর পাহাড়-জঙ্গলে মাথা কুটে মরবে।

মিল্লাত আজ শতধাবিচ্ছিন্ন। খেলাফত তিন ভাগে বিভক্ত।

আমীররা নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো দেশ শাসন করছে। খৃষ্টানদের কাছে বন্ধক দিয়ে দিয়েছে মিল্লাতের মর্যাদা। ওদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে রয়েছে তারা। আমার ভয় হয়, এ ধারা অব্যাহত থাকলে খৃষ্টানদের গোলামে পরিণত হবে সমগ্র জাতি। ওদের হুকুমবরদার হয়ে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের ভবিষ্যত

বংশধরকে। এই অবস্থায় আমাদের কওম জীবিত থাকলেও পরিণত হবে অনুভূতিহীন এক মানবগোষ্ঠীতে।

আলী! বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখো। আমাদের শাসকদের অবস্থা কী করুণ হয়েছে!'

আইউবী নীরব হয়ে গেলেন। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ তাঁর ভারী হয়ে এলো। ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন তিনি।

নীচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে পায়চারী করলেন কিছুক্ষণ। দাঁড়ালেন মাথা সোজা করে। আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন–

'কোন জাতির ধ্বংস উপকরণ যখন জাতির ভেতর থেকেই উত্থিত হয়, তখন আর তাদের ধ্বংস রোখা যায় না আলী! আমাদের খেলাফতের আমীর-উমরার নৈতিক অধঃপতন যদি রোধ করা না যায়, তবে খৃষ্টানদের আর আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে না। পারস্পরিক সংঘাত, বিদ্বেষ, লোভ আর হিংসার যে আগুন আমরা নিজেদের মধ্যে প্রজ্বলিত করেছি, ঈমান ও জাতির মর্যাদা ও কর্তব্যকে ভুলে আত্মঘাতী যে সংঘাতে আমরা লিপ্ত হয়েছি, খৃষ্টানরা তাতে ঘি ঢালবে শুধু। আমরা ওদের চক্রান্তে নিজেদের আগুনেই ধ্বংস হয়ে যাবো। জাতির শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত আমাদের আত্মঘাতী সংঘাতেই ব্যয়িত হবে।

জানি না, আমি আমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারবো কি-না। হয়ত খৃষ্টানদের কাছে আমার পরাজয়বরণ করতে হবে। আমি কওমকে এ কথাটাই জানিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিতে চাই শুধু–

'কাফেরের সাথে মুসলমানদের সখ্য হতে পারে না। বেঈমানদের সাথে ঈমানদারদের বন্ধুত্ব হতে পারে না। খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের সমঝোতা হতে পারে না। ওদের শুধু বিরোধিতা নয়– কঠোরভাবে দমন করাই মুসলমানদের কর্তব্য। এতে যদি যুদ্ধ করে জীবনও দিতে হয়, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই।'

'আপনার মধ্যে হতাশা ভর করেছে মাননীয় আমীর! কথা থেকেই বোঝা যায়, আপনি নিজের সংকল্পে সন্দিহান।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'হতাশা আমাকে ভর করেনি আলী! নিরাশা আমাকে কখনো কাবু করতে পারে না। আমি আমৃত্যু কর্তব্য পালনে সামান্যতম ত্রুটি করবো না।' বললেন আইউবী।

ফের আলীর দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আইউবী বললেন–

'সৈন্যভর্তির কাজটি বেগবান করো। এমন সব লোকদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করবে, যাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

আর জরুরী ভিত্তিতে তুমি একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা ইউনিট গড়ে তোল। তারা গোয়েন্দাগীরির পাশাপাশি শত্রু এলাকায় রাতে গুপ্ত হামলা চালাবে। তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে, যাতে মরুভূমির উটের মত দীর্ঘসময় ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এই ইউনিটের সদস্যরা হবে বাঘের চেয়ে ক্ষিপ্র, বাজের মত তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, হরিণের মতো সতর্ক আর সিংহের মতো সাহসী। মদের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ থাকবে না। নারীর প্রতি হবে নিরাসক্ত। সর্বোপরি ঈমানদার, নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে এই স্কোয়াডে প্রাধান্য দিবে।'

আলী! এ কাজটি তুমি খুব তাড়াতাড়ি সমাধা করে ফেলো। খেয়াল রাখবে, আমি সংখ্যাধিক্যে বিশ্বাসী নই। আমি চাই জানবাজ যোদ্ধা। অথর্বদের সংখ্যাধিক্য আমার দরকার নেই। আমি চাই এমন যোদ্ধা, যাদের মধ্যে আছে দেশপ্রেম, জাতিসত্ত্বার প্রতি যাদের আছে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার, যারা হবে সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ– যারা আমার উদ্দেশ্য ও সংকল্পকে অনুধাবন ও ধারণ করতে সক্ষম। যারা কখনও এমন সংশয়াপন্ন হয় না যে, কেন আমাদের প্রাণঘাতি যুদ্ধে লিপ্ত করা হচ্ছে।'

দশদিন চলে গেলো। এই দশদিনে আমীরে মেসেরের সৈন্য বাহিনীতে দশ হাজারের বেশী অভিজ্ঞ যোদ্ধা ভর্তি হলো।

অপরদিকে এ দশদিনে নাজি জোকিকে ট্রেনিং দিয়েছে, সালাহুদ্দীন আইউবীকে কীভাবে তার রূপের জালে ফাঁসাতে হবে।

জোকি ভেনাসের মতো সুন্দরী। নাজির যে সহকর্মীই জোকিকে দেখেছে, সে মন্তব্য করেছে, মিসরের ফেরাউন জোকিকে দেখলে তাকে পাওয়ার জন্যে সে খোদা দাবির কথা ভুলে যেতো।

নাজির নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনী চক্রান্ত বাস্তবায়নে তৎপর। শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতার বিচারে এরা অসাধারণ।

নাজি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন, আলী বিন সুফিয়ান আইউবীর প্রধান উপদেষ্টা। একজন চৌকস আরব গোয়েন্দার মতোই মনে হয় আলীকে। আলীর সহযোগিতা থাকলে আইউবীকে ঘায়েল করা কঠিন হবে বুঝে নাজি আগে তার

গোয়েন্দা বাহিনীকে আলীর পিছনে নিয়োগ করলেন। তিনি গোয়েন্দাদের নির্দেশ দেন, 'আলীর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করবে।'

সালাহুদ্দীন আইউবীকে ফাঁসানোর জন্যে জোকিকে প্রস্তুত করছিলেন নাজি। অথচ মরক্কোর এই স্বর্ণকেশীর সোনালী চুলে বাঁধা পড়লেন তিনি নিজে। নাজি বিন্দুমাত্র টের পেলেন না, জোকির মুক্তাঝরা হাসি, অনুপম বাচনভঙ্গি আর নাচ-গানের ফাঁদে বাঁধা পড়ে গেছেন তিনি নিজেই।

জোকি নাজিকে এতোই আসক্ত করে ফেললো যে, চক্রান্তের প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় সে মেয়েটিকে নিজের কোলে বসিয়ে রাখতো। নাজিরই দেয়া পোশাক, সুগন্ধি আর প্রসাধনী ব্যবহার করে জোকি তাকে বেঁধে ফেললো। ফেঁসে গেলেন নাজী তার রূপ-যৌবনের মাদকতায়, যাদুকরী চাহনী আর দেহের উষ্ণতায়।

এ কয়দিনে নাজি ভুলে গেলেন তার একান্ত প্রমোদ সঙ্গীনীদের, যাদের নাচ-গান আর শরীরের উষ্ণতা ছিলো তার একান্ত চাওয়া-পাওয়া। চার-পাঁচ দিন চলে গেলো। একবারের জন্যও তিনি সেবিকাদের একান্তে খাস কামরায় ডাকলেন না। এ কয়দিন সারাক্ষণ জোকিকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন নাজি।

এই নর্তকী-সেবিকা– রক্ষিতাদের কাছে নাজি পরম আরাধ্য। এদের কাছে নাজির সান্নিধ্য ছিলো নারীত্বের বিনিময়ে দীর্ঘ ত্যাগের পরম পাওয়া। মুহূর্তের জন্যে তার সান্নিধ্য হাতছাড়া করা ছিলো এদের জন্যে মৃত্যুসম যন্ত্রণা।

জোকির আগমনে নাজির এ পরিবর্তন সহ্য করতে পারলো না দুই নর্তকী-রক্ষিতা। মেয়েটাকে হত্যা করে পথের কাটা সরিয়ে দেয়ার ফন্দি করলো ওরা। কিন্তু কাজটি সহজ নয় মোটেই।

জোকির ঘরের বাইরে সার্বক্ষণিক দুই কাফ্রীকে পাহারাদার নিযুক্ত করলেন নাজি। জোকি ঘর থেকে বের হতো না তেমন। অনুমতি নেই নতর্কীদেরও ঘরের বাইরে যাওয়ার। বহু চিন্তা-ভাবনা করে ওরা হেরেমের এক দাসীকে প্ররোচিত করার সিদ্ধান্ত নিলো।

দু'জন ঠিক করলো, দাসীর মাধ্যমে খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যা করবে জোকিকে।

❖ ❖ ❖

আলী বিন সুফিয়ান মিসরের পুরাতন আমীরের দেহরক্ষী বাহিনী বদল করে আইউবীর দেহরক্ষী বাহিনীতে নতুন লোক নিয়োগ করলেন। এরা সবাই আলীর

নতুন রিক্রুটকরা সৈন্য। যোগ্যতার বিচারে এরা অদ্বিতীয়। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান– বিশ্বস্ত আর সাহস ও বীরত্বে সকলের সেরা।

নিজের গড়া গার্ড বাহিনীর পরিবর্তন মেনে নিতে পারলেন না নাজি। কিন্তু প্রকাশ্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ দেখালেন না তিনি। উল্টো গার্ড বাহিনীর পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে মোসাহেবী কথায় ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এরই ফাঁকে বিনয়ের সাথে আবার আইউবীকে সংবর্ধনায় যোগদানের কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আইউবী নাজির দাওয়াত গ্রহণ করলেন। বললেন, দু'-একদিনের মধ্যে জানাবো আমার পক্ষে কোন্দিন অনুষ্ঠানে যাওয়া সম্ভব হবে। মনে মনে কূটচালের সফলতায় উল্লসিত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন নাজি।

নাজি চলে যাওয়ার পর আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের সাথে পরামর্শ করলেন। জানতে চাইলেন কোন্ দিন নাজির অনুষ্ঠানে যাওয়া যায়।

'এখন যে কোন দিন আপনি অনুষ্ঠানে যেতে পারেন। আমার আয়োজন সম্পন্ন।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

পর দিন নাজি দফতরে এলেই আইউবী জানালেন, যে কোন রাতেই আপনার অনুষ্ঠানে যাওয়া যেতে পারে।

নাজি অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ করলেন। আইউবীকে ধারণা দিলেন, অনুষ্ঠানটি হবে জমকালো, অতিশয় আড়ম্বরপূর্ণ। শহর থেকে দূরে। মরুভূমিতে। উপস্থিত হবে বিশিষ্ট নাগরিক ও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। সৈন্য বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট কুচকাওয়াজ ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে। অন্ধকার রাতে মশালের আলোয় অনুষ্ঠিত হবে পুরো অনুষ্ঠান। বিভিন্ন তাঁবু থাকবে। সম্মানিত আমীরসহ সবারই রাত যাপনের ব্যবস্থা করা হবে অনুষ্ঠানস্থলে। রাতে সৈন্যরা একটু আমোদ-ফুর্তি, নাচ-গান করবে।

আইউবী অনুষ্ঠানসূচী শুনছিলেন নাজির মুখ থেকে। নাচ-গানের কথা শুনেও তিনি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না।

নাজি একটু সাহস সঞ্চয় করে বার কয়েক ঢোক গিলে বিনয়ী ভঙ্গিতে বললেন, 'সেনা বাহিনীতে বহু অমুসলিম সদস্য আছে। তাছাড়া দুর্বল ঈমানের অধিকারী নওমুসলিমও আছে অনেক। তারা মহামান্য আমীরের সৌজন্যে সংবর্ধনা সভায় একটু প্রাণ খুলে ফুর্তি করতে আগ্রহী। এজন্য তারা ওই দিন মদপানের অনুমতি চায়। তারা এ বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় ও আনন্দময় করে রাখতে চায়।'

'আপনি তাদের অধিনায়ক। আপনি প্রয়োজন বোধ করলে আমার অনুমতির প্রয়োজন কি?' বললেন আইউবী।

'আল্লাহ মহামান্য আমীরের মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিন।' তোষামোদের সুরে বললেন নাজি। সামনে ঝুঁকে অনুগত গোলামের মত কুর্নিশের ভঙ্গিতে বললেন, 'অধম কোন্ ছার! আপনি যা পছন্দ করেন না, তার অনুমতি চেয়ে.........!

'আপনি ওদের জানিয়ে দিন, সংবর্ধনার রাতে হাঙ্গামা-বিশৃংখলা ছাড়া সামরিক নিয়ম মেনে তারা সবই করতে পারবে। মদপান করে কেউ যদি হাঙ্গামা বাঁধায়, তবে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।' বললেন আইউবী।

নাজি কৌশলে মুহূর্ত মধ্যে ব্যারাকে এ খবর ছড়িয়ে দিলো। সালাহুদ্দীন আইউবী নাজির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছেন। শরাব-মদ, নাচ-গান সবকিছু চলবে সেখানে। আইউবী নিজেও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। একথা শুনে সৈন্য বাহিনীতে হুলস্থুল পড়ে গেলো। একজন আরেকজনের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। তাদের চোখে রাজ্যের বিস্ময়, এসব কী শুনছি আমরা! কেউ কেউ দৃঢ় কণ্ঠে বললো, এসব নাজির মিথ্যা প্রচার। নিজের ইমেজ বাড়ানোর জন্য তিনি ভূঁয়া প্রচারণা চালাচ্ছেন।'

কেউ আবার সাবধানে মন্তব্য করলো, 'নাজির যাদু আইউবীকে ঘায়েল করে ফেলেছে। সৈন্য বাহিনীতে যারা সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাদের মধ্যে কিছুটা হতাশা সৃষ্টি করলো এ সংবাদ।

অপরদিকে এ সংবাদ নাজির ভক্ত সেনা অফিসারদের হৃদয়-সমুদ্রে বয়ে আনলো খুশির বন্যা। আইউবীর আগমনের পর থেকেই সেনাবাহিনীতে মদ-সুরা, নাচ-গান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। এ ক'দিনে সেনাবাহিনীর মদ্যপ, লম্পট, প্রমোদবিলাসী অফিসারদের দিনগুলো কেটেছে খুব কষ্টে। যাক্ এবার শুক্‌নো হৃদয়-মন একটু ভিজিয়ে নেয়ার ফুরসত পাওয়া যাবে। তারা এই ভেবে উৎফুল্ল যে, কিছুদিন পরে হয়তো আমীর নিজেও মদ-সুরায় অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।

আলী বিন সুফিয়ান ছাড়া আর কেউ জানতেন না, সালাহুদ্দীন আইউবীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মদপান ও নাচ-গানের এ অনুমতি দানের রহস্য কী।

❖❖❖

অবশেষে একদিন এসে পড়লো কাঙ্ক্ষিত সন্ধ্যা। সূর্য ডুবে গেছে। মরু বিয়াবানে নেমেছে চতুর্দশী জোৎস্নার ঢল। চারদিকের মরুর বালু জোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় চিক্ চিক্ করছে। অসংখ্য মশালের আলোয় মরুভূমি উদ্ভাসিত।

ময়দানের একধারে বিশাল জায়গা জুড়ে সারি সারি তাঁবু। মাঝামাঝি স্থানে সুশোভিত মঞ্চ। অপরূপ কারুকার্যে সাজানো। রং-বেরঙের ঝাড়বাতি আর প্রদীপ্ত মশাল মঞ্চটিকে করে তুলেছে স্বপ্নীল। পাশেই বিশিষ্ট নাগরিক ও অফিসারদের বসার প্যান্ডেল। চতুর্দিকে হাজার হাজার সশস্ত্র প্রহরী। প্রাচীরের মতো নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা।

মঞ্চ থেকে একটু দূরে অনুপম শিল্প সুষমায় তৈরী করা হয়েছে একটি সুদৃশ্য তাঁবু। সেখানে রাতযাপন করবেন স্বয়ং আমীরে মেসের।

আলী বিন সুফিয়ান রাত নামার আগেই আইউবীর জন্য নির্ধারিত তাঁবুর আশেপাশে গোয়েন্দা বাহিনীর কমাণ্ডোদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। এ সময় নাজি তার বিশেষ তাঁবুতে জোকিকে শেষ নির্দেশনা দানে মহাব্যস্ত।

জোকি আজ সেজেছে অপরূপ সাজে। আকাশ থেকে যেন মর্তে নেমে এসেছে কোন রূপের পরী। কড়া সুগন্ধী দিয়ে স্নাত হয়েছে মেয়েটি। সূক্ষ্ম কারুকার্যের ধবধবে সাদা কাশফুলের মত কোমল এক প্রস্থ কাপড়ে সেজেছে জোকি। সোনালী চুলগুলো ছেড়ে দিয়েছে উন্মুক্ত কাঁধে। শ্বেতশুভ্র কাঁধের চুলগুলো এলোমেলো হয়ে জোকিকে করে তুলেছে স্বপ্নকন্যা। পটলচেরা হরিণী চোখে কাজল মেখে যেন হয়ে উঠেছে রহস্যময়ী। কণ্ঠে তো রয়েছেই যাদুর বাঁশি। নৃত্যে রয়েছে হৃদয় ছিনিয়ে নেয়ার তাল। মাতাল করা তার সুরলহরী। এমন কোন দরবেশ নেই, আজ জোকিকে দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে। হালকা কাপড় ভেদ করে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে জোকির বিস্ফোরন্মুখ রূপ-লাবণ্য। রঙিন ঠোঁটের স্মিত হাসিতে যেন ঝরে পড়ছে গোলাপের পাপড়ী।

জোকির আপাদমস্তক একবার গভীর নিরীক্ষার দৃষ্টিতে দেখলেন নাজি। সাফল্যের নেশায় মনটা ভরে উঠছে তার। কিন্তু তারপরও সতর্ক নাজি। জোকিকে আবার সাবধান করে দিলো– 'যদি তোমার এই অপরূপ অনিন্দসুন্দর দেহখানা দিয়ে আইউবীকে বশ করতে না পারো, তাহলে প্রয়োগ করবে মুখের যাদু। আমার শেখানো কথাগুলো ভুলো না যেন। সাবধান! তাঁর কাছে গিয়ে আবার তাঁর দাসী হয়ে যেয়ো না। তুমি তাঁর কাছে হবে ডুমুরের ফুল, যা দূর থেকে দেখা যায়; কখনো ছোয়া যায় না।

এই রূপ-লাবণ্য দিয়ে তুমি তাকে ভৃত্য বানিয়ে নেবে। আমার বিশ্বাস, তুমি পাথর গলাতে পারবে। মিসরের এই মাটিই জন্ম দিয়েছিলো ক্লিওপেট্রার মতো রূপসীকে। নিজের সৌন্দর্য, প্ররোচনা, যাদুকরী কূটচাল আর রূপের আগুনে

গলিয়ে সীজারের মত লৌহমানবকেও মরুর বালিতে পানির মতো বইয়ে দিয়েছিলো সে। ক্লিওপেট্রা তোমার চেয়ে বেশী সুন্দরী ছিলো না। আমি এতোদিন তোমাকে ক্লিওপেট্রার কৌশলই শিখিয়েছি। রমণীর এ চাল ব্যর্থ হয় না কোনদিন।

নাজির কথায় মুচকি হাসলো জোকি। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলো নাজির উপদেশগুলো। মিসরের এই রাতের মরুতে নাগিনীর রূপ ধরে ইতিহাসের পুরনো অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তির আয়োজন করলো নতুন এ ক্লিওপেট্রা।

সূর্য ডুবেছে একটু আগে। আঁধারে মিলিয়ে গেল পশ্চিম আকাশের লালিমা। জ্বলে উঠলো হাজারো মশাল।

ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অনুষ্ঠানের দিকে পা বাড়ালেন আইউবী। মিসরের নতুন আমীরের সম্মানে নাজির এই সংবর্ধনা, সামরিক মহড়া। মিসরের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

আইউবীর ডানে-বাঁয়ে, আগে-পিছে আলী বিন সুফিয়ানের অশ্বারোহী রক্ষী বাহিনী। ওরা আলীর কমাণ্ডো বাহিনীর বিশেষ সদস্য। দশজনকে আইউবীর তাঁবুর চার দিকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো আগেই।

সংবর্ধনা। রাজকীয় অভ্যর্থনা। সুলতান আইউবী ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। ধীরপায়ে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। বেজে উঠলো দফ। পর পর তোপধ্বনি। 'আমীরে মেসের সালাহুদ্দীন আইউবী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মুখরিত হয়ে উঠলো মরু উপত্যকা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে স্বাগত জানালেন নাজি। বললেন, 'ইসলামের রক্ষক, জীবন উৎসর্গকারী সেনাবাহিনী আপনাকে 'খোশ আমদেদ' জানাচ্ছে। তারা আপনার ইঙ্গিতে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। আপনি তাদের প্রাণচাঞ্চল্য দেখুন। আপনাকে পেয়ে তারা ভীষণ গর্বিত।'

সালাহুদ্দীন আইউবী মঞ্চে নিজ আসনের সামনে দাঁড়ালেন। চৌকস সৈন্যদলের একটি দল তাঁকে গার্ড অব অনার দিলো। তিনি তাদের সালাম গ্রহণ করলেন। রাজকীয় মার্চ ফাষ্ট করে ওরা আড়ালে চলে গেলো।

রাজকীয় আসনে বসলেন আইউবী। দূর থেকে কানে ভেসে এলো এক অশ্ব ক্ষুরধ্বনি। প্যান্ডেলের আলোর সীমানায় এলে দেখা গেলো, দুই প্রান্ত থেকে চারটি ঘোড়া ক্ষীপ্রগতিতে মঞ্চের সামনে ময়দানের মাঝ বরাবর এগিয়ে আসছে। প্রত্যেক ঘোড়ায় একজন করে সওয়ার। সবাই নিরস্ত্র।

দেখে মনে হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু না, চোখের পলকে মঞ্চের সোজাসুজি এসে থেমে গেলো তারা। আরোহীরা এক হাতে লাগাম টেনে

ধরে অন্য হাত প্রসারিত করে প্রতিপক্ষকে ডিঙিয়ে যেতে চাইলো। এক পক্ষ অপর পক্ষের আরোহীকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। এক আরোহী প্রতিপক্ষের আরোহীকে বগলদাবা করে তার বাহন থেকে নিজের বাহনে নিয়ে দ্রুত দিগন্তে হারিয়ে গেলো। ঘোড়া থেকে ময়দানে পড়ে ডিগবাজী খাচ্ছিল দুই আরোহী। অশ্ববাহিনীর এই ক্রীড়া-নৈপুণ্যে উপস্থিত দর্শকদের হর্ষধ্বনিতে মরুভূমি কেঁপে উঠলো। হর্ষধ্বনিতে কানে তালা লাগার উপক্রম হলো।

এদের পর দু' প্রান্ত থেকে আরো চারজন করে অশ্বারোহী অনুরূপ ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখালো। একে একে এলো উষ্ট্রারোহী, পদাতিক বাহিনী। এলো নেজা, বল্লম ও তরবারীধারী সৈনিকরা। নানা রকম নৈপুণ্য দেখালো। দর্শকদের উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনিতে অনুষ্ঠানস্থল মুখরিত হয়ে উঠলো।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সৈনিকদের ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখে খুশী হলেন। এমন সৈনিকের প্রত্যাশা-ই মনে লালন করেন তিনি। আলী বিন সুফিয়ানের কানে কানে বললেন, 'এ সৈনিকদের যদি ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত করা যায়, তাহলে এদের দিয়েই খৃষ্টানদের পরাজিত করা যাবে।'

'নাজিকে সরিয়ে দিন; দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। নাজি না থাকলে এদেরকে ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত করা কঠিন হবে না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী নাজির মতো অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সিপাহসালারকে অপসারণ না করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছিলেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সুরাপানের সম্মতি দিয়ে তিনি নিজ চোখে দেখে নিতে চাচ্ছিলেন নাজির নিয়ন্ত্রিত সৈনিকরা আরাম-আয়েশে, ভোগ-বিলাসিতায় কতটুকু নিমজ্জিত; রণকৌশল ও কর্মদক্ষতায় কতটুকু পটু।

নাজির সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন ক্রীড়া-নৈপুণ্য, অস্ত্র-মহড়া, কমাণ্ডো অভিযানের প্রদর্শনীতে প্রমাণিত হলো যুদ্ধবিদ্যা ও বীরত্ব-সাহসিকতায় তারা অসাধারণ। কিন্তু মহড়া শেষে যখন আহারের পর্ব এলো, তখনই ধরা পড়লো তাদের আসল চরিত্র।

বিশাল প্যাণ্ডেলের একদিকে সৈনিকদের খাওয়ার আয়োজন; অপরদিকে আমীর, পদস্থ অফিসার ও বিশিষ্ট নাগরিকদের আহারের ব্যবস্থা। অনুষ্ঠান তো নয়, যেন সুলাইমানী আয়োজন। হাজার হাজার আস্ত খাসি, দুম্বা, মুরগী আর উটের রকমারী রান্না। আরো যত রকম প্রাসঙ্গিক খাদ্য সামগ্রী হতে পারে, কোনটি বাকি রাখেননি নাজি। খাবারের মৌ মৌ গন্ধ গোটা প্যাণ্ডেল জুড়ে।

সৈনিকদের প্রত্যেকের সামনে একটি করে শরাবের মশক। খাবারের চেয়ে যেন মদের প্রতিই তাদের আগ্রহ বেশী। আহার শুরু হতে না হতেই সৈনিকদের মধ্যে মদের মশক দখলের হুড়োহুড়ি শুরু হলো। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত খাবারে হামলে পড়লো সবাই। কিছুক্ষণের মধ্যে নিঃশেষিত আহারের অবশিষ্টাংশ আর মদের সোরাহি নিয়ে শুরু হলো ওদের চেচামেচি, হৈ-হুল্লোড়। উচ্ছৃংখলতা ও হৈ-হুল্লোড় ছড়িয়ে পড়লো ছাউনীর বাইরেও।

নীরবে আইউবী পর্যবেক্ষণ করলেন সৈনিকদের আহারপর্ব। ভাবলেশহীন তাঁর চেহারা। তিনি গভীরভাবে কিছু ভাবছেন চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। সৈনিকদের উচ্ছৃংখল আচরণে তিনি নির্বাক্।

নাজিকে জিজ্ঞেস করলেন— 'হাজার হাজার সৈনিকের মধ্যে অনুষ্ঠানের জন্যে আপনি এদের কী করে বাছাই করলেন? এরা কি আপনার বাহিনীর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সৈনিক?'

'না, মহামান্য আমীর!'– ভৃত্যের মত অনুগত ভঙ্গিতে বললেন নাজি– 'এই দু' হাজার সৈন্য আমার বাহিনীর শ্রেষ্ঠ সৈনিক। আপনি তো এদের মহড়া দেখলেন। যুদ্ধের ময়দানে এদের দুঃসাহসিক লড়াই দেখলে আপনি বিস্মিত হবেন। দয়া করে এদের সাময়িক বিশৃংখলা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন। এরা আপনার ইঙ্গিতে জীবন বাজী রাখতে প্রস্তুত। আমি মাঝে-মধ্যে এদের একটু অবকাশ দেই, যাতে মরার আগে রূপ-রসে ভরা পৃথিবীর স্বাদ কিছুটা উপভোগ করে নিতে পারে।'

আইউবী নাজির অযৌক্তিক ব্যাখ্যায় কোন মন্তব্য করলেন না। আইউবীকে তোষামোদের ঝরনায় স্নাত করে নাজি যখন বিশিষ্ট মেহমানদের কাছে নিজের বাহাদুরী প্রকাশে ব্যস্ত, এ সুযোগে সালাহুদ্দীন আইউবী আলীকে বললেন–

'আমি যা দেখতে চেয়েছিলাম, দেখেছি। সুদানী ফৌজ মদ আর বিশৃংখলায় অভ্যস্ত। তুমি বলেছিলে এদের মধ্যে ইসলামী চেতনা ও দেশপ্রেম নেই। আমি দেখছি এদের সামরিক যোগ্যতাও নেই। এই বাহিনীকে যুদ্ধে পাঠালে যুদ্ধের চেয়ে এরা নিজের জীবন বাঁচানোর ধান্ধায় থাকবে বেশী। গনীমতের সম্পদ লুণ্ঠনের নেশায় থাকবে বিভোর। বিজিত এলাকায় নারীদের বাগে নিয়ে তাদের সাথে পাশবিক আচরণ করবে নিশ্চিত।'

'এর প্রতিকার হলো, আমাদের নতুন রিক্রুটকৃত মিসরীয় সৈনিকদেরকে এদের সাথে একীভূত করে দেয়া। তাহলে ভালোরা ভ্রষ্টগুলোর নৈতিকতাবোধ উন্নত করতে পারবে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

সালাহুদ্দীন আইউবী মুচকি হাসলেন। বললেন— 'আলী! তুমি দেখছি আমার মনের কথাই বলছো! আমিও কিন্তু তা-ই ভাবছিলাম। কিন্তু বিষয়টা আমি এখনই প্রকাশ করতে চাই না। সাবধান! এ পরিকল্পনার কথা যেন কেউ জানতে না পারে।'

আলী বিন সুফিয়ানের অসাধারণ মেধা। তিনি চেহারা দেখেই মানুষের মনের লেখা পড়ে ফেলতে পারেন। মানুষ চেনার ব্যাপারে আলী কখনো ভুল করেন না। তিনি আইউবীকে কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন। এ সময়ে মঞ্চের সামনে হঠাৎ করে জ্বলে উঠলো বাহারী ঝাড়বাতি। মঞ্চের সামনে দামী গালিচা বিছানো। বাদক দলের যন্ত্রে বেজে উঠলো মনমাতানো সুর। ব্যাণ্ড দলের সুরের লহরি আর মরুর মৃদু বাতাসে দুলতে শুরু করলো মঞ্চের শামিয়ানা।

মঞ্চের পিছন থেকে বাজনার সুরে সুরে নৃত্যের তালে তালে এগিয়ে এলো একদল তরুণী। সংখ্যায় বিশজন। পরনে নাচের ঝলমলে পোশাক। আধখোলা দেহ। উন্মুক্ত কাঁধে ছড়ানো রেশমী চুল।

মরু রাতের মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ছে তরুণীদের গায়ের কাপড়। চোখ-মুখ ঢেকে দিচ্ছে চুল। প্রত্যেকের পোশাকের রঙ ভিন্ন; কিন্তু শরীরে গড়ন এক। সবাই উর্বশী তরুণী। আবক্ষ খোলা বাহু দিগন্তে প্রসারিত। বকের মত ডানা মেলে যেন এক গুচ্ছ ফুটন্ত গোলাপ উড়ে আসছে। দেখা যাচ্ছে না তাদের পায়ের নড়াচড়া। এগিয়ে আসছে নৃত্যের ছন্দে দুলে দুলে, যেন বাতাসে ভর করে।

মঞ্চের সামনের গালিচায় এসে অর্ধ বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেলো তারা। আইউবীর দিকে দু' হাত প্রসারিত করে একই সাথে মাথা ঝুঁকালো সবাই। ওদের খোলা চুল এলিয়ে পড়লো কাঁধে। যেন কতগুলো তারা খসে পড়ছে আসমান থেকে। মাথার উপর কারুকার্যমণ্ডিত শামিয়ানা। পায়ের নীচের মহামূল্যবান কার্পেট। নর্তকীদের লতানো শরীর আর অপূর্ব সুরের মূর্ছনায় সৃষ্টি হলো এক স্বপ্নীল নীরবতা।

মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে দৈত্যের মত এক হাবশী ক্ষীপ্রগতিতে এগিয়ে এলো। পরনে চিতা বাঘের চামড়ার মত পোশাক। হাতে বিশাল এক ডালা। ডালায় আধফোটা পদ্মের ন্যায় একটি বস্তু।

তরুণীদের অর্ধবৃত্তের সামনে এসে ডালাটা রেখে দ্রুত আড়াল হয়ে গেলো হাবশী।

সঙ্গীত দলের বাজনা তুঙ্গে উঠলো। বেজে উঠলো আরো জোরে। ডালা থেকে ধীরে ধীরে উত্থিত হলো এক কলি। দেখতে দেখতে সব পাপড়ী মেলে ফুটন্ত গোলাপের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো এক অন্সরী।

মনে হচ্ছিলো লাল মেঘের আবরণ ছিড়ে বেরিয়ে আসছে দ্বাদশীর চাঁদ। এক অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী। ঠোঁটে মুক্তা ঝরানো হাসির ঝিলিক। এ যেন মাটির মানুষ নয়, এক হিরে-পান্নার তৈরী ভিন গ্রহের মায়াবিনী।

দু' হাত প্রসারিত করে নৃত্যের তালে এক পাক ঘুরে অভিবাদন জানালো তরুণী। আইউবীর দিকে চোখের পটলচেরা কটাক্ষ হেনে পলক নেড়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। অভ্যাগত দর্শকরা নৃত্য সঙ্গীতের বাজনা আর তরুণীদের আঁখি মুদিরায় তন্ময়। নিঃশ্বাসটি বেরুচ্ছে না কারো।

আইউবীর দিকে তাকালেন আলী বিন সুফিয়ান। ঠোঁটে রহস্যপূর্ণ হাসি। বললেনল 'মেয়েটি এতটা সুশ্রী হবে ধারণা করিনি।'

'আমীরে মেসেরের জয় হোক' বলতে বলতে এগিয়ে এলেন নাজি। আইউবীর সামনে এসে গদগদ চিত্তে বললেন– 'এর নাম জোকি। আপনার খেদমতের জন্যে একে আমি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আনিয়েছি। এ তরুণী পেশাদার নর্তকী বা বারবণিতা নয়। মেয়েটি ভালো নাচতে ও গাইতে জানে। এটা এর শখ। কখনো কোন অনুষ্ঠানে নাচে না।

মেয়েটির পিঁতা আমার পরিচিত। মাছ ব্যবসায়ী। বাপ-বেটি দু'জনই আপনার খুব ভক্ত। এই মেয়েটি আপনাকে পয়গম্বরের মতো শ্রদ্ধা করে। এক কাজে আমি এর বাবার সাথে সাক্ষাত করতে এদের বাড়ী গেলে মেয়েটি আমাকে বললো– 'শুনেছি, সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরের আমীর হয়ে এসেছেন। মেহেরবানী করে আপনি তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন। তাঁর পায়ে উৎসর্গ করার মতো আমার জীবন আর নাচ ছাড়া কিছুই তো নেই। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হতে চাই।'

'মহামান্য আমীর! আপনার কাছে নাচ-গানের অনুমতি চেয়েছিলাম শুধু এ মেয়েটিকে আপনার খেদমতে পেশ করার জন্যে।'

'আমি নগ্ন নারী আর নাচ-গান পছন্দ করি না, একথা কি আপনি ওকে বলেছিলেন? আর যে মেয়েদের আপনি পোশাক-পরিহিতা বলছেন, ওরা তো উলঙ্গ।' বললেন আইউবী।

'মাননীয় আমীর! আমি ওকে বলেছিলাম, মিসরের আমীর নাচ-গান পছন্দ করেন না। ও বললো, মাননীয় আমীর আমার নাচে অসন্তুষ্ট হবেন না। আমার নাচে কোন নোংরামী থাকবে না, থাকবে শৈল্পিক উপস্থাপনা। মাননীয় আমীরের সামনে আমি নৃত্যের শিল্প সুষমাই উপস্থাপন করবো। মেয়েটি আরো বললো, হায়! আমি যদি ছেলে হতাম, তাহলে মহামান্য আমীরের দেহরক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিজের জান তাঁর জন্যে কুরবান করে দিতাম।' স্বলাজ কম্পিত কণ্ঠে বললেন নাজি।

'আপনি চাচ্ছেন, আমি মেয়েটিকে কাছে ডেকে ধন্যবাদ দিয়ে বলি, 'তুমি হাজার হাজার পুরুষের সামনে উদ্দাম নৃত্যে চমৎকার নৈপুণ্য দেখিয়েছো, পুরুষের পাশবিক শক্তি উস্কে দিতে তুমি খুবই পারঙ্গম, এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, তাই না?'

'না, না আমীরে মেসের! এমন অন্যায় চিন্তা আমি কস্মিনকালেও করিনি।' কাচুমাচু হয়ে বললেন নাজি।

আমি তাকে এই নিশ্চয়তা দিয়ে এনেছি যে, এখানে এলে আপনার সাথে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবো। আপনার সাক্ষাতে ধন্য হতে প্রচণ্ড বাসনা নিয়ে সে অনেক দূর থেকে এসেছে।

আপনি ওর দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন। ওর নাচে পেশাদারিত্বের নোংরামী নেই। নেই কোন পাপের আহ্বান। আছে শৈল্পিক কৌশলে আত্মোৎসর্গের বিনয়ভরা মিনতি। একটু চেয়ে দেখুন, মেয়েটি আপনাকে কী অপূর্ব শ্রদ্ধামাখা দৃষ্টিতে দেখছে। নিঃসন্দেহে ইবাদত আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু এই মেয়ে ওর অনুপম নাচ, মোহিনী দৃষ্টি সবকিছু উজাড় করে দিয়ে আপনার ইবাদত করছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আপনি ওকে আপনার তাঁবুতে যাওয়ার অনুমতি দিন। ওকে মনে করুন সেই মহিয়সী মা, যার উদর থেকে জন্ম নেবে ইসলামের সুরক্ষক জানবাজ মুজাহিদ। ও হবে সেই বীরপ্রসূ মায়েদের একজন। ও সন্তানদের কাছে গর্ব করে বলতে পারবে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর একান্ত সান্নিধ্যধন্য ভাগ্যবতী।'

নাজি আবেগময় ভাষায় আইউবীকে বিশ্বাস করাতে চাইলো যে, এই মেয়েটি এক সম্ভ্রান্ত পিতার নিষ্পাপ কন্যা।

'ঠিক আছে, ওকে আমার তাঁবুতে পৌছিয়ে দেবেন।' বলে নাজিকে আশ্বস্ত করলেন আইউবী।

❖ ❖ ❖

নিজের অপূর্ব নৃত্যকলা দেখাচ্ছিলো জোকি। ধীরে ধীরে শরীর সংকোচিত করে একবার গালিচার উপর বসে যাচ্ছিলো আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো। শারীরিক সংকোচন ও সংবর্ধনের প্রতি মুহূর্তে জোকির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো আইউবীর প্রতি। ওর ভূবন-মোহিনী মুচকি হাসির মধ্যেই ফুটে উঠেছিলো মনের হাজারো কথামালা, বিনয়-নম্র আত্মোৎসর্গের আকুতি। জোকির চারপাশে অন্য মেয়েরাও ডানাকাটা পরীর বেশে উড়ছে মনোহারী প্রজাপতির মতো পাখা মেলে। মরুভূমির চাঁদনী রাতের আকাশে কোটি তারার মেলায় অসংখ্য ঝাড়বাতির আলোয়, শিল্পমণ্ডিত চাদোয়ার নীচে মনে হচ্ছে যেন স্ফটিকস্বচ্ছ পানির পুকুরে রাণীকে কেন্দ্র করে সাঁতার কাটছে একদল জলপরী।

সালাহুদ্দীন আইউবী নীরব। কী ভাবছেন বলা মুশকিল। মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে নাজির সৈন্যরা। সবাই যেন মৃত্যু-যন্ত্রণায় বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ধুঁকছে। ড্যাব-ড্যাবে চোখে তাকাচ্ছে নতর্কীদের প্রতি। দর্শকরা হারিয়ে গেছে স্বপ্নীল জগতে। একটানা বেজে চলছে সঙ্গীতের মৃদু তরঙ্গ। মরুভূমির নিশুতি রাতে অল্পক্ষণ মঞ্চস্থ হচ্ছে ইতিহাসের গোপন অধ্যায়, যা জানবে না সাধারণ মানুষ। যা স্থান পাবে না ইতিহাসের পাতায়।

নিজের সাফল্যে নাজি খুব খুশি। জোকি দেখিয়ে যাচ্ছে যাদুকরী নাচ। সমতালে চলছে বাজনা। গভীর হচ্ছে রাত।

❖ ❖ ❖

রাত অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। বিরতি টানা হলো নৃত্যসঙ্গীতে। সবাই চলে গেলো যার যার তাঁবুতে। জোকি শৈল্পিক ভঙ্গিতে হেলে-দুলে প্রবেশ করলো নাজির কামরায়।

নিজের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন আইউবী। দক্ষ কারিগরের হাতে সাজানো তাঁবু। মেঝেতে ইরানী কার্পেট। দরজায় ঝুলান্ত রেশমী পর্দা। রাজকীয় পালঙ্কে চিতা বাঘের চামড়ায় মোড়ানো বিছানা। ঝুলানো ঝাড়বাতির আলোয় তাঁবুর ভিতরে চাঁদের আলোর স্নিগ্ধতা। বাতাসে দুর্লভ আতরের সুবাস।

আইউবীর পিছনে পিছনে তাঁবুতে ঢুকলো নাজি। বললেন— 'ওকে একটু সময়ের জন্যে পাঠিয়ে দেবো কি? আমি ওয়াদা ভঙ্গকে খুব ভয় করি।'

'হ্যাঁ, দিন।' বললেন আইউবী।

শিয়ালের মত নাচতে নাচতে নিজ তাঁবুর দিকে লাফিয়ে চললেন নাজি।

কয়েক মুহূর্ত পরে প্রহরীরা দেখলো আইউবীর তাঁবুর দিকে অতি সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে এক তরুণী। গায়ে তার নর্তকীর পোশাক।

আইউবীর তাঁবুর চারপাশে প্রখর আলোর মশাল। নাজি তাঁবুর চতুর্দিকে কোন আলোর ব্যবস্থা রাখেননি। ব্যবস্থাটা করেছেন আলী বিন সুফিয়ান। অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্যেই এ আয়োজন, যাতে কোন দুষ্কৃতিকারীর আগমন হলে পরিষ্কার তাকে চেনা যায়। বিশেষ প্রহরার জন্যে আইউবীর তাঁবুর প্রহরীদেরও নিযুক্তি দেন আলী।

তাঁবুর কাছে আসতেই মশালের আলোয় প্রহরীরা দেখতে পেলো নর্তকীকে। এই সেই নর্তকী। এখনও গায়ে তার নাচের ফিনফিনে পোশাক। ঠোঁটে মায়াবী হাসির আভা।

পথ রোধ করে দাঁড়ালো প্রহরী দলের কমাণ্ডার। বললো, এদিকে যেতে পারবে না তুমি।

'মহামান্য আমীর আমাকে তাঁর তাঁবুতে ডেকে পাঠিয়েছেন।' বললো জোকি।

'হু! সালাহুদ্দীন আইউবী তোমার ন্যায় বাজে মেয়েদের সাথে রাত কাটানোর মত আমীর নন।'

'না ডাকলে কোন্ সাহসে আমি এখানে আসবো?'

'কার মাধ্যমে তোমাকে ডেকে পাঠালেন?'

'সেনাপতি নাজি আমাকে বলেছেন, মহামান্য আমীর তোমাকে তাঁর তাঁবুতে ডেকেছেন।'

'বিশ্বাস না হলে তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন। যেতে না দিলে আমি ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আমীরের নির্দেশ অমান্য করার দায়দায়িত্ব আপনার।'

'দেহরক্ষী কমাণ্ডার বিশ্বাস করতে পারছিলো না, সালাহুদ্দীন আইউবী এক নর্তকীকে রাতে তার শয়নঘরে ডেকে পাঠাবেন। আইউবীর চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে কমাণ্ডার অবগত। সে এ আদেশও জানতো যে, কেউ নর্তকী-গায়িকাদের সাথে রাত কাটালে তাঁকে একশ দোররা মারা হবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো কমাণ্ডার। কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না সে। সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত কমাণ্ডার আইউবীর তাঁবুতে ঢুকে পড়লো।

কম্পিত কণ্ঠে বললো— 'বাইরে এক নর্তকী দাঁড়িয়ে আছে। ও বলছে হুজুর জাঁহাপনা নাকি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও।' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আইউবী।

বেরিয়ে এলো কমাণ্ডার।

আইউবীর তাঁবুতে প্রবেশ করলো জোকি। প্রহরীদের ধারণা, এক্ষুণি সালাহুদ্দীন আইউবী নর্তকীকে তাঁবু থেকে বের করে দেবেন। তারা আমীরের সে নির্দেশের জন্যে তাঁবুর কাছেই অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু না। এমন কোন আওয়াজ ভিতর থেকে এলো না।

রাত বাড়ছে। ভিতর থেকে ভেসে আসছে ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠস্বর। অস্থির পায়চারী করছে দেহরক্ষী কমাণ্ডার। তাঁর মাথায় তোলপাড় করছে আকাশ-পাতাল ভাবনা। এক প্রহরী কমাণ্ডারকে বলেই বসলো– 'ও..... যত আইন শুধু আমাদের বেলায়?

'হ্যাঁ, আইন আর শাসন অধীনদেরই জন্য। শাস্তির যত খড়গ প্রজাদের জন্যে।' বললো এক সিপাই।

'মিসরের আমীরের জন্যে কি দোররার শাস্তি প্রযোজ্য নয়?' বললো অন্য এক সিপাই।

'না, রাজা-বাদশার কোন শাস্তি হয় না'– ঝাঝের কণ্ঠে বললো কমাণ্ডার– 'হয়ত সালাহুদ্দীন আইউবী মদও পান করেন। আমাদের উপর কঠোর শাসনের দণ্ড ঠিক রাখতে প্রকাশ্যে একটা পবিত্রতার ভান করেন মাত্র।'

একটি মাত্র ঘটনায় সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতি সৈনিকদের এত দিনের বিশ্বাস কর্পূরের মত উড়ে গেলো। এতদিন যাদের কাছে সালাহুদ্দীন ছিলেন একজন ইসলামী আদর্শের মূর্তপ্রতীক, সে স্থলে তাদের কাছে এখন তিনি ভালো মানুষীর ছদ্মাবরণে পাপাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বিলাসী চরিত্রহীন এক আরব শাহজাদা।

নাজি আজ পরম উৎফুল্ল। সালাহুদ্দীন আইউবীকে ঘায়েল করার সাফল্যে আজ মদ স্পর্শ করেনি সে। আনন্দে দুলছে লোকটা। সহকারী ঈদরৌসও নাজির তাঁবুতে বসা।

'গেলো তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। মনে হয় আমাদের তীর সালাহুদ্দীন আইউবীর অন্তর ভেদ করেছে।' মন্তব্য করলো ঈদরৌস।

'আমার নিক্ষিপ্ত তীর কবে আবার ব্যর্থ হলো?'

বলতে বলতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নাজি। ব্যর্থ হলে দেখতে, আমাদের ছোঁড়া তীর সাথে সাথে আমাদের দিকেই ফিরে আসতো।

'আপনি ঠিক-ই বলেছেন। মানবরূপী একটা যাদুর কাঠি জোকি।' বললো ঈদরৌস। মনে হয় ও হাশীশীদের সাথে কখনো থেকে থাকবে। না হয় মেয়েটা আইউবীর এমন পাথরের মূর্তি ভাঙ্গল কী করে।

'আমি ওকে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, হাশীশীরা তা কল্পনাও করতে পারবে না।' স্বাফল্যের ভঙ্গিতে বললেন নাজি। এখন আইউবীর গলা দিয়ে মদ ঢুকানোর কাজটি শুধু বাকি।

কারো পায়ের শব্দে লাফিয়ে উঠে তাঁবুর বাইরের এলেন নাজি। না, জোকি নয়। এক প্রহরী স্থান বদল করতে হেঁটে যাচ্ছে। নাজি আইউবীর তাঁবুর দিকে তাকালেন। দরজায় পর্দা ঝুলানো। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী।

বিজয়ের হাসিমাখা কণ্ঠে তাঁবুর ভিতরে বসতে বসতে নাজি বললেন— 'এখন আমি নিশ্চিত বলতে পারি, আমার জোকি এতক্ষণে পাথর গলিয়ে পানি করে ফেলেছে।

❖❖❖

রাতের শেষ প্রহর। আইউবীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো জোকি। নাজির তাঁবুতে না গিয়ে উল্টা দিকে রওনা দিলো ও। পথেই আপাদমস্তক কাপড়ে আবৃত এক ব্যক্তি দাঁড়ানো। ক্ষীণ আওয়াজে ডাকলেন— 'জোকি!' দ্রুত পায়ে জোকি চলে গেলো লোকটির কাছে। লোকটি জোকিকে নিয়ে একটি তাঁবুতে প্রবেশ করলো।

জোকি অনেকক্ষণ কাটালো ওই তাঁবুতে। তারপর বেরিয়ে সোজা হাঁটা দিলো নাজির তাঁবুর দিকে।

নাজি তখনও জাগ্রত। বারকয়েক তাকিয়ে দেখেছে আইউবীর তাঁবুর দিকে। সে জোকির আগমনের প্রতীক্ষায়। কিন্তু জোকিকে আসতে দেখেনি। তাঁর ধারণা, জোকি সালাহুদ্দীন আইউবীকে রূপের মায়াজালে আবদ্ধ করেছে। আসমানের সুউচ্চ অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে জোকি তার মর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে।

'ঈদরৌস! রাত তো প্রায় শেষ। ও-তো এখনো এলো না!'

'ও আর আসবেও না'– বললো ঈদরৌস– 'আমীর তাকে সাথে নিয়ে যাবে। এমন হীরের টুকরোকে শাহ্‌জাদারা কখনো ফিরিয়ে দেয় না– এ কথাটি কখনো আপনি ভেবেছেন কি মাননীয় সেনাপতি?'

'না তো! এ দিকটি আমি মোটেও ভাবিনি।'

'এমনও হতে পারে যে, আমীর জোকিকে বিয়ে করে ফেলবেন'– বললো ঈদরৌস— 'তখন আর মেয়েটি আমাদের কাজের থাকবে না।'

'ও খুব সতর্ক মেয়ে। অবশ্য নর্তকীদের উপর ভরসা করা যায় না। তাছাড়া জোকি পেশাদার নর্তকী মেয়ে। এ ধরনের কাজে সে অভিজ্ঞ। ধোঁকা দেয়াটা অস্বাভাবিক নয়।' বললেন নাজি।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে নাজি। তার এতক্ষণের সাফল্যের ঝিলিককে ঘন মেঘমালার আড়ালে হারিয়ে দিয়েছে বিপরীত চিন্তা। এমন সময় পর্দা ফাঁক করে তাঁবুতে প্রবেশ করলো জোকি। হাসতে হাসতে বললো, 'এবার আমায় ওজন করুন আর পাওনা চুকিয়ে দিন।'

'আগে বল কী করে এলে?' পরম আগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন নাজি।

'আপনি যা চাচ্ছিলেন, তা-ই করেছি। কে বললো, আপনাদের সালাহুদ্দীন আইউবী পাথর? আবার উনি নাকি ইস্পাতের মত ধারালো, মুসলমানদের জন্যে আল্লাহর রহমতের ছায়া?

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ দিয়ে মাটি খুড়তে খুড়তে জোকি বললো, সে এখন এই বালু কণার চেয়েও হালকা। এখন সামান্য বাতাসই উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাঁকে।

'তোমার রূপের যাদু আর কথার মন্ত্র তাকে বালুতে পরিণত করেছে'– বললো ঈদরৌস– 'নয়তো হতভাগা পাথুরে পর্বতই ছিলো।'

'ছিলো বটে, তবে এখন বালিয়াড়িও নয়।'

'আমার সম্পর্কে কোন কথা হয়েছে কি?' জিজ্ঞেস করেন নাজি।

'হ্যাঁ, হয়েছে। সালাহুদ্দীন আইউবী জিজ্ঞেস করেছেন, নাজি কেমন মানুষ। আমি বলেছি, মিসরে যদি আপনার কারো উপর নির্ভর করতে হয়, সেই লোকটি একমাত্র নাজি। তিনি জানতে চেয়েছেন, আমি আপনাকে কিভাবে চিনি? বলেছি, নাজি আমার পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি আমাদের বাড়িতে যেতেন এবং আমার পিতাকে বলতেন, 'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর গোলাম। তিনি যদি আমাকে উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, নির্দ্বিধায় আমি তা করতে প্রস্তুত।' তারপর তিনি বললেন, তুমি তো সতী-সাধ্বী মেয়ে। বললাম, আমি আপনার দাসী; আপনার যে কোন আদেশ আমার শিরোধার্য। তিনি বললেন; কিছু সময় তুমি আমার কাছে বসে থাক। আমি তার পার্শ্বে গা ঘেঁষে বসে পড়লাম। মুহূর্ত মধ্যে তিনি মোম হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য আমরা দু'জন প্রেমের অতল সমুদ্রে হারিয়ে গেলাম। পরে তিনি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, জীবনে আমি এ-ই প্রথমবার পাপ করলাম; তুমি আমায় ক্ষমা করে দিও। আমি বললাম, না, আপনি কোন পাপ করেননি। আমার সঙ্গে আপনি প্রতারণাও করেননি, জোর-জবরদস্তিও নয়। রাজা-বাদশাহদের ন্যায় আদেশ দিয়ে আপনি আমায়

ডেকে আনেননি। আমি নিজেই এসে স্বেচ্ছায় আপনার হাতে ধরা দিয়েছি। আসবো আবারো।' বললো জোকি।

আনন্দের আতিশয্যে নাজি বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরলো মেয়েটিকে। নাজি ও জোকিকে মোবারকবাদ জানিয়ে ঈদরৌস বেরিয়ে যায় তাঁবু থেকে।

মরুর রহস্যময় রাতের উদর থেকে জন্ম নিলো যে প্রভাত, তা অন্য কোন প্রভাতের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিলো না। তবে প্রভাত-কিরণ তার আঁধার বক্ষে লুকিয়ে রেখেছিলো এমন একটি গোপন রহস্য, যার দাম সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর স্বপ্নের সালতানাতে ইসলামিয়ার মূল্যের সমান, যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে যৌবন লাভ করেছেন সুলতান আইউবী।

গত রাতে এ মরুদ্যানে যে ঘটনাটি ঘটলো, তার দিক ছিলো দু'টি। একটি দিক সম্পর্কে অবগত ছিলেন শুধু নাজি আর ঈদরৌস। অপর দিক সম্পর্কে অবহিত ছিলো সুলতান আইউবীর রক্ষী বাহিনী। আর সুলতান আইউবী, গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান ও জোকী'র জানা ছিলো ঘটনার উভয় দিক।

সুলতান আইউবী ও তাঁর সহকর্মীদের মর্যাদার সাথে বিদায় জানান নাজি। পথের দু' ধারে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে 'সুলতান আইউবী জিন্দাবাদ' স্লোগান দিচ্ছে সুদানী ফৌজ। কিন্তু এই শ্লোগানের কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন না সুলতান। সামান্য একটু হাসির রেখাও দেখা গেলো না তার দু' ঠোঁটের ফাঁকে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেন সুলতান। অত্যন্ত গম্ভীর মুখে নাজির সঙ্গে করমর্দন করে ছুটে চলেন তিনি।

হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ান ও এক নায়েবকে সঙ্গে করে কক্ষে প্রবেশ করেন। বন্ধ হয়ে যায় কক্ষের দরজা। বেলা শেষে রাত নামে। আঁধারে ছেয়ে যায় প্রকৃতি। বাইরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই কক্ষের এই তিনটি প্রাণীর। খাবার তো দূরের কথা, এত সময়ে এক ফোঁটা পানিও ঢুকলো না কক্ষে। কক্ষের দরজা খুলে যখন তিনজন বাইরে বের হন, রাত তখন দ্বি-প্রহর।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে চলে যান আইউবী। রক্ষী বাহিনীর এক কমাণ্ডার আলী বিন সুফিয়ানের কাছে এগিয়ে এসে বিনীত সুরে বললো— 'মোহতারাম! বিনা বাক্যব্যয়ে আপনাদের আদেশ মান্য করে চলা আমাদের কর্তব্য। তথাপি একটি কথা না বলে পারছি না। আমার ইউনিটে এক রকম হতাশা ও অনাস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি নিজেও তার শিকার হতে চলেছি।'

'কেমন হতাশা?' জানতে চান আলী বিন সুফিয়ান।

'আমার অভিযোগকে যদি আপনি গোস্তাখী মনে না করেন, তবেই বলবো। আমাদের মহামান্য গভর্নরকে আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা মনে করতাম এবং সর্বান্তকরণে তাঁর প্রতি ছিলাম উৎসর্গিত। কিন্তু রাতে ....।' বললো কমাণ্ডার।

'রাতে সুলতান আইউবীর তাঁবুতে একটি নর্তকী গিয়েছিলো, তা-ই তো? তুমি কোন গোস্তাখী করোনি। অপরাধ গভর্নর করুন কিংবা ভৃত্য করুক, শাস্তি দু'জনের-ই সমান। পাপ সর্বাবস্থায়-ই পাপ। তবে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমীরে মেসের ও নর্তকীর নির্জন মিলনের সঙ্গে পাপের কোন সংশ্রব ছিলো না। বিষয়টা কী ছিলো, তা এখনই বলবো না; সময়ে তোমরা সবই জানতে পারবে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

আলী বিন সুফিয়ান কমাণ্ডারের কাঁধে হাত রেখে বললেন, মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোন আমের বিন সালেহ! তুমি একজন প্রবীণ সৈনিক। তোমার ভালো করে-ই জানা আছে, সেনাবাহিনী ও সেনা কর্মকর্তাদের এমন কিছু গোপন রহস্য থাকে, যার সংরক্ষণ আমাদের সকলের কর্তব্য। নর্তকীর আমীরে মেসেরের তাঁবুতে রাত কাটানোও তেমনি এক রহস্য। তুমি তোমাদের জানবাজদের কোন সংশয়ে পড়তে দিও না। রাতে সুলতানের তাঁবুতে কী ঘটেছিলো, তা নিয়ে কাউকে ভুল বুঝবার সুযোগ দিও না।'

আলী বিন সুফিয়ানের বক্তব্যে কমাণ্ডার নিশ্চিত হয়ে যায়। দূর হয়ে যায় তার মনের সব সন্দেহ। বাহিনীর অন্য সকলের মনের খটকাও দূর করে ফেলে সে।

পরদিন দুপুর বেলা। আহার করছেন সুলতান আইউবী। ইত্যবসরে সংবাদ আসে, নাজি আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে। সুলতানের খাওয়া শেষ হলে কক্ষে প্রবেশ করেন নাজি। তার চেহারা বলছে, লোকটা সন্ত্রস্ত ও ক্ষুব্ধ। খানিকটা চড়া গলায় বললো, 'মহামান্য আমীর! এ-কি আদেশ জারি করলেন আপনি! পঞ্চাশ হাজার অভিজ্ঞ সুদানী ফৌজকে মিসরের এই আনাড়ী বাহিনীর মধ্যে একাকার করে দিলেন!'

'হ্যাঁ, নাজি! আমি গতকাল সারাটা দিন এবং আধা রাত ব্যয় করে এবং গভীরভাবে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তুমি যে বাহিনীটির সালার, তাকে মিসরী বাহিনীর সঙ্গে এমনভাবে একাকার করে ফেলবো যে, প্রতিটি ইউনিটে সুদানী সৈন্যের সংখ্যা থাকবে মাত্র দশ শতাংশ। আর এতক্ষণে তুমিও নির্দেশ পেয়ে গেছো, তুমি আর এখন সে বাহিনীর সালার নও, তুমি সেনা হেডকোয়ার্টারে চলে আসবে।'

'মহারাজ! আপনি আমাকে এ কোন্ পাপের শাস্তি দিচ্ছেন?' বললেন নাজি।

'আমার এ সিদ্ধান্ত যদি তোমার মনোঃপূত না হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমার সেনাবাহিনী থেকে সরে দাঁড়াও।' বললেন সুলতান আইউবী।

'আমি বোধ হয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। আমি আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন মনে করি। হেডকোয়ার্টারে আমার অনেক শত্রু আছে।'

'শোন! প্রশাসন ও সেনাবাহিনী থেকে ষড়যন্ত্রের আশংকা যেন চিরতরে দূর হয়ে যায়, তার জন্য-ই আমার এ সিদ্ধান্ত। আরেকটি কারণ, আমি চাই সেনাবাহিনীতে যার পদমর্যাদা যত উঁচু হোক কিংবা যত নিচু, যেন কেউ মদপান ও ব্যভিচার না করে এবং কোন সামরিক মহড়ায় নাচ-গান না হয়।' বললেন সুলতান আইউবী।

'কিন্তু আলীজাহ! আমি তো আয়োজনটা হুজুরের অনুমতি নিয়েই করেছিলাম।' বললেন নাজি।

'তা ঠিক। তুমি যে বাহিনীটিকে মিল্লাতে ইসলামিয়ার সৈনিক বলে দাবি করতে, মদ ও নাচ-গানের অনুমতি আমি তার আসল রূপটা দেখার জন্য-ই দিয়েছিলাম। পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে আমি বরখাস্ত করতে পারি না। তাই মিসরী ফৌজের সঙ্গে একাকার করে আমি তাদের চরিত্র শোধরাবো। আর তুমি এ কথাটিও শুনে নাও যে, আমাদের মধ্যে কোন মিসরী, সুদানী, শামী ও আজমী নেই। আমরা মুসলমান। আমাদের পতাকা এক, ধর্মও অভিন্ন।' বললেন সুলতান আইউবী।

'আমীরে মোহতারাম কি ভেবে দেখেছেন, এতে আমার মর্যাদা কোথায় নেমে যাবে?' ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন নাজি।

'দেখেছি; তুমি যার যোগ্য, তোমায় সেখানে-ই রাখা হবে। নিজের অতীতের পানে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নাও। নিজের কারগুজারী আমার কাছে শুনতে চেও না। যাও, তোমার সৈন্য, সামান-পত্র ও পশু ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত করে এক্ষুণি আমার নায়েবের কাছে হস্তান্তর করো। সাতদিনের মধ্যে আমার হুকুমের তামিল সম্পন্ন হয়ে যায় যেন।

কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে চাইলেন নাজি। কিন্তু সুযোগ না দিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান সুলতান আইউবী।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবীর তাঁবুতে জোকির রাত যাপনের সংবাদ পৌছে গেছে নাজির গোপন হেরেমে। নাজির হেরেমের অন্যান্য মেয়েদের মনে জোকির

বিরুদ্ধে হিংসার আগুন প্রজ্বলিত হয়ে আছে পূর্ব থেকে-ই। এই হেরেমে জোকির আগমন ঘটেছে মাত্র ক'দিন হলো। কিন্তু প্রথম দিনটি থেকে-ই তাকে নিজের সঙ্গে রাখতে শুরু করেছেন নাজি। পলকের জন্য চোখের আড়াল করছেন না সে নবাগতা এই মেয়েটিকে। থাকতে দিয়েছেন আলাদা কক্ষ।

মহলের অন্য মেয়েদের জানা ছিলো না, নাজি জোকিকে সালাহুদ্দীন আইউবীকে মোমে পরিণত করার এবং বড় রকম নাশকতামূলক পরিকল্পনায় কাজ করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। জোকি নাজিকে হাত করে নিয়েছে, এ দেখেই মহলের অন্য মেয়েরা জ্বলে-পুড়ে ছাই হচ্ছে।

হেরেমের দু'টি মেয়ে জোকিকে হত্যা করার কথাও ভাবছিলো। এবার তারা দেখলো, স্বয়ং মিসরের গভর্নরও মেয়েটিকে এমন পছন্দ করে ফেলেছেন যে, জোকিকে তিনি রাতভর নিজের তাঁবুতে রাখলেন। এতে পাগলের মতো হয়ে পড়েছে তারা।

জোকিকে হত্যা করার পন্থা দু'টি। হয়ত বিষ খাওয়াতে হবে, অন্যথায় ভাড়াটিয়া ঘাতক দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে হবে। এর একটিও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, জোকি এখন নিজের কক্ষ থেকে বের হয় না এবং তার কক্ষে ঢুকে বিষ প্রয়োগও সম্ভব নয়।

হেরেমের সবচে' চতুর চাকরানীটিকে হাত করে নিয়েছিলো তারা। এবার দাবি অনুপাতে পুরস্কার দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করে চাকরানীর কাছে। বিচক্ষণ চাকরানী বললো, সালারের শয়নকক্ষে ঢুকে জোকিকে বিষপান করানো সম্ভব নয়। সুযোগমত খঞ্জর দ্বারা খুন করা যেতে পারে। তবে এর জন্য সময়ের প্রয়োজন।

জোকির গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় চাকরানী। মহিলা এ-ও বলে, আমি কোন সুযোগ বের করতে না পারলে হাশীশীদের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। তবে তারা বিনিময় নেয় অনেক। বিনিময় যত প্রয়োজন হয় দেবে বলে নিশ্চয়তা দেয় মেয়ে দু'টো।

❖ ❖ ❖

ক্ষুব্ধ মনে নিজ কক্ষে পায়চারী করছেন নাজি। তাকে শান্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে জোকি। কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে তার ক্ষোভ।

'আইউবীর কাছে আপনি আমাকে আরেকবার যেতে দিন। আমি লোকটাকে বোতলে ভরে ফেলবো।' বললো জোকি।

'লাভ হবে না। কমবখ্‌ত তার নির্দেশনামা জারি করে ফেলেছে; যার বাস্তবায়নও শুরু হয়ে গেছে। লোকটা আমার অস্তিত্ব-ই শেষ করে দিলো। তোমার যাদু তার উপর অচল। আমার বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্রটা কে করলো, তা আমি জানি। বেটা আমার ক্রমবর্ধমান মর্যাদা ও যোগ্যতায় হিংসা করছে। আমি মিসরের গভর্নর হতে যাচ্ছিলাম। আমি মিসরের শাসকবর্গের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতাম। অথচ আমি ছিলাম একজন সাধারণ সালার। এখন আমি একজন সালারও নই।' গর্জে উঠে বললেন নাজি। দারোয়ানকে বললেন, ঈদরৌসকে এক্ষুণি ডেকে আনো।

সংবাদ শুনে সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয় নাজির নায়েব ঈদরৌস। নাজি বলেন, আমি এর উপযুক্ত একটা জবাব ঠিক করে রেখেছি।

'কী জবাব?' জানতে চায় ঈদরৌস।

'বিদ্রোহ।' বললেন নাজি।

শুনে নির্বাক নিস্পলক নাজির প্রতি তাকিয়ে থাকে ঈদরৌস। ক্ষণকাল নীরব থেকে নাজি বললেন, তুমি অবাক্ হয়েছো? এই পঞ্চাশ হাজার সুদানী সৈন্য আমাদের ওফাদার হওয়ার ব্যাপারে তোমার কোন সন্দেহ আছে? এরা কি সালাহুদ্দীন আইউবীর তুলনায় আমাকে ও তোমাকে বেশী মান্য করে না? তুমি কি তোমার বাহিনীকে এই বলে বিদ্রোহের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলতে পারবে না যে, সালাহুদ্দীন আইউবী তোমাদেরকে মিসরীদের গোলামে পরিণত করছে; অথচ মিসর তোমাদের?'

গভীর এক নিঃশ্বাস ছেড়ে ঈদরৌস বললো, 'এরূপ কোন পদক্ষেপ নিয়ে আমি চিন্তা করে দেখিনি। বিদ্রোহের আয়োজন আঙ্গুলের এক ইশারায়-ই হতে পারে। কিন্তু মিসরী বাহিনী আমাদের বিদ্রোহ দমন করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। বাইরের সাহায্য নেয়ার ব্যবস্থাও তাদের আছে। সরকারের বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার আগে সবদিক ভালো করে ভেবে দেখা প্রয়োজন।'

'আমি সবই ভেবে দেখেছি। খৃষ্টান সম্রাটদের কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠাচ্ছি। তুমি দু'জন দূত প্রস্তুত করো। তাদের অনেক দূর যেতে হবে। এসো, আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শোন। জোকি! তুমি তোমার কক্ষে চলে যাও।' বললেন নাজি।

নিজ কক্ষে চলে যায় জোকি। নাজি ও ঈদরৌস পরিকল্পনা আঁটে সারা রাত জেগে।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী দুই বাহিনীকে একীভূত করার সময় ঠিক করেছিলেন সাত দিন। কাগুজে কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। পূর্ণ সহযোগিতা করছেন নাজি। কেটে গেছে চারদিন। এ সময়ে নাজি আরেকবার সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সাক্ষাত করে। কিন্তু কোন অভিযোগ করেননি। বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে সে সালাহুদ্দীন আইউবীকে নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, সপ্তম দিনে দুই বাহিনী এক হয়ে যাবে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নায়েবগণও তাকে নিশ্চিত করে, নাজি বিশ্বস্ততার সাথে সহযোগিতা করছে। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ানের রিপোর্ট ছিলো ভিন্ন রকম। আলীর গোয়েন্দা বিভাগ রিপোর্ট করেছে, সুদানী ফৌজের সিপাহীদের মধ্যে অস্থিরতা ও বিশৃংখলা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মিসরী ফৌজের সঙ্গে একীভূত হতে তারা সম্মত নয়। তাদের মধ্যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, মিসরী ফৌজের সঙ্গে একীভূত হলে তাদের অবস্থান গোলামের মতো হয়ে যাবে। তারা গনীমতের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে এবং তাদেরকে গাধার মত খাটতে হবে। সবচে' বড় ভয়, তাদের মদপান করার অনুমতি থাকবে না।

আলী বিন সুফিয়ান এ রিপোর্ট সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে পৌঁছিয়ে দেন। জবাবে সুলতান বললেন, এরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিলাসিতা করে আসছে তো, তাই হঠাৎ এই পরিবর্তন মনোঃপূত হচ্ছে না। আশা করি ধীরে ধীরে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাদের গা-সহা হয়ে যাবে। এতে চিন্তার কিছু নেই।

'আচ্ছা ঐ মেয়েটির সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়েছে কি?' জিজ্ঞেস করেন সুলতান।

'না। ওর সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমার লোকেরাও ব্যর্থ হয়েছে। নাজি তাকে বন্দী করে রেখেছে।' জবাব দেন আলী বিন সুফিয়ান।

পরের রাতের ঘটনা।

সবেমাত্র আঁধার নেমেছে। জোকি তার কক্ষে উপবিষ্ট। ঈদরৌসকে সঙ্গে নিয়ে নাজি তার কক্ষে বসা। ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পায় জোকি। দরজার পর্দাটা ঈষৎ ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকায় সে। বাইরে দীপের আলোতে দু'জন আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে দেখতে পায় মেয়েটি। পোশাকে তাদেরকে বণিক বলে মনে হলো তার। কিন্তু ঘোড়া থেকে অবতরণ করে যখন তারা নাজির কক্ষের দিকে পা বাড়ায়, তখন তাদের চলনে বুঝা গেলো, লোকগুলো ব্যবসায়ী নয়।

ইত্যবসরে বাইরে বেরিয়ে আসে ঈদরৌস। তাকে দেখেই থেমে যায় আগন্তুকদ্বয়। সামরিক কায়দায় সালাম করে ঈদরৌসকে। ঈদরৌস তাদের চারদিক ঘুরে, আপাদমস্তক গভীরভাবে নিরীক্ষা করে বলে, অস্ত্র কোথায় দেখাও। চোগার পকেট ও আস্তিনের ভিতর থেকে অস্ত্র বের করে দেখায় তারা। ক্ষুদ্র আকারের একটি তরবারী ও একটি করে খঞ্জর। তাদেরকে ভিতরে নিয়ে যায় ঈদরৌস।

গভীর ভাবনায় হারিয়ে যায় জোকি। নিজের কক্ষ থেকে বের হয়ে নাজির কক্ষপাণে হাঁটা দেয়। কিন্তু দারোয়ান দরজায় তার গতিরোধ করে বলে, ভিতরে যেতে পারবেন না, নিষেধ আছে। জোকি বুঝে ফেলে, বিশেষ কোন ব্যাপার আছে। তার মনে পড়ে যায়, দু' রাত আগে নাজি তার উপস্থিতিতে ঈদরৌসকে বলেছিলো, 'আমি খৃষ্টান সম্রাটদের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। তুমি দু'জন দূত প্রস্তুত করো; অনেক দূর যেতে হবে।' তারপর আমাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে বিদ্রোহের কথাও বলেছিলো।

নিজের কক্ষে চলে যায় জোকি। জোকি ও নাজির কক্ষের মধ্যখানে একটি দরজা, যা অপর দিক থেকে বন্ধ। এ দরজাটির সঙ্গে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে যায় জোকি। অপর কক্ষে নাজির কথা বলার ফিস্‌ফিস্ শব্দ শোনা গেলেও বোঝা যাচ্ছে না কিছুই।

কিছুক্ষণ পর নাজীর পরিষ্কার কণ্ঠ শুনতে পায় জোকি। সে বলছে, 'বসতি থেকে দূরে থাকবে। সন্দেহবশত কেউ তোমাদের ধরার চেষ্টা করলে সর্বাগ্রে পত্রটি গায়েব করে ফেলবে। জীবন বাজি রেখে কাজ করবে। পথে যে-ই তোমাদের গতিরাধ করবে, নির্দ্ধিধায় তাকে শেষ করে দেবে। সফর তোমাদের চার দিনের; কিন্তু পৌছে যাওয়ার চেষ্টা করবে তিন দিনে। দিকটা মনে রেখ; উত্তর-পশ্চিম।'

বাইরে বেরিয়ে পড়ে আগন্তুকদ্বয়। জোকিও বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে। নাজি ও ঈদরৌস দাঁড়িয়ে আছে ফটকের সামনে। আরোহীদের বিদায় দেয়ার জন্য-ই তারা বের হয়েছে বোধ হয়।

দু'টি ঘোড়ায় চড়ে দু' আরোহী ছুটে চলে দ্রুত। জোকিকে দেখে নাজি ডাক দিয়ে বলেন, 'আমি বাইরে যাচ্ছি, অনেক কাজ আছে, ফিরতে দেরী হবে, তুমি আরাম করো। একাকী ভালো না লাগলে হেরেমে ঘুরে আসো।'

হাত তুলে 'ঠিক আছে' বলে সম্মতি জানায় জোকি।

মহল ত্যাগ করে চলে যায় নাজি ও ঈদরৌস। কক্ষে প্রবেশ করে জোকি। চোগা পরিধান করে কটিবন্ধে খঞ্জর বাঁধে। কক্ষের দরজায় তালা দিয়ে হাঁটা দেয় হেরেমের দিকে।

জোকির কক্ষ থেকে হেরেমের দূরত্ব কয়েকশ' গজ। দারোয়ানকে অবহিত করে হেরেমে প্রবেশ করে সে। অপ্রত্যাশিতভাবে জোকিকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে হেরেমের মেয়েরা। এ-ই প্রথমবার হেরেমে প্রবেশ করলো জোকি। হেরেমের মেয়েরা তাকে সম্মানের সাথে স্বাগত জানায়। যে দু'টি মেয়ে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিলো, সহাস্যে অভিবাদন জানায় তারাও। কক্ষময় ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জোকি। সবার সাথে কথা বলে ফেরত রওনা হয়। যে চতুর চাকরানীটি তাকে খুন করার দায়িত্ব নিয়েছিলো, বিদায়ের সময় সেও সেখানে উপস্থিত। গভীর দৃষ্টিতে জোকির আপাদমস্তক একবার দেখে নেয় সে। জোকি বেরিয়ে পড়ে বাইরে।

হেরেমের প্রাসাদ আর নাজির বাসগৃহের মধ্যবর্তী জায়গাটা অনাবাদী; কোথাও উচু, কোথাও নীচু। হেরেম থেকে বেরিয়ে জোকি নাজির বাসগৃহে না গিয়ে দ্রুতগতিতে হাঁটা দেয় অন্যদিকে। ওদিকে একটি সরু গলিপথও আছে।

অতি দ্রুত হাঁটছে জোকি। হঠাৎ গলিপথের পনের-বিশ গজ পিছনে একটি কালো ছায়ামূর্তি চোখে পড়ে তার। সেটিও এগিয়ে চলছে দ্রুত। হয়তো বা কোন মানুষ। কিন্তু মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি কালো চাদরে আবৃত থাকায় তাকে ভূত বলেই মনে হলো জোকির কাছে।

হাঁটার গতি আরো বাড়িয়ে দেয় জোকি। সাথে সাথে ভূতের গতি বেড়ে যায় আরো বেশী। সামনে ঘন ঝোপ-ঝাড়। তার মধ্যে অর্ন্তহিত হয়ে যায় জোকি। সেখান থেকে আড়াই থেকে তিনশ' গজ সম্মুখে সুলতান আইউবীর বাসগৃহ, যার আশপাশে সেনা বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের আবাস।

জোকি যাচ্ছিলো ওদিকেই। মেয়েটি ঘন ঝোপের মধ্য থেকে বের হলো বলে, এমন সময় বাঁ দিক থেকে ছায়া মূর্তিটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। জোছনা রাত। তবু ছায়াটির মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে না। তার পায়ের কোন শব্দ নেই। হাতটা উপরে উঠে যায় ছায়াটির। জোছনার আলোয় একটি খঞ্জর চিক করে ওঠে এবং বিদ্যুদ্গতিতে জোকির কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যখানে এসে বিদ্ধ হয়। জোকির মুখ থেকে কোন চীৎকার বেরোয়নি। খঞ্জর তার কাঁধ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এতো গভীর জখম খেয়েও মেয়েটি দ্রুতগতিতে কোমর থেকে খঞ্জর বের করে। ছায়া

মূর্তিটি তার উপর পুনর্বার আক্রমণ চালায়। এবার জোকি আক্রমণকারার খঞ্জরধারী হাতটা নিজের বাহু দ্বারা প্রতিহত করে নিজের খঞ্জরটা তার বুকে সেঁধিয়ে দেয়। আঘাত খেয়ে ছায়া মূর্তিটি চীৎকার করে ওঠে। এবার জোকি বুঝতে পারে আক্রমণকারী মূর্তিটি একজন নারী। জোকি খঞ্জরটা তার বুক থেকে বের করে পুনরায় আঘাত হানে। এবার বিদ্ধ হয় ছায়া মূর্তির পিঠে। আঘাত লাগে নিজের পাজরেও। ছায়া মূর্তিটি ঘুরপাক খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আক্রমণকারী লোকটা কে দেখার চেষ্টা করলো না জোকি। ছুটে চললো গন্তব্যপানে। তার শরীর থেকে ফিনকি ধারায় রক্ত ঝরছে। জোৎস্নালোকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাসগৃহ দেখতে পাচ্ছে জোকি। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর মাথাটা চক্কর খেয়ে ওঠে তার। চলার গতি মন্থর হতে শুরু করেছে। জোকি চীৎকার করে ওঠে- 'আলী! আইউবী! আলী! আইউবী!

পরনের পোশাক রক্তে লাল হয়ে গেছে জোকির। সীমাহীন কষ্টে পা টেনে টেনে অগ্রসর হচ্ছে মেয়েটি। গন্তব্যের কাছে চলে এসেছে সে। কিন্তু বাকি পথ অতিক্রম করা সম্ভব মনে হচ্ছে না। দেহের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে অনর্গল ডেকে চলছে আলী ও আইউবীকে।

নিকটেই একস্থানে একজন টহল সেনা টহল দিয়ে ফিরছিলো। জোকির ডাক শুনে ছুটে আসে সে। জোকি তার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে বললো- 'আমাকে আমীরে মেসেরের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। দ্রুত- অতি দ্রুত। সান্ত্রী মেয়েটিকে পিঠে তুলে সুলতান আইউবীর বাসগৃহ অভিমুখে ছুটে যায়।

❖ ❖ ❖

নিজ কক্ষে বসে আলী বিন সুফিয়ানের নিকট থেকে রিপোর্ট নিচ্ছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। কক্ষে তাঁর দু'জন নায়েবও উপস্থিত। আলী বিন সুফিয়ান বিদ্রোহের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। সে নিয়েই আলাপ-আলোচনা করছেন তাঁরা। চরম ভয়ার্ত চেহারায় কক্ষে প্রবেশ করে দারোয়ান। বলে, এক সেপাহী একটি জখমী মেয়েকে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, মেয়েটি নাকি আমীরে মেসেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে।

শুনেই আলী বিন সুফিয়ান ধনুক থেকে ছুটে যাওয়া তীরের ন্যায় কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। সুলতান আইউবীও তার পেছনে পেছনে ছুটে যান। ইত্যবসরে মেয়েটিকে ভেতরে নিয়ে আসা হয়েছে। সুলতান আইউবী বললেন- 'তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকো।' মেয়েটিকে সুলতান আইউবীর খাটের উপর শুইয়ে দেয়া হলো। মুহূর্ত মধ্যে বিছানাপত্র রক্তে ভিজে যায়।

'ডাক্তার-কবিরাজ কাউকে ডাকতে হবে না'– ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটি বললো– 'আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।

'তোমাকে কে জখম করলো জোকি?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন।

আগে জরুরী কথাগুলো শুনুন– জোকি বললো– 'উত্তর-পূর্ব দিকে ঘোড়া হাঁকান। দু'জন অশ্বারোহীকে যেতে দেখবেন। উভয়ের পোশাকই বাদামী বর্ণের। একটি ঘোড়া বাদামী, অপরটি কালো। লোকগুলোকে দেখতে ব্যবসায়ী মনে হবে। তাদের সঙ্গে সালার নাজির লিখিত পয়গাম আছে, যেটি খৃষ্টান সম্রাট ফ্রাংক বরাবর পাঠানো হয়েছে। নাজির এই সুদানী ফৌজ বিদ্রোহ করবে। আমি আর কিছু জানি না। আপনাদের সালতানাত কঠিন বিপদের সম্মুখীন। অশ্বারোহী দু'জনকে পথেই ধরে ফেলুন। বিস্তারিত তাদের নিকট থেকে জেনে নিন।' বলতে বলতে চৈতন্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করে মেয়েটি।

অল্পক্ষণের মধ্যে দু'জন ডাক্তার এসে পৌঁছেন। তারা মেয়েটির রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে চেষ্টা শুরু করেন। মুখে ঔষধ খাইয়ে দেন। ঔষধের ক্রিয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে জোকি বাকশক্তি ফিরে পায়। জরুরী বার্তা তো আগেই জানিয়ে দিয়েছে। এবার বিস্তারিত বলতে শুরু করে। নাজি ও ঈদরৌসের কথোপকথন, তাকে নিজ কক্ষে পাঠিয়ে দেয়া, নাজির ক্ষুব্ধ হওয়া– দৌড়-ঝাপ এবং দু'জন অশ্বারোহীর আগমন ইত্যাদি সব কথা। শেষে জোকি বললো, আক্রমণকারী কে ছিলো, আমি জানি না। তবে আমার আঘাত খেয়ে আক্রমণকারী যে চীৎকারটা দিয়েছিলো, তাতে বুঝা গেছে লোকটা মহিলা। জোকি আক্রমণের স্থান জানায়। তৎক্ষণাৎ সেখানে দু'জন লোক প্রেরণ করা হয়। জোকি বাঁচবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করে। তার পেট ও পিঠে দু'টি গভীর জখম।

জোকির রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছে না। বেশির ভাগ রক্ত আগেই ঝরে গেছে। সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হাত ধরে চুমু খেয়ে বললো– 'আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার সাম্রাজ্যকে নিরাপদ রাখুন। আপনি পরাজিত হতে পারেন না। সালাহুদ্দীন আইউবীর ঈমান কতো পরিপক্ক আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না।' তারপর আলী বিন সুফিয়ানকে উদ্দেশ করে বললো— 'আমি কর্তব্য পালনে ক্রটি করিনি তো? আপনি আমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমি তা পালন করেছি।'

তুমি প্রয়োজনের বেশি দায়িত্ব পালন করেছো– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আমার তো ধারণাই ছিলোনা, নাজি এতো ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত এবং

তোমাকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। আমি তোমাকে শুধু গুপ্তচরবৃত্তির জন্য প্রেরণ করেছিলাম।'

'হায়, আমি যদি মুসলমান হতাম!'– জোকি বললো– তার চোখে অশ্রু নেমে আসে। বললো– 'আমার এ কাজের যা বিনিময় দেবেন, আমার অন্ধ পিতা ও চিররুগ্ন মাকে দিয়ে দেবেন। তাদের অক্ষমতাই বারো বছর বয়সে আমাকে নর্তকী বানিয়েছিলো।'

জোকির মাথাটা একদিকে ঝুকে পড়ে। চোখ দু'টো আধখোলা। ঠোঁট দুটোও এমনভাবে আছে, যেনো মেয়েটি মিটিমিটি হাসছে। ডাক্তার তার শিরায় হাত রাখেন এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতি তাকিয়ে মাথা নাড়ান। জোকির প্রাণপাখি আহত দেহের খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন– 'মেয়েটার ধর্ম যা-ই থাকুক, তাকে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে দাফন করো। ইসলামের জন্য মেয়েটা নিজের জীবন দান করেছে। ইচ্ছে করলে আমাদেরকে ধোঁকাও দিতে পারতো।'

দারোয়ান কক্ষে প্রবেশ করে বললো, বাইরে এক নারীর লাশ এসেছে। সুলতান আইউবী ও আলী বেরিয়ে দেখেন। মধ্য বয়সী এক মহিলার লাশ। অকুস্থলে দু'টি খঞ্জর পাওয়া গেছে। মহিলাকে কেউ চেনেনা। এ নাজির হেরেমের সেই চাকরানী, যে পুরস্কারের লোভে জোকির উপর সংহারী আক্রমণ চালিয়েছিলো।

জোকিকে রাতেই সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হলো। আর চাকরানীর লাশ পূর্ণ অবজ্ঞার সাথে গর্তে নিক্ষেপ করা হলো। তবে দু'টো কর্মই সম্পাদন করা হলো গোপনে।

সময় নষ্ট না করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী উন্নত জাতের আটটি তাগড়া ঘোড়া এবং আটজন কমাণ্ডো নির্বাচন করে তাদেরকে আলী বিন সুফিয়ানের কমাণ্ডে নাজির প্রেরিত লোক দুটিকে ধাওয়া করে ধরতে পাঠিয়ে দেন।

জোকি ছিলো মারাকেশের এক নর্তকী। কেউ জানতো না তার ধর্ম কী ছিলো। তবে মুসলমান ছিলো না, খৃষ্টানও নয়। আলী বিন সুফিয়ান জানতে পারেন, সুদানী ফৌজের সালার নাজি একজন কুচক্রী ও শয়তান চরিত্রের মানুষ। তার অন্দর মহলের খবরাখবর জানার জন্য আলী গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একটি তথ্য জানতে পারেন, নাজি হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ফেদায়ীদের ন্যায় প্রতিপক্ষকে রূপসী মেয়ে ও হাশিশ দ্বারা ফাঁদে আটকায় এবং

নিজের অনুগত বানায় কিংবা খুন করায়। আলী বিন সুফিয়ান বহু খোঁজাখুঁজির পর এক ব্যক্তির মাধ্যমে জোকিকে মারাকেশ থেকে আনান এবং কৌশলে নাজির নিকট পাঠিয়ে দেন। মেয়েটির মধ্যে এমনই জাদু ছিলো যে, নাজি তাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে ফাঁসানোর কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু মেয়েটি যে তারই জন্য একটি পাতা ফাঁদ, তা সে জানতো না। সুলতান আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানের কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে নাজি নিজেই জোকির ফাঁকে আটকে যায়। জোকির মাধ্যমে তার গোপন সব তথ্য চলে যেতে শুরু করে আইউবী ও আলীর কানে। এই তথ্য গ্রহণই ছিলো মহড়ার দিন মেয়েটিকে নিজ তাঁবুতে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের তাৎপর্য। তাঁবুতে নিয়ে সুলতান আইউবী মেয়েটির সঙ্গে প্রেম নিবেদন করেননি– নাজির কাছে থেকে তার প্রাপ্ত তথ্যাবলীর রিপোর্ট গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটির দুর্ভাগ্য যে, নাজির হেরেমে তার শত্রু জন্মে যায়, তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটা হয় এবং তাকে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়।

❖ ❖ ❖

আট দ্রুতগামী অশ্বারোহী নিয়ে ছুটে চলছেন আলী বিন সুফিয়ান। গন্তব্য দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। সম্রাট ফ্রাংকের হেডকোয়াটার কোথায় তাঁর জানা আছে। সে পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ-ঘাটও চেনা।

এখন পরদিন ভোর বেলা। রাতে তেমন বিশ্রাম করেননি। আরবী ঘোড়া ক্লান্ত হয়েও তাগড়া থাকে। দূর দিগন্তে খেজুর বীথির মধ্যে দু'টি ঘোড়া দেখতে পান আলী। রাস্তা পরিবর্তন ও আড়ালের জন্য তিনি টিলার কোল ঘেঁষে ঘেঁষে চলছেন। মরুভূমির ভেদ-রহস্য তার জানা আছে। লোকালয় ফেলে এখন অনেক দূরে চলে এসেছেন তিনি। বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা নেই তাঁর।

চলার গতি আরো বাড়িয়ে দেন আলী বিন সুফিয়ান। সামনের দুই আরোহী আর তাঁর দলের মধ্যকার ব্যবধান কমপক্ষে চার মাইল ছিলো। এখন দূরত্বটা কমিয়ে এনেছেন তিনি। কিন্তু ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

আলী বিন সুফিয়ান ও তার বাহিনী এখন খেজুর বীথির নিকটে এসে পৌঁছেছেন। সম্মুখের আরোহী দু'জন দু' মাইল দূরে একটি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলছে। বোধ হয় তাদের ঘোড়াও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আরোহী দু'জন ঘোড়া থেকে অবতরণ করে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

ওরা পাহাড়ের আড়ালে বসে পড়েছে বলেই আলী বিন সুফিয়ান রাস্তা বদল করে ফেলেন।

দু' দলের মাঝে ব্যবধান কমে আসছে। এখন দূরত্বটা কয়েক শ' গজের বেশি হবে না। সম্মুখের আরোহীদ্বয় আড়াল থেকে সামনে চলে আসে। পিছনে দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসা ঘোড়ার পদধ্বনি শুনে ফেলেছে তারা। তারা একদিকে সেরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আলী বিন সুফিয়ানের ঘোড়ার গতি আরো বেড়ে যায়। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ঘোড়া আপত্তি জানায় না। তারাও জানে, এই মিশনে আলী ও আইউবীকে সফল হতেই হবে। অতএব, কর্তব্যে অবহেলা করা চলবে না।

দলবলসহ পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন আলী। দু'টি ঘোড়া সে পথে অতিক্রম করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলো। কিন্তু এখনো বেশিদূর যেতে পারেনি। বোধ হয় পিলেয় ভয় ধরে গেছে তাদের। সম্ভবত তারা বেরুবার পথ পাচ্ছে না। একবার ডানে, একবার বাঁয়ে ছুটাছুটি করে ফিরছে শুধু।

আলী বিন সুফিয়ান ঘোড়াগুলো এক সারিতে বিন্যস্ত করে সামনে-পিছনে ঘুরিয়ে দেন এবং পলায়নপর আরোহীদের কাছাকাছি পৌঁছে যান। দু' দলের মাঝের দূরত্ব এখন মাত্র একশ' গজ। এক তীরান্দাজ ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে তীর ছোঁড়ে। তীরটা একটি ঘোড়ার সামনের এক পায়ে গিয়ে বিদ্ধ হয়। ঘোড়াটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আরো কিছু দৌড়-ঝাঁপের পর পলায়নপর লোক দু'জন আলীর বাহিনীর বেষ্টনীতে চলে আসে। তারা অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

আলী বিন সুফিয়ান তাদের পরিচয় জানতে চান। তারা মিথ্যা বলে। নিজেদের ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তল্লাশি নেয়ার পর সেই বার্তাটি পাওয়া গেলো, যেটি নাজি তাদের দিয়ে প্রেরণ করেছিলো। উভয়কে হেফাজতে নিয়ে নেয়া হলো। ঘোড়াগুলোকে বিশ্রামের জন্য সময় দেয়া হলো। অভিযান সফল করে আলী বিন সুফিয়ান ফেরত রওনা হন।

অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছেন সুলতান আইউবী। দিন কেটে গেছে। রাতটাও অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। মধ্যরাতে সুলতান আইউবী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর চোখ লেগে গেছে। অপেক্ষায় অপেক্ষায় কতোক্ষণ বসে থাকা যায়।

রাতের শেষ প্রহরে আইউবীর কক্ষের দরজায় আলতো করাঘাত পড়ে। তাঁর চোখ খুলে যায়। ধড়মড় করে উঠে দরজা খোলেন। আলী বিন সুফিয়ান দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনে দণ্ডায়মান তাঁর আট অশ্বারোহী ও দু' কয়েদি। সুলতান

আইউবী আলী এবং কয়েদী দু'জনকে নিজের শয়নকক্ষে ডেকে নিয়ে যান এবং নাজির পত্রখানা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করেন। প্রথম প্রথম তার চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে ওঠলেও পরক্ষণেই মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নাজির বার্তাটি বেশ দীর্ঘ। সে খৃষ্টানদের জনৈক সম্রাট ফ্রাংককে লিখেছে, অমুক দিন, অমুক সময় ইউনানী, রোমান ও অন্যান্য খৃষ্টানদের সমুদ্র পথে রোম উপসাগরের দিক থেকে সৈন্য অবতরণ করিয়ে আক্রমণ করুন। আপনার আক্রমণের সংবাদ পেলেই পঞ্চাশ হাজার সুদানী সৈন্য আইউবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। মিসরের নতুন বাহিনী আপনার আক্রমণ ও আমার বিদ্রোহের একসঙ্গে মোকাবেলা করতে পারবে না। বিনিময়ে সমগ্র মিসর কিংবা মিসরের সিংহভাগ অঞ্চলের শাসন আপনাকে দান করা হবে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বার্তাবাহী লোক দু'জনকে কয়েদখানার পাতাল প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখেন। তৎক্ষণাৎ নিজের নতুন বাহিনী প্রেরণ করে নাজি ও তার নায়েবদের নিজ গৃহে নজরবন্দি করে ফেলেন। হেরেমের সকল নারীকে মুক্ত করে দেন এবং নাজির যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করেন। এ সকল অভিযান গোপন রাখা হয়।

নাজির উদ্ধারকৃত পত্রটিতে আক্রমণের যে তারিখ ছিলো, সুলতান আইউবী সেটি পরিবর্তন করে অন্য তারিখ লিখে দু'জন বিচক্ষণ লোককে সম্রাট ফ্রাংকের নিকট প্রেরণ করেন। বলে দেন, তোমরা নিজেদেরকে নাজির লোক বলে পরিচয় দেবে। তাদের রওনা করিয়ে সুলতান সুদানী বাহিনীকে মিসরী বাহিনীতে একীভূত করে ফেলার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন।

আটদিন পর দূতরা ফিরে আসে। তারা সম্রাট ফ্রাংককে নাজির পত্র পৌঁছিয়ে উত্তর নিয়ে আসে। ফ্রাংক লিখেছেন, আমার আক্রমণের দু'দিন আগে যেনো সুদানীরা বিদ্রোহ করে, যাতে আইউবীর আক্রমণ মোকাবেলা করার হুঁশ-জ্ঞান না থাকে। আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীর অনুমতিক্রমে এই দূত দু'জনকে নজরবন্দি করে রাখেন, যাতে তথ্য ফাঁস হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকে।

যেসব স্থানে খৃষ্টানদের নৌযান এসে ভেড়ার কথা, সুলতান আইউবী সেই স্থানগুলোতে নিজের সৈন্য লুকিয়ে রাখেন।

পত্রে উল্লেখিত তারিখে সম্রাট ফ্রাংক আক্রমণ চালান। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে খৃষ্টানদের সম্মিলিত বাহিনী রোম উপসাগরে আত্মপ্রকাশ করে। ঐতিহাসিকদের পরিসংখ্যান মোতাবেক খৃষ্টানদের যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা ছিলো একশত পঁচিশ।

তন্মধ্যে বারোটি ছিলো বেশ বড়। সেগুলোতে বোঝাই ছিলো সৈন্য, যারা মিসর আক্রমণ করতে এসেছিলো। এই বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন এম্লার্ক, যার পালতোলা জাহাজগুলোতে রসদ ছিলো। লাইন ধরে আসছিলো জাহাজগুলো।

প্রতিরক্ষার কমাণ্ড নিজের হাতে রাখেন সুলতান আইউবী। তিনি খৃষ্টানদেরকে সাগরের কূলে ভেড়ার সুযোগ দেন। সর্বাগ্রে বড় জাহাজটি লঙ্গর ফেলে। হঠাৎ তার উপর আগুনের বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। এগুলো মিনজানিক দ্বারা নিক্ষিপ্ত আগুন। মুসলমানদের বর্ষিত এই অগ্নিগোলা খৃষ্টানদের জাহাজ-কিশতিগুলোর পালে আগুন ধরিয়ে দেয়। কাঠের তৈরি জাহাজগুলোর গায়েও আগুন ধরে যায়। অপর দিক থেকে মুসলমানদের লুকিয়ে থাকা জাহাজ এসে পড়ে। তারাও খৃষ্টানদের জাহাজের উপর আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করে। এখন মনে হচ্ছে, যেনো রোম উপসাগরে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে এবং সাগরটা জ্বলছে। খৃষ্টানদের জাহাজগুলো মোড় ঘুরিয়ে পরস্পর ধাক্কা খেতে ও একটি অপরটিতে আগুন ধরাতে শুরু করে দেয়। নিরুপায় হয়ে জাহাজের খৃষ্টান সেনারা সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের যারা কূলে এসে ভিড়ে, তারা সুলতান আইউবীর তীরান্দাজদের নিশানায় পরিণত হয়।

ওদিকে নুরুদ্দীন জঙ্গী সম্রাট ফ্রাংকের দেশের উপর আক্রমণ করে বসেন। ফ্রাংক মিসর প্রবেশের জন্য তার বাহিনীকে স্থলপথে রওনা করিয়ে নিজে নৌ বাহিনীতে যোগ দেন। নিজ দেশে আক্রমণের সংবাদ শুনে বড় কষ্টে তিনি দেশে ফিরে যান। গিয়ে দেখেন সেখানকার চিত্র-ই বদলে গেছে।

রোম উপসাগরে খৃষ্টানদের সম্মিলিত বহরটি অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সৈন্যরা আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে এবং আইউবীর সৈন্যদের তীর খেয়ে প্রাণ হারিয়েছে। তাদের এক কমাণ্ডার এম্লার্ক প্রাণে বেঁচে গেছেন। তিনি আত্মসমর্পণ করে সন্ধির আবেদন জানালে সুলতান আইউবী চড়া মূল্যের বিনিময়ে তা মঞ্জুর করেন। ইউনানী ও সিসিলির কয়েকটি জাহাজ রক্ষা পেয়েছিলো। সুলতান আইউবী তাদেরকে জাহাজগুলো ফিরিয়ে নেয়ার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু ফেরার পথে সমুদ্রে এমন ঝড় ওঠে যে, সবগুলো জাহাজ নদীতে ডুবে যায়।

১১৬৯ সালের ডিসেম্বরের ১৯ তারিখ খৃষ্টানরা তাদের পরাজয়ে স্বাক্ষর করে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে জরিমানা আদায় করে।

কিন্তু এ জয়ের পর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জীবন ও তার দেশ মিসর আগের তুলনায় বেশির সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

সপ্তম মেয়ে

ক্রুসেডারদের নৌ-বহর ও সেনাবাহিনীকে রোম উপসাগরে ডুবিয়ে মেরে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এখনো মিসরের উপকূলীয় অঞ্চলেই অবস্থান করছেন। সাতদিন কেটে গেছে। সুলতান আইউবী খৃষ্টানদের থেকে জরিমানাও আদায় করে নিয়েছেন। কিন্তু রোম উপসাগর এখনো একের পর এক নৌ-জাহাজ গলাধঃকরণ করে চলছে আর উদগীরণ করছে মানুষের লাশ। মাঝি-মাল্লা ও সৈন্যরা আগুন ধরে যাওয়া জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়েছিলো। এখন এক এক করে ভেসে উঠছে তাদের-ই মৃতদেহ।

দূরে মাঝ দরিয়ায় সাতদিন পরও আজ কয়েকটি জাহাজের পাল বাতাসে ফড় ফড় করছে। কোন মানুষ নেই তাতে। ছেঁড়া পাল জাহাজগুলোকে সমুদ্রের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সেগুলোর তল্লাশী নেয়ার জন্য কয়েকটি নৌকা প্রেরণ করেন। বলে দেন, যদি কোন জাহাজ বা কিশ্‌তী অক্ষত থাকে, কাজে আসার মতো হয়, তাহলে রশি বেঁধে টেনে নিয়ে আসবে। আঁর যেগুলো অকেজো, সেগুলোর মাল-পত্র বের করে আনবে।

খৃষ্টানদের ভাসমান জাহাজগুলোর তল্লাশী নেয়া হলো। যা পাওয়া গেলো, তন্মধ্যে বেশীর ভাগ অস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য আর মানুষের লাশ।

ভাসমান লাশগুলোকে সমুদ্রের উর্মিমালা তুলে তুলে তীরে ছুঁড়ে মারছে। লাশগুলোর কতিপয় আগুনেপোড়া। কিছু মাছেখাওয়া। অসংখ্য লাশ এমন যে, সেগুলোর গায়ে একটি বা একেরও অধিক তীর গাঁথা।

কাঠ-তক্তা ও ভাঙ্গা কিশ্‌তী অবলম্বন করে সাঁতার কেটে কেটে এখনো কিছু লোক কূলে এসে উঠছে। ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, ক্লান্ত-অবসন্ন সেই ভাগ্যাহত লোকগুলোকে ঢেউ যাকে যেখানে ছুঁড়ে মারছে, লাশের মত সেখানে-ই পড়ে থাকছে আর মুসলমানরা তাদের তুলে আনছে। সমুদ্রতীরে মাইলের পর মাইল এই একই দৃশ্য বিরাজ করছে।

সুলতান আইউবী তার বাহিনীকে মিসরের সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং যেখানে-ই কোন শত্রুসেনা সমুদ্র থেকে তীরে উঠে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে শুক্‌নো পোশাক আর পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করার এবং আহত হলে ব্যাণ্ডেজ-চিকিৎসারও ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তারপর একস্থানে জড়ো করছেন বন্দীদের।

ঘোড়ায় চড়ে উপকূলীয় এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন সুলতান আইউবী। তাঁবু ছেড়ে কয়েক মাইল দূরে চলে গেছেন তিনি। সম্মুখে ছোট-বড় অনেকগুলো টিলা। টিলার একদিকে সমুদ্র আর পিছনে ধু ধু মরু-প্রান্তর। এই সবুজ-শ্যামল মরুদ্যানে সারি সারি খেজুর বৃক্ষ ছাড়াও আছে নানা প্রকার মরুজাত গাছ-গাছালী, ঝোপ-ঝাড়, বৃক্ষ-লতা।

সুলতান আইউবী ঘোড়া থেকে নামলেন এবং পায়ে হেঁটে টিলার পাদদেশ বেয়ে এগিয়ে চললেন। সঙ্গে তাঁর রক্ষী বাহিনীর চার অশ্বারোহী। সুলতান নিজের ঘোড়াটা রক্ষীদের হাতে দিয়ে তাদের সেখানে-ই দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। তিন সালারও আছে তাঁরর সঙ্গে। তার মধ্যে একজন হলেন সুলতান আইউবীর অন্তরঙ্গ বন্ধু বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ। এই যুদ্ধের মাত্র একদিন আগে তিনি আরব থেকে এসেছেন। ঘোড়াটা রক্ষীদের হাতে দিয়ে সুলতানের সঙ্গে হাঁটা দেন তিনিও।

এখন শীতের মওসুম। শান্ত সমুদ্র। সুলতান আইউবী হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলেন অনেক দূর। দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন রক্ষীদের। এখন তার সামনে-পিছনে-বাঁয়ে উঁচু-নীচু টিলা। ডানে বালুকাময় সমুদ্রতীর। দু' আড়াই গজ উঁচু এক খণ্ড পাথরের উপর উঠে দাঁড়ান সুলতান। দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন রোম উপসাগরের প্রতি। তাঁর ঈমান-আলোকিত অবয়বে বিজয়ের আনন্দ-দীপ্তি। এক নাগাড়ে তাকিয়ে আছেন শান্ত-সমাহিত নীলাভ সমুদ্রপাণে। হঠাৎ নাকে হাত রেখে তিনি বলে উঠলেন— 'কেমন উৎকট একটা দুর্গন্ধ আসছে, না?'

সমুদ্রোপকূলে এদিক-ওদিক ঘুরতে শুরু করে সুলতান আইউবী ও তাঁর সালারদের দৃষ্টি। কিসের যেন ফড় ফড় শব্দ কানে ভেসে আসে তাদের। তারপর হালকা চেঁচামেচি ও কন্‌কন্‌ শব্দ। উপর থেকে তিন-চারটি শকুন ডানা মেলে নীচে নামতে দেখা গেলো। টিলার আড়ালে সমুদ্রের তীরের দিকে অবতরণ করলো শকুনগুলো। সুলতান আইউবী বললেন— 'লাশ আছে'।

ওদিকে হেঁটে গেলেন তাঁরা। পনের-বিশ গজের বেশি যেতে হলো না। তিনটি লাশ। শকুনগুলো ভাগাভাগি করে খাচ্ছে লাশগুলো। পাঞ্জা করে একটি

মানবমুণ্ড নিয়ে উড়ে গেলো এক শকুন। উঠে-ই চক্কর কাটে আকাশে। হঠাৎ পা থেকে ছুটে নীচে পড়ে যায় মুণ্ডটি। পতিত হয় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ঠিক সামনে।

মুণ্ডটির চোখ দু'টো খোলা। যেন চেয়ে আছে সুলতানের দিকে। মুখমণ্ডলের আকৃতি ও মাথার চুল বলছে, এটি কোন খৃষ্টানের মাথা। সুলতান আইউবী অনিমেষ নয়নে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মুণ্ডটির প্রতি। তারপর সালারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন— 'এদের মুণ্ড সেইসব বিশ্বাসঘাতক ঈমান-বিক্রয়কারী মুসলমানদের মুণ্ড অপেক্ষা অনেক ভালো, যাদের ষড়যন্ত্রে আমাদের খেলাফত আজ নারী ও মদের চিতায় বলি হতে চলেছে।'

'খৃষ্টানরা ইঁদুরের ন্যায় আমাদের সালতানাতে ইসলামিয়াকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে।' বললেন এক সালার।

'আর আমাদের বাদশাহ তাদেরকে কর দিচ্ছেন। ফিলিস্তীন আজ ইহুদীদের কজায়। মহামান্য সুলতান! আমরা কি আশা রাখতে পারি যে, ফিলিস্তীন থেকে আমরা ওদেরকে বিতাড়ন করতে পারবো?' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না শাদ্দাদ!' জবাব দেন সুলতান আইউবী।

'আল্লাহর রহমত থেকে নয়– আমরা আমাদের ভাইদের থেকে নিরাশ হয়েছি।' বললেন অপর এক সালার।

'তুমি ঠিক-ই বলেছো। যে আক্রমণ বাইরে থেকে আসে, তা আমরা প্রতিহত করতে পারি। তোমরা কেউ কি ভেবেছিলে, কাফিরদের এতো বিশাল নৌ-সেনাবহরকে এতো সামান্য শক্তি দিয়ে এতো সাফল্যের সাথে আমরা সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে পারবো? তোমরা হয়ত অনুমান করতে পারোনি, এই বহরে যে পরিমাণ সৈন্য আসছিলো, তারা সমগ্র মিসরে মাছির মতো ছেয়ে যেতো! মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাহস দিয়েছেন। আর আমরা একটু কৌশল করে তাদের গোটা বহরকে সমুদ্রতলে ডুবিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার বন্ধুগণ! যে আক্রমণ ভিতর থেকে আসছে, অত সহজে তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না। তোমার ভাই যখন তোমার উপর আঘাত হানবে, তখন তুমি আগে ভাববে, সত্যি-ই কি এ-কাজ আমার ভাই করেছে, নাকি অন্য কেউ। তোমার মনে সংশয় জাগ্রত হবে, আমি ভুল বুঝছি না তো! বাহুতে তুমি তার উপর তরবারীর আঘাত হানার শক্তি পাবে না। আর যদি সাহস করে তরবারী উত্তোলন করেও ফেলো,

তখন সুযোগ বুঝে দুশমন তোমাকে ও তাকে দু'জনকে-ই খতম করে দেবে।' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুলতান আইউবী।

সঙ্গীদের নিয়ে টিলার গা ঘেঁষে ঘেঁষে সুলতান আইউবী সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে চললেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে গেলেন। মাথা নুইয়ে বালি থেকে একটা কি যেন তুললেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বস্তুটি হাতের তালুতে নিয়ে সকলকে দেখালেন।

কাঠের তৈরি একটি ক্রুশ। শক্ত একখণ্ড সুতায় বাঁধা। শকুনরা যে লাশগুলো খাচ্ছিলো, সুলতান আইউবী সেগুলোর বিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলো দেখলেন। তারপর চোখ ফেললেন মুণ্ডটির প্রতি, যা শকুনের পাঞ্জা থেকে ছুটে তাঁর সামনে এসে পড়েছিলো। দ্রুত হেঁটে আবার মুণ্ডটির কাছে গেলেন। মুণ্ডটির মালিকানা নিয়ে লড়াই করছে তিনটি শকুন। সুলতান আইউবীকে দেখে আড়ালে চলে যায় শকুনগুলো। সুলতান মুণ্ডের উপর ক্রুশটি রাখলেন এবং দৌড়ে সালারদের নিকট চলে গেলেন। বলতে শুরু করলেন— 'আমি একবার খৃষ্টানদের এক কয়েদী অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তার গলায়ও ক্রুশ ছিলো। সে আমাকে বলেছিলো, যেসব খৃষ্টান সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়, ক্রুশে হাত রেখে তাদের থেকে শপথ নেয়া হয় যে, ক্রুশের নামে তারা জীবনবাজি রেখে লড়াই করবে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে সর্বশেষ মুসলমানটি খতম না করে ক্ষান্ত হবে না। এই হলফের পর প্রত্যেক সৈন্যের গলায় একটি করে ক্রুশ ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এখানে বালির মধ্যে আমি একটি ক্রুশ কুড়িয়ে পেয়েছি। কার ছিলো জানি না। রেখে দিয়েছি ঐ খুলিটির উপর, যাতে তার আত্মা ক্রুশবিহীন না থাকে। লোকটা ক্রুশের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। একজন সৈনিককে তার শপথের মর্যাদা দেয়া উচিত।'

'মাননীয় সুলতান! আপনার অবশ্যই জানা আছে, খৃষ্টানরা জেরুজালেমের মুসলিম নাগরিকদেরকে কী পরিমাণ কষ্ট দিচ্ছে। স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ওখানকার মুসলমানরা। লুণ্ঠিত হচ্ছে আমাদের মেয়েদের ইজ্জত-সম্ভ্রম। আমাদের বন্দীদেরকে ওরা এখনো মুক্তি দেয়নি। তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। খৃষ্টানদের থেকে কি আমরা এর প্রতিশোধ নেবো না?' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'প্রতিশোধ নয়– নেবো ফিলিস্তীন। কিন্তু ফিলিস্তীনের পথ যে আগলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের শাসকগোষ্ঠী!' বললেন সুলতান আইউবী।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে সুলতান আইউবী আরো বললেন, ক্রুশে হাত রেখে সালতানাতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে খৃষ্টানরা। আমি আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বুকে হাত রেখে শপথ নিয়েছি, ফিলিস্তীন উদ্ধার আমি

করবো-ই। আমি সালতানাতে ইসলামিয়ার সীমানা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবো। কিন্তু আমার বন্ধুগণ! আমার কাছে আমাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। এক সময় এমন ছিলো যে, খৃষ্টানরা ছিলো রাজা, আমরা ছিলাম যোদ্ধা। আর এখন আমাদের বুজুর্গরা পরিণত হচ্ছেন রাজায় আর খৃষ্টানরা হচ্ছে যোদ্ধা। উভয় জাতির গতি-প্রকৃতি দেখে আমার মনে হচ্ছে, একটি সময় এমন আসবে, যখন মুসলমানরা রাজায় পরিণত হয়ে যাবে ঠিক; কিন্তু তাদের উপর শাসন চালাবে খৃষ্টানরা। মুসলমানরা রাজা হওয়ার আনন্দে-ই বিভোর হয়ে থাকবে। তারা বলবে, আমরা স্বাধীন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাদের স্বাধীন সত্ত্বা বলতে কিছু-ই থাকবে না। তারা কাফিরদের দাসত্ব ছাড়া এক পা-ও চলতে পারবে না। আমি ফিলিস্তীন উদ্ধার করার সংকল্প গ্রহণ করেছি বটে, কিন্তু মুসলমানদের গাদ্দারী ঠেকাবে কে? খৃষ্টানদের মস্তিষ্ক বড় উর্বর। পঞ্চাশ হাজার সুদানী সৈন্যকে পুষছিলো কারা? আমাদের খেলাফত নিজের আঁচলে পুষেছিলো নাজি নামক একটি বিষধর সর্পকে। আমিই বোধ হয় মিসরের প্রথম গভর্নর, যে দেখতে পেয়েছে, এই বাহিনী দেশের জন্য অনর্থক-ই নয়– ভয়ঙ্করও বটে। নাজির চক্রান্ত যদি ফাঁস না হতো, তাহলে আমরা এই বাহিনীটির হাতে নিঃশেষ-ই হয়ে গিয়েছিলাম।'

হঠাৎ হাল্কা একটা শো শব্দ ভেসে আসে সকলের কানে। একটি তীর এসে গেঁথে যায় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দু' পায়ের মাঝে বালিতে। সুলতান আইউবীর পিঠের দিক থেকে ছুটে আসে তীরটি। সেদিকে দৃষ্টি ছিলো না কারুর।

তীরটি যেদিক থেকে ছুটে আসে, হঠাৎ চমকে উঠে সেদিকে চোখ তুলে তাকায় সকলে। উচু-নীচু কয়েকটি টিলা ছাড়া দেখা গেলো না কিছু-ই। সবাই উঠে দাঁড়ান। দৌড়ে গিয়ে দেয়ালের মত উঁচু একটি টিলার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেন। আরো তীর আসার আশঙ্কা আছে। খোলা ময়দানে তীরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাহাদুরী নয়। মুখে আঙ্গুল রেখে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সজোরে শিস্ দেন শাদ্দাদ। রেকাবে পা রেখে প্রস্তুত হয়ে-ই ছিলো রক্ষী বাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে তাদের ঘোড়াগুলো। তার সঙ্গে তিনজন সালার ছুটে যান সেদিকে, যেদিক থেকে তীরটি এসেছিলো। তিনজন তিন পথে উঠে যায় টিলায়। সালাহুদ্দীন আইউবীও ছুটে যান তাদের পিছনে। দেখে এক সালার বললো, 'সুলতান! আপনি আসবেন না।' কিন্তু তার বাধা মানলেন না সুলতান আইউবী।

ঘটনাস্থলে এসে পৌছে রক্ষী বাহিনী। সুলতান আইউবী তাদের বললেন, 'ঘোড়াগুলো এখানে রেখে টিলার পিছনে যাও। ওদিক থেকে একটি তীর এসেছে। যাকে-ই পাবে, ধরে নিয়ে আসবে।'

একটি টিলার উপরে উঠে যান সুলতান। চারদিক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছোট-বড়, উঁচু-নীচু অসংখ্য টিলা চোখে পড়ে তাঁর। সালারদের নিয়ে পিছন দিকে নেমে পড়েন তিনি। চারদিক ঘুরে-ফিরে দেখে আবার উঠে আসেন। টিলায় চোখ বুলিয়ে চতুর্দিক তাকালেন। কিন্তু নাম-গন্ধও নেই কোন মানুষের।

পাথুরে এলাকার ভিতরে, উপরে-নীচে, ডানে-বাঁয়ে সর্বত্র পাতিপাতি করে খুঁজে বেড়ায় রক্ষীরা। কিন্তু কিছু-ই দেখতে পেলো না তারা।

নীচে নেমে সুলতান আইউবী সে স্থানে চলে আসলেন, যেখানে বালিতে তীরটি বিদ্ধ হয়েছিলো। সহকর্মীদের ডাকলেন এবং তীরটির গায়ে হাত রাখলেন। পড়ে গেলো তীরটি। সুলতান বললেন— 'দূর থেকে এসেছে, তাই পায়ের পাশে পড়েছে। অন্যথায় ঘাড়ে কিংবা পিঠে এসে বিদ্ধ হতো। আর বালিতেও বেশী গাঁথেনি।' তীরটি হাতে তুলে নিয়ে সুলতান আইউবী দেখলেন এবং বললেন, 'হাশীশীদের নয়– খৃষ্টানদের তীর।'

'সুলতানের জীবন হুমকীর সম্মুখীন।' বললেন এক সালার।

'আর আজীবন হুমকীর মধ্যে-ই থাকবে'– মুখে হাসি টেনে সুলতান বললেন– 'আমি রোম উপসাগরে কাফিরদের সেসব জাহাজ-কিশ্‌তী দেখার জন্য বের হয়েছিলাম, যেগুলো মাঝি-মাল্লাবিহীন ভাসছিলো। কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধুগণ! খৃষ্টানদের কিশতী সমুদ্রে ভাসছে ভাববেন না। তারা আবার আসবে। আসবে বজ্রের মতো গর্জন করতে করতে। বর্ষিবেও। তারা আঘাত হানবে মাটির নীচ আর পিঠের পিছন থেকে। এখন থেকে খৃষ্টানদের সঙ্গে আমাদের এমন লড়াই লড়তে হবে, যা শুধু সৈন্যরা-ই লড়বে না। সামরিক প্রশিক্ষণে আমি নতুন এক মাত্রা যোগ করছি। তা হলো গোয়েন্দা লড়াই।'

তীরটি হাতে নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন সুলতান আইউবী। রওনা দিলেন ক্যাম্পের দিকে। তাঁর সালারগণও ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। একজন নিজের ঘোড়া নিয়ে এলেন সুলতানের ডান দিকে। একজন আসলেন বাঁ দিকে। একজন অবস্থান নিলেন সুলতানের পিছনে, ঠিক তার সন্নিকটে, যাতে কোন দিক থেকে তীর আসলে তা সুলতানের গায়ে আঘাত হানতে না পারে।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তীর ছোঁড়া হলো। কিন্তু সে জন্য বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই তাঁর। খৃষ্টান গুপ্তচর ও কমাণ্ডোরা কিরূপ ক্ষতি-সাধন করছে, নিজের তাঁবুতে বসে সালারদের কাছে তারই বিবরণ দিচ্ছেন

তিনি। সুলতান আইউবী বললেন— 'আলী বিন সুফিয়ানকে আমি একটি পরিকল্পনা দিয়েছিলাম। কিন্তু এখনো তা বাস্তবায়িত হয়নি। বিলম্ব না করে তোমরা নিজ নিজ সিপাহী ও কমাণ্ডারদের মধ্য থেকে এমন কিছু লোক বেছে নাও, যারা হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, বুদ্ধিমান, সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী ও উপস্থিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। তাদের মধ্যে থাকবে উটের ন্যায় দিনের পর দিন ক্ষুৎ-পিপাসা সহ্য করার শক্তি, সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ার দক্ষতা। যাদের দৃষ্টি হবে ব্যাঘ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, যারা দৌড়াতে পারে খরগোশ ও হরিণের মতো। যারা বিনা অস্ত্রে লড়াই করতে পারে সশস্ত্র দুশমনের সঙ্গে। সর্বোপরি তাদের মধ্যে থাকবে না কোন প্রকার মদ-মাদকতার অভ্যাস। তারা লোভে পড়ে নীতি-নৈতিকতা ত্যাগ করবে না। যতো রূপসী নারী-ই তাদের হাতে আসুক, যত সোনা-দানা, অর্থ-বৈভব তাদের পায়ে নিক্ষিপ্ত হোক, সবকিছু উপেক্ষিত হয়ে দৃষ্টি থাকবে তাদের কর্তব্যের প্রতি।'

তোমরা তোমাদের অধীন সকলকে বলে দাও, বুঝিয়ে দাও যে, গুপ্তচরবৃত্তি, সেনাদের মধ্যে অশান্তি-অস্থিরতা বিস্তার এবং চেতনার দিক থেকে সৈন্যদের অথর্ব করে তোলার জন্য খৃষ্টানরা সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করছে। আমি মুসলমানদের মধ্যে একটি দুর্বলতা লক্ষ্য করছি, তারা নারীর প্রলোভনে অল্প সময়ে অস্ত্র ত্যাগ করে। এমন কাজে আমি মুসলিম নারীদের কখনো দুশমনের এলাকায় প্রেরণ করবো না। আমরা নারীর ইজ্জতের মোহাফেজ। সেই ইজ্জতকে আমরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। আলী বিন সুফিয়ানের হাতে কয়েকটি মেয়ে আছে। কিন্তু ওরা মুসলমান নয়, খৃষ্টানও নয়। তারপরও আমি এর পক্ষপাতি নই।

তাঁবুতে প্রবেশ করে রক্ষীবাহিনীর কমাণ্ডার। বলে, আমার বাহিনীর লোকেরা কয়েকজন পুরুষ ও কয়েকটি মেয়ে ধরে নিয়ে এসেছে। সুলতান আইউবী বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিন সালারও বেরিয়ে আসেন তাঁর সঙ্গে। বাইরে পাঁচজন লোক দণ্ডায়মান। লম্বা চোগা, পাগড়ী আর ধরণ-প্রকৃতি বলছে, লোকগুলো বণিক। সঙ্গে তাদের সাতটি মেয়ে। সব ক'টিই যুবতী এবং একজন অপেক্ষা অপরজন অধিক রূপসী।

রক্ষীদের একজন– যে সুলতান আইউবীর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা তীরের উৎসের সন্ধানের গিয়েছিলো– বললো, আমরা সমগ্র এলাকা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলাম; কিন্তু কোন মানুষের সন্ধান পেলাম না। পিছনে আরো দূরে

চলে গেলাম। হঠাৎ দেখলাম, এরা তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছে। সঙ্গে তিনটি উট।

'এদের তল্লাশী নেয়া হয়েছে কি?' এক সালার জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, হয়েছে। বলছে, এরা ব্যবসায়ী। আমরা এদের জিনিসপত্র সব খুলে দেখেছি। দেহ-তল্লাশীও নিয়েছি। কিন্তু এই খঞ্জরগুলো ছাড়া আর কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি।' বলেই পাঁচটি খঞ্জর সুলতান আইউবীর পায়ের কাছে রেখে দেয় এক রক্ষী।

'আমরা মারাকেশের ব্যবসায়ী। যাবো ইস্কান্দারিয়া। দু'দিন আগে আমাদের অবস্থান ছিলো এখান থেকে দশ ক্রোশ পিছনে। পরশু সন্ধ্যায় এই মেয়েগুলো আমাদের হাতে আসে। তখন তাদের পরিধানের পোশাক ছিলো ভেজা। তারা আমাদের জানালো, তারা সিসিলির বাসিন্দা। খৃষ্টান সৈন্যরা এদের ঘর থেকে উঠিয়ে এনে একটি জাহাজে তুলে নেয়। এরা গরীব পিতা-মাতার সন্তান। এরা বলছে, বিপুলসংখ্যক জাহাজ ও নৌকা রওনা হয়েছিলো। এদেরকে যে জাহাজে তোলা হয়েছিলো, তাতে কমাণ্ডার গোছের কয়েকজন লোক এবং বেশ ক'জন সৈন্যও ছিলো। তারা নিজেরা মদ খেয়ে, এদেরও মদ খাইয়ে আমোদ করতে থাকে। সমুদ্রের এ-পারের নিকটবর্তী হলে জাহাজগুলোতে আগুনের গোলা নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে। আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষগুলো জাহাজ থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। এদেরকে তারা একটি নৌকায় বসিয়ে জাহাজ থেকে সমুদ্রে নামিয়ে ভাসিয়ে দেয়। এরা বলছে, এদের কেউ নৌকা বাইতে জানে না। তাই মাঝি-মাল্লাবিহীন নৌকাটি সমুদ্রে হেলে-দুলে ভাসতে থাকে। পরে একদিন আপনা-আপনি-ই নৌকাটি কূলে এসে ভিড়ে। আমরা কূলের কাছাকাছি-ই অবস্থান করছিলাম। এরা আমাদের কাছে চলে আসে। বড় বিপন্ন অবস্থায় ছিলো মেয়েগুলো। আমরা এদের আশ্রয় প্রদান করি। এই অসহায় নারীদেরকে তাড়িয়েও দিতে পারছিলাম না; আবার বুঝেও আসছিলো না যে, এদেরকে আমরা কী করি। অগত্যা এদেরকে নিয়ে আমরা সম্মুখে রওনা হই এবং একস্থানে এসে ছাউনি ফেলি। হঠাৎ এই আরোহীগণ এসে পড়েন এবং আমাদের তল্লাশী নিতে শুরু করেন। আমরা তাদের নিকট এই তল্লাশীর কারণ জানতে চাই। তারা বললেন, এটা মিসরের গভর্নর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নির্দেশ। আমরা অনুনয়-বিনয় করে বলি, আমাদেরকে তোমরা সুলতানের কাছে নিয়ে চলো; তাঁকে-ই আমরা নিবেদন করবো, যেন এই অসহায় মেয়েগুলোকে

তিনি তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে নেন। চলার পথে আমরা এদেরকে কোথায় নিয়ে ফিরবো।'

মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে তারা সিসিলী ভাষায় জবাব দেয়। বড় ভীত-সন্ত্রস্থ মনে হলো তাদের। দু' তিনজন একত্রে-ই কথা বলতে শুরু করে। সুলতান সালাহুদ্দীন বণিকদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ এদের ভাষা বুঝ কি? একজন বললো, শুধু আমি বুঝি। এরা নিবেদন করছে, সুলতান যেন এদেরকে তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে নেন। এরা বলছে, আমরা বণিক কাফেলার সঙ্গে যেতে রাজি নই। এমনও হতে পারে, পথে দস্যুরা আমাদের তুলে নিয়ে যাবে। তাছাড়া এখন যুদ্ধ চলছে। সর্বত্র খৃষ্টান ও মুসলিম সেনারা গিজগিজ করছে। আমরা সৈন্যদের অনেক ভয় পাই। ঘর থেকে যখন আমাদেরকে অপহরণ করা হয়, তখন আমরা কুমারী ছিলাম, খৃষ্টান সৈন্যরা জাহাজে আমাদেরকে গণিকায় পরিণত করেছে।

এক মেয়ে কিছু বললে বণিক তার তরজমা করে বললো, 'মেয়েটি বলছে, আমাদেরকে মুসলমানদের রাজার নিকট পৌছিয়ে দিন; হয়ত তিনি আমাদের প্রতি সদয় হবেন।'

মুখ খুললো অপর এক মেয়ে। বণিক বললো, এই মেয়েটি বলছে, 'আমাদেরকে আর যা-ই করুন, খৃষ্টান সৈন্যদের হাতে তুলে দেবেন না। কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের স্ত্রী হতে পারবো এই নিশ্চয়তা পেলে আমি মুসলমান হয়ে যাবো।'

পিছনে দাঁড়িয়ে মুখ লুকাবার চেষ্টা করছে দু' তিনটি মেয়ে। মুখে তাদের ভীতির ছাপ। ভয়ে কিংবা লজ্জায় কথা বলতে পারছে না তারা।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বণিককে বললেন, এদেরকে বলো, এরা খৃষ্টানদের কাছে ফিরে যাক আর না যাক আমরা কিন্তু এদেরকে মুসলমান হতে বাধ্য করবো না। এই যে মেয়েটি একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের স্ত্রী হওয়ার নিশ্চয়তার শর্তে মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো, তাকে বলো, আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি না। কেননা, মেয়েটি এক অপারগ অবস্থায় ও বিপদের মুহূর্তে মুসলমান হতে চাইছে। তাদের বলো, যদি আমার প্রতি তাদের আস্থা থাকে, তাহলে মুসলিম নারীর ন্যায় তাদেরকে আমি আমার আশ্রয়ে নিয়ে নেবো। রাজধানীতে পৌছে আমি তাদেরকে জেরুজালেমে খৃষ্টান পাদ্রীদের নিকট পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবো।

দোভাষী বণিকের মুখে সুলতান আইউবীর সিদ্ধান্তের কথা শুনে মেয়েরা উৎফুল্ল হয়ে উঠে। আনন্দের ঝিলিক ফুটে উঠে তাদের চোখে-মুখে। তারা সুলতান আইউবীর এই সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে। সুলতান আইউবী মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র তাঁবুর ব্যবস্থা করেন এবং বাইরে সর্বক্ষণ একজন প্রহরী নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দেন।

বন্দী মেয়েদের তাঁবু কোথায় স্থাপন করা হবে বলতে যাচ্ছিলেন সুলতান আইউবী। এমন সময় তাঁর সম্মুখে নিয়ে আসা হয় ছয়জন খৃষ্টান কয়েদী। লোকগুলোর পরনের কাপড় ভেজা। স্থানে স্থানে রক্তের দাগ ও বালিমাখা। মড়ার মত ফ্যাকাশে চেহারা, বিধ্বস্ত শরীর।

কমাণ্ডার জানায়, এরা এখান থেকে দেড়-দু' মাইল দূরে সমুদ্রতীরে বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়ে ছিলো। এরা সমুদ্র মাঝে একটি ভাঙ্গা নৌকায় ভাসছিলো। ভিতরে পানি ঢুকে একদিন নৌকাটি ডুবে যায়। এরা সাঁতার কেটে বহু কষ্টে কূলে এসে উঠে। ছিলো বাইশজন। এখন জীবিত আছে মাত্র এই ছয়জন।

তারা খৃষ্টান বাহিনীর সদস্য। সুলতান আইউবীর সামনে এসে বসে পড়ে ধড়াস্ করে। একজনের চেহারা বলছে, লোকটি সাধারণ সৈনিক নয়। সে কোঁকাচ্ছে। পোশাকে তার রক্তের দাগ নেই; আহতদের চেয়ে বেশী কষ্টে আছে বলে মনে হলো তাকে। মেয়েগুলোর প্রতি এক নজর দৃষ্টিপাত করে আবার কোঁকাতে শুরু করে লোকটি।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নির্দেশ ছিলো, যখন যে ধরা পড়বে, তাকে-ই যেন তাঁর সামনে হাজির করা হয়। সমুদ্রে খৃষ্টান বাহিনীর নৌ ও সেনাবহর ধ্বংস হওয়ার পর এখন জীবনে রক্ষা পাওয়া খৃষ্টান সেনারা একের পর এক বন্দী হচ্ছে আর নীত হচ্ছে সুলতান আইউবীর দরবারে। সুলতান আইউবী এ বন্দীদের প্রতিও চোখ তুলে তাকালেন; কিন্তু বললেন না কিছু-ই। তবে অফিসার গোছের যে লোকটি বেশী কোঁকাচ্ছিলো এবং যার পোশাকে রক্তের দাগ নেই, তাকে খুটিয়ে খুটিয়ে নীরিক্ষা করে দেখলেন তিনি। ক্ষীণকণ্ঠে সালারদের বললেন, 'আলী বিন সুফিয়ান এখনো আসলো না! এই বন্দীদের তো অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার ছিলো, এদের কাছ থেকে তথ্য নেয়ার প্রয়োজন ছিলো।' এ কয়েদীর প্রতি ইঙ্গিত করে সুলতান বললেন— 'এ লোকটিকে কমাণ্ডার বলে মনে হয়। একে চোখে চোখে রাখতে হবে। আলী বিন সুফিয়ান আসলে বলবে, এদেরকে যেন ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য নেয়। সম্ভবত এ লোকটা ভিতরে আঘাত পেয়েছে,

হাড়-গোড় ভেঙ্গে গেছে। এদের এখনি আহত কয়েদীদের তাঁবুতে পাঠিয়ে দাও। খাবার-পানি দাও, ব্যাণ্ডেজ-চিকিৎসা করাও।'

ছয় পুরুষ বন্দীকে নির্ধারিত তাঁবুর দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। মেয়েগুলো একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তাদের প্রতি। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় মেয়েদেরও।

ফৌজি ক্যাম্পের সামান্য দূরে মেয়েদের জন্য তাঁবু স্থাপন করা হচ্ছে। সেখান থেকে কয়েকশ' গজ দূরে আহত বন্দীদের তাঁবু। নতুন একটি তাঁবু স্থাপন করা হচ্ছে সেখানেও। পার্শ্বে মাটিতে পড়ে আছে ছয় নতুন আহত বন্দী। মেয়েগুলো তাকিয়ে আছে তাদের প্রতি।

তাঁবু দু'টো দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েরা চলে গেছে তাদের তাঁবুতে। আহত বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হয় নতুন তাঁবুতে। মেয়েদের তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে যায় একজন প্রহরী। অল্পক্ষণের মধ্যে খাবার চলে আসে। মেয়েরা আহার করে নেয়। একটি মেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে নতুন আহত বন্দীদের তাঁবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন আর তার চেহারায় ভীতির ছাপ নেই। প্রহরী তার দিকে দৃষ্টিপাত করে। সে-ও প্রহরীর দিকে তাকায়। চোখাচোখি হয় দু'জনের। মেয়েটি মুখে হাসি টেনে ইঙ্গিতে বলে, আমি একটু ঐ আহত লোকগুলোর তাঁবুতে যেতে চাই। প্রহরীও ইশারায় তাকে বারণ করে। মেয়েদের তাঁবু থেকে বের হয়ে কোথাও যাওয়ার বা কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি নেই। মেয়েদের ও আহত বন্দীদের তাঁবুর মাঝে অনেকগুলো বৃক্ষ। বাঁ দিকে মাটির একটি টিলা। টিলাটি ঝোপ-ঝাড়ে আচ্ছন্ন।

সূর্য ডুবে গেছে। রাত আঁধার হতে চলেছে। নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে প্রকৃতি। রাতের নিস্তব্ধতায় আহত বন্দীদের কোঁকানির শব্দ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। দূরবর্তী রোম উপসাগরের কুলকুল রবও চাপা গুঞ্জনের ন্যায় কানে আসতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিজের তাঁবুতে বিরাজ করছে দিনের পরিবেশ। কারো চোখে ঘুম নেই সেখানে। তিন সালার উপবিষ্ট সুলতানের কাছে।

সুলতান আইউবী পুনরায় বললেন— 'আলী বিন সুফিয়ান এখনো আসলো না?' কণ্ঠে তাঁর অস্থিরতার সুর। একটু থেমে আবার বললেন— 'তার দূতও আসলো না, না?'

'কোন অসুবিধা হলে তো সংবাদ পেতাম। আশা করি সেখানে সব ঠিক আছে।' বললেন এক সালার।

'আশা তো এমন-ই থাকা উচিত। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার সৈন্য-ই যদি বিদ্রোহ করে বসে, তবে তো সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে। আমাদের সৈন্য মাত্র সাড়ে তিন হাজার। দেড় হাজার অশ্বারোহী আর দু' হাজার পদাতিক। তাদের মোকালোয় সুদানী সৈন্যরা সংখ্যায় অনেক বেশী, অভিজ্ঞও বটে।' বললেন সুলতান আইউবী।

'নাজি ও তার কুচক্রী সহচরদের নির্মূল করার পর বিদ্রোহ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া সেনাবিদ্রোহ হয় না।' বললেন অপর এক সালার।

'আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্যে যে আলীকে দরকার!' বললেন সুলতান আইউবী।

ক্রুসেডারদের প্রতিরোধ অভিযানে সুলতান আইউবী নিজেই এসে পড়েছিলেন এখানে। সুদানী সৈন্যদের বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকায় আলী বিন সুফিয়ানকে রেখে এসেছিলেন রাজধানীতে। এতক্ষণে ফিরে এসে সুলতানকে সেখানকার পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার কথা। কিন্তু আলী আসলেন না এখনো। তাই সুলতান অস্থির। ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে তার উৎকণ্ঠা।

সালারদের সঙ্গে কায়রোর পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছেন সুলতান আইউবী। গোটা ক্যাম্প গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। জেগে আছে শুধু সেই সাতটি মেয়ে, সুলতান আইউবী যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পর্দা ফাঁক করে তাঁবুর ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে প্রহরী। ভিতরে বাতি জ্বলছে। টের পেয়ে জাগ্রত মেয়েগুলো ঘুমের ভান করে নাক ডাকতে শুরু করে। মেয়েগুলোকে গুণে দেখে প্রহরী। ঠিক আছে– সাতজন। ঘুমিয়ে আছে সবাই। পর্দাটা ছেড়ে দিয়ে সরে আসে প্রহরী। বসে পড়ে তাঁবুর কাছ ঘেঁষে।

তাঁবুর পর্দাসংলগ্ন শায়িত মেয়েটি নীচ থেকে পর্দাটা উঁচু করে সতর্কতার সাথে বাইরে তাকায়। পার্শ্বের মেয়েটির কানে কানে বলে, 'বসে পড়েছে'। পার্শ্বের জন তার পার্শ্বের জনকেও বলে, 'বসে পড়েছে'। এভাবে এক এক করে সব ক'টি মেয়ের কানে খবর পৌঁছে যায়, 'প্রহরী বসে পড়েছে'।

তাঁবুর অপর দরজার কাছে শুয়ে আছে যে মেয়েটি, সাবধানে উঠে বসে সে। মাটিতে বিছানো শয্যা। একটি কম্বল বিছানায় এমনভাবে ছড়িয়ে রাখে যে, দেখতে মনে হয়, কম্বলের নীচে একজন মানুষ শুয়ে আছে।

পা টিপে টিপে দরজার নিকটে চলে যায় মেয়েটি। পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে পড়ে তাঁবু থেকে। অপর ছয়জন ধীরে ধীরে নাক ডাকতে শুরু করে।

প্রহরী জানে, এরা সমুদ্রের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া আশ্রিতা— কোন বিপজ্জনক বন্দী নয়। তাই নিরুদ্বেগ বসে বসে ঝিমুচ্ছে সে।

পা টিপে টিপে টিলা অভিমুখে হাঁটা দেয় মেয়েটি। প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে টিলার কাছে পৌঁছে মোড় নেয় আরেকটি তাঁবুর দিকে। নতুন বন্দী ছয়জন অবস্থান করছে এ তাঁবুতে। অন্ধকার রাত। বেশ কিছু গাছ-গাছালিও আছে এখানে। প্রহরীরা মেয়েটিকে দেখে ফেলার কোন-ই জো নেই এখন।

মেয়েটি বসে পড়ে। পা পা করে এগিয়ে চলে সম্মুখে। বালির টিপির মত কতগুলো কি যেন দেখা যাচ্ছে সামনে। সেগুলোর আড়ালে আড়ালে পা টিপে টিপে তাঁবুর নিকটে চলে আসে মেয়েটি। দরজার সামনে টহল দিচ্ছে একজন প্রহরী।

একটি টিপির আড়ালে শুয়ে পড়ে মেয়েটি। কালো ছায়ার মত তাকে দেখে ফেলে প্রহরী। মেয়েটি এখন দুই প্রহরীর মাঝে। একজন নিজের তাঁবুর প্রহরী। অপরজন অন্য জখমীদের তাঁবুর। তার আশঙ্কা, জখমীদের তাঁবুর প্রহরী এদিকে আসলে নিশ্চিত ধরা খেয়ে যাবে।

ইতিউতি দৃষ্টি ফেলে, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে প্রহরী চলে যায় অন্য জখমীদের তাঁবুর দিকে। এ সুযোগে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর সন্নিকটে পৌঁছে যায় মেয়েটি। পর্দা তুলে ঢুকে পড়ে ভিতরে।

তাঁবুর ভেতরটা অন্ধকার। ক্ষীণ কণ্ঠে কোঁকাচ্ছে দু' তিনজন জখমী। সম্ভবত তাঁবুর পর্দা ফাঁক হওয়া দেখে ফেলেছে এদের একজন। তাই অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করে— 'কে?'

'কে?' প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে মেয়েটি ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'রবিন কোথায়?' জবাব আসে, ঐ ও-দিকে তৃতীয়জন।

গুণে গুণে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে চলে যায় মেয়েটি। পা ধরে নাড়া দেয় তার। আওয়াজ আসে— 'কে?' মেয়েটি জবাব দেয়— 'মুবী'।

ধড়মড় করে উঠে বসে রবিন। হাত বাড়িয়ে বাহুবন্ধনে টেনে নেয় মেয়েটিকে। শুইয়ে দেয় নিজের বিছানায়। নিজের ও তার গায়ে একটি কম্বল ছড়িয়ে দিয়ে বলে— 'প্রহরী এসে পড়তে পারে, আমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাক।'

রূপসী কন্যা মুবীর দেহের উষ্ণতা গ্রহণ করে রবিন। মৌনতায় কাটে কিছুক্ষণ। তারপর রবিন বলে, তোমরা-আমার এই মিলনে আমি বিস্মিত। এ এক অলৌকিক ঘটনা। এতে প্রমাণিত হয়, যীশুখৃষ্ট আমাদের সাফল্য মঞ্জুর করেছেন।

ছয় আহত কয়েদীর যাকে সুলতান আইউবী ব্যতিক্রমী এবং উচ্চপদস্ত সেনা বলে অনুমান করেছিলেন, রবিন সেই ব্যক্তি। সুলতান আইউবী বলেও দিয়েছিলেন— 'একে সাধারণ সিপাই বলে মনে হয় না, এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। আলী বিন সুফিয়ান এসে তদন্ত নেবে।'

'তোমার জখম কেমন? হাড়-গোড় ভেঙ্গে যায়নি তো?' জিজ্ঞেস করে মুবী।

'আমি সম্পূর্ণ ঠিক আছি। একটি আঁচড়ও নেই দেহের কোথাও। আইউবীর সামনে ভান করেছিলাম মাত্র।' জবাব দেয় রবিন।

'তাহলে এখানে এসেছো কেন?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'মিসর প্রবেশ করে সুদানী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু ইসলামী ফৌজ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকবার কোন পথ পেলাম না। অবশেষে কৌশলের আশ্রয় নিলাম। এই পাঁচজন জখমীকে খুঁজে জড়ো করে জখমীর ভান ধরে এদের সঙ্গে আমিও ঢুকে পড়লাম। এখন তো পালাবারও কোন পথ পাচ্ছি না।' জবাব দেয় রবিন।

এবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রবিন বলে, তুমি আমার দু'টি প্রশ্নের জবাব দাও। প্রথম প্রশ্ন, আইউবীকে আমি জিন্দা দেখেছি। কারণটা কি? তীর নিঃশেষ হয়ে গেলো, নাকি হারামখোরটা কাপুরুষ হয়ে গেলো? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, তোমরা সাতটি মেয়ের সব ক'জন মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো কেন? ওরা পাঁচজন কি মরে গেছে, নাকি পালিয়ে গেছে?'

'না, তারা জীবিত আছে। তুমি বলছো, যীশুখৃষ্ট আমাদের বিজয় মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু আমি বলছি, আমাদের খোদা আমাদেরকে কোন একটা পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। আর সালাহুদ্দীন আইউবীও এখনো জীবিত থাকার কারণ, তীরটা তার দু' পায়ের মাঝে বালিতে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিলো।' বললো মুবী।

'তীর কি কোন মেয়ে ছুঁড়েছিলো? ক্রিস্টোফর ছিলেন কোথায়?' জানতে চায় রবিন।

'না, তীর ছুঁড়েছিলেন ক্রিস্টোফর নিজেই। কিন্তু...'

'কিন্তু ক্রিস্টোফরের তীর ব্যর্থ গেছে, তাই না? যার তীরান্দাজী দেখে শাহ অগাস্টাস অভিভূত হয়েছিলেন, এখানে এসে তার নিশানা এত-ই ব্যর্থ হয়ে গেলো যে, ছয় ফুট দীর্ঘ আর তিন ফুট চওড়া একটা সালাহুদ্দীন তার তীর থেকে বেঁচে গেলো! অভাগার হাতটা ভয়ে কেঁপে উঠেছিলো বোধ হয়।' বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো রবিন।

'ব্যবধান ছিল অনেক। তাছাড়া ক্রিস্টোফর বললেন, ধনুক থেকে তীরটি বের হবে হবে অবস্থায় একটি পোকা এসে তার চোখে পড়ে এবং সে অবস্থায়-ই লক্ষ্যহীনভাবে তীরটি বেরিয়ে যায়।'

'তারপর কী হলো?'

'যা হওয়ার ছিলো, তা-ই হলো। সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে ছিলো তিনজন কমাণ্ডার এবং চারজন দেহরক্ষী। তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের ভাগ্য ভালো ছিলো। ক্রিস্টোফর টিলার আড়ালে নিরাপদে ফিরে আসেন। আমরা তীর-ধনুকগুলো বালিতে পুঁতে ফেলে উপরে উট বসিয়ে রাখি। আইউবীর সিপাইরা এসে পড়লে ক্রিস্টোফর জানালেন, তারা পাঁচজন মারাকেশী বণিক আর আমরা ছয়টি মেয়ে সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে তাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছি। মুসলিম সৈন্যরা আমাদের সামান-পত্র অনুসন্ধান করে ব্যবসার পণ্য ছাড়া আর কিছু-ই পেলো না। তারা আমাদের সবাইকে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট নিয়ে যায়। আমরা ভাবে বুঝালাম যে, আমরা সিসিলি ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানি না। ক্রিস্টোফর আইউবীকে বললেন, তিনি আমাদের ভাষা বুঝেন। আমরা মেয়েরা চেহারায় ভীতি ও শঙ্কার ভাব ফুটিয়ে তুললাম।'

সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে আরো যেসব কথা হলো, রবিনকে সবিস্তার সব শোনালো মুবি। এই সাতটি মেয়ে এবং মারাকেশী বণিকবেশী পাঁচজন পুরুষ আক্রমণের দু'দিন আগে কূলে অবতরণ করেছিলো। বণিকবেশী পুরুষ পাঁচজন ক্রুসেডারদের অভিজ্ঞ গুপ্তচর ও সেনাকমাণ্ডার। মেয়েগুলোও গুপ্তচর। তারা অত্যন্ত রূপসী। গুপ্তচরবৃত্তি ও মনন ধ্বংসের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তাদের। গোপনে হত্যাকাণ্ড সংঘটনেও তারা বেশ পারদর্শী। পুরুষ পাঁচজনের মিশন ছিলো সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করা আর নাজির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। মিসরের ভাষা অনর্গল বলতে পারতো মেয়েগুলো। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবীর সামনে তা গোপন রাখে তারা। রবিন ছিলো এ মিশনের প্রধান। নাজির সঙ্গে সাক্ষাত করার পরিকল্পনা ছিলো তার। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানের সতর্ক কৌশলের সাথে পেরে উঠলো না তারা।

'তোমরা কি সালাহুদ্দীন আইউবীকে ফাঁদে ফেলতে পারো না?' জিজ্ঞেস করে রবিন।

'এখানে সবেমাত্র প্রথম রাত। আমাদের ব্যাপারে তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যদি তা সত্যমনে দিয়ে থাকেন, তাহলে তার অর্থ হলো, তিনি মানুষ নন–পাষাণ। আমাদের কারো প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকতো, তাহলে তিনি রাতে কাউকে

না কাউকে নিজের তাঁবুতে অবশ্যই ডেকে পাঠাতেন। লোকটাকে হত্যা করাও অতটা সহজ নয়। একবার-ই তিনি উপকূলে এসেছিলেন। তীর ছোঁড়া হলো। ব্যর্থ গেলো তীর। সব সময় তিনি সালার ও রক্ষীদের প্রহরা বেষ্টনীতে থাকেন। এদিকে একজন মাত্র প্রহরী আমাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে আর তার তাঁবুটি ঘিরে রেখে আছে গোটা রক্ষী ইউনিট।'

'ওরা পাঁচজন কোথায়?' জিজ্ঞেস করে রবিন।

'এই তো সামান্য দূরে। আপাতত ওরা সেখানেই থাকবে।' জবাব দেয় মুবী।

শোনো মুবী! এই পরাজয়টা আমাকে পাগল করে তুলেছে। এ ব্যর্থতার সব দায়-দায়িত্ব যেন চাপছে এসে আমার ঘাড়ে। ক্রুশের উপর হাত রেখে শপথ তো আমরা সকলেই নিয়েছি। কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের শপথ আর আমার মতো একজন দায়িত্বশীলের শপথে পার্থক্য অনেক। তুমি আমার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করো। আমার কর্তব্যসমূহকে সামনে রেখে বিবেচনা করো। যুদ্ধের অন্তত অর্ধেকটা আমাদের মটির নীচ থেকে আর পিঠের পিছন থেকে আক্রমণ করে জয়লাভ করার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু আমি, তোমরা সাতজন এবং ওরা পাঁচজন নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি। এই ক্রুশ আমার থেকে জবাব চাইছে।'

গলায় ঝুলন্ত ক্রুশটা হাতে নিয়ে রবিন বললো— 'এটিকে আমি আমার বুক থেকে আলাদা করতে পারি না।'

রবিন মুবীর বুকে হাত বুলিয়ে তার ক্রুশটাও হাতে নিয়ে বললো, 'তুমি তোমার পিতা-মাতাকে ধোঁকা দিতে পারো, কিন্তু এই ক্রুশের মর্যাদা রক্ষায় উদাসীন হতে পারো না। তোমার উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, তা তোমাকে পালন করতে-ই হবে। খোদা তোমাকে যে রূপ দিয়েছেন, তা-ই তোমাকে পাথর চিড়ে পথ করে দেবে। আমি তোমাকে আবারো বলছি, আমাদের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মিলন প্রমাণ করে, সফল আমরা হব-ই। আমাদের বাহিনী রোম উপসাগরের ওপারে সংগঠিত হচ্ছে। যারা মারা গেছে, তারা তো মারা গেছে। যারা জীবিত আছে, তারা জানে, এটি কোন পরাজয় নয়– ছিল এক প্রতারণা। তুমি তোমার তাঁবুতে ফিরে যাও; সঙ্গী মেয়েদের বলো, তারা যেন তাঁবুতে-ই পড়ে না থাকে। বারংবার যেন সালাহুদ্দীন আইউবী ও তার সালারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার মন জয় করার চেষ্টা করে এবং মুসলমান হওয়ার ভান ধরে। তারপর কী করতে হবে, তা তাদের জানা আছে।'

'সর্বাগ্রে আমাদের জানা দরকার, ঘটনাটা ঘটল কী? সুদানীরা কি আমাদেরকে ধোঁকা দিলো?' বললো মুবী।

'তা আমি নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারছি না। হামলার অনেক আগে আমি মিসরে কর্তব্যরত আমার গুপ্তচরদের মাধ্যমে তথ্য পেয়েছিলাম, সুদানী সৈন্যদের উপর সালাহুদ্দীন আইউবীর আস্থা নেই। অথচ তারা মিসরে মুসলমানদের নিজস্ব বাহিনী। আইউবী এসে যখন মিসরী বাহিনী গঠন করলেন, তখন তারা এই বাহিনীতে শামিল হতে অসম্মতি জানায়। তাদের কমাণ্ডার নাজি আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করলো। আমি নিজে তার পত্র দেখেছি এবং সত্যায়ন করেছি যে, হ্যাঁ, এটি নাজির-ই পত্র এবং এতে কোন প্রতারণা নেই। এখন আমার জানতে হবে, এমনটি কেন ঘটলো এবং কে ঘটালো। তথ্য সন্ধান নিয়ে নিশ্চিত না হয়ে আমি ফিরছি না। আমাকে লক্ষ্য করে শাহ আগাস্টাস বড় গর্ব করে বলেছিলেন, আমি মুসলমানদের ঘর থেকে একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে তাদের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে পারবো। এখন চিন্তা করো মুবী! এ ঘটনায় শাহ অগাস্টাস কত মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন! তিনি কি আমাকে মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা লঘু শাস্তি দিয়ে রক্ষা করবেন? উপরন্তু ক্রুশের অভিশাপ তো আছে-ই।' বললো রবিন।

'আমি সবই জানি রবিন। আবেগ ছেড়ে কাজের কথা বলো। এখন আমার করণীয় কী তা-ই বলো।' বললো মুবী।

শোচনীয় পরাজয়ের কথা স্মরণ করে অবচেতন মনে কথা বলছে রবিন। মুবীর মতো চিত্তাকর্ষক এক রূপসী তরুণী যে তার বুকের সঙ্গে জড়ানো, একটি তম্বী-তরুণীর রেশম-কোমল এলো কেশগুচ্ছে যে তার মুখমণ্ডলের অর্ধেকটা আচ্ছন্ন, সে খবর-ই নেই তার। হঠাৎ মেয়েটার কোমল চুলের পরশ অনুভব করে রবিন বলে ওঠে, মুবী! তোমার এই চুল এমন-ই শক্ত শিকল যে, সালাহুদ্দীন আইউবীকে এ শিকলে একবার বাঁধতে পারলে-ই দেখবে, ব্যেটা তোমার গোলামে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু সর্বাগ্রে তোমাকে যে কাজটি করতে হবে, তাহলো, ক্রিস্টোফর ও তার সঙ্গীদের বলবে, তারা যেন বণিকের বেশ ধরে নাজির নিকট যায় এবং তথ্য সংগ্রহ করে, তার বাহিনী কেন বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং আমাদের গোপন তথ্য কিভাবে ফাঁস হয়ে গেলো যে, সালাহুদ্দীন গুটিকতক সৈন্য দিয়ে কমাণ্ডো আক্রমণ চালিয়ে আমাদের তিন তিনটি সেনাবহর ধ্বংস করে দিলো। তাদেরকে এ বিষয়টিও জেনে নিতে বলবে, নাজি তলে তলে সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে মিলে গেলো কিনা। আমাদের এভাবে ধ্বংস করার জন্য-ই প্রতারণামূলক পত্র লিখলো কিনা। তা-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে আমাদের যুদ্ধ-পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হবে। আমি একটি বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি, ইসলামপন্থীরা সংখ্যায় যত নগণ্য-ই হোক, সম্মুখসমরে সহজে আমরা

তাদেরকে পরাজিত করতে পারবো না। তাই তাদের শাসকমণ্ডলী ও সামরিক অধিনায়কদের ঈমানী চেতনা ধ্বংস করতে হবে আগে। এ লক্ষ্যে আমরা তোমার মতো বেশ কিছু মেয়েকে আরব শাসকদের হেরেমে ঢুকিয়ে রেখেছি।'

'আবারো তুমি কথা লম্বা করছো'– বাধা দিয়ে মুবী বললো– 'আমরা নিজ বাসভবনে এক শয্যায় শুয়ে নেই। আমরা এখন দুশমনের হাতে বন্দী। বাইরে প্রহরীরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাত কেটে যাচ্ছে। হাতে সময় বেশী নেই। মিশন ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী হবে, তা-ই বলো। আমরা সাতটি মেয়ে এবং পাঁচজন পুরুষ। বলো কী করবো। এক তো বুঝলাম, নাজির কাছে যেতে হবে, তার প্রতারণার সন্ধান নিতে হবে। তারপর তোমাকে সংবাদ জানাবো কী করে? তোমাকে পাবো কোথায়?

আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবো। তার আগে আমি এই ক্যাম্প, ক্যাম্পের লোকসংখ্যা এবং আইউবীর ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেবো। এই লোকটি সম্পর্কে আমাদের অনেক সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে ক্রুশের জন্য একমাত্র বিপদ এই লোকটি। অন্যথায় ইসলামী খেলাফত আমাদের জালে আটকা পড়ে গেছে। শাহ এমার্ক বলতেন, মুসলমানরা এতো-ই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে যে, এখন চিরদিনের জন্য তাদেরকে আমাদের গোলামে পরিণত করতে প্রয়োজন একটিমাত্র ধাক্কা। কিন্তু তার এই প্রত্যয় আত্মপ্রবঞ্চনা বলে-ই প্রমাণিত হলো। এখানে অবস্থান করে আমাকে আইউবীর দুর্বল শিরাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। তোমাদের পুরুষ পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে সুদানী বাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে, তাদের দিয়ে বিদ্রোহ করাতে হবে। তবে মনে রাখবে, সবচে' বেশী প্রয়োজন হলো, আইউবী যেন জীবিত থাকতে না পারে। থাকেও যদি থাকবে আমাদের জিন্দানখানার সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, যেখানে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কখনো সূর্য চোখে দেখবে না, নজরে আসবে না আকাশের একটি তারকাও। তুমি আগে তোমার তাঁবুতে যাও এবং সহকর্মী মেয়েদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দাও। তাদের বিশেষভাবে জানিয়ে দাও, একটি লোককে তোমাদের এই রেশম-কোমল চুল, মায়াবী চোখ আর হৃদয়কাড়া দেহ দিয়ে এমনভাবে অথর্ব করে দিতে হবে, যেন সে আইউবীর আর কোন কাজে-ই না আসে। সম্ভব হলে তার ও আইউবীর মাঝে এমন ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করতে হবে, যেন তারা একজন অপরজনের শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়। ভাল করে মনে রেখো, লোকটার নাম আলী বিন সুফিয়ান।

দু'জন পুরুষের মধ্যে কিভাবে দুশমনি সৃষ্টি করতে হয়, তা তোমরা ভালো করেই জানো। যাও, সহকর্মী মেয়েদের ভালোভাবে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ক্রিস্টোফরের নিকট পৌঁছে যাও। তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, 'তোমার তীর বুঝি আইউবীর উপর এসে-ই ব্যর্থ হলো? এবার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত্ব দাও আর তোমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করো।'

মুবীর চুলে চুমু খেয়ে রবিন বললো— 'ক্রুশের জন্য প্রয়োজনে তোমাদের সম্ভ্রমও বিলিয়ে দিতে হবে। তারপরও যীশুখৃষ্টের দৃষ্টিতে তোমরা মা মরিয়মের মত কুমারী-ই থাকবে। ইসলামকে মূল থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা জেরুজালেম দখল করেছি, এবার মিসর জয় করার পালা।'

রবিনের শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুবী। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে উঁকি দেয় বাইরে। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়লো না তার। মুবী বাইরে বেরিয়ে আসে। তাঁবুর আড়াল থেকে ইতিউতি দৃষ্টিপাত করে দেখে নেয় প্রহরী কোথায়। দূরে কারুর গোঙ্গানীর শব্দ শুনতে পায় সে। হতে পারে সে-ই প্রহরী। মুবী দ্রুত হাঁটা দেয় একদিকে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দ্রুত হেঁটে পিছনের দিকে সতর্ক কান রেখে পৌঁছে যায় টিলার নিকটে। হাঁটা দেয় নিজের তাঁবুর দিকে।

আধা পথ অতিক্রম করার পর দু'জন মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসে মেয়েটির। মনে হলো, তাঁর-ই তাঁবুর নিকটে কথা বলছে দু'জন মানুষ। মুবীর মনে আশঙ্কা জাগে, প্রহরী হয়ত জেনে ফেলেছে, তাঁবুর একটি মেয়ে উধাও হয়ে গেছে। হয়তো সে কারণেই সে অন্য কোন প্রহরী বা কমাণ্ডারকে ডেকে এনেছে। ভাবনায় পড়ে যায় মুবী। মুহূর্ত মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়, নিজের তাঁবুতে যাওয়া এ মুহূর্তে নিরাপদ নয়। তার চে' অন্য পাঁচ পুরুষ সঙ্গীর কাছেই চলে যাই।

মুবীর বণিকবেশী পাঁচ মারাকেশী পুরুষ সঙ্গী এখান থেকে দেড় মাইল দূরে তাঁবু ফেলে অবস্থান করছে। তাদের কাছেই যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় মেয়েটি। কিন্তু আবার ভাবে, তার পালানোর ফলে অন্য মেয়েদের উপর বিপদ নেমে আসবে। খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে সে। কিন্তু পরক্ষণেই হাঁটা দেয় সামনের দিকে। নিজের তাঁবু অভিমুখে লোক দু'টো কী বলছে শোনার চেষ্টা

করে। মুবী আরবী বুঝে। সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে সে মিথ্যা বলেছিলো, সিসিলি ছাড়া অন্য কোন ভাষা সে বুঝে না।

চুপ মেরে যায় লোক দু'টো। এখন আর কোন কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে না তাদের। পা টিপে টিপে আরো সামনে এগিয়ে যায় মুবী। এবার ডান দিক থেকে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পায়। চকিত নয়নে ফিরে তাকায়। ঘন বৃক্ষরাজির মধ্যে কালো একটি ছায়ামূর্তি চোখে পড়ে তার। গতি পরিবর্তন করে টিলার দিকে হাঁটা দেয় মেয়েটি।

কোন বিপদের মুখোমুখি হতে চাচ্ছে না মুবী। নিরাপদে টিলার উপরে উঠতে শুরু করে সে। টিলাটি তেমন উঁচু নয়। অল্পক্ষণের মধ্যে-ই মুবী টিলার উপরে উঠে যায়।

বড় বিচক্ষণ মেয়ে মুবী। কিন্তু যত চতুর-ই হোক মানুষ প্রতি পদে পূর্ণ সাবধানতা রক্ষা করতে সমর্থ হয় না। অন্যের চোখ ফাঁকি দিয়ে সবসময় শতভাগ নিরাপদ থাকা অতি বিচক্ষণের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে।

টিলার চূড়ায় উঠে গেলেও বিচক্ষণ মেয়ে মুবী লোকটার চোখে পড়ে যায়। মুবী নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করে। মুখের উপর ছড়িয়ে থাকা খোলা চুলগুলো পিঠের উপর সরিয়ে দেয় সে। কিন্তু ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে মেয়েটির উন্নত বক্ষ আর দীর্ঘ কালো ওড়না ধাওয়াকারী লোকটিকে জানিয়ে দেয়, এটি একটি মেয়ে।

লোকটি আইউবীর প্রহরীদের কমাণ্ডার। রাতের বেলা ক্যাম্পে টহল দিতে বেরিয়েছে। মুহূর্তটা প্রহরীদের ইউনিট পরিবর্তনের সময়। সুলতান আইউবী তিনজন অধিনায়কসহ ক্যাম্পে অবস্থান করছেন। আর সে জন্যে-ই কমাণ্ডার অধিক সতর্কতার সাথে টহল দিয়ে ফিরছে। সুলতান আইউবীর ব্যবস্থাপনা বড় কঠোর। প্রতি মুহূর্তে যে কোন দায়িত্বশীল আশঙ্কাবোধ করে, হয়ত এ মুহূর্তে সুলতান তদারকি করতে বেরিয়ে আসবেন।

কমাণ্ডার বুঝে ফেলে, টিলার উপর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ সন্ধ্যায়-ই উপর থেকে কমাণ্ডারদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, খৃষ্টানরা চরবৃত্তি এবং নাশকতামূলক তৎপরতার জন্য মেয়েদের ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তাদের নিয়োজিত মেয়েরা হতে পারে মরু যাযাবরের বেশে। ভিক্ষুক বেশে ক্যাম্পে আসতে পারে ভিক্ষা করতে। কেউ আবার নিজেকে বিপন্ন নির্যাতিত বলে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে। কমাণ্ডারদের বলা হয়েছে, আজ-ই সাতটি মেয়ে সুলতান আইউবীর আশ্রয়ে এসেছে। মহামান্য সুলতান বাহ্যত তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে– প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে সন্দেহভাজন আখ্যা দিয়ে আশ্রয়ে নিয়ে

নিয়েছেন। এ-সব নির্দেশনা শুনে এই কমাণ্ডার তার এক সঙ্গীকে বলেছিলো, 'আল্লাহ করুন, যেন এমন কোন মেয়ে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বসে!' বলেই দু'জন খিল্‌খিল করে হাসিতে ফেটে পড়েছিলো।

মধ্য রাতে যখন সমগ্র ক্যাম্প গভীর নিদ্রায় অচেতন, ঠিক তখনি টিলার উপর কমাণ্ডারের চোখে পড়লো এক নারীমূর্তি। প্রথমে তার ধারণা হয়, এটি কোন জিন-ভূত হবে হয়তো। কমাণ্ডার নতুন প্রহরীকে তাঁবুর সামনে দাঁড় করিয়ে বলেছিলো, ভিতরে সাতটি মেয়ে আছে। পর্দা তুলে তাকালে ঠিক-ই সাতটি শয্যা দেখতে পায় প্রহরী। প্রতিটি মেয়ের মুখমণ্ডল কম্বল দিয়ে মুড়ি দেয়া। প্রচণ্ড শীত পড়ছিলো। সপ্তম কম্বলের তলে আসলে-ই মানুষ আছে কিনা তা আর যাচাই করে দেখেনি কমাণ্ডার। সপ্তম শয্যার মেয়েটি-ই যে টিলার উপর তার সামনে দণ্ডায়মান, তা তার অজানা।

কমাণ্ডার কিছু সময় চিন্তা করে। নিজেই মেয়েটির কাছে যাবে, নাকি তাকে নীচে নেমে আসার জন্য আদেশ করবে, কিংবা জিন-ভূত হলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করবে, ভেবে নেয় সে।

ভাবনার মধ্যে কেটে যায় কিছু সময়। কিন্তু এতক্ষণেও অদৃশ্য হয়নি মেয়েটি। বরং দু'-তিন পা এগিয়ে গেছে আরো সামনে। আবার ফিরে আসে পিছনে। থেমে যায় এবার। কমাণ্ডার– যার নাম ফখরুল মিসরী– ধীরে ধীরে পৌঁছে যায় টিলার নিকটে। উপর দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে— 'কে তুমি? নীচে নেমে আসো।'

আহত হরিণীর মত লাফিয়ে ওঠে মেয়েটি। দৌড়ে চলে যায় টিলার অপর প্রান্তে। ফখরুল মিসরী এবার নিশ্চিত হয় এটি মানুষ-ই বটে।

কমাণ্ডার সুঠামদেহী এক সুপুরুষ। টিলাও তেমন উঁচু নয়। দীর্ঘ কয়েকটি পদক্ষেপে-ই উপরে উঠে যায় সে। চারদিক অন্ধকার। রাতের আঁধারে মেয়েটির পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় লোকটি। পিছু নেয় মেয়েটির।

টিলার অপর প্রান্ত দিয়ে নীচে নেমে তীব্রগতিতে দৌড়াতে শুরু করে মেয়েটি। কমাণ্ডারও নীচে নেমে ধাওয়া করতে শুরু করে তাকে। দু' জনের মাঝে ব্যবধান অনেক। কিন্তু ফখরুল মিসরী পুরুষ, তদুপরি সৈনিক। সিংহের মত দৌড়াচ্ছে সে। টিলার পিছনে উচু-নীচু, শুষ্ক ঝোপঝাড় এবং মাঝে-মধ্যে দু' চারটি বৃক্ষ। দীর্ঘক্ষণ দৌড়িয়ে এবার ফখরুল অনুভব করলো, সামনে কেউ নেই। দাঁড়িয়ে যায় সে। অনিমেষ চোখে তাকায় ডানে-বাঁয়ে ও সামনে-পিছনে। খানিক পর পিছনে বেশ বাঁয়ে মেয়েটির পায়ের আওয়াজ ভেসে আসে তার কানে।

প্রশিক্ষিত মেয়ে। রূপ-যৌবন ব্যবহারের পাশাপাশি সামরিক ট্রেনিংও পেয়েছে সে। খঞ্জর চালনার কৌশলও তার রপ্ত। দৌড়ে পালিয়ে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো সে। ফখরুল মিসরী তাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গেছে। এবার অন্য দিকে মোড় নিয়েছে মেয়েটি।

কানামাছি খেলছে যেন দু'জন। কমাণ্ডারের যত সমস্যা অন্ধকারের কারণে। মেয়েটির পায়ের আওয়াজ-ই তার ধাওয়া করার একমাত্র অবলম্বন। চোখে দেখছে না কিছু-ই। মুবীর পা থেমে গেলে থেমে যায় ফখরুল মিসরীও। চলতে শুরু করলে সক্রিয় হয়ে উঠে ফখরুল মিসরী।

ফখরুল মিসরীর বুঝতে বাকী নেই, মেয়েটি তাগড়া যুবতী। বয়সী হলে এত দ্রুত এবং এত বেশী দৌড়াতে পারতো না।

মুবীর পুরুষ সঙ্গীদের ছাউনি সামান্য সামনে। ফখরুল মিসরীকে ফাঁকি দিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে দৌড়ে ছাউনিতে পৌঁছে যায় মেয়েটি। হাঁক দেয় সঙ্গীদের। নারী কণ্ঠের আর্ত-চীৎকার শুনে সন্ত্রস্থ হয়ে জেগে উঠে তারা। বেরিয়ে আসে তাঁবুর বাইরে। আলো জ্বালায়। তরবারী কোষমুক্ত করে নেয় ফখরুল মিসরী। হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে যায় তাদের সম্মুখে। কমাণ্ডার দেখতে পায়, পাঁচজন মানুষ। পোশাকে প্রবাসী বণিক বলে মনে হলো তাদের। সম্ভবত মুসলমান। মেয়েটি তাদের একজনের দু'পা দু'বাহু দ্বারা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। মশালের কম্পমান আলোতে তার মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড ভীতির ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বুকটা উঠানামা করছে তার। প্রচণ্ড শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে মেয়েটি।

'এই মেয়েটিকে আমার হাতে তুলে দাও।' নির্দেশের সুরে বললো ফখরুল মিসরী।

'একটি কেন, আমরা সাত সাতটি মেয়ে আপনার সুলতানের হাতে তুলে দিয়েছি। মন চাইলে আপনি একে নিয়ে যেতে পারেন।' বিনয়ের সুরে জবাব দেয় একজন।

'না, না, আমি এর সঙ্গে যাবো না! এরা খৃষ্টানদের চেয়েও জংলী। এদের সুলতান মানুষ নয়– আস্ত একটা ষাড়, হিংস্র পশু। বেটা আমার হাড়-গোড় সব ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি তার কবল থেকে পালিয়ে এসেছি।' লোকটার পদযুগল আরো শক্ত করে ধরে কান্নাজড়িত ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো মুবী।

'কোন্ সুলতান?' বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করে ফখরুল মিসরী।

'আর কে? তোমরা যাকে সালাহুদ্দীন আইউবী বলো, সেই সুলতান। জবাব দেয় মুবী। মুবী এবার কথা বলছে আরবীতে।

'মেয়েটি মিথ্যে বলছে।' বলেই ফখরুল জানতে চায়, এ কে? তোমাদের আত্মীয় কি?

'ভিতরে আসো দোস্ত! বাইরে ঠাণ্ডা পড়ছে। তরবারী কোষবদ্ধ করে নাও। আমরা ব্যবসায়ী। ভয়ের কোন কারণ নেই। মেয়েটির কাহিনী শোন।' ফখরুল মিসরীকে উদ্দেশ করে বললো একজন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লোকটি বললো, 'তোমার সুলতানকে আমি মর্দে মুমিন মনে করতাম। কিন্তু একটি রূপসী মেয়েকে হাতে পেয়ে তিনি ঈমানের কথা ভুলে গেলেন! অবশিষ্ট ছয়টি মেয়েরও তিনি একই দশা ঘটিয়ে থাকবেন অবশ্যই।'

'অন্য মেয়েদের এই দশা ঘটিয়েছে সালাররা। সন্ধ্যায় তাদেরকে ওরা নিজ তাঁবুতে ডেকে নিয়ে যায় এবং হায়েনার মত উপভোগ করে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। তাঁবুতে এখন তারা অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে।' বললো মুবী।

ভাবান্তর ঘটে যায় ফখরুল মিসরীর। ধীরে ধীরে তরবারীটা কোষবদ্ধ করে তাদের সঙ্গে তাঁবুতে ঢুকে পড়ে সে। বসে পড়ে পাতানো শয্যার এক কোণে। চুলোয় আগুন ধরিয়ে হাড়িতে করে পানি চড়ায় একজন। কফি তৈরি করার নামে কি যেন ঢালে পানিতে। ফখরুল মিসরীর পদমর্যাদা কি জানতে চায় আরেকজন। ফখরুল মিসরী জানায়, আমি পদস্থ একজন কর্মকর্তা– কমাণ্ডার। নানা রকম কথা বলে বণিকরাও আন্দাজ করে নেয়, লোকটি সাধারণ নয়– আসলেই পদস্থ কেউ হবেন। অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং দুঃসাহসীও বটে।

বণিকদের একজন– যার নাম ক্রিস্টোফর– কমাণ্ডারকে মেয়েগুলো সম্পর্কে হুবহু সেই কাহিনী শোনায়, যা শুনিয়েছিলো সুলতান আইউবীকে।

মেয়েগুলো সুলতানকে প্রস্তাব করেছিলো, আমরা যেহেতু বাবা-মার নিকটও ফিরে যেতে পারবো না, খৃষ্টানদের কাছেও নয়, তাই আমরা মুসলমান হয়ে যাই। পদস্থ সাতজন সৈনিকের সঙ্গে আমাদের বিয়ে দিয়ে দিন। ক্রিস্টোফর বললো, আমরা শুনেছিলাম, নৈতিকতার প্রশ্নে সুলতান আইউবী আপোষহীন, চরিত্র তাঁর পাথরের মতো অটল। ব্যবসার ধান্ধায় আমরা সব সময়-ই সফরে সফরে থাকি। বিপন্ন নিরাশ্রয় এই মেয়েগুলোকে কিভাবে আমরা সঙ্গে নিয়ে ঘুরি। তাই নিরাপত্তার জন্য মেয়েগুলোকে সুলতানের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু সুলতান মেয়েগুলোর সঙ্গে কী আচরণ করলেন, তা তো এই মেয়েটির জবানীতে নিজ কানেই শুনলেন!

মেয়েটির প্রতি তাকায় ফখরুল মিসরী। সুযোগ বুঝে মেয়েটি বলে, খোদা আমাদেরকে একজন ফেরেশতার আশ্রয়ে তুলে দিয়েছেন ভেবে আমরা মনে মনে বেশ খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু সূর্যাস্তের পর সুলতানের এক রক্ষী এসে আমাকে বললো, সুলতান তোমায় ডাকছেন। অন্য ছয় মেয়ের তুলনায় আমি একটু বেশী সুন্দরী। আমি কল্পনাও করিনি, তোমাদের আইউবী আমায় অসৎ উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি সরল মনে চলে গেলাম। সুলতান মদের পিপার মুখ খুললেন। ঢেলে এক গ্লাস রাখলেন নিজের সামনে আর এক গ্লাস ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। আমি খৃষ্টান, মদ পান করেছি শতবার। জাহাজে খৃষ্টান কমাণ্ডাররা আমার দেহটাকে খেলনা বানিয়ে রেখেছিলো। সালাহুদ্দীন আইউবীও একই মতলব আঁটলেন। মদ ও পুরুষ আমার জন্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু সুলতান আইউবীকে আমি ফেরেশতা মনে করতাম। তার পবিত্র দেহটাকে আমি আমার নাপাক শরীর থেকে দূরে রাখতে চাইছিলাম। কিন্তু খৃষ্টান নরপশু কমাণ্ডারদের চেয়ে তিনি অধিক ঘৃণ্য বলে প্রমাণিত হলেন। তোমাদের সুলতান আমার শরীরের হাড়-গোড় সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন।

সমুদ্রের মহাবিপদ থেকে খোদা আমাদেরকে উদ্ধার করলেন এবং ছুঁড়ে মারলেন এমন এক ব্যক্তির আশ্রয়ে, যে ফেরেশতারূপী সাক্ষাৎ হায়েনা। সুলতান-ই আমাকে বলেছিলেন, আমার সঙ্গের অন্য মেয়েরা তার সালারদের তাঁবুতে রয়েছে। আমি সুলতানের পা ধরে মিনতি করেছিলাম, আপনি আমায় বিয়ে করে নিন। তিনি বললেন, তোমার যদি আমাকে পছন্দ-ই হয়ে থাকে, তো বিয়ে ছাড়া-ই আমি তোমায় আমার হেরেমে স্থান দেবো। তিনি আমার সঙ্গে হায়েনার মত আচরণ করেছেন। ছিলেন মদে মাতাল। এক পর্যায়ে দু' বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে আমাকে তিনি তার পার্শ্বে শুইয়ে দেন ....। এক সময়ে যখন তার দু' চোখের পাতা এক হলো, আমি উঠে সেখানে থেকে পালিয়ে এলাম। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হলে তার রক্ষীদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

এই ফাঁকে ফখরুল মিসরীকে কফি পান করায় একজন। খানিক পর মেজাজে পরিবর্তন আসতে শুরু করে তার। ঘৃণাভরা কণ্ঠে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এবং বলে— 'আমাদেরকে আদেশ দেন মদ-নারী থেকে দূরে থাকো আর নিজে মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে নারী নিয়ে রাত কাটান, না?'

ফখরুল মিসরী অনুভব-ই করতে পারেনি, মেয়েটি তাকে যে কাহিনী শুনিয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নিরেট মিথ্যা। মেজাজ তার কেন পাল্টে গেলো, তাও বুঝতে পারেনি সে।

কফি নয়– ফখরুল মিসরীকে খাওয়ানো হয়েছে হাশীশ। হাশীশের নেশায় পড়ে এমন আবোল-তাবোল বকছে সে। কিন্তু এ-যে নেশা, তাও বুঝে আসেনি তার। নিজের কল্পনায় এখন সে রাজা। মশালের কম্পমান আলো নাচছে মেয়েটির মুখে। চিক্ চিক্ করছে তার বিক্ষিপ্ত কালোপনা ভ্রুর পশমগুলো। পূর্বাপেক্ষা অধিক রূপসী বলে মনে হলো তাকে ফখরুল মিসরীর কাছে। মেয়েটিকে পাওয়ার নেশায় ব্যাকুল হয়ে উঠে তার হৃদয়। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে ওঠে— 'তুমি চাইলে আমি তোমাকে আমার আশ্রয়ে নিয়ে নিতে পারি।'

'না, তুমিও আমার সঙ্গে সুলতানের ন্যায় একই আচরণ করবে। আমাকে তুমি তোমার তাঁবুতে নিয়ে যাবে আর আমি পুনরায় তোমাদের সুলতানের কব্জায় চলে যাবো।' হঠাৎ ভয় পাওয়া মানুষের ন্যায় আঁৎকে উঠে দু' পা পিছনে সরে গিয়ে বললো মেয়েটি।

'আমরা এখন অপর ছয়টি মেয়েকে কিভাবে উদ্ধার করে আনা যায় ভাবছি। আমরা তাদের ইজ্জত বাঁচাতে চেয়েছিলাম; কিন্তু ভুল করে ফেললাম।' বললো ব্যবসায়ীদের একজন।

ফখরুল মিসরীর দৃষ্টি মেয়েটির উপর নিবদ্ধ। এতো সুন্দরী মেয়ে জীবনে আর দেখেনি সে কখনো। কারো মুখে রা নেই। অখণ্ড এক নীরবতা বিরাজ করছে তাঁবুতে। সেই নীরবতা ভাঙ্গে ক্রিস্টোফর। বললো— 'তুমি কি আরব থেকে এসেছো, নাকি মিসরী?'

'আমি মিসরী। দু' দু'টো যুদ্ধে লড়েছি। দক্ষতার বলে এ পদ পেয়েছি।' বললো ফখরুল মিসরী।

'নাজি যে সুদানী যে বাহিনীটির সালার, এখন সেটি কোথায়?' জিজ্ঞেস করে ক্রিস্টোফর।

'সেই বাহিনীর একজন সৈনিকও আমাদের সঙ্গে নেই।' জবাব দেয় মিসরী।

'বলতে পারো, এমনটি কেন হয়েছে? সুদানীরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নেতৃত্ব ও কমাণ্ড মেনে নেয়নি। বাহিনীটি নিজেকে স্বাধীন মনে করতো। নাজি সুলতানকে বলে দিয়েছিলো, সে মিসর ছেড়ে চলে যাবে। কারণ, সে বিদেশী মানুষ। এ কারণে আইউবী মিসরীদের একটি বাহিনী গঠন করেন এবং যুদ্ধ করাবার জন্য এখানে নিয়ে আসেন। তোমাদের সুলতান তোমাদেরকে আত্মমর্যাদা ও সৎকর্মের উপদেশ দেয় আর নিজে আয়েশ করে চলে। তা যুদ্ধ করে গনীমত কিছু পেয়েছো কি?.....। দু' এক চাকা সোনা-রূপা পেয়েছো হয়তো! খৃষ্টানদের জাহাজ থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা-চাঁদী সুলতানের হাতে এসেছে। রাতের আঁধারে হাজার হাজার উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে সেসব

পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে কায়রো। সেখান থেকে পাচার হবে দামেস্ক ও বাগদাদ। সুদানী বাহিনীটিকে নিরস্ত্র করে সুলতান তাদের গোলামে পরিণত করতে চায়। তারপর ফৌজ আসবে আরব থেকে। তখন তোমরা মিসরীরাও গোলাম হয়ে যাবে তাদের।' বললো ক্রিস্টোফর।

ক্রিস্টোফরের প্রতিটি কথা হৃদয়ে বসে যাচ্ছে ফখরুল মিসরীর। ক্রিয়াটা মূলত কথার নয়– ক্রিয়া মুবীর রূপ আর হাশীশের। ক্রিস্টোফর এই কৌশল রপ্ত করেছে হাসান ইবনে সাব্বাহ'র হাশীশীদের নিকট থেকে। মুবী কল্পনাও করেনি, একজন মিসরী কমাণ্ডার তাকে ধাওয়া করে অবশেষে তারই মুঠোয় এসে ধরা দেবে। মেয়েটি জেনে ফেলেছে, মিসরী কমাণ্ডার আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানে না।

এবার মুবী আরো তথ্য দিতে শুরু করে সঙ্গীদের। বলে, রবিন জখমের ভান করে সুলতান আইউবীর জখমীদের তাঁবুতে পড়ে আছেন। তিনি বলেছেন, নাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে হবে, তিনি বিদ্রোহ কেন করলেন না কিংবা পিছন থেকে কেন তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর আক্রমণ করলেন না। তাছাড়া নাজি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করলেন কিনা, রবিন তারও খোঁজ নিতে বলেছেন।

মুবীকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে দেখে ফখরুল মিসরী জিজ্ঞেস করে— 'ও কী বলছে?'

একজন জবাব দেয়— 'ও বলছে, যদি এ লোকটি, অর্থাৎ তুমি যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈনিক না হতে, তাহলে ও তোমাকে বিয়ে করে নিতো। প্রয়োজনে ও মুসলমান হয়ে যেতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু ও বলছে, এখন আর কোন মুসলমানের উপর তার আস্থা নেই।'

জবাব শুনে ব্যাকুল হয়ে উঠে ফখরুল মিসরী। খপ্ করে মেয়েটির দু' বাহু ধরে ফেলে নিজের কাছে টেনে আনে। আপ্লুত কণ্ঠে বলে— 'খোদার কসম! আমি যদি রাজা হতাম, তবুও তোমার খাতিরে আমি সিংহাসন ত্যাগ করতাম। শর্ত যদি এ-ই হয় যে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর তরবারী ফেলে দেবো, তাহলে এই নাও আইউবীর তরবারী।' নিজের কটিবন্ধ থেকে তরবারীটা বের করে কোষসহ মেয়েটির পায়ের উপর রেখে দেয় ফখরুল মিসরী। বলে— 'এ মুহূর্ত থেকে আমি আইউবীর সৈনিক নই, কমাণ্ডার নই।'

'আরো একটি শর্ত আছে। তোমার খাতিরে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করবো ঠিক; কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী থেকে প্রতিশোধ আমি নেবো-ই।' বললো মেয়েটি।

'তার মানে তুমি কি তাকে আমাকে দিয়ে হত্যা করাতে চাও?' জিজ্ঞেস করে ফখরুল।

মুবী তার সঙ্গীদের প্রতি তাকায়। পরস্পর চোখাচোখী করে সকলে। জবাবটা কী দেবে স্থির করে নেয় ক্রিস্টোফর। অবশেষে বলে— 'এক সালাহুদ্দীন বিদায় নিলে তাতে তেমন কি আর লাভ হবে। আসবে আরেক সুলতান। সেও হবে তার-ই মতো। গোলাম হয়ে-ই থাকতে হবে মিসরীদের। কাজেই ও-সবের প্রয়োজন নেই। তুমি বরং একটা কাজ করো; সুদানীদের সালার নাজির কাছে যাও এবং এই মেয়েটিকে তার সামনে উপস্থিত রেখে তাকে জানাও, সালাহুদ্দীন আইউবী আসলে কেমন মানুষ আর লক্ষ্য-ই বা তার কী?

বণিকবেশী খৃষ্টান কুচক্রীদের জানা ছিলো, খৃষ্টানদের সঙ্গে নাজির যোগসাজশ আছে এবং মুবী অকপটে তার সঙ্গে মিশন নিয়ে কথা বলতে পারবে। কিন্তু সুলতান আইউবী যে বিশ্বাসঘাতক নাজি ও তার সালারদের কৌশলে সংগোপনে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছেন, তা তাদের অজানা। তথ্য নেয়ার জন্য নাজির কাছে যাওয়ার কথা ছিলো মেয়েটির। কিন্তু তার একা যাওয়া সম্ভব ছিলো না। ঘটনাক্রমে ফখরুল মিসরীকে পেয়ে গেছে সে। তাকেই কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়।

মুবীকে নিয়ে রওনা হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয় ফখরুল মিসরীকে। একটি উট দেয়া হয় তাকে। পানির মশক এবং খাবারভর্তি একটি থলে বেঁধে দেয়া হয় উটের সঙ্গে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কিছু জিনিস আছে, তাতে হাশীশ মেশানো। বিষয়টা জানা ছিলো মুবীর।

একটি লম্বা চোগা এবং ব্যবসায়ীর পোশাক পরিয়ে দেয়া হয় ফখরুল মিসরীকে। উটের পিঠে সম্মুখভাবে চড়ে বসে মেয়েটি। ফখরুল বসে পিছনে। চলতে শুরু করে উট।

আশ-পাশের কোন খবর নেই ফখরুল মিসরীর। এমনকি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সম্পূর্ণ উদাসীন সে। এ মুহূর্তে লোকটা জানে শুধু একটা-ই— পৃথিবীর একটি সেরা সুন্দরী যুবতী তার মুঠোয়, সুলতান আইউবীকে উপেক্ষা করে যে তাকে বরণ করে নিয়েছে! মুবীকে দু' বাহুতে জড়িয়ে ধরে পিঠটা তার নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বসেছে ফখরুল মিসরী।

মুবী বললো— 'তুমিও আবার খৃষ্টান কমাণ্ডার আর তোমার সুলতানের মতো হায়েনার পরিচয় দেবে না তো? আমি এখন তোমার মালিকানাধীন, তোমার

হাতের মুঠোয়। যা মন চায় করার সুযোগ তোমার আছে। তবুও আমি তোমায় ঘৃণার চোখে দেখবো।'

'তুমি যদি বলো, আমি এখনি উটের পিঠ থেকে নেমে যাবো। আমাকে তুমি শুধু এতটুকু বলো, তুমি মনে-প্রাণে আমাকে কামনা করছো, না-কি নিছক বিপদে পড়ে আমার আশ্রয়ে এসেছো?' বাহুবন্ধন থেকে মুবীকে ছেড়ে দিয়ে বললো ফখরুল মিসরী।

'না, তা নয়। আশ্রয় তো আমি ঐ ব্যবসায়ীদেরও নিতে পারতাম। কিন্তু তোমাকে আমার মনে ধরেছে বলে-ই নিজের ধর্মটা পর্যন্ত ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' জবাব দেয় মুবী। আবেগময় কথা বলে মুবী ফখরুল মিসরীকে মাতিয়ে রাখে এবং কথায় কথায় রাত কাটিয়ে দেয়।

সফরটা ছিলো অন্তত পাঁচ দিনের। কিন্তু ফখরুল মিসরী পথ চলছে সাধারণ রাস্তা ছেড়ে অন্য পথে। কারণ, লোকটা দলছুট সৈনিক। ঘুম চাপতে শুরু করে মুবীর। তাই পিছনে হেলান দিয়ে মাথাটা ফখরুল মিসরীর বুকে এলিয়ে দিয়ে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায় সে। চলতে থাকে উট। জেগে আছে ফখরুল মিসরী।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সবেমাত্র ফজর নামায সমাপ্ত করেছেন। জায়নামাজ ছেড়ে এখনো ওঠেননি। কক্ষে প্রবেশ করে দারোয়ান সংবাদ জানায়, আলী বিন সুফিয়ান এসেছেন। সুলতান দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। সুলতানকে সালাম দেন আলী বিন সুফিয়ান। কিন্তু সালামের জবাব দেয়ার আগেই সুলতানের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে— 'ওদিকের খবর কী?'

'এখনো ভালো। তবে সুদানী সৈন্যদের মধ্যে অস্থিরতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাদের মধ্যে আমি যে গুপ্তচর রেখে এসেছিলাম, তার রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তাদের কোন একজন কমাণ্ডারও যদি নেতৃত্ব হাতে তুলে নেয়, তাহলে বিদ্রোহ ঘটে যাবে।' জবাব দেন আলী বিন সুফিয়ান।

আলী বিন সুফিয়ানকে নিয়ে তাঁবুর ভিতরে চলে যান সালাহুদ্দীন আইউবী। আলী বললেন— 'নাজি ও তার অনুগত সালারদের আমরা খতম করেছি ঠিক; কিন্তু তারা সুদানীদের মধ্যে মিসরী ফৌজের বিরুদ্ধে ঘৃণার যে বিষ ছড়িয়ে গেছে, তার ক্রিয়া এতটুকুও কমেনি। তাদের অস্থিরতার আরেক কারণ তাদের অধিনায়কদের গুম হওয়া। গুপ্তচরদের মাধ্যমে তাদের মধ্যে আমি এ সংবাদ ছড়িয়ে দিয়েছি যে, তাদের অধিনায়করা রোম উপসাগরের রণাঙ্গনে গেছে। কিন্তু আমীরে মোহতারাম! আমার ধারণা, সুদানীদের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ ঢুকে পড়েছে। তাদের বিশ্বাস, তাদের সালারদের বন্দী করে খুন করা হয়েছে।'

'আচ্ছা, বিদ্রোহের ঘটনা যদি ঘটেই যায়, তাহলে মিসরে আমাদের যে সৈন্য আছে, তারা কী তা দমন করতে পারবে? তারা অভিজ্ঞ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করতে পারবে কি? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে.......!' জিজ্ঞেস করেন সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আমার মনে হয়, আমাদের এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য তাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। তবে আয়োজন একটা আমি করে এসেছি। আমি মহামান্য নুরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট দ্রুতগামী দু'জন দূত প্রেরণ করেছি। তাঁর সমীপে পয়গাম পাঠিয়েছি, মিসরে বিদ্রোহের ডামাডোল শুরু হতে চলেছে। আমরা এ যাবত যে বাহিনী প্রস্তুত করেছি, প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। তাছাড়া তাদের অর্ধেক-ই অবস্থান করছে রণাঙ্গনে। সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমন করার জন্য আপনি শীঘ্র বাহিনী প্রেরণ করুন।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'ওদিক থেকে সহযোগিতার আশা খুব কম। গত পরশু এক দূত সংবাদ নিয়ে এসেছিলো, নূরুদ্দীন জঙ্গী রাজা ফ্রাংকের উপর আক্রমণ করেছেন। এ আক্রমণ তিনি আমাদের সহযোগিতার জন্য করেছেন। সে সময়ে ফ্রাংকের কর্মকর্তা ও অধিনায়কগণ ছিলো রোম উপসাগরে খৃষ্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর নৌ-বহরে। ফ্রাংকের কিছুসংখ্যক সৈন্য মিসরে প্রবেশ করে হামলা করতে চেয়েছিলো এবং আমাদের সুদানী বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য মিসরের সীমান্তে এসে উপনীত হয়েছিলো। সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী সেই বাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাদের সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিয়েছেন এবং রাজা ফ্রাংকের বিস্তর এলাকায় নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করেছেন। ক্রুসেডারদের থেকে জরিমানা বাবদ কিছু অর্থও আদায় করেছেন।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

তাঁবুর ভিতরে পায়চারী করতে শুরু করেন সুলতান আইউবী। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন— 'সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী থেকে আমি ওখানকার এমন পরিস্থিতির কথা জানতে পেরেছি, যা আমাকে অস্থির করে রেখেছে।'

'খৃষ্টানরা কি ওখানে পাল্টা আক্রমণ করবে বলে মনে করেন?' জিজ্ঞেস করেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমার খৃষ্টানদের আক্রমণের পরোয়া বিন্দুমাত্র নেই। অস্থিরতা আমার এই জন্য যে, কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব যাদের, তারা মদের মটকায় ডুবে আছে। ইসলামের দুর্গের প্রহরীরা বন্দী হয়ে আছে হেরেমে। নারীর চুল বেঁধে ফেলেছে তাদের পা। চাচা আসাদুদ্দীন শেরেকোহ'কে ইসলামের ইতিহাস

কখনো ভুলতে পারবে না। হায়! এ সময়ে যদি তিনি জিন্দা থাকতেন! যুদ্ধের ময়দানে তিনি-ই আমাকে টেনে এনেছিলেন। আমি বড় কঠিন কঠিন মুহূর্ত দেখেছি। চাচা শেরেকোহ'র বাহিনীর অগ্রগামী ইউনিটের আমি কমাণ্ড করেছি। তার সঙ্গে খৃষ্টানদের অবরোধে আমি তিন মাস কাটিয়েছি। চাচা সব সময় আমাকে সবক দিতেন, বেটা! কখনো ভীত হয়ো না, ভয়-ভীতি থেকে নিজেকে সদা মুক্ত রাখবে। মহান আল্লাহর সাহায্যের প্রতি আস্থা রাখবে। ইসলামের পতাকা উচ্চে ধরে রাখবে সব সময়। আমি শেরেকোহ'র কমাণ্ডে মিসরী এবং খৃষ্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। ইস্কান্দারিয়ায় অবরোধে কাটিয়েছি দীর্ঘদিন। আমার মাথার উপর পরাজয় এসে গিয়েছিলো। আমার মুষ্টিমেয় সৈন্যের মনোবল ভেঙ্গে যেতে শুরু করেছিলো। কিন্তু তারপরও বিজয় আমার পদচুম্বন করেছে। কীভাবে তা সম্ভব হয়েছিলো, কী করে আমি আমার সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা রেখেছিলাম, আল্লাহ-ই তা ভালো জানেন। চাচা শেরেকোহ আক্রমণ করে সেই অবরোধ ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। সেই কাহিনী তো তুমি ভালো করেই জান আলী! ঈমান-বিক্রেতারা কাফিরদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আমাদের বিরুদ্ধে কিরূপ ঝড় সৃষ্টি করেছিলো, তা-ও তোমার অজানা নয়। কিন্তু এমন কঠিন মুহূর্তেও আমি সাহস হারাইনি, ভয় পাইনি।'

'আমার সবকিছু মনে আছে সুলতান! এত যুদ্ধ-বিগ্রহ আর হত্যা-লুণ্ঠনের পর আশা করেছিলাম, এবার মিসরীরা সোজা পথে ফিরে আসবে। কিন্তু এক গাদ্দার মরে তো আরেক গাদ্দার এসে তার স্থান দখল করে। আমি বিশেষভাবে যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করছি, তা হলো, মিসরে এ যাবত যে ক'জন গাদ্দার আত্মপ্রকাশ করেছে, তারা সবাই দুর্বল খেলাফতের সৃষ্টি। ফাতেমী খেলাফত যদি হেরেমে ঢুকে না পড়তো, সুন্দরী নারীর আঁচলে বাঁধা না পড়তো, তাহলে আপনি আজ খৃষ্টানদের সঙ্গে লড়াই করতেন ইউরোপে, তাদেরই ভূখণ্ডে। কিন্তু আমাদের গাদ্দার বন্ধুরা এই ক্রুশ বনাম চাঁদ-তারার লড়াইকে মিসরের সীমানা অতিক্রম করতে দিচ্ছে না। রাজা যখন ভোগ-বিলাসে ডুবে যান, তখন প্রজাদের মধ্যে কিছু লোক রাজত্বের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। শক্তি ও সাহায্য লাভ করে তারা কাফিরদের থেকে। ঈমান বেচা-কেনায় এত অন্ধ হয়ে পড়ে যে, তারা কাফিরদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং আপন কন্যাদের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিতে পর্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করে না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমি সব সময় এদেরকে-ই ভয় পাই। আল্লাহ না করুন, ইসলামের নাম যদি কখনো ডুবে যায়, ডুববে মুসলমানদের-ই হাতে। আমাদের ইতিহাস গাদ্দারদের ইতিহাসে পরিণত হতে যাচ্ছে। আমার মন বলছে, একদিন

মুসলমানরা নিজেদের ভিটেমাটি কাফিরদের হাতে-তুলে দেবে। মুসলমান যদি কোথাও বেঁচে থাকে, সেখানে মসজিদ থাকবে কম, গান-বাজনা ও বেশ্যালয় থাকবে বেশী। আমাদের মুসলিম পুরুষরা বুকে ক্রুশ ঝুলিয়ে গর্ববোধ করবে আর মেয়েরা আধুনিকতা-স্বাধীনতার নামে বেহায়ার মত রাস্তায় চলাচল করবে। আমি মুসলিম মিল্লাতের পতনের ঘনঘটা শুনতে পাচ্ছি আলী! তবে হাল ছাড়া যাবে না। তুমি তোমার বিভাগকে আরো সুসংহত, শক্তিশালী করো। দুশমনের এলাকায় গিয়ে কমাণ্ডো আক্রমণ এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য শক্ত-সামর্থ ও বিচক্ষণ যুবকদের খুঁজে বের করো। খৃষ্টানরা দিন দিন শক্তিশালী ও সক্রিয় হচ্ছে। তোমাকে এক্ষুণি যে কাজটি করতে হবে, তা হলো, সমুদ্র থেকে যেসব খৃষ্টান সেনা জীবনে রক্ষা পেয়েছে, তাদের অধিকাংশ আহত। যারা আহত নয়, তারাও দিনের পর দিন সমুদ্রে সাঁতার কাটার ফলে আহতদের অপেক্ষাও বেশী বিপর্যস্ত। তাদের সকলের চিকিৎসা চলছে। আমি তাদের সকলকে দেখেছি। তুমি তাদের এক নজর দেখে নাও এবং জরুরী তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করো।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

দারোয়ানকে ডেকে নাস্তা আনতে বললেন সুলতান আইউবী। তারপর আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলতে শুরু করলেন— 'গতকাল কয়েকজন আহত পুরুষ ও কয়েকটি মেয়েকে আমার সামনে হাজির করা হয়েছিলো। ছয়জন সমুদ্র থেকে উদ্ধার পাওয়া কয়েদী। তাদের একজনের প্রতি আমাদের সন্দেহ হয়, লোকটা সাধারণ সেপাই নয়। পদস্থ কোন অফিসার বোধ হয়। তুমি সর্বাগ্রে তার সাথে কথা বলো। আর পাঁচজন ব্যবসায়ী সাতটি খৃষ্টান মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো।'

ব্যবসায়ীরা সুলতান আইউবীকে যা বলেছিলো, তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে তা শোনান। তিনি বললেন, আমি মেয়েগুলোকে মূলত বন্দী করেছি, যদিও তাদেরকে আশ্রয় দেয়ার কথা বলেছি। এই যে মেয়েগুলো বললো, তারা গরীব পরিবারের সন্তান, জ্বলন্ত জাহাজ থেকে নামিয়ে একটি নৌকায় বসিয়ে তাদের ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং নৌকা তাদেরকে কূলে এনে ফেলেছে, এসব বক্তব্য আমাকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে। আমি তাদেরকে একটি পৃথক তাঁবুতে রেখেছি এবং প্রহরার জন্য একজন সান্ত্রী দাঁড় করিয়ে রেখেছি। নাস্তাটা খেয়ে-ই তুমি ঐ কয়েদি আর মেয়েগুলোর কাছে চলে যাও।'

অবশেষে সুলতান আইউবী মুখে মুচকি হাসি টেনে বললেন— 'গতকাল দিনের বেলা আমি উপকূলে টহল দিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার প্রতি কোন্ দিক থেকে

যেন একটা তীর ছুটে আসে। তীরটি আমার দু' পায়ের মাঝে বালিতে এসে বিদ্ধ হয়।'

সালাহুদ্দীন আইউবী তীরটি আলী বিন সুফিয়ানকে দেখিয়ে বললেন, এলাকাটা ছিলো পর্বতময়। রক্ষীরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি করেও কোন তীরান্দাজের দেখা পায়নি। পাওয়া গেছে এই পাঁচজন ব্যবসায়ী। রক্ষীরা তাদেরকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসে। এই সাতটি মেয়েকে তারা আমার হাতে তুলে দিয়ে চলে গেছে।'

'কী বললেন, তারা চলে গেছে! আপনি তাদের যেতে দিলেন!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'রক্ষীরা তাদের তল্লাশী নিয়েছিলো, তাদের কাছে সন্দেহজনক কিছু-ই পাওয়া যায়নি।' বললেন সুলতান আইউবী।

তীরটি হাতে নিয়ে নিরীক্ষা করে দেখেন আলী বিন সুফিয়ান। বললেন, 'সুলতান আর গুপ্তচরের দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য। সর্বাগ্রে আমি ঐ ব্যবসায়ীদের ধরার চেষ্টা করবো।'

আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসলে দারোয়ান বললো, এই কমাণ্ডার সংবাদ নিয়ে এসেছেন, কাল যে সাতটি মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছিলো, তাদের একজনের খোঁজ নেই। সুলতানকে সংবাদটা জানানোর প্রয়োজন আছে কি?

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন আলী বিন সুফিয়ান। সংবাদদাতা কমাণ্ডার আলীর নিকটে এসে বললো— 'একটি খৃষ্টান মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হলো, ফখরুল মিসরী নামক কমাণ্ডার রাত থেকে উধাও। রাতের সান্ত্রীরা জানিয়েছে, ফখরুল মিসরী মেয়েদের তাঁবুর নিকট গিয়েছিলো। সেখান থেকে গেছে জখমীদের তাঁবুর দিকে। তারপর আর তাকে দেখা যায়নি। রাতে সে টহল দিতে বেরিয়েছিলো।'

খানিকটা চিন্তা করে আলী বিন সুফিয়ান বললেন, এ সংবাদ সুলতানকে এখনই দিও না। ফখরুল মিসরী রাতের যে সময়ে ডিউটিতে গিয়েছিলো, তখনকার সব সান্ত্রীকে সমবেত করো।' আলী সুলতান আইউবীর রক্ষী বাহিনীর কমাণ্ডারকে বললেন, গতকাল যে রক্ষী ইউনিটটি সুলতানের সঙ্গে উপকূল পর্যন্ত গিয়েছিলো, তাদেরও আসতে বলো।

রক্ষীরা সেখানেই উপস্থিত ছিলো। সামনে এগিয়ে আসে চারজন। আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'কাল যেখানে তোমরা ব্যবসায়ী ও মেয়েদের দেখেছিলে,

এক্ষুণি সেখানে চলে যাও। ব্যবসায়ীরা যদি এখনো সেখানে থাকে, তাহলে তাদের আটক করে ফেলো। আর যদি না পাও, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসো।'

রক্ষীরা রওনা হয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান মেয়েদের তাঁবুর নিকট চলে যান। ছয়টি মেয়ে তাঁবুর বাইরে বসে আছে। সান্ত্রী দাঁড়িয়ে। মেয়েদের এক সারিতে দাঁড় করান আলী বিন সুফিয়ান। আরবীতে জিজ্ঞেস করেন— 'সপ্তম মেয়েটি কোথায়?'

মেয়েরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মাথা নাড়ে। আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'তোমরা কি আমার ভাষা বুঝছো?'

মেয়েরা বিস্ময়ের সাথে আলীর প্রতি তাকিয়ে থাকে। আলী তাদের চেহারা ও হাবভাব দেখে সন্দেহে পড়ে যান। তিনি মেয়েগুলোর পিছনে গিয়ে দাঁড়ান। আরবীতে বলেন— 'পরনের পোশাক খুলে এদের উলঙ্গ করে ফেলো, চারজন হায়েনা চরিত্রের সেপাই ডেকে আনো।'

চমকে উঠে মেয়েরা মোড় ঘুরে পিছন দিকে তাকায়। সমস্বরে কথা বলতে শুরু করে দু' তিনজন। নিজেদের অলক্ষ্যে আরবীতেই বলছে তারা— 'আমাদের সঙ্গে তোমরা এরূপ আচরণ করতে পারো না।' একজন বললো— 'আমরা তো আর তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ছি না।'

মুখ থেকে হাসি বেরিয়ে আসে আলী বিন সুফিয়ানের। বললেন— 'আমি তোমাদের সঙ্গে অনেক ভালো ব্যবহার করবো। এক ধমকে-ই আরবী বুঝাতে ও বলতে শুরু করেছো। বড় ভালো মেয়ে তোমরা। এবার ধমক ছাড়াই বলে দাও, সপ্তম মেয়েটি কোথায়।'

সকলেই অজ্ঞতা প্রকাশ করে। আলী বললেন— 'এ প্রশ্নের যথাযথ জবাব আমি তোমাদের থেকে নিয়ে-ই ছাড়বো। সুলতানকে বলেছিলে, তোমরা আরবী জানো না। আর এখন কিনা আমাদের মতোই আরবী বলছো। আমি কি তোমাদের এমনিতে-ই ছেড়ে দেবো?' আলী বিন সুফিয়ান সান্ত্রীকে বললেন— 'এদেরকে তাঁবুর ভেতরে বসিয়ে রাখো।'

রাতের প্রহরী এসে গেছে। আলী বিন সুফিয়ান ফখরুল মিসরীর ডিউটির সময়কার প্রহরীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মেয়েদের তাঁবুর প্রহরী জানায়, ফখরুল রাতে তাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে জখমীদের তাঁবুর দিকে গিয়েছিলো। খানিক পর আমি তার কণ্ঠ শুনতে পাই— 'কে তুমি? নীচে নেমে আসো।' আমি সেদিকে দৃষ্টিপাত করে অন্ধকারে কিছু-ই দেখলাম না। সম্মুখে

মাটির টিলার উপর ছায়ার মতো কী যেন দেখলাম। পরক্ষণেই ছায়াটি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

তৎক্ষণাৎ আলী বিন সুফিয়ান ছুটে গেলেন সেখানে। টিলাটি উপকূলের সন্নিকটে। বালুকাময় মাটি। একস্থানে দু' মাপের দু'টি পায়ের ছাপ পাওয়া গেলো। একটি সামরিক বুট পরিহিত পুরুষের। অপরটি ছোট জুতার ছাপ– মেয়েলি বলে মনে হলো। মেয়েলি চিহ্নটি যেদিক থেকে এসেছে, আলী বিন সুফিয়ান ছুটে যান সেদিকে। এই চিহ্নটি তাকে নিয়ে যায় সেই তাঁবুর কাছে, যেখানে মুবী মিলিত হয়েছিলো রবিনের সঙ্গে। আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুর পর্দা তুলে ভেতরে ঢুকে যান।

এক এক করে জখমী কয়েদীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন আলী বিন সুফিয়ান। সকলের চেহারা পরিমাপ করেন তিনি। রবিন বসে আছে। আলী বিন সুফিয়ানকে দেখামাত্র কোঁকাতে শুরু করে সে। হঠাৎ ব্যথা উঠেছে তার। আলী বিন সুফিয়ান কাঁধে ধরে দাঁড় করিয়ে তাঁবুর বাইরে নিয়ে যান তাকে। জিজ্ঞেস করেন— 'রাতে তোমার তাঁবুতে একটি কয়েদী মেয়ে এসেছিলো। কেন এসেছিলো?' রবিন কোন জবাব না দিয়ে আলীর প্রতি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, যেন সে কিছু-ই বুঝছে না। আলী বিন সুফিয়ান ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন— 'তুমি কি আমার ভাষা বুঝ দোস্ত! আমি কিন্তু তোমার ভাষা বুঝি এবং বলতেও পারি। তোমাকেও আমার ভাষায়-ই জবাব দিতে হবে।' কিন্তু রবিন অপলক চোখে তাকিয়ে-ই আছে আলীর প্রতি। আলী বিন সুফিয়ান সান্ত্রীকে বললেন— 'একে তাঁবুর বাইরে রাখো।'

আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুতে প্রবেশ করেন। অন্যান্য কয়েদীদের তাদের ভাষায় জিজ্ঞেস করেন— 'রাতে মেয়েটি এ তাঁবুতে কতক্ষণ ছিলো? সত্য কথা বলো, অযথা নিজেদের কষ্টে ফেলো না।'

কথা বলছে না কেউ। ধমকি দেন আলী বিন সুফিয়ান। এবার এক জখমী বললো, একটি মেয়ে রাতে তাঁবুতে এসেছিলো এবং রবিনের শয্যায় বসে বা শুয়ে ছিলো।

এ লোকটি জ্বলন্ত জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলো। আগুন এবং পানি দু'য়ের-ই লীলা দেখে এসেছে লোকটি। যত ভীত ততটা আহত নয়। তবে তৃতীয় আর কোন বিপদে পড়তে প্রস্তুত নয় সে। সে জানায়, রবিন ও আগত মেয়েটির মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে, তা তার জানা নেই। মেয়েটি কে, তা-ও সে বলতে পারে না। রবিনের পদ কি, তাও তার অজানা। সে জানায়, ক্যাম্পে আসার পূর্ব

পর্যন্ত লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলো। এখানে আসার পর-ই সে এভাবে কোঁকাতে শুরু করেছে।

এক প্রহরীর দিক-নির্দেশনায় আলী বিন সুফিয়ান সেই পাঁচ ব্যক্তিকে দেখার জন্য চলে যান, যারা বণিক বেশে কিছু দূরে তাঁবু ফেলে অবস্থান করছে। আলীর রক্ষীরা আলাদাভাবে এক স্থানে বসিয়ে রেখেছে তাদের। রক্ষীরা আলী বিন সুফিয়ানকে তথ্য প্রদান করে, কাল এদের নিকট দু'টি উট ছিলো; আজ আছে একটি। বিচক্ষণ গোয়েন্দা প্রধান আলীর জন্য এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। অপর উটটি কোথায় গেলো, বণিকদের কাছে তার সন্তোষজনক কোন জবাব পাওয়া গেলো না। অনুসন্ধানে নেমে পড়েন আলী বিন সুফিয়ান। উধাও হওয়া উটের পদচিহ্ন পেয়ে গেলেন তিনি। বণিকদের বললেন— 'তোমরা সাধারণ কোন অপরাধে অপরাধী নও। অন্যায় তোমাদের গুরুতর। তোমরা গোটা একটি সাম্রাজ্য এবং তার সকল নাগরিকের জন্য বিপজ্জনক। তাই তোমাদের প্রতি আমি এতটুকু সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারি না। বলো তো, তোমরা কি ব্যবসায়ী?'

'হ্যা, আমরা ব্যবসায়ী জনাব! আমরা নিরপরাধ।' মাথা লেড়ে জবাব দেয় সকলে।

আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'তোমাদের সকলের হাতের উল্টা দিকটা একটু দেখাও দেখি।' সকলে নিজ নিজ হাত উল্টো করে আলী বিন সুফিয়ানের সামনে এগিয়ে ধরে। আলী সকলের বাঁ হাতের বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুলের মাঝখানটা দেখেন এবং একজনের বাহু ধরে সামনে নিয়ে আসেন। বললেন— 'ধনুক-তূনীর কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ বল্!'

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করে লোকটি। আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীর এক রক্ষীকে নিজের কাছে ডেকে এনে তার বাঁ হাতের উল্টো দিকটা লোকটাকে দেখান। আঙ্গুলের গোড়ায় উল্টো পিঠে একটি দাগ আছে। তেমনি একটি দাগ বণিক লোকটির আঙ্গুলের পিঠেও বিদ্যমান। আলী বিন সুফিয়ান তাকে রক্ষী সম্পর্কে বলেন— 'এ লোকটি সুলতান আইউবীর সেরা তীরান্দাজ। তার তীরান্দাজ হওয়ার প্রমাণ এই চিহ্ন।'

বণিক লোকটির আঙ্গুলের উল্টো পিঠে অস্পষ্ট ধরনের একটি চিহ্ন, যেন এ স্থানে বারবার কোন একটি বস্তুর ঘর্ষণ লেগেছে। এটি তীর ঘর্ষণের দাগ। তীর ধরা হয় ডান হাতে। ধনুক থাকে বাঁ হাতে। তীরের অগ্রভাগ থাকে আঙ্গুলের উপর। আর তীর ধনুক থেকে বের হওয়ার সময় আঙ্গুলে ঘর্ষণ লাগে। এমনি দাগ থাকে প্রত্যেক তীরান্দাজের হাতে। আলী বিন সুফিয়ান লোকটিকে বললেন, এই পাঁচজনের মধ্যে তুই-ই শুধু তীরান্দাজ। বল্, ধনুক-তূনীর কোথায় রেখেছিস্?'

পাঁচজন-ই নীরব। আলী বিন সুফিয়ান পাঁচজনের একজনকে ধরে রক্ষীদের বললেন— 'একে ঐ গাছটার সাথে বেঁধে রাখো।'

লোকটিকে একটি খেজুর গাছের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে বেঁধে রাখা হলো। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর তীরান্দাজের কানে কানে কী যেন বললেন। তীরান্দাজ কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে তীর সংযোজন করে এবং গাছের সঙ্গে বাঁধা লোকটিকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ে। তীর গিয়ে বিদ্ধ হয় লোকটির ডান চোখে। ছট্ফট্ করতে শুরু করে লোকটি। আলী বিন সুফিয়ান অপর চারজনকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে আর যে ক্রুশের সন্তুষ্টি অর্জনে এভাবে ছট্ফট্ করে করে জীবন দিতে প্রস্তুত আছো, ওর দিকে তাকাও।' লোকটির প্রতি চোখ তুলে তাকায় তারা। লোকটি ছট্ফট্ করছে আর চীৎকার করছে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরছে তার তীরবিদ্ধ চোখ থেকে।

'আমি ওয়াদা দিচ্ছি, তোমাদেরকে সসম্মানে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছিয়ে দেবো। বলো, অপর উটটিতে করে কে গেছে, কোথায় গেছে?' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'তোমাদের একজন কমাণ্ডার আমাদের একটি উট ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।' জবাব দেয় একজন।

'আর একটি মেয়েও।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

অল্পক্ষণের মধ্যে-ই আলী বিন সুফিয়ানের কৌশল লোকগুলো থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নেয় যে, তারা কারা। কিন্তু তারা একটি মিথ্যা কথা বলে যে, মেয়েটি রাতে তাঁবু থেকে পালিয়ে এসে বলেছিলো, সুলতান আইউবী রাতে তাকে তাঁর তাঁবুতে রেখেছিলেন এবং তিনি নিজেও মদপান করেন, মেয়েটিকেও পান করান। মেয়েটি পালিয়ে ভীত-সন্ত্রস্থ অবস্থায় এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। তাকে ধাওয়া করার জন্য ফখরুল মিসরী নামক এক কমাণ্ডার আসে এবং মেয়েটির বক্তব্য শুনে উটের পিঠে বসিয়ে তাকে জোরপূর্বক নিয়ে যায়। মেয়েটি সুলতান আইউবীর নামে যে অপবাদ আরোপ করেছিলো, আলী বিন সুফিয়ানকে তারা সব শোনায়।

আলী বিন সুফিয়ান মুচকি হেসে বললেন— 'তোমরা পাঁচজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক ও তীরান্দাজ। আর একটি মানুষ কিনা তোমাদের একটি মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো এবং একটি উটও। নিতান্ত নির্বোধ না হলে একথা বিশ্বাস করবে কেউ?'

লোকগুলোর নির্দেশনা মোতাবেক আলী বিন সুফিয়ান মাটিতে পুঁতে রাখা ধনুক ও তূনীর উদ্ধার করেন। তাঁবুতে পাঠিয়ে দেন চারজনকে। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মরে গেছে পঞ্চমজন।

উটের পদচিহ্ন চোখে পড়ছে স্পষ্ট। দশজন আরোহী ডেকে পাঠান আলী বিন সুফিয়ান। মুহূর্ত মধ্যে এসে পৌঁছে দশ আরোহী। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়ে উটের পায়ের দাগ অনুসরণ করে রওনা হন তিনি।

কিন্তু উটের রওনা হওয়া আর আলী বিন সুফিয়ানের এই পশ্চাদ্ধাবনের মাঝে চৌদ্দ-পনের ঘন্টার ব্যবধান। তদুপরি উটটি অতি দ্রুতগামীও বটে। দানা-পানি ছাড়া উট সবল ও তরতাজা থাকতে পারে অন্তত ছয়-সাত দিন। তাই পথে বিশ্রামেরও প্রয়োজন নেই। তার বিপরীতে পথে ঘোড়াগুলোর দানা-পানি ও বিশ্রামের প্রয়োজন পড়বে একাধিকবার। ফলে চৌদ্দ-পনের ঘন্টার ব্যবধান কাটিয়ে ফখরুল মিসরীকে ধরা সম্ভব হলো না আলীর। ধাওয়া খাওয়ার আশঙ্কায় পথে তেমন থামেনি ফখরুল।

পথে একটি বস্তু চোখে পড়ে আলী বিন সুফিয়ানের। একটি থলে। ঘোড়া থামিয়ে নেমে থলেটি তুলে নেন তিনি। খুলে দেখেন। খাদ্যদ্রব্য পাওয়া গেলো তাতে। থলেটির মধ্যে ছোট্ট আরেকটি পুটুলি। তার মধ্যেও কিছু আহার্য বস্তু। খাবারগুলো নাকের কাছে ধরে-ই আলী বিন সুফিয়ান বুঝে পেলেন, এতে হাশীশ মেশানো। পথে দু' জায়গায় তিনি এমন কিছু আলামত পান, যাতে বুঝা গেলো, এখানে উট থেমেছিলো এবং আরোহী উপবেশন করেছিলো। খেজুরের বীচি, ফলের দানা ও ছিলকা ছড়িয়ে আছে এদিক-সেদিক। থলেটি সন্দেহে ফেলে দেয় আলী বিন সুফিয়ানকে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি, হাশীশের নেশায় ফেলে মেয়েটি ফখরুল মিসরীকে তার রক্ষী বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তথাপি তিনি থলেটি নিজের কাছে রেখে দেন। কিন্তু থলের অনুসন্ধান ও অবস্থান বেশ সময় নষ্ট করে দিয়েছে তাঁর।

ফখরুল মিসরী ও মুবী গন্তব্যে পৌঁছুতে না পারলেও এবং পথে ধরা পড়ে গেলেও তেমন কোন অসুবিধা ছিলো না। কারণ, ইতিমধ্যে নাজি, ঈদরৌস ও তার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সহকর্মী সুলতান আইউবীর বিষের ক্রিয়ায় দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। নাজি ফাতেমী খেলাফতের একজন সেনাপতি হলেও প্রকৃতপক্ষে সে-ই মূল রাষ্ট্রনায়ক হয়ে বসেছিলো। সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে একজন ব্যর্থ ও অথর্ব গভর্নর প্রমাণিত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিলো। মুসলিম শাসকবর্গ নিজ নিজ হেরেমে বন্দী হয়ে পড়েছে সেই রূপসী

মেয়েদের হাতে, যাদের কেউ খৃষ্টান, কেউ ইহুদী। নাম তাদের ইসলামী। এদের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রে ভোগ-বিলাসিতা আর যৌনসম্ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মুসলিম শাসকগণ। ইসলামে নিবেদিত ও দেশপ্রেমিক সুলতান আইউবী এখন তাদের চোখের কাঁটা। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী যদি না থাকতেন, তাহলে ইতিহাসে সালাহুদ্দীন আইউবী নামক কোন ব্যক্তির নাম-চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেতো না। পৃথিবীর মানচিত্রে থাকতো না এতগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব।

সামান্য ইঙ্গিত পেলে-ই নুরুদ্দীন জঙ্গী সৈন্য প্রেরণ করতেন সুলতান আইউবীর সাহায্যে। সুদানী সৈন্যদের আহ্বানে খৃষ্টানরা যখন মিসর আক্রমণের জন্য রোম উপসাগরে ছড়িয়ে পড়লো, তখন সংবাদ পাওয়ামাত্র নুরুদ্দীন জঙ্গী এমন এক খৃষ্টান দেশের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে বসেন, যারা মিসর আক্রমণের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলো। নুরুদ্দীন জঙ্গী নিজের সমস্যা অপেক্ষা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সমস্যাকে অধিক প্রাধান্য দিতেন।

কতিপয় বিশ্বাসঘাতক মুসলিম সেনানায়ক ও অসামরিক ব্যক্তি অনুভব করলো, মিসরে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে অস্থিরতা ও বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছে। সেই বিদ্রোহের আগুনে হাওয়া দিতে শুরু করলো তারা। তারা নেপথ্যে থেকে সুদানী সৈন্যদের উত্তেজিত করতে শুরু করলো। তারা গুপ্তচর মারফত জানতে পারলো, সুদানী সৈনদের সালারদের গোপনে হত্যা করে গুম করে ফেলা হয়েছে। সুদানী বাহিনীর নিম্নপদস্থ কমাণ্ডাররা সালারের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর মিসরে অবস্থানরত স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের উপর হামলা করার পরিকল্পনা আঁটছেন। সুলতান আইউবীর আধা ফৌজ এবং রাজধানীতে সুলতানের অনুপস্থিতি থেকে ফায়েদা হাসিল করতে চাচ্ছে তারা। সেই পরিকল্পনার আওতায় কালো মেঘের ন্যায় ইসলামের চন্দ্রকে ঢেকে ফেলতে চাচ্ছে পঞ্চাশ হাজার সুদানী ফৌজ।

কায়রো পৌঁছে গেছেন আলী বিন সুফিয়ান। যাকে ধাওয়া করতে গেলেন, তার কোন সন্ধান পেলেন না। সুদানী হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত গোয়েন্দাদের তলব করলেন। তাদের একজন জানালো, গতরাতে একটি উট এসেছিলো। তার আরোহী ছিলো দু'জন। একজন পুরুষ একজন নারী। এখন তারা কোন্ ভবনে অবস্থান করছে, তাও অবহিত করে গোয়েন্দা। আলী বিন সুফিয়ান ইচ্ছে করলে এক্ষুণি হানা দিয়ে তাদেরকে ধরে ফেলতে পারেন। কিন্তু তিনি ভাবলেন, বিষয়টি জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি হতে পারে। সমস্যা আরো বেড়ে যেতে পারে। শুধু মুবী আর ফখরুল মিসরীকে গ্রেফতার করা-ই আলী বিন সুফিয়ানের একমাত্র লক্ষ্য

নয়। তার প্রধান লক্ষ্য, সুদানী বাহিনীর প্রত্যয় ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা, যাতে এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা সহজ হয়।

গোয়েন্দাদের প্রতি নতুন নির্দেশনা জারী করেন আলী বিন সুফিয়ান। বেশ কিছু মেয়েও আছে তাঁর গোয়েন্দাদের মধ্যে। তারা খৃষ্টান বা ইহুদী নয়– মুসলিম। বিভিন্ন পতিতালয় থেকে তুলে আনা হয়েছে তাদের। কিন্তু তাদের প্রতি আলী বিন সুফিয়ানের আস্থা আছে ষোলআনা। তাদেরকে বলে দিলেন মুবীকে খুঁজে বের করতে।

চারদিন হলো, আলী বিন সুফিয়ান রাজধানীর বাইরে ঘুরে ফিরছেন। সুদানী ফৌজী নেতৃত্বের চারপার্শ্বে ঘুরপাক খাচ্ছে তার কর্মতৎপরতা।

আজ পঞ্চম রাত। বাইরে খোলা আকাশের নীচে বসে দু'জন গোয়েন্দার নিকট থেকে রিপোর্ট নিচ্ছেন তিনি। আলী বিন সুফিয়ান কখন কোথায় থাকেন, তা জানা থাকে তার লোকদের। দলের এক ব্যক্তি আরেকজনকে সঙ্গে করে তাঁর নিকট আসে এবং বলে— 'এ লোকটাকে জঙ্গল থেকে ধরে এনেছি। ঢুলুঢুলু শরীরে লোকটা একবার পড়ছে আবার উঠে দু' কদম সম্মুখে এগিয়ে পুনরায় পড়ে যাচ্ছে দেখতে পেলাম। পরিচয় জানতে চাইলে বললো, আমাকে আমার বাহিনী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। নাম নাকি ফখরুল মিসরী। লোকটি ভাল করে কথা বলতে পারছে না।' এমনি সময়ে ধপাস্ করে মাটিতে বসে পড়ে সে।

'তুমি-ই কি সেই কমাণ্ডার, যে একটি মেয়ের সঙ্গে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছে?' জিজ্ঞেস করেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমি সুলতান আইউবীর পলাতক সৈনিক। মৃত্যুদণ্ডের অপরাধে অপরাধী। তবে আগে আমার পুরো ঘটনা শুনুন, অন্যথায় আপনাদেরও সকলের মৃত্যুদণ্ড বরণ করতে হবে।' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো লোকটি।

কথা বলার ভাব-ভঙ্গিতে আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, লোকটি নেশাগ্রস্থ। তাই তাকে নিজের দফতরে নিয়ে যান এবং রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা থলেটি তাকে দেখান। জিজ্ঞেস করেন— 'এই থলেটি কি তোমার? এর খাদ্য-দ্রব্য খেয়ে-ই কি তোমার এই দশা?'

'হ্যাঁ, ও আমাকে এর থেকে-ই খাওয়াতো।' জবাব দেয় ফখরুল মিসরী।

থলের ভিতরে পাওয়া পুটুলিটি আলীর সামনে রাখা। ফখরুল মিসরী ঝট্ করে পুটুলিটি হাতে নিয়ে খুলে-ই মিষ্টির মত একটি টুকরা তুলে নেয়। আলী বিন সুফিয়ান খপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেলেন। ফখরুল মিসরী অস্থিরচিত্তে বলে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমায় এটি খেতে দাও। এর-ই মধ্যে আমার জীবন। অন্যথায় আমি বাঁচবো না।'

আলী বিন সুফিয়ান ফখরুল মিসরীর হাত থেকে টুকরাটি ছিনিয়ে নেন এবং বলেন— 'তোমার পূর্ণ কাহিনী শোনাও, তারপর না হয় এসব খেয়ে জীবন বাঁচাবে।'

আলী বিন সুফিয়ানকে নিজের পূর্ণ কাহিনী শোনায় ফখরুল মিসরী। ক্যাম্প থেকে মেয়েটিকে ধাওয়া করা থেকে শুরু করে সর্বশেষ ঘটনা পর্যন্ত সবিস্তার বিবরণ দেয় আলী বিন সুফিয়ানের কাছে। সে জানায়, বণিকরা আমাকে কফি পান করায়, যার ক্রিয়ায় আমি ভিন্ন এক জগতে গিয়ে উপনীত হই। বণিকরা তাকে যা যা বলেছে, তাও শোনায় সে আলী বিন সুফিয়ানকে। মেয়েটির ফাঁদে আটকা পড়া সম্পর্কে ফখরুল জানায়, বণিকদের দেয়া কফি পান করে আমি নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। মেয়েটির বিবৃত্ত কাহিনী শুনে আমার মনে সুলতান আইউবীর প্রতি অশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। আমি তাদের ফাঁদে আটকা পড়ি। উটের পিঠে বসিয়ে মুবী আমাকে কোথায় যেন নিয়ে রওনা হয়। তার প্রেমে পড়ে আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

আমরা একটানা চলতে থাকি। মাঝে-মধ্যে সামান্য বিরতি দিয়ে মেয়েটি ছোট্ট পুটুলি থেকে আমাকে কি যেন খাওয়ায়। আমি নিজেকে রাজা ভাবতে শুরু করি। মেয়েটি আমাকে ভালবাসার নিশ্চয়তা দিয়েছিলো, ওয়াদা দিয়েছিলো আমাকে বিয়ে করবে। শর্ত দিয়েছিলো, আমি তাকে সুদানী কমাণ্ডারদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবো।

আমি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। বিয়ে ছাড়া-ই মেয়েটিকে স্ত্রীর মত ব্যবহার করার চেষ্টা করি। মেয়েটি তার বাহুবন্ধনে জড়িয়ে নিয়ে প্রেম দিয়ে আমাকে পাগল করে তোলে।

তৃতীয়বার পানাহারের জন্য অবতরণ করে দেখি, থলে নেই। খাদ্যভর্তি থলেটি পথে কোথায় পড়ে গেছে যেন। পিছনে ফিরে গিয়ে থলেটি খুঁজে আনার জন্য বলে মুবী। আমি বললাম, আমি পলাতক সৈনিক। আশঙ্কা আছে, দলের লোকেরা আমাকে ধাওয়া করবে। কিন্তু জিদ্ ধরে বসে মেয়েটি। বলে, না, যে করে-ই হোক থলেটি খুঁজে আনতে-ই হবে। আমি তাকে বুঝাবার চেষ্টা করি যে, আমাদের ক্ষুধায় মরে যাওয়ার ভয় নেই। একান্ত প্রয়োজন হলে পথে কোন বাড়িতে গিয়ে কিছু চেয়ে খাবো। কিন্তু লোকালয়ের কাছে ঘেঁষতে রাজি নয় মেয়েটি। আমি তাকে জোরপূর্বক উটের পিঠে বসিয়ে নিই এবং তার পিছনে বসে উট হাঁকাই।

সেদিন ছিলো সফরের তৃতীয় দিন। সন্ধ্যার সময় মেয়েটি শহরের বাইরে সুদানীদের এক কমাণ্ডারের নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়। আমি আমার মাথায় এমন

অস্থিরতা অনুভব করলাম, যেন মাথায় কতগুলো পোকা কিলবিল করছে। ধীরে ধীরে আমি বাস্তব জগতে ফিরে আসি।

ফখরুল মিসরী বুঝতে পারেনি, তার এ অস্থিরতা হাশীশ না পাওয়ার ক্রিয়া। তার কাল্পনিক রাজত্ব আর স্বপ্নের জান্নাত থলের মধ্যে কোথায় মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে। মেয়েটি তার সামনে কমাণ্ডারকে খৃষ্টানদের পয়গাম শোনায় এবং বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করে। ফখরুল মিসরী পাশে বসে সব শুনতে থাকে। তার মাথার পোকাগুলো বড় হয়ে ছুটোছুটি করতে শুরু করে। নেশার ঘোর কেটে গেছে অনেকটা। আস্তে আস্তে তার মনে পড়তে শুরু করে, সে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু মুবীর ধারণা, ফখরুল মিসরী এখনো নেশাগ্রস্থ। তাই সে নির্দ্বিধায় ফখরুল মিসরীর সামনেই কমাণ্ডারদের বলে, সুলতান আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানের মধ্যে এমন ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করতে হবে, যেন উভয়-ই উভয়কে নারীলোলুপ ও মদ্যপ ভাবতে শুরু করে।

তাদের এই দীর্ঘ আলাপচারিতায় বিদ্রোহ নিয়েও কথা হয়। এতক্ষণে ফখরুল মিসরী সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছে। কিন্তু মাথার অস্থিরতা দারুণ পেরেশান করে রেখেছে তাকে। মেয়েটি কমাণ্ডারকে বলে, বিদ্রোহ যদি করতে হয়, তাহলে সময় নষ্ট করা যাবে না। সুলতান আইউবী এখন রণাঙ্গনে আছেন এবং মহা ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

মেয়েটি তাদেরকে একটি মিথ্যে কথা বলে যে, তিন-চারদিন পর খৃষ্টানরা দ্বিতীয়বারের মত আক্রমণ করতে যাচ্ছে। এখানকার এই গুটিকতক সৈন্যকেও রণাঙ্গনে তলব করতে বাধ্য হবেন আইউবী। কমাণ্ডারও মুবীকে জানায়, ছয়-সাতদিনের মধ্যে সুদানী বাহিনী এখানকার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

এইসব কথোপকথন শুনতে থাকে ফখরুল মিসরী। মধ্য রাতের পর পৃথক একটি কক্ষে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে। তার শোয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে। মুবী ও কমাণ্ডারগণ অবস্থান করে অন্য কক্ষে। দুই কক্ষের মধ্যখানে একটি দরজা। বন্ধ করে দেয়া হয় দরজাটি। কৌতূহলী হয়ে উঠে ফখরুল মিসরী। কান খাড়া করে বসে দরজা ঘেঁষে। অপর কক্ষ থেকে হাসির শব্দ শুনতে পায় সে। তারপর মেয়েটির কথা বলার আওয়াজ– 'লোকটাকে হাশীশের জোরে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। প্রেম নিবেদন করে রূপের মোহজালে তাকে আবদ্ধ করে রেখেছি। আমার একজন রক্ষীর প্রয়োজন ছিলো। হাশীশের থলেটি পথে কোথায় যেন পড়ে গেছে। ভোরে উঠে যদি খাবার না পায়, বেটা বড় পেরেশান করবে।'

তারপর থেকে ফখরুল মিসরীর কানে যেসব শব্দ ভেসে আসে, তাতে পরিষ্কার বুঝা গেলো, তারা মদপান করছে, চলছে বেহায়াপনা। দীর্ঘ সময় পর

কমাণ্ডারের কণ্ঠ শুনতে পায় ফখরুল মিসরী— 'এ লোকটি এখন আমাদের জন্য সম্পূর্ণ বেকার। হয় তাকে বন্দীশালায় ফেলে রাখো, নতুবা শেষ করে দাও।'

প্রস্তাবে সায় দেয় মুবী।

পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করে ফখরুল মিসরী। রাতের তখন প্রথম প্রহর। ফখরুল মিসরী কক্ষ থেকে বের হয়। পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। ভোর নাগাদ নিরাপদ দূরত্বে চলে যায় সে। মনে তার দ্বিমুখী সংশয়। পশ্চাদ্ধাবনের ভয়। উভয় দিকে-ই মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে সে। নিজের বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেও অপরাধী, সুদানীদের হাতে ধরা পড়লে তো মৃত্যু নিশ্চিত।

দিনভর একস্থানে লুকিয়ে থাকে ফখরুল মিসরী। নেশার টান, ভয় আর ক্ষোভ লোকটার দেহ ও দেমাগকে বেকার করে তুলছে। রাত নাগাদ চলনশক্তিও লোপ পেতে শুরু করে তার। অবশেষে তার এই অনুভূতিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায় যে, এখন দিন না রাত। নিজে এখন কোথায় আছে, তাও বলতে পারছে না সে। একবার ইচ্ছে হয়, ঐ খৃষ্টান মেয়েটাকে গিয়ে খুন করে আসে। আবার ভাবে, একটা উট বা ঘোড়া পেলে রণাঙ্গনে গিয়ে সুলতান আইউবীর পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে। কিন্তু যা-ই সে ভাবছে, মুহূর্ত মধ্যে অন্ধকার এসে ঝাপসা করে দিচ্ছে তার সামনের সবকিছু।

এমনি অবস্থায় এই লোকটিকে পেয়ে যায় সে। লোকটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর। তাই প্রশিক্ষণ অনুযায়ী ফখরুল মিসরীর সঙ্গে সে বন্ধুত্ব ও সমবেদনামূলক কথা বলে এবং তুলে আলী বিন সুফিয়ানের নিকট নিয়ে আসে।

সুদানী বাহিনী যে আক্রমণ ও বিদ্রোহ করবে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। জানা গেলো, এ বিদ্রোহ সংঘটিত হতে পারে যে কোন মুহূর্তে। আলী বিন সুফিয়ান একবার ভাবলেন, তিনি সুদানী কমাণ্ডারদের বিদ্রোহের ব্যাপারে সতর্ক করবেন এবং সুলতান আইউবীকে সংবাদ দেবেন। কিন্তু হাতে তার সময় নেই। ইত্যবসরে আলী বিন সুফিয়ান সংবাদ পান, সুলতান তাঁকে ডাকছেন। আলী বিন সুফিয়ান শশব্যস্তে উঠে রওনা দেন। মনে তার আশঙ্কা, সুলতানকে ময়দানে রেখে এসেছি; এখন তিনি এখানে, কোন অঘটন ঘটেনি তো!

সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন— 'আমি সংবাদ পেয়েছি, উপকূলে খৃষ্টানদের একটি গ্যাং অবস্থান করছে। তাদের কেউ কেউ এদিকেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। ময়দানে এখন আর আমার কাজ নেই। নায়েবদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছি। এদিকে কোন সমস্যা হলো কিনা ভেবে মনটা আমার বেজায় ছট্‌ফট্ করছিলো। তাই চলে আসলাম। এদিকের খবর কী?

আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীকে সব খবর শোনান এবং বলেন, আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি মুখের অস্ত্র ব্যবহার করে বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করি কিংবা সুলতান জঙ্গীর সাহায্য আসা পর্যন্ত বিদ্রোহ মুলতবী

রাখার ব্যবস্থা করি। এ কাজে আমি আমার গোয়েন্দাদের-ই কাজে লাগাতে পারি। আমাদের সৈন্য কম। আক্রমণ হয়ে গেলে আমাদের পক্ষে মোকাবেলা করা কঠিন হবে।'

মাথা নত করে কক্ষে পায়চারী করতে শুরু করেন সুলতান আইউবী। গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান তিনি। আলী বিন সুফিয়ান তাকিয়ে আছেন সুলতানের প্রতি। হঠাৎ থেমে গেলেন সুলতান। বললেন–

'হ্যাঁ, আলী! তুমি তোমার ভাষা ও গুপ্তচরদের ব্যবহার করো। তবে আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে নয়– আক্রমণের পক্ষে। আমাদের উপর সুদানীদের হামলা করাই উচিত এবং তা হওয়া দরকার যখন আমাদের বাহিনী ব্যারাকে ঘুমিয়ে থাকে ঠিক তখন।'

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সুলতানের প্রতি তাকিয়ে থাকেন আলী বিন সুফিয়ান। সুলতান বললেন— 'এখানকার সব ক'জন কমাণ্ডারকে ডেকে পাঠাও এবং তুমিও এসে পড়ো।' সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে কঠোরভাবে বলে দেন, যেন তিনি কমাণ্ডারদের জানিয়ে দেন, তিনি যে ময়দান থেকে এখানে এসেছেন, তা যেন ঘুণাক্ষরেও অন্য কেউ না জানে। তিনি বলেন, এখানে আমার উপস্থিতি গোপন রাখা অত্যন্ত জরুরী। আমি অতি সাবধানে সন্তর্পণে চলে এসেছি।

❖ ❖ ❖

তিন রাত পর।

আঁধার রাতের কোলে গভীর নিদ্রায় শুয়ে আছে কায়রো। একদিন আগে নগরবাসীরা দেখেছিলো, তাদের নবগঠিত মিসরী বাহিনীটি শহর ত্যাগ করে কোথাও যাচ্ছে। প্রচার হয়েছিলো, বাহিনী সামরিক মহড়ার জন্য শহরের বাইরে গেছে। নীলনদের কূলে বালুকাময় পার্বত্য এলাকায় উপনীত হয়ে তাঁবু গেড়েছে সৈন্যরা। বাহিনীর কেউ পদাতিক, কেউ অশ্বারোহী।

রাতের প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্ত। কায়রোর ঘুমন্ত বাসিন্দারা দূরে কোথাও প্রলয় সংঘটিত হওয়ার শব্দ শুনতে পায়। ঘোড়ার দ্রুত দৌড়াদৌড়ির আওয়াজও কানে আসে তাদের। জেগে উঠে ঘুমন্ত মানুষগুলো। তারা প্রথম প্রথম মনে করেছিলো, সৈন্যদের মহড়া চলছে। কিন্তু শোরগোল ধীরে ধীরে নিকটে চলে আসছে এবং স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠছে। ঘরের ছাদে উঠে দেখতে শুরু করে জনতা। লাল বর্ণ ধারণ করছে আকাশ। কারো কারো চোখে পড়ছে, নীল নদ থেকে আগুনের শিখা উঠে এসে আঁধার রাতের বুক চিরে ডাঙ্গায় এসে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তারপর-ই শহরে হাজার হাজার ঘোড়ার ছুটোছুটি– দৌড়াদৌড়ির শব্দ-শোরগোল শুরু হয়ে যায়। শহরবাসীরা এখনো জানেনা, এটি মহড়া নয়– রীতিমত যুদ্ধ। আর যে আগুন দেখা যাচ্ছে, তাতে সুদানী বাহিনীর সিংহভাগ পুড়ে ছাই-এ পরিণত হচ্ছে।

সুলতান আইউবীর এ এক অনুপম রণকৌশল। তিনি রাজধানীতে অবস্থানরত স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে নীল নদ ও বালুকাময় টিলার পর্বতশ্রেণীর মাঝে বিস্তীর্ণ মাঠে পাঠিয়ে দেন। তারা তাঁবু স্থাপন করে সেখানে অবস্থান নেয়। নিজের কৌশল ও দক্ষতা কাজে লাগান আলী বিন সুফিয়ান। সুদানী বাহিনীর মধ্যে গুপ্তচর ঢুকিয়ে তিনি বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে এবং কমাণ্ডার থেকে এই সিদ্ধান্ত আদায় করে নেন যে, রাতে যখন সুলতান আইউবীর সৈন্যরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকবে, ঠিক তখন সুদানী বাহিনী তাদের উপর হামলা চালাবে। ভোর নাগাদ এক একজন করে সৈন্য শেষ করে নির্বিঘ্নে রাজধানী দখল করে নেয়া হবে। আর সুদানী বাহিনীর অপর অংশকে রোম উপসাগরের কূলে অবস্থানরত আইউবী বাহিনীর উপর আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা মোতাবেক সুদানী বাহিনীর একটি অংশকে নিতান্ত গোপনে রাতে রোম উপসাগরের রণাঙ্গন অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। অপর অংশ নীল নদের কূলে অবস্থানরত সৈন্য বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এ বাহিনীটি সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় এক মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তৈরী করা আইউবী বাহিনীর তাঁবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুহূর্ত মধ্যে অতি দ্রুত সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ তাঁবুগুলোর উপর আগুনের তীর ও তেলভেজা কাপড়ে প্রজ্বলমান গোলা বর্ষিত হতে শুরু করে। অগ্নিবর্ষণ করতে আরম্ভ করে নীলনদও। তাঁবুগুলোতে আগুন ধরে যায়। আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিশিখা। সুদানী বাহিনী তাঁবুতে না পেলো সুলতান আইউবীর বাহিনীর কোন সৈন্য, না পেলো কোন একটি ঘোড়া ও একজন আরোহী। সম্পূর্ণ শূন্য সবগুলো তাঁবু। এগিয়ে আসলো না কেউ মোকাবেলার জন্য। আর হঠাৎ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তাঁবু এলাকার সর্বত্র। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে সমগ্র এলাকা।

সুদানী বাহিনীর জানা ছিলো না, সুলতান আইউবী রাতের প্রথম প্রহরে ছাউনীগুলো থেকে তাঁর বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে বালুকাময় টিলাসমূহের পিছনে লুকিয়ে রেখেছেন এবং তাঁবুগুলোতে শুকনো ঘাসের স্তূপ ভরে রেখেছেন। তাঁবুর উপরে এবং ভিতরে তেল ছিটিয়ে রেখেছেন। সুলতান আইউবী কিশতীগুলোতে ছোট ছোট মিনজানীক রেখে সন্ধ্যার পর যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সুদানী বাহিনী যেই মাত্র ছাউনী এলাকায় প্রবেশ করে, অমনি সুলতান আইউবীর লুকিয়ে থাকা সৈন্যরা অগ্নিতীর এবং কিশতীতে রাখা মিনজানীক দ্বারা আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করে দেয়। তাঁবুগুলোতে আগুন ধরে গেলে শুক্‌নো ঘাস আর তেল এলাকাটাকে জাহান্নামে পরিণত করে। সুদানীদের ঘোড়াগুলো তাদের পদাতিক সৈন্যদের পিষতে শুরু করে। আগুনের বেষ্টনী থেকে

বেরিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাদের। হাজার হাজার সৈন্যের আর্তচীৎকার আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে তোলে। অন্ধকার রাতটাকে দিনে পরিণত করে প্রজ্বলিত আগুন। সুলতান আইউবীর মুষ্টিমেয় সৈন্য আগুনে প্রজ্বলমান সুদানীদের ঘিরে ফেলে। আগুন থেকে বেরিয়ে যে-ই পালাবার চেষ্টা করছে, তীর বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ছে সে।

ওদিকে সুদানীদের যে বাহিনীটি রণাঙ্গন অভিমুখে সুলতান আইউবীর বাহিনীর উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের ব্যাপারেও উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন সুলতান আইউবী। সুলতানের কয়েকটি ক্ষুদ্র বাহিনী বিভিন্ন স্থানে ওঁৎ পেতে বসে আছে পূর্ব থেকে। অগ্রসরমান সুদানী বাহিনীর পিছন ভাগে আক্রমণ চালিয়ে হুলস্থুল সৃষ্টি করে দেয় গোটা বাহিনীতে। এক আক্রমণে যতটুকু ক্ষতিসাধন করা সম্ভব ছিলো, তা করে তারা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। বিপর্যস্ত সুদানী বাহিনী নিজেদের সামলে নিতে না নিতে-ই বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের উপর আক্রমণ আসে আবারো। আক্রমণ চালিয়েই বিদ্যুদ্গতিতে অন্ধকারে হাওয়া হয়ে যায় তারাও।

ভোর পর্যন্ত সুদানীদের এই বাহিনীটির উপর হামলা হয় তিনবার। মনোবল হারিয়ে ফেলে সুদানী বাহিনী। মোকাবেলা করার সুযোগ-ই পাচ্ছে না তারা। দিনের বেলা কমাণ্ডাররা বুঝিয়ে-শুনিয়ে মন ঠিক করে সৈন্যদের। কিন্তু রাতে ফেরার পথে গতরাতের ন্যায় একই দশা ঘটে তাদের। এবার অন্ধকারে তীরও বর্ষিত হয় তাদের উপর। অন্ধকারে ঘোড়ার ছুটোছুটির শব্দ শুনতে পায় তারা। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কিছু-ই। এই ঘোড়াগুলোই তাদের করুণ দশা ঘটিয়ে যাচ্ছে নেপথ্যে থেকে।

তিন-চারজন ঐতিহাসিক– যাদের মধ্যে নীল পল ও উইলিয়াম অন্যতম– লিখেছেন, রাতের বেলা বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনার উপর গুটিকতক সৈন্যের কমাণ্ডো আক্রমণ ও চোখের পলকে উধাও হয়ে যাওয়া ছিলো সুলতান আইউবীর এমনি এক রণকৌশল, যা খৃষ্টানদের বিপুল ক্ষতিসাধন করেছে। এভাবেই দুশমনের অগ্রযাত্রাকে দারুণভাবে ব্যাহত করতেন সুলতান আইউবী। কৌশলের মার-প্যাচে ফেলে তিনি শত্রু সেনাদের তাঁর-ই নির্বাচিত স্থানে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতেন। এ ঐতিহাসিকগণ সুলতান আইউবীর এই জানবাজ সৈন্যদের বীরত্ব ও বিদ্যুদ্গতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ যুগের সমর বিশ্লেষকগণ স্বীকার করে থাকেন যে, বর্তমানকার গেরিলা ও কমাণ্ডো অভিযানের আবিষ্কর্তা হলেন বীর মুসলিম যোদ্ধা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। এ পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে-ই তিনি শত্রুপক্ষের সব পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিতেন।

এ কৌশল অবলম্বন করে-ই তিনি মাত্র দু' রাতে বার কয়েক কমাণ্ডো আক্রমণ চালিয়ে সুদানী সৈন্যদের যুদ্ধ করার মনোবল শেষ করে দিয়েছেন। সুদানীদের নেতৃত্বে বিচক্ষণ কোন মেধা ছিলো না। বিধ্বস্ত এই সৈন্যদের সামাল দিতে পারলো না কমাণ্ডাররা। সুদানী সৈনিকের বেশে আলী বিন সুফিয়ানের কিছু লোকও ছিলো এ বাহিনীতে। তারা সংবাদ ছড়িয়ে দেয়, আরব থেকে এমন একটি বাহিনী আসছে, যারা সুদানীদের ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করে দেবে। সুদানী সৈন্যদের মধ্যে ভীরুতা ও পলায়নপ্রবণতা সৃষ্টি করার কাজে সফল হয় আলীর লোকেরা। শৃংখলা হারিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তারা। নীল নদের কূলে এই বাহিনীটির যে পরিণতি ঘটে, তা নিতান্ত-ই করুণ।

আরব থেকে বাহিনী আগমনের সংবাদ গুজব ছিলো না। সত্যি সত্যি-ই একদিন এসে পৌঁছে নুরুদ্দীন জঙ্গীর একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী। সংখ্যায় তারা বেশী নয়। ঐতিহাসিকদের কারো মতে দু' হাজার অশ্বারোহী ও দু' হাজার পদাতিক। মোট চার হাজার। কারো কারো মতে আরো কিছু বেশী। সে যাই হোক, এই বাহিনী সুলতান আইউবীর অনেক উপকারে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীটির নেতৃত্ব হাতে তুলে নেন সুলতান।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এই আরব বাহিনী এবং নিজের বাহিনীর যৌথ অভিযান চালিয়ে সুদানীদের একজন একজন করে খুন করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি কৌশল অবলম্বন করেন। সুদানী কমাণ্ডারদের গ্রেফতার করেন এবং তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, এখন আর তাদের চূড়ান্ত পতন ছাড়া কোন পথ নেই। তবে আমি তোমাদের সমূলে বিনাশ করবো না। সুলতানের শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলো কমাণ্ডাররা। সুলতান আইউবী তাদের ক্ষমা করে দেন এবং শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে সুদানীদের বেঁচে যাওয়া সৈনিকদের কৃষি-কর্মে পুনর্বাসিত করেন। তাদেরকে জমি দান করেন এবং চাষাবাদের জন্য সরকারী সহযোগিতা প্রদান করেন। তারপর তাদের অনুমতি প্রদান করেন, তোমাদের কেউ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে চাইলে হতে পারো।

এমনি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে সুদানীদের দমন করে সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনী এবং নিজের বাহিনীকে একত্রিত করে ওফাদার সুদানীদেরও তাদের সঙ্গে যুক্ত করে একটি সুশৃংখল শক্তিশালী বাহিনীর রূপ প্রদান করেন এবং খৃষ্টানদের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে শুরু করেন। আলী বিন সুফিয়ানকেও তার বিভাগকে পুনর্বিন্যস্ত করার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড আরো জোরদার করে চলেছে খৃষ্টানরা।

সাইফুল্লাহ্

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর যুগের ঐতিহাসিকদের রচনাবলীতে সাইফুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়, 'কেউ যদি সুলতান আইউবীর উপাসনা করে থাকে, তাহলে সে ছিলো সাইফুল্লাহ্'। সুলতান আইউবীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ডান হাত বলে খ্যাত বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের ডাইরীতে– যা আজো আরবী ভাষায় সংরক্ষিত আছে– সাইফুল্লাহ'র বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কোন ইতিহাস গ্রন্থে এ লোকটির আলোচনা পাওয়া যায় না।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের ডাইরীর ভাষ্যমতে সাইফুল্লাহ নামের এ লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ওফাতের পর সতের বছর জীবিত ছিলো। জীবনের এই শেষ সতেরটি বছর অতিবাহিত করেছিলো সে সুলতান আইউবীর কবরের পার্শ্বে। লোকটি অসিয়ত করেছিলো, মৃত্যুর পর যেন তাকে সুলতান আইউবীর পার্শ্বে দাফন করা হয়। কিন্তু সাইফুল্লাহ ছিলো একজন সাধারণ মানুষ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন বিশেষত্ব ছিলো না। তাই মৃত্যুর পর তাকে সাধারণ গোরস্তানেই দাফন করা হয়। অল্প ক'দিন পর-ই তার সমাধি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; মানুষ তার কবরের উপর ঘর তুলে বসবাস শুরু করে।

রোম উপসাগরের ওপার থেকে সালাহুদ্দীন আঁইউবীকে হত্যা করতে এসেছিলো সাইফুল্লাহ। তখন তার নাম ছিলো মিগনানা মারিউঁস। ইসলামের নামটাই শুধু শুনেছিলো সে। তার জানা ছিলো না ইসলামের আসল পরিচয়। ক্রুসেডারদের প্রোপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত মিগনানা মারিউসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, ইসলাম একটি ঘৃণ্য ধর্ম, মুসলমানরা নারীলোলুপ ও নরখাদক এক হিংস্র জাতি। তাই 'মুসলমান' শব্দটি কানে আসা মাত্র ঘৃণায় থু থু ফেলতো মিগনানা মারিউস। কিন্তু পরম সাহসিকতা প্রদর্শন করে সালাহুদ্দীন আইউবী পর্যন্ত পৌঁছার পর মৃত্যু হয়ে গেলো মিগনানা মারিউসের। তার নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব থেকে জন্ম নিলো সাইফুল্লাহ্।

ইতিহাসের পাতায় এমন রাষ্ট্রনায়কদের সংখ্যা কম নয়, যারা শত্রুর হাতে যারা জীবন দিয়েছিলেন কিংবা আত্মঘাতী আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ইতিহাসের সেই গুটিকতক ব্যক্তিত্বের একজন, যাদেরকে বারবার হত্যা করার চেষ্টা যেমন করেছে শত্রুরা, তেমন করেছে মিত্ররাও। সুলতান আইউবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র শত্রুদের তুলনায় বেশী করেছে মিত্ররা। তাঁর কাহিনী বর্ণনা করতে গেলে একজন ঈমানদীপ্ত জানবাজ মুমিনের পাশাপাশি একদল বে-ঈমান গাদ্দারের নিদারুণ কাহিনীও উল্লেখ করতে হয় সমান তালে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। তাই সালাহুদ্দীন আইউবী বলতেন— 'অদূর ভবিষ্যতে ইতিহাস এমন একটি সময় প্রত্যক্ষ করবে, যখন পৃথিবীর বুকে মুসলমান থাকবে ঠিক; কিন্তু ঈমান তাদের বিক্রি হয়ে থাকবে কাফিরদের হাতে, তাদের উপর শাসন করবে খৃষ্টানরা।'

আমরা এখন ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকাল প্রত্যক্ষ করছি।

সালাহুদ্দীন আইউবী যখন ক্রুসেডারদের সম্মিলিত নৌ-বহরকে রোম উপসাগরে আগুনে পুড়িয়ে, পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সাইফুল্লাহ'র কাহিনী শুরু হয় তখন থেকে। আইউবীর আক্রমণ থেকে ক্রুসেডারদের কয়েকটি জাহাজ রক্ষা পেয়েছিলো। সাগরতীরে নিজ বাহিনীর সঙ্গে উপস্থিত থেকে সালাহুদ্দীন আইউবী সেই জীবন্ত রক্ষা পাওয়া ক্রুসেডারদের গ্রেফতার করতে থাকেন। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিলো সাতটি মেয়ে, যাদের বিস্তারিত কাহিনী ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

মিসরে বিদ্রোহ করেছিলো সুদানী বাহিনী। সেই বিদ্রোহ দমন করে ফেলেন সুলতান। অপরদিকে সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনীও এসে পৌঁছে তাঁর নিকট। এবার ক্রুসেডারদের প্রতিরোধ-পরিকল্পনা তৈরিতে মগ্ন হয়ে পড়েন তিনি।

রোম উপসাগরের ওপারে শহরের উপকণ্ঠে এক নিভৃত অঞ্চলে বৈঠক বসেছে খৃষ্টান কর্মকর্তাদের। শাহ অগাস্টাস, শাহ রেমান্ড, শাহেনশাহ সপ্তম লুই-এর ভাই রবার্টও সভায় উপস্থিত। পরাজয়ের গ্লানিতে বিমর্ষ সকলের মুখমণ্ডল। আলোচনা চলছে। এ সময়ে সভাকক্ষে প্রবেশ করে এক ব্যক্তি। নাম এমার্ক। ক্ষোভে-দুঃখে আগুনের ফুল্‌কি বেরুচ্ছে যেন তার দু' চোখ থেকে। খৃষ্টানদের যে সম্মিলিত নৌ-বহরকে মিসর আক্রমণে প্রেরণ করা হয়েছিলো, এমার্ক ছিলো তার কমাণ্ডার। কিন্তু আকস্মিক ঝড়ের ন্যায় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন সালাহুদ্দীন আইউবী। বহরের একজন সৈনিককেও সমুদ্র থেকে কূলে পা

রাখতে দিলেন না তিনি। মিসরের মাটিতে পা রাখতে সক্ষম হয়েছিলো যেসব খৃষ্টসেনা, আইউবীর হাতে যুদ্ধ-বন্দীতে পরিণত হয় তারা।

সভাকক্ষে বসে আছে এম্লার্ক। ক্ষোভে থর্ থর্ করে কাঁপছে তার ওষ্ঠাধর। তার বহর ডুবে মরেছে আজ পনের দিন হলো। ভাসতে ভাসতে আজ-ই ইটালীর কূলে এসে পৌঁছেছে সে। সালাহুদ্দীন আইউবীর অগ্নিতীর নিক্ষেপকারী বাহিনী পাল-মাস্তুল জ্বালিয়ে দিয়েছে তার জাহাজের। ভাগ্যক্রমে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে প্রথমবারের মত জাহাজটিকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় তার নাবিক-সৈনিকেরা। পালবিহীন জাহাজ হেলে-দুলে ভাসতে থাকে মাঝ দরিয়ায়।

এক সময়ে দিক-চক্রবাল আচ্ছন্ন করে আকাশে জেগে উঠে ঘোর কালো মেঘ। শুরু হয় প্রবল ঝড়। ঝড়ের কবলে পড়ে অসংখ্য শিশু-কিশোর-নারীসহ পানির নীচে তলিয়ে যায় এম্লার্কের জাহাজটি। অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় এম্লার্ক। প্রাণ নিয়ে পৌঁছে যায় ইটালীর তীরে।

বৈঠক চলছে। প্রশ্ন উঠেছে, খৃষ্টান বাহিনীকে এত বড় ধোঁকা কে দিলো? কার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে এত শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হলো তাদের? সংশয় ব্যক্ত করা হয় সুদানী সালার নাজির উপর। তার-ই পত্রের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছিলো এ নৌ-অভিযান। নাজির সঙ্গে খৃষ্টানদের পত্র-যোগাযোগ চলছিলো পূর্ব থেকেই। এ যাবৎ বেশ ক'টি পত্র দিয়েছে সে খৃষ্টানদের। খৃষ্টানরা নাজির সর্বশেষ যে পত্রটির উপর ভিত্তি করে এ অভিযানে নেমেছিলো, পূর্বের পত্রগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হলো সেটি। কিছুটা অমিল পাওয়া গেলো। নাজির প্রতি সন্দেহ আরো গাঢ় হলো। কায়রোতে গুপ্তচরও ঢুকিয়ে রেখেছিলো তারা। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকেও কোন সংবাদ পায়নি খৃষ্টানরা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যে বিশ্বাসঘাতক নাজি ও কুচক্রী সালারদের গোপনে হত্যা করে রাতের আঁধারে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছেন, সে সংবাদ খৃষ্টানদের কানে পৌঁছানোর ছিলো না কেউ। খৃষ্টানদের সম্রাট-কর্মকর্তাগণ কল্পনাও করতে পারেননি, যে পত্রের উপর ভিত্তি করে তারা মিসর অভিমুখে নৌ-বহর প্রেরণ করেছিলেন, সে পত্রখানা নাজিরই ছিলো বটে; কিন্তু তার আক্রমণের তারিখ পরিবর্তন করে অন্য তারিখ লিখে দিয়েছিলেন সুলতান আইউবী। এসব তথ্য সংগ্রহ করা ছিলো খৃষ্টান গোয়েন্দাদের সাধ্যের বাইরে।

দীর্ঘ আলাপ-পর্যালোচনার পরেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলো না এ বৈঠক। কথা সরছে না এম্লার্কের মুখ থেকে। পরাজয়ের গ্লানিতে লোকটি যেমন ক্ষুব্ধ, তেমনি ক্লান্ত। পরদিনের জন্য মুলতবী করে দেয়া হয় বৈঠক।

রাতের বেলা। মদের আসর জমে উঠেছে খৃষ্টান কর্মকর্তাদের। নেশায় বুঁদ হয়ে পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে চাইছে তারা। হঠাৎ সে আসরে আগমন ঘটে এক ব্যক্তির। রেমন্ড ছাড়া কেউ চেনে না তাকে।

লোকটি রেমন্ডের নির্ভরযোগ্য গুপ্তচর। হামলার দিন সন্ধ্যায় মিসরের তীরে এসে নেমেছিলো সে। তার-ই খানিক পর এসে পৌঁছে ক্রুসেডারদের নৌ-বহর। বহরটি সালাহুদ্দীন আইউবীর ক্ষুদ্র বাহিনীর হাতে ধ্বংস হয়েছিলো তার-ই চোখের সামনে।

বেশ কিছু তথ্য নিয়ে এসেছে লোকটি। রেমন্ড সকলের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয় তাকে। রিপোর্ট জানবার জন্য তাকে ঘিরে ধরে সবাই। খৃষ্টান কর্মকর্তাগণ সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার জন্য রবিন নামক এক সুশিক্ষিত অভিজ্ঞ গুপ্তচরকে সমুদ্রোপকূলে প্রেরণ করেছিলো এবং তার সঙ্গে পাঁচজন পুরুষ ও সাতটি রূপসী যুবতীকে প্রেরণ করেছিলো, এ গুপ্তচর তাদের সম্পর্কে অবহিত।

আগন্তুক জানায়— 'রবিন জখমের বাহানা দেখিয়ে আহতদের সঙ্গে সালাহুদ্দীন আইউবীর ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছিলো। তার পাঁচ পুরুষ সঙ্গী ছিলো বণিকের বেশে। তাদের একজন– ক্রিস্টোফর যার নাম– নেপথ্য থেকে তীর ছুঁড়ে আইউবীর গায়ে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তার তীর। ধরা পড়ে যায় পাঁচজনের সকলে। মেয়ে সাতটিকেও ধরে ফেলেন আইউবী। বেশ চমৎকার কাহিনী গড়ে নিয়েছিলো মেয়েরা। আইউবীকে শোনায় সে কাহিনী। মেয়েগুলোকে আশ্রয়ে রেখে পুরুষ পাঁচজনকে ছেড়ে দিয়েছিলেন আইউবী। কিন্তু তাঁর গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান হঠাৎ এসে পড়ে গ্রেফতার করে ফেলেন তাদেরকে। পাঁচজনের একজনকে সকলের সামনে হত্যা করে অন্যদের থেকে কথা আদায় করেন তিনি।'

গোয়েন্দা আরো জানায়, ধরা পড়ি আমিও। আইউবীর নিকট আমি নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দেই। তাই তিনি আমার উপর আহতদের ব্যাণ্ডেজ-চিকিৎসার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেই সুযোগে আমি জানতে পারলাম, সুদানীরা বিদ্রোহ করেছিলো বটে; কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী সে বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে ফেলেন। তিনি বিদ্রোহী অফিসার ও নেতাদের গ্রেফতার করেন।

রবিন, তার সহযোগী চার পুরুষ ও মেয়ে ছয়টি এখন আইউবীর হাতে বন্দী। তবে সপ্তম মেয়েটির– যে ছিলো সবচেয়ে বেশী বিচক্ষণ– তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিখোঁজ মেয়েটির নাম মুবিনা এরতেলাস, সংক্ষেপে মুবী।

গোয়েন্দা জানায়, বন্দী রবিন ও তার সহকর্মীরা এখনো উপকূলীয় শিবিরেই রয়েছে। আইউবী ক্যাম্পে নেই। তাঁর গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানও অনুপস্থিত। আমি বড় কষ্টে ওখান থেকে বের হয়ে এসেছি। ঘাটে এসে একটি নৌকা পেয়ে গেলাম। দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে দ্রুত নদী পার হয়ে চলে আসি। রবিন ও তার সহকর্মী পুরুষ ও মেয়েরা মৃত্যুমুখে পতিত। পুরুষদের চিন্তা না হয় না-ই করলাম; কিন্তু মেয়েগুলোকে উদ্ধার করা তো একান্ত আবশ্যক। ওরা সকলেই যুবতী এবং আমাদের বাছা বাছা রূপসী মেয়ে। উদ্ধার করতে না পারলে মুসলমানরা ওদের কী দশা ঘটাবে, তাতো আপনারা বুঝতে-ই পারছেন।'

'এ ত্যাগ আমাদের দিতে-ই হবে।' বললেন অগাস্টাস।

'আপনি যদি আমাকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, সালাহুদ্দীন আইউবী আমাদের মেয়েদেরকে প্রাণে শেষ করে-ই ক্ষান্ত হবে; অন্য কোন নির্যাতনের শিকার তাদের হতে হবে না, তাহলে এ ত্যাগ স্বীকার করতে আমিও প্রস্তুত। কিন্তু এমনটি আশা করা বৃথা; মুসলমানরা ওদের সঙ্গে পশুর মত আচরণ করবে আর তাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মেয়েগুলো আমাদেরকে অভিসম্পাত করবে। আমি তাদেরকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করবো।' বললেন রেমন্ড।

'এমনও হতে পারে, মুসলমানরা মেয়েগুলোর সঙ্গে ভাল আচরণ দেখিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহার করবে। তখন আমাদের মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এ কারণে ওদেরকে মুক্ত করে আনা একান্ত আবশ্যক। এর জন্য আমি আমার ভাণ্ডারের অর্ধেক সম্পদও উজাড় করতে প্রস্তুত আছি।' বললেন রবার্ট।

'আমাদের এ মেয়েগুলো শুধু এ কারণে-ই মূল্যবান নয় যে, এরা নারী। এরা প্রশিক্ষিত গুপ্তচর। এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে এদের মত মেয়ে আর পাবো কোথায়? এমন মেয়ে আমরা কোথায় পাবো, যারা জাতি ও ধর্মের স্বার্থে– ক্রুশের স্বার্থে নিজেকে দুশমনের হাতে তুলে দেবে, দুশমনের ভোগ-বিলাসিতার উপকরণে পরিণত হবে এবং গুপ্তচরবৃত্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে থাকবে? এ মিশনে তাদের সর্বপ্রথম বিলাতে হয় সম্ভ্রম। তদুপরি গুপ্তচর হিসেবে ধরা পড়ে গেলে কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়ে জীবন হারাবার ভয় থাকে পদে পদে। এ মেয়েগুলোকে আমাদের বিপুল অর্থের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়েছে। তারপর প্রশিক্ষণ দিয়ে বড় কষ্টে মিসর ও আরবের ভাষা শেখানো হয়েছে। আমি মনে করি, এভাবে একত্রে সাতটি মেয়ে হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।' বললো আগন্তুক গোয়েন্দা।

'আচ্ছা, তুমি কি নিশ্চয়তা দিতে পারো, মেয়েগুলোকে আইউবীর ক্যাম্প থেকে বের করে আনা যাবে?' জিজ্ঞেস করেন অগাস্টাস।

'যাবে। এর জন্য প্রয়োজন বেশ ক'জন দুঃসাহসী সৈন্য। তবে হয়ত দু'-একদিনের মধ্যে রবিন এবং তার সহকর্মী পুরুষ ও মেয়েদেরকে কায়রো নিয়ে যাওয়া হবে। তা-ই যদি হয়, তবে সেখান থেকে তাদেরকে বের করে আনা কঠিন হবে। সময় নষ্ট না করে উপকূলীয় ক্যাম্প থেকে-ই তাদেরকে মুক্ত করে আনা দরকার। আপনি বিশজন লোক দিন; আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু তারা হতে হবে এমন লোক, যারা জীবন নিয়ে খেলতে জানে।' বললো গোয়েন্দা।

'যে কোন মূল্যে মেয়েগুলোকে উদ্ধার করে আনা দরকার।' গর্জে উঠে বললো এম্লার্ক।

খৃষ্টান বাহিনী রোম উপসাগরে যে শোচনীয় পরাজয় ও মর্মান্তিক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিলো, তার প্রতিশোধ-স্পৃহায় পাগলের মতো হয়ে গেছে এম্লার্ক। লোকটি ক্রুসেডারদের সম্মিলিত নৌ-বহর এবং তার আরোহী সৈন্যদের সুপ্রীম কমাণ্ডার হয়ে এ আশা বুকে নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছিলো যে, মিসর দখলের পর জয়-মাল্য তার-ই গলায় ঝুলবে। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরের তীরে-ই ঘেঁষতে দিলেন না তাকে। বেচারা জ্বলন্ত জাহাজে জীবন্ত পুড়ে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েও পড়ে গেলো ঝড়ের কবলে। সেখান থেকে বেঁচে এসেছে মরতে মরতে। এখন কথা বলতে ঠোঁট কাঁপছে তার। কথায় কথায় টেবিল চাপড়িয়ে, নিজের উরুতে হাত মেরে মনের জ্বালা প্রশমিত করছে লোকটি। অবশেষে বললো–

'আমি মেয়েগুলোকেও মুক্ত করে আনবো, আইউবীকেও হত্যা করাবো। উদ্ধার করে এনে এ মেয়েগুলোকে মুসলমানদের সাম্রাজ্যের মূলোৎপাটনে ব্যবহার করবো।'

'আমি মনে-প্রাণে তোমাকে সমর্থন করি এম্লার্ক! এমন সুশিক্ষিত মেয়েদেরকে আমিও এত সহজে নষ্ট হতে দিতে চাই না। আপনাদের সকলের-ই জানা আছে, সিরিয়ার হেরেমগুলোতে আমরা কি পরিমাণ মেয়ে ঢুকিয়ে রেখেছি। বেশ ক'জন মুসলমান গভর্নর ও আমীর তাদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে। বাগদাদে আমাদের মেয়েরা আমীরদের হাতে এমন বেশ ক'জন লোককে হত্যা করিয়েছে, যারা ক্রুসেডের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলেছিলো। নারী আর মদ দিয়ে মুসলমানদের

খেলাফতকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছি, তাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছি। খেলাফত এখন ত্রিধাবিভক্ত। আমোদ-বিলাসিতায় ডুবে যেতে শুরু করেছেন খলীফারা। অবশিষ্ট আছে শুধু দু'টি লোক। যদি তারা দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকে, তাহলে তারা আমাদের জন্য স্বতন্ত্র এক বিপদ হয়ে থাকবে। একজন সালাহুদ্দীন আইউবী, অপরজন নুরুদ্দীন জঙ্গী। এদের একজনও যদি বেঁচে থাকে, তাহলে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি সুদানীদের বিদ্রোহ দমন করে-ই থাকে, তাহলে তার অর্থ হলো, লোকটি আমাদের ধারণা অপেক্ষাও বেশী ভয়ঙ্কর। তার বিরুদ্ধে ময়দানে মোকাবেলা করার পাশাপাশি নাশকতামূলক কার্যক্রমও আমাদের চালু করতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ-দলাদলি এবং অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ মেয়েগুলোকে আমাদের একান্ত প্রয়োজন।' বললেন রেমন্ড।

'আমাদের সকল অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। আমরা আরবে মুসলমানদের দুর্বলতা থেকে স্বার্থ উদ্ধার করেছি। মুসলমান নারী, মদ আর ঐশ্বর্য পেলে অন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানদের নিঃশেষ করার উত্তম পন্থা হলো, এক মুসলমান দিয়ে আরেক মুসলমানকে হত্যা করানো। হাতে ক'টি টাকা গুজে দাও, দেখবে, অর্থের লোভে তারা তাদের সাধের দ্বীন ও ঈমান ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। চেষ্টা করলে তোমরা অতি অনায়াসে মুসলমানের ঈমান ক্রয় করতে পারো।' বললেন রবার্ট।

মুসলমানদের দুর্বলতা নিয়ে আলাপ চলে দীর্ঘক্ষণ। তারপর বন্দী মেয়েদের মুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে কথা ওঠে। শেষে সিদ্ধান্ত হয়, বিশজন দুঃসাহসী সেনা প্রেরণ করা হবে এ কাজে। আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত রওনা হয়ে যাবে তারা।

তৎক্ষণাৎ তলব করা হয় চারজন কমাণ্ডার। দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তাদের বলা হলো, তোমাদের সহযোগিতার জন্য বিশজন সৈনিক বেছে নাও।

আলোচনায় বসে চার কমাণ্ডার। এ অভিযানে তারা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়। এক কমাণ্ডার বললো, 'আমাদের এমন একটি ফোর্স গঠন করতে হবে, যারা মুসলমানদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে কমাণ্ডো আক্রমণ চালাতে থাকবে এবং রাতে তাদের পেট্রোল বাহিনীর উপর হামলা করে তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। এ ফোর্সের জন্য দক্ষ ও বিচক্ষণ লোক বেছে নিতে হবে।'

'কিন্তু তারা হতে হবে শতভাগ বিশ্বস্ত। এ ফোর্স আমাদের দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে অভিযান পরিচালনা করবে। এমনও হতে পারে, তারা কিছু-ই না করে ফিরে এসে শোনাবে আমরা অনেক কিছু করে এসেছি।' বললেন অগাস্টাস।

এক কমাণ্ডার বললো, আপনি শুনে অবাক হবেন, আমাদের বাহিনীতে এমন কিছু সৈনিক আছে, যাদেরকে আমরা বিভিন্ন কারাগার থেকে এনে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করেছি। তাদের কেউ ছিলো ডাকাত, কেউ সন্ত্রাসী, কেউবা ছিলো ছিনতাইকারী। তারা দীর্ঘ মেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী ছিলো। ওরা কারাগারের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে-ই ধুঁকে ধুঁকে মরতো। আমাদের প্রস্তাব পেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। শুনলে হয়তো আপনি বিস্মিত হবেন, আমাদের ব্যর্থ নৌ-অভিযানে এই সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী সৈনিকরা বড় বীরত্বের সাথে আইউবীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে কয়েকটি জাহাজকে রক্ষা করেছে। বন্দী মেয়েদেরকে মুক্ত করার অভিযানে আমি এদের তিনজনকে প্রেরণ করবো।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন— 'মুসলমানদের মধ্যে বিলাস-প্রিয়তা বেড়ে যায় এবং তাদের ঐক্য নিঃশেষ হতে শুরু করে। মুসলমানের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য খৃষ্টানরা তাদের ঘরে ঘরে বিলাস-সামগ্রী ঢুকিয়ে দিতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তাদের মনে আশা জাগে, আর এক ধাক্কায়-ই তারা মুসলমানদের ধ্বংস করে ফেলতে সক্ষম হবে। এবার খৃষ্টানরা বিশ্বময় ইসলাম ও মুসলিম-বিরোধী ঘৃণা ছড়াতে শুরু করে এবং সকলকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানায়। জবাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ খৃষ্টান বাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করে। পাদ্রী থেকে আরম্ভ করে পেশাদার অপরাধীরা পর্যন্ত পঙ্কিল পথ ত্যাগ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। যেসব সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী দীর্ঘমেয়াদী সাজা ভোগ করছিলো, বিভিন্ন কারাগার থেকে এনে তাদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়। এ কয়েদীদের প্রতি খৃষ্টানদের বেশ আস্থা ছিলো। যার কারণে আইউবীর বন্দীদশা থেকে মেয়েদের মুক্ত করা এবং আইউবীকে হত্যা করার জন্য এক কমাণ্ডার কয়েদী সৈনিকদের নির্বাচন করেছিলো।'

সকাল পর্যন্ত অতীব দুঃসাহসী ও বিচক্ষণ বিশজন সৈনিক বেছে নেয়ার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। মিগনানা মারিউসও ছিলো তাদের একজন, যাকে বের করে আনা হয়েছিলো রোমের একটি কারাগার থেকে। যে গোয়েন্দা লোকটি ডাক্তার বেশে সুলতান আইউবীর ক্যাম্পে ছিলো এবং তথ্য সংগ্রহ করে পালিয়ে এসেছিলো, অভিযানের কমাণ্ডার নিয়োগ করা হলো তাকে।

এ বাহিনীর প্রথম দায়িত্ব হলো, মেয়েগুলোকে মুসলমানদের বন্দীদশা থেকে বের করে আনা এবং সম্ভব হলে রবিন ও তার চার সহকর্মীকেও মুক্ত করা। সহজে সম্ভব না হলে রবিনদের জন্য ঝুঁকি নিতে নিষেধ করে দেয়া হয় তাদের। দ্বিতীয় দায়িত্ব, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করা।

এ বাহিনীটিকে নতুন করে প্রাকটিক্যাল কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি; শুধু মৌখিক জরুরী নির্দেশনা এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রপাতি দিয়ে একটি পালতোলা নৌকায় করে মৎস-শিকারীর বেশে রওয়ানা করান হয় সে দিন-ই।

যে সময়ে এ নৌকাটি ইতালীর সমুদ্রতীর থেকে পাল তুলে রওনা হয়, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ততক্ষণে সুদানীদের বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করে ফেলেছেন। অনেক সুদানী কমাণ্ডার তাঁর বাহিনীর হাতে মারা গেছে, আহত হয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে অনেকে। অনেকে আবার দাঁড়িয়ে আছে গভর্নর হাউজের সম্মুখের চত্বরে। অস্ত্র ত্যাগ করে সুলতান আইউবীর আনুগত্য মেনে নিয়েছে তারা। এখন তারা সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

হাউজের ভেতরে বসে সালারদের নির্দেশনা দিচ্ছেন সুলতান। আলী বিন সুফিয়ানও তাঁর সামনে উপবিষ্ট। হঠাৎ সুলতান আইউবীর একটি বিষয় মনে পড়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ানকে উদ্দেশ করে বললেন— 'আলী! গ্রেফতারকৃত গোয়েন্দা মেয়েগুলো এবং তাদের সঙ্গীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা তো ভুলেই গেলাম! এখনো তো ওরা সমুদ্রোপকূলীয় কয়েদী ক্যাম্পে-ই রয়েছে। তুমি এক্ষুনি তাদেরকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো এবং পাতাল কক্ষে ফেলে রাখো।'

'ঠিক আছে, এক্ষুনি নির্দেশ পাঠিয়ে আমি তাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি সুলতান! আর সপ্তম মেয়েটির কথা বোধ হয় আপনি ভুলে গেছেন। মেয়েটি বালিয়ান নামক এক সুদানী কমাণ্ডারের নিকট ছিলো। কিন্তু বালিয়ান হাউজের বাইরে দণ্ডায়মান আত্মসমর্পণকারী কমাণ্ডারদের মধ্যেও নেই। আহতদের মধ্যেও নেই, নেই নিহতদের মধ্যেও। আমার সন্দেহ হচ্ছে, গোয়েন্দা মেয়েদের সপ্তম মেয়েটি– যার নাম মুবী– বালিয়ানের সঙ্গে কোথাও আত্মগোপন করে আছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'ঠিক আছে, তোমার সন্দেহ দূর করুন আলী! আপাতত এখানে আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই। বালিয়ান যদি নিখোঁজ-ই হয়ে থাকে, তাহলে বেটা রোম

উপসাগরের দিকেই পালিয়ে থাকবে। খৃষ্টানদের ছাড়া তাকে আর আশ্রয় দেবে কে। এখানে নিয়ে এসে তুমি গোয়েন্দাদের পাতাল কক্ষে আটকে রাখো এবং এক্ষুনি সমুদ্রোপকূল অভিমুখে গুপ্তচর প্রেরণ করো।' বললেন সুলতান আইউবী।

'মহামান্য সুলতান! আমার তো মনে হয়, আমাদের গুপ্তচরদেরকে নিজেদের-ই দেশে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন।' পরামর্শ দেন সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনীর সালার। তিনি আরো বললেন–

'খৃষ্টানদের দিক থেকে আমাদের ততো আশঙ্কা নেই, যতো আশঙ্কা আমাদের-ই মুসলিম আমীরদের পক্ষ থেকে। আমাদের গুপ্তচরদেরকে তাদের হেরেমে ঢুকিয়ে দিন, দেখবেন, বহু অজানা তথ্য বেরিয়ে আসবে, ফাঁস হয়ে যাবে অনেক ষড়যন্ত্র।' এ বলে তিনি এই স্বঘোষিত শাসকরা কিভাবে খৃষ্টানদের হাতে ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করছে, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন এবং বলেন, সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী অনেক সময় ভেবে অস্থির হয়ে যান— 'কোন্‌টা করবো? বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করবো, নাকি নিজ গৃহকে নিজের-ই প্রদীপের আগুন থেকে রক্ষা করবো!'

জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনীর এ সালারের বক্তব্য গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন আইউবী। বললেন— 'যদি তোমরা অর্থাৎ যাদের কাছে অস্ত্র আছে, যদি তারা দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান থাকতে পারো, একনিষ্ঠভাবে যদি তোমরা ইসলাম, দেশ ও জাতির জন্য কাজ করে যাও, তাহলে বাইরের আক্রমণ আর ভিতরের ষড়যন্ত্র কোনটি-ই জাতির এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা দৃষ্টিকে প্রসারিত করো, সীমান্ত ছাড়িয়ে দৃষ্টিকে নিয়ে যাও আরো অনেক দূরে– বহু দূরে। মনে রেখো, সালতানাতে ইসলামিয়ার কোন সীমান্ত নেই। যেদিন তোমরা নিজেদেরকে এবং আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলামকে সীমান্তের বেড়ায় আটকে ফেলবে, সেদিন থেকে-ই তোমরা নিজেদের-ই কারাগারে বন্দী হয়ে যাবে। আর ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকবে তোমাদের তূনীরের সীমানা। রোম উপসাগর অতিক্রম করে তোমরা আরো দূরে দৃষ্টি ফেলো। সমুদ্র রোধ করতে পারবে না তোমাদের পথ। আর ঘরের আগুনকে ভয় করো না। আমাদের এক ফুৎকারে নিভে যাবে ষড়যন্ত্রের সব মশাল। তার স্থানে আমরা ঈমানের আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ প্রজ্বলিত করবো।'

'আমরা আশাবাদী যে, আমরা বে-ঈমানদের প্রতিহত করতে পারবো মুহতারাম সুলতান! আমরা নিরাশ নই।' বললেন সালার।

'মাত্র দু'টি অভিশাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এক. নৈরাশ্য। দুই. বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা। মানুষ প্রথমে নিরাশ হয়। তারপর বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতার আশ্রয়ে পালাবার পথ খুঁজে।' বললেন সুলতান আইউবী।

ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছেন আলী বিন সুফিয়ান। তৎক্ষণাৎ তিনি রোম উপসাগরের ক্যাম্প অভিমুখে এ পয়গাম দিয়ে দূতকে রওয়া করিয়ে দেন যে, রবিন, তার চার সহযোগী এবং মেয়েদেরকে ঘোড়া কিংবা উটের পিঠে চড়িয়ে বিশজন রক্ষীর প্রহরায় রাজধানীতে পাঠিয়ে দাও।

দূতকে রওনা করিয়ে-ই আলী বিন সুফিয়ান ছয়-সাতজন সিপাহী নিয়ে কমান্ডার বালিয়ানের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তার আগে বাইরে দণ্ডায়মান সুদানী কমাণ্ডারদের নিকট বালিয়ান সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা জানিয়েছিলো, লড়াইয়ের সময় তাকে কোথাও দেখা যায়নি এবং সুলতানের বাহিনীর উপর আক্রমণ করার জন্য যে বাহিনীটিকে রোম উপসাগরের দিকে প্রেরণ করা হয়েছিলো, বালিয়ান তাদের সঙ্গেও যায়নি।

বালিয়ানের ঘরে যান আলী বিন সুফিয়ান। দু'জন বৃদ্ধা চাকরানী ছাড়া আর কাউকে পেলেন না সেখানে। চাকরানীরা জানায়, বালিয়ানের ঘরে পাঁচটি মেয়ে ছিলো। তার নিয়ম ছিলো, যখন-ই কোন মেয়ের বয়স একটু বেড়ে যেতো, তাকে হাওয়া করে ফেলতো এবং তার স্থলে আসতো নতুন এক টগবগে যুবতী। তারা আরো জানায়, বিদ্রোহের আগে বালিয়ানের ঘরে একটি ফিরিঙ্গী মেয়ে এসেছিলো। মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি বিচক্ষণ। দু'দিন যেতে না যেতে বালিয়ান মেয়েটির গোলাম হয়ে গিয়েছিলো। বিদ্রোহের একদিন পরে যেদিন সুদানীরা অস্ত্রসমর্পণ করে, সেদিন রাতে বালিয়ান নিজে একটি ঘোড়ায় চড়ে এবং সেই ফিরিঙ্গী মেয়েটিকে অপর একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে অজানার উদ্দেশ্যে উধাও হয়ে যায়। সাতজন অশ্বারোহীও ছিলো তার সঙ্গে। হেরেমের মেয়েদের ব্যাপারে বৃদ্ধারা জানায়, যে যা হাতে পেয়েছে, তুলে নিয়ে সবাই চলে গেছে।

ফিরে আসেন আলী বিন সুফিয়ান। হঠাৎ একটি ঘোড়া দ্রুত ছুটে এসে থেমে যায় তাঁর সামনে। ফখরুল মিসরী তার আরোহী। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নীচে নামে সে। হাঁফাতে হাঁফাতে কম্পিত কণ্ঠে বললো, 'আমিও আপনার-ই ন্যায় নরাধম বালিয়ান ও কাফির মেয়েটিকে খুঁজছি। আমি তার থেকে প্রতিশোধ নেবো। এদের দু'জনকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি আসবে না। আমি জানি, সে কোন্ দিক গেছে। আমি তাকে ধাওয়াও করেছি। কিন্তু সঙ্গে তার

সাতজন সশস্ত্র রক্ষী। আমি ছিলাম একা। রোম উপসাগরের দিকে যাচ্ছে লোকটা। কিন্তু যাচ্ছে সে সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে।'

আলী বিন সুফিয়ানের হাত চেপে ধরে ফখরুল মিসরী বললো, 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনি আমায় চারজন সিপাহী দিন; ধাওয়া করে আমি ওকে শেষ করে আসি।'

আলী বিন সুফিয়ান তাকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, চারজন নয়, আমি তোমাকে বিশজন সিপাহী দেবো। এখনো সে উপকূল অতিক্রম করতে পারেনি। তুমি আমার সঙ্গে চলো। বালিয়ান কোন্‌দিক গেলো সে ব্যাপারে নিশ্চিত হন আলী বিন সুফিয়ান।

মুবীকে নিয়ে বালিয়ান উপকূল অভিমুখে বহুদূর এগিয়ে গেছে। উপকূলগামী সাধারণ পথ ছেড়ে অন্য পথে এগুচ্ছে সে। এসব অঞ্চল-পথ-ঘাট বালিয়ানের চেনা। তাই নির্বিঘ্নে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে সে।

কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যে আত্মসমর্পণকারী সুদানী সৈন্য ও কমাণ্ডারদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, বালিয়ান তা জানে না। বালিয়ান পালাচ্ছে দু'টি কারণে। প্রথমত তার আশঙ্কা, ধরা পড়লে সুলতান আইউবী তাকে খুন করে ফেলবেন। দ্বিতীয়ত মুবীর ন্যায় রূপসী মেয়েকে হাতছাড়া করতে চাইছে না সে। যে কোন মূল্যে নিজেরও জীবন রক্ষা করতে হবে এবং মুবীকেও হাতে রাখতে হবে, এই তার প্রত্যয়। বালিয়ান মনে করতো, জগতের রূপসী মেয়েরা শুধু মিসর আর সুদানে-ই জন্মায়। কিন্তু ইতালীর এই ফিরিঙ্গী মেয়েটির চোখ-ধাঁধানো রূপ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলো। মুবীর জন্য নিজের মান-সম্মান, দ্বীন-ধর্ম ও দেশ-জাতি সব বিসর্জন দিয়েছে বালিয়ান। কিন্তু এখন মুবী যে তার থেকে মুক্তি লাভ করার চেষ্টা করছে, তা বালিয়ানের অজানা। যে উদ্দেশ্যে মুবীর এ দেশে আগমন, তা নস্যাৎ হয়ে গেছে সব। তবে মুবী তার কর্তব্য পালনে ত্রুটি করেনি বিন্দুমাত্র। লক্ষ্য অর্জনে নিজের দেহ ও সম্ভ্রম বিলিয়ে দিয়েছে মেয়েটি। এখনো নিজের দ্বিগুণ বয়সী এক পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়ে আছে সে।

বালিয়ান এই আত্মতৃপ্তিতে বিভোর যে, মুবী তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তার প্রতি মুবীর প্রচণ্ড ঘৃণা। একাকী পালাতে পারছে না বলে বাধ্য হয়ে এখনো বালিয়ানের সঙ্গ দিচ্ছে মুবী। মনে তার একটি-ই ভাবনা, কী করে রোম উপসাগর পার হওয়া যায় কিংবা কিভাবে রবিনের নিকটে পৌঁছে যাওয়া যায়।

মুবী জানে না, রবিন এবং তার বণিকবেশী সঙ্গীরা এখন সুলতান আইউবীর হাতে বন্দী। মুবী বারবার বালিয়ানকে বলছে, দ্রুত চলো, পথে অবস্থান কম করো, অন্যথায় ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু বে-ঈমান নারীলোলুপ বালিয়ান কোথাও ছায়াঘেরা একটু জায়গা পেলে-ই থেমে যায়, বিশ্রামের নামে বসে পড়ে। তারপর মেতে উঠে মদ আর মুবীকে নিয়ে।

এক রাতে একটি কৌশল আঁটে মুবী। অতিরিক্ত মদপান করিয়ে অচেতন করে শুইয়ে রাখে বালিয়ানকে। রক্ষীরা শুয়ে পড়ে খানিকটা দূরে একটি গাছের আড়ালে। রক্ষীদের একজন বেশ টগবগে, সুঠাম সুদেহী এক বলিষ্ঠ যুবক। অত্যন্ত বিচক্ষণও বটে। পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে মুবী। হাতের ইশারায় নিয়ে যায় খানিক দূরে অন্য একটি গাছের আড়ালে। বলে, তুমি ভালো করেই জান, আমি কে, কোত্থেকে এসেছি, কেন এসেছি। আমি তোমাদের জন্য সাহায্য নিয়ে এসেছিলাম, যাতে তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর মতো একজন ভিনদেশী শাসকের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারো। কিন্তু তোমাদের এই কমাণ্ডার বালিয়ান এত বিলাস-প্রিয় লোক যে, মদপান করে মাতাল হয়ে সর্বক্ষণ আমার দেহটা নিয়েই খেলা করতে ভালবাসে। আমার সহযোগিতায় বুদ্ধিমত্তার সাথে বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে বিজয় অর্জনের চেষ্টা করার পরিবর্তে লোকটি আমাকে হেরেমের দাসী বানিয়ে রেখেছিলো। তারপর নির্বোধের মতো বাহিনীটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এমন বে-পরোয়াভাবে আক্রমণ করালো যে, এক রাতে-ই তোমাদের এত বিশাল বাহিনীটি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেলো!

তোমরা হয়তো জানো না, তোমাদের পরাজয়ের জন্য এ লোকটি-ই দায়ী। এখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছে শুধু-ই ফুর্তি করার জন্য। আমাকে সে বলছে, আমি যেন তাকে সমুদ্রের ওপারে নিয়ে গিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীতে মর্যাদাসম্পন্ন একটি পদ দিই আর আমি তাকে বিয়ে করি। কিন্তু ওসব হবে না; আমি ওকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। আমি স্থির করেছি, আমার যদি বিয়ে করতে-ই হয়, নিজের দেশে নিয়ে যদি কাউকে দেশের সেনাবাহিনীতে মর্যাদাসম্পন্ন স্থান দিতে-ই হয়, তবে তার জন্য আমার মনোঃপূত একজন লোক বেছে নিতে হবে। আর সে হলে তুমি। তুমি যুবক, সাহসী ও বুদ্ধিমান। প্রথমবার যখন আমি তোমাকে দেখেছি, তখন থেকেই আমার হৃদয়ে তোমার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে আছে। তুমি এ বৃদ্ধের কবল থেকে আমাকে রক্ষা করো। আমি এখন তোমার। সমুদ্রের ওপারে চলো,

মর্যাদা, ধনৈশ্বর্য আর আমি সব তোমার পদচুম্বন করবে। কিন্তু তার জন্য আগে এ লোকটিকে এখানে-ই শেষ করে যেতে হবে। লোকটি অচেতন ঘুমিয়ে আছে; তুমি যাও, ওকে খুন করে আসো। তারপর চলো, রওনা হই।

রক্ষীর ঘাড়ে হাত রাখে মুবী। মুবীর রূপের মোহ-জালে আটকা পড়ে যায় রক্ষী। দু'বাহু দ্বারা জড়িয়ে ধরে মেয়েটিকে। প্রেমের যাদু দিয়ে পুরুষ বশ করায় অভিজ্ঞ মুবী। পূর্বের অবস্থান থেকে সরে একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায় মেয়েটি। রক্ষীও অগ্রসর হয়ে হাত বাড়ায় তার প্রতি।

এমন সময়ে হঠাৎ পিছন থেকে একটি বর্শা ছুটে এসে বিদ্ধ হয় রক্ষীর পিঠে। আহ! বলে চীৎকার করে ওঠে লোকটি। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। দূর থেকে ছুটে আসে একজন। রক্ষীর পিঠ থেকে বর্শাটি টেনে বের করতে করতে বলে— 'বেটা নিমকহারাম, তোর বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

চীৎকার দেয় মুবী। বলে, লোকটিকে তুমি খুন . ...। এর বেশী বলতে পারলো না সে। পিছন থেকে অপর একজন তার বাহু ধরে ঝট্‌কা এক টান দিয়ে ছুড়ে মারে বালিয়ানের দিকে। বলে, আমরা তার পোষ্য বন্ধু। আমাদের জীবন তার উপর নির্ভরশীল। তোমরা আমাদের কাউকে তার বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। বিভ্রান্ত যে হয়েছে, সে তার প্রায়শ্চিত্ত পেয়ে গেছে।'

মদের নেশায় অচেতন পড়ে আছে বালিয়ান।

'তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমরা কোথায় যাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করে মুবী।

'যাচ্ছি সমুদ্রে ডুবে মরতে। তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। বালিয়ান যেখানে নিয়ে যায়, আমরা সেখানেই- যাবো।' এই বলে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ে তারা।

পরদিন বেশ বেলা হলে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় বালিয়ান। রক্ষীরা রাতের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে তাকে। মুবী বলে, প্রাণের ভয় দেখিয়ে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো। বালিয়ান শাবাশ দেয় তার রক্ষীদের। কোন্ ঘটনায় নিজের একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক খুন হলো, তার জন্য কোন ভাবনা-ই জাগলো না তার মনে। মুবীর রূপ আর মদে বুঁদ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত হয়ে গেছে বালিয়ান। মুবী তাকে বলে, ওঠ, দ্রুত রওনা হও। কিন্তু বালিয়ানের কোন ভাবনা নেই। নিজেকে হারিয়ে-ই ফেলেছে যেন সে। মুবী ভাবে, এরা কতো নির্দয়, কতো নির্বোধ জাতি; সামান্য কারণে, হীন স্বার্থে আপন লোকদেরও হত্যা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়না!

আলী বিন সুফিয়ান কেন যেন বালিয়ানের পশ্চাদ্ধাবন না করে ফিরে গেলেন। বিদ্রোহের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনিও।

❖❖❖

সমুদ্রোপকূলের ক্যাম্প থেকে রবিন, তার চার সঙ্গী এবং ছয়টি মেয়েকে পনেরজন রক্ষীর প্রহরায় কায়রো অভিমুখে রওনা করা হয়েছে। দূত রওনা হয়ে গেছে তাদেরও আগে। বন্দীরা সকলে উটের পিঠে আর রক্ষীরা ঘোড়ায়। তারা স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলছে এবং পথে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্রাম নিচ্ছে। তাড়া নেই, শঙ্কা নেই। পথে বিপদের কোন ভয় নেই। নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায় পথ চলছে তারা। কয়েদীরা নিরস্ত্র, তদুপরি তাদের ছয়জন-ই নারী। কারোর পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই।

কিন্তু রক্ষীরা ভুলে গেছে, তাদের কয়েদীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর। তীর-তরবারী ব্যবহারে সকলে-ই অভিজ্ঞ। তাদের দলের যাদেরকে বণিকবেশে গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা রীতিমত যোদ্ধা। আর মেয়েগুলোও সেই মেয়ে নয়, যাদেরকে মানুষ অবলা নারী মনে করে থাকে। তাদের দেহ ও রূপের আকর্ষণ, মধুভরা যৌবন আর চপলতা এমন এক অস্ত্র, যা প্রবল প্রতাপশালী রাজা-বাদশাহদেরও কুপোকাত করে ফেলতে, বড় বড় বীর যোদ্ধাকেও মুহূর্তে নিরস্ত্র করতে সক্ষম।

রক্ষীদের কমাণ্ডার মিসরী। তার নজরে পড়ে, মেয়ে ছয়টির একজন বার বার তার প্রতি চোখ তুলে তাকাচ্ছে। চোখাচোখি হয়ে গেলে মিষ্টি-মধুর হাসি ভেসে ওঠে মেয়েটির ঠোঁটে। মেয়েটি যাদুর মত আকর্ষণ করছে কমাণ্ডারকে। তার রাঙ্গা ঠোঁটের মুচকি হাসি মোমের মত গলিয়ে ফেলছে তাকে।

সন্ধ্যার সময় এই প্রথমবার একস্থানে যাত্রা বিরতি দেয় কাফেলা। খাবার দেয়া হয় সকলকে। কিন্তু খাবারে হাত দিল না মেয়েটি। কমাণ্ডারকে জানান হলো। কমাণ্ডার কথা বললো মেয়েটির সঙ্গে। খাবার না খাওয়ার কারণ জানতে চায় সে। জবাবে ঝর্ ঝর্ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করে তার দু'চোখ থেকে। কিছুক্ষণ নতমুখে দাঁড়িয়ে থেকে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে— 'আপনার সঙ্গে আমি নিভৃতে কথা বলতে চাই।'

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত আসে। ঘুমিয়ে পড়ে কাফেলার সকলে। শুয়ে পড়ে কমাণ্ডারও। কিছুক্ষণ পর সে বিছানা থেকে উঠে মেয়েটিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে

তোলে। নিয়ে যায় আড়ালে। বলে, কি যেন বলবে বলেছিলে, এবার বলো। কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে মেয়েটি বললো, আমি একটি মজলুম মেয়ে। আমাকে খৃষ্টান সৈন্যরা অপহরণ করে একটি জাহাজে তুলে নিয়ে এসেছে । আমি এক অফিসারের রক্ষিতা হয়ে থাকতে বাধ্য হই।

অন্য মেয়েদের সম্পর্কে সে জানায়, তাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় জাহাজে। তাদেরকেও আনা হয়েছে অপহরণ করে। অগ্নিগোলার শিকার হয়ে জাহাজগুলো আগুনে পুড়তে শুরু করলে একটি নৌকায় তুলে আমাদেরকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হয়। ভাসতে ভাসতে আমরা কূলে এসে পৌঁছি। তারপর গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী হই আপনাদের হাতে।

বণিকবেশী গোয়েন্দারাও মেয়েগুলোর ব্যাপারে সুলতান আইউবীকে এ কাহিনী-ই শুনিয়েছিলো। মিসরী রক্ষী কমাণ্ডারের জানা ছিলো না এ কাহিনী, এ-ই প্রথমবার শুনছে সে। তার প্রতি নির্দেশ, এরা ভয়ঙ্কর গুপ্তচর; কঠোর নিরাপত্তার সাথে এদেরকে কায়রো নিয়ে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগের হাতে তুলে দিতে হবে। কাজেই মেয়েদের, বিশেষ করে এই মেয়েটির কোন সাহায্য করার সাধ্য তার নেই। তাই সে নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে দেয় মেয়েটিকে। তার জানা নেই, মেয়েটির তূনীরে আরো অনেক তীর অবশিষ্ট আছে। এক এক করে সেই তীর ছুঁড়তে-ই থাকবে সে।

এবার মেয়েটি বললো, আমি তোমার নিকট কোন সাহায্য চাই না। তুমি কোন সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এলেও আমি তা গ্রহণ করবো না। কারণ, তোমাকে আমার এত-ই ভালো লাগছে যে, আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না। তোমাকে ভালোবাসি বলে-ই আমি মনের বেদনার কথাগুলো তোমার কাছে ব্যক্ত করেছি।

এমন একটি রূপসী মেয়ের মুখে এ জাতীয় কথা শুনে আত্ম-সংবরণ করতে পারে কোন্ পুরুষ! তাছাড়া কমাণ্ডারের হাতে মেয়েটি নিতান্ত অসহায়ও বটে। তদুপরি নিঝুম রাতের নির্জন পরিবেশ। ধীরে ধীরে বরফের মত গলতে শুরু করে মিসরী কমাণ্ডারের পৌরুষ। বন্ধুসুলভ প্রেমালাপ জুড়ে দেয় সে মেয়েটির সঙ্গে। এবার মেয়েটি নিক্ষেপ করে তূনীরের আরেকটি তীর। সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পূত-পবিত্র চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করতে শুরু করে। বলে— 'আমি তোমার গভর্নর সালাহুদ্দীন আইউবীকে আমার নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়েছিলাম। আশা ছিলো, তার মত একজন মহৎ ব্যক্তি আমার প্রতি দয়াপরবশ

হবেন। কিন্তু আশ্রয়ের নামে তিনি আমায় নিজের তাঁবুতে নিয়ে রাখলেন এবং মদপান করে হায়েনার মত রাতভর আমার সম্ভ্রম লুট করলেন। পশুটা আমার হাড়গোড় সব ভেঙ্গে দিয়েছে। মদপান করে তিনি এমনই অমানুষ হয়ে যান যে, তখন তার মধ্যে মানবতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা।

মাথায় খুন চেপে যায় মিসরীর। দাঁত কড়মড় করে বলে ওঠে, 'এ্যা, আমাদের শোনান হয়, সালাহুদ্দীন একজন পাক্কা ঈমানদার, এক্কেবারে ফেরেশতা। মদ-নারীর প্রতি নাকি তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা। আর তলে তলে করে বেড়াচ্ছেন এসব, না?'

'এখন তোমরা আমাকে তার-ই কাছে নিয়ে যাচ্ছো। আমি যা বললাম, যদি তোমার বিশ্বাস না হয়ে থাকে, তাহলে রাতে দেখো, আমাকে কোথায় থাকতে হয়। তোমাদের সুলতান আমাকে কয়েদখানায় না রেখে রাখবেন তাঁর হেরেমে, সে কথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। লোকটার কথা মনে পড়লে আমার গা শিউরে ওঠে।' বললো মেয়েটি।

এ জাতীয় আরো অনেক কথা বলে মিসরী কমাণ্ডারের মনে সুলতান আইউবীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি করে মেয়েটি। মিসরী এখন সম্পূর্ণরূপে মেয়েটির হাতের মুঠোয়। সে তার মাথা কব্জা করে নিয়েছে। কিন্তু কমাণ্ডার জানেনা, এসব হলো গোয়েন্দা মেয়েদের অস্ত্র। সব শেষে মেয়েটি বললো— 'তুমি যদি আমাকে এ লাঞ্ছনার জীবন থেকে উদ্ধার করতে পারো, তাহলে আমি আজীবনের জন্য তোমার হয়ে যাবো এবং আমার পিতা বিপুল স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।'

তার পন্থাও জানিয়ে দেয় মেয়েটি। বলে, তুমি আমার সঙ্গে সমুদ্র পার হয়ে পালিয়ে যাবে। নৌকার অভাব হবে না। আমার পিতা বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি। আমি তোমাকে বিয়ে করে নেবো আর আমার পিতা তোমাকে উন্নত একটি বাড়ি ও বিপুল ধন-সম্পদ প্রদান করবেন। নির্বিঘ্নে ব্যবসা করে আমাকে নিয়ে সুখে জীবন কাটাতে পারবে।'

মিসরীর মনে পড়ে যায়, সে মুসলমান। বললো, কিন্তু আমি তো আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারবো না। মেয়েটি কিছুক্ষণ মৌন থেকে ভেবে বললো— 'ঠিক আছে, তোমার জন্য আমিই আমার ধর্ম বিসর্জন দেবো।'

পলায়ন ও বিয়ের পরিকল্পনা তৈরী করে দু'জনে। মেয়েটি বললো, 'তোমার উপর আমি কোন চাপ দিতে চাই না। ভালভাবে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে সিদ্ধান্ত

নাও। আমি শুধু জানতে চাই, আমার মনে তোমার প্রতি যতটুকু ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে, ততটুকু হৃদ্যতা আমার প্রতিও তোমার অন্তরে জেগেছে কি না। আমাকে বরণ করতে যদি তুমি প্রস্তুত হয়ে-ই থাকো, তাহলে চেষ্টা করো, যেন কায়রো পৌঁছুতে আমাদের সফর দীর্ঘ হয়। ওখানে পৌঁছে গেলে তুমি আমার গন্ধও পাবে না।

মেয়েটির উদ্দেশ্য, সফর দীর্ঘ হোক এবং তিন দিনের স্থলে ছয়দিন পথেই কেটে যাক। তার কারণ, রবিন ও তার সঙ্গীরা পালাবার চেষ্টা করছে। রাতে ঘুমন্ত রক্ষীদেরকে তাদের-ই অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে তাদের-ই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পালাবার পরিকল্পনা নিয়ে সুযোগের সন্ধান করছে তারা। এতো মাত্র প্রথম মন্‌যিল, প্রথম অবস্থান। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সফর, যাতে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে কাজ করা যায়।

এ উদ্দেশ্য সাধনে-ই মেয়েটিকে ব্যবহার করছে তারা। মিসরী কমাণ্ডারকে হাত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে তার উপর। মেয়েটি প্রথম সাক্ষাতে-ই ধরাশয়ী করে ফেলে মিসরী কমাণ্ডারকে।

মিসরী কমাণ্ডার তেমন ব্যক্তিত্ববান লোক নয়; একজন প্লাটুন কমাণ্ডার মাত্র। এমন সুন্দরী নারী স্বপ্নেও দেখেনি সে কখনো। অথচ এখন কিনা অনুপম এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী তার হাতের মুঠোয়। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় তার হাতে নিজেকে তুলে দিয়ে বসেছে মেয়েটি। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে কমাণ্ডার। ভুলে গেছে নিজের ধর্ম ও কর্তব্যের কথা। এখন সে ক্ষণিকের জন্যও মেয়েটি থেকে আলাদা হতে চাইছে না।

এ উন্মাদনার মধ্যে পরদিন ভোরবেলা কমাণ্ডার প্রথম আদেশ জারী করে, উট-ঘোড়াগুলো বেশ ক্লান্ত; কাজেই আজ আর সফর হবে না। রক্ষী ও উষ্ট্রচালকগণ এ ঘোষণায় বেশ আনন্দিত হয়। কারণ, রণক্ষেত্রে সীমাহীন পরিশ্রমে তাদেরও দেহ অবসন্ন। কায়রো পৌঁছবার কোন তাড়াও নেই তাদের।

বিশ্রাম ও গল্প-গুজবে কেটে যায় দিন। কমাণ্ডারও মেয়েটিকে নিয়ে উন্মাতাল। দিন গিয়ে রাত এলো। ঘুমিয়ে পড়লো সকলে। কমাণ্ডার মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল খানিকটা দূরে। সকলের দৃষ্টির আড়ালে মেয়েটি রঙ্গিন স্বপ্নের নীলাভ আকাশে পৌঁছিয়ে দিলো তাকে।

পরদিন তাঁবু তুলে যাত্রা করে কাফেলা। কিন্তু কমাণ্ডার সোজা রাস্তা ছেড়ে ধরে অন্য পথ। সঙ্গীদের বললো, এ পথে সামনে ছাউনি ফেলার জন্য বেশ

মনোরম জায়গা আছে। একটি বসতিও আছে কাছে। ডিম-মুরগী পাওয়া যাবে। শুনে সঙ্গীদের আনন্দ আরো বেড়ে যায় যে, কমাণ্ডার আমাদের আয়েশের চিন্তা করছেন।

কিন্তু প্লাটুনের দু'জন সৈনিক কমাণ্ডারের এসব আচরণের আপত্তি তোলে। তারা বলে, আমাদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর কয়েদী। লোকগুলো শত্রুবাহিনীর গুপ্তচর। যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছিয়ে দেয়া প্রয়োজন। অযথা সফর দীর্ঘ করা ঠিক হচ্ছে না। কমাণ্ডার তাদের এই বলে থামিয়ে দিলো যে, সে দায়িত্ব আমার। গন্তব্যে দ্রুত পৌঁছবো না বিলম্বে, সে তোমাদের ভাবতে হবে না। জবাবদিহি করতে হলে আমাকে-ই করতে হবে; তোমাদের এত মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তারা কমাণ্ডারের জবাবে চুপসে যায়।

এগিয়ে চলছে কাফেলা। দুপুরের পর কাফেলা যেখানে পৌঁছে, সেখানে আশপাশে অসংখ্য শকুন উড়তে ও মাটিতে নামতে-উঠতে দেখে তারা। বুঝা গেলো, মৃত মানুষের লাশ আছে এখানে। চারদিকে মাটি ও বালির টিলা, বড় বড় বৃক্ষও আছে। টিলার ভেতরে ঢুকে পড়ে কাফেলা। ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠে গেছে পথ। একটি উঁচু স্থান থেকে বিশাল এক ময়দান চোখে পড়ে তাদের। তার এক স্থানে বৃত্তাকারে উঠানামা করছে অনেকগুলো শকুন। শোরগোল করে কিসে যেন মেতে আছে শকুনগুলো। কিছুদূর অগ্রসর হলে চোখে পড়ে, সেখানে কতগুলো লাশ। পঁচা লাশের দুর্গন্ধে বিষিয়ে উঠেছে এলাকার পরিবেশ।

এগুলো সেই সুদানীদের লাশ, যারা রোম উপসাগরের তীরে অবস্থানরত সুলতান আইউবীর বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে রওনা হয়েছিলো। সুলতান আইউবীর জানবাজ সৈনিকরা রাতের বেলা পেছন থেকে হামলা চালিয়ে এখানে-ই থামিয়ে দিয়েছে তাদের অগ্রযাত্রা, ব্যর্থ করে দিয়েছে তাদের অশুভ তৎপরতা। আরো সামনে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে সুদানীদের অসংখ্য লাশ। আইউবী বাহিনীর হাতে পরাজিত হওয়ার পর নিহতদের লাশগুলো পর্যন্ত তুলে নেয়ার সুযোগ পায়নি তারা।

এগিয়ে চলছে কাফেলা।

নিহত সুদানীদের লাশের আশেপাশে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে তাদের অস্ত্র। তীর-কামান, বর্শা-ঢাল ইত্যাদি। কাফেলার কয়েদীদের চোখে পড়ে সেগুলো। তারা পরস্পর কানাঘুষা করে। যে মেয়েটি রক্ষী কমাণ্ডারকে কজা করে

রেখেছিলো, তার সঙ্গেও চোখের ইঙ্গিতে কথা বলে রবিন। লাশ ও অস্ত্র ছড়িয়ে আছে অনেক দূর পর্যন্ত।

ডান দিকে নিকটে-ই সবুজ-শ্যামল মনোরম একটি জায়গা। পানিও নজরে আসছে। এই সবুজের সমারোহ টিলাগুলোর চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। মেয়েটি চোখ টিপে ইঙ্গিত করলো কমাণ্ডারকে। কমাণ্ডার চলে আসে মেয়েটির নিকটে। মেয়েটি বললো— 'জায়গাটি বেশ মনোরম, এখানেই তাঁবু ফেলো। রাতে বেশ মজা হবে।'

কাফেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয় কমাণ্ডার। সবুজ-শ্যামল টিলার নিকটে পানির ঝরনার কাছে গিয়ে থেমে যায় সে। ঘোষণা দেয়, এখানে-ই রাত কাটবে। উট-ঘোড়ার পিঠ থেকে নামে সকলে। পানির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে পশুগুলো। রাত যাপনের জন্য উপযুক্ত জায়গার সন্ধান করে কমাণ্ডার। দু'টি টিলার মাঝে প্রশস্থ একটি জায়গা, সবুজে ঘেরা। ছাউনি ফেলার নির্দেশ হয় এখানে।

গভীর রাত। চারদিক অন্ধকার। ঘুমিয়ে আছে সকলে। জেগে আছে শুধু দু'জন। কমাণ্ডার আর মেয়েটি। কমাণ্ডারের ভাবনা এক, মেয়েটির মতলব আরেক। কমাণ্ডারের ইচ্ছা মেয়েটিকে ভোগ করে চলা আর মেয়েটির পরিকল্পনা কমাণ্ডারকে খুন করা।

নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে সবাই। কোন প্রহরা নেই। নিরাপত্তার কথা ভাববার-ই সময় নেই কমাণ্ডারের। শয়ন থেকে উঠে মেয়েটি। পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় কমাণ্ডারের নিকট। মেয়েটিকে নিয়ে সকলের থেকে অনেক ব্যবধানে দূরে শুয়ে আছে কমাণ্ডার। মেয়েটি তাকে একটি টিলার আড়ালে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ কাটায় সেখানে। সে আরো একটু দূরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। মিসরী কমাণ্ডার তার ইচ্ছার গোলাম। এ যে এক ষড়যন্ত্র, কল্পনায়ও আসছে না তার। মনে তার বেশ আনন্দ। সে মেয়েটির সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। আরো তিনটি টিলা পেরিয়ে মেয়েটি একস্থানে নিয়ে যায় তাকে। এবার সে থামে। কমাণ্ডারকে দু' বাহুতে জড়িয়ে ধরে মন উজাড় করে প্রেম-নিবেদন করে। নিজেকে প্রেম-সাগরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে কমাণ্ডার।

রবিন দেখলো, কমাণ্ডার নেই। অন্য রক্ষীরাও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। শুয়ে শুয়ে-ই সে পাশের সঙ্গীকে জাগায়। পাশের জন জাগায় তার পরের জনকে। এভাবে জেগে উঠে তারা চারজন।

রক্ষীরা ঘুমিয়ে আছে তাদের থেকে একটু দূরে। কোন পাহারাদার নেই। বুকে ভর দিয়ে ক্রোলিং করে সামনে এগিয়ে যায় রবিন। রক্ষীদের অতিক্রম করে

চলে যায় অনেক দূর। পিছনে পিছনে এগিয়ে যায় তার তিন সঙ্গী। তারা টিলার আড়ালে গিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। চলে যায় মাঠের লাশগুলোর কাছে। কুড়িয়ে নেয় অস্ত্র। তিনটি ধনুক, তূনীর ও একটি করে বর্শা হাতে তুলে নেয়। এবার অস্ত্র নিয়ে একত্রে ফিরে আসে তিনজন।

সঙ্গীদের নিয়ে ঘুমন্ত রক্ষীদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় রবিন। হাতের বর্শাটা শক্ত করে ধরে। তুলে ধরে চীৎ হয়ে শুয়ে থাকা এক রক্ষীর বুক বরাবর। অপর চারজনও এক একজন রক্ষীর নিকট দাঁড়িয়ে যায় পজিশন নিয়ে। মুহূর্ত মধ্যে জীবনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে সুলতান আইউবীর চার রক্ষীর। এ চারজনকে খুন করে কেউ টের পাওয়ার আগে অপর এগারজনকেও শেষ করে ফেলা ব্যাপার নয়। চাল তাদের সফল। তারপর থাকে তিন উষ্ট্রচালক আর কমাণ্ডার। পনের রক্ষীর হত্যার পর তারা হবে সহজ শিকার।

রক্ষীর বুকে বিদ্ধ করার জন্য বর্শাটা আরো একটু উপরে তোলে রবিন। সে রক্ষীর বুকটা শেষবারের মত দেখে নেয়। আঘাতের জন্য হাতটা তার নীচে নেমে এলো বলে, হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে আসে রবিনের কানে। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখ দিক থেকে একটি তীর এসে বিদ্ধ হয় রবিনের বুকে। ছুটে আসে আরেকটি তীর। বিদ্ধ হয় রবিনের এক সঙ্গীর বুকে। একই সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দু'জন। অপর তিনজন দেখার চেষ্টা করছে, ঘটনাটা কী ঘটলো। ইত্যবসরে ধেয়ে আসে আরো দু'টি তীর। আঘাত খেয়ে পড়ে যায় আরো দু'জন। এখনো দাঁড়িয়ে আছে একজন। পালাবার জন্য পিছন দিকে মোড় ঘুরায় সে। অমনি একটি তীর এসে গেঁথে যায় তার এক পাজরে। তার দু' চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে; পড়ে যায় মাটিতে।

ঘটনাটা ঘটে গেলো নিতান্ত চুপচাপ। একে একে পাঁচটি প্রাণী ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে; কিন্তু টের পেলো না কেউ। এখনো সবাই ঘুমুচ্ছে নাক ডেকে। যম এসে দাঁড়িয়েছিলো যাদের সামনে, টের পেলো না তারাও।

ঘটনাস্থলে এগিয়ে আসে তীরান্দাজরা। আলো জ্বালায় তারা। তারা সেই দুই রক্ষী, যারা কমাণ্ডারের আচরণে আপত্তি তুলে বলেছিলো, গড়িমসি না করে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছা দরকার। শুয়েছিলো তারা। চার কয়েদী যখন পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলো, তখন চোখ খুলে যায় একজনের। সে সঙ্গীকে জাগিয়ে কয়েদীদের অনুসরণ করে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, কয়েদীরা যদি পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের তীর ছুঁড়ে খতম করে দেবে। তাই তাদের গতিবিধি অনুসরণ করে

তারা অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে কয়েদীদের ফিরে আসতে দেখে একটি টিলার আড়ালে বসে পড়ে চুপচাপ। এবার যেইমাত্র কয়েদীরা রক্ষীদের বুক লক্ষ্য করে বর্শা তাক করে, অম্নি রক্ষীরা তাদের প্রতি তীর ছুঁড়ে দেয়। খতম করে দেয় চার কয়েদীর প্রত্যেককে।

এবার কমাণ্ডারকে আওয়াজ দেয় রক্ষীরা। কিন্তু কোন শব্দ-সাড়া নেই তার। তাদের ডাকাডাকিতে জেগে ওঠে মেয়েরা। জেগে ওঠে অপর রক্ষীরাও। চারটি লাশ দেখতে পায় মেয়েরা। লাশগুলো তাদের-ই চার সঙ্গীর। তারা আঁৎকে উঠে। দেহে একটি একটি করে তীর নিয়ে শুয়ে আছে লাশগুলো। অপলক নেত্রে নিঃশব্দে লাশগুলোর প্রতি তাকিয়ে থাকে মেয়েরা। কী করতে এসে সঙ্গীরা লাশ হলো, তা বুঝতে বাকী রইলো না তাদের। আজ রাতের পরিকল্পনা সম্পর্কে তারাও অবহিত।

মিসরী কমাণ্ডার ছাউনীতে নেই। নেই একটি মেয়েও।

কয়েদী গোয়েন্দাদের বুকে যখন তীর বিদ্ধ হলো, ঠিক তখন রক্ষীদের মিসরী কমাণ্ডারের পিঠেও বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো একটি খঞ্জর। দু'টি টিলার পরে তৃতীয় একটি টিলার নীচে পড়ে আছে তার লাশ। সে সংবাদ জানে না রক্ষীরা।

তাঁবু থেকে তুলে মেয়েটি বেশ দূরে তার পছন্দমত একটি স্থানে নিয়ে গিয়েছিলো কমাণ্ডারকে। রাতের আঁধারে মেয়েটিকে নিয়ে আমোদে মেতে উঠে কমাণ্ডার। একটি টিলার আড়ালে বসে আছে দু'জন। সে টিলার-ই খানিক দূরে তাঁবু ফেলেছিলো বালিয়ান। মুবীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বালিয়ানও এগিয়ে আসে টিলার দিকে। হাতে তার মদের বোতল। নীচে বিছানোর জন্য মুবী হাতে করে নিয়ে আসে একটি শতরঞ্জি। একস্থানে শতরঞ্জি বিছিয়ে বসে পড়ে মুবী। পাশে বসে মুবীকে জড়িয়ে ধরে বালিয়ান।

হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে কারো কথা বলার শব্দ ভেসে আসে তাদের কানে। কান খাড়া করে শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছে, আন্দাজ করার চেষ্টা করে বালিয়ান। কী বলছে, তাও বুঝবার চেষ্টা করে সে। বুঝা গেলো কণ্ঠটি একটি মেয়ের। বালিয়ান ও মুবী উঠে দাঁড়ায়। পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় সেদিকে। কাছে গিয়ে টিলার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে তাকায় দু'জনে। দু'টি ছায়ামূর্তি বসে আছে দেখতে পায় তারা। আরো গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। এবার পরিষ্কার বুঝতে পারে, ছায়ামূর্তি দু'টির একটি নারী অপরটি পুরুষ। আরো নিকটে চলে যায় মুবী। সে গভীর মনে তাদের আলাপ বুঝতে চেষ্টা করে। মিসরী

কমাণ্ডারের সঙ্গে মেয়েটি এমন স্পষ্ট ভাষায় কথা বলছিলো যে, মুবী নিশ্চিত হয়ে যায়, মেয়েটি তার-ই এক সহকর্মী। তারা আরো বুঝে ফেলে, কায়রো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মেয়েটিকে।

মিসরী কমাণ্ডারের আচরণ ও কথোপকথনে মুবী নিশ্চিত বুঝে ফেলে, লোকটি এ মেয়েটিকে তার অসহায়ত্বের সুযোগে ভোগের উপকরণে পরিণত করে রেখেছে। মনে মনে ফন্দি আঁটে মুবী। পিছনে সরে গিয়ে বালিয়ানকে কানে কানে বলে— 'লোকটি মিসরী। সঙ্গের মেয়েটি আমার-ই সহকর্মী। বেটা জোরপূর্বক ফুর্তি করছে মেয়েটিকে নিয়ে। তুমি তাকে রক্ষা করো। এই মিসরী লোকটি তোমার দুশমন আর মেয়েটি আমার আপন।' বালিয়ানকে উত্তেজিত করার জন্য মুবী আরো বলে— 'মেয়েটি বেশ সুন্দরী। মিসরীর কবল থেকে ওকে উদ্ধার করে আনো, এই সফরে ওকে নিয়ে বেশ আমোদ করতে পারবে।'

একটু আগে-ই মদপান করেছিলো বালিয়ান। মাথাটা এখনো তার ঢুলুঢুলু করছে। এবার খুনের নেশা পেয়ে বসেছে তাকে। সে মুবীর দেখানো লোভ সামলাতে পারলো না। কোমরবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করে হাতে নেয় বালিয়ান। বিলম্ব না করে দ্রুত এগিয়ে যায় মিসরীর প্রতি। খঞ্জরের আঘাত হানে তার পিঠে। পিঠ থেকে খঞ্জরটি টেনে বের করে মারে আরেক ঘা। লুটিয়ে পড়ে মিসরী।

মিসরীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটি। দৌড়ে আসে মুবী। সাংকেতিক শব্দে ডাক পাড়ে মেয়েটিকে। মেয়েটি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরে মুবীকে। অন্য মেয়েরা কোথায়, জিজ্ঞেস করে মুবী। সঙ্গী মেয়েরা কোথায় কিভাবে আছে, জানায় মেয়েটি। সে রবিন এবং তার সাথীদের কথাও জানায়।

পিছন দিকে দৌড়ে যায় বালিয়ান। ডেকে তুলে নিজের ছয় সঙ্গীকে। তাদের কাছে আছে ধনুক ও অন্যান্য হাতিয়ার।

ইত্যবসরে মুসলিম রক্ষীদের একজন কমাণ্ডারকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসে এদিকে। তীর ছুঁড়ে বালিয়ানের এক সঙ্গী; খতম করে দেয় রক্ষীকে। মেয়েটি তাদের নিয়ে হাঁটা দেয় ছাউনির দিকে।

সর্বশেষ টিলাটির পিছনে আলো দেখতে পায় বালিয়ান। টিলার আড়ালে গিয়ে উঁকি দিয়ে তাকায় সে। বড় বড় দু'টি মশাল জ্বলছে। মশালের দণ্ডগুলো লম্বা হয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

বালিয়ান ও তার সঙ্গীরা যেস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, জায়গাটা অন্ধকার। কিন্তু যে স্থানে মশাল জ্বলছে, সেখানে একধারে পাঁচটি মেয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে

দেখতে পায় সে। রক্ষীরাও দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যখানে পড়ে আছে পাঁচটি লাশ। লাশগুলোর গায়ে তীরবিদ্ধ। মুবী ও অপর মেয়েটির কান্না এসে যায়। মুবীর উস্কানীতে এবার বালিয়ান রক্ষীদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার সঙ্গীদের বলে, এরা তোমাদের শিকার, তীর ছুঁড়ে বেটাদের শেষ করে দাও। সংখ্যায় এখন তারা চৌদ্দ। দুর্ভাগ্যবশত মশালের আলোতে তাদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে শিকারীরা।

ধনুকে তীর সংযোজন করে বালিয়ানের সঙ্গীরা। একই সময়ে শোঁ করে ছুটে আসে ছয়টি তীর। এক সঙ্গে শেষ হয়ে যায় ছয়জন রক্ষী। বাকীরা কোত্থেকে কী হলো বুঝে উঠতে না উঠতে ছুটে আসে আরো ছয়টি তীর। মাটিতে পড়ে যায় আরো ছয় রক্ষী। এখনো বেঁচে আছে দু'জন। অন্ধকারে গায়েব হয়ে যায় তাদের একজন। পালাবার চেষ্টা করে অপরজনও। কিন্তু একত্রে তিনটি তীর এসে বিদ্ধ হয় তার পিঠের তিন জায়গায়। শেষ হয়ে যায় সে-ও। রক্ষা পেয়ে গেছে তিন উষ্ট্রচালক। ঘটনার সময় এখানে ছিলো না তারা। পরে দূর থেকে টের পেয়ে তারা অন্ধকারে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলো।

মশালের আলোতে এখন দেখা যাচ্ছে লাশ আর লাশ। প্রতিটি লাশ শুয়ে আছে একটি করে তীর নিয়ে। দৌড়ে এসে মেয়েদের সঙ্গে মিলিত হয় মুবী। এ সময় একটি ঘোড়ার দ্রুত ধাবন শব্দ শুনতে পায় তারা। শঙ্কিত হয়ে ওঠে বালিয়ান। বলো, 'এখানে বিলম্ব করা ঠিক হবে না। বেটাদের একজন জীবন নিয়ে পালিয়ে গেছে। লোকটা কায়রোর দিকে গেলো বলে মনে হলো। চল, জল্‌দি কেটে পড়ি।'

রক্ষীদের ঘোড়াগুলো নিয়ে নিজেদের ছাউনিতে চলে যায় তারা। গিয়ে দেখে, যিনসহ তাদের একটি ঘোড়া উধাও। বুঝতে বাকী রইলো না, রক্ষী-ই নিয়ে গেছে ঘোড়াটি। নিজেদের ঘোড়ার নিকট যেতে না পেরে লোকটা চলে আসে এদিকে। এখানে বাঁধা ছিলো আটটি ঘোড়া। যিনগুলো খুলে রাখা ছিলো পাশে-ই এক জায়গায়। একটি ঘোড়ায় যিন কষে পালিয়ে গেছে রক্ষী।

চৌদ্দটি ঘোড়ায় যিন বাঁধায় বালিয়ান। মাল-পত্র বোঝাই করে দু'টি ঘোড়ায়। অবশিষ্ট ঘোড়াগুলো সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে যায় একদিকে।

সুলতান আইউবীর রক্ষীদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনা গোয়েন্দা মেয়েরা মুবীকে তাদের ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনায়। রক্ষীরা তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলো, তাও জানায় সে। রবিন ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে বলে, পরিকল্পনা অনুযায়ী

তারা মাঠ থেকে অস্ত্র কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিলো। কিন্তু বুঝতে পারলাম না, কিভাবে তারা মারা পড়লো।

মুবী বললো, আইউবীর ক্যাম্পে অকস্মাৎ আমার ও রবিনের সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছিলো। সে বলেছিলো, আমি দেখতে পাচ্ছি, যীশুখৃষ্ট আমাদের সফলতা মঞ্জুর করেছেন। অন্যথায় এভাবে তোমার-আমার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ঘটতো না। আজ আমার-তোমাদের সাক্ষাৎ তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই ঘটে গেলো ঠিক; কিন্তু যীশুখৃষ্ট আমাদের কামিয়াবী মঞ্জুর করেছেন, সে কথা আমি বলবো না। আমার কাছে বরং যীশুকে আমাদের প্রতি রুষ্ট বলে-ই মনে হয়। যে কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেলো, রোম উপসাগরে আমাদের বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করলো। মিসরে আমাদের সহযোগী শক্তি সুদানীদের নির্মম পরাজয় হলো। এদিকে রবিন ও ক্রিস্টোফরের ন্যায় নির্ভরযোগ্য সাহসী ব্যক্তিদ্বয় এবং এতগুলো সঙ্গী মারা পড়লো! জানি না, আমাদের কপালে কী আছে!

বালিয়ান বললো, 'চিন্তা করো না, আমাদের জীবন থাকতে তোমাদের প্রতি কেউ হাত বাড়াতে পারবে না। আমার সঙ্গীদের কৃতিত্ব দেখলে-ই তো।'

কয়েদীদের এ কাফেলা টিলায় যখন লাশের পার্শ্বে দণ্ডায়মান, ঠিক তখন সমুদ্রোপকূলে সুলতান আইউবীর ক্যাম্পে প্রবেশ করে তিনজন আগন্তুক। তাদের পরনে ইতালীয় বেদুঈনদের সাদাসিধে পোশাক। কথা বলতে শুরু করে ইতালী ভাষায়। কিন্তু তাদের ভাষা বুঝছে না ক্যাম্পের কেউ।

আগন্তুকদের পাঠিয়ে দেয়া হয় বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের নিকট। সুলতান আইউবীর অবর্তমানে তিনি এখন ক্যাম্পের কমাণ্ডার। আগন্তুকদের পরিচয় জানতে চান শাদ্দাদ। তারা ইতালী ভাষায় জবাব দেয়। তিনিও তাদের ভাষা বুঝছেন না।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ ইতালীয় এক যুদ্ধবন্দীকে ডেকে আনেন কয়েদখানা থেকে। মিসরী ভাষাও তার জানা। তিনি তার মাধ্যমে আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনজনের একজন মধ্য বয়সী। দু'জন যুবক। তারা হুবহু একই কথা শোনায়। বলে, খৃষ্টানরা আমাদের তিনজনের তিনটি সুন্দরী বোনকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিলো। শুনেছি, ওরা নাকি খৃষ্টানদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আপনাদের ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছে। আমরা বোনদের খুঁজে বের করতে এসেছি।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ জানান, এখানে সাতটি মেয়ে এসেছিলো। তারাও আমাদেরকে একই কাহিনী শুনিয়েছিলো। ছয়জন আমাদের হাতে বন্দী আছে; সপ্তমজন পালিয়ে গেছে। আমাদের জানা মতে ওরা গুপ্তচর। আগন্তুকরা জানায়, গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে আমাদের বোনদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা নির্যাতিত গরীব মানুষ। একজন থেকে একটি নৌকা চেয়ে নিয়ে বোনদের সন্ধানে এতদূর এসেছি। আমাদের মত গরীবদের বোনেরা গুপ্তচর বৃত্তির সাহস করবে কিভাবে। আপনি যে সাত মেয়ের কথা বললেন, ওরা তাহলে আমাদের বোন হবে না। জানিনা ওরা কারা।

'আমাদের নিকট আর কোন মেয়ে নেই। এই সাতজন-ই ছিলো, তাদেরও একজন লা-পাত্তা হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ছয়জনকে গত পরশু কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ওদের মধ্যে তোমাদের বোনরা আছে কিনা, দেখতে চাইলে কায়রো চলে যাও। আমাদের সুলতান হৃদয়বান মানুষ, বললে তিনি মেয়েদেরকে দেখাতে পারেন।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'না, আমাদের বোনরা গুপ্তচর নয়। ঐ সাতজন অন্য মেয়ে হবে। তারা হয়তো সমুদ্রে ডুবে মরেছে কিংবা খৃষ্টান সৈনিকরা তাদের কাছে আটকে রেখেছে।' বললো আগন্তুকদের একজন।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ একজন সরল-সহজ দয়ালু মানুষ। তিনি আগন্তুক বেদুঈনদের সাজানো কাহিনীতে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাদের বেশ খাতিরদারী করেন এবং স্বসম্মানে বিদায় করে দেন। আলী বিন সুফিয়ান হলে তাদেরকে এত সহজে ছেড়ে দিতেন না। চেহারা দেখেই তিনি বুঝে ফেলতেন, লোকগুলো গুপ্তচর, যা বলছে সব মিথ্যে।

বিদায় নিয়ে চলে যায় তিনজন। কোথায় গেলো তা দেখারও চেষ্টা করলো না কেউ। ক্যাম্প থেকে বের হয়ে সোজা হাঁটা দেয় একদিকে। একটানা চলতে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারা ক্যাম্প থেকে বেশ দূরে নিরাপদ এক পাহাড়ী অঞ্চলে ঢুকে পড়ে।

সেখানে বসে তাদের অপেক্ষা করছিলো তাদের-ই আঠারজন লোক। এ তিনজনের মধ্য বয়সী লোকটির নাম মিগনানা মারিউস। গ্রেফতার হওয়া মেয়েদের মুক্ত করা এবং সম্ভব হলে সুলতান আইউবীকে হত্যা করার জন্য যে কমাণ্ডো পাঠানো হয়েছে, মিগনানা মারিউস সে বাহিনীর কমাণ্ডার।

এরা তিনজন সুলতান আইউবীর ক্যাম্প সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্যও সংগ্রহ করে নিয়েছিলো। তারা জেনে যায়, সুলতান আইউবী এখন এখানে নেই, আছেন

কায়রোতে। শাদ্দাদের সঙ্গে কথা বলে তারা জানতে পারে, গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার করা মেয়েগুলোকে কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পাঁচজন পুরুষ বন্দীও আছে তাদের সঙ্গে।

বড় একটি নৌকায় করে এসেছে এ ঘাতক দলটি। সমুদ্রের পাড়ে এক স্থানে সরু একটি খাল। সেই খালে ঢুকিয়ে বেঁধে রেখে এসেছে তারা নৌকাটি। এখন তাদের কায়রো অভিমুখে রওনা হতে হবে। কিন্তু বাহন নেই।

যে তিনজন লোক ক্যাম্পে গিয়েছিলো, তারা ক্যাম্পের আস্তাবল ও উট বাঁধার স্থানটা দেখে এসেছে। তারা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছে, ক্যাম্প থেকে পশু চুরি করে আনা সহজ নয়। প্রয়োজন তাদের একুশটি ঘোড়া বা উট। ক্যাম্প থেকে এতগুলো পশু চুরি করে আনা অসম্ভব।

ভোরের আকাশে নতুন দিনের সূর্য উদিত হতে এখনো বেশ বাকি। পায়ে হেঁটে-ই রওনা হয় কাফেলা। বাহন পেয়ে গেলে তারা মেয়েদেরকে পথে-ই গিয়ে ধরার চেষ্টা করতো। কিন্তু কায়রো না গিয়ে উপায় নেই তাদের। তারা জানে, তাদের এ মিশনের সফলতা জীবন নিয়ে খেলা করার শামিল। কিন্তু সফল হতে পারলে খৃষ্টান সেনানায়ক ও সম্রাটগণ যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার পরিমাণও এত বেশী যে, অবশিষ্ট জীবন তাদের আর কাজ করে খেতে হবে না। গোষ্ঠীসুদ্ধ বেশ আরামে বসে বসে তারা খেয়ে যেতে পারবে। এ লোভ সামলানোও তো কষ্টকর। তাই তাদের এত ঝুঁকিপূর্ণ মিশনে অবতরণ।

মিগনানা মারিউসকে বের করে আনা হয়েছিলো কারাগার থেকে। দস্যুবৃত্তির অপরাধে ত্রিশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিলো তাকে। তার সঙ্গে ছিলো আরো দু'জন কয়েদী, যাদের একজনের সাজা ছিলো চব্বিশ বছর, একজনের সাতাশ বছর। সে যুগের কারাগার মানে কসাইখানা। আসামী-কয়েদীদেরকে মানুষ মনে করা হতো না। কয়েদীদের রাতের বেলাও এতটুকু আরাম করার সুযোগ ছিলো না। তাদের নির্মমভাবে খাটান হতো। পশুর মতো অখাদ্য খাবার দেয়া হতো। তেমন কারাভোগ অপেক্ষা মৃত্যু-ই ছিলো শ্রেয়।

এ তিন কয়েদীকে মহামূল্যবান পুরস্কার ছাড়া সাজা-মওকুফের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে খৃষ্টানরা। তাদের ক্রুশ হাতে শপথ করিয়ে এ মিশনে নামান হয়েছে। যে পাদ্রী তাদের শপথ নিয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তারা যত মুসলমানকে হত্যা করবে, তার দশগুণ পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করতে পারলে মাফ হয়ে যাবে জীবনের সমস্ত গুনাহ আর পরজগতে যীশুখৃষ্ট তাদের দান করবেন চিরশান্তির আবাস জান্নাত।

প্রতিজ্ঞা তাদের দৃঢ়। মনোবলও বেশ অটুট। ভাব তাদের, কাজের কাজ করে-ই তবে মিসর ত্যাগ করবে কিংবা ক্রুশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেবে।

অবশিষ্ট আঠার ব্যক্তিও খৃষ্টান বাহিনীর বাছাবাছা সৈনিক। তারা জ্বলন্ত জাহাজ থেকে জীবন রক্ষা করে এসেছে। তারা রোম উপসাগরে এই অপমানজনক পরাজয় বরণের প্রতিশোধ নিতে চায়। পুরস্কারের লোভ তো আছে-ই। প্রতিশোধ স্পৃহা আর পুরস্কারের লোভে-ই অদেখা এক গন্তব্যপানে তাদের এই পদব্রজে রওনা হওয়া।

❖❖❖

বেলা দ্বি-প্রহর। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হেডকোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়ায় এক ঘোড়সওয়ার। পা বেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে ঘোড়ার গায়ের ঘাম। ভীষণ ক্লান্ত। কথা ফুটছে না আরোহীর মুখ থেকে। লোকটি ঘোড়ার পিঠ থেকে অবতরণ করলে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে ওঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঘোড়াটি। কোন দানা-পানি-বিশ্রাম ছাড়াই গোটা রাত এবং আধা দিন একটানা ঘোড়া ছুটায় আরোহী। আরোহীকে ধরে নিয়ে একস্থানে বসায় সুলতান আইউবীর রক্ষীরা। সামান্য পানি পান করতে দেয় তাকে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর এবার বাক্‌শক্তি ফিরে পায় আরোহী। ভগ্নস্বরে বলে, একজন কমাণ্ডার বা সালারের সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে। সংবাদ পেয়ে বেরিয়ে আসেন সুলতান আইউবী নিজেই। সুলতানকে দেখে উঠে দাঁড়ায় আরোহী। সালাম করে বলে— 'দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি আমি মহামান্য সুলতান!' সুলতান তাকে কক্ষের ভিতরে নিয়ে যান এবং বলেন— 'জল্‌দি বলো, কী সংবাদ তোমার।'

'বন্দী মেয়েরা পালিয়ে গেছে। আমাদের প্লাটুনের সব ক'জন রক্ষী মারা গেছে। পুরুষ কয়েদীদের আমরা হত্যা করেছি। বেঁচে এসেছি আমি একা। আক্রমণকারীরা কারা ছিলো, আমি তা জানি না। আমরা ছিলাম মশালের আলোতে আর তারা ছিলো অন্ধকারে। অন্ধকারের দিক থেকে তীর ছুটে আসে এবং সেই তীরের আঘাতে মারা যায় আমার সব ক'জন সঙ্গী।' বলল আরোহী।

এ লোকটি কয়েদীদের রক্ষী প্লাটুনের সেই ব্যক্তি, যে আক্রমণের পর অন্ধকারে উধাও হয়ে গিয়েছিলো এবং সুদানীদের ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছিলো। কাফেলা ত্যাগ করে ঘোড়ার পিঠে বসে লোকটি দ্রুত ছুটে চলে এবং পথে কোথাও মুহূর্তের জন্য না থেমে এত দীর্ঘ পথ অর্ধেকেরও কম সময়ে অতিক্রম করে চলে আসে।

আলী বিন সুফিয়ান এবং ফৌজের একজন সালারকে ডেকে পাঠান সুলতান আইউবী। তারা এসে পৌঁছুলে সুলতান আরোহীকে বললেন, এবার ঘটনাটা বিস্তারিত বলো। লোকটি ক্যাম্প থেকে রওনা হওয়ার সময় থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনায়। কমাণ্ডার সম্পর্কে বলে, কিছু পথ অতিক্রম করার পর থেকে তিনি একটি কয়েদী মেয়ে নিয়ে মনোরঞ্জনে মেতে ওঠেন এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে সোজা পথ ত্যাগ করে তিনি এমন পথ ধরে চলতে শুরু করেন, যে পথে কায়রো পৌঁছুতে আমাদের অনেক বেশী সময় ব্যয় হতো। আপত্তি জানালে তিনি ক্ষেপে ওঠেন এবং এ ব্যাপারে কাউকে নাক গলাতে বারণ করে দেন। এভাবে একের পর এক পুরো ঘটনা আনুপুংখ বিবৃত করে আরোহী। কিন্তু একথা জানাতে সে ব্যর্থ হলো যে, হামলাটা কারা করলো।

আলী বিন সুফিয়ান ও নায়েবে সালারকে উদ্দেশ করে সুলতান বললেন— 'তার মানে মিসরে এখনো খৃষ্টান কমাণ্ডো রয়ে গেছে।'

'হতে পারে, তারা মরুদস্যু। এমন রূপসী ছয়টি মেয়ে দস্যুদের জন্য বেশ লোভনীয় শিকার।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'তুমি লোকটির কথা খেয়াল করে শোননি। ও বললো, পুরুষ কয়েদীরা ময়দান থেকে অস্ত্র কুড়িয়ে এনে রক্ষীদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো। টের পেয়ে দু'জন রক্ষী তীরের আঘাতে তাদেরকে হত্যা করে ফেলে। হামলাটা হয় তার পরে। এতেই বুঝা যায়, খৃষ্টান গেরিলারা পূর্ব থেকেই কাফেলাকে অনুসরণ করছিলো।'

'মুহতারাম সুলতান! হামলাকারীরা যারা-ই হোক, এক্ষুনি আমাদের যে কাজটি করা দরকার, তাহলে পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্য এ সৈনিককে সঙ্গে দিয়ে অন্তত বিশজন দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার তাদেরকে ধাওয়া করার জন্য প্রেরণ করা। তারা কারা, সে প্রশ্নের জবাব পরে খুঁজে বের করা যাবে।' বললেন নায়েবে সালার।

'আমি আমার এক নায়েবকেও সঙ্গে দেবো।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'এ সৈনিককে আহার করাও। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে দাও। এ সুযোগে বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলো। প্রয়োজন মনে করলে আরো বেশী সৈনিক দাও।' বললেন সুলতান আইউবী।

'যেখান থেকে আমি ঘোড়া নিয়ে এসেছি, সেখানে আরো আটটি ঘোড়া বাঁধা ছিলো। সেখানে কোন মানুষ দেখিনি। এ ঘোড়াগুলোর আরোহীরা-ই

আক্রমণকারী হবে বোধ হয়। ঘোড়া যদি আটটি-ই হয়ে থাকে, তাহলে তারাও হবে আটজন।' বললো আরোহী।

'গেরিলাদের সংখ্যা বেশী হবে না। আমরা তাদের ধরে ফেলবো ইনশাআল্লাহ।' বললেন নায়েবে সালার।

'মনে রাখবে, ওরা গেরিলা, আর মেয়েগুলো গুপ্তচর। তোমরা যদি একটি গুপ্তচর কিংবা একজন গেরিলাকে ধরতে পারো, তাহলে বুঝবে, তোমরা শত্রুর দু'শ' সৈনিককে গ্রেফতার করে ফেলেছো। একজন গুপ্তচর খতম করার জন্য আমি দু'শ' শত্রুসেনাকে ছেড়ে দিতে পারি। একজন সাধারণ নারী কারুর তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু একটি গুপ্তচর কিংবা সন্ত্রাসী মেয়ে একাই একটি দেশের সমগ্র সেনাবহর সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে সক্ষম। এই মেয়েগুলো বড় ভয়ঙ্কর। এরা যদি মিসরের অভ্যন্তরেই থেকে যায়, তাহলে তোমরা পুরো বাহিনী-ই ব্যর্থ হয়ে পড়বে। একটি পুরুষ কিংবা মেয়ে গুপ্তচরকে গ্রেফতার কিংবা খুন করার জন্য প্রয়োজনে নিজেদের একশত সৈনিককে উৎসর্গ করে দাও। তারপরও আমি বলবো, এ সওদা অনেক সস্তা। গেরিলাদের ধরতে না পারলেও তেমন চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু যে কোন মূল্যে মেয়েগুলোকে ধরতে-ই হবে। যদি প্রয়োজন হয়, তীর ছুঁড়ে ওদের হত্যা করে ফেলো; তবু জীবিত পালাতে যেন না পারে।' বললেন সুলতান আইউবী।

এক ঘন্টার মধ্যে বিশজন দ্রুতগামী আরোহী প্রস্তুত করে রওনা করা হয়। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এই রক্ষী। আলী বিন সুফিয়ানের এক নায়েব যাহেদীন হলেন বাহিনীর কমাণ্ডার।

আলী বিন সুফিয়ান ফখরুল মিসরীকে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন এ বাহিনীতে। ফখরুল মিসরীর একান্ত কামনা ছিলো, যেন তাকে বালিয়ান ও মুবীকে গ্রেফতার করার জন্য প্রেরণ করা হয়। এখন এ বাহিনী যাদেরকে ধাওয়া করতে যাচ্ছে, তারা-ই যে বালিয়ান আর মুবী, সে তথ্য না জানে ফখরুল মিসরী, না জানেন আলী বিন সুফিয়ান।

এদিক থেকে রওনা হলো বিশজন আরোহী। একুশতম ব্যক্তি তাদের কমাণ্ডার। টার্গেট তাদের কয়েকটি মেয়ে এবং যারা তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। আবার অপর দিক থেকেও এগিয়ে আসছে খৃষ্টানদের বিশজন কমাণ্ডো, একুশতম ব্যক্তি তাদের কমাণ্ডার। তাদেরও লক্ষ্য সেই মেয়েরা। কিন্তু তাদের দুর্বলতা হলো, তাদের বাহন নেই। পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে তারা। মজার

ব্যাপার হলো, দু' পক্ষের কারুর-ই জানা নেই, যাদের উদ্দেশ্যে এ অভিযান, তারা কোথায়।

খৃষ্টানদের কমাণ্ডো দলটি পরদিন সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত অনেক পথ অতিক্রম করে ফেলে। এখন তারা যে স্থানে অবস্থান করছে, সেখানকার কোথাও চড়াই কোথাও উৎরাই। উঁচু-নীচু এলাকা। চড়াই বেয়ে উপরে আরোহণের পর তারা দূরবর্তী একটি ময়দানে কতগুলো উট দেখতে পায়। অসংখ্য খেজুর গাছসহ অন্যান্য গাছও আছে সেখানে। তারা দেখতে পায়, উটগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে পিঠ থেকে মাল নামানো হচ্ছে। বার-চৌদ্দটি ঘোড়াও আছে সেখানে। সেগুলোর আরোহীদেরকে সৈনিক বলে মনে হলো। আর যারা আছে, সবাই উষ্ট্রচালক। দেখে থেমে যায় এই একুশ কমাণ্ডোর কাফেলা। তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। এ মুহূর্তে যা একান্ত প্রয়োজন, তা-ই পেয়ে গেছি এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে সকলের চোখে-মুখে। কাফেলাকে থামিয়ে কমাণ্ডার বললো— 'সত্যমনে ক্রুশের উপর হাত রেখে আমরা শপথ করে এসেছিলাম। ঐ দেখ, ক্রুশের কারিশ্‌মা। জাজ্জ্বলমান অলৌকিক ব্যাপার। আকাশ থেকে খোদা তোমাদের জন্য সওয়ারী পাঠিয়েছেন। তোমাদের কারো মনে কোন পাপবোধ, কর্তব্যে অবহেলা কিংবা জান বাঁচিয়ে পালাবার ইচ্ছা থাকলে এ মুহূর্তে তা ঝেড়ে ফেলে দাও। খোদার পুত্র– যিনি মজলুমের বন্ধু, জালিমের দুশমন– আকাশ থেকে তোমাদের সাহায্যে নেমে এসেছেন।'

ক্লান্তির ছাপ উবে যায় সকলের চেহারা থেকে। মুহূর্ত মধ্যে ঝরঝরে হয়ে উঠে অবসন্ন দেহগুলো। আনন্দের দ্যুতি খেলে উঠে সকলের চোখে-মুখে। কিন্তু সশস্ত্র সৈনিকদের মোকাবেলা করে এতগুলো উট-ঘোড়ার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় বাহন ছিনিয়ে আনার প্রক্রিয়া কী হবে, তারা এখনো ভেবে দেখেনি।

প্রায় একশত উটের বিশাল এক বহর। যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ নিয়ে যাচ্ছে বহরটি। দেশের অভ্যন্তরে বর্তমানে শত্রুর আশঙ্কা নেই ভেবে কাফেলার নিরাপত্তার তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সঙ্গে দেয়া হয়েছে মাত্র দশজন সশস্ত্র অশ্বারোহী। উষ্ট্রচালকরা সকলে নিরস্ত্র। রাত যাপনের জন্য এখানে অবতরণ করে ছাউনি ফেলেছে তারা।

খৃষ্টান বাহিনীর কমাণ্ডার তার কমাণ্ডোদেরকে একটি নিম্ন এলাকায় বসিয়ে রাখে। কমাণ্ডার কাফেলায় ক'টি উট, ক'টি ঘোড়া, ক'জন সশস্ত্র মানুষ এবং

আক্রমণ করলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে, তার তথ্য নেয়ার জন্য দু' ব্যক্তিকে প্রেরণ করে। তারপর তারা রাতে আক্রমণ পরিচালনার স্কীম প্রস্তুত করতে বসে যায়। তাদের না আছে অস্ত্রের অভাব, না আছে আগ্রহ-স্পৃহার কমতি। যে কেউ নিজের জীবন নিয়ে খেলতে প্রস্তুত।

তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়া লোক দু'টো ফিরে আসে মধ্য রাতের অনেক আগেই। এসে তারা জানায়, কাফেলায় সশস্ত্র আরোহী আছে দশজন। তারা এক স্থানে একত্রে ঘুমিয়ে আছে। ঘোড়াগুলো বাঁধা আছে অন্যত্র। উষ্ট্রচালকরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে শুয়ে আছে নানা জায়গায়। মাল-পত্র বেশীর ভাগ বস্তায় ভরা। উষ্ট্রচালকদের নিকট কোন অস্ত্র নেই। আক্রমণ করে সফল হওয়া তেমন কঠিন হবে না।

কাফেলার লোকেরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসে খৃষ্টান কমাণ্ডো। চলে আসে একেবারে নিকটে। আগে আক্রমণ হয় ঘুমন্ত সৈনিকদের উপর। টের পেয়ে চোখ খুলতে না খুলতে পলকের মধ্যে অনেকগুলো তরবারী ও খঞ্জরের উপর্যুপরী আঘাতে লাশ হয়ে যায় সব ক'জন।

খৃষ্টান গেরিলারা তাদের এ অভিযান এত নীরবে সম্পন্ন করে ফেলে যে, অন্যত্র ঘুমিয়ে থাকা উষ্ট্রচালকরা টেরই পেলো না। চোখও খুললো না একজনেরও। যাদের চোখ খুললো, কী হচ্ছে বুঝে উঠতে পারলো না তারা। যার মুখে শব্দ বের হলো, তার সে শব্দ-ই জীবনের শেষ উচ্চারণ বলে প্রমাণিত হলো।

এবার উষ্ট্রচালকদের সন্ত্রস্ত করার জন্য চীৎকার জুড়ে দেয় কমাণ্ডোরা। তারা জেগে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ধড়মড় করে উঠে বসে বিহ্বল নেত্রে এদিক-ওদিকে তাকাতে শুরু করে। চেচামেচি করে ওঠে উটগুলো। এবার উষ্ট্রচালকদের কচুকাটা করতে শুরু করে খৃষ্টান কমাণ্ডোরা। পালিয়ে যায় অল্প ক'জন। বাকীরা নির্মম গণহত্যার শিকার হয় খৃষ্টান কমাণ্ডোদের হাতে। খৃষ্টান কমাণ্ডার চীৎকার করে বলে— 'এগুলো মুসলমানদের রসদ, ধ্বংস করে দাও সব। উটগুলোকেও মেরে ফেলো।' সঙ্গে সঙ্গে তরবারীর আঘাত শুরু হয়ে যায় উটগুলোর পিঠে। পশুগুলোর করুণ চীৎকারে ভারী হয়ে উঠে নিঝুম রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশ। ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় কমাণ্ডার। গুণে দেখে বারটি। দশটি আরোহণের যোগ্য হলেও অবশিষ্ট দু'টি কাজের নয়। নয়টি উট আগেই সরিয়ে রেখেছিলো সে।

রাত শেষে ভোর হলো। পূর্ব আকাশে সূর্য উদিত হলো। এক বীভৎস ভয়ানক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো ছাউনি। অসংখ্য লাশ ছড়িয়ে আছে এদিক-সেদিক। মারা গেছে অনেক উট। কোনটি এখনো ছট্‌ফট্‌ করছে। এদিক-সেদিক পালিয়ে গেছে কিছু। সবদিকে রক্ত আর রক্ত, যেন রাতে রক্তের বৃষ্টি হয়েছিলো এ স্থানটিতে। খুলে ছিড়ে ছড়িয়ে পড়েছে রসদের বস্তাগুলো। তছনছ হয়ে গেছে সব খাদ্যদ্রব্য। রক্তের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে সব। একজন জীবিত মানুষও নেই এখানে। বারটি ঘোড়াও উধাও। যে উদ্দেশ্যে খৃষ্টানদের এ অভিযান, এক প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে সে উদ্দেশ্য সাধন করে কেটে পড়েছে তারা। এবার তীব্রগতিতে শিকারের সন্ধানে এগিয়ে যেতে পারবে খৃষ্টান কমাণ্ডোরা।

মুবীর রূপ-যৌবন আর মদ-মাদকতায় বালিয়ানের মন-মেজাজ এমনিতেই বিগড়ে আছে। মুবী আর মদ, মদ আর মুবী এ-ই তার একমাত্র ভাবনা। তদুপরি এখন তার হাতে এসেছে আরো সাতটি পরমাসুন্দরী যুবতী। মুবীর চেয়ে এরাও কোন অংশে কম নয়। বিপদাপদের কথা ভুলে-ই গেছে সে। মুবী তাকে বারবার বলছে, এতো বেশী থেমে থাকা ঠিক হচ্ছে না। যতো দ্রুত সম্ভব আমাদের সমুদ্রের নিকট পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন। শত্রুরা আমাদের ধাওয়া করবে না, তার নিশ্চয়তা কী?

কিন্তু বালিয়ান রাজার ন্যায় অট্টহাসির তোড়ে ভাসিয়ে দেয় মুবীর সতর্কবাণী। মুবী যে রাতে বালিয়ানকে দিয়ে মেয়েদের উদ্ধার করিয়েছিলো, তার পরের রাতে এক স্থানে ছাউনি ফেলেছিলো বালিয়ান। সে রাতে সে মুবীকে বলেছিলো, আমরা সাতজন পুরুষ আর তোমরা সাতটি মেয়ে। আমার এ ছয়টি বন্ধু বড় বিশ্বস্ততার সাথে আমার সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে। তাদের উপস্থিতিতে তাদের চোখের সামনে আমি তোমার সঙ্গে রং-তামাশা করছি। তারপরও তারা কিছু বলছে না। এবার আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করতে চাই। অপর ছয়টি মেয়ের এক একজনকে আমার এক এক বন্ধুর হাতে তুলে দাও আর তাদের বলো, এ তোমাদের ত্যাগের উপহার।

'এ হতে পারে না। আমরা বেশ্যা মেয়ে নই। আমি বাধ্য ছিলাম বলেই তোমার খেলনা হয়ে আছি। কিন্তু এ মেয়েগুলো তোমার কেনা দাসী নয় যে, ইচ্ছে হলো আর তাদেরকে বন্ধুদের মাঝে বণ্টন করে দেবে।' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো মুবী।

'আমি তোমাদেরকে কখনো সম্ভ্রান্ত মনে করি না। তোমরা প্রত্যেকে আমাদের জন্য নিজ দেহের উপহার নিয়েই এসেছো। এই মেয়েরা না জানি কত পুরুষকে

সঙ্গ দিয়ে এসেছে। তাদের একজনও মরিয়ম নয়।' আবেশমাখা রাজকীয় ভঙ্গিতে বললো বালিয়ান।

আমরা কর্তব্য পালনের স্বার্থে-ই আমাদের দেহকে পুরুষের সামনে উপহার হিসেবে পেশ করে থাকি। আমোদ করার জন্য পুরুষের নিকট যাই না। আমাদের দেশ ও ধর্ম আমাদের উপর একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সে কর্তব্য পালনের নিমিত্ত আমরা আপন দেহ, রূপ ও সম্ভ্রমকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। এ যাত্রা আমাদের অর্পিত কর্তব্য পূরণ হয়ে গেছে। এখন তুমি যা করছো ও বলছো, সব-ই নিছক বিলাসিতা, ধর্মহীন কাজ, যা আমাদের কাম্য নয়, কর্তব্যও নয়। আমরা বিশ্বাস করি, যেদিন আমরা বিলাসিতায় মেতে উঠবো, সেদিন থেকে-ই ক্রুশের পতন শুরু হবে। প্রশিক্ষণে আমাদের বলা হয়েছে, একজন মুসলিম কর্ণধারকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনে দশজন মুসলমানের সঙ্গে রাত-যাপন করাও বৈধ এবং পুণ্যের কাজ। মুসলমানদের একজন ধর্মগুরুকে নিজের দেহের পরশে অপবিত্র করাকে আমরা মহা পুণ্যকর্ম মনে করি।' বললো মুবী।

'তার মানে তুমি আমাকে ক্রুশের অস্তিত্বের স্বার্থে ব্যবহার করছো! তুমি কি আমাকে ক্রুশের মুহাফিজ বানাবার চেষ্টা করছো?' বললো বালিয়ান। ধীরে ধীরে জাগ্রত হতে শুরু করে বালিয়ানের অনুভূতি।

'কেন, এখনো কি তোমার সন্দেহ আছে? একজন ক্রুসেডারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে কী উদ্দেশ্যে?' বললো মুবী।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসন থেকে মুক্তি অর্জন করার জন্য— ক্রুশের হেফাজতের জন্য নয়। আমি মুসলমান; কিন্তু তার আগে আমি সুদানী।' বললো বালিয়ান।

'আমি সর্বাগ্রে ক্রুশের অনুসারী— খৃষ্টান। তারপর আমি আমার দেশের একটি সন্তান।' এই বলে মুবী বালিয়ানের ডান হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে আবার বলে, ইসলাম কোন ধর্ম-ই নয়। সে কারণে তুমি দেশকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দিচ্ছো। এটা তোমার নয়— তোমার ধর্মের দুর্বলতা। আমার সঙ্গে তুমি সমুদ্রের ওপারে চলো; আমার ধর্ম কী জিনিস, তোমাকে দেখাবো। তখন নিজ ধর্মের কথা তুমি ভুলে-ই যাবে।'

'যে ধর্ম তার অনুসারী মেয়েদের পর-পুরুষের সঙ্গে রাতযাপন, নিজে মদপান করা এবং অন্যকে মদপান করানোকে পুণ্যের কাজ মনে করে, সে ধর্মকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি, হাজারবার অভিসম্পাত করি আমি সেই ধর্মকে।'

অকস্মাৎ জেগে উঠে বালিয়ান। তারপর বলে— 'আমার কাছে তুমি তোমার সম্ভ্রম বিলীন করোনি, বরং তুমি-ই আমার ইজ্জত লুট করে নিয়ে গেছো। আমি তোমাকে নই, বরং তুমি-ই আমাকে খেলনা বানিয়ে রেখেছো।'

'একজন মুসলমানের ঈমান ক্রয় করার জন্য সম্ভ্রম তেমন বেশী মূল্য নয়। আমি তোমার সম্ভ্রম লুটিনি, লুট করেছি তোমার ঈমান। তবে এখন আমি তোমাকে ভবঘুরে অবস্থায় পথে ফেলে যাবো না। আমি তোমাকে নতুন এক আলোর জগতে নিয়ে যাচ্ছি, তোমাকে হীরা-মাণিক্যের ন্যায় চকমকে উজ্জ্বল এক জীবন দান করবো আমি।' বললো মুবী।

'আমি তোমার সেই আলোর জগতে যেতে চাই না।' বললো বালিয়ান।

'দেখ বালিয়ান! একজন লড়াকু পুরুষ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ না করে পারে না। তুমি আমার সওদা বরণ করে নিয়েছো। তোমার ঈমানটা ক্রয় করে সেটি আমি মদের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি; তোমার চাহিদা অনুপাতে আমি তোমাকে মূল্য দিয়েছি। এতটা দিন তোমার দাসী, তোমার স্ত্রী হয়ে রইলাম। তুমি এ সওদা থেকে ফিরে যেও না; একটি অবলা নারীকে ধোঁকা দিওনা।' বললো মুবী।

'সমুদ্রের ওপারে নিয়ে তুমি আমাকে যে আলো দেখাবার কথা বলছো, সে আলো আমাকে এখানেই তুমি দেখিয়ে দিয়েছো। আমার ভবিষ্যত, আমার শেষ পরিণতি এখন-ই তোমার হীরে-মাণিক্যের মতো চমকাতে শুরু করেছে।' বললো বালিয়ান।

কিছু বলার জন্য মুখ খুলছিলো মুবী। কিন্তু বালিয়ান গর্জে উঠে বললো, খামুশ মেয়ে! একটি কথাও আর তোমার শুনতে চাই না আমি। আমি মিসরের গভর্নর সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন হতে পারি; কিন্তু আমি সেই মহান রাসূলের শত্রু নই, যার আদর্শ রক্ষার জন্য সালাহুদ্দীন আইউবী তোমাদের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন। সেই রাসূলের নামে আমি মিসর-সুদানকে উৎসর্গ করতে পারি। আমি সেই মহান ও পবিত্র আদর্শের বদৌলতে সালাহুদ্দীন আইউবীর সামনে অস্ত্রসমর্পণও করতে পারি।'

'তোমাকে আমি কতোবার বলেছি, মদ কম পান করো। একদিকে অপরিমিত মদ, অপরদিকে সারাটা রাত জেগে আমার দেহটা নিয়ে খেলা করা; তোমার মাথাটা-ই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। তুমি একথাটাও ভুলে গেছো যে, আমি তোমার স্ত্রী।' বললো মুবী।

'আমি কোন বেশ্যা খৃষ্টানের স্বামী হতে চাই না।' বললো বালিয়ান। বালিয়ানের নজর পড়ে মদের বোতলের উপর। অমনি বোতলটি হাতে নিয়ে

ছুঁড়ে মারে দূরে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। বন্ধুদের ডাক দেয়। ডাক শুনে দৌড়ে আসে সকলে। সে বলে, এই মেয়েগুলো, বিশেষ করে এ মেয়েটি এখন থেকে তোমাদের কয়েদী। এদের নিয়ে কায়রো ফিরে চলো। প্রস্তুত হও, জল্‌দি করো।

'কায়রো! আপনি কায়রো যেতে চাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আমি কায়রো-ই যেতে চাচ্ছি। অবাক্‌ হওয়ার কিছু নেই। এই বালুকাময় মরু প্রান্তরে ভবঘুরের ন্যায় আর কতকাল ঘুরে বেড়াবো? যাবো কোথায়? চলো, ঘোড়ায় যিন বাঁধো। এক একটি মেয়েকে এক একটি ঘোড়ায় বসিয়ে বেঁধে নিয়ে চলো।'

❖ ❖ ❖

মরুভূমিতে ঘোড়া চলবার সময় তেমন শব্দ হয় না। উট চলে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে। চোখে না দেখলে মরুভূমিতে উটের আগমন টের পাওয়া যায় না। বালিয়ান যখন মুবীর সঙ্গে কথা বলছিলো, তখন একটি উট ছোট্ট একটি বালির ঢিবির আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের গতিবিধি অবলোকন করছিলো। কিন্তু তা টের-ই পাইনি বালিয়ান। লোকটি খৃষ্টান কমাণ্ডো দলের একজন সদস্য। দলের কমাণ্ডার অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। বালিয়ানের তাঁবুর প্রায় আধা মাইল দূরে ছাউনি ফেলেছে সে। শিকার যে এতো কাছে, মাত্র আধা মাইল দূরে, তা বুঝতে-ই পারেনি কমাণ্ডার। বুদ্ধি করে সে আশপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিন কমাণ্ডোকে দায়িত্ব দেয়, উটে চড়ে তারা আশপাশে ঘুরে-ফিরে দেখে আসবে এবং আশঙ্কার কিছু চোখে পড়লে কমাণ্ডারকে অবহিত করবে। উট ছিলো এ কাজের উপযুক্ত বাহন।

তিন আরোহী চলে যায় তিন দিকে। এখানকার সমগ্র এলাকাটিই এমন যে, গোটা এলাকা যে কোন কাফেলার অবস্থানের জন্য বেশ উপযোগী। তাই এখানে এসে-ই কমাণ্ডার ভাবলো, অন্য কোন কাফেলা এখানে ছাউনি ফেলে থাকতে পারে।

এক স্থানে আলোর মত কিছু একটা চোখে পড়ে এক আরোহীর। সেদিকে এগিয়ে চলে সে। বস্তুটি একটি মশাল; জ্বলছে বালিয়ানের অস্থায়ী তাঁবুতে। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে একটি টিলার পিছনে দাঁড়িয়ে যায়। টিলাটি উচ্চতায় এতটুকু যে, উটের উপর বসে টিলার উপর দিয়ে সম্মুখে দেখা সম্ভব।

ক্ষীণ আলোতে কয়েকটি মেয়ে চোখে পড়ে তার। সংখ্যায় ছয়জন। কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে বসে গল্প করছে তারা। তাদের থেকে খানিক দূরে বসে

আছে আরো এক জোড়া নারী-পুরুষ। কথা বলছে তারাও। একপাশে বাঁধা আছে কয়েকটি ঘোড়া।

খৃষ্টান আরোহী উটের মোড় ঘুরিয়ে দেয় পিছন দিকে। ধীর-সন্তর্পণে চলে কিছু পথ। তারপর এগিয়ে চলে দ্রুত। আধা মাইল পথ উটের জন্য কিছু-ই নয়। অল্পক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যায় ছাউনিতে, কমাণ্ডারের কাছে। সুসংবাদ জানায়, শিকার আমাদের হাতের মুঠোয়। সময় নষ্ট না করে অপারেশনের প্রস্তুতি নেয় কমাণ্ডার। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজে শিকার সতর্ক হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কায় পায়ে হেঁটে-ই রওনা হয় তারা।

খৃষ্টান কমাণ্ডো দলটি যখন বালিয়ানের তাঁবুর নিকটে পৌঁছে, ততক্ষণে বালিয়ান নির্দেশ জারি করে ফেলেছে, এক একটি মেয়েকে এক একটি ঘোড়ায় বেঁধে ফেলো। বন্ধুরা বিস্মিত অভিভূতের ন্যায় তাকিয়ে আছে বালিয়ানের প্রতি। তাদের ধারণা, লোকটার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে হঠাৎ করে এমন খাপছাড়া কথা বলবে কেন! এ নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয় বন্ধুরা। অনেক সময় নষ্ট হওয়ার পর বালিয়ান তাদের বুঝাতে সক্ষম হয়, সে যা বলছে, হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে বুঝে-শুনেই বলছে এবং এ পরিস্থিতিতে কায়রো ফিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করাই কল্যাণকর।

পান্ডুর মুখে অপলক নেত্রে ফ্যাল ফ্যাল করে বালিয়ানের প্রতি তাকিয়ে আছে মেয়েগুলো। ঘোড়ায় যিন কষে বালিয়ানের সঙ্গীরা। ধরে ধরে মেয়েগুলোকে ঘোড়ার পিঠে বাঁধবে বলে— ঠিক এমন সময়ে তাদের উপর নেমে আসে অভাবিত এক মহাবিপদ। চারদিক ঘিরে ফেলে আক্রমণ করে বসে খৃষ্টান কমাণ্ডোরা। বালিয়ান বারবার চীৎকার করে উচ্চ কণ্ঠে বলছে— 'আমরা অস্ত্র ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা কায়রো রওনা হচ্ছি। আক্রমণ থামাও, আমাদের কথা শোন।'

আক্রমণকারীদেরকে বালিয়ান সুলতান আইউবীর বাহিনী মনে করেছিলো। কিন্তু তার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাই কোন ফল হলো না বালিয়ানের ঘোষণায়। একটি খঞ্জর এসে ঠিক হৃদপিণ্ডে বিদ্ধ হয়ে স্তব্ধ করে দেয় তাকে। এ আকস্মিক আক্রমণের মোকাবেলা করতে পারলো না বালিয়ানের বন্ধুরা। নিজেদের সামলে নেয়ার আগে-ই শেষ হয়ে যায় একে একে সকলে।

খৃষ্টান কমাণ্ডোদের অভিযান সফল। যাদের জন্য সমুদ্রের ওপার থেকে এসে তাদের এ ঝুঁকিপূর্ণ আক্রমণ, তারা এখন মুক্ত। বিলম্ব না করে তারা নিজেদের ছাউনিতে নিয়ে যায় মেয়েগুলোকে।

কমাণ্ডারকে চিনে ফেলে মেয়েরা। সেও তাদের-ই বিভাগের একজন গুপ্তচর। সেখানেই রাত যাপনের সিদ্ধান্ত নেয় তারা। পাহারার জন্য দাঁড়িয়ে যায় দু'জন সান্ত্রী। তারা ছাউনির চার পাশে টহল দিচ্ছে।

সুলতান আইউবীর প্রেরিত বাহিনীটি এখনো এ স্থান থেকে বেশ দূরে, বালিয়ান কয়েদী মেয়েদেরকে যেখান থেকে মুক্ত করেছিলো সেখানে। অকুস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া রক্ষী তাদের রাহ্‌বর। যেখানে তাদের উপর আক্রমণ হয়েছিলো, বাহিনীটিকে সে আগে সেখানে নিয়ে যায়। তারা একটি মশাল জ্বালিয়ে জায়গাটা দেখছে। রবিন ও তার সঙ্গীদের লাশগুলো পড়ে আছে বিক্ষিপ্তভাবে। লাশগুলো এখন আর অক্ষত নেই। শৃগাল-শকুনেরা ছিঁড়ে-ফেড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে দেহগুলো। তখনো কাড়াকাড়ি চলছিলো লাশগুলো নিয়ে। মানুষ দেখে এইমাত্র কেটে পড়েছে হিংস্র পশুগুলো।

রক্ষী যেখান থেকে ঘোড়া নিয়ে পলায়ন করেছিলো, সে কমাণ্ডারকে সেখানে নিয়ে যায়। মশালের আলোতে মাটি পর্যবেক্ষণ করেন কমাণ্ডার। ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন পাওয়া গেলো। রবিন তার দলবল নিয়ে কোন্‌দিকে গেলো, তাও অনুমান করা গেলো। কিন্তু রাতের বেলা সে পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলা তো সম্ভব নয়, কালক্ষেপণ করাও যাচ্ছে না। তবু তারা রাতটা সেখানেই অবস্থান করলো।

খৃষ্টান বাহিনীর ক্যাম্পের সকলে জেগে আছে। তারা সফলতার আনন্দে উৎফুল্ল। কমাণ্ডার সিদ্ধান্ত জানালো, আমরা শেষ রাতের আলো-আঁধারিতে রোম উপসাগর অভিমুখে রওনা হবো। শুনে মিগনানা মারিউস বললো, মিশন তো এখনো সম্পন্ন হয়নি। সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার কাজটা এখনো বাকি আছে। কমাণ্ডার বললো, মেয়েগুলোকে উদ্ধার করার জন্য যদি আমাদের কায়রো পৌঁছুতে হতো, তখন আমাদের এ কাজটাও করা সম্ভব ছিলো। এখন একদিকে আমরা কায়রো থেকে অনেক দূরে। অপরদিকে মেয়েদেরকে পেয়ে গেছি। এদেরকে নিরাপদে ওপারে নিয়ে যাওয়া-ই এ মুহূর্তে আমাদের মূল কাজ। তাছাড়া ওটা তো ছিলো একটা অতিরিক্ত বিষয়। কাজেই সে চিন্তা বাদ দিয়ে চলো, জল্‌দি রওনা হই।

মিগনানা মারিউস বললো— 'এটা আমার পরম লক্ষ্য। যে কোন মূল্যে কাজটা আমার সমাধা করতে-ই হবে। মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু এ মিশন থেকে আমাকে হটাতে পারবে না। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার শপথ নিয়েছি। এ শপথ আমি বাস্তবায়ন না করে ক্ষান্ত হবো না। আমার প্রয়োজন

একজন পুরুষ সঙ্গী আর একটি মেয়ে।'

'দেখ, মারিউস! আমি কাফেলার কমাণ্ডার। কী করবো আর কী করবো না, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আমার। তোমার কর্তব্য আমার আনুগত্য করা।' বললো কমাণ্ডার।

'আমি কারো হুকুমের গোলাম নই, আমরা সকলেই খোদার দাস।' বললো মিগনানা মারিউস।

ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে কমাণ্ডার। শাসিয়ে দেয় মারিউসকে। মিগনানা মারিউসের কাঁধে ঝুলানো তরবারী। সে-ও ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। কাঁধের তরবারীটা চলে আসে হাতে। উঁচিয়ে ধরে কমাণ্ডারের মাথার উপর। অবস্থা বেগতিক দেখে এক সঙ্গী এসে দাঁড়ায় মাঝখানে। নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে মারিউসকে। উর্ধ্বে তুলে ধরা তরবারিটা নামিয়ে ফেলে সে। তার চোখ ঠিক্‌রে আগুন ঝরছে যেন। মনে তার প্রচণ্ড ক্রোধ। বলে–

'আমি খোদার এক বিতাড়িত বান্দা। ত্রিশ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী। চলে গেছে পাঁচ বছর। আমার ষোল বছর বয়সের একটি বোন অপহৃতা হয়েছিলো। আমি গরীব মানুষ। বাবা বেঁচে নেই। মা অন্ধ। আমি ছোট ছোট কয়েকটি সন্তানের জনক। গতর খেটে তাদের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করতাম। আমি গীর্জায় ক্রুশের উপর ঝুলান যীশুখৃষ্টের প্রতিকৃতির কাছে বহুবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি গরীব কেন? আমি তো কখনো পাপ করিনি। বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তো আমি এত পরিশ্রম করি, কিন্তু সংসারে অভাব কেন? খোদা আমার মাকে অন্ধ করলেন কেন? কিন্তু যীশুখৃষ্ট আমার জিজ্ঞাসার কোন জবাব দেননি!

যখন আমার কুমারী বোনটি অপহৃতা হয়ে গেলো, তখনও আমি গীর্জায় গিয়ে কুমারী মাতা মরিয়মের প্রতিকৃতির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আমার কুমারী বোনের উপর এভাবে বিপদ নেমে এলো কেন? সে তো জীবনে কখনো অপকর্ম করেনি। তবে কি খোদা তাকে এতো রূপ দিয়ে তার প্রতি জুলুম করলেন? কিন্তু না, মা মরিয়মের পক্ষ থেকেও আমি কোন জবাব পেলাম না।

একদিন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির এক চাকর আমাকে বললো, তোমার বোন আমার মনিবের ঘরে আছে। আমার মনিব বড় বিলাসপ্রিয় মানুষ। সে সুন্দরী কুমারী মেয়েদের অপহরণ করে আনে আর তাদের সঙ্গে ক'দিন ফুর্তি করে কোথায় যেন গায়েব করে ফেলে। রাজ দরবারে লোকটির যাওয়া-আসা, উঠা-বসা। মানুষ তাকে বেশ শ্রদ্ধা করে। বাদশাহ তাকে একটি তরবারীও

উপহার দিয়েছেন। এত পাপিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও খোদা তার প্রতি সন্তুষ্ট। দুনিয়ার আইন-কানুন তার হাতের খেলনা।

সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি তার ঘরে গেলাম এবং আমার বোনকে ফিরিয়ে দিতে বললাম। লোকটি ধাক্কা দিয়ে আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। আমি আবারো গীর্জায় গেলাম। যীশুখৃষ্ট ও মা মরিয়মের প্রতিকৃতির নিকট দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করলাম। খোদাকে ডাকলাম। কিন্তু আমার আকুল আহ্বানে কেউ সাড়া দিলো না। আমি যখন সেদিন গীর্জায় প্রবেশ করি, তখন গীর্জায় আর কেউ ছিলো না। শেষে পাদ্রী আসলেন। তিনি আমাকে দেখে ধমক দিয়ে বাইরে বের করে দিলেন এবং বললেন— 'এখান থেকে দু'টি মূর্তি চুরি হয়ে গেছে। তুমি জল্দি চলে যাও, অন্যথায় তোমাকে আমি পুলিশের হাতে তুলে দেবো।' আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, এটা কি খোদার ঘর নয়? তিনি বললেন, আমাকে না বলে তুমি এ ঘরে ঢুকলে কেন? পাপের ক্ষমা-ই যদি চাইতে হয়, তাহলে আমার কাছে এসো; কি পাপ করেছো বলো, আমি খোদাকে বলবো তোমাকে ক্ষমা করে দিতে। খোদা সরাসরি কারো কথা শুনেন না। যাও, বের হও এখান থেকে।' এই বলে তিনি খোদার ঘর থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন।

মিগনানা মারিউসের করুণ কণ্ঠের স্মৃতিচারণে সকলে অভিভূত হয়ে পড়ে। অশ্রু ঝরতে শুরু করে মেয়েদের চোখ বেয়ে। মরুভূমির রাতের নিস্তব্ধতায় তার কথাগুলো সকলের মনে যাদুর মতো রেখাপাত করে।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে মিগনানা আবার বলে, সেদিন আমি পাদ্রী, যীশু-খৃষ্ট, কুমারী মরিয়মের প্রতিকৃতি এবং খোদার প্রতি তীব্র সংশয় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। মনে প্রশ্ন জাগলো, এরা যদি সত্য-ই হয়ে থাকে, তাহলে আমার প্রতি এতো অত্যাচার কেন? কেন এরা কেউ আমার আকুতিতে সাড়া দিলো না? বাড়ি গেলে অন্ধ মা জিজ্ঞেস করলেন, বাছা! আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছো? স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করলো সন্তানরা। যীশু-মরিয়ম-খোদার মত আমিও নীরব রইলাম, কথা বললাম না। কিন্তু আমার সহ্য হলো না। ভেতর থেকে একটি প্রচণ্ড ঝড় উঠে এলো। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। জ্ঞানশূন্যের মত আমি সারাদিন ঘুরতে থাকি।

সন্ধ্যার সময় একটি খঞ্জর ক্রয় করলাম। সমুদ্রের কূলে গিয়ে পায়চারী করতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে রাতের আঁধার নেমে এলো। এবার আমি একদিকে হাঁটা দিলাম। আমার বোন যে গৃহে বন্দী, সে গৃহের আলো চোখে পড়লো।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। সতর্কপদে চলে গেলাম মহলের পিছনে। আমি স্বল্পবুদ্ধির হাবাগোবা ধরনের মানুষ। কিন্তু এক্ষণে এক বুদ্ধি খেলে যায় আমার মাথায়।

আমি মহলের পিছন দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। একটি কক্ষ থেকে কোলাহলের শব্দ কানে ভেসে এলো। মদের আড্ডা বসেছিলো বোধ হয়। আমি একটি কক্ষে ঢুকতে চাইলাম। সামনে এসে দাঁড়ায় চাকর, বাধা দেয় আমাকে। তার বুকে খঞ্জর ধরে বোনের নাম বলে জিজ্ঞেস করলাম, ও কোথায় আছে বল্। চাকর সিঁড়ি বেয়ে আমাকে উপরে নিয়ে গেলো। আমাকে নিয়ে একটি কক্ষের দ্বারে দাঁড়িয়ে বললো, এখানে। আমি ভিতরে ঢুকে পড়লাম; অমনি বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে যায় কক্ষের দরজা। ভিতরটা শূন্য।

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে গেলো। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত ঢুকে পড়লো কতগুলো মানুষ। হাতে তাদের তরবারী আর লাঠি। আমি কক্ষের জিনিস-পত্র তুলে তুলে তাদের প্রতি ছুঁড়ে মারতে লাগলাম। পাগলের মতো যেখানে যা পেলাম, ভেঙ্গে চুরমার করলাম। তারা আমাকে ধরে ফেললো, অনেক মারলো। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

আমার যখন জ্ঞান ফিরে এলো, তখন আমি হাতকড়া আর ডান্ডা-বেড়ীতে বাঁধা। আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হলো, আমি ডাকাতি করেছি, বাদশাহর একজন দরবারীর ঘরে ভাংচুর করেছি, হত্যা করার উদ্দেশ্যে তিনজনকে জখম করেছি।

আমার আর্জি-ফরিয়াদ, আকুতি-মিনতি কেউ শুনলো না। ত্রিশ বছরের দণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে আমি নিক্ষিপ্ত হলাম কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। কেটেছে মাত্র পাঁচ বছর। এতদিনে আমি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি। কারাজীবনের কষ্ট তোমরা জানো না। দিনে পশুর মত খাটান হয় আর রাতে কুকুরের মতো জিঞ্জির পরিয়ে ফেলে রাখা হয় অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। এ পাঁচ বছরে আমি জানতে পারিনি, আমার অন্ধ মা এবং স্ত্রী সন্তানেরা বেঁচে আছেন কি-না। ভয়ঙ্কর ডাকাত মনে করে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার সুযোগ পর্যন্ত দেয়া হয়নি কাউকে।

আমি সর্বক্ষণ ভাবতাম, খোদা সত্য না আমি সত্য। শুনেছিলাম, খোদা নিরপরাধ লোকদের শাস্তি দেন না। তাই প্রশ্ন জাগে, তিনি আমায় কোন্ পাপের শাস্তি দিলেন? কোন্ অপরাধের কারণে আমার নিষ্পাপ সন্তানদের তিনি অসহায় বানালেন?

পাঁচ পাঁচটি বছর এ ভাবনা আমার মাথায় তোলপাড় করতে থাকে। এই কিছুদিন আগে দু'জন সেনা অফিসার যান কারাগারে। এখন আমরা যে মিশন

নিয়ে এসেছি, তারা তার জন্য লোক খুঁজছিলেন। আমি প্রথমে নিজেকে পেশ করতে চাইনি। কারণ, এসব হল রাজা-বাদশাদের লড়াই। আর কোন রাজার প্রতি-ই আমার শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু যখন আমি শুনলাম, কয়েকটি খৃষ্টান মেয়েকে মুসলমানদের কব্জা থেকে উদ্ধার করতে হবে, তখন আমার বোনের কথা মনে পড়ে যায়। আমাকে বলা হয়েছিলো, মুসলমান একটি ঘৃণ্য জাতি। আমি মনস্থ করলাম, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও আমি এ অভিযানে অংশ নেবো। মুসলমানদের কবল থেকে খৃষ্টান মেয়েদের উদ্ধার করে আনবো। খোদা যদি সত্য হয়ে থাকেন, তাহলে এর বদৌলতে আমার বোনকে তিনি খৃষ্টানদের কবল থেকে মুক্ত করে দেবেন। অফিসারদের কাছে আমার সিদ্ধান্ত জানালাম। তারা আমাকে আরো বললেন, একজন মুসলমান রাজাকে হত্যা করতে হবে। আমি সে দায়িত্বও মাথায় তুলে নিলাম। নিজেকে পেশ করলাম তাদের হাতে। তবে শর্ত দিলাম, এর বিনিময়ে আমাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দিতে হবে, যা আমি আমার পরিবারের হাতে তুলে দেবো। তারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। বললেন, যদি তুমি সমুদ্রের ওপারে মারাও যাও, তবু তোমার পরিবারকে আমরা এতো পরিমাণ অর্থ দেবো, যা তারা জীবনভর খেয়ে বাঁচতে পারবে, তাদের কারো কাছে হাত পাততে হবে না।

দু'জন সঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করে মিগনানা মারিউস বললো, এরা দু'জনও আমার সঙ্গে কারাগারে ছিলো। এরাও নিজেদেরকে অফিসারদের হাতে তুলে দেয়। খুটিয়ে খুটিয়ে তারা আমাদের নানা কথা জিজ্ঞেস করে। আমরা নিশ্চয়তা দেই, নিজের জাতি ও ধর্মের সঙ্গে আমরা প্রতারণা করবো না। আমরা মূলত নিজেদের পরিবার-পরিজনের জন্য-ই জীবন বিক্রি করে দিয়েছি।

কারাগার থেকে বের হওয়ার প্রাক্কালে এক পাদ্রী আমাদেরকে বললেন, 'মুসলমান হত্যা করলে খোদা সব গুনাহ মাফ করে দেন। আর যদি তোমরা খৃষ্টান মেয়েদের মুক্ত করে আনতে পারো, তাহলে সোজা জান্নাতে চলে যাবে।' আমি পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, খোদা আছেন কোথায়? জবাবে তিনি যা বললেন, তাতে আমি সান্ত্বনা পেলাম না। ক্রুশের উপর হাত রেখে আমি শপথ করলাম।

আমাদেরকে কারাগার থেকে বের করে আনা হলো। আমাকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার সামনে আমার পরিবারকে প্রচুর অর্থ দেয়া হলো। আমি আশ্বস্ত হলাম। আমার বন্ধুরা! তোমরা আমাকে এখন সেই শপথ পূরণ করতে দাও। খোদা কোথায় আছেন, দেখতে চাই আমি। আচ্ছা, একজন মুসলমানকে হত্যা করলে আমি খোদাকে দেখতে পাবো তো?'

'তুমি একটা বদ্ধ পাগল। এতক্ষণ যা বক্‌বক্‌ করলে, তাতে আমি বিবেক-বুদ্ধির গন্ধও পেলাম না।' বললো কমাণ্ডার।

'কেন, ইনি বেশ চমৎকার কথা বলেছেন। আমি এর সঙ্গে যাবো।' বললো মিগনানার এক সঙ্গী।

'আমার একটি মেয়ের প্রয়োজন'– মিগনানা মারিউস মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললো– 'আমার সঙ্গে যে মেয়েটি যাবে, তার জীবন-সম্ভ্রমের দায়িত্বও আমার। মেয়ে ছাড়া সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট পৌঁছতে পারবো না। এসে অবধি আমি ভাবছি, আইউবীর সঙ্গে একাকী কিভাবে সাক্ষাৎ করতে পারি।'

বসা থেকে উঠে মিগনানা মারিউসের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ায় মুবী। বলে— 'আমি যাবো এর সঙ্গে।'

'শোন মুবী! আমরা তোমাদের বড় কষ্টে মুক্ত করে এনেছি। এখন আমি তোমাকে এমন বিপজ্জনক মিশনে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারি না।' বললো কমাণ্ডার।

'আমাকে সম্ভ্রম হারাবার প্রতিশোধ নিতেই হবে। আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শয়নকক্ষে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারবো। আমি জানি, মুসলমানদের মর্যাদা যতো উঁচু, সুন্দরী নারীর প্রতি তারা ততো দুর্বল। আমি এমন কৌশল অবলম্বন করবো, আইউবী বুঝতে-ই পারবে না, এ-ই তার জীবনের সর্বশেষ নারীদর্শন।' বললো মুবী।

দীর্ঘ আলোচনা-তর্কের পর মিগনানা মারিউস তার এক সঙ্গী ও একটি মেয়েকে নিয়ে কাফেলা ত্যাগ করে রওনা হয়। তাকে দু'আ দিয়ে সকলে বিদায় জানায়। দু'টি উট নেয় সে। একটিতে সওয়ার হয় মুবী, অপরটিতে তারা দু'জন। তাদের সঙ্গে আছে মিসরী মুদ্রা, সোনার আশরাফী। মিগনানা ও তার সঙ্গীর পরনে জুব্বা। এতদিনে মিগনানার দাঁড়িগুলো বেশ লম্বা হয়ে গেছে। কারাগারের অসহনীয় গরম এবং হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কারণে তাঁর গায়ের রং এখন আর ইতালীদের মত গৌর নয়; অনেকটা কালো হয়ে গেছে। এখন তাকে ইউরোপিয়ান বলে সন্দেহ করার উপায় নেই। ছদ্মবেশ ধারণের জন্য আলাদা পোশাক দিয়ে পাঠান হয়েছিলো তাদের। কিন্তু সমস্যা হলো, মিগনানা মারিউস ইতালী ছাড়া আর কোন ভাষা জানে না। মিসরের ভাষা জানা আছে মুবীর। অপরজনও মিসরী ভাষা জানে না। এর একটা বিহিত না করলে-ই নয়।

তারা রাতারাতি-ই রওনা দেয়। অত্র অঞ্চলের পথ-ঘাট সব মুবীর চেনা। সে কায়রো থেকে-ই এসেছিলো। তার গায়েও একটি চোগা পরিয়ে দেয় মিগনানা। মাথায় পরিয়ে দেয় দোপাট্টার মত একটি চাদর।

❖❖❖

ভোরের আলোতে সুলতান আইউবীর প্রেরিত বাহিনী ঘোড়ার পদচিহ্ন অনুসরণ করে রওনা হয়ে পড়ে। খৃষ্টান কমাণ্ডোরা মেয়েদের নিয়ে রাত পোহাবার আগেই সমুদ্র অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। তারা তীব্রগতিতে এগিয়ে চলছে।

সূর্যাস্তের এখনো অনেক বাকি। হঠাৎ এক স্থানে আইউবী বাহিনীর চোখে পড়ে কয়েকটি লাশ। আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব দেখেই বলে ওঠেন, এ-যে বালিয়ানের লাশ! মুখাবয়ব তার সম্পূর্ণ অবিকৃত। পার্শ্বেই এলোপাতাড়ি পড়ে আছে তার ছয় বন্ধুর মৃতদেহ। শকুন-হায়েনারা তাদের দেহের অনেক গোশত খেয়ে ফেলেছে। অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে কাফেলা। বিষয়টি বুঝে উঠতে পারছে না তারা। রক্ত বলছে, এরা মরেছে বেশীদিন হয়নি। লোকগুলো বিদ্রোহের রাতে মারা গিয়ে থাকলে এতদিনে রক্তের দাগ মুছে যেতো, থাকতো শুধু হাড়গোড়। বিষয়টি দুর্ভেদ্য ঠেকে তাদের কাছে।

অশ্বখুরের চিহ্ন ধরে আবার রওনা হয় কাফেলা। তীব্রগতিতে ঘোড়া হাঁকায়। আধা মাইল পথ অতিক্রম করার পর এবার উটের পায়ের দাগও চোখে পড়ে তাদের। এগিয়ে চলছে অবিরাম। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও তারা থামেনি। এখন তারা যে স্থানে চলছে, সেখান থেকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উঁচু উঁচু মাটির টিলা। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আঁকা বাঁকা একটিমাত্র পথ।

খৃষ্টান কমাণ্ডোরাও এগিয়ে যাচ্ছে এ পথে-ই। বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকার পরে বিশাল ধূ ধূ বালু প্রান্তর। পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করে-ই থেমে যায় পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলিম বাহিনী। রাত কাটায় সেখানে।

ভোর হতে-ই আবার রওনা দেয় তারা। পাড়ি দেয় বিশাল মরু এলাকা। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা সামুদ্রিক আবহাওয়া অনুভব করে। তার মানে সমুদ্র আর বেশী দূরে নয়। কিন্তু শিকার এখানেও চোখে পড়ছে না। পথে একস্থানে খাদ্যদ্রব্যের উচ্ছিষ্ট প্রমাণ দিলো, রাতে এখানে কোন কাফেলা অবস্থান নিয়েছিলো। ঘোড়া বাঁধার এবং পরে ঘোড়াগুলোর সমুদ্রের দিকে চলে যাওয়ার আলামতও দেখা গেলো। তারা মাটিতে ঘোড়ার পদচিহ্ন অনুসরণ করে আরো দ্রুত ঘোড়া হাঁকায়।

সম্মুখে এক স্থানে অবতরণ করে কাফেলা। ঘোড়াগুলোকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে, পানি পান করিয়ে আবার ছুটে চলে। সমুদ্রের বাতাসের তীব্রতা ধীরে ধীরে বাড়ছে। সমুদ্রের লোনা ঘ্রাণ অনুভূত হচ্ছে নাকে। আস্তে আস্তে চোখে পড়তে শুরু করে উপকূলীয় টিলা।

ঘোড়া যতো সামনে এগুচ্ছে, উপকূলীয় টিলাগুলো ততো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। একটি টিলার উপরে দু'জন মানুষ নজরে পড়ে মুসলিম বাহিনীর। এক নাগাড়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারা কাফেলার প্রতি। তারপর তীব্রবেগে নেমে পড়ে সমুদ্রের দিকে। পশ্চাদ্ধাবনকারী কাফেলার ঘোড়াগুলোর গতি আরো বেড়ে যায়। টিলার নিকটে এসে হঠাৎ থেমে যেতে হয় তাদের। কারণ, টিলার পিছনে যাওয়ার একাধিক পথ। উপরে উঠে সম্মুখে দেখে আসার জন্য প্রেরণ করা হয় একজনকে। লোকটি ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে যায় সেদিকে। একটি টিলায় উঠে শুয়ে শুয়ে তাকায় অপরদিকে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে পেছনে। সেখান থেকেই ইঙ্গিতে সঙ্গীদের বলে, ঘোড়া থেকে নেমে জল্‌দি পায়ে হেঁটে এসো। আরোহীরা নেমে পড়ে ঘোড়া থেকে। দৌড়ে এসে দাঁড়ায় টিলার নিকট। সর্বাগ্রে উপরে ওঠেন আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব। সম্মুখে তাকান তিনি। তৎক্ষণাৎ পিছনে সরে নেমে আসেন নীচে। মুহূর্তের মধ্যে তার বাহিনীকে ছড়িয়ে দেন তিন দিকে। এক একজনকে পজিশন নিয়ে দাঁড়াতে বলেন এক এক স্থানে।

বিপরীত দিক থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি কানে আসছে। সুলতান আইউবীর গ্রেফতারকৃত গোয়েন্দা মেয়েদের ছিনিয়ে আনা খৃষ্টান কমাণ্ডো দল ঐখানে দাঁড়িয়ে। সমুদ্রের ওপার থেকে এসে তারা যে স্থানে নৌকা বেঁধে রেখে অভিযানে নেমেছিলো, এই সেই জায়গা। অভিযান সফল করে এখন তাদের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আপন দেশে ফিরে যাওয়ার পালা। তারা ঘোড়া থেকে নেমে এক এক করে নৌকায় উঠছে। ছেড়ে দিয়েছে ঘোড়াগুলো।

আচম্বিত তীরবর্ষণ শুরু হয় তাদের উপর। পালাবার পথ নেই। পাল্টা আক্রমণেরও সুযোগ নেই। তারা আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ক'জন লাফিয়ে উঠে নৌকায়। তারা রশি কেটে দিয়ে শপাশপ দাড় ফেলতে শুরু করে। পিছনে যারা রয়ে গেলো, তারা তীরের নিশানায় পরিণত হলো। নৌকায় করে পলায়নপর কমাণ্ডোদের থামতে বলা হয়। কিন্তু তারা থামছে না। বাতাস নেই। ধীরে ধীরে মাঝের দিকে চলে যাচ্ছে নৌকা। শোঁ শোঁ শব্দ করে বেশ ক'টি তীর গিয়ে বিদ্ধ হয় তাদেরও গায়ে। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় দাড়ের শব্দ। আরো এক ঝাঁক তীর ছুটে যায় নৌকায়। তারপর আরো এক ঝাঁক। গেঁথে গেঁথে দাঁড়িয়ে আছে লাশগুলোর গায়ে। মাঝি-মাল্লাহীন নৌকা দুলতে দুলতে স্রোতে ভেসে অল্পক্ষণের মধ্যে কূলে এসে ঠেকে। মুসলিম বাহিনী পাড়ে এসে ধরে ফেলে নৌকাটি। নৌকায় কোন প্রাণী নেই। আছে প্রাণহীন কতগুলো দেহ। তীরের আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে মেয়েরাও। গোটা কমাণ্ডোর বেঁচে নেই একজনও।

একটি খুটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো নৌকাটি। সাফল্যের গৌরব নিয়ে উপকূলীয় ক্যাম্প অভিমুখে রওনা হয় মুসলিম সেনারা।

❖ ❖ ❖

মুবী ও সঙ্গীকে নিয়ে কায়রোর একটি সরাইখানায় অবস্থান করছে মিগনানা মারিউস। এ সরাইখানাটি দু' ভাগে বিভক্ত। একাংশ সাধারণ ও নিম্নস্তরের মুসাফিরদের জন্য, অপর অংশ বিত্তশালী ও উচ্চস্তরের পর্যটকদের জন্য। ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরাও এ অংশে অবস্থান করে। এদের জন্য মদ, নারী ও নাচ-গানের ব্যবস্থা আছে। মিগনানা মারিউসের এসে অবস্থান নেয় এ অংশে। এসে পরিচয় দেয়, মুবী তার স্ত্রী আর সঙ্গের লোকটি তার ভৃত্য।

মুবীর রূপ-যৌবন সরাইখানার মালিক-কর্তৃপক্ষ এবং অবস্থানরত লোকদের মনে মিগনানা মারিউস এর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। এমন একজন সুন্দরী যুবতী যার স্ত্রী, তিনি অবশ্যই একজন বিত্তশালী আমীর। মিগনানাকে বিশেষ গুরুত্বের চোখে দেখতে শুরু করে কর্তৃপক্ষ।

নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর বাড়ী-ঘর ও দফতর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে মুবী। মুবী জানতে পায়, সুলতান আইউবী সুদানীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন ও সুদানী বাহিনীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন। মুবী আরো জানতে পারে, সুলতান আইউবী সুদানী সালার ও কমাণ্ডার শ্রেণীর লোকদের হেরেম থেকে ললনাদের বিদায় করে দিয়েছেন এবং আবাদী জমি দিয়ে তাদের পুনর্বাসিত করছেন।

মিসরের ভাষা জানে না মিগনানা মারিউস। তথাপি সে আগুন নিয়ে খেলার মত এই ঝুঁকিপূর্ণ মিশনে অবতরণ করলো। এটি হয়ত তার অস্বাভাবিক দুঃসাহস কিংবা চরম নির্বুদ্ধিতর পরিচয়। এ জাতীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটন এবং এতবড় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের নিকটে পৌঁছার প্রশিক্ষণও তার নেই। তদুপরি সে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত। তারপরও সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করতে আসলো! কমাণ্ডার বলেছিলো— 'তুমি একটি বদ্ধ পাগল; বুদ্ধি বিবেকের বাষ্পও নেই তোমার মাথায়'। বাহ্যত পাগল-ই ছিলো মিগনানা মারিউস।

এ এক ঐতিহাসিক সত্য যে, বড়দেরকে যারা হত্যা করে, তারা পাগল-ই হয়ে থাকে। বিকৃত-মস্তিষ্ক না হোক মাথার নাট-বোল্ট কিছুটা হলেও ঢিলে থাকে তাদের। ইতালীর এই সাজাপ্রাপ্ত লোকটির অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। তার কাছে এমন একটি সম্পদ আছে, যাকে সে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে শুধু। সে হলো মুবী। মুবী শুধু মিসরের ভাষা-ই জানতো না, বরং তাকে এবং তার নিহত ছয় সঙ্গী মেয়েকে মিসরী ও আরবী মুসলমানদের চলাফেরা,

উঠাবসা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি সব সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কেও দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সে মুসলমান পুরুষদের মনের যথার্থ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। অভিনয় করতে জানে ভালো। মুবীর সবচে' বড় গুণ, সে আঙ্গুলের ইশারায় পুরুষদের নাচাতে জানে। জানে প্রয়োজনে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে যে কোন পুরুষের সামনে নিজেকে মেলে ধরতে।

সরাইখানার রুদ্ধ কক্ষে মিগনানা মারিউস, মুবী ও তাদের সঙ্গী কী আলোচনা করলো, কী পরিকল্পনা আঁটলো, তা কেউ জানে না। সরাইখানায় তিন-চারদিন অবস্থান করার পর মিগনানা মারিউস যখন বাইরে বের হয়, তখন তার মুখে লম্বা দাড়ি, চেহারার রং সুদানীদের ন্যায় গাঢ় বাদামী। এই বেশ তার কৃত্রিম হলেও দেখতে কৃত্রিম বলে মনে হলো না। পরনে সাধারণ একটি চোগা, মাথায় পাগড়ী ও রোমাল। মুবী আপাদমস্তক কালো বোরকায় আবৃত। তার শুধু মুখমণ্ডলটাই দেখা যায়। কপালের উপর কয়েকটি রেশমী চুল সোনার তারের মত ঝক্ ঝক্ করছে। রূপের বন্যা বইছে তার চেহারায়। মেয়েটির প্রতি রাস্তার পথিকদের যার-ই দৃষ্টি পড়ছে, তারই চোখ আটকে যাচ্ছে। সঙ্গের লোকটির পরণে সাধারণ পোশাক। দেখে লোকটাকে এদের চাকর-ভৃত্য বলেই মনে হলো।

বাইরে উন্নত জাতের দু'টি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। সরাইখানার কর্তৃপক্ষ মিগনানা মারিউসের জন্য ভাড়ায় এনে দিয়েছে ঘোড়া দু'টো। সে স্ত্রীকে নিয়ে ভ্রমণে যাবে বলেছিলো। মিগনানা মারিউস ও মুবী দু'জন দু'টি ঘোড়ায় চড়ে বসে। অপরজন ভৃত্যের মত তাদের পিছনে পিছনে হাঁটছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কক্ষে উপবিষ্ট। তিনি সুদানীদের ব্যাপারে নায়েবদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। এই ঝামেলা অল্প সময়ে শেষ করে ফেলতে চান সুলতান। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সুলতান জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনী, মিসরের নতুন ফৌজ এবং ওফাদার সুদানীদের সমন্বয়ে একটি যৌথ বাহিনী গঠন করবেন এবং অতিসত্ত্বর জেরুজালেম আক্রমণ করবেন।

রোম উপসাগরে খৃষ্টানদের পরাজয়বরণের পর পরই সুলতান জঙ্গী রাজা ফ্রাংককে পরাজিত করেন। ফলে চরমভাবে বিপর্যস্ত খৃষ্টান বাহিনী দীর্ঘদিন পর্যন্ত আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। আত্মসংবরণের আগে আগেই খৃষ্টানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করার পরিকল্পনা নেন সুলতান আইউবী। তিনি তারও আগে সুদানীদের পুনর্বাসনের কাজটা সম্পন্ন করে ফেলতে চাইছেন, যাতে তারা চাষাবাদ ও সংসার কর্মে আত্মনিয়োগ করে এবং বিদ্রোহের চিন্তা করার সুযোগ না পায়।

নতুন বাহিনীর পুনর্গঠন এবং হাজার হাজার সুদানীকে জমি দিয়ে পুর্নবাসিত করা সহজ কাজ নয়। সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এমন কিছু কর্মকর্তা আছেন, যারা মিসরের গভর্নর হিসেবে সুলতান আইউবীকে দেখতে চান না। সুদানী বাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়েও সুলতান সমস্যার এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছেন। সুদানী বাহিনীর কয়েকজন পদস্থ অফিসার এখনো জীবিত। তারা বাহ্যত সুলতান আইউবীর আনুগত্য মেনে নিয়েছিলো ঠিক, কিন্তু আলী বিন সুফিয়ানের ইন্টেলিজেন্স বলছে, বিদ্রোহের ভস্মস্তূপে এখনো কিছু অঙ্গার রয়ে গেছে। সুদানীদের পুনর্বাসন এবং সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনে এ একটি মারাত্মক সমস্যা।

গোয়েন্দা বিভাগ আরো রিপোর্ট করে, নিজেদের পরাজয়ে এ বিদ্রোহী নেতাদের যতটুকু দুঃখ, তার চেয়ে বেশী দুঃখ খৃষ্টানদের পরাজয়ে। কারণ, তারা বিদ্রোহে ব্যর্থ হওয়ার পরও খৃষ্টানদের সাহায্য পেতে চাচ্ছিলো। এখন খৃষ্টানদের পরাজয়ে তাদের সে আশার গুড়ে বালি পড়েছে। মিসরের প্রশাসন ও ফৌজের দু'-তিনজন কর্মকর্তা সুদানীদের পরাজয়ে এজন্যেও ব্যথিত যে, তাদের বুকভরা আশা ছিলো, এ বিদ্রোহে সুলতান আইউবী হয়তো নিহত হবেন কিংবা মিসর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবেন।

এরা হলো ঈমান-বিক্রয়কারী গাদ্দার। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ঘটা করে তাদের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশন নেননি। তিনি তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ-ই করতেন। কোন বৈঠকে তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেননি। অধীন ও সেনাবাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে কখনো তিনি একথা বলেননি যে, যারা আমার বিরোধিতা করছে, আমি তাদের দেখিয়ে ছাড়বো। তাদের ব্যাপারে ধমকের সুরে কথা বলেননি কখনো। তবে প্রসঙ্গ এলে মাঝে-মধ্যে বলতেন— 'কেউ যদি কোন সহকর্মীকে ঈমান বিক্রি করতে দেখো, তাহলে তাকে বারণ করো। তাকে স্মরণ করিয়ে দিও যে, সে মুসলমান। তার সঙ্গে মুসলমানদের মত আচরণ করো, যাতে আত্মপরিচয় লাভ করে সে দুশমনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে।'

কিন্তু তিনি তাদের তৎপরতার উপর কড়া নজর রাখতেন। আলী বিন সুফিয়ানের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোও গুরুত্বের সঙ্গে তাদের গতিবিধির উপর নজরদারীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। বিশ্বাসঘাতকদের গোপন রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত হতেন সুলতান আইউবী।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব এখন বেড়ে গেছে আরো। রক্ষী ও উষ্ট্রচালকদের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছে গেছে কায়রো। এই রক্ষী ও

উষ্ট্রচালকদের হত্যা এবং অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা রক্ষীদের হাত থেকে গুপ্তচরদের ছিনিয়ে নেয়া প্রমাণ করলো, এখনো মিসরে খৃষ্টান গুপ্তচর এবং গেরিলা বাহিনী রয়ে গেছে। আর দেশের কিছু লোক যে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আশ্রয় দিচ্ছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে সুলতান আইউবীর প্রেরিত বাহিনী যে ঠিক নৌকায় উঠে ওপারে পাড়ি দেয়ার সময় সেই গেরিলা বাহিনী ও গুপ্তচরদের শেষ করে দিয়েছে, সে খবর কায়রো পৌঁছেনি এখনো। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি গেরিলাদের প্রতিহত করার জন্য প্রেরণ করেছেন দু'টি টহল বাহিনী। জোরদার করেছেন গোয়েন্দা তৎপরতা।

বিষন্নতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন সুলতান আইউবী। যে প্রত্যয় নিয়ে তিনি মিসর এসেছিলেন, তা কতটুকু সফল হলো, সে ভাবনায় তিনি অস্থির। তিনি সালতানাতে ইসলামিয়াকে জঞ্জালমুক্ত করে তাকে আরো বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ঝড় উঠেছে যেমন মাটির উপর থেকে, তেমনি নীচ থেকেও। সেই ঝড়ে কাঁপতে শুরু করেছে তাঁর সেই স্বপ্নসৌধ। এ চিন্তায়ও তিনি অস্থির যে, মুসলমানদের তরবারী আজ মুসলমানদের-ই মাথার উপর ঝুলছে। নীলাম হচ্ছে মুসলমানদের ঈমান। ষড়যন্ত্রের জালে আটকে গিয়ে সালতানাতে ইসলামিয়ার খেলাফতও এখন খৃষ্টানদের ক্রীড়নকে পরিণত। নারী আর কড়ি প্রকম্পিত করে তুলেছে আরবের বিশাল পবিত্র ভূখণ্ড।

নিজেকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও সুলতান সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু তার জন্য তিনি কখনো পেরেশান হননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন— 'জীবন আমার আল্লাহ'র হাতে। তাঁর নিকট যখন পৃথিবীতে আমার অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে, তখন তিনি আমাকে তুলে নেবেন।'

তাই সুলতান আইউবী কখনো নিজের হেফাজতের কথা ভাবেননি। কিন্তু গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ। খৃষ্টানদের কোন ষড়যন্ত্র যেনো সফল হতে না পারে, তার জন্য তিনি সুলতান আইউবীর চারদিকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করে রেখেছিলেন।

আজ কক্ষে বসে সুদানীদের ব্যাপারে নায়েবদের নির্দেশনা দিচ্ছেন সুলতান। হঠাৎ নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়ে যায় দু'টি ঘোড়া। আরোহী দু'জন মিগনানা মারিউস ও মুবী। তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে অবতরণ করে। এগিয়ে এসে ঘোড়ার বাগ হাতে নেয় পিছনে পিছনে হেঁটে আসা আরেকজন লোক। নিরাপত্তা কমাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলে মুবী। বলে, সঙ্গের লোকটি আমার পিতা। আমরা সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। মিগনানা মারিউসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কথা বলে কমাণ্ডার। সে সাক্ষাতের হেতু জানতে

চায়। না শোনার ভান করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে লোকটি। পাশের থেকে মুবী বলে— 'ইনি বধির ও বোবা। এর সাথে কথা বলে লাভ নেই। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য আমি সরাসরি সুলতানকে কিংবা উর্ধ্বতন অফিসারকেই জানাবো।'

কক্ষের বাইরে টহল দিচ্ছিলেন আলী বিন সুফিয়ান। মিগনানা মারিউস ও মুবীকে দেখে তিনি এগিয়ে আসেন। আস্‌সালামু আলাইকুম বলে সালাম দিলে ওয়ালাইকুমুস্ সালাম বলে জবাব দেয় মুবী। কমাণ্ডার তাঁকে বললেন, এরা সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে চায়। আলী বিন সুফিয়ান মিগনানা মারিউসকে সাক্ষাতের কারণ জিজ্ঞেস করেন। মুবী বললো, ইনি আমার পিতা। কানে শুনেন না, কথা বলতে পারেন না। আলী বিন সুফিয়ান বললেন, সুলতান এ মুহূর্তে কাজে ব্যস্ত। অবসর হলে হয়তো সময় দিতে পারেন। তার আগে আমাকে বলো, তোমরা কেন এসেছো; দেখি আমি-ই তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি কিনা। ছোট-খাট অভিযোগ শোনবার জন্য সুলতান সময় দিতে পারেন না। সংশ্লিষ্ট বিভাগ জনতার অনেক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে।

'কেন, সুলতান কি একটি নির্যাতিত নারীর ফরিয়াদ শুনবার জন্য সময় দিতে পারবেন না? আমার যা কিছু বলার, তাঁর কাছে-ই বলবো।' বললো মুবী।

'আমাকে না বলে আপনি সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। বলুন, আপনার ফরিয়াদ আমি-ই সুলতানের কাছে পৌঁছিয়ে দেবো। প্রয়োজন মনে করলে তিনি-ই আপনাদের ডেকে নেবেন।' একথা বলে-ই আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে নিজের কক্ষে নিয়ে যান।

উত্তরাঞ্চলের একটি পল্লী এলাকার নাম উল্লেখ করে মুবী বললো— 'দু' বছর আগে সুদানী বাহিনী এ অঞ্চল দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। তাদের দেখার জন্য মহল্লার নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোররা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে আসি। হঠাৎ এক কমাণ্ডার ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে আমার নিকটে এসে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী? আমি আমার নাম জানালে তিনি আমার পিতাকে ডেকে পাঠান। আড়ালে নিয়ে গিয়ে বাবাকে কানে কানে কী যেন বললেন। দূর থেকে এগিয়ে গিয়ে একজন বললো, ইনি তো বোবা ও বধির। শুনে কমাণ্ডার চলে গেলেন।

সন্ধ্যার পর আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত হলো চারজন সুদানী সৈনিক। কোন কথা না বলে তারা আমাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে কমাণ্ডারের হাতে অর্পণ করে। কমাণ্ডারের নাম বালিয়ান। তিনি আমাকে সঙ্গে করে আনেন এবং তার হেরেমে আবদ্ধ করে রাখেন। আরো চারটি মেয়ে ছিলো তার কাছে। আমি তাকে বললাম, আপনি সেনাবাহিনীর একজন কমাণ্ডার। আমাকে যখন নিয়ে-ই

এলেন, তো বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিন। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। বিয়ে ছাড়া-ই আমাকে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

দু'টি বছর তিনি আমাকে সঙ্গে রাখলেন। সুদানীদের সাম্প্রতিক বিদ্রোহের পর তিনি পালিয়ে গেছেন। পরে মারা গেছেন, না জীবিত আছেন জানি না। আপনার সৈন্যরা তার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আমাদের সব ক'টি মেয়েকে এই বলে বের করে দেয় যে, যাও তোমরা এখন মুক্ত।

আমি আমার বাড়িতে চলে গেলাম। আমার পিতা আমাকে বিয়ে দিতে চাইলেন; কিন্তু কেউ আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এলো না। মানুষ বলছে, আমি হেরেমের চোষা হাড়, চরিত্রহীনা, বেশ্যা। সমাজ আমাকে এক ঘরে করে রেখেছে। এখন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার।

নিরূপায় হয়ে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ইনি আমাকে নিয়ে সরাইখানায় এসে উঠেছেন। শুনলাম, সুলতান নাকি সুদানীদের জমি ও বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসিত করছেন। আমাকে আপনি আপনাদের-ই কমাণ্ডার বালিয়ানের রক্ষিতা বা স্ত্রী মনে করে একখণ্ড জমি এবং মাথা গোঁজার জন্য একটি ঘর প্রদান করুন। অন্যথায় আত্মহত্যা কিংবা পতিতাবৃত্তি ছাড়া আমার আর কোন পথ থাকবে না।'

'সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়া-ই যদি আপনি জমি-বাড়ি পেয়ে যান, তবু কি আপনার সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে হবে?' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'হ্যা, তারপরও আমি সুলতানকে এক নজর দেখতে চাই। একে আপনি আমার আবেগও বলতে পারেন। আমি সুলতানকে শুধু এ কথাটা জানাতে চাই যে, তার সালতানাতে নারীরা তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বিত্তশালী ও শাসক গোষ্ঠীর কাছে বিয়ে এখন প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি নারীর সম্ভ্রম-সতীত্ব রক্ষা করুন এবং হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে আনুন। একথাগুলো সুলতানকে জানাতে পারলে হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে।'

মিগনানা মারিউস এমন নির্লিপ্তের মত বসে আছে, যেন আসলেই কোন কথা তার কানে ঢুকছে না। আলী বিন সুফিয়ান মুবীকে বললেন, ঠিক আছে, সুলতানের বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। বৈঠক শেষ হলে আমি তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবো। একথা বলেই তিনি দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে যান।

ফিরে আসেন অনেক বিলম্বে। এসে বললেন, আপনারা আরেকটু বসুন, আমি সুলতানের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আসছি। আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীর কক্ষে প্রবেশ করেন; কথা বলেন অনেকক্ষণ। তারপর বেরিয়ে এসে

মুবীকে বললেন, ঠিক আছে, এবার পিতাকে নিয়ে আপনি সুলতানের কক্ষে চলে যান; সুলতান আপনাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। বলেই তিনি তাদেরকে সুলতান আইউবীর কক্ষটা দেখিয়ে দেন। সুলতান আইউবীর কক্ষে প্রবেশ করার সময় তারা গভীর দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকায়। সুলতানকে হত্যা করার পর পালাবার পথটা-ই দেখে নিলো বোধ হয়।

কক্ষে সুলতান আইউবী একাকী দাঁড়িয়ে। তিনি মিগনানা মারিউস ও মুবীকে বসালেন। মুবীর প্রতি তাকিয়ে বললেন— 'তোমার বাবা কি জন্মগতভাবেই বোবা ও বধির?'

'জি, মুহতারাম সুলতান! এটা তার জন্মগত ত্রুটি।' জবাব দেয় মুবী।

সুলতান আইউবী বসছেন না। কক্ষময় পায়চারী করছেন আর কথা বলছেন। তিনি বললেন— 'তোমার আর্জি-ফরিয়াদ আমি শুনেছি। তোমাদের ব্যথায় আমিও ব্যথিত। এখানে আমি তোমাদের জমিও দেবো, বাড়িও দেবো। শুনেছি, তুমি নাকি আরো কিছু বলতে চাও? বলো, কী সে কথা?'

'আল্লাহ আপনার মর্যাদা বুলন্দ করুন। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন যে, আমাকে কেউ বিয়ে করছে না। মানুষ আমাকে হেরেমের চোষা হাড্ডি আর নিংড়ানো ছোবড়া, চরিত্রহীনা, বেশ্যা বলে আখ্যা দেয়। তারা বলে, আমার পিতা নাকি আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এখন আপনি আমাকে জমি-ঘর তো দেবেন ঠিক, কিন্তু আমার একজন স্বামীরও প্রয়োজন, যিনি আমার ইজ্জত-সম্ভ্রমের সংরক্ষণ করবেন। অভয় দিলে আপনার নিকট আমি এ আর্জিও পেশ করবো যে, বিয়ের ব্যবস্থা করতে না পারলে আপনি-ই আমাকে আপনার হেরেমে রেখে দিন। আপনি আমার বয়স, রূপ-যৌবন ও দেহ-গঠন দেখুন। বলুন, আমি কি আপনার যোগ্য নই?'

একথা বলেই মুবী এক হাত মিগনানা মারিউসের কাঁধে রেখে অপর হাত নিজের বুকে স্থাপন করে এবং চোখে সুলতান আইউবীর প্রতি ইঙ্গিত করে।

মিগনানা মারিউস দু' হাত একত্র করে সুলতান আইউবীর প্রতি বাড়িয়ে ধরে, যেন সে বলছে, আপনি দয়া করে আমার মেয়েটাকে বরণ করে নিন।

'আমার কোন হেরেম নেই বেটী! আমি রাজ্য থেকে হেরেম, পতিতালয় এবং মদ উৎখাত করছি।' বললেন সুলতান আইউবী।

কথা বলতে বলতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিজের পকেট থেকে একটি মুদ্রা বের করলেন এবং হাতে নিয়ে মুদ্রাটি নাড়াচাড়া করছেন আর 'আমি নারীর ইজ্জতের মুহাফিজ হতে চাই' বলতে বলতে দু'জনের পিছনে চলে যান এবং হঠাৎ

মুদ্রাটি হাত থেকে ফেলে দেন। 'টন' করে একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে মিগনানা মারিউস চকিতে পেছন ফিরে তাকিয়েই অমনি মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিজের কোমরবন্ধ থেকে একটি খঞ্জর বের করে আগাটা মিগনানা মারিউসের ঘাড়ে তাক করে ধরে মুবীকে বললেন— 'লোকটা আমার ভাষা বুঝে না। একে বলো, হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিতে। তোমার বাবাকে বলো, যেন একটুও নড়াচড়া না করে। অন্যথায় তোমরা দু'জন এক্ষুনি লাশে পরিণত হবে।'

ভয়ে-বিস্ময়ে মুবীর চোখ দু'টো কোঠর থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তারপরও মেয়েটি অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাবার চেষ্টা করে এবং বলে— 'আমার বাবাকে ভয় দেখিয়ে আপনি আমাকে কব্জা করতে চাচ্ছেন কেন? আমি তো নিজেই নিজেকে আপনার সামনে পেশ করে দিলাম।'

সুলতান আইউবীর খঞ্জরের আগা মিগনানা মারিউসের ঘাড়েই ধরা। সে অবস্থায়-ই তিনি বললেন— 'যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তুমি আমার মুখোমুখি হয়েছিলে, তখন আমার ভাষা বলোনি। এখন এতো দ্রুত আমার ভাষাটা শিখে ফেললে তুমি ....! একে এক্ষুণি অস্ত্র ফেলতে বলো।'

মুবী তার ভাষায় মিগনানা মারিউসকে কি যেন বললো। সাথে সাথে সে চোগার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটি খঞ্জর বের করলো। লম্বায় ঠিক সুলতান আইউবীর খঞ্জরের সমান। সুলতান আইউবী হাত থেকে তার খঞ্জরটা নিয়ে নেন এবং ঘাড়ে তাক করে নিজের খঞ্জরটা সরিয়ে ফেলে বললেন— 'অপর ছয়টি মেয়ে কোথায়?'

'আপনি আমাকে চিনতে ভুল করেছেন মহামান্য সুলতান! আমার সঙ্গে আর কোন মেয়ে নেই। আপনি কোন্ মেয়েদের কথা বলছেন?' কম্পিত কণ্ঠে বললো মুবী।

সুলতান আইউবী বললেন— 'আল্লাহ আমাকে চোখ দিয়েছেন, মেধাও দিয়েছেন। একবার কাউকে দেখলে তার চেহারাটা আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়ে যায়। অর্ধেকটা নেকাবে ঢাকা তোমার এই মুখাবয়ব এর আগেও আমি দেখেছি। তোমরা যে কাজে এসেছো, তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে সে মেধা দেননি। সরাইখানায় তোমরা দু'জন ছিলে স্বামী-স্ত্রী। এখানে এসে হয়েছো পিতা-কন্যা। বাইরে ঘোড়ার নিকট দণ্ডায়মান তোমাদের সঙ্গীটিও তোমাদের ভৃত্য নেই। লোকটি এখন আইউবীর বন্দী।

কৃতিত্বটা আলী বিন সুফিয়ানের। মুবী তাঁকে বলেছিলো, তারা সরাইখানায় এসে উঠেছে। দু'জনকে নিজের কক্ষে বসিয়ে রেখে বের হয়েই ঘোড়ায় চড়ে

ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে। মুবী ও মিগনানা মারিউসের আকৃতির বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞেস করলে কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা দু'জন স্বামী-স্ত্রী। সঙ্গের লোকটি তাদের ভৃত্য। তারা আরো জানায়, এখানে উঠে লোক দু'টো বাজার থেকে কিছু কাপড় ক্রয় করে এনেছিলো। তন্মধ্যে মেয়েটির বোরকার ন্যায় চোগা এবং জুতাও ছিলো।

এতটুকু তথ্য পাওয়ার পর আলী বিন সুফিয়ান আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তিনি কক্ষের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করেন। তল্লাশী চালিয়ে এমন কিছু বস্তু উদ্ধার করেন, যা তাঁর সন্দেহকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করে।

সুলতান আইউবীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের মতলব বুঝে ফেলেন আলী বিন সুফিয়ান। তিনি ফিরে এসে তাদের ঘোড়াগুলোকে নিরীক্ষা করে দেখে গিয়েছিলেন। বেশ উন্নত জাতের ঘোড়া। সরাইখানার কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করে আলী বিন সুফিয়ান জানতে পারেন, এরা তিনজন এসেছিলো উটে চড়ে। মেয়েটি এই ঘোড়া দু'টো সংগ্রহ করায়। বলেছিলো, আমাদের অতি উন্নত ও দ্রুতগামী দু'টো ঘোড়ার প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ আরো জানায়, মেয়েটির স্বামী বোবা। ভৃত্যটিও বোধ হয় কথা বলতে পারে না। এখানে এসে অবধি দু'জনের কেউ কারো সঙ্গে কথা বলেনি। যা বলেছে সব মেয়েটিই বলেছে।

আলী বিন সুফিয়ান যখন ফিরে আসেন, ততক্ষণে বৈঠক শেষ হয়ে গেছে। সোজা চলে যান তিনি সুলতানের কাছে। তাঁকে আগন্তুকদের প্রসঙ্গে অবহিত করেন, তারা তাঁকে যা বলেছে তা-ও শোনান এবং ইতিমধ্যে সরাইখানা থেকে যেসব তথ্য এনেছেন, তা-ও সুলতানের কানে দেন। তাদের কক্ষ তল্লাশী করে সন্দেহজনক যা যা পেয়েছেন, তা-ও দেখান এবং নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আমি নিশ্চিত, তারা আপনাকে হত্যা করতে এসেছে। সেজন্য-ই আপনার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করা তাদের এতো প্রয়োজন। আমার প্রবল ধারণা, তারা পরিকল্পনা করে এসেছে, আপনাকে খুন করে বেরিয়ে যাবে এবং অন্যরা টের পেতে না পেতে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে ততক্ষণে শহর ত্যাগ করে চলে যাবে। এ-ও হতে পারে, এই সুন্দরী মেয়েটির ফাঁদে ফেলে আপনার শয়নকক্ষে-ই তারা আপনাকে হত্যা করতে চায়।

ভাবনায় পড়ে গেলেন সুলতান। ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন— 'এখনই ওদেরকে গ্রেফতার করো না; আগে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে সুলতানের কক্ষে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে দরজা ঘেঁষে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর কমাণ্ডারকে ডেকে বললেন— ঐ ঘোড়া দু'টোকে আমাদের ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে, যিনগুলো খুলে রাখ

আর সঙ্গের লোকটাকে তোমাদের প্রহরায় বসিয়ে রাখো। তল্লাশী করে দেখো, লোকটার সঙ্গে অস্ত্র আছে কিনা। থাকলে নিয়ে নাও।

নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হলো। মিগনানা মারিউসের সঙ্গী গ্রেফতার হলো, তল্লাশী নেয়া হলো। পোশাকের মধ্যে লুকানো একটি খঞ্জর পাওয়া গেলো। ঘোড়া দু'টোও জব্দ করা হলো।

সুলতান আইউবী তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে হাত থেকে একটি মুদ্রা নীচে ফেলে দিয়ে নিশ্চিত হলেন যে, মেয়েটির সঙ্গের লোকটি বধির নয়। মুদ্রাপতনের শব্দ হওয়া মাত্র সে চকিতে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলো।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী গম্ভীর কণ্ঠে মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তাকে বলো, আমার জীবন খৃষ্টানদের হাতে নয়– জীবন আমার খোদার হাতে।'

মুবী তার নিজের ভাষায় মিগনানা মারিউসকে কথাটা বললে সে চমকিত হয়ে মুবীকে কী যেন বললো। মুবী সুলতান আইউবীকে বললেন, ইনি জিজ্ঞেস করছেন, আপনারও কি খোদা আছেন, মুসলমানও কি খোদায় বিশ্বাস করে?

সুলতান আইউবী বললেন— 'তাকে বলো, মুসলমান সেই খোদাকে বিশ্বাস করে, যিনি নিজে সত্য এবং সত্যের অনুসারীদের ভালবাসেন। আমাকে কে বলে দিলো যে, তোমরা আমাকে হত্যা করতে এসেছো? বলেছেন আমার খোদা। তোমার খোদা যদি সত্য হতো, তাহলে তোমার খঞ্জর আমাকে শেষ করে ফেলতো। কিন্তু আমার খোদা তোমার হাতের খঞ্জরটি আমার হাতে এনে দিয়েছেন। এই বলে তিনি পার্শ্ব থেকে একটি তরবারী ও কিছু জিনিসপত্র বের করে তাদের দেখিয়ে বললেন— 'এ তরবারী ও এই জিনিসগুলো তোমাদের। সমুদ্রের ওপার থেকে তোমরা এগুলো নিয়ে এসেছিলে। কিন্তু তোমার পৌঁছার আগেই এগুলো আমার কাছে পৌঁছে গেছে।'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠে দাঁড়ায় মিগনানা মারিউস। চোখ দু'টো কোঠর থেকে বেরিয়ে এসেছে তার। এ পর্যন্ত যতো কথা হয়েছে, সব হয়েছে মুবীর মাধ্যমে। এবার নিজেই কথা বলতে শুরু করে সে। খোদা সম্পর্কে সুলতান আইউবীর কথাগুলো শুনে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে নিজের ভাষায় বলে ওঠে— 'এ লোকটিকে সঠিক বিশ্বাসের অনুসারী বলে মনে হয়। আমি তার জীবন নিতে এসেছিলাম; কিন্তু এখন আমার-ই জীবন তার হাতে। তাকে বলো, তোমার বুকে যে খোদা আছেন, তাকে আমাকে একটু দেখাও, আমি তার সেই খোদাকে এক নজর দেখতে চাই, যিনি বলে দিয়েছেন, আমরা তাঁকে হত্যা করতে এসেছি।'

এত দীর্ঘ আলাপচারিতার সময় নেই সুলতান আইউবীর; নেই প্রয়োজনও। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়াই ছিলো যুক্তিযুক্ত। কিন্তু লোকটাকে বিধ্বস্ত ও বিভ্রান্ত বলে মনে হলো তাঁর কাছে। সুলতানের কাছে মনে হলো, লোকটা পাগল না হলেও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাই মিগনানা মারিউসের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ কথা বলতে শুরু করেন তিনি।

ইত্যবসরে ভিতরে প্রবেশ করেন আলী বিন সুফিয়ান। সুলতান কি হালে আছেন, তিনি দেখতে এসেছেন। সুলতান আইউবী স্মিত হেসে বললেন— 'কোন অসুবিধা নেই আলী! তার থেকে আমি খঞ্জর নিয়ে নিয়েছি।' প্রশান্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বের হয়ে যান আলী বিন সুফিয়ান।

মিগনানা মারিউস মুবীকে বললো, সুলতানকে বলো, আমার দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করার আগে আমি তাঁকে আমার জীবন-কাহিনী শোনানোর একটু সময় চাই। অনুমতি পেয়ে মিগনানা মারিউস আগের রাতে তার কমাণ্ডার ও সঙ্গীদের যে আত্মকাহিনী শুনিয়েছিলো, সুলতান আইউবীকে আনুপুংখ তা শোনায়। সুলতান আইউবী তন্ময় হয়ে শ্রবণ করেন তার সেই করুণ কাহিনী। তারপর যীশুখৃষ্টের প্রতিকৃতির প্রতি, কুমারী মরিয়মের ছবির প্রতি এবং পাদ্রীদের মাধ্যম ছাড়া যে খোদার সঙ্গে কথা বলা যায় না, তার প্রতি তীব্র বিরাগ প্রকাশ করে সে বললো— 'আমার মৃত্যুর আগে আপনি আপনার খোদার একটি ঝলক দেখিয়ে দিন। আমার খোদা আমার পুত্র-কন্যাদের না খাইয়ে মেরে ফেলেছে, কেড়ে নিয়েছে আমার মায়ের দৃষ্টিশক্তি। মদ্যপ হায়েনাদের হাতে তুলে দিয়েছে আমার নিষ্পাপ সুন্দরী বোনকে। আর ত্রিশটি বছরের জন্য আমাকে নিক্ষেপ করেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। সেখান থেকে বের হয়ে এখন আমি নিপতিত হয়েছি মৃত্যুর মুখে। মহামান্য সুলতান! আমার জীবন এখন আপনার হাতে। আমায় সত্য খোদাকে একটু দেখিয়ে দিন, আমি তাঁর সমীপে ফরিয়াদ জানাবো, ন্যায় বিচার প্রার্থনা করবো।'

সুলতান আইউবী বললেন— 'তোমার জীবন আমার হাতে নয়– আমার আল্লাহর হাতে। অন্যথায় এতক্ষণে থাকতে তুমি আমার জল্লাদের কব্জায়। যে খোদা তোমার থেকে আমার তরবারীকে ফিরিয়ে রেখেছেন, তার দর্শন লাভে আমি তোমায় ধন্য করবো। কিন্তু তোমাকে সে খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অন্যথায় তিনি তোমার আকুতি শুনবেন না। ন্যায় বিচারও পাবে না কোনদিন।

সুলতান আইউবী মিগনানা মারিউসের খঞ্জরটি ছুঁড়ে মারেন তার কোলে। নিজে তার কাছে গিয়ে পিঠটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। মুবীকে

উদ্দেশ করে বললেন— 'তাকে বলো, আমি আমার জীবনটা তার হাতে অর্পণ করছি। পিঠে খঞ্জর বিদ্ধ করে আমাকে হত্যা করতে বলো।'

খঞ্জরটি হাতে তুলে নেয় মিগনানা মারিউস। নেড়ে-চড়ে গভীর দৃষ্টিতে দেখে অস্ত্রটি। দৃষ্টি বুলায় সুলতান আইউবীর পিঠে। তারপর উঠে ধীরে ধীরে চলে যায় সুলতান আইউবীর সামনে। তাঁকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিরীক্ষা করে দেখে। হাতটা কেঁপে উঠে মিগনানা মারিউসের। হাতের খঞ্জরটি রেখে দেয় সুলতানের পায়ের উপর। বসে পড়ে হাটু গেড়ে। সুলতানের ডান হাতটা টেনে ধরে চুমু খেয়ে কেঁদে উঠে হাউমাউ করে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে মুবীকে বলে, জিজ্ঞেস করো, ইনি নিজেই কি খোদা, নাকি নিজের বুকের মধ্যে খোদাকে বেঁধে রেখেছেন। তাঁর খোদাকে আমায় একটু দেখাতে বলো।'

মিগনানা মারিউসের দু' বাহু ধরে তুলে দাঁড় করান সুলতান আইউবী। বুকে জড়িয়ে নিয়ে নিজ হাতে মুছে দেন তার বিগলিত অশ্রুধারা।

মিগনানা মারিউস একজন বিভ্রান্ত মানুষ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার মনে ভরে দেয়া হয়েছিলো প্রচণ্ড ঘৃণা, ইসলামের বিরুদ্ধে ঢেলে দেয়া হয়েছিলো বিষ। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে সে নিজ ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে। এক পর্যায়ে যে বিষয়টি তাকে এম্‌নি এক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামিয়েছে, তা এক প্রকার পাগলামী ও তৃষ্ণা। সুলতান আইউবীর দৃষ্টিতে সে নিরপরাধ। কিন্তু তিনি লোকটাকে মুক্তি না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে মুবী রীতিমত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি মেয়ে, জঘন্য এক গুপ্তচর। যে সাতটি মেয়ে সুদানীদের নিকট খৃষ্টানদের বার্তা নিয়ে এসেছিলো এবং সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে সুদানীদের বিদ্রোহে নামিয়েছিলো, মুবী তাদের একজন। মুবী ইসলামী সালতানাতের দুশমন, দেশের শত্রু। ইসলামী আইন তাকে ক্ষমা করে না।

মুবী ও মিগনানা মারিউসকে আলী বিন সুফিয়ানের হাতে সোপর্দ করেন সুলতান আইউবী। জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধ স্বীকার করেছে দু'জন-ই। স্বীকার করেছে, তারা-ই রসদ কাফেলা লুট করেছে, বন্দী গুপ্তচর মেয়েদের তারা-ই মুক্ত করে নিয়েছে। রক্ষী বাহিনী এবং বালিয়ান ও তার সঙ্গীদেরও হত্যা করেছে তারা-ই।

জিজ্ঞাসাবাদ চলে একটানা তিনদিন। এ সময়ে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যায় মিগনানা মারিউসের মস্তিষ্ক। সে সুলতান আইউবীকে জিজ্ঞেস করে— 'মুবীকে মুসলমান বানিয়ে আপনার হেরেমে স্থান দিয়েছেন কি?'

'আজ সন্ধ্যায় আমি তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবো।' কিছুক্ষণ মৌন থেকে জবাব দেন সুলতান আইউবী।

সন্ধ্যার সময় সুলতান আইউবী মিগনানা মারিউসকে সঙ্গে করে খানিক দূরে একস্থানে নিয়ে যান। সেখানে পাশাপাশি বিছানো লম্বা দু'টি তক্তা। সাদা চাদর দিয়ে কি যেন ঢেকে রাখা আছে তার উপরে। একটি কোণ ধরে টান দিয়ে চাদরটি সরিয়ে ফেলেন সুলতান আইউবী। অকস্মাৎ ফ্যাকাশে হয়ে যায় মিগনানা মারিউসের চেহারা। চোখের সামনে একটি তক্তায় মুবীর লাশ, অপরটিতে তার সঙ্গীর মৃতদেহ। সুলতান আইউবী মুবীর মাথা ধরে টান দেন সামনের দিকে। ধড় থেকে আলাদা হয়ে সরে আসে মাথাটা। তারপর মিগনানা মারিউসের প্রতি তাকিয়ে বলেন, আমি মেয়েটাকে ক্ষমা করতে পারিনি। তাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছো, যাতে রূপের ফাঁদে পড়ে আমি আমার ঈমান হারাই। কিন্তু তার দেহটা আমার কাছে মোটেও ভালো লাগেনি । এ একটি অপবিত্র দেহ। তবে হ্যাঁ, এখন মেয়েটাকে বেশ ভালো লাগছে। আমি দু'আ করি, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

'কিন্তু আমাকে ক্ষমা করলেন কেন সুলতান!' আবেগাপ্লুত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে মিগনানা মারিউস।

'কারণ, তুমি হত্যা করতে এসেছিলে আমাকে। আর ও এসেছিলো আমার জাতির চরিত্র ধ্বংস করতে। তোমার সঙ্গীটিও বুঝে-শুনে পরিকল্পনা মোতাবেক এসেছিলো মানুষ খুন করতে। আর তুমি এসেছো, আমার রক্ত ঝরিয়ে আল্লাহর দর্শন লাভ করতে।' জবাব দেন সুলতান আইউবী।

অল্প ক'দিন পর-ই সাইফুল্লাহ'য় পরিণত হয় মিগনানা মারিউস। পরবর্তীতে সুলতান আইউবীর দেহরক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে সে।

সুলতান আইউবীর মৃত্যুর পর সাইফুল্লাহ বাকী জীবনের সতেরটি বছর কাটিয়ে দেয় সুলতানের কবরের পার্শ্বে। আজ কেউ জানে না, সাইফুল্লাহ'র সমাধি কোথায়।

আরেক বউ

কায়রো থেকে দেড়-দু' মাইল দূরবর্তী একটি অঞ্চল। এখানকার একদিকে উঁচু-নীচু বালির টিলা। অপর তিনদিকে ধু-ধু বালুকা প্রান্তর।

আজ লাখো জনতার পদভারে মুখরিত-প্রকম্পিত এ অঞ্চলটি। চারদিক থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় এসে ভীড় জমিয়েছে অগণিত মানুষ। কেউ এসেছে উটে চড়ে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ বা এসেছে গাধার পিঠে করে। পায়ে হেঁটে এসেছে অসংখ্য।

চার-পাঁচদিন ধরে মানুষ আসছে আর আসছে। সমবেত হচ্ছে বিশাল-বিস্তৃত এই মরুপ্রান্তরে। কায়রোর বাজারগুলোতে লোকের ভীড় বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে জৌলুস। সরাইখানাগুলোতে তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

দূর-দূরান্ত থেকে এরা এসেছে সরকারী এক ঘোষণা শুনে। মিসরী ফৌজের সামরিক মহড়া হবে এখানে। ঘোড়-সওয়ারী, শতর-সওয়ারী, ধাবমান উট-ঘোড়ার পিঠ থেকে তীরান্দাজি ইত্যাদি রণকৌশলের মহড়া প্রদর্শন করবে মিসরী সৈন্যরা।

ঘোষণাটি প্রচারিত হয়েছে মিসরের গভর্নর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পক্ষ থেকে। তাঁর উদ্দেশ্য দু'টি। এক. এতে সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার উৎসাহ পাবে। দুই. এখনো যারা সামরিক শক্তিতে সুলতান আইউবীকে দুর্বল মনে করে, তাদের সংশয় দূর হবে।

এ সামরিক মহড়ার প্রতি জনসাধারণের এত আগ্রহ দেখে সুলতান আইউবী বেজায় খুশী। কিন্তু খানিকটা অস্থিরচিত্ত বলে মনে হচ্ছে আলী বিন সুফিয়ানকে। তিনি সুলতানের সামনে নিজের এ অস্থিরতার কথা ব্যক্তও করেছেন। জবাবে সুলতান আইউবী হাসিমুখে বললেন— 'আরে, মহড়ায় অংশগ্রহণকারী লোকদের সংখ্যা যদি এক লাখ হয়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে আমরা পাঁচ হাজার সৈন্যও তো পাবো।'

'আমীরে মুহতারাম! আমি তো বিষয়টাকে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। আপনার ধারণা অনুযায়ী মহড়ায় অংশগ্রহণকারী লোকদের সংখ্যা যদি এক লাখ হয়, তবে তাতে গুপ্তচর থাকবে অন্তত এক হাজার। পাড়া গাঁ থেকে অসংখ্য

মহিলাও আসছে। তাদের বেশীর ভাগ-ই সুদানী ও শ্বেতাঙ্গী। ফলে খৃষ্টান মহিলারা তাদের মধ্যে লুকিয়ে যেতে পারবে অনায়াসেই।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'এ সমস্যাটা আমিও ভালো করেই বুঝি। কিন্তু তুমি তো জানো, আমি যে মেলার আয়োজন করেছি, তা কতো জরুরী। তোমার গোয়েন্দা বিভাগকে তুমি আরো সতর্ক করো।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'হ্যাঁ, তা আমি করবো অবশ্যই। এই মেলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার অস্থিরতার কথা আপনাকে পেরেশান করার জন্য বলিনি। এই মেলা কি বিপদ সঙ্গে নিয়ে আসছে, আমি আপনাকে তা-ই শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কায়রোতে অস্থায়ী পতিতালয় খোলা হয়েছে, যা কিনা আমোদীদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে সারা রাত। অনেকে শহরের বাইরে তাঁবু গেড়েছে। আমার গুপ্তচররা আমাকে তথ্য দিয়েছে, তাঁবুগুলোর মধ্যে জুয়াড়ী এবং বেশ্যা মেয়েদের আস্তানাও রয়েছে। আগামীকাল মেলার প্রথম দিন। নর্তকী-গায়িকারা মেলায় অংশ নেয়া নিরীহ লোকদের পকেট উজাড় করে নিচ্ছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'মেলা শেষ হয়ে গেলে এসব নোংড়ামীরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। এখনি এসবের উপর আমি কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চাই না। মিসরের মানুষের বর্তমান নৈতিক অবস্থা ভালো নয়। নাচ-গান, বেশ্যাবৃত্তি দু'-একদিনে নির্মূল করা যায় না। এ মুহূর্তে আমার প্রয়োজন বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী। আমার ফৌজের সংখ্যা বাড়াতে হবে। তুমি তো জানো আলী! আমাদের সৈন্যের কতো প্রয়োজন। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বৈঠকে স্পষ্ট করে-ই আমি একথা ঘোষণা দিয়েছি।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আপনার বক্তব্যে আমার দ্বিমত নেই। তবে আমীরে মুহতারাম! আমার গুপ্তচরদের দৃষ্টিতে আমাদের সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অর্ধেক-ই আমাদের ওফাদার নয়। আপনি ভালো করে-ই জানেন, এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আপনাকে এই গদিতে দেখতে চায় না। আর অবশিষ্ট যারা আছে, তাদের মনও সুদানীদের সঙ্গে। তাদের প্রত্যেকের পিছনে আমি একজন করে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছি। তারা আমাকে এদের তৎপরতা ও গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আচ্ছা, কারো কোন ভয়ঙ্কর তৎপরতা চোখে পড়েছে কি?' কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন সুলতান আইউবী।

'এরা আপন ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে রাতের আঁধারে বিভিন্ন সন্দেহজনক তাঁবুতে এবং পতিতালয়ে চলে যায়। দু'জন কর্মকর্তা সম্পর্কে আমি

এমন রিপোর্টও পেয়েছি যে, তারা নিজ ঘরে নর্তকী ডেকে এনে আসর বসায়। এ যাবত এর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তবে আমীরে মুহতারাম! দশদিন আগে রোম উপসাগরের কূলে যে রহস্যময় পালতোলা নৌকাটি দেখা গিয়েছিলো, আমার সব চিন্তা এখন তাকে নিয়ে-ই ঘুরপাক খাচ্ছে। বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

ঘটনাটি বিস্তারিত জানতে চান সুলতান আইউবী। আলী বিন সুফিয়ান বললেন–

'রোম উপসাগরের তীর থেকে আমাদের সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নিয়ে আসার সময় সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য বিভিন্ন স্থানে দু' দু'জন করে সৈন্য মোতায়েন করে রাখা হয়েছিলো। জেলে ও যাযাবর বেশে আমিও আমার ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কয়েকজন লোক রেখে এসেছিলাম। খৃষ্টানরা ইচ্ছে করলে-ই যাতে হঠাৎ করে আক্রমণ করে বসতে না পারে এবং ওদিক থেকে কোন খৃষ্টান চর যাতে মিসরে ঢুকতে না পারে, তার জন্যই ছিলো আমার এ আয়োজন। কিন্তু সমুদ্রতীর অতি দীর্ঘ হওয়ার কারণে সর্বত্র নজর রাখা সম্ভব হয়নি। দশদিন আগে একস্থান থেকে একটি পালতোলা নৌকা বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিলো। সম্ভবত নৌকাটি কোন এক রাতের আঁধারে ঢুকে গিয়েছিলো।

নৌকাটি যেতে দেখে ঘোড়া ছুটায় আমাদের দু'জন অশ্বারোহী। কিন্তু যে স্থান থেকে নৌকাটি বেরিয়েছিলো, সেখানে গিয়ে তারা কিছু-ই দেখতে পেলো না। তীরে কোন মানুষ নেই, নৌকা চলে গেছে মাঝ নদীতে। নৌকা ও পালের গঠনে তাদের মনে হয়েছে নৌকাটি মিসরী জেলেদের নয়– সমুদ্রের ওপারের হবে। আরোহীদ্বয় চারদিক ঘুরে-ফিরে কোন তথ্য বের করতে পারেনি। এ সংবাদ তারা কায়রোতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো।'

ঘটনার বিবরণ দিয়ে আলী বিন সুফিয়ান বললেন, মেলা অনুষ্ঠানের কথা আমরা দেড় মাস ধরে প্রচার করছি। দেড় মাসে এ সংবাদ ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং সেখান থেকে গুপ্তচর আগমন করা মোটেই বিচিত্র নয়। আমার তো প্রবল ধারণা, আমোদীদের সঙ্গে খৃষ্টানদের বহু গুপ্তচরও মেলায় ঢুকে পড়েছে।

কায়রোতে মেয়ে ক্রয়-বিক্রয় এখন একটি স্বতন্ত্র পেশা। সুলতানের বুঝতে নিশ্চয় কষ্ট হবে না যে, যারা এই মেয়েদের ক্রয় করে, তারা সমাজের সাধারণ মানুষ নয়। কায়রোর বড় বড় ব্যবসায়ী, আমাদের প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তারাই হলো মেয়েদের খরিদ্দার। আর বিক্রি হচ্ছে যেসব মেয়ে, তাদের মধ্যে যে খৃষ্টান গুপ্তচরও রয়েছে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

এসব রিপোর্টে সুলতান আইউবী বিচলিত হলেন না মোটেই। রোম উপসাগরে খৃষ্টানদের পরাস্ত করা হলো প্রায় এক বছর কেটে গেছে। আলী বিন সুফিয়ান সমুদ্রোকূলে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক বিছিয়ে রেখেছেন। তা শতভাগ নির্ভরযোগ্য না হলেও তিনি এ তথ্য পেয়ে গেছেন যে, খৃষ্টানরা মিসরে বহু গুপ্তচর ও সন্ত্রাসী ঢুকিয়ে রেখেছে। তবে মিসরে তাদের পরিকল্পনা কী, সে ব্যাপারে এখনো কিছু জানা যায়নি। বাগদাদ ও দামেশ্‌ক থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা গেছে; খৃষ্টানরা ওদিকে-ই বেশী চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। বিশেষত সিরিয়ায় তারা মুসলমান শাসকদের ভোগ-বিলাস ও মদ-নারীতে মত্ত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর বর্তমানে এখন-ই তারা সরাসরি সংঘাতে জড়িত করার সাহস পাচ্ছে না। রোম উপসাগরে যখন সুলতান আইউবী হাজার হাজার সৈন্যসহ খৃষ্টানদের নৌবহরকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন, ঠিক তখন নুরুদ্দীন জঙ্গী আরবে খৃষ্টানদের সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে সন্ধিচুক্তিতে বাধ্য করেছিলেন এবং জিযিয়া উসুল করে নিয়েছিলেন। সেই লড়াইয়ে বহু খৃষ্টান সুলতান জঙ্গীর হাতে বন্দী হয়েছিলো। রেনাল্ট নামক এক খৃষ্টান সালারও ছিলো তাদের মধ্যে। সুলতান জঙ্গী তাদেরকে মুক্তি দেননি। কারণ, ইতিপূর্বে খৃষ্টানরা মুসলমান কয়েদীদের শহীদ করেছিলো। তাছাড়া একে একে অনেক প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করে চলেছে খৃষ্টানরা।

সুলতান আইউবীর স্বপ্ন, খৃষ্টানদের হাত থেকে ফিলিস্তীন উদ্ধার করতে হবে এবং আরব ভূখণ্ডকে ক্রুসেডারদের নাপাক পদচারণা থেকে পবিত্র করতে হবে। পাশাপাশি তিনি মিসরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও মজবুত করতে চান। তাই একই সময়ে নানামুখী সেনা অভিযান পরিচালনা এবং শত্রুদের চতুর্মুখী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন বিপুলসংখ্যক সৈন্য।

সুলতানের পরিকল্পনা অনুপাতে মিসরের সেনাবাহিনীতে নতুন সেনাভর্তির গতি অনেক ধীর। এর কারণ, বিলুপ্ত সুদানী বাহিনীর আইউবী বিরোধী প্রোপাগাণ্ডা।

সুলতান আইউবীর যে বাহিনীটি এখন আছে, তার কিছু সৈন্য মিসর থেকে সংগৃহীত। কিছু সুলতান জঙ্গীর পাঠানো। কিছু আছে, যারা ওফাদারীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিলুপ্ত সুদানী বাহিনী থেকে এসে যোগ দিয়েছে।

মিসরের জনগণ এখনো এ বাহিনীটিকে চোখে দেখেনি। সুলতান আইউবীকেও দেখেনি তারা। তাই মেলার আয়োজন করে সুলতান তাঁর সামরিক কর্মকর্তা ও কমাণ্ডারদের আদেশ দিয়েছেন, যেন তারা মেলায় আগত সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিশে যায় এবং সদাচার ও ভালবাসা দিয়ে তাদের আস্থা অর্জন

করে। সুলতান তাদের স্মরণ করিয়ে দেন, তোমরা জনসাধারণের-ই একজন। আমাদের উদ্দেশ্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাজত্বকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করা এবং তাকে খৃষ্টানদের অরাজকতা থেকে মুক্ত করা।

মেলা শুরু হওয়ার আগের দিন থেকে আলী বিন সুফিয়ান সুলতানকে গুপ্তচরদের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন। তিনি বললেন, আমীরে মুহতারাম! আমার মূলত গুপ্তচরদের কোন ভয় নেই। আমার আসল শঙ্কা সেই মুসলমান ভাইদের, যারা কাফিরদের গোপন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে। এই গাদ্দাররা না থাকলে আমাদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের কোন পরিকল্পনা-ই সফল হতো না। আমি মেলায় যেসব নর্তকীদের দেখতে পাচ্ছি, তাদেরকে আমি ক্রুসেডারদের এক একটি ফাঁদ বলে মনে করি। তবু আমার লোকেরা দিন-রাত সারাক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

'তোমাদের লোকদের বলে দাও, যেন কোন গুপ্তচরকে খুন না করে। যাকেই সন্দেহ হবে, জীবন্ত ধরে নিয়ে আসবে। গুপ্তচর হলো দুশমনের চোখ-কান। আর আমাদের জন্য তারা জবান। ধরে এনে কায়দা মত চাপ সৃষ্টি করতে পারলে খৃষ্টানদের অজানা পরিকল্পনার তথ্য বের করা যাবে।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

মেলা দিবসের ভোরবেলা। বিশাল-বিস্তৃত মাঠের তিন দিক দর্শনার্থীদের ভীড়ে গমগম করছে। সমরডংকা বাজতে শুরু করেছে। অশ্বখুরধ্বনি এমন শোনা যাচ্ছে, যেন তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উর্মিমালা ধেয়ে আসছে। ধুলোয় ছেয়ে গেছে আকাশ।

দু' হাজারেরও অধিক ঘোড়া। প্রথমটি এইমাত্র প্রবেশ করলো মাঠে। আরোহী সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর দু'পার্শ্বে দু'জন পতাকাবাহী। পিছনে রক্ষী বাহিনী। ঘোড়াগুলোর পিঠে ফুলদার চাদর বিছানো। প্রতিটি ঘোড়ার আরোহীর হাতে একটি করে বর্শা। বর্শার চকমকে ফলার সঙ্গে বাধা রঙিন কাপড়ের ছোট একটি ঝাণ্ডা। প্রত্যেক আরোহীর কোমরে ঝুলছে তরবারী। দুল্‌কি চালে চলছে ঘোড়াগুলো। ঘাড় উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বসে আছে আরোহীরা। চেহারায় তাদের বীরত্বের ছাপ। তাদের ভাবভঙ্গিতে নিস্তব্ধতা নেমে আসে দর্শনার্থীদের মধ্যে। প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সকলের উপর।

দর্শনার্থীদের একদল সম্মুখের বৃত্তের উপর দণ্ডায়মান। তাদের পিছনে একদল ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট। তাদের পিছনে যারা আছে, তারা উটের পিঠে বসা। এক একটি উট ও ঘোড়ায় দু' তিনজন করে লোক বসা।

তাদের সম্মুখে এক স্থানে একটি শামিয়ানা টানানো, যার নীচে রাখা আছে কতগুলো চেয়ার। এখানে বসেছেন উঁচু স্তরের দর্শনার্থীবৃন্দ। বড় বড় ব্যবসায়ীও আছেন এদের মধ্যে। আছেন আইউবী সরকারের পদস্থ অফিসার ও দেশের সম্মানীত ব্যক্তিবর্গ। কায়রোর বিভিন্ন মসজিদের ইমামদেরও দেখা যাচ্ছে এখানে। ইমামগণকে বসান হয়েছে সকলের সামনে। কারণ, সুলতান আইউবী ধর্মীয় নেতৃবর্গ এবং আলেমদের এতই শ্রদ্ধা করেন যে, তিনি তাদের উপস্থিতিতে তাদের অনুমতি ছাড়া বসেনও না।

এক পার্শ্বে উপবিষ্ট সুলতান আইউবীর উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা আল-বারক। তার-ই পাশে বসা অতিশয় রূপসী এক তরুণী। মেয়েটির সঙ্গে বসা ষাটোর্ধ্ব বয়সের এক বৃদ্ধ। দেখতে তাকে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বলে মনে হয়। আল-বারক একাধিকবার তাকান মেয়েটির প্রতি। মেয়েটিও একবার তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুখ টিপে হাসে। বাঁকা চোখে দৃষ্টিপাত করে বৃদ্ধের প্রতি, সঙ্গে সঙ্গে উবে যায় তার মুখের হাসি।

দর্শনার্থীদের সম্মুখে অশ্বারোহীদের মহড়া শেষ হয়ে যায়। আসে উষ্ট্রারোহী বাহিনী। উটগুলোও ঘোড়ার ন্যায় রঙিন চাদর দ্বারা সজ্জিত। প্রত্যেক আরোহীর হাতে একটি করে লম্বা বর্শা, যার ফলার সামান্য নীচে বাধা পতাকার ন্যায় তিন ইঞ্চি চওড়া এবং দু' ফিট লম্বা দু' রঙা কাপড়। প্রত্যেক আরোহীর কাঁধে ঝুলছে একটি করে ধনুক। উটের যিনের সঙ্গে বাধা আছে রঙিন তূনীর। অপূর্ব এক আকর্ষণীয় ঢংয়ে বসে আছে আরোহীরা। অশ্বারোহীদের দৃষ্টিও সম্মুখপানে নিবদ্ধ। ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে না একজনও। দর্শনার্থীদের উট আর এই বাহিনীর উট দেখতে এক রকম হলেও সামরিক বিন্যাস, ফৌজী চলন ইত্যাদির কারণে এদেরেকে ভিন্ন জগতের ভিন্ন প্রকৃতির বলে মনে হচ্ছে।

পার্শ্বে উপবিষ্ট রূপসীর প্রতি আবার চোখ ফেলে আল-বার্‌ক। এবার পূর্ণ চোখাচোখি হয়ে যায় দু'জনে। একজনের আখিযুগল আটকে গেছে যেন অপরজনের চেহারায়। যাদুময়ী মেয়েটির দু' চোখে বিদ্যুতের ঝলক অনুভব করে যেন আল-বার্‌ক।

স্বলাজ হাসির রেখা ফুটে উঠে মেয়েটির ওষ্ঠাধরে। হঠাৎ যেন তার সম্বিৎ ফিরে আসে। তাকায় অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট বৃদ্ধের প্রতি। মুহূর্তে তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

ঘরে বউ আছে আল-বার্‌কের। চার সন্তানের বাবা। কিন্তু এ মুহূর্তে বউ-এর কথা মনে নেই লোকটির। দিব্যি ভুলে গেছে সব। মেয়েটি তার এতোই কাছে বসা যে, তার রেশমী ওড়না উড়ে এসে আল-বার্‌কের বুকে এসে ঝাপটা দেয়

কয়েকবার। একবার নিজের হাতে সরিয়ে নিয়ে 'মাফ করবেন' বলে ক্ষমা প্রার্থনাও করে মেয়েটি। আল-বার্ক মুখ টিপে হাসে– বলে না কিছু-ই।

উষ্ট্রারোহীদের পিছন দিয়ে আসছে পদাতিক বাহিনী। এদের মধ্যে আছে তীরান্দাজ ও তরবারীধারী ইউনিট। এদের সকলের চলার ঢং এক তালের, একই রকম অস্ত্র এবং একই ধরনের পোশাক দর্শনার্থীদের মধ্যে সেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, যা ছিলো সুলতান আইউবীর কামনা। সৈন্যদের দেখতে শক্ত-সামর্থ, সুঠাম-সুদেহী, উৎফুল্ল ও শান্ত-সুবোধ বলে মনে হচ্ছে।

পদাতিক বাহিনীর পিছনে আসছে মিন্‌জানীক। অনেকগুলো ঘোড়া টেনে নিয়ে আসছে সেগুলো। প্রতিটি মিনজানীক ইউনিটের পিছনে আছে একটি করে ঘোড়াগাড়ী। তাতে রাখা আছে বড় বড় পাথর ও পাতিলের মত বড় বড় বরতন। বরতনগুলো তেলের মতো এক ধরনের তরল পদার্থে ভরা। মিনজানীক দ্বারা নিক্ষেপ করা হয় এগুলো। মিনজানীকের সাহায্যে একটি বরতন ছুঁড়ে মারলে তা দূরে গিয়ে ভেঙ্গে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং তরল পদার্থগুলো চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার উপর নিক্ষেপ করা হয় অগ্নিতীর। সঙ্গে সঙ্গে তাতে আগুন জ্বলে উঠে দাউ দাউ করে।

সুলতান আইউবীর নেতৃত্বে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান দর্শনার্থীদের সম্মুখ দিয়ে সামনে বেরিয়ে আসে এসব আরোহী ও পদাতিক বাহিনী। রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে আবার মাঠে ফিরে এসেছেন সুলতান। সম্মুখে তার পতাকাবাহীদের ঘোড়া। ডানে-বাঁয়ে ও পিছনে রক্ষীবাহিনী। তাদের পিছনে নায়েব ও সালারদের বাহন।

মাঠে এসেই হঠাৎ থেমে যান সুলতান আইউবী। এক লাফে নেমে পড়েন ঘোড়ার পিঠ থেকে। হাত নেড়ে দর্শনার্থীদের সালাম ও অভিনন্দন জানাতে জানাতে চলে যান শামিয়ানার নীচে। দাঁড়িয়ে যায় সকলে। সুলতান আইউবী সবাইকে সালাম করে বসে পড়েন নির্দিষ্ট আসনে।

আরোহী ও পদাতিক বাহিনী মাঠ পেরিয়ে খানিক দূর অতিক্রম করে অদৃশ্য হয়ে যায় টিলার আড়ালে। দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে মাঠে প্রবেশ করে এক অশ্বারোহী। এক হাতে তার ঘোড়ার লাগাম, অপর হাতে উটের রশি। ঘোড়ার গতির সঙ্গে তাল রেখে একটি উটও ছুটে আসছে তার পিছনে। মাঠের মধ্যখানে এসে আরোহী হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যায় ঘোড়াটির পিঠে। লাফ দিয়ে চলে যায় উটের পিঠে। দাঁড়িয়ে থাকে সটান। আবার লাফিয়ে চলে আসে গোড়ার পিঠে। সেখান থেকে ঝাপিয়ে পড়ে মাটিতে। ঘোড়া ও উটসহ এগিয়ে যায় কয়েক পা। লাফিয়ে চড়ে বসে ঘোড়ার পিঠে। তার ঘোড়া ও উট ছুটে চলছে সমান তালে। ঘোড়ার পিঠ থেকে চলে যায় উটের পিঠে। ছুটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় একদিকে।

খাদেমুদ্দীন আল-বার্ক মাথাটা সামান্য এলিয়ে দেয় বাঁ দিকে। এখন তার মুখ আর মেয়েটির মাথার মাঝে ব্যবধান দু' থেকে তিন ইঞ্চি। তার প্রতি তাকায় মেয়েটি। মুখ টিপে হাসে আল-বার্ক। লজ্জা পায় মেয়েটি। বৃদ্ধ তাকায় দু' জনের প্রতি। কপালে ভাজ পড়ে যায় তার।

আচমকা ঘোড়াগাড়িতে করে নিয়ে আসা ডেকচির মত পাত্রগুলো টিলার পিছন থেকে উড়ে এসে নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে মাঠে। একের পর এক পাত্র এসে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হচ্ছে। তেল ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। অন্তত একশত পাত্র নিক্ষিপ্ত হয় এবং তার তরল পদার্থগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এমন সময়ে টিলার উপর আত্মপ্রকাশ করে ছয়জন তীরান্দাজ। তারা জ্বলন্ত সলিতাওয়ালা তীর ছুঁড়ে। মাঠের বিক্ষিপ্ত তরল পদার্থের উপর এসে নিক্ষিপ্ত হয় তীরগুলো। সঙ্গে সঙ্গে তাতে আগুন জ্বলে ওঠে। মাঠের এক হাজার বর্গগজ জায়গা জুড়ে এখন আগুন জ্বলছে।

ঠিক এমন সময়ে একদিক থেকে তীরগতিতে ছুটে আসে চার অশ্বারোহী। কিন্তু কি আশ্চর্য! তারা আগুনের কাছে এসে থামলো না। গতি হ্রাসও করলো না। শাঁ শাঁ করে ঢুকে পড়ল জ্বলন্ত শিখার মধ্যে। নির্বাক অনিমেষ নয়নে তাদের প্রতি তাকিয়ে আছে দর্শনার্থীরা। লোকগুলো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে নিশ্চিত। কিন্তু না, তারা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে দিব্যি দৌড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে যায় অন্যদিক দিয়ে। খুশীতে আত্মহারা হয়ে যায় দর্শনার্থীরা। আনন্দের আতিশয্যে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তারা তাকবীর ধ্বনি তোলে। আগুন ধরে গিয়েছিলো দু' আরোহীর কাপড়ে। তারা ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে পানির উপর লাফিয়ে পড়ে। গড়ানি খায় দু' তিনবার। তাদের কাপড়ের আগুন নিভে যায়।

এই শোরগোল, আনন্দ-উল্লাস এবং অশ্বারোহীদের বীরত্ব প্রদর্শনের দৃশ্যের প্রতি আল-বার্কের মন নেই। সে এর থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন। পার্শ্বের রূপসী মেয়েটিকে নিয়ে-ই ঘুরপাক খাচ্ছে তার সব ভাবনা-চিন্তা। সে প্রেম-সাগরে হারিয়ে যায়।

আল-বার্কের প্রতি এক নজর তাকিয়ে মুচকি একটি হাসি দিয়ে-ই আবার বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মেয়েটি। এবার কেন যেন উঠে চলে গেলো বৃদ্ধ। মেয়েটি তার গমন পথে তাকিয়ে থাকে। আল-বার্কের জানা ছিলো, মেয়েটি বৃদ্ধের সঙ্গে এসেছে। তাই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে 'তোমার পিতা কোথায় চলে গেলেন?'

'ইনি আমার পিতা নন– স্বামী।' জবাব দেয় মেয়েটি।

' 'স্বামী? তা এই বিয়ে কি তোমার বাবা-মা দিয়েছেন?' বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে আল-বারক।

'না, তিনি আমায় কিনে এনেছেন।' ক্ষুণ্ন কণ্ঠে জবাব দেয় মেয়েটি।

'এখন গেলেন কোথায়?' প্রশ্ন করে আল-বারক।

'আমার প্রতি নারাজ হয়ে চলে গেছেন। তার সন্দেহ, আমি আপনার সঙ্গে প্রেম নিবেদন করছি।' জবাব দেয় মেয়েটি।

'আচ্ছা, সত্যিই কি তুমি আমার প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছো?' কৌতূহলী কণ্ঠে জানতে চায় আল-বারক।

স্বলাজ হাসি ফুটে উঠে মেয়েটির ওষ্ঠাধরে। ফিস্‌ফিস্ করে বলে, বুড়োটাকে আমার আর ভালো লাগে না; এর ব্যাপারে আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। এর থেকে যদি কেউ আমাকে মুক্ত না করে, তবে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোন পথ থাকবে না।

সামরিক মহড়া ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি দর্শনার্থীরা। তারা দেখেছিলো শুধু সুদানী ফৌজ, যারা শ্বেতহস্তী হয়ে বসেছিলো রাজকোষের উপর। তাদের কমাণ্ডাররা বাইরে বের হতো রাজা-বাদশাহদের ন্যায়। সঙ্গে সেনাবহর থাকলে তারা পল্লীবাসীদের জন্য আপদ হয়ে দেখা দিতো। জনগণের গরু-ছাগল ছিনিয়ে নিয়ে যেতো। কারো নিকট উন্নত জাতের একটি ঘোড়া দেখলে সেটি কেড়ে নিয়ে যেতো। মানুষ বুঝতো, সরকার সৈন্য পুষে প্রজাদের উপর নিপীড়ন চালানোর-ই জন্য।

কিন্তু সুলতান আইউবীর বাহিনী সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সুলতানের বাহিনীর একটি অংশ মহড়ার মাধ্যমে আজ অনুপম বীরত্ব প্রদর্শন করলো। অপর এক অংশ সুলতানের পরামর্শে একাকার হয়ে গেছে জনতার মধ্যে। উদ্দেশ্য, জনতার সঙ্গে মিশে, কথা বলে এই ধারণা সৃষ্টি করা যে, আমরা তোমাদের ভাই, তোমাদের-ই একজন। তোমাদের কল্যাণে-ই আমাদের আবির্ভাব। জনগণের সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী অসৎ সৈন্যদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন সুলতান আইউবী।

সুলতান আইউবীর সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রধান, একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব খাদেমুদ্দীন আল-বারক এই অনুষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক। এদিকের কিছু-ই তার কানে ঢুকছে না। চোখেও পড়ছে না কিছু-ই। পার্শ্বস্থিত মেয়েটি যাদু হয়ে জেঁকে বসেছে তার মাথায়। মেয়েটির প্রেম-সাগরে তলিয়ে গেছে সে। মন দেয়া-নেয়ার খেলা জমে উঠেছে দু'জনের মধ্যে। মেয়েটিকে একস্থানে এসে মিলিত হওয়ার কথা বলে আল-বারক। মেয়েটি বলে, আমি বৃদ্ধের ক্রীতদাসী।

আমি তার হাতে বন্দী হয়ে আছি। সে আমাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে। মেয়েটি আরো জানায়, বৃদ্ধের ঘরে চারটি স্ত্রী।

নিজের পদমর্যাদার কথা ভুলে যায় আল-বার্ক। প্রেম-পাগল তরুণের ন্যায় মিলনের জন্য মেয়েটিকে এমন সব স্থানে আসতে প্রস্তাব করে, যেখানে বখাটেরা ছাড়া যায় না আর কেউ। একটি জায়গা পছন্দ হয়ে যায় মেয়েটির। শহরের বাইরে পরিত্যক্ত পুরনো এক জীর্ণ ভবন। মেয়েটিকে বৃদ্ধের কবল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেয় আল-বার্ক। সাক্ষাতের দিন-ক্ষণ ঠিক করে আলাদা হয়ে যায় দু'জন।

❖ ❖ ❖

তৃতীয় রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে আল-বার্ক। একজন শাসকের শান নিয়ে বের হতো সে। কিন্তু আজ বের হলো চোরের ন্যায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁটা দেয় একদিকে। গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন কায়রো শহর। নীরবতা বিরাজ করছে সর্বত্র। সামরিক মহড়া শেষ হয়ে গেছে দু'দিন হলো। চলে গেছে বহিরাগত দর্শনার্থীরা। অস্থায়ীভাবে নির্মিত পতিতালয়গুলো তুলে দেয়া হয়েছে সরকারী নির্দেশে। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগ তদন্ত চালাচ্ছে বহিরাগত কোন মেয়ে বা সন্দেহভাজন শহর কিংবা শহরতলীর কোথাও রয়ে গেলো কিনা। মেলার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। মাত্র দু'দিনে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছে চার হাজার যুবক। আরো ভর্তি হবে বলে আশা করছেন সুলতান আইউবী।

শহরের বাইরে চলে যায় আল-বার্ক। সে নির্ধারিত ভবনটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। নীরব-নিস্তব্ধ রজনী। মেয়েটি বলেছিলো, সে বৃদ্ধের কয়েদী। সারাক্ষণ তার চোখে চোখে থাকতে হয়। তবু আল-বার্কের আশা, মেয়েটি আসবে অবশ্য-ই। সম্ভাব্য বিপদের মোকাবেলা করার জন্য তার হাতে আছে খঞ্জর। নারী এমনি এক যাদু, যা একবার কারো উপর সওয়ার হয়ে বসলে আর রক্ষা নেই। নারীর প্রেমেপড়া পুরুষটি পরোয়া করে না কিছুর-ই। তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যায়।

আল-বার্ক একজন পরিণত বয়সের পুরুষ। কিন্তু এখন সে একটি নির্বোধ আনাড়ী যুবক।

ভবনটির নিকটে চলে আসে আল-বার্ক। সম্মুখে অন্ধকারে আপাদমস্তক কালো চাদরে আবৃত একটি ছায়ামূর্তি চোখে পড়ে তার। চোখের পলকে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ছায়াটি।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয় আল-বার্ক। প্রেমের নেশা তার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে– ডর-ভয়, আত্মমর্যাদাবোধ সব। সে পুরনো পরিত্যক্ত জীর্ণ ভবনটির

সামনে এসে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক ইতিউতি তাকিয়ে ভাঙ্গা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে-ই ভিতরে প্রবেশ করে। কবরের অন্ধকার বিরাজ করছে ভবনটিতে। সম্মুখে একটি কক্ষ। মাথার উপর দিয়ে ফড় ফড় করে দ্রুতগতিতে উড়ে গেছে কি একটা পাখি। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগে তার গায়ে। পরক্ষণেই চি চি শব্দ শুনতে পায় সে। বুঝা গেলো এগুলো চামচিকা।

এখান থেকে বেরিয়ে সামনে এগিয়ে যায় আল-বার্ক। ঢুকে পড়ে আরেকটি কক্ষে। কারো ক্ষীণ পদশব্দ তার কানে আসে। এখানে কেউ আছে বলে অনুমান করে। কোমর থেকে খঞ্জর বের করে হাতে নেয়। মাথার উপর তার ভীতিকর ফড় ফড় শব্দে চামচিকা উড়ছে। আল-বার্ক ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক দেয়— 'আসেফা?'

'আরে, আপনি এসেছেন?' খানিকটা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে মেয়েটি। কিন্তু কোন জবাবের অপেক্ষা না করেই ছুটে এসে গা ঘেষে দাঁড়ায় আল-বার্কের। লোকটাকে জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্লুত চাপা কণ্ঠে বলতে শুরু করে— 'শুধু আপনার খাতিরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছি। আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। বুড়োকে মদের সঙ্গে বড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। জেগে ওঠলে বিপদ হবে।'

'কেন, মদের সঙ্গে বিষ খাওয়াতে পারলে না?' জিজ্ঞেস করে আল-বার্ক।

'আমি কখনো কাউকে খুন করিনি। আমি মানুষ হত্যা করতে পারি না। একজন পর পুরুষের সঙ্গে প্রেম-নিবেদন করার জন্য এমন এক ভয়ঙ্কর স্থানে আসতে হবে, এমনটি ভাবিনি আমি কখনো।' জবাব দেয় মেয়েটি।

মেয়েটিকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে আল-বার্ক। ভোগের নেশায় উন্মাতাল তার হৃদয়। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠে পিছনের কক্ষে। যে কক্ষটি অতিক্রম করে আল-বার্ক এখানে এসে পৌঁছেছে, তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে দু'টি লণ্ঠন। লাঠির মাথায় তেলভেজা কাপড়ে আগুন জ্বালিয়ে বানানো প্রদীপ। আসেফাকে নিজের পিছনে নিয়ে লুকিয়ে ফেলে আল-বার্ক। হাতে তার খঞ্জর। এরা কি এই পরিত্যক্ত ভবনে বসবাসকারী কাল-ভূত, নাকি মেয়েটিকে ধাওয়া করতে তার স্বামী এসে পড়লো? উৎকণ্ঠিত ভাবনার জগত থেকে এখনো ফিরে আসেনি আল-বার্ক। হঠাৎ গর্জে উঠে একটি কণ্ঠ, 'দু'টাকে-ই খুন করে ফেলো।'

একেবারে নিকটে চলে আসে লণ্ঠন দু'টো। তার কম্পমান আলোয় চারজন লোক দেখতে পায় আল-বার্ক ও আসেফা। একজনের হাতে বর্শা, তিনজনের হাতে তরবারী। এক মাথা মাটিতে গেড়ে লণ্ঠন দু'টোকে দাঁড় করিয়ে রাখে তারা। আলোকিত হয়ে উঠে ভবনটির আঙ্গিনা। আল-বার্কের চারপার্শ্বে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে চক্কর দিতে শুরু করে চারজন লোক। আসেফা তার

পিছনে জড়সড় দণ্ডায়মান। পার্শ্বের কক্ষ থেকে আবার গর্জে উঠে একজন– 'পেয়েছিস্? জ্যান্ত ছাড়বি না কিন্তু।' এটি মেয়েটির বৃদ্ধ স্বামীর কণ্ঠ।

আল-বার্কের পিছন থেকে সরে সামনে এগিয়ে আসে আসেফা। ক্ষোভ ও ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বৃদ্ধকে উদ্দেশ করে বলে— 'সামনে আসো, আগে আমাকে খুন করো। আমি তোমাকে ঘৃণা করি, অভিসম্পাত দেই। কারো প্ররোচনায় নয়– আমি নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছি।'

সশস্ত্র চার ব্যক্তি আল-বার্ক ও আসেফার চারদিকে দণ্ডায়মান। বর্শাধারী লোকটি ধীরে ধীরে আসেফার প্রতি বর্শা এগিয়ে ধরে এবং আগাটা মেয়েটির পাজরে ঠেকিয়ে বলে— 'মরণের আগে বর্শার আগা কেমন দেখে নাও; কিন্তু এই বেটা তোমার আগে ছট্‌ফট্ করে তোমার সামনে মৃত্যুবরণ করবে, যার টানে তুমি এখানে ছুটে এসেছো।'

আসেফা মুখে কোন জবাব না দিয়ে ঝট্ করে বর্শাটা ধরে ফেলে এবং ঝটকা এক টান দিয়ে বর্শাটা হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। আল-বার্ক থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ঝাঝাল কণ্ঠে বলে— 'আসো, সাহস থাকলে আমার সামনে আসো। আমার আগে একে তোমরা কিভাবে হত্যা করবে, আমি দেখে ছাড়বো!'

খঞ্জর উঁচিয়ে মেয়েটির সামনে চলে আসে আল-বার্ক। আসেফা যার হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়েছিলো, খঞ্জরের আঘাত হানে তার উপর। পিছন দিকে পালিয়ে যায় লোকটি। পার্শ্ব পরিবর্তন করে তার সঙ্গীরা। তরবারী উদ্যত করলেও তারা আল-বার্কের উপর আক্রমণ করে না। অথচ, এ-স্থানে একটা লোককে হত্যা করা ব্যাপার-ই নয়। গর্জন করে চলেছে আসেফা। বারবার এগিয়ে গিয়ে হামলা করে ঠিক, কিন্তু তার প্রতিটি আঘাত-ই ব্যর্থ হচ্ছে। আল-বার্ক খঞ্জর দ্বারা আঘাত হানে একজনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক ছেড়ে দু'জন চলে আসে তার পিছনে। আসেফাও এক লাফে তার পিছনে চলে আসে। সে হাতের বর্শাটি দিয়ে তরবারীর মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু লাফ-ফাল আর তর্জন-গর্জন ছাড়া কিছু-ই করছে না সে।

একধারে দাঁড়িয়ে নিজের লোকদের উত্তেজিত করছে বৃদ্ধ। আল-বার্ক ও আসেফার উপর তারা বারবার আক্রমণ চালাচ্ছে। তাদের উপর বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে আসেফা। আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করছে আল-বার্ক। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়েটির উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও আহত হলো না একজনও। বৃদ্ধের লোকেরা তরবারী চালনায় পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও আসেফা ও আল-বার্ক অক্ষতই রয়ে গেলো। একটি আঁচড় লাগলো

না তাদের গায়ে। হঠাৎ বৃদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠে— 'আক্রমণ থামাও'। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় যুদ্ধ।

'এমন বে-ওফা, অসভ্য মেয়েকে আমি আর ঘরে রাখতে চাই না। ছুঁড়িটা যে এতো দুঃসাহসী, নির্ভীক, তা আগে আমি জানতাম না। এখন জোর করে ঘরে নিয়ে গেলেও সমস্যা; সুযোগ পেলে বেশ্যাটা আমাকে নির্ঘাত মেরেই ফেলবে।' ঝাঝাল কণ্ঠে বললো বৃদ্ধ।

'আমি তোমাকে এর উপযুক্ত মূল্য দিয়ে দেবো; বলো কত দিয়ে কিনেছিলে।' উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললো আল-বার্ক।

ডান হাতটা প্রসারিত করে এগিয়ে আসে বৃদ্ধ। আল-বার্কের হাতে হাত মিলিয়ে একটা ঝাকুনি দিয়ে বলে, মূল্য দিতে হবে না। আমার সম্পদের অভাব নেই। মেয়েটিকে তুমি এমনিতে-ই নিয়ে যাও। তোমার সঙ্গে ওর এত-ই যখন ভালোবাসা, তো ওকে আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম। তাছাড়া ও যোদ্ধা বংশের সন্তান, আমি হলাম গিয়ে ব্যবসায়ী, সওদাগর মানুষ। তোমার ঘরে-ই ওকে ভালো মানাবে। তুমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সরকারের কর্মকর্তা। আমি সুলতানের অনুগত ও ভক্ত। তোমাকে আমি নারাজ করতে পারি না। আমি মেয়েটিকে তালাক দিয়ে দিলাম এবং তোমার জন্য হালাল করে দিলাম ....। চলো দোস্ত! আমরা যাই।' বলেই তারা লণ্ঠন দু'টো হাতে তুলে নিয়ে চলে যায়।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে আল-বার্ক। তার পায়ের তলার মাটি কাঁপতে শুরু করে যেন। এমন একটি অভাবিত ঘটনা ঘটে গেলো, তা যেন তার বিশ্বাস-ই হচ্ছে না। একে বৃদ্ধের প্রতারণা বলে সংশয় জাগে তার মনে। আশংকা জাগে, পথে ওঁৎ পেতে বসে থেকে তারা দু'জনকে-ই তারা করে ফেলে কিনা।

একটি বর্শা ছিলো আসেফার হাতে। আল-বার্ক সেটি নিজের হাতে নিয়ে খানিক অপেক্ষা করে মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভবন থেকে। ডানে-বাঁয়ে-পিছনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে দু'জন। কিছু একটা শব্দ কানে এলে-ই চকিত নয়নে থমকে দাঁড়ায়। অন্ধকারে চারদিক ইতিউতি দেখে নিয়ে আবার শুরু করে পথ চলা। শহরে প্রবেশ করার পর তারা দেহে জীবন ফিরে আসে। আসেফা আল-বারকের গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি সত্যি-ই কি আমাকে বিশ্বাস করেন?' জবাবে মুখে কিছু না বলে আল-বার্ক বুকের সঙ্গে চেপে ধরে মেয়েটিকে। আবেগের আতিশয্যে কোন শব্দ বের হচ্ছে না তার মুখ থেকে। একটি অচেনা মেয়ের প্রেম অতীত জীবনের সকল অর্জন ছিনিয়ে নিয়েছে আল-বার্কের। আল-বার্কের স্ত্রী বয়সে তার সমান। এতকাল মন

উজাড় করে ভালবাসা দিয়ে এসেছে সে তাকে। কিন্তু আসেফাকে পেয়ে এখন তার মনে হচ্ছে, স্ত্রীর কোন মূল্য-ই নেই তার কাছে।

সে যুগে নারী বেচাকেনা হত। একত্রে চারটি বউ রাখাকে ন্যায্য অধিকার মনে করতো পুরুষরা। বিত্তশালীরা তো বিবাহ ছাড়াই দু'চারটি সুন্দরী মেয়ে ঘরে তুলতো। এই নারী-ই ধ্বংস করেছিলো মুসলিম আমীর-শাসকদের। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য খুঁজে খুঁজে সুন্দরী মেয়েদের সংগ্রহ করে স্বামীকে উপহার দিতো স্ত্রীরা।

আসেফাকে নিয়ে আল-বার্ক যখন ঘরে প্রবেশ করে, তখন ঘরের সকলে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সকালে জাগ্রত হয়ে স্ত্রী যখন স্বামীর খাটে অপরিচিতা এক সুন্দরী তরুণীকে শুয়ে থাকতে দেখে, তখন সে এতটুকু অনুভবও করেনি যে, স্বামী-সোহাগ তার শেষ হয়ে গেছে। উল্টো বরং সে এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, যা হোক আমার স্বামী এমন একটি রূপসী মেয়ে পেয়ে গেছেন! নতুন শয্যা-সঙ্গীনী জুটে যাওয়ায় আমার কর্তব্য অনেকখানি লাঘব হয়ে যাবে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মুসলমানদেরকে নারী থেকে এবং নারীকে মুসলমানদের কবল থেকে মুক্ত করতে চান। পুরুষদের নারী-লোলুপতা দেখে তিনি 'এক স্বামী এক স্ত্রী'র বিধান চালু করতে চাইছেন। কিন্তু বাঁধ সেঁধেছে তাঁর-ই আমীর-উজীরগণ। ঘরে তাদের একাধিক নারী। তারা-ই নারীর প্রধান খরিদ্দার। খোলা বাজারে নারী বেচা-কেনা, সুন্দরী মেয়েদের অপহরণ ঘটনা ঘটছে তাদের-ই কারণে। আমীর-শাসকদের নারী-পূজার ফলে-ই ইহুদী-খৃষ্টানরা নারীর মাধ্যমে সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাবার সুযোগ পাচ্ছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ভাবছেন এই নারীরা-ই একদিন পুরুষদের পাশাপাশি কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো; জিহাদের ময়দানে ছিলো তারা মিল্লাতের আধা শক্তি। এখন কিনা সেই নারীরা-ই পুরুষদের বিনোদন ও বিলাস উপকরণে পরিণত। এতে একটি জাতির অর্ধেক সামরিক শক্তি-ই যে নিঃশেষ হয়েছে, তা-ই নয়– নারী এখন এমন একটি নেশায় পরিণত হয়েছে, যা জাতির বীর পুরুষদেরকে কাপুরুষে পরিণত করেছে। এসব ভাবনা অস্থির করে তুলেছে সুলতান আইউবীকে।

নারীর ইজ্জত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন সুলতান আইউবী। এ লক্ষ্যে তিনি একটি পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন। তাহলো অবিবাহিতা মেয়েদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেনা-বাহিনীতে ভর্তি করে নেয়া। তাঁর আশা, এ পন্থা অবলম্বন করলে বিলাসপ্রিয় আমীর-উজীরদের হেরেম শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য তাঁর সালতানাতের খেলাফত ও ইমারাত হাতে নেয়া

একান্ত প্রয়োজন। এ এক কঠিন পদক্ষেপ। সুলতান আইউবীর দুশমনদের মধ্যে আপনদের সংখ্যা-ই বেশী। তিনি জানতেন, তাঁর জাতির মধ্যে ঈমান-বিক্রেতাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে-ই চলেছে। কিন্তু তাঁর একান্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রশাসনের পদস্থ এক কর্মকর্তা খাদেমুদ্দীন আল-বারকও যে একটি রূপসী রক্ষিতাকে ঘরে তুলেছে এবং মেয়েটির প্রেম-নেশায় নিজের পদমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের কথা ভুলে বসেছে, তা এখনো তিনি জানেন না।

❖ ❖ ❖

মহড়ায় সুলতান আইউবীর সামরিক শক্তি ও বাহিনীর বীরত্ব দেখে মিসরের মানুষ অতিশয় আনন্দিত। তারা এতে দারুণ প্রভাবিত হয়েছে। সুলতান আইউবী ভাষণ-বক্তৃতায় তেমন অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি সেদিনকার এই সমাবেশে বক্তৃতা দেয়া আবশ্যক মনে করলেন। তিনি বললেন, আমার এই বাহিনী জাতির মর্যাদার মোহাফেজ, ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী। খৃষ্টানদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার বিশ্লেষণ দিয়ে তিনি মিসরবাসীদের উদ্দেশে বলেন, আরব বিশ্বের মুসলিম আমীর ও শাসকদের বিলাসপ্রিয়তার কারণে খৃষ্টানরা সেখানকার মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে রেখেছে। পথে পথে মুসলিম কাফেলা লুট করছে। তারা অপহরণ করে সম্ভ্রমহানী করছে মুসলিম মেয়েদের। ভাষণে জনগণকে জাতীয় চেতনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুলতান আইউবী বললেন, আপনারা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে আপনাদের মা-বোন-কন্যাদের ইজ্জত ও ইসলামের মর্যাদা সংরক্ষণ করুন।

সুলতান আইউবীর সেই বক্তব্য এতো-ই জ্বালাময়ী ছিলো যে, তা শ্রোতাদেরকে দারুণ উদ্দীপ্ত করে তোলে। সেদিন থেকে-ই যুবকরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে শুরু করে।

দশদিনে ভর্তি হওয়া যুবকের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় হাজারে। এদের অন্তত দেড় হাজার যুবক নিজ নিজ উট সঙ্গে করে নিয়ে আসে। ঘোড়া ও খচ্চর নিয়ে আসে প্রায় এক হাজার। সুলতান আইউবী সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে বাহনের উপযুক্ত মূল্য দিয়ে দেন এবং সেনা কর্মকর্তারা তাদের প্রশিক্ষণ শুরু করে দেন।

মহড়ার তিনদিন পর।

সুলতান আইউবীর সেনাবাহিনীতে তিনটি অপরাধ বেড়ে চলেছে। চৌর্যবৃত্তি, জুয়াবাজী ও রাতে অনুপস্থিতি। অপরাধগুলো এর আগেও ছিলো; কিন্তু ছিলো অনুল্লেখযোগ্য। সেনা মহড়ার পর এগুলো মহামারীর আকার ধারণ করতে শুরু করেছে।

এ তিনটি অপরাধের মূলে ছিলো জুয়াবাজী। চুরির ব্যাপকতা এত বেশী ছিলো যে, এক সিপাহী অপর সিপাহীর ব্যক্তিগত জিনিস চুরি করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে ফেলতো। কিন্তু এক রাতে ঘটে যায় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। হঠাৎ উধাও হয়ে যায় ফৌজের তিনটি ঘোড়া। অথচ সিপাহীদের সকলেই উপস্থিত। উচ্চ পর্যায়ে রিপোর্ট পৌছে। কর্মকর্তারা সিপাহীদের সতর্ক করেন, শাস্তির ভয় দেখান ও আল্লাহকে ভয় করে চলার উপদেশ দেন। কিন্তু তবু অপরাধ তিনটির প্রবণতা উত্তরোত্তর বেড়ে-ই চলেছে।

এক রাতে ধৃত হয় একজন সিপাহী। সে কোথাও থেকে ক্যাম্পে ফিরছিলো। এর আগে রাতে অনুপস্থিত থাকা সিপাহীরা প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতো এবং তেমনিভাবে-ই ফিরে আসতো। কিন্তু আজ ধরা পড়ে গেলো একজন। কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছিলো লোকটি। তাকে দেখে হাঁক দেয় প্রহরী। সিপাহী থেমে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

কাছে গিয়ে প্রহরী দেখে, লোকটির সারা গায়ে রক্ত, যেন রক্ত দিয়ে গোসল করে এসেছে। তুলে তাকে কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করা হয়। কিন্তু রক্ষা করা গেলো না তাকে। মৃত্যুর পূর্বে সে বলেছিলো, নিজের এক সিপাহী সঙ্গীকে সে হত্যা করে এসেছে। ক্যাম্প থেকে আধা ক্রোশ দূরে একটি তাঁবুতে পড়ে আছে তার লাশ। তার বর্ণনা মতে সেখানে তিনটি তাঁবু আছে। অধিবাসীরা যাযাবর। তাদের কাছে আছে অনেক রূপসী তরুণী। অনেক সিপাহী সেখানে রাতে যাওয়া-আসা করে।

তাঁবুর যাযাবর অধিবাসী মেয়েরা শুধু দেহ ব্যবসায়ী-ই নয়– তাদের প্রতিটি মেয়ে আপন আপন খদ্দেরের মনে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো যে, আমার জীবন তোমার জন্য উৎসর্গিত। বিয়ে করে আমি তোমার স্ত্রী হয়ে জীবন কাটাতে চাই। পরে তদন্ত করে জানা গেছে, তারা তাদের খদ্দের সিপাহীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত ছিলো। তার-ই ফলে এই দু' সিপাহী যাযাবরদের তাঁবুতে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে একজন ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং অপরজন আহত হয়ে ক্যাম্পে ফিরে এসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে প্রাণ হারায়।

যাযাবরের তাঁবুতে নিহত সিপাহীর লাশ আনার জন্য কয়েকজন লোক প্রেরণ করা হয়। একজন কমাণ্ডারও আছে তাদের সাথে। ক্যাম্পে মৃত সিপাহীর দেয়া নির্দেশনা মোতাবেক তারা এক স্থানে গিয়ে পৌছে। কিন্তু তাঁবু নেই। পড়ে আছে শুধু একটি লাশ। আলামতে বুঝা যাচ্ছে, এখানে তাঁবু ছিলো; তুলে নেয়া হয়েছে। রাতের বেলা পালিয়ে যাওয়া যাযাবরদের খুঁজে বের করা সম্ভব ছিলো না। তারা সিপাহীর লাশ তুলে নিয়ে ফিরে আসে।

সুলতান আইউবীকে এ দুর্ঘটনার রিপোর্ট দেয়া হয়। রিপোর্টে এ-ও বলা হয় যে, সেনাবাহিনীর মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেছে। চুরি হয়েছে তিনটি ঘোড়া। সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে বললেন, সিপাহী বেশে ব্যারাকে গুপ্তচর ঢুকিয়ে তথ্য নাও, এসব অপরাধ বাড়লো কেন। আল-বার্‌কের বাহিনীকেও সুলতান আইউবী এ ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেন।

এই 'কেন'র জবাব নগরীতে-ই বিদ্যমান। কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছার সাধ্য নেই আলী বিন সুফিয়ানের গুপ্তচরদের। এটি দুর্গম একটি ভবন। একটি মিসরী পরিবার বাস করে এখানে। এই ভবন ও ভবনের অধিবাসীরা নগরীতে বেশ খ্যাতিমান। বিপুল পরিমাণ দান-খয়রাত বণ্টন হয় এখানে। গরীব-অসহায় মানুষ এখান থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। মহড়ার সময় এরা সৈন্যদের জন্য দু' থলে স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলো সুলতান আইউবীকে। এটি একটি ব্যবসায়ী পরিবার। সুলতান আইউবীর আগমনের আগে এ ভবনটি ছিলো সুদানী বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের মেহমানখানা। সুলতান আইউবী এসে সুদানীদের নির্মূল করে দেয়ার পর এরা সুলতানের অফাদারী মেনে নেয়।

সুলতান আইউবী যেদিন আল-বার্‌ক ও আলী বিন সুফিয়ানকে সেনাবাহিনীর অপরাধ প্রবণতার রহস্য উদঘাটনের নির্দেশ দেন, সেদিন এই ভবনটির একটি কক্ষে বসা ছিলো দশ-বারোজন লোক। কক্ষে মদের আসর চলছিলো। এমন সময়ে কক্ষে প্রবেশ করে এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধকে দেখে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায় সকলে। সঙ্গে ছিলো তার অতিশয় সুন্দরী একটি মেয়ে, যার মুখমণ্ডলের অর্ধেকটা নেকাবে ঢাকা। তারা কক্ষে প্রবেশ করামাত্র দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েটি তার মুখের নেকাব সরিয়ে ফেলে। সে বৃদ্ধের সঙ্গে এক পাশে বসে পড়ে।

'সেনাবাহিনীতে জুয়াবাজী ও অপকর্ম বেড়ে যাওয়ার সংবাদ এই গতকাল-ই সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছেছে। আমাদের আজকের এই বৈঠক অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সুলতান আইউবী সিপাহীদের বেশে সেনাবাহিনীতে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের এই গুপ্তচরবৃত্তিকে ব্যর্থ করতে হবে। আমি যে তাজা সংবাদটি নিয়ে এসেছি, তা বড়-ই আশাব্যঞ্জক। এক মেয়েকে কেন্দ্র করে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে দু'জন সিপাহী একে অপরকে হত্যা করেছে। এটি আমাদের সাফল্যের সূচনা।' বললো বৃদ্ধ।

'তিন মাসে মাত্র দু'জন মুসলমান সিপাহী খুন হয়েছে। সাফল্যের এই গতি বড়-ই ধীর। প্রকৃত সফল তো তখন হবো, যখন সুলতান আইউবীর কোন নায়েব সালার তার সালারকে হত্যা করবে।' বৃদ্ধের কথা কেটে বললো আরেকজন।

'আমি তো বরং কামিয়াবী তাকে বলবো, যখন কোন সালার কিংবা নায়েব সালার সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করবে। আমি জানি, কোন বাহিনীর এক হাজার সিপাহী খুন হলেও তেমন কিছু যায় আসে না। আমাদের টার্গেট আইউবী। আইউবীকে হত্যা করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। গত বছরের ঘটনা দু'টোর কথা আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে। সমুদ্রতীরে আইউবীকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া তীরটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেলো। রোম থেকে আমাদের বাহিনী আসলো, কিন্তু তারা সকলেই ধরা পড়লো। এতে বুঝা যায়, আপনারা সুলতান আইউবীকে হত্যা করা যতো সহজ মনে করছেন, বিষয়টা ততো সহজ নয়। তাছাড়া এমনও তো হতে পারে যে, আইউবী নিহত হলে তার স্থলে যিনি আসবেন, তিনি আরো কঠোর ও কট্টর মুসলমান হবেন। তাই আমার প্রস্তাব, তার বাহিনীকে সেই লোভনীয় ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করো, যে পথে ক্রুশের পূঁজারীরা নিক্ষেপ করেছে বাগদাদ ও দামেশ্‌কের আমীর-শাসকদের।' বললো বৃদ্ধ।

'ক্রুশের অনুসারী ও সুদানী বাহিনী পরাজিত হলো এক বছর কেটে গেছে। এই এক বছরে আপনি কী কী কাজ করেছেন? আপনি বড় দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। দু'জন লোককে যে করে হোক হত্যা করতে-ই হবে। সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ান।' বললো একজন।

'আলী বিন সুফিয়ানকে যদি হত্যা করা যায়, তাহলে আইউবী এমনিতে-ই অন্ধ ও বধির হয়ে যাবে।' বললো আরেকজন।

'আমি সেই চোখগুলোকে হাত করে ফেলেছি, যারা সুলতান আইউবীর বুকের প্রতিটি গোপন রহস্য স্পষ্ট দেখতে পায়।' বলে বৃদ্ধ তার সঙ্গে আসা মেয়েটির পিঠে হাত রেখে বললো— 'এই সেই চোখ। দেখে নাও, এই চোখ দু'টোতে কেমন যাদু! তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর পদস্থ এক কর্মকর্তা খাদেমুদ্দীন আল-বার্‌কের নাম অবশ্যই শুনেছো। কেউ হয়তো তাকে দেখেছেনও। সালাহুদ্দীন আইউবীর একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি দু'জন। আলী ও আল-বার্‌ক। আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যা করা বোকামী হবে। আমি আল-বার্‌ককে যেভাবে কব্জা করেছি, আলীকেও সেভাবে হাত করতে হবে।

'কী বললেন, আল-বার্‌ক আপনার কব্জায় এসে গেছে?' উদ্দীপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে একজন।

'হ্যাঁ'– মেয়েটির রেশমী চুলে আঙ্গুল বুলিয়ে বৃদ্ধ বললো– 'আমি তাকে এই শিকলে আটক করেছি। আজ বিশেষ করে এ সুসংবাদটি শুনানোর জন্যই আপনাদের এখানে তলব করেছি। আমাদের দ্রুত এ বৈঠক মুলতবী করতে হবে। কারণ, এভাবে একত্রে এক স্থানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা ঠিক নয়। এ মেয়েটিকে

বোধ হয় আপনারা সকলেই চিনবেন। এ যে এতো বিচক্ষণতার সাথে নাটক মঞ্চস্থ করতে পারবে, আমি তা কল্পনাও করিনি। বয়সে কচি হলে কি হবে, মেয়েটা কাজে বড় পাকা। গত একটি বছর আমি এমন একটি সুযোগের সন্ধান করে ফিরছিলাম, যাতে আলী ও আল্-বার্ককে— অন্তত একজনকে ফাঁদে ফেলতে পারি। তাদের সঙ্গে আমরা কখনো সাক্ষাৎ করিনি। তার কারণ, আমি তাদের কাছে পরিচিত হতে চাইনি। সুলতান আইউবী সামরিক কর্মকর্তাদের শহর থেকে দূরে রাখেন। অবশেষে তিনি সামরিক মহড়া ও মেলার ঘোষণা দেন। আমি জানতে পারলাম, তিনি সেনা কমাণ্ডার ও সালারদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন মেলায় এসে তারা আম-জনতার সঙ্গে বসে, তাদের সঙ্গে কথা বলে এবং ভীতি ছড়ানোর পরিবর্তে জনমনে আস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আলী বিন সুফিয়ানকে কোথাও পেলাম না। এই মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। খুঁজে পেলাম আল-বার্ককে। তার এক পাশে দু'টি শূন্য চেয়ার পেলাম। কাছেরটিতে মেয়েটিকে বসিয়ে অপরটিতে আমি বসে পড়লাম। একে আট মাস ধরে আমি ওস্তাদী কায়দা শিখিয়ে আসছি। আমাকে নিজের বৃদ্ধ স্বামী এবং নিজেকে খরিদকৃত মজলুম নারী পরিচয় দিয়ে আল-বার্কের ন্যায় ঈমানদার লোকটাকে নিজের রূপের ফাঁদে বন্দি করে মেয়েটি। অন্যত্র সাক্ষাতের সময় ও স্থান ঠিক করে নেয় দু'জনে। পতিত জীর্ণ ভবনটিতে নিয়ে এসে তার সঙ্গে কি ড্রামা খেলতে হবে, তা শিখিয়ে দিলাম। মেয়েটি যথাসময়ে ভবনটিতে চলে যায়। আল-বার্কও চলে আসে। চারজন লোক নিয়ে আমি পূর্ব থেকেই সেখানে লুকিয়ে ছিলাম। সেই চারজনের দু'জন এখানে উপস্থিত আছে। আপনারা সকলে হয়তো তাদেরকে চিনেন না। তারা আমাদের দলের লোক। মেয়েটি আল-বার্কের কাছে প্রমাণ করে যে, তার খাতিরে সে নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত। আমাদের চার সঙ্গী আর-বার্ক ও মেয়েটির উপর তরবারী দ্বারা আক্রমণ করে বসে। মেয়েটি বর্শা দ্বারা আক্রমণের মোকাবেলা করে। নাটকটিকে এমন সুনিপুণভাবে মঞ্চস্থ করা হলো যে, আল-বার্কের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগলো না। অভাগার মাথায় এ বুঝটুকুও আসলো না যে, তরবারী ও বর্শার এমন ঘোরতর লড়াই হলো, অথচ একটা লোকের গায়েও সামান্য আঁচড় লাগলো না; এমনকি তার নিজের গায়েও একটি খোঁচা লাগলো না! আমি এই বলে নাটকটির ইতি টানলাম যে, মেয়েটি এত দুঃসাহসী আমি আগে জানতাম না। এমন সাহসী মেয়ে কোন বীর পুরুষের পাশেই মানাবে ভালো। এই বলে সন্তুষ্টচিত্তে মেয়েটিকে আল-বার্কের হাতে তুলে দিলাম।'

'এমন পরিণত বয়সের একজন অভিজ্ঞ শাসক এতো সহজে আমার ফাঁদে আটকে গেলো, আমি ভেবে বিস্মিত হই। আমি তাকে সুরায় অভ্যস্ত করে তুলেছি, যা পূর্বে কখনো সে পান করেনি। তার প্রথমা স্ত্রী আমার সঙ্গে একই ঘরে বাস করে। তার ছেলে-মেয়েও আছে। কিন্তু আমাকে পেয়ে লোকটা সবাইকে ভুলে গেছে।' বললো মেয়েটি।

মেয়েটি কী কী পদ্ধতিতে সুলতান আইউবীর এমন একজন নির্ভরযোগ্য ও ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের বিবেক-বুদ্ধিকে নিজের মুঠিতে নিয়ে রেখেছে, সে সভাসদদের সামনে তার বিবরণ তুলে ধরে।

'এই তিন মাসে মেয়েটি আমাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কয়েকটি মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছে। সুলতান আইউবী বিশাল সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই বাহিনীর অর্ধেক থাকবে মিসরে। বাকি অর্ধেককে তিনি নিজের কমাণ্ডে খৃষ্টান রাজাদের বিরুদ্ধে লড়াবার জন্য নিয়ে যাবেন। দৃষ্টি তাঁর জেরুজালেমের উপর। কিন্তু আমার মেয়েটি আল-বার্‌ক থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে, তাহলো, সুলতান সর্বপ্রথম নিজের মুসলিম প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আপনজনদের ঐক্যবদ্ধ করবেন। কিন্তু ক্রুশের অনুসারীরা তাদের ঐক্যকে সেই পদ্ধতিতে বিনষ্ট করে দিয়েছে, যে পদ্ধতিতে আমরা আল-বার্‌ককে নিজেদের কব্জায় এনেছি।' বললো বৃদ্ধ।

'তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি, আল-বার্‌ক এখন আমাদের-ই লোক?' জানতে চাইল একজন।

'না। আল-বার্‌ক এখনো একনিষ্ঠভাবে-ই আইউবীর ওফাদার। পাশাপাশি ততটুকু ওফাদার আমাদের এই মেয়েটির। মেয়েটি বড় বিচক্ষণতা ও আবেগের সাথে নিজেকে এমনভাবে সুলতান আইউবী, জাতি ও ইসলামের জন্য উৎসর্গিত বলে প্রকাশ করে যে, আল-বার্‌ক একে স্বজাতির একটি জানবাজ কন্যা মনে করে। এর রূপ-যৌবন ও প্রেম-ভালবাসার ক্রিয়া-ই আলাদা। আল-বার্‌ককে আমরা আমাদের দলে ভেড়াতে পারবো না। তার প্রয়োজন-ই বা কি। সে আমাদের হাতের পুতুল হয়েই তো কাজ করছে।' জবাব দেয় বৃদ্ধ।

'সুলতান আইউবী আর কী করতে চান?' জিজ্ঞেস করে দলের এক সদস্য।

'সুলতান আইউবী সালতানাতে ইসলামিয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তিনি ক্রুশের সাম্রাজ্যে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। আমাদের যেসব গুপ্তচর সমুদ্রের ওপার থেকে এসেছিলো, তাদেরকে গ্রেফতার ও ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে বিশাল এক গ্রুপ তৈরি করেছেন। আল-বার্‌ক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তিনি জানবাজদের একটি

আলাদা বাহিনী গঠন করেছেন। তার পরিকল্পনা, তাদেরকে বিভিন্ন খৃষ্টরাজ্যে প্রেরণ করে গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা চালাবেন। এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। সালাহুদ্দীন আইউবীর পরিকল্পনা বড় ভয়াবহ। ক্রুসেড বিরোধী সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে-ই তিনি সামরিক মহড়ার আয়োজন করেছিলেন এবং সেনাবাহিনীতে সাত হাজার যুবক ভর্তি করেছেন। এখনো ভর্তি হচ্ছে। যারা ভর্তি হচ্ছে, তাদের মধ্যে সুদানীও রয়েছে। আমি উপর থেকে যে নির্দেশনা পেয়েছি, তাহলো, আইউবীর বাহিনীতে পাপের বীজ বপণ করতে হবে। সৈন্যদের মনে নারী ও জুয়ার আসক্তি ঢুকিয়ে দিতে হবে।' জবাব দেয় বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ আরো জানায়, সুলতান আইউবীর সামরিক মহড়া সমাপ্ত হওয়ার পর পর সে সেনাদের মধ্যে নিজের লোক ঢুকিয়ে রেখেছে। তারা বড় বিচক্ষণতার সাথে সৈন্যদের মধ্যে জুয়া খেলা শুরু করিয়ে দিয়েছে। জুয়া আর নারী এমন এক বস্তু, যা মানুষকে চুরি ও খুন-খারাবিতে লিপ্ত করে। বৃদ্ধ আরো জানায়, বেশ্যা মেয়েদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমি আইউবীর সেনা ক্যাম্পগুলোর আশপাশে ছড়িয়ে দিয়েছি। তারা এতই বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে যে, তারা যে পেশাদার পতিতা, তা কাউকে বুঝতে-ই দেয় না। সুলতান আইউবীর সৈন্যদেরকে পাপের পথে নিক্ষিপ্ত করার পাশাপাশি তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করছে। বৃদ্ধ জানায়, ইতিমধ্যে আমার এই অভিযানের ফলও ফলতে শুরু করেছে। এই একেবারে তাজা খবর, দু'জন সিপাহী রাতের আঁধারে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে একই সময়ে এক মেয়ের তাঁবুতে ঢুকে। মেয়েটির দখল নিয়ে তারা বিবাদে লিপ্ত হয়। সৈনিক মানুষ তো! এক কথা দু' কথার পর যুদ্ধ বেঁধে যায় দু'জনের মধ্যে। একজন খুন হয়ে যায় ঘটনাস্থলে-ই। অপরজনের ব্যাপারে শুনেছি, সে রক্তাক্ত অবস্থায় ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে মারা গেছে। এ রিপোর্ট চলে যায় সুলতান আইউবীর কাছে। তিনি আলী বিন সুফিয়ান ও আল-বারককে ডেকে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গুপ্তচর ঢুকিয়ে এই চুরি, জুয়াবাজি ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ উদ্‌ঘাটনের নির্দেশ দেন। তাই আমাদের যে মেয়েগুলো এ কাজে নিয়োজিত আছে, আপনারা তাদের বলে দেবেন, যেন তারা ক্যাম্পের নিকটে না যায়।

বৈঠকে বৃদ্ধ আরো জানায়, আসেফা পাঁচ-ছয়দিন পর পর নতুন তথ্য জানাবার জন্য তার নিকট আসে। যে রাতে তার বাইরে বেরুবার প্রয়োজন পড়ে, সে রাতে আল-বার্‌ককে মদের সঙ্গে এক প্রকার নেশাকর পাউডার মিশিয়ে

খাইয়ে দেয়। তার ক্রিয়ায় লোকটা ভোর পর্যন্ত অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। বৈঠকে এ তথ্যও প্রকাশ করা হয় যে, মিশরের শহর-নগর ও গ্রাম-গঞ্জে গোপন বেশ্যালয় ও জুয়ার আড্ডা প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়েছে। তার ফলাফল বেশ আশাব্যঞ্জক। প্রশিক্ষিত সুন্দরী মেয়েরা সুশীল-সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকদেরকে পাপের পথে নিক্ষেপ করে চলেছে। এখন থেকে চেষ্টা করতে হবে, মুসলিম মেয়েদের মধ্যেও কিভাবে এই অশ্লীলতা ছড়ানো যায়।

খৃষ্টান গুপ্তচরদের গোপন এই অধিবেশন সমাপ্ত হয়। তারা সকলে এক সঙ্গে বেরোয়নি। একজন বের হওয়ার দশ-পনের মিনিট পর বের হয় দ্বিতীয়জন। এভাবে একে একে সকলে চলে যায় আপন আপন ঠিকানায়। চলে যায় বৃদ্ধও। থেকে যায় শুধু আসেফা ও আরেকজন। অবশেষে আসেফাও মুখটা নেকাবে ঢেকে বেরিয়ে পড়ে লোকটার সঙ্গে।

আল-বারকের ঘরে আসেফা এখনো এক রহস্যময়ী নারী। অন্যায় না হলেও আল-বারক কাউকে জানতে দেয়নি যে, সে আরেকটি মেয়েকে বৌ বানিয়ে ঘরে তুলেছে। এতকাল এক স্ত্রী নিয়ে ঘর করে চল্লিশ বছর বয়সে একটি সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করার কথা শুনলে বন্ধুরা ঠাট্টা করবে, এই তার ভয়। কিন্তু সে এ রহস্য বেশীদিন গোপন রাখতে পারেনি। শহর এবং সেনা ক্যাম্পগুলোর আশপাশে আলী বিন সুফিয়ান যে গুপ্তচরদের ছড়িয়ে রেখেছিলেন, তাদের মাধ্যমে তিনি রিপোর্ট পান, সামরিক মহড়ার পর থেকে শহরে জুয়া ও অপকর্ম বেড়ে চলেছে। একদিন এক গুপ্তচর আলী বিন সুফিয়ানকে রিপোর্ট দেয়, গত তিন মাসে সে চারবার দেখেছে, রাতে যখন সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন খাদেমুদ্দীন আল-বারকের ঘর থেকে কালো চাদরে আবৃতা এক মহিলা বের হয়। ঘর থেকে বের হয়ে খানিক দূরে গেলে একজন পুরুষ তার সঙ্গ নেয়। গুপ্তচর জানায়, প্রথম দু'বার সে এতটুকু-ই দেখেছে। তৃতীয়বার সে মহিলার পিছু নেয়। দেখে, মহিলাটি লোকটির সঙ্গে একটি ঘরে ঢুকে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে বের হয়ে লোকটির সঙ্গে ফিরে যায়।

গুপ্তচর জানায়, গতরাতেও সে মহিলাটিকে আল-বারকের ঘর থেকে বের হয়ে উক্ত লোকটির সঙ্গে যেতে দেখে তাদের পিছু নেয়। কিছুদূর গিয়ে তারা আগের ঘরটিতে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসে অন্য একজনের সাথে। সেখান থেকে বেরিয়ে তারা প্রবেশ করে শহরের অপর একটি বিশাল

ভবনে। গুপ্তচর ভবনটির বেশ দূরে একস্থানে অবস্থান নেয়। দীর্ঘসময় পর পনের-বিশ মিনিট অন্তর অন্তর ভবন থেকে একে একে বের হয় এগারজন লোক। সবশেষে সঙ্গী পুরুষটির সঙ্গে মহিলাটিও বের হয়। গুপ্তচর অন্ধকারে তাদের পিছু নেয়। আল-বার্কের ঘরের সামান্য দূর থেকে লোকটি চলে যায় অন্যদিকে। মহিলা ঢুকে পড়ে আল-বার্কের ঘরে।

আল-বার্কের ন্যায় উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তার বাসগৃহ সম্পর্কে রিপোর্ট করার সাহস একজন সাধারণ গুপ্তচরের থাকার কথা নয়। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ানের নীতি অত্যন্ত কঠোর। তাঁর গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদের বলে রাখা ছিলো, স্বয়ং সুলতান আইউবীর কোন আচরণ-গতিবিধিতেও যদি সন্দেহ দেখা দেয়, তারও রিপোর্ট করতে হবে। এ ব্যাপারে কারো পদমর্যাদার তোয়াক্কা করা যাবে না। যখন-ই যার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেবে– হোক তা তুচ্ছ– সঙ্গে সঙ্গে তা আলী বিন সুফিয়ানকে অবহিত করতে হবে।

এই গুপ্তচর চার চারটিবার যা দেখেছে, আলী বিন সুফিয়ানের জন্য তা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি আল-বার্কের স্ত্রীকে ভাল করে-ই জানেন। মহিলা এমন নন যে, রাতের বেলা পরপুরুষের সঙ্গে ঘর থেকে বের হবেন। আল-বার্কের কোন যুবতী মেয়েও তো নেই! তাছাড়া আর-বার্ক নতুন কোন যুবতীকে বিয়ে করে ঘরে তুললে সে খবর তো তারা জানতেন!

বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবনায় পড়ে যান আলী বিন সুফিয়ান। তিনি ভাবেন, আল-বার্ক আমার বন্ধু মানুষ। তার ঘরে নতুন করে কিছু একটা ঘটে থাকলে তা আমার জানবার কথা। তবে কি আল-বার্ক কোন একটা নারীর খপ্পরে পড়ে গেলো? রহস্যটা উদ্ঘাটন করা যায় কিভাবে?

মাথায় একটা বুদ্ধি আসে আলী বিন সুফিয়ানের। গোয়েন্দা বিভাগের একটি মেয়েকে নির্যাতিতা নারীর বেশে আল-বার্কের ঘরে প্রেরণ করেন। তাকে বলে দেন, তুমি গিয়ে বলবে, আমার স্বামী মারা গেছেন। ছেলে-সন্তান কেউ নেই। আমাকে সাহায্য করুন।

আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশনা মোতাবেক মেয়েটি আল-বার্কের ঘরে যায়। আল-বার্ক তখন ঘরে ছিলো না। মেয়েটি কৌশল করে ঘরের সর্বত্র ঘুরে-ফিরে দেখে। সে এক নবাগতা সুন্দরী তরুণীকে দেখতে পায়। মেয়েটি আল-বারককের প্রথমা স্ত্রীর কাছে যায়। তার কাছে নিজের ফরিয়াদ পেশ করে।

বলে, আপনি দয়া করে আল-বার্কের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করুন। কথায় কথায় সে জিজ্ঞেস করে বসে, আপনার মেয়ের কি বিয়ে হয়ে গেছে? আল-বার্কের স্ত্রী জবাব দেয়— 'ও আমার মেয়ে নয়– আমার স্বামীর নতুন বউ। তিন মাস হলো, তিনি একে বিয়ে করেছেন।

আলী বিন সুফিয়ানের জন্য এ তথ্য ছিলো বিস্ময়কর। তার মনে এ সন্দেহ-ই জাগ্রত হয়েছিলো যে, রাতের অন্ধকারে বের হওয়া মেয়েটি আল-বার্কের স্ত্রী হতে পারে না। গুপ্তচর মেয়েটির দেয়া তথ্যের পর অপর এক মহিলার মাধ্যমে আলী বিন সুফিয়ান আল-বার্কের প্রথমা স্ত্রীর নিকট বার্তা প্রেরণ করেন যে, আমি বাইরে কোথাও আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই। তবে আল-বার্ক যেন জানতে না পারে। বার্তায় তিনি একথাও বলেন, আপনার পরিবার সম্পর্কে আমার অনেক জরুরী কথা আছে। আলী বিন সুফিয়ান সাক্ষাতের স্থান এবং সময়ও নির্ধারণ করে দেন।

আল-বার্ক অফিসের কাজে ব্যস্ত। তার প্রথমা স্ত্রী নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে এসে উপস্থিত হন। মহিলাকে বেশ শ্রদ্ধা করতেন আলী বিন সুফিয়ান। তিনি বললেন— 'আমি জানতে পারলাম, আপনার স্বামী নাকি আরেকটি বিয়ে করেছে? ' মহিলা বললেন— 'আল্লাহর শোকর, আমার স্বামী মাত্র দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন– তৃতীয় বা চতুর্থ বিয়ে করেননি।'

কথা প্রসঙ্গে আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন— 'তা নতুন বউটা কেমন হলো?'

'অত্যন্ত সুন্দরী।' জবাব দেন মহিলা।

'ভদ্রও তো, না? তার প্রতি আপনার কোন ধরনের সন্দেহ নেই তো?' জিজ্ঞেস করেন আলী বিন সুফিয়ান।

জবাবে মহিলা কিছু-ই বললেন না। নীরবে কিছুক্ষণ ভাবনায় পড়ে থাকেন। আলী বিন সুফিয়ান জবাবের অপেক্ষা না করে বললেন— 'আচ্ছা, আমি যদি বলি, মেয়েটি মাঝে-মধ্যে রাতের আঁধারে বাইরে কোথাও চলে যায়, তাহলে রাগ করবেন না তো?'

মহিলা স্মিত হেসে বললেন— 'আমি নিজে-ই অস্থিরচিত্তে ভাবছিলাম, কথাটা কাকে বলবো। আমার স্বামী মেয়েটির গোলাম হয়ে গেছেন। আমার সঙ্গে তো তিনি এখন কথাও বলেন না। অতি আদরের এই বউটির বিরুদ্ধে যদি কিছু বলতে

যাই, তাহলে নির্ঘাত আমাকে তিনি ঘর থেকে বের করে দেবেন। তিনি ভাববেন, হিংসাবশত আমি তার বদনাম করছি। মেয়েটি আসলেই ভালো নয়। আমার ঘরে ইতিপূর্বে কখনো মদের ঘ্রাণও আসেনি। আর এখন পিপার পর পিপা শূন্য হয়ে যায়।'

'মদ? আল-বারক মদও পান করতে শুরু করেছে?' হঠাৎ শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করেন আলী বিন সুফিয়ান।

'শুধু পানই করেন না- মাতাল-অচেতনও হয়ে যান। আমি ছয়বার মেয়েটিকে রাতের বেলা বাইরে যেতে দেখেছি। ফিরেছে অনেক বিলম্বে। আমি এ-ও দেখেছি যে, যে রাতে মেয়েটির বাইরে যেতে হয়, সে রাতে আল-বারক অজ্ঞানের মত পড়ে থাকেন। সকালে জাগ্রত হন অনেক বিলম্বে। মেয়েটি বড় বদমাশ, লোকটার সঙ্গে ও প্রতারণা করছে।' বললেন মহিলা।

'না, মেয়েটি বদমাশ নয়- গুপ্তচর। আর সে ধোঁকা দিচ্ছে আল-বারককে নয়- গোটা জাতিকে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'কী বললেন? গুপ্তচর? আমার ঘরে শত্রুর গোয়েন্দা?' অকস্মাৎ চমকে উঠেন মহিলা। বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত কড়মড় কর বললেন— 'আপনি জানেন, আমি শহীদ পিতার কন্যা। আমার স্বামী আল-বারক ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। নিজের জীবনটা উৎসর্গ করে রেখেছিলেন ইসলামের জন্য। সন্তানদেরকে আমি গঠন করছি জিহাদের জন্য। আর এখন আপনি কিনা বলছেন, আমার সন্তানদের পিতা একজন শত্রু গোয়েন্দা মেয়ের কব্জায় বন্দী! আমি আমার সন্তানদের পিতাকে ত্যাগ করতে পারি- জাতি ও ইসলামকে কোরবান হতে দিতে পারি না। যে করে হোক, দু'জনকে-ই আমি খুন করে ফেলবো।'

'আলী বিন সুফিয়ান মহিলাকে বড় কষ্টে শান্ত করেন। বললেন, মেয়েটি যে গুপ্তচর, তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। দেখতে হবে, আল-বারক গুপ্তচরদের দলে ভিড়েই গেলো, নাকি তাকে মদপান করিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। আলী বিন সুফিয়ান আল-বারকের স্ত্রীকে এ-ও জানান যে, আমরা গুপ্তচরদের হত্যা করি না- গ্রেফতার করে তাদের গ্যাং সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি।

আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শে শান্ত হয়ে আল-বারকের স্ত্রী চলে যান। কিন্তু তার ভাব-গতিতে মনে হচ্ছিলো, ঈমানী চেতনাসমৃদ্ধ মহিলা ফুঁসে উঠতে পারেন যে কোন মুহূর্তে। আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন তিনি।

❖ ❖ ❖

খাদেমুদ্দীন আল-বার্‌ক আলী বিন সুফিয়ানের কেবল সহকর্মী-ই নয়– অন্তরঙ্গ বন্ধুও বটে। বয়সেও দু'জন সমান। রণাঙ্গনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইও করেছেন দু'জনে। সে সুলতান আইউবীর প্রবীণ সহচর। তথাপি সে তার দ্বিতীয় বিয়ের কথা আলী বিন সুফিয়ান থেকে গোপন রেখেছে। বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর আলী বিন সুফিয়ান এ প্রসঙ্গে তার সঙ্গে কোন আলাপ করেননি। আল-বার্‌কের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সুকৌশলে তৎপরতা চালান। তিনি আল-বার্‌কের ঘর এবং মেয়েটি রাতের অন্ধকারে যে বাড়িতে যাওয়া-আসা করে, দু'য়ের মাঝে গুপ্তচর বসিয়ে দেন।

আল-বার্‌কের প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ানের কথা হলো দু'দিন হয়ে গেছে। এ সময়ে আসেফা ঘর থেকে বের হয়নি। রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে আলীর গোয়েন্দারা।

তৃতীয় রাতের দ্বি-প্রহরের পূর্ব মুহূর্ত। ঘুমিয়ে আছেন আলী বিন সুফিয়ান। হঠাৎ ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে এক চাকর। ঘুম থেকে ডেকে তোলে তাঁকে। বলে— 'ওমর এসেছে! তাকে বড় ভয়ার্ত দেখাচ্ছে!'

ধনুক থেকে বের হওয়া তীরের ন্যায় দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন আলী বিন সুফিয়ান। দু'-তিন লাফে বারান্দা অতিক্রম করে দেউড়ী পার হয়ে বাইরে চলে আসেন। বাইরে দণ্ডায়মান ওমর বললো— 'দ্রুত দশ-বারজন অশ্বারোহী প্রস্তুত করুন! নিজের ঘোড়াও হাজির করুন! তারপর বলছি, কী ঘটেছে।'

চৌদ্দজন সশস্ত্র আরোহী, নিজের ঘোড়া ও তরবারী প্রস্তুত করার আদেশ দিয়ে আলী ওমরকে জিজ্ঞেস করেন— 'বলো, ব্যাপার কী?'

আসেফার গতিবিধি অনুসরণ করার জন্য নিয়োজিত ছিলো ওমর ও আজর নামের দুই গোয়েন্দা। আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েটি কোথাও যেতে শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ দেবে।

বড় ভয়ানক সংবাদ নিয়ে এসেছে ওমর। সে জানায়, এই সামান্য আগে আল-বার্‌কের ঘর থেকে আপাদমস্তক কালো চাদরে ঢাকা একটি মেয়ে বের হয়েছে। পঞ্চাশ-ষাট গজ পথ অতিক্রম করার পর সেই ঘর থেকে বের হয় একই রকম পোশাকে আরেকজন নারী। দ্রুত অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় মহিলা প্রথম মহিলার

পিছনে চলে যায়। খানিকটা দূরে থাকতে-ই প্রথম মহিলা দাঁড়িয়ে যায়। গুপ্তচর দু'জন লুকানো ছিলো আড়ালে। তাদের দেখতে পায়নি কেউ। মহিলাদের অনুসরণও করছিলো অতি সন্তর্পণে। মুখোমুখি হলো মহিলাদ্বয়। কি যেন কথা হলো দু'জনের মধ্যে। হঠাৎ হাতে তালি বাজায় তাদের একজন। কাছাকাছি একস্থান থেকে বেরিয়ে আসে এক ব্যক্তি। সে দ্বিতীয় মহিলাকে আটক করার চেষ্টা করে। মহিলা কি একটি অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলো তার উপর। মহিলার উপরও পাল্টা আঘাত হানে লোকটি।

কণ্ঠস্বর শোনা গেলো প্রথম মহিলার– 'একে তুলে নিয়ে চলো'। দ্বিতীয় মহিলা আঘাত হানে তার উপর। তার চীৎকারের শব্দ ভেসে আসে। পুরুষ লোকটির আঘাত প্রতিহত করে দ্বিতীয় মহিলা। আরো একটি আঘাত হানে প্রথম মহিলার উপর। আহত হয়ে পড়ে মহিলাদের দু'জনই। আলী বিন সুফিয়ানকে সংবাদ দেয়ার জন্য দৌড়ে যায় ওমর। আজর লুকিয়ে থাকে সেখানে-ই। এরা যায় কোথায়, দেখবার অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকে সে।

এরূপ বিশেষ সময়ের জন্য অতি দ্রুতগামী ও অভিজ্ঞ আরোহীদের একটি বাহিনী গঠন করে রেখেছিলেন আলী বিন সুফিয়ান। রাতে ঘুমায় তারা আস্তাবলে– ঘোড়ার কাছে। যিন-হাতিয়ার প্রস্তুত থাকে সব সময়। প্রয়োজন হলে রাতেও যেনো তারা কয়েক মিনিটে প্রস্তুত হয়ে যথাস্থানে পৌঁছে যেতে পারে, তার প্রশিক্ষণ দিয়ে রাখা হয়েছে তাদের। বাহিনীটি এতো-ই তৎপর যে, সংবাদ পেয়ে আলী বিন সুফিয়ান পোশাক পরিবর্তন ও ঘোড়া প্রস্তুত করতে না করতে-ই তারা এসে উপস্থিত।

আলী বিন সুফিয়ানের নেতৃত্ব ও ওমরের রাহ্বরীতে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছে বাহিনীটি। দু'জন আরোহীর হাতে লাঠির মাথায় বাঁধা তেল-ভেজা কাপড়ের মশাল। ঘটনাস্থলে পড়ে আছে দু'টি মানব-দেহ। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে দেখলেন আলী বিন সুফিয়ান। একজন আল-বার্কের প্রথমা স্ত্রী, অপরজন ওমরের সহকর্মী আজর। দু'জন-ই জীবিত এবং রক্তরঞ্জিত।

আজর জানায়, অপর দু'জন এই মহিলাকে ফেলে চলে গেলে আমি এগিয়ে আসি। কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন পরপর তিনটি আঘাত হানে আমার উপর। আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি। আক্রমণকারী পালিয়ে যায়। অপর মহিলা আল-বার্কের ঘরের দিকে যায়নি, গেছে বরাবরের মতো ঐ ভবনটির দিকে। সেই ভবনটি জানা আছে ওমরের।

আলী বিন সুফিয়ান দু'জন আরোহীকে বললেন, তোমরা জখমীদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করো। অবশিষ্টদেরকে ওমরের দিক-নির্দেশনায় সেই ভবনটির দিকে নিয়ে যান, আসেফা যেখানে যাওয়া-আসা করতো।

পুরনো আমলের বিশাল এক বাড়ি। সঙ্গে সংযুক্ত আরো কয়েকটি ভবন। পিছনের দিক থেকে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শোনা গেলো। আলী বিন সুফিয়ান তার সৈন্যদেরকে ভবনটির দু'দিক থেকে পিছনে পাঠিয়ে দেন। দু'জনকে দাঁড় করিয়ে রাখেন সম্মুখের ফটকে। বলে দেন, ভেতর থেকে কেউ বেরুবার চেষ্টা করলে তাকে ধরে ফেলবে। পালাবার চেষ্টা করলে পেছন থেকে তীর ছুঁড়ে শেষ করে দেবে।

চক্কর কেটে আলী বিন সুফিয়ানের সৈন্যরা ভবনের পিছনে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন সময়ে তারা একাধিক ধাবমান ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পায়। আলী বিন সুফিয়ান এক আরোহীকে বললেন— 'জল্‌দি যাও, কমাণ্ডারকে বলো, দ্রুত ভবনটিকে ঘিরে ফেলে যেন ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং ভিতরের সবাইকে গ্রেফতার করে।'

আরোহী ক্যাম্পের দিকে ছুটে যায়।

আলী বিন সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে তাঁর বাহিনীকে আদেশ করেন— 'ঘোড়া ছুটাও-ধাওয়া করো।' নিজেও ঘোড়া হাঁকান আলী বিন সুফিয়ান। উন্নত জাতের বাছাই করা ঘোড়া তাঁর। বাতাসের গতিতে ছুটে চলেন তিনি। নগর এলাকা পেরিয়ে-ই সামনে খোলা ময়দান।

অন্ধকারে ঘোড়া দেখা যায় না। ধাবমান অশ্বের শব্দের অনুসরণ করা হচ্ছে শুধু। নগর ছেড়ে খোলা মাঠে এসে পড়ে পলায়নকারীরা। এবার আত্মগোপন করা কঠিন হয়ে পড়ে তাদের জন্য। বিস্তৃত দিগন্তের দৃশ্যপটে এবার ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে তাদের।

তারা চারজন। দু' পক্ষের মাঝে এখনো অন্তত একশত গজের ব্যবধান। আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশে ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে-ই তীর ছুঁড়ে দু' আরোহী। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় আক্রমণ। বড় চতুর মনে হলো ওদের। যাচ্ছিলো একত্রিতভাবে পাশাপাশি। এবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাদের ঘোড়া। ধেয়ে চলেছে অবিরাম। আলী বিন সুফিয়ানের বাহিনীও এগিয়ে চলছে তীব্রগতিতে।

ধীরে ধীরে দু' পক্ষের মাঝের দূরত্ব কমে আসতে থাকে। পলায়নকারীদের ঘোড়াও পরস্পর আরো বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। সামনে ঘন সন্নিবিষ্ট একটি খেজুর বাগান। এখানে উপনীত হয়ে তাদের ঘোড়াগুলো একের থেকে অপরটি আরো দূরে সরে যায়। দু'টি ডানে আর দু'টি বাঁয়ে কেটে পড়ে। স্থানটি বেশ উঁচু। উপরে অদৃশ্য হয়ে যায় ঘোড়াগুলো।

আলী বিন সুফিয়ানের বাহিনীও উঁচুতে আরোহণ করে। কিন্তু পলায়নরত ছায়ামূর্তিগুলো এবার অনেক ব্যবধানে চলে যায় তাদের থেকে। চারজন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, ওরা তার বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করতে চায়। উচ্চকণ্ঠে হাঁক দেন তিনি। বলেন— 'বিভক্ত হয়ে তোমরা ওদের ধাওয়া করো। আরো দ্রুত ঘোড়া ছুটাও। ব্যবধান কমিয়ে ফেলো। ধনুকে তীর সংযোজন করো।'

চারভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে আলী বিন সুফিয়ানের বাহিনী। কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে তাতে তীর সংযোজন করে। পিছু নেয় পলায়নকারী চারটি ঘোড়ার। পলায়নকারীদের ঘোড়ার গতি বেড়ে যায় আরো। বেড়ে যায় আলী বিন সুফিয়ানের বাহিনীর ঘোড়ার গতিও। হঠাৎ উনিশটি ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনির শব্দ ভেদ করে কানে ভেসে এলো ধনুক থেকে ছুটে যাওয়া একটি তীরের শাঁ শাঁ শব্দ। সঙ্গে একজনের চীৎকার ধ্বনি— 'একটা শেষ করেছি– ঘোড়া কাবু হয়ে গেছে।'

এদিকে আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে যে দু'জন আরোহী আছে, তারাও তীর ছুঁড়ে। অন্ধকারে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, হচ্ছেও। তবু তারা একটি ঘোড়াকে ঘায়েল করতে সক্ষম হয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘোড়াটি চক্কর কেটে চলে আসে পিছনে। একজন বর্শার আঘাত হানে ঘোড়াটির ঘাড়ে। পেটে বর্শা ঢুকিয়ে দেয় আরেকজন। অত্যন্ত শক্ত-সামর্থ ঘোড়া। দু'টি আঘাত খাওয়ার পরও দাঁড়িয়ে আছে। আরোহীদের জীবিত ধরতে হবে। আলীর এক সৈনিক হাত বাড়িয়ে এক আরোহীর ঘাড় ধরে ফেলে। তার ঘোড়া আহত। ঘোড়া থেমে যায়। ঘোড়ার আরোহী দু'জন। একজন পুরুষ, একটি মেয়ে। মেয়েটি বসেছে পুরুষের সামনে। তাকে অচেতন বলে মনে হলো।

অন্ধকার রাত। এখন আর কোন ধাবমান ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যায় না। এখন কানে আসছে শুধু কতিপয় মানুষের কথা বলার শব্দ আর দুল্‌কি চালে চলন্ত কয়েকটি ঘোড়ার আওয়াজ। আরোহীরা একে অপরকে ডাকাডাকি করছে। তাদের আওয়াজে বুঝা যাচ্ছে, তারা পলায়নপর লোকগুলোকে ধরে ফেলেছে।

আলী বিন সুফিয়ান সবাইকে একত্রিত করেন। পলায়নপর লোকগুলো এখন তার হাতে বন্দী। তাদের দু'টি ঘোড়া আহত। সেগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যমের হাতে।

পলায়নপর লোকের সংখ্যা পাঁচজন। চারজন পুরুষ, একটি মেয়ে। মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। পুরুষদের একজন বললো, আমাদের সঙ্গে তোমরা যেমন ইচ্ছা আচরণ করতে পারো। কিন্তু এই মেয়েটি আহত। আমরা আশা করি তোমরা একে বিরক্ত করবে না।

একটি ঘোড়ার যিনের সঙ্গে মশাল বাঁধা আছে। সেটি খুলে নিয়ে জ্বালানো হলো। মশালের আলোকে মেয়েটিকে নিরীক্ষা করে দেখা হলো। অতিশয় রূপসী এক যুবতী। গায়ের পোশাক রক্তে রঞ্জিত। কাঁধে ও ঘাড়ের পার্শ্বে গভীর ক্ষত। সীমাহীন রক্তক্ষরণে মুখমণ্ডল লাশের ন্যায় সাদা। চক্ষুদ্বয় মুদিত। আলী বিন সুফিয়ান জখমের গর্তে এক খণ্ড কাপড় ঢুকিয়ে আরেকটি কাপড় দ্বারা বেঁধে দেন। তারপর তাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে এক সৈনিককে বললেন, একে জলদি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। কিন্তু 'জলদি' যাওয়া কিভাবে। শহর এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। একজন বৃদ্ধও আছে কয়েদীদের মধ্যে।

❖ ❖ ❖

বন্দীদের নিয়ে আলী বিন সুফিয়ান যখন কায়রো পৌঁছেন, তখন রাত পেরিয়ে ভোর হয়েছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী রাতের অঘটনের খবর পেয়ে গেছেন আগেই। আলী বিন সুফিয়ান হাসপাতালে যান। ডাক্তারগণ আহত বন্দী মেয়েটির ব্যাণ্ডেজ-চিকিৎসায় ব্যস্ত। তারা মেয়েটির জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন। এই একটু আগে হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে মেয়েটি।

আল-বারকের প্রথমা স্ত্রী ও আজরের জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু অবস্থা তাদের আশাব্যঞ্জক নয়। সুলতান আইউবীও হাসপাতালে উপস্থিত। তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন— 'আমি অনেকক্ষণ যাবত এখানে আছি। আল-বারককে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এসে সে আমাকে এক অদ্ভুত কথা শোনালো। বললো, আল-বারক অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। কক্ষে তার মদের পেয়ালা-পিপা। লোকটা মদপান করতে শুরু করলো? স্ত্রীটা যে তার ঘরের বাইরে আহত হয়ে পড়ে আছে, সে খবরটা পর্যন্ত তার নেই। তার স্ত্রীর সঙ্গে আমি এখনও কথা বলিনি– ডাক্তার নিষেধ করে দিয়েছে।'

একজন নয়– আল-বার্কের দু' স্ত্রী-ই আহত। এই যে মেয়েটিকে আমরা মরুভূমি থেকে ধরে এনেছি, ও আল-বার্কের দ্বিতীয়া স্ত্রী। আমরা একটি মূল্যবান শিকার ধরে এনেছি।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

সূর্যোদয়ের পর ঘুম ভাঙ্গে আল-বার্কের। চাকরের মুখে সংবাদ পেয়ে সে হাসপাতালে ছুটে আসে। দু' স্ত্রী-ই তার রক্তাক্ত পড়ে আছে হাসপাতালের বিছানায়। চারজন গুপ্তচর দেখানো হয় তাকে। চারজনের মধ্যে বৃদ্ধকে দেখে অবাক্ হয়ে যায় আল-বার্ক। তার জানা মতে লোকটা তার দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামী।

কেইসটা নিজের হাতে তুলে নেন সুলতান আইউবী। অত্যন্ত মারাত্মক কেইস, যার সঙ্গে জড়িত প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের এমন একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, সুলতান আইউবীর ভবিষ্যত পরিকল্পনা, গোপন রহস্য সব-ই যার জানা।

জ্ঞান ফিরে আসে জখমীদের। জবানবন্দী নেয়া হয় আল-বার্কের প্রথমা স্ত্রীর। আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে কথা বলে ক্ষুব্ধ মনে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। তিনি জানান, ঘরে ফিরে গিয়ে আমি আসেফার গতিবিধির উপর গভীর নজর রাখতে শুরু করি। রাতে না ঘুমিয়ে পাহারা দিতে থাকি। এক সুযোগে আসেফার শয়নকক্ষের দরজায় একটুখানি ছিদ্র করি প্রথম দু' রাতে শুধু এতটুকু-ই দেখলাম যে, মেয়েটি আল-বারক্কে মদপান করাচ্ছে এবং বেহায়াপনা-উলঙ্গপনার চূড়ান্ত ঘটাচ্ছে। সুলতান আইউবী সম্পর্কে মেয়েটি এমন ধারায় কথা বলছে, যেন তিনি তার পীর, মুরশিদ। খৃষ্টানদের নিন্দাবাদ করছে। কথা বলছে সুলতান আইউবীর সামরিক পরিকল্পনা বিষয়ে। সুলতান আইউবী কী করবেন এবং কী ভাবছেন, অবলীলায় মেয়েটিকে বলে যাচ্ছে আল-বার্ক।

দু'টি রাত আমি এ পর্যন্ত দেখলাম ও শুনলাম। তৃতীয় রাতে মঞ্চস্থ হলো সেই নাটকটি, অধীর চিত্তে আমি যার অপেক্ষায় ছিলাম। আসেফা আল-বার্ককে মদপান করায় এবং সম্পূর্ণরূপে পশুতে পরিণত করে তোলে। দু'টি শূন্য পেয়ালা হাতে নিয়ে আসেফা এই বলে অন্য কক্ষে চলে যায় যে, 'অপেক্ষা করুন, আরো আনছি।' ফিরে আসে সুরাভর্তি আরো দু'টি পেয়ালা নিয়ে। একটি তুলে দেয় আল-বার্কের হাতে আর অপরটি লাগায় নিজের মুখে। তৃতীয় পেয়ালাটি গলাধঃকরণ করে আল-বার্ক মুদিত-নয়নে শুয়ে পড়ে, যেন হঠাৎ রাজ্যের ঘুম এসে তাকে চেপে ধরেছে।

আসেফা পোশাক পরিধান করে। আলতো পরশে গায়ে হাত বুলিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকে আল-বারককে। কিন্তু লোকটার কোন সাড়া-শব্দ নেই। আসেফা হাতে ধরে নাড়া দেয় তাকে। কিন্তু, না, তার বিন্দুমাত্র হুঁশ নেই। মেয়েটি মদের সঙ্গে নিদ্রাজনক পাউডার খাইয়ে আল-বারককে সম্পূর্ণ অচেতন করে ফেলেছে।

আসেফা গায়ে একটি কালো চাদর জড়িয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নেয়। তখন মধ্যরাত। আসেফা কক্ষের বাতি নিভিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। দাউ দাউ করে যেন আমার সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে। নিজের কক্ষে প্রবেশ করে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নেই। হাতে খঞ্জর তুলে নেই। বের হতে গিয়ে দেখি, আসেফা ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে এক চাকরানীর সাথে। বুঝলাম, এই চাকরানীটা তার সহযোগী।

আসেফা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। চাকরানী চলে যায় নিজ কক্ষে। বেরিয়ে পড়ি আমিও। দ্রুত হেঁটে পিছু নিলাম আসেফার। বাইরে ঘোর অন্ধকার। পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না। আমি আসেফার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে চলছি। মেয়েটি কোথায় যায়, তা দেখা আমার উদ্দেশ্য। এক পর্যায়ে বোধ হয় আসেফা আমার পদশব্দ শুনতে পায়। সে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু অন্ধকারে আমি তাকে ভালোভাবে দেখতে পাইনি। এসে পড়ি আসেফার একেবারে সন্নিকটে। হঠাৎ কী করবো বুঝে উঠতে পারলাম না। অলক্ষ্যে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে— 'যাচ্ছো কোথায়, আসেফা?'

মেয়েটির নিরাপত্তার জন্য চুপিসারে এগিয়ে চলছিলো এক ব্যক্তি। তা আল-বারকের প্রথমা স্ত্রীর জানা ছিলো না। আসেফা হাততালি দেয় এবং মুখে হাসি টেনে এনে আল-বারকের প্রথমা স্ত্রীকে বলে, তা আপনি কি আমার পিছু পিছু আসলেন, নাকি কোথাও যাচ্ছেন? এরই মধ্যে পিছন থেকে ছুটে এসে মহিলার বাহু চেপে ধরে একজন। বন্ধন শক্ত হওয়ার আগেই মহিলা ঝাপটা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় লোকটার কবল থেকে। লোকটি মহিলার আঘাত প্রতিহত করে পাল্টা আঘাত করে তার উপর। খঞ্জর বিদ্ধ হয় মহিলার পাজরে। অমনি সরে যায় পিছনে। আহত মহিলা আক্রমণ করে আসেফার উপর। খঞ্জর বিদ্ধ হয় মেয়েটির ঘাড় ও কাঁধের মাঝখানটিতে। চীৎকার করে উঠে আসেফা।

আসেফা মাটিতে পড়ে যায়। বসে পড়ে আল-বারকের প্রথমা স্ত্রীও। দু'জন-ই আহত, রক্তাক্ত। কাতরাচ্ছে তারা। ক্ষণিক পর লোকটি এগিয়ে এসে আসেফাকে তুলে নিয়ে চলে যায়।

আলী বিন সুফিয়ানের দু' গুপ্তচর ওমর ও আজর ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করছিলো চুপি চুপি। অপর মহিলাটি কে, তা তাদের জানা ছিলো না। যে লোকটি আসেফাকে তুলে নিয়ে গেলো, ওমর পিছু নেয় তার। দেখবে, লোকটি যায় কোথায়। আসেফা বরাবর যে ভবনটিতে যাওয়া-আসা করতো, সেখানে-ই নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। তৎক্ষণাৎ আলী বিন সুফিয়ানকে সংবাদ দেয়ার জন্য ছুটে যায় ওমর। আজর বসে থাকে সেখানে-ই। আল-বারকের আহত প্রথমা স্ত্রী-ও পড়ে আছেন ঘটনাস্থলে। অন্য কেউ নেই সেখানে। আজর পা টিপে টিপে মহিলার নিকট গিয়ে এসে বসে পড়ে একস্থানে। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন খঞ্জরের আঘাত হানে তার উপর। একে একে তিনটি আঘাত হেনে পালিয়ে যায় লোকটি। আজর চৈতন্য হারিয়ে পড়ে থাকে সেখানে।

সন্ধ্যা নাগাদ অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে আল-বারকের প্রথমা স্ত্রী ও আজরের। প্রাণপণ চেষ্টা করলেন ডাক্তার-কবিরাজগণ। কিন্তু বাঁচিয়ে রাখা গেলো না একজনকেও। আল-বারকের স্ত্রী আলী বিন সুফিয়ানকে বলেছিলেন— 'আমি আমার স্বামীকে কোরবান করতে পারি, কিন্তু জাতি ও দেশের ইজ্জত কোরবান হতে দিতে পারি না।'

অবশেষে দেশ ও জাতির জন্য নিজের জীবনটা কোরবান করে তিনি জান্নাতে চলে গেলেন।

সুলতান আইউবীর কারাগারে বন্দী করে রাখা হলো খাদেমুদ্দীন আল-বারককে। আল-বারক শতভাবে বুঝাবার চেষ্টা করে, এ অপরাধ সে জেনে-শুনে করেনি। সে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে বোকা বনে গিয়েছিলো। কিন্তু ইতিমধ্যে সে মদ ও সুন্দরী নারীর নেশায় পড়ে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর অনেক গোপন তথ্য-পরিকল্পনা দুশমনের হাতে তুলে দিয়েছে। সুলতান আইউবী হত্যার শাস্তি ক্ষমা করতে পারেন; কিন্তু মদপান, বিলাসিতা এবং দুশমনকে গোপন তথ্য দেয়ার অপরাধ তিনি মার্জনা করতে পারেন না।

সেদিন আসেফার নিকট থেকে কোন জবানবন্দী নেয়া হলো না। জখম অপেক্ষা পরিণাম-চিন্তায়-ই সে বেশী শঙ্কিত। মেয়েটি সৈনিক নয়—গুপ্তচর। সে শাহজাদীর রূপ ধারণ করে শাহজাদাদের তথ্য নেয়ার প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এমন একটি পরিণতি তাকে বরণ করতে হবে, তা ভাবেনি কখনো। মেয়েটির সবচেয়ে বড় ভয়, সে মুসলমানের কয়েদী; আর তার জানামতে মুসলমান মানেই হিংস্র, জংলী, বর্বর। এখন যে তার সব শেষ হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

একটি আশঙ্কা তার এ-ও ছিলো যে, মুসলমানরা তার জখমের চিকিৎসা করাবে না। কক্ষে বসে বসে ভয়-পাওয়া শিশুটির ন্যায় অঝোরে কাঁদছে মেয়েটি। আলী বিন সুফিয়ান তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেন, তোমার সঙ্গে আমরা সেই আচরণ-ই করবো, যা আমরা একজন আহত মুসলমান নারীর সঙ্গে করে থাকি। কিন্তু তবু তার ভয় কাটছে না। সে বার বার সুলতান আইউবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করছে। বিষয়টি অবহিত করা হয় সুলতান আইউবীকে।

সুলতান আইউবী মেয়েটির কাছে যান। তার মাথায় হাত রেখে বললেন— 'এ মুহূর্তে আমি তোমাকে নিজের কন্যা মনে করি'।

'আমি শুনেছি, সুলতান আইউবী তরবারীর নয়– হৃদয়ের রাজা। আপনি এতো-ই শক্তিধর বাদশাহ যে, আপনাকে পরাজিত করার জন্য খৃষ্টানদের সব রাজা একজোট হয়েছে। সেই খৃষ্টানদের হয়ে আজ আমি আপনার হাতে বন্দী। দুশমনকে কেউ কখনো ক্ষমা করে না। আপনিও আমাকে ক্ষমা করবেন না জানি। তবে আমি ধুঁকে ধুঁকে মরতে চাই না। আপনার লোকদের বলুন, এক্ষুনি যেনো তারা আমাকে একটু বিষ এনে দেন; আপনি আমাকে শান্তিতে মরতে দিন।' কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো আসেফা।

'তুমি বললে সারাক্ষণ আমি তোমার কাছে বসে থাকবো। আমি তোমার সঙ্গে কোন প্রতারণা করবো না। তুমি আরো সুস্থ হও। ডাক্তার বলেছে, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। আমার যদি তোমাকে নির্যাতন করার ইচ্ছা থাকতো, তাহলে সে অবস্থায়-ই তোমাকে বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখতাম; তোমার কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিতাম। চীৎকার করে করে তুমি সব অপরাধের কথা স্বীকার করতে, একজন একজন করে সঙ্গীদের নাম-ঠিকানা বলে দিতে। কিন্তু কোন নারীর সঙ্গে আমরা এমন আচরণ করি না। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।' বললেন সুলতান আইউবী।

'সুস্থ হয়ে গেলে আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন?' জিজ্ঞেস করে আসেফা।

'তুমি যেসবের আশঙ্কা করছো, তার কিছু-ই ঘটবে না। তুমি একটি যুবতী-রূপসী –এখানকার কেউ এ দৃষ্টিতে তোমার প্রতি তাকাবে না। এমন অমূলক আশঙ্কা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। মুসলমান নারীর অসম্মান করতে জানে না। তোমার সঙ্গে আমরা সেই আচরণ-ই করবো, যা ইসলামী বিধানে লেখা আছে।' বললেন সুলতান আইউবী।

আসেফা যে ভবনে যাওয়া-আসা করতো, আহত হওয়ার পর যে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, সে ঘরে তল্লাশী নেয়া হলো। ভবনটির কোন মালিক নেই। গুপ্তচরদের আখড়া এটি। ভিতরেই ঘোড়ার আস্তাবল। অনুসন্ধান করে ভেতরে পাঁচজন লোক পাওয়া গেলো। তাদের গ্রেফতার করা হলো। এই পাঁচজন এবং ধাওয়া করে যে চারজনকে ধরে আনা হয়েছিলো, জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো তাদেরকেও। কিন্তু তারা অপরাধের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করলো। অবশেষে তাদেরকে এমন একটি পাতাল কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে গেলে পাথরেরও জবান খুলে যায়। বৃদ্ধ স্বীকার করলো, মেয়েটিকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করে সে আল-বার্ককে ঘায়েল করেছিলো। নাটকটি আনুপূর্বিক বিবৃত করলো বুড়ো। অন্যরাও ফাঁস করে দেয় অনেক তথ্য। সেই ভবনটির রহস্যও উন্মোচিত হয়ে যায়, যাকে শহরের মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। অনেকগুলো সুন্দরী মেয়েও রাখা ছিলো সে ঘরে, যাদেরকে তারা দু'টি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতো। এক. গুপ্তচরবৃত্তির জন্য, দুই. শাসক শ্রেণীর উচ্চ পরিবারের মুসলিম যুবকদের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য। গুপ্তচর ও সন্ত্রাসীদের আখড়া সে ভবনটি।

গ্রেফতারকৃত খৃষ্টান গুপ্তচররা আরো জানায়, সুলতান আইউবীর বাহিনীর মধ্যে তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদেরও ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারা সৈন্যদের মধ্যে জুয়াবাজীর অভ্যাস ছড়িয়ে দিয়েছে। এই জুয়া খেলার জন্য এখন একে অপরের অর্থ-সম্পদ চুরি করা শুরু করেছে আইউবীর সৈন্যরা। শহরে তারা ছড়িয়ে দিয়েছে পাঁচ শ'রও অধিক বেশ্যা নারী। তারা ফাঁদে ফেলে ফেলে মুসলিম যুব সমাজকে বিলাসিতা ও বিপথগামীতার অন্ধকার পথে নিয়ে যাচ্ছে। চালু করা হয়েছে গোপন জুয়ার আসর।

গুপ্তচররা আরো জানায়, তারা-ই অপসারিত সুদানীদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে উস্কানী দিয়ে চলেছে। তাদের দেয়া সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, সুলতান আইউবী সরকারের উচ্চপদস্থ ছয়জন অফিসার তলে তলে আইউবীর বিরুদ্ধে কাজ করছে।

আসেফা খৃষ্টান মেয়ে। প্রাপ্ত তথ্যমতে তার নাম ফেলিমঙ্গো। বাড়ি গ্রীস। তের বছর বয়স থেকে তাকে এ কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাকে মিসরের ভাষাও শেখানো হয়েছে। মুসলমানদের ঈমান-আমান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চরিত্র ধ্বংস করার জন্য খৃষ্টানরা তার মতো এমন আরো কয়েক হাজার রূপসী মেয়েকে ট্রেনিং দিয়েছে। এখন তারা সুলতান আইউবীর মিসরে কর্তব্য পালন করছে।

মেয়েটিও কোন কথা গোপন রাখেনি। পনের দিনের মাথায় তার জখম শুকিয়ে গেছে। তাকে যখন বলা হলো, তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে, তখন সে বললো— 'আমি আনন্দের সাথে এই শাস্তি বরণ করে নিচ্ছি। আমি ক্রুশের মিশন সম্পন্ন করেছি।'

এক সময়ে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হয় মেয়েটিকে।

ফেলিমঙ্গোর সঙ্গীদের প্রয়োজন রয়ে গেছে এখনো। তাদের চিহ্নিত করা আরো কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলো। তাদের মধ্যে মুসলমানও ছিলো কয়েকজন। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো তাদের প্রত্যেককে। একশত বেত্রাঘাতের দণ্ড দেয়া হলো আল-বারককে। কিন্তু এ শাস্তি সহ্য করতে না পেরে মরে গেলো সে-ও। তার সন্তানদেরকে রাষ্ট্রের দায়িত্বে নিয়ে এলেন সুলতান আইউবী। সরকারী খরচে চাকরানী ও গৃহশিক্ষক নিয়োগ করে দেয়া হলো পিতৃ-মাতৃহারা এই ছেলে-মেয়েগুলোর জন্য। আমরা তাদেরকে ঈমান-বিক্রেতা আল-বারকের সন্তান বলবো না— বলবো, এরা এক বীরাঙ্গনা শহীদ জননীর সন্তান।

অপহরণ

১১৭১ সালের জুন মাস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিজ কক্ষে উপবিষ্ট। অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে খলীফা আল-আজেদের দূত। সালাম দিয়ে বলে, খলীফা আপনাকে স্মরণ করেছেন। বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠে সুলতান আইউবীর চেহারায়। ভ্রু-কুঞ্চিত করে দূতকে বললেন— 'খলীফাকে আমার সালাম দিয়ে বলবে, জরুরী কোন কাজ থাকলে যেন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান; অন্যথায় নয়। এ মুহূর্তে আমার এতটুকু অবসর নেই। তাঁকে আরো বলবে, আমার সামনে যে কাজ পড়ে আছে, তা হুজুরের দরবারে হাজেরী দেয়া অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।'

দূত ফিরে যায়। মাথা নুইয়ে কক্ষে পায়চারী করতে শুরু করেন সুলতান আইউবী।

ফাতেমী খেলাফতের যুগ। আল-আজেদ মিসরে এ খেলাফতের খলীফা। সে যুগের খলীফারা হতেন রাজা। জুমার খুতবায় আল্লাহ ও রাসূলের নামের পরে খলীফার নামও উচ্চারণ করতে হতো। বিলাসিতা ছাড়া তাঁদের আর কোন কাজ ছিলো না। নুরুদ্দীন জঙ্গী আর সুলতান আইউবী যদি না থাকতেন, কিংবা তাঁরাও যদি অপরাপর আমীর-উজীরদের ন্যায় আয়েশী ও ঈমান-বিক্রেতা হতেন, তাহলে সে যুগের খলীফারা ইসলামী সাম্রাজ্যকে বিক্রি করে খেয়ে-ই ফেলেছিলেন।

আল-আজেদও তেমনি এক খলীফা। মিসরের গভর্নর হয়ে আগমন করার পর তিনি সুলতান আইউবীকে প্রথম প্রথম বেশ ক'বার দরবারে ডেকে নিয়েছিলেন। সুলতান আইউবী বুঝে ফেলেছিলেন, খলীফা তাকে অযথা বারবার তলব করার উদ্দেশ্য, তাকে এ কথা বুঝানো যে, মিসরের সম্রাট, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আইউবী নয়– তিনি।

খলীফা সুলতান আইউবীকে বেশ শ্রদ্ধা করতেন। তাকে ডেকে নিয়ে নিজের কাছে বসাতেন। কিন্তু তার ভাবগতিক ছিলো রাজকীয়। কথা বলার ভঙ্গি ছিলো তাঁর শাসক-সুলভ। সুলতান আইউবীকে তিনি যতবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন,

ডেকে পাঠিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অকারণে এবং অনর্থক খোশগল্প করে কোন কাজ ছাড়াই বিদায় দিয়েছেন। এ কারণে রোম উপসাগরে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে এবং সুদানী সৈন্যদের বিদ্রোহ দমন করে সুলতান আইউবী খলীফাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেন।

খলীফার মহলের জাঁকজমক আগুন ধরিয়ে রেখেছিলো সুলতানের বুকে। সোনার তৈরি পাত্রে পানাহার করেন তিনি। মদের পিপা-পেয়ালা তাঁর হীরা-খচিত। সুন্দরী মেয়েদের দ্বারা পরিপূর্ণ তাঁর হেরেম। আরবী, মিসরী, মারাকেশী, সুদানী ও তুর্কী ছাড়াও ইহুদী-খৃষ্টান মেয়েও আছে তাঁর রংমহলে। এ সেই জাতির খলীফা, যে জাতির দায়িত্ব ছিলো বিশ্বময় আল্লাহ'র বাণী প্রচার করা, যে জাতি বিশ্ব কুফরী শক্তির ভয়াবহ সামরিক প্রতিরোধের মুখোমুখি।

খলীফার আরো কয়েকটি বিষয় শূলের ন্যায় বিদ্ধ করছিলো সুলতানকে। প্রথমত খলীফার ব্যক্তিগত রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা ছিলো সুদানী, হাবশী ও কাবায়েলী। তাদের আনুগত্য ছিলো সংশয়পূর্ণ। দ্বিতীয়ত বিদ্রোহী ও ক্ষমতাচ্যুত সুদানী ফৌজের কমাণ্ডার ও নায়েব সালার ছিলো দরবারে খেলাফতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি– খলীফার ডান হাত।

সালাহুদ্দীন আইউবীর পরামর্শে আলী বিন সুফিয়ান চাকর-চাকরানী ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের বেশে খলীফার মহলে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেন। হেরেমের দু'টি মেয়েকেও হাত করে তাদের উপর গুপ্তচরবৃত্তির দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাদের রিপোর্ট মোতাবেক খলীফা ছিলেন সুদানী কমাণ্ডারদের দ্বারা প্রভাবিত।

খলীফা ষাট-পয়ষট্টি বছর বয়সের বৃদ্ধ। তবুও সুন্দরী মেয়েদের নাচ-গান ছাড়া রাত কাটে না তার। তার এই চারিত্রিক দুর্বলতা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতিপক্ষের মোক্ষম সুযোগ। এই সুযোগকে কাজে লাগাতো তারা।

১১৭১ সালের ফেব্রুয়ারী কি মার্চ মাস। খলীফা আল-আজেদের হেরেমে আগমন ঘটে নতুন একটি মেয়ের। অস্বাভাবিক সুন্দরী এক তরুণী। আরবী পোশাক পরিহিত জনাচারেক লোক এসে উপহার হিসেবে মেয়েটিকে খলীফার হাতে তুলে দিয়ে যায়। দিয়ে যায় আরো মূল্যবান বেশ কিছু উপঢৌকনও।

মেয়েটির নাম উম্মে আরারাহ। রূপের ফাঁদে ফেলে অল্প ক'দিনে-ই খলীফাকে বশ করে ফেলে নবাগতা এই মেয়েটি। মহলের মেয়ে গুপ্তচর মারফত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন আলী বিন সুফিয়ান।

কসরে খেলাফতের এই কাণ্ড-কীর্তি সবই সুলতান আইউবীর জানা। কিন্তু খলীফার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার শক্তি তাঁর এখনো হয়নি। পূর্বেকার গভর্নর ও আমীরগণ চলতেন খলীফার সামনে মাথা নত করে। তাদের সেই চাটুকারিতার ফলে মিসর আজ বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভ। তাদের আমলে খেলাফত ছিলো বটে, তবে ইসলামের পতাকা ছিলো অবনমিত। সেনাবাহিনী ছিলো ইসলামী সাম্রাজ্যের। কিন্তু সুদানী সেনাপতি রাজ্য শাসনের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন নিজের হাতে। তার সম্পর্ক ছিলো খৃষ্টানদের সঙ্গে। তার-ই সক্রিয় সহযোগিতায় কায়রো ও ইস্কান্দারিয়ায় খৃষ্টানরা বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিলো। এই বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ছিলো অসংখ্য গুপ্তচর।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সুদানী সৈন্যদের দমন করেছিলেন ঠিক; কিন্তু বেশ ক'জন সেনাপতি রয়ে গেছে এখনো। যে কোন সময় তারা বিপদ হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কসরে খেলাফতে তাদের বেশ প্রভাব।

খেলাফতের বিলাসপূর্ণ এই গদির উপর এখনই হাত দিতে চাইছেন না সুলতান। কারণ, কিছু লোক এখনো খেলাফতের ব্যাপারে আবেগপ্রবণ। কতিপয় তো খলীফার সক্রিয় সহযোগী। তন্মধ্যে চাটুকারদের সংখ্যাই অধিক। এই চাটুকারদের মধ্যে উচ্চপদস্থ এমন কর্মকর্তাও আছেন, যাদের স্বপ্ন ছিলো মিসরের গভর্ণর হওয়া। কিন্তু সেই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত এখন সুলতান আইউবী।

খৃষ্টান গুপ্তচর ও বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা পরিপূর্ণ দেশ। গাদ্দারদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিলে খৃষ্টানদের পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল। তাই সুলতান আইউবী খেলাফতের মদদপুষ্ট শাসকবর্গকে এখন-ই শত্রুতে পরিণত করতে চাইছেন না।

কিন্তু ১১৭১ সালের জুনের একদিন খলীফা তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি যেতে পারবেন না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। সুলতান কক্ষে পায়চারী করছেন। দারোয়ানকে ডেকে বললেন— 'আলী বিন সুফিয়ান, বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ, ঈসা এলাহকারী ফকীহ ও আন্-নাসেরকে এক্ষুনি আমার কাছে আসতে বলো।'

❖ ❖ ❖

এই ব্যক্তিগণ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর খাস উপদেষ্টা ও বিশ্বস্ত। সুলতান আইউবী তাদের উদ্দেশে বললেন— 'এইমাত্র খলীফার দূত আমাকে

নিতে এসে গেলো। আমি যেতে পারবো না বলে জানিয়ে দিয়েছি। খেলাফতের ব্যাপারে আমি কঠোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাই। এর প্রথম ধাপে আমি জুমার খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিতে চাই। এ ব্যাপারে আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।'

'এ পদক্ষেপ নেয়ার সময় এখনো আসেনি। খলীফাকে মানুষ এখনো পয়গম্বর মনে করে। এতে জনমত আমাদের বিপক্ষে চলে যাবে।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'এখনো মানুষ তাকে পয়গম্বর মনে করে। ক'দিন পর খোদা ভাবতে শুরু করবে। খুতবায় আল্লাহ-রাসূলের নামের পাশে তার নাম উচ্চারণ করে আমরা-ই তো তাকে পয়গম্বর ও খোদার আসনে বসিয়েছি। কি ঈসা ফকীহ! আপনার পরামর্শ বলুন।' বললেন আইউবী।

'আপনার মতের সঙ্গে আমিও একমত। কোন মুসলমান জুমার খুতবায় আল্লাহ-রাসূলের পাশাপাশি অন্য কোন মানুষের নাম সহ্য করতে পারে না। তা-ও আবার এমন মানুষ, যিনি মদ-নারীসহ সব রকম পাপে নিমজ্জিত। শত শত বছর ধরে খলীফাকে পয়গম্বরের মর্যাদা দিয়ে আসা হচ্ছে বলে চিরদিন তা বহাল রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই। কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে আমি এমন-ই বুঝি। তবে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে এ পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা আমি বলতে পারবো না। বললেন ঈসা এলাহকারী ফকীহ।

'প্রতিক্রিয়া হবে অত্যন্ত তীব্র। আর হবে আমাদের বিপক্ষে। তথাপি আমার পরামর্শ, হয়তো এই কু-প্রথার অবসান ঘটাতে হবে কিংবা খলীফাকে খাঁটি মুসলমান বানিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত করতে হবে। তবে আমার দৃষ্টিতে দ্বিতীয়টি সম্ভব হবে না।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'জনমত সম্পর্কে আমার চেয়ে আর কে ভালো জানবে? জনগণ খলীফা আল-আজেদ নামের সঙ্গে নয়— সালাহুদ্দীন আইউবী নামের সাথে পরিচিত। আমার গোয়েন্দা বিভাগের নির্ভরযোগ্য রিপোর্টে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আপনার দু' বছরের শাসনামলে জনগণ এমন বহু সমস্যার সমাধান পেয়েছে, যার কল্পনাও তারা কখনো করেনি। দেশে উন্নত কোন হাসপাতাল ছিলো না। চিকিৎসার অভাবে সাধারণ রোগেও মানুষ মারা যেতো। এখন উন্নতমানের সরকারী হাসপাতাল আছে। স্থানে স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। আগে চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক-ছিনতাইয়ের কারণে ব্যবসায়ীরা নিরাপদে ব্যবসা করতে পারতো না। এখন তারও অবসান ঘটেছে।

অপরাধ প্রবণতা আগের তুলনায় এখন অনেক কম। মানুষ এখন তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য সরাসরি আপনার শরণাপন্ন হতে পারছে। জানাতে পারছে তাদের আর্জি-ফরিয়াদ। আপনার গভর্নর হয়ে মিসর আগমনের আগে মানুষ সরকারী কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর নামে সন্ত্রস্ত থাকতো সব সময়। আপনি তাদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছেন। মানুষ এখন নিজেদেরকে দেশ ও জাতির অংশ ভাবতে শিখেছে। খেলাফত থেকে তারা অবিচার আর নির্দয়তা ছাড়া আর কিছু-ই পায়নি। আপনি তাদেরকে সুবিচার উপহার দিয়েছেন, দিয়েছেন নাগরিক অধিকার। আমি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি, জাতি খেলাফতের নয়- ইমারাতের সিদ্ধান্ত-ই মেনে নেবে।'

সুলতান আইউবী বললেন— 'জাতিকে আমি সুবিচার দিতে পেরেছি কি পারিনি, তাদের অধিকার তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারলাম কি পারলাম না, তা আমি বলতে চাই না। আমি শুধু এটুকু জানি যে, দেশের ঈমানদার জনসাধারণের ঘাড়ে কোন বাজে প্রথা চাঁপিয়ে রাখা যায় না। শিরক-কুফরী থেকে আমি জাতিকে মুক্তি দিতে চাই। দ্বীন-ধর্মের অঙ্গ বলে পরিচিত এসব কু-প্রথাকে আমি ছিন্নভিন্ন করে অতীতের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে চাই। ঐ প্রথা যদি বহাল থেকে যায়, তাহলে বিচিত্র কি যে, কাল-পরশু আমিও নিজের নাম খুতবায় শামিল করে নেবো! বাতি থেকে বাতি জ্বলে। শিরকের এই বাতি আমি নিভিয়ে ফেলতে চাচ্ছি। কসরে খেলাফত পাপের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। সুদানী বাহিনী যে রাতে মিসর আক্রমণ করেছিলো, সে রাতেও খলীফা মদ পান করে হেরেমের মেঝে বুঁদ হয়ে পড়ে ছিলো। আমার কৌশল যদি ব্যর্থ হতো, তাহলে সেদিন-ই মিসরের বুক থেকে ইসলামের পতাকা হারিয়ে যেতো। সে রাতে আল্লাহ'র সৈনিকরা যখন ইসলাম ও দেশের জন্য শহীদ হচ্ছিলো, খলীফা তখন মদ খেয়ে পড়ে ছিলো মাতাল হয়ে।

সুদানীদের হামলা প্রতিহত করে আমি যখন তাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করতে গেলাম, তিনি তখন মাতাল ষাড়ের ন্যায় ঢুলু ঢুলু কণ্ঠে বলেছিলেন, 'শাবাশ! শুনে আমি বেশ খুশী হলাম। বিশেষ দূত মারফত আমি তোমার পিতার কাছে এর মোকারকবাদ ও পুরস্কার প্রেরণ করছি।' তখন আমি তাকে বলেছিলাম— 'খলীফাতুল মুসলিমীন! আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র। এ কর্তব্য আমি পালন করেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে- পিতার মনোরঞ্জনের জন্য নয়।'

খলীফা বললেন— 'সালাহুদ্দীন! বয়সে তুমি এখনো নবীন; কিন্তু কাজ করে দেখালে বিজ্ঞ প্রবীণের মতো!'

খলীফা আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেছিলেন, যেন আমি তার গোলাম। তা ছাড়া এই ধর্মহারা লোকটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য এক শ্বেত হস্তিতে পরিণত হয়ে বসেছে।

পকেট থেকে একখানা পত্র বের করে সুলতান সবাইকে দেখালেন এবং বললেন, ছয়-সাত দিন হলো নুরুদ্দীন জঙ্গী আমাকে এ পত্রখানা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন–

'খেলাফত তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। দুই অধীন খলীফার উপর বাগদাদের কেন্দ্রীয় খেলাফতের প্রভাব শেষ হয়ে গেছে। আপনি লক্ষ্য রাখবেন, পাছে মিসরের খলীফা স্বাধীন শাসক হয়ে না বসেন। প্রয়োজনে তিনি সুদানী ও ক্রুসেডারদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতেও কুণ্ঠিত হবেন না। আমি ভাবছি, খেলাফত থাকবে শুধু বাগদাদে। খলীফা থাকবেন স্রেফ একজন। 'অধীন খলীফা'র প্রথা বিলুপ্ত করা হবে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে রেখেছে। মিসরের খলীফার রাজত্বকে যদি আপনি তার মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন, তাহলে আমি আপনাকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাবো। সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কারণ, মিসরের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও অনুকূল নয়। মিসরে আরো একটি বিদ্রোহ ঘটতে যাচ্ছে। আপনি সুদানীদের উপর কড়া নজর রাখুন।'

পত্রটি পাঠ করে সুলতান আইউবী বললেন, আমাদের খেলাফত যে সাদা হাতী, তাতে সন্দেহ কি? আপনারা দেখছেন না, খলীফা আল-আজেদ যখন পরিভ্রমণে বের হন, তখন অর্ধেক সৈন্যকে তার নিরাপত্তার নামে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়? খলীফার চলার পথে গালিচা বিছিয়ে দেয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা হয়। যুবতী মেয়েদেরকে খলীফার গায়ে ফুলের পাপড়ি ছিটাতে বাধ্য করা হয়।

ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা, সম্প্রসারণ এবং জাতির উন্নয়নে যে অর্থ ব্যয় হতে পারতো, সে অর্থ ব্যয় করছেন তিনি নিতান্ত বিনোদনমূলক পরিভ্রমণে। আমাদের আর সময় নষ্ট করা যাবে না। মিসরী জনগণ, এদেশের খৃষ্টসমাজ এবং অপরাপর সংখ্যালঘুদের কাছে আমাদের প্রমাণ দিতে হবে, ইসলাম রাজ-রাজড়াদের ধর্ম নয়। ইসলাম আরব মরুভূমির রাখাল-কিষাণ ও

উষ্ট্রচালকদের সাচ্চা ধর্ম। ইসলাম মানবজাতিকে মানবতার মর্যাদাদানকারী অনুপম জীবন-ব্যবস্থা।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ বললেন— 'খলীফার বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে গেলে আপনার নামে এই অপবাদ রটানো হতে পারে যে, খলীফাকে অপসারিত করে আপনি তার মসনদ দখল করতে চাচ্ছেন। সত্যের বিরোধিতা চীরদিন হয়েছে এবং হতে থাকবে।'

সুলতান আইউবী বললেন— 'আজ মিথ্যা ও বাতিলের শিকড় এতো শক্ত হওয়ার কারণ, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচারণের ভয়ে মানুষ সত্য বলা ছেড়ে দিয়েছে। সত্যের বাণী আজ নিভৃতে কাঁদে।'

আমাদের শাসকরা জনসাধারণকে অনাহারে রেখে, তাদের উপর জবরদস্তি শাসন চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে গোলামীর শৃংখলে বেঁধে রেখেছেন, যে শৃংখল ভেঙ্গে মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করেছিলেন আমাদের রাসূল (সাঃ)। আমাদের রাজা-বাদশাহগণ এতো-ই অধঃপাতে নেমে গেছেন যে, নিজেদের ভোগ-বিলাসের স্বার্থে তারা খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতছেন, তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছেন। আর এ সুযোগে খৃষ্টানরা ধীরে ধীরে ইসলামী সাম্রাজ্যকে হাত করে চলেছে। শুনুন শাদ্দাদ! আপনি বলেছেন, জনগণ আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে, তাই না? সাহস নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠুন। এসব বিরোধিতাকে ভয় করলে আমাদের চলবে না।'

সুলতান আইউবীর নায়েব সালার আন-নাসের বললেন, বিরুদ্ধাচারণকে আমরা ভয় করি না শ্রদ্ধেয় আমীর! আপনি আমাদেরকে রণাঙ্গনে দেখেছেন। শত্রুর বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ হয়েও আমরা নির্ভীকচিত্তে লড়াই করেছি। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়েও জীবনপণ লড়েছি। সংখ্যায় যখন আমরা নিতান্ত নগণ্য ছিলাম, শত্রু বাহিনীর সয়লাব প্রতিরোধ তখনও করেছি। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি আপনাকে আপনার-ই বলা একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনি একবার বলেছিলেন, 'যে আক্রমণ বাইরে থেকে আসে, আমরা তা প্রতিরোধ করতে পারি। কিন্তু আক্রমণ যখন হয় ভেতর থেকে আর আক্রমণকারীরা হয় নিজেদের-ই লোক, তখন আমরা থমকে যাই, কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকি, হায়! একি হলো আল্লাহ?' মোহতারাম আমীরে মেসের! দেশের শাসনকর্তা-ই যখন দেশের শত্রু হয়ে যাবে, আপনার তরবারী তখন কোষের ভিতরে-ই ছট্‌ফট্‌ করতে থাকবে।'

সুলতান আইউবী বললেন— 'আপনি ঠিক ই বলেছেন, নাসের! তরবারী আমার খাপের মধ্যে-ই তড়পাচ্ছে! স্বদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে বেরুতে চাইছে না আমার শানিত অসি। দেশের শাসকবর্গ জনগণের মর্যাদার প্রতীক। শাসকমণ্ডলীকে আমি বরাবরই শ্রদ্ধার চোখে দেখি। কিন্তু ভেবে দেখুন, তারা সেই মর্যাদা রক্ষা করছে কতটুকু? শুধু খলীফা আল-আজেদের কথা-ই বলছি না। আলী বিন সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করুন। তার গোয়েন্দা বিভাগ মসুল, হাল্‌ব, দামেশ্‌ক ও মক্কা-মদীনা থেকে যে রিপোর্ট নিয়ে এসেছে, তা হলো বিলাসপ্রিয়তার কারণে যে যেখানকার গভর্নর বা শাসক, সে-ই সেখানকার সার্বভৌম ক্ষমতাধর হয়ে বসেছে। সালতানাতে ইসলামিয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। খেলাফত এতই দুর্বল যে, শাসক-গভর্নর এখন ব্যক্তিগত রাজনীতি চর্চার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমি জানি, জাতির এই বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলোকে যদি আমরা একত্রিত করতে যাই, তাহলে তা আরো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আমাদের সামনে সমস্যার পাহাড় এসে দাঁড়াবে। কিন্তু নির্ভয়ে আমি কাজ করতে চাই। আশা করি, আপনারাও সাহসিকতার সঙ্গে আমাকে সহযোগিতা দিয়ে যাবেন। সালতানাতে ইসলামিয়ার এই ধস আমাদের ঠেকাতেই হবে। আপনারা যে যা পরামর্শ দিয়েছেন, আমি তার মূল্যায়ন করবো। তবে এখন থেকে আমি খলীফার ডাকে তখন-ই সাড়া দেবো, যখন জরুরী কোন কাজ থাকবে। কি কাজে ডেকে পাঠালেন, খলীফাকে আগে-ই আমাকে তা অবহিত করতে হবে। অন্যথায় তাঁর ডাকে একটি মুহূর্তও আমি নষ্ট করতে চাই না। আর আপাতত আমি জুমার খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিচ্ছি।'

উপস্থিত সকলে সুলতান আইউবীর এ সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং তার বাস্তবায়নে পূর্ণ সহযোগিতা ও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি দেন।

❖ ❖ ❖

খলীফা আল-আজেদ তার খাস কামরায় উপবিষ্ট। দূত ফিরে এসে জানায়, সুলতান আইউবী বল্লেছেন, কোন জরুরী কাজ থাকলে তিনি আসতে পারবেন। অন্যথায় তিনি বেজায় ব্যস্ত।

শুনে খলীফা অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। দূতকে বললেন, রজবকে আসতে বলো।

রজব খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর কমাণ্ডার। নায়েব সালারের সমান তার মর্যাদা। এক সময় ছিলো মিসরের সেনাবাহিনীর অফিসার। খলীফার বডিগার্ড-এর কমাণ্ডারের দায়িত্বপ্রাপ্তির পর সে কসরে খেলাফত ও খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীতে দেখে দেখে সুদানী হাবশীদের নিয়োগ দান করে। রজব আইউবী বিরোধী এবং খলীফার চাটুকারদের অন্যতম।

খলীফার খাস কামরায় উম্মে আরারাও উপস্থিত। দূতের রিপোর্ট শুনে সে বলে ওঠলো, সালাহুদ্দীন আইউবী আপনার একজন নওকর বৈ নয়। অথচ আপনি তাকে মাথায় তুলে রেখেছেন। লোকটাকে আপনি বরখাস্ত করছেন না কেন?

'কারণ, তার ফল ভাল হবে না। সেনাবাহিনীর কমাণ্ড তার হাতে। ইচ্ছে করলে এ বাহিনীকে সে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।' কম্পিত কণ্ঠে বললেন খলীফা।

ইত্যবসরে এসে উপস্থিত হয় রজব। মাথা ঝুঁকিয়ে খলীফাকে সালাম করে। রাগে কাঁপছেন খলীফা। ক্রুদ্ধ ও কম্পিত কণ্ঠে বললেন, আমি পূর্ব থেকেই জানতাম, কমবখ্‌ত একটা অহংকারী ও অবাধ্য লোক। সালাহুদ্দীন আইউবীর কথা বলছি ......। দূত মারফত লোকটাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সে এই বলে আমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো যে, কোন জরুরী কাজ থাকলে আসব; অন্যথায় আপনার আহ্বান আমার নিকট অর্থহীন। কারণ, আমার সামনে জরুরী কাজ পড়ে আছে।

রাগের মাথায় বলতে বলতে হেঁচকি উঠে যায় খলীফার। তারপর প্রবল বেগে কাশি। দু' হাতে বুক চেপে ধরেন তিনি। চেহারার রং যেন হলুদ হয়ে গেছে তাঁর। এমনি অবস্থায় তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন— 'বদমাশ্‌টা এতটুকুও বুঝলো না যে, আমি একে তো বৃদ্ধ, তার উপর হৃদরোগের রুগী; অপ্রীতিকর সংবাদ আমাকে ক্ষতি করতে পারে। আমি এখানে শরীর-স্বাস্থ্যের চিন্তায় অস্থির আর ও কিনা দেখাচ্ছে তার কাজের গরজ!'

'তাকে আপনি কেন ডেকেছিলেন? আমাকে আদেশ করুন।' বললো রজব।

ডেকেছিলাম তাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যে, তার মাথার উপর একজন শাসকও আছেন। তুমি-ই তো বোধ হয় আমাকে বলেছিলে, সালাহুদ্দীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে যাচ্ছে। আমি বার বার তাকে এখানে ডেকে আনতে চাই, তাকে আদেশ করতে চাই, যেন সে আমার অনুগত থাকে। ডেকে পাঠাতে হলে জরুরী কোন কাজ থাকতে হবে, এমন তো কথা নেই!' বুকের উপর হাত রেখে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন খলীফা।

উম্মে আরারাহ খলীফার ঠোঁটের সঙ্গে মদের পেয়ালা ধরে বললো— 'আপনাকে শতবার বলেছি, মাথায় রাগ তুলবেন না। কতবার বলেছি, গোস্বা আপনার জন্য ক্ষতিকর!'

মদের পেয়ালা শূন্য হয়ে গেলে মেয়েটি একটি সোনার কৌটা থেকে এক চিমটি তামাকচূর্ণ নিয়ে খলীফার মুখে দেয় এবং পানি পান করিয়ে দেয়। খলীফা মেয়েটির বিক্ষিপ্ত রেশমী চুলে আঙ্গুল বুলিয়ে বিলি কাটতে কাটতে বললেন— 'তুমি না হলে আমার উপায় কি হতো, বলো তো? সকলের দৃষ্টি এখন আমার সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি। আমার ব্যক্তিসত্ত্বার উপর কারো এক বিন্দু নজর নেই। আমার একজন স্ত্রীর পর্যন্ত আমার প্রতি এতটুকু আন্তরিকতা নেই। এ মুহূর্তে তুমি আমার একমাত্র ভরসা। তুমি না হলে আমার উপায় ছিলো না।' খলীফা উম্মে আরারাহকে টেনে কাছে এনে গা ঘেঁষে বসিয়ে তার সরু কটি বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরেন।

'খলীফাতুল মুসলিমীন! আপনি বড় কোমল-হৃদয় ও মহৎ মানুষ। সে কারণেই সালাহুদ্দীন আইউবী এমন গোস্তাখী করতে পারলো। আপনি ভুলে গেছেন, সালাহুদ্দীন আরব বংশোদ্ভূত লোক নয়, আপনার বংশের লোক নয়। সে কুর্দী। আমি ভেবে অবাক্ হই, এতো বড় স্পর্ধা তাকে কে দিলো! তার গুণ তো শুধু এটুকুই যে, লোকটা একজন দক্ষ সৈনিক; রণাঙ্গনের শাহ্সাওয়ার। লড়তেও জানে, লড়াতেও জানে। কিন্তু এই গুণ এতো গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, মিসরের গভর্নরী তার হাতে তুলে দিতে হবে! সুদানের এতো বিশাল, এতো সুদক্ষ বাহিনীটিকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিলো, যেভাবে শিশুরা তাদের হাতের খেলনা ভেঙ্গে নষ্ট করে দেয়। মহামান্য খলীফা! আপনি একটু চিন্তা করুন, এখানে যখন সুদানী সেনারা ছিলো, নাজি এবং ঈদরৌসের ন্যায় সালারগণ ছিলো, তখন মানুষ আপনার কুকুরের সামনেও মাথা নত করতো। সুদানী বাহিনীর সালার আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আপনার দ্বারে সারাক্ষণ করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। আর এখন? এখন ডেকে পাঠালে একজন অধীন পর্যন্ত আপনার আহ্বান মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করে।' বললো রজব।

'রজব! সব দোষ তোমার।' হঠাৎ গর্জে উঠে বললেন খলীফা।

অকস্মাৎ পাংশু হয়ে যায় রজবের মুখ। ভয়ার্ত বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে থাকে খলীফার প্রতি। খলীফার বন্ধন ছাড়িয়ে চকিতে সরে পড়ে উম্মে আরারাহ। খলীফা পুনরায় তাকে কাছে টেনে পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চিবুক টিপে সস্নেহে বলেন— 'কী, ভয় পেয়েছো বুঝি? আমি রজবকে বলতে

চাচ্ছি, আজ দু' বছর পর সে আমার কানে দিচ্ছে, আমার পুরনো বাহিনী ও তার সালার ভালো ছিলো; সালাহুদ্দীনের তৈরি বাহিনী খেলাফতের পক্ষে কল্যাণকর নয়! কেন রজব! একথা কি তুমি আগেও জানতে? জানলে বললে না কেন? আজ যখন মিসরের গভর্নর তার খুঁটি শক্ত করে ফেলেছে, এখন কিনা তুমি আমাকে বলছো, সে খেলাফতের অবাধ্য!'

'বিষয়টা আমি পূর্ব থকে-ই জানতাম। কিন্তু হুজুরের তিরস্কারের ভয়ে কখনো বলিনি। সুলতান আইউবীকে নির্বাচন করেছে বাগদাদের খেলাফত। আমি ভেবেছিলাম, কাজটা আপনার পরামর্শেই হয়ে থাকবে। খেলাফতের মনোনয়নের বিরুদ্ধে মুখ খোলার দুঃসাহস আমি দেখাতে পারি না। আজ আমীরে মেসেরের গোস্তাখী আর আপনার মনোঃকষ্ট আমাকে মুখ খুলতে বাধ্য করেছে। এর আগেও একাধিকবার আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হুজুরের সঙ্গে গোস্তাখী করতে দেখেছি। বিপদ সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা আমি আমার কর্তব্য মনে করি।' বললো রজব।

খলীফার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ উম্মে আরারাহ খলীফার হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুল ঢুকিয়ে শিশুর ন্যায় খেলছে। এবার দু' হাতে খলীফার চিবুক স্পর্শ করে জিজ্ঞেস করে— 'মনটা এবার ঠিক হয়েছে?'

খলীফা তার চিবুক টেনে দিয়ে পুলকভরা কণ্ঠে বললেন— 'ঔষধ-পথ্যে ততোটা কাজ হয় না, যতটুকু কাজ হয় তোমার ভালোবাসায়। আল্লাহ তোমাকে যে রূপ দিয়েছেন, তা-ই আমার সব রোগের মহৌষধ।' খলীফা উম্মে আরারা'র মাথা নিজের বুকের উপর রেখে রজবকে বললেন— 'কিয়ামতের দিন যখন আমাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে, তখন আমি আল্লাহকে বলবো, আমি হুর চাই না– আমার উম্মে আরারাকে এনে দাও।'

'উম্মে আরারাহ শুধু রূপসী-ই নয়– বড় বিচক্ষণও বটে। হুজুরের হেরেম ষড়যন্ত্রের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিলো। উম্মে আরারাহ এসে সব কুচক্রীর মুখে ঠুলি পরিয়েছে। এখন আপনার কসরে খেলাফতে আপনার স্বার্থ বিরোধী কোন আচরণ করার সাধ্য কারও নেই।' বললো রজব।

উম্মে আরারা'র প্রেম-পরশে নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন খলীফা। নিশ্চল মূর্তির মতো উদাস বসে আছেন তিনি। রজবের এইসব কথার একটি শব্দও যেন কানে গেলো না তাঁর। তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে উম্মে আরারাহ। বলে— 'রজব সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রসঙ্গে কথা বলছিলো। আপনি মনোযোগ সহকারে তার বক্তব্য শুনুন এবং আইউবীকে বাগে আনার চেষ্টা করুন।'

সম্বিৎ ফিরে পান খলীফা। বলেন— 'এ্যা, কি যেন বলছিলে রজব।'

'বলছিলাম, আমি এ কারণে এতদিন মুখ বন্ধ রেখেছি যে, আমীরে মেসেরের বিরুদ্ধে কথা বললে আপনি তা মেনে নেবেন না। আর যা হোক, সালাহুদ্দীন আইউবী একজন দক্ষ সেনানায়ক তো বটে!' বললো রজব।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর এই একটি গুণই আমার নিকট পছন্দনীয় যে, যুদ্ধের ময়দানে সে ইসলামের পতাকাকে পদানত হতে দেয় না। তার মত সেনানায়কদের-ই আমার বড় প্রয়োজন, যারা রণাঙ্গনে খেলাফতে ইসলামিয়ার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখে।' বললেন খলীফা।

'গোস্তাখী মাফ করবেন খলীফাতুল মুসলিমীন! সালাহুদ্দীন আইউবী খেলাফতে ইসলামিয়ার মর্যাদার জন্য লড়াই করে না, লড়াই করে নিজের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। আপনি ফৌজের সালার থেকে নিয়ে একজন সাধারণ সিপাহীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন; সালাহুদ্দীন আইউবী তাদের এই দীক্ষা প্রদান করেছে যে, লড়াই করে এমন একটি ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবে, যার কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না। এতে পরিষ্কার বুঝা যায়, সে এমন একটি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছে, যার সম্রাট হবে সে নিজে। তার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন নুরুদ্দীন জঙ্গী। আইউবীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি দু' হাজার অশ্বারোহী এবং সমসংখ্যক পদাতিক বাহিনী প্রেরণ করেছেন। আপনি-ই বলুন, তিনি কি এ সৈন্য মিসরের খলীফার অনুমতি নিয়ে প্রেরণ করেছেন? খেলাফতের কোন দূত কি আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছিলো যে, মিসরে অতিরিক্ত সৈন্যের প্রয়োজন আছে কি-না? যা কিছু হয়েছে, খেলাফতকে উপেক্ষা করেই হয়েছে।' বললো রজব।

'তুমি ঠিকই বলছো রজব! এ ব্যাপারে আমাকে কিছু-ই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আর ওদিক থেকে আসা বাহিনীটিকে তো ফেরতও পাঠান হয়নি!' বললেন খলীফা।

'ফেরত এ জন্যে দেয়া হয়নি যে, তাদের পাঠানোই হয়েছিলো মিসরে আইউবীর হাতকে শক্ত করার জন্য। মিসরের পুরাতন বাহিনীকে কিষাণ আর ভিখারীতে পরিণত করার জন্য নুরুদ্দীন জঙ্গী এ বাহিনী প্রেরণ করেছেন। নাজি, ঈদরৌস, ককেশ, আবদে ইয়ায্দান, আবু আজর এবং এদের ন্যায় আরো আটজন সালার এখন কোথায়? হুজুর হয়তো কখনো ভেবে দেখেননি, এদের প্রত্যেককে সালাহুদ্দীন আইউবী গুপ্তভাবে খুন করিয়েছে। তাদের একটি মাত্র অপরাধ ছিলো, তারা ছিলেন রণনায়ক হিসেবে আইউবী অপেক্ষা যোগ্য।

আইউবী প্রচার করেছেন, গাদ্দারী ও বিদ্রোহের অপরাধে খলীফা তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।' বললো রজব।

'মিথ্যে– নির্জলা মিথ্যে। সালাহুদ্দীন আমাকে বলেছিলো ঠিক যে, এরা বিশ্বাসঘাতক। আমি তাকে বলেছিলাম, সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করো, আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করো।' ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন খলীফা।

'আর মোকদ্দমা না চালিয়ে তিনি নিজেই সেই রায় প্রদান করেন, খেলাফতের মোহর ছাড়া যার কোন কার্যকারিতা নেই। ঐ হতভাগা সালারদের অপরাধ ছিলো, তারা খৃষ্টান সম্রাটদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো খৃষ্টানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেশ ও দশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। বললে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না; কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, খৃষ্টানরা আমাদেরকে শত্রু মনে করে না। নুরুদ্দীন জঙ্গী আর শেরকোহ'র আক্রমণ-আশঙ্কায়-ই কেবল তারা আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে আছে। এখন শেরকোহ নেই ঠিক, কিন্তু তার স্থান দখল করেছে সালাহুদ্দীন আইউবী। এ লোকটি মূলত শেরকোহ'র-ই হাতে গড়া। শেরকোহ তার সারাটা জীবন খৃষ্টানদের সঙ্গে লড়াই করে, ইসলামের দুশমন সৃষ্টি এবং দুশমনের সংখ্যাই শুধু বৃদ্ধি করেছে। সালাহুদ্দীনের স্থলে অন্য কেউ যদি মিসরের গভর্নর হতো, তাহলে খৃষ্টান সম্রাটগণ আজ আপনার দরবারে বন্ধুরূপে আগমন করতেন। হত্যা-লুণ্ঠন হতো না, আমাদেরকে এতগুলো প্রবীণ ও সুদক্ষ সেনানায়ক হারাতে হতো না।' বললো রজব।

'কিন্তু রজব! খৃষ্টানরা যে রোম উপসাগর থেকে আক্রমণ করলো?' বললেন খলীফা।

'এর জন্যেও আইউবী-ই দায়ী। তিনি-ই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন, যা প্রতিহত করার জন্যে খৃষ্টানরা আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছিলো। সমস্যা যেহেতু তার-ই সৃষ্টি, তাই আক্রমণ যে হবে, তা পূর্ব থেকে-ই তার জানা ছিলো। সেজন্য তিনি আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। অন্যথায় তিনি কি করে জানলেন যে, রোম উপসাগর থেকে খৃষ্টানরা আক্রমণ করবে? তিনি তো অন্তর্যামী নন! এটি ছিলো তার সাজানো নাটক, যে খেলায় এতীম হলো হাজার হাজার শিশু, বিধবা হলো অসংখ্য নারী। আর তার এ কাজে আমার উপস্থিতিতে আপনি তাকে বাহ্‌বা দিয়েছিলেন। তারপর তিনি সুদানী ফৌজকে– যারা ছিলো আপনার একান্ত অনুগত– সামরিক মহড়ার নাম করে রাতের বেলা বাইরে নিয়ে যান এবং অন্ধকারে তাদের উপর তার নতুন বাহিনীকে লেলিয়ে দেন। পরে প্রচার করেন

যে, নাজির ফৌজ বিদ্রোহ করেছিলো; তাই তাদের এই পরিণতি বরণ করতে হয়। আপনি এতো সরল-সহজ মানুষ যে, আইউবীর এই চাল আর প্রতারণা বুঝে উঠতে পারলেন না!' বললো রজব।

উম্মে আরারাহ খলীফার বুকে মাথা রেখে এমন কিছু অশ্লীল আচরণ করে যে, খলীফার তীব্র মদের নেশা জেগে ওঠে। খলীফা এখন মেয়েটির হাতের খেলনা। রজবের কোন কথা-ই যেন শুনতে পাচ্ছেন না তিনি। রূপসী কন্যা উম্মে আরারাকে নিয়েই ঘুরপাক খাচ্ছে খলীফার সব ভাবনা।

এই ফাঁকে সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতি নিতান্ত অমূলক আরেকটি আঘাত হানে রজব। বলে— 'আইউবী আরো একটি প্রতারণামূলক আচরণ শুরু করেছেন। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ধরে এনে তিনি তাদের উপভোগ করেন। কয়েকদিন আমোদ-ফুর্তি করে এই বলে তাদের খুন করান যে, এরা খৃষ্টানদের গুপ্তচর। দেশবাসীর মনে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য তিনি সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে রেখেছেন, খৃষ্টানরা গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তাদের মেয়েদেরকে মিসর প্রেরণ করেছে। খৃষ্টানরা কুলটা নারীদের লেলিয়ে দিয়ে এই জাতির চরিত্র নষ্ট করছে। আমি তো এদেশের-ই নাগরিক। দেশে কী ঘটছে সবই আমার জানা। দেশের পতিতালয়গুলোতে যারা বেশ্যাবৃত্তি করছে, তারা মিসর ও সুদানী নারী। দু' চারজন খৃষ্টান থাকলেও তারা গুপ্তচর নয়, এটা তাদের পেশা।'

'হেরেমের তিন-চারটি মেয়েও আমাকে জানিয়েছে, সালাহুদ্দীন আইউবী ডেকে নিয়ে তাদের সম্ভ্রমহানি করেছে।' বললো উম্মে আরারাহ।

শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন খলীফা। বললেন— 'আমার হেরেমের মেয়ে? তুমি এতোদিন আমাকে বলোনি কেন?'

'বলিনি তার কারণ, এই অসুস্থ অবস্থায় আপনি সে দুঃসংবাদ সহ্য করতে পারতেন না। এখন আমার অলক্ষ্যে কথাটা মুখ থেকে ফস্‌কে বেরিয়ে গেলো। হেরেমে আমি এমন ব্যবস্থা করে রেখেছি যে, এখন আর কোন মেয়ে কারো আহ্বানে মনে চাইলে-ই বাইরে যেতে পারবে না।' জবাব দেয় উম্মে আরারাহ।

'এক্ষুনি ডেকে এনে ওকে আমি বেত্রাঘাত করবো। আমি এর প্রতিশোধ নেবো!' বললেন খলীফা।

'প্রতিশোধ নিতে হবে অন্যভাবে। বর্তমানে দেশের জনসাধারণ আইউবীর পক্ষে। এভাবে সরাসরি প্রতিশোধ নিতে গেলে মানুষ আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠবে।' বললো রজব।

'তবে কি আমাকে এই অপমান চোখ বুজে সহ্য করতে হবে?' বললেন খলীফা।

'না। আপনার অনুমতি ও সহযোগিতা পেলে আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে এমনভাবে গায়েব করে ফেলতে পারি, যেভাবে গুম করেছিলেন তিনি আমাদের প্রবীণ সালারদের।' বললো রজব।

'এ কাজ তুমি কীভাবে করবে?' জিজ্ঞেস করেন খলীফা।'

'এ কাজ আমি হাশীশীদের দ্বারা করাবো। তবে তারা বিপুল অর্থ দাবি করছে।' বললো রজব।

'টাকা যতো প্রয়োজন আমি দেবো। তুমি আয়োজন সম্পন্ন করো।' বললেন খলীফা।

❖ ❖ ❖

দু'দিন পর জুমার নামায। ঈসা এলাহকারী কায়রোর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীবকে বলে দিয়েছেন, যেন তিনি জুমার খুতবায় খলীফার নাম উল্লেখ না করেন।

তুরস্কের অধিবাসী এ খতীবের নাম ইতিহাসে উল্লেখিত হয়নি। সাধারণ্যে তিনি 'আমীরুল ওলামা' উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি নিজেও বেশ ক'বার খুতবা থেকে এ বিদআত তুলে দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় এমনও পাওয়া যায় যে, সালাহুদ্দীন আইউবী এ খতীবের-ই পরামর্শে খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দেয়ার নির্দেশ জারি করেছিলেন। তবে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কথোপকথনের যে সব দলীল-দস্তাবেজ পাওয়া যায়, তাতে প্রমাণিত হয়, এ সাহসী পদক্ষেপের কৃতিত্বের দাবিদার তিনি-ই।

শুক্রবার দিন। খতীব আমীরুল ওলামা খুতবা পাঠ করলেন; কিন্তু খলীফার নাম উল্লেখ করলেন না। মসজিদের মধ্যম সারিতে উপবিষ্ট সুলতান আইউবী। খানিক দূরে অপর এক সারিতে বসা আছেন আলী বিন সুফিয়ান। জনগণের প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করার জন্য জনতার মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছেন সুলতান আইউবীর অপরাপর উপদেষ্টামণ্ডলী ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তাবৃন্দ। আলী বিন সুফিয়ানের বিপুলসংখ্যক গোয়েন্দা সদস্যও মসজিদে উপস্থিত। খুতবা থেকে খলীফার নাম মুছে ফেলা একটি শক্ত পদক্ষেপ-ই নয়, খেলাফতের আইনে গুরুতর অপরাধও বটে। সুলতান আইউবীর নির্দেশে সে অপরাধ-ই সংঘটিত হলো আজ। খলীফা আল-আজেদ ব্যতীত খেলাফতের বহু কর্মকর্তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করলেন সে অপরাধ কম।

নামায শেষ হলো। মুসল্লীরা যার যার মতো চলে গেলো। উঠে দাঁড়ালেন সুলতান আইউবী। ধীরপায়ে এগিয়ে গেলেন খতীবের কাছে। সালাম-মোসাফাহার পর বললেন— 'আল্লাহ আপনার সহায় হোন মহামান্য ইমাম!'

খতীব আমীরুল ওলামা বললেন— 'এ নির্দেশ জারি করে আপনি জান্নাতে নিজের ঠিকানা করে নিলেন।'

মসজিদ থেকে বেরুতে উদ্যত হন আইউবী। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যান। আবার খতীবের নিকট গিয়ে বললেন— 'খলীফার পক্ষ থেকে যদি আপনার ডাক আসে, তাহলে সরাসরি তার কাছে না গিয়ে আপনি আমার কাছে চলে আসবেন। আমি আপনাকে খলীফার নিকট নিয়ে যাবো।'

'মোহতারাম আমীরে মেসের! যদি গোস্তাখী মনে না করেন, আমি বলবো- মিথ্যা ও শেরেকের বিরুদ্ধে কাজ করা ও সত্য বলা যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে সে অপরাধের শাস্তি আমি একাই ভোগ করবো। এর জন্য আমি আপনাকে কষ্ট দিতে যাবো না। খলীফা যদি আমাকে তলব করেন, আমি একা-ই গিয়ে তার কাঠগড়ায় হাজির হবো। মূলত আপনার নির্দেশে নয়- আল্লাহর হুকুমে আমি খুতবা থেকে খলীফার নাম বাদ দিয়েছি। আল্লাহ আমার সহায় হোন।' বললেন খতীব।

সন্ধ্যার পর।

আলী বিন সুফিয়ান, বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর নিকট থেকে দিনের রিপোর্ট শুনছেন সালাহুদ্দীন আইউবী। আলী বিন সুফিয়ান ছদ্মবেশে শহরময় গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। নামাযের পর ঘুরে ঘুরে তারা সর্বসাধারণের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করে। আলী বিন সুফিয়ান আইউবীকে জানান, এমন কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি যে, কেউ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বলেছে, আজ খুতবায় খলীফার নাম নেয়া হয়নি। জনগণের মুখ থেকে কথা নেয়ার জন্য এক গোয়েন্দা কয়েক স্থানে এমনও বলেছে, জামে মসজিদের খতীব আজ জুমার খুতবায় খলীফার নাম উচ্চারণ করেননি; কাজটা বোধ হয় তিনি ভাল করলেন না।' প্রত্যুত্তরে অনেকে এমন ভাব প্রকাশ করেছে, যেন খুতবায় আজ খলীফার নাম উচ্চারণ করা হলো কিনা, তা তারা বলতেই পারে না। যেন খলীফার নাম উল্লেখ করা না করা তাদের নিকট তেমন কোন ঘটনা-ই নয়। বেশ ক'জন মানুষ এমনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, 'এতে কি আর আসে যায়! খলীফা আল্লাহ-রাসূল তো আর নন!' এসব রিপোর্টে সুলতান আইউবী আশ্বস্ত হন যে, তাঁকে জনগণের

যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা দেখানো হয়েছিলো, বাস্তবে কোথাও তার প্রতিফলন ঘটেনি।

সে বৈঠকেই সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গীর নামে পয়গাম লিখেন। তাতে তিনি লিখেন— 'জুমার খুতবা থেকে আমি খলীফার নাম তুলে দিয়েছি। জনসাধারণের পক্ষ থেকে অনুকূল প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। আপনিও খুতবা থেকে কেন্দ্রীয় খেলাফতের আলোচনা তুলে দিন।'

এ মর্মে দীর্ঘ এক পত্র লিখে সুলতান আইউবী নির্দেশ জারি করেন, আগামীকাল সকাল সকাল দূতকে রওনা করাও। তারপর আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, 'খলীফার মহলে গুপ্তচরদের আরো সতর্ক থাকতে বলুন। সেখানে সামান্যতম সন্দেহজনক আচরণ দেখা মাত্র যেন সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাদেরকে অবহিত করে।'

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবী রজবকে ভাল করেই জানতেন। তিনি জানতেন, রজব খলীফার আজ্ঞাবহ নায়েব সালার। তাই তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, 'রজবের পিছনে একজন লোক সর্বক্ষণ ছায়ার মতো লাগিয়ে রাখুন।'

রাতের বেলা। রজব মহলে নেই। সুলতান আইউবীকে হত্যা করার আয়োজন সম্পন্ন করতে বাইরে চলে গেছে সে। হাসান ইবনে সাব্বাহ'র হাশীশীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে রজব।

আমোদে মেতে উঠেছেন খলীফা। প্রতিদিনকার ন্যায় আজও তিনি বহির্জগত সম্পর্কে উদাসীন। উম্মে আরারা'র যাদুময়ী রূপ-দেহে মাতোয়ারা তিনি। জুমার খুতবা থেকে নাম উঠে যাওয়ার সংবাদ এ যাবত কেউ তাকে দেয়নি। সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার প্রস্তুতি চলছে, সে আনন্দেই তিনি আত্মহারা।

তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়ানোর জন্য উম্মে আরারাহ অতিরিক্ত মদ পান করায় তাকে। মদের সঙ্গে নিদ্রাজনক পাউডারও খাইয়ে দেয়। বৃদ্ধের জ্বালাতন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সব সময় এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকে উম্মে আরারাহ। বৃদ্ধকে শুইয়ে দিয়ে, বাতি নিভিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় মেয়েটি। হাঁটা দেয় নিজের কক্ষের প্রতি। রাতে চুপিসারে এ কক্ষে-ই তার কাছে আসা-যাওয়া করে রজব।

উম্মে আরারাহ কক্ষে প্রবেশ করছে। তার এক পা কক্ষের ভিতরে, এক পা বাইরে। এমন সময় পিছন থেকে কে একজন একটি কম্বল ছুড়ে মারে তার গায়ে।

মুখ থেকে তার একটি শব্দ বের হতে না হতে-ই দৌড়ে এসে লোকটি আরেকখণ্ড কাপড় দ্বারা বেঁধে ফেলে তার মুখ। মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটা দেয় লোকটি।

তারা ছিলো দু'জন। মহলের আঁকা-বাঁকা গোপন পথ সবই যেন তাদের চেনা। অন্ধকার সিঁড়িতে নেমে পড়ে তারা। উপরে লম্বা রশি বেঁধে রেখেছিলো আগেই। সেই রশি ধরে ধরে ঘোর অন্ধকারে চোরা পথ বেয়ে মেয়েটিকে কাঁধে করে নেমে পড়ে একজন। অপরজন হাঁটছে তার পিছনে। মহল থেকে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় দু'টি লোক।

দূরে দাঁড়িয়ে আছে চারটি ঘোড়া। ঘোড়াগুলোর নিকটে সতর্ক বসে আছে আরো দু'জন লোক। আঁধার চিরে সঙ্গীদের আসতে দেখে তারা। আরো দেখে, কাঁধে করে কম্বল পেঁচানো কি যেন নিয়ে আসছে একজন।

চারটি ঘোড়ায় চড়ে বসে চার সঙ্গী। একজন মেয়েটিকে কম্বল মোড়ানো অবস্থায়-ই নিজের সামনে বসিয়ে দেয়। একজন বলে— 'ঘোড়াগুলোকে এখনই দ্রুত ছুটানো যাবে না। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজে প্রহরীরা সতর্ক হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে এগুতে শুরু করে চারটি ঘোড়া। বেরিয়ে যায় শহর থেকে।

❖ ❖ ❖

'এটি সালাহুদ্দীন আইউবীর-ই কাজ।'

'মিসরের গভর্নর ছাড়া এ দুঃসাহস আর কেউ দেখাতে পারে না।'

'তিনি ছাড়া এ-কাজ আর করতে-ই বা পারে কে?'

উম্মে আরারাহ্ অপহরণের খবর ছড়িয়ে পড়ে রাজমহলে। সকলের মুখে এক-ই কথা, সালাহুদ্দীন আইউবী ছাড়া আর কেউ এ-কাজ করাতে পারে না।

ফিরে এসেছে রজব। মহলের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজ নেয় সে। রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের গালাগাল করছে কমাণ্ডারগণ। স্বয়ং কমাণ্ডারগণ সিপাহীদের ন্যায় থর্ থর্ করে কাঁপছে।

মহলের একটি মেয়ে অপহরণ মামুলী ঘটনা নয়। তা-ও আবার সেই মেয়ে, খলীফা যাকে মহলের হীরক মনে করেন।

মহলের পিছনের গোপন পথে একটি রশি ঝুলছে দেখা গেলো। মাটিতে পায়ের ছাপ, যা একটু দূরে গিয়ে ঘোড়ার খুরের চিহ্নে মিলিয়ে গেছে। এতে

প্রমাণ পাওয়া গেলো, মেয়েটিকে রশি বেয়ে নীচে নামানো হয়েছে। কেউ কেউ এমন সন্দেহও ব্যক্ত করেছে যে, মেয়েটি হয়তো স্বেচ্ছায় কারো সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। খলীফা উড়িয়ে দেন এ সংশয়। বলেন, অসম্ভব, উম্মে আরারাহ স্বেচ্ছায় কারো হাত ধরে উধাও হতে পারে না। সে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো।'

'এ সালাহুদ্দীন আইউবীর কাজ। কসরে খেলাফতের সকলের মুখে এই একই কথা, আইউবী ছাড়া এ কাজ করার সাহস আর কেউ করতে পারে না।' খলীফার উদ্দেশে বললো রজব।

কথাটা রজব-ই সকলের কানে দিয়েছিলো। উম্মে আরারা'র নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ শোনামাত্র সে মহলময় ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের নিকট মেয়েটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলো আর বলেছিলো, 'সুলতান আইউবী-ই এ-কাজ করেছে।' রজবের উস্কানিতে মহলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে সাধারণ কর্মচারীদের পর্যন্ত সকলে এই একই কথা আওড়াতে শুরু করে। আর যখন কথাটা খলীফার কানে দেয়া হলো, তখন তিনি একটুও ভাববার প্রয়োজনবোধ করলেন না, এ অভিযোগ ভিত্তিহীন হতে পারে। তাকে আগেই জানানো হয়েছিলো, সুলতান আইউবী নারী-লোলুপ পুরুষ। তিনি মহলের মেয়েদের নিয়ে নিয়ে নষ্ট করছেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে খলীফা দূতকে ডেকে পাঠান। দূত আসলে তাকে তিনি বললেন, 'মিসরের গভর্নরের নিকট যাও। গিয়ে বলো, যেনো গোপনে তিনি মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিয়ে যান। তাহলে আমি এর প্রতিশোধ নেবো না।'

খলীফা আল-আজেদ যখন দূতকে এ পয়গাম প্রদান করছিলেন, ঠিক তখন কায়রো থেকে দশ মাইল দূরে তিনজন উষ্ট্রারোহী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিলো শহর অভিমুখে। এরা মিসরী ফৌজের টহলসেনা। তারা ডিউটি শেষ করে শহরে ফিরছিলো। তাদের সম্মুখে মাটি ও পাথরের বিস্তীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চল। তারা একটি উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করছিলো।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের এক আর্ত-চীৎকার ভেসে আসে তাদের কানে। সাথে পুরুষালী কণ্ঠও শুনতে পায়। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারে, কোন এক হতভাগী নারীর উপর নির্যাতন চলছে। দাঁড়িয়ে যায় তারা। উটের পিঠ থেকে নীচে নামে একজন। একজন টিলার উপরে উঠে চীৎকার-ধ্বনির দিক অনুসরণ করে উৎকীর্ণ হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে যায়। দেখে, টিলার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে চারটি ঘোড়া। চারজন মানুষও আছে সেখানে। সকলে সুদানী হাবশী। দৌড়ে

পালাবার চেষ্টা করছে অপরূপ এক যুবতী। এক হাবশী ধরে ফেলে তাকে। দু' বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে তুলে আনে মেয়েটিকে। সঙ্গীদের মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে তার সামনে হাটু গেড়ে বসে পড়ে লোকটি। দু' হাত নিজের বুকে চেপে ধরে বলে— 'তুমি পবিত্র মেয়ে। অযথা নিজেকে কষ্টে ফেলে আমাদের গোনাহগার করো না। অন্যথায় দেবতাদের রোষানল আমাদের পুড়ে ছারখার করে দেবে কিংবা পাথরে পরিণত করবে।'

'আমি মুসলিম! আমি তোমাদের দেবতাদের অভিসম্পাত করি। আমাকে ছেড়ে দাও। অন্যথায় আমি খলীফার কুকুর দিয়ে তোমাদের টুকরো টুকরো করাবো।' চীৎকার করে বললো মেয়েটি।

'তোমার মালিকানা এখন খলীফার হাতে নয়। আকাশের বিজলী, সাপের বিষ আর সিংহের শক্তি যে দেবতার হাতে, তোমার মালিক এখন তিনি। তিনি তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছেন। এখন যে-ই তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে, মরুভূমির তপ্ত বালুকারাশি তাকে-ই ভস্ম করে ফেলবে।' বললো একজন।

হাবশীদের একজন আরেকজনকে বললো— 'আমি তোমাকে বলেছিলাম, এখানে থেমো না। কিন্তু তোমার কিনা বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন। ওকে বাঁধা অবস্থায় লাগাতার এগিয়ে চললে সন্ধ্যার আগে আগেই আমরা গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারতাম।'

'কেন, ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে দেখতে পাচ্ছো না? তাছাড়া সারাটা রাত গেলো আমরা এক তিল ঘুমুতে পারিনি। আমাদেরও তো একটু বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। যাক, চলো, একে আবার বেঁধে রওনা হই।' বললো দ্বিতীয়জন।

উম্মে আরারাকে ঝাপটে ধরে রাখে একজন। হঠাৎ পিছন দিক থেকে একটি তীর এসে বিদ্ধ হয় তার পিঠে। উম্মে আরারাকে জড়িয়ে ধরা হাত শিথিল হয়ে আসে তার। ঝাপটা দিয়ে বন্ধন-মুক্ত হয়ে পালাতে উদ্ধত হয় মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন ঝাপটে ধরে টেনে ঘোড়ার আড়ালে নিয়ে যায় তাকে। শাঁ করে ছুটে আসে আরেকটি তীর। বিদ্ধ হয় অপর একজনের ঘাড়ে। ছট্‌ফট্ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে-ও। উম্মে আরারাকে ঝাপটে ধরে রাখা লোকটি ঘোড়ার বাগ ধরে উম্মে আরারাহ এবং ঘোড়াটিকে নিয়ে নেমে পড়ে নিম্নভূমিতে। চার হাবশীর অপরজনও দৌড়ে নেমে পড়ে নীচে।

উষ্ট্রারোহী সাথীদের যে লোকটি টিলার উপরে উঠে দাঁড়িয়েছিলো, সে-ই নিক্ষেপ করে তীর দু'টি। সে জানায়, দেবতার কথা শুনে প্রথমে আমি ভয় পেয়ে

গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে যখন শুনলাম, মেয়েটি বলছে, আমি মুসলমান; তোমাদের দেবতাকে আমি অভিসম্পাত করি; তখন আমার ঈমান জেগে উঠে। মেয়েটি যখন খলীফার নাম উল্লেখ করে, তখন আমি বুঝলাম, এ তো হেরেমের মেয়ে। তা ছাড়া মেয়েটির পোশাক-পরিচ্ছদ ও গঠন-আকৃতিতে পরিষ্কার বুঝা গেলো, এ কোন সাধারণ মেয়ে নয়। নিশ্চয় মেয়েটিকে অপহরণ করা হয়েছে এবং সুদান নিয়ে গিয়ে তাকে বিক্রি করে ফেলা হবে। সান্ত্রীর জানা ছিলো, অল্প ক'দিন পর সুদানী হাবশীদের মেলা বসছে। সুন্দরী মেয়েদের বেচা-কেনা হয় সে মেলায়।

সুলতান আইউবী সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, যেন তারা নারীর ইজ্জতের হেফাজত করে। একজন নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে প্রয়োজনে এক ডজন মানুষ হত্যা করার অনুমতিও দেয়া ছিলো তাদের। এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখে সান্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, যে করে হোক মেয়েটিকে উদ্ধার করতেই হবে। দু'টি তীর নিক্ষেপ করে দু' হাবশীকে খুন করে ফেলে সে।

মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যায় দুই হাবশী। সান্ত্রীর তীরের আঘাতে নিহত দু'জনের ঘোড়া দু'টোও নিয়ে যায় তারা। ফেলে যায় শুধু দু'টি লাশ।

সান্ত্রীদের সকলেই উষ্ট্রারোহী। একটি ঘোড়াও নেই তাদের কাছে। উটে চড়ে অশ্বারোহীদের ধাওয়া করা বৃথা। অগত্যা লাশ দু'টো উটের পিঠে তুলে নিয়ে কায়রো অভিমুখে রওনা হয় তারা।

অপহৃতা মেয়েটি কে এবং লাশ দু'টো কাদের, তা অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিলো সান্ত্রীরা। তাই হেরেমের একটি মেয়েকে কারা অপহরণ করলো, তার প্রমাণের জন্য লাশ দু'টো নিয়ে যাওয়া আবশ্যক মনে করে তারা।

কক্ষে অস্থিরচিত্তে পায়চারী করছেন সুলতান আইউবী। রাগে-ক্ষোভে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন যেন তিনি। তার নায়েব-উপদেষ্টাবৃন্দও কক্ষে উপস্থিত। নতমুখে বসে আছেন সবাই।

সুলতান আইউবী বরাবর-ই সহনশীল মানুষ। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে-ই কাজ করেন তিনি। তিনি কখনো আবেগপ্রবণ হন না। রাগের মাথায় কিছু বলেনও না, করেনও না। যত প্রতিকূল পরিস্থিতির-ই শিকার হন না কেন, সর্বাবস্থায় ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা-ই তার অভ্যাস। প্রবল থেকে প্রবলতর রাগ-ও তিনি হজম করে ফেলেন। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্যের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, যে

পরিস্থিতিতে প্রবল প্রতাপশালী যোদ্ধাও অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। শত্রুর বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ হয়েও ঠাণ্ডা মাথায় তিনি লড়াই করেছেন। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন, যখন বাহিনীসহ তিনি শত্রুর হাতে অবরুদ্ধ, সাহস হারিয়ে ফেলেছে তার সৈন্যরা, খাবার নেই, পানি নেই। সৈন্যদের তূনীরে একটি তীরও নেই। তার বাহিনী অপেক্ষা করছে, কখন তিনি আত্মসমর্পণ করে তাদের এ কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন, তাদের জীবন রক্ষা করবেন। কিন্তু সুলতান আইউবী নিজের সাহস অটুট রেখে শুধু লড়াই-ই অব্যাহত রাখেননি, তার সৈন্যদের মধ্যেও নবজীবন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু আজ? আজ তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। রাগে-ক্ষোভে দু' চোখ থেকে আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে যেনো তাঁর। চেহারায় ক্ষোভ ও যন্ত্রণার ছাপ। ফলে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না কেউ। মাথা নুইয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে নীরবে বসে আছে সকলে।

'এই আজ-ই আমি প্রথমবার আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম।' পায়চারী করতে করতে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'খলীফার এ 'পয়গাম'কে মস্তিষ্ক থেকে ঝেড়ে ফেলা কি সম্ভব নয়?' সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলেন নায়েব সালার আন-নাসের।

'আমি সে চেষ্টা-ই করছি। কিন্তু অভিযোগের ধরণটা দেখো। আমি কিনা খলীফার হেরেমের একটি মেয়েকে অপহরণ করিয়েছি। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে অপমান করতে লোকটা কোন পন্থা-ই বাদ রাখলো না। সবশেষে কিনা আমার নামে হেরেমের মেয়ে অপহরণ করানোর অবপাদ! 'পয়গাম'– বরং হুঁশিয়ারী পাঠালেন দূতের মুখে। তা না করে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে সরাসরি কথা বলতেন।' বললেন সুলতান আইউবী।

'তারপরও আপনাকে আমি পরামর্শ দেবো, আপনি মাথা ঠাণ্ডা করুন, মনের উত্তেজনা দূর করুন।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

সুলতান আইউবী বললেন— 'আচ্ছা, সত্যি-ই কি হেরেমের কোন মেয়ে অপহৃতা হয়েছে? আমার তো মনে হচ্ছে, সংবাদটা মিথ্যে। এতক্ষণে হয়তো খলীফা জেনে ফেলেছেন, আমি জুমার খোতবা থেকে তার নাম তুলে দিয়েছি। তার-ই প্রতিশোধ স্বরূপ বোধ হয় তিনি আমার উপর অপবাদ আরোপ করেছেন যে, আমি তাঁর হেরেমের একটি মেয়েকে অপহরণ করিয়েছি।' ঈসা এলাহকারীকে উদ্দেশ করে সুলতান বললেন— 'আজই আপনি মিসরের সব

মসজিদে এই নির্দেশনামা জারি করে দিন, আগামীতে যেন কোন ইমাম জুমার খুতবায় খলীফার নাম উল্লেখ না করেন।

'আপনি খলীফার নিকট চলে যান; তার সঙ্গে কথা বলুন। তাকে বলুন, খলীফা জাতির মর্যাদার প্রতীক বটে, কিন্তু তাঁর আদেশ-নিষেধ এখন অচল। বিশেষত যখন সারাদেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে, তখন তো খলীফার আইন মান্য করার জন্য কেউ-ই প্রস্তুত নয়। শত্রুর আশঙ্কা বাইরে থেকে যেমন, ভিতর থেকেও তেমনি। আমি তো আপনাকে এদ্দুর পরামর্শও দেবো যে, আপনি খলীফার রক্ষী বাহিনীর সংখ্যা কমিয়ে দিন। সুদানী হাবশীদের বাদ দিয়ে মিসরী সৈন্য নিয়োগ করুন এবং খলীফার মহলের বরাদ্দ হ্রাস করুন। এসব পদক্ষেপের পরিণাম আমার জানা আছে। পরিস্থিতির মোকাবেলা আমাদের করতে-ই হবে। তবু আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।' আন-নাসের বললেন।

'আল্লাহ এ অপমান থেকেও আমাকে রক্ষা করবেন।' বললেন সুলতান।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে দারোয়ান। আলোচনা বন্ধ করে সকলে তাকায় তার প্রতি। সালাম দিয়ে বলে— 'মরুভূমির টহল বাহিনীর কমাণ্ডার এসেছেন। সঙ্গে তার তিনজন সিপাহী। তিনি দু' জন সুদানীর লাশ নিয়ে এসেছেন।'

দারোয়ানের এই আকস্মিক প্রবেশে বিরক্তি বোধ করে সকলে। কারণ, সুলতান আইউবী তখন অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন। দারোয়ানের অনুপ্রবেশে ছেদ পড়ে সেই আলোচনায়। কিন্তু সুলতান আইউবী দারোয়ানকে বললেন— 'তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' সুলতান আইউবী আগেই দারোয়ানকে বলে রেখেছিলেন, কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অবহিত করা হয়। রাতে ঘুম থেকে জাগানোর প্রয়োজন হলেও অশংকোচে যেন তাঁকে জাগিয়ে তোলে।

ভেতরে প্রবেশ করে কমাণ্ডার। ধুলো-মলিন তার চেহারা। দেখে পরিশ্রান্ত মনে হলো তাকে। সুলতান আইউবী তাকে বসতে বলে দাওরায়ানকে বললেন, এর আহারের ব্যবস্থা করো। কমাণ্ডার জানালেন, একটি অপহৃতা মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য আমরা চারজন সুদানী হাবশীর দু'জনকে তীরের আঘাতে হত্যা করেছি। অপর দু'জন মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। নিহত দু'জনের লাশ আমরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। কমাণ্ডার আরো জানায়, মেয়েটি যাযাবর কিংবা সাধারণ ঘরানার কন্যা নয়। দেখে তাকে রাজকন্যা বলে মনে হলো। কথা প্রসঙ্গে নিজেকে খলীফার মালিকানাধীন বলে দাবি করতেও শুনেছি।

'মনে হয় আল্লাহ আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।' বলেই বসা থেকে উঠে সুলতান কক্ষ থেকে বের হয়ে যান। কক্ষে উপবিষ্ট সকলে তার পিছনে পিছনে বেরিয়ে আসেন।

কক্ষের বাইরে মাটিতে পড়ে আছে দু'টি লাশ। একটি উপুড় হয়ে। পিঠে বিদ্ধ একটি তীর। অপর লাশের ঘাড়ে একটি তীর গাঁথা। পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন সিপাহী। মিসরের গভর্নর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে এই প্রথমবার দেখলো তারা। পরিচয় পেয়ে সালাম করে পিছনে সরে যায়। সুলতান আইউবী তাদের সালামের জবাব দেন এবং হাত মিলিয়ে বলেন, 'এ শিকার তোমরা কোথা থেকে মেরে আনলে?' যে সান্ত্রী টিলায় দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ে এদেরকে হত্যা করেছিলো, সে সুলতান আইউবীকে পুরো ঘটনার বিবরণ দেয়।

উপদেষ্টাদের প্রতি তাকিয়ে সুলতান আইউবী বললেন— 'আমার মনে হয়, মেয়েটি খলীফার সেই রক্ষিতা-ই হবে। আপনারা কী বলেন?'

'আমারও তা-ই মনে হয়। এদের খঞ্জরগুলো দেখুন—' বলেই আলী বিন সুফিয়ান নিহতদের খঞ্জর দু'টো আইউবীকে দেখান। সান্ত্রী যখন সুলতানকে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলো, তখন আলী বিন সুফিয়ান লাশ দু'টোর সুরতহাল পর্যবেক্ষণ করছিলেন। পরনে সুদানের কাবায়েলী পোশাক। পোশাকের ভেতরে কটিবন্ধ, যাতে বাঁধা আছে একটি করে খঞ্জর। এগুলো খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ ধরনের খঞ্জর। খঞ্জরের হাতলে কসরে খেলাফতের মোহর অঙ্কিত।

আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'এরা যদি খঞ্জরগুলো চুরি করে না থাকে, তাহলে এরা কসরে খেলাফতের নিরাপত্তা বাহিনীর সিপাহী। আপাতত আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমাদের সান্ত্রীরা যে মেয়ের ঘটনা জানালো, সে হেরেমের-ই অপহৃতা মেয়ে, যার অপহরণকারীরা খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।'

'লাশগুলো তুলে খলীফার কাছে নিয়ে চলো।' বললেন সুলতান আইউবী।

আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার, এরা প্রকৃত-ই খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য কিনা। বলেই আলী বিন সুফিয়ান সেখান থেকে চলে যান।

বেশীক্ষণ অতিবাহিত হয়নি। কসরে খেলাফতের এক কমাণ্ডার এসে পড়ে আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে। লাশ দু'টো দেখান হলো তাকে। দেখেই সে লাশ

দু'টো চিনে ফেলে এবং বলে— 'এরা তো খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর সিপাহী। গত তিনদিন ধরে এরা ছুটিতে ছিলো। সাত দিনের ছুটি নিয়েছিলো।'

'আরো কোন সিপাহী ছুটিতে আছে কি?' জিজ্ঞেস করেন আইউবী।

'আছে আরো দু'জন।'

'তারা কি এদের সাথে এক সঙ্গে ছুটি নিয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, চারজন একত্রে-ই ছুটি নিয়েছিলো।'

জবাব দিয়ে কমাণ্ডার আরো এমনি এক তথ্য প্রকাশ করে, যা চমকিত করে তোলে সকলকে। কমাণ্ডার বলে— 'এরা সুদানের এমন একটি গোত্রের লোক, যারা রক্তপায়ী বলে খ্যাত। ফেরআউনী আমলের কিছু জঘন্য প্রথা এখনো তাদের সমাজে প্রচলিত। প্রতি তিন বছর অন্তর তারা একটি উৎসব পালন করে। উৎসব হয় মেলার মতো। তিন দিন তিন রাত চলে এই মেলা। দিনগুলো তারা এমনভাবে ঠিক করে, যাতে চতুর্থ রাতে পূর্ণিমা থাকে। এ গোত্রের বাইরের অনেক লোকও মেলায় অংশ নেয়। তারা আসে শুধু আমোদ করার জন্য। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের বেচা-কেনার জন্য রীতিমত হাট বসে মেলায়। এই মেলা বসার অন্তত একমাস পূর্ব থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকা, বরং কায়রোতে পর্যন্ত যাদের ঘরে যুবতী মেয়ে আছে, তারা সতর্ক হয়ে যায়। কেউ মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের হতে দেয় না। যাযাবর পরিবারগুলো পর্যন্ত এ সময়ে এ এলাকা থেকে অনেক দূরে চলে যায়। এই একমাস চতুর্দিকে মেয়ে অপহরণ হয় আর এ মেলায় বিক্রি হয়। চার সুদানী ফৌজ-ও এ মেলা উপলক্ষ্যে ছুটিতে গিয়েছিলো। আর মাত্র তিনদিন পর মেলা শুরু হচ্ছে।'

'আচ্ছা, তাদের ব্যাপারে কি একথা বলা যায় যে, তারাই খলীফার হেরেমের মেয়েটিকে অহপরণ করেছে?' জিজ্ঞেস করলেন আলী বিন সুফিয়ান।

একথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না। আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি, এ দিনগুলোতে উক্ত গোত্রের লোকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মেয়ে অপহরণ করার চেষ্টা করে। তারা এতো-ই রক্তপায়ী যে, যদি কোন মেয়ের অভিভাবক মেলায় গিয়ে নিজ কন্যার সন্ধান পায় এবং তাকে ফিরিয়ে আনতে চায়, তবে নির্ঘাত তাকে জীবন হারাতে হয়। মেয়েদের খদ্দেরদের মধ্যে মিসরের আমীর-উজীর-হাকীমও থাকেন। মেলায় এমন একটি অস্থায়ী পতিতালয় স্থাপন করা হয়, যেখানে সর্বক্ষণ মদ-জুয়া আর নারী নিয়ে আমোদ চলে। এ উৎসব-অনুষ্ঠানের শেষ রাতটি হয়

অত্যন্ত রহস্যময়। কোন একটি গোপন স্থানে একটি অস্বাভাবিক সুন্দরী যুবতী মেয়েকে বলী দেয়া হয়। কোন্ স্থানে কিভাবে এই নারী-বলী হয়, তা নির্দিষ্ট ক'জন ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। হাবশীদের এক ধর্মগুরু– যাকে তারা খোদা বলেও বিশ্বাস করে– এ কাজ সম্পাদন করে। তার সঙ্গে থাকে স্বল্পসংখ্যক পুরুষ আর চার-পাঁচটি মেয়ে। বলী দেয়া মেয়ের কর্তিত মাথা ও রক্ত প্রদর্শন করা হয় সর্বসাধারণকে। কর্তিত মস্তক দেখে গোত্রের মানুষ মাতালের ন্যায় নাচতে-গাইতে ও মদপান করতে শুরু করে।

অপহরণ ঘটনার তথ্য উদ্ধার করার জন্য খলীফা নিরাপত্তা বাহিনীর উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। তথ্য বের করার জন্য সেই ভোর থেকে সমগ্র বাহিনীকে প্রখর রোদে দাঁড় করিয়ে রাখেন তিনি। কমাণ্ডারদের পর্যন্ত এক তিল দানা-পানি মুখে দিতে দেননি সারা দিন। রজব বার বার আসছে আর ঘোষণা করছে— 'মহলের নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতা ছাড়া মেয়ে অপহরণ করা যেতে পারে না। যে-ই এ অপহরণে সাহায্য করেছো, সামনে এসে হাজির হও। অন্যথায় সকলকে এভাবে ক্ষুৎ-পিপাসায় মেরে ফেলা হবে। যদি মেয়েটি স্বেচ্ছায়ও পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও তো কেউ না কেউ দেখে থাকবে নিশ্চয়। বলো, কে তার অপহরণে সাহায্য করেছ!' কিন্তু না, এতোসব হুমকি-ধমকিতে কোন-ই ক্রিয়া হচ্ছে না। সকলের মুখে একই কথা, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, আমি নির্দোষ।

খলীফা রজবকে এক পা দাঁড়াতে দিচ্ছেন না। তাকে তিনি বলেছিলেন— 'উম্মে আরারার জন্য আমার আফসোস নেই। আমার পেরেশানীর কারণ হলো, যে বা যারা এত কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মহলের একটি মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে পারে, তারা আমাকে অনায়াসে হত্যাও তো করতে পারে! তুমি বলেছিলে, এ ঘটনা সালাহুদ্দীন ঘটিয়েছে; আমি তার প্রমাণ চাই।'

কিন্তু রজব প্রমাণ দেবে কোত্থেকে? প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর নিকট আবার ছুটে যায় সে। রাগে পাগলের মতো হয়ে গেছে লোকটি। সৈন্যদের উদ্দেশে পূর্বের বলা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করে। ঠিক এ সময়ে মহলের দরজায় দণ্ডায়মান সান্ত্রীরা দরজা খুলে দেয় এবং চেচিয়ে উঠে বলে— 'ঐ তো আমীরে মেসের আসছেন।"

প্রধান ফটকে প্রবেশ করে সুলতান আইউবীর অশ্ব। সামনে তাঁর দু'জন রক্ষীর ঘোড়া। আটজন আরোহী পিছনে। একজন ডানে আর একজন বাঁয়ে। সকলের পিছনে সুলতান আইউবীর একজন উপদেষ্টা আর গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান।

সুলতান আইউবীর এই বহরের পেছনে চার চাকাবিশিষ্ট একটি গাড়ী। দু'টি ঘোড়া টেনে এনেছে গাড়ীটি। গাড়ীতে পড়ে আছে দু'টি লাশ। একটি চীৎ হয়ে আর অপরটি উপুড় হয়ে। লাশ দু'টির গায়ে বিদ্ধ দু'টি তীর। লাশের সঙ্গে আছে তিনজন সিপাহী।

সংবাদ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন খলীফা। সুলতান আইউবী ও তাঁর সঙ্গীগণ নেমে পড়েন ঘোড়া থেকে। সুলতান খলীফাকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সালাম করেন, মোসাফাহা করেন ও হাতে চুমো খান। তারপর কোন ভূমিকা ছাড়া-ই বলে ওঠেন–

'আপনার হেরেমের মেয়েকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আপনি পয়গাম পাঠিয়েছেন। সে পয়গাম আমি পেয়েছি। আমি আপনার দুই নিরাপত্তা কর্মীর লাশ নিয়ে এসেছি। এই লাশ দু'টো-ই আমাকে নির্দোষ প্রমাণিত করবে। আর হুজুরের খেদমতে আমি এই আরজি পেশ করার আবশ্যক মনে করছি যে, সালাহুদ্দীন আইউবী আপনার ফৌজের সিপাহী নয়। আপনি যে খেলাফতের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সালাহুদ্দীন সে খেলাফতের-ই প্রেরিত গভর্নর।'

সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাব-গতিক বুঝে ফেলেন খলীফা। পাপের ভারে কুঁকিয়ে ওঠে এই ফাতেমী খলীফার হৃদয়। সুলতান আইউবীর প্রভাব আর মহান ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তর করার সৎ সাহস নেই তার। সুলতানের কাঁধে হাত রেখে বললেন— 'আমি তোমাকে আপন পুত্র অপেক্ষা অধিক স্নেহ করি। ভেতরে এসে বসো সালাহুদ্দীন!'

'আমি এখনো একজন আসামী। এক্ষুনি আমার প্রমাণ দিতে হবে, হেরেমের মেয়ে অপহরণে আমার কোন হাত নেই। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন, তিনি দু'টি লাশ প্রেরণ করেছেন। এই দু'টো লাশ কথা বলবে না ঠিক, কিন্তু তাদের নীরবতা, তাদের গায়ে বিদ্ধ হয়ে থাকা তীর-ই সাক্ষ্য দেবে, সালাহুদ্দীন কসরে খেলাফতে সংঘটিত এ অপরাধের সাথে জড়িত নয়। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত না করা পর্যন্ত আমি ভেতরে যাবো না, আসুন।' বলেই সালাহুদ্দীন

আইউবী লাশের গাড়ীর দিকে হাঁটা দেন। খলীফাও তার পিছনে পিছনে রওনা হন।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে চার থেকে সাড়ে চার শত নিরাপত্তা বাহিনী। সুলতান আইউবী গাড়ীর লাশ দু'টো উঠিয়ে তাদের কাছে নিয়ে রাখেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলেন— 'আট আটজন করে সিপাহী সামনে এগিয়ে আসো এবং লাশ দু'টো দেখে বলো, এরা কারা?'

প্রথমে আসে কমাণ্ডার ও প্লাটুন দায়িত্বশীলগণ। লাশ দু'টো দেখেই তারা নাম উল্লেখ করে বলে— 'এরা তো আমাদের বাহিনীর সিপাহী ছিলো!' তারপর আসে অপর আটজন। তারাও লাশ সনাক্ত করে বলে, এরা আমাদের সহকর্মী সিপাহী। এভাবে আটজন আটজন করে সকল কমাণ্ডার-সিপাহী এসে দেখে লাশ দু'টোর পরিচয় প্রদান করে।

'সালাহুদ্দীন! আমি মেনে নিলাম, এ দু'টো লাশ কসরে খেলাফতের দুই নিরাপত্তা কর্মীর। কিন্তু আমি শুনতে চাই, এদের হত্যা করলো কে?' বললেন খলীফা।

টহল বাহিনীর যে সান্ত্রী এদের হত্যা করেছিলো, সালাহুদ্দীন আইউবী তাকে সামনে ডেকে এনে বললেন, সমবেত মজলিসে তোমার কাহিনী পুনর্ব্যক্ত করো।'

ঘটনাটি আনুপুংখ বিবৃত করে শোনায় সান্ত্রী। তার বক্তব্য শেষ হলে সুলতান আইউবী খলীফাকে বললেন— 'অপহরণ করে আপনার মেয়েটিকে আমার নিকট নিয়ে যাওয়া হয়নি– নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে সুদানী হাবশীদের মেলায় বিক্রি করার জন্য। প্রথা অনুযায়ী হাবশীরা তারা বলীও দিতে পারে।'

লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হয়ে ওঠেন খলীফা। তিনি সুলতান আইউবীকে বললেন, বসুন, ভেতরে আসুন।' কিন্তু ভেতরে যেতে অস্বীকার করলেন আইউবী। বললেন, আমি মেয়েটিকে জীবিত হোক, মৃত হোক উদ্ধার করে এনে আপনার খেদমতে হাজির হবো। তবে আপনি মনে রাখবেন, হেরেমের এমন একটি মেয়ের অপহরণ– যে এসেছিলো উপহারস্বরূপ এবং যে আপনার বিবাহিত স্ত্রী নয়– রক্ষিতা– আমার কাছে বিন্দু বরাবর গুরুত্ব রাখে না। আল্লাহ আমাকে এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।'

'আমার পেরেশানীর কারণ এই নয় যে, হেরেমের একটি মেয়ে অপহৃতা হয়ে গেছে। পেরেশানীর আসল কারণ, যদি এভাবে নারী অপহরণ চলতে থাকে, তাহলে দেশের আইন-শৃংখলার পরিণতি কী হবে!' বললেন খলীফা।

'আর আমি পেরেশান এই ভেবে যে, খোদ ইসলামী সাম্রাজ্য-ই অপহৃত হয়ে যাচ্ছে। যা হোক, আপনি এতো অস্থির হবেন না। আমার গোয়েন্দা বিভাগ মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।' বললেন সুলতান আইউবী।

খলীফা সুলতান আইউবীকে খানিকটা আড়ালে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, সালাহুদ্দীন! বেশ কিছুদিন ধরে আমি দেখছি, তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো। তোমার পিতা নাজমুদ্দীন আইউবকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তোমার মনে আমার প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও নেই দেখছি। তাছাড়াও এই আজই আমি জানতে পারলাম, কায়রোর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আমীরুল ওলামা জুমার খোতবা থেকে আমার নাম তুলে দেয়ার মতো গোস্তাখী করেছে। কাজটা সে তোমার ইন্ধনে করেনি তো?'

'আমার ইন্ধনে নয়– সরাসরি আমার নির্দেশে তিনি খোতবা থেকে আপনার নাম তুলে দিয়েছেন। শুধু আপনার নাম-ই নয়, আপনার পরে যারা খেলাফতের মসনদে আসীন হবেন এবং তাদেরও পরে যারা আসবেন, সকলের নাম-ই আমি খোতবা থেকে তুলে দিয়েছি।' বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন সুলতান আইউবী।

'এ নির্দেশ কি ফাতেমী খেলাফতকে দুর্বল করার জন্য জারি করা হলো? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, ফাতেমী খেলাফতকে উৎখাত করে আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র চলছে।' বললেন খলীফা।

'হুজুর বেশ বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তাছাড়া মদপানের ফলে মস্তিষ্কও দুর্বল হয়ে গেছে। তাই কথাগুলো আপনার প্রলাপের মত শোনা যাচ্ছে . . . . . .।' বললেন সুলতান আইউবী। তারপর খানিক চিন্তা করে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কাল থেকে আপনার নিরাপত্তা বাহিনীতে রদবদল হবে। রজবকে প্রত্যাহার করে নিয়ে আমি তার স্থলে নতুন কমাণ্ডার দেবো।'

'কিন্তু রজবকে যে আমি এখানে রাখতে চাই।' বললেন খলীফা

'হুজুরের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন, সামরিক কর্মকাণ্ডে আপনি হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করবেন না।' বলেই সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি মনোযোগী হন। আলী বিন সুফিয়ান তখন পাঁচজন হাবশী রক্ষীসেনা নিয়ে এদিকে আসছিলেন।

'এরা পাঁচজন ঐ গোত্রের লোক। আমি নিরাপত্তা বাহিনীকে উদ্দেশ করে বললাম, ঐ গোত্রের কেউ এখানে থাকলে বেরিয়ে আসো। সারি থেকে বেরিয়ে

আসে এরা পাঁচজন। কমাণ্ডার বললো, এরা আগামী পরশু থেকে ছুটিতে যাচ্ছে। আমি এদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। মেয়েটির অপহরণে এদের হাত থাকতে পারে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'সালাহুদ্দীন আইউবী রজবকে ডেকে বললেন, আগামীকাল এখানে অন্য কমাণ্ডার আসছে। আপনি আমার নিকট চলে আসবেন। আমি আপনাকে মিনজানীকের দায়িত্ব দিতে চাই।'

শুনে ফ্যাকাশে হয়ে যায় রজবের চেহারা।

❖❖❖

উম্মে আরারাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে হাবশী দু'জন চলে যায় অনেক দূর। এখন আর কারো পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা নেই। ঘোড়া থামায় তারা। মেয়েটি পুনরায় মুক্ত হওয়ার জন্য ছট্‌ফট্‌ করতে শুরু করে। হাবশীরা তাকে বলে, এই তড়পানি তোমার অনর্থক। আমরা তোমাকে ছেড়ে দিলেও এখন আর এ বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম করে তুমি কসরে খেলাফতে জীবিত যেতে পারবে না। তারা মেয়েটিকে এই বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে যে, আমরা তোমাকে অপমান করতে চাই না। বাস্তবিক, যদি তাদের উদ্দেশ্য খারাপ হতো, তাহলে এতক্ষণে তারা মেয়েটির সঙ্গে হায়েনার মতো আচরণ করতো। কিন্তু তারা তেমন কিছু-ই করেনি। এমন একটি চিত্তাকর্ষক সুন্দরী মেয়ে যে তাদের হাতের মুঠোয়, সে অনুভূতি-ই যেন নেই তাদের। তাদের যে দু'জন লোক মারা পড়েছে, তার একজন মৃত্যুর আগে উম্মে আরারার সামনে হাটু গেড়ে বসে করজোরে নিবেদন করেছিলো, পালাবার চেষ্টা করে যেন সে নিজেকে কষ্টে না ফেলে। মেয়েটি তাদের জিজ্ঞেস করলো, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? জবাবে তারা বললো, আমরা তোমাকে আসমানের দেবতার রাণী বানানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছি।

তারা মেয়েটির চোখে পট্টি বেঁধে ঘোড়ায় বসায়। মেয়েটি পালাবার চেষ্টা ত্যাগ করে। এ চেষ্টা যে বৃথা, তা বুঝে ফেলে সে।

ছুটে চলে ঘোড়া। এক হাবশীর সামনে ঘোড়ায় বসে ফোঁফাতে থাকে উম্মে আরারা। দীর্ঘক্ষণ চলার পর শীতল বায়ুর পরশে সে বুঝতে পারে রাত হয়ে গেছে। আরো কিছুক্ষণ চলার পর এক স্থানে থেমে যায় ঘোড়া। একটানা পথ চলায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে মেয়েটি। সমস্ত শরীর ভেঙ্গে আসে যেনো তার। ভয়ে অকেজো হয়ে গেছে তার মস্তিষ্ক।

ঘোড়া থামতেই আশে-পাশে তিন-চারজন পুরুষ আর জনতিনেক মেয়ের মিশ্র স্বর শুনতে পায় মেয়েটি। অবোধ্য এক ভাষায় কথা বলছে তারা। অপহরণকারী হাবশীরা পথে তার সঙ্গে কথা বলেছে আরবী ভাষায়। কিন্তু তাদের বাচনভঙ্গি আরবী নয়।

চোখের পট্টি খোলা হয়নি উম্মে আরারার। সে অনুভব করে, একজন তাকে তুলে একটি নরম বস্তুর উপর বসিয়ে দেয়। বস্তুটি পাল্‌কি। উপরে উঠে যায় পাল্‌কিটি। শুরু হয় তার নতুন আরেক সফর। পালকি কাঁধে করে এগিয়ে চলে বেহারা। তার সঙ্গে দফের মৃদু-মধুর গুঞ্জরণ কানে আসতে শুরু করে তার। গান গাইতে শুরু করে মেয়েরা। গানের শব্দগুলো বুঝতে পারছে না মেয়েটি। কিন্তু গানের সুর-লয়ে জাদুর ক্রিয়া। তাতে উম্মে আরারার ভয়ের মাত্রা বেড়ে যায় আরো। এই ভয়ের মাঝে এমনও প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করে, যেন নেশা বা আচ্ছন্নতা চেপে ধরছে তাকে। রাতের হীম বায়ু সে আচ্ছন্নতায় এক প্রকার মধুরতা সৃষ্টি করে চলেছে। উম্মে আরারার একবার ইচ্ছা জাগে, পালকি থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টা করি আর ওরা আমাকে মেরে ফেলুক। কিন্তু পরক্ষণে-ই সে ভাবে, না, আমি যাদের কব্জায় আটকা পড়েছি, তারা মানুষ নয়– অন্য কোন শক্তি। স্বেচ্ছায় আমার কিছু-ই করা চলবে না।

উম্মে আরারা টের পায়, বেহারারা একের পর এক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। উঠছে তো উঠছে-ই। অন্তত ত্রিশটি সিঁড়ি অতিক্রম করে এবার তারা সমতল জায়গায় চলতে শুরু করে। কয়েক পা এগিয়ে-ই থেমে যায় পাল্‌কি। পাল্‌কিটি নামিয়ে রাখা হয় নীচে। উম্মে আরারার চোখ থেকে পট্টি খুলে দু'চোখে হাত রাখে একজন। কিছুক্ষণ পর চোখের উপর থেকে হাতের আঙ্গুল সরতে শুরু করে এক এক করে। চোখে আলো দেখতে শুরু করে মেয়েটি। ধীরে ধীরে চোখ থেকে সরে যায় হাত।

চোখ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকায় উম্মে আরারা। হাজার হাজার বছরের পুরনো একটি প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আছে সে। একদিকে প্রশস্থ একটি হল। তাতে বিছিয়ে রাখা ফরশ আলোয় ঝল্‌মল্ করছে। দেয়ালের সঙ্গে স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো দণ্ড। প্রদীপ জ্বলছে সেগুলোর মাথায়। এক প্রকার সুঘ্রাণ নাকে আসে তার, যার সৌরভ সম্পূর্ণ নতুন মনে হলো তার কাছে। দফের মৃদু শব্দ আর নারী কণ্ঠের গানের আওয়াজ কানে আসে উম্মে আরারার। এই বাদ্য–শব্দ আর গানের লয়-তাল অপূর্ব এক গুঞ্জরণ সৃষ্টি করে চলেছে হলময়।

সম্মুখে তাকায় উম্মে আরারা। একটি চবুতরা চোখে পড়ে। চবুতরায় পাথর-নির্মিত একটি মূর্তির মুখমণ্ডল ও মাথা। চিবুকের নীচে সামান্য একটু গ্রীবা। এই পাথরের মুখমণ্ডলটি দীর্ঘকায় একজন মানুষের চেয়েও দেড়-দু' ফুট উঁচু। মুখটা খোলা, যা এতো-ই চওড়া যে, একজন মানুষ একটুখানি ঝুঁকে অনায়াসে তাতে ঢুকে পড়তে পারে। ধবধবে সাদা দাঁতও আছে মুখে। দেখতে মনে হচ্ছে, খিল্‌খিল্ করে হাসছে মুখমণ্ডলটি। উভয় কান থেকে তার বেরিয়ে এসেছে দু'টি দণ্ড। প্রদীপ জ্বলছে সেগুলোর মাথায়। হাত দুয়েক করে চওড়া চোখ দু'টো তার অকস্মাৎ জ্বলজ্বল করে ওঠে। আলো বিচ্ছুরিত হতে শুরু করে তা থেকে। পাল্টে যায় মেয়েদের গানের লয়। তীব্র হয়ে ওঠে দফের বাজনা। আলোকিত হয়ে ওঠে পাথরের অভ্যন্তর। ধপধপে সাদা চোগা পরিহিত দু'জন মানুষ ঝুঁকে বেরিয়ে আসে মুখের ভেতর থেকে। লোক দু'টির গায়ের রং কালো। মাথায় বাঁধা লম্বা লম্বা রং-বেরংয়ের পাখির পালক। মুখের অভ্যন্তর থেকে বাইরে এসেই একজন ডান দিকে একজন বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে যায়।

পরক্ষণে-ই মুখের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করে আরেকজন মানুষ। ঝুঁকে বাইরে বেরিয়ে আসে সে-ও। বয়সে খানিকটা বৃদ্ধ মনে হলো তাকে। পরনে লাল বর্ণের চোগা, মাথায় মুকুট। দু' কাঁধে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফনা তুলে বসে আছে মিশমিশে কালো দু'টি সাপ। সাপ দু'টো কৃত্রিম। ভয়ে গা শিউরে উঠে উম্মে আরারার। নির্জীব নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে সে।

এ লোকটি অত্র গোত্রের ধর্মগুরু বা পুরোহিত। চবুতরার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসেন তিনি। ধীরে ধীরে উম্মে আরারার নিকটে এসে মেয়েটির সামনে হাটু গেড়ে বসে তার দুঁ'টি হাত নিজের দু'হাতে নিয়ে চুমো খান। আরবী ভাষায় মেয়েটিকে বলেন, তুমি-ই সেই ভাগ্যবতী মেয়ে, আমার দেবতা যাকে পছন্দ করেছেন। আমি তোমাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি।'

চৈতন্য ফিরে পায় উম্মে আরারা। কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলে, 'আমি কোন দেবতা মানি না। তোমাদের যদি দেবতায় বিশ্বাস থাকে, তো আমি তাদের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমরা আমাকে এখানে কেন আনলে!'

'এখানে যে-ই আসে, প্রথম প্রথম একথা-ই বলে। কিন্তু পরে যখন চোখের সামনে এ পবিত্র ভূখণ্ডের মাহাত্ম্য খুলে যায়, তখন বলে— 'আমি এখানে চিরদিন থাকতে চাই।' আমি জানি, তুমি মুসলমানদের খলীফার প্রেমাস্পদ। কিন্তু যিনি

পছন্দ করেছেন, দুনিয়ার সব খলীফা আর আকাশের ফেরেশতাকুল তাকে সেজদা করে। তুমি জান্নাতে এসে গেছো।'

পুরোহিত চোগার পকেট থেকে একটি ফুল বের করে। উম্মে আরারার ন্যাকের কাছে ধরে ফুলটি। উম্মে আরারাহ হেরেমের রাজকন্যা। এমনসব আতর-সুগন্ধি ব্যবহার সে করেছে, রাজকন্যারা ব্যতীত কেউ যার কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু এ ফুলের সৌরভ তার কাছে নিতান্তই অভিনব বলে মনে হলো। এ ফুলের সৌরভ হৃদয় ভেদ করে যায় উম্মে আরারার। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার রং-ও পাল্টে যায় তার। পুরোহিত বললেন— 'এটি দেবতার উপহার।' মেয়েটির নাক থেকে ফুলটি সরিয়ে নেন পুরোহিত।

ধীরে ধীরে ডান হাতটা আগে বাড়ায় উম্মে আরারা। পুরোহিতের ফুল-ধরা হাতটা টেনে আনে নিজের কাছে। নাকের কাছে নিয়ে ফুল শুঁকে আবেশমাখা কণ্ঠে বলে— 'কি মন ভুলানো উপহার! দেবেন এটি আমায়?'

'তুমি কি দেবতার এ উপহার গ্রহণ করেছো?' জিজ্ঞেস করেন পুরোহিত। ঠোঁটে তার হাসি।

'হ্যাঁ, দেবতার এ উপহার আমি কবুল করে নিয়েছি।' বলে উম্মে আরারাহ পুনরায় ফুলটি নাকের কাছে ধরে। নিজের চোখ দু'টো বন্ধ করে ফেলে, যেন ফুলের সৌরভে বিমোহিত হয়ে পড়েছে সে।

'দেবতাও তোমায় কবুল করে নিয়েছেন।' বললেন পুরোহিত। তারপর জিজ্ঞেস করলেন— 'এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?'

ভাবনায় পড়ে যায় মেয়েটি। যেন কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করছে সে। খানিক পর মাথা দুলিয়ে বলে— 'আমি এখানেই তো আছি।'

– না, না আমি অন্য এক জায়গায় ছিলাম– ধুত্তুরি ছাই! মনে-ই পড়ছে না, কোথায় ছিলাম।

'এখানে তোমাকে কে নিয়ে এসেছে?'

'কেউ নয়– আমি নিজেই এসেছি?'

'কেন, তুমি ঘোড়ায় চড়ে আসোনি?'

'না, আমি উড়ে এসেছি।'

'কেন, পথে মরুভূমি, পাহাড়-জঙ্গল, বিরাণভূমি দেখোনি?'

'দেখিনি মানে! কত সবুজের সমারোহ আর কত রং-বেরংয়ের ফুল দেখেছি!' শিশুর ন্যায় আপ্লুত কণ্ঠে জবাব দেয় মেয়েটি।

'তোমার চোখে কেউ পট্টি বাঁধেনি?'

'পট্টি? কই না তো! আমার চোখ তো খোলা-ই ছিলো! কত সুন্দর সুন্দর মন ভুলানো পাখি দেখেছি আমি!'

উচ্চশব্দে কি যেন বললেন পুরোহিত। উম্মে আরারার পিছন দিক থেকে ধেয়ে আসে চারটি মেয়ে। এসেই পরনের পোশাক খুলে বিবস্ত্র করে ফেলে উম্মে আরারাকে। উম্মে আরারাহ হেসে জিজ্ঞেস করে— 'দেবতা এ অবস্থায় আমাকে পছন্দ করবেন?' পুরোহিত বললেন— 'না, তোমাকে দেবতার পছন্দের পোশাক পরানো হবে।' মেয়েরা উম্মে আরারার কাঁধের উপর চাদরের মত দীর্ঘ একটি কাপড় ঝুলিয়ে দেয়। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত লম্বিত চাদরে আপাদমস্তক আবৃত হয়ে যায় তার। চাদরের পাড়ে কতগুলো রঙ্গিন রশির টুকরো বাঁধা। দুই পাড় একত্র করে বেঁধে দেয় মেয়েরা। চমৎকার এক চোগায় পরিণত হয় চাদরটি। উম্মে আরারার মাথার চুল রেশমের মত কোমল। একটি মেয়ে চুলগুলো আচড়িয়ে পিঠের উপর ছড়িয়ে দেয়। আরো বেড়ে যায় উম্মে আরারার রূপ।

পুরোহিত হাসিমুখে তাকায় উম্মে আরারার প্রতি। পাথর-নির্মিত ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডলটির প্রতি হাঁটা দেন তিনি। দু'টি মেয়ে উম্মে আরারারকে নিয়ে পুরোহিতের পেছনে পেছনে এগিয়ে যায়। রাজকন্যার মত হাঁটছে উম্মে আরারাহ। আশে-পাশে দৃষ্টি নেই তার। রাজকীয় ভঙ্গিমায় চলছে সে। পুরোহিতের অনুসরণে মেয়ে দু'টোর হাত ধরে চবুতরার সিঁড়িতে উঠতে শুরু করে। পাথরের পাহাড়সম মুখমণ্ডলের গহ্বরে ঢুকে পড়ে পুরোহিত। উম্মে আরারাও তিনটি সিঁড়ি অতিক্রম করে ঝুঁকে ঢুকে পড়ে মুখের অভ্যন্তরে। মেয়ে দু'টো দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে। উম্মে আরারার হাত ছেড়ে দেয় তারা; ধরে পুরোহিত নিজে। মুখের অভ্যন্তরটা যথেষ্ট প্রশস্থ, অনায়াসে সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে মেয়েটি। কণ্ঠনালী থেকে নীচে নেমে গেছে কয়েকটি সিঁড়ি। এই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামে দু'জন।

আবার একটি কক্ষ। কক্ষটি তেমন প্রশস্থ নয়। বেশ ক'টি প্রদীপ জ্বলছে। এখানেও ফুলের সৌরভ। কক্ষের ছাদ তেমন উঁচু নয়। দেয়াল ও ছাদ গাছের পাতা ও ফুল দিয়ে ঢাকা। ফরাশের উপর নরম ঘাস। ঘাসের উপর ফুল ছিটানো। এক কোনে মনোরম একটি পিপা ও একটি পেয়ালা। পিপা কাৎ করে দু'টি পেয়ালা ভর্তি করেন পুরোহিত। একটি উম্মে আরারার হাতে ধরিয়ে দেন আর অপরটি রাখেন নিজের হাতে। ঠোঁটের সঙ্গে লাগিয়ে পেয়ালা খালি করে ফেলেন দু'জনে।

'দেবতা কখন আসবেন?' জিজ্ঞেস করে উম্মে আরারা।

'এখনো তুমি তাঁকে চিনতে পারোনি? তোমার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছেন? বললেন পুরোহিত।

পুরোহিতের পায়ে লুটিয়ে পড়ে উম্মে আরারা। বলে, 'হ্যাঁ, এবার আমি দেবতাকে চিনতে পেরেছি। তুমি কি সে নও, যাকে আমি উপরে দেখেছিলাম? আমাকে তুমি কবুল করেছো?'

'হ্যাঁ, আজ থেকে তুমি আমার দুলহান।' বললেন পুরোহিত।

❖ ❖ ❖

আমি আপনাকে আর কিছু জানাতে পারছি না। আমার আব্বা আমাকে বলেছিলেন, পুরোহিত মেয়েটিকে একটি ফুল শোঁকান, যার সৌরভ তাকে ভুলিয়ে দেয়, সে কে ছিলো, কোথা থেকে এসেছে এবং কিভাবে তাকে এখানে আনা হয়েছে। স্বেচ্ছায় সে পুরোহিতের দাসীতে পরিণত হয়ে যায়। জগতের যত্তোসব বিশ্রী বস্তু সুশ্রী হয়ে দেখা দেয় তার চোখের সামনে। পুরোহিত তাকে পাতাল কক্ষে নিজের সঙ্গে রাখেন তিন রাত।'

খলীফার নিরাপত্তা বাহিনী থেকে নিয়ে আসা পাঁচ হাবশীর একজন আলী বিন সুফিয়ানের সামনে ব্যক্ত করছিলো উপরোক্ত তথ্যগুলো। যে গোত্রের চার সিপাহী উম্মে আরারাকে অপহরণ করেছিলো, এই পাঁচজনও সে গোত্রের লোক। যেহেতু অল্প ক'দিন পর তাদের মেলা বসছে আর এরা পাঁচজন সে মেলায় অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে ছুটিতে যাচ্ছে, তাই আলী বিন সুফিয়ান ধরে নিলেন, হেরেমের মেয়ে অপহরণের বিষয়টি তাদের জানা থাকতে পারে। সেমতে খলীফার নিরাপত্তা বাহিনী থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে আলী বিন সুফিয়ান এদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। প্রথমে পাঁচজন-ই বলে, তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। আলী বিন সুফিয়ান তাদের আশ্বস্ত করেন, সত্য কথা বললে তাদের কোন শাস্তি দেয়া হবে না। তবু তারা অজ্ঞতার কথা-ই প্রকাশ করতে থাকে। হায়েনা চরিত্র আর রক্ত-পিয়াসী বলে প্রসিদ্ধ এ গোত্রটি। সাজা-শাস্তির ভয়-ডর নেই তাদের মনে। আলী বিন সুফিয়ানের ধৃত পাঁচজনও বেশ সাহসিকতার সঙ্গে অস্বীকার করে চলে। অগত্যা আলী বিন সুফিয়ান ঐসব পদ্ধতি প্রয়োগ করতে বাধ্য হন, যা পাথরকেও মোমের মত গলিয়ে দেয়।

আলী বিন সুফিয়ান আলাদা আলাদাভাবে পাঁচজনকে এমন স্থানে নিয়ে যান, যেখানকার আহ-চীৎকার বাইরের কেউ শুনতে পায় না। বিরামহীন অত্যাচার-নির্যাতনে কোন আসামী মরে গেলেও জানতে পারে না কেউ।

এই পাঁচ সুদানী বড় কঠিন-হৃদয়ের মানুষ বলে মনে হলো আলী বিন সুফিয়ানের কাছে। তারা রাতভর কঠোর নির্যাতন সইতে থাকে। আর আলী বিন সুফিয়ানও রাত জেগে তাদের মুখ খোলানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কোন স্বীকারোক্তি আদায় করা যাচ্ছে না তাদের মুখ থেকে। অবশেষে সর্বশেষ কঠোর পন্থাটি অবলম্বন করলেন আলী।

কঠোর নির্যাতনের মুখে শেষ রাতে মধ্য বয়সী এক হাবশী আলী বিন সুফিয়ানকে বলে— 'আমি সবকিছু জানি। কিন্তু বলছি না দেবতার ভয়ে। বললে দেবতা আমাকে নির্মমভাবে মেরে ফেলবে।'

'এর চেয়ে নির্দয় শাস্তি আর কী হতে পারে, যা আমি তোমাদের দিচ্ছি? তোমার দেবতা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমাকে এই নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে বের করিয়ে নেয় না কেন? মৃত্যুকেই যদি তোমরা ভয় করে থাকো, তাহলে মৃত্যু এখানেও আছে। তোমরা কথা বলো। আমার হাতে এমন দেবতা আছে, যিনি তোমাদেরকে তোমাদের দেবতার কবল থেকে রক্ষা করবেন।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

আলী বিন সুফিয়ানের কঠোর শাস্তির মুখে বেশ ক'বার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে লোকটি। দেবতা নয়– বার বার মৃত্যু এসে চোখের সামনে হাজির হয় তার। আলী বিন সুফিয়ান তার মুখ খোলাতে সক্ষম হন। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়ে পানাহার করিয়ে আরামে শুইয়ে দেন তাকে।

সে স্বীকার করে, উম্মে আরারাকে তার-ই গোত্রের চার ব্যক্তি অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তারা খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর সিপাহী। তারা আগেই ছুটিতে গিয়েছিলো। পরিকল্পনা সম্পন্ন করে যাওয়ার সময় আমাদের অপহরণের রাত-ক্ষণ বলে গিয়েছিলো। সে রাতে পাহারায় ডিউটি ছিলো আমাদের পাঁচজনের। প্রধান ফটক দিয়ে তাদের দু'জনকে ভেতরে ঢুকতে দেয়ার সুযোগ আমরা-ই করে দিয়েছিলাম। আমরা তাদের অপহরণ ও পলায়নে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছি।

হাবশী জানায়, মেয়েটিকে দেবতার বেদীতে বলী দেয়া হবে। প্রতি তিন বছর পর পর আমাদের গোত্রে চার দিনব্যাপী একটি উৎসব মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার শেষ দিন মেয়েটির বলীপর্ব সম্পন্ন হওয়ার কথা। আমাদের নিয়ম, বলীর মেয়ে ভিনদেশী, শ্বেতাঙ্গী, উচ্চ বংশের এবং চোখ ধাঁধানো রূপসী হতে হয়।'

'তার মানে প্রতি তিন বছর পর পর তোমার গোত্র বাইরে থেকে একটি করে রূপসী মেয়ে অপহরণ করে নিয়ে আসে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'না, এটা ভুল প্রচারণা। তিন বছর পর পর মেলা বসে। আর মেয়ে বলী হয় প্রতি পাঁচ মেলার পর। তবে মানুষ এটাই জানে যে, প্রতি তিন বছর পর মেয়ে বলী হয়।' জবাব দেয় হাবশী।

কোন্ স্থানে মেয়ে বলী হয়, হাবশী তাও জানায়। যে জায়গায় মেলা বসে, তার থেকে এক-দেড় মাইল দূরে একটি পাহাড়ী এলাকা। এ এলাকায় দেবতারা বাস করে বলে জনশ্রুতি আছে এবং তাদের সেবার জন্য নিয়োজিত আছে অসংখ্য জিন-পরী। এ এলাকায় ফেরআউনী আমলের একটি জীর্ণ প্রাসাদ আছে। আছে একটি ঝিল, যাতে বাস করে ছোট-বড় অনেক কুমীর।

গোত্রের কেউ গুরুতর অপরাধ করলে তাকে পুরোহিতের হাতে তুলে দেয়া হয়। পুরোহিত তাকে জীবন্ত ঝিলে নিক্ষেপ করেন। কুমীররা অপরাধীকে খেয়ে ফেলে।

সেই প্রাসাদেই বাস করেন পুরোহিত। প্রাসাদের এক স্থানে পাথর-নির্মিত বৃহদাকার একটি মুখ ও মাথা আছে। এর-ই অভ্যন্তরে বাস করেন দেবতা। প্রতি পনের বছরের শেষ দিনগুলিতে বাইরে থেকে একটি মেয়ে অপহরণ করে এনে তুলে দেয়া হয় পুরোহিতের হাতে। পুরোহিত মেয়েটিকে একটি ফুল শোঁকান। সেই ফুলের সৌরভে বিমোহিত হয়ে মেয়েটি ভুলে যায় সে কে ছিলো, কোথা থেকে এসেছে এবং তাকে কে এনেছে। ফুলের সাথে এক প্রকার নেশাকর ঘ্রাণ মিশিয়ে দেয়া হয়, যার প্রভাবে মেয়েটি পুরোহিতকে দেবতা এবং নিজের স্বামী ভাবতে শুরু করে। ওখানকার পুঁতিগন্ধময় বস্তুও তার চোখে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।

পনের বছর পূর্ণ হওয়ার পথে। এই অল্প ক'দিন পর-ই মেয়েটিকে বলী দেয়া হবে। আমরা নয়জন লোক মিসরের ফৌজে ভর্তি হয়েছিলাম। নির্ভীক এবং জংলী হওয়ার কারণে আমাদেরকে খলীফার নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। দু'মাস আগে হেরেমের এই মেয়েটি আমাদের চোখে পড়ে। আমরা এমন রূপসী নারী জীবনে কখনো দেখিনি। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, একেই অপহরণ করে নিয়ে এবার বলীর জন্য পুরোহিতের হাতে তুলে দেবো। আমাদের এক সঙ্গী– যে গতকাল সান্ত্রীর হাতে মারা গেলো– এলাকায় গিয়ে গোত্রের মোড়লকে বলে এসেছিলো, এবার বলীর জন্য আমরা মেয়ে এনে দেবো। মেয়েটিকে আমরাই অপহরণ করে নিয়ে গেছি। বললো হাবশী।

❖❖❖

রিপোর্ট শুনে ভাবনার সমুদ্রে ডুবে যান সালাহুদ্দীন আইউবী। আলী বিন সুফিয়ান তার নির্দেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। সুলতান আইউবী ম্যাপ দেখলেন। বললেন— 'জায়গা যদি এটি-ই হয়, তাহলে স্থান তো আমাদের নাগালের বাইরে। শহরের প্রবীণ লোকদের নিকট থেকে তুমি যে তথ্য নিয়েছো, তাতে প্রমাণিত হয়, ফেরআউনের পতনের পর শত শত বছর অতিবাহিত হলেও ফেরআউনী কালচার এখনো বহাল আছে। মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য, বেশী দূরে যেতে না পারলেও এই নিকট প্রতিবেশী সমাজ থেকে অন্তত কুফ্‌র-শিরকের অবসান ঘটাতে হবে। কি জানি, এ পর্যন্ত কত বাবা-মায়ের নিষ্পাপ কন্যা ওদের হাতে বলীর শিকার হয়েছে! কত মেয়ে অপহৃতা হয়ে বিক্রি হয়েছে এ মেলায়! দেবতার বিশ্বাসের-ই মূলোৎপাটন করতে হবে। দেবতার নাম ভাঙ্গিয়ে মেয়ে অপহরণ করিয়ে অপকর্ম আর আমোদ-ফুর্তিতে মেতে ওঠে তথাকথিত ধর্মগুরুরা। এই বর্বরতার অবসান ঘটাতে হবে।'

'গুপ্তচর মারফত আমি জানতে পেরেছি, আমাদের ফৌজের কয়েকজন কমাণ্ডার এবং মিসরের কিছুসংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তি এ মেলায় অংশ নেয় এবং মেয়ে ক্রয় করে কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মেয়েদের ভাড়া আনে। বরখাস্তকৃত সুদানী সৈন্যদের বিপুল সংখ্যক লোকও এ মেলায় অংশ নিয়ে থাকে। কাজেই আমি মনে করি, আমাদের ফৌজ এবং বেসামরিক লোকদের ও প্রাক্তন সুদানী ফৌজদের সঙ্গে একত্রিত হওয়া ও একত্রে উৎসব করা ঠিক নয়। এ যৌথ বিনোদন জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। আর বলীর শিকার হওয়ার আগে আগেই মেয়েটিকে উদ্ধার করে খলীফার সামনে এজন্যে পেশ করা প্রয়োজন, যাতে প্রমাণিত হয় যে, খলীফা আপনার উপর অপহরণের যে অপবাদ দিয়েছেন, তা কত ভিত্তিহীন।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমার এর বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই আলী! আমার দৃষ্টি আমার ব্যক্তিসত্ত্বার উপর নয়। আমাকে যে যতো তুচ্ছ-ই ভাবুক, আমি ইসলামের মর্যাদা ও সমুন্নতির কথা ভুলতে পারি না। আমি নিজে কি আর ছাই! কথাটা তুমি মনে রেখো আলী! নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সালতানাতের কর্তৃত্ব রক্ষা, দেশের উন্নতি ও ইসলামের প্রসার-প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে কোরবান করে দাও। ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব ছিলো খলীফার। কিন্তু কালক্রমে খলীফা এখন হয়ে পড়েছেন আত্মকেন্দ্রিক, প্রবৃত্তির দাস। আজ আমাদের খেলাফত ফোক্‌লা ও দুর্বল। আমাদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে খৃষ্টানরা। সফলতার সঙ্গে যদি তুমি নিজের কর্তব্য পালন করতে চাও, তাহলে আত্মকেন্দ্রীকতা পরিহার করে

চলতে হবে। খলীফা আমার প্রতি যে অপবাদ আরোপ করেছেন, বড় কষ্টে আমি তা বরদাশ্‌ত করেছি। ইচ্ছে করলে আমি এর উপযুক্ত জবাব দিতে পারতাম। কিন্তু তখন আমি ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তাম। আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে, ক'দিন পর আমার আশ-পাশের লোকেরাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি, আত্মপ্রিয়তা ও ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।' বললেন সুলতান আইউবী।

'গোস্তাখীর জন্য ক্ষমা চাই, মোহতারাম আমীর! বলী হওয়ার আগেই যদি আপনি মেয়েটিকে উদ্ধার করাতে চান, তাহলে আদেশ করুন। সময় বেশী নেই। পরশু থেকে মেলা শুরু হচ্ছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'সেনাবাহিনীতে ফরমান জারি করে দিন, এ মেলায় কারো অংশ নেয়ার অনুমতি নেই।' বলেই নায়েব সালারকে ডেকে সুলতান বললেন— 'এ নির্দেশ যে অমান্য করবে, পদমর্যাদা যা-ই হোক, তাকে জনসমক্ষে পঞ্চাশ বেত্রাঘাত করা হবে। এক্ষুনি এ নির্দেশ সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দিন।'

পরিকল্পনা শুরু হয়ে যায়। সুলতান আইউবী সংশ্লিষ্ট অফিসারদের ডেকে পাঠান। ঘোষণা দেন, এই জঘন্য কুসংস্কারের আড্ডা আমাদের ভাঙ্গতে হবে। স্থানটি ফেরআউনী কালচারের শেষ নিদর্শন বলে মনে হয়। সরাসরি সেনা অভিযানের প্রস্তাব আসে। কিন্তু সে প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, একে গোত্রের মানুষ সরাসরি আক্রমণ মনে করবে। সংঘর্ষ বাঁধবে। মেলায় অংশ নেয়া নিরীহ মানুষ ও নারী-শিশু মারা যাবে। স্বীকারোক্তি প্রদানকারী সুদানী হাবশীকে রাহবার হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার এবং যে স্থানে মেয়ে বলী দেয়া হয়, সেখানে অতর্কিতে কমাণ্ডো আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তাব আসে। সুলতান আইউবী হাবশীকে নিয়ে যাওয়া ভালো মনে করলেন না। তিনি তাকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

সুলতান আইউবীর নির্দেশে আগেই একটি দুর্ধর্ষ কমাণ্ডো বাহিনী গঠন করে রাখা হয়েছিলো। দীর্ঘদিন যাবত প্রশিক্ষণ দিয়ে অভিজ্ঞরূপে গড়ে তোলা হয়েছে তাদের। একটি সুইসাইড স্কোয়াডও আছে তাদের সঙ্গে। ঈমানদীপ্ত এই স্কোয়াড এতোই চেতনা-সমৃদ্ধ যে, কোন অভিযান থেকে জীবিত ফিরে না আসতে পারাকে তারা গৌরবের বিষয় মনে করে।

নায়েব সালার আন-নাসের ও আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যে স্থানে পুরোহিত বাস করেন এবং মেয়ে বলী হয়, সেই দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় মাত্র বারজন কমাণ্ডো সেনা ঢুকে পড়বে। হাবশীর দেয়া তথ্য মোতাবেক বলীর রাতে মেলা বেশ জমে ওঠে। কারণ, এটি মেলার শেষ দিন।

গোত্রের লোকদের ছাড়া মেয়ে বলির ঘটনা আর কেউ জানে না। জান্লেও এই বলি কোথায় হয়, বলতে পারে না কেউ।

এসব তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, পাঁচশত মিসরী সৈন্য অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে দর্শক হিসেবে এদিন মেলায় ঢুকে পড়বে। তাদের দু'শ জনের কাছে থাকবে তীর-ধনুক। সে যুগে সঙ্গে এসব অস্ত্র রাখা ছিলো স্বাভাবিক ব্যাপার। এসবের উপর কোন পাবন্দি ছিলো না। কমাণ্ডো সদস্যদের বলির স্থানটি স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করে দেয়া হবে। তারা সরাসরি আক্রমণ করবে না। তারা কমাণ্ডো স্টাইলে পাহাড়ে ঢুকে পড়বে। অতর্কিতে প্রহরীদের হত্যা করে পৌঁছে যাবে আসল জায়গায়। মেয়েটিকে যখন বলির জন্য বেদীতে নিয়ে আসা হবে, হামলা করবে তখন। অন্যথায় তারা আক্রান্ত হয়ে মেয়েটিকে পাতাল কক্ষে গুম কিংবা খুন করে ফেলতে পারে।

তথ্য পাওয়া গেছে, মধ্য রাতের পূর্ণ চন্দ্রালোকে বলীপর্ব সম্পন্ন করা হয়। পাঁচশত সিপাহীকে এ সময়ের পূর্বে বলীর স্থান সংলগ্ন পাহাড়ের আশে-পাশে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের জানিয়ে দেয়া হয়, কমাণ্ডো সেনারা যদি প্রতিপক্ষের ঘেরাওয়ে পড়ে যায় কিংবা অভিযান ব্যর্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তারা একটি সলিতাওয়ালা অগ্নিতীর উপর দিকে নিক্ষেপ করবে। এ তীরের শিখা দেখে তারা হামলা চালাবে।

নির্বাচন করে নেয়া হয় চারজন জানবাজ। দু' বছর আগে নুরুদ্দীন জঙ্গী সুলতান আইউবীর সাহায্যার্থে যে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, তাদের থেকে নেয়া হয় বাছা বাছা পাঁচশত সৈন্য। এরা এসেছিলো আরব থেকে। এদের উপর মিসর ও সুদানের রাজনীতি এবং তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের কোন প্রভাব ছিলো না। ইসলাম পরিপন্থী আকীদার বিরুদ্ধে ছিলো তারা উচ্চকণ্ঠ। কুসংস্কার নির্মূলে ছিলো তারা বদ্ধপরিকর। তাদেরকে ধারণা দেয়া হয়, তারা এক ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছে এবং নিজেদের তুলনায় অধিক সৈন্যের মোকাবেলা করতে হতে পারে। লড়াই হতে পারে রক্তক্ষয়ী। আবার এমনও হতে পারে যে, তাদের সামনে দাঁড়াতে-ই পারবে না কেউ, যুদ্ধ ছাড়াই অভিযান সফল হয়ে যাবে। তাদেরকে পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়া হয়। সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়। পাহাড়ে আরোহণ, মরুভূমিতে দৌড়ানো এবং উটের মত দীর্ঘ সময় পিপাসায় অতিবাহিত করেও অকাতর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রশিক্ষণ আছে তাদের পূর্ব থেকেই।

বলীর রাত আসতে আর ছয় দিন বাকী। কমাণ্ডো বাহিনী ও পাঁচশত সৈন্যকে মহড়া দেয়া হয় তিনদিন তিনরাত। চতুর্থ দিন কমাণ্ডোদের উটে চড়িয়ে রওনা

করানো হয়। উটের মধ্যম গতিতে গন্তব্যে পৌঁছতে সময় লাগবে একদিন একরাত। উট চালকদের নির্দেশ দেয়া হয়, তারা কমাণ্ডোদের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে দূরে কোথাও নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে।

পাঁচশত সৈন্যের বাহিনীটি মেলার দর্শক বেশে দু'জন দু'জন চারজন চারজন করে লরি ও উটে চড়ে মেলার দিকে রওনা হয়। তাদের কমাণ্ডারও একই বেশে তাদের সঙ্গে রওনা হয়েছে। তাদের পশুগুলো থাকবে তাদের সঙ্গে।

মেলার শেষ রাত।

আকাশের ঝলমলে চাঁদ পূর্ণতা লাভ করতে আর অল্প বাকি। স্বচ্ছ কাচের মত পরিষ্কার মরুর পরিবেশ। মেলায় বিপুল দর্শকের ভীড়। পিনপতনের স্থান নেই যেন কোথাও। একধারে অর্ধনগ্ন মেয়েরা নাচছে-গাইছে। সুন্দরী মেয়েদের দেদারছে বেচা-কেনা চলছে এক জায়গায়। বেশী ভীড় সেখানেই। একটি মঞ্চ পাতা আছে সেখানে। একটি করে মেয়ে আনা হয় মঞ্চে। চারদিক থেকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে ক্রেতা। মুখ হা করিয়ে দাঁত দেখে। নেড়ে চেড়ে দেখে মাথার চুল। দেহের কোমলতা-কঠোরতাও পরখ করা হয়। তারপর শুরু হয় দর-দাম নিয়ে আলোচনা। অবশেষে বেচা-কেনা। জুয়ার আসরও আছে মেলায়। আছে মদের আড্ডা। মেলার চার ধারে বহিরাগত দর্শকদের থাকার আয়োজন।

উৎসবে যোগদানকারী লোকদের ধর্ম ও চরিত্রের কোন বালাই নেই। আদর্শিক অনুশাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তারা। মেলাঙ্গন থেকে খানিক দূরের পাহাড়ী অঞ্চলের কোন এক নির্ভৃত ভূখণ্ডে যে সুন্দরী নারী বলির আয়োজন চলছে, তাদের তা অজানা। একজন মানুষ যে সেখানে দেবতা হয়ে বসে আছে, তাও তারা জানে না। তারা শুধু এতটুকুই জানে, পাহাড়-বেষ্টিত এ এলাকাটি তাদের দেবতাদের আবাস। জিন-ভূত পাহারা দেয় তাদের। সেখানে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারে না কোন মানুষ।

তাদের এ-ও জানা নেই যে, আল্লাহ্র পাঁচশত সৈনিক তাদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বারজন রক্ত-মাংসের মানুষ তাদের দেবতাদের রাজত্বের সীমানায় ঢুকে পড়েছে। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কিভাবে প্রবেশ করতে হবে, সালাহুদ্দীন আইউবীর চার জানবাজকে আগেই তা বলে দেয়া হয়েছিলো। কঠোর পাহারার কারণে তারা সে পথে ঢুকতে পারেনি। অন্য এক দুর্গম পথ দিয়ে ঢুকতে হয়েছে তাদের। তাদের বলা হয়েছিলো, পাহাড়ের আশেপাশে কোন মানুষ থাকবে না। কিন্তু এসে তারা দেখতে পায়, মানুষ আছে। তার মানে ধৃত

হাবশীর দেয়া তথ্য ভুল। পাহাড়রটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এক বর্গ-মাইলের বেশী নয়। অতি সাবধানে বিক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে যায় তারা।

হঠাৎ একটি গাছের তলায় স্পন্দনশীল একটি ছায়ামূর্তি চোখে পড়ে এক কমাণ্ডোর। সঙ্গে সঙ্গে হাটু গেড়ে বসে পড়ে সে। অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে চলে যায় ছায়াটির। নিকটে গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। দু' বাহু দ্বারা ঘাড় ঝাপটে খঞ্জরের আগা ঠেকিয়ে ধরে তার বুকে। জিজ্ঞেস করে, বল্‌ল, এখানে কি করছিস্ তুই? আর কে আছে তোর সাথে?

ছায়া মূর্তিটি একজন হাবশী লোক। কমাণ্ডো কথা বলছে আরবীতে। হাবশী আরবী বুঝে না। এমন সময়ে এসে পড়ে আরেক কমাণ্ডো। সে-ও খঞ্জর তাক করে ধরে হাবশীর বুকে। ইংগিতে প্রশ্ন করে তারা হাবশীকে। হাবশীও ইংগিতে জবাব দেয়। তার জবাবে সন্দেহ হয়, এখানে কঠোর পাহারা আছে। দুই কমাণ্ডো ধমনি কেটে দেয় হাবশীর। মাটিতে পড়ে যায় সে। আরো সতর্কতার সাথে সম্মুখে এগিয়ে চলে তারা। গহীন জঙ্গল। সামনে একটি পাহাড়। চাঁদ উঠে এসেছে আরো উপরে। ঘন পাহাড়ের ভেতরটা গাছ-গাছালিতে ঘোর অন্ধকার। তারা পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করে।

পাহাড়ের অভ্যন্তরে– যেস্থানে মেয়েটিকে পুরোহিতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে– চলছে আরেক তৎপরতা। পাথরের মুখের সামনে চবুতরায় একটি জাজিম বিছানো। তার উপর বিশাল এক কৃপাণ। নিকটে-ই বড় একটি পেয়ালা। জাজিমে ছড়িয়ে আছে কতগুলো ফুল। পার্শ্বে একস্থানে আগুন জ্বলছে। চবুতরার চারদিকে জ্বলছে কতগুলো প্রদীপ। ঘোরাফেরা করছে চারটি মেয়ে। পরণে তাদের দু'টি করে গাছের চওড়া পাতা। বাকি শরীর নগ্ন। আছে চারজন হাবশী। কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত তাদের সাদা চাদর দিয়ে আবৃত।

উম্মে আরারা পাতাল কক্ষে পুরাহিতের সঙ্গে উপবিষ্ট। তার এলোচুলে বিলি কেটে খেলছেন পুরোহিত। মেয়েটি আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলছে— 'আমি আংগুকের মা। তুমি আংগুকের পিতা। আমার সন্তানরা মিসর ও সুদানের রাজা হবে। তাদেরকে আমার রক্ত পান করিয়ে দাও। আমার লম্বা লম্বা সোনালী চুলগুলো তাদের ঘরে রেখে দাও। তুমি আমার থেকে দূরে সরে গেলে কেন? এসো, আমার কাছে এসো।'

পুরোহিত তেলের মত একটি পদার্থ মালিশ করতে শুরু করে উম্মে আরারার গায়ে।

'আংগুক' এ গোত্রটির নাম। মদের নেশা একটি আরব মেয়েকে এই গোত্রের মা বানিয়ে দিয়েছে। বলীর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে সে। পুরোহিত সম্পন্ন করছে তার নিয়ম-নীতির শেষ পর্ব।

পদে পদে হোঁচট-ধাক্কা খেতে খেতে চড়াই বেয়ে উপরে উঠছে বারজন কমাণ্ডো সৈন্য। দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে তাদের। পাহাড়ের বেশীর ভাগ ঝোপ-ঝাড়, কাঁটাল। আকাশের পূর্ণ চাঁদ এখন মাথার উপর। আস্তে আস্তে গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলোক-রশ্মি চোখে পড়তে শুরু করে। সেই কিরণে তারা একস্থানে একজন হাবশীকে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পায়। তার এক হাতে একটি বর্শা। অপর হাতে ঢাল। লোকটি দেব-জগতের পাহারাদার। নীরবে মেরে ফেলতে হবে তাকেও। কিন্তু লোকটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে পিছন দিক থেকে হামলা করার সুযোগ নেই। সামনাসামনি মোকাবেলা করাও ঠিক হবে না। তাই ঝোপের মধ্যে নীরবে বসে পড়ে এক কমাণ্ডো। লোকটির ঠিক সম্মুখে একটি পাথর ছুঁড়ে মারে আরেকজন। চমকে ওঠে হাবশী। পাথরটি কোত্থেকে আসলো দেখার জন্য এগিয়ে আসে এদিকে। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কমাণ্ডোর ঠিক সামনে এসে পৌছামাত্র ঘাড়টা তার এসে পড়ে কমাণ্ডোর দু' বাহুর মাঝে। সঙ্গে সঙ্গে একটি খঞ্জর বিদ্ধ হয় তার বুকে। প্রহরীকে খুন করে বারজনের কমাণ্ডো বাহিনী খানিকটা বিলম্ব করে সেখানে। পরক্ষণেই এগিয়ে যায় অতি সাবধানে। পা টিপে টিপে অগ্রসর হয় সামনের দিকে।

বলীর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে উম্মে আরারা। তাকে শেষবারের মত বুকে জড়িয়ে ধরেন পুরোহিত। হাতে ধরে সিঁড়ি বেয়ে হাঁটা দেন তিনি। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা চার হাবশী পুরুষ ও মেয়েরা পাথরের মুখ ও মস্তকে আলোর ঝলক দেখতে পায়। মুখের সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে তারা। মুখে কি এক মন্ত্র পাঠ করতে করতে পাথরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসেন পুরোহিত। উম্মে আরারা তার সঙ্গে।

উম্মে আরারাকে জাজিমের উপর নিয়ে যান পুরোহিত। হাবশী পুরুষ ও মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে তার চারদিকে। উম্মে আরারা আরবীতে বলে— 'আমি আংগুকের ছেলে ও মেয়েদের জন্য গলা কাটাচ্ছি। আমি তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত্ব করছি। আর বিলম্ব না করে এবার আমার গলা কেটে দাও। আমার মাথাটা রেখে দাও আঙ্গুকের দেবতার পায়ে। এই মাথার উপর মিসর ও সুদানের মুকুট রাখবেন দেবতা।

চার হাবশী পুরুষ ও মেয়েরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে পুনর্বার। উম্মে আরারাকে জাজিমের উপর আসন গেড়ে বসিয়ে মাথাটা নত করে দেন পুরোহিত। ঘাড় বরাবর সুতীক্ষ্ম ধারাল কৃপাণ উত্তোলন করেন তিনি।

সকলের সামনে হাঁটছে যে কমাণ্ডো, থেমে যায় সে। হাতের ইশারায় থামতে বলে পিছনের সঙ্গীদের। পাহাড়ের চূড়া থেকে চবুতরা ও পাথরের মাথা দেখতে পায় তারা। চবুতরার উপরে নতমুখে আসন গেড়ে বসে আছে একটি মেয়ে। ধবধবে জোৎস্নালোক। বেশ ক'টি প্রদীপ ও বড় বড় মশালের আলোয় দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল করে রেখেছে স্থানটা। মেয়েটির কাছে দণ্ডায়মান লোকটির হাতে কৃপাণ। মেয়েটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার দেহের রং-ই বলছে, সে হাবশীদের গোত্রের মেয়ে নয়।

কমাণ্ডো সেনারা এখনো বেশ দূরে এবং পাহাড়ের চূড়ায় তাদের অবস্থান। সেখান থেকে তীর ছুঁড়লে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। আবার সেখান থেকে নীচে নেমে আসাও অসাধ্য। নীচের দিকে কোন ঢালু নেই। সামনে খাড়া দেয়াল।

কমাণ্ডোরা বুঝে ফেলে মেয়েটিকে বলীর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ধারাল তরবারীর আঘাত তার মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করলো বলে। হাতে সময় এত-ই কম যে, উড়ে গিয়ে বলীর স্থলে পৌঁছুতে না পারলে রক্ষা করা যাবে না তাকে। চূড়া থেকে নীচে তাকিয়ে তারা একটি ঝিল দেখতে পায়। এই সেই ঝিল, যেখানে বাস করে অসংখ্য কুমীর।

ডান দিকে খানিকটা ঢালু পথ। তা-ও প্রায় খাড়া দেয়ালের-ই মত। ঝোপ-জঙ্গল এবং গাছ-পালাও আছে এখানে। সেটি অবলম্বন করে একে অপরের হাত ধরে ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করে তারা। পিছনের কমাণ্ডো হঠাৎ দেখতে পায়, সামনের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক হাবশী। তার এক হাতে ঢাল, অপর হাতে বর্শা। নিক্ষেপের জন্য তীরের মত তাক করে রেখেছে বর্শাটি। কমাণ্ডোদের উপর চাঁদের আলো পড়ছে না। নিশ্চিত কিছু বুঝে উঠতে পারেনি হাবশী এখনো। ধনুকে তীর জুড়ে দেয় পিছনের কমাণ্ডো। ছুটে যায় তীর। রাতের নিস্তব্ধতায় তীরের শাঁ শাঁ শব্দ কানে বাজে সকলের। হাবশীর ধমনিতে গিয়ে বিদ্ধ হয় তীরটি। মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করে সে। ঢালু বেয়ে নীচে নেমে আসে কমাণ্ডোরা।

❖ ❖ ❖

তরবারীর ধারাল বুক উম্মে আরারার ঘাড়ে রাখেন পুরোহিত। আবার উপরে তোলেন। পার্শ্বস্থিত নারী-পুরুষরা সেজদা থেকে উঠে আসন গেড়ে বসে ধীর অথচ জ্বালাময়ী কণ্ঠে কী যেন পাঠ করতে শুরু করে। তরবারী উঁচু করে

দাঁড়িয়ে পুরোহিত। দু'-একটি নিঃশ্বাসের বিলম্ব আর। তরবারী নীচে নামলো বলে। ঠিক এমন সময়ে একটি তীর এসে বিদ্ধ হয় পুরোহিতের বগলে। তরবারী ধরা হাতটা তার নীচে পড়ে যায়নি এখনো। একই সঙ্গে আরো তিনটি তীর এসে বিদ্ধ হয় পাজরে। চীৎকার জুড়ে দেয় মেয়েরা। জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে হাবশী পুরুষরা। দেখতে না দেখতে আরো এক ঝাঁক তীর এসে আঘাত করে পুরোহিতের সহচরদের। ধরাশায়ী হয়ে পড়ে দু' ব্যক্তি। এদিক-সেদিক দৌড়ে পালিয়ে যায় মেয়েরা। উম্মে আরারার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে। দিব্যি মাথা নত করে বসে আছে সে।

দ্রুত দৌড়ে বেদীতে এসে পৌঁছে কমাণ্ডোরা। চবুতরায় উঠে তুলে নেয় উম্মে আরারাকে। নেশার ঘোরে প্রলাপ বকছে সে এখনো। এক জানবাজ নিজের গায়ের জামা খুলে পরিয়ে দেয় তাকে। উম্মে আরারাকে নিয়ে রওনা দেয় তারা।

হঠাৎ বার-তেরজন হাবশী বর্শা ও ঢাল নিয়ে ছুটে আসে একদিক থেকে। বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে সুলতান আইউবীর কমাণ্ডোরা। তীর-কামান ছিলো তাদের চারজনের কাছে। তীর ছুঁড়ে তারা। অবশিষ্টরা লুকিয়ে থাকে এক জায়গায়। হাবশীরা নিকটে এলে পিছন দিক থেকে তাদের উপর হামলা চালায় লুকিয়ে থাকা কমাণ্ডোরা। এক তীরান্দাজ কমাণ্ডো কামানে সলিতাওয়ালা তীর স্থাপন করে। সলিতায় আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারে উপর দিকে। বেশ উপরে উঠে থেমে যখন তীরটি নীচে নামতে শুরু করে, তখন প্রজ্বলিত হয়ে উঠে তীরের মাথায় জড়ানো সলিতার শিখা।

মেলার জাঁকজমক মন্দীভূত হয়নি এখনো। উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের পাঁচশত লোক মেলাঙ্গন থেকে পৃথক হয়ে তাকিয়ে আছে পাহাড়ী ভূখণ্ডের প্রতি। বেশ দূরে শূন্যে একটি শিখা দেখতে পায় তারা। হঠাৎ প্রজ্বলিত হয়ে নীচে নামছে শিখাটি। তারা উট-ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আছে। কমাণ্ডার আছে তাদের সঙ্গে। প্রথমে ধীরপায়ে এগিয়ে চলে তারা, যেন সন্দেহ না জাগে কারুর মনে। খানিক দূরে গিয়েই দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটায়। মেলার লোকেরা মদ-জুয়া, উলঙ্গ নারীর নাচ-গান আর গণিকাদের নিয়ে এত-ই ব্যস্ত যে, তাদের দেবতাদের উপর কি প্রলয় ঘটে যাচ্ছে, তার খবরও নেই তাদের।

কমাণ্ডো বাহিনী এই আশঙ্কায় অগ্নি-তীর নিক্ষেপ করেছিলো যে, হাবশীদের সংখ্যা বোধ হয় অনেক হবে। কিন্তু পাঁচশত সৈন্য অকুস্থলে পৌঁছে মাত্র চৌদ্দ-পনেরটি লাশ দেখতে পায়। তেরটি হাবশীদের আর দু'টি তাদের দু' কমাণ্ডোর। হাবশীদের বর্শার আঘাতে শাহাদাতবরণ করেছিলো কমাণ্ডো দু'জন।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারদিকের খোঁজ-খবর নেয় সৈন্যরা। তারা পাথরের মুখমণ্ডলের নিকট ও পাতাল কক্ষে যায়। যা পেলো কুড়িয়ে নেয় সব। তন্মধ্যে ছিলো একটি ফুল। ফুলটি প্রাকৃতিক নয়- কৃত্রিম। কাপড় দিয়ে তৈরী করা হয়েছিলো ফুলটি। নির্দেশনা মোতাবেক পাঁচশত সৈন্য জায়গাটি দখল করে অবস্থান নেয় সেখানে। আর উম্মে আরারাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে কায়রো অভিমুখে রওনা হয় কমাণ্ডো বাহিনী।

ভোর বেলা।

মেলার রওনক শেষ হয়ে গেছে। রাতভর মদপান করে এখনও অচেতন পড়ে আছে বহু লোক। দোকানীরা যাওয়ার জন্য মালামাল গুটিয়ে নিচ্ছে। মেয়ে-বেপারীরাও যাচ্ছে চলে। মেলাঙ্গন থেকে বের হওয়ার জন্য মরুবাসীদের ভীড় পড়ে গেছে রাস্তায়।

আংগুক গোত্রের লোকেরা অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুণছে কখন তাদের মাঝে বলী দেয়া মেয়ের চুল বিতরণ করা হবে।

এ গোত্রের যারা দূর-দূরান্তের পল্লি অঞ্চলে বাস করে, তারা এক নাগাড়ে পাহাড়ী অঞ্চল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে দেবপুরীর প্রতি তাকিয়ে আছে। বৃদ্ধ ও প্রবীণরা নবীনদের সান্ত্বনা দিচ্ছে, একটু অপেক্ষা করো, পুরোহিত এক্ষুনি চলে আসবেন, দেবতাদের সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রদান করবেন এবং আমাদের মাঝে চুল বিতরণ করবেন। কিন্তু দেবতাদের কোন পয়গাম যে আসবে না, তা কেউ জানে না।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। দেবতাদের কোন সংবাদ আসছে না। সংশয়ে পড়ে যায় এক শ্রেণীর যুবক। সব মিথ্যা বলে সন্দেহ জাগে তাদের মনে। কিন্তু কারুর এতটুকু সাহস নেই যে, ওখানে গিয়ে দেখে আসবে, পুরোহিত আসছেন না কেন।

❖ ❖ ❖

'ডাক্তারকে ডেকে আন। মেয়েটা নেশার ঘোরে এমন করছে।' বললেন সুলতান আইউবী।

উম্মে আরারা সুলতান আইউবীর সামনে বসে আছে এবং বিড় বিড় করে বলছে— 'আমি আঙ্গুকের মা। তুমি কে? তুমি তো দেবতা নও। আমার স্বামী কোথায়? আমার মাথাটা কেটে ফেলো এবং দেবতাকে দিয়ে দাও; আমাকে আমার ছেলেদের জন্য উৎসর্গ করো।'

অনর্গল বকে যাচ্ছে উম্মে আরারা। নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন সে। মাথাটা দুলছে তার।

ডাক্তার আসেন। মেয়েটির অবস্থা দেখেই তিনি সব বুঝে ফেলেন। সামান্য ঔষধ খাইয়ে দেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার চোখ দু'টো বুজে আসে। বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো তাকে। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে উম্মে আরারা।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনলেন আইউবী। অভিযান চালিয়ে সেই পার্বত্য অঞ্চলে কী কী পাওয়া গেলো, তা-ও শোনানো হলো তাঁকে। সুলতান আইউবী নায়েব সালার আন-নাসের ও বাহাউদ্দীন শাদ্দাদকে নির্দেশ দেন, পাঁচশত সৈন্য নিয়ে আপনারা এক্ষুনি রওনা হন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিন। মূর্তিটিকে ধুলায় মিশিয়ে দিন। জায়গাটিকে ঘেরাও করে রাখুন। আক্রমণ আসলে মোকাবেলা করবেন। এলাকার মানুষ যদি নতি স্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে স্থানটি দেখিয়ে মমতার সাথে বুঝিয়ে দেবেন, এ ছিলো স্রেফ প্রতারণা।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন–

'পাঁচশত সৈন্য নিয়ে আমরা ওখানে পৌঁছি। পূর্ব থেকে আমাদের যে বাহিনীটি ওখানে অবস্থান নিয়েছিলো, তার কমাণ্ডার আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। হাজার হাজার সুদানী কাফ্রী দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কেউ কেউ উট-ঘোড়ায় সওয়ার। হাতে তাদের বর্শা, তরবারী ও কামান-ধনুক।

আমাদের সমুদয় সৈন্যকে আমরা সেই পার্বত্য অঞ্চলের চারদিকে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দেই যে, তাদের মুখ বাইরের দিকে। তারা তীর-ধনুক বর্শা নিয়ে প্রস্তুত দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছিলাম।

আমি আন-নাসেরের সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করি। মূর্তিটি দেখেই আমি বললাম, এতো ফেরাউনদের প্রতিকৃতি।

আশে-পাশে পড়ে আছে হাবশীদের লাশ। আমরা পুরো এলাকা ঘুরে-ফিরে দেখি। দু'টি পাহাড়ের মাঝে একটি জীর্ণ প্রাসাদ। ফেরআউনী আমলের একটি মনোরম প্রাসাদ এটি। দেয়ালের গায়ে সে যুগের কিছু লিপি। আমাদের সন্দেহ রইলো না, এখানে ফেরআউনের-ই বাস ছিলো।

দেয়ালের মত খাড়া একটি পাহাড়ের পাদদেশে একটি ঝিল। ঝিলে অনেকগুলো কুমীর। পাহাড়ের কোল ঘেষে পাহাড়ের ভিতরে ঢুকে গেছে ঝিলের পানি। পানির উপর পাহাড়ের ছাদ। বড় ভয়ঙ্কর জায়গা। আমাদের দেখে সবগুলো কুমীর এসে পড়ে কূলে। চেয়ে চেয়ে আমাদের দেখতে থাকে।

আমি সৈনিকদের বললাম, হাবশীদের লাশগুলো ধরে ধরে ঝিলে নিক্ষেপ করো; ক্ষুধার্ত প্রাণীগুলোর ভাল আহার মিলবে। সৈনিকরা লাশগুলোকে টেনে-হেঁচড়ে ঝিলে নিক্ষেপ করে। কুমীরের সংখ্যা যে কতো, তার হিসেব নেই।

ফেলা মাত্র দেখলাম, লাশগুলো যেন দৌড়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে চলে গেলো। সব শেষে আসলো পুরোহিতের লাশ। বহু মানুষকে সে কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করেছিলো। আর আজ সে নিজে-ই নিক্ষিপ্ত হলো সেই কুমীরের মুখে।

দু'জন সিপাহী চারটি সুদানী মেয়েকে ধরে আনে। তারা এক স্থানে লুকিয়ে ছিলো। মেয়েগুলো বিবস্ত্র। কোমরে বাঁধা দু'টি পাতা। একটি সামনে, অপরটি পিছনে। আমি ও নাসের অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। সৈনিকদের বললাম, জলদি এদের ঢাকো। সৈনিকরা তাদের পোশাক পরায়। এবার আমরা তাদের পাণে তাকালাম। মেয়েগুলো বেশ রূপসী। তারা কাঁদছে। ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছে। তারা অভয় পেয়ে কথা বলে। খুলে বলে সেখানকার সব ইতিবৃত্ত। বড় লজ্জাকর সেসব ঘটনা। নারী জাতির এ অবমাননা কোন মুসলমানের সহ্য হওয়ার কথা নয়। আপন-পর, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলাম সব নারীকে সমান ইজ্জত করে। একজন মুসলমানের নিকট একজন মুসলিম নারীর যে মর্যাদা, একজন অমুসলিম নারীর মর্যাদা তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। যা হোক, মেয়েগুলোর বক্তব্যে আমরা বুঝলাম যে, তারা ফেরআউনদের খোদা বলে বিশ্বাস করে। তাদের গোত্রের মানুষ মানুষকে খোদা মানে।

স্থানটি বেশ মনোরম। সবুজ-শ্যামলিমায় ঘেরা সমগ্র এলাকা। ভেতরে পানির ঝরনা। এই ঝরনার পানি থেকেই ঝিলের উৎপত্তি। ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি ছায়া দিয়ে রেখেছে। কোন এক সৌখিন ফেরআউনের স্থানটি পসন্দ হয়ে গেলে একে সে বিনোদপুরি বানিয়েছিলো। নিজের খোদায়িত্বের প্রমাণস্বরূপ তৈরী করেছিলো এ মূর্তিটি। নির্মাণ করেছিলো পাতাল-কক্ষ। বহুদিন আমোদ করে গেছে সে এখানে।

অবশেষে এক সময় দিন বদলে যায়। খসে পড়ে ফেরআউনদের ক্ষমতার নক্ষত্র। মিসরে আসে আরেক মিথ্যা ধর্ম। কেটে যায় কিছু দিন। সবশেষে জয় হয় সত্যের। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মুখরিত ধ্বনি শুনতে পায় মিসর। আল্লাহর সমীপে মাথা নত করে মিসরের মানুষ। কিন্তু সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মিথ্যা তখনো টিকে থাকে এই পার্বত্য অঞ্চলে। আল-হাম্‌দু লিল্লাহ্, মহান আল্লাহ'র অপার কৃপায় আমরা মিথ্যার এই শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেললাম। মূর্তিপূজাসহ জঘন্যতম কুসংস্কার থেকে এ ভূখণ্ডটিকে পবিত্র করলাম।

সৈন্যরা স্থানটিকে ঘিরে ফেলে। প্রস্তর-নির্মিত বেদীটি ভেঙ্গে চুরমার করে। চবুতরাটিও গুড়িয়ে দেয়। পাতাল-কক্ষটি ভরে দেয় ইট-পাথর দিয়ে। বাইরে

হাজার হাজার হাবশী বিস্ময়াভিভূত দাঁড়িয়ে কাণ্ড দেখছে। ডেকে তাদেরকে ভিতরে নিয়ে দেখান হয়, এখানে কিছু-ই ছিলো না। বলা হয়, ধর্ম-বিশ্বাসের নামে তোমাদের সাথে এতোকাল শুধু প্রতারণা-ই করা হয়েছে। মেয়ে চারটিকে তাদের হাতে তুলে দেয়া হলো। মেয়েদের বাপ-ভাইরাও উপস্থিত ছিলো সেখানে। আপন আপন কন্যা ও বোনকে নিয়ে যায় তারা। তাদেরকে বলা হলো, এখানে একজন অসৎ লোক বাস করতো। ধর্মের নামে নারীর ইজ্জত ও মানুষের জীবন নিয়ে তামাশা করতো সে। এখন সে কুমীরের পেটে। এই হাজার হাজার হাবশীকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশে কমাণ্ডার বক্তৃতা করেন তাদের ভাষায়। তারা সকলে-ই নীরব। তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়। এবারও তাদের মুখে কোন কথা নেই। কখনো কখনো মনে হচ্ছিলো, রক্ত নেমে এসেছে তাদের চোখে। প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে মরছে যেন তারা। অবশেষে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয়— 'যদি তোমাদের সত্য খোদাকে দেখার ইচ্ছে থাকে, তাহলে এসো দেখিয়ে দিই। আর এখন তোমরা যে স্থানে বসে আছো, যদি তাকে মিথ্যা দেব-দেবীর আবাস মনে করে থাকো, তা-ও বলো; এই পাহাড়গুলোকেও আমরা ধুলোয় মিশিয়ে দিই। তার পরে তোমরা দেখবে কোন্ খোদা সত্য।

জ্ঞান ফিরে এসেছে উম্মে আরারার। মেয়েটি সুলতান আইউবীকে সে নিজের সব ঘটনা খুলে বলে। চৈতন্য ফিরে আসার পর এবার তার সব ঘটনা-ই মনে আসে। সে বলে, পুরোহিত দিন-রাত যখন-তখন তাকে উপভোগ করতো। বারবার একটি ফুল শোঁকাত তার নাকে। বলি দেয়ার কথাও পুরোহিত বলে রেখেছিলো তাকে। কমাণ্ডো বাহিনী যথাসময়ে গিয়ে না পৌঁছুলে এখন তার মস্তক থাকতো গর্তে আর দেহ থাকতো কুমীরের পেটে। ভয়ে কাঁপতে লাগলো মেয়েটি। চোখে অশ্রু নেমে আসে তার। সুলতান আইউবীর হাতে চুমো খেয়ে বললো, 'আল্লাহ আমাকে আমার পাপের শাস্তি দিয়েছেন। আমি জীবনে বহু পাপ করেছি। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।' মানসিকভাবে বড় বিধ্বস্ত উম্মে আরারা।

সিরিয়ার এক বিত্তশালী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে উম্মে আরারা জানায়, আমি তার কন্যা। লোকটি মুসলমান। বিখ্যাত ব্যবসায়ী। সিরিয়ার আমীরদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

তৎকালে আমীরগণ একটি শহর কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড শাসন করতো। কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে কাজ করতো তারা। দশম শতাব্দীর পর এই আমীরগণ সম্পূর্ণরূপে বিলাসিতায় ডুবে যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা তাদের সঙ্গে ব্যবসা করতো এবং সুদও গ্রহণ করতো। সুন্দরী

মেয়েদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের হেরেম। তারা নারী আর মদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

উম্মে আরারাও এমনি এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর কন্যা। বার-তের বছর বয়সেই সে পিতার সঙ্গে আমীরদের নাচ-গানের আসরে যোগ দিতে আরম্ভ করে। অসাধারণ সুন্দরী বলে-ই বোধ হয় পিতা শৈশব থেকে-ই তাকে আমীরদের কালচারে অভ্যস্ত করে তুলতে শুরু করেছিলো।

উম্মে আরারাহ জানায়— 'আমার বয়স যখন চৌদ্দ, তখন-ই আমীরগণ আমার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। দু'জন আমীর আমাকে বহু-মূল্যবান উপহারও দিয়েছিলেন। আমি নিজেকে পাপের হাতে তুলে দেই। ষোল বছর বয়সে পিতার অজান্তে গোপনে রক্ষিতা হয়ে যাই এক আমীরের। কিন্তু বাস করতাম নিজের ঘরে।'

বিত্তশালী পিতার কন্যা উম্মে আরারা। ঐশ্বর্যের মাঝে তার জন্ম, লালন-পালন ও যৌবন লাভ। লাজ-লজ্জার সঙ্গে কোন পরিচয় ছিলো না তার। তিন বছরের মাথায় পিতার হাত থেকে বেরিয়ে যায় সে। স্বাধীন চিত্তে আরো দু'জন আমীরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নেয়। বাক্‌পটু রূপসী কন্যা হিসেবে উম্মে আরারার নাম এখন সকলের মুখে মুখে।

অবশেষে পিতা তার সঙ্গে সমঝোতা করেন। পিতার সহযোগিতায় তিনজন আমীর তাকে নতুন এক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। ইসলামী সাম্রাজ্য ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এই তিন আমীর। উম্মে আরারার পিতাও এই ষড়যন্ত্রে জড়িত। খেলাফতের মূলোৎপাটন করার কাজে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে উম্মে আরারাকে। এক সময়ে এক খৃষ্টানও এসে যোগ দেয় এ প্রশিক্ষণে।

স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন এই আমীরগণ। এর জন্যে প্রয়োজন খৃষ্টানদের সহযোগিতা। নুরুদ্দীন জঙ্গী ও খেলাফতের মাঝে ভুল-বুঝাবুঝির কাজে ব্যবহার করা হয় উম্মে আরারাকে। এ অভিযানে তিন খৃষ্টান মেয়েকে যুক্ত করে একটি টিম গঠন করে ক্রুসেডাররা।

কঠোর প্রশিক্ষণ দিয়ে উম্মে আরারাকে তারা উপহারস্বরূপ খলীফা আল-আজেদের খেদমতে প্রেরণ করে। তার দায়িত্ব, প্রথমত খলীফার অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা এবং সাবেক সুদানী ফৌজের যে ক'জন অফিসার এখনো বাহিনীতে রয়ে গেছে, তাদেরকে খলীফার কাছে ভিড়িয়ে সুদানীদেরকে আরেকটি বিদ্রোহের প্রতি উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত সুদানী ফৌজকে বিদ্রোহে নামিয়ে অস্ত্র ও নানাবিধ উপায়ে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য খলীফাকে প্রস্তুত করা এবং সম্ভব হলে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একটি দলকে প্ররোচনা দিয়ে বিদ্রোহী বানিয়ে তাদেরকে সুদানীদের সঙ্গে যুক্ত

করা। খলীফা আর কিছু করতে না পারলেও তাকে দিয়ে অন্তত এতটুকু করানো যে, নিজের নিরাপত্তা বাহিনীকে সুদানীদের হাতে অর্পণ করে নিজে সুলতান আইউবীর নিকট চলে যাবেন এবং তাকে বলবেন, আমার রক্ষী বাহিনী বিদ্রোহী হয়ে গেছে। সারকথা, সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে এমন একটি যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যা তাকে মিসর ছেড়ে পালাতে বাধ্য করে এবং বাকি জীবনটা তার একঘরে হয়ে কাটাতে হয়।

উম্মে আরারাহ সুলতান আইউবীকে জানায়, সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে তার জন্ম হয়েছিলো। কিন্তু পিতা তাকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র-ই মূলোৎপাটনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের আমীরগণ শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে আপন সাম্রাজ্যের পতনের কাজে-ই ব্যবহার করে।

রূপ-যৌবন, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও বাকচাতুর্যে অল্প ক'দিনে খলীফাকে নিজের মুঠোয় নিয়ে আসে উম্মে আরারা। সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে সে খলীফাকে। রজবকে-ও জড়িত করে নেয় এ ষড়যন্ত্রে। আরো দু'জন সামরিক কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে আইউবীর বিরুদ্ধে মাঠে নামে রজব। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীতে মিসরীদের বাদ দিয়ে সুদানীদের টেনে আনতে শুরু করে সে।

উম্মে আরারা খলীফার মহলে এসেছে দু'-আড়াই মাস হলো। এই স্বল্প সময়ে-ই সে রাণী হয়ে গেছে মহলের। গোটা কসরে খেলাফত এখন ওঠে-বসে তার-ই ইঙ্গিতে।

উম্মে আরারা সুলতান আইউবীকে আরো জানায়, খলীফা আপনাকে হত্যা করাতে চান। হাশীশীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হত্যার আয়োজন সম্পন্ন করেছে রজব।

ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা এবং বিলাস-প্রিয়তায় বিরক্ত হয়ে সুলতান আইউবী খলীফার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে দিয়েছিলেন আগেই। এর মধ্যে কাকতালীয়ভাবে ঘটে গেলো এসব ঘটনা। খলীফা যাদের দ্বারা সুলতান আইউবীকে কোণঠাসা করাতে চেয়েছিলেন, তাদের-ই হাতে মহলের রাণী উম্মে আরারার অপহরণ এবং আইউবীর হাতে তার উদ্ধারের মধ্য দিয়ে দৈবাৎ ফাঁস হয়ে গেলো অনেক তথ্য। অবশেষে সুলতান কর্তৃক আইউবীর হত্যার ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাও গোপন রইলো না। উম্মে আরারার অপহরণকে কেন্দ্র করে-ই ইতিমধ্যে সুলতান আইউবী খলীফার নিরাপত্তা বাহিনী থেকে বদলি করে দিয়েছেন রজবকে। তার স্থলে প্রেরণ করেছেন নিজের বিশ্বস্ত এক নায়েব সালারকে। কিন্তু এসব ঘটনা সুলতান আইউবীর জন্য জন্ম দেয় নতুন এক বিপদ।

উম্মে আরারাকে নিজের আশ্রয়ে রাখলেন সুলতান। অনুতাপের আগুনে পুড়ে মরছে মেয়েটি। অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় সে। ভয়াবহ এক বিপদে ফেলে আল্লাহ তার চোখ খুলে দিয়েছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেবেন, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবছেন সুলতান আইউবী।

ফেরআউনদের শেষ চিহ্ন ধুলোয় মিশিয়ে পরদিন আন-নাসের ও বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ ফিরে আসেন কায়রো।

❖ ❖ ❖

আট দিন পর।

রাতের শেষ প্রহর। ঘুমিয়ে আছেন সুলতান আইউবী। চাকর এসে তাঁকে জাগিয়ে বলে, আন-নাসের, আলী বিন সুফিয়ান এবং আরো দু'জন নায়েব এসেছেন। ধড় মড় করে উঠে বৈঠকখানায় ছুটে যান সুলতান। অভ্যাগতদের একজন এক টহল বাহিনীর কমাণ্ডার।

সুলতান আইউবীকে জানানো হলো, প্রায় ছয় হাজার সুদানী সৈন্য মিসরের সীমান্ত অতিক্রম করে একস্থানে শিবির স্থাপন করেছে। তাদের মধ্যে আছে পদচ্যুত সুদানী বাহিনীর কিছু সদস্য এবং কাফ্রী গোত্রের বেশ কিছু লোক। এই কমাণ্ডার তথ্য জানার জন্য ছদ্মবেশে দু'জন উষ্ট্রারোহীকে তাদের ছাউনিতে প্রেরণ করেছিলো। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক কায়রো আক্রমণ করা তাদের উদ্দেশ্য। নিজেদেরকে পর্যটক দাবি করে উষ্ট্রারোহীদ্বয় বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে কথা বলে এবং এই বলে ফিরে আসে যে, এ অভিযানকে সফল করার জন্য প্রয়োজনে তারা সৈন্য দিয়ে তাদের সাহায্য করবে। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক তারা এদিক-ওদিক থেকে আরো সৈন্য আগমনের অপেক্ষা করছে এবং আগামী কাল-ই সেখান থেকে কায়রো অভিমুখে রওনা হবে।

সব শুনে সুলতান আইউবী আদেশ করলেন, খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীতে মাত্র পঞ্চাশজন সৈন্য আর একজন কমাণ্ডার রেখে অন্যদের ছাউনিতে ডেকে আনো। খলীফা আপত্তি জানালে বলবে, এ আমার আদেশ।

সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, আপনার ব্রাঞ্চের সুদানী ভাষায় পারদর্শী এমন একশত লোককে সুদানী বিদ্রোহী বেশে এই কমাণ্ডারের সঙ্গে এক্ষুনি রওনা করিয়ে দিন। কমাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, এ একশত লোক ঐ দু' উষ্ট্রারোহীর সঙ্গে সুদানী বাহিনীতে গিয়ে যোগ দেবে। উষ্ট্রারোহী সান্ত্রী দু'জন বলবে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা তোমাদের সাহায্য নিয়ে এসেছি। তাদেরকে বলে দেবে, যেন তারা বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে

আমাদের অবহিত করে এবং রাতে তাদের পশু ও রসদ কোথায় থাকে, তা চিহ্নিত করে রাখে। সুলতান আইউবী আন-নাসেরকে বললেন, আপনি অতি দ্রুতগামী অশ্বারোহী, কমাণ্ডো বাহিনী এবং ক্ষুদ্র একটি মিনজানিক প্লাটুন প্রস্তুত করে রাখুন।

'আমি ভেবেছিলাম, সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে শহর থেকে দূরে থাকতে-ই ওদের শেষ করে দেবো।' বললেন আন-নাসের।

'না, মনে রেখো নাসের! দুশমনের সংখ্যা তোমাদের অপেক্ষা কম হলেও মুখোমুখি সংঘাত এড়িয়ে চলবে। রাতে কমাণ্ডো বাহিনী ব্যবহার করবে, দুশমনের উপর অতর্কিতে হামলা চালাবে। পার্শ্ব থেকে, পিছন থেকে আঘাত হেনে পালিয়ে যাবে। দুশমনের রসদ নষ্ট করবে, পশু ধ্বংস করবে। তাদের অস্থির করে রাখবে ও শত্রু বাহিনীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। তাদের সামনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেবে না। ডানে-বাঁয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য করবে। মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হতে হলে মনে রাখবে, রণাঙ্গন মরুভূমি। সর্বপ্রথম পানির উৎস দখল করবে। সূর্য এবং বায়ুকে তাদের প্রতিকূলে রাখবে। তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে নিজের যুৎসই জায়গায় নিয়ে যাবে। মনে রাখবে, সুদানীদের কায়রো পর্যন্ত পৌছার কিংবা আমাদের সৈন্যদেরকে মুখোমুখি লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলার স্বপ্ন আমি পূরণ হতে দেবো না।

সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, যে একশত সৈন্যকে সুদানী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে পাঠাবে, তাদের বলে দেবে, যেন তারা ছাউনিতে গুজব ছড়ায়, 'ছয়-সাত দিনের মধ্যে সালাহুদ্দীন আইউবী ফিলিস্তীন আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। কাজেই আমাদের ক'টা দিন অপেক্ষা করে তাঁর অনুপস্থিতির সময়টাতে কায়রো আক্রমণ করতে হবে।'

এমনি বেশ কিছু আদেশ-নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবী বললেন, আজ আমি কায়রো থাকবো না। কায়রো থেকে বেশ দূরের একটি জায়গার নাম বললেন তিনি। সেখানে তিনি দুশমনের কাছাকাছি তার হেডকোয়ার্টার রাখতে চান; যাতে সরাসরি নিজে যুদ্ধের তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

বৈঠকখানায়-ই ফজর নামায আদায় করেন সকলে। সুলতান আইউবীর পরিকল্পনা মোতাবেক কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে যায়। প্রস্তুতির জন্য সুলতান নিজ কক্ষে চলে যান।

সুদানীদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। ইতিপূর্বে তাদের একটি বিদ্রোহ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলো দু' বছর হলো। আবার বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুতি

শুরু করে দিয়েছিলো তখন থেকেই। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলো খৃষ্টানরা। বিপুলসংখ্যক গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলো তারা মিসরে। একদিন যে সুদানীরা কায়রো আক্রমণ করবে, তা ছিলো সুনিশ্চিত। কিন্তু তা এতো তাড়াতাড়ি, এমন আচম্বিত হয়ে যাবে, তা ভাবেননি সুলতান আইউবী। হাবশী গোত্রের উপর সুলতান আইউবীর সামরিক অভিযানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো সুদানীরা। তার-ই প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে তার এই আকস্মিক সেনা অভিযান। হাবশীদের উপর আইউবীর সামরিক অভিযানের পর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে-ই তারা সেনা সমাবেশ ঘটায় এবং কায়রো আক্রমণের জন্য রওনা হয়।

দু' উষ্ট্রারোহীর সঙ্গে একশত সশস্ত্র মুসলিম সেনা যখন সুদানী বাহিনীতে যোগ দেয়, সুদানীরা তখন মিসর সীমান্ত থেকে বেশ ভিতরে পৌঁছে গিয়ে ছাউনী ফেলেছে। সুলতান আইউবী রাতে শহর ত্যাগ করে এমন স্থানে চলে যান, যেখান থেকে সুদানীদের গতিবিধির খবর নেয়া ছিলো নিতান্ত সহজ। সুদানী বাহিনীতে অনুপ্রবেশকারী আইউবীর সেনারা কর্মকর্তাদের জানায়, সুলতান আইউবী কয়েকদিনের মধ্যে ফিলিস্তীন আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। এ সংবাদ শুনে সুদানী সেনা কর্মকর্তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আইউবীর অনুপস্থিতির সময়টিতে-ই তারা কায়রো অভিযান পরিচালিত করবে বলে স্থির করে। ফলে এ ছাউনী আরো দু' দিন বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। পরদিন রাত থেকে সুলতান আইউবীর নিকট তাদের খবরা-খবর আসতে শুরু করে।

তারও পরের রাতে সুলতান আইউবী পাঁচটি মিন্‌জানিক, বেশ কিছু অগ্নিগোলা ও অগ্নিতীর দিয়ে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী প্রেরণ করেন।

মধ্য রাত। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সুদানী বাহিনী। এমন সময়ে তাদের রসদ-ডিপোতে অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে। পরক্ষণেই ছুটে আসতে শুরু করে অগ্নিতীর। ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখায় আলোকিত হয়ে ওঠে মধ্য রাতের নিঝুম শূন্য আকাশ। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সুদানী বাহিনীতে। সঙ্গে সঙ্গে মিনজানিকগুলোকে সেখান থেকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে যায় আইউবীর সেনারা। পঞ্চাশজন অশ্বারোহী তিন-চারটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটায় এবং সুদানী বাহিনীর ডান ও বাম পার্শ্বের সৈন্যদের পায়ে পিষে এবং বর্শা দ্বারা দমাদম আঘাত হেনে চোখের পলকে উধাও হয়ে যায়। খাদ্য-সম্ভারে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর আতঙ্কিত উট-ঘোড়াগুলো দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করছে। সুলতান আইউবীর সৈন্যরা এ ছাউনীতে আরো একবার হামলা চালায় এবং বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করে হাওয়া হয়ে যায়।

পরদিন সংবাদ পাওয়া গেলো, আগুনে পুড়ে, ঘোড়া ও উটের পদতলে পিষ্ট হয়ে ও সুলতান আইউবীর কমাণ্ডো বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে অন্তত চারশত সুদানী সৈন্য নিহত হয়েছে। সমুদয় খাদ্যসম্ভার ও তীরের ডিপো পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে।

অবশেষে সুদানী সৈন্যরা ছাউনী তুলে সেখান থেকে চলে যায় এবং রাতে এমন এক স্থানে শিবির স্থাপন করে, যার আশে-পাশে উঁচু উঁচু মাটির টিলা। কমাণ্ডো হামলার আশঙ্কা নেই এখানে। এবার টহল বাহিনী ছাউনীর চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত পাহারা দিতে শুরু করে। কিন্তু তারপরও আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেলো না। তারা ঠিক আগের রাতের মত আক্রমণের শিকার হয়। দু'জন প্রহরীকে কাবু করে খুন করে ফেলে সুলতান আইউবীর কমাণ্ডোরা। টিলার উপর থেকে অগ্নিতীর ছুঁড়তে শুরু করে তীরান্দাজ বাহিনী। ভোরের আলো ফোটার পূর্ব পর্যন্ত এ হামলা চালিয়ে তারা উধাও হয়ে যায়। আক্রমণকারীরা কোত্থেকে এলো, কোথায়-ই বা গেলো কিছু-ই বুঝতে পারলো না সুদানী বাহিনী। এ হামলায় তারা গত রাত অপেক্ষা বেশী ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

সন্ধ্যার পর আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীকে গুপ্তচর মারফত প্রাপ্ত রিপোর্ট সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান, সুদানী বাহিনী আমাদের কমাণ্ডো বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে এ্যাকশন নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা মোতাবেক তারা আগামী কাল-ই অভিযান পরিচালনা করবে। সুলতান আইউবী একটি রিজার্ভ ফোর্স আটকে রেখেছিলেন নিজের কাছে। গত দু' রাতের অভিযানে অংশ নেয়নি তারা। তিনি জানতেন, দু' একটি অপারেশনের পর দুশমন সতর্ক হয়ে যাবে। পর দিন তিনি সুদানী বাহিনীর ডানে ও বাঁয়ে চারশত করে পদাতিক বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদেরকে বলে দেন, যেন তারা সুদানী বাহিনী থেকে আধা মাইল দূর দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। সুদানীরা যখন দেখলো, শত্রু বাহিনীর দু'টি দল রণসাজে তাদের পার্শ্ব দিয়ে এগিয়ে চলছে, তখন তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শত্রুবাহিনী পিছন অথবা পার্শ্ব থেকে আক্রমণ করতে পারে, এ আশঙ্কায় দু' পার্শ্বের সৈন্যদেরকে দু'দিকে ছড়িয়ে দেয় এবং সুলতান আইউবীর এ দু' পদাতিক বাহিনীর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

সুলতান আইউবীর নির্দেশনা মোতাবেক তারা সামনে এগিয়ে চলে। ধোঁকায় পড়ে যায় সুদানীরা। ঠিক এমন সময়ে আচমকা পাঁচশত অশ্বারোহী টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সুদানী বাহিনীর মধ্যস্থলে হামলা করে বসে।

অশ্বারোহীদের এ আকস্মিক তীব্র আক্রমণে প্রলয় সৃষ্টি হয়ে যায় সমগ্র বাহিনীতে। পার্শ্ব থেকে তীরান্দাজ বাহিনী বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়তে শুরু করে তাদের প্রতি। এভাবে সুলতান আইউবীর মাত্র তেরশত সৈন্য অন্তত ছয় হাজার শত্রুসেনাকে ক্ষণিকের মধ্যে বিপর্যস্ত করে তোলে। সু-কৌশলে গ্যাড়াকলে আটকিয়ে এমন শোচনীয়ভাবে তাদের পরাজিত করে যে, মিসরের মরুপ্রান্তর তাদের লাশে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। জীবনে রক্ষা পাওয়া সুদানীদের দু' চারজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও বেশীর ভাগ-ই বন্দী হয় আইউবী বাহিনীর হাতে।

এ ছিলো সুদানীদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ, যাকে তাদের-ই রক্তে ডুবিয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন সুলতান আইউবী।

বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য সংগ্রহ করেন সুলতান। গ্রেফতারকৃত সুদানী সব কমাণ্ডার এবং বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও সিপাহীদের তিনি কারাগারে প্রেরণ করেন। জিজ্ঞাসাবাদে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত লোকদের নাম-পরিচয়ও পেয়ে যান সুলতান আইউবী। তিনি তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। রজব এবং তার মতো আরো যেসব সালার এই রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মতৎপরতায় জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলো, তাদেরকে আজীবনের জন্য জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হলো। এ ষড়যন্ত্র এমন কতিপয় কর্মকর্তার সম্পৃক্ততার তথ্যও পাওয়া গেলো, যাদেরকে সুলতান আইউবীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত মনে করা হতো। এ তথ্য পেয়ে সুলতান আইউবী স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি তাঁর নির্ভরযোগ্য সালার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেন, এ পরিস্থিতিতে মিসরের প্রতিরক্ষা এবং সালতানাতের অস্তিত্ব সুদৃঢ় করার জন্য এখনই আমাদের সুদান দখল করা একান্ত আবশ্যক।

সুলতান আইউবী খলীফা আল-আজেদের নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেন। খেলাফতের মসনদ থেকে খলীফাকে অপসারণ ঘোষণা দেন, এখন থেকে মিসর সরাসরি বাগদাদের খেলাফতের অধীনে পরিচালিত হবে। খেলাফতের একমাত্র মসনদ থাকবে বাগদাদে।

সুলতান আইউবী আটজন রক্ষীর সঙ্গে উম্মে আরারাকে নুরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট পাঠিয়ে দেন।

ফিলিস্তীনের মেয়ে

গম্ভীর মুখে কক্ষে পায়চারী করছেন সুলতান আইউবী। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন–

'দেশের সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং হয়েও যাচ্ছে। বিচ্ছিন্নতার পথ অবলম্বন করছে শুধু জাতির কর্ণধারগণ। আমীর-উজীর-শাসক নামের বড় বড় জাতীয় নেতাদের তুমি দেখে থাকবে আলী! মিসরবাসীদের মুখে তো আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। জাতির সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করছে বড়রা। আমার সঙ্গে এই বড়দের শত্রুতা ব্যক্তিগত নয়। আমি তাদের স্বপ্নের মসনদ দখল করে আছি, এটাই তাদের অন্তর্জ্বালার কারণ।'

আলী বিন সুফিয়ান ও বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ বসে নিবিষ্টচিত্তে শুনছেন সুলতানের বেদনাভরা কথাগুলো।

সময়টি ছিল ১১৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের এক অপরাহ্ন বেলা। জুন-জুলাইয়ে বিদ্রোহ দমন করে সুলতান আইউবী সঙ্গে সঙ্গে আল-আজেদকে খেলাফতের মসনদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তার আগে তিনি সুদানীদের বিদ্রোহকে কৌশলে দমন করে সেনাবাহিনী থেকে সুদানী বাহিনীকে বিলুপ্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোন বিদ্রোহী নেতা, কমান্ডার কিংবা সৈনিককে সাজা দেননি; কৌশলে কার্যসিদ্ধি করেছিলেন।

তারপর যখন তারা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তখন সুলতান আইউবী এই উদ্ধত মস্তকগুলোকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য রণাঙ্গনে সুদানীদের লাশের স্তূপ তৈরি করেন। পদ-পদবীর তোয়াক্কা না করে তিনি গ্রেফতারকৃতদের কঠোর শাস্তি দেন। অধিকাংশকে জল্লাদের হাতে তুলে দেন আর অবশিষ্টদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন কিংবা দেশান্তর করে সুদান পাঠিয়ে দেন।

'দু' মাস হয়ে গেল, আমি রাজ্যের কোন খোঁজ নিতে পারছি না! এক একজন অপরাধী ধরে আনা হচ্ছে আর বিচার করে আমি তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে চলছি! দুঃখে আমার কলজেটা ছিঁড়ে যাচ্ছে আলী! মনে হচ্ছে, আমি গণহত্যা করছি। আমার হাতে যারা জীবন দিচ্ছে, তাদের অধিকাংশ-ই যে মুসলমান! বুক ফেটে কান্না আসতে চায় আমার।' আক্ষেপের সাথে বললেন সুলতান আইউবী।

মুখ খুললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ। বললেন–

'সম্মানিত আমীর! একজন কাফির এবং একজন মুসলমান একই অপরাধে লিপ্ত হলে শাস্তি মুসলমানের-ই বেশী পাওয়া উচিত। কাফিরের না আছে বুদ্ধি-বিবেক, না আছে

ধর্ম-চরিত্র। কিন্তু আল্লাহ্‌র দ্বীনের আলো পাওয়ার পরও একজন মুসলমান কাফিরের মত অপরাধ করা গুরুতর নয় কি? মুসলমানদের শাস্তি দিচ্ছেন বলে আপনি মর্মাহত হবেন না মহামান্য সুলতান! ওরা বিশ্বাসঘাতক, মুসলিম নামের কলংক। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিষফোঁড়া ওরা। ইসলামের নাম-চিহ্ন ধূলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্য যারা কাফিরদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে, এ জগতে মৃত্যুদন্ড-ই তাদের উপযুক্ত শাস্তি। পরকালে তাদের জন্য আছে জাহান্নাম।'

'শাদ্দাদ! আমার ব্যথা হল, মিসরে আমি শাসক হয়ে আসিনি। দেশ শাসন করার নেশা যদি আমার থাকত, তাহলে মিসরের বর্তমান পরিস্থিতি আমার সম্পূর্ণ অনুকূল। কিন্তু আমি জানি, ক্ষমতার লোভ মানুষকে অন্ধ করে তোলে। মসনদপ্রিয় মানুষ চাটুকার-চালবাজদের পসন্দ করে বেশী। কিছু-ই না দিয়ে মিথ্যা প্রলোভন আর মনভোলানো রঙ্গিন ফানুস দেখিয়ে-ই তারা মাতিয়ে রাখে জাতিকে। শয়তানী চরিত্রের মানুষকে তারা আমলা নিয়োগ করে। তারা অধীনদের রাজপুত্রের মর্যাদা দিয়ে রাখে। নিজে হয় শাহেনশাহ। ক্ষমতার মসনদ রক্ষা করা ব্যতীত তারা আর কিছু-ই বুঝে না।

তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ, তোমরা এই মসনদ আমার থেকে নিয়ে নাও। আমাকে শুধু তোমরা এই প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমার পথে তোমরা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। আর কিছু চাই না আমি। যে লক্ষ্য নিয়ে আমি ঘর থেকে বের হয়েছি, আমায় সে উদ্দেশ্য পূরণ করতে দাও। হাজারো জীবন কোরবান করে এবং আরব মুজাহিদদের রক্তে নীল নদের পানির রং পরিবর্তন করে নুরুদ্দীন জঙ্গী মিসর ও সিরিয়াকে একীভূত করেছেন। এই ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যকে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। সুদানকে মিসরের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফিলিস্তীনকে মুক্ত করতে হবে ক্রুসেডারদের হাত থেকে। ইউরোপের ঠিক মধ্যাঞ্চলের কোথাও নিয়ে কোণঠাসা করে রাখতে হবে খৃষ্টানদের। এসব বিজয় আমাকে অর্জন করতে হবে আমার শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়– আল্লাহর রাজ্যে তাঁর-ই শাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মিসর যে পাঁকে জড়িয়ে রেখেছে আমায়! আমাকে তোমরা মিসরের এমন একটি ভূখন্ড দেখাও, যা ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও গাদ্দারী থেকে মুক্ত!' আপ্লুতকণ্ঠে বললেন সালাহুদ্দীন আইউবী।

'এইসব ষড়যন্ত্রের মূলে রয়েছে খৃষ্টানরা। কত জঘন্যভাবে ওরা ওদের মেয়েদেরকে বেহায়াপনার প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে! ভাবলে আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে। ওরা ওদের চুম্বকার্যক রূপ আর চাটুবাক্য দিয়ে ঘায়েল করছে আমাদের শাসকদের।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'ভাষার আঘাত তরবারীর আঘাতের চেয়েও মারাত্মক আলী! আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর খৃষ্টান মেয়েরা তোমার দুর্বলতা বুঝে এমন ধারায়, এমন ক্ষেত্রে, এমন যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করবে যে, মোমের মত গলে গিয়ে তুমি তোমার তরবারী কোষবদ্ধ করে দুশমনের পায়ে অর্পণ করবে। খৃষ্টানদের অস্ত্র হল দু'টি।

ভাষা আর পশুবৃত্তি। মানবীয় চরিত্র ধ্বংস করে আমাদের মধ্যে এই পশুবৃত্তি ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য ওরা সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ব্যবহার করছে। এই অস্ত্র ব্যবহার করে-ই ওরা আমাদের মুসলিম আমীর-শাসকদের হৃদয় থেকে ইসলামী চেতনাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে।' বললেন সালাহুদ্দীন আইউবী।

'শুধু আমীর-শাসক-ই নন সুলতান! মিসরের সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই অশ্লীলতার বিষবাষ্প মহামারীর ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ অভিযানে খৃষ্টানরা সফল। অর্থশালী মুসলিম পরিবারগুলোতেও এই বেহায়াপনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'এটি-ই সর্বাপেক্ষা বড় আশংকা। খৃষ্টানদের সকল সৈন্য যদি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবু আমি তাদের মোকাবেলা করতে পারব; করেছিও। কিন্তু তাদের এই চারিত্রিক আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে পারব কিনা আমার ভয় হয়। মুসলিম মিল্লাতের ভবিষ্যতপানে দৃষ্টিপাত করলে আমি শিউরে উঠি। তখন আমার কাছে মনে হয়, যদি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এ ধারা রোধ করা না যায়, তাহলে ভবিষ্যতে মুসলমান হবে নামমাত্র মুসলমান। তাদের মধ্যে ইসলামের নীতি-আদর্শ, সংস্কৃতি-চরিত্র কিছুই থাকবে না। খৃষ্টান সভ্যতা-সংস্কৃতি লালন করে মুসলমানরা গর্ববোধ করবে। প্রকৃত ইসলাম বলতে তাদের মধ্যে কিছুই থাকবে না।

মুসলমানদের দুর্বলতাগুলো আমার জানা আছে। মুসলমান শত্রু চিনে না। তারা শত্রুর পাতা আকর্ষণীয় জালে সরলমনে আটকে যায়।

পাশাপাশি খৃষ্টানদের দুর্বলতাগুলোও আমার অজানা নয়। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তা সন্দেহাতীত সত্য। কিন্তু ভিতরে তাদের মনের মিল নেই। ফরাসী-জার্মানী একে অপরের দুশমন। বৃটিশ-ইতালীয়রা একে অপরের অপছন্দ। মুসলমান তাদের সকলের শত্রু বলেই কেবল এই ইস্যুতে তারা একতাবদ্ধ হয়েছে। অন্যথায় তাদের পারস্পরিক বিরোধ শত্রুতার অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। তাদের ফিলিপ অগাস্টাস একজন কু-জাত ব্যক্তি। অন্যরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তারা মুসলিম শাসকদেরকে নারীর রূপ ও হিরা-মাণিক্যের চমক দেখিয়ে অন্ধ বানিয়ে রেখেছে। মুসলিম শাসকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাড়া দিলে ওরা পালাবার পথ পাবে না।

ফাতেমী খেলাফতের অবসান ঘটিয়ে আমি শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। মসনদ পুনর্দখলের জন্য ফাতেমীরা সুদানী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে। আমার জন্য এ এক নতুন সমস্যা।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'ফাতেমীদের কবিকে কাল মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন, আম্মারাতুল ইয়ামানীর কবিতা শুনে এক সময় আমিও আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু খৃষ্টানরা তার সেই ভাষা আর গীতিকে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত করিয়ে ইসলামী চেতনাকে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করেছে।'

আম্মারাতুল ইয়ামানী ছিল তৎকালের একজন নামকরা কবি। সে যুগে এবং তার আগেও সাধারণ মানুষ কবিদের প্রবল ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। অগ্নিঝরা কবিতার মাধ্যমে তারা সৈন্যদেরকে উজ্জীবিত করে তুলত। শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলত জনতাকে। আম্মারাতুল ইয়ামানীও সে- মানের একজন কবি। এক সময় সে কবিতার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে জিহাদী চেতনা জাগিয়ে তুলত।

কিন্তু পরবর্তীতে হতভাগাকে লোভে পেয়ে বসেছে। ফাতেমী খেলাফতের পৃষ্ঠপোষকতায় সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে বিষ উদগীরণ করতে শুরু করে কবি আম্মারা।

সন্দেহবশতঃ আকস্মিকভাবে একদিন হানা দেওয়া হয় তার গৃহে। অনুসন্ধান করে এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, লোকটি কেবল ফাতেমী খেলাফতের-ই নিমকখোর নয়- খৃষ্টানদের বেতন-ভোগী চরও বটে। মিসরীদের হৃদয়ে নপুংসক ফাতেমী খেলাফতের প্রতি সমর্থন এবং সুলতান আইউবীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পুষত তাকে খৃষ্টানরা।

'জাতির বিবেক বলে খ্যাত কবিরা পর্যন্ত যখন শত্রুর বেতনভোগী, তখন জাতির জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা অবধারিত।' ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন সুলতান আইউবী।

কক্ষে প্রবেশ করে দারোয়ান। বলে, ক্ষমতাচ্যুত খলীফা আল-আজেদের দূত সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইছেন।

সুলতানের কপালে ভাজ পড়ে যায়। ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করে বললেন, 'খেলাফত ছাড়া বুড়া আর আমার কাছে কি-ইবা চাইবে'। দারোয়ানকে বললেন, 'ওকে আসতে বল'।

আজেদের দূত কক্ষে প্রবেশ করে। বলে, 'খলীফা আপনাকে সালাম বলেছেন'।

'তিনি তো এখন আর খলীফা নন। দু' মাস হয়ে গেল, আমি তাকে বরখাস্ত করেছি। এখন আপন প্রাসাদে তিনি আমার বন্দী।' সুলতান বললেন।

'অপরাধ মার্জনা করবেন সুলতান! দীর্ঘদিনের অভ্যাস কিনা, তাই মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে এসেছে। সালামান্তে আল-আজেদ বলেছেন, তিনি গুরুতর অসুস্থ, বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না। কিন্তু আপনার সাক্ষাৎ তার একান্ত প্রয়োজন। আমীরে মুহতারাম দয়া করে একটু আসলে ভীষণ উপকার হবে।' দূত বলল।

খানিকটা ঝাঁঝ মেশানো কণ্ঠে সুলতান বললেন, এখনো তাহলে তিনি নিজেকে খলীফা-ই মনে করছেন। সে জন্যে-ই বুঝি আমাকে এই ডেকে পাঠানো, না!

'না, আমীরে মেসের! অবস্থা তার ভাল নয়। মহলের ডাক্তার আশংকা ব্যক্ত করেছেন। তিনি পুরনো এক রোগে ভুগছেন। চিন্তা ও রাগের সময় এ রোগ তার বেড়ে যায়। এখন তিনি রীতিমত শয্যাশায়ী।'

একটু থেমে দূত আরো বলে, 'আপনাকে তিনি একা যেতে বলেছেন; কি যেন গোপন কথা আছে, যা আপনি ছাড়া আর কাউকে বলা যাবে না।'

'তুমি যাও, আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবীর সব গোপন কথা-ই জানা আছে। তাকে বল গিয়ে গোপন কথা আল্লাহকে বলুক। আল্লাহ তাঁর অপরাধ ক্ষমা করুন।' বললেন সালাহুদ্দীন আইউবী।

নিরাশ মনে ফিরে যায় দূত।

সুলতান আইউবী দারোয়ানকে বললেন, 'ডাক্তারকে ডেকে আন'। আলী বিন সুফিয়ান ও বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের প্রতি তাকিয়ে সুলতান বললেন, 'আচ্ছা, লোকটি আমাকে একা যেতে বলল! কোন ষড়যন্ত্র আছে বোধ হয়। মহলে ডেকে নিয়ে আমাকে সে খুন করাতে চাইছে, এ আশংকা কি আমার অমূলক? আমার হাতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এখন কৌশলে তার প্রতিশোধ নেয়ার সাধ জাগা বিচিত্র কি?

'আপনি যাননি ভালো-ই করেছেন।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ। আলী বিন সুফিয়ানও সমর্থন করলেন।

ডাক্তার আসলে সুলতান বললেন, 'আপনি আজেদের নিকট যান। লোকটি দীর্ঘদিন যাবত গুরুতর অসুস্থ বলে শুনেছি। মনে হচ্ছে, তার ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। আপনি গিয়ে তাকে দেখুন, চিকিৎসা করুন। তবে হতে পারে প্রাপ্ত সংবাদ মিথ্যে; তিনি অসুস্থ নন। তা-ই যদি হয়, আমাকে জানাবেন।'

খলীফা থাকা অবস্থায় আল-আজেদ যে মহলটিকে খেলাফতের মসনদ হিসেবে ব্যবহার করতেন, ক্ষমতাচ্যুতির পর তাকে সে ভবনে-ই বাস করতে দেয়া হয়। মহলটিকে তিনি অপূর্ব এক বিলাস-ভবন বানিয়ে রেখেছিলেন। দেশ-বিদেশের সুন্দরী নারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল তার হেরেম। দাসীদের ভীড় লেগে থাকত সব সময়। হাজার হাজার মোহাফেজ বাহিনী প্রস্তুত থাকত সর্বক্ষণ। সেনা কমান্ডারগণ দরবারে আসলে বসবারও অনুমতি ছিল না– থাকতে হত হাতজোড় দাঁড়িয়ে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিপ্লব পাল্টে দেয় এ মহলের রূপ। আজেদ এখন খলীফা নন। একজন সাধারণ নাগরিকের মত এ মহলে জীবন যাপন করছেন তিনি। মহলের বিলাসোপকরণগুলো যেমন ছিল তেমন-ই পড়ে আছে সেখানে। সেনা কমান্ডার আর মোহাফেজ বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এখান থেকে। তবে একটি সেনাদল চোখে পড়ছে এখনো। এরা খলীফা আল-আজেদের মোহাফেজ নয়– বন্দী আজেদের প্রহরী। খেলাফতের এই মসনদটি ছিল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র, তাই এখন পাহারা বসিয়ে রাখা হয়েছে এখানে। আজেদ এখন নিজ মহলে আইউবীর বন্দী। বৃদ্ধ হৃদরোগের রোগী। ক্ষমতা হারাবার শোক, বার্ধক্য, মদ-মাদকতায় এখন তিনি শয্যাগত।

অল্প ক'দিনেই মরণাপন্ন হয়ে পড়ে লোকটি। দু'জন বিগত-যৌবনা মহিলা আর এক খাদেম সেবা-শুশ্রূষা করছে তার।

মহলের ডাক্তার বৃদ্ধকে ঔষধ খাইয়ে যান। ইত্যবসরে কক্ষে প্রবেশ করে দুই যুবতী। এক সময় তারা আল-আজেদের হেরেমের শোভা ছিল। একজন বৃদ্ধের হাত

নিজের মুঠোয় নিয়ে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে অবস্থা জানতে চায়। অপরজন বৃদ্ধের মুখমন্ডলে দু' হাতের পরশ দিয়ে তার সুস্থতার জন্য দু'আ দেয়। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দুই যুবতী। একজন বলে, আপনি আরাম করুন। আমরা আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না। অপরজন বলল, আমরা সারাক্ষণ পাশের কক্ষে-ই থাকি। প্রয়োজন হলে ডেকে পাঠাবেন। যুবতীদ্বয় কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

আরো একরাশ বেদনা চেপে ধরে বৃদ্ধকে। আহ! বলে এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পার্শ্বে দন্ডায়মান পৌঢ়া মহিলাদ্বয়কে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে এনে ক্ষীণ কণ্ঠে ভাঙ্গা স্বরে বলেন, 'মেয়ে দু'টো কেন এসেছে জান? ওরা দেখতে এসেছে আমি কবে মরব! ওরা শকুন। ওদের শ্যেণদৃষ্টি আমার সম্পদের উপর। অপেক্ষা শুধু আমার মৃত্যুর। তোমরা ছাড়া এখন আমার আপন আর কে আছে? কেউ নেই, একজনও নেই। ফাতেমী খেলাফতের শ্লোগান দিয়ে যারা আমাকে উস্কে দিয়েছিল, তারা এখন কোথায়?'

মৃতকল্প আজেদ নিজের বুকে হাত রেখে পার্শ্ব পরিবর্তন করেন। বড় কষ্ট হচ্ছে তার।

এ সময়ে দূত ফিরে এসে কক্ষে প্রবেশ করে এবং বলে, 'আমীরে মেসের আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন।'

'আহ! হতভাগা, বদনসীব সালাহুদ্দীন! আমার এই মুমূর্ষু অবস্থায় একটিবার আসলে কি হত তোমার!' কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে অব্যক্ত কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ।

সালাহুদ্দীন আইউবীর না আসার ব্যাথায় বৃদ্ধের কষ্ট আরো বেড়ে যায়। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে থেমে থেমে বললেন, 'আমার সেবার জন্য এক সময়ে একপায়ে খাঁড়া থাকত যেসব দাসী-বাঁদী, হাত তালির শব্দ পাওয়া মাত্র ছুটে আসত যারা, তারা-ই এখন আমার মিনতিভরা ডাকেও আসে না, তা মিসরের আমীর সালাহুদ্দীন আইউবী আসবে কেন? এ আমার পাপের শাস্তি। এ শাস্তি আমাকে ভোগ করতে-ই হবে। আমার রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়রাও কেটে পড়েছে। তাদের কেউ এখন আর আসে না। তবে আসবে। আসবে আমার জানাযায়। তারপর মহলে ঢুকে হাতে ধরে যার যা ইচ্ছে নিয়ে যাবে। সকলের দৃষ্টি এখন আমার মৃত্যু আর আমার সম্পদের উপর!'

রোগযন্ত্রণা বেড়ে যায় আজেদের। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কোঁকাতে থাকেন তিনি। শুশ্রুষাকারী মহিলাদ্বয় ব্যথিত-হৃদয়ে শুনছে তার জীবনের অন্তিম কথাগুলো। সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা তাদের নেই। চেহারায় তাদের কেমন যেন এক ভীতির ছাপ। যেন তারা আল্লাহর সেই গজবের ভয়ে ভীত, যা রাজাকে পথের ভিখারী আর ধনীকে ফকীরে পরিণত করে।

হঠাৎ– কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় তারা। চমকে উঠে দরজার দিকে তাকায়। দেখে, অনুমতির অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে সাদা দাঁড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক। অনুমতি পেয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন লোকটি। আজেদের শিরায় হাত রেখে সালাম করে বলেন, 'আমি মিসরের গভর্নর সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রাইভেট ডাক্তার। আপনার চিকিৎসার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর এতটুকু মানবতাবোধও কি নেই যে, এসে আমাকে এক নজর দেখে যেত! ডেকে পাঠাবার পরও তো একটু আসল না!' বৃদ্ধ বললেন।

'সে ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে আপনার চিকিৎসার জন্য। তবে আমি এতটুকু বলতে পারি যে, তাঁর ও আপনার মধ্যে যে অঘটন ঘটে গেছে, তারপর তিনি এখানে আসবেন না। দু'জনের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ হল, জীবন হারাল হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু আপনার রোগমুক্তির চিন্তা তাঁর আছে। অন্যথায় আপনার চিকিৎসা করার আদেশ তিনি আমাকে দিতেন না। এ অবস্থায় বেদনাদায়ক কোন কথা আপনি মনে আনবেন না। নতুবা চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না।' ডাক্তার বললেন।

চিকিৎসা আমার হয়ে গেছে। মনোযোগ সহকারে তুমি আমার একটি পয়গাম শুনে নাও। সালাহুদ্দীন আইউবীকে হুবহু শব্দে শব্দে পয়গামটি পৌঁছিয়ে দিও। আমার শিরা থেকে হাত সরিয়ে নাও। ইহজগতের সব হেকমত-বিজ্ঞান আর তোমার ঔষধ-পথ্যাদি থেকে আমি এখন সম্পূর্ণ নিরাশ।

শোন ডাক্তার! সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলবে, আমি তার শত্রু ছিলাম না– আমি শত্রুর ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্য আমার না আইউবীর, তা জানিনা, নিজের পাপের কথা স্বীকার করছি আমি এমন এক সময়ে, যখন এ জগতে আমি ক্ষণিকের মেহমান মাত্র। সালাহুদ্দীনকে বলবে, আমার হৃদয়ে সবসময়-ই তার প্রতি ভালবাসা ছিল এবং তার ভালবাসা হৃদয়ে বহন করেই আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমার অপরাধ, আমি সোনা-রূপা, হিরা-মাণিক্য আর ক্ষমতার মোহ হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলাম, যা ইসলামের মর্যাদার উপর বিজয়ী হয়ে গিয়েছিল।

আজ আমার মন থেকে সব নেশা দূর হয়ে গেছে। যারা সারাক্ষণ আমার পায়ে পড়ে থাকত, আমার দুর্দিনে সকলেই তারা কেটে পড়েছে। যে দাসীরা আমার আঙ্গুলের ইশারায় নাচত-গাইত, তারা আমার মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে আছে। আমার দরবারে নগ্নদেহে নাচত যেসব রূপসী মেয়ে, আমি এখন তাদের ঘৃণার পাত্র।

শোন ডাক্তার! মানুষের সবচে' বড় ভুল হল, মানুষ মানুষের দাসত্বে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর কথা ভুলে যায়। একদিন যে তার আল্লাহর নিকট উপস্থিত হতে হবে, যেখানে কোন মানুষ মানুষের পাপের বোঝা বহন করবে না– মানুষ সে কথা বেমালুম ভুলেই যায়। বদমাশরা আমাকে খোদার আসনে বসিয়েছিল। কিন্তু এখন যখন প্রকৃত খোদার ডাক এসে গেল, তখন সব হাকীকত আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে আজ আমি মুক্তির পথ খুঁজছি। শত্রুর প্রতারণার শিকার হয়ে যত পাপ আর যত অন্যায় করেছি, অবলীলায় সব স্বীকার করে দয়াময় আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাহুদ্দীনকে এমন কিছু বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে আমি মরতে চাই, যা বোধ হয় তার জানা নেই।

তুমি সালাহুদ্দীনকে বলবে, আমার মোহাফেজ বাহিনীর সালার রজব জীবিত আছে এবং সুদানের কোথাও আত্মগোপন করে আছে। যাওয়ার সময় সে আমাকে বলে

গিয়েছিল, ফাতেমী খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সে সুদানী এবং আস্থাশীল মিসরীদের নিয়ে বাহিনী গঠন করবে এবং খৃষ্টানদের থেকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করবে।

সালাহুদ্দীনকে তুমি আরো বলবে, সে যেন নিজের রক্ষীদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখে। তাকে একাকী চলাফেরা করতে নিষেধ করবে। রাতে যেন অধিক সতর্ক থাকে। ফেদায়ীদের নিয়ে রজব তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছে। আইউবীকে তুমি আরো বলবে, তোমার জন্য মিসর এক আগ্নেয়গীরি। যাদেরকে তুমি আপন বলে মনে করছ, তাদের অনেকে-ই তোমার শত্রু। যারা তোমার সুরে সুর মিলিয়ে বিস্তৃত ইসলামী সাম্রাজ্যের শ্লোগান দিচ্ছে, তাদের মধ্যে খৃষ্টানদের পোষ্য বিষধর সাপও আছে।

তার সামরিক বিভাগে ফয়জুল ফাতেমী পদস্থ একজন অফিসার। কিন্তু সে জানে না, সে-ও তার শত্রুদের একজন। রজবের ডান হাত সে। তার বাহিনীর তুর্কি, সিরীয় এবং আরব বংশোদ্ভূত কমান্ডার ও সৈন্যদের ব্যতীত আর কাউকে যেন সে বিশ্বাস না করে। এরাই শুধু তার ওফাদার এবং ইসলামের সংরক্ষক। মিসরী সৈন্যদের মধ্যে উভয় চরিত্রের লোক-ই আছে।

সালাহুদ্দীনকে বলবে, তুমি হয়ত জান না, সুদানী সৈন্যদের উপর যখন তুমি চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়েছিলে, তখন তোমার আক্রমণকারী বাহিনীতে দু'টি বাহিনীর দুই কমান্ডার তোমার নির্দেশনা লংঘন করে তোমার অভিযানকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তোমার নিবেদিতপ্রাণ তুর্ক ও আরব সৈন্যরা তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে শেষ পর্যন্ত কমান্ডার হওয়া সত্ত্বেও তাদের কমান্ড অমান্য করে সুদানীদের উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অন্যথায় এই দুই কমান্ডার যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন করে তোমাকে ব্যর্থ-ই করে দিয়েছিল বলা যায়।

মরণোন্মুখ ক্ষমতাচ্যুত খলীফা আল-আজেদ মর মর কণ্ঠে থেমে থেমে কথা বলছেন। ডাক্তার এক-দু'বার তাকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু হাতের ইশারায় তিনি ডাক্তারকে থামিয়ে দেন।

বৃদ্ধের মুখমন্ডল ঘামে ভিজে গেছে, যেন কেউ তার মুখে পানির ছিটা দিয়েছে। দুই মহিলা রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে দেয়। কিন্তু ঘাম যেন ফোয়ারার মত নির্গত হচ্ছে। এ অবস্থায় আজেদ আরো ক'জন প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তার নাম বললেন, যারা সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর হল ফেদায়ী, রহস্যময় উপায়ে হত্যাকান্ড ঘটানো যাদের একমাত্র কাজ। আজেদ মিসরে খৃষ্টানদের জেঁকে বসার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে বললেন–

আমি যাদের কথা বললাম, আইউবীকে বলবে, এদেরকে তুমি মুসলমান মনে কর না। এরা ঈমান বিক্রি করে ফেলেছে। শোন ডাক্তার! সালাহুদ্দীনকে আরো বলবে, আল্লাহ তোমাকে কামিয়াব করুন এবং বিজয় দান করুন। তবে মনে রাখবে, আপনদের মধ্যে তোমার শত্রু দু'প্রকার। প্রথমতঃ তারা, যারা গোপনে তোমাকে ধোঁকা দিয়ে বেড়াচ্ছে,

দ্বিতীয়তঃ তারা, যারা খোশামোদ করতে করতে তোমাকে খোদার আসনে নিয়ে বসাবে। মনে রাখবে, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুশমন প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা বেশী ভয়ংকর।

ডাক্তার! আইউবীকে আরো বলবে, শত্রুকে পরাজিত করে যখন তুমি নিশ্চিন্তে গদিতে বসবে, তখন আমার মত তুমিও উভয় জগতের রাজা হয়ে বস না যেন। নিরংকুশ রাজত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। মানুষ আল্লাহ্‌র অনুগত প্রতিনিধি মাত্র। এই মিসরে ফেরআউনের ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টি দাও, আমার পরিণতি দেখ। নিজেকে এম্‌নি পরিণতি থেকে রক্ষা করে চল।'

ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে আজেদের। কণ্ঠে জড়তা এসে যায় তার। আরো কিছু বলতে চায় বৃদ্ধ। কিন্তু কথার পরিবর্তে কণ্ঠনালী থেকে বেরিয়ে আসে গড়গড় শব্দ। মাথাট হেলে পড়ে একদিকে। ক্ষমতাচ্যুত খলীফা আল-আজেদ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যান। দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস।

মহলে আজেদের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ডাক্তার সুলতান আইউবীর নিকট সংবাদ পাঠান। এক কালের দোর্দন্ড প্রতাপশালী খলীফা আজেদ মারা গেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, তার মৃত্যুতে কাঁদছে না কেউ। জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত যে দু' মহিলা তার পাশে ছিল, তাদেরকেই শুধু আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে দেখা গেল।

কয়েকজন কর্মকর্তাসহ মহলে প্রবেশ করলেন সুলতান আইউবী। বহিরাগত লোকজন আর দাসী-চাকরে গম্ গম্ করছে সমগ্র মহল। কারো মুখে শোকের ছায়া দেখতে পেলেন না সুলতান। সন্দেহে পড়ে যান তিনি। একজন সাবেক খলীফার মৃত্যু সংবাদে এলাম; কিন্তু অবস্থা দেখে তো এ মহলে কেউ মারা গেছে বলে মনে হচ্ছে না! তা হলে বিষয়টা কী?

রক্ষী বাহিনীর কমান্ডারকে সুলতান আদেশ দিলেন, মহলের প্রতিটি কক্ষে ঘুরে দেখ. তল্লাশী চালাও। নারী-পুরুষ-যুবতী যাকে যেখানে পাও, বের করে বারান্দায় বসিয়ে রাখ। কাউকে মহলের বাইরে যেতে দেবে না। যত প্রয়োজন-ই দেখাক, কাউকে আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিতে দেবে না। সুলতান সমগ্র মহল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন।

সুলতান মৃত আজেদের কক্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু আশ্চর্য, একটি প্রাণীকেও শিয়রে বসে আজেদের জন্য কাঁদতে দেখলেন না তিনি। গোটা মহল নারী-পুরুষে পরিপূর্ণ। কিন্তু এতটুকু বিষাদের ছাপ নেই কারো মুখে। এক ফোঁটা অশ্রু পর্যন্ত নেই কারো চোখে।

ডাক্তার সুলতান আইউবীকে ইংগিতে নিভৃতে নিয়ে যান। আজেদের অন্তিম কথাগুলো শোনান। অবশেষে ডাক্তার অভিমত ব্যক্ত করেন, এই বিদায়ের মুহূর্তে একবার এসে আপনার তাকে দেখে যাওয়া উচিত ছিল। সুলতান বললেন, উচিত ছিল অস্বীকার করি না। তবে আসিনি দু'টি কারণে। প্রথমতঃ লোকটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তার এই ডেকে পাঠানোকে আমি ষড়যন্ত্র হতে পারে বলে সন্দেহ

করেছিলাম। দ্বিতীয়তঃ 'ঈমান-বিক্রেতা' বলে তার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল। একজন বিশ্বাসঘাতক ঘৃণ্য ব্যক্তিকে দেখতে আসায় আমার মন চাচ্ছিল না।

ডাক্তারের মুখে আল-আজেদের শেষ কথাগুলো শুনে অনুশোচনায় ফেটে পড়েন আইউবী। অস্থির-চিত্তে বললেন, 'হায়! না এসে তাহলে ভুল-ই করলাম! আসলে বোধ হয় তার মুখ থেকে আরো অনেক গোপন তথ্য বের করতে পারতাম। তাকে কোন গোপন কথা বুকে চেপে কবরে যেতে দিতাম না!'

বেশ ক'জন ঐতিহাসিক লিখেছেন, আল-আজেদ বিলাসপ্রিয় ও বিভ্রান্ত লোক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুলতান আইউবী-বিরোধী ষড়যন্ত্রেও তার পৃষ্ঠপোষকতা ছিল, তাও ঠিক। কিন্তু আইউবীর প্রতি তার বেশ অনুরাগও ছিল। আইউবীকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন।

দু'জন ঐতিহাসিক এ-ও লিখেছেন, সুলতান আইউবী যদি আজেদের ডাকে সাড়া দিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তাহলে আজেদ তাকে আরও অনেক তথ্য জানাতেন।

যা হোক, ইতিহাস একথা প্রমাণ করে যে, আজেদের ডাকে কোন প্রতারণা ছিল না। নিজের পাপমোচন এবং আইউবীর প্রতি হৃদ্যতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তিনি আইউবীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এই দুঃখ আইউবীকে বহুদিন পর্যন্ত দংশন করতে থাকে। আল-আজেদ যাদের ব্যাপারে যে তথ্য প্রদান করে গিয়েছিলেন, পরবর্তী অনুসন্ধানে তার প্রতিটি তথ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ঐসব লোকের নামের তালিকা আলী বিন সুফিয়ানের হাতে দিয়ে সুলতান নির্দেশ দেন, এদের পিছনে গুপ্তচর নিয়োগ কর। অতীব গুরুত্ব সহকারে সতর্কতার সাথে এদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ কর। তবে নিশ্চিত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করবে না। এমন পন্থা অবলম্বন কর, যেন অভিযুক্তকে হাতে-নাতে ধরা যায়, পাছে বিনা দোষে যেন কারো প্রতি অবিচার করা না হয়।

সুলতান আইউবী আজেদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করান। সেদিনেই অপরাহ্ন-বেলায় আজেদকে সাধারণ কবরস্তানে দাফন করা হয়। অল্প ক'দিনের মধ্যেই তার সেই কবরের নাম-চিহ্ন মুছে যায়।

সুলতান আইউবী মহলে তল্লাশী চালান। উদ্ধার করেন এত বিপুল পরিমাণ সোনা-হিরা-মাণিক্য ও মূল্যবান উপহার সামগ্রী, যা দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যান।

হেরেমের সকল নারী ও যুবতী মেয়েদেরকে আলী বিন সুফিয়ানের হাতে সোপর্দ করে সুলতান আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের নাম-পরিচয় ও বাড়ি-ঘরের ঠিকানা জেনে নাও। যারা নিজ বাড়িতে চলে যেতে চায়, নিজের তত্ত্বাবধানে তাদের পৌঁছিয়ে দাও। অমুসলিম কেউ থাকলে তাদের ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত চালিয়ে তথ্য নাও, কে কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে। কাউকে সন্দেহ হলে বন্দী করে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ কর।

সুলতান আইউবী মহল থেকে উদ্ধারকৃত অর্থ-সম্পদগুলো মিসরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালগুলোতে বন্টন করে দেন।

মৃত্যুর আগে আল-আজেদ তার রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার রজব সম্পর্কে বলেছিলেন, রজব সুদানে আত্মগোপন করে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে বাহিনী গঠন করছে এবং সহযোগিতার জন্য খৃষ্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আলী বিন সুফিয়ান এমন ছয়জন জানবাজ বেছে নেন, যারা অভিজ্ঞ গুপ্তচর হওয়ার পাশাপাশি দুঃসাহসী যোদ্ধাও। তাদের কমান্ডার রজবকে চিনে। পূর্ণ পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে আলী বিন সুফিয়ান বণিক বেশে তাদেরকে সুদান প্রেরণ করেন। তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়, সম্ভব হলে রজবকে জীবিত ধরে আনবে, অন্যথায় সেখানেই হত্যা করবে।

তারা যখন রওনা হয়ে যায়, রজব তখন সুদানে ছিল না। তখন ফিলিস্তীনের এক বিখ্যাত দুর্গ শোবকে অবস্থান করছিল সে। ফিলিস্তীন তখন খৃষ্টানদের দখলে। শোবক তাদের প্রধান ঘাঁটি। খৃষ্টানদের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে শোবকের মুসলমানরা দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছিল। সেখানকার কোন মুসলমানের ইজ্জত তখন নিরাপদ ছিল না। ডাকাত বেশে খৃষ্টানরা মুসলমানদের কাফেলা লুট করে বেড়াত। অপহরণ করে নিয়ে যেত মুসলিম মেয়েদের। এ কারণে-ই সুলতান আইউবী সর্বপ্রথম ফিলিস্তীনকে পদানত করতে চাইছিলেন। তাছাড়া মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসও খৃষ্টানদের দখলে। কিন্তু মুসলিম শাসকগণের অবস্থা ছিল এই যে, তারা খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা ও খাতির-তোয়াজে ব্যস্ত। রজবও ছিল তেমনি একজন। সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে মদদ হাসিল করার জন্য খৃষ্টানদের দুয়ারে ধরণা দিয়ে বসে আছে সে।

রজবের সম্মানে শোবকে নাচ-গান-বাদ্যের আসর চলছে। রজব কায়োমনে উপভোগ করছে সে অনুষ্ঠান। অপূর্ব সুন্দরী যুবতীরা নগ্নদেহে তার সামনে নাচছে, গাইছে। কিন্তু একটিবারও সে ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করেনি যে, এই গায়িকাদের অধিকাংশ-ই মুসলিম পিতা-মাতার সেইসব কন্যা, খৃষ্টানরা শৈশবে যাদের অপহরণ করে এনে বেহায়াপনার প্রশিক্ষণ দিয়ে এ পেশায় নিয়োজিত করেছে। স্বজাতির মেয়েদের নাচ দেখে, গান শুনে, তাদের হাতে মদ পান করে কাফিরদের আতিথেয়তা উপভোগ করছে রজব। রাতভর মদ আর নাচ-গানে মত্ত থাকে সে। পরদিন সকালে আলোচনার জন্য খৃষ্টানদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেয়।

বৈঠকে উপস্থিত আছেন খৃষ্টান সম্রাট হে অফ লুজিনান ও কনরাড। আছেন বেশ ক'জন খৃষ্টান সেনা কমান্ডার।

রজব আগেই খৃষ্টানদের অবহিত করেছিল, সুলতান আইউবী এক সুদানী হাবশী গোত্রের উপাসনালয়কে ভেঙ্গে চুরমার করে তার পুরোহিতকে হত্যা করে ফেলেছে। জবাবে সুদানীরা আইউবী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তারা পিছনে সরে আসতে বাধ্য হয়।

শুধু তা-ই নয়– খলীফা আল-আজেদের ফাতেমী খেলাফত বিলুপ্ত করে আইউবী খেলাফতে আব্বাসীয়াও ঘোষণা দেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মিসরের শাসন ক্ষমতায় কোন খলীফা থাকছেন না। সুলতান আইউবী নিজেই মিসরের স্বাধীন-সার্বভৌম শাসক হতে চাইছেন। এসবের মোকাবেলায় সুদানে গিয়ে আমি বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা নিয়েছি। এ কাজে আমি আপনাদের সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

এ বৈঠকে মিসরে বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্যও রজব খৃষ্টানদের সাহায্যের আবেদন জানায়।

'সুলতান আইউবী যে হাবশী গোত্রটির ধর্মীয় অধিকারে নির্দয় হস্তক্ষেপ করেছেন, প্রতিশোধের জন্য প্রথমতঃ তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি সুদানে আরো যে ক'টি ধর্ম আছে, সেগুলোর অনুসারীদেরকে আইউবীর বিরুদ্ধে এই বলে উত্তেজিত করে তুলতে হবে যে, এই মুসলিম রাজাটি মানুষের ধর্মীয় উপাসনালয় ও পুরোহিত-দেব-দেবীর উপর আগ্রাসন চালিয়ে বেড়াচ্ছেন। নতুন কোন অঘটন ঘটানোর আগে-ভাগে মিসরে-ই তার পতন ঘটাতে হবে। এভাবে মানুষের ধর্মীয় চেতনায় আগুন ধরিয়ে অনায়াসে তাদেরকে মিসর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব।' বললেন খৃষ্টান সম্রাট কনরাড।

এক খৃষ্টান কমান্ডার বলল, মিসরের মুসলমানদেরকেও আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারি। শ্রদ্ধেয় রজব যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে তার-ই উপকারার্থে আমি এর ব্যাখ্যা প্রদান করব। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমানকে খুন করানো কঠিন কিছু নয়। আমাদের ধর্মে যেমন কোন কোন পাদ্রী নিজেই নিজেকে গীর্জার কর্তা বানিয়ে নিজের অস্তিত্বকে মানুষ ও খোদার মাঝে দাঁড় করিয়ে দেন, ঠিক তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও কোন কোন ইমাম মসজিদের উপর নিজের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর এজেন্ট হয়ে বসেন।

আমাদের অর্থ আছে। এই অর্থ দিয়ে আমরা আমাদের পছন্দমত মুসলমান মৌলভী-মাওলানা তৈরি করে মিসরের মসজিদে মসজিদে বসাতে পারি। আমাদের কাছে এমন একজন খৃষ্টানও আছেন, যিনি ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে বেশ পারদর্শী। মুসলমান ইমামের বেশে তাকেও আমরা কাজে ব্যবহার করতে পারি। মসজিদে বসে ইমামদের সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে কথা বলা যাবেও না– প্রয়োজনও হবে না। ঐ মৌলভীদের মুখে মুসলমানদের মধ্যে আমরা এমন চিন্তাধারা ও কুসংস্কার সৃষ্টি করে দেব যে, তাদের মন থেকে সালাহুদ্দীন আইউবীর ভক্তি-শ্রদ্ধা এমনিতেই মুছে যাবে।

'এ কাজ আমাদের এক্ষুণি শুরু করে দেয়া দরকার। সুলতান আইউবী মিসরে মাদ্রাসা খুলেছেন। সেখানে শিশু-কিশোর-যুবকদেরকে ইসলামের সঠিক চিন্তা-চেতনার তালীম দেয়া হচ্ছে। এর আগে মিসরে এমন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না। মানুষ মসজিদে মসজিদে খোতবা শুনত। সে খুতবায় খলীফার স্তুতি-প্রশংসা-ই থাকত বেশী। এখন সালাহুদ্দীন আইউবী খোতবা থেকে খলীফার আলোচনা তুলে দিয়েছেন। যদি

মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো ও মানসিক সচেতনা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে আমাদের মিশন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আপনারা নিশ্চয় জানেন, ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে হলে জনসাধারণকে মানসিকভাবে পশ্চাদপদ আর দৈহিকভাবে পরনির্ভরশীল করে রাখা একান্ত আবশ্যক।' বলল রজব।

'মোহতারাম রজব! আপনি দেখছি নিজের দেশ সম্পর্কে কোন খবর-ই রাখছেন না যে, পর্দার আড়ালে সেখানে কী ঘটছে! সালাহুদ্দীন আইউবী রোম উপসাগরে যেদিন আমাদের পরাজিত করেছিলেন, এ কার্যক্রম তো আমরা সেদিনই শুরু করে দিয়েছি। আমরা প্রকাশ্য ধ্বংসযজ্ঞে বিশ্বাসী নই। আমরা ধ্বংস করি মানুষের মন-মস্তিষ্ক আর চিন্তা-চেতনা। একটু ভেবে দেখুন মোহতারাম! দু' বছর আগে কায়রোতে ক'টি পতিতালয় ছিল, আর এখন ক'টি? এই অল্প ক'দিনে বেশ্যাবৃত্তি কি সন্তোষজনকহারে বৃদ্ধি পায়নি? বিত্তশালী পরিবারগুলোতে যুবক-যুবতীদের মধ্যে আপত্তিজনক মন দেয়া-নেয়ার খেলা কি শুরু হয়ে যায়নি? আমাদের প্রেরিত খৃষ্টান মেয়েরা মুসলমান নারীর বেশ ধরে সেখানে মুসলমান পুরুষদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাদেরকে খুনাখুনিতে লিপ্ত করিয়েছে। কায়রোতে আমরা অতি আকর্ষণীয় একটি জুয়াবাজি চালু করেছি। আমাদের প্রেরিত লোক দু'টি মসজিদে ইমামতি করছে। অত্যন্ত চমৎকারভাবে তারা ইসলামের রূপ পাল্টে দিচ্ছে। জিহাদের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেখানকার মুসলমানদের চেতনা নষ্ট করছে। আলেমের বেশে আমরা আরো বেশ কিছু লোক সেখানে পাঠিয়ে রেখেছি। তারা মুসলমানদেরকে যুদ্ধ-জিহাদের বিপক্ষে প্রস্তুত করছে। শত্রু-বন্ধুর ধারণাও পাল্টে দিচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি আশাবাদী যে, অল্প ক' বছরের মধ্যে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা এই দাঁড়াবে যে, তারা নিজেদেরকে গর্বভরে মুসলমান দাবি করবে; অথচ তাদের মন-মানসিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর থাকবে ক্রুশের প্রভাব। শোন রজব! একটু বিলম্বে হলেও একটি সময় এমন আসবে, আজ যে মুসলমান ক্রুশের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, সে মুসলমান-ই সেদিন সভ্যতার প্রতীক বিশ্বাসে শ্রদ্ধাভরে ক্রুশ বুকে ধারণ করে চলবে।' বলল এক খৃষ্টান কমান্ডার।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগ অত্যন্ত দক্ষ ও অতিশয় সতর্ক। এ বিভাগের প্রধান আলী বিন সুফিয়ানকে যদি হত্যা করা যায়, তাহলো সালাহুদ্দীন অন্ধ ও বধির হয়ে যাবে।' বলল রজব।

'তার মানে নিজে আপনি কিছুই করতে পারবেন না; সব আমাদের-ই করে দিতে হবে। শত্রুর গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মকর্তাকেও হত্যা করার যোগ্যতা আপনার নেই, তাই না? আপনি যদি বিবেক-বুদ্ধিতে এতই দুর্বল হন, তাহলে তো আপনি আমাদের লোকদেরও ধরিয়ে খুন করাবেন, আমাদের অর্থ-সম্পদ নষ্ট করবেন।' বললেন সম্রাট কোনার্ড।

'না, জনাব! আমাকে অত দুর্বল ভাববেন না। আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যা করার দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিলাম। ফেদায়ীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি আলোচনাও করেছি। তারা সালাহুদ্দীন আইউবীকেও হত্যা করতে প্রস্তুত।' বলল রজব।

'সুদানের দিক থেকে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে আপনি মিসরের সীমান্তকে অস্থিতিশীল করে তুলুন। দেশের ভিতরে মানসিক ও অন্যান্য ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাব আমরা। এদিকে আরবের কয়েকজন মুসলমান আমীর আমাদের কব্জায় এসে গেছেন। তাদের দু'-চারজনকে তো আমরা এমনভাবে কোণঠাসা করে ফেলেছি যে, এখন তারা আমাদেরকে কর দিচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণ চালিয়ে আমরা একটু একটু করে তাদের ভূখন্ড দখল করে চলেছি। সুদানের দিক থেকেও আপনি এ কৌশল অবলম্বন করে কাজ করুন। মুসলমানদের দু'জন লোক এখনো রয়ে গেছে। নূরুদ্দীন জঙ্গী আর সালাহুদ্দীন আইউবী। এ দু'জনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর পশ্চিম আকাশে ইসলামী দুনিয়ার সূর্য ডুবে যাবে। শর্ত হল, আপনাকে দৃঢ়পদ থাকতে হবে। আর আপনাদের মিসর যে আপনাদের-ই থাকবে, তা বলাই বাহুল্য।' বললেন সম্রাট কনরাড।

মৌলিক আলাপ-আলোচনার পর বৈঠকে কাজের কৌশল ও পদ্ধতি নিয়েও পর্যালোচনা চলে দীর্ঘক্ষণ। শেষে উদ্ভিন্ন-যৌবনা অনিন্দ্যসুন্দরী ও অতিশয় বিচক্ষণ তিনটি মেয়ে এবং বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়ে রজবকে বিদায় করা হয়। কায়রোর দু'জন লোকের ঠিকানাও দেয়া হয় তাকে। তাদের যে কোন একজনের নিকট মেয়েগুলোকে গোপনে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয় রজবের হাতে। দু'জনের একজন হল সুলতান আইউবীর সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা ফয়জুল ফাতেমী।

মেয়েদের দিয়ে কিভাবে কাজ নিতে হয়, রজবকে তা বলা হয়নি। তাকে শুধু এতটুকু অবহিত করা হয়েছে যে, ফয়জুল ফাতেমীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে। মেয়েদেরকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, তার তা জানা আছে। তাছাড়া মেয়েরাও জানে তাদের কর্তব্য কী। রজবের সঙ্গে দেয়া এই মেয়ে তিনটি আরব ও মিসরের ভাষায় পারদর্শী।

দশজন রক্ষীর প্রহরায় রজব মেয়েদের নিয়ে রওনা হয়। আপাততঃ তার গন্তব্য সুদানের একটি পাহাড়ী অঞ্চল, যেখানে নারী বলি হত এবং যেখানে সুলতান আইউবীর জানবাজরা উম্মে আরারাহকে হাবশীদের কবল থেকে মুক্ত করে পুরোহিতকে হত্যা এবং তার আস্তানাকে ধ্বংস করেছিল। সুদানীদের পরাজয় এবং খলীফা আল-আজেদের ক্ষমতাচ্যুতির পর রজব পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল এবং এ স্থানকে নিজের আখড়ায় পরিণত করেছিল। হাবশীদের যে গোত্রটির পুরোহিতকে সুলতান আইউবী হত্যা করিয়েছিলেন, রজব তাদেরকে নিজের পাশে এনে জড়ো করেছিল। এখনো সে স্থানটিকে তারা দেবতার আখড়া বলে বিশ্বাস করছে। তারা পাহাড়ের অভ্যন্তরে যাচ্ছে না। মাত্র চারজন বৃদ্ধ ভিতরে যাওয়া-আসা করছে। তাদের একজন গোত্রের-ই ধর্মগুরু। পরলোকগত পুরোহিতের স্বঘোষিত স্থলাভিষিক্ত হয়ে বসেছে সে। রক্ষী হিসেবে তিনজন লোককে বেছে নিয়ে এখন সে পাহাড়ে আসা-যাওয়া করছে। সে অঞ্চলের-ই নিভৃত এক

কোণে রজব তার আস্তানা গেড়েছিল। ফেরার হয়ে সে প্রথমে সেখানে আশ্রয় নিয়ে পরে মিসরের অধিবাসী এক খৃষ্টান এজেন্টের সঙ্গে ফিলিস্তীন চলে গিয়েছিল।

❁❁❁

হাবশীদের এ গোত্রটি– যার নাম আংগুক– ভয়ে তটস্থ। কারণ, প্রথমতঃ তাদের দেবতার বলি পূরণ হয়নি। দ্বিতীয়তঃ তাদের পুরোহিত খুন হয়েছে। তৃতীয়তঃ তাদের দেবমূর্তির আস্তানাটিও ধ্বংস হয়ে গেছে। সর্বোপরি গোত্রের হাজার হাজার যুবক দেবতার আপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পরাস্ত হয়ে অধিকাংশ নিহত হয়েছে আর অবশিষ্টরা পরাজয়ের গ্লানি ও জখম নিয়ে ফিরে এসেছে। আংগুকের ঘরে ঘরে মাতম চলছে। সর্বত্র বিরাজ করছে শোকের ছায়া।

তাদের কেউ কেউ এমনও ভাবতে শুরু করেছে যে, যিনি তাদের দেব-মূর্তিটি ভেঙ্গেছেন, তিনি বোধ হয় তদপেক্ষাও বড় দেবতা হবেন।

নিহত পুরোহিতের স্থলাভিষিক্ত ও ধর্মগুরু এ অবস্থা দেখে বললেন, দেবতার কুমীর ক'দিন যাবত অভুক্ত; তার পেটে খাবার দাও। তবেই তোমরা এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। হাবশীরা দেবতার কুমীরের জন্য কয়েকটি বকরি পাঠিয়ে দেয়। একজন আবেগের আতিশয্যে নিজের উটটি পর্যন্ত পুরোহিতের হাতে তুলে দেয়। কয়েকদিন পর্যন্ত এ পশুগুলো কুমীরদের ঝিলে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। কিন্তু গোত্রের মানুষের মনের ভীতি এতটুকুও কমল না।

এক রাতে পুরোহিত গোত্রের লোকদেরকে এক স্থানে সমবেত করে ঘোষণা দেয় যে, তিনি দেবতাদের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয়েছেন। দেবতারা তাকে ইংগিত করেছে যে, যেহেতু সময়মত নারী বলি হয়নি, তাই গোত্রের উপর এ বিপদ নেমে এসেছে। দেবতারা বলেছেন, এখন যদি একত্রে দু'টি মেয়ে বলি দেয়া যায়, তাহলে বিপদ দূর হতে পারে। অন্যথায় দেবতা গোত্রের একটি মানুষকেও শান্তিতে থাকতে দেবেন না।

পুরোহিত আরো জানান যে, মেয়ে দু'টো আংগুক হতে পারবে না, সুদানীও নয়। হতে হবে ভিনদেশী শ্বেতাঙ্গী।

পুরোহিত আরো কি যেন বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এতটুকু শোনার সঙ্গে সঙ্গে গোত্রের অসংখ্য অকুতোভয় সাহসী যুবক দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলে উঠে, যে করে হোক, মিসর থেকে দু'টি খৃষ্টান কিংবা মুসলমান মেয়ে আমরা তুলে আনবই। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে হোক, এ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি আমাদের পেতেই হবে।

তিন খৃষ্টান যুবতীকে নিয়ে রক্ষীদের সঙ্গে এগিয়ে চলছে রজব। এ সফর তার যেমন দীর্ঘ, তেমনি বিপদসংকুল। রজব আইউবী বাহিনীর দলত্যাগী ও বিদ্রোহী কমান্ডার। সুলতান আইউবী যে তার সীমান্তে টহল-প্রহরার ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তা তার জানা আছে। তাই সীমান্তের অনেকদূর ভিতর দিয়ে কাফেলাকে নিয়ে আসছে সে।

রজবের কাফেলায় আছে তিনটি উট। পানি, খাবার এবং খৃষ্টানদের দেয়া মাল-পত্রে বোঝাই উটগুলো। নিজেরা চলছে ঘোড়ায় চড়ে।

কয়েকদিন পথ চলার পর রজব দেবতার পাহাড়ে এসে পৌছে। শ্বেতাঙ্গী দু'টি রূপসী মেয়ে বলি দিতে হবে পুরোহিত এ ঘোষণা দিয়েছিল মাত্র তার আগের দিন।

রজব এসে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করে পুরোহিতের সঙ্গে। রজবের সঙ্গে সাদা চামড়ার তিনটি সুন্দরী মেয়ে দেখে পুরোহিতের চক্ষু তো চড়ক গাছ। সীমাহীন আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠেন পুরোহিত। দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়ার জন্য ঠিক এমৃনি দু'টি মেয়ে-ই তার প্রয়োজন। পুরোহিত মেয়েদের ব্যাপারে জানতে চাইলে রজব বলে, আমি বিশেষ উদ্দেশ্যে এদেরকে সঙ্গে এনেছি।

পাহাড়ের অভ্যন্তরে সবুজ-শ্যামল মনোরম একটি জায়গা। স্থানটি তিনদিক থেকে পাহাড়ঘেরা। পূর্ব থেকে-ই তাঁবু খাটানো আছে। এটি-ই রজবের আস্তানা। রজব মেয়েদের নিয়ে যায় সেখানে।

মেয়েদের আরাম-আয়েশের সব আয়োজন-ই আছে এখানে। তাদের জন্য মদের ব্যবস্থাও করে রেখেছে রজব।

অনেক দীর্ঘ ও বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে রজব নিরাপদে এখানে এসে পৌছেছে। মনে তার বেশ আনন্দ। তাই সকলকে নিয়ে রাতে উৎসবের আয়োজন করে। নিজে মদপান করে, রক্ষী এবং মেয়েদেরও মদপান করায়।

মধ্যরাত। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। রজবের রক্ষীরা গভীর নিদ্রায় বিভোর। এমন সময়ে পা টিপে টিপে রজব এগিয়ে আসে মেয়েদের তাঁবুতে। একটি মেয়ের বাহু ধরে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করে নিজের তাঁবুতে। রজবের মতলব বুঝে ফেলে মেয়েটি। বলে, আমি গণিকা নই। এখানে এসেছি আমি ক্রুশের দায়িত্ব পালন করতে– অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। আপনার সঙ্গে আমি মদপান করতে পারি– যৌনকর্মে লিপ্ত হতে পারি না।'

রজব হাসতে হাসতে মেয়েটিকে জোর করে তার তাঁবুতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। মেয়েটি ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে রজবের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। রজব পুনরায় হাত বাড়াতে চাইলে মেয়েটি দৌড়ে তাঁবুতে চলে যায়।

ঘটনাটি অপর দু'মেয়ের কানে গেলে তারা তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসে। রজব বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা রজবকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না, এ আচরণ আপনার ঠিক হয়নি।

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রজব। বলে, 'তোমরা কত পবিত্র মেয়ে আমার তা জানা আছে। বেহায়াপনা যাদের পেশা, তারা গণিকা নয় তো কি?'

'এ পেশার প্রয়োগ আমরা সেখানেই করি, যেখানে কর্তব্য পালনে এ-কাজ প্রয়োজন হয়। নিছক বিনোদনের জন্য আমরা ও-সব করি না।' বলল মেয়েটি।

মেয়েদের কথায় নিরস্ত হতে চাইল না রজব। অবশেষে কঠোর হল মেয়েরা। 'বলল, আমাদের সঙ্গে দশজন রক্ষী আছে। তারা আমাদের নিরাপত্তার জন্য-ই এসেছে। আগামীকাল-ই তাদের ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রয়োজন বোধ করলে আমরা তাদেরকে এখানে রেখে দিতে পারি কিংবা তোমাকে ফেলে রেখে তাদের সঙ্গে আমরা চলেও যেতে পারি। আশা করি সীমালংঘন থেকে তুমি বিরত থাকবে।'

চুপসে যায় রজব। কিন্তু ভাবে মনে হচ্ছে, মেয়েদেরকে সে ক্ষমা করবে না।

কেটে যায় রাত।

পরদিন ফিলিস্তীন থেকে আসা দশ রক্ষীকে রজব বিদায় করে দেয়। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা এল। রজব মেয়েদের নিয়ে আড্ডায় বসেছে। হঠাৎ চারজন হাবশীসহ পুরোহিত এসে উপস্থিত। সুদানী ভাষায় পুরোহিত রজবকে বলে, 'দেবতা আমাদের উপর রুষ্ট হয়ে আছেন। তিনি দু'টি ফিরিঙ্গী বা মুসলমান মেয়ের বলি চাচ্ছেন। তোমার এই মেয়েগুলো বলির জন্য বেশ উপযুক্ত। এর থেকে দু'টি মেয়ে তুমি আমাকে দিয়ে দাও।'

আঁতকে উঠে রজব। আগুন ধরে যায় তার মাথায়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠে তার। বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে থাকে পুরোহিতের প্রতি। অবশেষে বলে, 'এরা তো বলির মেয়ে নয়। এদের দ্বারা আমাকে বিশেষ কাজ নিতে হবে। এদের হাতে-ই তোমাদের দেবতাদের দুশমনকে হত্যা করতে হবে।'

পুরোহিত বলল, 'না, তুমি মিথ্যে বলছ। তুমি এদেরকে এখানে আমোদ করার জন্য এনেছ। এদের দু'জনকে আমরা বলি দেব-ই দেব।'

রজব পুরোহিতকে নানাভাবে বুঝাতে চেষ্টা করে; কিন্তু পুরোহিত কিছুতেই কিছু মানছে না। দেবতা সাওয়ার হয়ে বসেছে যেন তার মস্তকে। দু'টি মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে পুরোহিত বলল, 'এরা দু'জন দেবতার জন্য উৎসর্গিত। আংগুকের মুক্তি এখন এদের হাতে।' রজবকে বলল, মেয়েদের নিয়ে বৃথা পালাবার চেষ্টা করবে না; আমাদের ফাঁকি দিয়ে তুমি এখান থেকে পালাতে পারবে না।'

'মেয়েরা সুদানী ভাষা বুঝে না। পুরোহিত চলে যাওয়ার পর রজবকে বিমর্ষ দেখে তারা জিজ্ঞেস করে, লোকটা কী বলে গেল? তার কথা শুনে তুমি-ই বা এত অস্থির হয়ে পড়লে কেন? রজব রাখঢাক না করে পরিষ্কার বলে দেয় যে, লোকটা এখানকার দেব-মন্দিরের পুরোহিত। তোমাদেরকে তিনি বলি দিতে চাইছেন। দেবতারা নাকি তাদের উপর রুষ্ট হয়ে গেছেন। এখন নারী বলি দিয়ে তিনি এই অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে চান।

'বলি' কী জানতে চায় মেয়েরা। রজব জানায়, তোমাদের মাথা কেটে শুকাবার জন্য ক'দিন রেখে দেবে এবং দেহটা ঝিলে নিক্ষেপ করবে। ঝিলে অনেকগুলো কুমীর আছে। তারা তোমাদের দেহকে খেয়ে ফেলবে।

বলির ব্যাখ্যা শুনে মেয়েরা শিউরে উঠে। গায়ের লোম কাঁটার মত দাঁড়িয়ে যায় তাদের। শুকিয়ে যায় মুখের রক্ত। তাদের রক্ষা করার জন্য রজব কি চিন্তা করেছে

জানতে চায় মেয়েরা। রজব বলে, 'আমি নানাভাবে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেছি। তোমরা কারা, কোথা থেকে কেন এসেছ, তা-ও বলেছি। কিন্তু আমার কোন কথা-ই তার কানে পশেনি। দেবতার সন্তুষ্টি ছাড়া কিছুই বুঝছে না সে। আমি এখন তার দয়ার উপর নির্ভরশীল। অনুগ্রহ করে যদি তিনি তোমাদের মুক্তি দেন, তবেই তোমরা রক্ষা পাবে। আমি এদেরকে কাছে টানার ইচ্ছা করেছিলাম। এ গোত্রের লোকেরা আমার বাহিনীতে যোগ দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু নিজেদের বিশ্বাসে তারা এতই অনড় যে, দেবতাদের সন্তুষ্ট না করে তারা আমার কোন কথা-ই শুনতে রাজি নয়।'

রজবের কথা শুনে মেয়েরা বুঝে ফেলে যে, সে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না কিংবা পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না। গতরাতে তারা রজবের দুর্মতির কিছুটা প্রমাণও পেয়ে গেছে। কাজেই রজবের ব্যাপারে মেয়েরা সম্পূর্ণ নিরাশ।

মেয়েরা তাঁবুতে চলে যায়। ভেবে-চিন্তে তিনজনে সিদ্ধান্ত নেয়, আমরা এখানে রজবের মনোরঞ্জন কিংবা হাবশীদের দেবতার বলির যূপকাষ্ঠে চড়ার জন্য আসিনি। জীবন রক্ষা করার চেষ্টা না করে এভাবে এক নির্মম অপমৃত্যুর মুখে নিজেদের ঠেলে দেয়ার কোন যুক্তি নেই। কাজেই যে করে হোক আমাদের পালাতে হবে। পালিয়ে আমাদের ফিলিস্তীন চলে যেতে হবে।

নিরাপদে সে রাত কেটে যায়। হাবশী পুরোহিত পরদিনও এসে রজবের সঙ্গে কথা বলে। মেয়েরা মনে মনে পলায়নের প্রস্তুতি নিয়েছে। রাতে ঘোড়াগুলো কোথায় থাকে, সেখান থেকে পালিয়ে বের হওয়ার পথ কোন্ দিকে, তা ভালভাবে দেখে নেয় তারা। এখান থেকে পালিয়ে ফিলিস্তীন পৌঁছা তিনটি মেয়ের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, তা মেয়েরা জানে; তবু তাদের যেতেই হবে।

পুরোহিত চলে গেলে মেয়েরা রজবকে জিজ্ঞাসা করে, লোকটা আবার এসে কী বলে গেল? রজব বলল, কাল রাতে এসে তোমাদেরকে তারা এখান থেকে নিয়ে যাবে। লোকটি আমাকে হুমকি দিয়ে গেল যে, আমি যদি তাদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করি, তাহলে তারা আমাকে খুন করে কুমীরের ঝিলে নিক্ষেপ করবে।

আতঙ্কের মধ্য দিয়ে কেটে যায় সারাটা দিন। পালাবার পরিকল্পনার কথা রজবকে জানায়নি মেয়েরা। কারণ, রজবের উদ্দেশ্য তাদের কাছে পরিষ্কার নয়। আর রজবের মনেও এমন কোন সন্দেহ জাগেনি যে, জীবন রক্ষা করার জন্য মেয়েগুলো পালিয়ে যেতে পারে।

পালাবার পথ চিনে নেয়ার জন্য কৌশল আঁটে মেয়েরা। তারা রজবকে বলে, নরকসম এই পার্বত্য এলাকার মধ্যখানে এমনি এক সবুজ-শ্যামল ভূখন্ড সত্যিই প্রকৃতির এক লীলা। চল, জায়গাটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখে আসি। রজব তাদের ভ্রমণে নিয়ে যায়। কতটুকু অগ্রসর হওয়ার পর তাদের চোখে পড়ে সেই ভয়ানক ঝিল। ঝিলের এক কিনারে লম্বা হয়ে পড়ে আছে পাঁচ-ছয়টি কুমীর। ঝিলের পানি গাঢ় ও পুঁতিগন্ধময়।

রজব বলে, এই সেই ঝিল। হাবশীরা নারী বলি দিয়ে বলির মস্তকবিহীন দেহ এ ঝিলে নিক্ষেপ করে। আর এই সেই কুমীর, যারা বলির নারীদেহ খেলে দেবতারা তুষ্ট হয়। তোমাদেরও বলি দিয়ে পুরোহিত এই ঝিলে এসব কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এমনি ভয়ানক দৃশ্য দেখে মেয়েদের মনে পালাবার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়ে উঠে। ভ্রমণের বাহানায় পালাবার পথ-ঘাট ভালো করে দেখে নেয় তারা। পালাবার জন্য তারা নরম পথ চিনে নেয়, চলার সময় যেন পথে ঘোড়ার পায়ের শব্দ না হয়।

অপরদিকে হাবশী পুরোহিত পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে বসে গোত্রের লোকদেরকে সুসংবাদ প্রদান করছে যে, বলির জন্য মেয়ে আমি পেয়ে গেছি। আজ থেকে চার দিন পর পূর্ণিমার রাতে অনুষ্ঠিত হবে বলির পর্ব। পুরোহিত জানায়, বলি হবে দেব-মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর। তারপর আমরা মন্দির পুনঃনির্মাণ করব। তারপর যারা আমাদের দেবতাদের অপমান করল, তাদের থেকে প্রতিশোধ নেব।

✿✿✿

রাতের দ্বি-প্রহর। বিশেষ প্রশিক্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় মেয়েরা। তারা রজব ও তার সঙ্গীদের এত পরিমাণ মদ পান করায় যে, সঙ্গে সঙ্গে তারা অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সহসা জাগ্রত হওয়ার কোন আশংকা নেই। কি পরিমাণ মদ খাওয়ালে একজন মানুষকে কত সময় অচেতন রাখা যায়, তা ওরা বেশ জানে।

উঠে দাঁড়ায় মেয়েরা। সফরের সামানাদি গুছিয়ে বেঁধে নেয়। ঘোড়ায় জিন লাগায়। তিনজন চড়ে বসে তিনটি ঘোড়ায়। দিনের বেলা ঠিক করে রাখা নরম মাটির পথে ঘোড়া ছুটায়। ভয়ানক এই বন্দীদশা থেকে বেরিয়ে যায় তারা।

গন্তব্য তাদের ফিলিস্তীন। রজব তাদের যে পথে নিয়ে এসেছে, এগুতে হবে সে পথ ধরে-ই। তারা অস্বাভাবিক বিচক্ষণ মেয়ে। সামরিক দক্ষতাও আছে তাদের। কিন্তু তাদের একথা জানা নেই যে, বালুকাময় মরুভূমিতে পদে পদে এত প্রবঞ্চনা লুকিয়ে থাকে, যা অতি অভিজ্ঞজনদেরকেও বোকা বানিয়ে ছাড়ে। এই দীর্ঘ মরু অঞ্চলে একাকী চলে না কেউ– চলে দল বেঁধে। সব রকম বিপদের মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে-ই যাত্রা শুরু করে মানুষ।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে বেশ কিছু পথ অগ্রসর হয়ে মেয়েরা ঘোড়ার গতি কমিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে চলছে তারা। অগ্রসর হয় আরো কিছু পথ। এবার তীব্রগতিতে ঘোড়া ছুটায়। তীরবেগে ছুটে চলেছে ঘোড়া। বাকী রাতটুকু চলে একই গতিতে। রাতের মরুভূমি নিরুত্তাপ।

ভোর হল। পূর্ব আকাশে সূর্য উদিত হয়েছে। মেয়েদের চারদিকে গোলাকার টিলা। সম্মুখে বালুকাময় মাটির উঁচু উঁচু পাহাড়। মেয়েদের পথ রোধ করে দানবের মত দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়গুলো। সূর্যের দিকে তাকিয়ে দিক-নির্ণয় করার চেষ্টা করে তারা। ঢুকে পড়ে

টিলার ফাঁকে আঁকা-বাঁকা দুর্গম পথে। ঘোড়াগুলো পিপাসার্ত। নিজেদেরও পিপাসায় ধরেছে তাদের। ঘোড়াগুলোর সঙ্গে একটি করে পানির ছোট্ট মশক বাঁধা। একদিনও চলবে না সেই পানিতে। পানির অন্বেষায় কোথাও খেজুর বাগান আছে কি না খুঁজতে শুরু করে তিন মেয়ে। সূর্য উঠে এসেছে আরো উপরে। ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে উত্তাপ। গরমে যেন মরুভূমি জাহান্নামে পরিণত হতে যাচ্ছে। না, খেজুর বাগান নেই আশেপাশে কোথাও, নেই এক ফোঁটা পানিও।

সূর্যোদয়ের পর এখনো ঘুমুচ্ছে রজব ও তার সঙ্গীরা। মদের নেশা ভালো করেই পেয়েছে তাদের। তিনজন হাবশীকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হয় পুরোহিত। আগে যায় মেয়েদের তাঁবুতে। তাঁবু শূন্য। রজবকে ঘুম থেকে জাগায় সে। বলে, 'কই, মেয়ে দু'টোকে আমার হাতে তুলে দাও, জলদি কর।' রজব তখনো বিছানায় শোয়া। ধড়মড় করে উঠে বসে সে। কাকুতি-মিনতি করে মেয়েদের জীবন ভিক্ষা চায়। মেয়েদেরকে কি উদ্দেশ্যে এখানে এনেছে, আবারও তার বিবরণ দেয়। কিন্তু পুরোহিত তার কোন কথা-ই শুনছে না। দেবতার সন্তুষ্টির জন্য নারী বলি তাকে দিতে-ই হবে। আর এদেরকে হাতছাড়া করলে বলি দেয়া তার অসম্ভব হয়ে পড়বে।

রজব সঙ্গীদের জাগাতে চাইলে হাবশীরা তাকে বাধা দেয়। বলে, পুরোহিত যা বলছেন, তার অন্যথা করলে পরিণতি ভাল হবে না। পুরোহিত জিজ্ঞেস করে, 'মেয়েগুলো কোথায়?'

নিজের তাঁবুতে বসে বসেই রজব মেয়েদের ডাক দেয়। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। উঠে দাঁড়ায় রজব। মেয়েদের তাঁবুতে গিয়ে দেখে, তাঁবু শূন্য। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও দেখা গেল না তাদের। হঠাৎ রজবের দৃষ্টি পড়ে ঘোড়ার জিনের উপর। কিন্তু একি! তিনটি জিন-ই যে নেই! রজব দৌড়ে যায় আস্তাবলে। ঘোড়াও তো তিনটি উধাও! ঘটনাটা বুঝে ফেলে রজব। পুরোহিতকে বলে, 'আপনার ভয়ে ওরা পালিয়ে গেছে। ওদের ভাগিয়ে আপনি বেশ করেছেন!'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে পুরোহিত। বলে, তু-ই ওদের ভাগিয়েছিস্! আমার আশা-ভরসা সব তুই মাটি করে দিলি!' হাবশীদের বলে, একে নিয়ে বেঁধে রাখ। বেটা আংগুকের দেবতাকে আবার রুষ্ট করল। কয়েকজন সুদক্ষ অশ্বারোহী ডেকে আন। এক্ষুণি মেয়েদের ধাওয়া করতে বল। যেখান থেকে হোক, খুঁজে ওদের আনতেই হবে। এখনো বেশী দূর যেতে পারেনি তারা। যাও, জল্‌দি কর।'

রজবের যুক্তি-প্রমাণ, অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করে হাবশীরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। হাত দু'টো পিছনে করে একটি গাছের সাথে বেঁধে রাখে। তার ঘুমন্ত সঙ্গীদের অস্ত্রগুলো নিয়ে নেয়। তাদের হুমকি দিয়ে বলে, এখান থেকে এক চুল নড়বি তো খুন করে ফেলব।

ক্ষণিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয় ছয়জন অশ্বারোহী। মেয়েদের ধাওয়া করে ধরে আনার জন্য রওনা হয় তারা। বালির উপর তিনটি ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে তীব্রবেগে ছুটে চলে ছয় ঘোড়সওয়ার। কিন্তু মেয়েদের

নাগাল পাওয়া অত সহজ নয়। তাদের পলায়ন আর এই পশ্চাদ্ধাবনের মাঝে কেটে গেছে আট-দশ ঘন্টা।

হাবশী অশ্বারোহীদের মরুভূমির পথ-ঘাট সব চেনা। তদুপরি তারা পুরুষ। অল্প সময়ে তারা এগিয়ে যায় অনেক পথ। তীব্র বাতাস বইছে। বালি উড়ছে। তবু সমান গতিতে এগিয়ে চলছে তারা।

তিন ঘন্টা পথ চলার পর হাবশী অশ্বারোহীরা হঠাৎ দেখতে পেল, সম্মুখ আকাশে দিগন্তেরও উপরে মরুভূমির ধূলো-বালি ঘুর্ণাবর্তের মত পাক খেয়ে খেয়ে ধেয়ে আসছে। ভয়ার্ত চোখে বীর আরোহীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে তীব্রগতিতে পিছন দিকে পালাতে শুরু করে তারা।

মরুভূমির দম্‌কা বাতাস, যাকে বলে সাইমুম। এ ভয়ংকর ঝড় বড় বড় টিলাকে বালু-কণায় পরিণত করে উড়িয়ে নিয়ে যায়। রাশি রাশি টিলা মুহূর্তের মধ্যে সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত হয়। এই ঝড়ের মধ্যে কোন মানুষ বা পশু যদি দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকে, তাহলে উড়ে আসা বালি তার গায়ে বসে তাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করে এবং ছোট-খাট একটি টিলা দাঁড়িয়ে যায় তার উপর।

দম্‌কা ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার মত আশেপাশে শক্ত কোন টিলা নেই। পালিয়ে নিজেদের পাহাড়ী এলাকায় ফিরে যেতে মনস্থ করে হাবশী অশ্বারোহী। কিন্তু সে পাহাড় যে অনেক দূর। তাছাড়া দম্‌কা ঝড় পৌঁছে গেছে সেখানেও। সেখানকার বড় বড় বৃক্ষগুলো বাতাসের তোড়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দ্বি-খণ্ডিত হয়ে চীৎকার করছে যেন।

ঝিলের কুমীরগুলো ভয়ে পাহাড়ের নালায় গিয়ে আত্মগোপন করে আছে। পুরোহিত একস্থানে হাটু গেড়ে বসে পড়ে হাত দু'টো একবার মাটিতে একবার মাথায় ছুঁড়ে হা-হুতাশ করছে আর বিলাপ করে বলছে, ওহে আংগুকের দেবতা! তোমার গজব সংবরণ কর। আর একটু ধৈর্য ধর দেবতা! অল্প পরেই আমরা দু'টি মেয়েকে তোমার চরণে নিবেদন করছি। আমাদের প্রতি একটু দয়া কর দেবতা!

পলায়নপর মেয়েরাও এই ঝড়ের কবলে আক্রান্ত হয়। বালির আস্তর জমে যায় তাদের ও তাদের ঘোড়াগুলোর গায়ে। আতঙ্কগ্রস্ত ঘোড়াগুলো নিয়ন্ত্রনহীনভাবে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর ও ঝড়-কবলিত তিনটি ঘোড়া মধ্যরাত পর্যন্ত এভাবে ছুটোছুটি করে। নিথর শরীরে নিরুপায় ঘোড়ার পিঠে বসে আছে তিন মেয়ে।

একদিকে সীমাহীন ক্লান্তি, অপরদিকে প্রবল পিপাসা। ক্লান্তি ও পিপাসা ধীরে ধীরে ঘোড়াগুলোকে বেহাল করে তুলতে শুরু করে। হঠাৎ একটি ঘোড়া উপুড় হয়ে পড়ে যায়, পড়ে যায় তার আরোহী মেয়ে। ঘোড়াটি আবার উঠে দাঁড়ায়। আবার পড়ে যায়। মেয়েটি ঘোড়ার বুকের নীচে চাপা পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর ঢিলে হয়ে আসে আরেকটি ঘোড়ার দেহ। পিঠের জিন সরে যায় একদিকে। তার আরোহী মেয়েটিও কাত হয়ে পড়ে যায় সে দিকে। কিন্তু এক

পা তার আটকে গেছে রেকাবে। মন্থর গতিতে চলছে ঘোড়া। মাটিতে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটিকে। তৃতীয় মেয়েটি সাহায্য করতে পারছে না তাকে। ঘোড়া তার নিয়ন্ত্রণহীন। মেয়েটির চীৎকার কানে আসে তার। এক সময় স্তব্ধ হয়ে যায় তারও কণ্ঠ। বিহ্বলের মত কেবল তাকিয়ে থাকে তৃতীয় মেয়ে। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে হেঁচড়াচ্ছে মেয়েটির মৃতদেহ। ভয়ে আঁতকে উঠে তৃতীয় মেয়ে। যত সাহসী-ই হোক মেয়ে তো! চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে সে।

নিজের ঘোড়া নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না তৃতীয় মেয়ে। পিছন ফিরে তাকায় সে। ধূলিঝড়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে।

মেয়েটি এখন একা। সে ভয়ে জ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়েছে। ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে হাত দু'টো এক করে আকাশপানে উচিয়ে ধরে। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলতে শুরু করে–

'আমার মহান খোদা! আসমান-জমিনের খোদা! তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি গুনাহগার। আমার দেহের প্রতিটি লোম পাপে নিমজ্জিত। পাপ করতে-ই আমি এসেছিলাম। পাপের মধ্যেই আমি বড় হয়েছি। আমি যখন নিতান্ত অবুঝ শিশু, তখনই বড়রা আমাকে পাপের সম্মুখে নিক্ষেপ করেছিল। পাপের পাঠ শিখিয়ে তারা আমাকে বড় করেছে। তারপর বলেছে, যাও, এবার নিজের রূপ আর দেহ দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত কর। মানুষ খুন কর। মিথ্যা বল, প্রতারণা কর। আপাদমস্তক চরিত্রহীন হয়ে যাও। এ পথে নামিয়ে ওরা আমাকে বলেছিল, এটা তোমার ক্রুশের অর্পিত দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করলে তুমি জান্নাত পাবে।'

পাগলের মত চীৎকার করছে মেয়েটি। ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসছে তার ঘোড়ার গতি। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বলে, 'খোদা! যে ধর্ম সত্য, যে দ্বীন তোমার মনোপূতঃ আজ আমাকে তুমি তার মোজেজা দেখাও, সে ধর্মের উসিলায় আমাকে রক্ষা কর।'

বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে উঠে মেয়েটির। পাপের অনুভূতি শিথিল করে তোলে তার পুরনো ধর্মের বাঁধন। মৃত্যুর ভয়ে ভুলে যায় সে কোন্ ধর্মের মেয়ে। নিজেকে পাপের সমুদ্রে নিমজ্জিত দেখতে পায় সে। হৃদয়ে তার এই অনুভূতি জাগতে শুরু করে, আমি পুরুষদের একটি ভোগ্য-সামগ্রী, আমি একটি প্রতারণার ফাঁদ। তার-ই শাস্তি এখন ভোগ করছি আমি।

চৈতন্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয় মেয়েটির। নিজেকে সামলিয়ে রাখার চেষ্টা করে সে। উচ্চকণ্ঠে আহ! বলে চীৎকার দিয়ে মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে সে বলে উঠে, 'আমাকে রক্ষা কর খোদা! আমাকে বাঁচাও। এমনি বেঘোরে প্রাণটা নিওনা তুমি আমার!'

তখনি মেয়েটার মনে পড়ে যায়, সে এতীম। মৃত্যুর কবলে পড়লে অতীতের দিকে পালাতে চেষ্টা করে মানুষ। এ যুবতীটিও তার অতীতে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা

করে। কিন্তু ওখানে তার নেই যে কেউ! মা নেই, বাপ নেই, ভাই-বোন কেউ নেই তার। তার মনে পড়ে যায়, খৃষ্টানরা তাকে লালন-পালন করেছে, প্রশিক্ষণ দিয়ে এ পথে নিক্ষেপ করেছে। নিজের প্রতি নিজের-ই ঘৃণা জাগতে শুরু করে তার।

মেয়েটি এখন ক্ষমার প্রত্যাশী। কৃত পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পেতে চায় সে।

ঘোড়ার গতি তার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। কোন রকম পা টেনে টেনে চলছে ঘোড়াটি। ধীরে ধীরে ঝড়ও থেমে যায়। চৈতন্য হারিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে-ই উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।

✿✿✿

সুলতান আইউবী মিসরের সীমান্তে টহল প্রহরার ব্যবস্থা করে রেখেছেন আগেই। তার তিনটি প্লাটুনের হেডকোয়ার্টার সুদান ও মিসর সীমান্ত থেকে পাঁচ মাইল ভিতরে। হেডকোয়ার্টারের তাঁবু বসান হয়েছে এমন স্থানে, যেখানে ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার মত আড়াল আছে। কিন্তু এই দমকা ঝড় তাদেরও নিরাপদ তাঁবুগুলো পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেছে। উট-ঘোড়াগুলোকে সামলানো দুষ্কর হয়ে পড়েছে। ঝড় থামলে সৈন্যরা তাঁবু প্রভৃতি গোছানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আহমদ কামাল এ তিন প্লাটুনের কমাণ্ডার। গৌরবর্ণ, সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান এক সুপুরুষ। বাড়ি তুরস্ক। ঝড় থামলে তিনিও বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং মাল-পত্র ও পশুপালের পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। আকাশ পরিষ্কার। ধূলো-বালি উড়ছে না এখন আর। অনেক দূরের বস্তুটিও এখন চোখে পড়ছে। এক সিপাহী হঠাৎ একদিকে ইঙ্গিত করে বলে উঠে, 'কমাণ্ডার! কমাণ্ডার!! ঐ যে একটি ঘোড়া আর একজন আরোহী দেখা যাচ্ছে! ওটি আমাদের নয় তো?'

সিপাহীর দৃষ্টির অনুসরণ করেন আহমদ কামাল। বলেন, 'আরোহী মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। আমাদের বাহিনীতে তো মেয়ে নেই। চল, দেখে আসি।'

সিপাহীকে নিয়ে ছুটে যান আহমদ কামাল। অবনত মুখে অতি ধীরপদে এগিয়ে আসছে একটি ঘোড়া। খাবারের গন্ধ পেয়ে হেডকোয়ার্টারের ঘোড়াগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে ঘোড়াটি। ঘোড়ার পিঠে একটি মেয়ে। নিস্তেজ উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। বাহু দু'টো তার ঘোড়ার ঘাড়ের দু'দিকে ছড়ানো। মাথার চুলগুলো তার এলোমেলো ছড়িয়ে আছে সামনের দিকে।

আহমদ কামাল কাছে পৌঁছার আগে-ই ঘোড়াটি হেডকোয়ার্টারের ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ে খাবার খেতে শুরু করে। ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়ান আহমদ কামাল। এক নজর তাকিয়ে নিরীক্ষা করেন মেয়েটিকে। তাকে রেকাব থেকে পা সরিয়ে দু' হাতে করে ধরে নীচে নামিয়ে আনেন। সিপাহীর উদ্দেশে বলেন, 'জীবিত; বোধ হয় খৃষ্টান। এর ঘোড়াটিকে পানি পান করাও।'

মেয়েটিকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে যান আহমদ কামাল। মাথার চুল ও সর্বাঙ্গ তার ধুলোমলিন। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মেয়েটির মুখমণ্ডলে পানির ঝাপটা দেন তিনি। তারপর ফোঁটা ফোঁটা করে পানি দিতে থাকেন তার মুখে।

মিনিট দশেক পর চোখ খুলে মেয়েটি। বিস্ময়াভিভূত নেত্রে কয়েক মুহূর্ত আহমদ কামালের প্রতি তাকিয়ে থেকে হঠাৎ উঠে বসে সে। গৌরবর্ণ একটি লোককে পাশে দেখতে পেয়ে মেয়েটি ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি এখন ফিলিস্তীনে?' মাথা দুলিয়ে আহমদ কামাল তাকে বুঝাতে চান, আমি তোমার ভাষা বুঝছি না। এবার মেয়েটি আরবীতে জিজ্ঞেস করে। আপনি কে? আমি কোথায়?'

'আমি ইসলামী ফৌজের একজন নগন্য কমাণ্ডার। আর তুমি এখন মিসরে।' জবাব দেন আহমদ কামাল।

আঁতকে উঠে মেয়েটি। মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করে তার মুখ। আবার চৈতন্য হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তার। বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে থাকে আহমদ কামালের প্রতি।

অভয় দেন আহমদ কামাল। বলেন, 'ভয় কর না, আত্মসংবরণ কর। আমরা মুসলমান। মুসলমান বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দেয় না।

সস্নেহে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে আহমদ কামাল বললেন, 'আমি জানি, তুমি খৃষ্টান। কিন্তু এখন তুমি আমার মেহমান। তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি শান্ত হও, সুস্থ হও।'

আহমদ কামাল একজন সিপাহীকে ডেকে মেয়েটির জন্য খানা-পিনার ব্যবস্থা করতে আদেশ করেন।

খাবার-পানি নিয়ে আসে সিপাহী। দেখা মাত্র পানির গ্লাসটি খপ্ করে হাতে তুলে নেয় মেয়েটি। মুখের সঙ্গে লাগিয়ে অতিশয় ব্যাকুলতার সাথে ঢক্ ঢক্ করে পানি পান করতে শুরু করে সে। গ্লাসটি ধরে ফেলেন আহমদ কামাল। টেনে ঠোঁট থেকে জোর করে সরিয়ে এনে বললেন, 'আস্তে, বেশী পিপাসার পর হঠাৎ এত পানি পেটে দিতে নেই। এখন খাবার খাও, পানি পরে পান কর।' খাবারের পাত্রে হাত দেয় মেয়েটি। তৃপ্তি সহকারে আহার করে। ধীরে ধীরে স্বস্তি ও শক্তি ফিরে আসতে শুরু করে তার। ফিরে আসে মুখের জৌলুস। চাঙ্গা হয়ে উঠে তার দেহ।

আহমদ কামালের তাঁবুর পার্শ্বেই ছোট আরেকটি তাঁবু। এটি তাঁর গোসলখানা। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি আছে এখানে। দেখে-শুনে একটি খেজুর বাগানের নিকটে স্থাপন করা হয়েছিল ক্যাম্পটি। তাই এখানে পানির কোন সংকট পড়ে না। আহারের পর আহমদ কামাল মেয়েটিকে সেই তাঁবুতে ঢুকিয়ে পর্দা ঝুলিয়ে দেন। গোসল করে মেয়েটি।

মেয়েটি অত্যন্ত সন্ত্রস্ত। আহমদ কামালের অভয় বাণীতে ভয় তার কাটেনি; শত্রুর আশ্রয়ে ভাল ব্যবহারের আশা করতে পারছে না সে। শৈশব থেকে-ই সে শুনে আসছে, মুসলমানের চরিত্র হায়েনার মত, নারীর সাথে তাদের আচরণ হিংস্র পশুর মত। তদুপরি

হাবশীদের আচরণ, কুমীর ও মরুঝড়ের ভীতি চেপে ধরে আছে তাকে। দুই সঙ্গী মেয়ের নির্মম মৃত্যুর করুণ দৃশ্য আরো ভয়ার্ত করে তোলে তাকে। সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তটির কথা স্মরণে আসা মাত্র সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠে তার।

গোসল করার সময় মেয়েটির মনে জাগে, আমি আমার এই অপবিত্র অস্তিত্বকে ধুয়ে পরিষ্কার করতে চাই। কিন্তু দুনিয়ার এ পানি তো পবিত্র করতে পারবে না আমায়!

চরম অসহায়ত্ব ও উপায়হীনতা বোধ করে মেয়েটি। অবশেষে মনে মনে পরিস্থিতির হাতে তুলে দেয় নিজেকে। বলে, ভেবে আর লাভ কি, যা হবার হবে। মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে এসেছি, আপাততঃ তা-ই বা কম কিসে!

গোসল সেরে তাঁবুতে ফিরে আসে মেয়েটি। এবার তার আসল রূপ ফুটে উঠে আহমদ কামালের সামনে। মন-মাতানো দেহটিতে তার রূপের বন্যা বইছে যেন। কোন সাধারণ মেয়ে হতে পারে না এ যুবতী। মিসরের এ অঞ্চলে এই ফিরিঙ্গী মেয়েটি আসল কিভাবে? কোত্থেকে-ই বা এল? বেজায় কৌতূহল আহমদ কামালের মনে। মেয়েটির পরিচয় জানতে চান আহমদ কামাল। জবাবে সে বলে, আমি কাফেলা হারিয়ে পথ ভুলে এসেছি। ঝড়ের কবলে পড়ে ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আশ্বস্ত হলেন না আহমদ কামাল। আরো তিন-চারটি প্রশ্ন করলেন তিনি। কাঁপতে শুরু করে মেয়েটির ওষ্ঠাধর। আহমদ কামাল বললেন, যদি বলতে, আমাকে অপহরণ করা হয়েছিল; ঝড়ের কবলে পড়ে দস্যুদের হাত থেকে ছুটে এখানে এসে পড়েছি, তাহলে বোধ হয় আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারতাম। কাফেলা হারিয়ে পথ ভুলে যাওয়ার কথাটা আমি মানতে পারছি না।

ইত্যবসরে এক সিপাহী তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে একটি থলে ও একটি পানির মশক আহমদ কামালের হাতে দিয়ে বলে, এগুলো মেয়েটির ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা ছিল। থলেটি হাতে নিয়ে খুলতে শুরু করেন আহমদ কামাল। সঙ্গে সঙ্গে থতমত খেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে থলের মুখ চেপে ধরে মেয়েটি। ফ্যাকাশে হয়ে যায় তার চেহারা। আহমদ কামাল থলেটি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, নাও তুমি-ই খুলে দেখাও।' শিশুর মত করে থলেটি পিছনে লুকিয়ে ফেলে মেয়েটি। ভয়জড়িত কণ্ঠে বলে, না, এটা কাউকে দেখান যাবে না।

আহমদ কামাল বললেন, দেখ, এমনটি আশা কর না যে, তোমার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে আমি বলব, ঠিক আছে চলে যাও! তোমাকে আটকে রাখার অধিকার হয়ত আমার নেই। কিন্তু লোকালয় থেকে বহু দূরে ঘোড়ার পিঠে নিঃসঙ্গ ও অচেতন অবস্থায় যে মেয়েটিকে পাওয়া গেল, তাকে আমি এমনিতে-ই ছেড়ে দিতে পারি না। তাছাড়া এই অসহায় অবস্থায় একাকী-ই বা তোমাকে ছেড়ে দিই কি করে। একটা মানবিক কতর্ব্যও তো আমার আছে। ঠিকানা বল, আমার রক্ষী বাহিনীর হেফাজতে তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেব। অন্যথায় সন্দেহভাজন মেয়ে সাব্যস্ত করে আমি তোমাকে কায়রোতে আমাদের প্রশাসনের কাছে পাঠিয়ে দেব। আমি নিশ্চিত, তুমি

মিসরীও নও, সুদানীও নও। তাহলে তুমি কে? এখানে-ই বা কেন এসেছ, এ প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই আমি তোমায় করতে পারি।'

চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করে মেয়েটির। থলেটি ছুঁড়ে দেয় আহমদ কামালের সামনে। রশি দিয়ে বাঁধা থলের মুখ খুলেন আহমদ কামাল। ভিতরে আছে কয়েকটি খেজুর, আর অপর একটি থলে। কৌতূহল বেড়ে যায় আহমদ কামালের। এ থলেটিও খুললেন তিনি। পেলেন অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা আর সোনার তৈরি সরু শিকলে বাঁধা কালো কাঠের একটি ক্রুশ। আহমদ কামাল বুঝে ফেললেন, মেয়েটি খৃষ্টান। তিনি বোধ হয় জানতেন না যে, খৃষ্টান মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য খৃষ্টান বাহিনীতে যোগ দিতে আসে, একটি ক্রুশে হাত ধরিয়ে তার থেকে শপথ নেয়া হয় এবং সে ছোট্ট একটি ক্রুশ সর্বক্ষণ সঙ্গে রাখে। আহমদ কামাল বললেন,থলেতে আমার প্রশ্নের জবাব নেই।'

'আমি যদি এইসবগুলো স্বর্ণ-মুদ্রা আপনাকে দিয়ে দিই, তাহলে কি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'কেমন সাহায্য?' জানতে চান আহমদ কামাল।

'আমাকে ফিলিস্তীন পৌঁছিয়ে দেবেন এবং আর কোন প্রশ্ন করবেন না।' বলল মেয়েটি।

'আমি তোমাকে ফিলিস্তীন পৌঁছিয়ে দিতে পারি। তবে প্রশ্ন করব অবশ্যই।' বললেন আহমদ কামাল।

'আমাকে যদি আপনি কিছু-ই জিজ্ঞেস না করেন, তাহলে তার জন্য আপনাকে আলাদা পুরস্কার দেব।' বলল মেয়েটি।

'কি পুরস্কার?' জানতে চান আহমদ কামাল।

'আমার ঘোড়াটি আমি আপনাকে দিয়ে দেব। আর ....'

'আর কি?'

'আর তিনদিনের জন্য আমি আপনার দাসী হয়ে থাকব।'

আহমদ কামাল ইতিপূর্বে কখনো এতগুলো সোনা হাতে নেননি। এমন চোখ ধাঁধানো রূপ আর এমন মনোহারী নারীদেহও দেখেননি কোনদিন। সম্মুখে পড়ে থাকা চকমকে সোনার টুকরাগুলোর প্রতি তাকান আহমদ কামাল। তারপর চোখ চলে যায় তার মেয়েটির রেশম-কোমল চুলের প্রতি। সোনার তারের ন্যায় ঝিক্‌ঝিক্ করছে চুলগুলো। চোখ দু'টোতে যেন তার যাদুর আকর্ষণ। এ চোখের যাদুময় চাহনি দিয়ে-ই রাজ-রাজড়াদের একজনকে আরেকজনের শত্রুতে পরিণত করে এরা। তা-ও নিরীক্ষা করে দেখেন আহমদ কামাল।

আহমদ কামাল সুঠাম সুদেহী এক বলিষ্ঠ যুবক। সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত তিন প্লাটুন সৈনিকের কমাণ্ডার। কোন কাজে তাকে বাধা দেয়, জবাব চায়, এমন নেই কেউ এখানে।

তবু—

তবু তিনি সোনার মুদ্রাগুলো কুড়িয়ে থলেতে ভরেন। ক্রুশটিও থলেতে রাখেন। তারপর নির্লিপ্তের মত থলেটি ছুঁড়ে দেন মেয়েটির কোলের মধ্যে।

'কেন, এ মূল্য কি কম?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'নিতান্ত কম। ঈমানের মূল্য আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না।' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আহমদ কামাল।

এ ফাঁকে কি যেন বলতে চায় মেয়েটি। আহমদ কামাল তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে বললেন–

'আমি আমার কর্তব্য ও আমার ঈমান বিক্রি করতে পারি না। সমগ্র মিসর আমার উপর নির্ভর করে স্বস্তিতে ঘুমায়। তিন মাস আগে সুদানীরা কায়রো আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। আমি যদি এখানে না থাকতাম, কিংবা যদি আমি তাদের কাছে আমার ঈমান বিক্রি করে দিতাম, তাহলে এই বাহিনী কায়রোতে ঢুকে পড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাত। আমার চোখে তুমি সেই বাহিনী অপেক্ষাও ভয়ংকর। কেন, তুমি কি গোয়েন্দা নও?'

'না।'

'মরুভূমির ঝড়ো-বাতাস তোমাকে কোন জালিমের কবল থেকে রক্ষা করে এখানে পাঠিয়েছে কিংবা দমকা বায়ুর মধ্যে থেকে নিজে বেরিয়ে এসেছ, এমন একটা কিছু বলে-ই কি তুমি আমাকে বুঝ দিতে চাও?' জানতে চান আহমদ কামাল।

জবাবে মেয়েটি আমতা আমতা করে যা বলল, তার কোন অর্থ দাঁড়ায় না। তাই আহমদ কামাল বললেন–

'ঠিক আছে, তুমি কে, কোথা থেকে এসেছ, এসব জানবার প্রয়োজন আমার নেই। তোমার মত মেয়েদের মুখ থেকে সত্য কথা বের করানোর জন্য কায়রোতে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ আছে। আগামী কাল-ই আমি তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার পরিচয় তারা-ই নিবেন।'

'অনুমতি হলে আমি এখন একটু বিশ্রাম নিই, কাল কায়রো রওনা হওয়ার প্রাক্কালে আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাব।' বলল মেয়েটি

গত রাতে এক তিল ঘুমুতে পারেনি মেয়েটি। আর দিনটি কেটেছে ভয়াবহ এক সফরের মধ্য দিয়ে। ক্লান্তিতে অবসন্ন তার দেহ। আহমদ কামালের অনুমতি নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় সে। অমনি দু' চোখের পাতা এক হয়ে আসে তার। রাজ্যের ঘুম এসে চেপে ধরে তাকে।

আহমদ কামাল দেখলেন, ঘুমের মধ্যে মেয়েটি বিড় বিড় করছে। অস্থিরতার কারণে মাথাটা এপাশ-ওপাশ করছে তার। মনে হল ঘুমের মধ্যে-ই কাঁদছে সে।

সাথীদের ডেকে আহমদ কামাল বলে দিলেন, একটি সন্দেহভাজন ফিরিঙ্গী মেয়েকে ধরে আনা হয়েছে। আগামীকাল তাকে কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হবে। আহমদ কামালের চরিত্র সকলের জানা। তার ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই কারুর।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে মেয়েটি। আহমদ কামাল তাঁবু থেকে বের হয়ে ঘোড়াটির কাছে যান। দেখে হতবাক্ হয়ে যান তিনি। এ যে উন্নত জাতের ঘোড়া। এ জাতের ঘোড়া তো মুসলিম বাহিনী ছাড়া অন্য কারুর নেই। জিনটি ধরে উলট-পালট করে দেখেন আহমদ কামাল। জিনের নীচে মিসরী ফৌজের প্রতীক আঁটা। আহমদ কামালের বাহিনীর-ই ছিল এ ঘোড়াটি।

ঝড়ের কারণে হাবশীরা মেয়েদের পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করে জীবিত ফেরত পৌঁছে যায়। পুরোহিতের নিশ্চিত ধারণা, ঝড়ের কবলে পড়ে মেয়েরা প্রাণ হারিয়েছে; ওদের কথা ভেবে আর লাভ নেই। এর মধ্যে সময়ও কেটে গেছে বেশ। বিপদ নেমে এল রজবের উপর। পুরোহিত তাকে বারবার একই কথা জিজ্ঞেস করছে, 'বল্, মেয়েরা কোথায়?' রজব দিব্যি খেয়ে বলছে, আমি কিছুই জানিনা। আমাকে না জানিয়ে-ই ওরা পালিয়েছে। রজবের উপর নির্যাতন চালাতে শুরু করে হাবশীরা। তরবারীর আগা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে রক্তাক্ত করছে আর বলছে, 'বল্ মেয়েরা কোথায়?' রজবের সঙ্গীদেরকেও তারা গাছের সঙ্গে বেঁধে অত্যাচার শুরু করে। দেশ ও জাতির সঙ্গে গাদ্দারী করার শাস্তি ভোগ করছে রজব। রাতেও তার বাঁধন খোলা হয়নি। আঘাতে আঘাতে চালনির মত ঝাঝরা হয়ে গেছে তার দেহ।

আহমদ কামালের তাঁবুতে শুয়ে আছে মেয়েটি। সূর্যাস্তের আগে একবার জেগেছিল সে। তাকে খাবার খাওয়ান আহমদ কামাল। তারপর পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ে সে। তার থেকে দু'-তিন গজ দূরে শয়ন করেন আহমদ কামাল। কেটে যাচ্ছে রাত। টিম্ টিম্ করে বাতি জ্বলছে তাঁবুতে। হঠাৎ চীৎকার করে উঠে মেয়েটি। ঘুম ভেঙ্গে যায় আহমদ কামালের। ধড়মড় করে উঠে বসে সে। ভয়ে থর্থর্ করে কাঁপছে তার দেহ। চোখে-মুখে ভীতির ছাপ। কাছে এসে বসেন আহমদ কামাল। কাঁপতে কাঁপতে আহমদ কামালের গা ঘেঁষে বসে মেয়েটি। কম্পিত কণ্ঠে বলে, ওদের থেকে আমাকে বাঁচাও। ওরা আমায় কুমীরের ঝিলে নিক্ষেপ করছে। আমার মাথা কাটতে চেয়েছে ওরা!

'কারা?' জিজ্ঞেস করেন আহমদ কামাল।

'ঐ কৃষ্ণাঙ্গ হাবশীরা। এখানে এসেছিল ওরা।' ভয়জড়িত কণ্ঠে বলে মেয়েটি।

হাবশীদের বলির কথা জানতেন আহমদ কামাল। মনে তার সংশয় জাগে, বোধ হয় একে বলি দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন। ভয় যেন আরো বেড়ে যায়। আহমদ কামালের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কর না; আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।' আহমদ কামাল দেখলেন, ভয়ে মেয়েটি আধখানা হয়ে গেছে। তিনি তাকে সান্ত্বনা দেন। অভয় দিয়ে বলেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাক, এখান থেকে তোমাকে তুলে নিতে কেউ আসবে না।' মেয়েটি বলল, 'আমি আর ঘুমাতে পারব না। আপনি বসে বসে আমার সাথে কথা বলুন। একা একা জেগেও আমি সময় কাটাতে পারব না। আমি পাগল হয়ে যাব।'

আহমদ কামাল বললেন, ঠিক আছে, আমিও তোমার সঙ্গে সজাগ বসে থাকব। আলতো পরশে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে আহমদ কামাল বললেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার কাছে আছি, ততক্ষণ তোমার কোন ভয় নেই।'

দীর্ঘক্ষণ জেগে কাটায় মেয়েটি। আহমদ কামালও সজাগ বসে থাকেন তার পার্শ্বে। হাবশীদের ব্যাপারে তিনি মেয়েটিকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করেননি। তুরস্ক ও মিসরের গল্প শোনাতে থাকেন তাকে। আহমদ কামালের গা ঘেঁষে বসে আছে সে। আহমদ কামাল অত্যন্ত মিশুক মানুষ। রসের কথা বলে বলে মেয়েটির মন থেকে ভয় দূর করে দেন তিনি। এক সময় প্রসন্নচিত্তে ঘুমিয়ে পড়ে মেয়েটি।

মেয়েটির যখন ঘুম ভাঙ্গে, রাতের তখন শেষ প্রহর। আহমদ কামাল নামায পড়ছেন। মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার প্রতি। তন্ময়চিত্তে আহমদ কামালের নামায পড়া দেখছে সে। দু'আর জন্য হাত উঠান আহমদ কামাল। চোখ দু'টো বন্ধ করেন। একনাগাড়ে নির্নিমেষ নয়নে মেয়েটি তাকিয়ে আছে আহমদ কামালের মুখের প্রতি। দু'আ শেষ করে হাত নামান আহমদ কামাল। চোখ খুললে দৃষ্টি পড়ে জাগ্রত মেয়েটির প্রতি।

'হাত তুলে খোদার কাছে আপনি কি প্রার্থনা করলেন?' কৌতূহলী মনে জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'অন্যায় প্রতিরোধের সাহস।' জবাব দেন আহমদ কামাল।

আপনি কি খোদার কাছে কখনো সুন্দরী নারী আর সোনা-দানা চাননি?

'এ দু'টি বস্তু তো প্রার্থনা ছাড়া-ই আল্লাহ আমাকে দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ওসবের উপর আমার কোন অধিকার নেই। আল্লাহ বোধ হয় আমায় পরীক্ষা নিতে চাইছেন।' বললেন আহমদ কামাল।

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, তিনি আপনাকে অন্যায়ের মোকাবেলা করার হিম্মত দিয়েছেন?' প্রশ্ন করে মেয়েটি।

'কেন! তুমি কি দেখনি? তোমার এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা আর তোমার রূপ-মাধুর্য্য তো আমাকে আমার আদর্শ থেকে এক চুল সরাতে পারেনি! এ আমার প্রচেষ্টা আর আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের প্রতিফল।' জবাব দেন আহমদ কামাল।

'আল্লাহ কি গুনাহ মাফ করেন?' জানতে চায় মেয়েটি।

'আলবৎ, তাওবা করলে আমাদের আল্লাহ মানুষের গুনাহ মাফ করে দেন। শর্ত হল, তাওবা করার পর সে পাপ আবার করা যাবে না।' জবাব দেন আহমদ কামাল।

আহমদ কামালের জবাব শুনে মাথা নত করে মেয়েটি। কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকে দু'জন। মেয়েটির ফোঁপানির শব্দ পান আহমদ কামাল। অবনত মাথাটা ধরে উপরে তুলে দেন তিনি। গুমরে কাঁদছে মেয়েটি। চোখ তার অশ্রুসজল। আহমদ কামালের হাত চেপে ধরে সে। হাতে চুমো খায় কয়েকবার। আহমদ কামাল নিজের হাত গুটিয়ে নেন।

রুদ্ধকণ্ঠে মেয়েটি বলে, 'আজ-ই আমরা সম্পর্কহীন হয়ে পড়ব। আমাকে পাঠিয়ে দেবেন কায়রো। আর হয়ত কোনদিন দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটবে না। আমার মন আমাকে বাধ্য করছে যে, আমি বলে দিই, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি। তারপর আপনাকে জানিয়ে দিই, এখন আমি কী।'

'তোমার যাত্রার সময় হয়ে গেছে। আমি নিজেই তোমার সঙ্গে যাব। এমন একটি স্পর্শকাতর গুরুদায়িত্ব আমি অন্য কারো উপর ন্যাস্ত করতে পারি না।'

'তবে কি শুনবে না আমার পরিচয়, আমার ইতিবৃত্ত?' নিরাশার সুরে বলল মেয়েটি।

'উঠ, এসব শ্রবণ করা আমার কাজ নয়।' বলে-ই তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন আহমদ কামাল।

✿✿✿

কায়রো অভিমুখে এগিয়ে চলছে ছয়টি ঘোড়া। একটিতে আহমদ কামাল। তাঁর পিছনের ঘোড়ায় মেয়েটি আর তার পিছনে পাশাপাশি চলছে রক্ষীদের চারটি ঘোড়া। একেবারে পিছনে একটি উট। তাতে সফরের সামান-খাবার-পানি ইত্যাদি বোঝাইকরা।

আহমদ কামালের ক্যাম্প থেকে কায়রো অন্তত ছত্রিশ ঘন্টার পথ। এগিয়ে চলছে কাফেলা। মেয়েটি দু' দু'বার তার ঘোড়াটি নিয়ে আসে আহমদ কামালের পাশে। কিন্তু প্রতিবার-ই তিনি তাকে পিছনে পাঠিয়ে দেন। কোন কথা বলছেন না মেয়েটির সঙ্গে। সূর্যাস্তের পর এক স্থানে কাফেলা থামান আহমদ কামাল। এখানে রাত যাপন করতে হবে। তাঁবু ফেলতে আদেশ করেন তিনি।

রাতে আহমদ কামাল নিজের তাঁবুতে ঘুমুতে দেন মেয়েটিকে। প্রদীপ জ্বালিয়ে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যান নিজে।

হঠাৎ চোখ খুলে যায় আহমদ কামালের। কে যেন আলতো পরশে হাত বুলাচ্ছে তার মাথায়। চমকে উঠেন তিনি। ঘুমের রেশ কাটিয়ে তিনি দেখতে পান, মেয়েটি তার শিয়রে বসা। মেয়েটির হাত তার মাথায়। দ্রুত উঠে বসেন আহমদ কামাল। তাকালেন মেয়েটির প্রতি। অশ্রুর বন্যা বইছে যেন তার চোখে। দু' হাতে আহমদ কামালের হাত চেপে ধরে চুম্বন করে সে। শিশুর মত রয়ে রয়ে কাঁদতে শুরু করে। গম্ভীর চোখে একদৃষ্টে মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে থাকেন আহমদ কামাল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মেয়েটি বলল, 'আমি তোমার দুশমন। আমি গুপ্তচরবৃত্তি, তোমাদের উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তার মাঝে বিভেদ সৃষ্টি এবং সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার আয়োজন সম্পন্ন করতে ফিলিস্তীন থেকে তোমাদের দেশে রওনা করেছিলাম। কিন্তু এখন আমার হৃদয় থেকে তোমাদের প্রতি শত্রুতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন আর আমি গুপ্তচর নই, তোমাদের শত্রুও নই।'

'কেন?' প্রশ্ন করেন আহমদ কামাল। কিন্তু জবাবের অপেক্ষা না করে-ই তিনি বললেন, তুমি একটি ভীরু মেয়ে। তুমি স্বজাতির সঙ্গে গাদ্দারী করছ। শূলে চড়েও

তোমাকে বলা উচিত, 'আমি খৃষ্টান। মুসলমান আমার জাতশত্রু। ক্রুশের জন্য জীবন দিয়ে আমি গর্ববোধ করছি।' বললেন আহমদ কামাল।

'কেন?' প্রশ্ন করেছেন, তার জবাবটা শুনে নিন ভাই! আমার জীবনে আপনি-ই প্রথম পুরুষ, যিনি এই রূপ-যৌবনকে তুচ্ছ বলে ছুঁড়ে ফেললেন। অন্যথায় কি আপন, কি পর সকলের চোখেই আমি এক খেলনা। আমার দৃষ্টিতেও আমার জীবনের লক্ষ্য এই পুরুষদের নিয়ে তামাশা করব, আনন্দ দেব, আনন্দ নেব, রূপের জালে আটকিয়ে পুরুষদের ধোঁকা দেব, আয়েশ করব। প্রশিক্ষণও পেয়েছি আমি এ কাজের-ই। আপনারা যাকে বেহায়াপনা বলেন, আমার জন্য তা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কৌশল, একটি অস্ত্র। ধর্ম কি, আল্লাহর বিধান বলতে কি বুঝায়, তা আমি জানি না। আমি চিনি শুধু ক্রুশ। শৈশবে-ই আমার মন-মগজে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল, ক্রুশ হল খোদার নিদর্শন, খৃষ্টবাদের মহান প্রতীক। সমগ্র বিশ্বে কর্তৃত্ব করার অধিকার একমাত্র এই ক্রুশের অনুসারীদের আর মুসলমান হল ক্রুশের শত্রু। তাদের রাজত্ব করার অধিকার নেই। বেঁচে থাকতে চাইলে থাকতে হবে ক্রুসেডারদের পদানত হয়ে। এ ক'টি কথা-ই আমার ধর্মের মূল ভিত্তি জানি। আমাকে মুসলমানদের মূলোৎপাটনের প্রশিক্ষণ দিয়ে বলা হয়েছিল, এটি তোমার পবিত্র কর্তব্য . . . . .।

এ পর্যন্ত বলে কিছুক্ষণ নীরব থেকে মেয়েটি আহমদ কামালকে জিজ্ঞেস করে–

'রজব নামে আপনাদের এক সালার আছে। তাকে জানেন আপনি?'

'জানি। সে খলীফার রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার। সুদানীদের মিসর আক্রমণের ষড়যন্ত্রে সে-ও জড়িত ছিল।' জবাব দেন আহমদ কামাল।

'এখন সে কোথায়, জানেন?'

'আমার জানা নেই। আমি শুধু এতটুকু আদেশ পেয়েছি যে, রজব পালিয়ে গেছে। যেখানে পাবে, সেখানেই ধরে ফেলবে। পালাতে চেষ্টা করলে তীর ছুঁড়ে শেষ করে দিবে।

'আমি কি বলে দেব, এখন সে কোথায়? সে সুদানে হাবশীদের নিকট আছে। সেখানে একটি মনোরম জায়গা আছে। সেখানে মেয়েদেরকে দেবতার নামে বলি দেয়া হয়। রজব সেখানেই অবস্থান করছে। আমি জানি সে দলত্যাগী সালার। তার সঙ্গে ফিলিস্তীন থেকে এসেছিলাম আমরা তিনটি মেয়ে।'

'অপর দু'জন কোথায়?'

সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠে মেয়েটির দু'চোখ। গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলে, 'তারা মারা গেছে। তাদের মৃত্যুই আমাকে বদলে দিয়েছে।'

এই বলে মেয়েটি আহমাদ কামালকে সুদীর্ঘ এক কাহিনী শোনায়। রজবের সঙ্গে কিভাবে তারা ফিলিস্তীন থেকে এসেছিল, কিভাবে হাবশীরা তাদের দু'টি মেয়েকে দেবতার নামে বলি দিতে চেয়েছিল, কিভাবে তারা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে, কিভাবে মরু ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে তার দুই সহকর্মী প্রাণ হারাল, সব কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করে মেয়েটি। সে বলে–

'আমি নিজেকে রাজকন্যা মনে করতাম। রাজা-বাদশাদের হৃদয়ে আমি রাজত্ব করেছি। একজন আল্লাহ আছেন, মৃত্যু আছে, এমনটি কল্পনায়ও আসেনি আমার কখনো। আমাকে পাপের সমুদ্রে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। আমিও অবলীলায় অবগাহন করতে থাকি তাতে। অপার আনন্দ পেতাম সেই অবগাহনে। হাবশীদের মহল্লায় গিয়ে আমি হাঙ্গর-কুমীর দেখলাম। বলি দেয়া মেয়েদের মস্তক আর কর্তিত দেহ নিক্ষেপ করা হয় ওদের মুখে। রজব ও দুই সঙ্গী মেয়ের সাথে যখন ঘুরতে যাই, কুমীরগুলো তখন ঝিলের কূলে লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল। তাদের কুৎসিত বিকট দেহ দেখে আমি কেঁপে উঠি। আমার এই দেহটিকে– যা রাজা-বাদশাদের মস্তক অবনত করে দেয়– হাবশীরা কুমীরের আহারে পরিণত করতে চেয়েছিল। আমাকে বলি দেয়ার দিন-তারিখ ধার্য হয়ে গিয়েছিল। আমি মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার দেহের প্রতিটি শিরা জেগে উঠে। আমি নিজের ভিতর থেকে আওয়াজ শুনতে পাই, এই হল রূপ আর দেহের অপব্যবহারের পরিণতি। আমি জীবন বাজি রেখে ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। ফিলিস্তীন থেকে আমাদেরকে রজবের সঙ্গে পাঠান হয়েছিল। কথা ছিল, ও আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু সে নিজে-ই আমাদের প্রতি হাত প্রসারিত করে বসে . . . . .।

হাবশীদের কঠিন অক্টোপাশ ছিঁড়ে রাতের আঁধারে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম আমরা তিনজন। রজব আমাদের কোন সহযোগিতা করেনি। হাবশীদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার কোন পদক্ষেপও সে নেয়নি। মরুভূমিতে আমাদের কোন আশ্রয় ছিল না। আমরা ঝড়ের কবলে পড়ে গেলাম। প্রথমে একটি মেয়ে ছিটকে পড়ে যায় ঘোড়ার পিঠ থেকে। তাকে পিষে ফেলে তার ঘোড়া। দ্বিতীয় মেয়েটি যখন ঘোড়া থেকে পড়ে গেল, তখন এক পা আটকে গেল তার ঘোড়ার রেকাবে। ঝুলন্ত অবস্থায় ঘোড়ার সঙ্গে মাটিতে হেঁচড়াতে লাগল। এভাবে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তার ঘোড়া তাকে অন্ততঃ দু' মাইলেরও বেশী পথ নিয়ে আসে। তার আর্তচীৎকারে আমার কলিজা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। এখনও তার সেই করুণ চীৎকার-ধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। যতদিন বেঁচে থাকব, তার সেই চীৎকার আমার কানে বাজতেই থাকবে।

প্রবল ঝড়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে আমার ঘোড়া। আমি ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। সঙ্গী দু' মেয়েকে মৃত্যু দিয়ে আল্লাহ্ আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, আমার পরিণতি কী হবে। ওরা ছিল আমার চেয়েও রূপসী। বহু রাজা-বাদশাহ ছিল তাদের হাতের পুতুল। রূপের অহংকার ছিল তাদেরও। কিন্তু এমনি ভয়ংকর মৃত্যু তাদের চাপা দিয়ে রেখেছে মরুভূমির বালির নীচে।

আমি এখন একা। ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দকে মনে হতে লাগল, যেন মৃত্যু দাঁত বের করে আমার দিকে তাকিয়ে খিল্ খিল্ করে হাসছে। আমার মাথার উপরে, সামনে, পিছনে, ডানে, বাঁয়ে আমি ভূত-প্রেত ও মৃত্যুর অট্টহাসি শুনতে পেলাম।

এমন এক মহাবিপদে নিক্ষিপ্ত হয়েও আমি চৈতন্য হারাইনি। হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে আমি ভাবনার সাগরে ডুবে গেলাম। বুঝলাম, এ আর কিছুই নয়– আল্লাহ্ আমাকে

আমার পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। আল্লাহ্‌র কথা মনে পড়ে যায় আমার। দু' হাত উপরে তুলে উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলাম তাঁকে। কেঁদে কেঁদে তাওবা করলাম। ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। তারপর চৈতন্য হারিয়ে যায় আমার . . . . .।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলে দেখলাম, আমি আপনার কব্জায়। আপনার গৌরবর্ণ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম, আপনি ইউরোপিয়ান কেউ হবেন আর আমি ফিলিস্তীনে। এ ধোঁকায় পড়ে আমি কথা বললাম ইংরেজীতে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? আমি কোথায়? যখন জানতে পারলাম, আমি মুসলমানের কব্জায় এসে পড়েছি এবং যেখানে আছি, জায়গাটা ফিলিস্তীন নয়– মিসর, তখন মনটা আমার ছ্যাৎ করে উঠে। ভয়ে আমি শিউরে উঠি। ভাবলাম, এভাবে দুশমনের হাতে এসে পড়ার চেয়ে ঝড়ে জীবন দেয়া-ই তো ভাল ছিল। জীবনে রক্ষা পেয়ে আমার লাভটা কী হল। প্রশিক্ষণে আমাদেরকে ধারণা দেয়া হয়েছিল, মুসলমানরা নারীর সাথে হিংস্র প্রাণীর ন্যায় আচরণ করে। আপনার পরিচয় পেয়ে আমার সে কথাটা-ই মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে যে আচরণ করলেন, তা ছিল আমার কল্পনারও অতীত। আপনি এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা ছুঁড়ে ফেললেন, আমাকেও সরিয়ে দিলেন। আমার এই উপচেপড়া রূপ আর মধুভরা দেহ আপনাকে এতটুকুও আকর্ষণ করতে পারল না। এ এক পরম আশ্চর্য-ই বটে। কিন্তু তখনও আমার ভয় কাটেনি। মনে মনে ভাবছিলাম, যদি একজন সৎ মানুষ পেয়ে যেতাম, যে আমাকে একটু আশ্রয় দেবে, আমায় পবিত্র মনে নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নেবে! আপনার চরিত্র যে এত পবিত্র, তখনও আমি তা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারিনি।

আমার আশংকা ছিল, রাতে আপনি আমায় উত্যক্ত করবেন। স্বপ্নে আমি কুমীর দেখলাম, হাবশী-হায়েনা ও মরুঝড়ের তান্ডব দেখলাম। ভয় পেয়ে উঠে বসলাম। আপনি আমায় বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নিলেন, শিশুদের ন্যায় গল্প শুনিয়ে আমাকে শান্ত করলেন, ঘুম পাড়ালেন। শেষ রাতে জেগে দেখলাম, আপনি আল্লাহ্‌র সমীপে সেজদায় পড়ে আছেন। যখন আপনি দু'আর জন্য হাত উঠালেন, চোখ বন্ধ করলেন, তখন আপনার চেহারায় যে আনন্দ, প্রশান্তি আর দ্যুতি আমি দেখতে পেলাম, ইতিপূর্বে আর কখনো এমনটি দেখিনি কারুর মুখে। আমি সন্দেহে পড়ে গেলাম, আপনি মানুষ না ফেরেশতা। এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা আর আমার মত যুবতী থেকে কোন মানুষ তো বিমুখ হতে পারে না!

আপনার মুখমন্ডলে আমি যে প্রশান্তি ও দীপ্তি দেখেছিলাম, তা আমার দু'চোখে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, এ প্রশান্তি আপনাকে কে দিল? কিন্তু কেন যেন প্রশ্নটা চেপে গেলাম। আপনার অস্তিত্বে আমি এত প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলাম যে, আসল সত্য গোপন রেখে আপনাকে ধাঁধার মধ্যে রাখতে চাইলাম না। আমি চেয়েছিলাম, নিজের সব ইতিবৃত্ত আপনার কাছে প্রকাশ করি। বিনিময়ে আপনি আপনার এই চরিত্র-মাধুর্য আর এই প্রশান্তির পরশ দিয়ে আমার হৃদয়ের

সব ভীতি, সব যন্ত্রণা দূর করে দেবেন। কিন্তু আপনি আমার কথা শুনলেন না; আপনার কর্তব্য-ই ছিল আপনার কাছে প্রিয়।'

আবেগের আতিশয্যে মেয়েটি আহমদ কামালের হাত চেপে ধরে এবং বলে, 'একেও হয়ত আপনি আমার প্রতারণা মনে করবেন। কিন্তু আপনার প্রতি আকুল নিবেদন, আমাকে সঠিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন, আমার হৃদয়ের কথাগুলো শুনুন। আপনার থেকে আর আমি বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। কাল আপনাকে পাপের আহ্বান জানিয়ে আমি বলেছিলাম, আপনি আমাকে দাসী বানিয়ে নিন। কিন্তু আজ নিতান্ত পবিত্র মনে আমি বলছি, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, আমি আপনার-ই পায়ে পড়ে থাকব। দাসী হয়ে আমি আপনার সেবা করব। বিনিময়ে আমি চাই শুধু সেই প্রশান্তি, যা নামায পড়ার সময় আপনার চেহারায় আমি দেখেছিলাম।

আহমদ কামাল বললেন, 'আমাকে তুমি ধোঁকা দিচ্ছ, একথা যেমন আমি বলব না, তেমনি আমার জাতি এবং আমার মিশনের সঙ্গেও আমি প্রতারণা করতে পারি না। আমার কাছে তুমি আমানত। আমি আমানতে খেয়ানত করতে পারি না। তোমার সঙ্গে আমি যে আচরণ করেছি, তা ছিল আমার কর্তব্য। এ দায়িত্ব থেকে তখন-ই আমি অব্যাহতি পাব, যখন তোমাকে আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগের হাতে তুলে দেব আর তারা আমাকে আদেশ করবেন, আহমদ কামাল! এবার তুমি চলে যাও।'

মেয়েটি আসলেই প্রতারণা করছিল না। এবার কান্না-বিজড়িত কণ্ঠে সে বলল, 'আপনার আদালত যখন আমাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করবে, আপনি তখন আমার হাত ধরে রাখবেন। আমার এই একটি মাত্র আবেদন আপনার কাছে। ফিলিস্তীন পৌঁছিয়ে দেয়ার কথা আমি আর আপনাকে বলব না। আপনার কর্তব্যের পথে আমি বাঁধা সৃষ্টি করতে চাই না। আপনি শুধু আমাকে এতটুকু বলুন যে, আমি তোমার ভালবাসা বরণ করে নিয়েছি। আমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নিন, এ আবদার আমি আপনার কাছে করব না। কারণ, আমি একটি অপবিত্র মেয়ে। আমার শিক্ষাগুরুরা আমাকে পাথরে পরিণত করে দিয়েছে। আমার মধ্যে যে মানবিক চেতনা বলতে কিছু নেই; তা-ও আমি বুঝি। কিন্তু আল্লাহ আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ পাথর হতে পারে না। যে যেভাবে-ই গড়ে উঠুক, একদিন না একদিন এ প্রশ্ন করতেই হয় যে, 'সরল পথ কোন্‌টি?'

ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে রাত আর কথা বলে চলেছে দু'জন। এক পর্যায়ে আহমদ কামাল মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, তোমার মত মেয়েদেরকে আমাদের দেশে পাঠিয়ে তাদের দ্বারা কি কাজ নেয়া হয়?'

'নানা রকম কাজ। কতিপয়কে মুসলমানের বেশে আমীরদের হেরেমে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তারা প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা মোতাবেক আমীর-উজীরদের কাবু করে নেয়। তাদের দ্বারা খৃষ্টানদের মনোপূতঃ লোকদেরকে উঁচু উঁচু পদে আসীন করানো হয়। যেসব কর্মকর্তা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করানো হয়। মুসলমান মেয়েরা ততটা চতুর নয়। নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে বিভোর থাকে তারা।

তারা মুসলিম শাসকদের হেরেমের রাণীর মর্যাদা পায় ঠিক; কিন্তু মুসলিমবেশী একটি খৃষ্টান কিংবা ইহুদী মেয়ে বিচক্ষণতার মাধ্যমে তাদেরকে কোণঠাসা করে রাখে। ফলে ইহুদী-খৃষ্টান মেয়েরাই হয়ে বসে হেরেমের দন্ডমুন্ডের অধিকারীনী।

বর্তমানে ইসলামী সরকারগুলোর আমীর-উজীরদের অন্ততঃ অর্ধেক সিদ্ধান্ত হয় আমার জাতির স্বার্থের অনুকূল।

মেয়েদের আরো একটি দল আছে। তারা ইসলামী নাম ধারণ করে মুসলমানদের স্ত্রী হয়ে যায়। তাদের কাজ হল সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলোর মেয়েদের চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করে তাদের বিপথগামী করে তোলা। তারা নিজেদের ছেলে-মেয়েদেরকে কু-পথে নামিয়ে দিয়ে তাদের দ্বারা সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলোর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবৈধ প্রেম-প্রণয় সৃষ্টি করিয়ে মুসলিম সমাজকে কলুষিত করে। আমার মত মেয়েরা অতি গোপনে আপনাদের এমন এমন পদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে যায়, যারা শেষ পর্যন্ত তাদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। আমার মত মেয়েদেরকে তারা এমনভাবে হেফাজত করে রাখে যে, তাদের প্রতি সামান্যতম সন্দেহের অবকাশও থাকে না। তারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মাঝে পরস্পর দ্বন্ধ-বিরোধ ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর মাঝে বিরাগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। ঠিক এমনি বরং এর চেয়ে জঘন্য এক কাজের জন্য আরো দু'টি মেয়েসহ আমাকে তুলে দেয়া হয়েছিল রজবের হাতে।

রাতভর মেয়েটি খৃষ্টানদের গোপন কার্যক্রম ও মুসলমানদের ঈমান বেচাকেনার বিস্তারিত বিবরণ শোনাতে থাকে, আর আহমদ কামাল তন্ময় হয়ে তা শুনতে থাকেন।

পরদিন সূর্যাস্তের আগেই কায়রো পৌঁছে যায় কাফেলা। আহমদ কামাল আলী বিন সুফিয়ানের নিকট যান এবং মেয়েটির ব্যাপারে সম্পূর্ণ রিপোর্ট পেশ করেন। আহমদ কামাল আরো জানান, রজব এখন হাবশীদের কাছে। হাবশীরা যে স্থানে নারী বলি দিয়ে থাকে, রজব সেখানে তার আস্তানা গেড়েছে। আহমদ কামাল আলী বিন সুফিয়ানকে আরো বলেন, যদি আদেশ হয়, তাহলে আমি রজবকে জীবিত কিংবা মৃত ধরে আনতে পারি। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ান সে আদেশ তাকে দিলেন না। কারণ, এরূপ অভিযানের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিচক্ষণ ও সুদক্ষ স্বতন্ত্র বাহিনী-ই তার আছে। রজব পর্যন্ত পৌঁছানোর পন্থাও আহমদ কামাল আলীকে অবহিত করেন। রজবকে ধরে আনার জন্য তিনি আগেই একটি বাহিনী সুদান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার আগে তিনি ছয়জন অতীব বিচক্ষণ সৈন্যকে রজবকে ধরে আনার জন্য আংগুক অভিমুখে রওনা করান। আহমদ কামালকে বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দেন। মেয়েটিকে ডেকে আনেন নিজের কাছে।

আলী বিন সুফিয়ান আহমদ কামালকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে মেয়েটির সামনে বসিয়ে দেন। মুচকি একটি হাসি দিয়ে কথা বলতে শুরু করে মেয়েটি। কোন কথা-ই গোপন

রাখল না সে। শেষে বলল, 'আমাকে যদি মৃত্যুদন্ড-ই দিতে হয়, তাহলে আমার একটি অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। আমি আহমদ কামালের হাতে মরতে চাই।' মেয়েটি আহমদ কামালের এত অনুরক্ত কেন হল, তার বিবরণও দিল সে।

আলী বিন সুফিয়ান মেয়েটিকে কারাগারে প্রেরণের পরিবর্তে আহমদ কামালের হাতে অর্পণ করে নিজে সুলতান আইউবীর নিকট চলে যান। মেয়েটির সব কথা তিনি আইউবীকে অবহিত করেন। বলেন, 'আপনার অতিশয় নির্ভরযোগ্য সেনাকর্মকর্তা ফয়জুল ফাতেমী আমাদের দুশমন। তার-ই নিকট আগমনের পরিকল্পনা ছিল মেয়েদের।' সুলতান আইউবী প্রথম বললেন, 'হয়ত বা মেয়েটি মিথ্যে বলছে। তোমাকে সে বিভ্রান্ত করছে। আমার জানামতে ফয়জুল ফাতেমী এমন ধারার লোক নয়।'

'আমীরে মুহতারাম! আপনি ভুলে গেছেন যে, লোকটি ফাতেমী। বোধ হয় এ কথাটাও আপনার মনে নেই যে, ফাতেমী ও ফেদায়ীদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক। এরা আপনার অনুগত হতেই পারে না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

গভীর চিন্তায় হারিয়ে যান সুলতান আইউবী। সম্ভবতঃ তিনি ভাবছিলেন, এমন হলে বিশ্বাস করব কাকে? কাজ-ই বা করব কাদের নিয়ে? কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, 'আলী! ফয়জুল ফাতেমীকে গ্রেফতার করার অনুমতি আমি তোমায় দেব না। তুমি এমন কৌশল অবলম্বন কর, যেন অপরাধ করা অবস্থায় তাকে হাতে-নাতে ধরা যায়। আমি তাকে স্পটে গ্রেফতার করতে চাই। আর সে পরিস্থিতি সৃষ্টি করার দায়িত্ব তোমার। ফয়জুল ফাতেমী যুদ্ধের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কর্মকর্তা। রাজ্যের সমর বিষয়ক সব তথ্য তার কাছে। লোকটি এত জঘন্য অপরাধের অপরাধী কি-না অতি শীঘ্র আমি তার প্রমাণ চাই।'

আলী বিন সুফিয়ান গোপন তথ্য সংগ্রহে অভিজ্ঞ। এটি তার সৃষ্টিগত প্রতিভা। তিনি কৌশল খুঁজে বের করলেন এবং সুলতান আইউবীকে বললেন, 'মেয়েটি যেসব বিপদ অতিক্রম করে এসেছে, তার ভীতি তার মন-মানসিকতাকে বিধ্বস্ত করে তুলেছে এবং আহমদ কামালের প্রতি সে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে। কারণ, আহমদ কামাল তাকে বিপদসংকুল পথ থেকে উদ্ধার করেছে এবং তার সঙ্গে এমন পবিত্র আচরণ করেছে যে, তাতে মুগ্ধ হয়ে মেয়েটি এখন তাকে ছাড়া কথা-ই বলছে না। আমার আশা, আমি এই মেয়েটিকে কাজে লাগাতে পারব।'

'চেষ্টা করে দেখ। কিন্তু মনে রেখ, সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া ফয়জুল ফাতেমীকে গ্রেফতার করার অনুমতি আমি তোমাকে কিছুতেই দেব না। ফয়জুল ফাতেমীর মত লোক দুশমনের ক্রীড়নক হয়ে গেছে, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' বললেন সুলতান আইউবী।

আলী বিন সুফিয়ান চলে যান মেয়েটির কাছে। তাকে নিজের পরিকল্পনার কথা জানান। জবাবে মেয়েটি বলল, 'আহমদ কামাল যদি বলেন, তাহলে আগুনে ঝাঁপ দিতেও

আমি প্রস্তুত।' সামনে উপবিষ্ট আহমদ কামাল বললেন, 'না, ইনি যেভাবে যা বলেন, তুমি তা-ই কর। পরিকল্পনাটা ভাল করে বুঝে নাও। আবেগমুক্ত হয়ে কাজ কর।'

'কিন্তু এর পুরস্কার আমি কী পাব?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'তোমাকে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে ফিলিস্তীনের দুর্গ শোবকে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। আর এখানে যে ক'দিন থাকবে, তোমাকে মর্যাদার সঙ্গে রাখা হবে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'নাহ, এ পুরস্কার যৎসামান্য। আমি যা চাইব, তা-ই আমাকে দিতে হবে। আমি ইসলাম গ্রহণ করব আর আহমদ কামাল আমাকে বিয়ে করে নেবেন।' বলল মেয়েটি।

দাবীর দ্বিতীয় অংশটি সরাসরি নাকচ করে দেন আহমাদ কামাল। আলী বিন সুফিয়ান আহমদ কামালকে বাইরে নিয়ে যান। আহমদ কামাল বললেন, 'মেয়েটি মুসলমান হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও আমি তাকে দুশমন মনে করব।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'দেশ ও জাতির নিরাপত্তার স্বার্থে এতটুকু তোমাকে ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।' আহমদ কামাল সম্মতি দেন। কক্ষে প্রবেশ করে তিনি মেয়েটিকে বললেন, 'আমি যেহেতু এ যাবত তোমাকে অবিশ্বাস করে আসছি, তাই তোমাকে বিয়ে করতে আমি অস্বীকার করেছি। কিন্তু যদি তুমি প্রমাণ দিতে পার যে, আমাদের ধর্মের জন্য তোমার ত্যাগ স্বীকার করার স্পৃহা আছে, তাহলে আমি আজীবন তোমাকে ভালোবেসে যাব।'

আলী বিন সুফিয়ানকে উদ্দেশ করে মেয়েটি বলল, 'বলুন, আমাকে কী করতে হবে। আমিও দেখে ছাড়ব, মুসলমান প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কতটুকু পরিপক্ক। আমার আরো একটি শর্ত হল, অভিযানে আহমদ কামাল আমার সঙ্গে থাকবেন।

আলী বিন সুফিয়ান মেয়েটির এ শর্তও মেনে নেন এবং আহমদ কামাল ও মেয়েটির বাসস্থানের ব্যবস্থা করার আদেশ দেন। তারপর কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আহমদ কামালের উপস্থিতিতে মেয়েটিকে তার কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতে শুরু করেন।

✿✿✿

তিনদিনের মাথায় আলী বিন সুফিয়ানের প্রেরিত ছয়জন সৈনিক গন্তব্যে পৌঁছে যায়। তিন খৃষ্টান মেয়ে যেখান থেকে পলায়ন করেছিল, রজব যেখানে বন্দী আছে, হাবশীদের সেই দেবমন্দিরে এসে তারা উপনীত হয়। তারা সব ক'জন-ই উষ্ট্রারোহী। ছদ্মবেশে নয়– এসেছে তারা মিসরী ফৌজের পোষাকে। হাতে তাদের বর্শা ও তীর-তলোয়ার। পরিকল্পনা মোতাবেক তারা সরাসরি হাবশীদের দুর্গে ঢুকে পড়ে। হঠাৎ কোন্ দিক থেকে যেন একটি বর্শা এসে তাদের সম্মুখে মাটিতে বিদ্ধ হয়। এর অর্থ, থাম, আর এক পা-ও এগুবে না। তোমরা আমাদের দ্বারা অবরুদ্ধ। তারা থেমে যায়। পুরোহিত সামনে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে তার তিনজন হাবশী। হাতে তাদের বর্শা। পুরোহিত সতর্ক করে দিয়ে বলে,

তোমরা আমার গুপ্ত তীরান্দাজদের কবলে আছ। বাড়াবাড়ি করলে একজনও জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না।

তারা অস্ত্র সমর্পণ করে। হাতের বর্শা-তীর-তরবারী হাবশীদের সামনে ফেলে দেয়। উটের পিঠ থেকে নেমে আসে। কমান্ডার হাবশী পুরোহিতের সঙ্গে মোসাফাহা করে বলেন, 'আমরা আপনার সুহৃদ। বন্ধুত্ব নিয়ে-ই ফিরে যাব। আচ্ছা, মেয়ে তিনজনকে বলি দিয়েছেন আপনি?'

কম্পিত কণ্ঠে পুরোহিত জবাব দেন, 'না, কোন মেয়েরই বলি হয়নি! তা আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'আমরা মিসরী ফৌজের বিদ্রোহী সেনা। আমরা আপনাদের দেবতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাই। আপনাদের লোকেরা আমাদের বলেছে যে, দেবতার সমীপে নারী বলি না হওয়া-ই নাকি আপনাদের পরাজয়ের কারণ। আমরা রজবের সঙ্গে ছিলাম। আমরা তাকে বলেছিলাম, তিনটি ফিরিঙ্গী মেয়ে অপহরণ করে নিয়ে আসব এবং একটির স্থানে তিনটি মেয়ে বলি দিয়ে দেবতার কুমীরদের খাওয়াব। পরিকল্পনা মোতাবেক বহু দূর থেকে তিনটি মেয়ে অহরণ করে এনে আমরা তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। মেয়েদের নিয়ে সে এখানে চলে এসেছিল। বলির কাজ সম্পন্ন হল কি-না আমরা তার খোঁজ নিতে এলাম।' বললেন কমাণ্ডার।

ফাঁদে আটকে যান পুরোহিত। বললেন, রজব আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করেছে। তিনটি মেয়ে সে নিয়ে এসেছিল ঠিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কু-মতলব পেয়ে বসে তাকে। বলির জন্য আমার হাতে অর্পণ না করে বেটা ভাগিয়ে দিয়েছে ওদের। ধরা পড়ে গেছে নিজে। আমরা তাকে পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি। আচ্ছা, তোমরা কি আমাকে দু'টি মেয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পার? দেবতাদের অসন্তোষ যে দিন দিন বেড়ে-ই চলেছে!

'পারব মানে? অবশ্যই পারব। আপনি অপেক্ষা করুন; দেখবেন, অল্প ক'দিনের মধ্যে-ই আমরা মেয়ে নিয়ে হাজির হব। আমাদেরকে রজবের কাছে নিয়ে চলুন। মেয়েগুলো কোথায় আছে তাকে জিজ্ঞেস করি।' বললেন কমাণ্ডার।

তাদের সকলকে ভিতরে নিয়ে যান পুরোহিত। এক স্থানে চওড়া ও গোলাকার একটি মাটির পাত্র। সেটি আরেকটি পাত্র দিয়ে ঢাকা। পুরোহিত উপরের পাত্রটি তুলে সরিয়ে রেখে নীচের পাত্রে হাত দেন। আস্তে আস্তে হাত বের করে আনেন। হাতে রজবের মাথা। মুখমন্ডলের আকৃতি সম্পূর্ণ অবিকৃত। চোখ দু'টো আধা-খোলা। মুখ বন্ধ। টপ্‌টপ্ করে পানি ঝরছে মাথা থেকে। এগুলো কেমিক্যাল। মাথাটা যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য কেমিক্যাল দিয়ে রাখা হয়েছে। পুরোহিত বললেন, 'দেহটি কুমীরদের খেতে দিয়েছি। এর সঙ্গীদেরও আমরা জীবন্ত ঝিলে নিক্ষেপ করেছি। অভুক্ত কুমীরগুলো খেয়ে ফেলেছে ওদের।'

'মাথাটা আমাদেরকে দিয়ে দিন, সঙ্গীদের নিয়ে দেখাব আর বলব, যে-ই আংগুকের দেবতার অবমাননা করবে, তাকেই এই পরিণতি ভোগ করতে হবে।' বললেন কমাণ্ডার।

'দিতে পারি। তবে শর্ত হল, সূর্যাস্তের আগে-ই ফিরিয়ে দিতে হবে। আংগুকের দেবতা এর মালিক। ফেরত না দিলে তোমার মাথাটাও কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।' বললেন পুরোহিত।

***

তিনদিন পর। রজবের কর্তিত মস্তক পড়ে আছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পায়ের কাছে। গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান সুলতান।

সে রাতের-ই ঘটনা। বারান্দায় শুয়ে আছেন আহমদ কামাল ও মেয়েটি। ছ'দিন ধরে দু'জনে তারা থাকছেন একত্রে। মেয়েটির দাবী অনুযায়ী আহমদ কামালকে রাখা হয়েছে তার সাথে– এক ঘরে। মেয়েটি বলছে, এক্ষুণি সে মুসলমান হতে প্রস্তুত। আহমদ কামালকে সে বিয়ের জন্য তাড়া দিচ্ছে। কিন্তু আহমাদ কামাল বলছেন, 'আগে কর্তব্য পালন কর; তারপর বিয়ে।' মেয়েটি আশংকা ব্যক্ত করে যে, কাজ উদ্ধার করে তাকে ধোঁকা দেয়া হবে। আহমদ কামাল এখনও তাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এতদিনে মেয়েটির মনের সব ভয় দূর হয়ে গেছে। এখন শান্ত মনে ভাবতে পারছে সে।

আহমদ কামাল ও মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে বারান্দায়। বাইরে প্রহরায় নিয়োজিত একজন সিপাহী। মধ্য রাতের খানিক আগে প্রহরী হাঁটতে হাঁটতে সরে যায় অন্যদিকে। এমন সময়ে কে যেন পিছন থেকে ঘাড় চেপে ধরে মেয়েটির। সঙ্গে সঙ্গে কাপড় বেঁধে দেয়া হয় তার মুখে। রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় তার হাত-পা।

তারা চারজন। ঘরের দরজা ছিল বন্ধ। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে যায় একজন। আরেকজন তার কাঁধে পা রেখে দেয়াল টপকে প্রবেশ করে ভিতরে। ভিতর থেকে দরজা খুলে দেয় সে। বাকী তিনজনও ঢুকে পড়ে ভিতরে।

চারজনের মধ্যে অধিক সবল লোকটি মুখে কাপড় বেঁধে দেয় মেয়েটির। জাগতে না জাগতে মেয়েটিকে সে ঝাঁপটে ধরে কাঁধে তুলে নেয়। অপর তিনজন আহমদ কামালের মুখেও কাপড় পেঁচিয়ে, রশি দিয়ে হাত-পা শক্ত করে বেঁধে খাটের উপর-ই ফেলে রাখে। প্রতিরোধ করার সব সুযোগ বন্ধ করে দেয় তার। বাইরে নিয়ে গিয়ে মোটা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে নেয়া হয় মেয়েটিকে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে, কাঁধের বস্তুটি মানুষ।

শহর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে ফেরআউনী আমলের জীর্ণ-পরিত্যাক্ত বিশাল এক বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন এক ভুতের নগরী। ভীতিকর অনেক রূপকথা শোনা যায় বাড়িটির ব্যাপারে। যেমনঃ ভিতরে আছে উঁচু একটি পাথরের টিলা। এই টিলা কেটে নির্মাণ করা হয়েছে অসংখ্য কক্ষ। তার নীচে আছে আরো বেশ ক'টি কক্ষ। বাড়িটি সম্পর্কে যার সম্যক ধারণা আছে, ভিতরে প্রবেশ করে সে-ই কেবল ফিরে আসতে পারে। অন্যথায় মৃত্যু অবধারিত। পথ-ঘাট কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে গেছে, ঠাহর

রাখা দুষ্কর। দীর্ঘদিন ধরে এ বাড়িতে প্রবেশ করার সাহস করছে না কেউ। বাড়িটি এখন জিন-ভূত, দৈত্য-দানবের আবাস। সাপ-খোপ যে কত কি আছে, তার তো কোন ইয়ত্তা-ই নেই। সাপের ভয়ে বাড়ির পাশ দিয়েও হাঁটে না কেউ। এমনি আরো অনেক ভীতিপ্রদ কল্প-কাহিনী।

তথাপি এই চারজন মেয়েটিকে অপহরণ করে নিয়ে এই ভুতের বাড়িতে-ই ঢুকে পড়ে এবং বেরও হয় এমনভাবে যেন এখানেই তাদের বাস।

মেয়েটিকে নিয়ে তারা বাড়িটির গুহাসম কক্ষাদি ও আঁকা-বাঁকা ঘোর অন্ধকার অলি-গলি অতিক্রম করে অবাধে-অনায়াসে শাঁই শাঁই করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সামনে কতগুলো প্রদীপ জ্বলছে। তাদের পায়ের আওয়াজে চামচিকাগুলো উড়াউড়ি, ফড়ফড় করতে শুরু করে। টিকটিকি ও সরিসৃপগুলো ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে পালাতে থাকে। মাকড়সার জাল আর ময়লা-আবর্জনায় ভিতরটা পরিপূর্ণ।

মেয়েটিকে নিয়ে তারা পাথর কেটে নির্মিত একটি কক্ষে প্রবেশ করে। দীপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। আলো দিয়ে পথ দেখিয়ে আগে হাঁটতে শুরু করে লোকটি।

সামনে নীচে অবতরণের কয়েকটি সিঁড়ি। তারা সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ে। একদিকে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ে প্রশস্ত একটি কক্ষে। মেঝেতে বিছানা পাতা। বহুমূল্যের মনোরম একটি শতরঞ্জী শোভা পাচ্ছে তাতে। কক্ষটি বেশ সাজানো-গোছানো পরিপাটি। বিছানায় রেখে মুখের কাপড় সরিয়ে দেয়া হয় মেয়েটির। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মেয়েটি বলে, 'আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা হল কেন? আমি মরে যাব, কাউকে আমার কাছে আসতে দেব না।'

'ওখান থেকে যদি তুলে না আনা হত, তাহলে আগামীকাল-ই তোমাকে জল্লাদের হাতে অর্পণ করা হত। আমার নাম ফয়জুল ফাতেমী। তোমাকে আমার নিকট-ই আসবার কথা ছিল। আর দু'জন কোথায়? তুমি একা ধরা পড়লে কিভাবে? রজব কোথায়?' বলল এক ব্যক্তি।

নিশ্চিন্ত হল মেয়েটি। বলল, 'আমি যীশুর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। বড় বড় ভয়ানক বিপথ থেকে রক্ষা করে শেষ পর্যন্ত আমায় তিনি গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিলেন!' এই বলে মেয়েটি ফয়জুল ফাতেমীর নিকট রজব, হাবশী গোত্র, মরুঝড়, সঙ্গী দু'মেয়ের করুণ মৃত্যু ও আহমদ কামালের হাতে ধরা পড়া পর্যন্ত সব কাহিনী আনুপুংখ বিবৃত করে। ফয়জুল ফাতেমী তাকে সান্ত্বনা দেন এবং যে চার ব্যক্তি মেয়েটিকে অপহরণ করে এনে দিয়েছে, ছয়টি করে সোনার টুকরা দিয়ে বললেন, 'তোমরা নিজ নিজ পজিশনে অবস্থান নাও। আমি কিছুক্ষণ পরে চলে যাব। এই মেয়েটি তিন-চারদিন এখানে থাকবে। আমি রাতে রাতে আসব। বাইরের খোঁজাখুঁজি শেষ হয়ে গেলে ওকে এখান থেকে নিয়ে যাব।'

অপহরণকারী চার ব্যক্তি চলে যায় এবং ভবনটির চারদিকে এমনভাবে অবস্থান নিয়ে বসে, যেন বাইরের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা যায়।

ফয়জুল ফাতেমীর সঙ্গে এক ব্যক্তি থেকে যান। ইনি মিসরী ফৌজের একজন কমান্ডার। ফয়জুল ফাতেমী তার এই সাফল্যে বেশ উৎফুল্ল। পাশাপাশি অপর মেয়ে দু'টোর মৃত্যুতে শোকাহতও বটে। রজবের পরিণতির সংবাদ এখনো তার কানে

পৌঁছেনি। তিনি বললেন, 'রজবকে ওখান থেকে বের করে আনা আবশ্যক। সে সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যা করার একটা আয়োজন সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ আমি এখনো জানতে পারিনি। সম্ভবতঃ ফেদায়ীদের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছে। এ দু'টো লোককে হত্যা করা এ মুহূর্তে বড্ড প্রয়োজন। এখন আমার নতুন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে কাল-ই আমি তোমাকে বিষয়টি অবহিত করব। এখন তুমি বিশ্রাম কর, আমি এখন যাই।'

'আপনার উপর সালাহুদ্দীন আইউবীর আস্থা আছে কেমন?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'এত বেশী যে, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তিনি আমার পরামর্শ নেন।' জবাব দেন ফয়জুল ফাতেমী।

'আমি জানতে পারলাম যে, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে সালাহুদ্দীন আইউবীর ওফাদার লোকের সংখ্যা-ই অধিক। আর সেনাবাহিনীও তার অনুগত।' বলল মেয়েটি।

'কথা ঠিক। তাঁর গোয়েন্দা বিভাগ, এত-ই বিচক্ষণ ও সতর্ক যে, কোথাও কেউ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেই তাঁর খবর হয়ে যায়। তবে পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে আরো দু'জন লোক আছেন, যারা আইউবীর বিরুদ্ধে কাজ করছেন। মুহতারাম ফয়জুল ফাতেমী আপনাকে তাদের নাম বলতে পারবেন।' বলল মিসরী কমান্ডার।

ফয়জুল ফাতেমী দু'জনের নাম বললেন এবং মুচকি হেসে বললেন, তোমাকে উচ্চ পর্যায়েই কাজ করতে হবে। আপাততঃ তোমার দায়িত্ব দু'জন কর্মকর্তার মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা আর দু'জনকে বিষ খাওয়ানো, তোমার পক্ষে তা একেবারে সহজ। তবে সমস্যা হল, তোমাকে প্রকাশ্য সভা-সমাবেশে নিতে পারব না। তোমাকে পর্দানশীল মুসলিম নারীর বেশ ধরে কাজ করতে হবে। নতুবা ধরা পড়ে যাবে। এমনও হতে পারে, আমি তোমাকে ফিলিস্তীন ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে তোমার স্থলে অন্য মেয়ে আনিয়ে নেব, যাকে এখানকার কেউ চিনবে না। আমি যে গ্রুপ তৈরি করেছি, তার সদস্যরা অত্যন্ত বিচক্ষণ, অতীব তৎপর। সালারের নীচের কমান্ডার পর্যায়ের লোক তারা। এই চার ব্যক্তি– যারা এত বীরত্বের সাথে তোমাকে তুলে আনল– সে গ্রুপের-ই লোক।

আইউবীর বাহিনীতে আমরা অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে দেয়ার কাজ শুরু করেছি। সেনাবাহিনী ও জনগণের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করা জরুরী। বর্তমান অবস্থাটা হল, সিরীয় ও তুর্ক বাহিনী সদাচার, উন্নত চরিত্র এবং যুদ্ধের স্পৃহার কারণে মিসরীদের কাছে বেশ সমাদৃত ও শ্রদ্ধার পাত্র। সুদানীদেরকে পরাজিত করে তারা নগরবাসীদের মনে আরো শক্ত আসন গেড়ে নিয়েছে। সেনাবাহিনীর এই মর্যাদাকে আমাদের ক্ষুণ্ন করতে হবে। অপদস্থ করতে হবে সালার ও অপরাপর সামরিক কর্মকর্তাদের। এছাড়া আমরা ক্রুসেডার ও সুদানীদের আর কোন সাহায্য করতে পারি না। সরাসরি আক্রমণ কখনো সফল হবে না।

আইউবীর সেনাবাহিনী তাকে কামিয়াব হতে দিবে না। দেশের জনগণ সঙ্গ দেবে সেনাবাহিনীর। মিসরের একদিক থেকে যদি খৃষ্টানরা আর অপরদিক থেকে সুদানীরা একযোগেও হামলা চালায়, তবু আইউবীকে তারা পরাস্ত করতে পারবে না। তখন দেশের জনগণ আর সেনাবাহিনী মিলে কায়রোকে একটি শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করবে। কায়রোকে জয় করার জন্য আগে আমাদের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। জনসাধারণের চিন্তা-চেতনায় অলিক ধ্যান-ধারণা ও সংশয় প্রবণতা এবং যুবকদের চরিত্রে যৌনপূজা ও লাম্পট্য সৃষ্টি করতে হবে।'

'আমাকে তো অবহিত করা হয়েছিল, এ কাজ দু'বছর ধরে চলে আসছে।' বলল মেয়েটি।

'তা ঠিক। বেশ সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। আগের তুলনায় অপকর্ম বেড়েছে। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী একে তো নতুন ধরনের মাদ্রাসা খুলেছেন, দ্বিতীয়তঃ মসজিদগুলোতে খোতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিয়ে ভিন্ন এক চমক সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া তিনি মেয়েদেরকেও সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেছেন।' বললেন ফয়জুল ফাতেমী।

ফয়জুল ফাতেমী আরো কি যেন বলতে চাইছিলেন। এমন সময়ে একজন প্রহরী হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ফয়জুল ফাতেমীকে বলে, 'এ মুহূর্তে আপনি বেরুবেন না। বাইরে সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

ফয়জুল ফাতেমী ঘাবড়ে যান। প্রহরীর সঙ্গে কক্ষের বাইরে চলে আসেন। একটি উঁচু জায়গায় চুপিসারে বসে বাইরের দিকে তাকান। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। দিনের আলোর ন্যায় বাইরের সবকি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ইতিউতি তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এ যে আইউবীর সৈন্য! ঘোড়াও তো আছে দেখছি! চারদিক ভাল করে দেখে আস, আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাতে পারি!'

'দেখা আমার হয়ে গেছে। কোন দিকে পালাবার পথ নেই। তারা পুরো প্রাসাদ ঘিরে রেখেছে। আপনি ওখানেই চলে যান। বাতিগুলো নিভিয়ে দিন। ওখান থেকে বের হলে ভুল করবেন। শত্রুরা ঐ পর্যন্ত পৌছুতে পারবে না।' বলল প্রহরী।

ফয়জুল ফাতেমী অদৃশ্য হয়ে যান। প্রহরী উঁচুস্থান থেকে নেমে ভিতরে না গিয়ে দেয়ালের গা ঘেঁষে সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে যায়। বাইরে পঞ্চাশজন পদাতিক সৈনিক। অশ্বারোহী বিশ-পঁচিশজন। তারা গোটা প্রাসাদটিকে অবরোধ করে রেখেছে। লোকটি পা টিপে টিপে চলে যায় তাদের নিকট। এক সৈনিককে জিজ্ঞেস করে 'আলী বিন সুফিয়ান কোথায়?' ইংগিতে আলীকে দেখিয়ে দেয় সৈনিক। প্রহরী দৌড়ে যায় তাঁর কাছে। আলীর সঙ্গে আহমদ কামাল। প্রহরী বলল, 'ভিতরে কোন আশংকা নেই। আপনার সঙ্গে আর দু'জন লোক হলেই চলবে। আমার সঙ্গে আসুন।'

যে চারজন লোক মেয়েটিকে অপহরণ করে এনেছিল, এ প্রহরী তাদের-ই একজন।

দু'টি মশাল প্রজ্বলিত করান আলী। আহমদ কামাল এবং চার সৈনিককে সঙ্গে নেন। দু'জনের হাতে দু'টি মশাল ধরিয়ে দেন, তরবারী কোষমুক্ত করেন সকলে। প্রহরীর পিছনে পিছনে ঢুকে পড়েন ভিতরে। ফয়জুল ফাতেমীর প্রহরী এখন আলী বিন সুফিয়ানের রাহ্‌বার। হঠাৎ কে একজন একদিক থেকে ছুটে এসে শাঁ করে চলে যায় ভিতরে। রাহ্‌বর বলল, 'এই যে গেল, বেটা ওদের লোক। টের পেয়ে ভিতরের লোকদেরকে সতর্ক করতে গেল। আপনারা আরো দ্রুত হাঁটুন।' তীব্রবেগে এগিয়ে চললেন তারা। পথ দেখিয়ে নেয়ার কেউ না থাকলে এই আঁকা-বাঁকা পথে ঢুকে তারা দিশে হারিয়ে ফেলত কিংবা ভয়ে পালাতে বাধ্য হত। কিন্তু এখন তারা রাহ্‌বরের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দেই অগ্রসর হচ্ছে। অন্য একদিক থেকে দৌড়ে এল আরেকজন। পার্শ্ব দিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, 'আমি ওদিকে যাচ্ছি। আপনারা আরো তাড়াতাড়ি আসুন।' এ লোকটি রাহ্‌বরের সঙ্গী।

নীচে অবতরণের সিঁড়ির পার্শ্বের কক্ষে পৌঁছে যান আলী। নীচের কক্ষ থেকে কথার শব্দ ভেসে আসে তাঁর কানে, 'আমরা প্রতারণার শিকার। এরা দু'জন ওদের লোক।' তারপর তরবারীর সংঘর্ষের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে কথা বলার আওয়াজ, 'একেও শেষ করে দাও, যেন কোন সাক্ষ্য দিতে না পারে।'

মশালধারীদের পিছনে পিছনে দ্রুতগতিতে নীচে নেমে পড়েন আলী বিন সুফিয়ান ও আহমদ কামাল। রক্তের জোয়ার বইছে কক্ষে। দু' হাতে পেট চেপে ধরে বসে আছে মেয়েটি। ফয়জুল ফাতেমীর সঙ্গে যে মিসরী কমান্ডার বসা ছিল, সে এবং আরেক ব্যক্তি লড়ছে ফয়জুল ফাতেমী ও তার এক প্রহরীর সঙ্গে। ফয়জুল ফাতেমীকে অস্ত্রত্যাগ করতে বললেন আলী বিন সুফিয়ান। সে হাতের তরবারী ছুঁড়ে ফেলে। আহমদ কামাল দৌড়ে যান মেয়েটির কাছে। পেট বিদীর্ণ হয়ে গেছে তার। বিছানার চাদরটি টেনে নিয়ে আহমদ কামাল মেয়েটির পেটটা কষে বেঁধে দেন এবং আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, 'অনুমতি হলে একে আমি বাইরে নিয়ে যাই।' আলীর অনুমতি পেয়ে আহমদ কামাল মেয়েটিকে নিজের দু' বাহুর উপর তুলে নেন। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছিল মেয়েটি। বড় কষ্ট হচ্ছিল তার। তারপরও মুখে হাসি টেনে বলল, 'আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি; তোমাদের আসামীকে আমি ধরিয়ে দিয়েছি।'

ফয়জুল ফাতেমীকে এবং যে চারজন লোক মেয়েটিকে অপহরণ করেছিল, তাদের দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। বাকী দু'জন আর ফয়জুল ফাতেমীর সঙ্গে থাকা মিসরী কমান্ডার আলী বিন সুফিয়ানের লোক।

এটি ছিল একটি নাটক। ফয়জুল ফাতেমীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করার জন্য এ নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। মেয়েটি সহযোগিতা করেছে পুরোপুরি। কিন্তু আহত হয় নিজে।

নাটকটি এভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল যে, মেয়েটির গ্রুপের একজন অপরজনের পরিচয় লাভের জন্য যেসব গোপন সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করার কথা, তার থেকে সেই ভাষা জেনে নেয়া হয়। মেয়েটি আরও জানিয়েছে যে, তার আগমন করার কথা ফয়জুল ফাতেমীর নিকট। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর তিনজন বিচক্ষণ গোয়েন্দাকে কাজে লাগান। তাদের একজন ছিলেন কমান্ডার পদের লোক। তাদেরকে গোপন ভাষা শিখিয়ে দিয়ে বলা হয়, ফয়জুল ফাতেমীর নিকট গিয়ে তাকে বলবে, তিন মেয়ের একজন এখানে এসে গেছে। কিন্তু সে অমুকের হাতে অমুক ঘরে বন্দী। সেখান থেকে তাকে সহজে বের করে আনা যায়। তাদেরকে একথাও বলা হয় যে, ফয়জুল ফাতেমীকে একটি ভূয়া পয়গাম শোনাবে যে, রজব যে করে হোক, মেয়েটিকে রক্ষা করতে এবং তৎপরতা জোরদার করতে বলেছেন।

আলী বিন সুফিয়ানের নিয়োজিত গুপ্তচররা তিনদিনের মধ্যে ফয়জুল ফাতেমীর নাগাল পেতে সক্ষম হয় এবং তাকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, তারা তার গুপ্ত বাহিনীর সদস্য। ফয়জুল ফাতেমী এ আশংকাও বোধ করেন যে, বন্দী মেয়েটি নির্যাতনের মুখে তার সংশ্লিষ্টতার কথা ফাঁস করে দিতে পারে। তাই বিলম্ব না করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। আলী বিন সুফিয়ানের প্রেরিত কমান্ডারকে তিনি নিজের কাছে রেখে দেন। অবশিষ্ট তিনজনের দু'জন আর নিজের দু' ব্যক্তিকে নিয়ে চারজনের হাতে মেয়েটিকে তুলে আনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। মেয়েটিকে অপহরণ করে ফেরআউনী আমলের যে জীর্ণ ভবনটিতে পৌঁছিয়ে দেয়ার কথা, সে ভবনটিকে ফয়জুল ফাতেমী বেশ কিছুদিন ধরে তাদের গোপন আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

ফয়জুল ফাতেমীর এ পরিকল্পনার বিস্তারিত রিপোর্ট আলী বিন সুফিয়ানের কানে চলে আসে। কোন্ দিন কখন এই অভিযান পরিচালিত হবে, আলী বিন সুফিয়ান তা-ও অবগত হন। আহমদ কামাল ও মেয়েটিকে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বলা হয়, এ রাতে মেয়েটিকে অপহরণ করা হবে। তোমরা বারান্দায় ঘুমাবে। আক্রমণ হলে প্রতিরোধের চেষ্টা করবে না।

মেয়ে ও আহমদ কামালের বাসস্থানের বাইরে প্রহরায় নিয়োজিত লোকটি গোয়েন্দা বিভাগের একজন সদস্য। কোন রাতে কিভাবে আক্রমণ হবে, তার কী করণীয়, সব তার জানা ছিল। আক্রমণকারীরা ছিল আলী বিন সুফিয়ানের লোক। ফয়জুল ফাতেমীর লোক হলে খঞ্জরের আঘাতে তাকে খুন করত আগে।

এ রাতে ফয়জুল ফাতেমী ও কমান্ডার জীর্ণ ভবনে চলে যান। নির্দিষ্ট সময়ে অপহরণ অভিযান শুরু হয়। পাহারাদার আগেই এক দিকে কেটে পড়ে। অপহরণকারী দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ করে। আহমদ কামাল জাগ্রত। কিন্তু ঘুমের ভান করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। মেয়েটিকে তুলে নিয়ে অপহরণকারীরা যখন তার হাত-পা বাঁধতে

শুরু করে, তখন তিনি ছট্‌ফট্‌ করতে শুরু করেন। অপহরণকারীরা মেয়েটিকে নির্ধারিত স্থানে পৌছিয়ে দেয়।

অপহরণের পর আলী বিন সুফিয়ান এসে আহমদ কামালের হাত-পায়ের বন্ধন খুলে দেন। পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী পূর্ব থেকে-ই প্রস্তুত ছিল। অল্পক্ষণ পর তারা ফয়জুল ফাতেমীর আস্তানা অভিমুখে রওনা হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক তারা ভবনটিকে ঘিরে ফেলেন।

ভিতর থেকে আলী বিন সুফিয়ানেরই এক ব্যক্তি তাদের দেখে কক্ষে গিয়ে ফয়জুল ফাতেমীকে সংবাদ দেয়। ফয়জুল ফাতেমীকে কক্ষের বাইরে নিয়ে এসে অবরোধ দেখিয়ে তাকে কক্ষে চলে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। তার-ই পরামর্শে ফয়জুল ফাতেমী বের হওয়ার চেষ্টা না করে তার গোপন কক্ষে চলে যায়।

লোকটি আলী বিন সুফিয়ান ও আহমদ কামালকে ভিতরে নিয়ে যায়। পথ দেখিয়ে পৌছিয়ে দেয় ফয়জুল ফাতেমীর কক্ষে। ঠিক শেষ মুহূর্তে ফয়জুল ফাতেমী বুঝতে পারে যে, মিসরী কমান্ডার এবং মেয়েটির সংবাদ নিয়ে আসা দুই ব্যক্তি আসলে তার দলের লোক নয়। তিনি প্রতারণার শিকার। মেয়েটি একটি ভুল করেছে, তার মুখ থেকে এমন কিছু কথা বেরিয়ে গেছে, যাতে ফয়জুল ফাতেমী বুঝে ফেলেছেন, সে-ও এ প্রতারণায় জড়িত।

বিপদ দেখে ফয়জুল ফাতেমীর দু' প্রহরী চলে যায় তার কাছে। কক্ষের ভিতরে লড়াই শুরু হয়ে যায়। ফয়জুল ফাতেমী তরবারীর পিঠ দিয়ে আঘাত করে মেয়েটিকে আহত করে। পেট কেটে যায় তার।

ফয়জুল ফাতেমী ও তার দুই সঙ্গীকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন আলী। তিনজনকে আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখেন। তাদেরকে রজবের কর্তিত মাথা দেখিয়ে বলেন, 'বন্ধুর পরিণতি দেখে নাও। তবে সরাসরি হত্যা করে আমি তোমাদের সাজা শেষ করে দেব না। দেশদ্রোহী ঈমান-বিক্রেতাদের দলে আর কে কে আছে, তোমাদের মুখ থেকে তা বের করে ছাড়ব। গাদ্দারীর পরিণতি যে কত ভয়াবহ, হাড়ে হাড়ে টের পাবে তোমরা। তোমাদেরকে আমি মরতেও দেব না, বাঁচতেও দেব না।'

আহত মেয়েটির অবস্থা ভাল নয়। সর্বশক্তি ব্যয় করে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে ডাক্তারগণ। কিন্তু তার কাটা নাড়ি-ভুড়ি জোড়া দেয়া গেল না। কিন্তু তারপরও মেয়েটি নিশ্চিন্ত-উৎফুল্ল, যেন তার কিছু-ই হয়নি। দাবি তার একটি-ই, বিদায় বেলা আহমদ কামালকে আমার শিয়রে বসিয়ে রাখুন। পলকের জন্য আহমদ কামালকে চোখের আড়ালে যেতে দিচ্ছে না সে।

সুলতান আইউবী মেয়েটিকে দেখতে আসেন। আহমদ কামাল তার মাথার কাছে বসা। সুলতান কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াতে উদ্ধত হন তিনি। কিন্তু

মেয়েটি খপ্ করে তার হাত ধরে টান দিয়ে বসিয়ে ফেলে তাকে। সমস্যায় পড়ে যান আহমদ কামাল। সুলতানের উপস্থিতিতে তিনি বসতে পারেন না। সংকোচে মাথা নুয়ে আসে তার। সুলতান তাকে মেয়েটির কাছে বসবার অনুমতি দেন। সুলতান সস্নেহে মেয়েটির মাথায় হাত বুলান, সুস্থতার জন্য দোয়া করেন।

তৃতীয় রাত্র। আহমদ কামাল বসে আসেন মেয়েটির শিয়রে। হঠাৎ মেয়েটি চোখ তুলে তাকায় আহমদ কামালের প্রতি। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'আহমদ! তুমি আমায় বিয়ে করে নিয়েছ, না? আমি আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। তুমিও তোমার ওয়াদা পূরণ করেছ! আল্লাহ আমার সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন . . . . .।'

কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠে মেয়েটির। আহমদ কামালের ডান হাতটি নিজের দু'হাতে চেপে ধরা ছিল তার। ধীরে ধীরে শ্লথ হয়ে আসে হাতের বন্ধন। টের পান আহমদ কামাল। কালেমা তাইয়্যেবা পড়তে পড়তে আহমদ কামাল মেয়েটিকে তুলে দেন আল্লাহর হাতে। পর দিন সুলতান আইউবীর নির্দেশে মেয়েটিকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

দু' দিনের নির্যাতনেই ফয়জুল ফাতেমী ও তার সঙ্গীদ্বয় দলের সকলের নাম বলে দেয়। গ্রেফতার করা হয় তাদেরও। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদী লিখেছেন, ফয়জুল ফাতেমীর মৃত্যুদণ্ডাদেশে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে অঝোরে কেঁদে ফেলেছিলেন সুলতান আইউবী।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে আটকিয়ে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

আবাবীল পাবলিকেশন্স

সিরিজ ::
নারীর ফাঁদ-২
ঐতিহাসিক উপন্যাস
ঈমানদীপ্ত
দাস্তান
আলতামাস

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

২

নারীর ফাঁদ-২

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

আবাবীল পাবলিকেশন্স

নারীর ফাঁদ-২
ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

প্রকাশক
মাওলানা আবদুল করীম
চেয়ারম্যান, আবাবীল পাবলিকেশন্স
১৩/১, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
জুলাই-২০০১
তৃতীয় প্রকাশ (সংশোধিত ও পরিমার্জিত)
জুলাই-২০০৩

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার, ঢাকা

মুদ্রণ
কালার সিটি

গ্রাফিক্স
কালার ক্রিয়েশন

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

IMANDIPTO DASTAN-2 : BY ALTAMAS. PUBLISHED BY MAULANA ABDUL KARIM, ABABIL PUBLICATIONS, 13/1, KARKONBARI LANE, DHAKA-1100. 1ST EDITION : JULY 2001, 3RD EDITION JULY 2003

PRICE : TAKA 100.00 ONLY

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে– বিশেষতঃ মিসর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। তারা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দুঃসাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিল, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হল সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

বইটির মূল লেখক পাকিস্তানের প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাস। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত মূল বইটির নাম 'দাস্তান ঈমান ফোরোশূ কী'। আল্লাহ তাআলার পরম অনুগ্রহে অন্তত ৭-৮ খণ্ডে সমাপ্য অনূদিত সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'-এর এটি দ্বিতীয় খণ্ড। একে একে অপর খণ্ডগুলোও যাতে আমরা যথাসময়ে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করেন।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

বিনীত

মাওলানা আবদুল করীম

চেয়ারম্যান

আবাবীল পাবলিকেশন্স

সূচীপত্রঃ

*বিষ..৭

*আই্ওনা নয় আয়েশা....................৬৩

*বিদ্রোহ....................................১০৯

*ভয়ংকর ষড়যন্ত্র..........................১৪৫

*রাইনি আলেকজান্ডার-এর চূড়ান্ত লড়াই....২০১

বিষ

১১৭১ সালের ঘটনা।

কায়রোর একটি মসজিদ। মসজিদটি বেশী বড়ও নয়, তেমন ছোটও নয়। জুমার জামাত অনুষ্ঠিত না হলেও পাঞ্জেগানা জামাতে মুসল্লি হয় প্রচুর।

শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এ মসজিদ-এলাকায় বাস করে মধ্যম ও নিম্নবিত্তের মানুষ। ধর্মের প্রতি এখনো তারা বেশ অনুরাগী। আবেগপূর্ণ আকর্ষণীয় কথায় সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তবে তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মিসর এসে যেসব নতুন সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে এই এলাকার লোকেরাই ভর্তি হয়েছিল বেশী। তার কারণ ছিল দু'টি। প্রথমতঃ এটি জীবিকা নির্বাহের একটি মাধ্যম। সালাহুদ্দীন আইউবী তার সৈন্যদের আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা ও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন। দ্বিতীয়তঃ জিহাদ যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আমল, তা তাদের ভাল করেই জানা ছিল। ইসলামের জন্য জীবন দিতে তারা প্রস্তুত থাকত সর্বক্ষণ। সে যুগে তাদের মত চেতনাসম্পন্ন মর্দে মুমিনের প্রয়োজন ছিল অপরিসীম। সরকারীভাবে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, খৃষ্টজগত ইসলামী দুনিয়ার নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছে। বীর বিক্রমে তাদের মোকাবেলা করে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে জিহাদের ময়দানে।

ছয়-সাত মাস হল, অখ্যাত এ মসজিদটির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিক। এই খ্যাতির কারণ নতুন ইমাম, যিনি প্রতিদিন ঈশার নামাযের পর আকর্ষণীয় দরস প্রদান করছেন।

আগের ইমাম তিনদিন আগে মারা গেছেন। তিনি দুঃসহ পেটব্যাথা আর অম্ল জ্বালায় ভুগছিলেন। অভিজ্ঞ ডাক্তার-হেকিম কেউ-ই তার এ রোগের কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি। অবশেষে এ রোগেই তিনি মারা যান। তিনি একজন সাধারণ মৌলভী ছিলেন। শুধু পাঞ্জেগানা জামাতের ইমামতি করতেন। এর অতিরিক্ত কোন যোগ্যতা তার ছিল না।

ইমামের মৃত্যুর ঠিক আগের দিন অচেনা এক মৌলভী এসে হাজির হন মসজিদে। লোকটির গৌরবর্ণ চেহারা। সুঠাম দেহ। মুখজোড়া ঘন লম্বা দাড়ি। সঙ্গে আপাদমস্তক

কালো বোরকায় আবৃতা দু'জন মহিলা। সম্পর্কে তার স্ত্রী। দুই স্ত্রী নিয়ে তিনি এতদিন কোন এক ঝুপড়িতে বাস করতেন।

আলাপ-পরিচয়ের পর আগন্তুক অত্র মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব পালন করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বেতন-ভাতার প্রয়োজন নেই। মুসল্লিদের খাতির-সমাদরও তার নিষ্প্রয়োজন। কারো হাদিয়া-নজরানাও গ্রহণ করবেন না। প্রয়োজন শুধু মানসম্পন্ন প্রশস্ত একটি বাসস্থান, যেন তিনি সেখানে দুই স্ত্রীসহ সম্মান ও পর্দার সাথে বাস করতে পারেন।

মুসল্লিরা তার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে নেয়। তারা মসজিদের সন্নিকটে একাধিক কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়িও তাকে খালি করে দেয়। দুই স্ত্রীকে নিয়ে সেই বাড়িতে এসে উঠেন নতুন ইমাম। স্ত্রী দু'জন কালো বোরকায় আবৃতা। হাতে-পায়ে কালো মোটা মোজা। দেহের কোন অংশ পর-পুরুষের চোখে পড়ার জো নেই। এমন পর্দানশীল মহিলা এ যুগে কমই চোখে পড়ে। মুসল্লিরা ঘরের জরুরী আসবাব-পত্রের ব্যবস্থাও করে দেয়। বাহ্যিক আচার-আচরণ দেখে তাদের মনে নতুন ইমামের প্রতি বেশ শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে একজন যোগ্য ইমাম পেয়ে গেছি, এই তাদের বিশ্বাস।

প্রথমবারের মত মিনারে দাঁড়িয়ে আযান দেন নতুন ইমাম। সে কি যাদুমাখা সুরেলা কণ্ঠ! যতদূর পর্যন্ত তার আযানের আওয়াজ পৌঁছে, সর্বত্র যেন নেমে আসে এক স্বর্গীয় নিস্তব্ধতা। গোটা প্রকৃতিকে মাতাল করে তুলছে যেন তার আযানের মধুর আওয়াজ। তার যাদুময় আযানের চুম্বকার্ষণে তারাও মসজিদপানে ছুটে আসে, ইতিপূর্বে যারা নামায পড়ত ঘরে, কিংবা আদৌ নামাযে অভ্যস্থ ছিল না।

প্রথম রাতেই তিনি ঈশার নামাযের পর মসজিদে দর্‌স প্রদান করেন। পরে ঘোষণা দেন যে, এভাবে প্রতি রাতেই তিনি দর্‌স প্রদান করবেন। নতুন ইমামের বয়ান শুনে মুসল্লিরা বেজায় খুশি।

ছয়-সাত মাস সময়ে নতুন ইমাম মুসল্লিদেরকে তার নিবেদিতপ্রাণ ভক্তে পরিণত করেন। অনেকে তার মুরীদও হয়ে যায়।

কায়রোর সেই মসজিদে এতকাল জুমার নামায অনুষ্ঠিত হত না। নতুন ইমাম এবার জুমার নামাযও চালু করেন।

দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সেই অখ্যাত মসজিদ এবং নতুন ইমামের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। শহর থেকেও কিছু লোক ইমামের দর্‌সে যোগ দিতে শুরু করে।

ইমাম ইসলামের যে দু'টি মৌলিক বিষয়ের উপর জোরালো বক্তব্য দিতেন, তাহল, ইবাদত ও সম্প্রীতি। দর্‌সে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের বিপক্ষে সবক দিতেন। মানুষের চিন্তা-চেতনায় তিনি এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেন যে, মানুষের ভাল-মন্দ

সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। ভাগ্য পরিবর্তনে মানুষের কোন দখল নেই। মানুষ দুর্বল প্রকৃতির একটি প্রাণী মাত্র।

বড় ক্রিয়াশীল ইমামের বয়ান। তিনি কুরআন হাতে নিয়ে বয়ান করতেন। যে কোন বিষয়ে বয়ান করার সময় কুরআনের কোন না কোন আয়াত বের করে তার আলোকে বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে দিতেন। তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। প্রায় সময়-ই তিনি বলতেন, মিসরের বড় খোশনসীব যে, সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মত এক মহান নেতা তার রাজত্ব করছেন।

ইমাম জিহাদের এমন দর্শন ও ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা সেখানকার লোকদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন। তবু বিনা বাক্যব্যয়ে অবলীলায় তারা তার সেই ব্যাখ্যা মেনে নেয়।

এক রাতে ইশার নামাযের পর ইমাম দর্স দিচ্ছেন। হঠাৎ এক কোণ থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'মুহতারাম! আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন। আপনার বিদ্যার আলো জিন-পরী এবং আমরা চোখে দেখি না এমন মাখলুক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন। আমরা আট বন্ধু বহু দূর থেকে আপনার মূল্যবান বয়ান শুনতে এসেছি। এসেছি আপনার সুনাম-সুখ্যাতি শুনে। যদি গোস্তাখী না হয় এবং যদি আপনি বিরক্তিবোধ না করেন, তাহলে আমাদেরকে জিহাদ সম্পর্কে আরো কিছু বলুন। জিহাদের ব্যাপারে আমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছি। মানুষ বলছে, জিহাদ সম্পর্কে নাকি আমাদেরকে ভুল ধারণা দেয়া হচ্ছে।'

মসজিদের বিভিন্ন স্থান থেকে আরো সাতটি কণ্ঠ সমস্বরে বলে উঠে, 'আমরা এমন ওয়াজ জীবনে আর কখনো শুনিনি। দয়া করে আপনি আরো বলুন। জিহাদ বিষয়টি আমাদের খোলাসা করে বুঝিয়ে দিন।

'মহামান্য ইমাম যা বললেন, তা-ই নির্ভুল এবং সময়োপযোগী বক্তব্য। অন্যরা আমাদেরকে বিকৃত ধারণা দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। আমরা সঠিক বক্তব্য শুনতে চাই।' বলল একজন।

ইমাম বললেন, এটি কুরআনের আওয়াজ। ইনশাআল্লাহ, কেউ একে বিকৃত করতে পারবে না। যা সত্য, যা সঠিক, তা আমি বলব-ই। প্রয়োজনে একই কথা হাজার বার বলতে হলেও আমি তা প্রতিটি মানুষের কানে পৌঁছিয়ে দেব। অন্যের ভূখন্ড দখল করার উদ্দেশ্যে মানুষ খুন করার নাম জিহাদ নয়। জিহাদ অর্থ হত্যা-লুণ্ঠন বা খুন-খারাবীও নয়।

ইমাম কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করে তার এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন–

'আমার নিজের কথা নয়– স্বয়ং আল্লাহই বলেছেন যে, তোমরা পাপাচারের বিরুদ্ধে লড়াই কর। এর-ই নাম জিহাদ। এই জিহাদ-ই আমাদের সকলের উপর

ফরজ। কেন, আপনারা কি শুনেননি যে, ইসলাম তরবারীর জোরে নয়- মমতার জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? জিহাদের রূপ বিকৃত হয়েছে পরে। আর তা করেছে রাজা-বাদশাহদের তল্পিবাহক আলেমরা। আজ খৃষ্টানরা যেমন অন্যের দেশ দখল করে নিজেদের সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করার জন্য লড়াই করাকে 'ক্রুসেড' বলছে, তেমনি মুসলমানরাও একই উদ্দেশ্যে হত্যা-লুণ্ঠন করাকে 'জিহাদ' আখ্যা দিচ্ছে। মূলতঃ এ-সব ক্ষমতা দখলের একটি কৌশল মাত্র। নিরীহ জনসাধারণকে ধর্মের নামে উত্তেজিত করে যুদ্ধে নামিয়ে রাজা-বাদশাহরা তাদের ক্ষমতার ভিত্তি পাকাপোক্ত করছে মাত্র। আমি জাতিকে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে চাই।'

'তবে কি মিসরের আমীর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে যুদ্ধে নামিয়েছেন?' প্রশ্ন করলেন একজন।

'না, সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। বড়রা তাকে যা করতে বলেছে, একজন খাঁটি মুসলমানের ন্যায় সম্পূর্ণ নেক নিয়তে তিনি তার-ই উপর আমল করছেন। তার অন্তরে খৃষ্টানদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে, তিনি সে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করছেন। আচ্ছা, খৃষ্টান আর মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কী? দু'জনের নবী তো অভিন্ন! পরে না কিছুটা ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) যেমন ভালবাসা ও শান্তির পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন, তেমনি আমাদের রাসূল (সাঃ)-ও তো প্রেম-ভালবাসার পয়গাম দিয়ে গেছেন! তাহলে এই তরবারীগুলো আসল কোত্থেকে? আল্লাহ্র এই প্রিয় ভূমিতে- যেখানে একমাত্র তাঁর-ই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা- সেখানে যারা আপন প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এবং আল্লাহ্র বান্দাদেরকে নিজেদের গোলামে পরিণত করতে চায়, এসব তাদের-ই আবিষ্কার। আমি মিসরের আমীরের দরবারে যাব। তার সামনে জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরব। তিনি অবশ্য সঠিক জিহাদের কার্যক্রম শুরু করেও দিয়েছেন। তা হলো, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জিহাদ। জুমার খোতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিয়ে তিনি বিরাট জিহাদ করেছেন। মাদ্রাসা খুলেও তিনি জিহাদ করেছেন। তবে মাদ্রাসাগুলোয় ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণ চালু করে তিনি ভাল করেননি। কোমলমতি শিশুদেরকে তিনি আল্লাহ্র নামে লুট-তরাজের সবক দিচ্ছেন। তার মাদ্রাসাগুলোতে অসি চালনা আর তীরান্দাজির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আপনি যদি আপনার সন্তানের হাতে তরবারী আর তীর-ধনুক তুলে দেন, তাহলে তাদেরকে একথাও বলতে হবে যে, এর দ্বারা তুমি অমুককে খুন করে আস। কিছু লোককে দেখিয়ে আপনাকে বলতে হবে, অমুক তোমার দুশমন, তাকে হত্যা কর।'

ইমামের কণ্ঠে এত প্রভাব আর প্রমাণ-উপস্থাপনায় এত আকর্ষণ যে, তার বক্তব্য শুনে শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়ে। তিনি বললেন-

'আপন সন্তানদেরকে তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। নতুবা তাদের সঙ্গে তোমাদেরও জাহান্নামে যেতে হবে। কারণ, সন্তানদেরকে ভুল পথে তুলে দেয়ার জন্য তোমরাও দায়ী। তোমাদের রাজা-বাদশাহ আর সেনাপতিরা তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। নিবেন সেই আলেমে দ্বীন, যাঁর হাতে ধর্ম ও ইলমের প্রদীপ। দুনিয়ার জীবনে যদি তোমরা আলেমের পিছনে চল, তাহলে কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। কিয়ামতের দিন যার হাত মানুষের রক্তে রঞ্জিত থাকবে, হাজারো নেক আমল এবং নামায-রোযা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আরো একটি সূক্ষ্ম কথা বুঝে নাও। তোমরা যাকাত দাও কাকে? বাইতুল মালকে তো? যখন যিনি দেশের শাসক থাকেন, বাইতুল মালের মালিক হন তিনি। আর যাকাত হল গরীব-অসহায়ের হক। শাসক তো গরীব হন না। বাইতুল মালে তোমরা যে যাকাত জমা দাও, তা দ্বারা ঘোড়া আর অস্ত্র ক্রয় করা হয়। অস্ত্রের কাজ হল মানুষ ধ্বংস করা। তার মানে, যে ফরজ আদায় করে তোমরা জান্নাতে যেতে পারতে, সেই ফরজ আদায় করে তোমরা জাহান্নামে ঠিকানা করে নিচ্ছ। তাই বলছি, তোমরা যাকাত আর বাইতুল মালে দিও না।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ইমাম আরো বললেন–

'অনেক কথা সাধারণ মানুষের বুঝে আসে না। কেউ তাদেরকে বলেও না। তোমরা কি দেখছ না যে, তোমাদের মধ্যে একটি পশুবৃত্তি আছে? কেন, তোমরা কি নারীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব কর না? এই পশুবৃত্তি-ই কি তোমাদেরকে পাপের অন্ধগলিতে নিয়ে যায় না? মানুষের এই বৃত্তিটা মানুষ সৃষ্টি করেনি– করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। তোমরা এই পশুবৃত্তিকে দমন করতে পার। এর-ই জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রে ঘরে চারটি করে স্ত্রী রাখতে আদেশ করেছেন। অর্থের অভাবে যদি তোমরা একজন স্ত্রী রাখতেও সক্ষম না হও, তাহলে কোন নারীকে পারিশ্রমিক দিয়ে তোমরা এই পশুবৃত্তি নিবারণ করতে পার। আরে! মানুষ তো সেই পশুবৃত্তির-ই এক ফসল। তবু তোমরা পাপ থেকে বেঁচে থাক। ঘরে এক এক, দু' দু', তিন তিন ও চার চারজন করে স্ত্রী রাখ। আর স্ত্রী ও কন্যাদেরকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে লুকিয়ে রাখ। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আজ যুবতী মেয়েদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ঘোড়সাওয়ারী ও উটসাওয়ারী শেখান হচ্ছে। মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন করে সেখানে মেয়েদেরকে যুদ্ধাহতদের সেবার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শেখান হচ্ছে, কিভাবে তারা আহত মুজাহিদের জখমে পট্টি বাঁধবে। এ এক বেদআত কাজ। এই ঘৃণ্য বেদআত থেকে তোমরা তোমাদের বোন-কন্যাদেরকে হেফাজত কর। তোমাদের বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের যারা মসজিদে আসে না, আমার এ কথাগুলো তাদেরও কানে দাও। আল্লাহ্র বিধানে তোমরা হস্তক্ষেপ কর না। এটি মস্তবড় পাপ।'

ইমামের দর্‌স সমাপ্ত হয়। শ্রোতারা উঠে ইমামের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে যেতে শুরু করে। সেদিন বয়ানে এত বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম হয়েছিল যে, মসজিদের ভিতরে জায়গা না পেয়ে বহু লোক বাইরে দাঁড়িয়ে বয়ান শ্রবণ করে।

সুযোগ মত অনেকে ইমামের হাতে চুম্বনও করে। মাথা ঝুঁকিয়ে মোসাফাহা করতে বাদ দেইনি একজনও।

একজন একজন করে চলে গেছে সবাই। শুধু দু'জন লোক ইমামের সামনে বসা। তাদের একজন সেই ব্যক্তি, যে ইমামের কাছে জিহাদ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য শুনতে আবদার করেছিল। গায়ে তার লম্বা জুব্বা। মাথায় ছোট্ট একটি পাগড়ী। পাগড়ীর উপর চওড়া ফুলদার রুমাল। মুখে লম্বা কালো দাড়ি। ঘন গোঁফ। পোশাকে তাকে মধ্যবিত্ত লোক বলে মনে হল। তার একটি চোখের উপর পট্টির মত সবুজ বর্ণের এক চিলতে কাপড়। কাপড় খন্ডটি দু'টি সুতা দিয়ে মাথার সঙ্গে বাঁধা।

ইমামের জিজ্ঞাসার জবাবে সে জানাল, তার এ চোখটি নষ্ট।

দ্বিতীয় ব্যক্তির পোশাকও ছিল সাধাসিধে। তারও লম্বা ঘন দাড়ি। তারা দু'জন-ই এখন মসজিদে ইমামের সামনে বসা। অপর ছয় সঙ্গী– যারা জিহাদের সবক নিতে এসেছিল– মসজিদের বাইরে দন্ডায়মান, যেন তারা সঙ্গীদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

'কেন, তোমাদের সন্দেহ এখনো দূর হয়নি?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন ইমাম।

'হ্যাঁ, আমাদের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেছে।' চোখে পট্টিওয়ালা ব্যক্তি জবাব দেয়।

'আমরা বোধ হয় আপনাকেই খুঁজে ফিরছি। আমরা মিসরের অর্ধেকটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেছি। বোধ হয়, আমাদেরকে মসজিদের অবস্থান সম্পর্কে ভুল নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল।'

'কেন, মিসরের অর্ধেকেও আমার চেয়ে ভাল আলেম খুঁজে পাওনি বুঝি?'

'খুঁজছি যে শুধু আপনাকে-ই। আমরা কি সঠিক জায়গায় এসে পৌঁছিনি? আপনার দর্‌স বলছে, আমরা আপনাকেই খোঁজ করছি।' জবাব দেয় একজন।

ইমাম বাইরের দিকে তাকালেন এবং নির্লিপ্তের মত বললেন, 'জানি না, আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে!'

'বৃষ্টি আসবে।' পট্টিওয়ালা জবাব দেয়।

'আকাশ তো বিলকুল পরিস্কার।' ইমাম বললেন।

'আমরা মেঘ নিয়ে আসব।' বলেই পট্টিওয়ালা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

ইমাম মুচকি হাসলেন এবং চাপাকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে এসেছ?'

'এক মাস ইসকান্দারিয়ায় ছিলাম। তার আগে শোবকে।'

'মুসলমান?'

'ফেদায়ী, তবে এখনো মুসলমান-ই মনে করুন।' বলে সঙ্গীর প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করে বিকট শব্দে হেসে উঠে পট্টিওয়ালা।

'আমি আপনাকে ওস্তাদ মানছি। এ-যে আপনি, আমার বিশ্বাস-ই হতে চাচ্ছে না। আপনি ব্যর্থ হতে পারেন না।' বলল দ্বিতীয়জন।

'তবে সফলতা অত সহজও নয়। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে হয়ত তোমরা জান না। আমি সর্বস্তরের মানুষের অন্তরে জিহাদ ও যৌনতা সম্পর্কে ইসলামী ধ্যান-ধারণার বিপরীত ধারা ঢুকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সালাহুদ্দীন যে মাদ্রাসা খুলেছে, তা সম্ভবতঃ আমাদের প্রচেষ্টাকে সহজে সফল হতে দিবে না। আচ্ছা, তুমি আমাকে জিহাদ সম্পর্কে বলতে বলেছিলে কেন?' ইমাম বললেন।

শোবকে আমাদেরকে বলা হয়েছিল, জিহাদ সম্পর্কীয় আলোচনা-ই আপনার সবচে' বড় পরিচয়। দর্সে আপনি যা বলেছেন, তা ওখানেই আমাদেরকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমাদেরকে আরো বলা হয়েছিল, জিহাদের পর আপনি অবশ্যই যৌনতা নিয়ে আলোচনা করবেন। আপনি আপনার সবক বেশ ভাল করেই রপ্ত করেছেন।" বলল পট্টিওয়ালা।

'আমার নাম কি?' ইমাম জিজ্ঞেস করেন।

আপনি কি আমাদেরকে পরীক্ষা নিতে চাচ্ছেন? আমাদের উপর কি আপনার সন্দেহ হচ্ছে? নাম নয়– আমাদেরকে পরস্পরের সংকেত শেখান হয়।' পট্টিওয়ালার জবাব।

'তোমরা কী উদ্দেশ্যে এসেছ?' জানতে চান ইমাম।

'ফেদায়ী কেন আসে?' পট্টিওয়ালার পাল্টা প্রশ্ন।

'তোমাদেরকে আমার নিকট কেন পাঠান হয়েছে?' জিজ্ঞেস করেন ইমাম।

'একটি উষ্ট্রীর জন্য।' আপনার কাছে দু'টি আছে। আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠান হত না। কিন্তু আপনি জেনে থাকবেন যে, সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর এক নায়েব সালার রজব সুদানীর সঙ্গে শোবক থেকে তিনটি উষ্ট্রী প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের একটি ছিল আমাদের জন্য। কিন্তু কী হয়েছে জানি না, তিনটি-ই মারা গেছে। রজবের বিচ্ছিন্ন মস্তক আর সবচে' রূপসী উষ্ট্রীটি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর নিকটে পৌঁছে গেছে। সেটিও শেষ হয়ে গেছে।' বলল একজন।

বেদনার নিঃশ্বাস ছেড়ে ইমাম বললেন, 'হ্যাঁ, জানি। আমাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল। আইয়ুবীর এই দক্ষ কমাণ্ডারকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে আমাদের বড় কাজ হত। কিন্তু জল্লাদ তাকে শেষ করে দিল। আচ্ছা, এবার ভিতরে চলুন, এ স্থান নিরাপদ নয়।'

দুই আগন্তুক ইমামের সঙ্গে উঠে মসজিদের বাইরে চলে আসেন। বাইরে অপেক্ষমান ছয় সঙ্গী অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

❁ ❁ ❁

তারা ইমামের ঘরে প্রবেশ করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। একাধিক কক্ষ। দু'তিনটি কক্ষ অতিক্রম করে ইমাম তাদের অপর একটি কক্ষের সামনে নিয়ে যান। কক্ষটির অবস্থান মাটির উপরে হলেও দেখতে তা মাটির নীচে বলে মনে হয়। কক্ষের সম্মুখে খড়-কুটো ছড়ানো। দরজা তালাবদ্ধ। বুঝা গেল, কয়েক বছর ধরে তালাটি খোলা-ই হয়নি, খোলা যাবেও না।

কক্ষের এক পার্শ্বে জানালা। জানালায় হাত লাগান ইমাম। খুলে যায় জানালা। ইমাম ভিতরে প্রবেশ করেন। পিছনে তারা দু'জন।

ভিতর দিক থেকে কক্ষটি বেশ সাজানো-গোছানো। দেয়ালে ঝুলছে একটি সোনার ক্রুশ। তার একদিকে হাতে আঁকা ঈসা (আঃ)-এর প্রতিকৃতি আর অপরদিকে মা মরিয়মের ছবি। ইমাম বললেন, 'এটি আমার গীর্জা, আমার আশ্রম।'

'তা বিপদের মুহূর্তে আপনার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কী?' জানতে চায় সবুজ পট্টিওয়ালা। 'ক্রুশ এবং ছবিগুলো এভাবে চোখের সামনে না রাখা উচিৎ' বলেও পরামর্শ দেয় সে।

'এ পর্যন্ত কারো আগমনের আশংকা নেই।' ইমাম জবাব দেন এবং হেসে বলেন, 'মুসলমান বড় সরল ও আবেগপ্রবণ জাতি। আবেগঘন জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনেই তারা জীবন দিতে শুরু করে। জৈবিক চাহিদা মানুষের সবচে' বড় দুর্বলতা। মুসলমানদের মধ্যে আমি এই দুর্বলতাকে উস্কে দিচ্ছি। তাদের আমি সবক দিচ্ছি যে, এক একজনের চারটি করে বিয়ে করা ফরজ। আমি ধীরে ধীরে তাদেরকে বিপথগামিতার প্রতি আগ্রহী করে তুলছি। ধর্মের নামে মুসলমানদের তোমরা ভালো-মন্দ দু-ই করতে পার। কুরআন হাতে নিয়ে কথা বললে এরা বোকামীসুলভ কথাও মেনে নেয়, মিথ্যাকেও সত্য বলে বিশ্বাস করে ফেলে। আমার পরীক্ষা সফল। এখানে আমি আমার-ই মত এমন একদল লোক তৈরি করে নেব, যারা মসজিদে বসে কুরআন হাতে নিয়ে মুসলমানদের জিহাদী জয্‌বা আর নৈতিকতাকে নিঃশেষ করে দেবে। আমি নারী সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিচ্ছি। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী নারীদেরকেও সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে। আমি তাদের বলছি, নারীদেরকে তোমরা ঘরে আবদ্ধ করে রাখ। এ জাতির অর্ধেক জনশক্তিকে আমি বেকার করে ছাড়ব।'

'সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ মানুষ আর সেনা সদস্যদের এক করে তিনি বড় সাফল্য অর্জন করেছেন। এ মুহূর্তে যদি তিনি জেরুজালেম জয় করার ঘোষণা দেন, তাহলে মিসরের সব মানুষ তার পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়বে।' বলল সবুজ পট্টিওয়ালার সঙ্গী।

'কিন্তু, এমন ঘোষণা তিনি দেবেন না। তিনি বুদ্ধিমান। আবেগপ্রবণ লোকদের

তিনি পছন্দ করেন না। তিনি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিককে আবেগপ্রবণ অপ্রশিক্ষিত একশত লোকের উপর প্রাধান্য দেন। আইউবী একজন বাস্তববাদী মানুষ। অন্তঃসারশূন্য সস্তা শ্লোগানে তিনি জাতিকে ক্ষেপান না।

আমাদের কাজ, বাস্তবতা ও প্রশিক্ষণ থেকে এ জাতিকে দূরে রাখা এবং আরো আবেগপ্রবণ করে তোলা। হুঁশ বলতে তাদের কিছু-ই থাকবে না– থাকবে শুধু জোশ। জোশের বশবর্তী হয়ে তারা ভুলে যাবে বাস্তবতা আর বিবেক-বুদ্ধির কথা। দুশমনের প্রথম আঘাতেই তারা দমে যাবে। শুনেছ তো, দর্সে আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর কেমন প্রশংসা করলাম? এটা আমার কূট-কৌশলের-ই অংশ।'

'এসব কথা আমরা পরে বলব। আগে আমাদেরকে উষ্ট্রী দু'টো দেখান এবং বলুন, এখানে কখন কিভাবে আমরা আশ্রয় পেতে পারি, এখানে আপনার অন্য কোন লোক থাকে কি?'

'না, এখানে আর কেউ থাকে না।' বললেন ইমাম।

আগন্তুকদের ব্যাপারে ইমাম এখন সন্দেহমুক্ত। গোপন সাংকেতিক শব্দ দ্বারা তিনি তাদের চিনে ফেলেছেন।

ইমাম কক্ষ থেকে বের হয়ে যান। খানিক পরে ফিরে আসেন। সঙ্গে তার চোখ ঝলসানো দু'টি অনুপম রূপসী যুবতী। এরা-ই সেই দু' মেয়ে, যাদেরকে তিনি নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এনেছিলেন আপাদমস্তক কালো বোরকায় ঢেকে। কিন্তু এখন সেই পর্দা নেই। দেহের অর্ধেকটা-ই এখন তাদের অনাবৃত। ইমাম আগন্তুকদের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং আলমারী থেকে মদের বোতল বের করে আনেন। এক মেয়ে গ্লাস এনে তাতে মদ ঢেলে মেহমানদের সামনে রাখে।

'এসব পরে হবে, আগে কাজের কথা বলে নিই।' বলল সবুজ পট্টিওয়ালা ব্যক্তি।

'আমাদের দু' ব্যক্তিকে হত্যা করতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবীকে আর আলী বিন সুফিয়ানকে। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা তাদেরকে চিনি না। আপনি দেখিয়ে দেবেন। আপনি কি ওদের দেখেছেন কখনো?' বলল অপরজন।

'দেখেছি মানে? এত দেখেছি যে, ঘোর অন্ধকারেও আমি তাদেরকে চিনতে পারব। আমি যে অভিযান শুরু করেছি, তার সাফল্যের জন্য ওদেরকে চিনে রাখা ছিল অপরিহার্য। আলী বিন সুফিয়ান এত-ই বিচক্ষণ, এত-ই অভিজ্ঞ যে, কোন গোয়েন্দা না পাঠিয়ে তিনি নিজেই আমার এখানে চলে আসতে পারেন। তবে আমার সামনে ছদ্মবেশে এলেও আমি তাকে চিনে ফেলব।' বললেন ইমাম।

'আর সালাহুদ্দীন আইউবীর ব্যাপারে আপনার ধারণা কী?' পট্টিওয়ালা জিজ্ঞেস করে।

'তাকেও বেশ ভাল চিনি।' বললেন ইমাম।

চোখে সবুজ পট্টিওয়ালা ব্যক্তি তার হাত দু'খানা নিজের কান আর মাথার

মধ্যখানে নিয়ে আসে। দাড়ি ধরে ঝটকা টান মারে নীচের দিকে। লম্বা কৃত্রিম দাড়ি আর ঘন গোঁফ চেহারা থেকে আলগা হয়ে যায়। চোখের উপর রাখা সবুজ পট্টিও খুলে ছুড়ে ফেলে। ফুটে উঠে তার আসল রূপ।

ইমাম যেখানে বসা ছিলেন, সেখানেই মূর্তির মত বসে রইলেন। বিস্ফারিত অপলক নেত্রে মুখ হা করে তাকিয়ে রইলেন মুখোশহীন আগন্তুকের প্রতি। মেয়ে দু'টো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা একবার লোকটির প্রতি, একবার ইমামের প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। রক্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ইমামের দেহ। এবার দুনিয়া জোড়া বিস্ময় ও ভয়জড়িত ইমামের কাঁপা কণ্ঠ ঃ 'সালাহুদ্দীন আইউবী!'

'হ্যাঁ, দোস্ত! আমি সালাহুদ্দীন আইউবী। সুনাম শুনে আপনার দর্‌স শুনতে এসেছিলাম।'

আইউবী এবার তার সঙ্গীর দাড়ি মুঠি করে ধরে ঝটকা এক টান দেন। চেহারা থেকে পৃথক হয়ে আসে দাড়ি। বললেন, 'একেও বোধ হয় চিনেন?'

'হ্যাঁ চিনি। আলী বিন সুফিয়ান।' ভয়ার্ত কণ্ঠে জবাব দেন ইমাম।

হঠাৎ মেয়ে দু'টো এবং ইমাম পিছনে দৌড়ে গিয়ে আলমারী খুলে হাতে তরবারী তুলে নেয়। কিন্তু পিছনে মোড় ঘুরিয়েই তারা থমকে যায়। উদ্যত তরবারীগুলো আপসে অধঃনমিত হয়ে যায় তাদের। কারণ, ইতিমধ্যে আইউবী আর আলী বিন সুফিয়ানের জুব্বার ভিতরে লুকানো তরবারীও তাদের হাতে এসে গেছে। অসি চালনায় প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও দুই পেশাদার যোদ্ধার মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারল না মেয়ে দু'টো। ছিনিয়ে নেয়া হল তাদের হাতের অস্ত্র।

আলী বিন সুফিয়ান বাইরে ছুটে যান। খানিক পর বাইরে অপেক্ষমান অপর ছয় সঙ্গীও উদ্যত তরবারী হাতে ভিতরে প্রবেশ করেন।

পরদিন মসজিদের সামনে এলাকাবাসীদের প্রচন্ড ভীড় জমে যায়। কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা পালাক্রমে তাদের নিয়ে যাচ্ছে ইমামের গোপন কক্ষে। জনতাকে ইমামের ঘর দেখান হল, দেখান হলো দেয়ালে ঝুলান ঈসা ও মরিয়মের প্রতিকৃতি আর সারি সারি সাজানো মদের বোতল। কর্মকর্তাগণ জনতার সামনে তুলে ধরেন ছদ্মবেশী ইমামের আসল রূপ।

খৃষ্টানরা সারা দেশে, বিশেষ করে কায়রোতে বিপুলসংখ্যক গুপ্তচর ও সন্ত্রাসী ছড়িয়ে দিয়েছিল। তার মোকাবেলায় সালাহুদ্দীন আইউবীর দিক-নির্দেশনায় আলী বিন সুফিয়ান দেশময় গোয়েন্দার জাল বিছিয়ে দেন। খৃষ্টানদের ইসলামী সভ্যতা ধ্বংসের অভিযান-ই আইউবীকে বেশী অস্থির করে তোলে।

আলী বিন সুফিয়ান যখন তাঁকে অবহিত করেন যে, এক মসজিদের পেশ ইমাম প্রতি রাতে মসজিদে দর্‌স দিচ্ছেন এবং ইসলামী চিন্তাধারাকে বিকৃত করছেন, তখন

আইউবী সঙ্গে সঙ্গে-ই তাকে গ্রেফতার করে আনার আদেশ দেননি। রিপোর্ট শুনে তিনি বলেছিলেন, 'আলী! ধর্ম নিয়ে ফের্কাবাজি শুরু হয়েছে। এই ইমামও কোন এক ফেরকার লোক হবেন হয়ত। এমনও হতে পারে যে, তিনি কুরআনের নিজস্ব ব্যাখ্যা-ই পেশ করছেন। ধর্মের ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমি শাসক, আলেম নই। লোকটিকে যদি তুমি কুচক্রী মনে কর, তাহলে গ্রেফতার করার আগে উত্তমরূপে যাচাই করে দেখ। একজন ইমামের মর্যাদা আমার চেয়ে অনেক উঁচু।'

আলী বিন সুফিয়ান দর্স শুনতে নিজে সেই মসজিদে যাননি। তার সন্দেহ ছিল যে, যদি এই ইমাম সত্যি-ই দুশমনের নিয়োজিত কুচক্রী-ই হয়ে থাকে, তাহলে সে তাকে চিনে থাকবে নিশ্চয়। তাই তিনি কয়েকজন বিচক্ষণ গুপ্তচরকে মসজিদে প্রেরণ করেন। তারা দশ-বার বার মসজিদে যায় এবং যে দর্স শোনে, তা আনুপূর্বিক আলী বিন সুফিয়ানকে শোনায়। সর্বশেষ এক রাতে ইমাম জিহাদের উপর এক দর্স প্রদান করেন এবং জিহাদের ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা পেশ করেন। গুপ্তচররা আলী বিন সুফিয়ানের নিকট রিপোর্ট করে। আলী বিন সুফিয়ান রিপোর্টটি আইউবীকে শোনান এবং অভিমত পেশ করেন যে, এই লোকটি যদি ক্রুসেডারদের চর কিংবা সন্ত্রসী না-ও হয়, তবু তাকে গ্রেফতার করা কিংবা নিবৃত্ত করা জরুরী। কারণ, সে জিহাদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করছে, যা কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে হয়ত শত্রুপক্ষের লোক অন্যথায় মাতাল।

সালাহুদ্দীন আইউবী বেশ মনোযোগ সহকারে রিপোর্টটি শ্রবণ করেন এবং বলেন, ঘটনা যা-ই হোক, বিষয়টি বড় স্পর্শকাতর। ধর্ম, মসজিদ ও ইমামের ব্যাপার। আমাদের ভেবে-চিন্তে পা ফেলতে হবে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, আলী বিন সুফিয়ানকে নিয়ে নিজেই ছদ্মবেশে ইমামের দর্স শুনতে যাবেন। 'জিহাদের সঙ্গে যৌনতার আলোচনা'র অভিযোগ আইউবীকে বেশী ভাবিয়ে তুলে। আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি একটি ছদ্মবেশ নির্ণয় করেন।

গোয়েন্দাবৃত্তি করা এবং গোয়েন্দাবৃত্তি প্রতিরোধে আলী বিন সুফিয়ান একজন ঝানু লোক। যে খৃষ্টান মেয়েকে দিয়ে তিনি ফয়জুল ফাতেমীকে গ্রেফতার করিয়েছিলেন এবং আহমাদ কামাল নামক এক কমাণ্ডারের হাতে যে মেয়ে মুসলমান হয়ে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল, সেই মেয়ে খৃষ্টান গোয়েন্দাদের সাংকেতিক ভাষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিল আলী বিন সুফিয়ানকে। তারই দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী আলী বেশ ক'জন মুসলমানকে গ্রেফতারও করেছিলেন, যারা অর্থ আর রূপসী নারীর বিনিময়ে ঈমান বিক্রি করে খৃষ্টানদের পক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। ধরা পড়ার পর চাপের মুখে তারাও স্বীকার করেছিল, হ্যাঁ খৃষ্টান গোয়েন্দাদের মধ্যে এসব ভাষা ও সংকেত ব্যবহৃত হয়।

খৃষ্টান গোয়েন্দারা অপরিচিত লোককে নিজের দলের লোক কিনা যাচাই করার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'জানি না, আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে।' কথাটা সে এমন নির্লিপ্তের মত বলবে, যেন এমনিতেই হঠাৎ তার আবহাওয়ার কথা মনে পড়ে গেছে। এখন অপরজন যদি তাদের দলের লোক হয়, তাহলে বলে 'বৃষ্টি আসবে'। তারপর প্রথমজন বলে, 'আকাশ তো বিলকুল পরিষ্কার'। দ্বিতীয়জন বলে, 'আমরা মেঘ নিয়ে আসব'। বলেই সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার তাৎপর্য হলো, যেন পাশের মানুষও শুনতে পায় কিংবা অপর ব্যক্তি গোয়েন্দা না হলে সে বুঝবে যে, এ লোকটি ঠাট্টা করছে।

আলী বিন সুফিয়ানকে এ তথ্যও প্রদান করা হয়েছিল যে, তাদের এই সাংকেতিক সংলাপ যদি কখনো শত্রুদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়, তখন-ই কেবল তা পরিবর্তন করা হবে। অন্যথায় এ সংকেত-ই ব্যবহার করা হবে।

আলী বিন সুফিয়ান আরো জানতে পেয়েছিলেন যে, খৃষ্টান গোয়েন্দারা কখনো একে অপরের নাম বলে না। তাদের হেডকোয়ার্টার ফিলিস্তীনের প্রত্যন্ত এক পল্লীতে। নাম তার শোবক। এই শোবক-ই ক্রুসেডারদের চরবৃত্তির প্রাণকেন্দ্র।

এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ান ছদ্মবেশে কায়রোর সেই মসজিদে গমন করেন। তারা জিহাদ বিষয়ক বয়ানের আবদার জানালে ইমাম তাদের আবদার পূরণ করেন। দর্স শেষে নির্জনে বসে সেই গোপন সাংকেতিক সংলাপের মাধ্যমে ইমামকে কুপোকাত করে ফেলেন তারা। পরে তিনি বলেও ছিলেন যে, আমি অত কাঁচা গোয়েন্দা ছিলাম না যে, অপরিচিত মানুষের সামনে মনের সব গোপন কথা প্রকাশ করব।

আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানের সাংকেতিক সংলাপ-ই তাকে ফাঁদে ফেলেছে। কারণ, সেই সংলাপ ছিল উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। সাধারণ গোয়েন্দারা তা জানত না। তাছাড়া এই সাংকেতিক সংলাপের শেষে অট্টহাসিতে ফেটে পড়াও ছিল বিশেষ তাৎপর্যবহ। যথাসময়ে এই হাসির অভিনয় করতে না পারলে খৃষ্টান গোয়েন্দারা গোপনীয়তা ফাঁস করত না অন্যের কাছে। সেজন্যেই সালাহুদ্দীন আইউবী সংলাপ শেষে অট্টহাসির অভিনয় করেছিলেন। সাথে তিনি ছয়জন জানবাজ সৈন্যও নিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে সময়ে তারা সাহায্য করতে পারে।

তিনজনকে বন্দী করে রেখে তদন্ত শুরু করলেন আলী বিন সুফিয়ান। প্রথমে সেই এলাকায় গিয়ে খোঁজ নিলেন, লোকটি কিভাবে এই মসজিদের দখলদারিত্ব হাতে নিল এবং তার আগে সে যে ঝুপড়িতে বাস করত, তা তাকে কে দিয়েছিল?

স্থানীয় লোকদের বিবরণে আলী জানতে পারলেন যে, দুই স্ত্রীসহ লোকটি এ অঞ্চলে আসে। প্রথমে একজনের ঘরে মেহমান হয়ে থাকে কিছুদিন। ধীরে ধীরে মানুষ যখন বুঝতে পারল যে, লোকটি আসলে বড় একজন আলেম, তখন স্ত্রীদেরসহ বসবাসের জন্য তাকে ঐ ঝুপড়িটি দেয়া হয়। নামায পড়তে আসতেন তিনি এ মসজিদে। আস্তে আস্তে ভাব গড়ে তোলেন মসজিদের ইমামের সঙ্গে।

পনের-ষোলদিন পর মসজিদে নামাযের মধ্যে-ই ইমাম সাহেবের পেটব্যাথা শুরু হয়। ধীরে ধীরে ব্যাথা এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, এখন আর মসজিদে আসতেই পারছেন না। ডাক্তাররা ঔষধ দেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তৃতীয় দিনে প্রচন্ড ব্যাথ্যা নিয়ে-ই ইমাম সাহেব মারা যান।

এ সুযোগে উক্ত আলেম মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব হাতে নেয়। অল্প ক'দিনের মধ্যে সে সমাজে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, মুসল্লিরা তার ভক্ত হয়ে যায় এবং স্ত্রীদের নিয়ে বাস করার জন্য একটি ঘর দিয়ে দেয়।

আলী বিন সুফিয়ানের প্রশ্নের জবাবে লোকেরা জানায়, তারা একাধিকবার তাকে পুরাতন ইমামের জন্য খাবার নিয়ে যেতে দেখেছে। আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, লোকটি ইমাম সাহেবকে বিষ খাইয়েছে এবং পথের কাঁটা সরিয়ে নিজে মসজিদের দখলদারিত্ব হাত করেছে।

গোয়েন্দা ইমামের বাসভবনে তল্লাশী চালান হল। পাওয়া গেল বিপুলসংখ্যক অস্ত্র। অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখা ছিল ভবনের বিভিন্ন জায়গায়। পাওয়া গেল পুটুলীভরা বিষ। বিষগুলো খাওয়ান হল একটি কুকুরকে। বিষ খেয়ে কুকুরটি অস্থির হয়ে পড়ে। উলট-পালট করতে থাকে তিনদিন পর্যন্ত। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় কুকুরটি মারা যায়।

আলী বিন সুফিয়ান তদন্ত রিপোর্ট পেশ করলেন আইউবীর সামনে। রিপোর্ট শুনে আইউবী বললেন–

'বন্দীদশায় ওদেরকে অস্থির করে তোল, ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখ সারাক্ষণ। কিন্তু আমি ওদেরকে জল্লাদের হাতে দেব না, কয়েদখানায়ও ফেলে রাখব না।'

'কী করবেন তাহলে?' জিজ্ঞেস করলেন আলী।

'মুক্তি দিয়ে আমি ওদেরকে সসম্মানে ফেরত পাঠাব।' বললেন আইউবী।

আলী বিন সুফিয়ান বিস্ময়ভরা অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন আইউবীর প্রতি।

আইউবী বললেন, 'আমি একটি জুয়া খেলতে চাই, আলী!

এখন আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কর না। আমি ভাবছি, এই বাজি লাগাব কি না।'

খানিক নীরবতার পর তিনি আবার বললেন, 'আগামীকাল দুপুরের আহারের পর নায়েব সালার, উপদেষ্টা ও উচ্চ পর্যায়ের কমাণ্ডার এবং প্রশাসনের প্রত্যেক বিভাগীয় কর্মকর্তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তুমিও থাকবে।'

❁ ❁ ❁

দিন শেষে রাত এল। আলী বিন সুফিয়ান এই প্রথমবারের মত বন্দী আলেমকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। কিন্তু বুঝা গেল, লোকটি বড় কঠিনপ্রাণ। আলীর এক প্রশ্নের জবাবে আলেম বলল–

'মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো শোন আলী বিন সুফিয়ান! আমরা দু'জন একই ময়দানের সৈনিক। তুমি যদি আমার দেশে ধরা পড়, তাহলে আমার তো বিশ্বাস, তুমি জীবন দেবে, তবু দেশ ও জাতিকে ধোঁকা দেবে না! আমাকে তুমি একই রকম মনে কর। আমি জানি, আমার পরিণতি কী হবে। আমার কাছে তুমি যা কিছু জানতে চাও, যদি আমি সব বলেও দিই, তবু তোমরা আমাকে ক্ষমা করবে না। জল্লাদের হাতে হোক কিংবা নির্যাতনের শিকার হয়ে হোক এই অন্ধকার কুঠরিতে-ই আমাকে মরতে হবে। তাহলে বল, জাতির সঙ্গে প্রতারণা কেন করব আমি?'

'আমার আশা, তুমি তোমার ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটাবে।' কেন, মেয়ে দু'টোর সম্ভ্রম রক্ষার খাতিরেও কি তুমি মুখ খুলবে না?'

'সম্ভ্রম? ওদের সম্ভ্রম বলতে কিছু নেই। সম্ভ্রম-সতীত্বের বিসর্জন দেয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে-ই ওদের মাঠে নামান হয়। আমরা জীবন আর সম্ভ্রম দূরে ছুঁড়ে ফেলে আসি। ওদের আছে শুধু রূপ আর পুরুষের মনকাড়া ছলনা। এ-ই ওদের সম্পদ। এ দিয়েই ওরা পাথরকে মোমে পরিণত করে। ওদের সঙ্গে তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার। আমার চোখের সামনে ওদের অপমান করলেও আমি কিছু বলব না। ওরাও আপত্তি করবে না।'

'গোয়েন্দা মেয়েদেরকে আমরা মৃত্যুদন্ড দিয়ে থাকি– অপমান করি না। আমাদের ধর্ম আমাদেরকে নারী নির্যাতনের অনুমতি দেয় না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'দোস্ত! মমতার লোভ দেখাও বা নির্যাতনের ভয় দেখাও, কোন অস্ত্র-ই তোমার সফল হবে না। আমাদের কারুর মুখ থেকে আমাদের সে সহকর্মীদের নাম-পরিচয় উদ্ধার করতে তুমি পরবে না, যারা তোমাদের শাসন ক্ষমতার শীর্ষস্থান দখল করে আছে। বন্দী মেয়েদের সঙ্গে তুমি সদ্ব্যবহারের ওয়াদা করেছ। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে এতটুকু বলতে পারি যে, এটা তোমার-আমার লড়াই নয়। এ লড়াই ক্রুসেড বনাম চাঁদ-তারার লড়াই। আমি সাধারণ গোয়েন্দা নই যে, এদিকের খবর ওদিকে, ওদিকের খবর এদিকে আদান-প্রদান করব। আমি গোয়েন্দা বিভাগের একজন শীর্ষ অফিসার। আমি আলেম। খৃষ্ট ও ইসলাম উভয় ধর্মে সমান পারদর্শী। ইঞ্জীল ও কুরআন উভয় গ্রন্থের তলা পর্যন্ত হাতড়িয়েছি। আমি স্বীকার করি, তোমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ ও সরল-সহজ। ইসলাম সব মানুষের ধর্ম। কোন জটিলতা নেই এতে। আর ইসলামের গ্রহণযোগ্যতার কারণও এটাই। কিন্তু পাশাপাশি তোমাদেরকে আমি এ

কথাও বলে দিতে চাই যে, শত্রুরা তোমাদের ধর্মের মৌলিকত্ব নষ্ট করে দিচ্ছে, যাতে এর গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট হয়। মুসলমান আলেমের বেশ ধারণ করে ইসলামের মধ্যে বহু ভিত্তিহীন বর্ণনা ঢুকিয়ে দিয়েছে তোমাদের শত্রুরা। ইসলাম ছিল কুসংস্কারবিরোধী ধর্ম। কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতি হল মুসলমান। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য গ্রহণের সময় মুসলমানদের আমি সেজদা করতে দেখেছি। দেখেছি এ সময় নজরানা দিতে। তাছাড়া এমন বহু বেদআত আছে, যাকে মুসলমানরা দ্বীনের অংশ বলে বিশ্বাস করে।' বলল, গোয়েন্দা আলেম।

'দীর্ঘদিন যাবত আমরা তোমাদের মূল চিন্তাধারাকে ধ্বংস করে আসছি। আমরা জানি, পৃথিবীতে মাত্র দু'টি ধর্ম টিকে থাকবে। খৃষ্টবাদ ও ইসলাম। আর দু'টির যে কোন একটি খতম না হওয়া পর্যন্ত তাদের পরস্পর লড়াই অব্যাহত থাকবে। আমরা জানি, তীর-তরবারী দ্বারা কোন ধর্মকে-ই বিলুপ্ত করা যায় না। প্রচারণার মাধ্যমেও নয়। এর একটি মাত্র পথ, যা আমরা অবলম্বন করেছি। মনে রেখ, এ অভিযানে আমি একা নই। আমরা বিশাল এক বাহিনী তোমাদের চিন্তাধারার উপর হামলা চালিয়ে আসছি।'

আলী বিন সুফিয়ান বন্দী গোয়েন্দার সামনে পায়চারী করছেন। গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছেন তার বক্তব্য। বুঝলেন, লোকটি সাধারণ গোয়েন্দাদের চেয়ে ব্যতিক্রম। এর মুখ থেকে তথ্য বের করা কঠিন ব্যাপার। তাই তিনি কৌশল পরিবর্তন করলেন।

গোয়েন্দার পায়ে বেড়ী, হাতে হাতকড়া। কয়েদখানার একজন রক্ষীকে ডাকলেন আলী। বন্দী গোয়েন্দার পায়ের বেড়ী আর হাতকড়া খুলে দিতে বললেন। বন্দীর খানাপিনার ব্যবস্থা করার আদেশ দেন।

'আমার এই আচরণকে কথা নেয়ার কৌশল মনে কর না। আমরা আলেমদের কদর করি। হোক সে যে কোন ধর্মের। আমি আর কিছুই জানতে চাইব না তোমার কাছে। ইচ্ছে হলে তুমি কিছু বলতে পার।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমি তোমাকে ইজ্জত করি আলী! আমি তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি। তুমি যেমন যোগ্য, তেমনি আদর্শবান। এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং খৃষ্টান রাজারা তোমাকে খুন করাতে চান? এর মানে তো এই-ই যে, তুমি আইউবী-জঙ্গীর সমমর্যাদার লোক! শোন আলী! কোন জাতির ধর্ম আর তাহযীব-তামাদ্দুন ধ্বংস করার জন্য সেনা অভিযান আর যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন পড়ে না। যৌনতার আগুন জ্বালিয়েই একটি জাতিকে নিঃশেষ করতে হয় তিলে তিলে। এ আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। বিশ্বাস যদি না হয়, তাহলে তোমাদের মুসলিম শাসকদের অবস্থাটা একটু

দেখে নাও। তোমাদের রাসূল বলে গেছেন, 'নিজের প্রবৃত্তিকে খুন কর; এটা সব অনিষ্টের মূল।' কিন্তু তোমার জাতি কবে পর্যন্ত এর উপর আমল করেছে? রাসূল যে ক'দিন জীবিত ছিলেন, সে ক'দিন-ই তো? ইহুদীরা তাদের সুন্দরী মেয়েদের দিয়ে তোমার জাতিকে উত্তেজিত করেছে। তাই তোমার জাতি আজ প্রবৃত্তির দাস। তোমাদের যার হাতে সম্পদ আছে, নারীদের দিয়ে সে হেরেম পূর্ণ করে আগে। কি ধনী, কি গরীব প্রত্যেক মুসলমান ঘরে চারটি করে বউ রাখতে চায়। মাওলানা-মৌলভীর রূপ ধরে ইহুদীরা তোমাদের চিন্তা-চেতনায় পাশবিকতা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, মুসলমানরা যদি তাদের নবীর আদর্শ অনুসরণ করত, তবে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ-ই হত মুসলমান। কিন্তু, তা হয়নি। যে ক'জন আছে, তারাও নামে মাত্র মুসলমান। তোমাদের রাজত্ব দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। আমার মত আলেমরা তোমাদের ধর্ম ও তাহযীব-তামাদ্দুনের উপর যে হামলা চালিয়ে আসছে, এ তারই প্রতিফল।'

শোন বন্ধু! এ হামলা কখনো বন্ধ হবে না। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, একদিন এ পৃথিবীতে ইসলাম থাকবে না। থাকেও যদি, থাকবে পৌরাণিক এক সংস্কার হিসেবে। নারী আর মদে মাতাল হয়ে থাকবে তার অনুসারীরা। যে কেউ তো আর সালাহুদ্দীন আইউবী, নুরুদ্দীন জঙ্গী হতে পারে না! কাল-পরশু তাদেরকে মরতেই হবে। তারপরে যারা আসবে, আমরা তাদেরকে প্রবৃত্তিপূজায় মাতিয়ে তুলব। আমাকে তুমি হত্যা করতে পার আলী! কিন্তু আমার মিশনকে হত্যা করা তোমার সম্ভব নয়। মানুষের মৃত্যুতে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মরে না। তোমার হাতে আমি খুন হলে আমার জায়গায় আরেকজন আসবে। বন্ধু! ইসলামকে বিলুপ্ত করে কিংবা মুসলমানদেরকে আমাদের তাবেদারে পরিণত করেই তবে আমরা ক্ষান্ত হব। আমার আর কিছু বলার নেই। এবার তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে পার।'

আলী বিন সুফিয়ান গোয়েন্দাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করেননি। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এক অপার্থিক গাম্ভীর্য তার চেহারায়। গোয়েন্দার বক্তব্যে কি এক কঠিন, কত স্পর্শকাতর চিত্র ফুটে উঠেছে তার সামনে। তা-ই বোধ হয় ভাবছিলেন তিনি। কল্পনার পাখায় ভর করে দেশময় ছুটে চললেন আলী। চোখ ঘুরিয়ে নতুন করে দেখে নিলেন দেশের মুসলমানদের বাস্তব চিত্রটা। খৃষ্টান গোয়েন্দার বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করলেন বাস্তবতার নিরিখে। না, গোয়েন্দার বক্তব্য একতিলও মিথ্যে নয়। বর্ণে বর্ণে সত্য তার প্রতিটি কথা। মুসলিম জাতির মধ্যে নৈতিক অধঃপতনের জীবাণু আসলেই ঢুকে পড়েছে। আরবের আমীর-উজীরগণ তো পুরোপুরি ধ্বংস হয়েই গেছে। যুদ্ধের ময়দানে খৃষ্টানদের পরাজিত করে ইসলামী সালতানাতকে আরো বিস্তৃত করার স্বপ্ন দেখছেন সালাহুদ্দীন আইউবী। কিন্তু খৃষ্টানরা এমন এক দিক থেকে আক্রমণ

করে বসেছে, যা প্রতিরোধ করা সুলতান আইউবীর সাধ্যের অতীত বলে মনে হচ্ছে আমার।

আলেম গোয়েন্দার কুঠরী বন্ধ করিয়ে আলী বিন সুফিয়ান বন্দী মেয়ে দু'টোর কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ান। একটি কক্ষের দরজা খুলিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন তিনি। বিছানায় বসা ছিল মেয়েটি। আলী বিন সুফিয়ানকে দেখে দাঁড়িয়ে যায় সে। আলী চুপচাপ গভীরভাবে দেখে নেন মেয়েটিকে। তারপর কিছুই না বলে নীরবে বেরিয়ে যান কক্ষ থেকে। বন্ধ করে দেয়া হয় কক্ষের দরজা।

পরদিন দুপুরের আহারের পর। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা সালাহুদ্দীন আইউবীর সভাকক্ষে উপস্থিত। দু'টি মেয়েসহ এক খৃষ্টান গোয়েন্দার গ্রেফতারীর সংবাদ তারা আগেই জেনেছেন। সভাকক্ষে বসে কানাঘুষা করছে তারা। ইত্যবসরে সালাহুদ্দীন আইউবী কক্ষে প্রবেশ করেন। গভীর দৃষ্টিতে এক নজর দেখে নিলেন গোটা কক্ষটি। যেন কাউকে খুঁজছেন তিনি।

নির্দিষ্ট আসনে বসলেন আইউবী। বললেন–

'বন্ধুগণ! আপনারা শুনে থাকবেন যে, একটি মসজিদ থেকে আমরা এক খৃষ্টান গুপ্তচরকে গ্রেফতার করেছি। লোকটি সেই মসজিদে নিয়মিত ইমামতি করত।'

লোকটাকে কিভাবে ধরা হল, আইউবী তার বিবরণ দেন। গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদে সে আলী বিন সুফিয়ানকে কী বলেছে, তাও বর্ণনা করেন।

সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন–

'আপনারা গুপ্তচর ও সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, এ উপদেশ দেয়ার জন্য আমি আজ আপনাদেরকে সমবেত করিনি। আজ আমি আপনাদেরকে একথাও বলব না যে, যারা ইসলামের দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা জাহান্নামে যাবে। শুধু একথাটি বলার জন্য আমি আপনাদের কষ্ট দিয়েছি যে, কাফিরদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তাদের জন্য দুনিয়াটাকে আমি জাহান্নামে পরিণত করব। এখন আর কোন গাদ্দারকে আমি মৃত্যুদন্ড দেব না, মৃত্যু তো মুক্তির-ই একটি মাধ্যম। এখন থেকে গাদ্দারের শাস্তি হবে, তাদের গলায় রশি বেঁধে সামনে একটি পিছনে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে প্রতিদিন বাজারে বাজারে ঘুরিয়ে পরে চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। সাইনবোর্ডে লিখা থাকবে 'আমি গাদ্দার'। এভাবে তাদের প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পর তার লাশ নিক্ষেপ করা হবে শহরের বাইরে কোন এক নর্দমায়। কাউকে জানাযা-দাফন করতেও দেয়া হবে না ...।

কিন্তু বন্ধুগণ! এতে দুমশনের তেমন কোন ক্ষতি হবে না। তারা নতুন গাদ্দার তৈরি

করে নেবে। যতদিন তাদের কাছে রূপসী নারীর অশ্লীলতা, অর্থ-কড়ি, সোনা-দানার প্রাচুর্য আর আমাদের কাছে ঈমানের কমতি থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তারা গাদ্দার সৃষ্টি করতেই থাকবে। আপনার দুশমন আপনার মসজিদে বসে, আপনার কুরআন হাতে নিয়ে আপনার নবীর আদর্শকে বিকৃত করছে। একি আপনার আত্মমর্যাদার প্রতি চ্যালেঞ্জ নয়? ক্রুসেডাররা যেসব মেয়েকে গুপ্তচরবৃত্তি আর আমাদের চরিত্র ধ্বংসের জন্য এদেশে পাঠায়, তাদের অনেকে মুসলমানের-ই সন্তান। মা-বাবার কোল থেকে ছিনিয়ে এনে অপকর্মের লজ্জাকর প্রশিক্ষণ দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের। ফিলিস্তীন এখন কাফেরের কব্জায়। সেখানকার মুসলমানরা চরম নির্যাতনের শিকার। কঠিন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে তারা। তাদের ঘর-বাড়ি লুটে নিচ্ছে ক্রুসেডাররা। প্রতিবাদ করলে তাদের নিক্ষেপ করা হয় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। অপহরণ করা হচ্ছে কিশোরীদের। সুন্দরীদের বেছে বেছে তাদের চিন্তা-চেতনা থেকে ইসলাম ও দেশপ্রেম বিলুপ্ত করে অশ্লীলতার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আঙ্গুলের ইশারায় পুরুষদের নাচাতে শিখে তারা। তারপর গুপ্তচরবৃত্তি আর নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য পাঠান হয় আমাদের দেশে।

ক্রুসেডারদের ফিলিস্তীন কব্জা করার পর সেখানকার মুসলমানদের জীবন এখন বিপন্ন। বেঁচে থাকার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। খৃষ্টানরা পাইকারীহারে হত্যা করে মুসলমানদের। লুটে নেয় তাদের সহায়-সম্পদ। মসজিদগুলোকে পরিণত করে গীর্জা আর ঘোড়ার আস্তাবলে। যুবতী মেয়েদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে যারা অধিক রূপসী, নাশকতা আর বেহায়পনার প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের ঢুকিয়ে দেয়া হয় আমাদের আমীর-উজীরদের হেরেমে। তাদের ব্যবহার করা হয় আমাদের বিরুদ্ধে। মুসলিম মেয়েদের গলায় ক্রুশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয় তারা। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে পলায়নপর মুসলিম ভাইদেরকেও হত্যা করে পথে। আমাদের বোন-কন্যাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে।

আমার কালেমায় বিশ্বাসী বন্ধুগণ! সেই ধারা এখনো বন্ধ হয়নি। ফিলিস্তীনে এখনো সমানগতিতে চলছে মুসলিম নির্যাতনের স্টীমরোলার। ক্রুসেডারদের একটি-ই লক্ষ্য– মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করা। তারা চায়, মুসলিম মেয়েরা খৃষ্টান সন্তান জন্ম দিক।

কিন্তু আমরা এখনো চুপ করে বসে আছি। ক্রুসেডারদের বর্বরতার শিকার হয়ে শাহাদাত বরণকারী ভাইদের কথা আমরা ভুলে গেছি। এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে! কোন আদেশ করার আগে আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, এ পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী? আপনাদের মধ্যে অভিজ্ঞ সৈনিক আছেন, আছেন প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দও। বলুন, আমরা কী করতে পারি।'

'আমীরে মেসের! আপনার আদেশের প্রয়োজন-ই বা কি। এতো আল্লাহর-ই নির্দেশ যে, প্রতিবেশী দেশের মুসলমান নির্যাতনের শিকার হলে তাদের উদ্ধার করার জন্য জালিমের সঙ্গে লড়াই করা ফরজ। কালবিলম্ব না করে এক্ষুণি আমাদের ফিলিস্তীনে অভিযান প্রেরণ করা উচিত।' প্রবীণ এক কমাণ্ডার বললেন।

নায়েব সালার পর্যায়ের অপর এক ব্যক্তি উঠে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের আগে আপনি ঐসব মুসলিম শাসক ও আমীরদের শায়েস্তা করুন, যারা নেপথ্যে থেকে কাফিরদের হাত শক্ত করছে। আমাদের জন্য লজ্জাকর বিষয় যে, আমাদের সারিতে গাদ্দারও আছে। ফয়জুল ফাতেমীর মত উচ্চপদের মানুষ যদি গাদ্দার হতে পারে, তাহলে নিম্নপদের লোকদের উপর ভরসা কি? একটি মুসলিম কিশোরীর শ্লীলতাহানীর প্রতিশোধের জন্য সমগ্র জাতি জীবন বিলিয়ে দেয়া দরকার। অথচ এদেশে আমাদের গোটা জাতির শ্লীলতাহানী চলছে আর আমরা কিনা এখনো ভাবছি, আমাদের কর্তব্য কী? ক্রুসেডাররা আমাদের মেয়েদেরকে অপকর্মের প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের দিয়েই তাদের সঙ্গে কুকর্ম করাচ্ছে। মুহতারাম আমীরে মেসের! আমি যদি আবেগপ্রবণ না হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে আমাকে এ প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি দিন যে, ফিলিস্তীন আমাদের উদ্ধার করতেই হবে। ক্রুসেডাররা আমাদের প্রথম কেবলাকে কুকর্মের আস্তানায় পরিণত করেছে, এর চেয়ে যন্ত্রণার বিষয় আর কি হতে পারে!

দাঁড়ালেন আরেকজন। কথা বলতে চাইলেন তিনি। কিন্তু সুলতান আইউবী হাতের ইশারায় তাকে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন–

'আমি এমন কথা-ই শুনতে চেয়েছিলাম। আপানাদের যারা আমার কাছে থাকেন, তারা জানেন যে, আমার প্রথম লক্ষ্য ফিলিস্তীন। মিসরের শাসনক্ষমতা হাতে নেয়ার পর পরই আমি ফিলিস্তীন আক্রমণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্ত দু' বছরেরও অধিক সময় কেটে গেছে। বিশ্বাসঘাতকরা আমাকে মিসরে এতই ব্যস্ত রেখেছে, যেন আমি পাকে আটকে গেছি। বিগত দু'টি বছরের ঘটনাবলী নিয়ে একটু ভাবুন। সন্ত্রাসী খৃষ্টান ও গাদ্দারদের সঙ্গে আপনারা যুদ্ধ করেছেন। যারা সুদানীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে, তারা আমাদের-ই লোক। সুদানী সৈন্যদের দিয়ে যে ব্যক্তি মিসর আক্রমণ করিয়েছে, সে ছিল আমাদের-ই কমান্ডার। সে সেই জাতীয় কোষাগার থেকে বেতন গ্রহণ করত, যে কোষাগারে জনগণের অর্থ আছে, আছে আল্লাহর নামে প্রদত্ত যাকাতের পয়সা। গুপ্তচর, গুপ্তচরদের আশ্রয় ও সাহায্যদাতা এবং ঈমান বিক্রেতাদের খতম করে ফিলিস্তীন আক্রমণ করব, এ আশায় আমি দু'টি বছর কাটিয়েছি। কিন্তু আমার দু' বছরের অভিজ্ঞতা, এই নাশকতার ধারা কখনো বন্ধ হবে না। আমরাই আমাদের মধ্যে গাদ্দার সৃষ্টি করার সুযোগ করে দিচ্ছি ...।'

আজ আমি আপনাদের একথা বলার জন্য একত্রিত করেছি যে, ফিলিস্তীন আক্রমণে আমি আর বেশী বিলম্ব করব না। আপনারা সৈন্যদের সামরিক মহড়া ও প্রশিক্ষণ জোরদার করুন। মুজাহিদদেরকে দীর্ঘ সময়ের অবরোধ পরিচালনার ট্রেনিং দিন। তুর্কী এবং সিরীয় বাহিনীর উপর আমি অধিক আস্থাশীল। মিসরী ও ওফাদার সুদানীদের মধ্যে আরো চেতনা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। প্রয়োজন তাদের আরো দক্ষ করে গড়ে তোলা। তাদের মনে শত্রু-বিরোধী ক্ষোভ সৃষ্টি করুন, আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করুন। তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন যে, যেসব নারী ক্রুসেডারদের হিংস্রতার শিকার হচ্ছে, তারা তোমাদের-ই বোন-কন্যা। মসজিদের ইমামদেরকে বলুন, যেন তাঁরা জনসাধারণের সামনে জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং যুবকদের মধ্যে জিহাদী স্পৃহা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। কোন ইমাম বা খতীব যদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে তাকে ইমামতের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিন। আমাদের নীতি-আদর্শ মজবুত থাকলে কোন যাদুমন্ত্র, কোন প্রতারণা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। মানুষের মন-মস্তিষ্ককে বেকার থাকতে দেবেন না; তাদেরকে একটা না একটা মহৎ কাজে জড়িয়ে রাখুন। অন্যথায় শত্রুরা তাদেরকে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। খুব শীঘ্র আপনারা বাকী নির্দেশনা পেয়ে যাবেন। সৈন্যরা কবে রওনা হবে, তাও অচীরে জানাব। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।

সাতদিন পর।

সুলতান আইউবী আলেম গুপ্তচর এবং মেয়ে দু'টোকে তলব করেন। হাজির করা হয় তাদেরকে আইউবীর সামনে। সুলতান তাদেরকে পাশের কক্ষে বসিয়ে রাখতে বললেন। তাদের পায়ে বেড়ী, হাতে শিকল।

সুলতান আইউবীর খাস কামরার পাশের কক্ষে তাদের বসিয়ে রাখা হল। দু' কামরার মাঝে একটি দরজা। দরজার একটি কপাট সামান্য খোলা।

কক্ষে পায়চারী করছেন সুলতান আইউবী। মাথা ঝুঁকিয়ে পায়চারী করতে করতে সুলতান বললেন, 'আমি অতি শীঘ্র কার্ক আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

কার্ক ফিলিস্তীনের দুর্গসম একটি জনপদ। আরেক প্রসিদ্ধ নগরীর নাম শোবক। শোবকও একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। ফিলিস্তীন দখলের পর শোবক এখন ক্রুসেডারদের প্রাণকেন্দ্র। খৃষ্টান রাজা ও উচ্চপদস্থ কমান্ডাররা শোবকেই একত্রিত হয়। এটাই ক্রুসেডারদের ইন্টেলিজেন্স-এর হেডকোয়ার্টার। গোয়েন্দাদের ট্রেনিংক্যাম্পও এটিই।

সুলতান আইউবী ফিলিস্তীন উদ্ধারের জন্য সর্বপ্রথম শোবক আক্রমণ করবেন, আইউবীর সেনাবাহিনী এবং প্রশাসন কর্মকর্তাদের এটাই ছিল বদ্ধমূল ধারণা। তাদের

ধারণায় কৌশলগত দিক থেকে এটাই হবে সঠিক সিদ্ধান্ত। খৃষ্টানদের কোমর ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ শক্ত ঘাঁটিটি ছিনিয়ে আনা-ই যথেষ্ট। কিন্তু সুলতান বলছেন, তিনি কিনা কার্ক আক্রমণ করবেন আগে, অথচ গুরুত্বের দিক থেকে কার্কের অবস্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে।

মুখ খুললেন এক নায়েব সালার। বিনীত কণ্ঠে বললেন, 'মুহতারাম! আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু আমার পরামর্শ, আগে শোবক আক্রমণ করা হোক। শত্রুর কেন্দ্রীয় কমান্ড আগে খতম করা জরুরী। শোবক হাত করার পর কার্ক দখল করা কঠিন হবে না। আমরা যদি সব শক্তি কার্কেই ব্যয় করে ফেলি, তাহলে শোবক দখল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

আলেম গুপ্তচর পাশের কক্ষে উপবিষ্ট। সুলতান আইউবীর কক্ষের সব কথাবার্তা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে গোয়েন্দার কক্ষ থেকে। কান খাড়া হয় গোয়েন্দার। পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে দরজা ঘেঁষে বসে সে। সুলতানের পরিষ্কার কণ্ঠ শুনতে পেল গোয়েন্দা—

'আমি ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে চাই। শোবকের তুলনায় কার্ক সহজ শিকার। কার্ক দখল করে তাকেই আমি কেন্দ্র বানাব। কার্ক আক্রমণে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদেরকে কিছুদিন বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে অতিরিক্ত রিজার্ভ সৈন্য তলব করে পূর্ণ প্রস্তুতির পর আমি শোবক আক্রমণ করব। আমাদের গোয়েন্দাদের রিপোর্ট মোতাবেক শোবকের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এত শক্ত যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদেরকে তা অবরুদ্ধ করে রাখতে হবে। আমার ধারণা, কার্কে আমাদের বেশী শক্তি ব্যয় হবে না। আগে আমাদের একটি ক্যাম্প প্রয়োজন। প্রয়োজন রসদ মজুদের এমন একটি নিরাপদ জায়গা, যেখান থেকে সময়মত রসদ সংগ্রহ করতে আমাদের বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হবে না।'

দরজা ঘেঁষে বসে সুলতান আইউবীর প্রতিটি শব্দ শুনছে আলেম গোয়েন্দা। মেয়ে দু'টোও তার কাছে এসে বসে। সুলতান আইউবীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে শত্রু গোয়েন্দার কানে।

কিন্তু আলী বিন সুফিয়ানের সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। সম্ভবত গোয়েন্দাদের শোবক পর্যন্ত পৌঁছার সম্ভাবনা ক্ষীণ ছিল বলেই আলী বিন সুফিয়ান কোন সাবধানতা অবলম্বন করেননি। যাদের আজীবন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে কিংবা জল্লাদের হাতে জীবন দিতে হবে, শত্রুর গুপ্তচর হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে গোপন তথ্য জানতে দেয়ায় ক্ষতি কি।

'ইস্, কত মূল্যবান তথ্য! আমরা কেউ যদি এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আইউবীর এ পরিকল্পনার কথা কার্ক ও শোবকে পৌঁছিয়ে দিতে পারতাম!! সংবাদটা

আগেভাগেই জানিয়ে দিতে পারলে কার্কের পথেই গতিরোধ করে মুসলিম বাহিনীর শক্তি নিঃশেষ করে দেয়া যেত। কার্ক পৌঁছার আগেই পরাজিত করা যেত তাদের।' কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে মেয়েদেরকে বলল গোয়েন্দা।

'আমাদের পরিপূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। আগেই যদি ক্রুসেডাররা আমাদের আক্রমণের খবর পেয়ে যায়, তাহলে আমরা কার্ক পৌঁছুতে ব্যর্থ হব। পথেই তারা আমাদের গতিরোধ করবে। ক্রুসেডারদের তুলনায় আমাদের সৈন্যসংখ্যা কম। অস্ত্র-ঘোড়ায়ও আমরা তাদের তুলনায় দুর্বল। তাদের আছে লোহার শিরস্ত্রাণ। আছে বর্ম। যার কারণে আমাদের তীরান্দাজ বাহিনী ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে একাধিকবার।

ক্রুসেডারদের অজান্তে-ই আমরা কার্ক পৌঁছে যেতে চাই, যাতে তারা খোলা ময়দানে আমাদের মুখোমুখি হতে না পারে। যদি তারা খোলা মাঠে আমাদের মোকাবেলায় আসার সুযোগ পায়, তাহলে পিছনে এসে তারা আমাদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিবে। তখন পরাজয়বরণ ছাড়া আমাদের আর উপায় থাকবে না। কার্ক পৌঁছার জন্য আমি জারিরের টিলা হয়ে অতিক্রম করা পথটি অবলম্বন করব। জারির একটি প্রশস্ত এলাকা। আমার ভয় শুধু একটি-ই যে, ক্রুসেডাররা পথে এসে আমাদের প্রতিরোধ করে বসে কিনা।' বললেন, সালাহুদ্দীন আইউবী।

'এর মোকাবেলায় আমাদের বাহিনীকে আমরা তিন চারটি দলে বিভক্ত করে নেব। পথ চলব শুধু রাতে। দিনের বেলা নড়াচড়া করব না; লুকিয়ে থাকব নিরাপদ স্থানে। পথে অপরিচিত কোন ব্যক্তি বা কাফেলা চোখে পড়লে, আটকে ফেলব এবং কার্ক পৌঁছা পর্যন্ত সঙ্গে রাখব। শত্রুর গোয়েন্দাবৃত্তির বিরুদ্ধে আমাদের এ পদক্ষেপ সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করি।' বললেন গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান।

বন্দী খৃষ্টান গুপ্তচর আর মেয়ে দু'টো যখন সুলতান আইউবীর মুখ থেকে অতি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যগুলো শুনছিল, ঠিক সে সময়ে চলছিল শোবক দুর্গে খৃষ্টান রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনা কমান্ডারদের জরুরী সভা। সভাসদদের সকলের মুখে বিষন্নতার ছাপ। হাতেমুল আকবর নামক এক মিসরী মুসলমানও সভায় উপস্থিত।

সভার কার্যক্রম শুরু হল। বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করছে হাতেম–

'ক্ষমতাচ্যুতির পর খলীফা আজেদ মারা গেছেন। মিসর এখন বাগদাদের খলীফার অধীনে। খৃষ্টানদের ওফাদার মুসলমান নায়েব সালার রজবও প্রাণ হারিয়েছে রহস্যময়ভাবে। শোবক থেকে রজব যে তিনটি মেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, খুন হয়েছে তারাও। খৃষ্টানদের আরেক ওফাদার মুসলিম সেনানায়ক ফয়জুল ফাতেমীও জল্লাদের হাতে মারা পড়েছে। সর্বোপরি দু'টি মেয়েসহ যে আলেম গোয়েন্দাকে কায়রো পাঠান হয়েছিল, মেয়েদেরসহ সেও ধরা পড়েছে। তাদের ধরা পড়ার ঘটনা ঠিক এমন সময়ে ঘটল, যখন তাদের মিশন সফল হওয়ার পথে।' থামল হাতেম।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগ বড় অভিজ্ঞ ও চৌকস। তাদের হাতে বন্দী মেয়েগুলোকে মুক্ত করে আনা অসম্ভব। আমাদের ভাল ভাল মেয়েগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' বলল, কনরাড। কনরাড খৃষ্টানদের বিখ্যাত এক রাষ্ট্রনায়ক ও সেনা কমাণ্ডার।

'ক্রুশের স্বার্থে এ ত্যাগ আমাদের দিতেই হবে। জীবন দিতে হবে আমাদেরও। আমাদের যারা এ যাবত ধরা পড়েছে, তাদেরকে ভুলে যাও। তাদের স্থলে নতুন লোক পাঠাও।' বলল অপর এক খৃষ্টান রাষ্ট্রনায়ক ও সেনা কমাণ্ডার গাই অফ লুজিনান।

'আচ্ছা, এই যে মুসলমানদের হাতে দু'টি মেয়ে ধরা পড়ল, এরা কারা? আর ঐ রজবের সঙ্গে মারা যাওয়া মেয়ে তিনটি এসেছিল কোথা থেকে?' প্রশ্ন করে লুজিনান।

'তাদের দু'জন ছিল খৃষ্টান। তারা ইটালীর মেয়ে। অপর তিনজন মুসলমান। শৈশবে তাদের অপহরণ করে আনা হয়েছিল। তারা বেশ রূপসী মেয়ে ছিল। তারা যে মুসলিম বাবা-মার সন্তান, তা তারা ভুলেই গিয়েছিল। শিশুকাল থেকে-ই তাদের গোয়েন্দাবৃত্তির প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। কাজেই এক সময়ে মুসলমান ছিল বলে তারা আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে, এমন সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই।' গোয়েন্দা প্রধান জবাব দেয়।

'ছিল-ই বা মুসলমান, তাতে কি?' বলল কনরাড। হাতেমুল আকবরের প্রতি ইঙ্গিত করে কনরাড বলল, 'এই যে আমাদের প্রিয় বন্ধু হাতেমও তো মুসলমান। নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগ নেই কি তার? তারপরও তো সে আমাদের আপন!'

হাতেমের হাতে মদের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে কনরাড আরো বলে, 'আমাদের হাতেম জানে যে, সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরকে দাসত্বের শৃংখলে আটকাতে চায় এবং ইসলামের নামে তামাশা করছে। আমরা মিসরকে স্বাধীন করতে চাই। তার প্রথম পদক্ষেপ হল, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে মিসরে এক মুহূর্তের জন্য সুস্থির হয়ে বসতে দেব না।'

মদোন্মত্ত হাতেম মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়। বলে, 'এবার আমি ওখানে এমন ব্যবস্থা নেব যে, আপনার একজন লোকও আর ধরা পড়বে না।'

'মিসরে যদি আমরা এ অশান্তি সৃষ্টি করে না রাখতাম, তাহলে সালাহুদ্দীন আইউবী বহু আগেই আমাদের উপর হামলা করে বসত। তার শক্তিকে আমরা তারই লোকদের উপর ব্যয় করাচ্ছি, এটা আমাদের কম সাফল্য নয়।' বলল এক খৃষ্টান কমান্ডার।

'আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার কোন ব্যবস্থা এখনো হয়নি?' জানতে চায় কনরাড।

'কয়েকবার চেষ্টা করেছি স্যার! কিন্তু কামিয়াব হইনি। ব্যর্থতার কারণ, লোক দু'টো পাথরের মত শক্ত। না তারা মদ স্পর্শ করে, না নারীর প্রতি তাদের দুর্বলতা

আছে। এ কারণে মদে কিছু মিশিয়েও তাদেরকে হত্যা করা যায় না, নারী দিয়েও কাবু করা যায় না। তবে আমরা নিরাশ নই। ব্যবস্থা একটা করে রেখেছি।

আইউবীর দেহরক্ষীদের মধ্যে চারজন-ই আমাদের ফেদায়ী। বড় বুদ্ধিমত্তার সাথে আমার তাদেরকে ঐ পর্যন্ত পৌঁছাতে হয়েছে। সুযোগ পেলেই ওরা তাদের দু'জনকে, অন্তত একজনকে খতম করে ফেলবে।' গোয়েন্দা প্রধান জবাব দেয়।

'আচ্ছা, আমাদের এখানেও আইউবীর গোয়েন্দা আছে নাকি?' জিজ্ঞেস করে লুজিনান।

'অবশ্যই। যখন থেকে আমরা মিসর ও সিরিয়ায় আমাদের গুপ্তচরবৃত্তি এবং নাশকতামূলক কার্যক্রম শুরু করি, তখন-ই আইউবী আমাদের এদিকে চর পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের হাতে দু'জন ধরাও পড়েছে। কিন্তু নির্যাতনের মুখে ওরা জীবন দিয়েছে ঠিক, তৃতীয় কোন সহকর্মীর নাম বলেনি।' গোয়েন্দা প্রধান জবাব দেয়।

'তাদের সফলতার পরিমাণ কী?' জানতে চায় লুজিনান।

'স্যার! কার্কে আমাদের গুদামে আগুন লেগে যে অর্ধেক রসদ পুড়ে গিয়েছিল, জীবন্ত জ্বলে গিয়েছিল এগারটি ঘোড়া, তা আইউবীর এই সন্ত্রাসী গুপ্তচরদের-ই কাজ ছিল। আমি আপনাকে আরো জানাতে পারি যে, আমাদের যুদ্ধের ধরন ও কৌশলের পুংখানুপুংখ রিপোর্ট আইউবীর কানে পৌঁছে যায় যথাসময়ে। আমি আইউবীর গুপ্তচরদের প্রশংসা না করে পারছি না যে, ওরা জীবন বাজি রেখে পরম নিষ্ঠা ও আমানতদারীর সাথে দায়িত্ব পালন করে থাকে।' জবাব দেয় অপর একজন।

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চলে এই সভা। মিসর ও সিরিয়ায় নাশকতামূলক কর্মতৎপরতা কিভাবে আরো জোরদার, আরো ধ্বংসাত্মক করা যায়, সে বিষয়ে চুলচেরা আলোচনা হয়। হাতেমুল আকবর সভাসদদের সামনে সুলতান আইউবীর সরকারের দুর্বলতা-সবলতার দিকগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। অবশেষে হাতেমুল আকবরকে আরো কিছু লোক ও দু'-তিনটি মেয়ে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

✿ ✿ ✿

দু' নায়েব এবং আলী বিন সুফিয়ানকে কার্ক আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করছেন সুলতান আইউবী। বিশদিন পর তাঁর বাহিনী রওনা হবে বলে জানালেন। পাশের কক্ষ থেকে আলেম গোয়েন্দা এবং মেয়ে দু'টো সব শুনে ফেলে। তারা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে ফেলে। আলেম গোয়েন্দা অনুশোচনা ব্যক্ত করে, এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অথচ শোবকে তা পৌঁছাতে পারছে না সে।

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে বাগে আনার চেষ্টা করব। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও যদি তিনি আমাকে নির্জনে তার সঙ্গে থাকার সুযোগ দেন, তাহলে আমি আমার মুক্তি আদায় করে নিতে পারব। তার বিবেক-বুদ্ধি কব্জা করতে পারব বলে আমি আশাবাদী।' বলল এক মেয়ে।

'তিনি আমাদেরকে কেন ডাকলেন, বুঝতে পারছি না। তবে মনে রাখবে, যদি তোমাদেরকে একজন একজন করে হাজির করা হয়, তাহলে তাকে পশুতে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। যদি মদ খাওয়াতে সক্ষম হও, তাহলে অচেতন করতে হলে কি পরিমাণ খাওয়াতে হবে, তা তোমাদের জানা আছে। তারপর পালাবার পদ্ধতিও তোমাদের অজানা নয়। পালিয়ে গিয়ে প্রথমে কার নিকটে পৌঁছতে হবে তা-ও তোমাদের জানা। মনে আছে তো? তার ঘর মসজিদের ঠিক বিপরীতে।' বলল গোয়েন্দা।

'আমি জানি– মাহদী আবাদান তার নাম।' বলল মেয়েদের একজন।

হ্যাঁ, তোমরা যদি মাহদী পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পার, তাহলে তোমাদেরকে শোবকে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তার। আমার পালাবার প্রশ্নই আসে না। আইউবীর পরিকল্পনা সবই তোমরা শুনেছ। মুসলিম বাহিনীর রওনা হওয়ার তারিখটা মনে রেখ। তারা কোন্ পথে যাবে, তাও ভুলো না। তারা পথ চলবে রাতে। দিনের বেলা তারা নড়াচড়া করবে না। আমি আশা করি, আগেভাগে তথ্যগুলো পৌঁছিয়ে দিতে পারলে আমাদের বাহিনী আইউবীকে পথেই প্রতিরোধ করতে পারবে। আর এটিই আইউবীর একমাত্র ভয়। শোবকে গিয়ে বিশেষভাবে একথাও জানাবে যে, আইউবী মুক্ত মাঠে মুখোমুখি লড়াই করতে ইচ্ছুক নয়। কারণ, তার সৈন্য কম।' বলল আলেম গোয়েন্দা।

বৈঠক সমাপ্ত হয়। যার যার মত চলে যান নায়েবগণ। টের পেয়ে দ্রুত আপন আপন জায়গায় গিয়ে বসে তিন গোয়েন্দা। আলেমের পরামর্শে মেয়ে দু'টো দুই হাটুর মাঝে মাথা লুকিয়ে বসে থাকে, যেন তারা কিছুই শুনেনি। আশপাশের কোন খবরই তারা রাখে না যেন।

তারা কক্ষে কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। তবু কেউ মাথা তুলছে না। আলী বিন সুফিয়ান আলেম গোয়েন্দার কাঁধে হাত রাখেন। বললেন, 'উঠ, আমার সঙ্গে চল।'

এবার মাথা তুলে তাকায় গোয়েন্দা। মেয়ে দু'টোকেও উঠিয়ে আনেন আলী। নিয়ে যান সুলতানের কক্ষে।

বন্দী গোয়েন্দাদের শৃংখল খুলে দেয়ার আদেশ দেন সুলতান। কর্মকার আনার জন্য আলী বাইরে বেরিয়ে পড়েন। সুলতান বসতে বললেন তিনজনকে। তারপর আলেম গোয়েন্দার উদ্দেশে বললেন–

'আমি তোমার ইলম ও বিচক্ষণতাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তুমি তোমার বিদ্যাকে শয়তানী কাজে ব্যবহার করছ। এই অপকর্মের স্থলে যদি তুমি এদেশে এসে নিজ ধর্ম প্রচার করতে, তাহলে এই ভেবে আমি মনের গভীর থেকে তোমাকে শ্রদ্ধা করতাম যে, তুমি নিজ ধর্ম ও নবীর খেদমত করছ। বল তো, তোমার ধর্ম কি তোমাকে অন্য

ধর্মের ইবাদতখানায় বসে সেই ধর্মে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটানোর বৈধতা স্বীকার করে? তোমার হৃদয়ে কি তোমার 'পবিত্র' ক্রুশ, নবী ঈসা ও কুমারী মাতা মরিয়মের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও আছে? যদি থাকে, তাহলে মিথ্যা ও শয়তানী কর্মকান্ডের মত কবীরা গুনায় লিপ্ত হয়ে তুমি তাদের ইবাদত কর কিভাবে?'

'এ মিথ্যাচার আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আমি যা কিছু করেছি, ক্রুশের জন্য-ই করেছি।' বলল গোয়েন্দা।

'তোমার দাবী অনুযায়ী তুমি গভীরভাবে ইঞ্জীল ও কুরআন অধ্যয়ন করেছ। বল, এই দুই আসমানী কিতাবের একটিতেও কি এই অনুমতি দেয়া আছে যে, এ রকম উদ্ভিন্ন-যৌবনা যুবতীদেরকে কুকর্মের পথে নিক্ষেপ করবে এবং পর পুরুষের কাছে পাঠিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করবে? ইঞ্জীল কি তোমাদের বলেছে যে, ক্রুশের খাতিরে তোমরা জাতির সুন্দরী মেয়েগুলোর ইজ্জত অন্যের হাতে তুলে দাও? তুমি কি কোন মুসলমান মেয়েকে কুরআন ও ইসলামের নামে নিজের ইজ্জত পরপুরুষের হাতে তুলে দিতে দেখেছ কখনো? বললেন আইউবী।

'ইসলামকে আমি খৃষ্টবাদের প্রতিদ্বন্দ্বি মনে করি। যখন-ই যে বিষ হাতে পাব, তা-ই আমি ইসলামের শিরায় শিরায় মিশিয়ে ছাড়ব।' বলল গোয়েন্দা।

'মধুর বিষ দিয়ে তোমরা গুটিকতক মুসলমানের চরিত্র হনন করতে পারবে জানি; কিন্তু তোমরা ইসলামের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না।' শান্ত-সমাহিত কণ্ঠে বললেন আইউবী।

এবার মেয়ে দু'টোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে সুলতান বললেন–

'তোমরা কোন্ বংশের মেয়ে জানা আছে তোমাদের? বল, তোমাদের আসল পরিচয় কি?'

দু'জন-ই নীরব। কারো মুখে রা নেই।

'নৈতিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা তো সব শেষ করেছ। এখন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কারুর স্ত্রী হয়ে জীবন অতিবাহিত করার ইচ্ছা আছে তোমাদের?' জিজ্ঞেস করেন আইউবী।

প্রশ্নটা লুফে নেয় এক মেয়ে। আইউবীকে টোপ দেয়ার জন্য এমন একটি মোক্ষম প্রশ্ন-ই দরকার ছিল তার। বলল, 'আমি সম্মানিত স্ত্রী হয়ে বাকী জীবন কাটাতে চাই। আপনি কি আমায় গ্রহণ করবেন? আপনি যদি গ্রহণ না করেন, তাহলে আমাকে অন্য একজন সম্ভ্রান্ত স্বামীর ব্যবস্থা করে দিন। ইসলাম কবুল করে অতীতের সব পাপ থেকে আমি তাওবা করব।

স্মিত হাসলেন আইউব। তারপর খানিক ভেবে বললেন–

'আমি চাই না, এ আলেমের ইল্‌ম জল্লাদের তরবারীর খুনে ভেসে যাক্। আমি এ-ও চাই না যে, তোমাদের দু'জনের রূপ-যৌবন আমার বন্দীদশার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে

গলে-পঁচে নিঃশেষ হোক। শোন মেয়ে! সত্যিই যদি অতীতের পাপাচার থেকে তাওবা করতে চাও, তাহলে আমি তোমাদের মুক্তি দিয়ে তোমাদের জন্মভূমিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে মনে রেখ, ঐ দেশ তোমাদের নয়– আমাদের। একদিন না একদিন আমি তোমাদের রাজাদের হাত থেকে আমার দেশকে উদ্ধার করব-ই। যাও; দেশে গিয়ে একজন ভদ্র পুরুষের স্ত্রী হয়ে পবিত্রতার সাথে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দাও। আমি তোমাদের তিনজনকেই মুক্তি দিলাম।'

'হঠাৎ চমকে উঠে তিন গোয়েন্দা। যেন সুঁই ফুটানো হয়েছে তাদের গায়ে। ইত্যবসরে কক্ষে প্রবেশ করেন আলী বিন সুফিয়ান। সঙ্গে তার এক কর্মকার। শৃংখল খুলে দেয়া হয় তিনজনের। সুলতান বললেন, আলী! আমি এদেরকে মুক্তি দিয়েছি। শুনে আলী তদ্রূপ বিস্মিত হলেন। দীর্ঘক্ষণ অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন সুলতানের মুখের দিকে। সুলতান বললেন, 'এদেরকে তিনটি উটে তুলে দাও। চারজন দক্ষ, বিচক্ষণ ও সাহসী অশ্বারোহী সশস্ত্র রক্ষী সঙ্গে দাও। তারা এদেরকে শোবক দুর্গে রেখে ফিরে আসবে। জরুরী পাথেয়-সামানও সঙ্গে দিয়ে দাও আর আজই এদের বিদায় করে দাও।'

আলেম গোয়েন্দার উদ্দেশে সুলতান বললেন–

'ওখানে গিয়ে এ ভুল প্রচার করো না যে, সালাহুদ্দীন আইয়ূবী গোয়েন্দাদের ক্ষমা করে দেয়। গোয়েন্দাদেরকে চাক্কিতে দানা পেষার মত পিষে পিষে নিঃশেষ করা-ই আমার নিয়ম। তুমি একজন আলেম বলেই আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। আমি তোমাকে ইলমের আলো ছড়ানোর সুযোগ দিলাম।'

✿ ✿ ✿

সূর্য এখনো অস্ত যায়নি। তিনটি উটে সাওয়ার হয়ে চারজন দেহরক্ষীর সঙ্গে রওনা হয় তিন গোয়েন্দা। দেহরক্ষী চারজন মুসলিম সেনাবাহিনীর বাছাইকরা লোক। সুশ্রী, সুঠাম, বলিষ্ঠ, সাহসী ও ব্যক্তিত্ববান সৈনিক তারা। সুলতানের নির্দেশে আলী বিন সুফিয়ান দেখে-শুনেই এদের নির্বাচন করেছেন। তার কারণ দু'টি। প্রথমতঃ পথে তাদের পদে পদে দুস্যু-ডাকাতের মোকাবেলা করতে হবে। এর জন্য শক্তি-সামর্থ ও সাহসের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ গোয়েন্দাদের পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তাদের খৃষ্টান সেনাকমান্ডারদের মুখোমুখি হতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। সঙ্গে দেয়া উট-ঘোড়াগুলোও অতি উন্নত।

কিন্তু সুলতান আইউবী এই ব্যতিক্রমী উদারতা কেন দেখালেন, ভেবে সবাই হতবাক্। দুশমনকে ক্ষমা করা তো তার স্বভাব নয়! সবিনয়ে ঘটনার রহস্য জানতে চান আলী বিন সুফিয়ান। জবাবে সুলতান শুধু বললেন–

'আলী! তোমাকে বলেছিলাম, আমি একটি জুয়া খেলতে চাই। এবার সেই জুয়ার বাজি-ই লাগালাম। বাজিতে যদি হেরে যাই, তাহলে ক্ষতি শুধু এতটুকু-ই হবে যে, তিনজন শত্রু গোয়েন্দা আমার হাতছাড়া হয়ে গেল।'

বিস্তারিত জানতে চান আলী। কিন্তু সুলতান এ পর্যন্ত-ই কথার ইতি টেনে বললেন, 'ধৈর্য ধর আলী! সময়মত সব জানতে পারবে।'

মুক্তিপ্রাপ্ত তিন গোয়েন্দা আনন্দচিত্তে এগিয়ে চলছে শোবক অভিমুখে। তাদের এই আনন্দ শুধু মুক্তির আনন্দ নয়। এ মুহূর্তে তাদের আনন্দের মূল কারণ, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য, যা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা শোবকে।

কায়রো শহর ত্যাগ করে বহুদূর এগিয়ে গেছে সাতজনের কাফেলা। তিন গোয়েন্দার উট তিনটি পাশাপাশি চলছে। চার দেহরক্ষীর দু'জন সামনে আর দু'জন পিছনে।

পথ চলতে চলতে আলেম গোয়েন্দা মেয়েদের উদ্দেশে বলে, 'আমাদের খোদা ঈসা মসীহ্ মোজেজা দেখালেন। এতে প্রমাণিত হয়, আমাদের তিনি ভালবাসেন এবং আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। এটি আমাদের ধর্মের সত্যতার লক্ষণ। খোদা সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানের মত বিচক্ষণ লোকের বিবেক অন্ধ করে দিয়েছেন। যার ফলে এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের কানে দিয়ে তিনি আমাদেরকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। এ তথ্য পেলে আমাদের সৈন্যরা আইউবীর বাহিনীকে খোলা মাঠে ঘিরে ফেলেই নিঃশেষ করে দেবে। বেটারা কার্ক পৌঁছার সুযোগই পাবে না। আমার আশা, আমাদের কমাণ্ডার যুদ্ধ আক্রমণ পর্যন্তই সীমিত রাখবেন না– মিসরেও চড়াও হবেন। পতন ঘটবে আইউবীর। অতি অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের ক্রুশ।

'আপনি অভিজ্ঞ আলেম। কিন্তু আপনি যাকে মোজেজা বলছেন, আমার কাছে তা বিপদ বলে মনে হচ্ছে। বিপদ হল এই চার দেহরক্ষী। বিচিত্র কি যে, সামনে কোথাও গিয়ে এরা আমাদেরকে হত্যা করে ফিরে যাবে। এমনও তো হতে পারে যে, আইউবী আমাদের সঙ্গে উপহাস করেছেন। জল্লাদের হাতে অর্পণ না করে তিনি আমাদেরকে তুলে দিয়েছেন এদের হাতে। নিরাপদ কোন স্থানে গিয়ে এরা মনভরে আমাদেরকে উপভোগ করবে। তারপর খুন করে ফিরে যাবে!' বলল এক মেয়ে।

'আর আমরা তো নিরস্ত্র। তোমার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কোন রাষ্ট্রনায়ক তার গোয়েন্দাকে এভাবে ক্ষমা করতে পারেন না। তাছাড়া মুসলমান এতই যৌনবিলাসী জাতি যে, তারা তোমাদের মত সুন্দরী মেয়েদের নাগালে পেয়ে হাতছাড়া করতে পারে না।' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল আলেম গোয়েন্দা। যেন সব আনন্দ, সব স্বপ্নসাধ উড়ে গেছে তার মন থেকে। চেহারায় তার নিদারুণ হতাশার ছাপ। মেয়েটির কল্পিত বিপদের আশংকা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাকেও।

'আমাদের চোখ-কান খোলা রেখে সতর্কতার সাথে রাত কাটাতে হবে। রাতে যখন এরা ঘুমিয়ে পড়বে, তখন এদের অস্ত্র দিয়ে-ই এদের খুন করতে হবে। আমাদের প্রয়োজন শুধু একটু সাহস।' বলল অপর মেয়ে।

'এতটুকু সাহস আমাদের করতেই হবে। কাজটা আজ রাতেই হয়ে গেলে ভাল হয়। সকাল পর্যন্ত আমরা অনেক পথ এগিয়ে যেতে পারব।' বলল আলেম।

তিন গোয়েন্দার আগে-পিছে দু'জন করে চার দেহরক্ষী গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। তাদের ভাব-গতিতে মনে হচ্ছিল, দু'টি হৃদয়কাড়া রূপসী যুবতী যে তাদের হাতের মুঠোয়, সে খবর-ই তাদের নেই।

বেলা শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবি ডুবি করছে। ধীরে ধীরে ঘনিভূত হচ্ছে তিন গোয়েন্দার বিপদ-শংকা। মেয়ে দু'টোর একজন আলেমকে বলে, আমরা এখন কোথাও থামব না। রাতের প্রথম প্রহরটি এভাবে অতিক্রম করেই কাটিয়ে দেব।

চলতে থাকে কাফেলা। মরুভূমির রাত আঁধারে ছেয়ে যায়। উট তিনটি কাছাকাছি এনে তিন গোয়েন্দা আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। তারা দেহরক্ষীদের হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করে।

দীর্ঘক্ষণ পর এক সবুজ-শ্যামল স্থানে এসে পৌঁছে কাফেলা। থেমে যায় দেহরক্ষীগণ। তাঁবু ফেলে সেখানে। গোয়েন্দাদের আহারের ব্যবস্থা করে। নিজেরাও আহার করে। তারপর শোয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

চার মুসলিম দেহরক্ষীকে হত্যা করার পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে শুয়ে পড়ে তিন গোয়েন্দা। সুযোগের সন্ধান করছে তারা। দৃষ্টি তাদের দেহরক্ষীদের প্রতি নিবদ্ধ।

চার দেহরক্ষীর তিনজন শুয়ে পড়ে। টহল দিচ্ছে একজন। নিজেদের তাঁবুর চারদিকে পায়চারী করছে সে। হঠাৎ কেমন যেন একটা সন্দেহ জাগে তার মনে। দৌড়ে যায় গোয়েন্দাদের তাঁবুর দিকে। দেখে-শুনে ফিরে আসে আবার।

এভাবে দু'ঘন্টা কেটে যায়। তারপর সে অপর এক সঙ্গীকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। নিজে শুয়ে পড়ে তার জায়গায়। নতুনজন চারদিক টহল দিতে থাকে। একবার পশুগুলোর কাছে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে, আবার ঘুমন্ত লোকদের কে কি অবস্থায় আছে, লক্ষ্য করে দেখে। এবার আলেম গোয়েন্দা মেয়েদের ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, 'বোধ হয় আমরা সফল হতে পারব না। বেটারা পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। চিন্তা করে লাভ নেই। ঘুমিয়ে পড়; কপালে যা আছে, তা-ই হবে।'

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তিন গোয়েন্দা।

রাতের শেষ প্রহর। এখনো আবছা অন্ধকার। তবে ভোর হলো বলে। রক্ষীরা জাগিয়ে তোলে গোয়েন্দাদের। শুরু হয় পুনরায় পথচলা। আগের নিয়মেই রওনা হয় তারা। তিন গোয়েন্দা পাশাপাশি। রক্ষীদের দু'জন সামনে দু'জন পিছনে।

সূর্য উদিত হয়। ধীরে ধীরে প্রখর হতে থাকে রোদের কিরণ। কাফেলাও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে গন্তব্যপানে।

উঁচু-নীচু এক পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়ে কাফেলা। এদিক-সেদিক মাটি আর বালির পাহাড়। দাঁড়িয়ে আছে বাঁকা দেয়ালের মত। দুই পাহাড়ের মধ্যখানে সরু

গলিপথ। পথের উপর দু'দিকের পাহাড়ের ভূতুড়ে ছায়া। ভয়ে মেয়েদের গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠে। ভীতির ছাপ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে তাদের চেহারায়। তাদের দৃষ্টিতে কু-কর্ম আর খুন করার বড় উপযুক্ত স্থান এটি। ওসবের জন্যই বোধ হয় রক্ষীরা তাদের এ পথে নিয়ে এসেছে।

'ওদেরকে আমাদের সাথে কথা বলতে বলুন। ওদের নীরবতা আর সম্পর্কহীনতার কারণে আমার ভয় লাগছে। বলুন, যদি ওরা আমাদেরকে খুন-ই করতে চায়, বিলম্ব না করে করে ফেলুক। মৃত্যুর অপেক্ষা করতে আমার কষ্ট হচ্ছে।' বলল এক মেয়ে।

আলেম কথা বলছে না। মেয়েদের কোন সহযোগিতা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা তিনজনই এখন মুসলিম রক্ষীদের দয়ার উপর নির্ভরশীল।

বেলা দ্বি-প্রহর। সূর্য এখন মাথার উপর। থেমে যায় কাফেলা। টিলার ছায়ায় অবস্থান নেয় তারা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে খেতে বসে সবাই। আহারের মাঝে এক পর্যায়ে আলেম গোয়েন্দা রক্ষীদের জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের সাথে তোমরা কথা বলছ না কেন?'

'আমরা কর্তব্যের অতিরিক্ত কথা বলি না। তোমাদের বিশেষ কোন কথা থাকলে বলতে পার, আমরা শুনব, প্রয়োজনে জবাব দেব।' বলল রক্ষীদের কমান্ডার।

'তোমাদের কি জানা আছে, আমরা কারা?' জিজ্ঞেস করে আলেম।

'তোমরা তিনজন গুপ্তচর। মেয়ে দু'টো কুলটা। যাদেরকে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাও, এরা তাদের ভোগের সামগ্রী। জানি না, মিসরের আমীর সালাহুদ্দীন আইউবী কেন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন! তোমাদেরকে শোবক দুর্গে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তোমরা আমাদের আমানত . . .। কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করলে কেন?' বলল রক্ষী কমান্ডার।

'মন চাইছিল তোমাদের সাথে কথা বলি। আমরা ক্ষণিকের সহযাত্রী ঠিক; কিন্তু আমাদের গন্তব্য এক, তোমাদের গন্তব্য অন্য। দু'দিন 'পর আমরা তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাব।' বলল কমান্ডার।

রক্ষীর জবাব যেন কানেই গেল না গোয়েন্দার। দূরের কি একটি বস্তু অবলোকন করছে যেন তার দু' চোখ। চকিত নয়নে এক নাগাড়ে তাকিয়ে আছে ওদিকে। ধীরে ধীরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে গোয়েন্দা। চোখে-মুখে তার ভীতির ছাপ। ভয়ংকর কি যেন দেখেছে সে।

রক্ষী কমান্ডারও চোখ তুলে তাকান সেদিকে। শংকিত হয়ে উঠেন তিনিও। বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ।

দু'শ গজ দূরে এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে দু'টি উট। পিঠে দু'জন মানুষ। মাথায় পাগড়ি। মুখমন্ডল কাপড়ে ঢাকা। সওয়ার নির্নিমেষ চক্ষে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে

রক্ষী ও গোয়েন্দাদের কাফেলার প্রতি। তাদের গতিবিধি আর পোষাক-ই বলে দিচ্ছে, তারা কারা।

'জান, ওরা কারা?' রক্ষী কমান্ডার প্রশ্ন করে আলেমকে।

'মরু ডাকাত। কি জানি, ওরা ক'জন!' জবাব দেয় আলেম।

'দেখা যাবে।' বলেই রক্ষী কমান্ডার উঠে দাঁড়ান। এক সঙ্গীকে বলেন, 'আমার সঙ্গে এস।'

ঘোড়ায় চড়ে দুই রক্ষী ডাকাতদের দিকে ছুটে যায়। তারা অস্ত্রসজ্জিত। সাথে তরবারী ছাড়াও আছে বর্শা। কাফেলা থেকে দু'জন লোক ছুটে আসতে দেখে উষ্ট্রারোহীরা টিলার পিছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাকী দুই রক্ষী নিকটতম টিলায় উঠে পড়ে। আলেম মেয়েদের উদ্দেশে বলে, 'বোধ হয় তোমাদের আশংকা-ই সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে। ওরা ডাকাত নয়- সালাহুদ্দীন আইউবীর পাঠানো লোক বলেই মনে হয়। না হলে রক্ষী দু'জন এত বীরদর্পে তাদের কাছে গেল কেন! তোমাদেরকে চরমভাবে অপদস্ত করতে চায় আইউবী। তোমাদের বড় ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর আমার জন্য মৃত্যু তো অবধারিত।'

'তার মানে, আসলে আমরা মুক্তি পাইনি। এখনো আমরা আইউবীর কয়েদী।' বলল, মেয়েদের একজন।

'তা-ই তো মনে হয়।' বলল অপরজন।

খানিক পর।

ফিরে আসে দুই মুসলিম রক্ষী। টিলা থেকে নেমে আসে সঙ্গীদ্বয়। তাদের চারপাশে জড়ো হয় সবাই।

রক্ষী কমান্ডারের নাম হাদীদ। হাদীদ জানায়-

ওরা মরুদস্যু। আমরা তাদের সাথে দেখা করে এসেছি। সংখ্যায় ওরা ক'জন, জানতে পারিনি। যে দু'জনকে আমরা উটের পিঠে দেখেছিলাম, তারা জানায়, আজ ভোর থেকেই তারা আমাদের পিছু নিয়েছে। তারা আমাকে বলে, 'তোমরা ফৌজের লোক। মুসলমান বলে মনে হয়। কিন্তু মেয়ে দু'টো মুসলমান নয়। মেয়েদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও; তোমাদেরকে বিরক্ত করব না।' আমি বললাম, মেয়ে দু'টো যে ধর্মের-ই হোক; আমাদের হাতে আমানত। জীবন থাকতে আমরা ওদেরকে তোমাদের হাতে অর্পণ করতে পারব না। আমাকে তারা সাধের জীবনটা না খোয়াবার পরামর্শ নেয়। আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। আমি ওদের সাফ বলে এসেছি, আগে আমাদেরকে খুন কর, পরে ওদেরকে নিয়ে নাও।

'তোমরা কি অস্ত্র চালাতে জান?' গোয়েন্দাদের জিজ্ঞেস করে রক্ষী কমান্ডার।

'আমরা মেয়েদেরকে যে কোন অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। তোমাদের

কাছে তো বর্শা-তীর-কামান সবই আছে। তার থেকে একটি একটি করে দাও না আমাদের!' বলল আলেম।

'এখন নয়। সংঘর্ষ শুরু হোক, তখন দেব।' বললেন হাদীদ। সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় গোয়েন্দাদের।

রক্ষী কমান্ডার বললেন, 'উট-ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করার জন্য এ জায়গা উপযোগী নয়। এক্ষুণি আমাদের এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।' বলেই এক লাফে ঘোড়ায় উঠে রওনা দেয় হাদীদ।

রক্ষীরা তীর-কামান হাতে নেয়। তূনীরের মুখ খুলে নেয়। ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলে তারাও। মেয়েদের নিয়ে আলেম গোয়েন্দাও এগিয়ে চলে।

এক সঙ্গীসহ হাদীদ সকলের আগে। সঙ্গী তাকে বলে, 'ওদের হাতে অস্ত্র দেয়া ঠিক হবে না। শত হলেও ওরা আমাদের শত্রু। অস্ত্র পেলে ওরা ডাকাতদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেলতে পারে।'

'ওরা আমাদের অস্ত্র দিতে অস্বীকার করল। ওদের মনোভাব ভাল নয়। ডাকাতরা ওদের-ই লোক। তোমাদের দু'জনকে ওরা ডাকাতদের হাতে তুলে দেবে আর আমাকে খুন করে ফেলবে।' মেয়েদের উদ্দেশে বলল গোয়েন্দা।

'মুখোশপরা কাউকে দেখামাত্র তীর ছুঁড়বে। আমার নির্দেশের অপেক্ষা করবে না। যখন হোক, যেখানে হোক, ডাকাতদের সঙ্গে সংঘর্ষ হবেই।' রক্ষীদের আগেই বলে দেন হাদীদ।

বিদ্যুদ্গতিতে এগিয়ে চলে কাফেলা। মাঝে-মধ্যে থেমে উট-ঘোড়াকে দানা-পানি খাইয়ে নিচ্ছে। তাই পথ চলায় ক্লান্তি নেই ওদের।

উঁচু-নীচু পার্বত্য এলাকা যেন ফুরাতে চায় না। মাঝে-মধ্যে পথের দু'ধারে উঁচু উঁচু টিলা। হাদীদ ভয় পান টিলার উপর থেকে ডাকাতরা তীর ছোঁড়ে কিনা। সতর্ক করে দেন তিনি সঙ্গীদের। গোয়েন্দাদেরও বলে দেন, যেন তারা উটের গতি বাড়িয়ে ঘোড়ার সমানে চলে আর উপর দিকে লক্ষ্য রাখে।

পার্বত্য এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসে কাফেলা। কোন ডাকাত চোখে পড়েনি। পশ্চিম আকাশে সূর্য নীচে নামতে শুরু করে। একবার দূরে ছায়ার মত দু'টি উট চোখে পড়ল। কাফেলা যেদিকে যাচ্ছে, উট দু'টোও সেদিকে এগুচ্ছে বলে মনে হল। দ্রুত এগিয়ে চলছে কাফেলা।

পথে একস্থানে পানি পাওয়া গেল। থামল কাফেলা। উট-ঘোড়াকে পানি পান করাল। নিজেরাও পান করল। আবার ছুটে চলল।

সূর্য আরো নীচে নেমে আসে। সাঝের আবছা আঁধারে ছেয়ে যায় প্রকৃতি। কাফেলাকে থামান হাদীদ। বলেন, 'যুদ্ধের জন্য এটি উপযুক্ত জায়গা। এখানে আশে-পাশে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।'

হাদীদ ঘোড়াগুলোর জিন খুললেন না, যাতে প্রয়োজনের সময় প্রস্তুত পাওয়া যায়। উটগুলোকে বসিয়ে দেন। আহারাদি সেরে হাদীদ মেয়েগুলোকে এক স্থানে শুইয়ে দেন। সতর্ক থাকতে বলে দেন তাদের। রক্ষীদেরকে তীর-কামান প্রস্তুত রাখতে বলেন। বলেন, চোখ-কান খোলা রেখে শুয়ে থাকতে। হাদীদ নিশ্চিত, রাতে যে কোন সময় আক্রমণ হবেই।

✿ ✿ ✿

মধ্য রাত। শান্ত-নিস্তব্ধ মরুভূমি। হঠাৎ কিসের যেন শব্দ শুনতে পায় কাফেলা। কান খাড়া করে সবাই। চকিতে চোখ তুলে তাকান হাদীদ। ভূত! ভূতের ন্যায় বড় বড় ছায়ামূর্তি দৌড়াচ্ছে কাফেলার চারদিকে। অনেকগুলো উটের পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট কানে আসছে। মাটি যেন থর থর করে কাঁপছে। উটের সংখ্যা দশেরও বেশী বলে মনে হল। একটিতে একজন করে আরোহী। কাফেলার মনে আতংক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তারা।

তিন চারটি চক্কর দিয়ে নিকটে এসে হাঁক দেয়, 'মেয়ে দু'টোকে আমাদের হাতে তুলে দাও। আমরা তোমাদের আর কিছু চাই না; ওদের নিয়েই ফিরে যাব।'

শুয়ে শুয়ে-ই হাদীদ প্রথম তীর ছুঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক আর্তচীৎকার ভেসে আসে। অন্য রক্ষীরাও শোয়া অবস্থাতেই তীর চালাতে শুরু করে। দু'টি উটের গোংগানীর শব্দ শোনা যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দস্যুদলের উট দু'টো।

হাদীদ মেয়েদের বলেন, 'পালাবার চেষ্টা কর না, আমাদের সঙ্গে থাক।'

দস্যুদের একজন বলল, 'আক্রমণ কর, ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। একজনকেও প্রাণে বাঁচতে দিওনা। মেয়েদের তুলে আন।'

জোৎস্না না থাকলেও মরুভূমির রাত বেশ ফর্সা। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। উটের পিঠ থেকে নেমে আসে দস্যুদল। তরবারী আর বর্শা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাফেলার উপর। হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়। দু' পক্ষের হাঁক-ডাকে নিঝুম রাতের নীরবতা ভেঙ্গে যায়। হাদীদ ও তার সঙ্গীরা নিজেরা ঢাল হয়ে দস্যুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করছে মেয়েদের। অস্ত্র চায় মেয়েরা। নিজের তরবারী দিয়ে দেন হাদীদ। নিজে বর্শা দিয়ে-ই মোকাবেলা করছেন তিনি। হাদীদের তরবারী হাতে নিয়ে এক মেয়ে রক্ষীদের নিরাপদ বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে যায়। আলেম গোয়েন্দার সাড়াশব্দ নেই।

দীর্ঘক্ষণ চলে এ সংঘর্ষ। ধীরে ধীরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যোদ্ধারা। রক্ষীরা একে অপরকে ডাকতে থাকে। এক সময়ে তাদের ডাক-চীৎকারও বন্ধ হয়ে যায়। রণাঙ্গনের হট্টগোলও কমে আসে।

হাদীদ তার সঙ্গীদের ডাকেন। কিন্তু কোন জবাব পাচ্ছেন না তিনি। একটি মেয়ের কণ্ঠ শুনতে পান হাদীদ। মেয়েটি চীৎকার করে ডাকছে তাকে। সাথে একটি ঘোড়ার তীব্রগতিতে ছুটে চলার শব্দও শোনা গেল। হাদীদ বুঝতে পারেন, কোন ডাকাত এক

মেয়েকে উটের পরিবর্তে তাদেরই ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত একটি ঘোড়ায় চড়ে বসেন হাদীদ। পলায়নপর ঘোড়ার অনুসরণ করেন তিনি।

বিদ্যুদ্গতিতে ছুটে চলছে তাঁর ঘোড়া। সমতল মরুভূমিতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না তাঁর।

কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করার পর পলায়নপর ঘোড়ার ছায়া চোখে পড়ে। ধীরে ধীরে দুই ধাবমান ঘোড়ার মধ্যকার দূরত্ব কমতে থাকে। হঠাৎ হাদীদ অনুভব করে, পিছন দিক থেকে আরো একটি ঘোড়া ধেয়ে আসছে। আরোহী তারই সঙ্গী না দস্যু বুঝতে পারছেন না তিনি। পিছন থেকে আসা ঘোড়াটি কাছে এসে গেছে হাদীদের। হাদীদ নিজের ঘোড়ার গতি স্বাভাবিক রেখেই উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করেন, কে? কোন জবাব পান না তিনি। হাদীদ তার অশ্বের গতি আরো তীব্র করার চেষ্টা করেন।

পলায়নপর ঘোড়ার বাগ এখন মেয়ের হাতে। ঘোড়া ডান-বাম করতে শুরু করে। গতিও কমে যায়। কাছে চলে আসেন হাদীদ।

হাদীদের হাতে বর্শা। পলায়নপর ঘোড়ার আরোহীর এক পার্শ্বে গিয়েই বর্শার আঘাত হানেন তিনি। এক দিকে সরে যায় ঘোড়া। আঘাত থেকে রক্ষা পায় আরোহী। বর্শা বিদ্ধ হয় ঘোড়ার গায়ে।

ঘোড়া থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ান হাদীদ। অপর ঘোড়ার আরোহীও মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সম্মুখে বসা মেয়েটি ঘোড়ার লাগাম এদিক-ওদিক করে স্থির হতে দিচ্ছে না তার ঘোড়াকে।

মেয়েটিকে নিয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে দস্যু। নিজের ঘোড়াকে ঢাল বানিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে সে।

ঘোড়ায় বসেই আঘাত করার চেষ্টা করছেন হাদীদ। কিন্তু যে দিক থেকেই তিনি আঘাত করছেন, দস্যু মেয়েটিকে নিয়ে তার ঘোড়ার আড়াল হয়ে হাদীদের আঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে।

এবার ঘোড়া থেকে নেমে আসেন হাদীদ। পিছন থেকে ধেয়ে আসা আরোহীও এসে পড়ে ইতিমধ্যে। হাদীদের সঙ্গী নয় সে, দস্যু। সে-ও নেমে পড়ে ঘোড়া থেকে। যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে গর্জে ওঠেন হাদীদ। বলেন, 'আমার জীবন থাকতে তোমরা মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

এক দস্যু মেয়েটিকে ঝাপটে ধরে রাখে। অপরজন যুদ্ধে লিপ্ত হয় হাদীদের সঙ্গে। মেয়ের কাছে এখন তরবারী নেই। মেয়েকে আটকে রাখা দস্যুও এবার হাদীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছেড়ে দেয় মেয়েটিকে।

হাদীদ মেয়েকে ডেকে বলে, 'ঘোড়ায় চড়ে তুমি শোবকের দিকে চলে যাও। আমি দস্যুদের তোমাকে ধাওয়া করতে দেব না।' কিন্তু মেয়ে এক পা-ও নড়ছে না, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে।

দু' দস্যুর মোকাবেলা করেন হাদীদ। দস্যুদ্বয় বারবার তাকে বলে, 'একটি মেয়ের

জন্য নিজের জীবন বিপন্ন কর না। আমাদের পথ ছেড়ে তুমি জীবন নিয়ে সরে যাও।' কিন্তু হাদীদের একই জবাব, 'আগে আমার জীবন নাও, পরে মেয়েকে নিও। আমার জীবন থাকতে তোমরা ওকে নিতে পারবে না।'

হাদীদ মেয়েকে পুনরায় বলে, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন তুমি? পালাও না কেন এখান থেকে!' মেয়ে বলে, 'তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না। জীবন দিতে হলে তুমি একা কেন, দু'জনই দেব। আমার জন্য তুমি তোমার জীবন বিপন্ন করবে, আর আমি তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাব, তা হতে পারে না।'

দস্যুদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন হাদীদ। প্রতিপক্ষের আঘাতে আহত হয়ে পড়েন তিনি। যুদ্ধরত অবস্থায় হাদীদ পুনরায় মেয়েকে বলেন, আমি আহত হয়ে গেছি। আমার মৃত্যুর আগেই তুমি এখান থেকে জীবন-সম্ভ্রম নিয়ে পালিয়ে যাও। অনুরোধ, আর দাঁড়িয়ে থেক না। যাও বলছি, যাও।'

মেয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় এক দস্যু। মওকা পেয়ে যান হাদীদ। তার পাজরে বর্শা ঢুকিয়ে দেন তিনি। কিন্তু এ সময়ে অপর দস্যুর তরবারী হাদীদের কাঁধে আঘাত হানে। হাদীদের আঘাত খাওয়া দস্যু লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে তার তরবারীটি নিয়ে নেয় এবং পিছন থেকে এসে এক ঘা মারে দস্যুর পিঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে চায় সে। এ সময়ে হাদীদের বর্শা এসে বিদ্ধ হয় তার বুকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দস্যুর অসাড় দেহ। চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে যায় সে-ও।

হাদীদও আহত। ক্ষত তার মারাত্মক। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। পড়ে যাচ্ছেন তিনি। মেয়েটি ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে তাঁকে।

কাঁপা কণ্ঠে হাদীদ মেয়েকে বলে, 'তুমি আমায় ছেড়ে দাও। ঘোড়ায় চড়ে এক্ষুণি শোবক অভিমুখে রওনা হও। শোবক এখান থেকে বেশী দূরে নয়; তুমি একাই যেতে পারবে। সঙ্গীদের দিকে যেও না। ওখানে বোধ হয় একজনও জীবিত নেই। যাও, আল্লাহ তোমায় নিরাপদে পৌঁছিয়ে দিন।'

'আপনার জখম কোথায় কোথায়, দেখি?' বলল মেয়েটি।

আমায় মরতে দাও মেয়ে! আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তুমি রওনা হও। আল্লাহর দিকে চেয়ে আমার দায়িত্বটা তুমি নিজেই পালন করে নাও। তোমাকে শোবক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া ছিল আমার দায়িত্ব। কিন্তু আমি আর বাঁচব না। অপর কোন দস্যু-তস্কর এদিকে এসে পড়তে পারে। তার আগে-ই তুমি এ স্থান ত্যাগ কর।'

হাদীদের ব্যাপারে মেয়ের মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। সব সংশয়, ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়েছে তার। মেয়েটি বুঝে ফেলেছে, তাদের ব্যাপারে হাদীদ ও তার সঙ্গীদের কোন কুমতলব বা দুরভিসন্ধি ছিল না। তার জীবন ও ইজ্জত রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দস্যুদলের মোকাবেলা করেছেন তিনি।

আহত হাদীদকে এই জনমানবহীন মরুভূমিতে একাকী ফেলে যেতে স্পষ্ট অস্বীকার করে মেয়েটি। দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা পানির মশক খুলে নিয়ে এসে হাদীদকে পানি পান করায়, নিজের পরিধানের কাপড় এবং হাদীদের পোষাক ছিড়ে কিছু কাপড় নিয়ে জখমে পট্টি বাঁধে। গোয়েন্দা মেয়ের প্রশিক্ষণ আছে এ কাজে।

মেয়েটি হাদীদকে ধরে দাঁড় করিয়ে একটি ঘোড়ার কাছে নিয়ে যায়। বড় কষ্টে তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে বসিয়ে দিয়ে নিজে অন্য ঘোড়ায় চড়তে যায়। কিন্তু হাদীদ ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, 'আমি একা ঘোড়ায় বসে থাকতে পারব না। সেই শক্তি আমার নেই।'

ঘোড়া ছিল তিনটি। একটি ঘোড়াও যাতে খোয়াতে না হয়, তার জন্য বুদ্ধি করে মেয়েটি দু'টি ঘোড়ার বাগ অপর ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে নেয়। নিজে হাদীদের পিছনে চড়ে বসে। হাদীদের পিঠ নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে তার মাথা নিজের কাঁধের উপর রেখে রওনার জন্য প্রস্তুতি নেয় সে।

'শোবক কোন্ দিকে বলতে পারেন?' হাদীদকে জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

হাদীদ মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকান। নক্ষত্র দেখে এবং একদিকে ইংগিত করে বলেন, 'ওদিকে চল'।

ঘোড়া ছুটায় মেয়ে। ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে তিনটি ঘোড়া। খানিক অগ্রসর হওয়ার পর হাদীদ বললেন, 'আমি বোধ হয় বাঁচব না। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। যেখানে আমার মৃত্যু হবে, সেখানেই আমাকে কবর দিও। আমার ব্যাপারে তোমার মনে কোন সন্দেহ থাকলে, তা মন থেকে দূর করে আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি আমানতে খেয়ানত করিনি। দুআ করি, আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে জীবিত গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিন।'

এগিয়ে চলছে ঘোড়া। কেটে যাচ্ছে রাত।

✿ ✿ ✿

পরদিন ভোর বেলা। মেয়েটির কাঁধে মাথা আর বুকে পিঠ ঠেকিয়ে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় বসে আছেন হাদীদ। নিজেকে সচেতন রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তিনি। তার জখমের রক্তক্ষরণ এখন বন্ধ। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে অসাড় হয়ে পড়েছে তার দেহ।

ছোট্ট একটি খেজুর বাগানে এসে ঘোড়া থামায় মেয়েটি। হাদীদকে আলগোছে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামায়। পানি পান করায়। ঘোড়াগুলোর সঙ্গে বাঁধা ছিল কিছু খাবার। হাদীদকে খাওয়ায় সেগুলো। হাদীদের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যায়। মস্তিষ্ক পরিষ্কার হতে শুরু করে। হাদীদ ভাবেন, ছিলাম মেয়েটির রক্ষী, এখন হয়েছি তার বন্দী।

মেয়েটি শুইয়ে দেয় হাদীদকে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সুস্থতা অনুভব করে সে। ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে উঠে তার দেহ। মেয়েটিকে বলেন, 'শোবক আর বেশী দূরে নয়। বোধ হয় আর একদিনের পথ হবে। একটি ঘোড়া নিয়ে তুমি চলে যাও, আমি ফিরে যাই।'

'জীবন নিয়ে তুমি গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। এখান থেকেই যদি ফিরে যেতে হয়, তাহলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। তুমি যেমন আমাকে একাকী ফেলে আসনি, আমিও তোমাকে একলা ছেড়ে যাব না।' বলল মেয়েটি।

'আমি পুরুষ। একজন নারী আমাকে হেফাজত করবে, আমার মন তা মানছে না। তার চেয়ে বরং আমার মরে যাওয়াই শ্রেয়।' বললেন হাদীদ।

'যারা ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকে, যারা পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া এক পা-ও চলতে পারে না, আমি তেমন মেয়ে নই। আমাকে একজন সৈনিক-ই মনে কর। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আমার অস্ত্র তীর-তরবারী নয়। আমার অস্ত্র হল, আমার রূপ-যৌবন, আমার নারীত্ব, আমার বাকপটুতা। তোমার মত আমিও কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত। এখান থেকে পায়ে হেঁটে আমি শোবক যেতে পারি।' বলল মেয়েটি।

'আমি তোমার আবেগের মূল্যায়ন করি। দস্যুরা আমাদের দু'জনকে পরস্পর কত কাছে এনে দিয়েছে! অথচ, আমরা একে অপরের দুশমন। তুমি আমার দেশের ভিত উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছ, আর আমি একদিন তোমার দেশ আক্রমণের স্বপ্নে বিভোর।' বললেন হাদীদ।

'কিন্তু এ মুহূর্তে আমার বন্ধুত্ব বরণ করে নাও। দুশমনির কথা তখন ভাববে, যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তুমি নিজের দেশে ফিরে যাবে।' বলল মেয়ে।

মেয়েটি হাদীদের বাহু ধরে শোওয়া থেকে উঠিয়ে বসায়। হাদীদ নিজ শক্তিতে উঠে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে হেঁটে ঘোড়ার কাছে পৌঁছে সে। মেয়েটি ধরে হাদীদকে ঘোড়ার রেকাবে তুলে দেয়। ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে বসায় তাকে। হাদীদকে বসিয়ে মেয়েটি নিজেও একই ঘোড়ায় চড়তে চায়। বাঁধা দেন হাদীদ। বলেন, 'তুমি অন্য ঘোড়ায় উঠ। আমি এখন একাই চলতে পারব।'

'তবু আমি এ ঘোড়ায়-ই বসব। তোমাকে জড়িয়ে রাখব আমার গায়ের সাথে।' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মেয়ে।

হাদীদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও মেয়েটি তার ঘোড়ার পিছনে চড়ে বসে। নিজের এক বাহু হাদীদের বুকে রেখে হাদীদকে নিজের গায়ের সাথে জড়িয়ে রাখার চেষ্টা করে। আপত্তি জানায় হাদীদ। বলে, 'আমাকে একটু নিজের শক্তিতে বসতে দাও।'

হাদীদের আপত্তিতে কান দেয় না মেয়ে। জোর করে হাদীদকে নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নেয় সে। নিজের কাঁধের উপর টেনে আনে হাদীদের মাথা। তারপর বলে, 'আমি জানি, খারাপ মেয়ে মনে করে তুমি আমার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছ।'

'না, 'খারাপ মেয়ে' মনে করে নয়– শুধু 'মেয়ে' হওয়ার কারণে আমি তোমার

থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছি। দু'টি রাত নিতান্ত অসহায় অবস্থায় তুমি আমার বন্দীনী ছিলে। ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে দাসীর মত ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু আমি শয়তানকে আমার উপর জয়ী হতে দেইনি। এখন আমার মনে হচ্ছে, যেন আমি আমানতে খেয়ানত করছি। আমার মধ্যে পাপবোধ জাগ্রত হচ্ছে।'

'তুমি পাথর তো আর নও। আমাকে যখনই যে পুরুষ দেখেছে, কামনার চোখেই দেখেছে। সামান্য মূল্যের বিনিময়ে আমি তোমার জাতির দু'জন মুমিনের ঈমান কিনে নিয়ে এসেছি।'

'কত মূল্য?' জিজ্ঞেস করে হাদীদ।

শুধু এতটুকু যে, তাদেরকে আমার কাছে বসতে দিয়েছি, আমার কাঁধে তাদের মাথা রেখেছি।' জবাব দেয় মেয়ে।

'ঈমান ছিল-ই না তাদের কাছে।' বলল হাদীদ।

'যতটুকু ছিল, তা-ই আমি নিয়ে এসেছি। তার স্থলে তাদের অন্তরে স্বজাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি।'

'তারা কারা?' জানতে চায় হাদীদ।

'এখন বলব না। তোমার অর্পিত দায়িত্বের প্রতি তুমি যেমন নিষ্ঠাবান, তেমনি আমার কর্তব্যও আমার কাছে ততটুকু প্রিয়।' জবাব দেয় মেয়েটি।

কথা বলা বন্ধ করে হাদীদ। যুবতীর দেহের উষ্ণতা, হালকা ঘ্রাণ অনুভব করছে সে। তরুণীর উন্মুক্ত রেশম-কোমল চুল বাতাসে উড়ে ছুয়ে যাচ্ছে হাদীদের গাল-মুখ।

তন্দ্রা পায় হাদীদের। ঝিমিয়ে পড়ে সে। এগিয়ে চলছে ঘোড়া। বেশ কিছু পথ অতিক্রম করার পর চোখ খুলে হাদীদ। সূর্য তখন মাথার উপরে উঠে এসেছে। হাদীদ বলে, 'ঘোড়ার গতি বাড়াও। আশা করি, সূর্যাস্তের পরপর আমরা শোবক পৌঁছে যেতে পারব।'

ঘোড়ার গতি বাড়ায় মেয়ে। তীব্রগতিতে পিছনে সরে যাচ্ছে মরুপ্রান্তর।

❁ ❁ ❁

সূর্য ডুবে গেছে। শোবকের সভাকক্ষে খৃষ্টান সম্রাট ও কমান্ডারগণ উপবিষ্ট। আলেম গোয়েন্দাও তথায় উপস্থিত। কর্মকর্তাদের নিকট রিপোর্ট পেশ করছে সে।

'মেয়ে দু'টোর পরিণতি কি হয়েছে, তা আমি বলতে পারছি না। ওদের রক্ষা করা তো দূরে থাক, আমি ওদেরকে এক নজর দেখে আসারও চেষ্টা করিনি। কারণ, মিসর থেকে আমি যে তথ্য নিয়ে এসেছি, তা মেয়ে দু'টোর চেয়েও বহু বহু মূল্যবান। আপনাদের নিকট সে তথ্য পৌঁছানোর জন্য ডাকাতদের আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক সুযোগে ঘোড়ায় চড়ে আমি পালিয়ে এসেছি। আইউবীর বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়া ছিল আমার এক বিস্ময়কর ঘটনা। তাই ডাকাতদের রক্তক্ষয়ী হামলা থেকে আমি নিরাপদে সরে এলাম, কেউ-ই আমাকে ধাওয়া পর্যন্ত করল না।

আমার মনে হয়, ওরা আসলে দস্যু নয়। আইউবী-ই দস্যুবেশে ওদেরকে আমাদের উপর লেলিয়ে দিয়েছেন। ঘটনাটি একটি সাজানো নাটক। সালাহুদ্দীন আইউবী আমাদের তিনজনকে মৃত্যুদন্ড কেন যে দিলেন না, কেন যে মেয়েদের নষ্ট করার জন্য তিনি এই পন্থা অবলম্বন করলেন, আমার তা মাথায় ধরছে না। মেয়েগুলো এখন বোধ হয় ওদের আয়ত্ত্বে চলে গেছে এবং অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করছে!' বলল আলেম গোয়েন্দা।

'ওদের মুক্তির কথা ভাববার সময় আমাদের নেই। দু'টো মেয়ে হারিয়েছি, তাতে তেমন কিছু হয়নি। বৃহত্তর স্বার্থে এরূপ ত্যাগ দিতেই হয়। আমাদের কাছে মেয়ের অভাব নেই। এ পদ্ধতি আমাদের সফল। এই ধারা চালু রাখার জন্য আরো মেয়ে প্রস্তুত কর। সভাসদদের সকলেই এসে গেছেন, এবার বলুন, আপনি কী তথ্য নিয়ে এসেছেন।' বলল এক কর্মকর্তা।

কায়রোর এক মসজিদে সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানের হাতে কিভাবে বন্দী হল, কয়েদখানায় তার ও মেয়েদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হল এবং সুলতান আইউবী কিভাবে তাদের অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি দিলেন, আলেম গোয়েন্দা সভাসদদের সামনে সব বিবরণ তুলে ধরে। এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আইউবী তাকে কিভাবে দিলেন, তাও শোনায়। দিন-তারিখ উল্লেখ করে আলেম গোয়েন্দা জানায়, 'সালাহুদ্দীন আইউবী এ-দিন কার্ক আক্রমণের জন্য বাহিনী প্রেরণ করবেন। তাঁর এ ঘোষণা শুনে এক সভাসদ বলল, কার্ক নয়– আগে আমাদের শোবক দখল করা প্রয়োজন। কারণ, কার্কের তুলনায় শোবক অধিক শক্তিশালী দুর্গ। কিন্তু আইউবী শোবকে তার শক্তি ব্যয় করতে চাইছেন না। দুর্বল মনে করে তিনি কার্ক দখল করতে চান আগে। তাঁর কথা হল, আগে কার্ক দখল করে তাকে তিনি সৈন্য ও রসদ ইত্যাদির কেন্দ্র বানাবেন। পর্যাপ্ত রসদ সংগ্রহ করে বিশেষ ফোর্স তলব করবেন। তারপর সৈন্যদের কিছুদিন বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে শোবকে হামলা চালাবেন।

তিনি আমাদের অজ্ঞাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে চান। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, তার সৈন্য কম। পক্ষান্তরে আমাদের সৈন্যও বেশী এবং আমাদের ঘোড়াও তার ঘোড়া অপেক্ষা উন্নত। তাছাড়া আমাদের আছে বর্ম, আছে শিরস্ত্রাণ, যা তার নেই। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'খৃষ্টান সৈন্যরা যদি আমাদেরকে পথেই প্রতিহত করে ফেলে, তাহলে পরাজয় ছাড়া আমাদের উপায় থাকবে না। তিনি খোলা মাঠে যুদ্ধ করতে ভয় পান।'

সুলতান আইউবীর মুখ থেকে শোনা সব কথা আনুপুংখ বিবৃত করে আলেম গোয়েন্দা।

এমন মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তার বিস্তারিত বিবরণ শুনে সবাই ভুলে গেল মেয়েদের কথা। এ বিষয়ে মত বিনিময় শুরু হল। দীর্ঘ আলোচনার পর সভা এ

সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সুলতান আইউবী একজন অসাধারণ বিচক্ষণ যোদ্ধা। কার্ক আক্রমণের যে পরিকল্পনা তিনি প্রস্তুত করেছেন, তাতেই তার সামরিক দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। পথে লড়াই এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্তও তার বিচক্ষণতার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। আমাদের প্রতি যীশু খৃষ্টের অপার অনুগ্রহ আছে বলেই আমরা আগেভাগে এ পরিকল্পনার খবর পেয়ে গেছি। অন্যথায় আইউবী শুধু কার্ক-ই নয়- শোবকের মত শক্ত দুর্গের জন্যও আশংকার কারণ হয়ে দেখা দিত।

সালাহুদ্দীন আইউবীর পরিকল্পনা মোতাবেক তখনই তাদের সেনা তৎপরতা ও প্রতিরোধ আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পরিকল্পনায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়-

সম্মিলিত খৃষ্টান বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড থাকবে শোবকে। রসদও থাকবে এখানে। শোবক থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কার্ক দুর্গকে আরো দুর্ভেদ্য করে তোলা হবে। শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কার্কে আরো কিছু সৈন্য পাঠান হবে।

আইউবীকে কার্ক থেকে দূরে তারই সীমান্তের ভিতরে কোন এক দুর্গম পার্বত্য এলাকায় প্রতিরোধ করা হবে। এ লক্ষ্যে বিপুলসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করা হবে। এই বাহিনীতে বেশী থাকবে অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী সৈন্য। আইউবীর বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। পানির ঝর্ণাগুলো কব্জা করতে হবে আগেই।

পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ শুরু করার নির্দেশ জারী করা হয়। সবাই ভীষণ আনন্দিত। এ-ই প্রথমবার তারা সময়মত সুলতান আইউবীর গোপন পরিকল্পনার কথা জানতে পারল। অন্যথায় সবসময়-ই তিনি ক্রুসেডারদের ফাঁকি দিয়ে-ই অভিযান পরিচালনা করে থাকেন।

খৃষ্টান সেনাপতিগণ বিস্ময় প্রকাশ করে বলে যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় দূরদর্শী সিপাহসালারের থেকে এই পদস্খলন ঘটল, যে শত্রু গোয়েন্দাদের তিনি মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদেরকে পাশের কক্ষে বসিয়ে উচ্চস্বরে এমন একটি নাজুক বিষয় নিয়ে কথা বললেন! সেনাপ্রধান তার ফ্রান্সের সৈন্যদের কাছেও এ পয়গাম প্রেরণ করে যে, অমুক দিনের আগেই তোমরা এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে, যেখানে নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিশেষ বাহিনীকে প্রতিরোধ করা যায়।

এ সময়ে কক্ষে প্রবেশ করে এক খৃষ্টান অফিসার। গোয়েন্দা প্রধানের কানে কানে কি যেন বলে। গোয়েন্দা প্রধান সকলকে জানায়, ডাকাতের হাতে আক্রান্ত মেয়ে দু'টোর একজন এইমাত্র এসে পৌঁছেছে। সাথে তার এক আহত মুসলিম রক্ষীসেনা।

আলেম গোয়েন্দা সকলের আগে কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ে। তার পিছনে অন্যরাও বাইরে আসে। আহত হাদীদকে বারান্দায় শুইয়ে রেখে তার মাথার কাছে বসে আছে মেয়েটি। দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে পট্টি-ব্যান্ডেজ খুলে গিয়ে ক্ষতস্থান থেকে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে হাদীদের। বিছানায় অচেতন পড়ে আছে সে।

খৃষ্টান সেনাপতিদের কেউ হাদীদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না। কারণ, তাদেরকে আগেই বলা হয়েছিল যে, ডাকাতদের আক্রমণ ছিল সাজানো নাটক। আইউবী-ই এ আক্রমণের মূল নায়ক।

আলেম গোয়েন্দা মেয়েটির হাত ধরে তাকে কক্ষের ভিতরে চলে আসতে বলে। খৃষ্টানদের বড় মূল্যবান মেয়ে ও। কিন্তু হাদীদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে এক চুল নড়বে না বলে জানিয়ে দেয় সে।

গোয়েন্দা প্রধান হরমুন মেয়েটিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কানে কানে বলে, 'কোন্ সাপের বাচ্চাকে তুমি ব্যান্ডেজ করাতে চাইছ? ভাগ্য প্রসন্ন ছিল বলেই না তুমি জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছ। অন্যথায় এরা তো তোমাদেরকে ডাকাতরূপী হায়েনাদের হাতে তুলে দিতেই চাইছিল!'

'এ তথ্য মিথ্যা। প্রথমে আমারও এ সন্দেহ ছিল। এ লোকটি আমার মনের সব সন্দেহ মুছে দিয়েছে। দু' ডাকাতকে খুন করে সে আমার জীবন রক্ষা করেছে।' কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

মেয়েটি হরমুনকে সব ঘটনা খুলে বলে। শেষে একথাও জানায় যে, লোকটি আমাকে বারবার বলছিল, 'আমাকে এখানে মরতে দাও আর তুমি শোবক চলে যাও।'

খৃষ্টানদের চোখে মুসলমান মানেই এক চরম ঘৃণ্য জাতি। মুসলমান হওয়ার কারণে হাদীদও ঘৃণার পাত্র। তাই এতগুলো অফিসার-সেনাপতির মধ্যে একজনও বলল না যে, লোকটির চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

জিদ্ ধরে বসে আছে মেয়েটি। অবশেষে একজন অফিসার বলল, লোকটিকে কক্ষে নিয়ে গিয়ে ব্যান্ডেজ করার ব্যবস্থা কর।

হাদীদকে তুলে কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। মেয়েটি চাপের মুখে অফিসারদের সঙ্গে চলে গেল।

মেয়েকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল অফিসাররা। তার জীবিত ফিরে আসার কাহিনী জানতে চায় তারা। সব ঘটনা খুলে বলে সে।

মেয়ের জন্য খাদ্য ও শরাব এসে যায়। আহার সেরে নিতে বলে অফিসাররা।

'জখমীকে খাইয়ে থাকলেই তবে আমি খাব। অন্যথায় আমি খাবার স্পর্শ করব না। আমি তাকে একটু দেখে আসি।' বলেই মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়।

'থাম লুজিনা! এই দ্বিতীয়বার ক্রুশের সামরিক নীতির বিরুদ্ধাচারণ করছ তুমি! প্রথমবার তোমাকে কক্ষে প্রবেশ করতে বলা হয়েছিল আর তুমি সেই নির্দেশ অমান্য করে বলেছিলে, আগে জখমীকে ব্যান্ডেজ করা হোক, তারপর আমি কক্ষে যাব। এবার তুমি বিনা অনুমতিতে অভদ্রের ন্যায় বাইরে যেতে পা বাড়িয়েছ! তোমার সম্মুখে যারা উপবিষ্ট, তারা সবাই খৃষ্টান বাহিনীর পদস্থ অফিসার। দু'জন সম্রাটও বসা আছেন এখানে। জান, তোমার এ অপরাধের শাস্তি কি? দশ বছরের কারাদন্ড। আর যেহেতু

তুমি এ আইন লংঘন করছ শত্রু বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিকের খাতিরে, তাই আমরা তোমাকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তিও দিতে পারি।' অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলল গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

'যে লোকটি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একজন অভিজ্ঞ খৃষ্টান গোয়েন্দা মেয়ের জীবন রক্ষা করল, খৃষ্টান সম্রাট ও সেনাপতিগণ কি তাকে এর কোন প্রতিদান দেবেন না? আমি জানি, ও আমাদের শত্রু শিবিরের একজন সেনা কমান্ডার। কিন্তু আমি তাকে দুশমন ভাবব তখন, যখন সে নিজ বাহিনীতে ফিরে যাবে।' বলল লুজিনা।

'শত্রু সর্বাবস্থায় এবং সব জায়গায়-ই শত্রু। ফিলিস্তীনে ক'জন মুসলমানকে আমরা জীবিত থাকতে দিয়েছি? কেনই বা আমরা তাদের বংশধারা নিঃশেষ করছি? কারণ, ওরা আমাদের শত্রু, আমাদের ধর্মের দুশমন। ক্রুশ ছাড়া আর কোন প্রতীক আমরা পৃথিবীতে রাখব না। আমাদের কাছে একজন আহত মুসলমানের কোনই মূল্য নেই। বস তুমি!' চীৎকার করে বলল এক কমান্ডার।

লুজিনা বসে পড়ে। বেদনার অশ্রুতে দু' চোখ ঝাপসা হয়ে আসে তার।

✿ ✿ ✿

পরদিন সকাল থেকে শোবকে নতুন এক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। এ তৎপরতা সামরিক। শোবকের বেসামরিক জনগণ আপন আপন কাজে লিপ্ত। এ তৎপরতার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। দুর্গ থেকে সারি সারি সৈন্য বের হচ্ছে। সামান-পত্র এদিক-ওদিক করা হচ্ছে। বহিরাগত সৈন্যদের সাময়িক তাঁবুর জন্য জায়গা খালি করা হচ্ছে। রসদ পরিবহনের জন্য উটের বহর দাঁড়িয়ে আছে। সেনা হেডকোয়ার্টারেও তৎপরতার অন্ত নেই। সালাহুদ্দীন আইউবীর আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে গতরাতে যে পরিকল্পনা ঠিক করা হয়েছিল, তার-ই অংশ হিসেবে এ ব্যস্ততা। অফিসারদেরও এক দন্ড দাঁড়াবার ফোরসত নেই। উঁচু পর্যায়ের কয়েকজন অফিসার রওনা হয়ে গেছে কার্ক অভিমুখে।

মাত্র একটি মেয়ে এ তৎপরতায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। লুজিনা। যে হাদীদকে সঙ্গে করে শোবকে নিয়ে এসেছিল, সেই মেয়ে।

গত রাতে সভাকক্ষ থেকে যখন সে ছুটি পায়, তখন মধ্য রাত। গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ শাখার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা বলে পূর্বেকার অভিযানের রিপোর্ট পেশ করতে হয়েছে তাকে রাতভর।

দীর্ঘ পথ অশ্ব চালনার ক্লান্তি ও অনিদ্রায় এখন অসাড় হয়ে পড়েছে তার দেহ। একজন অফিসার তাকে বলেছিল, 'তোমার আহত মুসলিম ফৌজিকে ডাক্তারের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। ওর জন্য তোমার এত অস্থির হওয়া ঠিক হচ্ছে না। এরূপ আবেগ-প্রবণতা তোমার কর্তব্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।'

গোয়েন্দা প্রধান হরমুন লুজিনাকে বলেছিল, 'এ রাতে না হলে কনরাড এবং গাই

অফ লুজিনান এর মত সম্রাট– যারা কাউকে ক্ষমা করতে জানেন না– তোমাকে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করতেন। তোমার মুসলিম রক্ষীর যা করার করা হয়েছে। তোমার জন্য নির্দেশ, তার সঙ্গে তুমি সাক্ষাৎ করতে পারবে না।'

'কেন? আমি কি তার কৃতজ্ঞতাও আদায় করতে পারব না?' বিস্ময় ও নিরাশার সুরে বলল লুজিনা।

'না। কারণ সে দুশমনের ফৌজি। তুমি যে বিভাগে চাকুরী কর, জান তো তা কি? আমি তোমাকে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিতে পারি না। তোমার বিদ্যা ও কর্তব্যের দাবীও তা-ই। আমি এ-ও লক্ষ্য করছি যে, তার প্রতি তুমি আসক্ত হয়ে পড়েছ। এটা ভাল লক্ষণ নয়। শত্রুর সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দেয়া যায় না লুজিনা।' হরমুনের কণ্ঠে দৃঢ়তা।

'আপনি আমাকে শুধু এতটুকু নিশ্চয়তা দিন যে, তার ক্ষতে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে আর নিরাপদে তাকে ফেরত পাঠান হবে।' বলল লুজিনা।

'লুজিনা! আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমার এ আকাংখা পূরণ করা হবে। আর শোন, তুমি বড় কঠিন ভয়ানক মিশন থেকে ফিরে এসেছ, তোমার সফরও ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তোমাকে দশদিনের ছুটি দেয়া হল। পরিপূর্ণ বিশ্রাম নাও।' ঝাঁঝ মেশানো কণ্ঠে বলল হরমুন।

রাতে এসব কথাবার্তার পর লুজিনা তার কক্ষে চলে যায়। গোয়েন্দা মেয়েদের আবাস হাইকমাণ্ড থেকে অনেক দূরে। কিন্তু লুজিনার মত উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দা মেয়েরা থাকে বেশ উন্নত কক্ষে, রাজকীয় হালে। রাজকন্যাদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা ও বিলাস উপকরণ পায় তারা। দায়িত্ব তাদের যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, সুযোগ-সুবিধা তেমনি উন্নত।

কক্ষে গিয়েই বিছানায় গা এলিয়ে দেয় লুজিনা। মুহূর্ত মধ্যে দু' চোখের পাতা বুজে আসে তার। গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে সে।

পরদিন বেশ বেলা হলে চোখ খোলে লুজিনার। কিন্তু বিছানা থেকে শরীর টেনে তুলতে পারছে না সে। ভেঙ্গে আসছে তার সারা শরীর। উঠে বসার শক্তিটুকুও পাচ্ছে না সে।

বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে অবশেষে উঠে দাঁড়ায় লুজিনা। নাস্তা করে বাইরে বের হওয়ার প্রস্তুতি নেয়। ইতিমধ্যে পাশের কক্ষের মেয়েরা এসে কায়রোর কারগুজারী শুনতে চায় তার কাছে। কথা বলতে মন চাচ্ছে না লুজিনার। সংক্ষেপে দু' চারটা কথা শুনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে হবে বলে হাসপাতাল অভিমুখে ছুটে যায়।

✿ ✿ ✿

একটু এগুতেই এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয় লুজিনার। গোয়েন্দা বিভাগেই চাকুরী করে মেয়েটি। লুজিনার সহকর্মী। দু'জনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। নিজের মনের কথা অপরজনের কাছে গোপন রাখে না দু'জনের কেউ।

মুখোমুখি হয় দু' বান্ধবী। কিছুক্ষণ মুখপানে তাকিয়ে থেকে লুজিনার বান্ধবী জিজ্ঞেস করে, যাচ্ছ কোথায়, লুজি? তোমাকে খুব অস্থির মনে হচ্ছে! কোন অঘটন ঘটেছে, নাকি দীর্ঘ সফরের ক্লান্তির কারণে এমনটি হল? ছুটি পাওনি বুঝি?

'ছুটি পেয়েছি বটে, তবে বিশেষ একটি ঘটনা আমাকে অস্থির করে তুলেছে।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল লুজিনা।

বান্ধবীর হাত ধরে একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে লুজিনা। বান্ধবীকে ঘটনা বিস্তারিত শুনিয়ে মনের বোঝা হালকা করার চেষ্টা করে। অফিসাররা তাকে যে ধমক দিয়েছে, বান্ধবীকে তাও শুনিয়ে লুজিনা বলল, 'আমি হাদীদকে এক নজর দেখতে চাই। আমার আশংকা, ওর কোন চিকিৎসা হয়নি এবং ওকে নির্দয়ভাবে নগর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে কিংবা মৃত্যুর জন্য কোন এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হয়েছে।'

'তুমি বললে, তোমাকে না ওর সঙ্গে দেখা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে! অফিসারদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এ ঝুঁকি নিওনা বোন! ধরা পড়লে জান তো শাস্তি কি!' লুজিনাকে নিরস্ত হওয়ার পরামর্শ দেয় বান্ধবী।

'লোকটির জন্য মৃত্যুদন্ডও মাথা পেতে নিতে আমি প্রস্তুত। আমার খাতিরে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছে সে, তা তোমাকে বলেছি। ডাকাতদের হাতে আমার জীবনের কোন ভয় ছিল না। আমাকে ওরা তুলে নিয়ে যেত। কিছুদিন ভোগ করে নষ্ট করে কোন আমীরের হাতে বিক্রি করে দিত। হাদীদ আমার এই পরিণতির কথা জানত। আমার ইজ্জতের খাতিরে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করেছে। ডাকাতরা তাকে বলেছিল পর্যন্ত, 'মেয়েটিকে আমাদের হাতে তুলে দাও, আর তুমি নিজে নিরাপদে চলে যাও।' হাদীদ এ-ও তো জানত যে, আমি পবিত্র মেয়ে নই। কিন্তু তারপরও তার বিবেচনায় আমি ছিলাম তার আমানত। এ আমানতকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশী মূল্য দিয়েছে সে।'

'লোকটির জন্য তুমি বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছ লুজি!'

'হ্যাঁ। হরমুনের সামনে আমি আমার আবেগ প্রকাশ করতে পারিনি। কিন্তু তোমার কাছে তো আমি মনের সব কথা খুলে বলতে পারি। তুমি আমার বান্ধবী। আমার-ই মত একজন নারী। নারীর হৃদয় বহন কর তুমি। আচ্ছা বল তো, আমাদের জীবনটা কি? আমরা সুদর্শন খঞ্জর। মধুর বিষ। আমাদের দেহ ব্যবহৃত হয় পুরুষের বিনোদ সামগ্রী আর প্রতারণার ফাঁদ হিসেবে। এ-ই কি আমাদের জীবনের মূল্য? এমন কথা

আমি আগে কখনো ভাবিনি। আমার মধ্যে কোন আবেগ-আসক্তি আছে বলেও মনে করিনি কখনো। কিন্তু এ লোকটির দেহের পরশ আমার ঘুমন্ত সব আবেগ-স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছে। আমি এখন নিজেকে যুগপৎ মা-বোন-কন্যা এবং একজন পুরুষপ্রার্থী নারী বলে কল্পনা করছি।' আবেগঝরা কণ্ঠে বলল লুজিনা।

এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলার পরও বলা শেষ হয় না লুজিনার। আবার বলতে শুরু করে সে–

'আমাকে সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আমি নাশকতামূলক কাজে এত দক্ষতা অর্জন করেছি যে, আমি যে কোন স্বৈরশাসককে আঙ্গুলের উপর নাচাতে পারি। কিন্তু ডাকাতরা আমাকে বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত করেছে। আমাকে তারা এমন এক স্তরে নামিয়ে এনেছে, যেখানে আমার মত মেয়েরা প্রতি রাতে নিত্য নতুন খদ্দেরের হাতে বিক্রি যায় কিংবা কোন মুসলমান আমীর বা শাসকের হেরেমের দাসীতে পরিণত হয়। হাদীদ আমাকে সেখান থেকে উপরে তুলে এনেছে। ডাকাতদের হাতে পড়ার আগে আমি তার বন্দীনী ছিলাম। ইচ্ছে করলে সে আমাকে তার বিনোদ উপকরণে পরিণত করতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। তারপর যখন লোকটি আমার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করল, তখন আমি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি; জড়িয়ে নিই তাকে নিজের বুকের সঙ্গে।

সালাহুদ্দীন আইউবীর একটি কথা আমার মনে পড়ে যায়। তিনি আমায় বলেছিলেন, তুমি কোন সম্ভ্রান্ত পুরুষের স্ত্রী হয়ে মর্যাদার সাথে জীবন কাটাতে পার না? তখন লোকটিকে আমার কাছে বোকা মনে হয়েছিল। মনে মনে বলেছিলাম, নিতান্ত বেওকুফ ছাড়া এমন কথা বলে নাকি কেউ! কিন্তু এখন অনুভব করছি, তিনি কত মূল্যবান কথা বলেছিলেন।

শোন সখী! আমি তোমায় পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, গুপ্তচরবৃত্তি করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। শৈশব থেকে যে প্রশিক্ষণ আমাকে দেয়া হয়েছিল, তার সব আমি হারিয়ে ফেলেছি। মরুভূমির সেই ভয়ানক রাত, দস্যুর ভয় আর হাদীদের দেহের উষ্ণ পরশ ও তার রক্তের ঘ্রাণ আমার ভিতর থেকে সব বিদ্যা ধুয়ে মুছে ছাফ করে দিয়েছে।'

লুজিনার অবলীলায় বলে যাওয়া কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনে তার বান্ধবী। লুজিনা থামলে এবার মুখ খুলে সে। বলে–

'এতগুলো কথা না বললেও তোমার মনের অবস্থা বুঝতে আমার অসুবিধা হত না। কিন্তু বাস্তবকে তো আর অস্বীকার করা যায় না লুজি! যার জন্য তোমার এত ব্যাকুলতা, এখান থেকে একদিন তাকে চলে যেতেই হবে। আর তুমিও পারবে না তার সঙ্গে যেতে। এ সময়ে যদি সে এখানে কষ্টেও থাকে, তবু উপরের নিষেধাজ্ঞার কারণে তুমি তো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারছ না। চেষ্টা করতে পার, কিন্তু ধরা

পড়লে তোমার সঙ্গে তাকেও জীবন হারাতে হবে। অতএব, এসব চিন্তা ত্যাগ করে তুমি শান্ত হও।'

'তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর বোন! এতটুকু খবর নাও যে, লোকটি কোথায় আছে। হাদীদ সুস্থ হয়ে আপন গন্তব্যে চলে গেছে, এটুকু জানতে পারলেই আমার মন শান্তি পাবে। এটুকু উপকার তুমি আমার কর বোন!' মিনতির সুরে বলল লুজিনা।

'ঠিক আছে, এ কাজ আমি করতে পারব। তুমি শান্ত হও। কক্ষে চলে যাও, আরাম কর।' বলল বান্ধবী।

লুজিনা তার কক্ষে চলে যায়। বান্ধবী চলে যায় অন্যদিকে।

❁ ❁ ❁

কায়রোতে চলছে ব্যাপক সেনা তৎপরতা। সৈন্যদের সামরিক মহড়া চলছে। অতর্কিত আক্রমণ, অল্প ক'জনে দুশমনের বিপুল সৈন্যের উপর হামলা চালিয়ে শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে কমান্ডো বাহিনী। আক্রমণ করে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে যাওয়ার ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে তাদের। রাতের বেলাও ছাউনিতে অবস্থান নেয়ার সময় পাচ্ছে না তারা; থাকতে হচ্ছে ছাউনির বাইরে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিজে মহড়ার তদারকি করছেন। তিন-চার দিন পরপর তিনি উচ্চপদস্ত অফিসার ও গ্রুপ কমান্ডারদের উদ্দেশে বক্তৃতা করছেন এবং মানচিত্রের সাহায্যে তাদের রণকৌশল শিক্ষা দিচ্ছেন।

তাঁর এ প্রশিক্ষণের মূলনীতি হল, স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের পক্ষে দুশমনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন, অস্ত্রের চেয়ে বুদ্ধিকে বেশী কাজে লাগান, মুখোমুখি লড়াই এড়িয়ে চলা, সম্মুখ থেকে হামলা না করা, দিনে একশত সৈন্য মুখোমুখি লড়াই করে দুশমনের যে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে, রাতে দশ-বারজনের কমান্ডো আক্রমণে তার চেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করা। তাছাড়া দুশমনের দুর্গ কিংবা শহর দীর্ঘ সময় অবরোধ করে রাখার পদ্ধতি এবং দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গার নিয়মও শিক্ষা দেন সুলতান। দুর্বল ও বয়স্ক উট, ঘোড়া ও খচ্চরগুলো আলাদা করে ফেলেন তিনি। আক্রমণের দিন-ক্ষণ ঠিক হয়ে আছে আগেই।

সুলতান আইউবী ফিলিস্তীন জয়ের যে পরিকল্পনা স্থির করেছেন, তার প্রথম অভিযানে সাফল্যের সঙ্গে ফিলিস্তীন প্রবেশ করার তৎপরতা চলছে জোরেশোরে। অপরদিকে আইউবীকে পথেই প্রতিহত করার আয়োজন করছে খৃষ্টান বাহিনী। প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছিল, দু' পক্ষ-ই একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে চিরদিনের জন্য।

শোবক থেকে কার্ক এবং মিসরের সীমান্ত পর্যন্ত ক্রুসেডারদের আয়োজনের পরিধি। এ অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে তারা তাদের সেনাবাহিনী। এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে তারা সুলতান আইউবীর জন্য ফাঁদ হিসেবে গড়ে তুলেছে। এ ফাঁদে একবার

আটকা পড়লে জীবনেও উদ্ধার পাবে না আইউবী। সুলতান আইউবীর সে পরিকল্পনার-ই আলোকে চলছে তাদের প্রস্তুতি, যা সময়ের আগেই তাদের গোচরে এসে গেছে। মনে মনে আত্মতৃপ্তিতে বিভোর খৃষ্টান রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাপতিগণ।

এই ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির ফাঁকে শোবকে চলছে অন্য এক গোপন তৎপরতা। তার সম্পর্ক যুদ্ধের সঙ্গে নয়– হৃদয়ের সঙ্গে।

লুজিনা নির্লিপ্ত পড়ে আছে তার কক্ষে। বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করছে সে হাদীদের জন্য। হাদীদের অমঙ্গল-আশংকায় উথালপাথাল করছে তার মন।

লুজিনার বান্ধবী দু'দিন ধরে ঘুরে ফিরছে হাদীদের সন্ধানে। হাদীদ অফিসারদের হাসপাতালে নেই। নেই সাধারণ সৈনিকদের হাসপাতালেও।

পদস্থ গুপ্তচর হওয়ার সুবাদে বড় বড় অফিসারদের কাছে তার অবাধ যাতায়াত। সকলে তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এ সুযোগকে কাজে লাগায় সে। 'লুজিনার সঙ্গে যে আহত মুসলিম ফৌজি এসেছিল, এখন সে কোথায়?' একে একে ছোট-বড় সব অফিসারকে জিজ্ঞেস করে লুজিনার বান্ধবী। কিন্তু প্রত্যেকের একই জবাব, কই এমন কাউকে তো আমি দেখিনি!

তৃতীয় দিন এক অফিসার তাকে সাবধানতার সাথে জানায়, লুজিনার সঙ্গে আসা আহত মুসলিম ফৌজিকে ব্যান্ডেজ করে 'মুসলিম ক্যাম্পে' পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

শোবকের 'মুসলিম ক্যাম্প' এক ভয়ংকর স্থান। মুসলিম যুদ্ধবন্দী আর বিজিত অঞ্চল থেকে ধরে আনা নিরপরাধ বেসামরিক মুসলমানদের রাখা হয় এ ক্যাম্পে। লুণ্ঠিত কাফেলার মুসলমানদের ধরে এনেও এ ক্যাম্পে নিক্ষেপ করে খৃষ্টানরা। 'বেগার ক্যাম্প' নামে পরিচিত এ ক্যাম্প।

এটি কোন কারাগার নয়। এখানে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা নেই। যাদেরকে এখানে রাখা হয়, তাদের নিয়মিত কোন রেকর্ডও রাখা হয় না। পশুর মত আচরণ করা হয় এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে। কোথাও প্রয়োজন হলে এখান থেকে পছন্দমত লোকদের ভেড়া-বকরীর মত হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে। গাধার মত খাটান হয় তাদের। খাবার দেয়া হয় সামান্য; বেঁচে থাকতে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু। থাকে তারা তাঁবুতে। যারা সাধারণ রোগে আক্রান্ত হয়, কেবল তাদের-ই চিকিৎসা করা হয়। রোগ বেড়ে গেলে মেরে ফেলা হয় বিষ খাইয়ে। এ অমানুষিক নির্যাতন সেলে নিক্ষিপ্ত বিপুলসংখ্যক মুসলমানের একমাত্র অপরাধ, তারা মুসলমান। গুপ্তচর মারফত সুলতান আইউবী অবহিত ছিলেন শোবকের এই বেগার ক্যাম্প সম্পর্কে।

হাদীদকেও পাঠিয়ে দেয়া হয় এ ক্যাম্পে। বান্ধবীর মুখে এ সংবাদ শুনে শিউরে উঠে লুজিনা। ধক্ করে জ্বলে উঠে তার হৃদয়। বেগার ক্যাম্পের পুরো চিত্র ফুটে উঠে তার চোখের সামনে।

হাদীদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি নেই লুজিনার। গোয়েন্দা প্রধান হরমুন কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছে তাকে। একজন মুসলিম ফৌজির প্রতি এতটুকু আবেগপ্রবণ হওয়ার শাস্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সে নিষেধাজ্ঞা মেনে নেয়নি লুজিনা। হাদীদ বেগার ক্যাম্পে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে, বান্ধবীর মুখে এ সংবাদ শুনে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠে লুজিনা। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বান্ধবীকে বলে, যে করে হোক, আমি ওকে মুক্ত করব-ই। তুমি আমায় সাহায্য কর বোন! সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় বান্ধবী। পরিকল্পনা প্রস্তুত করে দু'জনে মিলে।

লুজিনা তৎক্ষণাৎ ছুটে যায় শহরে। সাক্ষাৎ করে এক প্রাইভেট ডাক্তারের সঙ্গে। বলে, একজন আহত রোগী আছে, আপনাকে তার চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু বিষয়টা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলা যাবে না।

গোপনীয়তার কারণ জানতে চায় ডাক্তার।

'লোকটি একজন গরীব মুসলমান। সে আমার পরিবারের বহু উপকার করেছে। এক জায়গায় ঝগড়া-ঝাটি করে এখন সে আহত। অর্থ-কড়ি নেই বলে কোন ডাক্তার তার চিকিৎসা করছে না। এখানকার সব ডাক্তার-ই যে খৃষ্টান। বিনা পয়সায় একজন মুসলমানের তারা চিকিৎসা করবে-ই বা কেন!

তাছাড়া ঝগড়া-ঝাটি করে একজন মুসলমান আহত হয়েছে, প্রশাসন এ খবর পেলে নিশ্চিত তাকে বেগার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে। গোপনীয়তা রক্ষা করার এ-ও এক কারণ। লোকটি আমার পরিবারের যে উপকার করেছে, আমি তার প্রতিদান দিতে চাই। আমি তাকে রাতের বেলা নিয়ে আসব। বলুন, আপনাকে কত দিতে হবে? গোপনীয়তা রক্ষা করার পুরস্কারও আমি আপনাকে দেব।' বলল লুজিনা।

ডাক্তারের কাছে নিজেকে এক ভদ্র পরিবারের মেয়ে বলে পরিচয় দেয় লুজিনা। নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখে সে।

কথার ফাঁকে ডাক্তার আপাদমস্তক এক নজর দেখে নেয় লুজিনার। যুবতীর অস্বাভাবিক রূপে বিমোহিত হয়ে পড়ে ডাক্তার। পারিশ্রমিকের কথা মুখে আনার ভাষা হারিয়ে যায় তার। রূপের চেয়ে বড় মূল্যবান বস্তু আর কি হতে পারে, তা খুঁজে পাচ্ছে না সে।

ডাক্তারের দৃষ্টির অর্থ বুঝে ফেলে লুজিনা। ডাক্তার যে তার রূপের জালে আটকা পড়েছে, তা বুঝতে আর বাকি রইল না তার। লুজিনা এ জগতের অভিজ্ঞ মেয়ে। নিজের যোগ্যতা কাজে লাগায় সে। মোমের মত গলে যায় ডাক্তার।

লুজিনা চারটি স্বর্ণমুদ্রা গুজে দেয় ডাক্তারের হাতে। ডাক্তার যুবতীর হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে হাসিমুখে বলে, তোমার চেয়ে মূল্যবান বিনিময় আর হতে পারে না। বিশেষ ভঙ্গিতে স্মিত হাসি বেরিয়ে আসে লুজিনার দু' রাঙা ঠোঁটের ফাঁক বেয়ে। বলে, আপনি যা চাইবেন, তা-ই দেব; আগে আমার কাজ করুন।

ডাক্তার বুঝে ফেলল, বিষয়টি বিপজ্জনক ও রহস্যময়। কিন্তু লুজিনার রূপের ফাঁদে আটকে গিয়ে এ বিপদের ঝুঁকি মেনে নেয় সে। বলল, 'রোগী নিয়ে এস। আজ রাত, কাল রাত যেদিন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা এস। এসে আমাকে ঘুমে পেলেও জাগিয়ে দিও।'

ডাক্তার এক হাতে সোনার মুদ্রা আর অপর হাতে লুজিনার পেলব-কোমল হাতখানা মুঠি করে ধরে অপলক নেত্রে লুজিনার মুখপানে তাকিয়ে থাকে।

❁ ❁ ❁

হাদীদকে ক্যাম্প থেকে বের করে আনাটা-ই এ অভিযানের সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক কাজ। রাতে ক্যাম্পে নামমাত্র পাহারা থাকে বটে, কিন্তু ক্যাম্পে এসে হাদীদকে খুঁজে বের করে আনা লুজিনার পক্ষে ষোল আনাই ঝুঁকিপূর্ণ। ধরা পড়লে মৃত্যুদন্ড অনিবার্য।

ক্যাম্প সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে লুজিনার বান্ধবী। যেমন যখমী ও রুগ্ন কয়েদীদের প্রতিদিন অতি সাধারণ একটি ডাক্তারখানায় হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের সঙ্গে থাকে মাত্র একজন প্রহরী।

পরদিন বান্ধবীর সঙ্গে লুজিনা সেই ডাক্তারখানার সামনে এসে দাঁড়ায়। তাদের বেশী অপেক্ষা করতে হল না। পঁচিশ-ত্রিশজন রোগীর একটি দল পা টেনে টেনে অতি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকে। লাঠি হাতে তাদের পশুপালের ন্যায় হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে একজন প্রহরী। যারা দ্রুত হাঁটতে পারছে না, তাদের লাঠির দ্বারা ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে সে।

চোখে-মুখে কৌতূহলী ভাব নিয়ে সামনে অগ্রসর হয় মেয়ে দু'টো, যেন তারা তামাশা দেখছে। রোগীর দলটি তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করলে লুজিনার সন্ধানী দৃষ্টিতে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে শুরু করে সবাইকে। দলের মধ্যে হাদীদকে খুঁজছে সে।

হঠাৎ চমকে উঠে লুজিনা। দলের মধ্য থেকে একজন লোক প্রবল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চোখ লাল করে তাকিয়ে আছে তার প্রতি। ভালভাবে হাঁটতে পারছে না সে। লোকটি হাদীদ। পান্ডুর চেহারা। আহত হওয়ার আগে লুজিনা তার চেহারায় যে জৌলুস দেখেছিল, এখন আর তা নেই। পোষাকে শুকিয়ে যাওয়া লাল চট্‌চটে রক্তের দাগ।

দেখে কান্না আসে লুজিনার। ঝর ঝর করে দু' চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে বেদনার অশ্রু। কিন্তু হাদীদের দৃষ্টিতে ঘৃণার ভাব। লুজিনার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয় সে।

আরো সম্মুখে এগিয়ে যায় রোগীর দলটি। প্রহরীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয় লুজিনা ও তার বান্ধবী। এই মুসলমান রোগীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তারা। কথার যাদু দিয়ে প্রহরীকে পটিয়ে ফেলে দু' যুবতী। বলে, কথা বলে এদের সঙ্গে আমাদের একটু তামাশা করতে মন চাইছে।

ডাক্তারখানায় আগে থেকেই রোগীর প্রচন্ড ভীড়। কয়েদীদের বসিয়ে দেয়া হল একদিকে। লুজিনা তাদের ঘনিষ্ঠ হয়। প্রহরীর সঙ্গে মিষ্টি-মধুর গল্প জুড়ে দেয় বান্ধবী। দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে আলাপে মেতে উঠে প্রহরী।

দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসে পড়ে হাদীদ। অবস্থা তার ভাল নয়। চোখের ইশারায় তাকে আড়ালে আসতে বলে লুজিনা। লুজিনার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় হাদীদ। লুজিনা ক্ষীণ কণ্ঠে তাকে বলে, 'আমার প্রতি নির্দেশ, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না। আমি যে এখন তোমার সঙ্গে কথা বলছি, এ কথা কাউকে বুঝতে দেয়া যাবে না।'

'তোমার উপর আর যারা তোমাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করেছে, তাদের উপর আল্লাহর লানত। কোন প্রতিদানের লোভে আমি তোমাকে ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করিনি। তোমাকে রক্ষা করে আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ লোকদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করাই কি তোমাদের চরিত্র?' ক্ষীণ অথচ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল হাদীদ।

'চুপ কর হাদীদ! এসব কথা পরে হবে। আগে বল রাতে তুমি থাক কোথায়? আজ রাতেই তোমাকে বের করে আনতে হবে।' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল লুজিনা।

হাদীদ লুজিনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল না। লুজিনাকে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু লুজিনা চোখের অশ্রু দিয়ে মায়াবী কণ্ঠে হাদীদের মনে এ বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয় যে, তার সঙ্গে সে প্রতারণা করছে না। সত্যিই সে তাকে উদ্ধার করতে চায়।

আশ্বস্ত হয়ে হাদীদ বলল, রাতে যেখানে থাকি, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হবে না। কিন্তু বেরিয়ে এসে যাব কোথায়? মুহূর্ত মধ্যে পালানোর একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলে দু'জনে।

✿ ✿ ✿

বেগার ক্যাম্পে মড়ার মত ঘুমিয়ে আছে কয়েদীরা। প্রহরীও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এখান থেকে কেউ পালায়নি কখনো। পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? নরক হলেও এটাই তাদের বাসস্থান। তাছাড়া এক আধজন পালালেও কৈফিয়ত চায় না কেউ। তাই নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে প্রহরীরা।

রাতের প্রথম প্রহর শেষ প্রায়। পুরনো জীর্ণ এক তাঁবু থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে আসে। হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর আড়ালে আড়ালে অতি সন্তর্পণে চলে আসে প্রহরীদের আওতার বাইরে। অন্ধকার সত্ত্বেও সম্মুখে চোখে পড়ে একটি খেজুর গাছ। সেখানেই তার পৌছানোর কথা। খেজুর তলায় দাঁড়িয়ে আছে আপাদমস্তক মোটা কাপড়ে ঢাকা এক ছায়ামূর্তি। হামাগুড়ি থেকে উঠে দাঁড়ায় লোকটি। পায়ে হেঁটে খেজুর তলায় এসে পৌছে সে।

লোকটি হাদীদ। ছায়ামূর্তিটি লুজিনা। হাদীদের অপেক্ষায় পরিকল্পনা মোতাবেক খেজুর তলায় দাঁড়িয়ে আছে সে।

'দ্রুত হাঁটতে পারবে?' জিজ্ঞেস করে লুজিনা।

'চেষ্টা করব।' জবাব দেয় হাদীদ।

ক্যাম্প থেকে বেশ দূরে চলে যায় দু'জন। সামনে বিস্তীর্ণ অনাবাদী ভূমি। দ্রুত হাঁটতে পারছে না হাদীদ। তাকে ধরে দ্রুত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে লুজিনা। এ ফাঁকে ইতিমধ্যে কি কি ঘটেছে, গোয়েন্দা প্রধান কি বলেছে, হাদীদের ব্যাপারে কি কি নির্দেশ জারী হয়েছে, সব খুলে বলে লুজিনা। মনের সন্দেহ দূর হয়ে যায় হাদীদের। লুজিনার প্রতি আস্থা ফিরে আসে তার।

আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তারা শহরের একটি গলিতে ঢুকে পড়ে। এ গলিতেই ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তারের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় লুজিনা। বাড়ির দরজায় করাঘাত করে তিন-চারবার। দরজা খুলে ডাক্তার দ্রুত ভিতরে নিয়ে যায় দু'জনকে।

ডাক্তার হাদীদের জখম খুলে নিরীক্ষা করে দেখে। বলে, রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বিশদিনের মত সময় লাগবে।

শুনে ভাবনায় পড়ে যায় লুজিনা। এ এক নতুন সমস্যা। এতদিন হাদীদকে কোথায় লুকিয়ে রাখবে? বেগার ক্যাম্পে তো আর ফেরত পাঠান যাবে না! চিন্তার সাগরে ডুবে যায় লুজিনা। অবশেষে ভেবে-চিন্তে সমাধান একটা ঠিক করে রাখে মাথায়।

হাদীদের জখমে ব্যান্ডেজ করে ডাক্তার বলে, রোগীকে ভাল ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে।

লুজিনা ডাক্তারকে নিভৃতে নিয়ে যায়। বলে, 'লোকটি যেখানে থাকে, সেখানে তার পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা হবে না। আমার ঘরেও রাখতে পারছি না। আপনি তাকে এখানেই রেখে দিন। আপনি-ই তার উপযুক্ত খাবার-পথ্যের ব্যবস্থা করুন। খরচ ও পারিশ্রমিক যা চান, দেব।'

খরচ-পারিশ্রমিকের পরিমাণ জানায় ডাক্তার। বিশাল অংক। আপত্তি জানায় লুজিনা। কিছু কমাবার অনুরোধ করে। ডাক্তার বলে, 'আমাকে দিয়ে তুমি ভয়ংকর এক কাজ করাচ্ছ। আমি জানি, এ লোকটিকে বেগার ক্যাম্প থেকে আনা হয়েছে। লোকটি মিসরী ফৌজের সিপাহী। আমি যে অংক চেয়েছি, আপত্তি না করে যদি তা-ই প্রদান কর, তাহলে এ তথ্য আমার ঘরের বাইরে যাবে না।'

'ঠিক আছে, তা-ই দেব। তবে! যদি ঘুণাক্ষরে এ তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ে, তবে আপনিও বাঁচবেন না।' বলে লুজিনা।

ডাক্তার হাদীদকে একটি কক্ষে শুইয়ে দিয়ে বলে, সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকবে। ভিতর থেকে দুধ ও ফল এনে খেতে দেয় হাদীদকে। তারপর লুজিনাকে নিয়ে চলে যায় তার কক্ষে ...।

পরদিন লুজিনা ও তার বান্ধবী গোয়েন্দাগিরি করতে যায় ক্যাম্পে। তারা কয়েদী রোগীদের ডাক্তারখানায় প্রহরীদের সঙ্গে গল্প করে। কথার ফাঁকে তারা তথ্য সংগ্রহ করে যে, হাদীদের পালানোর কারণে ক্যাম্পে কোন পরিবর্তন আসেনি। টের পায়নি কেউ এ ঘটনা।

ডাক্তার অতি গোপনীয়তার সাথে হাদীদের চিকিৎসা করছে। পুষ্টিকর খাদ্য-খাবারও দিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ডাক্তারের বাসায় আসে লুজিনা। হাদীদের শিয়রে বসে কাটায় কিছু সময়। তারপর ডাক্তারের কক্ষে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে চলে যায়। এভাবে চলে যায় বিশদিন। হাদীদের জখমও শুকিয়ে গেছে। সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। লুজিনা ডাক্তারকে বলে, কাল রাত এসে আমি হাদীদকে নিয়ে যাব। আপনার পাওনাও তখন পরিশোধ করব।

নিম্নপদের এক অফিসার আসক্ত ছিল লুজিনার বান্ধবীর প্রতি। সময় পেলেই ঘুরঘুর করত সে মেয়েটির পিছনে। এ সুযোগ কাজে লাগায় লুজিনা।

পরদিন প্রেমের প্রলোভন দেখিয়ে লুজিনার বান্ধবী অফিসারকে কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে যায়। এ ফাঁকে লুজিনা বাক্স থেকে তার সামরিক উর্দি চুরি করে নিয়ে আসে। ডাক্তারের বাসায় গিয়ে আগে তার পাওনা পরিশোধ করে। তারপর হাদীদকে অফিসারের সামরিক পোষাক পরায়। ঘোড়ার ব্যবস্থাও হয়ে যায় অনায়াসে।

নগরীর চারিদিক উঁচু দেয়ালে ঘেরা। চারদিকে চারটি ফটক। ফটকগুলো বন্ধ থাকে দিন-রাত সব সময়। কিন্তু সম্প্রতি সুলতান আইউবীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে যে সামরিক তৎপরতা চলছে, তার কারণে ফটকগুলো দিনের বেলা খোলা থাকছে।

সূর্যাস্তের খানিক আগে এক অশ্বারোহী ছুটে আসে দুর্গের প্রধান ফটকের দিকে। গায়ে খৃষ্টান সেনা অফিসারের সামরিক উর্দি। কোমরে ঝুলছে একটি তরবারী। তরবারীটি মুসলমানদের তরবারীর ন্যায় বাঁকা নয়– সোজা। সব মিলিয়ে তাকে খৃষ্টান সেনা অফিসার মনে না করে উপায় নেই।

ফটক খোলা। বের হচ্ছে রসদ বোঝাই উটের বহর। অশ্বারোহী অফিসার উটের বহরের সঙ্গে যাচ্ছে যেন।

ফটকের নিকটে চলে আসে আরোহী। ঠিক এ সময়ে গোয়েন্দা প্রধান হরমুন ঘোড়ার পিঠে করে প্রবেশ করেন ফটকে। বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরছেন তিনি। অশ্বারোহী অফিসারের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে। তিনি মুচকি হাসেন। কিন্তু হাসি দিয়ে হাসির জবাব দেয় না অফিসার। কয়েক পা ভিতরে ঢুকে ঘোড়া থামান হরমুন। দু' তিন শ' কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পায় লুজিনাকে। হরমুনকে দেখেই দ্রুত কেটে পড়ে লুজিনা। চলে যায় নিজ কক্ষে।

আলী বিন সুফিয়ানের ন্যায় হরমুনও অত্যন্ত বিচক্ষণ গুপ্তচর। মনে বড় একটা খট্‌কা জাগে তার। তিনি সন্দেহে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দেন ফটকের দিকে। বিদ্যুদ্গতিতে ঘোড়া ছুটান। মনের সন্দেহ দূর করতে চাইছেন তিনি।

অশ্বারোহী অফিসার চলে গেছে বহু দূর। তীরগতিতে এগিয়ে চলছে তার ঘোড়া। চোখের নিমিষে হারিয়ে যায় বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে।

❁ ❁ ❁

কিছুদুর অগ্রসর হয়ে থেমে যান হরমুন। অশ্বারোহী অফিসারের নাগাল পাওয়ার সাধ্য নেই তার। ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে ফিরে আসেন। ফটক পেরিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়েন দুর্গের ভিতরে। ছুটে যান বেগার ক্যাম্পে। হাদীদের লক্ষণ বলে ইনচার্জকে জিজ্ঞেস করেন, লোকটি কোথায়? কিছুই বলতে পারে না ইনজার্চ। হাদীদকে পাওয়া গেল না ক্যাম্পে। যে তাঁবুতে তাকে রাখা হয়েছিল, তার অধিবাসীরা জানায়, লোকটি একদিন সকালে অনুপস্থিত ছিল। আমরা মনে করেছিলাম, আশেপাশে কোথাও আছে; কিন্তু আর ফিরে আসেনি।

হরমুনের সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়। খৃষ্টান সৈন্যের উর্দি পরিহিত যে লোকটিকে তিনি ঘোড়ায় চড়ে ফটক পেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন, সে হাদীদ-ই ছিল। আরো কিছু খোঁজখবর নিয়ে লুজিনার কক্ষে যান হরমুন।

মাথায় হাত চেপে কক্ষে নতমুখে বসে আছে লুজিনা। কোন ভূমিকা ছাড়াই গর্জে উঠেন হরমুন–

'তু-ই কি ভাগিয়েছিস্ লোকটাকে? মিথ্যা বলে রেহাই পাবি না। তদন্ত করে আমি প্রমাণ করে ছাড়ব যে, তু-ই ওর পলায়নে সাহায্য করেছিস্।'

ধীরে ধীরে মাথা উঠায় লুজিনা। অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে হরমুনের প্রতি। হরমুনের দু'চোখে আগুন। প্রবল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তিনিও তাকিয়ে আছেন লুজিনার প্রতি।

মুখ খুলে লুজিনা–

'আপনার তদন্তের প্রয়োজন নেই। আমার মিথ্যে বলারও আবশ্যক নেই। আমার জীবনটা-ই এক রাজকীয় মিথ্যা। আমার অস্তিত্ব চোখ ধাঁধাঁনো এক প্রতারণা। নিজের আত্মার মুক্তির জন্য সত্য বলেই আমি মৃত্যুবরণ করছি।'

লুজিনার কণ্ঠস্বরে নেশার ভাব। আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে তা। বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় সে। পা দু'টো কাঁপছে তার। নিকটে-ই পড়ে আছে একটি গ্লাস। তাতে কয়েক ফোঁটা পানি। কম্পিত হাতে গ্লাসটি তুলে নিয়ে হরমুনের প্রতি এগিয়ে ধরে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে–

'আমি নিজেই আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। এ গ্লাসের অবশিষ্ট কয়েক ফোঁটা পানি-ই তার সাক্ষী। আমার এই অপবিত্র দেহটাকে মৃত্যুদণ্ড আমি এজন্য দেইনি যে, আমি স্বজাতির সঙ্গে গাদ্দারী করেছি। বরং কারণ হল, আমি সেসব লোকদের ধোঁকা দিতে

গিয়েছিলাম, যারা ধোঁকা-প্রতারণা বলতে কিছু বুঝে না। তাদের চারটি লোক আমার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য– যা লুণ্ঠিত হয়েছে আগেই– দশজন দস্যুর মোকাবেলা করেছে। সবশেষে একজন নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে আমাকে ডাকাতদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে! এখন আমি ভাল-মন্দ ও ভালবাসা-ঘৃণার পার্থক্য বুঝি। আমি সত্য কথা বলেই মৃত্যুবরণ করছি। এ এক শান্তিময় মৃত্যু।'

দু'চোখ অন্ধকার হয়ে আসে লুজিনার। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যেতে শুরু করে সে। হাত থেকে গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে তাকে ধরে ফেলেন হরমুন। গায়ে বল নেই। তবু এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় হরমুনের বাহুবন্ধন থেকে। মাটিতে পড়ে যায় লুজিনা। শুয়ে শুয়ে অস্ফুট স্বরে বলে জীবনের শেষ কথাগুলো–

'আমাকে ছুঁয়ো না হরমুন। এখন আর আমি তোমাদের কোন কাজে আসব না। আমার মধ্যে সত্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এ বিষ; তোমাদের প্রয়োজন অপবিত্র নারী দেহ। ওকে আমি-ই ভাগিয়েছি। লুকিয়ে রেখেছিলাম বিশ দিন। ফার্নান্ডেজের উর্দি চুরি করে ওকে পরিয়েছি আমি। আমি-ই ওকে ঘোড়া দিয়েছি। আমি ওর সঙ্গে যেতে পারিনি, ওকে ছাড়াও থাকতে পারছিলাম না। তাই বিষপান করেছি। তুমি যদি আমায় না-ও দেখে ফেলতে, তবু এ বিষপান আমি করতাম-ই। সত্য বলে মৃত্যুবরণ করাকে কত যে শান্তি, কত যে আনন্দ, এ মুহূর্তে আমি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছি।'

ঝিমিয়ে পড়ে লুজিনা। সোজা হয়ে যায় তার বিষাক্ত দেহ। বুজে আসে দু'চোখের পাতা। মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ে সে চিরদিনের জন্য।

গোয়েন্দা প্রধান হরমুন হতবুদ্ধির ন্যায় পলকহীন নেত্রে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে লুজিনার মৃত দেহটার প্রতি। বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে তার কানে বাজতে থাকে লুজিনার জীবনের শেষ বাক্যটি–

'সত্য বলে মৃত্যুবরণ করায় কত যে শান্তি, কত যে আনন্দ, এ মুহূর্তে আমি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছি।'

শেষকৃত্য সম্পন্ন হল লুজিনার। আপন বলতে কেউ নেই তার। বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয় কেউ নয়। ছোটকালে এক কাফেলা থেকে তাকে তুলে আনা হয়েছিল। তখন বয়স তার দশ কি এগার বছর। তাই কাউকে তার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর ঝামেলা পোহাতে হল না অফিসারদের।

✿ ✿ ✿

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী অভিযানে রওনা হয়েছে তিনদিন হল। তাদের প্রতিহত করার জন্য পথে অবস্থান নিয়েছে খৃষ্টান বাহিনী। আইউবীর ঘোষণা অনুযায়ী হামলা হবে কার্কে। তাই শোবকের অধিকাংশ সৈন্য এখন কার্কেই অবস্থান করছে। সিরিয়া অভিমুখেও রওনা হয়ে গেছে একটি বাহিনী। উদ্দেশ্য, নুরুদ্দীন জঙ্গী আইউবীর সাহায্যে এগিয়ে আসলে তাঁকে প্রতিহত করা।

নিজের বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছেন আইউবী। পরস্পর দূরত্ব বজায় রেখে অগ্রসর হচ্ছে তাঁর তিন বাহিনী। একস্থানে এসে শিবির স্থাপন করেন সুলতান। অধীন সব কমাণ্ডারকে তলব করেন নিজের তাঁবুতে। বললেন–

'এবার আমার মনের গোপন কথা প্রকাশ করতে হচ্ছে। আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম, আক্রমণ হবে কার্কে। কিন্তু তোমাদের নিয়ে এসেছি অন্য পথে। বিষয়টা তোমাদের মনে খট্‌কা লাগছে নিশ্চয়। কিন্তু শোন, আমি কার্ক আক্রমণ করব না। লক্ষ্য আমার শোবক দুর্গ।

তিন খৃষ্টান গোয়েন্দাকে আমি কেন মুক্তি দিলাম, রক্ষীর প্রহরায় তাদের শোবক পৌছানোর ব্যবস্থা-ই বা কেন করলাম, এ প্রশ্ন তোমাদের ভাবিয়ে তুলেছে জানি। এখন শোন তার রহস্য।

গোয়েন্দাদের পাশের কক্ষে বসিয়ে মাঝের দরজা ঈষৎ ফাঁক করে রেখে আমি উচ্চকণ্ঠে আলী বিন সুফিয়ান ও দু' নায়েবকে বলতে শুরু করেছিলাম, অমুক তারিখে আমি কার্ক আক্রমণ করব। আমি জানতাম, আমার কথাগুলো সব গোয়েন্দাদের কানে যাচ্ছে। আমি একথাও তাদের কানে দিয়েছি যে, খৃষ্টানদের সঙ্গে খোলা মাঠে লড়তে আমাদের ভয় হয়।

এসব কথা কানে দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলাম খৃষ্টান গোয়েন্দাদের। চারজন রক্ষী দিয়ে তাদের নিরাপদে শোবক পৌছার ব্যবস্থাও করেছিলাম। সংবাদ পেয়েছি, শোবক যাওয়ার পথে তারা এক দুর্ঘটনার শিকার হয়। কতিপয় ডাকাত আমার তিনজন রক্ষী ও একটি গোয়েন্দা মেয়েকে হত্যা করে ফেলেছে। চতুর্থ রক্ষী গতকাল রাতে শোবক থেকে ফিরে এসেছে। গোয়েন্দা মারফত আমি জানতে পেরেছি যে, আলেম গোয়েন্দা জীবিত শোবক পৌছুতে সমর্থ হয়েছে। সে আমার কার্ক আক্রমণের পরিকল্পনার কথা খৃষ্টান কর্মকর্তাদের অবহিত করার কৌশল সফল করেছে। আমি যেভাবে চেয়েছিলাম, খৃষ্টানরা সেভাবেই তাদের বাহিনীকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ মুহূর্তে আমাদের বাহিনীর বাম অংশের অবস্থান খৃষ্টানদের বিশাল এক বাহিনীর বাম দিকে বার মাইল দূরে।'

বাহিনীর বাম অংশের কমাণ্ডারকে উদ্দেশ করে সুলতান বললেন, 'আজ সূর্যাস্তের পরপর তুমি তোমার সকল অশ্বারোহী বাহিনীকে সোজা দু' মাইল সম্মুখে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে মোড় নেবে বাঁয়ে। যাবে আরো সোজা চার মাইল। তারপর আবার বাঁয়ে মোড়। দু'মাইল অগ্রসর হওয়ার পর দেখবে শত্রু বাহিনী আরাম করছে। তীব্র গতিতে কমান্ডো আক্রমণ চালাবে তাদের উপর। অল্প সময়ে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করবে। সামনে যা পাবে, পায়ে পিষে দ্রুত ফিরে আসবে আগের জায়গায়।

বাহিনীর দ্বিতীয় অংশ সোজাসুজি সম্মুখে এগিয়ে যাবে। আট ন' মাইল পথ অতিক্রম করবে। শত্রু বাহিনীর রসদ ও কাফেলা চোখে পড়বে। তখন থাকবে তোমরা দুশমনের পিছনে। দিনের বেলা শত্রু বাহিনী তোমাদের বাম অংশকে ধাওয়া করবে। মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হবে না। দিনের বেলা সরে আসবে অনেক পিছনে।

আক্রমণ করবে রাতে। আক্রমণের পর থামবে না একদন্ডও, সরে আসবে পিছনে। সম্মুখে অগ্রসর হবে খৃষ্টান বাহিনী। তখন মাঝের অংশ পিছন থেকে তাদের উপর আক্রমণ করবে। নিজেদের সামলে নিয়ে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

বাহিনীর তৃতীয় অংশকে নিয়ে আমি আজ রাতে-ই রওনা হব। আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত আমরা শোবক অবরোধ সম্পন্ন করে ফেলব। বাহিনীর অপর দুই অংশ আমার শেখানো নিয়মে শত্রু বাহিনীকে মরুভূমিতে অস্থির করে রাখবে। তাদের কাছে রসদ পৌঁছতে দেবে না। সুযোগমত পানির ঝর্ণাগুলো দখল করে নেবে। আক্রমণ করবে সবসময় শত্রুর বাম পার্শ্ব থেকে। আক্রমণের পর লড়াই করার জন্য বিলম্ব করবে না। অতর্কিত কমান্ডো আক্রমণ করেই চোখের পলকে কেটে পড়বে। সুইসাইড স্কোয়াড প্রতিরাতে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করবে দুশমনের পশুপালের উপর।'

১১৭১ সাল। বছরের ঠিক শেষ দিন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর কার্কের লোকেরা জানতে পায় যে, শোবকের মত তাদের শক্ত দুর্গ সুলতান আইউবী অবরোধ করে ফেলেছেন। অথচ, তাদের বেশীর ভাগ সৈন্যকে সমবেত করা হয়েছে কার্কে, পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মরুভূমিতে। এসে তারা শোবককে সাহায্যও করতে পারছে না। মুসলিম বাহিনী মরুভূমির সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে ফিরছে। সামনে এসে মুখোমুখি লড়াই করছে না মুসলিম বাহিনী। গেরিলা ও কমান্ডো আক্রমণ করে তারা সীমাহীন ক্ষতি করছে খৃষ্টানদের। তারা খৃষ্টানদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। পানির ঝর্ণাগুলোও এখন তাদের দখলে।

হারিয়ে গেছে খৃষ্টান বাহিনীর মনোবল। উভয় সংকটে পড়ে গেছে তারা। না পারছে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে, না পারছে পিছনে সরে গিয়ে শোবক রক্ষা করতে। তারা দু' চোখে শোচনীয় পরাজয় ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

শোবক দুর্গ অবরোধ করেছেন সুলতান আইউবী। দুর্গ ও নগরীর পাঁচিলে দাঁড়িয়ে তীর ও বর্শা ছুড়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করে স্বল্পসংখ্যক খৃষ্টান সৈন্য। বেশিক্ষণ টিকতে পারে না তারা। দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে আইউবীর বাহিনী। প্রায় দেড় মাস অবরোধ করে রাখার পর দুর্গে প্রবেশ করেন সুলতান। সর্বাগ্রে ছুটে যান বেগার ক্যাম্পে। সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ক্যাম্পের হাড্ডিসার মুসলিম বন্দীরা।

মরুভূমির খৃষ্টান সৈন্যরা দিশে হারিয়ে পিছনে সরে গিয়ে ঢুকে পড়ে কার্ক দুর্গে। ওখানে বিপুলসংখ্যক সৈন্য বেকার বসে বসে সুলতান আইউবীর আক্রমণের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

আইওনা নয় আয়েশা

১১৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস।

শোবক দুর্গ মুসলমানদের পদানত হলেও শহরে এখনো শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসেনি। খৃষ্টান পরিবারগুলো শহর ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছে। পালিয়ে গেছেও কেউ কেউ। শোবকের মুসলমানদের উপর তারা যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, তার-ই প্রতিশোধ আশংকায় তারা তটস্থ। কৃতকর্মের প্রতিশোধ হিসেবে মুসলমানরা তাদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেবে, এই ভয় তাদের তাড়া করে ফিরছে। তারা যখন দুর্গ থেকে পলায়নপর খৃষ্টান বাহিনীকে সুলতান আইউবীর তীরান্দাজ বাহিনীর তীরের আঘাতে জীবন দিতে এবং অস্ত্র সমর্পণ করতে দেখেছিল, তখন প্রতিশোধ অভিযানের ভয়ে তারা পরিবার-পরিজনসহ ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছিল।

মুসলিম সৈনিকগণ তাদের আপন ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাতে নিষেধ করে। সালার ও কমান্ডারগণ নিজ নিজ সৈনিকদের আদেশ করেন, কোন নাগরিককে যেন নগর ছেড়ে পালাতে দেয়া না হয়। নির্দেশ পেয়ে মুসলিম সৈন্যরা পলায়নপর খৃষ্টানদেরকে মরুভূমির দূর-দূরান্ত পথ ও পার্বত্য অঞ্চল থেকে ধরে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে শুরু করে।

তবু ভয় কাটছে না তাদের। তারা নিজ শাসকবর্গের পাপের কথা ভুলে যায়নি। এখানকার মুসলমানদের মানবিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল খৃষ্টান শাসকরা। যেন ওরা মানুষ নয়– নরকের কীট। 'বেগার ক্যাম্প' তার জীবন্ত প্রমাণ।

এ ক্যাম্প সম্পর্কে অবহিত ছিলেন সুলতান আইউবী। তাই শোবকে প্রবেশ করেই আগে ছুটে আসেন তিনি এ ক্যাম্পে। তখনো অন্তত দু' হাজার মুসলমান বন্দী ছিল এখানে। চরম মানবেতর জীবন যাপন করছিল তারা। দু' হাজার মানুষ নয়, যেন দু' হাজার লাশ। পশুর মত খাটান হত তাদের। মানুষের পায়খানা পর্যন্ত বহন করান হত তাদের দ্বারা।

এখানে অনেকে এসেছিল যৌবনে। এখন তারা বৃদ্ধ। তারা ভুলে গেছে যে, তারা মানুষ। প্রথম দিকের লড়াইগুলোর যুদ্ধবন্দীও আছে এখানে।

এ ক্যাম্পের হতভাগ্যদের অধিকাংশ-ই হল তারা, যাদেরকে বিভিন্ন কাফেলা কিংবা

শহর থেকে ধরে এনে এখানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারা ছিল হয়ত বড় কোন ব্যবসায়ী কিংবা কোন রূপসী কন্যার পিতা। সম্পদ-কন্যা ছিনিয়ে নিয়ে খৃষ্টানরা তাদের বন্দী করে রাখে এ ক্যাম্পে। ইসলামী সালতানাতের প্রতি সমর্থন ও ক্রুসেডের বিরুদ্ধাচারণের অভিযোগেও এখানে বন্দী হয়েছিল কেউ কেউ।

শহরের মুসলিম অধিবাসীরা নামায পড়ত, কুরআন তেলাওয়াত করত নিজ ঘরে, অতি সংগোপনে। শব্দ যেন বাইরে না আসে, সেদিকেও তাদের সতর্ক থাকতে হত।

একজন অতি সাধারণ খৃষ্টানকেও মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করতে হত মুসলমানদের। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের লুকিয়ে তো রাখতে হত-ই। নিষ্পাপ কিশোরীদেরও বাইরে বের হতে দেয়া যেত না। সুশ্রী হলে অপহরণ করে নিয়ে যেত খৃষ্টানরা।

বেগার ক্যাম্পের এ দু' হাজার জিন্দা লাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন সুলতান আইউবী। অশ্রুতে ঝাপ্‌সা হয়ে আসে তার দু' চোখের পাতা। কান্নাভেজা কণ্ঠে বললেন, আমার এই মজলুম ভাইদের মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন হলে সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্যকে বন্ধক রাখতেও আমি কুণ্ঠাবোধ করতাম না।'

আপাতত ক্যাম্পেই তাদের উন্নত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন সুলতান। এদের বিস্তারিত ইতিবৃত্ত শুনবার মত এখন সময় নেই তাঁর। বাইরের পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে আগে।

বাইরে লড়াই চলছে এখনো। সুলতান আইউবীর কৌশলের ফাঁদে ধরা খেয়ে তাঁকে প্রতিহত করার জন্য যেসব খৃষ্টান সৈন্য কার্ক ও শোবকের বাইরে অবস্থান নিয়েছিল, মুসলিম বাহিনীর কমান্ডো আক্রমণে দিগ্বিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে তারা এখন পিছনে সরে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর কমান্ডো হামলা থামছে না তবু। ধাওয়া করে করে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে তারা খৃষ্টানদের।

কোন কোন অভিযানে মুসলিম বাহিনী খৃষ্টান বাহিনীর হাতে ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হচ্ছে বলেও সংবাদ পান আইউবী। তাছাড়া কার্ক দুর্গে অবস্থানরত খৃষ্টান বাহিনী তাদের মরুভূমির বিপর্যস্ত সৈনিকদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারে বলেও আশংকা জাগে তাঁর মনে।

ভাবনায় পড়ে যান সুলতান আইউবী। এ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মত সৈন্য তার নেই। মিসর থেকে রিজার্ভ বাহিনীও তলব করতে চাইছেন না তিনি। কারণ, সেখানকার পরিস্থিতিও অনুকূল নয়। বিলুপ্ত ফাতেমী খেলাফতের ধ্বজাধারীরা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সুদানী কাফ্রীরা স্বতন্ত্র শক্তি সঞ্চয় করছে। এ দুই বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে সাহায্য দিয়ে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করছে ক্রুসেডাররা। সর্বোপরি কতক রাজনৈতিক ও সামরিক মুসলিম কর্মকর্তাও পর্দার আড়ালে থেকে আইউবী

বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত। ক্ষমতার লোভে ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে নির্বোধ এই ঈমান-বিক্রেতাদের দল। সুলতান আইউবীকে একাধিকবার হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল যারা, তাদের সঙ্গে এখন এদের গলায় গলায় ভাব।

বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বেশ কিছু মুসলমানকে মৃত্যুদন্ডও দিয়েছেন সুলতান। কিন্তু একে তিনি খৃষ্টানদের-ই সাফল্য বলে মনে করছেন। তাঁর মতে যাদের তিনি মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তারা ঈমান বিক্রয়কারী গাদ্দার। কিন্তু ছিল তো তারা কালেমা-গো মুসলমান। এ প্রসঙ্গ তুলে সুলতান আইউবী বহুবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'হায়! এরা যদি শত্রু-মিত্র চিনতে পারত!'

শোবক দুর্গ এখন সুলতান আইউবীর পদানত। দুর্গের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। সঙ্গে তাঁর সামরিক উপদেষ্টাবৃন্দ। সুলতান দেখতে পান, শহরের মুসলিম অধিবাসীরা দলে দলে উল্লাস করছে। আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছে তারা। আনন্দচিত্তে এগিয়ে আসছে দুর্গের দিকে। পাশাপাশি উটের পিঠে করে শহীদদের লাশ ও আহত সৈন্যদেরকে নিয়ে আসা হচ্ছে। একদিকে বিজয়ী জনতার উল্লাস। অপরদিকে ইসলাম ও মুসলমানের বিজয়ের জন্য জীবন দানকারী শহীদদের লাশ! গভীর ভাবনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন সুলতান।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একান্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন—

'কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবীর চেহারায় বিজয়ের কোন প্রতিক্রিয়া-ই দেখা গেল না। শোবকের উল্লসিত মুসলমানরা দফ্ ও শানাইয়ের তালে তালে নেচে-গেয়ে পাঁচিলের সামনে এসে থামে। সালাহুদ্দীন আইউবী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন তাদের প্রতি। তাঁকে এক নজর দেখতে পেয়ে জনতা পাগলের মত লাফাতে শুরু করে। কিন্তু সুলতানের ঠোঁটে একটু হাসি নেই। তিনি হাত নেড়ে জনতাকে অভিনন্দন পর্যন্ত জানালেন না। অপলক নেত্রে জনতার প্রতি তাকিয়েই আছেন শুধু। হঠাৎ জনতার মধ্য থেকে উচ্চস্বরে একজন বলে উঠল, 'নাজমুদ্দীন আইউবের পুত্র সালাহুদ্দীন আইউবী! তুমি আমাদের মুক্তিদূত। তুমি শোবকের মুসলমানদের জন্য পয়গম্বর হয়ে এসেছ।'

'আমরা তোমাকে সেজদা করি।' জনতার মধ্য থেকে গগণবিদারী তাবকীর ধ্বনি তুলে বলল আরেকজন।

এবার নিজেকে খুঁজে পান সুলতান। চৈতন্য ফিরে আসে তাঁর। জনতার মন্তব্যে কেঁপে উঠে তাঁর সমস্ত শরীর। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'আমার পাপের বোঝা ভারি করতে ওদের নিষেধ কর। আমি পয়গম্বর নই— পয়গম্বরদের একজন দাসানুদাস মাত্র। আর সেজদার উপযুক্ত তো একমাত্র আল্লাহ।'

আমি সুলতানের এক রক্ষীকে বললাম, জল্‌দি যাও, জনতাকে এসব শ্লোগান বন্ধ করতে বল। বল, সুলতান এতে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন।

রক্ষী যেতে উদ্যত হয়। সুলতান তাকে থামিয়ে বললেন, বলবে শান্তভাবে। যেন ওরা মনে কষ্ট না পায়। ওদের আনন্দ-উল্লাসে ব্যাঘাত কর না। ওরা যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করেছে! আমার জীবন ওদের আনন্দের জন্য উৎসর্গিত।'

আর বলতে পারলেন না সুলতান। আবেগের আতিশয্যে রুদ্ধ হয়ে আসে তাঁর কণ্ঠ। মুখ ফিরিয়ে নেন অন্যদিকে। চোখের কোনে উদগত অশ্রু লুকাবার চেষ্টা করেন তিনি। আবার আমাদের প্রতি তাকান। বলেন, 'আমরা সবেমাত্র ফিলিস্তীনের আঙ্গিনায় এসে পৌঁছেছি। যেতে হবে অনেক দূর। রোম উপসাগর যেখান থেকে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে, উত্তরদিকে আমাদের যেতে হবে সে পর্যন্ত। আরব ভূমি থেকে সর্বশেষ ক্রুসেডারটিকেও ধাক্কা দিয়ে রোম উপসাগরে নিক্ষেপ করে ডুবিয়ে মেরেই তবে আমরা ক্ষান্ত হব।'

সুলতান আইউবী নায়েবদের নির্দেশ দেন যে, 'শহরময় ঘোষণা করিয়ে দাও, কোন অমুসলিম নাগরিক যেন এই ভয়ে শহর ছেড়ে না পালায় যে, মুসলমানরা তাদের উত্যক্ত করবে। কোন মুসলিম ফৌজি কিংবা কোন সাধারণ মুসলমানের আচরণে যদি কোন অমুসলিম নাগরিক কষ্ট পায়, তবে সে যেন দুর্গের দ্বারে এসে অভিযোগ করে। প্রতিকার পাবে।'

অত্যন্ত জোরালো ভাষায় সুলতান ঘোষণা করলেন–

'মানুষের জন্য আমরা অশান্তির বার্তা নিয়ে আসিনি। আমরা এসেছি ভালবাসার পয়গাম নিয়ে। তবে যদি কেউ ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে কোন উক্তি করে কিংবা যদি কেউ ইসলাম বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়, তবে মুসলিম হোক, অমুসলিম হোক, এর কঠোর শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে দেশের সব নাগরিককে।'

সুলতান আরো আদেশ জারি করেন, 'নগরীর কোথাও যদি কোন খৃষ্টান ফৌজি কিংবা গুপ্তচর লুকিয়ে থাকে, সে যেন এক্ষুণি মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।'

দেয়াল ভেঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করার পর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আইউবীর বাহিনী সর্বাগ্রে খৃষ্টানদের গোয়েন্দা সদর দফতরে তল্লাশী চালায়। কিন্তু পাওয়া গেল না গুরুত্বপূর্ণ কিছুই। আক্রান্ত হওয়ার পর চতুর খৃষ্টানরা সর্বাগ্রে এ অফিসটি খালি করে ফেলে। সরিয়ে ফেলে দফতরের জরুরী কাগজপত্র। পালিয়ে যায় গোয়েন্দা প্রধান হরমুন ও তার সহকর্মীরা।

তবে ধরা পড়ে যায় আটটি মেয়ে। তাদের তুলে দেয়া হয় আলী বিন

সুফিয়ানের হাতে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। তারা জানায়, অন্তত বিশটি মেয়ে এখান থেকে পালিয়ে গেছে। যে ক'জন পুরুষ গোয়েন্দা ছিল, তারাও পলায়ন করেছে। এদের একজন জানায়, আমার এক সহকর্মী মেয়ে ছিল। নাম তার লুজিনা। হাদীদ নামক এক আহত মুসলিম ফৌজিকে পালাতে সাহায্য করার পর সে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে।

বিশৃংখলা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার তৎপরতা চলছে শোবকে। অন্যদিকে কার্কে প্রস্তুত হচ্ছে শোবককে আইউবীর হাত থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা। আলোচনায় বসেছে তারা। কি হতে কি কি হয়ে গেল এই ভেবে স্তম্ভিত সবাই। আলেম গোয়েন্দার নিকট থেকে তারা নিশ্চিত রিপোর্ট পেয়েছিল যে, সুলতান আইউবী কার্ক আক্রমণ করবেন, কার্ক অভিমুখে এগিয়ে আসছে তাঁর বাহিনী। কায়রোর গুপ্তচরদের মারফতও একের পর এক তারা এ রিপোর্ট-ই পেয়েছিলেন যে, আইউবী কার্ক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অভিযানের কমান্ডে থাকবেন সুলতান নিজে। কিন্তু মাঝপথে সৈন্যরা কার্কের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে। তারা এমন এমন কৌশল অবলম্বন করে যে, তাদের প্রতিহত করার জন্য প্রেরিত খৃষ্টান বাহিনী তাদের কমান্ডো বাহিনীর হাতে বিপর্যস্ত হতে শুরু করে। সুলতান আইউবী আক্রমণ করে দখল করে নেন শোবকের মত শক্তিশালী দুর্গ। বিষয়টি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় সকলের মনে।

এর জন্য অভিযুক্ত করা হয় আইউবীর বন্দীদশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আলেম গোয়েন্দাকে। তার প্রদত্ত ভুল তথ্য-ই খৃষ্টানদের শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী বলে সকলের অভিমত।

হাতকড়া পরিয়ে কনফারেন্সে হাজির করা হল তাকে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে গোয়েন্দা। আইউবীর মুখ থেকে এ তথ্য সে কিভাবে পেয়েছিল, পুনরায় তা বিবৃত করে সকলের সামনে। অবশেষে বলল, আমার দেয়া তথ্যে সন্দেহ থাকলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সে অনুযায়ী কাজ না করলেই পারত! আমার রিপোর্ট গ্রাহ্য না করলেই তো আর এ বিপর্যয় ঘটত না!

প্রশ্ন আসে গোয়েন্দা প্রধান হরমুনের উপর। 'এত বড় বিচক্ষণ গুপ্তচর হওয়া সত্ত্বেও চোখ বুজে আপনি এ রিপোর্ট মেনে নিলেন কেন? কি করেইবা বুঝলেন যে, রিপোর্টটি সঠিক?' জানতে চায় এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

'এ প্রসঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সংগত কারণেই আমি এ দাবি করতে পারি যে, গুপ্তচরবৃত্তিতে আমি বিচক্ষণ। কিন্তু ইতিপূর্বে আমার বিচক্ষণতা ও আমার গোয়েন্দাদের শ্রম ও কোরবানীকে বহুবার অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ফলে আমার যোগ্যতা

বলি হয়ে গেছে সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নির্দেশের যূপকাষ্ঠে। এখানে উপস্থিত আছেন তিনজন রাষ্ট্রনায়ক। আছেন তাদের সম্মিলিত কমান্ডের উচ্চপদস্থ এক কমাণ্ডারও। অবিশ্বাস্য শোচনীয় এক পরাজয়ে বিপর্যস্ত আমরা। শোবকের মত শক্ত দুর্গ আমাদের হাতছাড়া। আমাদের মাইলের পর মাইল বিশাল-বিস্তৃত এলাকা এখন মুসলমানদের কব্জায়। আমাদের বছরের রসদ-পাতি ও মূল্যবান জিনিসপত্র এখন দুশমনের হাতে। শোবকের জনগণ এখন মুসলমানদের গোলাম। এর জন্য দায়ী কে? বে-আদবী মাফ করলে আমি আপনাদের প্রত্যেককে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা শপথ করেছিলাম, ক্রুশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করব। ব্যক্তিগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে হলেও ক্রুশের মর্যাদা রক্ষা করে সেই অঙ্গীকার পালন করে চলা উচিত আমাদের সকলের। এবার অনুমতি হলে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই।'

গোয়েন্দা প্রধান হরমুন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশীল লোক। কনরাড, গাই লে অফ লুজিনান এবং ফিলিপ অগাস্টাস-এর ন্যায় রাষ্ট্রনায়কগণও তার মতের বিরুদ্ধাচারণ করার সাহস পান না। গোয়েন্দা বিভাগের সকল নিয়ন্ত্রণ ও সর্বময় ক্ষমতা তার হাতে। একজন খৃষ্টান রাষ্ট্রনায়ককেও গুপ্তভাবে হত্যা করার মত ব্যবস্থা, সাহস ও যোগ্যতা তার আছে। তাকে সমীহ করে চলে সকলে। প্রশ্ন করার অনুমতি পান তিনি। পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে কক্ষজুড়ে। হরমুনের মুখের প্রতি সকলের দৃষ্টি। প্রশ্ন করেন হরমুন–

'দুশমনের গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং চরিত্র ধ্বংসের জন্য আমরা মেয়েদের উপর নির্ভরশীল কেন?'

'কারণ, নারীর প্রতি মানুষ সবচেয়ে বেশী দুর্বল। চরিত্র ধ্বংসের জন্য নারী শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। নারীর হাড্ডি-মাংসের এই দেহের মাধ্যমে হোক কিংবা সাহিত্যের মাধ্যমে নারীর রূপ-সৌন্দর্য, দেহ-সৌষ্ঠব ও আকর্ষণের কথা ফুটিয়ে তুলে হোক, মানুষের চারিত্রিক পদস্খলনে নারীর বিকল্প নেই।

তুমি কি একথা অস্বীকার করতে পারবে যে, আরবের বহু আমীর-উজীরকে নারীর হাতে আমরা আমাদের গোলামে পরিণত করেছি?' বললেন এক সম্রাট।

'কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের শাসন-ক্ষমতা যে আমীর-উজীরদের নয়– সেনাবাহিনীর হাতে। খলীফার শাসন মানছে না এখন মুসলমানরা। সামরিক ক্ষেত্রে খলীফাদের দখল বলতে নেই। সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরের একজন গভর্নর মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা তার হাতে। মিসরের খলীফাকে তিনি ক্ষমতাচ্যুৎ করেছেন। এদিকে আছেন নুরুদ্দীন জঙ্গী। তিনি একজন সেনাপতি ও মন্ত্রী। সামরিক ক্ষেত্রে বাগদাদের খলীফার আদেশ-অনুমতির তোয়াক্কা করতে হয় না তাঁকেও।

এমতাবস্থায় ক'জন আমীর-উজীরকে হাত করলে মুসলমানদের মধ্যে বড়জোর গাদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। দেশের এক ইঞ্চি জমিও ওরা আপনাকে দিতে পারবে না। ইসলামী সাম্রাজ্যের আসল রাষ্ট্রনায়ক এখন সেনাবাহিনী। সুলতান আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গী তাদের সেনাবাহিনীকে এমন প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছেন যে, মেয়ে দিয়ে তাদের সৈন্যদের চরিত্র আপনি নষ্ট করতে পারবেন না, পারেনওনি।

মুসলিম সৈন্যদের জন্য মদপান জঘন্য অপরাধ। ইসলামে যে কারো জন্য মদপান করা হারাম। এ কঠোর পাবন্দির কারণে সামরিক-বেসামরিক কোন মুসলমান-ই চৈতন্য হারায় না কখনো। হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে চলতে পারে তারা সবসময়। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি মদপানে অভ্যস্ত হতেন, তাহলে আজ মিসর হত আমাদের আর সালাহুদ্দীন আইউবী শোবক দুর্গের বিজয়ী নয়– হতেন এই দুর্গে আমাদের বন্দী।' বললেন হরমুন।

'হরমুন! মুসলমানদের প্রশংসা শোনবার সময় আমাদের নেই। মেয়ে সম্পর্কে কি বলছিলে, তা-ই বল।' বলল এক কমান্ডার।

মূল প্রসংগে ফিরে যান হরমুন। বললেন–

'আমি বলতে চেয়েছিলাম, গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আমাদের নারী ব্যবহারের কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। গত দু' বছরে অতি মূল্যবান মেয়েগুলোকে মিসর পাঠিয়ে আমরা মুসলিম সৈন্যদের হাতে তাদের খুন করিয়েছি। নারী হল আবেগপ্রবণ জাতি। মেয়েদেরকে আমরা যত কড়া প্রশিক্ষণ দেই না কেন, তারা পুরুষদের মত পাথর হতে পারে না। আমরা তাদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করি। কিন্তু কোমল-হৃদয়ের কারণে তারা অনেক সময় পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করে। ফল আসে বিপরীত। মেয়েরা ধরা পড়ে শত্রুর হাতে।

মুসলিম সৈন্যরা তাদের উপভোগ না করে সসম্মানে আশ্রয় দেয়। পরনারীর দেহকে তারা হারাম মনে করে। ওদের চরিত্র দেখে আমাদের মেয়েরা প্রভাবিত হয়ে পড়ে; দুর্বল হয়ে পড়ে ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি। এই তো সম্প্রতি আইউবীর এক কমান্ডার একদল দস্যুর সঙ্গে লড়াই করে আমাদের এক মেয়ের জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করেছে। গুরুতর আহত হয়েছে নিজে। মেয়েটি তাকে সঙ্গে করে শোবকে নিয়ে আসে। আমরা তাকে বেগার ক্যাম্পে ফেলে আসি। কিন্তু মেয়েটি এক সেনা অফিসারের সামরিক উর্দি চুরি করে তাকে পরিয়ে নিজের ঘোড়ায় করে পার করে দিয়েছে। আমি মেয়েটিকে ধরে ফেলি। কিন্তু বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে ও।

তার ভাষ্যমতে আত্মহত্যা সে শাস্তির ভয়ে করেনি। মুসলিম ফৌজির আদর্শ দেখে, তার সংস্পর্শে গিয়ে তার উপলব্ধি আসে যে, সে পাপী এবং নিজের দেহকে প্রতারণার ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করছে। এ অনুভূতি তার এত তীব্র ছিল যে, শেষ পর্যন্ত মেয়েটি আত্মহত্যার পথ বেছে নিল।

আমাদের বেশীর ভাগ গোয়েন্দা মেয়ে-ই এমন যে, শৈশবে তাদেরকে বাবা-মার কোল কিংবা মুসলমানদের বিভিন্ন কাফেলা থেকে অপহরণ করে এনেছিলাম। এখন তারা যুবতী। নিজেদের শৈশব এবং মূল পরিচয় তারা ভুলে গেছে। তারা যে মুসলিম পিতা-মাতার কন্যা, এখন সে কথা তাদের মনেও নেই। আমরা তাদের নাম পরিবর্তন করেছি। পাল্টে দিয়েছি তাদের ধর্ম, তাদের চরিত্র। ছিল মুসলমান, এখন তারা রীতিমত খৃষ্টান।

কিন্তু আমরা তাদের রক্ত পরিবর্তন করতে পারিনি। আমি মানুষের সাইকোলজি বুঝি। মুসলমানদের সাইকোলজি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের থেকে ভিন্ন। এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। আমাদের এই মেয়েরা যখন কোন মুসলমানের মুখপানে তাকায়, তখন হঠাৎ করে তাদের যেন মনে পড়ে যায়, তাদের ধমনীতেও মুসলিম পিতার রক্ত বইছে। অনেক কিছুই করা যায়, কিন্তু মুসলমানের রক্ত থেকে তার ধর্মকে মুক্ত করা যায় না।"

'তার মানে কোন মেয়েকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য না পাঠান হোক, এ-ই কি তোমার পরামর্শ?' জিজ্ঞেস করে এক কমান্ডার।

'না। বরং আমার বক্তব্য হল, এমন মেয়েদের গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত করা না হোক, যাদের জন্ম মুসলমানের ঘরে। তবে আমার বিভাগ থেকে যদি আপনারা মেয়েদের একেবারেই সরিয়ে দেন, তাতে ক্রুশের জন্য ভালোই হবে বলে আমি মনে করি। মুসলিম আমীরদের হেরেমে নারী ঢুকিয়ে আপনারা তাদেরকে ফাঁদে ফেলতে পারছেন। রূপসী নারীর ছলনার শিকার হয়ে অনায়াসে চলে আসছে তারা আপনাদের হাতে। কিন্তু কেন? কারণ, তারা যুদ্ধের ময়দান দেখেনি। আমাদের তরবারীর সঙ্গে তাদের তরবারীর সংঘাত হয়নি। আমাদের আসল রূপের সাথে তারা পরিচিত নয়। আমাদেরকে চিনে তাদের সেনাবাহিনী। যুদ্ধের ময়দানে যাদের রক্ত ঝরে, তারাই জানে, কে তাদের শত্রু, আর কে মিত্র। এ কারণে সেনাবাহিনীর বেলায় আমাদের রূপসী নারীদের ছলনা কোন কাজেই আসে না।' বললেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

ফিলিপ অগাস্টাস বড় শয়তান প্রকৃতির মানুষ। ইসলামের শত্রুতাকে তিনি ইবাদত মনে করেন। তিনি বললেন–

'দৃষ্টি তোমার সীমাবদ্ধ হরমুন! তুমি দেখছ শুধু সালাহুদ্দীন আইউবী আর নুরুদ্দীন জঙ্গীকে। আমাদের দৃষ্টি ইসলামের উপর। আমরা ইসলামের মূল উপড়ে ফেলতে চাই। তজ্জন্য মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস করা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় সংশয় সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। রঙ্গিন সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দাও মুসলমানদের মধ্যে। আমাদের লক্ষ্য আমাদের জীবদ্দশায়-ই যে অর্জিত হতে হবে এমন নয়। এ কাজ আমরা অর্পণ করে যাব পরবর্তী প্রজন্মের উপর। তারা কিছু সাফল্য অর্জন করবে।

তারপর পুরুষানুক্রমে চলতে থাকবে এ ধারা। তারপর একটি যুগ এমন আসবে যে, তখন ইসলামের নাম-নিশানাও থাকবে না। থাকলেও তার আর কোন সালাহুদ্দীন আইউবী, নুরুদ্দীন জঙ্গী জন্ম দেয়ার ক্ষমতা থাকবে না। সেদিন মুসলমানরা ইসলাম মনে করে যে ধর্ম পালন করবে, আমাদের-ই সভ্যতা-সংস্কৃতির রঙে রঙিন হবে তা। একশত বছর পরের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দাও হরমুন! জয়-পরাজয় একটি সাময়িক ঘটনা। শোবক দুর্গ আবার আমাদের দখলে আসবে। তুমি মিসরে ষড়যন্ত্রের জাল আরো শক্ত কর। ফাতেমী ও সুদানী সৈন্যদেরকে মদদ দিয়ে যাও। হাশীশীদের কাজে লাগাও।'

❁ ❁ ❁

সভাকক্ষে প্রবেশ করে এক খৃষ্টান অফিসার। লোকটি অতিশয় ক্লান্ত। মুসলিম বাহিনীর প্রতিরোধে পাঠানো একটি দলের কমান্ডার সে। বড় উদ্বিগ্ন বলে মনে হল তাকে। কক্ষে প্রবেশ করেই মলিন মুখে সে বলল–

'বাহিনীর অবস্থা ভাল নয়। আমি আপনাদের কাছে একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। কার্কে আমাদের যত সৈন্য আছে, কিছু রিজার্ভ সৈন্য যোগ করে তাদের দিয়ে শোবক আক্রমণ করা হোক। মুখোমুখি এসে লড়াই করতে বাধ্য করা হোক মুসলমানদের।

বর্তমানে যুদ্ধের অবস্থা হল, কেন্দ্রীয় কমান্ডের নির্দেশমত আমাদের বাহিনী কার্কের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে বাহিনীর পিছন অংশের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে উধাও হয়ে যায় আইউবীর কমান্ডো বাহিনীর গুটি কতক সৈন্য। দিনের বেলা তাদের তীরান্দাজ বাহিনী দু' চারটি তীর ছুঁড়ে আমাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে হাওয়া হয়ে যায়। টার্গেট করে তারা আমাদের ঘোড়া ও উটগুলোকে। আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ারগুলো তুলকালামকান্ড ঘটিয়ে দেয়। দেখাদেখি সমস্ত উট-ঘোড়া দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে। চলে যায় আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটি বাহিনীকে সমবেত করে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মুসলমানরা সামনাসামনি আসছে না। উল্টো নিজেদের পছন্দমত ময়দানে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়ে আমাদের কয়েকটি বাহিনীকে শেষ করে দিয়েছে। আমাদের সৈনিকরা যুদ্ধ করার মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। এ মনোবল ফিরিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন একটি তীব্র পাল্টা আক্রমণ।'

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

এ মুহূর্তে খৃষ্টানদের প্রধান সমস্যা হল, তাদের সিংহভাগ সৈন্য– যারা তাদের শ্রেষ্ঠ লড়াকু– কার্ক থেকে বহুদূরে বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরু অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তারা মুসলিম বাহিনীর হাতের ক্রীড়নক হয়ে আছে। সুলতান আইউবীর পরিকল্পনাকে অতীব সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে তাঁর কমান্ডাররা। তারা পার্বত্য

এলাকায় ওঁৎ পেতে লুকিয়ে থাকে। দিনের বেলা যখন তীব্র বাতাস বইতে শুরু করে, তখন যেদিক থেকে বাতাস বইছে, সেদিক থেকে আক্রমণ করছে। এতে বাতাস এবং ঘোড়ার পায়ের উড়ানো বালুকারাশি পড়ছে গিয়ে খৃষ্টান বাহিনীর চোখে-মুখে। চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে যাচ্ছে তারা।

আইউবীর সৈন্যসংখ্যা নগণ্য; প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, 'সে সময়ে খৃষ্টানরা শোবক আক্রমণ করে বসলে সুলতান আইউবীর উপায় ছিল না। সৈন্যের অভাবে অধিকৃত এ দুর্গকে তিনি ধরে রাখতে পারতেন না। কিন্তু তিনি অতি কৌশলে খৃষ্টানদের উপর নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিলেন।

শোবকের উত্তর-পূর্বে প্রেরিত বিপুল খৃষ্টান সেনা বেকার বসে আছে। পাছে নুরুদ্দীন জঙ্গী আইউবীর সাহায্যে ফোর্স প্রেরণ করে বসেন কিনা এ আশংকায় তাদেরও ফিরিয়ে আনতে পারছে না খৃষ্টানরা।

কার্ক দুর্গে কপালে হাত ঠেকিয়ে হিম্‌শিম বসে আছে খৃষ্টান রাষ্ট্রনায়ক ও কমান্ডাররা। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না কেউ। কোন সিদ্ধান্ত আসছে না কারুর মাথায়। অন্যদিকে শোবকে বসে ব্যাকুলচিত্তে সুলতান আইউবীও ভাবছেন, খৃষ্টানরা যদি শোবক আক্রমণ করেই বসে, তবে তা ঠেকাবেন তিনি কিভাবে!

কার্ক থেকে খৃষ্টানদের তথ্য সংগ্রহ করছে আইউবীর গোয়েন্দারা। খৃষ্টানদের ছদ্মবেশে কার্কে ঢুকে পড়েছে তারা। উন্নত ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিয়ত রিপোর্ট পাচ্ছেন সুলতান।

শোবক ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লোক সংগ্রহ করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি শুরু করে দেন সুলতান আইউবী। এক্ষুণি ট্রেনিং শুরু করতে আদেশ দেন তিনি। উট-ঘোড়ার অভাবে নেই। খৃষ্টানরা পালাবার সময় অনেক উট-ঘোড়া ফেলে গিয়েছিল দুর্গে।

বাইরের বাহিনীগুলোর প্রতি নির্দেশ পাঠান, এখন থেকে যেন তারা দুশমনের পশুগুলোকে না মেরে ধরে দুর্গে পাঠাতে থাকে।

নতুন ভর্তিহওয়া সৈনিকদের কমান্ডো ও ঝটিকা আক্রমণ পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেয়ার নির্দেশ দেন সুলতান আইউবী।

গুপ্তচরবৃত্তিতে নারী ব্যবহার না করা সংক্রান্ত হরমুনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় কার্কের কনফারেন্সে। অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় আলেম গোয়েন্দাকে। মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় আক্রমণ করার জন্য লোক তৈরি করার নির্দেশ দেয়া হয় তাকে।

শোবক দুর্গ থেকে ক'জন গোয়েন্দা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। নিরাপদে পালিয়ে যায় ক'জন। নিখোঁজ রয়েছে কিছু। পুরুষদেরও কয়েকজন ধরা পড়ে যায় মুসলমানদের হাতে। বেশ কিছু আত্মগোপন করে আছে শোবকেই। কনফারেন্সে এ তথ্য প্রকাশ করেন গোয়েন্দাপ্রধান হরমুন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। আত্মগোপন করে থাকা গোয়েন্দাদের প্রতি আপাতত সেভাবেই থাকতে নির্দেশ পাঠান হয়।

এক সম্রাট বললেন, বন্দী মেয়েদের সহজে বের করে আনা সম্ভব হবে না বোধ হয়। তবে নিখোঁজ মেয়েরা ওখানকার কোন খৃষ্টানের ঘরে আত্মগোপন করেছে। তাদেরকে খুঁজে বের করে আনা আবশ্যক।

আলোচনার পর সুলতান আইউবীর কমান্ডো বাহিনীর সৈনিকদের ন্যায় একটি জানবাজ বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয় খৃষ্টানরা। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী হতে হবে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য। আরবী কিংবা মিসরী ভাষা জানা থাকতে হবে প্রত্যেকের। মুসলিম বেশে শোবক যাবে তারা। গিয়ে বলবে, খৃষ্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা কার্ক থেকে পালিয়ে এসেছি। শোবকে আটকেপড়া গোয়েন্দা মেয়েদের খুঁজে বের করে নিয়ে আসা হবে তাদের দায়িত্ব।

বিভিন্ন জেল থেকে যেসব কয়েদীকে তাদের ইচ্ছায় সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল, এ বাহিনীতে আনতে হবে তাদেরকে। যারা শোবকে ছিল এবং শোবকের অলিগলি যাদের পরিচিত।

প্রখ্যাত ইতিহাস লেখক উইলিয়াম অফ টায়ার শোবক বিজয়ের পর্যালোচনা করতে গিয়ে খৃষ্টানদের সমালোচনা করে বলেছেন–

'খৃষ্টানরা সুন্দরী মেয়েদের দ্বারা মুসলমানদের দেশে গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও মুসলমানের চরিত্র ধ্বংস করার প্রতি বেশী মনোযোগী ছিল। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাদের চরিত্রটা ছিল কত নোংরা। তারা মুসলমানদের কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে হাত করতে সক্ষম হয়েছিল ঠিক; কিন্তু কোন জাতি এবং তার সেনা বাহিনীর জাতীয় চেতনাকে ধ্বংস করা যে সহজ নয়, তা তারা বুঝে উঠতে পারেনি। তাদের রূপসী মেয়েদের অপহরণ করে, বিজিত অঞ্চলসমূহে ব্যাপকহারে নারীর সম্ভ্রমহানী ও গণহত্যা চালিয়ে, সর্বোপরি নিরপরাধ মুসলমানদেরকে ধরে ধরে বেগার ক্যাম্পে নিক্ষেপ করে খৃষ্টানরা মুসলমানদের ক্ষতি করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। এসব ঘটনা উল্টো মুসলমানদের জাগিয়ে তুলেছিল। প্রতিশোধ-স্পৃহায় তারা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কোনভাবেই খৃষ্টানরা তখন মুসলমানদের জাতীয় ও সামরিক চেতনাকে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। মুসলমানের সারিতে কয়েকজন গাদ্দার তৈরি করে ইসলামের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা যায় না কখনো।'

ঐতিহাসিকগণ আরো লিখেছেন–

'যখন খৃষ্টানদের শোবক আক্রমণ করা ছিল একান্ত প্রয়োজন, যখন সুলতান আইউবী ছিলেন সামরিক শক্তিতে দুর্বল, তখন কিনা খৃষ্টানরা শোবক থেকে কয়েকটি মেয়েকে মুক্ত করার চিন্তায় ছিল বিভোর। সালাহুদ্দীন আইউবীর সামরিক দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। সমরশক্তিতে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি খৃষ্টানদের মনে আতংক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কৌশলের মারপ্যাচে আটকিয়ে তিনি খৃষ্টান বাহিনীকে এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। ফলে তারা বড় ধরনের কোন অভিযান পরিচালনার সাহস-ই হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া মুসলিম বাহিনী ছিল দেশ-প্রেম ও ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়েও যুদ্ধ থেকে পিছপা হয়নি তারা কখনো।

কিন্তু খৃষ্টান বাহিনী ছিল এ চেতনা থেকে বঞ্চিত। তারা যখন তাদের কমান্ডারদের পিছপা হতে দেখল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের যুদ্ধ করার মনোবল হারিয়ে গেল। সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে আইউবীর বাহিনীকে বিপর্যস্ত করা খৃষ্টানদের পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু তখন তারা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান বাদ দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।'

সে কালের খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের সুর টেনে দু'তিনজন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, 'সালাহুদ্দীন আইউবী লাগাতার দু'টি বছর শোবক অবরোধ করে রেখে অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। সালাহুদ্দীন আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর মধ্যে একটি ভুল বুঝাবুঝি তার কারণ। জঙ্গীর উপদেষ্টাগণ তাঁকে তথ্য দেয় যে, সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরকে নিজের একচ্ছত্র অধিকারে রেখে ফিলিস্তীনেরও একক রাষ্ট্রনায়ক হতে চাইছেন। তাঁর পরিকল্পনা, ফিলিস্তীন কব্জা করে তিনি জঙ্গীকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন।'

ঐতিহাসিক লিখেছেন– 'এ তথ্য পেয়ে নুরুদ্দীন জঙ্গী শোবক অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য, শোবকের সামরিক ক্ষমতা হাতে নেয়া। আইউবীর সহযোগিতার নাম করে জঙ্গীর বাহিনী শোবক এসে পৌঁছে। কিন্তু আইউবী তাদের গোপন পরিকল্পনার কথা টের পেয়ে যান। গোয়েন্দা মারফত এ তথ্য পেয়ে সুলতান আইউবী মনে প্রচন্ড আঘাত পান এবং অবরোধ তুলে নিয়ে ভগ্নহৃদয়ে মিসর ফিরে যান।'

তবে খৃষ্টানরা নুরুদ্দীন জঙ্গীকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে উস্কে দেয়ার অপচেষ্টা করেনি যে, তা নয়। সুলতান আইউবীর পিতাও সে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

আইউবীর পিতা নাজমুদ্দীন আইউব দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হঠাৎ একদিন শোবক এসে হাজির হন। হঠাৎ পিতাকে দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে পড়েন। ভাবলেন, তিনি হয়ত পুত্রকে বিজয়ের মোবারকবাদ দিতে-ই এসেছেন।

পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হল। সুলতান বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম-মোসাফাহা

করলেন। কিন্তু নাজমুদ্দীন আইউব কোন ভূমিকা ছাড়াই অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'যে নুরুদ্দীন জঙ্গী আমার ন্যায় অখ্যাত-অপরিচিত ব্যক্তির পুত্রকে মিসরের রাষ্ট্রনায়ক বানালেন, সে কি অজ্ঞ? 'তোমার পুত্র ব্যক্তিগত ক্ষমতার মোহে ইসলামী সাম্রাজ্যের অতন্দ্র প্রহরী নুরুদ্দীন জঙ্গীর দুশমন হয়ে গেছে' এ কথাটাও শুনতে হল আমাকে! যাও, নুরুদ্দীন জঙ্গীর পায়ে পড়ে ক্ষমা নিয়ে আস।'

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হল। ভুল ভাঙ্গল নাজমুদ্দীন আইউবের। স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এটি খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের-ই ফল।

সুলতান আইউবী তাঁর বিশেষ দূত ও বিখ্যাত ফকীহ্ ঈসা এলাহকারীকে সঙ্গে দিয়ে পিতাকে বিদায় করেন এবং এলাহকারীর কাছে নুরুদ্দীন জঙ্গী বরাবর একটি পত্র দেন। সঙ্গে শোবকের কিছু উপহার সামগ্রীও দিয়ে দেন। সেই পত্রে তিনি লিখেছেন–

'মূল্যবান হাদিয়া শোবকের দুর্গ। তা-ও আমি আপনার পায়ে নিবেদন করছি। এরপর কার্ক দুর্গও পেশ করব ইনশাআল্লাহ।'

এ পত্রে সুলতান আইউবী প্রচ্ছন্নভাবে নুরুদ্দীন জঙ্গীকে খৃষ্টানদের নিত্য নতুন ষড়যন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

পত্রে সুলতান আইউবী শোবকের বর্তমান পরিস্থিতি ও তার বাহিনীর অবস্থান বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন এবং কয়েকটি বৈপ্লবিক প্রস্তাব পেশ করেন। জঙ্গীকে তিনি লিখেন–

'দুশমন আমাদের ভূখন্ডে জেঁকে বসে আছে। তারা যুদ্ধ করছে আমাদের সাথে। গভীর চক্রান্তের মাধ্যমে গাদ্দার সৃষ্টি করছে তারা আমাদের মাঝে। আমাদের অ-সামরিক নেতৃত্ব কেবল ব্যর্থ-ই নয়– ইসলামী সাম্রাজ্যের জন্য বিরাট এক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ঘর-বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে জীবনের মায়া ত্যাগ করে আমরা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছি। আমাদের অকুতোভয় মুজাহিদরা লড়াই করছে আর জীবন দিচ্ছে। দিনের পর দিন না খেয়েও তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়েও থামছে না। শাহাদাতের পর কাফন পর্যন্ত জুটছে না তাদের। ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হচ্ছে তাদের লাশ। শৃগাল-শকুনের খোরাকে পরিণত হচ্ছে তাদের মৃতদেহ। ইসলামের মাহাত্ম্য ও জাতির মর্যাদা তারা যতটুক বুঝে, আর কেউ বুঝে না। ইসলাম ও জাতির জন্য আমাদের অ-সামরিক শাসকবর্গের এক ফোঁটা রক্তও ঝরে না। তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে বহু দূরে নিরাপদ প্রাসাদে ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে। অপরূপা সুন্দরী ও বাকচতুর নারী আর ইউরোপের মদ দিয়ে শত্রুরা তাদেরকে নিজেদের ভক্ত-অনুরক্তে পরিণত করছে। দ্বীন-ঈমানের সমুন্নতির জন্য আমরা জীবন দিচ্ছি আর তারা কিনা দুশমনের হাতে ঈমান বিক্রি করে আয়েশ করছে, শক্ত করছে কাফেরদের হাত।'

সুলতান আইউবী আরো লিখেন–

'আমি ফিলিস্তীনের দোরগোড়ায় এসে পৌছেছি। সংকল্প নিয়েছি, সমগ্র ফিলিস্তীন জয় না করে ফিরব না। আপনি অ-সামরিক নেতৃবর্গের উপর কড়া নজর রাখুন। আলেমদের বলে দিন, যেন তারা মসজিদে মসজিদে এবং সর্বত্র এ ঘোষণা জানিয়ে দেন যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা শুধু একজন– বাগদাদের খলীফা। এক খলীফার আনুগত্য মেনে চলতে হবে সব মুসলমানের। খোতবায় খলীফার নাম যেন কেউ উচ্চারণ না করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। খলীফা কিংবা তাঁর কোন গভর্নর বাইরে বের হলে রক্ষী বাহিনী ছাড়া কোন সাধারণ মানুষ তাদের পিছনে যেন না হাঁটে, মাথা নত করে তাদের সালাম না করে, বলে দেবেন।'

পত্রে সুলতান আইউবী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি লিখেছেন, তাহলো–

'শিয়া-সুন্নী বিরোধ বেড়ে চলেছে। ফাতেমী খেলাফতের পতন এ বিরোধকে বেশী উস্কে দিয়েছে। এর অবসান ঘটাতে হবে। খেলাফত ও হুকুমত সুন্নী বটে, কিন্তু তাই বলে শিয়াদের গোলামে পরিণত করার অধিকার কারুর নেই।'

পত্রখানা নুরুদ্দীন জঙ্গীর হাতে গিয়ে পৌছে। আইউবীর প্রস্তাবাবলীর প্রতি তিনি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তার বাস্তবায়ন শুরু করে দেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও প্রেম-ভালবাসার মাধ্যমে সুলতান আইউবীও নিজ অঞ্চলের শিয়া-সুন্নী বিরোধেরও অবসান ঘটাতে শুরু করেন।

সুলতান আইউবীর উপর পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা নিচ্ছে খৃষ্টানরা। সংঘাত এড়িয়ে কৌশলে বেরিয়ে আসার নির্দেশ প্রেরণ করে তারা মরুভূমির বিক্ষিপ্ত সৈনিকদের প্রতি। পাশাপাশি চল্লিশ সদস্যের একটি কমান্ডো বাহিনীও গঠন করে ফেলে। নির্যাতিত মুসলিম বেশে শোবক প্রবেশ করে আটকেপড়া গুপ্তচর মেয়েদের বের করে আনবে তারা।

সুলতান আইউবীর অনুপস্থিতির সুযোগে খৃষ্টানরা মিসরে তাদের নাশকতার কার্যক্রম জোরদার করারও সিদ্ধান্ত নেয়। দ্রুত সুদানী ও ফাতেমীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে কায়রো দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা আঁটে তারা।

শোবক ও কার্কের মধ্যবর্তী অঞ্চলে চলছে ব্যাপক রক্তপাত। এলাকাটি সম্পূর্ণ অসমতল। স্থানে স্থানে মাটি ও বালির উঁচু উঁচু টিলা। ঢুকে পড়লে বের হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এ দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে যেমন খৃষ্টানরা, তেমনি মুসলিম বাহিনীও। মুসলমানদের ভয়ে শোবক থেকে পালিয়ে আসা বেসামরিক খৃষ্টানরাও এখানে এসে পথ ভুলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে শকুনের দল। আনন্দের সীমা নেই ওদের। মানুষের গোশ্‌তে পরিপূর্ণ তাদের পেট। হিংস্র প্রাণীরা খাবলে খাচ্ছে নিহতদের লাশ। মরুভূমির কোথাও আছে খেজুর বাগান, আছে পানির ঝর্ণা। ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লান্ত ও আহত অনেক মানুষ জীবন বাঁচাবার আশায় ছুটে আসছে ওখানে। কিন্তু জীবন নিয়ে আর ফিরে যেতে পারছে না একজনও।

❁ ❁ ❁

আম্মাদ হাশেমী। মুসলিম বাহিনীর এক প্লাটুন কমাণ্ডার। বাড়ি সিরিয়া। খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড ক্ষোভ। অন্যদের তুলনায় বেশী আক্রোশ তার ক্রুসেডারদের প্রতি।

সঙ্গীরা জানে, আম্মাদ এতীম। পিতা নেই। মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই তার। কিন্তু নিজের এতীম হওয়ার বিষয়টি তার কাছে নিশ্চিত নয়। কারণ, পিতা তার চোখের সামনে মরেনি।

তের-চৌদ্দ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়েছে আম্মাদ। শৈশবে খৃষ্টানরা হানা দিয়েছিল তার শোবকের বাড়িতে। সেই লোমহর্ষক ঘটনাটি স্পষ্ট মনে আছে তার। তখন মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতনে মেতে উঠেছিল খৃষ্টানরা। খৃষ্টানদের নির্মম নির্যাতন চোখে দেখে বড় হয়েছে সে। সে দেখেছে পিটিয়ে পিটিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে মুসলিম বন্দীদের বেগার ক্যাম্পে নিক্ষেপ করার দৃশ্য। হাঁটতে না পারার কারণে চোখের সামনে দু'জন কয়েদীর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার এবং পিতা-মাতার সম্মুখ থেকে মেয়েদের তুলে নেয়ার হৃদয় বিদারক ঘটনা মনে পড়লে এখনো সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠে আম্মাদের। শহরে খৃষ্টানরা হঠাৎ নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে, মুসলমানদের অকারণে ধরে ধরে বেগার ক্যাম্পে পাঠাতে শুরু করলে, মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে হানা দিতে আরম্ভ করলে মুসলমানরা মনে করত, এই বুঝি খৃষ্টানরা কোথাও মুসলমানদের হাতে পরাজয়ের শিকার হয়েছে।

এ অত্যাচার থেকে আম্মাদ হাশেমীর ঘরও রক্ষা পায়নি। একটি বোন ছিল তার। বয়স সাত-আট বছর। নাম আয়েশা। সে বোনটির কথাও মনে আছে তার। অতিশয় সুশ্রী ও ফুটফুটে মেয়ে। ঘরে ছিল তার পিতা, মা ও বড় এক ভাই।

একদিন বাইরে খেলতে গিয়ে আয়েশা আর ফিরে আসেনি। নিখোঁজ হয়ে যায় মেয়েটি। সর্বত্র পাতিপাতি করে সন্ধান নিয়েও পাওয়া গেল না তাকে। অবশেষে এক প্রতিবেশী জানাল, খৃষ্টানরা ওকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

নগর প্রশাসকের কাছে ফরিয়াদ জানাতে গেলেন আম্মাদের পিতা। কিন্তু অপহৃতা মেয়েটি মুসলমান একথা জানতে পেরে গর্জে উঠে প্রশাসক। বলে, তোমার এত বড় স্পর্ধা! শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এত হীনকর্মের অপবাদ দিলে তুমি! কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন আম্মাদের পিতা।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরে আসেন তিনি। আর্জির ফল জানালেন সকলকে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পেয়ে ব্যাথ্যায় ছ্যাৎ করে জ্বলে উঠে সবার মন। সোচ্চার হয়ে উঠে তারা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে।

শাসক গোষ্ঠীর এ অত্যাচারের প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানায় তারা।

শাসক খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিবাদ! এর নিদারুণ পরিণতির শিকার হতে হয় আম্মাদের পরিবারকে। সে রাতেই খৃষ্টানরা হানা দেয় তাদের ঘরে। হত্যা করে আম্মাদের মা ও ভাইকে। নিজে পালিয়ে আশ্রয় নেয় এক প্রতিবেশী মুসলমানের ঘরে। সেই যে পালিয়ে আসা; আর ঘরে ফিরেনি আম্মাদ।

কিছুদিন লুকিয়ে থাকার পর এক ব্যক্তির সহায়তায় সাবধানে– অতি সন্তর্পণে শহর ত্যাগ করে আম্মাদ। এক কাফেলার সঙ্গে যোগ দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সিরিয়া পৌঁছে যায়। চাকুরী পেয়ে যায় এক ধনাঢ্য শিল্পপতির ঘরে।

পরের ঘরে নোকরী করে জীবন কাটাচ্ছে আম্মাদ। পাশাপাশি মানসিকভাবেও জাগ্রত হয়ে উঠে সে। মনে তার প্রতিশোধের আগুন। জ্বলছে দাউ দাউ করে।

সৈনিকদের ভাল লাগে আম্মাদের। শিল্পপতির বাসার নোকরী ছেড়ে তারও মন চায় সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করতে। কিন্তু আপাততঃ সৈনিক হতে না পারলেও এক সেনা অফিসারের ঘরে চাকরি মিলে যায় তার। কাটে কিছুদিন। নিজের করুণ কাহিনী শোনায় অফিসারকে। সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছের কথাও ব্যক্ত করে তার কাছে। আম্মাদের দুঃখের কাহিনী শোনেন অফিসার। সান্ত্বনা দেন তাকে। উপদেশ দেন ধৈর্য ধারণের। মনের আশাও তার পূরণ হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। নিজ সন্তানের মত বরণ করে নেন তিনি অসহায় আম্মাদকে।

ষোল বছর বয়সে অফিসার আম্মাদকে সেনা বাহিনীতে ভর্তি করে নেন। প্রতিশোধ স্পৃহায় ব্যাকুল হয়ে আছে আম্মাদ। তিন চারটি লড়াইয়ে অংশ নেয়। অল্প ক'দিনে বীরত্ব ও প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠে তার।

এক যুগ পর এক বাহিনীর সঙ্গে আম্মাদকে পাঠিয়ে দেয়া হয় মিসরে। সুলতান আইউবীর সাহায্যে নুরুদ্দীন জঙ্গী প্রেরণ করেছিলেন এ বাহিনীটি। মিসরে কাটে তার দু'বছর।

এবার তার মনের আশা পূরণ হওয়ার পালা। শোবক অভিযানে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের তালিকায় আম্মাদের নামও এসে যায়। মরুভূমিতে খৃষ্টান বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনাকারী মুসলিম বাহিনীগুলোর একটির কমান্ডার নিযুক্ত হয় সে। মনের ক্ষোভ প্রশমিত করার সুযোগ পেয়ে যায় আম্মাদ।

এই সেই খৃষ্টান বাহিনী, যারা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল আম্মাদের সাত বছর বয়সের নিষ্পাপ অবুঝ বোন আয়েশাকে। এই সেই ঘাতকের দল, যারা নির্মমভাবে খুন করেছে আম্মাদের মা ও ভাইকে, যাদের ভয়ে নিজ বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালাতে হয়েছিল তাকে, যাদের নির্দয় নিষ্পেষণের শিকার হয়ে ধুঁকে ধুঁকে জীবন দিতে হচ্ছে শোবকের নিরপরাধ মুসলমানদেরকে।

খৃষ্টান বাহিনী এখন প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রজ্বলিত আম্মাদের বৈধ শিকার। অতীব

বে-পরোয়া হয়ে উঠে আম্মাদ। খৃষ্টান বাহিনীর জন্য এক ভয়াবহ গজব হয়ে আবির্ভূত হয় সে।

দলের সৈন্যদের নিয়ে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় বারবার গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে সে খৃষ্টানদের। অল্প সময়ে তার অশ্বারোহী গেরিলা বাহিনীর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তবু বুকের প্রজ্বলিত আগুন নিভছে না তার। শত্রুদের উপর এত প্রলয় সৃষ্টি করার পরও মনের ক্ষোভ তার প্রশমিত হতে চাইছে না; মিটছে না হৃদয়ের জ্বালা।

একমাস পর।

আম্মাদের দলে মুজাহিদের সংখ্যা এখন চারজন। তাকে সহ পাঁচজন। বাকীরা সব শহীদ হয়ে গেছে। এক রাতে এই চার আরোহী আক্রমণ করে বসে খৃষ্টান বাহিনীর পঞ্চাশজনের এক প্লাটুনের উপর। সে এক অভাবিতপূর্ব দুর্ধর্ষ অভিযান। একস্থানে তাঁবু গেড়ে রাতের বেলা অবস্থান করছিল খৃষ্টান বাহিনী। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তারা। পাহারাও দিচ্ছে বেশ ক'জন সান্ত্রী। রাত তখন দ্বি-প্রহর। চার সঙ্গীকে নিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ঘোড়া ছুটায় আম্মাদ। ঘুমন্ত খৃষ্টান সৈনিকদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে অন্য দিকে যাওয়ার সময় বর্শা দ্বারা প্রবলবেগে আঘাত হানে ডানে-বাঁয়ে। তার সঙ্গীরাও একই প্রলয় সৃষ্টি করে। খৃষ্টানরা ঘটনা আঁচ করার পূর্বে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় আম্মাদ। ঘুমন্ত খৃষ্টানদের অনেকে আহত হয় বর্শার আঘাতে। চার চারটি ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে নিহত হয় বেশ ক'জন। সান্ত্রীরা অন্ধকারে তীর ছুঁড়ে। ব্যর্থ যায় তাদের লক্ষ্য।

কিন্তু মনে তৃপ্তি পেল না আম্মাদ। মোড় ঘুরে দাঁড়ায় সে। সঙ্গীদের থামায়। আস্তে আস্তে সরে আসে পিছনে। এতক্ষণে দুশমন সজাগ হয়ে গেছে, তা একটুও ভাবল না সে। সঙ্গীদের নিয়ে চলে যায় তাঁবুর নিকটে। দ্রুত ঘোড়া ছুটাতে নির্দেশ দেয়। অন্ধকারে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় শত্রু সেনাদের। দু'দিকে সমান গতিতে আক্রমণ চালিয়ে শত্রু শিবিরের উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটে যায় পাঁচটি ঘোড়া। কিন্তু শিবির অতিক্রম করার পর এবার তারা পাঁচজন নয়– তিনজন। তীরের আঘাতে খৃষ্টানরা ফেলে দিয়েছে দু'জনকে।

আম্মাদ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। রক্তের তেজ বেড়ে যায় তার। সঙ্গী দু'জনকে ডেকে বলে, 'এক্ষুণি আমি এর প্রতিশোধ নিচ্ছি।' সীমাহীন বেপরোয়া হয়ে উঠে আম্মাদ। ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে খৃষ্টানদের সন্নিকটে এসেই আক্রমণ করার নির্দেশ দেয় সঙ্গীদের। তাদের ঘোড়াগুলো এবার ক্লান্ত। দুশমনও পূর্ণ সজাগ-সচেতন। বেশ কিছুক্ষণ হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আম্মাদ সরে আসে পিছনে।

দুশমনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার পিছন পিছন ছুটে আসে দু' অশ্বারোহী। তারা আম্মাদের সঙ্গী নয়– শত্রুসেনা। ধাওয়া করছে তাকে। অন্ধকারে পিছন থেকে হাঁক দিলে ঘটনাটি টের পায় আম্মাদ। সঙ্গী দু'জন পান করে শাহাদাতের অমীয় সুধা।

দুই শত্রুসেনা চলে আসে আম্মাদের মাথার কাছে। হাতে তাদের তরবারী। আঘাত হানে আম্মাদের উপর। আম্মাদের হাতে বর্শা। প্রথমবার শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়ায় সে। মোকাবেলা করে দুই শত্রুর। তরবারীর মোকাবেলায় বর্শা। ঘোড়ার পিঠে বসে মুখোমুখি লড়াই করছে আম্মাদ। শত্রুর তরবারীর আঘাত প্রতিহত করছে, কৌশলে নিজে আঘাত করছে বর্শা দ্বারা।

দীর্ঘক্ষণ চলে এ লড়াই। আম্মাদের হাতে পরাজিত হয়ে পালাতে চেষ্টা করে শত্রু সেনাদ্বয়। কিন্তু আম্মাদ ওদের পালিয়ে বাঁচতে দেবে কেন? খৃষ্টানদের খুন করায়-ই যে তার আনন্দ! ছুটে গিয়ে পিছন থেকে আঘাত করে পলায়নপর দুই খৃষ্টান সৈন্যের উপর। অম্‌নি মাটিতে পড়ে যায় তারা। এবার মনটা খানিক হালকা হল আম্মাদের।

শোবক পাঠানোর জন্য ধরে নিল ঘোড়াগুলো। তুলে নিল তরবারী দু'টো। কিন্তু কোথায় এসে পৌছেছে, তা সে জানে না। দিনে আক্রমণ করা যাবে না বলে পিছু নিয়েছিল শত্রুদের। এসে পড়েছে মূল ঘাঁটি ছেড়ে বহু দূরে এখানে। নিজেকে এবং ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য সে অবস্থান নেয় এক জায়গায়। কিন্তু পাছে কোথাও থেকে হঠাৎ কোন শত্রু এসে আক্রমণ করে বসে কিনা, এ আশংকায় ঘুমায় না আম্মাদ। জেগে কাটায় সারা রাত। তারকা দেখে শোবক ও কার্কের দিক নির্ণয় করে। মরুভূমিতে কোন্ দিকে গেলে মুসলিম সৈন্যদের পাওয়া যাবে, তা-ও ঠিক করে নেয় সে।

ভোর হওয়া মাত্র উঠে রওনা দেয় আম্মাদ। মরুভূমির সন্তান সে। মরুভূমিতে তার জন্ম, ওখানেই তার লালন-পালন ও বড় হওয়া। তাই পথ হারাবার ভয় নেই তার। তাছাড়া সে একজন অভিজ্ঞ গেরিলা যোদ্ধা। দূর থেকে বিপদের গন্ধ পায় সে।

বহু দূরে শত্রু বাহিনীর চার-পাঁচজনের কয়েকটি ক্ষুদ্র দল চোখে পড়ে আম্মাদের। সাথে অতিরিক্ত ঘোড়া দু'টি না থাকলে কান্ড একটা ঘটিয়ে ছাড়ত। কিন্তু মূল্যবান ঘোড়া দু'টো রক্ষা করার নিমিত্ত সন্তর্পণে শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে এগিয়ে চলে আম্মাদ। পথে বিভিন্ন স্থানে মৃত উট-ঘোড়া ও খৃষ্টান সৈন্যদের মরা লাশ দেখতে পায় সে। শকুন-শৃগালেরা খাবলে খাচ্ছে ওদের গোশত। তাতে দু'চারজন মুসলিম সৈনিকের লাশ থাকাও বিচিত্র নয়।

গন্তব্য অভিমুখে এগিয়ে চলে আম্মাদ। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। সম্মুখের পার্বত্য ভূমিতে এসে পৌছে সে। আঁকাবাঁকা পথ। কয়েক পা পরপরই ডানে-বাঁয়ে

মোড় নিয়েছে এখানকার রাস্তাগুলো। খৃষ্টান বাহিনীর ক্ষুদ্র কোন দল এ অঞ্চলে অবস্থান নিয়ে থাকতে পারে বলে আশংকা জাগে আম্মাদের মনে। তাই সূর্যাস্তের আগে-ভাগেই এখান থেকে কেটে পড়তে চাইছে সে। টিলার উপর কোন তীরান্দাজ ওঁৎ পেতে বসে থাকার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। উপর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলছে আম্মাদ।

❁ ❁ ❁

দু'টি টিলার মধ্য দিয়ে মোড় নিয়েছে সামনের গলি। পথের বাঁক ধরে মোড় নিতেই আচম্‌কা কারো ধাবমান পায়ের শব্দ শুনতে পায় আম্মাদ। কে একজন লুকিয়ে ছিল পাশের টিলায়। ঘোড়ার লাগামে ঝাঁকুনি দেয় আম্মাদ। বেড়ে যায় ঘোড়ার গতি। তীরবেগে চলে যায় সে টিলার পিছনে। কিন্তু একি! পথ নেই যে আর! সম্মুখে আরেকটি টিলা রোধ করে রেখেছে আম্মাদের পথ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে আছে আম্মাদ। এদিক-সেদিক চোখ ফিরিয়ে পথের সন্ধান করছে সে। দৃষ্টি পড়ে সামনের টিলায়। দেখে, টিলার চড়াই বেয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করছে একজন লোক। গায়ে তার লম্বা জুব্বা। মাথাটা এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা আবৃত। পিঠটা আম্মাদের দিকে। দু'হাত ও কনুইয়ে ভর করে উঠার চেষ্টা করছে সে।

লোকটিকে নিরস্ত্র হওয়ার জন্য পিছন থেকে হাঁক দেয় আম্মাদ। বলে, নেমে এস, নইলে পরিণতি ভাল হবে না। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করল না লোকটি। উপরে উঠার চেষ্টা চালিয়ে-ই যাচ্ছে সে। বেশ দুর্গম টিলা।

সামনে এগিয়ে যায় আম্মাদ। দ্রুত উপরে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করে লোকটি। কিন্তু হাত-পা বসাতে পারছে না সে কোথাও। এতক্ষণে এক পা-ও উঠতে পারেনি সে। ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়েছে তার দেহ। টিলা থেকে ঢিলে হয়ে আসে তার মুষ্টি। হাত ফস্‌কে গড়িয়ে পড়ে নীচে; আম্মাদের ঘোড়ার ঠিক পায়ের কাছে। নেকাব সরে গিয়ে অনাবৃত হয়ে পড়ে তার মাথা ও মুখমন্ডল। কিন্তু একি! এযে পুরুষ নয়– নারী! অপূর্বদৃশ্য অপরূপা এক সুন্দরী যুবতী! বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে আম্মাদ।

ঘোড়া থেকে নামে আম্মাদ। ভয়ে কাঁপছে মেয়েটি। ভীতি অবশিষ্ট শক্তিটুকুও শেষ করে দিয়েছে তার। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে মেয়েটি। কিন্তু পারল না, বসে পড়ল।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করে আম্মাদ।

'পানি দাও।' জবাবে বলল মেয়েটি।

ঘোড়া থেকে মশক খুলে মেয়েটিকে পানি দেয় আম্মাদ। হাতে নিয়ে মেয়েটি চক্‌ঢক্ করে খেয়ে ফেলে সবটুকু পানি। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে মেয়েটির। তাকে কিছু খাবার এনে দেয় আম্মাদ। ক্ষুধায় কাতর মেয়েটি খাবার খেয়ে কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠে। জীবনীশক্তি ফিরে পায় সে।

'আমাকে ভয় কর না; বল তোমার পরিচয় কি?' বলল আম্মাদ।

'শোবক থেকে পরিবারের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলাম। পথে মারা গেছে সব ক'জন। বেঁচে আছি একা আমি। পথে মুসলমানরা আক্রমণ করেছিল।' অব্যক্ত কণ্ঠে জবাব দেয় মেয়েটি।

'না। সত্যি করে বল তুমি কে? যা বলেছ সব মিথ্যে।'

'মিথ্যে হলে হল। আমার প্রতি দয়া করুন; আমাকে কার্ক পৌঁছিয়ে দিন।'

'কার্ক নয়– আমি তোমাকে শোবকে নিয়ে যাব। বুঝতেই তো পারছ, আমি মুসলমান। পথে আমি খৃষ্টানদের হাতে মরতে চাই না।'

'তাহলে আমাকে একটি ঘোড়া দিন। আমি মেয়ে মানুষ। পথে কারুর হাতে পড়ে গেলে জানেন তো পরিণতি কী হবে।'

আমি তোমাকে ঘোড়াও দিতে পারব না। একাও পাঠাতে পারব না। সঙ্গে করে তোমাকে শোবক নিয়ে যাওয়া আমার অর্পিত কর্তব্য।'

'সেখানে নিয়ে আমাকে কার হাতে তুলে দিবেন?'

'শোবকে নিয়ে আমি তোমাকে সেখানকার নতুন শাসকদের হাতে তুলে দেব। তুমি অমূলক ভয় পাচ্ছ। ইসলাম নারীকে ইজ্জত করতে শেখায়-অপমান করা নয়। শোবকে নিয়ে তোমাকে আমি যাদের হাতে তুলে দেব, তাঁরা মুসলমান, ইসলামী আদর্শে বলিয়ান। তারা পরনারীর গায়ে হাত দিতে জানে না। আর আমিও সেই একই আদর্শের অনুসারী। সব ভয়-ভীতি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে আমার সঙ্গে চল।'

তবু শোবক যেতে চাইছে না মেয়েটি। কার্ক যাওয়ার জন্যই জিদ্ ধরে আছে সে। আম্মাদ বলে, শোবকের কোন নাগরিক যেন পালিয়ে যেতে না পারে, সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখার নির্দেশ রয়েছে আমাদের উপর। যারা নগর থেকে বের হয়ে এসেছে, তাদেরও ধরে ধরে ফেরত পাঠাতে বলা হয়েছে। তাছাড়া তুমি এখান থেকে রওনা হয়ে কার্ক পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছতে পারবে না। পথেই শেষ হয়ে যাবে তোমার সব সম্পদ। তোমার স্বজাতি ভাইয়েরাই খাবলে খাবে তোমাকে। নারীর ইজ্জতের গ্যারান্টি থাকলে আছে একমাত্র ইসলামে, আছে মুসলমানদের কাছে। দেরি না করে চল, রওনা হই।

আম্মাদের কোন কথাই কানে ঢুকছে না মেয়েটির। তার প্রবল আশংকা, এই মুসলমান সৈনিকটি কোথাও নিয়ে গিয়ে তাকে অপমান করবে। ইজ্জত লুট করে কেটে পড়বে। আম্মাদের সঙ্গে উপরে উঠছে না মেয়েটি। মনে মনে কৌশল আঁটে, আম্মাদকে খুন করে তার-ই ঘোড়া নিয়ে চম্পট দিবে। বলে, 'ঠিক আছে, তা-ই হবে। তবে এ অবসন্ন শরীর নিয়ে এখন আমি পথ চলতে পারব না। রাতটা দু'জনে এখানেই কাটাই। ভোরে উঠে আমরা রওনা হব।'

আম্মাদ নিজেও ক্লান্ত। ঘোড়াগুলোরও বেহাল অবস্থা। মেয়েটির ভগ্নদশাও তার চোখের সামনে। তাই প্রস্তাবে সম্মত হল সে।

প্রথমে মেয়েটি আম্মাদকে ভাল করে দেখেনি। লম্বা দাড়ি, দীর্ঘ দেহ আর মুখের গঠনে আম্মাদকে এক হিংস্র প্রাণী বলেই মনে হয়েছিল তার। তাছাড়া তার ধারণা, মুসলমান মানেই হিংস্র পশু, যাদের কাছে মায়া-দয়ার আশা করা বৃথা। কিন্তু এবার পুনর্বার গভীর দৃষ্টিতে, নিরীক্ষার চোখে ভাল করে দেখে নেয় সে আম্মাদকে। ভাবান্তর ঘটে যায় তার; না, মুসলমান মানেই হিংস্র নয়।

গভীর অপলক দৃষ্টিতে আম্মাদও তাকিয়ে আছে মেয়েটির প্রতি। ও ভাবছে, মেয়েটির অসহায়ত্বের কথা, এমনি এক অপরূপা সুন্দরী যুবতীর একাকী এই মরুভূমিতে পড়ে থাকার বিপদের কথা। আজ বেশ ক'দিন হল যুদ্ধ চলছে এই মরু অঞ্চলে। দু' পক্ষের সৈন্যরা ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক। এভাবে একাকী পড়ে থাকলে কখন কার হাতে পড়ে মেয়েটিরও ইজ্জত হারাতে হত, তা বলা মুশকিল। এমনও তো হতে পারে যে, দখল প্রতিষ্ঠার জন্য মেয়েটিকে নিয়ে সৈনিকরা নিজেরাই পরস্পর যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিবে! ভাগ্যিস, মেয়েটি আমার হাতে পড়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে সে, তাতে কি হল? আমিও তো ফেরেশতা নই। আমারও তো রক্ত-মাংস আছে, আছে কামনা-বাসনা, আছে যৌন-লালসা!

মেয়েটির চোখে চোখ রাখে আম্মাদ। মেয়েটিও তাকায় আম্মাদের প্রতি। লজ্জা পেল আম্মাদ। চোখ সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে সে। কিন্তু রূপের চুম্বকার্ষণে মেয়েটির চোখে চোখ আটকে যায় তার। নিজের মধ্যে কেমন এক অনুভূতি আবিষ্কার করে সে, যা তার কাছে নিতান্ত অপরিচিত, একেবারে নতুন।

বহু কষ্টে দৃষ্টি অবনত করে আম্মাদ। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য মাত্র। পরক্ষণেই আবার চোখাচোখি হয় দু'জনের। অভাবিতপূর্ব এক শিহরণ খেলে যায় আম্মাদের মনে। হৃদয়টা যেন কেমন তোলপাড় করতে শুরু করে দেয় তার। অস্থির হয়ে উঠে সে। মেয়েটির দু' ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে উঠে একটুখানি মুচকি হাসি।

'বোধ হয় তোমার এখনো বিয়ে হয়নি!' আম্মাদের মনে কৌতূহল।

'হ্যাঁ, আমি এখনো কুমারী।' জবাব দিয়েই ঝট্ করে বলে ফেলে, 'জগতে কেউ নেই আমার। আমার সঙ্গে কার্ক চল, আমি তোমার বউ হব।'

চৈতন্য ফিরে আসে আম্মাদের। বলে, 'হ্যাঁ, তারপর বলবে, এবার ধর্ম বদল কর। ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান হও; তাই না? তারচে' বরং শোবক চল। মুসলমান বানিয়ে আমি তোমায় বিয়ে করে নেব। তুমি ঈমানী জিন্দেগীর স্বর্গীয় স্বাদ অনুভব করবে।'

'যে করে হোক, কার্ক আমার যেতেই হবে। আমার সঙ্গে ওখানে গেলে তোমার জগত পাল্টে যাবে।' টোপ ফেলে মেয়েটি। ঈমান বেচা-কেনার হাট বসিয়ে দেয় সে।

কিন্তু হঠাৎ ভাবান্তর ঘটে যায় আম্মাদের মনে। মেয়েটির মুখমন্ডল, রেশমী চুল আর মায়াবী চোখ দু'টো সে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে আর মাথা ঝুঁকিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে গভীর চিন্তার জগতে। মেয়েটির কোন কথাই যেন ঢুকছে না আম্মাদের কানে।

মাথা তুলে উঠে দাঁড়ায় আম্মাদ। ঘোড়ায় বাঁধা থলে থেকে কিছু খাবার এনে খায় দু'জনে। কারো মুখেই রা নেই।

ঘুমিয়ে পড়ে আম্মাদ। অবসন্ন দেহটি মাটির শয্যায় এলিয়ে দেয়া মাত্র বুজে আসে তার দু' চোখের পাতা। গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায় সে। ঘুমিয়ে পড়ে মেয়েটি।

মধ্যরাতের পর পার্শ্ব পরিবর্তন করে মেয়েটি। চোখ খুলে যায় তার। কিছুক্ষণ আড়মুড়িয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা দূর করে আম্মাদের প্রতি তাকায় সে। নাক ঢেকে ঘুমুচ্ছে আম্মাদ। কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াগুলো। টিলার উপর নেমে এসেছে আকাশের চাঁদ। স্বচ্ছ কাচের মত পরিষ্কার মরুভূমির জোৎস্না। চন্দ্রালোকে ভেসে যাচ্ছে যেন প্রকৃতি। ঘোড়াগুলোর প্রতি তাকায় মেয়েটি। সব ক'টি ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধা। শোয়ার আগে জিনগুলো খুলে রাখবে, তা মনেই ছিল না আম্মাদের।

অনুকূল পরিবেশ পেয়ে জুব্বার পকেটে হাত ঢুকায় মেয়েটি। বের করে আনে চক্চকে একটি খঞ্জর। শক্ত করে ধরে প্রস্তুতি নেয় সে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আম্মাদকে। গভীর নিদ্রায় অচেতন সে। মেয়েটি একবার চক্‌মকে খঞ্জরের প্রতি আবার আম্মাদের মুখমন্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ক্ষীণ স্বরে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে আম্মাদ।

আম্মাদের বুকটা কোথায়, গভীর দৃষ্টিতে দেখে নেয় মেয়েটি। হৃদপিন্ডটা কোথায় থাকতে পারে তা-ও আন্দাজ করে নেয় সে। একবারের স্থলে দু'বার আঘাত করা যাবে না। তাই আঘাতটা হানতে হবে হৃদপিন্ডে, যেন আহ! বলার আগেই প্রাণটা বেরিয়ে যায়। অন্যথায় মরতে মরতেও পাল্টা আঘাত হেনে মেরে ফেলবে তাকে।

হাতের খঞ্জর আরো শক্ত করে ধরে মেয়েটি। পরিকল্পনাটা সম্পূর্ণ কল্পনায় নিয়ে আসে আরেকবার– হৃদপিন্ডে খঞ্জর বিদ্ধ করব। ছুটে গিয়ে একটি ঘোড়ায় চড়ে বসব। তীরবেগে ঘোড়া ছুটাব।

মেয়েটি সৈনিক নয়। অন্যথায় তার এত কিছু ভাবতে হত না। এক আঘাতে আম্মাদকে খতম করেই পালিয়ে যেত। কারণ হিসেবে এটা-ই যথেষ্ট ছিল যে, আম্মাদ মুসলমান ও তার শত্রু।

কিন্তু ও তা পারছে না। বারবার চোখ দু'টো চলে যাচ্ছে আম্মাদের মুখের প্রতি। আম্মাদের বুকে বিদ্ধ করার জন্য খঞ্জরের বাঁট শক্ত করে ধরে কাছে গেলেই কেন যেন মনটা তার ধড়ফড় করতে শুরু করে। খঞ্জরের হাতল ধরা হাতটা তার নেমে আসে নীচে।

আবারো বিড়বিড় করে আম্মাদ। এবার ঘুমের ঘোরে উচ্চারিত শব্দগুলো তার কিছুটা বুঝা যায়। স্বপ্নে বাড়ি গিয়েছিল সে। মাকে ডাকে, ডাকে বোনকে। আরও এমন কিছু শব্দ, যাতে বুঝা গেল, তাদেরকে কেউ খুন করেছে। খুনীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে সে।

কি এক অজানা অনুভূতি চেপে ধরেছে মেয়েটির হাত। সীমাহীন বিচলিত হয়ে পড়ে সে। আম্মাদকে হত্যা করার সংকল্প ত্যাগ করে। খঞ্জর হাতে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় ঘোড়ার কাছে। কিন্তু বালিতে পা আটকে যায় তার। থেমে পিছন ফিরে আম্মাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আরেকবার। হঠাৎ এক ঝাঁক প্রশ্ন জেগে উঠে তার মনে। আমার মত রূপসী এক যুবতীকে একাকী হাতের মুঠোয় পেয়েও কি লোকটির মনে কোন ভাবান্তর ঘটল না? জ্বলে উঠল না তার কামনার আগুন? একটি খৃষ্টান মেয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করে ফেলতে পারে, সে কথা কি একটিবারও ভাবল না? লোকটি ঘোড়ার জিনও খুলে রাখেনি, নিজের অস্ত্রগুলোকেও সাবধানে রাখেনি। কেন? তবে কি আমার উপর তার পূর্ণ আস্থা ছিল। লোকটা কি এতই অনুভূতিহীন যে, আমার যৌবন তার দেহে একটুও লালসা সৃষ্টি করতে পারল না? তবে কি সে নিজেকে তার ঘোড়া অপেক্ষা বেশী মূল্যবান মনে করেনি?

মেয়েটি ধীরে ধীরে পৌঁছে যায় একটি ঘোড়ার নিকট। মানুষের আগমন টের পেয়ে ডেকে উঠে ঘোড়া। ভয় পেয়ে যায় মেয়েটি। আম্মাদ জেগে গেল কিনা, তাকায় সেদিকে। কিন্তু না, গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে আম্মাদ। নীরব-নিস্তব্ধ নিশীথে একটি ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতেও ঘুম ভাঙল না তার।

নিশ্চিন্ত হয় মেয়েটি। তিনটি ঘোড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে একটিতে চড়ে বসার সংকল্প করে সে। এক পা তার ঘোড়ার রেকাবে। ঠিক এমনি সময়ে পিছন থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে আসে তার কানে, 'কে?'

চমকে উঠে মেয়েটি। মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকায়। এক ব্যক্তি শিস্ বাজিয়ে বলে, 'এ আমাদের সৌভাগ্য'।

তারা দু'জন। হাসিতে ফেটে পড়ে অপরজন।

মুখের ভাষায় মেয়েটি বুঝে ফেলে লোক দু'জন খৃষ্টান। দ্রুতপদে ধেয়ে আসে তারা মেয়েটির কাছে। ক্ষুধার্ত হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। একজন বাহু ঝাঁপটে ধরে মেয়েটিকে টেনে নেয় নিজের দিকে। 'আমি খৃষ্টান' বলে নিজের পরিচয় দিয়ে রক্ষা পেতে চায় মেয়েটি। হেসে উঠে দু'জন-ই। হাসি থামিয়ে একজন বলে, 'তবে তো তোমার সবটাই আমাদের, এস'।

'একটু থাম; আগে আমার কথা শোন। আমি শোবক থেকে পালিয়ে এসেছি। নাম আইওনা। আমি গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী। যাচ্ছি কার্কে। ঐ যে দেখ, একজন

মুসলিম সৈনিক ঘুমিয়ে আছে। ও আমাকে ধরে ফেলেছিল। তাকে ঘুমন্ত রেখে পালাতে চেয়েছিলাম। আমাকে তোমরা সাহায্য কর। দয়া করে আমাকে কার্কে পৌছিয়ে দাও।'

খৃষ্টান বাহিনীর জন্য কতটুকু মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ মেয়ে সে, তা খুলে বলল আইওনা। তবু ওরা নিরস্ত হল না।

একজন তাকে হায়েনার মত বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে বলল, 'যেখানে বলবে, সেখানে-ই তোমায় পৌছিয়ে দেব।' অশ্লীল এক মন্তব্য ছুঁড়ল অপরজন। একদিকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে শুরু করল তারা আইওনাকে।

ওরা দু'জন খৃষ্টান বাহিনীর সৈন্য। মুসলিম কমান্ডো বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। রাতে নিরিবিলি লুকিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য এসেছিল এখানে। আইওনার রূপ পশুতে পরিণত করেছে তাদের। ক্রুশের প্রতিও লোক দু'টোর কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। উচ্চস্বরে চীৎকার করে উঠে আইওনা। আম্মাদ জেগে উঠে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে, এই তার আশা। সৈন্যরা হেঁচড়াতে শুরু করে মেয়েটিকে।

হঠাৎ ভয়ার্ত কণ্ঠে চীৎকার করে একজন তার সঙ্গীর নাম নিয়ে বলে, সাবধান! কে যেন আসছে! কিন্তু না, সাবধান হওয়ার আগেই বর্শা আমূল বিদ্ধ হয়ে গেছে তার পিঠে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে।

তরবারী হাতে নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয়জন। হঠাৎ মেয়েটির মনে পড়ে যায়, তার হাতে খঞ্জর। বিলম্ব না করে খৃষ্টান সৈন্যের পাঁজরে ঢুকিয়ে দেয় সেটি। পর পর আরো দু'টি আঘাত হানে সে। চীৎকার করে বলে, 'তোমাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। তোমরা ক্রুশের কলংক।'

লাশ হয়ে গেছে দু' খৃষ্টান সৈন্য। আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অঝোরে কাঁদছে আইওনা। আম্মাদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'এখন আর এখানে থাকা ঠিক নয়। অন্য কোন খৃষ্টান সেনাদল এদিকে এসে পড়তে পারে। চল, এক্ষুণি শোবক রওনা হই।' বলে আম্মাদ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, 'ওরা কি তোমাকে জাগিয়ে তুলেছিল?

'না, আমি জাগ্রত-ই ছিলাম। ঘোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'ওখানে কেন?'

'ঘোড়ায় চড়ে পালাবার জন্য। তোমার সঙ্গে যাব না, আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম।'

'খঞ্জর পেলে কোথায়?'

'আমার সঙ্গে ছিল। ওরা আসার পূর্বে-ই এটি আমার হাতে ছিল।'

'কারণ?' আম্মাদের কণ্ঠে প্রচণ্ড কৌতূহল। কপালে ভাজ পড়ে যায় তার। বলে, 'বোধ হয় এজন্যে যে, জাগ্রত হওয়ার পর আমাকে হত্যা করবে।'

মেয়েটি নিরুত্তর। মাথা নত করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে। খানিক পর মাথা তুলে আম্মাদের মুখপানে তাকায়। তারপর চোখ সরিয়ে জড়তামাখা কণ্ঠে বলে, 'তোমাকে খুন করে আমি পালাতে চেয়েছিলাম। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তোমাকে হত্যা করারই জন্য জুব্বার পকেট থেকে এটি বের করেছিলাম। কিন্তু পারিনি; কেন জানি শত ইচ্ছার পরও তোমাকে খুন করার জন্য আমার হাত উঠেনি। তোমার জীবন ছিল আমার হাতের মুঠোয়। তাছাড়া আমি ভীরুও নই। তারপরও কেন যে তোমায় খুন করতে পারলাম না, আমি তা জানিনা। তুমি হয়ত বলতে পারবে।'

'মানুষের জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। তিনি-ই তোমার হাত স্তব্ধ করে রেখেছিলেন। আর তোমার সম্ভ্রমও রক্ষা করেছেন তিনি-ই। আমি তো একটি উপলক্ষ্য মাত্র। যাক্ গে ও-সব। একটি ঘোড়ায় চড়ে বস, রওনা হই।' বলল আম্মাদ।

হাতের খঞ্জর আম্মাদের প্রতি এগিয়ে ধরে মেয়েটি বলল, 'এই নিন, আমার খঞ্জরটি আপনার কাছে রাখুন। অন্যথায় আমি আপনাকে হত্যা করে ফেলতে পারি।'

'আমার তরবারীটিও তুমি নিজের কাছে রাখতে পার। তুমি আমায় হত্যা করতে পারবে না।' পরম গাম্ভীর্যের সাথে বলল আম্মাদ। মেয়েটির মুখেও গম্ভীরতার ছাপ।

দু'টি ঘোড়ায় চেপে বসে দু'জন। তৃতীয় ঘোড়াটিও সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে তারা।

সূর্যোদয়ের আগেই তারা এগিয়ে যায় বহুদূর। খৃষ্টান সৈনিকদের আনাগোনা চোখে পড়ছে না এখন। একদল মুসলিম সৈনিকের দেখা পেল আম্মাদ। ঘোড়ার বাগ টেনে কথা বলে তাদের সাথে। আবার রওনা হয়।

এপ্রিল মাস। প্রচন্ড তাপ। গরমে সিদ্ধ হয়ে যায় যেন আম্মাদের সমস্ত শরীর। দূরে ধূ-ধূ বালুকারাশি সমুদ্রের পানির মত চিক্‌চিক্ করছে। বাঁ-দিকে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বালির পর্বত। পথের দু'ধারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। অক্ষত নেই একটিও। শকুন-শিয়ালেরা খেয়ে খেয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে ওদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কোন কোন লাশের হাড় আর মাথার খুলি ছাড়া কিছুই নেই। প্রচন্ড খরতাপের সঙ্গে যোগ হয়ে পঁচা লাশগুলোর উৎকট দুর্গন্ধ বিষিয়ে তুলেছে আম্মাদকে।

এ যাবত কোন কথা হয়নি দু'জনের। মেয়েটির ঘোড়াকে পাশাপাশি নিয়ে আসে আম্মাদ। মুখ খুলে সে।

'এরা তোমার স্বজাতির সৈনিক। ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন ঘটানোর নিমিত্ত বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালী প্রভৃতি দেশ থেকে আসা রাজ-রাজড়াদের ইচ্ছার বলি এরা।'

কথা বলে না মেয়েটি। কেবল একবার আম্মাদের মুখপানে তাকিয়ে আহ! বলে এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নত করে সে। বাঁয়ের পর্বতের প্রতি মোড় ফেরায় আম্মাদ।

পিপাসা নিবারণের জন্য পানি আর বিশ্রামের জন্য ছায়া দুই-ই পাওয়া যাবে ওখানে।

আকাশের সূর্যটাকে পিছনে ফেলে পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়ে দু'জন। ঘোড়াগুলোকে ঘাসে ছেড়ে দিয়ে একটি ঝর্ণা খুঁজে নিয়ে পানি পান করে তারা। ঘোড়াগুলোকেও পান করায়। দু'জনে বসে পড়ে একটি গাছের ছায়ায়। প্রথমে মুখ খোলে মেয়েটি।

'তুমি কে? তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়?' আম্মাদকে প্রশ্ন করে মেয়েটি। মনে তার প্রচন্ড কৌতূহল। জবাবের জন্য অধীর চোখে তাকিয়ে আছে আম্মাদের মুখের প্রতি।

'আমি মুসলমান। নাম আম্মাদ। বাড়ি সিরিয়া।' জবাব দেয় আম্মাদ।

'রাতে ঘুমের ঘোরে তুমি কাকে স্মরণ করছিলে?'

'মনে নেই। স্বপ্নে আমি কথা বলছিলাম, না? আমার এক সহকর্মীও আমাকে বলত, আমি নাকি ঘুমের ঘোরে কথা বলি!'

'তোমার মা আছেন? বোন আছে? বোধ হয় তুমি ওদের কথা-ই স্মরণ করছিলে।'

আহ! বলে উত্তপ্ত এক দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে আম্মাদ। বলে, 'ছিল এক সময়। এখন কেবল স্বপ্নযোগেই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করি।'

আরো অনেক কিছু জানতে চায় মেয়েটি। কিন্তু এড়িয়ে যায় আম্মাদ। আর কোন প্রশ্নের-ই জবাব দেয় না সে। মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বলে–

'তুমি নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলে। তবে 'আসলে তুমি কে' এ প্রশ্ন করার এখন আর আমি প্রয়োজন মনে করি না। আমাদের পথ আর বেশী নেই। শোবক পৌছে নগর প্রশাসকের হাতে তোমায় তুলে দিয়ে-ই আমি ফিরে আসব। যদি সত্য বল, তাহলে নিজের সম্বন্ধে তুমি কিছু বলতে পার। কি বলবে, তুমি-ই জান; আমি কোন প্রশ্ন করব না। তবে, যেসব খৃষ্টান মেয়ে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আমাদের দেশে আসে, তুমি তাদের কেউ নও, একথা বলতে পারবে না আগেই বলে দিচ্ছি।'

'তোমার ধারণা যথার্থ। আমি গোয়েন্দা মেয়ে-ই বটে। আমার নাম আইওনা।' বলল মেয়েটি।

'বাবা-মা কি জানেন, তুমি কী কর?'

'বাবা-মা নেই। কখনো তাদের চেহারাও দেখিনি। আমি যে বিভাগে চাক্‌রী করি, সেই বিভাগ আমার মা; আর বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হরমুন আমার পিতা।' বলেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলে মেয়েটি। বলে–

'লুজিনা নামে আমার এক সহকর্মী ছিল। এক মুসলিম সৈনিকের জন্য সে বিষপানে আত্মহত্যা করেছিল। তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, একটি খৃষ্টান মেয়ে একজন মুসলমান সৈনিকের জন্য এত বড় ত্যাগ দিতে পারে! কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, হ্যাঁ, এমনটি হওয়া সম্ভব।

শুনেছিলাম, ঐ মুসলিম সৈনিকটিও নাকি তোমার ন্যায় একদল ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে লুজিনার জীবন-সম্ভ্রম রক্ষা করেছিল। আহত হওয়া সত্ত্বেও কর্তব্যবোধে সে লুজিনাকে শোবক পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। লুজিনা ছিল আমার-ই মত ভীষণ সুন্দরী। কিন্তু তার প্রতি তোমার ন্যায় সেই মুসলিম সৈনিকটিও ছিল নির্মোহ। আমার তো এখন নিশ্চিত মনে হচ্ছে, লুজিনার মত প্রয়োজনে আমিও তোমার জন্য জীবন দিতে পারব। আচ্ছা, নারীর প্রতি তোমরা এত নির্মোহ হও কি করে? এত সংযম তোমাদের শেখায় কে?

'ইসলাম। কু-চিন্তায় পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা সংযম অবলম্বন করে চলি।

ইসলামের প্রতি আমি নিবেদিতপ্রাণ বলেই ইজ্জত নিয়ে তুমি এ পর্যন্ত আসতে পেরেছ। অন্যথায় তোমার স্বজাতির দু' সৈনিকের মত আমিও রক্ত-মাংসের মানুষ। যৌনতাবোধ আছে আমারও। সেই ইসলামের-ই জন্য আমরা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করছি। আর তোমরা আমাদের এই চরিত্রটা ধ্বংস করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছ!'

'আবেগের তাড়নায়-ই কিনা জানি না, আমার মনে হচ্ছে, এর আগেও কোথাও যেন আমি তোমাকে দেখেছি।' বলল আইওনা।

'দেখতে পার। মিসরে হবে হয়ত।' বলে আম্মাদ।

'মিসরে আমি গিয়েছি ঠিক, কিন্তু ওখানে তোমাকে দেখেনি।' বলেই মুচকি হেসে আইওনা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা আমার ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? আমি কি অতিশয় সুন্দরী নই?'

'তোমার রূপের কথা আমি অস্বীকার করি না। তোমার এ প্রশ্নের মর্ম আমার বুঝতে বাকী নেই। কিন্তু একজন নিবেদিতপ্রাণ ও কর্তব্যপরায়ণ মুসলমান কোন নারীর কাছে হার মানে না। হোক সে শত সুন্দরী। তা না হলে মুসলমান কেন? মুসলমান তো আর খৃষ্টানদের মত নয় যে, ধর্ম রক্ষার সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও বিপদগ্রস্ত স্বজাতির এক মেয়েকে দেখামাত্র পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর!

তাছাড়া—

আমার বয়স যখন তের-চৌদ্দ বছর। তখন খৃষ্টানরা আমার ছোট্ট একটি বোনকে আমাদের শোবকের বাড়ি থেকে অপহরণ করেছিল। তার বয়স ছিল তখন সাত বছর। এখন সে বেঁচে আছে কিনা জানি না। থাকলেও কোথায় কি অবস্থায় আছে জানা নেই। কোন আমীরের হেরেমে আছে নাকি তোমার-ই মত গুপ্তচরবৃত্তি করছে, তা আল্লাহ ভাল জানেন। তাই এখন যে মেয়েই আমার চোখে পড়ে, তাকেই আমার সেই বোন বলে মনে হয়। আমি কোন মেয়ের প্রতি কু-দৃষ্টিতে তাকাতে পারি না।

পাছে সে-ই যদি হয় আমার অপহৃতা বোন! তোমাকে আমি শোবক নিয়ে যাচ্ছি শুধু তোমার নিরাপত্তার জন্য। মরুভূমিতে একাকী ছেড়ে আসলে তোমার কি দশা হত, তা আমার জানা ছিল। তোমার স্বজাতির দু'জন সৈনিকই তো তার প্রমাণ রেখে গেল। আমি এখন অন্য জগতের মানুষ। মা-বোন আছে কিনা তুমি জানতে চেয়েছিলে। শোন, আমার মাকে খৃষ্টানরা খুন করেছে। সঙ্গে বড় এক ভাইকে। বোনের কথা তো বললাম। আমি প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে মরছি। এখন এই মরু অঞ্চলে খৃষ্টান বাহিনীকে ধাওয়া করে ফিরতে আর ওদের রক্ত ঝরানোতে আমি শান্তি পাই। আমার সব সুখ এখন জড়ো হয়েছে এসে এখানে।

বিস্ময়াভিভূত নেত্রে আইওনা তাকিয়ে আছে আম্মাদের প্রতি। এক অতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। এ যাবত এমন কথা বলেনি কেউ তাকে। অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার দীক্ষা-ই পেয়েছে সে। তার কথাবার্তা আর চালচলনে কর্মকর্তারা সৃষ্টি করেছে যৌনতার আকর্ষণ। বড় সুদর্শন এক ফাঁদ রূপে গড়ে তুলেছে তাকে। সতীত্বের মত মহামূল্যবান সম্পদ থেকে করেছে বঞ্চিত। দীক্ষা লাভ করার পর আইওনা নিজেকে পুরুষের হৃদয়-রাণী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনি। নিজের বাড়ি কোথায়, বাবা-মা কেমন ছিলেন, কিছু-ই তার মনে নেই। কিন্তু এখন আম্মাদের আবেগময় কথাগুলো আইওনার ব্যক্তিসত্ত্বায় তার নারীসুলভ অনুভূতিগুলো সজাগ করে দিয়েছে। গভীর এক ভাবনার জগতে ডুবিয়ে ফেলে সে নিজেকে। আম্মাদের উপস্থিতির কথাও মন থেকে হারিয়ে যায় তার।

ভাবনার জগতে নিজের হারানো অতীত হাতড়ে ফিরছে আইওনা। হঠাৎ বলে উঠে, আমার একটি ঘটনার কথা স্বপ্নের মত মনে পড়েছে। কোন এক সময় আমাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বয়সটা তখন কত ছিল মনে নেই। দু'হাতে মাথার চুলে বিলি কাটে আইওনা। চুলগুলো মুঠি করে ধরে ঝাঁকুনি দেয় নিজের মাথাটা। অতীতের স্মৃতি স্মরণে আনার চেষ্টা করছে যেন সে। অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলে উঠে, কিছু মনে পড়ছে না, ছাই! মদ, বিলাসিতা, বেহায়াপনা আর প্রতারণার বানে ভেসে গেছে আমার অতীত। আমার বাবা-মা কে ছিলেন, কেমন ছিলেন, আমি কখনো ভাবিনি; তাদের প্রয়োজনও পড়েনি কোনদিন। চেতনা বলতে কিছু-ই ছিল না আমার মধ্যে। পুরুষ যে বাপ-ভাইও হতে পারে, তা জানতাম না। পুরুষরা আমাকে মনে করে তাদের ভোগের সামগ্রী। রূপের ফাঁদে আটকিয়ে আমি তাদের ব্যবহার করি। আমার রূপ-যৌবনের নেশা যাকে মাতাল করতে ব্যর্থ হয়, তাকে ঘায়েল করি মদ আর হাশীশ দিয়ে। কিন্তু মোহাবিষ্ট মনের দুয়ারে আঘাত করা তোমার এই অশ্রুতপূর্ব কথাগুলো খুলে দিয়েছে আমার বিবেকের দ্বার। সজাগ করে দিয়েছে আমার

সুপ্ত নারীসুলভ অনুভূতিগুলো। নারী যে পুরুষের ভোগের সামগ্রী নয়, নারী যে প্রতারণার ফাঁদ নয়, নারীরও যে মা-বাবা, ভাই-বোন থাকতে পারে, মা-বোন-স্ত্রী হওয়া-ই যে নারীর প্রকৃত পরিচয়, তা আমি স্বচ্ছ আয়নার মত পরিষ্কার বুঝতে পারছি এখন।

অস্থিরতা বেড়ে-ই চলেছে আইওনার। থেমে থেমে কথা বলছে সে। এক সময়ে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায় তার কণ্ঠ। হারানো অতীত আর বর্তমানের মাঝে শত পাকে যেন আটকে গেছে মেয়েটা। হাজার চেষ্টা করেও বেরই যেন হতে পারছে না সে। নিজের অতীতটা খুঁজে ধরে আনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আইওনা। কিন্তু না, পাচ্ছে না আর কিছু-ই।

'চল, রওনা হই'।

আম্মাদের কণ্ঠ শুনে প্রকৃতিস্ত হওয়ার চেষ্টা করে আইওনা। সহজ-সরল নিষ্পাপ বালিকার মত উঠে দাঁড়ায় সে। ঘোড়ায় চড়ে আম্মাদের পিছনে পিছনে এগুতে শুরু করে।

পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে আম্মাদ ও আইওনা। আম্মাদের মুখপানে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। হঠাৎ মুখে হাসি টেনে বলে উঠল, 'পুরুষের কথায় আর প্রতিশ্রুতিতে আমি কখনো বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন কেন যেন মনে হচ্ছে, আমার তোমার সঙ্গে যাওয়া-ই উচিত, বিষয়টা আমি বুঝতে পারছি না।'

আম্মাদ চোখ তুলে আইওনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে একটুখানি হাসল শুধু।

❁ ❁ ❁

পরদিন সূর্যোদয়ের সময় আইওনাকে নিয়ে আম্মাদ শোবকের প্রধান ফটকে এসে পৌঁছে। মরুভূমিতে কেটেছে তাদের আরো একদিন একরাত।

ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে তারা। এগিয়ে চলছে একটি গলিপথ ধরে।

একটি বাড়ির সামনে গিয়ে থেমে যায় আম্মাদ। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে আইওনা। বাড়ির বন্ধদ্বারের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ইতিউতি করে কি যেন দেখে নিয়ে খানিকক্ষণ ভেবে ঘোড়ায় বসে বসেই দরজায় নক্ করে আম্মাদ। দু'-তিনটি করাঘাতের পর খুলে যায় দরজা। ভিতরে সচকিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ।

'এখানে কে থাকে?' বৃদ্ধকে আরবী ভাষায় জিজ্ঞেস করে আম্মাদ।

'কেউ নয়। বাস করত একটি খৃষ্টান পরিবার। সুলতান আইউবীর শোবক দখলের পর তারা স্বপরিবারে পালিয়ে গেছে।' জড়তামাখা কণ্ঠে জবাব দেয় বৃদ্ধ।

'তারপর আপনি বাড়িটি দখল করে নিয়েছেন, তাই না?'

শোবক দখল করার পর সুলতান আইউবী হুকুম জারি করেছিলেন যে, কোন খৃষ্টান

যেন কোন মুসলমানের হাতে কষ্ট না পায়। অন্যথায় তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। আর এখন কিনা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তারই একজন সৈনিক এক বৃদ্ধের কাছে জবাব চাইছে, খৃষ্টানদের বাড়ি কেন দখল করল সে!

ভয় পেয়ে যায় বৃদ্ধ। কাঁপা কণ্ঠে বলে, 'না, দখল করিনি; বাড়িটি পাহারা দিচ্ছি শুধু। আপনি বললে বাড়িটি বন্ধ করে আমি চলে যাব, আর আসব না। বাড়ির মালিক এখনো বেঁচে আছেন। তিনি মুসলমান। পনের-ষোল বছর ধরে তিনি বেগার ক্যাম্পে পড়ে আছেন।'

'কেন, আমীরে মেসের কি ক্যাম্প থেকে তাদের মুক্ত করেননি? জানতে চায় আম্মাদ।

'ওখানকার মুসলমানরা তো এখন স্বাধীন। কিন্তু এখনো তারা ক্যাম্পে-ই আছে। সুলতান আইউবী আপাতত ওখানেই তাদের জন্য উন্নত থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বেশ ক'জন অভিজ্ঞ ডাক্তার তাদের চিকিৎসা করছেন। যখন-ই যার শরীর ঠিক হয়ে যাচ্ছে, পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে তাকে নিজ বাড়িতে। এখনও যারা আছেন, আত্মীয়-স্বজনরা অবাধে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে, খোঁজ-খবর নিচ্ছে। এ বাড়ির মালিকও সেখানে আছেন। লোকটি একে তো বৃদ্ধ, তদুপরি পনের-ষোল বছরের নির্যাতনে ক্লিষ্ট। বেচারা বেঁচে-ই আছেন শুধু। হাড্ডিসার-কংকাল তার দেহ। আমি তাকে মাঝে-মধ্যে দেখে আসি। আশা করি, সুস্থ হয়ে যাবেন। বাড়িটা খালি হয়েছে, তা আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছি।'

'তার আত্মীয়-স্বজন কোথায়?' জিজ্ঞেস করে আম্মাদ।

'কেউ বেঁচে নেই। ঐ যে তিনটি বাড়ির পরে যে বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন, ওটি আমার। আত্মীয়তার বন্ধন না থাকলেও আমাকেই তার আপনজন বলতে পারেন।' জবাব দেয় বৃদ্ধ।

ভিতরে কোন মহিলা নেই জেনে নিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ভিতরে ঢুকে পড়ে আম্মাদ। ঘুরে ঘুরে দেখে বাড়ির কক্ষগুলো। হাত বুলায় দেয়ালে। আইওনাও তার সঙ্গে। লুকিয়ে লুকিয়ে চোখ মুছে আম্মাদ। কিন্তু আইওনার নজরে পড়ে যায় বিষয়টি। কান্নার কারণ জানতে চায় আইওনা। রুদ্ধ কণ্ঠে আম্মাদ বলে, 'আমি আমার শৈশব খুঁজছি। এটি আমার বাড়ি। এ ঘর থেকেই আমি পালিয়েছিলাম। দু' চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করে আম্মাদের। অশ্রুভেজা চাঁপা কণ্ঠে সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, লোকটির স্বজনরা কি সবাই মারা গেছে? তার কি ছেলে-মেয়ে নেই কেউ?'

'একটি পুত্র বেঁচে ছিল। খৃষ্টান দস্যুদের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে সে আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। আমি তাকে সিরিয়া পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখানে থাকলে তাকেও জীবন দিতে হত।' জবাব দেয় বৃদ্ধ।

আম্মাদ এখন নিশ্চিত, এটি-ই তাদের বাড়ি। ষোল বছর আগে যার ঘরে আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল, ইনি-ই তিনি। এ বাড়ির মালিক বলে যার পরিচয় দেয়া হয়েছে, তিনি-ই তার পিতা।

কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন রাখে আম্মাদ। বাড়ির মালিকের সেই পুত্রের সঙ্গে-ই যে কথা হচ্ছে, সে-ই যে এখন সামনে দাঁড়িয়ে, বৃদ্ধকে তা বুঝতে দেয়নি আম্মাদ। এমনি এক পরিস্থিতিতে আবেগ ধরে রাখা ভারী কষ্টকর, বলা যায় অসম্ভব। আম্মাদের হৃদয়ও আবেগে উদ্বেলিত হয়ে আসে। দুনিয়ার কান্না এসে জড়িয়ে ধরে তাকে। কিন্তু আম্মাদ কঠিন-প্রাণ এক সৈনিক। আবেগ পরাজিত হয় তার বীরত্বের কাছে। নিজেকে সামলিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বৃদ্ধকে বলে, 'আমি এ বাড়ির মালিকের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই। নামটা কি তার বলুন।'

বাড়ির মালিকের নাম বলেন বৃদ্ধ। পিতার নাম জানা ছিল আম্মাদের। শুনে আরেকবার রুদ্ধ হয়ে আসে আম্মাদের কণ্ঠ।

'ছেলেটার এক বোন ছিল। বয়স বোধ করি সাত হবে। তাকেও তুলে নিয়ে যায় পাষন্ড খৃষ্টানরা। তার সূত্র ধরেই পরিবারের সবাইকে জীবন দিতে হল ক্রুসেডারদের হাতে।' বললেন বৃদ্ধ।

'আইওনা! 'চাঁদ তারকা'র উপর 'পবিত্র ক্রুশে'র নির্মমতার কাহিনী শুনছ তো?' মেয়েটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে কটাক্ষ করে আম্মাদ।

কোন জবাব দেয় না আইওনা। উপর দিকে মাথা তুলে ছাদ দেখছে সে। ছাদ থেকে চোখ নামিয়ে ছুটে যায় সে একটি কক্ষের দরজার কাছে। দরজার একটি কপাট বন্ধ করে উল্টো পিঠে কি যেন দেখে আইওনা। কপাটে গভীর করে খোঁদাই করা ছোট ছোট তিন-চারটি দাগ। বসে পড়ে গভীর মনোযোগ সহকারে নীরিক্ষা করে রেখাগুলো দেখতে শুরু করে আইওনা। আম্মাদ তাকিয়ে আছে সেদিকে। রেখাগুলোয় হাত বুলাচ্ছে আইওনা। এবার উঠে সে চলে যায় আরেক কক্ষে। বড় ব্যস্ত দেখাচ্ছে আইওনাকে। সেখানেও দরজার পাল্লায় কি যেন হাতড়াতে শুরু করে সে। কৌতূহল জাগে আম্মাদের মনে। করছে কি মেয়েটি! ছুটে যায় আইওনার নিকট। জিজ্ঞেস করে, 'অমন করে দেখছ কি তুমি?'

মুখে হাসি টেনে আইওনা বলে, 'তোমার মত আমিও আমার শৈশব খুঁজছি।' বলেই সে আম্মাদকে জিজ্ঞেস করে, 'এটি কি তোমাদের বাড়ি ছিল? তুমি কি এ বাড়ি থেকে-ই পালিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি এখান থেকেই পালিয়েছিলাম।' এই বলে আম্মাদ কিভাবে তার বোন অপহৃতা হয়েছিল, কিভাবে তাদের ঘরে খৃষ্টানরা আক্রমণ করেছিল, কিভাবে খৃষ্টানরা তার মা ও ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, সব ঘটনা আইওনাকে জানায়। খানিক পূর্ব পর্যন্তও আম্মাদের ধারণা ছিল, তার পিতাও বুঝি হায়েনাদের শিকারে পরিণত হয়ে

নিহত হয়েছেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ বলছেন, তিনি নাকি জীবিত আছেন।

'তুমি কি বৃদ্ধকে বলেছ যে, তিনি যাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তুমি-ই সেই ছেলে?' আইওনার মনে কৌতূহল।

'না, এখন-ই সেকথা বলতে চাই না।' জবাব দেয় আম্মাদ।

কিন্তু আম্মাদের মনে দোদুল্যমানতার ভাব। একবার ইচ্ছে হয়, পরিচয়টা দিয়েই ফেলি। আবার বলে, না, এখন থাক।

আম্মাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আইওনা। তার সাত বছর বয়সের চেহারাটা হৃদয়পটে ধরে আনার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। কিন্তু পারছে না। সেই ষোল বছর আগের কথা। আইওনার বয়স তখন মাত্র সাত বছর।

দু'টি ছেলে-মেয়ের অস্বাভাবিক কান্ড দেখে বিহ্বলের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ। এই ঘরে এরা করছে কি, এই তার কৌতূহল। কি খুঁজে ফিরছে দু'জনে, তাও তিনি বুঝতে পারছেন না। অবশেষে জিজ্ঞেস করে, 'বলুন, আমার জন্য কি হুকুম?'

বৃদ্ধের প্রতি চকিতে ফিরে তাকায় আম্মাদ। আদেশের সুরে বলে, 'আপনি-ই বাড়িটি দেখা-শুনা করুন। আপাতত এটি আপনার দায়িত্বে রইল। আম্মাদ আইওনার প্রতি তাকিয়ে বলে, 'চল, এবার যাই।'

'কেন, পিতার সঙ্গে দেখা করবে না?' জিজ্ঞেস করে আইওনা।

আগে কর্তব্য পালন করে নিই। মরুভূমিতে আমায় খুঁজে ফিরছেন কমাণ্ডার। না পেয়ে এতদিনে তিনি হয়ত আমাকে মৃত ঘোষণা করেই দিয়েছেন। ওখানে আমার বড্ড প্রয়োজন। চল, জল্‌দি আস। আগে এই আমানত কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি। আইওনার প্রতি ইংগিত করে সহাস্যে বলল আম্মাদ।

নারী, নারী, নারী।

বদ্‌মাশ খৃষ্টানরা পেয়েছেটা কি? ওরা কি আমার চলার পথে নারীর প্রাচীর দাঁড় করাতে চায়? আমার সম্মুখে মেয়েদের নাচিয়ে কি তারা শোবক দুর্গ পুনর্দখল করতে চায়?' গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানের উদ্দেশে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'না, আমীরে মোহ্‌তারাম! এরা দেয়াল নয়– এরা হচ্ছে উঁইপোকার দল। এরা উঁইপোকার ভূমিকা-ই পালন করছে। কাগজ কেটে টুকরো টুকরো করার ন্যায় মুসলিম জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও চরিত্র-ব্যক্তিত্ব কুরে কুরে খাওয়ার জন্য এদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে খৃষ্টানরা। আপনার ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস এই মেয়েদের-ই মাধ্যমে ঘটাতে চাচ্ছে। এরা হাশীশ আর মদ দ্বারা হাত করে নিয়েছে আমাদের মুসলিম শাসক ও আমীরদের।'

'যাক্ গে ওসব। এই মেয়েগুলোর ব্যাপারে আমায় কিছু বল। এরা আটজনই যে

গোয়েন্দা, তা তো প্রমাণিত। এদের থেকে এ যাবত নতুন কোন তথ্য পাওয়া গেছে কি?' জিজ্ঞেস করলেন সুলতান আইউবী।

এদের থেকে এ পর্যন্ত যতটুকু উদ্ধার করতে পেরেছি, তা হল শোবকে এখনো বেশ কিছু খৃষ্টান গোয়েন্দা ও সন্ত্রাসী আছে। কিন্তু তাদের নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়নি। এদের তিনজন নাকি মিসরে কিছু সময় কাটিয়ে এসেছে।'

'ওরা আছে কোথায়? কয়েদখানায়?' জানতে চাইলেন সুলতান আইউবী।

'না, ওদেরকে ওদের-ই আগের জায়গায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। বাড়ির চারদিকে কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা করেছি।' জবাব দেন আলী বিন সুফিয়ান।

ঠিক এ সময়ে কক্ষে প্রবেশ করে দারোয়ান। সালাম করে বলে, আম্মাদ শামী নামক এক প্লাটুন কমাণ্ডার এসেছেন। সঙ্গে তাঁর একটি খৃষ্টান মেয়ে। মেয়েটিকে নাকি তিনি কার্কের পথ থেকে ধরে এনেছেন। মেয়েটি গুপ্তচর।

'দু'জনকেই ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' বললেন সুলতান আইউবী।

বেরিয়ে যায় দারোয়ান। ভেতরে প্রবেশ করে আম্মাদ ও আইওনা। আম্মাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সুলতান বললেন, 'বোধ হয় তুমি বহু দূর থেকে এসেছ। তা আছ কার সঙ্গে?'

আমি সিরীয় বাহিনীতে আছি। আমার কমাণ্ডারের নাম এহতেশাম বিন মুহাম্মদ। আমি 'আল-বারক্' প্লাটুনের দায়িত্বশীল।

'আল-বারক্' কি হালে আছে?' বলেই আম্মাদের জবাবের অপেক্ষা না করে সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি তাকিয়ে বললেন, 'আল-বারক্' আসলেই বিদ্যুৎ। সুদানীদের উপর যখন আমরা কমান্ডো আক্রমণ চালিয়েছিলাম, তখন নেতৃত্বে ছিল এই আল-বারক। মরু অঞ্চলে গেরিলা আক্রমণে এদের জুড়ি নেই।' থামলেন আইউবী।

'মহান সেনাপতি! বাহিনীর সব ক'জন সৈনিক আল্লাহর পথে জীবন কোরবান করেছে। বেঁচে আছি আমি একা।' সুলতানের প্রশ্নের জবাব দেয় আম্মাদ।

'এতগুলো জীবন নষ্ট করনি তো আবার? মৃত্যুবরণ আর কোরবান কিন্তু এক নয়; দু'য়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। তা বুঝ তো?'

'না, নষ্ট করিনি মাননীয় সেনাপতি! আল্লাহ সাক্ষী, আমাদের এক একটি জীবনের বিনিময়ে আমরা শত্রু বাহিনীর অন্ততঃ বিশ বিশটি জীবন খেয়েছি। গুটিকতক আহত সৈনিক ছাড়া ওদের কেউ গন্তব্যে পৌছতে পারেনি। ক্রুসেড বাহিনীর রক্তে লাল করে দিয়েছি আমরা ফিলিস্তীনের মাটি। আমাদের অপরাপর বাহিনীগুলোও শত্রু বাহিনীর উপর প্রলয় সৃষ্টি করেছে। সহসা পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার শক্তি শেষ হয়ে গেছে তাদের।' দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে জবাব দেয় আম্মাদ।

'আর তুমি?' মেয়েটির প্রতি মুখ ঘুরিয়ে সুলতান বললেন, 'লুকোচুরি না করে নিজের সব কথা খুলে বল, ভাল হবে।'

'বলব, সব বলব, যা জানি একেবারে সমস্ত।' বলেই ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলে আইওনা।

'আম্মাদ শামী! তুমি ফৌজি বিশ্রামাগারে চলে যাও। নাওয়া-খাওয়া করে আরাম কর। আগামীকাল তোমার বাহিনীতে গিয়ে যোগ দিতে হবে।' সুলতান বললেন।

'আমি শত্রু বাহিনীর দু'টি ঘোড়া আর দু'টি তরবারী নিয়ে এসেছিলাম।' বলল আম্মাদ।

'ঘোড়া দু'টো আস্তাবলে আর তরবারীগুলো অস্ত্রাগারে জমা দাও।' বলে খানিক কি যেন ভেবে নিয়ে সুলতান পুনরায় বললেন, এর মধ্যে তোমার ঘোড়া অপেক্ষা ভাল ঘোড়া থাকলে বদল করে নাও। আর শোন, বাইরের রণাঙ্গনের ঘোড়াগুলোর অবস্থা কি?'

চিন্তার কারণ নেই মহান সেনাপতি! আমাদের একটি ঘোড়া নষ্ট হলে আমরা শত্রুর দু'টি পেয়ে যাই।' জবাব দেয় আম্মাদ।

সালাম করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় আম্মাদ। তার আমানত যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছে সে। এদিক থেকে তো আম্মাদ এখন সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। কিন্তু তার হৃদয়জুড়ে জগদ্দল পাথরের মত জেঁকে বসে আছে যে অন্য কতগুলো বোঝা! সে বোঝা আবেগের। সে বোঝা শৈশব-স্মৃতির। সে বোঝা পিতার ভালবাসার। স্থির হতে পারছে না আম্মাদ। মনটা কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠে তার। পিতৃস্নেহ এবং হৃদয়ের পুরণো ক্ষত কর্তব্য পালনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, এ আশংকায় পিতার সঙ্গে এখুনি দেখা করতে চাইছে না আম্মাদ।'

আম্মাদ নিজের ঘোড়ার পিছনে অপর দু'টি ঘোড়া বেঁধে নিয়ে আস্তাবল অভিমুখে আনমনে এগিয়ে চলেছে। আশপাশের কোন খবর নেই তার। ভাবাবেগে একেবারে মুষড়ে পড়েছে আম্মাদ।

'পথ ছেড়ে দাঁড়াও আরোহী!'

পিছন থেকে ভেসে আসা কারো কণ্ঠস্বরে মোহ ভাঙ্গে আম্মাদের। চৈতন্য ফিরে আসে তার। মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকায় সে। ছোট্ট একটি অশ্বারোহী সেনাদল এগিয়ে আসছে এদিকে। রাস্তার একধারে সরে ঘোড়া থামায় আম্মাদ। বাহিনীর একেবারে সামনের আরোহী আম্মাদের নিকট এসে থেমে যায়। দাঁড়িয়ে যায় পুরো কাফেলা। সম্মুখের আরোহী আম্মাদকে জিজ্ঞেস করে, তুমি বাইরে থেকে এসেছ? ওখানকার খবর কি?

'আল্লাহর রহমতে সব ভাল দোস্ত! কচুকাটা হচ্ছে শত্রু বাহিনী। আপাতত শোবকের ব্যাপারেও কোন আশংকা নেই।'

এগিয়ে চলে বাহিনী। ডান দিকে মোড় নিয়ে ঘোড়া হাঁকায় আম্মাদ।

❁ ❁ ❁

'আমি আপনার নিকট কিছুই গোপন রাখিনি।'

সুলতান সালাহুদ্দীন ও আলী বিন সুফিয়ানের সামনে বসে কথা বলছে আইওনা। সে যে গোয়েন্দা, তা-ও সে বলে দিয়েছে। একথা-ও জানিয়েছে যে, কায়রোতে সে একমাস ডিউটি করে এসেছে। কায়রোতে আইউবী বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত ছিল, এমন কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক মুসলমানের নাম বলেছে আইওনা। আইওনা আরো জানায়, সুদানীরা খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে বিপুল সহযোগিতা পাচ্ছে এবং খৃষ্টান বাহিনীর অভিজ্ঞ কমান্ডো সুদানীদের কমান্ডো আক্রমণের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে।

কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ করার আগেই আইওনা এমন সব তথ্য বলে দেয়, যা নির্যাতনের মুখেও গোয়েন্দাদের নিকট থেকে আদায় করা যায় না। সন্দেহে পড়ে যান আলী।

'আইওনা! আমিও তোমার বিদ্যায় পারদর্শী। আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, তুমি একজন উঁচু স্তরের গুপ্তচর। আমাদের জেল-শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুমি যে পন্থা অবলম্বন করেছ, তা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু আমি তো আর তোমার এ প্রতারণার ফাঁদে পা দিতে পারি না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আপনার নাম?' জিজ্ঞেস করে আইওনা।

'আলী বিন সুফিয়ান। তুমি হরমুনের নিকট থেকে আমার নাম শুনে থাকবে হয়ত।' জবাব দেন আলী।

হঠাৎ চমকে উঠে আইওনা। বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় সে। ধীরে ধীরে আলী বিন সুফিয়ানের কাছে গিয়ে হাটু গেড়ে বসে। আলীর ডান হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে চুমো খায় আইওনা। আলীর মুখপানে তাকিয়ে বলে, 'আপনাকে জীবিত দেখে আমার ভীষণ আনন্দ লাগছে। আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু শুনেছি। হরমুন বলতেন, আলী বিন সুফিয়ান মরে গেলে মুসলমানদের বুকে বসেই বিনা যুদ্ধে আমরা তাদের পতন ঘটাতে পারব।'

উঠে গিয়ে নিজ জায়গায় বসে আইওনা। বলে–

'কায়রোতে আমি আপনাকে দেখার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু পাইনি। আমার উপস্থিতিতে আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটা হয়েছিল। সে অভিযান সফল হল কি না পরে আর আমি জানতে পারিনি। আমাকে ডেকে পাঠান হয়েছিল শোবকে।'

'তুমি যা কিছু বলেছ, তার সব যে সত্য, আমরা তা বিশ্বাস করি কি করে?' জানতে চান আলী।

'আপনি আমায় কেন বিশ্বাস করছেন না?' বলে আইওনা।

'কারণ, তুমি খৃষ্টান।' পাশের থেকে বললেন সুলতান আইউবী।

'আমি যদি বলি, আমি খৃষ্টান নই– মুসলমান, তবে তখনও কি আপনারা বলবেন, বাপু! এটিও তোমার মিথ্যে কথা? আমার নিকট তো কোন প্রমাণ নেই! ষোল-সতেরটি বছর কেটে গেছে, আমি এই পল্লী থেকে অপহৃতা হয়েছিলাম। এখানে এসে জানতে পারলাম, আমার পিতা ক্যাম্পে আছেন।'

পিতার নাম বলে আইওনা। এ-ও জানায় যে, পিতার নামটি তার মনে ছিল না, এখানে এসে জানতে পেরেছে। মরুভূমিতে হায়েনার হাত থেকে আম্মাদ কিভাবে তার জীবন-সম্ভ্রম রক্ষা করেছে, রাতে তার আম্মাদকে হত্যা করার প্রচেষ্টা, আম্মাদকে হত্যা করার জন্য তার খঞ্জরধারী হাত না উঠা ইত্যাদি সব ঘটনার আনুপুংখ বিবরণ দেয় আইওনা। বলে–

দিনের বেলা আম্মাদের মুখমন্ডল ও চোখের প্রতি নজর পড়লে আমার হৃদয়ে এমন এক অনুভূতি জেগে উঠে, যা আমাকে সংশয়ে ফেলে দেয় যে, লোকটিকে আমি আগেও কোথায় যেন দেখেছি। ও যেন আমার পরিচিত লোক। কিন্তু কোথায় দেখেছি, কখন দেখেছি, কিভাবে পরিচয় তার কিছু-ই স্মরণ আসল না। আমার এ সন্দেহের কথা তার নিকট ব্যক্ত করলে সে বলল, না এমনটি হতে পারেনা; তুমি আমায় দেখবে কোথায়! রাতে দু'জন খৃষ্টান সৈনিক আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওরা আমার সম্ভ্রম লুট করতে চেয়েছিল। আমার চীৎকার শুনে আম্মাদ ঘুম থেকে জেগে উঠে। আমাকে রক্ষা করার জন্য সে এগিয়ে আসে। বর্শার আঘাতে হত্যা করে ফেলে একজনকে। তখন পর্যন্ত আমি নিজেকে খৃষ্টান-ই মনে করতাম। ক্রুশের নিবেদিতপ্রাণ এক কর্মী ছিলাম আমি। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার ভাবান্তর ঘটে যায়। যে জাতির সৈনিকেরা স্বজাতির এক অসহায় নারীর ইজ্জতে আঘাত হানতে পারে, তারা অমানুষ, মানুষ নামের কলংক। আমার হৃদয়ে প্রচন্ড ঘৃণা জন্মে যায় খৃষ্টানদের প্রতি।

হাতে ছিল আমার খঞ্জর। এক আঘাতে মাটিতে ফেলে দিলাম অপরজনকে। আম্মাদ আমার ইজ্জত রক্ষা করেছে, তাতে আমার যা আনন্দ, তারচে' বেশী প্রীত আমি আমার খঞ্জরাঘাত থেকে আম্মাদ রক্ষা পাওয়ায়। আহ! কি যে হত যদি আম্মাদকে আমি খুন করেই ফেলতাম!'

আইওনা আরো বলে–

'চলার পথে আম্মাদের মুখনিসৃত আবেগময় কিছু কথা শুনে আমি আরো আপ্লুত হয়ে পড়ি। আমার চেতনার দুয়ারে আঘাত করে তার কথাগুলো। সমস্ত পথে আমি তার মুখপানেই তাকিয়ে থাকি। আমার মনে পড়ে যে, শৈশবে আমাকে অপহরণ করা হয়েছিল। কিন্তু এই স্মৃতি আরো অস্থির করে তুলে আমাকে।

আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আমার মত মেয়েদেরকে কিভাবে প্রস্তুত করা হয়। প্রশিক্ষণের পর শৈশবের স্মৃতি আর নিজের মৌলিক পরিচয় মুছে যায় মন

থেকে। আমারো হয়েছে একই হাল। কিন্তু আমার সংশয় ক্রমেই দূর হয়ে যায়। নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হল যে, আম্মাদকে আমি জানি। এ ছিল রক্তের টান। আমার চোখ চিনে নিয়ে নিয়েছে আম্মাদের চোখকে আর হৃদয় চিনেছে হৃদয়কে।

বোধ হয় আম্মাদের হৃদয়েও এমনি এক অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। হয়ত সে কারণেই সে আমার ন্যায় হৃদয়কাড়া এক যুবতীকে হাতের কাছে পেয়েও বিন্দুবিসর্গ ভ্রুক্ষেপ করেনি, যেন আমি তার সঙ্গে-ই নেই। বহুবার গভীর দৃষ্টিতে সে আমার প্রতি তাকিয়েছিল বটে, তবে সে দৃষ্টি ছিল পবিত্র, তাতে লালসার লেশমাত্র ছিল না।'

বলেই চলেছে আইওনা।

'শোবকে প্রবেশ করে খানিকটা অগ্রসর হয়ে একটি বাড়ির সামনে এসে থেমে যায় আম্মাদ। দু'জনে ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাড়িটি ভিতর থেকে দেখামাত্র ধীরে ধীরে আমার মনের পর্দা অপসারিত হতে শুরু করে। কেমন যেন মনে হল, এ বাড়িটি আমি চিনি। আস্তে আস্তে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল শৈশবের হারানো স্মৃতি।

বাড়িটি ঘুরে-ফিরে দেখলাম। মনে আমার প্রচন্ড কৌতূহল। হঠাৎ কে যেন চোখের সামনে মেলে ধরে শৈশব-স্মৃতির আরেকটি পাতা। দৌড়ে গেলাম একটি কক্ষের দরজার কাছে। দরজার একটি পাল্লার উল্টো পিঠ নিরীক্ষা করে দেখলাম। কতগুলো রেখা চোখে পড়ল। মনে পড়ল, বড় ভাইয়ার খঞ্জর দ্বারা ছোটকালে আমি-ই এগুলো এঁকেছিলাম। ছুটে গেলাম আরেকটি দরজার পিছনে। সেখানেও একই রকম আঁকিবুকি খুঁজে পেলাম। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম আম্মাদের প্রতি। মুখজোড়া একরাশ ঘন দাঁড়ি থাকা সত্ত্বেও তার ষোল-সতের বছর আগের আকৃতি মনে পড়ে যায় আমার। বুক ফেটে কান্না আসে। উচ্ছ্বসিত আবেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। বহু কষ্টে ধরে রাখলাম নিজেকে। আম্মাদকে বলিনি, আমি যে তার বোন। সাহস পাইনি। কত পূত-পবিত্র চরিত্রবান পুরুষ সে, আর আমি আপাদমস্তক একটি নাপাক মেয়ে! ও কত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ আর আমার মর্যাদাবোধ বলতে কিছু নেই! বললে জানি না ওর প্রতিক্রিয়া কি হত।'

থামল আইওনা।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ান তন্ময় হয়ে শুনছিলেন আইওনার আবেগঝরা কথাগুলো। এ সময়ে আলী বিন সুফিয়ান বেশ ক'বার চোখ তুলে তাকান আইউবীর প্রতি। আইওনার প্রতি সন্দেহ তার দূর হয়নি এখনো। কিন্তু মেয়েটির আবেগময় কণ্ঠ, উদগত অশ্রুধারা ও অপ্রতিরোধ্য দীর্ঘশ্বাস দু'জনকে প্রভাবিত করে ফেলে, তার প্রতিটি কথা-ই সত্য।

আইওনা বলে, 'এত কিছুর পরও যদি আমাকে বিশ্বাস করতে আপনাদের কষ্ট হয়,

তাহলে বিষয়টি আপনারা তদন্ত করে দেখুন। তাতে যদি আমি মিথ্যুক প্রমাণিত হই, তবে আমার সঙ্গে আপনারা যেমন ইচ্ছা আচরণ করুন। দুনিয়ার প্রতি আমার আর কোন আকর্ষণ নেই; আমি আর একদন্ডও বেঁচে থাকতে চাইনা। তবে আপনাদের অনুমতি পেলে আমি একটা কাজ করে পাপের বোঝা হালকা করে মরতে চাই।'

'কি করতে চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন সুলতান আইউবী।

'আপনি যদি নিরাপদে আমাকে কার্ক পৌছিয়ে দেন, তা হলে খৃষ্টানদের তিন-চারজন সম্রাট এবং গোয়েন্দা প্রধান হরমুনকে হত্যা করতে পারি।' বলল আইওনা।

'আমরা তোমাকে কার্ক পর্যন্ত পৌছিয়ে দিতে পারি বটে, কিন্তু কাউকে খুন করার জন্য নয়। ইতিহাসের পাতায় আমি এ অপবাদ লিখিয়ে মরতে চাই না যে, সালাহুদ্দীন আইউবী নিজে শোবকে বসে থেকে একজন নারীকে দিয়ে শত্রু নিধন করেছিল। আমি তো বরং যদি জানতে পাই যে, একজন খৃষ্টান সম্রাট দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তাহলে তার চিকিৎসার জন্য আমি ডাক্তার পাঠিয়ে দেব। তা ছাড়া তোমার উপর ভরসাও করতে পারি না। তবে তুমি চাইলে ক্ষমা করে তোমাকে নিরাপদে কার্ক পৌছিয়ে দেয়া যায় কিনা, ভেবে দেখতে পারি।' বললেন সুলতান আইউবী।

'না। অন্তরে সেই সুখ আমার নেই। কার্ক আর আমার যেতে হবে না। যেখানে জন্মেছি, সেখানে-ই আমার মৃত্যু হোক, এই আমার কামনা। আমি যে আম্মাদের হারিয়ে যাওয়া বোন, তা ওকে বলবেন না যেন। ক্যাম্পে বাবার সঙ্গে আমি সাক্ষাত করব, তবে তাকেও জানাব না, আমি তার অপহৃতা কন্যা।' এই বলে ফুঁফিয়ে কাঁদতে শুরু করে আইওনা। অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে আসে তার দু'চোখ। বড় বড় অশ্রুফোঁটা টপ্‌টপ্ করে ঝরে পড়তে লাগল তার দু'গন্ড বেয়ে।

আলী বিন সুফিয়ান প্রয়োজনীয় অনেকগুলো কথা জিজ্ঞেস করেন আইওনাকে। তারপর আইউবীর প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলেন, একে কোথায় পাঠাব? কিছুক্ষণ চিন্তা করে সুলতান বললেন, একে সসম্মানে আরামে রাখতে হবে। ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও।

আইওনাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যান আলী। আইউবীর শোবক দখলের আগে খৃষ্টানদের গোয়েন্দা মেয়েরা যে কক্ষে থাকত, তার একটি কক্ষে থাকতে দেন তাকে। কিন্তু এখানে থাকতে অস্বীকৃতি জানায় আইওনা। বলে, 'এই কক্ষগুলোকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। আমি যে বাড়িটি থেকে অপহৃত হয়েছিলাম, আমাকে কি সেখানে থাকতে দেয়া যায় না?

'না, আবেগের বশবর্তী হয়ে আমি নিয়ম লংঘন করতে পারি না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

প্রহরী ও চাকর-বাকরদের জরুরী উপদেশ দিয়ে আইওনাকে ওখানেই রেখে আসেন আলী।

সেনা বিশ্রামাগারে গিয়ে গা-গোসল সেরে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে আম্মাদ। কিন্তু এত ক্লান্তি সত্ত্বেও কিছুক্ষণ পর হঠাৎ চোখ খুলে যায় তার। শত চেষ্টা করেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না আর সে। পিতার সঙ্গে সাক্ষাত করবে কি করবে না- এই একটি প্রশ্ন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে তার মাথায়।

ক্লান্তি ঝেড়ে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আম্মাদ। হাঁটা দেয় ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্পে পৌঁছে পিতার নাম উল্লেখ করে লোকটি কোথায় আছে জিজ্ঞেস করে সে। খুঁজে বের করে পিতাকে।

আম্মাদের সামনে শুয়ে আছেন এক বৃদ্ধ। সালাম করে মাথা নুইয়ে তার সঙ্গে হাত মিলায় আম্মাদ।

ষোলটি বছর পর পিতাকে দেখল আম্মাদ। বৃদ্ধের গায়ে গোশ্‌ত নেই। আছে শুধু হাড্ডি আর চামড়া- যেন পূর্ণাঙ্গ একটি মানব-কংকাল পড়ে আছে তার সামনে। এখন পুষ্টিকর খাদ্য ও ঔষধপত্র চলছে।

নিজের পরিচয় না দিয়ে পিতা কেমন আছেন জানতে চায় আম্মাদ। জবাবে বৃদ্ধ বললেন, কেমন আর থাকব? ষোলটি বছরের নির্মম নির্যাতন, এতদিনের দীর্ঘ বন্দী জীবন আর পুত্র-কন্যার শোক আমাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এই ধকল বোধ হয় কেটে উঠা আমার সম্ভব হবে না। এত উন্নত খাবার আর উন্নত চিকিৎসা এতটুকু ক্রিয়াও করছে না। আমি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছি।

ক্ষীণ কণ্ঠে নিজের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয় আম্মাদের পিতা। কিন্তু আম্মাদ চলে যায় ষোল বছর পিছনে। চোখের সামনে ধরে আনে সে সময়কার পিতার চেহারা। সেকি নাদুস-নুদুস স্বাস্থ্যবান এক বলিষ্ঠ পুরুষ। আর এখন? তবু এই হাড্ডিসার কংকাল চেহারাও পিতাকে চিনতে পারে আম্মাদ।

আম্মাদ একবার ভাবে, নিজের পরিচয় দিয়ে বলি, আমি আপনার পালিয়ে যাওয়া সেই পুত্র আম্মাদ। আবার ভাবে- না এত বড় শুভ সংবাদের ধাক্কা তিনি হয়ত সামলাতে পারবেন না। পারলেও তিনি আমার কর্তব্যের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন। বড় কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে পিতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফিরে আসে সে।

বিশ্রামাগারে শুয়ে আছে আম্মাদ। আগামী দিন ভোর পর্যন্ত ছুটি আছে তার। তারপর চলে যেতে হবে ময়দানে। কিন্তু হঠাৎ কেন্দ্র থেকে নির্দেশ আসে, পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই থাকতে হবে। সর্বদা বিশ্রামাগারে উপস্থিত থাকতে হবে। বিস্মিত হয় আম্মাদ। ঘটনা কি? তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমান্ডের এমন কি কাজ থাকতে পারে, বুঝতে পারছে না সে। আইওনার ব্যাপারে তদন্ত নেয়ার জন্য আলী বিন সুফিয়ান এ নির্দেশ পাঠিয়েছেন। মেয়েটির কাহিনী কতটুকু সত্য, তা যাচাই করে দেখতে চান আলী।

ক্যাম্পে যান আলী। আইওনার বলা নামের লোকটিকে খুঁজে বের করেন। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর ছেলে-মেয়ে আছে কিনা বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করেন তিনি। জবাবে বৃদ্ধ জানান–

দু'টি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল। ষোল বছর আগে আমার এই ক্যাম্পে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে খৃষ্টান দস্যুদের হাতে নিজ ঘরে মায়ের সঙ্গে খুন হয় বড় ছেলে। ছোট ছেলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় পাশের এক বাড়িতে। এই ক্যাম্পে বসে শুনেছিলাম, ওকে নাকি পরে সিরিয়া পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখন বেঁচে আছে কিনা জানিনা। আর– আর মেয়েটিকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে বদমাশরা। মেয়ের কথা বলতে গিয়ে সংযম হারিয়ে ফেলেন বৃদ্ধ। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে করুণ কণ্ঠে ভাঙ্গা গলায় বৃদ্ধ আবার বলেন, হায়! আমার সাত বছরের ফুটফুটে দুরন্ত মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গেল ওরা! আহ্! জানি না মেয়েটির আমার পরিণতি কি হয়েছে! অশ্রুতে ভিজে গেছে বৃদ্ধের দু'চোখের পাতা। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তার কপোল বেয়ে।

মধ্যরাত। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায় আইওনা। ঘুম আসছে না তার। এ পর্যন্ত কেবল এপাশ-ওপাশ করে ছট্‌ফট্ করে কাটিয়েছে সে। আলী বিন সুফিয়ানের আচরণে আইওনা আন্দাজ করেছে যে, তাকে তারা এখনো বিশ্বাস করতে পারেনি। না জানি এখন পরিণতি কি ঘটে! আলীর মনে কিভাবে বিশ্বাস জন্মানো যায়, তা ভাবছে আইওনা।

পাশাপাশি প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে তার মনে। আম্মাদের সঙ্গে নিজ বাড়িতে ঢুকে শৈশবের অনেক স্মৃতি-ই খুঁজে পেয়েছে সে। অপহরণের পর সীমাহীন আদর-যত্ন, আমোদ-আহলাদ আর উন্নত খাবার দিয়ে দেহে তার রূপের এই যে জোয়ার সৃষ্টি করা হয়েছিল, তারপর সেই জোয়ারে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল তার অতীত, তার পরিচয়, তার সতীত্ব-সম্ভ্রম। তাকে পরিণত করা হয়েছে পাপের এক কালিমূর্তিতে, স্মৃতিপটে সব ভেসে উঠে আইওনার। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উথাল-পাথাল করছে তার মন। ত্বরা সইছে না এক মুহূর্তও। আবার পিতার সঙ্গে সাক্ষাত করার ইচ্ছাও তার প্রবলতর হচ্ছে ধীরে ধীরে।

কিন্তু কক্ষ থেকে বের হওয়ার পথ কি? বাইরে দু'জন প্রহরী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিছুই ভেবে পায়না আইওনা। কোন বুদ্ধি আসল না তার মাথায়।

গাত্রোত্থান করে উঠে দাঁড়ায় আইওনা। কক্ষের দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে উঁকি দেয় বাইরে। কারো কথা বলার শব্দ কানে আসে তার। ডান দিকে গজ বিশেক দূরে সান্ত্রী দু'জনকে ছায়ার মত চোখে পড়ে। ওরাই ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। দরজার

দুই কপাটের ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে ওদের প্রতি তাকিয়ে থাকে আইওনা। কেন যেন আরো খানিকটা দূরে অন্ধকারে সরে যায় সান্ত্রীদ্বয়।

বেরিয়ে পড়ে আইওনা। পা টিপে টিপে অতি সাবধানে-সন্তর্পণে ভবনের আড়ালে প্রহরীদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায় সে।

বেগার ক্যাম্পের অবস্থা আইওনার পূর্ব থেকে-ই জানা। এই ক্যাম্প যে এখন কারাগার নয়– অতিথিশালা, তাও তার অবিদিত নয়। কাজেই ক্যাম্পে গিয়ে সান্ত্রীর হাতে ধরা পড়ার আশংকা তার নেই।

দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে আইওনা। হঠাৎ পিছনে কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় সে। পিছনে ফিরে তাকায় মেয়েটি। কিন্তু দেখতে পায় না কিছু-ই। ভ্রম মনে করে আবার হাঁটা শুরু করে। পিছনে আবারো সেই পদশব্দ। কে যেন লম্বা পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

কেউ আসছে কিনা পিছনে ফিরে তাকায় আইওনা। চলার গতি থামিয়ে এই পিছন পানে দৃষ্টি দিবে বলে, হঠাৎ তার মাথা ও মুখমন্ডলে এসে পড়ে একটি মোটা বস্ত্র। চোখের পলকে বস্ত্রটি জড়িয়ে ধরে আইওনাকে। দু'টি শক্ত বাহু ঝাঁপটে ধরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

কেঁপে উঠে আইওনা। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠে তার। ঝাপটা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় সে।

অন্ধকার রাত। জনমানবহীন অনাবাদী এলাকা। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একটি কম্বলে পেঁচিয়ে গাঠুরীর মত করে কাঁধে তুলে নেয়া হয় মেয়েটিকে। তারা ছিল দু'জন।

আঁধা ঘন্টা পর কাঁধ থেকে নামিয়ে পুটুলি থেকে বের করা হয় আইওনাকে। আইওনা নিজেকে একটি কক্ষে আবিষ্কার করে। টিম্ টিম্ করে দু'টি প্রদীপ জ্বলছে কক্ষে।

চারজন লোক তাকিয়ে আছে তার প্রতি। বিস্ময়াভিভূ নেত্রে এক এক করে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আইওনা। বলে, 'তোমরা এখনো এখানে? একি, মিঃ জেরাল্ড আপনি? আপনিও এখানে?'

'আমরা গিয়ে আবার এসেছি– তোমাকে বের করে নেয়ার জন্য। ভালো-ই হল যে, তোমাকে পেয়ে গেছি!'

দুর্গ দখলের পর যেসব খৃষ্টান গোয়েন্দা মেয়ে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েছে, তাদেরকে বের করে নেয়ার জন্য এবং যারা শোবকে আত্মগোপন করে আছে, তাদের সংগঠিত করে সম্ভব হলে তাদের দ্বারা নাশকতামূলক কাজ করানোর উদ্দেশ্যে কার্ক থেকে চল্লিশ সদস্যের একটি কমান্ডো বাহিনীকে শোবকে প্রেরণ করা হয়েছিল। এ চারজন সে বাহিনীর সদস্য।

আস্তাবলে ঢুকে ঘোড়ার খাদ্যে ও লঙ্গরখানায় মানুষের খাবারে বিষ মেশানো আর আগুন লাগানো এদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রধান অংশ। গ্রুপ কমান্ডার জেরাল্ড এ কাজে বেশ পারদর্শী। আইওনা তার শিষ্য। গলায় গলায় ভাব ছিল দু'জনের।

কিন্তু এখন? লোকটিকে দেখামাত্র প্রবল ঘৃণা ও প্রতিশোধ-স্পৃহায় মাথায় খুন চড়ে যায় আইওনার। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নেয় সে নিজেকে। এটা ঘৃণার বহিঃপ্রকাশের জায়গা নয়। এখানে বসে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। কিন্তু আইওনা যে সম্পূর্ণ বদলে গেছে, জেরাল্ড তা জানবে কি করে?

'কোথায় যাচ্ছিলে তুমি?' আইওনাকে জিজ্ঞেস করে জেরাল্ড।

'সুযোগ পেয়ে পালাতে চেয়েছিলাম।' জবাব দেয় আইওনা।

মিঃ জেরাল্ড আইওনাকে জানায়, নির্যাতিত মুসলমানের ছদ্মবেশে চল্লিশজনের কমান্ডো গুপ্তচর নিয়ে আমি এখানে এসেছি। সেদিন শোবকের প্রধান ফটকে তেমন কোন কড়াকড়ি ছিল না। যুদ্ধের কারণে মুসলিম সৈনিকরা হরদম যাওয়া-আসা করছিল। আশপাশের পল্লী অঞ্চলের মুসলমানরাও দলে দলে শহরে প্রবেশ করছিল। এ সুযোগে আমরাও বিনা বাধায় ভিতরে ঢুকে পড়ি।

জেরাল্ড আইওনাকে আরও জানায়, যে বাড়িটিতে আমাদের গোয়েন্দা মেয়েরা বন্দী হয়ে আছে, দু'দিন ধরে তার উপর আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। প্রহরীদের গতিবিধির প্রতিও আমাদের বেশ কড়া নজর। সৌভাগ্যবশত আমরা তোমাকে পেয়ে গেলাম। অন্যদেরও বের করে আনা যায় কি করে বল। আইওনা বলে, ওদেরকে বের করে আনা দুরুহ হলেও অসম্ভব নয়। কৌশলে চেষ্টা করলে সফলতা আশা করা যায়।

রাতে-ই পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে যায়। আইওনা জেরাল্ডকে জানায়, মেয়েরা যেখানে থাকে, সেটি জেলখানা নয়– উন্মুক্ত ক'টি কক্ষ মাত্র। প্রহরী মাত্র দু'জন। এ জাতীয় আরো অনেক তথ্য দেয় আইওনা।

মেয়েদের বের করে আনার জন্য কয়েকজন লোক সেখানে যাবে বলে সিদ্ধান্ত হল। অন্যরা থাকবে অমুক বাড়িতে।

সিদ্ধান্তের পর আইওনা বলে, আমার ফিরে যাওয়া দরকার। কারণ, আমার পলায়নের সংবাদ জানাজানি হয়ে গেলে মেয়েদের প্রহরা কঠোর হয়ে যাবে। ফলে আমাদের এ অভিযান ব্যর্থ হবে।

আইওনার প্রস্তাবটি জেরাল্ডের মনঃপূত হল। সঙ্গে করে রাতারাতি আইওনাকে তার কক্ষের নিকটে পৌঁছে দিয়ে যায় সে। আইওনাকে বাইরে থেকে আসতে দেখে প্রহরীরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে, সে কোথায় গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল, কি আশয়-বিষয় ইত্যাদি। আইওনা শান্ত কণ্ঠে বলে, বেশী দূরে নয়– ঐ তো ওখানে একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম। মনটা ভাল লাগছিল না কিনা তাই।

কক্ষে প্রবেশ করে আইওনা। প্রহরীরাও নিজেদের কর্তব্যে অবহেলার কথা স্মরণ করে চুপসে যায়।

পরদিন।

আইওনা প্রহরীদের বলে, আমাকে তোমরা একটু আলী বিন সুফিয়ানের নিকট নিয়ে চল; তাঁর সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। প্রহরীরা অসম্মতি জানিয়ে বলে, প্রয়োজন হলে তিনি-ই তোমাকে ডেকে পাঠাবেন, তোমাকে নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আইওনা প্রহরীদের প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝাবার চেষ্টা করে। বলে, দেখ, তার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী কথা আছে, দয়া করে আমাকে দিয়ে আস। অন্যথায় কারো মাধ্যমে শুধু এ সংবাদটা পৌঁছিয়ে দাও যে, আমার তাকে বড্ড প্রয়োজন। আইওনা একথাও বলে, তোমাদের অবহেলায় যদি সংবাদটা না পৌঁছে, তবে এর জন্য যে ক্ষতি হবে, তার মাশুল তোমাদেরও ভোগ করতে হবে বলে দিচ্ছি।

আলী বিন সুফিয়ান তার কক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক কাজে ব্যস্ত। ইত্যবসরে সালাম দিয়ে এক ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করে। মাথা তুলে তাকান আলী। আগন্তুকের সালামের জবাব দেন। আগন্তুক নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, গতকাল আইওনা নামের যে গোয়েন্দা মেয়েটিকে রেখে এসেছিলেন, সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চায়। আপনার সঙ্গে নাকি তার জরুরী কথা আছে। সংবাদটা আপনাকে না জানালে যে ক্ষতি হবে, তার জন্য প্রহরীদের শাস্তি ভোগ করতে হবে বলেও সে শাসিয়ে দিয়েছে।

সংবাদ পাওয়া মাত্র আলী বিন সুফিয়ান আইওনাকে ডেকে পাঠান। কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে আইওনা। সেই কক্ষে আর ফিরে যায়নি সে।

❁ ❁ ❁

নীরব-নিস্তব্ধ গভীর রজনী। শোবকের কোথাও কেউ জেগে নেই। গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন সমগ্র নগরী। গোয়েন্দা মেয়েদের বন্দী করে রাখা ভবনটির চারদিকে নড়াচড়া করছে আট-দশটি ছায়ামূর্তি। কোন প্রহরী নেই। অবাক্ হল ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে কাছে এগিয়ে যায় লোকগুলো। বন্দী মেয়েরা কোথায় কিভাবে থাকে, সব বলে এসেছিল আইওনা। দু'জন ঢুকে পড়ে এক কক্ষে। বাকীরা ঢুকে পড়ে অন্য কক্ষগুলোতে। কোন প্রহরী আছে কি-না, নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি তারা। আইওনা বলেছিল, প্রহরী থাকে মাত্র দু'জন। এখন থাকলেও দু'জনকে ঘায়েল করা আট-দশজনের পক্ষে কঠিন হবে না। অবলীলায় সব ক'জন ঢুকে পড়ে মেয়েদের কক্ষগুলোতে। কিন্তু তারপর আর বের হল না একজনও।

গত রাতে আইওনাকে যে ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, গেরাল্ড সে ভবনের একটি কক্ষে বসা। পরিকল্পনা মোতাবেক এ বাড়িতে বিশজন লোক অবস্থান করছে। অন্যরা লুকিয়ে আছে এক খৃষ্টানের বাড়িতে। গেরাল্ড অপেক্ষা করছে অধীর চিত্তে। এতক্ষণে অভিযান সফল করে মেয়েদের নিয়ে ওদের ফিরে আসার কথা! কিন্তু আসছে না

এখনো! অস্থির হয়ে উঠে গেরাল্ডে মন। এ অভিযান তো ব্যর্থ হবার কথা নয়!

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনতে পায় গেরাল্ড। তারই নির্ধারিত সাংকেতিক শব্দ। অতএব সন্দেহের কোন কারণ নেই। দ্রুত উঠে গিয়ে গেরাল্ড নিজে দরজার অর্গল খুলে দেয়। অমনি কে একজন ঝাপ্‌টে ধরে টেনে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায় গেরাল্ডকে। দেখতে না দেখতে ছুটে আসে একদল সৈনিক। দ্রুতপদে ঢুকে পড়ে তারা ভিতরে।

প্রশস্ত একটি কক্ষে বসে আছে বিশজন সন্ত্রাসী গোয়েন্দা। আত্মসংবরণ করার সুযোগ পেল না তারা। একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে সৈন্যরা কেড়ে নেয় তাদের অস্ত্র। তীর-তরবারী-খঞ্জর, যা ছিল সব।

ভবনটির মালিক একজন ধনাঢ্য খৃষ্টান। এখানেই স্বপরিবারে বাস করছে সে। পরিবার-পরিজনসহ তাকে এবং গ্রেফতারকৃত বিশ সন্ত্রাসী খৃষ্টানকে হাতকড়া পরিয়ে বের করে নিয়ে যায় সৈনিকরা।

বাদ বাকী খৃষ্টান সন্ত্রাসী অপর যে বাড়িটিতে প্রস্তুতি নিয়ে বসে ছিল, একই সময়ে হানা হয় সেখানেও। এ রাতে এভাবে আকস্মিক হানা হয় দশ–এগারটি বাড়িতে। রাতভর চলে মুসলিম বাহিনীর এ বিস্ময়কর অভিযান।

এ অভিযানে গ্রেফতারকৃত সন্ত্রাসী গুপ্তচরদের পরদিন সকালে সুলতান আইউবীর সামনে হাজির করা হয়। তন্মধ্যে খৃষ্টানদের প্রেরিত কমান্ডো বাহিনীর চল্লিশজন সদস্য, বাহিনী প্রধান গেরাল্ড ছাড়াও ছিল বিভিন্ন বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ধৃত আরো চল্লিশজন গুপ্তচর। এসব বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গিয়েছিল বিপুলসংখ্যক অস্ত্র, প্রচুর পরিমাণ বিষ, অসংখ্য তীর, বিস্ফোরক ও মোটা অংকের নগদ অর্থ।

এ অভিযানের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ আইওনার। গেরাল্ডের সঙ্গে পরিকল্পনা তৈরি করে সহকর্মীদের কে কোথায় লুকিয়ে আছে জেনে নিয়ে ফিরে এসেছিল সে। আইওনার প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিল গেরাল্ডের। পরদিন সকালে আইওনা সব পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয় আলী বিন সুফিয়ানের নিকট। আলী বিন সুফিয়ানের গুপ্তচররা দিনাদিন সবগুলো বাড়ির অবস্থান জেনে নেয়।

এসব ঠিকানায় অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার পর সুলতান আইউবীর বিশেষ কমান্ডো বাহিনীকে তলব করা হয়। বন্দী মেয়েদেরকে সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখা হয় অন্যত্র। তাদের পরিবর্তে প্রতিটি কক্ষে বসিয়ে রাখা হয় তিনজন করে কমান্ডো সদস্য। তুলে নেয়া হয় প্রহরীদের। রাতের বেলা খৃষ্টান কমান্ডো সদস্যরা যেই মাত্র কক্ষগুলোতে হানা দেয়, অম্‌নি ওঁৎ পেতে থাকা মুসলিম কমান্ডোরা ধরে ফেলে তাদের।

এভাবে শোবকে লুকিয়ে থাকা প্রায় সব খৃষ্টান গুপ্তচর-সন্ত্রাসী ধরা পড়ে যায়। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা দামী হল গেরান্ড। সুলতান আইউবী তাদের সকলকে পাঠিয়ে দেন জেলে।

যেসব বিশ্বাসঘাতক মুসলমান কায়রোতে সুলতান আইউবী বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত, আইওনা তাদের কথাও ফাঁস করে দেয়। হাশীশীদের হাতে সুলতান আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল, আইওনা তা-ও জানিয়ে দেয়। সবশেষে সে সুলতান আইউবীর মুখপানে তাকিয়ে সহাস্যে বলে, 'এবার বোধ হয় আমাকে আপনার বিশ্বাস করা উচিত!'

আইওনাসহ সুলতান আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ান কক্ষে বসে আছেন। ইতিমধ্যে সুলতান ডেকে পাঠান আম্মাদকে। সংবাদ পেয়ে চলে আসে আম্মাদ। সালাম দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে সে। অপূর্ব এক গাম্ভীর্য বিরাজ করছে কক্ষ জুড়ে। তিনজন-ই নীরব। বসে আছেন চুপচাপ। সালামের জবাব দিয়ে সুলতান ইঙ্গিতে আইওনার সম্মুখের চেয়ারটায় বসতে বলেন আম্মাদকে। গম্ভীর মুখে সুলতান তাকান আম্মাদের প্রতি। বলেন–

'আম্মাদ! আইওনা তোমার হারিয়ে যাওয়া বোন আর তুমি ওর পালিয়ে যাওয়া ভাই!'

ছল্ছল্ করে উঠে দু'জনের চোখ। অশ্রুভেজা চোখে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে একজন অপরজনের প্রতি।

ভাই-বোনকে নিয়ে যাওয়া হল পিতার সামনে। পরিচয় করিয়ে দেন সুলতান নিজে। আবেগের আতিশয্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন বৃদ্ধ। চৈতন্য ফিরে আসলে বুকে টেনে নেন পুত্র-কন্যাকে। বললেন, ওর নাম আইওনা নয়– আয়েশা।

সুলতান আইউবী এ বৃদ্ধের পরিবারের জন্য ভাতা চালু করে দেন। এরূপ সব মেয়ের ব্যাপারে অনুসন্ধান নেয়ার নির্দেশ দেন গোয়েন্দা বিভাগকে। না জানি এমন কত মুসলিম ঘরানার মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে এই কুকর্মে লিপ্ত করেছে খৃষ্টানরা। সুলতান ফরমান জারি করেন যে, এমন কোন মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেলে যেন তার বাড়ি-ঘর খুঁজে বের করে, তাকে পিতা-মাতার হাতে তুলে দেয়া হয়।

ভয়ানক এক বিপদ থেকে বেঁচে গেলেন সুলতান আইউবী। শোবকের বাইরে– দূরের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোর সংবাদ সন্তোষজনক। কিন্তু এক্ষুণি যে কাজটি একান্ত প্রয়োজন, তা হল মরুভূমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাহিনীগুলোকে একস্থানে সমবেত করা। এ লক্ষ্যে সুলতান আইউবী শোবকের সেনানিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সহকারীদের হাতে ন্যস্ত করে নিজে চলে যান ময়দানে। নিজের হেডকোয়ার্টার স্থানান্তর করেন সুদূর মরু অঞ্চলে। সঙ্গে রাখেন বিদ্যুদ্গতিসম্পন্ন একদল দূত।

তাদের মাধ্যমে এক মাসের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের একত্রিত করেন তিনি।

সুলতান আইউবী কায়রোর ন্যায় শোবকের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যও তাঁর সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করে নেন। এক ভাগ নিয়োজিত করেন সীমান্ত অঞ্চলে। এক ভাগ তাঁবু ফেলে সীমান্তে– বাহিনীর পাঁচ-ছয় মাইল পিছনে। তৃতীয় ভাগকে রাখা হয় পেট্রোল ডিউটির জন্য।

যেসব খৃষ্টান সৈন্য জীবনে রক্ষা পেয়ে কার্কে এসে পৌঁছেছে, এক্ষুণি আবার অভিযান পরিচালনা করবে, এমন শক্তি তাদের নেই। যুদ্ধ করার শক্তি-সাহস সব হারিয়ে ফেলেছে তারা।

এদিকে সুলতান আইউবী সেনাভর্তির গতি আরো জোরদার করে দেন। মরুভূমির খোলা ময়দানে নয়া ভর্তি হওয়া সেনাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন চলছে। কার্কে গুপ্তচর প্রেরণের জন্য তিনি আলীকে নির্দেশ দেন, যেন তারা খৃষ্টানদের তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি সেখানকার মুসলিম যুবকদেরকে কার্ক থেকে বেরিয়ে ময়দানে এসে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

বিদ্রোহ

খৃস্টানদের পায়ের তলায় কাতরাচ্ছে ফিলিস্তীন। ক্রুশের মাথায় ঝুলছে জেরুজালেম। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরছে এই নগরীর পবিত্র দেহ থেকে। খৃস্টান হায়েনাদের লোমশ থাবায় পিষ্ট হচ্ছে এখানকার মুসলমানরা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অপেক্ষায় দিন গুণছে তারা। জেরুজালেমের নির্যাতিত মুসলমানরা সংবাদ পেয়ে গেছে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ফিলিস্তীনের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছেন এবং শোবক দুর্গ এখন মুসলমানদের দখলে।

জেরুজালেমের মুসলমানদের জন্য এটি এক সুসংবাদ। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এই সুসংবাদ পরিণত হয়ে যায় মৃত্যুর পরোয়ানায়। জেরুজালেম ও অন্যান্য নগর-পল্লীর মুসলমানদের থেকে শোবকের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে শুরু করে খৃস্টানরা। বেশী অত্যাচার চলছে কার্কের মুসলমানদের উপর।

শোবকের পর কার্ক বিশাল এক দুর্গ। খৃস্টানদের অতি গর্বের ধন। শোবক নিয়েও ছিল তাদের এমনি গৌরব। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সূক্ষ্ম কৌশল ও তাঁর মুজাহিদদের বীরত্ব ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে তাদের সেই অহংকার।

কার্ককে আরো দুর্ভেদ্য– শক্ত করে তুলছে খৃস্টানরা। নির্যাতন চালিয়ে অথর্ব করে তুলছে মুসলমানদের। তাদের ধারণা, জেরুজালেমের মুসলমানরা গুপ্তচরবৃত্তি করছে। খৃস্টানদের গোপন তথ্য পৌঁছিয়ে দিচ্ছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে। তাই শোবকের ন্যায় এখানেও তারা 'সন্দেহভাজন' মুসলমানদের ধরে ধরে নিক্ষেপ করছে বেগার ক্যাম্পে।

'ফিলিস্তীন জয় করা আমাদের এক মহান লক্ষ্য। কিন্তু কার্ক থেকে মুসলমানদের বের করে আনা তদপেক্ষা মহত্তর লক্ষ্য হওয়া উচিত।' গোয়েন্দা বিভাগের এক তুর্কী কর্মকর্তা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলল একথা। নাম তার তলআত চেঙ্গীস। চেঙ্গীস ছয়জন গুপ্তচর নিয়ে শোবকের নির্যাতিত খৃস্টানের বেশে কার্কে প্রবেশ করেছিল। তিন মাস পর ফিরে এসে এখন আলী বিন সুফিয়ানের উপস্থিতিতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট রিপোর্ট পেশ করছে।

যেসব খৃস্টান সৈন্য পালিয়ে কার্ক পৌঁছে গিয়েছিল, চেঙ্গীস জানায়, তাদের অবস্থা বড় শোচনীয়। সহসা যুদ্ধ করার শক্তি-সাহস তাদের নেই। এই পরাজিত খৃস্টান

সৈন্যরা কার্ক পৌঁছামাত্র অত্যাচারের ঝড় নেমে আসে সেখানকার মুসলমানদের উপর। মুসলিম মহিলাদের ঘরের বাইরে বের হওয়ার সাধ্য নেই। সামান্যতম সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ামাত্র তারা একজন মুসলমানকে অমনি নিক্ষেপ করছে বেগার ক্যাম্পে, যেখানে তাদের পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীবনযাপন করতে হয়। কাকডাকা ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তাদের খাটতে হয় গাধার মত।

'আমরা সেখানে গোপন তৎপরতা শুরু করেছি। সেখানকার যুবক মুসলমানদের বের করে আনার চেষ্টা করছি, যাতে শোবক এসে তারা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে পারে। কারো সাহায্যের অপেক্ষা না করেই যাতে আমরা কার্ক আক্রমণ করতে পারি, আমি সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সেখানে থাকা অবস্থাতেই বেশকিছু যুবক সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু কাজটি বড় দুরূহ। কারণ, খৃস্টান সৈন্যরা চারদিকে গিজ গিজ করছে। তাছাড়া আত্মীয়-স্বজন, বিশেষত মহিলাদেরকে খৃস্টানদের দয়ার উপর ফেলে আসতে পারে না। তাই কালক্ষেপণ না করে কার্ক আক্রমণ করে সেখান থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করা প্রয়োজন।' বলল চেঙ্গীস তুর্কী।

এর আগে অপর এক গুপ্তচর তথ্য দিয়েছিল যে, খৃস্টানদের বর্তমান পরিকল্পনা হল, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কার্ক অবরোধ করলে তাদের একটি বাহিনী পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালাবে। তবে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আগেই তাঁর সেনা কর্মকর্তাদের এরূপ একটি ধারণা দিয়ে রেখেছেন। এ পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য তাঁর অতিরিক্ত সৈন্যের প্রয়োজন।

চেঙ্গীস তুর্কীকে বিদায় দিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, 'আবেগের দাবী অনুসারে এই মুহূর্তে কার্ক আক্রমণ করাই উচিত। সেখানকার মুসলমানরা কোন্ জাহান্নামে পড়ে আছে , আমি তা ভাল করেই বুঝতে পারছি। কিন্তু বাস্তবতার দাবী হল, পূর্ণ প্রস্তুতি ব্যতীত এক পা-ও অগ্রসর হয়ো না। আঘাত হানো তখন, যখন তুমি নিশ্চিত হবে যে অভিযান ষোল আনা সফল হবে। যেসব নারী ও শিশু দুশমনের হাতে অপদস্ত, নিগৃহীত ও নিহত হচ্ছে, আমরা তাদের ভুলে থাকতে পারি না। তাদের-ই জীবন-সম্ভ্রমের খাতিরে আমি ফিলিস্তীন উদ্ধার করতে চাই। এই যদি আমার লক্ষ্য না হয়, তাহলে যুদ্ধের উদ্দেশ্য লুটতরাজ ছাড়া আর কিছু থাকে না। যে জাতি দুশমনের হাতে নিগৃহীত শিশু ও নারীদের কথা ভুলে থাকে, তারা দস্যু-ডাকাতদেরই দলভুক্ত হয়ে যায়। সে জাতির জনগণ দুশমন থেকে প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে একে অপরকে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে, সে জাতির শাসকগোষ্ঠী জনগণকে শোষণ করে বিলাসিতায় দিন কাটায়। অবশেষে দুর্বলতার সুযোগে দুশমন যখন মাথার উপর এসে পড়ে. ফাঁকা স্লোগান তুলে জনগণকে বোকা ঠাওরায় আর তলে তলে দুশমনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এরূপ কয়েকটি জাতির নাম উচ্চারণ করে বললেন, 'ওরা ছিল সম্প্রসারণবাদী। ওদের স্বপ্ন ছিল, কিভাবে সমগ্র পৃথিবীকে নিজেদের করতলে নিয়ে আসবে, কিভাবে সারা জগতের সমুদয় সম্পদের অধিকারী হবে। ওরা বিজাতীয় নারীদের সম্ভ্রমে হাত দিয়েছে আর বিজাতীয়দের দ্বারা ওদের বোন-কন্যাদের সম্ভ্রমহানী ঘটিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ ওদের নাম-চিহ্ন মুছে দিয়েছেন।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আরো বললেন, 'আমরা আক্রমণ পরিকল্পনায় ব্যস্ত আর দুশমনও আক্রমণোদ্যত। পার্থক্য হল, খৃস্টানরা দূরদেশ থেকে এসেছে আমাদের জাতি-ধর্ম ও কৃষ্টি-কালচারকে নিশ্চিহ্ন করতে। এসেছে আমাদের মুসলিম নারীদের গর্ভে খৃস্টান সন্তান জন্ম দিতে। আর আমরা তাদের প্রতিরোধ করছি মাত্র। কুফরের এই সয়লাবকে যদি আমরা প্রতিরোধ করতে না পারি, তাহলে প্রমাণিত হবে- আমরা অথর্ব, আমরা মুসলামান নই। পক্ষান্তরে যদি এমনটা হয় যে, আমরা দুশমনের অপেক্ষায় ঘরে বসে রইলাম, দুশমন আমাদের সীমানায় প্রবেশ করে আক্রমণ করল আর আমরা নিজ ঘরে বসে প্রতিরোধ করলাম আর মনে মনে ভাবলাম, আহ! আমরা শত্রুর মোকাবেলা করেছি; তাহলে বুঝতে হবে আমরা কাপুরুষ। দুশমনের প্রতিরোধের নিয়ম হল, দুশমন যদি তোমাকে আঘাত করার জন্য তরবারী কোষমুক্ত করতে উদ্যত হয়, তাহলে তোমার তরবারী ততক্ষণে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। দুশমন তোমার উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিয়েছে আগামীকাল, তো তুমি আজই তাকে চরম শিক্ষা দিয়ে দাও।'

'আমার মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর সাহায্য নিয়ে কার্ক আক্রমণ করা উচিত।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'এটাও হবে ক্ষতিকর। জঙ্গীর কাছে এত পরিমাণ সৈন্য থাকা প্রয়োজন যে, খৃস্টানরা যদি আমাদের উপর পেছন থেকে আক্রমণ করে বসে, তাহলে জঙ্গীও তাদের পেছন থেকে হামলা করতে সক্ষম হবেন। আমি সাহায্য চাওয়ার পক্ষপাতী নই। তার পরিবর্তে আমরা এ-ও করতে পারি যে, কার্কে কমান্ডো বাহিনী প্রেরণ করে খৃস্টানদের আরামের ঘুম হারাম করে দিই। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমাদের গুপ্তচররা খৃস্টান কমান্ডোদের শিকড় ইঁদুরের ন্যায় কেটে ফেলতে পারবে। কিন্তু তার পরিণতি ভোগ করতে হবে সেখানকার নিরপরাধ নিরীহ মুসলমানদের। গেরিলারা তো তাদের অভিযান পরিচালনা করে এদিক-ওদিক আত্মগোপন করে থাকবে। পরিণতিতে নির্যাতনের শিকার হবে আমাদের নিরস্ত্র বোন-কন্যাসহ নিরীহ মুসলমানরা। তবে সেখানকার মুসলিম পরিবারগুলোকে বের করে আনার কোন নিরাপদ পন্থা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা ভেবে দেখতে পার। কার্ক আক্রমণে এখনো বেশ সময় নিতে হবে। সেনাসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কার্কের অনেক যুবকও বেরিয়ে এসেছে এবং অনেকে এখনও আসছে। আক্রমণ চালাতে হবে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে।

'আমি মনে করি, এখানকার মুসলমান নাগরিকদের ব্যাপারে আমাদের পলিসিতে পরিবর্তন আনা দরকার।' বলল, খৃস্টানদের গোয়েন্দা প্রধান হরমুন। কার্ক দুর্গে খৃস্টানদের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন চলছে। কয়েকজন খৃস্টান সম্রাট, সেনা কমান্ডার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা বৈঠকে উপস্থিত। পরাজয়ের গ্লানির ছাপ সকলের চোখে-মুখে। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলজ্বল করছে সকলের চোখ। শোবকের পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করতে চায় তারা দ্রুত। শুধু গোয়েন্দা প্রধান হরমুন-ই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি কথা বলছেন বুদ্ধিমত্তার সাথে– ঠান্ডা মাথায়। কার্কের মুসলমানদের উপর তার খৃস্টান ভাইয়েরা কিরূপ অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে, তার চোখের উপর ভাসছে সব। গম্ভীর কণ্ঠে হরমুন বললেন– 'শোবকের মুসলমানদের সঙ্গেও আপনারা এরূপ আচরণ করেছিলেন। তার পরিণতি আমাদের জন্য কল্যাণকর হয়নি। আমাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তারা ক্যাম্প থেকে এমন এক ব্যক্তিকে পালাতে সাহায্য করেছিল, যাকে আমরা ভয়ংকর গুপ্তচর মনে করে আটক করেছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ লোকটিকে ওখানকার মুসলমানরাই আশ্রয় দিয়েছিল। লোকটি দুর্গের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য নিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সালাহুদ্দীন আইউবী আমাদের দুর্গের যে দেয়াল ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করেছিল. তাতে ভেতরের মুসলমানদেরও হাত ছিল। আমাদের আচরণে তারা এতই অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল যে, তারা জীবনবাজি রেখে মুসলমান সৈন্যদের সহযোগিতা করেছিল।'

'এ কারণেই তো আমরা কার্কের মুসলমানদের হাড়গোড় ভেঙ্গে দিচ্ছি, শক্তি-সাহস নিঃশেষ করে দিচ্ছি।' বলল এক খৃস্টান সেনাপতি।

'তা না করে যদি আপনারা তাদেরকে বন্ধুতে পরিণত করে নেন. তাহলে তারা আপনাদের সহযোগিতা করবে। আপনাদের অনুমতি পেলে আমি প্রেম-ভালবাসা দিয়ে ধর্ম পরিবর্তন না করেও তাদেরকে ক্রুশের ভক্তে পরিণত করতে পারি, মুসলমানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াতে পারি।' বললেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

'জান না হরমুন! তুমি হয়ত হাতেগোনা কয়েকজন মুসলমানকে লোভ দেখিয়ে গাদ্দারে পরিণত করতে পারবে। কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামী ফৌজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারবে না। গোটা জাতি কখনো বিশ্বাসঘাতক হয় না। শোন হরমুন! ওদের উপর তুমি এত আস্থা রেখো না। আমরা মুসলমানদেরকে বন্ধু বানাতে চাই না। আমরা চাই মুসলমানদের বংশধারা নিঃশেষ করে দিতে। তুমি যখনই একজন অমুসলিমকে কোন মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে, বুঝবে লোকটি ইসলামকে ভালোবাসে। অথচ আমাদের উদ্দেশ্য হল, ইসলামের মূলোৎপাটন। কার্ক, জেরুজালেম, আক্কা ও আদীসায় এবং যেখানেই আমাদের কর্তৃত্ব চলছে, সবখানে মুসলমানদের এত অস্থির করে তোল, যাতে তারা হয়তো মৃত্যুমুখে পতিত হয় নতুবা ক্রুশের সামনে মাথানত করতে বাধ্য হয়।' বললেন সম্রাট রেমন্ড।

'মুসলমানদের সাথে যখন যে আচরণ করা হচ্ছে, সবই যথারীতি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কানে পৌঁছে যাচ্ছে। আপনারা আইউবীকে দ্রুত কার্ক আক্রমণে বাধ্য করছেন। আপনারা হয়তো ভুলে গেছেন যে, এক্ষুণি কোন আক্রমণ হলে আমাদের সৈন্যরা সে হামলার সামনে দাঁড়াবার শক্তি রাখে না।' বললেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

'তার সমাধান এই নয় যে, আমরা এখানকার মুসলমানদেরকে মাথায় তুলে নাচবো। আপনারা এখনো মুসলমান বন্দীদের খাইয়ে-পরিয়ে পুষছেন। ওদেরকে হত্যা করে ফেলছেন না কেন?' ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন ফিলিপ অগাস্টাস।

'করছি না, তার কারণ আইউবী আমাদের বন্দীদের হত্যা করে ফেলবে। আমাদের হাতে মুসলমান বন্দীর সংখ্যা সর্বমোট ৩৬১ জন। আর মুসলমানদের হাতে আমাদের বন্দীর সংখ্যা ১২৭৫ জন।' জবাব দেন গাই অফ লুজিনান।

'একজন মুসলমান খুন করার জন্য কি আমরা চারজন খৃস্টানের জীবন বিসর্জন দিতে পারি না? আমাদের যারা এখন সালাহুদ্দীনের হাতে বন্দী, তারা কাপুরুষ। যুদ্ধের পরিবর্তে বন্দীত্ববরণ করে নিয়েছে ওরা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল না বলেই শত্রুর হাতে ধরা পড়েছে। ওরা মুসলমানদের হাতে মরে গেলেই বরং ভাল। তোমরা নিশ্চিন্তে মুসলমান বন্দীদের হত্যা করে ফেল।' বললেন অগাস্টাস।

'মুসলমান বন্দীদের সাথে পশুর ন্যায় আচরণ করে এবং মুসলিম বন্দী সৈনিকদের হত্যা করে কি তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করতে পারবে? এ মহূর্তে আমাদের সামনে বড় সমস্যা হল, আইউবী যদি তার অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখেন, তাহলে আমরা কিভাবে তাকে প্রতিহত করব এবং কিভাবে তার থেকে শোবক দুর্গ পুনরুদ্ধার করব? আচ্ছা, আমরা যদি কার্কের সব মুসলমানকে হত্যা করে ফেলি, তাহলে কি হবে? আইউবীর ন্যায় তোমরা সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করছো না কেন? হরমুন কী বলতে পারবে, মিসরে তার গোপন তৎপরতার অগ্রগতি কেমন? সাফল্য কতটুকু?' বলল সেনাপতি গোছের এক খৃস্টান।

'আশার চেয়েও অধিক। আলী বিন সুফিয়ান এখন সালাহুদ্দীন আইউবীর সাথে শোবকে অবস্থান করছেন। কায়রোতে তার অনুপস্থিতি থেকে আমি প্রচুর ফায়দা হাসিল করেছি। কায়রোর নায়েবে নাজেম মুসলেহুদ্দীনকে ফাতেমীরা দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে। মুসলেহুদ্দীন আইউবীর একান্ত বিশ্বস্ত। কিন্তু এখন সে আমাদের অফাদার। ফাতেমীরা তলে তলে একজন খলীফা ঠিক করে রেখেছে। তিনি কায়রোর ভেতর থেকে বিদ্রোহ এবং সুদানীদের আক্রমণের অপেক্ষা করছেন। আমাদের সেনা অফিসার সুদানে সুদানীদের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করছে। কায়রোতে সালাহুদ্দীন আইউবী যে ফৌজ রেখে এসেছেন, তার দু'জন নায়েব সালার এখন আমাদের হাতের পুতুল।

ওদিক থেকে সুদানীরা হামলা চালাবে । কায়রোতে বিদ্রোহ হবে এবং ফাতেমীরা তাদের খেলাফত ঘোষণা করবে।' জবাব দেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

'তোমরা বোধ হয় ভুলে গেছ যে, সালাহুদ্দীন আইউবী এতই চতুর ও বিচক্ষণ লোক যে, প্রয়োজনবোধে কার্ক আক্রমণ মুলতবী রেখে হঠাৎ করে তিনি কায়রো চলে যাবেন। আমাদের উচিত, জ্বালাতন করে করে তাকে শোবকেই অবস্থান করতে বাধ্য করা। তার জন্য আমরা একটি কাজ এই করতে পারি যে, আমরা তার পথ আগলে রাখব এবং তার একজন সৈন্যকেও কায়রো যেতে দেব না।' রেমন্ড বললেন।

'আমার শতভাগ আশা, কায়রোতে এখন আইউবীর যেসব সৈন্য আছে, তারা আর তার কোন কাজে আসবে না। আমার লোকেরা আইউবীর সেনাবাহিনীতে এ সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, কায়রোতে রেখে গিয়ে সুলতান তাদেরকে গনীমত থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং শোবকে হাজার হাজার খৃস্টান যুবতী তার হাতে এসে গেছে, যাদেরকে তিনি সেনাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। আমার বড় সফলতা এই যে, আমি মুসলমান সেনা কর্মকর্তাদেরই মুখে সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছি। আমি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি যে, কায়রোর সকল ফৌজী সুদানীদের সঙ্গ দেবে এবং সালাহুদ্দীন আইউবী বিদ্রোহ দমন করার জন্য শোবক থেকে তার সব সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু এরা যখন গিয়ে কায়রো পৌঁছুবে, ততক্ষণে কায়রোতে ফাতেমী খেলাফতের পতাকা উড্ডীন হয়ে যাবে এবং সুদানী বাহিনী দেশের ক্ষমতা হাতে নিয়ে ফেলবে। আক্রমণ করে সালাহুদ্দীন আইউবীকে শোবকে আটকে রাখা আমাদের নিষ্প্রয়োজন। মুসলমানদেরই হাতে আমরা তাকে শেষ করে দেব।' বললেন খৃস্টান গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

হরমুন আরো বললেন– 'আপনি মুসলমানদের মতিগতি এখনো বুঝে উঠতে পারেননি। সে কারণেই আপনি আমার অনেক কার্যকর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছেন। মুসলমান যদি সৈনিক হয় আর প্রশিক্ষণের সময় যদি তার মাথায় একথা ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে, তুমি দেশ ও জাতির মোহাফেজ, তাহলে সে দেশ-জাতির স্বার্থে নিজের জীবন কুরবান করতে কুণ্ঠিত হয় না। আপনি পৃথিবীর রাজত্ব তাদের পায়ের উপর রেখে দেখুন, তারা একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে কাজ করাই বেশী পছন্দ করবে। প্রকৃত মুসলমান জাতির সাথে গাদ্দারী করে না। তবে সেই মুসলমানদেরই মাঝে যদি যৌনতা, মদ, নারী আর ক্ষমতার লিপ্সা সৃষ্টি করে দেয়া যায়, তাহলে তারা নিজেদের দ্বীন-ধর্মকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেও এতটুকু ভাববে না। আমি যেসব মুসলমান শাসককে দলে ভিড়িয়েছি, তাদের মধ্যে ঐ দুর্বলতাগুলো সৃষ্টি করেছি এবং করে চলেছি।'

বক্তব্য শেষ হয় না হরমুনের-

'কিন্তু একজন সৈনিককে গাদ্দার বানানো অতটা সহজ নয়, যতটা সহজ একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে দলে ভেড়ানো। প্রশাসনের সব কর্মকর্তাই ক্ষমতালিপ্সু। সকলেরই চেষ্টা, কি করে মন্ত্রী-গবর্নর হওয়া যায়। মুসলমানদের ইতিহাস দেখুন। দেখতে পাবেন, তাদের রাসূলের পর সব শাসকই ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত। কিন্তু তাদের খলীফারা যখনই দেখলেন যে, অমুক সেনাপতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে ফেলল, রাজ্যজয়ের বদৌলতে জাতি তাকে খলীফা অপেক্ষা বেশী মর্যাদা দিতে শুরু করল, তখন খলীফা ও তার সাঙ্গরা সেই সেনাপতিকে ভুল নিদের্শনা দিয়ে অপদস্ত করেছে। এই ক্ষমতালিপ্সু মুসলিম শাসকদের জাতি-ধর্ম বিধ্বংসী আচরণের ফলেই আমরা আজ আরব রাজ্যে পা রাখতে পেরেছি। সালাহুদ্দীন আইউবী সেইসব সেনানায়কদেরই একজন, যারা সালতানাতকে সেই সীমান্তরেখা পর্যন্ত নিয়ে যেতে চান. যে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল প্রথম যুগের সেনানায়করা। এই লোকটির বিশেষ একটি গুণ হল, ইনি প্রশাসন ও খেলাফতের তোয়াক্কা করেন না। যখনই ইনি মিসরের খেলাফতকে নিজের চলার পথের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে দেখলেন, সাথে সাথে খলীফাকেই ক্ষমতাচ্যুত করে দিলেন। নিজের সামরিক শক্তি ও বিচক্ষণতার কারণেই ইনি এমন সাহসী পদক্ষেপ হাতে নিতে পেরেছেন।'

হরমুন বলে যাচ্ছেন আর গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছে খৃস্টান কমান্ডার। হরমুন বলছিলেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবী তার জাতির এই দুর্বলতাটা বুঝে ফেলেছেন যে, অসামরিক নেতৃত্ব ক্ষমতালোভী। আর এটি এমনি এক লোভ, যা মানুষের মধ্যে সম্পদের মোহ ও মদ-নারীর নেশার জন্ম দেয়। আমি শুধু সেই সেনা অফিসারদেরই হাত করতে পেরেছি, যাদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ আছে। এ কারণে আমরা বেশী প্রভাব ফেলছি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপর। সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করার পন্থা হল, জনমনে তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করতে হবে। এটি আমার দায়িত্ব, যা আমি পালন করে যাচ্ছি। আপনি হয়ত বা আমার সাথে একমত হবেন না, তবু আমি আপনাকে অবহিত করতে চাই যে, সালাহুদ্দীন আইউবীকে সহজে আপনি যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করতে পারবেন না। আইউবী শুধু লড়াই করার জন্য লড়ে না। তার প্রত্যয়ভিত্তি এমন এক পরিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা তার সকল সৈনিকের কাছে স্পষ্ট। তার একটি মৌলিক গুণ হল, তিনি তার খলীফা কিংবা অসামরিক নেতৃত্বে থেকে নির্দেশ নেন না। তিনি একজন কট্টর মুসলমান। তিনি বলেন, আমি নির্দেশ গ্রহণ করি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে। আমার যেসব গুপ্তচর বাগদাদে অবস্থান করছে, তারা আমায় তথ্য দিয়েছে যে, আইউবী নূরুদ্দীন জঙ্গীর যোগসাজশে এখান থেকে বৈপ্লবিক কর্মসূচী প্রেরণ করেছেন, যার বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে। তার একটি হল, 'আমীরুল ওলামা' থেকে ফতুয়া নিয়ে প্রচার করা হয়েছে যে, খেলাফত হবে মাত্র

একটি আর তা হবে বাগদাদের খেলাফত। এই খেলাফত অন্য দেশ সম্পর্কে কোন নির্দেশ জারি করতে হলে আগে সামরিক কর্মকর্তাদের অনুমোদন নিতে হবে। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে সামরিক কর্মকর্তাদের ছাড়া অন্য কারো হাত থাকবে না। দূরদূরান্ত অঞ্চলে লড়াইরত সেনাপতিদের কাছে খলীফার কোন নির্দেশ পাঠাতে পারবেন না। তৃতীয়তঃ খোতবায় খলীফার নাম উল্লেখ করা যাবে না। তাছাড়া খেলাফতের প্রভাব নিঃশেষ করার জন্য আইউবী নির্দেশ জারী করেছেন যে, খলীফা, খলীফার নায়েব বা অন্য কেউ পরিদর্শন-পর্যবেক্ষণ কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যখন বাইরে বের হবেন, তখন জনগণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, স্লোগান দিতে পারবে না, এমনকি সালাম পর্যন্ত করতে পারবে না।

'সালাহুদ্দীন আইউবী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করেছেন, তাহল, তিনি শিয়া-সুন্নী বিভেদ মিটিয়ে দিয়েছেন। তিনি শিয়াদেরকে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে সুন্নীদের সমান মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে শিয়া পণ্ডিতদের সম্মতি আদায় করে নিয়েছেন যে, তারা ইসলামের পরিপন্থী আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করে চলবে। সালাহুদ্দীন আইউবীর এমন পদক্ষেপ আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এখন আমাদের উচিত মুসলমানদের প্রশাসনকে সালাহুদ্দীন আইউবী ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা। অবশ্য এ মিশনের উপর কাজ চলছেও বটে।'

'আমাদের শত্রুতা সালাহুদ্দীন আইউবীর সাথে নয়- আমাদের শত্রু ইসলাম। আমাদের যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে। আমাদের চেষ্টা করা দরকার, আইউবীর মৃত্যুর পর এ জাতি যেন আর কোন আইউবী জন্ম দিতে না পারে। এ জাতিটাকে ভুল ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসের অস্ত্র দ্বারা শেষ করে দাও। তাদের মধ্যে ক্ষমতার মোহ ও রাজা হওয়ার উন্মাদনা সৃষ্টি করে বিলাসী বানাও এবং এমন রীতির প্রবর্তন কর, যাতে এরা মসনদের নেশায় পরস্পর খুনাখুনীতে লিপ্ত থাকে। তারপর এই খেলাফতকে তাদের সেনাবাহিনীর ঘাড়ে সাওয়ার করে দাও। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, এরা একদিন না একদিন ক্রুশের গোলামে পরিণত হবে। এদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, এদের দ্বীন-ধর্ম ক্রুশের রঙে রঙিন হবে। এরা রাজত্ব ও খেলাফত লাভ করার জন্য পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য আমাদের শরণাপন্ন হবে। এখন এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছি, সে সময়ে হয়তো কেউ জীবিত থাকব না। আমাদের আত্মা দেখবে, আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী করলাম, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামকে নির্মূল করার জন্য ইহুদীরা তোমাদেরকে তাদের মেয়েদের উপহার দিচ্ছে। এদেরকে তোমরা কাজে লাগাও। ইহুদীদেরকে তোমরা শুধু এজন্য শত্রু মনে কর যে, তারা জেরুজালেমকে তাদের পবিত্র ভূমি এবং

ফিলিস্তীনকে তাদের আবাস মনে করে। তাদের বলে দাও যে, হ্যাঁ, ফিলিস্তীন তোমাদেরই। এ ভূখণ্ডটি আমরা তোমাদেরই দিয়ে দেব। এখন আমাদের সঙ্গ দাও, সহযোগিতা কর। তবে সাবধান! ইহুদীরা কিন্তু অতি চতুর জাতি। তোমাদের পক্ষ থেকে কোন আশংকা দেখা দিলে তখন কিন্তু তারা মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়াবে, তোমাদের বিপক্ষে চলে যাবে। তাদের সম্পদ ও মেয়েদের ব্যবহার কর, বিনিময়ে তাদেরকে ফিলিস্তীনের মুলো দেখাও।

✿ ✿ ✿

শোবক ও কার্ক দুর্গ থেকে বেশ দূরের বিস্তীর্ণ একটি ভূখণ্ড। মাটি ও বালির পর্বত এবং উঁচু-নীচু টিলাবেষ্টিত এই ভূখণ্ডটি অন্তত দেড় মাইল দীর্ঘ, দেড় মাইল চওড়া। ভূখণ্ডটির বিপুল এলাকা বালুকাময় মরুপ্রন্তর। কোথাও ছোট-বড় অনেক গর্ত, কোথাওবা পাথরখণ্ড ছড়ানো।

খৃস্টান শাসকবর্গ ও সেনা কমান্ডারগণ যে সময়ে বসে বসে ইসলামের মূলোৎপাটনের পরিকল্পনা আঁটছিল এবং অতি ভয়াবহ পন্থা-পদ্ধতি ঠিক করছিল, সে সময়ে মরুভূমির এ ভূখণ্ডে চলছিল যুদ্ধের মহড়া। হাজার হাজার পদাতিক সৈন্য, ঘোড়সওয়ার ও উটসওয়ার দৌঁড়াদৌঁড়ি-ছুটাছুটি করছিল। চকমক করছিল তরবারী ও বর্শা। উট-ঘোড়ার ছুটাছুটিতে কালো মেঘের ন্যায় আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল মরুদ্যানের ধুলোবালিতে। অশ্বগতিকে হার মানাবার বাসনায় তীরবেগে দৌঁড়াবার চেষ্টা করছে পদাতিক বাহিনী। খানা-খন্দক ও গর্ত লাফিয়ে পার হচ্ছে অশ্বারোহীরা। পার্শ্ববর্তী পর্বতচূড়ায় শান্ত মনে ঘোরাফেরা করছে দু'জন সৈনিক। এক পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ছুটে এসে আরেক পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নিভে যাচ্ছে। হৈ চৈ-কলরোলে কেঁপে উঠেছে আকাশ।

উঁচু এক টিলার উপর ঘোড়ার পিঠে বসে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী গভীর মনোযোগ সহকারে অবলোকন করছেন এ দৃশ্য। দীর্ঘক্ষণ ধরে এ মাঠের আশপাশের পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। সঙ্গে তাঁর দু'জন নায়েব।

'যেরূপ দ্রুতগতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, তাতে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, নতুন সৈনিকরা অল্প ক'দিনের মধ্যেই অভিজ্ঞ সৈনিকরূপে গড়ে উঠবে। যে অশ্বরোহীদের আপনি এত চওড়া গর্ত লাফিয়ে অতিক্রম করতে দেখলেন, তারা সকলেই কার্ক থেকে আগত নওজোয়ান। আমি তাদেরকে আনাড়ী ভেবেছিলাম। তীরান্দাজদের মানও দিন দিন উন্নত হচ্ছে।' বলল এক নায়েব।

'শুধু অস্ত্র চালনা আর সুস্থ-সবল দেহ দিয়ে অভিজ্ঞ সৈনিক হওয়া যায় না। অভিজ্ঞ সৈনিক হতে হলে বুদ্ধি-বিচক্ষণতা এবং আদর্শিক চেতনাও অনিবার্য। আমার এমন সৈনিকের প্রয়োজন নেই, যারা এলোপাতাড়ি দুশমনের উপর আঘাত হানবে আর

শুধুই ধ্বংস করবে। প্রয়োজন আমার এমন সৈনিকের, যাদের জানা থাকবে যে, তাদের শত্রু কে এবং তাদের লক্ষ্য কি। আমার সৈনিকদের জানা থাকতে হবে যে, তারা আল্লাহর বাহিনী এবং তারা আল্লাহর পথে লড়াই করছে। যে জোশ ও চেতনা আমি প্রত্যক্ষ করছি, তা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষ্য যদি স্পষ্ট না হয়, নিজেদের অবস্থান-মর্যাদা যদি পরিস্কার না হয়, তাহলে এই জোশ যে কোন মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে। তাদের মন-মগজে এ কথাটা বদ্ধমূল করে দাও যে, ফিলিস্তীন আমাদের কেন উদ্ধার করতে হবে। তাদের জানিয়ে দাও, গাদ্দারী কত বড় অপরাধ। তাদের বুঝাও যে, তোমরা শুধু ফিলিস্তীনের জন্যই নয়– বরং ইসলামের সুরক্ষা ও বিস্তারের জন্য লড়াই করছ। তোমরা যুদ্ধ করছ ভবিষ্যত প্রজন্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য। সমর-প্রশিক্ষণের পর তাদের ওয়াজ কর, স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দাও তাদের জাতীয় মর্যাদার প্রকৃত স্বরূপ।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'প্রতি সন্ধ্যায় তাদেরকে নসীহত করা হয় মহামান্য সালারে আজম! আমরা তাদেরকে আদর্শ বিবর্জিত শুধু হায়েনা বানাচ্ছি না।' বলল এক নায়েব।

'তাদের হৃদয়ে জাতির সেই কন্যাদের কথাও স্মরণ করিয়ে দাও, যারা কাফেরদের হাতে অপহৃত ও অপমানিত হয়েছে ও হচ্ছে। তাদের স্মরণ করিয়ে দাও সেই কুরআনের কথা, যা খৃস্টানদের পায়ের তলায় দলিত হয়েছে। তাদের স্মরণ করিয়ে দাও আল্লাহর ঘর মসজিদের কথা, যাকে আল্লাহর দুশমনরা পরিণত করেছে ঘোড়ার আস্তাবলে। মনে রেখো, নারীর ইজ্জত আর মসজিদের সম্মান মুসলমানদের জাতীয় মর্যাদার প্রতীক। আমাদের সৈনিকদের জানিয়ে দাও, যেদিন তোমরা নারীর সম্ভ্রম আর মসজিদের সম্মানের কথা ভুলে যাবে, সেদিন মনে করবে পৃথিবীটা তোমাদের জন্য জাহান্নামে পরিণত হয়ে গেছে। আর আখেরাতের শাস্তি কত ভয়াবহ হবে, তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

পাহাড়ের উপর দু'চারজন করে যে সৈনিক ঘোরাফেরা করছিল, ওরা প্রহরী। খৃস্টানদের জবাবী হামলার আশংকা আছে। তাই এই প্রহরার আয়োজন।

পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করছিল তাদের দু'প্রহরী। হঠাৎ তারা দাঁড়িয়ে যায়। তারা দেখতে পায় নীচে একখণ্ড পাথরের উপর দাঁড়িয়ে সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর পিঠটা তাদের দিকে। দূরত্ব দু'আড়াইশ' গজ মাত্র। এক প্রহরী বলল, বেটার পিঠটা ষোলআনা আমাদের সামনে। এখান থেকে তীর ছুঁড়ে বেটার হৃদপিণ্ড পার করিয়ে দিতে পারি। তুমি কি বলো?'

'তারপর পালাবে কোথায়?' জিজ্ঞেস করে অপরজন।

'তা ঠিক, এরা যদি আমাদের ধরে নিয়ে মেরে ফেলতো, তাহলে তো ল্যাঠা চুকে

যেতো। কিন্তু তাতো করবে না। ধরতে পারলে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে এমন শাস্তি দেবে যে, আমরা আমাদের সাথীদের নাম বলে দিতে বাধ্য হবো।' বলল প্রথমজন।

'এ কাজটা তারই রক্ষীদের জন্য ছেড়ে দাও। সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করা যদি এতই সহজ হত, তাহলে এখনো তিনি জীবিত থাকতেন না।' বলল একজন।

'কাজটা এখন হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। শুনেছি, ফাতেমীরা বলাবলি করছে, তোমরা আমাদের থেকে দেদারছে অর্থ নিচ্ছ আর কাজ করছ না কিছুই।' বলল দ্বিতীয়জন।

আশা করি কাজটা দ্রুত হয়ে যাবে। শুনেছি, হাশীশীরা খুব সাহসী। জীবন হাতে নিয়ে তারা একজনকে খুন করতে পারে। এ যাবত তারা কিছুই করে দেখায়নি। আমি এও জানি যে, আইউবীর রক্ষীদের মধ্যে তিনজন হাশীশী আছে। আইউবীর রক্ষী বাহিনীতে ঢুকে যাওয়া তাদের কম যোগ্যতা নয়। তারা কারা কেউ জানে না। কিন্তু তারা আইউবীকে হত্যা করবে কবে? বেটারা ভয় পাচ্ছে মনে হয়।' কথা বলতে বলতে সামনের দিকে হেঁটে যায় প্রহরীদ্বয়।

✿ ✿ ✿

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অবর্তমানে মিসরে বিরোধী পক্ষের গোপন অপতৎপরতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তা সামাল দেয়া কেবল কোন অলৌকিক শক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই অপতৎপরতার নেপথ্যে ছিল খৃস্টানরা আর বাস্তবায়ন করেছে সেইসব মুসলিম শাসকবর্গ, যারা ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একান্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। খৃস্টানরা বেশকিছু ইহুদী ললনা হাত করে নিয়েছিল, যারা অবলীলায় আরবী-মিসরী ভাষা বলতে পারত এবং যখন যেমন প্রয়োজন তেমন রূপ ধারণ করতে পারত। মিসরের প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তা ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা জাতীয় চেতনা ও মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলেছিল। ফাতেমীরা তাদেরকে তাদের ক্রীড়নকে পরিণত করে এবং হাসান বিন সাব্বাহর হাশীশীদের সহযোগিতায় দেশে অরাজকতা বিস্তারে মেতে উঠে।

সে যুগের ঐতিহাসিকগণ– যাদের মধ্যে আসাদুল আসাদী, ইবনুল আছীর, আবুল ফাররা ও ইবনুল জাওযী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- লিখেছেন, সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে খৃস্টানরা সুদানীদেরকে মিসর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করেছিল। মিসরে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর যে অল্প ক'জন সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তারাও বিদ্রোহ করার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থকরা চরম উৎকণ্ঠায় পড়ে যায় যে, সুলতান যদি সময় থাকতে এসে না পৌছেন, তাহলে মিসর হাতছাড়া হয়ে যাবে নিশ্চিত।

উল্লিখিত ঐতিহাসিকদের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে একটি ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, খিজরুল হায়াত নামক এক ব্যক্তি ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অর্থমন্ত্রী। তিনি আইউবীর অতি বিশ্বস্ত ও বড় সৎলোক ছিলেন।

একদিনের ঘটনা। খিজরুল হায়াত রাতে বাড়ি ফিরলেন। অন্ধকার রাত। ঘরে প্রবেশ করবেন বলে। এমনি সময়ে রাতের আঁধার ভেদ করে একটি তীর ছুটে আসে তার দিকে। তীরটি তার পিঠ ভেদ করে হৃদপিন্ডে আঘাত হানে। চীৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। চীৎকার শুনে ঘরের লোকেরা ছুটে আসে। দৌড়ে আসে চাকর-বাকররা। পিঠে তীরবিদ্ধ খিজির উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে। হৃদয়বিদারক এক দৃশ্যের অবতারণা হল। শোকের ছায়া নেমে এলো বাড়িময়।

হঠাৎ একজন দেখতে পেল, খিজরুল হায়াতের ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলি মাটির উপর রাখা। মাটিতে কি যেন লিখেছেন তিনি। তিনি মৃত। কি লিখেছেন? দেখার জন্য কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে আসে অনেকে। একটি মাত্র শব্দ 'মোসলেহ'। আরবী শব্দ 'মোসলেহ' এর 'হা' বর্ণটিও পুরোপুরি লিখতে পারেননি। ঘাতকের তীর তার প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তার আগেই।

লাশ তুলে নেয়া হল। সংরক্ষণ করে রাখা হল খিজরুল হায়াতের মৃত্যুর পূর্বক্ষণে লেখা শব্দটি। ব্যাপক অর্থ লুকিয়ে আছে এই একটি শব্দের মধ্যে। কোতোয়াল গিয়াসকে ডেকে পাঠানো হল। গিয়াস বিলবিস একাধারে কোতোয়াল ও পুলিশ বিভাগের প্রধান। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিশ্বস্ত আমলা। আলী বিন সুফিয়ানের ন্যায় অভিজ্ঞ গুপ্তচর।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন গিয়াস বিলবিস। গভীর দৃষ্টিতে দেখলেন লেখাটি। এমন সময়ে খিজরুল হায়াতের মৃত্যুসংবাদ শুনে এসে উপস্থিত হন নগর প্রশাসক মোসলেহুদ্দীন। তাকে দেখেই পা দ্বারা লেখাটি মুছে ফেললেন গিয়াস বিলবিস । নগর প্রশাসক হওয়ার সুবাদে কোতোয়ালি বিভাগ ছিল তারই অধীনে। তিনি বিলবিসকে আদেশের সুরে বললেন, 'আগামীকালের সূর্যোদয়ের আগেই আমি ঘাতকের সন্ধান পেতে চাই। এর বেশী এক মুহূর্ত সময়ও আমি দিতে পারবো না।' ঘাতককে শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে বলে নিশ্চয়তা দেন গিয়াস বিলবিস। স্থান ত্যাগ করে চলে যান তিনি।

রাতেই বৈঠকে বসেন বিলবিস। খিজরুল হায়াতের নায়েব-সহযোগী ও ঘনিষ্ঠজনদের সাথে কথা বলেন তিনি। জানতে চান, হত্যার দিনে সারাদিন খিজরুল হায়াত কি কি কাজে ব্যস্ত ছিল। তারা জানায়, গতকাল নগর প্রশাসনের উচ্চপদস্ত কর্মকর্তাদের মিটিং বসেছিল। সেনাবাহিনীর কোন প্রতিনিধি তাতে উপস্থিত ছিল না। খিজরুল হায়াতের নায়েব খিজিরের সহযোগিতার জন্য বৈঠকে উপস্থিত ছিল। বৈঠকে সামরিক খাতের ব্যয় প্রসঙ্গে আলোচনা উঠে। খিজির বলল, মিসরের সাধারণ ব্যয়ের পরিমাণ আরো হ্রাস করতে হবে, সামরিক খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী শোবকে বহু নতুন সৈন্য ভর্তি করেছেন। তাদের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

নগর প্রশাসক মোসলেহুদ্দীন তার এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, সামরিক ব্যয় সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। নতুন সৈন্য ভর্তি না করে আমাদের প্রয়োজন সেই সৈন্যদের সমস্যার সমাধান করা, যারা পূর্ব থেকেই দেশের বোঝা হয়ে আছে। তিনি আরো বলেন, মিসরের সৈন্যরা অশান্ত হয়ে উঠেছে। শোবক থেকে যে গনীমত হাতে এসেছিল, এখানকার সৈন্যদেরকে তার ভাগ দেয়া হয়নি।

জবাবে খিজরুল হায়াত বললেন, 'আপনি কি ভুলে গেছেন যে, আমীরে মেসের সৈন্যদের মাঝে গনীমত বন্টন করার প্রথা বিলুপ্ত করে দিয়েছেন? তার এ ফয়সালা অতি প্রশংসনীয়। যেসব সৈন্য গনীমতের লোভে যুদ্ধ করে, তাদের কোন আদর্শ এবং দেশপ্রেম থাকে না।

বিষয়টি নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে মোসলেহুদ্দীন বলেই ফেললেন যে, আমীরে মেসের শামী ও তুর্কী সৈন্যদের সাথে যতটুকু সদ্ব্যবহার দেখান, মিসরীয়দের সাথে ততটুকু দেখান না। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি আরো আপত্তিকর কিছু কথা বলেন। জবাবে খিজির বললেন, মোসলেহুদ্দীন! আমি অনুভব করছি, তোমার কণ্ঠে ক্রুসেডার ও ফাতেমী কথা বলছে। মোসলেহুদ্দীনের উত্তেজনা আরো বেড়ে যায় এবং সে অবস্থায়ই বৈঠক মুলতবী হয়ে যায়।

খিজরুল হায়াতের নায়েব জানায়, বৈঠকের পর মোসলেহুদ্দীন খিজরুল হায়াতের দফতরে আসেন। সেখানেও দু'জনের মধ্যে চটাচটি-বাকবিতণ্ডা হয়। মোসলেহুদ্দীন খিজরুল হায়াতের একথার উপর সম্মতি নিতে চেষ্টা করছিল যে, মিসরী বাহিনী আইউবীর প্রতি সন্তুষ্ট নয়। তিনি বৈঠকে বলা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন। খিজরুল হায়াত বললেন, 'বিষয়টা যদি এমনই হয়, তা হলে তোমার পক্ষ থেকে আমি সমস্যাটা আমীরে মেসেরের নিকট লিখে পাঠাব। তবে আমি এ কথাটা অবশ্যই লিখব যে, তুমি বৈঠকে সভাসদদের বুঝাবার চেষ্টা করেছ যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সৈন্যদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন। আমি আরো লিখব, তুমি আমাদের মনে এ বিশ্বাস জন্মাবারও চেষ্টা করেছ যে, সুলতান অইউবী শোবকের সব গনীমত শামী ও তুর্কীদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে মিসরীয়দের বঞ্চিত করেছেন। পত্রে আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে এ কথাও অবহিত করব যে, তুমি তোমার অভিযোগগুলোর পক্ষে মত দেয়ার জন্য আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছ এবং সৈন্যদের প্রচারিত গুজব সম্পর্কে বলেছ, এসব গুজব নয়– বাস্তব সত্য।'

খিজরুল হায়াতের নায়েব আরো জানায়, মোসলেহুদ্দীন যখন খিজিরের কক্ষ থেকে বের হন, তখন তাকে এ কথাও বলতে শোনা গিয়েছিল যে, ঠিক আছে, যদি জীবনে বেঁচে থাকতে পার, তাহলে এসব লিখে সুলতানকে পত্র দিও।

গিয়াস বিলবিস তৎক্ষণাৎ মোসলেহুদ্দীনকে কিছু জিজ্ঞাসা করা সমীচীন মনে করলেন না। তার কারণ, প্রথমত পদমর্যাদায় তিনি তার বড়। দ্বিতীয়ত এর পক্ষে তিনি আরো তথ্য সংগ্রহ করতে চান। তিনি আশংকা করছিলেন, সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া যদি মোসলেহুদ্দীনের প্রতি হাত বাড়ান, তবে উল্টো তিনি নিজেই বিপদে পড়তে পারেন। সুলতান আইউবী যদি কায়রো উপস্থিত থাকতেন, তাহলে বিলবিস তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারতেন। বিলবিস বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ড ব্যক্তি আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ নয়। এর পিছনে রয়েছে জাতিবিধ্বংসী সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। যা হোক, রাতে তিনি আরো কয়েকজনের দরজায় করাঘাত করেন। কিন্তু আর কোন তথ্য পেলেন না।

পরবর্তী সাক্ষ্য-প্রমাণে যা পাওয়া গিয়েছিল, তার সারমর্ম হল, হত্যাকাণ্ডের পরের রাত মোসলেহুদ্দীন যখন ঘরে ফিরেন, তখন তার প্রথমা স্ত্রী তাকে নিজ কক্ষে ডেকে নিয়ে যায়। স্ত্রী বিশটি স্বর্ণমুদ্রা মোসলেহুদ্দীনের সামনে রেখে বলল, খিজরুল হায়াতের ঘাতক এই মুদ্রাগুলো ফেরত দিয়েছে এবং বলে গেছে, তোমার সাথে নাকি তার পঞ্চাশ আশরাফী এবং দু'টুকরো সোনার চুক্তি ছিল। সে তার দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু তুমি তাকে দিয়েছ মাত্র বিশ আশরাফী। তার ভাষায় তুমি তাকে ধোঁকা দিয়েছ! এখন সে তোমার থেকে একশত আশরাফী এবং দু'টুকরো সোনা আদায় করে ছাড়বে। দু'দিনের মধ্যে না পৌঁছুলে খিজরুল হায়াতের ন্যায় তোমারও একই পরিণতি ঘটবে বলে সে হুমকি দিয়ে গেছে।

শোনামাত্র মোসলেহুদ্দীনের মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে যায়। বিস্ফারিত নয়নে খানিক নীরব থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'এসব তুমি কি বলছ? কার কথা বলছ? কই আমি তো খিজরুল হায়াতকে হত্যা করার বিনিময়ে কাউকে অর্থ দেইনি!'

'না, তুমিই খিজরুল হায়াতের ঘাতক। জানি না, কেন তুমি তাকে হত্যা করেছ। আমি এতটুকু জানি, তার হত্যাকারী তুমিই।" বলল স্ত্রী।

মোসলেহুদ্দীনের প্রথমা স্ত্রী। নাম ফাতেমা। বয়স বড়জোর ত্রিশ বছর। অতিশয় রূপসী । মাস কয়েক হল মোসলেহুদ্দীনের ঘরে আগমন ঘটেছে আরেক অপরূপ এক সুন্দরী যুবতীর। সে যুগে একাধিক স্ত্রী রাখা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। এক স্ত্রী অপর স্ত্রীকে হিংসা করত না। কিন্তু মোসলেহুদ্দীন দ্বিতীয়া স্ত্রীকে ঘরে এনে প্রথমা স্ত্রীর কথা একেবারেই ভুলে যান। নতুন স্ত্রীর আগমনের পর ফাতেমার কক্ষে যাওয়া ছেড়েই দেন মোসলেহুদ্দীন। মহিলা বেশ ক'বার ডেকেও পাঠিয়েছিল তাকে। কিন্তু তিনি যাননি একবারও। ফলে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে প্রথমা স্ত্রী। এই যে লোকটি আশরাফীগুলো ফেরত দিয়ে গেল, বোধ হয় মোসলেহুদ্দীন থেকে বড় রকমের প্রতিশোধ নিতে চায় সে। তাই লোকটি মোসলেহুদ্দীনের ক্ষুব্ধ স্ত্রীকে জানিয়ে দিল যে, মোসলেহুদ্দীনই খিজরুল হায়াতকে খুন করিয়েছে।

‘এ ব্যাপারে তুমি কোন কথা বলতে পারবে না। এটি আমার কোন দুশমনের ষড়যন্ত্র হবে নিশ্চয়। আমার ও তোমার মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে কেউ।’ কঠোর ভাষার বলল মোসলেহুদ্দীন।

তোমার হৃদয়ে আমার শত্রুতা ছাড়া আর আছেই বা কি? জানতে চায় স্ত্রী।

‘‘আমার মনে এখনো তোমার সেই প্রথম দিনের ভালোবাসা বিরাজ করছে। আচ্ছা, লোকটিকে কি তুমি চেন?’ বলল মোসলেহুদ্দীন।

‘লোকটি মুখোশপরা ছিল। কিন্তু তোমার মুখোশ তো উন্মোচিত হয়ে গেল। আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। তুমি খুনী।’ বলল স্ত্রী।

মোসলেহুদ্দীন জবাবে কি যেন বলতে চাইল। কিন্তু স্ত্রী তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে বলল, ‘আমার মনে হয়, তুমি রাজকোষের সম্পদ আত্মসাৎ করেছ। খিজরুল হায়াত সে খবর পেয়ে গিয়েছিল। তাই ভাড়াটিয়া খুনী দ্বারা তুমি তাকে হত্যা করে পথের কাঁটা দূর করেছ।’

‘তুমি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিও না। রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করা আমার কী প্রয়োজন?’

তোমার নয়– টাকার প্রয়োজন তার, যাকে তুমি বিবাহ ছাড়াই ঘরে স্থান দিয়েছ।’ অকস্মাৎ আগুনের মত জ্বলে উঠে বলল স্ত্রী, ‘মদের জন্য তোমার টাকার প্রয়োজন এ অভিযোগ যদি সত্য না হয়ে থাকে, তাহলে বল, এ চারটি গোড়াগাড়ী কোথেকে এসেছে? নিত্যদিন তোমার ঘরে যে নর্তকীরা আসে, তারা কি ফ্রি আসে? প্রতিদিন যে মদের আসর বসাও, তার ব্যয় আসে কোথা থেকে? বল।’

‘আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি চুপ হয়ে যাও। আমাকে খোঁজ নিয়ে জানতে দাও লোকটি কে ছিল। তবেই ঘটনার প্রকৃতরূপ তোমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে।’ বলল মোসলেহুদ্দীন।

‘এখন আর আমি চুপ থাকতে পারব না। আমার বুকটা তুমি প্রতিশোধ-স্পৃহায় ভরে দিয়েছ। আমি সমগ্র মিসরকে জানিয়ে দেব, আমার স্বামী খুনী, একজন ঈমানদারের ঘাতক, তুমি আমার ভালোবাসার হন্তা। এ হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবই।’ বলল স্ত্রী।

অনুনয়-বিনয় করে স্ত্রীর মুখ বন্ধ করতে চান মোসলেহুদ্দীন। অবশেষে দু'দিন কোন কথা বলবে না বলে স্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে। এ সময়ে মোসলেহুদ্দীন উক্ত লোকটিকে খুঁজে বের করে প্রমাণ করবেন যে, তিনি ঘাতক নন। মোসলেহুদ্দীন তার স্ত্রীকে আরো জানান, গিয়াস বিলবিস কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এবং শীঘ্রই আসল ঘাতকের সন্ধান বেরিয়ে আসবে।

❁ ❁ ❁

রাত কেটে যায়। চলে যায় পরের দিনও। মোসলেহুদ্দীন ঘর থেকে উধাও। তার দ্বিতীয় স্ত্রী বা গণিকারও পাত্তা নেই। সন্ধ্যায় মোসলেহুদ্দীন ঘরে ফিরেন এবং সোজা ঢুকে পড়েন প্রথমা স্ত্রীর কক্ষে। প্রেম-ভালোবাসার কথা শুরু করেন তার সাথে। তার কাছে আসতে চাইছিল না স্ত্রী। কিন্তু এক পর্যায়ে ভালোবাসার প্রতারণার জালে আটকে যায় মহিলা। মোসলেহুদ্দীন তাকে জানায়, যে লোকটি তাকে বিশ আশরাফী দিয়ে গিয়েছিল, তাকে খুঁজছে সে। খানিক পর ঘুমিয়ে পড়ে স্ত্রী। সে রাতের জন্য মোসলেহুদ্দীন তার চাকরদের ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। ঘরময় স্তব্ধতা বিরাজ করছে, যেমনটি অতীতে কখনো দেখা যায়নি। মোসলেহুদ্দীন স্ত্রীর কক্ষে শুয়ে থাকেন দীর্ঘক্ষণ। তারপর উঠে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান।

মধ্যরাত। মোসলেহুদ্দীনের ঘরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এক ব্যক্তি। তার কাঁধের উপর চড়ে বসে একজন। দু'জনকে সিঁড়ি বানিয়ে দেয়াল টপকে ভেতরে লাফিয়ে পড়ে তৃতীয় একজন। ভেতর থেকে প্রধান ফটক খুলে দেয় সে। ভেতরে ঢুকে পড়ে তার সঙ্গীদ্বয়।

প্রহরার জন্য একটি কুকুর আছে মোসলেহুদ্দীনের ঘরে। প্রতিরাতেই ছাড়া থাকে কুকুরটি। কিন্তু আজ রশি দিয়ে বাঁধা। সম্ভবত চাকররা যাওয়ার সময় কুকুরটি ছেড়ে যেতে ভুলে গেছে।

ঘোর অন্ধকার। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলছে তিনজন। একজনের পিছনে আরেকজন। তার পিছনে অপরজন। মোসলেহুদ্দীনের স্ত্রীর (যার নাম ফাতেমা) কক্ষের দরজায় করাঘাত করে একজন। দরজা খুলে যায়। অন্ধকার। ভিতরে ঢুকে পড়ে তিনজন। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মহিলার খাটের কাছে চলে যায় তারা। ফাতেমার মুখে হাত পড়ে একজনের। চোখ খুলে যায় তার। মনে করেছিল স্বামী মোসলেহুদ্দীনের হাত। জাগ্রত হয়েই হাতটা ধরে ফেলে ফাতেমা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

জবাবে একজন একটি কাপড় গুঁজে দিলো তার মুখের মধ্যে। সাথে সাথে লোকগুলো ঝাঁপটে ধরে ফাতেমাকে। আরেকটি কাপড় কষে চোখ-মুখ বেঁধে ফেলে আরেকজন। একটি বস্তা বের করে মুখ মেলে ধরে একজন। অপর দু'জন হাত-পা বেঁধে বস্তার ভেতর ভরে ফেলে ফাতেমাকে। রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে বস্তার মুখ। দু'জন বস্তাটি কাঁধে তুলে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ঘটনার সময়ে ঘরে কোন চাকর ছিল না। দাসীরাও সব ছুটিতে। সামান্য দূরে গাছের সাথে বাঁধা ছিল তিনটি ঘোড়া। লোক তিনজন চড়ে বসে ঘোড়ার পিঠে।

বস্তাটি নিজের সম্মুখে রেখে নেয় একজন। কায়রো থেকে বেরিয়ে ইস্কান্দারিয়া অভিমুখে রওনা হয় ঘোড়া তিনটি, ফিরে আসেন মোসলেহুদ্দীনও।

সকালবেলা চাকর-চাকরানীরা ফিরে আসে। ফাতেমাকে তালাশ করে মোসলেহুদ্দীন। দু'জন চাকরানী খোঁজাখোঁজি করে এসে জানায়, তিনি ঘরে নেই। কোথায় গেল ফতেমা? শুরু হয় তল্লাশী। কিন্তু বাড়ীময় তন্নতন্ন করে খুঁজে- পেতেও পাওয়া গেল না মোসলেহুদ্দীনের প্রথমা স্ত্রী ফাতেমাকে।

এক চাকরানীকে নির্জনে নিয়ে যায় মোসলেহুদ্দীন। দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তার সাথে। তারপর তাকে সাথে নিয়ে চলে যান গিয়াস বিলবিসের কাছে। মোসলেহুদ্দীন গিয়াস বিলবিসকে জানায়, গত রাতে আমার স্ত্রী নিখোঁজ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, ফাতেমাই খিজরুল হায়াতকে হত্যা করিয়েছে এবং খিজির মৃত্যুর সময় হাতের আঙ্গুল দ্বারা যে মোসলেহ শব্দটি লিখেছিলেন, সেটি মূলত তিনি মোসলেহুদ্দীনের স্ত্রী লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাকে বাকীটুকু লিখতে দেয়নি। তার প্রমাণস্বরূপ মোসলেহুদ্দীন সাথে নিয়ে যাওয়া চাকরানীকে পেশ করে। চাকরানী বলে–

'গত পরশু সন্ধ্যায় মুখোশ পরিহিত অপরিচিত এক ব্যক্তি ঘরে এসেছিল। আমার মনিব মোসলেহউদ্দীন তখন ঘরে ছিলেন না। আগন্তুক দরজায় করাঘাত করলে আমি দরজা খুলে দিই। আগন্তুক বলল, আমি ফাতেমার সাথে দেখা করতে চাই। আমি বললাম, ঘরে কোন পুরুষ নেই; এ মুহূর্তে আপনি তার সাথে দেখা করতে পারবেন না। লোকটি বলল, তাকে বলুন, আমি আশরাফীগুলো ফেরত দিতে এসেছি। চুক্তি অনুযায়ী সবগুলো স্বর্ণমুদ্রা না দিলে আমি নেব না। আমি ফাতেমাকে গিয়ে বললে তিনি লোকটিকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যান।

চাকরানী আরো বলে, ম্যাডাম আমাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলেন এবং বলে দেন যে, হঠাৎ কেউ এসে পড়লে আমাকে সংবাদ দিও। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি ভেতরের যে ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ শুনতে পেয়েছি, তাতে লোকটির ক্ষোভ এবং ফাতেমার অনুনয়-বিনয় প্রকাশ পাচ্ছিল। তাদের কথোপকথন থেকে আমি যা বুঝতে পেরেছি, তাহল, আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে হত্যা করবে। বিনিময়ে আমি তোমাকে পঞ্চাশটি আশরাফী আর দু'টুকরা সোনা প্রদান করব। কিন্তু তুমি টার্গেট মিস করেছ। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর পরিবর্তে তুমি খিজরুল হায়াতকে হত্যা করে এসেছ। তাই যা দিলাম, নিয়ে যাও। জবাবে আগন্তুক বলল, আপনি আমাকে পরিষ্কার বলেছিলেন, হাসান ইবনে আবদুল্লাহ অমুক সময় খিজরুল হায়াতের ঘরে যাবেন। আমি আপনারই নির্দেশনা মোতাবেক ওঁৎ পেতে বসে থাকি। ঠিক সময়ে এক ব্যক্তিকে খিজরুল হায়াতের ঘরের দিকে যেতে দেখলাম। গঠন-প্রকৃতি ঠিক হাসান ইবনে আবদুল্লাহরই ন্যায়। আমি তীর ছুঁড়ে

সেখান থেকে পালিয়ে যাই। খুন করার সময় তো অত ভাবা-চিন্তা যায় না।

লোকটি ফাতেমার নিকট থেকে পঞ্চাশ আশরাফী দাবী করেছিল আর ফাতেমা অননুয়-বিনয় করছিলেন। অবশেষে তিনিও চটে গিয়ে বললেন, আসল লোককে খুন করে আসতে পারলে এই বিশ আশরাফী ছাড়া আরো পঞ্চাশ আশরাফী দেব। আর দু'টুকরা সোনাও পাবে। যাও, কাজ করে আস। লোকটি বলল, আমার কাজ আমি করেছি। পূর্ণ পারিশ্রমিক আদায় না করে আজ আমি যাচ্ছি না। কিন্তু ফাতেমা রাজি হলেন না। লোকটি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে একথা বলে চলে যায় যে, দেবেন না! আমার পাওনা আমি উসুল করে ছাড়ব। ফাতেমা আমাকে বলে দেন যে, এই লোকটির আগমনের সংবাদ কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পায়। আমাকে তিনি দু'টি আশরাফী পুরস্কারও দেন। আজ সকালে তার কক্ষে গিয়ে দেখি, তিনি নেই। আমার মনে হয়, লোকটি প্রতিশোধস্বরূপ তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

সব শুনে গিয়াস বিলবিস মোসলেহুদ্দীনকে বাইরে বের করে দিয়ে কঠোর ভাষায় চাকরানীকে জিজ্ঞেস করেন, 'বলো, এই গল্প তোমাকে কে পড়িয়েছে? ফাতেমা না মোসলেহুদ্দীন?'

'কেউ নয়, এ তো আমার চোখের দেখা ঘটনা।' চাকরানী জবাব দেয়।

'সত্য বল, ফাতেমা কোথায়? কার সাথে গেছে সে?'

চাকরানী ভয় পেয়ে যায়। সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারল না সে। বিলবিস বললেন, 'বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যেতে চাও? আজ তুমি ফিরে যেতে পারবে না।'

চাকরানী গরীব-অসহায় এক মহিলা। তার জানা ছিল, বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে গেলে সত্য-মিথ্যা আলগা হয়ে যায়। তার আগে পৃথক হয়ে যায় দেহের জোড়া। মহিলা কেঁদে ফেলে। বলে, এখন আমার উপায় কি? সত্য বললে মনিবের শাস্তি ভোগ করতে হবে আর মিথ্যা বললে সাজা ভোগ করতে হবে আমার। হায় এখন আমি কি করি!

বিলবিস চাকরানীকে সাহস দেন এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। চাকরানী বলল, 'হত্যার ঘটনার দ্বিতীয় দিন মুখোশ পরিহিত এক ব্যক্তি আমার মনিবের ঘরে এসেছিল। মনিব মোসলেহুদ্দীন তখন ঘরে ছিলেন না। আগন্তুক ফাতেমাকে ডেকে পাঠায়। লোকটি সদর দরজার বাইরে আর ফাতেমা ভেতরে। দু'জনের মধ্যে কথা হয়। কিন্তু কি কথা হয়েছে আমরা তা শুনতে পাইনি। আগন্তুক চলে গেলে ফাতেমা কক্ষে ফিরে আসেন। হাতে তার ছোট্ট একটি থলে। ফাতেমা কক্ষে ফেরেন অবনত মস্তকে। পরদিন সন্ধ্যায় মনিব সব চাকর-চাকরানী ও সহিসকে পুরো রাতের জন্য ছুটি দিয়ে দেন।'

'আচ্ছা, এর আগে কি কখনো সব চাকর-চাকরানীকে এভাবে একত্রে ছুটি দেয়া হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করেন বিলবিস।

'না। ইতিপূর্বে একজনের অধিক দু'জনকে কখনো একত্রে ছুটি দেয়া হয়নি।' খানিক ভেবে চাকরানী বলল, 'মজার ব্যাপার হল, সবাইকে ছুটি দিয়ে মনিব বললেন, কুকুরটা আজ রাতে বাঁধা থাকবে। অথচ এর আগে কুকুর প্রতিরাতে ছাড়া থাকত। বড় তেজস্বী কুকুর। অপরিচিত কাউকে দেখলেই হামলে পড়ে সাথে সাথে।'

'ফাতেমার সাথে মোসলেহুদ্দীনের সম্পর্ক কিরূপ ছিল?' প্রশ্ন করেন বিলবিস।

'বড় তিক্ত। অল্প ক'দিন আগে সাহেব অপরূপ সুন্দরী এক যুবতীকে ঘরে এনেছেন। এই মেয়েটি সাহেবকে গোলামে পরিণত করে ফেলেছে। ফাতেমার সাথে সাহেবের কথাবার্তাও বন্ধ ছিল।' চাকরানী বলল।

গিয়াস বিলবিস চাকরানীকে আলগ বসিয়ে রেখে মোসলেহুদ্দীনকে ভেতরে ডেকে পাঠান। নিজে বাইরে বের হয়ে যান এবং মুহূর্ত পর দু'জন সিপাহী নিয়ে ফিরে আসেন। সিপাহীরা মোসলেহুদ্দীনের দু'বাহুতে ধরে টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যেতে শুরু করে। মোসলেহুদ্দীন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিলবিস 'একে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখ' নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে যান। তার দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল, মোসলেহুদ্দীনের ঘর ঘেরাও করে রাখ, যাতে কেউ বেরিয়ে যেতে না পারে।

✿ ✿ ✿

কায়রোর উত্তরে বহু দূরে সবুজ-শ্যামল মনোরম একটি স্থান। চারদিকে উঁচু উঁচু টিলা। ফাতেমা সূর্যোদয়ের আগেই পৌঁছে গেছে সেখানে। অপহরণকারীদের ঘোড়া থেমে গেছে। ফাতেমাকে বের করা হয়েছে বস্তা থেকে। মুখের কাপড় সরিয়ে দেয়া হল, খুলে দেয়া হল হাত-পায়ের বাঁধন। তিন মুখোশধারীর কবলে অচেতন পড়ে আছে মহিলা।

অল্প সময়ের মধ্যে চৈতন্য ফিরে আসে ফাতেমার। চীৎকার জুড়ে দেয় সে। মুখোশধারীরা তাকে খাবার খেতে দেয়। কাঁপা হাতে একটু একটু করে খাদ্য মুখে দেয় ফাতেমা। পানি পান করে। আস্তে আস্তে চাঙ্গা হয়ে উঠে, দেহের শক্তি ফিরে আসে। হঠাৎ ফাতেমা উঠে দাঁড়ায় এবং দৌড় দেয় সামনের দিকে। মুখোশধারীরা কিছুই বলছে না। বসে বসে তামাশা দেখছে তারা। খানিক দূরে গিয়ে একটি টিলার আড়ালে চলে যায় ফাতেমা।

এবার ঘোড়ায় চড়ে বসে এক মুখোশধারী। ঘোড়া হাঁকায় এবং ছুটে গিয়ে ফাতেমাকে ধরে ফেলে। দৌড়ে দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ফাতেমা। অবসন্ন দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। মুখোশধারী আরোহী তাকে ঘোড়ায় তুলে নেয় এবং নিজে তার পেছনে বসে ঘোড়া হাঁকিয়ে সাথীদের নিকট ফিরে যায়।

'পালাবে? পালিয়ে যাবে কদ্দূর? এখান থেকে পালিয়ে কায়রো পৌঁছা একজন বলিষ্ঠ সুপুরুষের পক্ষেও তো সম্ভব নয়।' শান্ত কণ্ঠে বলল অপহরণকারীদের একজন।

ফাতেমা কাঁদছে, চীৎকার করছে, বকাবকি করছে। আরেকজন বলল, আমরা যদি তোমাকে কায়রো ফিরিয়ে নিয়েও যাই, তবু তোমার রেহাই নেই। তোমার স্বামীই তোমাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

'মিথ্যে কথা।' চীৎকার করে বলল ফাতেমা।

'না, সত্যি বলছি। আমরা তোমাকে পারিশ্রমিক হিসেবে এনেছি। তুমি আমাকে চিনতে পারনি। ঐ যে একজন লোক তোমার হাতে বিশ আশরাফীর একটি থলে দিয়ে এসেছিল, আমি সেই লোক। তুমি তোমার স্বামীকে বলে ফেলেছ যে, সে-ই খিজরুল হায়াতের খুনী। বোকামীবশত তুমি এও বলেছ যে, তুমি কোতোয়ালকে ঘটনাটা বলে দেবে। লোকটি তোমার প্রতি পূর্ব থেকেই অতিষ্ঠ ছিল। তার মন-মেজাজ, প্রেম-ভালোবাসা সব কব্জা করে রেখেছে তার রক্ষিতা। মেয়েটি কে, কোত্থেকে এসেছে এবং কেনই বা এসেছে, তা আমি বলতে পারব না। পরদিন তোমার স্বামী আমাদের আস্তানায় আসে। লোকটা এতই বেঈমান যে, খিজরুল হায়াতের হত্যার বিনিময়ে তার আমাদেরকে পঞ্চাশ আশরাফী আর দু'টুকরা সোনা দেয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু যখন কাজ হয়ে গেল, পাঠালো মাত্র বিশ আশরাফী। আমি তোমাকে কাজে লাগালাম। আশরাফীগুলো তোমার হাতে ফেরত দিয়ে এলাম, যাতে রহস্যটা তোমারও জানা হয়ে যায়। আমাদের তীর ঠিক জায়গায় আঘাত হানে। পরদিন আমাদের আস্তানায় এসে সে দিল পঞ্চাশ আশরাফী। সোনার টুকরা দু'টির খবর নেই। আমার এই সাথীরা বলল, ওয়াদা যা ছিল, এখন আমরা তার চেয়েও বেশী আদায় করে ছাড়ব। না দিলে যে করে হোক, কোতোয়ালের কাছে সব ফাঁস করে দেব।

যা হোক, এবার তোমার স্বামীর মনে আশংকা জাগল যে, সে-ই যে খিজরুল হায়াতের ঘাতক, তুমিও তা জেনে ফেলেছ। উভয় সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে তিনি তোমাকে আমাদের হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাবলেন, আমরা যদি তোমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাই, তাহলে আমাদের দাবী-দাওয়ার দায় থেকেও তিনি বেঁচে গেলেন, আর তুমি যে তার পথের কাঁটা, তাও সরে গেল। তারই পরিণতিতে তুমি এখন এখানে।

কাঁদতে কাঁদতে ফাতেমার চোখের অশ্রু শুকিয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার এই কাহিনী শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে মহিলা। বিস্ফারিত নয়নে এক এক করে তাকাতে থাকে মুখোশধারী অপহরণকারীদের প্রতি। অপহরণকারীরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, তোমার অস্থিরতা, কান্না বা পলায়ন চেষ্টা সবই বেকার।

'আমি তোমাকে আগেই দেখেছিলাম। মোসলেহুদ্দীন যখন বললেন, ঠিক আছে, শ্রমের বিনিময়ে তোমরা ফাতেমাকে তুলে নিয়ে যাও, আমি তখন তোমার মূল্য পরিমাপ করলাম। ভাবলাম, তুমি রূপসী যুবতী। আমি তোমাকে চড়া দামে বিক্রি করতে পারব। তার প্রস্তাব মেনে নিলাম। তিনি আমাদের জানালেন, রাতে তার ঘরে কোন চাকর থাকবে না, কুকুরটাও বাঁধা থাকবে। তবে ঘরের সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকবে। আমরা তিনজন পরস্পরের কাঁধে দাঁড়িয়ে দেয়াল টপকে ঘরে প্রবেশ করি। খঞ্জর হাতে অতি সাবধানে আমি তোমার কক্ষের দিকে এগিয়ে যাই। তোমার স্বামীর প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আশংকা ছিল, ফাঁদে ফেলে তিনি আমাদের খুন করাতে পারেন। কিন্তু আমরা পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার পেয়েছি। নিরাপদে আমরা তোমাকে তুলে নিয়ে এলাম।' বলল অপহরণকারীদের একজন।

'তুমি নিশ্চিত থাক, আমরা তোমার সম্ভ্রমে হাত দেব না। আমরা ব্যবসায়ী। ভাড়ায় খুন আর অপহরণ করে দেয়া আমাদের পেশা। তোমার গায়ে হাত দেয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই। তিনজন পুরুষ একজন নারীকে অপহরণ করে এনে বেকায়দায় ফেলে উপভোগ করা কোন গৌরবের বিষয় নয়।' বলল আরেকজন।

'তোমরা আমাকে ইস্কান্দারিয়ার বাজারে নিয়ে বিক্রি করে ফেলবে? আহ! এখন বুঝি আমাকে ইজ্জত বিক্রি করে বেড়াতে হবে।' কাঁদো কাঁদো করুণ কণ্ঠে বলল ফাতেমা।

'না, দেহ ব্যবসা করানোর জন্য জংলী ও যাযাবর মেয়েদের ক্রয় করা হয়। তুমি তো হেরেমের সম্পদ। বিক্রিত হয়ে তুমি সম্ভ্রান্ত কোন আমীরের ঘরে চলে যাবে। আমাদের উপযুক্ত মূল্য প্রয়োজন। আমরা তোমাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলব না। তুমি কান্নাকাটি-দুশ্চিন্তা বাদ দাও, তোমার চেহারার জৌলুস ফিরে আসুক। অন্যথায় বেশ্যাবৃত্তিই কপালে জুটবে। যাও শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।' বলল আরেকজন।

✿ ✿ ✿

ফাতেমা শুয়ে পড়ে। অপহরণকারীরা কোন অসদাচরণ করছে না দেখে ফাতেমার মনে খানিকটা স্বস্তি ফিরে আসে। শোয়া মাত্র দু'চোখের পাতা বুজে আসে তার।

অল্পক্ষণ পরই হঠাৎ ফাতেমার চোখ খুলে যায়। দেখে অপহরণকারী তিনজন ঘুমিয়ে আছে। ফাতেমা প্রথমে ভাবে, কারো একটি খঞ্জর তুলে নিয়ে তিনজনকেই খুন করে ফেলি। কিন্তু তার অত সাহস হল না। তিনজন পুরুষকে একসাথে হত্যা করা একজন নারীর পক্ষে সহজ নয়। ঘোড়াগুলোর প্রতি তাকায় ফাতেমা। সব ক'টি ঘোড়ায় জিন বাঁধা। ফাতেমা উঠে দাঁড়ায়। পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ঘোড়ারগুলোর নিকটে। টিলার পেছনে আড়াল হয়ে যাচ্ছে সূর্য। ফাতেমা জানে না কায়রো এখান থেকে কোন্দিকে এবং কতদূর। কিন্তু তবুও তার পালাতে হবে।

অপহরণকারীদের হাতে জীবন বিপন্ন করা অপেক্ষা বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে জীবন হারানো শ্রেয় ফাতেমার কাছে।

ফাতেমা জিনকষা একটি ঘোড়ায় চড়ে বসে। ঘোড়া হাঁকায় দ্রুত। ধাবমান ঘোড়ার খুরধ্বনী জাগিয়ে তোলে ঘুমন্ত অপহরণকারীদের। ফাতেমাকে ঘোড়া হাঁকিয়ে টিলার দিকে যেতে দেখে ফেলেছে তারা। দু'জন চড়ে বসে দু'টি ঘোড়ায়। ঘোড়া হাঁকায়।

পর্বতঘেরা বন্দীদশা থেকে কিভাবে বের হতে হয় ফাতেমার তা জানা নেই। যে পথে সে এগিয়ে চলে, সে পথে বের হওয়ার সুযোগ নেই। মাথায় পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি টিলা। টিলা পর্যন্ত পৌঁছে যায় ফাতেমা। পিছনে ফিরে দেখে ধাওয়াকারীরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ফাতেমা টিলার উপর উঠিয়ে দেয় ঘোড়াটি। শক্ত-সামর্থ ঘোড়া টিলা অতিক্রম করে নেমে যায় অপরদিকে। একদিকে মোড় ঘুরিয়েই পথ পেয়ে যায় ফাতেমা। ধাওয়াকারীরাও পৌঁছে যায় তার অতি নিকটে। ব্যবধান কমে আসছে ধীরে ধীরে। সম্মুখে সমুদ্রের ন্যায় বিশাল-বিস্তীর্ণ মরুভূমি চোখে পড়ে ফাতেমার। সেই মরুপথ অতিক্রম করে তারই দিকে এগিয়ে আসছে চারটি উষ্ট্রারোহী। ফাতেমা সর্বশক্তি দিয়ে চীৎকার করতে শুরু করে- 'বাঁচাও! ডাকাতের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।' ফাতেমার নিকটে চলে আসে চার উষ্ট্রারোহী।

উষ্ট্রারোহীদের দেখে পেছন থেকে ঘোড়ার গতি হ্রাস করে ধাওয়াকারী অশ্বারোহীরা। ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে পালাতে উদ্যত হয় তারা। উষ্ট্রারোহীরা ধাওয়া করতে শুরু করে তাদের। তীর ছুঁড়ে একজন। একটি ঘোড়ার ঘাড়ে গিয়ে বিদ্ধ হয় তীর। ব্যাথায় কুঁকিয়ে উঠে ঘোড়া। ছুটাছুটি করতে থাকে এলোপাতাড়ি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে আরোহী। লাফিয়ে পড়ে যায় মাটিতে। পালাবার চেষ্টা করে অপরজন। থামতে নির্দেশ দেয় উষ্ট্রারোহীরা। ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে যায় অশ্বারোহী। দু'জনকে ধরে ফেলে উষ্ট্রারোহীরা। ফাতেমার দেয়া তথ্য অনুযায়ী ধরে আনা হয় তৃতীয়জনকেও।

এরা চারজন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর টহল বাহিনীর সৈনিক। শত্রুরা যাতে হঠাৎ করে আক্রমণ করতে না পারে এবং খৃস্টান সন্ত্রাসীরা যাতে মিসরে ঢুকতে না পারে, তার জন্য সমগ্র মরু এলাকায় টহলের ব্যবস্থা করে রেখেছেন আইউবী। সম্প্রতি তাদের হাতে ধরাও পড়েছে বেশ ক'জন সন্দেহভাজন। এবার তাদের ফাঁদে আটকা পড়ে তিন মুখোশধারী অপহরণকারী।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈন্যদের কাছে বৃত্তান্ত শোনায় ফাতেমা। আরো জানায়, মিসরের রাজকোষের পরিচালক, সুলতানের একান্ত আস্থাভাজন খিজরুল হায়াত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। নগর প্রশাসক মোসলেহুদ্দীন সে হত্যার নেপথ্য নায়ক। আমি তার স্ত্রী ফাতেমা। এ তিনজনের একজন তার ঘাতক।

ধৃতদের থেকে খঞ্জর নিয়ে নেয়া হয়। পিঠমোড়া করে বাঁধা হয় তাদের। তাদের তিন ঘোড়ার একটি পালিয়ে যায় তীরের আঘাত খেয়ে। তাই এবার দু'টির একটিতে দু'জন, অপরটিতে একজনকে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কমান্ডারের নিকট। চার মাইল পথ অতিক্রম করে সূর্যাস্তের আগে আগে তারা পৌঁছে যায় ক্যাম্পে। খর্জুর-বীথিবেষ্টিত এ এলাকায় টহল বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। কমান্ডারের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় ফাতেমাকে। সেনা প্রহরায় বসিয়ে রাখা হয় মুখোশধারী আসামীদের। আগামী দিন কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হবে তাদের।

❁ ❁ ❁

কার্কে বসে বসে সালাহুদ্দীন আইউবীর অপেক্ষা করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে খৃস্টানরা। নবউদ্যমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তাদের সেনাবাহিনী। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈন্যদের পথেই প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি গ্রহণের দায়িত্ব পড়েছে ফ্রান্সের সৈন্যদের উপর। মুসলিম বাহিনীর উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার দায়িত্ব ন্যাস্ত হয় রেমন্ডের বাহিনীর উপর। কার্ক দুর্গ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব জার্মানীর সেনাদের। এখন নতুন করে তাদের সঙ্গে যুক্ত করা হল ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের কিছু সৈন্যকে। গোয়েন্দা বিভাগ তাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নতুন বাহিনী প্রস্তুত করছেন। খৃস্টান শাসকমণ্ডলী চেয়েছিল, তাদের সৈন্যরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালিয়ে পেছনে সরে আসবে। কিন্তু তাতে দ্বিমত পোষণ করে তাদের গোয়েন্দা বিভাগ। গোয়েন্দা বিভাগের যুক্তি হল, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তার প্রতিরক্ষাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে রেখেছেন। তার একটি হল টহল বাহিনী। তাছাড়া তার নিজের নিরাপত্তা রক্ষীদের একটি দল দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। মরুভূমিতে কিছু একটা নড়াচড়া করতে দেখলেও নিকটে গিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এসব শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে সুলতানের ক্যাম্পে আক্রমণের পরিকল্পনা থেকে সরে আসে খৃস্টানরা।

এক আমেরিকান লেখক এন্টেনী ওয়েস্ট বিভিন্ন ঐতিহাসিকের উদৃতি উল্লেখ করে লিখেছেন, খৃস্টানদের কাছে সৈন্য ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈন্য অপেক্ষা চারগুণ বেশী। তন্মধ্যে বর্মধারী পদাতিক এবং অশ্বারোহী-উষ্ট্রারোহী সৈন্য ছিল বিপুল। এতগুলো সৈন্য সরাসরি আক্রমণ করলেও মুসলমানদের বেশী সময় টিকে থাকতে পারার কথা ছিল না। কিন্তু শোবকের শোচনীয় পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতিতে তারা ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। এন্টনী ওয়েস্ট আরো লিখেছেন যে, খৃস্টান বাহিনীটি ছিল বিভিন্ন রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনী, যারা বাহ্যত ছিল ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু মুসলমানদের নির্মূল করার ইস্যুতে তারা একমত হলেও কমান্ডার- অধিনায়কগণের মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা

দখল ও নিজ নিজ রাজ্যের সম্প্রসারণ। ফলে কার্যত তাদের শক্তি ছিল বহুধা বিভক্ত।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, খৃস্টানরা ছিল ষড়যন্ত্র আর নাশকতার ওস্তাদ। মুসলমানদের কোন ভূখণ্ড দখল করে নিলে সেখানে তারা গণহত্যা আর নারীর সম্ভ্রমহানীর মহড়া শুরু করে দিত। পক্ষান্তরে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী প্রেম-ভালোবাসা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা শত্রুর মন জয় করে নিতেন। তাছাড়া নিজের সৈনিকদের তিনি এমনভাবে গঠন করে নিয়েছিলেন যে, মাত্র দশজন সৈনিকের একটি গেরিলা দল খৃস্টানদের এক হাজার সৈনিকের ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে সব তছনছ করে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে যেত। নিজের জীবন বিসর্জন দেয়াকে তারা সামান্য কুরবানী মনে করত। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যুদ্ধের ময়দানে তার স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে এমনভাবে পরিচালনা করতেন যে, প্রতিপক্ষের বিশাল বাহিনী তাদের কাছে অসহায় হয়ে পড়ত। শোবক জয়ের লড়াইয়েও তিনি তার সেই বিচক্ষণতার প্রদর্শন করেছিলেন। এসব বিবেচনা করেই খৃস্টানরা সরাসরি আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করে এবং বিকল্প কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু সেই কৌশলও কতটুকু সুফল বয়ে আনবে, তাতেও তারা ছিল সন্দিহান। তাই নিরুপায় হয়ে তারা মিসরে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করার এবং মিসর আক্রমণ করার জন্য সুদানীদের উস্কানি দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে।

মিসরের নগর প্রশাসক মোসলেহুদ্দীনের পক্ষ থেকে একের পর এক আশাব্যঞ্জক রিপোর্ট পাচ্ছিল কার্কের খৃস্টানরা। এখনও তারা এই সংবাদ পায়নি যে, মিসরের রাজকোষের পরিচালক খিজরুল হায়াত নিহত হয়েছেন এবং এ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য নায়ক অভিযোগে মোসলেহুদ্দীনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কার্ক পর্যন্ত এ সংবাদ পৌঁছতে সময়ের প্রয়োজন অন্তত পনের দিন। কারণ, মিসর-কার্ক যাতায়াতের সোজা পথ এখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দখলে। মিসর থেকে কার্ক যেতে বহুদূর পথ ঘুরে যেতে হবে দূতের। যে রাতে মোসলেহুদ্দীনের স্ত্রী ফাতেমা অপহৃত হয়েছিল, বহু সময় ব্যয়ে এক দূত সে রাতে সংবাদ নিয়ে কার্ক পৌঁছে। দূত রিপোর্ট দেয় যে, মিসরে বিদ্রোহ করার পরিবেশ এখন অনুকূল, কিন্তু সুদানীরা এখনও হামলা করার জন্য প্রস্তুত নয়। তাদের ঘোড়ার অভাব। উট আছে অনেক। আরো অন্তত পাঁচশ' উন্নত ঘোড়া না হলে তারা সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। জিনও প্রয়োজন সমানসংখ্যক।

তিন-চার দিনের মধ্যে পাঁচশ' জিন ও ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেয় খৃস্টানরা। এগুলোকে এমন পথে রওনা করান হয়, যে পথ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, এ পথে গেলে ধরা পড়ার কোন আশংকা নেই। মিসর থেকে আগত দূতই পথ দেখিয়ে

নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াগুলো। লোকটি সুদানী। গুপ্তচরবৃত্তি করছে তিন বছর ধরে। ঘোড়ার সাথে আছে আটজন খৃস্টান সেনা অফিসার। সুদানী হামলার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যাচ্ছে তারা। তাদের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে, সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈন্যদের এখান থেকে বের হতে দেয়া হবে না।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী শুধু এতটুকু জানতেন যে, মিসরের পরিস্থিতি ভালো নয়। অবস্থা যে এত নাজুক ও বিস্ফোরন্মুখ, তা তিনি জানতেন না। আলী বিন সুফিয়ান তাকে আশ্বস্ত করে রেখেছিলেন যে. গুপ্তচরবৃত্তির এমন জাল তিনি বিছিয়ে রেখেছেন, অঘটন ঘটার আগেই তিনি সব খবর পেয়ে যাবেন। খিজরুল হায়াতের হত্যাকাণ্ড ও মোসলেহুদ্দীনের সংবাদ তিনি জানতেন না। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে সংবাদ দেয়ার জন্য গিয়াস বিলবিসকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি বললেন, আগে তদন্ত সম্পন্ন করে নেই; সুলতানকে সংবাদ দেব পরে।

❁ ❁ ❁

টহল বাহিনীর কমান্ডার ফাতেমাকে রাতে আলাদা এক তাঁবুতে থাকতে দেয়। রাতের শেষ প্রহরে তাকে ও তিন অপহরণকারীকে আটজন রক্ষীর সাথে রওনা করা হয় কায়রো। সূর্যাস্তের পর এ কাফেলা কায়রো গিয়ে পৌঁছে এবং চলে যায় সোজা গিয়াস বিলবিসের দপ্তরে।

গিয়াস বিলবিস খিজরুল হায়াত ও ফাতেমার অপহরণ ঘটনার তদন্তে ব্যস্ত। তিনি মোসলেহুদ্দীনের ঘরে তল্লাশী চালান এবং তার রক্ষীতাকে তুলে নিয়ে আসেন। রক্ষীতা নিজেকে উজবেক মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। বিলবিসের চোখে ধুলো দেয়ার চেষ্টা করে মেয়েটি। বিলবিস মেয়েটিকে সেই কক্ষটির খানিক ঝলক প্রদর্শন করেন, যেখানে বড় বড় পাষাণহৃদয় পুরুষও মনের সব ভেদ উদগীরণ করে দেয়। ফলে নিজের আসল পরিচয় ফাঁস করে দেয় মেয়েটি। স্বীকার করে, আমি খৃস্টান, এসেছি জেরুজালেম থেকে। পাশাপাশি মেয়েটি গিয়াস বিলবিসকে নিজের দেহ ও সম্পদের লোভ দেখাতে শুরু করে।

তল্লাশী চালিয়ে মোসলেহুদ্দীনের ঘরে যেসব সম্পদ পাওয়া গেল, তা রীতিমত ভাবিয়ে তুলল গিয়াস বিলবিসকে। মোসলেহুদ্দীন কেন খৃস্টানদের ফাঁদে আটকে গেল বুঝে ফেললেন তিনি। স্বয়ং তার রক্ষীতা মেয়েটি এতই চিত্তাকর্ষক ও বাকপটু যে, তাকে উপেক্ষা করতে হলে প্রয়োজন সুকঠিন ও নিষ্কম্প ঈমান।

বিলবিস উপলব্ধি করলেন, এ সুদূরপ্রসারী এক ষড়যন্ত্র, যা নিয়ন্ত্রিত হয় জেরুজালেম থেকে। তিনি মেয়েটিকে বললেন, মনের সব কথা বলে দাও; কিছুই গোপন রাখার চেষ্টা কর না। জবাবে মেয়েটি বলল, 'যা বলা সম্ভব ছিল, বলেছি; আর সম্ভব নয়। আমি ক্রুশের সাথে প্রতারণা করতে পারি না। ক্রুশে হাত রেখে আমি শপথ

নিয়েছি, দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনে জীবন দিয়ে দেব, তবুও নিজের জাতি ও ধর্মের সাথে বেঈমানী করব না। আমার বলা এ পর্যন্তই শেষ। এবার আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। মুক্তি দিয়ে যদি আমাকে জেরুজালেম কিংবা কার্ক পৌছিয়ে দেন, তবে আপনি যা চাইবেন, আমি তা-ই প্রদান করব। মোসলেহুদ্দীন আপনার হাতে বন্দী আছে। তাকে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নিতে পারেন। তিনি আপনাদেরই ভাই। হয়তো তিনি সব বলে দেবেন।'

বিলবিস মেয়েটিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। চলে যান মোসলেহুদ্দীনের নিকট। বড় শোচনীয় অবস্থায় আছে মোসলেহুদ্দীন। দু'বাহুতে রশি বেঁধে ছাদের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। গিয়াস বিলবিস গিয়েই বললেন, 'দোস্ত মোসলেহ! যা জিজ্ঞেস করি, সত্য সত্য বলে দাও। বল, তোমার স্ত্রী কোথায়? তাকে কাকে দিয়ে অপহরণ করিয়েছ? তোমায় আরো অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তোমার রক্ষিতা তার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে।'

'আমার বাঁধন খুলে দে নরাধম! আমীরে মেসের আসুন, আমি তোরও একই পরিণতি ঘটাব বলে রাখছি।' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে দাঁত কড়মড় করে বলল মোসলেহুদ্দীন।

ঠিক এমন সময় বিলবিসের এক আমলা তার কানে কানে কি যেন বলল। চমকে উঠেন বিলবিস। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করে দৌড়ে উপরে চলে যান। কক্ষে বসা আছে হত্যার অভিযোগে ধৃত মোসলেহুদ্দীনের স্ত্রী ফাতেমা এবং তাকে অপহরণকারী তিন ব্যক্তি। নিজে কিভাবে অপহৃত হল এবং কিভাবে অপহরণকারীরা ধরা পড়ল, ফাতেমা তার বিবরণ দেয় গিয়াস বিলবিসের নিকট।

বিলবিস ফাতেমা ও তিন আসামীকে পাতাল কক্ষে নিয়ে মোসলেহুদ্দীনের সম্মুখে উপস্থিত করান। তাদের দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলে মোসলেহুদ্দীন। বিলবিস জিজ্ঞেস করেন, 'বল, এদের মধ্যে খিজরুল হায়াতের ঘাতক কে?' কথা বলে না মোসলেহুদ্দীন। কথাটি তিনবার জিজ্ঞেস করেন বিলবিস। মোসলেহুদ্দীন তারপরও নীরব। পাতাল কক্ষের এক ব্যক্তিকে ইশারা দেন বিলবিস। এগিয়ে এসে ঝুলন্ত মোসলেহুদ্দীনের কোমর জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ে লোকটি। সুঠাম-সুদেহী লোকটির দেহের সম্পূর্ণ ওজন চাপ ফেলে মোসলেহুদ্দীনের দু'বাহুতে। রশিবাঁধা বাহু দু'টো ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় মোসলেহুদ্দীনের। প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকিয়ে চীৎকার করে উঠে মোসলেহুদ্দীন বলল, 'মাঝের জন'। তিনজনকে মোসলেহুদ্দীনের নিকট থেকে সরিয়ে নিয়ে যান বিলবিস। বলেন, এবার সব ঘটনা খুলে বল্, অন্যথায় এখান থেকে কেউ জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবি না।

আপোসে পরামর্শ করে তারা সব বলে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। বিলবিস আলাদা আলাদা কক্ষে পাঠিয়ে দেন তাদের। ফাতেমাকে নিয়ে যান উপরে। ফাতেমা জানায়,

তার মা সুদানী, পিতা মিসরী। তিন বছর আগে সে পিতার সাথে মিসর এসেছিল। নজরে পড়ে মোসলেহুদ্দীনের। তিনি পিতার নিকট লোক পাঠান। মূল্য কত নির্ধারণ হয়েছিল তা জানে না ফাতেমা। মোসলেহুদ্দীনের ঘরে মেয়েকে রেখে যায় পিতা, হাতে করে নিয়ে যান একটি থলে। একজন মৌলভী ও কয়েকজন লোক ডেকে বিয়ে পড়িয়ে নেন মোসলেহুদ্দীন। মোসলেহুদ্দীনকে প্রাণভরে ভালোবাসত ফাতেমা। এই তিন বছরের দাম্পত্য জীবনে কখনো স্বামীর প্রতি ফতেমার সন্দেহ হয়নি যে, লোকটি এত বাজে। মোসলেহুদ্দীন মদ্যপান করত না। তার ঘরের বাইরের তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই জানত না ফাতেমা।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শোবক চলে যাওয়ার পরপর পাল্টে যায় মোসলেহুদ্দীন। গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে কাটাতে শুরু করে। এক রাতে ফাতেমা দেখতে পায় যে, স্বামী তার আজ মদ খেয়ে এসেছে। ফাতেমার পিতাও ছিল মদ্যপ। মদের ঘ্রাণ আর মদ্যপ চিনে সে ভালোভাবে। কিন্তু ভালোবাসার খাতিরে স্বামীর এই অপরাধটুকু সে ক্ষমার চোখে দেখে। তারপর ধীরে ধীরে ঘরে অচেনা লোকদের আনাগোনা শুরু হয়। এক রাতে মোসলেহুদ্দীন আশরাফীভর্তি দু'টি থলে ও কয়েক টুকরা সোনা ফাতেমাকে দেখিয়ে ঘরে রেখে দেয়। আরেক রাতে মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ঘরে এসে ফাতেমাকে বলল, 'যদি মিসরের উত্তরাঞ্চল– যা রোম উপসাগরের তীরের সাথে সংযুক্ত– আমার হাতে এসে যায়, তা তোমার নিকট কেমন লাগবে? নাকি সুদানের সীমান্তবর্তী এলাকাটা নেব? তোমার যেটা পছন্দ হবে, আমি হব তার রাজা আর তুমি হবে রাণী।' ফাতেমা অত বিচক্ষণ নয় যে, এর রহস্য বুঝতে পারে। সে এতটুকুই বুঝে, স্বামীধন তার মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় তো আর এসব কথা তিনি বলেন না।

তারপর একদিন ঘরে নিয়ে আসে অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে। সাথে দু'জন পুরুষ। তখন থেকেই ঘরে থেকে যায় মেয়েটি। বিয়ে-শাদী হয়নি। ফাতেমাকে ঘনিষ্ঠ বানাবার অনেক চেষ্টা করে মেয়েটি। কিন্তু দিন দিন তার প্রতি ঘৃণাই বাড়তে থাকে ফাতেমার। বুক থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে নিল যে মেয়ে, তার সঙ্গে খাতির কিসের! তারপর সংঘটিত হল খিজরুল হায়াতের হত্যার ঘটনা।

✿ ✿ ✿

প্রথম দিকে বিলবিসকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে অপহরণকারীরা। কিন্তু তাদের সোজা পথে নিয়ে আসেন বিলবিস। তিনজন পৃথক পৃথক যে জবানবন্দী পেশ করে, তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, এরা হাশীশী দলের সদস্য। খৃস্টানদের হয়ে মোসলেহুদ্দীনকে হাত করেছে এরাই। বিপুল অর্থ সম্পদ আর একটি সুন্দরী মেয়ে দেয়া হয় মোসলেহুদ্দীনকে। সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সফল হতে

পারলে মিসরের সীমান্ত এলাকায় একটা প্রদেশ গঠন করে দেয়া হবে বলেও তাকে ওয়াদা দেয়া হয়ে। যার শাসন ক্ষমতা থাকবে তার ও এই খৃস্টান মেয়েটির হাতে।

মোসলেহুদ্দীন ধীরে ধীরে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের হাত করতে শুরু করে। কিন্তু অনেকের ব্যাপারে সফল হলেও খিজরুল হায়াতকে বাগে আনতে সক্ষম হল না। অথচ মিশন বাস্তবায়নে রাজকোষের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছিল অপরিহার্য। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একান্ত অনুগত আপোসহীন খিজরুল হায়াতের বর্তমানে যা তার পক্ষে অসম্ভব। রাজকোষের রক্ষীবাহিনীর সকলেই নির্বাচিত জানবাজ সৈনিক। এদের সরিয়ে অনুগত লোকদের নিয়োগ দিতে হবে মোসলেহুদ্দীনের। তার আগে দুনিয়া থেকে সরানো প্রয়োজন খিজরুল হায়াতকে। দু'জন হাশীশী ও বিদ্রোহীদের দ্বারা গঠন করতে হবে এ বাহিনী।

মোসলেহুদ্দীনের তালিকা অনুযায়ী বেশ ক'জন কর্মকর্তাকে হত্যা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ধৃত এই তিন অপহরণকারীর উপর। তারা খৃস্টানদের পক্ষ থেকে এ কাজের পারিশ্রমিক যথারীতি পেয়ে আসছিল। এভাবে ভাড়ায় মানুষ খুন করা ছিল তাদের পেশা। তাই উপরি লাভের জন্যও তারা চেষ্টা করত। এ সূত্রেই অতিরিক্ত পঞ্চাশ আশরাফী ও দু'টুকরা সোনার চুক্তি হয় তাদের মোসলেহুদ্দীনের সাথে। খিজরুল হায়াতের হত্যার পর এ বখশিশ পরিশোধ করার কথা। কিন্তু মোসলেহুদ্দীন তা আদায় করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, পূর্ণ পারিশ্রমিক তো তোমরা পেয়েই আসছ। এর জন্য এত পীড়াপীড়ি করছ কেন? জবাবে মোসলেহুদ্দীনকে হুমকি দেয় ঘাতক দল। মোসলেহুদ্দীন তার স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বলে, নিয়ে যাও, তোমরা একে উপযুক্ত দামে বিক্রি করতে পারবে।

এখনো ছাদের সাথে ঝুলে আছে মোসলেহুদ্দীন। বাঁধন খুলে যখন তাকে নামানো হল, তখন সে অচেতন। তার রক্ষিতা মেয়েটির কক্ষে গিয়ে দেখা গেল, সে পড়ে আছে মৃত। তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলেন, মেয়েটি বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। ছোট্ট একখণ্ড কাপড় পড়ে আছে তার পার্শ্বে। স্পষ্ট বুঝা গেল, এতে কি বাঁধা ছিল, যা লুকানো ছিল তার পোশাকের ভেতর।

দীর্ঘক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে আসে মোসলেহুদ্দীনের। এখনো স্পষ্ট কথা সরছে না তার মুখ দিয়ে। ছানাবড়া চোখে তাকায় সকলের প্রতি। তারপর বিড়ু বিড়ু করে আবোল-তাবোল বলে কি যেন। মুখে ঔষধ দেন ডাক্তার। তবু সুস্থ হচ্ছে না মোসলেহুদ্দীন।

সে রাতেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তির আগমন ঘটে গিয়াস বিলবিসের নিকট। নাম তার যায়নুদ্দীন আলী ইবনে নাজা আল-ওয়ায়েজ। তিনি বিলবিসকে বললেন, শুনতে পেলাম, কয়েকজন গুপ্তচর ও সন্ত্রাসী নাকি ধরা পড়েছে! তাদের নিকট থেকে

তোমরা অনেক তথ্য জানতে পারবে। তবে আমিও তোমাদের কিছু তথ্য দিতে চাই।

পীর-মুরশিদ না হলেও যায়নুদ্দীন ধর্ম, রাজনীতি ও সামাজিক জগতের এক মহান ব্যক্তিত্ব। বড় বড় বহু আমলা-কর্মকর্তা তার শিষ্য। সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে পীরের মত মান্য করে। তিনি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছেন যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও তাঁর সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগে দুশমন ফায়দা হাসিল করছে এবং এত সূক্ষ্মভাবে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে যে, কাউকে ধরা সহজ নয়। প্রাথমিক রিপোর্টের পর যায়নুদ্দীন কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজেই গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করেছেন। সেনাবাহিনীর ছোট-বড় অনেক অফিসার তার মাহফিলে যাওয়া-আসা করত। তাদের থেকেই তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং বেশকিছু কর্মকর্তার নাম-ধাম ও তাদের তৎপরতার খবর সংগ্রহ করেন। যায়নুদ্দীন ব্যক্তিগত উদ্যোগে নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধে এমন একটি দল গঠন করে নিয়েছিলেন, যারা অনেক সূক্ষ্ম তথ্যও সংগ্রহ করে ফেলে।

এক মিসরী ঐতিহাসিক মোহাম্মদ ফরিদ আবু জাদীদ তার 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী' পুস্তকে মিসরের ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের মুখোশ উন্মোচনের নায়ক হিসেবে যায়নুদ্দীন আলীর নাম উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তিন-চারজন ইতিহাসবেত্তার সূত্রও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে যুগের যেসব রচনা এখনো সংরক্ষিত আছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, রাজকোষ পরিচালকের হত্যাকাণ্ডেই খৃস্টানদের এসব ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। যার ক্রীড়নক ছিল এমন কতিপয় মুসলমান, যারা ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একান্ত বিশ্বস্ত।

যা হোক যায়নুদ্দীন আলী বললেন, আমি আরো কয়েকটা দিন আমার গুপ্তচরবৃত্তি চালু রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের সংবাদ শহরে এমনভাবে ছড়িয় পড়েছে যে, এখন তাদের সাথীরা গা-ঢাকা দিয়ে ফেলবে। তিনি গিয়াস বিলবিসকে ষড়যন্ত্রকারীদের নাম-ঠিকানা অবহিত করেন এবং হাসান বিন আবদুল্লাহ সহ তার গ্রুপটিকে গিয়াস বিলবিসের হাতে তুলে দেন।

গিয়াস বিলবিস ও হাসান পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরিস্থিতি সম্পর্কে এখনই সংবাদ দেয়া প্রয়োজন। তার জন্য যায়নুদ্দীন আলীকেই নির্বাচন করা হল এবং বারজন অশ্বারোহীর মোহাফেজ বাহিনীর সাথে সেদিনই তাকে শোবকের উদ্দেশ্যে রওনা করা হল।

❁ ❁ ❁

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শোবক পৌঁছে যায় কাফেলা। যায়নুদ্দীনকে দেখে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যেমন বিস্মিত হন, তেমনি হন আনন্দিত। এই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ব থেকেই তিনি অবহিত ছিলেন। বুকে জড়িয়ে ধরেন একজন অপরজনকে।

যায়নুদ্দীন বললেন, 'আমি ভালো সংবাদ নিয়ে আসিনি। রাজকোষ পরিচালক খিজরুল হায়াত খুন হয়েছেন। নগর প্রশাসক মোসলেহুদ্দীন তার ঘাতক। গিয়াস বিলবিস তাকে গ্রেফতার করে কোতোয়ালীতে আটকে রেখেছেন।'

সংবাদ শুনে বিবর্ণ হয়ে যান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী । যায়নুদ্দীন সুলতানকে সান্ত্বনা দেন এবং মিসরের বর্তমান পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। মিসরে অবস্থানরত সৈন্যদের সম্পর্কে তিনি বললেন, তাদের মধ্যে অস্থিরতা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গুজব রটানো হয়েছে যে, সুলতান শোবক-বিজয়ী সৈন্যদের বিপুল সোনা-রূপা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন এবং তাদের মাঝে খৃস্টান মেয়েদেরকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয়া হয়েছে। মিসরের সৈন্যদের মনে এই ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে যে, বিশাল এক সুদানী বাহিনী মিশর আক্রমণ করতে যাচ্ছে, যার মোকাবেলা করা স্বল্পসংখ্যক মিসরী সৈন্যদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সুদানীরা মিসরী বাহিনীর সব সৈন্যকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে আসছে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীও এমনটিই কামনা করছেন। তাছাড়া এই গুজবও ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী রণাঙ্গনে গুরুতর আহত হয়েছেন এবং তাঁর অবস্থা আশংকাজনক। কমান্ডার তার মন মত কাজ করছে। যায়নুদ্দীন জানান, আপনার আহত হওয়ার সংবাদ এমনভাবে ছড়ানো হয়েছে যে, এ ব্যাপারে মিসরীদের মনে কোন সংশয় নেই। ফলে মোসলেহুদ্দীনের ন্যায় একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি খৃস্টানদের মদদে মিসরকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করার এবং নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

কালবিলম্ব না করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অতি বিচক্ষণ একজন দূতকে ডেকে পাঠান এবং সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর নামে একটি পয়গাম লিখে তাতে মিসরের সঠিক পরিস্থিতির বিবরণ তুলে ধরেন ও সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। পত্রে সুলতান লিখেছেন–

'আমি যদি এখানেই থেকে যাই, তাহলে মিসর হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর যদি মিসর চলে যাই, তাহলে শোবকের বিজয় পরাজয়ে পরিণত হবে। উদ্ধারকৃত অঞ্চল কোনক্রমেই হাতছাড়া করা যাবে না। আমি এখানেই থাকব, নাকি মিসর চলে যাব, তা এখনো স্থির করতে পারিনি...।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী দূতকে বলে দেন যে, তুমি দিন-রাত ঘোড়া হাঁকাতে থাকবে। ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে গেলে সামনে যাকেই পাবে, তার থেকে ঘোড়া বদল করে নেবে। দিতে না চাইলে তাকে হত্যা করে নিয়ে যাবে। সুলতান তাকে এই নির্দেশনাও প্রদান করেন যে, পথে দুশমনের কবলে পড়ে গেলে বেরিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। ধরা পড়ে গেলে পত্রখানা মুখে দিয়ে গিলে ফেলবে। পত্রটি কোনক্রমেই যেন দুশমনের হাতে না যায়।

দূত রওনা হয়ে যায়।

সুলতান অনুরূপ আরো একজন দূতকে ডেকে আনলেন। আপন ভাই তকিদ্দীনের নামে একখানা পত্র লিখে অনুরূপ নির্দেশনা দিয়ে তাকে প্রেরণ করেন। এই পত্রে তিনি ভাই তকিউদ্দীনকে লিখলেন–

'তোমার নিকট যা কিছু সম্পদ আছে, যত সৈন্য সংগ্রহ করতে পার, নিয়ে এই মুহূর্তে ঘোড়ায় চড় এবং কায়রো পৌছে যাও। পথে অযথা সময় নষ্ট কর না। তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ কোথায় হবে এ মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না। আদৌ হবে কিনা তাও জানিনা। যদি কায়রোতে আমার সাক্ষাৎ না পাও কিংবা যদি আমার মৃত্যু সংবাদ পাও, তাহলে মিসরের শাসন-ক্ষমতা হাতে তুলে নিও। মিসর বাগদাদের খেলাফতের একটি সাম্রাজ্য। আর মহান আল্লাহ এ সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যাস্ত করেছেন আইউবী বংশের উপর। রওনা হওয়ার পূর্বে আব্বাজানের সঙ্গে দেখা করবে এবং অবনত মস্তকে আবেদন জানাবে, তিনি যেন তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। আম্মাজানের কবরে ফাতেহা পাঠ করে তার আত্মা থেকে দোয়া নিয়ে আসবে। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আমি যেখানেই থাকি ইসলামের ঝান্ডা অবনমিত হতে দেব না। তুমি মিসরে ইসলামের ঝান্ডাকে বুলন্দ রাখ।

এই দূতও রওনা হয়ে যায়।

প্রথম দূত যখন নূরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট গিয়ে পৌছে, তখন তার বাম বাহু তরবারীর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত এবং পিঠ তীরবিদ্ধ। লোকটি সুলতান জঙ্গীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে। জঙ্গীর হাতে পত্রখানা তুলে দিয়ে সে শুধু এতটুকু বলতে সক্ষম হয় যে, 'পথে শত্রুর কবলে পড়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহর রহমতে পত্রখানা নিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।' বলেই দূত শহীদ হয়ে যায়।

নূরুদ্দীন জঙ্গীর বাহিনী যখন শোবকের নিকটে পৌছে, তখন দুর্গ ও শহরময় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, খৃস্টানদের বিশাল এক বাহিনী আক্রমণে ধেয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে মুসলিম বাহিনী মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু কাফেলা আরো নিকটে এলে দেখা গেল এ জঙ্গীর বাহিনী। গগনবিদারী তাকবীর ধ্বনি ভেসে এলো কানে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নায়েবগণ সংবর্ধনা দেয়ার জন্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন।

✿ ✿ ✿

তিন অথবা চার দিন পর।

ভোরের আলো এখনো পুরোপরি ফুটে উঠেনি। কায়রো অবস্থানরত সৈন্যরা ময়দানে সমবেত হওয়ার আদেশ পায়। সৈন্যদের মধ্যে কানাগুষা শুরু হয় যে, ব্যাপার কি? কেউ বলল, বিদ্রোহ হবে। কারো ধারণা, সুদানীদের হামলা আসছে।

তাদের কমান্ডার পর্যন্ত জানে না এই সমাবেশের হেতু কি? নির্দেশটি জারী হয়েছে সেনাবাহিনীর কেন্দ্র থেকে।

সুবিন্যস্তভাবে সৈন্যরা ময়দানে এসে সমবেত হয়। সঙ্গে সঙ্গে একদিক থেকে ছুটে আসে সাতটি ঘোড়া। দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক! কারণ, সামনের জন স্বয়ং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। অথচ, তারা জানে, সুলতান শোবকে।

অদ্ভুত এক ভঙ্গিমা দেখালেন সুলতান। পরনের পাজামাটা ছাড়া সব খুলে ছুড়ে ফেলে দিলেন। খুলে ফেলে দিলেন মাথার শিরস্ত্রাণও। সৈন্যদের সারির সম্মুখ দিয়ে হেলে-দুলে এগিয়ে গেল ঘোড়া। তারপর মোড় ঘুরিয়ে আবার সকলের সম্মুখে এসে উচ্চস্বরে সুলতান আইউবী বললেন, 'আমার শরীরে তোমরা কেউ কোন জখম দেখতে পাচ্ছ? আমি মরে গেছি না জীবিত আছি?'

'আমীরে মেসেরের হায়াত দীর্ঘ হোক। আমরা শুনতে পেয়েছিলাম যে, আপনি আহত হয়েছেন এবং আপনার অবস্থা আশংকাজনক।' বলল এক উষ্ট্রারোহী।

'এ সংবাদটা যখন মিথ্যা প্রমাণিত হল, তখন বাকী সেইসব গুজবও সত্য নয়, যা তোমাদের কানে দেয়া হয়েছে।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। কথাটা তিনি এত উচ্চস্বরে বললেন যে, এর আওয়াজ শেষ সারি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি বললেন, 'যেসব মুজাহিদের ব্যাপারে তোমাদের বলা হয়েছিল যে, তারা শোবকে সোনা-রূপা আর খৃস্টান ললনাদের নিয়ে আয়েশ করছে, তারা মূলত বালুকাময় মরুপ্রান্তরে পরবর্তী দুর্গ, তার পরের দুর্গ এবং তারও পরের দুর্গ জয় করার প্রস্তুতি নেয়ার কাজে পাগলের মত হয়ে আছে। তাদের রীতিমত খাবার পানিও জুটছে না। কেন? তার কারণ, খৃস্টান হায়েনাদের হাত থেকে তারা তোমাদের মা-বোন-কন্যাদের ইজ্জত রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শোবকে আমরা মুসলমান কন্যা ও তাদের মা-বাবাদের অবস্থা যা দেখেছি, তাহল, কন্যাদের রাত কাটছে খৃস্টানদের শয্যায় আর তাদের মা-বাবারা ধুঁকে ধুঁকে মরছে খৃস্টানদের বেগার খেটে। কার্ক, জেরুজালেম ও ফিলিস্তীনের খৃস্টান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে বর্তমানে মুসলমানদের এই একই করুণ অবস্থা বিরাজ করছে। সেখানকার মসজিদগুলো এখন আস্তাবল। কুরআনের পবিত্র পাতা অলিতে-গলিতে পিস্ট হচ্ছে খৃস্টানদের পায়ের তলায়।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এই তেজস্বী ও স্পর্শকাতর বক্তৃতা শুনে কমান্ডার চিৎকার করে উঠল, 'তারপরও আমরা এখানে বসে থাকি কেন? আমাদেরও কেন ময়দানে পাঠানো হচ্ছে না?'

'তোমাদেরকে এখানে এ জন্যে বসিয়ে রাখা হয়েছে যে, তোমরা দুশমনের প্রোপাগান্ডা শুনে শুনে কান ভারি করবে এবং নির্দ্বিধায় তা বিশ্বাস করবে। এখানে বসে বসে তোমরা নিজেদের পতাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, যাতে সুদানীদের

সহযোগিতায় খৃস্টানরা এই ভূখন্ডে দখল প্রতিষ্ঠা করতে এবং তোমাদের বোন-কন্যাদের সম্ভ্রম বিনষ্ট করতে পারে। পবিত্র কুরআনকে তোমরা নিজের হাতে ধরে কেন বাইরে নিক্ষেপ করছ না? কেন তোমরা পবিত্র কুরআনের অবমাননা খৃস্টানদের হাতে করাতে চাচ্ছ? তোমরা যারা নিজেদের ঈমানের হেফাজত করতে পার না, তারা জাতির ইজ্জতের হেফাজত কিভাবে করবে?' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

সুলতানের এই জবাবে সমগ্র বাহিনীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যায়। অবশেষে সুলতান বললেন, 'এখানে তোমরা কয়েকজন কমান্ডারকে দেখতে পাচ্ছ না। আমি তাদেরকে তোমাদের দেখাচ্ছি।' সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী একদিকে ইশারা করলেন। গলায় রশি লাগানো দু'হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা দশ-এগার ব্যক্তিকে সেদিক থেকে নিয়ে আসা হল। সৈন্যদের সারির সম্মুখ দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ঘোষণা করলেন, 'এরা তোমাদের কমান্ডার ছিল। কিন্তু এরা সেই জাতির বন্ধু, যারা তোমাদের রাসূল ও তোমাদের কুরআনের দুশমন। এরা এখন বন্দী।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী খিজরুল হায়াতের হত্যাকাণ্ড এবং মোসলেহুদ্দীনের গ্রেফতারির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। মোসলেহুদ্দীনকে সকলের সামনে নিয়ে আসা হল। লোকটি এখনও পাগলপ্রায়। গত রাতে কোতোয়ালীর পাতাল কক্ষে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী লোকটাকে দেখে এসেছেন। সুলতানকে চিনেনি মোসলেহুদ্দীন। স্বপ্নের সাম্রাজ্য আর নিজের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে করে স্বগতোক্তি করছিল সে। এবার ঘোড়ায় বসিয়ে তাকে সেনাবাহিনীর সম্মুখে উপস্থিত করেন সুলতান। সৈন্যদের প্রতি চোখ বুলিয়ে সে বলে উঠে, 'তোমরা আমার ফৌজ। তোমরা মিসরের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ফেল। আমি তোমাদের সম্রাট। সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরের দুশমন। তোমরা তাকে হত্যা করে ফেল...।'

এক নাগাড়ে বলেই যাচ্ছে মোসলেহুদ্দীন। পাগলের মুখ থেকে যেভাবে ফেনা বের হয়, তেমনি তার মুখে থেকেও ফেনা বেরুচ্ছে। হঠাৎ একটি 'শা' শব্দ ভেসে এল ফৌজের মধ্য থেকে। একটি তীর এসে বিদ্ধ হয় মোসলেহুদ্দীনের ধমনীতে। লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হয় তার রক্তাক্ত দেহ। ছুটে আসে আরো কয়েকটি তীর। বিদ্ধ হয় তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে। চীৎকার করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিবৃত্ত করেন তীরান্দাজদের। তীরান্দাজদের সামনে বেরিয়ে আসতে আদেশ করেন কমান্ডারগণ। তারা বলে, 'আমরা একজন গাদ্দারকে হত্যা করেছি। এ হত্যা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের গর্দানগুলো উপস্থিত।' সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাদের ক্ষমা করে দেন। সুলতানের পরনে এখনো শুধু পাজামা, বাকী শরীর উন্মুক্ত। তিনি জল্লাদকে কাছে ডাকেন। অবশিষ্ট গাদ্দারদের তার হাতে তুলে দিয়ে তাদের

মস্তকগুলো দেহ থেকে ছিন্ন করিয়ে দেন।

আরো একটি হুকুম জারি করে সবাইকে স্তম্ভিত করে দেন সুলতান। তিনি আদেশ করেন, এ ফৌজ এখান থেকে সরাসরি ময়দানে রওনা করবে। তোমাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, সরঞ্জামাদি ও রসদপাতি পরে আসবে। এর অর্থ মিসরে কোন সৈন্য থাকছে না।

বাহিনী রওনা হয়ে যায়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী গাদ্দারদের কর্তিত মস্তকগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেন। একজনের সাথে কথা বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেন তিনি। বেদনার অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে তাঁর নয়নযুগল। তিনি পোশাক পরিধান করেন এবং একদিকে হাঁটা দেন। হাঁটতে হাঁটতে সাথের কর্মকর্তাদের বললেন, 'আমার আশংকা হচ্ছে এই যে, দুশমনরা মিল্লাতে ইসলামিয়ায় এমনিভাবে গাদ্দার সৃষ্টি করতেই থাকবে এবং এমন দিন এসে যাবে, তখন যারা গাদ্দারদের শিরচ্ছেদ করবে, তারাও দুশমনকে বন্ধু ভাবতে শুরু করবে। আমার বন্ধুগণ! তোমরা যদি ইসলামকে সমুন্নত দেখতে চাও, তাহলে বন্ধু-শত্রুকে চিনতে শেখ।'

মিসর খালি রেখে সেনা বাহিনীকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী-

'এ বাহিনীটি এখানে অবসর বসে ছিল। তাদেরকে কাজে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে আমি এ আদেশ জারি করলাম। আমি আদেশ দিয়ে গিয়েছিলাম যে, সৈন্যদের যেন অবসর রাখা না হয়, সামরিক মহড়া চালু রাখা হয়। সৈন্যদের শহর থেকে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে মাঝে-মধ্যে যুদ্ধাবস্থায় রাখা হয় এবং মানসিক প্রশিক্ষণও অব্যাহত রাখা হয়। কিন্তু আমার এ আদেশ পালন করা হয়নি। দায়িত্বশীল দু'জন কর্মকর্তাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। তারা চক্রান্ত করে সৈন্যদের নিষ্ক্রিয় রেখেছিল। অবসর পেয়ে সৈন্যরা মদ-জুয়ায় মন ভুলাতে এবং শত্রুর প্রোপাগান্ডায় কান দিতে শুরু করেছিল। আর তোমরা সম্ভবত ভাবছ যে, মিসরে এখন সৈন্য নেই। না, ভাবনার কিছু নেই। সৈন্য আসছে। আমার যে বাহিনী শোবক জয় করেছিল, তারা কায়রো ঢুকে গেছে। আমার পেছনে পেছনেই তাদের রওনা করানো হয়েছিল। তারা দুশমনকে এবং দুশমনের পাপাচারকে খুব কাছে থেকে দেখে এসেছে। তাদের হৃদয়কে কেউ বিদ্রোহী বানাতে পারবে না। শহীদের রক্তের সাথে তারা বেঈমানী করবে না। আর এখান থেকে যাদের প্রেরণ করা হল, তারা হয়ত কার্কের উপর হামলা চালাবে অথবা দুশমন তাদের উপর হামলা করবে। এ প্রক্রিয়ায় তারাও দুশমন চিনে ফেলবে। তোমরা মনে রেখ, যে সিপাহী দুশমনের চোখে চোখ রেখে একবার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, কোন লালসা তাকে গাদ্দার বানাতে পারে না।'

নুরুদ্দীন জঙ্গী ও নিজ ভাই তকিউদ্দীনের কাছে দূত প্রেরণ করে সুলতান

সালাহুদ্দীন আইউবী গোপনে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। নায়েবদের সাবধান করে দিয়ে যান যে, তার অনুপস্থিতির খবর যেন কেউ জানতে না পারে। রওনার সময় বলে যান, সুলতান জঙ্গী অবশ্যই সাহায্য পাঠাবেন। তিনি যে পরিমাণ সৈন্য পাঠাবেন, আমাদের ঠিক সে পরিমাণ সৈন্য এখান থেকে কায়রো পাঠিয়ে দেবে। বলে দেবে যেন পথে বেশি বিরতি না দেয়। তাতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। প্রথমতঃ মিসরের সৈন্যরা সত্যই যদি বিদ্রোহী হয়ে থাকে, তাহলে এরা সেই বিদ্রোহ দমন করবে। দ্বিতীয়তঃ মিসরের পরিস্থিতি যদি অনুকূল থাকে, তাহলে মিসরের ফৌজ ময়দানে চলে আসবে আর ময়দানের ফৌজ মিসর ফিরে যাবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কায়রো উপস্থিতির সংবাদও গোপন রাখা হয়। রাতারাতি তিনি যায়নুদ্দীনের চিহ্নিত গাদ্দারদের ঘুমন্ত অবস্থায়ই গ্রেফতার করান এবং আরো কয়েকটি স্থানে তল্লাশি চালান। ফাতেমার অপহরণকারী হাশীশী তিনজন কয়েকজন নাগরিকের নাম বলেছিল। গ্রেফতার করা হয় তাদেরও। পদমর্যাদার তোয়াক্কা করা হয়নি কারো।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নির্দেশ মোতাবেক ফাতেমাকে যায়নুদ্দীনের হাতে তুলে দেয়া হয় এবং উপযুক্ত পাত্র দেখে মেয়েটিকে বিবাহ দিয়ে দিতে বলা হয়। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এবার তকিউদ্দীনের অপেক্ষা করার পালা।

তিনদিন পর দু'শ' আরোহীসহ এসে উপস্থিত হন তকিউদ্দীন। মিসরের সার্বিক পরিস্থিতি, ঘটনা প্রবাহ এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করে তাকে মিসরের ভারপ্রাপ্ত গবর্নর নিযুক্ত করেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। বলে দেন সুদানীদের প্রতি কড়া নজর রাখতে। প্রয়োজনে আক্রমণ করার অনুমতিও প্রদান করেন।

এবার শোবক অভিমুখে রওনা হতে উদ্যত হন সুলতান। ঠিক এমন সময়ে আলী বিন সুফিয়ান বলে উঠলেন, 'কার্কের খৃস্টানরা আপনার জন্য কিছু হাদিয়া প্রেরণ করেছে। অনুরোধ করছি, একটু অপেক্ষা করুন, মহামূল্যবান হাদিয়াগুলো এক নজর দেখে যান।' বলেই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে বিস্ময়ের মধ্যে ফেলে রেখে আলী বিন সুফিয়ান বাইরে বেরিয়ে যান। 'আমার সাথে আসুন' বলে সুলতানকেও বেরিয়ে আসতে ইশারা দেন।

ঘোড়ায় চড়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের সাথে এগিয়ে চলেন। সামান্য অগ্রসর হয়েই সুলতান দূর ময়দানে কতগুলো ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। জিন বাঁধা প্রতিটি ঘোড়ার পিঠে। পাঁচশ' ঘোড়া। পার্শ্বেই দণ্ডায়মান রশিবাঁধা আটজন খৃস্টান। প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বিস্মিত কণ্ঠে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব ঘোড়া কোথা থেকে আসল?'

আলী বিন সুফিয়ান এক ব্যক্তিকে ডেকে এনে সুলতানের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ আমার গুপ্তচর। তিন বছর পর্যন্ত লোকটি প্রকাশ্যে খৃস্টানদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করে আসছে। এর দায়িত্ব ছিল খৃস্টান ও সুদানীদের মাঝে সংবাদ আদান-প্রদান করা। তারা একে তাদেরই গুপ্তচর বলে জানে। সম্প্রতি কার্ক গিয়ে খৃস্টান সম্রাটদের নিকট সুদানীদের পয়গাম পৌঁছায় যে, তাদের পাঁচশ' ঘোড়া ও পাঁচশ' জিনের প্রয়োজন। খৃস্টানরা চাহিদা অনুযায়ী ঘোড়া ও জিন এই আটজন সেনা অফিসারসহ প্রেরণ করে। এরা সেই সুদানী বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছিল, যাদের মিসর আক্রমণে প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমার সিংহ এদের উত্তর দিক থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এক ফাঁদে এনে আটকে ফেলে এবং আমাদের এই সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সংবাদ পাঠায়। তারা এলে লোকটি নিজের পরিচয় প্রদান করে এবং তাদের সহযোগিতায় ঘোড়াগুলো ও খৃস্টান সেনা অফিসারদের হাঁকিয়ে কায়রো নিয়ে আসে।'

তথ্য সংগ্রহের জন্য আলী বিন সুফিয়ান খৃস্টান অফিসারদের হাসান ইবনে আবদুল্লাহর হাতে সোপর্দ করেন এবং নিজে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সাথে শোবক রওনা হয়ে যান।

ভয়ংকর ষড়যন্ত্র

বেঈমান-গাদ্দারের অপবিত্র খুন কায়রোর বালুকাময় জমিন চুষে নেয়নি এখনো। তার আগেই দু'শ' অশ্বারোহী নিয়ে কায়রো এসে পৌঁছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই তকিউদ্দীন। সুলতান আইউবী শিরচ্ছেদ করেছেন ষড়যন্ত্রকারী আমলাদের। মনে হচ্ছিল, কায়রোর মাটি এই মৃত মুসলমানদের খুন চুষে নিয়ে নিজের বুকে স্থান দিতে বিব্রতবোধ করছে, যারা খৃষ্টানদের সাথে যোগ দিয়ে সালতানাতে ইসলামিয়ার পতাকাকে ভূলুণ্ঠিত করার ষড়যন্ত্র করছিল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী লাশগুলো দেখলেন। কর্তিত মস্তকগুলোকে রেখে দেয়া হয়েছে নিস্প্রাণ দেহগুলোর বুকের উপর। অবিচ্ছিন্ন রয়েছে মাত্র একটি মস্তক। এটিই সবচে' বড় গাদ্দারের লাশ, যার উপর পরিপূর্ণ ও অখণ্ড আস্থা ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর। একটি তীর লোকটির ধমনীতে ঢুকে গিয়ে অপরদিক দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। এটিই কায়রোর নগর প্রশাসক মোসলেহুদ্দীনের লাশ। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন তাকে হাজির করে সেনাবাহিনীকে তার অপরাধের বিবরণ দিচ্ছিলেন, তখন ইসলাম-প্রেমী উত্তেজিত এক সৈনিক একটি তীর ছুঁড়ে তার ধমনী এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সৈনিকের এই বেআইনী আচরণ–যা ছিল সামরিক আইনের পরিপন্থী- এ জন্য ক্ষমার চোখে দেখলেন যে, কোন ঈমানদারই ইসলামের বিরুদ্ধে গাদ্দারী বরদাশত করতে পারে না। সৈনিকদের মধ্যে এই ঈমানী জযবা সুলতান আইউবী নিজেই সৃষ্টি করেছেন।

লাশগুলো দেখে সুলতান আইউবীর চেহারায় এতটুকু খুশীর ঝলকও পরিলক্ষিত হল না যে, প্রশাসনের এতগুলো গাদ্দার কুচক্রী ধরা পড়ল এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। উল্টো তাকে বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন তার কান্না পাচ্ছে। উদগত অশ্রু ঠেকাবার চেষ্টা করছেন তিনি। মনে তার প্রচণ্ড ক্ষোভ , যার প্রকাশ তিনি করেছিলেন এভাবে-

'এদের কারো জানাযা পড়া হবে না। লাশগুলো তাদের আত্মীয়-স্বজনের হাতে দেয়া যাবে না। লাশগুলো রাতের আঁধারে কোন এক গভীর গর্তে নিয়ে ফেলে মাটিচাপা দিয়ে সমান করে রেখে আস। পৃথিবীতে এদের নাম-চিহ্নও যেন অবশিষ্ট না থাকে।'

'আমীরে মোহতারাম! কোতোয়াল এবং সাক্ষীদের জবানবন্দী ও বিচারকের রায় লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা দরকার, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে যে, এটি একক কারো রায় ছিল। স্বীকার করি, আপনার ফয়সালা যথার্থ। আপনি অতি ন্যায়সঙ্গত বিচার করেছেন। কিন্তু আইনের দাবী অন্যকিছু।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সুহৃদ ও একান্ত বিশ্বস্ত কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'যারা কাফিরদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে আল্লাহর দ্বীনের মূলোৎপাটনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, আল্লাহর বিধান তাদেরকে এই সুযোগ প্রদান করার অনুমতি দেয় কি যে, তারা আইনের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাঃ) ও ঈমানদারদের ইজ্জতের অতন্দ্র প্রহরীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক? আমি যদি অবিচার করে থাকি, তাহলে এতগুলো মানুষ হত্যার দায়ে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দাও এবং আমার মৃতদেহটা জনবসতি থেকে বহুদূরে কোন এক মরু প্রান্তরে নিয়ে ফেলে আস। শৃগাল-শকুনরা আমার লাশটা খেয়ে আমাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলুক। কিন্তু আমার বন্ধুগণ! আমাকে শাস্তি দেয়ার আগে তোমরা পবিত্র কুরআনটা আলিফ-লাম-মীম থেকে ওয়ান্নাস পর্যন্ত পড়ে নিও। আর শাস্তি যদি দিতেই হয়, তাহলে আমার গর্দান উপস্থিত।' আবেগাপ্লুত অথচ অতীব গুরুগম্ভীর কণ্ঠে উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আপনি অবিচার করেননি মহান সেনাপতি! কাজী শাদ্দাদ আসলে বলতে চেয়েছিল, পাছে আইনের অবমাননা হয়ে না যায় যেন।' বলল একজন।

'আমি বুঝতে পেরেছি। উদ্দেশ্য তার আয়নার মত পরিষ্কার। আমি আপনাদের শুধু এ কথাটাই বলতে চাই যে, গবর্নর যদি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত জানেন যে, অভিযুক্ত সত্যিই গাদ্দারীর অপরাধে অপরাধী, তাহলে তার কর্তব্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অন্যান্য আইনী ঝামেলায় না জড়িয়ে আসামীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা। অন্যথায় বুঝতে হবে,গবর্নর নিজেও গাদ্দার। অন্তত অযোগ্য এবং বেঈমান তো অবশ্যই। আমি আশংকা করছি, যদি এদের বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতাম, তাহলে এরা উল্টো আমাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করে বসত। আমার বক্তব্য স্পষ্ট। তোমরা আমাকে গাদ্দারদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দাও। দেখবে, আল্লাহর কুদরতী হাত আমাকে তাদের থেকে আলগা করে ফেলবে। তোমাদের হৃদয় যদি কাবার প্রভূর আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে, তাহলে পাপিষ্ঠদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে ভয় কর না। তথাপি বন্ধু বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ যে পরামর্শ দিয়েছেন, তোমরা তা বাস্তবায়ন করে ফেল। কাগজপত্র প্রস্তুত করে মাননীয় বিচারপতির স্বাক্ষর নিয়ে রাখ। লিখবে, 'আমীরে মেসের- যিনি মিসর সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতিও বটে- নিজের বিশেষ

ক্ষমতাবলে এই অপরাধীদের যে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে, এদের অপরাধ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত।'

আপন ভাই তকিউদ্দীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন সুলতান। দীর্ঘ সফরে তিনি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। সুলতান তাকে বললেন, 'আমি তোমার চেহারায় চিন্তা ও ক্লান্তি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তুমি মুহূর্তের জন্যও আরাম করতে পারবে না। তোমার সফর শেষ হয়নি- শুরু হল মাত্র। আমাকে শিগগিরই শোবক পৌঁছুতে হবে। তোমাকে জরুরী কিছু কথা বলেই রওনা হব।'

'যাওয়ার আগে আরো একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে যাবেন আমীরে মোহতারাম! যাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল, তাদের বিধবা ও সন্তানের কি হবে?' বলল নতুন নগর প্রশাসক।

এদের ব্যাপারেও সেই একই সিদ্ধান্ত, যা পূর্বেকার গাদ্দারদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে দেয়া হয়েছিল। বিধবাদের ব্যাপারে তদন্ত কর, স্বামীদের ন্যায় তাদেরও কারুর দুশমনের সাথে যোগসাজস আছে কিনা দেখ। স্ত্রী-পূজাও আমাদের মধ্যে অনেক গাদ্দার জন্ম দিয়েছে। দেখনি, সুন্দরী নারী দিয়ে খৃস্টানরা কিভাবে আমাদের ভাইদের ঈমান ক্রয় করে নিয়েছে! এই বিধবাদের মধ্যে যারা সতী-সাধ্বী ও পাক্কা ঈমানদার বলে প্রমাণিত হবে, তাদেরকে তাদের মর্জি-মাফিক বিয়ে দিয়ে দাও। খবরদার! কারো উপর নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিও না। সাবধান! কোন নারী যেন অসহায় হয়ে না পড়ে এবং সম্মানজক ডাল-রুটি থেকে বঞ্চিত না থাকে। তাদের যেন অসহায়ত্ব বোধ করতে না হয়। খেয়াল রাখবে, কোন কুচক্রী মহল যেন একথা তাদের কানে দিতে না পারে যে, তোমাদের স্বামীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। বরং তাদের বুঝাবার চেষ্টা কর, তোমাদের সৌভাগ্য যে তোমরা এরূপ স্বামীদের থেকে মুক্তি পেয়েছ। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দাও। যাবতীয় ব্যয় বহন করবে বাইতুলমাল থেকে। মনে রেখো, গাদ্দারের সন্তান গাদ্দারই হবে এমন কোন কথা নেই। শর্ত হল, তাদের সঠিক শিক্ষা দিয়ে ঈমানদাররূপে গড়ে তুলতে হবে। তোমরা ভুলে যেও না যে, এরা মুসলমানের সন্তান। এদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেন এদের মনে কোন প্রকার অসহায়বোধ জাগতে না পারে। খবরদার! পিতার পাপের কাফফারা যেন সন্তানদের আদায় করতে না হয়।' জবাব দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

✿ ✿ ✿

শোবক রওনা হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তিনি ভাবছেন, পাছে তার অনুপস্থিতিতে খৃস্টানরা হামলা করে বসে কিনা। নূরুদ্দীন জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনী ময়দানে পৌঁছে গেছে। কায়রোর বাহিনীও এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে। উভয় বাহিনীকে এলাকা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে পরিচিত করে তুলতে

হবে। নিজ দফতরে গিয়ে বসেন সুলতান। ডেকে পাঠান ভাই তকিউদ্দিন, আলী বিন সুফিয়ান, আলীর নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহ, কোতোয়াল গিয়াস বিলবিস এবং আরো কয়েকজন নায়েব-কর্মকর্তাকে। বেশিরভাগ উপদেশ প্রদান করেন ভাই তকিউদ্দীনকে। প্রথমে বৈঠকে তিনি ঘোষণা দেন, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার ভাই তকিউদ্দিন আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং মিসরে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে। তার ঠিক ততটুকু ক্ষমতা থাকবে, যতটুকু ছিল সালাহুদ্দীন আইউবীর।

'তকিউদ্দীন! আজ থেকে মন থেকে ঝেড়ে ফেল যে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই। অযোগ্যতা, অসততা, অবহেলা, গাদ্দারী, ষড়যন্ত্র কিংবা কোন অন্যায়-অবিচারে যদি লিপ্ত হও, তাহলে তোমাকেও সেই শাস্তিই ভোগ করতে হবে, যা শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে।' তকিউদ্দীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আমি আমার কর্তব্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতন আছি মোহতারাম আমীরে মেসের! মিসরের বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে আমি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।' অবনত মস্তকে বললেন তকিউদ্দীন।

'শুধু মিসরই নয়, সমগ্র সালতানাতে ইসলামিয়া এই হুমকির সম্মুখীন। ইসলামের প্রসার ও ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তারে এসব সমস্যা বিরাট এক প্রতিবন্ধক। তোমাকে স্মরণ রাখতে হবে, সালতানাতে ইসলামিয়ার কোন একটি ভূখণ্ড কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের জমিদারী নয়। এর মালিক আল্লাহ। তোমরা এর পাহারাদার মাত্র। এর প্রতিটি অণু-পরমাণু তোমাদের হাতে আমানত। এর এক মুষ্ঠি মাটিও যদি তোমাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে আগে ভেবে দেখ, তুমি অন্যের হক নষ্ট করছ কিনা, আল্লাহর আমানতের খেয়ানত হচ্ছে কিনা। আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শোন তকিউদ্দীন! ইসলামের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, তার অনুসারীদের মধ্যে গাদ্দার ও কুচক্রী মানুষের সংখ্যা অনেক। মুসলমান যত গাদ্দার জন্ম দিয়েছে, এত আর কোন জাতি দেয়নি। আমাদের আল্লাহর পথে জিহাদের গৌরবময় ইতিহাস গাদ্দারীর ইতিহাসে পরিণত হতে চলেছে। স্বজাতি ও স্বধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বেড়ানো যেন আমাদের ঐতিহ্যের রূপ ধারণ করেছে। আলী বিন সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস কর তকি! আমাদের যেসব গুপ্তচর খৃস্টানদের এলাকায় দায়িত্ব পালন করছে, তাদের রিপোর্ট হল, 'খৃস্টান সম্রাটগণ, ধর্মীয় নেতৃবর্গ ও সচেতনমহল ইসলামের এই দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত যে, মুসলমান নারী আর ক্ষমতার লোভে নিজ ধর্ম, দেশ ও জাতির সিংহাসন উল্টিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।'

সভাসদ সকলের প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন সুলতান। বললেন, আমাদের

গোয়েন্দারা জানিয়েছে যে, খৃস্টানরা তাদের গুপ্তচরদের ধারণা দিয়েছে, মুসলমানদের ইতিহাস যতটা বিজয়ের, ততটা গাদ্দারীরও বটে। তারা যে পরিমাণ গাদ্দার জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে, সে পরিমাণ বিজয় তারা অর্জন করতে পারেনি। তাদের রাসূলের ওফাতের পরপরই খেলাফতের দখলদারিত্ব নিয়ে মুসলমানরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়। ক্ষমতার স্বার্থে তারা একে অপরকে হত্যা করে। কেউ খলীফা বা আমীর নিযুক্ত হলে নিজের মসনদের জন্য হুমকি হতে পারে এমন লোকদের অবলীলায় হত্যা করে। এমনকি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তারা শত্রুদের নিকট থেকে পর্যন্ত সহযোগিতা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। পারস্পরিক সংঘাতে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়েছে। রয়ে গেছে শুধু ব্যক্তিগত ক্ষমতার দাপট। থেমে গেছে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ধারা।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন, 'খৃস্টানরা আমাদের এই ঐতিহাসিক দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত যে, আমরা ব্যক্তি ক্ষমতার সংরক্ষণ ও নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সালতানাতের বিশাল অংশও বিসর্জন দিতে পারি। এটাই আমাদের ইতিহাসে পরিণত হতে যাচ্ছে।'

'তকিউদ্দীন ও আমার বন্ধুগণ! আমি যখন অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং যখন বর্তমান যুগের গাদ্দারদের বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্তের জাল দেখতে পাই, তখন আমি এই আশংকাবোধ করি যে, একটি সময় আসবে, যখন মুসলমান তাদের ইতিহাসের সাথেও গাদ্দারী করবে। জাতির চোখে ধুলো ছিটিয়ে তারা লিখবে যে, তারাই বীর এবং তারাই দুশমনের নাকে রশি বেঁধে রেখেছে। অথচ তারা হবে দুশমনের তাবেদার। দুশমন হবে তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিজেদের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের উপর পর্দা ঝুলিয়ে রাখবে। ইসলামী সম্রাজ্য ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকবে এবং আমাদের স্বঘোষিত খলীফা তার দায়দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাতে চেষ্টা করবে। মুসলমানদের একটি বংশধর এমন আসবে, যারা 'ইসলাম জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে ঈমানী কর্তব্য শেষ করবে। নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছুই তাদের জানা থাকবে না। তাদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মতও কেউ থাকবে না যে, একদল মানুষ আপন বাড়ীঘর, স্ত্রী-স্বজন ত্যাগ করে দূরে মরু-প্রান্তরে পাহাড়ে-উপত্যকায়, বিদেশ-বিভূঁইয়ে গিয়ে লড়াই করে ইসলামের অস্তিত্ব ও পতাকা রক্ষা করেছে। তারা বিশাল বিশাল নদী-সমুদ্রে সাঁতার কেটেছিল। আকাশের বিদ্যুৎ-বজ্র, আঁধার-ঝড় কিছুই তাদের গতিরোধ করতে পারেনি। এমন এমন দেশে গিয়ে জীবন বাজি রেখে তারা লড়াই করেছে, যেখানকার পাথর খণ্ডও ছিল তাদের দুশমন। লড়াই করেছে তারা ক্ষুৎ-পিপাসায় বিনা অস্ত্রে বিনা বাহনে। তারা আহত হয়েছে। কেউ তাদের জখমে পট্টি বাঁধেনি। শহীদ হয়েছে। সঙ্গীরা তাদের জন্য কবর খনন করার সুযোগ

পায়নি। তারা রক্ত ঝরিয়েছে নিজেদের। রক্ত ঝরিয়েছে শত্রুদের। আর ঠিক সেই সময়ে কসরে খেলাফতে আসর বসেছিল মদের। নেচে গেয়ে উলঙ্গ সুন্দরী মেয়েরা আনন্দ দিচ্ছিল খলীফা ও তার সাঙ্গদের। ইহুদী ও খৃস্টানরা সোনা আর নারীর রূপ দিয়ে অন্ধ করে দিয়েছিল আমাদের খলীফা ও আমীরদের। খলীফারা যখন দেখলেন যে, দেশের মানুষ সেই অস্ত্রধারী মুজাহিদদের ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে যাচ্ছে, যারা ইউরোপ ও ভারত উপমহাদেশে ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করেছেন, তখন তারা খলীফাদের টার্গেটে পরিণত হন। ব্যভিচারের ন্যায় অপবাদ আরোপ শুরু হয় তাদের উপর। বন্ধ করে দেয় সৈন্য ও রসদ সরবরাহ।

এই মুহূর্তে আমার কাসেমের সেই অপরিণত বয়সী ছেলেটির কথা মনে পড়ছে, যে কারো কোন সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া হিন্দুস্তানের শক্তিধর এক শাসককে পরাজিত করেছিল এবং হিন্দুস্তানের বিশাল এক ভূখণ্ড কব্জা করে নিয়েছিল। ছেলেটি বিজিত এলাকায় এমন সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল যে, হিন্দুরা তার গোলামে পরিণত হয়ে যায় এবং তার স্নেহপূর্ণ সুশাসনে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। আমার যখন এই ছেলেটির কথা মনে পড়ে, তখন মনটা আমার ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠে। কিন্তু তৎকালীন খলীফা তার সাথে কিরূপ আচরণ করলেন? তার উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলেন এবং অপরাধীর ন্যায় প্রত্যাহার করে নিলেন।' বলতে বলতে হিঁচকি উঠে যায় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর। বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠে তার দু'নয়ন। থেমে যান তিনি।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তার রোজনামচায় লিখেছেন-

'আমার বন্ধু সালাহুদ্দীন আইউবী তার ফৌজের হাজারো শহীদের লাশ দেখলেও বিচলিত হতেন না; বরং তার চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। কিন্তু একজন গাদ্দারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যখন তার লাশে চোখ ফেলতেন, তখন তার মুখমণ্ডল বিমর্ষ হয়ে উঠত এবং দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করত। তেমনি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের কথা বলতে বলতেও তার হিঁচকি এসে যায়– তিনি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েন। তখন আমি নিজ চোখে দেখেছি যে, তিনি অশ্রু রোধ করার চেষ্টা করছিলেন।'

তারপর তিনি বলতে লাগলেন- 'দুশমন তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তাকে শহীদ করল তার আপন লোকেরা। দুমশন তাকে বিজেতারূপে বরণ করে নিল আর আপনরা তাকে আখ্যা দিল ব্যভিচারী।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যিয়াদের পুত্র তারেকের কথাও উল্লেখ করলেন। সেদিন তিনি এতই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন যে, জবান তার থামছিল না যেন। অথচ স্বভাবগতভাবেই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। ছিলেন বাস্তববাদী। আমরা সকলে নীরব বসে রইলাম। অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া অনুভব হচ্ছিল আমাদের। সালাহুদ্দীন আইউবী একজন মহান নেতা ছিলেন নিশ্চিত। অতীতকে তিনি কখনো ভুলতেন না।

সমকালীন সমস্যা ও সময়ের দাবীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। দৃষ্টি তার নিবদ্ধ হয়ে থাকত অনাগত সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি।'

খৃস্টানদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের ভবিষ্যতের উপর নিবদ্ধ। খৃস্টান সম্রাট ও শাসকবর্গ বলছে যে, তারা ইসলামকে চিরতরে খতম করে দেবে। তারা আমাদের সাম্রাজ্য দখল করতে চায় না। আমাদের হৃদয়গুলো তারা চিন্তার তরবারী দিয়ে কেটে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায়। আমার গোয়েন্দারা আমাকে বলেছে যে, খৃস্টাদের সবচেয়ে কট্টর ইসলাম-দুশমন সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাসের বক্তব্য হল, তারা তাদের জাতিকে একটি লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছে এবং একটি ধারার প্রবর্তন করে দিয়েছে। এখন তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যায়ক্রমে সে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাবে। তারা তরবারীর জোরে লক্ষ্য হাসিল করা প্রয়োজন মনে করে না। তরবারী ছাড়া অন্য অস্ত্রও আছে তাদের কাছে ...। তকিউদ্দীন! তাদের দৃষ্টি যেমন ভবিষ্যতের প্রতি, তেমনি আমাদেরও ভবিষ্যতের উপর নজর রাখা দরকার। তারা যেভাবে আমাদের মধ্যে গাদ্দার সৃষ্টি করার ধারা চালু করে দিয়েছে, তেমনি আমাদেরও এমন সব উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, যাতে গাদ্দারীর জীবাণু চিরতরে শেষ হয়ে যায়। গাদ্দারদের হত্যা করতে থাকা কোন প্রতিকার নয়। গাদ্দারীর প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। ক্ষমতার মোহ দূর করে আমাদের রাসূল-প্রেম সৃষ্টি করতে হবে। আর তার জন্য জাতির মনে দুমশনের অস্তিত্বের অনুভূতি থাকতে হবে। মুসলমানদের জানতে হবে যে, খৃস্টানদের সভ্যতায় এমন অশ্লীলতা বিরাজমান, যা চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণীয়। বিভিন্ন জাতি আপন ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তাদের সভ্যতায়। তাদের ধর্মে মদপান করা বৈধ। মেয়েদের পরপুরুষের সামনে বিবস্ত্র নাচ-গান ও নির্জনে সময় কাটানো সবই সিদ্ধ। আমাদের ও তাদের মধ্যে বড় পার্থক্য এটাই যে, আমরা নারীর ইজ্জতের পাহারাদার আর তারা নারীর ইজ্জতের বেপারী। এই ব্যবধানটাই আজ আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা মুছে ফেলতে চায়। তকিউদ্দীন! তোমার যুদ্ধক্ষেত্র দু'টি। একটি মাটির উপরে, অপরটি মাটির নীচে। একটি হল দুমশনের বিরুদ্ধে আর অপরটি আপনদের বিরুদ্ধে। আমাদের নিজেদের মধ্যে যদি গাদ্দার না থাকত, তাহলে এ মুহূর্তে আমরা এখানে নয়, বৈঠক করতাম ইউরোপের হৃদপিন্ডে আর খৃস্টানরা আমাদের বিরুদ্ধে সুন্দরী মেয়ের পরিবর্তে ভালো কোন অস্ত্র ব্যবহার করত। আমাদের ঈমানের উত্তাপ যদি তীব্র হত, তাহলে এতদিনে খৃস্টানরা সে উত্তাপে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেত।'

'আপনার সমস্যাগুলো আমি এখানে এসে বুঝতে পারলাম। মোহতারাম নূরুদ্দীন জঙ্গীও পুরোপুরি অবহিত নন যে, আপনি মিসরে একটি গাদ্দার বাহিনীর বেষ্টনীতে পড়ে গেছেন। এ ব্যাপারে তো আপনি তার সাহায্য নিতে পারতেন।' বললেন তকিউদ্দীন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী জবাব দিলেন-

'ভাই তকি! সাহায্য শুধু আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করা উচিত। সাহায্য প্রার্থনা আপনদের নিকট করা হোক বা দুশমনের নিকট, তা ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। খৃস্টানদের বাহিনী বর্মপরিহিত। আমার সৈন্যরা আবৃত থাকে সাধারণ পোশাকে। তারপরও তারা খৃস্টানদের পরাজিত করেছে বারবার। ঈমান যদি লোহার মত শক্ত হয়, তাহলে লৌহবর্মের প্রয়োজন হয় না। বর্ম ও খন্দক নিরাপত্তার অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং সৈন্যদের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি সব সময় পরিখার বাইরে থাকবে। ঘুরে-ফিরে লড়াই করবে। দুশমনের পিছনে যাবে না কখনো, বরং দুশমনকেই পিছনে রেখে লড়াই চালিয়ে যাবে। কেন্দ্র ঠিক রাখবে। পার্শ্ব বাহিনীকে ছড়িয়ে দেবে। দুশমনকে বেকায়দায় ফেলে হত্যা করবে। গেরিলা বাহিনী ব্যতীত কখনো যুদ্ধে যাবে না। গেরিলাদের দ্বারা দুশমনের রসদ ধ্বংস করাবে। পেছন থেকে যে রসদ আসবে, তাও ধ্বংস করবে এবং যা তাদের সাথে আছে, তাও ধ্বংস করবে। গেরিলাদেরকে দুশমনের পশুদের হত্যা কিংবা অস্থির করে তোলার কাজে ব্যবহার করবে। কখনো মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হবে না। যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করবে। দুশমনকে পেরেশান করে রাখবে। যে বাহিনীটি আমি রেখে যাচ্ছি, সেটি ময়দান থেকে এসেছে। তারা শোবক দুর্গ জয় করে এসেছে। এসেছে দুশমনের চোখে চোখ রেখে। এসেছে নিজের বহু সৈন্য শহীদ করিয়ে। জানবাজ গেরিলা বাহিনীও আছে এর মধ্যে। তাদের শুধু ইশারার প্রয়োজন। এই বাহিনীর মধ্যে আমি ঈমানের উত্তাপ সৃষ্টি করে রেখেছি। পাছে এমন যেন না হয় যে, তুমি নিজেকে সম্রাট ভেবে বস আর বাহিনীটির ঈমান ধ্বংস করে ফেল। আমাদের উপর যেসব হামলা হচ্ছে, তা আসছে আমাদের ঈমানের উপর। মনে রেখো, খৃস্ট সভ্যতা মিসরে ঢুকে পড়ছে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তার ভাই তকিউদ্দীনকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেন যে, সুদানে মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। সুদানীদের অধিকাংশ হল ওখানকার হাবশী উপজাতি, যারা না মুসলমান, না খৃস্টান। তাদের মধ্যে এমন কিছু মুসলমানও আছে, যারা মিসরের এই বাহিনীর পলাতক সৈনিক। বিদ্রোহের অভিযোগে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন-

'কিন্তু তুমি ঘরে বসে দুমশনের অপেক্ষা করবে না। গোয়োন্দারা তোমাকে রিপোর্ট জানাতে থাকবে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তোমার সাথে থাকবে। যখনই টের পাবে যে, দুশমনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং তারা আক্রমণ করার জন্য সমবেত হচ্ছে, সময় নষ্ট না করে সাথে সাথে তুমি হামলা করে ফেলবে এবং প্রস্তুত অবস্থাতেই দুশমনদের খতম করে দেবে। পেছনের ব্যবস্থাপনা শক্ত রাখবে। দেশবাসীকে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকবে। আল্লাহ না করুন যদি তুমি পরাজিত হও,

তাহলে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে জাতিকে পরাজয়ের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অবহিত করবে। যুদ্ধে লড়া হয় জনগণের রক্ত ও অর্থে। যুদ্ধে দেশবাসীর সন্তানরাই শহীদ হয়, পঙ্গু হয়। তাই জনগণের সমর্থন নিয়েই কাজ করতে হবে। যুদ্ধকে রাজা-বাদশাদের খেলতামাশা মনে করবে না। এটি একটি জাতীয় বিষয়। এতে জাতিকে সাথে রাখতে হবে।

আমি যে ফাতেমী খেলাফতকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলাম, তার সমর্থকরা এখনো আমাদের বিরুদ্ধে তৎপর। আমি জানতে পেরেছি যে, তারা নাকি একজনকে তাদের খলীফা নির্ধারণ করে রেখেছে। তাদের খলীফা আল আজেদ মৃত্যুবরণ করেছে ঠিক; কিন্তু এ আশায় তারা এই খেলাফতকে জীবিত রেখেছে যে, সুদানীরা মিসরে আক্রমণ করবে, আমাদের সৈন্যরা বিদ্রোহ করবে এবং এই সুযোগে খৃস্টানরা গোপনে ভেতরে ঢুকে ফাতেমী খেলাফত পুনর্বহাল করে দেবে। ফাতেমীরা হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতক দলের সহযোগিতা পাচ্ছে। আমি আলী বিন সুফিয়ানকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি। তার নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ও কোতোয়াল গিয়াস বিলবিসকে তোমার সাথে রেখে যাচ্ছি। এরা গুপ্ত বাহিনীর প্রতি নজর রাখবে। তুমি সেনাভর্তি বাড়িয়ে দাও এবং সামরিক মহড়া চালিয়ে যাও।'

'ইদানীং আমাদের নিকট সংবাদ আসছে যে, মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা থেকে ফৌজে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এ সংবাদও পেয়েছি যে, সেখানকার জনগণ সেনাবাহিনীর বিপক্ষে চলে গেছে।' বলল হাসান ইবনে আবদুল্লাহ।

'তার কারণ জানা গেছে কি?' জিজ্ঞেস করেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমার দু'জন গুপ্তচর সে এলাকায় খুন হয়েছে। সেখান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি আমি নতুন লোক পাঠিয়েছি।' জবাব দেন হাসান।

'আমার সন্দেহ, সেখানকার মানুষ নতুন কোন প্রোপাগান্ডার শিকার হয়ে পড়েছে। এলাকাটা বড় দুর্গম। মানুষগুলো বড় পাষাণ, বিশ্বাসে নড়বড়ে এবং সন্দেহপ্রবণ।' বলল গিয়াস বিলবিস।

'সংশয়প্রবণতা বড় এক অভিশাপ। যা হোক, তোমরা এলাকাটার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখ এবং সেখানকার মানুষগুলোকে সংশয় থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ নাও।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

❁ ❁ ❁

তিন-চার দিন পর।

কার্ক দুর্গে মিটিং বসেছে খৃস্টানদের। খৃস্টান সম্রাট ও সেনা অধিনায়কগণ বৈঠকে উপস্থিত। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অগ্রযাত্রায় তারা শংকিত। তিনি শোবক নিয়ে গেছেন; যে কোন মুহূর্তে কার্কও আক্রান্ত হতে পারে বলে তারা বেজায় চিন্তিত।

মুসলমানরা যদি শোবকের ন্যায় কার্কও জয় করে নিয়ে যায়, তাহলে জেরুজালেম রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে ভেবে তারা বিচলিত। তারা টের পেয়েছে যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সাবধানতার সাথে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি একটি এলাকা দখল করছেন আর নতুন ভর্তি দিয়ে সৈন্যের অভাব পূরণ করছেন। নতুন সৈন্যদেরকে পুরাতন সৈন্যদের সাথে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এবং যখন নিশ্চিত হচ্ছেন যে, এবার এরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার যোগ্য হয়েছে, তখন সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এই কর্মধারাকে সামনে রেখেই খৃস্টানরা কার্কের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্ত করেছে, বাইরে এসে লড়াই করারও পরিকল্পনা প্রস্তুত। কিন্তু এ বৈঠকে তারা সেই পরিকল্পনায় পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তার বাহিনী ও মিসরের সাম্প্রতিক বিপ্লব সংক্রান্ত গোয়েন্দা প্রধান হরমুনের রিপোর্টই তাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর যে বাহিনীটি শোবক দুর্গ জয় করেছিল, তিনি তাদেরকে কায়রো নিয়ে গেছেন। কায়রোর বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নূরুদ্দীন জঙ্গীর সামরিক সাহায্য ময়দানে পৌঁছে গেছে। সুলতান আইউবী কায়রো গিয়েছেন এবং কুচক্রী গাদ্দারদের শাস্তি দিয়ে আবার রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে গুপ্তচর মারফত সে সংবাদ কার্ক পৌঁছে গিয়েছিল। কায়রোর উপ-রাষ্ট্রপ্রধান মোসলহুদ্দীনের গ্রেফতারি ও মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ ছিল খৃস্টানদের জন্য অনভিপ্রেত। মোসলেহুদ্দীন ছিল খৃস্টানদের একজন সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট। বৈঠকে এসব ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ দিচ্ছিলেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

তিনি বললেন, মোসলেহুদ্দীনের মৃত্যুতে আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়েছে ঠিক; কিন্তু তকিউদ্দীনের নিয়োগ আমাদের জন্য আশাব্যঞ্জক। তকিউদ্দীন সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই বটে, তবে আমাদের গুপ্তবাহিনী তাকে বাগে আনতে সক্ষম হবে। আরো আশার কথা হল, সালাহুদ্দীন এবং আলী বিন সুফিয়ান দু'জনই কায়রোতে অনুপস্থিত।

'আমি বুঝতে পারছি না যে, তোমার হাশীশীরা কি করছে! অভাগারা এখনো সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করতে পারল না! টাকা তো এ পর্যন্ত প্রচুর নষ্ট করলাম।' বললেন সম্রাট রেমান্ড।

'অর্থ যা ব্যয় করছি, নষ্ট হচ্ছে না। আমি আশা করছি, সালাহুদ্দীন আইউবী রণাঙ্গন পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবেন না। তার সাথে যে চব্বিশজন দেহরক্ষী কায়রো গিয়েছিল, তাদের চারজন আমাদের হাশীশী সদস্য। মওকা তাদের হাতে এসে গেছে। সব আয়োজন আমি সম্পন্ন করে দিয়েছি। সালাহুদ্দীন আইউবীকে তারা পথেই হত্যা করে ফেলবে। সংবাদটা এই এসে পড়ল বলে।' বললেন হরমুন।

'আমাদের এত আত্মবিশ্বাস না থাকা উচিত। ধরে রাখ, সালাহুদ্দীন আইউবী নিহত হয়নি এবং জীবিত ও অক্ষত রণাঙ্গনে অবস্থান করছে। তার কাছে আছে এখন তাজাদম বাহিনী। নতুন ভর্তির পর এখন তার সৈন্য সংখ্যা অনেক। নূরুদ্দীন জঙ্গীর সাহায্যও পেয়ে গেছে। শোবকের ন্যায় দুর্ভেদ্য দুর্গ এখন তার দখলে। তার রসদ এখন কায়রো থেকে আসবে না। শোবকে তিনি বিপুল খাদ্য-সম্ভার জোগাড় করে রেখেছেন। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি, সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। আমি এই সুযোগ দিতে চাই না যে, আইউবী কার্ক অবরোধ করে ফেলবেন আর আমরা তার অবরোধে লড়াই করব।' বললেন ফিলিপ অগাস্টাস।

'আইউবীকে আমরা দুর্গ অবরোধ করার সুযোগ দেব না। আমরা দুর্গের বাইরে গিয়ে লড়াই করব এবং এমন ধারায় লড়ব যে, ধীরে ধীরে আমরাই বরং শোবক অবরোধ করে ফেলব।' বললেন অপর এক খৃস্টান সম্রাট।

'সালাহুদ্দীন মরু-শিয়াল। মরু এলাকায় তাকে পরাস্ত করা সহজ নয়। আমাদেরকে তিনি শোবক অবরোধ করার সুযোগ হয়তো দেবেন, কিন্তু বিনিময়ে স্বয়ং আমাদেরকেই তিনি অবরুদ্ধ করে ফেলবেন। আমি তার চাল বুঝে ফেলেছি। তোমরা যদি মুখোমুখি এনে তাকে লড়াই করাতে বাধ্য করতে পার, তাহলে আমি তোমাদেকে বিজয়ের গ্যারান্টি দিতে পারি। তবে একথা সত্য যে, তোমরা তাকে মুখোমুখি আনতে পারবে না।' বললেন ফিলিপ অগাস্টাস।

দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হল, অর্ধেক সৈন্য দুর্গের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীর সন্নিকটে ছাউনী ফেলে অবস্থান নেবে এবং মুসলিম বাহিনীর গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখবে।

এ পরিকল্পনায় যারা দুর্গের বাইরে গিয়ে লড়াই করবে, তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সংখ্যায় তারা হবে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীর তিনগুণ। দ্বিগুণ তো অবশ্যই। পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে স্বতন্ত্র বাহিনী। পরিকল্পনায় স্থির করা হয়েছে, যেহেতু মুসলিম বাহিনীর রসদ ও অন্যান্য সাহায্য আসবে শোবক থেকে, তাই শোবক আর মুসলমানদের মধ্যকার ফাঁকা স্থানকে রাখতে হবে কমান্ডো বাহিনীর দখলে। সম্মুখ থেকে এত জোরালো আক্রমণ চালাতে হবে, যাতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী একস্থানে স্থির হয়ে মুখোমুখি লড়াই করতে বাধ্য হন।

খৃস্টানদের ভরসা মূলত বর্মাচ্ছাদিত বাহিনীর উপর। তাদের অধিকাংশ সৈন্য বর্মপরিহিত। সকলের মাথায় শিরস্ত্রাণ। উট-ঘোড়াগুলো পর্যন্ত বর্মাচ্ছাদিত। তাদের ইউরোপিয়ান ঘোড়াগুলো মরুভূমিতে অল্পসময়ে ক্লান্ত ও বেহাল হয়ে যায় বলে তারা আরব থেকে ঘোড়া ক্রয় করে এনেছে। কিন্তু সংখ্যায় তেমন বেশী নয়। তাই তারা

মুসলমানদের কাফেলা থেকে ঘোড়া ছিনতাই করতে শুরু করেছিল। চুরি করেও এনেছে কিছু। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ঘোড় উন্নতজাতের। তার আরবী জাতের ঘোড়াগুলো অসীম সহনশীল। পিপাসায় অকাতর মাইলের পর মাইল ছুটতে পারে এগুলো।

এতো হলো খৃস্টানদের সামরিক প্রস্তুতি। এর বাইরে তারা আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছিল। সে ব্যাপারে গোয়েন্দা প্রধান হরমুনের রিপোর্ট হল, সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা থেকে নতুন ভর্তি পাবেন না। অত্র অঞ্চলের কেউ তার বাহিনীতে ভর্তি হবে না। এই সেই এলাকা, যার ব্যাপারে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উপ-গোয়েন্দা প্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহ রিপোর্ট করেছিলেন যে, অমুক এলাকার মানুষ এখন সেনাবাহিনীতে ভর্তি হচ্ছে না এবং অনেক লোক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধাচারণ করছে।

এটি একটি অবাধ্য ও দাঙ্গাবাজ গোত্রের অঞ্চল। এক সময় এরা সুলতান আইউবীকে বেশ ভাল ভাল সৈন্য দিয়েছিল। কিন্তু এখন হরমুনের রিপোর্ট প্রমাণ করছে, খৃস্টানদের সন্ত্রাসী বাহিনী সে এলাকায় পৌছে গেছে। তাদের অপতৎপরতায় এখন সেখানকার পরিস্থিতি এত নাজুক হয়ে গেছে যে,হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সংবাদ নেয়ার জন্য দু'জন গোয়েন্দা প্রেরণ করেছিলেন ;দু'জনই খুন হয়েছে। তাদের লাশ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। শুধু রহস্যময় ধরনের একটি সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল যে, তাদেরকে চিরদিনের জন্য গুম করে ফেলা হয়েছে। বিশাল-বিস্তৃত সেই লোকালয়টি এখন দুর্ভেদ দুর্গ। সেখান থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করে আনা এখন মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব। শুধু এতটুকু তথ্য জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে যে, সেখানকার জনসাধারণ মুসলমান বটে, তবে তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি সম্প্রদায়।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে হরমুন জানান যে, তার পরিকল্পনা সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলছে। এখন তিনি মিসরের সবক'টি সীমান্ত এলাকায় এ পন্থা প্রয়োগ করবেন। তারপর ধীরে ধীরে এর প্রভাব মিসরের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন। হরমুন আশা প্রকাশ করেন যে, গোটা মিসরকেই তিনি তার প্রভাব-বলয়ে নিয়ে আসবেন। তিনি বললেন, আমি মুসলমানদের এমন একটি দুর্বলতাকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছি, যাকে তারা নিজেদের গুণ মনে করে। মুসলমান দরবেশ-ফকির, পীর-মুরীদ, মাওলানা-মৌলভী এবং মসজিদের কোণে বসে আল্লাহ আল্লাহ জিকিরকারী সকলেই বুজুর্গ ধরনের এমন একদল লোককে নির্বিচারে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকে, যারা ইসলামী ফৌজের সেই সব সালারদের শত্রু মনে করে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে খ্যাতি অর্জন করেছে। এই পীর-মাশায়েখগণ তাদের আপন আপন ভক্ত-মুরিদদের

বলে থাকেন যে, আল্লাহ তাদের হাতে আছেন। তারা আল্লাহর খাস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তদের চিন্তা, কিভাবে তারা জনমনে সুখ্যাতি অর্জন করবেন। যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার হিম্মত তাদের নেই। তাই ফৌজের সালারগণ ময়দানে জীবনবাজি লড়াই করে যে খ্যাতি অর্জন করেছে, তারা ঘরে বসেই তা লাভ করতে চায়। প্রকৃত বিচারে মুসলমানদের এই সেনাপতিগণই– সালাহুদ্দীন আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গী যাদের অন্যতম– খাঁটি মানুষ, আসল মুসলমান। দেশের মানুষ যদি ইবাদত-বন্দেগীতে তাদের নামও উল্লেখ করে, আমি বলব, তারা এর হকদার। কিন্তু তাদের খলীফারা ইবাদতের মধ্যে নিজেদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে ফেলেছেন। পাশাপাশি নামধারী আলেম ও ইমামদের একটি দলের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা কাজ করতে ভয় পান। খলীফাদের ছত্রছায়ায় তারা জিহাদের বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছে, যাতে মানুষ জিহাদবিমুখ হয়ে তাদের নিকট গিয়ে ভীড় জমায় এবং তাদেরকে পীর-বুজুর্গ,আল্লাওয়ালা জেনে শ্রদ্ধা করে। তারা এমন যাদুময় ভাষায় কথা বলে যে, সাধারণ মানুষ ভাবতে শুরু করে, তাদের হৃদয়ে এমন এমন ভেদ লুকায়িত আছে, যা আল্লাহ যাকে তাকে দান করেন না। ফলে সরল-সহজ মানুষ তাদের পাতা ফাঁদে আটকা পড়ে যাচ্ছে। আমি সেই আলেম ও দরবেশদের কাজে লাগাচ্ছি। মুসলমানদের এই দুর্বলতা আমাদের অনেক ফায়দা দিচ্ছে। আমি মুসলমানদেরকে ইসলামেরই কথা শুনিয়ে শুনিয়ে ইসলামের মৌল চেতনা থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছি। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে, ইহুদীরা তথ্যসন্ত্রাস দিয়েই ইসলামকে বেশ দুর্বল করে দিয়েছিল। আমি তাদেরই নীতিমালা অনুসারে কাজ করে যাচ্ছি।

এটিই সেই যুদ্ধক্ষেত্র, যার ব্যাপারে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তার এত দুশ্চিন্তার মূল কারণ, এই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরই জাতির লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং সে যুদ্ধক্ষেত্র তাঁর দৃষ্টির আড়ালে।

✿ ✿ ✿

তকিউদ্দীন ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবী রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। সাথে চব্বিশজন ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর একটি বাহিনী। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দেহরক্ষীদের এই সংখ্যা জানা ছিল খৃস্টানদের। তারা এও জানত যে, এই বাহিনীর চারজন হাশীশী, যারা নিজেদের যোগ্যতা ও বীরত্বের প্রমাণ দিয়ে সুলতানের দেহরক্ষী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু তারা সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ, দেহরক্ষীদের সংখ্যা সব সময় চব্বিশ অপেক্ষা বেশী থাকে এবং তাদের ডিউটি পরিবর্তন হতে থাকে। এই চারজনের ডিউটি একত্রে পড়েনি কখনো। রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার যতটুকু সম্ভব সাবধান থাকেন সব সময়। রক্ষীদের মধ্যে ঘাতক আছে, কমান্ডার তা জানতেন না বটে, কিন্তু তিনি সর্বদা সজাগ থাকতেন, পাছে কেউ

দায়িত্বে অবহেলা না করে। এই সফরে সুলতান আইউবী নিজেই বললেন, রক্ষীদের পুরো বাহিনীকে তিনি সাথে রাখবেন না। চব্বিশজনই যথেষ্ট। অথচ, পথে খৃস্টান কমান্ডোদের আক্রমণের আশংকা আছে প্রবল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কায়রো থেকে দ্বি-প্রহরের পর রওনা হন। রাতের অর্ধেকটা কাটে সফরে আর বাকিটা বিশ্রামে। শেষ রাতে আবার সফর শুরু করেন। সূর্য উদয় হয়। রোদের তাপ প্রখর থেকে প্রখরতর হতে থাকে। চলতে থাকে কাফেলা। দ্বি-প্রহরের প্রচন্ড সূর্যতাপ ঘোড়াগুলোকে অস্থির করে তুলতে শুরু করে। কাফেলা থেমে যায়। অবস্থান গ্রহণ করে এমন একস্থানে, যেখানে পানি আছে, গাছ আছে, আছে টিলার ছায়াও। অল্প সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তাঁবু। সুলতানের চারপাই ও চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয় তাঁবুতে।

পানাহার শেষে শুয়ে পড়েন সুলতান। তাঁবুর সামনে–পিছনে দাঁড়িয়ে যায় দু'রক্ষী। নিকটেই গাছের ছায়ায় বসে পড়ে অন্যান্য রক্ষীরা। ঘোড়াগুলোকে পানি পান করানোর জন্য নিয়ে যায় কয়েকজন। আলী বিন সুফিয়ান ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ একটি গাছের নীচে গিয়ে শুয়ে পড়েন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তাঁবু এখান থেকে দেখা যায় না। মরুভূমির সূর্য জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে আসমান-জমিন। যে যেখানে ছায়া পেল বসে-শুয়ে পড়ল সকলে।

যে দু'রক্ষীর উপর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তাঁবু পাহারার দায়িত্ব চাপে, তারা দু'জন হাশীশী। এমন ঘটনা এই প্রথম। দীর্ঘদিন ধরে এমনি একটি সুযোগেরই সন্ধানে ছিল তারা। মিশন বাস্তবায়নে তাদের এখনই সুবর্ণ সুযোগ। রক্ষী বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য চলে গেছে ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাতে। পানির কূপের অবস্থান একটি টিলার অপর প্রান্তে। কাফেলার মাল বহনকারী উটের চালকরাও উটগুলোকে পানি পান করানোর জন্য নিয়ে গেছে কূপে। তাদের মধ্যেও দু'জন হাশীশী। চোখের ইশারায় ডিউটিরত হাশীশী রক্ষীদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে যায় তারা।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তাঁবুর সম্মুখে দন্ডায়মান রক্ষী তাঁবুর পর্দাটা ঈষৎ ফাঁক করে ভিতরে তাকায়। ঈশারা করে বাইরের জনকে। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। পিঠটা তাঁর তাঁবুর দরজার দিকে ফেরানো। পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকে পড়ে রক্ষী। খঞ্জর-তরবারী কিছুই বের করেনি সে। হাতের রশিটাও রেখে এসেছে তাঁবুর বাইরে। সুঠাম, সুদেহী বলবান এক যুবক। শক্তিতে সুলতান আইউবীর দিগুণ না হলেও দেড়গুণ তো অবশ্যই।

রক্ষী সতর্ক পায়ে পৌঁছে যায় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট। বিদ্যুদ্বেগে দু'হাতে ঝাপটে ধরে সুলতানের ঘাড়। ঘুম ভেঙ্গে যায় সুলতানের। পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন সুলতান। কিন্তু রক্ষীর পাঞ্জা থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারলেন না তিনি।

আক্রমণকারী সান্ত্রী সুলতানের পিঠে কনুইচাপা দিয়ে এক হাত সরিয়ে নেয় ঘাড় থেকে। অপর হাতে চেপে ধরে রাখে সুলতানের ধমনী। কটিবন্ধ থেকে পুরিয়ার মত কি যেন একটা বের করে সে। পুরিয়াটা এক হাতেই খুলে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মুখে ঢুকিয়ে দিতে যায়। সুলতানকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চাইছে রক্ষী।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অসহায়। পিঠে তাঁর শক্তিশালী একটি দানবের চাপা দেয়া কনুই। ধমনীটা চেপে ধরে আছে সে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে সুলতানের। মুখটা ছিল খোলা। পুরিয়া দেখে মুখটা এখন বন্ধ করে ফেলেছেন তিনি। মৃত্যু তাঁর এসে গেছে মাথার উপর। তবু বুদ্ধি হারাননি সুলতান।

তরবারী-সদৃশ একটি খঞ্জর সর্বদা সঙ্গে থাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর। এটি তাঁর অলংকার। বাঁধা থাকে কোমরে। সেটি বের করে হাতে নেন তিনি। আক্রমণকারী সুলতানের মুখে বিষ দেয়ার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। তার পাজরে খঞ্জরটি সেঁধিয়ে দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। এক টানে বের করে আনেন। আঘাত হানেন পুনর্বার। পাজরে বিদ্ধ হয় আবারো। আক্রমণকারী রক্ষী গন্ডারের ন্যায় মোটা চামড়ার মানুষ। এত অল্প সময়ে সরবার নয় সে । সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী একজন সৈনিক। খঞ্জরের আঘাত ও কার্যকারিতা জানা আছে তাঁর। দ্বিতীয় আক্রমণের পর রক্ষীর পাজর থেকে খঞ্জরটি বের করে নেন তিনি। কয়েকটা মোচড় দিয়ে আরো ভিতরে সেঁধিয়ে ঝটকা এক টান দেন নীচের দিকে। আক্রমণকারীর নাড়িভুঁড়ি ও পেটের ভেতরটা বেরিয়ে আসে বাইরে।

শিথিল হয়ে আসে আক্রমণকারীর হাত দু'টো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ঘাড় ছুটে যায় তার হাত থেকে। অপর হাত থেকে ছুটে পড়ে যায় পুরিয়াটা। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। ধাক্কা দেন আক্রমণকারীকে। চারপাই থেকে নীচে গিয়ে পড়ে লোকটি। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই তার।

মাত্র আধা মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায় এ যুদ্ধ। তাঁবুর বাইরে দণ্ডায়মান ছিল অপর রক্ষী। কিছু একটা পতনের শব্দ শুনতে পায় সে। পর্দা তুলে উঁকি দেয় তাঁবুর ভেতর। দৃশ্য দেখে চমকে উঠে। তরবারী উঁচু করেই ভেতরে প্রবেশ করে রক্ষী। আঘাত হানে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর। ঝট করে তাঁবুর মধ্যবর্তী খুঁটির আড়ালে চলে যান তিনি। আঘাতটা পড়ে গিয়ে বাঁশের খুঁটির উপর। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যেমন জন্মগত অসিচালক, তেমনি সুদক্ষ যোদ্ধাও। সাথে সাথে পাল্টা খঞ্জরের আঘাত হানেন আক্রমণকারীর উপর। আক্রমণকারীও সৈনিক। সুলতানের আঘাত প্রতিহত করে সে। সাথে সাথে রক্ষীবাহিনীর কমান্ডারকে আওয়াজ দেন সুলতান। পুনরায় আঘাত হানে আক্রমণকারী। সম্মুখ থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। চলে যান আক্রমণকারীর এক পার্শ্বে। পাল্টা আঘাত করেন সুলতান। সুলতানের এই খঞ্জরাঘাত ঠেকাতে ব্যর্থ হয় রক্ষী।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ডাকে তাঁবুতে প্রবেশ করে দু'রক্ষী। কিন্তু তারাও হামলা করে সুলতানের উপর। এতক্ষণে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আহত করে ফেলেন দ্বিতীয় রক্ষীকে। তবুও লড়ে যাচ্ছে সে। এখন সাথে এসে যোগ দেয় তার অপর দু'সঙ্গী। হুঁশ-জ্ঞান-সাহস ঠিক রেখে মোকাবেলা করে যান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। আল্লাহর রহমত, এমনি সময়ে বাহিনীর কমান্ডার এসে প্রবেশ করেন তাঁবুর ভেতর। অন্যান্য রক্ষীদেরও ডাক দেন তিনি। সুলতান আইউবীর নির্দেশে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েন আক্রমণকারীদের উপর। ছুটে আসে চার-পাঁচজন রক্ষী। চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে আসেন আলী বিন সুফিয়ান ও তাঁর সঙ্গীরা। ঘটনা দেখে থ খেয়ে যান তারা। রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে আছে চারজন রক্ষী। মরে গেছে দু'জন। একজনের মরি মরি অবস্থা, হুঁশ নেই তার। পেটটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ফাঁড়া। বুকে গভীর দু'টি জখম। চতুর্থজনের পেটে একটি জখম, অপর জখমটি উরুতে। মাটিতে বসে হাতজোড় করে চীৎকার করছে সে- 'আমাকে বাঁচতে দাও, বোনটির জন্য আমাকে বাঁচাও!'

নিজ রক্ষীদের নিরস্ত্র করেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। অবস্থা দেখে তারা এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, তৃতীয় লোকটিকে অচেতন অবস্থায় নিঃশ্বাস ফেলতে দেখেই ধমনী কেটে দেয় তার। চতুর্থজনকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন সুলতান। এটি একদিকে যেমন তাঁর মমতার বহিঃপ্রকাশ, অপরদিকে ষড়যন্ত্রের মূল সূত্র উদঘাটনের জন্য একজনের বেঁচে থাকা আবশ্যকও বটে।

কাফেলার সাথেই ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ডাক্তার। সুলতান যেখানে যান, এই ডাক্তার সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকেন। সুলতান তাকে বললেন, 'যে কোন মূল্যে এ লোকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।' সুলতানের গায়ে এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি। তিনি হাঁপাচ্ছেন। তবে মানসিক দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ শান্ত। আবেগ-উৎকণ্ঠা, রাগ-ক্ষোভ কিছুই নেই তার মনে। মুখে মুচকি হাসি টেনে তিনি বললেন, 'আমি বিস্মিত নই। এমনটি হওয়ারই কথা।'

তবে আলী বিন সুফিয়ানের মনে বেশ অস্থিরতা পরিলক্ষিত হল। তাঁর দায়িত্ব ছিল, সুলতানের দেহরক্ষী হিসেবে যাকে নির্বাচন করবেন, যাচাই-বাছাই করে দেখবেন লোকটা নির্ভরযোগ্য কিনা। এখন তাকে দেখতে হবে বাহিনীর অবশিষ্ট সিপাহীদের মধ্যে এদের কোন সদস্য রয়ে গেছে কিনা।

প্রথম আক্রমণকারী রক্ষী যে পুরিয়াটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মুখে দিতে চেয়েছিল, সেটা পড়ে আছে সুলতানের বিছানায়। এক প্রকার পাউডার। রং সাদা। তার খানিকটা ছিটিয়ে পড়েছে বিছানায়। ডাক্তার পাউডারগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। বললেন, 'এগুলো বিষ- এমন বিষ যে, এর তিল পরিমাণও যদি কারো

কণ্ঠনালী অতিক্রম করে, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে।' এগুলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল শুনে তিনি আঁতকে উঠেন। ডাক্তারের নির্দেশে বিছানাটি উঠিয়ে বাইরে নিয়ে পরিষ্কার করে আনা হয়।

জখমীকে তুলে নিজের বিছানায় শুইয়ে দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তরবারীর একটি আঘাত লেগেছে তার পেটে। অপরটি উরুতে। পেটের আঘাত আশংকাজনক নয়। তেরছা করে কাটা। উরুর জখম লম্বা ও গভীর। হাতজোড় করে সুলতানের নিকট জীবন ভিক্ষা চাইছে সে। সুলতানের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। দৃষ্টিভঙ্গির কোন বিরোধও নয়। সে ভাড়াটিয়া ঘাতক। ধরা পড়ার পর এখন নিজের অবিবাহিতা বোনটির জন্যই তার যত অস্থিরতা। বারবার নিজেন নাম উচ্চারণ করে মিনতির সুরে বলছে– আমি মুসলমান। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন মহামান্য সুলতান! আমার নিরপরাধ বোনের খাতিরে আমায় মাফ করে দিন।

'মানুষের জীবন-মৃত্যু দুই-ই আল্লাহর হাতে।' শান্ত সমাহিত অথচ ভাব-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। সুলতান বললেন, 'নিজ চোখেই তো দেখলে, কে মারেন আর কে জীবিত রাখেন। তবে দোস্ত! এ মুহূর্তে তোমার জীবনটা যার হাতে, তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। নিজের অপরাধের প্রতি দৃষ্টি দাও। নিজের অসহায়ত্বের কথা একটু ভাব। আমি তোমাকে তোমার সতীর্থদের মরদেহের সাথে জীবন্ত মরুভূমিতে ফেলে আসব। মরুর শিয়াল আর নেকড়েরা তোমাকে জীবন্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভক্ষণ করবে। তোমার হুঁশ-জ্ঞান ঠিকই থাকবে, তুমি সব টের পাবে। কিন্তু পালাতে পারবে না। তুমি ধুঁকে ধুঁকে জীবন বিসর্জন দেবে আর নিজের পাপের শাস্তি ভোগ করবে।'

অকস্মাৎ শিউরে উঠে জখমী। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দু'হাত ঝাপটে ধরে। উপুড় হয়ে পড়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? আমার সঙ্গে তোমার শত্রুতা কিসের?'

'আমি হাশীশীদের লোক। আমরা চারজন হাশীশী ছিলাম। কেউ দু'বছর, কেউ তিন বছর আগে আপনার ফৌজে ভর্তি হয়েছি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদেরকে আপনার দেহরক্ষী ডিভিশনে ঢোকানো হয়েছে।' জবাব দেয় জখমী। অকপটে সব তথ্য ফাঁস করে দিতে শুরু করে সে। বলে– 'আপনার রক্ষী বাহিনীতে আমরা এই চারজন ছিলাম ঘাতক।' বক্তব্যের ফাঁকে সুলতান ডাক্তারকে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ডাক্তার তাকে ঔষধ খাইয়ে দেন। রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। জখমীকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– ভয় নেই, ঠিক হয়ে যাবে।

জখমী তার মনের সব গোপন কথা বলে যায় অনর্গল। ক্ষমতাচ্যুত ফাতেমী খেলাফত এবং হাশীশীদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয় সে। ফাতেমীরা খৃষ্টানদের

থেকে কি কি সাহায্য গ্রহণ করেছে এবং করে যাচ্ছে, তার বিবরণ প্রদান করে।

দীর্ঘ সময় ব্যয় করে ডাক্তার তার জখমে পট্টি বাঁধার কাজ সম্পন্ন করেন। তবে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মমতা-ই হল অসহায় জখমীর আসল চিকিৎসা।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী লাশগুলো বাইরে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। আলী বিন সুফিয়ান জখমী সম্পর্কে বলেন, 'একে নিয়ে তুমি কায়রো চলে যাও এবং এর স্বীকারোক্তি মোতাবেক অভিযান চালাও।'

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিল জখমী। তন্মধ্যে কিছু ছিল এতই ভয়ংকর যে, সেগুলোর অনুসন্ধান কেবল আলী বিন সুফিয়ানের পক্ষেই সম্ভব। জখমীকে উটের পিঠে শুইয়ে নিয়ে কায়রো অভিমুখে রওনা হন আলী বিন সুফিয়ান।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল বেশ ক'বার। তার সব ক'টি ঘটনার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মাত্র দু'টি হামলার উল্লেখ পাওয়া যায়। যার একটি হল এই। অপরটির বিবরণ নিম্নরূপ–

একবার এক ফেদায়ী ঘাতক সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর এমনিভাবে শায়িত অবস্থায় খঞ্জর দ্বারা আক্রমণ করেছিল। খঞ্জর তাঁর শিরস্ত্রাণে আঘাত হানে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সজাগ হয়ে যান। এই ঘাতক সুলতানের হাতেই মারা যায় এবং সুলতানের দেহরক্ষীদের মধ্যে তার বাহিনীর এমন ক'জন সদস্য ধরা পড়ে, যারা ছিল ফেদায়ীদের ভাড়া করা ঘাতক।

❁ ❁ ❁

মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে–যা সুদানের সীমান্তের সাথে সংযুক্ত–শত শত বছরের পুরনো কিছু প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। তৎকালে মিসরের সীমান্ত ছিল ভিন্ন রকম। সুলতান সালাহুদ্দীন বলতেন যে, মিসরের কোন সীমান্ত নেই। সুদানীরা একটি কাল্পনিক সীমান্ত স্থির করে রেখেছিল মাত্র।

প্রাসাদগুলোর আশপাশের এলাকা অতি দুর্গম। মনে হচ্ছে ফেরাউনদের যুগে এসব এলাকা ছিল সবুজ-শ্যামল। ছিল পানির ঝরণা, ঝিল, সুগভীর দু'টি নদী, বালুকারময় মরুপ্রান্তর ও বালিমাটির টিলা। কোন টিলা সুবিশাল প্রাসাদের স্তম্ভের ন্যায় চলে গেছে উপরে–অনেক দূরে। কোনটি দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের ন্যায়। যেখানেই সমতল ভূমি, সেখানেই বালি। লক্ষণে মনে হয়, এলাকার স্থানে স্থানে পানি ছিল। ছিল গাছপালা-তরুলতা। অধিবাসীরা চাষাবাদ করত, ফসল উৎপাদন করত। অন্তত চল্লিশ মাইল দীর্ঘ এবং দশ-বারো মাইল প্রস্থের এই অঞ্চলে এক সময় মানুষের বসবাস ছিল। অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিল মুসলমান। তবে অদ্ভুত ধরনের বিশ্বাস লালন করত তারা।

ফেরআউনী আমলের এই প্রাসাদ-ধ্বংসাবশেষগুলোকে মানুষ প্রচণ্ড ভয় করে। আশপাশের এলাকাগুলোও এমন যে, দেখামাত্র মানুষের গা শিউরে উঠে। ভুলেও এখানে পা রাখে না কেউ। মানুষের বিশ্বাস, এ অঞ্চলে ফেরাউনদের বদরূহগুলো বসবাস করে। দিনের বেলা এরা পশুর রূপ ধারণ করে ঘোরাফেরা করে। কখনো এদেরকে উটের উপর সওয়ার সিপাহীর বেশে দেখা যায়। আবার কখনো রূপসী নারীর আকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয়। রাতের বেলা সেখান থেকে ভয়ংকর ধরনের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

বছর কয়েক হল, এ ধ্বংসাবশেষগুলো মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। তার আগে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন অত্র অঞ্চলে নতুন সেনাভর্তির অভিযান শুরু করেছিলেন, তখন থেকে তাঁর সৈন্যরা এ এলাকার আশপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে। এলাকার অধিবাসীরা তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, যেন তারা টিলার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে। স্থানীয় লোকেরা তাদেরকে রহস্যময় শব্দ, ভয়ংকর বস্তু ও বদরূহদের নানা কাহিনী শোনায়।

এ এলাকা থেকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অনেক নতুন সৈন্য পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের চিন্তা-চেতনা পাল্টে যায়। সীমান্ত প্রহরীরা রিপোর্ট দিয়েছিল যে, তাদের টহলদার সান্ত্রীরা পর্যন্ত কখনো অত্র এলাকায় প্রবেশ করত না এবং কখনো কাউকে সেদিকে যেতে দেখেনি। কিন্তু এখন অনেকেই ভেতরে যাওয়া- আসা করছে এবং যারা যাচ্ছে, ফিরে আসার পর তাদের চেহারায় কোন ভীতির ছাপ পরিলক্ষিত হয় না। এখন শোনা যাচ্ছে, প্রতি বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে মেলা বসে। তারপর একটি ঘটনা এই ঘটে যে, সীমান্তরক্ষীদের চার-পাঁচজন সিপাহী হঠাৎ একদিন লাপাত্তা হয়ে যায়। তাদের ব্যাপারে রিপোর্ট দেয়া হল যে, তারা পালিয়ে গেছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী একদিকে যেমন শত্রুর দেশে নিজের গুপ্তচর ঢুকিয়ে রেখেছিলেন, তেমনি নিজের দেশেও গুপ্তচরদের জাল বিছিয়ে রেখেছিলেন। অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ বিশেষভাবে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রশংসা করেছেন যে, তিনি গুপ্তচরবৃত্তি ও কমান্ডো স্টাইলের যুদ্ধকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণের নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে, মাত্র দশজন সৈন্য দ্বারা এক হাজার সৈন্যের কাজ করা সম্ভব। তবে এটা সত্য কথা যে, মুসলমান হওয়ার কারণে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এই বিদ্যাকে ইতিহাসের পাতায় যতটুকু স্থান দেয়া উচিত ছিল, ততটুকু দেয়নি। অবশ্য তৎকালের ঐতিহাসিকগণের রচনা থেকে জানা যায় যে, ইসলামের এই মহান প্রহরী ইন্টেলিজেন্স

এবং গেরিলা ও কমান্ডো অপারেশনে কী পরিমাণ অভিজ্ঞ ছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে তার গোয়েন্দা বাহিনী পরতে পরতে দৃষ্টি রাখত এবং সেনা হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট সরবরাহ করত। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল, মিসরের দূর-দূরান্তের এমন সব এলাকার তৎপরতার সংবাদও কেন্দ্রে পৌছে যেত, যেসব এলাকা সম্পর্কে বলা হতো যে, স্বয়ং খোদাও এ এলাকার কথা ভুলে গেছেন। অবশ্য সংবাদদাতারা সেসব এলাকার জনসাধারণের শুধু বাহ্যিক পরিবর্তনই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তার রিপোর্ট কেন্দ্রে পৌছিয়েছে। অভ্যন্তরে কী সব ঘটনা ঘটেছিল, তার সন্ধান তারা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। এতটুকু তথ্য লাভ করার পর এক পর্যায়ে নিহত কিংবা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল দু'জন গুপ্তচর।

এবার সেখানকার জনসাধারণ শুধু টিলার ভয়ংকর এলাকার ভেতরে প্রবেশ করাই শুরু করেনি বরং ফেরাউনদের পুরোনো এমন সব প্রাসাদের অভ্যন্তরেও ঢুকতে আরম্ভ করে দিয়েছে, এক সময়ে যেখানে যাওয়ার কথা কল্পনা করলেও তাদের গা শিউরে উঠত।

সম্প্রতি এই গমনাগমনের ধারা এভাবে শুরু হয় যে, এক গ্রামে একজন উষ্ট্রারোহীর আগমন ঘটে। নবাগত সেই লোকটি মিসরীয় মুসলমান। উটটি তার উন্নত জাতের এবং সুস্থ-সবল। এলাকাবাসীদের সমবেত করে লোকটি একটি কাহিনী শোনায়–

আমি একজন গরীব মানুষ। দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে কোন উপায় না দেখে এক পর্যায়ে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। আমার কোন বাহন ছিল না। লাগাতার কয়েকদিন পায়ে হেঁটে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে-ফিরেও ডাকাতি করার জন্য কোন শিকার পাইনি। অবশেষে ঐ পার্বত্য এলাকায়–যেখানে কেউ যাওয়া-আসা করে না–প্রবেশ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। কয়েকদিন পর্যন্ত পেটে খাবার পড়েনি। আমি শক্তিহীন হয়ে পড়ি। উপায়ন্তর না দেখে আমি আকাশ পানে হাত তুলে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি। তৎক্ষণাৎ আমি গুঞ্জনের ন্যায় একটি শব্দ শুনতে পাই। কে যেন বলছে, 'তোমার ভাগ্য ভালো যে তুমি এখনো পাপ করনি; পাপের সংকল্প করেছ মাত্র। তুমি যদি কাউকে লুট করে এখানে আসতে, তাহলে এতক্ষণে তোমার গায়ের গোশতগুলো খসে পড়ত এবং তোমার দেহটা কংকালে পরিণত হয়ে যেত। শয়তানের লেলিয়ে দেয়া হিংস্র প্রাণীরা তোমার খসে পড়া গোশত ভক্ষণ করত।'

আওয়াজ শুনে আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলি। অনুভব করলাম, কে যেন আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। চোখ খুলে দেখলাম, আমি এক স্থানে বসে আছি। আমার সম্মুখে শুভ্র শশ্রুমন্ডিত এক বুজুর্গ। দুধের মত সাদা তার গায়ের রং। নুরানী চেহারা। আমি বুঝে ফেললাম, ঐ যে আওয়াজ শুনলাম, তা এই বুজুর্গেরই কণ্ঠস্বর। আমার বাক্‌শক্তি

হারিয়ে যায়। আমি কাঁপতে শুরু করি। বুজুর্গ লোকটি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভয় পেও না। ঐ যে মানুষগুলো– যারা এখানে আসতে ভয় করে–ওরা কপালপোড়া। শয়তানই ওদেরকে এখানে আসতে দেয় না। তুমি যাও, ওদেরকে বল, এখন আর এখানে ফেরাউনদের প্রভূত্ব চলে না। এটি হযরত মূসা (আঃ) এর সাম্রাজ্য। শেষ জমানায় হযরত ঈসাও (আঃ) আকাশ থেকে এখানে অবতরণ করবেন। তখন ইসলামের আলোতে এসব অনাবাদী এলাকা আলোকিত হবে, যে আলোতে উদ্ভাসিত হবে সমগ্র পৃথিবী। তুমি যাও, লোকদেরকে আমার পয়গাম শুনিয়ে দাও, তাদেরকে এখানে নিয়ে আস।

আগন্তুক বলল, আমি উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। অনাহারে শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। বুজুর্গ বললেন, 'তুমি উঠে দাঁড়াও। পঞ্চাশ কদম উত্তর দিকে যাও। খবরদার পিছনে ফিরে তাকাবে না। ভয় পাবে না। মানুষের কাছে আমার পয়গাম অবশ্যই পৌঁছিয়ে দিবে। অন্যথায় তোমার বিরাট ক্ষতি হবে বলে দিচ্ছি। পঞ্চাশ কদম অতিক্রম করার পর একটি উট বসে আছে দেখবে। তার সঙ্গে খাবার আছে, পানি আছে। সঙ্গে তার যা কিছু পাবে, সবই তোমার।'

আগন্তুক গ্রামবাসীদের জানায়-

এবার আমি উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হই। দেহে শক্তি ফিরে আসে। আমি ভয় পাচ্ছিলাম, এটি কোন ফেরাউনের বদরূহ কিনা। আমি পেছনের দিকে তাকালাম না। ঠিক পঞ্চাশ কদম সম্মুখে আসার পর একটি উট দেখতে পেলাম। সঙ্গে তার খাদ্য-পানীয় বাঁধা। আমি সেই খাবারগুলো খেলাম ও পানি পান করলাম। এবার আমার শরীরের এত শক্তি জাগে যে, এর আগে কখনো আমি এমন শক্তি পাইনি।

আগন্তুক জনসাধারণকে একটি থলে খুলে দেখায়, যাতে কতগুলো সোনার আশরাফী। এ থলেটি উটের সঙ্গে বাঁধা ছিল। লোকটি সেই উটের পিঠে চড়ে গ্রামে এসে উপস্থিত হয়।

আগন্তুক গ্রামবাসীদের শুভ্র শশ্রুমন্ডিত বুজুর্গের পয়গাম শুনিয়ে উট হাঁকিয়ে ফিরে যায়।

আগন্তুকের কাহিনী শুনে গ্রামবাসীদের মনে ভয়ংকর সেই পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করার তীব্র আকাংখা জাগ্রত হয়। কিন্তু এলাকার প্রবীণ লোকেরা বলে যে, এই অপরিচিত আগন্তুক মানুষ নয় বরং এ প্রেত-পুরীরই ভয়ানক কোন বাসিন্দা।

মানবস্বভাবের একটি দুর্বলতা এই যে, মানুষ গুপ্ত বিষয়কে জানার এবং গোপন রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করে, তাতে যত নিষেধাজ্ঞাই থাকুক না কেন। যেসব দেহে যৌবনের খুন প্রবাহমান, তারা বড় বড় ঝুঁকিও বরণ করে নিতে কুণ্ঠিত হয় না। গ্রামের

যুবকরা সংকল্পবদ্ধ হয় যে, তারা ওখানে যাবেই। স্বর্ণমুদ্রার আকর্ষণ বড় কঠিন, যা থেকে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

চল্লিশ মাইল দীর্ঘ দশ মাইল প্রস্থ এই ভূখণ্ডে যতগুলো গ্রাম আছে, সব ক'টি গ্রামের অধিবাসীরা শুনতে পেয়েছে, অজ্ঞাত পরিচয় এক আগন্তুক এমন এমন কাহিনী শুনিয়ে গেছে। শুনে কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। আবার কেউ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে দোল খেতে লাগল। কিন্তু সেদিকে যেতে ভয় পাচ্ছে সবাই। সাহস করে যারা গেল, তারাও রহস্যময় সেই পার্বত্য অঞ্চলকে দূরে থেকে দেখেই ফিরে এল। কিছুদিন পর আরো দু'জন উষ্ট্রারোহী যুবক এসে সমগ্র এলাকা ঘুরে যায়। তারাও এলাকবাসীকে একই রকম কাহিনী শুনিয়ে যায়। এক বুজুর্গ ব্যক্তি তাদেরও বলে দেন যে, তোমরা পাড়ায় গিয়ে সবাইকে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও, যেন তারা ফেরাউনী আমলের ধ্বংসাবশেষগুলোকে ভয় না করে।

তারপর এলাকাবাসীদের মধ্যে এ জাতীয় কাহিনী একের পর এক ছড়াতে থাকে। ধীরে ধীরে মানুষের মন থেকে ভীতি ও শংকা কেটে যেতে শুরু করে। এক পর্যায়ে এলাকাবাসী কৌতূহলী হয়ে উঠে এবং পর্বতসমূহের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করে দেয়। অনেককে তারা ভেতরে যাওয়া-আসা করতে দেখতে পায়। তারা জানায় যে, ভেতরে একজন বুজুর্গ লোক আছেন, তিনি গায়েবের অবস্থা ও আকাশের খবর বলে দিতে পারেন। এমনও বলাবলি শুরু হয় যে, তিনিই ইমাম মাহদী। কেউ বলে, তিনি হযরত মূসা (আঃ)। আবার কারো মতে ঈসা (আঃ)। তবে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, লোকটি আল্লাহ-প্রেরিত একজন মহামানব অবশ্যই। তিনি পাপিষ্ঠদের সাক্ষাৎ দেন না। তার নিকট যেতে হলে নিয়ত পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। এমনও বলা হচ্ছে যে, তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন।

এসব তেলেসমাতি ও রহস্যময় কাহিনী শোনার পর এবার মানুষ ভেতরে যাওয়া-আসা শুরু করে। প্রথমবারের মত তারা নিকট থেকে ফেরাউনী প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করে, যেগুলোকে এতদিন তারা ভয় করত। তারা প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করে। অসংখ্য কক্ষ, আঁকাবাঁকা সরু পথ। একটি কক্ষ বিশাল-বিস্তৃত। ছাদটা অনেক উঁচু। আশপাশের পরিবেশ ভয়ানক। কিন্তু খোশবুতে মৌ মৌ করছে এলাকাটা। কক্ষের ভেতর থেকে কয়েকটি সিঁড়ি চলে গেছে নীচের দিকে।

এ প্রাসাদ সেই ফেরাউনদের, যারা নিজেদেরকে খোদা বলে দাবী করত। ঘনিষ্ঠজন ব্যতীত তাদেরকে কেউ চোখে দেখত না। তারা জনসধারণকে এই প্রাসাদে সমবেত করত এবং নিজেদের শুধু কণ্ঠস্বর শোনাত– দেখা দিত না কখনো। তাদের কণ্ঠস্বর কতগুলো সুরঙ্গ পথে ভেসে এসে এই প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ছড়িয়ে পড়ত। বক্তা অবস্থান করত সুরঙ্গের অপর প্রান্তে, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারতো না। এই

অদৃশ্য কণ্ঠস্বরকে তারা খোদার আওয়াজ মনে করত। প্রাসাদের বড় বড় কক্ষগুলোতে আলোর জন্য এমন ব্যবস্থা থাকত যে, দীপ-বাতি দেখা যেত না, কিন্তু কক্ষগুলো থাকত আলোকোজ্জ্বল। স্বচ্ছ কাচের মত চকমকে এক প্রকার ধাতুর তৈরী চাঁদর ব্যবহার করা হত। তার ভেতরে লুকায়িত থাকত ছোট ছোট বাতি। সেই বাতির আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ত কক্ষময়; কিন্তু সাধারণ মানুষ বিষয়টি বুঝত না।

এসব তো হল শত শত বছর আগের কথা। এখন সালাহুদ্দীন আইউবীর আমলেও এই প্রাসাদে পুনরায় সেই আওয়াজ গুঞ্জরিত হতে শুরু করে, যাকে এককালে মানুষ খোদার কণ্ঠস্বর বলে বিশ্বাস করত। স্বল্প সময়ের মধ্যে মানুষের হৃদয় থেকে এই পরিত্যক্ত প্রাসাদের ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়ে যায়। প্রশস্ত অন্ধকার সুরঙ্গ পথ অতিক্রম করে তারা প্রাসাদের বড় কক্ষে পৌঁছে যায়। আলোয় ঝলমল করছে গোটা কক্ষ। কিন্তু কোন বাতি নেই। একটি কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াচ্ছে কক্ষময়। কে যেন বলছে–

'আমি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর পথে এনেছি। এটি তূর পাহাড়ের আলো। এই আলোকে তোমরা হৃদয়ে স্থান করে দাও। ফেরাউনের প্রেতাত্মারা মরে গেছে। এখন এখানে বিরাজ করছে মূসার নূর। ঈসা এসে এ নূরকে আরো আলোকময় করবেন। তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, কালেমা পাঠ কর।'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে জনতা। বিস্ফারিত নয়নে একজন তাকায় অপরজনের দিকে। ইল্লাল্লাহর জিকিরে মুখরিত করে তোলে গোটা কক্ষ।

এই বক্তব্যে যদি নবী হযরত মূসা, হযরত ঈসা (আঃ) ও কালেমা তায়্যেবার উল্লেখ না থাকত, তাহলে সাধারণ মানুষ এতে প্রভাবিত হত না। তারা ছিল মুসলমান। ইসলামের নাম ব্যবহার করার কারণেই এই অদৃশ্য বাণী তাদের হৃদয়ে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছিল। পরক্ষণে পুনরায় শব্দ ভেসে আসল-

'আল্লাহ তার রাসূলকে রেসালাত দান করেছিলেন হেরা গুহার অন্ধকারে, তোমরা এই গুহার অন্ধকারে আল্লাহর নূর দেখতে পাবে।'

জনতার মস্তক অবনমিত হয়ে আসে এবং এই বাণীও তাদের হৃদয়ে গেঁথে যায়। কিন্তু যে মহান সত্তার কণ্ঠস্বর, যিনি অসহায় পথিকদের উট-ঘোড়া, খাবার-পানি ও স্বর্ণমুদ্রা দান করেন, মৃতকে জীবন দান করেন, তাকে এক নজর দেখার জন্য মানুষ উদগ্রীব হয়ে উঠে। তাদের উৎকণ্ঠা দিন দিন বাড়তেই থাকে। যখনই তারা ঘরে ফিরত, তাদের স্ত্রীরা জানাত আজ অপরিচিত একজন লোক এসেছিল। লোকটা প্রাসাদের দরবেশের কারামত শুনিয়ে গেল এবং বলল, সে নাকি দরবেশের সাথে সাক্ষৎ করে এসেছে।

একদিন জনসাধারণ এলাকার সবচেয়ে বড় গ্রামটির মসজিদের ইমামের নিকট এসব ঘটনার তাৎপর্য জানতে চায় যে, হুজুর! বিষয়টা আসলে কী? জবাবে ইমাম

বললেন, 'তিনি একজন মহান ব্যক্তি। নেক লোকদের ছাড়া কাউকে সাক্ষাৎ দেন না, কারো নিকট ধরা দেন না। আর নেক মানুষ তারা, যারা খুন-খারাবী করে না। আপোস ও শান্তির জীবনযাপন করে। কাউকে মারেও না, নিজেও মরতে যায় না। তোমরা যে দরবেশের কথা জানতে চাইছ, তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর পয়গাম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তার পয়গামে যুদ্ধ নেই, আছে প্রেম আর ভালোবাসা। তার আনীত পয়গামের একটি উপদেশ হল, কাউকে জখমী কর না বরং জখমীর ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দাও। তোমরা যদি তার নীতির অনুসরণ করে চল, তাহলে তিনি তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন করে দেবেন। তোমরা সুখময় জীবন লাভ করবে।'

একজন সম্মানিত ইমাম যখন দরবেশ ও তার বক্তব্য সঠিক বলে রায় দিলেন, তখন আর জনমনে সন্দেহের অবকাশ রইল না। এবার তারা ঠাটপাট প্রাসাদে যাওয়া-আসা করতে শুরু করল।

কিছুদিন পর ঘোষণা হল, প্রতি বৃহস্পতিবার সারাদিন প্রাসাদের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং সন্ধ্যায় মেলা বসবে। সেইদিন থেকে প্রাসাদের যাওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার দিনটি নির্ধারিত হয়ে গেল এবং সেই সাথে মহিলারা যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেল। এখন নিজের ইচ্ছায় আর কেউ প্রাসাদে যেতে পারছে না। বৃহস্পতিবার এলেই এলাকা সরগরম হয়ে উঠে। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ উট, ঘোড়া ও খচ্চরে চড়ে এবং পায়ে হেঁটে প্রাসাদ অভিমুখে ছুটতে শুরু করে। ভেতরের স্পর্শকাতর জগতে বিপ্লব এসে যায়। তথায় মানুষের দৃষ্টিতে এখন পাপ-পুণ্য ও আলো-আঁধারের ধারণা এমনভাবে উপস্থাপিত হতে শুরু করে যে, মানুষের কাছে তাকে একটি শরীরী বস্তু হিসেবে দেখতে পাচ্ছে এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছে। কারো মনে উল্টো-সিধে কোন প্রশ্ন নেই, নেই কোন সংশয়-সন্দেহ।

পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্র সেই অন্ধকার সুরঙ্গপথের মুখ খুলে যায়। সুরঙ্গের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েকজন লোক। তাদের পার্শ্বে থাকে স্তূপিকৃত খেজুরছড়া। এগুলো জনসাধারণের দেয়া নজরানা। খেজুরের স্তূপের পার্শ্বেই থাকে মশকভর্তি পানি আর গ্লাস। সন্ধ্যায় যখন দর্শনার্থীরা ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি লাভ করে, তখন আগে তাদের প্রত্যেককে তিনটি করে খেজুর আর এক গ্লাস পানি খাইয়ে দেয়া হয়। তারপর তারা একজন একজন করে ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করে। আঁকাবাঁকা অন্ধকার সুরঙ্গপথ অতিক্রম করে আলো-ঝলমল বিশাল হলরুমে প্রবেশ করেই তারা শুনতে পায় একটি বাণী—

'তোমরা কালেমা তায়্যেবা পাঠ কর। আল্লাহকে স্মরণ কর। হযরত মূসা (আঃ) আগমন করেছেন। ঈসাও (আঃ) এসে পড়বেন। অন্তর থেকে পাপ-প্রবণতা ও শত্রুতা

ঝেড়ে ফেল। লড়াই-ঝগড়া ত্যাগ কর। আর জান্নাতের প্রলোভন দেখিয়ে যাদেরকে যুদ্ধে নামান হয়েছিল, তাদের পরিণতি দেখ।'

এ ঘোষণা শেষ হওয়া মাত্র উপস্থিত লোকদের চোখে অতি প্রখর একটি আলো এসে পতিত হয়। তাদের সকলকে একদিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করানো হয়। ধীরে ধীরে চোখের আলো তাদের ক্ষীণ হয়ে আসে। তারপর আলো কখনো প্রখর কখনো ক্ষীণ হতে থাকে এবং লোকদের সম্মুখের দেয়ালে তারকার চমক পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। তারকাগুলো কাঁপতে থাকে এবং অতি ভয়ংকর আকৃতির কিছু মানুষের গমনাগমন চোখে পড়তে আরম্ভ করে। আবার ভেসে আসে একটি কণ্ঠস্বর–

'এরা তোমাদেরই ন্যায় যুবক ও সুশ্রী ছিল। কিন্তু এরা খোদার পয়গাম মান্য করেনি। এরা কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এদেরই ন্যায় সুদর্শন যুবকদের হত্যা করেছিল। এদের বলা হয়েছিল, তোমরা লড়াই কর। যুদ্ধ করতে করতে যদি মারা যাও, তাহলে শহীদ হবে এবং জান্নাতে চলে যাবে। এখন তোমরা এদের পরিণতি দেখ। খোদা এদের আকৃতিকে শয়তানের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে পথে ছেড়ে দিয়েছেন।'

এই কণ্ঠস্বরের সাথে শোনা যেত মেঘের গর্জন আর দেখা যেত বিজলির চমক। এমন কিছু আওয়াজও ভেসে আসত, যা হিংস্র কোন প্রাণীর শব্দ বলে মনে হতো। আলো এত প্রখর হয়ে উঠত যে, মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। তারপর লম্বা লম্বা দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীরা ডানে-বাঁয়ে ছুটাছুটি শুরু করে দিত। এরাও মূলত মানুষ। কিন্তু এদের আকৃতি ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ংকর। তারা বাহুর উপর দু'টি করে উলঙ্গ মেয়ে তুলে রেখেছে। মেয়েগুলো অত্যন্ত সুন্দরী ও যুবতী। ছটফট করছে তারা। মেঘের গর্জন ধীরে ধীরে আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠে। আবার ভেসে আসে কণ্ঠস্বর- 'নিজের রূপ-লাবণ্যে এদের বড় গৌরব ছিল। কিন্তু খোদার রূপকে এরা কলংকিত করেছিল।'

তারপর জনতার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে কিছু সুদর্শন পুরুষ ও নারী। হাসিমুখে উৎফুল্লচিত্তে তারা অতিক্রম করে। ঘোষণা হয়- 'এরা নেক ও পবিত্র মানুষ। এরা কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। যুদ্ধ-বিগ্রহকে কখনো সমর্থনও করেনি। এরা আপাদমস্তক প্রেম ও শান্তির প্রতিমূর্তি।'

তারপর দর্শনার্থীদের নিয়ে যাওয়া হতো একটি পাতাল কক্ষে। সেখানে একদিকে পড়ে আছে অসংখ্য মানব কংকাল, অপরদিকে হেসে-খেলে ফূর্তি করে ছুটাছুটি করছে বেশকিছু রূপসী তরুণী। খানিক পরপর ভেসে আসছে একটি কণ্ঠস্বর– 'হযরত ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-খারাবী মন থেকে ঝেড়ে ফেল। অন্যথায় তোমাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ।'

পাতাল কক্ষের একটি দরজা দিয়ে লোকদের বাইরে বের করে দেয়া হয়। বের

হওয়ার পর তাদের কাছে মনে হয় যেন তারা ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। যেমন ভয়ংকর তেমন প্রীতিকর স্বপ্ন। তারা পুনরায় ভেতরে প্রবেশ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। কিন্তু আপাতত আর তাদের প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। তারা ঘরে ফিরে যেতে চায় না। প্রাসাদের আশপাশে বসে বসেই রাত কাটিয়ে দেয়। ওখানকার লোকেরা তাদের ভেতরের রহস্যের বিবরণ দেয়। একটি রহস্য হল, প্রাসাদের ভেতরে যার কণ্ঠ শোনা যায়, তিনি খোদার পক্ষ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করছেন এবং খলীফা আল-আজেদও দুনিয়াতে ফিরে এসেছেন।

আল-আজেদ ফাতেমী খেলাফতের খলীফা ছিলেন। তার সিংহাসন ছিল মিসরে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে মিসরকে বাগদাদের খেলাফতে আব্বাসীয়ার অধীন করে দেন। তার অল্প ক'দিন পরেই আল-আজেদ মৃত্যুবরণ করেন। এটি দু'আড়াই বছর আগের ঘটনা। ফাতেমীরা খৃস্টান ও হাশীশীদের সাথে যোগসাজশ করে একটি ষড়যন্ত্র আঁটে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং মিসরে ফাতেমী খেলাফতের পুনর্বহাল ছিল সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই ষড়যন্ত্রকে সফল করার লক্ষ্যে মিসর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল সুদানীদের।

প্রাসাদের অদৃশ্য দরবেশের মুরীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। এলাকাবাসী অতিদ্রুত ভক্তে পরিণত হচ্ছে তার। দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার মানুষদের মধ্যে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে শুরু করেছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) খলীফা আল-আজেদকে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং তিনি নিজেও আসছেন। তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সংকল্প থেকে তওবা করে ফেলে। এখন তাদের বিশ্বাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ পাপের কাজ। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী একজন পাপিষ্ঠ মানুষ। নিজের রাজত্বের বিস্তৃতির জন্য তিনি ধোঁকা দিয়ে লোকদের ফৌজে ভর্তি করান যে, তোমরা যুদ্ধে মারা গেলে শহীদ হবে এবং সোজা জান্নাতে চলে যাবে।

প্রাসাদের ভেতরের জগত্ এখন মানুষের উপাসনালয়। আশপাশের পার্বত্য এলাকায় এখন তাঁবু ফেলে বাসবাস করছে তারা। প্রাসাদের পুণ্যাত্মা দরবেশের সাক্ষাত লাভের জন্য তারা ব্যাকুল-বেকারার। একটি নতুন ফেরকার উদ্ভব হল মিসরের এ অঞ্চলটিতে।

✿ ✿ ✿

যে জখমী হাশীশী সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর সংহারী হামলা করেছিল, আলী বিন সুফিয়ান তাকে কায়রো নিয়ে যান। আলাদা একটি ঘরে থাকতে দেয়া হয়

তাকে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নির্দেশ মোতাবেক সর্বক্ষণের জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত করে দেয়া হয় তার জন্য। তার ঘরের দরজায় একজন সান্ত্রী দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কিন্তু এখনো পালাবার শক্তি ফিরে আসেনি তার।

সীমান্ত এলাকার ফেরাউনী প্রাসাদ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে জখমী। এখান থেকে পরিচালিত হয় খৃস্টানদের ইসলাম ও আইউবী বিরোধী ষড়যন্ত্র। জখমী সুস্থ হলে তার সহযোগিতায় গোয়েন্দা পাঠিয়ে প্রাসাদের ভেতরের খবরাখবর নেন আলী বিন সুফিয়ান। হতে পারে জখমী মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছে। কায়রো ফিরে এসেই আলী বিন সুফিয়ান তার নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ও গিয়াস বিলবিসকে বলে দিয়েছিলেন যে, যে অঞ্চলের মানুষ আমাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চলে গেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে, সেখানে আপাতত কোন সংবাদদাতা বা গুপ্তচর যেন না পাঠায়। বড় ধরনের রহস্য উদঘাটনের আশা করছেন আলী বিন সুফিয়ান।

জখমীর মনে কেন যেন সন্দেহ জন্মে গেছে যে, সে বাঁচতে পারবে না। অনর্গল সে কাঁদছে আর নিজের গ্রামের নাম উল্লেখ করে করে বলছে, অমুক জায়গা থেকে আমার বোনটাকে এনে দিন, মৃত্যুর আগে আমি ওকে একটু দেখে যাই। বোনের প্রতি অস্বাভাবিক আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে লোকটি। এ মুহূর্তে বোন ছাড়া আর কোন ভাবনাই নেই যেন তার হৃদয়ে। দু'জন দূতকে আলী বিন সুফিয়ান জখমীর গ্রামের ঠিকানা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, যাও এর বোনকে সাথে করে নিয়ে আস। এলাকাটি মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। সাথে সাথে রওনা হয়ে যায় দূত।

শোবক পৌঁছে গেছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। প্রাণ-সংহারী হামলার কোন প্রতিক্রিয়া নেই তার চেহারায়। যেন পথে কিছুই ঘটেনি। তার দেহরক্ষী বাহিনী কমান্ডার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যেমন পেরেশান তেমনি লজ্জিত। তাদের আশংকা, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যে কোন মুহূর্তে আমাদেরকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করবেন। কিন্তু না, এ সম্পর্কে তার কোন কথা নেই। ইঙ্গিতে-আভাসেও কিছু বলছেন না তিনি। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কমান্ডের সামরিক কর্মকর্তাদের বললেন, 'আপনারা নিজ চোখেই তো দেখলেন যে, আমার জীবনের কোন ভরসা নেই। আপনারা আমার সমরকৌশল রপ্ত করার চেষ্টা করুন। গভীর মনোযোগ সহকারে দেখুন, আমি কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করছি। আমার অবর্তমানে আপনাদের সামনে অগ্রসর হতে হবে। দুশমন আমাদের বিরুদ্ধে অপর যে গোপন যুদ্ধটি চালু করে ফেলেছে, সেদিকে গভীর নজর রাখুন। নাশকতাকারীদের ধরুন আর শিরচ্ছেদ করতে থাকুন। যারা নিজ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও দ্বীন-ধর্মের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিজের দেহরক্ষী বাহিনীটির ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। শোবক দুর্গে পৌছে প্রথম কথাটি বললেন, 'কোন গুপ্তচর ফিরে এসেছে কি?' তাকে বলা হল, দু'জন গুপ্তচর বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে এসেছে। সুলতান আইউবী দু'জনকে ডেকে পাঠান এবং খৃস্টানদের পরিকল্পনার বিস্তারিত রিপোর্ট গ্রহণ করেন। গুপ্তচরদের নিকট থেকে তিনি খৃস্টানদের পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করেন। তিনি সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনীর সালার, মিসর থেকে আগত সেনা অধিনায়ক এবং দু'জনের দু'নায়েবকে ডেকে পাঠিয়ে গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান।

চারদিন পর জখমী হাশীশীর বোন এসে পৌছে। সাথে তার চারজন পুরুষ। এরা জখমীর চাচাতো ভাই বলে পরিচয় দেয়া হল। মেয়েটি তরুণী, অতিশয় রূপসী। ভাইয়ের জন্য বোনও ছিল উৎকণ্ঠিত। জখমী হাশীশী তার একমাত্র ভাই। বাবা বেঁচে নেই। মা মারা গেছেন।

তারা জখমীর সাথে সাক্ষাৎ করবে। কিন্তু এর জন্য আলী বিন সুফিয়ানের অনুমতির প্রয়োজন। আলী বিন সুফিয়ান শুধু বোনকে অনুমতি দিলেন। অনুনয়-বিনয় করে পুরুষ চারজন। বলে, আমরা অনেক দূর থেকে বহু কষ্ট করে এসেছি। জখমী ভাইটিকে শুধু এক নজর দেখে যেতে দিন। তার সাথে আমরা কোন কথা বলব না।

আলী বিন সুফিয়ান এই মর্মে তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন যে, তিনি নিজে তাদের সাথে থাকবেন এবং জখমীকে এক নজর দেখার সুযোগ দিয়ে সাথে সাথে বের করে দেবেন।

তখনই তিনি তাদেরকে জখমীর কক্ষে নিয়ে গেলেন। ভাইকে দেখেই বোন তার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে এবং হাউমাউ করে কেঁদে উঠে। অন্যদের সম্পর্কে আলী বিন সুফিয়ান জখমীকে বললেন, এদের সাথে হাত মিলাও, এরা এক্ষুণি চলে যাবে। জখমী এক এক করে চারজনের সাথে হাত মিলায়। আলী বিন সুফিয়ান তাদের বের হয়ে যেতে আদেশ করলেন এবং বলে দিলেন, এরপর আর কখনো তোমরা এর সাথে দেখা করার চেষ্টা কর না।

তারা চলে যায়। বোন আলী বিন সুফিয়ানের পা জড়িয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আবেদন জানায়, ভাইয়ের সেবার জন্য আপনি আমাকে এখানে থাকার অনুমতি দিন। আলী বিন সুফিয়ান একটি নারীর এরূপ করুণ আর্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। দেহ তল্লাশি নিয়ে তিনি মেয়েটিকে জখমীর নিকট থাকার অনুমতি দিয়ে বেরিয়ে যান।

কক্ষে এখন শুধু ভাই আর বোন। বোন জানতে চায়, তুমি কী করেছিলে? ভাই ঘটনার বিবরণ দেয়। বোন জিজ্ঞেস করে, তা এখন তোমার পরিণতি কী হবে? ভাই

জবাব দেয়, 'আমি আমীরে মেসেরের উপর প্রাণ-সংহারী হামলা করেছি। এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। সুলতান যদি করুণা করেন, তবে বড়জোর মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেতে পারি। কিন্তু আজীবন তাদের বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুঁকে ধুঁকে জীবন কাটাতে হবে অবশ্যই।'

'তার অর্থ কি এই যে, আমি জীবনে আর কখনো তোমায় দেখতে পাব না?' জিজ্ঞেস করে বোন।

'না শারজা! তুমি জীবনে আর কখনো আমায় দেখতে পাবে না। আর আমিও না পারব মরতে, না পারব বেঁচে থাকতে। তারা আমাকে যেখানে বন্দী করে রাখবে, তা বড়ই ভয়ংকর জায়গা।' বলল জখমী।

শিশুর ন্যায় হাউমাউ করে কেঁধে উঠে বোন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে- 'আমি তখনও তোমায় বারণ করেছিলাম যে, ওদের চক্করে পড় না। তুমি বলেছিলে, সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করা বৈধ। তুমি লোভে পড়ে গিয়েছিলে। আমার ভবিষ্যত কি হবে, তুমি তারও চিন্তা করলে না। তুমি না থাকলে আমার উপায় কি হত বল তো।'

এলোমেলো হয়ে গেছে জখমী ভাইয়ের মস্তিষ্ক। কখনো সে অনুতপ্ত হয়ে বলছে, 'হায়! কেন আমি ওদের খপ্পরে পড়লাম।' কখনো বলছে, 'সালাহুদ্দীন আইউবী মানুষ নন, আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা। আমরা চারটি তাগড়া যুবক মিলেও তার দেহে খঞ্জরের একটি আচড়ও বসাতে পারলাম না। একতিল বিষ তার মুখে পুরতে পারলাম না। তিনি একা আমাদের তিনজনকে প্রাণে মেরে ফেললেন আর আমাকেও যমের মুখে তুলে দিলেন।'

'এই যে মানুষ বলছে, সালাহুদ্দীন আইউবীর ঈমান এত শক্ত যে, কোন পাপিষ্ঠ তাকে হত্যা করতে পারে না, তাতো মিথ্যা নয়। তোমরা চারজনই তো মুসলমান ছিলে। এতটুকু চিন্তাও তোমরা করলে না যে, তিনিও মুসলমান।' বলল শারজা।

'তিনি আল্লাহর খলীফার সিংহাসনের অবমাননা করেছেন।' উল্টো দিকে ঘুরে যায় জখমীর মস্তিষ্ক। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'তুমি জান না যে, আল-আজেদ আল্লাহর প্রেরিত খলীফা ছিলেন।'

'হয়তো বা ছিলেন অথবা ছিলেন না। আমি শুধু এতটুকু জানি যে, তুমি আমার ভাই আর আমার থেকে তুমি আজীবনের জন্য হারিয়ে যাচ্ছ। তোমার মুক্তির কোন পথ বের করা যায় না কি?' বলল শারজা।

'হয়ে যাবে হয়তো। আমি এ শর্তেই তাদেরকে আমার সব তথ্য ফাঁস করে দিয়েছি যে, তারা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু আমার অপরাধ এতই মারাত্মক যে, ক্ষমা বোধ হয় পাব না।' জবাব দেয় জখমী।

এ সময়ে জখমীর ঘুমিয়ে পড়ার কথা। এত কথা বলা ঠিক হচ্ছে না তার। পেটের জখম খুলে যাওয়ার আশংকা প্রবল। কিন্তু একনাগাড়ে বলেই যাচ্ছে সে। কাঁদছে তার বোন। হঠাৎ তার পেটের জখমে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। অস্থির হয়ে উঠে সে। বোনকে বলে, 'শারজা! তুমি বাইরে যাও। কাউকে পেলে বল, ডাক্তার নিয়ে আসতে। আমি মরে যাচ্ছি।'

এক দৌড়ে বেরিয়ে পড়ে শারজা। প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। প্রহরীকে ভাইয়ের অবস্থা জানায়। প্রহরী শারজাকে ডাক্তারের ঘরটি দেখিয়ে দেয়। ডাক্তারের প্রতি নির্দেশ ছিল, দিন হোক রাত হোক জখমীকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। শাহী ডাক্তার তিনি।

প্রহরীর দেখিয়ে দেয়া পথ ধরে ছুটে যায় শারজা। পৌঁছে যায় ডাক্তারের ঘরে। ডাক্তারকে ভাইয়ের অবস্থা জানায়। সংবাদ পাওয়া মাত্র ছুটে আসেন ডাক্তার।

রক্তে লাল হয়ে গেছে জখমীর পেটের পট্টি। ডাক্তার সাথে সাথে পট্টিটা খুলে ফেলেন। রক্ত বন্ধ করার পাউডার মেখে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে আবার পট্টি বেঁধে দেন। রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তার জখমীকে ওষুধ খাইয়ে দেন, যার ক্রিয়ায় ঘুমিয়ে পড়ে সে।

শাহী ডাক্তার বয়সে তরুণ। সুদর্শন চেহারা। আকর্ষণীয় দেহ। শারজার চোখ আটকে যায় তার প্রতি। আপন ভাইয়ের প্রতি তার সহানুভূতিতেও সে অতিশয় মুগ্ধ। এত রাতে সংবাদ পাওয়া মাত্র একজন কয়েদী জখমীর চিকিৎসার জন্য কেউ ছুটে আসতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারছে না শারজা। কিন্তু ইনি আসলেন এবং পরম গুরুত্ব সহকারে জখমীর চিকিৎসা করলেন। তাই ডাক্তারের প্রতি অভিভূত শারজা। নিদ্রায় জখমীর দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এলে ডাক্তার নিজের চোখ দু'টো বন্ধ করে দু'হাত ঊর্ধে তুলে ধরে মোনাজাত করলেন– 'মানুষের জীবন-মৃত্যু দু-ই তোমার হাতে হে আমার আল্লাহ! এই হতভাগার প্রতি তুমি রহম কর। একে তুমি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর। একে সুস্থতা দান কর।'

দু'চোখ গড়িয়ে অশ্রু নেমে আসে শারজার। ডাক্তারের প্রতি ভক্তিতে-আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে সে। ডাক্তারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার একটি হাত মুঠি করে ধরে মাথানত করে চুম খায় শারজা। শারজার পরিচয় জানতে চান ডাক্তার। শারজা বলে, আমি আপনার রোগীর বোন। বলেই সে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার অন্তরে কি এতই দয়া যে, আপনি আমার ভাইকে কষ্টের মধ্যে দেখতে চান না। নাকি এ উদ্দেশ্যে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান যে, সে আপনাকে সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবে?'

‘এর কাছে কোন তথ্য আছে কি নেই তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমার কর্তব্য একে বাঁচিয়ে রাখা এবং সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তোলা। আমার দৃষ্টিতে মুমিন-মুজরিমে কোন পার্থক্য নেই।’ বললেন ডাক্তার।

‘আপনি বোধ হয় জানেন না যে, এর অপরাধ কি? জানলে আপনি এর কাটা ঘায়ে পট্টি বাঁধার পরিবর্তে নুন ভরে দিতেন।’ বলল শারজা।

‘জানি। তবু আমি একে বাঁচিয়ে রাখার পূর্ণ চেষ্টা করে যাব।’ জবাব দেন ডাক্তার।

ডাক্তারের প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়ে শারজা। নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত শোনাতে শুরু করে সে ডাক্তারকে। শারজা জানায়, শৈশবে তার বাবা-মা দু'জনই মারা যান। সে সময়ে তার এই ভাইয়ের বয়স ছিল দশ-এগার বছর। ভাই তাকে লালন-পালন করে। ভাই না থাকলে এতদিন কেউ না কেউ তাকে অপহরণ করে নিয়ে যেত। ভাই তার জীবনটাকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিল বোনের জন্য।

ডাক্তার মনোযোগ সহকারে শারজার কথা শুনতে থাকেন। এক পর্যায়ে মেয়েটিকে তিনি বাইরে আঙ্গিনায় নিয়ে যান, পাছে জখমীর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। শারজার কথায় ডাক্তার এতই নিমগ্ন হয়ে পড়েন, যেন রাতটা তিনি এখানেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন তিনি চলে যেতে উদ্যত হলেন, তখন শারজা তার হাত ধরে বলল, ‘আপনি চলে গেলে আমি ভয় পাব।’ ডাক্তার বললেন, ‘আমি না তোমায় সাথে করে নিয়ে যেতে পারি, না তোমার সাথে এখানে থাকতে পারি।’ তবু শারজার খাতিরে তিনি আরো কিছু সময় এখানে অতিবাহিত করে রাত দ্বি-প্রহরের পর ঘরে ফেরেন।

পরদিন ভোরবেলা। সূর্য এখনো উদয় হয়নি। ডাক্তার জখমীকে দেখার জন্য এসে পড়েন। রাতের ন্যায় যত্নের সাথে তিনি রোগীকে নিরীক্ষা করে দেখেন। জখমীকে দুধ পান করান এবং এমন খাবার খাওয়ান,যা শারজা কখনো স্বপ্নেও দেখেনি।

এ সময়ে জখমীর কক্ষে আসেন আলী বিন সুফিয়ান। জখমীকে এক নজর দেখে চলে যান তিনি। কিন্তু ডাক্তার যাননি এখনো। শারজার সাথে কথা বলতে শুরু করেন তিনি। কাটান অনেকক্ষণ।

সেদিন ডাক্তার সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনবার জখমীকে দেখতে আসেন। অথচ তার আসার কথা মাত্র একবার- দুপুরে। সন্ধ্যায় যখন ডাক্তার জখমীকে দেখে ফিরে যান, তখন জখমী তার বোনকে বলে, ‘শারজা! মনোযোগ দিয়ে তুমি আমার একটি কথা শোন। আমার জীবন এই ডাক্তারের হাতে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমাকে দেখার পর ডাক্তার চিকিৎসা আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো করছেন। আমি মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারি, কিন্তু এত বেশী মূল্য আমি তাকে দেব না, যার আশা সে পোষণ করছে। সন্দেহ নয়- আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাকে জীবিত রাখার বিনিময়ে লোকটি তোমার ইজ্জতের নজরানা হাতিয়ে নিতে চায়।’

'আমি তো তাকে ফেরেশতা মনে করি। এ যাবত এমন কোন আভাস-ইঙ্গিতও পাইনি তার কাছে। তাছাড়া আমি তো আর ছোট্ট খুকী নই যে, চাইলেই সে আমাকে পটাতে পারবে।'

রাতে ডাক্তার আসেন। ঘুমিয়ে পড়েছে জখমী। শারজা জাগ্রত। ডাক্তারের সঙ্গে বারান্দায় চলে যায় শারজা। দু'জন কথা বলে দীর্ঘক্ষণ। ডাক্তার বললেন, ওষুধের ক্রিয়ায় তোমার ভাই যে ঘুম ঘুমুচ্ছে, ভোর নাগাদ তার সজাগ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এসো, আমার ঘরে চল। ডাক্তারের প্রস্তাব ফেলে দিতে পারে না শারজা। চলে যায় তার সাথে।

সুশ্রী যুবক ডাক্তার একা থাকেন ঘরে। শারজা অতিশয় বুদ্ধিমতি তরুণী। তার ধারণা, আজ রাতে লোকটা ধরা খেয়ে যাবে নিশ্চয়। কিন্তু তেমনটি হয়নি। সমব্যাথী বন্ধুর ন্যায় শারজার সাথে কথা বলে সময় কাটান ডাক্তার। তার এই স্নেহমাখা পবিত্র আচরণ মুগ্ধ করে তুলে শারজাকে। হঠাৎ শারজা জিজ্ঞেস করে বসে, 'আমি সুদূর এক মরু অঞ্চলের একটি গরীব মেয়ে। তদুপরি এমন এক আসামীর বোন, যে মিসরের সুলতানের ন্যায় মহান ব্যক্তিকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তথাপি তুমি আমার সাথে এমন সদয় আচরণ কেন করছ, যার আমি হকদার নই?'

জবাবে শুধু মুচকি একটা হাসি দেন ডাক্তার। শারজা বলে, 'আমার তো এ ছাড়া আর কোন গুণ নেই যে, আমি একটি যুবতী মেয়ে। আর সম্ভবত কিছুটা রূপ-সৌন্দর্য্যও আছে।'

তোমার মধ্যে আরো এমন একটি গুণ আছে, যা তোমার জানা নেই। আমার একটি বোন ছিল দেখতে ঠিক তোমারই মত। তোমাদের যেমন আর কোন ভাই-বোন নেই, তেমনি আমরাও ভাই-বোন দু'জনই ছিলাম। আব্বা-আম্মা মারা গেছেন। তোমার ভাইয়ের ন্যায় আমিও আমার বোনকে লালন-পালন করে বড় করেছিলাম। নিজের জীবনের সব হাসি-আনন্দ আমি তার জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলাম। এক সময়ে তার অসুখ হল আর মারা গেল আমারই হাতে। রয়ে গেলাম আমি একা। তোমাকে দেখে আমার সেই বোনের কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল, আমার বোনকে আমি ফিরে পেয়েছি। তুমি যদি নিজেকে যুবতী ও সুন্দরী মেয়ে ভেবে আমার উপর সন্দেহ করেই থাক, তাহলে ঠিক আছে, তোমার ব্যাপারে আমার আর কোন কৌতূহল রইল না। আমি তোমার ভাইকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি। তাকে সুস্থ করে তোলা আমার কর্তব্য।

শারজা যখন ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তখন গভীর রাত। মেয়েটির মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। পরদিন ডাক্তার জখমীকে দেখতে আসেন। শারজার সাথে কোন কথা বলেন না তিনি। রোগী দেখে যখন কক্ষ থেকে বের হয়ে

যেতে উদ্যত হলেন, অমনি শারজা তার সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। শারজার ধারণা, ডাক্তার তার সাথে রাগ করেছেন। ডাক্তার বলেন, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নই। শারজা খানিকক্ষণ ডাক্তারের মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পথ ছেড়ে দেয়। ডাক্তার চলে যান।

রাতে জখমীকে ঘুম পাড়িয়ে শারজা আবার হাঁটা দেয় ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তারের সঙ্গে কাটায় দীর্ঘ সময়। নিজের মনে কিছু জট পড়ে আছে তার। সেগুলো খুলতে চাইছে সে। শারজা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা বলুন তো, খলীফা কি আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি নন?'

'না, খলীফা সাধারণ মানুষ হয়ে থাকেন। আল্লাহর প্রেরিত লোক তো ছিলেন নবী-রাসূলগণ। মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এসে সে ধারা বন্ধ হয়ে গেছে।' জবাব দেন ডাক্তার।

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'না, তিনিও মানুষ। তবে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাঁর মর্যাদা বড়। কারণ, তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহান পয়গামকে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছিয়ে দিতে চাইছেন।' ডাক্তার জবাব দেন।

শারজা এরূপ আরো অনেকগুলো প্রশ্ন করে আর ডাক্তার জবাব দেন। সবশেষে শারজা বলে, 'আমার ভাইটি মস্তবড় পাপী। আপনি এই যে কথাগুলো আমায় বললেন, তা যদি আমার ভাইকে জানাতেন, তাহলে হয়তো ভাইটি আমার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু তার জীবন তো আর রক্ষা পাবে না।'

'পাবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন বলে দিয়েছেন যে, একে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা কর, তো এর অর্থ হল, তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। তোমার ভাইয়ের উচিত, পাপাচার থেকে তাওবা করে নেয়া। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, তোমার ভাই ক্ষমা পেয়ে যাবে।' বললেন ডাক্তার।

কেঁদে ফেলে শারজা। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, 'আমি সারাটা জীবন সালাহুদ্দীন আইউবীর খেদমতে কাটিয়ে দেব আর আমার ভাই আপনাদের গোলাম হয়ে থাকবে।' বলতে বলতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে শারজা। আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাক্তারের হাত ধরে বলে, 'আপনি মূল্য যা চাইবেন, আমি আদায় করব। আপনি আমায় আপনার দাসী বানিয়ে নিন, আপত্তি নেই। বিনিময়ে আমার ভাইকে সুস্থ করে তুলুন এবং তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'

'কাজের বিনিময় আমরা আল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকি'– শারজার মাথায় হাত রেখে ডাক্তার বললেন– 'তুমি নিশ্চিত থাক, ভাইয়ের অপরাধের সাজা বোনকে দেয়া হবে না এবং ভাইয়ের চিকিৎসার মূল্যও বোন থেকে আদায় করা হবে না। সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী আল্লাহ। তিনিই আমার উপর তোমার ইজ্জত সংরক্ষণ

এবং ভাইয়ের সুস্থতার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। দু'আ কর, যেন আমি এই আমানতে খেয়ানত না করি। নারীর আহাজারি আল্লাহর আরশকে কাঁপিয়ে তুলতে পারে। তুমি দু'আ কর এবং সেই আল্লাহর মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখ, যার বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।'

মেয়েটির হৃদয়জগতে জেঁকে বসেন ডাক্তার। ডাক্তারের যাদুমাখা কথা আর মায়াময় পবিত্র আচরণ চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট করে তোলে মেয়েটিকে। ডাক্তারের ব্যাপারে মেয়েটির ধারণা ছিল এক রকম আর প্রমাণিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন নির্জন রাতে অতিশয় রূপসী একটি যুবতী যে তার দয়ার উপর নির্ভরশীল, সে অনুভূতিই যেন তার নেই। এভাবে কেটে গেল রাতের অর্ধেকটা। ডাক্তার তাকে বললেন, 'ওঠ, তোমাকে ওখানে রেখে আসি, তোমার ভাইকেও এক নজর দেখে আসি।'

ঘর থেকে বের হয় দু'জন। দরজায় তালা লাগিয়ে হাঁটা দেয় তারা। অন্ধকার রাত। দু'টি ঘরের মধ্যখানে একটি সরু গলিপথ অতিক্রম করতে হবে তাদের। এই গলিপথ অতিক্রম করে সামান্য একটু সামনে এগুলেই জখমী হাশীশীর থাকার ঘর। ঘরের দরজায় সান্ত্রী দণ্ডায়মান।

ডাক্তার ও শারজা গলির মধ্যে ঢুকতে যাবেন, ঠিক এমন সময়ে পেছন থেকে কারা যেন হঠাৎ ঝাঁপটে ধরে দু'জনকে। মোটা কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় দু'জনের মুখ। টু-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারছে না তারা। ডাক্তার দৈহিক শক্তিতে দুর্বল নন। কিন্তু আগে টের পাননি বলে কোন প্রতিরোধ করতে পারলেন না তিনি। আক্রমণকারীরা পাঁচজন বলে মনে হল তাদের কাছে। ডাক্তার ও শারজাকে তুলে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় তারা।

কিছুদূরে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকটি ঘোড়া। ডাক্তারের হাত-পা রশি দ্বারা বেঁধে তুলে নেয়া হয় ঘোড়ার পিঠে। একজন চড়ে বসে তার ঘোড়ায়। একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পান ডাক্তার। লোকটি শারজাকে উদ্দেশ করে বলছে, 'শব্দ কর না শারজা! তোমার কাজ হয়ে গেছে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বস। এই নাও তোমার ঘোড়া।'

শারজার মুখের কাপড় সরিয়ে নেয়া হল। ডাক্তার তার কণ্ঠস্বর শুনতে পান, 'ওকে ছেড়ে দাও, ওর কোন দোষ নেই। লোকটি বড় ভালো মানুষ।'

'আমাদের ওকে প্রয়োজন আছে।' বলল একজন।

'শারজা! চুপচাপ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বস।' আদেশের সুরে বলল আরেকজন।

'উহ্! তুমি?' শারজার কণ্ঠস্বর।

'সওয়ার হয়ে যাও। সময় নষ্ট কর না।' আদেশ দেয় আরেকজন।

শারজা ঘোড়ায় চড়ে বসে। ছুটে চলে কাফেলা। অল্পক্ষণের মধ্যে কায়রো থেকে বেরিয়ে যায় তারা।

❁ ❁ ❁

পরদিন ভোরবেলা। পাহারাদার পরিবর্তনের সময়। নতুন প্রহরী এসে দেখে রাতের প্রহরী নেই। ঘরের ভেতরে উঁকি মেরে দেখে জখমী শুয়ে আছে কম্বল মুড়ি দিয়ে। মুখটাও তার আবৃত। প্রহরী বাইরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তার জানা মতে জখমীকে দেখার জন্য এক্ষুণি ডাক্তার এসে পড়বেন। আসবেন আলী বিন সুফিয়ানও। সে এও জানত যে, জখমীর বোন জখমীর সঙ্গে থাকে এবং সে ছাড়া অন্য কারো ভেতরে যাওয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু বোনটিকেও দেখা যাচ্ছে না এদিক-ওদিক কোথাও।

সূর্য উদয় হল। আলী বিন সুফিয়ান আসলেন। ডাক্তার এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। প্রহরী, 'ডাক্তার আসেননি। আমি এসে পূর্বের প্রহরীকেও পাইনি। ভেতরে জখমীর বোনও নেই।' শুনে আলী বিন সুফিয়ান মনে করলেন, জখমীর ব্যাথা বোধ হয় বেড়ে গেছে ,তাই তার বোন ডাক্তার ডাকতে গেছে।

এই জখমী সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য মিসরের সমান মূল্যবান ব্যক্তি। অপেক্ষা শুধু তার সুস্থ হওয়ার। আলী বিন সুফিয়ানের আশা, তার মাধ্যমে ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হবে।

দ্রুত ঘরে প্রবেশ করেন আলী বিন সুফিয়ান। জখমীর আপাদমস্তক কম্বল দিয়ে ঢাকা। তাজা রক্তের ঘ্রাণ নাকে আসে আলী বিন সুফিয়ানের। জখমীর মুখের কম্বল সরান তিনি। হঠাৎ আঁৎকে ওঠে সরে যান পেছন দিকে। যেন ওটা মানুষ নয়, অজগর। সেখানে দাঁড়িয়েই বাইরে দণ্ডায়মান প্রহরীকে ডাক দেন তিনি। ছুটে আসে প্রহরী। আলী বিন সুফিয়ান তাকে কম্বলাবৃত লোকটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ লোকটি রাতের প্রহরী না তো?' শায়িত লোকটির চেহারা দেখেই আতংকিত হয়ে উঠে প্রহরী। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, তা-ই তো! ইনি এই বিছানায় শুয়ে আছেন কেন হুজুর? জখমী কোথায়?'

'শুয়ে আছে নয়– বল মরে আছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

উপর থেকে কম্বলটা তুলে সরিয়ে ফেললেন আলী বিন সুফিয়ান। রক্তে রঞ্জিত বিছানা। জখমী হাশীশীর নয়– রাতের প্রহরীর লাশ। আলী বিন সুফিয়ান দেখলেন, লাশের হৃদপিন্ডের কাছে খঞ্জরের দু'টি জখম। জখমী হাশীশী উধাও। আলী বিন সুফিয়ান কক্ষে, বারান্দায়, বাইরে নিরীক্ষা করে দেখলেন। কোথাও এক ফোঁটা রক্তও চোখে পড়ল না। এতে পরিস্কার বোঝা গেল, প্রহরীকে জীবিত তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে রেখে খঞ্জরের আঘাতে খুন করা হয়েছে। এতটুকু ছট্‌ফট্‌ও করতে দেয়া হয়নি। অন্যথায় এদিক-ওদিক রক্ত ছড়িয়ে থাকত। প্রাণ যাওয়ার পর লাশের উপর কম্বল মুড়িয়ে রাখা হয়েছে। তারপর ঘাতকরা জখমী ও তার বোনকে তুলে নিয়ে

গেছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, জখমীর বোন তার পলায়নে সাহায্য করেছে। সম্ভবত রূপের জালে আটকিয়ে মেয়েটি প্রহরীকে ভেতরে নিয়ে এসেছিল আর ঘাতকদল তাকে হত্যা করেছে।

আলী বিন সুফিয়ান নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলেন যে, চার সঙ্গীকে জখমীর সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়া তার ঠিক হয়নি। তারা নিজেদেরকে জখমীর চাচাতো ভাই বলে পরিচয় দিয়েছিল। ভেতরে প্রবেশ করে তারা এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গেছে। জখমীর বোনকেও এখানে থাকার অনুমতি না দেয়াই উচিত ছিল। তা ছাড়া মেয়েটি আসলেই জখমীর বোন কিনা, তাও তিনি যাচাই করে নিশ্চিত হননি।

আলী বিন সুফিয়ানের ন্যায় একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা প্রধানকে ধোঁকা দেয়া সহজ ছিল না। কিন্তু এই জখমী ও তার সঙ্গীদের কাছে হেরে গেলেন তিনি। অনুতপ্ত হন নিজের ভুলের জন্য। প্রহরীকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, এর আগের রাতে ডিউটি ছিল আমার। আমি মেয়েটিকে ডাক্তারের সঙ্গে তার ঘরে যেতে এবং গভীর রাতে ফিরে আসতে দেখেছি। এতে আলী বিন সুফিয়ানের সন্দেহ হল যে, তার মানে মেয়েটি ডাক্তারকেও রূপের জালে আটকে ফেলেছিল। আলী বিন সুফিয়ান প্রহরীকে বললেন, 'তুমি দৌড়ে গিয়ে ডাক্তারকে নিয়ে আস।'

প্রহরী চলে যাওয়ার পর আলী বিন সুফিয়ান তথ্য অনুসন্ধানে নেমে পড়েন। বাইরে গিয়ে মাটি পরীক্ষা করেন। তিনি মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখতে পান। কিন্তু পদচিহ্ন তাকে কোন সাহায্য করতে পারল না। জখমী শহরে পালিয়ে থাকতে পারে না। পথ আছে মাত্র একটি। তা হল, জখমীর বোনকে যে গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে হানা দেয়া। কিন্তু সে তো অনেক দূরের পথ।

প্রহরী ফিরে এসে জানাল, ডাক্তার ঘরে নেই। আলী বিন সুফিয়ান নিজে তার ঘরে গেলেন। চাকর বলল, ডাক্তার গভীর রাতে একটি মেয়ের সাথে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন, আর ফিরেননি। মেয়েটি সম্পর্কে জানায়, এর আগেও সে ডাক্তারের সঙ্গে এ ঘরে এসেছিল এবং অনেক রাত পর্যন্ত দু'জন বসে বসে কথা বলেছিল। শুনে আলী বিন সুফিয়ান নিশ্চিত হন যে, ডাক্তারও তাহলে জখমীর পলায়ন ঘটনায় জড়িত এবং এর মূলে রয়েছে মেয়েটির রূপের যাদু।

আলী বিন সুফিয়ান তার গুপ্তচরদের ডেকে পাঠান। তারা এলে তিনি তাদের জখমীর ঘটনা অবহিত করেন। তথ্য অনুসন্ধানের জন্য তারা চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। একস্থানে তারা অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন দেখতে পায়। স্থানীয় তিন-চার ব্যক্তি বলল, রাতে তারা অনেকগুলো ঘোড়া দৌড়ানোর শব্দ শুনতে পেয়েছিল। ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে শহরের বাইরে চলে যায় গুপ্তচররা। কিন্তু আর

অগ্রসর হওয়া নিরর্থক। রাতে পালিয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলোর পায়ের চিহ্ন দেখে পাকড়াও করা কোনমতেই সম্ভব নয়। আসামী পালিয়ে কোন্‌দিকে গেছে, তা-ই শুধু নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছে তারা।

আলী বিন সুফিয়ানের আপাতত করণীয়, মিসরে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর স্থলাভিষিক্ত তকিউদ্দীনকে সংবাদ দেয়া যে, জখমী হাশীশীকে তার সতীর্থরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এখন আলী বিন সুফিয়ানের ধারণা, জখমী তাকে যে তথ্য দিয়েছিল, তা সঠিক নয়। নিজের জীবন রক্ষা এবং পালাবার একটি সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই সে এ কৌশল অবলম্বন করেছিল। লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এবং আলী বিন সুফিয়ান দু'জনকেই বোকা ঠাওরিয়ে ছাড়ল। আলী বিন সুফিয়ান তকিউদ্দীনকে সংবাদ জানানোর জন্য চলে গেলেন।

❁ ❁ ❁

বেলা দ্বি-প্রহর। যে জখমী কয়েদীর দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না, এখন সে পৌঁছে গেছে মিসর থেকে বহু দূরে জনশূন্য বিরান এক এলাকায়। ডাক্তারও আছেন তার সঙ্গে। ডাক্তারের হাত-পা বাঁধা। নির্জীবের মত পড়ে আছেন একটি ঘোড়ার পিঠে। পা দু'টি তার ঘোড়ার একদিকে, মাথা ও বাহুদ্বয় অপরদিকে। সারাটা রাত ঘোড়ার পিঠে এভাবেই কেটেছে তার। ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘোড়া থেমে যায়। পট্টি বেঁধে দেয়া হয় ডাক্তারের দু'চোখে। পট্টিটা কে বাঁধল দেখতে পেলেন না তিনি। চোখে পট্টি বাঁধার পর পায়ের বন্ধন খুলে দিয়ে তাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দেয়া হল। হাত দু'টি এখনো বাঁধা। তার পেছনে চড়ে বসে একজন। ঘোড়া চলতে শুরু করে। ডাক্তার অনুভব করছেন যে, তার পেছনে পেছনে আরো কয়েকটি ঘোড়া চলছে এবং আরোহীরা ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে।

ঘোড়া এগিয়ে চলছে আর সূর্য নীচ থেকে উপরে উঠছে। এক পর্যায়ে ডাক্তার আন্দাজ করলেন, তার ঘোড়া চড়াই অতিক্রম করছে। একটু পর পর মোড় নিচ্ছে ডানে-বাঁয়ে। আবার নীচে নামছে। এতে তিনি অনুমান করলেন যে, এটি কোন পার্বত্য এলাকা।

এভাবে দীর্ঘক্ষণ পথ অতিক্রম করেন ডাক্তার। সূর্য তখন মাথার উপর উঠে এসেছে। হঠাৎ পেছন দিক থেকে উচ্চকিত এক কণ্ঠস্বর ভেসে আসে তার কানে। তাতে তিনি বুঝতে পারেন যে, কোন আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেছে। তার ঘোড়াটি থেমে গিয়ে মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছে পেছন দিকে। তারপর আবার কণ্ঠস্বর- 'তুলে নাও, ছায়ায় নিয়ে চল, লোকটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। উহ! রক্ত ঝরছে তো! ডাক্তারের চোখ ও হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দাও। তিনি রক্তক্ষরণ বন্ধ করে দেবেন। অন্যথায় ভাইটি আমার মরে যাবে।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া লোকটি জখমী হাশীশী। সারাটা রাতের ঘোড়সাওয়ারীর ফলে পেটের জখম খুলে গেছে তার। উরুর ক্ষত থেকেও পুনরায় রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। রাতভর রক্ত ঝরেছে। অবশেষে এখানে এসে এত বেশী রক্ত ঝরল যে, লোকটা চৈতন্য হারিয়ে ফেলল এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। তাকে তুলে একটি টিলার ছায়ায় নিয়ে যাওয়া হল, মুখে পানি দেয়া হল। কিন্তু পানি কণ্ঠনালী অতিক্রম করছে না তার। রক্তে ভিজে গেছে তার গায়ের কাপড়-চোপড়।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামানো হয় ডাক্তারকে। চোখ দু'টি খুলে যায় তার। এদিক-ওদিক না তাকিয়ে সোজা সামনের দিকে হাঁটতে নির্দেশ দেয়া হয় তাকে। পেছনে পিঠ ঘেঁষে খঞ্জর ধরে আছে কেউ, টের পান ডাক্তার। নির্দেশনা অনুযায়ী সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করেন তিনি।

একটি টিলার পাদদেশে পড়ে আছে জখমী। পাশে উপবিষ্ট শারজা। ডাক্তারকে দেখেই শারজা বলে উঠে, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমার ভাইকে রক্ষা করুন।'

জখমীর শিরায় হাত রাখেন ডাক্তার। এদিক-ওদিক তাকাবার অনুমতি নেই তার। হাত রেখে বসে পড়েন তিনি। পিঠে খঞ্জরের খোঁচা অনুভব করেন। জখমীর শিরা দেখে তিনি সটান উঠে দাঁড়ান। ঘাড় ঘুরিয়ে দৃষ্টি ফেলেন পেছন দিকে। সম্মুখে কালো মুখোশপরা চারজন লোক দাঁড়িয়ে। শুধু চোখগুলো দেখা যায় তাদের। একজনের হাতে খঞ্জর। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, 'তোমাদের উপর আল্লাহর গজব পড়ুক। বাঁচাবার পরিবর্তে লোকটাকে তোমরা খুন করে ফেলেছ! আমরা একে চারপাই থেকে নড়তে দেয়নি। আর তোমরা কিনা একে এতদূর থেকে নিয়ে এসেছ ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে। ওর জখম খুলে গেছে এবং দেহের সব রক্ত ঝরে গেছে। লোকটা বেঁচে নেই।'

ভাইয়ের লাশের উপর লুটিয়ে পড়ে শারজা। হাউমাউ করে বিলাপ জুড়ে দেয় মেয়েটি। ডাক্তারের চোখের উপর আবার পট্টি বেঁধে দেয় মুখোশধারীরা। নিয়ে যায় সেখান থেকে খানিক দূরে। ঘোড়ার পিঠে তুলে নেয়া হয় লাশটি। চলতে শুরু করে কাফেলা।

শারজার বুক-চেরা কান্নার করুণ শব্দ শুনতে পান ডাক্তার। মুহূর্তের জন্যও থামছে না মেয়েটি। ডাক্তার তার ঘোড়ার আরোহীকে বললেন, 'লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেত। কিন্তু তোমরা তাকে মেরে ফেললে। তাকে কোন সাজাও ভোগ করতে হতো না।

আরোহী বলল, 'আমরা তাকে তার প্রাণরক্ষা করার জন্য নিয়ে আসিনি। আমরা মূলত সেইসব গোপন তথ্য অপহরণ করেছি, যা তার সঙ্গে ছিল। তার মৃত্যুতে আমাদের কোন দুঃখ নেই। তার বুকে আমাদের যেসব তথ্য লুকায়িত ছিল, তোমার সরকার যে তা বের করতে পারেনি, তা-ই আমাদের পরম পাওয়া।'

'তা আমাকে তোমরা কোন্ অপরাধে শাস্তি দিচ্ছ?' জিজ্ঞেস করেন ডাক্তার।

'আমরা তোমাকে দেবতার হালে রাখব। একটু গরম বাতাসও তোমার গায়ে লাগতে দেব না। তোমাকে আমরা নিয়ে এসেছি তিনটি কারণে। এক. পথে জখমীর কোন সমস্যা দেখা দিলে তুমি চিকিৎসা করবে। কিন্তু আমরা ভেবেই দেখেনি যে, তোমার কাছে না আছে ওষুধ, না আছে ব্যান্ডেজ করার সরঞ্জাম। দুই. শারজাকেও আমাদের আনবার প্রয়োজন ছিল। ঘটনাক্রমে তুমি ছিলে তার সাথে। এমতাবস্থায় তোমাকে ছেড়ে আসা ছিল আমাদের জন্য বিপজ্জনক। তাই তোমাকেও তুলে আনতে হল। তৃতীয় কারণ, আমাদের একজন ডাক্তারের প্রয়োজন। তোমাকে আমরা সবসময় আমাদের সাথে রাখব।'

'আমি এমন লোকদের চিকিৎসা করব না, যারা আমার সরকারের বিরোধী। তোমরা খৃস্টান, সুদানী ও ফাতেমীদের আপন এবং তাদেরই ইঙ্গিতে তোমরা সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছ। আমি তোমাদের কোন কাজে আসব না।' ডাক্তার বললেন।

'তাহলে আমরা তোমাকে হত্যা করে ফেলব।' বলল আরোহী।

'তা-ই বরং ভালো।' জবাব দেন ডাক্তার।

'তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে এমন আচরণ করব, যা তোমার জন্য প্রীতিকর হবে না। তবে আমি আশা করছি, তোমার সাথে আমাদের খারাপ আচরণের প্রয়োজন পড়বে না। তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসন দেখেছ। আমাদের রাজত্বও দেখবে। তখন তুমি বলবে, আমি এখানেই থাকতে চাই। এ তো জান্নাত। কিন্তু যদি তুমি আমাদের জান্নাতকে প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে আমাদের জাহান্নাম কি জিনিস, তা তুমি দেখতে পাবে।' বলল আরোহী।

চলতে থাকে ঘোড়া। ডাক্তারের চোখে পট্টি বাঁধা। পট্টির অন্ধকার ভেদ করে নিজের ভবিষ্যত দেখার চেষ্টা করছেন তিনি। মনে মনে পালাবার পন্থাও খুঁজতে থাকেন। বারবার শারজার কথা মনে পড়ে তার। কিন্তু এই ভেবে তিনি নিরাশ হয়ে পড়ছেন যে, এ মেয়েটিও এদেরই লোক। তার সহযোগিতা পাওয়ার আশা করা বৃথা।

❁ ❁ ❁

সফরটা তাদের এতো দীর্ঘ ছিল না। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সীমান্ত প্রহরীদের হাতে ধরা খাওয়ার ভয়ে চুপিচুপি দূরবর্তী আঁকা-বাঁকা পথ ধরে অতিক্রম করতে হয়েছে এ সন্ত্রাসী চক্রটির। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পরও পথচলা অব্যাহত থাকে কাফেলার।

মধ্যরাতের খানিক আগে কাফেলা থেমে যায়। ঘোড়া থেকে নামিয়ে হাত-পা খুলে দেয়া হয় ডাক্তারের। চোখের পট্টিও সরিয়ে ফেলা হয় তার। তবু অন্ধকারের কারণে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। তাকে কিছু খাবার খেতে দেয়া হয় এবং পানি পান করানো হয়।

আহার শেষে আবার তার হাত-পা বেঁধে ফেলা হয়। শুয়ে পড়তে বলা হয় তাকে। ডাক্তার শুয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে ডাক্তারের ক্লান্ত-অবসন্ন চোখে।

শুয়ে পড়ে কাফেলার অন্যান্য লোকেরাও। জিন খুলে ঘোড়াগুলো বেধে রাখে সামান্য দূরে। ডাক্তারের পালাবার কোন আশংকা নেই। হাত-পা তার শক্ত করে বাঁধা।

কিছুক্ষণ পর কারো ডাকে ডাক্তারের চোখ খুলে যায়। ভাবলেন, আবার রওনা হওয়ার জন্য ডাকা হচ্ছে। পরক্ষণে মনে হল, কেউ তার পায়ের বাঁধন খুলছে। চুপচাপ পড়ে থাকেন তিনি। মৃত্যুর জন্য তিনি পূর্ব থেকেই প্রস্তুত। তার আশংকা ছিল, খুন করে হয়ত তাকে কোথাও ফেলে দেয়া হবে। কিন্তু পায়ের বাঁধন খুলে যাওয়ার পর যখন হাতের বাঁধনও খুলে যেতে শুরু করল, তখন তিনি কার যেন ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। কে যেন তার কানে কানে বলছে, 'আমি দু'টি ঘোড়ায় জিন বেঁধে রেখে এসেছি। চুপচাপ আমার পেছনে পেছনে আস। আমিও তোমার সাথে যাব। ওরা ঘুমুচ্ছে।' এ কণ্ঠস্বর শারজার।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় ডাক্তার। শারজার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করেন তিনি। জায়গাটা বালুকাময় হওয়ার কারণে পায়ের শব্দ হচ্ছে না। সম্মুখে দু'টি ঘোড়া দণ্ডায়মান। ডাক্তারকে ইশারা দিয়ে একটিতে চড়ে বসে শারজা। অপরটিতে উঠে বসেন ডাক্তার। শারজা বলে, 'তুমি যদি দক্ষ ঘোড়সাওয়ার না-ও হয়ে থাক, তবু ভয় নেই, পড়বে না! ঘোড়া ছুটাও, লাগাম ঢিলে করে দাও। ঘোড়াটিকে ডানে-বাঁয়ে ঘুরাতে তো পারবে!'

প্রত্যুত্তরে কিছু না বলেই ডাক্তার ঘোড়া ছুটায়। সমান তালে ছুটে চলে শারজার ঘোড়াও। ধাবমান ঘোড়ার পিঠে থেকেই শারজা বলে, 'তুমি আমার পেছনে পেছনে থাক। আমি পথ চিনি। অন্ধকারে আমার থেকে আলাদা হবে না কিন্তু।'

দ্রুত ধাবমান ঘোড়া দু'টোই সজাগ করে তোলে অপহারণকারীদের। কিন্তু ধাওয়া করা অত সহজ নয়। তাদের প্রথমে দেখতে হবে, যে ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি শোনা গেল, সেগুলো কার। তাদের মনে শারজার পালাবার কোন আশংকাই ছিল না। ঘোড়া ছুটিয়ে কে গেল তার সন্ধান নিতে নিতে কেটে গেল কিছুক্ষণ। জানা গেল, শারজা এবং ডাক্তার পালিয়ে গেছে। এরপর তাদের ঘোড়ায় জিন বাঁধতে হবে। এসবে যে সময় ব্যয় হল, ততক্ষণে পলায়নকারীরা অতিক্রম করে গেছে দু'-আড়াই মাইল পথ।

বারবার পেছন দিকে তাকাচ্ছে ডাক্তার ও শারজা। কেউ তাদের ধাওয়া করছে কিনা, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে তারা। না, তারা নিশ্চিত, কেউ তাদের পিছু নেইনি। তবু ঘোড়ার গতি হ্রাস করে না তারা। ছুটে চলে তীরবেগে। এতক্ষণে তারা বহু পথ অতিক্রম করে আসে। ডাক্তার শারজাকে বলেন, 'আশপাশে কোথাও না কোথাও সীমান্ত চৌকি থাকার কথা। কিন্তু তা কোথায় নির্দিষ্টভাবে আমার জানা নেই।' বলতে পারে না শারজাও। শারজা ডাক্তারকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলে, 'আমরা সঠিক পথেই কায়রো অভিমুখে এগিয়ে চলছি। পথও আর বেশী নেই।'

❁ ❁ ❁

পরদিন দ্বি-প্রহর। মিসরের ভারপ্রাপ্ত গবর্নর তকিউদ্দীনের সামনে বসে আছেন আলী বিন সুফিয়ান। তকিউদ্দীন বলছিলেন, 'আমি এ জন্য বিস্মিত নই যে, আপনার ন্যায় একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই ভুল করেছেন যে, একটি সন্দেহভাজন মেয়েকে জখমী বন্দীর নিকট থাকার অনুমতি দিয়েছেন এবং চারজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেও জখমীর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ প্রদান করেছেন। আমার বিস্ময় এ কারণে যে, এই চক্রটি অত্যন্ত দুঃসাহসী ও সুসংগঠিত। জখমীকে তুলে নিয়ে যাওয়া, প্রহরীকে হত্যা করে জখমীর বিছানায় ফেলে যাওয়া অতিশয় দুঃসাহসী অভিযানই বটে। সীমাহীন দুর্ধর্ষ ও সুসংগঠিত চক্র ছাড়া এমন সাহস কেউ দেখাতে পারে না।'

'আমার মনে হয়, ডাক্তার আর মেয়েটি এই অভিযানকে সহজ করে দিয়েছিল। এই অপরাধেও আমাদের জাতির সেই দুর্বলতা কাজ করেছে, যার জন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অস্থির, পেরেশান। যার কারণে তিনি বলে থাকেন যে, নারী আর ক্ষমতার মোহ মিল্লাতে ইসলামিয়াকে ডুবিয়ে ছাড়বে। ডাক্তারকে আমি সচ্চরিত্রবান যুবক মনে করতাম। একটি তরুণী তাকেও অন্ধ করে দিল। যা হোক, জখমী কয়েদীর গ্রামের ঠিকানা আমি পেয়ে গেছি। একটি বাহিনী রওনাও করিয়ে দিয়েছি।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আর জখমী কয়েদী দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার যে প্রাসাদটির কথা বলেছিল, তার ব্যাপারে আপনি কি সিদ্ধান্ত নিতে চান?' জিজ্ঞেস করলেন তকিউদ্দীন।

'আমার মনে হচ্ছে, লোকটি মিথ্যে বলেছে। নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য একটি ভূয়া গল্প বানিয়েছিল বোধ হয়। তথাপি আমি খোঁজ-খবর নিয়ে দেখব।' জবাব দেন আলী বিন সুফিয়ান।

কক্ষে বসে এ বিষয়ে কথা বলছেন দু'জন। হঠাৎ দারোয়ান ভেতরে প্রবেশ করে এমন একটি সংবাদ বলে, যা তাদের হতভম্ব করে দেয়। একজনের মুখের প্রতি তাকিয়ে থাকেন অন্যজন। বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন যেন তারা। সম্বিত ফিরে পেয়ে আলী বিন সুফিয়ান উঠে দাঁড়ান এবং 'অন্য কেউ হবে বোধ হয়' বলে বাইরে বেরিয়ে যান। তার পেছনে বেরিয়ে পড়েন তকিউদ্দীন। কিন্তু লোকটা অন্য কেউ নয়- তাদেরই ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন তাদের সামনে। সঙ্গে তার জখমী কয়েদীর বোন শারজা। ঘোড়াগুলো হাঁপাচ্ছে তাদের। ডাক্তার ও শারজার সমস্ত শরীর ধূলিমাখা। ওষ্ঠদ্বয় কাঠের মত শুষ্ক।

আলী বিন সুফিয়ান খানিকটা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কয়েদীকে কোথায় রেখে এসেছ?' ডাক্তার হাতের ইশারায় বললেন, 'আমাদের একটুখানি বিশ্রাম নিতে দিন।' আলী বিন সুফিয়ান দু'জনকে ভেতরে নিয়ে যান। তাদের জন্য খাবার ও পানির ব্যবস্থা করার আদেশ দেন।

ডাক্তার তার ও শারজার অপহরণের কাহিনীর সবিস্তার বিবরণ দেন। এও জানান যে, জখমী কয়েদী মারা গেছে। তিনি বলেন, আমি জানতাম না যে, জখমী কয়েদীও অপহরণ হয়েছে। পরদিন যখন একটি লোক ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে জখম খুলে গেল এবং বিপুল রক্তক্ষরণের দরুন লোকটা মারা গেল, তখনই আমি বিষয়টি জানতে পাই। তারপর ডাক্তার তার মুক্ত হয়ে ফিরে আসার কাহিনী শোনান।

কথা বলে শারজা। আলী বিন সুফিয়ান এবার বুঝতে পারেন মেয়েটি মরু অঞ্চলের মানুষ এবং অতি সাহসী ও গোঁয়ার প্রকৃতির। সে জানায়, আমি আমার ভাইয়ের আশ্রয়ে এবং তারই মুখ পানে তাকিয়ে বেঁচে ছিলাম। ভাইয়ের জন্য আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকতাম সবসময়। আপনারদের ডাক্তার যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আমার ভাইয়ের চিকিৎসা করেছিলেন, তাতে আমি তার অনুরক্ত হয়ে যাই। আমার কাছে ডাক্তার ফেরেশতার মত মনে হতে লাগল।

শারজা জানায়- 'আমার সাথে যে চারজন লোক এসেছিল, তারা আমাদের আত্মীয় ছিল না। তারা ছিল সেই চক্রের সদস্য, যারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও তাঁর পদস্ত কর্মকর্তাদের হত্যাচেষ্টায় তৎপর। আপনার লোকেরা যখন আমাকে আনার জন্য আমাদের গ্রামে যায়, তখন তারা চারজন গ্রামে অবস্থান করছিল। তারা জানতে পেরেছিল যে, আমার ভাই জখমী অবস্থায় আপনাদের হাতে বন্দী হয়ে আছে। তাই তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমার সাথে চলে আসে। তাদের আশংকা ছিল, জখমীর কাছে যে তথ্য আছে, তা ফাঁস হয়ে যাবে। জখমী কোথায় কোন্ অভিযানে আহত হয়েছে, তা তাদের জানা ছিল।'

শারজার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার পরিকল্পনাও এটাই ছিল যে, সে ভাইকে অপহরণ করাবে। ভাইয়ের নিকট থাকার যে আবেদন সে করেছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। প্রথমতঃ ভাইয়ের সেবা-শুশ্রূষা করা, দ্বিতীয়তঃ সুযোগ পেলে ভাইকে অপহরণ করান।

জখমীর সাথে সাক্ষাৎ করে তারা। কায়রোতেই অবস্থান নিয়েছিল এক জায়গায়। শারজার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল তারা। কিন্তু ডাক্তার মেয়েটিকে এমনভাবে প্রভাবিত করে ফেলেন যে, চিন্তাই পাল্টে যায় তার। ডাক্তার শারজাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, তার ভাইয়ের সাজা হবে না। তাছাড়া তিনি মেয়েটিকে এমন এমন কথা শোনান, যা এর আগে কখনো সে শোনেনি। তিনি মেয়েটির হৃদয়ে ইসলামের মর্যাদা জাগ্রত করে দেন এবং উন্নত চরিত্রের প্রমাণ দিয়ে তাকে ভক্ত বানিয়ে ফেলেন। মেয়েটি সারাক্ষণ ডাক্তারের কাছে বসে বসে তার মধুর-মূল্যবান কথা শুনতে ব্যাকুল হয়ে উঠে।

একদিন ডাক্তারের ঘরে যাওয়ার পথে চারজনের একজনের সাথে দেখা হয়ে যায় শারজার। লোকটি শারজাকে বলে, তোমার ভাইয়ের অপহরণে আর বিলম্ব করা ঠিক

নয়। জবাবে শারজা সাফ জানিয়ে দেয়, আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলেছি। ভাই আমার এখানেই থাকবে। লোকটি বলল, তোমার ভাইয়ের যদি মতিভ্রম হয়েই থাকে, তাহলে ওকে আমরা বেঁচে থাকতে দেব না।

চার কুচক্রী জখমীকে এমন সাহসিকতার সাথে অপহরণ করে নিয়ে যাবে, তা ছিল শারজার কল্পনার অতীত। তাই সে ডাক্তারকেও অবহিত করা প্রয়োজন মনে করেনি যে, তার ভাই অপহৃত হওয়ার আশংকা আছে। সে রাতেই শারজা ও ডাক্তার পড়ে যায় চার কুচক্রীর কবলে। অপহরণ করে যখন তাদেরকে ঘোড়ার পিঠে তুলতে নিয়ে যাওয়া হল, তখন শারজা দেখতে পেয়েছিল যে, তার ভাই বসে আছে। ভাই মুক্ত হয়েছে দেখে তখন কিছুটা আনন্দিতও হয়েছিল সে। পলায়নে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল নিজেও। কিন্তু ডাক্তারকে ওদের বন্দী হিসেবে দেখে মেনে নিতে পারেনি শারজা। তাই সে ডাক্তারকে ছেড়ে দিতে অনুরোধও করেছিল। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা করেনি সন্ত্রাসীরা। হাত-পা বেঁধে ঘোড়ার পিঠে তুলে নেয় তারা ডাক্তারকে। পথে জখমীকে কিভাবে অপহরণ করল সে কাহিনী শোনায় তারা শারজাকে।

ওখানে গিয়েছিল মাত্র দু'জন। পথের কথা জিজ্ঞেস করার নাম করে একজন আলাপে ভুলিয়ে দেয় প্রহরীকে। এই সুযোগে পেছন থেকে প্রহরীর ঘাড় ঝাপটে ধরে ফেলে অপরজন। এবার দু'জনে মিলে তুলে নিয়ে যায় তাকে ভেতরে। তাদের দেখে উঠে বসে জখমী। বিছানা থেকে সরে দাঁড়ায় সে। প্রহরীকে বিছানায় শুইয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। খঞ্জর দ্বারা গভীর দু'টি আঘাত হানে তার হৃদপিন্ডে। মারা যায় প্রহরী। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় প্রহরীর রক্তাক্ত লাশটা। জখমী কয়েদীকে নিয়ে বেরিয়ে যায় দু'জন।

শারজা ডাক্তারের ঘরে আছে, তাও জানা ছিল অপহরণকারীদের। তাদের আশংকা ছিল, শারজা বিষয়টা মেনে নেবে না এবং তাদের এই অপহরণ অভিযানকেও ব্যর্থ করে দেবে। অথচ তাকেও এখান থেকে সরিয়ে ফেলা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, অনেক তথ্য তারও জানা। তাই একস্থানে ওঁৎ পেতে বসে যায় দু'জন। গভীর রাতে ঘর থেকে বের হয়ে ডাক্তার ও শারজা যেই মাত্র অন্ধকার সরু গলিতে প্রবেশ করে, অমনি পেছন থেকে দু'ব্যক্তির বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় তারা। সফল হয়ে যায় অপহরণ অভিযান।

✿ ✿ ✿

ডাক্তার ও শারজার কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করলেন না আলী বিন সুফিয়ান। তিনি ভাবলেন, এটিও ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে। তাই তিনি দু'জনকে পৃথক করে ফেললেন। আলাদা আলাদা জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাদের। ডাক্তার অতিশয় জ্ঞানী লোক। তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হন যে, তার বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি বললেন, আকার-আকৃতিতে মেয়েটিকে আমার এক মৃত বোনের

মত দেখা যায়। তাই আবেগাপ্লুত হয়ে আমি তাকে আমার ঘরে নিয়ে যাই। কয়েকবারই সে আমার ঘরে যায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে আমি তার সাথে কথাবার্তা বলি। জখমীর ঘরেও আমি তার সাথে বসে থাকতাম। মেয়েটির প্রতি আমি কখনো কুদৃষ্টিতে তাকাইনি।

ডাক্তার জানায়, আমার এই অমলিন সদাচারে মেয়েটি এতই প্রভাবিত হয়ে পড়ে যে, ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে সে তার মনের কতিপয় সন্দেহ আমার সামনে উপস্থাপন করে। আমি এক এক করে তার সব সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করি। এতে সে আরো প্রভাবিত হয়ে যায়। আমার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে যায়। মেয়েটি মুসলমান। কিন্তু আমি বুঝলাম, সে দারুণ বিভ্রান্ত। আমি তার সব ভ্রান্তি দূর করে দেই। চিন্তা-চেতনায় ছিল মেয়েটি পশ্চাৎপদ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লী অঞ্চলের মানুষ। তার কথা-বার্তায় আমি বুঝতে পেরেছি যে, তার এলাকায় ইসলাম পরিপন্থী ধ্যান-ধারণা এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী-বিরোধী প্রচারণা জোরে-শোরে বিস্তার লাভ করছে।

শারজার নিকট থেকে কোন জবানবন্দী নেননি আলী বিন সুফিয়ান। তিনি মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে থাকেন আর মেয়েটি তার উত্তর প্রদান করে। তার জবাবী বক্তব্যই তার জবানবন্দীর রূপ লাভ করে। ফেরাউনী আমলের পরিত্যক্ত প্রাসাদসমূহ সম্পর্কে সেও সেই বিবরণ প্রদান করে, যা আমরা উপরে বিবৃত করে এসেছি। সেও প্রাসাদের রহস্যময় অদৃশ্য দরবেশের ভক্ত।

শারজা জানায়, তার ভাই সেনাবাহিনীতে চাকরি করত। নিজে ঘরে একা থাকত। গাঁয়ের কতিপয় লোক এই বলে তাকে প্রাসাদে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয় যে, ওখানকার দরবেশ সুন্দরী কুমারীদের বেশ পছন্দ করেন।

আলী বিন সুফিয়ান কৌশলে তার থেকে এ তথ্যও বের করে আনেন যে, তার গ্রামের তিনটি কুমারী মেয়ে ঐ প্রাসাদে গিয়েছিল। কিন্তু পরে আর ফিরে আসেনি। একবার তার ভাই বাড়ী আসে। শারজা তার নিকট প্রাসাদে যাওয়ার অনুমতি চায়। কিন্তু ভাই তাকে বারণ করে দিয়েছিল। শারজা অবস্থাটা স্পষ্টরূপে ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে না পারলেও আলী বিন সুফিয়ান এতটুকু বুঝে ফেললেন, মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কি সব হচ্ছে।

ডাক্তার সম্পর্কে শারজা বলে, অপহরণকারীরা যদি তাকে গ্রামে নিয়েও যেত, এমনকি যদি বন্দীশালায় আবদ্ধ করে ফেলত, তবু আমি তাকে মুক্ত করেই ছাড়তাম। কিন্তু যখন আমার ভাই মরে গেল, আমি গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলাম এবং সংকল্প নিলাম, যে কোন মূল্যে হোক ডাক্তারকে আমি এখান থেকেই মুক্ত করব। চার অপহরণকারীকে সে তার আপন মনে করত। কিন্তু ডাক্তার তাকে জানাল যে, এরা আল্লাহর মস্তবড় দুশমন। শারজা আরো জানতে পেরেছে যে, এরা তার ভাইয়ের সাথে

ভালো আচরণ করেনি। তার কাছে যেসব তথ্য ছিল, তা যেন ফাঁস হয়ে না যায়, সে জন্যেই এদের এতো ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান। উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর ইচ্ছে করেই এরা তার ভাইকে মেরে ফেলেছে।

আলী বিন সুফিয়ান শারজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন তুমি কি করতে চাও? নিজের ব্যপারে তুমি কি চিন্তা করছ?' শারজা জবাব দেয়, 'আমি আমার সারাটা জীবন ডাক্তারের চরণে কাটিয়ে দিতে চাই। তিনি যদি আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, আমি তাও করতে প্রস্তুত আছি।' শারজা সম্মতি প্রকাশ করে যে, আপনি যদি ফেরাউনী প্রাসাদে অভিযান প্রেরণ করেন, তাহলে আমি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব এবং আমার গ্রামের যারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিপক্ষে, তাদের ধরিয়ে দেব।

আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শে সামরিক ও প্রশাসনিক শীর্ষ কর্মকর্তাদের জরুরী বৈঠক তলব করা হয় এবং তকিউদ্দীনকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সকলের ধারণা ছিল, তকিউদ্দীন মিসরে নতুন এসেছেন। এত বড় গুরুদায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপে এই প্রথম। তাই তিনি আপাততঃ ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না।

বৈঠকে অধিকাংশ কর্মকর্তা অভিন্ন মত পোষণ করলেন যে, যেহেতু এত বিশাল একটি এলাকার এতগুলো মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, সেহেতু আপাততঃ তাদের বিরুদ্ধে কোন সামরিক অভিযান পরিচালনা করা ঠিক হবে না। প্রাসাদের অভ্যন্তরের যে পরিস্থিতি জানা গেছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, সেখান থেকে যে একটি নতুন বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করেছে, জনগণ তা বরণ করে নিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের এই উপাসনালয় ও বিশ্বাসের উপর আমাদের এই সামরিক অভিযান সহ্য করবে না। তার পরিবর্তে বরং সেখানে কিছু মুবাল্লিগ প্রেরণ করা হোক। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে লোকদের সঠিক পথে আনার চেষ্টা করলে ভালো ফল হবে আশা করা যায়। বৈঠকে একটি পরামর্শ এই দেয়া হয় যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে তাঁর মতামত নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হোক।

'তার মানে আপনারা মানুষকে ভয় পাচ্ছেন! আপনাদের মনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভয় নেই, যাদের সত্য ধর্মের অবমাননা করা হচ্ছে। আমার প্রথম কথা হচ্ছে, মিসরের বর্তমান পরিস্থিতির সংবাদ ঘুণাক্ষরে আমীরে মেসেরের কানে দেয়া যাবে না। আপনারা কি জানেন না যে, তিনি কেমন শক্তিশালী দুশমনের মোকাবেলায় মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছেন? আপনারা কি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, দু'চার হাজার দেশদ্রোহী পাপিষ্ঠকে আমরা ভয় পাচ্ছি? আমি সরাসরি এবং কঠিন অভিযান পরিচালনা করতে চাই।' জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন তকিউদ্দীন।

'গোস্তাখী মাফ করবেন মুহতারাম আমীর! খৃষ্টানরা আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ

আরোপ করছে যে, ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে। আমরা কাজে-কর্মে এ অপবাদের প্রতিবাদ করতে চাই। আমরা তাদের কাছে স্নেহ-ভালোবাসার বার্তা নিয়ে যেতে চাই।' বললেন এক নায়েব সালার।

'তা-ই যদি হয়, তাহলে কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে রেখেছ কেন? এতো টাকা ব্যয় করে সেনাবাহিনী পুষছই বা কেন? তার চে' বরং এটা উত্তম নয় কি যে, তোমরা সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করে দিয়ে অস্ত্রগুলো সব নীল নদে ফেলে দিয়ে দাওয়াত-তাবলীগের মিশন নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে গাশ্‌ত কর, দরবেশের ন্যায় গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াও।' তিরস্কারের সুরে বললেন তকিউদ্দীন। বলতে বলতে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন তিনি। তিনি বললেন–

'রাসূলে খোদার পয়গামের বিরুদ্ধে যদি ক্রুশের তরবারী উত্তোলিত হয়, তাহলে ইসলামের তরবারীও কোষবদ্ধ থাকবে না। আর ইসলামের তরবারী যখন কোষমুক্ত হবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) দুশমনদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করবে। ইসলামের সত্য-সঠিক বাণীকে যারা অস্বীকার করবে, তাদের জিহ্বা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। খৃস্টানরা যদি এই অপবাদ আরোপ করে থাকে যে, ইসলাম তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করেছে, তাহলে আমি তাদের নিকট এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে প্রস্তুত নই। আপনারা কি জানেন, সালতানাতে ইসলামিয়া কেন দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছে? বলতে পারেন, স্বয়ং মুসলমান কেন ইসলামের দুশমনে পরিণত হচ্ছে? তার একমাত্র কারণ, খৃস্টানরা মদ, নারী, অর্থ আর ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে ইসলামের তরবারীতে জং ধরিয়ে রেখেছে। তারা আমাদের উপর যুদ্ধপ্রিয়তা ও জুলুমের অভিযোগ আরোপ করে আমাদের সামরিক শক্তিকে নিঃশেষ করে দিতে চায়। আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মুরোদ তাদের নেই। তাদের স্থলবাহিনী-নৌবহর সব ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে তারা নাশকতামূলক অভিযান পরিচালনা করছে। আল্লাহর সত্য দ্বীনে কুঠারাঘাত করছে। আর আপনারা কিনা ওদের উপর অস্ত্রধারণ করতে বারণ করছেন।'

'মনোযোগ দিয়ে শুনুন বন্ধুগণ! খৃস্টান ও আমাদের অন্যান্য দুশমনরা ভালোবাসার প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের হাত থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিতে চায়। তারা চায় আমাদের পিঠে আঘাত হানতে।'কেউ তোমার এক গালে চড় মারলে অপর গালটাও এগিয়ে দাও' তাদের এই নীতি প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কার্কের মুসলমানদের সাথে তারা কি নির্মম আচরণ করেছে, তাতো আপনাদের অজানা নয়। শোবক দুর্গ জয় করার পর আপনারা কি সেখানকার বেগার ক্যাম্পের করুণ দৃশ্য দেখেননি? সেখানকার মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম নিয়ে তারা যে ছিনিমিনি খেলা খেলেছিল, তা কি আপনারা শুনেননি? অধিকৃত ফিলিস্তীনের মুসলমানরা চরম ভয়-উৎকণ্ঠা, অপমান ও নির্যাতনের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। খৃস্টানরা লুণ্ঠন করছে মুসলমানদের কাফেলা,

অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে মুসলিম নারীদের। আর আপনারা কিনা বলছেন, ইসলামের নামে অস্ত্রধারণ করা অন্যায়। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের নামে অস্ত্রধারণ করা যদি অন্যায়ই হয়ে থাকে, তাহলে আমি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি, এই অপরাধে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই। খৃস্টানদের তরবারী নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর আঘাত হানছে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা মুসলমান। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) কথা বলে। তারা ক্রুশ ও প্রতিমার পূজারী নয়। আপনাদের তরবারী হাত থেকে খসে পড়বে তখন, যখন আপনাদের সম্মুখের লোকটি হবে নিরস্ত্র এবং তার কাছে ইসলামের পয়গাম পৌছেনি। এই যে কে যেন বললেন 'মানুষের চেতনার উপর আঘাত করা ঠিক নয়'। আমি এই মতের সমর্থন করি না। আমি দেখেছি যে, আরব রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম শাসক ও অযোগ্য নেতৃবর্গ সাধারণ লোকদের সন্তুষ্ট করার জন্য তোষামোদমূলক কথা বলে থাকে। জনগণকে তাদের খেয়াল-খুশি মত চলার সুযোগ দিয়ে নিজেরা ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে। তারা নিজেদের চারপাশে এমন কিছু চাটুকার জুড়িয়ে নিয়েছে, যারা তাদের সব কথায় 'জ্বী হুজুর' এর নীতি পালন করে এবং প্রজাদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, আমাদের শাসকবর্গ যা কিছু বলছেন ও করছেন, সবই ঠিক। এর ফল কি হল? আল্লাহর বান্দাগণ দুশ্চরিত্র বিলাসী লোকদের গোলামে পরিণত হতে চলেছে। জাতি শাসক ও শাসিতে বিভক্ত হতে চলেছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি যে, দুশমন আমাদের মূলোৎপাটন করছে এবং আমাদের জাতির একটি অংশকে কুফ্‌রের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ না করি, তবে তার অর্থ হবে, আমরাও কুফরকে সমর্থন করছি। আমার ভাই সুলতান সালাহুদ্দীন বলেছিলেন, গাদ্দারী আমাদের রীতিতে পরিণত হতে চলেছে। আর আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের মধ্যে আরও একটি রীতি এই চালু হতে যাচ্ছে যে, জাতির একটি গোষ্ঠী শাসন করবে আর অন্যরা শাসিত হবে। শাসক গোষ্ঠীটি জনগণের সম্পদকে মদের স্রোতে ভাসিয়ে দেবে আর জনগণ এক ঢোক পানিও পান করতে পারবে না। আমার ভাই ঠিকই বলেছেন যে, আমাদের জাতি ও ধর্মের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের জনগণের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও সচ্চরিত্রতা সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্যে আমাদের কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে। এই সঠিক পদক্ষেপ জাতির গুটিকতক মানুষের জন্য ক্ষতিকর হলেও পরোয়া করা যাবে না। জাতির গুটিকতক মানুষের জন্য আমরা গোটা জাতির মর্যাদাকে বিসর্জন দিতে পারি না। জাতির একটি অংশকে আমরা কেবল এই জন্য দুশমনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের হাতে সোপর্দ করতে পারি না যে, সেখানকার মানুষের চেতনায় আঘাত আসবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, সেখানকার মানুষগুলো সরল-সহজ ও অশিক্ষিত। তাদের সমাজপতিরা দুশমনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করছে।'

সভাসদদের কারুর এই কল্পনাও ছিল না যে, তকিউদ্দীনের দৃষ্টিভঙ্গি এত কঠোর। তার সিদ্ধান্ত এত কঠিন হবে। তার উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণের বিরুদ্ধে কেউ টু-শব্দটি করার সাহস পেলেন না। তিনি বললেন, 'মিসরে এখন যে বাহিনী আছে. তারা যুদ্ধফেরত সৈনিক। এর আগেও তারা লড়াই করেছে। এ বাহিনীর পাঁচশ' অশ্বারোহী, দুইশ' উষ্ট্রারোহী এবং পাঁচশ' পদাতিক সৈন্য আজ সন্ধ্যায় সেই অঞ্চল অভিমুখে রওনা করিয়ে দিন। এই বাহিনী সন্দেহজনক প্রাসাদ থেকে এতটুকু ব্যবধানে অবস্থান করবে যে, প্রয়োজনে যেন সাথে সাথে তারা প্রাসাদ অবরোধ করে ফেলতে পারে। আমার সাথে দামেশ্‌ক থেকে যে দু'শ' সাওয়ার এসেছে, তারা এলাকায় প্রবেশ করে প্রাসাদের উপর আক্রমণ চালাবে। একটি কমান্ডো দল প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকে যাবে। দু'শ' অশ্বারোহী প্রাসাদ অবরোধ করে রাখবে। যদি বাইরে থেকে আক্রমণ আসে কিংবা যদি সংঘাত হয়, তাহলে বাহিনীর বড় অংশটি তার মোকাবেলা করবে এবং অবরোধ সংকীর্ণ করতে থাকবে। এই অভিযানে বাহিনীকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে রাখবে, যেন তারা কোন নিরস্ত্রের উপর আঘাত না করে।'

তকিউদ্দীন এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরপরই সেনাকর্মকর্তাগণ বাহিনীর রওনা হওয়া, আক্রমণ ও অবরোধ প্রভৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

❁ ❁ ❁

মিসরের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবহিত নন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। কার্ক ও শোবকের মধ্যবর্তী এলাকার মাইলের পর মাইল বিস্তৃত মরু অঞ্চলে খৃস্টানদের নয়া যুদ্ধ পরিকল্পনা মোতাবেক নিজের বাহিনীকে প্রস্তুত ও বিন্যস্ত করছেন তিনি। গুপ্তচররা তাকে রিপোর্ট দিয়েছিল যে, দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে খৃস্টানরা দুর্গের বাইরে এসে আক্রমণ চালাবে। তাদের এ বাহিনীর সৈন্যরা থাকবে অধিকাংশ বর্মপরিহিত। তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীকে মুখোমুখী লড়াইয়ে বাধ্য করার চেষ্টা করবে। একদল হামলা চালাবে পেছন দিক থেকে।

নিজের বাহিনীকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তিনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করলেন, তাহল, যে ক'টি স্থানে পানি ও গাছ-গাছালি ছিল, তার সব ক'টি এলাকা তিনি দখলে নিয়ে নেন। জায়গাগুলোর নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখার জন্য তিনি বড় বড় ধনুকধারী তীরান্দাজদের সেসব স্থানে পাঠিয়ে দেন। স্থাপন করলেন অগ্নিগোলা নিক্ষেপকারী মিনজানিক। এসব আয়োজনের উদ্দেশ্য, যাতে শত্রু কাছে আসতে না পারে। আশপাশের উচুঁ জায়গাগুলোও দখল করে নেন তিনি। সব ক'টি বাহিনীকে তিনি নির্দেশ দেন, দুশমন যদি সম্মুখ দিক হতে হামলা করে, তাহলে যেন তারা আরো ছড়িয়ে পড়ে, যাতে দুশমনও বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হয়। তিনি তার সৈন্যদের এমনভাবে বিন্যস্ত করলেন যে, দুশমন বুঝতেই পারেনি, মুসলিম বাহিনীর পার্শ্ব কোন দিক্ আর পেছন কোন্ দিক।

বাহিনীর বড় একটা অংশ রিজার্ভ রেখে দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। একটা অংশকে তিনি এমনভাবে তৎপর রাখেন যে, প্রয়োজন হলেই যেন তারা সাহায্যের জন্য যথাস্থানে পৌঁছুতে পারে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হল কমান্ডো বাহিনী। তদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা বিভাগ, যারা খৃস্টানদের যে কোন তৎপরতার সংবাদ পৌঁছিয়ে দেবে সুলতানের কাছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী শোবক দুর্গ জয় করে নিয়েছেন আগেই। খৃস্টানদের পরিকল্পনার একটি ছিল এই যে, পরিস্থিতি অনুকূলে এসে গেলে অবরোধ করে তারা শোবক পুনর্দখল করবে। তাদের আশা ছিল, তাদের এই বিপুল সৈন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে মরুভূমির তপ্ত বালুতেই নিঃশেষ করে ফেলতে কিংবা এতটুকু দুর্বল করে দিতে সক্ষম হবে যে, তারা বাইরে থেকে শোবককে সাহায্য দিতে পারবে না।

তাদের এই পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী শোবকের সেই দিকটিকে শূন্য করে ফেলেন, যেদিক থেকে খৃস্টানরা দুর্গের উপর আক্রমণ করার সম্ভাবনা আছে। পথ পরিস্কার দেখে খৃস্টানরা যাতে শোবক আক্রমণে এগিয়ে আসে, তার জন্য সুযোগ করে দেন সুলতান। সেদিক থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ চৌকিগুলোও প্রত্যাহার করে নেন এবং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এলাকা খালি করে দেন।

খৃস্টান গুপ্তচররা সাথে সাথে কার্কে সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয় যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী খৃস্টানদের সাথে লড়াই করতে তার বাহিনীকে শোবক থেকে দূরে এক স্থানে সমবেত করেছে এবং শোবকের রাস্তা খালি করে দিয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে খৃস্টানরা তাদের বাহিনীকে– যাদেরকে সুলতান আইউবীর উপর সম্মুখ থেকে আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য রওনা করা হয়েছিল– নির্দেশ প্রদান করে, যেন তারা গতি পরিবর্তন করে শোবকের দিকে চলে যায়। নির্দেশমত বাহিনীটি শোবকের পথ ধরে অগ্রসর হতে শুরু করে। তাদের পেছনে পেছনে আসছে বিপুল রসদবাহী কাফেলা। শোবকের চার মাইল দূরে থাকতেই কাফেলা যাত্রাবিরতি দেয় এবং অস্থায়ী ছাউনী ফেলে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করে। রসদবাহী হাজার হাজার ঘোড়া-গাড়ী ও উট-খচ্চর এখনো এসে পৌঁছায়নি। কোন শংকা নেই তাদের মনে। কারণ, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীর নাম-চিহ্নও দেখছে না তারা।

আনন্দে উৎফুল্ল খৃস্টান সম্রাটগণ। শোবক দুর্গকে তারা তাদের পদানত দেখছে। কিন্তু রাতে পাঁচ-ছয় মাইল দূরের আকাশটা হঠাৎ লাল হয়ে গেছে দেখতে পায় তারা। একদিক থেকে ছুটে গিয়ে আকাশ লাল করে অপর একদিকে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অসংখ্য অগ্নিশিখা। কি হল দেখে আসার জন্য অশ্বারোহী ছুটায় খৃস্টানরা। তাদের রসদবাহী কাফেলা শেষ হয়ে গেছে সব। ঘটনাস্থলে পৌঁছে অশ্বারোহী দলটি দেখতে

পায়, লাগামহীন ঘোড়া আর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য উট-খচ্চরগুলো ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছে মরুভূমিতে।

এ ধ্বংসযজ্ঞ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একটি কমান্ডো বাহিনীর কৃতিত্ব। খৃস্টানদের রসদের মধ্যে ঘোড়ার খাদ্য হিসেবে শুকনো খড় বোঝাই ছিল অসংখ্য ঘোড়াগাড়ী। রসদ-ক্যাম্পে চারদিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল সেগুলো। খৃস্টানদের মুখে বিজয়ের আগাম হাসি। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর যে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সতর্ক দৃষ্টি বিদ্যমান, সে খবর তাদের নেই। রাতে যখন রসদ ক্যাম্পের সবাই নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে পড়ে, তখন এই মুসলিম কমান্ডো বাহিনীটি শুকনো ঘাসের উপর আগুনের সলিতা বাঁধা তীর ছুড়ে। সাথে সাথে ঘাসে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের বেষ্টনীতে পড়ে যায় গোটা ক্যাম্প। অবরুদ্ধ মানুষগুলো প্রাণরক্ষা করার উদ্দেশ্যে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করলে তাদের উদ্দেশ্যে তীর ছুড়ে কমান্ডো সেনারা। যেসব পশু রশি ছিঁড়ে পালাতে সক্ষম হয়, সেগুলো প্রাণে বেঁচে যায়। আর যারা রশি ছিঁড়তে পারেনি, সেগুলো জীবন্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জাহান্নামে পরিণত হয় বিশাল ক্যাম্পটি। সম্ভব পরিমাণ উট-ঘোড়া ধরে নিয়ে পালিয়ে যায় কমান্ডোরা।

ভোরবেলা রসদ-ক্যাম্প পরিদর্শন করে খৃস্টান কমান্ডোরা। কিছুই নেই, জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সব। ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের এক মাসের রসদ। তারা বুঝে ফেলে, শোবকের পথ পরিস্কার থাকা ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একটি কৌশল। কার্ক থেকে শোবক পর্যন্ত পথটা তাদের জন্য মোটেও নিরাপদ নয়, তাও বুঝে ফেলে তারা। তাই তারা শোবক অবরোধের পরিকল্পনা মুলতবী করে দেয়। রসদ ছাড়া দুর্গ অবরোধ ছিল অসম্ভব। আর যখন তারা সংবাদ পেল যে, গত রাতে তাদের সেই বাহিনীর রসদও ধ্বংস হয়ে গেছে ,যারা আইউবীর বাহিনীর উপর সম্মুখ থেকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল, তখন তারা পুরো পরিকল্পনাই পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন অনুভব করে। কোথাও সুলতান বাহিনীর কোন সৈন্য চোখে পড়ছিল না তাদের। তাদের গুপ্তচররাও জানাতে পারেনি যে, সুলতানের সৈন্য সমাবেশ কোথায়। মূলত ছিলও না কোথাও।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সংবাদ পান, উভয় যুদ্ধক্ষেত্রেই খৃস্টানরা তাদের অগ্রযাত্রা স্থগিত করে দিয়েছে। তিনি তাঁর কমান্ডারকে ডেকে বললেন, 'খৃস্টানরা যুদ্ধ মুলতবী করে দিয়েছে, কিন্তু আমাদের যুদ্ধ বন্ধ হবে না। তারা যুদ্ধ মনে করে দু'বাহিনীর মুখোমুখি সংঘাতকে। আর আমাদের যুদ্ধ হল কমান্ডো আর গেরিলা আক্রমণ। এখন গেরিলা বাহিনীকে তৎপর রাখ। খৃস্টানরা উভয়দিক থেকেই পেছনে সরে যাচ্ছে। তাদেরকে তোমরা শান্তিতে কেটে পড়তে দিও না। পেছন থেকে, পার্শ্ব

থেকে কমান্ডো হামলা চালাও। খৃস্টানরা আমাদেরকে মুখোমুখি নিয়ে লড়াই করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে আমার পছন্দসই এমন জায়গায় মুখোমুখি নিয়ে আসব, যেখানে বালুকণাটিও আমাদের সহযোগিতা করবে।' সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কোন ঠিকানা নেই। আমলা-রক্ষীবাহিনীর সাথে তিনিও যাযাবর। কোন এক স্থানে স্থির থাকছেন না বলে মনে হচ্ছে। সব জায়গায়ই আছেন তিনি।

❁ ❁ ❁

মিসরে খৃস্টানদের অপর যুদ্ধক্ষেত্রের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই তকিউদ্দীন। এটি মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্বত্য এলাকার ফেরাউনী আমলের সেইসব ভয়ংকর প্রাসাদ, যেখানে হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন বলে মানুষের বিশ্বাস। নতুন এক বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে গিয়েছিল যে এলাকার সব মানুষ।

এক বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাবেলা। শতশত দর্শনার্থী গুহাসদৃশ দরজা অতিক্রম করে প্রবেশ করছে প্রাসাদের ভিতরে। ভেতরের বৃহৎ কক্ষটিতে গুঞ্জরিত হচ্ছে রহস্যময় কণ্ঠস্বর। নেক-বদ নির্বিশেষে সব মানুষই বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় রহস্যময় সেই দরবেশের কণ্ঠস্বর, যার ব্যাপারে জনশ্রুতি ছিল যে, বদকার মানুষ তার সাক্ষাৎ পায় না। তার স্থলে ভেসে এল আরেকটি কণ্ঠস্বর- 'লোক সকল! আজ রাতে তোমরা কেউ ঘরে যেও না। কাল সকালে তোমাদের সম্মুখে সেই রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে, যার জন্য তোমরা উদগ্রীব হয়ে আছ। এক্ষুণি তোমরা এখান থেকে বের হয়ে যাও। হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করছেন। এ প্রাসাদ থেকে বের হয়ে দূরে কোথাও গিয়ে তোমরা শুয়ে পড়।'

ইতিপূর্বে বড় কক্ষের দেয়ালে যেসব উজ্জ্বল তারকা ভেসে উঠত, আজ তা মন্দীভূত। দৃশ্যে যেসব রূপসী তরুণী আর সুদর্শন পুরুষ হেসে-খেলে ভেসে বেড়াত, এবার দেখা গেল সিপাহীর মত একদল মানুষ তাদের ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। চিৎকারের শব্দও ভেসে আসছে মাঝে-মধ্যে। বন্ধ হয়ে গেছে মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের চমক। এলাকাবাসীর চোখে যে স্থানটি ছিল অতিশয় পবিত্র, সেটি এখন ভয়ংকর এক স্বপ্নপুরী। ভয়ার্ত মানুষগুলো অল্পক্ষণের মধ্যে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যায়। শূন্য হয়ে যায় প্রাসাদ।

এ বিপ্লব সাধন করেছেন তকিউদ্দীন ও আলী বিন সুফিয়ান। তকিউদ্দীনের প্রেরিত সৈন্যরা সন্ধ্যার পর গিয়েছিল পার্বত্য এলাকার সন্নিকটে। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে শারজা। শারজা অশ্বারোহী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সৈন্যদের পার্বত্য এলাকায় নিয়ে আসে মেয়েটি। প্রতি সপ্তাহে এইবারে এখানে মেলা বসে এবং দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসে। বাহিনীর বড় অংশটিকে- যাতে আছে দু'শ' অশ্বারোহী, দু'শ' উষ্ট্রারোহী আর পাঁচশ' পদাতিক- দাঁড় করিয়ে রাখা হয় খানিক দূরে। সুদানের

সীমান্তের উপর নজর রাখা তাদের দায়িত্ব। অসামরিক লোকদের উপর আক্রমণ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে তাদের। প্রাসাদের নাশকতামূলক তৎপরতা যেহেতু পরিচালিত হচ্ছিল খৃস্টান ও সুদানীদের পৃষ্ঠপোষকতায়, তাই সেখানে সামরিক অভিযান পরিচালিত হলে সুদানীদের পক্ষ থেকে হামলা আসার আশংকা ছিল প্রবল।

তকিউদ্দীনের সাথে দামেশ্‌ক থেকে এসেছিল বাছা বাছা দু'শ' দু'সাহসী অশ্বারোহী। ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে লক্ষ্যভেদী তীর নিক্ষেপ করা তাদের একটি বিশেষ গুণ। পদাতিক বাহিনীতে আছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিজ হাতে গড়া বেশকিছু দুর্ধর্ষ কমান্ডো। তাদের এমন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল যে, অতীব দুর্গম টিলা-পর্বত ও বিশাল বিশাল গাছে অবলীলায় উঠানামা করতে পারে তারা। কয়েক গজ বিস্তৃত জ্বলন্ত আগুনের মধ্যদিয়ে আক্রমণ করা তাদের জন্য সাধারণ ব্যাপার।

দর্শনার্থীরা যখন দলে দলে প্রাসাদে প্রবেশ করছিল, ঠিক তখন প্রাসাদ অভিমুখে রওনা করা হয় এই জানবাজ কমান্ডোদের। সে পর্যন্ত নিয়ে যায় তাদের শারজা। সাথে তাদের আলী বিন সুফিয়ান। সাথে আছে তাদের দ্রুতগামী দূত, যাতে বার্তা পৌঁছাতে সময় না লাগে। প্রাসাদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। ভেতরে গমনকারীদের তিনটি করে খেজুর আর পানি খাওয়াচ্ছে তারা। দরজা অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করলেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরে জ্বলছে ক্ষীণ আলোর একটি প্রদীপ।

দর্শনার্থীদের সাথে প্রাসাদের ফটকের নিকট পৌঁছে যায় ছয়জন লোক। সবার মাথা চাদর দিয়ে ঢাকা। ভেতরে গমনকারীদের খেজুর খাওয়াচ্ছে যে চারজন, ভিড় এড়িয়ে তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় তারা। তাদেরকে সম্মুখ দিয়ে যেতে বলা হয়; কিন্তু কারো কথায় কর্ণপাত নেই তাদের। উল্টো দু'জনের পিঠে খঞ্জরের আগা ঠেকিয়ে কানে কানে বলে, 'বাঁচতে হলে এখান থেকে সরে যাও। এ মুহূর্তে তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ঘেরাওয়ে রয়েছ।' তারা ছয়জন কমান্ডো সদস্য।

টু-শব্দটি না করে সরে যায় লোক দু'জন। উপস্থিত জনতাকে না দেখিয়ে নিজ নিজ চোগার পকেটে খঞ্জরগুলো লুকিয়ে ফেলে কমান্ডোরা। বাইরে ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে আছে আরো দশ-বারোজন কমান্ডো। ছয় কমান্ডোর হুমকির মুখে চার ব্যক্তি যেইমাত্র বাইরে বেরিয়ে আসে, অমনি তাদের ঘিরে ফেলে ছদ্মবেশী দশ-বারোজনের কমান্ডো দলটি। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তাদের টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যায় দূরে। সেখানে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় তাদের। খেজুরের স্তূপ ও পানির মশকের নিকট দণ্ডায়মান ছয় কমান্ডো ভেতরে গমনকারী জনতাকে বলতে শুরু করে, আপনারা আজ খেজুর-পানি ছাড়াই ভেতরে ঢুকে পড়ুন। ভেতর থেকে নতুন পয়গাম এসেছে। কোন উচ্চবাচ্য না করে জনতা ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করে।

এবার আম-জনতার সাথে কমান্ডো সদস্যও ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। ঢুকছে

বাতি-প্রদীপ। অন্তত পঞ্চাশটি বাতি ও দু'শ' কমান্ডো ভেতরে ঢুকে যায়। আলোকিত কক্ষে না গিয়ে তারা চলে যায় অন্ধকার সরুপথ ও ছোট কক্ষে- বাইরের মানুষ যেখানে ইতিপূর্বে যায়নি কখনো। তাদের কারো কাছে খঞ্জর, কারো নিকট তরবারী, কারো হাতে ছোট ছোট তীর-ধনুক। যে পথে জনতা বাইরে বের হত, সে পথেও ঢুকে পড়ে কমান্ডোরা। নির্দেশনা মোতাবেক আঁকাবাঁকা সরু গলিপথে ঢুকে পড়ে তারা।

সম্মুখে এগিয়ে আসে তকিউদ্দীনের দু'শ' অশ্বারোহী। তারা প্রাসাদ এলাকাটি ঘিরে ফেলে। পদাতিক বাহিনীও আছে তাদের সাথে। ভেতর থেকে বহির্গমনকারীদের একদিকে একত্রিত করতে শুরু করে তারা। মশালধারীদের পেছনে পেছনে ভিতরে প্রবেশ করার পর কমান্ডোদের কাছে মনে হল, যেন তারা কারো উদরে চলে এসেছে। সরুপথ অতিক্রম করে করে তারা এমন এক স্থানে গিয়ে উপনীত হয়, সেখানকার দৃশ্য দেখে কমান্ডোরা থমকে দাঁড়ায়।

একটি খোলামেলা কক্ষ। ছাদটি বেশ উঁচু। ভেতরে অনেক নারী আর পুরুষ। তাদের কারো কারো চেহারা বাঘের ন্যায় ভয়ংকর। অনেকের চেহারা এতই বীভৎস ও ভয়ংকর যে, দেখলে ভয়ে দেহের লোম দাঁড়িয়ে যায়। দেখতে তাদের জিন-ভূতের ন্যায় মনে হয়। তাদের মাঝে চকমকে পোশাক পরিহিত কিছু সুন্দরী যুবতী হাসছে-খেলছে। একদিকে দেয়ালের সাথে কয়েকটি রূপসী মেয়ে কয়েকজন সুদর্শন পুরুষের সাথে ঠাঁট করে হেঁটে যাচ্ছে। অপরদিকে ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত দীর্ঘ একটি পর্দা ঝুলে আছে। পর্দাটা ডানে-বাঁয়ে নড়াচড়া করছে এবং একবার খুলে যাচ্ছে আবার বন্ধ হচ্ছে। আরেক দিকে চোখ ঝলসানো আলো জ্বলছে আর নিভছে।

কমান্ডোদের যদি নিশ্চিতভাবে জানানো না হত যে, প্রাসাদে যাকেই দেখবে, যেমন আকৃতিই চোখে পড়বে, সকলেই মানুষ এবং সেখানে ভূত-প্রেত বলতে কিছু নেই; তাহলে ভয়ে তারা সেখান থেকে নির্ঘাত পালিয়ে যেত। সেখানকার সুন্দরী মেয়ে আর সুদর্শন পুরুষগুলোও ভয়ংকর বলে মনে হচ্ছিল তাদের কাছে। কমান্ডোদের দেখে অদ্ভুত এই প্রাণীগুলো ভীতি সৃষ্টির জন্য ভয়ংকর শব্দ করতে শুরু করে দিয়েছিল। বাঘের চেহারার বীভৎস লোকগুলোর শব্দ ছিল বেশী ভীতিকর। এ সময়ে সম্ভবত ভয়ে দু'তিনজন লোক তাদের মুখোশ খুলে ফেলে। তাদের চেহারা ছিল বাঘের ন্যায়। ব্যাঘ্রের মুখোশ খুলে ফেলার পর ভেতর থেকে আসল মানবাকৃতি বেরিয়ে আসে তাদের।

কমান্ডোরা ঘিরে ধরে ফেলে তাদের সকলকে। মুখোশ খুলে ফেলে সব ক'জনের। নিয়ে যাওয়া হল বাইরে।

অনুসন্ধান চালানো হল প্রাসাদের অন্যত্র। পাকড়াও করা হল এক ব্যক্তিকে। লোকটি একটি সরু সুড়ঙ্গের মুখে মুখ রেখে বলছে, 'তোমরা গুনাহ থেকে তওবা

কর। হযরত ঈসা (আঃ) এসে গেছেন বলে...।' এ সুড়ঙ্গ পথটি এঁকেবেঁকে চলে গেছে সেই আলোকময় কক্ষে যেখানে দর্শনার্থীদের এসব রহস্যময় ভয়ংকর ও সুদর্শন দৃশ্যাবলী প্রদর্শন করে লোকদের অভিভূত করা হয়। লোকটিকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে কমান্ডো বাহিনীর এক কমান্ডার সুড়ঙ্গে মুখ রেখে বলে, 'লোক সকল! আজ রাতে তোমরা ঘরে ফিরো না। কাল সকালে তোমাদের সামনে সেই রহস্য উন্মোচিত হবে, তোমরা যার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছ।'

কমান্ডোদের সাথে সংঘাতে আসেনি প্রাসাদের কেউ। কমান্ডোদের খঞ্জর ও তরবারীর সামনে গ্রেফতারির জন্য নিজেদের সমর্পণ করে একে একে সকলে। গ্রেফতারকৃতদের নির্দেশনা মোতাবেক কমান্ডোরা সেসব জায়গায় পৌঁছে যায়, যেখানে বিজলীর ন্যায় উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা ছিল। ছিমছাম নিরাপদ একটি স্থানে কতগুলো বাতি জ্বলছে। বাতিগুলোর পেছনে কতগুলো কাঠের তক্তা। তক্তাগুলো শীশার মত পাত করা। এই শীশার চমকই মানুষের চোখে গিয়ে পড়ত। কক্ষটিকে অন্ধকার করার জন্য বাতিগুলো নিয়ে যাওয়া হত পেছনে। একদিকে ঝুলানো অনেকগুলো পর্দা। পর্দাগুলোর স্থানে স্থানে শীশার টুকরো আটকানো। এগুলোতে আলো পড়লেই ঝলমল করে উঠতো তারকার ন্যায়। তাছাড়া পর্দাগুলোর রঙও এমন যে, কারো বলার সাধ্য ছিল না যে এগুলো কাপড়। দেখলে মনে হয় ফাটা দেয়াল। বিবেকসম্পন্ন লোকদের কাছে এসব বিস্ময়কর কিছু নয়। এসব হল আলোর জাদু, যা সম্মোহিত করে ফেলত মানুষদের। কিন্তু যে-ই ভেতরে প্রবেশ করত, তার হুঁশ-জ্ঞান তার নিজের আয়ত্বে থাকত না। ভেতরে প্রবেশ করার সময় লোকদের যে খেজুর-পানি খাওয়ানো হত, তাতে নেশাকর মিশ্রণ থাকত। খাওয়ার পর সাথে সাথে তার ক্রিয়া শুরু হয়ে যেত। ফলে দর্শনার্থীদের মন-মস্তিষ্কে যে ধারণা এবং কানে যে শব্দই দেয়া হত, তাদের কাছে তা শতভাগ সঠিক বলে মনে হত। সে নেশার প্রতিক্রিয়ায়ই মানুষ বাইরে বের হয়ে পুনরায় প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে যেত। তারা জানত না যে, এটি তাদের বিশ্বাসের ক্রিয়া নয়; এটি সেই নেশার ক্রিয়া, যা তাদের খেজুর ও পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হত।

খেজুরের স্তূপ আর পানির মশকগুলোও কব্জা করে নেয় কমান্ডোরা। ধর-পাকড় অব্যাহত থাকে ভেতরে। বাইরে সমগ্র প্রাসাদ এলাকাটি অবরোধ করে আছে দু'শ' সৈন্য। সর্বত্র মশালের আলো। ফৌজের বৃহৎ অংশটি এবং দু'টি সীমান্ত ইউনিট টহল দিচ্ছে সুদানের সীমান্ত এলাকায়।

রাত কেটে গেছে। সুদানের দিক থেকে কোন হামলা আসেনি। সংঘাত হয়নি প্রাসাদেও। সর্বত্র ভীত-সন্ত্রস্ত এলাকাবাসীর ভীড়। রাতে এদিক-ওদিক ঘুমিয়েছিল অনেকে। তাদের অবরোধ করে রেখেছে অশ্বারোহী বাহিনী।

❁❁❁

কিছুক্ষণ পর একস্থানে একত্রিত করে বসিয়ে দেয়া হয় জনতাকে। সংখ্যায় তারা তিন থেকে চার হাজার। একদিক থেকে এক পাল লোককে হাঁকিয়ে নিয়ে আসে সেনারা। এরা সকলে ব্যাঘ্রের মুখোশপরা মানুষ। কুৎসিত ও ভয়ানক এদের আকৃতি। 'এরা সেইসব লোক, প্রাসাদের ভেতরে জনতাকে যাদের প্রদর্শন করা হত আর বলা হত এরা পাপিষ্ঠ। কৃত অপরাধের সাজা ভোগ করছে এরা। এদের অপরাধ ছিল, এরা যুদ্ধ-বিগ্রহে অভ্যস্ত ছিল।' অর্থাৎ এরা মুজাহিদ।

তারপর দশ-বারটি মেয়েকেও নিয়ে আসা হয় জনতার সম্মুখে। এরা অত্যন্ত রূপসী যুবতী। এদের সাথে আছে বেশক'জন সুদর্শন পুরুষ।

জনতার ভীড়ের সামনে একটি উঁচু স্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় এ দল দু'টিকে। মুখোশ খুলে জনতার সামনে আসল রূপ প্রদর্শন করার নির্দেশ দেয়া হয় তাদের। সাথে সাথে বাঘের কৃত্রিম চেহারা খুলে ফেলে তারা। স্বাভাবিক মানবাকৃতির বেরিয়ে আসে তার ভেতর থেকে।

জনতাকে নির্দেশ দেয়া হয়, তোমরা কাছে এসে দেখ এদের চেন কিনা। নির্ভয়ে তাদের নিকটে যায় জনতা। চোখ বুলিয়ে দেখে সবাইকে। দেখে তারা হতভম্ব। কোথাকার এরা আকাশের প্রাণী! এরা দেখছি সকলেই আমাদের চেনা-জানা পরিচিত। সকলেই তাদের এলাকার মানুষ। এ খৃস্টান চক্রটির উদ্দেশ্য, মুসলমানদের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা যে, সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া অন্যায় কাজ। যুদ্ধ করা মস্ত বড় পাপ। এ উদ্দেশে চক্রটি সম্পূর্ণ সফল। এ এলাকার লোকদের মনে সুদানীদের প্রতি সমর্থন সৃষ্টিতেও সফল হয়েছে এ চক্রটি। ধর্ম পরিবর্তন না করেই তাদের ধর্মহীণ করে তুলেছে তারা।

জনতাকে বলা হল, এবার তোমরা প্রাসাদে ঢুকে অবলীলায় ঘুরে-ফিরে দেখ এবং খৃস্টান কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র-প্রতারণার প্রমাণ স্বচক্ষে দেখে আস। মানুষ দলে দলে ভেতরে ঢুকে পড়ে। স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে আছে সেনারা। এখানে জনতাকে কিভাবে প্রতারিত করা হয়েছিল, সেনারা তার বিবরণ দেয়।

দীর্ঘ সময় পর্যবেক্ষণ করে জনতা বাইরে বেরিয়ে এলে তকিউদ্দীন তাদের উদ্দেশে ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি জানান, প্রাসাদে প্রবেশ করার সময় আপনাদের যে খেজুর ও পানি দেয়া হত, তার সাথে আপনাদের নেশা মিশিয়ে খাওয়ানো হত। ভেতরে যে জান্নাত-জাহান্নাম দেখানো হত, তা নেশার ক্রিয়ায় আপনাদের দৃষ্টিগোচর হত। এই কুচক্রীদের বলুন, ভেতরে গিয়ে তোমরা দেখাও হযরত মূসা (আঃ) কোথায় এবং মৃত খলিফা আল আজেদই বা কোথায়। এসব ছিল প্রতারণা। এ সেই নেশা, যা খাইয়ে হাশীশীদের গুরু হাসান ইবনে সাব্বাহ মানুষদের জান্নাত প্রদর্শন করত। সে তো একসময়ে কয়েকজন মানুষকে নেশা খাওয়াত মাত্র। আর এখানে ইসলামের এই

দুশমনরা বিশাল একটি অঞ্চলের বাসিন্দাদের মাতাল করে তুলেছে।

জনতার সামনে ঘটনার আসল চিত্র তুলে ধরে তকিউদ্দীন বললেন, প্রথমে আপনাদেরকে একজন দরবেশের কাহিনী শোনানো হয়েছিল, যে পথিকদের উষ্ট্র ও স্বর্ণমুদ্রা দান করত। তা ছিল নিছক ভিত্তিহীন গুজব। যারা আপনাদেরকে এসব কাহিনী শোনাত, তারা ছিল ইসলামের দুশমনদের দালাল, খৃস্টানদের মদদপুষ্ট।

তকিউদ্দীনের ভাষণের পর উত্তেজিত হয়ে উঠে জনতা। ক্ষিপ্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুচক্রীদের উপর। ততক্ষণে রাতের নেশা কেটে গেছে তাদের। বিক্ষুব্ধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে সেনারা। কিন্তু গ্রেফতারকৃত সকল কুচক্রী ও মেয়েদের প্রাণে মেরেই তবে ক্ষান্ত হয় জনতা।

এলাকায় সেনাবাহিনী ছড়িয়ে দেন তকিউদ্দীন। দুশমনের দালালদের খুঁজে খুঁজে গ্রেফতার করে তারা। কায়রোর হক্কানী আলেমদের ইমাম নিযুক্ত করা হয় মসজিদগুলোতে। ধর্মীয় ও সামরিক তালিম-তরবিয়ত শুরু করে দেয়া হয় ফেরাউনী আমলের পরিত্যক্ত প্রাসাদগুলোতো।

কায়রো ফিরে গিয়ে দু'টি কাজ আঞ্জাম দেন তকিউদ্দীন। প্রথমত ডাক্তার-শারজাকে বিবাহবন্ধনে আবন্ধ করলেন, যা ছিল শারজার মনের ঐকান্তিক কামনা। দ্বিতীয়ত সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ডোকে সুদান আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। প্রাসাদ অভিযানে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র সুদান মিসরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে এমনভাবে তাদের প্রভাব-বলয়ে নিয়ে নিয়েছে যে, প্রচণ্ড সামরিক অভিযান ছাড়া তা প্রতিহত করা সম্ভব নয়। তিনি আরো তথ্য পেয়েছিলেন যে, সুদানীরা খৃস্টানদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে এবং তারা যথারীতি মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তার আগেই সুদান আক্রমণ করা অত্যাবশ্যক বলে সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তাতে সুদানের কোন এলাকা দখলে আসুক বা না আসুক এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, দুশমনের আয়োজন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে এবং তাদের পরিকল্পনা দীর্ঘ সময়ের জন্য পিছিয়ে যাবে।

রাইনি আলেকজান্ডার-এর চূড়ান্ত লড়াই

খৃস্টানদের একটি ষড়যন্ত্র যথাসময়ে নস্যাৎ করে দিলেন মিসরের ভারপ্রাপ্ত গবর্নর তকিউদ্দীন। ষড়যন্ত্রের আখড়াটি ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন তিনি। তবু তিনি চিন্তামুক্ত হতে পারেননি। কারণ, তিনি জানেন যে, ইসলাম-বিধ্বংসী হলাহল মিশে গেছে জাতির শিরায় শিরায়। খৃস্টানদের এই নাশকতামূলক কর্মকান্ডে সমর্থন যোগাচ্ছে সুদানীরা। আর সুদানীরা পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে খৃস্টানদের।

ফেতনার এই আড্ডাটিও ধ্বংস করার পরিকল্পনা নেন তকিউদ্দীন। সুদান আক্রমণের জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে দেন তিনি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিলেন সুদানেও। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট প্রেরণ করছে তারা। সুদানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচ্ছেন তকিউদ্দীন। কিন্তু সেসব তথ্যাবলীকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যতটুকু কাজে লাগাতে পারতেন, ততটুকু পারছেন না ভাই তকিউদ্দীন। দু'ভাইয়ের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-জযবা সমান বটে; কিন্তু দু'জনের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় তফাত অনেক। দু'জনের সিদ্ধান্তই কঠোর–আপোসহীন। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পা ফেলেন মেপে মেপে–সাবধানে। আর তকিউদ্দীন হলেন অস্থির স্বভাবের মানুষ।

সামরিক উপদেষ্টাগণ বললেন, 'সুদান আক্রমণের সিদ্ধান্ত সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপ। কিন্তু মহামান্য এতে সুলতানের মতামত নেয়া প্রয়োজন।' জবাবে তকিউদ্দীন তার উপদেষ্টাদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বললেন–' আপনারা কি মোহতারাম আইউবীকে একথা বুঝাতে চান যে, আপনারা তাকে ছাড়া কিছুই করতে পারেন না? আপনারা কি জানেন না যে, মিসর থেকে সুদূর এক এলাকায় কেমন এক ঝড়ের তিনি মোকাবেলা করছেন? আমাদের তার পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকার অর্থ হবে সুদানীদেরকে মিসর আক্রমণের সুযোগ করে দেয়া।'

' আপনি এক্ষুণি আক্রমণ করার আদেশ দিন। বাহিনী এ মুহূর্তে যে অবস্থায় আছে, রসদ ছাড়াই সে অবস্থায় রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু আমি এত বড়, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিযানের জন্য গভীর ভাবনা-চিন্তা প্রয়োজন মনে করি। রওনা হওয়ার সকল আয়োজন আমরা অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করে ফেলতে পারি। কিন্তু আমরা চাই যে, আপনি মহামান্য আইউবীকেও বিষয়টি অবহিত করে রাখুন, যাতে তিনি ও মোহতারাম জঙ্গী এদিকে দৃষ্টি রাখেন।'

কিন্তু তকিউদ্দীন মানলেন না। তিনি বললেন–' মিসরে আপনারা এক একজন গাদ্দার, এক একটি সন্ত্রাসী গ্রেফতার করছেন আর মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন। আমি চাই এই গাদ্দারী আর নাশকতার উৎস বন্ধ করতে। এ কাজের জন্য আমার কারো নির্দেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন নেই।'

মিসরে খৃস্টান ও সুদানীদের গুপ্তচররা তৎপর। এখানকার সামরিক সব তৎপরতার প্রতি নজর রাখছে তারা। ইচ্ছে করলে তারা তকিউদ্দীনের সুদান আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে পারে। কিন্তু তকিউদ্দীন সে বিষয়টি ভেবে দেখলেন না। তার একটি দুর্বলতা এও ছিল যে, তার দুশমনের গুপ্তচরদের একদল হল মুসলমান, যাদের এক একজন প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা। তার বিপরীতে তকিউদ্দীনের গুপ্তচররা সুদানের রাজনৈতিক ও নীতি নির্ধারকদের পর্যন্ত যেতে পারে না। তাছাড়া সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ১১৬৯ সালে মিসরের যে সুদানী বাহিনীটিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন, তার কয়েকজন কমান্ডার-কর্মকর্তা এখন সুদানে অবস্থান করছেন। তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর-কৌশল সম্পর্কে অবহিত। সেই কৌশল অনুযায়ী তাদের বাহিনীকে গড়ে নিয়েছে তারা। খৃস্টানরা তাদের উন্নতমানের অস্ত্র এবং প্রয়োজনেরও অধিক সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে রেখেছে। মিসরের নাড়ী-নক্ষত্র তাদের জানা।

তকিউদ্দীন আরো যে বিষয়টি ভেবে দেখলেন না, তা হল, তিনি সুদানের যে এলাকায় পা রাখতে যাচ্ছেন, সেটি বিশাল এক মরু অঞ্চল। পানির অভাব সেখানো অত্যন্ত প্রকট। আর যে জায়গায় গিয়ে তার আক্রমণ করতে হবে, মিসর থেকে তার দূরত্ব এত বেশী যে, সে পর্যন্ত রসদ সরবরাহ অব্যাহত রাখা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সর্বোপরি মিসরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং নাশকতামূলক কর্মকান্ডের প্রতি নজরদারী করার জন্যও সৈন্যের প্রয়োজন। কিন্তু তকিউদ্দীন এতই আবেগ-প্রবণ হয়ে উঠেছেন যে, এসব কিছু উপেক্ষা করেই তিনি আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে অবহিত না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

তকিউদ্দীনের এই স্বাধীনচেতা মানসিকতায় সেই জযবাই কাজ করছিল, যা ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মধ্যে। তিনি জানতেন যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কেমন প্রচন্ড ঝড়ের মোকাবেলা করছেন এবং খৃস্টানরা চূড়ান্ত লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

এ মুহূর্তে কার্ক থেকে আট-নয় মাইল দূরে একটি পার্বত্য এলাকায় হেডকোয়ার্টারে অবস্থান করছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। এটি তার অস্থায়ী ছাউনি। কৌশলগত কারণে এক সময় এক স্থানে অবস্থান নিচ্ছেন তিনি। যখন তিনি যে এলাকায় আক্রমণ

পরিচালনা করার কিংবা গেরিলা হামলার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তখন তার সন্নিকটে কোথায় ছাউনি ফেলছেন। আক্রমণকারী বাহিনীর কমান্ডারকে জানিয়ে রাখছেন, ফেরার সময় তিনি কোথায় থাকবেন।

শত্রুবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে ফিরছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডো বাহিনী। জানবাজ কমান্ডোদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলো এক মহাবিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে মরুভূমিতে ছড়িয়ে থাকা খৃস্টান বাহিনীর জন্য। ব্যাপক ক্ষতি সাধন হচ্ছে খৃস্টানদের।

কিন্তু কমান্ডোদের শাহাদাতবরণের ঘটনাও বেড়ে গেছে ব্যাপকহারে। আক্রমণকারী দলে কমান্ডো থাকে যদি দশজন, তো ফিরে আসে তিন-চারজন। খৃস্টানরা এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে, যা কমান্ডোদের সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে জীবনের সীমাহীন ঝুঁকি নিয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হচ্ছে তাদের। তাই কৌশল পরিবর্তনের কথা ভাবতে শুরু করেছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'খৃস্টানরা বোধ হয় আমাকে মুখোমুখী লড়াইয়ে আসতে বাধ্য করছে। কিন্তু আমি তাদেরকে সফল হতে দেব না। তাছাড়া আপাততঃ আমার এতো লোকও আমি মরতে দেব না।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আমি আপনাকে গেরিলা বাহিনীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করার পমামর্শ দেব। এ পরামর্শও দেব যে, আমাদের শুধু এ কারণে দুশমনের শক্তিকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না যে, আমাদের সৈন্যদের আবেগ অনেক বেশী। কিন্তু আবেগ একজন সৈনিককে প্রাণপণ যুদ্ধে জড়িয়ে খুন করাতে পারে, বিজয়ের জামিন হতে পারে না। খৃস্টানদের মোকাবেলায় আমাদের সৈন্যসংখ্যা অনেক কম। আমাদের এ কথাও ভুললে চলবে না যে, খৃস্টানদের অধিকাংশ সৈনিক বর্মপরিহত।' বললেন এক নায়েব।

মুচকি হাসলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। বললেন–' তারা যে লোহা পরিধান করে রেখেছে, তা তাদের নয়– উপকার দেবে আমাদের। দেখেননি, ওরা মার্চ করে হয়তো রাতে অথবা ভোরে? কারণ, তারা রোদ সহ্য করতে পারে না। সূর্যের তাপ তাদের বর্মগুলোকে জ্বলন্ত অংগারের ন্যায় উত্তপ্ত করে তোলে। তখন বর্মপরিহিত সৈনিকেরা তাদের লোহার ঐ পোশাকগুলো খুলে ছুড়ে ফেলতে চায়। তাছাড়া লোহার ওজন তাদের চলাচলের গতিও ব্যাহত করে তুলে। আমি তাদেরকে দুপুর বেলা লড়াই করতে বাধ্য করব। তাদের মাথার শিরস্ত্রাণগুলো ঘাম ঝরিয়ে ঝরিয়ে চোখে ফেলবে। তারা অন্ধ হয়ে যাবে। আর সংখ্যার ঘাটতি আমাদের পূরণ করতে হবে আবেগ ও কৌশল দিয়ে।'

এ সময়ে এসে উপস্থিত হন আলী বিন সুফিয়ানের এক নায়েব জাহেদান। সাথে

তাঁর দু'জন লোক। চমকে উঠলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাদের বসতে দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ' খবর কি?' জামার ভেতর হাত ঢোকালেন তারা। বের করে আনলেন কাঠের তৈরি দু'টো ক্রুশ। এগুলো ঝুলানো ছিল তাদের গলায়। এরা খৃস্টান নয়- মুসলমান। নিজেদের খৃস্টান জাহির করার জন্য তারা গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখে। দু'জনই ক্রুশ দু'টো খুলে নীচে ফেলে দেয়। রিপোর্ট পেশ করে একজন।

❁ ❁ ❁

এরা দু'জন গুপ্তচর। ফিরে এসেছে কার্ক থেকে। কার্ক ফিলিস্তীনের দুর্গবেষ্টিত একটি শহর। দখল খৃস্টানদের। শোবক নামক একটি দুর্গও তাদের দখলে ছিল। সেটির পতন ঘটেছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে। কার্ক দুর্গকে কোনক্রমেই হাতছাড়া করতে চাইছে না তারা। তাই তারা শোবক পতনের পর কার্কের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেক শক্ত করে ফেলেছে। এখন আর তারা দুর্গের ভেতরে থেকে যুদ্ধ করতে চাইছে না।

শোবক পতনের পর মুসলমানদের ভয়ে যখন খৃস্টান ও ইহুদী নাগরিকরা পালিয়ে কার্ক চলে যেতে শুরু করেছিল, তখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তার সেনাবাহিনী ও প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, পলায়নপর অমুসলিমদের যেন ফিরিয়ে আনে এবং তাদের সাথে ভাল আচরণ করে। কিন্তু সুলতান একটি গোপন নির্দেশ এ-ও দিয়ে রেখেছিলেন যে, যারা চলে যেতে চায়, তাদেরকে যেতে দাও। রহস্য এই ছিল যে, তাহলে অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচররাও কার্ক ঢুকে যেতে পারে। দুশমনের এই নগরীতে এবং তার আশ-পাশে–যার উপর অল্প ক'দিন পরই আক্রমণ হতে চলেছে–গুপ্তচর ঢুকিয়ে রাখার এটি এক মোক্ষম সুযোগ। ইহুদী ও খৃস্টান শরণার্থীদের বেশে মুসলিম গুপ্তচররা সে সুযোগে ঢুকে পড়েছিল কার্কে। সেখানকার মুসলিম বাসিন্দাদের সাথে নিয়ে একটি গোপন আড্ডা তৈরী করে নিয়েছিল তারা। সেখান থেকে তথ্য প্রেরণ করছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট। সুলতান নিজ কানে শুনতেন তাদের রিপোর্ট।

আজও আসল দু'জন গুপ্তচর। তৎক্ষণাৎ তাদের তাঁবুতে ডেকে নিয়ে গেলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। সরিয়ে দিলেন অন্য সকলকে। খৃস্টান বাহিনীর গতি-বিধি ও বিন্যাস সম্পর্কে নানা তথ্য প্রদান করে তারা। সে মোতাবেক ছক তৈরি করতে শুরু করেন সুলতান। এ সময়ে চেহারায় তার কোন পরিবর্তের ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু গুপ্তচররা যখন কার্কের মুসলিম নাগরিকদের নির্যাতনের করুণ চিত্র তুলে ধরতে শুরু করল, তখন বিবর্ণ হয়ে গেল সুলতানের চেহারা। আবেগাপ্লুত হয়ে এক পর্যায়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁবুর মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করলেন।

গুপ্তচররা তাকে জানায়, শোবকে পরাজয় বরণ করে খৃস্টনরা কার্কের মুসলমানদের

বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়ে গেছে। সেখানকার হাট-বাজারগুলোতে মুসলমান ব্যবসায়ীরা পথে বসতে শুরু করেছে। অমুসলিম ক্রেতারা তো তাদের থেকে সওদা ক্রয় করেই না, উপরন্তু মুসলমারদেরও ভয় দেখিয়ে তাদের দোকান থেকে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। সেখানে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজ রুটিনে পরিণত হয়েছে। ইহুদী-খৃস্টানরা মসজিদগুলোর চত্বরে উট-ঘোড়া ও গরু-ছাগল বেঁধে রাখছে। আযান-নামাযের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই বটে, তবে আযান শুরু হলেই অমুসলিমরা হৈ-চৈ, গান-বাদ্য শুরু করে দিয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

গোয়েন্দা আরো জানায়–

মুসলমানদের জাতীয় চেতনা নস্যাৎ করার জন্য সেখানে জোরেশোরে ছড়ানো হচ্ছে নানা রকম গুজব। প্রচার করা হচ্ছে সালাহুদ্দীন আইউবী গুরুতর জখম হয়ে দামেশ্‌ক চলে গেছেন। এতক্ষণে হয়ত তিনি মারা গেছেন। আরো বলা হচ্ছে, নেতৃত্বের দুর্বলতার ফলে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈন্যরা মরুভূমিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা পালিয়ে মিসর চলে যাচ্ছে। গুজব ছড়ানো হচ্ছে, মুসলমানদের এখন আর কার্ক আক্রমণ করার শক্তি নেই এবং অতি সত্বর শোবক দুর্গ খৃস্টানদের হাতে চলে আসছে। প্রচার করা হচ্ছে, সুদানীরা মিসর আক্রমণ করেছে এবং মিসরের সৈন্যরা স্বপক্ষ ত্যাগ করে সুদানীদের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। আরো কত কি গুজব ছড়িয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে কার্কের মুসলমারদের।

গুপ্তচররা জানায়, এখন প্রতিদিন ভোরে খৃস্টান পাদ্রীরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় এবং মুসলমানদের ঘরের দরজায় গিয়ে গিয়ে ঘন্টা বাজায়, গান গায় ও মুসলমানদের জন্য প্রার্থনা করে। পাদ্রীরা এর বেশী কিছু করে না। ইহুদী ও খৃস্টান মেয়েরা মুসলমানদের মধ্যে তাদের ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়। প্রেম-ভালোবাসার ফাঁদ পেতে মুসলিম যুবকদের চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করছে সুন্দরী তরুণীরা। বান্ধবী বানিয়ে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে স্বাধীনতার চিত্তাচর্ষক প্রলোভন দেখাচ্ছে তারা মুসলিম মেয়েদের। তাদের ধারণা দিচ্ছে যে, মুসলিম বাহিনী যখনই যে এলাকা জয় করছে, তারা সেখানকার অন্যদের সাথে মুসলিম মেয়েদেরও সম্ভ্রম নষ্ট করছে।

গোয়েন্দাদের এ রিপোর্ট সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য নতুন কিছু ছিল না। কার্কের মুসলমানদের করুণ দশা সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকেই অবহিত। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন গুজব কানে নিতে প্রস্তুত ছিল না সেখানকার মুসলমানরা। কিন্তু গুজব শুনতে শুনতে এখন কান ঝালা-পালা হয়ে গেছে তাদের। যখন যে কথা তাদের কানে ঢুকছে,সবই আঘাত হানছে তাদের মনোবলে। কত আর শোনা যায়। এখন ধীরে ধীরে প্রভাবিত হতে শুরু করেছে তারা।

ভয়ে তারা মুখ খুলতে পারছে না। তাদের ঘরের দেয়ালেরও কান আছে। পদে

পদে গুপ্তচর। শবযাত্রা-বরযাত্রায়ও গোয়েন্দা। মসজিদে-মসজিদেও গুপ্তচর। তাদের বড় দুর্ভাগ্য, তাদের মুসলমান ভাই খৃস্টানদের পক্ষে চরবৃত্তি করছে। নিজ ঘরে বসে কথা বলতে হয় তাদের কানে কানে। 'অমুক মুসলমান খৃস্টান সরকারের বিরোধী' শুধু এতটুকু রিপোর্টই যথেষ্ট একজন মুসলমানের বেগার ক্যাম্পে ঠাঁই নেয়ার জন্য।

'কিন্তু সালারে আজম! সেখানে নতুন এক চাল শুরু হয়েছে। খৃস্টানরা মুসলমানদের সাথে ভালো আচরণ করতে শুরু করেছে। এই তো অল্প ক'দিন আগের ঘটনা। খৃস্টান সরকারের এক কর্মকর্তা একটি মসজিদের দৈন্যদশা দেখে সাথে সাথে মসজিদটা মেরামত করে দেয়ার ঘোষণা দেন এবং অল্প ক'দিনের মধ্যে নিজে উপস্থিত থেকে মসজিদটি মেরামত করেও দেন। তারা বেগার ক্যাম্পের মুসলমানদের মুক্তি দেয়নি ঠিক, কিন্তু তাদের কষ্ট অনেকটা লাঘব করে দিয়েছে এবং শ্রমের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছ। কিন্তু তাদের বুঝানো হচ্ছে, তোমরা ক্রুশের বিরুদ্ধে মারাত্মক অন্যায় করেছ, তথাপি আমরা তোমাদের উপর রহম করছি। কার্কের খৃস্টানদের এই ভালোবাসার অস্ত্র বড়ই ভয়ংকর। কৃত্রিম এই ভালোবাসা দিয়ে তারা মুসলিম যুবকদেরকে নেশা ও জুয়াবাজিতে অভ্যস্ত করে তুলছে। আমরা যদি আক্রমণে বিলম্ব করি, তাহলে সেখানকার মুসলমানরা ততদিনে কুরআনের পরিবর্তে গলায় ক্রুশ ধারণ করবে। মুসলমান থাকেও যদি থাকবে নামমাত্র। তখন আমরা কার্ক অবরোধ করলে তারা আমাদের কোন সহায়তা করবে না। পাশাপাশি মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের চরবৃত্তিও আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে। তবে মুসলমানদের ঈমানী চেতনা এখনো বহাল আছে। এখনো তারা ঈমানের উপর দৃঢ় থাকতে সংকল্পবদ্ধ। এখনো তারা খৃস্টানদের ভালোবাসাকে বরণ করে নেয়নি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এভাবে চলতে থাকলে তারা বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না।' বলল এক গোয়েন্দা।

পরিস্থিতির বিবরণ শুনে বিচলিত হয়ে পড়েন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। 'মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করছে ' এ রিপোর্টটি বেশী পীড়াদায়ক তার কাছে। অধিকৃত অঞ্চলে মুসলমানদের সাথে খৃস্টানদের ভালো আচরণ এবং তার পাশাপাশি মুসলিম যুবকদের চরিত্র ধ্বংসের অভিযোগ তাঁর পেরেশানীর আরেকটি কারণ। সবচে' বেশী ভয়াবহ হল সেইসব গুজব, যা ছড়ানো হচ্ছে সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের নায়েব জাহেদানকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, ' তুমি কি এদের বক্তব্য শুনেছ?'

'বর্ণে বর্ণে শুনেই তবে এদের আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।' জবাব দেন জাহেদান।

'আলী বিন সুফিয়ানকে কায়রো থেকে ডেকে আনবে? ...নাকি তুমিই তার স্থান পূরণ করতে পারবে? বিষয়টি কিন্তু বড় স্পর্শকাতর। দুশমনের নগরীতে মুসলমানদেরকে গুজব এবং দুশমনের বিষাক্ত ভালোবাসা থেকে রক্ষা করতে হবে।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আলী বিন সুফিয়ানকে কায়রো থেকে ডেকে আনার প্রয়োজন নেই। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকেও তার সাথে থাকতে দিন। মিসরের পরিস্থিতি ভালো নয়। দেশ নাশকতাকারী ও গাদ্দারে ভরে গেছে। কার্কের বিষয়টা আমিই সামলে নেব।' বললেন জাহেদান।

'তুমি কী চিন্তা করেছ?' জিজ্ঞেস করলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। মূলতঃ পরীক্ষা নিচ্ছিলেন তিনি জাহেদানের। সুলতান জানতেন, জাহেদান নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী গুপ্তচর এবং আলী বিন সুফিয়ানের হাতেগড়া লোক। তার প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর। তারপরও তিনি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন মনে করছেন যে, জাহেদান তার ওস্তাদের অভাব পূরণ করতে পারবে কি-না। জাহেদানের জবাবের অপেক্ষা না করেই সুলতান বললেন,' জাহেদান! আমি কখনো যুদ্ধের ময়দানে পরাজয়বরণ করিনি। এ ময়দানেও আমি পরাজিত হতে চাই না। আমি কার্কের মুসলমানদের চারিত্রিক ও আদর্শিক পতন থেকে রক্ষা করতে চাই।'

'আপনি জানেন, কার্কে আমাদের গুপ্তচর আছে। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি তাদের কাজে লাগাব। তারা সেখানকার মুসলমানদেরকে আপনার সম্পর্কে, আমাদের সেনা বাহিনী ও মিসর সম্পর্কে সঠিক খবরাখবর শোনাতে থাকবে এবং তাদের কাছে আপনার পয়গাম পৌঁছাতে থাকবে।' বললেন জাহেদান।

'ওখানকার মুসলিম মহিলাদের মধ্যে জাতীয় ও ঈমানী চেতনার কমতি নেই। আমরা মুসলিম যুবতীদের বলে দেব, যেন তারা ঘরে ঘরে মুসলিম মহিলাদের মন-মানসিকতা ধোলাই করতে থাকে। আমি তো নিজের চোখে দেখেছি, সেখানকার মেয়েরা অস্ত্র হাতে লড়াই পর্যন্ত করতে প্রস্তুত।' বলল এক গোয়েন্দা।

'মহিলারা যদি নিজ নিজ ঘর ও শিশু-সন্তানদের চরিত্র গঠনের ময়দান নিয়ন্ত্রণে রাখে, তাহলে তাতেই ইসলামের প্রসার ও ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তারে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে। তাদের বলে দাও, যেন তারা মুসলিম পরিবারগুলোতে এবং মুসলিম শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈসলামী কার্যকলাপ ও ইসলাম-বিরোধী চিন্তা-চেতনা ঢুকতে না দেয়। আমি চেষ্টা করছি, যাতে শীঘ্র কার্ক আক্রমণ করতে পারি এবং শোবকের ন্যায় সেখানকার মুসলমানদেরও নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে উদ্ধার করতে পারি।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তিনি জাহেদানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মিশন নিয়ে তুমি কাকে কার্ক পাঠাবে?'

'এই দু'জনকে। আসা-যাওয়ার পথ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে এরা অভিজ্ঞ। ওখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথেও পরিচিত।' জবাব দেন জাহেদান।

কার্কের মুসলমানদের উপর ভালোবাসার যে অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল, তা ছিল খৃস্টানদের গোয়েন্দা প্রধান হরমুনের আবিস্কার। শোবকে পরাজয়বরণ করার পর তিনি খৃস্টান সম্রাটদের উপর চাপ দিয়ে আসছিলেন যে, কার্কের মুসলমানদেরকে ভালোবাসার টোপ দিয়ে ক্রুশের অনুগত বানানো হোক কিংবা অন্ততঃ সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রুতে পরিণত করা হোক। কিন্তু খৃস্টান শাসকগণ মুসলমালদের এতই ঘৃণা করত যে, তাদের প্রতি কৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শন করতেও তারা রাজী নন। অত্যাচার-নির্যাতন দিয়েই মুসলমানদের জাতীয় চেতনা ধ্বংস করতে চাইতেন তারা।

জার্মান বংশোদ্ভূত হরমুন একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। মানুষের সাইকোলজী বুঝেন তিনি। খৃস্টান সম্রাটদের অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে বড় কষ্টে তিনি নিজের মতে নিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং পরিকল্পনা পাস করিয়ে নেন যে, শহর ও শহরতলীতে যেসব মুসলমান বাস করছে, তাদেরকে সন্দেহভাজন ও গুপ্তচর হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। যার ব্যাপারে সামান্যতম প্রমাণও পাওয়া যাবে, তাকে গ্রেফতার করে গুম করে ফেলা হবে। কিন্তু সব মুসলমান নাগরিককে আতংকগ্রস্ত করা যাবে না। পলিসির একটি মৌলিক দিক এই ছিল যে, খৃস্টান মেয়েদের দ্বারা মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বেহায়াপনা ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং মুসলিম মেয়েদেরকে বিলাসী ও মদ্যপ বানাতে হবে। তাদের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করতে হবে।

পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হল। সূচনা হল গুজব ছড়ানোর মধ্য দিয়ে। মুসলমানদের মধ্যে গাদ্দারীর জীবাণু সৃষ্টি করার জন্য আগেই বিপুল অর্থ বরাদ্দ নিয়ে রেখেছিলেন হরমুন।

হরমুন কয়েকজন মুসলমানকে হাত করে নেন। আকর্ষণীয় কয়েকটি ঘোড়াগাড়ী দিয়ে শাহজাদার মর্যাদায় ভূষিত করেন তাদের। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরবৃত্তি করবে এবং তাদের মধ্যে গুজব ছড়াবে।

মাঝে-মধ্যে নিমন্ত্রণ করে দরবারে এনে তাদের রাজকীয় মর্যাদা দেয়া হবে। তাদের স্ত্রীদেরও দাওয়াত করে এনে সাদর আপ্যায়ন করা হবে, যাতে ধীরে ধীরে তারা তাদের মূল পরিচয় ও ইসলামী চেতনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে 'উদারপন্থী' পরিচয় ধারণ করে।

হরমুন বললেন, 'আপনারা যদি মুসলমানদেরকে আপনাদের গোলাম বানাতে চান, তাহলে তাদের মাথায় ক্ষমতা ও রাজত্বের পোকা ঢুকিয়ে দিন। গাড়ী-বাড়ী দিয়ে তাদের মুঠোয় কিছু অর্থ ধরিয়ে দিন। দেখবেন, ক্ষমতার নেশায় তারা আপনাদের আঙ্গুলের ইশারায় নাচতে শুরু করবে। শূন্য করতে শুরু করবে গ্লাসের পর গ্লাস।

নিজ কন্যাদের বিবস্ত্র করে তুলে দেবে আপনাদের হাতে। যদি আপনারা মুসলমানদের ভবিষ্যত অন্ধকার বানাতে চান, তাহলে আমার এই ফর্মুলাটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আমি আপনাদের আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি, ইহুদীরা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য তাদের মেয়েদের পেশ করেছে। আপনারা তো জানেন যে, মুসলমানদের সবচে' আদি ও সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হল ইহুদী জাতি। ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য তারা নিজ কন্যার ইজ্জত এবং সঞ্চিত অর্থের শেষ মুদ্রাটিও উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।'

❁ ❁ ❁

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যেদিন জাহেদানের উপর কার্কের পরিস্থিতি সামাল দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন, তার বিশদিন পরের ঘটনা। হঠাৎ এক পাগল আত্মপ্রকাশ করে কার্কে। হাতে তার হাত দুয়েক লম্বা একটি কাঠের ক্রুশ। ক্রুশটি উর্ধ্বে তুলে ধরে লোকটি চীৎকার করে বলছে–

'মুসলমানদের পতনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। শোবকে মুসলমানরা তাদেরই মেয়েদের সম্ভ্রমহানী করছে। মিসরে মুসলমানরা মদপান শুরু করেছে। যীশুখৃষ্ট বলেছেন, এ জাতির আর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। মুসলমানগণ! নূহ এর দ্বিতীয় তুফান থেকে যদি তোমরা রক্ষা পেতে চাও, তাহলে ক্রুশের ছায়াতলে এসে পড়। ক্রুশ যদি তোমাদের পছন্দ না হয়, তাহলে ইহুদী হয়ে যাও। এখন আর মসজিদের সেজদা করে তোমাদের লাভ নেই।'

পোষাক ও গঠন-প্রকৃতিতে লোকটাকে ভালো মানুষ বলেই বোঝা যায়। কিন্তু কথা-বার্তা আর চালচলনে মনে হয় লোকটা পাগল। মুখে দাড়ি আছে। পরনে লম্বা চোগা। মাথায় পাগড়ী। তার উপরে রুমাল। লোকটার চেহারা ও কাপড়-চোপড় ধূলা-মলিন। অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছে মনে হয়। কেউ থামতে বললে থমকে দাঁড়ায়। কিছু জিজ্ঞেস করলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, যেন কারো কথাই বুঝছে না সে। যে যা জিজ্ঞেস করছে, মুখে একই বুলি, একই ঘোষণা, 'মুসলমানদের পতনের সময় ঘনিয়ে এসেছে ....।'

কেউ জানতে চেষ্টা করল না, লোকটা কে, কোথা থেকে এসেছে। খৃষ্টানরা এজন্য আনন্দিত যে, তার হাতে ক্রুশ, মুখে যীশুখৃষ্টের নাম। ইহুদীরা এজন্য উৎফুল্য যে, মুসলমানদের ইহুদী হওয়ার আহ্বান করছে। একটি কারণে উভয় ধর্মের মানুষই আনন্দিত যে, লোকটি মুসলমানদের ধ্বংসের সুসংবাদ প্রচার করছে। তার ঘোষণা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। খৃষ্টবাহিনীর কয়েকজন সৈনিক পাগল বলে ভ্রুক্ষেপ করল না পুলিশের লোকেরা, মুসলমানদের কারও এত বড় বুকের পাটা নেই যে, তার মুখটা বন্ধ করে দেবে। তার মুখে নিজেদের পতনের ঘোষণা শুনে মুসলমানরা ভয় পেয়েছে, ক্ষুব্ধও হয়েছে। কিন্তু তারা অসহায়।

পাগলটা শহরের অলি-গলি আর হাট-বাজার ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলছে, ' মুসলিম বাহিনী কার্কে আসবে না। তাদের সালাহুদ্দীন আইউবী মরে গেছে।' কখনো বা এমন আবোল-তাবোল বকছে, যার কোন অর্থ হয় না। তাতে প্রমাণিত হয় লোকটা পাগল।

এলাকার শিশু-কিশোররা জড়ো হয়ে ছুটছে পাগলটার পিছনে। বড়রাও কেউ কিছু দূর তার পিছনে হেঁটে কেটে পড়ছে। এলাকার কিছু মানুষ পিছু নিয়েছে তার। ক্ষোভে ফেটে যাচ্ছে মুসলমানরা। শিশুদের ফেরানোর চেষ্টা করছে তারা। শুধু একজন মুসলমান– মাত্র একজন পেছনে পেছনে যাচ্ছে পাগলটার। দু'জনের মাঝে ব্যবধান দশ-বারো কদম। এক যুবক মুসলমান পথে দু'জন খৃস্টান তাকে দেখে টিপ্পনি কাটে, তিরস্কার করে। একজন বলে,' ওসমান ভাই! তুমিও খৃস্টান হয়ে যাও। ক্রুশের ছায়ায় এসে পড়।' রোশকষায়িত নয়নে তাদের প্রতি তাকায় ওসমান। গোস্বা হজম করে চুপচাপ এগিয়ে সামনের দিকে পাগলটার পিছু নেয়। খৃস্টান যুবকদ্বয় জানেনা, ওসমানের কাছে খঞ্জর আছে , জানেনা পাগলটাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে হাঁটছে ওসমান।

যুবকের পুরো নাম ওসমান সারেম। বাবা-মা জীবিত। ছোট একটি বোন আছে। নাম আন-নূর সারেম। বয়স বাইশ-তেইশ বছর। ওসমান তার তিন বছরের বড়। বড় তেজস্বী যুবক। ইসলামের জন্য নিবেদিত মুসলমান। খৃস্টান সরকারের সন্দেহভাজনদের তালিকার একজন। কারণ, মুসলমান যুবকদের খৃস্টান সরকারের বিরুদ্ধে গোপন অভিযানের জন্য প্রস্তুত করেছিল সে। কিন্তু খৃস্টানরা এ যাবত হাতে-নাতে ধরতে পারেনি তাকে।

পাগলটার আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ওসমান সারেম। তখন ইয়া বড় এক ক্রুশ উঁচিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস ঘোষণা করে ফিরছিল পাগলটা। গায়ে আগুন ধরে যায় ওসমানের। ওসমান দেখল না, লোকটা পাগল। ক্রুশ দেখে পাগলের কথা শুনে স্থির থাকতে পারল না যুবক। ঘরে ফিরে তুলে নেয় খঞ্জরটা। জামার তলে লুকিয়ে হাঁটা দেয় পাগলের পিছনে পিছনে। নিরাপদ কোন এক স্থানে খুন করতে হবে লোকটিকে। নিজে ধরা পড়া যাবে না। খৃস্টানদের বিরুদ্ধে আরো কিছু কাজ করার জন্য বেঁচে থাকা প্রয়োজন তার। পাগলটা থেকে দশ-বারো কদম দূর দিয়ে হাঁটছে আর তার ঘোষণা শুনছে। খৃস্টান যুবকদ্বয় তিরস্কার করায় দু'চোখে তার রক্ত জমে যায়। হত্যার মনোবৃত্তি আরো দৃঢ় হয়ে যায় তার।

পাগলটার পেছনে ও দু'পাশে জনতার যে ভীড়, তার অধিকাংশই কৌতূহলী শিশু-কিশোর। যেন বিশাল এক শোভাযাত্রা। খুন করার পরিবেশ পাচ্ছে না ওসমান।

এভাবে কেটে যায় সারাটা দিন। ক্ষীন হয়ে আসে পাগলের কণ্ঠও। কমে যায় উৎসুক জনতার সংখ্যা। শিশু-কিশোররা কেটে পড়ে এক এক করে।

সূর্য ডুবতে এখনো সামান্য বাকি। সামনে একটি মসজিদ। মসজিদের দরজায় গিয়ে বসে পড়ে পাগলটা। হাতের ক্রুশটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বলে, ' এটি এখন আর মসজিদ নয়–গীর্জা।'

ওসমান সারেম নিকটে গিয়ে দাঁড়ায় পাগলটার। ওসমান ভালো করেই জানে যে, লোকটি আসলেই পাগল। তবুও তাকে হত্যা করলে শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। কারণ, হাতে তার ক্রুশ। কণ্ঠ তার উচ্চকিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ওসমান সারেম পাগলটার কাছে ঘেঁষে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'এখান থেকে এক্ষুণি উঠে যাও, ক্রুশটা নিয়ে পালিয়ে যাও এলাকা থেকে। নইলে খৃস্টানরা এখান থেকে তুলে নেবে তোমার লাশটা।'

যুবকের প্রতি চোখ তুলে তাকায় পাগলটা। অপলক চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। আশ-পাশে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো শিশু। পাগলটা ওসমানের কথায় কোন জবাব না দিয়ে ধমক দিয়ে চলে যেতে বলে শিশুদের। ভয়ে পালিয়ে যায় শিশুরা।

পাগল ঢুকে পড়ে মসজিদের ভিতরে। ওসমান সারেমের জন্য এটি মহা সুযোগ। সেও ঢুকে পড়ে মসজিদে। বন্ধ করে দেয় দরজাটা। আঘাত করতে উদ্যত হয় পাগলটার পিঠে। অম্নি মোড় ঘুরিয়ে তাকায় পাগল। যুবকের খঞ্জরের আঘাত নিজের গায়ের দিকে আসতে দেখেই সামনে বাড়িয়ে ধরে হাতের ক্রুশটা। আঘাতটা নিয়ে নেয় ক্রুশের গায়ে। বলে– 'থামো যুবক। ভিতরে চল। আমি মুসলমান।'

আর আঘাত করল না ওসমান সারেম। পায়ের জুতা খুলে মসজিদের মিম্বরের কাছে চলে যায় পাগল। ক্রুশটা আছে তার হাতেই। এগিয়ে যায় ওসমানও। দু'জনে বসে সামনাসামনি। পাগল যুবকের নাম জিজ্ঞেস করে। যুবক নিজের নাম জানায়। পাগল বলে 'আমি মুসলমান । তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন। তা তুমি কখন থেকে আমার পিছু নিয়েছ?'

'আজ সারাটি দিনই আমি তোমার পিছনে পিছনে ঘুরেছি। কিন্তু তোমাকে খুন করার মওকা পাইনি।' জবাব দেয় ওসমান সারেম।

'আমাকে তুমি কেন খুন করতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করে পাগল।

'কারণ, আমি ইসলাম ও সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে কোন কথা সহ্য করতে পারি না। তুমি পাগল হও বা না হও আমি তোমাকে জীবিত রাখব না।' ওসমান জবাব দেয়।

পাগলটা ওসমান সারেমকে আরো কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করে। শেষে বলে–

'আমার তোমার মত একটি যুবকের প্রয়োজন ছিল। ভালই হল যে. তুমি নিজেই আমার পিছনে এসে পড়েছ। আমার আশা ছিল যে, কষ্টে হলেও আমি মনের মত একজন মুসলমান পেয়ে যাব। আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রেরিত গোয়েন্দা।

খৃস্টানদের বোকা ঠাওরানোর জন্য আমি সফর করে এসেছি। তোমার সাথে আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। পিছন দিকে খেয়াল রেখ। কোন খৃস্টান এসে পড়লে আমি আগের মত বকওয়াস শুরু করে দেব। তুমি তন্ময় হয়ে আমার কথাগুলো শুনতে থাকবে, যেন তুমি আমার কথায় প্রভাবিত হচ্ছ। মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে আসছে। মুসলমানদের মধ্যেও খৃস্টানদের চর আছে। মসজিদের নামাজীদের আগমন শুরু হওয়ার আগেই আমি আমার কথা শেষ করতে চাই।'

কখনো গোয়েন্দা দেখেনি ওসমান সারেম। লোকটা যে কত অস্বাভাবিক বিচক্ষণ, তা জানেনা ওস্মান। ওসমানকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেই গোয়েন্দ বুঝে ফেলে যে, যুবকটাকে বিশ্বাস করা যায়। গোয়েন্দা তাকে বলল–

তুমি তোমার মত আরো কয়েকটি যুবককে একত্রিত কর। মুসলমান মেয়েদেরও প্রস্তুত কর। প্রতিটি মুসলিম পরিবারে তোমাদেরকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিতে হবে যে, সালাহুদ্দীন আইউবী জীবিত আছেন। নিজ বাহিনীর সাথে তিনি এখান থেকে মাত্র আধা দিনের পথ দূরে অবস্থান করছেন। তাঁর গোটা ফৌজ কার্ক আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতই নয় শুধু, খৃস্টান বাহিনীর দম নাকের আগায় এনে রেখেছেন তিনি। মিসরের পরিস্থিতি শান্ত-স্বাভাবিক। খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রের গোড়া উপড়ে ফেলা হয়েছে সেখানে।

'সালাহুদ্দীন আইউবী কার্ক আক্রমণ করবেন?' জানতে চায় ওসমান সারেম। বলে, আমরা তাঁর পথপানে চেয়ে আছি। তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা যদি বাইরে থেকে আক্রমণ কর, তাহলে ভেতর থেকে আমরাও খৃস্টানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ব। আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা জলদি এসে পড়।

ধৈর্যের সাথে কাজ কর যুবক। আগে সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম শোন। সব মুসলিম যুবকের কানে পয়গামটা পৌঁছিয়ে দাও। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কার্কের মুসলিম যুবকদের বলতে বলেছেন–

'তোমরা দেশ ও ধর্মের মোহাফেজ। আমি যখন প্রথম যুদ্ধ করি, তখন আমি কিশোর। লড়াই করেছি শত্রুর হাতে অবরুদ্ধ অবস্থায়। ফৌজের কমান্ডো ছিল আমার চাচার হাতে। তিনি আমায় বলেছিলেন, অবরোধে পড়েছ বলে ভয় পেওনা। এ বয়সে যদি ভীত হয়ে পড়, তাহলে সারাটা জীবনই কাটবে ভয়ে ভয়ে। যদি ইসলামের আলমবরদার হতে চাও, তাহলে এই পতাকা আজই হাতে তুলে নাও এবং দুশমনের ব্যূহ ভেঙ্গে বেরিয়ে যাও। তারপর মোড় ঘুরিয়ে আবার ফিরে এসে দুশমনের উপর ঝাপিয়ে পড়। তিন মাসের অবরোধে আমরা না খেয়ে কাটিয়েছি অনেক দিন। তথাপি আমরা অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলাম। এ সময়ে আমরা যা খেয়েছি. সব দুশমনের ছিনিয়ে আনা রসদ। অবরোধে আমাদের যেসব ঘোড়া ক্ষুৎ-পিপাসায় মারা গিয়েছিল, তার অভাব আমরা দুশমনের ঘোড়া দিয়ে পূরণ করেছি...।'

সালাহুদ্দীন আইউবী বলেছেন, 'আমার কওমের মেয়েদের বলবে, দুশমন তোমাদের উপর ভালোবাসার অস্ত্র দিয়ে আঘাত, হামলা করেছে। তোমরা স্মরণ রাখবে, কোন অমুসলিম কখনো কোন মুসলমানের আপন হতে পারে না। খৃস্টানরা যুদ্ধের ময়দানে টিকতে পারেনি। তাদের সব পরিকল্পনা ধুলোয় মিশে গেছে। সেজন্য এখন তারা মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের চিন্তা থেকে দেশপ্রেম ও ঈমানী চেতনা বিলুপ্ত করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তারা যে অস্ত্র ব্যবহার করেছে, তা বড় ভয়ংকর। বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা, আলস্য ও কর্তব্যে অবহেলা– এ তিনটি দোষ তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্য একজোট হয়েছে ইহুদী ও খৃস্টানরা। ইহুদীরা তাদের মেয়েদের দিয়ে তোমাদের মধ্যে পশুবৃত্তি উস্কে দেয়ার চেষ্টা করছে এবং তোমাদেরকে নেশায় অভ্যস্ত করে তুলছে। আমি একথা বলব না যে, এই পাশবিকতা ও মাদকাসক্তি তোমাদের আখেরাত নষ্ট করবে আর মৃত্যুর পর তোমরা জাহান্নামে যাবে। আমি বরং তোমাদের বুঝাতে চাই যে, এই চারিত্রিক ক্রটিগুলো তোমাদের জন্য এ দুনিয়াটাকে জাহান্নামে রূপান্তরিত করবে। যাকে তোমরা জান্নাতের স্বাদ মনে করছ, মূলতঃ তা জাহান্নামের আজাব। তোমরা সেই খৃস্টানদের গোলামে পরিণত হবে, যারা তোমাদের বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তোমাদের পবিত্র কুরআনের পাতা অলি-গলিতে উড়বে এবং তোমাদের মসজিদগুলো পরিণত হবে ঘোড়ার আস্তাবলে...।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আরো বলেছেন–

'তোমরা যদি মর্যাদাসম্পন্ন জাতির ন্যায় বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে নিজেদের আদর্শ-ঐতিহ্য ভুলো না। খৃস্টানরা একদিকে তোমাদের উপর অত্যাচার করছে, অন্যদিকে ঘোড়া-গাড়ীর লোভ দেখাচ্ছে। মনে রেখ, তোমাদের সম্পদ হল তোমাদের চরিত্র– তোমাদের ঈমান। খৃস্টানরা যে আমাদের কাছে পরাজিত, তার প্রমাণ তারা তোমাদের তীর-তরবারীতে ভীত হয়ে এখন নিজ কন্যাদের বেশ্যা বানিয়ে তোমাদের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে। ওহে আমার জাতির যুবকগণ! তোমরা তোমাদের নীতি-আদর্শ রক্ষা কর। নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কর। অত্যাচারী রাজারা মূলতঃ দুর্বল শাসক হয়ে থাকে। তারা তাদের প্রতিপক্ষের পদানত রাখার চেষ্টা করে কাউকে নীপিড়ন দিয়ে, কাউকে সম্পদের লোভ দেখিয়ে। তোমরা কারো নির্যাতনেও ভয় পেয় না, কারো লোভেও পড় না। তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ আমরা জাতির অতীত। দুশমন তোমাদের মস্তিস্ক থেকে তোমাদের গৌরবময় অতীতকে মুছে দিয়ে তাতে তাদের চিন্তা-চেতনা স্থাপন করার চেষ্টা করছে, যাতে ইসলামের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। তাই তোমরা নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন কর। দুশমন শুধু এই কারণে তোমাদেরকে তাদের তাবেদার বানাতে চায় যে, তারা তোমাদের ভয় পায়। দৃষ্টি আজকের উপর নয়, আগামী দিনের উপর নিবদ্ধ রাখ। কারণ, দুশমনের নজর তোমাদের দ্বীন-ধর্মের

ভবিষ্যতের উপর। তোমরা তো দেখেছ যে, দুশমন তোমাদের কি দশা করেছে। তোমরা যদি বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতায় নিপতিত হও, তাহলে গোটা মিল্লাতের ইসলামিয়ার সে পরিণতিই বরণ করতে হবে, যা ঘটছে তোমাদের বেলায়।

গোয়েন্দ ওসমান সারেমকে অতিদ্রুত সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম শুনিয়ে দেন এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সবক দেন। সে বলল–

' মহান সেনাপতি বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা আবেগতাড়িত না হও। বিবেকের উপর আবেগকে বিজয়ী হতে না দেও যেন। কখনো উত্তেজিত না হও। নিজেদেরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে কাজ কর। সতর্কতা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। কখনো অসাবধান হয়ো না।'

গোয়েন্দা ওসমান সারেমকে জানায়, সে এবং তার দু'সঙ্গী কোন না কোন বেশে এসে তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে যে বিষয়টি আবশ্যক, তাহল মুসলমানরা নিজ নিজ ঘরে গোপনে তীর-ধনুক-বর্শা তৈরী করবে। মহিলারা ঘরে বসেই খঞ্জর ও বর্শা চালানোর প্রশিক্ষণ নেবে এবং আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল রপ্ত করবে। ইহুদী মেয়েদের কথায় তারা কর্ণপাত করবে না। তাদের সাথে এমন কোন কথা বলবে না, যাতে তাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। নিজেদের পক্ষ থেকে তোমরা কোন সামরিক পদক্ষেপ নেবে না। আগে সংগঠিত হও. নেতৃত্ব সৃষ্টি কর। যে যা করবে, সবই যেন নেতার নির্দেশনা মোতাবেক হয়। কারো কোন পদক্ষেপই যেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃকক্ষের অনুমতি ছাড়া না হয়।'

সূর্যটা পশ্চিম আকাশে অস্ত গেল বলে। মসজিদের ঈমাম এসে গেছেন। তাকে দেখেই গোয়েন্দা ক্রুশটা হাতে নিয়ে একদৌড়ে বেরিয়ে যায় মসজিদ থেকে। আবার শুরু হয় সেই ঘোষণা–' মুসলমানগণ! ক্রুশের ছায়ায় এসে পড়। তোমাদের ইসলাম মরে গেছে।'

ঈমাম সাহেব ওসমান সারেমের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'লোকটা এখানে কি করছিল? আর তুমিই বা ওকে ভিতরে এনে বসিয়ে রাখলে কেন? পাগলটাকে মেরে ফেলতে পারলে না? তোমাদের শিরায় কি মুসলমান বাপের রক্ত শুকিয়ে গেছে? বুড়ো না হলে আমি বেটাকে এখান থেকে জ্যান্ত বের হতে দিতাম না।'

'আমি লোকটার পিছনে পিছনে এ জন্যই এসেছিলাম যে, এখান থেকে তাকে জীবন নিয়ে যেতে দেব না।' বলেই ওসমান সারেম ঈমাম সাহেবকে খঞ্জরটা দেখিয়ে আবার বলতে শুরু করল–

'কিন্তু আল্লাহর শোকর, বেচারা ক্রুশ দ্বারা আঘাতটা প্রতিহত করেছে। লোকটা পাগল নয়। খৃস্টান বা ইহুদীও নয়– মুসলমান। এসেছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম নিয়ে।'

ওসমান সারেম বৃদ্ধ ঈমামকে আইউবীর পয়গাম শোনাল এবং বলল, সুলতানের এ পয়গাম আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। এ সন্ধ্যা থেকেই আমি কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের একজন নেতার তো প্রয়োজন। আপনি কি নেবেন সে দায়িত্বটা? তবে মনে রাখতে হবে, খৃস্টান সরকার জানতে পারলে আমীরের গর্দানই উড়ে যাবে আগে।

'মসজিদে দাঁড়িয়ে কি আমি কথা বলার দুঃসাহস দেখাতে পারি যে, আমি আমার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব? তবে আমি আমীর হওয়ার যোগ্য কিনা সে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব দেশবাসির। আমি আল্লাহর ঘরে দাঁড়িয়ে ওয়াদা করছি যে, আমি আমার মেধা, সম্পদ, সন্তানাদি ও আমার জীবন ইসলামের সুরক্ষায়, দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও ক্রুশের মূলোৎপাটনে কোরবান করব। শোন বৎস, সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতিটা বর্ণ মুখস্থ করে রাখো। তিনি ঠিকই বলেছেন যে, যুবকরা জাতি ও ধর্মের ভবিষ্যৎ। যুবকরা যেমন নিজেদের দেশ, জাতি ও ধর্মকে আলোকিত করতে পারে, তেমনি পারে তার উল্টোটাও। একজন মুসলিম যুবক যখন ইহুদী-খৃস্টানদের বেহায়াপনার শিকার হয়ে যুবতীদের প্রতি কু-নজরে দৃষ্টিপাত করা শুরু করে, তখন সে বুঝতে পারে না যে, তার আপন বোনও তারই ন্যায় কোন যুবকের কু-দৃষ্টির শিকারে পরিণত হচ্ছে। এখানেই একটি জাতির কবর রচিত হয়। ওসমান, তুমি এই আল্লাহর ঘরে দাঁড়িয়ে ওয়াদা কর, তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম অনুযায়ী কাজ করবে।' বললেন ঈমাম সাহেব।

✿ ✿ ✿

মাগরিবের নামাজ আদায় করে ওসমান সারেম। ঘরে গিয়ে ছোট বোন আন-নূরকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম শোনায় এবং বলে–

'আন-নূর! আমাদের ধর্ম ও আমাদের জাতি তোমার থেকে অনেক কুরবানী আশা করছে। দেশের সব মুসলমান মেয়ের কাছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমি তোমার উপর অর্পণ করলাম। মেয়েদের কাছে সুলতানের এ পয়গাম পৌঁছিয়ে তুমি তাদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত কর। আমি তোমাকে বর্শা-তীর-কামান-খঞ্জরের ব্যবহার শিখিয়ে দেব। তবে সাবধান থাকতে হবে, যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও টের না পায় যে, আমরা কি করছি।'

'আমি সবরকম ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত আছি। নিজেদের আযাদী এবং দেশের জন্য কি করা যায়, সে বিষয়ে আমি ও আমার বান্ধবীরা অনেক আগে থেকেই ভাবছি। কিন্তু পুরুষদের থেকে পরিকল্পনা না পেলে আমরা মেয়েরা কি করতে পারি?' নিজের প্রতিক্রিয়া জানায় আন-নূর।

ওসমান সারেম বোনকে জানায়, সালাহুদ্দীন আইউবী ও তার সেনাবাহিনী সম্পর্কে

এখানে যত খবর প্রচার করা হয়, সবই মিথ্যা। ওসমান আরো জানায়, আমাদের মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা গাদ্দার এবং খৃস্টানদের চর। তোমরা মুসলমানদের ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের সঠিক সংবাদ সম্পর্কে অবহিত কর। ওসমান তিন-চারটি পরিবারের কথা উল্লেখ করে বোনকে বলে, তোমরা এসব ঘরে গিয়ে মহিলাদের বলে আসবে, তাদের স্বামীরা বিশ্বাসঘাতক, খৃস্টানদের দালাল। তাদেরকে আরো জানিয়ে আস, তোমরা ইহুদী ও খৃস্টান মেয়েদের প্রীতি থেকে নিজেদের রক্ষা করে চল। ওদের পেয়ার-প্রীতি প্রতারণা বৈ কিছু নয়।

'তাহলে কি আমি রাইনীকে এখানে আসতে নিষেধ করে দেব? ওতো তোমার সঙ্গেও ফ্রি হয়ে গেছে।' জিজ্ঞেস করে আন-নূর।

'ওকে আমি বলে দেব যে, তুমি আর আমাদের ঘরে এসো না। মেয়েটা বড় চটপটে ও বিচক্ষণ।' বলল ওসমান।

রাইনী এক খৃস্টান যুবতী। ওসমান সারেমের ঘরের সামান্য দূরে তার ঘর। পিতা প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তা। মেয়েটির পুরো নাম রাইনী আলেকজান্ডার। আন-নূরের বান্ধবী। ওসমান সারেমের সাথেও প্রেম নিবেদন করতে চেষ্টা করছে মেয়েটি। কিন্তু ওসমান পাত্তা দিচ্ছে না তাকে। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ওসমান জানে যে, এই খৃস্টান মেয়েটি তাদের কাছে ঘেঁষছে গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য। তবে ওসমান উপরে উপরে ভাব দেখাত, যাতে তার মনে কোন সন্দেহ জাগতে না পারে। কিন্তু এখন তো এ ঘরে তার আনা-গোনা বিপজ্জনক। কিন্তু ওসমান তাকে কি করে বলবে যে, তুমি আর আমাদের ঘরে এসো না। অথচ আনাগোনা তার বন্ধ না করলেই নয়। ওসমানের ঘরে এখন চলবে সামরিক প্রশিক্ষণ।

ভেবে-চিন্তে বুদ্ধি একটা ঠিক করে ওসমান। বোনকে বলে দেয়, রাইনী যদি আবার কখনো আসে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি এই বলে বের হয়ে যেও যে, আমি এক বান্ধবীর নিকট যাচ্ছি, তুমি অন্য সময় এসো। এভাবে মেয়েটাকে উপেক্ষা করতে থাক,দেখবে আপনা থেকেই সে এখনে আসা ছেড়ে দেবে।

পাগলটার কথা এখন কার্কবাসীর মুখে মুখে। খৃস্টানদের নিকট বড় ভালো লেগেছিল লোকটাকে। কিন্তু এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। খুঁজছে সবাই। খুঁজছে সরকার। খৃস্টান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মুসলমানদের মনে ভীতির সঞ্চার ও মুসলমানদের জযবা দমন করার কাজে পাগলটাকে ব্যবহার করবে। কিন্তু হঠাৎ করে লোকটা কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। ঐ যে মসজিদ থেকে বের হল, সে রাতেই হাওয়া হয়ে গেছে সে। দশ-বারো দিন পর্যন্ত চলল তার অনুসন্ধান। কিন্তু পাওয়া গেল না।

এই দশ-বার দিনে ওসমান সারেম তার মিশনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূর। বোন আন-নূর ও তার বান্ধবীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছে সে। বড় পরিশ্রম করে তরবারী চালনা শিক্ষা দিয়েছে সে মেয়েগুলোকে। তাছাড়া গোপনে গোপনে সে সুলতান আইউবীর পয়গাম শুনিয়ে শুনিয়ে মুসলিম যুবকদের সংঘবদ্ধ করে তুলে। যুবকরা হাত করে নেয় তীর-ধনুক-বর্শা প্রস্তুতকারী কারীগরদের। এরা সকলেই খৃষ্টানদের বেতনভোগী কর্মচারী। নিজেদের জন্য কোন অস্ত্র তৈরী করতে পারেনা তারা। অস্ত্র রাখা মুসলমানদের জন্য অন্যায়।

কিন্তু এবার তারা নিজ নিজ ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে অস্ত্র তৈরী শুরু করে দেয়। এ এক মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। ধরা পড়লে শুধু মৃতুদণ্ড-ই যে ভোগ করতে হবে তা নয়, মৃতুর আগে খৃষ্টানদের নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে হবে তাদের। এখানে কোন মুসলমান কোন লঘু অপরাধে কিংবা সন্দেহবশত: ধরা পড়লে তাকে জিজ্ঞাসা করা হত, মুসলমানদের ঘরে কি হচ্ছে এবং তোমাদের গোয়েন্দারা কোথায়। তার সঙ্গে সঙ্গে তুলোধুনা করা হত তাদের শরীরে।

কারীগরদের তৈরী করা অস্ত্রগুলো বিভিন্ন ঘরে লুকিয়ে রাখছে ওসমান সারেমের সহকর্মী যুবকেরা। দিনের বেলা মেয়েরা বোরকা পরে লুকিয়ে লুকিয়ে তীর -ধনুক-খঞ্জরগুলো নিয়ে যেত বিভিন্ন মুসলমানের ঘরে। কিন্তু অস্ত্র তৈরী এবং ঘরে ঘরে পৌঁছানোর কাজটা চলছে খুব ধীরগতিতে।

ওদিকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট সংবাদ পৌঁছে গেছে যে, কার্ক ও তার আশপাশের মুসলমানদের ঘরে ঘরে আপনার পয়গাম পৌঁছে গেছে এবং সেখানকার মুসলিম যুবক-যুবতীরা আন্ডারগ্রাউন্ড তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। একজন বিচক্ষণ ও নির্ভীক গোয়েন্দা সংবাদটা পৌঁছিয়ে দিয়েছে সুলতানের কাছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে সে জানায়, ওসমান সারেমের নিকট যে গোয়েন্দা পাগলের বেশ ধারণ করে আপনার পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছে, সে ষোলআনা সাফল্য অর্জন করেছে। এ সংবাদ শুনে সুলতান খুব খুশী হলেন এবং বললেন, 'যে জাতির যুবকেরা সজাগ হয়ে যায়, কোন শক্তি তাদের পরাজিত করতে পারে না।'

'এই সাফল্য আমার সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আপনার অনুমতি পেলে অধিকৃত অঞ্চলের যুবকদের আমি এমনভাবে উত্তেজিত করে তুলতে পারি যে, তারা অগ্নিস্ফূলিঙ্গে পরিণত হয়ে সমগ্র কার্ক ও জেরুজালেমে আগুন ধরিয়ে দেবে।' বলল গোয়েন্দা উপ-প্রধান জাহেদান।

'আর সেই আগুনে তারা নিজেরাও পুড়ে মরবে'– বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী– 'আমি যুবকদের অগ্নিস্ফূলিঙ্গ বানাতে চাই না। আমি তাদের বুকে ঈমানের আগুন জ্বালাতে চাই। যুবসমাজকে উত্তেজিত করে তোলা কঠিন কাজ নয়। বন্দুকের

মুখ খুলে দিয়ে দেখ, কিভাবে তারা তোমার কথায় উঠাবসা করতে শুরু করে। অধিকাংশকে জ্বালাময়ী বক্তৃতা আর উত্তেজনাকর শ্লোগানে মাতিয়ে তোলা যায়। তারপর তুমি তাদের দিয়ে যা করাতে চাও করাতে পার। তুমি তাদের আপসেও লড়াতে পার। তার কারণ এই নয় যে, তারা বোকা ও গোঁয়ার। তার অর্থ এই নয় যে, তাদের নিজস্ব বুদ্ধি নেই। আসল কারণ হল, এই বয়সটাই এমন হয়ে থাকে যে, রক্তের উষ্ণতা তাদের কিছু একটা করতে বাধ্য করে। এ সময়ে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আবার সৎকর্মের প্রতিও ঝুকে পড়ে। তরুণ মেধাগুলোকে তুমি যেভাবে ব্যবহার করতে চাইবে, সেভাবেই ব্যবহৃত হবে। আমাদের দুশমন আমাদের এই নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিলাসিতা ও পাশবিকতার জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই, যাতে আমরা আমাদের যুবসমাজকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে দুশমনের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে না পারি। তুমি বরং এই চেষ্টা চালিয়ে যাও, যাতে আমাদের যুবকরা উত্তেজিত না হয়। যাতে তারা ঠান্ডা মাথায় ভাবতে শিখে। আমাদের প্রিয়নবী (সঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের পরিচয় লাভ কর এবং শত্রু-মিত্র চিহ্নিত কর।' তুমি নিজেও এ মহান শিক্ষা অনুযায়ী আমল কর এবং যুবকদের এ কথাটি বুঝাও। যুবকদের চিন্তা-চেতনা পাল্টিয়ে দাও। তাদের মধ্যে ঈমান ও দেশপ্রেম জাগ্রত কর। এটি দেশের যুবসমাজের বড় মূল্যবান সম্পদ। তুমি ওদেরকে উত্তেজিত হয়ে পুড়ে জীবন দেয়া থেকে রক্ষা কর। যুবকদের মৃত্যুর হাতে ঠেলে দেয়া বুদ্ধির কাজ নয়। তাদের হাতে দুশমনদের শেষ করাও। এটা বুদ্ধিমানের কাজ। তবে দুশমন কারা, তা ওদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। কোন মুসলমান যদি আমাকে মন্দ-শক্ত বলে, তবে সে না ইসলামের দুশমন, না গাদ্দার। সে আমার দুশমন । ইসলাম ও সালতানাতে ইসলামিয়ার সুরক্ষার জন্য প্রণীত আইনের আশ্রয়ে আমি তাকে শাস্তি দেব না। দেশের আইন দেশনেতার ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাবে না। গাদ্দারীর সাজা তাকেই দেয়া হবে, যে দেশ ও জাতির মূলোৎপাটন ও ইসলামের শত্রুদের হাত শক্ত করে। দেশনেতা নিজেও যদি এ দোষে দুষ্ট হন, তাহলে তিনিও গাদ্দার এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।'

'তাহলে কী কারা যায়? সেখানকার যুবকরা তো প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের পরিকল্পনার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।' জিজ্ঞেস করলেন জাহেদান।

'তাদেরকে হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে অগ্রসর হতে বল– জবাব দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী– 'তাদের চিন্তা-চেতনাকে জাগিয়ে তোল। সেখানকার পরিস্থিতি অনুপাতে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে, কি করতে হবে। আবেগের বশীভূত হয়ে যেন কিছু না করে ফেলে, সে মানসিকতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি কর। সেখানে আরো বেশী করে বিচক্ষণ চর পাঠাও। স্মরণ রেখ জাহেদান! দুশমন আমাদের নয়-ধ্বংস করতে

চাইছে আমাদের যুবসমাজের চরিত্র কিংবা সেই কর্মকর্তাদের, যাদের বিবেক কিশোরদের ন্যায় আনাড়ী। একটি জাতিকে যদি তুমি যুদ্ধ ছাড়া পরাজিত করতে চাও, তা হলে সে জাতির যুবকদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতায় ডুবিয়ে দাও। দেখবে, সে জাতি এমনভাবে তোমাদের গোলামে পরিণত হবে যে, তারা আপন স্ত্রী-কন্যা-বোনদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে গর্ববোধ করবে। ইহুদী-খৃস্টানরা আমাদেরকে এ ধারায়ই ধ্বংস করতে চাইছে।'

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর। জাহেদানকে বললেন, কার্কের যেসব মুসলমান অস্ত্র তৈরি করছে, কাকে যেন বলেছিলাম, যেন তাদের কাছে বারুদ পৌঁছিয়ে দেয় কিংবা তাদেরকে বারুদ তৈরি করার ফর্মুলা এবং ব্যবহারের প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেয়। কিন্তু তার কি হল, জানতে পারলাম না।

'হ্যা, তা তাদের শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। খবর পেয়েছি, মুসলমানরা বারুদ তৈরির কাজ শুরুও করে দিয়েছে।' জবাব দেন জাহেদান।

❁ ❁ ❁

আকস্মিকভাবেই কার্কে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেল যে, সেখানকার মুসলিম যুবকেরা আপনা-আপনিই জেগে উঠল। অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে খৃস্টানরা কাফেলা লুণ্ঠনেরও ধারা শুরু করে রেখেছিল। দস্যু-তস্করের ভয়ে ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ভ্রমণকারীরা একত্রিতভাবে সফর করত। অনেক সময় এক একটি কাফেলার সদস্য সংখ্যা দেড়-দু'শ হয়ে যেত। সশস্ত্র যোদ্ধাও থাকত কাফেলায়। উট-ঘোড়া থাকত প্রচুর। বিপুল পণ্যদ্রব্য নিয়ে এক স্থান থেকে অন্যত্র যেত বণিকরা। এক এক সময় এক এক স্থানে অবস্থান করত তারা। অল্প ক'জন ডাকাতের পক্ষে এসব কাফেলা লুট করা সম্ভব ছিল না। আক্রান্ত হলে মোকাবেলা করত তারা। এই লুট-তরাজের কাজটা করত খৃস্টান সৈন্যরা। কোন পথে কোন মুসলিম কাফেলার গমনের সংবাদ পেলেই দু'এক প্লাটুন সৈন্যকে মরুচারী লোকের বেশে প্রেরণ করে সেটি লুট করাত। কাফেলায় থাকত শুধু মুসলমান। এই অপকর্ম সেসব খৃস্টান সম্রাটগণও করিয়েছেন এবং লুণ্ঠিত সম্পদের ভাগ গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে আজ ইতিহাসে ক্রুশের লড়াইয়ের হিরো বলে পরিচিত করা হচ্ছে।

এ অপকর্মে কতিপয় মুসলমান আমীরও শামিল ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতগুলো প্রদেশের শাসক ছিল তারা। সৈন্যও ছিল তাদের কাছে। লুণ্ঠিত কাফেলার দু'চারজন লোক তাদের নিকট গিয়ে ফরিয়াদও পেশ করত। কিন্তু মজলুমের সেই আহজারি ঢুকত না তাদের কানে। কারণ, নারী,মদ আর উপঢৌকনের নামে তাদেরও ভাগ দিত খৃস্টানরা। মদ-নারী আর অর্থের লোভে পড়ে নিজেদের ঈমান ও স্বাধীনতা-স্বকীয়তা খৃস্টানদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছিল তারা।

এ মুসলিম প্রদেশগুলো কব্জা করতে চাইছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। এ মুসলিম শাসকদেরকে খৃস্টানদের চাইতেও ভয়ংকর মনে করছেন তিনি। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী একবার তাঁর নিকট একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি নানা প্রসঙ্গের মধ্যে এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম প্রদেশগুলো সম্পর্কে একথাটিও লিখেছিলেন যে, 'এ মুসলিম শাসকগণ নিজেদের জাগতিক সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের নিমিত্ত প্রদেশগুলোকে খৃস্টানদের কাছে বন্ধক রেখেছে। কাফেরদের নিকট থেকে উপঢৌকন, সোনা-চাঁদী আর অপহৃত মুসলিম যুবতীদের গ্রহণ করছে আর ইসলামের নাম ডুবিয়ে চলেছে। এ মুসলমানরা খৃস্টানদের চেয়েও বেশী অপবিত্র ও অধিক ভয়ংকর। ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে তারা। খৃস্টানরা ঢুকে পড়েছে তাদের একেবারে শিকড়ে। তাই খৃস্টানদের পরাজিত করার আগে প্রদেশগুলো কব্জা করে সালতানাতে ইসলামিয়ার সাথে একীভূত করে ফেলা এবং বাগদাদের খেলাফতের অধীনে নিয়ে আনা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া ইসলামের সুরক্ষা সম্ভব নয়।'

একদিনের ঘটনা। কার্ক থেকে মাইল কয়েক দূর দিয়ে পথ অতিক্রম করছে বিশাল এক কাফেলা। কাফেলায় আছে একশ'রও বেশী উট, আছে অসংখ্য ঘোড়া। উটের পিঠে বোঝাই ব্যবসায়ীদের পণ্য। আছে এমন একটি পরিবার, যার দু'সদস্য যুবতী মেয়ে। সম্পর্কে তারা বোন।

কার্ক থেকে মাইল কয়েক দূর দিয়ে অতিক্রম করছিল কাফেলাটি। এ সংবাদ পেয়ে গেছে খৃস্টানরা। সাথে সাথে এক দল সৈন্য পাঠিয়ে দেয় তারা। দিন দুপুরে হামলা করে বসে কাফেলার উপরে। আক্রমণ মোকাবেলা করে কাফেলার অশ্বারোহী যাত্রীরা। কিন্তু সংখ্যায় খৃস্টানরা অনেক। রক্তে লাল হয়ে যায় সেখানকার বালুকাময় ভূমি। কাফেলার শিশু-কিশোরদের পর্যন্ত রেহাই দেয়নি খৃস্টান দস্যুরা। যুদ্ধ শেষে এখন বেঁচে আছে মাত্র পনের-ষোলজন মুসলমান। বন্দী করে ফেলা হয় তাদের। আটক করা হয় মেয়ে দু'টোকে। উট-ঘোড়া ও মালামালসহ তাদের নিয়ে যাওয়া হয় কার্কে।

কাফেলা প্রবেশ করছে কার্কে। সম্মুখে মুসলিম বন্দীরা। তাদের পিছনে দু'টি ঘোড়ায় সওয়ার মেয়ে দু'টো। তাদের পোষাকই বলে দিচ্ছে, তারা মুসলমান। মেয়েদের পিছনে মুখোশপরিহিত খৃস্টান দস্যুরা। সর্ব পিছনে মাল বোঝাই উটের বহর।

মেয়ে দু'টো কাঁদছে। তামাশা দেখার জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে কার্কের লোকজন। হাত তালি দিচ্ছে তারা। দাঁত বের করে খিলখিল করে হাসছে। কারণ, তারা জানে লুণ্ঠিত এ কাফেলাটি মুসলমানের। বন্দীরাও মুসলমান।

বন্দীদের একজনের নাম আফাক। বয়সে যুবক। অপহৃত মেয়ে দু'টো তার বোন। আফাক আহত। কপাল ও কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে দর্ দর্ করে। কাফেলার আগে আগে শহরে প্রবেশ করে সে। উৎফুল্ল জনতাকে উদ্দেশ করে উচ্চস্বরে সে বলে, কার্কের মুসলমানগণ! তোমরা আমাদের তামাশা দেখছ? গলায় রশি বেঁধে ডুবে মরতে পার না? ঐ মেয়ে দু'টোর প্রতি চেয়ে দেখ। ওরা শুধু আমার বোন নয়- তোমাদেরও বোন। ওরা মুসলমান।

পেছন থেকে আফাকের ঘাড়ে ধাক্কা মারে এক খৃস্টান। উপুড় হয়ে পড়ে যায় আফাক। হাত দু'টো তার রশি দিয়ে পিঠমোড়া করে বাঁধা। তাঁকে ধরে তুলে দেয় বন্দীদের একজন। চীৎকার করে আফাক। বলে, 'কার্কের মুসলমানগণ! এরা তোমাদের কন্যা...।' আর বলতে পারে না আফাক। পেটাতে শুরু করে তাকে দু'তিনজন মুখোশধারী। চীৎকার করে করে কাঁদছে তার বোনরা। তারা ফরিয়াদ করছে-'আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা আমার ভাইকে মের না। আমাদের সাথে তোমরা যেমন আচরণ করতে চাও,কর। তবু মের না আমাদের ভাইকে।'

এক বোন চীৎকার করে বলে,'চুপ হয়ে যাও আফাক! তুমি ওদের কিছু করতে পারবে না।' কিন্তু আফাক থামছে না।

কিছু মুসলমানও আছে উৎসুক জনতার মধ্যে। আগুন জ্বলছে তাদের গায়ে। কিন্তু তারা অসহায়। তাদের অনেকে যুবক। আছে ওসমান সারেমও। যুবক বন্ধুদের প্রতি তাকায় ওসমান। চোখগুলো লাল হয়ে গেছে তাদের সকলের। প্রতিশোধের আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে যেন তাদের চোখ থেকে।

অনেক দূর পর্যন্ত কাফেলার সাথে হেঁটে যায় ওসমান সারেম। এক জায়গায় রাস্তার পাশে বসে আছে এক মুচি। মানুষের জুতা সেলাই করছে সে। একজন মুসলমানের ঘরের আঙ্গিনায় রাত কাটায় লোকটা। সারাদিন বাইরে বসে জুতা সেলাই করে। এটা তার পেশা। কিন্তু আশ্চর্য, কাফেলাটি তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করল, আফাকের ডাক-চীৎকার তার কানে ঢুকল, শুনল মেয়ে দু'টোর আহাজারি। অথচ একটি মাত্র নজর চোখ তুলে তাকিয়ে সাথে সাথে মাথা নুইয়ে মন দিল নিজের কাজে। আবার জুতা সেলাই। যেন কিছুই দেখল না, কিছুই শুনল না লোকটা।

এই মুচিকে কেউ না দেখেছে মসজিদে যেতে, না দেখেছে গীর্জায়, না দেখেছে ইহুদীদের উপাসনালয়ে। কারো কোন কৌতূহল নেই তাকে নিয়ে। পায়ের জুতা ছিঁড়ে গেলেই তার কথা মনে পড়ে সকলের। লোকটাকে কেউ কখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতে শুনেনি। সৃষ্টির এক আজব প্রাণী লোকটা। লোকটার না আছে ঐ খৃস্টানদের প্রতি কোন আগ্রহ, না আছে মুসলমানদের সাথে কোন সম্পর্ক।

কাফেলার সাথে হাঁটছে ওসমান সারেম। মুচির সন্নিকটে গিয়ে থেমে যায় সে। বন্দীরা চলে গেছে আগে। এখন যাচ্ছে উটের বহর। একেবারে পিছনের উটটাও অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে। এবার পায়ের জুতা জোড়া খুলে নিয়ে রেখে দেয় মুচির সামনে। বসে পড়ে লোকটার সম্মুখে। মাথা নুইয়ে একজনের জুতা মেরামত করছিল মুচি। ওসমান সারেমের প্রতি মাথা তুলে তাকালও না সে। ওসমান ইতিউতি দৃষ্টিপাত করে ফিসফিসিয়ে বলে, 'মেয়ে দু'টোকে আজ রাতেই মুক্ত করতে হবে।'

'জান রাতে তারা কোথায় থাকবে?' মাথা না তুলেই ক্ষীণ কণ্ঠে ওসমানকে জিজ্ঞেস করে মুচি।

'জানি। থাকবে খৃস্টান সম্রাটদের কাছে। কিন্তু আমাদের কেউ সেই স্থানটি ভেতর থেকে দেখেনি।' জবাব দেয় ওসমান সারেম।

'আমি দেখেছি। সেখান থেকে মেয়েদের বের করে আনা সম্ভব নয়।' নিজের কাজে নিমগ্ন থেকে জবাব দেয় মুচি।

'তুমি তাহলে কোন্ ব্যধির দাওয়াই?' ওসমানের কণ্ঠে যেমন তীব্র আবেগ, তেমনি প্রচন্ড ক্ষোভ। বলে, 'তুমি আমাদের রাহ্বরী কর। আমরা যদি মেয়েদের পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে ধরা পড়ি, তাহলে মেয়ে দু'টোকে খুন করে ফেলব। তারপর যা হওয়ার হবে। খৃস্টানদের নিকট ওদেরকে জীবিত থাকতে দিব না।'

'তুমি ক'জন যুবকের কুরবানী দিতে চাও?' জিজ্ঞেস করে মুচি।

'যে ক'জন দরকার।'

'ঠিক আছে, কাল রাত।'

'না, আজ রাত। আজ রাতেই বারজিস! আজ রাতেই।

'ইমামের নিকট চলে যাও।' বলল মুচি।

'যুবক ক'জন?' জিজ্ঞেস করে ওসমান।

খানিক চিন্তা করে বারজিস বলল, আট... অস্ত্র শুনে নাও-খঞ্জর।

জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে উঠে চলে যায় ওসমান সারেম।

✿ ✿ ✿

সূর্য এখনও ডুবেনি। ওসমান সারেম সাতজন বন্ধুকে ঘর থেকে ডেকে নেয়। ঈমাম সাহেবের নিকট যেতে বলে এবং নিজে ঈমামের ঘরে চলে যায়। ইনি সেই মসজিদের ঈমাম, যেখানে পাগলের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল ওসমানের। ওমসানই ঈমামকে তার আন্ডারগ্রাউন্ড দলের নেতা হওয়ার প্রস্তাব করেছিল। দলের সব সদস্য বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছিল সে প্রস্তাব। এরা এক সময় একজনের ঘরে বসে মিটিং করছে এবং কর্মসূচী প্রস্তুত করছে। এখন তাদের সামনে অপহৃতা এই মেয়ে দু'টোর উদ্ধার করার পালা। ওসমান সারেম মেয়েদের উদ্ধারের সংকল্প নিয়েছে, যা মূলত আত্মহত্যার শামিল। মুচির কথা অনুযায়ী ইমামের ঘরে চলে গেছে সে।

অস্থিরচিত্তে ঘরের বারান্দায় পায়চারী করছেন ইমাম। ওসমান সারেমকে দেখেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন. 'তুমি কি ঐ বন্দী মুসলমানটার আহাজারি শুনেছ ওসমান?'

'আমি সেই ডাকে লাব্বাইক বলতেই এসেছি মহামান্য ইমাম! বারজিস আসছেন। আমার সাত বন্ধুও আসছে।' বলল ওসমান সারেম।

'তুমি কী করবে? করতে পারবেই বা কী? আমাদের অনেক মেয়েই তো কাফেরদের হাতে বন্দী। কিন্তু এ মেয়ে দু'টো আমাকে মহা এক পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে।' বললেন ইমাম। খানিক নীরব থেকে মাথাটা উপরে তুলে গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইমাম আবার বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! এই একটি রাতের জন্য তুমি আমায় যুবক বানিয়ে দাও, না হয় আজ রাতেই আমাকে তুমি তোমার কাছে নিয়ে যাও। বেঁচে থাকলে আজীবন মেয়ে দু'টোর আর্তচীকার আমার কানে বাজতেই থাকবে আর আমি পাগল হয়ে যাব।'

'আপনি আমাদের পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করুন। আমি আশা করি, এক রাতের বেশী আপনাকে অস্থির থাকবে দেব না।' বলল ওসমান সারেম।

ভিতরে প্রবেশ করে ওসমান সারেম-এর দু'সঙ্গী। ইমাম তাদের বসতে বলে তিনজনকেই উদ্দেশ করে বললেন–

'আজ আমার মনে হচ্ছে, আমার বিবেক-বুদ্ধি সব হারিয়ে গেছে। আমি আমার নিয়ন্ত্রণ হারিয়া ফেলেছি। কিন্তু কেউ যদি আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করিয়ে আহ্বান জানায়, তাহলে চেতনা ক্ষেপে উঠে আর তখনই তাকে শান্ত করার জন্য যুবক হতে হয়। কিন্তু বৎসরা! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। এখন আর আমার সহনশক্তি নেই। তোমরা যা কিছু করতে চাও, সামলে কর।'

এক একজন করে সাত যুবকই সমবেত হয় ইমামের ঘরে। মুচিও এসে পড়ে খানিক পরে। হাতে তার বাক্স। ভিতরে পুরনো ছেড়া জুতো আর জুতা সেলাইয়ের যন্ত্রপাতি। ভিতরে ঢুকেই বাক্সটা এক ধারে রেখে কোমর সোজা করে দাঁড়ায় সে। এবার কে বলবে লোকটা দুনিয়ার সব কোলাহল– ঝক্কি-ঝামেলার সাথে সম্পর্কহীন একজন মুচি, যে রাস্তার পার্শ্বে বসে মানুষের ছেড়া জুতা সেলাই করে?

ইমাম সাহেবের রুদ্ধদ্বার ঘরে এখন সে মুচি নয়- বারজিস। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের গোপন শাখার একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ গুপ্তচর। ইমামকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন–

'এ ছেলেটি আজই ঐ মেয়ে দু'টোকে খৃস্টানদের বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে আনতে চায়। আমি মনে করি, এতে ধরা পড়ার কিংবা ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকিই নয়- মৃত্যুর ঝুঁকিও প্রায় ষোল আনা।'

'আমরা এ ঝুঁকি বরণ করে নিচ্ছি মোহতারাম বারজিস! আপনি এ বিদ্যার গুরু। আপনি আমাদের পথনির্দেশ করবেন।' বলল এক যুবক।

'তাহলে আমার পরামর্শ শোন'– বারজিস বললেন- 'খৃস্টানদের কাছে অনেক মুসলমান মেয়ে আছে। তাদের কতিপয়কে তারা শৈশবে বিভিন্ন কাফেলা ও বাড়ি-ঘর থেকে অপহরণ করে এনেছিল এবং তাদের মত করে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও তোমাদের চরিত্র-ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করছে। এই সব মেয়েকে তোমরা মুক্ত করাতে পারবে না। তোমরা যদি আমার বিদ্যা থেকে উপকৃত হতে চাও, তাহলে আমি বলব, দু'টি মাত্র মেয়ের জন্য আটটি যুবক কোরবান করে দেয়া বুদ্ধিমত্তা নয় এবং তোমাদের ধৈর্যের সাথে কাজ করা দরকার।'

'কিন্তু আমি কিভাবে ধৈর্যধারণ করতে পারি?' গর্জে উঠে ওসমান সারেম।

'আমার ন্যায়'– বারজিস বললেন–'আমি কি পেশাদার মুচি? আমি যখন মিসরে অবস্থান করি, তখন আমার সওয়ারীর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে আরবী ঘোড়া। আমার ঘরে আছে দু'টি চাকর। আর এখানে কিনা তিনটি মাস ধরে আমি মুচিগিরি করছি। রাস্তায় বসে মানুষের ময়লাযুক্ত পুরনো জুতা মেরামত করছি। আমি তোমাদেরকে সমগ্র কার্ক এবং তারপরেরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করার জন্য জীবিত রাখতে চাই। তোমরা ধৈর্য ধর, অপেক্ষা কর।'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীদের। তাদের কথা-বার্তায় বুঝা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে অপেক্ষা করার হিম্মত অবশিষ্ট নেই। কেউ রাহনুমায়ী না করলেও নিজেরাই সেখানে হামলা করতে প্রস্তুত। ইমামের কথাও মান্য করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা। অগত্যা বারজিস তাদের জানায়, খৃস্টান সম্রাটগণ রাতে যে স্থানে সমবেত হন এবং যেখানে তাদের মদের আসর বসে, তার দু'গোয়েন্দা সেখানকার সাধারণ কর্মচারী। শোবক জয়ের পর সেখান থেকে পালিয়ে আসা খৃস্টানদের সাথে এসে এখানে এসেছিল তারা। এখন তারা খৃস্টান সরকারের চাকরী করছে আর সফল গুপ্তচরবৃত্তি করছে।

বৃটেন, ইটালী, ফ্রান্স ও জার্মানী প্রভৃতি দেশ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আসা খৃস্টান সম্রাটগণ যে প্রাসাদটিতে থাকেন, সেটি তোমরা অবশ্যই দেখেছ। প্রাসাদে বড় একটি কক্ষ আছে। সে কক্ষে সন্ধ্যার পর তারা একত্রিত হন এবং মদপান করেন। তাদের বিনোদনের জন্য থাকে অনেকগুলো সুন্দরী মেয়ে। আধা রাত পর্যন্ত চলে তাদের আসর।

স্থানটি খানিকটা উচুঁতে। সশস্ত্র পাহারাও থাকে। সেই ভবন পর্যন্ত পৌছানো তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, বিশিষ্ট কোন নাগরিকের পক্ষেও তার কাছে যাওয়া অসম্ভব। মেয়ে দু'টোকে কোথায় রাখা হয়েছে, সে খবর

আমি তোমাদের দিতে পারব। কিন্তু তাদের পর্যন্ত পৌছানোর একমাত্র পন্থা, আমাদের সৈন্যরা বাইরে থেকে এক্ষুণি হামলা করবে। তাহলে খৃস্টান সম্রাট ও সামরিক কর্মকর্তাগণ ভবন ছেড়ে চলে যাবে এবং হামলা প্রতিহত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু হামলা যে আজ রাতে হবে না, তাতো নিশ্চিত। সালাহুদ্দীন আইউবী কবে হামলা করবেন, তারও কোন ঠিক নেই।

'প্রয়োজন হামলার, না? অর্থাৎ প্রয়োজন উক্ত প্রাসাদে যারা আছে, তাদের সেখান থেকে সরে যাওয়া এবং মেয়েগুলোর সেখানে অবস্থান করা। অমনটি হলে আমাদের এই যুবকরা প্রাসাদে ঢুকে পড়ে মেয়েগুলোকে তুলে আনবে। এই তো বলতে চাচ্ছেন আপনি?' বারজিসের পরিকল্পনাটা খোলাসা করে বুঝে নিতে চান ইমাম।

'জি হ্যা'— পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দেন বারজিস— 'যদি শহরে মারাত্মক ধরনের কোন হাঙ্গামা সৃষ্টি করে দেয়া যায়— যেমন, কোথাও আগুন লাগিয়ে দেয়া হল আর সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল খৃস্টানদের সমর সরঞ্জামাদিতে, তাহলে হয়ত সম্রাটগণ এবং অন্যান্যরা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে চলে যাবেন। এই সুযোগে...।'

গভীর চিন্তায় হারিয়ে যান বারজিস। ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীদের প্রতি এক এক করে দৃষ্টিপাত করেন তিনি। খানিক পরে বললেন,'হ্যা আমার মুজাহিদগণ! একটি জায়গায় যদি তোমরা আগুন লাগাতে পার, তাহলে মেয়েদের মুক্ত করার সুযোগ বেরিয়ে আসতে পারে।'

'জলদি বলুন, মোহতারাম! বলুন কোথায় আগুন লাগাতে হবে? আপনি বললে গোটা শহরেও আমরা আগুন ধরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।' অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে ওসমান সারেম।

'খৃস্টানদের সামরিক ঘোড়াগুলো কোথায় বাঁধা থাকে, তা তো তোমরা জান'—বারজিস বললেন— 'এ মুহূর্তে সেখানে অন্ততঃ ছয়শত ঘোড়া বাঁধা আছে। বাকীগুলো অন্যান্য স্থানে। নিকটেই বাঁধা আছে প্রায় সমপরিমাণ উট। তার খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে শুক্‌নো খড়ের বিশাল এক পাহাড়। তার থেকে সামান্য ব্যবধানে সেনা ছাউনির সারি। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ঘোড়া-গাড়ী আর বিপুল পরিমাণ এমন কিছু সরঞ্জাম, যাতে সহজে আগুন ধরে যেতে পারে। কিন্তু চাইলেই সেখানে যাওয়া যায় না। অস্ত্র হাতে টহল দিচ্ছে সেন্ট্রিরা। রাতের বেলা সে পথে গমন করার অনুমতি নেই কারুর। তোমরা যদি এই খড়ের গাদা আর তাঁবুর সারিতে আগুন ধরিয়ে দিতে পার, তাহলে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, খৃস্টান সম্রাটগণ জগতের সবকিছু ভুলে গিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ ত্যাগ করে সেখানে ছুটে যাবে। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করবে। আতংক ছড়িয়ে পড়বে শহরময়। তাছাড়া আগুন লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমরা যত সম্ভব ঘোড়ার রশি খুলে দিতে পার, তাহলে আতংকিত ঘোড়াগুলো এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে সৃষ্টি করবে আরেক

প্রলয়কান্ড। মানুষজন পিষ্ট হবে তাদের পায়ের তলায়। কিন্তু আগুন কে লাগাবে, ঘোড়ার বাঁধন কে খুলবে এবং আগুন লাগাবার জন্য সেখানে কিভাবে পৌঁছুবে, তাই আগে ভাববার বিষয়।'

'ধরে নিন, আগুন লেগে গেছে। প্রাসাদও শূন্য হয়ে গেছে। এখন আমাদের করণীয় কি?' জিজ্ঞেস করে এক যুবক।

'আমি সঙ্গে থাকব'– জবাব দেন বারজিস–'উক্ত প্রাসাদে আমাকে ছাড়া তোমরা যেতে পারবে না। ওখানে আমার দু'জন সহকর্মী আছে। তারাই জানাবে, মেয়েরা কোথায় আছে। কিন্তু মেয়ে দু'টোকে উদ্ধার করে এনে রাখবে কোথায়? তাছাড়া ঘটনার পর কার্কের সাধারণ মুসলমানদের উপর যে কেয়ামত নেমে আসবে, তা-ও তোমাদের ভেবে দেখা দরকার। এ যে মুসলমান ছাড়া অন্য কারো কাজ নয়, খৃস্টানরা তা নিশ্চিতভাবেই বুঝে নেবে।'

'মুসলমানরা এখন কি সুখে আছে!' বললেন ইমাম– 'আমার পরামর্শ, কাজটা হয়ে যাক। খৃস্টানরা জানা দরকার যে, মুসলমান যতই নিরাশ্রয়, যতই অসহায় হোক না কেন, কারো গোলাম হয়ে থাকতে রাজী নয়। আর মুসলমানের আঘাত যে দুশমনের কলিজা ছেদিয়ে দেয়, তাও ওদের টের পাইয়ে দেয়া জরুরী।'

বারজিস কমান্ডো ধরনের গোয়েন্দা বটে। কিন্তু এ জাতীয় নাশকতামূলক অভিযানের সুযোগ তার কখনো ঘটেনি। এমন দুর্ধর্ষ অভিযান পরিচালনা করা তার মতেও আবশ্যক, যাতে খৃস্টানরা বুঝতে পারে যে, মুসলমান কেমন চীজ।

ওসমান সারেম ও তাঁর সঙ্গীদের কর্তব্য বুঝাতে শুরু করলেন বারজিস। দু'টি কাজ বেশী স্পর্শকাতর। প্রথমতঃ আগুন ধরানোর জন্য যাবে তিন-চারটি মেয়ে। সেনা প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নাম করে সেন্ট্রির কাছে গিয়ে আলাপ জুড়ে দিয়ে এক পর্যায়ে সেন্টিকে খুন করে ফেলবে তারা। বারজিসের এ কাজের জন্য মেয়েদের নির্বাচন করার কারণ, মহিলারা, বিশেষত যুবতী মেয়েরা পুরুষের মনে যে প্রভাব ফেলতে পারে, তা পুরুষরা পারে না। দ্বিতীয়তঃ ক'জন যুবক সম্রাটদের প্রাসাদে আক্রমণ চালাবে। বারজিস ও ইমাম একমত হলেন যে, বেশী প্রয়োজন নেই–মাত্র এই আটজনই যথেষ্ট। কারণ, লোক বেশী হলে কেউ না কেউ ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকবে।

প্রশ্ন আসে, এতগুলো সাহসী বুদ্ধিমতী মেয়ে পাওয়া যাবে কোথায়। ওসমান সারেম বলল, একজন থাকবে আমার বোন আন-নূর। আরেক যুবক বলল, আমার বোনকেও নেয়া যাবে। অপর ছয় যুবকের বোন নেই। তবে এরা দু'জন এদের বান্ধবীদের মধ্য থেকে একজন করে নিতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। চারজনই যথেষ্ট। মেয়েদেরকে কাজ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিজের হাতে রাখেন বারজিস।

সূর্য ডুবে গেছে। ইমাম সাহেব উঠে চলে গেছেন একদিকে। অন্যরা এক এক করে বেরিয়ে পড়ে ইমামের ঘর থেকে। সকলের শেষে বের হলেন বারজিস। এখন আবার তিনি মুচি। হাতে বাক্স। দুনিয়াটায় কি ঘটছে কিচ্ছু জানেন না। এঁকে-বেঁকে, হেলে-দুলে হাঁটছে। গায়ে এক ফোঁটা বল নেই যেন। জগতের সব বেদনা আর দুঃখ যেন এসে চেপে বসেছে তার ঘাড়ে।

❁ ❁ ❁

বাড়ি অভিমুখে রওনা হয়েছে ওসমান সারেম। ঘরে পৌঁছুতে এখনো খানিক দেরী। হঠাৎ রাইনি আলেকজান্ডার তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে।

রাইনি ওসমানের বোন আন-নূরের বান্ধবী। এখন ভাই-বোন দু'জনই চায় মেয়েটা তাদের ঘরে না আসুক। কিন্তু হঠাৎ নিষেধ করে দিয়ে মেয়েটাকে সন্দেহে ফেলতে চাইছে না ওসমান সারেম। ওসমানের সঙ্গেও অকৃত্রিম হতে চায় রাইনি। ওসমানের ধারণা, এভাবে চরিত্র নষ্ট করে মেয়েটা তার ঈমানী চেতনা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।

আজ রাস্তায় রাইনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওসমানের সন্ধ্যাবেলা। মুখে সামান্য হাসির রেশ টেনে না দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করে ওসমান। কিন্তু ওসমানের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে যায় রাইনি। ওসমান সারেমের মনে এমন কোন ভয় নেই যে, একটি খৃস্টান মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলাপরত অবস্থায় ধরা পড়লে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ইহুদী-খৃস্টানরা বরং খুশীই হবে যে, যাহোক তাদের একটি মেয়ে একজন সন্দেহভাজন মুসলমানকে আপন করে নিতে পেরেছে। অগত্যা দাঁড়িয়ে যায় ওসমান। বলে, 'এখন পথ ছাড়, বড্ড তাড়া আছে আমার রাইনি!'

'না, তোমার কোন তাড়া নেই ওসমান! এত সহজে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে?' বন্ধুসুলভ কণ্ঠে বলল রাইনি।

'কই, তোমাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি নাকি আমি!' ওসমানের কণ্ঠে বিস্ময়।

'মিথ্যা বল না ওসমান!'– মুচকি হেসে বলল রাইনি– 'এই আমি তোমার ঘর থেকে আসলাম। তোমার বোন আমাকে পরিস্কার বলে দিল, আমি যেন তোমার ঘরে কম আসি। আমি আসলে নাকি ওসমান নারাজ হয়....। কেন ওসমান! কথাটা তুমি আমায় নিজে বললে না কেন?'

কোন জবাব দেয় না ওসমান। বোনের প্রতি রাগ আসে তার। এভাবে সরাসরি বলার তো কথা ছিল না। তাই রাইনির কথার জবাব দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে ওসমানের। ওসমানকে নীরব দেখে রাইনি বলে, 'আমাকে কারণটা তো বলবে যে, আমি কেন তোমার ঘরে আসব না?'

রাইনির কথাটা কানে পৌঁছে না ওসমান সারেমের। মন তার অন্যত্র। মেজাজ ক্ষিপ্ত। বড্ড ব্যস্ত। রাইনিকে একটা বুঝ দিয়ে চলে যাওয়ার মত উপযুক্ত কোন জবাব

মাথায় আসল না তার। অগত্যা সাদা-মাটা করে মনের আসল কথাটাই বলে ফেলে ওসমান। 'রাইনি! তুমি আমার ঘরে এস না' কথাটা কেন যে আমি তোমাকে বলতে পারলাম না, জানিনা। এখন শুনে নাও। আমাদের পরস্পর যত প্রেম-ভালবাসাই থাকুক, জাতীয় পরিচয়ে আমি-তুমি একে অপরের দুশমন। তুমি হয়ত বলবে, এ ভালবাসা আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত সম্পর্ক এখানে অবান্তর। কিন্তু আমি জাতীয় ভালবাসায় বিশ্বাসী, যা ক্রুশ ও কুরআনের মাঝে কখনো সৃষ্টি হতে পারে না। এটা আমার জন্মভূমি, বাসভূমি। তোমার জাতি এখানে করছে কি? যতদিন পর্যন্ত তোমার জাতির সর্বশেষ ব্যক্তিটিও এ মাটিতে বর্তমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমর-আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না। আমার মনের কথাটা আমি অকপটে তোমাকে বলে দিলাম। এবার যা বুঝ বুঝতে পার।'

'আর আমার মনে কী আছে, তাও তুমি শুনে নাও'– রাইনি বলল– 'আমার হৃদয় থেকে তোমার ভালবাসা না বের করতে পারবে ক্রুশ, না পারবে কুরআন। তোমাকে না দেখলে আমি মনে শান্তি পাইনা। তোমাকে হাসতে দেখলে আমার আত্মাও হেসে উঠে। শোন ওসমান! তুমি যদি আমাকে তোমার ঘরে অসতে বারণই কর, তাহলে ভাল হবে না।'

'তুমি আমাকে হুকুম দিতে পার। তুমি শাসক সম্প্রদায়ের কন্যা।' ঠান্ডা মাথায় বলল ওসমান।

'আমার মনে যদি ক্ষমতার দম্ভ থাকত, তাহলে এ মুহূর্তে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতে না। অনেক আগ থেকেই তুমি পঁচে মরতে আমাদের বন্দীশালায়'– রাইনি বলল– 'তুমি কি ভাবছ, আমি তোমার তৎপরতা সম্পর্কে কিছু জানি না? বল, তোমার আন্ডারগ্রাইন্ড তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ আমি তোমাকে শুনিয়ে দিই। বল, তোমার ঘর থেকে সমস্ত খঞ্জর,তীর-ধনুক, গোলা-বারুদ বের করে নিই, যা তুমি তোমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছ আমার জাতি ও আমার সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য, যা তোমার ঘরে রাখার অনুমতি নেই। আন-নূরকে যে তুমি তরবারী চালনা শিক্ষা দিচ্ছ, তা কি আমি জানিনা? তোমার দলে আর কে কে কাজ করছে, তাও কি আমার অজানা? কিন্তু ওসমান! তুমি হয়ত জান না যে, তোমার আর বন্দীশালার মাঝে যে বস্তুটি প্রতিবন্ধবতা সৃষ্টি করে রেখেছে, তা হল আমার অস্তিত্ব। তুমি তো জান, আমার পিতা কে। জান তো, তিনি কি জানেন না আর কি করতে পারেন না। এই পাঁচবার তিনি ঘরে বলেছেন, ওসমানকে গ্রেফতার কথা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমি সব ক'বার তার নিকট তোমার জন্য বিনীত সুপারিশ করে বলেছি, ওসমানের বোন আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তার বাবা একজন পঙ্গু মানুষ। আপনি ছেলেটাকে রেহাই দিন। বাবা দু'-তিনবার আমাকে ধমক দিয়ে বলেছেন, প্রয়োজনে

আমি তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব, তবু ছেলেটাকে ছাড়া যাবে না। তিনি আমায় এ-ও বলেছেন যে, মুসলমানের সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি-ঘনিষ্ঠতা ঠিক হচ্ছে না। এসব তুমি ছেড়ে দাও। কিন্তু যেহেতু আমি বাবা-মার একমাত্র কন্যা , আদরের দুলালী, তাই তিনি আমাকে অসন্তুষ্টও করতে চাচ্ছেন না।'

সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে আছে ওসমান সারেম। মন তার অন্য কোথাও। এবার কোন উত্তর না দিয়েই হাঁটা দেয় সে। দু'পা-ও এগুতে পারল না ওসমান। রাইনি ছুটে গিয়ে সম্মুখ থেকে এমনভাবে তার পথ আগলে দাঁড়ায় যে, বুকটা তার লেগে গেছে ওসমানের বুকের সঙ্গে। আলতোভাবে হাত দু'টো রেখে দেয় ওসমানের দু'কাঁধের উপর। ওসমানের আরো ঘনিষ্ঠ হয় মেয়েটি। যৌবনভরা দেহের উষ্ণ পরশে ওসমানকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে রাইনি। রাইনির রেশম-কোমল চুলগুলো ছুয়ে যায় ওসমানের দু'গন্ড। কেঁপে উঠে ওসমান। শিকারীর ফাঁদ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য পিছনে সরে আসার চেষ্টা করে সে। বন্ধন ছেড়ে দেয় রাইনি।

'আমাকে মুক্তি দাও রাইনি! পাথরে পরিণত হতে দাও তুমি আমায়। আমার পথ এক, তোমার পথ আরেক। তোমার-আমার একপথে চলা সম্ভব নয় বোন!' ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল ওসমান।

'ভালবাসা ত্যাগ চায়'– বলল রাইনি– 'কী ত্যাগ দিতে হবে বল আমায়। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, তোমার যা মনে চায় কর, আমি তোমাকে বন্দী হতে দেব না।'

'আর আমি তোমায় ওয়াদা দিচ্ছি'–কঠোর ভাষায় বলল ওসমান– 'আমার মন কি চায়, আমি কি করতে যাচ্ছি, কক্ষনো তা তোমায় বলব না। তোমার এই রূপসী শরীর আর রেশম-সুন্দর চুলের যাদুতে আমাকে আটকাতে পারবে না তুমি।'

'তারপরও আমার প্রমাণ দিতে হবে যে, তোমার জন্য আমি কি ত্যাগ দিতে পারি'– রাইনি বলল– 'তাড়া আছে তো যাও ওসমান! তবে তোমার ঘরে যাওয়া থেকে আমি বিরত হবনা বলে রাখছি। যাব, আগের চেয়ে বেশী যাব।'

আর দাঁড়ায় না ওসমান। ছুটে চলে সম্মুখপানে। রাইনি তাকিয়ে থাকে তার প্রতি। অন্ধকারে হারিয়ে যায় ওসমান। বেদনার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দেয় মেয়েটি।

✿ ✿ ✿

ওসমান ঘরে পৌঁছে দেখে বারজিস তার দেউরিতে বসা। সোজা ভিতরে চলে যায় ওসমান। বাবা-মা-বোনের কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলে, আমি সঙ্গীদের নিয়ে মেয়ে দু'টোকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি। আমাদের এ অভিযানে আন-নূরকে প্রয়োজন।

ওসমান সারেমের বাবা পঙ্গু। যুবক বয়সে খৃষ্টানদের সঙ্গে লড়াই করে একটা পা ভেঙ্গে ফেলেছেন তিনি। পরবর্তী জীবনটা তিনি এই আফসোস করে করে কাটিয়ে দিয়েছেন যে, আহ! এখন আর আমার জিহাদ করার সামর্থ নেই। তিনি ওসমানকে বললেন– বৎস! এমন একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সংকল্প নিয়েই ফেলেছ যখন, তো আমার যেন একথা শুনতে না হয় যে, তুমি তোমার সঙ্গীদের সাথে গাদ্দারী করেছ। এ অভিযানে ধরা পড়ার আশংকাই বেশী। শোন, যদি তুমি ধরা পড়ে যাও আর তোমার সঙ্গীরা নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তাহলে জীবন দিয়ে দেবে, তবু সঙ্গীদের নাম বলবে না। আমি তোমাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীর সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করার জন্য বড় করেছি। ভেবেছিলাম, তোমার বোনটার বিয়ের কাজটা সম্পন্ন করে তোমাকে বিদায় দেব। যা হোক, তুমি যাও, আমার আত্মাকে শান্তি দাও! আবার শুনে নাও, আমি কারো মুখে একথা শুনতে চাই না যে, ওসমানের শিরায় সারেমের রক্ত নেই।'

কন্যাকেও অনুমতি দিয়ে দেন পিতা। ওসমান সারেম জানায়, বারজিস দেউরীতে বসে আছেন। তিনিই এ অভিযানে আমাদের নেতত্ব দেবেন। বারজিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দেউরীতে চলে যান ওসমানের পিতা।

ওসমান সারেম আন-নূরকে বলে, এক্ষুণি তুমি তোমার এমন দু'জন বান্ধবীকে ডেকে আন, যারা আমাদের এ অভিযানে অংশ নেয়ার সাহস রাখে। আন-নূর তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ে এবং দু'বান্ধবীকে নিয়ে খানিক পরেই ফিরে আসে। এর মধ্যে ওসমান সারেমের এক সঙ্গী তার বোনকে সঙ্গে করে এসে উপস্থিত হয়।

এক এক করে এসে হাজির হয় ওসমান সারেমের সাত সঙ্গী। মেয়েরা কোন্ পথে কোথায় যাবে এবং কি করবে, বিষয়টা তাদের পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেন বারজিস। বললেন, পথে একজন সেন্ট্রি তোমাদের পথ রোধ করবে। তোমরা তার কাছে উপরে যাওয়ার পথ কোন্ দিকে জিজ্ঞেস করবে। বলবে, সম্রাট রেনাল্ড আমাদের আসতে বলেছেন। কিন্তু আমরা পথটা ভুলে গেছি। তোমাদের একজন থাকবে চাকরানীর বেশে। তার মাথায় থাকবে টুকরি। সেন্ট্রিকে হত্যা করে আগুন লাগাতে হবে। আগুন লাগাবার উপাদান থাকবে চাকরানীর মাথার টুকরিতে। আগুন লাগাবার পর খঞ্জর দ্বারা উট-ঘোড়ার রশি কেটে দেবে। দু'চারটি ঘোড়াকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করতে হবে। আঘাত খেয়ে ঘোড়াগুলো চীৎকার করে উঠে ছুটাছুটি করতে শুরু করবে এবং তাদের দেখা-দেখি অন্যান্য ঘোড়ার মধ্যেও আতংক সৃষ্টি হবে।

অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের বেশ-ভুষা ঠিক করে নিতে বলেন বারজিস। চাকরানী সাজিয়ে দেন একজনকে। তাকে ছেড়া-মলিন-পুরাতন পোশাক পরতে দেন। মুখমন্ডলে ছাই-কালি মাখিয়ে দেন।

ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীদের দিক-নির্দেশনা দিতে শুরু করেন বারজিস। ওসমান সারেমের পিতাও কিছু পরামর্শ দেন। তারপর প্রত্যেকের হাতে তুলে দেয়া হল একটি করে খঞ্জর। এ সব কাজে কেটে যায় অনেক সময়। সব আয়োজন সম্পন্ন। কিন্তু রাত গভীর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরো কিছুক্ষণ।

রওনা করার সময় হয়ে গেছে। আলাদা আলাদা গিয়ে নির্ধারিত এক স্থানে সমবেত হবে সকলে। মেয়েদের পথ আলাদা। কাজও ভিন্ন। আগুন লাগাবার দায়িত্ব তাদের। আগুন কখন লাগাবে, তার একটা নির্দিষ্ট সময় বলে দেয়া হয়েছে। ঠিক সে সময়ে আক্রমণের স্থানে উপস্থিত থাকতে হবে বারজিসের দলের। এ এক স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান। সময়ের সামন্য হেরফের কিংবা কারো একটুখানি ভুল হয়ে গেলে ফল বিপরীত। নির্ঘাত ধরা খাওয়া আর বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হওয়া। তারপর জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা। সবচে' বেশী ঝুঁকি মেয়েদের। কারণ ওরা নারী। ধরা খেয়ে গেলে তাদের পরিণতি কি হবে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। আন-নূর বলল, ধরা পড়ে গেলে খঞ্জর দ্বারা আমরা আত্মহত্যা করে ফেলব। জীবিত যাব না কাফেরদের হাতে।

গভীর রাত। নীরব-নিস্তব্দ কার্ক শহর। কোথাও কেউ জেগে নেই। নেই কোন সাড়াশব্দ। এক ফোঁটা আলো দেখা যাচ্ছে না কোথাও। জেগে আছে শুধু একটি প্রাসাদ। খৃস্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। খৃস্টান সম্রাট ও উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের আবাসও এটি। এটি তাদের পানশালা। শহর ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে ওঠে এ প্রাসাদ। রাত ভর চলে মদ-নারী আর নাচ-গানের আসর।

এক এক করে প্রাসাদের পানশালায় এসে উপস্থিত হয় সকলে। আসর জমে উঠে। আজকের আলোচ্য বিষয় অপহৃতা নতুন দুই মুসলিম নারী আর কাফেলা-লুণ্ঠিত সম্পদ। মেয়ে দু'টো আর কী কাজে আসতে পারে, জিজ্ঞেস করে একজন। জবাবে সেনা কমান্ডার বলে, এরা পরিণত বুদ্ধির মেয়ে। গুপ্তচরবৃত্তি ইত্যাদিতে এদের ব্যবহার করা যাবে না। একজনের বয়স ষোল-সতের, অপর জনের বাইশ-তেইশ। কিছুদিন আনন্দ-উপভোগে-ই ব্যবহার করা যেতে পারে শুধু।

'তারপর দু'জন সামরিক অফিসারের হাতে তুলে দিলেই হবে। তারা এদের বিয়ে করে নেবেন।' বলল পদস্থ এক সেনা অফিসার।

আসরে হাসি-ঠাট্টা আর অশ্লীল আলোচনা চলছে অপহৃতা এই দু'টো মুসলিম মেয়েকে নিয়ে। ঠাট্টা চলছে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে। মেয়ে দু'টো অবস্থান করছে আলাদা আলাদা দু'টি কক্ষে। কাঁদতে কাঁদতে বেহাল হয়ে যাচ্ছে তারা। একজনের অবস্থা জানে না অন্যজন। দু'জনের কাছে দু'জন সেবিকা। মধ্যবয়সী

মহিলা। মেয়ে দু'টোকে গোসল করিয়েছে তারা। এখন রাতের পোশাক পরাচ্ছে। সাজাচ্ছে বধূসাজে। সেই থেকে কিছু-ই মুখে দেয়নি তারা। সামনে পড়ে আছে এমন এমন খাবার, যা এর আগে তারা কখনো স্বপ্নেও দেখেনি। কিন্তু তা ছুয়েও দেখেনি তারা।

দু'বোনের কে কোথায় আছে, কি হালে আছে, জানে না অপরজন। দু'জনকে স্বপ্নের সবুজ বাগান দেখাচ্ছে সেবিকারা। একজনকে বলা হল, ফ্রান্সের সম্রাট তোমাকে পছন্দ করেছেন। তুমি হবে রাণী। অপরজনকে বলা হল, জার্মানীর রাজার তোমাকে মনে ধরেছে, জীবনটা বদলে যাবে তোমার। পাশাপাশি সাদরে হুমকিও দেয়া হচ্ছে তাদের যে, সম্রাটদের যদি অসন্তুষ্ট কর, তাহলে তোমাদেরকে সৈন্যদের হাতে তুলে দেয়া হবে।

মেয়ে দু'টো মরু অঞ্চলের বাসিন্দা। ভীরু নয়। কিন্তু এখন তো অসহায়-নিরূপায়। আত্মরক্ষার জন্য কিছু-ই করার নেই তাদের। তাদের ইজ্জত রক্ষা করার-ই জন্য তাদের বাবা-মা ও বড় ভাই তাদের নিয়ে খৃস্টান অধ্যুষিত এলাকা ছেড়ে হিজরত করছিল। কিন্তু খৃস্টান হায়েনাদের-ই ফাঁদে পড়ে গেল তারা। বাবা-মা মারা গেলেন। ভাই বন্দী হল। আর তারা এসে পড়ল খৃস্টান সম্রাটদের হাতে। এখন তাদের সাহায্য করার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। বন্দীদশা থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগও দেখছে না তারা। বসে বসে তারা কাঁদছে, চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছে আর আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে। ভাই আফাকের জন্যও অস্থির তারা। বেগার ক্যাম্পে ছট্‌ফট্‌ করছে আফাক। আফাক আহত। খৃস্টানরা খুব পিটিয়েছে তাকে।

আগের কয়েদীরা নিত্যদিনের খাটুনির পর ফিরে এসেছে ক্যাম্পে। নতুন বন্দীদের দেখতে পায় তারা। তাদের কাহিনী শোনে। সব ক'জনের মধ্যে আফাক-ই শুধু আহত। এ পর্যন্ত কেউ তার ব্যান্ডেজ করেনি। মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে আফাক। পুরাতন কয়েদীরা রাতে আফাকের জখম পরিস্কার করে। লুকিয়ে রাখা কিছু ঔষধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেয় তাতে।

✿ ✿ ✿

শরীরে এতগুলো জখম। কিন্তু কোন ব্যাথা অনুভব হচ্ছে না আফাকের। নিজের কথা ভুলে গিয়ে ভাবছে শুধু বোনদের কথা। বোন দু'টো কোথায় থাকতে পারে কয়েদীদের কাছে জানতে চায় আফাক। এখান থেকে কিভাবে পালানো যায়, তাও জিজ্ঞেস করে। বোনরা কোথায় থাকতে পারে, তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ হয়ে থাকতে পারে, আফাককে স্পষ্ট ধারণা দেয় কয়েদীরা। কয়েদীরা তাকে জানায়, এ বন্দীশালার কোন দেয়াল নেই। কারো পায়ে বেড়ীও পরানো হয় না। তারপরও কেউ এখান থেকে পালাতে পারে না। কারণ, এখানে সারাক্ষণ প্রহরা থাকে। তাছাড়া কেউ

পালাতে পারলেও যাবে কোথায়। কোথাও না কোথাও ধরা পড়তেই হবে। পালাবার পর ধরা পড়লে এমন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করতে হবে, যা কল্পনাও করা যায় না। আফাককে জানানো হয়, এখানে বছরের পর বছর ধরে এমন অনেক কয়েদী পড়ে আছে, যারা কার্কের বাসিন্দা ছিল। কিন্তু পালাবার কোন সাহস তারা করতে পারছে না। তারা জানে যে, পালাবার পর যদি তারা ধরা না পড়ে, তাহলে তাদের গোটা পরিবার বন্দীশালায় নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু এতসব অপারগতা ও আশংকা সত্ত্বেও নিজের পলায়ন ও বোনদের উদ্ধারের কথা ভাবছে আফাক। অথচ, উঠে দাঁড়াবার শক্তিও নেই তার দেহে। সারাদিনের ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত কয়েদীরা শুয়ে পড়ে। গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায় তারা। জেগে আছে শুধু আফাক।

❁ ❁ ❁

'মেয়েগুলো ধরা না পড়লে-ই হল।' ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল ওসমান সারেম।

'আল্লাহকে স্মরণ কর ওসমান!'– বারজিস বললেন– 'এ মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর মুখে আছি। মন থেকে সব ভীতি ঝেড়ে ফেল, আল্লাহকে স্মরণ কর.......। আচ্ছা অপর মেয়েগুলোর উপর তোমার আস্থা কতটুকু?'

'একশ ভাগ'–ওসমান বলল–' এ ব্যাপারে আপনার ভাবতে হবে না। আমি ভাবছি, ওরা ধরা পড়ে যায় কিনা!'

'আল্লাহ আল্লাহ কর'–বারজিস বললেন–'আমরা চুরি করতে আসিনি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন।'

অপহৃত মেয়ে দু'টোকে যে প্রাসাদে রাখা হয়েছে, তার থেকে সামান্য দূরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে ওসমান সারেম ও বারজিস। তার-ই সামান্য ব্যবধানে নির্দেশের অপেক্ষায় কানখাড়া করে বসে আছে তাদের অন্য সাথীরা। কোন্ সংকেতে কি করতে হবে, তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে আগেই।

ফৌজি সরঞ্জাম ও খড়ের গাদায় আগুন দিতে পাঠানো হয়েছে যে চারটি মেয়েকে, তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ওসমান সারেম। বোন আন-নূরও তাদের একজন। এতক্ষণে আগুন ধরে যাওয়ার কথা। পরিকল্পনা সফল হলে আগুনের শিখা উঠবে, ছড়িয়ে পড়বে চারদিক। প্রাসাদের সব সম্রাট-কমান্ডার ছুটে যাবে সেদিকে। এ সুযোগে প্রাসাদে ঢুকে পড়ে মেয়ে দু'টোকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে ওসমান ও তার সঙ্গীরা। কিন্তু মেয়েরা গেল অনেক সময় হল। বোধ হয় সেন্ট্রি পথরোধ করে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে।

এখনো সেন্ট্রি পর্যন্ত পৌঁছুতে-ই পারেনি মেয়েরা। সেন্ট্রির সঙ্গে মেয়েদের যেখানে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা, সেখানে কোন সেন্ট্রি নেই। সেন্ট্রিকে না পাওয়া আশংকার

ব্যাপার। কারণ, আগুন লাগাতে হবে সেন্ট্রিকে হত্যা করে। অন্যথায় আগুন লাগানো অবস্থায় মেয়েদের হাতেনাতে ধরা পড়ার আশংকা আছে।

সেন্ট্রিকে খুঁজতে শুরু করে মেয়েরা। শুক্‌নো খড়ের গাদার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তারা। অন্ধকারে তাঁবুর সারি চোখে পড়ছে না। চারজন হাঁটছে একত্রে। একস্থানে লাঠির মাথায় বাঁধা প্রদীপের শিখা দেখতে পায় তারা। এগিয়ে যায় সেদিকে। ঐ তো সেন্ট্রি। প্রদীপের কাছে সেন্ট্রিকে পেয়ে গেল মেয়েরা। প্রদীপের লাঠিটি মাটিতে গাড়া। সেন্ট্রি হাতে তুলে নেয় প্রদীপটি। এগিয়ে আসে মেয়েদের প্রতি। পথরোধ করে তাদের। সুসজ্জিত তিনটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে। সঙ্গে একজন চাকরানী। মাথায় তার টুকরি। অল্পতে-ই কাবু হয়ে যায় সেন্ট্রি? প্রভাবিত হয়ে পড়ে মেয়েগুলোর প্রতি।

'তোমরা কারা? যাচ্ছ কোথায়?' জিজ্ঞেস করে সেন্ট্রি। কণ্ঠে তার নমনীয়তা।

'মনে হয় আমরা ভুল পথে এসে পড়েছি'– মুখে হৃদয়কাড়া হাসি টেনে বলল আন-নূর– 'সম্রাট রেনাল্ডের দাওয়াতপত্র পেয়েছিলাম। কথা ছিল আমরা রাতে আসব। ঘর থেকে বের হতে দেরী হয়ে গেল। একজন বলল, এ পথটা নাকি সোজা। কিন্তু সামনে দেখছি ঘোড়া বাঁধা। পথ কোন্ দিকে? কোন্ দিকে যাব?'

একজন সাধারণ সেন্ট্রিকে প্রভাবিত করতে সম্রাট রেনাল্ডের নাম-ই যথেষ্ট। খৃস্টান সম্রাটদের কার চরিত্র কেমন, সব তার জানা। রেনাল্ড যদি আমোদ করার জন্য এ মেয়েগুলোকে তলব করে থাকেন, তো বিচিত্র কিছু নয়। মেয়েগুলোর রূপ-লাবণ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, বয়স ও গঠন-আকৃতি সর্বোপরি আন-নূর এর নির্ভীক কণ্ঠ ও ভাব-ভঙ্গি-ই প্রমাণ করছে যে, এরা তার বড় স্যারদের মতলবের মেয়ে।

রেনাল্ডের ভবনের পথ দেখাতে শুরু করে সেন্ট্রি। তার পিছনে চলে যায় একটি মেয়ে। নষ্ট করার মত সময় তাদের হাতে নেই। এমনিতে-ই সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেক। খঞ্জরটা শক্ত করে ধারণ করে সে। নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তীব্র এক আঘাত হানে সেন্ট্রির পিঠে। এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায় সেন্ট্রির দেহ। হৃদপিন্ড ভেদ করে খঞ্জরটা বেরিয়ে যায় সামনে দিয়ে। হাতের মশালটা ছুটে পড়ে যায় তার। দু'পা দ্বারা পিষ্ট করে প্রদীপের আগুন নিভিয়ে ফেলে আন-নূর। সেন্ট্রি লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। আঘাত হানে অন্য মেয়েরাও। আহ! বলার সুযোগও দেয়া হল না লোকটাকে। দম যেতে সময় লাগল না তেমন।

বারজিস বলেছিলেন, শুক্‌নো খড়ে আগুন ধরে গেলে তার আলোতে সেনা ছাউনির সারি ও গাড়ির বহর চোখে পড়বে। খড়ের গাদাগুলো দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে-ই। চাকরানীবেশী মেয়েটি টুকরিটা নামায় মাথা থেকে। তাতে আগুন লাগাবার সরঞ্জাম। ডিবায় ভরা কেরসিন, দেয়াশলাই ইত্যাদি।

প্রথমে তারা খড়ের একটি গাদায় আগুন ধরায়। তারপর আরেকটিতে, তারপর

আরো একটিতে। এভাবে সবগুলোতে। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে সবগুলো খড়ের গাদায়। আলোকিত হয়ে উঠছে চারদিক। ঐ তো ছাউনিগুলো দেখা যায়, ঐ তো গাড়ির বহর। এবার তারা দেখতে পাচ্ছে সবকিছু।

তাঁবুগুলো কাপড়ের তৈরী। গাড়ীগুলোও একটার সঙ্গে একটা লাগানো। মেয়েগুলো দ্রুত দৌড়ে যায় সেদিকে। আগুন ধরিয়ে দেয় তাঁবুতে। জ্বলে উঠে কাপড়ের তাঁবুগুলো। অস্বাভাবিক আনন্দের ঢেউ জেগে উঠে মেয়েগুলোর মনে। তিন-চারটি গাড়ীতে কেরসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় তাতেও।

এতক্ষণে আকাশ ছুয়ে যেতে শুরু করেছে খড়ের আগুন। মেয়েগুলো দৌড়ে যায় ঘোড়ার আস্তাবলের দিকে। এখনো সজাগ হয়নি কেউ। মেয়েরা খঞ্জর দ্বারা কেটে দেয় ঘোড়ার রশিগুলো। এক রশিতে চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে ঘোড়া বাঁধা। কাজেই সময় বেশী ব্যয় হল না। কয়েকটি ঘোড়ায় খঞ্জরের আঘাত হানে তারা। চীৎকার করে উঠে ঘোড়াগুলো। ভয়ানক শব্দে হ্রেষাধ্বনি দিয়ে ছুটাছুটি করতে শুরু করে পশুগুলো। উটগুলো আগে থেকেই খোলা। আগুনের লেলিহান শিখা আর ঘোড়ার ডাক-চীৎকার-ছুটাছুটি দেখে এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করে সেগুলোও। বলতে না বলতে এক প্রলয়কান্ড ঘটে যায় সেখানে।

ছুটন্ত উট-ঘোড়ার কবলে পড়ে গেল মেয়ে চারটি। প্রজ্বলিত আগুনের তাপে দূর থেকে পুড়ছে তাদের দেহ। পশুগুলোর ডাক-চীৎকার আর পদশব্দে জেগে উঠে সৈন্যরা।

✿ ✿ ✿

বধূসাজে সাজানো হল অপহৃতা মেয়ে দু'টোকে। একই সময়ে একজন একজন করে পুরুষ প্রবেশ করে তাদের কক্ষে। এরা খৃস্টানদের সামরিক কর্মকর্তা। নেশাগ্রস্ত। পানশালা থেকে বেরিয়ে এসেছে এইমাত্র। সেবিকারা বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

হঠাৎ ভয়ে আতংকিত হয়ে উঠে মেয়ে দু'টো। হায়েনার কবল থেকে পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করে তারা। এই মুহূর্তে একমাত্র আল্লাহ-ই তাদের ইজ্জতের হেফাজতকারী।

হাটু গেড়ে বসে পড়ে এক মেয়ে। হাতজোড় করে, কেঁদে কেঁদে সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহর কাছে। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে লোকটি। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় মেয়েটির প্রতি...।

হঠাৎ বাইরে গোলযোগের শব্দ শুনতে পায় সে। অস্বাভাবিক এক শোরগোল, ডাক-চীৎকার। দরজা ফাঁক করে তাকায় বাইরের দিকে। একি! শহরে আগুন লেগে গেছে মনে হয়! কি ব্যাপার, উট-ঘোড়াগুলো এভাবে ছুটাছুটি করছে কেন!

নেশা কেটে যায় লোকটির। বেরিয়ে আসে বাইরে। অন্য কক্ষ থেকে বেরিয়ে

আসে অপরজনও। হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে আসে দু'তিনজন লোক। ভয়জড়িত কাঁপা কণ্ঠে বলে, খড়ের গাদা-তাঁবু-ঘোড়াগাড়ীতে আগুন লেগে গেছে। ছুটন্ত উট-ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা গেছে কয়েকজন।

আগুন যদি লোকালয়ে, জনবসতিতে লাগত, তাহলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করত না এই শাসকমন্ডলী। কিন্তু এ অগ্নিকান্ড ঘটেছে যে তাদের ব্যারাকে, সামরিক সরঞ্জামে, সেনাছাউনিতে!

মুহূর্তের মধ্যে প্রাসাদে অবস্থানরত সকল সম্রাট, প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তা-যে যেখানে ছিল ছুটে যান ঘটনাস্থলে। নিজ তত্ত্বাবধানে আগুন নির্বাপিত করার চেষ্টা করছে তারা। প্রাসাদের চারপাশের ডিউটিরত সশস্ত্র প্রহরীরা ছুটে যায় পিছনে পিছনে। এমনি একটি মুহূর্তের-ই অপেক্ষায় বসে আছেন বারজিস ও ওসমান। উচ্চশব্দে হাঁক দেন বারজিস। 'চল' বলে সংকেত দেন সহকর্মীকেদের। ছুটে যান প্রাসাদ অভিমুখে। সঙ্গে তাঁর ওসমান। পিছনে পিছনে ছুটে আসে অন্যরা। সকলের হাতে খঞ্জর।

প্রাসাদের অলিন্দে প্রবেশ করে বারজিস তাঁর সেই দু'সহকর্মীকে খুঁজতে শুরু করে, যারা খৃস্টান বেশে এখানে চাকুরী করছে। পাওয়া গেল একজনকে। বারজিস তাকে জিজ্ঞেস করেন, এই আজ যে মেয়ে দু'টোকে আনা হল, ওরা কোথায়? বিষয়টি পরিস্কার জানা ছিল না লোকটির। তবু হাতের ইশারায় দেখিয়ে দেয় একটি কক্ষ। নিজেও সঙ্গে যান বারজিসের। প্রাসাদে দায়িত্বশীল কেউ নেই। প্রহরীরা যারা আছে, এদিকে তাদের কোন খেয়াল নেই। আগুনের তামাশা দেখতেই ব্যস্ত সকলে।

খৃস্টান সম্রাট-কর্মকর্তাদের উপভোগের জন্য ধরে আনা মুসলিম মেয়েরা যেসব কক্ষে অবস্থান করে, সেই কক্ষগুলোর দিকে এগিয়ে যান বারজিস। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কর্মচারী। অলিন্দে দন্ডায়মান কয়েকটি মেয়ে। তাদের কেউ কেউ অর্ধনগ্ন। বারজিস তাদের জিজ্ঞেস করেন, আজ যে দু'টো মেয়েকে ধরে আনা হয়েছে, ওরা কোথায়? বলতে পারল না তারাও। অবশেষে একটি কক্ষে পাওয়া গেল একজনকে। বিহ্বলচিত্তে কক্ষে বসে আছে সে। ওসমান সারেম ও তার কয়েকজন সঙ্গী দিনের বেলা দেখেছিল মেয়েটিকে। বারজিসের দলটির সকলেই মুখোশপরিহিত। তাদের দেখে চীৎকার করে উঠে মেয়েটি। বারজিস তাকে জানায়, আমরা মুসলমান। আমরা তোমাদের দু'বোনকে উদ্ধার করতে এসেছি। কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না সন্ত্রস্ত মেয়েটির। বারজিসের হাতে ধরা দিচ্ছে না সে। কিন্তু সময় তো আর নষ্ট করা যাবে না। বারজিস জোরপূর্বক তুলে নেয় মেয়েটিকে।

আরেক কক্ষে পাওয়া গেল অপর মেয়েটিকে। একই প্রতিক্রিয়া দেখায় সেও। আগন্তুকদের দস্যু মনে করে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে সে। জোর করে

তুলে নেয়া হল তাকেও। এ দৃশ্য দেখে লোকগুলোকে ডাকাত ভেবে এদিক-ওদিক পালিয়ে যায় পুরনো মেয়েরা। চীৎকার করছে নতুন দু'জন। বারজিস রাগতঃ স্বরে তাদের বললেন, চুপ কর হতভাগীরা! আমরা মুসলমান। আমরা তোমাদের মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছি! বড় কষ্টে মেয়ে দু'টোকে থামানো হল। তাদের নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল জানবাজ মুসলিম কমান্ডোরা।

❁ ❁ ❁

বড় ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে আগুন। লকলকিয়ে আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে আগুনের লেলিহান শিখা। চারদিক ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত। আরো ছড়াচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। শহরময় প্রলয় সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে ধাবমান উট-ঘোড়াগুলো। জেগে উঠেছে গোটা শহর। পশুগুলোর পায়ে পিষ্ট হয়ে জীবন হারাবার ভয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছে না কেউ। প্রায়-বার'শত উট-ঘোড়ার জ্ঞানশূন্য ছুটাছুটি যা তা ব্যাপার নয়। আগুনের ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাবার প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছে অনেকে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা আছে কার্কে। লোকগুলো সুযোগের সদ্ব্যবহারে বড় পাকা। তারা আগুন, উট-ঘোড়ার ছুটাছুটি ও হুলস্থুল কান্ড দেখে কি ঘটল, তার কোন তত্ত্ব-তালাশ না নিয়েই প্রচার করে দিল যে, সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী শহরে ঢুকে পড়েছে এবং শহরে আগুন লাগিয়ে চলছে।

এই খবর একদিকে যেমন মুসলমানদের জন্য আশাব্যঞ্জক ও সাহসবর্ধক, তেমনি ইহুদী-খৃস্টানদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। আগুনের মতই মুহূর্তের মধ্যে শহরময় ছড়িয়ে পড়ে এ গুজব। পালাতে শুরু করে দেয় অমুসলিমরাও।

খৃস্টান সম্রাট ও কর্মকর্তাবৃন্দ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন কোন লোক নেই। তারাও ধরে নেন যে, মুসলিম বাহিনী দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। দুর্গের প্রতিরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ তাদের বাহিনীকে সমরবিন্যাসে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। দুর্গের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য আদেশ দেন একদল সৈনিককে।

দু'-তিনজন কমান্ডার দৌড়ে গিয়ে পাঁচিলের উপর উঠে তাকায় বাইরের দিকে। কিন্তু বাইরে কোন শব্দ-সাড়া নেই। কোন দিক থেকে আক্রমণ এসেছে বলে মনে হল না। রাতে দুর্গের ফটক খোলা হয় না কখনো। কিন্তু আজ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডো বাহিনী ভিতরে ঢুকে প্রলয় সৃষ্টি করেছে এই আশংকায় দুর্গের পিছনের ফটক খুলে দেয়া হল। এটি বাইরের আক্রমণের পূর্বাভাস। ঘটনা যদি এমন-ই হয়ে থাকে, তাহলে আইউবীর বাহিনীও এগিয়ে আসছে নিশ্চয়। তাই শহর থেকে দূরেই তাদের প্রতিহত করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করতে হবে।

আগুন বিস্তার লাভ করছে। ঘোড়াগাড়ী, রসদের স্তূপ আরো নানা রকম সরঞ্জাম। এগুলো রক্ষা করা প্রয়োজন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা আবশ্যক। কিন্তু পর্যাপ্ত পানি নেই! আশ-পাশে না আছে পুকুর, না আছে নদী-খাল। বেশ দূরে দু'চারটি কূপ আছে বটে,

কিন্তু পানি তুলে আনার লোক যে নেই! নগরবাসী কেউ তো এগিয়ে আসেনি। তাদের কেউ নিজ ঘরে ঘাপটি মেরে বসে আছে, কেউ বা পালাচ্ছে। ফটক তো খোলা। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে লোকজন বেরিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে। সেনাবাহিনী তলব করা হল। এর মধ্যে একজনের মনে পড়ে গেল বেগার ক্যাম্পের মুসলমানদের কথা। ওদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে। নির্দেশ দেয়া হল, বেগার ক্যাম্পের কয়েদীদের নিয়ে আস। ঘোষণা দাও, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে কাল সকালেই তাদের মুক্তি দেয়া হবে।

বাইরের কোলাহলে জেগে উঠেছিল কয়েদীরা। লাঠিপেটা করে করে তাদের শুয়ে যেতে বলছে সেন্ট্রি। এর মধ্যে ঘোষণা দেয়া হল, কয়েদীদের আগুন নেভানোর জন্য নিয়ে চল। অভিযানে সফল হলে সকালে মুক্তি দেয়ার ঘোষণাও শোনানো হল।

আফাকও আছে তাদের মধ্যে। জখমের ব্যাথায় কাতরাচ্ছে সে। ঘোষণা শুনে আফাক এক কয়েদীকে বলল, 'খৃস্টানদের গোটা সাম্রাজ্য পুড়ে গেলেও আমি আগুন নেভাতে যাব না। বেটারা পেয়েছে কি?

'পাগল নাকি!'– বলল কয়েদী–'ওরা ঘোষণা করেছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে দিতে পারলে কাল সবাইকে মুক্ত করে দেবে। আমি জানি এটি সম্পূর্ণ ধোঁকা। কাফেররা মিথ্যা বলায় বড় পাকা। তবু তুমি আমাদের সঙ্গে চল, সুযোগ বুঝে পালিয়ে যেও। আমাদের পালাবার সুযোগ নেই। কারণ, ওরা আমাদের ঘর-বাড়ী চেনে। তুমি বেরিয়ে যাও।'

'কিন্তু যাব কোথায়?' আফাকের কণ্ঠে হতাশা।

কয়েদী আফাককে নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলল, 'সুযোগমত আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে রেখে আসব। কিন্তু সেখানে বেশী দিন থাকবে না। খৃস্টানরা জানতে পারলে আমার গোটা পরিবারকে তছনছ করে দেবে।'

আগুন নিভানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কয়েদীদের। দলে দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন কূপে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাদের। সেনা সদস্যরা কূপ থেকে মশক ভরে ভরে পানি তুলে দিচ্ছে আর তারা পানি নিয়ে নিয়ে আগুনের উপর ছিটিয়ে দিচ্ছে। দু'এক চক্কর তাদের সঙ্গে যাওয়া-আসা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সেন্ট্রি। দ্রুত দৌড়া-দৌড়ি করে কিছুক্ষণ পানি বহন করার পর নির্জীব হয়ে পড়ে বলহীন কয়েদীরা। ক্লান্ত হয়ে পড়ে সেনাসদস্যরাও । বেহাল হয়ে পড়ে সবাই। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। ভীত-সন্ত্রস্ত খৃস্টান কমান্ডার অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে শুরু করে সকলকে। হঠাৎ একদিক থেকে ছুটে আসে আতংকিত একপাল ঘোড়া। আগুন নির্বাপনকারী কয়েদী ও সেনাসদস্যরা পড়ে যায় ঘোড়াগুলোর কবলে। এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করে তারা। ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষ্টও হয় অনেকে। এ সুযোগে আফাককে সঙ্গে করে কেটে পড়ে সেই পুরাতন কয়েদী।

শহরের মুসলমানদের মনে কোন শংকা নেই। তারা জানে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ এসে পড়েছে। আফাককে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় কয়েদী। ঘরের সব মানুষ জাগ্রত। তাকে দেখে আনন্দিত হয় সকলে। কিন্তু সে আফাককে তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'একে আপাততঃ লুকিয়ে রাখুন এবং অল্প সময়ের মধ্যে শহর ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। খৃস্টানরা ওয়াদা দিয়েছে, কাল সকালে আমাদের মুক্তি দেবে। একে এখনো কেউ চেনে না, এসেছে মাত্র একদিন হতে চলল। আমি থেকে গেলে আমার কারণে হয়ত ক্যাম্পের একজনও মুক্তি পাবে না।'

'আচ্ছা, সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ নাকি শহরে ঢুকে পড়েছে, কথাটা কি সত্য?' জিজ্ঞেস করে কয়েদীর পিতা।

'জানি না'– জবাব দেয় কয়েদী– 'আগুন মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। ঠিক নেই, কবে নিভবে।'

'আমাদের ফৌজ যদি না-ই এসে থাকে, তাহলে আমরা এই ঝুঁকি মাথায় নেই কিভাবে?' বললেন কয়েদীর পিতা।

'ইনি নিজেই বের হয়ে যাবেন'– কয়েদী বলল– 'কাল-ই ইনি এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন।'

'না, এর ব্যাপারে আমাদের কোন ভয় নেই'– কয়েদীর পিতা বললেন– 'এই একটু আগে তোমার ছোট ভাই দু'টি মুসলিম মেয়েকে নিয়ে এসেছে। ও, সারেমের পুত্র ওসমান এবং তাদের আরো কয়েকজন সঙ্গী মিলে মেয়ে দু'টোকে খৃস্টাদের রাজপ্রাসাদ থেকে উদ্ধার করে এনেছে। দু'জনকে আমরা আমাদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছি।

'কারা ওরা?' জিজ্ঞেস করে কয়েদী।

'ওরা বলছে, গতকাল একটি কাফেলা থেকে খৃস্টানরা ওদেরকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল'– পিতা জবাব দেন– 'ওদের এক ভাই নাকি বন্দী অবস্থায় আছে।'

হঠাৎ চমকে উঠে আফাক। জিজ্ঞেস করে, 'কই, ওরা কোথায়?'

খানিক পর।

দু'বোনকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে আফাক। তিনজনের চোখেই আনন্দের অশ্রু। বুকভরা কৃতজ্ঞতা। সে এক আবেগঘন দৃশ্য। বাবা-মা মারা গেছেন খৃস্টান দস্যুদের হাতে। লুণ্ঠিত হয়ে বন্দী হয়েছিল তিন ভাই-বোন। সাহায্য করার মত কেউ ছিল না তাদের। ফরিয়াদ করেছিল আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ তাদের আকুতি কবুল করেছেন। এই অবিশ্বাস্য মিলন ছিল তাদের কল্পনারও অতীত।

কয়েদী আর দাঁড়ায় না। দ্রুত বেরিয়ে পড়ে সে। আবার গিয়ে হাজিরা দিতে হবে

তাকে বেগার ক্যাম্পে। বন্দীদশা থেকে পালাবার ইচ্ছে নেই তার।

কয়েদীর ছোট ভাই এ অভিযানে ছিল বারজিস ও ওসমান সারেমের সঙ্গে। মেয়ে দু'টোকে ঘরে রেখে-ই কোথাও চলে গেছে সে।

হঠাৎ ঘরে ফেরে আসে ছেলেটা। মেয়েদের বলে, 'এক্ষুণি উঠে আসুন, শহর থেকে বের হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেছি।' আফাকের সংবাদটা জানানো হল তাকে। তাকেও সঙ্গে নিয়ে নিল সে। বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

বাইরে তিনটি ঘোড়া দন্ডায়মান। এ ব্যবস্থাপনা বারজিসের। দু'বোনকে দু'টি ঘোড়ায় চড়িয়ে বসান তিনি। নিজে যখন তৃতীয়টিতে আরোহণ করতে উদ্ধত হন, তখন আফাকের কথা বলা হল তাকে। আফাককে নিজের ঘোড়ায় তুলে নেন বারজিস।

শহরের পিছনের ফটক অভিমুখে ছুটে চলে তিনটি ঘোড়া। আতংকিত নগরবাসী পালাচ্ছে দলে দলে। বেরিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে। কিন্তু বারজিস তখন মেয়েদের নিয়ে ফটকের নিকটে পৌঁছে, তখন ফটক বন্ধ হয়ে গেল বলে। বিপুল পরিমাণ জনতা আটকা পড়ে যায় ফটকের মুখে। হুলস্থুল পড়ে যায় ফটকের মুখে। বারজিস পিছন থেকে চীৎকার করে বলতে শুরু করে, 'পিছন থেকে ফৌজ আসছে। ফটক খুলে দাও। পালাও, মুসলমানরা আসছে।'

জনতার ভীড় ধাক্কা মারে সামনের দিকে। বন্ধ হতে হতেও খুলে যায় ফটক। ঢলের মত বিপুল লোক এক ঠেলায় বেরিযে যায় ফটক অতিক্রম করে।

ফটক পার হয়ে বেরিয়ে এসে বারজিস আফাককে বলল, তুমি তোমার এক বোনের ঘোড়ায় চড়ে বস। দু'জন পুরুষের ভার বহন করা এক ঘোড়ার পক্ষে কষ্টকর হবে। আমাদের সফর অনেক দীর্ঘ।

এক বোনের পিছনে চড়ে বসে আফাক। অপর বোনকে বলে, ভয়ের কিছু নেই, ঘোড়া তোমায় ফেলবে না। ঘোড়া হাঁকায় তারা।

পথে স্থানে স্থানে খৃষ্টানদের চৌকি বসানো আছে, তা জানা আছে বারজিসের। কোন্ পথে গেলে খৃস্টান সেনাদের নজরে পড়তে হবে না, তাও তিনি জানেন। সেই পথ ধরে-ই এগুতে শুরু করেন তিনি।

কার্ক থেকে পালিয়ে আসা মানুষজন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এদিক-সেদিক। লেলিহান আগুনে আলোকিত হয়ে গেছে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত।

আফাক ও তার বোনেরা জানে না, তারা কিভাবে মুক্তি পেল। বারজিস বলছে না কিছু-ই। মাঝে-মধ্যে মুখ খুললেও আফাকের পার্শ্বে এসে তার কুশল জিজ্ঞেস করছে আর তার একাকী সওয়ার মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করছে, ভয় পাচ্ছ বোন!

পিছনে সরে যাচ্ছে কার্কের লেলিহান অগ্নিশিখা। ধাবমান ঘোড়াগুলোর গতির তালে কেটে যাচ্ছে রাত।

❁ ❁ ❁

রাত শেষে ভোর হল। সূর্যোদয়ের আগেই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীর এলাকায় পৌঁছে যান বারসিজ। এক কমান্ডারের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে সুলতান কোথায় আছেন জানতে চান তিনি। কমান্ডার বারজিসকে নিয়ে যান সিনিয়র এক কমান্ডারের নিকট। সুলতান এ মুহূর্তে কোথায় থাকতে পারেন বারজিসকে ধারণা দেন কমান্ডার। বারজিস উৎফুল্ল। অভিযান তাঁর ফুলসাক্সেস। তিনি শুধু দু'টো মেয়েকেই খৃস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করেননি– কার্কে আগুন লাগানোর মত নাশকতামূলক অভিযান চালিয়ে খৃস্টান ফৌজ ও নাগরিক সাধারণের মনে চরম এক ভীতিও সঞ্চার করে এসেছেন। তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরামর্শ দিতে চান যে, এক্ষুণি কার্ক আক্রমণ করা হোক।

কার্কের সকালটা ছিল নিদারুণ ভয়ানক। দাবানল নিভে গেছে বটে, তবে আগুন জ্বলছে এখনো। ধোঁয়ার কুন্ডলীও দেখা যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে। খৃস্টান বাহিনীর সমুদয় রসদ উট-ঘোড়ার খাদ্য পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জ্বলে গেছে সেনা ছাউনি ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-সরঞ্জাম। রাতভর ছুটাছুটি করা ক্লান্ত-অবসন্ন উট-ঘোড়াগুলো এখন লা-ওয়ারিশ ঘুরে ফিরছে দিগ্বিদিক। স্থানে স্থানে পড়ে আছে অসংখ্য মানুষের লাশ। রাতে উট-ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে মারা গেছে এরা। সেনাসদস্য ও বেগার ক্যাম্পের কয়েদীরা কূপ থেকে পানি তুলে আগুন নেভানোর কসরত চালিয়ে যাচ্ছে এখনো।

খৃস্টান নেতৃবর্গের এখনো ধারণা, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ শহরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোন আলামত। দুর্গের প্রাচীর পরীক্ষা করে দেখে তারা। কিন্তু কই, ইসলামী ফৌজ তো দেখা যাচ্ছে না দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কোথাও। চারপার্শ্বে ঘোরাফেরা করছে শুধু খৃস্টান ফৌজ। এবার তদন্তের পালা, আগুন লাগল কিভাবে।

আগুন লাগানোর প্রাক্কালে মেয়েরা খঞ্জরের আঘাতে যে সেন্ট্রিকে হত্যা করেছিল, পাওয়া গেল তার মৃতদেহ। কিন্তু উট-ঘোড়ার পেষা খেয়ে লাশটি এমনভাবে থেতলে গেছে যে, খঞ্জরের জখম ধরা যাচ্ছে না। সেখান থেকে সমান্য দূরে পাওয়া গেল আরো চারটি লাশ– চারটি মেয়ের লাশ। খৃস্টানদের উট-ঘোড়া বাঁধার স্থানে পড়ে আছে লাশগুলো। তদন্ত করছেন গোয়েন্দা প্রধান হরমুন।

হরমুন লাশগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ান। তাকিয়ে আছেন অপলক নেত্রে। অশ্বক্ষুরের পেষা খেয়ে খেয়ে বিকৃত হয়ে গেছে লাশের মুখমন্ডল। অক্ষত নেই শরীরের কোন অংশ। লাশগুলো পড়ে আছে একটি থেকে আরেকটি দূরে দূরে। ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে পরিধানের পোষাক। রক্ত-মাটি মেখে আছে কাপড়গুলোতে।

আসল রং বুঝবার কোন উপায় নেই। শুধু এতটুকু বুঝা যাচ্ছে যে, এগুলো মহিলার পোষাক। লাশ দেখেও বুঝা যায় যে, এরা নারী। সব ক'জনের সমস্ত দেহের চামড়া ছিলে গেছে। গোশত আলগা হয়ে গেছে কোন কোন স্থানে। হাড় দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও। প্রতিটি লাশের গলায় একটি করে চেইন। চেইনের সঙ্গে বাঁধা আছে একটি ছোট্ট ক্রুশ। ক্রুশ প্রমাণ করছে মেয়েগুলো খৃস্টান।

হরমুন ও খৃস্টান সেনা অফিসারগণ বিস্মিত হয়ে পড়েন যে, নারীর লাশ পড়ে আছে কেন এখানে! এটি তো সামরিক এলাকা। কোন নাগরিকের তো এখানের আসার অনুমতি নেই! সাধারণ মানুষের চলাচলের পথও তো নয় এটি! এ তো পশু বাঁধা, রসদ রাখার জায়গা! নারীর লাশ কেন এখানে?

সেখানে পড়ে আছে আরো কয়েকটি লাশ। এগুলো সেনাসদস্যদের। রাতের আঁধারে মেয়েগুলো এখানে কেন এসেছিল, জবাব আছে এ প্রশ্নের। কিন্তু জবাবদাতা নেই কেউ।

যাক, এ প্রশ্ন মুখ্য নয়। আসল প্রশ্ন হল, আগুন লাগল কিভাবে? শহরের মুসলমানদের উপর সন্দেহ করা যায়। স্বাভাবিক। কিন্তু অপরাধীদের খুঁজে বের করা সহজ নয়। হানা শুরু হয়ে গেল সন্দেহভাজন মুসলমানদের ঘরে ঘরে। মসজিদে-মসজিদে, মাদ্রাসায়-মাদ্রাসায়। গ্রেফতারকৃতদের সংখ্যা বাড়তে লাগল দিন দিন। জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন। তারপর জেল।

আন-নূর ও তার বান্ধবীদের পরিজন বেজায় পেরেশান। মেয়েগুলো ফিরে আসল না এখনো। তা হলে কি তারা ধরা পড়ে গেল? তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে পূর্ণ সাফল্যের সাথে। কিন্তু এখনো তারা নিখোঁজ। ঘরের কোণে আত্মগোপন করেনি ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীরা। তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে, তথ্য সংগ্রহ করছে।

আগুন লাগার স্থানে উৎসুক জনতার প্রচন্ড ভীড়। বন্ধুদের নিয়ে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে ওসমান সারেম। শুনতে পায়, চারটি মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে।

খানিক পরে জনতার উদ্দেশ্যে ঘোষণা হল, লাশ চারটি অমুক স্থানে রেখে দেয়া হয়েছে। লাশগুলো দেখে তোমরা সনাক্ত করার চেষ্টা কর। জনতার ভীড় চলে যায় সে দিকে। একত্রিতভাবে রাখা লাশ চারটি দেখে ওসমান সারেম ও তার সঙ্গীরা। ক্রুশগুলো রেখে দেয়া হয়েছে লাশের বুকের উপর। কেউ চিনল না এরা কারা। যারা চিনল, তারা কি বলবে, এরা কারা? না, জীবন গেলেও নয়।

দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে ওসমান সারেমের। ঝর ঝর করে নেমে আসে অশ্রু। ওসমান বেরিয়ে আসে জনতার ভীড় থেকে। বন্ধুরাও এসে মিলিত হয় তার সঙ্গে।

তারা জানে, লাশগুলো কাদের। ওসমান সারেমের বোন আন-নূর এর লাশও আছে এখানে। অবশিষ্ট তিনটি লাশ তার বান্ধবীদের। রাতে কর্তব্য পালন করে শহীদ হয়ে গেছে চারজন। তাদের শাহাদাতের চাক্ষুষ সাক্ষী নেই কেউ। লাশের সুরতহাল যে কাহিনী বর্ণনা করছে, তার বিবরণ অনেকটা হতে পারে এ রকম–

সেন্ট্রিকে হত্যা করে মেয়েরা আগুন লাগায়। তারপর ঘোড়ার রশি কাটে। তারপর তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ছুটন্ত ঘোড়ার কবলে পড়ে যায়। অবশেষে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে নির্মমভাবে প্রাণ হারায় । আল্লাহ্ মালুম, কত শত উট-ঘোড়া দলিত করেছে লাশগুলো।

দু'টি মেয়ের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য জীবন দিল চারটি মেয়ে। নিজ হাতে মেয়েগুলোর গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল বারজিস, যাতে প্রয়োজনে তারা দাবি করতে পারে, আমরা খৃস্টান।

মেয়েগুলোর জানাযা হল না। খৃস্টান মনে করে ক্রুসেডাররা তাদের-ই গোরস্তানে তাদের রীতি অনুসারে দাফন করে রাখে লাশগুলো। কেউ বিলাপ করল না তাদের জন্য। তবে, ঈসালে সাওয়ারের জন্য কুরআন পাঠ করা হল, গায়েবানা জানাযা পড়া হল ঘরে ঘরে গোপনে।

মুসলমানদের ঘরে তল্লাশী শুরু করে খৃস্টানরা। সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়, মুজাহিদ-অমুজাহিদ কারো ঘর-ই বাদ পড়ল না অভিযান থেকে। প্রবলভাবে দু'টি আশংকা দেখা দিল। প্রথমতঃ মুসলমানরা ঘরে ঘরে যেসব অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল, তল্লাশীতে ধরা পড়ে যাবে সব। তাই ভিটার মাটি খুড়ে খুড়ে অস্ত্রগুলো দাফন করে রাখল তারা। দ্বিতীয় আশংকা এই ছিল যে, যে চারটি মেয়ে শহীদ হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে জবাব দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে যে, তারা কোথায়। আগুন লাগার রাতের পরদিন-ই ইমাম সাহেবকে যখন মেয়েদের শাহাদাতের সংবাদ দেয়া হল, তখন শুনে তিনি প্রথম কথাটি এই বললেন যে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে মেয়েগুলো কোথায়, তাহলে জবাব কি দেবে?'

ইমাম সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মানুষ। প্রশ্নটা মুখ থেকে বের করে-ই মাথাটা নীচু করে, চোখ দু'টো অর্ধমুদ্রিত করে গভীর চিন্তায় হারিয়ে যান। খানিক পর মাথা তুলে চোখ খুলে বললেন, মেয়েগুলোর 'বাপ-ভাইদের আমার কাছে নিয়ে আস।'

সংবাদ পেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে চলে আসে শাহাদাতপ্রাপ্ত চার মেয়ের পিতা ও ভাইয়েরা। তাদের সামনে প্রশ্নটা পুনর্ব্যক্ত করে ইমাম সাহেব তাদের একটি বুদ্ধি শিখিয়ে দেন এবং সকলকে নিয়ে খৃস্টান পুলিশ প্রশাসনের অফিসে চলে যান। অনুমতি নিয়ে পুলিশ প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন–

'আমি এদের ইমাম। মসজিদে নামায পড়াই। গত রাতে যখন শহরে আগুন লাগে, তখন এরা আগুন নেভানোর জন্য ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। রাতভর এরা কূপ থেকে পানি তুলে আগুনে ছিটাতে থাকে। শহরে হুলস্থুল কান্ড ঘটে গিয়েছিল। কারো কোন হুঁশ-জ্ঞান ছিলনা। সকালে ঘরে ফিরে এরা জানতে পায় যে, আপনার লোকেরা এদের ঘরে ঢুকে এই চার ব্যক্তির চারটি যুবতী মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে। আমরা মেয়েগুলোর এখন পর্যন্ত কোন খোঁজ পাইনি।'

'আমাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার আগে ভাল করে ভেবে দেখুন ইমাম সাহেব! আপনি একজন দায়িত্বশীল মানুষ। ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে পরে নিজে-ই ফেঁসে যাবেন।' কঠোর ভাষায় বলল পুলিশ প্রধান।

'আমি একজন ধর্মীয় নেতা জনাব! আপনার দরবারে আমি মিথ্যা বলতে আসিনি'– বললেন ইমাম সাহেব– 'আমি আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই যে, আপনি আমাদের ধমক দিতে পারেন, আপনার পুলিশ বাহিনীকে নির্দোষ বলতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর নিকট থেকে সত্যকে গোপন রাখতে পারেন না। আপনি আমাদের শাসক–খোদা নন। এ লোকগুলো আপনাদের রক্ষা করার জন্য সারা রাত আগুনের সাথে যুদ্ধ করল, আর আপনি কিনা তার পুরস্কার এই দিচ্ছেন যে, আপনার পুলিশ মেয়েগুলোকে তুলে নিয়ে গেল আর আপনি তার স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত দিচ্ছেন না! এই কি আপনাদের নীতি?'

দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর পুলিশ প্রধান বললেন, 'ঠিক আছে, আমি খুঁজে দেখব।' এতটুকু প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়া-ই ছিল ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য।

বাইরে এসে ইমাম বলে দিলেন, তোমরা প্রচার করে দাও যে, পুলিশ রাতে আমাদের মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তারা তা-ই করল। প্রতিবেশী অমুসলিমরা কথাটা বিশ্বাস করে নিল। বস্তুত রাতের শহরের অবস্থা এমন-ই ছিল যে, চারটি মেয়ে অপহরণ হওয়া ছিল স্বাভাবিক।

বারজিস সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তাঁবুতে বসে আছেন। আফাকের ব্যাণ্ডেজ-চিকিৎসা সেরে ফেলেছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ডাক্তার। আফাকের বোন দু'টিও তাঁবুতে বসা। সুলতানকে রাতের ঘটনাপ্রবাহ শোনাচ্ছেন বারজিস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বারবার দৃষ্টিপাত করছেন মেয়ে দু'টোর প্রতি। চোখ দু'টো লাল হয়ে গেছে তাঁর।

বারজিস জানান, কার্ক শহরকে তিনি এমন এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে রেখে এসেছেন যে, এক্ষুণি যদি হামলা করা যায়, তাহলে হামলা সফল হতে পারে। শহরে সেনাবাহিনীর রসদ নেই। উট-ঘোড়ার খাদ্যও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পশুগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত। জনগণ আতংকিত। ভয়ে সেনাবাহিনীও কাঁপছে থরথর করে।

গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। দীর্ঘক্ষণ পর মাথা তুলে নায়েব-উপদেষ্টাদের তলব করেন। আদেশ দেন, 'মেয়ে দু'টো ও তার ভাইকে কায়রো পাঠিয়ে দাও এবং তাদের ভাতা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দাও।'

'আমার বোন দু'টোকে আপনি আপনার হেফাজতে নিয়ে নিন'– আফাক বলল– 'আমি আপনার সঙ্গে থাকব। আমাকে আপনি সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে নিন। আমি আমার বাবা-মায়ের খুনের প্রতিশোধ নেব। যদি আমাকে কার্ক পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমি খৃস্টানদের আরো অস্থির করে তুলব।'

'যুদ্ধ আবেগ দিয়ে লড়া যায় না'– সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন–'মুজাহিদ হতে হলে দীর্ঘ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তুমি তো শুধু তোমার পিতা-মাতার খুনের বদলা নেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়েছ। আর আমার নিতে হবে, সেইসব পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-কন্যাদের রক্তের বদলা, যারা জীবন-সম্ভ্রম খুইয়েছে খৃস্টান হায়েনাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে। তুমি শান্ত হও। ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ কর।'

আবেগ প্রশমিত হচ্ছে না আফাকের। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য জিদ্ ধরেছে ছেলেটা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বাধ্য করছেন তাকে বোনদের সাথে কায়রো চলে যেতে। সুলতান তাকে বললেন, 'কায়রো গিয়ে আগে নিজের চিকিৎসা করাও। সুস্থ হও। তারপর আমি তোমার আকাংখা পূরণ করব।'

ইত্যবসরে এসে উপস্থিত হন নায়েব সালার ও চীফ কমান্ডার। গোয়েন্দা উপ-প্রধান জাহেদানও আছেন তাদের সঙ্গে। আফাক ও তার বোনদের বাইরে পাঠিয়ে দেন। তাদের নিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বৈঠকে বসেন।

বৈঠকের আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। এক্ষুণি কার্ক অবরোধ করার পরামর্শ দিয়েছে বারজিস। এ ব্যাপারে আপনারা যার যার মতামত বলুন। কার্কের সর্বশেষ পরিস্থিতির বিবরণ দিলেন সুলতান। আলোচনা শুরু হল।

মুখ খুললেন জাহেদান। নিজ গোয়েন্দাদের রিপোর্টের আলোকে তিনি বললেন, খৃস্টান বাহিনী কেবল কার্ক দুর্গে-ই নয়- বাইরেও অবস্থান করছে। তাদের একটি অংশ বাইরে থেকে আমাদের অবরোধ ভেঙ্গে দেয়ার মত পজিশন নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা রসদ সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানের জন্য পর্যাপ্ত সৈন্য প্রস্তুত করে রেখেছে। সাময়িকের জন্য রসদের কিছু ঘাটতি দেখা দিলেও এ জন্য আমাদের আক্রমণ সফল হবে ধারণা করা আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল। পুড়ে যাওয়া রসদ-সরঞ্জাম ছাড়াও তাদের আরো বিপুল আয়োজন রয়েছে। তাদের প্রত্যেক সৈনিকের সঙ্গে পর্যাপ্ত রসদ-সরঞ্জাম থাকে সব সময়। তাছাড়া তাদের সৈন্যসংখ্যাও আমাদের চেয়ে পাঁচ-ছয়গুণ বেশী। নিজ নিজ অভিমত পেশ করে বৈঠকে উপস্থিত অন্যরাও। অধিকাংশের অভিমত, বিলম্ব না করে এক্ষুণি আক্রমণ করা হোক। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করার পরামর্শ

দেন কেউ কেউ। সকলের পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শুনেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। কমান্ডারের তীব্র স্পৃহা দেখে যারপরনাই প্রীত হন সুলতান। তাদের অধিকাংশের পরামর্শ হল, হামলা এক্ষুণি হোক বা ক'দিন পরে হোক, হামলা করে একথা যেন শুনতে না হয়, অবরোধ তুলে নাও। চুপচাপ সকলের পরামর্শ শুনতে থাকেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। অবশেষে ফৌজের মানসিক ও অন্যান্য অবস্থা জানতে চাইলেন তিনি। সন্তোষজনক জবাব পেলেন সুলতান।

'আমি অবিলম্বে হামলা করতে চাই'– সবশেষে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী- 'তবে আমি তাড়াহুড়ার পক্ষে নই। দুর্গের শক্ত প্রাচীর-ই কেবল আমাদের প্রতিবন্ধক নয়–বাইরে ছড়িয়ে থাকা খৃস্টান বাহিনীর সঙ্গেও মোকাবেলা করে আমাদের বিজয় অর্জন করতে হবে। জাহেদান ঠিক-ই বলেছে যে, কার্কের ভিতরের ধ্বংসযজ্ঞে আমাদের প্রবঞ্চিত হওয়া যাবে না। তথাপি হামলা হবে অবিলম্বে। দূরত্ব তো বেশী নয়। একরাতে-ই আমাদের বাহিনী কার্ক পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু একটি লড়াই তাদের দুর্গের বাইরে লড়তে হবে। রওনা হওয়ার আগে কার্কের মুসলমানদের প্রস্তুত করে নিতে হবে। আমি ভিতরের যেসব তাজা খবর পেয়েছি, তা হল, সেখানকার মুসলমানরা তলে তলে সংঘবদ্ধ হয়ে গেছে। আশা করা যায় আমরা দুর্গ অবরোধ করলে তারা ভিতরে নাশকতা চালিয়ে যাবে। তাদের বোন-কন্যারাও মাঠে নেমে এসেছে। চারটি মাত্র মেয়ে খৃস্টানদের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছে, পঞ্চাশ সদস্যের চারটি বাহিনীর পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। আমরা শহরে আমাদের কমান্ডো ঢুকিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করব।'

'কমান্ডো যদি পাঠাতে-ই হয়, তাহলে এক্ষুণি প্রেরণ করুন। আগুনের ভয়ে কার্কের যেসব নাগরিক পালিয়ে এসেছিল, তারা অবশ্যই ফিরে যাবে। তাদের ছদ্মাবরণে আমরা শহরে কমান্ডো ঢুকিয়ে দিতে পারি। এরপর কিন্তু সম্ভব হবে না। অনুমতি দিন, তাদের নিয়ে আজই আমি রওনা হয়ে যাই। সঙ্গে কোন অস্ত্র নিতে হবেনা। অস্ত্র ওখান থেকেই সংগ্রহ করা যাবে।' সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বলার মাঝে বলে উঠলেন বারজিস।

সিদ্ধান্ত হল, আজ রাতে-ই বারজিসের নেতৃত্বে কমান্ডো রওনা হয়ে যাবে। যতদূর পর্যন্ত ঘোড়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব, ঘোড়ায় চড়ে যাবে। তার পরে পায়ে হেঁটে। সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত লোক যাবে। তারা ঘোড়াগুলোকে মাঝ পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে।

তৎক্ষণাৎ জাহেদানকে নির্দেশ দেয়া হল, বারজিসের নির্দেশনা মোতাবেক কমান্ডোদের অসামরিক পোশাকের ব্যবস্থা কর এবং সন্ধ্যার পর রওনা করিয়ে দাও।

সেনা কমান্ডারদের জরুরী নির্দেশনা দিতে শুরু করেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। বললেন–

'তোমাদের মনে রাখতে হবে, যে বাহিনীটি দিয়ে আমরা কার্ক আক্রমণ করাতে যাচ্ছি, এটি সেই বাহিনী নয়, যারা শোবক জয় করেছিল। এরা মিসর থেকে আগত সেইসব সৈনিক, যাদের মধ্যে দুশমন অস্থিরতা সৃষ্টি করে রেখেছিল। অবরোধ করে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। কাজেই সর্বক্ষণ কমান্ডারদের সতর্ক থাকতে হবে। আমার তো এ-ও সন্দেহ হচ্ছে যে, এ বাহিনীর মধ্যে বিকৃত চিন্তার সৈন্যও আছে। যে বাহিনীটিকে আমি নিজের হাতে রেখেছি, তারা তুর্কী ও শামী। নুরুদ্দীন জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনীটিকেও আমি আমার কাছে রিজার্ভ রাখব। পরিস্থিতি তোমাদের প্রতিকূলে চলে গেলে ভয় পেয়ে পিছনে সরে এস না। আমি তোমাদের পিছনে থাকব। আর হ্যা, তোমরা কার্কের মুসলমানদের আশায় বসে থেক না। আমি তাদের জন্য যে পয়গাম প্রেরণ করব, তা কক্ষনো এমন হবে না যে, তার এমন ঝুঁকিবরণ করে নেবে যে, তাদের মহিলাদের ইজ্জতও নিরাপদ থাকবে না। আমি তাদের কাছে এত বেশী কোরবানী চাইব না। তারা খৃস্টানদের শাসনাধীন, অসহায়, অপারগ। নির্যাতনের শিকার। আমরা যাচ্ছি তাদের আযাদী ও মুক্তির জন্য- তাদের ভরসায় নয়।

❁ ❁ ❁

কার্কের মুসলমানদের ঘরে ঘরে খৃস্টানদের হানা অব্যাহত থাকে পাঁচদিন পর্যন্ত। সন্দেহবশতঃ গ্রেফতার হয় বেশ ক'জন মুসলমান। বেগার ক্যাম্পের যে কয়েদীদের মুক্তি দেয়ার ওয়াদা দিয়ে আগুন নেভাতে নেয়া হয়েছিল, মুক্তি দেয়া হয়নি তাদের। মুসলিম নির্যাতনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে খৃস্টানরা। অগ্নিকান্ডে তাদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল অস্বাভাবিক। তাদের জানা ছিল যে, মুসলমান ছাড়া এমন দুঃসাহসী অভিযান চালাতে পারে না অন্য কেউ।

গ্রেফতারকৃতদের দু'জন হল ওসমান সারেমের বন্ধু। মেয়েদের মুক্তি অভিযানে শরীক ছিল তারা। নির্মম নির্যাতন চালানো হয় তাদের উপর। তবু কোন তথ্য মিলছে না খৃস্টানদের। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে এই দু'যুবকের হৃদয়ে লুকায়িত আছে সব তথ্য। কিন্তু মুখ তাদের বন্ধ। নির্মম নির্যাতনে শরীরের জোড়াগুলো আলগা হয়ে গেছে তাদের। তবু মুখ খুলছে না তারা।

অবশেষে নিজে কয়েদখানায় এসে উপস্থিত হন হরমুন। দৃষ্টি তার এই দু'যুবকের উপর। হরমুনের মুসলমান গুপ্তচররা জানিয়েছে যে, এরা দু'জন আগুন লাগানোর ঘটনায় জড়িত। সংবাদদাতা দু'জন মুসলমান। দু'জন-ই এ দু'যুবকের প্রতিবেশী। অর্থে-বংশে সাধারণ মানুষ। কিন্তু এখন চলে ঘোড়াগাড়ীতে করে। খৃস্টানদের দরবারে তাদের অবাধ যাতায়াত। এক একজনের দু'-তিনটি করে বউ। মদ চলে রীতিমত।

গ্রেফতারকৃত এই দু'যুবককে তারা আগুন লাগার ঘটনার রাতে কোথাও সন্দেহজনক অবস্থায় দেখেছিল। তারা-ই ধরিয়ে দিয়েছে যুবকদের।

কয়েদখানায় এসে যুবকদের অবস্থা দেখে হরমুন বুঝতে পারলেন যে, নির্যাতনে মুমূর্ষু অবস্থায় এসেও যুবকরা যখন কিছু বলছে না, তো এদের নিকট থেকে আর তথ্য পাওয়ার আশা করা যায় না। নির্যাতন এদের গা-সহা হয়ে গেছে।

যুবকদের সঙ্গে করে নিয়ে যান হরমুন। উন্নত খাবার খাওয়ান। মমতা দেখান তাদের প্রতি। ডাক্তার এনে চিকিৎসা করান, ঔষধ খাওয়ান । তারপর তাদের শুইয়ে দেন আরাম বিছানায়। মুহূর্তের মধ্যে তারা গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায়।

হরমুন বসে পড়েন দু'জনের মধ্যখানে। কিছুক্ষণ পর বিড়বিড় করে উঠে একজন। ঘুমের ঘোরে স্পষ্ট ভাষায় বলতে শুরু করে, 'আমি কিছু জানি না। আমার দেহটা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেল। আমি কিছুই বলতে পারব না। কোন কথা জানা থাকলেও বলব না। তোমরা তোমাদের গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখ আর আমি আমার গলায় বেঁধে রেখেছি পাক কুরআন।'

'তুমি আগুন লাগিয়েছ'– হরমুন বললেন– 'তুমি খৃস্টানদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছ। তুমি বাহাদুর। মরে গেলে মানুষ তোমাকে শহীদ বলবে।'

'আমি যদি মরে যাই'- আবার বিড়বিড় করে যুবক– 'আমি যদি মরে যাই, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানও থাকবে। প্রাণ বের হয়ে যাবে তো ঈমান বের হবে না।

যুবকের ঘুমন্ত মস্তিষ্কে নিজের মনের কথা ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন হরমুন। কিন্তু যুবকের মস্তিষ্ক কোন কথা-ই গ্রহণ করছে না তার।

এমন সময়ে বিড়বিড় করে উঠে অপর যুবকও। এবার তার প্রতি মনোনিবেশ করেন হরমুন। ঘুমের ঘোরে তার থেকেও কথা নেয়ার চেষ্টা করেন তিনি। সঙ্গে তার আরো তিন-চারজন গোয়েন্দা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর হতাশার নিঃশ্বাস ছেড়ে হরমুন বললেন, 'আর চেষ্টা করা বৃথা। এদের মুখ থেকে তোমরা কোন কথা বের করতে পারবে না। মনে হয় লোকগুলো নির্দোষ। তবে কিন্তু আপন বিশ্বাস ও চেতনায় বড় পাকা। তৈলাক্ত খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে আমি এদেরকে যে পরিমাণ হাশীশ খাইয়েছি, তা যদি একটি ঘোড়াকে খাওয়াতাম, তাহলে ঘোড়া কথা বলতে শুরু করত। কিন্তু এদের উপর কোন ক্রিয়া-ই হল না। তার অর্থ, এদের জাতীয় চেতনা– এরা যাকে ঈমান বলে– এদের আত্মায় ঢুকে পড়েছে। আর এদের আত্মার উপর তোমরা নেশা প্রয়োগ করতে পারবে না। অন্যথায় বলতে হবে এরা নির্দোষ, ঘটনার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। '

ঠিক-ই এরা নির্দোষ। খৃস্টানরা যাকে অপরাধ মনে করে, এই মুসলমান যুবকদের কাছে তা সওয়াবের কাজ। খৃস্টানদের দৃষ্টিতে যা সন্ত্রাস, এই মুসলমানদের কাছে তা জিহাদ। আগুন লাগানো ও অপহৃত মেয়ে দু'টোর উদ্ধার অভিযানের এরা সক্রিয় কর্মী। তবে এরা নিরপরাধ।

হাশীশ তাদের অজ্ঞান করে তুলেছিল। নেশার প্রভাবে বিবেক ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের। কিন্তু তাদের আত্মা ছিল সজাগ। তাদের মুখ থেকে সামান্য ইংগিতও নিতে পারেনি খৃস্টানরা। অগত্য তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ছেলেগুলো বে-কসুর।

যুবক দু'টোর যখন চোখ খুলে, তখন জনমানবহীন একস্থানে পড়ে আছে তারা। অচেতন অবস্থায় খৃস্টানরা তাদের সেখানে ফেলে এসেছিল। জাগ্রত হয়ে চোখাচোখী করে দু'জন। তারপর উঠে চলে আসে যার যার বাড়ীতে।

কার্কের পরিস্থিতি এখন শান্ত। আগুনও নিভে গেছে। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ সংবাদেরও সত্যতা পাওয়া যায়নি। এবার দলে দলে ফিরে আসতে শুরু করেছে পালিয়ে যাওয়া নাগরিকরা। দুর্গের ফটক খুলে দেয়া হল। স্রোতের মত ঢুকতে শুরু করল জনতা। এদের-ই সঙ্গে ঢুকে পড়েছিলেন বারজিস। সঙ্গে তাঁর পনেরজন কমান্ডো।

কার্কের মানুষ দেখল, নিতান্ত সরল-সোজা যে মুচি রাস্তায় বসে মানুষের জুতা মেরামত করত, তিনদিনের অনুপস্থিতির পর আবার এসে বসে পড়েছে রাস্তায়। পনেরজন কমান্ডোকে ওসমান সারেম ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় রাতারাতি মুসলমানদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তাদের কেউ এখন দোকানের কর্মচারী। কেউ খৃস্টানদের আস্তাবলের সহিস। কেউ মসজিদের খাদেম।

এবার তাদের দেখতে হবে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী শহর আক্রমণ করলে ভিতর থেকে তারা কি সহযোগিতা করতে পারবে। খুঁজে-পেতে কর্তব্য স্থির করে তারা। তা হল, কোন এক স্থান দিয়ে দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে সুলতানের বাহিনীকে ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয়া। এ কাজের জন্য পরিবেশ তৈরি করতে শুরু করেছে তারা।

যুব সংগঠনের সদস্য বৃদ্ধি করেছে ওসমান। প্রস্তুত করে তুলেছে অনেক মেয়েকে। কিন্তু ছায়ার মত তার পিছনে লেগে আছে রাইনি আলেকজান্ডার। রাইনি পথ আগলে ধরছে ওসমান সারেমের। ঘন ঘন যাওয়া আসা করছে তার বাড়িতে। একদিন কৌতূহলবশত মেয়েটি ওসমান সারেমকে জিজ্ঞেস করে বসে, 'আন-নূর কোথায় ওসমান?'

'তোমার জাতির কোন এক পাপিষ্টের কাছে'–জবাব দেয় ওসমান– 'ওর উপর আল্লাহর লানত।'

'লানত' নয়– 'রহমত' বল ওসমান'– রাইনি বলল– 'যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করে, তাদের তোমরা শহীদ বল। আন-নূর শহীদ হয়ে গেছে।'

হঠাৎ চমকে উঠে ওসমান। কোন জবাব খুঁজে পেল না সে।

'আর মেয়ে দু'টোকে উদ্ধার করে আনার কাজে তুমিও ছিলে'- রাইনি বলল- 'তবে এখনো তুমি গ্রেফতার হওনি। আমি না বলেছিলাম, তোমার ও কয়েদখানার মাঝে আমার অস্তিত্ব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। বল, ওসমান! আর কত ত্যাগ চাও তুমি!'

ওসমান সারেম যুবক। দেহে জোশ-জযবা যতটুকু, বুদ্ধি-বিবেক ততটুকু নেই। বিচক্ষণতা অভাব আছে ছেলেটার। রাইনির কথাগুলো অস্থির করে তুলে তাকে। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে, 'রাইনি! আমার কাছে কি চাও তুমি?'

'প্রথমতঃ তুমি আমার ভালবাসা বরণ করে নাও। দ্বিতীয়তঃ এসব গোপন সন্ত্রাসী তৎপরতা থেকে ফিরে আস।' জবাব দেয় রাইনি।

'তুমি তোমার সরকার ও তোমার জাতিকে ভালবাস। তোমার হৃদয়ে আমার ভালবাসা যদি এতই গভীর হয়ে থাকে, তাহলে আমার জাতির প্রতি সমবেদনা দেখাচ্ছ না কেন?' বলল ওসমান সারেম।

'আমার না নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা আছে, না তোমার জাতির প্রতি'- বলল রাইনি- 'আমি বুঝি শুধু তোমাকে। এসব ভয়ংকর তৎপরতা থেকে আমি তোমাকে ফিরে আসতে বলছি এজন্য যে, তুমি মারা যাবে। অর্জন হবে না কিছুই। আমি আবেগতাড়িত নই। যা বাস্তব, তা-ই শুধু তোমাকে বলছি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কার্ক জয় করতে পারবেন না। আমি আব্বার নিকট থেকে শুনে বলছি। এবার যুদ্ধ অবরোধের হবে না। যুদ্ধ হবে কার্কের বাইরে অনেক দূরে। আমাদের কমান্ডাররা আইউবীর কৌশল ধরে ফেলেছেন। শোবকের পরাজয় থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছেন। আইউবীর বাহিনী এবার দুর্গ অবরোধের সুযোগ-ই পাবে না। এমতাবস্থায় তোমরা যদি শহরের ভিতর থেকে কোন তৎপরতা চালাও, তা হলে ফল একটা-ই। তোমরা হয়ত মারা পড়বে কিংবা ধরা খেয়ে অবশিষ্ট জীবন আমাদের বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুঁকে ধুঁকে অতিবাহিত করবে। আমি তোমাকে শুধু জীবিত ও নিরাপদ দেখতে চাই।'

মনোযোগ সহকারে রাইনির কথাগুলো শোনে ওসমান সারেম। তারপর অবনত মস্তকে হাঁটা দেয় সেখান থেকে। আবারো রাইনির কণ্ঠ শুনতে পায় ওসমান। 'ভেবে দেখ ওসমান, ভেবে দেখ। বিধর্মী মেয়ে বলে আমার কথাগুলো ফেলে দিও না ভাই!'

❁ ❁ ❁

'আমি আপনাদের আবারো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কার্ক আর শোবক এক নয়'- শেষবারের মত নির্দেশনা দিতে গিয়ে কমান্ডারদের উদ্দেশে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী- 'খৃষ্টানরা এখন আগের চে' বেশী সজাগ ও সতর্ক। আমি গুপ্তচর মারফত জানতে পেরেছি যে, একটি যুদ্ধ আমাদের কার্কের বাইরে লড়তে

হবে। শহরের ভিতর থেকে মুসলমানরা যদিও কোন গোপন তৎপরতা চালায়, বোধ হয় তা আমাদের উপকারে আসবে না। তার পরিণতি এ-ও হতে পারে যে, লোকগুলোর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমি তাদেরকে এত কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চাই না। তীব্র আক্রমণ-ই তাদের রক্ষা করার একমাত্র পথ।'

এরূপ আরো কিছু জরুরী নির্দেশ-উপদেশ দিয়ে কার্ক অবরোধকারী সৈন্যদের রওনা করার আদেশ দেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

সূর্যাস্তের পর বাহিনী রওনা হল। দূরত্ব বেশী নয়। সোবহে সাদেকের আগে আগে-ই শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে যায় বাহিনী। অবরোধের বিন্যাসে সম্মুখে অগ্রসর হয় এখান থেকে।

পথে কোন খৃস্টান সৈনিক চোখে পড়ল না তাদের। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারা শুনেছিল, খৃস্টান বাহিনী শহরের বাইরে ছাউনি ফেলে অবস্থান নিয়ে আছে।

কার্ক দুর্গ অবরোধ করে ফেলে মুসলিম বাহিনী। দুর্গের প্রাচীরের উপর থেকে তীরবর্ষণ শুরু হয়। তীব্র জবাবী হামলা থেকে বিরত থাকে মুসলিম বাহিনী। কোথায় প্রাচীর ভেঙ্গে বা ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে কমান্ডাররা। তীরান্দাজদেরও বিরত রাখেন তারা। কার্ক সম্পর্কে অভিজ্ঞ গুপ্তচররা শহরের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে কমান্ডারদের।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী দুর্গ অবরোধ করেছে, এ সংবাদ এখনো পায়নি নগরবাসী। অবরোধ এখনো সম্পন্ন হয়নি। পিছনটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। দু'টি ফটক আছে সেদিকটায়।

হঠাৎ অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে দুর্গের ভিতরে সেনা অবস্থানের উপর। মিনজানিকের মাধ্যমে বাইরে থেকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে সেগুলো। এটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর আবিষ্কার।

টের পেয়ে গেছে নগরবাসী। তারা দেখতে পাচ্ছে, তাদের সৈন্যরা দুর্গের প্রাচীরে উঠে বাইরের দিকে তীর ছুড়ছে সমানে। আতংক ছড়িয়ে পড়ে জনমনে। নিজ নিজ ঘরে লুকিয়ে পড়ে ইহুদী ও খৃস্টান নাগরিকরা। সেজদায় পড়ে যায় মুসলমানরা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিজয়ের জন্য দু'আ করছে তারা। বিপদজ্জনক তৎপরতায় লিপ্ত কিছু মুসলমান। তারা সমাজের যুবক শ্রেণী। মেয়েরাও আছে এদের মধ্যে। আছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পনেরজন কমান্ডো। নগরবাসীদের অস্থিরতার সুযোগে একস্থানে সমবেত হয়েছে। এ দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দেয়ার কিংবা ভেঙ্গে ফেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে তারা।

ফটক ভাঙ্গার জন্য গোলা ছুড়ল মুসলিম বাহিনী। মোটা কাঠের তৈরী মজবুত ফটক। কাঠের উপর লোহার পাত মোড়ানো। গোলার আঘাতে ভাঙ্গল না দুর্গের ফটক। উপর থেকে বৃষ্টির মত তীর ছুড়ে চলেছে খৃস্টানরা। অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে

আঘাত হানছে তীর। কামানের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছে যেখান থেকে, তীর পৌঁছে যাচ্ছে সে পর্যন্ত। তীরের আঘাতে শহীদ হয়ে গেছে কয়েকজন মুসলিম সৈনিক। আহত হয়ে পড়েছে অনেকে। আত্মরক্ষার জন্য কামানগুলো সরিয়ে নেয়া হয় আরো পিছনে। ব্যর্থ হয়ে পড়ে গোলা নিক্ষেপের প্রক্রিয়া।

প্রাচীরের উপর অবস্থিত দুশমনদের উপর তীর নিক্ষেপ করার নির্দেশ পায় মুসলিম সৈনিকরা। উপর দিক থেকে তীর ছোড়াছুড়ি চলতে থাকে দিনভর। শূন্যে তীর উড়তে-ই দেখা যাচ্ছে শুধু । ক্ষয়-ক্ষতি বেশী হচ্ছে মুসলমানদের।

প্রচীর ভাঙ্গার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে মুসলমানরা। বিশেষজ্ঞরা ঘুবে-ফিরে দেখার চেষ্টা করে চারদিক। কিন্তু তীরের জন্য কাছে ভিড়তে পারছে না তারা।

সন্ধার খানিক আগে আটজনের একটি দল এগিয়ে যায় সামনের দিকে। এখনো প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি তারা। হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসে উপর থেকে। সেই সাথে আসে বর্শা। শহীদ হয়ে যায় আটজন জানবাজের সব ক'জন। একাধিক তীর-বর্শা বিদ্ধ হয় তাদের এক একজনের গায়ে।

রাতের প্রথম প্রহর। রাইনি তার ঘরে বসা। অবসন্ন দেহে ঘরে আসে তার পিতা। 'রাতে-ই আমার ডিউটি আছে, তাড়াতাড়ি উঠতে হবে' বলেই বিছানায় গা এলিয়ে দেন তিনি। বালিশে মাথা রেখে তিনি বললেন, 'সংবাদ পেয়েছি, শহরের মুসলমানরা ভিতর থেকে ভয়ানক কিছু একটা করতে যাচ্ছে। প্রতিটি মুসলিম পরিবারের উপর নজর রাখতে হচ্ছে।' বলেই ঘুমিয়ে পড়ে রাইনির পিতা।

কিছুক্ষণ পর করাঘাত পড়ে দরজায়। চাকরের পরিবর্তে উঠে গিয়ে দরজা খুলে রাইনি। একজন বিত্তশালী মুসলমান বাইরে দাঁড়িয়ে। নতুন বড় লোক। খৃষ্টানদের দালালী করে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। রাইনি লোকটাকে চিনে। তাই আগমনের হেতু জিজ্ঞেস না করে-ই বলল, আব্বা এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন। জাগবেন কিছুক্ষণ পর। সংবাদটা আমাকে বলে যান, আমি আব্বাকে বলব। আগন্তুক বলল, না, ওনার সঙ্গে আমার সরাসরি কথা বলতে হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।

'কথাটা আমি জানতে পারি কি?' জিজ্ঞেস করে রাইনি।

'মুসলমানদের বেশ কিছু যুবক-যুবতী এই আজ রাতে ভিতর থেকে প্রাচীর ভেঙ্গে আইউবীর বাহিনীকে ভিতরে ঢোকবার সুযোগ করে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে'– জবাব দেয় আগন্তুক– 'আমি বন্ধু সেজে তাদের কাছে গিয়ে এ তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমি আরো সংবাদ পেয়েছি যে, এদের সঙ্গে বাইরে থেকে আসা কমান্ডোও আছে। সবচে' চাঞ্চল্যকর তথ্য হল, ঐ যে মুচিটি রাস্তায় বসে জুতা মেরামত করে, লোকটা আইউবীর গুপ্তচর। নাম বারজিস। তথ্যগুলো আমি তোমার পিতাকে জানাতে চাই, যাতে সময় থাকতে তিনি ব্যবস্থা নিতে পারেন।'

রাইনি কয়েকজন মুসলমানের নাম উল্লেখ করে ওসমানের নাম বলে জিজ্ঞেস করল, 'এ ছেলেটাও কি অভিযানে আছে?'

'আছে মানে? সারেমের পুত্র ওসমান-ই তো এ দলের নেতা। আর তার নেতা হল ইমাম রাজী।' জবাব দেয় আগন্তুক।

'আপনি খানিক পরে আবার আসুন। আব্বাকে একটু ঘুমুতে দিন।' অনুযোগের স্বরে বলল রাইনি।

কিন্তু যেতে চাচ্ছে না দালালটা। খৃস্টানদের খুশী করে পুরস্কার গ্রহণ করার এটি তার এক মোক্ষম সুযোগ। সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছে না লোকটা। লোকটা যে কুরআনের পরিবর্তে ক্রুশের অফাদার, বিষয়টা জানে না মুসলমানরা।

তথ্যটা ভুল নয়। আজ রাত-ই প্রাচীর ভাঙ্গার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে মুসলিম যুবক ও কমান্ডোরা। এ গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিল বেশ ক'জন আলেম-ইমাম। ছিল এই দালাল মুসলমানটাও। সবচে' বেশী আবেগ জাহির করেছিল এই লোকটা। লোকটা দুশমনের পোষা সাপ হতে পারে কল্পনাও করেনি কেউ।

ফিরে যেতে চাইছে না লোকটা। ভাবনায় পড়ে গেল রাইনি। মনে বুদ্ধি আঁটে মেয়েটা। তাকে ভিতরে বসতে না দিয়ে 'চলুন' বলে হাতের ইশারায় নিয়ে যায় বাইরে। 'ঘটনাটা বিস্তারিত বলুন' বলে লোকটার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে মেয়েটা। নিয়ে যায় একটি কূপের ধারে।

রোমাঞ্চ অনুভব করে লোকটি। এত বড় একজন অফিসারের একটি রূপসী মেয়ে হাঁটছে তার পাশাপাশি! লোকটা ভাগ্যবান মনে করে নিজেকে।

কূপের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ায় রাইনি। লোকটাও দাঁড়িয়ে আছে তার পাশ ঘেঁষে। কথা বলছে দু'জনে। দু'জনেই তাকিয়ে আছে কূপের প্রতি। আলতো পরশে লোকটার কাঁধের উপর নিজের ডান হাতটা রাখে রাইনি। উষ্ণতা অনুভব করে লোকটা। মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায় তার। চলে যায় অন্য জগতে।

কাঁধ থেকে হাতটা আস্তে আস্তে নীচে নামিয়ে আনে রাইনি। লোকটার পিঠ বরাবর এসে থেমে যায়। নিজে খানিকটা সরে আসে পিছনে। অমনি একটা ঠেলা। লোকটা পড়ে যায় কূপের ভিতর। কূপটা যেমন নোংরা, তেমনি গভীর। একটা চীৎকার ভেসে আসে রাইনির কানে। 'ধড়াম' শব্দের সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যায় তার আর্তচীৎকার।

বিজয়ের হাসি ফুটে উঠে রাইনির মুখে। ওসমান সারেমকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করতে পারত এমন একটি তথ্য কূপের গভীরে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এ-ই তার আনন্দ।

❁ ❁ ❁

সেখান থেকে-ই রাইনি দ্রুত ছুটে যায় ওসমান সারেমের ঘরে। ওসমান ঘরে নেই। জিজ্ঞেস করে মাকে। ওসমানের মা জানালেন, ছেলেটা সন্ধ্যার পরপরই কোথায় যেন গেল, এখনো ফিরেনি। ঘটনাটা বুঝে ফেলে রাইনি। বন্ধুদের নিয়ে প্রাচীর ভাঙ্গার অভিযানে-ই গেছে ওসমান। ওসমানকে বারণ করতে এসেছিল রাইনি। এক দালাল শেষ হয়েছে ঠিক, ওদের ভিতরে আরো কেউ দালাল যে নেই, তার গ্যারান্টি কি? অন্য কেউ যদি খৃস্টানদের কাছে তথ্যটা জানিয়ে দেয়, তবে তো ধরা পড়ে যাবে ওসমান।

হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে রাইনি। দুর্গের যেদিক থেকে ওসমানরা প্রাচীর ভাঙ্গার পরিকল্পনা নিয়েছিল, ছুটে যায় সেদিকে। যে মুসলমানটিকে রাইনি কূপে নিক্ষেপ করে এসেছে, সে তাকে বলেছিল, আইউবীর কমান্ডোরা প্রাচীরের উপরে উঠে তীরান্দাজ খৃস্টানদের এমনভাবে হত্যা করে ফেলবে যে, কেউ টের-ই পাবে না। যুবক-যুবতী নীচ থেকে খুড়ে খুড়ে প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবে। দুর্গের প্রাচীর মাটির তৈরী। এত চওড়া যে, দু'টি ঘোড়া পাশাপাশি দৌড়াতে পারে অনায়াসে। এই প্রাচীর খুড়ে খুড়ে ভেঙ্গে ফেলা শুধু কষ্টসাধ্য-ই নয়- দুঃসাধ্যও বটে।

প্রয়োজনে যুদ্ধ করার প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছে ওসমান বাহিনী। সঙ্গে আছে তাদের খঞ্জর ও বর্শা। সে এক দুঃসাহসী অভিযান, যা ব্যর্থ হওয়ার আশংকা-ই প্রবল। প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য তারা প্রাচীরের এমন একটি স্থান নির্বাচন করে নিয়েছে, যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।

নির্দিষ্ট স্থান অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে ওসমান বাহিনী। রাইনিও ছুটে চলেছে সেদিকে। ওসমান সারেমকে এ বিপজ্জনক অভিযান থেকে ফেরাতেই হবে রাইনির। রাইনি নিশ্চিত, লোকগুলো ধরা পড়বে আর ওসমান সারেম মারা যাবে।

ওসমান বাহিনী যাচ্ছে এক পথে আর রাইনি ধরেছে অন্য পথ। ওরা যাচ্ছে ধীরগতিতে সন্তর্পণে আর রাইনি যাচ্ছে দৌড়িয়ে। ওসমানদের আগেই গন্তব্য পৌঁছে যায় রাইনি।

অন্ধকারে এদিক-ওদিক তাকায় রাইনি। পাগলের মত হয়ে গেছে মেয়েটা। হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন ধরে ফেলে তাকে। টেনে নিয়ে যায় আড়ালে। লোকটা একজন খৃস্টান ফৌজি। রাইনির পরিচয় জানতে চায় ফৌজি। পিতার নাম উল্লেখ করে পরিচয় দেয় রাইনি। তাকে সেখান থেকে সরে যেতে বলে ফৌজি। কিন্তু রাইনি নড়ছে না এক পা-ও। ওসমানকে বাঁচাতে-ই হবে তার।

খৃস্টানদের বিশাল এক বাহিনী লুকিয়ে আছে এখানে। ফৌজি রাইনিকে বলে, মুসলমানদের একটি দল দেয়াল ভাঙ্গার জন্য রাতে এখানে আসার কথা। ওদের ধরার জন্য আমরা ওঁত পেতেছি...। অপর এক মুসলমান চর খৃস্টানদের কানে দিয়েছে সংবাদটা।

খৃস্টান সৈনিকদের এখান থেকে চলে যেতে বলতে পারে না রাইনি। তার উদ্দেশ্য ওসমানকে রক্ষা করা। একজন মুসলমান যুবকের ভালবাসা অন্ধ করে তুলেছে মেয়েটাকে। ইত্যবসরে একজন সৈনিক বলে উঠল, 'তথ্য ভুল নয়, ওরা আসছে।'

কেঁপে উঠে রাইনি। চীৎকার করে বলে, 'ওসমান! ফিরে যাও, ফিরে যাও বলছি ওসমান!'

রাইনির মুখে হাত চেপে ধরে কমান্ডার। বলে, 'মেয়েটা গুপ্তচর মনে হয়। একে বন্দী কর।'

কিন্তু রাইনিকে গ্রেফতার করার সুযোগ আর পেলনা খৃস্টানরা। প্রচন্ড কোলাহল ভেসে এল দূর থেকে।

খৃস্টানদের ফাঁদে এসে আটকা পড়েছে ওসমান বাহিনী। সংখ্যায় খৃস্টানরা বিপুল। জানবাজ মুসলিম বাহিনীটি নিজেদের সামলে নেয়ার আগেই বেষ্টনীতে পড়ে গেছে খৃস্টানদের। প্রদীপ জ্বলে উঠে চারদিকে। আলোকিত হয়ে যায় সমগ্র এলাকা। মুসলমানদের হাতে খনন-যন্ত্র, বর্শা ও খঞ্জর। পালাবার কোন সুযোগ নেই তাদের। গ্যাড়াকলে আটকা পড়ে গেছে দুঃসাহসী এই মুসলিম জানবাজ বাহিনীটি। এগারজন মেয়ে আছে দলে। খৃস্টান কমান্ডার উচ্চকণ্ঠে বলল, ' 'মেয়েগুলোকে জীবিত গ্রেফতার করে নাও।' জানবাজদের একজন ঘোষণা করল, 'মুজাহিদগণ! পালাবে না কিন্তু। মেয়েগুলোকে একজন একজন করে সঙ্গে রেখে লড়াই চালিয়ে যাও।'

দু'দলে যুদ্ধ শুরু হল। তীব্র এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। মুসলমানদের সব ক'জনই প্রশিক্ষিত লড়াকু। সংখ্যায় নগন্য হওয়া সত্ত্বেও তারা খৃস্টানদের অস্থির করে তুলে। বীর বিক্রমে লড়াই করছে মেয়েরাও। উত্তেজিত করছে যুবকদের। তাদের ধরতে আসা বেশ ক'জন খৃস্টানকে খঞ্জরের আঘাতে যমের হাতে তুলে দেয় তারা।

ইতিমধ্যে এসে পড়ে খৃস্টানদের আরো দু'প্লাটুন সৈনিক। যুদ্ধ চলছে ঘোরতর। ভেসে আসে উচ্চকিত এক নারীকণ্ঠ। 'বেরিয়ে যাও ওসমান! ওসমান তুমি যে করে হোক পালাও।'

এটি রাইনির কণ্ঠ। প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে ওসমান। একজন খৃস্টান চলে আসে তার সামনে। ওসমানের হাতে খঞ্জর আর খৃস্টান সৈনিকটির হাতে তরবারী। এই বুঝি শেষ হয়ে গেল ওসমান। হঠাৎ– নিতান্ত-ই হঠাৎ একটি খঞ্জর এসে ঢুকে যায় খৃস্টান সৈনিকের পিঠে। খৃস্টান লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ছুটে পড়ে যায় হাতের তরবারীটা। এটি রাইনির খঞ্জর। ওসমানকে তরবারীর আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাইনি খঞ্জর সেঁধিয়ে দিল তার এক স্বজাতির পিঠে। ছুটে আসে আরেক

খৃস্টান। তুলে নেয় মাটিতে পড়ে থাকা তরবারীটা। ঝাপিয়ে পড়ে রাইনির উপর।

রাইনির সাহায্যে এগিয়ে যায় ওসমান। মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়ায় খৃস্টান। আঘাত হানে ওসমানের উপর। তরবারীর আঘাত খেয়ে ওসমান পড়ে যায় মাটিতে। শহীদ হয়ে যায় ওসমান।

একজন একজন করে শহীদ হয়ে গেছে সব ক'জন জানবাজ। বেঁচে আছে শুধু দু'জন। দু'টি মেয়ে। খৃস্টানদের ঘেরাওয়ে এখন আবদ্ধ তারা। হাতে তাদের খঞ্জর। ঘেরাও সংকীর্ণ হয়ে আসে ধীরে ধীরে। খৃস্টানরা অস্ত্রসমর্পণ করতে বলে তাদের। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে অসহায় মেয়ে দু'টো। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে চোখের ইশারায়। জীবন্ত ধরা খাওয়া যাবে না। আত্মহত্যা করে হলেও খৃস্টান পশুদের হাত থেকে সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করতে হবে সতীর্থদের।

মুহূর্তের মধ্যে হাতের খঞ্জর বুকে স্থাপন করে মেয়ে দু'টো। তারপর সেঁধিয়ে দেয় নিজ নিজ হৃদপিন্ডে। একই সময়ে দু'জন ধড়াম করে পড়ে যায় মাটিতে।

খৃস্টানদের হাতে আহত অবস্থায় বন্দী হয় রাইনি। ওসমানকে বাঁচাতে পারল না মেয়েটি। এই দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেছে সে।

দুর্গের দেয়াল ভাঙ্গার আশা শেষ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে ভিতরের মুসলমানদের তৎপরতা। শহীদ হয়ে গেছে আইউবীর প্রেরিত পনেরজন জানবাজ। শাহাদাতবরণ করেছেন বারজিস।

কিন্তু শুধু এ ক'জন-ই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একমাত্র ভরসা নয়। কার্ক দুর্গের পতন ঘটিয়ে-ই ছাড়বেন তিনি। অবরোধের সবেমাত্র দ্বিতীয় দিন। অপরদিকে খৃস্টনরাও সংকল্পবদ্ধ। কার্ক দুর্গের দখল তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে ছাড়বে না কিছুতে-ই।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে আটকিয়ে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

আবাবীল পাবলিকেশন্স

সিরিজ

নারীর ফাঁদ-৩

ঐতিহাসিক উপন্যাস

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

নারীর ফাঁদ-৩

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

নারীর ফাঁদ-৩

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

আবাবীল পাবলিকেশন্স

নারীর ফাঁদ-৩

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

প্রকাশক
মাওলানা আবদুল করীম
চেয়ারম্যান, আবাবীল পাবলিকেশন্স
১৩/১, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর-২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ
মার্চ-২০০৩

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার, ঢাকা

মুদ্রণ
কালার সিটি

গ্রাফিক্স
কালার ক্রিয়েশন

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

IMANDIPTO DASTAN-3 : BY ALTAMAS. PUBLISHED BY MAULANA ABDUL KARIM, ABABIL PUBLICATIONS, 13/1, KARKONBARI LANE, DHAKA-1100. 1ST EDITION : OCTOBER 2002

PRICE : TAKA 100.00 ONLY

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে—বিশেষতঃ মিসর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। তারা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দুঃসাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিল, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হল সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

বইটির মূল লেখক পাকিস্তানের প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাস। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত মূল বইটির নাম 'দাস্তান ঈমান ফোরোশূ কী'। আল্লাহ্ তাআলার পরম অনুগ্রহে অন্তত ৭-৮ খণ্ডে সমাপ্য অনূদিত সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক মহলে বেশ সমাদর লাভ করেছে। এবার তৃতীয় খণ্ডটি পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম। একে একে অপর খণ্ডগুলোও যাতে আমরা যথাসময়ে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করেন।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

বিনীত
মাওলানা আবদুল করীম
চেয়ারম্যান
আবাবীল পাবলিকেশন্স

সূচীপত্রঃ

*ফিলিস্তীনে আসব আমি......................৭
*কার্ক দুর্গের পতন..........................৫৭
*ফেরাউনের গুপ্তধন......................১০৯
*তিন গোয়েন্দা.............................১৬৫
*দুর্যোগের ঘনঘটা..........................২১১

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ফিলিস্তীনে আসব আমি

খৃস্টানদের চোখে ধূলি দিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী দুর্গ অবরোধ করে ফেললেন। খৃস্টানরা যখন টের পেল, ততক্ষণে সুলতান আইউবী কার্ক অবরোধ করে ফেলেছেন। কিন্তু সেই অবরোধ ছিল অসম্পূর্ণ– ত্রিমুখী। গুপ্তচররা সুলতান আইউবীকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, তিনি আগেভাগেই কার্ক শহরে যে কমান্ডোদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্থানীয় মুসলিম বাসিন্দারা ভেতর থেকে দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবে। কিন্তু অবরোধের চতুর্থ দিন ভেতর থেকে এসে দূত সুলতানকে সংবাদ দিল যে, আপনার প্রেরিত কমান্ডো বাহিনী এবং কয়েকজন স্থানীয় মুসলিম নাগরিক কার্কের প্রাচীর ভাঙ্গতে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম মেয়েও রয়েছে। আছে একটি খৃস্টান মেয়েও। সুলতান আইউবী এ তথ্যও পেলেন যে, কে একজন ঈমান-বিক্রেতা নামধারী মুসলমান আপনবেশে কমান্ডোদের দলে ভিড়ে তথ্য নিয়ে খৃস্টানদের কাছে ফাঁস করে দেয়। ফলে খৃস্টানরা অভিযানের প্রাক্কালে ওঁৎ পেতে দলের সব ক'জন সদস্যকে হত্যা করে ফেলে। সুলতান আইউবীকে এ সংবাদও প্রদান করা হয় যে, এখন ভেতর থেকে প্রাচীর ভাঙ্গার আর কোন আশা নেই।

খৃস্টানরা দেখতে পেল, প্রাচীর ভাঙ্গার অভিযানে নিহতরা কার্কের-ই মুসলিম যুবক-যুবতী। সেই সূত্র ধরে তারা গণহারে মুসলমানদের ধর-পাকড় শুরু করে দেয়। মুসলিম মহিলারাও তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি। যুবকদেরকে ধরে ধরে বেগার ক্যাম্পে নিক্ষেপ করে। বৃদ্ধদেরকে নিজ নিজ ঘরে এবং যুবতী মেয়েদেরকে দুর্গের সামরিক ব্যারাকে বন্দী করে রাখে। খৃস্টানদের হাতে বন্দী হয়ে কতিপয় মেয়ে আত্মহত্যাও করে ফেলে। কারণ, কাফেররা তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করবে, তা তাদের জানা ছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীও ধারণা করলেন যে, এর জন্য কার্কের মুসলমানদের চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হবে। জানবাজদের সংবাদ শুনে তিনি তার নায়েবদের উদ্দেশে বললেন–

'এটা একজন ঈমান-বিক্রেতার গাদ্দারীর ফল। একজন মাত্র গাদ্দার ইসলামের এত বিশাল একটি বাহিনীকে ব্যর্থ করে দিল। কেউ আল্লাহর নামে

নিজের জান কোরবান করছে, আবার কেউ নিজের অমূল্য ঈমানটা কাফেরদের পায়ে উৎসর্গ করছে। গাদ্দাররা ইসলামের ইতিহাসের ধারাই পাল্টে দিচ্ছে...!'

বলতে বলতে সুলতান ক্ষুব্ধ হয়ে বসা থেকে ওঠে দাঁড়ান এবং প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'অতি শীঘ্রই আমি কার্ক জয় করব এবং ঐ গাদ্দারদের উপযুক্ত শাস্তি দেব।'

সুলতান আইউবীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের অফিসার জাহেদান কক্ষে প্রবেশ করেন। সুলতান তখন বলছিলেন–

'আজ রাতেই অবরোধ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। কার্কের পেছন দিকে কোন্ বাহিনীকে পাঠাবে, একটু পরেই আমি তা জানাব।'

'ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্য ক্ষমা চাই মহামান্য আমীরে মেসের'– জাহেদান বললেন– 'বোধ হয় এখন আর আপনি অবরোধ পরিপূর্ণ করতে পারবেন না। আমরা সময় নষ্ট করে ফেলেছি।'

'তুমি কি নতুন কোন সংবাদ নিয়ে এসেছ?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

'দুশমনকে অসচেতন রেখে যেরূপ সফলতার সাথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার পূর্ণ সাফল্য আপনি উঠাতে পারলেন না'– জাহেদান জবাব দেন।

তিনি এমন অবলীলায় কথা বলছিলেন, যেন নিম্নপদস্থ অধীন কাউকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। এমনটা হবেই-বা না কেন। সুলতান তাঁর সব সিনিয়র-জুনিয়র কমান্ডার ও প্রশাসনের সব বিভাগের কর্মকর্তাদের স্পষ্ট বলে রেখেছেন যে, তারা যেন তাকে রাজা ভেবে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম না করে। সাহসিকতা ও পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে পরামর্শ দেয় এবং খোলাখুলি সমালোচনা করে। জাহেদান সুলতানের সেই নির্দেশনার উপরই আমল করছিলেন। তাছাড়া তিনি গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানও বটে। তিনি এমন একটি চোখ, যে চোখ অন্ধকারেও দেখে। তিনি এমন একটি কান, যে কান শত শত মাইল দূরের ফিসফিস কানাঘুষাও শুনতে পায়। তিনি কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তা সম্পূর্ণ অবগত। সুলতান জানেন, সফল গুপ্তচরবৃত্তি ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। বিশেষত খৃস্টানরা যেখানে সালতানাতে ইসলামিয়ায় গুপ্তচর ও নাশকতাকারীদের জাল বিছিয়ে রেখেছে, সেখানে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অতিশয় উন্নত, অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ একটি গোয়েন্দা বাহিনীর একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সফল। তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের তিনজন অফিসার আলী বিন সুফিয়ান, তাঁর দু'নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ও জাহেদান হলেন জানবাজ গুপ্তচর। বিচক্ষণতার সাথে তাঁরা খৃস্টানদের বহু পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

'আপনার তো জানা ছিল যে, খৃস্টানরা কার্কের প্রতিরক্ষা শক্ত করার

পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক সৈন্য কার্ক থেকে খানিক দূরে প্রস্তুত করে রেখেছে'– জাহেদান বললেন– 'আপনাকে এ তথ্যও দেয়া হয়েছিল, এই বাহিনীটিকে বাইরে থেকে অবরোধ ভাঙ্গার কাজে ব্যবহার করা হবে। আমার গুপ্তচরদের তথ্যাদি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, খৃস্টানরা দুর্গের বাইরে লড়াই করবে। তারপরও আপনি সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ পরিপূর্ণ করেননি। তা থেকে দুশমন উপকৃত হয়েছে।'

'তা তারা কি আক্রমণ করে ফেলেছে?' বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আজ সন্ধ্যা নাগাদ তাদের বাহিনী সেই স্থান পর্যন্ত এসে পৌঁছবে, যেখানে আমাদের কোন সৈন্য নেই'– জাহেদান জবাব দেন– 'আমার গুপ্তচররা যেসব তথ্য নিয়ে এসেছে, তার সারমর্ম হল, খৃস্টান বাহিনী থাকবে অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী। এ অভিযানে তাদের পদাতিক বাহিনী থাকবে কম। তারা আমাদের অবরোধের স্থানগুলোতে এসে পৌঁছবে এবং ডানে-বাঁয়ে হামলা করবে। তার ফল এছাড়া আর কী হবে যে, আমাদের অবরোধ ভেঙ্গে যাবে? খৃস্টানরা সংখ্যায় বিপুল বলেও সংবাদ পেয়েছি।'

'আমি তোমাকে আর তোমার সেইসব গোয়েন্দাদের ধন্যবাদ জানাই, যারা এসব তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'এটা কত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, আমি তা বুঝি। তবে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, যেসব খৃস্টান সৈন্য আমাদের অবরোধ ভাঙ্গতে এবং শূন্যস্থান পূরণ করতে আসছে, আমি তাদেরকে সেই শূন্যস্থানেই খুইয়ে ফেলব। আল্লাহর সাহায্যের উপর আমার ভরসা আছে। তোমাদের কেউ যদি গাদ্দার না হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়দান করবেন।'

'এখনো সময় আছে'– এক নায়েব বললেন– 'আপনার আদেশ পেলে আমরা এক্ষুণি তিন-চারটি ইউনিট পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং অবরোধের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে ফেলছি। এতে খৃস্টানদের হামলা ব্যর্থ হবে ইনশাআল্লাহ।'

সুলতান আইউবীর চেহারায় অস্থিরতার সামান্য ছাপও নেই। তিনি জাহেদানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার রিপোর্ট যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কি তুমি বলতে পারবে যে, খৃস্টানরা ঠিক কোন্ সময়টিতে আক্রমণের স্থানে পৌঁছবে?'

'তাদের অগ্রযাত্রা বেশ দ্রুত'– জাহেদান জবাব দেন– 'তবুও রসদ তাদের সঙ্গে আসছে না; আসছে তাদের পেছনে। এতে বুঝা যাচ্ছে, পথে তারা কোথাও বিরতি দেবে না। যদি তারা এ গতিতেই অবিরাম এগুতে থাকে, তাহলে দুপুররাত নাগাদ তারা হামলার স্থলে পৌঁছে যাবে।'

'আল্লাহ রহম করুন, যেন তারা পথে কোথাও না থামে'– সুলতান

আইউবী বললেন– 'কিন্তু তারা এসেই তো আর ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত উট-ঘোড়া নিয়ে হামলা করবে না। হামলার স্থানে এসে তারা পশুদেরকে দানা-পানি গ্রহণ ও বিশ্রামের সুযোগ দেবে। এই অবসরে তারা দেখে নেবে যে, আমাদের অবরোধে কোন ফাঁক-ফোকড় আছে কিনা। খৃস্টানরা এত নির্বোধ নয় যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি না বুঝেই হামলা করে বসবে।'

সুলতান আইউবী তার দু'তিনজন কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠালেন। তাদেরকে নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে বললেন-

'খৃস্টানরা আমাদের ফাঁদে এগিয়ে আসছে। দুর্গের পেছন দিকে আমরা যে স্থানটুকু অবরোধের বাইরে রেখেছি, তা আরো সম্প্রসারিত করে দাও। ডান ও বামের বাহিনীকে জানিয়ে দাও যে, তোমাদের পেছন থেকে হামলা আসছে। পার্শ্ব বাহিনীকে আমাদের মধ্যস্থলে এসে পড়ার সুযোগ করে দাও। খবরদার, কোন তীরান্দাজ আদেশ ছাড়া যেন তীর না ছুঁড়ে।'

এসব দিক-নির্দেশনা প্রদান করে সুলতান আইউবী নিজের স্পেশাল পদাতিক ও অশ্বারোহী তীরান্দাজ বাহিনীকে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে সেই স্থানে পৌঁছে যাওয়ার আদেশ দেন, যা খৃস্টানদের সম্ভাব্য আক্রমণের নিকটবর্তী জায়গা। এলাকাটা না সমতল, না বালুকাময়। এলাকার কোথাও টিলা, কোথাও বড় বড় পাথর খণ্ড, কোথাও গুহা। সুলতান আইউবী কমান্ডো বাহিনীর কমান্ডারকেও ডেকে আনান। তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, খৃস্টান ফৌজের পেছনে অমুক পথে তাদের রসদ আসছে। সেই রসদের বহর রাতেই পথে ধ্বংস করতে হবে। এ জাতীয় আরো কিছু নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবী তাঁবু থেকে বেরিয়ে যান এবং ঘোড়ায় চড়ে বসেন। কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাকে সঙ্গে করে সুলতান রণাঙ্গন অভিমুখে রওনা হয়ে যান।

❁ ❁ ❁

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আবেগপ্রবণ মানুষ নন। তিনি দূর থেকে অবরোধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বললেন, 'খৃস্টানদের হাত থেকে এই দুর্গ ছিনিয়ে আনা সহজ নয়। অবরোধ দীর্ঘসময় পর্যন্ত বহাল রাখতে হবে।' সুলতান দেখলেন যে, দুর্গের সামনের প্রাচীর থেকে বৃষ্টির মত তীরবর্ষণ হচ্ছে। দুর্গের ফটক পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব। তাঁর বাহিনীর অবস্থান তীরের আওতার বাইরে। কাজেই জবাবী তীরান্দাজী অনর্থক। সুলতান আইউবী দুর্গের সম্মুখ থেকে এক পার্শ্বের দিকে চলে যান। সেখানে তিনি বিস্ময়কর এক দৃশ্য দেখতে পান। তাঁর বাহিনীর একটি ইউনিট বৃষ্টির ন্যায় দুর্গের প্রাচীরের উপর তীর নিক্ষেপ করছে। অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করছে ছয়টি মিনজানিক। প্রাচীরের উপর যেখানে তীর ও অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে,

সেখানে কোন খৃস্টান সেনা চোখে পড়ছে না। তারা পেছনে সরে গেছে। সুলতান আইউবী দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা অবলোকন করছেন। এ সময়ে তার বাহিনীর চল্লিশজন সৈনিক হাতে বর্শা ও কোদাল তুলে নিয়ে দ্রুতগতিতে প্রাচীরের দিকে ছুটে যায়। তারা প্রাচীরের সন্নিকটে পৌঁছে যায়। দুর্গের প্রাচীর পাথর ও মাটি দ্বারা নির্মিত। তারা প্রাচীর ভাঙ্গতে শুরু করে। প্রাচীরের উপরে তীর ও আগুনের গোলাবর্ষণ এ জন্যই চলছিল যে, যাতে প্রাচীর ভাঙ্গার সময় দুশমন উপর থেকে তীর ছুঁড়তে না পারে।

সুলতান আইউবীর মুখ থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে আসে 'শাবাশ'। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠেন তিনি। দুর্গের প্রাচীরের উপর হট্টগোলের শব্দ শুনতে পান। সুলতানের জানবাজরা যে স্থানে প্রাচীর ভাঙ্গছিল, ঠিক তার সোজা প্রাচীরের উপর হঠাৎ বেশকিছু খৃস্টান সৈন্যের মাথা ও কাঁধ আত্মপ্রকাশ করে। পরপরই বড় বড় বালতি ও ড্রাম চোখে পড়ে। প্রাচীরের অপর দিক থেকে মাথা জাগিয়েই খৃস্টান সৈন্যরা বালতি ও ড্রামগুলো প্রাচীরের উপর দিয়ে বাইরের দিকে উল্টিয়ে ফেলে দেয়। সেগুলো থেকে জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গার বেরিয়ে আসে। এগুলো নীচে প্রাচীর ভাঙ্গার কাজে রত মুজাহিদদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। দূরের মুজাহিদরা সামনে এগিয়ে গিয়ে তীর ছুঁড়তে শুরু করে। তাদের তীরের আঘাতে বেশকিছু খৃস্টান সেনা ঘায়েল হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরের অন্য একদিক থেকে অনেকগুলো তীর মুজাহিদদের দিকে ধেয়ে আসে। তাতে তীরান্দাজ মুজাহিদদের অনেকে আহত হয়, অনেকে শহীদ হয়ে যায়। তারপর উভয় দিক থেকে বৃষ্টির মত এত অধিক তীর আসতে শুরু করে যে, যেন শূন্যে তীরের জাল বোনা হচ্ছে। জানবাজদের প্রাচীর ভাঙ্গার কাজ অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু কাজটি বেশ দুরূহ। প্রাচীরের উপর দিক অপেক্ষা নীচের দিকটা বেশী প্রশস্ত। তাদের গায়ে উপর থেকে তীর ছোঁড়া সম্ভব নয় বটে, কিন্তু তাদের উপর জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গার নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। জ্বলন্ত কয়লাভরা বালতি ও ড্রাম নিক্ষেপকারী খৃস্টান সেনারা কেউ-ই বাহ্যত মুসলিম তীরান্দাজদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু তারা তীরের আঘাত খেয়ে নীচে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগেই বাইরের দিকে আগুন ফেলে দিচ্ছে।

একদিকে উপর থেকে আগুন পড়ছে, অপরদিকে সুলতান আইউবীর জানবাজরা নিক্ষিপ্ত আগুন উপেক্ষা করে প্রাচীর ভেঙ্গে চলেছে। আরেকদিকে দু'পক্ষের মধ্যে চলছে তীর বিনিময়। অবশেষে প্রাচীর ভাঙ্গার কাজে রত মুজাহিদরা আগুনের কাছে ঘায়েল হয়ে যায়। আগুনে অনেকের গা ঝলসে যায়। তাদের কয়েকজন এমন অবস্থায় পেছনে ছুটে যায় যে, তাদের গায়ের কাপড়-চোপড়ে আগুন জ্বলছে। তারা প্রাচীরের সন্নিকট থেকে সরে যাওয়া মাত্র

উপর থেকে তীর আসতে শুরু করে। তীর তাদের পিঠে বিদ্ধ হয়। তীরের আঘাত খেয়ে তাদের সব ক'জনই শাহাদাতবরণ করে।

এবার অপর দশজন জানবাজ মুজাহিদ প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য এগিয়ে আসে। উপর থেকে দুশমনের নিক্ষিপ্ত তীর উপেক্ষা করে তারা প্রাচীরের নিকটে পৌঁছে যায়। তারা প্রাচীর ভাঙ্গার কাজ অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়। উপর থেকে তাদের গায়েও আগুনের বালতি ও ড্রাম নিক্ষেপ করা হয়। নিক্ষেপকারীদের কয়েকজন এতো উপরে উঠে আসে যে, তারা বুকে মুজাহিদদের তীর নিয়ে পেছন দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে সামনের দিকে প্রাচীরের বাইরে পড়ে যায় এবং নিজেদেরই নিক্ষিপ্ত আগুনে পুড়ে ছটফট করে মরে যায়। তবে প্রাচীর ভাঙ্গার কাজে রত এই মুজাহিদদেরও সবাই শহীদ হয়ে যায়।

সুলতান আইউবী ঘোড়া ছুটান। অপারেশনরত বাহিনীর কমান্ডারের নিকট গিয়ে বললেন, 'তোমার উপর এবং তোমাদের জানবাজদের উপর আল্লাহ্ রহম করুন। ইসলামের ইতিহাস তোমার সেই জানবাজদের আজীবন স্মরণ রাখবে, যারা আল্লাহর নামে আগুনে পুড়ে জীবন দিয়েছে। তবে এই পন্থা আপাতত বন্ধ করে দাও। পেছনে সরে যাও। এখনই এত মানুষ ও তীর নষ্ট কর না। খৃস্টানরা এই দুর্গের জন্য এত আয়োজন করে রেখেছে, যা আগে আমি কল্পনাও করিনি।'

'আর আমরাও এত অধিক কোরবানী দেব, যা খৃস্টানদের কল্পনার অতীত'– কমান্ডার বলল- 'কার্ক দুর্গের প্রাচীর এখান থেকেই ভাঙ্গব এবং আপনাকে আমরা এখান দিয়েই ভেতরে নিয়ে যাব।'

'আল্লাহ তোমার আকাঙ্খা পূর্ণ করুন'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তবে আপাতত তুমি তোমার মুজাহিদদের বাঁচিয়ে রাখ। খৃস্টানরা বাইরে থেকে হামলা করতে যাচ্ছে। তোমাদেরকে সম্ভবত দুর্গের বাইরেই যুদ্ধ করতে হবে। অবরোধ শক্ত রাখ। আমরা খৃস্টানদেরকে দুর্গের ভেতরে না খাইয়ে মারব।'

বাহিনীটিকে পেছনে সরিয়ে নেয়া হল। কিন্তু কমান্ডার সুলতান আইউবীকে বলল, 'সালারে আজমের অনুমতি হলে আমি শহীদদের লাশগুলো তুলে আনতে চাই।'

'হ্যাঁ, তুলে নিয়ে আস'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি কোন শহীদের লাশ যেখানে-সেখানে ফেলে রাখতে চাই না।'

সুলতান আইউবী সেখান থেকে চলে যান। তার জানবাজ বাহিনীটি সঙ্গীদের লাশগুলো তুলে আনে। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। যে ক'টি লাশ তুলে আনা হল, সে পরিমাণ মুজাহিদ নতুন করে শাহাদতবরণ করল। সুলতান আইউবী ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছেন। যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর পতাকা সঙ্গে রাখেন না, যাতে দুশমনরা বুঝতে না পারে যে, তিনি এখন কোথায়

আছেন। ফৌজ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে সুলতান এক পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়েন। তিনি ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন এবং একটি টিলার উপর উঠে শুয়ে পড়েন, যাতে দুশমন তাকে দেখতে না পায়। এখন তিনি কার্ক দুর্গ ও নগরীর প্রাচীর দেখতে পাচ্ছেন। অন্তত দীর্ঘ এক মাইল এলাকা এখন তার চোখের সামনে। খানিক পর তিনি শয়ন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং সাবধানে চারদিক ঘুরে-ফিরে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।

সূর্য ডুবে গেছে। সুলতান আইউবী সেখানেই আছেন। কিছুক্ষণ পর সংবাদ এল, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক পদাতিক ও অশ্বারোহী তীরান্দাজ বাহিনী এগিয়ে আসছে। তিনি দূতকে বললেন, কমান্ডারদের ডেকে আন। মুহূর্তে মধ্যে কমান্ডাররা এসে সুলতানের সামনে উপস্থিত হল। কমান্ডো বাহিনীর কমান্ডারও আছে তাদের সঙ্গে। পথ-নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবী তাকে অপারেশনে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর অন্যান্য কমান্ডারদের দিক-নির্দেশনা দিতে শুরু করেন।

✿ ✿ ✿

মধ্যরাত। দূর থেকে ঘোড়ার পদশব্দ কানে আসতে শুরু করেছে, যেন বাঁধভাঙ্গা মহাপ্লাবন ধেয়ে আসছে। জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় ফক ফক করছে চারদিক। খৃস্টানদের বিশাল এক অশ্বারোহী বাহিনী পার্বত্য এলাকার খানিক দূরে এসে পড়েছে। তাদের পেছনে উষ্ট্রারোহী বাহিনী। তাদের সংখ্যার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে, তিন হাজারের কম। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে পাঁচ থেকে আট হাজার। তবে তাদের সঠিক সংখ্যা ছিল দশ থেকে বার হাজারের মধ্যে। তাদের কমান্ডার ছিল প্রখ্যাত খৃস্টান সম্রাট রেমান্ড। দু'জন ঐতিহাসিকের মতে কমান্ডারের নাম রেনাল্ট। তবে সঠিক তথ্য হল, রেনাল্ট নয়- রেমান্ডই ছিল সেই বাহিনীর কমান্ডার। এই অভিযানের লক্ষ্যে এই বাহিনীটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত দূরবর্তী এক স্থানে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিল। আজ রাত-ই কিংবা কাল প্রত্যুষে তারা সুলতান আইউবীর কার্ক অবরোধকারী বাহিনীটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

খৃস্টান আরোহীরা ঘোড়া ও উটের পিঠ থেকে অবতরণ করে। প্রতিটি ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা খাবারের থলে। আরোহী সৈন্যদের নির্দেশ দেয়া হল, তারা যেন নিজ নিজ পশুর কাছে থাকে এবং বেশী সময়ের জন্য ঘুমিয়ে না পড়ে। তাদের পশুপালের দানা-পানি পেছনে আসছে। খৃস্টানদের পরিকল্পনা ছিল, মুসলমানদের উপর পেছন থেকে আচানক হামলা করে ঘোড়াগুলোকে দুর্গের ভেতর থেকে পানি পান করিয়ে আনবে। সুলতান আইউবীর গুপ্তচররা খৃস্টান

বাহিনীর গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখছে। খৃস্টান সেনাদের সংখ্যাধিক্য দেখে তারা ঘাবড়ে যায়।

খৃস্টান সৈন্যরা নিজ নিজ বাহনে আরোহন ও তরবারী-বর্শা প্রস্তুত রাখার নির্দেশ পায়। এটি মূলত হামলা করারই নির্দেশ। বিশাল এলাকা জুড়ে সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধভাবে তারা সম্মুখপানে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু যেইমাত্র সামনের সারিটি ঘোড়ার পিঠে কষাঘাত করে ছুটতে উদ্যত হয়, অমনি পেছন থেকে বৃষ্টির মত তীর আসতে শুরু করে। যেসব আরোহী সৈন্যের গায়ে তীর বিদ্ধ হয়, তারা কেউ ঘোড়ার উপরই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আর যেসব ঘোড়া তীরবিদ্ধ হয়, তারা নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে। উটগুলোও যেইমাত্র চলতে শুরু করল, অমনি তাদের মধ্যেও হুলস্থুল শুরু হয়ে যায়। শা শা করে তীর এসে বিদ্ধ হতে থাকে তাদের গায়ে। খৃস্টান কমান্ডার বুঝেই উঠতে পারলেন না যে, হলটা কী? তার সৈন্যবিন্যাস এভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছেই বা কেন? তিনি রাগের মাথায় চীৎকার শুরু করে দেন। দিশেহারা উট-ঘোড়াগুলো পুরো বাহিনীর মধ্যে চরম এক আতংক ছড়িয়ে দেয়। ভোরের আলো ফোটার পর রেমান্ড টের পেলেন যে, তিনি সুলতান আইউবীর গ্যাড়াকলে আটকা পড়েছেন। মুসলমানদের সংখ্যা কত, তা তাঁর জানা ছিল না। তার ধারণা, সংখ্যায় মুসলমানরা অনেক। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত নন। তিনি আক্রমণ অভিযান স্থগিত ঘোষণা করে দেন। কিন্তু ততক্ষণে তার সামনের সারির সৈন্যরা সেই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যেখানে তার পুরো বাহিনীর পৌঁছানোর কথা।

সুলতান আইউবী দুর্গ অবরোধকারী বাহিনীকে পূর্ব থেকেই সতর্ক করে রেখেছেন। তারা এই হামলাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত। শূন্যে ধূলোবালি উড়তে দেখেই তারা পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যায়। একসময় আত্মপ্রকাশ করে একদল অশ্বারোহী খৃস্টান সৈন্য। মুজাহিদরা হামলা প্রতিহত করার পজিশনে চলে যায়। তারা ডানে ও বাঁয়ে প্রস্তুত অবস্থায় ছিল। যেইমাত্র খৃস্টানদের ঘোড়ার বহর তাদের মধ্যখানে এসে পৌঁছায়, অমনি তারা দু'দিক থেকে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতক্ষণে খৃস্টানদের এই দলটি টের পেল যে, তারা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের বাহিনী পূর্বের স্থান ছেড়ে রওনা-ই হয়নি। সুলতান আইউবী নিজেই এই অভিযানের তত্ত্বাবধান করছিলেন। মোকাবেলা করার জন্য খৃস্টানরা পেছনে মোড় ঘুরায়। কিন্তু সুলতান আইউবী তাদের কৌশল আগেই ব্যর্থ করে দিয়েছেন, পেছনে সরে গিয়ে মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার জন্য তারা কোন শত্রুই খুঁজে পাচ্ছে না। আইউবীর সৈন্যরা তাদের উপর বেধড়ক তীর ছুঁড়ছে ডান-বাম ও পেছন দিক

থেকে। খৃস্টান কমান্ডাররা তাদের বাহিনীটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে ফেলে। সুলতান আইউবীর কমান্ডাররা নির্দেশনা মোতাবেক তাদের মুখোমুখি মোকাবেলা করার সুযোগই দিচ্ছে না। খৃস্টানদের ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। তারা রসদের অপেক্ষা করছে। তাদের রসদ ভোর পর্যন্ত এসে পৌঁছানোর কথা।

বেলা দ্বিপ্রহর। কিন্তু এখনো খৃস্টানদের রসদ এসে পৌঁছায়নি। সংবাদ নেয়ার জন্য কয়েকজন অশ্বারোহী ছুটে যায়। কিন্তু তারা পথে মুসলিম তীরান্দাজদের আক্রমণের শিকার হয়ে নিহত হয়। গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হলেও তারা রসদের সন্ধান পেত না। তাদের রসদের বহর রাতেই সুলতান আইউবীর গেরিলাদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে।

সুলতান আইউবী তার রিজার্ভ বাহিনী থেকে আরো ফোর্স তলব করেন এবং রেমান্ডের বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন। মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা যদি খৃস্টানদের সমানও হত, তাহলে তারা হামলা করে খৃস্টানদের সমূলে নিঃশেষ করে দিতে পারত। কিন্তু সংখ্যায় মুসলমানরা নগন্য। তাই সুলতান আইউবী তার এই সামান্য জনশক্তিকে নষ্ট করতে চাইছেন না। তিনি খৃস্টান বাহিনীটিকে ঠেলে ঠেলে পার্বত্য এলাকায় নিয়ে গিয়ে নিজের ঘেরাওয়ে নিয়ে ফেলেন। তিনি জানতেন, সময় যত গড়িয়ে যাবে, খৃস্টানরা তত হতাশ ও শক্তিহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু খৃস্টানদেরকে ঘেরাওয়ে নিয়ে ফেলে তিনি নিজেও বেশ বেকায়দায় পড়ে যান। কারণ, ঘেরাও বহাল রাখার জন্য তার বহু সৈন্য এখানে এমনভাবে আটকা পড়ে গেছে যে, তাদের দিয়ে অন্য কোন কাজ করান যাচ্ছে না।

এলাকায় পানি আছে, যা বেশ কিছুদিন পশুদের বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। আর সৈন্যদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য আছে আহত ঘোড়া ও উটের গোশত। সুলতান আইউবী নগরীর অবরোধ পরিপূর্ণ করে ফেলার নির্দেশ দেন। খৃস্টান বাহিনী কোথাও স্থির দাঁড়াতে পারছে না। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও আক্রমণের মোকাবেলা করতে হচ্ছে তাদের। এভাবে দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। সুলতান দুর্গ ও নগরীর চারপাশে ঘুরে-ফিরে দেখছেন, কোন দিক দিয়ে প্রাচীর ভাঙ্গার সুযোগ পাওয়া যায় কিনা।

✿ ✿ ✿

অবরোধের ষোল কিংবা সতেরতম দিন। সন্ধ্যাবেলা। সুলতান আইউবী নিজ তাঁবুতে বসে নায়েব ও অন্যান্যদের সঙ্গে দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গার কৌশল নিয়ে কথা বলছেন। এমন সময় এক রক্ষী ভেতরে প্রবেশ করে সংবাদ দেয়, সুদানের রণাঙ্গন থেকে দূত এসেছেন। সুলতান আইউবী চমকে উঠে বললেন, 'তাকে এক্ষুণি

ভেতরে পাঠিয়ে দাও। আল্লাহ করুন, লোকটা ভাল সংবাদ এনে থাকুক।'

দূত তাঁবুতে প্রবেশ করে। সুলতান আইউবী দেখেই চিনে ফেললেন, লোকটি দূত নয়- কোন এক সেনাদলের কমান্ডার। সুলতান তাকে অস্থির কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাল সংবাদ নিয়ে এসেছ তো?... বস।

কমান্ডার 'না সূচক' মাথা নেড়ে বলল, 'মহান সেনাপতি যেমন মনে করেন। আমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছি, ইচ্ছে হলে আপনি তাকে ভালও বলতে পারেন, আবার মন্দও বলতে পারেন। ভাল এ জন্য নয় যে, আমরা সুদানে বিজয় অর্জন করতে পারিনি। আর ভাল এ কারণে বলা যায় যে, আমরা পরাজিত কিংবা পিছপা হয়নি।'

'তার মানে পরাজয় ও পিছুহটার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাই না?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

'সেই লক্ষণ স্পষ্ট'– কমান্ডার জবাব দেয়– 'আমি আপনার আদেশ নেয়ার জন্য এসেছি যে, এখন আমরা কী করব? আমাদের স্পেশাল সৈন্যের একান্ত প্রয়োজন। যদি তার ব্যবস্থা না হয়, তাহলে পেছনে সরে না এসে উপায় নেই।'

সুলতান আইউবীর অবর্তমানে তাঁর ভাই তকিউদ্দীন মিসরের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি সুদান ও মিসরের সীমান্তবর্তী এলাকায় ফেরাউনী আমলের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খৃস্টানদের সৃষ্ট ভয়ংকর এক ড্রামা আবিষ্কার করেছিলেন। তারপরই তিনি এই ভেবে সুদান আক্রমণ করেন যে, সেখানে মিসরের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। তার উপদেষ্টাবৃন্দ ও সালারগণ বলেছিলেন, কাজটা সুলতান আইউবীর অনুমতি নিয়ে করা হোক। কিন্তু তকিউদ্দীন তা না করে এই বলে সুদান আক্রমণ করে বসেন যে, তিনি সুলতানকে এর জন্য বিরক্ত করতে চান না। এখন এই কমান্ডার সংবাদ নিয়ে এল, সুদানে তারা পরাজিত হতে চলেছে। সাধারণ দূতের পরিবর্তে তকিউদ্দীন একজন কমান্ডার এ জন্য প্রেরণ করেছেন যে, সে সুলতানকে ময়দানের সঠিক চিত্র সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত করতে পারবে। তার আগে সুলতান শুধু এতটুকু সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তকিউদ্দীন সুদান আক্রমণ করেছে।

কমান্ডার সুলতান আইউবীকে যে কাহিনী শোনায়, সংক্ষেপে তা এই–

মিসরের বর্তমান অস্থায়ী গভর্নর বাস্তবতার উপর দৃষ্টি রাখার পরিবর্তে আবেগতাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন ও নির্দেশ দেন। বস্তুত তকিউদ্দীনের আবেগ-ইচ্ছা সুলতান আইউবীর আবেগ-ইচ্ছারই অনুরূপ। কিন্তু দু'ভাইয়ের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার মধ্যে বেশ তফাৎ। তকিউদ্দীন যে ফয়সালা নিয়েছিলেন, সৎ উদ্দেশ্য ও ইসলামী চেতনা থেকেই নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই সত্যটাকে

উপেক্ষা করেছেন যে, বিচার-বিবেচনা ছাড়া দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম যুদ্ধ-জিহাদ নয়। তিনি সুদানে নিয়োজিত তার গোয়েন্দাদের রিপোর্টও গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখেননি। তিনি একটি বিষয়ই মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, খৃস্টান কমান্ডাররা সুদানীদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং সুদানীরা মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তকিউদ্দীন দুশমনকে রণসাজে প্রস্তুত অবস্থায়ই কাবু করে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো বিষয় খুটিয়ে দেখেননি যে, সুদানীদের সামরিক শক্তি কতটুকু, আক্রান্ত হলে তারা কি পরিমাণ শক্তি নিয়ে মোকাবেলা করবে, তাদের অস্ত্রের পরিমাণ কি, আরোহী সৈন্য কতজন, পদাতিক ক'জন ইত্যাদি। সবচে' গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তিনি ভেবে দেখেননি, তা হল সুদান আক্রমণ করলে পথের দূরত্ব কতটুকু হবে এবং রসদের ব্যবস্থা কিভাবে হবে?

তকিউদ্দীনের এই অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের দু'টি বিরূপ ফল শুরুতেই সামনে এসে যায়। প্রথমত সুদানীরা– অন্য শব্দে খৃস্টান সৈন্যরা তাকে সীমান্তে প্রতিরোধ করেনি। তারা তকিউদ্দীনকে সুদানের সেই অঞ্চল পর্যন্ত যাওয়ার পথ ছেড়ে দেয়, যেটি পানিহীন বিশাল মরু প্রান্তর। তকিউদ্দীন অবলীলায় সেই এলাকায় পৌঁছে যান। দ্বিতীয়ত তকিউদ্দীনের বাহিনী মূলত সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কৌশল অনুপাতে যুদ্ধ করায় অভ্যস্ত, যারা সংখ্যায় সামান্য হয়েও দুশমনের বিশাল বিশাল বাহিনীকে তছনছ করে দিতে পারঙ্গম। এই বাহিনীকে সুলতান শুধু নিজেই ব্যবহার করতে পারতেন। সুলতান আইউবী সব সময় মুখোমুখি সংঘাত পরিহার করে চলতেন। কিন্তু তকিউদ্দীন ওসবের ধার ধারলেন না। তার এই বাহিনীতে অভিজ্ঞ ও জানবাজ গেরিলা যোদ্ধাও আছে। কিন্তু এদের সঠিক ব্যবহার জানতেন সুলতান আইউবী। এদের নিয়ে সুদান পৌঁছানোর পর অবস্থা এমন হল যে, তকিউদ্দীনের সমস্ত সৈন্য একটি মাত্র বাহিনীতে-ই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। দুশমন তকিউদ্দীনকে তাদের পছন্দনীয় জায়গায় নিয়ে যায় এবং তাঁর বাহিনীর উপর সুলতান আইউবীর-ই ধারায় গেরিলা হামলা শুরু করে দেয়। তকিউদ্দীন তার জানোয়ার ও জওয়ানদের জন্য এক ফোঁটা পানিও পেলেন না। তার গেরিলা বাহিনীর কমান্ডাররা তাকে বলল, আপনি আমাদেরকে ময়দানে স্বাধীন ছেড়ে দিন। আমরা নিজের মত করে অপারেশন চালিয়ে যাই। কিন্তু তকিউদ্দীন তা মানলেন না। তিনি ভাবলেন, এতে বাহিনীর মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিবে, কেন্দ্রীয় কমান্ডে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

যখন রসদের সমস্যা সামনে এল, ততক্ষণে তকিউদ্দীন বুঝতে পারলেন, তিনি অনেক দূর চলে এসেছেন, যেখানে রসদ পৌঁছতে কয়েকদিন সময় লেগে

যাবে এবং রসদ বহনের পথও নিরাপদ নয়। আবহাওয়া এতই প্রতিকূল যে, তকিউদ্দীন সংবাদ পেয়ে যান, দুশমন তার রসদ ধ্বংস করার আগেই বাতাসের তোড়ে তার সমস্ত রসদ ও রসদবাহী পশুগুলো উড়ে গেছে।

এই দুর্ঘটনার পর গেরিলা বাহিনীর এক কমান্ডার ও তকিউদ্দীনের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হয়ে যায়। কমান্ডার বলল, আমি লড়াই করতে এসেছি লড়াই করব; কিন্তু এভাবে নয় যে, দুশমন কমান্ডো হামলা চালাবে, রসদপাতি শেষ হয়ে গেছে আর আমরা কেন্দ্রীয় কমান্ডের পাবন্দ হয়ে বসে বসে মার খাব। তকিউদ্দীন আদেশের সুরে কঠোর ভাষায় জবাব দিলেন। প্রত্যুত্তরে কমান্ডার বলল, আপনার মনে রাখা উচিত যে, আপনি তকিউদ্দীন– সালাহুদ্দীন নন। আমরা সেই প্রত্যয় ও সেই পদ্ধতিতে লড়াই করব, যেভাবে লড়াই করতে আমাদেরকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী শিখিয়েছেন। আমরা গেরিলা সৈনিক। আমরা দুশমনদের রসদ ছিনিয়ে এনে নিজ বাহিনীকে খাওয়াতে অভ্যস্ত।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কমান্ডারের এ বক্তব্যের পর তকিউদ্দীন চৈতন্য ফিরে পান। তিনি নিজের ভুল উপলব্ধি করতে শুরু করেন। তিনি বুঝতে পারলেন, কমান্ডারের বক্তব্য কত বাস্তবসম্মত এবং মর্মস্পর্শী। তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, 'আমি মহান আল্লাহর আযাবকে ভয় করি। আমি এই জানবাজদেরকে– যারা ফিলিস্তিনে লড়াই করে এসেছে– অপমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চাই না।'

'তা-ই যদি হয়, তাহলে আপনার আক্রমণ করাই উচিত হয়নি'– কমান্ডার বললেন– 'আমাদের মধ্যে একজন সৈনিকও এমন নেই, যে আল্লাহর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত নয়। আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি এসে পৌঁছেছি। আর মুসলমানদের এটাই শান যে, তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে নিজেকে আল্লাহর নিকটবর্তী মনে করে। আপনি আবেগের তাড়নায় তাড়িত হয়ে বের হয়েছেন। আমরা দুশমনের ফাঁদে এসে পৌঁছেছি।'

তকিউদ্দিন আনাড়ি নন। সুলতান আইউবীর সেই উক্তিটি তার স্মরণ আছে যে, তিনি বলেছিলেন, নিজেকে রাজা ভেবে অন্যকে আদেশ কর না এবং জিহাদের ময়দানে গিয়ে নিজের ভুল এড়িয়ে যেও না। তাই কমান্ডারের এই কঠোর মন্তব্যকে তিনি গোস্তাখী মনে করেননি এবং তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বতন সব কমান্ডারকে ডেকে এনে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা ও আগামী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত হল, কমান্ডো বাহিনীকে জবাবী আক্রমণ করার জন্য ছড়িয়ে দেয়া হবে। রসদ পরিবহনের রাস্তাও তারা নিজেদের দখলে নিয়ে আসবে। বাহিনী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, তাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দুশমনের উপর তিনদিক থেকে হামলা করা হবে।

এবারকার বন্টন ও বিন্যাসে উপকার এই হল যে, তকিউদ্দীনের বাহিনী সেই এলাকা থেকে বেরিয়ে গেল, যেখানে পানি নেই। আছে শুধু বালি আর টিলা। কিন্তু একটি অসুবিধাও হল এই যে, এতে সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে তারা নিজ নিজ পজিশনে গিয়ে শত্রুর উপর আঘাত হানার আগেই শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে আরো বিক্ষিপ্ত করে দিল। মুজাহিদদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কমান্ডাররা নিজ নিজ বাহিনীকে আলাদা করে সুলতান আইউবীর শেখানো পন্থায় যুদ্ধ শুরু করল। কিন্তু তারপরও স্পষ্ট বুঝ হয়ে গেল যে, এই লড়াইয়ে তারা পেরে উঠবে না। তবু তারা ময়দানে অটল থাকার চেষ্টা চালিয়ে যায়। রসদ ও রিজার্ভ বাহিনীর সহযোগিতা পাওয়ার আশা তো সম্পূর্ণই তিরোহিত। কমান্ডো বাহিনী শত্রুর উপর অতর্কিত হামলা করে শত্রুর ক্ষতিসাধন করছে আর খাদ্য-খাবার যা পাচ্ছে ছিনিয়ে আনছে। এই ছিনিয়ে আনা খাবার খেয়েই মুজাহিদরা টিকে থাকার চেষ্টা করছে।

মুজাহিদদের এখন আর কেন্দ্রীয় কমান্ড নেই। তকিউদ্দীন তাঁর কর্মকর্তাদের নিয়ে দৌড়-ঝাঁপে ব্যস্ত। তিনি আগে যতটা আবেগতাড়িত ছিলেন, এখন ততটা শান্ত ও গম্ভীর। অনেকটা আশান্বিতও বটে। এ যাবত তাকে এমন কোন সংবাদ শুনতে হয়নি যে, অমুক দল বা বাহিনী শত্রুর হাতে অস্ত্র সমর্পণ করেছে। সংঘাত-সংঘর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিক্ষিপ্ত হয়ে এখন সুদানের অর্ধেকটায় ছড়িয়ে পড়েছে। মুজাহিদ কমান্ডাররাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, তারা এভাবে যুদ্ধ চালিয়েই যাবে। তারা সুদান ত্যাগ করবে না। এখন দুমশনেরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এক পর্যায়ে দুশমন দিশেহারা হয়ে পড়ে। মুজাহিদদেরকে কিভাবে সুদান ত্যাগে বাধ্য করা যায়, সেই চিন্তায় তারা অস্থির হয়ে পড়ে। মুসলিম সৈন্যরা মরু ও আবাদী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানদের কি পরিমাণ সৈন্য নিহত হয়েছে, তার কোন পরিসংখ্যান কেন্দ্রের কাছে নেই। তবে এতটুকু অনুমান করা যাচ্ছে যে, শত্রুও অনেকটা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং এখন আর তাদের মিসর আক্রমণের শক্তি-সাহস নেই। কিন্তু এ পদ্ধতির যুদ্ধ স্পষ্ট কোন সুফল বয়ে আনবে না। কোন এলাকা জয় করা যাবে না। মরা আর মারা ছাড়া এ যুদ্ধের কোন ফলাফল নেই।

এমনি পরিস্থিতিতে তকিউদ্দীন তার একজন কমান্ডার মারফত সুলতান আইউবীর নিকট মৌখিক পয়গাম প্রেরণ করেন। তিনি সুলতান আইউবীকে বলার জন্য বলে দেন যে, এখন সুদান অভিযানে সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায়, আপনি সাহায্য প্রেরণ করুন। আমার সমস্ত সৈন্য বিভক্ত হয়ে গেরিলা অভিযান চালাচ্ছে। এই অভিযান দ্বারা সাফল্য অর্জন করতে হলে আরো সৈন্য

প্রয়োজন। তকিউদ্দীন কমান্ডারকে সুলতান আইউবীর নিকট থেকে এ প্রশ্নেরও জবাব নিয়ে আসতে বলে দেন যে, সাহায্য না পেলে কি আমি সুদানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া সৈন্যদেরকে একত্রিত করে মিসর ফিরে যাব? বর্তমানে মিসরে যে ফৌজ আছে, তা মিসরের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসন এবং সীমান্ত সংরক্ষণের জন্যই যথেষ্ট নয়। কাজেই তাদেরকে ভিন্ন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করার প্রশ্নই আসে না। তবে সুলতান আইউবী পিছুটানে বিশ্বাসী নন। তকিউদ্দীনের সমস্যার সমাধান দেয়া তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান।

❁ ❁ ❁

তকিউদ্দীনের এই দূত সুলতান আইউবীকে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছিল বটে, কিন্তু খৃস্টান ও সুদানীরা সেখানে আরো যে একটি যুদ্ধক্ষেত্র চালু করে রেখেছিল, সে সম্পর্কে কিছু বলেনি। সম্ভবত সে যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে তার জানা ছিল না। সে তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল অনেক পরে।

তকিউদ্দীনের সৈন্যরা দশ-দশজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুদানের কোন কোন এলাকায় যাযাবরদের ঝুপড়ি এবং তাঁবুও ছিল। কোথাওবা সবুজ-শ্যামল বাগান। অধিকাংশ এলাকা পতিত, অনাবাদী ও বালুকাময়।

একদিন সন্ধ্যায় তিনজন গেরিলা মুজাহিদ ফিরে এসে সিনিয়র এক কমান্ডারের সামনে উপস্থিত হয়। তাদের দু'জন আহত। তারা কমান্ডারকে জানায়, আমাদের দলে একুশজন মুজাহিদ ছিল। কমান্ডারসহ বাইশজন। আমরা দিনের বেলা একস্থানে লুকিয়ে ছিলাম। কমান্ডার এদিক-ওদিক টহল দিচ্ছিলেন, যেন তিনি পাহারা দিচ্ছেন কিংবা কারো আগমনের অপেক্ষা করছেন। এমন সময় এক সুদানী উষ্ট্রারোহী এদিক দিয়ে পথ অতিক্রম করতে শুরু করে। আমাদের কমান্ডারকে দেখে সে থেমে যায়। কমান্ডার তার নিকট এগিয়ে যান এবং তার সঙ্গে কি যেন কথা বলেন। আরোহী চলে গেলে কমান্ডার আমাদেরকে সুসংবাদ শোনান যে, এখান থেকে দু'মাইল দূরে একটি গ্রাম আছে, সেখানকার অধিবাসীরা মুসলমান। আরোহী আমাদের আপন লোক। সে আমাদেরকে সেই এলাকায় যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়ে গেছে। বলেছে, আমরা গেলে রাতে সেখানে আমাদের মেহমানদারী করবে এবং দুশমনের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দিয়ে হামলার কাজে সহযোগিতাও করবে।

শুনে আমরা খুশী হলাম। কিছু সময় নিরাপদে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ পাওয়ার পাশাপাশি দুশমনের উপর হামলা করারও সুযোগ পাব, এ কম কথা নয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরপরই আমরা সেই গ্রাম অভিমুখে রওনা হলাম।

সেখানে পৌঁছে দেখি, তিনটি কুঁড়ে ঘর। আশপাশে গাছ-গাছড়া এবং পানি আছে। আমাদেরকে ঝুঁপড়ির বাইরে ছাউনী ফেলতে বলা হল। কমান্ডার একটি ঝুঁপড়িতে ঢুকে পড়লেন। বাইরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হল এবং আমাদের সবাইকে খাবার খাওয়ান হল। কমান্ডার বললেন, এবার তোমরা শুয়ে পড়; আক্রমণের সময় হলে জাগিয়ে দেব। আমরা ক্লান্ত সৈনিকরা শুয়ে পড়লাম। আমি শুয়ে পড়লেও ঘুমালাম না। বিষয়টা আমার কাছে কেমন যেন খটকা লাগছিল। হঠাৎ একটি ঝুঁপড়িতে একাধিক নারীর অট্টহাসির শব্দ কানে আসতে লাগল। আমি মাথা তুলে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলাম। মনে সন্দেহ জাগল। আমি সেদিকে আরো মনোযোগ দিলাম। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, আমাদের কমান্ডার ঝুঁপড়িতে দু'টি সুন্দরী মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করছে ও মদপান করছে। মেয়েগুলো গ্রাম্য পোশাক পরিহিত হলেও তাদেরকে গ্রাম্য বলে মনে হল না। কিছুক্ষণ পর একদিকে আমি চাপা পদশব্দ শুনতে পেলাম। একাধিক মানুষের চলার শব্দ। চাঁদের আলোতে দেখতে পেলাম, বেশকিছু মানুষ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের হাতে বর্শা ও তরবারী। আমি ঝুঁপড়ির আড়ালে চলে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, এরা কারা। কিছুক্ষণ পর একজন লোক ঝুঁপড়িতে প্রবেশ করল এবং চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কাজ সেরে ফেলব কি? আমাদের কমান্ডার বললেন, ও তোমরা এসে গেছ? সবাই ঘুমিয়ে আছে, যাও সব ক'টাকে শেষ করে দাও।

আগত লোকগুলো আমাদের ঘুমন্ত মুজাহিদদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেকে ঘুমন্ত অবস্থায়ই শহীদ হয়ে যায়। অনেকে জাগ্রত হয়ে মোকাবেলা করে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে থাকি।

কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম, আমার দু'জন সঙ্গী পালাচ্ছে। মওকা পেয়ে আমিও পালাতে শুরু করলাম এবং সঙ্গীদ্বয়ের সাথে মিলিত হলাম। তারা দু'জন আহত। আমরা সামনের দিকে এগুতে লাগলাম। কেউ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করল না।

তকিউদ্দীনের এই কমান্ডার উষ্ট্রারোহী দুশমনের প্রদত্ত লোভে পড়ে গিয়েছিল, নাকি পূর্ব থেকেই দুশমনের এজেন্ট ছিল, তা জানা না গেলেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এ যুদ্ধেও দুশমন বিক্ষিপ্ত মুসলিম সেনাদলগুলোকে নিঃশেষ করার জন্য সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করা শুরু করেছে। দুশমন মানবিক দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগাচ্ছিল।

এরূপ আরো একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। গেরিলা বাহিনীর এক কমান্ডার আতা আল-হাশেমী একস্থানে উপবিষ্ট। তার বাহিনী তিন-চারটি দলে বিভক্ত হয়ে আছে। জায়গাটা মিসর থেকে রসদ আসার পথ। আতা আল-হাশেমী–

যার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা একশ'রও কম– মিসর থেকে রসদ আসার সমস্ত রাস্তা নিরাপদ করে ফেলেছিল। রসদের উপর গেরিলা আক্রমণকারী দুশমনের তিনি ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছেন। সুদানীরা তাকে ঘায়েল করার জন্য অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু জনাপাঁচেক জানবাজকে হত্যা করা ব্যতীত তারা আর কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

আতা আল-হাশেমী টিলার আড়ালে একস্থানে বসে আছে। তার সঙ্গে ছয়-সাতজন গেরিলা। এটি তার হেডকোয়ার্টার। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, মধ্যবয়সী এক পুরুষের সঙ্গে যাযাবরের পোশাকে দু'টি রূপসী মেয়ে কোথাও যাচ্ছে। আতা আল-হাশেমীকে দেখে তারা তার কাছে চলে আসে। মেয়েগুলোকে সুদানী বলে মনে হল। কিন্তু পোশাকে তারা ছদ্মবেশী। মুখমণ্ডল ধূলিমলিন। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। মেয়ে দু'টো পুরুষ লোকটির পেছনে পেছনে হেঁটে আসে, যেন তারা লজ্জায় অবনত।

পুরুষ লোকটি মিসরী ও সুদানী মিশ্রিত ভাষায় বলল, আমি মুসলমান। এরা দু'জন আমার কন্যা। এরা ক্ষুধায় মরে যাচ্ছে। এদের খাওয়ার জন্য কিছু দিন।

আতা আল-হাশেমীর সুদানী ভাষা জানা ছিল। তিনি গেরিলা সৈনিক। সুদানী অঞ্চলে কমান্ডো অভিযানে পরিচালনার সুবিধার জন্য তিনি সুদানী ভাষা শিখেছিলেন। তার কাছে খাদ্য-খাবারেরও অভাব নেই। মুজাহিদদের রসদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তার হাতে। এ-পথে এ যাবত দু'-তিনবার রসদ অতিক্রম করে। তার থেকে প্রতিবারই তিনি নিজের বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য-খাবার রেখে দিয়েছিলেন। পানিরও অভাব নেই।

কমান্ডার তিনজনকে খাবার খেতে দেন। তারা আহার করছে। এই ফাঁকে তিনি তাদের ঠিকানা-পরিচয় জেনে নিচ্ছেন। কমান্ডার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ এবং কোথায় যাচ্ছ? পুরুষ লোকটি একটি গ্রামের নাম উল্লেখ করে বলল, আমরা অমুক এলাকার বাসিন্দা। আমাদের পুরো এলাকা যুদ্ধের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সুদানী-মুসলমান যখন, যারাই এসেছে আমাদের ক্ষতি করেছে, সহায়-সম্পদ খাদ্য-খাবার ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি আমার এই মেয়ে দু'টোকে সৈন্যদের কবল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রেখেছি। শেষ পর্যন্ত আর পেরে উঠলাম না। নিরুপায় হয়ে এদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মেয়ে দু'টোর সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমি এখন ঘরছাড়া। যে কোন প্রকারে হোক আমি মিসর চলে যেতে চাই। কিন্তু কোন পথ দেখছি না। আপনি আমাদেরকে মিসর পৌঁছিয়ে দিন– বলেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা এখানে ক'দিন থাকবে?'

'যে ক'দিন থাকব, তোমাদের তিনজনকে সঙ্গে রাখব।' আতা আল-

হাশেমী জবাব দেন।

'তুমি এই মেয়ে দু'টোকে তোমার হেফাজতে নিয়ে নাও'– মধ্যবয়সী লোকটি বলল– 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'আপনার জীবন কত কঠিন, দেখে আমার বিস্ময় লাগছে'– কোমল কণ্ঠে এক মেয়ে বলল– 'আপনার কি স্ত্রী-সন্তানদের কথা মনে পড়ে না?'

'সবই মনে পড়ে'– আতা আল-হাশেমী জবাব দেন– 'কিন্তু তাই বলে আমি আমার কর্তব্যের কথা তো ভুলতে পারি না।'

মনে হচ্ছে, যেন খাবার খেয়ে ও পানি পান করে আগন্তুকদের দেহে নতুন জীবন সঞ্চারিত হয়েছে। দু'মেয়ের একজন নিশ্চুপ থাকলেও অপরজনের মুখ খুলে গেছে। মেয়েটি যা বলল, তাতে আতা আল-হাশেমী ও তার জানবাজদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ পায়। মেয়েটি এ-ও বলল যে, আপনারা এতদূর এসে নিজেদের জীবন নষ্ট করছেন কেন?

এ কথা শোনা মাত্র আতা আল-হাশেমী উঠে দাঁড়ান। আগন্তুক তিনজনকেও উঠিয়ে দাঁড় করান এবং সঙ্গীদের ডেকে বললেন, এই সুদানীর পায়ে রশি বেঁধে আমার ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ফেল। হাশেমীর জানবাজরা কমান্ডারের নির্দেশ তামিল করে। তারা রশির এক মাথা লোকটির পায়ে বেঁধে অপর মাথা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে দেয়। আতা আল-হাশেমী এক সিপাহীকে বললেন, তুমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বস। সিপাহী ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে।

আতা আল-হাশেমী মেয়ে দু'টোকে একত্রিত পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দু'জন তীরান্দাজকে ডেকে এনে বললেন, আমি ইশারা করা মাত্র মেয়ে দু'টোর চোখের ঠিক মধ্যখানে একটি করে তীর ছুঁড়বে এবং অশ্বারোহী ঘোড়া হাঁকিয়ে দেবে। ঘোড়ার পেছনে বেঁধে রাখা সুদানী মাটিতে পড়ে আছে। ঘোড়া ছুটে চললে তার কী পরিণতি হবে, তা তার জানা ছিল। তীরান্দাজরা নিজ নিজ ধনুকে একটি করে তীর স্থাপন করে রাখে এবং অশ্বারোহী ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত দাঁড়িয়ে থাকে। আতা আল-হাশেমী সুদানী মেয়ে দু'টো এবং মধ্যবয়সী পুরুষটিকে বললেন, আমি তোমাদের তিনজনকে একবারই বলব যে, তোমরা তোমাদের আসল পরিচয় বলে দাও। যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ, স্বীকার কর। অন্যথায় পরিণতি বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

সবাই নীরব। কারো মুখে রা নেই। মেয়েরা ঘোড়ার পেছনে বাঁধা তাদের সঙ্গীর প্রতি তাকায়। সেও নিশ্চুপ। তারা পরস্পর চোখাচোখি করে মতবিনিময় করে নেয়। সুদানী প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আমাদেরকে মুক্ত করে দিন, আসল পরিচয় বলে দেব। আতা আল-হাশেমী তার সম্মুখে বসে যান এবং বলেন, আগে বল তারপর মুক্ত করব। লোকটি বলল, আরে পাষান! তোমার কাছে

আমি এত রূপসী দু'টি মেয়ে নিয়ে আসলাম, আর তুমি কিনা তাদেরকে তীরের নিশানা বানাচ্ছ! কোন অঘটন না ঘটিয়ে মেয়ে দু'টোকে বরণ করে নাও এবং সঙ্গীদের নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। এই মূল্য যদি সামান্য হয়, তাহলে বল সোনা-রূপা যা ইচ্ছা চাও, আমি সিরিয়া থেকে তোমাকে এনে দেব।

আতা আল-হাশেমী উঠে দাঁড়ান এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসা সিপাহীকে বললেন, দুলকি চালে ঘোড়া হাঁকাও, পনের-বিশ কদম চালাও।

ঘোড়া চলতে শুরু করে। কয়েক পা অগ্রসর হওয়া মাত্র সুদানী চীৎকার শুরু করে। আতা আল-হাশেমী চালককে ঘোড়া থামাতে বলেন। ঘোড়া থেমে যায়। হাশেমী লোকটির নিকটে গিয়ে বললেন, এখনো সময় আছে, সোজা করে কথা বল। লোকটি সম্মতি জানায় এবং বলে দেয় যে, আমি সুদানী গুপ্তচর। খৃস্টানরা আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে নামিয়েছে। মেয়ে দু'টো সম্পর্কে বলল, ওরা মিসরী বংশোদ্ভূত। খৃস্টানরা তাদেরকে নাশকতামূলক কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে ছেড়েছে।

আতা আল-হাশেমী লোকটির পায়ের বন্ধন খুলে দেন এবং তাকে নিজের কাছে বসিয়ে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করেন। সে জানায়–

আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, আমি সুদানে ছড়িয়েপড়া মুসলিম কমান্ডার ও সৈন্যদেরকে সুন্দরী নারী কিংবা সোনা-রূপার চমক দেখিয়ে হত্যা বা গ্রেফতার করিয়ে দেব কিংবা তাদেরকে পক্ষে নিয়ে আসব। লোকটি আরো জানায়, আতা আল-হাশেমী নামক এক মুসলিম কমান্ডার তাদের রসদ পরিবহনের পথকে এত নিরাপদ করে রেখেছে যে, তার তৎপরতায় খৃস্টান ও সুদানী গেরিলাদের অসংখ্য জীবনও নষ্ট হয় এবং মুসলমানদের রসদও গন্তব্যে পৌঁছে যায়। তাই আমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে যে, আমি আতা আল-হাশেমীকে এই মেয়েদের মাধ্যমে অন্ধ করে তাকে হত্যা করব কিংবা ফাঁদে নিয়ে গিয়ে হত্যা কিংবা বন্দী করব। আর যদি সে পাক্কা ঈমানদার বলে প্রমাণিত হয়, মেয়েদের দ্বারা ঘায়েল করা না যায়, তাহলে যে কোন কৌশলে আমাদের দলে ভিড়িয়ে নেব।

আতা আল-হাশেমী এই অনিন্দ্য-সুন্দর মেয়ে দু'টোকে কেন বরণ করল না ভেবে লোকটি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। সে তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি এত রূপসী দু'টো মেয়ে এবং সোনা-দানার প্রস্তাব কেন প্রত্যাখ্যান করলেন? জবাবে তিনি বললেন, কারণ, আমার ঈমান কাঁচা নয়।

আতা আল-হাশেমী মেয়েদেরকেও নিজের কাছে ডেকে আনেন। পূর্বে যে মেয়েটি কথা বলেছিল, সে জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবেন? তিনি বললেন, আগামীকাল সকালে আমি তোমাদেরকে

আমাদের হেডকোয়ার্টারে সালারে আজম তকিউদ্দীনের কাছে পাঠিয়ে দেব।

তিন গোয়েন্দার তল্লাশি নেয়া হল। তিনজনেরই কাছে খঞ্জর পাওয়া গেল। পুরুষ লোকটির কাছে পাওয়া গেল একটি পুটুলী। ভিতরে হাশীশ।

আতা আল-হাশেমী তার একদল জানবাজকে পাহারাদারির জন্য খানিক দূরে একস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা ফিরে এসেছে। এখন সন্ধ্যা। কমান্ডার তাদেরকে আগন্তুক তিনজনের ব্যাপারে অবহিত করেন। বলেন, এরা গুপ্তচর ও নাশকতাকারী সন্ত্রাসী। হতে পারে, এদের সঙ্গীদের জানা আছে যে, এরা আমাদের এখানে আছে এবং তারা এদেরকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য হামলা করবে। কমান্ডার গোয়েন্দাদেরকে তাদের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েন। তার চোখে ঘুম এসে যায়।

অল্পক্ষণ পরই কমান্ডারের চোখ খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে মেয়ে দু'টোর চেহারা ভেসে উঠে। তিনি ভাবনার জগতে হারিয়ে যান। কী সুশ্রী ও দেখতে নিষ্পাপ দু'টো মেয়ে! অথচ তাদের দ্বারা কাজ নেয়া হচ্ছে কত ঘৃণ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ। এরা যদি কোন মুসলিম পরিবারে জন্ম নিত, তাহলে এখন এরা কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের বধূ হয়ে সম্মানজনক জীবনযাপন করত।

ভাবতে ভাবতে নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায় আতা আল-হাশেমীর। ভাবেন, আমার স্ত্রীও তো যখন বধূবেশে আমার ঘরে এসেছিল, তখন এদেরই ন্যায় যুবতী ও মনোহারী ছিল। স্ত্রীর স্মরণ আতা আল-হাশেমীকে কল্পনার জগতে নিয়ে যায়।

জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় ফক ফক করছে চারদিক। আতা আল-হাশেমী শয়ন করেছিলেন একটি টিলার পার্শ্বে। তিনি শোয়া থেকে উঠে দাঁড়ান। পা টিপে টিপে মেয়ে দু'টো যেখানে শুয়ে আছে, সেদিকে এগিয়ে যান, যেন তিনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছেন।

মেয়ে দু'টো শুয়ে আছে একত্রে। তাদের আশপাশে ঘুমিয়ে আছে সিপাহীরা। সুদানী পুরুষটি খানিক দূরে কয়েকজন সৈনিকের বেষ্টনীতে শায়িত।

আতা আল-হাশেমী নিজের পা দ্বারা একটি মেয়ের পায়ে আলতোভাবে আঘাত করেন। কারো পায়ের ছোঁয়া অনুভব করে মেয়েটির চোখ খুলে যায়। চাঁদের আলোতে চিনে ফেলে আতা আল-হাশেমীকে। মেয়েটি উঠে বসে। আতা আল-হাশেমী তাকে তার সঙ্গে আসতে ইশারা করেন। মেয়েটি মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠে যে, অবশেষে তাহলে আমার যৌবনের যাদু এই পাথরসম কমান্ডারকে প্রভাবিত করেছে!

মেয়েটি আতা আল-হাশেমীর পেছনে পেছনে হাঁটা দেয়। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বলে কিছুই অন্য সিপাহীরা টের পায়নি।

মেয়েটিকে নিজের জায়গায় নিয়ে যান আতা আল-হাশেমী। মেয়েটির মাথায় এখন ওড়না নেই। চাঁদের আলোয় মাথার বিক্ষিপ্ত চুলগুলো সোনার তারের ন্যায় চিকচিক করছে। কমান্ডার কিছুক্ষণ মেয়েটির প্রতি পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন। মেয়েটিও একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকে কমান্ডারের প্রতি। তারপর মুখে হাসি টেনে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'আপনি ভয় করছেন দেখে আমার অবাক্ লাগছে। আমাকে আপনার নিকট আপনারই জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। আপনি কি আমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না?'

আতা আল-হাশেমীর মুখে কথা নেই। তিনি নিশ্চল মূর্তির ন্যায় চুপচাপ মেয়েটির প্রতি তাকিয়েই আছেন। মেয়েটি তার ডান হাতটা ধরে টেনে এনে নিজের ঠোঁটের সঙ্গে লাগায় এবং বলে, 'আমি জানি, আপনি আমাকে কেন ডেকেছেন এবং কী ভাবছেন।'

মুখ খুললেন কমান্ডার– 'আমি ভাবছি, তোমার পিতা আমারই মত একজন পুরুষ।' মেয়েটির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কমান্ডার বললেন– 'আমিও একজন পিতা। কিন্তু এই দুই পিতার মধ্যে আকাশ-জমিন পার্থক্য। তোমার পিতা কত আত্মমর্যাদাবোধহীন আর আমি আত্মমর্যাদার পাহারাদারি করার লক্ষ্যে নিজের সন্তানদের এতীম বানানোর চেষ্টা করছি।'

'আমার পিতা নেই'– মেয়েটির বলল–'হয়ত দেখেছি; কিন্তু স্মরণ নেই।'

'মারা গেছেন?'

'তাও মনে নেই।'

'আর মা?'

'কিছুই মনে নেই'– মেয়েটি বলল- 'এ-ও মনে নেই যে, আমি কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম, নাকি কোন যাযাবরের তাঁবুতে। কিন্তু এটা তো এমন রসহীন আলাপ করার সময় নয়।'

'আমরা সৈনিকরা স্মৃতিচারণে স্বাদ পাই'– আতা আল-হাশেমী বললেন– 'আমি তোমার মাথায়ও তোমার অতীতের দু'চারটি স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।'

'আমি স্বয়ংই একটি সুদর্শন স্মৃতি'– মেয়েটি বলল– 'যার সঙ্গে আমি সামান্য সময়ও অতিবাহিত করি, আজীবনের জন্য আমি তার স্মৃতি হয়ে যাই। আমার নিজের কোন স্মৃতি নেই।'

'তুমি নিজেকে 'সুদর্শন' নয় একটি 'ঘৃণ্য' স্মৃতি বল'– আতা আল-হাশেমী বললেন– 'তোমার দেহ থেকে আমি পাপের উৎকট গন্ধ পাচ্ছি। তুমি আমার কাছে আসলে আমি মাতাল হয়ে যাব। কোন পুরুষই তোমাকে স্মরণে রাখে না। তোমার মতো মেয়েদের শিকারীরা আজ এখানে কাল ওখানে রাত কাটায়। এক শিকার পেয়ে গেলে পূর্বের শিকারের কথা ভুলে যায়। তোমার

এই রূপ দিন কয়েকের মেহমান মাত্র। তুমি এখন আমার হাতে বন্দী। তোমার এই চেহারাটাকে আমি এই মুহূর্তে শাস্তিস্বরূপ আহত করে বিশ্রী বানিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি তা করব না। এই মরুভূমি, মদ, হাশীশ আর অপকর্ম তোমাকে অল্পদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাওয়া ফুলে পরিণত করবে। তখন কাছে টেনে নেয়ার পরিবর্তে মানুষ তোমাকে অকেজো ভেবে ছুঁড়ে ফেলবে। এই খৃস্টান আর এই সুদানীরা তোমাকে ভিক্ষা করার জন্য রাস্তায় ঠেলে দেবে।

আতা আল-হাশেমীর দৃঢ়তা ও প্রভাব মেয়েটির মনোজগতে তোলপাড় সৃষ্টি করে দেয়। তকিউদ্দীনের কমান্ডার বলছিলেন–

'আমার একটি মেয়ে আছে। বয়সে তোমার চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট হবে। আমি তাকে এমন সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেব, যে আমার ন্যায় কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে উন্নত জাতের ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে। আমার মত সে-ও রণাঙ্গনের শাহসাওয়ার হবে। আমার কন্যা বধূসাজে সাজবে। স্বামীর ঘরের রাণী হবে। স্বামীর হৃদয়-রাজ্যে রাজত্ব করবে। মানুষ আমার সৌভাগ্যশীল মেয়েটিকে এক নজর দেখতে চাইবে। কিন্তু পারবে না। আমি তাকে নিয়ে গর্ব করব। তার স্বামী তাকে এত বেশী ভালবাসবে যে, বৃদ্ধা হয়ে গেলেও সেই ভালবাসা শেষ হবে না। অপরদিকে তোমাকে দেখার জন্য কেউ অস্থির হয় না। কারণ, তুমি একটি উন্মুক্ত রহস্য। কারো অন্তরে তোমার মর্যাদা নেই। তোমাকে ভালবাসা দেবে এমন কাউকেও তুমি খুঁজে পাবে না।'

'আপনি আমার সঙ্গে এসব কথাবার্তা কেন বলছেন?' মেয়েটি এমনভাবে জিজ্ঞেস করে, যেন কথাগুলো তার ভাল লাগছে না।

'আমি তোমাকে বুঝাতে চাই যে, তোমার মত মেয়েরা পবিত্র হয়ে থাকে'– আতা আল-হাশেমী জবাব দেন– 'আমরা মুসলমানরা মেয়েদেরকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করি। তুমি যদি সতীত্ব-সম্ভ্রম ও ধর্মের অর্থ বুঝে নিতে পার, তাহলে আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করবেন। কিন্তু তুমি তা বুঝবে না। কারণ, তুমি সেই ভালবাসা সম্পর্কে অবহিত নও, যা আত্মার গভীর থেকে উত্থিত হয় এবং আত্মার গভীরে গিয়ে স্থান করে নেয়। তুমি বদনসীব। তুমি পুরুষের মোহ দেখেছ, ভালবাসা দেখনি।'

আতা আল-হাশেমী ধীরে ধীরে বলে চললেন। তার কথা বলার ভঙ্গী আর প্রভাবই আলাদা। কিন্তু মেয়েটি এই ভেবে বিস্মিত যে, এই লোকটিও তো আর দশজনের ন্যায় পুরুষ। কিন্তু লোকটি আমার এই উপচেপড়া রূপ-যৌবনকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিল না! আতা আল-হাশেমী তো পাষাণও নন। তিনি তো আপাদামস্তক আবেগে নিমজ্জিত একজন সুপুরুষ। মেয়েটি অস্থির হয়ে যায়। বলল, 'আপনার কথার মধ্যে আমি এমন নেশা ও মাদকতা অনুভব করছি, যা

আমার হাশীশে নেই। আপনার একটি কথাও আমি বুঝতে পারিনি। তথাপি প্রতিটি কথাই আমার অন্তরে দাগ কেটেছে।'

মেয়েটি বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ। এ ধরনের নাশকতামূলক কাজের জন্য বিচক্ষণতা অবশ্যকীয় গুণ। পুরুষদেরকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচানোর জন্য ওকে ছোটবেলা থেকেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পুরুষটি মেয়েটির সব বিদ্যা-বুদ্ধি অকেজো করে দিয়েছে। মেয়েটি আতা আল-হাশেমীকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করে। ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নও করে। তার বলার ভঙ্গিতে এখন পেশাদারী ভাব নেই। এখন কথা বলছে যে স্বাভাবিক গতিতে। মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, 'আপনি আমাকে কী শাস্তি দেবেন?'

'তোমাকে আমি কোন শাস্তি দিতে চাই না'- আতা আল-হাশেমী বললেন- 'আগামীকাল সকালে আমি তোমাকে আমার সালারে আজমের হাতে তুলে দেব।'

'তিনি আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন?'

'যা আমাদের আইনে লেখা আছে।'

'আপনি কি আমাকে ঘৃণা করেন?'

'না।'

'আমি শুনেছি, মুসলমানরা নাকি একের অধিক স্ত্রী রাখে'- মেয়েটি বলল- 'আপনি যদি আমাকে আপনার স্ত্রী বানিয়ে নেন, তাহলে আমি আপনার ধর্ম গ্রহণ করে আজীবন আপনার সেবা করব।'

'আমি তোমাকে আমার কন্যা বানাতে পারি- স্ত্রী নয়'- আতা আল-হাশেমী বললেন- 'কারণ, তুমি এখন আমার হাতে অসহায়। তুমি আমার আশ্রয়েও আছ, বন্দীতেও। আমি তোমার অসহায়ত্ব থেকে সুযোগ নিতে চাই না।'

❁ ❁ ❁

আতা আল-হাশেমী ও গোয়েন্দা মেয়েটি কথা বলছেন। মেয়েটির পুরুষ সঙ্গী তিনজন সৈনিকের বেষ্টনীর মধ্যে শুয়ে আছে। কিন্তু সে জাগ্রত। আতা আল-হাশেমী মেয়েটিকে নিদ্রা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সে দেখেছিল। তাতে সে এই ভেবে আনন্দিত যে, মেয়েটি মুসলিম কমান্ডারকে ফাঁদে ফেলে খুন করতে পারবে। শুয়ে শুয়ে সে মেয়েটির ফিরে আসার অপেক্ষা করছে।

দীর্ঘ সময় পর লোকটি ঘুমন্ত মুসলিমের প্রতি চোখ বুলায়। সিপাহীরা অচৈতন্য ঘুমিয়ে আছে। এই সুদানী লোকটি সন্ধ্যার পর তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছিল এবং হাসি-তামাশার মধ্যে তাদেরকে হাশীশ খাইয়ে দিয়েছিল। আতা আল-হাশেমী তল্লাশি চালিয়ে তার থেকে হাশীশের একটি পুটুলী উদ্ধার করলেও সামান্য একটু হাশীশ তার চোগার পকেটে লুকায়িত ছিল, যা আতা আল-

হাশেমী খুঁজে পাননি। রাতে গল্পের ছলে সেটুকু বের করে তিনজন সিপাহীকে খাইয়ে দেয়। মুসলিম সিপাহীরা নেশাপানে অনভ্যস্ত। তাই সামান্য একটুতেই অচেতন ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবে সুদানী পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল।

সুদানী দেখল যে, তার সঙ্গী এক মেয়ে একটি টিলার পাদদেশে মুসলিম কমান্ডার আতা আল-হাশেমীর কাছে বসে আছে। এভাবে অনেক সময় কেটে গেল, কিন্তু মেয়েটি ফিরে আসছে না। সুদানী মনে করল, বোধ হয় মেয়েটি লোকটাকে খুন করার মওকা পাচ্ছে না।

সুদানী শয়ন থেকে উঠে দাঁড়ায়। অতি সাবধানে ঘুমন্ত সিপাহীদের একটি ধনুক ও তূনীর থেকে কয়েকটি তীর হাতে তুলে নেয়। মুসলমানদের অস্ত্র দিয়েই মুসলিম কমান্ডারকে খুন করতে চাইছে সে। একপা-দু'পা করে অগ্রসর হতে শুরু করে। সামনে কয়েক ফুট উঁচু একটি জায়গা, যার কারণে আতা আল-হাশেমীকে দেখা যাচ্ছে না। পা টিপে টিপে জায়গাটা অতিক্রম করে এগিয়ে যায় লোকটি।

এবার দু'জনকেই দেখা যাচ্ছে। কমান্ডারের পিঠটা তার দিকে। তাই কমান্ডার তাকে দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটি চাঁদের আলোতে তীর-ধনুক হাতে একটি লোকের আগমন দেখতে পায়। আগত লোকটিকে চিনে ফেলে সে। আতা আল-হাশেমী নিজের মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন। খঞ্জরটা তার কোষবদ্ধ পড়ে আছে এক পার্শ্বে। মেয়েটি ঝট করে খঞ্জরটা হাতে তুলে নেয়। দেখে আতা আল-হাশেমী খঞ্জর ছিনিয়ে নেয়ার জন্য মেয়েটির প্রতি হাত বাড়ায়। কিন্তু এরই মধ্যে মেয়েটি অতি দ্রুততার সাথে নিজের সঙ্গী পুরুষটির প্রতি খঞ্জর ছুঁড়ে মারে।

দু'জনের মাঝে গজ কয়েকের ব্যবধান। অপরদিক থেকে আর্তচিৎকারের শব্দ কানে আসে। খঞ্জরটি সুদানীর ধমনীতে গিয়ে বিদ্ধ হয় এবং আহত হয়েও মেয়েটিকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে। শাঁ করে এসে তীরটি মেয়েটির বুকে বিদ্ধ হয়।

মেয়েটি যেদিকে খঞ্জর ছুঁড়ে মারল এবং যেদিক থেকে তীর আসল, আতা আল-হাশেমী সেদিকে দৌড়ে যান। সুদানী লোকটি ততক্ষণে দেহ থেকে খঞ্জরটি টেনে বের করে উঠে দাঁড়িয়ে গেছে। তার আক্রমণের আশংকায় আতা আল-হাশেমী লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পায়ের সর্বশক্তি দিয়ে লোকটির পাজরে লাথি মারেন। লোকটি দূরে ছিটকে পড়ে। আতা আল-হাশেমী নিজে পড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ান। কিন্তু সুদানী উঠতে পারল না। তার ক্ষতস্থানে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরছে। তিনি খঞ্জর কুড়িয়ে হাতে নেন এবং মেয়েটির কাছে যান। মেয়েটি নিজেরই সঙ্গী ও দেহরক্ষীর তীর বুকে নিয়ে নির্জীব পড়ে আছে। তবে এখনো সে জীবিত। তীর বের করার কোন ব্যবস্থা নেই।

মেয়েটি আতা আল-হাশেমীর হাত চেপে ধরে কাঁপা কাঁপা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আমি আপনার জীবন রক্ষা করেছি। বিনিময়ে আপনি আপনার খোদাকে বলুন, যেন তিনি আমার আত্মাকে তার আশ্রয়ে নিয়ে নেন। আমার জীবনটা পাপের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। আপনি আমাকে নিশ্চয়তা দেন, আল্লাহ এই একটি নেকীর বিনিময়ে আমার গোটা জীবনের পাপ ক্ষমা করবেন কিনা। আপনি আপনার কন্যার মাথায় যেভাবে হাত বুলান, আমার মাথায়ও সেভাবে হাত বুলিয়ে দিন।'

আতা আল-হাশেমী মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তোমার সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুমি নিজে পাপ করনি, তোমাকে দিয়ে পাপ করানো হয়েছে। এতকাল কেউ তোমাকে আলোর পথ দেখায়নি।'

প্রচণ্ড ব্যথায় মেয়েটি কুঁকিয়ে উঠে শক্ত করে আতা আল-হাশেমীর ডান হাতটা ধরে বলতে থাকে–

'এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে সুদানীদের একটি ঘাঁটি আছে। তারা সেখানে আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে অবস্থান করছে। আপনার সৈন্যরা এতবেশী ছড়িয়ে পড়েছে যে, তাদের ভাগ্যে এখন মৃত্যু বা বন্দীত্ব ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। আপনার প্রত্যেক কমান্ডার ও প্রতিটি সেনাদলের পেছনে আমার ন্যায় মেয়েদের লাগিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি এ পর্যন্ত আপনার চারজন কমান্ডারকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করেছি। আপনি মিসরের কথা ভাবুন। খৃস্টানরা সেখানে ভয়ানক ও সূক্ষ্ম জাল পেতে রেখেছে। আপনার জাতি ও সৈনিকদের মধ্যে এমন অনেক মুসলিম কর্মকর্তা আছে, যারা খৃস্টানদের বেতনভোগী গুপ্তচর ও ওফাদার। তারা আমার ন্যায় রূপসী নারী আর অঢেল সম্পদ ভোগ করছে। আপনারা মিসরকে রক্ষা করুন। সুদান ত্যাগ করে চলে যান। গাদ্দারদের চিহ্নিত করে শায়েস্তা করুন। আমি কারো নাম জানি না। যা জানা ছিল বলে দিলাম। আপনিই প্রথম পুরুষ, যিনি আমাকে কন্যা আখ্যায়িত করলেন। আপনি আমাকে পিতার স্নেহ দিয়েছেন। তারই বিনিময়স্বরূপ আমি আপনাকে এসব তথ্য প্রদান করলাম। আপনি আপনার বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে একত্রিত করুন এবং আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আগামী দু'তিন দিনের মধ্যেই আপনার উপর আক্রমণ হবে। ফাতেমী ও ফেদায়ীদের থেকে সাবধান থাকুন। তারা মিসরে এমন বহু কর্মকর্তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ও জাতির একান্ত বিশ্বস্ত ও অফাদার।'

ক্ষীণ হয়ে আসে মেয়েটির কণ্ঠস্বর। সে দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ছেড়ে স্তব্ধ হয়ে যায় চিরদিনের জন্য।

রাত কেটে ভোর হল। আতা আল-হাশেমী দু'টি লাশ ও জীবিত মেয়েকে নিয়ে তকিউদ্দীনের নিকট চলে যান। তকিউদ্দীনকে ঘটনা শোনান এবং নিহত মেয়েটির শেষ কথাগুলো তার কানে দেন। এসব নিয়ে তকিউদ্দীন পূর্ব থেকেই উদ্বিগ্ন। তিনি আরো বিচলিত হয়ে উঠেন। বললেন, 'তবে আমি সুলতান আইউবীর অনুমতি ব্যতীত পিছপা হতে চাই না। আমি বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল এক কমান্ডারকে কার্ক পাঠিয়েছি। তোমরা তার ফিরে আসা পর্যন্ত অটল থাক।'

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবী দূতের বিবৃত যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে ভাবনায় পড়ে যান। তিনি তার উপদেষ্টাদের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বললেন–

'বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের একত্রিত করে পেছনে সরে আসা সহজ কাজ নয়। দুশমন তাদেরকে একত্রিত হতে দেবে না। তাছাড়া পেছনে সরে আসলেই সৈন্যদেরও মনোবল ভেঙ্গে পড়বে, যারা মিসরে অবস্থান করছে। বিষয়টা তাদেরও উপর প্রভাব ফেলবে, যারা আমার সঙ্গে এখানে রয়েছে। জনগণের মনও ভেঙ্গে যাবে। তবে বাস্তবকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। বাস্তবতার দাবী হল, তকিউদ্দীন তার বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে আসুক। আমরা এ মুহূর্তে তাকে সাহায্য করতে পারছি না। কার্ক অবরোধ প্রত্যাহার করে তাকে সহযোগিতা দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ভাই বিরাট ভুল করল। আমার বড় মূল্যবান সৈন্যগুলো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'সুদানের যুদ্ধ থেকে আমাদের হাত গুটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্তই নেয়া উচিত'– পদস্থ এক কর্মকর্তা বললেন– 'নেতা ও শাসকবর্গের ভুল পদক্ষেপের কারণে সেনাবাহিনীর দুর্নাম হচ্ছে। দেশবাসীকে আমাদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া দরকার যে, সুদানে আমাদের পরাজয়ের জন্য সেনাবাহিনী দায়ী নয়।'

'সন্দেহ নেই যে, এটি আমার ভাইয়ের ভুল'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আর আমার ভুল হল, আমি তাকে এই অনুমতি দিয়ে রেখেছিলাম যে, কখনো কোন অভিযান পরিচালনা করার প্রয়োজন দেখা দিলে যেন আমাকে কিছু না জানিয়েই করে ফেলে। এখন বেচারা সাত-পাঁচ বিবেচনা না করেই এতবড় অভিযান পরিচালনা করে ফেলল এবং নিজেকে দুশমনের দয়ার উপর ছেড়ে দিল। কিন্তু আমি আমার ও আমার ভাইয়ের এই বিচ্যুতিকে দেশবাসী ও নূরুদ্দীন জঙ্গী থেকে গোপন রাখব না। আমি ইতিহাসকে ধোঁকা দেব না। আমি ইতিহাসের পাতায় লিখিয়ে রাখব যে, আমিই এই পরাজয়ের জন্য দায়ী– সেনাবাহিনী নয়। আমি সালতানাতে ইসলামিয়ার অনাগত শাসকদের জন্য এই নমুনা প্রতিষ্ঠিত করে যেতে চাই যে, তারা যেন নিজেদের ত্রুটি গোপন রেখে নির্দোষ লোকদেরকে অপদস্থ না করে। নিজের দোষ ঢেকে রেখে

নিরপরাধ লোকদের উপর দায়-দায়িত্ব চাপানো এমন এক প্রবণতা ও প্রতারণা, যা বিশ্ব ভূমণ্ডলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

সুলতান আইউবীর চেহারা লাল হয়ে যায়। কণ্ঠস্বর কাঁপতে শুরু করে। মনে হচ্ছিল, যেন তিনি 'পেছনে সরে আস' উচ্চারণ করতে চাইছে না। তিনি কখনো পিছপা হননি। তিনি অনেক কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতে লড়াই করেছেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কাছে তিনি অসহায়। তিনি তকিউদ্দীনের প্রেরিত কমান্ডারকে বললেন–

'তকিউদ্দীনকে গিয়ে বল, সে যেন তার বাহিনীকে গুটিয়ে নেয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে পেছনে পাঠিয়ে দেয়। কোথাও দুমশন ধাওয়া করলে মোড় ঘুরিয়ে দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করবে এবং এমন ধারায় লড়াই করবে, যেন দুশমন তোমাদেরকে ধাওয়া করতে করতে মিসরে ঢুকে না পড়ে। যখন যে দল মিসরে প্রবেশ করবে, তাদের সংঘবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেবে, যাতে দুশমন মিসর আক্রমণ করলে সফলতার সাথে তার মোকাবেলা করা যায়। নিরাপদে সরে আসার জন্য গেরিলা বাহিনীকে ব্যবহার করবে। কোন সেনাদলকে দুশমনের বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ অবস্থায় ফেলে আসবে না। পেছনে সরে আসার এ সিদ্ধান্ত আমি বড় কষ্টে সহ্য করছি। কারণ, আমার এই সংবাদ বরদাশত করা সম্ভব হবে না যে, তোমাদের কোন বাহিনী দুশমনের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পেছনে সরে আসা সহজ কাজ নয়। অগ্রাভিযানের তুলনায় মান-মর্যাদা বজায় রেখে নিরাপদে সরে আসা অনেক কঠিন কাজ। তোমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে। দ্রুতগামী একদল দূত সঙ্গে রাখবে। আমি লিখিত পয়গাম প্রেরণ করছি না। কারণ, পথে ধরা পড়ে গেলে দুশমন বুঝে ফেলবে যে, তোমরা পেছনে সরে যাচ্ছ।'

সুলতান আইউবী জরুরী নির্দেশনা দিয়ে দূত কমান্ডারকে বিদায় জানান। দূত রওনা হয়ে যায়।

দূতের ঘোড়ার পদশব্দ এখনো শোনা যাচ্ছে। এমন সময় জাহেদান কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং বললেন– 'কায়রো থেকে একজন দূত এসেছে।' সুলতান আইউবী তাকে ভেতরে ডেকে পাঠান। লোকটি গোয়েন্দা বিভাগের একজন পদস্থ কর্মকর্তা। মিসরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সংক্রান্ত দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন তিনি। তিনি জানান, মিসরে দুশমনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড দিন দিন বেড়েই চলেছে। আলী বিন সুফিয়ান তার পুরো বিভাগ নিয়ে তার মোকাবেলায় দিন-রাত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। পরিস্থিতি এমন নাজুক রূপ ধারণ করেছে যে, সেনা বিদ্রোহেরও আশংকা দেখা দিয়েছে।'

সুলতান আইউবীর চেহারার রঙ বিবর্ণ হয়ে যায়। সমস্যা শুধু মিসরের

হলে চিন্তার তেমন কারণ ছিল না। মিসরকে তিনি বহু আশংকাজনক সমস্যা থেকে রক্ষা করেছেন। খৃস্টান ও ফাতেমীদের অনেক ভয়ংকর নাশকতামূলক পরিকল্পনা তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন। সমুদ্রের দিক থেকে আসা খৃস্টানদের ভয়াবহ হামলা তিনি সফলতার সাথে প্রতিহত করেছেন। খলীফাকে পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি দেশের পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে রেখেছেন। কিন্তু কার্ক অবরোধ করে এখন তিনি সেখানে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে গেছেন। এই ময়দানে তার অনুপস্থিতি যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। কার্ক অবরোধ ছাড়াও তিনি দুর্গের বাইরে খৃস্টানদের অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। এই অবরুদ্ধ খৃস্টান বাহিনী অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে সুলতান আইউবী তাঁর দুশমনের জন্য আপদ হয়ে আবির্ভত হয়েছেন। এই যুদ্ধ তাঁর তত্ত্বাবধান ছাড়া লড়া সম্ভব নয়।

সুলতান আইউবীর আশংকা, তকিউদ্দীন যদি পলায়নের ধারায় পিছপা হতে শুরু করে, তাহলে শত্রু বাহিনী তাকে ওখানেই খতম করে সোজা মিসরে ঢুকে পড়বে। মিসরে যে পরিমাণ সৈন্য আছে, তারা হামলা প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট নয়।

এদিকে সুলতান আইউবীর কার্ক অবরোধের আশু সাফল্য সংশয়পূর্ণ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। উভয় রণাঙ্গনের সার্বিক চিত্র মিসরে বিদ্রোহের আশংকা জোরদার করে তুলছে, যার ফলে সুলতান আইউবীর সুদৃঢ় পা টলতে শুরু করেছে। তিনি কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁবুর মধ্যে পায়চারী করতে থাকেন। খানিক পর মাথা তুলে বললেন–

'আমি খৃষ্টানদের সকল সৈন্যের মোকাবেলা করতে পারি। আমি তাদের সেই বাহিনীরও মোকাবেলা করতে পারি, যাদেরকে তারা ইউরোপে সমবেত করে রেখেছে। কিন্তু আমার স্বজাতীয় গুটিকতক গাদ্দার আমাকে পরাজিত করে তুলেছে। কাফেরদের এই সহযোগীরা কেন নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করছে? বোধ হয় তারা জানে, যদি তারা ধর্ম পরিবর্তন করে নতুন পরিচয় ধারণ করে, তাহলে খৃষ্টানরা তাদেরকে এই বলে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিবে যে, তোমরা ঈমানবেঁচা গাদ্দার। তাই ওরাই এদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে, তোমরা নাম-পরিচয়ে নিজ ধর্মে-ই থাক আর আমাদের থেকে বেতন-ভাতা নিয়ে গাদ্দারী কর।'

সুলতান আইউবী নীরব হয়ে যান। তাঁর তাঁবুতে যারা উপস্থিত ছিল, তারাও নীরব। সুলতান তাদের সকলের প্রতি একবার করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন–

'আল্লাহ আমাদের থেকে কঠিন পরীক্ষা নিতে চাইছেন। আমরা যদি ঈমানের

উপর অটল থাকতে পারি, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে কামিয়াব করবেন।'

সুলতান আইউবী তার সঙ্গীদের সাহস বাড়ানোর লক্ষ্যে একথা বললেন বটে; কিন্তু তার চেহারা বলছে তিনি শংকিত।

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবীকে শুধু এটুকুই জানানো হয়েছিল যে, মিসরে বিদ্রোহের আশংকা দেখা দিয়েছে এবং খৃষ্টানদের নাশকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বিস্তারিত তাকে জানানো হয়নি। এই সংক্রান্ত রিপোর্টের ব্যাখ্যা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। তার অনুপস্থিতির সুযোগে তিন-চারজন মুসলিম কর্মকর্তা খৃষ্টানদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে। সুদান আক্রমণ করার দিনকয়েক পর-ই তকিউদ্দীন মিসরে রসদ চেয়ে পাঠান। যত দ্রুত সম্ভব রসদ প্রেরণ করার নির্দেশ পাঠানো হয়। কিন্তু দু'দিন পর্যন্ত রসদ পাঠানোর কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাব আসে, একই সময়ে দু'টি ময়দান খোলা হয়েছে, এত রসদ আমি কোথা হতে দিব? এক পারি মিসরের বাহিনীকে উপোস রেখে সব খাদ্যসম্ভার ময়দানে পাঠিয়ে দিতে। এত পেট আমি ভরতে পারব না।

এই উক্তিটি যার, তিনি উচ্চপদস্থ একজন মুসলিম কর্মকর্তা এবং সুলতান আইউবীর ঘনিষ্টজনদের একজন। এমন এক ব্যক্তি, যার প্রতি সন্দেহ পোষণ করার প্রশ্নই আসেনা। ফলে তার জবাবের সত্যতা স্বীকার-ই করে নেয়া হল যে, আসলেই খাদ্যসম্ভারের অভাব রয়েছে। তথাপি তাকে অনুরোধ করা হল যে, যেভাবে সম্ভব ময়দানের যোদ্ধাদের জন্য কিছু রসদ পাঠিয়ে দিন। কর্মকর্তা কিছু রসদের ব্যবস্থা করলেন বটে, কিন্তু পাঠালেন আরো দু'দিন বিলম্ব করে।

পঞ্চম দিবসে রসদের কাফেলা রওনা হয়। উট ও খচ্চরের দীর্ঘ এক বহর। কাফেলার সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য একদল অশ্বারোহী সৈনিক দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু কর্মকর্তা তাতে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি যুক্তি দেখান, রসদ পরিবহনের সমস্ত পথ-ই নিরাপদ, নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তিনি মিসরেও পর্যাপ্ত সৈন্যের উপস্থিতির আবশ্যকতাও ব্যক্ত করেন। অবশেষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই রসদবাহী কাফেলা রওনা হয়ে যায়। ছয়দিন পর সংবাদ আসে, রসদ পথে-ই (সুদানের অভ্যন্তরে) দুশমনের কাছে আটকা পড়ে গেছে। সুদানী সৈন্যরা পশুপালসহ সমস্ত রসদ নিয়ে গেছে এবং পশুচালকদের হত্যা করে ফেলেছে।

কায়রোর শীর্ষ কর্মকর্তাগণ অস্থির হয়ে পড়েন। এই রসদ বহর ধ্বংস হওয়া মিসরের জন্য বিরাট এক ক্ষতি। সুদান রণাঙ্গনের বাহিনীর সংকট-অনুভূতি কর্মকর্তাদের আরো ভাবিয়ে তোলে। তারা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে

বললেন, আপনি অবিলম্বে পুনরায় রসদ পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। কর্মকর্তা বললেন, বাজারে খাদ্যসামগ্রীর তীব্র অভাব। আপনারা ব্যবসায়ীদেরকে বলুন, তারা খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিক। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা হল। তারা তাদের খাদ্যগুদাম খুলে দেখায়–সব শূন্য। গোশতের জন্য দুম্বা, বকরী, গরু, মহিষ কিছু-ই পাওয়া গেল না। আরো খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মিসরে অবস্থানরত সৈন্যরাও পর্যাপ্ত রেশন পাচ্ছে না। তাই তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানায়, গ্রামাঞ্চল থেকে কোন মাল-ই আসছে না। অনুসন্ধানে জানা গেল, বাইরে থেকে মানুষ মফস্বলে এসে তরি-তরকারী, ধান-চাল ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী বাজার মূল্যের চেয়ে বেশী দামে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তার অর্থ, মিসরের খাদ্যসামগ্রী পাচার হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। এবার সকলের স্মরণ হল যে, তিন-চার বছর আগে সুলতান আইউবী মিসরের পূর্বেকার সেনাবাহিনীকে– যাদের অধিকাংশ ছিল সুদানী–বিদ্রোহের অপরাধে ভেঙ্গে দিয়ে তার অফিসার সৈন্যদেরকে সীমান্ত লাগোয়া আবাদযোগ্য জমি দিয়ে কৃষিকার্যে জুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারা এখন মিসর সরকার এবং ব্যবসায়ীদেরকে তাদের উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করছে না।

এ হল সুদান আক্রমণের প্রতিক্রিয়া। এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে মাত্র ছয়-সাত দিনের মধ্যে। ফলে মিসর সরকার খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর উপর অর্পণ করে। তারা দিন-রাত খাটা-খাটুনি করে সামান্য যা পেল, নিরাপত্তা হেফাজতে সুদানের রণাঙ্গন অভিমুখে পাঠিয়ে দেয়া হল।

রসদ সংকটের বিষয়টি মিসরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য প্রচণ্ড মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর আগে এমন খাদ্যসংকট কখনো দেখা যায়নি। তারা এই চিন্তায়ও অস্থির হয়ে পড়েন যে, সুলতান আইউবী নিজে যদি রসদ চেয়ে বসেন, তা হলে কি জবাব দেবেন। মিসরে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে, একথা সুলতান বিশ্বাস-ই করবেন না। এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হল। তাদের মধ্যে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সালীম আল-ইদরীসও রয়েছেন। সে সময়কার অপ্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, আল-ইদরীস সেই কমিটির প্রধান ছিলেন। অপর দু'জন ছিলেন তার থেকে মাত্র এক স্তর নিম্নপদের বে-সামরিক কর্মকর্তা।

রাতে কমিটির বৈঠক বসে। দু'সদস্য আল-ইদরীসকে বললেন, সুলতান আইউবী একত্রে দু'টি ময়দান খুলে মারাত্মক ভুল করেছেন। আর তকিউদ্দীন তো পরাজয়ের গ্লানি মাথায় না নিয়ে ফিরছেন না।

'ফিলিস্তীন মুসলমানদের ভূখণ্ড'– আল-ইসরীস বললেন–'ওখান থেকে খৃষ্টানদের বিতাড়িত করা আবশ্যক। মুসলমানরা ওখানে পশুর মত জীবন-

যাপন করছে। ওখানকার মুসলিম নারীদের ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা নেই। মসজিদসমূহ আস্তাবলে পরিণত হয়েছে।'

'এ-সবই প্রচারণা'– বলল একজন– 'আপনি কি নিজ চোখে দেখেছেন যে, ফিলিস্তীনে খৃষ্টানরা মুসলমানদের উপর জুলুম করছে?'

'প্রচারণা নয়–আমি বাস্তব সত্য আপনাদের বলেছি'– আল-ইদরীস বললেন।

'আমাদের থেকে সত্য গোপন করা হচ্ছে'– অপরজন বলল– সালাহুদ্দীন আইউবী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বটে, কিন্তু সত্য প্রকাশ করতে আমাদের ভয় করা উচিত নয়। দেশ দখলের মোহ আইউবীকে স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না। আইউবী খান্দানকে তিনি শাহী খান্দানে পরিণত করতে চাইছেন। খৃষ্টান বাহিনী অপ্রতিরোধ্য ঝড়। তাদের মোকাবেলা করার সাধ্য আমাদের নেই। খৃষ্টানরা যদি আমাদের দুশমন হত, তাহলে তারা ফিলিস্তীনের পরিবর্তে মিসর কব্জা করে নিত। তাদের এত সৈন্য আছে যে, এতদিন তারা আমাদের ক্ষুদ্র বাহিনীকে পিষে ফেলতে পারত। তারা আমাদের নয়– সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন।'

'আপনার কথাগুলো আমার কাছে অসহ্য লাগছে'–আল-ইদরীস বললেন–' এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আসুন আমরা আসল কথা বলি।'

'কথাগুলো আমারও কাছে অসহনীয়'–একজন বলল– 'কিন্তু এক ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ পূরণের জন্য আমাদের গোটা জাতির স্বার্থ ত্যাগ করা উচিত হবে না। আপনি উভয় ময়দানের জন্য রসদ সরবরাহের কথা বলছেন। কিন্তু রসদের অবস্থা তো দেখছেন যে, পাওয়া যাচ্ছে না। সুদানের ময়দান ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি ভাবছি, এই ময়দানের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেব। তকিউদ্দীন পিছনে সরে আসবেন আর সাধারণ সৈন্যরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।'

'এ-ও তো হতে পারে যে, আমরা রসদ না পাঠালে তকিউদ্দীন অপারগতাবশত দুশমনের হাতে ধরা পড়ে যাবে'– আল-ইদরীস বললেন– 'এমনও হতে পারে যে, নিরুপায় হয়ে আমাদের সৈন্যরা দুশমনের হাতে আত্মসমর্পণ করবে।'

'আত্মসমর্পণ করুক, আমরা পরাজয়ের দায় সৈন্যদের উপর চাপিয়ে দেব।' লোকটি বলল।

'আপনি কেন এমনটি বলছেন?' আল-ইদরীস বললেন।

'আমার চিন্তা খুবই স্পষ্ট'– লোকটি জবাব দেয়– 'সালাহুদ্দীন আইউবী আমাদের উপর সামরিক শাসন চাপিয়ে দিতে চাইছেন। তিনি খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ করে জাতিকে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, জাতির নিরাপত্তার জিম্মাদার শুধু সেনাবাহিনী আর জাতির ভাগ্য সেনাবাহিনীর হাতে। আইউবী যদি সত্যিই শান্তিপ্রিয় মানুষ হতেন, তাহলে তিনি খৃষ্টান ও সুদানীদের

সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে শান্তির পথ বেছে নিতেন।'

আল-ইদরীস হঠাৎ শিউরে উঠেন। সুলতান আইউবী-বিরোধী ও খৃষ্টানদের পক্ষপাতিত্বমূলক কথাগুলো তার সহ্য হচ্ছে না। বৈঠকে তীব্র বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। কমিটির অপর দু'সদস্য আল-ইদরীসকে কথা-ই বলতে দিচ্ছে না। অবশেষে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি বৈঠক সমাপ্ত ঘোষণা করছি। আগামীকালই আমি আপনাদের মতামত ও প্রস্তাবাবলী নিয়ে ময়দানে আমীরে মেসের-এর নিকট পাঠিয়ে দেব।'

তিনি রাগের মাথায়-ই উঠে দাঁড়ান।

অপর দু'সদস্যের একজন সেখান থেকে চলে যায়। দ্বিতীয়জন–যার নাম আরসালান–আল ইদরীস-এর সঙ্গে থেকে যায়। আরসালান বলল, আপনি আসলে ব্যক্তিপূজারী ও আবেগপ্রবণ মানুষ। আমি সত্য কথা বললাম আর আপনি ক্ষেপে গেলেন। এখন আপনার প্রতি আমার পরামর্শ, 'আমার বিরুদ্ধে আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে কিছু-ই লিখবেন না। এর অন্যথা হলে আপনার জন্য ভাল হবেনা।'

লোকটির কণ্ঠস্বর চ্যালেঞ্জ ও হুমকিমিশ্রিত। আল-ইদরীস তার প্রতি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন। আরসালান বলল, 'সুযোগ দিলে আমি আপনার সঙ্গে নির্জনে আরো কিছু কথা বলতে চাই।'

'এখানেই বলুন।' আল-ইদরীস বললেন।

'আমার ঘরে চলুন'–আরসালান বলল– 'খাবার আমার ঘরে খাবেন। তবে খেয়াল রাখবেন এই সাক্ষাৎ হবে একেবারে গোপনীয়।'

আল-ইদরীস আরসালান-এর সঙ্গে তার ঘরে চলে যান। ভিতরে ঢোকার পর তার মনে হল, যেন তিনি কোন রাজমহলে এসেছেন। অথচ আরসালান তেমন উচ্চপদের কর্মকর্তাও নয়।

দু'জন একটি কক্ষে উপবিষ্ট। এমন সময়ে এক অতিশয় রূপসী যুবতী আকর্ষণীয় একটি সোরাহী ও রূপার গোলাকার একটি থালায় করে রূপার দু'টি গ্লাস হাতে কক্ষে প্রবেশ করে এবং পাত্রগুলো তাদের সম্মুখে রেখে দেয়। আল-ইদরীস ঘ্রাণ থেকে-ই বুঝে ফেললেন, পাত্রের পদার্থগুলো মদ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আরসালান, 'তুমি মুসলমান হয়ে মদপান করছ?'

আরসালান মুচকি হেসে বলল, 'এক চুমুক পান করুন, তাহলে আপনিও সেই সত্যকে বুঝতে পারবেন, যা আমি আপনাকে বুঝাতে চাচ্ছি।'

দু'জন সুদানী ভিতরে প্রবেশ করে। তাদের হাতে চকমকে তশতরীতে রকমারী খাবার। আল-ইদরীস বিস্ময়ভরা চোখে আরসালান-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আরসালান বলল, 'অবাক্ হবেন না মোহতারাম ইদরীস! এই শান-

শওকত আপনিও লাভ করতে পারেন। আমিও আপনার ন্যায় একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। কিন্তু আজ দেখুন কেমন রূপসী দু'টি যুবতী আমার ঘরের শোভা বৃদ্ধি করেছে। আপনি দামেস্ক ও বাগদাদের আমীর-উজীরদের ঘরে গিয়ে দেখুন, তারাও এরূপ রূপসী যুবতী মেয়েদের দিয়ে হেরেম পূর্ণ করেছে। দেখবেন, ওদের হেরেমে মদের বন্যা বইছে।'

'এই রূপসী মেয়ে, এই ঐশ্বর্য, এই মদ খৃষ্টানদের গোলামীর আশির্বাদ'—আল-ইদরীস বললেন—'নারী আর মদ সালতানাতে ইসলামিয়ারকে ফোক্‌লা করে দিল।'

'আপনি দেখছি, সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাষায় কথা বলছেন'— আরসালান বলল—'এ আপনার দুর্ভাগ্য।'

'তুমি কী বলতে চাও?'— আল-ইদরীস ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন—'আমার মনে হচ্ছে তুমি ক্রুসেডারদের জালে আটকা পড়েছ।'

'আমি সোনবাহিনীর গোলামে পরিণত হতে চাই না'—আরসালান বলল—'আমি সেনাবাহিনীকে আমার গোলাম বানাতে চাই। তার একমাত্র পন্থা হল, সুদানে তকিউদ্দীনকে রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিন। বিশেষ সাহায্য আসছে বলে তাকে ধোঁকা দিতে দিতে এবং মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে দিয়ে তাকে যুদ্ধে জড়িয়ে রাখতে হবে, যাতে সে সুদানীদের হাতে অস্ত্রসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তকিউদ্দীন সুদানীদের হাতে মারা পড়বে এবং তার বাহিনী চিরদিনের জন্য ওখানেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমরা পরাজয়ের দায়ভার সেনাবাহিনীর উপর চাপিয়ে জাতির সামনে তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করব। তারপর জাতি সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীকেও ঘৃণা করতে শুরু করবে। আপনি চেষ্টা করুন, এ পন্থা অবলম্বন করলে আপনি ঠকবেন না। আপনি এর এত প্রতিদান পাবেন, আপনি যার কল্পনা করতেও পারবেন না।'

'আমি তোমার মতলব বুঝে ফেলেছি'— 'আল-ইদরীস বললেন—'তুমি আমাকে দিয়ে ঈমান বিক্রি করাতে চাও। আমার দ্বারা কক্ষনো তা হবে না।'

দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর আল-ইদরীস বললেন, 'আচ্ছা, তুমি এত ভয়ংকর কথা এমন বড় গলায় কিভাবে বলছ? আমি যে তোমাকে গ্রেফতার করে গাদ্দারীর শাস্তি দিতে পারি, সে কি তুমি ভুলে গেছ?'

'আহা, আমি কি বলতে পারবনা যে, আপনি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন?'—আরসালান বলল—'সালাহুদ্দীন আইউবী আমার বিরুদ্ধে একটি শব্দও শুনবেন না।'

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যান আল-ইদরীস। দেশের এমন পদস্থ একজন

কর্মকর্তা কত বড় এক শয়তানে পরিণত হয়ে গেল! লোকটি কেমন অহংকারের সাথে কথা বলছে!!

আল-ইদরীস নিজে একজন পরিপক্ক ঈমানদার মানুষ। তার বুঝেই আসছিল না যে, যারা নীলামে ঈমান বিক্রি করে ফিরে, তারা লাঞ্ছনার কত নিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হতে পারে!

আল-ইদরীস পদমর্যাদায় আরসালান-এর সিনিয়র। এই মুহূর্তে আরসালানকে কুপথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। আল-ইদরীস-এর কাছে তার একটিই পন্থা–ক্ষমতা প্রয়োগ করা। তিনি আরসালানকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তুমি কী বলতে চাও এবং কী করছ, তা আমার আর বুঝতে বাকী নেই। তুমি যে অপরাধে লিপ্ত হয়েছ, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমি তোমাকে এতটুকু খাতির করতে পারি যে, আগামী সাত দিনের মধ্যে যদি তুমি অবস্থান পরিবর্তন করে পথে ফিরে আস এবং দুশমনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাকে এই নিশ্চয়তা প্রদান কর যে, তুমি বাগদাদের খেলাফত ও স্বজাতির অফাদার, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি। তবে এই মুহূর্তে আমি তোমাকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলাম। এ দায়িত্ব আপাতত আমি নিজেই পালন করব। আমি তোমাকে সাতদিনের সময় দিলাম। সাতদিন অনেক দীর্ঘ সময়। এ-মুহূর্ত থেকে এ-বাড়িতে আমি তোমাকে নজরবন্দী করলাম। এমন যেন না হয় যে, অষ্টম দিনে এখান থেকে বের করে তোমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে হয়।

আল-ইদরীস বসা থেকে উঠে দাঁড়ান । তিনি দেখলেন, আরসালান মিটিমিটি হাসছে।

আরসালান বলল, 'শুনুন মোহতারাম ইদরীস! আপনার দু'টি পুত্র আছে এবং দু'জনই যুবক।

'হ্যাঁ,–আল ইদরীস বললেন–'তাতে কী হয়েছে।'

'না, কিছু-ই নয়'– আরসালান বলল–'আমি শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছি যে, আপনার দু'টি যুবক পুত্রসন্তান রয়েছে। আর এরা ছাড়া আপনার আর কোন সন্তান নেই।'

আরসালান-এর ইংগিতটা বুঝতে পারলেন না আল-ইদরীস। তিনি বললেন, 'মদ তোমার মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিয়েছে।'

বলেই তিনি বাইরে বেরিয়ে যান।

আরসালানের ঘর থেকে বের হয়ে আল-ইদরীস সোজা আলী বিন সুফিয়ানের কাছে চলে যান এবং তাঁকে আরসালান-এর ঘটনা শোনান। শুনে

আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'আরসালান আমার সন্দেহভাজনদের একজন। তবে এ-যাবত আমি তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাইনি। তথাপি লোকটাকে আমি গোয়েন্দার নজরে রেখেছি।'

আল-ইদরীস শুধু অস্থির-ই নন–বিস্মিতও যে, আরসালান এত বীরত্বের সাথে গাদ্দারীতে লিপ্ত হল কি করে! আলী বিন সুফিয়ান তাকে জানালেন, 'সে একা নয়–গাদ্দারী চলছে সুসংগঠিতভাবে। এর জীবাণু সেনাবাহিনীতেও ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কাজ, সুদান রণাঙ্গনের জন্য রসদ প্রেরণ করা। আল-ইদরীস আলী বিন সুফিয়ানকে জানালেন, আমি আরসালানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছি, রসদের এন্তেজাম এখন আমার নিজের করতে হবে। আলী বিন সুফিয়ান তাকে জানালেন, 'দেশের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। মফস্বল থেকে তরি-তরকারী, গরু, মহিষ, ভেড়া-বকরী ইত্যাদি সীমান্তের ওপারে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বাজারে খাদ্যসামগ্রীর কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, আমি আমার গুপ্তচর ও তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে দায়িত্ব দিয়েছি, তারা যেন রাতে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে এবং কোথাও খাদ্যসম্ভার চোখে পড়লে তুলে নিয়ে আসে। দীর্ঘ আলোচনার পর দু'জনে রসদ সংগ্রহের পন্থা ঠিক করে ফেলেন।

আল-ইদরীস জাতীয় কর্তব্য পালনে এতই নিমগ্ন হয়ে পড়েন যে, তার মাথা থেকে আরসালান-এর এই ইংগিত ছুটে-ই যায় যে, 'তোমার দু'টি যুবক পুত্র আছে এবং ওরাই তোমার সাকুল্য সন্তান।' পুত্রদের চরিত্রের ব্যাপারে আল-ইদরীস-এর পূর্ণ আস্থা আছে। কিন্তু মানুষের যৌবন অন্ধ হয়ে থাকে। সুলতান আইউবীর অনুপস্থিতির সুযোগে কায়রোতে অপকর্মের এমন এক ঢেউ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা যুব সমাজের চিন্তা-চেতনায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে শুরু করে। দু'-তিন বছর আগেও এমন এক তুফান উঠেছিল; সুলতান আইউবী, যা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবার এই ঢেউ জেগেছে মাটির নীচ থেকে এবং সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে। চরিত্রহীনতার এই ঢেউ জেগেছে নানারকম খেলাধুলার নামে।

এক ব্যক্তি তাঁবু খাটিয়ে ও শামিয়ানা ঝুলিয়ে খেলা দেখাতে শুরু করেছে। এই খেলা-তামাশার মধ্যে বাহ্যত আপত্তিকর কিছু ছিল না। কিন্তু শামিয়ানার ভিতরে স্থাপন করা ছোট ছোট তাঁবুতে আলাদা আলাদাভাবে যুবকদেরকে ইংগিতে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের থেকে টাকা নিয়ে কাপড়ের উপর হাতের তৈরী বিভিন্ন প্রকার চিত্র প্রদর্শন করা হয়–অশ্লীল-উলঙ্গ নারীর ছবি। ছবি দেখানোর দায়িত্ব পালন করত যুবতী মেয়েরা,

যাদের মুচকি হাসি ও অঙ্গভঙ্গিতে থাকত পাপের আবেদন।

সেখানে-ই এক পর্যায়ে যুবকদেরকে হাশীশ খাওয়ানো হত। এই লজ্জাকর ও ভয়াবহ অভিযান পরিচালিত হত মাটির উপরে। কিন্তু কেউ কুচক্রীদের ধরতে পারতনা। তার কারণ, যে-ই ছবি দেখে কিংবা হাশীশের স্বাদ উপভোগ করে আসত, সে-ই নিজের এই অপরাধপ্রবণতার কথা লুকিয়ে রাখত। সেই পাপে এমন-ই স্বাদ ছিল যে, যে একবার যেত, সে বারবার যেতে বাধ্য হত। তারা বিষয়টা বাইরে এ জন্যেও প্রকাশ করত না যে, সরকার জানতে পারলে তারা এই আনন্দ ও স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এই অপরাধের শিকার হচ্ছিল সমাজের যুবক শ্রেণী ও সেনাসদস্যরা। তাদের জন্য পর্দার অন্তরালে বেশ্যালয়ও খুলে দেয়া হয়েছিল। মুসলমানের চরিত্র ধ্বংস করার এই অভিযান কিরূপ সফল ছিল? তার জবাব কার্ক দুর্গে খৃস্টানদের ইন্টেলিজেন্স প্রধান ও মনস্তাত্বিক যুদ্ধের লড়াকু জার্মান বংশোদ্ভূত হরমুন তার সম্রাটদের দিয়েছিলেন এভাবে–

'এসব ছবি অংকন করেছে স্পেনের চিত্রকররা। এ এমন এক অশ্লীল চিত্র, যা পাথরের তৈরী পুরুষদেরকেও মাটির মূর্তিতে পরিণত করে দেয়।'

হরমুন একটি নারী-পুরুষের যুগল অশ্লীল চিত্র উপস্থিত সম্রাটদের দেখান। এটি বৃহৎ আকারের একটি ছবি, যা তুলির আঁচড়ে আকর্ষণীয় রং দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। খৃস্টান সম্রাটগণ ছবিটি দেখে পরস্পর অশ্লীল ঠাট্টা করতে শুরু করেন। হরমুন বললেন–

'আমি এমন অসংখ্য ছবি তৈরী করিয়ে মিসরের বড় বড় শহরে সে-সবের গোপন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছি। ওখান থেকে আমাদের সফলতার সংবাদ আসছে। আমি কায়রোর যুবক শ্রেণীর মধ্যে পাশবিকতা উস্কে দিয়েছি। পাশবিকতা এমন এক শক্তিশালী চেতনা, যা উত্তেজিত হয়ে উঠলে সকল সামরিক চেতনাকে–যার মধ্যে জাতীয় চেতনা অন্যতম–ধ্বংস করে দেয়। আমার তৈরী করান চিত্রসমূহ মিসরে অবস্থানরত মুসলিম সৈন্যদেরকে মানসিক ও চারিত্রিক দিক থেকে অকর্মণ্য করে দিতে শুরু করে দিয়েছে। এসব চিত্রের স্বাদ নেশার আবেদনও সৃষ্টি করে। আমি তারও ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমি অনেকগুলো রূপসী যুবতী মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কায়রো ও অন্যান্য শহর-গ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছি। ওরা উঁইপোকার ন্যায় সালাহুদ্দীন আইউবীর জাতি ও সেনাবাহিনীকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। কায়রোতে আমার যে কয়টি মেয়ে ধরা পড়েছিল, তার কারণ ভিন্ন। এবার আমি যে নতুন পন্থা অবলম্বন করেছি, তা সফল হতে চলেছে। এখন ওখানকার মুসলমানরা নিজেরাই আমার মিশনের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং তাতে শক্তি জোগাবে। তারা এই মানসিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। অল্প ক'দিন পর-ই আমি তাদের মন-

মানসিকতায় তাদের-ই স্বজাতি ও স্বদেশের বিরুদ্ধে বিষ ঢুকাতে শুরু করব।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী অত্যন্ত সতর্ক মানুষ'– উপস্থিত লোকদের একজন বলল–'তিনি যখন-ই মিসরে ফিরে আসবেন, সঙ্গে সঙ্গে তোমার সব অভিযান শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলবেন।'

'যদি তিনি মিসর পৌঁছাতে পারেন, তবে-ই তো ......'–হরমুন বললেন– 'এই প্রশ্নের জবাব আপনি-ই দিতে পারেন যে, আপনি তার অবরোধ সফল হতে দিবেন কিনা। তিনি রেমণ্ডের বাহিনীকে দুর্গের বাইরে ঘিরে ফেলেছেন এবং দুর্গ তার হাতে অবরুদ্ধ। কিন্তু এই ঘেরাও ও অবরোধ তার-ই জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। আপনি এখানে চূড়ান্ত লড়াই লড়বেন না। আইউবীকে আমাদের দুর্গ অবরোধ করে রাখতে দিন, যাতে তিনি এখানে-ই আবদ্ধ থাকেন এবং মিসর যেতে না পারেন। সুদানে আমাদের কমাণ্ডারগণ তকিউদ্দীনের বাহিনীকে অত্যন্ত সফলভাবে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। তিনি এখন না পারছেন লড়াই করতে, না পারছেন সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে। মিসরের সব বাজারের এবং ক্ষেত-খামারের সমুদয় খাদ্যসামগ্রী আমি উধাও করে ফেলেছি। আপনার প্রদত্ত অর্থ আপনাকে পূর্ণ ফল দিচ্ছে। আইউবীর এক অফাদার প্রশাসনিক কর্মকর্তা আরসালান মূলত আপনার-ই অফাদার। লোকটি আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। তার আরো কয়েকজন সহকর্মীও আমাদের সঙ্গে আছে।'

'আরসালানকে বেতন-ভাতা কত দিচ্ছ?' –ফিলিপ আগস্টান জিজ্ঞেস করলেন।

'যতটুকু একজন মুসলিম কর্মকর্তার মস্তিস্ক নষ্ট হওয়ার জন্য প্রয়োজন'– হরমুন জবাব দেন– 'নারী, মদ, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার নেশা যে কোন মুসলমানের ঈমান ক্রয় করতে পারে। আমি তা-ই ক্রয় করে নিয়েছি। আমি আপনাকে এ সুসংবাদও দিতে পারি যে, সালাহুদ্দীন আইউবী যদি এই মুহূর্তে মিসর যান, তাহলে তিনি ওখানকার জগত ভিন্ন কিছু দেখতে পাবেন। তিনি যে যুবসমাজের কথা গর্বের সাথে উল্লেখ করেন, তারা মুসলমান হয়েও ইসলামের কোন কাজে আসবে না। তাদের চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রের রশি থাকবে আমাদের হাতে। তার এই প্রজন্ম যৌন উচ্ছৃঙ্খলরূপে গড়ে উঠেছে। একই দশা তার সেই বাহিনীরও হবে, যাদেরকে তিনি মিসর রেখে এসেছেন। তাদের মধ্যে আমার ঘাতক কর্মীরা এমন অস্থিরতা ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে দিয়েছে, প্রয়োজনে যে কোন মুহূর্তে তারা বিদ্রোহ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। আজ আমি পূর্ণ আস্থার সাথে এই দাবি করতে পারি যে, আমি আপনারও আগে আমার যুদ্ধের ইতি টানতে সক্ষম হব। প্রতিপক্ষের চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা ধ্বংস করে দিতে পারলে আর সামরিক অভিযানের প্রয়োজন হবে না।'

হরমুনের এই উদ্দীপনামূলক রিপোর্ট শুনে খৃস্টান সম্রাটগণ বেজায় আনন্দিত হন। ফিলিপ অগাস্টাস সেই একই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন, যা তিনি আগেও কয়েকবার বলেছিলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের লড়াই সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে নয়–ইসলামের সঙ্গে। একদিন আইউবীর মুত্যু হবে, আমরাও মরে যাব। কিন্তু আমাদের চেতনা ও প্রত্যয় জীবিত থাকতে হবে, যাতে এক সময় ইসলামেরও মৃত্যু ঘটে এবং দুনিয়ার শাসন-ক্ষমতা ক্রুশের হাতে চলে আসে। তার জন্য আমাদের এমন এক যুদ্ধক্ষেত্র চালু করতে হবে, যদ্বারা মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ও নৈতিকতার উপর জোরদার হামলা করা যায়। আমি হরমুনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, সে এমন যুদ্ধক্ষেত্র শুধু চালু-ই করেনি, বরং অভিযানে এক পর্যায়ে সফলতাও অর্জন করেছে।'

❁ ❁ ❁

সালীম আল-ইদরীস-এর দু'টি যুবক পুত্র আছে। একজনের বয়স সতের বছর। অপরজনের একুশ। তারাও কায়রোতে খৃস্টানদের পাতা চরিত্র-বিধ্বংসী ফাঁদে পা দিয়েছিল কিনা জানা না গেলেও এতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এক সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে বড় পুত্রের গোপন সম্পর্ক ছিল। মেয়েটি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করত এবং বে-পর্দায় ঘোরাফেরা করত। মেয়েটি কোন এক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ খান্দানের সন্তান। দু'জনের মিলন হত গোপনে। যেদিন আরসালান আল-ইদরীসকে বলেছিল যে, আপনার দু'টি যুবক পুত্র আছে, তার পরদিন মেয়েটি বড়পুত্রকে বলল, অন্য এক যুবক আমাকে খুব বিরক্ত করছে। আমি যেদিকে যাই, যুবকটি আমাকে অনুসরণ করছে এবং আমাকে অপহরণ করার হুমকি দিচ্ছে। বড় পুত্র মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, যুবকটি কে? কিন্তু মেয়ে তা বলেনি। বিষয়টা তালগোল পাকিয়ে যায়। মেয়েটি আমতা আমতা করে বলল, বেশী সমস্যা হলে তোমাকে জানাব।

সেদিন সন্ধ্যায়-ই মেয়েটি তার কাছে এসে বলল, ঐ যুবকটি আমাকে সীমাহীন উত্যক্ত করতে শুরু করেছে। সে তোমার সম্পর্কে বলেছে, তোমাকে নাকি সে এমনভাবে খুন করবে যে, কেউ টের-ই পাবে না। কাজেই এখন থেকে তুমি খঞ্জর সঙ্গে রাখ, বলা যায় না কখন কী ঘটে যায়।

পরদিন সন্ধ্যায় মেয়েটি অপর যুবক-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকেও একইভাবে উত্তেজিত করে এবং বলে, এখন থেকে তুমি খঞ্জর সঙ্গে রাখ, বলা যায় না কখন কী ঘটে যায়।

অপর যুবক হল আল-ইদরীস-এর ছোট পুত্র। অর্থাৎ-মেয়েটির দু'দিকে দুই সহোদর। কিন্তু তাদের কেউ-ই জানেনা যে, মেয়েটি যে যুবক সম্পর্কে উত্তেজনার রিপোর্ট দিচ্ছে, সে তার-ই ভাই। এ-ও জানত না যে, তারা দু'ভাই

এক-ই মেয়ের জালে আটকা পড়েছে। দু'ভাই-ই খঞ্জর নিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করেছে। মেয়েটিও উভয়ের সঙ্গে পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ করতে থাকে।

মাত্র পাঁচদিনে মেয়েটি দু'ভাইকে প্রথমে পশুতে, পরে হিংস্র প্রাণীতে পরিণত করেছে। পঞ্চমদিন সন্ধ্যায় মেয়েটি বড় ভাইকে শহরের খানিক দূরে এক অন্ধকার স্থানে মিলিত হতে বলে। ছোট ভাইকেও একই সময়ে একই স্থানে উপস্থিত থাকতে বলে। মেয়েটি উভয়কে এ কথাও বলে যে, যে যুবকটি আমাকে উত্যক্ত করছে, সে বলে গেছে, আজ সন্ধ্যায় তুমি যেখানে যাবে, সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে। আমি তোমার প্রেমনিবেদনকারীকে তোমার-ই চোখের সামনে হত্যা করব। মেয়েটি জানায়, আমি তাকে বলেছি, আচ্ছা, তুমি যদি এতই বীরপুরুষ হয়ে থাক, তাহলে অমুক সময় অমুক জায়গায় এসে পড়। তুমি যদি ওকে খুন করতে পার, তাহলে আমি একান্তভাবে তোমার-ই হয়ে যাব।

দু'ভাই প্রাণঘাতী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় বড় ভাই খঞ্জর হাতে মেয়েটির নির্দেশিত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়। মেয়েটি এতই দক্ষতার পরিচয় দেয় যে, জায়গাটা নির্ধারণ করেছে অন্ধকার দেখে। এ বিষয়ের প্রতিও লক্ষ রেখেছে, যেন দু'ভাই তার পৌঁছানোর আগেই একত্রিত হয়ে একে অপরকে চিনে না ফেলে।

মেয়েটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে বড় ভাইকে উপস্থিত দেখতে পায়। সে তাকে জানায়, ঐ যুবকটি আমার পিছনে পিছনে আসছে। বড় ভাই খঞ্জর প্রস্তুত করে রাখে। খানিক পরেই ছোট ভাই এসে পৌঁছে। মেয়েটি বড় ভাইকে বলে, ও এসে পড়েছে; তবে আমি চাই না যে, তোমরা খুনাখুনিতে লিপ্ত হও। আমি গিয়ে ওকে বলি, তুমি চলে যাও। বলেই মেয়েটি ছোট ভাইয়ের নিকট ছুটে যায় এবং বলে, তোমার দুশমন পূর্ব থেকেই এখানে এসে উপস্থিত আছে। তার হাতে খঞ্জর। ছোট ভাইয়ের বিবেকের উপর যৌবনের তাজা খুন চেপে বসে আছে। ছেলেটি খঞ্জর হাতে নেয় এবং অন্ধকারের মধ্যে-ই আপন বড় ভাইয়ের প্রতি ধেয়ে আসে। বড় ভাই আক্রমণোদ্যত প্রতিপক্ষ যুবককে ছুটে আসতে দেখে সে-ও খঞ্জর হাতে দ্রুত এগিয়ে যায়। একজন অপরজনের উপর প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করে বসে। অন্ধকারে দু'ভাইয়ের সংঘাত শুরু হয়ে যায়। এক ভাই অপর ভাইকে রক্তাক্ত করে ফেলে। মেয়েটি পার্শ্বে দাঁড়িয়ে উভয়কে উত্তেজিত করতে থাকে।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা কর্মীরা রাতে টহল দিচ্ছে। হঠাৎ এক অশ্বারোহী গুপ্তচর ঘটনাস্থলে এসে পড়ে। দেখে মেয়েটি পালাতে উদ্যত হয়। আরোহী ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলে। তাকে সঙ্গে করে আবার ঘটনাস্থলে

ফিরে যায়। দু'ভাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে। মেয়েটি এই ঘটনার সঙ্গে নিজের সম্পর্কহীনতার প্রমাণ দিতে জোর চেষ্টা করে। কিন্তু আরোহী তাকে ছাড়ল না। মেয়েটি নানা রকম প্রলোভন দেখালেও আরোহী সেসব প্রত্যাখ্যান করে নীতির উপর অটল থাকে। আরোহী হাঁক দিয়ে তার সহকর্মীদের ডেকে আনে। ততক্ষণে দু'ভাই মারা গেছে।

মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ আলী বিন সুফিয়ানের নিকট নিয়ে যাওয়া হল। লাশ দু'টোও তুলে নেয়া হল। আলো জ্বালিয়ে লাশ দু'টি দেখা হল। আল-ইদরীস-এর দু'পুত্রের লাশ। আল-ইদরীসকে সংবাদ দেয়া হল। দু'যুবক পুত্রের দু'টি লাশ একত্রে দেখার পর পিতার মানসিক অবস্থা কেমন হল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

মেয়েটি এলোমেলো কথা বলে। 'তুমি কার মেয়ে, কোথায় থাক'–এ প্রশ্নের জবাব দিতে সে অপারগতা প্রকাশ করে। আল-ইদরীস ভীষণ বিমর্ষ-বিপর্যস্ত। তিনি ক্ষুব্ধ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'মেয়েটাকে পিঞ্জিরায় আটকে রাখ আলী! এভাবে ওর মুখ থেকে কথা বের করা যাবে না।'

'আমার বলার আছে-ইবা কী?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মেয়েটি বলল। তারপর বড় ভাইয়ের লাশের প্রতি ইংগিত করে বলল, 'ইনি আমাকে ডেকেছিলেন। আমি তার ডাকে সাড়া দেই। মধ্যখান থেকে ইনি (ছোট ভাইয়ের লাশের প্রতি ইশারা করে) এসে পড়লেন। আমার দখল নিয়ে দু'জন খঞ্জর হাতে পরস্পরে ঝাপিয়ে পড়লেন। আমি ভয়ে পালাতে উদ্যত হই। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এসে আমাকে ধরে নিয়ে আসেন। আমি পিতার নাম বলতে এজন্য ইতস্তত করছি যে, তাতে তার অপমান হবে।'

আলী বিন সুফিয়ান বিচক্ষণ, ধীশক্তিসম্পন্ন ও উপস্থিত বৃদ্ধির মানুষ। তার মনে পড়ে যায়, আরসালান ও আল-ইদরীস-এর মাঝে বাক-বিতণ্ডা হয়েছিল। আরসালান তার সন্দেহভাজনদের একজন। তার ঘরে কী সব হচ্ছে, তাও তিনি জানেন। তিনি আল-ইদরীসকে ইশারা করে বললেন, মেয়েটি যে-ই হোক, ঘাতক নয়। একটি মেয়ে দু'টি যুবককে খুন করতে পারেনা। মেয়েটি যা বলেছে, সত্যই বলেছে। আমি তার বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশন নিতে পারব না। বলেই তিনি মেয়েটিকে বললেন, 'যাও, তুমি মুক্ত। আগামীতে কোন বেগানা পুরুষের সঙ্গে এতদূর যেও না; অন্যথায় কখন কার হাতে খুন হও বলা যায় না।'

ছাড়া পেয়ে মেয়েটি দ্রুতবেগে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান সঙ্গে সঙ্গে দু'জন গুপ্তচরকে বললেন, 'তোমরা একজন মেয়েটি কোন্ পথে যায় লক্ষ্য রেখে অরেক পথে আরসালান-এর বাড়ির সদর দরজার সামান্য দূরে চুপচাপ বসে থাক। অপরজন অতি সাবধানে মেয়েটির অনুসরণ

করে দেখবে, ও কোথায় যায় এবং যেখানে-ই গিয়ে পৌছুক, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ দিবে।'

দু'জন রওনা হয়ে যায়। মেয়েটি দ্রুতপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং একজন তাকে অনুসরণ করছে। আলী বিন সুফিয়ানের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হল। মেয়েটি সোজা আরসালানের ঘরে চলে যায়। আলীর নিয়োজিত লোক এসে সংবাদ দেয়। আল-ইদরীস যখন জানতে পারলেন যে, মেয়েটির যোগাযোগ আরসালানের ঘরের সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ তার পিছনের ঘটনা মনে পড়ে যায়। তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, ' আরসালান আমাকে বলেছিল, 'তোমার দু'টি যুবক পুত্র আছে'। কিন্তু তখন আমি সেই ইংগিত বুঝতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, সেই ইংগিত আর এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আমার স্পষ্ট ধারণা, এই ঘটনা আরসালান-ই ঘটিয়েছে। আমার দু'পুত্রকে সে-ই অভিনব এক পন্থায় একজনকে অপরজন দ্বারা খুন করিয়েছে।'

আল-ইদরীস পুলিশ প্রধানকে সংবাদ দেন। পুলিশ প্রধান গিয়াস বিলবীস এসে পৌছান। আলী বিন সুফিয়ানেরও ক্ষমতা আছে। তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, আরসালানের বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে নজরবন্দী করা হোক।

'এবার আমি সালীম আল-ইদরীসকে বলব, আমি কেন এত সাহসিকতার সাথে কথা বলি'– মেয়েটির সাফল্যের কাহিনী শুনে আরসালান বলল– 'এবার আমি তাকে জানিয়ে দেব, আমি কী করতে পারি।' আরসালান মেয়েটিকে মদপান করতে দেয় এবং দু'জনে বিজয়ের উল্লাসে মেতে উঠে।

আরসালান-এর উৎসব এখনো শেষ হয়নি। এমন সময় বলা-কওয়া ছাড়াই কে যেন তার ঘরে ঢুকে পড়ে। লোকটি আল-ইদরীস। তিনি আরসালান ও একটি মেয়েকে নেশাগ্রস্থ ও বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পান। মেয়েটিকে তিনি চিনে ফেলেন। আরসালান নেশার ঘোরে-ই বলল, ' নিজের পুত্রদেরকে খুন করিয়ে তুমি নিজে আমার হাতে খুন হতে এসেছ? ....। দারোয়ান! লোকটি আমার অনুমতি ছাড়া আমার জান্নাতে ঢুকল কেন?'

'ঢুকেছি তোকে জাহান্নামে পাঠাতে'– আল-ইদরীস বললেন– 'আমি আমার পুত্রদের প্রতিশোধ নিতে আসিনি– 'এসেছি তোমাকে গাদ্দারীর পরিণতি পর্যন্ত পৌছিয়ে দিতে।'

ইতিমধ্যে নগর প্রধান ভিতরে প্রবেশ করেন। তার সঙ্গে গিয়াস বিলবীস ও আলী বিন সুফিয়ান। তারা মেয়েটিকে গ্রেফতার করে ফেললেন। আরসালান-এর সব চাকর-বাকর ও অন্যান্য লোকদেরকে বের করে দিয়ে প্রাসাদোপম ভবনটির ভিতরে-বাইরে প্রহরা বসিয়ে দেয়া হল। অনুসন্ধানে ঘরের মধ্যে প্রশস্ত এক আন্ডারগ্রাউন্ড কক্ষ পাওয়া গেল। সেখান থেকে উদ্ধার করা হল বিপুল

পরিমাণ তীর-কামান ও বর্শা। পাওয়া গেল এক গাদা খঞ্জর ও বিস্ফোরক। একটি বাক্স খুলে পাওয়া গেল হাশীশ ও বিষ। অপর এক কক্ষ থেকে উদ্ধার হল, অনেকগুলো সোনার ইট ও স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি বেশ ক'টি থলে। আরসালান তার পুরাতন দু'স্ত্রী ও তাদের সন্তানদেরকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখন ঘরে পাওয়া গেল তিনটি ষোড়শী কন্যা। তাদের একজন অপেক্ষা অপরজন অধিক রূপসী। তিনজনই অমুসলিম। রাতারাতি চাকর-বাকরদের তল্লাশী ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। তাদের তিনজনই খৃস্টানদের গুপ্তচর।

'তুমি নিজেই বলে দাও তোমার মিশন কি?'– নগর প্রধান আরসালানকে বললেন– 'এই বিত্ত-বৈভব ও অস্ত্রের ডিপো তোমার মৃত্যুদণ্ডের জন্য যথেষ্ট।'

'তাহলে মৃত্যুদণ্ড-ই দিয়ে দিন'– নেশার ঘোরে বলল আরসালান– 'জীবন যখন দিতে-ই হবে, মুখ খুলে লাভ কী?'

'জীবনের শেষ মুহূর্তে তুমি একটি নেক কাজ করে যাও; ঈমান, ইসলাম ও দেশের শত্রুদের সম্পর্কে তথ্য দাও'– নগর প্রধান বললেন– 'আমি আশা করি, এর উছিলায় আল্লাহ্ তোমার এতবড় অপরাধও ক্ষমা করে দেবেন।'

'কিন্তু তোমরা তো ক্ষমা করবে না।' আরসালান বলল।

'সুলতান আইউবী এর চেয়েও জঘন্য অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আপনার জীবনে বেঁচে যাওয়ার পথ খুলতে পারে; এখানে কিরূপ নাশকতা চলছে বলে দিন এবং কিছু লোককে ধরিয়ে দিন।'

আরসালান কক্ষে পায়চারী করছে। অন্যরা এদিক-ওদিক উপবিষ্ট। আল-ইদরীস-এর কোমরে খঞ্জর সদৃশ একটি তরবারী বাঁধা। আরসালান নিশ্চুপ পায়চারী করতে করতে তার কাছে চলে যায় এবং হঠাৎ কোমর থেকে তরবারীটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের বুকে ও পেটের মধ্যখানে স্থাপন করে। উপস্থিত লোকেরা তার থেকে তরবারীটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু তার আগেই আরসালান হাতলটা ধরে পূর্ণ শক্তিতে তরবারীর আগাটা নিজের পেটে ঢুকিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। লোকেরা পেট থেকে তরবারীটা টেনে বের করে আনার চেষ্টা করলে আরসালান বলল, 'ওটা ওখানেই থাকুক, তোমরা আমার দু'তিনটি কথা শুনে রাখ। আমার মৃত্যু হয়ে গেলে তরবারীটা বের করে নিও। আমি নিজেই নিজের শাস্তি দিয়েছি। আমি জীবিত অবস্থায় সালাহুদ্দীন আইউবীর সামনে উপস্থিত হতে চাইনি। কেননা, তিনি আমাকে তার অফাদার বন্ধু বলে বিশ্বাস করতেন। আমি তোমাদের কারুর কাছে কোন প্রশ্নের জবাব দেব না। তরবারী তার কাজ করে ফেলেছে। তোমরা সাবধান হও, মিসর ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন। মিসরে যে ফৌজ আছে, তারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। খাদ্যের কৃত্রিম সংকট আমি-ই

সৃষ্টি করেছিলাম। সৈন্যরা ঠিকমত খাবার পেত না। খৃস্টান নাশকতাকারীরা ফৌজের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে, দেশের গরু, ভেড়া-বকরী-দুম্বা, তরী-তরকারী, খাদ্যসামগ্রী সব বিভিন্ন রণাঙ্গনে চলে যাচ্ছে আর সেখানকার সৈনিকেরা গনীমতের মালামাল দিয়ে বিলাসিতা করছে। আমার দলে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও ছিল। তবে আমি তাদের কারো নাম বলব না। ফাতেমী ও ফেদায়ীরা ধ্বংসযজ্ঞ ও নাশকতার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। তোমরা বিদ্রোহ প্রতিহত করতে পারবে না। নতুন সৈন্য নাও, পরিস্থিতি তোমাদের নিয়ন্ত্রণের...।' আরসালান শেষ বাক্যটি আর পূর্ণ করতে পারল না। তার আগেই তার জীবন প্রদীপ নিভে গেল।

আরসালানের ঘর থেকে যে দু'টি মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তারা নিজেদের সম্পর্কে জানায় যে, আমাদেরকে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও পুরুষদেরকে ফাঁদে আটকিয়ে ব্যবহার করার জন্য পাঠান হয়েছিল। তারা জানায়, আরসালান-এর ঘরে প্রতি রাতে বৈঠক হত, যাতে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের অনেক অফিসার আসা-যাওয়া করতেন। তাদের গোপন সাক্ষাৎ ও বৈঠক এই মেয়েদের অনুপস্থিতিতে হত। মেয়েরা স্বীকারোক্তি দেয় যে, মিসরে বিদ্রোহের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। যে মেয়েটি আল-ইদরীস-এর দু'পুত্রকে একে অপরের দ্বারা খুন করিয়েছিল, সে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করে। মেয়েটি জানায়, সে আল-ইদরীস-এর বড় পুত্রকে আগেই ভালবাসার জালে আটকিয়ে ফেলেছিল। আরসালান তাকে স্বয়ং আল-ইদরীস-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন আরসালান পরিকল্পনা পাল্টে দেয় এবং মেয়েটিকে বলে তুমি আল-ইদরীস-এর দু'পুত্রকে একজন দ্বারা অপরজনকে খুন করাও।

মাত্র এক রাতের অভিযানের পর প্রায় আড়াইশ' উট কেন্দ্রীয় দফতরের সামনে এনে দাঁড় করানো হয়। উটগুলো খাদ্য-সামগ্রীতে বোঝাই। এই উটগুলো তিন-চারটি পয়েন্ট থেকে ধরে আনা হয়েছে। তরী-তরকারী ইত্যাদি যাতে সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে তার জন্য টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটি তাদের প্রথম সাফল্য। ধরে আনা উট কাফেলার সঙ্গে যেসব মানুষ ছিল, তারা শহরের কয়েকজন ব্যাপরীর নাম বলে, যারা দেশের খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে সীমান্তের বাইরে চালান করার কাজে জড়িত। মধ্যরাতের পর তারা এসব পণ্য বিদেশের অপরিচিত ব্যবসায়ীদের হাতে বিক্রি করত। ধৃত লোকগুলো পল্লী এলাকার ও এমন কয়েকটি জায়গার নাম বলে, যেখানে অপরিচিত ব্যবসায়ীরা অবস্থান করত এবং পণ্যদ্রব্য কিনে জমা করে নিয়ে যেত। উষ্ট্রচালকরা সীমান্তবর্তী এমন একটি অঞ্চলের কথা জানায়, যেখান

থেকে এসব কাফেলা সুদান ঢুকে পড়ত। ওখানে একটি সীমান্তপ্রহরী ইউনিট ছিল। তদন্তে জানা গেল, তার কমাণ্ডার নিয়মিত দুশমনের কাছ থেকে ঘুষ নিত এবং কাফেলার সীমান্ত অতিক্রমের সুযোগ করে দিত। আরো জানা গেল যে, এর সবই হচ্ছিল আরসালান-এর নেতৃত্বে।

❁ ❁ ❁

আল-ইদরীস ও প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাগণ আরসালান-এর গাদ্দারী, আল-ইদরীস-এর শক্রদের মৃত্যু ও অন্যান্য ঘটনাবলী নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য বৈঠকে বসেন। আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস অভিমত ব্যক্ত করেন; পরিস্থিতি এত-ই নাজুক রূপ লাভ করেছে যে, এখন তা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তারা প্রস্তাব করেন, মিসরে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার এবং ফাতেমী কিংবা ফেদায়ীদের হাতে উচ্চ পর্যায়ের কোন ব্যক্তিত্বের খুন হওয়ার আগেই সুলতান আইউবীকে পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত করা হোক এবং তাঁকে পরামর্শ দেয়া হোক, কার্ক অবরোধ তাঁর নায়েবদের হাতে সোপর্দ করে তিনি কায়রো চলে আসুন। একজন দূত আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল বটে; কিন্তু তাকে বিস্তারিত জানান হয়নি। এখন পরিস্থিতি আরো কঠিন আকার ধারণ করেছে। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হল, আলী বিন সুফিয়ান ময়দানে গিয়ে সুলতান আইউবীর সঙ্গে মিলিত হবেন।

কার্ক অবরোধের বয়স দু'মাস হয়ে গেল। কিন্তু এখনো সফলতার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। খৃস্টানরা অস্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাদের একটি ব্যবস্থাপনা এই যে, তারা শহরে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য-পানীয়'র আয়োজন করে রেখেছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এক গুপ্তচর ভিতর থেকে তীরের সঙ্গে বার্তা বেঁধে বাইরে নিক্ষেপ করে। যাতে লিখা ছিল–'ভিতরে খাদ্য-পানীয়'র কোন অভাব নেই। মুসলমান অধিবাসীর উপর এমন কঠোর পাবন্দী আরোপ করে রাখা হয়েছে যে, তাদের ঘরের দেয়ালগুলোও তাদের বিরুদ্ধে চরবৃত্তি করছে। ফলে ভিতরে নাশকতামূলক তৎপরতা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যথায় খৃস্টানদের এসব খাদ্যসম্ভার ধ্বংস করে দেয়া যেত।'

শহরে সুলতান আইউবীর গুপ্তচরেরও অভাব ছিল না। তারা মাঝে-মধ্যে রাতের বেলা তীরের সঙ্গে পয়গাম বেঁধে সময়-সুযোগমত বাইরে ছুঁড়ে মারত। সেনাদের প্রতি নির্দেশ ছিল এরূপ তীর পেলে যেন তারা কমাণ্ডারদের হাতে পৌঁছিয়ে দেয়। খৃস্টানরা অবরোধ ভাঙ্গার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে। তারা সুলতান আইউবীর শক্তি ক্ষয় করার কৌশল অবলম্বন করেছে। সুলতান তাদের কৌশল

ধরে ফেলেছেন। তাই জবাবে তিনিও পন্থা পরিবর্তন করেন।

খৃস্টানরা দুর্গের বাইরে থেকে আইউবীর উপর আক্রমণ করার যে কৌশল অবলম্বন করেছিল, সুলতান তা ব্যর্থ করে দেন। এই হামলার জন্য তিনি পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি অতি কৌশলে তাদেরকে ঘিরে ফেলেন।

খৃস্টানদের এই বাহিনীটি সুলতান আইউবীর বেষ্টনীতে আটকা পড়েছে দেড় মাস হয়ে গেছে। বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য তারা চারদিক থেকে হামলাও করতে থাকে। কিন্তু সুলতান তাদের কোন হামলায়-ই কামিয়াব হতে দেননি। অবশ্য তাতে ঘেরাও কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এলাকাটা ছিল সবুজ-শ্যামল। খৃস্টান সৈন্য ও তাঁদের পশুদের খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা ছিল। তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না। হাজার-হাজার উট-ঘোড়ার জন্য সে খাদ্য-পানীয় ছিল অপর্যাপ্ত। পানির জন্য সেখানে কোন নদ-নদী ছিল না। ছিল তিন-চারটি কূপ, যার পানি দেড় মাসেই নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে খৃস্টান সৈন্যদের মাঝে বিশৃংখলা শুরু হয়ে যায়। খাদ্য ও পানীয়'র অভাবে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। রাতে সুলতান আইউবীর কমাণ্ডো বাহিনী তাদের উপর গেরিলা হামলা চালিয়ে ক্ষতিসাধন করতে থাকে। দেড় মাসে এই বাহিনী সংখ্যায় অর্ধেকে নেমে আসে। তাদের পশুগুলোরও বেহাল অবস্থা। খৃস্টান সম্রাট রেমাণ্ড এই বাহিনীর কমাণ্ডার। চরম বিপর্যস্ত এক অবস্থার মধ্যে তিনি অপেক্ষা করছেন, কখন বন্ধুরা হামলা করে তাদেরকে আইউবীর কবল থেকে মুক্ত করে নিবে। কিন্তু তার কোন লক্ষ-ই দেখা যাচ্ছে না।

সুলতান আইউবী ইচ্ছে করলে চারদিক থেকে হামলা করে এই বাহিনীকে পরাস্ত করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে তাদেরও প্রাণহানীর ঘটনা ঘটত প্রচুর। তাছাড়া তাতে যুদ্ধের গতি পাল্টে যাওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু সুলতান আইউবী নিজের শক্তি ক্ষয় করতে চাচ্ছিলেন না। তিনি খৃস্টান বাহিনীকে মার দিতে চাচ্ছেন ধীরে ধীরে। সেভাবে-ই তিনি অগ্রসর হচ্ছেন। অবশ্য তাতে তার এই ক্ষতি হচ্ছিল যে, তার বাহিনীর তৃতীয় যে অংশটি খৃস্টান বাহিনীকে ঘিরে রাখার অভিযানে আবদ্ধ হয়ে আছে– তাদেরকে তিনি শহর অবরোধ সফল করে তোলার কাজে ব্যবহার করতে পারছিলেন না। সুলতান আইউবী এখন আর অবরোধ দীর্ঘ করতে চাচ্ছেন না। তিনি ভাবছেন, কিভাবে দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকা যায়। সে যুগে এক একটি অবরোধ সাধারণত দীর্ঘ-ই হত। এক একটি শহরকে শত্রুরা দু'বছর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখত। ছয়-সাত মাসের অবরোধকে 'দীর্ঘ' ভাবা হত না। কিন্তু সুলতান আইউবী অবরোধ দীর্ঘ করার পক্ষপাতি নন। তিনি ঐসব রাজা-বাদশাদের ন্যায়ও ছিলেন না, যারা কোন দেশের রাজধানী অবরোধ করে ভিতরের লোকদের কাছে বার্তা

পাঠাবে যে, এতগুলো সোনা-রূপা, এত হাজার ঘোড়া কিংবা এত পরিমাণ সুন্দরী নারী পাঠিয়ে দাও, আমরা চলে যাব। সুলতান আইউবীর লক্ষ্য আরব ভূখণ্ড থেকে খৃস্টানদের বিতাড়িত করা। তিনি বলতেন, এই ভূখণ্ড ইসলামের ঝর্ণাধারা, যা গোটা পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করবে। তিনি তার আয়ুকে প্রয়োজনের তুলনায় কম মনে করতেন। তিনি বারবার বলতেন, এ-কাজটি আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে সমাপ্ত করে যেতে চাই। অন্যথায় আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিম শাসকগণ এই পবিত্র ভূমিকে খৃস্টানদের হাতে বিক্রি করতে চলেছে।

এক রাত। সুলতান আইউবী তাঁর তাঁবুতে গভীর ভাবনায় নিমগ্ন। ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলেন তিনি। এক পর্যায়ে তার মাথায় বুদ্ধি এল যে, দুর্গের আশপাশ থেকে সুড়ঙ্গ খনন করে ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করলে কেমন হয়। আরো কিছু পন্থাও তার মাথায় জাগলো। এখন দিনকয়েকের মধ্যেই তিনি কার্ক দুর্গ দখল করতে চাচ্ছেন।

ঠিক এমনি মুহূর্তে আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুতে প্রবেশ করেন। আলীকে দেখে সুলতান আনন্দিত হলেন না। কারণ, তিনি ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছেন যে, মিসরের পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। চেহারায় বেদনার ছাপ নিয়েই তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং বললেন, 'নিশ্চয় তুমি আমার জন্য সুসংবাদ নিয়ে আসনি'।

'আমীরে মেসের যথার্থ বলেছেন। আপনার জন্য আমি কোন শুভ সংবাদ বয়ে আনতে পারিনি।' বলেই আলী বিন সুফিয়ান মিসরের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী বিবৃত করতে শুরু করেন। তার মত একজন দায়িত্বশীল মানুষ সুলতান আইউবীর নিকট থেকে কিছুই গোপন রাখতে পারেন না, পারেন না তিনি তাকে অলীক আশার বাণী শোনাতে। সুলতান আইউবীকে খোলামেলা সব কথা বলে দেয়াই সময়ের দাবী। আলী বিন সুফিয়ান তকিউদ্দীনের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সুলতান আইউবীরও দু'একটি ভুলের কথা খোলাখুলি উল্লেখ করেন। আরসালান-এর গাদ্দারীর কাহিনী এবং আল-ইদরীসের পুত্রদের খুন হওয়ার ঘটনা শুনে সুলতানের চোখে পানি এসে যায়। আরসালান যদি নিজেকে মৃত্যুর হাতে সপে না দিত, তাহলে তিনি কখনো বিশ্বাস-ই করতেন না যে, তার এই কর্মকর্তা– যাকে তিনি নিজের অফাদার বন্ধু মনে করতেন– গাদ্দারী করতে পারে।

'আরসালান আরো কিছুক্ষণ বেঁচে থাকলে অবশিষ্ট তথ্যও ফাঁস করে দিত'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তার সর্বশেষ বাক্য (যা সে পূর্ণ করে যেতে পারেনি) থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মিসরে বিদ্রোহ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। মিসরে আমাদের যে বাহিনী আছে, তাদেরকে মানসিকভাবে

হীনমন্য করে দেয়া হয়েছে। আমার গুপ্তচরবৃত্তি প্রমাণ করে, আমাদের এক একজন কমান্ডার পর্যন্ত ভুল বুঝাবুঝি ও অস্থিরতার শিকার হয়ে পড়েছে। খাদ্যদ্রব্য ও মাছ-গোশতের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এই সেনাবাহিনীর মাঝে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের সব রেশন ময়দানে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এমন অপপ্রচারও করা হয়েছে যে, ফৌজের বরাদ্দ কর্মকর্তারা বিক্রি করে খাচ্ছে। মিসরে দুশমনের ষড়যন্ত্র পুরোপুরি সফল হয়েছে।'

'দুমশনের চক্রান্ত সে দেশেই সফল হয়, যে দেশের কতক মানুষ দুশমনের সঙ্গ দেয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমাদের আপনজনরা যদি দুশমনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পড়ে, তাহলে আমরা দুশমনের মোকাবেলা করব কিভাবে? আমি যেভাবে আল্লাহর ঐ সিংহদের চেতনার জোরে এবং তাদের জীবন কোরবান করে খৃস্টানদেরকে রণাঙ্গনে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছি, আমার প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও যদি তেমন পাকা মুসলমান হত, তাহলে প্রথম কেবলা আজ দখলমুক্ত থাকত এবং আমাদের আযানের সুর ইউরোপের গীর্জাগুলোতেও ধ্বনিত হত। কিন্তু আমি আজও মিসরে আটকা পড়ে আছি, আমার চেতনা, আমার প্রত্যয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছে।' সুলতান আইউবী কিছুক্ষণ নীরব রইলেন এবং কি যেন চিন্তা করে আবার বললেন, 'আমাকে সর্বাগ্রে ঐ গাদ্দারদের খতম করতে হবে; অন্যথায় ওরা দেশ-জাতি-রাষ্ট্রকে উঁইপোকার ন্যায় খেতেই থাকবে।'

'আমি আপনার সমীপে এই পরামর্শ নিয়ে এসেছি যে, যদি ময়দান আপনাকে অনুমতি দেয়, তাহলে আপনি মিসর চলুন'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'আমি বাস্তবতাকে এড়াতে পারি না আলী'– সুলতান বললেন– 'তবে আমি তোমাকে এ কথাও না বলে পারছি না যে, যারা আমার হাত থেকে খৃস্টানদের গর্দান আর ফিলিস্তীনকে ছাড়িয়ে নিতে চায়, তারা আমারই ভাই-স্বজন শোন আলী! যারা স্বজাতির সঙ্গে গাদ্দারী করে, যারা ইসলামের দুশমনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে, আমি যদি তাদেরকে এখনই খতম না করি, তাহলে তারা কখনোই নিঃশেষ হবে না আর আমাদের ইতিহাসকে এই গোষ্ঠীটি আজীবন কলংকিত করতেই থাকবে।' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করলেন, 'সুদানের রণাঙ্গনের সংবাদ কী? আমি তকিউদ্দীনের নিকট পয়গাম পাঠিয়েছিলাম, যেন সে ময়দান গুটাতে শুরু করে।'

'মিসরে কেউ-ই জানে না যে, আপনি এমন নির্দেশ দিয়েছেন।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'আর কারো জানবার প্রয়োজনও নেই।' সুলতান আইউবী বললেন।

দারোয়ানকে ডাক দিলেন তিনি। দারোয়ান আসলে তিনি বললেন,

'কেরানীকে ডেকে আন। কেরানী কাগজ-কলম নিয়ে এসে উপস্থিত হলে সুলতান বললেন, লিখ, মাহামান্য নুরুদ্দীন জঙ্গী... ।'

❁ ❁ ❁

দ্রুতগতিসম্পন্ন একজন দূতকে পত্রটি দিয়ে নূরুদ্দীন জঙ্গী বরাবর প্রেরণ করা হল। দূত সুলতান আইউবীর এই পয়গাম পরদিন রাতের শেষ প্রহরে বাগদাদে নূরুদ্দীন জঙ্গীর হাতে পৌঁছিয়ে দেয়। সুলতান দূতকে বলে দিয়েছিলেন, পথে প্রতিটি চৌকিতে তুমি তাজাদম ঘোড়া পেয়ে যাবে। তবে ঘোড়া বদল করতে যতটুকু সময় লাগবে, ঠিক ততটুকু বিলম্ব করবে, তার বেশী নয়। যত দ্রুত সম্ভব ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে যাবে। ঘোড়ার গতি শ্লথ হতে দেবে না কোথাও। নুরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট পৌঁছতে যদি রাত হয়ে যায়, তাহলে দারোয়ানকে বলবে তাকে জাগিয়ে দিতে। ভাই জঙ্গী যদি তাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাহলে বলবে, সালাহুদ্দীন বলেছেন, আমরা সকলে জেগে আছি।

সুলতান আইউবীর এই দূত যখন নুরুদ্দীন জঙ্গীর দরজায় গিয়ে উপনীত হয়, রক্ষী বাহিনী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, পয়গাম পৌঁছানোর জন্য তোমাকে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দূত ঘোড়া তো একাধিকবার বদল করেছিল, কিন্তু নিজে এক ঢোক পানি পান করার সময়ও ব্যয় করেনি। ক্লান্তি, ক্ষুধা, পিপাসা, সর্বোপরি দু'রাতের নিদ্রাহীনতায় লোকটির মৃতপ্রায় অবস্থা। পিপাসায় এতই কাতর যে, মুখ দিয়ে কথা সরছে না। দু'দিনের না-খাওয়া বলহীন শরীর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তাই শুধু ইঙ্গিতে বলল, 'অনেক জরুরী পয়গাম।'

নুরুদ্দীন জঙ্গীও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় বিশিষ্ট আমলা, দারোয়ান ও দেহরক্ষীদের বলে রেখেছিলেন, জরুরী কোন বার্তা আসলে যেন তার নিদ্রা ও বিশ্রামের পরোয়া না করা হয়।

রক্ষী কমান্ডার ভেতরে প্রবেশ করে নুরুদ্দীন জঙ্গীর কক্ষের দরজায় করাঘাত করেন। নুরুদ্দীন জঙ্গী জাগ্রত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং পত্রটি হাতে নিয়ে দূতকে সঙ্গে করে সাক্ষাতের কক্ষে প্রবেশ করেন। টলটলায়মান পায়ে কক্ষে প্রবেশ করেই দূত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। নূরুদ্দীন জঙ্গী তার কর্মচারীদের ডাক দেন। তারা এলে দূতকে তুলে নিয়ে সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তোলার নির্দেশ দেন। সময় নষ্ট না করে তিনি সুলতান আইউবীর পত্রখানা পাঠ করতে শুরু করেন–

'আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার পয়গাম আপনাকে সন্তুষ্ট করবে না। আপাতত আপনার জন্য সন্তোষজনক সংবাদ শুধু এটুকুই যে, আমি হিম্মত হারাইনি। আমি আপনাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করছি। আপনি

আমার নিকট চলে আসুন; আমি আপনাকে সব ঘটনা শুনাব। আমি কার্ক অবরোধ করে রেখেছি। এখনো সফল হইনি। শুধু এতটুকু সাফল্য অর্জন করেছি যে, খৃস্টানদের একটি বাহিনী সম্রাট রেমান্ডের নেতৃত্বে আমার উপর হামলা করেছিল; আমি নিরাপদ অবস্থান থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছি। এ যাবত তার অর্ধেক সৈন্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত খৃস্টান সৈন্যরা তাদের সুদূর এলাকা থেকে যুদ্ধের জন্য নিয়ে আসা উট-ঘোড়াগুলো জবাই করে খাচ্ছে। আমি রেমান্ডকে জীবিত ধরার চেষ্টায় আছি। কিন্তু কার্ক অবরোধ দীর্ঘ হতে চলেছে। খৃস্টানদের মেধা ও যুদ্ধরীতি এখন আগের চেয়ে উন্নত। আমি অবরোধ সফল করার চেষ্টায় আছি। আমি আশাবাদী যে, আমার জানবাজ মুজাহিদরা দুর্গ ভাঙ্গতে সক্ষম হবে। তারা যে চেতনা ও উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করছে, তা আপনাকে বিস্মিত করবে। কিন্তু সুদানে আমার ভাই তকিউদ্দীন ব্যর্থ হয়েছে। আমি তাকে পিছিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছি। মিসরের সংবাদও ভাল নয়। গাদ্দার ও ঈমান-বিক্রেতারা দুশমনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে বিদ্রোহ ও ক্রুসেড আক্রমণের পথ সুগম করে দিয়েছে। আপনি আলী বিন সুফিয়ানকে ভাল করে চিনেন। সে আমার কাছে এসেছে। আমি তার পরামর্শকে উপেক্ষা করতে পারি না। সে আমাকে মিসর চলে যেতে বলছে। মুহতারাম! আমি কার্ক দুর্গের অবরোধ প্রত্যাহার করতে পারি না। অন্যথায় খৃস্টানরা বলবে, সালাহুদ্দীন পিছপা হতে পারে। দুশমনের ঘাড় আমার মুঠোয়। আপনি আসুন, এই ঘাড় আপনি নিজের মুঠোয় তুলে নিন। সঙ্গে সৈন্য নিয়ে আসবেন। আপনার বাহিনীকে আমি মিসর নিয়ে যাব। অন্যথায় মিসর বিদ্রোহের শিকার হয়ে পড়বে। আমি আশা করি, আপনি আমার দ্বিতীয় বার্তার অপেক্ষা করবেন না।'

সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী এক মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না। রাতের পোষাকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের তলব করলেন এবং তাদের জরুরী নির্দেশ প্রদান করেন। দিনের এখনো অর্ধেকও অতিবাহিত হয়নি, তার বাহিনী কার্ক অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে। সুলতান জঙ্গী একজন মর্দে মুজাহিদ। তার নাম শুনলে খৃস্টানরা কেঁপে উঠত। তার বক্ষে ছিল ঈমানের প্রদীপ। ছিল যুদ্ধ বিষয়ে পারদর্শিতা। তিনি পথে যথাসম্ভব কম বিরতি দিয়ে এতদ্রুত ময়দানে গিয়ে উপনীত হন যে, দেখে সুলতান আইউবী হতবাক হয়ে যান। দূত যদি আগেভাগেই তাকে অবহিত না করত যে, সুলতান জঙ্গী সৈন্য নিয়ে রওনা হয়েছেন, তাহলে দূর থেকে দেখে সুলতান আইউবী মনে করতেন, খৃস্টান বাহিনী হামলা করতে আসছে। সুলতান আইউবী ঘোড়া হাঁকিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে গেলেন। তাকে দেখে নুরুদ্দীন জঙ্গী ঘোড়া থেকে

ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইসলামের দু'প্রহরী যখন আলিঙ্গনাবদ্ধ হন, তখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গীকে সব ঘটনা এবং গাদ্দারদের সবিস্তার কাহিনী শোনান। জঙ্গী বললেন, শোন সালাহুদ্দীন! ইসলামের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, গাদ্দাররা আমাদের জাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে এবং জাতি তাদের থেকে কখনো মুক্ত হতে পারবে না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, এমন একটি সময় আসবে, তখন গাদ্দাররা যথারীতি এ জাতিকে শাসন করবে। তারা দুশমনের বিরুদ্ধে কথা বলবে, বড় বড় দাবি করবে, দুশমনকে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করবে, কিন্তু জাতি জানতেই পারবে না যে, তাদের শাসকরা মূলত তাদের ও তাদের দ্বীন-ধর্মের দুশমনের সঙ্গে তলে তলে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। দুশমন তাদেরকে ঢাল-তরবারীরূপে ব্যবহার করবে এবং তাদের হাতে জাতিকে পিষে মারবে। তুমি অস্থির হয়ো না সালাহুদ্দীন! আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হব। তুমি মিসর চলে যাও এবং তকিউদ্দীনকে সাহায্য দিয়ে সুদান থেকে বের করে আন। ডানে-বাঁয়ে আক্রমণ করে দুশমনকে অস্থির করে তোল, যাতে তকিউদ্দীনের বাহিনী কোথাও দুশমনের বেষ্টনীতে আটকা না পড়ে। মিসরের সৈন্যদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি তাদের মস্তিষ্ক থেকে বিদ্রোহের পোকা বের করে দেব।'

সন্ধ্যার পর নুরুদ্দীন জঙ্গী তার বাহিনীকে কার্ক অবরোধে নিয়োজিত করেন এবং সুলতান আইউবীর বাহিনী পেছনে সরে আসে। তাদেরকে তৎক্ষণাৎ কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

এখানে কিছু ভুল হয়ে যায়। সুলতান আইউবী রেমান্ডের বাহিনীকে ঘিরে রেখেছিলেন। নূরুদ্দীন জঙ্গী যখন জরুরী নির্দেশনা দিয়ে তার বাহিনীকে তথায় প্রেরণ করেন, তখন নির্দেশনার কিছু ভুল বুঝাবুঝির কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায়। রেমান্ড অকস্মাৎ সেনাবেষ্টনীর সেই দিকটিতে আক্রমণ করে বসে, যেদিকে সুলতান আইউবীর অবস্থান দুর্বল বলে তার ধারণা। ভুল বুঝাবুঝির কারণে মুসলিম বাহিনী সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত ছিল না। রেমান্ড সেদিক থেকে দলবল নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপরও কিছু সৈন্য বেষ্টনীতে আটকা পড়ে থাকে। তারা পরদিন জানতে পারে যে, তাদের অধিনায়ক রেমান্ড পালিয়ে গেছেন। তখন তারাও এলোপাতাড়ি পালাবার চেষ্টা শুরু করে দেয়। তারা তাদের জীবন রক্ষা করার জন্য লড়াই করে। ফলে কতিপয় নিহত হয়, বাকীরা ধরা পড়ে। এতে সুলতান আইউবীর এতটুকু ক্ষতি হয় যে, রেমান্ড পালিয়ে গেছে। পাশাপাশি উপকারও হয় যে, নুরুদ্দীন জঙ্গীর বাহিনী কার্ক

অবরোধ সফল করে তোলার কাজে নিয়োজিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে।

সুলতান আইউবী যখন কায়রো রওনা হন, তখন তিনি বেদনাহত চোখে কার্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তিনি জঙ্গীকে বললেন, 'ইতিহাস একথা বলবে না তো যে, সালাহুদ্দীন আইউবী পিছপা হয়েছিল? আমি অবরোধ প্রত্যাহার করিনি তো?'

'না, সালাহুদ্দীন!'– নুরুদ্দীন জঙ্গী তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'তুমি পরাজিত হওনি। তুমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছ। যুদ্ধ আবেগ দিয়ে লড়া যায় না।'

'আমার ফিলিস্তীনে আমি আবার আসব'– কার্কের প্রতি তাকিয়ে সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি আসব...।' বলেই তিনি ঘোড়া হাঁকান, আর পেছনে ফিরে তাকাননি।

নুরুদ্দীন জঙ্গী সুলতান আইউবীর গমনপথে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকেন। একসময় দূর পথে সুলতানের ঘোড়া যখন ধূলো-বালির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন তিনি তার এক নায়েবকে বললেন, 'ইসলামের প্রতিযুগেই একজন সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রয়োজন হবে।' ঘটনাটি ১১৭৩ সালের (৬৫৯ হিজরী) মধ্যভাগের।

কার্ক দুর্গের পতন

মিসরের পল্লী এলাকার মানুষ লোকটির পথপানে তাকিয়ে আছে। সকলের মুখে একই কথা– 'ইনি আকাশ থেকে নেমে এসেছেন, আল্লাহর দ্বীন নিয়ে এসেছেন। ইনি মানুষের মনের কথা বলে দেন, ভবিষ্যতের অন্ধকারকে আলোকিত করে দেখান। ইনি মৃত মানুষকে জীবিত করেন।'

কে 'ইনি'? লোকটিকে যে-ই দেখেছে, তার কারামত দেখে এতই অভিভূত হয়েছে যে, কেউ জানবার প্রয়োজন মনে করল না ইনি কে? মানুষের বিশ্বাস, লোকটি আকাশ থেকে এসেছেন এবং আল্লাহর দ্বীন নিয়ে এসেছেন। তার কারামতের কাহিনী মানুষের মুখে মুখে। কেউ তাকে পয়গাম্বর বলে বিশ্বাস করে। অনেকে তাকে বৃষ্টির দেবতা বলে জানে এবং তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজের জীবন পর্যন্ত কোরবান করতে প্রস্তুত। তার ধর্ম কী, তার বিশ্বাস কী– জানবার গরজ নেই কারুর।

সেকালের মিসরের যে অঞ্চলের অধিবাসীদের কথা বলছি, তারা ছিল পশ্চাৎপদ অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক সম্প্রদায়। যার ব্যাপারেই তাদের প্রতীতি জন্মাত যে, তার কাছে সমস্যার সমাধান আছে, তার পায়ে গিয়েই তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত। তবে ধর্ম পরিচয়ে তারা বেশীরভাগই মুসলমান। ইসলামের আলো তাদের কাছে পৌঁছেনি তা নয়। অনেক মসজিদও নির্মাণ করে রেখেছিল তারা। কাবার প্রভুর দরবারে পাঁচ ওয়াক্ত সেজদাবনতও হত। কিন্তু ইসলামের নির্ভুল আকীদা-বিশ্বাস থেকে ছিল তারা বঞ্চিত। তাদের ইমামরা ছিল অজ্ঞ। নিজেদের কারামত ফুটিয়ে তোলার জন্য মানুষকে আজগুবি সব কল্পকাহিনী শুনিয়ে মাতিয়ে রাখত। পবিত্র কুরআনকে তারা সাধারণ মানুষের জন্য এক অস্পৃশ্য গ্রন্থরূপে পরিচিত করেছে। ফলে সাধারণ মুসলমানরা কুরআনের গায়ে হাত দিতেও ভয় পেত।

ইমামগণ মুসলমানদের অন্তরে একটি শব্দ 'গায়েব' বদ্ধমূল করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যা কিছু আছে, সবই গায়েবী ব্যাপার-স্যাপার আর গায়েবের ইলম অর্জন করার শক্তি আছে শুধু ইমামের। ইমামরা জনসাধারণকে একটি দুর্বল পদার্থে পরিণত করে রাখে।

এখান থেকেই জনমনে অলীক বিশ্বাস ও কুসংস্কারের জন্ম নেয়। মরুঝড়ের শো শো শব্দের মধ্যে তারা প্রাণীর কণ্ঠ শুনতে পায়। ইমাম বলছেন,

এসব অদৃশ্য প্রাণী তোমরা দেখতে পাবে না। তাদের বিশ্বাসে রোগ-ব্যাধি এখন জ্বিন-ভূতের প্রভাব, যার চিকিৎসা করার ক্ষমতা ইমাম ছাড়া কারুর নেই। ইমামদের দাবি, জ্বিন জাতি তাদের কব্জায়। মানুষ এখন 'গায়েব' আর 'গায়েবের শক্তি'কে এতই ভয় পেতে শুরু করেছে যে, তাদের অন্তরে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস দুর্বল হয়ে গেছে। মুসলমানদের বিশ্বাস এসে স্থির হয়েছে এখন সেসব স্বর-শব্দে, যা তাদেরকে 'গায়েবী প্রাণী'ও তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়।

চিত্রটি মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন পল্লী এলাকার। সে যুগে সীমান্ত বলতে স্পষ্ট কিছু ছিল না। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কাগজের উপর একটি রেখা টেনে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বলতেন, ইসলাম ও ইসলামী সাম্রাজ্যের কোন সীমানা নেই। সীমানা মূলত বিশ্বাস-সংশ্লিষ্ট বিষয়। ইসলামের পরিধি যতটুকু, ইসলামী সালতানাতের সীমানাও ততটুকু। যেখান থেকে অনৈসলামী চিন্তা-চেতনা শুরু, সেই এলাকা অন্য দেশের।

মিসরের যে প্রান্তীয় গ্রামগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তাকে মিসরের সীমান্তগ্রাম বলা হত। সে কারণেই খৃস্টানরা মিল্লাতে ইসলামিয়ার চিন্তা-চেতনার উপর আক্রমণ চালাত এবং ইসলামী বোধ-বিশ্বাসকে দুর্বল করে তদস্থলে তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার প্রাধান্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে সীমান্তের মর্যাদা যতটা ভৌগলিক ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল সাংস্কৃতিক। সে যুগের ঘটনাবলী থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য অমুসলিমদের অন্যতম অস্ত্র ছিল সংস্কৃতিক আগ্রাসন। তারা জানত, মুসলমান যুদ্ধকে 'জিহাদ' বলে। আর কুরআন মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ করে দিয়েছে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে জিহাদ নামায অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের এই অমোঘ বিধানটিও তাদের জানা ছিল যে, কোন অমুসলিম দেশের মুসলিম অধিবাসীরা যদি নির্যাতনের শিকার হয়, তাহলে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করে তাদেরকে অমুসলিমদের নির্যাতনের হাত থেকে উদ্ধার করা অন্য দেশের মুসলমানদের জন্য ফরজ।

ইসলামের এসব বিধানই মুসলমানদের মাঝে এমন সামরিক চেতনা সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে মুসলমান যখনই কোন দেশে অভিযান চালাত কিংবা ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত হত, তাদের চিন্তা-চেতনায় যুদ্ধের লক্ষ্য উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। ইসলামের সৈনিকদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা মালে গনীমত হালাল হলেও লুটপাট করা ইসলামের সৈনিকদের লক্ষ্য হত না, তারা গনীমতের লোভে লড়াই করত না। তার বিপরীতে খৃস্টানদের যুদ্ধ হত আগ্রাসনমূলক

প্রতিপক্ষের সম্পদ লুট করা ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য। তাতে খৃস্টানদের একটি ক্ষতি এই হত যে, যে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সামরিক শক্তি থাকত মুসলমান অপেক্ষা পাঁচ থেকে দশ গুণ। কিন্তু তারা মুষ্টিমেয় মুসলমানদের হাতে পরাজয়বরণ করত, অন্তত বিজয় অর্জন করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াত। তারা জানত যে, পবিত্র কুরআন মুসলমানদের মধ্যে সামরিক চেতনা সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা আল্লাহর নামে লড়াই করে, জান দেয়। তাই খৃস্টান সেনাপতিদের অন্যতম ভাবনা ছিল, কিভাবে মুসলমানদের মধ্য থেকে এই 'যুদ্ধ-চেতনা' দূর করা যায়। তারা জানত, একজন মুসলমান দশজন খৃস্টানের মোকাবেলা করতে সক্ষম। তারা আকাশের ফেরেশতা বা জ্বিন-ভূত নয়, বরং তারা নিজেদের মধ্যে আল্লাহর শক্তি অনুভব করে থাকে, যা তাদেরকে সব ধরনের লোভ-লালসা এমনকি নিজের জীবন থেকেও উদাসীন করে তোলে। তাই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীরও বহু আগে ইহুদী ও খৃস্টান আলেম-পন্ডিতগণ মুসলমানদের সামরিক চেতনাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তাদের চরিত্র ধ্বংসের অভিযান এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসে সূক্ষ্ম বিকৃতি সাধন করে তাদের ঈমানকে দুর্বল করার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এবং নুরুদ্দীন জঙ্গীর দুর্ভাগ্য যে, যখন তারা খৃস্টানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, ততক্ষণে খৃস্টানদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অনেকখানি সফল হয়ে গেছে। ইসলামের দুশমনরা এই আগ্রাসনকে দু'ধারায় পরিচালিত করেছিল। উচ্চ পর্যায়ের মুসলমানদেরকে– যাদের মধ্যে ছিল শাসক, আমীর ও মন্ত্রীবর্গ– অর্থ, নারী ও মদ দ্বারা ঘায়েল করেছিল। আর নিম্নস্তরের মুসলমানদের বিপথগামী করেছিল কুসংস্কার ও ধর্মের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করার মাধ্যমে। সর্বশেষ সুলতান আইউবী ও সুলতান জঙ্গী খৃস্টানবিরোধী অভিযানে যেমন নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তেমনি পাশাপাশি খৃস্টানরাও মুসলমানদের নৈতিক আগ্রাসনের ময়দানে নতুন পন্থা উদ্ভাবনে তৎপর হয়ে উঠে। তিন-চারজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এমনও লিখেছেন, একটি সময় এমনও এসেছিল যে, কোন কোন খৃস্টান সম্রাট যুদ্ধের ময়দানের কথা চিন্তা করাই বাদ দিয়েছেন। তারা এই কৌশল অবলম্বন করে যে, এমন যুদ্ধে লড় যাতে মুসলমানের জিহাদী চেতনা ও সামরিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর জোরদার হামলা চালাও আর তাদের অন্তরে এমন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দাও, যা সাধারণ মুসলমান ও সৈন্যদের মাঝে অবিশ্বাস-অনাস্থা ও ঘৃণার জন্ম দেয়। ফিলিপ অগাস্টাস ছিলেন এই তালিকার প্রধান ব্যক্তি। এই খৃস্টান সম্রাট ইসলামের শত্রুতাকে তার ধর্মের মূল কাজ মনে করতেন এবং বলতেন,

আমাদের যুদ্ধ সালাহুদ্দীন আইউবী-নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিরুদ্ধে নয়– ইসলামের বিরুদ্ধে। আমাদের এই লড়াই ক্রুশ বনাম ইসলামের লড়াই, যা আমাদের জীবদ্দশায় না হলেও কোন না কোন সময় অবশ্যই সফল হবে। তার জন্য তোমরা মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের মন-মানসিকতায় জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমের পরিবর্তে যৌনতার বীজ ঢুকিয়ে দাও এবং তাদেরকে ভোগ-বিলাসিতায় ডুবিয়ে দাও।

নিজের এই মিশনকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে অগাস্টাস যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের সামনে অস্ত্র ত্যাগ করে সন্ধির পথ অবলম্বন করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আমি যে যুগের (১১৬৯ সাল) কাহিনী বলছি, সে সময়ে সম্রাট অগাস্টাস নুরুদ্দীন জঙ্গীর কাছে পরাজিত হয়ে বিজিত এলাকাসমূহ প্রত্যার্পন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি জরিমানাও আদায় করেছিলেন এবং আর যুদ্ধ করবেন না বলে চুক্তি স্বাক্ষর করে জিযিয়া প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বন্দী বিনিময়ের ক্ষেত্রে তিনি শুধু কয়েকজন পঙ্গু মুসলিম সৈনিককেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অন্য সুস্থ-সবল সৈনিকদেরকে হত্যা করেছিলেন। আর এখন তিনি কার্ক দুর্গে ইসলামের মূলোৎপাটনের পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজে মহাব্যস্ত। ইসলামের শত্রুতা যেন তার মজ্জাগত বিষয়। তার কোন কোন কর্মকৌশল এতই গোপনীয় হত যে, তার সমমর্যাদার খৃস্টান নেতা-সেনাপতিরাও তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। তার সহকর্মীরা তার উপর এই অপবাদও আরোপ করেছিল যে, সম্রাট অগাস্টাস তলে তলে মুসলমানদের আপন এবং গোপনে তাদের সঙ্গে সওদাবাজী করছেন। এক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক আন্দ্রে আজবন-এর ভাষ্য মতে, এই অপবাদের জবাবে অগাস্টাস একবার বলেছিলেন, একজন মুসলিম শাসককে জালে আটকানোর জন্য আমি আমার কুমারী কন্যাদেরকেও তার হাতে তুলে দিতে কুণ্ঠিত হব না। তোমরা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি ও বন্ধুত্ব করতে ভয় পাচ্ছ। কারণ, তার মধ্যে তোমার লাঞ্ছনা দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু তোমরা এ কথা ভেবে দেখছ না যে, মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ময়দান অপেক্ষা সন্ধির ময়দানে মার দেয়া সহজ। প্রয়োজনে তাদের সামনে অস্ত্র ত্যাগ করে সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর কর আর ঘরে এসে তার বিপরীত কাজ কর। আমি কি এমনই করছি না? তোমরা কি জান না যে, আমার রক্ত সম্পর্কের দু'টি যুবতী মেয়ে দামেস্কের এক শায়খের হেরেমে অবস্থান করছে? তোমরা কি সেই শায়খের হাত থেকে বিনা যুদ্ধে অনেক ভূখণ্ড দখল করনি? তিনি কি বন্ধুত্বের হক আদায় করেননি? তিনি আমাকে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করেন; অথচ আমি তাকে আমার জানী দুশমন জ্ঞান করি। আমি প্রত্যেক অমুসলিমকে বলব, তোমরা মুসলমানদের

সঙ্গে চুক্তি করে চল এবং তাদেরকে প্রতারণা জালে আটকিয়ে মার।

❁ ❁ ❁

এ হল ক্রুসেডারদের সেই মানসিকতা, যা এক সফল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সালতানাতে ইসলামিয়ার ভিতকে উঁই পোকার ন্যায় খেয়ে ফোকলা করে চলেছিল। সেই ষড়যন্ত্রের-ই ফলে মিসরে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ লেলিহান শিখায় পরিণত হতে শুরু করেছিল, যাকে অবদমিত করার জন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে এমন এক মুহূর্তে কার্ক অবরোধ থেকে তার সৈন্য বাহিনীকে তুলে আনতে হল, যখন তিনি খৃষ্টানদের শক্তিশালী একটি বাহিনীকে দুর্গের বাইরে পরাস্ত করে ফেলেছেন। কার্ক অবরোধ সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর হাতে তুলে দিয়ে তাকে সৈন্যসহ কায়রো ফিরে যেতে হল। তাতে সুলতান আইউবী হীনবল হননি বটে, কিন্তু পরিস্থিতি তার মনের উপর বিরাট এক বোঝা হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা তার চেহারায় স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল। তার বাহিনীর সৈন্যরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত যে, তাদেরকে বিশ্রামের জন্য কায়রো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাহিনীর কমান্ডারগণ (যারা সুলতান আইউবীর প্রত্যয় ও যুদ্ধরীতি সম্পর্কে অবগত) এই ভেবে বিস্মিত যে, তিনি নুরুদ্দীন জঙ্গীকে সৈন্যসহ ডেকে আনলেন কেন? অবরোধই বা তুলে নিলেন কি কারণে? তিনি তো জয় বা পরাজয় পর্যন্ত লড়াই করার পক্ষপাতি ছিলেন। বস্তুত, সুলতান আইউবীর হেড কোয়ার্টারের দু'-তিনজন সালার ছাড়া কেউ জানত না, মিসরের পরিস্থিতি শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে, তকিউদ্দীনের সুদান হামলা ব্যর্থ হয়েছে এবং তাকে জান বাঁচিয়ে পেছনে সরে আসতে হচ্ছে। সুলতান আইউবীর সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ানও উপস্থিত ছিলেন। তিনিই মিসরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির রিপোর্ট নিয়ে এসেছিলেন।

সুলতান আইউবী কার্ক ত্যাগ করে মিসর অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ প্রদানের সঙ্গে এই আদেশও প্রদান করেন যে, পথে যাত্রাবিরতি হবে খুব কম এবং চলতে হবে অতি দ্রুত। এই নির্দেশে সকলের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, সমস্যা কিছু একটা হয়েছে।

সফরের প্রথম দিনের সন্ধ্যাবেলা। বাহিনী রাতের জন্য একস্থানে থেমে যায়। সুলতানের জন্য তাঁবু খাটান হয়। তিনি তার উচ্চপদস্থ কমান্ডার ও কেন্দ্রীয় কমান্ডের দায়িত্বশীলদের একত্রিত করেন। তিনি বললেন, আপনারা অধিকাংশই জানেন না যে, আমি কেন কার্ক অবরোধ তুলে আনলাম এবং কেনইবা বাহিনীকে মিসর নিয়ে যাচ্ছি। অবরোধ ভেঙ্গে যায়নি ঠিক, আপনারা কেউ পিছপাও হননি। কিন্তু আমি একে 'পরাজয়' না বললেও 'পিছপা' হওয়া বলব অবশ্যই। আমার বন্ধুগণ! আমরা পিছপা হচ্ছি এবং আপনারা শুনে

বিস্মিত হবেন যে, যারা আপনাদেরকে পিছপা হতে বাধ্য করেছে, তারা আপনাদেরই ভাই, আপনাদেরই বন্ধু। এখন তারা খৃস্টানদের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। তারা বিদ্রোহের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে প্রস্তুত। আলী বিন সুফিয়ান, তার নায়েব ও গিয়াস বিলবীস যদি চৌকস না হতেন, তাহলে আজ আপনারা মিসর যেতেই পারতেন না। ওখানে এখন চলত খৃস্টান ও সুদানীদের রাজত্ব। আরসালানের ন্যায় কর্মকর্তা খৃস্টানদের ক্রীড়নক প্রমাণিত হয়েছে। লোকটি আল-ইদরীসের দু'যুবক পুত্রকে খুন করিয়ে নিজে আত্মহত্যা করেছে। আরসালানের মতো লোকই যখন গাদ্দার প্রমাণিত হল, এমতাবস্থায় আপনারা আর নির্ভর করবেন কার উপর!

সুলতান আইউবীর বক্তব্য শুনে শ্রোতারা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। অস্থিরতা ও উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠে সকলের চোখে-মুখে। সুলতান নীরব হয়ে সকলের প্রতি চোখ বুলালেন। তৎকালের এক ঐতিহাসিক কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের ডায়েরীর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, তখন দু'টি প্রদীপের কম্পমান আলোয় সকলের মুখমণ্ডল এমন দেখাচ্ছিল, যেন তাদের কেউ কাউকে চেনে না। আইউবীর বক্তব্য শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল সবাই। সুলতান আইউবীর ভাষা অপেক্ষা বর্ণনাভঙ্গী ও উপস্থাপনার ঢং তাদেরকে বেশী প্রভাবিত করছিল। সুলতানের কণ্ঠে জোশ ছিল না বটে, তবে এতই গাম্ভীর্য ছিল যে, সবাই প্রকম্পিত হয়ে উঠে। তিনি বললেন, 'আপনাদের মধ্যেও গাদ্দার আছে' বলে আমি মাফ চাইব না। আমি আপনাদেরকে এ কথাও বলব না যে, আপনারা কুরআন হাতে নিয়ে হরফ করে বলুন, আপনারা ইসলাম ও সালতানাতে ইসলামিয়ার অফাদার। কারণ, আমি জানি, যারা ঈমান বিক্রি করতে জানে, তারা কুরআনে হাত রেখেও মিথ্যা অঙ্গীকার করতে পারে। আমি আপনাদেরকে শুধু এটুকু বলব যে, যে ব্যক্তি মুসলমান নয়, সে-ই আপনাদের দুশমন। দুশমন যখন আপনার সঙ্গে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করে, তখনও তার মধ্যে দুশমনী লুকিয়ে থাকে। তারা আপনাকে আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে, আপনার ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে এবং যখনই মুসলমানদের উপর তার শাসন করার সুযোগ আসে, তখন সে মুসলিম নারীর সম্ভ্রমহানি এবং ইসলামের মূলোৎপাটন করে থাকে। এ-ই তার লক্ষ্য। আমরা যে লড়াই লড়ছি, তা আমাদের ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয়; এটি ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভের বা কোন দেশ দখল করার প্রচেষ্টা নয়। এটি হল দু'টি বিশ্বাসের লড়াই– কুফর ও ইসলামের। এ যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ না কুফর কিংবা ইসলাম নির্মূল হবে।

'গোস্তাখী মাফ করুন সালারে আজম!'– এক সালার বললেন– 'আমরা যে

গাদ্দার নই, তা যদি প্রমাণই করতে হয়, তাহলে আপনি আমাদেরকে মিসরের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করুন। দেখবেন, আমরা প্রমাণিত করব যে, আমরা কী। আরসালান সেনাবাহিনীর নয়– প্রশাসনের কর্মকর্তা ছিলেন। আপনি গাদ্দার প্রশাসনিক বিভাগগুলোতে খুঁজে পাবেন– সেনাবাহিনীতে নয়। কার্ক দুর্গের অবরোধ আপনি তুলে নিয়েছেন– আমরা আনিনি। মোহতারাম জঙ্গীকে ডেকে এনেছেন আপনি- আমরা নই। আমাদের পরীক্ষা হবে যুদ্ধের ময়দানে- নিরাপদ পিছু হটার মাধ্যমে নয়। আপনি বলুন, মিসরে কী সব ঘটছে।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি তাকিয়ে বললেন, 'আলী! এদেরকে বল, মিসরে কী হচ্ছে।'

আলী বিন সুফিয়ান বললেন–

'গাদ্দাররা দুশমনের সঙ্গে যোগ দিয়ে সুদানের রণাঙ্গনের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য উধাও করে ফেলেছে। দেশের পল্লী এলাকাগুলোতে অপরিচিত লোকজন এসে খাদ্যদ্রব্য, তরিতরকারী ইত্যাদি চড়া মূল্যে ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছে। গোশত এখন দুষ্প্রাপ্য বস্তু। ময়দানে রসদ প্রেরণ করা হলেও অজ্ঞাত কারণে বিলম্ব ঘটান হচ্ছে। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, রসদ রওনা করিয়ে দুশমনকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে দুশমন রসদের বহর পথে ধরে ফেলেছে। শহরে অপরাধপ্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এমন আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে জুয়াবাজির প্রসার ঘটান হয়েছে যে, আমাদের যুবসমাজ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। ফৌজে নতুন ভর্তির জন্য পল্লী অঞ্চলগুলোতে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। গরু-মহিষ, ছাগল-দুম্বা-ভেড়াও উধাও হয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমাদের জাতীয় চরিত্র ধ্বংস করার আয়োজন করা হয়েছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। খৃস্টানরা তাদেরকে এই প্রলোভন দেখিয়েছে। অজ্ঞাত উৎস থেকে বিপুল অর্থ-সম্পদ তাদের হাতে আসছে। যেহেতু সরকারের সব ব্যবস্থাপনা তাদের হাতে, তাই তারা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছে, যা দুশমনের জন্য অনুকূল। সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হল, পল্লী এলাকাগুলোতে আজগুবি ধরনের নতুন নতুন বিশ্বাসের প্রসার ঘটছে। মানুষ ইসলাম পরিপন্থী চিন্তা-চেতনা লালন ও পালন করতে শুরু করেছে। সেসব ভিত্তিহীন ও ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। এ এক বিরাট আশংকার বিষয়।

'আপনি কি তার প্রতিকার করেননি?' উপস্থিতদের একজন জিজ্ঞেস করল।

'জি, করেছে'– আলী বিন সুফিয়ান জবাব দেন– 'আমার গোটা বিভাগ অপরাধীদের তথ্য সংগ্রহ ও তাদের গ্রেফতার করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

আমি আমার গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদেরকে পল্লী এলাকাগুলোতেও ছড়িয়ে রেখেছি। কিন্তু দুশমনের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এত-ই বেড়ে গিয়েছে যে, দুষ্কৃতিকারীদেরকে ধরা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। সবচে' বড় সমস্যা হল, আমাদের মুসলমান ভাইরা-ই দুশমনের গুপ্তচর ও দুষ্কৃতিকারীদের আশ্রয় ও সহযোগিতা প্রদান করছে। আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন যে, পল্লী এলাকার কোন কোন মসজিদের ইমামও দুশমনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে।'

'এমন তো হতে পারে না যে, আমি প্রশাসনকে সেনা বিভাগের হাতে তুলে দেব!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'সেনাবাহিনীকে যে কাজের জন্য গঠন করা হয়েছে, যদি তারা যথাযথভাবে তা পালন করে যায়, তাহলে দেশের জন্যও মঙ্গল, তাদের জন্যও কল্যাণকর। একজন কোতোয়াল যেমন সালার হতে পারেন না, তেমনি একজন সালারও কোতোয়ালের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। তবে প্রত্যেক সালারকে অবশ্যই খবর রাখতে হবে, প্রশাসন কী করছে। এক্ষেত্রে সামরিক বিভাগ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছে না তো? আমার বন্ধুগণ! আল্লাহ আমাদেরকে ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছেন। মিসরের পরিস্থিতি আপনারা শুনেছেন। সুদানের হামলা ব্যর্থ হয়েছে। তকিউদ্দীন তার ভুলের জন্য সুদানের মরুভূমিতে আটকা পড়ে আছে। তার বাহিনী ছোট ছোট দলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তার নিরাপদে পেছনে সরে আসার সম্ভাবনাও নজরে আসছে না। তাছাড়া মোহতারাম জঙ্গী কার্ক জয় করতে পারবেন কিনা, তাও আমার জানা নেই। তিনিও যদি ব্যর্থ হন, তাহলে তার দায়ভার আমাকেই বহন করতে হবে। আমি জানি, আপনারা কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও যুদ্ধের ময়দানে দুশমনকে পরাজিত করতে পারেন। কিন্তু আমাদের দুশমন যে ময়দানে হামলা করেছে, তাতে দুশমনকে পরাস্ত করা আপনাদের পক্ষে বাহ্যত সহজ বলে মনে হয় না। আপনারা ধারাল তরবারী। আপনারা মরুভূমির শাহসাওয়ার। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, ক্রুসেডারদের এই যুদ্ধক্ষেত্রে আপনারা অস্ত্র সমর্পণ করে ফেলবেন।'

মজলিসের ভেতরে বেশকিছু লোকের জোরালো কণ্ঠ শোনা গেল। তারা ইসলাম ও দেশের স্বার্থে জীবন দিতে প্রস্তুত। শুনে সুলতান আইউবী বললেন–

'বর্তমানে মিসরে যে সৈন্য আছে, তারা যখন কার্ক ও শোবকের ময়দান থেকে মিসর ফিরছিল, তখন তাদের কমান্ডার-দায়িত্বশীলদের জযবাও ঠিক এমন ছিল, যেমনটি এখন আপনাদের। কিন্তু কায়রো পৌঁছে যখন তারা দুশমনের সবুজ বাগান দেখতে পেল, তখন তারা বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। আর আজ তাদের নৈতিক অবস্থা এমন যে, আপনারা তাদের উপর ভরসা করতে পারছেন না।'

'আমরা এ ধরনের প্রত্যেক কমান্ডারকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হব।' তেজোদ্বীপ্ত কণ্ঠে এক সালার বললেন।

'আমরা সর্বপ্রথম নিজেদেরকে গাদ্দারদের থেকে পবিত্র করব।' বললেন আরেকজন।

'আমার পুত্রও যদি খৃস্টানদের আপন বলে প্রমাণ পাই, তাহলে নিজ তরবারী দ্বারা তার মাথা কেটে আমি আপনার পায়ে এনে ফেলব।' বললেন প্রবীণ এক নায়েবে সালার।

'আমি এরূপ আবেগময় উত্তেজনাপূর্ণ কথার পক্ষে নই।' সুলতান আইউবী বললেন।

উপস্থিত সামরিক কর্মকর্তাদের সকলেই উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত। এরা এমন মানুষ, যারা সুলতান আইউবীর সামনে মুখ খুলে কথা বলতে ভয় পেত। কিন্তু যখন শুনতে পেল যে, তাদের সহকর্মীরা দুশমনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিজ সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্যত, তখন তারা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। একজন তো সুলতান আইউবীকে এমনও বলে ফেলল যে, 'আপনি সবসময় আমাদেরকে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করতে এবং ধৈর্যের সাথে কাজ করতে বলে থাকেন। কিন্তু পরিস্থিতি এমনও সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, তখন ধৈর্য ও সহনশীলতা ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আপনি অনুমতি দিন, আমরা পথে আর কোথাও যাত্রাবিরতি না দিয়ে সোজা কায়রো পৌঁছে যাই। আমরা ঐ বাহিনীকে নিরস্ত্র করে বন্দী করে ফেলব।'

পরিবেশ এতই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠে যে, নিয়ন্ত্রণে রাখা সুলতান আইউবীর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। উত্তেজনার মধ্যেই তিনি আরো কিছু কথা বলে ও শুনে বৈঠক মুলতবী করে দেন। প্রত্যুষে কাফেলা আবার রওনা হয়। সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলে তারা। সুলতান আইউবী তার আমলাদের থেকে খানিক আলাদা হয়ে এগুচ্ছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, আলী বিন সুফিয়ান তার সঙ্গে নেই। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাহিনীকে দু'বার কিছু সময়ের জন্য থামানো হয়। রাতেও কাফেলা চলতে থাকে। রাতের প্রথম প্রহর শেষ প্রায়। সুলতান আইউবী রাতে অবস্থানের জন্য যাত্রাবিরতি দেন। সুলতানের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আলী বিন সুফিয়ানের আগমন ঘটে।

'সারাদিন কোথায় ছিলে আলী!' সুলতান জিজ্ঞেস করেন।

'গতরাতে আমার মনে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল'– আলী বিন সুফিয়ান জবাবে দেন– 'তার বাস্তবতা খতিয়ে দেখার জন্য দিনভর বাহিনীর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

'কী সন্দেহ!' বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জানতে চান সুলতান আইউবী।

'রাতে আপনি দেখেননি যে, সকল সালার, কমান্ডার ও ইউনিট দায়িত্বশীলরা কিভাবে মিসরে অবস্থানরত বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তাতে আমার মনে সন্দেহ জাগে যে, এরা নিজ নিজ অধিনস্থ সিপাহীদেরও ক্ষেপিয়ে তুলবে। বাস্তবে আমার সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তারা বাহিনীকে এমন সব কথাবার্তা দ্বারা উত্তেজিত করে তুলেছে যে, গোটা বাহিনীর মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠেছে। আমি সাধারণ সৈনিকদের বলতে শুনেছি যে, আমরা যুদ্ধের ময়দানে আহত হচ্ছি, শহীদ হচ্ছি আর আমাদের সহকর্মী অন্য সৈনিকরা কায়রোতে বসে মৌজ করছে আর ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করার চেষ্টা করছে। আমরা মিসর গিয়ে নিই, আগে তাদেরকে শেষ করে তারপর সুদানে আটকাপড়া বাহিনীকে সাহায্য করব। মহামান্য আমীর! আমরা যদি এ ব্যাপারে আগাম কোন ব্যবস্থা না নিই, তাহলে এই বাহিনীর কায়রো পৌছামাত্র গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আমাদের এই বাহিনী এখন সম্পূর্ণ প্রতিশোধপরায়ণ। সবাই উত্তেজিত। আর মিসরের বাহিনী পূর্ব থেকেই অজুহাতের সন্ধানে রয়েছে।'

'আমি এ জন্য আনন্দিত যে, অবিরাম যুদ্ধক্লান্ত এই বাহিনীর মধ্যে এমন স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছে'– সুলতান বললেন– 'কিন্তু আমাদের দুশমনের একান্ত কামনা যে, আমাদের বাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আপসে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ুক।'

সুলতান আইউবী গভীর চিন্তায় ডুবে যান। কিছুক্ষণ পর বললেন–

'কৌশল একটা পেয়েছি। কায়রো থেকে উল্লেখযোগ্য দূরে থাকা অবস্থায় আমি আমার একজন বিচক্ষণ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন দূত পাঠিয়ে মিসরের বাহিনীকে অন্যপথে কার্ক অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেব। এমনও হতে পারে যে, আমি আগেভাগে গিয়ে বাহিনীকে রওনা করাব। এতে আমাদের সঙ্গে যে বাহিনী আছে, তারা ওখানে পৌছে কোন সৈন্য দেখতে পাবে না। বিষয়টা তদন্ত করে তুমি ভালই করেছ আলী। বিষয়টা আমার মাথায় আসেনি।'

✿ ✿ ✿

সীমান্তবর্তী পল্লী অঞ্চলের রহস্যময় সেই লোকটি ভক্ত-সহচরদের নিয়ে দলবেঁধে সফর করে বেড়ায়। লোকটি বৃদ্ধ নয়। তার কাজল-কালো ভ্রু, গৌরবর্ণ মুখাবয়ব। মাথায় লম্বা চুল। দু'চোখে চাঁদের চমক। দাঁতগুলো তারকার ন্যায় শুভ্র। দীর্ঘকায় সুঠাম দেহ। কথা বললে শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকে তার বিপুলসংখ্যক সহচর ও অগণিত উট। তার কাফেলা জনবসতি থেকে দূরে কোথাও গিয়ে অবস্থান নেয় এবং লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়। জনবসতিতে অনুপ্রবেশ করে না সে কখনো।

যে রাতে আলী বিন সুফিয়ান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলছিলেন

যে, আমাদের এই কায়রোগামী বাহিনী মিসরে অবস্থানরত সৈন্যদের ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, সে রাতে রহস্যময় সেই লোকটি কায়রো থেকে বেশ দূরবর্তী এক খর্জুরবীথি-ঘেরা এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করে। তার নিয়ম ছিল, সে কখনো জ্যোৎস্না রাতে কাউকে সাক্ষাৎ দিত না। দিনের বেলা কারো সঙ্গে কথা বলত না। অন্ধকারের রাতগুলোই ছিল তার প্রিয়। তার মাহফিল এমন সব বাতি দ্বারা আলোকিত হত, যার একটির রং ছিল অন্যটি থেকে আলাদা। সেই আলোরও বিশেষ এক প্রভাব ছিল, যা উপস্থিত লোকদের উপর যাদুর ন্যায় ক্রিয়া করত।

বর্তমানে লোকটি যেখানে অবস্থানরত, তার খানিক দূরে একটি লোকালয়, যার অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। সুদানী হাবশীও আছে কিছু। এলাকায় একটি মসজিদও আছে, যার ইমাম স্বল্পভাষী মানুষ। একটি যুবক ছেলে আজ দেড়-দু'মাস হল তার নিকট দ্বীনি তালীম হাসিল করতে আসা-যাওয়া করছে। মাহমদু বিন আহমদ নামক এই যুবকটি এসেছে অন্য এক এলাকা থেকে। তার সব ভাবনা ইমাম আর তার ইলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আরো একটি জিনিস নিয়ে তার কৌতূহল আছে- একটি মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটির নাম সাদিয়া। সাদিয়া মাহমুদকে ভালবাসে। মেয়েটি কয়েকবার তাকে তার বকরীর দুধপান করিয়েছে।

দু'জনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে লোকালয় থেকে দূরে এক চারণভূমিতে। যেদিন সাদিয়া তার চারটি বকরী ও দু'টি উট চড়াতে সেখানে গিয়েছিল, সেদিন মাহমুদও চলার পথে সেখানে পানি পান করার জন্য থেমেছিল। দু'জনের চোখাচোখি হলে সাদিয়াই প্রথম জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথা থেকে এসেছেন, কোথায় যাচ্ছেন? মাহমুদ জবাব দেয়, আমি কোথাও থেকে আসেনি এবং কোথাও যাচ্ছি না। শুনে সাদিয়া ফিক্ হেসে ফেলে। সাদিয়া জিজ্ঞেস করে, আপনি কি মুসলমান? সুদানী? মাহমুদ জবাব দেয়, আমি মুসলমান। মেয়েটি মুচকি হাসে। মাহমুদ মেয়েটির সঙ্গে এমন কিছু কথা বলে, যা তার কাছে ভাল লাগে। সাদিয়া তাকে সুদানের যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তার কথার ধরনে বুঝা যায়, ইসলামী ফৌজের প্রতি তার সমর্থন রয়েছে। মেয়েটি সুলতান সালাহুদ্দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে মাহমুদ তার এমন সব প্রশংসা করে যে, সুলতান আইউবী মানুষ নন– আসমান থেকে নাযিল হওয়া ফেরেশতা। সাদিয়া জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, সালাহুদ্দীন আইউবী কি সেই ব্যক্তি অপেক্ষাও বড় বুযুর্গ, যিনি আকাশ থেকে এসেছেন এবং মৃত প্রাণীকে জীবিত করে ফেলেন?

'না, সালাহুদ্দীন আইউবী মৃত প্রাণীকে জীবিত করতে পারেন না।' মাহমুদ জবাব দেয়।

'আমরা শুনেছি, সালাহুদ্দীন আইউবী নাকি জীবন্ত মানুষকে খুন করে ফেলেন!' সন্দেহমূলক প্রশ্ন করে সাদিয়া– 'মানুষ এ-ও বলছে, তিনি নাকি মুসলমান এবং আমাদের ন্যায় নামায-কালাম পড়েন?'

'তোমাকে কে বলেছে যে, তিনি মানুষ খুন করেন?' মাহমুদ জিজ্ঞেস করে।

'আমাদের গ্রাম দিয়ে অনেক মুসাফির আসা-যাওয়া করে। তারা বলে, সালাহুদ্দীন আইউবী নাকি খুব খারাপ মানুষ।' সাদিয়া জবাব দেয়।

'তোমাদের মসজিদের ইমাম কী বলেন?' মাহমুদ জিজ্ঞেস করে।

'তিনি অত্যন্ত ভাল কথা বলেন'– সাদিয়া জবাব দেয়– 'তিনি বলেন, সালাহুদ্দীন আইউবী সমগ্র মিসরে ও সুদানে ইসলামের আলো বিস্তার করার জন্য এসেছেন। তিনি বলেন, ইসলাম-ই আল্লাহ্ পাকের একমাত্র সত্য দ্বীন।'

মাহমুদ বিন আহমদ মেয়েটির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে থাকে। আলোচনা থেকে সে জানতে পারে যে, তার গ্রামে এমন কিছু লোক আসা-যাওয়া করে থাকে, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে; কিন্তু কথা-বার্তা এমন বলে যে, তাতে কিছু লোকের মনে ইসলামের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়ে গেছে। মাহমুদ সাদিয়ার মনের সংশয় দূর করে দিয়েছে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব ও মধুর ভাষায় তার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে ফেলে যে, মেয়েটি অকপটে বলেই ফেলে, আমি এখানে প্রায়-ই বকরী চড়াতে আসি। আপনি এ-পথে আসলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। মাহমুদ মেয়েটিকে আবেগ ও বাস্তবতার মাঝে ফেলে রেখে তার গ্রামের দিকে রওনা হয়ে যায়।

সাদিয়া একাকি দাঁড়িয়ে ভাবে, লোকটি কে? কোত্থেকে এল? যাচ্ছে-ইবা কোথায়? লোকটির পোশাক অত্র এলাকার বটে, কিন্তু তার গঠন-আকৃতি, তার কথা-বার্তা প্রমাণ করছে সে এখানকার কেউ নয়।

সাদিয়ার সন্দেহ যথার্থ। মাহমুদ অত্র এলাকার মানুষ নয়। বাড়ি তার ইস্কান্দারিয়া। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ সদস্য। বেশ কয়েক মাস যাবত সে অর্পিত দায়িত্ব পালনার্থে সীমান্তবর্তী পল্লী এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। তার থাকা-খাওয়ার ঠিকানা গোপন। সঙ্গে আরো কয়েকজন গুপ্তচর রয়েছে, যারা অত্র এলাকার-ই বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। ক'দিন পর পর তারা নির্ধারিত গোপন ঠিকানায় একত্রিত হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে একজনকে কায়রো পাঠিয়ে দেয়। এভাবে-ই আলী বিন সুফিয়ান সংবাদ পাচ্ছেন যে, দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতে কী সব ঘটনা ঘটছে।

মাহমুদ বিন আহমদ সাদিয়াকে তার গ্রামের মসজিদের ইমাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তার কারণ, ইতিপূর্বে দু'টি গ্রামের বিভিন্ন মসজিদে সে এমন ইমামের সন্ধান পেয়েছে– যাদেরকে তার সন্দেহ হয়েছিল। এলাকার

লোকদের থেকে সে জানতে পারে যে, ইমামরা এখানে নতুন এসেছেন। এর আগে এসব মসজিদে ইমাম ছিলেন-ই না। তারা দু'জন-ই জিহাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করেন, কুরআন হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। রহস্যময় সেই লোকটিকে সমর্থন করেন এবং জনসাধারণকে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। মাহমুদ ও তার দু'সহকর্মী মিলে এই ইমামদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে কায়রো পাঠিয়ে দেয়। আর এখন সে যাচ্ছে সাদিয়ার গ্রামের দিকে। তার একথা শুনে বেশ ভাল লেগেছিল যে, সেই গ্রামে ইমাম সুলতান আইউবীর ভক্ত ও ইসলামের জন্য নিবেদিত। মাহমুদ বিন আহমদ সেই মসজিদকে নিজের ঠিকানা বানাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

❁ ❁ ❁

মাহমুদ সাদিয়ার এলাকার মসজিদে পৌঁছে ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বলে, আমি ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আমাকে দ্বীনের তালীম দিন। ইমাম তাকে তালীম দেবেন বলে ওয়াদা দেন এবং তাকে মসজিদে-ই থাকার প্রস্তাব করেন। মাহমুদ মসজিদে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। সে ইমামকে বললে, দু'-তিন দিন পরপর আমাকে বাড়ি যেতে হবে। ইমাম নাম জিজ্ঞেস করলে মাহমুদ নিজের আসল নাম গোপন রেখে অন্য নাম বলে। বাড়ি কোথায় জানতে চাইলে সে দূরবর্তী কোন সীমান্ত এলাকার কথা বলে। ইমাম মুচকি হেসে বলে উঠলেন, মাহমুদ বিন আহমদ! আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, তুমি তোমার কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন নও। ইস্কান্দারিয়ার মুসলমানরা দায়িত্ব পালনে বড় পাকা।

মাহমুদ সহসা চমকে ওঠে। সে মনে করেছিল ইনি খৃষ্টানদের চর। কিন্তু ইমাম তাকে দীর্ঘ সময় সন্দেহের মধ্যে পড়ে থাকতে দিলেন না। বললেন, অন্তত তোমার কাছে আমার পরিচয় প্রকাশ করে দেয়া উচিত। আমি তোমার-ই বিভাগের একজন কর্মকর্তা। আমি তোমার সব সঙ্গীকেই– যারা এ অঞ্চলে কর্মরত আছে–জানি। তোমরা কেউ আমাকে চিননা। আমি আলী বিন সুফিয়ানের সেই স্তরের কর্মকর্তা, যারা দুশমনের উপর দৃষ্টি রাখার পাশপাশি নিজেদের গুপ্তচরদের উপরও নজর রাখে। আমি ইমাম সেজে গুপ্তচরবৃত্তির দায়িত্ব পালন করছি।

'তারপর-ও আমি আপনাকে বিচক্ষণ বলব না'–মাহমুদ বিন আহমদ বলল–'আপনি যেভাবে আমার সামনে নিজেকে প্রকাশ করলেন, তেমনি দুশমনের কোন গুপ্তচরের সামনেও করতে পারেন।'

'আমি নিশ্চিত ছিলাম তুমি আমার-ই মানুষ'–ইমাম বললেন–'প্রয়োজনের তাগিদে-ই আমি নিজেকে তোমার সামনে প্রকাশ করে দেয়া আবশ্যক মনে

করেছি। আমার দু'জন রক্ষী আছে। তারা ছদ্মবেশে এই এলাকায় অবস্থান করে। তবে আমার আরো লোকের প্রয়োজন ছিল। ভালোই হল, তুমি এসে পড়েছ। এই গ্রামে দুশমনের সন্ত্রাসীরা আসছে। তুমি নিশ্চয় ঐ লোকটির কথা শুনে থাকবে, যার সম্পর্কে প্রসিদ্ধি আছে যে, সে ভবিষ্যতের সংবাদ বলতে পারে এবং মৃত প্রাণীকে জীবিত করতে পারে। এই গ্রামটিও তার সেই সব অদেখা কারামতের কবলে চলে গেছে। আমি গ্রামবাসীদেরকে প্রথমদিকে বলেছিলাম যে, এর সবই মিথ্যা। কোন মানুষ লাশের ভিতরে জীবন ঢুকাতে পারে না। কিন্তু তার প্রভাব এত-ই ব্যাপক যে, মানুষ আমার বিরোধী হয়ে উঠে। আমি সংযত হয়ে যাই। কারণ, আমি এই মসজিদ থেকে বের হতে চাইনা। আমার একটি আড্ডা এবং একটি ঠিকানার তো প্রয়োজন। এখানকার পথহারা মানুষগুলোকে ইসলামের সোজা রাস্তাও তো দেখাতে হবে। পনের-বিশদিন পর রাতে দু'জন লোক আমার নিকট আসে। আমি তখন মসজিদে একা। তাদের উভয়েই ছিল মুখোশপরা। তারা আমাকে হুমকি দেয়, আমি যেন এখান থেকে চলে যাই। তাদেরকে বললাম, আমি অসহায় মানুষ, আমার আর কোন ঠিকানা নেই। তারা বলল, এখানে থাকতেই যদি চান, তাহলে দারস বন্ধ করে দিয়ে সেই ব্যক্তির কথা প্রচার করুন, যিনি আসমান থেকে এসেছেন এবং আল্লাহর সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন। আমি তখন ইচ্ছে করলে দু'জনের মোকাবেলা করতে পারতাম। অস্ত্র তো সবসময় সঙ্গে-ই রাখি। কিন্তু লড়াই করে কাউকে হত্যা বা নিজে নিহত হয়ে তো আমি কর্তব্য পালন করতে পারতাম না। আমি কৌশল অবলম্বন করি। আমি তাদেরকে নিশ্চয়তা দেই যে, আজ থেকে তোমরা আমাকে তোমাদের-ই লোক মনে কর। তারা বলল, আপনি যদি আমাদের কথামত আজ করেন, তাহলে আপনি দু'টি পুরস্কার পাবেন। প্রথমত আপনার জীবন রক্ষা পাবে। দ্বিতীয়ত আপনার অর্থের অভাব হবে না।

'তারপর আপনি আপনার বয়ানের ধারা পাল্টিয়ে দিয়েছেন?'—মাহমুদ জিজ্ঞেস করে।

'এক রকম'—ইমাম জবাব দেন—'এখন আমি দু'রকম কথাই বলি। আমার স্বর্ণমুদ্রার নয়—প্রয়োজন শুধু জীবনটার। আমি কর্তব্য পালন না করে মরতে চাই না। গ্রামের বাইরে গিয়ে তোমাকে বা তোমার অন্য কোন সহকর্মীকে খুঁজে বের করাও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সে রাতে আমার দেহরক্ষীরাও আমার কাছে ছিল না। এখন আল্লাহ নিজেই তোমাকে আমার সামনে এনে দিয়েছেন। তুমি আমার কাছে আমার শিষ্য হয়ে থাক। কথা বলবে সরল-সহজ গ্রাম্য মানুষদের মত। গ্রামের চার-পাঁচজন মানুষ এমন আছে, যারা আমাকে সঙ্গ দিতে প্রস্তুত। আমরা

যদি কাছাকাছি কোন সীমন্ত রক্ষী বাহিনী পেয়ে যেতাম, তাহলে কাজ হত। তবে আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কোন কমাণ্ডারের উপর ভরসা রাখাও বিপজ্জনক। দুশমন সোনা-দানা আর নারী দিয়ে অনেককে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে। তারা বেতন খায় আমাদের কোষাগারের, আর কাজ করে দুশমনের।'

মাহমুদ বিন আহমদ ইমামের কাছে থেকে যায়। সেদিনই ইমাম তার দু'দেহরক্ষীর সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দেন।

সন্ধ্যার সময় সাদিয়া মসজিদে ইমামের জন্য খাবার নিয়ে আসে। মাহমুদকে দেখে প্রথমে থমকে যায়। তারপর মুচকি হাসে। মাহমুদ জিজ্ঞেস করে, আমার জন্য খাবার আনবে না? সাদিয়া খাবারের পাত্র ইমামের হুজরায় রেখে ছুটে যায়। কিছুক্ষণ পর কয়েকটি রুটি ও এক পেয়ালা বকরীর দুধ নিয়ে আসে।

সাদিয়া চলে যায়। ইমাম মাহমুদকে বললেন, এটি অত্র অঞ্চলের সবচে' সুন্দরী মেয়ে। বয়স কম। বুদ্ধিমতীও বটে। মেয়েটির বেচা-কেনার কথা-বার্তা চলছে।

'বেচা-কেনা না বিবাহ?' বিস্ময়ের সাথে মাহমুদ জিজ্ঞেস করে।

'বেচা-কেনা'—ইমাম বললেন—'তুমি জান না, এদের বিবাহ মূলত ক্রয়-বিক্রয়-ই হয়ে থাকে। কিন্তু সাদিয়ার ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে। বিষয়টি নিয়ে আমাদের পেরেশান হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তার ক্রেতা একজন সন্দেহভাজন মানুষ। লোকটি এখানকার বাসিন্দা নয়। মনে হচ্ছে, যারা আমাকে হুমকি দিয়েছিল, এরা তারাই। তুমি একটু চিন্তা করলে-ই বুঝতে পারবে যে, ওরা মেয়েটিকে ওদের রঙে রঙিন করে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। তাই মেয়েটিকে রক্ষা করা জরুরী। তাছাড়া মেয়েটি মুসলমান। সালতানাতের পাশাপাশি আমাদেরকে দেশের মেয়েদের সম্ভ্রমের হেফাজত করাও আবশ্যক। আমি আশা রাখি, এই সওদা হতে পারবে না। সাদিয়ার পিতাকে আমি আমার মুরীদ বানিয়ে রেখেছি। কিন্তু সমস্যা হল, লোকটি গরীব ও নিঃসঙ্গ মানুষ। সমাজের রীতি-নীতি উপেক্ষা করে টিকে থাকার মত শক্তি তার নেই। এক কথায়, জগতে সাদিয়ার মোহাফেজ আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।

মাহমুদ ইমামের শিষ্য হয়ে যায়। দিন যেতে থাকে। সাদিয়ার সঙ্গেও তার সাক্ষাৎ ঘটতে থাকে। মেয়েটি বকরী নিয়ে চারণভূমিতে যায়, মাহমুদও যথাসময়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয়। দু'জনে কথা হয়, গল্প হয়।

মাহমুদ সাদিয়াকে জিজ্ঞেস করে, ঐ যে কে যেন তোমাকে কিনতে চায়, লোকটা কে?

সাদিয়া তাকে চিনে না। লোকটা অপরিচিত—অন্য এলাকার মানুষ। গরু-

মহিষ ক্রয় করার আগে মানুষ যেভাবে দেখে থাকে, ঐ লোকটাও এসে সাদিয়াকে সেভাবে দেখে গেছে।

সাদিয়ার ভাল করেই জানা আছে যে, সে কারো স্ত্রী হবে না। আরবের কোন বিত্তশালী ব্যবসায়ী-আমীর বা উজীর তাকে নিজের হেরেমে বন্দী করে রাখবে আর কোন পুরুষের স্ত্রীত্বের মর্যাদা না পেয়ে-ই বৃদ্ধা হয়ে মরে যাবে। কিংবা নাচ-গান শিখিয়ে তাকে বিনোদনের উপকরণে পরিণত করবে। মেয়েটি তার গ্রামের সৈন্যদের কাছে এরূপ মেয়েদের অনেক কাহিনী শুনেছে।

একটি অনুন্নত এলাকার বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও সাদিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। নিজের ভালোমন্দ সম্পর্কে সচেতন সে। প্রথম সাক্ষাতে মাহমুদের মনে স্থান করে নেয়। তারপর যখন বুঝল যে, মাহমুদও তাকে কামনা করতে শুরু করেছে, তখন সে মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে, সে বিক্রি হবে না। মেয়েটি জানত, ক্রেতাদের থেকে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। একদিন সাদিয়া মাহমুদকে জিজ্ঞেস করে–

'আপনি কি আমাকে কিনে নিতে পারেন না?'

'পারি'–মাহমুদ জবাব দেয়–'কিন্তু আমি যে মূল্য দেব, তা তোমার পিতা গ্রহণ করবেন না।'

'কত মূল্য দেবেন?'

'আমার কাছে দেয়ার মত আমার হৃদয়টা ছাড়া আর কিছুই নেই'–মাহমুদ জবাব দেয়–'জানিনা তোমার হৃদয়ের মূল্য জানা আছে কিনা।'

'আপনার অন্তরে যদি আমার ভালবাসা থাকে, তাহলে এই মূল্য আমার জন্য অনেক বেশী'–সাদিয়া বলল–'আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আমার পিতা এই মূল্য গ্রহণ করবেন না। কিন্তু আমি একথাও বলে দিব যে, আমার পিতা আমাকে বিক্রি করতে-ই চান না। তার সমস্যা হল, তিনি গরীব এবং নিঃসঙ্গ মানুষ। আমার কোন ভাই নেই। ক্রেতারা তাকে হুমকি দিয়েছে, তিনি যদি তাদের মূল্য গ্রহণ না করেন, তাহলে তারা আমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবে।'

'তোমার পিতা এত মূল্য কেন গ্রহণ করছেন না?'–মাহমুদ জিজ্ঞেস করে–'মেয়েদেরকে বিক্রি করার তো এতদঞ্চলে নিয়ম আছে।'

'আব্বা বলছেন, ওদেরকে মুসলমান বলে মনে হয়নি'–সাদিয়া বলল–'আমিও আব্বাকে বলে দিয়েছি, আমি অমুসলিমদের কাছে যাব না। আপনি যদি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে আমি এখনই যেতে রাজি আছি।'

'আমি প্রস্তুত'– মাহমুদ বলল।

'তাহলে চলুন'–সাদিয়া বলল– 'আজ রাতেই চলুন।'

'না'–মাহমুদ বলে ফেলল–'আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন না করে যেতে পারব না।'

'কী কর্তব্য?'–সাদিয়া জিজ্ঞেস করে।

মাহমুদ বিন আহমদ অপ্রস্তুত হয়ে যায়। সাদিয়াকে বলা সম্ভব নয় যে, তার কর্তব্য কী। সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সাদিয়া ছাড়বার পাত্রী নয়। মাহমুদের হঠাৎ স্মরণ এসে যায়। বলল, 'আমি ইমামের কাছে ধর্মশিক্ষা নিতে এসেছি; তা সম্পন্ন না করে যাব না।'

'ততদিন জানিনা আমি কোথায় চলে যাব!'–হতাশ কণ্ঠে বলল সাদিয়া।

মাহমুদ বিন আহমদ নিজের কর্তব্যের উপর একটি মেয়েকে প্রাধান্য দিতে পারেনি। তার মনে এই সন্দেহ জাগ্রত হয় যে, এই মেয়েটি দুশমনের চরও তো হতে পারে যে, আমাকে বেকার করে দেয়ার জন্য তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে! মাহমুদ মেয়েটিকে যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন অনুভব করে।

✿ ✿ ✿

সুলতান আইউবীর বাহিনীর অবস্থান কায়রো থেকে আট-দশ মাইল দূরে। তাঁকে অবহিত করা হয়েছিল যে, এই বাহিনী উত্তেজিত এবং মিসরের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। সুলতান আইউবী সেখানে-ই ছাউনী ফেলার নির্দেশ দেন এবং নিজে সৈন্যদের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে শুরু করেন। তিনি নিজে সৈন্যদের জযবা যাচাই করে দেখতে চান। তিনি একজন অশ্বারোহী সৈন্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। সঙ্গে আরো কয়েকজন সৈন্য এসে তাঁর চতুর্পার্শ্বে ভীড় জমায়। তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করেন এবং স্বাভাবিক কথা-বার্তা বলতে শুরু করেন। হঠাৎ এক সিপাহী মুখ খুলল। 'গোস্তাগী মাফ করুন সালারে আজম! এখানে ছাউনী ফেলার প্রয়োজন তো ছিল না। আমরা তো সন্ধ্যা নাগাদ-ই কায়রো পৌঁছে যেতে পারতাম!'

'তোমরা দীর্ঘদিন লড়াই করে এসেছ'–সুলতান আইউবী বললেন–'আমি তোমাদেরকে এই খোলা ময়দানে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দিতে চাই।'

'আমরা এসেছি লড়াই করতে, যাচ্ছিও লড়াই করতে।'–সিপাহী বলল।

'লড়াই করতে যাচ্ছ?' কিছুই জানেন না এমন ভান ধরে সুলতান বললেন–'আমি তো তোমাদেরকে কায়রো নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবে!'

'ওরা আমাদের দুশমন'–সিপাহী বলল–'আমাদের বন্ধুরা বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, এই তথ্য যদি সত্য হয়, তাহলে ওরা আমাদের শত্রু।'

'খৃস্টানদের চেয়েও ঘৃণ্য শত্রু'– আরেক সিপাহী বলল।

'কেন সালারে আজম'–কায়রোতে গাদ্দারী ও বিদ্রোহ চলছে, একথা কি

সঠিক নয়?' জিজ্ঞেস করে অন্য এক সিপাহী।

'কিন্তু সমস্যা হয়েছে শুনেছি'–সুলতান আইউবী বললেন– 'আমিও দোষীদের শাস্তি দেব।'

'আপনি সমগ্র বাহিনীকে কী শাস্তি দেবেন?' এক সৈন্য বলল– 'শাস্তি আমরা দেব। আমাদের কমান্ডারগণ আমাদেরকে কায়রোর পুরো ঘটনা শুনিয়েছেন। আমাদের সঙ্গীরা শোবক ও কার্কে শহীদ হয়েছে। কার্ক-শোবকে আমাদের মা-বোন-কন্যাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে। কার্কে তো এখনো হচ্ছে। আমাদের সঙ্গীরা প্রাচীরের উপর থেকে নিক্ষিপ্ত আগুনে জ্বলে-পুড়ে শহীদ হয়েছে। আমাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস কাফেরদের দখলে। আর আমাদের সেনাবাহিনী কিনা কায়রো বসে মৌজ করছে, আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে! যাদের কাছে শহীদের মর্যাদা নেই, নিজ কন্যার মান-সম্ভ্রমের মূল্য নেই, তাদের বেঁচে থাকারও অধিকার নেই। আমরা খবর পেয়েছি, তারা ইসলামের দুশমনের দোস্ত হয়ে গেছে। যতক্ষণ না আমরা গাদ্দারদের মস্তক ছিন্ন করব, ততক্ষণ শহীদদের আত্মা আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। আমরা যে জখমী ভাইদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি, আপনি তাদের প্রতি একটু তাকান। তাদের কারো পা নেই, কারো হাত নেই। এরা কি চিরদিনের তরে এই জন্য পঙ্গুত্ববরণ করে নিল যে, আমাদের সাথী-বন্ধুরা দুশমনের হাতের খেলনায় পরিণত হবে? না, আমরা তা বরদাশত করব না। তাদেরকে আমরা নিজ হাতে শাস্তি দেব।'

দেখতে না দেখতে বিপুল সৈন্য সুলতান আইউবীর চারদিকে এসে জড়ো হয়। সকলের চোখে প্রতিশোধের আগুন, মুখে প্রতিবাদী ভাষা। সুলতান আইউবী তাদের এই জোশ এই চেতনা অবদমিত করে তাদের মন ভাঙ্গতে চাইছেন না। তিনি তাদেরকে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়ার উপদেশ দিলেন– কোন নির্দেশ দিলেন না।

সুলতান নিজ তাঁবুতে ফিরে আসেন। উপদেষ্টা ও নায়েবদের ডেকে এনে বললেন, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বাহিনী এখানেই অবস্থান করবে। তিনি বললেন–

'আমি চাক্ষুস দেখেছি যে, এই বাহিনী মিসর গেলে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাবে। সেনাবাহিনী যদি পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়, তাহলে দুশমন লাভবান হয়। আমি আজ রাতেই কায়রো যাচ্ছি। কেউ যেন টের না পায় যে, আমি এখানে নেই। সৈন্যদের স্পৃহাও দমন করার চেষ্টা করবেন না।'

কতিপয় জরুরী নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়ে সুলতান আইউবী বললেন–

'আমাদের কায়রোর যে বাহিনী বিদ্রোহ করতে উদ্যত, আমার দৃষ্টিতে

তারা নির্দোষ। জাতির যে যুবক শ্রেণী মদ-জুয়া ও মানসিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত হতে চলেছে, আমার মতে তাদেরও কোন দোষ নেই। আমাদের প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাই ভুল তথ্য দিয়ে তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ঐ কর্মকর্তাদেরই ইঙ্গিতে দুশমন আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় শহরে নগ্নতা ও বিলাসিতার উপকরণ ছড়িয়েছে। দেশের এই নৈতিক অধঃপতন এ কারণেই বিস্তার লাভ করার সুযোগ পেয়েছে যে, আমাদের প্রশাসনের যেসব কর্মকর্তার দায়িত্ব ছিল এসব প্রতিহত করা, তারাই এ কাজে মদদ যুগিয়েছে। দুশমন তাদেরকে ভাতা দিচ্ছে। যখনই কোন জাতির রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা দুশমনের হাতের খেলনায় পরিণত হয়, তখন সেই জাতির পরিণতি এমনই নয়। আমাদের একদল সৈন্য সুদানের মরুভূমিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে না খেয়ে লড়ছে, মরছে আর প্রশাসন তাদের রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে বসে আছে। এসব কি দুশমনের ষড়যন্ত্র নয়, যা সফল করে তুলছে আমাদেরই কর্মকর্তারা? আমাদের কোন কোন ভাই মিসরের ক্ষমতা দখল করার স্বপ্ন দেখছে। তারা সর্বাগ্রে সেনাবাহিনীকে জনগণের চোখে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে, যাতে ক্ষমতা দখল করে তারা ইচ্ছেমত শাসন করতে পারে। আমার বন্ধুগণ! আমার ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার কোন খায়েশ নেই। আমার বিরুদ্ধবাদীদের কেউ যদি আমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, সে আমার লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে, তাহলে আমি তার বাহিনীতে একজন সাধারণ সিপাহী হয়ে কাজ করব। কিন্তু এমন লোকটি কে? ওরা অবশিষ্ট জীবন রাজা হয়ে কাটাতে চায়। তার জন্য দুশমনের হাতে হাত মিলাতে হলেও তারা প্রস্তুত। আর আমি আমার জীবদ্দশায়ই জাতিকে এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ করতে চাই, যেখানে তারা তাদের দ্বীনের দুশমনের মাথায় পা রেখে রাজত্ব করবে। আমাদের ঐসব লোভী ও গাদ্দার শাসকদের দৃষ্টি বর্তমানের উপর। আর আমার নজর জাতির ভবিষ্যতের প্রতি।'

সুলতান আইউবী বলতে বলতে থেমে যান। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'এক্ষুণি আমার ঘোড়া প্রস্তুত কর।' তিনি যাদেরকে সঙ্গে নেবেন, তাদের নাম উল্লেখ করে বললেন, 'চুপিচুপি এদেরকে ডেকে আন এবং বলে দাও তাদের কায়রো যেতে হবে। আমার তাঁবু এখানে এভাবেই থাকবে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে, আমি এখানে নেই।'

সুলতান আইউবী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমি আপনাদেরকে পরিষ্কার করে বলছি, মিসরের যে বাহিনী বিদ্রোহ করতে চাচ্ছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে যাব না। তোমরা কেউ তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না। আমি এ্যাকশন নেব তাদের বিরুদ্ধে, যারা সেনাবাহিনী ও দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত

ও অপদস্ত করার কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। আমাদের এই বাহিনীই যখন দুশমনের মুখোমুখি হবে এবং দুশমন তীর ছুঁড়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে, তখন তাদের স্মরণ এসে যাবে যে, তারা আল্লাহর সৈনিক। তখন তাদের মাথা থেকে বিদ্রোহের পোকা বেরিয়ে যাবে। আপনারা যখন নিজ নিজ সন্তানদেরকে তাদের দ্বীনের দুশমনকে দেখিয়ে দেবেন, তখন তাদের চিন্তা-চেতনা আপনা-আপনিই জুয়া থেকে সরে গিয়ে জিহাদমুখী হয়ে যাবে। আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলছি, ইসলাম ও ইসলামী সালতানাতের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা সেনাবাহিনী ছাড়া সম্ভব নয়। খৃস্টান ও ইহুদীদের প্রত্যয়, তাদের যুদ্ধরীতি ও গোপন তৎপরতার আলোকে আমি বলে দিতে পারি যে, তারা আমাদের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে ইসলামের মূলোৎপাটন করতে চায়। কোন মুসলিম রাষ্ট্র শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। আমাদের আজকের ভুল পদক্ষেপ ইসলামের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দেবে। আমি বলতে পারি না, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর আমাদের বিচ্যুতি, ব্যর্থতা ও সফলতা থেকে লাভবান হতে পারবে কিনা।'

'মোহতারাম আমীরে মেসের!'– এক উপদেষ্টা বলল– 'আমাদের ভাইয়েরা যদি গাদ্দারীর বিদ্যায়-ই পান্ডিত্য অর্জন করতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধর গোলাম হয়েই থাকতে বাধ্য হবে। তারা জানবেই না, আযাদী কাকে বলে এবং জাতীয় মর্যাদাইবা কী? আমাদের কাছে কি এর কোন প্রতিকার নেই?'

'জাতির মন-মস্তিষ্ককে সচেতন কর'– সুলতান বললেন– 'জনগণকে প্রজা বল না। দেশের প্রতিটি মানুষই আপন আপন ক্ষেত্রে রাজা। দেশের একজন মানুষকেও জাতীয় মর্যাদা থেকে বঞ্চিত কর না। আমাদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মাথায় রাজা ও খলীফা হওয়ার ভূত সাওয়ার হয়েছে। তাই তারা জাতিকে প্রজা বানিয়ে তাদেরকে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার কাজে ব্যবহার করতে চায়। মনে রেখ, 'জাতি শুধু কতগুলো দেহের সমষ্টিই নয়, যাদেরকে তোমরা পশুপালের ন্যায় হাঁকাতে থাকবে। জাতির মধ্যে মেধা-মস্তিষ্কও আছে। আত্মা আছে। আছে জাতীয় মর্যাদাবোধও। তোমরা জাতির এই গুণগুলোকে শাণিত কর, যাতে তারা নিজেরাই ভাল-মন্দ বিবেচনা করতে শিখে। সচেতন দেশবাসী যদি অনুভব করে যে, দেশে সালাহুদ্দীন আইউবী অপেক্ষা ভাল ও যোগ্য নেতা আছেন, যিনি সালতানাতে ইসলামিয়াকে টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি সমুদ্রের ওপার পর্যন্ত তার বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হবেন, তাহলে যে কেউ আমার পথরোধ করে সাহসিকতার সঙ্গে বলতে পার যে, সালাহুদ্দীন ! তুমি মসনদ ছেড়ে দাও, আমরা তোমার অপেক্ষা যোগ্য নেতা

পেয়ে গেছি। এমন সচেতনতা ও সাহিসকতা দেশের মানুষের থাকা উচিত। তোমরা দোয়া কর, আমার মধ্যে যেন ফেরাউনী চরিত্র ঢুকে না পড়ে যে, কেউ আমার বিরুদ্ধে কথা বলল আর আমি অমনি জল্লাদ ডেকে তার মাথাটা কেটে ফেললাম। আমার আশংকা, মিল্লাতে ইসলামিয়া এরূপ ফেরাউনদের বলির শিকার হতে যাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে, এ জাতিকে একদিন প্রজা ও পশুতে পরিণত করা হবে। তখন মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না। থাকলেও থাকবে নামমাত্র। ধর্ম পরিচয়ে তারা মুসলমানই থাকবে, কিন্তু সভ্যতা হবে খৃস্টানদের।'

এমন সময়ে এক মোহাফেজ ভেতরে প্রবেশ করে বলল, ঘোড়া প্রস্তুত। যে তিন-চারজন নায়েব সালারকে তলব করা হয়েছিল, তারাও এসে পড়েছেন। সুলতান আইউবী চারজন মোহাফেজ সঙ্গে নিলেন। অন্যদের বললেন, তোমরা আমার এই শূন্য তাঁবুটি পাহারা দাও। কেউ যেন বুঝতে না পারে যে, আমি এখানে নেই। যেসব আমলা তার সঙ্গে যাবে, তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা সাবধানে অমুক স্থানে চলে যাও, আমি যথাসময়ে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। একজন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে সুলতান আইউবী তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়েন।

❁ ❁ ❁

অন্ধকার মরুভূমি। দ্রুতগতিতে দৌড়াচ্ছে চৌদ্দটি ঘোড়া। সুলতান আইউবী ভোরের আলো ফোঁটার আগেই কায়রো পৌঁছুতে চান। আলী বিন সুফিয়ানকে তিনি সঙ্গে রেখেছেন। চৌকিতে সৈন্যরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। জাগ্রত সান্ত্রীরাও টের পায়নি যে, তাদের সালার বেরিয়ে গেছেন। আর কায়রোবাসীদের তো কল্পনায়ও নেই যে, তাদের সুলতান এই মুহূর্তে কায়রো ঢুকে যেতে পারেন।

রাতের শেষ প্রহর। সুলতান আইউবীর কাফেলা কায়রোতে প্রবেশ করে। তাদের কোন সান্ত্রীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হল না। কোন সান্ত্রী ছিলও না সেখানে। সুলতান তার সঙ্গীদের বললেন, 'এ হল, বিদ্রোহের প্রথম ধাপ। শহরে কোন প্রহরী নেই। বাহিনী ঘুমিয়ে আছে- বেপরোয়া, উদাসীন। অথচ দু'টি ময়দানে আমাদের যুদ্ধ চলছে। দুশমনের হামলার আশংকা আছে প্রতি মুহূর্তে।'

গন্তব্যে পৌঁছে যান সুলতান আইউবী। মুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি মিসরের অস্থায়ী সেনা প্রধানকে তলব করেন। আল-ইদরীসকেও ডেকে পাঠালেন। সেনাপ্রধান সুলতান আইউবীকে দেখে ভয় পেয়ে যান। সুলতান আল-ইদরীসের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। আল-ইদরীস বললেন, 'আমার ছেলেরা যদি যুদ্ধের ময়দানে নিহত হত, তাহলে আমি আনন্দ পেতাম। কিন্তু আফসোস, ওরা নিহত হল প্রতারণার শিকার হয়ে।' তিনি বললেন, 'এখন

পুত্রদের বিরহে মাতম করার সময় নয়। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে অন্য উদ্দেশ্যে তলব করেছেন। বলুন, হুকুম কী?'

ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান ইসলামের জন্য নিবেদিত মুসলমান। সুলতান আইউবী তাদের দু'জনের নিকট থেকে কায়রোর আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট নেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের দৃষ্টিতে প্রশাসনের কোন্ কোন্ কর্মকর্তা সন্দেহভাজন। তিনি বিশেষ করে সেনা কর্মকর্তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারা সুলতান আইউবীকে কয়েকটি নাম বলেন। তিনি নির্দেশ দিতে শুরু করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটি হল, সন্দেহভাজন কর্মকর্তাগণ কায়রোয় কেন্দ্রীয় দফতরেই অবস্থান করবে এবং সকল সৈন্যকে সূর্যোদয়ের আগে আগেই অভিযানে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে। আরো কিছু নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবী একটি পরিকল্পনা তৈরিতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। আলী বিন সুফিয়ানকেও কিছু পরামর্শ দিয়ে বিদায় করে দেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেনাক্যাম্পে তোলপাড়া শুরু হয়ে যায়। সৈন্যদেরকে সময়ের আগেই জাগিয়ে তোলা হল। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সন্দেহভাজন কর্মকর্তাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর হেডকোয়ার্টারে ডেকে নেয়া হয়। তারা ভেবে বিস্মিত যে, এ সব কী হয়ে গেল! তারা শুধু এতটুকু জানতে পেরেছেন যে, সুলতান আইউবী এসে পড়েছেন। তারা সুলতানের ঘোড়াও দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখেননি। সুলতানও এসে পরিকল্পনামাফিক নিজেকে তাদের থেকে গোপন রেখেছেন।

ভোরের আলো এখনো ফোঁটেনি। সৈন্যরা সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান। পদাতিক ও আরোহীদের সারির পেছনে রসদ ও অন্যান্য সামানপত্রে বোঝাই উটের বহর। সুলতান আইউবী দেশের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এমনভাবে গঠন করেছেন যে, কখনো তাৎক্ষণিক নির্দেশ পেলে যেন এক ঘন্টার মধ্যে রসদ ও অন্যান্য সামানসহ প্রস্তুত হয়ে যায়। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল এখানেও। বাহিনী রাত শেষ হওয়ার আগেই রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

সুলতান আইউবী ঘোড়ায় আরোহন করেন। মিসরের ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধানও তাঁর সঙ্গে। সুলতান সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান বাহিনীর প্রতি চোখ বুলান এবং একটি সারির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করেন। মুখে তার হাসি হাসি ভাব। তিনি বলছেন, 'শাবাশ! শাবাশ! ইসলামের বীর সেনানীরা! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক।'

সালাহুদ্দীন আইউবীর ব্যক্তিত্বের কাছে সবাই অবনত। সৈন্যরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাকিয়ে আছে তাদের মহান সেনাপতির মুখের প্রতি। সেই সঙ্গে তাঁর মুচকি হাসি আর প্রশংসামূলক উক্তি সৈন্যদের আরো প্রভাবিত, আরো

উজ্জীবিত করে তোলে। মিসরের গবর্নর ও সালারে আজমের সাধারণ সৈন্যদের এতটুকু ঘনিষ্ঠ হওয়াই ছিল যথেষ্ট।

সমগ্র বাহিনী পরিদর্শন করে এবার সুলতান আইউবী সেনাদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দান করেন। তিনি বললেন–

'আল্লাহর নামে জীবনদানকারী মুজাহিদগণ! তোমরা শোবকের দুর্ভেদ্য দুর্গ– যা ছিল কুফরের সবচেয়ে নিরাপদ আস্তানা– বালির স্তূপ মনে করে গুড়িয়ে দিয়েছিলে। তোমরা খৃস্টানদেরকে মরুভূমিতে বিক্ষিপ্ত করে হত্যা করেছিলে এবং অনেকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান করে নিয়েছ। তোমাদের সঙ্গীরা, তোমাদের বন্ধুরা তোমাদের চোখের সামনে শহীদ হয়েছে। তোমরা তাদের লাশ নিজ হাতে দাফন করেছ। তোমরা সেই কমান্ডো শহীদদের কথা স্মরণ কর, যারা দুশমনের সারির মধ্যে ঢুকে পড়ে শাহাদাতবরণ করেছে। তোমরা তাদের জানাযা পড়তে পারনি, দাফন করতে পারনি। এমনকি তাদের মৃতদেহটা পর্যন্ত তোমরা এক নজর দেখতে পারনি। দুশমন তাদের লাশের সঙ্গে কী আচরণ করেছে, তা তোমরা জান। তোমরা শহীদদের বিধবা স্ত্রী ও এতীম সন্তানদের কথা স্মরণ কর, যাদের স্নেহ-মমতা-ভালবাসা আল্লাহর নামে কোরবান হয়ে গেছে। আজ শহীদদের আত্মা তোমাদের ডাকছে। তোমাদের আত্মমর্যাদা ও পৌরুষকে চীৎকার করে আহ্বান করছে। দুশমন কার্ক দুর্গকে এত দুর্ভেদ্য ও মজবুত করে তুলেছে যে, তোমাদের সঙ্গীরা প্রাচীরের উপর থেকে নিক্ষিপ্ত আগুন ভেদ করে প্রাচীর ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে...।

'ইসলামের মর্যাদার প্রহরীগণ! কার্ক দুর্গে তোমাদের বোন-কন্যাদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে। বৃদ্ধদেরকে পশুর ন্যায় খাটান হচ্ছে। যুবকদেরকে বন্দীশালায় আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু যে আমি খৃস্টানদের পাথরের কেল্লা ভেঙ্গে চুরমার করেছিলাম, সেই আমি মাটির দুর্গ জয় করতে পারলাম না। আমার শক্তি তোমরা। আমার ব্যর্থতা তোমাদেরই ব্যর্থতা।'

সুলতান আইউবীর কণ্ঠস্বর আরো উঁচু হয়ে যায়। তিনি দু'বাহু ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বললেন–

'তোমরা আমার বুকটা তীরের আঘাতে ঝাঝরা করে দাও। আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। কিন্তু আমার জীবন হরণ করার আগে আমাকে অবশ্যই এ সুসংবাদ শোনাতে হবে যে, তোমরা কার্ক দুর্গ জয় করে নিয়েছ এবং সম্ভ্রমহারা মা-বোন-কন্যাদের উদ্ধার করেছ।'

তৎকালের ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদী লিখেছেন, সুলতান আইউবীর ভাষণ মুসলিম সৈনিকদের অন্তরে তীরের ন্যায় গেঁথে যাচ্ছিল। তাদের চেহারা

রক্তিম হয়ে ওঠে এবং তারা আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। তাদের হৃদয় থেকে বিদ্রোহের আগুন নিভে যেতে শুরু করে। সুলতান আইউবীর উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়।

সালতানাতে ইসলামিয়ার মুহাফিজগণ! তোমাদের তরবারীগুলো ভোতা করে দেয়ার জন্য খৃস্টানরা তাদের মেয়েদের ইজ্জত ও হাশীশ ব্যবহার করছে। তোমরা হয়ত জান না, খৃস্টানরা তাদের একটি মেয়ের ইজ্জত বিলিয়ে এক হাজার মুজাহিদকে বেকার করে তুলছে। একটি মেয়েকে দিয়ে আমাদের হাজার মেয়ের চরিত্র নষ্ট করছে। তারা তোমাদের মাঝে একটি চরিত্রহীনা মেয়ে ঢুকিয়ে আমাদের হাজার হাজার মেয়ের চরিত্র বিনষ্ট করছে। তোমরা যাও, আপন বোন-কন্যাদের ইজ্জত রক্ষা কর। তোমরা সেই কার্ক অভিমুখে রওনা হচ্ছ, যেখানে পবিত্র কুরআনের পাতা ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে ও কাফিরদের পায়ে দলিত হচ্ছে। যেখানে তোমাদের মসজিদগুলো খৃস্টানদের শৌচাগারে পরিণত হয়েছে। যে খৃস্টানরা তোমাদের ভয়ে থরথর করে কাঁপত, ওখানে তারা তোমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছে। শোবক তোমরা জয় করেছিলে; কার্কও তোমাদের-ই জয় করতে হবে।'

সুলতান আইউবী বাহিনীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেননি যে, তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তিনি কারো ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহের ইঙ্গিতও করেননি। তার স্থলে তিনি বাহিনীর চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধকে উত্তেজিত করে তোলেন, যার ফলে যে বাহিনী এতক্ষণ এই ভেবে বিস্মিত ছিল যে, এত সাত সকালে কেন আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা হল, এখন তাদের বিস্ময়ের কারণ হল, কেন আমাদেরকে এক্ষুণি কার্কের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে না!

সুলতান আইউবীর ভাষণের পর সমস্ত বাহিনী এখন উত্তেজিত। তিনি ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কমান্ডারদের ডেকে পাঠান। তারা এলে তিনি তাদেরকে রওনা হওয়া সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বাহিনীকে যে পথে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন, সেটি সেই রাস্তা থেকে অনেক দূরে, যে পথে রণাঙ্গনের বাহিনী ফিরে আসছে। সুলতান আইউবী যে কমান্ডারদেরকে কার্ক থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তাদেরকেও রওনাকারী বাহিনীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। তাদেরকে তিনি আগেই গোপনে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন। বাহিনী যখন রওনা হওয়ার নির্দেশ পায়, তখন সৈন্যদের তাকবীর ধ্বনিতে কায়রোর আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠে। আবেগের অতিশয্যে জ্বলজ্বল করে ওঠে সুলতান আইউবীর মুখমণ্ডল।

বাহিনী যখন সুলতান আইউবীর দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, তখন তিনি

একজন দূতকে পয়গাম দিয়ে সেই ছাউনীর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন, যেখানে রণাঙ্গন থেকে আগত বাহিনী অবস্থান নিয়ে আছে। দূতকে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছার নির্দেশ দেয়া হয়। বার্তা হল, পয়গাম প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীকে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা করাও।

পথের দূরত্ব ছিল আট-দশ মাইল। দূত দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে যায়। তৎক্ষণাৎ বাহিনী রওনা হওয়ার নির্দেশ পায়। সূর্যাস্তের পর বাহিনীর অগ্রগামী ইউনিট কায়রোতে ঢুকে পড়ে। পেছনে পেছনে ঢুকে পড়ে অন্যান্য ইউনিটও। তাদেরকে থাকার জন্য সেই স্থান দেয়া হয়, যেখানে গতরাত পর্যন্ত কার্কের উদ্দেশ্যে রওনাকারী বাহিনী অবস্থান করছিল। কমান্ডাররা সৈন্যদেরকে অবহিত করে যে, এখানকার বাহিনীকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এরা ছিল ক্ষুব্ধ উত্তেজিত। আলী বিন সুফিয়ান এদেরকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছেন।

সুলতান আইউবী পরম বুদ্ধিমত্তার সাথে বিদ্রোহের আশংকাও দূর করে দেন এবং গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনাও নিঃশেষ করে দেন। তিনি ঊর্ধ্বতন কমান্ডার ও সেসব সেনা কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠান, যারা সীমান্ত বাহিনীগুলোর জিম্মাদার। সীমান্তে কত সৈন্য আছে এবং কোন্ কোন্ স্থানে আছে জেনে নিয়ে তিনি সে পরিমাণ সৈন্য সকাল সকাল যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সুলতানকে অবহিত করা হয়েছিল যে, সীমান্ত বাহিনীগুলো দেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য ও সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র বাইরে পাচার করার ব্যাপারে দুশমনের সহযোগিতা করছে। সুলতান আইউবী এই বাহিনীগুলোর কমান্ডারকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সীমান্ত থেকে প্রত্যাহৃত বাহিনীগুলো সম্পর্কে নির্দেশ দেন, যেন তাদেরকে ওখান থেকেই রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

❁ ❁ ❁

সাদিয়া দু'বেলা মসজিদে ইমামকে খাবার দিয়ে যায়। মাহমুদ বিন আহমদ শিষ্য পরিচয় নিয়ে ইমামের নিকট থেকে ধর্মশিক্ষা অর্জন করছে। সাদিয়া যে চারণভূমিতে বকরি চরায়, মাঝে-মধ্যে সেখানেও যাওয়া-আসা করে সে। ওখানে টিলা আছে। জায়গাটা সবুজ-শ্যামল। পানির অভাব নেই। এলাকাটা লোকালয় থেকে খানিক দূরে।

সাদিয়া মাহমুদকে নিজের মোহাফেজ ভাবতে শুরু করেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, মাহমুদ তাকে কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করবে-ই। কিন্তু মাহমুদ এখন-ই তাকে নিজ গ্রামে নিয়ে যেতে রাজি হচ্ছে না। সাদিয়া মাহমুদকে এমনও বলে যে, তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে রেখে এস, তারপর

বিদ্যা অর্জন কর। মাহমুদ তাকে বলতে পারছে না যে, তার বাড়ি মিসরের অন্য প্রান্তে, যেখানে ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না।

মাহমুদ তার অভিজ্ঞতা বলে বুঝে ফেলেছে, সাদিয়া দুশমনের ক্রীড়নক নয়। কর্তব্যের পথে প্রতিবন্ধক না হলেও আরো আগেই মাহমুদ মেয়েটিকে এলাকায় নিয়ে যেত। তাছাড়া মসজিদের ইমাম তারই বিভাগের একজন অফিসার, যার উপস্থিতিতে সে কর্তব্যে অবহেলা করতে পারে না। ইমাম তাকে এ-ও বলেছিলেন যে, তুমি আমার সঙ্গে-ই থাক। মাহমুদের দৃষ্টিতে এটি তার প্রতি তার অফিসারের নির্দেশ।

একদিন হঠাৎ গ্রামে হুলস্থুল শুরু হয়ে যায়। কিছু অপরিচিত লোকের চেহারা চোখে পড়তে শুরু করে। সকলের মুখে এক-ই কথা–তিনি আসছেন। তিনি আকাশ থেকে এসেছেন। মৃতকে জীবন দানকারী আসছেন...।

আজ গ্রামের প্রতিটি মানুষ বেজায় খুশি। তারা বলছে, তাদের উদ্দেশ্য পূরণকারী আসছেন।

সাদিয়া দৌঁড়ে আসে। মাহমুদ বিন আহমদকে বলে, শুনেছ, তিনি আসছেন। তুমি কি জান, আজ আমি তার কাছে কি চাইব? আমি তাকে বলব, মাহমুদ যেন আমাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যায়। তারপর তুমি আমাকে নিয়ে যাবে।

মাহমুদ কোন জবাব দিতে পারল না। এখনও সেই রহস্যময় লোকটিকে দেখেনি সে। মাহমুদের ডিউটি এলাকায় এই প্রথমবার-ই আসছেন তিনি। তার কেরামতের কাহিনী এ এলাকার মানুষ শুনেই আসছে শুধু।

মাহমুদ বাইরে বেরিয়ে পড়ে। অপরিচিত লোকদের মধ্যে তার দু'জন গোয়েন্দা সহকর্মী দেখতে পায়। তাদের কর্মস্থল অন্য এলাকা। মাহমুদ তাদেরকে এখানে কেন এসেছে জিজ্ঞেস করে। তারা বলে, আমরা গায়েবজানা লোকটিকে দেখতে এসেছি। তবে তারা এসেছে গুপ্তচর হিসেবে নয়। তারা লোকটির দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত। তারা কোথাও লোকটির কারামত দেখেছে। সেই কাহিনী তারা মাহমুদের কাছে এমনভাবে বিবৃত করে, যেন এতে তাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তাদের বিবরণে মাহমুদও প্রভাবিত হয়ে পড়ে। মাহমুদের এ দু'সহকর্মী গায়েবজানা লোকটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। মাহমুদ ভাবে, আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দারা যার দ্বারা প্রভাবিত হয়, সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে পারে না।

সাদিয়া যেখানে উট-বকরী চরানোর বাহানা দেখিয়ে মাহমুদের সঙ্গে মিলিত হত, মাহমুদ সেই সবুজঢাকা এলাকায় চলে যায়। কিন্তু এখন সেখানে ভিন্ন পরিবেশ। দু'ব্যক্তি দূরে থাকতেই তাকে থামিয়ে দেয় এবং বলে, খোদার

প্রেরিত পয়গাম্বর আসছেন। এ জায়গা তার জন্য পরিস্কার করা হচ্ছে। তিনি এখানে অবস্থান করবেন।

মাহমুদ দূর থেকে তাকিয়ে দেখে, টিলার ভিতরে গুহামত কি যেন তৈরী করা হচ্ছে এবং জায়গাটা সমতল করা হচ্ছে। এখন সেখানে কারো যাওয়ার অনুমতি নেই। গ্রামের মানুষ কাজ-কর্ম ত্যাগ করে সেদিকে ছুটছে আর নির্দিষ্ট স্থানে এসে জড়ো হচ্ছে। জায়গাটা পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা পালাক্রমে এসে এসে জনতাকে আগন্তুকের অলৌকিক কাহিনী শোনাচ্ছে। মানুষ আনন্দিত ও অভিভূত হচ্ছে।

রাতেও মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটির প্রতি তাদের ভক্তি-বিশ্বাসের অবস্থা এই যে, সেদিন তারা মসজিদে যাওয়ার কথাও ভুলে যায়। পরদিন ভোর হতে না হতে-ই মানুষ আবার সেখানে সমবেত হতে শুরু করে। রাতে আপরিচিত লোকদের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। তারা সেখানে গর্তও খনন করছিল। তাদের সঙ্গে কয়েকটি উটও আছে, যেগুলো মালামাল দ্বারা বোঝাইকরা। মালপত্র নামানোর কাজ শুরু হয়। তার মধ্য থেকে অনেকগুলো তাঁবু বেরিয়ে এল। তারা তাঁবুগুলো স্থাপন করতে শুরু করে।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। তারপর রাত। অন্ধকার রাত। 'তিনি' অন্ধকার রাত ছাড়া মানুষকে সাক্ষাৎ দেন না। সন্ধ্যার পরও মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। উৎসুক জনতার একধারে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো মেয়ে। তাদের মধ্যে আছে সাদিয়াও।

মেহমানদের জন্য যে জায়গাটা পরিস্কার করা হচ্ছিল, সেখানে প্রদীপ জ্বলছে। সাদিয়া যে মেয়েদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, দু'জন লোক তাদের পিছনে এসে দাঁড়ায়। মেয়েগুলো তাদের দেখেনি। সম্মুখে আছে তিন-চারজন। এরা অপরিচিত। মেয়েদের কাছে এসে তারা বলে উঠে, এই ,তোরা দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তারা মেয়েগুলোকে সরাবার জন্য তাড়া দেয়। মেয়েরা ছুটে পালাতে উদ্যত হয় এবং এক একজন এক একদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একজন পিছন থেকে সাদিয়ার গায়ের উপর কম্বল ছুড়ে মারে। শক্ত দু'টি বাহু দ্বারা তার কোমর ঝাপটে ধরে। তারপর কম্বল পেছানো অবস্থায় কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত কেটে পড়ে। এক তো অন্ধকার। দ্বিতীয়ত সঙ্গী মেয়েরা যার যার মত পালিয়ে গেছে। তাই সাদিয়ার অপহরণ ঘটনা দেখেনি কেউ।

পরদিন ভোরবেলা। চারণভূমি অভিমুখে মানুষের ঢল নেমেছে যেন। জনতার বিশাল এক মিছিল এগিয়ে চলছে চারণভূমির দিকে। মিছিলের সম্মুখে ষোল-সতেরটি উট। প্রতিটি উটের উপর একটি করে পালকি। প্রতিটি পাল্কি পর্দা দ্বারা ঢাকা। তার কোন একটিতে 'তিনি' উপবিষ্ট। সামনে বাজছে দফ ও সানাই। দফ-সানাইয়ের বাজনার তালে গুনগুন করে কি যেন গাইছে কিছু

মানুষ। উটগুলোর ঘাড়ে ঝুলন্ত বড় বড় ঘন্টার আওয়াজ সেই বাজনার-ই অংশ বলে মনে হচ্ছে। জনতার এত বিপুল সমাগম, কিন্তু কোন হৈ হুল্লোড়, চেচামেচি নেই। নিঝুম-নীরব এগিয়ে চলছে সকলে। এটি মুরীদ ও ভক্তদের মিছিল। এরা কোথা কোথা থেকে 'পীর সাহেব'-এর পিছনে পিছনে হেঁটে চলছে। এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যেন পালকি বহনকারী উটটি আকাশ থেকে অবতরণ করছে।

কাফেলাটি সবুজ-শোভিত জায়গায় চলে যায়। এলাকাটা চারদিক থেকে টিলায় ঘেরা। একস্থানে অনেকগুলো তাঁবু বসানো আছে পূর্ব থেকেই। তন্মধ্যে একটি তাঁবু বেশ বড়। উৎসুক জনতাকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে কেউ দেখতে পেল না পাল্‌কি থেকে কে নামল আর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ভক্তদের ভীড় দূরে সরে গিয়ে একস্থানে বসে পড়ে। সাদিয়ার গ্রামের মানুষ তাদের থেকে 'পবিত্র মানুষ'টির গল্প-কাহিনী শুনতে থাকে। মানুষ যত গোঁয়ার, পশ্চাদপদ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়, আজগুবি কল্প-কাহিনীর প্রতি তত দুর্বল হয়। সেই পরিবেশ-ই বিরাজ করছে এখন এখানে।

এ দৃশ্য অবলোকন করছেন ইমামও। দেখছে মাহমুদ বিন আহমদও। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে মাহমুদ। কায়রো থেকে তার এবং তার সহকর্মীদের কাছে নির্দেশ এসেছে, সীমান্ত এলাকায় নতুন এক বিশ্বাসের বিস্তার ঘটছে। সে সম্পর্কে তথ্য নিয়ে রিপোর্ট দাও, সেসমস্ত আসলে কী এবং কারা তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কায়রো এখনো এ ব্যাপারে কোন তথ্য পায়নি। তার কারণ, রহস্যময় লোকটি এ-যাবত যে ক'টি এলাকায় গমন করেছে, সেসব এলাকার গুপ্তচররাও তার ভক্তে পরিণত হয়ে গেছে। তারা তার বিপক্ষে কোন কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। সীমান্ত বাহিনীগুলোও তার প্রভাবে প্রভাবিত। পালা এবার ইমামের। তিনি যাচাই করে দেখবেন, এসব আসলে কী? ভাওতা? ভন্ডামী? বুযুর্গী? তিনি লক্ষ করছেন, মানুষ শুধু তার গল্প শুনে এত-ই প্রভাবিত হয়ে পড়ছে যে, তারা মসজিদে যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। লোকটাকে এক নজর দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে আছে।

ইমাম ও মাহমুদ একস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। সাদিয়ার পিতা এসে তাদের সামনে দাঁড়ান। অস্থিরচিত্তে বললেন, সাদিয়া রাত থেকে নিখোঁজ। তার সঙ্গী মেয়েরা বলছে, রাতে তারা এখানে কোথাও দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ কয়েকজন লোক এসে তাদেরকে সম্মুখ থেকে তাড়া দেয় এবং চলে যেতে বলে। ভয়ে তারা এদিক-সেদিক দৌড় দেয়। এক মেয়ে বলল, সে তাদের পিছনে দু'টি লোক দেখেছিল। তারপর কী হয়েছে কেউ বলতে পারেনা।

সাদিয়ার পিতা সাদিয়ার সন্ধানে নেমে পড়ে। মাহমুদও তার সঙ্গ নেয়।

এখানে কোথায় পাওয়া যাবে সাদিয়াকে! তারপরও পিতার মন! বেচারা অস্থিরমনে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে। মাহমুদও তার সঙ্গে ঘুরছে। হঠাৎ অপরিচিত এক ব্যক্তি তাদেরকে থামতে বলে। তারা থেমে যায়। লোকটি জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি কাউকে খুঁজছ? সাদিয়ার পিতা বললেন, হ্যাঁ, গত রাতে আমার একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, এই একটু আগেই কে যেন আমাকে বলল, তুমি তার বাপ। অপরিচিত লোকটি সাদিয়ার গঠন-আকৃতির বিবরণ দিয়ে বলল- 'তুমি মেয়েটিকে এখানে খুঁজে পাবেনা। এতক্ষণে সে মিসরের সীমানা পার হয়ে অনেক দূর চলে গেছে হয়ত। গতকাল সন্ধ্যায় আমি একটি ঘোড়া দেখেছিলাম। একটি অতিশয় রূপসী যুবতী মেয়ে তার সঙ্গী মেয়েদের থেকে সরে ঘোড়াটির কাছে চলে যায়। আরোহী ঘোড়ার কাছেই দাঁড়ানো ছিল। মেয়েটি তার সঙ্গে কথা বলে। আরোহী ঘোড়ায় চড়ে কয়েক পা সরে আড়ালে চলে যায়। মেয়েটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার পিছনে পিছনে চলে যায়। নিকটে গিয়ে সে নিজেই আরোহীর সামনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। আরোহী ঘোড়া হাঁকিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আজ কে একজন আমাকে বলল, মেয়েটি তোমার কন্যা। এখন আর ওকে তালাশ করে লাভ নেই।

সাদিয়ার পিতার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মাহমুদ ভাবে ভিন্ন কিছু। সে গোয়েন্দা । তার বিশ্বাস, লোকটি জ্বলন্ত মিথ্যা কথা বলছে। তার বক্তব্যের আগাগোড়া পুরোটাই অসত্য। ঘটনাটা দেখেছে যখন সে একা, তাহলে অন্য কেউ কি করে তাকে বলল, মেয়েটি কার কন্যা? গোয়েন্দাদের বিশেষভাবে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যে, কারো কথা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবে না এবং প্রথম প্রথম যে কাউকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে।

মাহমুদ অপরিচিত এই লোকটির পিছু নেয়, লোকটি ভীড়ের মধ্যদিয়ে টিলার পিছনে চলে যায় এবং অসংখ্য তাঁবুর কোন একটির মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যায়। মাহমুদ নিশ্চিত, সাদিয়া এসব তাঁবুর-ই কোন একটিতে আছে এবং তার অপহরণে এই লোকটির হাত আছে। লোকটি সাদিয়ার সেই কাষ্টমারদেরও একজন হতে পারে, যারা এক পর্যায়ে সাদিয়ার পিতাকে মেয়ের অপহরণের হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু সাদিয়ার পিতা লোকটাকে চিনেনি। সাদিয়ার পিতা যাতে মেয়েকে খুঁজে না বেড়ায়, সেজন্য লোকটি তাকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।

মাহমুদ ইবনে আহমদ গভীরভাবে ভালবাসে সাদিয়াকে। সে মেয়েটিকে উদ্ধার করার প্রত্যয় নেয়। মসজিদে গিয়ে ইমামকে বিষয়টি অবহিত করে। ইমাম গোয়েন্দা বিভাগের একজন বিচক্ষণ কর্মকর্তা। তিনিও অভিমত ব্যক্ত

করেন যে, এই গরীব লোকটিকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে। মাহমুদ এলাকায় অবস্থানকারী দু'গোয়েন্দার কথা উল্লেখ করে বলে, আমি সাদিয়াকে উদ্ধার করব; এ-কাজে আমার ওদের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। এ মুহূর্তে টিলার অভ্যন্তরে যাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

❁ ❁ ❁

সূলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী তার বাহিনীকে কার্ক অবরোধের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন এবং কিভাবে দুর্গ ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করা যায় ভাবতে থাকেন। তিনি প্রথম দিন-ই তাঁর কমান্ডারকে বলে দেন, যে দুর্গ সালাহুদ্দীন আইউবী জয় করতে পারেননি, তা তোমরাও সহজে পদানত করতে পারবে না। সালাহুদ্দীন আইউবী তো অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানোর মত মানুষ।

সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গীকে অবহিত করে গেছেন যে, তিনি দুর্গজয়ে কি কি পন্থা প্রয়োগ করেছেন। দুর্গের অভ্যন্তরে কি কি আছে, তাও তিনি জঙ্গীকে জানিয়ে গেছেন। খৃষ্টানদের রসদ কোথায়, পশুপাল কোথায়, জনবসতি কোন্ দিকে সব-ই তিনি জঙ্গীকে জানিয়ে গেছেন। তিনি গোয়েন্দা মারফত এসব তথ্য জেনেছিলেন। তিনি ভিতরে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মিনজানীক ছোট হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। তার বিপরীতে খৃষ্টানদের কাছে আছে বড় বড় কামান, যার গোলা বহুদূর পর্যন্ত পৌছে যায়। আইউবীর মিনজানীকের পাল্লা কম। এ কারণে দুর্গের ফটকেও আগুনের গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব হচ্ছে না। কোন দিক থেকে মুজাহিদরা প্রাচীর ভাঙ্গার চেষ্টা করলে উপর থেকে খৃষ্টানরা জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গারের ড্রাম গড়িয়ে ছেড়ে দেয়।

নুরুদ্দীন জঙ্গী তার নায়েবদের নিয়ে বৈঠক করেন। তিনি বললেন-

'সালাহুদ্দীন আইউবী আমাকে বলেছিলেন, তিনি বড় মিনজানীক তৈরি করিয়ে ভিতরে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে পারতেন। কিন্তু সমস্যা হল, ভিতরে মুসলমান বসতিও আছে। তিনি এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে চাচ্ছিলেন না, যাতে একজন মুসলমানেরও ক্ষতি হয়। কিন্তু আমি আইউবীর চিন্তাধারার পরিপন্থী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। আমি এত বড় মিনজানীক তৈরি করার ব্যবস্থা করেছি, যার দ্বারা নিক্ষিপ্ত আগুন ও ভারী পাথর বহু দূর গিয়ে পতিত হবে। তাতে ভিতরে দু'একজন মুসলমানের ক্ষতি হলেও বৃহত্তর স্বার্থে তা মেনে নিতে হবে। আমার বন্ধুগণ! তোমরা যদি কার্কের মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা জানতে, তাহলে বলতে, ওদের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। ওখানে একজন মুসলমানেরও ইজ্জত নিরাপদ নয়। মুসলিম মেয়েরদের খৃষ্টানদের বিছানায় রাতযাপন করতে হচ্ছে। পুরুষরা বন্দীদশায় বেগার

খাটছে। তারা হয়ত এ দুআ-ই করছে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি দুনিয়া থেকে নিয়ে যাও। আমাদের অবরোধ যত দীর্ঘ হবে, তাদের দুর্দশাও তত দীর্ঘতর হতে থাকবে। তাছাড়া আমাদের এ অভিযানে মুসলমানদের ক্ষতি হলেও ক'জনের আর হবে। যতটুক হবে, সে কোরবানী আমাদের দিতে-ই হবে। আপনারাও তো মরবার জন্যই এসেছেন। ইসলামকে জিন্দা রাখতে হলে কিছু জীবন হারাতে-ই হবে। আমি বিষয়টা আপনাদেরকে এজন্য অবহিত করলাম, যেন আপনারা কেউ আমার উপর এই অভিযোগ আরোপ করতে না পারেন যে, আমি একটি দুর্গ জয় করার জন্য নিরপরাধ মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে মেরেছি।'

'না, আমরা কেউ তেমনটা ভাবব না'– এক সালার বললেন– 'এখানে আমরা নিজেদের রাজত্ব কায়েম করতে আসিনি। ফিলিস্তীন মুসলমানদের। আমরা এখানে আমাদের রাসূলের বাদশাহী বহাল করতে এসেছি। প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস আমাদের– ইহুদী-খৃষ্টানদের নয়।'

'আমরা ইহুদীদের এ দাবিও সমর্থন করি না যে, ফিলিস্তীন ইহুদীদের আদি জন্মভূমি'– অন্য একজন বললেন– 'আমরা প্রত্যেকে আগুনে পুড়ে মৃতবরণ করতে প্রস্তুত আছি। আমরা এ যুদ্ধজয়ে আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানদেরকেও কোরবান করতে কুণ্ঠাবোধ করব না।'

সুলতান নুরুউদ্দীন জঙ্গী দু'ঠোটে মুচকি হাসি টেনে বললেন-

'আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, ফিলিস্তীনকে নিজেদের আবাসভূমিতে পরিণত করার জন্য ইহুদীরা কোন্ কোন্ ময়দানে লড়াই করছে। তারা তাদের ধন- সম্পদ ও বোন-কন্যাদের সম্ভ্রম খৃষ্টানদের হাতে তুলে দিয়েছে এসং তাদের দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছে। তারা তাদের সম্পদ ও মেয়েদের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে গাদ্দার সৃষ্টি করছে। তাদের প্রধান টার্গেট সালাহুদ্দীন আইউবী ও মিসর। মিসরের বড় বড় শহরগুলোতে দুশ্চরিত্রা নারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এরা সবাই ইহুদী কন্যা। দুঃখজনক সত্য হল, আমাদের মুসলিম নেতৃবর্গ ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরা ইহুদীদের জালে আটকে গেছে। এবার কাফেররা তাদেরকে আপসে সংঘাতে লিপ্ত করবে। যদি আমাদের হুঁশ ফিরে না আসে, তাহলে ইহুদীরা একদিন না একদিন ফিলিস্তীনকে কব্জা করে নিবেই। আর মুসলমানরা বুঝতেও পারবে না যে, তাদের সেই পারস্পারিক দ্বন্দ্বের পিছনে ইহুদী ও খৃষ্টানদের হাত আছে। তা হবে অর্থ, নারী আর মদের প্রতিক্রিয়া, যার প্রভাব ইতিমধ্যে শুরুও হয়ে গেছে। আমাদের যদি ভবিষ্যৎ বংশধরকে সম্মানজনক জীবন উপহার দিয়ে যেতে হয়, তবে তার জন্য বর্তমান প্রজন্মের কিছু সন্তানকে কোরবান করতে-ই হবে। আমি আগামী মাসের নতুন

চাঁদ উদিত হওয়ার আগে-ই কার্ক জয় করতে চাই। হোক তা কার্কের ধ্বংস্তূপ, থাকুক তাতে মুসলমানদের ভস্মিভূত লাশ। আমরা আর অপেক্ষা করতে পারিনা। ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে আমাদের রোম সাগরে ডুবাতেই হবে। এ কাজ আমি আমার জীবদ্দশাতে-ই সম্পন্ন করে যেতে চাই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের পরে ইসলামের পতাকা গাদ্দার ও ক্রুশ-প্রেমিক মুসলমানদের হাতে চলে যাবে।'

নুরুদ্দীন জঙ্গী একদল কারিগরও সঙ্গে রেখেছিলেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কারিগরদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা লম্বা লম্বা খেজুরের ডাল কেটে মিনজানীক তৈরি করে। কারিগররা দিন-রাত অবিশ্রাম মিনজানীক তৈরির কাজে ব্যস্ত। তার পাশাপাশি নুরুদ্দীন জঙ্গী ভারী ভারী পাথরেরও স্তূপ তৈরি করে ফেলেন। তাঁর কাছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর রেখে যাওয়া জ্বালানীও রয়েছে। বিপুল পরিমাণ তরল দাহ্য পদার্থ তিনি সঙ্গে করেও এনেছিলেন।

সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর আগুনের গোলা তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ঠিক এ সময়ে মিসর থেকে সুলতান আইউবীর প্রেরিত বাহিনীও এসে পৌঁছে। তাদের সম্পর্কে নুরুদ্দীন জঙ্গীকে জানানো হয়েছিল, তারা বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু সুলতান জঙ্গীও তাদের মধ্যে বিদ্রোহের আভাষও পেলেন না। সুলতান জঙ্গী সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মানুষ। তিনিও এই বাহিনীকে এক জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন, যেমনটা জ্বালাময়ী ভাষণে উত্তেজিত করে প্রেরণ করেছেন সুলতান আইউবী।

একদিন। সূর্য ডুবে গেছে। খৃষ্টান সম্রাট ও উচ্চপদস্থ সেনা কমান্ডারগণ দুর্গের ভিতরে বৈঠক করছেন। তাদের কথা-বার্তা প্রমাণ করছে, দুর্গ অবরোধ সম্পর্কে তাদের কোন অস্থিরতা নেই। তারা এ-ও জানে যে, সুলতান আইউবী মিসর চলে গেছেন এবং নুরুদ্দীন জঙ্গী এসে তার দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন। বৈঠকের দিন সকালে তারা জানতে পারে যে, মিসর থেকে নতুন সৈন্য এসেছে। এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য তাদের এ বৈঠকের আয়োজন।

সবেমাত্র তাদের আলোচনা শুরু হয়েছে। এমনি সময়ে বিস্ফোরণের ন্যায় একটি শব্দ তাদের কানে আসে। ধসেপড়া ইট-পাথরের পতনের শব্দও শুনতে পায়। খৃষ্টান সম্রাট ও কমান্ডারগণ দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তারা যে কক্ষে বৈঠক করছিল, তারই সংলগ্ন অন্য একটি কক্ষের ছাদ ফেটে গেছে। একটি ভারী পাথরের আঘাতে ছাদ ফেটে যাওয়ার শব্দ-ই বিস্ফোরণের মত মনে হয়েছিল। তার-ই সন্নিকটে এসে পড়েছিল আরো একটি পাথর। অবস্থা আশংকাজনক মনে করে খৃষ্টানরা সেখান থেকে সরে যায়। তারা বুঝে ফেলেছে

যে, মুসলমানরা মিনজানীক দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করছে। তারা দুর্গের প্রাচীরের নিকট গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে; কিন্তু অন্ধকারের কারণে কিছু-ই দেখা গেল না।

এটি নুরুদ্দীন জঙ্গীর তৈরিকরা মিনজানীকের প্রথম পরীক্ষামূলক ব্যবহার। নুরুদ্দীন জঙ্গী মধ্যরাতের পর পুনরায় অভিযান পরিচালনা করেন। তাতে খৃষ্টানদের প্রধান কার্যালয়ের দু'টি ছাদ ধসে পড়ে এবং কয়েকটি কক্ষের দেয়াল ফেটে যায়। এই ক্ষয়ক্ষতি তেমন মারাত্মক না হলেও তাতে খৃষ্টানদের মনোবলে ভাটা পড়ে যায়, তাদের মনে ভয় ধরে যায়। দেয়ালের কয়েকটি ফাটল হেডকোয়ার্টারের রক্ষীসেনা ও অন্যান্য আমলাদেরকে সেখান থেকে পালাতে বাধ্য করে। ভোর নাগাদ নুরুদ্দীন জঙ্গীর এই ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ এক ভয়াবহ সংবাদ হয়ে নগরীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অথচ, মধ্য রাতের পর নুরুদ্দীন জঙ্গীর নতুন উদ্ভাভিত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক ব্যবহারের পর তা অকার্যকর হয়ে যায়।

❁ ❁ ❁

সাদিয়া মহল্লার বাইরে যেখানে বকরী চরাত, সে ভূখন্ড এখন এমন এক জনবসতিতে পরিণত হয়েছে, যার চাকচিক্য তথাকার লোকদের চোখে এক স্বর্গীয় পরিবেশ বলে মনে হচ্ছে। সূর্য অস্ত গেছে বেশ আগে। এখন চারদিক অন্ধকার। উৎসুক জনতা পর্বতময় এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি পেয়ে গেছে। তবে কারো কোন টিলার উপরে ওঠার অনুমতি নেই। একধারে বসিয়ে রাখা হয়েছে সবাইকে। যে যেখানে বসেছে, সেখান থেকে নড়াচড়া করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কাউকে কোন নির্দেশ দেয়া হচ্ছেনা; শুধু 'তার' ভয় দেখানো হচ্ছে যে, কারো কোন আচরণে যদি 'তিনি' রুষ্ট হন, তাহলে সকলের উপর বিপদ নেমে আসবে। সবাই নীরব-নিশ্চুপ বসে আছে। কারো মুখে রা নেই।

জনতার অবস্থানের খানিক দূরে বড় বড় দু'টি পালংক পাতানো। বেশ চমৎকার পালংক। উপরে জাজিম বিছানো। পালংকের পিছনে কতগুলো পর্দা ঝুলছে। পর্দাগুলোর গায়ে চকমক করছে কতগুলো তারকা। এক স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে স্থাপন করা আছে কতগুলো প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোতে-ই তারকাগুলো ঝলমল করছে। পর্দার পেছনে কতগুলো টিলা, যার পাদদেশে গুহা খনন করছে অপরিচিত মানুষগুলো। টিলার পিছনে কতটুকু সমতল ভূমি। সেখানে নানা রংয়ের তাঁবু পাতানো।

পরিবেশ- পরিস্থিতিতে উৎসুক জনতা এত-ই প্রভাবিত যে, তারা পরস্পর কানে-কানেও কথা বলছে না। যে রাতে সাদিয়া অপহৃত হয়েছিল, এটি তার পরের রাত। জনতার সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখা পর্দা ধীরে ধীরে দুলতে শুরু করে। পর্দার তারকাগুলো আকাশের তারকারাজির ন্যায় টিমটিম করছে এবং এমন

বাজনা শোনা যাচ্ছে, যা মানুষ ইতিপূর্বে কখনো শুনেনি। যাদুর ন্যায় ক্রিয়া করছে বাজনাটি। পার্বত্য এলাকার নীরব রাতে এই বাজনা জনতার অন্তর ভেদ করছে মনে হচ্ছে। এমনও মনে হচ্ছে যে, বাজনার এই তাল জনতার মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে, যা দেখাও যাবে ছোঁয়াও যাবে। ফলে মানুষ বারবার উপরে ও ডানে-বাঁয়ে তাকাতে শুরু করে। কিন্তু তারা কিছু-ই দেখতে পাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর যাদুময় এই বাজনার সঙ্গে যোগ হয় অন্য এক গুঞ্জন। স্পষ্ট মনে হচ্ছে, বেশকিছু মানুষ একত্রিত হয়ে একই সুরে গুনগুন করে গান গাইছে। তাতে নারী কণ্ঠও আছে। তার সঙ্গে যখন টিলার সামনে ঝুলন্ত লম্বা পর্দাগুলো দুলতে শুরু করছে, তখন মনে হচ্ছে, যেন রাতের এই পরিবেশের উপর মাদকতা নেমে এসেছে।

উৎসুক জনতা এখন সম্পূর্ণরূপে বিমুগ্ধ, অবচেতন। এমন সময়ে কোথাও থেকে বলিষ্ঠ আওয়াজ উঠে, 'তিনি এসে পড়েছেন, তিনি আসমান থেকে অবতরণ করেছেন। তোমরা তোমাদের দেল-দেমাগকে সবরকম ভাবনা-চিন্তা থেকে শূন্য কর। তিনি তোমাদের দেল-দেমাগে খোদার সত্য বাণী অবতারণ করবেন।'

ঝুলন্ত পর্দাগুলো একটু নড়ে উঠে। পর্দার আড়াল থেকে এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। আকারে-গঠনে তিনি মানুষ বটে, কিন্তু বাজনামুখর, ভীতিপ্রদ ও আলোক-উজ্জ্বল এই পরিবেশে তাকে কোন এক ঊর্ধ্ব জগতের প্রাণী বলে মনে হল। তার মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ। রেশমের ন্যায় চিক চিক করছে চুলগুলো। কাজল কালো ভ্রু। গোলগাল পরিপুষ্ট সুদর্শন মুখমণ্ডল। মুখে দীর্ঘ ঘন দাড়ি। গায়ে সবুজ রঙের চোগা, যা পর্দার-ই ন্যায় তারকাখচিত। আলোয় ঝলমল করছে তারকাগুলো। তেমনি চমক বিরাজ করছে লোকটির দু'চোখেও। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে প্রভাব বিরাজ করছে লোকটির, যাতে জনতা বিমুগ্ধ, বিমোহিত। পাশাপাশি বাজছে মিউজিক, আরো নানারকম গুনগুন শব্দ। মানুষ পূর্ব থেকেই তার অনুরক্ত। এখন বিস্ময়কর এক পরিবেশে তিনি তাদের চোখের সামনে উপস্থিত। এতক্ষণ জনতা উপবিষ্ট ছিল মাথানত করে। এখন তারা আরো অবনত আরো ভক্তিবিগলিত।

তিনি পর্দার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দু'বাহু উপরে মেলে ধরলেন এবং বললেন–

'তোমাদের উপর খোদার রহমত নাযিল হোক, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে দেখার জন্য চোখ দিয়েছেন, শোনবার জন্য কান দিয়েছেন, বুঝবার জন্য মেধা দিয়েছেন ও কথা বলার জন্য জবান দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদেরই ন্যায় কিছু মানুষ– যাদের চোখ তোমাদেরই

ন্যায়, জবানও তোমাদেরই ন্যায়– তোমাদেরকে গোলামে পরিণত করে খোদার নেয়ামত ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এখন তোমাদের অবস্থা হল, তোমাদের চোখ আছে বটে, কিন্তু তোমরা কিছু দেখতে পাচ্ছ না, তোমাদের কান আছে সত্য, কিন্তু তোমরা সত্য কথা শুনতে পাচ্ছ না। তোমাদের বিবেক আছে ঠিক, কিন্তু তা মিথ্যা ও অলীক বোধ-বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তোমরা কথা বলতে পার ঠিক, কিন্তু সেই লোকদের বিরুদ্ধে তোমরা একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পার না, যারা তোমাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। তারা তোমাদেরকে, তোমাদের উট-ঘোড়া ও তোমাদের যুবক সন্তানদেরকে ক্রয় করে নিয়েছে। তারা তোমাদের যুবক পুত্রদের দিয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করাচ্ছে, যেমনি মানুষ লড়াই করায় দু'টি কুকুর দিয়ে। তারা তোমাদের উট ও ঘোড়াগুলোকে তীর-বর্শা দ্বারা ঝাঝরা করিয়ে মেরে ফেলছে। তোমাদের সন্তানদেরকে খুন করিয়ে মরুভূমিতে নিক্ষেপ করছে। আমি সেই চোখ, যা ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আমি সেই মস্তিষ্ক, যা বিশ্বমানবতার কল্যাণ নিয়ে ভাবে এবং আমি সেই জবান, যা মানুষকে খোদার বাণী শোনায়। আমি খোদার জবান।'

'আপনি কি অক্ষয় যে, আপনি কোনদিনি মৃত্যুবরণ করবেন না?'– সভার মধ্য থেকে একটি আওয়াজ ভেসে উঠে। সব মানুষ নীরব, নিস্তব্ধ। কেউ কেউ ভয়ও পেয়ে গেছে, লোকটার এতবড় দুঃসাহস যে, তার কথার মাঝে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল? এই অপরাধে সকলের উপর গজব নেমে আসবে না তো!

'তুমি পরীক্ষা করে দেখে নাও'– তিনি বললেন-'আমার বুকে তীর নিক্ষেপ কর।'

লোকটির কণ্ঠে ও বলার ভঙ্গীতে যাদুর ক্রিয়া। তিনি আবার বললেন, এখানে যদি কোন তীরান্দাজ থাক, তাহলে আমার বুকে তীর চালাও। পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে মজলিসে। তিনি ক্ষুব্ধ ও উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি, উপস্থিত লোকদের মধ্যে কারো কাছে তীর-কামান থাকলে আমার সামনে চলে আস।'

চারজন তীরান্দাজ- যারা আশপাশের কোন মহল্লার অধিবাসী নয়– ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করে। তারা ভয়ে জড়সড় যেন। তিনি বললেন, গুণে গুণে ত্রিশ কদম এগিয়ে এসে তোমরা আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাও।' তারা তা-ই করে। তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যায়।

'ধনুকে তীর সংযোজন কর।'

চারজন তূনীর থেকে তীর নিয়ে যার যার ধনুকে সংযোজন করে।

'আমার হৃদপিন্ডকে নিশানা বানাও।'

তারা ধনুক তাক করে নিশানা ঠিক করে।

'আমি মরে যাব, সে কথা না ভেবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তীর ছোঁড়।'

তীরান্দাজগণ ধনুক সরিয়ে নেয়। তারা ভাবে, লোকটি মরে যাবে।

'আমার হৃদপিন্ডকে নিশানা বানিয়ে তীর ছোঁড়।' তিনি গর্জে উঠে বললেন- 'অন্যথায় যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, ওখানেই অঙ্গার হয়ে যাবে।'

তীরান্দাজগণ ভয় পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা ধনুক উপরে তুলে নিশানা তাক করে। জনতা নিথর, নিস্তব্ধ, যেন এখানে কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। মিউজিক বাজছে। তার সঙ্গে অদৃশ্য কিছু মানুষের গুনগুন শব্দ কানে আসছে। একসঙ্গে চারটি ধনুক থেকে শা করে চারটি তীর বেরিয়ে যায়। তীরগুলো সব তার ঠিক বুকের মাঝখানটায় গিয়ে বিদ্ধ হয়। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বাহু দু'টো উপরে তোলা, ঠিক আগের মতো। ঠোঁটে তার মুচকি হাসির রেখা।

'চারজন খঞ্জরধারী এগিয়ে আস'- তিনি বললেন-'তীরান্দাজরা চলে যাও।'

বিস্ময়াভিভূত তীরান্দাজগণ মাথা নিচু করে ফিরে যায়। অন্য চারজন লোক একদিক থেকে এগিয়ে আসে। তিনি বললেন, খঞ্জর হাতে নিয়ে আমার থেকে পনের কদম দূরে গিয়ে দাঁড়াও। তারা তা-ই করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি নিশানায় খঞ্জর নিক্ষেপ করতে জান?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ, জানি।'

তিনি বললেন, 'চারজন একসঙ্গে আমার বুকে খঞ্জর নিক্ষেপ কর।'

চার খঞ্জরধারী পূর্ণ শক্তিতে তার গায়ে খঞ্জর নিক্ষেপ করে। সবক'টি খঞ্জর তার বুকে গিয়ে বিদ্ধ হয়। তিনি পূর্ববৎ সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। চারটি খঞ্জরের আগা তার বুকে বিদ্ধ। তিনি হাসছেন। ভীড়ের মধ্য থেকে আওয়াজ উঠে, 'শাবাশ...। মৃত্যুর ফেরেশতা তার হাতে।'

'আমি অক্ষয় কিনা জিজ্ঞেস করেছিলে, জবাব পেয়েছ?' বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন তিনি।

এক বেদুইন দৌড়ে আসে এবং তার পায়ে সেজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। তিনি ঝুকে হাতে ধরে তাকে তুলে দেন এবং বললেন, 'খোদা তোমার উপর রহম করুন।'

'তাহলে তো তুমি মৃতকেও জীবিত করতে পার'- এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বলল- 'আল্লাহ আমাকে একটি পুত্রসন্তান দিয়েছিলেন। ছেলেটা মারা গেছে। আমি শুনেছি আপনি মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারেন। আমি বহুদূর থেকে পুত্রের লাশ বহন করে নিয়ে এসেছি। আমি বুড়ো মানুষটার উপর আপনি দয়া করুন, ছেলেটাকে জিন্দা করে দিন।' বৃদ্ধ হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে।

চারজন লোক কাফন প্যাঁচান একটি লাশ নিয়ে এগিয়ে আসে। লাশটি তার

সম্মুখে রাখা হয়। তিনি বললেন, 'একটি বাতি আন। লাশটি তুলে সবাইকে দেখিয়ে নিয়ে আস, যেন কেউ বলতে না পারে যে, ছেলেটি জীবিতই ছিল।'

লাশটি বহন করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখিয়ে আনা হল। তার মুখমণ্ডলের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এক ব্যক্তি বাতি ধরে সবাইকে লাশের মুখমণ্ডল দেখায়। চেহারাটা মৃত মানুষেরই ন্যায় ফ্যাকাশে। চোখ দু'টো আধাখোলা। মুখখানা সামান্য হা করা। জনতাকে দেখানোর পর লাশটি নিয়ে আবার তার সম্মুখে রাখা হল। বাজনার লয় পাল্টে গেছে এবং আগের চেয়েও হৃদয়কাড়া হয়ে উঠেছে। তিনি দু'বাহু আকাশপানে উচিয়ে ধরে উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'জীবন ও মৃত্যু তোমারই হাতে। আমি তোমার পুত্রের পুত্র। তুমি তোমার পুত্রকে ক্রুশ থেকে রক্ষা করেছ এবং আমাকে ক্রুশের মর্যাদা দান করেছ। তোমার পুত্র ও তার ক্রুশ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাকে শক্তি দাও, যাতে আমি এই হতভাগ্য বৃদ্ধের পুত্রকে জিন্দা করে দিতে পারি।' তারপর লাশের উপরে শূন্যে এমনভাবে হাত ঘুরাতে শুরু করেন, যেন হাত দু'টি তার কাঁপছে। কাফনের কাপড়টা ফড় ফড় শব্দ করতে শুরু করে। তিনি শূন্যে আরো বেগে হাত ঘুরাতে থাকেন এবং কাফনও আরো শব্দ করে ফড় ফড় করে উঠে। দর্শকদের অনেকে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে। মহিলাদের কেউ কেউ হাউমাউ করে চীৎকার জুড়ে দেয়। দৃশ্যটা এ কারণেও ভয়ংকর রূপ ধারণ করে যে, মৃতকে জীবনদানকারী লোকটির বুকে চারটি তীর ও চারটি খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে।

কাফনের ভেতরে নড়াচড়া অনুভূত হয়। লাশ উঠে বসে পড়ে। দু'হাত কাফনের ভেতর থেকে বের করে আনে। নিজ হাতে মুখমণ্ডল থেকে কাফনের কাপড় সরিয়ে ফেলে এবং চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে উঠে, 'আমি কি পবিত্র জগতে পৌঁছে গেছি?'

'না' জীবিতকারী তাকে ঠেস দিয়ে তুলে দাঁড় করান– 'তুমি সে জগতেই আছ, যেখানে তুমি জন্ম নিয়েছিলে। যাও, পিতার সঙ্গে বুক মিলাও।'

পিতা দৌড়ে গিয়ে পুত্রকে জড়িয়ে ধরে। অস্থিরচিত্তে পুত্রকে চুম্বন করে আদর দেয়। আবার তাকে ছেড়ে দিয়ে জীবনদানকারীর পায়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। জনতা আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে। বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায় এবং পরস্পর ফিসফিস করতে শুরু করে। জলজ্যান্ত কাফনে মোড়ানো একটি মৃতদেহ এখন তাদের চোখের সামনে হাঁটছে। মরা মানুষ জীবিত হয়ে গেছে!

'কিন্তু আমি আর কাউকে জিন্দা করব না'– তিনি বললেন-'জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতে। আমি যে খোদার দূত হয়ে এসেছি, তোমাদেরকে শুধু সে কথাটুকু বুঝাবার জন্য এইমাত্র আমি খোদার নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছি যে, আমাকে সামান্য সময়ের জন্য এমন শক্তিদান করুন, যাতে আমি মৃতকে

জীবিত করতে পারি। খোদা আমাকে সেই শক্তি দিয়েছেন।

'আপনি কি যুদ্ধে নিহত সৈনিকেও জীবিত করতে পারেন?' সভার মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করল।

'না'– তিনি জবাব দেন- 'যারা যুদ্ধ করে মারা যায়, খোদা তাদের প্রতি এতবেশী অসন্তুষ্ট হন যে, তাকে আর তিনি দ্বিতীয় জীবন দান করেন না। পরজগতে তাকে তিনি নরকে নিক্ষেপ করেন। খোদা মানবজাতিকে কাউকে খুন করার জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, যেভাবে তোমাকে একজন পিতা জন্ম দিয়েছেন, তেমনি তুমিও অন্যকে জন্ম দিবে। এ জন্যই তোমাদেরকে ঘরে চারটি করে বউ রাখতে বলা হয়েছে। নারী ও পুরুষের কাজ একটাই– সন্তান জন্ম দেয়া এবং সেই সন্তান যখন বড় হবে, তার মাধ্যমেও সন্তান জন্ম দেয়ান। এ-ই তো এবাদত।

❁ ❁ ❁

তিনি যখন একের পর এক অলৌকিক ঘটনার জন্ম দিচ্ছেন, ঠিক তখন টিলার পেছনে সে জায়গাটিতে লুকিয়ে আছে দু'জন লোক, যেখানে রংবেরঙের তাঁবু খাটান রয়েছে। একটি তাঁবুর মধ্য থেকে কতগুলো মেয়ের কথা ও হাসাহাসির শব্দ কানে আসছে। লোক দু'জন হলেন সাদিয়ার গ্রামের মসজিদের ইমাম ও তার শিষ্য মাহমুদ বিন আহমদ। মাহমুদ নিশ্চিত, সাদিয়া এখানেই কোথাও আছে। মাহমুদ ধর্মজ্ঞানে পরিপক্ক নয়। খোদার এই দূতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সে কোন সিদ্ধান্ত স্থির করার যোগ্যতা তার নেই। ইমাম বলেছিলেন, কোন মানুষ মৃতকে জীবিত করতে পারে না। রহস্যময় এই লোকটি জনতাকে কি সব প্রদর্শন করছে, সেদিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ-ই নেই। তিনি বরং কৌশল অবলম্বন করেছেন যে, মানুষ তার কারামত দর্শনে নিমগ্ন থাকুক, আর এই সুযোগে আমি তার ভেদ-রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা চালিয়ে যাই।

ইমাম ও মাহমুদ সাদিয়াকে খুঁজে ফিরছে। তাঁবুগুলোর জায়গাটা অন্ধকার। কেবল তিনটি তাঁবুতে আলো জ্বলছে। তিনটির সবক'টির পর্দা ভিতর-বাহির উভয় দিক থেকে আটকানো। পাহারার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। দু'তিনজন লোক দূরে একস্থানে বসে কথা বলছে। তারা প্রহরী। দেখে ফেললে বিপদ আছে। টিলার অপরদিক থেকে তার কথা বলার আওয়াজ আসছে এবং বাজনা-মিউজিক-এরও শব্দ ভেসে আসছে। তবে এই বাজনার উৎস কোথায় বুঝা যাচ্ছে না।

ইমাম ও মাহমুদ আলোময় একটি তাঁবুর নিকটে গিয়ে কান পেতে মেয়েদের কথা শোনার চেষ্টা করে। মেয়েদের কথাবার্তা তাদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়। এক নারীকণ্ঠ বলছে, 'ম্যাজিক এখানেও সফল হচ্ছে।'

আরেকজন বলল, 'বড় মূর্খ সম্প্রদায়।'

'মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার এই একটাই পন্থা যে, তাদেরকে ম্যাজিক দেখিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বানিয়ে দাও'– আরেক নারীর কণ্ঠ।

'জানি না ও কি অবস্থায় আছে।'

'কে?'

'নতুন চিড়িয়া'– এক মেয়ে বলল–'তোমাদের স্বীকার করতেই হবে, ওটা আমাদের সকলের চেয়ে রূপসী।'

'মেয়েটা দিনভর কেঁদেই চলেছে'– একজন বলল।

'আজ রাতেই তার কান্না থেমে যাবে'– এক মেয়ে বলল– 'ওকে খোদার পুত্রের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।'

মেয়েদের অট্টহাসি শোনা যায়। একজন বলল, 'খোদা কি স্মরণ করবেন যে, আমরা তাকে কেমন পুত্র দিয়েছি। বড় কামেল মানুষ।'

মেয়েরা পরস্পর অশ্লীল কথোপকথন শুরু করে। ইমাম ও মাহমুদ বুঝে ফেলেছেন, 'নতুন চিড়িয়া' সাদিয়া ছাড়া কেউ নয়। তারা সর্বোতভাবে নিশ্চিত হন যে, এসব কর্মকাণ্ড ম্যাজিক-যাদু বৈ নয়। পশ্চাৎপদ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য এ এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। ইমাম মাহমুদের কানে কানে বললেন, 'এই মেয়েগুলোর অশ্লীল কথা-বার্তা ও মদের গন্ধই প্রমাণ করে এরা কারা এবং কী করছে...। আমরা ক্লু পেয়ে গেছি বলা যায়।'

ইমাম ও মাহমুদ বড় তাঁবুর নিকট চলে যান। তাঁবুটি একটি টিলা ঘেঁষে তৈরি করা। টিলা ও তাঁবুর পেছন দরজার মাঝখানের ব্যবধান এক-আধ গজের বেশী নয়। তাঁবুর সন্নিকটে গিয়ে তারা উঁকি দিয়ে তাকায়। তাঁবুর পর্দা মধ্যখানে রশি দিয়ে বাঁধা। ভিতরে উঁকি দিয়ে তাকানোর জন্য এক স্থানে এক চোখ পরিমাণ ফাঁকা। ইমাম ও মাহমুদ এই ছিদ্রপথে উঁকি দিয়ে তাকান। ভিতরে লম্বা একটি পালংক পাতানো।

পালংকে জাজিম বিছানো। তার উপর অতি আকর্ষণীয় চাদর। দু'ধারে দু'টি প্রদীপ জ্বলছে। একধারে মদের সোরাহী ও গ্লাস রাখা। পালংকের উপর সাদিয়া বসা। ভিতরের সাজ-সজ্জা ও শান-শওকত প্রমাণ করে, এটি-ই এই কাফেলার নেতার তাঁবু। সাদিয়ার পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন নারী ও একজন পুরুষ। সাদিয়াকে বধূসাজে সাজাচ্ছে তারা।

'আজ সারাটা দিন-ই তুমি কেঁদে কাটালে'– সাদিয়াকে উদ্দেশ করে মহিলা বলল- 'তবে একটু পর-ই তোমার মনে হাসি ফুটে যাবে এবং তুমি নিজেকে চিনতে-ই পারবে না। তুমি বড় ভাগ্যবতী মেয়ে যে, যে মহান ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে এসেছেন, তিনি তোমাকে পছন্দ

করেছেন। তিনি শুধু তোমার জন্য এ এলাকায় এসেছেন। বিশ দিনের দূরত্ব থেকে গায়েবী চোখে তিনি তোমায় দেখেছিলেন। স্বয়ং খোদা তাকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে এসেছেন। ইনি যদি না আসতেন, তাহলে তোমার পিতা তোমাকে কোন অসহায় বেদুইনের কাছে বিয়ে দিয়ে দিতেন কিংবা কারো কাছে বিক্রি করে ফেলতেন।'

মহিলার কথাগুলো সাদিয়ার উপর যাদুর ন্যায় ক্রিয়া করতে শুরু করে। সাদিয়া নীরবে শুনছে। চরম উত্তেজনা এসে গেছে মাহমুদের। ইমাম তাকে ঠেকিয়ে রাখেন। তিনি দেখতে চান যে, সাদিয়াকে কিসের জন্য সাজানো হচ্ছে।

খানিক পর টিলার অপর দিক থেকে ঘোষণা হয়, 'তিনি খোদার প্রেরিত পয়গম্বর এবং যার হাতে আমাদের সকলের জীবন ও মৃত্যু, যার চোখ গায়েব দর্শনে সক্ষম, এখন তিনি রাতের অন্ধকার ভেদ করে আকাশে চলে যাচ্ছেন। তোমরা কেউ তাঁবু এলাকার দিকে দৃষ্টিপাত করবে না এবং টিলার উপরে উঠবে না। কেউ সেদিকে যাওয়ার বা দেখার চেষ্টা করলে, সে চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যাবে। আগামী রাত তিনি তোমাদের প্রত্যেকের আকুতি শুনবেন।

ইমাম ও মাহমুদ সেখানে-ই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁবুর ভিতর পুরুষ ও মহিলা সাদিয়াকে সাবধান করিয়ে দেয় যে, তিনি আসছেন। খবরদার কোন প্রকার বে-আদবী যেন না হয়।

- 'তিনি' এসে পড়েছেন। সম্মুখ দিক থেকে পর্দা তুলে তাঁবুতে প্রবেশ করেন। বুকে তার চারটি তীর ও চারটি খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে। দেখে ইমাম ও মাহমুদ অবাক্ হয়ে যান। সাদিয়া ভয়ে আৎকে উঠে। অস্ফুট একটা চীৎকার বেরিয়ে যায় তার মুখ থেকে। 'তিনি' মুচকি হাসলেন এবং বললেন, ভয় পেয় না বেটী! এই মোজেজা খোদা আমাকে দিয়েছেন যে, তীর-খঞ্জর আমাকে মারতে পারেনা।' তিনি সাদিয়ার গা ঘেঁষে বসে পড়েন।

'এই ভেল্কি আমি একবার কায়রোতে দেখেছিলাম'- মাহমুদের কানে কানে ইমাম বললেন- 'আমি জানি, তীর- খঞ্জর কোথায় গেঁথে আছে।' তিনি উঠে দাঁড়ান। তাঁবুর পর্দাটা ভিতর থেকে রশি দ্বারা বেঁধে দেন।

আর অপেক্ষা করার সুযোগ নেই। চোখা-চোখি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন ইমাম ও মাহমুদ। বে-পরোয়া হয়ে উঠেন তারা। বাইরে থেকে পর্দাটা খুলে ফেলেন। শা করে ঢুকে পড়েন ভিতরে। কারো পায়ের আওয়াজ শুনে 'তিনি' পিছনে ঘুরে তাকান। অমনি তারা ঝাপটে ধরেন লোকটাকে। মাহমুদ সাদিয়াকে ইংগিত করে বলে, পালংকের উপর থেকে চাদরটা তুলে এর গায়ের উপর ছুঁড়ে দাও। হতভম্ব সাদিয়া তা-ই করে। লোকটার দেহ্ বেশ শক্তিশালী মনে হল। ইমাম ও মাহমুদ তাকে চাদর পেঁচিয়ে শক্তভাবে আটকে ফেলেন।

বাতিগুলো নিভিয়ে দেয়া হল। ইমামের নির্দেশে সাদিয়া তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে যায়। মাহমুদ চাদর পেচানো বন্দীটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ধরা পড়ার ভয় প্রতি পায়ে। তারা সতর্কপদে বন্দী ও অপহৃতা সাদিয়াকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। রাতের আঁধার তাদের বেশ সহযোগিতা করে।

অনেক পথ ঘুরে তারা গ্রামে পৌঁছে। চলে যায় সোজা মসজিদে। ইমামের হুজরায় নিয়ে ভেল্কিবাজকে কাঁধ থেকে নামানো হয়। বন্ধন খুলে দেয়া হয়। তার বুকে তীর ও খঞ্জর গেঁথে আছে। সাদিয়াকেও তারা হুজরায় রাখে। আশংকা আছে, ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে ভেল্কিবাজের দলের লোকেরা এসে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের একথা ভাববারও পরিবেশ নেই যে, তাদের 'খোদার পুত্র' কোথায়। জনসমাবেশের পর এখন তারা মদ নারী নিয়ে ব্যস্ত। তারা ভাবতেও পারছে না, তাদের মনিব নতুন চিড়িয়াসহ অপহরণ হতে পারে।

ইমাম ও মাহমুদ ধৃত ভেল্কিবাজকে পরিধানের চোগা খুলতে বলেন। সে প্রথমে তীর ও খঞ্জর টেনে বের করে। তারপর চোগা খুলে। ভিতরের পোষাকও খোলানো হয়। পোষাকের নীচে গায়ে নরম কাঠ বাঁধা। কাঠের উপরে চামড়া জড়ানো। তার বুকটা সম্পূর্ণ কাঠ দ্বারা ঢাকা। চামড়া জড়ানো এই কাঠে-ই বিদ্ধ হয়েছিল তীর ও খঞ্জরগুলো। সে ইমাম ও মাহমুদকে বলল, 'কি চাও বল– সোনা-রূপা, উট যা চাও, যত চাও দেব; আমাকে ছেড়ে দাও।'

'তুমি ছাড়া পাবে না।' ইমাম বললেন।

ইমাম মাহমুদকে বললেন, 'নিকটবর্তী চৌকিটা কোথায় তা তোমার নিশ্চয় জানা আছে। সেখানকার সব সৈনিকদের নিয়ে আস।'

মাহমুদ যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। হুজরা থেকে বের হয়। ইমামও উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে মাহমুদকে কানে কানে বলেন, আগে এখানকার সহকর্মীদের আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

মাহমুদ ইমামের ঘোড়ার জিনে বসে-ই সাওয়ার হয়ে রওনা দেয়। ইমামের এ এলাকার গোয়েন্দাদ্বয়কে যথাস্থানে পেয়ে যায়। তাদেরকে এক্ষুণি মসজিদে গিয়ে ইমামের সঙ্গে দেখা করতে বলে চৌকি অভিমুখে ছুটে চলে। ঘন্টা দেড়েকের পথ।

মাহমুদ ছুটে চলেছে। কিন্তু তার মনে সংশয়। চৌকির কমান্ডারকে চিনে সে। লোকটা নীতিহারা। খৃষ্টান ও সুদানীরা ঘুষ দিয়ে তাকে দলে ভিড়িয়ে রেখেছে। মাহমুদ সে রিপোর্টও কায়রো পাঠিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। মাহমুদ প্রায় নিশ্চিত যে, কমান্ডার তার বাহিনীকে দিবে না কিংবা টালবাহানা করে কালক্ষেপন করবে, যাতে শত্রু হাত

থেকে ছুটে যেতে পারে। তা-ই যদি হয়, তাহলে কী করবে ভাবছে মাহমুদ। অথচ, রাত পোহাবার আগেই বাহিনী নিয়ে গ্রামে পৌছতে হবে তাকে। সৈন্য না পেলে ইমাম ও তার গোয়েন্দাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। কারণ, ধৃত দাগাবাজের হাতে অনেক লোক আছে। তার সাধারণ ভক্ত-মুরীদরাও অনেকে তার জন্য নিবেদিত।

ইমামের কাছে খঞ্জর আছে। তার গোয়েন্দারাও এসে গেছে। তাদের কাছেও খঞ্জর আছে। তারা ভেল্কিবাজকে পাহারা দিয়ে আটকে রাখে। লোকটি মুক্তির জন্য এত মূল্যের অফার দিয়ে যাচ্ছে যে, ইমাম ও তার গোয়েন্দারা কখনো তা স্বপ্নেও দেখেনি। ইমাম তাকে বললেন, 'আমি এখন মসজিদে বসা আছি। এটি সেই আল্লাহর ঘর, যিনি তোমাকে সত্য দ্বীনসহ আকাশ থেকে নামিয়েছেন। আর এই বুঝি তোমার সত্য দ্বীন? দেখ দোস্ত! আমি কায়রো সরকারের একজন কর্মকর্তা। যত লোভ-ই দেখাও, আমি তোমাকে ছাড়তে পারি না। আমি ঈমান বিক্রি করতে পারি না।

মাহমুদ বিন আহমদ চৌকিতে গিয়ে পৌছে। কমান্ডারের তাঁবু তার চেনা। তাঁবুতে আলো জ্বলছে। ঘোড়ার পদশব্দ শুনে কমান্ডার তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু ইনি কে! কমান্ডারকে মাহমুদ চিনতে পারছে না। মাহমুদ নিজের পরিচয় দেয়। কমান্ডার তাকে তাঁবুতে নিয়ে যায়। কমান্ডার জানালেন, গতকাল সন্ধ্যায় পুরাতন বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে একটি নতুন বাহিনী এসেছে। এই রদবদল হয়েছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নির্দেশে। এরা সুলতান আইউবীর সঙ্গে ময়দান থেকে আসা বাহিনী।

মাহমুদ কমান্ডারকে জানায়, আমরা বিরাট এক শিকার পাকড়াও করেছি এবং তার পুরো গ্যাং ধরার জন্য এক্ষুণি চৌকির সব সৈন্য প্রয়োজন। রাতারাতি-ই তাদেরকে ঘিরে ফেলতে হবে।

বাহিনীর সেনাসংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। কমান্ডার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে তৈরি হয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার নির্দেশ দেন। তাদের কাছে আছে বর্শা, তরবারী, তীর ও তীরান্দাজ। মাত্র আট-দশজন সিপাহীকে চৌকিতে রেখে দেয়া হয়। এরা এসেছে কার্ক অবরোধ অভিযান থেকে। অটুট চেতনার অধিকারী এরা।

কমান্ডার দ্রুত ঘোড়া ছুটান। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাহমুদ। গন্তব্যের নিকটে পৌছে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দেয়া হয়, যাতে অপরাধীরা টের না পায়। তবে অপরাধীরা টের পাওয়ার মত অবস্থায় ছিলও না। মদ ও নিদ্রা তাদেরকে অজ্ঞান করে রেখেছে।

কমান্ডার মাহমুদের দিক-নির্দেশনায় এলাকাটা সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলেন এবং অভিযান ভোর নাগাদ মুলতবী রাখেন। মাহমুদ ইমামকে সংবাদ জানিয়ে দেয় যে, বাহিনী যথাসময়ে এসে গেছে। সাদিয়া ইমামের হুজরায়-ই অবস্থান করছে। ইমাম একজন দূত পাঠিয়ে সাদিয়ার পিতাকেও ডেকে আনেন।

'তাকে' এক নজর দেখার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্ত-মুরীদ-দর্শনার্থীরা রাতের কারামত দর্শনের পর খোলা আকাশের নীচে শুয়ে পড়েছে। তাদের 'পবিত্র মানুষ' তাদেরকে বলেছিল, আগামী রাত আমি তোমাদের আর্জি শুনব। সকালের আলো ফোটার আগেই তারা জেগে ওঠে। আবছা অন্ধকারে অনেকগুলো ঘোড়া দেখতে পায় তারা। ঘোড়াগুলোর আরোহীরা সৈনিক বলে মনে হল তাদের কাছে। বিষয়টা তারা কিছু-ই বুঝে উঠতে পারল না। তাদের জানা নেই যে, মৃত প্রাণীকে জীবনদানের ক্ষমতাওয়ালা মানুষটি মসজিদের হুজরায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে।

বাহিনীর কমান্ডার দামেস্ক-এর অধিবাসী। নাম রুশদ ইবনে মুসলিম। সরকারের সাধারণ একজন কর্মচারী। কিন্তু সীমান্ত চৌকিতে এসে তিনি তার সিপাহীদের উদ্দেশে যে ভাষণ প্রদান করেন, তাতে তার বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। তিনি বললেন-

'গোটা দেশ শুধু তোমাদের উপর ভরসা করে ঘুমায়। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সব সময়-ই তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যদিও তাকে দেখতে না পাও, তাহলে তাকে আমার চোখে দেখ। আমরা সকলেই এক একজন সালাহুদ্দীন আইউবী। এখানে কেউ যদি পুরাতন বাহিনীর সিপাহীদের ন্যায় ঈমান বিক্রি কর, তাহলে আমি হাত-পা বেঁধে তাকে মরুভূমিতে ফেলে আসব। তার শাস্তির নির্দেশ আমি কায়রো থেকে নেব না। আমি আল্লাহ্ থেকে নির্দেশ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি।'

ভোর হল। রুশদ ইবনে মুসলিম দেখলেন, তাঁবুগুলোতে কোন নড়াচড়া নেই। তার মানে ওদের জাগতে এখনো দেরী। তিনি জনতাকে বললেন, তোমরা একটু সরে গিয়ে বস; কিন্তু চলে যেও না, অপেক্ষা কর। তোমাদের কাংখিত পবিত্র মানুষটিকে অতি কাছে থেকেই তোমরা দেখতে পাবে।

জনতাকে সরিয়ে দিয়ে কমান্ডার তিন-চারজন অশ্বারোহী সিপাহীকে বিভিন্ন টিলার উপর দাঁড় করিয়ে দেন, যাতে অপরাধীদের কেউ পালাতে না পারে। অবশিষ্ট সৈনিকদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা ঘোড়া থেকে নেমে চারদিকে থেকে ভেতরে ঢুকে পড়। কেউ প্রতিরোধ করলে তাকে হত্যা করে ফেল। কেউ পালাবার চেষ্টা করলে তাকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলে। অবশ্য পালাবার সুযোগ নেই এখানে।

কমান্ডার খোলা তরবারী হাতে একটি তাঁবুতে প্রবেশ করেন। দেখলেন, একটি অর্ধনগ্ন মেয়ে ও দু'জন পুরুষ ঘুমিয়ে আছে। তরবারীর আগার খোঁচা দিয়ে তিনি তাদের জাগাবার চেষ্টা করেন। তারা জাগ্রত হওয়ার পরিবর্তে উল্টো গালাগাল শুরু করে দেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এবার কমান্ডারের তরবারীর আগা তাদের চামড়া ছেদ করে যায়। তিনজনই বিড় বিড় করে ওঠে। তাদের বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যান্য তাঁবুগুলোতেও যেসব নারী ও পুরুষদের পাওয়া গেল, সকলের একই অবস্থা। একটি তাঁবুতে পাওয়া গেল অনেকগুলো সারিন্দা-হারমোনিয়াম।

ধৃত আসামীদের সবাইকে একস্থানে জড়ো করে পাহারা বসিয়ে দেয়া হল। তাদের উট ও অন্যান্য জিনিসপত্র সব জব্দ করা হল। ইমাম মসজিদের হুজরা থেকে বড় আসামীকে নিয়ে আসেন। তার দু'হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা। রাতে যেস্থানে সে 'মোজেজা' দেখিয়েছিল, তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। পিছনটায় এখনও পর্দা ঝুলছে। তার সাঙ্গপাঙ্গদের তার সম্মুখে বসিয়ে দেয়া হল। তাদেরও প্রত্যেকের হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা। উদ্ধারকৃত বাদ্যযন্ত্রগুলো সামনে রাখা হল। ইমাম জনতাকে এগিয়ে আসতে বললেন। জনতা হুড়মুড় করে এগিয়ে আসে। ইমাম বললেন, 'তোমরা লোকটাকে বল, যদি তুমি খোদার দূত বা খোদার পুত্র হয়ে থাক, তাহলে তোমার হাতের বন্ধন খুলে ফেল। এ নাকি মরা মানুষ জীবিত করতে পারে। আমি এর দলের একজনকে খুন করব। তোমরা একে বল, যেন এ তাকে আমার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখে কিংবা মারা গেলে জীবিত করে নেয়।' বলেই ইমাম তার দলের একজনকে ধরে আনেন এবং কমান্ডারের হাত থেকে তরবারীটা নিয়ে আঘাত হানতে উদ্যত হন। লোকটি চীৎকার করে বলে উঠে, 'আমাকে ক্ষমা করে দিন। এ লোকটি আমাকে জীবিত করতে পারবে না। এ বড় পাপী মানুষ। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে খুন করবেন না।'

জনতার সংশয় এখনো কাটেনি। ইমাম লোকটার চোগা এবং অন্যান্য কাপড়-চোপড়ও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। নিয়ে এসেছেন তার দেহ থেকে খুলে নেয়া নরম কাঠ এবং চামড়াও। ইমাম নিজে কাপড়গুলো পরিধান করেন। কাউকে না দেখিয়ে চামড়া মোড়ানো নরম কাঠটাও বুকে বেঁধে নেন। তারপর চোগা পরিধান করেন। তিনি কমান্ডারকে বললেন, আপনার চারজন তীরান্দাজকে আমার সামনে আসতে বলুন। তারা আসে। ইমাম তাদেরকে বললেন, আমার থেকে ত্রিশ কদম দূরে গিয়ে দাঁড়াও। আমার বুকটাকে নিশানা বানিয়ে তীর ছোঁড়।'

তীরান্দাজরা রুশদ ইবনে মুসলিমের প্রতি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকায়।

রাতে মাহমুদ কমান্ডারকে তীর-খঞ্জরের কাহিনী বিস্তারিত শুনিয়েছিল। কমান্ডার তার তীরান্দাজদের নির্দেশ দেন, তীর চালাও। তারা নিশানা ঠিক করে তীর ছোঁড়ে। চারটি তীর ইমামের বুকের ঠিক মাঝখানটায় এসে গেঁথে যায়। ইমাম বললেন, এবার চারজন এগিয়ে এসে আমার বুকে চারটি খঞ্জরের আঘাত হান। চারজন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ইমামের বুকে খঞ্জরের আঘাত হানে। খঞ্জর ইমামের বুকে গিয়ে আটকে যায়।

ইমাম তীরান্দাজদের বললেন, আরো একটি করে তীর ধনুকে সংযোজন করে নাও। তিনি দাগাবাজ 'পবিত্র' মানুষটিকে সামনে এনে দাঁড় করান। জনতাকে উদ্দেশ করে উচ্চস্বরে বললেন, 'এ লোকটি নিজেকে 'অক্ষয়' বলে দাবি করে। আমি তোমাদেরকে দেখাব, লোকটি আসলে কী।' তিনি তীরান্দাজদের বললেন, এর হৃদপিন্ডকে নিশানা বানিয়ে তীর নিক্ষেপ কর।'

চারটি ধনুক উপরে উঠে প্রস্তুত হয়ে যায়। লোকটি দৌড়ে ইমামের পেছনে চলে আসে। মৃত্যুর ভয়ে লোকটি থর থর করে কাঁপছে আর ইমামের নিকট জীবন ভিক্ষা চাচ্ছে। ইমাম তাকে বললেন, সামনে আস এবং জনতাকে বল যে, তোমরা খৃস্টানদের নিয়োজিত সন্ত্রাসী ও দাগাবাজ। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি জনতার দিকে মুখ করে উচ্চস্বরে বলতে শুরু করল, আমি অক্ষয় নই। আমি তোমাদের-ই ন্যায় মানুষ। তোমাদের ঈমান নষ্ট করার জন্য খৃস্টানরা আমাকে নিয়োজিত করেছে। তারা আমাকে বেতন দেয়।

'আর শামউনের কন্যা সাদিয়াকে এ ব্যক্তিই অপহরণ করিয়েছিল'– জনতার উদ্দেশ্যে ইমাম বললেন– 'আমরা ওকে উদ্ধার করেছি।'

ইমাম চোগাটা খুলে ফেলেন। ভেতরের কাপড়ও খুলেন। দেহ থেকে কাঠটা আলাদা করে রুশদ ইবনে মুসলিমের একজন সিপাহীর হাতে দিয়ে বললেন, এটিকে উপস্থিত জনতার প্রত্যেককে দেখিয়ে আন। সিপাহী কাঠটা হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখিয়ে আনে। ইমাম কাঠটা উঁচিয়ে ধরে জনতার উদ্দেশে বললেন, তীর আর খঞ্জর এই কাঠে বিদ্ধ হত।

জনতার সামনে সব রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়। ইমাম বললেন, এবার যাও, ঘুরে-ফিরে ওদের ভণ্ডামীর সাজ-সরঞ্জাম কোথায় কি আছে দেখ। মানুষ হুড়মুড় করে ছুটে যায়।

ঝুলন্ত পর্দার পেছনে একটি গুহা তৈরি করা হয়েছিল। রাতে ওখানে বসেই বাদকরা বাজনা বাজাত। মানুষ তাঁবুগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে। সবগুলো তাঁবুতে মদের উৎকট গন্ধ। সব জায়গা ঘুরে-ফিরে দেখার পর জনতাকে আবার এ স্থানে বসিয়ে ইমাম ভণ্ডটার ভণ্ডামীর বিস্তারিত বিবরণ দেন। ইমাম তথ্য বের করে নিয়েছেন যে, রাতে যে ছেলেটিকে 'জীবিত' করা হয়েছিল, সে

তাদেরই লোক। এখন রশি দিয়ে বাঁধা কয়েদীদের একজন সে। তাকে জনতার সম্মুখে নিয়ে আসা হল। দেখান হল আরো এক ব্যক্তিকে, যে রাতে বৃদ্ধ'র ভান ধরে লাশের পিতা সেজেছিল। যে চারজন তীরান্দাজ রাতে তীর চালিয়েছিল, তাদেরকেও সামনে নিয়ে আসা হল। তারাও সেই দলেরই মানুষ। এবার ইমাম জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন–

'মুসলমানগণ! মনোযোগ সহকারে শোন! এরা সবাই ক্রুশের পূজারী। তোমাদের ঈমান ধ্বংস করতে এসেছে। তোমরা জান যে, কোন মানুষ মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহও মরে যাওয়া মানুষকে জীবিত করেন না। কারণ, আল্লাহ নিয়ম ও আইন অনুযায়ী কাজ করেন। তিনি একক; তার কোন শরীক নেই। তার কোন সন্তান নেই। ক্রুশের পূজারী এই লোকগুলো ইসলামের আলোকে নির্বাপিত করার লক্ষ্যে এসব অস্ত্র ব্যবহার করছে। মিথ্যার পূজারী এসব মানুষ তোমাদের ঈমান, ঈমানী চেতনা ও তোমাদের তরবারীকে ভয় করে। এরা ময়দানে তোমাদের মোকাবেলা করার সাহস রাখে না। এ কারণে এসব আকর্ষণীয় পন্থা অবলম্বন করে তোমাদের অন্তরে সন্দেহ ও কু-মন্ত্রণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, যাতে তোমরা ইসলামের হেফাজতের জন্য ক্রুশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে না পার। এই মিসরেই ফেরাউন নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছিল। মহান আল্লাহ সেই খোদায়ী দাবীদারকে নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। আমার বন্ধুগণ! তোমরা নিজেদের মর্যাদা বুঝ। দুশমনকে ভালভাবে চিনে নাও।'

উপস্থিত জনতা– যাদের সকলেই মুসলমান– অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। লোকগুলো অশিক্ষিত, পশ্চাৎপদ। ফলে সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে ফেলা তাদের স্বভাব। ভক্তিতেও সীমালংঘন, বিরোধেও সীমালংঘন। তারা একজন পাপিষ্ঠ ভণ্ডের ভেল্কিবাজি দেখে তাকে 'খোদার পুত্র' বলে বরণ করে নিয়েছিল। আর পরে তার বিপক্ষে বক্তব্য শুনে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যে, ক্ষুব্ধকণ্ঠে ধ্বনি তুলে তার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইমাম আসামীদেরকে কায়রো পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতার ভীড়ের মধ্য থেকে তাদেরকে জীবিত বের করে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। কমান্ডার রুশদ ইবনে মুসলিম যে কোন প্রকারে হোক জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনার পরামর্শ দেন। কিন্তু ইমাম তাতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, তা করতে গেলে এই সহজ-সরল নিরীহ মানুষগুলো মারা যাবে। তা না করে বরং তাদের হাতেই ঐ পাপিষ্ঠদের জীবনের অবসান ঘটুক। তারা বুঝুক, যে লোকটি খোদার দূত ও পুত্র হওয়ার দাবি করল, সে একটা পাপিষ্ঠ মানুষ– যাকে যে কোন মানুষ হত্যা করতে পারে।

ইমাম, রুশদ ইবনে মুসলিম ও মাহমুদ একদিকে সরে যান। কমান্ডার একটি টিলার উপরে উঠে তার সিপাহীদের ডেকে বললেন, 'তোমরা যে যেখানে আছ, সেখানেই থাক; ওদেরকে বাধা দিও না।'

কিছুক্ষণ পরের দৃশ্য। ঘটনাস্থলে ইমাম, মাহমুদ, কমানডার রুশদ ইবনে মুসলিম ছাড়া আর কেউ নেই। রাতে যেখানে ভেল্কি দেখানো হয়েছিল, সেখানে ভেল্কিবাজ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের লাশগুলো পড়ে আছে। জনতার রোষানল থেকে মেয়েরাও রেহাই পায়নি। খুন হয়েছে তারাও। ক্ষতবিক্ষত লাশগুলো পড়ে আছে। একটিও চেনার উপায় নেই। উত্তেজিত জনতা তাঁবু, পর্দা ও অন্যান্য সব সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে গেছে। অপরাধী চক্রের উটগুলোও জনতা নিয়ে গেছে। লাপাত্তা হয়ে গেছে রুশদ ইবনে মুসলিমের ন'টি ঘোড়াও। মানুষ বুঝতে পারেনি যে, এগুলো তাদেরই সৈন্যদের ঘোড়া। সব মিলে মনে হচ্ছিল যে, হঠাৎ একটি ঝড় এসে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

'আমার কায়রো যেতে হবে'- ইমাম কমান্ডার ও মাহমুদকে বললেন- 'ঘটনাটি সরকারকে অবহিত করতে হবে।'

❁ ❁ ❁

দিন কয়েকের মধ্যে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যেসব আইন জারি করলেন ও যেসব পদক্ষেপ হাতে নিলেন, তা ছিল বৈপ্লবিক- এতই বৈপ্লবিক যে, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহল ও ভক্তদের পর্যন্ত চমকে দিল। তিনি সর্বপ্রথম আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীসের সন্দেহভাজন তালিকাভুক্তদের বাড়ী-ঘরে তল্লাশি চালান। তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমান্ডের বেশ ক'জন পদস্থ কর্মকর্তাও ছিল। তল্লাশিতে তাদের ঘরে প্রচুর পরিমাণ হিরা-জহরত, মূল্যবান সহায়-সামগ্রী ও ভিনদেশী অতিশয় রূপসী নারী উদ্ধার হয়। কারো কারো ঘরে এমন কতিপয় চাকর পাওয়া যায়, যারা মূলত সুদানের অভিজ্ঞ গুপ্তচর। তাছাড়া অভিযোগের পক্ষে আরো অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলতান আইউবী পদমর্যাদা নির্বিশেষে তাদের প্রত্যেককে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, এদের সঙ্গে সাধারণ বন্দীর ন্যায় আচরণ করবে। সুলতান আইউবীর এই পদক্ষেপের ফলে তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ড ও উপদেষ্টা পরিষদের বেশক'টি পদ শূন্য হয়ে যায়। কিন্তু তিনি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।

সুলতান আইউবী আঘাত হানলেন সেসব লোকদের উপর, যারা ইসলামের স্বঘোষিত ইজারাদার সেজে বসেছিল। উপদেষ্টাগণ সুলতান আইউবীকে পরামর্শ দেন যে, ধর্ম একটি স্পর্শকাতর বিষয়। সাধারণ মানুষ মসজিদের ইমামদের ভক্ত। আপনার এই অভিযানে জনসমর্থন আপনার বিপক্ষে চলে যাবে। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, 'তাদের মধ্যে ক'জন এমন

আছে, যারা ইসলামের মর্ম বুঝে? মানুষ তো তাদের ভক্ত হয়েছে এই জন্য যে, তারা তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে থাকে নিরীহ জনসাধারণ তাদের অনুরক্ত হোক। আমি জানি এই ইমামরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, নিজেদের সম্মান ও স্বার্থ রক্ষা করার জন্য জনসাধারণকে ইসলামের সঠিক বুঝ ও আসল চেতনা থেকে অজ্ঞই রাখে। জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয় হল মসজিদ। মসজিদের চার দেয়ালের ভেতরে বসে মানুষের কানে যা-ই দেয়া হয়, তা-ই মর্মমূলে পৌঁছে যায়। এ হল মসজিদের পবিত্রতা ও মহত্ত্বের ক্রিয়া। কিন্তু আমাদের দেশে মসজিদের অপব্যবহার হচ্ছে। মসজিদে বসে একজন ইমাম পীর-মুরশিদ সাজছে। এখনই যদি আমি অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে আমলদার আলেমদের নিয়োজিত না করি, তাহলে কিছুদিন পর মানুষ ইমাম ও পীর-মুরশিদদের পূজা করতে শুরু করবে। এই বে-এলেম ও বে-আমল আলেমরা নিজেদেরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার দূত বানিয়ে নেবে এবং ইসলামের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

যাইনুদ্দীন আলী বিন নাজা আল-ওয়ায়েজ একজন বিজ্ঞ চিন্তাশীল ও আমলদার আলেম। সুলতান আইউবী পরামর্শ নেয়ার জন্য তাঁকে ডেকে আনলেন। যাইনুদ্দীন বিন আলী ব্যক্তিগত উদ্যোগে গুপ্তচরবৃত্তির একটি ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। একবার তিনি খৃস্টানদের ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তথ্য দিয়ে বহু কুচক্রীকে ধরিয়েও দিয়েছিলেন। তিনি ধর্ম এবং ধর্ম বিষয়ে যেসব অপতৎপরতা চলছিল, সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি এই বলে সুলতান আইউবীর মনোবল বাড়িয়ে দেন যে, আপনি যদি আজ ধর্মকে অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে কাল জাতি আপনার আদেশ-নিষেধ মান্য করার জন্য আগে নামধারী ধর্মগুরুদের অনুমতি নেয়া আবশ্যক মনে করবে আর আপনিও সেই রীতি মেনে নিতে বাধ্য হবেন। আর এতদিনে খৃস্টানরা মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনায় কুসংস্কার ও অনৈতিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েই ফেলেছে।

বিজ্ঞ আলেম যাইনুদ্দীন বিন আলীর সমর্থন পেয়ে সুলতান আইউবী সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ফরমান জারি করলেন যে, যাইনুদ্দীন বিন আলী বিন নাজা আল-ওয়ায়েজের তত্ত্বাবধানে দেশের সকল মসজিদের ইমামদের ইলম, আমল ও চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত পরিচালিত হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন ইমাম নিয়োগ করা হবে। ইমাম নিযুক্তির ব্যাপারে সুলতান আইউবী যে ক'টি শর্ত আরোপ করলেন, তার মধ্যে অন্যতম হল, ইমাম বিজ্ঞ আলিম হওয়ার পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। সুলতান আইউবী জিহাদ, দর্শন ও সামরিক চেতনাকে ধর্ম ও মসজিদ-মাদ্রাসা থেকে পৃথক করতে রাজি নন।

তিনি দেশে এমন সব খেলাধুলা ও বিনোদনের উপকরণ ও পদ্ধতিকে অবৈধ ঘোষণা করেন, যাতে জুয়াবাজি ও চরিত্রহীনতার সংমিশ্রণ রয়েছে। তার নির্দেশে আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগ বিনোদনের বিভিন্ন আখড়ায় হানা দিয়ে নানারকম উলঙ্গ ছবি ইতাদি আপত্তিকর জিনিস উদ্ধার করে। গ্রেফতার করে অনেক কুচক্রীকে। তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও শত্রুর পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগে আজীবনের জন্য কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে। তার পরিবর্তে সুলতান আইউবী বিনোদনের জন্য তরবারী চালনা, ঘোড়সওয়ারী, অস্ত্র ছাড়া লড়াই ও কুস্তি ইত্যাকার খেলাধুলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। তিনি বিদ্যালয় ও মসজিদে জ্ঞান প্রতিযোগিতার রেওয়াজ চালু করেন।

সুলতান আইউবী সীমান্ত বাহিনীগুলোর প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি অবগত আছেন যে, শহর-নগর ও রাজধানী থেকে দূরে বসবাসকারী মানুষ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের দ্রুত শিকার হয়ে পড়ে এবং তারাই সর্বপ্রথম দুশমনের আক্রমণের শিকার হয়। তাদের মানসিক ও দৈহিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুলতান আইউবী বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নেন। সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে তিনি যেসব বাহিনী প্রেরণ করেছেন, তিনি নিজে তাদেরকে দিক-নির্দেশনা ও কঠোর নীতিমালা প্রদান করেন। বাহিনীর কমান্ডারদের নিয়োগ করেছেন বেছে বেছে ঈমানী চেতনা, বিচক্ষণতা ও দেশপ্রেমের ভিত্তিতে। রুশদ ইবনে মুসলিমও সেসব কমান্ডারদেরই একজন, যিনি যেইমাত্র মাহমুদের একটু ইঙ্গিত পেলেন যে, একজন গুরুত্বপূর্ণ আসামী ধরা পড়েছে, অমনি বাহিনী নিয়ে ছুটে চললেন। কমান্ডার যদি আগের জন হত, তাহলে মাহমুদ গিয়ে তাকে খৃস্টান ও সুদানীদের পরিবেষ্টিত মদ-নারীতে মত্ত পেত আর টালবাহানা করে সময় নষ্ট করে কুচক্রীদের পালাবার সুযোগ করে দিত।

কমান্ডার রুশদ ইবনে মুসলিম, মাহমুদ ইবনে আহমদ ও ইমাম– যাঁর নাম ইউসুফ ইবনে আজর– এ মুহূর্তে সুলতান আইউবীর কক্ষে উপবিষ্ট। তারা সুলতানকে নিহত ভেল্কিবাজের কাহিনী শোনাচ্ছেন। আলী বিন সুফিয়ানও বৈঠকে উপস্থিত। সুলতান আইউবী সীমাহীন আনন্দিত যে, এতবড় একটি সাংস্কৃতিক আক্রমণ প্রতিহত করা গেল। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'সবেমাত্র আক্রমণ প্রতিহত করা শুরু হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া দূর করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। আমি তথ্য পেয়েছি যে, সীমান্ত এলাকাগুলো থেকে সেনাবাহিনীতে ভর্তির লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার অধিবাসীরা সুদানীদের বন্ধু এবং মিসর সরকারের বিরোধী হয়ে গেছে। তাদের জিহাদী জযবা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য ও

গবাদিপশু আমাদেরকে দেয় না– এসব তারা সরবরাহ করে সুদানীদের। সেসব এলাকার মসজিদ এখন বিরান। মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে দাগাবাজ ও ভেল্কিবাজ পীরদের পূজা করতে শুরু করেছে। তাদের মনমানসিকতাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য নিয়মতান্ত্রিক অভিযান শুরু করা আবশ্যক। আলোচ্য ভেল্কিবাজ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের যদি হত্যা না করা হত, তাহলে তাদের গলায় জুতার মালা পরিয়ে জনতার মাঝে প্রদর্শন করে কাজ হাসিল করা যেত।'

সুলতান আইউবী তার বৈপ্লবিক পরিকল্পনায় সীমান্ত এলাকাগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত রেখেছিলেন। এবার সেদিকে আরো বেশি দৃষ্টি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার জন্য এ মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা বেশি জরুরী তকিউদ্দীন ও তার বাহিনীকে সুদান থেকে বের করিয়ে আনা। কায়রো পৌঁছেই তিনি পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাতে এক তিলও ঘুমান না তিনি। তিনি নিজে সুদানের ময়দানে যেতে পারছেন না। আভ্যন্তরীণ ঘোলাটে পরিস্থিতি তাঁকে যেতে দিচ্ছে না। তিনি কায়রো ফিরে এসেই তকিউদ্দীনকে এ সংবাদ দেয়ার জন্য দূত প্রেরণ করেন যে, আমি মিসর এসে গেছি।

দূত ফিরে এসেছে। সে সংবাদ নিয়ে এসেছে যে, তকিউদ্দীনের এ পর্যন্ত বহু সৈন্য মারা গেছে এবং কিছু সৈন্য দুশমনের হাতে ধরা পড়েছে কিংবা পরিস্থিতির শিকার হয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেছে। দূত জানায়, তকিউদ্দীন তাঁর অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু দুশমন তাদের ধাওয়া করে ফিরছে। তকিউদ্দীন জবাবী আক্রমণ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। আপাতত তার কয়েক প্লাটুন সৈন্য প্রয়োজন, যাদের সহযোগিতায় তিনি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবেন।

সুলতান আইউবী সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটি কমান্ডো ইউনিট এবং কয়েক প্লাটুন অভিজ্ঞ সৈনিক সুদান পাঠিয়ে দেন। সুদান পৌঁছে তারা অভিযান শুরু করে। তকিউদ্দীনকে দুশমনের ধাওয়ার হাত থেকে মুক্ত করে বেরে করে আনাই তাদের লক্ষ্য। তারা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে দুশমনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। কমান্ডো ইউনিটগুলো দুশমনকে অস্থির করে তোলে। কাঙ্খিত সময়ের আগেই তারা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

তকিউদ্দীন সুদান আক্রমণে যারপরনাই ব্যর্থ হয়। সাফল্য শুধু এতটুকু অর্জিত হয় যে, তকিউদ্দীন, তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ডের সালার ও অবশিষ্ট সৈন্যরা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন। মিসরের সীমান্তে প্রবেশ করে তকিউদ্দীন টের পেলেন যে, তিনি তাঁর বাহিনীর অর্ধেক সুদানে খুইয়ে এসেছেন।

❁ ❁ ❁

ওদিকে কার্ক জ্বলছে। নুরুদ্দীন জঙ্গীর কারিগররা প্রয়োজন অনুপাতে দূরপাল্লার মিনজানিক তৈরি করে নিয়েছে। এসব মিনজানিক দ্বারা পাথর ও আগুন নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ভেতরের কয়েকটি টার্গেট ঠিক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রসদের ডিপো। আগুনের প্রথম গোলাটি দুর্গের সেইদিক থেকে নিক্ষেপ করা হয়, যেদিক থেকে রসদের ডিপো খানিকটা কাছে। সৌভাগ্যবশত গোলা নিশানায় গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে। আগুনের লেলিহান শিখা জঙ্গী বাহিনীর মনোবল বাড়িয়ে দেয়। মুসলমানরা দূরপাল্লার তীর-কামানও তৈরি করে নিয়েছে। অতিশয় শক্তিশালী সিপাহীরা এগুলো ব্যবহার করছে। কিন্তু আট-দশটি তীর নিক্ষেপ করার পর তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সুলতান জঙ্গী আরো একটি দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি বেশ ক'জন শক্তিশালী সিপাহী বেছে নেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, তোমরা দুর্গের ফটকের উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং ফটক ভাঙ্গতে শুরু কর। ফটক ভাঙ্গার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তাদের সরবরাহ করা হয়।

জঙ্গীর এই জানবাজ বাহিনী ফটকের দিকে ছুটে যায়। উপর থেকে খৃস্টানরা বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়তে শুরু করে। কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায়। জখম হয় ক'জন। সুলতান জঙ্গী দূরপাল্লার তীরান্দাজদের তথায় সমবেত করেন। সাধারণ তীরান্দাজদের একটি দলকেও ডেকে নেন। সবাইকে বিভিন্ন পয়েন্টে দাঁড় করিয়ে প্রাচীরের উপর অবস্থানরত খৃস্টান সেনাদের উপর তীর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র মুসলিম তীরান্দাজরা শাঁ শাঁ করে তীর ছুঁড়তে শুরু করে। জানবাজদের আরেকটি দল ফটকের দিকে ছুটে যায়। জঙ্গীর সৈন্যদের তীর ছোঁড়া এবার মুষলধারার বৃষ্টির রূপ ধারণ করে। প্রাচীরের উপর ডাক-চিৎকার শোনা যায়। খানিক পর প্রাচীরের উপর কতগুলো ড্রাম দেখা যায়। সেগুলো জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গারে ভরা। তারা ড্রামগুলো বাইরের দিকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু ড্রাম ঠেলে বাইরের দিকে দেয়ার জন্য যেইমাত্র একজন মাথা জাগায়, অমনি সে মুজাহিদদের তীরের নিশানায় পরিণত হয়। ফলে দু'একটি ড্রাম বাইরে এসে পড়লেও অন্য সবগুলো প্রাচীরের উপরই উপুড় হয়ে যায়। প্রাচীরের উপর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে। আগুন নিক্ষেপকারীরাই নিজেদের আগুনে পুড়ে মরতে শুরু করে।

সুলতান জঙ্গীর একজন কমান্ডার জঙ্গীর আক্রমণের এই পন্থা দেখে ঘোড়া হাঁকিয়ে দুর্গের পেছন ফটকের দিকে ছুটে যায় এবং সেখানকার কমান্ডারকে বিষয়টি অবহিত করে। দু'কমান্ডার মিলে পেছন ফটকেও একই পদ্ধতির

হামলা পরীক্ষা করতে শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে মুজাহিদরা কিছুটা ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের এ অভিযানও সফল হয়। মুসলিম তীরান্দাজরা খৃস্টান সেনাদেরকে উপর থেকে আগুন নিক্ষেপ করার সুযোগ বন্ধ করে দেয়। সুলতান জঙ্গীও দু'কমান্ডারের এ অভিযান সম্পর্কে অবহিত হন।

সুলতান জঙ্গী এবার মিনজানিক দ্বারা দুর্গের ভেতরে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। মুসলিম বাহিনী কার্ক দুর্গের উভয় ফটকের দুঃসাহসী আক্রমণ অভিযান দেখে কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করেই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগ দুর্গের সামনে চলে যায়, অপর ভাগ পেছনের ফটকের দিকে। উভয় পয়েন্টে প্রাচীরের উপর এত অধিক তীরবর্ষণ করা হয় যে, উপরের প্রতিরোধ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কার্ক দুর্গের সামনের ও পেছনের উভয় ফটক ভেঙ্গে ফেলা হয়। সুলতান জঙ্গীর বাহিনী দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়ে। শহরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। জনসাধারণের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। নিরীহ মানুষগুলো ছুটাছুটি শুরু করে দেয়। এই সুযোগে খৃস্টান সম্রাট ও কমান্ডারগণ দুর্গ থেকে পালিয়ে যায়। সন্ধ্যা নাগাদ খৃস্টান বাহিনী অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য হয়। সুলতান জঙ্গী বন্দী মুসলমানদেরকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেন। খৃস্টান সম্রাটদের শহরময় অনুসন্ধান করা হয়; কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না।

কার্কের দুর্ভেদ্য দুর্গ মুসলমানদের দখলে আসে। বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের চোখে পড়তে শুরু করেছে। এ ঘটনা ১১৭৩ সালের শেষ তিন মাসের।

ফেরাউনের গুপ্তধন

ফিলিস্তীনে খৃস্টানদের কনফারেন্স চলছে। যে কোন জয়, যে কোন পরাজয়, পিছুহটা কিংবা সফল অগ্রযাত্রার পর বৈঠকে মিলিত হওয়া তাদের নিয়ম। বসে তারা মতবিনিময় করে, মদপান করে ও নারী নিয়ে আমোদ করে। তাদের বিশ্বাস, মদ আর নারী ছাড়া যুদ্ধজয় করা যায় না। তারা নিজেদের মেয়েদেরকে মুসলমানদের এলাকায় গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও মুসলিম শাসকদের চরিত্র হননের জন্য লেলিয়ে দিচ্ছে আর নিজেরা অধিকৃত এলাকাসমূহ থেকে মুসলমান মেয়েদের অপহরণ করে নিজেদের বিনোদন উপকরণে পরিণত করছে।

গোয়েন্দারা তাদেরকে রিপোর্ট প্রদান করল যে, সালাহুদ্দীন আইউবী বলে থাকেন, খৃস্টানরা হল নারী ব্যাপারী আর মুসলমান হচ্ছে নারীর সম্ভ্রমের মোহাফেজ। শুনে খৃস্টান সম্রাট ও কমান্ডারগণ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। একজন উপহাস করে বলল, লোকটা এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছে না যে, ক্রুশের পুত্ররা যেমন সৈনিক হয়ে ধর্মের কাজে তাদের দেহকে ব্যবহার করছে, তেমনি মেয়েরাও মুসলমানদেরকে বেকার করে তোলার জন্য নিজেদের দেহকে ব্যবহার করছে! আরেকজন বলল, সালাহুদ্দীন আইউবী এখনো টের পায়নি যে, তার জাতির অসংখ্য ছোট ছোট শাসক-কেল্লাদার ও সালারকে আমাদের এক একটি মেয়ে, সোনার এক একটি থলে এমনভাবে ঘায়েল করে রেখেছে যে, সেই পরাজয়ে তারা গর্ববোধ করছে এবং সুখ অনুভব করছে। এমতাবস্থায় সালাহুদ্দীন আইউবী আমাদের থেকে ইসলামের মর্যাদা কিভাবে রক্ষা করবে?

এ হল খৃস্টানদের প্রথম দিকের কনফারেন্সগুলোর বক্তব্যের সারাংশ। কিন্তু ১১৭৩ সালের শেষদিকে যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে খৃস্টান সম্রাট ও নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসেন, তখন তাদের উপর অন্যরকম ভাব বিরাজ করছিল। এবার তারা সুলতান আইউবীকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করছেন না। কারো মুখে হাসি নেই। কারো এ কথাও স্মরণ নেই যে, মদ-নারী ছাড়া তাদের বৈঠক চলে না। কার্ক থেকে তারা বড় লজ্জাজনক অবস্থায় পেছনে সরে এসেছে। তাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন কার্ক-এর কেল্লাদার রেজনাল্ডও। রেজনাল্ড একজন বিখ্যাত সমরবিদ। সুলতান আইউবীর বাহিনীর সঙ্গে তিনি বারকয়েক সংঘর্ষে লিপ্তও

হয়েছিলেন। এ বৈঠকে উপস্থিত আছে রেমান্ডও, যিনি কার্ক অবরোধের সময় সুলতান আইউবীর বাহিনীকে ঘিরে ফেলেছিলেন। রেমান্ড ও রেজনাল্ড দু'জন মিলে এমন পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, যা নিয়ে তারা বেজায় উৎফুল্ল ছিলেন। কিন্তু সুলতান আইউবী কার্ক অবরোধ বহাল রাখতে সক্ষম হন এবং রেমান্ডের অবরোধ এমনভাবে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেন যে, এবার তার বাহিনীই উল্টো সুলতান আইউবীর হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদের সব রসদ-পাতি ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সৈন্যরা আহত উট-ঘোড়াগুলো যবাই করে খেতে শুরু করে। তার অর্ধেকেরও বেশী সৈন্য আইউবীর হাতে মারা পড়ে। কিছু বন্দী হয় এবং অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়।

রেজনাল্ড-এর ভাগ্য ভাল যে, নূরুদ্দীন জঙ্গীর বাহিনী যখন কার্ক দুর্গে ঢুকে পড়ে, তখন ভেতরের ভীত-সন্ত্রস্ত জনতার হৈ-হুল্লোড় ও ছুটাছুটির ফাঁকে তিনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যথায় আজ এই কনফারেন্সে তিনি অংশ নিতে পারতেন না।

আজকের এই বৈঠকে খৃস্টানদের সেই যুদ্ধবাজ সরদারদের বিপুলসংখ্যক উপস্থিত আছেন, যাদেরকে বলা হয় 'নাইট'। এটি একটি উপাধি, যা রাজার পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। কনফারেন্সে উপস্থিত আছেন আক্রার পাদ্রীও, যিনি ক্রুশের প্রধান মুহাফিজের মর্যাদায় ভূষিত। তাছাড়া উপস্থিত আছেন গে-অফ লুজিনান, তার ভাই আমারলক ও মুসলমানদের প্রধান শত্রু ফিলিপ অগাস্টাস। নাইট ও অন্যান্য কমান্ডারদের সঙ্গে এ কনফারেন্সে উপস্থিত আছেন খৃস্টানদের সম্মিলিত ইন্টেলিজেন্স প্রধান হরমুন ও তার দু'-তিনজন সহযোগী। প্রথম প্রথম সবাই চুপচাপ বসে থাকেন, যেন তারা কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। অবশেষে ফিলিপ অগাস্টাস প্রথম মুখ খুলেন। তিনি 'ক্রুশের প্রধান মুহাফিজ'-কে সভাপতি ঘোষণা করে তাকে উদ্বোধনী ভাষণ দেয়ার অনুরোধ জানান।

'আমার সেই লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে লজ্জা লাগছে, যারা শপথ ভঙ্গ করেছে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে জীবিত ও সহীহ্ সালামত এসে পৌঁছেছে'– আক্রার পাদ্রী বললেন– 'আমি যীশুখৃষ্টের কাছে লজ্জিত। ক্রুশ দেখলে আমার চোখ লজ্জায় অবনত হয়ে আসে। তোমরা কি সবাই ক্রুশে হাত রেখে অঙ্গীকার করনি যে, জীবন দিয়ে হলেও তোমরা তার দুশমনকে নির্মূল করবে! তোমরা কি এই শপথ নাওনি যে, পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য প্রয়োজন হলে নিজেদের জীবন, সম্পদ ও শরীরের প্রতিটি অঙ্গ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হবে না? কিন্তু তোমরা ক'জন এমন আছ, যাদের গায়ে সামান্য একটু আচড়ও লেগেছে? একজনও নেই! তোমরা শোবক দুর্গ মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিলে। এবার

ফেলে এসেছ কার্ক। আমি জানি, যারা ময়দানে জয়লাভ করে, তারা মাঝে-মধ্যে পরাজিতও হয়। দু'টি জয়ের পর একটি পরাজয় কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু তোমাদের পরপর দু'টি পরাজয়, দু'টি পিছুটান প্রমাণ করছে যে, ক্রুশ ইউরোপেই বন্দী হয়ে গেছে এবং এমন একটি সময়ও আসন্ন, যখন ইউরোপের গীর্জাগুলোতে মুসলমানদের আযানের ধ্বনি গুঞ্জরিত হবে।'

'এমনটা কক্ষনো হবে না'– ফিলিপ অগাস্টাস বললেন– 'ক্রুশের মহান মুহাফিজ! এমনটা হবে না কখনো। আমাদের এই পরাজয়ের পেছনে কিছু কারণ ছিল। আমরা বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখেছি এবং আপনার উপস্থিতিতে এখনও বিষদ পর্যালোচনা হবে।'

'সম্ভবত তোমরা ভেবে দেখনি যে, মুসলমানদের গন্তব্য এখন বাইতুল মোকাদ্দাস'– ক্রুশের মহান মুহাফিজ বললেন– 'তোমরা কি জান না, সালাহুদ্দীন আইউবী বাইতুল মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করার শপথ নিয়েছিল? তোমাদের কি জানা নেই যে, বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কেবলা, যার স্বার্থে তারা আপন সন্তানদের পর্যন্ত কুরবানী করতে পারে?'

'আমরা মুসলমানদের মধ্যে গাদ্দারীর বীজ বপন করেছি'– ফিলিপ অগাস্টাস বললেন– 'আমরা মুসলমানদের মধ্যে এত গাদ্দার তৈরি করেছি, যারা সালাহুদ্দীন আইউবী ও নূরুদ্দীন জঙ্গীকে বাইতুল মোকাদ্দাসের পথে বিভ্রান্ত করে পিপাসায় মেরে ফেলবে।'

'তাহলে সেই মুসলমানরা কারা, যারা তোমাদের হাত থেকে এত শক্ত দু'টি কেল্লা কেড়ে নিল?'– ক্রুশের মুহাফিজ বললেন– 'তোমরা এ কথাটা ভুলে যেও না যে, মুসলমান একটি কঠিন জাতি। মুসলমান গাদ্দারীর পথ অবলম্বন করলে আপন ভাইয়ের গলায়ও ছুরি চালাতে পারে। কিন্তু সেই 'গাদ্দার' মুসলমানেরই মধ্যে যখন জাতীয় চেতনা জেগে উঠে, তখন নিজের গলা কাটিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করে। মুসলমান গাদ্দারও যদি হয়ে যায়, তোমরা তাদের উপর ভরসা রেখ না। বেশী দূর যেতে হবে না, কেবল নিকট অতীতের দশটি বছরের ঘটনাবলীতে চোখ বুলাও। হিসাব করে দেখ, গাদ্দার মুসলমানরা তোমাদেরকে কতটুকু ভূখণ্ড দিয়েছে? মিসরে পা রাখার মত সাহস তোমাদের এখনো হয়েছে কি? আজ মুসলমান ফিলিস্তীনে বসে আছে। কাল তোমাদের বুকে এসে বসবে। মনে রেখ আমার বন্ধুগণ! সালাহুদ্দীন আইউবী ও নূরুদ্দীন জঙ্গী যদি তোমাদের থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস কেড়ে নিতে সক্ষম হয়, তাহলে ইউরোপকেও তোমরা ধরে রাখতে পারবে না। তবে সমস্যা ফিলিস্তীন– ইউরোপের নয়, সমস্যা পৃথিবীর কোন ভূখণ্ড নিয়ে নয়– আসল সমস্যা হল ক্রুশ ও ইসলামের। এটি দু'টি ধর্ম ও দু'টি আদর্শের লড়াই। এ

দু'টির যে কোন একটির পতন হতেই হবে। কিন্তু তোমরা কি ক্রুশের পতন মেনে নেবে?'

'না, পবিত্র পিতা! এমন কখনো হবে না'– সভার পারিষদবর্গের মধ্যে জোশ সৃষ্টি হয়ে যায়– 'এত নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই মহান পিতা!'

'তাহলে তোমরা সেই কারণগুলো খুঁজে বের কর, যার ফলে তোমাদের একের পর এক পরাজয় বরণ করতে হচ্ছে'– ক্রুশের মুহাফিজ বললেন– 'আমি তোমাদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন উপদেশ দিতে পারি না। আমি তো সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সৈনিক, আমি কালীসার মুহাফিজ। আমি কালীসার কুমারীদের শপথ করে বলছি, তোমরা দশজন কট্টর মুসলমানকে আমার সামনে নিয়ে আস, আমি তাদেরকে ক্রুশের পূজারী বানিয়ে ফেলব। তোমরা একটু ভেবে দেখ, তোমাদের এত বিশাল শক্তিধর সেনাবাহিনী মুসলমানদের ক্ষুদ্রতম একটি বাহিনীর মোকাবেলা কেন করতে পারছে না? তোমাদের পাঁচশ' আরোহী সৈনিককে একশ' পদাতিক মুসলিম সৈনিক কিভাবে পরাস্ত করে? কারণ একটাই– মুসলমান লড়াই করে ধর্মীয় চেতনা নিয়ে। তারা যখন তোমাদের মোকাবেলায় আসে, আসে বিজয় কিংবা মৃত্যুর শপথ নিয়ে। আমি শুনেছি, তাদের কমান্ডাররা তোমাদের পেছনে চলে যায় এবং অতর্কিত হামলা করে তোমাদের কোমর গুড়িয়ে দিয়ে তোমাদের তীর খেয়ে চালনীর ন্যায় ঝাঝরা হয়ে যায় কিংবা নিরাপদে কেটে পড়ে। ভেবে দেখ, দশ-বারজন মুসলমান দলবদ্ধ হয়ে কিভাবে তোমাদের হাজার হাজার সৈন্যের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে? এ আর কিছু নয়– ধর্মীয় বিশ্বাস। তারা মনে করে, খোদা তাদের সঙ্গে আছেন, আছেন খোদার রাসূলও। এমন দুঃসাহসী অভিযানে তারা নির্দেশনা তাদের কমান্ডার থেকে গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে কুরআন থেকে। আমি অতি মনোযোগ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে, কুরআন তাকে 'জিহাদ' বলে। জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। এমনকি ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব নামাযের চেয়েও বেশী। কাজেই তোমরাও যতক্ষণ না নিজেদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারবে না।'

আক্রার পাদ্রী তার পরাজিত শাসকমণ্ডলী ও কমান্ডারদের মধ্যে নবপ্রেরণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন এবং বললেন, তোমরা নিজেরা বসে পর্যালোচনা কর যে, এসব পরাজয়ের কারণগুলো কী, এর দায়-দায়িত্ব কার কার উপর বর্তায় এবং কিভাবে এই পরাজয়গুলোকে বিজয়ে পরিণত করা যায়। নিজেদের সর্বশক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতি নিবদ্ধ কর। মনে রেখ, সালাহুদ্দীন আউবী ফেরেশতা নয়– তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ। তার শক্তি শুধু একটাই যে,

সে একজন পাকা ঈমানদার।'

পাদ্রী বৈঠক ত্যাগ করে চলে যান।

পাদ্রীর চলে যাওয়ার পর সভাসদদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনা-পর্যালোচনা ও বাকবিতণ্ডার পর তারা কতিপয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। একটি সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা আর জবাবী আক্রমণ করব না; বরং সুলতান আইউবী ও নূরুদ্দীন জঙ্গীকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার এবং যুদ্ধ অব্যাহত রাখার সুযোগ প্রদান করব। তাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হবে এবং এদিক-ওদিক দিয়ে লড়াইয়ে জড়িয়ে রাখা হবে। এভাবে তাদের রসদ সরবরাহের পথ দীর্ঘ ও অনিরাপদ হয়ে পড়বে।

আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ইউনানী, লাতিনী ও ফ্রিংকীদেরকে অতিশীঘ্র প্রস্তুত করা হবে, যাতে তারা সমুদ্রের তীরে মিসরের উত্তর-পশ্চিমের এতটুকু এলাকা দখল করে নেবে, যাকে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করা যায় এবং ফিলিস্তীনের প্রতিরক্ষা ও মিসর আক্রমণে কাজে লাগান যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়, তাহল ইসলামী ভূখণ্ডে মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের কার্যক্রম তীব্রতর করে তুলতে হবে।

মিসরের সীমান্ত এলাকাগুলোতে মুসলমানদের মধ্যে কুসংস্কার ও ইসলামবিরোধী চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পরিচালিত খৃস্টানদের যে মিশনটি সাফল্যের দোড়গোড়ায় উপনীত হওয়ার পর নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে, গোয়েন্দা মারফত সে সংবাদ কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে। গোয়েন্দারা খৃস্টান কর্মকর্তাদের কাছে এ সংবাদও পৌঁছায় যে, আমাদের নিয়োজিত ব্যক্তিরা যেসব মুসলমানদেরকে দলে ভিড়িয়েছিল, তারাই তাদেরকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।

বৈঠকে এ তথ্যও পরিবেশন করা হয় যে, অধিকৃত এলাকাগুলোতে মুসলমানদের জীবনধারাকে দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে। জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে তারা দলে দলে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। আমরা তাদেরকে শান্তিতে-নিরাপদে পালাতেও দিচ্ছি না। আমরা পলায়নপর কাফেলার পথরোধ করে তাদের সর্বস্ব লুটে নিচ্ছি এবং মেয়েদেরকে অপহরণ করে নিয়ে আসছি।

বৈঠকে এ পদক্ষেপটির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বলা হয় যে, মুসলিম নিধনের এটি একটি উত্তম পন্থা।

বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত এই গ্রহণ করা হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে খৃস্টবাদের প্রচার করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন বিরাট অংকের বাজেট। এ-কাজ পূর্ব থেকেই পরিচালিত হয়ে আসছে এবং অর্থও দেদারছে ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু তাতে কিছু সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে। একটি সমস্যা হল, যথাস্থানে অর্থ প্রেরণ করতে হচ্ছে উটের মাধ্যমে। বেশ ক'বার এমনও হয়েছে যে, অর্থ ও

স্বর্ণমুদ্রা বোঝাই উট মিসরের সীমান্ত প্রহরীদের হাতে ধরা পড়েছে কিংবা দস্যুদের হাতে লুণ্ঠিত হয়েছে। এ সমস্যার সমাধানে এমন একটি পন্থা বের করে নেয়া দরকার যে, অর্থ-কড়ি, সোনা-দানা ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু সেখান থেকেই হস্তগত করা যায়, যেখানে এগুলো ব্যয় করতে হবে। দীর্ঘদিন যাবত এ নিয়ে মাথাও ঘামান হচ্ছে। খৃষ্টানদের ইন্টেলিজেন্স প্রধান হরমুন সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানেরই ন্যায় অস্বাভাবিক বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। তিনি আগেই ভেবে ঠিক করে রেখেছেন যে, মিসরের ভূমি নিজের মধ্যে এত অধিক সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে, যা দ্বারা গোটা পৃথিবীকে ক্রয় করা সম্ভব। কিন্তু সেসব ধন-ভাণ্ডার হস্তগত করা আকাশের তারকা হাতে নেয়ার সমান। এসব ধন-ভান্ডার ফেরাউনদের সমাধিস্থলে পুঁতে রাখা আছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, যখন কোন ফেরাউন মৃত্যুবরণ করত,তখন তার সঙ্গে তার রাজকীয় সব ধন-সম্পদ, সোনা-দানা, হিরা-জহরত পুঁতে রাখা হত। মিসর থেকে ফেরাউনদের এসব গুপ্তধন উদ্ধার করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কথাই ভাবছেন হরমুন।

ফেরাউনদের দাফন করার জন্য মাটির নীচে বিশাল পরিসরের একটি মহল নির্মাণ করা হত। ফেরাউনরা নিজেরাই নিজেদের জীবদ্দশায় এই মহল তৈরি করে রেখে যেত। তার জন্য তারা এমন একটি স্থান বেছে নিত, যেখানে পৌঁছা কারো পক্ষে যেন সম্ভব না হয়। মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী তাকে তথায় দাফন করে সমাধিস্থলটি এমনভাবে বন্ধ করে দেয়া হত যে, নির্মাণকারী কারিগররা ছাড়া অন্য কারো জানা সম্ভব হত না যে, এটি কিভাবে খোলা যাবে। দাফন কাজ সমাপ্ত করার পর মৃত ফেরাউনের স্বজনরা মহল নির্মাতা কারিগরদের মেরে ফেলত।

ফেরাউনদের বিশ্বাস ছিল, তারা খোদা। আরেক বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর পরও তাদের এই প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বহাল থাকবে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা পাহাড় কেটে এবং পাহাড়ের নীচে মাটি খনন করে প্রাসাদোপম হলঘর ও অন্যান্য কক্ষ তৈরি করিয়ে তাতে বিপুল পরিমাণ হিরা-জহরত ও সোনা-রূপা গচ্ছিত রাখত। তাছাড়া ভেতরে লাশের সঙ্গে ঘোড়াগাড়ী, ঘোড়া, গাড়োয়ান ও মাঝি-মাল্লাসহ নৌকা রেখে দিত। সেবার জন্য দাস-দাসী এবং সুন্দরী নারীও সঙ্গে দেয়া হত। সব মিলে অবস্থা এই দাঁড়াত যে, মারা গেল একজন মানুষ, আর তার সঙ্গে দাফন করা হল বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ও অসংখ্য মানুষ। সবশেষে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এমনভাবে সমাধির মুখ বন্ধ করে দেয়া হত, যেখানে প্রবেশ করা দুনিয়ার কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ফেরাউনী যুগের পরিসমাপ্তি ঘটার পর যখনই যে রাজা মিসরের শাসন

ক্ষমতায় আসীন হন, সবাই ফেরাউনদের সমাধিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হন। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেকে ফেরাউনদের সমাধিসমূহ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তাদের কেউ কেউ সমাধির ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তারা আর ফিরে আসতে পারেনি; কোথায় হারিয়ে গেছে, তা আর কারো জানা সম্ভব হয়নি। দু'একজন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসলেও তারা আপাদমস্তক অন্যদের জন্য শিক্ষার উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে একটি বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, ফেরাউনরা খোদা ছিল না বটে, কিন্তু মৃত্যুর পরও তাদের কাছে এমন শক্তি রয়ে গেছে, যার বলে তারা সমাধিতে গমনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকে। মানুষের কাছে এ বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হল, যখনই যে বাদশা যে কোন ফেরাউনের সমাধিতে হাত দিয়েছে, তার রাজত্বে পতন এসেছে। অনেকে আবার একই কারণে ফেরাউনদেরকে অপয়া বলেও মনে করে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর যুগেরও পূর্বে খৃস্টানদের জানা ছিল, মিসর গুপ্তধনের দেশ। খৃস্টানরা যে ক'টি কারণে মিসর দখল করতে চাইছিল, এটিও তার একটি কারণ। দীর্ঘ সংঘাত-লড়াইয়ের পর খৃস্টানদের কাছে যখন সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করে মিসরের দখল নেয়া কঠিন মনে হল, তখন তারা ভাবতে শুরু করল যে, মিসরীয়দের কারো দ্বারা-ই এসব গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান করতে হবে এবং সেই অমূল্য সম্পদ উদ্ধার করে কাজে লাগাতে হবে।

খৃস্টানরা যেভাবে হোক জানতে পারল যে, মিসর সরকারের পুরাতন কাগজপত্রে এমন কিছু তথ্য ও নকশা রয়েছে, যাতে কিছু কিছু সমাধির দিক-নির্দেশনা দেয়া আছে। কিন্তু সেসব কাগজ উদ্ধার করা তো আর সহজ ব্যাপার নয়। খৃস্টানরা শুধু এ তথ্য নেয়ার জন্য মিসরে দক্ষ ও অভিজ্ঞ গুপ্তচর পাঠায় যে, কাগজগুলো কোথায় আছে এবং কিভাবে গায়েব করা যায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বশীলদের হাত করা সম্ভব ছিল না। সুলতান আইউবী যে সময়ে কার্ক ও শোবকের লড়াই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং যে ঘোলাটে পরিস্থিতিতে তার অনুপস্থিতিতে মিসর ষড়যন্ত্রের উর্বর ভূমি ও বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভের রূপ ধারণ করেছিল, সেই সুযোগে খৃস্টানদের গোয়েন্দা প্রধান হরমুন এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেন যে, সুলতান আইউবীর সেনাবাহিনীর পদস্থ এক কমান্ডার আহমার দরবেশকে হাত করে নেন। আহমার ছিলেন সুদানী। তার বিরুদ্ধে গাদ্দারীর কোন অভিযোগ ছিল না। সুলতান আইউবীর পরম আস্থাভাজন ছিলেন তিনি। তিনি সুলতান আইউবীর কমান্ডে যুদ্ধও করেছেন। সেনাবাহিনীতে বেশ সুনাম ছিল তার। পরে জানা গেল যে, এক খৃস্টান মেয়ে

আহমারের মস্তিষ্কে সুদানপ্রেম ও সুলতান আউইবীর বিরোধী চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। এসথিনা নাম্মী এই মেয়েটি আহমারকে মিসরের সীমান্ত অঞ্চলের কিছু এলাকার শাসনক্ষমতা দেয়ার প্রলোভনও দেখিয়েছিল। লোকটি ছিল মুসলমান, কিন্তু খৃস্টানরা তার মাথায় এ দর্শন ঢুকিয়ে দেয় যে, তুমি আগে সুদানী, পরে মুসলমান।

নূরুদ্দীন জঙ্গী যখন কার্ক দুর্গ জয় করে নেন এবং সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরে গাদ্দারদের মূলোৎপাটনে ব্যস্ত, ততক্ষণে আহমার দরবেশ কয়েকজন খৃস্টান গুপ্তচরের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছেন। তিনি কারো মনে এমন কোন সন্দেহ পর্যন্ত জাগ্রত হতে দেননি যে, তিনি দুশমনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছেন। প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত তিনি সকলের কাছে এতই বিশ্বস্ত যে, অনায়াসে তিনি পুরনো দলিল-দস্তাবেজ পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেখান থেকে তিনি খৃস্টানদের কাঙ্ক্ষিত কাগজপত্রগুলো চুরি করে নিয়ে আসেন।

আহমার দরবেশ যা চুরি করে আনল, সেগুলো মূলত কাগজ নয়- কাগজ ও কাপড়ের মাঝামাঝি একটা কিছু। তাতে স্পষ্ট ভাষায় কিছু লেখা নেই, আছে কতগুলো আঁকিবুঁকি দাগ ও কিছু নকশা-নমুনা। লেখাজোখা কিছু থাকলেও তা সেই ফেরাউনী আমলের ভাষা, যা বুঝবার উপায় নেই।

আহমার দরবেশ কাগজগুলো খৃস্টানদের হাতে তুলে দেন। তারা অনেক চিন্তা-গবেষণা করে, তা থেকে যা উদ্ধার করে তার মর্ম হল, কায়রো থেকে প্রায় আঠার ক্রোশ দূরে একটি পরিত্যক্ত পাহাড়ী অঞ্চল অবস্থিত। যার ভেতরে সম্ভবত হিংস্র প্রাণীও অনুপ্রবেশ করে না। তার-ই অভ্যন্তরে এক স্থানে কোন এক ফেরাউনের সমাধি।

তথ্যটি কতটুকু সঠিক, তা কেউ জানে না। তবু ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে না আহমার। এটা যে ফেরাউনের সমাধি, তার নাম র‍্যামন্স দ্বিতীয়। তার সমাধি অনুসন্ধান ও খনন করার জন্য খৃস্টানরা কায়রোতে ক'জন চতুর, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ গোয়েন্দা প্রেরণ করে। মারকুনী তাদের দলনেতা। ইতালীর অধিবাসী মারকুনী একজন অভিজ্ঞ পর্যটক ও পর্বত বিশেষজ্ঞ। আহমারের নির্দেশনায় তারা এমন ছদ্মবেশ ধারণ করেছে যে, তাদের আসল রূপ ধরার উপায় নেই কারো। তাদের দু'জন এখন আহমারের গৃহভৃত্য। আহমারের সহযোগিতায় এরা ফেরাউনদের সমাধি খনন করে মহামূল্য সম্পদ, হিরা-জহরত উদ্ধার করবে। তারপর খৃস্টানরা সেই সম্পদ ব্যবহার করবে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজে, ফেদায়ীদের পেছনে ব্যয় করে সুলতান আইউবীকে খুন করাবে। বিনিময়ে যখন মিসর খৃস্টান কিংবা সুদানীদের দখলে আসবে, তখন খৃস্টানরা আহমারকে কোন এক এলাকার

গবর্নর বানাবে। এতকিছুর বিনিময়ে এই হবে আহমারের পুরস্কার। আহমার এ দায়িত্বও বরণ করে নিয়েছে যে, এই গুপ্তধন অনুসন্ধানকালীন যদি সুলতান আইউবী খৃস্টান কিংবা সুদানীদের উপর আক্রমণ করে বসেন, তাহলে তিনি তার বাহিনীকে আইউবীর যুদ্ধ পরিকল্পনার বিপক্ষে ব্যবহার করবেন।

মিসর থেকে ফেরাউনী গুপ্তধন উদ্ধার করে খৃস্টানদের হাতে তুলে দেয়াই এখন আহমারের একমাত্র মিশন। লোকটির দেল-দেমাগ সম্পূর্ণরূপে খৃস্টানদের কব্জায়। অভিযানের যে দু'সদস্য ভৃত্যবেশে তার ঘরে অবস্থান করছিল, মারকুনীর নেতৃত্বে তাদেরকে সমাধি অভিমুখে রওনা করিয়ে দেন তিনি। জায়গার নকশাটাও সঙ্গে দিয়ে দেন। অপর এক গোয়েন্দার মাধ্যমে হরমুনের নিকট সংবাদ পৌঁছান যে, গুপ্তধন অনুসন্ধানের অভিযান শুরু হয়ে গেছে। হরমুন কনফারেন্সে খৃস্টান সম্রাট প্রমুখদের অবহিত করেন যে, এ সমাধির সন্ধান যদি পেয়েই যাই, তাহলে তা থেকে যে পরিমাণ সম্পদ উদ্ধার হবে, তা দ্বারা মিসরীয়দের হাতেই মিসরের মূল উপড়ে ফেলা যাবে। হরমুনের মুখে সম্ভাব্য সাফল্যের আনন্দের দ্যোতি।

১১৪৭ সালের মার্চ মাসের শেষ দিন। কায়রো থেকে আঠার ক্রোশ দূরে একস্থানে তিনটি উট দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি উটের পিঠে একজন করে আরোহী। প্রত্যেকের মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢাকা। একজন চোগার পকেট থেকে চওড়া একটি কাগজ বের করে। খুলে গভীর দৃষ্টিতে দেখে সঙ্গীদের বলে, ঠিক আছে, জায়গা এটাই। তিনজনই উটের পিঠে বসা। তার ইশারা পেয়ে উট তিনটি সামনের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে।

সম্মুখে দেয়ালের মত খাড়া দু'টি টিলা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে সরু রাস্তা, যেখান দিয়ে একটি উট চলতে পারে। এক সারিতে উট তিনটি ভেতরে ঢুকে পড়ে। ভেতরের পর্বতগুলো আকারে এমন, যেন ছাদবিহীন বিশাল এক প্রাসাদ। বালির অন্তহীন সমুদ্রে এ পার্বত্য এলাকাটি তিন-চার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাইরে এখানে-ওখানে অনেকগুলো টিলা ও চত্বর। পেছনে শক্ত মাটির পাহাড়।

সূর্য অস্ত যাওয়ার অনেক আগেই এখানে সন্ধ্যা হয়ে যায়। কেউ কখনো এ ভূতুড়ে পার্বত্য এলাকার ভেতরে প্রবেশ করার সাহস করেনি। করবেই বা কেন, এর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করার প্রয়োজনই তো কারো হচ্ছে না। মরুভূমির মুসাফিরদের প্রয়োজন পড়ে শুধু পানির। কিন্তু এমন শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চলে পানি পাওয়া যাবে ভুলেও তো ভাবে না কেউ।

এলাকাটি মানুষের কোন গমন পথের পার্শ্বেও নয়। মাইলের পর মাইল

দূর থেকে চোখে দেখা যায় শুধু। এলাকা সম্পর্কে জনসমাজে অনেক ভীতিকর কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে। মানুষ বলাবলি করে, এটি নাকি শয়তানের আড্ডাখানা। আল্লাহ যখন শয়তানকে আকাশ থেকে জমিনে নামিয়ে দেন, তখন শয়তান এখানেই অবতরণ করেছিল। সামরিক দিক থেকেও এলাকাটির কোন গুরুত্ব নেই। সে কারণে সৈন্যরাও কখনো এ এলাকার ভেতরে প্রবেশ করার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

মিসরের এ ভয়ংকর ভূখণ্ডের ইতিহাসে এ তিনজন মানুষই বোধ হয় প্রথম, যারা এর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করল। এর ভেতরে তাদের ঢুকতে হবেই। কারণ, পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ ও নকশা এ স্থানকেই চিহ্নিত করছে। সন্দেহে ফেলে দিল শুধু নকশার একটি রেখা। রেখাটা একটি নদীর। কিন্তু এখানে কখনো কোন নদী ছিল না। চিহ্নিত স্থানে এখন চোখে পড়ছে অনেকখানি লম্বা একটি নিম্নাঞ্চল, যার প্রস্থ বার কি চৌদ্দ হাত। ভেতরের বালির আকার-আকৃতি প্রমাণ করছে, শত শত বছর আগে এ পথে পানি প্রবাহিত হত। এই নিম্নাঞ্চলের পরিধি নিকটে কোথাও গিয়ে থেমে যাওয়ার পরিবর্তে চলে গেছে নীল দরিয়া অভিমুখে। উষ্ট্রচালকরা নিশ্চিত যে, তারা যে জায়গার অনুসন্ধান করছে, এটিই সে জায়গা।

অভিযানের দলনেতা মারকুনী ও তার দু'সঙ্গী সবাই খৃস্টান। তারা সুলতান আইউবীর এক কমান্ডার আহমার দরবেশ– এর দিক-নির্দেশনায় ফেরাউন র‍্যামন্স দ্বিতীয়-এর সমাধির অনুসন্ধানে এসেছে। নকশা অনুযায়ী সঠিক জায়গায় এসে উপনীত হয়েছে তারা। এবার ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে নকশার তথ্য কতটুকু সঠিক।

মারকুনী স্বাভাবিক কণ্ঠে তার সঙ্গীদের বলল, নিজেকে খোদা দাবিদার ফেরাউন নিজের শেষ বিশ্রামাগার এ জাহান্নামে বানাতে এসেছে, তা আমার বিশ্বাস হয় না। আহমার ও হরমুন আমাদেরকে অনর্থক এক পরীক্ষায় ফেলে দিলেন!

মারকুনী কঠিনপ্রাণ মানুষ। হিম্মত হারাবার মত লোক নয়। সকলের সামনে এগিয়ে চলছে সে। পেছনে সঙ্গীরা। অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়েছে তারা। এলাকার রূপ-আকৃতি একস্থানে একরকম। মাটির রং কোথাও গাঢ় বাদামী, কোথাও খয়েরী, কোথাও বা লাল। স্থানে স্থানে বালির উঁচু উঁচু ঢিবি। কোথাও মাটির খাড়া টিলা। ঢালু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বালি গড়িয়ে পড়ছে দেখা যাচ্ছে।

আরো অনেকখানি এগিয়ে যায় মারকুনী। সামনে আর পথ নেই। মারকুনী ডানে-বাঁয়ে তাকায়। একদিকে একটি টিলা চোখে পড়ে তার। টিলার মধ্যখানে এমনভাবে ফাটা, যেন ভূমিকম্পে ফেটে ফোকর হয়ে গেছে। মারকুনী সেই

ছিদ্রপথে উঁকি দিয়ে দেখতে পায়, একটি গলিপথ চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। উটের চলা কঠিন হবে মনে হয়। তবু মারকুনী তার উটটি ঢুকিয়ে দেয় সরু গলির ভেতর। পেছনে পেছনে ঢুকে পড় অন্য দু'জন সঙ্গীও। দু'পার্শ্বের টিলার দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলতে শুরু করে উটগুলো। আরোহীরা পা বাইরে রাখতে পারছে না। তাই তুলে রেখে দিয়েছে উটের উপর। উটগুলোর পেটের ঘষায় টিলার দেয়ালের মাটি খসে নীচে পড়ছে। পথটা ক্রমেই উঠে গেছে উপরদিকে। মারকুনী এগিয়ে চলছে সঙ্গীদের নিয়ে। উটের পায়ের আঘাতে দু'পার্শ্বের টিলা দু'টো কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে, এই বুঝি টিলা দু'টো ভেঙ্গে পড়ে দু'দিক থেকে চাপা দিয়ে পিষে ফেলবে তিনটি উট ও তাদের চালকদের।

সামনে অগ্রসর হয়ে উপরদিকে তাকায় মারকুনী। দূর উপরে টিলার উভয় চূড়া পরস্পর মিশে গেছে। সম্মুখে আবছা অন্ধকার। কিন্তু দূরে একস্থানে আলোর মত চোখে পড়ে, যাতে মারকুনীর মনে আশা জাগে, ও পর্যন্তই গলি শেষ; তারপর প্রশস্ত জায়গা।

সরু গলিপথটি এখন যেন একটি সুড়ঙ্গ। উটের পায়ের আওয়াজ ভীতিকর এক গুঞ্জরণ সৃষ্টি করে চলেছে তাতে। মারকুনী সামনের দিকে এগিয়ে চলে। রাস্তা এখানে একটিই; ফলে পথ ভোলার আশংকা নেই। সামনে যে আলো পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আর সুড়ঙ্গপথ শেষ হয়ে আসছে।

মারকুনী সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছে। সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা। দাঁড়িয়ে যায় তিনটি উট। মারকুনী চারদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নতুন জায়গাটি দেখে নেয় এক নজর। এখানে চতুর্দিকে পুরাতন একটি দুর্গের সুউচ্চ অনেকগুলো প্রাচীর চোখে পড়ল। দুর্গটি মানুষের নির্মিত নয়- প্রাকৃতিক। এলাকাটি মূলত পাহাড়ী। পাহাড়গুলো তিন-চারশ' গজ পর্যন্ত ঢালু। কোনটি অনেক উঁচু, কোনটি নিচু। গোলাকার এই জায়গাটা চারদিক থেকেই বন্ধ বলে মনে হল। মারকুনী উটগুলো একস্থানে বসিয়ে রেখে সঙ্গীদের নিয়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করল। বালি-মাটির পাহাড়। হাঁটতে হচ্ছে পা টিপে টিপে। পা ফস্‌কে পড়ে যাওয়ার আশংকা প্রবল।

এলাকায় কোন রাস্তা পাওয়া গেল না। একটি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পায়ে হাঁটা যায়, এমন একটি ফাঁকা জায়গা। সে পথ ধরেই হাঁটছে মারকুনী ও তার সঙ্গীরা। এলাকার মাটি ও টিলা প্রমাণ করছে, শত শত বছর যাবত এখানে কোন মানুষের পা পড়েনি।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মারকুনী ও তার সঙ্গীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠে। ডানদিকের পাহাড়ের কোলঘেঁষে পা টিপে টিপে হাঁটার চেষ্টা করছে অভিযাত্রী দল। বাঁ-দিকের এলাকাটি নীচের দিকে চলে গেছে অনেক দূর

পর্যন্ত। এটি সুবিশাল ও গভীর এক গর্ত। এখান থেকে নীচে পতিত হওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু। গর্তের অপর পাড়েও উঁচু উঁচু পাহাড়।

'তুমি কি বিশ্বাস কর যে, র‍্যামন্স ফেরাউনের জানাযা এ-পথে অতিক্রম করেছিল?' মারকুনীকে জিজ্ঞেস করল তার এক সঙ্গী।

'আহমার দরবেশ তো এ পথের কথাই বলেছেন'– মারকুনী বলল– 'আমি নকশাটা যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে বুঝা যায়, আমাদের রাস্তা এটিই। র‍্যামন্সের মৃতদেহ অতিক্রম করেছিল অন্য পথে। সে পথটি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সেটি ছিল একটি গোপন পথ, যা শত শত বছরের ব্যবধানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে পথটি খুঁজে বের করতে পারলে আমরা র‍্যামন্স-এর সমাধি পেয়ে যাব।'

'যদি বেঁচে থাকি, তবেই তো!'

'হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারি না'– মারকুনী বলল–'তবে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, সমাধি পর্যন্ত যদি পৌঁছতে পারে, তাহলে তোমাদের দু'জনকে লাল করে দেব।'

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পথ এখন খানিকটা চওড়া। পার্শ্বের গর্তের পরিধিও শেষ হয়ে গেছে। সম্মুখে এমন দু'টি পাহাড়, যার পাদদেশ একটির সঙ্গে অপরটি মিলিত। এ দু'পাহাড়ের মধ্যখান দিয়ে তারা ঢুকে পড়ে। সামান্য অগ্রসর হওয়ার পর এখন সামনে আর পথ নেই। পাহাড় দু'টি এখানে এসে মিলে গেছে। তারা বাঁ-দিকে উপরে ওঠে যায়। শ' খানেক গজ উপরে ওঠার পর সরু একটি গলি চোখে পড়ে। গলিটি সেখান থেকে বেয়ে গেছে নীচের দিকে। চারদিকের পাহাড়ী পরিবেশ অত্যন্ত ভীতিকর মনে হল। তারা সরু গলিপথ বেয়ে নীচের দিকে নেমে যায়।

কয়েকটি বাঁক ঘুরে আরা নীচে নেমে আসে। সম্মুখে বিশাল-বিস্তৃত সুগভীর এক খাদ। এত গভীর যে, খাদের তলদেশ দেখা যায় না। চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। সে এক ভীতিকর পরিবেশ। গলিপথ অতিক্রম করে বাইরে বের হয়ে এ দৃশ্য দেখেই কয়েক পা পিছিয়ে আসে মারকুনী ও তার সঙ্গীরা।

এখানকার আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম। মাটির সঙ্গে কি যেন এক ধাতু মিশ্রিত, যার তাপেই গরমটা এত অসহ্যকর। পাহাড়ের পাদদেশে বালুকারাশি চিকচিক করছে। সূর্যতাপ এত প্রখর যে, বালি থেকে ধুঁয়ার মত উঠছে।

খাদের এক পার্শ্বে আপনা-আপনি গড়ে উঠা একটি দেয়াল চোখে পড়ল। এটি মূলত মাটি ও বালির টিলা, যা দেখতে দেয়ালের মত। টিলার উপরটা যতটুকু চওড়া, নীচটাও ঠিক ততটুকু। পুরু আধা হাতের বেশী হবে না। উপরটা কোথাও গোলাকার, যার উপর দিয়ে অতিক্রম করা অত্যন্ত

বিপজ্জনক। তবে মারকুনীকে খাদ পার হতে হলে এই দেয়াল বেয়েই হতে হবে, যা পোলসেরাত অতিক্রম করার নামান্তর। দেয়ালটার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ গজেরও বেশী হবে। মারকুনীর এক সঙ্গী বলল, 'আমার মতে এর উপর দিয়ে অতিক্রম না করে তুমি আত্মহত্যার অন্য কোন ভাল পথ বেছে নাও।'

'গুপ্তধনের ভাণ্ডার রাস্তায় পড়ে থাকে না'– মারকুনী বলল– 'আমাদেরকে এ পথেই অতিক্রম করতে হবে।'

'আর ফস্‌কে নীচে জাহান্নামের আগুনে পড়তে হবে।' বলল অপর সঙ্গী।

'আমরা কি ক্রুশে হাত রেখে শপথ করিনি যে, ক্রুশের মর্যাদা ও ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য প্রয়োজনে আমরা জীবন দেব?' মারকুনী বলল– 'আমাদের সহকর্মীরা কি যুদ্ধের ময়দানে জীবন উৎসর্গ করছে না? আমি কাপুরুষের ন্যায় ফিরে গিয়ে আহমার দরবেশকে বুঝ দিতে পারি যে, শত শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেখানকার সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। যেখানে নদী ছিল, এখন সেখানে পাহাড় আর নকশার যেখানে পাহাড় দেখান হয়েছে, সেখানে এখন কিছুই নেই; কালের বিবর্তনে সব উলট-পালট হয়ে গেছে। কিন্তু আমি কাপুরুষ সাজতে পারব না, আমি মিথ্যা বলব না। তোমাদের মত আমার মনেও ভয় ধরে গেছে। আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করছি। তোমরা আমার মনের ভীতি বৃদ্ধি কর না বন্ধুরা। তোমরা যদি আমার সঙ্গ না দাও, তাহলে তা ক্রুশের সঙ্গে প্রতারণা বলে গণ্য হবে এবং তার শাস্তি হবে বেদনাদায়ক। আমি তোমাদের আগে আগে হাঁটব। কোথাও পা ফস্‌কে পড়ার আশংকা দেখা দিলে বসে পড়বে; ঘোড়ার পিঠে যেভাবে বস, ঠিক সেভাবে। তারপর বসে বসেই সামনে অগ্রসর হতে থাকবে।'

হঠাৎ গরম বাতাসের ঝাপটা তীব্র হতে শুরু করে। বাতাসের ঝাপটা খেয়ে বালুকারাশি উড়তে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো নারীর কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। তারা শুনতে পাচ্ছে যে, দু'-তিনজন নারী একযোগে উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন করছে। মারকুনীর সঙ্গীরা ঘাবড়ে যায়। মারকুনী কান খাড়া করে বিষয়টা অনুধাবন করার চেষ্টা করে। এক সঙ্গী বলল, 'এই জাহান্নামে কোন মানুষ জীবিত থাকতে পারে না; এরা মানুষ নয়- প্রেতাত্মা।'

'এসব কিছুই নয়'– মারকুনী বলল– 'প্রেতাত্মাও নয়, জীবন্ত নারীও নয়। এটা বাতাসের শব্দ। এ এলাকায় কোন কোন টিলায় লম্বা লম্বা ছিদ্রপথ আছে, যা উভয় দিক থেকে খোলা। কোন কোন টিলা এমন যে, সেগুলোর গা ঘেঁষে যখন বাতাসের ঝাপটা অতিক্রম করে, তখন এ ধরনের শব্দ সৃষ্টি হয়, যা তোমরা এ মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছ। এতে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।'

তবু মারকুনীর সঙ্গীদের ভয় কাটছে না। মারকুনীর ব্যাখ্যায় তারা আশ্বস্ত

হতে পারছে না যে, এ কান্নার শব্দ কোন জ্বিন-ভূত বা প্রেতাত্মার নয়। মারকুনীর ব্যাখ্যা তারা মেনে নিতে পারল না।

বাতাসের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। উড়ন্ত বালুকারাশি মেঘের মতো ছেয়ে গেছে। ফলে এখন আর বেশী দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। প্রথমে মারকুনী দেয়ালের উপর পা রাখে। জায়গাটা এত কাঁচা যে, বালি মাটিতে মারকুনীর পা ধসে যায়। মারকুনী আরেক পা তুলে সম্মুখে অগ্রসর হয়। তাকায় নীচের দিকে। খাদের গভীরতা দেখে দুঃসাহসী অভিযাত্রী মারকুনীর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে। খাদের তলা দেখা যায় না। মনে হচ্ছে এর কোন তলা-ই নেই।

মারকুনী কয়েক পা এগিয়ে যায়। এখানে ডানে-বাঁয়ে কোন টিলা নেই। মারকুনী হাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে যেন। কান্নার শব্দ আরো উচ্চ হয়ে যায়।

মারকুনী তার সঙ্গীদের বলল, 'পা টিপে টিপে সাবধানে এগিয়ে আস। নীচের দিকে একদম তাকাবে না। এই ভেবে অগ্রসর হও, যেন তোমরা সমতল ভূমিতে হাঁটছ।'

মারকুনীর সঙ্গীদ্বয় পূর্ব থেকেই ভীত-সন্ত্রস্ত। পা কাঁপছে, হাঁটু থর থর করছে। কাঁপছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। তবু দেয়ালের উপর উঠে তারা কয়েক পা অগ্রসর হয়। প্রবলবেগে বয়ে যাওয়া বাতাস তাদের পা উপড়ে ফেলে। গা দুলতে শুরু করে। মারকুনী তাদের সাহস যোগাচ্ছে আর ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে।

দেয়ালের মধ্যখানে পৌছে যায় মারকুনী। সামনে দেয়ালের কিছু অংশ ভাঙ্গা এবং নীচু। প্রস্থ এত কম যে, দাঁড়িয়ে হাঁটা সম্ভব নয়। মারকুনী বসে পড়ে এবং ঘোড়ার পিঠে বসার মত করে দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে সে অবস্থায়ই সামনে অগ্রসর হতে থাকে। দেয়ালের প্রস্থ ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ ও গোল হয়ে চলেছে। মারকুনী খুব সাবধানে অগ্রসর হতে থাকে। পেছনে তার সঙ্গীদ্বয়ও এগিয়ে আসছে। হঠাৎ এক সঙ্গীর ভীতিপ্রদ আর্তচীৎকার ভেসে আসে– 'মারকুনী, আমাকে ধর।'

কিন্তু ধরার জন্য তার কাছে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। লোকটি একদিকে কাৎ হয়ে যায় এবং কোন অবলম্বন না থাকার কারণে পড়ে যায়। তার চীৎকারের শব্দ শুনছে মারকুনী ও তার অপর সঙ্গী। শব্দটা ক্রমান্বয়ে দূরে চলে যায়। তারপর ধপাস করে ভারী কোন বস্তু পড়ে গেলে যেরূপ শব্দ হয়, তেমন একটা আওয়াজ শোনা যায় এবং চীৎকারের শব্দ থেমে যায়। সঙ্গীর পরিণতি বুঝতে বাকী নেই মারকুনীর। মারকুনী নীচের দিকে তাকায়। জাহান্নামসম অতল খাদে পড়ে যাওয়া সঙ্গীর আর্তচীৎকারের ধ্বনি ভয়ানক এই বিরান ভূমিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এখনো।

'আমাকে তোমার সঙ্গে রাখ মারকুনী'– অপর সঙ্গী বলল। কণ্ঠস্বর থর থর করে কাঁপছে তার– 'আমি এমন করে মরতে চাই না।'

মারকুনী তার সঙ্গীকে সাহস যোগায়। নিজে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। দেয়াল এখন উপরের দিকে উঠছে। মারকুনী বসে বসেই এগিয়ে চলছে। নারী কণ্ঠের সেই ক্রন্দন শব্দ এখনো কানে আসছে যথারীতি। পড়েযাওয়া সঙ্গীর চীৎকারধ্বনিও প্রতিধ্বনির ন্যায় ঘুরে ফিরছে।

এখন দেয়ালটা কিছু চওড়া। মারকুনী মোড় ঘুরিয়ে সঙ্গীর হাত ধরে। ধীরে ধীরে দেয়াল বেয়ে দু'জন উঠে যায় উপরে। দেয়াল খানিকটা পুরু হওয়ার কারণে কিছুটা অনায়াসে এগুতে পারার কথা। কিন্তু বাতাসের গতি এতই তীব্র যে, ভারসাম্য রক্ষা করে চলা দুষ্কর। তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। এক সময় দেয়াল পার হয়ে তারা সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মারকুনী। পাশাপাশি সঙ্গীর নির্মম মৃত্যুতে তার বুকটা বেদনায় ভারী হয়ে উঠে। স্বস্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে সঙ্গী হারানোর বেদনার দীর্ঘশ্বাস।

সম্মুখে দু'টি টিলার মধ্যখান দিয়ে একটি সংকীর্ণ পথ। একমাত্র সঙ্গীকে নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে মারকুনী। মারকুনীর সঙ্গী তাকে জিজ্ঞেস করে, 'জেফ্রে কি মরেই গেল? কোনভাবে কি তাকে উদ্ধার করা কিংবা এক নজর দেখা যায় না? আমরা কি লোকটাকে এভাবে রেখেই ফিরে যাব?'

সঙ্গীর প্রতি তাকায় মারকুনী। তার চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে 'না' সূচক মাথা নাড়ে। মারকুনীর চোখে পানি এসে গেছে। কিছু না বলে অপর সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়। তারপর ধীরপায়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে।

এটিও একটি গলিপথ। মারকুনী যত সামনে অগ্রসর হচ্ছে, পথটা ততই প্রশস্ত হচ্ছে। মারকুনী সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমাদের সৌভাগ্য যে, যেদিকেই যাই পথ পেয়ে যাই। তাও একটিমাত্র পথ। পথ একাধিক হলে ধাঁধাঁয় পড়ে যাওয়ার আশংকা ছিল।'

গলি শেষ হয়ে গেছে। শেষ প্রান্তের রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত। সামনে পাহাড়ের চড়াই। এখনও তীব্র বাতাস বইছে। এই ভয়ানক এলাকায় কতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, সে হিসাব নেই মারকুনীর। সে এতটুকুই জানে যে, জগত থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। ক্রুশের নামে দেওয়ানা হতে চলেছে মারকুনী। ফেরাউনের সমাধি খুঁজে বের করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে এতটুকুই জানে যে, সেখান থেকে উদ্ধারকৃত সম্পদ দ্বারা মুসলমানদের ক্রয় করে তাদেরকে ইসলামী সাম্রাজ্যেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে এবং পৃথিবীতে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

সন্ত্রস্ত সঙ্গীকে নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলে মারকুনী। এখন তারা যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে, বাতাস সেদিক থেকেই প্রবাহিত হচ্ছে। পাহাড়ের চড়াই সরে গেছে ডানে-বাঁয়ে। সামনে সুবিস্তৃত নীল আকাশ চোখে পড়ছে। মারকুনী চড়াই বেয়ে উপরে উঠছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় মারকুনী। নাক টেনে বাতাস শুকে সঙ্গীকে বলে, 'তুমিও শুকে দেখ, বাতাসের ঘ্রাণে পাহাড়ী এলাকার ঘ্রাণ না?'

'তোমার মাথাটা আসলেই খারাপ হয়ে গেছে'– মারকুনীর সঙ্গী বলল- 'পাহাড়ী এলাকায় পাহাড়ের ঘ্রাণ থাকবে না তো থাকবে কী? তুমি বোধ হয় ভাবছ, তুমি এখন ইতালীতেই আছ। তোমার নাকে সম্ভবত তোমার বাড়ির ঘ্রাণ আসছে।'

সঙ্গীর খোঁচামারা কথায় মারকুনীর কোন ভাবান্তর ঘটল না। চেহারায় তার অন্য প্রতিক্রিয়া। বাতাস শুকে শুকে কি যেন উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে সে। তারপর সঙ্গীকে বলল, তুমি বোধ হয় ঠিকই বলেছ যে, পাহাড়ের কাঠিন্য আমার মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। এখানে তো পানি থাকতে পারে না। আমি সম্ভবত কল্পনায় খেজুর, সবুজ-শ্যামলিমা ও পানির ঘ্রাণ শুকছি। এসব ঘ্রাণ তো আমার চির পরিচিত। বোধ হয় আমার ঘ্রাণশক্তি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে। এই জাহান্নামে পানির চিহ্নও থাকার কথা নয়।'

'মারকুনী!'– হঠাৎ মারকুনীর সঙ্গী তার বাহু চেপে ধরে তাকে থামিয়ে দেয় এবং বলে– 'আমিও একটি ঘ্রাণ শুকছি– মৃত্যুর ঘ্রাণ। মনে হচ্ছে আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। চল বন্ধু! যেদিক থেকে এসেছি, সে-পথেই ফিরে যাই। তুমি যদি মনে কর আমি ভীরু, তাহলে তুমি আমাকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে পরীক্ষা নাও, দেখবে আমি একশ' মুসলমানের গলা না কেটে মরব না।' লোকটির কণ্ঠে ভীতির ছাপ, দু'চোখে টলটলায়মান অশ্রুর ফোঁটা।

মারকুনী স্বল্পবাক মানুষ। সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলল, 'আমরা একশ' নয়– এক হাজার মুসলমানের গলা কাটব; তারপরও মরব না। তুমি আমার সঙ্গে থাক।'

মারকুনী সঙ্গীকে নিয়ে পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। চড়াই বেশী উঁচু নয়। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। এখন আর রোদের তাপ নেই, কিরণও নেই। সারাদিনের ক্লান্তিতে পা আর এগুতে চাচ্ছে না। তারা সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পা টেনে হাঁটছে। একসময় পৌঁছে যায় পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায়। ধূলিবালিতে তাদের চোখ-মুখ সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে গেছে। দু'চোখ মেলে দেখে মারকুনী। সামনে ঢালু ও ছোট ছোট পাথর। একটি পাথরের উপর উঠে দাঁড়ায় সে। সঙ্গীকে ডাক দিয়ে হঠাৎ বসে পড়ে। সঙ্গীকে

উদ্দেশ করে বলে, 'তোমার যদি মরুভূমি সম্পর্কে ভাল অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে সামনে মরিচিকা দেখা যাচ্ছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ, ওটা আসলেই মরুভূমি কিনা।'

সঙ্গী মাথা উঁচু করে সামনের দিকে তাকায়। চক্ষুদয় বন্ধ করে আবার খোলে। আবার গভীরভাবে নিরীক্ষা করে তাকায়। সে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, ওটা মরিচিকা নয়।

দৃশ্যটা আসলেই মরিচিকা ছিল না। কতগুলো খেজুর গাছের মাথা তাদের চোখে পড়ছিল। পাতাগুলো হরিদ্রা বর্ণের। গাছগুলোর অবস্থান নিম্ন এলাকায় বলে মনে হল বেশ দূরে।

মারকুনী পাথরের উপর থেকে নেমে সম্মুখে চলে যায়। এবার মনে ভয় ধরে গেছে দুঃসাহসী খৃস্টান সেনাকমান্ডার মারকুনীর। সঙ্গী পেছনে পেছনে হাঁটছে তার। জায়গাটায় নানা বর্ণ ও নানা আকারের পাথরখণ্ড ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। কোনটি এমন, যেন একজন মানুষ হাঁটুতে মাথা গেড়ে বসে আছে। কোনটি বেশ বড়, কোনটি ছোট। এগুলোর ফাঁকে পথের সন্ধান করছে মারকুনী।

সূর্যটা পশ্চিম আকাশে আরো নীচে নেমে গেছে। পাহাড়ের চূড়াগুলো স্পর্শ করছে যেন অস্তাচলগামী লাল সূর্যটা। নিঃশ্বাসের গতি বেড়ে গেছে মারকুনীর। ভয়ের তীব্রতায় বুকটা ধড়-ফড়, দুরু দুরু করছে। পা টেনে টেনে পেছনে পেছনে হেঁটে চলে অসহায় সঙ্গী।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় মারকুনী। মোড় না ঘুরিয়েই ধীরে ধীরে সরতে শুরু করে পেছন দিকে। মনে হয় মারকুনী ভয়ংকর কিছু দেখেছে। সঙ্গীও তার কাছে এসে দাঁড়ায় এবং বিস্ময়ভরা চোখে তার প্রতি তাকায়।

✿ ✿ ✿

একটি নিম্ন এলাকা দেখতে পাচ্ছে মারকুনী ও তার সঙ্গী। এলাকাটির বিস্তার এক বর্গ মাইলের কম নয়। চারপাশে মাটি ও বালির উঁচু উঁচু প্রাকৃতিক দেয়াল। এলাকাটা সবুজ-শ্যামলে ঢাকা। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। অনেকগুলো খেজুর গাছ চোখে পড়ছে। বুঝা যাচ্ছে, ওখানে প্রচুর পানি আছে।

এই জাহান্নামে এমন সবুজ-শ্যামল এলাকা চোখের ভেল্কি নয় তো? না, মারকুনী যা দেখছে, সবই সত্য, বাস্তব। এই ভূখণ্ডের ঘ্রাণই একটু আগে মারকুনী অনুভব করেছিল।

তার থেকে সামান্য সামনে কতগুলো পাহাড় দেখতে পায় মারকুনী। পাহাড়গুলো মাটিরও নয়, বালিরও নয়– পাথরের। রং কালচে। হঠাৎ মারকুনী নিজে দ্রুত বসে পড়ে, টেনে সঙ্গীকেও বসিয়ে দেয়। আরো একটি বিস্ময়কর

কি যেন দেখতে পেয়েছে সে। দু'জন মানুষ নিম্নভূমিতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। আপাদমস্তক উলঙ্গ। এক চিলতে সুতাও নেই পরনে। গায়ের রং গাঢ় বাদামী। বেশ সুদর্শন। লোকগুলো পুরুষ।

হঠাৎ করে একদিক থেকে বেরিয়ে আসে এক মহিলা। অন্যদিকে হেঁটে যাচ্ছে সে। সেও মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিবস্ত্র। মাথার চুলগুলো এলোমেলো, হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত। আকার-গঠনে এদের কাউকেই কাফ্রি বা জংলী বলে মনে হয় না।

'এরা প্রেতাত্মা'– মারকুনীর সঙ্গী বলল- 'এরা মানুষ নয় মারকুনী! সূর্য ডুবে যাচ্ছে। চল, পেছনের দিকে পালিয়ে যাই। রাতে এরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। তুমি বিশ্বাস কর মারকুনী! আর কিছু সময় এখানে কাটালে আমরা জীবিত ফিরে যেতে পারব না! চল, পেছন দিকে ফিরে যাই।'

মারকুনীরও ধারণা, এরা মানুষ নয়, অন্য কিছু হবে। তবু সঙ্গীকে বুঝাতে চেষ্টা করছে, এরা মানুষই; তুমি অহেতুক ভয় পাচ্ছ। মারকুনী নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছে, আসলে এরা কি? মানুষই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এরা কারা? এমন উলঙ্গ কেন? এরা তো বাতাসে উড়ছে না; মাটিতেই হাঁটছে। দূরে একস্থানে তিনটি শিশুকে দৌড়াদৌড়ি-ছুটাছুটি করতে দেখতে পায় মারকুনী। শিশুগুলো এদেরই সন্তান হবে নিশ্চয়। ওদের চলাফেরা তো ঠিক মানুষেরই ন্যায়।

মারকুনী উপুড় হয়ে পেটে ভর করে সরিসৃপের ন্যায় সামনে এগিয়ে যায়। তার সঙ্গীও তার পার্শ্বে গিয়ে শুয়ে পড়ে। দু'জন শুয়ে শুয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। ওখানকার দেয়ালগুলো খাড়া নয়– কিছুটা ঢালু। বালিও প্রচুর। মারকুনীর সঙ্গী বোধ হয় আরো একটু সামনে এগুবার চেষ্টা করে কিংবা কি হল কে জানে: হঠাৎ সে পড়ে যায় এবং গড়াতে গড়াতে নীচে গিয়ে পতিত হয়।

ওখান থেকে উপরে উঠে আসা অসম্ভব। মারকুনী পেছনে সরে গিয়ে এমন একটি পাথরের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করে, যেখান থেকে নীচের অবস্থা দেখা যায়। মারকুনীর সঙ্গী যে ঢালু দিয়ে নীচে পড়ে গেল, তার উচ্চতা ত্রিশ কি চল্লিশ গজের বেশী হবে না। মারকুনী দেখতে পেল, তার সঙ্গী ওঠে আসার চেষ্টা করছে। সে তার সঙ্গীকে কোন সাহায্য করতে পারছে না।

যে উলঙ্গ পুরুষ দু'জন স্বাভাবিক গতিতে এদিকে আসছিল, তারা এবার দৌড়াতে শুরু করে। দৃশ্যটা উপর থেকে দেখে ফেলে মারকুনী। কিন্তু তার সঙ্গী বিষয়টা টের পায়নি। মারকুনী তাকে ডাক দিয়ে সতর্কও করতে পারছে না। এখানে কোন মানুষ আছে, তা বুঝতে দিতে চাইছে না সে। লোক দু'জন এসে মারকুনীর সঙ্গীকে পেছন থেকে ঝাঁপটে ধরে। তার সঙ্গে খঞ্জর আছে,

আছে ছোট তরবারীও। কিন্তু অস্ত্র খুলে হাতে নেয়ার মওকা পেল না সে। লোক দু'জন তাকে টেনে নীচে নামিয়ে ফেলে। যে উলঙ্গ মহিলা দু'জন কোথাও যাচ্ছিল, ছুটে আসে তারাও। এসে পড়ে ক্রীড়ারত শিশুরাও। তারা নিজ ভাষায় কাকে যেন ডাক দেয়। কোথা থেকে ছুটে আসে দশ-বারজন মানুষ। তারাও সবাই উলঙ্গ। একজন তার বন্ধুর কোমর থেকে তরবারীটা খুলে নেয়। মাটিতে ফেলে দেয়া হয় লোকটাকে। মারকুনী উপর থেকে দেখতে পায়, লোকগুলো তরবারী দ্বারা তার সঙ্গীর ধমনী কেটে ফেলে। দর দর করে লাল টাটকা রক্ত বেরুতে শুরু করে। সবাই নাচতে শুরু করে। কি যেন গাইছে তারা। খিলখিল করে হাসছেও। এমন সময় ক্ষীণকায় এক বৃদ্ধ এসে পড়ে। তার হাতে তার দেহের উচ্চতার সমান লম্বা একটি লাঠি। তাকে দেখে সবাই একদিকে সরে দাঁড়ায়।

বৃদ্ধের পরনেও কিছু নেই– উলঙ্গ। তার লাঠির মাথায় দু'টি সাপের ফণা। ফেরাউনদের বৈশিষ্ট্যমূলক চিহ্ন এটা। বৃদ্ধ মারকুনীর সঙ্গীর গায়ে হাত লাগায়। সে এখন নিথর। মারা গেছে মারকুনীর সঙ্গী। বৃদ্ধ নিজের এক হাত উপরে তুলে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলে। তার সঙ্গে উলঙ্গ মানুষগুলো– যাদের মধ্যে দু'জন নারী এবং কয়েকটি শিশু রয়েছে– সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। বৃদ্ধ এখন কি যেন বলছে। সে পুনরায় উপরে হাত উঠায়। এবার সবাই সেজদা থেকে উঠে দাঁড়ায়। একজন বৃদ্ধকে ঢালুর দিকে ইঙ্গিত করে বলছে, লোকটা ওদিক থেকে নীচে গড়িয়ে পড়েছে। বৃদ্ধের ইশারা পেয়ে তারা মারকুনীর সঙ্গীর মৃতদেহটা তুলে নিয়ে যায়। মারকুনীর মনে ভয় জাগে, এই রহস্যময় মানুষগুলো উপরে উঠে দেখে কিনা যে, নীচে পড়ে যাওয়ার লোকটার সঙ্গে আর কেউ ছিল কিনা। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত নীচের দিকে তাকিয়ে থাকে মারকুনী।

সূর্য ডুবে গেছে। জীবনের মায়া ত্যাগ করেছে মারকুনী। জীবন যায় যাক, এ জায়গা এবং এই মানুষগুলোর ভেদ-রহস্য উদ্ধার করবেই সে। তরবারীটা তুলে নেয় ডান হাতে। বাঁ-হাতে খঞ্জর। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁটা দেয় একদিকে।

রাতের অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ধীরে ধীরে। কোথাও কোন আওয়াজ নেই, শব্দ নেই। ভয়ংকর নীরবতা বিরাজ করছে এলাকায়। ডান-বাঁয়ে ও পেছনের দিকে কান রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে মারকুনী। নিম্নাঞ্চলের পাশ ঘেঁষে এগুচ্ছে সে। এবার ক্ষীণ কণ্ঠের শব্দ তার কানে আসতে শুরু করে। শব্দটা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। খানিক পর সে যে আওয়াজটা শুনতে পায়, তা নাচ-গান ও শোরগোলের আওয়াজ। আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে এগিয়ে যায় মারকুনী। দেখতে পায় এক ভয়ংকর দৃশ্য।

বাঁ-দিকে আরেকটি প্রশস্ত এলাকা। কয়েকটি মশাল জ্বলছে সেখানে। গাছ-গাছালি আছে সেখানেও। অন্তত পঁচিশজন নারী-পুরুষ ও শিশু গোল হয়ে নাচছে ও গাইছে। তাদের মধ্যখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুনের উপর ঝুলছে হাত-পা বাঁধা একটি মানুষের লাশ। আগুনে ছেকা হচ্ছে লাশটাকে। মারকুনী বুঝতে পারে এটা তার সঙ্গীর মৃতদেহ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে মারকুনীর। ভয়ানক এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে। আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লাঠিওয়ালা বৃদ্ধ। লাশের দেহের গোশত কেটে সকলের মাঝে বন্টন করছে বৃদ্ধ।

দৃশ্যটা গভীর রেখাপাত করে মারকুনীর মনে। আর স্থির থাকতে পারল না সে। ফিরে রওনা হয় পিছন দিকে– যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। পথটা মনে আছে তার। সতর্ক পায়ে চলছে মারকুনী। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যায় পোলসেরাতসম সেই দেয়ালের কাছে, যার উপর থেকে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিল তার এক সঙ্গী। খাদের ভেতর থেকে শিয়ালের চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পায় মারকুনী। মারকুনী বুঝতে পারে, জংলী শিয়ালরা তার সঙ্গীর লাশটা ছিঁড়েকুড়ে খাচ্ছে আর চেঁচামেচি করছে। তার অপর সঙ্গীকে ভক্ষণ করছে জংলী মানুষ। বাতাসের এখন তেজ নেই। মারকুনী অন্ধকারে সাবধানে দেয়ালটা পার হয়ে ওপার চলে যায়।

রাতের এখন শেষ প্রহর। মারকুনী ও তার সঙ্গীদ্বয় যেখানে তিনটি উট রেখে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে ঢুকে পড়েছিল, পৌঁছে যায় সেখানে। এবার এক মুহূর্তও দেরী করবে না সে। উটের সঙ্গে বাঁধা মশক থেকে এক ঢোক পানি পান করার বিলম্বও সহ্য হচ্ছে না তার। চড়ে বসে একটি উটের পিঠে। সঙ্গে নিয়ে নেয় অপর দু'টি। হাঁটতে শুরু করে উট।

❁ ❁ ❁

পরদিন সন্ধ্যাবেলা। একজন সম্ভ্রান্ত মিসরী বণিকের বেশে আহমার দরবেশের ঘরে প্রবেশ করে মারকুনী। মারকুনীকে দেখেই আহমার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি একা কেন? অন্য দু'জন কোথায়?'

জবাব না দিয়েই ধপাস করে একটি চেয়ারে বসে পড়ে মারকুনী। হুঁশ-জ্ঞান ঠিক নেই তার। আহমারকে ইঙ্গিতে সামনে বসতে বলে। আহমার মারকুনীর সামনে মুখোমুখি বসে পড়ে। কিছুটা শান্ত হয়ে কথা বলতে শুরু করে মারকুনী। অভিযানের প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতি পদের কাহিনী শুনিয়ে যায় আহমারকে।

মারকুনীর দু'সঙ্গীর করুণ মৃত্যুতে একবিন্দু দুঃখ প্রকাশ করলেন না আহমার। তিনি যখন শুনতে পেলেন যে, উলঙ্গ হিংস্র মানুষগুলো মারকুনীর এক সঙ্গীকে খেয়ে ফেলেছে, তখন তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে জিজ্ঞেস

করলেন, আচ্ছা, তুমি কি নিজ চোখে দেখেছ যে, ওদের কারো পরনেই কাপড় নেই? তুমি কি সত্যিই বৃদ্ধের লাঠির মাথায় সাপের ফণা দেখেছ? তুমি কি ভালভাবেই দেখেছ যে, তারা আমাদের লোকটির গোশত খাচ্ছে? অভূতপূর্ব কৌতূহল আহমার দরবেশের কণ্ঠে।

'আমি আপনাকে স্বপ্নের কাহিনী শোনাচ্ছি না'— শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলল মারকুনী— 'আমার মাথার উপর দিয়ে যে ঝড় বয়েছিল, আমি আপনাকে তারই বিবরণ দিচ্ছি। নিজ চোখে যা যা দেখেছি, তা-ই আমি আপনাকে শোনাচ্ছি।'

'ফেরাউনও এ কথাই বলেছেন, যা তুমি শুনিয়েছ'— আহমার দরবেশ বসা থেকে উঠে মারকুনীর কাঁধে হাত রাখলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে অনেকটা চীৎকার করে বললেন— 'তুমি রহস্য উদঘাটন করে ফেলেছ মারকুনী! এরাই সেই লোক, আমি যাদের সন্ধান করছিলাম। এই গোত্রটি ষোল শতক পর্যন্ত ওখানে বসবাস করছে। এরা ভাবতেও পারেনি যে, কালের বিবর্তন তাদেরকে মানুষের গোশত খেতে বাধ্য করবে। কাগজের লেখাগুলো তুমি পড়তে পারবে না, আমি পড়তে সক্ষম হয়েছি। তাতে লেখা আছে, 'ধনভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ করবে সাপ। কিন্তু আমার সমাধির হেফাজত করবে মানুষ, যারা কয়েক শতক পর সাপ ও হিংস্র প্রাণীতে পরিণত হয়ে যাবে। আমার সমাধির সীমানায় কোন মানুষ প্রবেশ করলে রক্ষীরা তাকে খেয়ে ফেলবে। কালের বিবর্তন তাদেরকে উলঙ্গ করে ফেলবে। কিন্তু আমি যেখানে আমার অন্য জগতের ঘর তৈরি করেছি, সেখানে তাদেরকে পোশাক পরান হবে। বাইরের কোন মানুষ তাদের গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারবে না। যে-ই তাকাবে, সে ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

'আমি তো জীবিত ফিরে এসেছি!' মারকুনী বলল।

'কারণ, তুমি নীচে যাওনি'— আহমার বললেন— 'তুমি কালো রঙের যে পাথুরে পাহাড়ের কথা বলেছ, তারই পাদদেশে কোন এক স্থানে র‍্যামসের লাশ ও ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রাখা আছে। আর এই উলঙ্গ মানুষগুলো? এদের পূর্বপুরুষরা র‍্যামসের সময় থেকে ওখানে পাহারার দায়িত্ব পালন করছে। তাদের মৃত্যুর পর তাদের বংশধর একের পর এক এ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এভাবে পনের-ষোল শতাব্দী কেটে গেছে। আমি বলতে পারব না, ওরা কি খেয়ে জীবন বাঁচায়। বোধ হয় হিংস্র প্রাণীর ন্যায় তারা মরুভূমির পথিকদের শিকার করে সিদ্ধ করে খায়। ওখানে পর্যাপ্ত পানি আছে। খেজুরেরও অভাব নেই। কাজেই ওদের বেঁচে থাকা বিস্ময়কর নয়। তারা আজও ফেরাউনকে খোদা বলে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাসে যদি ফাটল ধরত, তাহলে তারা ওখানে থাকত না। তুমি কি তাদের কাছে কোন অস্ত্র দেখেছ?'

'না।'

'সংখ্যায় তারা কতজন হবে?'

'রাতে যখন তারা একত্রিত ছিল, তখন পঁচিশজন ছিল।'

'এমনই হবে। এর চেয়ে বেশী হওয়ার কথায় নয়।'

'আমি তাদের কাছে দু'টি উটও দেখেছি। আরো থাকতে পারে, তবে আমি দেখেছি দু'টোই।'

'তার মানে তারা বাইরেও আসে'– আহমার দরবেশ বললেন– 'বাইরে তারা অবশ্যই আসে। পথচারীদের শিকার করতে বাইরে তাদের আসতেই হয়। শোন মারকুনী, কান পেতে শোন! ওখানে নিশ্চয়ই এমন একটি সোজা পথ আছে, যে পথে তারা বাইরে আসা-যাওয়া করে। সেটি পাহাড়ের কোন একটি গোপন পথ হবে। আমি তোমাদেরকে যে পথের কথা বলেছিলাম, তা এমন কোন পথ নয়, যে পথে বারবার আসা-যাওয়া করা যায়। ওখানে অন্য আরো একটি পথ আছে, যার সন্ধান ঐ হিংস্র উলঙ্গ মানুষগুলোর নিকট থেকে নেয়া যায়। কিভাবে নেয়া যায়, আমি তার পন্থা ভেবে দেখেছি। ওখানে যথারীতি হামলা করা যেতে পারে। তার জন্য তোমার এক সঙ্গী যেখানে খাদে পড়ে গিয়ে মারা গেছে– সেখানে আরো কিছু লোককে মারতে হবে। এই ত্যাগ অত্যন্ত জরুরী। তুমি বল, পঁচিশ-ত্রিশজন লোককে– যাদের মধ্যে নারী-শিশু-বৃদ্ধও আছে– হত্যা করার জন্য এবং তাদের দু'-তিনজনকে জীবিত ধরার জন্য তোমার কত সৈন্যের প্রয়োজন? সর্বনিম্ন সংখ্যা বল। তুমি হবে সে বাহিনীর রাহবার ও সেনাপতি।'

'পরিকল্পনাটা আমি বুঝে ফেলেছি'– মারকুনী বলল– 'আমার মাথায়ও একটা বুদ্ধি এসেছে। আমরা ওদেরকে হত্যা করতে পারি। দু'-তিনজনকে জীবিত ধরাও সম্ভব। কিন্তু আমি আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি না যে, তারা ওখানকার সব গোপন তথ্য আমাদেরকে দেবে। গোত্রের অন্যদেরকে মরতে দেখে তারাও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, তবু মুখ খুলবে না। আমি এমন এক কৌশল অবলম্বন করব যে, তাড়া খেয়ে তাদের দু'একজন বাইরের দিকে পালাতে শুরু করবে আর আমরা তাদের পিছু নেব। আমাদের রাস্তা চেনা হয়ে যাবে।'

'তুমি বড় বিচক্ষণ মারকুনী!'– আহমার দরবেশ বললেন– 'বল, কত লোকের প্রয়োজন?'

'পঞ্চাশজন'– মারকুনী জবাব দেয়– 'অধিকাংশ লোক আমার নির্বাচিত হতে হবে, আমিই তাদেরকে খুঁজে নেব। তবে কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে আমি আমার শর্তের কথা জানাতে চাই।'

'তুমি দাবি অনুপাতে পুরস্কার পাবে– যা চাইবে ঠিক তা-ই দেব।' আহমার বললেন।

'আমি গুপ্তধনের ভাগ চাই'– মারকুনী বলল– 'এমন একটি বিপজ্জনক অভিযান আমার দায়িত্বের আওতাভুক্ত নয়। আমি একজন গুপ্তচর ও নাশকতা কর্মী। আমাকে ফেরাউনের গুপ্তধন খুঁজে বের করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি। এটা আপনার নিজের কাজ। পুরস্কার নয়– আমি চাই উদ্ধারকৃত ধনের ভাগ, যা চাইব ঠিক তা। আপনার পরিকল্পনা সফল হলে আপনি তো একটি প্রদেশের শাসনকর্তা হয়ে যাবেন; আর আমি গুপ্তচর গুপ্তচরই রয়ে যাব। কাজেই আমার সম্পদ চাই।'

'এ অভিযান কারো ব্যক্তিগত নয়'– আহমার বললেন– 'এটি মিসর, ক্রুশ ও সুদানের শাসন ক্ষমতা দখল করার খৃস্টীয় পরিকল্পনা।'

নিজ দাবিতে অনড় থাকে মারকুনী। বেকায়দায় পড়ে যান আহমার দরবেশ। আহমার জানেন র‍্যামসের সমাধি পর্যন্ত পৌঁছা মারকুনী ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তার দাবি মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই আহমারের। মারকুনী বলল, 'কতদিন পর্যন্ত মরুভূমিতে কাটাতে হবে তার কোন ঠিক নেই। শক্ত ও শুকনো খাবার আমি পছন্দ করি না। কাজেই, আমাকে অতিরিক্ত দু'-তিনটি উটও দিতে হবে, যা আমি সঙ্গীদের নিয়ে রান্না করে খাব। আর– আর কুদুমীকেও দিতে হবে।'

'কুদুমীকে?'– বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন আহমার– 'এমন উঁচু স্তরের ভুবনমোহিনী রূপসী গায়িকাকে দেব তোমার সঙ্গে এমন বিপজ্জনক অভিযানে! আর সেও তো যেতে রাজি হবে না!'

'অতিরিক্ত বিনিময় দিলে সে রাজি হয়ে যাবে'– মারকুনী বলল– 'আমি তার জন্য এমন ব্যবস্থা করে দেব যে, মেয়েটা টেরই পাবে না, সে মরুভূমিতে আছে নাকি কোন বিপজ্জনক মিশনের সঙ্গে আছে। আমি তার মূল্য বুঝি।'

সে যুগের রীতি ছিল, কোন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সফরে গেলে প্রিয়তমা স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। স্ত্রীদের মধ্যে কাউকে ভাল না লাগলে টাকার বিনিময়ে পছন্দমত কোন নর্তকী-গায়িকা কিংবা বেশ্যা মেয়েকে নিয়ে যেত। সেনা কমান্ডাররাও যুদ্ধের সময় স্ত্রী কিংবা ভাড়াকরা সুন্দরী কোন মেয়েকে সঙ্গে রাখত। সে যুগে রূপসী যুবতী মেয়ে ছিল সোনার চেয়েও দামী। আর সে কারণেই ইহুদী-খৃস্টানরা সালতানাতে ইসলামিয়ার মূলোৎপাটনের জন্য নারীকে ব্যবহার করত। কাজেই মারকুনীর ন্যায় একজন দুঃসাহসী ও বিপজ্জনক অভিযানের নায়কের একটি সুন্দরী নর্তকীকে সঙ্গে নেয়ার দাবি করা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু আহমার দরবেশের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে

তার কুদুমীর মত এমন এক পরমাসুন্দরী যুবতী নতর্কীর দাবি উত্থাপন করায়, যার গমনাগমন আমীর ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট। মেয়েটা সুদানের বাসিন্দা। মুসলমান। আর অতিশয় রূপসীই নয়- তার চালচলন, ভাবভঙ্গীমায়ও ছিল অনুপম এক যাদু। বড় বড় ব্যক্তিত্বদের দেমাগ সদা খারাপ করে রাখত মেয়েটা। এই কুদুমী মারকুনীর সঙ্গে বিপজ্জনক এক অভিযানে জনমানবশূন্য ধু-ধু মরু অঞ্চলে চলে যাবে, তা কল্পনায়ও আসে না। কিন্তু মারকুনীর কুদুমীকে চা-ই চাই। শেষ পর্যন্ত আহমার দরবেশকে প্রতিশ্রুতি দিতেই হল যে, ঠিক আছে, কুদুমীকে পাবে।

কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। পঞ্চাশ ব্যক্তির সন্ধানে নেমে পড়ে মারকুনী ও আহমার। কায়রোতে খৃস্টান গোয়েন্দা ও সন্ত্রাসীর অভাব নেই। মারকুনী অধিকাংশ লোক তাদের থেকেই নিতে চাইছে। কারণ, তারা তার বিশ্বস্ত। আহমার দরবেশেরও একই অভিমত। একটি নাশকতাকারী গ্রুপ আছে আহমার দরবেশেরও। সুলতান আইউবীর এই সেনাপতি তলে তলে এ গ্রুপটিকে তৈরি করে রেখেছে। তারা সবাই মুসলমান। তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য খৃস্টানদেরই ন্যায়। আহমার দরবেশ নিজের ঈমান নীলাম করে এ লোকগুলোকেও ঈমান বিক্রেতা বানিয়ে দিয়েছে। এরা সবাই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন। এদের ওঠাবসা হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদায়ীদের সঙ্গে। এই গ্রুপের মধ্য থেকেও কয়েকজনকে বাছাই করে নেয় আহমার দরবেশ।

মারকুনী নিজে কুদুমীর নিকট আহমার দরবেশের পয়গাম নিয়ে যায়। আহমার কোন সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি একজন পদস্থ সেনা কর্মকর্তা। আর মিসরে শাসন চলছে কার্যত সেনাবাহিনীর। কুদুমী আহমারকে ভালভাবে চেনে ও শ্রদ্ধা করে। মেয়েটি অম্লান বদনে সম্মত হয়ে যায়। মারকুনী তাকে জানায়, আমরা ফেরাউনের সমাধি থেকে হিরে-জহরত উদ্ধার করতে যাচ্ছি। শুনে কুদুমী এতই উৎফুল্ল হয়ে উঠে যে, সে এক্ষুণি যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। মারকুনী অত্যন্ত সুচতুর ও সতর্ক মানুষ। মুখের কথায় রাণী কিওপেট্রা বানিয়ে ফেলে কুদুমীকে। কুদুমী একজন নর্তকী। তার চেতনা বলতে কিছু নেই। সে চেনে শুধু নিজের রূপ-যৌবন, অর্থ আর হিরে-জহরত। নিজের রূপ-যৌবনে কখনো ভাটা পড়বে না বলেই তার বিশ্বাস। মারকুনী তাকে একথা জানায়নি যে, সমাধি থেকে উদ্ধার করা গুপ্তধন কোথায় কি কাজে ব্যয় করা হবে।

পঞ্চাশজন লোক খুঁজে বের করতে পনের-বিশদিন কেটে যায়। তাদের অধিকাংশ খৃস্টান নাশকতাকারী। অন্যরা মুসলমান। তারাও খৃস্টানদের নাশকতা কর্মী।

উটে চড়ে সবাই কায়রো থেকে বেরিয়ে যায়। তবে একত্রে নয়– তারা তিন তিনজন ও চার চারজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মুসাফির ও ব্যবসায়ীর বেশ ধরে আলাদা আলাদভাবে বেরিয়ে গেছে। কুদুমীকে নিয়ে যাওয়া হয় একজন পর্দানশীল সম্ভ্রান্ত বধূরূপে। মারকুনী সাজে তার স্বামী। কুদুমী ছাড়াও মারকুনীর সাথে আরো দু'জন লোক, তাদের একজন খৃস্টান অপরজন মুসলমান। মুসলমানের নাম ইসমাইল। ইসমাইল আহ্মারের খাস লোকদের একজন। খৃস্টানদের দালাল, ভাড়াটিয়া খুনী। সমাজে তার কোন মর্যদাা নেই কিন্তু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাকে সালাম দিয়ে চলে। মারকুনীও তাকে ভালভাবেই চিনে এবং এ অভিযানের একজন বিশ্বস্ত কর্মী বলে মনে করে।

সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় রওনা হয়। আঠার ক্রোশ দূরে কোথায় গিয়ে একত্রিত হতে হবে, তা সবাইকে জানিয়ে দেয়া হবে। সকলের সঙ্গে তীর-ধনুক-তরবারী এবং রশি ও খননযন্ত্র।

সকলের আগে মারকুনী, ইসমাইল, কুদুমী ও তাদের অপর সঙ্গী গন্তব্যে পৌঁছে যায়। মারকুনী তাদেরকে পাহাড়ী এলাকার ভেতরে নিয়ে যায়।

সূর্য ডুবে গেছে। তারা তাঁবু স্থাপন করে। তাদের অন্যান্য সঙ্গীদের এ রাতেই এসে পৌঁছানোর কথা। ইসমাইল কুদুমীকে চেনে; কিন্তু কুদুমী ইসমাইলকে জানে না।

❁ ❁ ❁

এক ময়দানে লড়াই করছেন নূরুদ্দীন জঙ্গী। কার্ক দুর্গ জয় করে সেখানকার এবং তার আশপাশের আরো কিছু এলাকার নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন করে ফেলেছেন তিনি। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরছে তার বাহিনী, যাতে খৃস্টানরা কোনদিক থেকে পাল্টা আক্রমণ করতে চাইলে যথাসময়ে তা প্রতিহত করা যায়। বিভিন্ন পয়েন্টে খৃস্টান বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত- সংঘর্ষও চলছে তাদের।

উদ্ধারকৃত এলাকার নিয়ন্ত্রণভার সুলতান আইউবীর বাহিনীকে বুঝিয়ে দিয়ে বাগদাদ ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে চাইছেন নুরুদ্দীন জঙ্গী। আইউবীর অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন তিনি। কিন্তু সুলতান আইউবী যুদ্ধে লিপ্ত অপর রণাঙ্গনে, যে রণাঙ্গন মিসরে খুলে বসেছে খৃস্টান ও তাদের মদদ পুষ্ট মুসলিম গাদ্দাররা। এ ময়দানই বেশী ভয়ংকর। তবে এমন আন্ডারগ্রাউন্ড যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করার যোগ্যতা আছে সুলতান আইউবীর। মোকাবেলা করছেনও পুরোদমে। কিন্তু তৃতীয় আরো একটি যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে, তা এখনও জানতে পারেননি তিনি। এটি হল ফেরাউনদের সমাধি অনুসন্ধানের অভিযান।

রাতের আহারের পর হলরুমে প্রবেশ করেন সুলতান আইউবী। আলী বিন

সুফিয়ান, গিয়াস বিলবীস এবং বেশ ক'জন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা কক্ষে উপস্থিত। সেদিনই নুরুদ্দীন জঙ্গীর দীর্ঘ একখানা পত্র সুলতান আইউবীর হস্তগত হয়। তিনি পত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো উপস্থিত কর্মকর্তাদের পাঠ করে শোনান। সুলতান জঙ্গী লিখেছেন–

"প্রিয় সালাহুদ্দীন! আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন ও নিরাপদ রাখুন। কার্ক ও তার আশপাশের এলাকাসমূহ এখন শত্রুমুক্ত। আমাদের সৈন্যরা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরছে। মাঝে মধ্যে খৃস্টান সৈন্যদের সঙ্গে তাদের ছোটখাট সংঘাতও হচ্ছে। খৃস্টানরা আমাকে নানা কৌশলে বুঝাতে চাচ্ছে যে, তারা এখনো পরাজিত হয়নি। তোমার গড়া গেরিলা বাহিনী সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তারা বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। তুমি তাদের উপর যে পরিশ্রম করেছ, তারা তার মূল্য পরিশোধ করছে। তোমার গোয়েন্দারা তাদের চেয়েও সাহসী ও বুদ্ধিমান। আমি এতদূরে বসে তাদেরই চোখে দুশমনের সব তৎপরতা প্রত্যক্ষ করছি.....।

সর্বশেষ তথ্য যা পেলাম, তাতে বুঝা যাচ্ছে, খৃস্টানরা আপাতত জবাবী আক্রমণ চালাবে না। তারা আমাদেরকে উৎসাহিত করছে, যেন আমরা এগিয়ে গিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করি। তুমি তো জান, বাইতুল মোকাদ্দাস– যা আমাদের প্রথম কেবলা, আমাদের লক্ষ্য– আমাদের থেকে কত দূরে। আমি জানি, তুমি এই দূরত্বকে ভয় পাওয়ার লোক নও। তবে দূরত্বটা যত না বেশী, তার চেয়ে বেশী পথের দুর্গমতা ও প্রতিবন্ধকতা। বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছতে হলে পথে আমাদের অনেক দুর্গ জয় করে অগ্রসর হতে হবে। তন্মধ্যে কয়েকটি দুর্গ তো অত্যন্ত দুর্ভেদ্য। দূর-দূরান্তের এসব দুর্গ দ্বারা খৃস্টানরা বাইতুল মোকাদ্দাসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্ত করে রেখেছে। তোমার গোয়েন্দারা আমাকে আরো জানিয়েছে যে, খৃস্টানরা ইউনান, ল্যাটিন ও ইতালীয়দের নৌ-বাহিনীকে একত্রিত করার চেষ্টা করছে। তারা কামনা করছে যে, এ তিনটি বাহিনী একসঙ্গে মিসর আক্রমণ করে উত্তর এলাকায় সৈন্য নামিয়ে দিক। এমন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তুমি তৈরি থাক। তোমাদের কাছে দূরে অগ্নিগোলা নিক্ষেপণযোগ্য মিনজানিকে বেশী থাকতে হবে। আমার পরামর্শ হল, উত্তর এলাকার মাটি যদি অনুমতি দেয়, তাহলে দুশমনের নৌ-বহরকে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত আসতে দাও, ওখানে মোকাবেলা করার প্রয়োজন নেই। দুশমনকে এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হতে দাও যে, তারা তোমাদের অজ্ঞাতে মিসরে ঢুকে পড়েছে। সৈন্যরা জাহাজ থেকে কূলে নেমে আসার পর অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে জাহাজগুলোকে পুড়ে ফেল এবং খৃস্টান সৈন্যদেরকে পছন্দমত কোন এক

ময়দানে নিয়ে কোণঠাসা করে ফেল...।

আমি তোমার অপারগতা সম্পর্কে বেখবর নই। তোমার দূত আমাকে সব কথাই বলেছে। তবে আমি কাবার প্রভুর শপথ করে বলতে পারি, খৃস্টানদের রাজারা সবাই যদি ঝড়ের ন্যায়ও ছুটে আসে, আল্লাহর রাসূলের উম্মতদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। উম্মত রক্ত দিতে জানে, জানে মাথা দিতে। কিন্তু একদল ঈমান বিক্রয়কারী গাদ্দার আমাদেরকে শিকল পরিয়ে রেখেছে। তুমি কায়রোতে আটকা পড়ে আছ। আমি বাগদাদ থেকে বের হতে পারছি না। নারী, মদ আর সোনার থলে আমাদের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। আমাদের ঘরে যদি শান্তি থাকত, স্বস্তি থাকত, তাহলে তুমি-আমি দু'জনে মিলে ক্রুশের মোকাবেলা করতে পারতাম। কিন্তু কাফেররা এমন ফাঁদ পেতে রেখেছে যে, মুসলমানরাও কাফের হতে চলেছে। এই কাফের মুসলমানরা এতই অন্ধ যে, বুঝতেও পারছে না, দুশমন তাদের বোন-কন্যাদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করছে। কার্কের মুসলমানরা যেরূপ মানবেতর জীবন-যাপন করছিল, তা আমি তোমাকে বলে বুঝাতে পারব না। খৃস্টানরা তাদের উপর যে অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছিল, তা শুনলে তোমার গা শিউরে উঠবে। আমি জাতির গাদ্দারদেরকে কিভাবে বুঝাব যে, দুশমনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সরাসরি দুশমনি করার চেয়েও বেশী ভয়ংকর...।

তুমি দুঃখ প্রকাশ করেছ যে, তোমার ভাই, ভাল ভাল কর্মকর্তা ও সুযোগ্য কমান্ডারগণ তোমার হাতে নিহত হচ্ছে। শোন সালাহুদ্দীন! ওরা তোমার হাতে নিহত হচ্ছে, দুঃখের বিষয় এটা নয়। দুঃখজনক বিষয় হল, স্বজাতির কর্ণধার হওয়া সত্ত্বেও তারা গাদ্দারীর পথ বেছে নিল! মুসলমানের হাতে মুসলমান নিহত হচ্ছে দেখে খৃস্টানরা উল্লাস করছে, এটা হল আফসোসের বিষয়। তুমি গাদ্দারদের ক্ষমা করতে পার না। গাদ্দারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমি তোমার অপেক্ষা করছি। তুমি যখন আসবে, সঙ্গে বেশীসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আসবে। খৃস্টানরা তোমাদেরকে দুর্গের অভ্যন্তরে লড়াইয়ে লিপ্ত করিয়ে তোমাদের শক্তি নিঃশেষ করে দিতে চায়। এমন যেন না হয় যে, বাইতুল মোকাদ্দাসের পথেই তোমরা সব শক্তি হারিয়ে ফেলবে। তুমি যখন আসবে, মিসরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে আসবে। সুদানীদের ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। আমি জানতে পেরেছি, তোমার আর্থিক সমস্যাও আছে। আমি তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারলে ভাল হবে। কায়রো থেকে যথাশীঘ্র বেরিয়ে আসার চেষ্টা কর। তবে ভেতর ও বাইরের পরিস্থিতি দেখে-শুনে আসবে। আল্লাহ তোমার সহায় হোন।"

✿ ✿ ✿

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী উপস্থিত কমান্ডার-কর্মকর্তাদেরকে নুরুদ্দীন জঙ্গীর বার্তাটি পাঠ করে শোনান। তিনি তাদেরকে আশার বাণী শোনান যে, সেনাবহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য পল্লী এলাকাসমূহ থেকে লোক আসতে শুরু করেছে। দুশমন কুসংস্কার বিস্তারের যে অভিযান শুরু করেছিল, তা সফলভাবে দমন করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে এখনো তার ক্রিয়া রয়ে গেছে। একটি আবহ উঠেছিল দেশের বিভিন্ন মসজিদ থেকে। তাও কঠোর হাতে দমন করা হয়েছে। খৃস্টানরা আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসে যেসব অলীক চিন্তা-চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করেছিল, তিন-চারটি মসজিদের ইমামও মানুষের মন-মস্তিষ্কে সেই চিন্তা-চেতনা ঢুকাতে শুরু করেছিল। তারা আল্লাহর দূত সেজে বসেছিল। আমি এমন মানুষেরও দেখা পেয়েছি, যে বিপদে পড়ে সরাসরি আল্লাহর নিকট দোয়া করার পরিবর্তে ইমামদেরকে নজরানা দিয়ে থাকে যে, ইমামরা তার জন্য দোয়া করবে। মানুষের মধ্যে এই বুঝ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষ না সরাসরি আল্লাহর নিকট কিছু চাইতে পারে, না আল্লাহ সরাসরি তাদের কথা শুনেন। সুলতান আইউবী বললেন, আমি সেই ইমামদেরকে অপসারণ করে সেই মসজিদগুলোতে এমন ইমাম নিয়োগ করেছি, যাদের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা কুরআনের অনুকূল। তারা এখন লোকদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আল্লাহ আলেম-বেআলেম, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা সকলের জন্য সমান। তিনি সরাসরি যে কারো দোয়া শুনে থাকেন, ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি প্রদান করেন। আমি আমার জাতির মধ্যে এই শক্তি ও চেতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি, যেন তারা নিজেদেরকে এবং আল্লাহকে চেনার চেষ্টা করে। আমার বন্ধুগণ! তোমরা তো দেখেছ, তোমাদের দুশমন শুধু যুদ্ধের ময়দানেই লড়াই করছে না, তারা তোমাদের মন-মগজে নতুন বিশ্বাস ও চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানোরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ অভিযানে ইহুদীরা সকলের আগে। ইহুদীরা এখন আর তোমাদের মুখোমুখি এসে লড়াই করবে না। তারা তোমাদের ঈমানকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এ কাজে তারা শীঘ্র সফল হতে না পারলেও ব্যর্থও হবে না। এমন একটি সময় আসবে, যখন আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত এই সম্প্রদায়টি মুসলমানদেরকে দুর্বল পেয়ে এমন চাল চালবে যে, তারা লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে– তাদের খঞ্জর সালতানাতে ইসলামিয়ার হৃদপিণ্ডে আঘাত হানবে। তোমরা যদি তোমাদের ইতিহাসকে এই যিল্লতির হাত থেকে রক্ষা করতে চাও, তাহলে আজই পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ কর– জনগণের কাছে যাও। নিজেকে শাসক ও জনগণকে শাসিত ভাবতে ভুলে যাও। জনমনে এমন আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত কর, যেন তারা দেশ-জাতি-দ্বীনের জন্য জীবন কুরবান করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।'

সুলতান আইউবী বললেন, 'খৃষ্টানদের কাছে আছে মদ আর সুন্দরী নারী। আর আমাদের আছে এ দু'য়ের মোহ। জাতির অন্তর থেকে মদ-নারী-সম্পদের এই লোভ দূর করতে হবে। তার জন্য ঈমানের পরিপক্কতা প্রয়োজন।'

'আমীরে মোহরাতাম!'– ঊর্ধ্বতন এক কমান্ডার বললেন– 'আমাদের সম্পদেরও প্রয়োজন আছে। ব্যয় নির্বাহ আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। অর্থের অভাবে অনেক কাজে আমাদের বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

'আমি তোমাদের এ সমস্যার সমাধান করব'– সুলতান আইউবী বললেন– 'সব সময়ের জন্য তোমাদেরকে একটি সত্য মেনে নিতে হবে যে, মুসলমানদের কাছে সম্পদ, সৈন্য ও অস্ত্রের অভাব অতীতেও ছিল, এখনও আছে। এর ব্যতিক্রম কখনো ঘটেনি। আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) তার জীবনের প্রথম যুদ্ধটিতে লড়েছিলেন মাত্র তিনশ' তেরজন প্রায় নিরস্ত্র সৈন্য নিয়ে। সে যুদ্ধে কাফেরদের সৈন্য ছিল এক হাজার। তারা সবাই ছিল অস্ত্রসজ্জিত। পরবর্তীতে যখন সেখানে কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছে, এ অনুপাতেই হয়েছে। তাছাড়া মুসলমানদের কাছে মোটের উপর সম্পদের অভাব কখনো ছিল না। কিন্তু সে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে ছিল গুটিকতক লোকের হাতে। এখনও আমাদেরও ঠিক একই অবস্থা। ছোট ছোট যেসব প্রদেশের মালিক মুসলমান, তাদের কাছে বিপুল সম্পদের স্তূপ পড়ে আছে।'

'সম্পদের স্তূপ এ অঞ্চলেও পড়ে আছে সালারে আজম!'– গিয়াস বিলবীস বললেন– 'আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা একটি নতুন অভিযান শুরু করতে পারি। আপনি জানেন যে, মিসর গুপ্তধনের জায়গা। অতীতে এখানে যখন যে ফেরাউনই মারা গেছে, নিজের সম্পদ-ধনভাণ্ডার সঙ্গে করে মাটির নীচে নিয়ে গেছে। ঐ সকল সম্পদ কার ছিল? ছিল গরীব মানুষগুলোর, যাদেরকে অভুক্ত রেখে তাদের থেকে সেজদা আদায় করা হত। সে যুগের মানুষ ফেরাউনদেরকে খোদা বলে মান্য করত শুধু এ কারণে যে, তাদের পেটে খাবার ছিল না, পরনে কাপড় ছিল না। তাদের ভাগ্য ছিল ফেরাউনদের হাতে। তাদের জীবন-মৃত্যু দু-ই ফেরাউনরা নিজ হাতে তুলে নিয়েছিল। মানুষদের দ্বারা মাটি খুঁড়ে পাহাড় কেটে ফেরাউনরা পাতালে তাদের সমাধি তৈরি করেছিল, যা ছিল ঠিক প্রাসাদের ন্যায়। মানুষের ধনভাণ্ডারকে তারা তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। মহামান্য সুলতান যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা ফেরাউনদের সেই সমাধির অনুসন্ধান শুরু করে দেই এবং ধনভাণ্ডার উদ্ধার করে দেশ ও জাতির স্বার্থে ব্যবহার করি।

'উনি ঠিকই বলেছেন আমীরে মোহতারাম।'– গিয়াস বিলবীসের পক্ষে মজলিস থেকে একাধিক আওয়াজ উঠে।

'আমরা এর আগে বিষয়টা কখনো ভেবে দেখেনি।' বললেন একজন।

'এই অভিযানে আমরা সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে পারি।' বললেন আরেকজন।

'জনসাধারণের মধ্য থেকে নতুন একটি বাহিনী গঠন করে এ অভিযান শুরু করা যায়।' বললেন আরেকজন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ কাজে বেতন দিয়ে অসামরিক লোকদের ব্যবহার করা যেতে পারে।' সমর্থন জানায় অন্যজন।

একরকম শোরগোল পড়ে যায় মজলিসে। প্রত্যেকে কিছু না কিছু বলছেন। চুপচাপ বসে আছেন শুধু একজন– সুলতান আইউবী। দীর্ঘক্ষণ পর সভাসদগণ টের পান যে, তাদের আমীর ও সেনাপতি কথা বলছেন না। হঠাৎ নীরবতা ছেয়ে যায় মজলিসে। এখন কেউ-ই কথা বলছেন না, নিস্তব্ধ বসে আছেন সবাই। সুলতান আইউবী সকলের প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন। বললেন–

'আমি গিয়াস বিলবীসের এই প্রস্তাব অনুমোদন করি না।'

সবাই নিশ্চুপ–নিস্তব্ধ। পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে হলময়। সুলতান আইউবীর কথার উপর কথা বলবে এমন সাহস কারো নেই। সুলতান বললেন–

'আমি চাই না, আমার মৃত্যুর পর ইতিহাস বলুক সালাহুদ্দীন আইউবী কবর-চোর ছিল, কবর-ডাকাত ছিল। ইতিহাস আমাকে অপদস্থ করলে তা তোমাদের জন্যও অপমান বলে গণ্য হবে। ভবিষ্যৎ বংশধর বলবে সালাহুদ্দীন আইউবীর মন্ত্রী-উপদেষ্টাগণও কবর-চোর ছিল। ইতিহাসের এমন তথ্য খৃষ্টানদের জন্য এক উপাদেয় খোরাকে পরিণত হবে। তারা তোমাদের কুরবানী ও ইসলামী চেতনাকে ডাকাতী ও দস্যুতা আখ্যা দিয়ে তোমাদেরকে তোমাদের-ই বংশধরের মাঝে অপমানিত করবে। আর তাতে শুধু তোমরা-ই নও, আমাদের ইতিহাসও কলংকিত হয়ে পড়বে।'

'গোস্তাখী মাফ করুন আমীরে মোহতারাম!'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন–'অতীতে অল্প ক'দিনের জন্য মিসর খৃষ্টানদের কব্জায় এসেছিল। ক্ষমতা পেয়ে তারা সর্বপ্রথম এখানকার গুপ্তভাণ্ডারসমূহ অন্বেষণ শুরু করেছিল। কায়রো উপকণ্ঠে আমরা যে পরিত্যক্ত ভগ্ন প্রাসাদগুলো থেকে খৃষ্টান সন্ত্রাসী ও ফেদায়ীদের একটি চক্রকে গ্রেফতার করেছিলাম, সেটিও কোন এক ফেরাউনের সমাধি ছিল। খৃষ্টানরা সেখান থেকে সব ধনভাণ্ডার নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খৃষ্টানদের শাসনক্ষমতা বেশীদিন টিকে থাকেনি। না হলে তারা মিসরের সব গুপ্তধন উদ্ধার করে নিয়ে যেত। মাননীয় গিয়াস বিলবীস ঠিকই বলেছেন যে, এই ধনভাণ্ডারের যদি কোন মালিক থেকে থাকে, তাহলে

সে আর যে হোক ফেরাউন নয়। এসব সম্পদের মালিক ছিল দেশের জনগণ। আমি আপনাকে এ পরামর্শ দেয়ার সাহস করি যে, এসব গুপ্তধন উদ্ধার করে জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা হোক।'

'আর আমি তোমাকে জ্ঞাত করতে চাই'– সুলতান আইউবী বললেন– 'এসব ধনভাণ্ডার যখন তোমাদের হাতে আসবে, তখন তোমরাও ফেরাউন হয়ে যাবে। মানুষকে এত দুঃসাহস কে দিল যে, মানুষ নিজেকে খোদা দাবি করবে? সম্পদ আর সম্পদের মোহ-ই তো! মানুষকে মানুষের সামনে সেজদা করতে কিসে বাধ্য করল? দারিদ্র্য আর ক্ষুধা-ই তো! তোমরা খৃস্টানদের কথা বললে যে, তারা ফেরাউনের একটি সমাধি লুট করেছে। শোন, যখন প্রথম ফেরাউনের মরদেহ তার সমুদয় সম্পদসহ মাটিচাপা দেয়া হয়, তখন থেকে কবর-চুরির সূচনা হয়। মানুষ হিংস্র হায়েনার ন্যায় প্রথম ফেরাউনের কবরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নিজেদের দ্বীন-ঈমান ত্যাগ করে মানুষ গুপ্তধনের উপর লুটিয়ে পড়েছিল। তারপর একের পর এক ফেরাউন মৃত্যুবরণ করতে থাকে আর কবর-চুরি নিয়মিত একটি পেশার ন্যায় চলতে থাকে। তারপর এই কবরচুরির প্রবণতা রোধ করার জন্য প্রত্যেক ফেরাউন নিজের জীবদ্দশায় মৃত্যু-পরবর্তী সমাধির জন্য এমন দুর্গম জায়গা ঠিক করে যেতে শুরু করে, যেখানে পৌঁছা কারো পক্ষে সম্ভব না হয় এবং মৃত্যুর পর তাদের উত্তরসূরী ও স্থলাভিষিক্তরা সেই সমাধি এমনভাবে বন্ধ করে রাখতে শুরু করে, যেন কেউ তা খুলতে না পারে। তারপর একসময় যখন ফেরাউনদের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন মিসরের শাসনক্ষমতা যখন যার হাতে আসে, তখনই সে সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করার প্রতি মনোনিবেশ করে। আমি জানি, ফেরাউনদের অনেক সমাধি এমনও আছে, সেগুলো কোথায় আছে কেউ জানে না। সেগুলো মূলত পাতালপ্রাসাদ। মিসরের শাসকবর্গ ও হানাদাররা কেয়ামত পর্যন্ত এসব সমাধি খুঁজতে থাকবে...।

জানো, ঐ শাসকদের পতন কেন ঘটেছে? তার একমাত্র কারণ, তাদের দৃষ্টি ঐ ধনভাণ্ডারের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। তারা প্রজাদের এই বুঝ দিয়েছিল যে, সম্পদ আছে তো সম্মান আছে। হাতে অর্থ নেই, তাহলে তোমাদের এবং তোমাদের সুন্দরী স্ত্রী-কন্যাদের মালিকও তারা, যাদের দৌলত আছে। আমার বন্ধুগণ! তোমরা সালাহুদ্দীন আইনবীকে সেই সারিতে দাঁড় করিও না। আমি জাতিকে এ বুঝ দিতে চাই যে, আসল সম্পদ হল জাতীয় মর্যাদা আর ঈমান। কিন্তু তা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমি নিজে এবং তোমরা যারা সরকারের স্তম্ভ, অন্তর থেকে সম্পদের মোহ দূর করতে পারবে।'

'আমরা তো এই ধনভাণ্ডার অন্বেষণ ব্যক্তিগত স্বার্থে করতে চাই না'– এক

কমান্ডার বললেন– 'আমরা জাতীয় স্বার্থে এ অভিযানে হাত দিতে চাই।'

'আমি জানি, আমার এই অস্বীকৃতি তোমাদের কারো পছন্দ নয়'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমার কথা বুঝতে হলে তোমাদের মস্তিষ্ক থেকে অন্যসব চিন্তা দূর করে ফেলতে হবে। আমার বিবেক আমাকে বলছে যে, যে সম্পদ বাহির থেকে আসে– হোক তা জাতীয় প্রয়োজনে– তা শাসকদের ঈমান নড়বড়ে করে দেয়। এ হল সম্পদের অভিশাপ। আমার বুঝ হল, আমার নিকট যদি ঘোড়া ক্রয় করার জন্য অর্থ না থাকে, তাহলে আমি বাহিনীর সঙ্গে পায়ে হেঁটে বাইতুল মোকাদ্দাস গিয়ে পৌঁছব, তবু ঘোড়া কেনার জন্য কবর খুঁড়ে লাশের গায়ের অলংকার চুরি করে বিক্রি করতে পারব না। আমার লক্ষ্য বাইতুল মোকাদ্দাসকে খৃস্টানদের থেকে উদ্ধার করা; ঘোড়া ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা নয়। তোমরা যখন গুপ্তধনের অনুসন্ধান শুরু করবে, তখন জনসাধারণের মধ্যে অনেকে যেখানে সেখানে কবর-চুরি করতে শুরু করবে। মিসরে এমন ঘটনা ঘটে আসছে। আর যখন ঐসব গুপ্তধন তোমাদের হাতে চলে আসবে, তখন তোমরা একজন অপরজনের শত্রুতে পরিণত না হলেও পরস্পরের মধ্যে সন্দেহপ্রবণতা সৃষ্টি হবে। নিঃসন্দেহে অর্থের প্রাচুর্য মানুষের পারস্পরিক ভালবাসা নষ্ট করে দেয়। বান্দার হক আদায় করার উৎসাহ নিঃশেষ করে দেয়। এই ধনৈশ্বর্যই মানুষকে খোদার আসনে বসিয়েছিল। আজ সেই 'খোদারা' কোথায়? তারা তো আকাশে উঠে যায়নি, মাটির নীচেই দাফন হয়ে আছে। আমার বন্ধুগণ! আমি নতুন একটি অপরাধের বীজ বপন করতে চাই না। তোমরা এই ধনভাণ্ডারের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। আরে, তোমাদের মধ্যে এই যে গাদ্দার তৈরি হয়ে আছে, তা তো এই সম্পদের-ই লীলা। তোমরা দু'জন গাদ্দারকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান কর তো আরো চারজন তৈরি হয়ে যায়। তোমরা নিজ হাতে উপার্জিত-উৎপাদিত সম্পদ দ্বারা জীবন নির্বাহ করার চেষ্টা কর। তোমরা মুসলমান। নিজেদের ভাগ্য কাফেরদের হাতে তুলে দিও না। অন্যথায় সবাই গাদ্দার হয়ে যাবে। ফেরাউনরা মারা গেছে। ঐ মৃত দেহগুলোকে মাটির নীচেই চাপা পড়ে থাকতে দাও।'

'আপনার অনুমোদন ছাড়া আমরা এ জাতীয় কোন অভিযান শুরু করব না।' বললেন একজন।

'গিয়াস!'– সুলতান আইউবী গিয়াস বিলবীসের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন– 'আজ হঠাৎ করে এই গুপ্তধনের কথা তোমার মাথায় আসল কিভাবে? আমি মিসর আসলাম চার বছর হয়ে গেল। এর আগে কোনদিন তো তুমি এমন প্রস্তাব পেশ করনি?'

'ইতিপূর্বে এই চিন্তা কখনো আমার মাথায় আসেওনি আমীর

মোহতারাম!'– গিয়াস বিলবীস বললেন– 'মাস দু'য়েক আগে জাতীয় গ্রন্থাগারের কেরানী আমাকে বলল, পুরাতন কাগজপত্র থেকে কিছু কাগজ হারিয়ে গেছে। আমি সেই কাগজগুলোর ধরণ ও গুরুত্ব জিজ্ঞেস করলে সে বলল, কাগজগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, খুঁজে বের করতে হবে। তাতে ছিল কিছু নকশা ও ফেরাউনদের আমলের কিছু লেখা-জোখা। অনেক পুরাতন ও ছেঁড়াফাড়া ছিল কাগজগুলো। কেরানী যখন ফেরাউনদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করল, তখন আমার মনে খেয়াল চাপল যে, সেসব লেখা ও নকশাগুলোতে ফেরাউনদের গোপন সমাধি সম্পর্কে তথ্য থাকতে পারে। যে ফাইল থেকে কাগজগুলো গুম হয়েছিল, আমি তা দেখেছি। আমি বিষয়টিকে এই বলে গুরুত্ব দেইনি যে, ওসব লেখা-জোখা এ যুগে কে আর বুঝবে।'

'তোমার এ ধারণা সঠিক নয় গিয়াস!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'মিসরে এমন অনেক লোক আছে, যারা এসব লেখা, নকশা ও ইশারা-ইঙ্গিত বুঝতে সক্ষম। এসব কাগজ ও নকশা চুরি হওয়া বিস্ময়কর ঘটনা নয়। এই চুরি গ্রন্থাগারের কোন লোভী কর্মকর্তা করে থাকবে। এ কাগজগুলোর প্রতি আমার কোন কৌতূহল নেই– আমার দৃষ্টি চোরের প্রতি। লোকটি তোমাদেরই বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কিনা কে জানে। চোরটিকে খুঁজে বের করতে হবে। আলী! বিলম্ব না করে অভিযান শুরু কর।'

'আমার মনে হচ্ছে, কাগজগুলোর কিছু না কিছু গুরুত্ব অবশ্যই আছে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আমি মোহতারাম গিয়াস বিলবীসের সঙ্গে কথা বলেছি। বেশ কিছুদিন যাবত আমাদের সংবাদদাতা ও গোয়েন্দারা আমাদেরকে শহরে একটি রহস্যময় তৎপরতার সংবাদ দিয়ে আসছে। কুদুমী নাম্মী এক নর্তকী আছে। বিশেষ মহলে মেয়েটি সকলের কাছে পরিচিত, যাকে বিত্তশালীদের পানশালার প্রদীপ বলা চলে। আজ পাঁচদিন যাবত মেয়েটি নিখোঁজ রয়েছে। একটি নর্তকীর শহর থেকে উধাও হয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা নয়। কিন্তু কুদুমীকে আমি বিশেষ নজরে রেখেছি। আমি গোয়েন্দা মারফত জানতে পেরেছি যে, মেয়েটির কাছে অজ্ঞাতপরিচয় ও সন্দেহভাজন দু'জন লোক যাওয়া-আসা করত। হঠাৎ একদিন তার ঘর থেকে বোরকা পরিহিত একজন মহিলাকে বের হয়ে যেতে দেখা গেছে। মহিলা অপরিচিত এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে যাচ্ছিল। আমার সন্দেহ, কুদুমীই নিজের বেশ বদল করে বেরিয়ে গেছে। আমার আরেক দল গোয়েন্দা কিছু লোককে সন্দেহজনক অবস্থায় দক্ষিণ দিকে যেতে দেখেছে। আমার সন্দেহ, এসব তৎপরতা হারিয়ে যাওয়া কাগজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমার আরো সন্দেহ হচ্ছে, এরা খৃস্টান সন্ত্রাসী চক্রই হবে। তবে আসল ঘটনা যাই হোক, আমি এসব তৎপরতার রহস্য

উদ্‌ঘাটন করে ছাড়ব।'

'হ্যাঁ, তুমি অনুসন্ধান শুরু করে দাও'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আর ঐসব গুপ্তধনের কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেল। আমি জানি, জাতির কল্যাণ সাধন এবং খৃস্টানদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ লড়ার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি কারো নিকট সাহায্য চাইব না। মোহতারাম নুরুদ্দীন জঙ্গী আমাকে সাহায্য করবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। আমি তার এ সাহায্য গ্রহণ করব না। আর্থিক সাহায্য মায়ের পেটের ভাইও যদি করে, তবু তা মানবিক উৎকর্ষ, শ্রম ও দ্বীনদারীর জন্য ক্ষতিকর। তারপরও মানুষ গুপ্তধনের সন্ধানে দিশেহারার মত ঘুরে ফিরছে। শোন আলী! মিসরের মাটি বন্ধ্যা হয়ে যায়নি। পরিশ্রম কর; এ মাটিতেই সোনা ফলবে। দেশের জনগণকে বুঝাও, তাদের প্রতি সরকারের কর্তব্য কি। তাহলে তারা নিজেদেরকে প্রজা ভাবা ছেড়ে দেবে। তাদেরও কি কি কর্তব্য আছে, তাও তাদেরকে অবহিত কর। দেশের জনগণ যদি কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে, তাহলে দেশের উন্নতি হতে পারে না। তোমরা যে ভূখণ্ডের সংরক্ষণে রক্ত ঝরাবে না, যে দেশের মর্যাদার জন্য ঘাম ঝরাবে না; সে ভূখণ্ড সে দেশ তোমাদের পাওনা আদায় করবে না। তারপর দেশের শাসকগোষ্ঠী বিদেশের ধনভাণ্ডারের অনুসন্ধানে নেমে পড়বে আর জনগণ বিভক্ত-বিশৃঙ্খল হয়ে কাফেরদের গোলামে পরিণত হবে।'

❁ ❁ ❁

মিসরের গবর্নর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যে ধনভাণ্ডারে হাত দেয়া অপছন্দ করছেন, সেসব যে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় রক্ষিত, সে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তারই এক জেনারেলের প্রেরিত পঞ্চাশ ব্যক্তির বাহিনী। মারকুনী, ইসমাইল, কুদুমী এবং অপর এক খৃস্টান পৌঁছে গেছে সন্ধ্যায়। তাদের অন্য সঙ্গীরা– যাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে প্রেরণ করা হয়েছিল গন্তব্যে পৌঁছতে শুরু করেছে সে রাতেই। মধ্যরাত পর্যন্ত পৌঁছে যায় পঞ্চাশজনের সব ক'জন।

জায়গাটা এমন যে, এর পাশ দিয়ে কোন পথিক কখনো পথ অতিক্রম করেনি। অত্যন্ত ভয়ানক জায়গা। সীমান্ত থেকে দূরে হওয়ার কারণে এখানে কখনো কোন সীমান্ত বাহিনীর নজরও পড়েনি।

মারকুনী রাতারাতি সবাইকে ভেতরে পৌঁছিয়ে দেয়, যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখে না ফেলে। সে সঙ্গীদের বলে দেয়, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছা ঘুমাতে পার; ঘুম থেকে উঠে এখান থেকে পায়ে হেঁটে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। নিজে কুদুমীকে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়ে।

একটি পাহাড়ের পাদদেশে ঘুমিয়ে পড়ে সকলে। পরদিন সকালে যখন তারা জাগ্রত হয়, তখন ভোরের রক্তিম সূর্য টিলার উপরে উঠে গেছে। এই

অভিযানে সঙ্গে সরঞ্জাম, যন্ত্র ও অস্ত্রপাতি কি কি সঙ্গে নিতে হবে, মারকুনী আগেই তা বলে দিয়েছিল। সরঞ্জামাদির মধ্যে আছে শক্ত ও মোটা রশি, কোদাল ও বেলচা ইত্যাদি। অস্ত্রের মধ্যে তীর-ধনুক ও তরবারী। পথের দুর্গমতা সম্পর্কেও সকলকে অবহিত করা হয়েছে। মারকুনীর এক সঙ্গী যে দেয়াল অতিক্রম করতে গিয়ে নীচে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিল, সেই দেয়াল সম্পর্কেও ধারণা দিয়ে সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ ইত্যাদি সব বিষয়ে কাফেলার প্রত্যেককে পূর্ব ধারণা দিয়ে রেখেছে মারকুনী। এখান থেকে উটে সওয়ার হয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে না। যেতে হবে পায়ে হেঁটে। তাই উটগুলো বেঁধে রেখে দেখাশোনার জন্য মাত্র এক ব্যক্তিকে রেখে দেয়া হয়েছে। কুদুমীকেও এপথে নেয়া যাবে না। মারকুনীর আশা, খুঁজলে অন্য কোন নিরাপদ পথ পাওয়া যাবে, যে পথে কুদুমীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে পারবে সে। কুদুমীর হেফাজতের জন্যও একজন লোকের প্রয়োজন। এ-কাজের জন্য কেবল ইসমাইলই উপযুক্ত ব্যক্তি।

মারকুনী ইসমাইলকে বলল, 'তুমি কুদুমীকে নিয়ে এখানেই থাক। তবে মনে রাখবে, কুদুমীর মর্যাদার তুলনায় তুমি কিছুই নও। তুমি তার আরাম ও হেফাজতের দায়িত্ব পালন করবে। আমি শিগগির ফিরে আসব। এসে তোমাদের দু'জনকে নিয়ে যাব।'

মারকুনী দলবল নিয়ে রওনা হয়ে যায়। এ-পথ তার চেনা। নির্ভয়ে-নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলে মারকুনী। দলের অন্যরা যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছে, ততই ভয় চেপে বসছে তাদের মনে। পাহাড়ী এলাকা সম্পর্কে তারা সবাই সম্যক অবহিত। কিন্তু এমন এলাকা, এ ধরনের পাহাড় তারা আগে কখনো দেখেনি। যে জায়গাটায় নারী কণ্ঠের কান্নার শব্দ শোনা যায়, সেখানে পৌঁছে হঠাৎ সবাই হতচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে শুরু করে। তারা নিশ্চিত, কতগুলো নারী একযোগে কান্নাকাটি করছে। ভয়ে গা ছম ছম করে ওঠে সকলের। সর্বাঙ্গ কাটা দিয়ে উঠে তাদের। কিন্তু এ অভিযানের জন্য তাদেরকে যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার শক্তি এতই বেশী যে, এই ভীতিকর অবস্থা তার কাছে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তারা তো খৃস্টানদের বেতনভোগী কর্মচারী। মারকুনী তাদের অফিসার। তারা পুরস্কারের লোভ ও হুকুমের চাপে এগিয়ে চলছে সম্মুখপানে। কান্নার শব্দ শুনে তারা যখন হঠাৎ চমকে উঠে, তখন মারকুনী তাদের বলে, এগুলো নারী বা প্রেতাত্মা কিছুই নয়—এটা বাতাসের শব্দ। তারপরও তাদের ভয় কাটেনি। পরস্পর চোখাচোখি করে সাহসের ভান দেখিয়ে এগুতে থাকে।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। কাফেলা সেই প্রশস্ত ও সুগভীর খাদের নিকট পৌঁছে

গেছে, মারকুনী যেটি একবার অতিক্রম করেছিল। প্রাকৃতিক সরু দেয়াল বেয়ে এখন তাদের এ খাদ পার হতে হবে। দলের সদস্যদের নিয়ে মারকুনী সমস্যায় পড়ে যায়। দেয়ালে পা রাখতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। মারকুনী সকলের সামনে। দেয়ালে পা রেখে এগুতে শুরু করে সে। তার দেখাদেখি এক এক করে অন্যরাও দেয়ালে উঠে যায়। এক পা দু'পা করে অগ্রসর হতে শুরু করে তারা। সূর্য ডুবে গেছে। আলো না থাকায় খাদের গভীরতা কারো চোখে পড়ছে না। মারকুনীর সঙ্গীদের জন্য এটা ভালই হল।

মারকুনী দেয়াল অতিক্রম করে ওপার পৌঁছে গেছে। হঠাৎ এমন একটি আর্তচীৎকার তার কানে আসে, যা ধীরে ধীরে নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। খানিক পর ভেসে আসে আরো একটি ভয়ংকর চীৎকার শব্দ। এটিও নীচের দিকে চলে গিয়ে হাল্কা ধপাস্ শব্দের সঙ্গে নীরব হয়ে যায়। এরূপ পাঁচটি চিৎকার ধ্বনি শুনতে পায় মারকুনী।

মারকুনীর কাফেলার সদস্যরা দেয়াল অতিক্রম করে ওপার গিয়ে সমবেত হয়। গুনে দেখা গেল, পাঁচজন কম। মারকুনী জানায়, সামনে আর বড় কোন সমস্যা নেই। আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছি। আর একটু অগ্রসর হলে সোজা পথ পেয়ে যাব।

গভীর রাত। মারকুনী তার সঙ্গীদের নিয়ে সে স্থানে পৌঁছে যায়, যার নীচে বিস্তৃত সবুজ-শ্যামল ভূখণ্ড। মারকুনী সবাইকে সেখান থেকে সামান্য দূরে লুকিয়ে রাখে। দু'ব্যক্তিকে নিজের সঙ্গে নিয়ে অন্যদের বলে, সঙ্গে যা আছে খেয়ে শুয়ে পড়। আমি সময়মত তোমাদেরকে জাগিয়ে দেব।

সঙ্গীদ্বয়কে নিয়ে স্থান পর্যবেক্ষণে নেমে পড়ে মারকুনী। নীচে কবরের নীরবতা। ঘোর অন্ধকার। কোথাও এক ফোঁটা আলোও চোখে পড়ছে না। আর সামনে অগ্রসর হতে ভয় পাচ্ছে মারকুনী। রাত পোহাবার আগে আক্রমণ চালাবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয় সে। ফিরে যায় ঘুমন্ত সঙ্গীদের নিকট।

❁ ❁ ❁

কুদুমী ও ইসমাইল রয়ে গেছে পিছনে। এমন নিরিবিলি পরিবেশ ভাল লাগে না কুদুমীর। কোলাহলপূর্ণ মদ আর নাচ-গানের আসরের হৈ-হুল্লোড় তার প্রিয়। কিন্তু মারকুনী তাকে এই ভয়ংকর নির্জন এলাকায় নিয়ে এল এবং এই একটি মানুষের সঙ্গে এখানে রেখে গেল!

ইসমাইল কুদুমীকে জানে। কুদুমী ইসমাইলকে চিনে না। ইসমাইল অপরাধ জগতের মানুষ। তবে তার দৈহিক গঠন ও আলাপ-ব্যবহারে কুদুমীর কাছে তাকে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বলে মনে হল। ইসমাইলের কাছে ঘেঁষতে চায় কুদুমী। কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না ইসমাইল।

সন্ধ্যার পর ইসমাইল ভুনা গোশত গরম করে কুদুমীকে খেতে দেয়। মদের গ্লাস সামনে রেখে বলে, খেয়ে শুয়ে পড়। প্রয়োজন হলে আমাকে আমার তাঁবু থেকে ডেকে নিও।

ইসমাইল কুদুমীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়। কুদুমী খাবার খায়, মদ পান করে। ইসমাইলের পরামর্শ মোতাবেক এখন তার শুয়ে পড়া দরকার। কিন্তু একা একা ভাল লাগছে না তার। মনটা ছটফট করছে। নিজের রূপ-লাবণ্যে গর্ব আছে কুদুমীর। ইসমাইল তার কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। এমন একটা আশাও মনে মনে পোষণ করে কুদুমী। কিন্তু ইসমাইল সম্পূর্ণ উদাসীন। রূপসী কুদুমীকে নিয়ে কোন ভাবনাই যেন নেই তার।

কুদুমীর চোখে ঘুম আসছে না। নিজের তাঁবু থেকে বের হয় সে। চলে যায় ইসমাইলের তাঁবুতে। ইসমাইল এখনো সজাগ। কুদুমীর আগমন টের পেয়ে বাতি জ্বালায় সে। জিজ্ঞেস করে কেন এসেছ? কুদুমী বলল, একা একা ভাল লাগছে না, তাই এলাম। বলতে বলতে ইসমাইলের কাছে ঘেঁষে বসে পড়ে মেয়েটি। জিজ্ঞেস করে–

'তুমি বোধ হয় মুসলমান?'

'ধর্ম নিয়ে তোমার কৌতূহল কিসের?'– ইসমাইল জবাব দেয়– 'তোমার সব সম্পর্ক তো মানুষের সাথে। মানুষের জন্যই তোমার জীবন, তোমার মরণ! নামটা আমার ইসলামী– ইসমাইল। কিন্তু আমার কোন ধর্ম নেই।'

'এ্যাঁ!'– মুখে মুচকি হাসি টেনে বিস্ময়ের সাথে কুদুমী বলল– 'তুমি ইসমাইল! আহমার দরবেশের খাস লোক।'

প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় ইসমাইল।

মারকুনী সম্পর্কে কথা তোলে কুদুমী। বলে, 'লোকটা নিজের নাম বলেছে সোলায়মান সেকান্দার। কিন্তু তাকে মুসলমান বলে মনে হয় না!'

'লোকটা মিসরী নয়'– ইসমাইল বলল– 'সুদানীও নয়। নামও তার সোলায়মান সেকান্দার নয়।'

'তাহলে তিনি কে?'– কুদুমী জিজ্ঞেস করে– 'তার আসল নাম কি?'

'তার আসল নাম আমি জানি; কিন্তু তোমাকে বলতে পারব না'– ইসমাইল বলল– 'এই ভেদ লুকিয়ে রাখার জন্য আমি তার নিকট থেকে বিনিময় পেয়ে থাকি। তার সম্পর্কে তোমার কৌতূহল না থাকাই উচিত যে, সে কে। তুমি উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার মনোরঞ্জনের জন্য এখানে এসেছ। এটা তোমার পেশা। সে তোমাকে গুপ্তধনের ভাগও দেবে বলে ওয়াদা করেছে নিশ্চয়।'

'সে তো আমার প্রাপ্য'– কুদুমী বলল- 'তিনি আমাকে যে বিনিময় দিয়েছেন,

এই ভয়ংকর বিয়াবানে আসার বিনিময় হিসেবে তা নিতান্তই কম। তোমার ধারণাই সঠিক যে, আমি গুপ্তধনের ভাগ পাওয়ার ওয়াদা নিয়েই এসেছি।'

'তোমার কি বিশ্বাস হয় যে, সে তোমাকে গুপ্তধনের ভাগ দেবে?'– ইসমাইল জিজ্ঞেস করে– 'তোমার কি বিশ্বাস হয়, সে তার সেই কাঙ্খিত গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যাবে, তুমি যার ভাগ নিতে এসেছ?'

'আমি এতই দামী মেয়ে যে, মানুষ আমাকে ধন-ভাণ্ডারের বিনিময়েও কিনতে প্রস্তুত'– গর্বের সুরে কুদুমী বলল– 'এই লোকটি তো আমার উপযুক্ত মূল্য আদায়ই করতে পারবে না। আমি আমীরজাদা আর শাহজাদাদের গোলাম বানিয়ে রাখি।'

'কয়দিন?'– ইসমাইল মুচকি হেসে বলল– 'বড়জোর আর দু'বছর। তারপর তোমার দাম এতই কমে যাবে যে, তুমি অলিগলিতে পাগলের ন্যায় ছুটতে থাকবে, কেউ তোমাকে জিজ্ঞেসও করবে না। যাদের কাছে ধনভাণ্ডার আছে, তারা আরেক কুদুমীকে জোগাড় করে নেবে। কাজেই এত গর্ব কর না কুদুমী।'

'কেন করব না?' –কুদুমী বলল– 'এই লোকটি– যিনি নিজের নাম সোলায়মান সেকান্দর বলে জানিয়েছেন– আমার রূপের জাদুতে এমনভাবে ফেঁসে গেছেন যে, আমাকে একাধিকবার কসম খেয়ে বলেছেন, তিনি শুধু আমারই জন্য গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে ইস্কান্দারিয়া নিয়ে যাবেন। সেখানে সমুদ্রের পাড়ে আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। তারপর আমি আর নর্তকী থাকব না। কেন, তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে?'

'সন্দেহ নয়– আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে তোমার কাছে মস্তবড় মিথ্যে বলেছে'– ইসমাইল বলল– 'আমি তো এসেছি এটা আমার চাকুরী। আহমার দরবেশের নির্দেশ আমাকে মান্য করতে হয়। তিনি আমাকে বললেন, যাও, আমি এসেছি। এটা আমার পেশা। আমি ভাড়াটিয়া, পাপী। বিনিময় পেয়ে আমি খুনও করতে পারি। কিন্তু আমি মিথ্যে বলতে পারি না। অপরাধ করতে গিয়ে আমি কখনো ধরা পড়িনি। আহমার দরবেশ আমকে বাঁচিয়ে রাখেন। আমার মধ্যে আরেকটি গুণ কিংবা দোষও বলতে পার আছে যে, আমি নারীকে শ্রদ্ধা করি। কেন করি তা জানি না। একজন নারী ভদ্র হোক কিংবা বেশ্যা হোক, আমি তাকে সম্মান করি। আমি নারীকে ধোঁকা দিতে পারি না। তোমাকে আমি ধোঁকার মধ্যে রাখব না। আমি তোমাকে একথা বলে দেয়া আমার নৈতিক কর্তব্য মনে করি যে, এ ধনভাণ্ডার তোমার মহল নির্মাণের লক্ষ্যে উদ্ধার করা হচ্ছে না। এই ধন ব্যবহৃত হবে মিসরের মূলোৎপাটনের কাজে। তারপর মিসরে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, মসজিদগুলোকে গীর্জায় পরিণত করা হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে এই ধনভাণ্ডার মিসরের

বাইরে চলে যাবে। আমি জানি, মিসর নিয়ে তোমার কোন কৌতূহল নেই। নেই আমারও। আমরা দু'জনই পেশাদার। পাপ করা আমাদের পেশা। আমার তোমাকে শুধু দু'টি কথা বলার ছিল, বলেছি। শোন, আবারও বলছি, প্রথম কথা- তোমার রূপ-যৌবন আর বেশি দিন টিকবে না। দ্বিতীয় কথা- এই লোকটি তোমাকে সঙ্গে করে এনেছে ফুর্তি করার জন্য। তার দৃষ্টিতে তুমি একটি বেশ্যা। সদয় হয়ে সে দু'একটি হীরক খণ্ড তোমার হাতে গুঁজে দিলেও দিতে পারে, তার বেশী নয়। সে যদি কারো জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করেও, সে হবে অন্য কোন ষোড়শী কন্যা- তুমি নও। তোমার চেহারায় আমি চুলের ন্যায় সরু দু'টি রেখা দেখতে পাচ্ছি, যা আজ ভালই লাগছে। কিন্তু ক'দিন পর রেখা দু'টো গভীর হয়ে তোমাকে মূল্যহীন করে ফেলবে।'

ইসমাইলের ঠোঁটে মুচকি হাসি। বলার ধরনটা এমন যে, তাতে না আছে তিরস্কার না আছে প্রতারণার আভাস। আছে হৃদ্যতা ও বাস্তবতা, যা কুদুমী এর আগে কখনো শুনেনি। কুদুমীর ধারণা, বরং আশা ছিল, ইসমাইল তাকে কাছে টেনে নেবে। প্রেম নিবেনদন করবে। কিন্তু ইসমাইল তাকে সেই চোখে দেখলই না। বরং উল্টো তাকে এই বুঝ দেয়ার চেষ্টা করল যে, এই পাপের জগতে সে দু'দিনের মেহমান মাত্র। কুদুমী বরাবরই নিজের রূপের প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত। নিজেকে তার ক্লিওপেট্রা মনে করত সে। কিন্তু আজ ইসমাইল তাকে এমন এক ধারণা দিল, যাকে সে ফেলতে পারছে না। ইসমাইলের বলার ধরনই এমন যে, তার বক্তব্য কুদুমীর মনের গভীরে গেঁথে যায়।

রাত কেটে যাচ্ছে। তবু কুদুমীর চোখে ঘুম আসছে না। ইসমাইলের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাতে ভাল লাগছে তার। ইসমাইলও তাকে নিরাশ করল না। রাতের শেষ প্রহর। এবার দু'চোখের পাতা এক হয়ে আসে কুদুমীর।

বেশ বেলা হলে যখন কুদুমীর চোখ খুলল, তখন সে ইসমাইলের তাঁবুতে। ইসমাইল তাঁবুর বাইরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কুদুমী তাকে জাগিয়ে তুলে বলল, 'আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি- বড় বিস্ময়কর স্বপ্ন। কী দেখলাম পুরোপুরি মনে নেই। এতটুকু মনে আছে যে, কে যেন আমাকে বলছে, 'সোলায়মান সেকান্দারের ধনভাণ্ডারের চেয়ে ইসমাইলের কথাগুলোর মূল্য বেশী।' বলেই কুদুমী হেসে ওঠে- এমন হাসি, যাতে নর্তকীর কৃত্রিমতা নেই- আছে একটি নিষ্পাপ মেয়ের নির্মল সরলতা।

সূর্য এখনো উদিত হয়নি। পরিকল্পনা মোতাবেক মারকুনী তার সঙ্গীদেরকে উপযুক্ত জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে। রাত পোহাবার পর এখন নীচের সবুজ-শ্যামল এলাকায় উলঙ্গ নারী-পুরুষের হাঁটা-চলা চোখে পড়তে

শুরু করে। মারকুনী তার এক দুঃসাহসী ও নির্ভীক সৈনিককে নীচে অবতরণ করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। আগের অভিযানে তার এক সঙ্গী যে ঢালু গড়িয়ে নীচে পড়ে, এই রহস্যময় লোকগুলোর সুস্বাদু খাবারে পরিণত হয়েছিল, সেই ঢালু বেয়ে নীচে নেমে যেতে হবে তাকে। লোকটি ঢালের উপরে বসে নিজেকে নীচের দিকে গড়িয়ে দেয়। গড়াগড়ি খেতে খেতে নীচের সমতল ভূমিতে গিয়ে পড়ে সে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে যায় এবং হাঁটতে শুরু করে। তিন-চারজন মানুষখেকো লোক তাকে দেখে ফেলে। তাকে ধরার জন্য তারা ছুটে আসে। আনন্দে চিৎকার করছে তারা। তারা যখন লোকটির নিকটে চলে আসে, অমনি উপর থেকে শাঁ করে চারটি তীর ধেয়ে আসে এবং তাদের প্রত্যেকের বুকে এসে বিদ্ধ হয়। ওদিক থেকে আরো দু'জন উলঙ্গ পুরুষ দৌড়ে আসে। তারাও তীরের নিশানায় পরিণত হয়। মারকুনী উপরে একটি পাথরের সঙ্গে রশি বেঁধে রেখেছিল। রশির অপর মাথা নীচের দিকে ছেড়ে দিয়ে রশি বেয়ে প্রত্যেককে নীচে নেমে যেতে নির্দেশ দেয়।

রশি বেয়ে বেয়ে এক এক করে নীচে নেমে যায় মারকুনীর দলের সকলে। মারকুনী রশিটা খুলে নীচে ফেলে দেয় এবং নিজে গড়ানী খেয়ে নেমে যায়। এই ঢালু বেয়ে নীচে অবতরণ করা মারকুনীর পক্ষে ব্যাপার নয়। মারকুনীর নেতৃত্বে তরবারী উঁচিয়ে একদিকে ছুটে চলে বাহিনী। আরো কয়েকজন উলঙ্গ মানুষ সামনে পড়ে তাদের। তরবারীর আঘাতে টুকরো করে ফেলা হয় তাদেরকে। দূর থেকে দেখে পেছন দিকে পালিয়ে যায় কয়েকজন।

নীচের এই সবুজ-শ্যামল এলাকটা কয়েক ভাগে বিভক্ত। মারকুনী দেখতে পায় পলায়নপর সবগুলো মানুষ একই অংশে ঢুকে পড়েছে। সে তাদের পিছু নেয়। লোকগুলো চিৎকার করছে শুনতে পায় মারকুনী। চিৎকারের শব্দ অনুসরণ করে ধাওয়া করতে থাকে সে। দলের অন্যরা যাকে যেখানে পাচ্ছে, নির্বিচারে হত্যা করছে সবাইকে। পলায়নপর লোকগুলোর অনুসরণ করছে মারকুনী একা। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর লোকগুলো নজরে আসে মারকুনীর। তারা তিনজন। পালাবার পথ খুঁজছে তারা। মারকুনী ও তাদের মাঝে এখন সামান্য ব্যবধান। একদিকে একটি পাহাড় দেখতে পায় মারকুনী। পাহাড়ের পাদদেশে একস্থানে একটি গুহার মুখ। পলায়নপর লোকগুলো ঢুকে পড়ে এ-পথে। ঢুকে পড়ে মারকুনীও। মারকুনীর হাতে তরবারী।

এটি গুহা নয়– সুড়ঙ্গপথ। হতে পারে প্রাকৃতিক, কিংবা কোন ফেরাউনের তৈরি। কয়েকটি মোড় আছে সুড়ঙ্গটির। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সম্মুখে কথা বলার শব্দ কানে আসছে তার। মারকুনী এগিয়ে যায় সামনের দিকে। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একস্থানে আলো চোখে পড়ে। সেই আলোতে

তিনজন মানুষকে দৌড়াচ্ছে দেখে সে। এটি সুড়ঙ্গের অপর মুখ। লোকগুলোকে হত্যা করতে চাইছে না মারকুনী। মিশন তার সফল হতে চলেছে।

ভেতর থেকে বেরিয়ে যায় পলায়নপর লোক তিনজন। বেরিয়ে পড়ে মারকুনীও। দৌড়াতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় একজন। কাছে গিয়ে দেখে মারকুনী। একজন বৃদ্ধ, আগেরবার তার সঙ্গী নীচে পড়ে যাওয়ার পর যাকে দেখেছিল, সে।

সুড়ঙ্গের বাইরে বালুকাময় ও পাথুরে টিলা, বড় বড় পাথরখণ্ড। একদিকে কালো পাহাড় উপরে চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। মারকুনী বৃদ্ধকে হাতে ধরে তুলে দাঁড় করায়। তাকে তার পলায়নপর সঙ্গীদ্বয়কে ফিরিয়ে আনতে বলে ইঙ্গিতে।

মারকুনীর ইঙ্গিত বুঝে ফেলে বৃদ্ধ। ডাক দেয় সঙ্গীদের। তারা দাঁড়িয়ে যায়। বৃদ্ধ তাদেরকে ফিরে আসতে বলে। তারা ফিরে আসে।

বৃদ্ধ মারকুনীর সঙ্গে মিসরী ভাষায় কথা বলে। সে বলল, 'আমি তোমার ভাষা বুঝি ও বলতে পারি। আমাকে খুন করে তুমি কিছুই পাবে না।'

মারকুনীও মিসরী ভাষা জানে। সে বৃদ্ধকে বলল, 'আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। তোমার সঙ্গীদেরও খুন করব না। আমাকে এখান থেকে বের হওয়ার পথটা দেখিয়ে দাও।'

'তুমি কি এখান থেকে বের হতে চাও?' জিজ্ঞেস করে বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ'– মারকুনী জবাব দেয়– 'আমি তোমাদের রাজত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।'

বৃদ্ধ তার সঙ্গীদেরকে কি যেন বলল। তারা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত। বৃদ্ধ মারকুনীকে বলল, 'এদের সঙ্গে যাও, এরা তোমাকে সোজাপথ দেখিয়ে দেবে।'

'তুমিও সঙ্গে চল'– মারকুনী বলল– 'এরা আমাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে।'

বৃদ্ধ মারকুনীকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটা দেয়। কতগুলো টিলার মধ্যদিয়ে হেঁটে তারা অপর একটি টিলার উপর উঠে যায়। তারপর আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে এক খোলা ময়দানে গিয়ে উপনীত হয়। ভেতরে যাওয়া-আসার সোজাপথ পেয়ে যায় মারকুনী।

বৃদ্ধ মারকুনীকে বলল, 'তুমি এবার চলে যাও। অন্যথায় খোদার গজব তোমাকে ভস্মীভূত করে ফেলবে।' কিন্তু মারকুনী তো এমনিতেই চলে যেতে আসেনি। তার অভিযানের অগ্রযাত্রা শুরু হল মাত্র। এই বিজন পাহাড়ী এলাকায় যাওয়া-আসার সোজা পথ পেল মাত্র। ভয় দেখিয়ে তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে নেয় সে। তারপর এই বলে যে-পথে এসেছিল, সে-পথে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যে, আমার কিছু লোক ভেতরে আটকা পড়ে আছে, তাদেরকেও বের করে

আনতে হবে।

মারকুনীর হাতে খাপখোলা তরবারী। তার ভয়ে তিনজনই তটস্থ। তারা মারকুনীর সঙ্গে ফেরত রওনা হয়।

পথটা ভালভাবে চিনে নেয় মারকুনী। বাঁক-মোড় সব রপ্ত করে নেয়। বৃদ্ধ ও তার সঙ্গীদের নিয়ে সুড়ঙ্গপথের একমুখ দিয়ে প্রবেশ করে অন্যমুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বৃদ্ধ মারকুনীকে সে স্থান দিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে মারকুনীর সঙ্গীকে ভুনা করে কেটে কেটে ভক্ষণ করা হয়েছিল। সেখানে কয়েকটি উলঙ্গ মানুষের লাশ পড়ে আছে। বেশক'টি শিশুর লাশও আছে। মারকুনীর সঙ্গীরা শিশুদেরকে হত্যা করে ফেলেছে। বৃদ্ধ এই গণহত্যা বোধ হয় আগে দেখেনি। তাই অকস্মাৎ চমকে উঠে থেমে যায়। ধৈর্য সংবরণ করে মারকুনীকে জিজ্ঞেস করে, 'এই নিরপরাধ লোকগুলোকে খুন করে তোমরা কী পেয়েছ?'

'তোমরা আমার একজন সঙ্গীকে আগুনে সিদ্ধ করে খেয়েছিলে। সে তোমাদের কী ক্ষতি করেছিল?' প্রশ্ন করে মারকুনী।

'সে অপরাধ জগতের মানুষ ছিল'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'আমাদের এই পবিত্র সাম্রাজ্যে এসে সে একে নাপাক করেছিল।'

'তোমরা এখানে কেন থাক?'– মারকুনী জিজ্ঞেস করে– 'ফেরাউন র‍্যামন্স দ্বিতীয়-এর সমাধি কোথায়?'

'এ দু'টি প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে দেব না।' বৃদ্ধ জবাব দেয়।

ইত্যবসরে মারকুনীর সঙ্গীদের কয়েকজন এখানে এসে সমবেত হয়। মারকুনী তাদেরকে বলল, এদের মহিলাদেরকে নিয়ে আস। আক্রমণের আগেই মারকুনী সঙ্গীদের বলে রেখেছিল, কোন নারীকে হত্যা করবে না, উত্যক্তও করবে না। তাদেরকে পণ হিসেবে আটকে রাখবে।

মারকুনীর সঙ্গীরা দশ-এগারজন মহিলাকে সামনে নিয়ে আসে। তাদের দু'তিনজন বৃদ্ধা। দু'তিনজন কিশোরী। অন্যরা যুবতী। সবাই উলঙ্গ। গায়ের রং ফর্সা। বেশ সুন্দরী। মাথার চুল কোমর পর্যন্ত লম্বা। সোনার তারের ন্যায় চিক চিক করছে সকলের চুল।

'আমরা যদি তোমাদের এই মেয়েগুলোকে তোমাদের চোখের সামনে অপমান করে হত্যা করি, তা কি তোমাদের কাছে ভাল লাগবে?' বৃদ্ধের প্রতি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে মারকুনী।

'তার আগে তোমরা আমাকে হত্যা করে ফেল।' বলল বৃদ্ধ।

'না, তা করব না। তোমার সামনেই এদের সম্ভ্রমহানি করে হত্যা করব।' বলল মারকুনী।

'শোন!' বৃদ্ধ বলল– 'তোমাদের মহিলারা কাপড়ে আবৃত থাকে। তাদের তোমরা পোশাকের তলে লুকিয়ে রাখ। কিন্তু তারা অশ্লীলতা পরিহার করে না। তোমরা নারীর খাতিরে রাজ্য বিসর্জন দাও। তোমরা নারীকে নাচাও, তাদেরকে দিয়ে পাপ করাও। আর আমাদের মহিলারা কাপড় পরিধান করে না– উলঙ্গ থাকে। কিন্তু অশ্লীলতা করে না। আমাদের কোন পুরুষ অন্য পুরুষের স্ত্রীর প্রতি সেই দৃষ্টিতে তাকায় না, যে দৃষ্টিতে তোমরা আমাদের নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছ। আমি তো তোমাদের এই কুদৃষ্টিপাতকেও সহ্য করতে পারি না। তোমরা পবিত্র খোদা র‍্যামন্স-এর ধনভাণ্ডার লুট করে নিয়ে যাও, তবু আমার কন্যাদের ইজ্জতের উপর হাত দিও না।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি। তুমি আমাকে র‍্যামন্স-এর সমাধিটা দেখিয়ে দাও'– মারকুনী বলল– 'আমি তোমাদের ইজ্জতের উপর হাত দেব না।'

'দস্যুর ওয়াদা বিশ্বাস করা যায় না'– বৃদ্ধের দু'ঠোঁটে অবজ্ঞার হাসি– 'যাদের অন্তরে লোভ থাকে, তাদের চোখে লজ্জা থাকে না। তারা যে মুখে ওয়াদা করে, সে মুখেই তা ভঙ্গ করে। তুমি তো সেই জগতের মানুষ, যেখানে সম্পদের জন্য নারীকে বলি দেয়া হয়। আর শোন দোস্ত! তুমি মিসরী নও। আমি তোমার চোখে নীল নদের পানি নয় সমুদ্রের চমক দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার দেহ থেকে সমুদ্রের ওপারের ঘ্রাণ পাচ্ছি, মিসরের নয়।'

'আমি র‍্যামন্স-এর সমাধির সন্ধানে এসেছি'– ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মারকুনী বলল– 'বেশী কথা না বলে তুমি আমাকে সমাধিটা দেখিয়ে দাও।'

'তা দেখিয়ে দেব'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'তার আগে আমি তোমাকে একথা অবহিত করা জরুরী মনে করছি যে, সমাধির ভেতরে গিয়ে তোমরা জীবিত বের হয়ে আসতে পারবে না।'

'কেন, তোমার সৈনিকরা কি ভেতরে লুকিয়ে আছে যে, ওরা আমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে?' মারকুনী জিজ্ঞেস করে।

'না'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'তোমাদেরকে হত্যা করার মত আমার কাছে কোন সৈন্য নেই। তোমার লোকেরাই তোমাকে হত্যা করে ফেলবে। তারপর তোমার লাশটা ওখান থেকে কেউ তুলেও আনবে না।'

'তুমি কি গায়েব জান?'– মারকুনী জিজ্ঞেস করে– 'যে তুমি ভবিষ্যতের সংবাদ বলতে পার?'

'না'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'আমি অতীত দেখেছি। আর যে অতীতকে বিবেক ও অন্তরের চোখে দেখেছে, সে তার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। আমি দেখতে পাচ্ছি, মৃত্যু তোমার দু'চোখে এসে বসেছে।'

মারকুনী খিলখিল করে হেসে ফেলে। বলে– 'বুড়ো! তুমি জংলী মানুষ। ওসব প্যাচাল বাদ দিয়ে বল, সমাধিটা কোথায়?'

'তোমার সামনে'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'ঐ তো উপরে। আমার সঙ্গে এস।'

মারকুনী কি যেন চিন্তা করে। তারপর সঙ্গীদের বলে, এই মেয়েগুলোকে সসম্মানে রাখ। বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প কর। ঐ লোক দু'টোর সঙ্গেও দুর্ব্যবহার কর না। আমি কুদুমী ও ইসমাইলকে নিয়ে আসি।'

মারকুনী নতুন আবিস্কৃত সোজা পথে বেরিয়ে যায়।

বৃদ্ধের দেখান পথে বাইরে বেরিয়ে আসে মারকুনী। মিসর থেকে এসে কোন্ পথে এই ভয়ানক বিজন এলাকায় প্রবেশ করেছিল, তা মনে আছে তার। কুদুমী ও ইসমাইলকে কোথায় রেখে এসেছে, তাও আন্দাজ করতে পারছে সে। বের হয়ে সেদিকে ছুটে চলে মারকুনী।

অন্তত দু'মাইল পথ অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছে যায় মারকুনী। মনে আনন্দের সীমা নেই তার। এখন সে যেখানে দাঁড়িয়ে, এখানেই ইসমাইল ও কুদুমীকে রেখে সে ভেতরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু একটি দৃশ্য দেখে হঠাৎ মারকুনীর মনের আনন্দ উবে যায়। বদলে যায় চেহারার রং। কুদুমী ও ইসমাইল একই তাঁবুতে একত্রিত বসা। এ দৃশ্য সহ্য হল না মারকুনীর। প্রচণ্ড ক্ষোভ ঝরে পড়ে ইসমাইলের প্রতি। বলে, 'আমি না তোমাকে বলেছিলাম, নিজের মর্যাদা রক্ষা করে থাকবে! ওর পাশে বসে তুমি কী করছ?'

'এই বিজন এলাকায় আমি একা বসে থাকব?'– কুদুমী বলল– 'ও আসেনি, আমি নিজেই ওকে ডেকে এনেছি। ওর দোষ নেই।'

'আমি তোমাকে সঙ্গে করে শুধু এবং শুধুই নিজের জন্য এনেছি'– ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মারকুনী বলল– 'আমি তোমাকে বিনিময় দিয়েছি। কাজেই তোমাকে আমি অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখতে চাই না, দেখতে পারি না। নিজের ঘরে শত পুরুষকে ডেকে আনতে পার; কিন্তু এখানে তুমি আমার কেনা দাসী।'

গত রাতে ইসমাইল নিষ্ঠমনে কুদুমীর হৃদয়ে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছিল, যা তার অন্তরে মারকুনীর বিরুদ্ধে সন্দেহ ও বিরাগের জন্ম দেয়। যার ফলে কুদুমী মারকুনীকে নিজের একজন খদ্দের ভাবতে শুরু করেছে। এবার মারকুনী যখন তাকে 'ক্রীত দাসী' বলে অভিহিত করে বসল, তখন তার অন্তরে মারকুনীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেল। কুদুমী ভাল ও মন্দ মানুষের পার্থক্য বুঝতে শুরু করেছে। অথচ ইসমাইল তাকে ঘুণাক্ষরেও বলেনি যে, আমি ভালমানুষ। বরং সে বলেছিল, আমি ভাড়াটিয়া অপরাধী, ভাড়াটিয়া খুনী।

কুদুমী মারকুনীকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। কারণ, সে চুক্তিবদ্ধ।

পাওনাটা বুঝে নিয়েই তবে এখানে এসেছে সে। ভবিষ্যতে গুপ্তধনের ভাগ পাওয়ারও কথা আছে। অবশ্য এখন তা সংশয়পূর্ণ মারকুনী ইসমাইলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, কুদুমী তা সহ্য করতে পারে না।

ইসমাইল কোন কথা বলছে না। অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে মারকুনীর প্রতি। কিছুক্ষণ পর উঠে মারকুনীর বাহু ধরে তুলে সামান্য আড়ালে নিয়ে গিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আহমার দরবেশ বোধ হয় তোমাকে আমার সম্পর্কে কিছু বলেনি! তুমি আমার সম্পর্কে কিছুই জান না। আমি তোমাকে ভালভাবেই জানি। তুমি আমার দেশ ও জাতির মূলোৎপাটন করতে এসেছ। আর আমি এত জঘন্য পাপী যে, ভাড়ায় তোমার সঙ্গ দিচ্ছি। তোমাকে আমি আমার রাজা স্বীকার করতে পারি না। আমি আমার পারিশ্রমিক কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করব আর গুপ্তধন উদ্ধার হলে তার থেকেও উপযুক্ত ভাগ নেব।'

'তুমি এসব কথা আহমার দরবেশের কাছে বল গিয়ে'– মারকুনী একজন সেনা কমান্ডারের ন্যায় বলল– 'এখানে তুমি আমার অধীন। গুপ্তধন যা উদ্ধার হবে, সব আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আমি যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাব।'

'শোন সুলায়মান সেকান্দার!'– ইসমাইল পূর্বের ন্যায় ক্ষীণ ও হাসিমাখা কণ্ঠে বলল– 'আমি জানি, তুমি মারকুনী- সুলায়মান সেকান্দার নও। আমি একজন পেশাদার অপরাধী। তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি যে, তোমার এসব কথা আমাকে 'অপরাধী' থেকে 'মিসরী মুসলমানে' পরিণত করবে। আমি তোমাকে আরো হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, মুসলমান জাতীয় চেতনায় এতই অন্ধ যে, যদি কোন মুসলমানের লাশের মধ্যেও এই চেতনা জেগে ওঠে, তাহলে সেও উঠে দাঁড়িয়ে যায়। আমাকে তুমি অপরাধীই থাকতে দাও, তাতেই তোমার মঙ্গল।'

মারকুনী অনুভব করল, লোকটা বড় পাকা। এ মুহূর্তে তাকে শত্রুতে পরিণত করা ঠিক হবে না। ইসমাইলের কাঁধে হাত রেখে এবং মুখে বন্ধুসুলভ হাসি টেনে বলল, তুমি অহেতুক ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়েছ। আসল কথা হল, আমি চাই না যে, এই বেশ্যা মেয়েটা তোমার আমার কারো মস্তিষ্কে জেঁকে বসুক। ও বড় চতুর মেয়ে। আমাদের দু'জনের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে সব গুপ্তধন হাতিয়ে নেয়ার বুদ্ধি আঁটছে। তুমি আমাকে শত্রু মনে কর না। আহমার দরবেশ কি তোমাকে বলেননি যে, তিনি তোমার ব্যাপারে কী ভাবছেন?'

'গুপ্তধন পেয়ে যাব আশা করা যায় কি?' জিজ্ঞেস করে ইসমাইল।

'পেয়ে গেছি'– মারকুনী জবাব দেয়– 'আমি তোমাদের দু'জনকে নিতে এসেছি।'

ইসমাইল গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মারকুনীর প্রতি। তাকিয়ে আছে কুদুমীও। মনটা তার ক্ষুণ্ন স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। উট দেখাশোনা করার জন্য রেখে যাওয়া লোকটাকে ডাক দেয় মারকুনী। লোকটা ছুটে আসে। মারকুনী উটগুলোকে একটার পেছনে একটা বেঁধে নেয়ার নির্দেশ দেয় তাকে। গুটিয়ে নেয়া হয় তাঁবু দু'টোও।

ইসমাইল ও কুদুমীকে নিয়ে আসে মারকুনী। মনোরম সবুজ-শ্যামল জায়গা দেখে, বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে কুদুমী। উঁচু একটি পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট একটি ঝিল। পাহাড়ের নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি। দেখে মনটা ভরে যায় কুদুমীর।

মারকুনী গোত্রের উলঙ্গ বৃদ্ধ নেতার কাছে চলে যায়। কুদুমী ইসমাইলের সঙ্গে এদিক-ওদিক ঘুরতে শুরু করে। হঠাৎ ছোট্ট একটি শিশুর লাশ চোখে পড়ে কুদুমীর। শিশুটি উলঙ্গ। সারা গায়ে রক্ত- যেন রক্ত দিয়ে গোসল করেছে বাচ্চাটা। ভয়ে আঁৎকে উঠে মেয়েটি। সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠে তার।

দু'জন এগিয়ে যায় আরো সামনে। এবার এক স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে দু'টি লাশ। এগুলো বয়স্ক মানুষের মৃতদেহ। উভয় লাশের গায়ে তীরবিদ্ধ। কুদুমীর ভয় আরো বেড়ে যায়। কাঁপতে শুরু করে সে।

দু'জন এগিয়ে যায় আরো সম্মুখে– যেখান দিয়ে মারকুনীর লোকেরা উপর থেকে নীচে নেমেছিল সেখানে। খোলামেলা জায়গা। এখানে পড়ে আছে আরো কয়েকটি লাশ। পাঁচ-ছয়টি শিশুর লাশ। অন্যগুলো বড়দের। সবগুলো লাশের মুখ ও চোখ খোলা। গায়ে নির্যাতনের ভয়ানক আলামত। মিসরের রূপসী কন্যা কুদুমী এমন বীভৎস দৃশ্য স্বপ্নেও দেখেনি কখনো। ছোট একটি শিশুর লাশ দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠে সে।

মারকুনীর তিন-চারজন লোক চিৎকার শুনে দৌড়ে আসে। কুদুমী মাথা চক্কর খেয়ে লুটিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ইসমাইল তাকে আগলে ধরে। মারকুনীর লোকদেরকে অবহিত করা হয় যে, মেয়েটি লাশ দেখে ভয় পেয়েছে। একজন পানি আনতে ছুটে যায়। কুদুমী অল্প সময়ের মধ্যেই সম্বিৎ ফিরে পায়। নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই লাশগুলো কাদের? এদেরকে হত্যা করা হল কেন?'

ইসমাইলের ঘটনা জানা ছিল না। মারকুনীর এক লোক কুদুমীর প্রশ্নের জবাব দেয়। কুদুমী ইসমাইলের প্রতি তাকায়। পীতবর্ণ ধারণ করেছে তার মুখের রং। ইসমাইল বলল, 'এই লোকগুলো আমাদের চেয়ে ভাল। এরা গুপ্তধন পাহারা দিত। এরা মানুষ খেত, পোশাক পরত না ঠিক; কিন্তু আমানতদার ছিল। এরা যদি ফেরাউনের সমাধি খুঁড়ে ধনভাণ্ডার তুলে নিয়ে

যেত, তাহলে কে ঠেকাত?' আর আমরা? আমরা দস্যু, খুনী। অথচ আমরা নিজেদেরকে সভ্য দাবি করি। এসব মারকুনীর কারসাজি।'

'আমি সেই সম্পদ থেকে কিছুই নেব না, যার জন্য এই নিষ্পাপ শিশু ও নিরপরাধ লোকগুলোকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে'– কুদুমী বলল– 'এদের কাছে কোন অস্ত্র দেখতে পাচ্ছি না। এরা নিরস্ত্র ছিল।'

বৃদ্ধকে নিয়ে একটি পাথরখণ্ডের পেছনে চলে গেছে মারকুনী। বৃদ্ধ তাকে বলল, উপরে উঠে পড়; সেখানে ঐ যে বড় একটা পাথর দেখা যাচ্ছে, যদি তুমি পাথরটা সেখান থেকে সরাতে পার, তাহলে তুমি সেই জগতের দরজা দেখতে পাবে, যেখানে র‍্যামন্স-এর লাশের বাক্স ও তার ধনভাণ্ডার রাখা আছে। পাথরটা যেদিন এখানে স্থাপন করা হয়েছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কেউ তা নাড়ায়নি। পনেরশ' বছর যাবত এই পাথরকে কেউ স্পর্শও করতে পারেনি। আমরা পনেরশ' বছর পর্যন্ত এর রক্ষণাবেক্ষণ করছি। আমি তোমাকে র‍্যামন্স-এর মৃত্যুর কাহিনী এমনভাবে শোনাতে পারব, যেন তিনি এই গতকাল আমার চোখের সামনে মারা গেছেন। এই কাহিনী আমাকে আমার বাপ-দাদারা শুনিয়েছেন। দাদাকে শুনিয়েছেন, তার বাপ-দাদা। আমি আমার গোত্রের সব মানুষকে সেই কাহিনী শুনিয়েছি।'

'তোমার এসব কথা আমি পরে শুনব'– বলেই মারকুনী পাথরটির উপর উঠে যায়। তার চেহারায় অস্থিরতার ছাপ। আর বিলম্ব সইছে না যেন তার। উপরের পাথরটা আলাদা স্থাপন করা কিংবা সেটি সরানো সম্ভব, তা তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। এদিক-ওদিক খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে মারকুনী। কিন্তু পাথরটা যে আলাদা, তার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। নীচে নেমে আসে মারকুনী।

'আমি জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না যে, এই পাথরটির দু'টি অংশ আছে'– বৃদ্ধ বলল– 'উপরের যে অংশটি পেছনের পাহাড়ের সঙ্গে মিলিত, সেটি পাহাড়েরই অংশ বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তব তা নয়। এটি মানুষের হাতের কৃতিত্ব। এর গাঁথুনী কুদরতী বলে মনে হলেও মূলত এটি মানুষেরই কারিগরী। র‍্যামন্স নিজের তত্ত্বাবধানে এটি তৈরি করিয়েছেন। তার নীচে এবং পাহাড়ের বুকে যে জগত বিদ্যমান, তাও র‍্যামন্স তার জীবদ্দশায় তৈরি করিয়েছেন এবং বাইরের জগতের মানুষ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত গোপন রাখার জন্য এই পাথর ও তার সমাধি তৈরি করিয়ে কারীগরদের বন্দী করে রাখেন। মৃত্যুবরণ করার পর তার লাশের বাক্স এই সমাধিতে রাখা হয়। একজন জীবন্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও তাতে রাখা হয়। তারপর কারিগরদের বন্দীশালা থেকে বের করে এনে তাদের দ্বারা উপরে পাথরটা স্থাপন করিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়। তারপর এখানকার বিভিন্ন গুহায় বারজন লোককে বাস

করতে দেয়া হয়। তাদের মিসরের বারটি সুন্দরী নারী দেয়া হয়। তাদের দায়িত্ব এ এলাকার পাহারাদারী করা। আজ তুমি যাদেরকে হত্যা করেছ এবং এখনো যারা এখানে জীবিত আছে, তারা সবাই সেই বার দম্পতিরই বংশধর।'

'এখন বলুন, এই পাথরটা এখান থেকে সরাতে পারি কিভাবে?' জিজ্ঞেস করে মারকুনী।

'তোমার কি চোখ নেই?' বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'তোমার কি বিবেক নেই? পাথরের ঐ চূড়াটা দেখ, তার সঙ্গে কি রশি বাঁধতে পার না? তোমার লোকদের গায়ে যদি শক্তি থাকে, তাহলে সবাই মিলে রশিটা টান। তাতে হয়ত পাথরটা নীচে নেমে আসতে পারে।'

মারকুনীর আর তর সইছে না। যত তাড়াতাড়ি সমাধির মুখটা উন্মুক্ত করে ফেলতে চাইছে। নিজের লোকদের ডাক দেয় সে। সঙ্গে নিয়ে আসা সরঞ্জামাদির মধ্যে রশিও আছে। মোটা একটা রশি হাতে নেয়। একজনকে উপরে উঠিয়ে রশির এক মাথা পাথরের চূড়ার সঙ্গে বাঁধতে বলে। তারপর রশির অন্য মাথায় ধরে নীচ থেকে টান দেয়ান জন্য সবাইকে নির্দেশ দেয়। নিজে উঠে যায় উপরে। নীচ থেকে সবাই সর্বশক্তি ব্যয় করে রশি ধরে হেইয়ো বলে টান দেয়। মারকুনী দেখতে পায়, রশির টানের সঙ্গে পাথরটা দুলছে। একবার এতটাই নড়ে উঠে যে, তার ফাঁক দিয়ে মারকুনী সমাধির ভেতরটা দেখে ফেলে। মনোবল বেড়ে যায় তার। ধ্বনি দিতে শুরু করে সে। এবার আরো জোরে টান মারে তার লোকেরা। স্থান থেকে পাথরটা অনেকটা সরে যায়। মারকুনী তার সঙ্গীদের বিশ্রাম নিতে বলে। সূর্য কালো পাহাড়ের পেছনে চলে গেছে। সঙ্গে করে মদ নিয়ে এসেছিল মারকুনী। তার নির্দেশে মদ হাজির করে একজন। মারকুনী বলল, পান কর, শক্তি সঞ্চয় করে পাথরটাকে কংকরের ন্যায় নীচে ফেলে দাও।

সবাই মদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মারকুনী ঘোষণা দেয়, 'আজ রাতে আমি তোমাদেরকে দু'টি উট রান্না করে খাওয়াব।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। নতুন উদ্যম সৃষ্টি হয় সকলের মাঝে।

ইতিমধ্যে পশ্চিম দিগন্তেরও নীচে চলে গেছে সূর্য। অন্ধকার ছেয়ে যাওয়ার আগেই কয়েকটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। সকলে রশি ধরে আরেকবার শক্তির পরীক্ষা দিতে শুরু করে।

মারকুনী উপরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রদীপের কম্পমান আলোতে পাথরের উপরিভাগ সম্মুখে ঝুঁকে সরে যেতে দেখতে পায় সে। পূর্বাপেক্ষা আরো জোরে ধ্বনি তোলে সে– আনন্দ ধ্বনি। হঠাৎ ভয়ংকর এক শব্দ তুলে পাথরটা গড়িয়ে

পড়ে এবং উল্টে নীচে পড়ে যায়। মারকুনীর লোকেরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সে জায়গাটা অপ্রশস্ত। তার পেছনেও বড় একটি পাথর। উপর থেকে পাথরটা এত তীব্রবেগে পড়ে যে, নীচ থেকে লোকগুলো সরবার সুযোগ পায়নি। নীচে আলোও কম। পাহাড় ও পাথরে ঘেরা এই জগতটা কয়েকটি সমস্বর চিৎকার ধ্বনিতে কেঁপে উঠেই আবার নীরব হয়ে যায়। মারকুনী হন্তদন্ত হয়ে নীচে নেমে আসে। একটি বাতি হাতে নিয়ে দেখে পতিত পাথরের নীচ থেকে রক্ত বইছে। কারো হাত দেখা যাচ্ছে, কারো পা, কারো মাথা। মস্তবড় পাথরটার চাপা খেয়ে থেতলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে প্রত্যেকের দেহ।

মারকুনী কারো দৌড়ানোর শব্দ শুনতে পায়। ভাবে, কে যেন বেঁচে গেছে, সে-ই পালাচ্ছে। কান খাড়া করে এদিক-ওদিক তাকায় সে। নজর পড়ে পার্শ্বে অবস্থিত পাথরটির উপর। তার উপর চারজন লোক দাঁড়িয়ে। আবছা অন্ধকার। লোকগুলো কারা চেনা যাচ্ছে না। মারকুনী ধীরপায়ে গম্ভীর মুখে পাথরটির দিকে এগিয়ে যায়। একটি বাতি হাতে নিয়ে নিরীক্ষা করে দেখে। একজন বৃদ্ধ। অপরজন ইসমাইল। তৃতীয়জন মারকুনীর অন্য এক সঙ্গী। চতুর্থজন কুদুমী। কুদুমী যেন আপাদমস্ত ভীতির মূর্তপ্রতীক। এ মুহূর্তে একটি নিশ্চল পাথর যেন মেয়েটা। অন্যরাও সবাই নীরব-নিস্তব্ধ। ঘটনার আকস্মিকতায় থ খেয়ে আছে সবাই।

সবার আগে মুখ খুলে বৃদ্ধ। বলে, 'আমি তোমাকে সাবধান করেছিলাম যে, আমি তোমার চোখের মধ্যে মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। আমি আমার কর্তব্য বিসর্জন দিয়ে তোমাকে ভেদ বলে দিয়েছি। আমি জানতাম, এই ভেদ তোমার জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা আর মৃত্যুই আমার কর্তব্য পালন করে দেবে। যা হোক, এখন কি তুমি ফিরে যাবে?'

'না'– ক্ষীণ কণ্ঠে মারকুনী জবাব দেয়– 'আমি আমার মিশন সম্পন্ন করব; এই সঙ্গীরা আমার সাহায্য করবে।' বলেই মারকুনী তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে, 'মনে হচ্ছে কে যেন রক্ষা পেয়ে পালিয়েছে। কে পালাল?'

'আমাকে জিজ্ঞেস কর'– বৃদ্ধ বলল– 'তোমার চারজন লোক আমার দু'ব্যক্তির সঙ্গে পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমার লোকেরা তাদেরকে বের হওয়ার পথ দেখাবে না। তাদেরকে ভেতরেই পথ হারিয়ে মরতে হবে। ভাল হত, যদি তারা অন্যদের সঙ্গে পাথরের নীচে এসে জীবন দিত। এ মৃত্যু সহজ ছিল। যা হোক, আজ রাতের জন্য কাজ বন্ধ করে দাও; আমি সকালে তোমাদেরকে ভেতরে নিয়ে যাব।'

❁ ❁ ❁

মারকুনীর মনে এই দুর্ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যেন

কিছুই ঘটেনি। বৃদ্ধকে নিজের সঙ্গে বসিয়ে খানা খাওয়ায় মারকুনী। ইসমাইল বৃদ্ধকে একটি চাঁদর প্রদান করে। বৃদ্ধ চাদরটি গায়ে জড়িয়ে নেয়। কুদুমীর মুখে রা নেই।

'তোমরা আমার এক সঙ্গীকে খেয়েছিলে'– বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে মারকুনী বলল– 'তার আগে কত মানুষ খেয়েছ?'

'যত পেয়েছি'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'আমাদের বংশধারায় নরমাংস খাওয়ার প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়েছে, তা আমি বলতে পারব না। যে ইতিহাস আমার কানে দেয়া হয়েছে, তাতে পনেরশ' বছরের আগের একটি ভবিষ্যদ্বাণীও আছে। কেউ বলেছিল, যারা খোদা র‍্যামন্স-এর সমাধির রক্ষণাবেক্ষণ করবে, বিজন পার্বত্য এলাকা তাদেরকে নিজের শীতল কোলে আগলে রাখবে, তারা পানি ও ছায়া থেকে বঞ্চিত হবে না, তারা দুনিয়ার মোহ, সোনা-রূপা ও মদ-নারীর মোহ থেকে মুক্ত থাকবে। ফলে তাদের শরীর আবৃত করার প্রয়োজন পড়বে না। তাদের অন্তরে পরস্পর ভালবাসা থাকবে। তাদের মধ্যে কোন লালসা থাকবে না। লালসাই মানুষকে খুনী, ডাকাত ও অসাধুতে পরিণত করে। মানুষ কখনো সম্পদের লালসার শিকার হয়, কখনো নারীর। লোভী মানুষের দ্বীন-ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা বলতে কিছু থাকে না। লালসাই সব অনিষ্টের মূল। আমাদেরকে এই লালসার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, একটি সময় আসবে, যখন র‍্যামন্স-এর রক্ষণাবেক্ষণকারীরা নরমাংস ভক্ষণ করবে। তারা এখান থেকে বাইরে বের হবে, মানুষ শিকার করে আনবে। কোন পশু পেলেও খেয়ে ফেলবে। অন্যথায় তাদের বংশধারা নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'তোমরা কি এখনো ফেরাউনদেরকে খোদা বলে বিশ্বাস কর?' কুদুমী বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করে।

'মানুষ বড় দুর্বল প্রাণী'– বৃদ্ধ বলল– 'তারা নিত্য খোদা বদল করে থাকে। অনেক সময় মানুষ নিজেই খোদা সেজে বসে। এ মুহূর্তে আমার খোদা তোমরা। কারণ, আমার জীবন ও আমার কন্যাদের ইজ্জত এখন তোমাদের হাতে। এই ভেদ আমি তোমাদেরকে খোদা বিশ্বাস করে ফাঁস করেছি। কেননা, আমি মৃত্যুকে ভয় করি, আমার কন্যাদের সম্ভ্রমহানিকে ভয় করি। ফেরাউনও তোমাদেরই ন্যায় সেকালের জনগণের ঘাড়ে তরবারী রেখে বলেছিল, আমি খোদা! তখন নিরীহ মানুষগুলো বাধ্য হয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, তুমিই আমাদের খোদা। ক্ষুধা-দারিদ্র্য মানুষকে বাস্তব জগত থেকে বহু দূরে নিয়ে নিক্ষেপ করে। মানুষের ভেতরকার মনুষ্যত্ব মরে যায়। আসল খোদা যাদেরকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' আখ্যা দিয়েছেন, তাদের দেহটাই শুধু রয়ে যায়। যার

কারণে তখন পেটের জ্বালায় পড়ে মানুষ সেই মানুষের সামনে সেজদায় অবনত হয়ে পড়ে, যে তার জঠর জ্বালা ঠাণ্ডা করে। মানুষের এই দুর্বলতাই রাজার জন্ম দিয়েছে, ডাকাত-দস্যু সৃষ্টি করেছে, মানুষকে শাসক-শাসিত ও জালিম-মজলুমে পরিণত করেছে। হিরে-জহরত মানুষকে পাপী বানিয়েছে। এই যেমন ধর, (কুদুমীকে উদ্দেশ্য করে) তুমি কে? তুমি এদের কার স্ত্রী? এদের কাকে তুমি আপন বলতে পার?' কুদুমী নর্তকী, তা জেনে ফেলেছে বৃদ্ধ।

বৃদ্ধের প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ে কুদুমী। নানা কারণে পূর্ব থেকেই মনটা তার বেচাইন। এবার যোগ হল নতুন মাত্রা। বৃদ্ধের প্রশ্ন ঘামিয়ে তুলল মেয়েটিকে। তাকে কিছু বলতে না দেখে বৃদ্ধ বলল, তুমি তোমার সুশ্রী চেহারা আর যৌবনের কারণে নিজেকে খোদা ভাবছ। আর তোমার খদ্দেররা তোমাকে ভাবছে খোদা। তোমরা আমাকে জংলী বা হিংস্র মনে কর না। আমার কাছে কাপড় আছে, যা মাঝে-মধ্যে পরিধান করে আমি কায়রো যাই, তোমাদের সভ্য জগতটা দেখি। তারপর ফিরে এসে খুলে ফেলি। তোমাদের জগতে আমি শাহজাহাদেরকে ঘোড়া গাড়ীতে চড়ে ভ্রমণ করতে দেখি। দেখি তোমার ন্যায় শাহজাদীদের। দেখি নর্তকী-গায়িকাদের। আর দেখি তাদেরকে, যারা ওদেরকে নাচায়-গাওয়ায়। আমি ফেরাউনদের আমলের অনেক কথা শুনেছি। আর এ-যুগের ফেরাউনদেরকেও দেখছি। আমি তাদের পরিণতিও দেখেছি। দেখতে পাচ্ছি তোমাদেরও পরিণতি, যা তোমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছ না। তোমরা সম্পদের লোভে এতগুলো নির্দোষ প্রাণীকে হত্যা করলে! এটা তোমাদের অপরাধ, যার শাস্তি থেকে তোমরা রেহাই পাবে না, যেমনটি রক্ষা পায়নি ফেরাউনরা। আমি আগামীদিন ভোরে তোমাদেরকে সমাধির ভেতরে নিয়ে যাব। তখন তোমরা ফেরাউনের পরিণতি দেখতে পাবে। র‍্যামন্স যদি খোদা হত, তাহলে তার এই পরিণতি হত না। খোদা তো তিনি, যিনি জগতের সবকিছুকে পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়– নিজে পরিণতি ভোগ করে না। পাহাড়ের তলে কংকাল হয়ে পড়ে আছে যে মানুষটি, আমি তাকে কখনো খোদা বলে স্বীকার করিনি। আমি ও আমার গোত্র তাকে পাহারা দেই না। আমরা দুনিয়ার লোভ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি বিশ্বাস স্থির করে নিয়েছি। আমরা সেই বিশ্বাসেরই রক্ষণাবেক্ষণ করছি শুধু।'

থেমে থেমে কাঁপা কণ্ঠে কথা বলছে বৃদ্ধ। তার প্রতি বিমোহিতের ন্যায় অপলক তাকিয়ে আছে কুদুমী। বৃদ্ধের বক্তব্যে কুদুমী নিজের পরিণতি দেখতে পাচ্ছে। মারকুনীর মুখে অবজ্ঞার হাসি। লোকটা মদপান করছে। সে বৃদ্ধকে বলল, 'তুমি তোমার মহিলাদের নিকট চলে যাও। সকালে তাড়াতাড়ি ওঠে পড়বে। এসে আমাদেরকে ভেতরে নিয়ে যাবে।'

বৃদ্ধ চলে যায়। মারকুনী কুদুমীকে বলে, 'চল, আমরা শুয়ে পড়ি।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব না।' মারকুনীকে সঙ্গ দিতে অস্বীকৃতি জানায় কুদুমী।

মারকুনী কুদুমীর প্রতি গা এলিয়ে দেয়। কুদুমী সরে যায় পেছন দিকে। মারকুনী মেয়েটিকে ধমক দেয়। ইসমাইল দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়ায়। কিছু না বলে মারকুনীর চোখে চোখ রাখে সে। মারকুনী পেছনে সরে যায়। কেটে পড়ে ধীরে ধীরে। ইসমাইলের বুকে মাথা গুঁজিয়ে শিশুর ন্যায় কাঁদতে শুরু করে কুদুমী।

❁ ❁ ❁

ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় মারকুনী। বৃদ্ধকে খোঁজ করে। পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না মহিলাদেরকেও। ডাকাডাকি করা হল, এদিকে-ওদিক ঘুরে দেখা হল। কিন্তু নেই– একজনও নেই। তবে মারকুনী তাদের তেমন প্রয়োজনও অনুভব করছে না। র‍্যামন্স-এর সমাধির মুখ তো এখন উন্মুক্ত। ভেতরে কোথায় কি আছে, বৃদ্ধ তার জানেই বা কি।

মারকুনী ইসমাইল, কুদুমী ও অপর সঙ্গীদের নিয়ে সেই পাথরের উপরের উঠে যায়, সেখানে সমাধির ভেতরে প্রবেশ করার পথ। মারকুনী ভেতরে নেমে পড়ে।

সুপ্রশস্ত এক গর্ত, যা সুড়ঙ্গের রূপ ধারণ করে চলে গেছে একদিকে। মারকুনীর হাতে প্রদীপ। কিছুদূর গিয়ে সুড়ঙ্গ বন্ধ হয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের প্রান্তসীমায় কোদালের আঘাত হানে সে। আঘাত খেয়ে এমন এক শব্দের সৃষ্টি হয়, যেন পেছনের জায়গাটা ফোক্‌লা। এটি পাথরের দরজা। উপর্যুপরি আঘাত করা হয় তাতে। এক কিনারা দিয়ে ভেঙ্গে যায় দরজা। ফাঁক দিয়ে ভেতরের খোলা জায়গা চোখে পড়ে মারকুনীর। আরো পিটিয়ে দরজাটা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে সরিয়ে ফেলা হয়। ভেতর থেকে পনের-ষোলশ' বছরের পুরনো দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। অসহনীয় উৎকট দুর্গন্ধে সবাই পেছন দিকে সরে যায়। নাকে-মুখে কাপড় চেপে ধরে সবাই। কিছুক্ষণ পর আবার তারা অগ্রসর হয়। প্রদীপ হাতে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কয়েক পা সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটি সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে।

সিঁড়িগুলোর উপরে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে মানব-মস্তিষ্কের খুলি ও কংকাল। ঢাল-বর্শাও পড়ে আছে সেগুলোর আশপাশে। এগুলো সমাধির পাহারাদারদের হাড়-কংকাল। প্রহরার জন্য তাদেরকে জীবন্ত ভেতরে দাঁড় করিয়ে রেখেই সমাধির মুখটা এভাবে ভারী পাথর দ্বারা সীল করে দেয়া হয়েছিল।

সিঁড়িগুলো তাদেরকে অনেক নীচে এক স্থানে নিয়ে যায়। এখানে একটি

প্রশস্ত কক্ষ। এখানকার মাটি পাথুরে। অসংখ্য কারিগর দীর্ঘ সময় ব্যয় করে কক্ষটির দেয়াল ও ছাদ এমন নিপুণভাবে খোদাই করেছে, যেন এটি এই বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মডেলের প্রাসাদ। অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি নৌকা স্থাপন করে রাখা আছে কক্ষটির এক জায়গায়। নৌকাটির মধ্যেও পড়ে আছে অনেকগুলো হাড়গোড়-কংকাল-খুলি। এরা ছিল এই নৌকার মাঝি-মাল্লা।

কারিগরদের নিপুণ হাতে খোদাইকরা একটি অন্ধকার পথ অন্য একটি কক্ষে নিয়ে যায় মারকুনী ও তার সঙ্গীদের। এই কক্ষে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুসজ্জিত ঘোড়াগাড়ী। গাড়ীটির সম্মুখে আটটি ঘোড়ার বিক্ষিপ্ত কংকাল। সামনের আসনে মানব-হাড়ের স্তূপ। অন্যত্র পড়ে আছে আরো কয়েকটি মানব-কংকাল।

এই কক্ষ অতিক্রম করে আরো একটু অগ্রসর হওয়ার পর পাওয়া গেল আরো একটি কক্ষ, ঠিক যেন শীষমহল। কক্ষটির ছাদ বেশ উঁচু। কক্ষের একটি দেয়াল ঘেঁষে উপর দিকে উঠে গেছে কতক সিঁড়ি। সিঁড়ির উপর পাথর-নির্মিত একটি চেয়ার। এই চেয়ারে বসে আছে র‍্যামন্স-এর একটি মূর্তি। মূর্তিটিও পাথরের তৈরি।

সিঁড়ির উপর ইতস্তত কতগুলো মানব-কংকাল ও খুলি ছড়িয়ে আছে এখানেও। একটি খুলির সঙ্গে একটি মুক্তার হার চোখে পড়ে কুদুমীর। নীল বর্ণের একটি হীরাও আছে সঙ্গে। পার্শ্বে পড়ে আছে মহিলাদের কানে ব্যবহার্য কয়েকটি সোনার অলংকার ও কয়েকটি আংটি। অন্যান্য কংকালের গায়েও অনুরূপ নানা ধরনের অলংকার দেখতে পায় কুদুমী।

মারকুনী একটি হার তুলে হাতে নেয়। দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও হিরা ও মুক্তাগুলো এখনো ঝকঝক করছে। এতটুকুও মন্দা পড়েনি তাতে। প্রদীপের আলোয় হিরাগুলো নানা বর্ণের কিরণ ছড়াচ্ছে। মারকুনী হারটা কুদুমীর গলায় পরিয়ে দিতে উদ্যত হয়। কুদুমী চিৎকার করে সরে ইসমাইলের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। খিলখিল করে হাসি দিয়ে মারকুনী বলে, 'আমি বলেছিলাম না, তোমাকে আমি রানী ক্লিওপেট্রা বানিয়ে দেব। ভয় কর না কুদুমী। এসব হার-অলংকার তোমারই।'

'না'– কেঁপে উঠে কুদুমী– 'না, আমি এসব খুলি ও হাড়-কংকালের মধ্যে আমার পরিণাম দেখতে পেয়েছি। এরাও আমারই ন্যায় রূপসী ছিল। এটা ঐ খোদার প্রিয়ার হার, যিনি এখানে কোথাও মৃত পড়ে আছেন। আমি সেই লোকদের আঞ্জাম দেখে ফেলেছি, অহংকার যাদেরকে খোদায় পরিণত করেছিল।'

কুদুমী এতই ভয় পেয়ে যায় যে, সে ইসমাইলকে ধরে টানাটানি শুরু করে

দিয়ে বলে, 'আমাকে তুমি এখান থেকে নিয়ে চল, নিয়ে যাও আমাকে এখান থেকে। আমি এখন কংকাল ছাড়া কিছুই নয়।'

কুদুমীর গলায় একটি হার ছিল। হারটা খুলে সে সেটি একটি কংকালের উপর ছুঁড়ে মারে। হাতের আঙ্গুল থেকে মহামূল্যবান আংটিগুলো খুলে ফেলে দেয়। তারপর চিৎকার করে বলে ওঠে, 'আমি আমার পরিণতি দেখে ফেলেছি। ইসমাইল তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।'

ইত্যবসরে মারকুনী অন্য একটি কক্ষে চলে যায়। এই সুযোগে কুদুমীকে আত্মসংবরণ করার পরামর্শ দিয়ে ইসমাইল বলল, 'এতকিছুর পর এ মুহূর্তে আমরা এখান থেকে চলে গেলে সমুদয় সম্পদ এই দু'খৃস্টান তুলে নিয়ে যাবে।'

আরো একটি পথ চোখে পড়ে ইসমাইলের। প্রদীপ তার হাতে। কুদুমীকে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে যায় ইসমাইল। আরো একটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করে তারা। কক্ষের মধ্যখানে একটি চবুতরায় একটি বাক্স রাখা আছে। বাক্সের ভেতর একটি মানুষের লাশ। লাশের মুখমণ্ডলের দিকটা খোলা। এ-ই সেই ফেরাউন র‍্যামন্স দ্বিতীয়, যাকে মানুষ খোদা বলে বিশ্বাস করত ও সেজদা করত। লাশটা মমি করা। চেহারাটা সম্পূর্ণ অক্ষত। চোখ দু'টো খোলা।

ইসমাইল র‍্যামন্স-এর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত। তাকায় কুদুমীও। তারপর চোখাচোখি করে দু'জন।

এদিক-ওদিক চোখ বুলায় ইসমাইল ও কুদুমী। এখানেও হাড়ের কংকাল দেখতে পায় তারা। অত্যন্ত আকর্ষণীয় কয়েকটি বাক্সও দেখতে পায়। একটি বাক্সের ঢাকনা খোলা। বাক্সটার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখে তারা। কতগুলো সোনার অলংকার, হিরা-জহরত পড়ে আছে তাতে। একটি মানুষের বাহুর হাড় ও একটি হাতের হাড্ডিও ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে। মাথার খুলি ও অন্যান্য হাড়-কংকাল পড়ে আছে বাইরে বাক্স সংলগ্ন।

'হায়রে মানুষ!'– দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইসমাইল বলল– 'লোকটা মারা যাওয়ার আগে অলংকার হিরা-জহরত তুলে নেয়ার চেষ্টা করেছিল। তার আশা ছিল, সে এখান থেকে জীবন নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তার আগেই লোকটা স্বর্ণালংকারেরই উপর মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল! বৃদ্ধ ঠিকই বলেছিল যে, লালসা-ই মানুষের বড় শত্রু। ইসমাইল বাক্সটার প্রতি হাত বাড়িয়ে বলল, 'কুদুমী! তুমিও লোভে পড়েই এসেছ। আমি তোমাকে কিছু দিয়ে দেব।'

'না ইসমাইল!'– ইসমাইলের বাক্সর প্রতি বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে ফিরিয়ে আনে কুদুমী– 'আমার লালসা মরে গেছে। কুদুমী মৃত্যুবরণ করেছে।'

ইসমাইল পুনরায় বাক্সে হাত ঢুকিয়ে দেয়। হঠাৎ কুদুমী চিৎকার করে বলে ওঠে, 'নিজেকে রক্ষা কর ইসমাইল!'

'ইসমাইল ঝানু লোক। একদিকে লুটিয়ে পড়ে চক্কর কাটে সে। খানিক সরে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দেখে, মারকুনী তরবারী উঁচিয়ে তার উপর আক্রমণ করতে উদ্যত। ইসমাইল সরে যাওয়ায় তরবারীর আঘাতটা গিয়ে পড়ে বাক্সর উপর। মারকুনী জোরালো কণ্ঠে বলে, 'এ ধনভাণ্ডার আমার।'

ইত্যবসরে মারকুনীর সঙ্গীও এসে যায়। ইসমাইলের কাছে খঞ্জর আছে, যা দ্বারা তরবারীর মোকাবেলা করা যায় না। পার্শ্বেই একস্থানে একটা বর্শা পড়ে আছে দেখতে পায় কুদুমী। মারকুনী ইসমাইলের উপর আঘাত হেনে চলেছে। ইসমাইল দক্ষতাবলে হাতের প্রদীপকে ঢাল বানিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করে চলেছে। মারকুনীর সঙ্গীও তার সঙ্গে যোগ দেয়। ধনভাণ্ডার দেখে মাতাল হয়ে গেছে খৃস্টানদ্বয়। কুদুমী কী করছে, সেদিকে তাদের নজর নেই।

কুদুমী বর্শাটা কুড়িয়ে নেয়। অপেক্ষা করতে থাকে সুযোগের। একসময় মারকুনীর পিঠটা চলে আসে কুদুমীর সামনে। কুদুমী তার সর্বশক্তি ব্যয় করে হাতে বর্শাটা ছেদিয়ে দেয় মারকুনীর পাজরে। টেনে বের করে আঘাত হানে আবারো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারকুনী।

মারকুনীর সঙ্গী কুদুমীর উপর তরবারীর আঘাত হানতে উদ্যত হয়। এ সময় ইসমাইল খঞ্জরের আঘাত হানে তার উপর। লোকটির পাজর থেকে পেট পর্যন্ত ছিঁড়ে যায়। লুটিয়ে পড়ে সে-ও।

কুদুমী যে গুপ্তধনের ভাণ্ডার থেকে ভাগ নিতে এসেছিল, সঙ্গে নিয়ে আসা নিজের গলার হার, মূল্যবান আংটি ও নাক-কানের অলংকার সব সেখানে খুলে ছুঁড়ে ফেলে ইসমাইলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে। নির্মল বায়ু গায়ে লাগে কুদুমীর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে। চলতে চলতে ইসমাইলকে বলে– 'বলতে পার, আমরা কোথা থেকে এসেছি? তুমি কি আমাকে চেন? বল তো আমি কে?'

'এসব প্রশ্ন তো আমারও'– ইসমাইল বলল- 'আমরা অতীত জীবনের সব পাপ ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে এসেছি।'

এই বিজন পার্বত্য এলাকা থেকে বের হওয়ার পথ তাদের জানা আছে। তারা পাহাড়ী এলাকা থেকে বেরিয়ে আসে। অল্প ক'টি উট দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। অন্যগুলো কোথায় গেছে, কি হয়েছে, কে বলবে। দু'টি উটের পিঠে চড়ে বসে দু'জন। কায়রো অভিমুখে রওনা হয় তারা।

❁ ❁ ❁

পরদিন রাত দ্বিপ্রহর। গিয়াস বিলবীস ইসমাইল ও কুদুমীর মুখ থেকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শুনে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কথার তাৎপর্য এখন আমার বুঝে এসেছে। তিনি বলেছিলেন, এসব ধনভাণ্ডার থেকে তোমরা দূরে থাক।'

গিয়াস বিলবীস নগরীর কোতোয়াল। ইসমাইল ও কুদুমী তাকে ভালভাবেই চিনত। তারা গুনাহের কাফফারা আদায় করতে চাচ্ছিল। পাহাড়ী এলাকা থেকে বের হয়ে তারা আহমার দরবেশের নিকট না গিয়ে সোজা চলে যায় গিয়াস বিলবীসের কাছে। কাহিনীর ইতিবৃত্ত শুনিয়ে তারা বলল, 'এই ঘটনার মূল নেপথ্য নায়ক আহমার দরবেশ।'

গিয়াস বিলবীস সঙ্গে সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে পাঠান। তাকে ঘটনা শুনান হল। আহমার সাধারণ কোন ব্যক্তি নন। তারা সুলতান আইউবীকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন এবং আহমার দরবেশকে গ্রেফতার করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সুলতান আইউবী অনুমতি প্রদান করেন। গিয়াস বিলবীস ও আলী বিন সুফিয়ান কয়েকজন সেনাসদস্য নিয়ে আহমার দরবেশের বাড়িতে হানা দেয়। সমস্ত ঘরে তল্লাশি নেয়া হয়। অন্য সবকিছুর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া পুরনো সেই কাগজগুলোও পাওয়া গেল। আহমার দরবেশকে গ্রেফতার করা হল।

রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীসের সঙ্গে এক প্লাটুন সৈন্য র‍্যামন্স-এর সমাধি অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। সুলতান আইউবী নির্দেশ দেন, সমাধিটা আগে যেভাবে বন্ধ ছিল, ঠিক সেভাবেই বন্ধ করে রেখে আসবে। তিনি কাউকে ভেতরে ঢুকতে নিষেধ করে দেন। ইসমাইল তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

সুলতান আইউবীর বাহিনী সমাধি এলাকায় গিয়ে উপনীত হয়। রক্তাক্ত এক কাহিনীর জীবন্ত এক গ্রন্থ যেন এলাকাটি। এখানে লাশ, ওখানে লাশ। এখানে রক্ত, ওখানে রক্ত। রক্তের ছোঁয়ায় ম্লান হয়ে গেছে এলাকার মনোমুগ্ধকর সবুজের সমারোহ।

সুলতান আইউবীর সৈন্যরা সমাধির মুখটা পূর্বের ন্যায় সুবিশাল সেই পাথর দ্বারা বন্ধ করে দেয়। ফেরাউন র‍্যামন্স চোখের আড়ালে চলে যায় পুনর্বার। শুধু নতুন করে নিজের বুকে তুলে নেয় আরো দু'টি পাপীর লাশ।

তিন গোয়েন্দা

১১৭৪ খৃস্টবর্ষ মোতাবেক ৫৬৯ হিজরী ইসলামী দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হল না। বছরের শুরুতেই আলী বিন সুফিয়ান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে সংবাদ শোনালেন যে, আক্রায় আপনার একজন গোয়েন্দা শহীদ হয়েছে এবং অপর একজন ধরা পড়েছে। এ সংবাদ নিয়ে এসেছিল তৃতীয় অন্য এক গুপ্তচর, যে এ দু'জনের সঙ্গী ছিল। ফিরে আসা গোয়েন্দা অনেক মূল্যবান তথ্যও নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এক গোয়েন্দার শাহাদাত ও একজনের গ্রেফতারী ব্যাকুল করে তোলে সুলতান আইউবীকে।

আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন যে, সুলতান মাত্রাতিরিক্ত অস্থির হয়ে পড়েছেন। আলী জানতেন, সুলতান আইউবী হাজারো সৈনিকের শাহাদাতবরণে কখনো অস্থিরতা কিংবা মনস্তাপ প্রকাশ করেন না। কিন্তু একজন কমান্ডো বা কোন গোয়েন্দার শাহাদাতের সংবাদ তাকে ব্যাকুল করে তোলে।

তেমনি এক দুঃসংবাদে সুলতান আইউবীর সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বেদনার ছাপ দেখে আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'আমীরে মোহতারাম! আপনার চেহারা মলিন হয়ে গেলে মনে হয় যেন সমগ্র ইসলামী দুনিয়া বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। ইসলামের ইজ্জত জীবনের কুরবানী কামনা করছে। একদিন আমাদের দু'জনকেও হয়ত শহীদ হতে হবে। দু'জন গোয়েন্দা হারিয়ে গেছে, তাতে কী হয়েছে? তাদের জায়গায় অন্য দু'জন পাঠিয়ে দেব। এই ধারা তো আর বন্ধ হয়ে যাবে না।'

'গোয়েন্দা মারফত শত্রুর সংবাদ সংগ্রহের ধারা রুদ্ধ হয়ে যাবে, আমি সেই আশংকা করছি না আলী!'– ম্লান মুখে হাসি টেনে সুলতান আইউবী বললেন– 'একজন গোয়েন্দার শাহাদাত আমার মনে এই ভাবনাটা জাগিয়ে তোলে যে, একদিকে এই নিবেদিতপ্রাণ মুমিন আমাদের চোখের আড়ালে জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন ও পিতা-মাতার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থেকে দুশমনের দেশে একা দায়িত্ব পালন করছে ও জীবনদান করছে, অন্যদিকে একজন ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার নিজের বিলাস-ভবনে রাজার হালে বাস করছে, বিলাসিতা করছে এবং ইসলামের মূল উপড়ে ফেলতে শত্রুর হাতকে শক্তিশালী করছে।'

'আচ্ছা, সালার, নায়েব সালার ও সকল কমান্ডারকে একটা নিয়ম করে ওয়াজ-নসীহত করলে কেমন হয়?'- আলী বিন সুফিয়ান বললেন- 'আপনি মাসে অন্তত একবার ইসলামের মর্যাদা এবং ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াজ করুন। আমার ধারণা, দুশমনের প্রতি যাদের আকর্ষণ আছে, আপনি যদি তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, তাদের দুশমন কে এবং তাদের লক্ষ্য কী; তাহলে তাদের মনমানসিকতায় পরিবর্তন এসে যাবে।'

'না'- সুলতান আইউবী বললেন- 'একজন মানুষ যখন ঈমান বিক্রির পেশা অবলম্বন করে, তুমি তার সম্মুখে কুরআন রেখে দিলে সে পবিত্র কিতাবখানা ধরে একদিকে সরিয়ে রাখবে। একদিকে কতগুলো শব্দসম্ভার অপরদিকে অর্থ-বৈভব, নারী আর মদ। এমতাবস্থায় মানুষ শব্দসম্ভার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। শব্দ-ভাষা মানুষকে নেশা দিতে পারে না, পারে না রাজত্বদান করতে। আমাদের জাতির গাদ্দাররা শিশু নয়, অজ্ঞ-অশিক্ষিতও নয়। তারা সবাই শাসক, সেনাবাহিনী ও সরকারের উঁচুপদের লোক। তারা সাধারণ সৈনিক নয়। দুশমনের সঙ্গে মাখামাখি শাসকরাই করে থাকে। সৈনিকরা লড়ে আর মরে। আমি কাউকে ওয়াজ করব না, ভাষণ দেব না। ঘন ঘন ভাষণদানকারী শাসকরা মূলত দুর্বলমনা ও অসৎ হয়ে থাকে। তারা দেশবাসীর হৃদয় ভাষা ও ভাষণ দ্বারা জয় করার চেষ্টা করে। ঘন ঘন ভাষণ শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে। আমি ফৌজ ও কওমকে একথা বলব না যে, আমরা বিজয়ী, আমরা সুখী। আমি পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাব। তারপর পরিস্থিতিই বলবে, আমরা ধনী না গরীব, বিজয়ী না পরাজিত। ফৌজ ও জনগণ আমার নিকট খাবার চাইবে। আমি মুখের ভাষায় তাদের পেট ভরাব না। আমি গাদ্দারদের শাস্তি দেব। তাদেরকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করব। শোন আলী বিন সুফিয়ান! তুমি আমাকে বক্তৃতার জালে আবদ্ধ কর না। আমার যদি বলার অভ্যাস বেড়ে ওঠে, তাহলে আমি মিথ্যা বলতেও শুরু করব।'

মিসরে বিদ্রোহের যে আশংকা দানা বেঁধেছিল, তাকে দমন করা হয়েছে। প্রশাসনের উচ্চপদের কয়েকজন কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। দু'জন সুলতান আইউবীর নিকট এসে আত্মসমর্পণ করে অপরাধ স্বীকার করেছে এবং ক্ষমা নিয়ে নিয়েছে। সুলতান আইউবীর কথা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশে যারা গাদ্দারী ও অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়, তারা স্বার্থপূজারী শাসক হয়ে থাকে। তারাই ফৌজ ও কওমকে বিভ্রান্ত করে সুখের স্বপ্ন দেখায় এবং বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করে। ১১৭৪ সাল পর্যন্ত মিসরে বিদ্রোহের নাম-চিহ্নও ছিল না। খৃস্টানরা গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতামূলক কাজে

লিপ্ত ছিল এ-ই যা। সুলতান আইউবী খৃস্টান অধিকৃত এলাকাগুলোতে গুপ্তচর নিয়োগ করে রেখেছিলেন।

আক্রা ফিলিস্তিনের একটি এলাকা। খৃস্টানদের প্রধান পাদ্রী–খৃস্টানরা যাকে 'ক্রুশের মোহাফেজ' বলে বিশ্বাস করে– এখানে অবস্থান করেন। এখান থেকেই খৃস্টান কমান্ডাররা দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করে থাকে। এক কথায়, আক্রা খৃস্টান হাইকমান্ডের হেডকোয়ার্টার। নুরুদ্দীন জঙ্গী যখন কার্ক দুর্গ জয় করেন, তখন খৃস্টানরা এই আক্রাকে কেন্দ্র বানিয়ে সুলতান আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর হাত থেকে বাইতুল মোকাদ্দাসকে রক্ষা করার পরিকল্পনা তৈরি ও কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সেখানকার পরিস্থিতি এবং দুশমনের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সুলতান জঙ্গীকে অথবা কায়রোতে সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছানোর জন্য তিনজন গোয়েন্দা প্রেরণ করা হয়েছিল। অতিশয় নির্ভীক ও বিচক্ষণ গুপ্তচর ইমরান তাদের কমান্ডার।

তিন গোয়েন্দা অতি অনায়াসে ঢুকে যায় আক্রা। সুলতান আইউবী যখন শোবক দুর্গ ও শহর জয় করেন, তখন সেখান থেকে অসংখ্য খৃস্টান ও ইহুদী কার্ক পালিয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা যখন কার্কও জয় করে ফেলে, তখন সেখান থেকেও অমুসলিমরা পালিয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে যায়।

এই দু'টি বিজিত অঞ্চলের আশপাশের এলাকার ইহুদী-খৃস্টানরাও পালিয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শে তার কয়েকজন গুপ্তচর নির্যাতিত ও বাস্তুহারা খৃস্টানের বেশ ধারণ করে খৃস্টানদের এলাকায় চলে গিয়েছিল। তাদের তিনজনকে দায়িত্ব দেয়া হয়, তারা আক্রা থেকে খৃস্টানদের যুদ্ধ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে কায়রো প্রেরণ করবে। সেখানকার খৃস্টান বাহিনীর গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখবে, অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে মুসলিম সৈন্যদের ব্যাপারে আতংক সৃষ্টি করবে এবং এই তথ্যও সংগ্রহ করবে যে, সেখানে কী ধরনের নাশকতা পরিচালনা করা যায়।

মুসলমানদের হাতে সর্বস্বহারা খৃস্টানের বেশে আক্রা ঢুকে পড়ে তিন গোয়েন্দা। নির্যাতিত খৃস্টান হিসেবে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় পেয়ে যায় তারা। তিনজনই প্রশিক্ষিত ও অত্যন্ত বিচক্ষণ। ইমরান সোজা বড় পাদ্রীর নিকট চলে যায়। নিজেকে এমন একটি এলাকার শরণার্থী বলে পরিচয় দেয়, যেটি খৃস্টানদের ভূখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। ইমরান এমনভাবে কথা বলে, যেন তার মাথায় ধর্মীয় উন্মাদনা চেপে বসেছে এবং খোদার সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ঘুরে ফিরছে। সে পাদ্রীকে জানায়, তার স্ত্রী-সন্তানরা সবাই মুসলমানদের হাতে মারা গেছে। কিন্তু তাদের জন্য তার কোন দুঃখ নেই। অস্থিরচিত্ত ইমরান প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করে যে, সে গীর্জার সেবা

করতে চায়। সে শুনেছে, খোদা ও রূহানী শান্তি গীর্জায় পাওয়া যায়। পাদ্রী জিজ্ঞেস করলে বলে, জন্‌গন্থুর।

'আর আমি মুসলমান তো হয়েই গিয়েছিলাম। ইমরান পাদ্রীকে বলল– 'মুসলমানদের একজন মৌলভী বলেছিল, খোদা মসজিদে আছেন। আমার স্ত্রী ও সন্তানদের অভিযোগ ছিল, আমি কোন কাজ করি না– কেবল খোদা আর রূহানী শান্তি খুঁজে বেড়াই। আমি খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। তিনি খোদা-ই ছিলেন, যিনি আমার স্ত্রীকে মুসলমানদের হাতে হত্যা করিয়ে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছেন। কারণ, আমি তাকে ভাত-কাপড় দিতে পারতাম না। তিনি খোদা-ই ছিলেন, যিনি আমার সন্তানদেরকেও তুলে নিয়েছেন। কারণ, সন্তান মা ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর আমি তো তাদের খবরই নিতাম না। আমি মুসলমান হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মুসলমানরা আমার নিষ্পাপ সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলল। তারা আমার উপর অনেক অত্যাচার করে। তাতেই আমি বুঝে ফেলি, খোদা মুসলমানদের বুকে নেই, আছেন অন্য কোথাও।'

বলতে বলতে সীমাহীন আবেগপ্রবণ হয়ে উঠে ইমরান। হঠাৎ পাদ্রীর গলা জড়িয়ে ধরে দাঁতে দাঁত পিষে বলে, 'পবিত্র পিতা, বলুন! আমি পাগল হয়ে যাইনি তো? আমি আত্মহত্যা করব পবিত্র পিতা! তারপর পরজগতে আপনাকে টেনে খোদার সামনে নিয়ে যাব এবং বলব, এই লোক ধর্মগুরু ছিল না- ছিল একজন ভণ্ড। ধর্মের নামে মানুষকে ধোঁকা দিত।'

ইমরানের মানসিক অবস্থা এমন রূপ ধারণ করে যে, ক্রুশের প্রধান মোহাফেজ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি ইমরানের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুমি আমার নির্যাতিত সন্তান। খোদা তোমার নিজেরই বুকে আছেন। খোদার পুত্রের এবাদতখানায় তুমি তাকে দেখতে পাবে। এই ধর্মে এই রূপেই তুমি খোদাকে পেয়ে যাবে। এখন তুমি চলে যাও। প্রতিদিন সকালে আমার কাছে এস। আমি তোমাকে খোদা দেখাব।'

'আমি কোথাও যাব না পবিত্র পিতা'! ইমরান বলল– 'আমার কোন ঘর নেই। জগতে কেউ নেই আমার। আপনি আমাকে আপনার কাছেই থাকতে দিন। আমি আপনার এবং খোদার পুত্রের গীর্জার এত অধিক সেবা করব যে, তত সেবা আপনিও করেননি।'

ইমরান প্রশিক্ষণ পেয়েছিল আলী বিন সুফিয়ানের নিকট থেকে। তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে যেহেতু খৃস্টানদের গোপন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, সেহেতু তাদেরকে খৃস্টবাদ ও খৃস্টানদের গীর্জার আদব-কায়দা সম্পর্কে শুধু শিক্ষাই দেয়া হয়নি, রীতিমত রিহার্সেলও করান হয়েছে। ইমরান সেই মহড়াকে এমন চমৎকারভাবে বাস্তবের রূপ দেয় যে, আক্রার বড় পাদ্রী

এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং তাকে গীর্জায় থাকতে দেয়। ইমরান এত চমৎকারভাবে পাদ্রীর সেবা করতে শুরু করে যে, অল্প ক'দিনে সে পাদ্রীর খাস খাদেমে পরিণত হয়ে যায়। প্রশিক্ষণ ও বিচক্ষণতা-বুদ্ধিমত্তার বলে ইমরান পাদ্রীর অন্তর জয় করে নেয়। পাদ্রী স্বীকার করে নেন যে, লোকটি অসাধারণ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। কিন্তু আবেগ তার উপর এত প্রবলভাবে চেপে বসেছে যে, তার বুদ্ধি-মেধা লোপ পেতে শুরু করেছে। পাদ্রী ইমরানকে দীক্ষা দিতে শুরু করেন।

❁ ❁ ❁

ইমরানের এক সঙ্গী খৃস্টান এক ব্যবসায়ীর নিকট গিয়ে বলে, আমি কার্ক থেকে পালিয়ে আসা খৃস্টান। ওখানে আমার গোটা পরিবার মুসলমানদের হাতে মারা গেছে। লোকটি তার দুঃখের কাহিনী এমন আবেগময় ভঙ্গিতে বর্ণনা করে যে, তাতে প্রভাবিত হয়ে ব্যবসায়ী তাকে নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসেবে রেখে দেয়।

ইমরানের এই সঙ্গী গোয়েন্দার নাম রহীম হাঙ্গুরা। সুদানী মুসলমান। ইমরানের মতই বিচক্ষণ, সাহসী ও সুদর্শন।

রহীম এখন খৃস্টান ব্যবসায়ীর দোকানের কর্মচারী। রহীম লক্ষ্য করে, অনেক খৃস্টান অফিসার তার দোকানে আসছে এবং সওদাপাতি ক্রয় করছে। বুদ্ধিমত্তা ও প্রশিক্ষণের জোরে রহীম ব্যবসায়ীর বিশ্বস্ত কর্মচারীতে পরিণত হয়।

কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ব্যবসায়ী তাকে দিয়ে বাসার কাজও করাতে শুরু করে। আইলীমুর নামক খৃস্টান ব্যবসায়ীর বাসায়ও আনাগোনা শুরু হয়ে যায় রহীমের। বাসার লোকদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে ফেলে রহীম হাঙ্গুরা। ব্যবসায়ীর স্ত্রী, যুবতী কন্যা ও পুত্রদের কাছে রহীম নিজের বিপদের কাহিনী এমনভাবে বিবৃত করে যে, শুনে তাদের প্রত্যেকের চোখে পানি এসে যায়। রহীম তাদেরকে জানায়, আমার ঘরও আপনাদের ঘরের ন্যায় বিলাসবহুল ছিল। ছিল উন্নত জাতের ঘোড়া। ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে রহীম বলে, আমার ছিল আপনার এই কন্যারই মত অতিশয় রূপসী যুবতী বোন। প্রয়োজনীয় চাকর-চাকরানী ছাড়াও ছিল এমন অনেক কর্মচারী, যাদেরকে শুধু বিপদগ্রস্থ বলে আশ্রয় দেয়া হয়েছিল। রহীম চোখের পানি মুছতে মুছতে কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলে, আর আজ আমি অন্যের ঘরে নোকরী করছি।

ব্যবসায়ীর ষোড়শী কন্যা আইলসন। অতিশয় রূপসী। রহীমের বক্তব্যে অন্যদের তুলনায় বেশী প্রভাবিত হয় মেয়েটি। রহীমকে তার বোন সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করে। খুটিয়ে খুটিয়ে এ-কথা ও-কথা নানা বিষয় জানতে চায়। রহীম বলে, 'আমার বোনটি ঠিক তোমারই ন্যায় ছিল, যেন তুমিই। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার তার কথা বেশী বেশী মনে পড়ছে। বোনটি মরে গেলেও দুঃখ করতাম না। দুঃখের বিষয় হল, ওকে মুসলমানরা তুলে নিয়ে গেছে। তুমি বুঝতে পারবে, ওর কী পরিণতি ঘটেছে! এখন আমার একটাই ভাবনা, বোনকে মুসলমানদের হাত থেকে কিভাবে উদ্ধার করব। বিষয়টি মনে পড়লে অনেক সময় আমি পাগলের মত হয়ে যাই, মন চায় বোনকে যেখান থেকে হারিয়েছি, সেখানে ছুটে যাই। কিন্তু আবার ভাবি, তাতে কী হবে? ওখানে গেলে বোন তো পাব না, পাব মৃত্যুকে। আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।' বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে রহীমের। দু'চোখ তার বাষ্পাচ্ছন্ন।

মা-মেয়ে বোধ হয় চিন্তা করেছে যে, এমন সুশ্রী যুবক ভরা যৌবনেই দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত। তার আবেগময় অবস্থা-ই প্রমাণ করছে, তার দুঃখ যদি হাল্কা করা না যায়, তাহলে লোকটি পাগল হয়ে যেতে পারে কিংবা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে। ব্যবসায়ীর অবিবাহিত রূপসী কন্যা আইলসন হৃদয় দিয়ে রহীমের দুঃখ অনুভব করতে শুরু করে। রহীমের বেদনা নিজেকেও বেদনাহত করেছে বলে মনে হয় তার। প্রথম দিনেই রহীমের প্রতি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে আইলসন।

নিজের দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে রহীম যখন ব্যবসায়ীর ঘর থেকে বের হয়, তখন এক বাহানায় আইলসন ছুটে এসে রহীমের পথ আগলে দাঁড়ায় এবং বলে, আপনি আমাদের বাসায় প্রতিদিন আসা-যাওয়া করবেন। মেয়েটি সান্ত্বনামূলক কিছু কথা বলে রহীমের দুঃখের বোঝা হাল্কা করার চেষ্টা করে।

রাতে ব্যবসায়ী ঘরে ফিরলে মা-মেয়ে দু'জনই ছেলেটার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার কথা বলেন। রহীমের চেহারা-গঠন এমন যে, দেখতে তাকে কোন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পরিবারের সন্তান বলে মনে হয়। ত্রুটি যদিও কিছু আছে, সেটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তার ব্যবহার আর চালচলনে। আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে চলেছে রহীম হাঙ্গুরা।

তিন-চারদিন পর। রহীম হাঙ্গুরা তার মালিকের কাছে উপবিষ্ট। এমন সময় সে তার এক সঙ্গীকে দেখতে পায়। তার নাম রেজা আলজাদা। রহীম উঠে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে। দু'জন পাশাপাশি হাঁটছে আর কথা বলছে। রহীম রেজাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কী করছ? রেজা জানায়, আমি এখনো কোন আশ্রয় পায়নি।

রেজা অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ার। ঘোড়া প্রতিপালনেও তার বেশ দক্ষতা আছে। রহীম তাকে নিজের মালিকের কাছে নিয়ে এসে ফ্রান্সিস নামে পরিচয়

করিয়ে দেয়। বলে, এ আমার বন্ধু, আমারই ন্যায় মজলুম। একটা চাকরির প্রয়োজন। রহীম মালিককে এ-ও জানায় যে, তার বন্ধু ঘোড়া প্রতিপালনে খুবই অভিজ্ঞ। ব্যবসায়ী বলল, ঠিক আছে, আমার কাছে তো অনেক অফিসারের আসা-যাওয়া আছে; দেখি, তাদের মাধ্যমে ফ্রান্সিসকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি কিনা।

দু-তিনদিন পর এমন একটি আস্তাবলে রেজার চাকরি হয়ে যায়, যেখানে খৃস্টান ফৌজের বড় বড় অফিসারদের ঘোড়া থাকে।

খৃস্টানদের অনেক সেনা অফিসার আসা-যাওয়া করে রহীমের মালিকের কাছে। সেও যাওয়া-আসা করে তাদের কাছে। রহীম দেখতে পায়, তার মালিক অফিসারদেরকে মদ-হাশীশ ছাড়াও লুকিয়ে লুকিয়ে নারী সরবরাহ করছে। এই সূত্রেই সামরিক অফিসারদের মুঠোয় করে রেখেছে ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়ীকে রহীম সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে চলেছে। সে আকাঙ্খা ব্যক্ত করে যে, খৃস্টান ফৌজ সমগ্র আরব ও মিসর দখল করে নিক, কোন মুসলমান জীবিত না থাকুন এবং পৃথিবীর বুক থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। এ জাতীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে রহীম এমন ব্যাকুল ও আত্মহারা হয়ে উঠছে, যেন সে আক্রার মুসলমানগুলোকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। তাদের রক্ত পান করবে। ব্যবসায়ী তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন যে, খৃস্টান ফৌজ তার এই খায়েশ পূরণ করবে। রহীম খৃস্টান বাহিনীর ঐসব অফিসারদেরকেও মন্দ বলতে শুরু করে, যারা আক্রায় বসে বসে আয়েশ করছে।

এসব আবেগময় কথাবার্তার পাশাপাশি রহীম বুদ্ধিমত্তার কথাও বলতে থাকে এবং মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য এমন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব করে যে, ব্যবসায়ী তাকে অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান বলে ভাবতে শুরু করে। রহীমের এই আবেগ ও বুদ্ধিমত্তার জন্যই ব্যবসায়ী তাকে খৃস্টানদের যুদ্ধ পরিকল্পনা সংক্রান্ত ভেদ জানাতে শুরু করে। সেনা অফিসারদের সঙ্গে উঠাবসা থাকার কারণে ব্যবসায়ী সামরিক বিষয়ে অনেক তথ্যই জানে।

ব্যবসায়ীর রূপসী কন্যা আইলসনের সখ্য গড়ে উঠে রহীমের সাথে। রহীমও নিজের মনে আসক্তি অনুভব করে আইলসনের প্রতি। রহীম মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখে, দায়িত্ব পালন শেষে আইলসনকে সঙ্গে করে কায়রো যাবে। মেয়েটাকে বিয়ে করবে মুসলমান বানিয়ে। মন দেয়া-নেয়া চলছে দু'জনের মধ্যে। কিন্তু দু'জনের একজনও জানে না, খৃস্টান ফৌজের বড় এক অফিসার নজর রাখছে আইলসনের প্রতি।

রেজা আলজাদাও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর। তার আস্তাবলে ঘোড়া রাখেন,

এমন একজন পদস্থ অফিসারের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে আলাপ হয় তার। কথাবার্তা শুনে অফিসার আন্দাজ করে, ছেলেটা অসাধারণ, বেশ বুদ্ধিমান। মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে দু'জনের মধ্যে। অফিসারের সঙ্গে আগ বাড়িয়েও কথা বলতে পারছে রেজা। একদিন রেজা অফিসারকে জিজ্ঞেস করে, 'সালাহুদ্দীন আইউবীকে আপনারা কবে নাগাদ পরাস্ত করবেন?' তারপর সে অফিসারের আপন হয়ে আইউবীর সৈন্যদের কি কি গুণ আছে এবং খৃস্টান সৈন্যদের কি কি ত্রুটি আছে তার বিবরণ দেয়। একদিন অফিসারকে এমন কিছু কথাবার্তা শোনায়, যা একজন যুদ্ধাভিজ্ঞ লোক ছাড়া বলতে পারে না। অফিসার খানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি আসলে কে?' ঘোড়া প্রতিপালন করা তো তোমার পেশা হতে পারে না!'

'সহিসী আমার পেশা, আপনাকে কে বলল?' রেজা জবাব দেয়– 'আমি কার্কে অনেকগুলো ঘোড়ার মালিক ছিলাম। আমি নিজে ফৌজে ছিলাম না বটে; আমার দু'টি গোড়া যুদ্ধে গিয়েছিল। এটা কালের চক্র স্যার! কালের চক্রেই আমি ঘোড়ার মালিক আজ আপনাদের আস্তাবলে সহিসীর চাকুরী করছি। তবে তার জন্য আমার দুঃখ নেই। আপনি যদি সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করতে পারেন, তাহলে জীবনের বাকী দিনগুলো আমি আপনার জুতা পরিষ্কার করে কাটিয়ে দেব।'

'পরাজয় সালাহুদ্দীন আউইবীর লিখন হয়ে গেছে ফ্রান্সিস!' রেজাকে বললেন অফিসার।

'কিন্তু কিভাবে?'– সুযোগ পেয়ে প্রশ্নটা করে ফেলল রেজা– 'আমাদের সম্রাটগণ যদি কার্ক ও শোবকের উপর আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে সেই পদ্ধতিতে অবরুদ্ধ করে পরাজিত করার চেষ্টা করেন, যে পদ্ধতিতে তারা আমাদেরকে পরাজিত করেছিল, তাহলে আপনারা সফল হতে পারবেন না। সালাহুদ্দীন আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গী যুদ্ধের ওস্তাদ। আমি শুনেছি, তারা নাকি আমাদের বাহিনীকে দুর্গ থেকে দূরে প্রতিহত করার আয়োজন করে রেখেছে। ভাল হবে, যদি আক্রমণটা এমন একদিক থেকে করা হয়, যেদিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে বলে আইউবী কল্পনাও করে না। আইউবী ও জঙ্গী দুর্গে বসে থাকুক, আপনারা মিসরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন।'

'এমনই তো হবে'– অর্থবহ মুচকি হেসে অফিসার বললেন– 'সমুদ্রে কোন দুর্গ থাকে না। মিসরের উপকূলেও কোন দুর্গ নেই। মিসরে এখন ক্রুশেরই রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে ফ্রান্সিস।'

প্রথম তথ্যটি সংগ্রহ করল রেজা। তারপর সেই অফিসারের নিকট থেকে আরো অনেক তথ্য জেনে নেয় সে। যুদ্ধের ভেদ বিস্তারিত প্রকাশ করে না

কেউ। ইঙ্গিত থেকেই জেনে নিতে হয় অনেক কিছু। 'ই' বললে 'ইদরীস' বুঝতে হয়। একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী গোয়েন্দার পক্ষে তা কোন ব্যাপারই নয়। একটি ইশারাকে নিজের যোগ্যতা বলে এক বিশাল কাহিনীর রূপ দিতে পারে অভিজ্ঞ গুপ্তচর।

✿ ✿ ✿

রহীম ও রেজা প্রতি রোববার সকালবেলা গীর্জায় গিয়ে ইমরানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে এবং আগের দিনের রিপোর্ট প্রদান করছে। রহীম ইমরানকে অবহিত করে রেখেছিল যে, তার মালিকের মেয়ে আইলসন তাকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে শুরু করেছে। ইমরান তাকে বলে দেয়, 'তুমি তার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান কর না; অন্যথায় তুমি ওখানে থাকতে পারবে না। তবে সাবধান! তুমি আবার মেয়েটির ভালবাসায় হারিয়ে যেও না।'

কিন্তু ঘটনা সেদিকেই গড়াচ্ছিল। রহীম আইলসনের রূপ-যৌবনে হারিয়ে যেতে শুরু করল। মেয়েটি রহীমকে এমনও বলে দিয়েছিল যে, তোমার-আমার বিয়ে হতে হলে আমাদেরকে আক্রা থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। কারণ, একজন সেনা অফিসার আমাকে পাওয়ার জন্য আমার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়েছে। কিন্তু রহীম ইমরানকে এতকিছু অবহিত করেনি।

ইমরান এখন পাদ্রীর ঘনিষ্ঠ শিষ্য। পাদ্রীর ভেদ-রহস্য সবই রহীমের জানা হয়ে যায়। অবসর সময়ে ইমরানকে ধর্মের দীক্ষা প্রদান করছেন পাদ্রী। তিনি ইমরানকে সবক দিচ্ছেন যে, খৃস্টবাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল, ভূপৃষ্ঠ থেকে ইসলামের অস্তিত্ব মুছে ফেলা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য খৃস্টানদের লড়াই করতে হবে এবং যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটা জরুরী নয় যে, মুসলমানদেরকে মেরে ফেলতে হবে। প্রথমত তাদেরকে খৃস্টান বানাবার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করার পরও যাদেরকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা সম্ভব হবে না, তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে ইসলামকে সরিয়ে দিতে হবে। তার উপায় হল, তাদের মধ্যে অপকর্মের বীজ বপন করতে হবে। এ-কাজের জন্য মেয়েদেরকে ব্যবহার করতে হবে। আমাদের মেয়েরা মুসলিম মেয়েদের মধ্যে অপকর্ম ছড়িয়ে দেবে, মুসলিম যুবক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চরিত্র ধ্বংস করবে। যেহেতু ইহুদীরাও মুসলমানদের দুশমন এবং তারা তাদের মেয়েদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, সেহেতু মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের জন্য ইহুদী মেয়েদেরকেও কাজে লাগাতে হবে। আমাদের লক্ষ্য থাকবে একটাই- মুসলমানদের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলা। তারপর এর জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করা। অন্যের দৃষ্টিতে হোক তা অবৈধ, নিপীড়নমূলক, লজ্জাকর।

ইমরান পাদ্রীর মুখ থেকে এসব কথা শুনছে আর স্বস্তি প্রকাশ করছে।

পাদ্রীর আস্তানায় সামরিক ও প্রশাসনিক অফিসাররাও আসা-যাওয়া করছে। সে দিনগুলোতে যেহেতু খৃস্টানদের একের পর এক ময়দান থেকে পরাজিত হয়ে পালাতে হচ্ছিল, সে কারণে আক্রায় যে কারো মুখে একই প্রশ্ন বিরাজ করছিল যে, জবাবী হামলা কবে হবে। পাদ্রীর আস্তানায় ও এর বাইরে অন্য কোন আলোচনা নেই। ইমরান সেখান থেকে মূল্যবান তথ্য হাসিল করে চলেছে। সে এও জেনে ফেলেছে যে, খৃস্টান সম্রাটদের মধ্যে একতা নেই। প্রত্যেকের কাছে নিজ নিজ রাজত্বই মুখ্য। কিন্তু যেহেতু তাদের প্রত্যেকের ধর্ম এক, তাই ক্রুশের উপর হাত রেখে তারা ইসলাম নির্মূলের যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। অন্যথায় ভেতরে ভেতরে তারা বিভক্ত। কেউ কেউ এমনও আছে, তারা একদিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, অন্যদিকে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন সিজার ম্যানুয়েল, যিনি এক ময়দানে নুরুদ্দীন জঙ্গীর সঙ্গে সন্ধি করে জরিমানা আদায় করেছেন এবং মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন তিনি অন্যান্য সম্রাটদের উত্তেজিত করছেন, যেন সবাই মিলে সুলতান জঙ্গীর উপর আক্রমণ চালায়। তার পরামর্শ, আমাদের আক্রমণ অভিযানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হোক; একটি জঙ্গীর উপর অপরটি মিসরের উপর। সুলতান জঙ্গী তখন কার্কে অবস্থান করছিলেন।

এ কারণে অনেক সম্রাটের উপরই পাদ্রীর আস্থা ছিল না। তাদের দু-মুখো নীতির জন্য তিনি বেজায় অস্থির। ইমরান ইচ্ছে করলে বলতে পারে, 'যে জাতি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদের মেয়েদেরকে যা-তা কাজে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না, সে জাতির সম্রাটরা একে অপরকে ধোঁকা দিবে তাতে বিচিত্র কী? ময়দানে পরাজিত হয়ে যে জাতি আন্ডারগ্রাউন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সে জাতির চারিত্রিক অবস্থা তো এমন হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পরস্পর পরস্পরকে ধোঁকা দিয়েই বেড়াবে।' কিন্তু ইমরান প্রসঙ্গটা এড়িয়ে। সে এ কথাটা সুলতান আইউবীকে বলার জন্য মুখস্ত করে রেখেছে যে, যদি ইসলামের সারিতে গাদ্দার না থাকত, তাহলে খৃস্টানদেরকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে তাদের থেকে ইউরোপকেও ছিনিয়ে নেয়া সম্ভব হত। গাদ্দারীই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ঘাতক। আক্রার পাদ্রী ও খৃস্টান সম্রাটগণ মুসলমানদের এই দুর্বলতায় অত্যন্ত আনন্দিত। এখানে অবস্থান করে ইমরান জানতে পারে, খৃস্টানরা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের অভিযান আরো জোরদার করেছে। সে মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সেই শাসকদের নামও সংগ্রহ করে নেয়, যারা তলে তলে খৃস্টানদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে এবং খৃস্টানরা তাদেরকে ইউরোপের মদ, নারী ও অর্থ সরবরাহ করছে।

ইমরান ও রেজা দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু ধীরে ধীরে কর্তব্য থেকে সরে যাচ্ছে রহীম হাঙ্গুরা। এখন তার চেষ্টা, দোকান ছেড়ে কিভাবে ব্যবসায়ীর ঘরে কাজ নেয়া যায়। আইলসনের ভালবাসা তাকে অন্ধ করে চলেছে।

দিনকয়েক পর আইলসন রহীমকে জানায়, তার তিনগুণ বয়সী এক সেনা অফিসারের সঙ্গে তার বিবাহ হচ্ছে। বয়সের এত ব্যবধান না হলেও আইলসন রহীম ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি নয়। মাকে সে জানিয়েও দিয়েছে যে, অফিসারকে সে বিয়ে করবে না। কিন্তু তার পিতা তা মানতে রাজি নয়। এই সেনাঅফিসারকে দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে সে। তার সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য। একদিন আইলসন তার গলার ক্রুশটা খুলে রহীমের হাতে দিয়ে তার উপর নিজের হাত রেখে ক্রুশের শপথ করে বলল, আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করব না। রহীমও শপথ করে, আমিও তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

❁ ❁ ❁

একদিন চার-পাঁচজন সেনা অফিসার পাদ্রীর নিকট আগমন করেন। পাদ্রী তাদেরকে তার খাস কামরায় নিয়ে বসান। ইমরান তাদের মুখের ভাব দেখে বুঝে ফেলে, বিশেষ কোন কথা আছে নিশ্চয়ই। সে পাদ্রীর কক্ষে ঢুকে পড়ে। তাকে দেখামাত্র যে অফিসার কথা বলছিল, তিনি কথা বন্ধ করে দেন। পাদ্রী ইমরানকে বললেন, 'জনগন্থর! তুমি এ সময় কক্ষে ঢুকবে না; আমরা একটা জরুরী আলাপ করছি।'

ইমরান বের হয়ে পাশের কক্ষে চলে যায় এবং দেয়ালের সঙ্গে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অফিসার কথা বলছেন ক্ষীণ কণ্ঠে। তবু কাজের কথাগুলো ইমরান বুঝে ফেলে। মিটিং শেষ হওয়ার পর অফিসাররা যখন বের হতে শুরু করেন, তখন ইমরান সরে অন্যত্র চলে যায়। পাদ্রী বা অন্য কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

গুরুত্বপূর্ণ আরো তথ্য পেয়ে গেছে ইমরান। সে সিদ্ধান্ত নেয়, এক্ষুণি সে পালিয়ে যাবে। অবিরাম পথ চলে কায়রো পৌঁছে সুলতান আইউবীকে সংবাদ দেবে যে, আপনি আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি গ্রহন করুন। কিন্তু পাদ্রী তাকে ডেকে নিয়ে এমন একটি কাজে জুড়িয়ে দেন যে, তৎক্ষণাৎ পালানো আর তার পক্ষে সম্ভব হল না। তাছাড়া যাওয়ার আগে তাকে রহীম ও রেজার নিকট থেকেও তথ্য নিতে হবে। এমনও হতে পারে, আজ সে যে তথ্য লাভ করল, তারাও তা পেয়ে থাকবে। এভাবে সকলের দ্বারা সত্যায়িত হলে তিনজন একত্রেই আক্রা থেকে বেরিয়ে যাবে। এর জন্য তাকে চারদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাচ্ছে না ইমরানের ব্যাকুল মন।

পরদিন রেজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায় ইমরান। রেজাকে সে তার আস্তাবলেই পেয়ে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করে, নতুন কোন তথ্য পেয়েছ কি? রেজা জানায়, আমি অস্বাভাবিক একটা তৎপরতা লক্ষ্য করছি। উড়ো উড়ো শুনেছি, খৃস্টানরা জবাবী আক্রমণ স্থলপথে করবে না। মনে হচ্ছে, তারা সমুদ্রপথে হামলা চালাবে। এখন আমাদেরকে তাদের আক্রমণের বিস্তারিত পরিকল্পনা জানতে হবে।

ইমরান রেজাকে জানায়, খৃস্টানরা এই আক্রমণকে চূড়ান্ত অভিযানের রূপ দিতে চায়। নিজে যা কিছু শুনেছে, তা রেজাকে শুনিয়ে দেয় এবং বিস্তারিত জানার জন্য তাকে দায়িত্ব দেয়। বিস্তারিত তো জানাই আছে ইমরানের। কিন্তু রেজাকে বিষয়টা সত্যায়ন করাতে চাইছে সে। ইমরান রেজাকে জানায়, আমি দু'একদিনের মধ্যে এখান থেকে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কর্তব্য আমার পালন হয়ে গেছে। বাহনের জন্য তিনটি ঘোড়া বা উটের প্রয়োজন। কোথাও হতে চুরি করে সংগ্রহ করতে হবে এগুলো।

রহীমের নিকটও যাওয়া আবশ্যক ইমরানের। চলে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের কথা জানিয়ে দেয়া দরকার তাকেও। কিন্তু রাত অনেক হয়ে গেছে। তাছাড়া তার কাছে যেতেও চাচ্ছে না ইমরান। কারণ, ব্যবসায়ী রহীমকে থাকার জন্য যে জায়গা দিয়েছে, সেখানে যাওয়া ইমরানের জন্য ঠিক নয়। ইমরান গির্জায় চলে যায়।

রহীমের উদ্দেশ্যে গেলেও তাকে পেত না ইমরান। নিজ ঠিকানায় ছিলও না সে। ছিল না আক্রার কোথাও। ইমরান যখন তার কর্তব্য নিয়ে অস্থির, সে সময় আইলসন রহীমকে ব্যস্ত করে রেখেছে অন্য ব্যাকুলতায়।

সে রাতে খৃস্টানদের নাচ-গান ও ভোজসভার আয়োজন ছিল। যে বয়সী অফিসার আইলসনকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল, সে মেয়েটিকে তার সঙ্গে নৃত্য করার আহ্বান জানায়। কিন্তু আইলসন তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে অন্য যুবক অফিসারদের সঙ্গে নৃত্য করে। অফিসার আইলসনের পিতার কাছে নালিশ করে। পিতাও সেই আসরে উপস্থিত ছিল। পিতা মেয়েকে শাসিয়ে দেয় যে, তুমি তোমার পাণিপ্রার্থীকে অপমান কর না, যাও তার সঙ্গে গিয়ে নাচ। আইলসন রাগ করে আসর ত্যাগ করে চলে যায় এবং পিতাকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে আসে যে, আমি এই বুড়োটাকে বিয়ে করব না।

ক্ষুণ্নমনে কিছুক্ষণ চুপ থেকে আইলসনের পিতা ও বুড়ো অফিসার আইলসনের পেছন পেছন ছুটে। মেয়েটি এতক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে। দু'জন ঘরে গিয়ে দেখতে পায়, মেয়ে ঘরে নেই। তালাশ করে মেয়েকে রহীমের কক্ষে পায়। সে মেয়েকে জিজ্ঞেস করে, তুমি এখানে কি করছ? মেয়ে

বিরক্ত হয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দেয়, আমি যথায় ইচ্ছে যাব; আপনি তাতে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন! আইলসনের কথায় তার পাণিপ্রার্থী বুড়ো অফিসারের মনে সন্দেহ জাগে। ব্যবসায়ী তার মেয়েকে ঘরে নিয়ে যায়। অফিসার রহীমকে জিজ্ঞেস করে, 'ঐ মেয়েটি এখানে কেন এসেছিল?' রহীম উত্তর দেয়, 'এসেছে তো আপনার কী?' ও এখানে অতীতেও এসেছে, ভবিষ্যতেও আসবে!' অফিসার রহীমকে ধমকি দিয়ে বলে, 'তুই এখান থেকে চলে যাবি; অন্যথায় আমি তোকে জ্যান্ত রাখব না। রহীমের দেহেও যৌবনের রক্ত প্রবাহমান। সেও মুখের উপর জবাব দেয়। কথা কাটাকাটি হয় দু'জনের মধ্যে। আইলসনের পিতা এসে দু'জনকে শান্ত করে। শেষে অফিসার ব্যবসায়ীকে উদ্দেশ করে আদেশের সুরে বলে, 'আমি এই লোকটাকে এখানে আর এক দণ্ডও দেখতে চাই না।'

পরদিন রহীমকে ডেকে নিয়ে ব্যবসায়ী বলল, 'তোমার আর এখানে চাকুরী করা হবে না। তুমি নিজের পথ দেখ। সেনাবাহিনীর এতবড় একজন অফিসারকে অসন্তুষ্ট করে আমি আমার ব্যবসা লাটে উঠাতে চাই না। আর দেরী না করে তুমি এখান থেকে চলে যাও। অফিসার ইচ্ছে করলে তোমাকে বিনা দোষেও কয়েদখানায় পাঠাতে পারতেন।'

কী উদ্দেশ্যে এই খৃস্টান এলাকায় আসা, ভুলে গেছে রহীম। খৃস্টান মেয়ে আইলসনই এখন জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, চাওয়া-পাওয়া তার। যতসব মান-মর্যাদা আইলসনকে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। অফিসার তাকে ধমকি দিল, এই অপমানের বাস্তব জবাব দিতে চাইছে সে। প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর রহীম।

ব্যবসায়ী প্রতিদিনের মতো দোকানে চলে যায়। রহীম যায় তার মালিকের ঘরে। দেখা করে আইলসনের সঙ্গে। তারা উভয়ে শলাপরামর্শ করে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পালানোর সময় ঠিক করা হয় সন্ধ্যায়।

রাতে যখন ইমরান রেজার নিকট বসে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঠিক করছিল এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও কর্তব্য পালনের অঙ্গীকার করছিল, তখন রহীম আইলসনের অপেক্ষায় শহরের বাইরে এক নির্জন এলাকায় অপেক্ষমান। আইলসন রহীমকে বলে দিয়েছিল, সে তার বাবার ঘোড়া নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হবে, পরে একসাথে দু'জনে ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যাবে। অধীর অপেক্ষমান রহীম চিন্তা করছিল, আইলসন তার বাবার অগোচরে কি করে ঘোড়া নিয়ে আসবে।

আইলসন ঘোড়া চুরি করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। আইলসনকে দেখে রহীম বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, সে এত সহজেই এসে পড়বে।

ক্ষীপ্রগতিতে ছুটে এসে নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে যায় ঘোড়াসহ আইলসন। রহীম ঘোড়ার পিঠে আইলসনের পেছনে এক লাফে চড়ে বসে। ঘোড়া চলতে শুরু করে। বেশ কিছুদূর চলার পর ঘোড়ার গতি কিছুটা কমিয়ে দেয় আইলসন। পরে আবার বাড়িয়ে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আক্রা অতিক্রম করে বেশ দূরে চলে যায়।

❀ ❀ ❀

মধ্যরাত নাগাদ রহীম ও আইলসন এমন এক স্থানে এসে ঘোড়া থামায়, যেখানে পানি আছে। উদ্দেশ্য ঘোড়াকে পানি পান করাবেন এবং নিজেরাও কিছুটা বিশ্রাম করবে। রহীমের জানা আছে, সামনে বহুদূর পর্যন্ত পানি পাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত যে, এখন আর তাদের নাগাল কেউ পাবে না। রহীম আইলসনকে বলল, 'কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও; শেষ রাতের আঁধারীতে আবার আমরা রওনা হয়ে যাব।'

'তুমি কি বাইতুল মুকাদ্দাসের পথ চেন?' জিজ্ঞেস করে আইলসন।

আক্রা থেকে পালিয়ে আসার আগে তারা স্থির করেনি তারা কোথায় গিয়ে উঠবে। বাইতুল মোকাদ্দাসের কথা উল্লেখ করায় রহীম বলল, 'বাইতুল মোকাদ্দাস কেন? আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব, যেখানে তোমাকে ধাওয়া করার কেউ সাহস পাবে না।'

'কোথায় সেই জায়গা?' আইলসন জিজ্ঞেস করে।

'মিসর।' রহীম উত্তর দেয়।

'মিসর?'– একরাশ বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করে আইলসন– 'ও তো মুসলমানের দেশ। ওরা আমাদেরকে জ্যান্ত রাখবে না।'

'মুসলমানদেরকে তুমি চিন না আইলসন!'– রহীম বলল– 'মুসলমান বড় হৃদয়বান; তুমি গিয়েই দেখতে পাবে।'

'না'– ভয়ার্ত কণ্ঠে আইলসন বলল– 'মুসলমান নাম শুনলে আমার ভয় লাগে। শিশুকাল থেকেই আমি জানি, মুসলমান এক ঘৃণ্য ও হিংস্র জাতি। আমাদের এলাকায় মায়েরা শিশুদেরকে মুসলমানের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ায়। আমি মুসলমানকে ঘৃণা করি।'

মিসর ও মুসলমান নাম শুনে আইলসন সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে যায়। সে রহীমের আরো কাছে এসে বসে। বলে, 'তুমি আমাকে বাইতুল মোকাদ্দাস নিয়ে চল। ওখানে গিয়ে আমরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হব। কোন্‌দিকে বাইতুল মোকাদ্দাস? আমি দিকটা ভুলে গেছি।'

'আমি মিসরের দিকে যাচ্ছি।' রহীম বলল।

আইলসন বিগড়ে যায় এবং কাঁদতে শুরু করে।

'তুমি কি মুসলমানদেরকে ঘৃণা কর?' জিজ্ঞেস করে রহীম।

'অনেক।' জবাব দেয় আইলসন।

'আর আমাকে কি ভালবাস?'

'অনেক।' উত্তর দেয় আইলসন।

'যদি বলি, আমি মুসলমান, তাহলে তুমি কি করবে?'

'আমি হাসব'- আইলসন জবাব দেয়- 'তোমার রসিকতা আমার কাছে বেশ ভাল লাগছে।'

'আমি রসিকতা করছি না আইলসন।'- গম্ভীর কণ্ঠে রহীম বলল- 'আমি সত্যি সত্যিই বলছি, আমি মুসলমান। তোমার ভালবাসাই আমাকে এত ত্যাগ স্বীকার করতে বাধ্য করেছে! আমি সন্তুষ্টচিত্তেই তোমার জন্য এই কুরবানী বরণ করে নিয়েছি।'

'কিরূপ কুরবানী?' আইলসন জিজ্ঞেস করে- 'তুমি তো পূর্ব থেকেই আশ্রয়হীন; এখন না আমরা ঘর বাঁধব, সংসার করব!'

'না, আইলসন!'- রহীম বলল- 'আমি এখন আশ্রয়হীন হয়েছি। তুমি নিজের ঘর থেকে পালিয়েছ। আমাকে বিবাহ করে নতুন করে সংসার করবে। কিন্তু আমার আর কোন ঠিকানা হবে না। আমি কর্তব্য থেকে পালিয়ে আসা মানুষ, আমি আমার বাহিনীর দলত্যাগী সৈনিক। আমি গোয়েন্দা। আক্রায় গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিলাম। কিন্তু তোমার প্রেমের বেদীতে বলি দিয়েছি আমার সব দায়িত্ব-কর্তব্য।'

'তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ'- মুখে হাসি টেনে আইলসন বলল- 'চল, শুয়ে পড়ি; রাত পোহাবার আগেই আমি তোমাকে জাগিয়ে তুলব।'

'আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না আইলসন।' বলল রহীম- 'আমার নাম রহীম হাঙ্গুরা। আইলসন! আমি তোমাকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রাখতে চাই না। তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি তোমাকে যেখানেই রাখব, শান্তিতে রাখব। আমি তোমাকে তোমার পিতার ঘরের রাজত্ব দিতে পারব না ঠিক, তবে তোমাকে আমি কষ্ট পেতে দেব না। তোমার জীবন শান্তিতেই কাটবে।'

'আমাকে কি মুসলমান হতে হবে?' জিজ্ঞেস করে আইলসন।

'তাতে অসুবিধা কি?' রহীম জবাব দেয়- 'তুমি ওসব ভেব না। শুয়ে পড়। আমাদের সফর অনেক দীর্ঘ। সামনে কথা বলার প্রচুর সময় পাব।'

রহীম শুয়ে পড়ে। শুয়ে পড়ে আইলসনও। কিছুক্ষণের মধ্যেই আইলসন রহীমের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পায়। আইলসনের চোখে ঘুম আসছে না। গভীর চিন্তায় হারিয়ে যায় সে।

✿ ✿ ✿

রহীমের যখন ঘুম ভাঙ্গে, তখন ভোর হয়ে গেছে। সজাগ হওয়া মাত্র ধড়মড় করে উঠে বসে। এতক্ষণ পর্যন্ত তার ঘুমানো ঠিক হয়নি, কথাও এমন ছিল না। চোখ খুলে এদিক-ওদিক তাকায় রহীম। কিন্তু একি! ঘোড়াও নেই, আইলসনও নেই।

রহীম বসা থেকে উঠে দাঁড়ায়। আশপাশে ঘুরে একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে দূরপথে দৃষ্টিপাত করে। বিরান মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ছে না। আইলসনের নাম ধরে সজোরে ডাক দেয় রহীম। কোন জবাব নেই। একঝাঁক চিন্তা এসে চেপে ধরে রহীমকে। ভাবনার সাগরে তলিয়ে যায় সে।

রহীমের মনে সন্দেহ জাগে, হয়ত কেউ পশ্চাতে তাদের ধাওয়া করেছিল। এসে আইনসনকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু তা-ই যদি হবে, তাহলে রহীমকে জীবিত রেখে যাওয়ার কথা নয়। কেউ আসলে তো তাকে হত্যা করে ফেলত কিংবা অপহরণের দায়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যেত। আইলসনকে তারা এত সঙ্গোপনে তুলে নিয়ে যাবে, অথচ সে টের পাবে না– এটা তার কাছে বিস্ময়কর ঠেকে! আবার এও হতে পারে যে, আইলসন নিজেই পালিয়ে গেছে। মুসলমান পরিচয় দেয়ার কারণে মেয়েটি হয়ত তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে।

আইলসনকে কেউ তুলে নিয়ে যাক কিংবা সে নিজেই চলে যাক, একটি প্রশ্ন রহীমকে অস্থির করে তুলেছে যে, এখন সে যাবে কোথায়? আক্রা ফিরে যাওয়া তো আশংকামুক্ত নয়। কায়রো গেলেও ভয়। কারণ, রহীম তার কর্তব্য থেকে পালিয়ে এসেছে। কমান্ডার ইমরানকে তো আর বলে আসেনি যে, সে চলে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে একটি অজুহাত ঠিক করে নেই রহীম। সিদ্ধান্ত নেয়, এখন সে কায়রোর পরিবর্তে কার্কে চলে যাবে। গিয়ে বলবে, ওখানকার খৃস্টানরা টের পেয়ে গেছে যে, আমি মুসলমান এবং গুপ্তচর। তাই অনেক কষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। ইমরান বা রেজাকে সংবাদ বলে আসার সুযোগও পাইনি। বেশ চমৎকার বাহানা। রহীম নিশ্চিত, এই কাহিনী বিবৃত করলে কেউ বলবে না যে, প্রমাণ দাও, সাক্ষী আন।

রহীম কয়েক ঢোক পানি পান করে কার্ক অভিমুখে রওনা হয়। আইলসনের উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তাকে অস্থির করে ফিরছে। যার জন্য সব ত্যাগ করা– দায়িত্ব, ঈমান, সহকর্মী সমস্ত– তাকে হারানোর বেদনা কম নয়। মেয়েটির কি হল, কোথায় গেল, জীবনে হয়ত আর তা জানাই হবে না– এই অনুতাপে পুড়ে মরছে রহীম।

তিন মাইল পথ অতিক্রম করেছে রহীম। হঠাৎ কয়েকটি ধাবমান ঘোড়ার

ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসে তার। পেছনের দিকে তাকায়। উড়ন্ত ধূলি-বালির একখণ্ড মেঘ ধেয়ে আসছে তার দিকে। এদিক-সেদিক তাকিয়ে পালাবার পথ খুঁজে রহীম। কিন্তু নেই। ঘোড়ায় চড়ে কে আসছে, জানে না সে। রহীম ঘোড়ার পথ ছেড়ে পার্শ্বপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। মনে তার প্রচণ্ড ভয়।

নিকটে চলে এসেছে ঘোড়াটি। দাঁড়িয়ে যায় ঠিক রহিমের পার্শ্ব ঘেঁষে। এবার রহীম থেমে যায়, ঘোড়ার আরোহীরা খৃস্টান। রহীম নিরস্ত্র। পালাবারও পথ নেই। আরোহীরা রহীমকে ঘিরে ফেলে। রহীম তাদের একজনকে চিনে ফেলে। লোকটা আইলসনের পাণিপ্রার্থী অফিসার। সে রহীমকে উদ্দেশ করে বলে, 'আমার আগে থেকেই সন্দেহ ছিল, তুমি খৃস্টান নও।'

রহীমকে গ্রেফতার করা হল। হাত দু'টো পিঠমোড়া করে বেঁধে লাশের ন্যায় তুলে নেয়া হল একটি ঘোড়ার পিঠে। আক্রা অভিমুখে ছুটে চলে ঘোড়া।

ঠিক এ সময় রহীমের সঙ্গে দেখা করতে যায় ইমরান। না পেয়ে রহীমের মালিকের এক কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে। কর্মচারী জানায়, তাকে চাকুরী থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

ইমরান ভাবনায় পড়ে যায়। কী হল? রহীম গেলই বা কোথায়? এখান থেকে বিতাড়িত হয়ে আমার কাছে গেল না কেন? রেজার নিকটও তো যেতে পারত। কোন প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে পায় না সে।

ইমরান গির্জায় ফিরে যায়। রহীমকে খুঁজে বের করতে হবে। তার মনে এই শংকাও জাগে, রহীম গ্রেফতার হল কিনা। তবে তো আমাদের ব্যাপারেও তথ্য দিয়ে ফেলবে। এতক্ষণ বলে ফেলেছেও হয়ত। ধরা পড়া কিংবা মারা যাওয়া চিন্তার বিষয় নয়– চিন্তা হল তারা যে তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিল এবং সংগ্রহ করেছে, তা নিয়ে এখান থেকে বের হতে হবে।

সূর্য অস্ত যেতে এখনো বেশ দেরী। রেজা আস্তাবলের বাইরে একস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। চারটি ঘোড়া আস্তাবলের গেটে এসে দাঁড়িয়ে যায়। এক আরোহী তার আসনের সম্মুখ থেকে লাশের ন্যায় কি একটা নীচে নামায়। দেখে রেজার গায়ের রক্ত শুকিয়ে যায়। এ তো রহীম! হাত দু'টো পিঠমোড়া করে বাঁধা। আরোহীদের মধ্যে বড় এক অফিসারও রয়েছে। রেজা ভালভাবেই চিনে তাকে। অন্যরাও তার অচেনা নয়।

আরোহীরা রহীমকে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। এমন সময় রেজার প্রতি দৃষ্টি পড়ে অফিসারের। অফিসার রেজাকে ডাক দেয়, ফ্রান্সিস! রেজা ছুটে আসে। কিন্তু তার পা উঠছে না যেন। সে নিশ্চিত বুঝে ফেলে, আমিও ধরা পড়ে যাচ্ছি। ভীতপদে অফিসারের কাছে দাঁড়ায় রেজা– 'জ্বী স্যার।'

'এই ঘোড়াগুলোকে ভেতরে নিয়ে যাও'– অফিসার শান্ত কণ্ঠে রেজাকে

বলল– 'নিয়ে আমাদের সহিসদের হাতে বুঝিয়ে দাও।' অফিসার রহীম সম্পর্কে নির্দেশ দেয়, 'ওকে ঐ কামরায় নিয়ে যাও।'

'ফ্রান্সিস' নামে ডাকায় রেজার হালে পানি আসে যে, তাহলে রহীম আমার কথা বলেনি। রেজা এক অফিসারকে জিজ্ঞেস করে, 'ও কে? চুরি-টুরি করেছে বোধ হয়?'

'বেটা সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর'– এক সৈনিক জবাব দেয় এবং তাচ্ছিল্যভরে বলে– 'এবার লোকটা পাতালের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে গোয়েন্দাগিরি করবে; তুমি যাও, ঘোড়াগুলো রেখে আস।'

এ সময়ের মধ্যে কোন এক সুযোগে রেজা ও রহীমের চোখাচোখি হয়ে যায়। রহীম রেজাকে চোখের সাংকেতিক ভাষায় বলে দেয়, তোমার কোন ভয় নেই। রেজা নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। তথাপি একজনের ধরা পড়া তো কোন প্রীতিকর ঘটনা নয়। রহীম ধরা পড়েছে। পরিণতি কী হবে, তা তো বলা যায় না। অন্য সঙ্গীদের ব্যাপারে রহীম এখনো কোন তথ্য দেয়নি, দেয়ার পর্যায় এখনো আসেওনি। জিজ্ঞাসাবাদের পর দেখা যাবে কি হয়! তাছাড়া রহীমকে জীবন দিতেই হবে। মরতে হবে খৃষ্টানদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুকে ধুকে।

রহীমকে কোন্ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা জানে রেজা। তারপর সেখান থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, তাও তার জানা।

❁ ❁ ❁

ইমরান গির্জা সংলগ্ন নিজ কক্ষে অস্থির মনে বসে বসে ভাবছে, রহীম কোথায় উধাও হয়ে গেল। কক্ষের দরজা খোলা। হঠাৎ শাঁ করে ভেতরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দেয় এক ব্যক্তি। লোকটা রেজা। কোন ভূমিকা ছাড়াই ভয়জড়িত কণ্ঠে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিসফিস করে বলে, 'রহীম ধরা পড়ে গেছে!'

নিজে যা দেখেছে, ইমরানকে অবহিত করে রেজা। এ-ও জানায়, রেজা ইংগিতে বলে দিয়েছে, আমাদের কথা সে কিছু বলেনি।

'এখনো বলেনি। ইন্টারোগেশন সেলে গিয়ে সব-ই বলে দিবে'– ইমরান বলল– 'ও জায়গায় মুখ বন্ধ রাখা সহজ নয়।'

ইমরান ও রেজা এখন কী করবে? এক্ষুণি বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, নাকি আরো এক-দু'দিন অপেক্ষা করবে?'

এমনি স্পর্শকাতর মুহূর্তে একটি ভুল করে ফেলে তারা। তারা আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে যায়। কমান্ডো এবং গেয়েন্দাদের জন্য নির্দেশ হল, যে কোন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও সাহসিকতা বজায় রেখে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। তাড়াহুড়া ও আবেগ পরিহার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোন সহকর্মী

যদি কোথাও এমনভাবে ফেঁসে যায় যে, তাকে উদ্ধার করতে গেলে নিজেদেরকেও ফেঁসে যাওয়ার আশংকা আছে, তাহলে তাকে সাহায্য করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু রহীমের ঘটনায় আবেগপ্রবণ হয়ে যায় রেজা। বলল, 'আমি রহীমের ন্যায় সুদর্শন ও সাহসী বন্ধুকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করব।'

'সম্ভব হবে না।' ইমরান বলল। সে রেজাকে এই ঝুঁকিপূর্ণ প্রত্যয় থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

'শোন ইমরান! রহীমকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আমি সেখানেই থাকি। কাজেই ওকে সেখান থেকে বের করে আনা সম্ভব কিনা দেখতে তো পারি'– রেজা বলল– 'সেখানকার প্রত্যেকের সঙ্গে আমার এতটুকু বন্ধুত্ব আছে যে, আমি তথ্য নিতে পারব, রহীম কোথায় আছে। যদি আমি তার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি, তাহলে নিশ্চিত রহীম মুক্তি পেয়ে যাবে। অন্যথায় এর বেশী আর কী হবে, আমিও না হয় তার পথের পথিক হয়ে গেলাম! এমতাবস্থায় আমি যদি ধরা খেয়ে যাই, তাহলে তুমি চলে যেও। তথ্য তো সব তোমার কাছে। আমি রহীমকে রেখে যেতে পারব না।'

রহীমকে মুক্ত করে আনা যদিও রেজার পক্ষে সম্ভব ছিল না; কিন্তু রেজার আবেগপ্রবণতায় ইমরানও সম্মত হয় এবং বাস্তবতাকে ভুলে যায়। রেজা ইমরানকে এই বলে ফিরে যায়, সে রাতে খোঁজ নিয়ে জানবে রহীমকে মুক্ত করার কোন সুযোগ আছে কিনা। যদি কোন সুযোগ বের করতে না পারে, তাহলে তারা রাতের মধ্যে চলে যাবে। ইমরানের দায়িত্ব ঘোড়ার ব্যবস্থা করা।

ঘোড়ার ব্যবস্থা করা ইমরানের জন্য সহজ ছিল না। কারণ, তাকে পাদ্রীর দেহরক্ষীদের ঘোড়া চুরি করতে হবে। আর এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

রহীমকে তখনো বন্দীশালায় নিক্ষেপ করা হয়নি। ইন্টেলিজেন্স হিংস্র প্রকৃতির দু'জন অফিসারের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে তাকে। কারণ, গোয়েন্দা ধরা পড়লে প্রথমে তার থেকে তথ্য আদায় করা হয়। তারপর চলে অকথ্য নির্যাতন। যেহেতু গোয়েন্দারা একাধিক লোক থাকে, তাই অন্য সহযোগীদের খুঁজে বের করার জন্য স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় যে, তার অন্য সাথীরা কোথায়? এখানে এসে সে কি কি তথ্য সংগ্রহ করেছে ইত্যাদি।

রহীমকেও উপরোক্ত প্রশ্নগুলো করা হয়। রহীম জবাব দেয়, এখানে আমি একা। আমার কাছে কোন তথ্য নেই। ব্যবসায়ীর কন্যা আইলসনের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমরা পরস্পর ভালবাসতাম। একজন বৃদ্ধ অফিসারের সাথে আইলসনকে জোর করে বিবাহ দিতে চাওয়ায় আমরা দু'জনে পালাতে বাধ্য হয়েছিলাম।

‘ জান, তুমি কিভাবে ধরা পড়েছ?’

‘না’– রহীম জবাব দেয়– ‘আমি এতটুকুই জানি যে, আমি ধরা পড়েছি।’

‘তুমি আরো অনেক কিছু জান’– এক অফিসার বলল– ‘যা যা জান, সব বলে দাও, আমরা তোমাকে কোন কষ্ট দেব না।’

‘আমি শুধু এতটুকুই জানি যে, আমি আমার কর্তব্য ভুলে গেছি’– রহীম বলল– ‘এই অপরাধের শাস্তি আমি সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করে নেব।’

‘তোমার হৃদয়ে এখনো কি আইলসনের ভালবাসা আছে?’

‘আছে’– রহীমের সোজা উত্তর– ‘এবং চিরকাল থাকবে। আমি তাকে কায়রো নিয়ে যাচ্ছিলাম। মুসলমান বানিয়ে তাকে বিয়ে করার কথা ছিল।’

‘আমি যদি বলি, মেয়েটা তোমার সাথে প্রতারণা করেছে, তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করবে?’

‘না’– রহীম বলল– ‘যে মেয়ে আমার জন্য নিজের বাড়ি-ঘর, পিতা-মাতা, স্বজন ত্যাগ করেছিল, সে প্রতারক হতে পারে না। অন্য কেউ তার সঙ্গে প্রতারণা করে থাকবে হয়ত।’

‘আচ্ছা, আমরা যদি আইলসনকে তোমার হাতে তুলে দেই, তাহলে কি বলবে, তোমার ক’জন সঙ্গী আছে এবং তারা কোথায় আছে? তুমি এখান থেকে কি কি তথ্য সংগ্রহ করেছ?’

রহীমের মস্তক অবনত হয়ে যায়। সে অবস্থায় কেটে যায় কিছু সময়। এক অফিসার যখন তার মাথাটা ধরে উপরে তোলে, তখন তার দু’চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। অফিসারদের বারবার প্রশ্ন করার পরও রহীম নির্বাক। অফিসার ভাবল, ছেলেটির ভেতরটায় ‘হ্যাঁ’ এবং ‘না’-এর দ্বন্দ্বে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না। তবে তার ভাব-গতিতে বুঝা যাচ্ছে, আইলসনের প্রতি তার ভালবাসা এখনো প্রগাঢ় এবং এ প্রেম তার হৃদয়ের অনেক গভীরে প্রোথিত।

‘দেখ, সময় নষ্ট করে লাভ নেই, সব প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতেই হবে’– এক অফিসার বলল– ‘কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার হাড়গোড় সব গুড়ো হয়ে যাবে। তখন তুমি না বেঁচে থাকবে, না মরতে পারবে। উত্তরটা যদি আগেভাগেই দিয়ে দাও, তাহলে আইলসনকেও পাবে আর শাস্তি থেকেও রক্ষা পাবে। এটা বন্দীশালা নয়– এক অফিসারের কক্ষ। তুমি যদি চিন্তা করার সময় চাও, তাহলে হয়ত এই রাতটুকু তোমাকে সময় দেয়া যেতে পারে।’

রহীম কোন কথাই বলছে না। মুখ তুলে শুধু প্রত্যেক অফিসারের দিকে এক নজর করে তাকায়। অফিসারদের এমন কোন আশংকা নেই যে, রহীম এই কক্ষ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে। সামরিক এলাকা, বারান্দায় পাহারা আছে, আছে টহল প্রহরাও। কক্ষ থেকে বের হতে পারলেও পালিয়ে যাবার

সুযোগ নেই। এক অফিসার আরেক অফিসরকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা অহেতুক সময় নষ্ট করছ, ওকে পাতাল কক্ষে নিয়ে চল। লোহার উত্তপ্ত শলাকার ছ্যাঁকা দাও, দেখবে কথা কিভাবে বের হয়। এরপরও যদি মুখ না খুলে, তাহলে পানাহার বন্ধ করে ফেলে রাখ।'

'আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন!'– দ্বিতীয় অফিসার বলল– 'এ কথা ভুলে যেও না, লোকটা মুসলমান। এ যাবত তোমরা ক'জন শত্রু গোয়েন্দার নিকট থেকে তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছ? তোমরা হয়ত জান না– এরা জীবন দিতে রাজী, মুখ খুলতে রাজী নায়। তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা, লোকটা বলেছিল, সে সমস্ত নির্যাতন-নিপীড়ন তার পাপের শাস্তি মনে করে বরণ করে নেবে? লোকটাকে কট্টর মুসলমান বলে মনে হচ্ছে। দেখবে, পাতাল কক্ষে নিলেও সে বলবে, 'আমি কিচ্ছু জানি না।' আমাদের উদ্দেশ্য তো ওকে প্রাণে মেরে ফেলা নয়; আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, যে কোন প্রকারেই তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার অন্য সঙ্গীদের ঠিকানা নেয়া। আর এ কথা জানা যে, আমরা মিসর আক্রমণের যে পরিকল্পনা নিয়েছি, তা ওরা জেনে ফেলেছে কিনা।'

'এ তথ্য জানা ওর বাপেরও সাধ্য নেই'– দ্বিতীয় অফিসার বলল– 'আমাদের হাইকমান্ডের অফিসারদের ব্যতীত আর কেউ এই পরিকল্পনা সম্পর্কে জানে না। তাছাড়া লোকটি ব্যবসায়ীর মেয়ের প্রেমেই ডুবে ছিল। দুনিয়ার কোন খবরই ওর ছিল না। ও তো এটাও জানে না যে, আইলসনই ওকে ধরিয়ে দিয়েছে। লোকটা এখনও আইলসনে প্রেম সরোবরে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

'আমি আইলসনকেই ব্যবহার করতে চাই'– এক অফিসার বলল– 'লোকটাকে আজ রাতটা এই কক্ষেই থাকতে দেব। আমি আশা করি, দিনের পর দিন পরিশ্রম করেও আমরা যে তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারব না, আইলসনের ন্যায় রূপসী মেয়ে তার থেকে কয়েক মিনিটেই তা বের করে ফেলতে পারবে।'

'কিন্তু মেয়েটার উপর কি ভরসা রাখা যায়?'

'তোমাদের কি এখনো সন্দেহ আছে?' দ্বিতীয় অফিসার বলল– 'তুমি বোধ হয় পুরো ঘটনা শোননি। আইলসন ফিরে এসে ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছে, তা সম্পূর্ণ তুমি শোননি। এখন জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব যেহেতু আমাদের দু'জনের উপর, সেজন্য পুরো ঘটনা তোমার জানা থাকা দরকার। আইলসন লোকটাকে মনে-প্রাণে ভালবাসত। কিন্তু আসল পরিচয়টা তার জানা ছিল না। আইলসন জানত, লোকটা খৃস্টান, নাম আইলীমোর। আইলসনকে তার পিতা কামান্ডার ওয়েস্ট মেকার্টের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। মূলত ঘুষ হিসাবেই মেয়েটাকে তার হাতে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এক পর্যায়ে মেয়েটা এই

গোয়েন্দার হাত ধরে পালিয়ে যায়। পথে কথায় কথায় সে আইলসনের কাছে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করে দেয়। সে অকপটে বলে দেয়, আমি খৃস্টান নই– মুসলমান। নাম আইনীমোর নয় রহীম হাঙ্গুরা এবং সে গোয়েন্দা। আইলসনের হৃদয়ে মুসলমান নামের প্রতি কি পরিমাণ ভীতি ও ঘৃণা শৈশব থেকেই বদ্ধমূল হয়ে আছে, তা লোকটি জানত না। জানত না মেয়েটা কত ধার্মিক খৃস্টান। শেষ পর্যন্ত আইলসন নিশ্চিত হয় যে, এই মুসলমানটা তাকে ধোঁকা দিয়েছে এবং কায়রো নিয়ে গিয়ে তাকে নষ্ট করবে। হয়ত কারো কাছে তাকে বিক্রি করে ফেলবে। আমরা আমাদের শিশুদের মন-মস্তিষ্কে মুসলমান সম্পর্কে যে ঘৃণা সৃষ্টি করে রেখেছি, তা যে কোন খৃস্টান ছেলে-মেয়ে-ই মনে রাখবে।

আইলসনের হৃদয়েও ধর্মপ্রীতি জেগে ওঠে এবং এই অনুরাগ মুসলমানের ভালবাসার উপর জয়ী হয়। রহীমের প্রতি ভালবাসার স্থলে সৃষ্টি হয় প্রবল ঘৃণা। আইলসন পেছনের সব ভুলে যায়। ভুলে যায় বৃদ্ধ অফিসারের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথাও। তার ক্রুশের কর্তব্যের কথা স্মরণ এসে যায় যে, মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শত্রুজ্ঞান করবে এবং ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য কাজ করবে। বস্তুত আইলসন অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমতী। সে রহীমকে বুঝতেই দেয়নি, ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে সে পালিয়ে আসবে। রহীম ঘুমিয়ে পড়লে আইলসন সুযোগ বুঝে ঘোড়া নিয়ে চলে আসে। আইলসনের পথঘাট জানা ছিল। সে আক্রা এসে পৌঁছে এবং পিতার কাছে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে রহীম সম্পর্কে অবহিত করে। তার পিতা তৎক্ষনাৎ এ খবর কমান্ডার ওয়েস্ট মেকাটকে ঘুম থেকে জাগিয়ে অবহিত করে। কমান্ডার তিনজন সিপাহী নিয়ে রহীমকে ধাওয়া করতে চলে যায়। রহীম পায়ে হেঁটে কতটুকুই আর যেতে পেরেছে– সে ধরা পড়ে যায়। ফলে এখন সে আমাদের হাতে বন্দী।'

'রহীম কি জানে, আইলসন তাকে ধোঁকা দিয়েছে?'

'না, আমি এখন আইলসনকে কাজে লাগাতে চাই। রহীমকে আমরা উন্নত খাবার পরিবেশন করব।'

চাকর-বাকর ও আম-জনতার মুখে একই কথা, একই আলোচনা– একজন মুসলমান গোয়েন্দা ধরা পড়েছে। ফ্রান্সিস নামে রেজাও তাদের একজন। সেও অন্যদের ন্যায় ধৃত মুসলমান গোয়েন্দাকে নিয়ে নানারকম মন্তব্য এবং অভিমত ব্যক্ত করছে– লোকটিকে জনসমক্ষে ফাঁসিতে ঝুলান উচিত কিংবা ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ঘোড়া হাঁকিয়ে মেরে ফেলা দরকার।

রেজা জানে, রহীম এখনও সেই কক্ষেই আছে। অনেকেই ভেবে পায় পায় না, গোয়েন্দাকে এখনো বন্দীশালায় নিক্ষেপ করা হচ্ছে না কেন! বন্দীশালার এক কর্মচারী জানায়, কয়েদীর জন্য অফিসারদের ন্যায় খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অফিসার নিজেই খাবার পরিবেশন করছে। এ কথা শুনে সবাই বিস্মিত হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করে দেয়। রেজা কথায় কথায় বাবুর্চিখানার কর্মচারীকে আলগ নিয়ে যায় এবং জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি ঠাট্টা করছ যে, মুসলমান গোয়েন্দাকে অফিসারদের মানের খাবার দেয়া হয়েছে! তাই যদি হয়, তাহলে তো লোকটা গোয়েন্দা নয়!'

'অত্যন্ত ভয়ংকর গোয়েন্দা'– কর্মচারী বলল– 'আমি তদন্তকারী অফিসারের কথা শুনেছি। খানা খাওয়ার পর আবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তিনি একটি মেয়ে সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। মেয়েটি গোয়েন্দাকে ফাঁদে ফেলে কথা বের করবে।'

রহীমের খাওয়া শেষ হলে আইলসন তার কক্ষে প্রবেশ করে। অফিসাররা চলে গিয়েছিল আগেই। তারা আইলসনকে ডেকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়– তাকে কী করতে হবে এবং কয়েদীকে কি কি জিজ্ঞেস করতে হবে। আইলসনকে দেখে রহীম চমকে উঠে– বিষয়টা স্বপ্নের মত মনে হয় তার কাছে।

'তুমি?'– বিস্মিত কণ্ঠে আইলসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করে রহীম– 'তোমাকেও কি গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে? তুমি কি বন্দী?'

'হ্যাঁ'– আইলসন জবাব দেয়– 'গতরাত থেকে আমি বন্দী।'

'ওখান থেকে তুমি কিভাবে উধাও হয়েছিলে?'– রহীম জিজ্ঞেস করে– 'তুমি নিজে নিজে পালিয়ে এসেছ, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'তা বটে'– আইলসন বলল– 'আমার জীবন-মরণ তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তোমাকে ছেড়ে আমি পালাতে পারি না। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমার চোখে ঘুম আসছিল না। আমি উঠে পায়চারি করতে শুরু করি। হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা দূরে চলে যাই। হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন আমার মুখ চেপে ধরে এবং আমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নেয়। তারা ছিল দু'জন। একজন আমার ঘোড়া ছিনিয়ে নেয় এবং অপরজন আমার মুখ চেপে রাখে, যার ফলে আমার আর্তচিৎকার তুমি শুনতে পাওনি। তারা আমাকে এখানে নিয়ে আসে।'

'তাদেরকে কে বলল যে, আমার নাম রহীম– আইলীমোর নয়?'– রহীম জিজ্ঞেস করে– 'আর যারা তোমাকে ধরে নিয়ে আসল, তারা আমাকে ধরল না কেন? আমাকে কেন হত্যা করল না?'

'আমি তোমার এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না'– আইলসন বলল– 'আমি নিজেই আসামী।'

'তুমি মিথ্যা বলছ আইলসন।'– রহীম বলল– 'তারা ভয় দেখিয়ে তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল আর তুমি ভয়ে বলে দিয়েছে আমি কে। তোমার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তোমার কোন কষ্ট হোক আমি তা সহ্য করতে পারব না।'

'আমার কোন কষ্ট না হোক, তা-ই যদি তোমার কাম্য হয়, তাহলে তারা তোমাকে যা যা জিজ্ঞেস করছে, সব বলে দাও'– আইলসন বলল– 'তারা আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছে, তোমাকে তারা ছেড়ে দেবে।'

'কথা শেষ কর আইলসন'– তাচ্ছিল্যের সাথে রহীম বলল– 'এ কথাও বল, আমি সব বলে দিলে তারা আমাকে মুক্ত করে দেবে আর তুমি আমাকে বিয়ে করে নেবে।'

'হ্যাঁ, বিয়ে তো হবেই'– আইলসন বলল– 'শর্ত হল, তোমাকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে।'

'তুমি কি এই আশা নিয়ে এসেছ যে, মুক্তির খাতিরে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব?'– রহীম বলল– 'আইলসন! আমি ফৌজের সাধারণ সৈনিক নই– আমি একজন গোয়েন্দা। আমার বিবেক আছে। আমি ক্ষণিকের জন্য বিবেকের উপর তোমার প্রেম-ভালবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম। এখন আমি আমার সেই পাপেরই শাস্তি ভোগ করছি। তুমি মিথ্যা বলছ। যে ক্রুশের নামে শপথ করেছ, তা-ই গলায় ঝুলিয়ে তুমি মিথ্যে কথা বলছ। ওখান থেকে তুমি নিজে পালিয়ে এসেছ, কথাটা কি মিথ্যে? তোমার হৃদয় মুসলমানদের ঘৃণায় পরিপূর্ণ। আমার আসল পরিচয় পেয়ে তুমি আমার প্রতি আর আস্থা রাখতে পারনি। আমাকে নিদ্রায় রেখে তুমি নিজে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে পালিয়ে এসেছ। এসে তুমি তোমার বুড়ো পাণিপ্রার্থীকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছ। বল, বল আইলসন আমি কি মিথ্যা বলছি? বল, ঘটনাটি কি এরকম-ই নয়? আমার অন্তরেও তোমার জাতির প্রতি ঘৃণা আছে। তোমার জাতিকে আমি আমার শত্রু ভাবি। আমার জীবনটা আমি তোমার জাতির ধ্বংস-সাধনে কুরবান করেছি। কিন্তু আমার হৃদয়ে তোমার ভালবাসা অক্ষুণ্ন থাকবে আইলসন। তার প্রতি কখনো আমার ঘৃণা জন্মাবে না। তোমার খাতিরে কর্তব্য ভুলে গিয়ে আমি আমার ভবিষ্যৎ ধ্বংস করেছি। কিন্তু তুমি– তুমি নাগিনীর ন্যায় আমাকে দংশন করছ। আর এটাই তোমার ধর্ম– এটাই তোমাদের চরিত্র।'

অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় ও হৃদয়কাড়া ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল রহীম। আইলসনের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এতকিছুর মাঝেও তার হৃদয়ে রহীমের ভালবাসা বিদ্যমান। তার চোখে চোখ রেখে ধীর অথচ হৃদয়গ্রাহী রহীমের কথাগুলো তার মন ছুঁয়ে যায়। আবেগপ্রবণ হয়ে উঠে রূপসী

তরুণী আইলসন। তার দু'চোখে পানি এসে যায়। তারপর অস্থিরতার সাথে রহীমের হাত দু'টো চেপে ধরে এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, 'তোমার প্রতি আমার কোন ঘৃণা নেই আইলীমোর। তুমি তোমার কর্তব্য ভুলে গিয়েছিলে, আমি ভুলিনি। আমি অপরাধী– আমি তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছি। এই পাপের কঠিন শাস্তি আমাকে ভোগ করতে হবে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে মদ্যপ ঐ বৃদ্ধ কমান্ডারের হাতে তুলে দেয়া হবে। আমাকে আর তিরস্কার কর না আইলীমোর।'

'আমি আইলীমোর নই– আমি রহীম।' রহীম বলল– 'আমি রহীম– আবদুর রহীম– আমি দয়াময়ের গোলাম।'

❁ ❁ ❁

রাতের বেলা। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ইসলামী দুনিয়া। কিন্তু একদল মানুষ শত্রুর পরিবেশিত মদ আর নারী নিয়ে পড়ে আছে মাতালের ন্যায়। এরা মিল্লাতে ইসলামিয়ার গাদ্দার। অপরদিকে তাদের থেকে দূরে-বহুদূরে একজন মুসলমান ইহলীলা সাঙ্গ করছে ইসলামের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়ে। দু'জন জান বাজি রেখে জাতির জন্য মূল্যবান উপহার– গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আক্রা থেকে বেরিয়ে কায়রো পৌঁছার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এ এমন এক তথ্য, মিসরের ইজ্জত ও ইসলামের আব্রু নির্ভর করছে তার উপর। তাদের দৃষ্টিতে এই ভেদ আল্লাহর আমানত। তারা এখানে নিজ দায়িত্ব পালন করছে, নাকি আয়েশ করে ফিরছে, তা দেখবার মত কেউ নেই। কিন্তু তাদের বিশ্বাস, আল্লাহ্ তাদেরকে দেখছেন এবং তারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করছে।

রহীম মুক্ত হয়ে আসতে পারবে কি পারবে না, রেজা আসবে কি আসবে না?– এই ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে ইমরান। কী করবে সে? ওদের অপেক্ষা করবে, নাকি এক্ষুণি চলে যাবে? কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, যে ইসলামী দুনিয়ার জন্য অতিশয় মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করলাম, তা কি কায়রো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব? মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে ইমরানের।

ইমরান আরো একটি কারণে শীঘ্র কায়রো কিংবা অন্তত কার্ক গিয়ে পৌঁছতে চায়। পাছে সুলতান আইউবী কিংবা নুরুদ্দীন জঙ্গী বা উভয়ে অন্য কোনদিকে আক্রমণ বা অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা নিয়ে না ফেলেন। যদি এমনটা হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে বিরত রাখতে হবে। তাদের ফৌজ যদি অন্য কোন দিকে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মিসরের মোহাফেজ তো আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। এসব ভাবনা ইমরানকে এমনভাবে বিচলিত করে তোলে যে, কোন দিশা না পেয়ে সে কক্ষের দরজা বন্ধ করে নামাযে দাঁড়িয়ে যায়।

ইমরান নফল নামায পড়ছে। সুপ্ত নগরীর নীরবতা ভেদ করে কোন একটা তৎপরতার শব্দ তার কানে ভেসে আসে। কারো ছুটে চলার আওয়াজও শোনা যায়। তাতে ইমরানের ব্যাকুলতা আরো বেড়ে যায়। দু'চার রাকাত নামায আদায় করে ইমরান মহান আল্লাহর দরবারে হাত তুলে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে ইমরান দোয়া করে, 'হে আল্লাহ! দায়িত্ব পালন করা পর্যন্ত তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখ। আমাকে তুমি এই আমানতটা যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়ার সুযোগ দাও, এরপর তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে আমার বংশসহ নিয়ে নিও।'

ইমরানের কক্ষের বন্ধ দরজায় করাঘাত পড়ে। ইমরান দরজা খুলে দেয়। বাইরে রেজা দণ্ডায়মান। রেজা ভেতরে ঢুকতেই ইমরান তাড়াতাড়ি দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়।

রেজা হাঁপাচ্ছে। ইমরানকে ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানায়, রহীম শহীদ হয়ে গেছে। সেই সাথে মারা গেছে একটি মেয়েও। রহীমের লাশটা এলাকার এক মুসলিম পরিবারের ঘরে রেখে এসেছে। সেই ঘরেরই কোন স্থানে তাকে দাফন করার কথা।

ইমরানের অস্থিরতা আরো বেড়ে যায়। চিন্তা তার রহীমকে নিয়ে নয়, দ্বীনের জন্য জীবন দেয়া-নেয়াই তো তাদের কাজ। ইমরান ভাবে, রহীমের জন্য এই মুসলিম পরিবারটা আবার বিপদে পড়ে না যায়। রেজা জানায়, সে ঘরে তিনজন পুরুষ আছে, অন্যরা মহিলা। তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এক কোণে মাটি খনন শুরু করে দিয়েছে। তারা বেশ সতর্ক। কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।

আক্রা থেকে বের হওয়া এই মুহূর্তে কঠিন ব্যাপার। সমস্ত শহর সীল করে দিয়েছে খৃস্টানরা। একটি খৃস্টান মেয়ের নিহত হওয়া এবং একটি শত্রু গোয়েন্দার পলায়ন মামুলি ব্যাপার নয়। বের হতে হবে রাতে। দু'জন একত্রে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, দু'জনের কেউ ধরা পড়লে আর যা হোক এ তথ্য দেয়া যাবে না যে, রহীম মারা গেছে এবং তার লাশ অমুক জায়গায় আছে।

এখন প্রয়োজন শুরু ঘোড়ার। একস্থানে খৃস্টানদের আটটি ঘোড়া বাঁধা আছে। ইমরান রেজাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু দূর থেকে দেখা গেল, এক প্রহরী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। রেজাকে একস্থান লুকিয়ে রেখে ইমরান এগিয়ে যায়। চলে যায় সান্ত্রীর নিকটে। জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার, আজ পাহারা কেন? সান্ত্রী ইমরানকে ভাল করেই চেনে। চেনে জনগন্থর নামে। বড় পাদ্রীর খাস খাদেম হিসেবে তাকে বেশ শ্রদ্ধাও করে। সে বলে, একজন মুসলমান গোয়েন্দা ধরা পড়েছিল। আজ সে একটি মেয়েকে খুন করে পালিয়ে গেছে। সে জন্য

নির্দেশ এসেছে সাবধান থাকতে।

সান্ত্রীর উপস্থিতিতেঘোড়া খুলে নেয়া সম্ভব নয়। ইমরান তাকে কথায় মাতিয়ে তোলে। এক পর্যায়ে তার পেছনে গিয়ে দু'বাহু দ্বারা তার ঘাড়টা ঝাঁপটে ধরে। সান্ত্রীর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ইমরান বাঁহাতে তাকে শক্ত করে ধরে ডান হাতে কোমর থেকে খঞ্জরসম ছোট তরবারীটা বের করে সান্ত্রীর পেটে আঘাত করে। মারা যায় সান্ত্রী।

ইমরান রেজাকে ডেকে নিয়ে আসে। দু'টি ঘোড়া খুলে নিয়ে জিন বাঁধে। তারপর দু'জন দু'টিতে চড়ে ছুটে চলে।

গীর্জার অন্য সান্ত্রীরা কোথাও ঘুমিয়ে আছে। ইমরান ও রেজা এগিয়ে যায়। শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একাধিক পথ আছে। তারা একটি পথ ধরে এগুতে থাকে। বেরিয়ে যায় শহর থেকে। আচমকা তারা কতগুলো লোকের বেষ্টনীতে পড়ে যায়। হাঁক আসে– 'থাম, তোমরা কারা?'

'আমরা এলাকার বাসিন্দা'– ইমরান বলল– 'তোমাদের ন্যায় আমরাও কর্তব্য পালন করছি।'

তিন-চারটি প্রদীপ জ্বলে ওঠে, যার আলোতে ইমরান ও রেজা দেখতে পায়, একটি অশ্বারোহী বাহিনী এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। এবার তাদের স্মরণে আসে, আরে, শহর তো সীল করে দেয়া হয়েছে! ইমরানের গায়ের পোশাকে নিহত সান্ত্রীর রক্তের দাগ। সেদিকে খেয়াল নেই তার। প্রদীপের আলোতে খৃস্টান সেনাদের চোখ পড়ে যায় সেদিকে। তারা জিজ্ঞেস করে, তোমার শরীরে রক্তের দাগ কেন? ইমরান বুঝে ফেলে অবস্থা বেগতিক। কথা বাড়িয়ে ঝামেলা করলেই ক্ষতি। তার চেয়ে পালাবার চেষ্টা করা ভাল।

হাতে ধরা লাগামটা ঝটকা একটা টান দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দেয় ইমরান। রেজাও তার অনুসরণ করে। বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে।। খানিকটা বিলম্ব করে ফেলেছে তারা।

ইমরান বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তার পেছনে ছুটছে তিন অশ্বারোহী। রেজা শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যায়। রেজার উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি ইমরান শুনতে পায়– 'থামবে না ইমরান, ছুটে যাও– আল্লাহ হাফেজ।'

অনেক দূর পর্যন্ত ইমরান এই শব্দ শুনতে থাকে। ইমরানের ঘোড়াটা বেশ উন্নতজাতের- দ্রুতগামী। তার ডান-বাঁ দিয়ে তীর অতিক্রম করতে শুরু করে। পথ তার চেনা। কার্ক অভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটে চলে ইমরান। ধাওয়াকারীদের সাথে তার ব্যবধান বাড়তে থাকে।

পরদিন ভোরবেলা। সূর্য উদিত না হলেও ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ততক্ষণে চলনশক্তি হারিয়ে ফেলেছে ইমরানের ঘোড়া। কিন্তু পানির

সন্ধান করার সুযোগ তার নেই। সামনের এলাকা বালুকাময় প্রান্তর। ঘোড়া হাঁটছে ধীরলয়ে।

ইমরান মরু এলাকায় প্রবেশ করেছে মাত্র, এমন সময় দু'টি তীর এসে বিদ্ধ হয় তার সম্মুখে। এর অর্থ হল থেমে যাও। ইমরান দাঁড়িয়ে যায়। লোকগুলো ইমরানের বাহিনীরই সদস্য। দেখে হালে পানি আসে তার।

ইমরানকে কমান্ডারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কমান্ডার তার কথা শুনে তাকে একটি তাজাদম ঘোড়া ও দু'জন সিপাহী দিয়ে কার্ক অভিমুখে রওনা করিয়ে দেয়। ইমরান নুরুদ্দীন জঙ্গীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কায়রো যাবে। আক্রা থেকে যে তথ্য নিয়ে এসেছে, তা জঙ্গীর নিকট পৌঁছিয়ে যেতে চায় সে।

❁ ❁ ❁

ইমরান যখন কার্ক দুর্গে নুরুদ্দীন জঙ্গীর সামনে বসে তার কাহিনী বিবৃত করছিল, তখন সুলতান জঙ্গী তার প্রতি এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন, যেন তিনি এ সুদর্শন যুবকটিকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে দিতে চাইছেন। সুলতান জঙ্গী বসা থেকে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলচিত্তে ইমরানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং গণ্ডদ্বয়ে চুম্বন করেন। তিনি খাপ থেকে তরবারীটা বের করে আবার সেটি খাপে ঢুকিয়ে দু'ঠোঁটে স্পর্শ করে চুমো খান। তিনি তরবারীটা দু'হাতের তালুতে নিয়ে ইমরানকে উদ্দেশ করে বললেন, 'যে সময়টায় খৃস্টানরা হিংস্র চিলের ন্যায় মুসলমানদের চাঁদ-তারার উপর ছোঁ মেরে চলেছে, তখন একজন মুসলমান তার একজন মুসলিম ভাইকে তরবারী অপেক্ষা ভাল আর কী উপহার দিতে পারে! তুমি বাগদাদে বল, দামেস্কে বল, অন্য যে কোন জায়গায় বল, আমি তোমাকে একটি মহল উপহার দিতে পারি। তুমি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছ, তার বিনিময়ে তুমি বিপুল অর্থ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু প্রিয় বন্ধু আমার! আমি তোমাকে প্রাসাদ পুরস্কার দেব না। সম্পদের স্তূপ দিয়েও আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব না। কারণ, এ দু'টি বস্তুই মুসলমানদেরকে অন্ধ ও পঙ্গু করে দিয়েছে। এই নাও, এটি আমার পক্ষ থেকে তোমাকে দিলাম। এটি আমার তরবারী। মনে রাখবে, এই তরবারী প্রবল প্রতাপশালী বহু খৃস্টানের রক্তপান করেছে। এই তরবারী অনেক দুর্গে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছে। আমার এই তরবারী ইসলামের প্রহরী।'

ইমরান নুরুদ্দীন জঙ্গীর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। জঙ্গীর হাত থেকে তরবারীটা নিয়ে তাতে চুমো খায়, চোখে লাগায়। তারপর অস্ত্রটা কোমরের সঙ্গে বেঁধে নেয়। আনন্দের অতিশয্যে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে ইমরানের। মুখ দিয়ে কথা আনতে পারছে না, দু'চোখ বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার।'

'আর তুমি নিজের মর্যাদা জেনে নাও দোস্ত!'– জঙ্গী বললেন– 'একজন গুপ্তচর শত্রুর বিশাল বাহিনীকে যেমন পরাস্ত করতে সক্ষম, তেমনি একজন গাদ্দার পারে নিজের জাতিকে পরাজয়ের গ্লানির মুখে ঠেলে দিতে। তুমি দুশমনকে পরাজিত করে ফেলেছ ইমরান। তুমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছ, তা দুশমনের পরাজয়েরই সংবাদ। খৃস্টানরা মিসর-ফিলিস্তিনের কূলে ভিড়তে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তাদের নৌ-বহর ফিরে যেতে পারবে না। এই বিজয় তোমার। এর উপযুক্ত প্রতিদান তোমাকে আল্লাহ্ প্রদান করবেন।'

'বিলম্ব না করে আমাকে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাওয়া উচিত'– ইমরান বলল– 'দিন তো বেশী নেই। সময়ের অনেক আগেই আমীরে মেসেরের সংবাদটা পেয়ে যাওয়া দরকার।'

'তুমি এক্ষুণি রওনা হয়ে যাও'– নুরুদ্দীন জঙ্গী বললেন– 'আমি তোমাকে উন্নতজাতের ঘোড়া দিচ্ছি।'

সুলতান জঙ্গীর নির্দেশিত পথে ইমরান কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। এ-পথে বেশক'টি সেনা চৌকি আছে। প্রতিটি চৌকিতে দূতদের ঘোড়া পরিবর্তনের ব্যবস্থা আছে।

'... আর সালাহুদ্দীনকে প্রথম কথাটা বলবে, সে যেন রহীম ও রেজার পরিবারকে নিজের পরিবারভুক্ত করে নেয়। বাইতুলমাল থেকে যেন তাদের পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে।'

নুরুদ্দীন জঙ্গী ইমরানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি শুধু গুপ্তচরবৃত্তিই জান, নাকি যুদ্ধও বুঝ?'

'কিছু বুঝি না তা নয়'– ইমরান জবাব দেয়– 'আপনি হুকুম করুন।'

'পয়গাম লেখার সময় নেই'– নুরুদ্দীন জঙ্গী বললেন– 'তুমি সালাহুদ্দীনকে বলবে, কার্কের নিয়ন্ত্রণভার তার হাতে তুলে দিয়ে আমার বাগদাদ ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। একের পর এক খবর পাচ্ছি, সেখানে খৃস্টানদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে চলেছে এবং আমাদের ছোটখাট শাসকরা তাদের হাতে খেলছে। কিন্তু তোমার এই টাটকা সংবাদটা আমাকে এখানে থাকতে বাধ্য করছে। বছর চার-পাঁচেক আগে তোমরা রোম উপসাগরে খৃস্টানদের নৌ-বহরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলে। তারা তোমাদের ফাঁদে আটকে গিয়েছিল। এবার তারা আসবে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে। সে জন্যই তারা ইস্কান্দারিয়ার উত্তর কূলকে বেছে নিয়েছে। তোমরা যদি সরাসরি সমুদ্রে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, তা ভুল হবে। তোমাদের কাছে খৃস্টানদের সমান নৌ-শক্তি নেই। তাদের আছে বিশাল বিশাল জাহাজ। প্রতিটি জাহাজে পাল ছাড়াও আছে অসংখ্য দাঁড়। দাঁড় চালনার জন্য আছে

বিপুলসংখ্যক মাল্লা। তোমাদের তা নেই। তোমাদের স্বতন্ত্র মাল্লা নেই। যারা মাল্লা, তারাই সৈনিক। নৌ-যুদ্ধে তারা একত্রে দু'কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে না। তাই আমার পরামর্শ, শত্রুকে কূল পর্যন্ত আসতে দাও। ওরা অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে নগরীতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। তার মোকাবেলার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'...ইমরান যে তথ্য নিয়ে এসেছে, দুশমন যদি সে মতেই আক্রমণ চালায়, তাহলে আমি থাকব দুশমনের পার্শ্বে। তাদের হিসেবে বাঁ-পার্শ্বে। ডান পার্শ্বকে তোমরা নিয়ন্ত্রণ করবে। তোমাদের দায়িত্বে আরেকটি কাজ এই থাকবে যে, খৃস্টানদের জাহাজগুলো যেন ফিরে যেতে না পারে। পিছুহটার চেষ্টা করলে আগুন ধরিয়ে দেবে। তোমাদের কাছে যদি নৌ কমান্ডো থাকে, তাহলে জানই তো তাদের দ্বারা কী কাজ নেয়া যাবে। আর সুদানের প্রতি সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে, আশা করি সে কথা বলতে হবে না। ওদিককার সীমান্ত উন্মুক্ত না থাকে যেন। আমার ধারণা, তোমাদের কাছে সৈন্য কম। সেই অভাব আমি পূরণ করার চেষ্টা করব। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গোপনীয়তা রক্ষা করা। গোপনীয়তার খাতিরে আমি পয়গাম লিখে পাঠালাম না। আল্লাহ বিজয় দান করলে আমি কার্কের দায়িত্বভার ফৌজের হাতে তুলে দিয়ে বাগদাদ চলে যাব।'

নুরুদ্দীন জঙ্গীর এই পয়গাম হৃদয়ঙ্গম করে ইমরান কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

১১৭৪ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকের কোন একদিন যখন আলী বিন সুফিয়ান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে সংবাদ দিলেন যে, আক্রায় এক গোয়েন্দা শহীদ হয়েছে, একজন ধরা পড়েছে এবং তাদের কমান্ডার ইমরান ফিরে এসেছে; তখন সঙ্গে সঙ্গে সুলতান নির্জীব হয়ে যান। বেদনা-ভারাক্রান্ত মুখে আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে দু'চারটি কথা বলেই তিনি ইমরানকে ভেতরে ডেকে নেন এবং বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বন্ধন ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বসে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, 'বল, তোমার এক সঙ্গী কিভাবে শহীদ হল, অপরজন কিভাবে ধরা পড়ল?'

ইমরান পুরো ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা দেয়। সুলতান আইউবী তন্ময় হয়ে ঘটনার বিবরণ শোনেন। তারপর ইমরান যখন তার আক্রা থেকে নিয়ে আসা মহামূল্যবান তথ্যের বিবরণ দেয়, শুনে সুলতান আইউবী চমকে ওঠেন। ইমরান আরো অবহিত করে যে, আমি নুরুদ্দীন জঙ্গীকেও বিষয়টি অবহিত করে এসেছি। ইমরান সুলতান আইউবীকে নুরুদ্দীন জঙ্গীর বার্তা শোনায়।

সুলতান আইউবী সর্বপ্রথম রহীম ও রেজার পরিবারের জন্য ভাতা চালু

করে দেন। তারপর ইমরানকে অনেক বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। ইমরান জানায়, খৃস্টানদের নৌ-বহর আগেকার তুলনায় বড় হবে। আক্রমণ হবে এক মাসের মধ্যে। ইউরোপ থেকে তাগড়া সৈন্য আসবে। তাদেরকে ইস্কান্দারিয়ার উত্তর কূলে অবতরণ করান হবে। অপর বাহিনী আসবে বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে। এরা মিসরের দিকে এগিয়ে যাবে। ইস্কান্দারিয়ার উত্তর কূলে অবতরণ করা সৈন্যরা ইস্কান্দারিয়া দখল করে সে অঞ্চলকে তাদের আখড়ায় পরিণত করবে। তারপর উত্তরদিক থেকে মিসরের উপর আক্রমণ চালাবে। ইমরানের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী খৃস্টানদের আশা, তারা সুলতান আইউবীর অজান্তেই অভিযানটা সেরে ফেলবে এবং নুরুদ্দীন জঙ্গীও তাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন না। কেননা, পথে বাইতুল মোকাদ্দাসে অবস্থানরত বাহিনী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। বাস্তবিক সে এমনই এক ঝড় ছিল সে, সুলতান আইউবী আগাম খবর যদি না পেতেন, তাহলে খৃস্টানরা সুনিশ্চিতরূপেই মিসর দখল করে নিত।

সুলতান আইউবী তৎক্ষণাৎ তাঁর সকল সিনিয়র কমান্ডদের তলব করেন। আলী বিন সুফিয়ানকে নির্দেশ দেন, দুশমনের গোয়েন্দাদের প্রতি নজরদারী তীব্রতর কর, তৎপরতা বৃদ্ধি কর, যাতে তারা আমাদের বাহিনীর গতিবিধি সংক্রান্ত কোন সংবাদ বাইরে পাচার করতে না পারে। ইস্কান্দারিয়া সম্পর্কেও তিনি জরুরী নির্দেশনা প্রদান করেন।

❁ ❁ ❁

বৃটেন এখনো এ-যুদ্ধে শরীক হতে চাচ্ছে না। ইংরেজদের আশা ছিল, তারা একাই যে কোন সময় মুসলমানদেরকে পরাজিত করে মুসলিম অঞ্চলগুলো দখল করে নিতে পারবে। কিন্তু পোপের অনুরোধে তারা ক্রুসেডারদেরকে গোটা কতক যুদ্ধজাহাজ প্রদান করে। স্পেনের পূর্ণ বহর এই আক্রমণে অংশ নিতে প্রস্তুত। ফ্রান্স, জার্মানী এবং বেলজিয়ামের জাহাজও এসে পড়েছে। এই সম্মিলিত নৌ-বহরে ইউনান ও সিসিলীর কতগুলো জঙ্গী কিশতীও যোগদান করেছে। রসদ ও অস্ত্র বহনের জন্য নেয়া হয়েছে মাছ ধরার পালতোলা নৌকা। এ বহরে ঐ সকল দেশ থেকে তাগড়া সৈনিকরা এসে যোগ দিচ্ছে, যারা ক্রুশে হাত রেখে শপথ করেছিল, বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবে না।

'সালাহুদ্দীন আইউবী যদি তার নৌ-বাহিনী দ্বারা আমাদের মোকাবেলা করে, তাহলে তাকে মিসরের সমান মূল্য দিতে হবে'– রোম উপসাগরের ওপারে এক কনফারেন্সে বসে ফরাসী নৌ-বাহিনীর কমান্ডার বলল– 'আমরা জানি, তার নৌবাহিনীর কতটুকু শক্তি আছে। সালাহুদ্দীন আইউবী ও নুরুদ্দীন

জঙ্গী স্থলপথে লড়াই করার মানুষ। আমরা আশা করতে পারি যে, এই অভিযানের সংবাদ মুসলমানরা সময়ের আগে জানতে পারবে না। সালাহুদ্দীন আইউবী যখন এ সংবাদ পাবেন, ততক্ষণে আমরা কায়রো অবরোধ করে ফেলব। আর নুরুদ্দীন জঙ্গীও তার সাহায্যে আসতে পারবেন না। আমাদের এই আক্রমণ হবে চূড়ান্ত।'

'আমি আবারো বলছি, সুদানীদেরকে কাজে লাগানো আবশ্যক।' বললেন রেনাল্ট। রেনাল্ট একজন প্রখ্যাত খৃস্টান সম্রাট ও যুদ্ধবাজ। তার দায়িত্ব বাইতুল মোকাদ্দাসের দিক থেকে স্থলপথে আসা ও আক্রমণ করা। তিনি শুরু থেকেই জোর দিয়ে বলছিলেন, মিসরের উপর উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে হামলা হলে দক্ষিণ দিক থেকে সুদানীরা যাতে আক্রমণ করে, সেই ব্যবস্থা করা হোক।

'আপনি পূর্বের অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাচ্ছেন'– ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু ফিলিপ অগাস্টাস বললেন– '১১৬৯ সালে আমরা সুদানকে দেদারছে সাহায্য দিয়েছিলাম এবং এই আশায় আমরা সমুদ্রপথে মিসর আক্রমণ করেছিলাম যে, সুদানীরা দক্ষিণ দিক থেকে হামলা করবে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীতে যেসব সুদানী আছে, তারা বিদ্রোহ করবে। কিন্তু তারা কিছুই করেনি। দু'বছর পর আবার তাদেরকে মদদ দিলাম। তাতেও কোন সুফল পেলাম না। তারা আবারো আমাদেরকে হতাশ করল। এখন কেন আমরা তাদেরকে আমাদের এই অভিযানে শরীক করতে যাব? আপনি জানেন না যে, সুদানীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা। মুসলমানদের উপর ভরসা রাখা ঠিক নয়। আপনি যদি সত্য সত্য ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলতে চান, তাহলে কোন মুসলমানকে বন্ধু বানাবেন না। ক্রয় করে তাদেরকে কাজে লাগাতে পারেন, বন্ধুত্বের ভাব দেখাতে পারেন, কিন্তু অন্তরে তাদের প্রতি শত্রুতা-ই পোষণ করতে হবে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন'– অপর এক খৃস্টান সম্রাট বললেন– 'আপনারা ফাতেমীদেরকে বন্ধু বানিয়েছিলেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তারা এখন পর্যন্ত তাকে হত্যা করতে পারেনি। আমরা তাদেরকে বড় বড় যোগ্যতাসম্পন্ন গোয়েন্দা ও নাশকতা কর্মী দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে তাদেরকে ধরা খাইয়েছে ও খুন করিয়েছে। তাই এখন আর আমরা কারো প্রতিই আস্থা রাখতে পারছি না। আমাদের ভরসা একমাত্র আমাদের নিজেদের সামরিক শক্তির উপর। এখন সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।'

বিপুল সমরশক্তিতে গর্বিত খৃস্টানরা। তাদের নৌ-শক্তির তো কোন হিসাব

নেই। বাইতুল মোকাদ্দাসের দিক থেকে যে বাহিনী আসছে, সংখ্যায় তারা সমুদ্রপথে আগমনকারী সেনাসংখ্যার দ্বিগুণ। অন্তত ছয়জন সম্রাটই আছেন এই বাহিনীতে। নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে আসা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকের সংখ্যা ছিল অগনিত। তবে তাদের একটি ত্রুটি ছিল, তাদের একক কমান্ড ছিল না। তথাপি এই বাহিনী অতি অনায়াসে সুলতান আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গীকে পরাস্ত করে ফেলার কথা।

সুলতান আইউবীর দুর্বলতা, প্রথমত তাঁর সৈন্য কম। দ্বিতীয়ত গাদ্দাররা মিসরে অশান্তি ছড়িয়ে রেখেছে। বড় আশংকা, সুদানীরা হামলা করে বসতে পারে। নুরুদ্দীন জঙ্গীও ঠিক এ ধরনেরই সমস্যার সম্মুখীন। ইসলামী দুনিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। শাসকরা ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত। তারা প্রত্যেকে খৃস্টানদের করতলগত। ইসলাম ও মুসলমানের মর্যাদার কোনই পরোয়া নেই তাদের।

সুলতান আইউবী তার সিনিয়র কমান্ডারদেরকে ডেকে মূল বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করে ফেলেন। এক অংশকে সুদানের সীমান্ত অভিমুখে রওনা হয়ে যেতে বললেন। তার কমান্ডারকে নির্দেশ দেন, সীমান্তের বেশ দূরে তাঁবু স্থাপন করবে; কিন্তু বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে এমনভাবে সক্রিয় ও তৎপর রাখবে, যেন ধূলিবালি উড়তে থাকে, যাতে শত্রুরা মনে করে, তোমাদের সৈন্য অনেক। একটি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করলেন যে, কখনোই যেন বাহিনী বেকার না থাকে।

দ্বিতীয় অংশকে ইস্কান্দারিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। তাদের প্রতি নির্দেশনা, রওনা হবে রাতে আর গন্তব্যে পৌছবে দিনের বেলা। এ দলের কমান্ডারদেরকে বলে দিলেন, তোমার গন্তব্য কোথায় এবং সর্বশেষ অবস্থান কোন্ স্থানে হবে, তা পরে জানান হবে।

তৃতীয় দলকে সুলতান আইউবী নিজের হাতে রেখে দেন। তিনি কোন দলের কমান্ডারকে বলেননি যে, এই অভিযানের উদ্দেশ্যে কি? তারা সবাই দেখতে পেল, সবগুলো মিনজানীক সেই দলটিকে দেয়া হয়েছে, যাদের গন্তব্য ইস্কান্দারিয়া।

এর সাত দিন পর। সুলতান আইউবী কায়রোতে নেই, নুরুদ্দীন জঙ্গী কার্কে নেই। দু'জনই ইস্কান্দারিয়ার পূর্বপ্রান্তে ঘোরাফেরা করছেন। কিন্তু কারো বুঝার যো নেই যে, এরা কোন্ দেশের সম্রাট কিংবা সেনাকমান্ডার। কারো বুঝার সাধ্য নেই যে, এরাই তারা, যারা খৃস্টানদের জন্য আপাদমস্তক আতংক। এ মুহূর্তে তারা দু'জন নিরীহ উষ্ট্রচালক, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে কেউ জানে না।

সমুদ্রের কূলে গিয়ে তারা চোখের দৃষ্টিতে রোম উপসাগরের বিস্তৃতি পরিমাপ করেন। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের এই ঘোরাফেরা অব্যাহত থাকে তিন-চারদিন পর্যন্ত। তারপর নুরুদ্দীন জঙ্গী চলে যান কার্কে আর সুলতান আইউবী ইস্কান্দারিয়া গিয়ে তার নৌ-বাহিনী প্রধানকে জরুরী নির্দেশনা দিয়ে মিসর ফিরে যান।

❁ ❁ ❁

পূর্ণ নীরবতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করে এসে পড়ে খৃস্টানদের নৌ-বহর। বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে মিসর অভিমুখে রওনা দেয় স্থল বাহিনী। উভয় বাহিনী রওনা দেয় সময়ের মিল রেখে। বেশ উপযুক্ত মওসুম বেছে নিয়েছে খৃস্টানরা। শান্ত সমুদ্র। ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঢেউ-তরঙ্গের আশংকা নেই।

খৃস্টীয় নৌ-জাহাজের কাপ্তানদের মিসরের উপকূলীয় এলাকা চোখে পড়তে শুরু করেছে। একেবারে সম্মুখের জাহাজের কাপ্তান সমুদ্রে একটি মাছধরা নৌকা দেখতে পায়। চলে যায় নৌকার কাছে। জাহাজ থামিয়ে উপর থেকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'এই, তোমাদের জঙ্গী জাহাজগুলো কোথায়? মিথ্যে বললে কিন্তু পানিতে ডুবিয়ে মারব।'

জেলেরা বলল, 'মিসরের জাহাজ এদিকে থাকেনা। এখান থেকে এনেক দূরে থাকে।'

জাহাজ থেকে একটি রশি ফেলা হয়। দু'জন জেলে রশি বেয়ে জাহাজে উঠে যায়। তারা কাপ্তানকে মিসরের যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রদান করে, তাহল, কয়েকটি জাহাজের মেরামতের কাজ চলছে। যেগুলো ভাল, সেগুলোও ইস্কান্দারিয়া পৌঁছতে দু'দিন প্রয়োজন হবে। কারণ, একে তো এখান থেকে অনেক দূরে, তদপুরি ওগুলোর পাল ও দাঁড় দুর্বল। জেলেরা খৃষ্টানদেরকে সবচেয়ে মূল্যবান যে তথ্যটি প্রদান করে, তা হল, সুলতান আইউবী নৌ-বাহিনীর প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন না; ফলে এই শাখার সৈন্য ও মাল্লারা অলসতা-বিলাসিতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে থাকে। তারা কূলবর্তী লোকালয়ে চলে যায়, জেলেদের থেকে মাছ ছিনিয়ে নেয় আর খায়।

খৃস্টান নৌ-বাহিনীর রাহবারের জন্য এই সব তথ্য দারুণ সুসংবাদ-ই বটে। সে জাহাজ থামিয়ে দেয় এবং একটি নৌকায় করে বাহিনীর কমাণ্ডারের নিকট ছুটে যায়। কমাণ্ডারকে জেলেদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অবহিত করে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ময়দান ফাঁকা। কমাণ্ডার জাহাজের বহর এখানেই থামিয়ে দেয় এবং সন্ধার পর অন্ধকারে কূলে গিয়ে ভিড়বে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

ইস্কান্দারিয়ার বন্দরঘাট থেকে আরো একটি নৌকা সমুদ্রের দিকে ছেড়ে আসে। বাহ্যত মাছধরার নৌকা। সূর্য এখনো অস্ত যায়নি। নৌকাটা খৃস্টানদের

জাহাজের বহরের নিকট চলে যায়। অন্তত আড়াইশ' যুদ্ধ-জাহাজ সমুদ্রে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। জেলেরা নৌকাটা বহরের মধ্যখান দিয়ে নিয়ে যায় এবং একে ওকে জিজ্ঞাসা করে কমাণ্ডারের নিকট চলে যায়। তারা কমাণ্ডারকে জানায়, ইস্কান্দারিয়ায় কোন ফৌজ নেই। আছে শুধু সাধারণ মানুষ। মিসরের যুদ্ধ জাহাজ এখান থেকে অনেক দূরে। এই জেলেরা মূলত সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা; কিন্তু পরিচয় দেয় খৃস্টানদের গোয়েন্দা বলে।

রাতের প্রথম প্রহর। প্রথম সারির জাহাজগুলো সম্মুখ পানে এগিয়ে চলে এবং কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কূলে ভিড়ে। দ্বিতীয় সারিটি প্রথমটির পিছনে পিছনে এগিয়ে এসে নোঙ্গর ফেলে। এগিয়ে আসে তৃতীয়টিও।

সৈন্য অবতরণ করার ব্যবস্থা এই ছিল যে, প্রতিটি জাহাজ তীরে ভিড়বে না। একটির সঙ্গে আরেকটি সামনে পিছনে লাগোয়া থাকবে আর একের পর এক জাহাজ বেয়ে একেবারে সম্মুখের জাহাজ দিয়ে তারা ডাঙ্গায় অবতরণ করবে।

খৃস্টানদের সিদ্ধান্ত, ইস্কান্দারিয়ার উপর নীরবে হামলা করবে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইস্কান্দারিয়ায় মুসলমানদের কোন সৈন্য নেই, কোন প্রতিরোধের আশংকাও নেই। শহরটি অতি অনায়াসে দখল হয়ে যাবে।

সম্মুখের জাহাজ থেকে যেসব সৈন্য অবতরণ করে, তাদেরকে ইস্কান্দারিয়ায় ঢুকে পড়ার নির্দেশ দেয়া হল। তাদের আগাম বলে দেয়া হল, শহর তোমাদের; কোন প্রতিরোধ হবে না। হুড়মুড় করে ছুটে চলে খৃস্টান সৈন্যরা। শহরটা লুণ্ঠন করা তাদের প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ নারীদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করা।

কিন্তু বাহিনীটি যেইমাত্র শহরের কাছাকাছি চলে আসে, শহরের বাইরে ডানে-বাঁয়ে হঠাৎ করে বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বলে উঠে। অগ্নিশিখায় অন্ধকার রাত আলোকিত হয়ে যায়। এগুলো শুক্‌নো খড়, কাঠ ও কাপড়ের স্তূপ। রাতের অন্ধকারে আলোর প্রয়োজনে কেরোসিন ঢেলে এগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।

শহরের অলি-গলিতে প্রদীপ জ্বলে উঠে। ঘরের ছাদ থেকে তীর বৃষ্টি শুরু হয়। খৃস্টানরা পিছন দিকে পালাতে উদ্যত হয়। কিন্তু ডান-বাম থেকেও তাদের উপর তীর বর্ষিত হতে থাকে। আত্মসংরক্ষণ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তীরের আঘাত খেয়ে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে সৈন্যরা। তাদের হাঁক-ডাক আর আর্তচিৎকারে রাতের পরিবেশ প্রকম্পিত হয়ে উঠে।

সংখ্যায় তারা দু'হজার। দু'চার-জন জীবনে রক্ষা পেলেও পেতে পারে। অন্যরা সব ধ্বংস হয়ে গেছে সুলতান আইউবীর যোদ্ধাদের হাতে।

যেসব খৃস্টান সৈন্য জাহাজ থেকে অবতরণ করেনি, তারা এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ পায়। তারা এলোপাতাড়ি অগ্নিগোলা ও বহুদূরগামী তীর ছুঁড়তে শুরু করে।

কাপ্তানরা পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে, হঠাৎ একেবারে পিছনের দু'তিনটি জাহাজ থেকে আগুনের শিখা জ্বলে উঠেছে। তাদের মনে হল, যেন সমুদ্রের ভিতর থেকে আগুনের গোলা উঠে এসে জাহাজে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। পরম আত্মবিশ্বাসের শিকার হয়ে খৃস্টানরা সবগুলো জাহাজকে একত্রিতভাবে জড়ো করে রেখেছিল। তাদের ধারণা, বিনা বাধায় বিজয় তাদের সুনিশ্চিত। কিন্তু তারা যে সুলতান আইউবীর পাতা ফাঁদে এসে ঢুকেছে, সে খবর তাদের নেই।

দিনের বেলা প্রথম জাহাজের কাপ্তান যে সব জেলের সাথে কথা বলেছিল, তারাও ছিল আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের লোক। কিন্তু সমুদ্রে জেলেদের পেয়ে যাওয়াকে সৌভাগ্য মনে করে তাদের থেকে ভুল তথ্য সংগ্রহ করে সে আনন্দ করেছিল। জেলেরা তাদেরকে একটি তথ্য-ই সঠিক দিয়েছিল যে, মিসরের নৌ-বহর এখান থেকে অনেক দূরে। ছিল আসলে দূরে-ই।

সুলতান আইউবী তাঁর নৌ-বাহিনী প্রধানকে বলে রেখেছিলেন, সমুদ্রের প্রতি নজর রাখ; যে কোন সময় হামলা আসতে পারে। নৌ-বাহিনী প্রধান নজরদারীর বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি সময়ের আগে-ই খবর পেয়ে যান যে, খৃস্টানদের নৌ-বহর মাঝ-দরিয়ায় এসে পড়েছে। তিনি কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজকে– যেগুলোতে অগ্নি-গোলা নিক্ষেপকারী মিনজানীক স্থাপন করা আছে– দূরে একদিকে পাঠিয়ে দেন। জাহাজগুলোর পাল-মাস্তুল নামিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে দূর থেকে দেখা না যায়। তার পরিবর্তে তিনি জাহাজগুলোকে গতিময় করার জন্য একদাঁড়ে দু'জন করে লোক নিয়োজিত করেন।

সন্ধ্যার পর যখন খৃস্টানদের নৌ-বহর তীরে এসে ভীড়ে, সঙ্গে সঙ্গে মিসরের নৌ-বাহিনী প্রধান তার জাহাজগুলোর পাল-মাস্তুলও তুলে দেন। দাঁড়ের গতিও তীব্রতর করে তুলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি এমন একসময় খৃস্টানদের জাহাজ-বহরের পিছনে গিয়ে পৌঁছেন, যখন তারা তাদের জাহাজগুলোকে একটার সঙ্গে অপরটা মিলিয়ে নোঙ্গর করে রেখেছে। খৃস্টানদেরকে এই প্রবঞ্চনায় ফেলেছে ইস্কান্দারিয়া থেকে আসা 'জেলে'রা। তারা খৃস্টান কমাণ্ডারকে বলেছিল, আমরা আপনাদের-ই গুপ্তচর। তারা তথ্য দিয়েছিল, ইস্কন্দারিয়ায় কোন ফৌজ নেই। অথচ বাস্তব অবস্থা হল, নগরীর সমুদ্রবর্তী বাড়ী-ঘরগুলোতে শুধু ফৌজ-ই ছিল– অধিবাসীদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে।

সুলতান আইউবীর নৌ-বাহিনী প্রধান মাত্র অল্প ক'টি জাহাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। তা দ্বারা-ই তিনি দুশমনের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হন। কয়েকটি জাহাজ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অন্যরা মোকাবেলা করে। জ্বলন্ত জাহাজগুলো রাতকে দিবসে পরিণত করে দেয়। সেই আলোতে সুলতান আইউবীর জাহাজগুলোও চোখে পড়তে শুরু করে। তার মধ্য থেকে একটি জাহাজ খৃস্টানদের আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ে। আইউবীর নৌ-প্রধান তার জাহাজগুলোকে পিছনে সরিয়ে নিতে শুরু করেন। খৃস্টানরা সেগুলোকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে। ইস্কান্দারিয়ায় অবস্থানরত আইউবীর জানবাজরা দুশমনের জাহাজগুলোতে অগ্নি-গোলা ছুঁড়তে শুরু করে। এই জানবাজরা মিসরের বাহিনীর তৃতীয় অংশ, যাদেরকে সুলতান নিজের হাতে রেখে দিয়েছিলেন। তাদেরকে-ই অসামরিক বেশে ইস্কান্দারিয়ার বসত-বাড়ীগুলোতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল এবং অতি নীরবে শহরের বাসিন্দাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী লড়ছেন বুদ্ধি আর কৌশলের লড়াই। শক্তি ব্যয় করছেন নিতান্ত কম। তার নিজের অধীনে রাখা আছে এখনো অনেক কমাণ্ডো।

রাতভর এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। সমুদ্রে জ্বলতে থাকে অসংখ্য জাহাজ। এক প্রলয়ের দৃশ্য সৃষ্টি হয়ে আছে নদীতে। খৃস্টানদের জাহাজ অসংখ্য। বিপুল পরিমাণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর এখনো আস্তো আছে অনেকগুলো। এগুলো মুসলমানদের জাহাজগুলোকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। অবস্থা অনেকটা ঘিরে ফেলার মতো-ই হয়ে গেছে। রাত হওয়ার কারণে অবস্থা পরোপুরি আঁচ করা যাচ্ছে না। সুলতান আইউবীও রণাঙ্গনে উপস্থিত। তিনি নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখা জাহাজগুলোকে অভিযানে অংশ নেয়ার নির্দেশ প্রেরণ করেন। রাতের শেষ প্রহরে সেগুলোও এসে পড়ে।

রাত পোহাতে আর দেরি নেই। মিসরের নৌ-বাহিনী প্রধান একটি নৌকায় করে কূলে এসে পৌঁছান। সঙ্গে তার কয়েকজন সিপাহী। তার পরিধানের পোশাক রক্তে রঞ্জিত। এক-পা আগুনে ঝলসে গেছে। তিনি যে জাহাজে ছিলেন, সেটিও পুড়ে গেছে। নিজে আহত হয়ে কয়েকজন সিপাহীকে উদ্ধার করে নিয়ে তীরে এসেছেন। তিনি সুলতান আইউবীকে পরিস্থিতির বিবরণ দেন যে, তার অর্ধেক জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। খৃস্টানদেরও এতো অধিক ক্ষতি হয়েছে যে, আর বেশী সময় লড়াই করার সাধ্য তাদের নেই। সুলতান আইউবী তাকে অবহিত করেন যে, আমাদের অবশিষ্ট জাহাজগুলোকেও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

সুলতানের এই পদক্ষেপে বাহিনী প্রধান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তার

কামনাও এটা-ই ছিল। তিনি সুলতান আইউবীকে বললেন, খৃষ্টানরা জাহাজগুলোতে যেসব মালামাল ও রসদপাতি বোঝাই করে রেখেছে, সেগুলো এখন তাদের পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রসদ ছাড়া তাদের জাহাজে ফৌজও আছে। কোন কোন জাহাজে ঘোড়াও আছে। এই কারণে তাদের জাহাজের গতি কম, চক্কর কাটতে সময় লাগে। অন্যদিকে আমার জাহাজ শূন্য ও হালকা।

সুলতান আইউবীর নৌ-বাহিনী প্রধানের জখম খুব গুরুতর। এখন আর তিনি বসে থাকতে পারছেন না, মাথাটা দুলছে। সুলতান ডাক্তার ডেকে পাঠান।

সুলতানের স্থাণীয় হেড-কোয়ার্টার সমুদ্র কূলবর্তী এক পার্বত্য এলাকায়। তিনি উঁচু একখণ্ড পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। সূর্যের প্রভাত-কিরণ সমুদ্রের যে দৃশ্য উপস্থাপন করল, তা রীতিমত ভয়াবহ। অনেকগুলো জাহাজ মত্ত হাতীর ন্যায় সমুদ্রে দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগুনে জ্বলছে বহু জাহাজ। পাল-মাস্তুল পুড়ে যাওয়ায় একই স্থানে দাঁড়িয়ে চক্কর কাটছে জাহাজগুলো। সমুদ্রে বহু মানুষ ভাসতে দেখা গেল। তরঙ্গমালা লাশগুলোকে তীরের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। নিজের জাহাজগুলোর কোন সন্ধান পেলেন না সুলতান। অনেক দূরে পশ্চিমদিকে প্রথমে অনেকগুলো মাস্তুলের মাথা, তারপর পাল চোখে পড়তে শুরু করে। জাহাজগুলো এক সারিতে একটা থেকে অপরটা বেশ ব্যবধানে রণাঙ্গন অভিমুখে এগিয়ে আসছে। সুলতান আইউবী 'তোমার জাহাজ আসছে' বলেই তিনি পার্শ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু নৌ-বাহিনী প্রধান সেখানে নেই।

নৌ-বাহিনী প্রধান তাঁর জাহাজ-বহরের আগমন দেখে-ই সুলতানকে কিছু না বলে উপর থেকে নেমে যান। সুলতান যখন তাকে দেখতে পান, ততক্ষণে তিনি একটি নৌকায় চড়ে বসেছেন এবং নৌকার পালও উঠে গেছে। নৌকাটা দশ দাঁড়ের। সুলতান চীৎকার করে তাকে ডাক দেন– 'সাদী! তুমি ফিরে আস, তোমার স্থলে আমি আবু ফরীদকে পাঠাচ্ছি।'

নৌ-বাহিনী প্রধান বেশ দূরে চলে গেছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে জবাব দেন– 'এটা আমার যুদ্ধ আমীরে মেসের! আল্লাহ্ হাফেজ।'

নৌকাটা দ্রুতগতিতে দূর থেকে দূরান্তে চলে যেতে থাকে। তারপর একসময় দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে যায়।

দূত এসে সুলতান আইউবীকে সংবাদ দেয়, ইস্কান্দারিয়ার উত্তর-পশ্চিমে তিন মাইল দূরে খৃষ্টানদের কিছু সৈন্য অবতরণ করেছে এবং সেখানে ঘোরতর লড়াই চলছে। সুলতান সেখানকার জন্য কিছু নির্দেশ জারি করেন এবং

সমুদ্রের যুদ্ধ অবলোকন করতে থাকেন।

সুলতান দেখতে পান, খৃস্টানদের একটি জাহাজ কূলের একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। আবার তার বহরের একটি জাহাজও ঐ জাহাজটির কাছে চলে আসার চেষ্টা করছে। খৃস্টানরা বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়ে সেটিকে প্রতিহত করার কসরত চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুসলমান মাল্লারা সবকিছু উপেক্ষা করে জাহাজটির একেবারে নিকটে চলে যায় এবং লাফিয়ে লাফিয়ে জাহাজে ঢুকে পড়ে-ই হাতাহাতি লড়াই করে জাহাজটি দখল করে নেয়। মিসর নৌ-বাহিনীর জানবাজ সৈন্যরা খুন ও জীবনের নজরানা পেশ করে এ যুদ্ধ জয় করে। তারা তিন তিনজন, চার চারজন করে ভাগে ভাগে শত্রুপক্ষের বিভিন্ন দলের সঙ্গে লড়াই করে। জীবন দিয়ে জীবন নিয়ে তারা শত্রুর জাহাজটা দখল করে নেয়।

খৃস্টানদের কোমর রাতারাতি-ই ভেঙ্গে যায়। তাদের কমাণ্ডার ক্রুশের শপথ পূর্ণ করে চলেছে। তারা তাদের সৈন্যদেরকে ভোর পর্যন্ত এই আশ্বাস দিয়ে দিয়ে লড়াতে থাকে যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে-ই আমরা সুলতান আইউবীর ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে কাবু করে ফেলছি। কিন্তু পরদিন দ্বি-প্রহর পর্যন্ত তাদের অবস্থা দাঁড়ায়, জাহাজগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে যেতে থাকে। তাদের অধিকাংশ শক্তি মুসলমানদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের যে ক্ষুদ্র বাহিনীটি কূলে অবতরণ করেছিল, তাদের অনেকে ইস্কান্দারিয়া থেকে তিন-চার মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিমে একস্থানে লাশ হয়ে পড়ে আছে। অবশিষ্টরা মুসলমানদের হাতে আত্মসমর্পণ করেছে।

সুলতান আইউবীর বাহিনীর দ্বিতীয় গ্রুপ এখনো যুদ্ধে অবতরণ করেনি। সুলতানের নিকট দূত আসছে-যাচ্ছে। তিনি যখন নিশ্চিত হলেন যে, খৃস্টানরা পরাজিত হয়ে গেছে, তখন তিনি ফৌজের দ্বিতীয় গ্রুপটিকে অন্য এক ময়দানে প্রেরণ করেন। ইমরানের তথ্য মোতাবেক বাইতুল মোকাদ্দাসের দিক থেকেও খৃস্টান ফৌজ আসার কথা। তাদের জন্য নুরুদ্দীন জঙ্গী ওঁত পেতে আছেন। তথাপি অধিক সতর্কতার জন্য সুলতান আইউবী তাঁর প্রতিরক্ষা শক্ত করে নেন। সুলতান তৃতীয় যে গ্রুপটিকে নিজের অধীনে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তাদেরকে সেই খৃস্টানদের গ্রেফতার করার কাজে লাগিয়ে দেন, যারা সমুদ্র থেকে উঠে আসছে।

শেষ বেলার ক্লান্ত সূর্যের ম্লান কিরণমালা সুলতান আইউবীকে যে দৃশ্যটি প্রদর্শন করল, তাহল, এখন খৃস্টানদের সেই জাহাজগুলো-ই দেখা যাচ্ছে, যেগুলো পুড়ে গেছে, কিন্তু এখনো ডুবেনি কিংবা যেগুলোকে মুসলমানরা ধরে নিয়ে এসেছে অথবা সেই জাহাজগুলোর-ই পাল-মাস্তুল নজরে আসছে, যেগুলো ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। অপরদিকে

সুলতানের নিজের যে জাহাজগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে, সেগুলো কূলের দিকে এগিয়ে আসছে। দর্শকরা অনুমান করল, সুলতান আইউবীর অর্ধেক নৌ-শক্তি মিসরের জন্য আত্মত্যাগ করেছে। নৌকাগুলো কূলের দিকে আসছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের রক্ষাপাওয়া আহত-অক্ষত সৈন্যরা এগুলোতে করে কূলে আসছে। একটি নৌকা সেই টিলাটির নিকটে এসে কূলে ভিড়ে, সুলতান আইউবী যার উপর দাঁড়িয়ে। কার যেন লাশ তার মধ্যে। সুলতান আইউবী বিচলিত কণ্ঠে উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'এই, এটি কার লাশ?'

'নৌ-বাহিনী প্রধান সাদী বিন সাদ-এর।' এক মাল্লা জবাব দেয়।

সুলতান আইউবী দৌড়ে নীচে নেমে আসেন। লাশের উপর থেকে কাপড়টা সরালেন। তার নৌ-বাহিনী প্রধান সাদী বিন সাদ-এর রক্ত রঞ্জিত লাশ!

মাল্লারা জানায়, সাদী বিন সাদ একটি জাহাজে গিয়ে পৌঁছে যুদ্ধের কমাণ্ড হাতে তুলে নেন এবং নিজে লড়াই করতে থাকেন। সেই জাহাজটির উপর তিনি তার কমাণ্ডের পতাকা উড়িয়ে দেন। খুব সম্ভব সে কারণে-ই খৃস্টানদের চারটি জাহাজ তাকে ঘিরে ফেলে। প্রতিরোধের শিকার হয়ে সেগুলোর মধ্যে দু'টি জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। সাদী বিন সাদ-এর জাহাজও ধ্বংস হয়।

সুলতান আইউবী তার নৌ-বাহিনী প্রধানের লাশের হাতে চুমো খেয়ে অশ্রু ছল ছল নয়নে বললেন, 'তুমি-ই সমুদ্রের বিজেতা সাদী বিন সাদ- আমি নই।'

সুলতান আইউবী নির্দেশ দেন, 'দুশমনের কিশতিগুলো সব সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও। শহীদদের লাশগুলো সব সমুদ্র থেকে তুলে আন, একটি লাশও যেন সমুদ্রে না থাকে। তাদেরকে এখানেই দাফন কর। রোম উপসাগরের হিমেল হাওয়া চিরদিন তাদের কবরগুলোকে ঠাণ্ডা রাখবে।'

সমুদ্রে শহীদহওয়া মুজাহিদদের সংখ্যা কম ছিল না।

বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে খৃস্টানদের বাহিনী রওনা হয়ে অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে। তারা জানেনা যে, তাদের নৌ-বাহিনী চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে গেছে। খৃস্টানদের খ্যাতনামা যুদ্ধবাজ সম্রাট রেজনাল্ট তাদের কমাণ্ডার। বাহিনীটি তিন ভাগে বিভক্ত। এক অংশ সম্মুখে। দ্বিতীয় অংশ কিছুটা পিছনে মধ্যখানে এবং তৃতীয় অংশ অনেক বাঁ ঘেষে এগিয়ে চলছে। বাহিনীর সম্মিলিত কমান্ড রেজনাল্টের হাতে। তাদের আশা, তারা সুলতান আইউবীর উপর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আঘাত হানতে সক্ষম হবে। কল্পনার চোখে তারা কায়রো দেখতে পাচ্ছে। ঘোড়া-গাড়ির কাফেলা এবং রসদও আছে তাদের সাথে।

ইস্কান্দারিয়া থেকে অনেক দূরে উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত বালুকাময় এক এলাকা। এখানকার কোথাও মাটির টিলা, কোথাওবা সমতল ভূমি। তার পার্শ্ববর্তী এলাকাটা পর্বতময়। পর্যাপ্ত সুপেয় পানি আছে এখানে। এই এলাকায় ছাউনি ফেলেন কমান্ডার রেজনাল্ট। তার বাহিনীর অগ্রগামী অংশ এগিয়ে চলছে সম্মুখে। ডানদিকের অংশ এখনো অনেক দূরে পিছনে। মধ্যরাতে হঠাৎ–নিতান্ত-ই হঠাৎ সম্পূর্ণ অকল্পনীয়ভাবে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যায় তার ক্যাম্পে। কেয়ামতটা আসমান থেকে নেমে এল, নাকি তার বাহিনী বিদ্রোহ করে বসল, কিছু-ই বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি।

সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর ফাঁদে এসে পা দিয়েছে রেজনাল্ট। জঙ্গী তার সৈন্যদেরকে কয়েকদিন যাবত বসিয়ে রেখেছেন এ এখানকার বিভিন্ন জায়গায়। তিনি ধরে নিয়েছেন, যেহেতু এখানে পানি আছে, কাজেই খৃস্টানরা অবশ্যই এখানে ছাউনি ফেলবে।

সুলতান জঙ্গীর কমাণ্ডারদের দুঃখ, খৃস্টান বাহিনীর অগ্রগামী অংশ আগে চলে গেছে। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, রাতে ছাউনিতে হামলা চালাবে। কিন্তু অগ্রগামী বাহিনী এখানে ছাউনি না ফেলে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। অনেক পরে তারা দূরে ধূলির মেঘ দেখতে পায়। তারা ভেবেছিল, ঝড় আসছে। মরু এলাকার ঝড়োহাওয়া বড় ভয়ানক হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে তা ঝড় নয়–খৃস্টান বাহিনীর মধ্যম অংশ। তারা এসে এ স্থানে থেমে যায়। তারা তাঁবু স্থাপন করেনি। কেননা, ভোরেই তাদেরকে রওনা হতে হবে। পশুগুলোকে আলাদা বেঁধে রাখে। সূর্য ডুবে যায়।

মধ্যরাতে জঙ্গীর ওঁত পেতে থাকা সৈন্যরা বাইরে বেরিয়ে আসে। তারা সকলে-ই আরোহী। তারা প্রথমে অন্ধাকারে তীরবৃষ্টি বর্ষণ করে। খৃস্টান সৈন্যদের মধ্যে হুলস্থুল শুরু হয়ে যায়। এবার আরোহীরা ঘোড়া ছুটায়। এলোপাতাড়ি বর্শা ও তরবারী চালাতে চালাতে সামনে এগিয়ে যায়। খৃস্টান সৈন্যরা নিজেদের সামলে নিতে না নিতে-ই জঙ্গীর সৈন্যেরা আবার তীব্র আঘাত হানে। খৃস্টানদের বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোর রশি খুলে দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলো এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে। রেজনাল্ট এলাকা ছেড়ে পালিয়ে পিছনের বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। বাহিনীর সেই অংশটি এখান থেকে এখনো অনেক দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে। নুরুদ্দীন জঙ্গী সেদিকে-ই কোথাও অবস্থান করছেন। খৃস্টান বাহিনীর সমস্ত রসদ পিছনে আসছে। জঙ্গী তাঁর জন্য আলাদা ইউনিট নিয়োজিত করে রেখেছেন। তারা ভোর নাগাদ রসদের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। ডানদিকের বাহিনী রাতে-ই টের পেয়ে গিয়েছিল। রেজনাল্ট সেই বাহিনীকে নিজের কাছে নিয়ে

আসতে চাইছেন। তার ধারণা মতে যুদ্ধ এখানেই সংঘটিত হবে। এই বাহিনী ভোরের আলো-আঁধারিতে রওনা হয়। নুরুদ্দীন জঙ্গী পিছন থেকে তার এক পার্শ্বের উপর আক্রমণ করে বসেন। তারা টের-ই পেলনা যে, আক্রমণটা কোন্ দিক থেকে আসল বা কে করল। সুলতান আইউবীর ন্যায় জঙ্গীও এক জায়গায় স্থির হয়ে লড়াই করেন না। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে হামলা করে করে প্রতিপক্ষকে বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করে থাকেন।

সুলতান জঙ্গী রাতে সুলতান আইউবীর নিকট দূত প্রেরণ করেন। পরিকল্পনা তো দু'জনে আগেই তৈরী করে রেখেছেন। জঙ্গীর প্রতিটি কর্মতৎপরতা, পদক্ষেপ ও দুশমনের গতিবিধি হুবহু তার পরিকল্পনা মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। রেজনাল্ট তার অগ্রগামী বাহিনীকে পিছনে সরে আসার বার্তা প্রেরণ করে। চারদিন পর্যন্ত জঙ্গী ও রেজনাল্টের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। জঙ্গী খৃস্টান সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত করে ফেলেন এবং 'আঘাত কর আর পালাও'-এর নীতি অনুযায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যান। খৃস্টানদের সম্মুখের বাহিনী পিছনে সরে আসে। রাতে তার উপর পিছন দিক থেকে হামলা হয়। হামলা করে সুলতান আইউবীর কমাণ্ডো বাহিনী। তারা দু-তিন রাত কমাণ্ডো হামলা চালায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ধারা অব্যাহত থাকে তারপরও। খৃস্টানরা মুখোমুখি লড়াই করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সুলতান আইউবী তাদেরকে সফল হতে দিচ্ছেন না। যে পন্থায় হামলা চলছে, তাও চাট্টিখানি বিষয় নয়। আক্রমণে কমাণ্ডো যদি যাচ্ছে একশ', ফিরে আসছে ষাটজন। তা ছাড়া তার জন্য প্রয়োজন বিশেষ দক্ষতা, বীরত্ব ও দৃঢ়তা, যা সুলতান আইউবী তার সৈন্যদের মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

যুদ্ধ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। খৃস্টান সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের কমাণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে। রসদ-পানি এসে পড়েছে জঙ্গীর কব্জায়। এ যুদ্ধের আগা-মাথা, দিক-পাশ কিছুই ধরতে পারছে না তারা। কী থেকে কী হয়ে গেল, কী-ইবা হচ্ছে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কোন দিশা না পেয়ে তারা পালাতে শুরু করে। পালাবার শক্তিও যাদের নেই, তারা আত্মসমর্পণ করতে থাকে।

সেনাপতি রেজনাল্ট হার মানতে প্রস্তুত নন। তিনি একস্থানে কিছু সৈন্য জড়ো করে নেন এবং তাদেরকে জঙ্গীর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা জঙ্গীর অবস্থানের উপর হামলা চালায়। জীবনমৃত্যুর লড়াই লড়ছে খৃস্টান সৈন্যরা। চতুর্থ কিংবা পঞ্চম রাতে জঙ্গীর গেরিলা গ্রুপের কিছু সৈন্য রেজনাল্টের নিজস্ব তাঁবুতে হামলা চালায়।

ভোর হল। খৃস্টান সেনাপতি রেজনাল্ট বন্দী হিসেবে জঙ্গীর সামনে

দণ্ডায়মান। সুলতান জঙ্গী বিভিন্ন শর্তে তাকে মুক্তি দেয়ার কথা ভাবছেন। মুক্তির শর্তগুলো তাকে অবহিত করছেন। বাইতুল মোকাদ্দাসের প্রসঙ্গ আসে। জঙ্গী বললেন, বাইতুল মোকাদ্দাসকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে তুমি মুক্ত হয়ে যাও।

সন্ধ্যা নাগাদ সুলতান আইউবীও এসে পড়েন।

যথাযথ সম্মানের সাথে রাখা হয়েছে রেজনাল্টকে। সুলতান আইউবী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন।

'আপনি এক মহান যোদ্ধা।' সুলতান আইউবীর উদ্দেশ্যে রেজনাল্ট বললেন।

'বরং বল, ইসলাম এক মহান ধর্ম'– সুলতান বললেন– 'সেই যোদ্ধা-ই মহান হন, যার ধর্ম মহান।'

মোহতারাম রেজনাল্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাদের নৌ-বহর এসেছে নাকি? নুরুদ্দীন জঙ্গী সুলতান আইউবীকে বললেন- 'এ প্রশ্নের সঠিক জবাব তুমি-ই দিতে পার; আমি তো এখানেই ছিলাম।'

আপনাদের নৌ-বহর সমভিব্যহারে এসেছিল'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আবার ফিরেও গেছে। অনেকগুলো জাহাজ সমুদ্রের তলায় ডুবে গেছে। যেগুলো ডুবেনি, সেগুলোর পোড়া খোল সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে। যেসব সৈন্য জাহাজ থেকে নেমেছিল, তারা একজনও ফিরে যেতে পারেনি। আপনাদের সমস্ত মরদেহ আমরা পূর্ণ সম্মানের সাথে মাটিতে পুঁতে রেখেছি।'

সুলতান আইবী সেনাপতি রেজনাল্টকে যুদ্ধের পুরো ঘটনার বিবরণ প্রদান করছেন আর রেজনাল্ট তন্ময় হয়ে শুনছেন। তার বিশাস হচ্ছিল না যে, সুলতান যা বলছেন, সত্য বলছেন কি!

'আপনি যা শোনালেন, যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে পারেন, এমনটা কিভাবে সম্ভব হল?' রেজনাল্ট জিজ্ঞেস করে। তার চোখে-মুখে দুনিয়ার বিস্ময়।

'এই রহস্য আপনাকে সেদিন উন্মোচন করব, যেদিন ফিলিস্তীন থেকে খৃষ্টানদের সর্বশেষ সৈন্যটি বেরিয়ে যাবে'– নুরুদ্দীন জঙ্গী বললেন- 'আপনার এই পরাজয় শেষ পরাজয় নয়। কেননা, আপনারা এই ভূখন্ড ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নন মনে হচ্ছে।'

'আপনার ভূখন্ড আমি আপনাকে দিয়ে দিব'– রেজনাল্ট বললেন- 'আপনি আমাকে মুক্তি দিন। আমি আপনার সঙ্গে আর যুদ্ধ না করারও চুক্তি করব। আপনার সাম্রাজ্য অনেক বিস্তৃত হয়ে যাবে।'

'নিজের রাজত্ব নয়'-সুলতান আইউবী বললেন- 'আমরা আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করছি। আমরা ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করতে চাই। আপনাদের লক্ষ ইসলামের মূলোৎপাটন , যা কোনদিনও

সম্ভব নয়। আপনারা ফৌজ ব্যবহার করে দেখেছেন। নৌ-শক্তিও পরীক্ষা করেছেন। নিজ কন্যাদেরও ব্যবহার করে দেখেছেন। আপনারা আমাদের জাতির মধ্যে গাদ্দার তৈরি করেছেন। বলুন, বিগত এক শতাব্দীতে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছেন?'

'আমি কি আপনাকে বলব যে, আমরা কোন্ কোন্ স্থান থেকে ইসলাম বের করে দিয়েছি?'— রেজনাল্ট বলল- 'ইসলাম তো রোম উপসাগরের ওপারে পৌঁছে গিয়েছিল। বলুন তো সেখান থেকে ইসলাম কেন বিতাড়িত হয়েছে? রোম আপনাদের হাতছাড়া হল কেন? সুদান কেন আপনাদের দুশমনে পরিণত হল? শুধু এই জন্য যে, ইসলামের মোহাফেজদেরকে আমরা ক্রয় করে নিয়েছি। আর আজও আপনাদের বহু শাসক ভাই আমাদের কেনা গোলাম। তাদের শাসনাধীন ভূখন্ডগুলোতে মুসলমান আছে বটে; ইসলাম নেই।'

আমরা ওসব ভূখন্ডে ইসলামকে পুনর্জীবিত করব।' সুলতান আইউবী বললেন।

'আপনি স্বপ্ন দেখছেন, সালাহুদ্দীন!'— রেজনাল্ট বললেন— 'আপনারা দু'জন ক'দিন জীবিত থাকবেন? ক'দিন যুদ্ধ করতে পারবেন? আপনারা ইসলামের পাসবানী কতদিন পর্যন্ত করবেন? আমি আপনাদের দু'জনের প্রশংসা করছি। স্বীকার করছি, আপনারা সফল। আপনারা দু'জন সত্যিই ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। কিন্তু আপনাদের জাতির মধ্যে ধর্মকে নীলামে বিক্রয়কারী লোকের সংখ্যা অনেক। আমরা হলাম ক্রেতা। আপনারা আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবেন না। আপনাদের জাতির কর্ণধাররা আকণ্ঠ বিলাসিতায় নিমজ্জিত। আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, যে পঁচন একটি জাতির মাথা থেকে শুরু হয়, তা রোধ করা যায় না; গোটা জাতিই তাতে ধ্বংস হয়ে যায়। সে কারণে আমরা আপনাদের জাতির কর্ণধারদের ফাঁদে ফেলেছি। আপনারা যদি আমাকে হত্যা করে ফেলেন, যদি আমার ন্যায় দু'চারজন খৃস্টান সম্রাটকে খুন করেন, তবু ইসলামের পতন অনিবার্য। আমরা যে বিষ আপনাদের জাতির শিরায় ঢুকিয়ে দিয়েছি, তার ক্রিয়া দিন দিন বাড়বে বৈ কমবে না।'

সেনাপতি রেজনাল্ট এমন এক বাস্তবতার বিবরণ দিচ্ছিলেন, সুলতান আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গী যা অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু আপাতত তারা তো খৃস্টানদের উপর বিশাল এক বিজয় অর্জন করেছেন এবং এ মুহূর্তে খৃস্টানদের একজন বড় মাপের কমান্ডার তাদের হাতে বন্দী আছে। আরো অনেক খৃস্টান তাদের হাতে বন্দী হয়েছে।

✿ ✿ ✿

নূরুদ্দীন জঙ্গী রেজনাল্ট ও অন্যান্য খৃস্টান বন্দীদেরকে কার্ক নিয়ে যান। সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গী থেকে বিদায় নিয়ে কায়রো ফিরে যান। নুরুদ্দীন জঙ্গীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎই যে তার শেষ সাক্ষাৎ, সুলতান আইউবী তা কল্পনাও করেননি। নুরুদ্দীন জঙ্গী রেজনাল্টের ন্যায় মূল্যবান কয়েদীকে কঠিন শর্ত আদায় না করে মুক্ত করবেন না, এই আনন্দ নিয়েই তিনি কায়রো ফেরেন। জঙ্গীও মনে মনে পরিকল্পনা একটা স্থির করে রেখেছেন নিশ্চয়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন।

১১৭৪ সালের শুরুর দিক। বাগদাদের একটি এলাকায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। তাতে ছয়-সাতটি জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়। রাজধানী বাগদাদের কিছু ক্ষতি হয়। ঐতিহাসিকগণ এই ভূমিকম্পকে ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ভূকম্পন বলে অভিহিত করেছেন।

দেশের জনসাধারণের প্রতি নুরুদ্দীন জঙ্গীর এত আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা ছিল যে, দূরে বসে দুর্গতদের সাহায্যের নির্দেশ না পাঠিয়ে তিনি স্বয়ং কার্ক ত্যাগ করে ছুটে যান। দুর্গত জনতার সেবা তিনি নিজ হাতে করতে চান। তিনি কার্ক থেকে রেজনাল্ট ও অন্য কয়েদীদের সঙ্গে করে নিয়ে যান।

নুরুদ্দীন জঙ্গী বাগদাদ পৌঁছে সর্বপ্রথম ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। দারুল খেলাফতের বাইরে সময় কাটাতে শুরু করেন তিনি। তিনি হৃদয়-মন দিয়ে দুর্গত মানুষদের সেবা-শুশ্রূষা করে যাচ্ছেন। যেখানে রাত হচ্ছে, সেখানেই তিনি অবস্থান করছেন। নিজের নিরাপত্তার কথা তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। খাবার কোত্থেকে আসছে, রান্না কে করছে, তার প্রতি তিনি কোনই ভ্রূক্ষেপ করছেন না।

এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ দুর্গত সব মানুষের পুনর্বাসনের কাজ সমাপ্ত হয়। টানা ব্যস্ততা থেকে তিনি অবসর হন। ডাক্তারকে বললেন, আমার গলায় কিসের যেন একটা ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। ডাক্তার ওষুধ প্রয়োগ করেন। কিন্তু কণ্ঠনালীর জ্বালা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ডাক্তার নানাভাবে চিকিৎসা করেন; কিন্তু সুলতান জঙ্গীর অবস্থা খারাপ হতে হতে এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, এখন আর তিনি কথাই বলতে পারছেন না। অবশেষে ১১৭৪ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে যান। হাসান বিন সাব্বাহর ফেদায়ী গোষ্ঠী খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীকে।

নুরুদ্দীন জঙ্গী মৃত্যুর সময় কোন অসিয়ত করে যেতে পারেননি। সুলতান আইউবীর জন্য কোন পয়গামও রেখে যেতে পারেননি। সুলতান আইউবী যখন সংবাদ পান, ততক্ষণে জঙ্গীর দাফন সম্পন্ন হয়ে গেছে।

পরদিনই বাগদাদ থেকে এক দূত সংবাদ নিয়ে আসে, নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে মওসেল, হালব ও দামেস্কের আমীরগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সুলতান আইউবী এ সংবাদও পান যে, বাগদাদের আমীর-উজীরগণ নুরুদ্দীন জঙ্গীর এগার বছর বয়সের পুত্র আল মালিকুস্ সালিহ্কে সালতানাতে ইসলামিয়ার খলীফা নিযুক্ত করেছেন। সুলতান বুঝে ফেললেন, আমীরগণ এই নাবালক খলীফাকে কোন্ পথে পরিচালিত করবে এবং কোন্ কূপের পানি পান করাবে।

সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে বললেন–

'পাঁচ মাস আগে তুমি আমাকে সংবাদ দিয়েছিলে যে, আক্রায় তোমার একজন গোয়েন্দা শহীদ হয়েছে, একজন ধরা পড়েছে। তখনই আমার মন বলছিল এবং অনুভূত হচ্ছিল যে, এই বছরটা ইসলামী দুনিয়ার জন্য শুভ হবে না।... বস আলী! আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শোন। এখন থেকে আমাদেরকে আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।'

দুর্যোগের ঘনঘটা

১১৭৪ সালের মে মাস। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী মৃত্যুবরণ করলেন এই মাসের কোন একদিন। এটি ইসলামের ইতিহাসের একটি অন্ধকার দিন। নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃতদেহকে এখনো গোসলও দেয়া হয়নি। তার আগেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বেশকিছু মানুষের চেহারা। এরা খৃস্টান নয়। কথাটা এভাবেও বলা যায় যে, নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুতে যারা আনন্দিত হয়েছিল, তারা শুধু খৃস্টানই ছিল না, তাদের মধ্যে এমন কতিপয় মুসলমানও ছিল, যাদের আনন্দ ছিল খৃস্টানদের অপেক্ষা বেশী। এরা মুসলিম রিয়াসত ও জমিদারির আমীর-শাসক। জঙ্গীর মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র এরা সকলেই জঙ্গীর বাসভবনে ছুটে এসেছে। এসেছে জঙ্গীর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য। তাদের মধ্যে কতিপয়কে এমন অস্থির দেখাচ্ছিল, যেন তারা জঙ্গীর মৃত্যুতে শোকাহত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অস্থিরতা ছিল জঙ্গীকে দ্রুত সন্ধ্যার আগেই দাফন করার জন্য। তাদের তর সইছে না।

জঙ্গীর মৃত্যুতে তারা সকলেই সমবেত হয়েছে। এদিক থেকে তারা ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু তাদের হৃদয় শতধা-বিভক্ত। একজন অপরজনকে সন্দেহের চোখে দেখছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না। তাদের ধর্ম এক, আল্লাহ এক, রসূল এক, কুরআন এক, দুমশনও এক। কিন্তু অন্তর তাদের একটি থেকে অপরটি আলাদা। তাদের দৃষ্টান্ত কোন গাছের এমন কতগুলো ডালের ন্যায়, যেগুলো গাছ থেকে ভেঙ্গে আলাদা হয়ে পড়ে গছে।

যুগটা ছিল মূলত নবাবী ও জামিদারীর। কিছু মুসলিম রিয়াসত সামান্য বিস্তৃত হলেও অন্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষদ্র। তাদের শাসকদেরকে 'আমীর' বলা হত। তারা ছিল কেন্দ্রীয় খেলাফতের অধীন। ইসলামের কোন দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে এই আমীরগণ খেলাফতকে আর্থিক ও সামরিক সহযোগিতা দিত। কিন্তু এই সাহায্য শুধুমাত্র সাহায্য পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। তাতে কোন জাতীয় চেতনা ছিল না। তারা জমিদারী টিকিয়ে রাখার জন্য খেলাফতের দাবি পূরণ করত। আবার সেই একই লক্ষ্যে ইসলামের একমাত্র দুশমন খৃস্টানদের সঙ্গে তলে তলে বন্ধুত্ব গড়ে তুলত। তাদের কেউ কেউ গোপনে খৃস্টানদের সঙ্গে চুক্তিও করে রেখেছিল। কিন্তু নুরুদ্দীন জঙ্গীর অস্তিত্ব খৃস্টানদের অগ্রগতির পথে বিরাট এক প্রতিবন্ধক ছিল। তিনি এই মুসলিম আমীরদেরকে বহুবার সতর্কও করেছিলেন।

তাদেরকে একথা বুঝাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যে, খৃস্টানরা তোমাদেরকে ইসলামী ঐক্য থেকে সরিয়ে নিয়ে হজম করে ফেলবে। কিন্তু খৃস্টানদের পরিবেশিত ইউরোপীয় মদ, সুন্দরী নারী আর চকচকে সোনার টুকরোর মধ্যে এতই শক্তি ছিল যে, এগুলো তাদের কানে তুলা ও বিবেকে অর্গল এঁটে দিয়েছিল। জঙ্গীর আহ্বান পাথরের সঙ্গে টক্কর খেয়ে ফিরেই আসে শুধু।

তাদের প্রথম পরিচয় তারা জমিদার জায়গীরদার, নবাব, আমীর ও হাকেম। ধর্মের প্রশ্ন দেখা দিলে পরে মুসলমান। মুসলমান পরিচয়টা ছিল তাদের তৃতীয় এবং গৌন। তাদের ধর্ম পরিচয় যদিও ছিল, ছিল তা ক্ষমতা আর জায়গীরদারীর জন্য। এটাই তাদের ঈমান। তারা ইসলামী ঐক্যের কথা ভাবত না। তারা যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিল। কেননা, তাদের আশংকা ছিল, খৃস্টানরা তাদের জায়গীরদারী কেড়ে নেবে। তাদের মনে এই ভয়ও ছিল যে, তাদের প্রজারা যদি দুশমনের পরিচয় পেয়ে যায়, তাহলে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও ঈমানী শক্তি জেগে উঠবে। তারা তাদের নবাবীর জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেবে। বস্তুত প্রজারা তাদের জন্য স্বতন্ত্র এক হুমকিই ছিল। তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ছিল বিদ্যমান। জঙ্গীর বাহিনী তাদেরই ভাই-বন্ধু ছিল। জঙ্গীর মুজাহিদরা নিজেদের অপেক্ষা দশগুণ বেশী সৈন্যের মোকাবেলা করেছে। এ ছিল চেতনার ফল। এই চেতনা দু'চোখে সহ্য করতে পারত না আমীরগণ। তাই নুরুদ্দীন জঙ্গী ছিলেন তাদের অপ্রিয়। আর সালাহুদ্দীন আইউবীকেও তারা দুশমন ভাবত। এখন জঙ্গী মারা গেছেন। তারা আনন্দিত। তারা মনে করত, এই জগত দ্বিতীয় আর কোন জঙ্গীর জন্ম দেবে না। জঙ্গীর সঙ্গে জিহাদও দাফন হয়ে যাবে।

জঙ্গীকে দাফন করা হয়েছে। খৃস্টানদের মনে মুসলমানদের যে ভীতি ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। এখন আর একটি কাঁটা অবশিষ্ট আছে, সে হল সুলতান আইউবী। কিন্তু এ কাঁটা নিয়ে তাদের তেমন কোন ভাবনা নেই। সুলতান আইউবী এখন নিঃসঙ্গ। তাকে সাহায্যদাতা জঙ্গী মারা গেছেন। খৃস্টানদের বড় আনন্দ এই জন্য যে, জঙ্গীর মৃত্যুর পর তাদের অনুগত আমীর-উজীরগণ জঙ্গীর অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র আল মালিকুস সালিহকে সিংহাসনে বসিয়েছে। বয়স তার এগার বছর। খেলাফতের মূল সিংহাসন এখন খৃস্টানদের হাতে।

খৃস্টানদের অনুগত আমীরদের মধ্যে একজন হলেন গোমস্তগীন। একজন মওসেলের গবর্নর সাইফুদ্দীন। একজন দামেস্কের শাসক শামসুদ্দীন ইবনে আবদুল মালেক। আল জাজীরা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজত্ব নুরুদ্দীন জঙ্গীর ভাতিজার হাতে। তাছাড়া আরো কয়েকজন জায়গীরদার আছেন। তারা সকলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তারা সকলেই আনন্দিত। কিন্তু এই বুঝ

তাদের নেই যে, বালি-কণার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে এখন তারা খৃস্টানদের সহজ শিকারে পরিণত।

জঙ্গীর মৃত্যুতে ইসলামী দুনিয়ার যে ক্ষতি হয়েছে, জঙ্গীর স্ত্রী তা অনুধাবন করতে পেরেছেন। উপলব্ধি করেছেন সুলতান আইউবীও। আর বুঝেছে তারা, যাদের অন্তরে ইসলামের মর্যাদা জাগ্রত ছিল।

❁ ❁ ❁

নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর বেশ ক'দিন পর। সুলতান আইউবী নিজ কক্ষে পায়চারী করছেন। কক্ষে বসে কথা বলছেন মোস্তফা জুদাত।

মোস্তফা জুদাত একজন উর্ধ্বতন তুর্কী সেনা অফিসার। নুরুদ্দীন জঙ্গীর সেনাবাহিনীতে তিনি মিনজানীকের কমান্ডার ছিলেন। জঙ্গীর ওফাতের পর ইসলামী দুনিয়ায় তিনি যে ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন, তা তাকে কাঁপিয়ে তুলেছে। তিনি এই বলে ছুটি নিয়ে এসেছেন যে, বাড়ি গিয়েছি কয়েক বছর হয়ে গেল; এবার একটু বাড়ি যাওয়া দরকার। দামেস্ক থেকে রওনা হয়ে তিনি কায়রোতে সুলতান আইউবীর নিকট চলে আসেন। মোস্তফা জুদাত সেই অফিসারদের একজন, যারা আগে মুসলমান পরে অফিসার। তিনি জানতেন, নুরুদ্দীন জঙ্গীর পর সুলতান আইউবীই ইসলামের মর্যাদা সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম এবং করবেনও। তার আশংকা ছিল, সুলতান আইউবী এদিককার খবর হয়ত জানেন না, তাই তাকে তিনি দামেস্কের কারগুজারী শুনাতে এসেছেন।

'.. আর ফৌজ কি অবস্থায় আছে?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

'মহামান্য জঙ্গী ফৌজের মধ্যে যে জযবা সৃষ্টি করেছিলেন, তা অটুট আছে'– মোস্তফা জুদাত জবাব দেন– 'কিন্তু এই জযবা বেশীক্ষণ টিকবে না। আপনি জানেন, খৃস্টানদের সয়লাব শুধু সেনাবাহিনীই রোধ করে রেখেছে। মাননীয় জঙ্গীর জীবদ্দশায় কার্যত সেনাবাহিনীই দেশ শাসন করত। যুদ্ধ পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত সেনাবাহিনীরই হাতে ছিল। কিন্তু সেই পদক্ষেপ ছিল খেলাফতের অপছন্দনীয় ও রাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী। এখন আমরা খেলাফতের অনুগত। আমরা এখন নিজেদের মত করে কোন পদক্ষেপ নিতে পারি না। খলীফা যদি কোন যুদ্ধ পরিকল্পনা হাতে না নেন, তাহলে সেনাবাহিনীর কিছুই করার নেই। জাতীয় ও ধর্মীয় স্বার্থে লড়াই করার ও জীবন দেয়ার মত আত্মমর্যাদাবোধ মুসলিম আমীরদের মধ্যে নেই। আমীরদের জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনাবোধ খৃস্টানরা ক্রয় করে নিয়েছে। এবার তারা আমাদের সেনাপতিদের ক্রয় করার অভিযানে নেমেছে। তাদের এই ধ্বংসাত্মক তৎপরতা ফৌজ ও জনগণ উভয় ক্ষেত্রেই শুরু হয়ে গেছে। এই অপতৎপরতা যদি অতিদ্রুত

প্রতিহত করা না যায়, তাহলে খৃস্টানরা যুদ্ধ ছাড়াই সালতানাত ইসলামিয়ার মালিক হয়ে যাবে। আমাদের সালতানাতে ইসলামী জায়গীর-জমিদারীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। আমীরদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব নয়। তারা মদে আকণ্ঠ ডুবে গেছে। খৃস্টানরা ওখানে নারীর ফাঁদ ছড়িয়ে দিয়েছে। আপনি শুনে অবাক্ হবেন যে, এই মেয়েরা আমাদের আমীরদের হেরেমে অবস্থান করছে। তারা হেরেমে বিনোদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। সেই অনুষ্ঠানে আমাদের সেনাঅফিসারদের নিমন্ত্রণ করে তাদেরকে বেহায়াপনার ফাঁদে আটক করছে।

'আর আমি জানি তারপর কী হবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমাদের সৈন্যদেরকে অপকর্মে অভ্যস্ত করা হবে।'

'অভ্যস্ত করা হচ্ছেও'– মোস্তফা জুদাত বললেন– 'আর হাশীশীরাও তাদের তৎপরতা পুরোদমে শুরু করে দিয়েছে। এখন হবে কি জানেন? আমাদের যে সালার বা নায়েব সালার মন থেকে খৃস্টানদের দুশমনী ঝেড়ে না ফেলবে এবং জিহাদের পক্ষে কাজ করবে, তাদেরকে হাশীশীদের পেশাদার ঘাতকদের দিয়ে রহস্যময় উপায়ে হত্যা করা হবে।'

কোন্ আমীর কী করছেন, মোস্তফা জুদাত সুলতান আইউবীকে তার বিস্তারিত বিবরণও প্রদান করেন। তার সারাংশ হল, নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী আমীরগণ একে অপরকে দুশমন ভাবতে শুরু করেছেন। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। খৃস্টানরা মুসলিম আমীরদের এই কপটতা ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

'আপনি আমাকে ওখানকার পরিস্থিতি জানাতে এসে ভালই করেছেন'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আপনি না আসলে আমি এতকিছু জানতাম না। তবে আমার এতটুকু অনুমান করা কঠিন ছিল না যে, এগার বছরের বালককে খলীফা নিযুক্ত করে মানুষ কী করতে চায়।'

'আর আপনি কী করতে চান?'– মোস্তফা জুদাত জিজ্ঞেস করেন– 'আপনি যদি অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, তাহলে মনে করুন সালতানাতে ইসলামিয়ার সূর্য ডুবে গেছে। আর আপনার পদক্ষেপ হওয়া উচিত শুধুই যুদ্ধ।'

'আহ! সেই দিনটিও আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হল যে, আজ আমাকে আমার ভাইদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার কথা ভাবতে হচ্ছে'– দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি আশংকা করছি, আমার মৃত্যুর পর গাদ্দাররা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করবে যে, সালাহুদ্দীন আইউবী গৃহযুদ্ধের অপরাধে অপরাধী ছিল।'

'কিন্তু আপনি যদি এই ভয়ে কায়রো বসে থাকেন, তাহলে ইতিহাস আপনার পথে এই লজ্জাজনক অভিযোগ আরোপ করবে যে, নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুবরণ করার পর সালাহুদ্দীন আইউবীরও দম বেরিয়ে গিয়েছিল। তিনি মিসরের কব্জা অটুট রাখার জন্য সালতানাতে ইসলামিয়াকে কুরবান করে দিয়েছিলেন।'

'তা ঠিক'– সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন– 'এই অভিযোগ বেশী অপমানজনক। আমি সবদিকেই চিন্তা করেছি মোস্তফা! শোন, আমি যদি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র জন্য বের হই, তাহলে আমি দেখব না আমার ঘোড়ার পদতলে কে পিষ্ট হচ্ছে। আমার দৃষ্টিতে সেই কালেমাগো মানুষগুলো কাফেরদের চেয়েও বেশী ঘৃণ্য, যারা কাফেরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতে...।'

'আপনি ফিরে যান। আমি আলী বিন সুফিয়ানকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি গেছেন গোয়েন্দাবেশে। ওখানকার কেউ টের পাবে না যে, আলী বিন সুফিয়ান তাদের মাঝে ঘোরাফেরা করছে এবং পরিসংখ্যান নিচ্ছে যে, এখানে কোন্ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া দরকার। আপনি গিয়ে দেখুন, কোন্ কোন্ সালার সন্দেহভাজন। আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে আরো অনেক লোক গেছে। ওখানে তাদের করণীয় কী, তা তারাই ভাল জানে। পাশাপাশি আমি আমীরদের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাওয়ার আহ্বান সম্বলিত বার্তা দিয়ে দূতও প্রেরণ করেছি। তারা আমার পয়গাম বুঝবার চেষ্টা করবে, সেই আশা আমি করি না। আমি শুধু তাদেরকে সোজা পথটা শেষবারের মত দেখিয়ে দিতে চাই। আমি তাদেরকে একথা বলব না, তারা যদি আমার নির্দেশমত কাজ না করে, তাহলে আমি কী করব।'

মোস্তফা জুদাত বিদায় নিয়ে যান। সুলতান আইউবী দারোয়ান ডাকেন। দারোয়ান আসলে তিনি কয়েকজন সালার ও প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করে বললেন, 'এদেরকে জলদি আমার কাছে আসতে বল।'

এরা সকলেই সুলতান আইউবীর হাইকমান্ডের সদস্য।

❁ ❁ ❁

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'আল্লাহ সালাহুদ্দীন আইউবীকে কঠিন হৃদয় দান করেছেন। তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে এত শক্ত করে তৈরি করেছিলেন যে, পাহাড় সমান বেদনাও তিনি হাসিমুখে সহ্য করে নিতেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী ও স্বতন্ত্র্য মেজাজের অধিকারী। আমীর-গোলাম সকলকে তিনি সমান মর্যাদা প্রদান করতেন। একজনের উপর আরেকজনকে প্রাধান্য দিতেন বীরত্ব ও বাহাদুরীর ভিত্তিতে। যারা তাঁর কাছে ঘেঁষত, তারা তাঁর থেকে দু'রকম প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করত। প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভালবাসা। তাঁর সৈনিকরা যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে

দেখলে এতই উজ্জীবিত হয়ে উঠত যে, তারা শত্রুর উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ত। একবার তাঁর এক খাদেম অপর খাদেমের গায়ে জুতা নিক্ষেপ করে। তিনি তখন কক্ষ থেকে বের হচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে জুতাটি এসে তার গায়ে পড়ে। খাদেমরা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে শুরু করে। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান, যেন কিছুই হয়নি। এ ছিল তার চরিত্র মাধুরী। বন্ধু তো ভাল, শত্রুও তার সম্মুখে উপস্থিত হলে তার ভক্ত-অনুরক্তে পরিণত হয়ে যেত।'

'নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যু সালতানাতে ইসলামিয়াকে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল। সেই সমস্যার সর্বাপেক্ষা গুরুতর দিক ছিল, মুসলমানদের নিজেদেরই আমীর-উজীরগণ খৃস্টানদের বন্ধু ও ইসলামের দুশমনে পরিণত হয়েছিল।

মিসরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এখনো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। সালাহুদ্দীন আইউবী এখনো মিসর থেকে বের হতে পারছেন না। এমনি পরিস্থিতিতে তার সাধ্য এতটুকুই ছিল যে, তিনি সালতানাতে ইসলামিয়ার প্রতিরক্ষার চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু মিসরের প্রতিরক্ষাকে অটুট রাখবেন। তার চেয়ে বেশী কিছু করার সাধ্য তাঁর ছিল না। কিন্তু আমার এই বন্ধুটি বিন্দু পরিমাণ ঘাবড়ালেন না। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, 'আমি যদি ইসলামের সংরক্ষণের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেই, তাহলে কিয়ামতের দিন আমাকে খৃস্টানদের সঙ্গে হাশর করা হবে'। তিনি ইসলামের সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারকে তাঁর জীবনে সবচে বড় কাজ মনে করতেন। তিনি কখনো নিজেকে শাসক ভাবেননি। সালাহুদ্দীন আইউবীর যৌবনকালের কথা আমার স্মরণ আছে। যৌবনে তিনি পূর্ণরূপে ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে গিয়েছিলেন। তিনি মদপান করতেন, নাচ-গানের আসর বসাতেন। বাদ্য-বাজনা ও নাচের খুঁটিনাটি বুঝতেন। আরো দশজন বিপথগামী যুবক যা করে থাকে, তিনি তার কোনটিই বাদ দিতেন না। কেউ কখনো কল্পনাও করেনি যে, এই যুবক অল্প ক'বছরেই ইসলামের সবচেয়ে বড় পতাকাবাহী ও ইসলামের দুশমনের যমদূতে পরিণত হবেন। চাচার সঙ্গে প্রথমবারের মত খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে এসেই তিনি সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি সর্বপ্রথম বিলাসিতা পরিত্যাগ করলেন এবং নিজের জীবনকে ইসলামের জন্য কুরবান করে দিলেন। তিনি দেশের জনগণ ও সৈন্যদেরকে শিক্ষা দেন যে, ইসলামের কোন সীমানা-সরহদ নেই...।'

তার এই পরিবর্তিত চরিত্র দেখে কারো বিশ্বাস করার উপায় ছিল না যে, একসময় তিনি বিলাসী ছিলেন। প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখারই নাম চরিত্রের

উঁচুতা ও আদর্শের পরিপক্কতা। এই পরিপক্কতা সালাহুদ্দীন আইউবীর মধ্যে ছিল। বন্ধুদের আসরে তিনি বলতেন, আমাকে কাফেররা মুসলমান বানিয়েছে। আমরা যদি আমাদের বিপথগামী যুবকদেরকে খৃস্টানদের মন-মানসিকতা বুঝাতে পারি, তাহলে তারা সঠিক পথে ফিরে আসবে। দুশমনের সঙ্গে যে বন্ধুত্বের দীক্ষা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে, তা তাদেরকে জাতীয় মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করছে। আমি আপনাদেরকে রাসূল (সাঃ)-এর একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নবীজী (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে চিনে নাও যে, তোমরা কী এবং কারা। আর দুশমনকেও ভাল করে চিনে নাও যে, তারা কারা এবং তাদের লক্ষ্য কী।' সালাহুদ্দীন আইউবীর চরিত্র ও আদর্শের মোড় দুশমনই পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তিনি নিজ কাজে এতই নিমগ্ন থাকতেন যে, কখনো ভাববারই সময় পাননি, তিনি ইসলামী দুনিয়ার বড় মাপের একজন নেতা, মিসরের প্রতাপান্বিত শাসক এবং এমন একজন বীরযোদ্ধা যে, খৃস্টানদের বড় বড় কমান্ডাররা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরও তার ভয়ে তটস্থ থাকছে। তার আর্থিক অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি অর্থাভাবে জীবনে কখনো হজ্ব করতে পারেননি। জীবনের শেষ মুহূর্তে তার একটিই বাসনা ছিল- হজ্ব করা। কিন্তু তার কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ দেরহাম রূপা ও একখণ্ড সোনা। সম্পদ বলতে ছিল একটি ঘর, তা-ও পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত।'

তার চারিত্রিক পরিপক্কতার বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, তিনি যখন তাঁর সালার প্রমুখকে বৈঠকের তলব করলেন, তখন তাঁর চেহারায় ভীতি বা পেরেশানীর লেশমাত্র ছিল না। উপস্থিত পারিষদবর্গ নীরব-নিস্তব্ধ। তাদের ধারণা ছিল, এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে তিনি ঘাবড়ে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু না, তিনি মুচকি হেসে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, আমার বন্ধুগণ! তোমরা অত্যন্ত কঠিন ও সংকটময় পরিস্থিতিতেও আমার সঙ্গ দিয়েছ। আজ এমন এক পরিস্থিতি আমাকে বিচলিত করে তুলেছে, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসবার মত নয়। কিন্তু স্মরণ রেখ, তারপরও যদি আমরা পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, তা হবে আমাদের জন্য দুনিয়াতেও অপমান, আল্লাহর দরবারেও অপমান। ইতিহাস আমাদের উপর অভিশম্পাত করবে এবং কিয়ামতের দিন সেই শহীদগণ আমাদেরকে লজ্জা দেবে, যারা ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন কুরবান করেছে। এখন আমাদের প্রত্যেককে জীবন কুরবান করার সময় এসেছে।'

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর সুলতান আইউবী তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ দেন এবং বললেন, 'আমাদেরকে এখন আমাদের

ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।'

এই বলে তিনি সকলের চেহারা নিরিক্ষণ করেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। সকলের চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। সুলতান নিশ্চিত বুঝে নেন যে, হ্যাঁ, আমার এই কর্মকর্তাগণ যে কোন পরিস্থিতিতে আমার সঙ্গ দেবে। তিনি বললেন, আমার প্রথম পদক্ষেপ হল, আমি আমার স্বাধীনতা ঘোষণা দিতে যাচ্ছি। আমি আর কেন্দ্রীয় খেলাফতের অনুগত থাকতে চাই না। কিন্তু এই ঘোষণা আমি তোমাদের প্রত্যেকের সম্মতি ছাড়া করব না। এ ব্যাপারে মতামত দেয়ার আগে তোমরা আরো দু'টি বিষয় নিয়ে ভেবে দেখ। প্রথমত, খেলাফত কার্যত শেষ হয়ে গেছে। তোমরাই বলেছ যে, খলীফা এখন এগার বছরের বালক, তিন-চারজন আমীর তাকে ঘিরে রেখেছে। আর এই আমীরগণ খৃস্টানদের বন্ধু। কাজেই বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, খেলাফত এখন খৃস্টানদের মুঠোয়। তাই এবার আমাদের সংঘাত হবে খেলাফতের বিরুদ্ধে। এমতাবস্থায় তোমরা যদি স্বাধীন না হও, তাহলে তোমাদের খলীফাকে মান্য করতে হবে আর এই মান্যতা হবে সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য ধ্বংসাত্মক। তোমরাই বল, এমন পরিস্থিতিতে আমাদের এই পদক্ষেপ কি সঠিক হবে না যে, আমি মিসরের খেলাফতকে কেন্দ্রীয় খেলাফত থেকে স্বাধীন করে ফেলব এবং তারপর আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হবে স্বাধীন, যা এখন ইসলামের জন্য অত্যাবশ্যক?'

'তাহলে কি আপনি খেলাফতের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে চান?' এক সালার জিজ্ঞেস করেন।

'এখনো সিদ্ধান্ত নেইনি'- সুলতান আইউবী জবাব দেন- 'কাল-পরশু পর্যন্ত আমার দূত ফিরে আসবে। পরিস্থিতি যদি আমাকে খেলাফতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য করে, তাহলে আমি কুণ্ঠিত হব না।'

'আপনি মিসরকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়ে দিন'- এক কর্মকর্তা বলল- 'আমরা এগার বছরের বালককে খলীফা মানতে পারি না।'

'তো তোমরা কি সকলে আমাকে মিসরের সুলতান হিসেবে মেনে নেবে?' সালাহুদ্দীন আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

সর্বান্তকরণে উপস্থিত সকলে একবাক্যে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আমরা আপনাকে মিসরের সুলতান হিসেবে মেনে নেব। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তখনই মিসরের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পর থেকেই সালাহুদ্দীন আইউবী 'সুলতান' অভিধায় ভূষিত হন।

'আমি রাসূলের উম্মতের নয়- রনাঙ্গনের বাদশাহ'- সুলতান আইউবী বললেন- 'তোমরা তো দেখেছ, আমি খৃস্টান সৈন্যদের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা

করে থাকি। আমি দশ দশজন জানবাজ দিয়ে দশ দশ হাজার দুশমন সৈন্যকে পরাভূত করেছি। কিন্তু যখন আমি আপন ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা ভাবি, তখন আমার সব রণকৌশল মাথা থেকে উধাও হয়ে যায়, আমার তরবারী তখন কোষ থেকে বেরুতে চায় না। দুর্ভাগ্য, আমাকে ও তোমাদেরকে সেই দিনটিও প্রত্যক্ষ করতে হল যে আমরা পরস্পর লড়াই করব আর খৃস্টানরা বসে বসে তামাশা দেখবে!'

'এই তামাশা আমাদের দেখাতেই হবে মহামান্য সুলতান!'– এক সালার বলল– 'মুখের ভাষা যদি আমাদের ভাইদের উপর ক্রিয়া না করে, তাহলে তরবারী ব্যবহার করতেই হবে। আমাদের কারো মধ্যে খেলাফতের গদির মোহ নেই। আমরা যা কিছু করব, ইসলামের খাতিরেই করব– ব্যক্তি স্বার্থে নয়।'

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবী ইতিপূর্বে দামেস্ক, হাল্‌ব, মওসেল এবং আরো দু'তিনটি রিয়াসতের আমীরদের নিকট দু'জন দূত প্রেরণ করেছিলেন। সকলের নিকট তিনি দীর্ঘ পয়গাম প্রেরণ করেছেন। তাতে তাদের প্রত্যেককে খৃস্টীয় ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে ইসলামী ঐক্যের পক্ষে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দূতদ্বয় ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। একজন আমীরও সুলতানের পয়গাম গ্রহণ করেননি, বরং অনেকে বিদ্রেপের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

দূতগণ সুলতান আইউবীকে জানায়, আমরা প্রথমে খলীফার দরবারে গমন করি। পয়গাম পেশ করলে তা খলীফা নিজে পাঠ না করে তাকে ঘিরে রাখা আমীরদের পড়তে দেন। এই আমীরগণই তাকে খেলাফতের গদিতে বসিয়েছে। তারা আপনার পয়গাম পাঠ করে পরস্পর ফিসফিস করতে থাকে। একজন খলীফাকে বললেন, সালাহুদ্দীন আইউবী খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বাহানা দেখিয়ে সকল মুসলিম রিয়াসতকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাচ্ছেন। তারপর তিনি নিজেই হবেন সেই রাজ্যের অধিপতি। আরেকজন মুখ খুললেন। তিনিও এগার বছর বয়সী খলীফাকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে উস্কে দিলেন এবং বললেন, 'আপনি তাকে নির্দেশ দিতে পারেন যে, যুদ্ধ করা না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক একমাত্র খলীফা। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি খলীফার আদেশ অমান্য করেন, তাহলে আপনি তাকে বরখাস্ত করতে পারেন; মিসরের নেতৃত্ব অন্য কাউকে দিতে পারেন।'

বালক খলীফা আমাদেরকে এই নির্দেশই প্রদান করেন এবং বললেন, 'সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলবে, সে যেন আমার নির্দেশের অপেক্ষা করে। ইসলামী ঐক্যের প্রয়োজন আছে কিনা, আমিই তার সিদ্ধান্ত জানাব।'

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট যে ফৌজ আছে, তন্মধ্যে মরহুম জঙ্গীর প্রেরিত অনেক বাহিনীও আছে'– এক আমীর খলীফাকে বললেন– 'আপনি তাকে নির্দেশ প্রেরণ করুন, যেন তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। নিজের মর্জিমত ফৌজ ব্যবহার করার সুযোগ তার থাকা উচিত নয়।'

'তাকে আরো বলবে, খেলাফতের পক্ষ থেকে যে বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদেরকে যেন ফেরত পাঠায়'– দূতদের উদ্দেশে খলীফা বললেন– 'আর তোমরা এবার যেতে পার।'

'আইউবীকে আরো বলবে, ভবিষ্যতে যেন তিনি খলীফাকে এরূপ পয়গাম পাঠানোর দুঃসাহস না দেখান।' অন্য এক আমীর বললেন।

দূতরা সুলতান আইউবীকে জানায়, আমরা অন্যান্য আমীরদের নিকটও গমন করি। সবাই অবজ্ঞার সাথে আপনার পয়গাম প্রত্যাখ্যান করে। কেউ কেউ আপনার বিরুদ্ধে অবমাননাকর উক্তিও করে।

রিপোর্টে সুলতান আইউবীর চেহারায় কোন পরিবর্তন আসল না, যেন তিনি এরূপই হওয়ার আশা করছিলেন। তিনি মূলত আলী বিন সুফিয়ানের অপেক্ষা করছিলেন। গোয়েন্দা প্রধান আলী একশত যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে দামেস্ক চলে গেছেন। গিয়েছেন বণিক ও বণিক কাফেলার বেশে। সুলতান এখনো তার কোন সংবাদ পাননি। নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পরপর-ই সুলতান আইউবী সংবাদ পেয়ে যান যে, বিভিন্ন রিয়াসতের আমীরগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছেন। সংবাদটা পেয়েছেন স্বয়ং নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রীর মাধ্যমে, যিনি বর্তমান খলীফার মা। তিনি অতি সঙ্গপনে একজন দূত কায়রো পাঠিয়ে দেন এবং সুলতান আইউবীকে জঙ্গীর মৃত্যুর পর উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি সুলতান আইউবীকে বলে পাঠান–

'ইসলামের ইজ্জত এখন আপনার হাতে। আমার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকে খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছে। মানুষ আমাকে সম্মান করতে শুরু করেছে। কেননা, আমি খলীফার মা। তারা মনে করছে, আমি সৌভাগ্যশীল মা। কিন্তু আমার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আমার পুত্রকে খলীফা বানানো হয়নি– তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। মওসেলের আমীর সাইফুদ্দীন ও অন্যসব আমীর আমার পুত্রের চারপাশ ঘিরে রেখেছে। আমার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্ররাও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে। তারপরও এই আমীরদের মধ্যে যদি ঐক্য থাকত, তাহলে আমি এতটুকু বিচলিত হতাম না। প্রকৃতপক্ষে তারা একে অপরের দুশমন। আপনি যদি বলেন, তাহলে আমি নিজ হাতে পুত্রকে হত্যা করে ফেলব। কিন্তু তার পরিণতিকে আমি ভয় করি। ভাল হবে, আপনি এসে পড় ন। কিভাবে আসবেন, এসে কী করবেন, তা

আপনিই ভাল জানেন। আমি আপনাকে সতর্ক করতে চাই যে, আপনি যদি এদিকে দৃষ্টি না দেন কিংবা যদি বিলম্ব করে ফেলেন, তাহলে প্রথম কেবলা তো খৃস্টানদের কব্জায় আছেই, পবিত্র কাবাও তাদের হাতে চলে যাবে। সেই লাখো শহীদের খুন কি বৃথা যাবে, যারা জঙ্গী ও আপনার নেতৃত্বে জীবন কুরবান করেছে? আপনি হয়ত আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার পুত্রকে আমি কেন নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখলাম না? তার জবাব আমি দিয়েছি। আমীরগণ আমার পুত্রকে ছিনিয়ে নিয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর একবার মাত্র সে আমার কাছে এসেছে। এখন তাকে আমার পুত্র মনে হয় না। বোধ হয় তাকে হাশীশ খাওয়ানো হয়েছে। সে ভুলে গেছে, আমি তার মা। ভাই সালাহুদ্দীন! আপনি জলদি এসে পড় ন; দামেস্কের জনগণ আপনাকে স্বাগত জানাবে। আমার এই দূতের নিকটই জবাব দিন, আপনি কী করবেন কিংবা কিছুই করবেন কিনা!'

সুলতান আইউবী তখনই জবাব দিয়ে দূতকে বিদায় করে দেন। তিনি জঙ্গীর স্ত্রীকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, আমি অতিশয় কঠোর পদক্ষেপ হাতে নিচ্ছি। কিন্তু পা ফেলব বুঝে-শুনে।

দূত রওনা হওয়ার পরপর সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে দামেস্ক, মওসেল, হাল্‌ব, ইয়েমেন ও অন্যসব ইসলামী অঞ্চলে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ প্রদান করেন। আলী বিন সুফিয়ানের এ সফর কোন সরকারী সফর ছিল না। তিনি গুপ্তচরের বেশে এলাকাগুলোতে চলে যান। তার দায়িত্ব হল, যেসব মুস্‌লিম আমীর একনায়কত্ব ঘোষণা করেছে, তারা কী চায়, খৃস্টানদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে কি-না, খলীফার বাহিনীর মতিগতি কেমন, এই বাহিনীকে খলীফার এমন সব নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণের জন্য প্রস্তুত করা যায় কি-না, যা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর, দুশমনের জন্য লাভজনক। আলী বিন সুফিয়ানের এ-ও জানার বিষয় ছিল যে, ও-সব এলাকার জনগণের মতিগতি ও চিন্তাধারা কী এবং ফেদায়ীরাও খলীফার সঙ্গে মিশে গেছে কি-না। তাকে এ ব্যাপারেও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে যে,সুলতান আইউবী দামেস্ক কিংবা অন্য কোন মুসলিম এলাকায় অভিযান পরিচালনা করলে জনগণের প্রতিক্রিয়া কী হবে।

সুলতান আইউবী অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েন না। কোথাও যেতে হলে বা অভিযান পরিচালনা করতে হলে আগে গোয়েন্দা মারফত সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি, সুবিধা ও সমস্যা সম্পর্কে আগে তথ্য-পরিসংখ্যান জেনে নেন। এখানেই ছিল তার সাফল্য। সুলতান জঙ্গীর মৃত্যুর পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন নিশ্চিত হওয়ার জন্য একই ধারায় তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে প্রেরণ করেন। আলী বিন সুফিয়ান রিপোর্ট নিয়ে আসবেন,

তারপর তিনি সে মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এখন অপেক্ষা শুধু আলী বিন সুফিয়ান কবে ফিরবেন।

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবীর নির্দেশ প্রাপ্তির পর আলী বিন সুফিয়ান এক মুহূর্ত নষ্ট না করে একশ' যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা বাছাই করে ফেলেন। তিনি তাদেরকে মিশন সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বলেন, ইসলামের আব্রু-ইজ্জত তোমাদের থেকে বিরাট কুরবানী তলব করছে। এই মিশনে তোমাদেরকে পূর্ণ যোগ্যতা ও দক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে।

এই একশ' গোয়েন্দাকে বণিকের পোশাক পরানো হয়। আলী বিন সুফিয়ান কাফেলার সরদার সাজেন। তারা কতগুলো উটের পিঠে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বোঝাই করে। দামেস্ক ইত্যাদির বাজারে নিয়ে এগুলো বিক্রি করা হবে এবং তৎপরিবর্তে অন্য মাল ক্রয় করা হবে। বেশকিছু উট ছাড়াও তাদের সঙ্গে আছে কয়েকটি ঘোড়া। বাণিজ্যিক পণ্যের অভ্যন্তরে তারা তরবারী, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে। তন্মধ্যে আছে দাহ্যপদার্থ ও আগুন জ্বালানোর অন্যান্য বস্তু। আলী বিন সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাফেলা রাতের বেলা কায়রো থেকে রওনা হয় এবং রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত বহুদূর এগিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর কাফেলা আবার রওনা হয়। আলী বিন সুফিয়ান যথাশীঘ্রই গন্তব্যে পৌঁছুতে চাচ্ছেন।

কাফেলা দিনভর চলতে থাকে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও কাফেলা কোথাও থামেনি। রাত গভীর হতে চলেছে। এবার একটি উপযুক্ত জায়গা পাওয়া গেল। এলাকাটা সবুজ-শ্যামল। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে উঁচু-নীচু টিলা আছে এখানে। আছে পানিও। বিশ্রাম ও পানির জন্য কাফেলা থেমে যায়।

লোকগুলো আসলে বণিক নয়– সৈনিক। তাদের চাল-চলনে শৃঙ্খলা আছে। আছে সতকর্তা। তাদের উট-ঘোড়াগুলো এমনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে, মানুষগুলোর ন্যায় ওরাও সুশৃঙ্খল। কারো মুখে টু-শব্দ নেই। না মানুষের মুখে, না পশুগুলোর মুখে। আলী বিন সুফিয়ান টিলা ও পর্বতের অভ্যন্তরে ঢুকে না গিয়ে বাইরেই ছাউনী ফেলেন। দু'ব্যক্তিকে পানির সন্ধানে প্রেরণ করা হয়। এখন সবারই হাতে অস্ত্র। কারণ, এই সফরে দু'টি ভয় রয়েছে। এক. মরুদস্যুর ভয়, দুই. খৃস্টান কমান্ডোদের ভয়।

পার্বত্য এলাকার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে লোক দু'জন। পানির সন্ধান ছাড়াও তাদের দেখতে হবে, এখানে দুশমনের কোন কমান্ডো কিংবা কোন টহল বাহিনী অবস্থান নিয়ে আছে কিনা। তারা কিছুদূর চলে যায়। একস্থানে আলোর মত কিছু একটা দেখতে পায়। চলে যায় আরো সম্মুখে। একটি টিলার

উপরে উঠে যায়। এখানে মাঠের ন্যায় মনোরম একটি জায়গা। পানি আছে। সবুজ-শ্যামল এলাকা। আছে খেজুর বাগানও। দু'টি প্রদীপ জ্বলছে এখানে। সেই প্রদীপের আলোতে দশ-এগারজন মানুষ চোখে পড়ে তাদের। ছয়-সাতজন পুরুষ। অন্যরা নারী। মেয়েগুলো অতিশয় সুন্দরী। তারা আগুন জ্বালিয়ে গোশত ভুনা করছে আর পেয়ালায় করে কি যেন পান করছে। বোধ হয় মদ। খানিকটা আড়ালে একটি ঘোড়া ও কয়েকটি উট বাঁধা। অনেকগুলো সামানও একদিকে পড়ে আছে।

আলী বিন সুফিয়ানের লোক দু'জন লুকিয়ে লুকিয়ে নিকটে চলে যায়। রাতের নীরবতায় তাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তাদের হাসি-কৌতুক প্রমাণ করছে, তারা মুসলমান নয়। মেয়েগুলো অশ্লীল আচরণ করছে।

লোক দু'জন ফিরে এসে আলীকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। এবার আলী বিন সুফিয়ান নিজে যান। লুকিয়ে লুকিয়ে কাছে থেকে দেখেন। আলী লোকগুলোর ভাষা বুঝতে পারছেন না। ওরা খৃস্টান। আলী বিন সুফিয়ান ভাবছেন, তিনি তাদের নিকটে চলে যাবেন এবং জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন, তারা কারা, কোথায় যাচ্ছে। আবার ভাবছেন, গিয়ে কাজ নেই, এখান থেকেই তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করি। তার সঙ্গে একশ' যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা আছে। এই ছয়-সাতজন পুরুষ আর চারটি মেয়েকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

লোকগুলোকে গোয়েন্দার দৃষ্টিতে দেখছেন আলী বিন সুফিয়ান। তার মনে সন্দেহ জাগে, তারা খৃস্টান গুপ্তচর ও সন্ত্রাসী এবং কোন ইসলামী ভূখন্ডে অভিযানে যাচ্ছে। তা-ই যদি হয়, তাহলে আলীকে তাদেরই তো প্রয়োজন।

আরো নিকটে যাওয়ার জন্য তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যান। চলে যান টিলার একেবারে শেষপ্রান্তে। এখান থেকে চোখ পড়ে তার নীচে। আরো দু'জন লোক দেখতে পান তিনি। তাদের মুখমণ্ডল ও মাথা কালো কাপড়ে ঢাকা। তারা টিলার আড়াল থেকে ঐ লোকগুলোর প্রতি বারবার তাকাচ্ছে। আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, ওরা মরুদস্যু। ওদের দৃষ্টি মেয়েগুলোর প্রতি।

লোকগুলো আস্তে আস্তে পেছন দিকে সরে যায়। পরস্পর কথা বলে। আলী বিন সুফিয়ান তাদের কথা শুনতে পান, বুঝতেও পারেন। আলীর ভাষায়-ই কথা বলছে তারা।

'ওদের কাছে কি অস্ত্র আছে?' এক দস্যু জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, আছে'– অপরজন বলল– 'আমি দেখেছি। তাদের তরবারী সরু। তারা খৃস্টান।

'তারা সাধারণ মুসাফির বলে মনে হয় না।'

'ঠিক আছে, ওরা ঘুমিয়ে পড়ুক, আমি সবাইকে ডেকে নিয়ে আসি।'

'আমরা তো আটজন; ঘুমন্ত অবস্থায়ই আমরা ওদেরকে ধরে ফেলতে পারব।'

'ধরার প্রয়োজন কি। পুরুষদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে ফেলব আর মেয়েগুলোকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যাব।'

তারা সঙ্গীদের ডেকে আনতে চলে যায়। আলী বিন সুফিয়ান লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের অনুসরণ করেন। তারা অন্য একটি পথে বের হয়ে যায়। ওখানে তাদের ঘোড়া দণ্ডায়মান। তারা ঘোড়ায় আরোহন করে অন্ধকালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আলী বিন সুফিয়ান ভাবেন কী করা যায়। লোকগুলোকে সাবধান করে দেবেন, নাকি নিজ কাফেলায় নিয়ে যাবেন। গভীর ভাবনা-চিন্তার পর তিনি একটি পন্থা উদ্ভাবন করেন। নিজ কাফেলার লোকদের নিকট ফিরে আসেন। জনাবিশেক লোককে বর্শাসজ্জিত করে সঙ্গে করে নিয়ে যান। তাদেরকে উপযুক্ত স্থানে প্রস্তুত অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং কর্তব্য বুঝিয়ে দেন। নিজেও সতর্ক অবস্থায় এদিক-ওদিক টহল দিতে থাকেন। দস্যুরা কখন আসবে তিনি জানেন না। তিনি দেখতে পান যে, মেয়েরা ও তাদের সঙ্গের পুরুষরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মাত্র একজন লোক বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। তাতে বুঝা গেল, লোকগুলো প্রশিক্ষিত। প্রদীপগুলো জ্বলছে।

রাতের শেষ প্রহর ঘনিয়ে আসছে। পার্বত্য এলাকার অভ্যন্তরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে আসে। সবাই সতর্ক হয়ে যায়। মেয়েদের প্রহরীও বদল হয়। এবার পাহারা দিচ্ছে অন্যজন। দস্যুরা পার্বত্য এলাকার মাঝামাঝিতে এসে পড়েছে। আলী বিন সুফিয়ান ও তার লোকেরা টিলার উপরে। খানিক পর আট-নয়জন দস্যু সেই স্থানে ঢুকে পড়ে, যেখানে তাদের শিকার ঘুমিয়ে আছে। প্রহরী ভয় পেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ঘুমন্ত সঙ্গীদের জাগিয়ে তোলে। দস্যুরা তাদের চারপাশ ঘিরে ফেলে এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে। মেয়েদের সঙ্গী পুরুষরা জেগে ওঠে। কিন্তু দস্যুরা তাদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার সুযোগ না দিয়েই চিৎকার করে বলে, 'সব মাল-পত্র ও মেয়েগুলোকে আমাদের হাতে তুলে দাও এবং নিজেদের প্রাণ বাঁচাও।' দু'জন দস্যু তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে একদিকে সরিয়ে দেয়। লোকগুলো নিরস্ত্র। তারপরও দু'জন মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক। বীর বিক্রমে লড়ে যায় অনেকক্ষণ।

সংকেত দেন আলী বিন সুফিয়ান। বাজের ন্যায় ছুটে আসে তার লোকেরা। এরা কারা ডাকাত দল তা বুঝে ওঠার আগেই এক একটি বর্শা এক একজন দস্যুর দেহে গিয়ে বিদ্ধ হয়। তার আগে দস্যুদের হাতে মেয়েদের সঙ্গের দু'জন লোক মারা পড়েছে। তবে এর জন্য আলী বিন সুফিয়ানের কোন দুঃখ নেই।

আলী বিন সুফিয়ান মেয়েদের কাছে চলে যান। মেয়েগুলো ভয়ে থর থর

করে কাঁপছে। তাদের সামনে এগারটি লাশ পড়ে আছে। দু'টি তাদের দু'সঙ্গী পুরুষের। নয়টি দস্যুদের। আলী বিন সুফিয়ান তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। আলীর প্রতি মেয়েরা অতিশয় কৃতজ্ঞ। তিনি তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কারা? কোথা থেকে এসেছ? কোথায় যাচ্ছ? তাদের জবাব শুনে সুলতান আইউবীর প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন বিচক্ষণ গোয়েন্দা প্রধান আলী মুচকি হাসলেন এবং বললেন, "তোমরাও যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করতে, আমিও তোমাদেরকে এমন অসত্য জবাব-ই দিতাম। আমি তোমাদের প্রশংসা করছি যে, এমনি এক ভীতিপ্রদ অবস্থায়ও তোমরা নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছ।'

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'– আলী বিন সুফিয়ানকে পাল্টা প্রশ্ন করে একজন– 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'তোমরা যেখান থেকে এসেছ'– আলী বিন সুফিয়ান জবাব দেন– 'আর যাবও সেখানে, যেখানে তোমরা যাচ্ছ। আমাদের কাজ ভিন্ন; কিন্তু গন্তব্য এক।'

তারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে। সবিস্ময়ে তাকায় আলীর প্রতি। আলীর মুখে মুচকি হাসির রেখা। তিনি বললেন, দেখেছ তো কেমন চাল খেলে দস্যুদের হত্যা করে ফেললাম। কোন সাধারণ পথিক-মুসাফির কি এমন চাল খেলতে পারে? আমি যে দক্ষতা প্রদর্শন করলাম, তাকি একজন সুশিক্ষিত সেনা কমান্ডারের ওস্তাদীকর্ম নয়?

'তুমি মুসলমান সৈনিকও হতে পার।' এক মেয়ে বলল।

'আমি ক্রুশের সৈনিক।' আলী বিন সুফিয়ান জবাব দেন।

'তুমি কি তোমার ক্রুশ দেখাতে পারবে?' প্রমাণ চায় মেয়েরা।

'তুমি পারবে আমাকে তোমার ক্রুশ দেখাতে?' আলী বিন সুফিয়ান পাল্টা প্রশ্ন করেন এবং সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'আমি জানি, তোমরা একজনও ক্রুশ দেখাতে পারবে না। তোমাদের সঙ্গে ক্রুশ নেই। কারণ, তোমরা যে কাজে যাচ্ছ, সেখানে ক্রুশ সঙ্গে রাখা যায় না। আমি তোমাদের কাছে তোমাদের নামও জিজ্ঞেস করব না, নিজের নামও বলব না। আর আমার মিশন কি তাও বলব না। শুধু এতটুকুই বলব যে, আমরা একই পথের পথিক। আর আমাদের কারুরই জানা নেই যে, আমাদের মধ্য থেকে কে নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারবে। যীশুখৃস্ট যেভাবে আমাকে ও আমার লোকদেরকে তোমাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছেন, তা প্রমাণ করে তোমরা সঠিক পথে আছ এবং তোমরা কামিয়াব হবে। নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে গেছে, সমগ্র পৃথিবীতে ক্রুশের রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মুসলমানদের কোন্ আমীর এমন আছে, যে আমাদের জালে আটকা পড়েনি? আমি তোমাদের উপদেশ দেব, তোমরা দৃঢ়পদ থাক।'

আলী বিন সুফিয়ান মেয়েদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, তোমাদের কাজ সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ। খোদাওন্দ ঈসা মসীহ তোমাদের কুরবানীকে বিফল করবেন না। আমরা যারা পুরুষ, তারা জীবন বিলিয়ে দুনিয়ার ঝক্কি-ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাই। কিন্তু কেউ তোমাদের জীবন হরণ করে না— হরণ করে তোমাদের সম্ভ্রম। আর তোমাদের পক্ষে এটাই সবচেয়ে বড় কুরবানী।'

আলী বিন সুফিয়ান ঝানু অতিশয় সুদক্ষ গোয়েন্দা। মুখের ভাষা তার জাদুমাখা। সবাই তন্ময় হয়ে শুনছে তার কথাগুলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি তাদের থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নেন যে, তারা খৃস্টান এবং নাশকতামূলক কাজের উদ্দেশ্যে দামেস্কসহ আন্যান্য অঞ্চলে যাচ্ছে। তারা বণিকের বেশে।

আলী বিন সুফিয়ান খৃস্টানদের গুপ্তচরবৃত্তির নিয়ম-নীতি, গোপন সংকেত ও পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে অবহিত। এ পর্যন্ত বহু খৃস্টান গুপ্তচরকে গ্রেফতার করে তিনি অপরাধের স্বীকৃতি আদায় করেছেন। এবার যখন তিনি তাদের-ই পরিভাষায় কথা বলছেন, তখন মেয়েরা ও তাদের সঙ্গী পুরুষরা শুধু নিশ্চিতই হয়নি যে, তিনি খৃস্টান, বরং তাকে খৃস্টান গোয়েন্দা বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলে বিশ্বাস করে নেয়। তিনি ওদেরকে অবহিত করলেন যে, আমার সঙ্গে একশ' লোক আছে। তাদের মধ্যে যুদ্ধবাজ গোয়েন্দাও আছে। আছে ফেদায়ীও। আমরা দামেস্কসহ অন্যান্য এলাকায় মুসলমানদের সেসব উর্ধ্বতন অফিসারদের খুন কিংবা গুম করতে যাচ্ছি, যারা সালাহুদ্দীন আইউবীর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তিনি তাদেরকে আরো জানালেন, আমি দীর্ঘদিন যাবত মিসরে কাজ করেছি, এবার আমাকে ওদিকেই পাঠানো হয়েছে।

খৃস্টান দলটি আলী বিন সুফিয়ানের সামনে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে একটি সমস্যার কথা ব্যক্ত করে। সমস্যাটা হল, তাদের কমান্ডার দস্যুদের হাতে নিহত হয়েছে। এরা যেসব এলাকায় যাচ্ছে, ঐসব এলাকায় সে আগে গিয়েছিল। কিন্তু তার মৃত্যুতে এরা এখন দিশেহারা। এদেরক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন।

আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, অসুবিধা হবে না, প্রয়োজনে আমি নিজের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে হলেও তোমাদের পথ-নির্দেশনা করব। তোমাদের মিশন কি আমাকে খুলে বল।

তারা আলী বিন সুফিয়ানকে তাদের মিশন খুলে বলে। তাদেরকে কয়েকজন মুসলিম সালারের নাম দিয়ে বলা হয়েছে, তাদের কাছে উপঢৌকন পৌঁছিয়ে দেবে এবং প্রয়োজন অনুপাতে মেয়েদের ব্যবহার করবে। তাদের

এমন কতিপয় সালার ও আমীর পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, যারা খৃস্টানদেরকে দুশমন মনে করে। তাদেরকে খৃস্টানদের বন্ধু বানাতে হবে।

'দেখ, এই স্তরে এসে তোমাদের ও আমার কাজ এক হয়ে যাচ্ছে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আমাকেও ঐসব সালার ও নেতাদের খতম করতে হবে, যারা অন্তর থেকে খৃস্টানদের দুশমনী দূর করছে না।.. আচ্ছা, তোমরা দামেস্কে কোথায় থাকবে?'

'আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন যে, আমরা বণিকের বেশে যাচ্ছি'– একজন জবাব দেয়– 'দামেস্কের নিকেট গিয়ে এই মেয়েরা পর্দানশীল মুসলিম নারীতে রূপান্তরিত হবে। আমরা সরাইখানায় অবস্থান নেব। ওখান থেকে বণিকের বেশ ধারণ করে সালার প্রমুখদের নিকট যাব।'

❁ ❁ ❁

পরদিন ভোরবেলা। আলী বিন সুফিয়ানের কাফেলা দামেস্ক অভিমুখে এগিয়ে চলছে। খৃস্টান দলটিও এই কাফেলার শামিল হয়ে গেছে। পশুর মধ্যে ডাকাতদের ঘোড়াগুলো এখন অতিরিক্ত। খৃস্টান নারী-পুরুষরা আলী বিন সুফিয়ানকে তাদের নেতা মেনে নিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে তিনিও খৃস্টান। তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছেন, তোমরা আমার লোকদের সঙ্গে কথা বলবে না। কারণ, তাদের মধ্যে মুসলমানও আছে, যারা ফেদায়ী ও হাশীশী বটে, কিন্তু তাদের উপর ভরসা রাখা যায় না। পথে আলী বিন সুফিয়ান খৃস্টানদেরকে নিজের সঙ্গে রাখেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকেন। এই ফাঁকে তাঁর অনেক কাজের কথা জানা হয়ে গেছে।

পরদিন কাফেলা দামেস্ক প্রবেশ করে। আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশ মোতাবেক কাফেলা সরাইখানায় অবস্থান নেয়ার পরিবর্তে একটি মাঠে তাঁবু স্থাপন করে। মাঠে মানুষের ভীড় জমে যায়। বাহির থেকে কোন বণিক কাফেলা আসলে এলাকার মানুষ এভাবেই ভীড় জমায়। তারা চেষ্টা করে, পণ্য বাজারে যাওয়ার আগেই সরাসরি কাফেলার কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে সংগ্রহ করতে।

আলী বিন সুফিয়ান ঘোষণা করে দেন, দশটি ঘোড়াও বিক্রি হবে। এই ভীড়ের মধ্যে দামেস্কের ব্যবসায়ী-দোকানদাররাও আছে। দু'চার ঘন্টার মধ্যে লোক সমাগম এক মেলার রূপ ধারণ করে। আলী বিন সুফিয়ান তার লোকদেরকে বলে দেন, যেন তারা মালপত্র দ্রুত বিক্রি না করে আটকে রাখে। তিনি তার কয়েকজন বিচক্ষণ লোককে বলে দেন, তোমরা জনতার মধ্যে মিশে যাও এবং সুযোগমত তাদের মনমানসিকতা জেনে নাও। তারা পরিধানের চোগা খুলে ফেলে ছদ্মবেশে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। দু'তিনজন চলে যায় শহরে।

আলী বিন সুফিয়ান ও তার সকল লোকজন মাগরিবের নামায বিভিন্ন মসজিদে আদায় করে নেয়। তিনি খৃস্টান দলটিকে তাঁবুতে রেখে যান। তারা মসজিদে স্থানীয় লোকদেরকে জানায়, আমরা ব্যবসায়ী, কায়রো থেকে এসেছি। গল্প-গুজবের মধ্যদিয়ে তারা লোকদের মনোভাব জেনে নেয়। লোকদের চিন্তাধারা ও চেতনা আশাব্যঞ্জক। কিছু লোককে ভীত-সন্ত্রস্ত পাওয়া যায়। তারা নতুন খলীফা ও আমীরদের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাদের মধ্যে সমাজের উঁচু স্তরের লোকও আছে। অধিকাংশেরই বিশ্বাস, খৃস্টশক্তি ইসলামী দুনিয়ার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং খেলাফত বিলাসী আমীরদের হাতে চলে গেছে। তারা অত্যন্ত বিচলিত ও হতাশাগ্রস্ত। তারা বলে, জঙ্গীর পর এখন একমাত্র সালাহুদ্দীন আইউবীই অবশিষ্ট আছেন, যিনি ইসলামের নাম জীবিত রাখতে সক্ষম হবেন।

আলী বিন সুফিয়ান তার লোকদেরকে বলে দিয়েছেন, এই নারী ও পুরুষগুলো খৃস্টান এবং তাদের নিকট এক কথাই প্রকাশ করতে হবে যে, আমরা সবাই ক্রুশের মিশন নিয়ে এসেছি। আমাদের প্রতি তাদের কোন সন্দেহ নেই। তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছেন, এ রাতটা তোমরা বিশ্রাম কর এবং আমার নির্দেশের অপেক্ষা কর।

আলী বিন সুফিয়ান রাতে তাওফীক জাওয়াদের ঘরে চলে যান। বেশভূষা বণিকের। মুখমণ্ডলে কৃত্রিম দাড়ি। তিনি দারোয়ানকে বললেন, ভেতরে সংবাদ দাও, কায়রো থেকে আপনার একজ বন্ধু এসেছেন। দারোয়ান ভেতরে সংবাদ পাঠায়। আলী বিন সুফিয়ানকে ভেতরে ডেকে নেয়া হয়। তাওফীক জাওয়াদ আলীকে চিনতে পারলেন না। আলী কথা বললে এবার তিনি চিনে ফেলেন এবং দাঁড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এই লোকটার প্রতি আলী বিন সুফিয়ানের আস্থা আছে। তিনি তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন এবং বললেন, 'আমি কয়েকজন খৃস্টান গোয়েন্দাকে ফাঁদে আটকিয়েছি। এখন ভাবতে হবে তাদেরকে কিভাবে কাজে লাগান যায়।'

'তার আগে বলুন এখানকার পরিস্থিতি কী?'– আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন– 'কায়রোতে অত্যন্ত উদ্বেগজনক সংবাদ পৌঁছেছে।'

সুলতান জঙ্গীর মৃত্যু পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে কায়রো যেসব সংবাদ পৌঁছেছে, তাওফীক জাওযাদ তার সবগুলোরই সত্যতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি বললেন–

'আলী ভাই! তুমি একে হয়ত গৃহযুদ্ধ বলবে; কিন্তু খৃস্টানদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে হলে সালাহুদ্দীন আইউবীকে খেলাফতের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা করতেই হবে।'

'আচ্ছা, আমরা যদি কায়রো থেকে সেনা অভিযান পরিচালনা করি, তাহলে এখানকার ফৌজ কি আমাদের মোকাবেলা করবে?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন।

'তোমরা হামলার ভাব নিয়ে এস না'– তাওফীক জাওযাদ জবাব দেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবী উপরে উপরে প্রকাশ করবেন, তিনি খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন এবং খলীফার সম্মানার্থে সঙ্গে সৈন্য নিয়ে এসেছেন। এমতাবস্থায় আমীরদের উদ্দেশ্য যদি ভাল হয়, তাহলে তারা সুলতানকে স্বাগত জানাবে। অন্যথায় তারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তা সময়মত দেখা যাবে। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি, এখানকার ফৌজ তোমাদের মোকাবেলা করবে না, বরং সঙ্গ-ই দেবে। তবে এ কথাও মাথায় রাখতে হবে, তোমরা সময় যত নষ্ট করবে, এই ফৌজ তোমাদের থেকে ততই দূরে সরতে থাকবে। এখানকার ফৌজের যে জযবা-চেতনা এখনো বিদ্যমান আছে, তা নষ্ট করার প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আর এই জযবাই তো ইসলামী ফৌজের আসল শক্তি। তুমি তো জান আলী ভাই! যে শাসক ভোগ-বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়, সে সর্বপ্রথম দুশমনের সঙ্গে সমঝোতা করে। তারপর দেশের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে এবং এমন সব সালারদেরকে আপন বানিয়ে নেয়, যারা আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে তার অনুগত হয়। এই কর্মধারা এখানে শুরু হয়ে গেছে। আমাদের উচ্চপদস্থ কয়েকজন সেনা অফিসার ইতিমধ্যেই জাতীয় চেতনা ও ঈমানী জযবা হারিয়ে ফেলেছেন। তবে এখনো আমার মত এমন কিছু সালারও আছেন, যারা খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেননি এবং নুরুদ্দীন জঙ্গীর জিহাদী চেতনাকে জীবিত রাখতে প্রস্তুত। কিন্তু খেলাফতের নির্দেশ ছাড়া নিজের থেকে তারা কিই-বা করতে পারবে?'

'তাহলে কি আমি সুলতান আইউবীকে নিশ্চিতভাবে একথা বলতে পারি যে, এখানকার সৈন্যরা আমাদের সঙ্গ দেবে?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন।

'অবশ্যই বলতে পারেন'– তাওফীক জাওযাদ জবাব দেন– 'তবে খলীফা ও আমীরদের দেহরক্ষীরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাদের সংখ্যাও কম নয় এবং তারা ফৌজের বাছা বাছা সৈনিক। সম্ভবত তাদেরকে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।'

'এখানকার জনসাধারণের মধ্যে আমি যে জাতীয় চেতনা লক্ষ্য করেছি, তাতে আমি আশান্বিত যে, আমরা যদি এখানে আসি, তাহলে সফল হব।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'দেখ, দেশের জনসাধারণ অত তাড়াতাড়ি বোধ হারায় না'– তাওফীক জাওয়াদ বললেন– 'যে জাতি তাদের সন্তানদেরকে কুরবানী দিয়েছে, তারা

দুশমনকে কখনো ক্ষমা করতে পারে না। আবার যে সেনাবাহিনী দুশমনের মুখোমুখি লড়াই করেছে, তারাও এত দ্রুত দমে যায় না। কিন্তু শাসকদের হাতে এমন সব অস্ত্র থাকে, যা দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীকে লাশে পরিণত করে ফেলে। এখন জনগণ ও ফৌজের মধ্যে নেফাকের বীজ বপন করা হচ্ছে। ফৌজকে জনগণের চোখে হেয় করা হচ্ছে।'

'আমি মোহতারাম নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তিনি খলিফর মা-ও বটে। সুলতান আইউবীর নিকট তিনি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন যে, আপনি ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করুন। তাকে কি এখানে ডেকে আনা সম্ভব?'

'এই তো কাল-ই তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল'– তাওফীক জাওয়াদ জবাব দেন– 'ঠিক আছে, তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমার নাম শুনলে তিনি ছুটে আসবেন।'

তাওফীক জাওয়াদ তার চাকরানীকে ডেকে বললেন, খলীফার আম্মার কাছে গিয়ে আমার সালাম জানাবে এবং কানে কানে বলবে, কায়রো থেকে একজন মেহমান এসেছেন।

❁ ❁ ❁

আলী বিন সুফিয়ান যখন তাওফীক জাওয়াদের গৃহে বসে কথা বলছেন, সে সময় তার তাঁবু এলাকায় চলছিল সরগরম অবস্থা। রাত অনেক হয়েছে। ক্রেতাদের ভীড় শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ হল। আলীর একশ' লোক এসেছে দীর্ঘ সফর করে। বাজার থেকে বকরী ও দুম্বা কিনে এনেছে। এখন তারা রান্না করে সেগুলো আহার করছে। চলছে হাসি-কৌতুক। মেয়েগুলো আলাদা একটি তাঁবুতে অবস্থান নিয়েছে। খৃস্টান পুরুষরা বসে আছে আলীর লোকদের সঙ্গে। আসরের পূর্ণতা লাভের জন্য মদের পাত্র বের করে নিয়েছে তারা। সবাইকে মদপান করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আলীর লোকেরা সকলেই না করে দেয়। খৃস্টানরা অবাক হয়। আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে বলেছিলেন, আমার লোকদের মধ্যে মুসলমানও আছে, খৃস্টানও আছে। যারা মুসলমান তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, এরা ফেদায়ী। আর ফেদায়ীরা তো নামের মুসলমান। হাসান ইবনে সাব্বাহর দলের মানুষ, যারা মদকে হারাম ভাবে না। অথচ এদের একজনও মদপান করতে রাজি হল না! ব্যাপারটা কি? খৃস্টানদের মনে সন্দেহ জাগে। পরিস্থিতি যাই হোক, এরা তো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। তারা আরো এমন দু'চারটি লক্ষণ দেখতে পায়, যার ভিত্তিতে তাদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। তারা এক এক করে আসর থেকে উঠতে শুরু করে, যেন তাঁবুতে ঘুমাতে যাচ্ছে।

আসর থেকে উঠে গিয়ে তারা মেয়েদেরকে বলে, তোমরা তোমাদের যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর, দেখ, আসলে এরা কারা। একটি মেয়ে স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় এবং এই বলে বাইরে চলে যায় যে, এই তাঁবুটি খালি করে দাও। মেয়েটি উঠে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করতে থাকে। অবশেষে আলী বিন সুফিয়ানের এক লোক উঠে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যায়। লোকটি কেন গেল বুঝা গেল না। মেয়েটি তাকে থামিয়ে বলল, তাঁবুতে বসে বসে ভয় পাচ্ছিলাম, তাই একটু বাইরে বেড়াতে আসলাম। মেয়েটা পুরুষদেরকে আঙ্গুলে করে নাচাতে জানে। তার মোহনীয় কথা ও ভঙ্গিমায় লোকটা ভুলেই যায় যে, সে কোথায় যেতে উঠেছিল। মেয়েটি বলল, 'আমাদের সঙ্গে যে লোকগুলো আছে, ওরা বড় খারাপ মানুষ। আমরা এখানে তোমাদের ন্যায় অন্য এক কাজে এসেছিলাম। কিন্তু লোকগুলো আমাদেরকে বেজায় উত্যক্ত করে ফিরছে। আচ্ছা, তুমি কি আমার তাঁবুতে এসে ঘুমাতে পার? তাহলে আমি ওদের থেকে রক্ষা পাই।' বলে মেয়েটি এমন কিছু আচরণ করে, যার ফলে লোকটি মোমের মত গলে যায় এবং মেয়েটির তাঁবুতে চলে যায়।

তাঁবুর মধ্যে মিটমিট করে একটি প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় মেয়েটি লোকটির আপাদমস্তক এক নজর দেখে নিয়ে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল, 'উহ্! তুমি তো বড্ড সুশ্রী পুরুষ। তুমিই আমার হেফাজত করতে পারবে।' এই বলে এক পেয়ালা মদ লোকটির প্রতি এগিয়ে দিয়ে বলল– 'নাও, পান কর।'

'না।'

'কেন?'

'আমি মুসলমান।'

'এত পাক্কা মুসলমানই যদি হয়ে থাক, তাহলে ক্রুশের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে আসলে কেন?'

লোকটি চমকে উঠে বলল, 'এর বিনিময় পাই।'

মেয়েটা যতটা না রূপসী, তার চেয়ে বেশী চতুর। এই উভয় অস্ত্র ব্যবহার করে সে আলী বিন সুফিয়ানের এই লোকটির দেল-দেমাগ কব্জা করে ফেলে। মেয়েটি বলল, 'মদপান না কর তো শরবত এনে দেই'। বলেই সে অন্য তাঁবুতে চলে যায় এবং একটি পেয়ালা হাতে নিয়ে আসে। শরবতের পেয়ালাটা লোকটির দিকে বাড়িয়ে দেয়। লোকটি পেয়ালাটা হাতে নিয়ে মুখের সঙ্গে লাগিয়েই মুচকি একটা হাসি দিয়ে পেয়ালাটা রেখে দেয়। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, 'এর মধ্যে হাশীশ কতটুকু দিয়েছ?'

অকস্মাৎ মেয়েটি নিরুত্তর হয়ে যায়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'বেশী নয়; এই যতটুকুতে কিছু সময়ের জন্য তোমাকে আত্মভোলা করে রাখা যায়।'

'কেন?'

'আর কেন? আমি তোমাকে হাত করতে চাই'– ধীর কণ্ঠে মেয়েটি বলল– 'আমার কথাগুলো যদি তোমার কাছে খারাপ লাগে, তাহলে তোমার খঞ্জরটা আমার বুকে বিদ্ধ করে দাও। আমি তোমাকে হঠাৎ পেয়ে যাইনি। আমি তোমার ওদিকে আসা দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সফরকালে আমি তোমাকে গভীর মনে দেখেছিলাম। মনে হচ্ছিল, তুমি আর আমি কোথায় যেন কখনো একত্রে ছিলাম এবং একজন আরেকজনের পরিচিত। তোমাকে আমার মনে ধরেছে। দেখলে না, আমি তোমাকে মদ পেশ করেছি, কিন্তু নিজে পান করিনি। কারণ, আমি মুসলমান। এরা আমাকে জোর করে মদপান করায়।'

লোকটি চকিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তা তুমি এই কাফেরদের সঙ্গে কিভাবে আসলে?'

'আমি বারটি বছর ধরে এদের সঙ্গে আছি'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমি জেরুজালেমের বাসিন্দা। তখন আমার বয়স ছিল বার বছর। আমার পিতা যখন আমাকে বিক্রি করে দেন, তখন আমি জানতাম না, আমার খরিদ্দার খৃস্টান। তারা আমাকে সেই কাজের প্রশিক্ষণ দেয়, এই আজ যে কাজের জন্য আসলাম। আমি দামেস্ক ও বাগদাদের নাম শুনেছি। নামগুলো আমার কাছে বেশ ভাল লাগে। এই ভূখণ্ডে পা রাখা মাত্র এর আবহাওয়া আমার ভেতরে ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে দিয়েছে। আমি মুসলমান, মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য আমি কাজ করতে পারব না।'

মেয়েটি অতিশয় আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠে। বলল– 'আমার হৃদয় কাঁদছে। আমার আত্মা কাঁদছে।' লোটটির হাত দু'টো চেপে ধরে টেনে নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বলল, 'তুমিও মুসলমান, চল আমরা পালিয়ে যাই। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব। ধু ধু মরু প্রান্তরে নিয়ে যাবে? আমি সহাস্যবদনে সেখানে যাব। তুমিও স্বজাতিকে ধোঁকা দেয়া থেকে ফিরে আস। আমাদের কাছে অনেক স্বর্ণমুদ্রা আছে; আমি সেগুলো নিয়ে নেব। চল, আমরা পালিয়ে যাই।'

আলী বিন সুফিয়ানের এই লোকটি বুদ্ধিমান ছিল বটে, কিন্তু এখন মেয়েটির রূপ ও কথার ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। তার ডিউটির কথা মনে পড়ে। সে মদপান করেনি, হাশীশও নয়। হাশীশের ঘ্রাণ কেমন তার জানা আছে। সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, তোমরা এখানে কেন এনেছ? মেয়েটি

তাদের মিশনের কথা জানায়। লোকটি বলল, আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, এখানে তোমরা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে পারবে না। সত্য সত্যই যদি তুমি এ- কাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাক, তাহলে তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি আমাদের হাতে এসে পড়েছ। পালাতে হবে না, তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকতে পারবে। আমরা কেউ খৃস্টানদের গুপ্তচর নই। আমরা সবাই মিসরের যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা।'

মেয়েটি আনন্দের আতিশয্যে লোকটিকে জড়িয়ে ধরে। লোকটি বলল, 'আমি আমার কমান্ডারকে বলব, তোমাকে যেন অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা রাখা হয় এবং কোন আমীর বা অন্য কারো হাতে সোপর্দ না করেন।'

মেয়েটি অস্থিরচিত্তে লোকটির হাতে চুমো খেতে শুরু করে। মিশন তার সফল। আলী বিন সুফিয়ানের এত সতর্ক একজন গোয়েন্দা একটি খৃস্টান গোয়েন্দা মেয়ের প্রতারণার শিকার হয়ে পড়ল!

'একটু অপেক্ষা করুন'– মেয়েটি বলল– 'আমি দেখে আসি আমার সঙ্গীরা ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা।'

মেয়েটি তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

✿ ✿ ✿

আলী বিন সুফিয়ান সালার তাওফীক জাওয়াদের ঘরে বসে নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রীর অপেক্ষা করছেন। ইসলামের মহান মুজাহিদের স্ত্রী দূত মারফত সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট তার চিন্তা-চেতনা ও আবেগের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তারপরও আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা জরুরী। তার নিকট থেকে অনেক তথ্য জানতে হবে এবং পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে।

কিছুক্ষণ পর সম্মানিতা মহিলা এসে উপস্থিত হন। তিনি কালো ওড়নায় আবৃতা। মুখে কৃত্রিম দাড়ি থাকার কারণে আলী বিন সুফিয়ানকে প্রথমে চিনতে পারেননি। পরক্ষণে পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন–

'এমন একটি সময়ও আমাদের ভাগ্যে লেখা ছিল যে, আমরা দু'জন এভাবে লুকিয়ে ও ছদ্মবেশ ধারণ করে পরস্পর সাক্ষাৎ করব। তুমি এখানে মাথা উঁচু করে আসতে। এবার এসেছ এমনভাবে, যেন তোমাকে কেউ চিনতে না পারে। আর আমিও ঘর থেকে এমন সাবধানে বের হয়েছি, যেন কেউ আমার পিছু না নেয় যে, আমি কোথায় যাচ্ছি।'

আলী বিন সুফিয়ানও অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না তিনি। আবেগে এতই আপ্লুত হয়ে পড়েন যে, দীর্ঘক্ষণ কোন কথাই তার মুখ থেকে বেরুল না। নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী বললেন–

'আলী বিন সুফিয়ান! এই পোশাক আমি স্বামীর শোক পালনের জন্য পরিধান করিনি। আমি শোক পালন করছি ইসলামের সেই মর্যাদার জন্য, যা আমার জাতির অলংকার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসকরা আমার পুত্রকে ক্রীড়নকে পরিণত করে জাতীয় মর্যাদাকে খৃস্টানদের পায়ে অর্পণ করেছে। তুমি সম্ভবত জান না, যে খৃস্টান সম্রাটকে সুলতান জঙ্গী বন্দী করে রেখেছিলেন, গতকাল খলীফার নির্দেশে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এই সেই সম্রাট রেজনাল্ড, যাকে মাস কয়েক আগে নুরুদ্দীন জঙ্গী বেশ ক'জন খৃস্টান সৈন্যের সঙ্গে এক লড়াইয়ে গ্রেফতার করেছিলেন। নুরুদ্দীন জঙ্গী তাকে ও অন্যান্য বন্দীদেরকে কার্ক থেকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন।

এ ঘটনায় জঙ্গী বেশ আনন্দিত ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমি খৃস্টানদের সঙ্গে এমন একটি চাল খেলে এই সম্রাটকে মুক্ত করব, যে চাল তাদের কোমর ভেঙ্গে দেবে। একজন সম্রাট ও উচ্চপদস্থ কমান্ডারের গ্রেফতারি সাধারণ কোন ব্যাপার ছিল না। আমরা তার পরিবর্তে খৃস্টানদের থেকে আমাদের অনেক দাবি-দাওয়া আদায় করে নিতে পারতাম। কিন্তু গতকাল আমার পুত্র আনন্দের সাথে আমাকে বলল, 'মা! আমি খৃস্টান সম্রাট এবং তার সঙ্গীসহ সব খৃস্টান বন্দীকে মুক্ত করে দিয়েছি।' সংবাদটি আমার মনে প্রচণ্ড একটা আঘাত হানে। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আত্মভোলার ন্যায় বসে থাকি। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পুত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিনিময়ে নিজের বন্দীদের ছাড়িয়ে এনেছ কি?' পুত্র জবাব দেয়, 'ওদেরকে ফিরিয়ে এনে আমরা আর কি করব। আমরা তো আর কারো সঙ্গে যুদ্ধ করব না।' আমি পুত্রকে বললাম, 'তুমি এখন থেকে আর তোমার বাপের কবরের নিকট যাবে না। আর তুমি মারা গেলেও তোমার পিতার কবরস্থানে তোমাকে দাফন করব না। সেই করবস্থানে এমন বহু মুজাহিদও শুয়ে আছেন, যারা খৃস্টানদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। তোমাকে সেখানে দাফন করে আমি তাদের অবমাননা করতে চাই না। তুমি নুরুদ্দীন জঙ্গীর কলংক...।'

'কিন্তু যা-ই বলি, পুত্র তো আমার নাবালক, এখনো সবকিছু বুঝে উঠার বয়স হয়নি। আমার পুত্র যেসব আমীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে, আমি তাদের নিকটও গিয়েছি। তারা আমাকে শ্রদ্ধা করে বটে, কিন্তু মান্য করতে প্রস্তুত নয়। তারা আমার কথা মানছে না। খৃস্টানরা তাদের সম্রাট ও বন্দী সৈন্যদের মুক্তি দিয়ে ইসলামের মুখে চপেটাঘাত করেছে। আমার নিকট অবাক লাগে যে, সুলতান আইউবী কায়রোতে বসে কী করছেন! তিনি আসছেন না কেন? সালাহুদ্দীন আইউবী কী ভাবছেন আলী বিন সুফিয়ান? তুমি তাকে বলবে, তোমার এক বোন তোমার আত্মমর্যাদার জন্য মাতম করছে।

তাকে বলবে, আমি এই কালো পোশাক সেইদিন খুলব, যেদিন তোমরা দামেস্কে প্রবেশ করে বিলাসপ্রিয় ও ঈমান বিক্রেতাদের হাত থেকে মিল্লাতে ইসলামিয়ার মর্যাদাকে রক্ষা করবে। অন্যথায় আমি এই পোশাকেই মৃত্যুবরণ করব আর অসিয়ত করে যাব, যেন আমাকে এই পোশাকেই দাফন করা হয়। আমি কিয়ামতের দিন আমার স্বামী ও আল্লাহর সম্মুখে সাদা পোশাকে উপস্থিত হতে চাই না।'

'আমি আপনার মনের কথা বুঝতে পারছি'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আসুন আমরা কাজের কথা বলি। সুলতান আইউবীও আপনারই ন্যায় অস্থির-বেকারার। আবেগ ও উত্তেজনাবশত আমাদের কোন পদক্ষেপ নেয়া ঠিক হবে না। এখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারি। তার পন্থা একটাই যে, দেশের জনগণ আমাদের পক্ষে থাকবে। আর সেনাবাহিনীর ব্যাপারে ভাই তাওফীক জাওয়াদ আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, ফৌজ আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না। তবে খলীফা ও আমীরদের রক্ষীবাহিনী মোকাবেলা করতে পারে।'

'দেশের জনগণ আপনাদের সঙ্গে আছে'– জঙ্গীর স্ত্রী বললেন– 'আমি মহিলা মানুষ; ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারব না। তবে আমি অন্য অঙ্গনে লড়ে যাচ্ছি। আমি দেশের নারী সমাজের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করে রেখেছি যে, আপনি যে কোন সময় তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যেতে পারবেন। আমার ব্যবস্থাপনায় এখানকার যুবতী মেয়েরা তরবারী চালনা ও তীরান্দাজীতে দক্ষতা অর্জন করেছে। তারা তাদের পুত্র, পিতা, স্বামী ও ভাইদেরকে স্ফুলিঙ্গ বানিয়ে রেখেছে। আমি যেসব মহিলাদের দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়েছি, তারা আমার অনুগত। পরিস্থিতি যদি গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে প্রতিটি গৃহকে মহিলারা খলীফার ফৌজের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে ফেলবে। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি ফৌজ নিয়ে আসেন, তাহলে আমার খলীফা পুত্র ও তার চাটুকাররা নিজেদেরক সঙ্গীহীন দেখতে পাবে। তুমি যাও ভাই আলী! ফৌজ নিয়ে আস। এখানকার পরিস্থিতি আমার উপর ছেড়ে দাও। তুমি নিশ্চিত থাক, জনগণের দিক থেকে একটি তীরও তোমাদের গায়ে বিদ্ধ হবে না। যদি আমার পুত্রকে হত্যা করে ফেল্যার প্রয়োজন মনে কর, তাহলে ভুলে যেও সে আমার ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র। আমি আমার পুত্রকে খণ্ডবিখণ্ড করাতে রাজি আছি, সালতানাতে ইসলামিয়াকে টুকরো টুকরো করতে দিতে রাজি নই।

তাওফীক জাওয়াদও আলী বিন সুফিয়ানকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, গৃহযুদ্ধ হবে না। তারপর তিনজন মিলে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন যে, সুলতান

আইউবী কিভাবে আসবেন এবং এসে কি করবেন। সিদ্ধান্ত হল, সুলতান আইউবী আসনে নীরবে, খলীফা ও তার চাটুকারদের অজান্তে।

❁ ❁ ❁

আলী বিন সুফিয়ানের লোকটিকে তাঁবুতে বসিয়ে রেখে খৃস্টান মেয়েটি তার সঙ্গীদের নিকট গিয়ে বলে, শিকার জালে আটকা পড়েছে। এরা সবাই মিসরী ফৌজের যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা। বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান তাদের কমান্ডার।

এই তথ্য খৃস্টানদের চমকে দেয়। তারা ভাবতে শুরু করে যে, এখন কি করা যায়। এখানে থাকা তাদের জন্য নিরাপদ নয়।

মেয়েটি পুনরায় মিসরী গোয়েন্দার কাছে ফিরে যায়। এক খৃষ্টান বাইরে বেরিয়ে আলী বিন সুফিয়ানকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু আলীকে পায় না সে। তিনি তো তখন তাওফীক জাওয়াদের ঘরে বসা। আলী এখানে আছে কি নেই, এটাই লোকটির জানা দরকার। আলীকে অনুপস্থিত দেখে মনে ভয় জাগে যে, তিনি তাদেরকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করছেন। সঙ্গীদের নিকট গিয়ে সে জানায়, বিলম্ব না করে এক্ষুণি এখান থেকে পালাতে হবে।

এখন মধ্য রাত। এরা এই নগরী সম্পর্কে অজ্ঞ। দিনের বেলা হলে গন্তব্য একটা ঠিক করে নিতে পারত। তাছাড়া এই রাত দুপুরে মেয়েদের নিয়ে চলাও অনুচিত।

একজন পরামর্শ দিল, 'চল আমরা কোন একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠে। বলব, আমরা কায়রোর ব্যবসায়ী; বাইরে খোলা মাঠে ঘুমুতে পারি না, তাই সরাইখানায় রাত কাটাতে চাই।' তার এই মতের উপরই সিদ্ধান্ত হল। কিন্তু সরাইখানা কোথায়, সেটা তাদের জানা নেই।

একজন লুকিয়ে লুকিয়ে সরাইখানার সন্ধানে বের হয়। লোকটি হাঁটছে। রাস্তাঘাট, হাটবাজারে কোথাও জনমানুষের চিহ্ন নেই। একজন মানুষও তার নজরে পড়ল না, যাকে জিজ্ঞেস করবে এখানে সরাইখানার কোথায়।

লোকটি এলোপাতাড়ি ঘুরছে। হঠাৎ সামনে একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখে। অন্ধকারে এতটুকুই বুঝতে পারে, একজন মানুষ আসছে। নিকটে আসলে খৃস্টান লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করে, 'ভাই এদিকে সরাইখানা কোথায় বলতে পারেন কি?'

লোকটির মাথা ও মুখের অর্ধেকটা চাদর দিয়ে ঢাকা। তিনি বললেন, 'এখানে ধারে-কাছে কোন সরাইখানা নেই।

'আছে এখান থেকে অনেক দূরে- নগরীর ওই প্রান্তে।' বলে লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, 'এত রাতে আপনি সরাইখানা খুঁজছেন কেন? এখন তো আর আপনার জন্য কেউ সরাইখানার দরজা খুলবে না।'

খৃস্টান বলল, 'এই আজই আমি একটি বণিক কাফেলার সঙ্গে এসেছি। সঙ্গে চারটি মেয়ে আছে; ওদেরকে তো আর তাঁবুতে রাখা যায় না।'

'হ্যাঁ, এটা তো সমস্যা'– আগন্তুক বলল– 'আপনাকে সন্ধ্যার আগেই এর ব্যবস্থা করে রাখা আবশ্যক ছিল। যা হোক, আসুন, আমি আপনার সাহায্য করব। আপনি বিদেশী মানুষ, এখান থেকে গিয়ে যাতে বলতে না হয় যে, দামেস্কে আমার মেয়েরা খোলা মাঠে রাত কাটিয়েছে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। মেয়েদেরকে নিয়ে আসুন, আমি সরাইখানা খুলিয়ে আপনাদের রাত যাপনের ব্যবস্থা করে দেব।'

আগন্তুক খৃস্টান লোকটির সঙ্গে হাঁটা দেয়। দু'জন কাফেলার তাঁবুর নিকট চলে যান। খৃস্টান তাকে একস্থানে দাঁড় করিয়ে বলল, 'আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি ওদেরকে নিয়ে আসছি।' বলেই সে তাঁবুর একদিক থেকে চক্কর কেটে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

খৃস্টানদের তাঁবু এখান থেকে সামান্য দূরে অন্য জায়গায়। তাঁবুতে পৌঁছে সে সঙ্গীদের বলল, একজন লোক আমার সঙ্গে এসেছে, তিনি আমাদেরকে সরাইখানায় জায়গার ব্যবস্থা করে দেবেন। সঙ্গীরা কিছুটা ভয় পেয়ে যায়। পাছে এই লোকটিও ধোঁকা দিয়ে বসে কিনা। কিন্তু ভয় পেয়ে লাভ নেই। যে জালে আটকা পড়েছে, সেখান থেকে যে কোন মূল্যে হোক বের তাদের হতেই হবে। মিসরী গোয়েন্দা মেয়েটিকে এতটুকুও বলে দিয়েছে যে, খলীফা ও আমীরগণ খৃস্টানদের পদানত হয়ে পড়েছেন। সে জন্য আলী বিন সুফিয়ান ছদ্মবেশে একশ' যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা নিয়ে এখানে এসেছেন। তার মিশন হল, এখানকার পরিস্থিতি যাচাই করা যে, খৃস্টানদের প্রভাব কতটুকু বিস্তার লাভ করেছে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী কিনা।

মেয়েটি আলী বিন সুফিয়ানের এই মিশনের কথা তার সঙ্গীদের অবহিত করেছিল। তাদের কাছে এটা এতই মূল্যবান তথ্য যে, রাতারাতি খলীফার কানে দিতে পারলে প্রশংসা লাভ করা যেত। তাছাড়া খৃস্টান শাসকদের নিকটও সংবাদটা পৌঁছানো দরকার, যাতে তারা সময়মত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারা এমনও সংকল্প করে যে, আলী ও তার এই দলটিকে খলীফাকে দিয়ে ধরিয়ে দিতে পারলে মন্দ হত না।

তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আলী বিন সুফিয়ানের লোকেরা তো ঘুমিয়ে আছে; আমরা সবাই একত্রে বেরিয়ে যাব। মালপত্র ও পশুগুলোকে এখানেই রেখে যাব। ভোর পর্যন্ত তো এই মিশরী দলটি খলীফার হাতে ধরা পড়ছেই। পরে আমাদের মালামাল আমরা নিয়ে নেব।

সব ক'জন একত্রে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। পা টিপে টিপে আড়ালে

আড়ালে হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছে, সেখানে সাহায্যকারী লোকটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন লোকটা জায়গায় নেই। সবাই এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। ঠিক এমন সময় উটের আড়াল থেকে বেশ ক'জন লোক উঠে দাঁড়ায় এবং খৃস্টান দলটিকে ঘিরে ফেলে। তাদেরকে হাঁকিয়ে একদিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকটি প্রদীপ জ্বালান হয়। আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'দোস্তরা, কোথায় যাচ্ছ?' তারা মিথ্যা জবাব দেয়। আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন, সরাইখানার সন্ধানে দিশেহারার ন্যায় ঘুরছিল যে লোকটি, সে কে?'

একজন বলল, 'আমি।'

'আর যার নিকট সরাইখানার সন্ধান জিজ্ঞাসা করেছিলে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'সে হলাম আমি।'

এ এক আকস্মিক ঘটনা। আলী বিন সুফিয়ান তাওফীক জাওয়াদের ঘর থেকে ফিরছিলেন আর একই পথে খৃস্টান লোকটি সরাইখানার সন্ধানে যাচ্ছিল। লোকটি আলী বিন সুফিয়ানকে সরাইখানার পথ জিজ্ঞেস করে। আলো থাকলে লোকটি আলীকে চিনে ফেলত। কিন্তু একে তো ছিল অন্ধকার, দ্বিতীয়ত আলী বিন সুফিয়ানের মাথা ও মুখমণ্ডল ছিল রুমাল দ্বারা ঢাকা। লোকটির দু'একটি কথা শুনেই তিনি বুঝে ফেললেন, ওরা জেনে ফেলেছে যে, ওরা ফাঁদে আটকা পড়েছে; তাই পালাবার পথ খুঁজছে। আলী বিন সুফিয়ান নিশ্চিত ছিলেন, এই খৃস্টানরা গোয়েন্দা। কিন্তু এখানে আমীরদের কেউ না কেউ তাদেরকে আশ্রয় দেবেন। তাই তিনি সাহায্যের ফাঁদ পেতে তাকে আটকে ফেলেছেন এবং তার সঙ্গে তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। তিনি ভাবছিলেন, এ মুহূর্তে কী পদক্ষেপ নেয়া যায়। খৃস্টান লোকটি তাঁর প্রতি করুণাই করেছে যে, তাকে তাঁবু থেকে অনেক দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে।

আলী বিন সুফিয়ান তৎক্ষণাৎ তাঁর দু'তিনজন লোককে জাগিয়ে তোলেন এবং নেহায়েত দ্রুততার সাথে তাদেরকে তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। দিক-নির্দেশনা দিয়ে তিনি নিজে খৃস্টানদের তাঁবুর নিকটে নিয়ে যান। মেয়েদেরসহ তারা সবাই একটি তাঁবুতে জড়ো হয়েছে। আলী বিন সুফিয়ান পা টিপে টিপে সন্নিকটে গিয়ে তাদের কথোপকথন শ্রবণ করেন। তিনি এতটুকু জানতে পারেন যে, খৃস্টান গোয়েন্দারা তার মিশন জেনে ফেলেছে। কিন্তু এই গোপন তথ্য কিভাবে ফাঁস হল, তা জানতে পারলেন না।

ইত্যবসরে আলী বিন সুফিয়ানের লোকেরা তার নির্দেশনা মোতাবেক বর্শাসজ্জিত হয়ে উটপালের আড়ালে গিয়ে বসে পড়েছে। খৃস্টানদের এখানেই আসবার কথা। যেইমাত্র তারা এখানে এসে উপস্থিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে আলী বিন

সুফিয়ানও এসে হাজির হন এবং সবাইকে ঘিরে ফেলে বন্দী করে ফেলেন।

'দোস্তরা!' আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তোমাদের চরবৃত্তি অনেক দুর্বল। এখনো তোমাদের অনেক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। গুপ্তচর কি এভাবে সুনসান– জনমানবশূন্য অলিগলিতে ঘোরাফেরা করে? আর গুপ্তচর কি কোন অজানা লোকের সঙ্গে তার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত কথা বলে? এই বিদ্যা তোমাদের আমার নিকট থেকে শিখতে হবে।'

'এই বিদ্যা আপনি আপনার লোকদেরই শিক্ষা দিন'– এক খৃস্টান বলল– 'আপনি কি আমাদের এই দক্ষতার প্রশংসা করবেন না যে, আমরা আপনারই একজন থেকে আপনাদের আসল পরিচয় জেনে নিয়েছি? এতো ভাগ্যের লীলা। আজ আপনি জিতে গেছেন, আমরা হেরে গেছি। আমাদের কমান্ডার যদি মৃত্যুবরণ না করতেন, তাহলে আজ আমরা এভাবে ধরা খেতাম না।'

'আমার সেই লোকটি কে, যে আমার গোপন তথ্য ফাঁস করে দিল?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন।'

'ঐ যে ঐ তাঁবুতে ঘুমিয়ে আছে।' মেয়েটি একটি তাঁবুর প্রতি ইশারা করে উত্তর দিল– 'ও আমার ফাঁদে এসে পড়েছিল।'

'যাক গে, এসব আলাপ কায়রো গিয়ে হবে।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

ভোর হল। জনতা দেখতে পেল, একটি বণিক কাফেলা এগিয়ে চলছে। অনেকগুলো উটের পিঠে যেখানে ব্যবসার পণ্য বোঝাই করা, সেখানে কয়েকটি তাঁবুও পেঁচিয়ে রাখা আছে। আলী বিন সুফিয়ান ও তার একশ' লোক ব্যতীত কেউ জানে না, এই তাঁবুগুলোর মধ্যে চারটি মেয়ে ও চারজন পুরুষ শুয়ে আছে। রওনা হওয়ার প্রাক্কালে আলী বিন সুফিয়ান শেষ রজনীর আলো আঁধারীতে এক একজন খৃস্টানকে এক একটি তাঁবুর মধ্যে পেঁচিয়ে উটের পিঠে বোঝাই করে বেঁধে নিয়েছেন। ওরা দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে, নাকি জীবিত থাকবে, তার কোন ভাবনা নেই আলী বিন সুফিয়ানের।

কাফেলা দামেস্ক অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। এখন আর পেছনের দিকে তাকালে শহরটা দেখা যায় না। আলী বিন সুফিয়ান বন্দী খৃস্টান গোয়েন্দাদেরকে তাঁবুর মধ্য হতে বের করেন। সকলেই জীবিত। তিনি মেয়েগুলোকে উটের পিঠে আর পুরুষদেরকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে নেন। তারা মুক্তির জন্য তাদের সমুদয় মণি-মাণিক্য ও সোনাদানা আলী বিন সুফিয়ানকে দিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করে। এগুলো তারা খলীফা ও আমীদেরকে উপঢৌকন দেয়ার জন্য এনেছিল। আলী বিন সুফিয়ান মুখে হাসির রেখো টেনে বললেন, 'এসব দৌলত তো আমার সঙ্গে যাচ্ছেই।'

❁ ❁ ❁

সে সময়ে রেমান্ড নামক এক খৃস্টান ত্রিপোলীর শাসক ছিলেন। বর্তমানকার লেবাননকে সে যুগে ত্রিপোলী বলা হত। অন্যান্য খৃস্টান শাসকরা অবস্থান করতেন জেরুজালেম ও তার আশপাশের এলাকায়। নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুতে তারা সকলেই আনন্দিত। ইতিমধ্যে তারা একটি বৈঠক করে ফেলেছেন। পরিকল্পনাসমূহকে পুনর্বিবেচনা করে দেখেন, ঠিক আছে কিনা। সে মোতাবেক খৃস্টান কমান্ডার আইরিজ তার বাহিনী নিয়ে হাল্‌ব পৌঁছে যান। হাল্‌বের আমীর হলেন শামসুদ্দীন। আইরিজ শামসুদ্দিনের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন, আপনি হাল্‌বকে আমাদের হাতে তুলে দিন কিংবা চুক্তিনামায় সই করে আমাদেরকে কর প্রদান করুন। শামসুদ্দিন এই ভয়ে খৃস্টানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন যে, দামেস্ক ও মওসেলের আমীরগণ আমাকে যুদ্ধে লিপ্ত দেখলে আমার রাজ্য কব্জা করে নেবে।

এই একটি মাত্র সাফল্যে খৃস্টানরা দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। তারা বুঝে ফেলে যে, এই মুসলমান আমীরগণ পরস্পর সহযোগী হওয়ার স্থলে একে অপরের দুশমন। তাই তারা বিনা যুদ্ধেই মুসলমানদেরকে পদানত করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলে। তাদের ভয় ছিল শুধু সালাহুদ্দীন আইউবীকে। আইউবীর নীতি ও চরিত্র সম্পর্কে তারা অবহিত। তাদের আশংকা ছিল, সুলতান আইউবী যদি দামেস্ক বা অন্য কোন এলাকায় এসে পড়েন, তাহলে তিনি সব আমীরকে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলবেন। তিনি সকল আমীরকে অতিদ্রুত ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছিলেনও। রেমান্ড খলীফা আল-মালিকুস্‌ সালিহকে দূত মারফত মূল্যবান উপঢৌকনসহ এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে সামরিক সহেযাগিতাও প্রদান করব।

ইসলামের অস্তিত্ব ও মর্যাদা প্রচণ্ড হুমকির সম্মুখীন। এ মুহূর্তে ইসলামের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে সুলতান আইউবীর পদক্ষেপের উপর। বিলীয়মান প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামকে ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। সুলতান আইউবী কায়রোতে আলী বিন সুফিয়ানের অপেক্ষা করছেন। তাঁকে আলীর রিপোর্ট অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি বাগদাদ, দামেস্ক, ইয়ামান প্রভৃতি অঞ্চলে সেনা অভিযান প্রেরণের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। তার জন্য সমস্যা হল, মিসরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভাল নয় এবং সৈন্যও প্রয়োজনের তুলনায় কম। মিসর থেকে তিনি বেশী সৈন্য নিয়ে যেতে পারবেন না। এ মুহূর্তে এটাই তার বড় সমস্যা, যার জন্য তিনি অতিশয় বিচলিত যে, এত সামান্য সৈন্য দিয়ে কি তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন! কিন্তু তবুও সেনা অভিযান ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। সুলতান আইউবী প্রতিদিন দু'একবার ঘরের ছাদে উঠে একনাগাড়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন, যেদিক থেকে আলী বিন সুফিয়ান

আসবেন। দিগন্তে দৃষ্টি মেলে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকছেন তিনি।

এভাবে একদিন তিনি দূর দিগন্তে ধূলিবালির কুন্ডলী দেখতে পান। ধূলির কুন্ডলী জমিন থেকে উত্থিত হয়ে যেন উপরদিকে উঠে যাচ্ছে। সুলতান আইউবী বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। ধূলির কুন্ডলী ধীরে ধীরে নিকটে এগিয়ে আসছে। একসময় ধূলির ভেতর ঘোড়া ও উটের কায়া নজরে আসে। এটা আলী বিন সুফিয়ানেরই কাফেলা। দামেস্ক থেকে রওনা হওয়ার পর পথে তিনি কমই যাত্রাবিরতি দিয়েছেন। মিসরের মিনার চোখে পড়া মাত্র তিনি উট-ঘোড়ার গতি আরো বাড়িয়ে দেন। এ পরিস্থিতিতে একটি মুহূর্তের মূল্য কত, তা তিনি জানেন। তাঁর অপেক্ষায় যে সুলতান আইউবীর রাতে ঘুম আসছে না, সেই অনুভূতিও তাঁর আছে।

আপাদমস্তক ধূলিমলিন আলী বিন সুফিয়ান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। সুলতান আইউবী তাকে নাওয়া-খাওয়ার সময়ও দিলেন না। রিপোর্ট শোনার জন্য তিনি অস্থির-বেকারার। এখানেই তার খাওয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে তাকে দফতরে নিয়ে যান। আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীকে বিস্তারিত রিপোর্ট শোনান। নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর পয়গাম, তার আবেগ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সালার তাওফীক জাওয়াদের সঙ্গে যে কথপোকথন হয়েছে, তারও বিবরণ দেন। শেষে বললেন, দামেস্ক থেকে আমি একটি উপঢৌকন নিয়ে এসেছি। এই উপঢৌকন হল চারজন খৃস্টান গোয়েন্দা পুরুষ ও চারটি মেয়ে। তিনি সুলতান আইউবীকে বললেন, 'আমি সন্ধ্যার আগে আগে তাদের থেকে কিছু মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করব।'

'তার মানে আমাদের সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে!' সুলতান আইউবী বললেন।

'হ্যাঁ, করতে হবে এবং আমরা অবশ্যই করব'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তবে আমার আশা, গৃহযুদ্ধ হবে না।'

সুলতান আইউবী তাঁর দু'জন উপদেষ্টাকে তলব করেন। এই উপদেষ্টাদ্বয়ের উপর তার পূর্ণ আস্থা আছে। সুলতান তাদেরকে বললেন, 'এই মুহূর্তে আমি তোমাদেরকে যে কথাগুলো বলব, সেগুলো মনে গেঁথে নেবে। তোমরা দু'জন ব্যতীত আলী বিন সুফিয়ানও এই গোপন ভেদ সম্পর্দে অবহিত থাকবে।'

সুলতান আইউবী তাদেরকে দামেস্ক ও অন্যান্য ইসলামী রিয়াসত ও জায়গীরের পরিস্থিতির বিবরণ প্রদান করেন। আলী বিন সুফিয়ানের নিয়ে আসা রিপোর্ট শুনিয়ে বললেন, আল্লাহর সেনারা তাঁরই হুকুম তামিল করে থাকে। আমীর ও খলীফাদের আনুগত্য আমাদের উপর ফরজ। কিন্তু আমীর-খলীফা যদি ইসলাম ও মুসলমানের দুশমনে পরিণত হয়, তখন ইসলাম ও

মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা আল্লাহর সৈনিকদের জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায়। আমার অস্তিত্ব যদি দেশ ও জাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া কিংবা পায়ে শিকল পরিয়ে বন্দীশালায় আবদ্ধ করে রাখা তোমাদের জন্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। আজ এমনি একটি কর্তব্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের খলীফা ইসলাম ও সার্বভৌমত্বের কথা ভুলে গিয়ে দুশমনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তিনি আজ ইসলামের দুশমনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন, তাদের গুপ্তচরদের আশ্রয় প্রদান করছেন। তার আশপাশের লোকেরা ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে আছে। তারা সালতানাতে ইসলামিয়াকে বিক্রি করে খাচ্ছে। হাল্ব-এর গবর্নর শামসুদ্দীন খৃষ্টানদের হাতে আত্মসমর্পণ করে কর প্রদান করছে এবং তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। খৃষ্টজগত চতুর্দিক থেকে আলমে ইসলামকে ঘিরে ফেলছে। এমতাবস্থায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে খলীফাকে গদিচ্যুত করে ইসলামের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা পরামর্শ দিন।'

'অবশ্যই ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' উভয় উপদেষ্টা একবাক্যে জবাব দেন।

'আমাদের পদক্ষেপ-পরিকল্পনা এই চারজনের মধ্যেই গোপন থাকবে।' সুলতান আইউবী বললেন এবং তাদেরকে নিয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কাজ শুরু করে দেন।

খৃস্টান গোয়েন্দা ও মেয়েদেরকে আলী বিন সুফিয়ান একটি বিশেষ পাতাল কক্ষে নিয়ে যান এবং বললেন, 'তোম'রা এমন একটি জাহান্নামে এসে প্রবেশ করেছ, যেখানে তোমরা জীবিতও থাকবে না, মরবেও না। তোমাদের দেহগুলোকে কংকালে পরিণত করে আমি তোমাদের থেকে যেসব তথ্য উদ্ধার করব, ভালোয় ভাল আগেই সব বলে দাও। তবেই এই জাহান্নাম থেকে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে। তোমাদেরকে চিন্তা করার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিলাম। আমি একটু পরে আসছি।'

আলী বিন সুফিয়ান যখন তাদেরকে বেড়ী পরানোর নির্দেশ প্রদান করেন, তখন তাদের একজন বলল, 'আমরা আপনাকে সব কথা বলে দেব। আমরা বেতনভোগী কর্মচারী। শাস্তি যদি দিতেই হয়, আমাদেরকে না দিয়ে যারা আমাদেরকে খাটায়, তাদেরকে দিন। তাছাড়া আমরা পুরুষরা না হয় শাস্তি বরদাশত করতে পারব; কিন্তু এই মেয়েগুলোকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করুন।'

কেউ তাদের গায়ে হাত দেবে না'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তোমরা যদি আমার কাজ সহজ করে দাও, তাহলে তোমাদের মেয়েরা তোমাদেরই সঙ্গে থাকবে। এই পাতাল প্রকোষ্ঠ থেকে তোমাদেরকে বের করে নেয়া হবে

এবং সসম্মানে নজরবন্দী করে রাখা হবে।'

খৃস্টান গোয়েন্দারা যেসব তথ্য প্রদান করে, তাতে নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর উদ্ভূত পরিস্থিতির সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়।

তিন দিন পর।

মিসরের সীমান্ত থেকে অনেক দূরে– উত্তর-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ একটি ভূখণ্ড। এলাকাটি পর্বতময়, উঁচু-নীচু টিলায় পরিপূর্ণ। মাঝে-মধ্যে সবুজ গাছগাছালী। আছে পানিও। এলাকাটা কাফেলা ও সেনা চলাচলের সাধারণ রাস্তা থেকে ভিন্ন। তার-ই অভ্যন্তরে এক স্থানে অনেকগুলো ঘোড়া বাঁধা আছে। ঘোড়াগুলোর সামান্য দূরে আড়ালে শুয়ে আছে বিপুল সংখ্যক মানুষ। সেখান থেকে খানিক ব্যবধানে একটি তাঁবু। তাঁবুর ভিতরে শুয়ে আছেন এক ব্যক্তি। তিন চারজন লোক বিভিন্ন টিলার উপর হাঁটাহাঁটি করছে। এলাকার বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে টহল দিয়ে ফিরছে আরো জন চারেক লোক।

তাঁবুর ভিতরে শায়িত লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। টিলার উপরে-নীচে যারা ঘোরাফেরা করছে তারা প্রহরী। বেঁধে রাখা অশ্বপালের অদূরে শুয়ে থাকা লোকগুলো সুলতান আইউবীর সৈন্য। তারা সংখ্যায় সাতশত।

সুলতান আইউবী গভীর ভাবনা-চিন্তার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তিনি যথাসম্ভব কম সৈন্য নিয়ে দামেস্ক যাবেন। যদি একজন সুলতানের ন্যায় তাকে স্বাগত জানানো হয়, তবে তো ভাল, মৌখিক আলাপ-আলোচনায়-ই সমস্যার সমাধান হবে। আর যদি সংঘর্ষ বাঁধে, তাহলে এই সল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারাই মোকাবেলা করবেন। আলী বিন সুফিয়ান তাঁকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন যে, খলীফা ও আমীরদের রক্ষীবাহিনী যদি সংঘাতে লিপ্ত হয়, তাহলে সালার তাওফীক জাওয়াদ তার বাহিনীকে সুলতানের হাতে তুলে দিবেন। জঙ্গীর স্ত্রীও নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, নগরবাসী সুলতান আইউবীকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু সুলতান আইউবী নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হতে দেননি। তিনি সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ধরে নিয়েছিলেন যে, দামেস্কের প্রত্যেক সৈনিক ও জনতা তাঁর দুশমন। তাই তিনি তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী থেকে এমন সাতশত সৈন্য বেছে নেন, যারা অসংখ্য যুদ্ধে লড়াই করেছে। তাদের মধ্যে আছে এমন সব গেরিলা যোদ্ধাও, যারা দুশমনের পিছনে যুদ্ধ লড়ায় অভিজ্ঞ। সামরিক দক্ষতা ছাড়াও এসব সৈন্য জাতীয় ও ঈমানী চেতনায় বলীয়ান। খৃস্টানদের নাম শুনলেই লাল যায় হয়ে তাদের চোখ।

সুলতান আইউবী কায়রো থেকে এই সৈন্যদেরকে রাতের আঁধারে গোপনে বের করে এনেছেন। তারা এক-দু'জন করে কায়রো থেকে বেরিয়ে আসে এবং

কায়রোর অনেক দূরে পূর্ব নির্ধারিত একস্থানে সমবেত হয়। সুলতান আইউবীও কায়রো থেকে বের হন অতি গোপনে। বিষয়টা জানতেন শুধু আলী বিন সুফিয়ান ও সুলতানের দুই খাস উপদেষ্টা। সুলতান আইউবীর রক্ষী বাহিনী যথারীতি কায়রোতে তার বাসগৃহ ও হেডকোয়ার্টার পাহারা দিচ্ছে। তারা জানে, সুলতান এখানেই আছেন।

সকল ইউরোপীয় ও মুসলমান ঐতিহাসিক একমত যে, সুলতান আইউবী শত শত অশ্বারোহী বেছে নিয়ে শহর থেকে গোপনে বের হয়ে দামেস্ক রওনা হয়েছিলেন। কায়রো এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় খৃস্টান গোয়েন্দারা তৎপর ছিল। তাদের মধ্যে এমন মিসরী মুসলমানও ছিল, যারা সরকারী কর্মচারী। কিন্তু কেউ টের পায়নি যে, কায়রো থেকে সুলতান আইউবী এবং সাতশ' অশ্বারোহী উধাও হয়ে গেছেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান আইউবী দামেস্ক প্রবেশ করা পর্যন্ত তার সকল তৎপরতা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। সে জন্য তিনি পথ চলতেন রাতে। দিনের বেলা কোথাও লুকিয়ে থাকতেন। সাতশ' ঘোড়া ও সাতশ' আরোহীকে লুকিয়ে রাখা কঠিন ছিল না। তিনি এমন পথে অতিক্রম করেন, যে পথে কোন কাফেলা চলাচল করে না। দু'জন ঐতিহাসিক লিখেছেন, সুলতান আইউবী এই গোপন সফরে সৈন্যদের সঙ্গে একজন সাধারণ সৈনিকেরই ন্যায় মিলেমিশে অবস্থান করেন। সকলের সঙ্গে খোশ-গল্প করতে থাকেন এবং কথা দিয়ে তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকেন। পাশাপাশি তাদেরকে বুঝাতে থাকেন যে, পরিস্থিতি কেমন এবং কিরূপ হতে যাচ্ছে। তিনি তার সৈনিকদেরকে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হতে দেননি, মিথ্যা আশ্বাস দেননি। তাদেরকে তিনি সমস্যা ও বিপদ সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন। তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাবে প্রত্যেক সৈন্য প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা উড়ে দামেস্কে পৌঁছে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে অবশ্য এ ব্যাপারে দ্বিমত পাওয়া যায় যে, সময়টা ১১৭৪ সালে কোন্ মাস ছিল। কারো মতে জুলাই মাস। কারো মতে নবেম্বর মাস। ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, সুলতান আইউবী সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি মিসরের নির্বাহী ক্ষমতা গোপনে দু'জন উপদেষ্টার হাতে সোপর্দ করে এসেছিলেন। সুদানের দিককার সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করে রেখে এসেছিলেন। উত্তরদিকের নৌবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়, সর্বক্ষণ দিনে-রাতে সমুদ্রে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত নৌযান টহল দিতে থাকবে এবং নৌসেনাদের নিয়ে নৌজাহাজ সারাক্ষণ প্রস্তুত হয়ে থাকবে। সুলতান আইউবী তাঁর স্থলাভিষিক্তদের বলে এসেছেন, কোনদিক

থেকে আক্রমণ আসলে আমার অপেক্ষা না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি এই নির্দেশও প্রদান করে যান যে, কোন সীমান্তে দুশমন সামান্য গড়বড় করলেও কঠোর জবাব দেবে। সর্বক্ষণ আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত থাকবে। প্রয়োজন হলে সুদানের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে মিশরের প্রতিরক্ষা অটুট রাখবে।

সুলতান আইউবী মিসরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে সাতশ' অশ্বারোহী নিয়ে চুপিসারে দামেস্ক অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছেন।

❁ ❁ ❁

দামেস্কের দুর্গের প্রধান ফটকে সান্ত্রীরা টহল দিয়ে ফিরছে। হঠাৎ তারা দূর-দিগন্তে ধূলিবালির মেঘ দেখতে পায়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মেঘগুলো দামেস্কের দিকে ধেয়ে আসছে। সান্ত্রীরা কিছু সময় সেদিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, ব্যবসায়ী ও মুসাফিরদের কাফেলা হবে বোধ হয়। কিন্তু তাতে তো এত ধূলি উড়তে পারে না। সম্ভবত এগুলো ঘোড়া। মেঘমালা অনেক নিকটে চলে আসে। এবার মেঘের ভেতরে আবছা আবছা ঘোড়া দেখা যায়। তারপর ঊর্ধ্বে উচিয়েধরা বর্শার ফলা নজরে আসতে শুরু করে। প্রতি বর্শার মাথায় পতাকা বাঁধা। নিঃসন্দেহে এরা সৈন্য হবে। কিন্তু খলীফার ফৌজ হতে পারে না। এক সান্ত্রী নাকারা বাজিয়ে দেয়। দুর্গের অন্যান্য ফটক থেকেও নাকারা বেজে উঠে। দুর্গে যেসব সৈন্য ছিল, তারা প্রস্তুত হয়ে যায়। তীরান্দাজরা ধনুকে তীর সংযোজন করে পাঁচিলের উপর উঠে যায়। দুর্গের কমান্ডারও উপরে উঠে আসে। ধূলি উড়াতে উড়াতে আরোহীরা দুর্গের নিকটে চলে আসে এবং আক্রমণের বিন্যাসে এসে থেমে যায়। দুর্গের কমান্ডার অশ্বারোহীদের কমান্ডারের ঝাণ্ডা দেখে চমকে উঠেন। এত সালাহুদ্দীন আইউবীর ঝাণ্ডা! দুর্গের কমান্ডারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বলে দেয়া হয়েছিল, সুলতান আইউবী স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তিনি যদি এদিকে আসেন, তাহলে যেন তিনি শহরে ঢুকতে না পারেন।

'আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন?' দুর্গের কমান্ডার জিজ্ঞাসা করে– 'খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সৈন্যদের পেছনে দূরে কোথাও নিয়ে রেখে আসুন এবং আপনি একা সম্মুখে অগ্রসর হোন।'

'খলীফাকে এখানে ডেকে নিয়ে আস'– সুলতান আইউবী উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'আর তুমি শুনে নাও, আমার সৈন্যরা পেছনে হটবে না– শহরে প্রবেশ করবে। খলীফাকে সংবাদ পাঠাও, সে যদি বাইরে না আসে, তাহলে অনেক মুসলমানের রক্ত ঝরবে এবং তার দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে।'

'নাজমুদ্দীন আইউবের পুত্র সালাহুদ্দীন!'– দুর্গের কমান্ডার বলল– 'আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমার একজন সৈন্যও জীবিত ফিরে যেতে পারবে না। আমি খলীফার হুকুমের পাবন্দ। তোমার জন্য নগরীর দ্বার খোলা হবে না।'

দুর্গের বাইরে প্রহরারত সৈন্যরা সংবাদ দেয়ার জন্য এক সিপাইকে খলীফার নিকট প্রেরণ করে। সুলতান আইউবীও তার সৈন্যদেরকে কি যেন নির্দেশ প্রদান করেন। সৈন্যরা বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত নড়েচড়ে ওঠে। তারা আরো বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ধনুক বের করে হাতে নেয়। তাতে তীর সংযোজন করে।

ওদিকে দামেস্কের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শহরের পাঁচিলে তীরান্দাজ সৈন্যরা প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। দুর্গের কমান্ডার সম্ভবত খলীফার নির্দেশ কিংবা ভেতর থেকে বাহিনী আসার অপেক্ষা করছে। কোন পদক্ষেপ নেয়নি সে। কিন্তু মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

খলীফা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। বাচ্চা মানুষ। একবার প্রচণ্ড ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেন। পরক্ষণেই আবার ঘাবড়ে যান। তার উপদেষ্টাগণ তাকে সাহস দেয় এবং তার থেকে এই নির্দেশ আদায় করে নেয় যে, ফৌজ বাইরে গিয়ে সুলতান আইউবীকে ঘিরে ফেলবে এবং অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করিয়ে তাকে গ্রেফতার করবে।

ইতিমধ্যে নগরবাসীও জেনে যায় যে, সুলতান আইউবী ফৌজ নিয়ে এসেছেন। নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তার প্রশিক্ষিত মহিলারাও তৎপর হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে সংবাদ পৌঁছে যায় যে, সুলতান আইউবী এসেছেন। মহিলারা ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে এবং স্লোগান তুলে, সালাহুদ্দীন আইউবী জিন্দাবাজ, সালাহুদ্দীন আইউবীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম। অনেকে আইউবীকে উপহার দেয়ার জন্য ফুল সংগ্রহ করে। পুরুষরাও রাস্তায় নেমে আসে, তাকবীর ধ্বনিতে দামেস্কের আকাশ মুখরিত হয়ে ওঠে।

খলীফার চাটুকারদের এ দৃশ্য পছন্দ হল না। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ছে নগরীর প্রধান ফটকের উপর। বানের মত ছুটে আসছে মানুষ। অনেকে পাঁচিলের উপর উঠে যায় আর স্লোগান দেয়, 'খোশ আমদেদ সালাহুদ্দীন আইউবী।'

দামেস্কের ফৌজ সুলতান আইউবীর মোকাবেলা করতে অস্বীকৃতি জানায়। সংবাদ চলে আসে খলীফার কানে। খলীফা ও আমীরগণ ভাবনায় পড়ে যান। আমীরদের অনুগত কমান্ডাররা নিজ নিজ বাহিনীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেয়। খলীফার বিরোধী কমান্ডাররা তাদেরকে সাবধান করে দেয় যে, সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে পরিণতি ভাল হবে না। ঘোড়ার পেছনে বেঁধে তোমাদেরকে শহরময় টেনে-হেঁচড়ে খুন করা হবে। তিন-চারজন কমান্ডার পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। এমন সময়ে জঙ্গীর স্ত্রী এসে উপস্থিত হন। মহিলা পাগলের ন্যায় দৌড়ে আসেন। আসেন ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়াটাও হাঁফাচ্ছে তার। তিনি দেখতে এসেছেন, ফৌজ কী

করছে। পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করছে না তো? তিনি দেখতে পান যে, তিন-চারজন কমান্ডার তরবারী উঁচিয়ে একে অপরকে শাসাচ্ছে। তাওফীক জাওয়াদও আছেন তাদের মধ্যে। জঙ্গীর স্ত্রীকে দেখেই তিনি তার দিকে এগিয়ে যান এবং বললেন, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন?'

'এখানে কী হচ্ছে?'– জঙ্গীর স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন– 'ফৌজ সালাহুদ্দীন আইউবীকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছে, নাকি মোকাবেলা করতে?'

'ফৌজ যাচ্ছে না'– তাওফীক জাওয়াদ জবাব দেন– 'আমরা খলীফার নির্দেশ অমান্য করেছি। আর এরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হতে চাচ্ছে: । এদের মধ্যে দু'জন আছে খলীফার অনুগত।'

জঙ্গীর স্ত্রী ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে যান এবং বিবদমান কমান্ডারদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে যান। তিনি নিজের মাথাটি উলঙ্গ করে চিৎকার দিয়ে বললেন, ওহে আত্মমর্যাদাহীন লোক সকল! তোমরা আগে এই মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কর, আপন মায়ের মস্তক মাটিতে ছুঁড়ে মার। তারপর কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধ কর। তোমরা ঐসব কন্যাদের কথা ভুলে গেছ, যাদেরকে কাফেররা তুলে নিয়ে গেছে। তোমরা ভুলে গেছ ঐসব শিশু কন্যাদের কথা, যারা কাফেরদের নির্মমতার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। বল, তোমরা কার সমর্থনে একে অন্যের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করেছ? আমার পুত্রের অনুগতরা কাফের। তোমরা আস, আগের আমার গর্দানটা উড়িয়ে দাও, তারপর আইউবীর মোকাবেলায় গমন কর।'

জঙ্গীর স্ত্রী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তার দু'চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসে। কমান্ডারগণ তরবারী কোষবদ্ধ করে মাথানত করে কেটে পড়ে।

'ফৌজ কি নির্দেশ অমান্য করল?' খলীফার এক উপদেষ্টার ভীতিপ্রদ কণ্ঠস্বর। এক ভীতিকর পরিবেশ বিরাজ করছে খলীফার দরবারে।

'রক্ষীদেরকে বাইরে বের করে নিয়ে যাও'– ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এক আমীর বলল– 'দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা কর।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই রক্ষী বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যায়। এতক্ষণে নগরবাসীদের ভীড় আরো বেড়ে গেছে। মহিলারা চিৎকার করে বলছে, 'ফটক খুলে দাও। আমাদের ইজ্জতের মোহাফেজ এসেছেন।' পুরুষরা উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দিচ্ছে। রক্ষী বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথ পাচ্ছে না।

খেলাফতের কাজী (প্রধান বিচারপতি) কামালুদ্দীন তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি খলীফার দরবারে ছুটে যান। তিনি খলীফাকে বললেন, আপনি যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর মোকাবেলায় ফৌজ প্রেরণ করেন, তাহলে দেশের

সাধারণ মানুষ তাদের মোকাবেলা করবে। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হবে। গৃহযুদ্ধ বাঁধবে। তার চেয়ে বেশী ক্ষতি এই হবে যে, আশপাশে অবস্থানরত খৃস্টান ফৌজ বিনা যুদ্ধে ভেতরে ঢুকে পড়বে, খৃস্টানরা দেশটা দখল করে নেবে। তারপর না থাকবে আপনার খেলাফত, না থাকবেন আপনি নিজে। দেশটা তছনছ হয়ে যাবে। শরীয়তের নির্দেশ হল, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করা যায় না। আপনি একটুখানি বাইরে এসে মানুষের উৎকণ্ঠা দেখুন। আপনি এই স্রোত কিভাবে প্রতিহত করবেন? ভাল হবে, নগরীর চাবি আমার হাতে দিয়ে দিন; আমি একটা সুন্দর সমাধান করে ফেলি।'

চাবি কাজী কামালুদ্দীনের হাতে তুলে দেয়া হল। তিনি নিজ হাতে নগরীর ফটক খুললেন। চাবিটা সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দেন। সুলতান আইউবী অবনত মস্তকে তার হাতে চুম্বন করেন এবং তারই সঙ্গে শহরে প্রবেশ করেন। নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী সুলতান আইউবীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হন। সুলতান আইউবী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী আবেগের অতিশয্যে সুলতান আইউবীকে জড়িয়ে ধরেন এবং শিশুর ন্যায় হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। মহিলারা সুলতান আইউবী ও তার সৈন্যদের উপর ফুল ছিটিয়ে দেয় এবং স্লোগান দিয়ে ভেতরে নিয়ে যায়।

দুর্গের চাবিও সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দেয়া হয়। তিনি সর্বপ্রথম নিজে বাড়িতে যান। আইউবী দামেস্কেরই সন্তান। একসময় তিনি এ বাড়িতে বাস করতেন। বড় আবেগের সাথে তিনি পুরাতন ঘরটিতে প্রবেশ করেন, যেখানে তার জন্ম হয়েছিল।

❁ ❁ ❁

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর সুলতান আইউবী ছোট-বড় কমান্ডারদেরকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান। তাদের সঙ্গে কথা বলে আন্দাজ করে নেন,তাদের উপর কতটুকু নির্ভর করা যায়। ফৌজের অবস্থা জিজ্ঞেস করেন এবং নির্দেশ জারি করেন।

এ সময়ে তিনি সংবাদ পান যে, খলীফা তার অনুগত আমীর ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন। ফৌজের উচ্চপদস্থ দু'তিনজন কর্মকর্তাও তাদের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

সুলতান আইউবী তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে যান এবং পালিয়ে যাওয়া লোকদের ঘরে ঘরে তল্লাশী অভিযান প্রেরণ করেন। এ গৃহগুলো মূলত বালাখানা। পলাতকরা শুধু আপন আপন জীবন নিয়েই পালিয়েছে– বিত্তবৈভব সবই পড়ে আছে। হেরেমের নারী, নর্তকী ও বিলাস সামগ্রী সবই পেছনে রয়ে গেছে।

সুলতান আইউবী সমস্ত মাল-দৌলত কব্জা করে নেন। তার একাংশ বাইতুলমালে জমা দেন, অবশিষ্টগুলো গরীব ও পঙ্গুদের মাঝে বন্টন করে

দেন। সুলতান আইউবী খলীফা ও ফেরার আমীর প্রমুখদের ধাওয়া করা প্রয়োজন মনে করলেন না। তিনি মিসর ও সিরিয়ার একীভূত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে দেন এবং আপন ভাই তকিউদ্দীনকে দামেস্কের গবর্নর নিযুক্ত করেন। অন্যান্য প্রদেশগুলোতেও নতুন গবর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি নিজে সালতানাতের সুরক্ষা ও ভিত শক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তার ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্টসমূহ তাকে জানান দিয়ে যাচ্ছে যে, তার আমীরগণ– যারা আল-মালকুস্ সালিহের অফাদার– তাকে শান্তিকে বসতে দেবে না। ইউরোপীয় রাজ্যসমূহ থেকে আসা তথ্যাদি থেকে জানা গেল, খৃস্টানরা সুবিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছে, যাদের নিয়ে ইসলামী বিশ্বের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানবে। সুলতান আইউবীর জন্য সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হল, তার আমীরগণ তাকে পরাস্ত করার জন্য খৃস্টানদের পথপানে চেয়ে আছে। তাই তার জন্য আবশ্যক হল, প্রথমে এই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করা। কাজটা অত সহজ নয়। দামেস্কের ফৌজের যোগ্যতা কেমন, তাও তিনি জানেন না। তাই কালবিলম্ব না করে তিনি এই ফৌজের প্রশিক্ষণ শুরু করে দেন। যে অঞ্চলে তাকে লড়তে হবে, জায়গাটা পর্বতময়। শীতের মওসুমে ঐসব পাহাড়ে বরফ জমে যায়। আর এখন শীতকাল।

সুলতান আইউবী কায়রো ও দামেস্কের মধ্যে একটি পার্থক্য লক্ষ্য করেন। কায়রোতে খৃস্টান ও সুদানী গোয়েন্দা ও দুর্বৃত্তদের একাধিক গোপন আখড়া আছে। সেসব এলাকার মানুষের উপর সুলতান আইউবীর পূর্ণ আস্থা নেই। পক্ষান্তরে দামেস্কেও খৃস্টান দুর্বৃত্ত আছে বটে; কিন্তু এখানকার সাধারণ নাগরিক, এমনকি অবুঝ শিশুরা পর্যন্ত তার সহযোগী বরং তারা তার আঙ্গুলের ইশারায় আগুনে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত। তাই এখানকার সাধারণ মানুষদের ব্যাপারে এই আশংকা কম যে, তারা দুশমনের গোয়েন্দা ও দুর্বৃত্তদের ক্রীড়নকে পরিণত হবে। দামেস্ক ও সিরিয়ার মানুষ নুরুদ্দীন জঙ্গীর আমলে মর্যাদাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই ব্যক্তি মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নতুন শাসকরা তাদেরকে প্রজায় পরিণত করেছে। আমীর-উজীরগণ ভোগ-বিলাসিতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ জনগণের জন্য আপদে রূপান্তরিত হয়েছে। আইনের শাসন ও মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বেশ্যালয় ও শরাবখানা চালু হয়ে গেছে। মাত্র চার-পাঁচ মাসেই মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বাজারে সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে এবং মানুষ অভাব ও দুর্ভিক্ষ অনুভব করতে শুরু করেছে।

এখানকার জনসাধারণ অভাব-অনটন বরদাশত করার জন্য প্রস্তুত বটে,

কিন্তু জাতীয় মর্যাদা বিলুপ্ত হতে দিতে প্রস্তুত নয়। তারা খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের পক্ষপাতি নয়। তারা অনুভব করতে শুরু করে যে, তাদের শাসকরা তাদেরকে দুশমনের হাতে তুলে দিচ্ছে। নুরুদ্দীন জঙ্গীর শাসনামলে ঝুপড়ি ও ছেঁড়া তাঁবুতে বসবাসকারী লোকেরাও সরকার কখন কী করছে জানতে পারত। যুদ্ধের সময় তারা যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারত। কিন্তু জঙ্গীর ওফাতের পর দেশের জনগণ এখন অস্পৃশ্য ঘোষিত হয়েছে। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামাবার অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাক, নিজের চরকায় তেল দাও। দু'টি মসজিদের ইমামকে শুধু এই জন্য চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে যে, তারা মুসল্লীদেরকে আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার ওয়াজ শোনাতেন। খলীফার মহল ও অন্যান্য সরকারী ভবনের নিকটে আসাও জনগণের জন্য দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যারা এক সময় নুরুদ্দীন জঙ্গীকেও পথরোধ করে দাঁড় করিয়ে কথা বলত এবং রণাঙ্গনের খবরাখবর নিত, এখন তারা সরকারের একজন সাধারণ কর্মকর্তাকে দেখলেও পেছনে সরে যায়।

মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। জিহাদের স্লোগান হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু স্লোগান হারিয়ে যেতে পারে, মানুষের জযবা এত তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হওয়ার নয়। মানুষ লুকিয়ে লুকিয়ে পরস্পর মিলিত হয়ে মতবিনিময় করতে শুরু করে যে, এমন অবস্থায় আমরা কী করতে পারি।

নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী মহিলাদের একটি দল গঠন করেছিলেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তারা জানতে পারে যে, সালাহুদ্দীন আইউবী এসেছেন এবং তিনি ফৌজ নিয়ে এসেছেন। তারা সুলতানকে স্বাগত জানানোর জন্য বেরিয়ে আসে। যখন তারা জানতে পারে যে, খলীফা সুলতান আইউবীকে সামরিক শক্তি প্রযোগ করে প্রতিহত করতে চাচ্ছেন, তখন তারা খলীফার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়ে যায়। খলীফার রক্ষীবাহিনী তাদের সঙ্গে অসদাচরণ করে। আর এই কারণেই খলীফা আল-মালিকুস্ সালিহ ও তার সহযোগিরা চোরের ন্যায় দলবলসহ পালাতে বাধ্য হয়েছিল। এখন মানুষ সুলতান আইউবীর নির্দেশে জীবন দিতে প্রস্তুত। জনগণের এই আবেগ-উচ্ছ্বাস সুলতান আইউবীর মিশনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।

✿ ✿ ✿

দামেস্কের মুসলিম নারীদের মধ্যে ঈমানী জযবা ও জাতীয় চেতনা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। এখন সেই জযবা জ্বলন্ত অঙ্গারের রূপ লাভ করেছে। যুবতী মেয়েদের একটি প্রতিনিধি দল সুলতান আইউবীর নিকট এসে নিবেদন জানায়, মহামান্য সুলতান! আপনি আমাদেরকে ফৌজের সঙ্গে রণাঙ্গনে প্রেরণ করুন

এবং আমরদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিন। আমরা আহত মুজাহিদদের সেবা-চিকিৎসা ছাড়া লড়াইও করতে চাই। সুলতান আইউবী তাদেরকে বললেন, যেদিন প্রয়োজন হবে, তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে আনব। আপাতত তোমাদের ময়দান হল ঘর। আমি তোমাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখতে চাই না। তোমরা যদি মা হয়ে থাক, তাহলে স্বামী-সন্তানদেরকে মুজাহিদরূপে গড়ে তোল। যদি বোন হও, ভাইদেরকে ইসলামের মোহাফেজ বানাও। ওয়াদা দিচ্ছি, আমি তোমাদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব। কিন্তু তোমরা একথা ভুল না যেন, তোমাদেরকে নিজ নিজ ঘর সামলাতে হবে।'

এরূপ আরো কিছু কথা বলতে বলতে সুলতান আইউবীর হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যায়। তিনি বললেন, আরো একটি ময়দান আছে, যেখানে তোমরা কাজ করতে পার। তোমরা হয়ত শুনেছ, খলীফার মহল এব আমীর-উজীর ও শাসকদের বাসভবন থেকে অনেকগুলো মেয়ে উদ্ধার হয়েছে। তাদের সংখ্যা দু– তিনশ'। আমি তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম। তারা এই শহরেই কিংবা শহরের আশপাশে কোথাও অবস্থান নিয়ে থাকবে। তারা কে কোথাকার বাসিন্দা আমার জানা নেই। এখনইবা কোথায় কোথায় ঘুরে ফিরছে, নিজেদের জীবন বরবাদ করছে, তাও আমি বলতে পারব না। এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। আমার সম্মুখে বিশাল বিশাল কাজের পাহাড় পড়ে আছে। এই কাজটা আমি তোমাদের উপর সোপর্দ করছি যে, তোমরা তাদেরকে খুঁজে বের কর। তাদের মধ্যে অনেকে এমনও থাকবে, যাদেরকে ক্রয় কিংবা অপহরণ করে আনা হয়েছিল। এখন তাদের ভবিষ্যৎ এই যে, তারা বেশ্যালয়ে ঢুকে পড়বে, সরাইখানায় মুসাফিরদের সেবা করবে এবং এভাবে লাঞ্ছিত হয়ে জীবনের অবসান ঘটাবে। তাদেরকে কেউ বিয়ে করবে না। তোমরা তাদেরকে খুঁজে বের কর এবং তাদের বিয়ের ব্যবস্থা কর।

মেয়েরা কালবিলম্ব না করে অভিযান শুরু করে দেয়। তারা নিজ নিজ ঘরের পুরুষদের থেকে সহযোগিতা নেয় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বেশক'টি মেয়েকে খুঁজে বের করে নিজেদের ঘরে রেখে তাদের চরিত্র শোধরানোর প্রশিক্ষণ শুরু করে দেয়।

হতভাগা মেয়েগুলোর মধ্যে একটি মেয়ের নাম সাহার। সাহারকে জোরপূর্বক নর্তকী বানানো হয়েছিল। তাকে এক আমীরের ঘর থেকে উদ্ধার করে মুক্ত করা হয়েছিল। মুক্তি পেয়ে মেয়েটি এক দরিদ্র পরিবারে আশ্রয় নেয়। উদ্ধারকারী মেয়েরা খোঁজ পেয়ে তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসে।

সাহার যখন দেখল, দামেস্কের মেয়েরা নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর ন্যায় কাজ করছে, তখন তার ঘুমন্ত মর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। জাগ্রত হয়ে উঠে তার

প্রতিশোধস্পৃহাও। সে মেয়েদেরকে জানায়, আমার সঙ্গের এক নর্তকী সরাইখানার মালিকের নিকট থাকে। সাহার সরাইখানার মালিককে চেনে। সে জানায়, এই লোকটি খৃস্টানদের গুপ্তচর। লোকটি একটি পাতাল কক্ষ তৈরি করে রেখেছে। সেখানে ফেদায়ী ও খৃস্টান গোয়েন্দারা রাত কাটায়। সেখানে নাচ হয়, মদের আসর বসে। আমাকেও এক রাত সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি সেই গোয়েন্দাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। আমি সরাইখানার মালিককে তাদের সঙ্গে নিজ হাতে হত্যা করতে চাই। একাকী করা সম্ভব নয়। তোমরা আমার সঙ্গ দাও।

মেয়েরা প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা একটি পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলে। সে মোতাবেক সাহার একদিন পর্দাবৃত হয়ে সরাইখানার মালিকের নিকট চলে যায়। সরাইখানার মালিক সাহারকে দেখে বেজায় আনন্দিত। সাহার বলে, 'আমি তখনই তোমাদের নিকট পৌঁছে যেতাম। কিন্তু শহরে ধরপাকড় চলছিল। আমি আশংকা করি, যদি আমি তোমাদের নিকট চলে আসি, তাহলে তোমরাও ধরা পড়ে যাবে। আমি এতিম মেয়ের পরিচয় দিয়ে একটি দরিদ্র পরিবারে লুকিয়ে থাকি। এখন পরিস্থিতি ভাল। তোমাদের প্রতি কারো কোন সন্দেহ নেই। তাই এবার তোমাদের নিকট চলে এলাম।'

সরাইখানার মালিক সাহারকে তার নর্তকীর নিকট নিয়ে যায়। নর্তকীও অত্যন্ত আনন্দিত হয়। এখানে সে কয়েক রাত অতিবাহিত করে। সাহার দেখতে পায় যে, খলীফা ও বিলাসী আমীরদের পতন এবং সুলতান আইউবীর ক্ষমতা দখল সত্ত্বেও সরাইখানার পাতাল কক্ষের জৌলুস আগেরই মতই অক্ষুণ্ন আছে। এতো উত্থান-পতনের পরও তাতে কোন ব্যাত্যয় ঘটেনি। মুসাফিররা নিজ নিজ কক্ষে ঘুমিয়ে পড়ার পর এই পাতাল কক্ষের জগত সক্রিয় হয়ে উঠে। এখানে এখনো খৃস্টান গুপ্তচর ও দুর্বৃত্তরা আছে। সাহার তাদের মনোরঞ্জন করতে থাকে। রাতে নাচে ও তাদেরকে মদপান করায়। এরা মুসাফিরের বেশে সরাইখানায় আসা-যাওয়া করে।

সাহার আরো দেখে নেয় যে, রাতে সরাইখানার বাইরে পাহারার ব্যবস্থা থাকে, যাতে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে সংবাদ যথাসময়ে পাতাল কক্ষে পৌঁছে যায়। সাহার একাকী বাইরে যেতে পারে না। মনের বিরুদ্ধে হলেও সে নাচতে-গাইতে থাকে। একরকম বন্দীই করে রাখা হয়েছে তাকে। মেয়েটি এই ভেবে নিরাশ হয়ে যায় যে, আসলাম প্রতিশোধ নিতে এখন কিনা হয়ে গেলাম বন্দী। কিন্তু এই নৈরাশ্য সে কাউকে বুঝতে দেয়নি। তাকে সবাই তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। অনেক গোপনীয় কথাও তার উপস্থিতিতে আলোচনা হচ্ছে এখন।

এক রাতে পাতাল কক্ষের আসরে এক খৃস্টান গোয়েন্দা সরাইখানার মালিককে

বলল, শুধু এই দু'টি মেয়েতে আমাদের একঘেঁয়েমী এসে গেছে। নতুন মেয়ে আন।

গোয়েন্দা যখন কথাটা বলে, তখন মেয়ে দু'টো সেখানেই উপস্থিত ছিল। তাতে অন্য নর্তকী ব্যথিত হলেও সাহারের চোখে আশার আলো জ্বলে ওঠে। সরাইখানার মালিক বলল,সালাহুদ্দীন আইউবী এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছেন যে, এখন দামেস্কে আর কোন নর্তকী বা নতুন কোন মেয়ে পাওয়া যাবে না।

'কেন পাওয়া যাবে না?' সাহার বলল– 'আমীর-উজীরদের ঘর থেকে যেসব নর্তকীদের উদ্ধার করে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, তারা এখনো এই শহরেই আছে। আমার মত তারাও লুকিয়ে আছে। আপনারা যদি আমাকে দু'-তিন দিনের জন্য বাইরে যেতে দেন, তাহলে পর্দানশীল নারীর বেশে আমি তাদেরকে এখানে নিয়ে আসতে পারব।'

সাহার অনুমতি পেয়ে যায়। সরাইখানার মালিক তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দেয়। সকাল হলে সাহার পর্দাবৃত হয়ে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে যায়।

❁ ❁ ❁

চার-পাঁচ দিন পর সরাইখানার চোরা দরজা দিয়ে আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা আটটি মেয়ে প্রবেশ করে এবং সোজা সরাইখানার মালিকের কক্ষে চলে যায়। মেয়েগুলোর মুখমণ্ডল নেকাবে ঢাকা। মালিকের কক্ষে প্রবেশ করে সবাই মুখের নেকাব সরিয়ে ফেলে। মালিক চোখ মেলে তাদের প্রতি তাকায়। সব ক'টি মেয়ে যুবতী এবং একটির চেয়ে অপরটি রূপসী। সাহার তাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। এরা কোন্ কোন্ আমীরের নিকট ছিল, সাহার তা মালিককে অবহিত করে। আরো জানায় যে, এদের নাচ দেখে, গান শুনে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। আরো বলল, আজ রাত আপনার সব বন্ধু-বান্ধবকে এখানে দাওয়াত করুন।

সরাইখানার মালিক পাগলের মত উঠে দৌড় দেয়। বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত দিতে ছুটে যায়। সাহার মেয়েগুলোকে পুরাতন নর্তকীর কাছে নিয়ে যায়। নর্তকী তাদেরকে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়, এদের একজনকেও সে চেনে না। নর্তকী একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিশেষ পরিভাষায় কথা বললে মেয়েটি খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়ে। সাহার বলল, 'নতুন জায়গা কিনা, মেয়েটি ভয় পেয়েছে। তাছাড়া আমি এদেরকে এক বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে এনেছি। রাতে এদের নৈপুণ্য দেখলে তখন তুমি বুঝতে এরা কারা, কোথা থেকে এসেছে।'

সাহারের কথায় নর্তকী আশ্বস্ত হল না। সন্দেহ হোক বা না হোক এই অনুশোচনা তার অবশ্যই আছে যে, এই মেয়েদের সামনে তার মূল্য শেষ হয়ে গেছে। সে সাহারকে নিজের কক্ষে ডেকে নিয়ে বলল, 'বোধ হয় তোমার

মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে! এই মেয়েগুলো টাটকা যুবতী। তাছাড়া অতিশয় রূপসী। এদের সামনে আমাদের আর মূল্য কি? এ-কী করলে তুমি? এদেরকে কোত্থেকে এনেছ? কেনইবা এনেছ? বড় ভুল করলে সাহার!'

'আসলে আমি আমাদের পরিশ্রম কমাতে চাচ্ছি'– সাহার বলল– 'ওদের আগমনের পর এখন আমাদের কাজ কমে যাবে।'

নর্তকী তার এই যুক্তি মানতে পারল না। সাহারের নিকট আর কোন যুক্তি নেই, যা দ্বারা সে নর্তকীকে আশ্বস্ত করবে। দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে যায়। নর্তকী ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'আমি সরাইখানার মালিককে বলব, এই মেয়েগুলো নর্তকী নয়– বেশ্যা। এদেরকে এই স্পর্শকাতর স্থানে নিয়ে আসা ঠিক হয়নি। এই পাতাল কক্ষের গোপন তথ্য বাইরে গেলে বিপদ অনিবার্য। এদেরকে কিসের ভিত্তিতে বিশ্বাস করব?'

এই নর্তকী অতিশয় অভিজ্ঞ ও চতুর। সে সাহারের মুখ বন্ধ করে দেয়। আবার সাহারও তার বক্তব্য মানতে প্রস্তুত নয়। অবশেষে নর্তকী হুমকি দিল, 'তুমি যদি এখনই ওদেরকে এখান থেকে না তাড়িয়েছ, তাহলে আমি মেহমানদেরকে এই বলে ফিরিয়ে দেব যে, তুমি এদের দ্বারা তাদেরকে গ্রেফতার করাবার ষড়যন্ত্র করছ।'

সাহার অস্থির হয়ে যায়। নর্তকী ক্ষোভের সাথে বের হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং দরজার দিকে হাঁটা দেয়। অমনি সাহার তার কামিজের নীচে হাত ঢুকিয়ে কটিবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করে নর্তকীর পিঠে এক ঘা বসিয়ে দেয়। আহত হয়ে মেয়েটি ঘুরে যায়। সাহার খঞ্জরের আরেকটি আঘাত করে নর্তকীর হৃদপিন্ডে। তারপর দাঁত কড়মড় করে বলে উঠে, 'তুমি আমাকে খুন করাতে চাচ্ছিলে। কিন্তু তোর মরণই যে হল আমার হাতে।'

সাহার নর্তকীর পরিধানের কাপড় দ্বারাই খঞ্জর পরিষ্কার করে। লাশটা তার খাটের উপর তুলে কম্বল দ্বারা ঢেকে রাখে। তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে নিজের কক্ষে চলে যায়। পরনের রক্তাক্ত পোশাক পরিবর্তন করে এবং খঞ্জরটা আবার কটিবন্ধে সেঁটে কামিজের নিচে লুকিয়ে রাখে।

✿ ✿ ✿

রাতে সরাইখানার মালিক ছাড়াও আরো সাতজন লোক এই পাতাল কক্ষে আসে। মালিক সাহারকে পুরাতন নর্তকীর কথা জিজ্ঞেস করে, ও কোথায়? সাহার নাক ছিটকে, ভ্রু কুচকে বলল, ও এই নতুন মেয়েদের দেখে জ্বলে-পুড়ে মরছে। নিজেকে সে এদের চেয়েও বেশী রূপসী মনে করে। আজ রাত সে এখানে না আসলেই ভাল হবে। আসর রং ধরবে।'

'লানত পড়ুক ওর উপর'– মালিক বলল– 'ওকে ওর কক্ষেই পড়ে থাকতে দাও।'

সাহার ছয় মেহমানকে উদ্দেশ করে বলল, এই মেয়েদের সঙ্গে ভাল পোশাক নেই; আপনারাই এদের উপযুক্ত পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে। এই রাতটা এখন ওরা যে পোশাকে আছে, সে পোশাকেই আপনাদের সামনে আসবে।

তারা যখন মেয়েদের দেখল, তখন ভুলেই গেল, ওরা কোন্ পোশাকে আছে। মেয়েগুলোকে পেশাদার নর্তকীর মত মনে হয় না। চেহারার রং তাদের একদম টাটকা এবং নিষ্পাপ বলে মনে হয়। তাদের মাথার চুলগুলোও পরিপাটি করা হয়নি। তাদের আচরণ প্রমাণ করে যে, তারা পেশাদার নর্তকী নয়। ভাবসাব তাদের সহজ-সরল। সাহার তাদেরকে উদ্দেশ করে বলল, এবার মেহমানদের মদ পরিবেশন কর। তারা সোরাহী থেকে পেয়ালায় মদ ঢালতে শুরু করে। এক মেহমান একটি মেয়েকে খানিকটা উত্যক্ত করে। মেয়েটি লাফ মেরে পেছনে সরে যায়। তার চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করে।

'সাহার!'– লোকটি বলল– 'এদেরকে কোথা থেকে এনেছ? এরা কার কাছে ছিল?'

সাহার অট্টহাসি হেসে বলল, 'বিদ্যা ভুলে গেছে। ঐ সালাহুদ্দীন আইউবীর ভয়। অল্প পরেই ঠিক হয়ে যাবে, ধৈর্য ধরুন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী!'– তাচ্ছিল্যের সাথে একজন বলল– 'এবার বেটা আমাদের জালে এসেছে। আমরা তাকে তারই আমীর-সালারদের হাতে খুন করাব।' লোকটি তার এক সঙ্গীর কাঁদে চাপড় মেরে বলল, 'এর খঞ্জর সালাহুদ্দীন আইউবীর খুনের পিয়াসী। চিন তো একে? এ হাসান বিন সাব্বাহর দলের লোক- ফেদায়ী।' লোকটি এক মেয়ের গালে আলতো আঘাত করে বলল, 'আইউবীর ভয় মন থেকে ঝেড়ে ফেল। ও তো দিন কয়েকের মেহমান মাত্র।'

কিছুক্ষণ পর। মদপান শুরু হল। নাচের ফরমায়েশ হল। মেয়েরা সোরাহী ও পেয়ালাগুলো এদিক-ওদিক সরিয়ে রাখার ভান করে ছয়জন লোকের পেছনে চলে যায়। অকস্মাৎ সবাই যার যার কামিজের তলে হাত ঢুকায়। প্রত্যেকে একটা করে খঞ্জর বের করে। একটি খঞ্জর বের করে নেয় সাহারও। প্রথমে সাহার সরাইখানার মালিকের উপর আঘাত হানে। অন্যরা ছয় পুরুষের উপর উপর্যুপরি আঘাত হানতে থাকে। সবাই ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। একজনও নিজেকে সামলানোর সুযোগ পেল না। সাহার এক এক করে প্রত্যেকের গায়ে আঘাত করতে থাকে, যেন মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে। মেয়েটা প্রতিশোধ নিয়ে নেয়।

এই মেয়েগুলো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সেইসব মেয়ে, যারা সুলতান আইউবীর নিকট নিবেদন পেশ করেছিল যে, আমাদেরকে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ দিন। তারাই সাহারকে একটি জীর্ণ গৃহ থেকে উদ্ধার করে এনেছিল। সাহার যখন মেয়েগুলোকে সমর বিষয়ক কাজ করতে দেখল, তখন তার সরাইখানার মালিকের কথা মনে পড়ে যায়। তাদেরকে অবহিত করে যে,

সরাইখানার পাতাল কক্ষটি খৃস্টান গোয়েন্দা ও দুর্বৃত্তদের আখড়া; তোমরা সহযোগিতা করলে আমি তাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারি। এই পরিকল্পনা দিয়ে সে ওখানে গেল। কিন্তু সরাইখানার মালিক তাকে আটকে ফেলল। এক পর্যায়ে গোয়েন্দারা ফরমায়েশ করল নতুন মেয়ে নিয়ে আস। সাহার সুযোগ পেয়ে যায়। সে নতুন মেয়ে নিয়ে আসার জন্য বের হওয়ার অনুমতি লাভ করে।

বেরিয়ে এসে সে মেয়েদেরকে বিষয়টা অবহিত করে এবং বলে, তোমরা নর্তকী সেজে চল এবং লোকগুলোকে হত্যা কর। মেয়েরা প্রস্তুত হয়ে যায়। পরিকল্পনা ঠিক করে সাহারের সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু তারা এই চিন্তা করল না যে, লোকগুলোকে ফাঁদে ফেলে গ্রেফতার করাতে পারলে অনেক লাভ হবে– তাদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করা যাবে। মেয়েরা আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। তারা এতটুকুই জানত যে, দুশমনকে খুন করাই বড় কাজ। তারা তাদের জিহাদী চেতনাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছিল। সাহারের বক্ষও প্রতিশোধ– স্পৃহায় ফেটে যাচ্ছিল। ওদেরকে সে নিজ হাতে হত্যা করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

সাহার পুরাতন নর্তকীকে এ জন্য খুন করে ফেলে, তার দ্বারা মেয়েদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। বস্তুত তাদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়ার উপক্রমও হয়েছিল। এ জাতীয় নোংরামীপূর্ণ আসরের রীতি-নীতি ও মদপান করানোর পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল না। ভাগ্য ভাল যে, তারা যথাসময়ে খঞ্জর বের করে ফেলে এবং উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়।

কাজ সমাধা করে তারা সবাই চোরাপথে পাতাল কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী কিছুক্ষণ পর সৈন্যরা সরাইখানায় হামলা দেয় এবং পাতাল কক্ষে চলে যায়। ওখানে পড়ে আছে সাতটি লাশ। কক্ষে কক্ষে তল্লাশি চালানো হয়। একটি কক্ষে সাহার-এর সঙ্গী নর্তকীর লাশ পাওয়া যায়। সরাইখানার মালিকের কক্ষে এমন কিছু দলিল পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রমাণিত হল, এরা গুপ্তচর এবং দুর্বৃত্তই ছিল।

কিন্তু অনাগত ভবিষ্যত সুলতান আইউবী ও সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদ নিয়ে আসছে। সুলতান আইউবী দিন-রাত যুদ্ধ পরিকল্পনা ও সেনা প্রশিক্ষণে মহা-ব্যস্ত।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে আটকিয়ে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

আবাবীল পাবলিকেশন্স

সিরিজ
নারীর ফাঁদ-৪
ঐতিহাসিক উপন্যাস
ঈমানদীপ্ত
দাস্তান
আলতামাস

নারীর ফাঁদ-৪

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

নারীর ফাঁদ-৪

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

আবাবীল পাবলিকেশন্স

নারীর ফাঁদ-৪
ঈমানদীপ্ত দাস্তান
আলতামাস

প্রকাশক
মাওলানা আবদুল করীম
চেয়ারম্যান, আবাবীল পাবলিকেশন্স
১৩/১, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০০৩
দ্বিতীয় প্রকাশ
অক্টোবর ২০০৪

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার, ঢাকা

মুদ্রণ
কালার সিটি

গ্রাফিক্স
কালার ক্রিয়েশন

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

IMANDIPTO DASTAN-4 : BY ALTAMAS. PUBLISHED BY MAULANA ABDUL KARIM, ABABIL PUBLICATIONS, 13/1, KARKONBARI LANE, DHAKA-1100. 2ND EDITION : OCTOBER 2004

PRICE : TAKA 100.00 ONLY

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে– বিশেষতঃ মিসর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। তারা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দুঃসাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিল, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হল সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

বইটির মূল লেখক পাকিস্তানের প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাস। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত মূল বইটির নাম 'দাস্তান ঈমান ফোরোশূ কী'। আল্লাহ্ তাআলার পরম অনুগ্রহে অন্তত ৭-৮ খণ্ডে সমাপ্য অনূদিত সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'-এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক মহলে বেশ সমাদর লাভ করেছে। এবার চতুর্থ খণ্ডটি পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম। একে একে অপর খণ্ডগুলোও যাতে আমরা যথাসময়ে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারি; আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করেন।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

বিনীত
মাওলানা আবদুল করীম
চেয়ারম্যান
আবাবীল পাবলিকেশন্স

সূচীপত্রঃ

*সর্পকেল্লার ঘাতক......................৭
*ক্রুশের ছায়াতলে......................৫৩
*ভয়াবহ ষড়যন্ত্র......................১০৭
*রক্ত চাই......................১৬৩
*ভয়ংকর ষড়যন্ত্র......................২০৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সর্পকেল্লার ঘাতক

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন দামেস্কে প্রবেশ করেন, তখন তার সঙ্গে ছিল সাতশ' অশ্বারোহী যোদ্ধা। সকল ঐতিহাসিক এ সংখ্যা-ই লিখেছেন। কিন্তু ইতিহাস সুলতান আইউবীর সেই জানবাজদের ব্যাপারে বে-খবর, যাদের কেউ বণিকের বেশে, কেউ সাধারণ পর্যটকরূপে এবং কেউ সিরীয় সাধারণ সৈনিকের পোশাকে– একজন, দু'জন, চারজন– এভাবে দলবদ্ধ হয়ে দামেস্কে প্রবেশ করেছিল। তাদের অধিকাংশই সুলতান আইউবীর নীরব হামলার আগেই এখানে এসে পৌঁছেছিল। আর কতিপয় প্রবেশ করেছিল তখন, যখন সুলতান আইউবীর জন্য দামেস্কের দ্বার খোলা হয়েছিল। এরা সবাই ছিল জানবাজ গোয়েন্দা। তারা সর্বপ্রকার লড়াই, সব ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার ও নাশকতামূলক কাজে পারঙ্গম ছিল। মানসিক দিক থেকে তারা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তাদের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তারা জীবনের পরোয়া করত না। তারা এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে ফেলত, যার কল্পনা করলে সাধারণ সৈনিকরা শিউরে ওঠত। এ কাজের জন্য এমন যুবকদের বেছে নেয়া হত, যাদের অন্তর দ্বীনি চেতনা ও দুশমনের ঘৃণায় পরিপূর্ণ থাকত। কাজকর্ম দেখলে এ জানবাজদের উন্মাদ মনে হত। সুলতান আইউবী এমন জানবাজদের কয়েকটি ইউনিট প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

সাতশ' অশ্বারোহী নিয়ে সুলতান আইউবী যখন দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হন, তার আগেই তিনি একদল জানবাজ গোয়েন্দাকে জরুরী নির্দেশনা প্রদান করে দামেস্কে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, দামেস্কের ফৌজ যদি মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে তোমরা নগরীতে নিজেদের বুঝ ও প্রয়োজন অনুপাতে নাশকতা পরিচালনা করবে এবং ভিতর থেকে নগরীর ফটক খুলে দেয়ার চেষ্টা করবে। তারা ছিল জনমনে ত্রাস সৃষ্টি ও গুজব ছড়ানোর কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এই জানবাজদের সংখ্যা ছিল দু' থেকে তিনশ'র মত। সে সময়কার ঐতিহাসিকগণ এদের সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা উল্লেখ করেননি। শুধু লিখেছেন যে, সুলতান আইউবীর আগমনের সময় দামেস্কে দু'-তিনশ' গোয়েন্দা ও নাশকতাকারী অবস্থান করছিল।

একজন ফরাসী ঐতিহাসিক ক্রুসেড যুদ্ধের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুলতান আইউবীর লড়াকু গোয়েন্দাদের সম্পর্কে অনেক কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সুলতান আইউবীর এই জানবাজদের ইসলামী চেতনাকে 'ধর্মীয় উন্মাদনা' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, এই গোয়েন্দাগুলো 'মানসিক রোগী' ছিল। তারা 'ধর্মীয় উন্মাদনা'কে 'মানসিক ব্যাধি' বলে নিন্দা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সেটি একটি মানসিক অবস্থাই ছিল বটে। একজন মুসলমান তখনই প্রকৃত ঈমানদার বলে পরিগণিত হয়, যখন ধর্ম তার মনন ও মানসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। সুলতান আইউবীর এই জানবাজদের গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন আলী বিন সুফিয়ান এবং তার দু'নায়েব হাসান বিন আব্দুল্লাহ ও জাহেদান। আর যুদ্ধের প্রশিক্ষণ পেয়েছিল অভিজ্ঞ সৈন্যদের হাতে।

সুলতান আইউবী দামেস্কে প্রবেশ করলেন। আলী বিন সুফিয়ানকে রেখে এসেছেন কায়রো। ওখানকার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভালো নয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছেন আলী। সুলতান আইউবীর অনুপস্থিতি, তাঁর দামেস্কের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ ও খেলাফতের পতন– সবমিলে অরাজকতার আশংকা বেড়ে গেছে কায়রোতে। এসব কারণেই সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে রেখে এসেছেন। দামেস্কে এসেছেন আলীর এক নায়েব হাসান বিন আব্দুল্লাহ। তিনিই লড়াকু জানবাজদের কমান্ডার।

সুলতান আইউবী দামেস্ক কব্জা করার পর সেখানকার অধিকাংশ ফৌজ সালার তাওফীক জাওয়াদের নেতৃত্বে সুলতানের সঙ্গে যোগ দেয়। অবশিষ্ট ফৌজ, খলীফার দেহরক্ষী বাহিনী, খলীফা ও তার অনুচর আমীরগণ দামেস্ক ছেড়ে পালিয়ে যায়। ধারণা ছিল, গ্রেফতার করার জন্য সুলতান তাদের পেছনে ফৌজ প্রেরণ করবেন।

কিন্তু না, তিনি এমন কিছু করলেন না। দু'-তিনজন সালার সুলতানকে এমনও বলেছিলেন যে, এই আমীর-ওমরাদের গ্রেফতার করা আবশ্যক। অন্যথায় তারা কোথাও গিয়ে সংগঠিত হবে এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

'আর আমি এ-ও জানি যে, তারা খৃস্টানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং পেয়েও যাবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কিন্তু আমি অন্ধকারে পথ চলি না। আমাকে প্রথমে জানতে হবে, তারা কোথায় যাচ্ছে এবং কোথায় জড়ো হচ্ছে। আপনারা অস্থির হবেন না। আমার চোখ-কান পলায়নকারীদের

সঙ্গে লেগে আছে। তারা এত তাড়াতাড়ি হামলা করার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে না। আমি দেখছি, খৃস্টানরা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা মিশরে আক্রমণ চালাতে পারে। পারে সিরিয়ায় হামলা করতে। তারা সম্ভবত আমি কি করি, দেখার অপেক্ষায় আছে। তারা হয়ত আমার পদক্ষেপের উপর ভিত্তি করে নিজেরা পদক্ষেপ নিতে চাইছে। আপনারা আমার নির্দেশনা মোতাবেক সেনা প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ মহড়া অব্যাহত রাখুন।'

সুলতান আইউবী যাদেরকে নিজের 'চোখ-কান' বলে অভিহিত করেছিলেন, তারা হল মিশর থেকে আগত একদল গোয়েন্দা। খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমীর-উজীরগণ যখন দামেস্ক ত্যাগ করে পালিয়ে যায়, তখন সুলতান আইউবীর এই গোয়েন্দারাও তাদের সঙ্গ নেয়। পলায়নকারীদের সংখ্যা কম ছিল না। দেশের সকল আমীর-উজীর এবং বেশ ক'জন জাগীরদার-মোসাহিবও ছিল তাদের সঙ্গে। ছিল কতিপয় সেনা সদস্য এবং চাটুকার। তারা পালিয়ে গেছে বিক্ষিপ্তভাবে। সুলতান আইউবীর গোয়েন্দাদের তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়া কঠিন ছিল না। পদচ্যুত খলীফা আল মালিকুস সালিহ ও তার আমীরগণ কোথায় যায়, কি করে, পাল্টা আক্রমণ করে কিনা এবং খৃস্টানদের থেকে তারা কী পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে– এসব ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা-ই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এই গুপ্তচররা হল হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর নির্বাচিত লোক। তারা উদ্ভূত পরিস্থিতির রাজনৈতিক মূল্যায়নও বেশ ভাল করেই বুঝত।

তাদের একজন হল মাজেদ ইবনে মুহাম্মদ হেজাজী। সুদর্শন যুবক, সুঠাম দেহ; সর্বোপরি আল্লাহ তাকে দান করেছেন জাদুকরী মধুর ভাষা। সুলতান আইউবীর সব গোয়েন্দাই সুশ্রী, সুঠাম, স্বাস্থ্যবান ও স্বচ্চরিত্রের অধিকারী। তাদের না আছে নেশার অভ্যাস, না তারা বিলাসী। তাদের চরিত্র আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ। মাজেদ হেজাজী তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতায় তার চেহারায় নূর চমকায়। সে-ও দামেস্ক ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আরবের উন্নত জাতের একটি ঘোড়া তার বাহন। সঙ্গে আছে তরবারী আর ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা চকচকে ফলাবিশিষ্ট বর্শা।

বিজন মরুভূমিতে একাকী পথ চলছে মাজেদ। তার একজন সঙ্গীর প্রয়োজন– এমন সঙ্গী, যার দ্বারা তার এই মিশন উপকৃত হবে। মাজেদ দেখতে পায়, বেশকিছু লোক হাল্‌ব অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গী

হিসেবে তাদের একজনও তার পছন্দ হল না। কারণ, সফরসঙ্গী হিসেবে তার প্রয়োজন পদস্থ কোন সেনা অফিসার কিংবা এমন একজন লোক, যার আল-মালিকুস সালিহ সম্পর্কে জানাশোনা আছে।

পালিয়ে আসা খলীফাকে খুঁজে ফিরছে মাজেদের অনুসন্ধানী চোখ। কয়েকজন লোককে সে জিজ্ঞেসও করেছে যে, আল-মালিকুস সালিহ কোন্‌দিক গেছেন। কিন্তু কেউ কোন তথ্য দিতে পারেনি। তার জানা ছিল, আল-মালিকুস সালিহ সুলতান জঙ্গীর সমবয়স্ক ব্যক্তি নন, বরং তিনি এগার বছর বয়সের বালক মাত্র, যাকে স্বার্থপূজারী আমীরগণ তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সালতানাতের মসনদে বসিয়েছিল। শাসনক্ষমতা মূলত ছিল তাদেরই হাতে। মাজেদ হেজাজীর আন্দাজ করা কঠিন ছিল না যে, এই কিশোর খলীফা একাকী যাচ্ছেন না। তার সঙ্গে আছে তার আমীর-উজীর ও দরবারীদের বিরাট বহর। বহরে থাকছে সোনা-দানা ও মূল্যবান সম্পদ বোঝাই অসংখ্য উট।

মাজেদ হেজাজী ভেবে রেখেছে– এই কাফেলাটি পাওয়া গেলে কি করতে হবে এবং তাদের মনের কথা কিভাবে বের করা যাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত শিকারের সন্ধান পেল না মাজেদ। সামনে পার্বত্য এলাকা। আশাপাশে সবুজের সমারোহ। পর্বতমালার গভীর প্রবেশ করে মাজেদ।

মাজেদ একস্থানে দু'টি ঘোড়া দেখতে পায়। সেখান থেকে খানিক দূরে সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে আছে একজন পুরুষ। সঙ্গে একজন মহিলা। মহিলাও শায়িত। মাজেদ থেমে যায়। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটি গাছের নীচে বসে পড়ে। তার বিশ্রামের প্রয়োজন।

হঠাৎ হ্রেষারব তুলে একটি ঘোড়া। ঘোড়ার শব্দ শুনে শোয়া থেকে ওঠে বসে লোকটি। মাজেদ ভালভাবে দেখতে পায় তাকে। পোশাক-আশাকে প্রমাণ মেলে লোকটা উঁচু শ্রেণীর। মাজেদ হেজাজীর প্রতি চোখ পড়ে তার। ইশারায় তাকে নিজের কাছে ডাকে।

মাজেদ তার নিকটে চলে যায়। তার সঙ্গে হাত মিলায়। মহিলাও উঠে বসে। মহিলা নয়– এক রূপসী যুবতী। যুবতীর গলার হার প্রমাণ করছে, মেয়েটি কোন সাধারণ ঘরের সন্তান নয়। লোকটির বয়স চল্লিশের মতো মনে হল। আর যুবতীর বয়স পঁচিশেরও কম। মাজেদ হেজাজী এক দৃষ্টিতেই আন্দাজ করে নেয় দু'জনকে।

'তুমি কে?'– লোকটি মাজেদ হেজাজীকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কি দামেস্ক থেকে এসেছ?'

'আমি দামেস্ক থেকেই এসেছি'– মাজেদ জবাব দেয়– 'কিন্তু আমি কে, সে কথা আপনাকে বলতে পারব না। আপনাদের পরিচয় বলুন?'

'বোধ হয় আমরা একই পথের পথিক'– লোকটি মুচকি হেসে বলল– 'তুমি সম্ভ্রান্ত লোক বলে মনে হচ্ছে।'

'আমি সম্ভ্রান্ত না বদমাশ, তা কি আপনি নিশ্চিত হতে চান?'– দু'ঠোঁটের মাঝে মুচকি হাসির রেখা টেনে মাজেদ বলল– 'যার সঙ্গে এমন একটি রূপসী যুবতী আছে আর যুবতীর গলায় এত মহামূল্যবান হার আছে এবং সঙ্গে আরো মূল্যবান সম্পদ আছে, সে যে একজন পথচারীকে বদমাশ আর দস্যু মনে করবে, তা বিচিত্র কিছু নয়। আমি দস্যু নই। তবে নিজের জীবন বিলিয়ে হলেও আপনাদেরকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। দামেস্ক থেকে পালিয়ে আসা কিছু লোক পথে দস্যুর কবলে পড়েছিল। আমি পথে তাদের দু'টি লাশও দেখে এসেছি। পরিস্থিতিটা দস্যু-তস্করদের জন্য খুবই অনুকূল যে, মানুষ ধন-দৌলত নিয়ে দামেস্ক থেকে পালিয়ে যাচ্ছে আর ওরা ধরে ধরে লুট করছে।'

সহসা মেয়েটির লাবণ্যময় চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। সঙ্গী পুরুষটির গা ঘেঁষে জড়সড় হয়ে বসে। লোকটির মুখমণ্ডলেও ভীতির ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এবার মাজেদ হেজাজী বুঝে গেছে, এরা কারা এবং কী এদের মিশন। মাজেদ তাদের মনে ভীতি সৃষ্টি করে নিজের জাদুকরী ভাষার কারিশমা দেখাতে শুরু করে। কথা প্রসঙ্গে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সমালোচনা করে এবং এমনভাবে খলীফা আল-মালিকুস সালিহ'র প্রশংসা করে, যেন তিনিই জগতের একমাত্র মহান ব্যক্তিত্ব। মাজেদ তাদেরকে আরো প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বলল– 'সালাহুদ্দীন আইউবী দামেস্ক থেকে পলায়নরত আপনার ন্যায় লোকদের সম্পদ লুণ্ঠন এবং তাদের সুন্দরী মেয়েদের ছিনিয়ে নেয়ার জন্য এদিকে তার ফৌজ লেলিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, এই মেয়েটি আপনার কী হয়?'

'আমার স্ত্রী।' লোকটি জবাব দেয়।

'আর দামেস্কে ক'টি রেখে এসেছেন?' মাজেদ জিজ্ঞেস করে।

'চারটি।' লোকটি জবাব দেয়।

'আল্লাহ করুন, এই পঞ্চমজন আপনার সঙ্গে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।' মাজেদ বলল।

'আচ্ছা, আইউবীর ফৌজ এখান থেকে কত দূরে?'– লোকটি জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কি সৈন্যদেরকে লুট করতে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি'– মাজেদ জবাব দেয়– 'যদি বলি, আমিও সালাহুদ্দীন আইউবীর একজন সৈনিক, তাহলে আপনি কী করবেন?'

লোকটি কাঁপতে শুরু করে। আবার পরক্ষণেই হাসতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার কম্পিত ঠোঁটের ব্যর্থ হাসির রেখা মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। বলে– 'আমি তোমাকে কিছু দিয়ে দেব। তোমার প্রতি আমার নিবেদন, তুমি আমাকে ভিখারীতে পরিণত কর না। আরো আবেদন করব, এই মেয়েটাকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিও না।'

মাজেদ হেজাজী খিল খিল করে হেসে ফেলে। হাসি বন্ধ করে বলে– 'ধন আর নারীর মোহ মানুষকে ভীরু ও দুর্বল করে তোলে। কেউ যদি মাথার উপর তরবারী উঁচিয়ে বলে, সঙ্গে যা আছে দিয়ে দাও; তাহলে আমি নিজের তরবারীটা কোষমুক্ত করে বলব, আগে আমাকে খুন কর, তারপর আমার সঙ্গে যা পাও নিয়ে যাও। জনাব! বলে ফেলুন, আপনি কে? দামেস্কে আপনি কী ছিলেন? আর এখন যাচ্ছেন কোথায়? সত্য বললে হয়ত আমিই হব আপনার একনিষ্ঠ মোহাফেজ। আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের আর আমার গন্তব্য এক। আমি আইউবীর ফৌজের সেনা বটে, তবে দলত্যাগী।'

চরমভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে লোকটি। সে অকপটে নিজের আসল পরিচয় ও ইতিবৃত্ত ব্যক্ত করে মাজেদ হেজাজীর নিকট। লোকটি দামেস্কের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জাগীরদার। রাজ দরবারে তার অনেক মর্যাদা ছিল। সালতানাতের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক বিষয়ে বেশ দখল ছিল। খলীফার দেহরক্ষী বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিকই ছিল তার দেয়া। এক কথায় বলা চলে, এই লোকটি সরকারের উচ্চপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা ছিল। সুলতান আইউবীর দামেস্ক অনুপ্রবেশের পর যখন পলায়নের প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তার ঘর থেকে বের হতে একটু বিলম্ব হয়ে যায়। আল-মালিকুস সালিহ তার অনুচরদের বলে দিয়েছিলেন, আমি হাল্‌ব পৌঁছে যাব, তোমরাও সেখানে চলে এস। সে মতে এই জাগীরদারও হাল্‌ব-এর দিকেই যাচ্ছে। লোকটি এও বলে দেয় যে, আমার সঙ্গে প্রচুর সোনা-রূপা ও মণি-মাণিক্য আছে। স্ত্রী চারজনকে দামেস্কে ফেলে এসেছে। এটি সকলের ছোট ও রূপসী বলে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। লোকটি অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে জানায়, তার রক্ষীবাহিনী ও সকল চাকর-বাকর দামেস্কেই তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। তারা তার সব লুট করে নিয়ে গেছে।

লোকটির কাহিনী শুনে মাজেদ হেজাজী বেশ আনন্দিত হয়। তার বড় কাজের লোক এই জাগীরদার। অন্তত হাল্‌বের দরবার পর্যন্ত পৌঁছা যাবে এর সঙ্গে।

মাজেদ হেজাজী তাকে নিজের পরিচয় প্রদান করে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মিশর থেকে যে ফৌজ দামেস্কে নিয়ে এসেছেন, আমি তার একটি ব্যাটলিয়নের কমান্ডার। কিন্তু আমি আল-মালিকুস সালিহ'র অনুরক্ত। এ জন্য দলত্যাগ করে আইউবীর ফৌজ থেকে পালিয়ে এসেছি এবং খলীফার দরবারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পথ চলছি। খলীফা যদি আমাকে পছন্দ করেন, তাহলে তার রক্ষী বাহিনীতে যোগ দেব।

'আমি যদি এখনই তোমাকে আমার রক্ষী বানিয়ে নেই, তাহলে তোমাকে কত বেতন দিতে হবে?' লোকটি মাজেদ হেজাজীকে জিজ্ঞেস করে– 'আমি দামেস্কে যেমন রাজা ছিলাম, ওখানেও তা-ই থাকব। আমার রক্ষী হলে তোমার ভাগ্য বদলে যাবে।'

'আপনি যদি আমাকে আপনার মোহাফেজ নিয়োগ করেন, তাহলে আপনার আর সামরিক উপদেষ্টার প্রয়োজন হবে না।'– মাজেদ হেজাজী বলল– 'আর যোগ্যতা দেখে পারিশ্রমিক আপনিই ঠিক করে নেবেন। আমি এখনই কিছু বলব না।'

মাজেদ হেজাজী লোকটির বডিগার্ড হয়ে যায়। কথাটা এভাবেও বলা যায় যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একজন গুপ্তচর একজন দরবারী জাগীরদারের ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হয়ে যায়।

সময়টা সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত। অল্প পরেই সূর্য অস্তমিত হয়ে আঁধার নেমে আসবে। আজকের মতো আর সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় নেই। মাজেদ হেজাজীর পরামর্শে তারা ওখানে রাত কাটানোর আয়োজন করে। রাত পোহাবার পর জাগীরদার এখন নিশ্চিত– মাজেদ বিশ্বস্ত, তারই একজন।

❁ ❁ ❁

দীর্ঘ সফরের পর তারা হাল্‌ব গিয়ে পৌঁছে। সে সময়ে হাল্‌ব-এর আমীর ছিলেন শামসুদ্দীন, যিনি অল্প ক'দিন আগে খৃস্টানদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। আল-মালিকুস সালিহ্ দামেস্ক থেকে পালিয়ে তার নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার সকল আমীর ও উজীর তার সঙ্গে। দেহরক্ষী বাহিনীও তথায় পৌঁছে গেছে।

আল-মালিকুস সালিহ হাল্‌ব-এর শাসনক্ষমতা হাতে তুলে নেন। সেনা বাহিনীকেও নতুনভাবে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তার কাছে সোনাদানা ও সম্পদের অভাব ছিল না। অভাব ছিল ফৌজ, কমান্ডার ও উপদেষ্টার। তিনি এবং তার অনুচরদের ভাবনা, কিভাবে সুলতান আইউবীকে

পরাজিত করে 'খেলাফত' বহাল করা যায়। তাদের ভাবনা ও অস্থিরতা প্রমাণ করে, তাদের দুশমন খৃষ্টানরা নয়– সুলতান আইউবী। তারা এদিক-ওদিকের আমীরদের নিকট খলীফার সীল-স্বাক্ষরযুক্ত বার্তা প্রেরণ করে যে, সালতানাতের প্রতিরক্ষার জন্য তোমরা খলীফাকে সামরিক সাহায্য প্রদান কর। তাদের কারো নিকট থেকে আশাব্যঞ্জক জবাব পাওয়া গেল, কারো নিকট থেকে পাওয়া গেল মৌখিক প্রতিশ্রুতি।

এই জাগীরদার হাল্‌ব পৌঁছলে খলীফা তাকে স্বাগত জানান। ইনি ছিলেন খলীফার সামরিক উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য। বসবাসের জন্য হাল্‌বে তাকে একটি ভবন প্রদান করা হল। এখানে এসেই তিনি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, ঘর থেকে সকালে বের হচ্ছেন তো ফিরছেন মধ্যরাতে।

তার এই অনুপস্থিতির সুযোগে তার স্ত্রী ঝুঁকে পড়তে শুরু করে মাজেদ হেজাজীর প্রতি। সুযোগটাকে লুফে নেয় মাজেদ। সে আত্মমর্যাদা ও চারিত্রিক পবিত্রতা বজায় রেখে মেয়েটাকে ঘনিষ্ঠ করে নেয়। মেয়েটা মাজেদ হেজাজীর প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যে, মাজেদ হেজাজী যে তার স্বামীর একজন দেহরক্ষী, সে তা ভুলেই গেছে। এই ফাঁকে মাজেদ অগ্রসর হচ্ছে তার মিশন নিয়ে। সে দু'-তিন দিনের মধ্যেই মেয়েটাকে পুরোপুরি মুঠোয় নিয়ে আসে। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার স্বামীর অন্য চার স্ত্রী কেমন ছিল?'

মেয়েটি বলল, 'খারাপ তেমন ছিল না। পুরাতন বিধায় তিনি তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে ফেলে আমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন।'

'আর একদিন তোমাকেও ফেলে অন্য কাউকে নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবে। এই আমীরদের কাজই এই।' মাজেদ বলল।

'আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে আমার মনের কথা বলি, তা আমার স্বামীকে বলে দেবে না তো? আমার সঙ্গে তুমি প্রতারণা করবে না তো!' মেয়েটি বলল।

'দেখ, আমার চরিত্রে যদি ধোঁকা-প্রতারণা বলে কিছু থাকত, তাহলে ঐ যেখানে তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তোমার স্বামীকে খুন করে সেখানেই আমি তোমাকে ও তোমাদের ধন-দৌলত ছিনিয়ে নিতাম।' মাদেজ বলল। আরো বললো, 'আমি পুরুষ, একজন নারীর সঙ্গে প্রতারণা করা পুরুষের মর্যাদার খেলাফ।'

'হৃদয়ের গোপন কথাটা আর চেপে রাখতে পারছি না আমি'– মেয়েটি বলল– 'আমি তোমাকে ভালবাসি মাজেদ! আর আজ এ কথাটাও আমি গোপন রাখছি না যে, আমি আমার স্বামীকে ঘৃণা করি। আমি কারো স্ত্রী নই। আমি

বিক্রি হওয়া মেয়ে। আমি বহুবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সম্ভবত আমি ভীরু। আত্মহত্যা করার সাহসটুকুও আমার নেই। আমার ইচ্ছে ছিল এক, করছি আরেক। এবার তুমি আমার ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করে দিয়েছ যে, আত্মহত্যা আমাকে করতেই হবে।'

'তার মানে আমাকে ভালবাস বলে তুমি আত্মহত্যা করতে চাচ্ছ?'

'না'- মেয়েটি বলল- 'আমার বিশ্বাস ছিল, সালাহুদ্দীন আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গী অপেক্ষা যোগ্য ও মহৎ মানুষ। কিন্তু তুমি আমার সেই বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছ। আচ্ছা, সালাহুদ্দীন আইউবী কি এতই খারাপ, যেমনটা তুমি বলেছিলে?'

মাজেদ হেজাজীর ভাবান্তর ঘটে যায়। বুঝতে পারে আঘাতটা ওর কোথায় লেগেছে। বলল- 'তুমি তোমার মনের গোপন কথা আমাকে বলে দিয়েছ- তার বিনিময়ে আমিও আমার একটি গোপন কথা তোমাকে বলছি। আমি তোমার থেকে কোন ওয়াদা নেব না যে, আমার এই গোপন কথা তুমি কাউকে বলতে পারবে না। শুধু এতটুকু বলে রাখব, আমার ভেদ যদি ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে তুমিও বাঁচবে না, তোমার স্বামীও নয়। শোন, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর একজন গুপ্তচর। আমি দু'-চার দিনেই তোমার আসল পরিচয় টের পেয়ে গেছি। শোন, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে যতটা পবিত্র ভেবেছিলে, তিনি তার চেয়েও বেশী পবিত্র, বেশী মহৎ। তিনি সেইসব আমীর ও রাজা-বাদশাহদের দুশমন, যারা নারীদেরকে হেরেমে আবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি নারীদেরকে বিনোদন ও ভোগের সামগ্রী মনে করেন না। তিনি নারীর মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা এবং পুরষদের জন্য বহু বিবাহ-বিলাসিতা পছন্দ করেন না। নারীদেরকেও তিনি সমরবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে চান। আমি তোমার স্বামীর আস্থা অর্জনের জন্য মিথ্যা বলেছিলাম যে, আইউবী দামেস্ক থেকে পলায়নকারী লোকদের লুণ্ঠন ও তাদের মেয়েদের তুলে নেয়ার জন্য বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছেন। তিনি ইসলামের পতাকাবাহী। আমি ইসলামের বিজয় ও সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য এখানে একটি মিশন নিয়ে এসেছি।'

সহসা মেয়েটির চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। দু'হাতে মাজেদ হেজাজীর একটা হাত চেপে ধরে টেনে মুখের কাছে নিয়ে চুমো খেয়ে বলল, 'তোমার এই ভেদ কখনো ফাঁস হবে না। আমাকে বল, এখানে তুমি কেন এসেছ এবং আমি তোমার জন্য কী করতে পারি? বল, সালাহুদ্দীন আইউবী আসলে কেমন মানুষ। নুরুদ্দীন জঙ্গীর জীবদ্দশায় আমরা একটি মহিলা সংগঠন করেছিলাম।

আমরা খৃস্টানদের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলাম। জঙ্গীর স্ত্রী আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু আমি এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হয়ে কাজ করি, আমার পিতা তা পছন্দ করতেন না। তিনি একজন মোহান্ধ ও চাটুকার মানুষ। তার নিকট ক্রুশ ও চাঁদ-তারার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যে তার হাতে ক'টি টাকা গুঁজে দেয়, তিনি তারই গোলাম হয়ে যান। তিনিই এই লোকটির কাছে আমাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। এই সওদাকে মানুষ বিবাহ বলে। তুমি তো জান, একজন মুসলিম নারী সুযোগ পেলে যুদ্ধের ময়দানে পুরুষদেরকেও তাক লাগিয়ে দিতে পারে। পারে দুশমনের হাঁটু ভেঙ্গে দিতে। কিন্তু সে নারীকেই যখন হেরেমে বন্দী করে ফেলা হয়, তখন সে পিপিলিকায় পরিণত হয়ে যায়। আমার দশাটা তা-ই হয়েছে। আমার স্বামী যদি সাধারণ মানুষ হতেন, তাহলে আমি অবশ্যই বিদ্রোহ করতাম, তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তার শক্তি আছে, আছে সম্পদ। খলীফা আল-মালিকুস সালিহ'র রক্ষী বাহিনীর অর্ধেকই তার লোক।'

'তার আরো চারটি বউ আছে। কিন্তু তাদের অপেক্ষা আমার বয়স কম ও রূপসী বিধায় তিনি আমাকে তার খেলনা বানিয়ে রেখেছেন। আমার আত্মা মরে গেছে। বেঁচে আছে শুধু দেহটা। বাইরের জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি বন্দী হয়ে যে জগতে পড়ে ছিলাম, সেখানে মদ আর নাচগান ছাড়া কিছুই ছিল না। হ্যাঁ, ছিল আরো একটি বিষয়। তাহল, নুরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহুদ্দীন আইউবীর হত্যার পরিকল্পনা।'

বলতে বলতে মেয়েটি থেমে যায়। আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে তার। বার কয়েক ঢোক গিলে দু'হাতে মাজেদ হেজাজীর বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'শুনছ কি ভাই আমার কথা? তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর না আমার স্বামীর, সেই পরিচয় বাদ দিয়েই আমি তোমাকে আমার মনের কথাগুলো বলে দিচ্ছি। আমি জানি, জানতে পারলে আমার স্বামী আমাকে শাস্তি দেবেন– নির্মম শাস্তি। কিন্তু আমি যে কোন শাস্তি ভোগ করতে প্রস্তুত আছি। আমার এখন দেহ ছাড়া আর কিছুই নেই। দেহটাও পাথর হয়ে গেছে। আমার আত্মা মরে গেছে।

'না, তোমার আত্মা জীবিত আছে'– মাজেদ হেজাজী বলল– 'আমার চোখ হৃদয়ের গভীরে দেখতে পায়। আমি দেখেছি, তোমার আত্মা বেঁচে আছে। অন্যথায় কখনো আমি তোমার সম্মুখে আমার ভেদ প্রকাশ করতাম না। আমি রূপ-যৌবনের কাছে পরাজিত হওয়ার মত মানুষ নই। আমি পুরুষ। নিজের

জীবনটা ইসলামের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। তুমি বলে যাও, হৃদয়ের বোঝা হাল্কা করতে থাক। আমি শুনছি। তোমার কাহিনী আমার কাছে নতুন কিছু নয়। এটা প্রতিটি মুসলিম নারীর কাহিনী। যেদিন প্রথম একজন মুসলমান হেরেম নামক ভোগ্যালয়ে রূপসী মেয়েদের বন্দী করেছিল, সেদিন থেকে ইসলামের পতন শুরু হয়েছিল। খৃস্টানদের পরিকল্পনা, তারা আমাদেরকে নারীর হাতে খুন করাবে। তারাই তাদের মেয়েদের দ্বারা আমাদের রাজা-বাদশাদের হেরেম ভরে রেখেছে।'

'আমার স্বামীর ঘরেও এই একই ঘটনা ঘটেছে'– মেয়েটি বলল– ' আমি খৃস্টান মেয়েদের আমার স্বামীর ঘরে আসতে এবং মদপান করতে দেখেছি। চোখের পানি ফেলা ছাড়া আমার তখন কিছুই করার ছিল না। আমি এ জন্যে কাঁদতাম না যে ওরা আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। আমার কান্নার কারণ ছিল, ওরা আমার থেকে সেই ইসলামকে ছিনিয়ে নিচ্ছে, যার জন্য তোমার ন্যায় আমিও আমার জীবন ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলাম।'

'আবেগ ত্যাগ কর। এস, কাজের কথা বলি। আমি যে মিশন নিয়ে এখানে এসেছি, কাজ শুরু করা প্রয়োজন'– মাজেদ হেজাজী বলল– 'আচ্ছা, স্বামীর উপর তোমার প্রভাব কেমন? তুমি কি তার মনের কথা বের করতে পারবে?'

'দু-পেয়ালা মদপান করিয়ে তার মাথাটা আমার বুকের সঙ্গে লাগিয়েই আমি তার মনের সব ভেদ বের করে ফেলতে পারব'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'কি তথ্য বের করতে হবে বল।' তারপর একটুখানি ভেবে মুচকি হেসে মেয়েটি বলল, 'তুমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত একটি দাবি মানবে কিনা বল– আমি যদি তোমার কাজ আদায় করে দিতে পারি, তাহলে তুমি আমাকে এখন থেকে উদ্ধার করবে , আমার এই আশা পূরণ হবে কি? আমার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করবে না তো?'

'হবে, তোমার এই মনোবাসনা পূরণ হবে। আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। তোমার ভালবাসার মূল্যায়ন করব।' মেয়েটির দাবি মেনে নেয় মাজেদ।

মাজেদ হেজাজী বলল, 'খলীফা আল-মালিকুস সালিহ এগার বছর বয়সের কিশোর। তিনি আমীর-উজীরদের খেলনায় পরিণত হয়ে আছেন। এই আমীর-উজীরগণ উম্মাহকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায়। তাদের এই আশা যদি পূরণ হয়, তাহলে খৃস্টানরা খণ্ডিত মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে খেয়ে হজম করে ফেলবে। এই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বলে থাকে, যে জাতি নিজ সাম্রাজ্যকে খণ্ডিত

করে, তাদের অস্তিত্ব টিকে না। আমাদের এই আমীরগণ খৃস্টানদের থেকে সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হবে না। খৃস্টানরা তাদেরকে মদদ দেবে ঠিক, কিন্তু তার বিনিময়ে তাদেরকে প্রজায় পরিণত করে ফেলবে। সুলতান আইউবী আমাকে এখানে এই তথ্য সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছেন যে, খলীফা কী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং খৃস্টানরা তাদেরকে কিরূপ সাহায্য প্রদান করছে। এই তথ্য আমাকে যত দ্রুত সম্ভব সুলতানের নিকট পৌঁছাতে হবে। তিনি সেই মোতাবেক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। এমন যাতে না হয় যে, সুলতান কোন প্রস্তুতি-পদক্ষেপ না নিতেই খৃস্টানরা তার উপর হামলা করে বসল।'

'আচ্ছা, সালাহুদ্দীন আইউবী কি মুসলিম আমীরদের উপর হামলা করবেন?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'যদি প্রয়োজন হয়, তিনি তাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবেন না।'

মেয়েটি যেমন আগেগপ্রবণ, তেমন বুদ্ধিমতী। তার চোখ গড়িয়ে ঝরঝর করে পানি গড়াতে শুরু করে। বলল, 'ইসলামকে সেই দিনটিও দেখতে হল যে, একই রাসূলের উম্মত পরস্পর লড়াই করবে!'

'এছাড়া আর কোন পথ নেই যে!'– মাজেদ বলল– 'সালাহুদ্দীন আইউবী রাজা নন; আল্লাহর একজন সৈনিক মাত্র। তার মতে, দেশ-জাতিকে বিপদ ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর। এই বিপদ বাইরের দুশমনের পক্ষ থেকে আসুক কিংবা ভেতরের গাদ্দার ও স্বার্থপূজারী শাসকদের থেকে; জাতিকে রক্ষা করা সৈনিকদের পবিত্র কর্তব্য। তিনি প্রায়ই বলে থাকেন, আমি দেশের সেনাবাহিনীকে শাসকগোষ্ঠীর খেলনায় পরিণত হতে দেব না। সেই মুসলমান কাফিরদের চেয়েও বেশী ভয়ংকর, যে কাফিরদেরকে বন্ধু ভেবে বুকে জড়িয়ে নেয়। এখন তোমার কাজ হল, তুমি তোমার স্বামীর নিকট থেকে তথ্য নাও, এখানে কী পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছে।'

'আমি তোমাকে তথ্যও দেব এবং এই দু'আও করব যে, তুমি যখন এখান থেকে দামেস্ক ফিরে যাবে, তখন যেন তোমার সঙ্গে তথ্যের সঙ্গে আমিও থাকি।'

❁ ❁ ❁

'ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট রেমন্ড-এর নিকট দূত মারফত আবেদন পাঠানো হয়েছে, তিনি যেন আল-মালিকুস সালিহ'র সাহায্যে এগিয়ে আসেন' –পরদিনই মেয়েটি মাজেদ হেজাজীকে বলল– 'রাতে আমি আমার স্বামীকে মদপান করিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে অনেক কথা বললাম এবং শেষে

বললাম, তোমরা আসলে কাপুরুষ বলেই দামেস্ক থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছ। কোন মুসলমানই শাসকগোষ্ঠীর এই অপমান সহ্য করতে পারে না, যা সালাহুদ্দীন আইউবী তোমাদের করল।' মেয়েটি বলল, 'আমি তাকে এমন সব কথা বললাম যে, তিনি শিউরে ওঠলেন এবং আমার সঙ্গে অশালীন আচরণ করতে করতে বললেন, 'আইউবী দিন কয়েকের মেহমান মাত্র। ফেদায়ী ঘাতকদের প্রধান শেখ সান্নানকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সে সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার ব্যবস্থা করবে এবং তাকে তার দাবি অনুপাতে পুরস্কার দেয়া হবে। সে তার অভিজ্ঞ ঘাতক দলকে দামেস্ক পাঠাচ্ছে। তিনি আরো বললেন, আমরা বাহিনী প্রস্তুত করার জন্য অনেক সময় পাব। কারণ, শীতের মওসুম এসে গেছে। পার্বত্য এলাকাগুলোতে বরফপাত শুরু হবে। সালাহুদ্দীন আইউবী তার মরু এলাকার বাহিনীকে এত ঠান্ডা আর বরফের মধ্যে লড়াতে পারবে না।'

মাত্র শুরু। মদ আর নারী একজন পুরুষের মনের গোপন রহস্য বের করতে শুরু করেছে। মেয়েটি রাতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা কৌশলে তার স্বামীর সারাদিনের কারগুজারী শুনতে আরম্ভ করেছে। আর দিনের বেলা এই ভেদ-রহস্য কানে দিচ্ছে মাজেদ হেজাজীর।

একদিন মেয়েটির স্বামী মাজেদ হেজাজীকে বলল– 'তোমার নামে নালিশ আছে।' মাজেদ শিউরে ওঠে। ভাবে, তাহলে কি ধরা খেয়ে গেলাম! লোকটি বলল, 'শুনলাম, তুমি নাকি আমার স্ত্রীকে উত্যক্ত করছ! আমার অবর্তমানে তুমি ওর কাছে গিয়ে বসে থাকছ! আমি জানি, আমার তুলনায় তুমি সুদর্শন এবং যুবক। আমার স্ত্রী তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু এখনই বিরত না হলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।'

মাজেদ হেজাজী তার মনিবকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে, এটা আপনার ভুল ধারণা। বাস্তবে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু লোকটির মন থেকে সংশয় দূর হচ্ছে না। সে তার স্ত্রীকেও একই কথা বলে এবং তাকে বারণ করে দেয়– 'মাজেদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করা চলবে না।'

এখনই এখান থেকে চলে যেতে চাচ্ছে না মাজেদ হেজাজী। তার মিশন এখনো সফল হয়নি। এখনো এখানকার পুরো পরিকল্পনা তার জানা হয়নি। মেয়েটিও রাগ-ধমক সহ্য করে নিয়ে উপরে উপরে মান্যতা ও আনুগত্যের ভান ধরে স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে এমন হবে না বলে অঙ্গীকার করে। স্বামী তাকে ক্ষমা করে দেয় বটে; কিন্তু সেদিনই আরো

ছয়জন দেহরক্ষী নিয়ে এসে তাদের একজনকে কমান্ডার নিযুক্ত করে মাজেদ হেজাজীকে তার অধীন করে দেয়। দায়িত্ব বুঝে পেয়েই কমান্ডার মাজেদ হেজাজীকে শতর্ক করে দেয়, তুমি মনিবের দৃষ্টিতে সন্দেহভাজন। অতএব কখনো মনিবের বাসভবনের দরজার নিকটও যেতে পারবে না। আর রাতে সামান্য সময়ের জন্যও অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

মাজেদ অম্লান বদনে কমান্ডারের নির্দেশ মেনে নেয় এবং মাথা ঝুঁকিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে।

এভাবে কেটে যায় আরো তিন দিন। তৃতীয় দিন মধ্যরাতে মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। প্রধান ফটকে একজন প্রহরী দণ্ডায়মান। মেয়েটি চেহারায় মনিবের প্রভাব ও গাম্ভীর্যসহ তাকে জিজ্ঞেস করে, 'এই তুমি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাক, নাকি ভবনের আশপাশটাও ঘুরে-ফিরে দেখ?' প্রহরী উত্তরে কিছু বললে মেয়েটি বলল, 'তুমি নতুন মানুষ, আমাদের আগের দামেস্কের প্রহরীটা বেশ সতর্ক ও চৌকস ছিল। এখানে চাকুরী টেকাতে হলে তোমাকে তার মত হুঁশিয়ার হতে হবে। জান তো, সাহেব কড়া মেজাজের মানুষ।'

প্রহরী মনিবের স্ত্রীর প্রতি অবনত হয়ে যায়।

প্রহরীদের এক এক করে তদারকি করছে মেয়েটি। ঘুমন্ত প্রহরীদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে যায় সে। প্রধান ফটকের প্রহরী ছুটে গিয়ে কামান্ডারকে জাগিয়ে দিয়ে বলে, মনিবের স্ত্রী পরিদর্শনে এসেছেন। কমান্ডার ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় এবং এগিয়ে এসে মনিব-পত্নীর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। মেয়েটি তাকে জরুরী নির্দেশনা দিয়ে আরেকটি তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুরু করে।

মাজেদ হেজাজী এই তাঁবুতে শুয়ে আছে। মেয়েটির কথার শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। শোয়া থেকে উঠে তাঁবুর বাইরে চলে আসে। মেয়েটি তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে, যেন তার সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই। সে মাজেদকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমিই বোধ হয় পুরাতন প্রহরী?' মাজেদ শ্রদ্ধার সঙ্গে জবাব দেয়, 'জি, হ্যাঁ।' মেয়েটি কমান্ডারকে বলে, 'এই লোকটিকে জলদি প্রস্তুত করে দাও, এ আমার সঙ্গে রাজ দরবারে যাবে। জলদি দু'টি ঘোড়া প্রস্তুত কর।'

'মনিব যদি আপনার কথা জিজ্ঞেস করে, তাহলে কী বলব?' কমান্ডার জিজ্ঞেস করে।

'আমি আমোদ ভ্রমণে যাচ্ছি না'– মেয়েটি শাসকসুলভ কণ্ঠে বলল–

'মনিবের কাজেই যাচ্ছি। রাষ্ট্রীয় কাজে তোমাদের অতো মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। যাও, দু'টি ঘোড়া প্রস্তুত করে ফেল।'

কমান্ডার এক রক্ষীকে আস্তাবলের দিকে পাঠিয়ে দেয়। মাজেদ হেজাজী তরবারী সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে যায়। মেয়েটি তাকে আস্তাবলের দিকে নিয়ে যায়।

মেয়েটির স্বামী কমান্ডারকে আগেই বলে রেখেছে, মাজেদের প্রতি নজর রাখবে এবং তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। আর এখন কিনা তার স্ত্রী নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লোকটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে!

মেয়েটি ও মাজেদ আস্তাবলের দিকে চলে যায়। কমান্ডার নিশ্চিত হতে চায়, মনিবের স্ত্রী সন্দেহভাজন রক্ষীর সঙ্গে যাচ্ছে, তা তার মনিবের জানা আছে কিনা। মেয়েটিকে সে বাঁধাও দিতে পারছে না। কারণ, সে তার মনিবের স্ত্রী।

কমান্ডার ঘরে ঢুকে পড়ে। ভয়ে ভয়ে মনিবের কক্ষের দরজায় হাত রাখে। সামান্য ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে যায়। ভেতরে প্রদীপ জ্বলছে। কক্ষটা মদের দুর্গন্ধে ভরে আছে। মনিবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কমান্ডার। লোকটা বিছানার উপর এমনভাবে পড়ে আছে যে, তার মাথা ও একটি বাহু পালংকের উপর থেকে ঝুলে আছে। একটি খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে তার বুকে। একাধিক আঘাতের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে। রক্তে লাল হয়ে আছে তার সমস্ত দেহ, বিছানা ও মেঝে। কমান্ডার মনিবের নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়। শিরায় হাত রেখে পরীক্ষা করে। নেই। মারা গেছে।

মেয়েটি মাজেদ হেজাজীকে জানায়, সে তার স্বামীর নিকট থেকে সব পরিকল্পনা জেনে এসেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ শুরু হয়ে গেল বলে।

প্রতিদিনের ন্যায় মেয়েটি আজও লোকটিকে মদপান করায় এবং একটু বেশি পরিমাণে করায় যে, নেশায় লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাকে অচেতন অবস্থায় ফেলে আসতে পারতো মেয়েটি। কিন্তু প্রতিশোধ-স্পৃহা তাকে পাগল করে তুলেছে। খঞ্জর দ্বারা লোকটির বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে খঞ্জরটি বুকে বিদ্ধ রেখেই বেরিয়ে আসে।

ঘটনা শুনে মাজেদ হেজাজী এতটুকুও ভয় পেল না। সে তো প্রতি মুহূর্তেই এমন লোমহর্ষক ঘটনার সংবাদ শুনে অভ্যস্ত। মাজেদ মেয়েটির এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানায় এবং বলে, 'সুস্থিরভাবে ঘোড়ায় চড়।'

তারা ঘোড়ায় আরোহন করছে। ঠিক এমন সময় রাতের নীরবতা ভেদ করে উচ্চস্বর কানে আসে- 'ঘোড়া দিও না, ওদেরকে আটক কর, ওরা খুন

করে পালাচ্ছে।'

রক্ষীরা তরবারী ও বর্শা উঁচিয়ে বেরিয়ে আসে। মাজেদ হেজাজী ও মেয়েটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছে। রক্ষীরা যে পথটা আগলে রেখেছে, তাদেরকে সে পথই অতিক্রম করতে হবে। মাজেদ মেয়েটিকে বলল, 'তুমি যদি ঘোড়া হাঁকাতে না জান, তাহলে দ্রুত আমার ঘোড়ার পেছনে চড়ে বস। ঘোড়া যথাসম্ভব দ্রুত হাঁকাতে হবে।'

মেয়েটি প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'সমস্যা নেই। আমি ঘোড়সওয়ারী জানি।'

'তোমার ঘোড়া আমার পিছনে রাখবে' বলে মাজেদ হেজাজী হাতে তরবারী তুলে নেয়।

এদিকে রক্ষীদের চেচামেচির শব্দ ধীরে ধীরে নিকটে আসছে। তারা আস্তাবলের দিকে ছুটে আসছে। মাজেদ দ্রুত ঘোড়া হাঁকায়। দেখাদেখি তার পেছন পেছন মেয়েটিও ঘোড়া ছুঁটায় । কমান্ডার গর্জে উঠে– 'থেমে যাও, অন্যথায় বাঁচতে পারবে না।'

জ্যোৎস্না রাত। মাজেদ পেছন ফিরে দেখে রক্ষীরা বর্শা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। মাজেদ ঘোড়ায় গতি ঘুরিয়ে দেয়। মোকাবেলা করতে হবে। সামান্য এগিয়ে গিয়ে তরবারী ঘুরাতে শুরু করে। ঘোড়ার গতি তার আশার চেয়ে তীব্র। দু'জন রক্ষী তার সম্মুখে চলে আসে এবং ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষে যায়। একটা বর্শা ধেয়ে আসে মাজেদের দিকে। কিন্তু মাজেদ তরবারীর আঘাতে নিশানা ব্যর্থ করে দেয়।

'ধনুক বের কর'– কমান্ডার চিৎকার করে বলল। লোকটা অভিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে দু'-তিনটা তীর শাঁ করে মাজেদ হেজাজীর কানের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে চলে যায়। মাজেদ তার ঘোড়াটা ডানে-বাঁয়ে ঘোরাতে শুরু করে, যাতে তীরান্দাজ নিশানা করতে না পারে।

ইতিমধ্যে মাজেদ তীরের আওতা থেকে বেরিয়ে যায়। এখন ভয়, রক্ষীরা ঘোড়ায় চড়ে তাকে ধাওয়া করে কিনা। কিন্তু ধরা খাওয়ার ভয় নেই মাজেদের। জিন কষে ঘোড়ার পিঠে চড়তে চড়তে মাজেদ চলে যেতে পারবে অনেক দূর। লোকালয় ত্যাগ করা পর্যন্ত পেছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল না। মাজেদ মেয়েটিকে বলল, 'এবার তোমার ঘোড়াটা আমার ডান পার্শ্বে নিয়ে আস।'

মেয়েটি তার ঘোড়া মাজেদের পার্শ্বে নিয়ে আসে। মাজেদ তাকে জিজ্ঞেস

করে, 'ভয় পাওনি তো?'

মেয়েটি জবাব দেয়– 'না, কোন অসুবিধা হয়নি।'

পাশাপাশি ছুটে চলেছে দু'টি ঘোড়া। মেয়েটি দূরন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকেই উচ্চস্বরে তথ্য শোনাতে শুরু করে, যা সে তার স্বামীর নিকট থেকে সংগ্রহ করেছে। মাজেদ বলল, 'এখন কথা রাখ; আরো কিছু পথ অতিক্রম করে যাত্রাবিরতি দিয়ে তোমার সব কথা শুনব।' কিন্তু মেয়েটি বলেই যাচ্ছে। মাজেদ বারবার বলছে, 'এখন কথা রাখ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।' মেয়েটি বলল, 'তাহলে এখানেই থেমে যাও; বেশী অপেক্ষা করতে পারব না।' মাজেদ হেজাজী এখনই যাত্রাবিরতি দিতে চাচ্ছে না! কিন্তু মেয়েটি কথা বলেই যাচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে মাজেদ তার ঘোড়ার বাগ টেনে ধরে। এর জন্য তাকে সামনের দিকে এত ঝুঁকতে হয় যে, মাজেদ দেখতে পায়, মেয়েটির এক পাজরে তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। মাজেদ সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামিয়ে ফেলে।

'এই তীর এখানেই বিদ্ধ হয়েছিল'– মেয়েটি বলল– 'আমি এ কারণেই ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, যাতে আমার অর্জিত মহামূল্যবান তথ্য মৃত্যুর আগেই তোমাকে বলে দিতে পারি।'

মাজেদ মেয়েটিকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচে নামায়। মাটিতে বসে মেয়েটির মাথাটা কোলের উপর রাখে। তীর বিদ্ধ জাগায় হাত লাগায় মাজেদ। অনেক গভীরে ঢুকে গেছে তীরটি। বের করার উপায় নেই। ডাক্তার হলে হয়ত পারত।

'ওটাকে ওখানেই থাকতে দাও।' মেয়েটি বলল। অতঃপর সে তার স্বামীর নিকট থেকে যা তথ্য সংগ্রহ করেছে, সব মাজেদকে জানায়। তারপর বলল, 'আমরা যে হাল্‌ব থেকে তথ্য নিয়ে পালিয়েছি, তা বোধ করি কেউ বুঝতে পারেনি। কাজেই ওদের পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন আসবে না। মোহাফেজরা পর্যন্ত জানে, আমার স্বামীর সন্দেহ, তোমার ও আমার মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তারা শুধু এ কথাই বলবে যে, তোমার ভালবাসার খাতিরেই আমি পালিয়েছি।'

তথ্য বলা শেষ হলে মেয়েটি মাজেদের হাতে চুমো খেয়ে বলল– 'এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব!' পরক্ষণেই নিথর হয়ে আসে তার দেহ।

মাজেদ অপর ঘোড়াটি নিজের ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে মেয়েটিকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নেয়। মেয়েটিকে এমনভাবে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে রাখে, যাতে তীর তাকে কোন কষ্ট না দেয়।

✿ ✿ ✿

মাজেদ হেজাজী যখন দামেস্কে তার কমান্ডার হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট পৌঁছে, তখন মেয়েটি শহীদ হয়েছে অন্তত বার ঘন্টা অতিক্রম হয়েছে। মাজেদ হাল্‌ব-এর রাজপ্রাসাদের পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করে মাজেদ হেজাজী বলল, এর সবটুকু কৃতিত্ব এই মেয়েটির। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ ততক্ষণে মাজেদ হেজাজীকে এবং মেয়েটির প্রাণহীন দেহটিকে সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে যান। মাজেদ হেজাজী মেয়েটির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে। সুলতান আইউবী মেয়েটির লাশ নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, 'মেয়েটিকে সামরিক মর্যাদায় দাফন করার ব্যবস্থা করুন।'

মৃত্যুর আগে মেয়েটি মাজেদ হেজাজীকে যে তথ্য দিয়েছিল, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

খলীফা আল-মালিকুস সালিহ সকল মুসলিম রাষ্ট্রের আমীরদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং তাদের সেনাবাহিনীগুলোকে এক কমান্ডারের অধীনে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন। ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডের নিকট সাহায্যের আবেদন পাঠানো হয়েছিল আগেই। এই মেয়েটি নতুন যে তথ্য দিয়েছে, তাহল রেমন্ড তার বাহিনীকে এমনভাবে ব্যবহার করতে চায় যে, তারা মিশর ও সিরিয়ার মাঝখানে সুলতান আইউবীর রসদ ও সহযোগিতার জন্য আসা বাহিনীকে প্রতিহত করবে। রেমন্ড আন্দাজ করে নিয়েছে, যুদ্ধ বেঁধে গেলে সুলতান আইউবী মিশর থেকে সৈন্য তলব করবেন। তাছাড়া রেমন্ড সুলতান আইউবীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্যও দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখবে। প্রয়োজন হলে সে অন্যান্য খৃস্টান সম্রাটদের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানাবে। হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতক বাহিনীর সঙ্গে সুলতান আইউবী হত্যার চুক্তি ও লেনদেন চূড়ান্ত হয়ে গেছে। ফেদায়ীরা দামেস্ক এসে পৌঁছল বলে।

পরিকল্পনার প্রতিটি অংশই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুলতান আইউবী যে অংশটির প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করলেন, তাহল, দুশমন শীতের মওসুম শেষ হওয়ার পর আক্রমণ করবে। হাড়কাঁপানো শীত, প্রবল বর্ষণ ও বরফপাতের কারণে শীত মওসুমে এসব এলাকায় যুদ্ধ করা কঠিন ব্যাপার।

তারা সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করছে। সৈন্যরা দুর্গে অবস্থান নিয়ে থাকবে এবং আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ঋতু পরিবর্তন হলেই তারা সিরিয়ায় হামলা করবে। খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, আইউবী বিরোধী যুদ্ধে

সহযোগিতা করলে বিনিময় দেয়া হবে অনেক স্বর্ণমুদ্রা। রেমন্ড শর্ত দেয়, বিনিময় আগে পরিশোধ কর। আল-মালিকুস সালিহ ও তার অনুচররা রেমন্ডের শর্ত মেনে নেয়।

'মুসলমানদের দুর্ভাগ্য'– দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুলতান আইউবী বললেন– 'মুসলমান আজ কাফেরদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে। প্রিয়নবীজির আত্মার এর চেয়ে বড় কষ্ট আর কী হতে পারে!'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'আমার প্রিয় বন্ধু সালাহুদ্দীন আইউবী আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন না। কিন্তু যখন তাঁকে তথ্য প্রদান করা হল, খৃস্টানদেরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে আপনি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটানোর যে স্বপ্ন দেখছেন, খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার অনুগত মুসলিম আমীরগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনার সেই পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে, তখন তিনি এতই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন যে, তেমনটা কখনো দেখিনি। তথ্যটি শোনামাত্র তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে আসে এবং তিনি কক্ষে পায়চারী শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে প্রবল আবেগঘন কণ্ঠে বললেন– 'এরা আমাদের ভাই নয়– শত্রু। মুরতাদ ভাইকে হত্যা করা যদি পাপ হয়, তাহলে এই পাপ করে আমি পরজগতে জাহান্নামে যেতে প্রস্তুত আছি, তবু ইহজগতে ইসলামকে লাঞ্ছিত হতে দেব না। যেসব মুসলিম শাসক কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়, কাফেরদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ায়, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। আমি জানি, এরা সবাই ক্ষমতা ও অর্থের লোভী। এরা ঈমান নীলাম করে ক্ষমতার নেশা পূরণ করতে চায়।' সুলতান আইউবী তরবারীর হাতলে হাত রেখে বললেন, 'ওরা শীত মওসুমে লড়াই করতে রাজি নয়। বরফময় অঞ্চলে যুদ্ধ করতে ওরা ভয় পায়। কিন্তু আমি হাড় কাঁপানো কনকনে শীতের মধ্যেও যুদ্ধ করব। আমি বরফের স্তরজমা পর্বতচূড়ায় এবং তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যেও লড়াই করব... ।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। তিনি সস্তা শ্লোগানে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রতিটি সেনা ইউনিটের কমান্ডারদেরকে দফতরে ডেকে নিয়ে কাগজে দাগ টেনে নকশা এঁকে এবং যুদ্ধের ময়দানে মাটিতে আঙ্গুল দ্বারা রেখা টেনে নির্দেশনা প্রদান করতেন। কিন্তু সেদিন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না তিনি। আবেগের নিকট পরাজিত হয়ে এমন সব কথা বলে

ফেললেন, যা সচরাচর আম মজলিসে বলেন না।

'তাওফীক জাওয়াদ!'– সুলতান আইউবী দামেস্কের সেনা অধিনায়ককে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমার বাহিনী শীতের মধ্যে লড়াই করতে পারবে কিনা, তাতো এখনো জানা হল না। আমি কমান্ডারদেরকে রাতে এমন স্থানে হানা দেয়ার জন্য প্রেরণ করব, যেখানে তাদেরকে সমুদ্র অতিক্রম করে গমন করতে হবে। তখন প্রচণ্ড শীত থাকবে, বরফপাত হবে, বৃষ্টিও হতে পারে। কাজেই, চিন্তা-ভাবনা করে জবাব দাও।'

'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমার সৈন্যদের মধ্যে জযবা আছে'– তাওফীক জাওয়াদ বললেন– 'তার একটি প্রমাণ হল, তারা আমার সঙ্গে আছে; আস-সালিহ'র সঙ্গে পালিয়ে যায়নি। আমার সৈনিকরা যুদ্ধের লক্ষ-উদ্দেশ্য বুঝে।'

'সৈনিকের মধ্যে যদি জযবা থাকে এবং তারা যদি যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত থাকে, তাহলে তারা উত্তপ্ত বালুকাময় ময়দানে দাঁড়িয়েও যুদ্ধ করতে পারে। পারে জমাটবাঁধা বরফের উপর দাঁড়িয়েও।'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আল্লাহর সৈনিকদের ঠেকাতে না পারে মরুভূমির অগ্নি-উত্তাপ, না হীমশীতল বরফ।'

সুলতান আইউবী সভার উপস্থিতিদের প্রতি একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'ইতিহাস হয়ত আমাকে মাতাল বলবে। কিন্তু আমার স্থির সিদ্ধান্ত, ডিসেম্বর মাসে আমি যুদ্ধ শুরু করব। এই সিদ্ধান্ত থেকে কেউ আমাকে টলাতে পারবে না। তখন শীতের তীব্রতা থাকবে তুঙ্গে। পাহাড়-পর্বতের রং হবে সাদা– বরফঢাকা। থাকবে হাড় কাঁপানো শীত। আপনারা সবাই কি আমার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন?'

সকলের সমবেত কণ্ঠে জবাব– 'আমরা প্রস্তুত, সুলতানের যে কোন সিদ্ধান্ত শিরোধার্য।'

এবার সুলতান আইউবীর ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। কণ্ঠ তার আবেগমুক্ত, ধীর-শান্ত। তিনি নির্দেশ দিতে শুরু করেন–

'আজ রাতেই সকল ফৌজ মহড়া শুরু করবে। সালার থেকে সিপাহী প্রত্যেকে আবরণমুক্ত থাকবে। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত একখণ্ড কাপড় ছাড়া কারো গায়ে আর কোন পোশাক থাকবে না। নামাযের পরপর সকল সৈন্য পোশাক খুলে ব্যারাক থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে। সন্নিকটে অনেক ঝিল আছে। ফৌজ সেগুলোর মধ্যদিয়ে অতিক্রম করবে। আমাদের সামরিক

ডাক্তারগণও তাদের সঙ্গে থাকবে। প্রথমদিকে সৈন্যরা ঠাণ্ডায় অসুস্থতার শিকার হতে পারে। ডাক্তারগণ তাদেরকে গরম কাপড়ে পেঁচিয়ে এবং আগুনের কাছে শুইয়ে দিয়ে চিকিৎসা করবে। আমার আশা, এই অসুস্থতার ঘটনা বেশী ঘটবে না। দিনের বেলা ডাক্তারগণ সৈন্যদের খোঁজ-খবর নেবে। প্রয়োজন হলে মিশর থেকে আরো ডাক্তার তলব করতে হবে।'

১১৭৪ সালের নভেম্বর মাসের শুরুর দিক। এই সময়টায় রাতে প্রচণ্ড শীত পড়ে। সুলতান আইউবী রাতের বেলা সামরিক জুনিয়র কমান্ডারদের তলব করেন। তিনি তাদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন–

'এবার তোমাদেরকে যে দুশমনের সঙ্গে লড়তে হবে, তাদেরকে দেখার পর তোমাদের তরবারী খাপ থেকে বাইরে বের হতে ইতস্তত করবে। কারণ, তারাও 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান তুলে তোমাদের সামনে আসবে। তাদের পতাকাও তোমাদের পতাকারই ন্যায় তারকাখচিত থাকবে। তারাও সেই কালেমা পাঠ করে, যা তোমরা পড়। তোমরা তাদেরকে মুসলমান মনে করবে; কিন্তু তারা মুরতাদ। আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে তোমাদের মুখোমুখি এসে তারা কোষ থেকে যে তরবারী বের করবে, তা খৃস্টবাদীদের সরবরাহ করা তরবারী। তাদের তূনীরে খৃস্টবাদীদের তীর। তোমরা ঈমানের প্রহরী আর তারা ঈমানের ব্যাপারী। সুলতান আস-সালিহ বাইতুলমালের সোনাদানা ও সমুদয় সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সেই সম্পদ তিনি এই উদ্দেশ্যে ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাটের হাতে তুলে দিয়েছে, যাতে সে তোমাদের পরাজিত করতে তাকে সামরিক সহযোগিতা দেয়। এই পরাজয় তোমাদের নয়– ইসলামের। এই ধনভাণ্ডার কারো ব্যক্তিগত নয়– জাতির। এগুলো দেশের জনগণেরই প্রদত্ত যাকাতের অর্থ। সেই সম্পদ এখন মদ-বিলাসিতায় ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই সম্পদ কাফেরদেরকে বন্ধু বানানোর কাজে ব্যয়িত হচ্ছে, তোমরা কি জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারী এই দস্যুটাকে সুলতান মেনে নেবে?'

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, 'না, না, আমরা এমন লোকদের ক্ষমতার স্বপ্নসাধ চিরতরে মিটিয়ে দেব।'

সুলতান আইউবী বললেন–

'আমি যে নীতিমালার ভিত্তিতে মিশরের ফৌজ গঠন করেছি, তা-ই তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে চাই। আমার মৌলিক নীতি হল, দুশমনের অপেক্ষায় ঘরে বসে থাকা চলবে না। দুশমন আক্রমণ করলে আমি তা প্রতিহত করব, এটা কোন নীতি হতে পারে না। কুরআন আমাদেরকে যে

শিক্ষা প্রদান করেছে, তাহল, যুদ্ধ আছে তো লড়াই কর। যুদ্ধ নেই, যুদ্ধের প্রস্তুতিতে নিমগ্ন থাক। তোমরা যখনই টের পাবে যে, দুশমন তোমাদের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তোমরা দুশমনের উপর তখনই হামলা কর। স্মরণ রেখ! যারা মুসলমান নয়, তারা তোমাদের বন্ধু নয়। কাফের যদি তোমার পায়ে সেজদাও করে, তবু তাকে বন্ধু মনে কর না।

আমার দ্বিতীয় মূলনীতি হল, তোমরা ইসলামী সাম্রাজ্য ও দেশের জনগণের ইজ্জতের প্রহরী। তোমাদের শাসকগোষ্ঠী যদি আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলে, জাতি যদি পাপ করতে করতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং দুশমন তোমাদের উপর জয়ী হয়, তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্ম বলবে, এই জাতির সৈন্যরা অযোগ্য ও দুর্বল ছিল। মনে রাখবে, জয়-পরাজয়ের সিদ্ধান্ত হয় যুদ্ধের মাঠে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর বিলাস-প্রিয়তা ও স্বার্থপরতা দেশের সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে দেয়। কিন্তু পরাজয়ের দায় চাপানো হয় সেনাবাহিনীর কাঁধে। কাজেই, তোমাদের যে খলীফা ও শাসকগোষ্ঠী জাতিকে লাঞ্ছনায় নিক্ষিপ্ত করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও। আমি যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তার রূপ কেমন হবে, তা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারব না। আমি শুধু এটুকু জানি, একটি ভয়াবহ ও কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হবে। কঠিন এই অর্থে যে, আমি তোমাদেরকে চরম এক সংকটাপূর্ণ অবস্থায় লড়াচ্ছি। আরেক সমস্যা হল, তোমাদের সংখ্যা কম। সংখ্যার এই অভাব পুষিয়ে নিতে হবে জযবা ও ঈমানী শক্তি দ্বারা।'

সুলতান আইউবী কমান্ডারদের এ-ও অবহিত কবেন যে, তোমাদের মধ্যে দুশমনের চর ঢুকে আছে। তারা কি কি পন্থায় কাজ করছে, তিনি তারও বিবরণ প্রদান করেন।

❁ ❁ ❁

'তোমরা বিশ্বাস কর না যে, সালাহুদ্দীন আইউবী মুসলমান'– হাল্‌বে নিজ সৈন্যদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক আমীর বলল– 'খলীফার মর্যাদা একজন নবীর সমান। নাজমুদ্দীন আইউবীর এই মুরতাদ ছেলেটা খলীফাকে কস্‌রে খেলাফত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং সিরিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মিশর ও সিরিয়ার রাজা হয়ে বসেছে। তোমরা যদি খোদার আজাব-গযব থেকে রক্ষা পেতে চাও, প্রলয়ংকারী ভূমিকম্প ও ব্যাপক বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাস থেকে নিরাপদ থাকতে চাও, তাহলে সালাহুদ্দীন আইউবীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সালতানাতের গদি ফিরিয়ে আন।

শীতকাল শেষ হলেই আমরা দামেস্কে আক্রমণ করব। তার আগে আমরা সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করব এবং তোমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নিতে থাক।'

'একটি জাতির চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করতে না পারলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করা যায় না'– আল-মালিকুস সালিহ'র নিকট রেমন্ড কর্তৃক প্রেরিত খৃস্টান সেনাবাহিনীর এক সামরিক উপদেষ্টা বলল– 'আমরা তোমাদের এলাকায় এসে যুদ্ধ করব না। আইউবীর সাহায্যে মিশর থেকে যে বিশেষ ফোর্স আগমন করবে, আমরা পথে তাদেরকে প্রতিহত করব এবং সুযোগমত আইউবীকে কোথাও ঘিরে ফেলব। আপনার বাহিনী দামেস্কে হামলা করবে। শীতের মওসুমে না আপনি হামলা করতে পারবেন না– না আইউবী। এই সময়টাকে আপনি কাজে লাগান। আমি যে আশংকা অনুভব করছি, তাহল, আপনার জাতি আপসে লড়াই করতে ইতস্তত করতে পারে। আপনি আপনার নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোর জনগণকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলুন। এর জন্য উত্তম হাতিয়ার হল আপনার ধর্ম ও কুরআন। এই লক্ষ্য অর্জনে আপনি ধর্ম, কুরআন ও মসজিদকে ব্যবহার করুন। মুসলমানদের নিকট ধর্ম একটি স্পর্শকাতর বিষয়। তারা ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু শুনলে অমনি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আপনি সহযোগিতা করলে আমরা দামেস্কেও এ লক্ষ্যে কাজ করতে পারি।'

'পাঁচ পাঁচটি বছর কেটে গেল; কিন্তু আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে খুন করতে পারলাম না! লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে'– সুলতান আইউবীকে হত্যার জন্য গমনকারী ফেদায়ী ঘাতক বলল– 'আইউবীর উপর আমাদের চারটি হামলা ব্যর্থ হয়েছে। তাও এত শোচনীয়ভাবে যে, তাতে আমাদের কিছু লোক মারা গেছে এবং গ্রেফতার হয়েছে। হাসান ইবনে সাব্বাহর আত্মা আমাকে তিরস্কার করছে– তুমি কি আইউবীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে পারলে না? তুমি কি লুকিয়ে কোথাও তাকে তীরের নিশানা বানাতে পারলে না? তুমি কি মৃত্যুর ভয়ে ভীত? তুমি আমার সঙ্গে কী বলে অঙ্গীকার করেছিলে, তা কি ভুলে গেছ? কাজেই আমি এখন আর এক মুহূর্তের জন্যও একথা শুনতে চাই না যে, সালাহুদ্দীন আইউবী জীবিত।'

'তিনি আর বেশীদিন জীবিত থাকবেন না।' এক ফেদায়ী বলল। তাঁর সঙ্গীরা তার বক্তব্যে সমর্থন ব্যক্ত করল।

সুলতান আইউবী দামেস্ক আগমনের সময় তাঁর ভাই আল-আদেলকে মিসরের সেনাবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত করে আসেন। তিনি তাঁকে

নির্দেশ দিয়ে আসেন যে, সেনাভর্তি বেগবান করে তোল এবং সামরিক মহড়া অব্যাহত রাখ। তিনি তাকে সুদানের ব্যাপারেও সতর্ক করে আসেন এবং বলে আসেন, সুদানের পক্ষ থেকে সামান্যতম সামরিক তৎপরতা যদি চোখে পড়ে, তাহলে তুমি ব্যাপকহারে সেনা অভিযান পরিচালনা করবে।

সুলতান আইউবী তাঁর ভাইকে সদা রিজার্ভ বাহিনী ও রসদ প্রস্তুত রাখতে নির্দেশ দিয়ে আসেন। দামেস্কের অভিযান সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা যাচ্ছিল না, পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে। এখন সুলতান যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, তাতে তার সেনা সহযোগিতার প্রয়োজন। কিন্তু গুপ্তচর মাজেদ হেজাজীর সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক খৃস্টান সম্রাট রেমন্ড মিশর ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সুলতান আইউবীর রিজার্ভ সেনা ও রসদ আগমন প্রতিহত করবে– এই তথ্যের ভিত্তিতে সুলতান আইউবী সময়ের আগেই মিশর থেকে স্পেশাল ফোর্স ও রসদ এনে রাখা আবশ্যক মনে করেন। এই বাহিনীকে শীতের মধ্যে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তিনি দীর্ঘ একটি বার্তাসহ একজন দূতকে কায়রো প্রেরণ করেন।

পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য কতজন করে পাঠাতে হবে সুলতান পত্রে তাও উল্লেখ করেন। সঙ্গে এই নির্দেশনাও প্রদান করেন যে, সকল সৈন্য যেন একত্রে না আসে। বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে রাতের বেলা একদল অপরদল থেকে দূরত্ব বজায় রেখে পথ চলবে। দিনে সফর বন্ধ রাখবে। এই ফোর্স আগমন যথাসম্ভব গোপন রাখবে।

আল-আদেল তাঁর ভাই সালাহুদ্দীন আইউবীরই হাতে গড়া। পয়গাম পাওয়ামাত্র তিনি বাহিনী রওনা করিয়ে দেন এবং বিষয়টা গোপন রাখার জন্য পন্থা অবলম্বন করেন যে, কয়েকজন সেনা সদস্যকে ছদ্মবেশে উটে চড়িয়ে এই নির্দেশনা দিয়ে রাস্তায় পাঠিয়ে দেন, তোমরা ডানে-বাঁয়ে ছড়িয়ে গিয়ে পরস্পর দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করবে। কোন সন্দেহভাজন লোক দেখলে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। প্রয়োজন বোধ করলে গ্রেফতার করে ফেলবে।

বাহিনীর সৈন্যরা দিন কয়েক পরই দামেস্ক পৌঁছতে শুরু করে। সুলতান আইউবী তাদেরকেও রাতের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তার সঙ্গে তিনি নতুন ভর্তিরও নির্দেশ জারি করেন।

❁ ❁ ❁

দামেস্কের প্রত্যন্ত এলাকা। ঘন বনজঙ্গল আর খানাখন্দকে ভরা গোটা অঞ্চল। সেখানে শত শত বছরের পুরাতন একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ

বিদ্যমান। তার অভ্যন্তরে কেউ কখনো অনুপ্রবেশ করেছে বলে জানা যায়নি। রাতে মানুষ তার পাশ দিয়েও হাঁটে না। দুর্গটা এক সময় সামরিক কাজে ব্যবহৃত হলেও এখন তা ব্যবহারের অনুপযুক্ত। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও স্থানটি অনুপযোগী। সে কারণে দেশের সামরিক বাহিনীর কখনো সেদিকে চোখ যায়নি। সুলতান আইউবীর আমলে দামেস্কের প্রতিরক্ষার জন্য অন্যত্র একটি দুর্গ তৈরি করে নেয়া হয়েছিল। এই পুরাতন দুর্গটি 'সর্পকেল্লা' নামে পরিচিত। কথিত ছিল যে, দুর্গের ভেতর এক জোড়া নাগ-নাগিনী বাস করে। তাদের বয়স হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। এও বলা হত যে, দুর্গটি সেকান্দারে আজম নির্মাণ করেছিলেন। কারো মতে, ইরানের বাদশা দারা এর নির্মাতা। অনেকের মতে, দুর্গটি তৈরি করেছিল বনী ইসরাঈল।

সে যা হোক, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, কয়েকশ' বছর আগে এখানে এক পারস্য রাজা আগমন করেছিলেন। জায়গাটা তার পছন্দ হয়ে গেলে তিনি এখানে এই দুর্গটি নির্মাণ করেন এবং তার অভ্যন্তরে নিজের জন্য একটি মনোরম মহল তৈরি করেন। কিন্তু মহলটি আবাদ করার জন্য তার কোন স্ত্রী ছিল না। খুঁজে পেতে তিনি এক রাখাল কন্যাকে পছন্দ করেন। কিন্তু মেয়েটি ছিল অন্য এক যুবকের বাগদত্তা। দু'জনের মধ্যে ছিল গভীর ভালবাসা। রাজা মেয়েটির পিতামাতাকে অগাধ সম্পদ দিয়ে বাগিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে নেয়। যুবক বাদশার নিকট এসে বলল, মহারাজ! শখ করে মহল নির্মাণ করেছেন এবং আমার বাগদত্তা প্রেমিকাকে ছিনিয়ে এনেছেন! কিন্তু এই দুর্গে বাস করা আপনার কপালে জুটবে না। আপনি এখানে থাকতে পারবেন না। যুবকের কথায় বাদশা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে দুর্গে নিয়ে হত্যা করে ফেলে এবং লাশটা নিকটেই এক স্থানে পুঁতে রাখে। অপরদিকে মেয়েটি বাদশাকে বলল, আপনি আমার দেহটা ক্রয় করেছেন, আমার হৃদয়টাকে কখনোই আপনি দখল করতে পারবেন না।

বাদশাহ রাখাল কন্যাকে রাজকীয় সাজে সাজিয়ে প্রথম দিনের মতো মহলে প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মহলের মেঝে ধসে যায়, ছাদ ও দেয়াল তাদের মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ে। দু'জনই মহলের ছাদ ও দেয়াল চাপা পড়ে মারা যায়। বাদশাহর সেনাদল ছুটে এসে মহলের ধ্বংসাবশেষ সরাতে শুরু করে। এসময় ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে দু'টি নাগ বেরিয়ে আসে। সেনারা তাদেরকে বর্শা, তীর-ধনুক আর তরবারী দ্বারা মারার চেষ্টা করে। কিন্তু নাগ দু'টোর গায়ে না লাগে বর্শা, না বিদ্ধ হয় তীর, না আঘাত হানে তরবারী। বাদশার সেনাদল

ভয়ে পালিয়ে যায়। এ কথাও প্রসিদ্ধ ছিল যে, এখনো রাতের বেলা দুর্গের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে রাখালের পোশাক পরিহিত একটি মেয়েকে ভেড়া চড়াতে দেখা যায়। মাঝে-মধ্যে একটি যুবক চোখে পড়ে। এক কথায়, সবাই বিশ্বাস করত যে, দুর্গটা জ্বিন-পরীর আবাস।

সুলতান আইউবী যে সময়টায় খলীফা ও আমীরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, ঠিক তখন দামেস্কে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, সর্পকেল্লায় এক বুজুর্গ আত্মপ্রকাশ করেছেন, যিনি দু'আ করলে মানুষের সব রোগ ভাল হয়ে যায় এবং তিনি ভবিষ্যতের সংবাদ বলে দিতে পারেন। কে একজন শহরে সংবাদটা বলামাত্র মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের ন্যায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে তাকে 'ইমাম মাহদী' আখ্যা দিতে ভুল করেনি। মানুষ সেখানে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আবার এই ভয়ে পিছিয়ে যায় যে, ওটা রাখালের কন্যা ও তার বাগদত্তার কিংবা পারস্যের রাজার প্রেতাত্মা কিনা! নাকি জ্বিন-ভুতের কারসাজি। অনেকে দূরে দাঁড়িয়ে দুর্গের দিকে তাকায়, কিছু দেখা যায় কিনা। জনা তিন-চারেক লোক দাবি করে, তারা কালো দাড়ি ও সাদা চোগা পরিহিত এক ব্যক্তিকে দুর্গের বাইরে আসতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে যেতে দেখেছে। মানুষ বুজুর্গের কারামত নিয়ে বলাবলি করছে। কিন্তু এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, যে বলবে, আমি দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করেছি এবং বুজুর্গ লোকটি আমার জন্য দু'আ করেছেন।

একদিনের ঘটনা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর রক্ষী বাহিনীর এক সিপাহী ডিউটি পালন শেষে বাইরে ঘোরাফেরা করছিল। লোকটার সুদর্শন চেহারা, সুঠাম দেহ। তাঁগড়া যুবক। হঠাৎ সম্মুখ থেকে নূরানী চেহারার এক ব্যক্তি এগিয়ে আসে। মুখে কালো দাড়ি, পরনে সাদা চোগা, মাথায় অতীব আকর্ষণীয় পাগড়ি, হাতে তসবীহ। সিপাহীর সামনে এসেই লোকটি দাঁড়িয়ে যায়। হাত বাড়িয়ে চিবুক ধরে সামান্য উপরে তুলে আবার ছেড়ে দেয়। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'আমি কখনো ভুল করি না; তোমার বাড়ি কোথায় দোস্ত?'

'বাগদাদ'– মিষ্টি ভাষায় সিপাহী জবাব দেয়– 'আপনি আমাকে চেচেন নাকি?'

'হ্যাঁ, দোস্ত! আমি তোমাকে চিনি'– আগন্তুক জবাব দেয়– 'তবে বোধ হয় তুমি নিজেকে চেন না।'

লোকটি যে ধারায় কথা বলছে, তাতে সিপাহী প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বস্তুত তার নূরানী চেহারা, আকর্ষণীয় দাড়ি, সাদা পোশাক ও পাগড়ী যে কোন

মানুষকে প্রভাবিত না করে পারে না। এসব না থাকলে হয়ত সিপাহী তাকে মাতাল বলে এড়িয়ে যেত। কিন্তু লোকটার ভাবভঙ্গি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও কথার ধরণ সুলতান আইউবীর সৈনিককে কাবু করে ফেলে।

'আচ্ছা, তুকি কি তোমার পূর্বপুরুষকে জান, তারা কারা ছিলেন এবং কী ছিলেন?' লোকটি সিপাহীকে জিজ্ঞেস করে।

'না!' সিপাহী জবাব দেয়।

'দাদার কথা জান না?'

'না।'

'তোমার পিতা বেঁচে আছেন?'

'না।'– সিপাহী জাবাব দেয়– 'আমি যখন দুধের শিশু, তখনই তিনি মারা যান।'

'তোমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি রাজা ছিলেন?'– আগুন্তুক জিজ্ঞেস করে– 'পরদাদা?'

'কেউ নয়,' সিপাহী জবাব দেয়– 'আমি কোন রাজবংশের সন্তান নই। আমি সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবীর রক্ষী বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক। আপনি বোধ হয় ভুল করছেন। আমার গঠন-আকৃতির সঙ্গে আপনার পুরনো কোন বন্ধুর মিল আছে হয়ত। আপনি আমাকে অন্য কেউ মনে করেছেন।'

লোকটি এমন ভাব দেখায়, যেন সে সিপাহীর কথাটা শুনেইনি। তার হাত ধরে ডান হাতের তালুর রেখাগুলো গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। তারপর তার কাঁধে হাত রেখে মাথাটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে ঝুঁকে তার মুখমণ্ডলের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মধুর ভাষায় ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বলে– 'তবে এই সিংহাসনে আমি কাকে দেখতে পাচ্ছি? এই মুকুটটার মালিক কে? তোমাকে কে বলল, তুমি রাজবংশের সন্তান নও? আমার বিদ্যা আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না। আমার চোখ ভুল দেখতে পারে না। আচ্ছা, তুমি কি বিয়ে করেছ?'

'না।' সিপাই ভয়ার্ত কণ্ঠে জবাব দেয়– 'বংশের একটি মেয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে আছে।'

'হবে না' লোকটি বলল– 'এই বিয়ে হবে না।'

'কেন?' চকিত হয়ে সিপাহী প্রশ্ন করে।

'তোমার জুড়ি অন্য কোথাও' লোকটি বলল– 'কিন্তু মেয়েটি অন্যত্র আটকা পড়ে আছে। শোন বন্ধু! তুমি মজলুম, প্রতারণার শিকার। তুমি বিভ্রান্ত।

তোমার ধনভাণ্ডারের উপর সাপ বসে আছে। একজন রাজকন্যা তোমার পথপানে তাকিয়ে আছে। কেউ যদি তোমাকে তথ্য প্রদান করে, মেয়েটি কোথায়, তাহলে কি তুমি জীবনের বাজি রেখে তাকে উদ্ধার করবে?'

এই বলে লোকটি যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হাঁটা দেয়।

সিপাহী ছুটে গিয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং বলে– 'আমার হাত ও চোখে আপনি কী দেখেছেন? আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? আপনি আমাকে কেন বিভ্রান্ত ও অস্থির করে চলে যাচ্ছেন!'

'আমি কিছুই নই' লোকটি জবাব দেয়– 'আমার আল্লাহর সত্ত্বাই সবকিছু। গোটা তিন-চারেক মহান পবিত্র আত্মা আমার হাতে আছে। এরা আল্লাহ পাকের সেই প্রিয়জনদের আত্মা, যারা অতীত ও ভবিষ্যতকে সমানভাবে জানতেন। আমি কিছু অজিফা পালন করি। এক রাতে আমি নির্দেশ পাই যে, তুমি সর্পকেল্লায় চলে যাও। একব্যক্তি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। ওখানে যেতে আমি ভয় পেতাম। কিন্তু এটা খোদার নির্দেশ। কাজেই এখন আর ভয় কিসের। আমি সর্পকেল্লায় চলে গেলাম। প্রথম রাতেই অজিফা যপকালে আত্মাগুলো পেয়ে যাই। তারা আমাকে এমন শক্তি দান করে যে, আমি মানুষের চেহারা ও চোখের প্রতি তাকালে তাদের দাদা ও পরদাদার ছবি দেখতে পাই। কিন্তু এই অবস্থা সবসময় থাকে না। মাঝে-মধ্যে দেখা যায়। তোমাকে দেখামাত্র আমার কানে একটি আত্মার কণ্ঠ ভেসে আসে। এই যুবকটিকে দেখ! ছেলেটা রাজপুত্র। কিন্তু সে তার ভাগ্যলিপি সম্পর্কে অনবহিত। রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও সে সিপাহী বেশ ধারণ করে অন্যের সুরক্ষার জন্য পাহারাদারী করে। এখন আমার সেই অস্বাভাবিক অবস্থা চলে গেছে, এখন আমি তোমাকে একজন সিপাহীরূপেই দেখছি। আমি জ্যোতিষী নই, গায়েবও জানি না। আমি একজন দরবেশ মাত্র। আল্লাহ-বিল্লাহ করে দিন কাটাই। কিন্তু তারপরও আবদার যখন করেছ, কিছু জানার চেষ্টা করব এবং আমি যেখানকার কথা বলি, তোমাকে সেখানে যেতে হবে। পারবে বেটা?'

'হ্যাঁ, পারব! আপনি যথায় বলেন, তথায়ই গিয়ে আমি হাজির হব।'

'সর্পকেল্লায় এসে পড়।'

'ঠিক আছে আসব, অবশ্যই আসব।'

'পাকসাফ হয়ে মন-মস্তিষ্ককে দুনিয়ার ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত করে আসবে। খবরদার, কাউকে বলবে না, আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল এবং রাতে তুমি কোথাও যাচ্ছ। একদম চুপি চুপি এসে পড়বে।' বলল লোকটি।

❀ ❀ ❀

ধনভাণ্ডার, রাজকন্যা ও সিংহাসনের লোভে না পেলে সুলতান আইউবীর এই সৈনিক যত সাহসীই হোক রাত্রিকালে স্বর্পকেল্লায় যেত না। রাতের শেষ প্রহরে সুলতান আইউবীর বাসগৃহের পেছন দরজায় তার পাহারা ছিল। তার পূর্ব পর্যন্ত পুরো রাত তার ঘোরাফেরা করার সুযোগ রয়েছে। রাত খানিকটা গভীর হলে সিপাহী চুপি চুপি স্বর্পকেল্লা অভিমুখে হাঁটা দেয়। কেল্লার দ্বার পর্যন্ত পৌঁছামাত্র ভয়ে তার গা ছমছম করে ওঠে। দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে– 'আমি এসে গেছি, আপনি কোথায়?'

তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কোথা থেকে একটি মশাল বেরিয়ে আসে এবং তার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। তার মনের ভয় আরো বেড়ে যায়। সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে। মশালটি এক ব্যক্তির হাতে। লোকটি নিকটে এসে সিপাহীকে জিজ্ঞেস করে, 'হযরত আজ পথে কোথাও কাকে দেখেছিল, তুমিই কি সেই লোক?'

সিপাহী বলল, হ্যাঁ, আমিই সেই লোক।'

মশালবাহী লোকটি বলল, 'আমার পেছনে পেছনে আস।'

'তুমি কি মানুষ?' ভয়জড়িত কণ্ঠে সিপাহী তাকে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি চোখে যা দেখছ, আমি তা-ই। মন থেকে ভীতি দূর করে ফেল। মাথা থেকে সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেল। চুপচাপ আমার পেছনে পেছনে আস'– মশালবাহী লোকটি সম্মুখের দিকে হাঁটছে আর কথা বলছে– 'তুমি হযরতকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না। তিনি যা নির্দেশ দেন, তা-ই করবে।'

ঘোর অন্ধকার। ছাদঢাকা আঁকা-বাঁকা সরু পথ। ডান-বাম করে কয়েকটি রাস্তা অতিক্রম করে মশালবাহী লোকটি একটি দরজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং উচ্চস্বরে বলে, 'হযরত! অনুমতি হলে তাকে নিয়ে আসি।' ভেতর থেকে জবাব আসে, 'আস'। মশালবাহী একদিকে সরে যায় এবং সিপাহীকে ইঙ্গিতে বলে, 'যাও, ভেতরে চলে যাও।'

সিপাহী ভেতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য! এই ভয়ানক স্থানে আকর্ষণীয় মহামূল্যবান জিনিসপত্রে সাজানো মনোরম এক কক্ষ। যুগপৎ বিস্ময় ও ভীতি চেপে ধরে সিপাহীকে। একধারে অদৃশ্যপূর্ব কারুকার্যখচিত নয়ন মাতানো একটি পালংক। তাতে তাতোধিক মনোহরী জাজিম বিছানো। তার উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গুরুগম্ভীর মুখে বসে আছে সেই ব্যক্তি। চোখ বন্ধ করে তাসবীহ যপ করছে লোকটি। সে-ই ইঙ্গিতে সিপাহীকে বসতে বলল। সিপাহী

বসে যায়। মন মাতানো সুগন্ধিতে মৌ মৌ করছে কক্ষটি।

হযরত চোখ খোলেন, সিপাহীর প্রতি তাকান এবং হাতের তাসবীহটি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'গলায় পরে নাও'। সিপাহী তসবীহটি হাতে নিয়ে চুমো খায়। তারপর গলায় পরিধান করে নেয়। কক্ষে মিটমিট করে একটি প্রদীপ জ্বলছে। হযরত হাত তালি দেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের আরেকটি কক্ষের দরজা খুলে যায়। একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে। অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী। মাথার চুলগুলো খোলা। সোনালি তারের ন্যায় ঝিকমিক করছে। চুলগুলো ছড়িয়ে আছে দু'কাঁধের উপর। এমন রূপসী মেয়ে এর আগে কখনো সিপাহী দেখেনি। মেয়েটির হাতে সুদর্শন একটি পেয়ালা। পেয়ালাটা সিপাহীর তাতে দেয় সে। হযরত বসা থেকে উঠে দাঁড়ান। চলে যান অন্য কক্ষে। সিপাহী পেয়ালাটা হাতে নিয়ে একবার মেয়েটির প্রতি একবার পেয়ালার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। মুখ খুলে মেয়েটি। বলল- 'হযরতের আসতে একটু দেরী হবে। তুমি এগুলো পান কর।' মেয়েটির ঠোঁটে হাসি- মন মাতানো অকৃত্রিম হাসি। সিপাহী পেয়ালাটা ঠোঁটের সঙ্গে লাগায় এবং এক ঢোক পান করে মেয়েটির প্রতি তাকায়।

'তোমার মতো সুশ্রী যুবক আমি মাঝে-মধ্যে দেখি'- সিপাহীর কাঁধে হাত রেখে মেয়েটি বলল- 'পান কর! এই শরবত আমি তোমার জন্য মনের মাধুরি মিশিয়ে তৈরি করে এনেছি। হযরত আমাকে বলেছিলেন, আজ রাতে তোমার পছন্দের এক যুবক আসবে; কিন্তু আমি ছেলেটার পরিচয় জানি না।'

সিপাহী প্রথমে থেমে থেমে দু'তিন চুমুক পান করে। তারপর ঢক ঢক করে গিলতে শুরু করে। পেয়ালাটা শূন্য হয়ে যায়। মেয়েটি ধীরে ধীরে সিপাহীর একেবারে গা ঘেঁষে বসে। সিপাহী অনুভব করে, মেয়েটি তার তেলেসমাতী রূপ আর জাদুকরী দেহটা নিয়ে শরবতের ন্যায় তার কণ্ঠনালী অতিক্রম করে শিরায় শিরায় মিশে গেছে।

হযরত ফিরে এসেছেন। তার হাতে কাচের একটি বল, আকারে যেন একটি নাশপতী। তিনি বলটি সিপাহীর হাতে দিয়ে বললেন, এটি চোখের সামনে ধর। এর ভেতর দিয়ে প্রদীপের শিখার দিকে তাকাও এবং তাকিয়ে থাক।

সিপাহী কাচের বলটির মধ্যদিয়ে প্রদীপের দিকে তাকায়। তাতে চোখের সামনে কয়েকটি রংও শিখায় দেখতে পায়। মেয়েটির রেশমী এলোমেলো চুল তার গণ্ড স্পর্শ করেছে। মেয়েটি তাকে এমনভাবে বাহুবন্ধনে আগলে রেখেছে যে, সিপাহী তার দেহের উষ্ণতা ও সুবাস অনুভব করছে। এবার তার কানে

জাদুকরী এক সুরেলা কণ্ঠ ভেসে আসতে শুরু করে– 'আমি সুলায়মানের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি। আমি সুলায়মানের সিংহাসন দেখতি পাচ্ছি।' কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে অনুভব করে কণ্ঠটা হযরতের। কিন্তু পরক্ষণেই সেটি তার নিজের কণ্ঠে পরিণত হয়ে যায়। সিপাহী এখন সেই জগতের বাসিন্দা, যা সে কাচের বলের মধ্যদিয়ে দেখছিল। সিপাহী সুলায়মানের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছে। নূরানী চেহারার এক বাদশাহ তার উপর বসে আছেন। তার ডানে-বামে ও পেছনে চার-পাঁচটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েগুলো এতই রূপসী যে, মনে হচ্ছে হুর-পরী।

'হ্যাঁ হ্যাঁ'– সিপাহী বলে ওঠল- 'আমি সুলায়মানের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি।'

মেয়েটির বিক্ষিপ্ত চুলগুলো সিপাহীর বুকে-পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। সিপাহী কাচের মধ্যে দেখছে, সুলায়মানী সিংহাসনের নিকটে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি বলছে– 'এই রাজা তোমার দাদা, যিনি সাত রাজ্যের বাদশাহ। সুলায়মান বাদশাহর জিন-পরীরা তার দরবারে সিজদা করে। তুমি তোমার দাদাকে চিনে নাও। এই সিংহাসন তোমার উত্তরাধিকার সম্পদ।'

সিংহাসনটা সিপাহীর চোখের সম্মুখ থেকে সরে যেতে শুরু করে। সিপাহী চীৎকার করে ওঠে– 'উনি সিংহাসন নিয়ে গেলেন। ওরা দৈত্য। অনেক বড় বড়। ওরা সিংহাসনটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে।'

এখন কাচের বলের মধ্যে কয়েক বর্ণের কতগুলো শিখা রয়ে গেছে শুধু। শিখাগুলো তিরতির করে কাঁপছে, যেন উদ্বেলিত হয়ে নাচছে। সিপাহী অনুভব করে, যেন কোন বস্তু তার নাকের সঙ্গে লেপটে আছে। কাচের বলটি তার চোখের সামনে থেকে আপনা-আপনি সরে যায়। সিপাহী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তন্দ্রাভাব কেটে যায় সিপাহীর। এখন সে প্রকৃতিস্থ। মেয়েটি তার মাথায় হাত বুলাচ্ছে। চোখ খুলে দেখতে পায়, সে জাজিমের উপর বসে আছে। মেয়েটির একটি বাহু তার মাথার নীচে। মেয়েটি আধা শোয়া আধা বসা। সিপাহী উঠে বসে। রাজ্যের বিস্ময় তার মাথায়, বেজায় অস্থির। তার মুখ থেকে প্রথম কথা বের হয়– 'তিনি বলছিলেন, এটি তোমার দাদার সিংহাসন। এটি তোমার পৈত্রিক সম্পদ।'

'হযরতও একথাই বলেছেন।' মেয়েটি অত্যন্ত কোমল ও আন্তরিক কণ্ঠে বলল।

'হযরত কোথায়?' সিপাহী জিজ্ঞেস করে।

'তিনি আজ আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না।' মেয়েটি জবাব দেয়। 'তুমি বলেছিলে রাতের শেষ প্রহরে তোমার ডিউটি আছে। সেজন্য আমি

তোমাকে জাগিয়ে দিলাম। এখন মধ্যরাত। তুমি এবার চলে যাও।'

সিপাহী ওখান থেকে উঠতে চাচ্ছে না। সে মেয়েটির নিকট জানতে চায়– 'আমি স্বপ্ন দেখলাম, না বাস্তব।'

মেয়েটি বলল– 'না, তুমি স্বপ্ন দেখনি, এটা হযরতের বিশেষ কেরামত। তার প্রতি নির্দেশ, তিনি কোন ভেদ নিজের কাছে রাখতে পারবেন না। যার ভেদ তার নিকট পৌঁছিয়ে দেবেন। কিন্তু এই হালত তার মাঝে-মধ্যে দেখা যায়, সব সময় থাকে না। আবার কখন দেখা দেবে বলতে পারব না।'

সিপাহী মেয়েটির কাছে অনুনয়-বিনয় করতে শুরু করে। মেয়েটি বলল. 'তুমি আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছ। আমার আত্মাটা আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। আমি প্রয়োজন হলে তোমার জন্য নিজের জীবনও উৎসর্গ করে দেব। আমি তোমাকে কোনদিন যেতে দেব না। কিন্তু তোমার কর্তব্য পালন করাও তো জরুরী। এখন চলে যাও। আগামী রাতে আবার এস। আমি হযরতকে বলব, যেন তিনি তোমার ভেদ তোমাকে দিয়ে দেন।'

সিপাহী দুর্গ থেকে বের হয়। তার পা উঠছে না। তার মস্তিষ্কে দাদার তখতে সুলায়মানী জেঁকে বসেছে। হৃদয়টা দখল করে আছে মেয়েটা। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। কিন্তু দুর্গের ধ্বংসস্তূপটা তার কাছে রাজমহলের ন্যায় হৃদয়কাড়া মনে হচ্ছে। আনন্দের ঢেউ খেলছে তার মনে। এখন তার মনে কোন ভীতি নেই, অস্থিরতা নেই।

✿ ✿ ✿

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পূর্ণ দৃষ্টি সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ পরিকল্পনায় নিবদ্ধ। তিনি নিজের ও উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের আরাম হারাম করে রেখেছেন। ইন্টেলিজেন্স ইনচার্জ হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে এ চিন্তাও মাথায় রেখেছেন যে, সুলতান আইউবী নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে সবসময় উদাসীন থাকেন। তাঁর দেহরক্ষী কমান্ডার একাধিকবার হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট অভিযোগ করেছেন যে, সুলতান অনেক সময় তাকে কিছু না জানিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যান এবং তিনি ভেতরে আছেন মনে করে আমরা শূন্যকক্ষ পাহারা দেই। কমান্ডার সুলতান আইউবীর সঙ্গে দু'-চারজন গার্ড ছায়ার মত জড়িয়ে রাখতে চায়। কমান্ডারকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, ফেদায়ী ঘাতকদল পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে সুলতান আইউবীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দামেস্কে ঢুকেছে। এই সংবাদ কমান্ডারকে আরো বেশী পেরেশান করে তুলে। কিন্তু সুলতান আইউবী নিজে এতই বেপরোয়া যে,

হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ যখন তাকে বললেন, 'মহামান্য সুলতান! আপনি কখনো গার্ড ছাড়া বের হবেন না।' তখন সুলতান মুখে মুচকি হাসি টেনে তার পিঠ চাপড়ে বলেন, 'আমাদের প্রত্যেকের জীবন আল্লাহর হাতে। রক্ষীদের উপস্থিতিতে খুন করার উদ্দেশ্যে আমার উপর চারবার হামলা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল, আমি আরো ক'দিন বেঁচে থাকব। আমি আল্লাহর পথে চলছি। তিনি যদি ভিন্ন কিছু কামনা করেন, তাহলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারব না। মোহাফেজরা পারবে না আমার মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখতে।'

'কিন্তু তারপরও মোহতারাম সুলতান!'– হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ বললেন– 'আমার এবং রক্ষী বাহিনীর কর্তব্য তো এমন যে, আমরা আপনার বিশ্বাস ও আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারি না। আমি ফেদায়ীদের সম্পর্কে যে তথ্য পেয়েছি, তাতে রাতেও আমাকে আপনার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত।'

'আমি তোমার ও তোমার রক্ষী বহিনীর কর্তব্যবোধকে শ্রদ্ধা করি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কিন্তু যখন আমি মোহাফেজবেষ্টিত হয়ে বাইরে বের হই, তখন আমার নিকট মনে হয় যেন জনগণের উপর আমার কোন আস্থা নেই। নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের অভাব থাকলেই কেবল শাসকগোষ্ঠী জনগণকে ভয় করে থাকে।'

'ভয় জনগণের নয় মাননীয় সুলতান!'– হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ বললেন– 'আমি ফেদায়ীদের প্রসঙ্গে বলছি।'

'ঠিক আছে, আমি সাবধান থাকব।' সুলতান আইউবী হেসে বললেন।

সর্পকেল্লা থেকে ফিরে এসে রক্ষী সিপাহী তার ডিউটিতে চলে যায়। দিনটা সে এই মানসিক অবস্থার মধ্যে কাটায় যে, কল্পনায় তখ্‌তে সুলায়মান ও মেয়েটিকে দেখতে থাকে। সন্ধ্যা গভীর হওয়ামাত্র আবার সে দুর্গ অভিমুখে হাঁটা দেয়। এবার তার মনে কোন ভয় নেই। দুর্গের ফটক অতিক্রম করে অন্ধকারে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বলল– 'আমি এসে পড়েছি। অগ্রসর হতে পারি কি?'

তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সে মশালের আলো দেখতে পায়। মশালটা তার থেকে খানিকটা দূরে এসে থেমে যায়। মশালধারী বলল– 'কক্ষে ঢুকে অবশ্যই হযরতের পায়ে সিজদা করবে। আজ তিনি কাউকে সাক্ষাৎ দিতে রাজি নন, তুমি যখন এসে পড়েছ, তোমার জন্য ব্যবস্থা করা হবে।'

গতরাতের ন্যায় আজও আঁকাবাঁকা গলিপথ অতিক্রম করে সিপাহী মশলবাহী লোকটির পেছনে পেছনে হযরতের কক্ষের দরজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। হযরত তাকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করেন। সিপাহী কক্ষে ঢুকে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে এবং নিবেদন করে– 'হযরত! আমাকে কী দেখাবেন বলেছিলেন, দেখিয়ে দিন।'

হযরত হাততালি দেন। সঙ্গে সঙ্গে গতরাতের মেয়েটি পাশের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। সিপাহীকে দেখে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি একটি হাসি দেয়– ভুবন মতানো হাসি। সিপাহী মেয়েটিকে নিজের কাছে বসানোর জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। হযরত মেয়েটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'লোকটা আজো এসে পড়েছে। আমি কি এখানে তামাশা দেখাতে বসেছি!'

'আপনি এই গুনাহগারকে ক্ষমা করে দিন'– মেয়েটি বলল– 'লোকটা বড় আশা নিয়ে অনেক দূর থেকে এসেছে।'

কিছুক্ষণ পর। কাচের ছোট্ট গোলকটি সিপাহীর হাতে। তার আগে মেয়েটি তাকে শরবত পান করিয়েছে। এখন তার পেছনে বসে পিঠটা নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বাহু দ্বারা তাকে জড়িয়ে রেখেছে, যেন মা তার শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে আছে। সিপাহী হযরতের সুরেলা কণ্ঠ শুনতে পায়– 'আমি সুলায়মান বাদশাহর রাজপ্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। আমি সুলায়মান বাদশাহর সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি।' আওয়াজটা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে, যেন বক্তা আস্তে আস্তে দূর থেকে দূরান্তে চলে যাচ্ছে।

'উহ!'– হতচকিত হয়ে সিপাহী বলল– 'এমন প্রাসাদ ইহজগতের কোন রাজা-বাদশাহর হতে পারে না।'

'আমি এই প্রাসাদে জন্মলাভ করেছিলাম'– সিপাহী কারো কণ্ঠ শুনতে পায়– 'আমি এই প্রাসাদেই জন্মলাভ করেছিলাম।' পরক্ষণে এটি তার নিজের কণ্ঠে পরিণত হয়ে যায়। তারপর সে অনুভব করে, যেন তারই অস্তিত্বের মধ্যে এই আওয়াজটি সঞ্চারিত হচ্ছে– 'আমি এই প্রাসাদে জন্মলাভ করেছিলাম।'

কিন্তু পরক্ষণেই এখন আর কোন সাড়াশব্দ নেই। সিপাহী এখন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। এখন তার চোখের সামনে একটি মহল ভাসছে এবং নিজে তার বাইরে একটি বাগানের ভেতর ঘোরাফেরা করছে। এখন আর কাচের মধ্যদিয়ে নয়, এসব সে বাস্তবেই প্রত্যক্ষ করছে। ইচ্ছে করলে এখন সে বাগান, ফুল ইত্যাদি হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে, শুকতে পারে। এখন সে কারো সিপাহী নয়– রাজপুত্র।

হঠাৎ মহলটি সিপাহীর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায়। এখন সে বিস্ময়কর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তাকিয়ে দেখে, সে মেয়েটির কোলে বসে আছে। মেয়েটিকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে সে। মেয়েটি বলে– 'হযরত বলে গেছেন, এই লোকটি (অর্থাৎ তুমি) রাজপুত্র ছিল। এখনো সে রাজপুত্র হতে পারে। তিনি জানতে চেষ্টা করছেন, তোমার সিংহাসন কে দখল করে আছেন। তিনি বলে গেছেন, তুমি যদি সাত-আট দিন এখানে থাক, তাহলে সবকিছু জানতে পারবে এবং তোমাকে সবকিছু দেখানো হবে।'

❁ ❁ ❁

পরের রাত। সিপাহী স্বর্পকেল্লার উক্ত কক্ষে উপবিষ্ট। চার দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে সে। মেয়েটি আগের পেয়ালাটিতে করে তাকে শরবত পান করায় এবং কাচের বলটি তার হাতে দেয়। কারো কিছু বলার অপেক্ষা না করেই সে বলটি চোখের সামনে ধরে তার মধ্যদিয়ে দীপশিখা দেখতে থাকে। শিখার মধ্যে রং-বেরঙের আলোর খেলা দেখতে পায় সে। হযরত তার জাদুকরী ধারায় কিছু বলতে শুরু করেন। ইতিপূর্বে সে কয়েকবার এররূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। প্রথম সে কাচের বলের মধ্যে তখ্‌তে সুলায়মান এবং দ্বিতীয়বার শাহে সুলায়মান দেখেছিল। কিন্তু পরক্ষণে আর তার হাতে বলটি থাকত না। বলটির মধ্যদিয়ে যখন সে কিছু দেখতে শুরু করত, তখনই হযরত কিংবা মেয়েটি সিপাহীর হাত থেকে বলটি নিয়ে যেত।

আজ তৃতীয় রাতে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। কালো দাড়িওয়ালা হযরত তার সামনে বসে পড়ে এবং তার চোখে চোখ রেখে জাদুকরী ভাষায় ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে– 'এটি ফুল, এটি বাগিচা। আমি বাগানে আছি।' দেখাদেখি সিপাহীও একই কথা উচ্চারণ করছে। মেয়েটি সিপাহীর গা ঘেঁষে বসে তার চুলে বিলি কাটছে।

সিপাহী একটি বাগিচা দেখতে পায়। বাগানটি উঁচু-নীচু। সর্বত্র ফুলের সমারোহ। যেদিকে চোখ পড়ে শুধু ফুল আর ফল। মন মাতানো সৌরভ মৌ মৌ করছে। সিপাহী দেখতে পায়, বাগিচার মধ্যে একটি মেয়ে পায়চারী করছে। মেয়েটি অত্যন্ত রূপসী। তার গায়ে এক রংয়ের পোশাক। কিন্তু তা দুনিয়ার কোন রং নয়। সিপাহী এখন সর্পকেল্লার কক্ষে নয়। কালো দাড়িওয়ালা হযরত আর সঙ্গের মেয়েটি থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ও সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে সে। বাগিচায় অপরূপ সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে দুর্গ থেকে বেরিয়ে তার দিকে ছুটে যায়। মেয়েটিও তার দিকে দৌড়ে আসে। মেয়েটির শরীর

থেকে ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে। সিপাহী সুলায়মান বাদশাহর বংশের রাজপুত্র। মেয়েটির সঙ্গে তাকে মানিয়েছে বেশ। দু'জন বাগিচার এক কোণে চলে যায়। ওখানে গুহাসম একটি জায়গা। গুহাটিও ফুল দিয়ে সাজানো। মেঝেতে ঘাসের ন্যায় মখমল বিছানো।

ফুলসজ্জিত গুহার এক কোণ থেকে সুন্দর একটি কলসি বের করে আনে মেয়েটি। তার থেকে কি যেন ঢেলে পেয়ালায় নিয়ে সিপাহীর হাতে দেয়। মদ। মেয়েটির রূপ আর ভালবাসার নেশা সিপাহীকে আগে থেকেই মাতাল করে রেখেছে। এবার মদের নেশা তাকে আরো মাতাল করে তুলে। মেয়েটি বলল, 'তুমি থাক। আমি এক্ষুণি আসছি।' বলেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। মুহূর্ত পর সিপাহী মেয়েটির চীৎকার শুনতে পায়– আর্তচিৎকার। সিপাহী বাইরের দিকে ছুটে যায়। এদিক-ওদিক তাকায়। কিন্তু মেয়েটি নেই কোথাও। সে চিৎকারের শব্দ অনুসরণ করে দৌড়াতে থাকে। মেয়েটির হৃদয়বিদারক চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সিপাহী ক্ষুব্ধ হয়ে তরবারী হাতে নিয়ে মেয়েটিকে খুঁজতে থাকে। পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করছে সে। অবশেষে খুঁজতে খুঁজতে সিপাহী এক বৃদ্ধাকে দেখতে পায়। বৃদ্ধা তাকে জানায়, তুমি যাকে খুঁজছ, তাকে আর পাওয়া যাবে না। যে ব্যক্তি তোমার প্রেয়সীকে নিয়ে গেছে, সে তোমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। তাকে তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। তাকে যে নিয়ে গেছে, সে এখন সেই সিংহাসনে আরোহণ করবে, যেখানে তোমার বসবার কথা ছিল। ছুটাছুটি করে লাভ নেই। বেঁচে থাক, সময় সুযোগ মতো তাকে খুন করে তোমার প্রিয়াকে উদ্ধার করে এন। মেয়েটি তোমার বিরহে নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'আমার প্রিয়াকে যে নিয়ে গেল, সে কে?' সর্পকেল্লার মহলের কক্ষে ফিরে এসে সিপাহী জিজ্ঞেস করে– 'আর আমি এসব কী দেখলাম?'

'তুমি তোমার অতীত জীবন দেখেছ'– হযরত বললেন– 'আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি।'

'না, আমি ওখান থেকে ফিরে আসতে চাই না'– অস্থির ও ব্যাকুল কণ্ঠে সিপাহী বলল– 'আমাকে ওখানেই পাঠিয়ে দিন।'

'ওখানে গিয়ে তুমি কী করবে?'– হযরত জিজ্ঞেস করেন– 'যার জন্য যাওয়া, তাকে অন্য কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সে তো এখন অন্যের দখলে। তুমি যতক্ষণ না তাকে হত্যা করবে, ততক্ষণ ওকে ফিরে পাবে না। আমি চাই না তুমি কাউকে হত্যা কর। আর তুমি তাকে হত্যা করতে পারবেও না।'

'হযরত!'– সিপাহী গর্জে ওঠে– 'কাউকে খুন করে যদি আমি পৈত্রিক সিংহাসন আর প্রেয়সীকে ফিরে পেতে পারি, তাহলে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর চেয়েও মর্যাদাবান এবং ক্ষমতাসম্পন্ন লোককে আমি খুন করব।'

'তারপর সেই খুনের দায় আমার ঘাড়ে চাপাবে, না দোস্ত!' হযরত বললেন।

সিপাহী তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে মাথা ঠুকতে শুরু করে– 'হযরত! হযরত!' বলে ক্রন্দন করতে থাকে।

হযরত সিপাহীকে আবার সেই জগতে পৌঁছিয়ে দেন, যেখানে তখ্‌তে সুলায়মানী ছিল, মহল ও বাগিচা ছিল। সিপাহীর কানে আওয়াজ আসতে শুরু করে– 'এই তো সেই ব্যক্তি, যে তোমার দাদাকে হত্যা করেছে, তোমার পিতাকে হত্যা করেছে। তোমার সিংহাসন ও মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তোমার প্রেয়সী এরই হাতে বন্দী।'

'না না, ইনি নন'– সিপাহী ভয়জড়িত কণ্ঠে বলল– 'ইনি তো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।'

'আরে ইনিই তো তোমার ভাগ্যের হন্তা।'– সিপাহীর কানে আওয়াজ আসতে শুরু করে– 'ইনি তোমার সুলতান হতে পারেন না। ইনি কুর্দী আর তুমি আরব। তুমি বল, সালাহুদ্দীন আইউবী আমার দাদার ঘাতক, আমার পিতার ঘাতক, আমার সিংহাসন ও রাজমুকুট ছিনতাইকারী। ভেদ বেরিয়ে এসেছে, রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। তুমি প্রতিশোধ নাও। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকে।'

সিপাহী এই জাদুময় পরিবেশে চক্কর কাটছে আর জপ করছে– 'সালাহুদ্দীন আইউবী আমার দাদার হন্তারক, আমার পিতার ঘাতক, আমার সিংহাসন ও রাজমুকুট ছিনতাইকারী, আমার প্রেমের সংহারক, আমার ভাগ্যের খুনী।'

এখন তার দৃষ্টির সামনে শুধুই সালাহুদ্দীন আইউবী। সালাহুদ্দীন আইউবী তার চোখের সামনে হাঁটছেন, চলাফেরা করছেন। সিপাহী হাতে খঞ্জর তুলে নিয়ে তার পেছনে পেছনে হাঁটছে। কিন্তু খুন করার মওকা পাচ্ছে না।

হঠাৎ প্রেয়সী মেয়েটি চোখে পড়ে সিপাহীর। পিঞ্জিরায় আবদ্ধ মেয়েটি। সালাহুদ্দীন আইউবী যেন পিঞ্জিরার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছেন। মেয়েটি সিপাহীর প্রতি করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সুলতান আইউবীর চেহারাটা ধীরে ধীরে হিংস্র হয়ে ওঠছে। সিপাহী বলা বন্ধ করে। এবার তার কানে শূন্য থেকে আওয়াজ ভেসে আসে– 'সালাহুদ্দীন আইউবী আমার দাদার ঘাতক, আইউবী আমার পিতার হন্তারক...।'

❁ ❁ ❁

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিজ কক্ষে তাঁর উপদেষ্টাবৃন্দ ও ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে কথা বলছেন। নতুন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করছেন তিনি। সর্পকেল্লায় গিয়ে আসা মোহাফেজ সিপাহী এই মুহূর্তে সুলতানের প্রহরায় বাইরে দণ্ডায়মান। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর উপদেষ্টা প্রমুখ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। সুলতান আইউবী একাকী কক্ষে থেকে যান। সিপাহী হন হন করে কক্ষে ঢুকে পড়ে এবং সুলতানের মাথার উপর তরবারী উঁচিয়ে বলে ওঠে– 'তুমি আমার দাদার ঘাতক, তুমি আমার পিতার ঘাতক।' সুলতান চকিতে তার দিকে ফিরে তাকান– 'ওকে মুক্ত করে দাও, ও আমার স্ত্রী।' সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় ক্ষোভের সাথে সিপাহী সুলতান আইউবীর উপর তরবারীর আঘাত হানে। সুলতানের হাতে কিছু নেই। তিনি কৌশলে আঘাত প্রতিহত করেন। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে রক্ষী কমান্ডারকে ডাক দেন এবং উঠে ছুটে গিয়ে নিজের তরবারীটা হাতে তুলে নেন। সিপাহী আরো অধিক ক্ষুব্ধ হয়ে পুনরায় আঘাত হানে। সিপাহীর টার্গেট যদি সুলতান আইউবী না হতেন, তাহলে তার মতো অভিজ্ঞ সৈনিকের একটি আঘাতও ব্যর্থ হতো না। সুলতান আইউবী শুধু তার আক্রমণ প্রতিহত করেন। নিজে একটি আঘাতও করলেন না। ডাক শুনে কমান্ডার যখন ছুটে আসে, তখন সুলতান তাকে বললেন, ওকে আঘাত কর না; অক্ষত ধরে ফেল।

সিপাহী চক্কর কেটে কমান্ডারের উপর আঘাত হানে। ইতিমধ্যে তিন-চারজন বডিগার্ড কক্ষে ঢুকে পড়ে। সিপাহী এতই ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত যে, সে একের পর এক আঘাত হেনে কাউকেই তার কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। তার লক্ষ্য সুলতান আইউবীকে হত্যা করা। তাই তাকে উদ্দেশ করে গর্জন করে বলছে– 'তুমি আমার দাদার ঘাতক, আমার পিতার ঘাতক, তুমি আমার সিংহাসন ও রাজমুকুট কেড়ে নিয়েছ।'

অবশেষে তাকে পাকড়াও করা হল। তার থেকে তরবারী ছিনিয়ে নেয়া হল।

'ধন্যবাদ আমার মোহাফেজ!'– সুলতান আইউবী ক্ষোভ জাহির করার পরিবর্তে সিপাহীর প্রশংসা করে বললেন– 'সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য তোমার মত দক্ষ অসিবাজের প্রয়োজন রয়েছে।'

রক্ষী কমান্ডার ও অন্যান্য সিপাহীরা বিস্ময়ে হতবাক যে, ঘটনা কী ঘটল! সুলতান আইউবী কমান্ডারকে বললেন– 'ডাক্তার এবং হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে এক্ষুণি নিয়ে আস।'

চারজন বডিগার্ড সিপাহীকে ঝাঁপটে ধরে রেখেছে। সিপাহী চিৎকার করছে– 'ইনি আমার ভালাবাসার ঘাতক। ইনি আমার ভাগ্যের হন্তারক।'

এক বডিগার্ড হাত দ্বারা সিপাহীর মুখটা চেপে ধরে। কিন্তু সুলতান বললেন– 'ওকে বলতে দাও, মুখ থেকে হাত সরিয়ে নাও'– তিনি সিপাহীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'বলতে থাক দোস্ত! বল, তুমি কেন আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে?'

'ওকে মুক্ত করে দিন'– সিপাহী চীৎকার করে বলল– 'আপনি ওকে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। হযরত আমাকে বলেছেন, আমি নাকি আপনাকে খুন করতে পারব না। আসুন, আমার মোকাবেলা করুন, আপনি নিজেকে রক্ষা করার জন্য কাপুরুষের ন্যায় এতগুলো লোক জড়ো করেছেন। তরবারী বের করুন, আমার তরবারীটা আমাকে দিয়ে দিন, আপনি ময়দানে আসুন। '

সুলতান আইউবী অপলক তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সিপাহীর প্রতি তাকিয়ে আছেন। বডিগার্ড সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। হামলাকারী সিপাহীকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। তার অপরাধ লঘু নয়। হত্যার উদ্দেশ্যে সুলতান আইউবীর উপর হামলা করেছে। সুলতান যদি উদাসীন থাকতেন কিংবা কক্ষে সিপাহীর প্রবেশ দেখে না ফেলতেন, তাহলে তাঁর খুন হয়ে যাওয়া নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সুলতান আইউবী তাকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন না। সিপাহী বকে যাচ্ছে উন্মাদের ন্যায়। এমন সময়ে ডাক্তার এসে গেছেন। তার খানিক পর হাসান ইবনে আব্দুল্লাহও এসে পড়েন। ভেতরের পরিস্থিতি দেখে তিনি হতবাক্ হয়ে যান।

'একে নিয়ে যান।'– সুলতান আইউবী ডাক্তারকে বললেন– 'লোকটা বোধ হয় হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে।'

'লোকটা চারদিন ছুটি কাটিয়ে এসেছে' রক্ষী কমান্ডার বললেন– 'আসার পর থেকে লোকটা কোন কথা বলছে না।'

সিপাহীকে টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তারও সঙ্গে চলে যান। সুলতান আইউবী হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে অবহিত করলেন, 'এই সিপাহী হত্যার উদ্দেশ্যে আমার উপর হামলা করেছে।' হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সন্দেহ ব্যক্ত করলেন, 'লোকটা ফেদায়ী হতে পারে।' সুলতান বললেন, 'যে কারণেই হোক, লোকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।' সুলতান হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে বললেন, 'একে ভালভাবে জিজ্ঞাসাবাদ কর, তথ্য নাও।'

দীর্ঘক্ষণ পর ডাক্তার সুলতান আইউবীর নিকট ফিরে এসে তথ্য প্রদান করেন, আপনার এই সিপাহীকে লাগাতার কয়েকদিন পর্যন্ত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে এবং তার উপর হেপটানিজম প্রয়োগ করা হয়েছে। ডাক্তার তার নিঃশ্বাস শুঁকে বুঝতে পারেন যে, লোকটাকে নেশাকর দ্রব্য খাওয়ানো বা পান করানো হয়েছে। তিনি সুলতান আইউবীকে জানান, 'হেপটানিজম চিকিৎসা শাস্ত্রে বিস্ময়কর কোন বিষয় নয়। এর উদ্ভাবক হল হাসান ইবনে সাব্বাহ। আপনার হয়ত জানা আছে, হাসান ইবনে সাব্বাহ এক প্রকার নেশাকর শরবত আবিষ্কার করেছে। যে-ই তা পান করে, তার চোখের সামনে অত্যন্ত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য ভেসে ওঠে। সেই অবস্থায় যে কথাই তার কানে দেয়া হোক, তা তার সামনে বাস্তব সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। হাসান ইবনে সাব্বাহ এই নেশা আর হেপটানিজমেরই ভিত্তিতে একটি জান্নাত তৈরি করে রেখেছে, যাতে কেউ একবার প্রবেশ করলে আর বের হতে চায় না। সে মাটির চাকা আর কংকর মুখে দিয়ে মনে করে, অতি সুস্বাদু খাবার খাচ্ছে। কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে মনে করে গালিচার উপর দিয়ে চলছে। হাসান ইবনে সাব্বাহ দুনিয়া থেকে চলে গেছে ঠিক, কিন্তু তার এই শরবত আর প্রক্রিয়া দুনিয়াতে রেখে গেছে। তার অনুসারীরা 'ঘাতক চক্র' হিসেবে অবির্ভূত হয়েছে। এরা কার্যসিদ্ধির জন্য সুন্দরী নারী আর 'শরবতের' ব্যবহার করে। আমি যতটুকু বুঝেছি, এই সিপাহী আপনাকে হত্যা করার লক্ষ্যে এই হেপটানিজম প্রক্রিয়ার শিকার।'

ডাক্তার সিপাহীকে ঔষধ সেবন করান। অল্প সময়ের মধ্যেই ঔষধ ক্রিয়া করতে শুরু করে। সিপাহী শান্ত হয়ে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ে। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ জানতে পারেন যে, সিপাহী ইতিমধ্যে চারদিনের ছুটিতে গিয়েছিল। কিন্তু ছুটিটা কোথায় কাটিয়ে এসেছে, তা কেউ জানে না। সর্পকেল্লা সম্পর্কে শহরে যে গুজব ছড়িয়েছে, হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ গোয়েন্দা মারফত সে সংবাদ পেয়ে গেছেন। মানুষ বলাবলি করছে, সর্পকেল্লায় এক বুজুর্গ আত্মপ্রকাশ করেছেন, যিনি অদৃশ্যের খবর বলতে পারেন এবং মানুষের মনোবাসনা পূরণ করে দেন। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর এক গুপ্তচর রিপোর্ট করেছে, আমি কালো দাড়িওয়ালা এক বুজুর্গকে দু-দু'বার দুর্গে ঢুকতে দেখেছি। কিন্তু হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। তিনি মনে করেছেন, এ ধরনের পীর-বুজুর্গদের উৎপাত-আনাগোনা তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অনেক সময় মানুষ উন্মাদ-

দেওয়ানাকে বুজুর্গ মনে করে তাদের পিছনে ছুটতে শুরু করে।

দুর্গের আশপাশে চলাচলকারী লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের এক ব্যক্তি জানায়, 'হ্যাঁ, আমি কালো দাড়ি ও সাদা চোগা পরিহিত এক ব্যক্তিকে দুর্গে আসা-যাওয়া করতে দেখেছি।' এরূপ একাধিক সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সেদিনই সূর্যাস্তের কিছু আগে একটি সেনাদল প্রেরণ করে কেল্লায় হানা দেন। সৈন্যরা মশাল নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। দুর্গের অভ্যন্তরে আঁকা-বাঁকা পথ। বিধ্বস্ত দেয়াল ও ছাদের ধ্বংসাবশেষ। কয়েকটি কক্ষ এখনো অক্ষত আছে। সৈন্যরা দুর্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ এক কোন থেকে শোরগোল ভেসে আসে। কয়েকজন সিপাহী সেদিকে দৌড়ে যায়। ওখানে দু'জন সিপাহী মাটিতে পড়ে তড়পাচ্ছে। তাদের বুকে তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। ইতিমধ্যে আরো তিন-চারটি তীর ছুটে আসে। পড়ে যায় আরো তিন-চারজন সিপাহী। কয়েকজন সিপাহী এই ভয়ে পেছনে সরে যায় যে, এরা মানুষ নয়– ভূত-প্রেত হবে নিশ্চয়ই। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ ছিলেন বাস্তববাদী মানুষ। তিনি সিপাহীদের উৎসাহ প্রদান করে বললেন, এই তীর মানুষই ছুঁড়ছে। তিনি অবরোধের বিন্যাস পরিবর্তন করে ঘেরাও সংকীর্ণ করতে শুরু করেন। কিন্তু তারা কোথাও কোন মানুষ দেখতে পেলেন না। কেবল অজ্ঞাত স্থান থেকে দু'-চারটি তীর ছুটে আসছে আর তাতে দু'-চারজন সিপাহী জখম হচ্ছে।

হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ আরেক দল সৈন্য ডেকে আনেন। রাত গভীর হয়ে গেছে। তিনি অনেকগুলো মশালেরও ব্যবস্থা করেন। সিপাহী যে কক্ষটিতে যাওয়া-আসা করেছিল, এক সেনা ইউনিটের কমান্ডার সে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই ভয়ংকর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এমন সাজানো-গোছানো মনোরম একটি কক্ষ দেখে কমান্ডার ভয় পেয়ে যায়। জিন-ভূতের আবাস কিনা কে বলবে। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে তলব করা হল। তিনি এসে ভেতরে প্রবেশ করে সামানপত্র দেখতে শুরু করলেন। আস্তে আস্তে রহস্য উন্মোচিত হতে লাগল। ইতিমধ্যে কয়েকজন সিপাহী কালো দাড়িওয়ালা লোকটিকে কোথাও থেকে ধরে নিয়ে আসে। তার সঙ্গে অতিশয় রূপসী একটি মেয়ে। তার পরক্ষণেই ধরা পড়ল অন্য এক স্থানে লুকিয়ে থাকা আরো ছয়জন। তাদের হাতে তীর-ধনুক। কালো দাড়িওয়ালা নিজেকে দুনিয়াত্যাগী নির্জনবাসী বুযুর্গ দাবি করে সাধু সাজতে চেষ্টা করে। কিন্তু সঙ্গের রূপসী যুবতী ও তীর-ধনুক-সজ্জিত সেনা বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা

তাকে মিথ্যুক বলে প্রমাণিত করে। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ তাদের সামানপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন।

কক্ষে পাওয়া গেছে তিন-চারটি সোরাহী ও পানপাত্র। বস্তুগুলো রাতেই হাকীমের হাতে তুলে দেয়া হয়। হাকীম সেগুলো নাকে শুঁকেই বলে দিলেন, আমি হাসান ইবনে সাব্বার যে শরবত উদ্ভাবনের কথা বলেছিলাম, এগুলো থেকে তারই ঘ্রাণ পাচ্ছি। মেয়েটিসহ গ্রেফতারকৃত সবাইকে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখা হল।

পরদিন ভোরবেলা। এখনো সূর্য উদিত হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের প্রথম ধাপেই মেয়েটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে দেয়– 'লোকগুলো ফেদায়ী ঘাতক।' কালো দাড়িওয়ালা লোকটি নতুন শপথ নিয়ে এসেছে, হয়ত সুলতান আইউবীকে হত্যা করে ফিরবে, অন্যথায় নিজে জীবন দেবে। মেয়েটি জানায়, এই মোহাফেজ সিপাহীকে কালো দাড়িওয়ালা ফাঁদে ফেলেছে এবং নেশা পান করিয়ে তার উপর হেপটানিজম প্রয়োগ করেছে। সেই নেশা আর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে এমন ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে সুলতানকে হত্যা করার জন্য ছুটে এসেছে। আশা ছিল, সুলতান আইউবী এই সিপাহীর হাতে নিহত হবেন। সেজন্য তিনি নিশ্চিন্তে দুর্গে বসে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু কোন তথ্য নিতে পারেননি। সিপাহীকেও কোথাও দেখতে পাননি। আর সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ফৌজ হানা দিয়ে বসে।

কালো দাড়িওয়ালা লোকটি বড় কঠিন হৃদয়ের মানুষ প্রমাণিত হল। সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, মেয়েটির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তার সঙ্গীরাও প্রথম প্রথম অস্বীকার করে। কিন্তু হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ যখন তাদেরকে পাতাল কক্ষে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন শুরু করে, তখন এক এক করে অপরাধের কথা স্বীকার করে। কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে যখন তাদের সামনে উপস্থিত করা হল, তখন আর তার অস্বীকার করার কোন উপায় থাকল না। সঙ্গীদের করুণ দৃশ্য দেখামাত্র তার কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। তাকে বলা হল, সব ঘটনা খুলে বললে তোমাকে স্বসম্মানে রাখা হবে। অন্যথায় তুমি বাঁচতেও পারবে না, মরতেও পারবে না। হাড়-গোশত একাকার হওয়ার আগে সত্য সত্য বলে দাও। লোকটি কক্ষে নির্যাতনের উপকরণ ও পন্থা-পদ্ধতি দেখে সব কথা বলে দিতে সম্মত হয়ে যায়।

তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক সে ফেদায়ী ঘাতকদলের সদস্য।

ফেদায়ীদের পৃষ্ঠপোষক শেখ সান্নানের বিশেষ ভক্ত। কিন্তু সে নিজ হাতে হত্যা করে না। হাসান ইবনে সাব্বাহ আবিষ্কৃত বিশেষ পন্থায় অন্যকে দিয়ে খুন করায় সে। সকল ঐতিহাসিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ হাসান ইবনে সাব্বাহকে অস্বাভাবিক মেধা দান করেছিলেন, যা সে শয়তানী কাজে ব্যবহার করেছে।

কালো দাড়িওয়ালা জানায়, সুলতান আইউবীকে হত্যা করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে চারবার হামলা করা হয়েছিল। তার প্রতিটি হামলা ব্যর্থ হওয়ার পর আমাকে আবার বিশেষ পন্থা প্রয়োগ করার জন্য পাঠানো হয়েছে। সে জানায়, সুলতান আইউবীর উপর যে ক'টি হামলা হয়েছে, সবক'টিই হয়েছে সরাসরি। তাতে প্রমাণিত হয়েছে, সুলতানকে সোজা পথে হত্যা করা যাবে না। সে তার দলের ছয়জন অভিজ্ঞ লোক ও একটি মেয়েকে নিয়ে দামেস্ক চলে আসে। এসে সর্পকেল্লায় আস্তানা বানায়। এই চক্রটি রাতের অন্ধকারে তাতে প্রবেশ করে। তাদেরই দলের লোকেরা শহরে গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, দুর্গে একজন দরবেশ আত্মপ্রকাশ করেছেন, যার হাতে গায়েবী শক্তি আছে এবং ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারেন। এই গুজবের উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ দুর্গে আসুক এবং লোকটিকে অস্বাভাবিক শক্তিধর পীর-বুজুর্গ বলে বিশ্বাস করুক। তিনি প্রভাব বিস্তার করে এক বা একাধিক লোককে হাত করে নিয়ে তাদের দ্বারা সুলতান আইউবীকে হত্যা করাবে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হল না, একজন মানুষও দুর্গে এল না। কারণ, মানুষ জানত, এই দুর্গে এমন দু'টি নাগ-নাগিনী বাস করে, যাদের বয়স হাজার বছর অতিক্রম করেছে। এখন তারা মানুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং যাকে পায় তাকেই গিলে ফেলে।

এই চক্রের প্রধান কালো দাড়িওয়ালা লোকটি একজন অভিজ্ঞ ঘাতক। তার মাথায় পরিকল্পনা আসে যে, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সুলতান আইউবীর বাহিনীর কোন সিপাহীকে ব্যবহার করতে হবে। সে কয়েকদিন পর্যন্ত খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করে, রক্ষী বাহিনীর সিপাহীরা কোথায় থাকে এবং তাদের ডিউটি কোন্ দিন পড়ে। কিন্তু সে সুলতান আইউবীর দফতর ও বাসগৃহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। কারণ, এ দু'টো হল সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা। কোন নাগরিক কিংবা সাধারণ কোন সৈনিক সে এলাকায় ঢুকতে পারে না। এক পর্যায়ে লোকটি এই সিপাহীর সন্ধান পায় এবং কোন প্রকারে জানতে পারে যে, সে সুলতান আইউবীর

দফতরের রক্ষীসেনা। অর্থাৎ এই লোকটি অনায়াসে সুলতানের দফতর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। দলনেতা এই সিপাহীর উপর নজর রাখতে শুরু করে। তখন তার বেশভূষা ছিল অন্যরকম। একদিন এই সিপাহী বাইরে বের হয়। ঘাতক নেতা তাকে দেখতে পায়। সে পথেই তার গতিরোধ করে এবং এমনভাবে এমন ধারার কথা বলে, যাতে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষও প্রভাবিত না হয়ে পারে না। লোকটা ঘাতকচক্র নেতার জাদুকরী জালে আটকে যায় এবং রাতে দুর্গে চলে যায়।

দুর্গের একটি মনোরম কক্ষে যে আয়োজন-ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল, তা পাথরকে মোমে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এক তো ছিল কক্ষের সাজগোজ, পরিপাটি ও মহামূল্যবান জাজিম বিছানো; তদুপরি যাদুকরী রূপ-যৌবন ও সুডৌল-সুঠাম দেহের অধিকারী অর্ধনগ্ন একটি মেয়ে। মেয়েটির উন্মুক্ত রেশমী চুলে জাদুর আকর্ষণ, যা কিনা একজন দুনিয়াত্যাগী আবেদের মধ্যেও পাশবিকতা জাগিয়ে তোলে। আসল বস্তু হল 'শরবত', যা পান করিয়ে নেশা সৃষ্টি করা হয়। কাচের গোলকটি ব্যবহার করা হয় দৃষ্টিতে ভেল্কিবাজি সৃষ্টি করার জন্যে। সিপাহীর মস্তিষ্কে এই ধারণা দেয়া হয় যে, সে রাজবংশের সন্তান এবং তার বংশ তখ্‌তে সুলায়মানীর উত্তরসূরী।

এই সিপাহী যখন উক্ত কক্ষে প্রবেশ করে, তখন কক্ষের সাজসজ্জা ও মূল্যবান জিনিসপত্র তাকে প্রভাবিত করে ফেলে। কালো দাড়িওয়ালা ঘাতকনেতা তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তারও একটি ক্রিয়া ছিল। উপরন্তু পার্শ্বে একটি রূপসী মেয়েকে পেয়ে সে রীতিমত কাবু হয়ে যায়। মেয়েটি তাকে যে শরবত পান করায়, তাতেও নেশা ছিল। সেই নেশার ক্রিয়া এমন ছিল যে, তাতে মানুষ বাস্তব জগত থকে সম্পর্কহীন হয়ে মন ভোলানো সুদৃশ্য এক কল্পনার জগতে চলে যায়। আর সেই অবস্থায়ই তাকে হেপটানাইজ করা হয় এবং তার মস্তিষ্কে কাঙ্খিত কল্পনা ঢেলে দেয়া হয়। তার হাতে কাচের যে গোলকটি দেয়া হয়, তার মধ্য দিয়ে দীপ শিখার কয়েকটি রং দেখা যায়, যা মূলত ভেল্কি ছাড়া কিছু নয়। কাচের গঠন এমন যে, তার মধ্যদিয়ে অতিক্রমকারী আলো সাতটি বর্ণে প্রতিভাত হয়, যা মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে। পরক্ষণে একটি রূপসী মেয়ে সিপাহীর পার্শ্বে বসে যায় এবং কথায় কথায় প্রকাশ করে যে, সে তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। কালো দাড়িওয়ালা লোকটি জাদুকরী সুরেলা কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করে। তার উচ্চারিত শব্দমালা সিপাহীর কানে পৌঁছে তার মস্তিষ্কে

কাঙ্খিত কল্পনা সাজিয়ে তোলে। কালো দাড়িওয়ালা আন্দাজ করে নেয় যে, সিপাহী এখন প্রকৃতিস্থ নেই। সেই অবস্থায় তার হাত থেকে কাচের গোলকটি নিয়ে গিয়ে তার চোখে চোখ রাখে এবং তাকে হেপটানাইজ করে।

সিপাহী যাকে নিজের আওয়াজ মনে করে, তা মূলত কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তির কণ্ঠস্বর। তারপর সে এমন এক স্তরে গিয়ে উপনীত হয়, যেখানে সে নিজের কল্পনাকে বাস্তব মনে করে তাতে একাকার হয়ে যায়। এবার দুর্বলমনা সিপাহী সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তি তাকে বাস্তব জগতে নিয়ে এসে নিজে অন্য কক্ষে চলে যায় এবং মেয়েটি একাকী সিপাহীর সঙ্গে থেকে যায়। সে সিপাহীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মন-মস্তিষ্কে জেঁকে বসে। এই উদ্দেশ্য সাধনে সে এমন আচরণ ও এমন কথা বলে, যার ক্রিয়া থেকে অন্তত এই সিপাহী রক্ষা পেতে পারে না। সিপাহীকে শুধু 'তখ্‌তে সুলায়মানী' প্রদর্শন করিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় এবং ধারণা দেয়া হয় যে, ভেদ এখনো অবশিষ্ট আছে। সিপাহী সম্পূর্ণরূপে তার জালে ফেঁসে যায়। এবার সে কাকুতি-মিনতি শুরু করে যে, অবশিষ্ট ভেদও বলে দাও। তাকে বলা হল, ঠিক আছে, তুমি আরো কয়েকদিন আমার নিকট থাক। সিপাহী কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে পুনরায় দুর্গে চলে যায়।

সিপাহী টানা চার দিন চার রাত সর্পকেল্লার কক্ষে অবস্থান করে। এ সময়টায় তাকে লাগাতার নেশা ও হেপটানিজমের ক্রিয়াধীন রাখা হয় এবং তার নিষ্ক্রীয় মস্তিষ্কে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কল্পনা সৃষ্টি করে এই বক্তব্য ঢেলে দেয়া হয় যে, সালাহুদ্দীন আইউবী সিপাহীর পিতা ও দাদার ঘাতক এবং তিনি তাদের সিংহাসন দখল করে আছেন। সিপাহীকে একটি রূপসী মেয়ে দেখানো হয় এবং তারপর দেখানো হয়, সুলতান আইউবী মেয়েটিকে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। চারদিন পর তাকে সেই অবস্থায়ই দুর্গ থেকে বের করে দেয়া হয়। সে ডিউটিতে চলে যায় আর সুযোগ পাওয়া মাত্র সুলতান আইউবীর উপর হামলা করে বসে।

✿ ✿ ✿

সিপাহী অচেতন হয়ে পড়ে আছে। হাকীম তার মস্তিষ্ক থেকে নেশার ক্রিয়া দূর করার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করেন। লোকটি বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। হাকীম তার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য একাধিক পন্থা অবলম্বন করেন।

দু'দিন পর সিপাহী চোখ খুলে। সে এমনভাবে উঠে বসে, যেন এতক্ষণ

গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিল এবং স্বপ্ন দেখছিল। উঠে বসেই বিস্মিত চোখে চারদিক তাকাতে শুরু করে। ডাক্তার জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? সে জবাব দেয়, ঘুমিয়ে ছিলাম। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে তার অনেক সময় কেটে যায়। কিন্তু তেমন কিছু বলতে পারল না। সে বলল, চোগা পরিহিত কালো দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তি তাকে সর্পকেল্লায় নিয়ে গিয়েছিল। সে সেখানকার কিছু ঘটনাও শোনায়। কিন্তু তখ্‌তে সুলায়মানী ইত্যাদি যে দেখেছিল, তা তার মনে নেই। তার একথাও স্মরণ নেই যে, সে সুলতান আইউবীর উপর হামলা করেছিল।

সিপাহী অসত্য বলে ধোঁকা দিচ্ছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে যাওয়া হল। সে একজন সৈনিকের ন্যায় সুলতানকে সালাম করে। সুলতান তার সঙ্গে স্নেহসুলভ কথা বলেন। কিন্তু সিপাহীর মনে রাজ্যের বিস্ময়, এদের কী হয়ে গেল, এরা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছে কেন! শেষ পর্যন্ত তাকে তার কৃতকার্য সম্পর্কে অবহিত করা হল। শুনে সে চিৎকার করে ওঠে– 'মিথ্যা কথা, আমি আমার সুলতানের উপর হামলা করতে পারি না। সুলতান আইউবী বললেন, 'আমার এই সিপাহী নিরপরাধ। এ কী কাজ করেছে, তা তাকে স্মরণ করানোরও প্রয়োজন নেই।'

ক্রুশের ছায়াতলে

সুলতান আইউবী জরুরী বৈঠক তলব করেছেন। বৈঠকে অন্যদের সঙ্গে দামেস্কের আমীর একং সেনা কর্মকর্তাগণও উপস্থিত। কারো মন-মেজাজই ভালো নয়। শত্রুরা সুলতান আইউবীর নিবেদিতপ্রাণ একজন রক্ষীসেনাকে দিয়ে তাঁর উপর সংহারী আক্রমণ চালিয়েছে ভেবে আইউবীর সামরিক কর্মকর্তাগণ হতবাক। আল্লাহর মেহেরবানী, সুলতান এবারও রক্ষা পেয়ে গেছেন!

বৈঠকে উপস্থিত সবাই ক্ষুদ্ধ-ক্রুদ্ধ। তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আস-সালেহ ও আমীর-উজীরদের থেকে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। তাদের ধারণা, সুলতান তাদেরকে হামলা সম্পর্কে আলোচনা করতে ডেকেছেন।

সুলতান আইউবীর বক্তব্য শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা গর্জে ওঠলেন। তারা শত্রু থেকে প্রতিশোধ নেয়ার পক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। সুতলান আইউবী ঠাণ্ডা মাথায় মুখে মুচকি হাসির রেখা টেনে বললেন– 'উত্তেজনা, ক্রোধ ও আবেগ পরিহার কর। দুশমন তোমাদেরকে উত্তেজিত করে এমন তৎপরতায় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করতে চায়, যা তোমাদের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনতে পারে। আমার গোটা পরিকল্পনাই এক ধরনের প্রতিশোধমূলক তৎপরতা। কিন্তু এ প্রতিশোধ ব্যক্তির জন্য নয়– দ্বীনের জন্য। আমার জীবন, আমার ব্যক্তিস্বত্ত্বা, তোমাদের জীবন ও ব্যক্তিস্বত্ত্বার গুরুত্ব এর বেশী নয় যে, আমরা ইসলামী দুনিয়ার মোহাফেজ। ইসলামের ও ইসলামী ভূখণ্ডের জন্য আমাদেরকে জীবন দিতে হবে। আমরা যুদ্ধের ময়দানে মারা যেতে পারি। প্রতারিত হয়ে শত্রুর হাতেও প্রাণ হারাতে পারি। শাসক আর মুজাহিদদের মধ্যে এই পার্থক্য। শাসক হেফাজত করে নিজেকে আর ক্ষমতাকে। কিন্তু মুজাহিদ দেশ, জাতি ও দ্বীনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়। আস-সালেহ ও তার আমীর-উজীরগণ তাদের রাজত্বের হেফাজত করছে। তাদের পরাজয় অবধারিত।'

সুলতান আইউবী গোয়েন্দা উপপ্রধান হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে বললেন– "দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মালিকানাবিহীন যেসব পরিত্যক্ত প্রাসাদ আছে, সেগুলো গুড়িয়ে দাও।' তিনি এই নির্দেশও জারি করেন যে, 'দেশের মসজিদগুলোর ইমামদেরকে বলে দাও, যেন তারা এই মর্মে বয়ান করেন যে,

দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের মালিক আল্লাহ এবং গায়েবের অবস্থা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর ও বান্দার মাঝে যোগাযোগের মাধ্যমে হতে পারে না। আল্লাহ সরাসরি যে কারো কথা শুনেন। কোন মানুষের সামনে সেজদাবনত হওয়া মস্তবড় পাপ। তোমরা দেশবাসীকে ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও কল্পনাবিলাস থেকে রক্ষা কর।'

সুলতান আরো বললেন, 'তোমরা সৈনিকদেরকে বুঝাও, যুদ্ধের ময়দানে যেমন তোমরা নিজেদের দেহকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে থাক, তেমনি বিশ্বাস ও মনন-মানসকেও দুশমনের হামলা থেকে রক্ষা করে চল। আর এই আক্রমণ তরবারীর নয়– মুখের আক্রমণ। দেহের জখম একদিন ভাল হয়ে যায়, দেহ আহত হয়েও লড়াই করে থাকে। কিন্তু মানুষের বিশ্বাস, মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারা আহত হয়ে পড়লে দেহ বেকার হয়ে যায়। তোমরা নেশার ক্রিয়া তো দেখেছ। নেশাগ্রস্ত হয়ে আমার একজন দেহরক্ষী আমারই উপর হামলা করে বসেছে! কিন্তু পরে যখন তার মস্তিষ্ক থেকে নেশা দূর হয়ে গেল, তখন আর সে স্বীকারই করল না যে, সে আমার উপর হামলা করেছে। এই নেশার মধ্যে একটি রূপসী নারীর নেশাও ছিল। তোমরা মানুষের মধ্যে দায়িত্বশীলতা এবং ইসলাম ও মুসলমানের মর্যাদার অনুভূতি জাগ্রত কর। তাদের মধ্যে নাগরিক কর্তব্যবোধ ও জাতীয় মর্যাদার নেশা সৃষ্টি কর। দেশ ও জাতির মর্যাদার অনুভূতি এবং এই মর্যাদার সংরক্ষণ তাদের ঈমানের অংশে পরিণত কর। তাহলে অন্য কোন নেশা তাদেরকে ঘায়েল করতে পারবে না।'

সুলতান আইউবী আক্রমণের যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন, তাতে দুর্গের পর দুর্গ জয় করে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। হেম্‌স, হামাত ও হাল্‌বের দুর্গ হল সবচে' শক্ত ও প্রসিদ্ধ। হাল্‌বের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও অত্যন্ত শক্তিশালী। হাল্‌ব দুর্গ এই শহর থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। এগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি দুর্গ আছে, যেগুলোর অধিকাংশ পাহাড়ী ও দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। সবচে' বড় সমস্যা হচ্ছে ঐসব এলাকার শীত। শীতের সঙ্গে বরফপাত যোগ হয়ে এক অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে। এ কারণে ঐসব এলাকায় শীত মওসুমে কখনো যুদ্ধ হয়নি। তাই বিরুদ্ধবাদীরা তাদের বাহিনীকে দুর্গে ঢুকিয়ে রেখেছে। এই সময়ে কেউ হামলা করতে পারে, তা তাদের কল্পনার বাইরে। তাদের খৃস্টান উপদেষ্টারাও তাদেরকে এই পরামর্শই প্রদান করেছে। অপরদিকে সুলতান আইউবী এই শীতের মওসুমেই লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। গোয়েন্দারা তাঁকে একের পর এক সংবাদ পৌঁছাচ্ছে।

সুলতান আইউবী গোয়েন্দা মারফত জানতে পারেন যে, হাল্‌বের মসজিদগুলোর ইমাম ও খতীবরা জনগণকে বুঝাবার চেষ্টা করছে , সালাহুদ্দীন আইউবী একজন পাপিষ্ট মানুষ। তিনি রাজত্বের লোভে ও সামরিক শক্তির দাপটে খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিয়েছেন। তারা সুলতান আইউবীকে বিলাসপ্রিয় ও চরিত্রহীন মানুষ হিসেবে অভিহিত করছেন। তারা বলছেন, জুমার খুতবায় খলীফার নাম উল্লেখ করা না হলে খুতবা পরিপূর্ণ হয় না। আর অসম্পূর্ণ খুতবায় গুনাহ হয়। সরাইখানা, হাট-বাজর এবং রাস্তাঘাটেও মানুষ বলাবলি করছে যে, সালাহুদ্দীন আইউবী একজন চরিত্রহীন মানুষ, নামের মুসলমান। সেই সঙ্গে লোকদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্যও উত্তেজিত করা হচ্ছে।

আস-সালেহ'র সৈন্য কম। তার অর্ধেক সৈন্য সেনাপতি তাওফীক জাওয়াদের নেতৃত্বে সুলতান আইউবীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তাই তার স্বার্থপূজারী মুসলিম আমীর ও শাসকমণ্ডলী এভাবে জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছে। খৃস্টানরা তাদের মদদ যোগাচ্ছে।

গোয়েন্দারা সুলতান আইউবীকে তথ্য প্রদান করে যে, হাল্‌বে জনসাধারণ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। সব মানুষ যুদ্ধের জন্য উন্মাদ ও উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে। তবে বয়সী মুসলমানরা খুবই অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে এবং বলছে, এটা কেয়ামতের লক্ষণ যে, মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ হবে। কিন্তু তাদের আওয়াজ আইউবী বিরোধী লোকদের ধ্বনি ও অপবাদ প্রচারণার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রবীণদের এই আওয়াজ ছিল খৃস্টানদের বিপক্ষে। তারা তাকে স্তব্ধ করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বস্তুত আইউবী বিরোধী মুসলমানদের পুরো কার্যক্রমই খৃস্টানদের পরিকল্পনা। যেসব ইমাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে মুসলমানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে প্রস্তুত নন, তাদেরকে অপসারণ করে অন্য ইমাম নিয়োগ দেয়া হয়।

উপযুক্ত বিনিময় হাতে নিয়ে ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট রেমন্ড তার কয়েকজন সামরিক কমান্ডারকে উপদেষ্টা হিসেবে হাল্‌ব প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে একজন বিশেষ গোয়েন্দা কর্মকর্তাও ছিলেন, যিনি নাশকতা পরিচালানায় বেশ দক্ষ।

পদচ্যুৎ খলীফা আল-সালেহ বিলম্ব না করে তাকে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে দেন। সৈন্যরা বিভিন্ন দুর্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। মসুলের গবর্নর সাইফুদ্দীন, গবর্নর পদমর্যাদায় ভূষিত গোমস্তগীন নামক এক কেল্লাদার, সুলতান আস- মালিকুস সালিহ ও ইয়াজ্জুদ্দীন বাহিনীর কমান্ডারদের

অন্যতম। রেমন্ড তাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মিশর থেকে সালাহুদ্দীন আইউবী এবং যে রসদ ও ফোর্স আসবে, তিনি তাদেরকে প্রতিহত করবেন এবং আইউবী যেখানেই অবরোধ আরোপ করবেন, সেখানেই খৃস্টান বাহিনী বাহির থেকে হামলা করে অবরোধ ভেঙ্গে ফেলবে।

✿ ✿ ✿

দামেস্কে সুলতান আইউবী দুই-তিন দিন পরপর কমান্ডারদের নিয়ে বৈঠক করছেন। সামরিক প্রশিক্ষণ নিজেও পর্যবেক্ষণ করছেন এবং কমান্ডারদের থেকেও রিপোর্ট গ্রহণ করছেন। রাতের বেলা উদোম শরীরে প্রশিক্ষণ দিয়ে তিনি তার বাহিনীকে হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছেন। আশপাশে অনেক টিলা আছে। তিনি মরুভূমিতে চলাচলে অভ্যস্ত ঘোড়াগুলোকে টিলায়-পাহাড়ে উঠানামা করার অভ্যাস গড়ে তুলেছেন।

ওদিকে হাল্‌বেও দু'-তিনটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেখানকার কমান্ডাররা সংবাদ পেয়েছে যে, সুলতান আইউবী রাতের বেলা তার বাহিনীকে সামরিক মহড়া করাচ্ছেন। কিন্তু এ বিষয়টাকে তারা কোন গুরুত্ব দেয়নি। বলছে, আইউবীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে; আমাদের মুখোমুখি হলে সে হামলা করার স্বাদ বুঝতে পারবে। সেই কমান্ডারদের একজনও ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়। খৃস্টানরা দামেস্কে তাদের গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিল। শেখ সান্নানের ঘাতক ও নাশকতাকারী দলটিও তাদের। খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডও তার একজন বিশেষ দূত প্রেরণ করেছেন দামেস্কে। সুলতান আইউবী কেন রাতের বেলা সামরিক মহড়া করাচ্ছেন, তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে আত্মনিয়োগ করে রেমন্ড-এর বিশেষ গোয়েন্দা। হাল্‌বে কমান্ডারদের কনফারেন্সে বিষয়টি এখনো উত্থাপন করেনি সে। ঘটনার রহস্য এখনো তার জানা হয়নি।

সুলতান আইউবী হাল্‌ব ও মসুল ইত্যাদি এলাকায় গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে রেখেছেন। তাঁর গোয়েন্দা তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত হয় হাল্‌ব থেকে। দলনেতা একজন বিজ্ঞ আলিমের বেশে হাল্‌বে অবস্থান করছেন এবং গোয়েন্দাদের থেকে তথ্য গ্রহণ করে দামেস্ক পৌঁছাবার ব্যবস্থা করছেন। তিনি তার গোয়েন্দাদের নিরাপত্তা বিধান ও বিপদ দেখা দিলে তাদেরকে লুকিয়ে ফেলার বন্দোবস্তও করে রেখেছেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে গাল-মন্দ এবং সমালোচনা করার কাজে তিনি সকলের বাড়া। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমীর-উজীর এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। তার গোয়েন্দা সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ সবক'টি স্থানেই অবস্থান নিয়ে আছে। আল-মালিকুস

সালেহ'র মহলের বডিগার্ডের মধ্যেও তার গোয়েন্দা রয়েছে। দু'জন গোয়েন্দা বিশেষ প্রহরীর পদ নিয়ে খলীফার কেন্দ্রীয় কমান্ডের সেই প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যেখানে তাদের যুদ্ধ বিষয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। খৃস্টান গোয়েন্দাদের কমান্ডার এসেই সর্বপ্রথম দামেস্কে তাদের গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে সংহত ও কার্যকর করা এবং হাল্‌বে সুলতান আইউবীর যেসব গোয়েন্দা রয়েছে, তাদের সন্ধান বের করার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবী যে দু'জন গুপ্তচর হাল্‌বে হাইকমান্ডের প্রহরীদের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, তাদের একজনের নাম খলীল।

একটি ভবনের কতগুলো কক্ষ। তার একটি হলরুম। এখানে ভোজসভা, নাচ-গানের আসর ও দরবার অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত সাজানো-গোছানো একটি কক্ষ। হাল্‌বে আমীর-উজীরদের খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের পর এখন কক্ষটি আরো পরিপাটি, আরো সুসজ্জিত। অপরূপ সুন্দরী ও অভিজ্ঞ যুবতী মেয়েরা এখানে নাচ-গান করে। এখন কয়েকটি খৃস্টান মেয়েও এসে যোগ দিয়েছে এখানে। এরা সুশিক্ষিত পেশাদার মেয়ে। খলীফা আস-সালিহ'র আমীর-উজীরগণ এদের আঙ্গুলের ইশারায় ওঠ্-বস্ করে। এদের আসল কর্তব্য, আস-সালিহ'র বিশিষ্ট দরবারী আমীর ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কমান্ডারদের উপর নজর রাখা এবং অনুধাবন করা যে, তাদের মধ্যে সুলতান আইউবীর অনুগত কেউ আছে কিনা। তাছাড়া খলীফার পদস্থ কর্মকর্তাদের মনে খৃস্টান-প্রীতি ও ক্রুশের অনুগত্য সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালানোও তাদের অন্যতম দায়িত্ব।

মাঝে-মধ্যে ভোজের আয়োজন হয় হলটিতে। তখন নাচ-গানের আসর বসানো হয়। উজাড় হয় হাড়ি হাড়ি মদ। সব শেষে অপকর্মের চরমে পৌঁছে যায় মজলিস। কখনো কখনো সামরিক বিষয়ে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এখানে।

রক্ষীবাহিনীর দু'জন প্রহরী কোমরে তরবারী ও হাতে বর্শা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সবসময়। তিন-চার ঘন্টা পরপর প্রহরী বদল হয়।

খলীল সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। আইউবীর আরেক গোয়েন্দা তার সহকর্মী। দু'জনের ডিউটি পড়ে একসঙ্গে। তারা এখান থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। অনেক তথ্য দমেস্কে পৌঁছিয়েও দিয়েছে।

একদিন সন্ধ্যা বেলা। নতুন এক নর্তকীর আগমন ঘটে হলে। আজ ভোজসভার আয়োজন আছে। মেহমানরাও আসছেন। নর্তকী-গায়িকা এবং অন্যান্য মেয়েরাও আসছে। খলীল ও তার সঙ্গী তাদের সবাইকে চিনে। দূর-

দূরান্তের কেল্লাদারগণও এসেছেন। এক ব্যক্তি এসেছে নতুন। ইনি রেমন্ড-এর প্রেরিত গোয়েন্দাদের কমান্ডার। তার পরিচয়টা জেনে নেয় খলীল। এবার লোকটার তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে খলীলকে।

তাকে ছাড়া আরো একটি নতুন মুখ দেখতে পায় খলীল। এই মুখ একটি মেয়ের। খলীল মেয়েটিকে আজ তিন-চার দিন ধরে দেখছে। নতুন আসা মেয়ে।

একদিন ডিউটি শেষ করে সঙ্গীসহ কর্মস্থল ত্যাগ করছে খলীল। হঠাৎ মেয়েটা এসে সামনে দাঁড়ায়। খলীল উঠে থমকে দাঁড়ায়। অপলক জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় তার প্রতি। মেয়েটাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে খলীলের। কে এই মেয়েটা? খলীলের মনে কৌতূহল। আবার ভাবে, না পরিচিত কেউ নয়। মানুষের চোহারায় চোহরায় মিল থাকে। খলীল দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। কিন্তু মেয়েটা তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাকাতে তাকাতে সামনের দিকে চলে যায়। খলীল ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটার প্রতি তাকায়। মেয়েটাও তাকায় তার প্রতি।

পরদিনও এমনি ঘটনা ঘটে। তার আগেই খলীল মেয়েটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়। জানতে পারে, মেয়েটা নর্তকী।

মেয়েটা দেখতে যেন রাজকন্যা। খলীল একজন সাধারণ সিপাহী। এমন একটি মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক জমতে পারে না। রাজকন্যারূপী নর্তকীরা তো আমীরদের সম্পদ। কিন্তু এই মেয়েটাকে দেখে খলীলের অন্য একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে গেছে– যাকে দেখতে ঠিক এই মেয়েটিরই ন্যায়।

❁ ❁ ❁

এগার-বার বছর আগের কথা। খলীল তখন আঠার বছরের যুবক। দামেস্কের সামান্য দূরে এক গ্রামে বাস করত এবং পিতার সঙ্গে ক্ষেতে-খামারে কাজ করত। হাসি-খুশি স্বভাবের মানুষ খলীল। উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন মেধাবী ছেলে। পাড়ার শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের কাছেই প্রিয়।

তখন হিজরতের পালা চলছিল। খৃস্টানদের দখল করা এলাকাসমূহ থেকে মুসলমান পরিবারগুলো খৃস্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলিমশাসিত এলাকায় চলে যাচ্ছিল। স্থানীয় লোকেরা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করত এবং তাদের বসবাস করার সুযোগ করে দিত।

এমনি একটি পরিবার কোথা থেকে হিজরত করে খলীলদের গ্রামে চলে আসে। সেই পরিবারের একটি মেয়ের নাম হুমায়রা। তখন তার বয়স ছিল এগার কি বার বছর। অত্যন্ত সুন্দরী ও ফুটফুটে একটি মেয়ে।

গ্রামবাসীরা এই পরিবারটিকে সাদরে বরণ করে নেয় এবং মাথা গোজার ঠাঁই

করে দিয়ে চাষাবাদ করে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহের জন্য জমি-জিরাত দান করে। হুমায়রার ভাই-বোন সবাই ছোট। সংসারে কর্মক্ষম লোক একমাত্র পিতা। খলীল এই অসহায় পরিবারটির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। খলীলের কথাবার্তা ভাল লাগে হুমায়রার কাছে। হুমায়রাকেও ভাল লাগে খলীলের। হুমায়রা খলীলের ঘরে আসা-যাওয়া করতে শুরু করে। সুযোগ পেলেই খলীলের কাছে গল্প শুনে হুমায়রা। হুমায়রাকে শুনানোর জন্য মজার মজার গল্প বানিয়ে নিয়েছে খলীল। ভাব গড়ে ওঠে দু'জনের মাঝে।

এভাবে মাস চারেক সময় কেটে যায়। ক্ষেত-খামারে কাজ করা তখন আর ভাল লাগছে না হুমায়রার পিতার। দামেস্ক শহরটা সেখান থেকে নিকটে। হুমায়রার পিতা সকালে শহরে চলে যান এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসেন। এভাবে কেটে যায় এক বছর। হুমায়রার পিতাকে কিছু করতে দেখছে না কেউ। কিন্তু সংসার চলছে বেশ ভালভাবেই।

খলীলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে হুমায়রা। তাকে ছাড়া একদণ্ডও ভাল লাগে না মেয়েটার। সবসময় খলীলের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চায় সে। খলীল ক্ষেতে গেলে হুমায়রাও চলে যায় সেখানে।

হুমায়রার বয়স এখন তের বছর। ভাল-মন্দ বুঝতে শুরু করেছে। প্রেম-ভালবাসা, মন দেয়া, মন নেয়া এসব এখন হুমায়রার অবোধ্য নয়।

একদিন খলীল হুমায়রাকে জিজ্ঞেস করে– 'আচ্ছা, তোমার আব্বা এখন কী কাজ করেন?'

হুমায়রা উত্তর দেয়– 'আমি জানি না। আমি শুধু এটুকু জানি যে, আমার বাবা ভাল মানুষ নন। তিনি শহর থেকে যখন আসেন, নেশা করে আসেন।'

হুমায়রা খলীলকে আরো নতুন একটি তথ্য প্রদান করে– 'ইনি আমার পিতা নন। আমার মা-বাপ দু'জনই মারা গেছেন। আমার বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছর, তখন ইনি আমার ভার নেন এবং আমাকে তার ঘরে নিয়ে লালন-পালন করেন। পরে আমি তাকেই পিতা ডাকতে শুরু করি। আমাকে তিনি আপন মেয়ের মত আদর করেন এবং নিজের মেয়ের মতই আচরণ করেন। কিন্তু মানুষটা ভাল নন।'

এভাবে কেটে গেছে দু'টি বছর। খলীলের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে হুমায়রা। হুমায়রা এখন পরিপূর্ণ যুবতী। হৃদয়কাড়া সুশ্রী মুখাবয়ব। যৌবন-রসে টইটুম্বর ও নজরকাড়া দেহ।

একদিন খলীলের নিকট গিয়ে হাজির হয় হুমায়রা। মুখে অস্থিরতা ও

মলিনতার ছাপ। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে কথা বলে খলীলের সঙ্গে– 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, বাবা বিয়ের নামে আমাকে এক অপরিচিত ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে চাচ্ছেন। বাবার সঙ্গে একজন লোক এসেছিল। তিনি লোকটাকে অনেক খাতির-যত্ন করলেন এবং কিছুক্ষণ পর আমাকে ডেকে তার কাছে নিয়ে বসালেন। লোকটা আমাকে খুব নীরিক্ষন করে দেখল। আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কেন ডাকলেন বাবা? জবাবে তিনি আমতা আমতা করে যা বলতে চাইলেন, তাতেই আমার মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হয়।' হুমায়রা খলীলকে বলল, 'আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাই না।'

খলীল বলল– 'ঠিক আছে, আমি আমার আব্বা-আম্মার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।'

হুমায়রা যে লোকটাকে পিতা বলে ডাকে, সে তার পিতা নয়। কাজেই হুমায়রার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার কোন ভাবনা নেই। সে যুগে মেয়েদের কোন মর্যাদা ছিল না। অর্থের বিনিময়ে মেয়েদেরকে অন্যের হাতে তুলে দেয়ার প্রচলন ছিল। শাসক ও ধনবান লোকেরা হেরেম বানিয়ে রেখেছিল। তারা নিত্যনতুন সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ক্রয় করত। হুমায়রাকে যদি তার পিতা বিক্রি করার পরিকল্পনা করেও থাকে, সে সমাজের রীতি অনুযায়ী তা অপরাধ ছিল না।

খলীল ধনবান পিতা-মাতার সন্তান নয়। হুমায়রাকে নিয়ে পালিয়ে কোথাও আত্মগোপন করা অপেক্ষা বেশী কিছু করার সুযোগ তার নেই। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কী করবে খলীল? ভাবনায় পড়ে যায় সে। হুমায়রার প্রতি তার ভালবাসা এতই গভীর যে, বিষয়টা উপেক্ষাও করতে পারছে না খলীল।

খলীলের ভাবতে ভাবতে কেটে যায় অনেক সময়– দু'দিন। তৃতীয় দিনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারল না সে।

খলীল ক্ষেতে গিয়ে কাজে লেগে যায়। এমন সময় একদিক থেকে নারী কণ্ঠের চিৎকার ভেসে আসে তার কানে। একটি মেয়ে যেন তাকেই ডাকতে ডাকতে দৌড়ে আসছে। খলীল হঠাৎ চমকে উঠে মাথা তুলে তাকায়। হুমায়রা। হুমায়রা-ই তাকে ডাকতে ডাকতে তার দিকে পাগলিনীর ন্যায় ছুটে আসছে। পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে তিনজন লোক। তাদের একজন হুমায়রার পিতা। অপর দু'জনকে চিনে না খলীল।

হুমায়রার চিৎকার শুনে পাড়ার অনেক মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। কিন্তু তারা সবাই তামাশা দেখছে শুধু। তারা এই ভেবে হুমায়রার সাহায্যে এগিয়ে আসছে না যে, পেছনের লোকগুলোর মধ্যে হুমায়রার পিতাও আছেন।

খলীল হুমায়রার দিকে এগিয়ে যায়। হুমায়রা কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানায়, এরা আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। বাবা আমাকে এদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। হুমায়রার পিতা হুমায়রাকে খলীলের সম্মুখ থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। খলীল তাকে ধমক দেয়– 'খবরদার! এর গায়ে হাত দেবেন না। আগে আমার সঙ্গে কথা বলুন।'

'এ আমার কন্যা'– হুমায়রার পিতা বলল– 'তুমি কে আমাকে ঠেকাবার?'

'এ আপনার কন্যা নয়'– খলীল বলল– 'আমি সব জানি।'

অপর দু'জন হুমায়রার দিকে এগিয়ে আসে। একজন হাতে তরবারী তুলে নেয়। খলীলের হাতে কোদাল। সেটি দ্বারা লোকটার মাথায় আঘাত করে সে। লোকটার হাত থেকে তরবারীটা পড়ে যায়। পরক্ষণেই রক্তাক্ত মাথায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে লোকটি। খলীল তরবারীটা হাতে তুলে নেয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতেও তরবারী। খলীল তরবারী চালনা ও তরবারী আঘাত প্রতিহত করার কলা-কৌশল জানে না। তারপরও লোকটার দু'-একটা আঘাত প্রতিহত করে সে। কিন্তু বেশীক্ষণ টিকতে পারল না খলীল। ভারী কি একটা বস্তু আঘাত হানে তার মাথায়। হঠাৎ দু'চোখের সামনের সব অন্ধকার হয়ে যায়। খলীল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

খলীলের যখন জ্ঞান ফিরে, তখন সে নিজের ঘরে। হঠাৎ ধড়মড় করে শোয়া থেকে উঠে বসে সে। চোখে মুখে প্রচন্ড ক্রোধ। তার পিতা ও দু'-তিনজন লোক এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলে শান্ত করার চেষ্টা করে– 'তুমি অনেকক্ষণ যাবত অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলে। এইমাত্র তোমার জ্ঞান ফিরেছে। শুয়ে থাক। হুমায়রা এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। তাকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না।'

খলীল চিৎকার করে ওঠে– 'লোকটা মেয়েটাকে বিক্রি করে ফেলেছে! আহ! আমি বুঝি হুমায়রাকে হারিয়ে ফেললাম। খলীলকে বুঝানো হল, হুমায়রাকে যথারীতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়েই বিদায় করা হয়েছে।'

খলীলের মাথার অবস্থা ভাল নয়। বসার চেষ্টা করলেই মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। বড়রা তাকে উপদেশ দেন, হুমায়রাকে নিয়ে ভাবা তোমার পক্ষে ঠিক হবে না। ও এখন অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী।

খলীল সুস্থ্য হয়ে যখন বাইরে বের হয়, ততক্ষণে হুমায়রার পিতা পরিবারসহ এলাকা ত্যাগ করে চলে গেছে।

❁ ❁ ❁

হুমায়রাকে হারিয়ে পাগলের মত হয়ে গেছে খলীল। মেয়েটির ভালবাসা আর

তার মুখডাকা পিতার প্রতিশোধস্পৃহা অস্থির করে তুলেছে তাকে। কাজ-কর্মে মন বসছে না তার। মাঝে-মধ্যে দামেস্ক গিয়ে হুমায়রার পিতাকে খুঁজে বেড়ায় খলীল। তার পিতা-মাতা তাকে অনেক ভাল ভাল মেয়ে দেখায়; কিন্তু কাউকেই পছন্দ হচ্ছে না তার। তার মন-মস্তিষ্কে চেপে বসে আছে হুমায়রা।

এক-দেড় বছর পর্যন্ত এভাবেই সময় কাটে খলীলের। একদিন দামেস্কে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে জানতে পারে, সেনাবাহিনীতে লোক নেয়া হচ্ছে। খলীল সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যায়।

খলীলকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অশ্বচালনা, তীরন্দাজি ও অন্যান্য অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ নেয়। একটা ব্যস্ততা পেয়ে যায় খলীল। এবার হুমায়রার ভাবনা ধীরে ধীরে কেটে যেতে শুরু করে তার মাথা থেকে। স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায় সে। খলীল পুনরায় একজন কর্মতৎপর যুবকে পরিণত হয়।

এ সেই সময়কার কথা, যখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। মানুষ তখনো শুধু নুরুদ্দীন জঙ্গীকেই চিনে। সুলতান আইউবী এ পর্যন্ত একবার রণাঙ্গনে হাজির হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করতে পেরেছেন মাত্র। সেটি ছিল এক রক্ষক্ষয়ী লড়াই। তিনি এই প্রথমবার দুশমনকে চোখে দেখেছেন। তিনি খৃস্টানদের নির্যাতনের শিকার লুণ্ঠিত একটি পরিবারের করুণ দৃশ্য দেখলেন। তিনি জানতে পারলেন, খৃস্টানরা বহু মুসলিম যুবতী মেয়েকে তাদের হাতে কব্জা করে রেখেছে। এসব দেখে-শুনে তার ভেতরে জাতীয় চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধ জেগে উঠে। সেই চেতনা ও বোধ-বিশ্বাস তাঁকে সেই সৈনিকদের সারিতে নিয়ে দাঁড় করায়, যারা বেতন-ভাতা ও গনীমতের জন্য নয়– আল্লাহর নামে লড়াই করে ও জীবন কুরবান করে।

তিন-চার বছর পর সালাহুদ্দীন আইউবীকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করে কায়রো প্রেরণ করা হয়। খৃস্টানরা সুদানীদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে সমুদ্রের দিক থেকে মিসরের উপর হামলা চালালে সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। নুরুদ্দীন জঙ্গী তাঁর একটি বিশেষ বাহিনীকে কায়রো পাঠিয়ে দেন। খলীল ছিল সেই বাহিনীর একজন সদস্য। খলীল সেই বিচক্ষণ সৈনিকদের একজন, যারা তরবারীর পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগায়। তাকে পঞ্চাশ সদস্যের এক বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। মিশরে আসার পর তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা পুরোপুরি জাগ্রত হয়ে ওঠে। গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীর পরামর্শে খলীলকে তাঁর যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তাকে একাধিকবার কমান্ডো ও গেরিলা

অভিযানে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তাকে দেশের বাইরে কখনো পাঠান হয়নি। তাকে দেশের অভ্যন্তরে শত্রু-চরদের তথ্য সংগ্রহ, পশ্চাদ্ধাবন ও গ্রেফতার করার কাজে নিয়োজিত করা হয়। এ কাজে বড় দক্ষ খলীল।

এখন ১১৭৪ সাল। নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর যখন সুলতান আইউবী সাতশ' অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে দামেস্ক দখল ও আল-মালিকুস সালিহকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে রওনা হন, তখন তিনি তার গোয়েন্দা দলকে আগেই দামেস্ক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা বিভিন্ন বেশে দামেস্ক অনুপ্রবেশ করে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান আইউবী যখন দামেস্ক দখল করে ফেলেন এবং খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমীর-উজীর-দেহরক্ষীগণ দামেস্ক ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখন আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ– যিনি গোয়েন্দাদের সঙ্গে দামেস্ক ঢুকে গিয়েছিলেন– কয়েকজন গোয়েন্দাকে সেদিকে পাঠিয়ে দেন, যেদিকে আস-সালিহ ও তার দেহরক্ষীরা পালিয়েছিল। এই গোয়েন্দাদেরকে কতগুলো বিশেষ নির্দেশনা ও বিভিন্ন মিশন বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল। খলীল ছিল তাদের একজন। তার এক সঙ্গীও ছিল সেই দলে।

এই গোয়েন্দা দলটি যখন হাল্‌ব পৌঁছে, তখন সেখানে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। আস-সালিহ'র সাঙ্গপাঙ্গদের এই মুহূর্তে সৈন্যের প্রয়োজন। তাদের মনে প্রবল আশংকা, সুলতান আইউবী তাদের ধাওয়া করবেন এবং হামলা চালাবেন। ফলে তারা সেই অস্থির পরিস্থিতিতে যাকেই পেয়েছে, সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নিয়েছে। খলীল এবং তার সঙ্গী নিজেদেরকে দামেস্ক থেকে পালিয়ে আসা সৈনিক পরিচয় দিয়ে বাহিনীতে ঢুকে পড়ে।

সুলতান আইউবীর এই গোয়েন্দারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আস্তানা তৈরি করে নেয়।

খলীল অত্যন্ত সুশ্রী ও শক্তসামর্থ যুবক। অতিশয় বাকপটু। এই সুবাদে তাকে রাজপ্রাসাদের প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। কৌশলে সঙ্গীকেও সাথে রাখে।

❁ ❁ ❁

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে ব্যস্ত হয়ে পড়ে খলীল। ভুলে গেছে হুমায়রার কথা। একদিনও- একবারও তার মনে পড়ছে না ভালবাসার মানুষটির কথা। এসব ভাবনার সুযোগই পায়নি খলীল। কিন্তু এই নতুন মেয়েটি খলীলকে স্মরণ করিয়ে দিল হুমায়রার কথা।

খলীল হুমায়রাকে হারিয়েছে সাত-আট বছর হয়ে গেছে। তখন মেয়েটির বয়স ছিল ষোল বছর। মেয়েটি অত্যন্ত রূপসী। কিন্তু তার মুখাবয়বে হুমায়রার

সেই নিষ্পাপতা ও সরলতা এখন অনুপস্থিত। দু'জনের মুখোমুখি হওয়ার সময় তার পরনে ছিল সংক্ষিপ্ত পোশাক। বলা চলে অর্ধনগ্ন। কাজেই অশালীন এই মেয়েটি হুমায়রা হতে পারে না। মেয়েটা তৃতীয়বার যখন খলীলের মুখোমুখি হয়, তখন খলীল আরো নিরীক্ষা করে দেখে। মেয়েটিও তাকিয়ে থাকে খলীলের প্রতি। এবার কথা বলে মেয়েটি– 'তোমার নাম কী?'

খলীল নিজের ছদ্মনাম বলে, যে নাম এখানে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সময় লিখিয়েছিল। তারপর প্রশ্ন করে– 'তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'তুমি আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখছ। তাই নামটা জিজ্ঞেস করলাম।' হুমায়রা এমনভাবে জবাব দেয়, যেন তার মধ্যে সভ্যতার লেশমাত্র নেই– 'তুমি একজন সাধারণ সৈনিক। নিজের কাজ কর; ওসব ভেবে লাভ নেই।'

আজ রাতেই ভোজসভা। রেমন্ডের গোয়েন্দা বাহিনীর কমান্ডার দিন চারেক আগে এখানে এসে পৌঁছেছে। তার নাম উইন্ডসর। তারই সম্মানে এই ভোজসভার আয়োজন। উইন্ডসর একজন অভিজ্ঞ গুপ্তচর। হাল্বের গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যেই তার আগমন।

সূর্য ডুবে গেছে। সাজের আঁধারে ছেয়ে গেছে চারদিক। মেহমানরা আসছেন। আয়োজন চলছে। চলছে মদপানের ধারা। প্রধান অতিথি উইন্ডসর এখনো আসেননি। খলীল ও তার সঙ্গীর ডিউটি হলরুমের দরজায়।

কিছুক্ষণ পর উইন্ডসর এসে পৌঁছান। হলরুমের দরজা পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়ান তিনি। গভীর দৃষ্টিতে তাকান প্রহরীদ্বয়ের প্রতি। তারপর খলীলের চেহারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

'তুমি খলীফার রক্ষীবাহিনীতে কবে ঢুকেছ?' উইন্ডসর খলীলকে জিজ্ঞেস করেন। তার কণ্ঠে গাম্ভীর্য।

'এখানে আসার পরই আমাকে রক্ষী বাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়'– খলীল জবাব দেয়– 'তার আগে আমি দামেস্কের সেনাবাহিনীতে ছিলাম।'

'তুমি কি মিশর গিয়েছিলে?' উইন্ডসর জিজ্ঞেস করেন।

'না।' খলীল জবাব দেয়।

উইন্ডসর খলীলকে অপর প্রহরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি একে কখন থেকে জান?'

'আমরা দু'জন দামেস্কের বাহিনীতে একসঙ্গে ছিলাম'– খলীল জবাব দেয়– 'আমরা উভয়ে উভয়কে ভালভাবেই জানি।'

'আর আমি সম্ভবত তোমাদের দু'জনকেই ভালভাবে চিনি'– উইন্ডসর মুচকি

হেসে বললেন– 'একটু আমার সঙ্গে এস।'

খলীল ও তার সঙ্গীকে প্রহরা থেকে সরিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যান উইন্ডসর। লোকটা অত্যন্ত ঘাঘু ও বিচক্ষণ গোয়েন্দা। এখানে এসে পৌঁছেই তিনি গোপনে গোপনে দেহরক্ষীদের বিশ্বস্ততা যাচাই-বাচাই শুরু করে দেন। খলীলকে দেখামাত্র তার কিছু একটা মনে পড়ে যায়। মনে সন্দেহ জেগে ওঠে। পরক্ষণে খলীলের সঙ্গীকে দেখার পর তার সন্দেহ পোক্ত হয়ে যায়।

উইন্ডসর-এর সন্দেহ অমূলক নয়। খলীল ও তার সঙ্গী তিন-চার বছর যাবত সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগে এক সঙ্গে কাজ করেছিল।

উইন্ডসর খলীল ও তার সঙ্গীকে নিজ কক্ষে নিয়ে যান। এই ভবনেরই বড় রুমটির সামান্য দূরের রুমটিই উইন্ডসরের কক্ষ। কক্ষে প্রবেশ করে তিনি রাতের আলোতে তাদেরকে পুনরায় গভীরভাবে নিরীক্ষা করে দেখেন।

'আমাকে যদি প্রমাণ দিতে পার যে, তোমরা এখানকার অফাদার এবং সালাহুদ্দীন আইউবী তোমাদের দুশমন, তাহলে আমি তোমাদেরকে শুধু ছেড়েই দেব না, বরং এমন পদে চাকুরী দেব যে, তোমাদের ভাগ্য ফিরে যাবে।'– উইন্ডসর বললেন– 'কিন্তু মিথ্যা বললে পরে অনুতাপ করতে হবে।'

'আমরা এখানকারই অফাদার।' খলীল জবাব দেয়।

'তোমরা অফাদারী কখন থেকে পরিবর্তন করেছ?'– উইন্ডসর জিজ্ঞেস করে– 'এবং কেন করেছ?'

'আল্লাহ ও রাসূলের পরই খলীফার মর্যাদা'– খলীল বলল– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর কোন মর্যাদা নেই। তিনি খলীফা নন।'

'মিশর থেকে কবে এসেছ?' উইন্ডসর জিজ্ঞেস করেন এবং জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'তোমরা বোধ হয় আমাকে চেন না। আমি তোমাদেরই ন্যায় একজন গুপ্তচর। আমি যাকে একবার দেখি, নাম ভুলে যেতে পারি– চেহারা ভুলি না। আলী বিন সুফিয়ান কোথায়? মিসরে না দামেস্কে?'

'আপনি কার কথা বলছেন? আমরা তো এই নামের কাউকে চিনি না'– খলীলের সঙ্গী বলল– 'আমরা সাধারণ সিপাহী মাত্র।'

উইন্ডসর বসা থেকে উঠে দাঁড়ান। দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একজন চাকরকে ডাক দেন। চাকর আসলে তিনি একটি মেয়ের নাম উল্লেখ করে তাকে ডেকে আনতে বললেন।

মেয়েটি পাশেরই একটি কক্ষে ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অতিশয় রূপসী একটি মেয়ে এসে কক্ষে প্রবেশ করে। খলীল জানে, এই মেয়েটি খৃস্টান। তার

সঙ্গে সেই নর্তকীও আসে, যাকে দেখলে খলীলের হুমায়রার কথা মনে পড়ে।

উইন্ডসর খৃস্টান মেয়েটির সঙ্গে আরবীতে কথা বলেন। তাকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করেন, বাইজীটাকে সঙ্গে এনেছ কেন?

মেয়েটি জবাব দেয়, 'না, মানে ও প্রস্তুত হয়ে আমার কক্ষে এসে গিয়েছিল আর আমিও প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এর মধ্যে আপনার ডাক পেয়ে মনে করলাম, ভোজসভায় আপনার সঙ্গে যেতে হবে তাই ডাকছেন। তাই আমি একেও সঙ্গে করে নিয়ে আসলাম।'

'ঠিক আছে, অসুবিধা নেই'– উইন্ডসর বললেন– 'এসেছে যখন তামাশা দেখতে পাবে।'

উইন্ডসর খৃস্টান মেয়েটিকে বললেন, 'আমি তোমাকে অন্য এক কাজের জন্য ডেকেছি'– তিনি প্রহরীদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে মেয়েটিকে বললেন– 'এদের প্রতি ভালভাবে তাকাও, দেখ তো কিছু মনে পড়ে কিনা?'

মেয়েটি খলীল ও তার সঙ্গীর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করে। মাথা তুলে আবার দু'জনের মুখাবয়বে চোখ বুলায়। এবার তার ঠোঁটে মুচকি হাসির আভা ফুটে ওঠে। সে খলীল ও তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করে– 'তোমাদের জ্ঞান ফিরে এসেছিল কখন?'

খলীল ও তার সঙ্গী পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর মেয়েটির দিকে দৃষ্টিপাত করে। খলীল উপস্থিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষ। সে বুঝে ফেলে, এরা আমাদের চিনে ফেলেছে। কিভাবে বাঁচা যায় পন্থা খুঁজতে শুরু করে সে। এরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয় হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। মুহূর্তে হাবা বনে যায় খলীল, যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না– 'আমাদের বুঝে আসছে না, আপনারা পাহারাদারী থেকে সরিয়ে এনে আমাদের সঙ্গে কেন মস্কারা করছেন। কমান্ডার দেখে ফেললে তো আমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

'তোমরা প্রহরী নও'– উইন্ডসর বললেন– 'তোমাদের দু'জনকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রাখার চেয়ে বরং ভাল, ওখানে কেউ না দাঁড়াক। ওখানে তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই।' তিনি খলীলের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'এখানে এসে বেশ-ভূষা পরিবর্তন করে নিলে না কেন? সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ান চরবৃত্তিতে দক্ষ বটে, কিন্তু আমরাও আনাড়ী নই। নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিও না। ভালোয় ভালোয় বলে ফেল, আমরা মিশর থেকে

আসা গুপ্তচর। তোমাদের সঙ্গে আমার ও এই মেয়েটির সাক্ষাৎ আগেও হয়েছিল। তোমরা আমাকে চিনতে পারনি। কারণ, আমি তখন ছদ্মবেশে ছিলাম। কিন্তু আমি তোমাদের চিনে ফেলেছি। কেননা, এখনও তোমরা সেই বেশেই আছ, যে বেশে আড়াই বছর আগে ওখানে ছিলে। একটু চিন্তা কর; স্মরণ এসে যাবে। তোমরা দু'জন মিশরের উত্তরে একটি কাফেলায় ঢুকে গিয়েছিলে। কাফেলাটার প্রতি তোমাদের সন্দেহ ছিল। সেই কাফেলার সঙ্গে তোমরা একটি রাতও কাটিয়েছিলে। কিন্তু তোমাদের দুর্ভাগ্য, যখন তোমরা চোখ খুললে, তখন মরুভূমিতে সংজ্ঞাহীন পড়ে ছিলে। কাফেলা ততক্ষণে বহুদূরে চলে গিয়েছিল।'

খলীল ও তার সঙ্গীকে পরিচয়ের সূত্রটা স্মরণ করিয়ে দেন উইন্ডসর।

✿ ✿ ✿

আড়াই থেকে তিন বছর আগের কথা। খলীল ও তার সঙ্গী তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল। সুদানীরা সুলতান আইউবীর হাতে পরাজয়বরণ করেছিল ঠিক, কিন্তু খৃস্টানদের সহযোগিতায় মিশর আক্রমণ পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তারা। মিসরের অভ্যন্তরে খৃস্টান গুপ্তচর ও নাশকতাকারীরা তৎপর। তাদেরই খুঁজে বের করার জন্য আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগ কাজ করছিল। সীমান্তে টহল বাহিনী নিয়োজিত ছিল। মিসরের গোয়েন্দারা মুসাফির ইত্যাদির বেশে সীমান্ত এলাকাগুলোতে ঘোরাফেরা করছিল।

একদিন খলীল ও তার এই সঙ্গী মিশরের উত্তরাঞ্চলীয় এক এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। দু'জনই উটের উপর সওয়ার। দীনহীন মরু মুসাফিরের বেশ তাদের। এমন সময়ে তারা একটি কাফেলা দেখতে পায়, যাতে অনেকগুলো উট ও দু'টি ঘোড়া ছিল। কাফেলায় যুবক-বৃদ্ধ-নারী–শিশু সব বয়সের লোকই ছিল।

খলীল ও তার সঙ্গী গোয়েন্দা। তারা কাফেলা থামিয়ে তদন্ত করতে পারে না। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা গমনাগমনকারী কাফেলার প্রতি নজর রাখবে এবং সামান্যতম সন্দেহ হলে নিকটবর্তী সীমান্ত চৌকিতে সংবাদ দেবে। বাহিনী সামরিক শক্তির বলে এ কাজ আঞ্জাম দেবে। এতো বিপুলসংখ্যক লোকের কাফেলার গতিরোধ করে তল্লাশি চালানো দু'জন গোয়েন্দার পক্ষে সম্ভব নয়।

খলীল ও তার সঙ্গী কাফেলার সঙ্গে এসে ভীড়ে। পরিচয় দেয়, আমরা মুসাফির এবং সামনে যাব। কাফেলার লোকেরা খলীল ও তার সঙ্গীকে তাদের দলে নিয়ে নেয়।

খলীল ও তার সঙ্গী গল্প-গুজব ও কথোপকথনের মধ্যদিয়ে জানার চেষ্টা করে, কাফেলা কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাচ্ছে। সামনের সীমান্ত চৌকিটা কোথায়, তা তাদের জানা আছে। কিন্তু তারা দেখতে পেল, কাফেলা সেই পথ এড়িয়ে এমন এক পথ ধরেছে, যে পথে কোন চৌকি নেই। অঞ্চলটাই এমন যে, সেনা টহল চৌকি এড়িয়ে পথচলা সম্ভব। কাফেলার উটপালের পিঠে যে মালামাল বোঝাই করা আছে, তাও সন্দেহজনক মনে হল। এই বিশাল বিশাল মটকা ও পেচিয়ে রাখা তাঁবুর মধ্যে কী আছে কে জানে। মালামালও অনেক।

খলীল ও তার সঙ্গী মরু যাযাবর সেজে তথ্য নেয়ার চেষ্টা করছে। কাফেলায় চারটি যুবতী মেয়েও আছে। পোশাক-পরিচ্ছদে তারা যাযাবরই নয়– রীতিমত বেদুঈনের মত। মাথার চুলের ধরণ-কাটিংও প্রমাণ করছে, সভ্যতা-ভদ্রতার ছোঁয়া তাদের গা স্পর্শ করেনি। কিন্তু তাদের মুখাবয়ব, চোখের চাহনি ও শারীরিক গঠন-আকৃতি প্রমাণ করছে, আসলে ব্যাপার অন্যকিছু এবং এটা তাদের ছদ্মবেশ।

কাফেলায় একজন বৃদ্ধ লোক আছে। তার গায়ের রং গৌর। মুখে বসন্তের দাগ। কিন্তু তার দাঁত বলছে, তার বয়স এত বেশী নয়, যতটা চেহারা দেখে মনে হচ্ছে।

এই বৃদ্ধ খলীল ও তার সঙ্গীকে নিজের সঙ্গে নিয়ে নেয় এবং অত্যন্ত স্নেহের সাথে জিজ্ঞেস করতে শুরু করে, তোমরা কোথা থেকে এসেছ এবং কোথায় যাচ্ছ?

খলীল নিজের আসল পরিচয় না দিয়ে উল্টো জানতে চাচ্ছে, কাফেলা কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাচ্ছে এবং এই মালপত্রগুলো কী?

বৃদ্ধ এত হৃদয়গ্রাহী মজার মজার কথা বলতে শুরু করে যে, খলীল ও তার সঙ্গী সুযোগ পায়নি তথ্য নেয়ার।

চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তারপর গভীর রাত। কাফেলা চলতে থাকে। খলীল বৃদ্ধকে কাফেলার গতিপথ পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়ে বলল, এই পথে চলুন, তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌছা যাবে। সে চেষ্টা করছে কাফেলাটি সেনা চৌকির নিকট দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। খলীল স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কাফেলা সেনা চৌকি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে।

খলীলের সন্দেহ পাকাপোক্ত হতে চলেছে। আরো একটু সামনে অগ্রসর হওয়ার পর ছাউনি ফেলার উপযোগী স্থান পাওয়া যায়। কাফেলা থেমে যায়। রাত যাপনের জন্য তাঁবু খাটায়।

খলীল ও তার সঙ্গী কাফেলা থেকে খানিক দূরে সরে গিয়ে একস্থানে বসে

পরামর্শ করে, কী করা যায়। দু'টি পন্থা অবলম্বন করা যায়। প্রথমত, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে কাফেলার মালপত্রের তল্লাশী নেয়া যায়। দ্বিতীয়ত, দু'জনের একজন চুপিচুপি এখান থেকে বেরিয়ে যাবে এবং নিকটবর্তী চৌকিতে গিয়ে সংবাদ দেবে। কিন্তু দ্বিতীয় পন্থায় আশংকা আছে। তাতে কাফেলার লোকদের মনে সন্দেহ জাগবে এবং অপরজনকে হত্যা কিংবা অপহরণ করে দ্রুতগতিতে স্থান ত্যাগ করে কেটে পড়বে।

তারা না ঘুমিয়ে জাগ্রত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কাফেলার লোকেরা আহরাদি সেরে শুয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে কাফেলার দু'টি মেয়ে চুপিচুপি তাদের নিকট এমনভাবে চলে আসে, যেন তারা সঙ্গীদের ফাঁকি দিয়ে এসেছে। তারা অত্র এলাকার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। তারা খলীল ও তার সঙ্গীকে বলল, 'আমরা যদি তোমাদেরকে একটি রহস্য জানিয়ে দেই, তাহলে কি তোমরা আমাদেরকে সাহায্য করবে?'

'রহস্য' শব্দটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচরদের চমকে দেয়। তাদের কাজই তো রহস্য উদঘাটন করা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো এবং বিশেষ করে এই কাফেলায় যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যই তো রহস্য জানা।

মেয়েরা বলল, 'কাফেলার লোকগুলো অপহরনকারী। আমরা যে চারটি মেয়ে আছি, আমাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, আমরা জানি না।' মেয়েরা আরো জানায়, 'আমরা মুসলমান এবং এদের থেকে মুক্ত হতে চাই।'

কথায় কথায় এক মেয়ে খলীলকে সরিয়ে নিয়ে যায়। মেয়েটির কথাবার্তায় সরলতা আছে, আকর্ষণও আছে। সে খলীলকে বলল, 'তুমি যদি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করব এবং সারাজীবন তোমার সেবা করব।' মেয়েটি আরো এমন কিছু কথা বলল, যার ফলে খলীল তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। মেয়েটা খলীলের প্রতি তার ভালবাসা ও নিজের অসহায়ত্বের কথা এমনভাবে প্রকাশ করে যে, খলীল তার ও অন্যান্য মেয়েদেরকে কিভাবে মুক্ত করা যায় ভাবতে শুরু করে।

অপর মেয়ে খলীলের সঙ্গীর সঙ্গে আলাদা ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছে এবং এ ধারায়ই কথা বলছে। একজন নারীর স্রেফ নারী হওয়াই একটা শক্তি। সেই নারী যখন হয় রূপসী-যুবতী এবং বিপদগ্রস্ত, তখন একজন পুরুষ না গলে পারে না। সে অবস্থায়ই হয়েছে খলীল ও তার সঙ্গীর। দু'জনই যৌবনদীপ্ত যুবক। তাছাড়া

একজন নারী– সে যে-ই হোক– বিপদে পড়লে সাহায্য করা তাদের সামরিক নীতির অংশ।

মেয়েরা আলাদাভাবে দুই মিশরী গুপ্তচরকে খুশী করার জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু কি যেন খেতে দেয়। এক মেয়ে উঠে পা টিপে টিপে তাঁবুতে যায় এবং ছোট একটি মশক হাতে নিয়ে ফিরে আসে। মশক থেকে শরবত ধরনের পানীয় ঢেলে দু'জনকে খাওয়ায়। অত্যন্ত সুস্বাদু শরবত। তৃপ্তি সহকারে পান করে খলীল ও তার সঙ্গী।

অল্পক্ষণ পরই দু'জনের চোখের পাতা বুজে আসে। তারা ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন যখন তাদের চোখ খুলে, তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবি ডুবি করছে। সারা রাত ও সারাটা দিন ঘুমিয়ে থাকে তারা। মরুভূমির বালুকা প্রান্তরের ঝলসানো রোদও তাদেরকে জাগাতে পারেনি। সন্ধ্যাবেলা যখন তারা চোখ মেলে তাকায়, তখন কাফেলাও নেই, তাদের উটও নেই। আর তারাও সেই জায়গায় নেই, যেখানে ঘুমিয়েছিল। এ অন্য এক স্থান, যার আশপাশে মাটি ও বালির টিলা।

খলীল ও তার সঙ্গী ধড়মড় করে উঠে একটি উঁচু টিলার উপর চড়ে এদিক-ওদিক তাকায়। তারা চারদিকে সারি সারি টিলার চূড়া আর দূরদিগন্তে মরুভূমির বালু ছাড়া আর কিছুই দেখছে না।

❁ ❁ ❁

'সেই বৃদ্ধ লোকটা আমি ছিলাম, সফরের সময় তুমি যার সঙ্গে কথা বলছিলে' রেমন্ডের গোয়েন্দা কমান্ডার বললেন– 'আমি তোমার কথাবার্তায় বুঝে ফেলেছিলাম, তুমি গোয়েন্দা এবং জানতে চাচ্ছ আমরা কারা এবং কোথায় যাচ্ছি।'

'না, সে লোকটি তুমি নও'– খলীল বলল– 'সে তো বৃদ্ধ ছিল।'

'ওটা ছিল আমার ছদ্মবেশ'– উইন্ডসর বলল– 'যা হোক আমি খুশি হলাম যে, তুমি মেনে নিয়েছ, তোমরা গুপ্তচর ছিলে এবং এখনও তা-ই আছ। আরো শুনো, যে দু'টি মেয়ে তোমাদেরকে অজ্ঞান করেছিল, এ হল তাদের একজন।'

'এখন আমরা গুপ্তচর নই'– খলীল বলল– 'আমরা এখন খলীফার অনুগত সৈনিক।'

'তুমি বকওয়াস করছ'– উইন্ডসর বললেন– 'আমি সব সময় আলী বিন সুফিয়ানের প্রশংসা করে থাকি। কিন্তু তোমাদের প্রশিক্ষণ তো অসম্পূর্ণ। তোমরা এখনো পরিচয় গোপন করা ও গঠন-আকৃতি পরিবর্তন করা শেখনি।

উইন্ডসর খলীল ও তার সঙ্গীকে জানায়– 'আমরা সামরিক সরঞ্জাম ও প্রচুর

নগদ অর্থ নিয়ে সিরিয়া যাচ্ছিলাম। কাফেলার মরুবাসী বেশের লোকগুলো ছিল সামরিক উপদেষ্টা। তারা ছিল খৃস্টান। সুদান যাচ্ছিল। তারাই সুদানী ফৌজ গঠন করে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই তকিউদ্দীনকে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে যে, সে অর্ধেক ফৌজ সুদান ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি বিচক্ষণতার পরিচয় না দিতেন, তাহলে তকিউদ্দীনের অবশিষ্ট ফৌজও সুদান থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না। ঐ মেয়েগুলোও সেই যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।"

উইন্ডসর আরো জানায়, সেদিন মিশরের উত্তরাঞ্চলে যখন খলীলদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেদিন ছাউনীতে অবস্থান করার সময় তাদের একজন লোকও ঘুমায়নি এবং তাদেরকে কথা ও নারী দেহের ফাঁদে ফেলে অজ্ঞান করার জন্য মেয়ে দু'টোকে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের কৌশল সফল হয় এবং খলীল ও তার সঙ্গীকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে কাফেলা রওনা হয়ে যায়।

ঘটনাটা খলীলের ভালভাবেই মনে আছে এবং অন্তরে কাঁটার ন্যায় বিদ্ধ হয়ে আছে। এমন একটি ভয়ংকর গোয়েন্দা দলের কাফেলা তার হাত থেকে ছুটে গেল! তার গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাসে এমন ঘটনা দ্বিতীয় আরেকটি ঘটেনি। খলীল তার হেডকোয়ার্টারে এ ঘটনার রিপোর্টই করেনি। কারণ, প্রতিপক্ষের গোয়েন্দারা তাকে ধোঁকা দিয়ে কাবু করে ফেলেছিল। এটা তার ও তার সঙ্গীর এমন একটা অপমান, যা কাউকে বলা যায় না।

এখন সেই কাফেলার একজন পুরুষ ও একটি মেয়ে তার সামনে দন্ডায়মান। খলীল ও তার সঙ্গী তাদের কয়েদী। তবে খলীল অস্ত্রত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। হয়ত তাকে এখান থেকে পালাতে হবে কিংবা জীবন ত্যাগ করতে হবে।

'তোমরা আমার একটা প্রস্তাব মেনে নাও'– উইন্ডসর বললেন– 'আমি তোমাদের উপর এমন দয়া করব, যেমনটি পূর্বে কখনও কারো উপর করিনি। তোমরা উভয়ে আমার দলে শামিল হয়ে যাও। বেতন-ভাতা যা চাইবে, তা-ই দেব। বললে দামেস্কে পাঠিয়ে দেব। যদি কায়রো পাঠাতে বল, তাতেও আপত্তি করব না। সেখানে গিয়ে তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর লোক হয়ে থাকবে; কিন্তু কাজ করবে আমাদের। তোমাদের দায়িত্ব হবে, ওখানে আমাদের যেসব গোয়েন্দা কাজ করছে, তাদের সাহায্য করা। ধরা পড়ার উপক্রম হলে তোমরা সময়ের আগে তাদেরকে সতর্ক করে ঠিকানা থেকে সরিয়ে দেবে।'

উইন্ডসর বলেই যাচ্ছেন আর খলীল ও তার সঙ্গী চুপচাপ শুনছে। তার ধারণা ছিল, এরা তার প্রস্তাব মেনে নেবে। তিনি বললেন– 'তবে এই প্রস্তাব

গ্রহণ করে নেয়ার আগে একটি শর্ত পালন করতে হবে। তাহল, এখানে তোমাদের যত গোয়েন্দা আছে, তাদেরকে ধরিয়ে দেবে এবং বলে দেবে তারা কে কোথায় আছে।'

'আপনার প্রস্তাবের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই'– খলীল বলল– 'আর এখানে কারো গোয়েন্দা আছে কিনা, তাও আমার জানা নেই।'

'তোমরা সম্ভবত বুঝতে পারছ না, আমি তোমাদের কী দশা ঘটাব'– উইন্ডসর বললেন– 'তোমরা যদি এই আশা করে থাক যে, আমি হুট করে তোমাদেরকে খুন করে ফেলব, তাহলে তোমাদের সেই বাসনা পূরণ হবে না। যে জাহান্নামে আমি তোমাদেরকে নিক্ষেপ করব, সেখান থেকে অত তাড়াতাড়ি তোমরা মুক্তি পাবে না।'

উইন্ডসর মুচকি একটা হাসি দিয়ে বললেন– 'তোমরা কি আশা কর যে, আমি মেনে নেব তোমরা গোয়েন্দা নও? তোমরা কি ভাবছ, আমি এখনো দ্বিধার মধ্যে আছি। তোমাদের অত জ্ঞান নেই যে, তোমরা আমাদের ধোঁকা দিতে পারবে। তাই যদি হত, তাহলে দু'টা মেয়ের হাতে তোমরা বোকা সাজতে না। তারা তোমাদেরকে তাদের যৌবন ও রূপের জালে আটকে ফেলেছিল।'

'শোন আমার খৃস্টান বন্ধু'– কণ্ঠস্বর দৃঢ় ও কঠিন রূপ ধারণ করল খলীলের– 'আমরা দু'জন গোয়েন্দা। তবে এটা ভুল যে, আমি কিংবা আমার এই বন্ধু সেদিন তোমার মেয়েদের রূপের ফাঁদে আটকেছিলাম। আমি পাথর। কিন্তু আমার মধ্যে একটা দুর্বলতা আছে। বেশ ক'বছর আগে পনের-ষোল বছর বয়সের একটি মেয়ে আমার চোখের সামনে বিক্রি হয়েছিল। আমি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম। এক ব্যক্তির হাত থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। একজনকে জখমও করেছিলাম। তারা ছিল তিনজন আর আমি একা। তারা আমাকে কাবু করে ফেলে। সেদিন যদি আমি অজ্ঞান না হয়ে পড়তাম, তাহলে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারতাম। তারা মেয়েটাকে নিয়ে গেল। মানুষ আমাকে অচেতন অবস্থায় তুলে আমার ঘরে নিয়ে যায়।'

'তোমার বাড়ী কোথায়?' উইন্ডসরই জিজ্ঞেস করেন।

'আমি কিছুই গোপন করব না। দামেস্কের সন্নিকটে একটি গ্রাম আছে। আমি সেখানকার বাসিন্দা। আর আমার এই বন্ধুর বাড়ী বাগদাদে। এসব কথা এত খোলামেলাভাবে আমি তোমার ভয়ে বলছি না। তুমি আমাকে এত সহজে পাকড়াও করতে পারবে না। সাহস থাকে তো আমার হাত থেকে বর্শাগুলো কেড়ে নাও। তুমি যে চুলার কথা উল্লেখ করেছ, সেখানে নিক্ষিপ্ত হলে আমার

লাশ নিক্ষিপ্ত হবে।'

খলীলের বক্তব্য শুনে উইন্ডসর অবজ্ঞার হাসি হাসলেন। পার্শ্ব থেকে খৃস্টান মেয়েটি হেসে বলল– 'এই আত্মবিশ্বাসই তোমাদের জীবনের অবসান ঘটাবে।' নতুন নর্তকী খলীলের মুখপানে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'আমি বলছিলাম, আমি ঐ মেয়েটাকে রক্ষা করতে পারিনি– তার স্মৃতি কাঁটা হয়ে আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে আছে। সেই রাতে যখন আমরা দু'জন তোমাদের কাফেলার সঙ্গে ছিলাম, তখন তোমার মেয়ে দু'টো আমাকে বলেছিল, তাদেরকে বিক্রি করার জন্য অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন সেই মেয়েটির মুখাবয়ব আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে, আমি যাকে রক্ষা করতে পারিনি। আমি তোমার মেয়ে দু'টোর চেহারায় সেই মেয়েটির নিষ্পাপ চেহারা দেখতে পেয়েছি। আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে থাকা কাঁটা আমার বিবেকের উপর পর্দা ফেলে দেয়। তখন যদি আমার সেই মেয়েটির কথা মনে না পড়ত, তাহলে তোমার মেয়েরা কক্ষনো আমাকে বোকা বানাতে পারত না।'

নতুন নর্তকীর দেহ সজোরে একটা ঝাকুনী দিয়ে ওঠে। একটু পেছনে সরে গিয়ে সে পালংকের উপর ধপাস করে বসে পড়ে। চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে যায়।

'আর এখন তো মৃত্যুও আমাকে বোকা বানাতে পারবে না'– খলীল বলল– 'আর তোমার কোন প্রলোভনই আমাকে আমার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।'

ভোজসভার হলরুমে আগত মেহমানরা উইন্ডসরের অপেক্ষা করছে। তাদের অধীর অপেক্ষা নতুন নর্তকীর জন্য। হলরুমের দরজার বাইরে যে দু'জন সান্ত্রী দন্ডায়মান ছিল, তারা এখন কোথায়, সে খবর কেউ জানে না।

বর্শা ও তরবারী এখনো খলীল ও তার সঙ্গীর সঙ্গেই আছে। উইন্ডসর যখন দেখলেন, আসামীরা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা ঈমান ও কর্তব্যবোধে অটল, তখন তিনি বললেন– 'ঠিক আছে, তোমাদের অস্ত্রগুলো আমার হাতে দিয়ে দাও।'

খলীল ও তার বন্ধু তাও স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে। উইন্ডসর জোরপূর্বক অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার জন্য উদ্যত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যান। সম্ভবত তিনি তার দেহরক্ষীদের ডাকতে যাচ্ছিলেন। খলীল দ্রুত ছুটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয় এবং বর্শার আগাটা উইন্ডসরের দিকে তাক করে কঠোর ভাষায় বলে উঠে– 'যেখানে আছ, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক; এক চুলও নড়বে না বলে দিলাম।' খলীল আরো সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে বর্শার আগাটা উইন্ডসরের ধমনীর উপর

স্থাপন করে। খলীলের সঙ্গীও তৎপর হয়ে ওঠে। সেও তার বর্শার আগা উইন্ডসরের ধমনীতে স্থাপন করে।

উইন্ডসরের ডেকে আনা মেয়েটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পিছনে সরতে সরতে দেয়ালের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ায়। খলীল ও তার সঙ্গী তাদেরকে ওখানেই কাবু করে ফেলে। খলীল নতুন নর্তকীকে উদ্দেশ করে বলল– 'তুমিও ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাও। চিৎকার করলে শেষ করে ফেলব বলে দিলাম।'

'তুমি যদি খলীল হয়ে থাকে, তাহলে আমি হুমায়রা'– নতুন নর্তকী বলল– 'আমি তোমাকে প্রথমদিনই চিনেছিলাম। আর তুমি আমাকে চিনতে চেষ্টা করছিলে।'

খানিক আগে খলীল তার নাম ব্যতীত আর সব লক্ষণই বলে দিয়েছিল। হুমায়রা এখানে এসে অবধি খলীলকে অবলোকন করছিল। কিন্তু খলীলের মতো সেও সন্দেহে নিপতিত ছিল। সেও ভাবছিল, মানুষে মানুষে চেহারায় মিল থাকে, আমার ধারণা সঠিক নাও হতে পারে।

'তুমিও কি গুপ্তচর?'– খলীল জিজ্ঞেস করে।

'না'– হুমায়রা জবাব দেয়– 'আমি শুধু নর্তকী। আমাকে সন্দেহ কর না খলীল। আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং তোমার সঙ্গেই থাকব। যদি জীবন দিতে হয়, তোমার সঙ্গেই দেব।

❁ ❁ ❁

ক্ষমতাচ্যুত খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ভোজসভায় এসে পৌছান। এসে উপস্থিত হন তার সকল আমীর-উজীর ও আমন্ত্রিত অথিতিগণ। উপদেষ্টা হিসেবে আগত খৃস্টান সেনা অফিসারগণও আছেন মেহমানদের মধ্যে। তাদের চলন-বলনের ধরণ রাজা-বাদশার মতো। তাদের একজন হল রেমন্ডের সামরিক প্রতিনিধি। তারা সকলে উইন্ডসরকে তালাশ করছে। উইন্ডসর এখনো এসে পৌছাননি। এখানকার সকল খৃস্টান মেয়ে হলে এসে গেছে। আসেনি শুধু একজন। নর্তকীরাও সবাই এসেছে। আসেনি কেবল নতুনজন। আস-সালিহ এসে পৌছানোর পর সকলের অস্থিরতা বেড়ে গেছে। আর বিলম্ব সইছে না কারো। এক চাকরকে বলা হল, তুমি উইন্ডসর ও মেয়ে দু'জনকে গিয়ে বল, সবাই এসে গেছেন, আপনাদের অপেক্ষা করছেন।

'চল, হাত-পা বেঁধে এদেরকে এখানেই ফেলে রেখে আমরা পালিয়ে যাই।' খলীলের বন্ধু বলল।

'তুমি কি একটা বিষাক্ত সাপকে জীবিত রাখতে চাও?' বলেই খলীল পূর্ব

থেকে উইন্ডসরের ধমনী স্পর্শ করে রাখা বর্শাটা পূর্ণ শক্তিতে সেঁধিয়ে দেয়। উইন্ডসরের মাথাটা দেয়ালের সঙ্গে লাগা ছিল। বর্শার আগা তার ধমনী অতিক্রম করে পিছন দিকে বেরিয়ে যায়। উইন্ডসরের মুখ থেকে সামান্য একটু গোঙ্গানীর শব্দ বেরিয়ে আসে। পরক্ষণেই অনুরূপ একটি গড়গড় শব্দ বেরিয়ে আসে খৃস্টান মেয়েটির মুখ থেকেও। খলীলের বন্ধুও একই কায়দায় মেয়েটিকেও কাবু করে ফেলে।

বর্শা দু'টো টেনে বের করে আনে তারা। উইন্ডসর ও মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে থাকে। এবার খলীল ও তার সঙ্গী তাদের হৃদপিণ্ডের উপর বর্শা রেখে উপর থেকে সজোরে চাপ দেয়। ঠাণ্ডা হয়ে যায় দু'জন। খলীল লাশ দু'টিকে ঠেলে দেয় পালংকের নীচে।

কক্ষটা উইন্ডসরের। দেয়ালের সঙ্গে হেঙ্গারে তার চোগাটা ঝুলছিল। মাথা ঢাকার অংশটাও আছে সঙ্গে। হুমায়রা টান দিয়ে চোগাটি নিয়ে পরে ফেলে এবং মাথাটা ঢেকে নেয়। নিজের পোশাক খুলে দেহের নিম্নাংশে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। পায়ের মোজা পরিবর্তন করে ফেলে এবং মুখটা ঢেকে নেয়। এখন এক নজরে কারো বুঝবার উপায় নেই যে, সে একজন মহিলা।

খলীল দরজা খুলে বাইরে তাকায়। বারান্দায় চাকর-বাকরদের আসা-যাওয়া ও দৌড়-ঝাপ চলছে।

তারা তিনজন বাইরে বেরিয়ে পড়ে। দরজাটা বাহির থেকে বন্ধ করে একদিকে হাঁটা দেয়। মুহূর্তের মধ্যে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

খলীল ও তার সঙ্গীর জানা আছে, তাদের কোথায় যেতে হবে। বুজুর্গ আলেমের বেশে তাদের কমান্ডার যেখানে অবস্থান করছেন, সেখানে লুকাবার জায়গাও আছে। ওখান থেকে পালাবার ব্যবস্থাও আছে। এ সময়ে শহর থেকে বের হওয়া নিরাপদ নয়। সঙ্গে ঘোড়াও নেই। হাল্ব থেকে পালিয়ে তাদের দামেস্কে পৌঁছতে হবে। খুনের ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর শহরে কী তোলপাড় শুরু হবে, সেই আন্দাজও তাদের আছে।

উইন্ডসরের খুনের ঘটনা জানাজানি হতে বেশী বিলম্ব হল না। একব্যক্তি উইন্ডসরের কক্ষের দরজা খুলেই চীৎকার করে ওঠে। পালংকের নীচ থেকে রক্ত বেয়ে বেয়ে দরজা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদময় হুলস্থূল শুরু হয়ে যায়। একটি নয়– দু'টি লাশ! জখম দু'জনের একই ধরনের!

কর্মকর্তারা ছুটে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীদের কথা মনে পড়ে যায়। তাদের উপস্থিতিতে একসঙ্গে দু'টি খুন কিভাবে হতে পারে? কর্তব্যরত সান্ত্রীদের তলব

করা হয়। কিন্তু দু'জনই উধাও। এই ভবনে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। শাসক কিংবা গণ্যমান্য নাগরিক ছাড়া কেউ এই প্রাসাদে ঢুকতে পারে না। তাদেরকেও চেক করে ঢুকতে দেয়া হয়। রক্ষী কমান্ডারের উপর বিপদ নেমে এল। এই দুর্ঘটনার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

এই হত্যাকাণ্ড কাদের কাজ? পেশাদার ঘাতকদের, নাকি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচরদের? ফেদায়ী ঘাতকদেরও হতে পারে। এই ভাড়াটিয়া ঘাতকরা অর্থের বিনিময়ে যে কাউকে খুন করতে পারে।

কর্তব্যরত প্রহরীদেরকে খুঁজে না পাওয়ায় সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল যে, এটা সুলতান আইউবীর কাজ এবং পলাতক প্রহরীরা তারই লোক। গভীর রাত অবধি খলীল ও তার সঙ্গীকে না পেয়ে শহরে তাদের অনুসন্ধান শুরু হয়ে যায়। নতুন নর্তকী যে নেই, সে তথ্য ফাঁস হয় অনেক পরে। শহর সীল করে দেয়া হয়।

খলীল, তার সঙ্গী ও হুমায়রা ঠিকানায় পৌঁছে গেছে। তারা কমান্ডারকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। কমান্ডার তাদেরকে লুকিয়ে ফেলেন এবং বলে দেন, বাইরের পরিস্থিতি অনুযায়ী তোমাদের জানানো হবে, তোমরা কবে এবং কখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে।

এই কমান্ডারের উপর কারো সন্দেহ হবে না। কারণ, মানুষ তাকে একজন বিজ্ঞ আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি বলেই জানে। যে দু'জন শিষ্যকে তিনি সঙ্গে রেখেছেন, তারাও গোয়েন্দা। হাল্‌বের তথ্যাদি দামেস্কে এরাই পৌঁছিয়ে থাকে। তিনি বাইরের পরিস্থিতির উপর নজর রাখার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেন।

হুমায়রা কমান্ডারের সম্মুখে খলীলকে তার কাহিনী শোনায়–

'তুমি যখন আমাকে আমার পিতা ও লোক দু'জন থেকে রক্ষা করার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলে, তখন আমার পিতা তোমার মাথায় কোদাল দ্বারা আঘাত হানে। আঘাতের ফলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলে। তারা তিনজন আমাকে ধরে নিয়ে একজন মৌলভী ডেকে আনে। মৌলভী সাহেব আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস না করে আমার বিবাহ পড়িয়ে দেন। তারপর লোক দু'জন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তারা আমাকে এক রাত দামেস্কে রাখে। তারপর এমন একটি এলাকায় নিয়ে যায়, যেখানে খৃষ্টানদের শাসন চলছে। তারা আমাকে নাচ-গানের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। আমি প্রথম প্রথম অমত পোষণ করি। ফলে আমার উপর এমন নির্যাতন চালানো হয় যে, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। শুরুর দিকে আমাকে উন্নত মানের খাবার দেয়া হত এবং অত্যন্ত সুস্বাদু এক প্রকার শরবত পান করাত, যার ক্রিয়ায় আমি হাসতে ও নাচতে শুরু করতাম।'

তারা নির্যাতন ও নেশার ঘোরে আমাকে নর্তকী বানিয়ে নেয়। আমি উঁচুমানের লোকদের ভোগের বস্তুতে পরিণত হই। আমাকে জেরুজালেম নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওখানে দু'ব্যক্তি আমাকে দেখে আমার মালিককে বলল, 'মূল্য যা চাইবে, তা-ই দেব, মেয়েটাকে আমাদেরকে দিয়ে যাও।' কিন্তু মালিক এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমরা একে গুপ্তচরবৃত্তি ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করে থাকি।'

হুমায়রা জানায়–

'আমাকে বেশ কয়েকবার অপহরণ করারও চেষ্টা করা হয়েছে, যা ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। এখন আমাকে এক আমীরের ফরমায়েশে হাল্‌বে তলব করা হয়েছে।'

হুমায়রা জানায়, 'প্রথমদিন যখন আমি তোমাকে দেখি, তখন আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে, তুমি খলীল। কিন্তু পরক্ষণে মনে এই সন্দেহও জাগ্রত হয় যে, মানুষে মানুষে চেহারায় মিল থাকে। হয়ত তুমি দেখতে খলীলের মত অন্য কেউ। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি তোমাকে নিরীক্ষা করে দেখতে থাকি। তারপর তো নিশ্চিত হলাম তুমি খলীল ছাড়া আর কেউ নও।'

হুমায়রা জানায়–

'আমি নোংরা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার চেতনা মরে গিয়েছিল। আমি একটি পাথরখণ্ডের ন্যায় এদিক-ওদিক নড়াচড়া করতে থাকি। কিন্তু তোমাকে দেখার পর আমার চেতনা জীবিত হয়ে ওঠে। আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে, তুমি খলীল। কিন্তু তোমার গঠন-আকৃতি আমাকে সেই সময়টা স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন আমার হৃদয়ে তোমার ভালবাসা ছিল এবং আমি তোমার সন্তানের মা হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম যে, সুযোগমত একসময় তোমাকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি খলীল? তুমি খলীল প্রমাণিত হলে তোমাকে বলব, চল আমরা পালিয়ে যাই এবং যাযাবরদের ন্যায় জীবন-যাপন করি।'

হুমায়রা খলীলকে পেয়ে গেছে এবং তার সঙ্গে পালিয়েও এসেছে। কিন্তু হাল্‌ব থেকে নিরাপদে বের হওয়া তাদের পক্ষে বিরাট এক সমস্যা।

❁ ❁ ❁

খলীফার ভোজসভা এবং নাচ-গানের আসর লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। ওখানে অপেক্ষা চলছিল উইন্ডসরের। কিন্তু পৌঁছে তার লাশ। খৃস্টান সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন যে অফিসার সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

সবচে' বেশি ক্ষুব্ধ হয় রেমন্ডের প্রতিনিধি।

উইন্ডসর অত্যন্ত চৌকস অফিসার ছিলেন। রেমন্ডের প্রতিনিধি আল-মালিকুস সালিহ, তার আমীর ও সেনা কমান্ডারদের বকাঝকা শুরু করে দেয়। তার সম্মুখে নতশীরে চুপসে আছে সবাই। তাদের অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রুতা ও ঘৃণা এত প্রবল যে, তারা খৃস্টান অফিসারদেরকে ফেরেশতা মনে করেন। তাদেরই সাহায্য-সহযোগিতায় তারা আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কাজেই তাদের তোষামোদ করা আবশ্যক। রেমন্ডের প্রতিনিধি যা-ই বলছে, তার সামনে তারা মাথানত করছে এবং জ্বি হ্যাঁ, জ্বি হ্যাঁ বলছে। রেমন্ডের প্রতিনিধি বলল–

'ঘাতকরা রাতারাতি শহর ত্যাগ করতে পারবে না। কাজেই ভোর থেকেই হাল্‌বের প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চালানো হোক। এলাকার সমস্ত ফৌজকে এ কাজে লাগিয়ে দাও। মানুষ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার আগেই ফৌজ ঘরে ঘরে ঢুকে পড়বে। এখানকার অধিবাসীদের অস্থির করে তুলতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই ঘাতকদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।'

'তা-ই হবে'– এক মুসলমান আমীর বললেন– 'আমরা ফৌজকে এখনই নির্দেশ দিচ্ছি, যেন তারা রাতের আঁধারেই শহরে ছড়িয়ে পড়ে।'

'না, এটা হতে পারে না'– একজন মুসলমান কেল্লাদারের কণ্ঠ। তিনি হুংকার ছেড়ে আবার বললেন– 'না, এমন হতে পারে না। তল্লাশি শুধু সেই ঘরেই নেয়া হবে, যে ঘরে ঘাতকরা লুকিয়েছে বলে প্রবল সন্দেহ হবে এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকবে।'

কেল্লাদারের এ হুংকারে অকস্মাৎ উত্তপ্ত মজলিস ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পিনপতন নীরবতা নেমে এলে হলরুমে। হঠাৎ চুপসে গেল প্রতাপান্বিত এতগুলো পদস্ত শাসক-কর্মকার্তা। এমন একটি জ্বলন্ত সত্য ভাষণ শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ। রেমন্ডের সামরিক প্রতিনিধির নির্দেশকে কোন মুসলমান এত সাহসিকতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তা সকলের কল্পনার বাইরে। মাথা উঁচু করে, চোখ বড় করে ও কপালে ভাজ তুলে দেখার চেষ্টা করল, লোকটা কে।

লোকটা হামাতের দুর্গ- অধিপতি। তার নাম জুরদিক। ইতিহাসে তার নাম এই জুরদিকই উল্লেখ করা হয়েছে। পুরো নাম পাওয়া যায় না। ইতিহাস তার সম্পর্কে এটুকুই বলছে যে, লোকটা সালাহুদ্দীন আইউবীর বন্ধু ছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা পর্যন্ত তিনি আইউবী বিরোধী শিবিরেরই লোক ছিলেন এবং আল-মালিকুস সালিহ'র অফাদার ছিলেন। তার প্রমাণ, তিনি এই ভোজসভায় শুধু

উপস্থিত-ই ছিলেন না; বরং আইউবী বিরোধীদের জঙ্গী কর্মকাণ্ডগুলোতেও হাজির থাকতেন। সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছিল, তিনি তাতেও উপস্থিত ছিলেন।

জুরদিক যখন একজন খৃষ্টানের মুখ থেকে শুনলেন যে, হাল্‌বের প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চালানো হবে, তখন তার মধ্যে ইসলামী মর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। তিনি প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। তিনি বললেন– 'এখানকার প্রতিটি পরিবার মুসলমান। তাদের মধ্যে পর্দানশীল সম্ভ্রান্ত মহিলারাও রয়েছেন। আমি তাদের অবমাননা মেনে নিতে পারি না। সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে সৈন্য ঢুকতে পারবে না।'

'উইন্ডসরের ঘাতক এই নগরীরই মানুষ'– এক খৃষ্টান অফিসার বলল– 'আমরা সব নাগরিক থেকে প্রতিশোধ নেব। উইন্ডসরের ন্যায় একজন সুদক্ষ অফিসার খুন হল। আমরা কারো ইজ্জত, কারো পর্দার পারোয়া করি না।'

'আর তোমাদের একজন অফিসার খুন হয়েছে, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।' ক্ষুব্ধ জুরদিক কম্পিত কণ্ঠে বললেন।

'চুপ কর জুরদিক!'– অনভিজ্ঞ বালক সুলতান আদেশের ভঙ্গিতে বললেন– 'এরা এতদূর থেকে আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছেন! এরা আমাদের সম্মানিত মেহমান। তুমি কি মেহমানদারীর আদব-কায়দা ভুলে গেছ? নিমকহারামী কর না জুরদিক! যে করেই হোক, খুনীকে আমাদের ধরতেই হবে।'

খলীফার সমর্থনে আরো কয়েকটি কণ্ঠ ভেসে এল– 'ঠিক, ঠিক।'

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরোধী হতে পারি এবং বিরোধী-ই'– জুরদিক বললেন– 'কিন্তু আমি আমার স্বজাতির বিরোধী নই। মুহতারাম সুলতান! আপনি যদি জনসাধারণকে বিরক্ত করেন, তাহলে তারা আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে। আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যে রণ প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তা দুর্বল হয়ে পড়বে।'

'আমরা জনগণের পরোয়া কখনো করি না'– রেমন্ডের প্রতিনিধি বলল– 'উইন্ডসরের ঘাতকদেরকে আমরা খুঁজে বের করবই। শহরের যেখানেই পালিয়ে থাকুক, তাদেরকে ধরবই। এ হত্যাকাণ্ড যে সালাহুদ্দীন আইউবী করিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই।'

'আমার দোস্ত!'– জুরদিক বললেন– 'তোমাদের একজন অফিসারের খুন হওয়া তেমন কোন ঘটনা নয়। তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে খুন করার জন্য কতবার চেষ্টা করেছ! পারনি, সে ভিন্ন কথা। আমি একথা বলছি না যে, আইউবীকে খুন করার চেষ্টা করে তোমরা অন্যায় করেছ। দুশমন একে অপরকে

বৈধ-অবৈধ যে কোন পন্থায়ই ঘায়েল করার চেষ্টা করে। তোমাদের উইন্ডসরকে যদি আইউবী-ই খুন করিয়ে থাকেন, তাহলে পার্থক্য শুধু এটুকু যে, তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় তোমরা সফল হওনি; কিন্তু তিনি সফল হয়েছেন। তোমরাও তো তার কয়েকজন অফিসারকে খুন করিয়েছ। তারপরও তো তিনি জনসাধারণকে বিরক্ত করেননি।'

সমস্ত মুসলিম আমীর ও কর্মকর্তা জুরদিকের বিপক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। তারা খৃস্টানদেরকে নারাজ করতে চাচ্ছেন না। কিন্তু জুরদিক একাই সকলের মোকাবেলা করেন এবং নিজের অভিমতের উপর সুদৃঢ় থাকেন যে, নগরীর ঘরে ঘরে নির্বিচারে তল্লাশী চালানো যাবে না।

'তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, তুমিও এই খুনের ঘটনায় জড়িত রয়েছ?' এক খৃস্টান উপদেষ্টা বলল– 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর অনুগত।'

'যদি হাল্‌বের মুসলিম পরিবারগুলোকে অন্যায়ভাবে পেরেশান করা হয়, তাহলে আমি যে কারো হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারি'– জুরদিক বললেন– 'আর আইউবীর বন্ধুও হয়ে যেতে পারি।'

'আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে আছি, আমাদেরই নির্দেশ চলবে।' খৃস্টান প্রতিনিধি বলল।

'এখানে তোমরা ভাড়ায় এসেছ'– জুরদিক বললেন– 'এদেশে শাসন চলবে আমাদের। আমরা মুসলমান। পরিস্থিতি আমাদেরকে আপসে যুদ্ধে করাচ্ছে। মুসলিম-অমুসলিমে কখনো সখ্য হতে পারে না। যদি বল, তোমরা পারিশ্রমিক ছাড়া এসেছ, তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। দুর্গ অধিপতির পদ থেকেও আমি অব্যাহতি গ্রহণ করছি। আমি তোমাদের সকলকে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমার জাতির একটি নিরপরাধ লোককেও যদি কষ্ট দেয়া হয়, আমি তার প্রতিশোধ নেব।'

কার যেন ইশারায় দু'ব্যক্তি জুরদিককে বাহিরে নিয়ে যায়। তার অনুপস্থিতিতে খৃস্টান প্রতিনিধি সভাসদদের উদ্দেশ করে বলল– 'পরিস্থিতি এমন যে, দুর্গ অধিপতিকে ক্ষেপানো যাবে না। লোকটা যেভাবে সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলছে, তাতে বুঝা যায় যে, তার দুর্গে যেসব সৈন্য আছে, তারা তার অনুগত। ঘটনা যদি তা-ই হয়, তাহলে পরিস্থিতিটা ভাল নয়।

আপসে শলা-পরামর্শ করে জুরদিককে ভেতরে নিয়ে আসা হল। তাকে আশ্বস্ত করা হল, নিরীহ জনসাধারণকে হয়রানী করা হবে না। কিন্তু ঘাতকদের খুঁজে বের করতে হবে।

জুরদিক বললেন– 'ঠিক আছে, আমি তিন-চার দিন এখানে থাকব। দেখব, তোমরা কী কর।'

চারদিন পর জুরদিক হাল্ব থেকে রওনা হন। গন্তব্য তার হামাতের দুর্গ। তার উপস্থিতিতে খুনীদের অনুসন্ধান ও গোয়েন্দা তৎপরতা চলে। তিনি পরিস্থিতির উপর কড়া দৃষ্টি রাখেন। তার দাবি অনুযায়ী কারো বাড়ি-ঘরে হানা দেয়া হয়নি। তিনি নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছেন। কিন্তু খৃস্টানরা তার ব্যাপারে আশ্বস্ত নয়। সঙ্গে দশ-বারজন রক্ষীসেনা। তিনিসহ সবাই অশ্বারোহী।

জুরদিক এগিয়ে চলছেন। একটু পরপর পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করতে হচ্ছে। দু'-তিনটা পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করার পর আরো একটা পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে পড়েন। পথের দু'পার্শ্বে উঁচু-নীচু অনেক টিলা। হঠাৎ কোন একদিক থেকে একসঙ্গে দু'টি তীর ছুটে আসে তার দিকে। উভয় তীর জুরদিকের ঘোড়ার মাথায় এসে বিদ্ধ হয়। হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে ঘোড়াটা দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করে। শাঁ করে ধেয়ে আসে আরো দু'টি তীর। এগুলোও বিদ্ধ হয় ঘোড়ার গায়ে।

জুরদিক দক্ষ ঘোড়সওয়ার। তিনি ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে একটি পাথরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান। তার রক্ষী সেনারা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। যারা তীর ছুঁড়েছে তাদেরকে খুঁজতে থাকে।

এলাকাটি এমন যে, কাউকে গ্রেফতার করা কঠিন ব্যাপার। জুরদিক বুঝে ফেলেন, এরা ভাড়াটিয়া ঘাতক। সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে খৃস্টানরা তাকে খুন করার জন্য এদের নিয়োগ করেছে। খৃষ্টানদের মনে সন্দেহ, জুরদিক সুলতান আইউবীর সমর্থক।

জুরদিক দক্ষ যোদ্ধা। তিনি পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে উপরে উঠে আসেন। চারদিকে টিলা আর টিলা। তার রক্ষীসেনারা তীরান্দাজদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'এদিকে আস!' এক রক্ষী চিৎকার করে বলল– 'জলদি এদিকে আস, ধরে ফেলেছি।'

সবাই ওদিকে ছুটে যায়। তিন ব্যক্তিকে ঘিরে ফেলেছে তারা। তিনজনই মুখোশ পরিহিত। কিন্তু তাদের নিকট ধনুক নেই, তূনীরও নেই। শুধু ঘোড়া আছে। তাদেরকে এমন অবস্থায় পাকড়াও করা হয়েছে, যখন তারা ঘোড়ায় আরোহন করছিল। সবারই মুখমণ্ডল আবৃত। শুধু চোখ দু'টো দেখা যাচ্ছে। রক্ষীরা তদেরকে ধরে জুরদিকের নিকট নিয়ে যায়।

'তোমাদের ধনুক-তূনীর কোথায়?' জুরদিক ধৃতদের জিজ্ঞেস করে।

'আমাদের কাছে তরবারী ছাড়া আর কিছুই নেই।' একজন জবাব দেয়।

'শোন ভাইয়েরা!'– জুরদিক শান্ত কণ্ঠে বললেন– 'তোমাদের চারটি তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তোমরা আমাকে খুন করতে ব্যর্থ হয়েছ। এবার ধরাও পড়েছ। কাজেই মিথ্যা বলে লাভ নেই।'

'কিসের তীর?'– বিস্ময়ভরা কণ্ঠে একজন বলল– 'আমরা তো কোন তীর ছুঁড়িনি। আমরা পথচারী। খানিক বিশ্রাম করার জন্য বসেছিলাম! যখন রওনা হতে উদ্যত হলাম, এরা আমাদেরকে ধরে নিয়ে এল!'

জুরদিক হাসেন এবং মুখোশ পরিহিত উত্তরদানকারী লোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আমার শত্রু মনে করি না। তা-ই যদি হতো, তাহলে এতক্ষণে তোমাদের সকলের মস্তক উড়িয়ে দিতাম। আমি জানি, তোমরা ভাড়াটিয়া খুনী। তোমরা শুধু এটুকু স্বীকার কর– আমাকে খুন করার জন্য তোমাদেরকে কে পাঠিয়েছে? সত্য সত্য বল, তোমাদেরকে ছেড়ে দেব।' কিন্তু ধৃতরা একই কথা বলছে যে, এ ব্যাপারে তারা কিছুই জানেনা।

দু'জন মুখোশধারী শপথ করে বলল– 'এই ঘটনার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।'

তৃতীয় জন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

'দেখ, অযথা নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিও না'– জুরদিক বললেন– 'পরের জন্য নিজের জীবন নষ্ট কর না। আমি তোমাদেরকে শাস্তি দেব না, এক্ষুণি ছেড়ে দেব।'

'এদের মুখোশগুলো খুলে ফেল'– জুরদিক তার রক্ষীদের নির্দেশ দেন– 'এদের হাত থেকে তরবারীগুলো নিয়ে নাও।'

দুই মুখোশধারী খাপ থেকে তরবারী খুলে হাতে নেয় এবং লাফ মেরে পিছনে সরে যায়। তৃতীয়জন তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার সঙ্গে তরবারী নেই।

জুরদিক অট্টহাসি হেসে বললেন– 'তোমরা কি এতগুলো রক্ষীসেনার মোকাবেলা করতে পারবে? অথচ তোমাদের তৃতীয়জনের হাতে অস্ত্র নেই! আমি তোমাদেরকে পুনরায় সুযোগ দিলাম। তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ কিন্তু আমি এখনো দেইনি।'

রক্ষীরা অস্ত্র তাক করে তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যায়।

'আর আমি আপনাকে শেষবারের মতো বলছি, আমরা কেউ তীর ছুঁড়িনি।' এক মুখোশধারী বলল।

রক্ষীসেনাদের কমান্ডার ধৃত তিন ব্যক্তির পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার মনে বিশেষ সন্দেহ জাগে। তৃতীয় যে লোকটির হাতে অস্ত্র নেই, টান মেরে তার মুখোশটা খুলে ফেলে। তার মুখোশহীন উন্মুক্ত মুখাবয়ব দেখে সবাই থ খেয়ে যায়। এ যে একজন রূপসী যুবতী!

জুরদিক বললেন, ওকে আমার কাছে নিয়ে আস। অপর দু'জন হঠাৎ লাফ মেরে পেছনে মোড় ঘুরিয়ে মেয়েটিকে পাকড়াওকারী রক্ষীর বুকে তরবারী তাক করে ধরে।

একজন চিৎকার করে বলে ওঠে– 'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাদেরকে তোমাদের পুরো ঘটনা খুলে না বলবে এবং আমাদের ইতিবৃত্ত না শুনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটির গা স্পর্শ করবে না বলে দিচ্ছি। আমরা জানি, আমাদেরকে তোমাদের হাতে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু তোমাদের অন্তত অর্ধেক রক্ষীসেনাকে না মেরে আমরা মরছি না। মেয়েটাকে তোমরা জীবিত নিতে পারবে না।'

জুরদিক ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। তিনি রক্ষীদেরকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে মুখোশধারীদের বললেন– 'তোমরা আমার কাছে আর কী কথা শুনতে চাও বল। কথা তো এটুকুই যে তোমরা ভাড়াটিয়া খুনী আর এই মেয়েটিকে পুরস্কার হিসেবে লাভ করেছ।'

'তোমরা ভুল করছ'– একজন মুখোশধারী বলল– 'খৃস্টান অফিসার ও একটি মেয়েকে হত্যা করে আমরা অপরাধ করিনি। পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছি, সে আমাদের দুর্ভাগ্য। তারপরও আমরা আনন্দিত যে, আমরা কর্তব্য পালন করেছি। এই মেয়েটি মুসলমান ও নিপীড়িত। আমরা একে খৃস্টানদের পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করে এনেছি। আর যাচ্ছি দামেস্কে।'

'আচ্ছা! উইন্ডসর ও খৃস্টান মেয়েটাকে তাহলে তোমরা খুন করেছ!' হঠাৎ চমকে ওঠে জিজ্ঞেস করেন জুরদিক।

'হ্যাঁ'– এক মুখোশধারী জবাব দেয়– 'আমরাই তাদেরকে হত্যা করেছি।'

'আর তোমরা আমার উপর এই জন্য তীর ছুঁড়েছ যে, আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন।' জুরদিক বললেন।

'দেখুন, আমরা ভালভাবেই জানি, আপনার নাম জুরদিক এবং আপনি হামাত দুর্গের অধিপতি'– এক মুখোশধারী বলল– 'আমরা এ-ও জানি যে, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন। কিন্তু আপনাকে হত্যা করার প্রয়োজন আমাদের নেই। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতি শীঘ্র আমরা তোমাদেরকে নিরস্ত্র

করব। সকল সৈন্যসহ তোমাদেরকে কয়েদী বানাব। সুলতান আইউবী হাসান ইবনে সাব্বাহ কিংবা শেখ সান্নান নন। তিনি ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ করেন– চোরের মতো কাউকে খুন করান না। উইন্ডসর ও খৃস্টান মেয়েটির হত্যাকাণ্ড আমাদের ব্যক্তিগত কাজ। কাজটা আমরা বাধ্য হয়েই করেছি। পরিস্থিতি আমাদেরকে বাধ্য করেছিল। এতে সুলতান আইউবীর কোন হাত নেই।'

জুরদিকের ঘোড়াটা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তারা সেটির দিকে তাকায়। দু'টি তীর ঘোড়াটার কপালে আর দু'টি পাজরে বিদ্ধ হয়েছে। বলল– 'আপনি সুদক্ষ দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসুন। আমাদের একজনকে তীর-ধনুক দিন। আপনি ঘোড়া হাঁকান। অশ্ব চালনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন। আমরা যে কোন একজন ঘোড়ার পিঠে বসে তীর ছুঁড়ব। যদি প্রথম তীরটি লক্ষভ্রষ্ট হয়, তাহলে আমাদের গর্দান উড়িয়ে দিন। যে চারটি তীর আপনার বদলে ঘোড়ার গায়ে বিদ্ধ হয়েছে, এগুলো আমরা ছুঁড়িনি। আমাদের নিশানা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।'

'তোমাকে তো সাধারণ সৈনিক মনে হয় না!'– জুরদিক বললেন– 'তুমি কি সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজের লোক?'

'আর আপনি কে?' মুখোশধারী জিজ্ঞেস করে– 'আপনি কি সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজের লোক নন? আপনি কি ইসলামের সৈনিক নন? আপনি কি আপনার পরিচয় ভুলে গেছেন? কেল্লাদারির পদমর্যাদা আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিয়েছে। আপনি আরো উচ্চ মর্যাদা লাভ করার জন্য কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন।'

'আপনি ভেঙ্গে যাওয়া সেই বৃক্ষ ডালটির ন্যায়, যার ভাগ্যে শুকিয়ে পরে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।' অপর মুখোশধারী বলল– 'আপনি এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নন যে, সালাহুদ্দীন আইউবীর আপনাকে হত্যা করার গরজ পড়েছে। নিজের কৃতকর্মের সাজা ভোগ করার জন্য আপনার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। আপনি খুন হবেন তো খৃস্টানদের হাতে হবেন।'

'আপনি হাল্‌বে মদপান করতে আর আয়েশ করতে গিয়েছিলেন'– প্রথম মুখোশধারী বলল– 'আপনি এই মেয়েটির নাচ উপভোগ করতে গিয়েছিলেন।'

'আমি মুসলমান মেয়ে'– মেয়েটি বলে ওঠল– 'আমাকে খৃস্টানদের আসরে আসরে নাচানো হয়েছে। খৃস্টানরা আমার দেহ নিয়ে খেলা করেছে। আপনি কিছুক্ষণের জন্য কল্পনা করুন, আমি আপনার কন্যা। আমি ওখানে মুসলিম মেয়েদেরকে উলঙ্গ নাচতে দেখেছি। আপনারা এতো আত্মমর্যাদাহীন হয়ে

গেছেন যে, আপন বোন-কন্যাদের শ্লীলতাহানিও আপনাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে পারে না। আমি খৃস্টানদের মাঝে সাত-আট বছর কাটিয়ে এসেছি। আমি সেই খৃস্টান সম্রাট-শাসকদের সঙ্গেও সময় অতিবাহিত করেছি, যাদেরকে আপনারা বন্ধু বানিয়ে আপনাদের মাতৃভূমিতে ডেকে এনেছেন। আমি তাদের কথাবার্তা শুনেছি। তারা বন্ধুত্বের ফাঁদ পেতে মুসলমানদের আপসে যুদ্ধ করাচ্ছে।'

জুরদিক নীরব-নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছেন। অপলক নেত্রে এক নাগাড়ে তাকিয়ে আছেন মেয়েটির প্রতি। তার রক্ষীরা হতভম্ব যে, এত প্রতাপশালী ও দুঃসাহসী দুর্গ অধিপতি কীভাবে এসব বরদাশত করছেন!

গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেছেন জুরদিক। কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কোমল কণ্ঠে মুখোশধারীদের উদ্দেশ করে বললেন- 'আমি তোমাদেরকে কেল্লায় নিয়ে যেতে চাই।'

'কয়েদি বানিয়ে?' প্রশ্ন করে এক মুখোশধারী।

'না'– সবাইকে হতবাক করে জুরদিক বললেন– 'মেহমান বানিয়ে। আমার উপর ভরসা রাখ। তরবারীগুলো সঙ্গেই রাখ।'

সকলে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। জুরদিকের ঘোড়া মারা গেছে। তিনি এক রক্ষীর ঘোড়ায় ওঠে বসেন।

কাফেলা রওনা হয়ে যায়।

❁ ❁ ❁

কাফেলা পার্বত্য অঞ্চল ত্যাগ করে সমতলভূমিতে বেরিয়ে এল বলে, ঠিক এমন সময় তারা একাধিক ধাবমান ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পায়। তারা ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয়। দেখতে পায়, দু'জন অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে হাল্‌বের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের ধনুক-তূনীর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তারা এখান থেকেই পালিয়েছে বলে কাফেলা নিশ্চিত হয়।

'সম্ভবত এরাই আপনার ঘাতক।' বলেই এক মুখোশধারী ঘোড়ার গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। অপর মুখোশধারীও তার ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয়। উভয়ে তরবারী হাতে তুলে নেয়।

পলায়নপর ঘোড়া দু'টিকে ধাওয়া করছে কাফেলা। দুই মুখোশধারীর ঘোড়ার গতিই সবচে' বেশী। সামনে বালির টিলা ও পার্বত্য অঞ্চল। পলায়নপর আরোহীদ্বয় ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। মুখোশধারী দু'জন অভিজ্ঞ অশ্বারোহী। তারাও ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দূরত্ব কমিয়ে ফেলে। পলায়নকারীরা কাঁধের ধনুক

হাতে নিয়ে তাতে তীর সংযোজন করে। হঠাৎ ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে মোকাবেলার পজিসনে ধাওয়াকারীদের প্রতি তীর ছোঁড়ে। তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। মুখোশধারী দু'জন আরো নিকটে চলে আসে। এখন উভয়ই তীর ছোঁড়ার চেষ্টা করে। পলায়নকারী একজন একটি ঘোড়ার পিছন দিকে তরবারীর আঘাত হানে। ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। অপর পলায়নকারীর উপরও আঘাত করা হয়। তার একটি বাহু কেটে যায়। ঘোড়াটিও আহত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কাফেলার রক্ষীরা পলায়নকারী অশ্বারোহীদের ধরে ফেলে।

ধৃতদেরকে জুরদিকের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। এবার আসল চেহারা খুলে যায়।

মুখোশধারীরা তাদের মুখোশ খুলে ফেলে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়, তারা সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। তাদের একজন হল খলীল। অপরজন তার সঙ্গী।

পলায়নরত অবস্থায় যে দু'অশ্বরোহীকে ধরা হল, তারাও মুসলমান। কিন্তু এখানে এসেছিল তারা জুরদিককে হত্যা করতে। খৃস্টানদের নিকট ঈমান বিক্রিকরা বিভ্রান্ত মুসলমান তারা। তাদের যে লোকটির বাহু কেটে গেছে, তাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে কিছু দূরে ফেলে দেয়া হল। অপরজনকে বলা হল, তুমি যদি জীবিত ফিরে যেতে চাও, তাহলে বল তোমাদেরকে কে পাঠিয়েছে? অন্যথায় তোমাকেও সঙ্গীর পরিণতি বরণ করতে হবে।

অশ্বরোহী এবার মুখ খুলল– 'পাঠিয়েছে রেমন্ডের সামরিক প্রতিনিধি। তিনি হাল্‌বের ভোজসভায় মুসলিম আমীরদের উপস্থিতিতে বলেছিলেন, অমুক দিন অমুক সময় জুরদিক পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করবে। তিনি আমাদেরকে বিপুল অর্থ প্রদান করেছেন। আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, তোমরা পাহাড়ের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকবে আর জুরদিককে সময়মত তীরের নিশানা বানিয়ে ফিরে আসবে।'

আমরা দু'জন নির্দিষ্ট সময়ে এই এলাকায় পৌঁছি এবং পথের দিকে দৃষ্টি রেখে একটি উঁচু পাথরের উপর লুকিয়ে বসে থাকি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আপনার কাফেলা এসে পড়ে। আমরা আপনাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ি। কিন্তু তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পুনরায় তীর ছুঁড়লে সেটিও লক্ষভ্রষ্ট হয়ে ঘোড়ার গায়ে বিদ্ধ হয়।'

অক্ষত তীরান্দাজকে নিয়ে জুরদিক হামাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। অপরজন কর্তিত বাহুর রক্তক্ষরণের ফলে প্রাণ হারায়।

পথে খলীল হুমায়রার ইতিবৃত্ত কাহিনী জুরদিককে শোনায়। উইন্ডসরকে সে কিভাবে হত্যা করেছিল, তারও বিবরণ দেয়। জুরদিক বিস্ময় প্রকাশ করেন যে,

এমন ঝুঁকিপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটিয়ে তোমর হাল্‌ব থেকে কিভাবে বেরিয়ে এলে!

খলীল জুরদিককে আরো জানায়– 'হাল্‌বে আমাদের একজন কমান্ডার রয়েছেন। কিন্তু আমি তার নাম ও গঠন-আকৃতি আপনাকে বলব না। তিনি কাপড় ইত্যাদি বস্তু পেঁচিয়ে নবজাতক শিশুর সমান একটি প্রতিকৃতি তৈরি করে তার উপর কাফন পরিয়ে দেন। আমাদের চার-পাঁচজন গোয়েন্দা আশপাশে সংবাদ ছড়িয়ে দেয় যে, এখানে অমুকের একটি সন্তান মারা গেছে। কমান্ডার কাফন পেঁচানো প্রতিকৃতিটি দু'হাতে তুলে কবরস্তানের দিকে হাঁটা দেন। আমি, আমার সঙ্গী, হুমায়রা (পুরুষের পোশাকে) এবং আরো চার-পাঁচ ব্যক্তি শবযাত্রার ন্যায় তার পেছন পেছন এগিয়ে আসি। কবরস্তানটি শহরের বাইরে। ওখানে তিনটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে ছিল। হাল্‌বের ফৌজে কর্মরত আমাদের এক গোয়েন্দা ঘোড়াগুলো সংগ্রহ করে ওখানে নিয়ে রেখেছিল। জানাযা হাল্‌বের ডিউটিরত সেনা সদস্যদের সম্মুখ দিয়েই কবরস্তানে গিয়ে পৌঁছে। ওখানে একটি কবর খনন করলাম। লাশ দাফন করে আমি, আমার সঙ্গী ও হুমায়রা ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে আসি।'

জুরদিকের কাফেলা যখন দুর্গে গিয়ে পৌঁছে, তখন রাত হয়ে গেছে। জুরদিক খলীল ও তার সঙ্গীদেরকে সম্মানিত মেহমানের ন্যায় থাকতে দেন। তিনি খলীলকে বললেন– 'এবার আমাকে তোমার বন্ধু মনে করতে পার। বল, সালাহুদ্দীন আইউবী কী করছেন? তোমার অবশ্যই জানা আছে যে, আইউবী আস-সালিহ্‌কে ধাওয়া করে ধরলেন না কেন। বল, কারণটা কী?'

'আমি সুলতান আইউবীর পরিকল্পনা যদিও জানি, কিন্তু আপনাকে বলব না'– খলীল বলল– 'আর হাল্‌ব থেকে আমি কী কী তথ্য নিয়ে এসেছি, তাও আপনাকে জানাব না।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল'– জুরদিক বললেন– 'পরে এই শত্রুতা আদর্শিক দ্বন্দ্বের রূপ ধারণ করে। তার কারণ যা-ই থাকুক, আমি ভুলের উপর ছিলাম। দুশমন আমাকে ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি খৃস্টানদের মতলব বুঝে ফেলেছি। তারা একদিকে আমার ফৌজ ও আমার দুর্গকে ব্যবহার করতে চায়, অন্যদিকে আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে। আমার মরহুম নুরুদ্দীন জঙ্গী ও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কথা মনে পড়ে। তাদের মতে এই যুদ্ধ চাঁদ-তারা ও ক্রুশের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ কোন মুসলিম রাজার সঙ্গে কোন খৃস্টান রাজার যুদ্ধ নয়। সুলতান আইউবী বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে একজন মুসলমানও জীবিত থাকবে, খৃস্টানরা তাকে খতম করার

চেষ্টায় রত থাকবে। অমুসলিম যে ধর্মেরই হোক মুসলমানের আপন হতে পারে না। অমুসলিম মুসলমানের প্রতি বন্ধুত্বের নামে যে হাত প্রসারিত করে, তাতে শত্রুতার বিষ মেশানো থাকে। নুরুদ্দীন জঙ্গীও এই নীতিরই অনুসারী ছিলেন। তিনি সবসময় বলতেন, যেদিন মুসলমান কোন অমুসলিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়বে, সেদিন থেকে ইসলামের পতন শুরু হয়ে যাবে।'

'তবে কি আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে যোগ দেবেন?'- খলীল জিজ্ঞাসা করল- 'আমি একজন সামান্য মানুষ, সাধারণ একজন সৈনিক। আমার এই দুঃসাহস না দেখানেই উচিত যে, একজন দুর্গপতিকে জিজ্ঞেস করব, আপনি কী ভাবছেন এবং আপনার উদ্দেশ্য কী? কিন্তু একজন মুসলমান হিসেবে আমার অধিকার আছে, যে মুসলমান পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তাকে এটুকু বলব, তুমি গোমরাহ হয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ'- জুরদিক বললেন- 'তোমার এই অধিকার রয়েছে। আমি তোমাকে একটি পয়গাম শোনাতে চাই। পয়গামটি তুমি সুলতান আইউবীর কানে পৌঁছিয়ে দিও। আমি লিখিত পয়গাম পাঠাতে চাই না। আপাতত দূত প্রেরণ করাও সমীচিন মনে করছি না। তুমি আইউবীকে বলবে, তিনি যেন হামাতের দুর্গকে তাঁরই দুর্গ মনে করেন। কিন্তু সাবধান! কোন বিশ্বস্ত সালারকেও যেন বুঝতে না দেন যে, আমি এই প্রস্তাব পেশ করেছি। বিষয়টা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাঁকে বলবে, খৃস্টানরা বন্ধুত্বের আড়ালে আমাদের ভূখণ্ডে ঝেঁকে বসেছে। তোমরা সম্ভবত শীতের পর হামলা করবে। কিন্তু সাবধান! এদিক থেকে তোমাদের উপর আগেই হামলা হয়ে যায় কিনা। তোমরা যদি অগ্রসর হও, তাহলে হামাতের পথে আসবে। আমি ইনশাল্লাহ তোমাদের পুরাতন বন্ধুত্বের হক আদায় করব।'

পরদিন জুরদিক খলীল, তার সঙ্গী ও হুমায়রাকে বিদায় করে দেন।

❁ ❁ ❁

খৃস্টান ইন্টেলিজেন্স কমান্ডার উইন্ডসরের হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে একটি আকস্মিক ঘটনা। তিনি সুলতান আইউবীর দুই গোয়েন্দার সামনে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, যার ফলে তারা বাধ্য হয়েই তাকে খুন করে। কিন্তু কাজটি ছিল অবশ্যই দুঃসাহসিক। উইন্ডসর হত্যাকাণ্ডে সুলতান আইউবীর একটি উপকার এই হয়েছিল যে, তাঁর শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা বিভাগ- যা পূর্ব থেকেই দুর্বল ছিল- সংগঠিত হতে পারল না। অপরদিকে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত ও বিচক্ষণ। তার গোয়েন্দারা কেবল

গোয়েন্দাই নয় যে ধরা পড়ে গেলে কিছুই করতে পারবে না। তিনি তাঁর গোয়েন্দাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর কমান্ডো প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছেন, যাতে ধরা পড়ে গেলেও প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং কাউকে হত্যার প্রয়োজন হলে হত্যা করবে। তাদের দেহ-মন এতই পাষাণ যে, নির্যাতন যতো কঠিনই হোক, তারা সহ্য করে নেবে। তীব্র থেকে তীব্রতর ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও চরম ক্লান্তি তাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়।

খলীল ও তার সহকর্মীদের মধ্যেও এসব গুণাবলী বিদ্যমান। তারা কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ খৃস্টান অফিসারকে হত্যা করেই দুশমনকে বোকা বানায়নি, বরং জুরদিকের ন্যায় কঠিন মনের দুর্গপতিকে কথার মাধ্যমে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তাকে সুলতান আইউবীর পক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

খলীল যখন সুলতান আইউবীকে জুরদিকের বার্তা শোনায়, তখন সুলতান এমন এক স্বস্তি অনুভব করেন, যেন উত্তপ্ত মরুভূমিতে হঠাৎ শীতল বায়ুর ঝাঁপটা এসে গায়ে লাগে। সুলতান চারদিকে শুধু দুশমনই দেখতে পেতেন। আপনও দুশমন, পরও দুশমন। জুরদিকের পয়গাম তাকে স্বস্তি দিল বটে; কিন্তু তিনি আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হলেন না। বিষয়টা প্রতারণাও হতে পারে বিধায় তিনি আক্রমণ পরিকল্পনায় কোন রদবদল করলেন না। শুধু এতটুকু চিন্তা মাথায় রাখলেন যে, হামাত থেকে সাহায্য পেতে পারি।

দুশমনের আস্তানা হাল্‌ব থেকে যেসব সংবাদ আসছে, তাতে নতুন কোন তথ্য নেই। ওখানে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ওখানকার উপদেষ্টা ও কমান্ডারদের দৃঢ় বিশ্বাস, শীতের মওসুমে যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। একটি সংবাদই পাওয়া গেছে যে, খৃস্টানরা বাহ্যত ওখানকার সকলের বন্ধুর রূপ ধারণ করেছে ঠিক; কিন্তু আমীরদের একজনের বিরুদ্ধে অপরজনকে উত্তেজিত করে তুলছে। আস-সালিহ'র আশপাশের লোকেরা একে অপরের দুশমন, সে তো সুলতান আইউবীর জানা বিষয়। তারা সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে শুধু এজন্যে একত্রিত হয়েছে যে, সুলতান তাদের সকলের প্রতিপক্ষ। আর এই শত্রুতার কারণ হল, সুলতান আইউবী তাদেরকে বিলাসিতা ও স্বাধীন জীবন-যাপন করার অনুমতি দেন না। সুলতান আইউবীর এই মিশনটাও তাদের ভাল লাগে না যে, সালতানাতে ইসলামিয়ার সম্প্রসারণ ও সুরক্ষাকে ঈমানী দায়িত্ব ভাবতে হবে। তিনি সেইসব রাষ্ট্রনায়কদের মত নন, যারা শান্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা ও ভোগ-বিলাসিতার জন্য শত্রুকে বন্ধুরূপে বরণ করে নেয়। যুদ্ধের যত প্রকার বিদ্যা ও কলাকৌশল রপ্ত করা আবশ্যক, তার সবই সুলতান আইউবী অর্জন করেছেন।

তার বাহিনী হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেও লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। এখন রাতের প্রশিক্ষণে কোন সৈনিক অসুস্থ হচ্ছে না।

১১৭৪ সালের ডিসেম্বর মাস। সুলতান আইউবী তাঁর সেনাকমান্ডারদের সর্বশেষ বৈঠক তলব করেন। কেন্দ্রীয় কমান্ডের সকল অফিসার ও সকল ইউনিট কমান্ডারগণের বৈঠকে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে সর্বপ্রথম নির্দেশ এই প্রদান করেন যে, এ মুহূর্ত থেকে বাহিনীর গতিবিধি সংক্রান্ত কোন তথ্য কোনক্রমেই বাইরের কাউকে বলবে না। এমনকি নিজ স্ত্রী-সন্তানদেরকেও নয়। ফৌজ অভিযানে রওনা হওয়ার সময় এসে গেছে। কিন্তু বুঝাতে হবে, নিত্যদিনের ন্যায় ফৌজ মহড়া ও প্রশিক্ষণে যাচ্ছে।

এসব দিক-নির্দেশনার পর সুলতান বললেন– 'আমাদের বিলাস-পূজারী ও ঈমান-বিক্রয়কারী ভাইয়েরা ইসলামের ইতিহাসকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে, আজ তোমাদের উপর তোমাদেরই আপনজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কি কখনো কল্পনা করেছে, আমি আমার পীর ও মুরশিদ নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করব? কিন্তু পরিস্থিতি এমনই রূপ ধারণ করেছে যে, জঙ্গীর এই ছেলেটির মা আমাকে অভিসম্পাৎ করছে, আমি কেন তার মুরতাদ পুত্রকে হত্যা করছি না! আমার বন্ধুগণ! তোমরা যে বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছ, তাতে তোমাদের চাচাতো ভাই আছে, মামাতো ভাই আছে, খালাতো ভাই আছে। আমি এমন দুই আপন ভাই সম্পর্কেও জানি, যাদের একজন আমার বাহিনীতে আর অপরজন দুশনের বাহিনীতে। তোমরা যদি রক্ত ও আত্মীয়তা সম্পর্ককে হৃদয়ে স্থান দাও, তাহলে ইসলামের সঙ্গে তোমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, তা ছিন্ন হয়ে যাবে। রওনা হওয়ার আগে এখানেই তোমাদেরকে ওয়াদা করতে হবে, প্রতিপক্ষ কে তা তোমরা দেখবে না। তোমাদের দৃষ্টি থাকবে নিজেদের পতাকার উপর। তোমরা হৃদয়ে এই সত্যটাকে বসিয়ে নাও যে, তোমাদের সম্মুখের প্রতিপক্ষ লোকটি তোমাদের মতো কালেমা-গো মুসলমান ঠিক; কিন্তু তার পিছনের লোকগুলো খৃস্টান। আমি সেই ভাইকে ভাই মনে করি না, যে নিজ ধর্মের শত্রুকে বন্ধু মনে করে।

এক ঐতিহাসিকের হস্তলিখিত পান্ডুলিপি থেকে জানা যায়, এই ভাষণের মধ্যখানে এক পর্যায়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর কণ্ঠ থেমে যায়। তিনি কিছুক্ষণ মাথা ঝুকিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। নীরব-নিস্তব্ধ গোটা সভাকক্ষ। কারো মুখে রা নেই।

খানিক পর সুলতান আইউবী মাথা তুলে দু'হাত উত্তোলন করে আকাশের

দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে দু'আ করতে শুরু করেন–

'আমার মহান আল্লাহ! আমি তোমার খাতিরে, তোমার রাসূল ও তোমার দ্বীনের খাতিরে আমার ভাইদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করছি। এটা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আমার আল্লাহ! আমাকে তোমার দিক-নির্দেশনা প্রয়োজন। আমি পাপী, আমি গুনাহগার। তুমি আমাকে পথ দেখাও।'

সুলতান আবারো মাথানত করে ফেললেন। নিজের মাথায় নতুন কোন বুদ্ধি আসল নাকি আল্লাহ'র পক্ষ থেকে তার মনে জাগল জানিনা, তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'আমাকে প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস মুক্ত করতে হবে। বাইতুল মোকাদ্দাস তোমাদেরকে ডাকছে। আমার তরবারীর নীচে যদি আমার পিতাও আসেন, আমি তাকেও হত্যা করব। আমার সন্তানও যদি আমার মিশনের প্রতিবন্ধক হয়, তাকেও আমি খুন করে ফেলব।'

সুলতান আইউবীর মুখমন্ডল জ্বল জ্বল করে ওঠে। তার আবেগ দমে গেছে। এখন তিনি সেই সালাহুদ্দীন, যিনি শুধু বাস্তবভিত্তিক সংক্ষিপ্ত কথা বলে থাকেন। তিনি কমান্ডারদের বললেন– দু'দিন পর রাতে রওনা হতে হবে। তিনি পরিকল্পনা অনুসারে বাহিনীকে যেভাবে বিভক্ত করেছেন, তা সবাইকে জানিয়ে দেন এবং প্রতিটি গ্রুপের কমান্ডারদেরকে রওনা হওয়ার সময় বলে দেন। অগ্রগামী ইউনিটের কমান্ডারদেরকে জরুরী দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। কমান্ডো বাহিনীকে উপদেশ প্রদান করেন। পার্শ্ব বাহিনীগুলোর কমান্ডারদেরকে রওনা হওয়ার সময়, ধরন ও পথের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি সকলকে জানিয়ে দেন, তোমাদের হেডকোয়ার্টার ঘোরাফেরা করতে থাকবে। তিনি আগেই মিশরের পথে টহল বাহিনী পাঠিয়ে দেন এবং পথচারী ও যাযাবরের বেশে সেইসব এলাকায় অসংখ্য গুপ্তচর প্যাঠিয়ে দেন, যে পথে রেমন্ডের বাহিনীর আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

রসদের ব্যাপারে সুলতান আইউবীর কোন পেরেশানী নেই। অন্তত এক বছর মিশর থেকে রসদ ও রিজার্ভ ফোর্স তলব করার প্রয়োজন হবে না। বিপুল অস্ত্র এবং পশু তিনি দামেস্কে মজুদ করে রেখেছেন। তিনি মিশরের রাস্তার আশ-পাশে এই নির্দেশনাসহ অশ্বারোহী কমান্ডো প্রেরণ করে রেখেছেন যে, রেমন্ডের বাহিনী যদি এগিয়ে আসে, তাদের উপর গেরিলা হামলা চালাবে এবং আবশ্যক মনে করলে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠাবে। আমরা খৃষ্টানদেরকে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করব।

❁ ❁ ❁

১১৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখ রাতে অগ্রগামী বাহিনী দামেস্ক থেকে রওনা হয়। সে রাতে শীতের প্রকোপ ছিল খুব বেশী। তীব্র শীত গায়ে কাঁটার মত বিদ্ধ হচ্ছিল। তবে সুলতান আইউবীর সৈন্য ও ঘোড়া এই শীত সহ্য করতে অভ্যস্ত। অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডারকে বলে দেয়া হল, তত্ত্বাবধানকারী বাহিনী আগেই রওনা হয়ে গেছে। সে বাহিনীর সৈন্যরা সামরিক পোশাকে নয়– গেছে মুসাফিরের বেশে। সুলতান আইউবী তাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন, যেন দ্রুতগামী দূত পিছনে এসে অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডারকে সম্মুখের খবরাখবর পৌঁছাতে থাকে। অগ্রগামী বাহিনী যাবে হামাত পর্যন্ত। কমান্ডারকে সুলতান আইউবী বলে দিয়েছেন, হামাতের দুর্গ যুদ্ধ ছাড়া জয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু প্রতারণা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। তিনি যেন দুর্গ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেমে যান এবং দুর্গওয়ালাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। জুরদিক যদি সন্ধি করতে চায়, তা হলে তাকে দুর্গের বাইরে ডেকে আনবে এবং সুলতানের এসে পৌঁছা পর্যন্ত কোন সমঝোতায় উপনীত না হয়।

শক্ত দেয়াল ভাঙ্গতে সক্ষম এমন অভিজ্ঞ একদল লোক সুলতান আইউবী আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। অগ্রগামী বাহিনীর রওনা হওয়ার তিন-চার ঘন্টা পর আরো দু'টি ইউনিটকে এমনভাবে রওনা করিয়েছেন যে, তাদের এক ইউনিট অগ্রগামী বাহিনীর ডানে এবং অপর ইউনিট বাঁয়ে অবস্থান নিয়ে চলবে। তাদের জন্য নির্দেশনা ছিল, অগ্রগামী বাহিনী যদি হামাত দুর্গ থেকে সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়, তাহলে তারা দু'দিক থেকে এগিয়ে গিয়ে দুর্গ অবরোধ করে ফেলবে এবং দুর্গের উপর এমনভাবে তীর বর্ষণ করবে, যেন দেয়াল ভাঙ্গার দলটি দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।

সুলতান আইউবী এই দুই বাহিনীর মাঝে অগ্রসর হচ্ছেন। অগ্রগামী বাহিনী ও দুই পার্শ্ব বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সুলতান আইউবীর মোট বাহিনীর চারভাগের একভাগ। অন্য সকল সৈন্যকে তিনি পিছনে রেখে এসেছেন। তিনি যত কম সংখ্যক সৈন্য দিয়ে সম্ভব দুশমনকে ঘায়েল করতে চান। সেই পরিকল্পনা তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছেন। শত্রুবাহিনীর রসদের প্রতি নজর রাখার জন্য তিনি কমান্ডো ছড়িয়ে রেখেছেন। হামাত থেকে অনেক সম্মুখেও এরূপ বেশ ক'টি ছোট ছোট দল পাঠিয়ে দিয়েছেন, যাতে হামাত থেকে কোন দূত হালব যেতে না পারে এবং কোন দিক থেকে শত্রুর সাহায্যে সৈন্য এসে গেলে কমান্ডো হামলা চালিয়ে তাদেরকে অস্থির করে রাখে এবং তাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে।

পরদিন অতিবাহিত হয়েছে। রাত গভীর হয়ে গেছে। অগ্রগামী বাহিনীর হামাত পৌঁছাতে আর দু-তিন মাইল পথ বাকি।

১১৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর। রাতের শেষ প্রহর। হামাত দুর্গের ফটকে দন্ডায়মান শান্ত্রী আবছা আলো-আঁধারীতে ছায়ার মত এমন কিছু দেখতে পায়, যেন বিপুলসংখ্যক মানুষ ও ঘোড়া। হয়ত কোন কাফেলা এগিয়ে আসছে।

ভোর হয়েছে। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। অন্ধকার পুরোপুরি কেটে গেছে। শান্ত্রীরা এবার দেখতে পেল, ওরা সৈন্য। কিন্তু তাদের দুর্গের ডানে-বাঁয়ে যে ফৌজ রয়েছে, তা এখনো তারা টের পায়নি। ডংকা বাজিয়ে দেয়া হল। এক কমান্ডার দৌড়ে উপরে উঠে যায়। ফৌজ দেখে দৌড়ে গিয়ে সে দুর্গপতি জুরদিককে সংবাদ জানায়।

'ভয় পেওনা'– জুরদিক কমান্ডারকের বললেন– 'এরা আক্রমণকারী ফৌজ নয়। খৃস্টানরা আমাকে খুন করতে পারেনি। তারা অন্য কোন ষড়যন্ত্র করে থাকবে হয়ত। তারা হয়ত আস-সালিহ্-এর নিকট থেকে এই অনুমোদন নিয়েছে যে, আমার থেকে দুর্গ ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেবে। তোমরা বাইরে গিয়ে দেখ বাহিনীটা কার এবং তারা কী চায়।'

কমান্ডার ঘোড়ায় চড়ে বাইরে বেরিয়ে যায় এবং সুলতান আইউবীর অগ্রগামী বাহিনীর দিকে এগিয়ে যায়। পতাকা দেখেই চিনে ফেলে, এ তো আইউবীর বাহিনী! খানিক দূরে থাকতেই কমান্ডার থেমে যায়। আইউবীর অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডার তার নিকট এগিয়ে যায়। দু'জন-ই একে অপরকে চিনে ফেলে। তারা নুরুদ্দীন জঙ্গীর বাহিনীতে একসঙ্গে কাজ করেছে।

'আহ! এমন একটা সময়ও প্রত্যক্ষ করতে হল যে, আমাদের দু'জনকে পরস্পর লড়াই করতে হবে'– আইউবীর অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডার দুর্গের কমান্ডারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– 'জঙ্গী যখন জীবিত ছিলেন, আমরা তখন বন্ধু ছিলাম। তিনি মারা গেছেন, তো আমরা পরস্পর দুশমন হয়ে গেলাম।'

'তোমরা কেন এসেছ?' দুর্গের কমান্ডার জিজ্ঞেস করে।

'তোমরা দুর্গকে রক্ষা করতে পারবে না'– অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডার বললেন– 'তোমার প্রতি আমার পরামর্শ, দুর্গের অধিপতিকে বল, যেন তিনি দুর্গটা আমাদের হাতে তুলে দেন এবং রক্তক্ষয় হতে না দেন। আমরা তোমাদেরকে বেশী সময় দিতে পারব না। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুর্গ অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। আমরা তোমাদের সাহায্য-সহযোগিতার সব পথ বন্ধ করে এসেছি।

তোমরা অস্ত্রত্যাগ কর।'

দুর্গের কমান্ডার কোন জবাব না দিয়েই ফিরে যায়। জুরদিককে জানায়, সালাহুদ্দীন আইউবী হামলা করেছেন। তিনি আমাদেরকে অস্ত্রত্যাগ করতে বলছেন। এই বাহিনী তাঁরই। জুরদিক চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'দুর্গ থেকে পতাকা সরিয়ে ফেল। সাদা পতাকা উড়িয়ে দাও। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এসেছেন।'

জুরদিক দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ থেকে অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডারের নিকট চলে যান। সুলতান আইউবী অনেক পিছনে অবস্থান করছেন। জুরদিক একজন রাহবার ও তার দেহরক্ষীদের নিয়ে সুলতান আইউবীর হেডকোয়ার্টারের দিকে রওনা হয়ে যান।

✿ ✿ ✿

সুলতান আইউবী জুরদিককে বুকে জড়িয়ে ধরেন। জুরদিক সুলতানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেগময় কিছু কথা বলেন এবং সৈন্যসহ দুর্গকে সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দেন। সুলতান আইউবী তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন এবং সাদা পতাকার স্থলে নিজের ঝান্ডা উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। জুরদিক দুর্গে অবস্থানরত তার বড়-ছোট সব কমান্ডারকে সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করে বললেন– 'তোমাদেরকে পরাজিত করা হয়নি। তোমরা যার যার ইউনিটের সৈন্যদেরকেও বলে দাও, তারা যেন নিজেদেরকে পরাজিত মনে না করে। আমরা সবাই মুসলমান। এখন আমরা খৃস্টান ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।'

সম্মুখে হেম্‌স দুর্গ। সুলতান আইউবী রওনা হওয়ার জন্য এমন একটা সময় নির্ধারণ করেন যে, হেম্‌স গিয়ে পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে। তিনি এই অগ্রগামী বাহিনীটিকেই সম্মুখে রওনা করিয়ে দেন। এবার তিনি সেনাবিন্যাসে কিছু রদবদল করেন। কারণ, হেম্‌স দুর্গ যুদ্ধ ব্যতীত জয় হবে, এমন আশা তাঁর নেই। খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য একটি দলকে তিনি আগেই রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। ফিরে এসে তারা সুলতানকে দুর্গের অবস্থান ও আশ-পাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে। যেসব দিক থেকে শত্রুপক্ষের সাহায্য আসার সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব দিকেও তিনি বাহিনী প্রেরণ করে রেখেছেন। নিজের রসদ তিনি হামাত দুর্গে জড়ো করে রাখেন এবং রসদ সরবরাহের পথকে টহল বাহিনী ও কমান্ডারদের দ্বারা নিরাপদ করে রাখেন। তাদের সঙ্গে হামাতের একটি ইউনিটও রয়েছে। সুলতান আইউবীর প্রচেষ্টা

ছিল, এই অভিযানের সংবাদ যাতে হাল্‌ব পর্যন্ত না পৌছে। তাহলে তিনি দুশমনকে তাদের অজ্ঞাতেই কাবু করে ফেলতে পারবেন। অভিযানের ব্যবস্থাপনাটা তিনি এভাবেই করে নিয়েছেন। তিনি হাল্‌বের পথে নিজের লোক ছড়িয়ে রেখেছেন, যাদের প্রতি নির্দেশ হল, সৈনিক বা সাধারণ কাউকে পালাতে দেখলে আক্রমণ করে হলেও তাকে প্রতিহত করবে।

রাত গভীর হয়ে গেছে। হেম্‌স দুর্গের অধিপতি ও তার কমান্ডাগণ প্রশস্ত একটি কক্ষে সুরাপানে ব্যস্ত। সঙ্গে আছে দু'জন নর্তকী। কক্ষে বাদ্য-বাজনা ও নাচ-গান চলছে। সাধারণ সৈনিকরা অবচেতন মনে নিদ্রা যাচ্ছে। প্রহরারত সৈনিকরাও শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আড়ালে-আবডালে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। কনকনে শীত। কমান্ডার সবাইকে জানিয়ে রেখেছে, শীতের মওসুমে যুদ্ধের কোন আশংকা নেই।

'আমরা এ কারণেই নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর জন্য দু'আ করতাম যে, দুনিয়াতেই আমরা জান্নাতের সুখ উপভোগ করব'– দুর্গের অধিপতি মদের পেয়ালা মুখে দিতে দিতে বলল– 'এখন সালাহুদ্দীন আইউবী এসেছেন। আল্লাহ তাকেও জলদি তুলে নেবেন।'

'না, তাকে আমরা তুলে আনব'– এক কমান্ডার বলল- 'ঋতুটা একটু পরিবর্তন হোক।'

দুর্গের দেয়ালে দন্ডায়মান এক শান্ত্রী তার সঙ্গীকে বলল– 'এই দেখ, দেখ, আগুন জ্বলছে।'

'জ্বলতে দাও'– সঙ্গী বলল– 'কোন কাফেলা হবে বোধ হয়।'

বলতে না বলতে আগুনের তিন-চারটি গোলা উপরে উঠে দুর্গের দিকে ধেয়ে এসে শান্ত্রীদের মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করে দুর্গের ভিতর গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পরক্ষণে আরো একটি গোলা ধেয়ে আসে। তারপর আরো কয়েকটি। সব ক'টি-ই দুর্গের সামান-পত্রের উপর গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আগুন ধরে যায়। দুর্গে বিপদ ঘন্টা বেজে ওঠে। দুর্গ অধিপতির আসর ভেঙ্গে যায়। সবাই জান্নাতের সুখ ত্যাগ করে দৌড়ে ফটকের দিকে ছুটে আসে। এবার তীরবর্ষণ চলছে তাদের উপর। ফটকের শান্ত্রীরা চীৎকার ও হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দেয়– 'ফটক পুড়ে যাচ্ছে'। সুলতান আইউবীর আক্রমণকারী সৈন্যরা ফটকের উপর দাহ্য পদার্থ ছুড়ে মেরে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। শান্ত্রীরা চীৎকার করে দুর্গের সৈন্যদেরকে জাগ্রত করে। দুর্গের ভিতর থেকেও প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বাহির থেকে এত তীর আসতে থাকে যে, মাথা উত্তোলন করাও সম্ভব হচ্ছে না।

সুলতান আইউবীর মিনজানীকগুলো দুর্গটাকে জাহান্নামে পরিণত করে তোলে। দুর্গের কমান্ডার চীৎকার করে করে তার সৈন্যদের মনোবল বাড়াবার চেষ্টা করছে। সৈন্যরা এলোপাতাড়ি তীর ছুঁড়ছে।

'অস্ত্রসমর্পন কর'— সুলতান আইউবীর দিক থেকে একজন উচ্চকণ্ঠে বলতে শুরু করে— 'তোমরা অস্ত্রত্যাগ কর। তোমরা কোন দিক থেকে সাহায্য পাবে না। জীবন রক্ষা কর। তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে আত্মসমর্পন কর। কাউকে যুদ্ধবন্দি বানানো হবে না। তোমরা সুলতানের আনুগত্যবরণ করে নাও। আমাদের ফৌজে শামিল হয়ে যাও।'

রাতভর এই ঘোষণা চলতে থাকে এবং উভয় পক্ষে তীর বিনিময় হতে থাকে। পরদিন ভোরের আলো ফুটলে দুর্গপতি বাইরের দৃশ্য ও দুর্গের ফটকে তার সৈনিকদের লাশ দেখে সাদা পতাকা উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে। সুলতান আইউবী এই দুর্গও দখল করে নেন। দুর্গপতি ও তার কমান্ডারগণ অস্ত্রত্যাগ করে। সুলতান দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে দুর্গপতি ও কমান্ডারদের উদ্দেশ করে শুধু বললেন— 'আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।' তিনি নির্দেশ প্রদান করেন, সিপাহীদেরসহ এদেরকে দামেস্ক পাঠিয়ে দাও। সুলতান তদেরকে নিজের ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারবেন না। কারণ, তাদের অফাদারী এখনো সন্দেহযুক্ত। এই দুর্গে অস্ত্র ও রসদের বিপুল সংগ্রহ। আছে মদ আর নর্তকী। মদের পাত্রগুলো বাইরে ফেলে দেয়া হল। নর্তকীদেরকে তাদের লোকদের সঙ্গে দামেস্ক পাঠিয়ে দেয়া হল। সুলতান আইউবী হেম্‌সের দুর্গকে তার দ্বিতীয় ঘাঁটিতে পরিণত করেন।

সামনে হাল্‌বের দুর্গ। এটি হাল্‌ব শহর থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। এখানেও হেম্‌সের ন্যায় একই ঘটনা ঘটে। সুলতান আইউবীর হামলা ছিল আকস্মিক। তিনি এই দুর্গের লোকদেরকেও সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে যান। পর পর দু'টি দুর্গ জয় করার পর তার বাহিনীর মনোবল এখন অনেক চাঙ্গা। তারা হাল্‌বের দুর্গও জয় করে নেয় এবং সেখানকার সৈনিকদেরকে কমান্ডারদেরসহ দামেস্ক পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এ পর্যন্ত এসে সুলতানের গোপনীয়তা শেষ হয়ে যায়। অস্ত্রসমর্পনকারী সিপাহীদের কেউ পালিয়ে গিয়ে কিংবা অন্য কেউ হাল্‌ব গিয়ে সংবাদ জানিয়ে দেয় যে, সুলতান আইউবী হামাত, হেম্‌স ও হাল্‌ব দুর্গ জয় করে এখন হাল্‌ব শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু এই তথ্য সুলতান জানতেন না। তিনি অগ্রসরতার গতিও কমিয়ে দেন। তার কারণ, যে বাহিনী হামাত, হেম্‌স ও হাল্‌ব দুর্গকে অবরোধ করে

রাতের বেলা লড়াই করেছে, তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন এবং আগে প্রেরণের জন্য তাদের স্থলে নতুন বাহিনী আবশ্যক। এখন পরিবর্তিত বিন্যাসে সৈন্যদের সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। কেননা, হাল্‌ব শহরের লড়াই দুর্গ অবরোধ থেকে ভিন্ন। নতুন বিন্যাসে কিছু সময় ব্যয় হয়ে যায়। সুলতান আইউবী অত্যন্ত সতর্ক মানুষ। তিনি জানেন, আসল লড়াই সামনে রয়ে গেছে। আবার খৃস্টান বাহিনীর এসে পড়ার আশংকাও রয়েছে।

✿ ✿ ✿

হাল্‌বে সংবাদ পৌঁছে গেছে। খৃস্টান উপদেষ্টাগণ সেখানে উপস্থিত। তারা প্রথমে বিস্ময় প্রকাশ করে যে, সুলতান আইউবী এই শীতের মধ্যে হামলা করলেন! পরে তারা এই ভেবে সন্তোষ প্রকাশ করে যে, সুলতানের ফৌজ মরুযুদ্ধে অভ্যস্ত। তারা পার্বত্য এলাকায় লড়াই করে জিততে পারবে না। আবার তাদের এই অনুভূতিও আছে যে, হাল্‌বের সৈন্যও এ অঞ্চলে লড়তে পারবে না। তারা দু'টি পন্থা নিয়ে ভাবে। এক. সুলতান আইউবীকে তাদের-ই মনঃপুত স্থানে যুদ্ধে লিপ্ত করাতে হবে। দুই. এখানে খৃস্টানদের সেই বাহিনীটিকে নিয়ে আসতে হবে, যারা ইউরোপ থেকে এসেছে। এদের অধিকাংশ সৈন্য-ই রেমন্ডের বাহিনীতে কর্মরত। সিদ্ধান্ত মোতাবেক দ্রুতগামী দূতের মাধ্যমে রেমন্ডকে সংবাদ পৌঁছানো হল, সুলতান আইউবী হাল্‌বের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তাকে পিছন দিক থেকে ঘিরে ফেলা হোক।

রেমন্ড যাতে সময় থাকতে এসে পৌঁছুতে পারে, সে জন্য তারা কালক্ষেপণের পন্থা অবলম্বন করে যে, সুলতান আইউবীকে হাল্‌ব অবরোধে দীর্ঘ সময় আটকে রাখতে হবে। খৃস্টান উপদেষ্টাগণ গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করে। তাদের জানা আছে যে, শহরে সুলতান আইউবীর গুপ্তচর রয়েছে। তাই তারা শহরটা সম্পূর্ণ সীল করে দেয়। তারা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দেয়, যদি কেউ শহর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে সাবধান না করেই তীর ছুঁড়বে। সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে মসজিদেও ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, সুলতান আইউবী সামরিক শক্তি ও রাজত্বের নেশায় হাল্‌ব আক্রমণ করেছেন। খৃস্টানরা নাশকতার ওস্তাদ। তারা নতুন নতুন পন্থায় প্রোপাগান্ডা চালাতে শুরু করে। ঘরে ঘরে, গলিতে গলিতে, মসজিদে মসজিদে গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, সুলতান আইউবীর ফৌজ যে শহর জয় করে, সেখানকার সকল যুবতী মেয়েদের একত্রিত করে তারা তাদের সম্ভ্রম ছিনিয়ে নেয়। মানুষের সহায়-সম্পদ লুট করে শহরে আগুন

ধরিয়ে দেয়। এ কথাও প্রচার করা হয় যে, সুলতান আইউবী নবুওতের দাবি করেছেন এবং একটি নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন, যা সম্পূর্ণ কুফ্‌রী।

এমন বহু গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় হাল্‌বের সর্বত্র। এমনিতেই সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির তৎপরতা বিগত ছয় মাস যাবত চলে আসছে। জনমনে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বশেষ এসব তাজা প্রোপাগান্ডা জনগণকে অগ্নিশর্মা করে তোলে। তারা জীবন দিতে ও জীবন নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

শহর সীল হওয়ার কারণে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দারা বেকার হয়ে পড়ে। তারা শহরের অধিবাসীদের মধ্যে আইউবী বিরোধী রোষ ও ক্রোধ প্রত্যক্ষ করে। এক গোয়েন্দা শহর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে প্রাণ হারিয়েছে। সে সুলতান আইউবীকে এই সংবাদ পৌঁছাতে চেয়েছিল যে, শহরের পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল নয় এবং তিনি যেন আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হয়ে না আসেন। সে শহর থেকে বের হওয়ার জন্য ঘোড়া হাঁকায়। কিন্তু দু'টি তীর তাকে কাবু করে ফেলে। আইউবীর গোয়েন্দাদের কমান্ডার নাগরিকদের মধ্যে খৃস্টানদের প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিলেন বটে; কিন্তু তার লোকেরা কোথাও মুখ খুলতে পারেনি।

আস-সালিহ খৃস্টান উপদেষ্টাদের পরামর্শে মসুলের গভর্নর সাইফুদ্দীনের নিকটও সাহায্যের আবেদন জানান। হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ফেদায়ীদের গুরু শেখ সান্নান-এর নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হয়, দাবি অনুপাতে পারিশ্রমিক দেয়া হবে, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে যেভাবে হোক খুন করে দিন। শেখ সান্নানের আইউবী হত্যার একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। সুলতান আইউবীর একজন দেহরক্ষীকে নেশা খাইয়ে সে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এবার সে তার এমন ফেদায়ীদের তলব করে, যারা জীবন ও মৃত্যুকে কিছু-ই মনে করে না। তারা নামেমাত্র মানুষ। নিজের জীবন দেয়া ও অন্যের জীবন নেয়া তাদের পক্ষে ডাল-ভাত। তাদের মধ্যে অনেক পলাতক খুনীও রয়েছে। শেখ সান্নান তাদেরকে বলল, পারিশ্রমিক যা চাও, দেব; সুলতান আইউবীকে হত্যা করে আস। নয়জন ফেদায়ী একাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

আস-সালিহ-এর সমর্থকদের মধ্যে সবচে' হিংসুক ও শয়তান প্রকৃতির মানুষ হল গোমস্তগীন। একজন গবর্নরের সমান মর্যাদা তার। লোকটা বাহ্যত সুলতান আইউবীর বিরোধী বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বন্ধু কেউ-ই নয়। আস-সালিহকে খুশি করার জন্য তাকে সহযোগিতা প্রদান করে এবং খৃস্টানদের সঙ্গে

বন্ধুত্ব এভাবে প্রকাশ করে যে, তার দুর্গে অনেক খৃস্টান সৈন্য বন্দি ছিল, তাদের সকলকে মুক্ত করে দেন। এখনো সে সুলতান আইউবী দ্বারা হাল্ব আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পেয়ে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং নিজেও যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সুলতান আইউবীর জন্য এ এক মহা-বিপদ। অল্প ক'জন সৈন্য দিয়ে এত বিশাল শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা তিনি কীভাবে করবেন! তদুপরি বর্তমানে তাঁর গোয়েন্দারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার ফলে তিনি জানতে-ই পারছেন না, হাল্বে দুশমনের ক্যাম্পে কী হচ্ছে। এখনো তিনি এই আত্মপ্রচঞ্চনায় লিপ্ত যে, হাল্বকেও তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে দখল করে নেবেন। কিন্তু আশার কথা হল, সুলতান আনাড়ি যোদ্ধা নন। তিনি বাহিনীর পেছন ও দু'পার্শ্ব রক্ষা করার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তদারককারী দল সামনে এগিয়ে গেছে। সম্মুখের এলাকা টিলাময়, পাথুরে ও উঁচু-নীচু। পথে মাঝারী আকারের একটি নদী।

❁ ❁ ❁

১১৭৫ সালের জানুয়ারী মাস শুরু হয়ে গেছে। শীতের তীব্রতা বেড়ে গেছে আরো। সুলতান আইউবী যুদ্ধের জন্য তাঁর মোট সেনাবাহিনীর চার ভাগের এক ভাগ ময়দানে নিয়ে এসেছেন। অধিকাংশ সৈন্যকে তিনি রিজার্ভ রেখে এসেছেন। তিনি যখন হাল্বের উদ্দেশ্যে রওনা হন, তখন গোয়েন্দারা সংবাদ দেয়, নদীর ওপারে বিশাল-বিস্তৃত এক মাঠে শত্রুবাহিনী প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছে। সুলতান আইউবীকে এ পথেই নদী পার হতে হবে। শীত মওসুমের কারণে নদীতে পানি কম। এ জায়গাটায় আরো কম। মানুষ ও ঘোড়া পানি ভেঙ্গে অনায়াসে নদীটা পার হতে পারবে। দুশমন এ জায়গাটায়ই তাদের সেনাদের ছড়িয়ে রেখেছে। গোয়েন্দারা সুলতান আইউবীকে জানায়, রাতে শত্রু বাহিনীর কয়েকজন শান্ত্রী জেগে পাহারা দেয় আর দিনে টহল বাহিনী চারদিক ঘুরে বেড়ায়।

এ সংবাদে সুলতান আইউবীর মনে সন্দেহ জাগে, তাহলে কি হাল্ববাসীরা আমার আগমন সংবাদ জেনে ফেলল! তবে তো তাদের অজ্ঞাতসারে হাল্ব জয় করা সম্ভব হবে না! তিনি অন্য কোন স্থান দিয়ে নদী পার হওয়া যায় কিনা তথ্য নেয়ার জন্য আবার গোয়েন্দা প্রেরণ করেন। পাশাপাশি তিনি এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন, ওপারের শত্রুবাহিনীকে ধোঁকা দিতে হবে যে, আমার আক্রমণ ও অগ্রযাত্রা এ পথেই হবে। তিনি সে রাতেই কমান্ডো বাহিনী রওনা করিয়ে দেন। তাঁর নিজের হেডকোয়ার্টার সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। নদীর তীরে

দুশমনের যে ফৌজ অবস্থান করছে, তারাও এই আত্মপ্রচঞ্চনায় লিপ্ত যে, এত তীব্র শীতের রাতে কেউ হামলা করবে না।

তখন মধ্যরাত। হাল্বের সৈন্যরা নিজ নিজ তাঁবুতে জবুথবু হয়ে পড়ে আছে। কমান্ডার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছে। জেগে আছে শুধু কয়েকজন প্রহরী। এক প্রহরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করছে। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তার ঘাড় ঝাপটে ধরে। অন্য একজন এসে দু'জনে মিলে লোকটাকে তুলে নিয়ে যায়। এরা সুলতান আইউবীর কমান্ডো। তারা প্রহরীকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের ঘোড়ার পাল কোথায়? কমান্ডোরা প্রহরীর বুকে দু'টি তরবারীর আগা ঠেকিয়ে রেখেছে। প্রহরী বুঝে ফেলেছে, এরা সুলতান আইউবীর সৈনিক। সে বিনীত কণ্ঠে বলল, আমি তোমাদের মুসলমান ভাই। যুদ্ধটা হচ্ছে রাজ-বাদশাহদের বিবাদ। আমরা কেন পরস্পর রক্ত ঝরাব?

প্রহরী জানায়, ঘোড়াগুলো এক স্থানে বাঁধা নেই। ফৌজ প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। সে কারণে সৈন্যদের তাঁবুর সঙ্গে দু'-তিনটি করে ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে।

কমান্ডোরা প্রহরীকে তাদের ক্যাম্পের নিকট নিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, কমান্ডাররা কে কোথায় আছে বল। প্রহরী অনুমানের ভিত্তিতে কমান্ডারদের তাঁবুর অবস্থান দেখিয়ে দেয়।

প্রহরীকে পিছনে সরিয়ে আনা হল এবং বলা হল, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তামাশা দেখ।

সেখানে ছোট আকারের একটি মিনজানীক ছিল। কমান্ডোরা তাতে একটি পাতিল বসিয়ে দেয়। চারজন লোক ওটিকে একটু পিছনে টেনে নিয়ে ছেড়ে দেয়। পাতিলটা গুলির ন্যায় উড়ে যায়। আরেকটি পাতিল ছোঁড়া হয় অন্যদিকে। তারপর আরো দু'টি। সবগুলো গিয়ে দুশমনের ক্যাম্পে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রহরীরা 'কে? কে?' বলে চীৎকার জুড়ে দেয়। কোন্দিক থেকে যেন মাথায় সলিতাগাঁথা তীর এসে মাটিতে পড়ে। পাতিলগুলো এখানেই এসে পড়ে ভেঙ্গেছিল। ভাঙ্গা পাতিলের ভিতর থেকে তরল পদার্থ বের হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এগুলো দাহ্য পদার্থ। তীরের সলিতাগুলো তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দু'টি তাঁবুতেও আগুন ধরে যায়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। ক্যাম্পে শোর-গোল, ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। ঘোড়াগুলো রশি ছিড়ে পালাতে থাকে। সৈন্যরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করলে কমান্ডোরা তীর ছুঁড়তে শুরু করে। দৈর্ঘ-প্রস্থে এক মাইলেরও বেশী জায়গা জুড়ে তাঁবু। কমান্ডার জবাবী অভিযান

শুরু করতে না করতে সুলতান আইউবীর কমান্ডোরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে ক্যাম্পের অবস্থা। বিপুল ক্ষতিসাধণ করেছে আগুন। তার উপর কমান্ডোদের তীর আর ভীত-সন্ত্রস্ত অশ্বপালের পায়ের তলায় পিষে হতাহত হয়েছে অসংখ্য সৈনিক। অবস্থা সামলাতে তাদের ভোর হয়ে যায়। হঠাৎ একদিক থেকে এক ব্যক্তি চীৎকার করে ওঠে– 'সাবধান! সাবধান!' পুনরায় প্রলয় শুরু হয়ে যায়। এবার কমান্ডো নয়-হামলা করেছে সুলতান আইউবীর বাহিনীর একটি ইউনিট। দুশমন এখানে প্রতি মুহূর্ত প্রস্তুত থাকে। কিন্তু রাতের কমান্ডোরা তাদের অবস্থা এমনই শোচনীয় করে এসেছে যে, তাদের সব প্রস্তুতি লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। তারা পুনঃসংগঠিত হয়ে লড়াই করার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু আর স্থির হতে পারেনি তারা। সুলতান আইউবী তাদের শক্তি-সাহস আগেই শেষ করে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও উভয় পক্ষের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। শত্রুবাহিনী পিছু হটতে শুরু করে। কমান্ডাররা তাদের উজ্জীবিত করার বহু চেষ্টা করে। কিন্তু কোন কাজ হল না। সুলতান আইউবীর কমান্ডোরা তাদের উদ্দেশে চীৎকার করে বলতে থাকে– 'তোমরা কাফেরদের বন্ধু। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা নিজেদের পরিণতি দেখ। তোমাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হচ্ছে।'

সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিকের মাথায়ও এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর কাফেরদের বন্ধুরা মুরতাদ। তার বিপরীতে খলীফার বাহিনীর কাছে এরূপ কোন লক্ষ্য বা কোন স্লোগান ছিল না।

শত্রুবাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। অনেকে পিছপা হয়ে নদী পার হয়ে পালিয়ে গেছে। অনেকে এদিক-ওদিক গিয়ে লুকিয়ে গেছে। সুলতান আইউবী তাঁর আক্রমণকারী বাহিনীর কমান্ডারকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, দুশমন যদি পিছু হটে যায়, তাহলে তোমার বাহিনী বা কোন সৈন্য যেন নদী পার না হয়। তিনি এই ক্যাম্পের উপর হামলা করে মূলত শত্রুকে ধোঁকা দিয়েছেন। তিনি শত্রুদেরকে ধাওয়া করতে চাচ্ছেন না। সামনের বিস্তারিত তথ্য না নিয়ে তিনি আর অগ্রসর হবেন না। দূরের অন্য কোন স্থান দিয়ে তিনি নদী পার হতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দুশমন যখন এখান দিয়েই তাঁকে সুযোগ দিয়ে দিল, তখন তিনি এখান দিয়েই নদী অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি নিজে সম্মুখে এগিয়ে যান। তাঁর সৈনিকরা এদিক-ওদিক লুকিয়ে থাকা শত্রুসেনাদের

খুঁজে খতম করছে। অস্ত্রসমর্পনকারীদের সংখ্যাও অনেক। সুলতান একটি উঁচু টিলার উপর চড়ে রণাঙ্গনের দৃশ্য অবলোকন করছেন। আনন্দের পরিবর্তে তার মুখমন্ডল বিষাদে ছেয়ে গেছে।

'এ দৃশ্য দেখে হয়ত আল্লাহও কাঁদছেন'– পার্শ্বে দন্ডায়মান নায়েবদের উদ্দেশে সুলতান বললেন– 'উভয় পক্ষে এ কাদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে? এ হল ইসলামের পতনের আলামত। মুসলমান যদি হুঁশে না আসে, তাহলে কাফেররা তাদেরকে এভাবেই যুদ্ধ করিয়ে করিয়ে শেষ করে দেবে। আমার বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে নিশ্চিত কর যে, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই। আমি আমার তরবারীটা আস্-সালিহ্-এর পায়ের উপর ফেলে দেই।'

'আপনি অবশ্যই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মোহতারাম সুলতান'– এক নায়েব বললেন– 'আমরাও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আপনি মন থেকে সব সংশয়-সন্দেহ দূর করে ফেলুন।'

সুলতান আইউবীর বাহিনী নদী পার হয়ে গেছে। সম্মুখে হাল্‌ব নগরী দেখা যাচ্ছে। সুলতান নগরীর প্রতি তাকান। তার বিস্তৃতি, গঠন প্রণালী ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে ভাবেন, সরাসরি হামলা করে শহরের অভ্যন্তরে ঢুকে লড়াই করব নাকি অবরোধ করব। শহরের আভ্যন্তরীণ অবস্থাটা আসলে কী, তা এখনো তাঁর অজানা। হাল্‌বের সাধারণ মানুষগুলো তাঁর বিপক্ষে এক একটা আগুনের ফুল্কি হয়ে আছে, তা তিনি জানেন না। তাঁর আশা ছিল, যেহেতু তারা মুসলমান, তাই জনগণ যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। সম্ভবত আশাবাদ-ই তাঁকে দিয়ে এমন কিছু কাজ করায়, যা তাকে অস্থির করে ফেলে। তিনি আধা অবরোধের বিন্যাসে তাঁর বাহিনীকে সম্মুখে এগিয়ে দেন। যুদ্ধের সূচনা হয় তীর বিনিময়ের মাধ্যমে। কিন্তু খানিক পর-ই তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর বাহিনী পিছনে সরে আসছে। হাল্‌বের নিরাপত্তা বিধানে একদিক থেকে অন্তত দু'শত ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে আসে। তারা সুলতান আইউবীর এক পদাতিক ইউনিটের এক পার্শ্বের উপর আক্রমণ চালায়– বড় তীব্র ও দুঃসাহসী আক্রমণ।

সুলতান আইউবীর অশ্বারোহী বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে তাদের পদাতিক বাহিনীকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে নিজেদের-ই সৈন্য মারা যায়। তারপর পরিস্থিতি এই দাঁড়ায় যে, শহর থেকে পদাতিক কিংবা অশ্বারোহী এক একটি সেনাদল বেরিয়ে আসছে আর তাদের পিছনে পিছনে শহরের উঁচু উঁচু স্থান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসছে। এই তীরবৃষ্টির আড়ালে আক্রমণকারী সেনারা সুলতান আইউবীর বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে

পড়ছে। হাল্‌বের এই যুদ্ধ ছিল বড়ই রক্তক্ষয়ী।

এই অবস্থায় সুলতান আইউবীর দু'-তিনজন গোয়েন্দা শহর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং সুলতানকে খুঁজে বের করে তাঁর নিকট চলে যায়। হাল্‌বের জনসাধারণকে কীভাবে উত্তেজিত করা হয়েছে, তারা সুলতানকে তা অবহিত করে। তারা জানায়, শহর প্রতিরক্ষায় যত না সৈন্য যুদ্ধ করছে, তার চেয়ে বেশি করছে সাধারণ নাগরিক। এ মুহূর্তে আপনার মোকাবেলায় সৈন্যের চে' জনসাধারণের সংখ্যা বেশী। সুলতানের শুধু এটুকু জানা ছিল যে, হাল্‌বের অধিবাসীদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তারা যে তাঁর বিরুদ্ধে এমন উন্মাদনার সাথে লড়াই করবে, সে ধারণা তার ছিল না। সুলতান তাদের বীরত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে আফসোসের সুরে বললেন– 'এ হল মুসলমানের শান! এই হল মুসলমানদের সামরিক চেতনা! কিন্তু কাফেররা তাদের এই চেতনাকে তাদের-ই দ্বীন-ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে; কিন্তু তারা তা বুঝছে না।'

সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে পিছনে সরিয়ে আনেন। এক নায়েব তাঁকে পরামর্শ দিলেন, শহরের উপর মিনজানীক দ্বারা অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু সুলতান তাঁর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বললেন– 'তা করা হলে সাধারণ মানুষদের বাড়ী-ঘর পুড়ে যাবে। নারী ও শিশুরা মারা যাবে। শহরটা যদি খৃস্টানদের হত, তাহলে এতক্ষণে নগরীর সর্বত্র দাউ দাউ করে আগুন জ্বলত এবং তা আমার কমান্ডোদের আয়ত্তে চলে আসত। যেসব মুসলমান ময়দানে এসে যুদ্ধ করে ও জীবন দেয়, আমি তাদেরকে ঠেকাতে পারি না আর যারা ঘরে বসে আছে, তাদেরকে হত্যা করতে পারি না।

সুলতান আইউবী আরো কয়েকটি ইউনিটকে সামনে ডেকে এনে শহরকে পরিপূর্ণরূপে অবরোধ করে ফেলেন এবং নির্দেশ জারি করেন, আপতত আমরা আত্মরক্ষামূলক লড়াই করব। আমাদের উপর যদি হামলা হয়, তাহলে তা প্রতিহত করব এবং অবরোধ শক্তভাবে ধরে রাখব। সুলতান আইউবীর সেনা সংখ্যাও কম, শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাও তাঁর লক্ষ্য।

১১৭৫ সালের জানুয়ারী পুরো মাসটা অবরোধ বহাল থাকে। হাল্‌বের ফৌজ ও জনসাধারণ অবরোধ ভাঙ্গার জন্য হামলা চালায়। কিন্তু তারা সফল হতে পারছে না।

১লা ফেব্রুয়ারী ভোরবেলা সুলতান আইউবী সংবাদ পান, ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট রেমন্ড হামাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি রেমন্ডের সৈন্য সংখ্যা

সম্পর্কেও অবহিত হন। এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, সে ব্যাপারে সুলতান আইউবীর আগে থেকেই ধারণা ছিল। তার মোকাবেলার প্রস্তুতিও তিনি নিয়ে রেখেছেন। তিনি তার জন্য দু'ইউনিট সৈন্য রিজার্ভ রেখে দিয়েছেন এবং এমন জায়গায় রেখেছেন, যেখান থেকে রেমন্ডকে স্বাগত জানানোর জন্য তাদের সময়মত পৌঁছানো সম্ভব। সুলতান সংবাদটা পাওয়ামাত্র তাদের নিকট দূত প্রেরণ করেন– 'যত দ্রুত সম্ভব তোমরা আলরিস্তান পৌঁছে গিয়ে উঁচুতে তীরন্দাজদের বসিয়ে দাও। অশ্বারোহী বাহিনীকে পিছনে রাখবে। আমি আসছি। খৃস্টান বাহিনী যদি আমার আগে পৌঁছে যায়, তাহলে তোমরা মুখোমুখি যুদ্ধের ঝুঁকি নেবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত ওঁৎ পেতে গেরিলা হামলা চালিয়ে যাবে।'

আলরিস্তান একটি পর্বতশ্রেণীর নাম। রেমন্ডকে তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। তার পরিকল্পনা অনুপাতে এই পথ তার জন্য খুবই উপযোগী। হামাত এসে সুলতান আইউবীর বাহিনীকে পিছন ভাগ ও রসদ ইত্যাদির পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে, এই হল তার পরিকল্পনা। তাতে সফল হলে সুলতান আইউবী হাল্‌বের ফৌজ ও রেমন্ডের বাহিনীর মধ্যখানে আটকা পড়ে যাবেন। কিন্তু সুলতান আইউবী হাল্‌ব অবরোধ প্রত্যাহার করে বাহিনীকে অন্য একদিকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে আলরিস্তানের দিকে রওনা হয়ে যান।

আলরিস্তানের পাহাড়ের চূড়াগুলো বরফে ঢাকা। রেমন্ড আনন্দিত যে, এই মওসুমে সুলতান আইউবীর মরু সৈনিকরা তার ইউরোপিয়ান ও অত্র অঞ্চলের খৃষ্টান সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠবে না। কিন্তু এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে যখন সে একটু সামনে অগ্রসর হল, তো বরফঢাকা পর্বতমালার চূড়া থেকে তার বাহিনীর উপর তীর বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। ঘটনাটা তার কাছে নিতান্তই আকস্মিক ও অভাবিতপূর্ব।

রেমন্ড কোন যুদ্ধ ছাড়াই তার বাহিনীকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে যায়। সর্বত্র-ই তার আক্রান্ত হওয়ার আশংকা। সুলতান আইউবীর যুদ্ধকৌশল তার ভালভাবেই জানা। অনেক দূর পিছনে সরে গিয়ে সে ছাউনি ফেলে। এবার কোন্ পথে এগুবে, ভাবতে শুরু করে সে।

ঋতু পাল্টে গেছে। বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। সাত-আটদিনে ঘোড়ার শুকনা ঘাস শেষ হয়ে গেছে। রসদ-পাতিরও অভাব দেখা দিয়েছে। রেমন্ড রসদের ব্যবস্থাটা ভালই করে রেখেছিল। ওখান থেকে নিয়মিত রসদ আসছিল। কিন্তু দিন কয়েক হল, এখন আর আসছে না। আসছেনা কোন সংবাদও। ব্যাপারটা কী? রেমন্ড দূত পাঠায়। দূত ফিরে এসে সংবাদ জানায়, সুলতান আইউবীর

সৈন্যরা রসদের পথও অবরোধ করে রেখেছে। শুনে রেমন্ড বিস্মিত হয়ে পড়ে যে, সুলতান আইউবী এত দ্রুত এ পর্যন্ত আসল কীভাবে! পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য রেমন্ড দু'জন অফিসারকে পিছনে প্রেরণ করে।

অফিসাররা তিন-চারদিন পর ফিরে আসে। তারা সংবাদের সত্যতা স্বীকার করে, সত্যিই সুলতান আইউবী রসদের পথ বন্ধ করে রেখেছেন। তারা এ সংবাদও নিয়ে আসে যে, আইউবী হাল্‌বের অবরোধ তুলে নিয়েছেন।

'তার অর্থ আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি'– রেমন্ড বলল– 'চল, ত্রিপোলী ফিরে যাই।'

রেমন্ড যুদ্ধ না করেই ফিরে গেছে, এ সংবাদ শুনে সুলতান আইউবী বিস্মিত হন। পিছুহটার জন্য সে যেপথ অবলম্বন করে, তা ছিল দুর্গম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যেপথে এসেছিল, সে পথে যেতে রাজি নয়। সুলতান আইউবীর সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা-ই ত্যাগ করেছে সে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রেমন্ড যুদ্ধ করার ইচ্ছা ত্যাগ করেছিল কথাটা সঠিক। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, সুলতান আইউবী তাকে লড়াই করার পজিশনে থাকতে দেননি। রেমন্ড এই ভেবে ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, মুসলিম সৈন্যরা এই শীতের মধ্যে এত চমৎকার লড়াই করছে, যেন তারা লড়াইটা উপযুক্ত মওসুমে সমতল ময়দানে করছে। দ্বিতীয় কারণ, সুলতান আইউবী তার পিছনে এবং রসদ সরবরাহের পথে গিয়ে বসে পড়েছিলেন। তৃতীয় ও সবচে' বড় কারণ ছিল ভিন্ন একটি, যা পরে ফাঁস হয়। তাহল, রেমন্ড মূলত আস-সালিহ-এর নিকট থেকে বিপুল অর্থ-সম্পদ নিয়েছিল। কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল, মুসলমানদেরকে পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে দেয়া। সে লক্ষ্য তার পূরণ হয়ে গেছে। খৃস্টানরা মুসলিম উম্মাহকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যখন ত্রিপোলী থেকে রেমন্ডের দূত একটি বার্তা এনে আস-সালিহ-এর হাতে পৌঁছায়, তখন তার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যায়। বার্তাটা হল– 'আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, সালাহুদ্দীন আইউবী যদি আপনাকে অবরোধ করে ফেলে, তাহলে আমি সেই অবরোধ ভেঙ্গে দেব। আমি যেইমাত্র সংবাদ পেলাম যে, সালাহুদ্দীন আইউবী হাল্‌ব আক্রমণ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজে ফৌজ নিয়ে আপনার সাহায্যে ছুটে এসেছি। আমার আগমনের সংবাদ টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ আইউবী হাল্‌বের অবরোধ তুলে নিয়েছেন। আমি আমার ওয়াদা পূর্ণ করেছি। কাজেই আপনার সঙ্গে আমার যে সামরিক চুক্তি ছিল, তা এখন আর নেই। যে কর্তব্য

পালনের জন্য আপনি আমাকে সোনা-দানা পাঠিয়েছিলেন, তা আমি পালন করেছি। কাজেই পত্র পাওয়া মাত্র আপনি আমার সামরিক প্রতিনিধি ও উপদেষ্টাদের ফেরত পাঠিয়ে দিন।'

রেমন্ডের বার্তা পাঠ করে হাল্‌বের শাসকরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। দু'জন ঐতিহাসিক লিখেছেন, রেমন্ডের মনে এই শংকাও জাগতে শুরু করে যে, সুলতান আইউবী তার রাজধানী ত্রিপোলী আক্রমণ করে বসতে পারেন। এই আশংকার ভিত্তিতে আলরিস্তান থেকে ফিরে গিয়ে রেমন্ড তার রাজধানীর প্রতিরক্ষা আরো শক্ত করতে শুরু করে।

আস-সালিহ এখনো আনাড়ি-অনভিজ্ঞ। তাঁর এক-দু'জন উপদেষ্টা তাঁকে পরামর্শ দেয়, আপনি সুলতান আইউবীর সঙ্গে আপস করে নিন। কিন্তু সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগীন প্রমুখ তাঁকে সাহায্যের নিশ্চয়তা দিয়ে আপস-সমঝোতার পথ থেকে সরিয়ে রাখে। তাদের-ই একজন আস-সালিহকে বলেছিল, 'সালাহুদ্দীন আইউবী দিন কয়েকের মেহমান মাত্র। নতুন ঘাতকদল এসে গেছে। তারা ধর্মীয় নেতা ও পীর-বুযুর্গের বেশে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট এই আবেদন নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে যে, আপনারা আর পরস্পর যুদ্ধ করবেন না। উভয়পক্ষ বসে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করে নিন। সুলতান আইউবী সম্মানার্থে তাদেরকে নিজের পার্শ্বে বসতে দেবেন। নির্জনে বসে তাদের কথা শুনবেন। এই সুযোগে ঘাতক তাকে হত্যা করে নিরাপদে কেটে পড়বে।

সুলতান আইউবী আলরিস্তানের পর্বতমালায় বসে পরবর্তী হামলার পরিকল্পনা ঠিক করছেন আর হাল্‌বে বসে নয়জন ভাড়াটিয়া খুনী ভাবছে, আইউবীকে কোথায় কীভাবে হত্যা করা যায়।

ভয়াবহ ষড়যন্ত্র

মিশরের সে এলাকায় বর্তমানে আসওয়ান ডেম অবস্থিত, আটশত বছর আগে সেখানে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ আইউবী আমলের সেই যুদ্ধের কথা উল্লেখই করেননি। ইতিহাসে শুধু এতটুকু উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সুলতান আইউবীর একজন সেনাপতি বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তার ডায়েরীতে সেই সেনাপতির নামও লিখে রেখেছেন। নামটা হল, আল-কানাজ বা আল-কিন্দ। লোকটা ছিল মিশরী মুসলমান। তার মা ছিলেন সুদানী। সম্ভবত সুদানী রক্ত-ই তাকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উস্কে দিয়েছিল। সে যুগের ঐতিহাসিকদের প্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে তার বিদ্রোহের পটভূমি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১১৭৪ সালের শেষ এবং ১১৭৫ সালের শুরুর সময়। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মিশরে অনুপস্থিত। নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবেলায় তিনি এখন দামেস্ক অবস্থান করছেন। ষড়যন্ত্র-শিকার অপ্রাপ্ত বয়স্ক আনাড়ী খলীফার হাত থেকে দামেস্ক দখল করার পর হেম্স ও হামাত দুর্গও জয় করেছেন। হাল্ব দুর্গ অবরোধ করতে গিয়ে তিনি অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। সেই সঙ্গে ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডের আক্রমণের শিকার হন তিনি। সুলতান আইউবী হাল্বের অবরোধ প্রত্যাহার করে পিছনে সরে গিয়ে খৃস্টান বাহিনীকে পথেই প্রতিহত করার কৌশল অবলম্বন করেন। সুলতান আইউবী তাঁর কৌশলে সফল হন এবং রেমন্ড লড়াই ত্যাগ করে পিছনে সরে যায়। কিন্তু সেখানে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেনি; বরং সেখান থেকেই মূল যুদ্ধের সূচনা হয়।

সুলতান আইউবী আলরিস্তান পর্বতমালায় তার বাহিনীকে ছড়িয়ে রেখেছেন। একই সময়ে তাঁকে তিনটি শত্রুর মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এক. আস-সালিহ ও তার সহচরগণ। দুই. খৃস্টান বাহিনী। তিন. ঋতু। পরিস্থিতিটা ১১৭৫ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের, যখন পাহাড়ের চূড়াগুলো সাদা বরফে ঢাকা এবং জনবসতিগুলো শীতে কাঁপছে থর থর করে। সুলতান

আইউবী সেখানে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, যেন তিনি লোহার শিকলে বাঁধা পড়েছেন।

মিশরের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নন সুলতান। তিনি সেখানকার সেনাকমান্ড আপন ভাই আল-আদেলের হাতে অর্পণ করে এসেছেন। সেখান থেকে কিছু ফৌজ তিনি পরে তলব করে নিয়েও এসেছেন। মিশরের উপর সমুদ্রের দিক থেকে খৃস্টানদের এবং দক্ষিণ দিক থেকে সুদানীদের হামলার আশংকা বিদ্যমান। তার চেয়েও বেশী শংকা খৃস্টান ও সুদানীদের গোপন নাশকতামূলক তৎপরতা। মিশরে দুশমনের গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা অনেকটাই দমন করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে বলা যায় না। এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে কায়রো রেখে এসেছেন। ভাই আল-আদেলকেও তিনি এ ব্যাপারে সতর্ক করে এসেছেন। কিন্তু আল-আদেল ও আলী বিন সুফিয়ান দু'জনে মিলেও সুলতান আইউবীর শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম হননি।

মিশর ত্যাগ করার সময় মিশরের সীমান্তে ও উপকূলীয় রক্ষীবাহিনীর ব্যাপারে সুলতান তাঁর ভাই আল-আদেলকে নির্দেশ প্রদান করে যান, সুদানী সীমান্তে যদি সামান্যতম গন্ডগোলও দেখা দেয়, তাহলে যেন কঠোর হাতে তার মোকাবেলা করা হয় এবং প্রয়োজন হলে যেন সুদানের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে যুদ্ধ করা হয়। কিন্তু অতি জরুরী একটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করতে ভুলে যান সুলতান। তাহল, সীমান্ত বাহিনীর বদলি। সে সময়ে সীমান্ত বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ও কমান্ডার এমন ছিল যে, তারা দু'বছরের বেশি সময় ধরে সীমান্তে নিয়োজিত রয়েছে। এরা সেই বাহিনী, যারা দুশমনের সঙ্গে জানবাজি লড়াই লড়ে এসেছে। কাজেই তাদের হৃদয় দুশমনের ঘৃণায় পরিপূর্ণ। তারা সুদানীদের কিছু-ই মনে করে না। তাদের আগে সীমান্ত প্রহরায় যে বাহিনী ছিল, তারা ভাল ছিল না। তাদের উপস্থিতিতেই মিসরের বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী চোরাচালান হয়ে সুদান চলে যেত। সুলতান আইউবী ময়দান থেকে ফিরে এসে সেই বাহিনীকে বদলী করে ময়দান থেকে আনা বাহিনীকে সীমান্তে নিয়োজিত করেন। তারা সীমান্তে পৌঁছেই ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যে সত্যিকার অর্থেই তারা মিশরের সীমান্তকে সুরক্ষিত করে ফেলে।

এটি দু'-আড়াই বছর আগের ঘটনা। শুরুতে তাদের মনে জোশ ও জযবা ছিল এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসার পর তারা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রীয়

হয়ে পড়ে। এই বেকারত্ব তাদের চেতনাকে উই পোকার ন্যায় খেয়ে ফেলতে শুরু করে। সুলতান আইউবী ছিলেন একজন দূরদর্শী মানুষ। তিনি প্রতিটি দিক, প্রতিটি কোণ ও প্রতিটি ক্ষেত্রের উপর সমানভাবে দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু সীমান্ত বাহিনীর বদলির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টির প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তিনি দৃষ্টি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। সীমান্ত বাহিনীর বিভাগটাই ছিল আলাদা, যার কমান্ডার ছিল সেনাপতি পদমর্যাদার এক ব্যক্তি, যার নাম আল-কিন্দ। বছরে তিনবার না হোক অন্তত দু'বার সেনাবদলি ছিল তার দায়িত্ব। কিন্তু লোকটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটা করল না। ফলে এই অবহেলার পরিণতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে শুরু করে।

একই পরিবেশ, একই আবহাওয়া এবং একই ভূখন্ডে অবস্থান করে ও দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রহরার দায়িত্ব পালন করতে করতে এই সৈন্যরা বিরক্তি অনুভব করতে শুরু করেছে। সুদান নিশ্চুপ। চোরাচালানী বন্ধ। বেকারত্ব ও অলসতা সৈন্যদের মন-মানসিকতার উপর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া ফেলতে শুরু করেছে। তাদের হাতে এখন না আছে কোন কাজ, না আছে বিনোদনের কোন উপায়-উপকরণ। ঋতুতেও কোন পরিবর্তন নেই। বালির সমুদ্র, বালির টিলা ছয়মাস আগে যেমন, এখনো তেমন। আকাশের বর্ণেও কোন পরিবর্তন নেই। এই পরিস্থিতি ও সৈন্যদের বিরক্তির প্রথম ক্রিয়া এই দেখা দেয় যে, টহলরত অবস্থায় কোন পথিককে পেলে তুমি কে, কোথায় যাচ্ছ, তোমার সঙ্গে কী? এসব প্রশ্ন করার পরিবর্তে থামিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিচ্ছে এবং এটা-ওটা বলে চিত্তরঞ্জন করছে। যেসব চৌকির সন্নিকটে জনবসতি আছে, তারা গ্রামে ঢুকে পড়ে লোকদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে, গল্প-গুজব করছে।

একটি দেশের সীমান্ত প্রহরীদের এই আচরণ দেশের জন্য ছিল বিপজ্জনক। কিন্তু তারা দায়িত্ব পালনে অতিষ্ঠ সৈনিক। কোন না কোন উপায়ে কোন না কোন স্থানে গিয়ে মনোরঞ্জন করা এখন তাদের মানবিকতার দাবি। তাদের কমান্ডারও তাদের-ই ন্যায় মানুষ। তিনিও সময় কাটানোর এবং বিনোদনের উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত।

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবী যখন দামেস্ক রওনা হন, তখন তিনি এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, সীমান্ত বিষয়ে সকল প্রকার নিদের্শনা প্রদান করা সত্ত্বেও তাঁর মাথায় আসেনি যে, সীমান্তের পুরাতন বাহিনীর বদলির নির্দেশ প্রদান করে যেতে হবে। সম্ভবত তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁর কমান্ডার আল-কিন্দ সব দায়িত্ব-ই

পালন করে থাকবে। সুলতান আইউবীর চলে যাওয়ার পর যখন আল-আদেল সিপাহসালারের দায়িত্ব বুঝে নেন, তখন তিনি আল-কিন্দকে জিজ্ঞেস করেন, সীমান্তে যে বাহিনী রয়েছে, তারা কতদিন যাবত দায়িত্ব পালন করছে? আল-কিন্দ জবাব দেন, বহুদিন যাবত।

'সীমান্তে আরো সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন আছে কি?'– আল-আদেল জিজ্ঞেস করেন– 'আর পুরাতন বাহিনীকে প্রত্যাহার করে কায়রো নিয়ে এসে সেখানে নতুন বাহিনী প্রেরণ করার আবশ্যক রয়েছে কিনা?'

'না'– আল-কিন্দ জবাব দেন– 'এরা সেই বাহিনী, যারা দেশ থেকে তরি-তরকারী, খাদ্যদ্রব্য, পশু এবং অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বিদেশে চোরাচালান হওয়াকে প্রতিহত করেছে। তারা এখন সীমান্ত এবং আশ-পাশের এলাকায় থাকতে অভ্যস্ত। তারা দূর থেকে সন্দেহভাজন লোকের ঘ্রাণ শুকে-ই তাকে গ্রেফতার করে ফেলতে সক্ষম। তাদের স্থলে নতুন সৈন্য প্রেরণ করলে নতুনদের অভিজ্ঞতা অর্জন করতেই অন্তত এক বছর সময় লেগে যাবে। এমন ঝুঁকি মাথায় তুলে নেয়া আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না।'

আল-কিন্দ-এর জবাবে আল-আদেল নিশ্চিন্ত হন। তাকে একথাও বলার মত কেউ ছিল না যে, এই আল-কিন্দ রাতে নিজ ঘরে বসে বলছিলেন, 'আমার এই সীমান্ত বাহিনীটা অকর্ম হয়ে পড়েছে। আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে যে, আমি তাদের বদলি হতে দেইনি। তারা সীমান্ত এলাকার লোকদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিয়েছে। তাদের বর্তমান অবস্থা হল, তাদের পেট সবসময় ভরা থাকে–খাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন অভিযোগ নেই। আমি তাদের জন্য প্রয়োজনের চেয়েও বেশী খাদ্য সরবরাহ করি। কিন্তু তারা প্রবৃত্তির যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আছে। কোন কাফেলা পথ অতিক্রম করতে দেখলে তারা কাফেলার মহিলাদের মুখ উদোম করে তাকিয়ে থাকে। এবার আমি আমার কাজ করতে পারি।

আল-কিন্দ যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, সে একজন সুদানী। মেহমানের বেশে আল-কিন্দ-এর ঘরে সে এসেছে। সুদান থেকে তার জন্য উপঢৌকন নিয়ে এসেছে। সঙ্গে ছিল একটি বার্তা। লোকটি আল-কিন্দকে জানায়, সুদানীরা প্রস্তুত। কিন্তু সেনাসংখ্যা এখনো ততবেশী সংগৃহীত হয়নি। লোকটি জানতে চায়, সুদানী সৈন্যরা কিভাবে মিসরে প্রবেশ করবে? সীমান্ত অতিক্রম করা তার দৃষ্টিতে একটি কঠিন ব্যাপার। তারই জবাবে আল-কিন্দ উপরোক্ত তথ্য পেশ করে।

আল-কিন্দ সেই সালারদের একজন, যাদের উপর সুলতান আইউবীর পূর্ণ আস্থা আছে। তিনিও কারো মনে এই সন্দেহ জাগতে দেননি যে, তিনি মিশরের অনুগত নন। আলী বিন সুফিয়ানকে পর্যন্ত তিনি ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। দু'-আড়াই বছর আগে তিনি যে সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানী রোধ করেছিলেন এবং সীমান্তকে সম্পূর্ণরূপে সীল করে দিয়েছিলেন, সেই ইমেজই তাকে বেশ কাজ দিচ্ছে। তিনি যে দেশের একজন গাদ্দারে পরিণত হয়েছেন, তা কেউ টের-ই পেলনা।

সুলতান আইউবীর চলে যাওয়ার পর আল-কিন্দ আদেলকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন, আপনি সুদানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। সুদানের একটি পাখিও মিশরে প্রবেশ করতে পারবে না। আলী বিন সুফিয়ানকেও তিনি একই নিশ্চয়তা প্রদান করতে থাকেন। অথচ সুদানে হাবশীদের একদল সৈন্য মিশর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। তাদের পরিকল্পনা হল, তারা ছোট ছোট দলে মিশরে ঢুকে চুপিচুপি কায়রোর নিকটে পৌঁছে যাবে এবং রাতের বেলা হামলা করে রাতেই মিশরের ক্ষমতা দখল করে নিবে।

❁ ❁ ❁

সুদানের গা ঘেঁষে মিসরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে নীল দরিয়া। কিছুটা অগ্রসর হয়ে মিশরীয় এলাকায় প্রশস্ত একটি ঝিলের রূপ ধারণ করেছে নদীটি। আরো সামনে গিয়ে ঢুকে পড়েছে পার্বত্য এলাকার ভেতর। তারপর সম্মুখের দিকে এগিয়ে গেছে নালার রূপ ধারণ করে। তারই নিকটে অবস্থিত আসওয়ান ডেম।

সুলতান আইউবীর আমলে আসওয়ান ডেমের চারপাশের ভৌগলিক অবস্থা ছিল ভিন্ন রকম। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টিলা আর পাহাড়। ফেরাউনদের বিশেষ সুদৃষ্টির প্রমাণ বহন করছে টিলা ও পাহাড়গুলো। তারা পাহাড় কেটে কেটে তৈরী করেছিল বিশাল বিশাল মূর্তি। সবচে' বড় মূর্তিটির নাম আবু সম্বল। কোন কোন পর্বতের চূড়া কেটে কেটে উপাসনালয়ের গম্বুজ কিংবা কোন এক ফেরাউনের মুখের আকৃতি তৈরী করা হয়েছে। পর্বতমালার পাদদেশে তৈরী করা হয়েছে গুহা। অভ্যন্তর অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তৃত। কোন গুহা এমনও তৈরী করা হয়েছে, যার ভিতরে অসংখ্য কক্ষ ও রাস্তা-ঘাট বিদ্যমান।

ফেরাউনরা এই রহস্যময় জগতটা কেন আবাদ করেছিল, তা বলা মুশকিল। পাহাড় কেটে কেটে এই মূর্তি নির্মাণ ও গুহা ইত্যাদি তৈরী করতে অতীত হয়েছে তিনটি বংশধারা। ফেরাউনরা ছিল সে যুগের খোদা।

জনসাধারণের কাজ ছিল ফেরাউনদের সেজদা করা এবং তাদের যে কোন আদেশ-নিষেধ মান্য করে চলা। সেই মজলুম ও ক্ষুধা-পীড়িত প্রজাদের দ্বারাই খোদাই করা হয়েছে এই পাহাড়, পর্বত। আজ সেখানে কোন মূর্তি নেই। নেই কোন গুহা বা পাহাড়। বর্তমানে সে স্থানে বিরাজ করছে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত আসওয়ান ডেম। এই ডেম তৈরীর আগে পাহাড়ের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ মূর্তিগুলোকে মেশিনের সাহায্যে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড়গুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। ফেরাউনরা যদি মানুষের হাতে এসব পাহাড়-পর্বতকে এভাবে উড়ে যেতে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে দেখত, তাহলে তারা খোদা হওয়ার দাবি থেকে হাত গুটিয়ে নিত।

সুলতান আইউবীর আমলে এই পার্বত্য এলাকাটার চিত্র ছিল অন্য রকম। সে যুগে এই পর্বতমালার উপত্যকা ও গুহায় পৃথিবীর সব সৈন্য লুকিয়ে থাকতে পারত। সীমান্তের যে স্থান দিয়ে নীলদরিয়া মিশরে প্রবেশ করেছে, সুলতান আইউবীর সে এলাকাটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল। সুদানীরা নৌকায় করে এস্থান দিয়ে মিশর ঢুকে যেতে পারত। এই নদী পথটির উপর দৃষ্টি রাখার জন্য নদী থেকে বেশ দূরে সুলতান আইউবী একটি সেনাচৌকি বসিয়েছিলেন। চৌকি থেকে নদী দেখা যেত, নদী থেকে চৌকি দেখা যেত না। সুলতান আইউবী পরিকল্পিতভাবেই এই দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন, যাতে অনুপ্রবেশকারীরা এই আত্মপ্রবঞ্চণায় লিপ্ত থাকে যে, তাদেরকে দেখার ও ধরার মত কেউ নেই। গোপন প্রহরার মাধ্যমে নদীতে চলাচলকারী নৌযানের প্রতি নজর রাখা হত। দু'জন অশ্বারোহী প্রতিক্ষণ টহল দিয়ে ফিরত।

সুলতান আইউবীর মিশরে অনুপস্থিতির সময়কার ঘটনা। একদিন দিনের বেলা সীমান্ত চৌকির দু'অশ্বারোহী ডিউটিতে বের হয় এবং প্রতিদিনের ন্যায় দূরে চলে যায়। নদীর কূলে একস্থানে কতটুকু সবুজ-শ্যামল এলাকা। বড় বড় ছায়াদার বৃক্ষ আছে সেখানে। জায়গাটা খুবই মনোরম। টহল সেনারা সুযোগ পেলে এখানে এসে বিশ্রাম নেয়, সময় কাটায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা কোন সুদানীকে নদী পার হয়ে এপার আসতে দেখেনি। প্রথমদিকে তারা অনেক লোককে গ্রেফতার করেছে। তাদের অনেকে ছিল নাশকতাকারী ও গুপ্তচর। তারপর থেকে এই নদীপথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সান্ত্রীরা আসে শুধু ডিউটি পালন করার জন্য এবং চৌকির দৃষ্টির বাইরে চলে এসে কোথাও বসে আরাম করে সময় কাটায়।

এই দু'অশ্বারোহীর নিয়মও একই ছিল। এখন তারা বিরক্ত ও অতিষ্ঠ। নদীকূলের এমন সবুজ-শ্যামল জায়গাও এখন তাদের কাছে ভাল লাগে না। প্রতিদিন নদী দেখে দেখে তারা তার সৌন্দর্যের প্রতি নির্মোহ হয়ে পড়েছে। বহিঃজগতের কোন বস্তু এখানে চোখে পড়ে থাকলে তাহল মরু শিয়াল। ওরা নদীতে পানি পান করতে আসে আর সান্ত্রীদের দেখে পালিয়ে যায়। আর দেখা যেত দু'-চারজন মৎস্যশিকারী। সুলতান আইউবীর সান্ত্রীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করত, তোমরা কোথাকার লোক। পরে তারা এই প্রশ্ন করাও ছেড়ে দিয়েছে আর এক সময় ওরাও আসা বন্ধ করে দিয়েছে। সেদিন সান্ত্রীরা টহল এলাকায় পৌঁছে বলাবলি করতে শুরু করে– 'আমাদের সঙ্গীরা কায়রো, ইস্কান্দারিয়া ও অন্যান্য শহরে বসে আয়েশ করছে আর আমরা এই জঙ্গল -বিয়াবানে পড়ে রয়েছি।' তাদের কণ্ঠে ক্ষোভ ও অস্থির আভাস।

সান্ত্রীরা দূর থেকেই দেখতে পায়, সবুজ এলাকায় চার-পাঁচটি উট বাঁধা রয়েছে। পার্শ্বে এক স্থানে উপবিষ্ট আট-দশজন লোক। চারজন মানুষ নদীতে গোসল করছে। অশ্বারোহী সান্ত্রীদ্বয় কতটুকু সামনে অগ্রসর হয়ে থমকে দাঁড়ায়। গোসলরত প্রাণীগুলো সম্ভবত মানুষ নয়। তারা পরী। গাঁয়ে হালকা কাপড়। কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে গোসল করছে তারা। তাদের গায়ের রং মিশরী নারীদের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়। তারা গোসল করছে আর হাসাহাসি করছে। সান্ত্রীদ্বয় এই ভেবে ঘাবড়ে যায় যে, ওরা কি জলপরী, আকাশপরী, নাকি ফেরাউনদের রাজকন্যাদের প্রেতাত্মা! সান্ত্রীদ্বয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। তারা আর সামনে অগ্রসর না হয়ে সেখান থেকেই ফিরে যাওয়ার মনস্থ করে। কিন্তু এমন সময় উটের পার্শ্বে উপবিষ্ট লোকগুলোর দু' ব্যক্তি উঠে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। মেয়েরাও তাদেরকে দেখে ফেলে। তারা নদী থেকে উঠে কূলবর্তী ডাঙ্গায় একস্থানে লুকিয়ে যায়। সান্ত্রীদের ভয় কিছুটা কেটে যায়। তারা অগ্রসরমান ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা? এখানে কী করছ? তারা মাথা ঝুঁকিয়ে সান্ত্রীদের সালাম করে। লোকগুলো মরুবাসীর পোশাক পরিহিত। তার বলল, আমরা কায়রোর ব্যবসায়ী। সীমান্তবর্তী এলাকায় মাল বিক্রি করে ফিরে যাচ্ছি।

'কায়রো যাওয়ার পথ তো এটা নয়।' এক সান্ত্রী বলল।

'আমাদের সঙ্গে কয়েকটা মেয়ে আছে। তাদের শখ, তারা নদীর কূলে কূলে যাবে'– একজন জবাব দেয়– 'আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কোন তাড়া নেই। দু'-তিনদিন এখানেই অবস্থান করব। আপনাদের যদি

সন্দেহ হয়, তাহলে আসুন, আমাদের মাল-পত্র পরীক্ষা করে দেখুন। আমাদের নিকট প্রচুর অর্থ আছে। তাও দেখুন। তাতেই আপনারা নিশ্চিত হবেন যে, আমরা সত্যিই মিশরী ব্যবসায়ী।'

অশ্বারোহী সান্ত্রীদ্বয় তাদের সঙ্গে হাঁটা দেয় এবং তাদের তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছে। দেখে অন্য সবাই ওঠে দাঁড়িয়ে তাদের সম্মান প্রদর্শন করে। সবাই মাথানত করে সালাম জানিয়ে তাদের সঙ্গে হাত মিলায়। একজন সরলমনে জিজ্ঞেস করে, আমাদের মাল-পত্র খুলে দেখবেন কি? সান্ত্রীদ্বয় পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে এবং বলে, না, দেখার প্রয়োজন নেই। একজন সুলতান আইউবীর ফৌজের প্রশংসা করতে শুরু করে। তারপর তারা সান্ত্রীদের যৌবন, বীরত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার তারিফ করে। তারা মুখে এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করল না, যার ফলে তাদের ব্যাপারে সান্ত্রীদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

ইত্যবসরে মেয়ে চারটি পোশাক পাল্টিয়ে ও মাথার চুল ঝেড়ে তাঁবুতে এসেছে। কিন্তু তারা সরাসরি সামনে না এসে লাজুক মুখে আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সান্ত্রীরা এই বিরানভূমিতে দু'-আড়াই বছরে এই প্রথম কয়েকজন মানুষের মজমা দেখতে পেল এবং এই দীর্ঘ সময়ে এ-ই প্রথমবারের মত তারা নারীর মুখ দেখল। তারা মেয়েগুলোর মধ্যে নারীর সব রূপ-ই দেখতে পেল। মা, বোন, স্ত্রী এবং সেই নারী, যে না বোন, না মা, না স্ত্রী। সান্ত্রীদের চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে গেছে যেন মেয়েগুলো। মেয়েগুলো তাদের প্রতি তাকিয়ে তাকিয়ে লজ্জা প্রকাশ করছে এবং মুখ লুকিয়ে হাসছে। তাদের লাজ-শরম প্রমাণ করছে, তারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা।

লোকগুলোর সহজ-সরল কথামালা আর মেয়েগুলোর রূপের জাদুতে ফেঁসে যায় সুলতান আইউবীর দুই সীমান্ত প্রহরী। কর্তব্যের কথা ভুলে যায় তারা। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সীমান্ত এলাকায় পড়ে থাকা এবং কাজ-কর্ম না থাকার প্রতিক্রিয়ায় ভয়াবহ এই যৌন পিপাসা তাদের ঘায়েল করে ফেলছে। এক ব্যক্তি নদীর কূলে দাঁড়িয়ে বড়শি দ্বারা মাছ ধরছিল। লোকটা অনেকগুলো মাছ শিকার করেছে। একজন মেয়েদের বলল, যাও মাছগুলো রান্না কর। নির্দেশ পাওয়ামাত্র চারটি মেয়ে ছুটে যায়। তারা মাছগুলো কেটে রান্না করে ফেলে।

❁ ❁ ❁

অশ্বারোহী সীমান্ত প্রহরীদ্বয় তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও ত্যাক্ত-বিরক্ত। তাদেরকে উন্নত খাবার পরিবেশন করা হয় বটে; কিন্তু প্রতিদিন একই খাবার খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। নীল নদের কূলে যখন তাদের সামনে

ভুনা মাছ আর রান্না করা শুকনো গোশ্‌ত পরিবেশন করা হল, দেখেই তাদের জিহ্বায় পানি এসে গেল। তার উপর যখন সবাই একসঙ্গে খাওয়া শুরু করে, খাবার আরো সুস্বাদু হয়ে ওঠে। আহারের মাঝে তারা দেখল, একটি মেয়ে তাদের একটি ঘোড়ার ঘাড় ও শিং-এ হাত বুলাচ্ছে এবং ঘোড়াটাকে আদর করছে। মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে খেতে বসেনি। এই ঘোড়াটা যে সান্ত্রীর, সে মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে। মেয়েটিও তার উপর চোখ পড়ামাত্র মুচকি একটা হাসি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সান্ত্রীরা এত রূপসী মেয়ে আগে কখনো দেখেনি।

এক বৃদ্ধ সান্ত্রীদের বলল– 'আমাদের এই মেয়েরা কখনো ঘোড়ায় চড়েনি। যে মেয়েটা ঘোড়ার নিকট দাঁড়িয়ে আছে, ওর ঘোড়ায় চড়ার বড় শখ। কিন্তু কখনো-ই তার ঘোড়ার পিঠে বসার সুযোগ হয়ে ওঠেনি।'

'আমরা চারজনের-ই শখ পূরণ করব।' এক সান্ত্রী বলল।

আহার শেষে সান্ত্রী উঠে তার ঘোড়ার নিকট চলে যায়। মেয়েটি মাথানত করে লাজুক মুখে একদিকে সরে দাঁড়ায়। সান্ত্রী তাকে বলল– 'আস, আমি তোমার ঘোড়ার পিঠে চড়ার শখ পুরণ করব। একজন একজন করে সবাইকে ঘোড়ায় চড়াব।'

পিছন দিক থেকে আওয়াজ ভেসে এল– 'লজ্জা কর না; এরা তোমাদের ইজ্জত ও দেশের মোহাফেজ। এরা না থাকলে খৃষ্টান ও সুদানীরা তোমাদের কী দশা ঘটাবে, আল্লাহ-ই ভাল জানেন।'

মেয়েটি মাথার ওড়নাটা নীচের দিকে টেনে নিয়ে ঘোমটার মত করে পা টিপে টিপে ঘোড়ার নিকটে চলে যায়। সান্ত্রী তার পা রেকাবে তুলে দিয়ে পাজাকোলা করে তাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দেয়। এমন সময় কে একজন পিছন থেকে সান্ত্রীকে ডাক দিয়ে কি যেন বলতে শুরু করে। সান্ত্রী সে দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে। হঠাৎ ঘোড়াটা একদিকে ছুটতে শুরু করে। মেয়েটা চীৎকার জুড়ে দেয়। সান্ত্রী ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ঘোড়া দ্রুতগতিতে দৌড়াচ্ছে এবং পিঠে বসা মেয়েটি এদিক-ওদিক দুলে পড়ছে আর সামলে বসে থাকার চেষ্টা করছে। সবাই হৈ-হুল্লোড় জুড়ে দেয় যে, ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে পড়েছে– মেয়েটা পড়ে মরে যাবে। সান্ত্রীর নিকটে তার সঙ্গীর ঘোড়াটা দাঁড়ান ছিল। সে এক লাফে তাতে চড়ে বসে চাবুক মেরে ছুটে চলে। মেয়েকে বহনকারী ঘোড়া চোখের আড়ালে চলে গেছে। সান্ত্রী তার ঘোড়ার গতি যতটুকু সম্ভব বাড়িয়ে দেয়। তার জানা মতে এতক্ষণে মেয়েটি ঘোড়ার

পিঠ থেকে পড়ে গেছে, তার পা দু'টো রেকাবের সঙ্গে আটকে গেছে। হাড়-গোড় ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং ঘোড়া তাকে টেনে-হেঁচড়ে হাড়-মাংস আলাদা করে ফেলছে।

সান্ত্রী ছুটে চলছে। এখন তার সম্মুখে খোলা মাঠ। কিন্তু না, মেয়েটার তো কিছু-ই হয়নি! ঐ তো ঘোড়া তাকে নিয়ে ছুটে চলছে! কতটুকু অগ্রসর হয়ে তার ঘোড়া একদিকে মোড় নিয়েই আবারো চোখের আড়ালে চলে যায়। সান্ত্রী মেয়েটির চীৎকার ও ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না। কতদূর অগ্রসর হয়ে সেও একদিকে মোড় ঘুরায়। কিন্তু এখন না ঘোড়া দেখা যাচ্ছে, না মেয়েটির চীৎকার শোনা যাচ্ছে। সান্ত্রী ভাবে, সম্ভবত ঘোড়া কোন গর্তে পড়ে গেছে। সে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দেয়। এগিয়ে যায় আরো কতটুকু সামনে। এবার মেয়েটির ডাক তার কানে আসে– 'এদিকে আস, জলদি আমার কাছে আস।'

সান্ত্রী সেদিক তাকায়। অবস্থা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সে। একি! ঘোড়াটা বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে আছে, আর মেয়েটি দিব্যি তার পিঠে বসা! তার চেহারায় ভয়-ভীতির কোন ছাপ নেই; বরং দু'ঠোঁটে মুচকি হাসি! সান্ত্রী একবার ভাবে, ঘোড়া হাঁকিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাই। সে নিশ্চিত, মেয়েটি মানুষ নয়– জিন-পরী কিংবা ভূত-প্রেত। ফাঁকি দিয়ে তাকে এই নির্জন জায়গায় নিয়ে এসেছে আর এখন তার রক্ত পান করবে। কিন্তু মেয়েটির মুখের মুচকি হাসি আর দেহের রূপ-লাবণ্যে এতই শক্তি যে, সিপাহীকে ঘোড়াসহ কাছে টেনে নিয়ে যায়।

'তুমি সৈনিক– তুমি পুরুষ'– মেয়েটি বলল– 'তুমি আমাকে ভয় করছ?'

মেয়েটি সান্ত্রীর হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বলল– 'ঘোড়া বে-লাগাম হয়নি। আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছি আর চীৎকার করে বুঝাবার চেষ্টা করেছি, ঘোড়া বে-লাগাম হয়ে গেছে এবং আমি পড়ে যাচ্ছি। আমার জানা ছিল, তুমি আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসবে। আমি আনাড়ি নই– দক্ষ ঘোড়সওয়ার।'

'এই ধোঁকাটা তুমি কেন দিয়েছ?' সান্ত্রী জিজ্ঞেস করে।

'আমাকে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন'– মেয়েটি বলল– 'কথাটা সকলের সামনে বলা সম্ভব ছিল না। ঐ লোকগুলোর মধ্যে তুমি একজন বৃদ্ধলোক দেখেছ। তিনি আমার স্বামী। তুমি তার বয়স দেখ আর আমার যৌবনও দেখ। লোকটা আমাকে খুশী রাখার জন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'অপর মেয়েরা কারা?' সান্ত্রী জিজ্ঞেস করে।

'ওরা দু'জনই বিবাহিতা'- মেয়েটি জবাব দেয়- 'তাদের স্বামীরা যুবক। বিনোদনের জন্য তারা ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

'লোকটা যদি তোমাকে অপহরণ করে নিয়ে আসত, তাহলে আমি তাকে ধরে চৌকিতে নিয়ে যেতাম'- সান্ত্রী জবাব দেয়- 'কিন্তু তুমি তো তার স্ত্রী।'

'আমি তাকে স্বামী বলে স্বীকার করি না। তাছাড়া তোমাকে দেখার পর তার প্রতি আমার ঘৃণা আরো বেড়ে গেছে'- আবেগাপ্লুত কণ্ঠে মেয়েটি বলল- 'তোমাকে প্রথমবার দেখামাত্র আমার অন্তর থেকে আওয়াজ আসল, এই যুবক-ই তোমার স্বামী। আল্লাহ তোমাকে এই সুদর্শন যুবকটির জন্যই সৃষ্টি করেছেন।'

'আমি অত সুশ্রী নই, যতটা তুমি বলছ'- সান্ত্রী বলল- 'তুমি কেন আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ? তোমার মনে কী আছে, খুলে বল।'

'আল্লাহ জানেন আমার অন্তরে কী আছে'- দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ কণ্ঠে মেয়েটি বলল- 'তিনিই হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করবেন। তুমি যদি আমার হৃদয়ের আওয়াজকে প্রতারণা মনে করেও থাক, তারপরও আমি আর বুড়োটার কাছে ফিরে যাব না। ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘোড়াসহ সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ব। আল্লাহর নিকট গিয়ে বলব, তুমি আমাকে হত্যা করেছ।'

সান্ত্রী সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী, আলী বিন সুফিয়ান কিংবা আল-আদেলের ন্যায় ব্যক্তিত্ব নয়- একজন ত্যাক্ত-বিরক্ত সাধারণ সৈনিক। তদুপরি টগবগে যুবক। মেয়েটির রূপ-যৌবন ও চলন-বলন তাকে মোমে পরিণত করে ফেলেছে। তবে তার এতটুকু অনুভূতি আছে যে- 'আমি একজন সাধারণ সৈনিক আর তুমি রাজকন্যার সমান। কোমল গালিচা থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে এই বালুকাময় প্রান্তর আর পাহাড়-উপত্যকায় টিকতে পারবে না।'

'নরম গালিচা ও ধন-দৌলত আমার লক্ষ যদি হত, তাহলে ঐ বৃদ্ধ অপেক্ষা ভাল স্বামী আর হতে পারে না'- মেয়েটি বলল- 'লোকটা তো তার সমুদয় ঐশ্বর্য্য আমার পায়ের উপর ফেলে রেখেছে। আমার একান্ত আকাংখা, আমি একজন সৈনিকের স্ত্রী হব। আমার পিতাও সৈনিক। বড় দু'ভাইও সৈনিক। তারা সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে দামেস্ক ও সিরিয়ার ময়দানে যুদ্ধ করছে। আমার মা আমাকে এই বৃদ্ধের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমরা গরীব মানুষ। আমার রূপ-সৌন্দর্যই আমাকে এই দুর্ভাগ্যের পথে ঠেলে দিয়েছে। আমি

একজন দক্ষ অশ্বারোহী। কিন্তু আমার স্বামী বিষয়টা জানেন না। আমি বহুবার আকাংখা করেছি, আমি সুলতান আইউবীর বাহিনীতে যোগ দেব। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে একজন সৈনিকের স্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করব। তুমি আমাকে বালুকাময় প্রান্তর আর পাহাড়-উপত্যকার ভয় দেখিও না। মরুভূমিতে আমার জন্ম। মরুভূমির উত্তপ্ত বালি যখন আমার রক্ত চুষে নিবে, তখন-ই কেবল আমার আত্মা নিশ্চিন্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।'

'আমি কিভাবে তোমার সাহায্য করতে পারি বল।' সান্ত্রীর পরাজিত কণ্ঠ।

'ওঠ, আমরা ধীরে ধীরে ফিরে যাই। ওরা আমাদের পিছনে পিছনে এসে থাকবে হয়ত। পথে তোমাকে বলব, আমি কী ভাবনা ভেবে রেখেছি।' মেয়েটি বলল।

সান্ত্রী ও মেয়েটি যার যার ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে পাশাপাশি চলছে। মেয়েটি বলছে,– 'আমি তোমাকে বলব না যে, তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। এটা আইনত অপরাধ হবে। আমার স্বামী আদালতে মামলা করবে, আমরা উভয়ে শাস্তি ভোগ করব। আমাকে আগে স্বামীটা থেকে মুক্ত হতে হবে। তার পন্থা হল, তাকে এমনভাবে হত্যা করতে হবে, যা মূলত হত্যা বলে মনে হবে না। তুমি না পারলে কাজটা আমি করব। একটা পদ্ধতি এই হতে পারে যে, মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাকে পান করাব আর রাতের বেলা নদীর কিনারে নিয়ে ধাক্কা মেরে নদীতে ফেলে দেবে। মানুষ মনে করবে, লোকটা নিজেই নেশা করে পানিতে পড়ে গেছে। এর জন্য দু'-চারদিন অপেক্ষা করতে হবে। তার জন্য আমি তাকে এখানেই রেখে দেব।'

'তোমার সঙ্গে কি বিষ আছে?' সান্ত্রী জিজ্ঞেস করে।

'থাকতে হবে না'– খিলখিল করে হেসে উঠে মেয়েটি বলল– 'তুমি আসলে আস্ত একটা বদ্দু সৈনিক। আমি কায়রো থেকে অনেক দূরে এক উঁচু এলাকার বাসিন্দা– এই নদীটা যেখান থেকে এসেছে ঠিক সেখানে আমার বাস। আমাদের প্রধান খাদ্য হল মাছ। মাছের পিত্ত বিষে পরিপূর্ণ থাকে। তুমি দেখেছ, আমরা এখানেও মাছ শিকার করে থাকি। রান্না করার সময় আমি মাছের একটা পিত্ত লুকিয়ে রাখব আর তার কয়েক ফোঁটা বিষ নিয়ে মদের সঙ্গে মিশিয়ে বুড়োকে খাইয়ে দেব। তারপর ভ্রমণের নাম করে নদীর কূলে নিয়ে গিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বেটাকে নদীত ফেলে দেব।'

'তারপর আমি তোমাকে কিভাবে নিয়ে যাব?' সান্ত্রী জানতে চায়।

'বৃদ্ধ মরে গেলে আমি স্বাধীন হয়ে যাব'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমি

সকলকে বলব, তোমরা কেউ আমার অভিভাবক নও যে, তোমরা আমার পছন্দের বিয়ে প্রতিহত করবে। তারপর আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব। তুমি আমাকে আমার বাড়ী পৌঁছিয়ে দেবে। আর শোন, মাঝে-মধ্যে আমার খোঁজ-খবর নেবে কিন্তু। আচ্ছা, এখন চলে গেলে তুমি আবার কবে আসবে?'

'আমি শুধু টহলের সময়টায় আসতে পারব'– সান্ত্রী জবাব দেয়– 'চৌকি এখান থেকে অনেক দূরে। টহলের ডিউটি ছাড়া ঘোড়া ব্যবহার করা যায় না। আগামী কাল দুপুরে এই সঙ্গীর সাথেই এখানে আমার ডিউটি পড়বে। তখন আসব।'

'এখান থেকে একটু দূরে থেক'– মেয়েটি বলল– 'আমি পথে তোমার সঙ্গে দেখা করব। তারপর কোথাও লুকিয়ে বসে কথা বলব।'

মেয়েটি সান্ত্রীর একটি হাত তার মুঠোয় নিয়ে নেয়। সান্ত্রী তার প্রতি তাকিয়ে থাকে। মেয়েটিও তার চোখে চোখ রাখে। সান্ত্রীর সব সংশয় দূর হয়ে যায়। সে মেয়েটির ডান হাতটা টেনে নিয়ে নিজের বুকে লাগিয়ে চেপে ধরে রাখে।

❁ ❁ ❁

মেয়েটি যেখান থেকে পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছিল, সান্ত্রী ও মেয়েটি সেখানে গিয়ে পৌঁছে। কাফেলার মানুষগুলো তাদের চোখে পড়ে। তারা এদিকে তাকিয়ে রয়েছে। সান্ত্রী ও মেয়েটি সেদিকে ছুটে যায়। দু'জন ঘোড়া থেকে অবতরণ করে। মেয়েটির বৃদ্ধ স্বামী উঠে এগিয়ে এসে সান্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না তার। ঠোঁট কাঁপছে। অন্য লোকেরাও আপ্লুত কণ্ঠে সান্ত্রীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। মেয়েটি তাদেরকে মিথ্যা কাহিনী শোনায়– 'এই সান্ত্রী নিজের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে আমাকে উদ্ধার করে এনেছে। অন্যথায় ঘোড়া আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করে মেরেই ফেলেছিল।'

নাটকের প্রথম পর্ব এখানেই শেষ হয়। সান্ত্রীদ্বয় চৌকির অভিমুখে ফেরত রওনা হয়। পথে এই সান্ত্রী তার সঙ্গীকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। সঙ্গীও জানায়, তুমি চলে যাওয়ার পর অন্য একটি মেয়ে আমাকে প্রেম নিবেদন করে। মেয়েটি প্রথমে আমার প্রতি এক বিস্ময়কর ভঙ্গীমায় তাকাতে থাকে। কাফেলার পুরুষ লোকগুলো অন্যমনস্ক হয়ে কথা বলছে। আমি তোমার সন্ধানে উঠে কিছুদূর অগ্রসর হই। কিন্তু পায়ে হেঁটে গিয়ে তোমাকে ধরা সম্ভব ছিল না বলে বেশীদূর এগুয়নি। দু'টি মেয়ে আমার পিছনে পিছনে এগিয়ে আসে। একজন আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। কথায় কথায় মেয়েটি আমার

প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি এদিকে আবার কবে আসবে? তোমার সঙ্গে আমার আবার কোন্‌দিন দেখা হবে? আমি বললাম, আগামীকাল দুপুরের সময় এখানে আমাদের ডিউটি থাকবে। মেয়েটি বলল, আমার স্বামী একজন বৃদ্ধ লোক। আমি তাকে ছেড়ে পালাতে চাই।'

দুই সৈনিকের একই কাহিনী। তারা ভাবতে শুরু করে, মেয়ে দু'টোকে কিভাবে সঙ্গে করে নেয়া যায়। তারা ভাবছে, মেয়েরা যদি তাদের স্বামীকে খুন করতে না পারে, তাহলে আমরা-ই তাদেরকে খুন করব। সুদর্শন এক কল্পনার জাল বুনতে বুনতে চৌকিতে গিয়ে পৌঁছে সুলতান আইউবীর দুই সিপাহী।

তারা চৌকির কমান্ডারকে রিপোর্ট করে– 'অমুক জায়গায় কায়রোর একটি বণিক কাফেলা অবস্থান নিয়ে আছে। আমরা তাদের তল্লাশী নিয়েছি। তাদের নিকট সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।'

সিপাহীরা কমান্ডারকে মেয়েদের সম্পর্কেও অবহিত করে। কমান্ডার রিপোর্টের প্রথম অংশটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ না করলেও তিনটি রূপসী যুবতী মেয়ের উল্লেখে চমকিত হয়ে ওঠে। মেয়েগুলোর সংখ্যা, বয়স, গঠন-আকৃতি, উচ্চতা, রং-রূপ ইত্যাদি সবকিছু খুটিয়ে খুটিয়ে জেনে নেন তিনি।

চৌকিতে অন্য এক চৌকির এক সৈনিক অবস্থান করছিল। সে চৌকিটা এখান থেকে আট-দশ মাইল দূরে অবস্থিত। তার কমান্ডার এই সৈনিককে একটি বার্তা দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন– 'আজ সন্ধ্যার পর আমার চৌকিতে আসবেন; জরুরী কাজ আছে।' একসঙ্গে যাওয়ার জন্য কমান্ডার বার্তাবাহক সৈনিককে বসিয়ে রেখেছেন।

সূর্যাস্তের পর কমান্ডার সিপাহীর সঙ্গে রওনা হয়ে যান। আট-দশ মাইল পথ অতিক্রম করে তারা যখন অপর চৌকিতে পৌঁছেন, তখন অনেক রাত।

চৌকিটা সবুজ-শ্যামল মনোরম একটা এলাকায় অবস্থিত। আজ অতিরিক্ত আরো কিছু জাঁকজমক চলছে। চৌকির সকল সৈনিক– যাদের এখন ডিউটি নেই– চৌকির বাইরে বৃত্তাকারে বসে আছে। স্থানে স্থানে বাতি জ্বলছে। কমান্ডার এখানে নেই। মেহমান কমান্ডার তার তাঁবুতে যান। তাঁবুতে কমান্ডারের সঙ্গে উপবিষ্ট দু'টি মেয়ে ও তিনজন মরুবাসী পুরুষ। তাদের সন্নিকটে পড়ে আছে বাদ্যযন্ত্র।

মেহমান কমান্ডারের তাঁবুতে প্রবেশ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে খাওয়ার আয়োজন করা হল। সবাই খানা খেলেন। আহার শেষে কমান্ডারের নির্দেশে বাদক পুরুষ ও মেয়েরা বেরিয়ে যায়। মেহমান কমান্ডার জিজ্ঞেস করেন, এরা

কারা? বাইরে কী হচ্ছে?

'মেয়েগুলো নর্তকী'– কমান্ডার জবাব দেন– 'সঙ্গের পুরুষরা বদক, তারা এ পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। পানি পান করার জন্য অবতরণ করলে আমি ডেকে এনে বসাই এবং কথা বলি। মেয়েগুলোকে আমার ভাল লেগেছে। আমি তাদেরকে খানা খাওয়ালাম। এই রাত তাদেরকে এখানেই রাখব। ওরা বড় ভাল মানুষ।'

'এই ধারা আমার পছন্দ হয় না'– মেহমান কমান্ডার বললেন– 'এই বিলাসিতা সৈনিকদেরকে নষ্ট করে ফেলবে।'

'এসব ছাড়া সৈনিকরা নষ্ট হচ্ছে আরো বেশি'– মেজবান কমান্ডার বললেন– 'আমাদের সহকর্মীরা শহরে-নগরে আয়েশ করছে আর আমরা এখানে দেউলিয়ার ন্যায় ঘুরে মরছি। এই বিড়ম্বনা থেকে কবে নাগাদ নিস্তার পাব, জানি না। এভাবে জীবন কাটানো যায় না। তোমার সৈনিকরা কি তোমাকে কখনো বলেনি, আমাদেরকে বদলি করা হোক? আমার সৈনিকরা তো আমাকে অস্থির করে ফেলছে।'

'তা বটে, আমার চৌকিতে তো এ নিয়ে দু'সৈনিকের মধ্যে মারপিটও হয়ে গেছে'– মেহমান কমান্ডার বললেন– 'এখন তো সৈনিকরা সামান্য ব্যাপারেও রেগে ওঠে।'

'আমি আমার সালার আল-কিন্দ-এর নিকট আবেদন প্রেরণ করেছি যে, এবার আমাদের প্রতি রহম করুন এবং আমাদেরকে প্রত্যাহার করে নিন'– মেজবান কমান্ডার বললেন– 'কিন্তু তিনি কোন জবাব দেননি। আমি বলেছি, আমাদেরকে সেই ময়দানে পাঠিয়ে দিন, যেখানে ঘোরতর লড়াই চলছে। যেখানে কোন কাজ নেই, সেখান থেকে আমাদের সরিয়ে নিন। এখানে যে কাজ ছিল, তা আমরা সম্পন্ন করেছি। এখানে অন্য বাহিনী প্রেরণ করা হোক।'

অপর চৌকি থেকে আসা কমান্ডারের ভাবনাও একই। উভয় কমান্ডার ও তাদের অধীন সৈনিকরা একই পরিস্থিতির শিকার। উপরের সামান্য অবহেলা ভয়ঙ্কর এক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে দেশটাকে। দুশমনের উপর বিদ্যুতের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ত অকুতোভয় যে ফৌজ, তারা আজ চরম মানসিক বিপর্যয়, নৈতিক অধঃপতন ও বিশৃংখলার শিকার। তারা আজ বিনোদনের উপায় খুঁজে ফিরছে এবং কর্তব্য পালনের পরিবর্তে নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা দ্বারা মন ভুলানোর চেষ্টা করছে।

❁ ❁ ❁

রাত কেটে যাচ্ছে। মেয়েরা পালাক্রমে নাচছে-গাইছে। তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে গানের সুর ধরে বাদকরা। সৈনিকরা চীৎকার ও করতালি দিয়ে তাদের প্রশংসা করছে, উৎসাহ প্রদান করছে। তিন-চারজন সৈনিক মেয়েদের দিকে পয়সা ছুঁড়ে মারে। কিন্তু মেয়েরা এই বলে সেগুলো ফিরিয়ে দেয় যে, আমরা দেশের অতন্দ্র প্রহরী মোহাফেজদের নিকট থেকে পয়সা নেই না। বাদকরা দর্শক--শ্রোতাদের উদ্দেশে বলে, আমরা বিনিময় নেব না। আমাদের নাচ-গানে যদি আপনারা আনন্দ পেয়ে থাকেন, তাহলে আবার তলব করবেন। যখনই বলবেন, আমরা এসে যাব। কোন বিনিময় ছাড়াই আমরা আপনাদের আনন্দ দিয়ে যাব।

দর্শনার্থীদের দু'জন কমান্ডার। পদমর্যাদায় উচ্চ না হলেও দায়িত্বশীল লোক তো বটে। কিন্তু তারা তাদের দায়িত্বের কথা ভুলে গেছে। এই গায়ক-নর্তকীরা কোথা থেকে আসল এবং কোথায় যাবে এবং নিজেদের যে পরিচয় প্রদান করল, তা সঠিক কিনা, তাও তারা জানবার চেষ্টা করল না। কমান্ডারগণ এ-ও দেখল না যে, আসরে শ্রোতা-দর্শনার্থীদের মাঝে মিশরের মরুবাসীর পোশাকে যে ক'জন অপরিচিত লোক এসে বসল, তারা কারা এবং কোথা থেকে এসেছে। তারা এটাও লক্ষ্য করল না, চৌকির চারজন সৈনিক টহল প্রহরা থেকে আগে-ভাগে ফিরে আসল এবং তাদের পরিবর্তে অন্য সৈনিক পাঠানো হল না।

চৌকি থেকে দূরবর্তী একটি স্থান। অমাবশ্যার রাতের ন্যায় কালো চেহারার অন্তত পঞ্চাশজন লোক একজন অপরজনের পিছনে দল বেঁধে সুদানের দিক থেকে এদিকে আসছে। কাফেলার অনেক সম্মুখে অবস্থান করছে আরো দু'ব্যক্তি। কাফেলা সামান্য পথ অগ্রসর হয়ে থেমে যাচ্ছে। সম্মুখের লোক দু'জন এদিক-ওদিক দেখে কাফেলাকে পথনির্দেশ করছে। কখন কোন্ দিকে যাবে, কোন্ পথে চলবে, স্থির করে তারা শকুনের ন্যায় শব্দ করছে আর তাদের সংকেত অনুসারে পিছনের কাফেলা অগ্রসর হচ্ছে। কাফেলাকে থামাতে হলে তারা শিয়ালের ন্যায় রা করছে।

চৌকির বাদ্য-বাজনার উচ্চ শব্দমালা মিশর সীমান্তের নীরব পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

সম্মুখে পার্বত্য এলাকা। কাফেলার কালো মানুষগুলো ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বতমালার ফাঁকে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বর্শা, তীর-ধনুক, তরবারী ও খঞ্জর। তাদেরকে স্বাগত

জানানোর লক্ষ্যে সেখানে অবস্থান করছে জনাচারেক মানুষ। তাদের একজন আগত কাফেলার সরদারকে অভিবাদন জানিয়ে হাসিমুখে বলল– 'মেয়েরা কাজ করে ফেলেছে স্যার।'

'হ্যাঁ, খবর পেয়েছি'– সরদার বলল– 'আমরা বাদ্যের সুর শুনতে এসেছি। দশ-বারজন লোককে আমরা আগেই সেখানে পাঠিয়ে রেখেছিলাম। তাদের একজন এসে সংবাদ দিয়ে গেল, আসর তুঙ্গে উঠে গেছে এবং রাস্তা পরিষ্কার। টহলদার সিপাহীরাও আসরে চলে এসেছে।'

'নীল নদ থেকেও ভাল সংবাদ এসেছে'– অভ্যর্থনাকারীদের একজন বলল– 'তারা মেয়েদের দ্বারা ঠিক ঠিক কাজ নিয়েছে। আগামীকাল রাতে ওখানে যে দু'সিপাহীর ডিউটি থাকবে, তাদেরকে ফাঁদে আটকে ফেলা হয়েছে। আমি সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছি। আগামীকাল রাত পর্যন্ত কমপক্ষে তিনটি বড় নৌকা এসে যাবে।'

তারা সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে। সম্মুখে সারি সারি পাহাড়। দলনেতা দাঁড়িয়ে যায় এবং কাফেলার সবাইকে দাঁড়াতে নির্দেশ দেয়। সে অভ্যর্থনাকারীদের সঙ্গে কানে কানে বলে– 'একথা ভুলে যেওনা, এরা সবাই হাবশী। তাদের ধর্ম অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি তোমাদেরকে অবাক্ করে ফেলবে। তোমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। তারা যদি চরম হাস্যকর কোন আচরণও করে ফেলে, তবু তাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে চলতে হবে। আমরা তাদেরকে ধর্মের নামে নিয়ে এসেছি। তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়েছি, তোমাদেরকে যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে খোদা অবস্থান করে থাকেন– সেই খোদা, যিনি বালুকারাশিকে পিপাসু রাখেন, সূর্যকে আগুন দান করেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তোমরা একটি সমস্যার সম্মুখীন হবে। তাহল, এরা মানুষ বলি দিতে চাইবে। এরা মানুষ বলিদানে অভ্যস্ত।'

বলি পুরুষের হবে নাকি নারীর, নাকি একজন পুরুষ ও একজন নারীর হবে, তা তাদের সরদার বলে দেবে। আমরা যদি তাদের এই রীতি পালন করার সুযোগ করে দেই, তাহলে যুদ্ধের ময়দানে দেখবে, তারা কিভাবে মিশরের ইট-পাথরগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী তাদের মোকাবেলায় একদিনের বেশি টিকতে পারবে না।'

সরদার সকলকে বলল– 'তোমরা সেজদায় লুটিয়ে পড়; তোমরা খোদার ঘরে এসে পড়েছ।'

সবাই সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর সরদারের নির্দেশে উঠে দাঁড়ায় এবং

সরদারের পিছনে পিছনে হাঁটা দেয়।

এরা সুদানী হাবশী, যাদেরকে সুদান থেকে এনে মিশরে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে। তাদেরকে লুকিয়ে রাখার জন্য বেছে নেয়া হয়েছে এই পার্বত্য ভূখন্ডকে। ফেরাউন আমলের গুহাসমূহ– যা মূলত পাতালপ্রাসাদ– উট-ঘোড়াসহ বিশাল সেনাবাহিনীকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

সুদানে রক্তখোর হাবশীদেরকে ধর্ম ও কুসংস্কারের নামে ঐক্যবদ্ধ করে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। তারা যুদ্ধে অতিশয় পারদর্শী। গোত্রে গোত্রে লড়াই চলে তাদের। তীরান্দাজী ও অব্যর্থ বর্শাবাজীতে তারা পারঙ্গম। সুদানের শাসকরা খৃস্টানদের সঙ্গে চুক্তি করে অনেক খৃস্টান সেনাঅফিসারকে ডেকে এনেছিল। তারাই এই হাবশীদেরকে সুসংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক কমান্ডের অধীনে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ইতিপূর্বে সুদানী বাহিনী দু'বার পরাজিত হয়েছিল। তৃতীয় যুদ্ধ সেসময় সংগঠিত হয়, যখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই তকিউদ্দীন সুদান হামলা করেছিলেন। এই হামলাকে ব্যর্থ করে সুদানীরা তকিউদ্দীনের বাহিনীকে তছনছ করে দিয়েছিল। তকিউদ্দীন সুলতান আইউবীর সহায়তায় তার অবশিষ্ট সৈন্যকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সে যুদ্ধে সুদানীদের ব্যর্থতা এই ছিল যে, তারা তকিউদ্দীনকে ধাওয়া করেনি এবং মিশর আক্রমণ করেনি। যদি তখন সুদানীরা সাহস করে তকিউদ্দীনের বাহিনীকে ধাওয়া করত এবং মিশর আক্রমণ করে বসত, তাহলে তকিউদ্দীনের বাহিনী এতই পরিশ্রান্ত ছিল যে, তারা সুদানীদের হাত থেকে মিশরকে রক্ষা করতে পারত না।

এসব ব্যর্থতাকে সামনে রেখে খৃস্টানরা সুলতান আইউবীর যুদ্ধকৌশল পরীক্ষা করে দেখার পরিকল্পনা হাতে নেয়। তারা প্রত্যক্ষ করছিল যে, সুলতান আইউবী স্বল্প থেকে স্বল্পতম সৈন্য দ্বারা অধিক থেকে অধিকতর সৈন্যের উপর গেরিলা হামলা চালান এবং এক স্থানে স্থির হয়ে লড়াই করার পরিবর্তে বিক্ষিপ্ত হয়ে লড়াই করেন এবং বিশাল বিশাল বাহিনীকে ছিন্ন করে পর্যুদস্ত করে ফেলেন। তাদের জানা আছে যে, এ জাতীয় আক্রমণ পরিচালনার জন্য কঠোর প্রশিক্ষণ ও বিশেষ প্রকৃতির সৈন্যের প্রয়োজন। সাধারণ সৈন্যরা জানে হুজুগের মধ্যে যুদ্ধ লড়তে। এ পেক্ষাপটেই তারা হাবশী কাবায়েলীদের মধ্যে যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি করে ক্ষুদ্র একটি বাহিনী গঠন করে নিয়েছে এবং তাদেরকে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছে। তারা কায়রোবাসীকে রাতের আঁধারে ঝাপটে ধরতে চাচ্ছে।

সুলতান আইউবী এখন মিশরে অনুপস্থিত। তাদের বিশ্বাস, এই সুযোগে তারা ময়দান বাজিমাত করে ফেলতে সক্ষম হবে।

এই আক্রমণের কমান্ডের জন্য তাদের এমন একজন সেনা অধিনায়কের প্রয়োজন, যিনি হবেন মিশরী ফৌজের লোক, যাতে সময় ও শক্তি ব্যয় হবে কম এবং আঘাতও হানবে ঠিকানামত। তাদের এই প্রয়োজন পূরণ করে দিলেন সুলতান আইউবীর সালার আল-কিন্দ। সুদানের হাবশী সৈন্যদের লুকানোর ব্যবস্থা আল-কিন্দ-ই করে দিয়েছিলেন। তিনি মিশরী ফৌজের চার-পাঁচজন কমান্ডারকেও সঙ্গে ভিড়িয়ে নিয়েছেন। তিনি গোয়েন্দা মারফত সুদানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। সেই বাহিনী-ই এখন মিশরে অনুপ্রবেশ করছে।

❁ ❁ ❁

গভীর রাত পর্যন্ত চৌকিতে নাচ-গান চলতে থাকে। অপর চৌকির কমান্ডার বিদায় নেয়ার সময় মেজবান কমান্ডারকে বললেন, ওদেরকে বলুন, আগামী রাতে যেন আমার চৌকিতে আসে। বাদকদল আনন্দচিত্তে কমান্ডারের আবদার মেনে নেয়। তারা আর যাবেই বা কোথায়। তারা তো সুদানী তথা আল-কিন্দের প্রেরিত লোক। তারা যে বলেছিল, কারো আমন্ত্রণে এক গ্রামে গান গাইতে যাচ্ছিল, সে ছিল মিথ্যা কথা। তাদের কর্তব্য-ই ছিল, পানি পান করার নামে এই চৌকি দু'টিতে অবতরণ করবে এবং কথা দ্বারা কমান্ডারদেরকে ফাঁদে আটকে ফেলবে। নর্তকী মেয়েরা ছিল অতিশয় চিত্তাকর্ষক। কমান্ডার তাদের জালে আটকে যান। বেজায় আবেগতাড়িত হয়ে তিনি অপর চৌকির কমান্ডারকেও ডেকে আনলেন। এই সুযোগে পঞ্চাশজন হাবশী সীমান্ত পার হয়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পরবর্তী রাত বাদক ও নর্তকীদল অপর চৌকিতে গিয়ে পৌঁছে। সেখানেও জাঁকজমকপূর্ণ আসর জমে যায়। দুপুর রাতে নদীর কূলে টহলদানকারী দু'সৈনিক ফিরে আসে। তাদের স্থানে অপর দু'সৈনিক রওনা হতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাদের সঙ্গীরা বাঁধা দিয়ে বলল, পাগল হয়েছ? এই আমোদ ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ? কমান্ডার তখন মেয়েদের নাচ-গানের আসরে মত্ত হয়ে আছেন। কিন্তু সৈনিকদ্বয় সঙ্গীদের আবদার উপেক্ষা করে বলল, না যেতে হবে; ওটা আমাদের কর্তব্য। এরা সেই দু'সৈনিক, যাদেরকে মেয়েরা প্রেম নিবেদন করে বলেছিল, আমরা আমাদের স্বামীদেরকে খুন করে তোমাদের সঙ্গে চলে যাব। দায়িত্বের প্রতি তাদের অতটুকু গুরুত্ব নেই, যতটুকু আগ্রহ মেয়েদের মিলন

লাভের প্রতি। মেয়েরা প্রেম নিবেদন করে বলেছিল, পরে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

ইতিপূর্বে তারা ডিউটিতে যেত ধীর পদক্ষেপে, থেমে থেমে অসর্তকতার সাথে। কিন্তু আজ রাত চৌকি থেকে বেরিয়ে সামান্য দূরে গিয়েই ঘোড়া থামিয়ে অবতরণ করে এবং কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে একসঙ্গে হেঁটে দু'জন দু'দিকে আলাদা হয়ে যায়। মেয়ে দু'টো পৃথক দু'জায়গায় তাদের অপেক্ষা করছে।

মেয়েদের সঙ্গে সুলতান আইউবীর সৈনিকদের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। মেয়েরা তাদেরকে নদী থেকে দূরবর্তী এক পার্বত্য এলাকায় নিয়ে যায়। উভয় মেয়ে সৈনিকদের উপর তাদের রূপ-যৌবন ও ভালবাসার তেলেসমাতি প্রয়োগ করে এবং স্বামীদের হত্যার পরিকল্পনা আঁটতে থাকে। তারা সৈনিকদের জানায়, আমরা স্বামীদেরকে মদের সঙ্গে নিদ্রাজনক পাউডার মিশিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। সৈনিকদের একজন তার ভালবাসার পাত্রীকে নিয়ে টিলার একদিকে এবং অপরজন তার বিপরীত দিকে অবস্থান করছে। শুধু কর্তব্য-ই নয়– আশ-পাশ এবং জগতের সব কিছু-ই ভুলে গেছে তারা।

সুলতান আইউবীর এই সৈনিকদ্বয় যেস্থানে মিশরী বণিক পরিচয়দানকারী লোকদেরকে অবস্থান করতে দেখেছিল, সেখান থেকে সামান্য দূরে নদীর কূলে চারটি ছায়া এদিক-ওদিক নড়াচড়া করছে। নদীতে হালকা তরঙ্গ বইছে। লোকগুলো অন্ধকারের মধ্যে নদীর দিকে দূরপানে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছু একটা অবলোকন করার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে অস্থির হয়ে উঠছে তারা। একজন বলল– 'তাদের তো এতক্ষণে এসে পড়ার কথা!' আরেকজন বলল– 'তাদেরকে সংবাদ তো পৌঁছানো হয়েছে, বুঝলাম না এখনো এসে পৌঁছল না কেন।' একজন কিছুক্ষণ এক নাগাড়ে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, পাল দেখা যাচ্ছে মনে হয়!' বলেই বাতি জ্বালিয়ে লোকটি ডানে-বাঁয়ে নাড়াতে শুরু করে। পরক্ষণে দূর নদীতে দু'টি প্রদীপ জ্বলে উঠে আবার নিভে যায়।

কিছুক্ষণ পর একটি পালতোলা নৌকা নদীর কূলে এসে ভিড়ে। কিনারায় দন্ডায়মান এক ব্যক্তি বলল, 'কোন শব্দ যেন না হয়। পূর্ণ নীরবতার সাথে কৃষ্ণকায় হাবশী লোকগুলো নৌকা থেকে তীরে নেমে আসতে শুরু করে। মুহূর্ত পর তার পাশে এসে ভিড়ে আরেকটি নৌকা। তার মধ্য থেকেও হাবশী লোক নেমে আসে। উভয় নৌকা-ই বিশাল। দু'নৌকা থেকে কমপক্ষে দু'শ লোক মিশরের ভূখন্ডে অবতরণ করে। তারপর ভিতর থেকে মালামাল নামাতে শুরু করে। সবই সামরিক সরঞ্জাম। মাল খালাস হওয়ামাত্র মাঝিদের নির্দেশ

দেয়া হল, বিলম্ব না করে তোমরা এক্ষুণি ফিরে যাও। মাঝিরা পাল নামিয়ে গতি বদল করে নোঙ্গর তুলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। হাবশীদের এই চালানটিও পার্বত্য এলাকায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই সৈনিকদ্বয় যখন ফিরে আসে, তখন চৌকির নাচ-গানের আসার ভেঙ্গে গেছে। আসর থেকে উঠে সৈনিকরা যার যার তাঁবুতে ফিরছে। কমান্ডার নর্তকীদের জন্য আলাদা একটি তাঁবু স্থাপন করে দিয়েছেন। একটি মেয়েকে তার খুবই ভাল লাগে। নিষ্পাপ মিষ্টি মুখ মেয়েটির। কমান্ডারের দৃষ্টিতে তারা পেশাদার মেয়ে। তিনি বাদকদের বললেন, তোমরা অমুক মেয়েটাকে আমার তাঁবুতে পাঠিয়ে দাও।

লোকগুলো মূলত শত্রুর গোয়েন্দা ও নাশকতাকারী। তাদের মিশন-ই হল, সুলতান আইউবীর এই দু'টি সেনাচৌকিকে ফাঁদে আটকিয়ে রাখা এবং কমান্ডারদেরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা করা, যাতে এই সুযোগে সুদানের হাবশী সৈন্যরা মিশরে ঢুকে যেতে পারে। এমতাবস্থায় এই চৌকির কমান্ডার যখন তাদের একটি মেয়ের সঙ্গ লাভের ইচ্ছা পোষণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার আকাংখা পূরণ করে দেয়া হল। নর্তকী কমান্ডারের সঙ্গে তার তাঁবুতে ঢুকে পড়ে।

কমান্ডার মধ্য বয়সী পুরুষ আর মেয়েটা তাগড়া যুবতী। তাঁবুতে ঢুকেই মেয়েটি গম্ভীর হয়ে যায়। বাইরের আলো-প্রদীপ নিভে গেছে। তাঁবুর মধ্যে টিম টিম করে একটি বাতি জ্বলছে। কমান্ডার মেয়েটির প্রতি মুখ করে বসে গভীর দৃষ্টিতে তাকে দেখতে শুরু করে।

'আমি কোনদিন মদপান করিনি।' কমান্ডার বললেন।

'আমার পিতাও কখনো মদপান করেননি'– মেয়েটি বলল– 'কিন্তু আপনি মদের উল্লেখ কেন করলেন? আমি তো বলিনি মদপান করব? আপনি সম্ভবত ভেবেছেন, আমাদের সঙ্গে মদ আছে আর আমি এনে আপনাকে পান করাব?'

'কথায় বলে মদ ছাড়া নারী আর নারী ছাড়া মদ জমে না'– কমান্ডার মুচকি হেসে বললেন– 'আমি মদের স্বাদ সম্পর্কে অবহিত নই এবং পরনারীর সুখ সম্পর্কেও অনবহিত।'

'তবে তো তুমি নতুন পাপী'– মেয়েটি অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল– 'আমি তোমার থেকে কোন নগদ বিনিময় নেব না। তুমি আমার একটি দাবি মেনে নাও, তাহলে আমি সারারাত তোমার সঙ্গে অতিবাহিত করাকেই তার বিনিময় মনে করব। কথা হল, পাপ করার মধ্যে সেই স্বাদ নেই, যে স্বাদ আছে পাপ

না করার মধ্যে। তুমি পুরুষ। নির্জন পরিবেশে আমার মত একটি যুবতীর সম্মুখে উপস্থিত থাকা অবস্থায় আমার কথাগুলো তোমার নিকট বিস্ময়কর ঠেকবে। তুমি আমার কথা মানবে না। একটু ভাব, তোমার চেহারা বলছে, তুমি এই আজ প্রথমবার পাপ করার মনস্থ করেছ। এমন শীতের রাতে আমি তোমার কপালে ঘামের ফোঁটা লক্ষ করছি।'

'তুমি ঠিকই বলছ'– কমান্ডার বললেন– 'আমাদেরকে যখন সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল, তখন পাপ থেকে বেঁচে থাকার সবক শেখানো হয়েছিল। আমাদেরকে সামরিক ও দৈহিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি আত্মিক এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়ে থাকে। একারণেই সুলতান আইউবীর একশত সৈনিকের কাছে খৃস্টান বাহিনীর এক হাজার সৈনিকও হার মানতে বাধ্য হয়।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা অবলা মেয়ে তোমাকে নিরস্ত্র করে ফেলেছে!'– নর্তকী বলল– 'তোমার রূহানী ও আখলাকী শক্তি কেড়ে নিয়ে গেছে!'

মেয়েটির কথায় কমান্ডার হতভম্ব হয়ে যান। তিনি অগত্যা বলে উঠেন– 'আমার বিলকুল ধারণা ছিল না যে, এখানে এসে তুমি এ ধরনের কথা বলবে! আমি ধারণা করেছিলাম, নির্জনে এসে তুমি আমাকে প্রেম-ভালবাসা দিয়ে মাতিয়ে তুলবে। তোমার ঠোঁটের সেই হাসি কোথায়, যা আমাকে বাধ্য করেছিল, তোমার লোকদের থেকে তোমাকে ভিক্ষা চাইতে? আমি বিনিময় হিসাবে তোমাকে দু'টি আরবী ঘোড়া দিতে প্রস্তুত আছি।'

'আর তোমার তরবারীটাও দেবে?'– মেয়েটি বলল– 'বর্শা, ঢাল এবং খঞ্জরটাও।'

'হ্যাঁ'– কিন্তু কমান্ডার নিশ্চুপ হয়ে যান। পরক্ষণে অস্থির কণ্ঠে বললেন– 'না, সৈনিক কখনো অস্ত্রমুক্ত হয় না।'

কমান্ডার বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যান। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে কিছুক্ষণ পায়চারী করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে রাগত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'একটি নর্তকীর মুখে এসব কথা আমার ভাল লাগছে না। তুমি কি আমার থেকে রক্ষা পেতে চাও? তুমি কি ভাবছ, আমি তোমার দেহে হাত লাগাব না?'

'হ্যাঁ'– নর্তকী বলল– 'আমি তোমার থেকে আমার দেহকে রক্ষা করতে চাই।'

'তুমি কি তোমার দেহটাকে পবিত্র মনে করছ?'

'না'– নর্তকী বলল– 'আমি আমার দেহটাকে নাপাক-ই মনে করি। তবে তোমার দেহটাকে আমি নাপাক করতে চাচ্ছি না।'

মেয়েটির বক্তব্য কমান্ডারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। তিনি বোকার ন্যায় হা করে নর্তকীর প্রতি তাকিয়ে থাকেন। নর্তকী বলল– 'কোন কন্যা তার পিতার দেহকে অপবিত্র করতে চায় না।'

'উহ!'– কমান্ডার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আমি বৃদ্ধ আর তুমি যুবতী।' তিনি বসে পড়েন এবং মাথাটা নত করে ফেলেন।

নর্তকী একটু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কমান্ডারের চিবুক ধরে মাথাটা উপরের দিকে তুলে বলল, এত হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি পালাব না, তোমাকে ধোঁকাও দেব না। তুমি যদি একজন 'পুরুষ' পরিচয় ধারণ করেই থাকতে চাও, তাহলে আমিও নর্তকী ও বেশ্যা হয়েই থাকব। তারপর বলল, আমি তোমাকে পিতার রূপে দেখছি। তুমি আমার দু'-একটি কথা শুনে নাও। তারপর যা ইচ্ছে হয় কর, আমি পাথর হয়ে যাব আর তুমি তাকে নিয়ে খেলা করতে থাক। আচ্ছা, তোমার কি কোন মেয়ে আছে?'

'একটি আছে।' কমান্ডার জবাব দেন।

'তার বয়স কত?'

'বার বছর।'

'আচ্ছা, তুমি যদি মৃত্যুবরণ কর আর তোমার স্ত্রী অভাবের জ্বালায় বাধ্য হয়ে তোমার মেয়েটাকে গায়ক-নর্তকীদের কাছে বিক্রি করে দেয়, তাহলে তোমার আত্মার কী দশা হবে? তোমার আত্মা কি তখন এসব মরু বিয়াবান ও পাহাড়ে-জঙ্গলে চীৎকার করে ফিরবে না?

কমান্ডার মেয়েটার প্রতি আড় চোখে তাকাতে শুরু করেন। তার কপালের উপর আরো কয়েক ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে।

'তুমি একটু কল্পনা কর'– মেয়েটা বলল– 'মনে কর, তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং তোমার কন্যা এক পাপিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে তাঁবুতে বসে আছে এবং লোকটা তাকে বলছে, মদ আন; 'মদ ছাড়া নারী আর নারী ছাড়া মদ জমে না।'

কমান্ডারের ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে। হঠাৎ করে গর্জে উঠে বললেন, বেরিয়ে যাও তুমি এখানে থেকে। কুলটা, বেশ্যা!

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– 'আমার পিতা যদি আমাকে ও তোমাকে দু'জনকেই খুন করে ফেলতেন!'

মেয়েটির দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে আসে। কমান্ডার বসা থেকে উঠে তাঁবুর মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করেন। মেয়েটি তার মানসিক অবস্থা ও ক্ষোভ

উপেক্ষা করে বলল– 'বৃদ্ধ বলে আমি তোমাকে ঘৃণা করছি না। আমি এমন এমন বৃদ্ধ লোকদের তাঁবুতে রাত যাপন করেছি, বার্ধক্য যাদেরকে ভিতর থেকে ফোকলা করে ফেলেছে। তারা ঐশ্বর্যের বলে তাদের মৃতদেহে আত্মার সঞ্চারণ করতে চাইত। সে তুলনায় তুমি অতটা বৃদ্ধ নও। আসল কথা হল, তোমার গঠন-আকৃতি ঠিক আমার পিতার মত। আমি তোমাকে যে কথাগুলো বললাম, তা আগে আমার মাথায় ছিল না। আমি শুধু নাচতে আর অঙ্গুলি হেলনে নাচাতে জানতাম। তুমি নিজেই ভেবে দেখ, আমার মত একটা বেশ্যা নর্তকীর মাথায় এমন সব কথা আসল কেন, যা তোমাকে বিস্মিত করে তুলেছে?'

কমান্ডার মেয়েটির প্রতি তাকান। তার রাগ পানি হয়ে গেছে। মেয়েটি বলল– 'আমার পিতা-মাতার চেহারা ও দৈহিক গঠন আমার ভালভাবে স্মরণ আছে। তাদের গায়ের গন্ধও আমার মনে আছে। তোমার কন্যার বয়স বার বছর। আমার বয়স যখন নয়-দশ বছর ছিল, তখন বাবা মারা যান। তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। মিশরের সেনাবাহিনীর সৈনিক ছিলেন। তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বেই মারা যান। তখন আমার মা যুবতী এবং নিতান্ত অসহায়। তিনি পেটের দায়ে আমাকে অর্থের বিনিময়ে এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেন। বিনিময়টা তিনি আমার চোখের সামনে গ্রহণ করেছিলেন। লোকটা যখন আমার মাকে বলেছিল, উঁচু পর্যায়ের একজন ভাল মানুষের সঙ্গে আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে দেব। আমি কাঁদতে শুরু করলে মা বললেন, কাঁদিস্‌নে মা, ইনি তোর চাচা। ইনি তোকে তোর পিতার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর আমি বার বছর পর্যন্ত পিতাকে সন্ধান করে ফিরছি। আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাচ শেখানো হয়েছে যে, তোমাকে তোমার পিতার নিকট নিয়ে যাব। বয়স বাড়ার পর আমি বুঝে ফেলি যে, আমাকে যা কিছু বলা হয়েছে ও হচ্ছে, সবই প্রতারণা। ওরা কিভাবে আমাকে আমার পিতার নিকট নিয়ে যাবে? তিনি তো মারা গেছেন! ততক্ষণে নাচ-গান আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আমাকে জীবনে কেউ প্রহার করেনি। পিতার নামে আমি নাচের প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আমার ওস্তাদ ও মনিব আমার সঙ্গে ভাল আচরণ করতেন এবং ভাল ভাল খাবার খাওয়াতেন। তারপর একদিন আমার যৌবন আসে। তখন আমি আমার মূল্য আন্দাজ করতে সক্ষম হই। সেই মূল্য আমার সব চেতনাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। আমি একটি সুদর্শন পাথরে পরিণত হয়ে যাই। কিন্তু

তোমাকে দেখার পর আমার মৃত চেতনা আবার জেগে উঠেছে।'

মেয়েটির দু'চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। সে অশ্রু ঝর ঝর নেত্রে বলতে শুরু করল, এ মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমার পিতার আত্মা এই তাঁবুটার চার পার্শ্বে ঘুরে ফিরছে। এই তাঁবুতে প্রবেশ করার আগে কখনো আমার এমনটা মনে হয়নি। মাঝে-মধ্যে মনে হত, যেন আমার অস্তিত্বটা-ই আমার পিতার আত্মা, যিনি দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

তুমি যদি একটি মূল্যবান নর্তকী-ই ছিলে, তাহলে এই পাহাড়-জঙ্গলে কী অর্জন করতে এসেছ?' কমান্ডার জিজ্ঞাসা করেন।

'আমি ভাড়ায় এসেছি'– নর্তকী জবাব দেয়– 'আমি ওদেরকে চিনিনা। অন্যান্য নর্তকীদেরও পূর্বে চিনতাম না। আমাকে বলা হয়েছিল, সীমান্ত এলাকায় যেতে হবে এবং ওখানকার সেনাচৌকিতে যদি প্রয়োজন পড়ে, বিনা পরিশ্রমে নাচতে হবে। মিশরের ইজ্জত ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী সৈনিকদেরকে খুশী করে আমি যে আনন্দ পাচ্ছি, অন্য কিছুতে আমি ততটা আনন্দ পেতাম না। আমার অনেক সময় মনে হয়, আমার নাচে আমার মুজাহিদ পিতার আত্মাও খুশী হন। আমি একটি প্রতারণা – নিজের জন্যও, অন্যের জন্যও। কিন্তু আমি স্বদেশের মুজাহিদদের দেহকে অপবিত্র করতে পারি না। আগের চৌকির কমান্ডার আমাকে তার তাঁবুতে ডেকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আমি তার আবেগ প্রত্যাখ্যান করেছি। তোমার কাছে শুধু এজন্য এসেছি যে, চেহারা-সুরতে তোমাকে আমার পিতার মত মনে হয়েছিল।'

নর্তকী কমান্ডারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। কমান্ডারের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তুলে চোখের সঙ্গে লাগায়। তারপর সেই হাতে চুম্বন করে। কমান্ডার নিজের অপর হাতটা তার মাথায় রেখে জিজ্ঞাসা করেন– 'তোমার নাম কী?'

'আমার মনিব আমাকে বার্‌ক নামে ডাকেন। আব্বা ডাকতেন যোহরা নামে।' নর্তকী জবাব দেয়।

'যাও, যোহরা!'– কমান্ডার স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন– 'নিজ তাঁবুতে চলে যাও।'

'তুমি ঘুমিয়ে পড়'– যোহরা বলল– 'আগে তুমি ঘুমাও, আমি তারপর যাব।'

✿ ✿ ✿

রাত কেটে যাচ্ছে। বাদক দলের দু'সদস্য তাঁবুতে জাগ্রত বসে আছে। অন্যান্য নর্তকী ও অবশিষ্ট বাদকরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। জাগ্রতদের একজন অপরজনকে বলল, আমাদের কর্মপদ্ধতি সঠিক বলে মনে হচ্ছে না।

আমরা মেয়েগুলোকে এই বলে এনেছিলাম যে, তারা নেচে-গেয়ে সৈন্যদের মনোরঞ্জন করবে। তাদেরকে বলে দেয়া আবশ্যক ছিল, আমাদের আসল উদ্দেশ্য কী।'

'একজন নর্তকীকে বিশ্বাস করা যায় না'– অপরজন বলল– 'যে মেয়েটি এখন কমান্ডারের তাঁবুতে অবস্থান করছে, সে আবেগের বশবর্তী হয়ে আলাদা পুরস্কার গ্রহণ করে কমান্ডারকে বলে দিতে পারে, আমরা সীমান্ত চৌকিগুলোর জন্য ধোঁকা ও প্রতারণা হয়ে এসেছি। এজন্যে কোন নর্তকীকে আসল রহস্য বলা ঠিক হবে না। আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করে বিনিময় পাওয়া-ই ওদের জন্য যথেষ্ট। আমরা তাদেরকে দাবি অনুপাতে পারিশ্রমিক দিয়েছি। কাজ আমাদের হয়ে গেছে।'

আমাদের উদ্দেশ্য কী, যদি মেয়েটাকে বলে দিতাম, তাহলে সে কমান্ডারকে ভালভাবে অন্ধ করে ফেলত। তাকে সে এমনভাবে ফেঁসে ফেলত যে, তারই সহযোগিতায় আমরা হাবশীদেরকে ভিতরে নিয়ে আসতাম।'

ওস্তাদ আমাদের চেয়ে ভাল বুঝেন। এই মেয়েগুলো আমাদের হাতিয়ার। কেউ হাতিয়ারকে রহস্য জানায় না। এটা নিরাপদ নয়। কমান্ডার এই চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন যে, মেয়েটি তাকে পাপ থেকে রক্ষা করেছে এবং তার হৃদয়ে পিতৃবোধ জাগিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার মাথার কাছে বসে থাকে। তারপর এক সময়ে ধীর পায়ে বের হয়ে নিজের তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

এখন ভোর। নায়ক-নর্তকীরা যখন জাগ্রত হয়, তখন সূর্য উপরে ওঠে গেছে। মেয়েরা জানেনা, এখন তাদের গন্তব্য কোথায়। বাদক পুরুষরা যখন তাদেরকে একদিকে নিয়ে রওনা হয়, কমান্ডার তখন তাঁর তাঁবুর বাইরে দন্ডায়মান। যোহরা দৌড়ে তার নিকট এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল– 'আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।' কমান্ডার তার মাথায় হাত রাখেন। যোহরা কমান্ডারের অপর হাতটি ধরে টেনে নিয়ে নিজের চোখের সঙ্গে লাগায় এবং আদ্র চোখে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসে।

তারা নদীর দিকে রওনা হয়ে যায়। পথে একদিক থেকে দু'টি উট এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। দু'উটের দু'আরোহী নীচে অবতরণ করে উটগুলোকে বসিয়ে নর্তকী মেয়ে দু'টোকে উটের পিঠে বসিয়ে রওনা হয়ে যায়। এই উষ্ট্রোরোহীদ্বয় তাদের-ই দলের মানুষ। তারা নিকটেই কোথাও তাদের অপেক্ষায় লুকিয়ে ছিল।

চারটি মেয়েসহ বণিক কাফেলা যে স্থানে অবস্থান করেছিল, এরা সেখানে গিয়ে পৌঁছে। উভয় দল পরস্পর এমনভাবে মিলিত হয়, যেন কারো সঙ্গে কারো পরিচয় নেই। বণিক কাফেলার মেয়েরা গায়কদলের মেয়েদেরকে পুরুষদের থেকে সরিয়ে নদীর কূলে নিয়ে যায়। বণিক কাফেলার মেয়েরা যোহরা ও তার সঙ্গী মেয়েকে জানায়, আমরা তাদের স্ত্রী-কন্যা; ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে এখানে এসেছি।

ওদিকে পুরুষদের আসরে আসল মিশন নিয়ে আলোচনা চলছে। বাদকরা তাদের দু'রাতের কারগুজারী শোনায়। বণিক কাফেলার লোকেরা জানায়, তোমাদের নাচ-গানের আসরের সুযোগে অন্তত একশত হাবশী মিশর ঢুকে পড়েছে। আর আমাদের মেয়েরা দু'জন সৈনিককে ফাঁদে ফেলে ঢুকিয়েছে দু'শ-রও বেশি হাবশীকে।

নিজ নিজ দলের কারগুজারী শোনানোর পর তারা সিদ্ধান্ত নেয়, এই নাচ-গান দ্বারা তেমন বেশি হাবশীকে ভিতরে ঢুকানো যাবে না। নদীর পথটা-ই বেশি উপযোগী। নৌকায় করেই অধিক থেকে অধিকতর লোক ভিতরে ঢুকতে পারবে। তাই সিদ্ধান্ত হল, মেয়েরা এই দু'সৈনিক ছাড়াও আরো দু'-চারজন সান্ত্রীর সঙ্গে অনুরূপ খেলা খেলবে, যাতে প্রতি রাতে নৌকা আসতে পারে। এ-ও সিদ্ধান্ত হল যে, যোহরা ও তার সঙ্গী নর্তকীকে এখানেই এক স্থানে রাখা হবে। কিন্তু তাদের কোন রহস্য জানতে দেয়া হবে না।

বৈঠক শেষ হয়ে গেছে। বাদক পুরুষরা তাদের মেয়েদের ডেকে এনে বলল, তোমাদের আপাতত কোন কাজ নেই। এ জায়গাটা খুবই মনোরম। তোমরা কয়েকটা দিন এখানে-ই অবসর কাটাও। তারা মেয়েদেরকে এমনভাবে উৎসাহিত করে যে, তারা সম্মত হয়ে যায়। অপর দলের মেয়েরা তাদেরকে আপন ও ঘনিষ্ট বানিয়ে নেয়। কিন্তু খানিকটা দূরে আলাদাভাবে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

এখন রাত। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু যোহরার চোখে ঘুম আসছে না। তার বারবার কেবল কমান্ডারের কথা মনে পড়ছে। কমান্ডারের ব্যক্তিত্ব যোহরাকে প্রভাবিত করে ফেলেছে। প্রথমত একারণে যে, কমান্ডারের মধ্যে সে তার পিতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই কমান্ডার-ই প্রথম পুরুষ, যে তাকে খেলনা মনে করার পরিবর্তে তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়েছে। তৃতীয়ত, কমান্ডার তাকে বারূক নয়– যোহরা নামে ডেকেছে।

যোহরা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়। পা টিপে টিপে তাঁবু থেকে বাইরে

বেরিয়ে আসে। রাস্তা তার আগে থেকেই চেনা। এবার দ্রুতপায়ে চৌকি অভিমুখে হাটা দেয় সে। যোহরা এত দ্রুত আর এত দীর্ঘ পথ হাঁটায় অভ্যস্ত নয়। কিন্তু তার আবেগ তাকে শক্তি জুগিয়ে চলেছে।

যোহরা চৌকিতে পৌছে যায়। কমান্ডারের তাঁবু তার আগে থেকেই চেনা। তাঁবুতে ঢুকে পড়ে সে। কমান্ডার গভীর ঘুমে অচেতন। কারো আগমন টের পেয়ে তার চোখ খুলে যায়। যোহরা অন্ধকারের মধ্যে কমান্ডারের মুখে হাত রাখে। কমান্ডার চোখ খুলেই বিড়বিড় করে উঠে হাত ধরে ফেলে। তুলতুলে নরম ছোট্ট হাত। কমান্ডার বুঝে ফেলে, এ হাত নারীর। তিনি কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'কে?'

'যোহরা।'

কমান্ডার ধড়মড় করে উঠে বসেন। যোহরা বলল– 'তোমাকে দেখতে এসেছি। শুড়ে পড়, আমি চলে যাচ্ছি।'

কমান্ডার বাতিটা জ্বালিয়ে দেন। যোহরাকে জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে এসেছ? তার কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময়। যোহরা তার মনের কথা খুলে বলল। কমান্ডার বাইরে বেরিয়ে আসেন। দু'টি ঘোড়া প্রস্তুত করেন এবং যোহরাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটিতে তাকে চড়ান এবং অপরটিতে নিজে চড়ে বসেন। ঘোড়া চলতে শুরু করে।

দু'টি ঘোড়া পাশাপাশি চলছে। যোহরা আবেগের ভাষায় কথা বলছে। কমান্ডার মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকেন। গন্তব্য থেকে কিন্তু দূরে থাকতেই যোহরা কমান্ডারকে থামতে বলে এবং তাকে ফিরে যেতে বলে। কমান্ডার তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ফিরে যান।

যোহরা তাঁবুতে গিয়ে পৌছে। তার দলের এক ব্যক্তি সজাগ বসে আছে। যোহরাকে দেখেই জিজ্ঞেস করে, কোথায় গিয়েছিলে? যোহরা বলল, একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম। লোকটি যোহরাকে ধমকাতে শুরু করে। তার মনে সন্দেহ জাগে। যোহরা বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

'আমাদের অনুমতি ছাড়া তোমরা কোথাও যেতে পারবে না।' লোকটা নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

'আমি তোমাদের ক্রীতদাসী নই'– যোহরা বলল– 'আমি যে পারিশ্রমিক নিয়েছি, তার বিনিময়ে কাজ যা করার ছিল, করে ফেলেছি। এখন আর আমি কারো আদেশ-নিষেধ পালন করতে বাধ্য নই।'

'তোমরা সম্ভবত মালিকের নিকট জীবিত ফেরত যেতে চাও না'– লোকটা

বলল– 'এখান থেকে আমাদের অনুমতি ছাড়া কোথাও গিয়ে দেখ।'

❁ ❁ ❁

সুলতান আইউবীর সীমন্ত রক্ষী সৈনিকদ্বয় প্রতিদিন ডিউটিতে বেরিয়ে নদীর কূলে এসে পড়ছে আর তাদের প্রেয়সী মেয়ে দু'টো তাদেরকে ভালবাসার মূলা দেখিয়ে দেখিয়ে একদিকে সরিয়ে নিচ্ছে। এই সুযোগে সুদানী হাবশী বোঝাই পালতোলা নৌকা এসে কূলে ভিড়ছে এবং সৈন্যরা তীরে নেমে পর্বতমালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বণিক কাফেলার চারটি মেয়ে আরো দু'জন মিশরী সৈন্যকে নিজেদের 'বৃদ্ধ স্বামীদের স্ত্রী' বানিয়ে এবং তাদের সঙ্গে চলে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে আটকে ফেলে।

মিশরের এই সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে এত অধিক সুদানী হাবশী সৈন্য এসে জড়ো হয়েছে যে, তারা ইচ্ছে করলে রাতের বেলা সীমান্ত চৌকিগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে মিশরী সৈন্যদেরকে অতি অনায়াসে খতম করে ফেলতে পারে। কিন্তু তাদের কমান্ডারগণ ভেবে রেখেছেন অন্য কিছু। সীমান্ত চৌকি হামলার সংবাদ কায়রো পৌছে যাবে। তার ফল এই দাঁড়াবে যে, কায়রো থেকে সৈন্য এসে যাবে এবং খৃষ্টানদের আকষ্কিকভাবে কায়রো আক্রমণের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দেবে।

নীল নদের উপকূলীয় পার্বত্য এলাকায় সুদানী হাবশী সৈন্যসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলছে। কায়রো আক্রমণ পরিচালনা করা যে খৃস্টান কমান্ডারদের দায়িত্ব, সুদানে খৃষ্টান উপদেষ্টাগণ তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছে। তারা কিছুদিনের মধ্যে মিশরের সীমান্ত অতিক্রম করে পাহাড়ী এলাকায় অনুপ্রবেশ এবং হামলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। সালার আল-কিন্দ এখনো কায়রোতে বহাল তবিয়তে তার দায়িত্ব পালন করছেন। তার কোন আচরণে কারো মনে সন্দেহ জাগেনি যে, তিনি বড় রকমের একটি বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত। রাতে ঘরে বসেই তিনি রিপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, গত রাতে কতজন হাবশী মিশরের সীমান্ত অতিক্রম করেছে এবং এযাবত তাদের সংখ্যা কতোয় দাঁড়িয়েছে। আক্রমণের মূল নেতৃত্ব তাঁকেই দিতে হবে। তিনি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রেখেছেন।

মিশরের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় হাজার হাজার সুদানী হাবশী সৈন্যের সমাগম। এবার তাদের ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী বলি দেয়ার পালা– মানুষ বলি। প্রথমে তাদের পরস্পরে কানাঘুষা চলে। তাদের দাবি, মানুষ বলি দিতে হবে। আল-কিন্দ-এর লোকেরা তাদেরকে এ দাবি প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য জোর

প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু হাবশীদের পুরোহিত দাবিতে অটল। হাবশীরা তাকে বিরক্ত করে তোলে যে, বলুন, মানুষ বলী কবে হবে? তাদের স্পষ্ট কথা, অন্যথায় আমরা ফিরে যাব। পুরোহিতদের বলা হল, আপনারা আপনাদেরই মধ্য থেকে একজনকে ধরে বলি দিয়ে দিন। তারা জবাব দেয়, না, এই বলি কবুল হয় না। বলির জন্য সেই অঞ্চলের মানুষ হতে হয়, যেখানে হামলা হবে। যারা আক্রমণ করে, তারা নিজেদের লোক বলি দেয়ার নিয়ম নেই।

অবশেষে তাদেরকে বলা হল, হামলার একদিন আগে মিশরের কোন এক ব্যক্তিকে ধরে এনে তোমাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। হাবশীদের পুরোহিতগণ বলল– 'না. আমরা মানুষ এখনই চাই। অনেকদিন পর্যন্ত তাকে বিশেষ ধরনের খাবার খাইয়ে পুষতে হবে, মোটাতাজা করতে হবে এবং তার উপর বিশেষ আমল প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি এই বলি উপলক্ষে আমাদেরও পূজা-অর্চনা করতে হবে। আরো কথা আছে। আমাদের হিসাব-নিকাশ করতে হবে, বলি পুরুষের দিতে হবে, না নারীর। নাকি উভয়ের।

সে রাতে-ই আল-কিন্‌দকে সংবাদ পাঠানো হয়, হাবশীরা বলি দেয়ার জন্য মানুষ দাবি করছে। জবাবে আল-কিন্‌দ বললেন– 'এতে ভাবনার কী আছে। একটা মানুষ ধরে নিয়ে তাদের হাতে তুলে দাও।'

'কিন্তু তারা এখনো বলেনি যে, বলি একজন পুরুষের হবে নাকি নারীর কিংবা উভয়ের।'

'তারা যা-ই দাবি করে পূরণ কর'– আল-কিন্‌দ বললেন– 'ক'দিন পর যখন আমরা কায়রোতে হামলা চালাব, তখন কতগুলো মানুষ প্রাণ হারাবে, তার ঠিক নেই। তার আগেই যদি দু'-একজন মেরে ফেলা হয়, তাতে ক্ষতির কী আছে!'

আল-কিন্‌দ গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান। এমন সময়ে এক খৃস্টান কমান্ডার ভিতরে প্রবেশ করে। লোকটির পরনে মিশরী পোশাক। ভিতরে প্রবেশ করেই সে মুখের কৃত্রিম দাড়ি খুলে ফেলে। সে আল-কিন্‌দকে জিজ্ঞেস করে, আপনাকে অস্থির এবং চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

'হাবশীরা তাদের রীতি পালন করতে চাচ্ছে'– আল-কিন্‌দ জবাব দেয়– 'তারা বলি দেয়ার জন্য মানুষ চাচ্ছে।'

'তা আপনি ভাবছেন কী?'

'আমি ভাবছি, হামলার একদিন আগে একজন মানুষ তাদের হাতে তুলে দেব।'

'না'– খৃস্টান কমান্ডার বলল– 'তারা যদি এখনই বলি দিতে চেয়ে থাকে,

আপনি তাদের দাবি পূরণ করুন। এখন-ই তাদের প্রথা পালনের ব্যবস্থা করুন। আপনি সুদান যাননি। আমরা তাদেরকে ধর্মের নামে এ পর্যন্ত এনেছি। আপনি সম্ভবত মানুষকে কাজে লাগাতে জানেন না। সালাহুদ্দীন আইউবী আপনাকে শুধু লড়াই করতে শিখিয়েছেন। কিন্তু মানুষকে বিনা তলোয়ারে কিভাবে খুন করা যায়, তা আপনাকে আমাদের নিকট শিখতে হবে। একজন লোককে কাজে লাগাতে হলে তার ধর্মকে ব্যবহার করুন। তাদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় উন্মাদনা উস্কে দিয়ে তাদের বিবেককে মুঠোয় নিয়ে আসুন। তাদের কাজে এবং অর্থহীন প্রথা-পার্বনের বিরোধিতা না করে বরং তার অনুসরণ করুন। সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ক ধর্ম আর কুসংস্কার বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে। আমরা বহু মুসলমানকে হাতে এনেছি এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছি। সবাইকে ধর্ম ও কুসংস্কারের অস্ত্র দ্বারা হাত করেছি। মুসলমান ধর্মের নামে অতি তাড়াতাড়ি আমাদের জালে এসে ধরা দেয়। এই হাবশীরা তো জংলী। আমরা তাদেরকে এক বছরেরও অধিক আগে দুই সুদানীকে ধরে তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলেছি, এরা মিশরী। তারা তাদেরকে যবাই করে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল।

'তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তারা বলির জন্য পুরুষ চায়, না নারী।' আল-কিন্দ বললেন।

'এই মুহূর্তে আপনার কিন্তু ওখানে যাওয়া খুবই জরুরী'– খৃস্টান কমান্ডার বলল– 'কিন্তু আমি আপনাকে তাদের সম্মুখে অন্য এক পন্থায় নিয়ে যাব। ওরা অত্যন্ত জংলী ও রক্তপিপাসু যোদ্ধা। এ মুহূর্তে মিশরে তাদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। আমরা যদি তাদের উপর ধর্মের ভূত চাপিয়ে রাখি এবং তাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করি যে, এটা আমাদের নয়– তোমাদের-ই যুদ্ধ, তাহলে তাদের মাত্র এক হাজার যোদ্ধা-ই কায়রোর সব সৈন্যকে লাশে পরিণত করে ফেলতে সক্ষম হবে। আমরা তাদেরকে এই বলে এনেছি যে, আমরা তাদেরকে তোমাদের খোদার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি এবং তোমাদের দুশমনরা তোমাদের খোদার ভূখন্ড কব্জা করে আছে।'

'আমি যাব।' আল-কিন্দ বললেন।

আল-কিন্দ মিশরের উপর সুদানীদের শাসন কামনা করতেন। কিছুদিন আগে তিনি একজন গাদ্দারের নিকট তার এই মনোবাঞ্ছার কথা প্রকাশ করে বসেন। গাদ্দার তার আকাঙ্খাকে দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত করে দেয় এবং খৃস্টানদের সঙ্গে তার যোগাযোগ করিয়ে দেয়।

খৃস্টানরা তার সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, মিশরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এক অংশ তোমাকে দিয়ে দেব আর অবশিষ্টাংশ সুদানকে দেব। ঐতিহাসিকগণ আল-কিন্দ-এর বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের কাহিনী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেননি। সে যুগের মহান ব্যক্তিত্ব কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় এ বিষয়টা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আল-কিন্দ খৃস্টান ও সুদানী নেতৃবৃন্দের সহায়তায় সভ্যতা-বিবর্জিত হিংস্র হাবশীদের উপর তাদের ধর্মের ভুত সাওয়ার করে তাদের উপর যুদ্ধ-উন্মাদনা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং তিনি স্বয়ং তাদের ধর্মগুরুতে পরিণত হন। হাবশীদেরকে বলা হয়েছিল, ইনি তোমাদের খোদার সেই দূত, যিনি শত শত বছর ধরে খোদার নিকট আসা-যাওয়া করছেন।

❁ ❁ ❁

সে রাতটা ছিল অন্ধকার। মিশরের আকাশ ছিল তারায় তারায় উজ্জ্বল। কায়রো শহর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। দিন কয়েক পরই তাদের উপর কী মহাপ্রলয় সংঘটিত হতে যাচ্ছে, তা কারো জানা ছিল না। মিশরের সীমান্তরক্ষী বাহিনীও ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে শুধু কয়েকজন টহলসেনা। তারাও জেগেই আছে শুধু– কর্তব্যের প্রতি তাদের কোনই মনোযোগ নেই।

নদীপথে আগ্রাসন রোধকল্পে নীল নদের কোল ঘেঁষে যে চৌকিটি স্থাপন করা হয়েছিল এবং তার থেকে মাইল চারেক দূরে অপর যে চৌকিটি পার্বত্য এলাকাকে নিরাপদ করার জন্য বসানো হয়েছিল, সেই দু'টি চৌকির দু'জন করে চারজন টহলসেনা চারটি মেয়ের রূপের জালে আটকে আছে। মেয়েগুলো তাদেরকে আলাদা আলাদা নিয়ে যাচ্ছে। আজ তারা আরো বেশি তৎপর।

যোহরা ও তার সঙ্গী নর্তকীর দল থেকে কিছু দূরে একটি তাঁবুতে শুয়ে আছে। দলের বাদক পুরুষরা বাহ্যত ঘুমিয়ে থাকলেও মূলত তারা সজাগ। তাদেরকে বলা আছে, আজকের রাতটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমরা জেগে থাকবে। উভয় দলের প্রতি নির্দেশ, বাইরের কোন মানুষ যেন নদীর কূলে এবং এই পার্বত্য এলাকার কাছে আসতে না পারে। কেউ এসে পড়লে তাকে যেন ধরে ভিতরে নিয়ে আসা হয়।

কিছুক্ষণ পর এক বাদক শোয়া থেকে উঠে পড়ে। সে প্রথমে তাঁবু থেকে বের হয়ে বাইরে ঘোরাফেরা করে। তারপর মেয়ে দু'টো যে তাঁবুতে আছে, তার ভিতরে উঁকি দিয়ে তাকায়। কিন্তু ভিতরে কিছুই দেখা গেল না। বাদক ভিতরে ঢুকে পড়ে। গভীরভাবে দেখার চেষ্টা করে। তার মনে সন্দেহ জাগে।

এবার দেয়াশলাই জ্বালিয়ে দেখে। যোহরা নেই! অপর মেয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। বাদক তাকে জাগাল না। তার জানা আছে, যোহরা কোথায় গিয়ে থাকতে পারে। চৌকির কমান্ডার ছাড়া আর কোথায় যাবে সে! এখন সমস্যা এই হতে পারে যে, কমান্ডার যোহরার সঙ্গে এদিকে আসবে আর তার প্রহরীদের না পেয়ে অনুসন্ধান করবে। এমনও হতে পারে, তিনি নদীর কূলে সেই জায়গাটায় পৌঁছে যাবেন, যাকে আজ রাত বাইরের জগত থেকে লুকিয়ে রাখা আবশ্যক।

বাদক তার দু'জন সঙ্গীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জানায়, আমাদের একটি মেয়ে উধাও হয়ে গেছে। সম্ভবত সে চৌকিতে গিয়ে থাকবে। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, নদী থেকে দূরে কোথাও ওঁত পাততে হবে এবং কমান্ডার যদি মেয়েটির সঙ্গে এদিকে আসে, তাহলে উভয়কে ধরে আমাদের কমান্ডারের হাতে তুলে দিতে হবে। প্রয়োজনে দু'জনকে হত্যা করে লাশ দু'টো নদীতে ফেলে দেয়া হবে।

এই পার্বত্য এলাকার ভিতরের জগত জেগে আছে। বিশাল-বিস্তৃত এই এলাকা সম্পর্কে বাইরের মানুষ সম্পূর্ণ অনবহিত। প্রথমত, ভূখন্ডটা লোকালয় থেকে বহুদূরে এবং আশ-পাশ দিয়ে মানুষ চলাচলের কোন রাস্তা নেই। আরো একটি কারণ হল, জনমনে প্রসিদ্ধ আছে, পাহাড়গুলোর মধ্যে প্রেতাত্মারা লড়াই করে বেড়ায় এবং কোন মানুষ যদি তার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, তাহলে তার শরীরের গোস্ত উধাও হয়ে কংকালটা শুধু অবশিষ্ট থাকে। আরো কথিত আছে, এই পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে পাহাড় কেটে কেটে ফেরাউনদের বিরাট বিরাট প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হয়েছে এবং পাহাড়গুলোকে ভিতর থেকে ফোকলা করে প্রাসাদোপম ভবন তৈরী করা হয়েছে।

আজ রাতে পাতাল প্রাসাদগুলো আলোয় জ্বলমল করছে। চারদিক পাহাড়-বেষ্টিত একটি ময়দান। হাজার হাজার সুদানী হাবশী সমবেত আজ। তাদেরকে উঁচু শব্দে কথা বলতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আজ তাদেরকে তাদের খোদাকে দেখানো হবে।

হাবশীরা ভয়ে প্রকম্পিত ও আবেগে আপ্লুত। ভয়ে তারা পরস্পর কানাঘুষাও করছে না। এই পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে তারা সম্যক অবহিত। তারা জানে, এই মুহূর্তে তারা যে পাহাড়টির প্রতি মুখ করে বসে আছে, তার মধ্যভাগে উঁচুতে বিশাল এক মূর্তি বিদ্যমান। এটি আবু সম্বল মূর্তি। এই মূর্তি সম্পর্কে-ই হাবশীদের জানানো হয়েছিল, এটি তাদের খোদার প্রতিকৃতি এবং কোন এক

রাতে তাদের এই খোদা মানুষের রূপে তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবেন।

সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে সারা মাঠে। হঠাৎ বিকট একটা শব্দ শোনা গেল, যেন বজ্রপাত হয়েছে। হাবশীরা পূর্ব থেকেই নীরব। এই গর্জন তাদের নিঃশ্বাসও বন্ধ করে দেয়। তার পরক্ষণেই একটি শব্দ ভেসে আসে– 'খোদা জাগ্রত হচ্ছেন। তোমরা সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও– উপর দিকে দৃষ্টিপাত কর।' বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত পর্বতমালার অভ্যন্তরে শব্দটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে কানে বাজতে থাকে। আকাশে দু'টি আগুনের গোলা উড়তে দেখা যায়। শূন্যে কয়েকটা চক্কর কেটে গোলা দু'টো সম্মুখের পাহাড়ের দিকে ছুটে যায় এবং পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। গোলা দু'টো পাহাড়ের যে অংশের সঙ্গে ধাক্কা খায়, সেখান থেকে একটি অগ্নিশিখা তৈরী হয়ে যায়। আবু সম্বল মূর্তিটির অবস্থান শিলাটির পিছনে এবং কিছু উপরে। শিখার কম্পমান আলো মূর্তিটির ভয়ানক চেহারায় নিপতিত হলে দেখা যাচ্ছে, যেন মূর্তিটি দু'চোখের পাতা ও মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে। এমনও মনে হচ্ছে, যেন তার চেহারাটা ডানে-বাঁয়ে দুলছে।

সমবেত হাবশী জনতা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তাদের পুরোহিতগণ সেজদা থেকে মাথা তোলেন। তারা হাত উপরে তুলে বাহু প্রসারিত করে প্রার্থনা করতে শুরু করেন। প্রধান পুরোহিত উচ্চশব্দে বলে উঠেন'– আগুন ও পানির খোদা! আগুন দ্বারা কাঠ ভস্মকারী ও নদী-সমুদ্রকে পানি দানকারী খোদা! আমরা তোমাকে দেখে ফেলেছি। বল, আমরা তোমার পায়ে ক'টি মানুষ অর্পণ করব? বল, পুরুষ চাই না নারী?

'একটি পুরুষ একটি নারী'– পর্বতমালার অভ্যন্তর থেকে আওয়াজ আসে– 'তোমরা এখনো আমাকে দেখনি। আমি মানুষের রূপে তোমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করব। তোমরা যদি আমার দুশমনের রক্ত না ঝরাও, তাহলে তোমাদের প্রত্যেককে আমি এই পর্বতমালার পাথরের ন্যায় পাথরে পরিণত করে দেব। তারপর চিরদিন তোমরা রোদে পুড়তে থাকবে। তোমাদের কেউ যদি যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর, উত্তপ্ত মরুভূমির বালি তাকে চুষে খেয়ে ফেলবে। তোমরা অপেক্ষা কর– আমার অপেক্ষা করতে থাক।'

নীরবতা আরো গভীর হয়ে যায়। শিখাটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করে। পাহাড়ের ভিতর থেকে হাবশীদের ধর্মীয় সঙ্গীতের সুর ভেসে আসতে শুরু করে। এটা তাদের সেই সঙ্গীত, যাকে তারা ধর্মীয় উৎসবগুলোতে উপাসনার সময় গেয়ে থাকে। এখন সঙ্গীতটি গাওয়া হচ্ছে সম্মিলিত কণ্ঠে।

সঙ্গে বাজছে সারেন্দা। মাঠে উপবিষ্ট হাজার হাজার হাবশী জনতা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। সবাই নিশ্চিত, সঙ্গীতটা তাদের মধ্য থেকে কেউ গাইছে না। সুরটা অদৃশ্য থেকে আসছে।

❁ ❁ ❁

যোহরা চৌকির কমান্ডারের নিকট বসে আছে। আগের চেয়ে বেশী আবেগ ঝরছে তার কথা থেকে। সে কমান্ডারকে বলল– 'তোমার সঙ্গে যদি আমার সাক্ষাৎ না ঘটত, তাহলে আমি অবশিষ্ট জীবনও নাচ-গানে অতিবাহিত করতাম। তোমাকে দেখার পর আমার মনে পড়ে যায়, আমি কারো কন্যা-নর্তকী বা বেশ্যা নই। এখন হয়ত তুমি আমাকে মেরে ফেল; না হয় আশ্রয় দাও– না হয় আমাকে আমার ঘরে পৌঁছিয়ে দাও। আজ তুমি আমাকে ফেরত যেতে দিও না।'

'আজ তুমি চলে যাও'– কমান্ডার জবাব দেন– 'আমি তোমাকে আমার চৌকিতে রাখতে পারি না। ওয়াদা করছি, আমি তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব। আর এখান থেকে যদি তুমি চলেও যাও, তো কায়রোতে কোথায় উঠবে, ঠিকানা দিয়ে যাও, আমি সেখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাব।'

কিছুক্ষণ পর কমান্ডার দু'টি ঘোড়া প্রস্তুত করেন এবং যোহরাকে বললেন, চল রওনা হই। দু'জন ঘোড়ায় চড়ে রওনা হন। পথে যোহরা কমান্ডারকে বলল– 'আচ্ছা, রাতের বেলা এখানে নৌকা আসে কেন– অনেক নৌকা?'

'নৌকা?'– কমান্ডার বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'কোন্ দিক থেকে আসে?'

'ওদিক থেকে'– সুদানের প্রতি ইংগিত করে যোহরা বলল– 'ক'দিন যাবত রাতে আমার তেমন ঘুম হয় না। মধ্যরাতে উঠে তাঁবুর বাইরে বসে থাকি। আমি ঘটনাটা দু'রাত দেখছি। এক রাতে তিনটি ও এক রাতে দু'টি নৌকা এসে কূলে ভিড়েছে। নৌকাগুলোর সাদা পাল অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায়। এখান থেকে একটু সামনের জায়গাটায় তীরে ভিড়েছে। আমি কান খাড়া করে বিষয়টা বুঝবার চেষ্টা করি। মনে হল, নৌকাগুলো থেকে অনেক মানুষ নামছে। তারপর গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢুকে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা, তুমি কি আমাদের দু'জন সৈনিককে কখনো দেখেছ?'– কমান্ডার জিজ্ঞেস করেন– 'তারা ঘোড়ায় চড়ে ডিউটিতে আসে। তদের তো নদীর তীরে থাকার কথা।'

না'– যোহরা জবাব দেয়– 'কখনো তো আমি কোন সৈনিক দেখিনি! তবে দিনের বেলা দেখেছি দু'জন সৈনিক আসে। সম্মুখে একটি কাফেলা অবস্থান করছে। তারা তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব করে সময় কাটায়। একদিন তাদের একজনকে কাফেলার একটি মেয়ের সঙ্গে টিলার আড়ালে বসে প্রেম-নিবেদন করতে দেখেছি।'

যোহরা জানে না। মিসরের এই সীমান্ত এলাকায় কী হচ্ছে এবং কী হতে পারে। সীমান্তে নিয়োজিত সৈনিকেদের দায়িত্ব-ই বা কী, তা-ও তার অজানা। রাতে কিংবা দিনে সুদানের দিক থেকে কোন নৌকা এদিকে আসার তাৎপর্য কী, তাও জানেনা যোহরা। যা বলেছে, সবই তার সহজ-সরল কথা। কিন্তু কমান্ডারের জন্য এটি বিরাট এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যোহরা যা বলেছে, তা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে কমান্ডারকে সে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে। কমান্ডার এই দীর্ঘ ডিউটি এবং সীমান্ত এলাকার পরিবেশে বিরক্ত বটে; কিন্তু যোহরার বক্তব্য তাকে সজাগ করে তুলেছে। তিনি যোহরাকে বললেন– 'আস, আজ নদীর কূলে কূলে হাঁটব।' তিনি ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দেন।

কমান্ডার যোহরাকে নিয়ে নদীর কূলে পৌঁছে যান। তারা কূল ধরে হাঁটতে শুরু করেন। নদীর পানিতে সাঁতার কাটছে কমান্ডারের দৃষ্টি। কিছুক্ষণ পর মাঝ নদীতে দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে আলো চোখে পড়ে কমান্ডারের। তারপর আরো একটি আলো। কিন্তু পরক্ষণই আলোটা নিভে যায়। এ সময়ে এ এলাকায় যে সান্ত্রীদের ডিউটি করার কথা, কমান্ডার তাদেরকে হাঁক দেন। কিন্তু কোন জবাব এল না। তিনি কণ্ঠ উঁচু করে আবারো ডাক দেন। এবারো কোন জবাব নেই। তিনি আরো উচ্চকণ্ঠে ডাক দেন। তিনি নদীতে দু'টি নৌকার পাল দেখতে পান। তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। কমান্ডার যোহরার উপস্থিতি ভুলে যান এবং ঘোড়ায় চড়ে নদীর কূলে কূলে সামনের দিকে এগিয়ে যান। যোহরাও তার পিছনে পিছনে অগ্রসর হয়। সান্ত্রীদের ডেকে চলছেন কমান্ডার।

সান্ত্রীরা কমান্ডারের ডাক-চীৎকার শুনতে পাচ্ছে। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'জন দু'টি টিলার আড়ালে 'বৃদ্ধ স্বামীদের যুবতী স্ত্রীদের' জালে আটকে আছে। তারা তাদের কমান্ডারদের কণ্ঠস্বর চিনে ফেলে এবং সেখান থেকে উঠে দাঁড়ায়। তারা যেখানে ঘোড়া বেঁধে রেখে গিয়েছিল, সেখানে ফিরে আসে। কিন্তু ঘোড়া উধাও। তারা ওখানেই অবাক্ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দূরে একস্থানে দু'টি ঘোড়া দৌড়াচ্ছে দেখতে পায় তারা।

কমান্ডার সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। যোহরার ঘোড়া তার পাশাপাশি

দৌড়াচ্ছে। হঠাৎ তারা শুনতে পায়– 'তোমরা যাদেরকে ডাকছ, তারা অনেক দূরে– সম্মুখে।'

'তোমরা কারা?'– কমান্ডার জিজ্ঞেস করেন– 'এদিকে এস।'

'আমরা পথিক'– তারা জবাব দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দু'টি ঘোড়া কমান্ডারের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। পরক্ষণেই আরো একটি আওয়াজ আসে– 'আপনারা সামনের দিকে অগ্রসর হোন; আমরা আপনাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

কমান্ডার তরবারী হাতে নেন। রাতের বেলা মুসাফিরদের ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া এবং এই এলাকায় অবস্থান করা সন্দেহজনক। তারা কমান্ডারের নিকটে চলে আসে। একজন কমান্ডারকে বলল– 'ওদিকে দেখুন, ওরা আসছে।' কমান্ডার যেই মাত্র ওদিকে তাকালেন, সঙ্গে সঙ্গে লোকটি এক হাতে কমান্ডারের ঘাড়টা ঝাঁপটে ধরে এবং অপর হাতে তার তরবারীধারী হাতের কনুই ধরে ফেলে। অপর ব্যক্তি মেয়েটিকে ঝাপটে ধরে। কমান্ডারকে পাকড়াওকারী লোকটি তার ঘোড়া হাঁকায়। ফলে কমান্ডার ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমন সময়ে অন্ধকার ভেদ করে আরো দু'জন লোক দৌড়ে আসে। তারা কমান্ডারকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বে নিয়ে নেয়।

লোকগুলো বাদকদল, যারা মূলত প্রশিক্ষিত গেরিলা সৈনিক। যোহ্‌রা তাঁবু থেকে বের হলে তাদের-ই দু'-তিনজন লোক তার পিছু নিয়েছিল। তারা পরিকল্পনা মাফিকই কমান্ডার ও যোহ্‌রাকে ধরে ফেলেছে। তাদের একজন বলল– 'এদেরকে জীবিত নিয়ে চল।' এরূপ সন্দেহভাজন লোক ধরা পড়লে জীবিত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

তারা কমান্ডার ও যোহ্‌রাকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে রওনা হয়। কমান্ডার দেখতে পান, সমুদ্রতীরে বেশ ক'টি নৌকা থেকে হাবশীরা নামছে এবং কি যেন মাল-পত্র খালাস করছে। লোকগুলো সুদানী হাবশী যোদ্ধা এবং মাল-পত্রগুলো তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ।

পাহাড়ের অভ্যন্তরে হাজার হাজার হাবশী এখনো নিশ্চুপ বসে আছে। পাহাড়ের গায়ে প্রজ্বলিত শিখাটি নিভে গেছে অনেক আগে। হাবশীদের ধর্মীয় সঙ্গীতের সুর মুর্ছনা শোনা যাচ্ছে। তারা ধীরে ধীরে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ছে। তারা নিজেদেরকে সেই হাবশীদের তুলনায় মর্যাদাসম্পন্ন ভাবতে শুরু করেছে, যারা সুদানে পড়ে রয়েছে।

সঙ্গীতের সুর থেমে গেছে। হঠাৎ সম্মুখের পাহাড়টির গায়ে আলোর ঝিলিক চমকে ওঠে, যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবার আলো চমকায়। আলোটা আবু সম্বল মূর্তিটির গায়ে গিয়ে পড়ছে। আলোটা কোথা থেকে আসছে, বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, যেন মূর্তিটির চেহারা নিজ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

আলো নিভে গেছে। কিছুক্ষণ পর আবার আলো জ্বলে উঠে। সবাই দেখছে, পাহাড়সম মূর্তিটির কোল থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে এসে সামনের দিকে হাঁটছে। মূর্তিটির পিছন থেকে আত্মপ্রকাশ করে চারজন মানুষ। প্রত্যেকের গায়ে মাত্র একটি করে সাদা চাদর। সেই চাদরে তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত। মূর্তির কোল থেকে বেরিয়ে আসা লোকটিকে রাজার মত দেখাচ্ছে। তার মাথায় রাজমুকুট। মুকুটের উপর একটি কৃত্রিম সাপের ফনার ছায়া। গায়ের চোগাটা লাল। অজ্ঞাত স্থান থেকে আসা আলোকরশ্মিটি তার উপর পতিত হয়ে চলছে। চোগার গায়ে অসংখ্য তারকা। আলোর চমকে সেগুলো চমকাচ্ছে ও মিটমিট করে জ্বলছে। লোকটার এক হাতে বর্শা, অপর হাতে নাঙ্গা তরবারী। সাদা চাদর পরিহিত লোকগুলো তার পিছনে পিছনে হাঁটছে।

তারা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নীচের দিকে নেমে আসছে এবং আলোটাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছে। এবার সম্মুখের লোকটি দাঁড়িয়ে যায়। পিছনের লোকগুলো সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠে– 'আমাদের খোদা ধরায় নেমে এসেছেন। তোমরা সেজদায় লুটিয়ে পড়। তারপর মাথা তুলে তোমাদের খোদাকে মন ভরে দেখ।'

সব মানুষ সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর মাথা তুলে খোদাকে দেখে। খোদা একটি তরবারী উচ্চে তুলে ধরে রেখেছেন। তিনি ঢালু বেয়ে নীচে নামছেন। ময়দানে এমন নীরবতা বিরাজ করছে, যেন একজন মানুষও নেই। লোকটি নামতে নামতে জনতার ভীড়ের সন্নিকটে একটি উঁচুস্থানে এসে দাঁড়ায়। জায়গাটা প্রশস্ত। আলোটা শুধু তার এবং তার লোকদের উপর-ই পড়ছে। হঠাৎ চারটি মেয়ে সেই আলোর ভিতরে ঢুকে পড়ে। মেয়েগুলো আধা উলঙ্গ। গায়ের রং গৌর। পিঠের উপর কাঁধ থেকে সামান্য নীচে পাখির পালকের ন্যায় পালক। মাথার চুল খোলা। তারা এমনভাবে নড়াচড়া করছে, যেন তারা উড়ছে। তারা নাচের ভঙ্গিমায় হাবশীদের 'খোদা'র চার পার্শে কিছুক্ষণ চক্কর কেটে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

চার ব্যক্তি কমান্ডার ও যোহরাকে একটি গুহায় নিয়ে যায়। তাদেরকে গুহার

একটি কক্ষে রেখে একজন বাইরে বেরিয়ে যায়। লোকটি আরো এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে ফিরে আসে। তাকে জানানো হল, এই লোকটিকে নদীর কূল থেকে এমন এক সময় ধরে আনা হয়েছে, যখন সুদান থেকে আগত নৌকা থেকে মালামাল খালাস করা হচ্ছিল এবং নতুন আগত হাবশীরা অবতরণ করছিল। লোকটি কমান্ডার ও যোহরার প্রতি তাকায়। তার ঠোঁটে মুচকি হাসি। পরক্ষণেই এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে সে বাইরে বেরিয়ে আসে।

'তোমরা এদেরকে বড় উপযুক্ত সময় ধরে এনেছ'– লোকটি বলল– 'হতভাগ্য হাবশীরা মানুষ বলির দাবি করছে। আল-কিন্দ-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী খোদার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, একজন পুরুষ ও একজন নারী বলি দিতে হবে। আমাদের কোথাও না কোথাও থেকে এক পুরুষ ও এক নারীকে অপহরণ করে এনে তাদের হাতে তুলে দিতে হত। তোমরা আমাদের বিরাট এক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছ। আমাদেরকে চিন্তামুক্ত করেছ। মনে হচ্ছে, আমরা সফল হব। আমাদের প্রতিটি কাজই পূর্ণ সফলতার সঙ্গে আঞ্জাম হয়ে যাচ্ছে। বলির জন্যও দু'জন মানুষ আপনা-আপনি-ই এসে গেল।'

'হাবশীরা তাদের খোদাকে দেখেছে কি?'– একজন জিজ্ঞেস করল।

'তুমি যদি উপস্থিত থাকতে, তাহলে দেখতে আমরা কিরূপ বিচক্ষণতার সাথে তাদেরকে 'খোদা' দেখিয়েছি'– লোকটি জবাব দেয়– 'মূর্তির সম্মুখের পাহাড় থেকে প্রজ্বলমান সলিতাওয়ালা দু'টি তীর নিক্ষেপ করা হয়। তীরান্দাজরা অন্ধকারের মধ্যে এমন নিশানা করে যে, তীর গিয়ে ঠিক জায়গায় বিদ্ধ হয়। আমরা বেশ কিছু জায়গা জুড়ে জ্বালানী ছড়িয়ে রেখেছিলাম। শুরুতেই দু'টি তীর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এন্দ্রোসন একজন অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি বলেছিলেন, আগুনের শিখায় মূর্তিটি হাসছে ও দুলছে দেখা যাবে। আমাদেরই নিকট তো মনে হচ্ছিল, যেন মূর্তিটি মুখ ও ঠোঁট নাড়াচাড়া করছে। বরং মুখটাও ডানে-বাঁয়ে নাড়াচ্ছে।'

'তখন হাবশীরা কী প্রতিক্রিয়া দেখাল?'

'তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়েছিল'– লোকটি জবাব দেয়– 'অভ্যন্তরে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার গুঞ্জন চলতে থাকে। আমি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাইনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হাবশীরা ভয়ে কেঁপে থাকবে। আল-কিন্দ-এর নাটক সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছে। আলো নিভে গেলে আমরা আল-কিন্দকে পোশাক পরিয়ে মূর্তিটির কোলে বসিয়ে দেই। চারজন লোক পূর্ব থেকেই সেখানে একস্থানে লুকিয়ে বসেছিল। সম্মুখের পাহাড় থেকে মূর্তির

গায়ে আলো বিচ্ছুরণের ধারাও বেশ সফল হয়। পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের গায়ে যে আগুন জ্বালানো হয়, তা নীচ থেকে কেউ দেখেনি। তার সন্নিকটে বড় একটি আয়না রেখে মূর্তির উপর আলোর প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করা হলে মনে হল, যেন এটি মূর্তির চেহারার নূর। তারই মধ্য থেকে যখন আল-কিন্দ 'খোদা' সেজে নেমে আসেন, তখন আমাদের মেয়েরা সবাইকে নিশ্চিত করে যে, ইনিই খোদা এবং তারা পরী। আমরা এ যাবত কোন পদক্ষেপে ব্যর্থ হয়নি। এখন আল-কিন্দকে এক স্থানে বসিয়ে রেখে সকল হাবশীকে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা হবে এবং বলা হবে ইনি-ই তোমাদের খোদা, যিনি যুদ্ধে তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

'আচ্ছা, এ দু'জনকে (কমান্ডার ও যোহরার প্রতি ইংগিত করে) কি আজই বলি দেয়া হবে?

সে সিদ্ধান্ত নেবে হাবশীরা। সম্ভবত তারা তাদেরকে তিন-চারদিন লালন-পালন করবে এবং কিছু রীতি-নীতি পালন করবে।'

তারা কারো কণ্ঠস্বর শুনতে পায়– 'সেনাপতিকে এমন একটা নাটক সাজাতে হবে, আমার জানা ছিল না।' অপর একজন বলল– 'এছাড়া হাবশীদের দ্বারা যুদ্ধ করানো সম্ভবও ছিল না। এই নাটক বেশ কাজ দিচ্ছে।'

কণ্ঠস্বরটা আল-কিন্দ ও তার সহযোগী লোকদের। তারা নিকটে এগিয়ে এলে ব্যক্তিদ্বয় বলল, একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে ঘটনাক্রমে আমাদের হাতে এসে গেছে। তাদেরকেই হাবশীদের হাতে তুলে দেয়া যায়। আল-কিন্দ তারা কারা জিজ্ঞেস না করেই মাথা থেকে মুকুটটা সরিয়ে ফেলে কমান্ডার ও যোহরাকে যে কক্ষে রাখা হয়েছে, সে কক্ষে ঢুকে পড়েন। সে কমান্ডারকে চিনতে না পারলেও কমান্ডার তাকে চিনে ফেলেন। বাইরে কী কথা-বার্তা হয়েছিল, কমান্ডার সেসব শুনে ফেলেছেন। তিনি একাধিকবার আল-কিন্দ-এর নামও শুনেছেন। তিনি এও জেনে ফেলেছেন যে, তাকে ও যোহরাকে বলি দেয়া হবে। কাজেই আল-কিন্দ কক্ষে প্রবেশ করার পর তিনি মোটেই বিস্মিত হননি যে, তার সালার এখানে কেন এবং কিভাবে এলেন।

আল-কিন্দ এই বলে বাইরে বেরিয়ে যায় যে, এদেরকে হাবশীদের পুরোহিতদের হাতে তুলে দাও।

❁ ❁ ❁

তিন-চারদিন পর। কায়রোতে আল-আদেল আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে বললেন– 'তিন-চার দিন হল, আল-কিন্দকে পাওয়া যাচ্ছে না। যখন-ই তলব

করি, জবাব আসে, তিনি নেই। তার ঘর থেকেও একই জবাব আসছে। লোকটা কোথায় গিয়ে থাকতে পারে?'

'সীমান্ত বাহিনীর পরিদর্শনে যদি সীমান্ত সফরে গিয়ে থাকে, তাহলে তো আপনাকে জানিয়ে যেত। আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এ মুহূর্তে আমার যা ধারণা, তাহল, তাকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ কিংবা খুন করে থাকতে পারে।'

'এও তো হতে পারে যে, সে নাশকতাকারী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।' আল-আদেল বললেন।

'তার ব্যাপারে এমন সন্দেহ তো অতীতে কখনো জাগেনি'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আচ্ছা, আমি তার ঘরে গিয়ে খবর নিচ্ছি।

আলী বিন সুফিয়ান আল-কিন্দ-এর ঘরে চলে যান। বারজন দেহরক্ষী উপস্থিত। রক্ষী কমান্ডারকে জিজ্ঞাসা করেন, আল-কিন্দ কোথায়? কমান্ডার অজ্ঞতা প্রকাশ করে। একজন দেহরক্ষীও বলতে পারে না, আল-কিন্দ কোথায় গেছে। পরিচারিকাকে বাইরে ডেকে এনে বললেন, আল-কিন্দ-এর স্ত্রীদেরকে জিজ্ঞেস কর, সে কোথায় গেছে। পরিচারিকা আলী বিন সুফিয়ানকে ভিতরে নিয়ে একটি কক্ষে বসতে দেয়। বৃদ্ধা মহিলা বলল, আপনি ঘর থেকে আল-কিন্দ-এর সন্ধান পাবেন না। আমি আজ বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এখানে যা কিছু দেখছি, তা আপনাকে বলে দিচ্ছি। আমার জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার। তবে আমি মরে গেলেও তেমন কিছু আসবে যাবে না। আমি বিধবা। স্বামী মারা গেছেন বহু আগে। আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল। সুদানের লড়াইয়ে সে শাহাদাতবরণ করেছে। নিরূপায় হয়ে আমি এখানে চাকুরী নিয়েছিলাম। এরা আমাকে গরীব এবং সহজ-সরল মহিলা মনে করে। তাদের জানা ছিল না, একজন শহীদের মা দেশ ও ধর্মবিরোধী কোন তৎপরতা সহ্য করতে পারে না, যার জন্য তার পুত্র জীবন দিয়েছে। এ ঘরে দীর্ঘদিন যাবত সন্দেহভাজন লোকদের আনাগোনা চলছিল। এক রাতে এক ব্যক্তি আসল। লোকটা আরবী পোশাক পরিহিত। মুখে দাড়ি। আমাকে ডেকে বলা হল, মদের ব্যবস্থা কর। লোকটা ভিতরে প্রবেশ করে মুখের কৃত্রিম দাড়ি ও গোঁফ খুলে ফেলে। তার আগে থেকেই-ই এখানে এমন সব লোকদের আসা-যাওয়া চলছিল, যাদের প্রতি আমার সন্দেহ ছিল যে, এদের উদ্দেশ্য ভাল নয়। আমার কানে আমি অর্ধেক মিশর সুদানের–মিশরের রাষ্ট্রক্ষমতা– এক রাতেই কাজ হয়ে যাবে– ইত্যাদি বাক্যও শুনেছি। সালার আল-কিন্দ রাতে বের হতেন। তার সঙ্গে দু'জন অপরিচিত লোক থাকত। আমি সালারকে রক্ষী কমান্ডারের

সঙ্গেও কানে কানে কথা বলতে দেখেছি।

বৃদ্ধা পরিচারিকা আরো কিছু কথা বলে আলী বিন সুফিয়ানকে স্বপ্রমাণিত করে দেয়, সালার আল-কিন্দ না অপহরণ হয়েছে, না খুন, না সে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে কোথায় গিয়েছে। মিশরে নাশকতা ও গাদ্দারী এতই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেড়ে চলছে যে, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও সন্দেহ না করে পারা যাচ্ছিল না। কিন্তু তথাপি আল-কিন্দ-এর উপর কখনো কারো সন্দেহের চোখ পড়েনি। লোকটা তার সন্দেহজনক সকল অপতৎপরতা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে আলী বিন সুফিয়ানও অতিশয় দূরদর্শী গোয়েন্দা। এক্ষেত্রে তার জন্য সমস্যা হচ্ছে, সালার পদমর্যাদার ব্যক্তির ঘরে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া তল্লাশী নেয়া যায় না। এ কাজের জন্য মিশরের অস্থায়ী সুপ্রীম কমান্ডার আল-আদেল-এর অনুমতি আবশ্যক। তাই তিনি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে নিজের একজন রক্ষীসেনাকে প্রেরণ করে তিন-চারজন গোয়েন্দা ডেকে আনেন এবং তাদেরকে আল-কিন্দ-এর ঘরে এদিক-ওদিক লুকিয়ে রাখেন। তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন, কোন পুরুষ কিংবা নারী ঘর থেকে বের হলে তার পিছু নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে।

আল-কিন্দ-এর ঘর থেকে বের হয়ে আলী বিন সুফিয়ান রক্ষী কমান্ডারকে নির্দেশ দেন, তোমার নিজের এবং অধীন সকল রক্ষীসেনার অস্ত্র ভিতরে রেখে দাও এবং সবাই আমার সঙ্গে চল। বার সদস্যের রক্ষী বাহিনীটিকে নিরস্ত্র করে আলী বিন সুফিয়ান সঙ্গে করে নিয়ে যান এবং আল-আদেলকে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করেন। আল-আদেল তাঁকে আল-কিন্দ-এর ঘরে হানা দিয়ে তল্লাশী নেয়ার অনুমতি দিয়ে দেন। আলী বিন সুফিয়ান সময় নষ্ট না করে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

ওদিকে ইতিমধ্যে আল-কিন্দ-এর ঘরে ঘটে গেছে আরেক ঘটনা। আলী বিন সুফিয়ান যখন সেখান থেকে বের হয়ে আসেন, তখন আল-কিন্দ-এর এক স্ত্রী- যে বয়সে যুবতী– পরিচারিকাকে নিজ কক্ষে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, আলী বিন সুফিয়ান তোমাকে কী বললেন এবং তুমি কী জবাব দিলে? উত্তরে বৃদ্ধা বলল, তিনি আমাকে সালার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং আমি বলেছি, আমি গরীব মানুষ, এই ঘরের একজন চাকরানী। তিনি কোথায় গেছেন, আমি তা জানিনা।

'তোমার অনেক কিছু জানা আছে'– স্ত্রী বলল– 'তাকে তুমি অনেক তথ্য বলে দিয়েছ।'

বৃদ্ধা তার বক্তব্যে অটল থাকে। স্ত্রী এক চাকরকে ডেকে তাকে সব ঘটনা শুনিয়ে বলল– 'এই বৃদ্ধার মুখ থেকে কথা বের কর। বলছে, ও নাকি কিছুই বলেনি।'

চাকর বৃদ্ধার মাথার চুল মুঠি করে ধরে এমন ঝটকা টান মারে যে, বৃদ্ধা চক্কর খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। চাকর তার ধমনিতে পা রেখে চাপ দেয়। বৃদ্ধার চোখ দু'টো বাইরে বেরিয়ে আসে। চাকর দাঁতে দাঁত পিষে বলল, বল্, ওকে কী কী বলেছিস? সে পা সরিয়ে নেয়।

বৃদ্ধা নিথর-নিস্তব্ধ পড়ে আছে। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। চাকর তার পাজরে লাথি মারে। বৃদ্ধা ছটফট করতে শুরু করে। চাকরের নির্যাতনে বৃদ্ধা আধ-মরা হয়ে পড়ে থাকে। এবার সে বলল– 'আমাকে জীবনে মেরে ফেল। আমি আমার শহীদ পুত্রের আত্মার সঙ্গে গাদ্দারী করতে পারব না। তুমি একজন ঈমান-বিক্রেতার অসৎ স্ত্রী। আমি তোমাকে পরোয়া করি না।'

'একে পাতাল কক্ষে নিয়ে শেষ করে দাও'– স্ত্রী বলল– 'রাত হলে লাশ গুম করে ফেলবে। আমরা এখনো বিপদমুক্ত নই। লোকটা আমাদের রক্ষী সেনাদেরকে নিরস্ত্র করে সঙ্গে নিয়ে গেছে। এই হতভাগা বৃদ্ধার অনেক তথ্য জানা আছে। একে তথ্যসহ মাটিতে পুতে ফেল।

বৃদ্ধা মেঝেতে পড়ে আছে। অবস্থা তার মৃতপ্রায়। চাকর তাকে গাট্টির মত করে কাঁধে তুলে নেয়। কক্ষ থেকে বের হয়ে বারান্দা অভিমুখে পা বাড়ায়। এমন সময় আওয়াজ আসে– 'থাম'। লোকটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। অনেক সৈন্য ধেয়ে আসছে। ঘর তাদের অবরুদ্ধ। আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশে তারা মহলের সমস্ত কক্ষ ও বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ে। চাকর পালাতে ব্যর্থ হয়। তার কাঁধ থেকে বৃদ্ধাকে নামানো হল। বৃদ্ধার মুখ থেকে রক্ত বের হচ্ছে। সে চোখ খুলে তাকায়। সম্মুখে আলী বিন সুবিয়ানকে দেখামাত্র তার চেহারায় হাসি ফুটে ওঠে। সে বলল– 'ইতিপূর্বে আমার ঠিক জানা ছিল না, এই ঘরে কী হচ্ছে। তুমি আসার পর আমার সন্দেহ পোক্ত হয়ে যায় যে, সমস্যা একটা আছে।'

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে। সে বড় কষ্টে বলল যে, আল-কিন্দ-এর নতুন বেগম এবং তার এই চাকর আমার মুখ থেকে বের করবার চেষ্টা করেছে যে, আমি তোমাকে কী বলেছি। ওরা আমাকে পিটিয়ে শেষ করে ফেলেছে।

আলী বিন সুফিয়ান এক সিপাহীকে বললেন– 'একে এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।' বৃদ্ধা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল– 'আমাকে কোথাও পাঠিও না।

আমি আমার শহীদ পুত্রের নিকট চলে যাচ্ছি। তোমরা আমাকে বাঁধা দিও না।'

বৃদ্ধা চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে যায়।

আল-কিন্দ-এর বাসগৃহের প্রতিটি কোণ তল্লাশী নেয়া হল। পাতাল কক্ষে গিয়ে থ খেয়ে যান গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান। যেন এক অস্ত্রগুদাম। ঘর থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ সোনা ও নগদ অর্থ। পাওয়া গেল আল-কিন্দ-এর নামাংকিত একটি সীল, যাতে আল-কিন্দকে ভূষিত করা হয়েছে 'সুলতানে মেসের' অভিধায়। বিজয়ের ব্যাপারে আল-কিন্দ এতই নিশ্চিত যে, মিশরের সুলতান হিসেবে নিজ নামে সীল-মোহরও তৈরী করে রেখেছেন! এই সীল-মোহর আলী বিন সুফিয়ানের সব সন্দেহকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করে দেয়।

আল-কিন্দ-এর ঘরে দু'জন স্ত্রী ছিল। ছিল মদ-মাদকতার বিপুল আয়োজন। আল-কিন্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল, তিনি মদপান করেন না। এখন প্রমাণ পাওয়া গেল, রাতে ঘরে বসে তিনি মদপান করতেন। আলী বিন সুফিয়ান স্ত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মূল তথ্য হাসিল করেন। নতুন যে যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধা পরিচারিকাকে চাকর দ্বারা খুন করিয়েছে, তার জবানবন্দী ছিল সবচে' গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সব স্ত্রীর একই কথা, আপনার যত তথ্যের প্রয়োজন, সব নতুন বেগমের বুকে লুক্কায়িত। তথ্য পাওয়া গেল, এই নতুন স্ত্রী মিশরী নয়– সুদানী এবং বাহির থেকে অপরিচিত লোকজন আসলে শুধু এ মেয়েটি-ই তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলত, খোলামেলা চলত এবং মদপান করত। অন্যান্য স্ত্রীদের সরল-সহজ কথায় বুঝা গেল, তারা আর কিছু জানে না।

আল-কিন্দ-এর স্ত্রীকে আলাদা করে ফেলা হল। আলী বিন সুফিয়ান বৃদ্ধা চাকরানীর খুনী চাকরকে বললেন– 'এখন আর কিছু লুকাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। যা জানা আছে, বলে ফেল। আমাকেও কষ্ট দিও না, নিজেও কষ্ট পেও না।'

চাকর জানে, লুকোচুরি করতে গেলে পরিণতিটা কী হবে। বলল, হুজুর! আমি একজন চাকর মাত্র। আমি হুকুমের গোলাম। দু'পয়সা পাওয়ার আশায় মনিবের সব নির্দেশ মেনে চলতাম। এখন আমি আপনার অনুগত। কিছু লুকাব না; যা জানি সবই বলে দেব। শুনুন–

দেশের একজন সেনা অধিনায়কের গোপন পরিকল্পনা এক গৃহভৃত্যের জানা থাকার কথা নয়। তবু চাকর বলল, আল-কিন্দ যাওয়ার সময় বলে গেছেন, আমার আসতে অনেকদিন বিলম্ব হবে এবং কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, তিনি

কোথায় গেছেন, আমরা জানিনা। ভৃত্য আসলেই জানত না, আল-কিন্দ কোথায় গেছেন।

আলী বিন সুফিয়ান আল-কিন্দ-এর নতুন স্ত্রীকে দু'জন লোকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পাতাল কক্ষে পাঠিয়ে দেন। নিজে আরো কিছু তত্ত্ব-তালাশ নিয়ে এবং আল-কিন্দ-এর ঘরে প্রহরা বসিয়ে নিজ দফতরে চলে যান, যেখানে আল-কিন্দ-এর নিরস্ত্র দেহরক্ষীরা কঠোর প্রহরায় বসে আছে। আলী বিন সুফিয়ান এসে-ই তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন– 'তোমরা মিশর ও সিরিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর সৈনিক। কিছু গোপন রাখবার চেষ্টা করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড। আর যদি আমার নির্দেশ পালনপূর্বক সালার আল-কিন্দ-এর তৎপরতার কথা প্রকাশ করে দাও, তাহলে মুক্তি পেতে পার।'

রক্ষী কমান্ডার বলতে শুরু করে। তার বক্তব্যে প্রমাণিত হয়ে যায়, আল-কিন্দ-এর নিকট খৃস্টান ও সুদানী লোকজন আসা-যাওয়া করত এবং তিনি গাদ্দারীতে লিপ্ত। তবে আল-কিন্দ কোথায় গেছেন, তা তারও জানা নেই।'

দুপুর রাতে আলী বিন সুফিয়ান পাতাল কক্ষে যান। আল-কিন্দ-এর নতুন স্ত্রী সংকীর্ণ একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। তাকে সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তার কক্ষে অন্য এমন এক পুরুষ কয়েদীকে রাখা হয়েছে, যে লাগাতার নির্যাতন-অত্যাচারে জর্জরিত। লোকটা খৃস্টানদের গুপ্তচর। নিজে ধরা পড়লেও সতীর্থদের সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে না। আল-কিন্দ-এর স্ত্রী সেই দুপুর থেকে তার সঙ্গে এক প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। তার তড়পানি ও ছটফটানি প্রত্যক্ষ্য করেছে সে।

এখন মধ্যরাত। মেয়েটা রাজকন্যা। এই সংকীর্ণ পাতাল কক্ষের গন্ধই তাকে পাগল বানাবার জন্য যথেষ্ট। তদুপরি বন্দি লোকটার শোচনীয় অবস্থা দেখে দেখে তার রক্ত শুকিয়ে গেছে। আলী বিন সুফিয়ান যখন সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হন, তখন সে হাউমাউ করে চীৎকার জুড়ে দেয়। আলী তাকে সেখান থেকে বের করে অন্য একটি কক্ষের সামনে নিয়ে যান। সেটিও একটি অপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠ। কৃষ্ণকায় এক হাবশী তাতে আটক রয়েছে। লোকটার ভয়ানক দেহ। মহিষের মত শরীর। সে সীমান্ত বাহিনীর এক কমান্ডারকে খুন করেছিল। আলী বিন সুফিয়ান মেয়েটিকে বললেন, বাকী রাতটুকু তোমাকে এর সঙ্গে কাটাতে হবে। মেয়েটি চীৎকার করে উঠে আলীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে।

'আপনার যা যা জানার প্রয়োজন, আমাকে জিজ্ঞেস করুন।' আলীর দু'পা জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বলল।

'আল-কিন্দ কোথায় গেছে? কেন গেছে? তার লক্ষ্য কী?' আলী জিজ্ঞেস

করলেন– 'তার সম্পর্কে আরো যা যা তোমার জানা আছে, সব বলে দাও।'

আল-কিন্‌দ-এর স্ত্রী মাথা তুলে দাঁড়ায়। স্বামী সম্পর্কে যা কিছু জানা ছিল, সবই বলে দেয়। তবে আল-কিন্‌দ কোথায় গেছে, সেও জানেনা। মেয়েটি জানায়, সুদান থেকে হাবশী সৈন্য আনা হচ্ছে। তারা কোন এক রাতে কায়রো আক্রমণ করে সমগ্র মিশর দখল করে নেবে।

মেয়েটি মদপান করানোর দায়িত্ব পালন করত। সেই সুবাদে আল-কিন্‌দ-এর ঘরে গমনাগমনকারী খৃস্টান ও সুদানী মেহমানরা তার সম্মুখেও কথা-বার্তা বলত। সুদানের ধনাঢ্য কোন এক ব্যক্তির কন্যা আল-কিন্‌দ-এর এই স্ত্রী। আল-কিন্‌দ-এর জন্য তাকে উপহার স্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। আল-কিন্‌দ তাকে বিয়ে করে নিয়েছিল। মেয়েটা বেশ সতর্ক ও দুরন্ত। সুদানীদের লক্ষ্য তার ভালভাবেই জানা আছে। আল-কিন্‌দ-এর বাসভবনে যে বিপুল পরিমাণ সোনা ও নগদ অর্থ পাওয়া গিয়েছিল, তার বর্ণনামতে সেগুলো সুদান থেকে এসেছে। এগুলো যুদ্ধের ব্যয় এবং মিশরের সেনাবাহিনী থেকে গাদ্দার ক্রয়ের মূল্য। বিপুল সংখ্যক হাবশী সৈন্য এসে কোথায় জমায়েত হয়েছে, মেয়েটি সে ব্যাপারে অবহিত নয়। সে এতটুকু জানে যে, সমুদ্র পথে এসে তারা তীরবর্তী কোন একস্থানে অবস্থান নিয়েছে এবং তাদের হামলা হবে গেরিলা ধরনের।

যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল, আলী বিন সুফিয়ান তা করে ফেলেছেন। তিনি আল-আদেলকে বিস্তারিত রিপোর্টও প্রদান করে প্রস্তাব পেশ করেছেন যে, পর্যবেক্ষণের জন্য দু'জন দু'জন ও চারজন চারজন করে সৈন্য চতুর্দিক ছড়িয়ে দেয়া হোক। তারা সুদানী ফৌজের অবস্থান খুঁজে বের করবে এবং তথ্য সংগ্রহ করবে, সুদানী হাবশী বাহিনী সত্যিই যদি ভিতরে ঢুকে গিয়ে থাকে, তাহলে তারা কোন্ দিক থেকে এল। তিনি আল-আদেলকে এই পরামর্শও প্রদান করেন যে, সুলতান আইউবীকে বিষয়টা না জানানো হোক। কেননা, সংবাদটা পেয়ে তিনি পেরেশান হওয়া ছাড়া কোন সাহায্য করতে পারবে না। কিন্তু আল-আদেলের মতে সুলতানকে বিষয়টা অবহিত করা আবশ্যক। তার আশংকা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তখন সুলতান আইউবীর উপস্থিতি আবশ্যক হয়ে পড়বে। তাই তিনি পূর্ণাঙ্গ একটি রিপোর্ট লিখে চারজন রক্ষীসহ এক সিনিয়র কমান্ডারকে সুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেন এবং তাকে নির্দেশ প্রদান করেন, প্রতিটি চৌকি থেকে ঘোড়া বদল করে নেবে এবং কোথাও দাঁড়াবে না।

✿ ✿ ✿

রণাঙ্গনে সুলতান আইউবীর হেডকোয়ার্টার স্থির থাকছে না। তিনি দিনে এক জায়গায় থাকছেন, তো রাতে অবস্থান করছেন অন্য জায়গায়। ঘুরে-ফিরে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। কিন্তু তিনি এমন ব্যবস্থা কর রেখেছেন যে, প্রয়োজনে তাকে পাওয়া সহজ ব্যাপার। স্থানে স্থানে লোক বসিয়ে রাখা হয়েছে। তারা জানে, সুলতান কখন কোথায় অবস্থান করছেন। সুলতান আইউবীর অবস্থান একটি গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই নির্দেশক লোকগুলোকে নির্বাচন করা হয়েছে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান দেখে।

তিনদিন পথ অতিক্রম করে আল-আদেলের বার্তাবাহক কমান্ডার চার রক্ষীসহ দামেস্ক পৌঁছে যায়। সুলতান এখন আলরিস্তানের পার্বত্য এলাকায় অবস্থান করছেন। প্রচন্ড শীত পড়ছে। লাগাতার দীর্ঘ পথচলার কারণে বার্তাবাহী কমান্ডার ও তার রক্ষীদের অবস্থা শোচনীয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অনিদ্রা ও অবিরাম চলার ফলে তাদের মুখমন্ডল লাশের ন্যায় শুকিয়ে গেছে। তবু তারা এক্ষুণি— এই মুহূর্তে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উদগ্রীব। সামান্য পানাহার করে কালবিলম্ব না করে তারা আলরিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

❁ ❁ ❁

ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট খলীফা আল-মালিকুস সালিহ্-এর সাহায্যে এসেছিলেন এবং যুদ্ধ না করেই ফিরে গিয়েছিলেন। কারণ, সুলতান আইউবীর বাহিনী তার বাহিনীর উপর অপ্রত্যাশিতভাবে গেরিলা হামলা চালায় এবং পিছন থেকে রসদ সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পিছনে সুলতান আইউবীর বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে রেমন্ড তার বাহিনীকে অন্য দিক দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। সুলতান আইউবী তার পশ্চাদ্ধাবন সংগত মনে করলেন না। কেননা, তাতে সময় ও শক্তি দু-ই নষ্ট হত। তিনি অধিকাংশ গেরিলা সৈন্যকে রেমন্ডের রসদ দখল কিংবা ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বর্ষাও শুরু হয়ে গেছে। খৃস্টানদের রসদ বহর ছিল বিশাল।

রাতের বেলা। রেমন্ডের রসদ রক্ষণাবেক্ষণকারী সৈন্যরা ঘোড়াগাড়ির নীচে ও তাঁবুতে নিশ্চিন্তে শুনে আছে। এই রসদ তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আগামীকাল ভোরে রওনা হবে। দিন থেকেই যে কয়েক জোড়া চোখ পাহাড় ও পাথরের আড়াল থেকে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছে, তা তারা জানে না। সম্ভবত তাদের ধারণা, এই শীত আর বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে কেউ তাদের উপর হামলা করতে আসবে না। কিন্তু রাতে হঠাৎ তাদের ক্যাম্পের একদিকে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। ক্যাম্পে আগুন ধরে যায়। তাঁবুগুলো জ্বলছে। বিষয়টা

সুলতান আইউবীর গেরিলা যোদ্ধাদের অভিযানের ফসল। তারা প্রথমে ছোট ছোট মিনজানীক দ্বারা দাহ্য পদার্থভর্তি পাতিল নিক্ষেপ করে। তারপর জ্বলন্ত সলিতাওয়ালা তীর ছোঁড়ে। ক্যাম্পে আগুন ধরে যাওয়ার পর জ্বলন্ত আগুনের আলোতে তারা হামলা করে বসে। বর্শা ও তীরের আক্রমণে বহু খৃস্টান সেনাকে খতম করে তারা পর্বতমালার অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সন্নিকটস্থ পাহাড় থেকে খৃস্টানদের ক্যাম্পের উপর তীর বর্ষিত হতে থাকে। তারপর হামলা চালায় অপর একটি কমান্ডো দল। সকাল নাগাদ দেড় মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত সুবিশাল ক্যাম্পটিতে যা কিছু পড়ে আছে, তা খৃস্টানদের ফেলে যাওয়া রসদ, নিহতদের লাশ আর গুরুতর আহত ক্রুসেডসেনা। অনেকগুলো ঘোড়া হাঁকিয়ে নিয়ে গেছে খৃস্টানরা। ফেলেও গেছে বহুসংখ্যক। কমান্ডোদের বিরতির সময়টায় খৃস্টানরা কিছু ঘোড়াগাড়ি নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে। ফেলে যাওয়া রসদ ও ঘোড়াগুলো সুলতান আইউবীর সৈন্যরা কব্জা করে নিয়ে যায়।

হাল্‌বের অবরোধ তুলে নেয়া হয়েছিল। সুলতান আইউবী এই গুরুত্বপূর্ণ নগরীটিকে পুনরায় অবরোধ করার পরিকল্পনা করেছেন। দিনের বেলা গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার সুলতানকে বিগত রাতের কমান্ডো অভিযানের রিপোর্ট প্রদান করছে। এমন সময় দারোয়ান তাঁবুতে প্রবেশ করে সুলতানকে সংবাদ দেয়, কায়রো থেকে এক কমান্ডার বার্তা নিয়ে এসেছেন। বার্তা বহন করে থাকে দূত। সে জায়গায় কমান্ডারের নাম শুনে সুলতান আইউবী দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং কোন ভূমিকা ছাড়াই বললেন– 'খরব ভাল তো?....তুমি কেন এসেছ?'

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম নিয়ে এসেছি'– কমান্ডার বলল– 'আল্লাহ্ পাকের নিকট মুমিনের ভালোর-ই আশা রাখা উচিত।'

সুলতান আইউবী কমান্ডার থেকে পত্রখানা বুঝে নিয়ে তাকে নিয়ে ভিতরে চলে যান। তিনি বার্তাটি পাঠ করে গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান।

'এখনো কি জানা যায়নি যে, সুদানী সৈন্যরা মিশরে প্রবেশ করে কোন্ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছে?' সুলতান জিজ্ঞেসা করেন।

'তথ্য সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।' কমান্ডার জবাব দেয়।

'আমার অবর্তমানে মিশরে অবশ্যই কোন না কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে, সে আশংকা আমার ছিল'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমার ভাইকে বলবে, ভয় পেও না। কায়রোর প্রতিরক্ষা শক্ত কর। তবে শুধু প্রতিরক্ষা যুদ্ধ-ই লড়বে

না। বেশির ভাগ সৈন্য নিজের কাছে রাখবে এবং জবাবী হামলার জন্য তাদের মধ্যে থেকে অভিজ্ঞ লোকদের বাছাই করে রাখবে। কিন্তু তাদেরকে শহরের বাইরে যেতে দেবে না। আমাদের বাহিনীর কোন তৎপরতা যেন শত্রুপক্ষ টের না পায়, যাতে তারা এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত থাকে যে, তারা আমাদের অসর্তকতার মধ্যে মিশর দখল করতে সক্ষম হবে। বুঝাতে হবে, কায়রো আক্রান্ত হচ্ছে, সে খবর কায়রোবাসী জানে না। শত্রুরা যাতে শহরকে অবরোধ করতে না পারে। তার আগেই পাল্টা হামলা করবে। আক্রমণ হওয়ার আগেই দুশমনের অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। যদি তাদের অবস্থানের সন্ধান মিলে যায়, তাহলে বেশি সৈন্য দ্বারা হামলা করাবে না। বরং যথাসম্ভব অল্প সৈন্য দিয়ে গেরিলা হামলা চালাবে। সীমান্ত বাহিনীতে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি কর, যাতে শত্রুরা পালাতে না পারে। আমি ভেবে পাচ্ছিনা, এত বিপুলসংখ্যক সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করে কোন্ দিক থেকে প্রবেশ করল! কোন না কোন সীমান্ত চৌকির সহযোগিতা কিংবা উদাসীনতা ছাড়া এ ঘটনা ঘটতে পারে না। আল্লাহ তোমাদের সাফল্য দান করুন। দুশমন রসদ ও পিছন থেকে সাহায্য ছাড়া যুদ্ধ করতে পারবে না। তুমি সীমান্তকে শক্তভাবে সীল করে দাও। যুদ্ধ যাতে দীর্ঘতর হয়, সে চেষ্টা করতে হবে, যাতে দুশমন না খেয়ে মরতে বাধ্য হয়। আমি তো তোমাদেরকে হাতে-কলমেই শিখিয়েছি, দুশমনকে বিক্ষিপ্ত করে কিভাবে যুদ্ধ করতে হয়। বিপুল সৈন্যের মোকাবেলা বিপুল সৈন্য দিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধ করা আবশ্যক নয়।

'আল-কিন্দও একদিন গাদ্দার প্রমাণিত হবে, আমি কখনো ভাবিনি। তারপরও আমি বিস্মিত নই। মানুষের ঈমান বিক্রি করতে সময় লাগে না। রাজত্বের শুধু কল্পনাই মানুষকে ঈমানহারা করতে পারে। ক্ষমতার নেশা কুরআনকে গেলাফবদ্ধ করে সরিয়ে রাখে। আমার আফসোস আল-কিন্দ-এর জন্য নয়– আমি ইসলামের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির। আমার ভাইয়েরা একের পর এক খৃস্টানদের হাতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার ভাইয়েরা আমার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমার পীর ও মুরশিদ নুরুদ্দীন জঙ্গী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। কাল-পরশু আমরাও চলে যাব। তারপর কী হবে? এই প্রশ্নটাই আমাকে অস্থির করে তুলছে। যা হোক, আমাদের চেষ্টা করতে হবে, যে ক'দিন বেঁচে থাকি, ইসলামের পতাকা অবনমিত হতে দেব না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা আমাকে নিয়মিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবে।'

সুলতান আইউবী বার্তাবাহক কমান্ডারকে বিদায় করে দেন।

❁ ❁ ❁

যে চৌকির কমান্ডার যোহ্‌রার সঙ্গে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, তার এক সিপাহী কায়রো এসে রিপোর্ট করে, চৌকির কমান্ডারকে কয়েকদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। চৌকিতে যে নাচ-গানের আসর বসেছিল এবং এক নর্তকী কমান্ডারের তাঁবুতে ঢুকেছিল, সে তথ্য জানায়নি সিপাহী। এ তথ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, কমান্ডার দুশমনের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিতে পারে এবং শত্রু বাহিনী তার-ই সহযোগিতায় সীমান্ত অতিক্রম করেছে। আলী বিন সুফিয়ান অভিমত ব্যক্ত করেন, চৌকিটি যেহেতু নদীপথ পাহারার জন্য স্থাপিত, সেহেতু দুশমন সেই নদীপথেই এসে থাকবে। সিদ্ধান্ত হল, একজন বিচক্ষণ কমান্ডারকে একদল রক্ষীসেনাসহ এই চৌকির দায়িত্ব পালনে প্রেরণ করা হবে।

চৌকির কমান্ডার ও যোহ্‌রা হাব্‌শীদের হাতে আবদ্ধ। কিন্তু বন্দি হয়েও তারা বন্দি নয়। এখন তাদের পরনে রং-বেরংয়ের পক্ষীপালকের তৈরি পোশাক। তাদেরকে যে কক্ষে রাখা হয়েছে, সেটিও পাখির পালক ও ফুল দ্বারা সজ্জিত। বিশেষ ধরনের খাবার খাওয়ানো হচ্ছে তাদের। হাবশীদের পুরোহিত তাদের সামনে সেজদা করছে ও বিড়বিড় করে কি যেন পাঠ করছে। অন্য কাউকে তাদের সম্মুখে আসতে দেয়া হচ্ছে না। একবার তাদেরকে গাছের শক্ত ডাল ও লতার তৈরি পালকিতে করে নদীতে গোসল করিয়ে আনা হয়েছে। তারা ভেবেছিল, তাদেরকে বলী দেয়া জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাতে তারা একা থাকছে। কিন্তু বাইরে আট-দশজন হাবশী পাহারা দিচ্ছে। কমান্ডার একাধিকবার পালাবার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন সুযোগ মিলেনি।

এক রাতে হাবশীদের দু'জন পুরোহিত তাদের কক্ষে আসে। কমান্ডার ও যোহ্‌রা তখন ঘুমিয়ে ছিল। তাদেরকে জাগানো হল। তারা ভাবে, তাদের মৃত্যু এসে গেছে। পুরোহিতগণ তাদের সম্মুখে সেজদাবনত হয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে যায়। বাইরে দু'টি পালকি রাখা আছে। তার একটিতে কমান্ডারকে, অপরটিতে যোহ্‌রাকে তুলে বসানো হল। দু'জন করে হাবশী পালকি দু'টি কাঁধে তুলে নেয়। পুরোহিতদ্বয় সামনে হাঁটতে শুরু করে। তারা সমকণ্ঠে কি যেন পাঠ করছে। পালকির পিছনে আরো দু'জন হাবশী। তাদের হাতে বর্শা। তারা রক্ষীসেনা। কমান্ডার ও যোহ্‌রা নীরব। পাহাড়ী এলাকা থেকে বের হয়ে তারা নদীর দিকে এগিয়ে যায়। সময়টা মধ্য রাত। জোসনার আলোয় চারদিক ফক্ ফক্ করছে।

নদীর কূলে পৌঁছে বেহারারা কাঁধ থেকে পালকি দু'টি নামাল। পুরোহিতগণ এগিয়ে এসে কমান্ডার ও যোহরার পরিধানের পোশাক খুলতে শুরু করে। কমান্ডার চাঁদের আলোতে দেখতে পেলেন, বর্শাধারী রক্ষীদ্বয় ও পালকি বহনকারী হাবশী বেহারারা তাদের প্রতি পিঠ দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেছে। সম্ভবত এমনটা করা তাদের প্রতি নির্দেশ। কমান্ডার হঠাৎ সিংহের ন্যায় এক হাবশীর হাত থেকে তার বর্শাটা ছিনিয়ে নেন। লোকটা একজন অভিজ্ঞ সৈনিক। তিনি পিছনে সরে গিয়ে বর্শাধারী অপর হাবশীর পাজরে বর্শার আঘাত হানেন। আঘাতের ধাক্কায় তার হাতের বর্শাটাও ছিটকে পড়ে যায়। কমান্ডার চীৎকার করে বলে উঠলেন- 'দৌড়ে এস যোহরা। বর্শাটা তুলে নাও।' যোহরা ছুটে আসে। কমান্ডার পড়ে যাওয়া বর্শাটায় পা দ্বারা লাথি মারেন। সেটি যোহরার সম্মুখে চলে যায়। যোহরা বর্শাটা হাতে তুলে নেয়। কমান্ডার বললেন- 'এবার তুমি পুরুষ হয়ে যাও।' হাবশীরা খালী হাতে মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বর্শার মোকাবেলা করতে পারল না। পুরোহিতগণ পালাতে উদ্যত হয়। কমান্ডার তাদেরকে দূরে যেতে দিলেন না। যোহরাও কমান্ডারের সঙ্গ নেয়। উভয় পুরোহিত খতম হয়ে যায়। অন্যরা মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। কমান্ডারের বর্শা ঠান্ডা করে দেয় সকলকে। কমান্ডার যোহরাকে নিয়ে চৌকি অভিমুখে রওনা হন। বেশ কিছু পথ অগ্রসর হওয়ার পর দু'জন অশ্বারোহী শান্ত্রী দেখতে পান। কমান্ডার তাদেরকে হাঁক দেন- 'জল্‌দি এদিকে এস।'

সান্ত্রীরা তাদের কমান্ডারকে চিনে ফেলে। কমান্ডার তাদেরকে বললেন- 'ঘোড়া দু'টো আমাদেরকে দাও। আমরা কায়রো যাচ্ছি। তোমরা চৌকিতে ফিরে যাও। কেউ যদি আমাদের সন্ধানে আসে, বলবে, আমরা তাদেরকে দেখিনি।'

সিপাহীদ্বয় পায়ে হেঁটে চৌকিতে ফিরে যায়। কমান্ডার যোহরাকে একটি ঘোড়ার পিঠে তুলে বসান এবং নিজে অপরটিতে সাওয়ার হয়ে যোহরাকে বললেন, তোমার যদি অশ্বচালনার অভিজ্ঞতা নাও থাকে, তবু ভয় নেই। ঘোড়া তোমাকে ফেলবে না। কমান্ডার ঘোড়া হাঁকান। ঘোড়া ছুটতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে যোহরা ভয়ে চীৎকার জুড়ে দেয়। কমান্ডার ঘোড়া থামিয়ে যোহরাকে তার ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিজের ঘোড়ার পিছনে বসিয়ে নেন এবং অপর ঘোড়াটির বাগ নিজের ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে যোহরাকে বললেন, তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখ।

ঘোড়া পুনরায় ছুটে চলে। কমান্ডার পাহাড়ী এলাকা এড়িয়ে বেশ দূর

দিয়ে এগিয়ে চলছেন। কায়রোর দিক ও পথ তার চেনা। এখনো তিনি দু'মাইল পথ অতিক্রম করেননি, একদিক থেকে আওয়াজ আসে- 'থাম, কে তুমি?' কমান্ডার থামলেন না। এক সঙ্গে চারটি ঘোড়া তাকে ধাওয়া করতে শুরু করে। কমান্ডার তার ঘোড়ার গতি আরো তীব্র করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তার। তিনি অপর ঘোড়াটিকে পাশে নিয়ে এসে তাতে সাওয়ার হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু চলন্ত অবস্থায় যোহরাকে নিয়ে ঘোড়া বদল করবেন কিভাবে। আকাশের চাঁদটা এখন ঠিক মাথার উপরে। জোসনার আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ধাওয়াকারী লোকগুলো অনেক কাছে চলে এসেছে।

দু'টি তীর ধেয়ে এসে কমান্ডারের পাশ দিয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক আসে,- 'থাম বলছি। অন্যথায় তীর তোমার মাথায় বিদ্ধ হবে।'

কমান্ডার ভাবছে, থামলেও মৃত্যু অবধারিত। এরা আমাদেরকে হাবশীদের হাতে তুলে দেবে আর হাবশীরা আজই আমাদেরকে যবাই করে ফেলবে। বাঁচতে হলে পালাবারই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তিনি ঘোড়াটিকে ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দৌড়াতে শুরু করেন, যাতে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

কমান্ডারের বুঝটা ছিল ভুল। তার ও ধাওয়াকারীদের দূরত্ব কমে গেছে। কমান্ডার তাদের বেষ্টনীতে আটকা পড়ে গেছেন। পালকের পোশাক পরিহিত হওয়ার কারণে কমান্ডারকে পাখি বলে মনে হচ্ছে। যোহরার অবস্থাও একই। কমান্ডার চার ব্যক্তির দিকে তাকান। তার মনে সন্দেহ জাগে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করে- 'তোমরা কারা? এই মেয়েটি কে?' একজন বলল- 'কী জিজ্ঞেস করছ? দেখেই তো বুঝা যাচ্ছে, এরা সুদানী। পরেছে কি দেখ।'

কমান্ডার হেসে ফেললেন এবং বলে উঠেন- 'দোস্তরা! আমি তোমাদের-ই ফৌজের একজন কমান্ডার।' তিনি যোহরার পরিচয় প্রদান করেন এবং পুরো ঘটনা খুলে বলেন।

এরা চারজন মিশরের টহলসেনা। সুদানী ফৌজের অবস্থান খুঁজে ফিরছে তারা। তারা কমান্ডার ও যোহরাকে নিয়ে কায়রো অভিমুখে রওনা হয়ে যায়।

✿ ✿ ✿

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ছয়জনের কাফেলা পরদিন রাতে কায়রো গিয়ে পৌঁছে। তাদেরকে সর্বপ্রথম আলী বিন সুফিয়ানের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। আল-আদেলকে রাতেই ঘুম থেকে জাগিয়ে জানানো হয়, চার হাজারের বেশি সুদানী হাবশী ফৌজ অমুক স্থানে লুকিয়ে আছে এবং সালার আল-কিন্দ

তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আল-আদেল তৎক্ষণাৎ তার বাহিনীকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। সুলতান আইউবীর রণকৌশল মোতাবেক তিনি সম্মুখে অশ্বারোহী বাহিনীকে রাখেন। বাহিনীর পিছন অংশে দু'পার্শ্বে রাখেন দু'টি দল। নিজে অবস্থান নেন বাহিনীর মধ্যখানে। তিনি জানেন, এলাকাটা পাহাড়ী। তিনি ফৌজকে দুর্গ অবরোধের বিন্যাসে বিন্যস্ত করেন এবং কমান্ডারদের স্থানটা বুঝিয়ে দিয়ে অবরোধের-ই ন্যায় নির্দেশনা প্রদান করেন। পাহাড়ে উঠার জন্য তিনি আলাদা কমান্ডো দল ঠিক করে তাদেরকে নিজের কমান্ডে রাখেন।

ওদিকে রাত পোহাবার পর এক ব্যক্তি দেখতে পেল, নদীল কূলে হাবশীদের দু'জন ধর্মগুরু ও চারজন হাবশীর মৃতদেহ পড়ে আছে। আল-কিন্দ ও তার খৃস্টান উপদেষ্টাদেরকে সংবাদ জানানো হল। তারা ঘটনাটা কোন হাবশীকে জানতে দেয়নি। আল-কিন্দকে এ তথ্যও জানানো হয়েছে যে, যে পুরুষ ও মহিলাকে বলির জন্য রাখা হয়েছিল, তারা পালিয়ে গেছে। আল-কিন্দ এবার জিজ্ঞেস করেন, ওরা কারা ছিল? তাকে জানানো হল, তাদের পুরুষ লোকটি নিকটবর্তী চৌকির কমান্ডার। শুনে আল-কিন্দ চমকে ওঠেন। তার মনে পড়ে যায়, লোকটা তাকে দেখেছিল।

'লোকটা সোজা কায়রো চলে গিয়ে থাকবে'– আল-কিন্দ বললেন– 'তাকে চৌকিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন আমাদের আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না। আমরা অতর্কিতভাবে কায়রোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। সে সুযোগ আমাদের শেষ হয়ে গেছে। আমরা সময় নষ্ট করে ফেলেছি। এখন উল্টো আমরা-ই বেঘোরে প্রাণ হারাব। আমি আমার বাহিনীকে জানি। তারা সংবাদ পাওয়ামাত্র উড়ে এসে পৌঁছে যাবে...। আচ্ছা, একটা কাজ কর, এক্ষুণি নিহত হাবশীদের লাশগুলো নদীতে ভাসিয়ে দাও। হাবশীরা যদি জানতে পারে, তাদের পুরোহিত ও কয়েকজন লোক খুন হয়েছে এবং তারা যাদেরকে বলি দেয়ার জন্য প্রস্তুত করেছে, তারা পালিয়ে গেছে, তাহলে উপায় থাকবে না।

পুরোহিত ও হাবশীদের লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে দেয়া হল, নদীর কিনারে বলির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। খোদা আদেশ করেছেন, এবার তোমরা দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। কমান্ডারগণ সংখ্যা অনুপাতে যার যার অধীন হাবশী সেনাদের আলাদা করে ফেলে। তীরান্দাজগণ আলাদা হয়ে যায়। যুদ্ধ পরিকল্পনা মোতাবেত তাদেরকে বিন্যস্ত করা হয়।

তাদেরকে পাহাড়ের ভিতর থেকে বের করে নদীকূলের যে স্থানে পুরোহিত ও হাবশী রক্ষীরা খুন হয়েছে, তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করানো হল। সেখানে ছোপ ছোপ রক্ত ও দু'টি পালকি পড়ে আছে। এক ব্যক্তি সেখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছে– 'এই রক্ত সেই পুরুষ ও নারীর, যাদেরকে বলি দেয়া হয়েছে।'

বাহিনীটি নদীর কূল ঘেঁষে কায়রো অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ে। রণসঙ্গীত গাইছে হাবশীরা। দিন শেষে রাত নামে। রাত যাপনের জন্য কাফেলা ছাউনি ফেলে। পরদিন ভোরে আবার রওনা হয়। তারা পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে অনেক দূর এসে গেছে। কেটে যায় এদিনটিও। আসে আরেকটি রাত। বাহিনী এক স্থানে ছাউনি ফেলে। তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। অনেকটা নিশ্চিন্ত তারা।

মাঝরাতে বাহিনীর পিছন অংশের উপর আল-আদেলের একটি গেরিলা দল আক্রমণ করে বসে। কয়েকটি ঘোড়া দ্রুত ছুটে এসেই অদৃশ্য হয়ে যায়। হৈ চৈ ও তোলপাড় শুরু হয়ে যায় হাবশী ফৌজের মধ্যে। দীর্ঘক্ষণ পর এরূপ আরেকটি হামলা হয়। এবার আক্রমণকারীরা বহু হাবশী সেনাকে দলে-পিষে বেরিয়ে যায়। আল-কিন্দ বাহিনীর আগে আগে অবস্থান করছেন। সংবাদ পেয়ে তিনি পরদিনের অগ্রযাত্রা মুলতবী করে দেন।

'এই গেরিলা আক্রমণ প্রমাণ করছে, আমরা মিশরী বাহিনীর নজরে পড়ে গেছি'– আল কিন্দ বললেন– 'এটা সালাহুদ্দীন আইউবীর বিশেষ রণনীতি। আমরা আর সম্মুখে অগ্রসর হতে পারব না। যতই সাহস করনা কেন, তোমরা মিশরী সৈন্যদের সঙ্গে খোলা মাঠে লড়াই করে টিকতে পারবে না। এখন আমাদেরকে পিছনে সরে গিয়ে পাহাড়ী এলাকায় লড়তে হবে। আমাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। কায়রোবাসী শুধু টের-ই পেয়ে যায়নি- তারা বাহিনীও পাঠিয়ে দিয়েছে!'

'আমরা কি মিশরী সৈন্যদের খুঁজে বের করে খোলা মাঠে যুদ্ধ করতে পারব না?'– এক খৃস্টান কমান্ডার জিজ্ঞেস করে– 'তোমরা যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীকে মুখোমুখি এনে লড়াই করাতে পারতে, তাহলে মিশর আজ তোমারদেই থাকত'– আল-কিন্দ বললেন– 'আমি সেই বাহিনীরই একজন অধিনায়ক। তাদের সঙ্গে কিভাবে লড়াই করতে হবে, আমার চেয়ে তোমরা ভাল জানবেনা।'

শেষ রাতে হাবশী ফৌজ ফেরত রওনা হয়। ছাউনির এলাকাটায় চারদিকে

সর্বত্র হাবশীদের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। আল-কিন্দ ঠিকই বুঝেছেন যে, তার বাহিনী মিশরী ফৌজের নজরে এসে গেছে। মিশরী ফৌজের তথ্যানুসন্ধানী দল আল-কিন্দ এর প্রতিটি গতিবিধি প্রত্যক্ষ করছে। সুদানী বাহিনীকে পেছনে সরিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল-আদেল বুঝে ফেললেন আল-কিন্দ পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধ করতে চান। তিনি তখনি অশ্বারোহী তীরান্দাজ বাহিনীটিকে দূর পথ দিয়ে পাহাড়ী এলাকা অভিমুখে রওনা করিয়ে দেন। প্রেরণ করা হল পদাতিক বাহিনীও। তবে অধিকাংশ সৈন্যকে তিনি নিজের কাছে রেখে দেন। তিনি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সেই বাহিনীকে নিয়ে হাবশী ফৌজের পিছনে পিছনে এগিয়ে চলতে শুরু করেন।

পথেই রাত হয়ে যায়। হাবশী ফৌজ ছাউনি ফেলে। আল-আদেলের কমান্ডো সেনারা তৎপর হয়ে ওঠে। একদল হাবশীসেনা জেগে আছে। তারা তীরান্দাজ বাহিনী। তারা বিপুল পরিমাণ তীর ছুঁড়ে। তাতে কিছুসংখ্যক কমান্ডোসেনা শহীদ হয়ে যায়। কিন্তু তারা সুদানী বাহিনীর যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করে যায়, তা অসামান্য। সবচে' বেশি ক্ষতিটা এই যে, তাতে হাবশী ফৌজের যুদ্ধ করার শক্তি-সাহস ও মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে। তারা কল্পনা করে এসেছিল অন্যকিছু। তারা মুখোমুখি লড়াই করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এখানে দুশমন তাদের চোখেই পড়ছে না। অথচ, তারা প্রলয় ঘটিয়ে ফিরে যাচ্ছে। হাবশী ফৌজ দিকহারা হয়ে পড়ে।

রাত পোহাবার পর বেলা হলে হাবশী ফৌজ তাদের সঙ্গীদের লাশ দেখে। বিপুল লাশ! লাশ আর লাশ!! তারা পিছনে সরে যায়।

সূর্য অস্ত যেতে এখনো বেশ বাকি। তারা পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে পড়ে। বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য এখনো ভিতরে ঢুকেনি, এরই মধ্যে তাদের গায়ে উপর থেকে তীর বর্ষিত হতে শুরু করে। আল-আদেল-এর তীরান্দাজ বাহিনী আগেই সেখানে পৌঁছে ওঁত পেতে বসে থাকে। হাবশী কমান্ডারগণ হাঁক- ডাক দিয়ে সৈন্যদেরকে আড়ালে নিয়ে যায় এবং তীর ছোঁড়ার নির্দেশ দেয়। অবশিষ্ট অর্ধেক সৈন্য এখনো বাইরে। তাদেরকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আল-কিন্দ তাদেরকে পাহাড়ে উঠিয়ে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং উপর থেকে তীর নিক্ষেপ করার পরিকল্পনা আঁটে। তার এই পরিকল্পনা বেশ সফলও হয়। বহু হাবশীসেনা পাহাড়ে উঠে যেতে সক্ষম হয় এবং তারা সফল তীরান্দাজী করে। তাতে আল-আদেল-এর অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা বেশ চমৎকার। তিনি সেখান থেকে তার বাহিনীকে পিছনে সরিয়ে

নিয়ে যান। তার আগাম নির্দেশনা মোতাবেক অপর দিক থেকে তীরান্দাজ ও অন্যান্য বাহিনী পাহাড়ের উপরে উঠে যাচ্ছে। অশ্বারোহী বাহিনীর একটি ইউনিটকে নদীর তীরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

আসওয়ানের এই পাহাড়ী অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হল। উপত্যকা ও পর্বতপৃষ্ঠে অনেক তীর ছোঁড়াছুঁড়ি হল। তারপর অশ্বারোহী বাহিনী উপত্যকায় প্রলয় সৃষ্টি করার নির্দেশ পেল। রাতে হাবশীরা লুকিয়ে থাকে বটে; কিন্তু আল-আদেল তার মিনজানীক বাহিনীকে নির্দেশ দেন, স্থানে স্থানে এদিক-সেদিক সর্বত্র দাহ্য পদাথ্য ভর্তি পাতিল ছুঁড়ে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাক। কিছুক্ষণ পরই পর্বতমালার ঢালুতে ও পাদদেশে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠে এবং চতুর্দিক আলোকিত হয়ে যায়। এই আলোতে সারা রাত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। যখন ভোর হল, তখন হাবশীরা সর্বশান্ত-নীরব। তাদের কিছু লোক পাতাল ঠিকানায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

দিনের বেলা আল-কিন্‌দ-এর লাশ পাওয়া গেল। কারো তীর কিংবা তরবারীর • আঘাতে নয়– লোকটি নিজের তরবারীর আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। তারই তারবারীটা তার লাশের হৃদপিন্ডের উপর গেঁথে আছে। অর্থাৎ-আল-কিন্‌দ আত্মহত্যা করেছেন। কয়েকজন খৃস্টান ও সুদানী কমান্ডার জীবিত বন্দি হল। বন্দি হল এক হাজারেরও বেশি হাবশী যোদ্ধা।

আল-আদেল সেখান থেকেই সুলতান আইউবীর নিকট পয়গাম লিখে দূত প্রেরণ করেন। তাকে নির্দেশ দেন, যত দ্রুত সম্ভব সুলতানের নিকট পৌছে যাও; তিনি চরম অস্থিরতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন।

রক্ত চাই

ইসলামী দুনিয়ার যে ভূখন্ডে আজ সিরীয় মুসলমানরা লেবাননী খৃস্টানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফিলিস্তিনী মুক্তি কর্মীদের উপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে, আটশত বছর পূর্বে সেই ভূখন্ডে বহু মুসলমান আমীর, শাসক ও সুলতান জঙ্গীর বালক পুত্র খৃস্টানদের মদদে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মুসলমান মুসলমানের রক্ত ঝরাচ্ছিল। ফিলিস্তীন তখন খৃস্টানদের কব্জায়। সুলতান আইউবী প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের সেই ভূখন্ডটিকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ময়দানে নেমেছেন। ফিলিস্তীন উদ্ধারে তাঁর সফল হওয়াও নিশ্চিত ছিল। কিন্তু একদল মুসলমান-ই তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বসে। ফিলিস্তীন আজো কাফেরদের কব্জায় এবং স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনীরা যায়নবাদী হায়েনাদের ট্যাংকের চাকায় নিষ্পিষ্ঠ হচ্ছে।

১১৭৫ সালের মার্চ মাস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সেই ভূখন্ডের-ই আলরিস্তান পর্বতমালার কোন এক স্থানে তাঁর হেডকোয়ার্টারে বসে উপদেষ্টা ও কমান্ডারদের নিয়ে পরবর্তী যুদ্ধপরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলছেন। আগেই উল্লেখ করেছি, সুলতান আইউবী হাল্‌ব অবরোধ করে পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তার কারণ, আল-মালিকুস সালিহ খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডের সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, সে মোতাবেক সম্রাট রেমন্ড সুলতান আইউবীর বাহিনীর উপর পিছন থেকে হামলা করার পরিকল্পনা নিয়ে এসে পড়েছিলেন। সুলতান আইউবী যথাসময়ে অবরোধ তুলে নেন এবং কৌশল অবলম্বন করে রেমন্ডের বাহিনীর পিছনের চলে যান এবং রেমন্ড যুদ্ধ ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচানো শ্রেয় মনে করেন।

হাল্‌ব মুসলিম অধ্যুষিত নগরী। কিন্তু এখন তা ইসলাম ও ইসলামী রাজ্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মুমিন সুলতান আইউবীর দুশমন মুসলমান আমীর ও খৃস্টানদের পুতুল খলীফা আল-মালিকুস সালিহ-এর সামরিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। খলীফা ও আমীরদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে হাল্‌বের মুসলমান সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে মাঠে নামে।

সুলতান আইউবী হাল্‌বের উপর পুনরায় আক্রমণ করে গাদ্দার ও ঈমান-বিক্রেতাদের এই আড্ডাটি গুড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিলেন। ঠিক এমন সময় মিশর থেকে সংবাদ আসে যে, মিশরে তাঁর এক সেনা অধিনায়ক আল-কিন্‌দ খৃস্টানদের মদদে মিশরের মাটিতে সুদানী সৈন্যের সমাবেশ ঘটাচ্ছেন। তার লক্ষ্য, সুলতান আইউবীর অনুপস্থিতির সুযোগে মিশর আক্রমণ করবে এবং সুলতান আইউবীর হাত থেকে মিশরের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু সুলতান আইউবীর ভাই অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সুদানী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন এবং আল-কিন্‌দ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। তবে এই সাফল্যের সংবাদ এখনো সুলতান পাননি। তিনি আলরিস্তানের পার্বত্য এলাকায় চিন্তিত মনে বসে আছেন।

ইসলামের এই মহান সেনানী চারদিক থেকে সমস্যা ও সংকটে নিপতিত হয়ে পড়েছেন। একদিকে কয়েকজন মুসলিম আমীরের সেনাবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। অপরদিকে খৃস্টানদের ষড়যন্ত্র। এসবের মোকাবেলায় সুলতানের হাতে যে সৈন্য আছে, তা নগন্য। কিন্তু তিনি এমন কৌশল ও কৃতিত্বের সঙ্গে সেসব সমস্যার মোকাবেলা করেন, যা কারো কল্পনায় ছিল না। তাঁর দুশমনদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শীতের মওসুমে এই পাহাড়ী ভূখন্ডে যুদ্ধ করার কল্পনাও কেউ করবে না। উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোতে বরফ পড়ছে। কিন্তু সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন এক সময় আক্রমণ পরিচালনা করেন, যখন শীত তুঙ্গে। এই দুঃসাহসী ও অপ্রত্যাশিত অভিযান পরিচালনা করে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীটি দ্বারা শত্রু বাহিনীকে যে কোন সুবিধাজনক স্থানে টেনে নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত করাতে পারেন। তার সৈন্যসংখ্যা এতই কম যে, পরম আত্মবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও মাঝে-মধ্যে তাঁর পরাজয়ের আশংকা অনুভূত হত। কিন্তু তারপরও শত্রুপক্ষ তাঁর ভয়ে তটস্থ। সুলতান আইউবীর আশংকা, রেমন্ড পরিকল্পনা ও রাস্তা বদল করে তাঁর উপর হামলা করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে রেমন্ডের অবস্থা হল, তিনি এই ভয়ে নিজ এলাকা ত্রিপোলীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করে তোলেন যে, সুলতান আইউবী হামলা করতে পারেন।

সুলতান আইউবী রেমন্ডকে যে প্রক্রিয়ায় বিতাড়িত করেন, তাতে খৃস্টান সেনাদের ধাওয়া করে সাফল্য অর্জন করার চেষ্টা করাই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সৈন্য কম হওয়ার কারণে তিনি সে ঝুঁকি নেননি। বড় কারণ হল, মিশরে আল-কিন্‌দ-এর বিদ্রোহ ও গাদ্দারী তাঁকে থামিয়ে দিয়েছিল। তিনি আশংকা করছিলেন যে, মিশরের পরিস্থিতি গুরুতর রূপ লাভ করবে। সে পরিস্থিতিতে

তাঁকে মিশর ফিরে যেতে হবে। আর যদি তাঁকে মিশর যেতেই হয়, তাহলে মুসলিম আমীরগণ ইসলামী দুনিয়াকে খৃস্টানদের কাছে নীলাম করে দেবে, তাতে সন্দেহ নেই। এখন সবকিছু নির্ভর করছে, মিশর থেকে কী সংবাদ আসে, তার উপর।

আলরিস্তানের হেডকোয়ার্টারে বসে উপদেষ্টামন্ডলী ও কমান্ডারদের নিকট মিশরের ব্যাপারেই তাঁর উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করছিলেন সুলতান। এমন সময় তিনি সংবাদ পান যে, কায়রো থেকে দূত এসেছে। খবরটা পেয়ে সুলতান রাজা-বাদশাদের ন্যায় বললেন না, তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও। বরং সংবাদটা শোনামাত্র তিনি বসা থেকে উঠে দাঁড়ান এবং দৌড়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে যান। দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত দূত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। সুলতান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, কোন সুসংবাদ নিয়ে এসেছ তো?

'সংবাদ খুবই ভাল মহামান্য সুলতান'– দূত জবাব দেয়– 'মাননীয় আল-আদেল হাবশী সেনা বাহিনীটিকে আসওয়ানের পার্বত্য এলাকায় এমনভাবে পরাস্ত করেছেন যে, সুদানের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিনের জন্য আংশকা দূর হয়ে গেছে।'

সুলতান আইউবী দু'হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তাঁবুর ভিতর থেকে অন্যান্যরাও বেরিয়ে আসে। সুলতান তাদেরকে সুসংবাদটা শোনান এবং দূতকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে যান। তাঁবুতে তার জন্য আহারের ব্যবস্থা করেন। সুলতান দূতের মুখ থেকে আসওয়ান যুদ্ধের বিস্তারিত শুনে তাকে জিজ্ঞেস করেন– 'আমাদের কতজন সৈন্য শাহাদাতবরণ করেছে?'

'তিনশত সাতাশজন'– দূত জবাব দেয়– 'আর আহত হয়েছে পাঁচশ'রও বেশি। দুশমনের সম্পূর্ণ যুদ্ধ সামগ্রী আমাদের দখলে এসে গেছে। এক হাজার দু'শত দশজন হাবশী সেনা বন্দী হয়েছে। খৃস্টান ও সুদানী নেতা-কমান্ডার যারা বন্দী হয়েছে, তারা এই সংখ্যার বাইরে। আল-আদেল বন্দীদের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানতে চেয়েছেন।'

'খৃস্টান ও সুদানী সালার-কমান্ডারদেরকে কয়েদখানায় ফেলে রাখ'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর বলতে শুরু করেন– 'আর যে হাজারেরও বেশি হাবশী সেনাকে বন্দী করেছ, তাদেরকে আসওয়ানের পাহাড়ী এলাকায় নিয়ে যাও। তারা মিশরে অনুপ্রবেশ করে পর্বতমালার যে গুহাগুলোতে আত্মগোপন করেছিল, তাদের দ্বারা সেগুলোকে পাথর দিয়ে ভরে দাও। ওখানে ফেরাউনদের যেসব পাতালপ্রাসাদ আছে,

সেগুলোকে পাথর দ্বারা পূর্ণ করে দাও। যদি পাহাড় খনন করার প্রয়োজন পড়ে, তাও ঐ হাবশীদের দ্বারা করাও। ওখানে কোন গুহা এবং পাতালপ্রাসাদ যেন অবশিষ্ট না থাকে। আল-আদেলকে বলবে, বন্দীদের সঙ্গে যেন মানবিক আচরণ করা হয়। দৈনিক তাদের দ্বারা ঠিক অতটুকু কাজ করাবে, যতটুকু কাজ সাধারণত একজন মানুষ করতে পারে। কোন কয়েদী যেন খানা-পানিতে কষ্ট না পায় এবং কারো উপর যেন শুধু এজন্য অত্যাচার করা না হয় যে, সে বন্দী। আসওয়ানের সন্নিকটে খোলামেলা জায়গায় জেলখানা তৈরী করে নাও। তোমাদের হাতে যদি অন্য কোন কাজ থাকে, তাহলে সে কাজটাও কয়েদীদের দ্বারা করাও। সুদানীরা যদি তাদের বন্দীদের ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে আমাকে অবহিত করবে। আমি স্বয়ং তাদের সঙ্গে বুঝা-পড়া করব।'

এই বার্তা প্রদানের পর সুলতান আইউবী দূতকে বললেন– 'আল-আদেলকে বলবে, আমার সাহায্যের তীব্র প্রয়োজন। নিজের প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রাখবে। সেনাভর্তির গতি বাড়িয়ে দাও। সারাক্ষণ সামরিক মহড়া অব্যাহত রাখ। গোয়েন্দা জাল আরো বিস্তৃত কর। আল-কিন্দ-এর ন্যায় নির্ভরযোগ্য সালার-ই যদি গাদ্দারীর পথ বেছে নিতে পারে, তাহলে তোমরাও গাদ্দারও হয়ে যেতে পার, আমিও পারি। এখন থেকে কাউকে বিশ্বাস করবে না। আলী বিন সুফিয়ানকেও বলবে, সে যেন আরো সতর্ক ও তৎপর হয়।'

'মিশর থেকে সাহায্য এসে না পৌঁছা পর্যন্ত কোন অভিযান পরিচালনা না করাই ভাল হবে'– দূতকে বিদায় দিয়ে সালার ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের উদ্দেশে সুলতান আইউবী বললেন– 'সে পর্যন্ত আমরা এতদিনের সাফল্য ধরে রাখার কাজে নিয়োজিত থাকব। তোমরা বর্তমান পরিস্থিতিটার উপর একটু দৃষ্টি দাও। তোমাদের ভাই-ই তোমাদের বড় দুশমন! তোমাদের শক্তিশালী দুশমন তিনজন। এক. আল-মালিকুস সালিহ, যিনি হাল্‌বে জেঁকে বসে আসেন। দুই. তার কেল্লাদার গোমস্তগীন, যিনি হাররানে সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে সময়ের অপেক্ষা করছেন এবং তিন. মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন। এ তিনটি বাহিনী যদি সংঘবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তাদের মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে না। তোমরা রেমন্ডকে হটিয়ে দিয়েছ ঠিক; কিন্তু সে এই অপেক্ষায় আছে যে, মুসলিম বাহিনী পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়বে আর সে পিছন দিক থেকে আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। আমি অবরুদ্ধ হয়েও যুদ্ধ করতে জানি; কিন্তু সেই পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে চাই।'

'আচ্ছা, আল-মালিকুস সালিহ, গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনকে ইসলাম ও কুরআনের দোহাই দিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা চালালে কেমন হয়?' এক সালার বললেন।

'না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যারা নিজেদের মন-মস্তিষ্ককে সত্যের আওয়াজের জন্য সীল করে রাখে, আল্লাহর কহর ও গজব ছাড়া তাদের মন-মস্তিষ্ক উন্মুক্ত হয় না। আমি কি চেষ্টা করিনি? তার জবাবে আমি নানা রকম হুমকি-ধামকি লাভ করেছি। এখন যদি আবার আমি সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে দূত প্রেরণ করি, তারা ভাববে, সালাহুদ্দীন ভয় পেয়ে গেছে। এখন আমি তাদের উপর আল্লাহ গজব হয়ে নিপতিত হয়ে চাই, যা তাদের বিবেক-বুদ্ধির বন্ধ দুয়ার খুলে দেবে। সেই গজব হচ্ছে তোমরা এবং এই ফৌজ।'

সুলতান আইউবী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন–

'তোমরা হাল্‌ব অবরোধ করার পর হাল্‌বের মুসলমানরা যে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করল, তা তোমরা কখনো ভুলবে না। তারা নিশ্চয় আমাদের বিপক্ষে লড়াই করেছে। কিন্তু আমি তাদের প্রশংসা করি, এমন দুঃসাহসী লড়াই কেবল মুসলমানই লড়তে পারে। হায়! যদি এই চেতনা ও এই শক্তি ইসলামের পক্ষে ব্যবহৃত হত! তোমরা তো জান, আমি রাজা হতে চাই না। আমার লক্ষ্য হল, ইসলামী দুনিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক এবং মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলো কেন্দ্রীভূত হয়ে খৃস্টানদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হোক এবং ফিলিস্তীনকে মুক্ত করে আমরা সালতানাতে ইসলামিয়াকে বিস্তৃত করি।'

'আমরা নিরাশ নই মাননীয় সুলতান!'– এক সালার বললেন– 'নতুন সেনা ভর্তি চলছে। এ অঞ্চলেও বিপুলসংখ্যক যুবক ভর্তি হচ্ছে। মিশর থেকেও বিশেষ সাহায্য আসছে। আমরা আপনার প্রতিটি বাসনাকে পূর্ণ করব ইনশাল্লাহ।'

'কিন্তু তোমরাই বল, আমি কতদিন বেঁচে থাকব?'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমরা-ই বা ক'দিন জীবিত থাকবে? শয়তানী শক্তি দিন দিন জোরদার হচ্ছে। তাদের সীমানার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। যে বন্ধুদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল, তারা খৃস্টানদের হাতে খেলছে আর আমার হাতে খুন হচ্ছে। আল-কিন্‌দ তোমাদের-ই মধ্যকার একজন বিশ্বস্ত সালার ছিল। সেই আল-কিন্‌দ সুদান থেকে হাবশী সৈন্যদের ডেকে এনে মিশর হামলা করার চেষ্টা করেছে শুনে কি তোমরা অবাক হওনি? লোকটা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে যে, সে নিজেই নিজেকে হত্যা করেছে। আমি তাকে মৃত্যুদন্ড দেইনি। ক্ষমতার নেশা, সম্পদের লোভ আর নারীর মোহ ভাল ভাল মানুষকেও অন্ধ করে দেয়।

ঈমান সোনার ন্যায় চমকায় না। ঈমান নারীর ন্যায় বিলাসিতার বস্তু নয়। ঈমান মানুষকে রাজা ও ফেরাউনে পরিণত হতে দেয় না। আত্মার দ্বার বন্ধ করে দেখ, ঈমান নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। তারপর বিবেকের উপর আবরণ পড়ে যাবে।'

'স্পেন থেকে তোমাদের পতাকা হারিয়ে গেল কেন? ইতিহাস বলছে, স্পেনের মুসলমানদের এই পতন ছিল কাফেরদের ষড়যন্ত্রের ফল। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র সফল হল কেন? কারণ, মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদেরকে কাফেরদের ক্রীড়নকে পরিণত করেছিল। তারা তাদের ঈমান নীলাম করে দিয়েছিল। স্পেন ছিল তাদের, যারা সমুদ্র পার হয়ে পারাপারের নৌকাগুলো পুড়ে ফেলেছিল, যাতে পালাবার কিংবা ফিরে যাওয়ার চিন্তা-ই মাথায় না আসে। স্পেনের মূল্য তারা-ই বুঝে, যারা বাহন পুড়ে ফেলেছিল। স্পেন ছিল শহীদদের। খুনের নজরানা আদায় করে যারা রাজ্য জয় করে, তাদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সেই লোকগুলো দেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, যারা এক ফোঁটাও রক্ত ঝরায়নি। ভবিষ্যতেও এমনই ঘটবে। তারা যেহেতু দেশটা বিনামূল্যে পেয়ে যায়, তাই দেশটাকে তারা বিলাসিতার উপকরণে পরিণত করে এবং সিংহাসনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য ঈমানদার দেশপ্রেমী লোকদের জবান বন্ধ করে দেয়, তাদের গলা টিপে ধরে রাখে।'

স্পেনেও এটাই ঘটেছে। কাফেররা আমাদের রাজা-বাদশাহদেরকে হীরা-জহরত ও ইউরোপের সুন্দরী মেয়েদের বিনিময়ে হাত করে নিয়েছিল। তাদেরকে তাদের-ই সৈন্যদের বিপক্ষে দাঁড় করিয়েছিল। মুজাহিদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল। এভাবে স্পেনের ইসলামী রাজ্য ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়। রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সহচরগণ দেহের রক্ত দ্বারা বাতি জ্বালিয়ে আধা পৃথিবীকে সত্যের আলোয় আলোকিত করেছিলেন। সেই চেরাগ এখন কোথায়? সেই চেরাগ এখন একটি একটি করে নিভে যাচ্ছে। সেই চেরাগ এখন রক্ত চায়। কিন্তু রক্ত দেয়া যাদের কর্তব্য ছিল, তারা খৃষ্টানদের মদ ও নারীর নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম কেবলা মুসলমানের হাতছাড়া। আর আমরা মুসলমানরা একজন আরেকজনের রক্ত ঝরাচ্ছি।'

'কাফেরদের আগে গাদ্দারদের হত্যা করা আবশ্যক'– একজন উপদেষ্টা বললেন– 'আমরা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি, তাহলে আমরা ব্যর্থ হব না।'

'আমি দেখতে পাচ্ছি, এই ভূখন্ড খুনের মাঝেই ডুবে থাকবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'শাসনক্ষমতা হয়ত মুসলমানদের-ই হাতে থাকবে; কিন্তু তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর খৃষ্টানরা শাসন করবে।'

❀ ❀ ❀

সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে এমন এক পজিশনে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করে রাখেন যে, কোন একটি দুর্গ জয় হওয়ার পর শত্রুপক্ষ তার উপর সরাসরি হামলা চালাতে পারবে না। তিনি বিজিত দুর্গগুলোতে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছেন। কারণ, তিনি দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে লড়াই করার পক্ষপাতী নন। পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিটি পবর্তচূড়ায় তিনি তীরান্দাজ বসিয়ে রেখেছেন। যে পথটি সংকীর্ণ, তার উপর পাহাড়ে বড় বড় পাথরসহ কিছু লোক নিয়োজিত রেখেছেন। তাদের দায়িত্ব হল, দুশমন এই পথ অতিক্রম করার সময় উপর থেকে পাথর গড়িয়ে ফেলে দিবে। দামেস্ক থেকে আসা পথটিকে তিনি কমান্ডো ধরনের টহল সেনাদের দ্বারা নিরাপদ করে রেখেছেন, যাতে দুশমন তাঁর রসদের কোন ক্ষতি করতে না পারে। একটি জায়গা এমন যে, সেটি 'হামাতের শিং' নামে খ্যাত। প্রশস্ত একটি উপত্যকা। তাতে বেশ উঁচু একটি পাথর বিদ্যমান। পাথরটির মাথা শিং-এর ন্যায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে বলে তাকে 'হামাতের শিং' বলা হয়। সুলতান আইউবী পার্বত্য এলাকায় এই উপত্যকাটিকে ফাঁদ হিসেবে নির্বাচিত করেন। তিনি তার সালারদেরকে কৌশল শিখিয়ে দেন যে, দুশমন যদি বাইরে থেকে এসে যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে এই উপত্যকায় টেনে নিয়ে এসে যুদ্ধ করাবে।

সুলতান আইউবী সমগ্র এলাকায় এমন জায়গাগুলোতে পজিশন গ্রহণ করেছেন যে, সেসব জায়গা থেকে দুশমনকে পছন্দমত যে কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাড়াছাও তাঁর গেরিলা যোদ্ধারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরছে। গুপ্তচরবৃত্তির ব্যবস্থাপনা এতই শক্তিশালী যে, দুশমনের দুর্গগুলোতে পর্যন্ত আইউবীর চর রয়েছে। তারা খবরা-খবর প্রেরণ করছে। সুলতান তথ্য পেয়েছেন, আল-মালিকুস সালিহ তার গভর্নর গোমস্তগীন ও মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনকে সাহায্যের জন্য তলব করেছেন এবং তারা শর্তসাপেক্ষে সাহায্য দেবেন বলে জানিয়েছেন। গুপ্তচররা সুলতানকে আরো অবহিত করে যে, মুসলমান শাসক ও আমীরগণ বাহ্যত আল-মালিকুস্-সালেহের সাথে ঐক্যবদ্ধ হলেও তাদের মাঝে পরস্পর মনের মিল নেই। তারা প্রত্যেকেই যুদ্ধ করে অধিক থেকে অধিকতর ভূখণ্ডে নিজ নিজ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে। খৃস্টানরা তাদেরকে যত না সাহায্য দিচ্ছে, উস্কানি দিচ্ছে তার চে' বেশি। তারা তাদের পারস্পরিক মতবিরোধকে জিইয়ে রাখার চেষ্টায় লিপ্ত।

'আচ্ছা, শামসুদ্দীন এবং শাদবখত-এর কোন সংবাদ আসেনি, না?' সুলতান আইউবী হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন।

'না, তাজা কোন সংবাদ আসেনি'– হাসান বিন আব্দুল্লাহ জবাব দেন– 'তারা বড় সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। গোমস্তগীন কোন পদক্ষেপ নিলে তারা তাদের যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাবে। তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, তারা পরিস্থিতি অনুপাতে অভিযান পরিচালনা করবে।'

হাসান বিন আব্দুল্লাহ সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মকর্তা– আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব। আলী বিন সুফিয়ান বর্তমানে মিশরে অবস্থান করছেন। সেখানকার পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। মিশরে তাকে একান্ত প্রয়োজন।

সুলতান আইউবী হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর সঙ্গে বাইরে পায়চারি করছেন। হঠাৎ করেই তিনি শামসুদ্দীন ও শাদবখত-এর প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেন। এরা দু'জন বর্তমানে গোমস্তগীনের সেনাঅধিনায়ক। গোমস্তগীন নামে মুসলমান হলেও শয়তান চরিত্রের একজন লোক। পদমর্যাদায় আল-মালিকুস সালিহ্-এর গভর্নর। অবস্থান করছেন হাররান-এর দুর্গে। এই দুর্গের ভিতরে ও বাইরে তিনি বিপুলসংখ্যক সৈন্য সমবেত করে রেখেছেন। লোকটা তথাকথিত খেলাফতের অধীন এবং খলীফার অনুগত। কিন্তু বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার বলে সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন অবস্থান তৈরি করে রেখেছেন যে, কাউকে তিনি পাত্তা-ই দিচ্ছেন না। কেন্দ্রকে উপেক্ষা করে খৃস্টানদের সঙ্গে রয়েছে তার ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক। তার দুর্গে নুরুদ্দীন জঙ্গীর ধৃত খৃস্টান কয়েদী ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন কমান্ডারও ছিল। জঙ্গীর মৃত্যুর পর কারো সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করেই তিনি তাদেরকে মুক্ত করে দেন। এটা করেছেন তিনি খৃস্টানদের সন্তুষ্টি ও সুদৃষ্টি লাভের আশায়। গোমস্তগীন এখন খৃস্টানদের বিরোধী নয়। বরং তাদের সাহায্য নিয়ে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

গোমস্তগীনের দু'জন বিশেষ সালার রয়েছে। বিচক্ষণতা ও সামরিক যোগ্যতার কারণে তারা তার অত্যন্ত আস্থাভাজন। তারা দু'জন আপন ভাই। একজনের নাম শামসুদ্দীন, অপরজনের নাম শাদবখত। দু'জন ভারতীয় মুসলমান। ইরাকের তৎকালীন ঐতিহাসিক কামালুদ্দীন 'হালবের ইতিহাস' নামক একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– 'শামসুদ্দীন ও শাদবখত সহোদর ভাই ছিলেন এবং সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর জীবদ্দশায় ভারত উপমহাদেশ থেকে তাঁর নিকট গিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করে হাররান প্রেরণ করেছিলেন।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদও তাঁর রোজনামচায় এদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এও লিখেছেন– 'আরবে যেহেতু মানুষের নামের সঙ্গে পিতার নামও উল্লেখ করার নিয়ম ছিল, তাই এই দু'ভাই-এর নাম শামসুদ্দীন আলী বিন জিয়া এবং শাদবখত আলী বিন জিয়া বলে উল্লেখ করা হত। কিন্তু এই জিয়া কে ছিলেন, তার কোন বিবরণ ইতিহাসে উল্লেখ নেই। তারা ইতিহাসে আলোচিত হওয়ার পিছনে একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটা এরকম–

গোমস্তগীন ছিলেন স্বাধীনচেতা, তথা স্বেচ্ছাচারী চরিত্রের মানুষ। হাররানে কার্যত তারই শাসন চলত। তিনি ইবনুল খাশিব আবুল ফজল নামক তার অনুগত এক ব্যক্তিকে কাজী তথা বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ইবনুল খাশিব ছিল চাটুকার ও দুশ্চরিত্র মানুষ। ইসলামের কাজীগণ তাদের ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞার কারণে মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ। কিন্তু জনসমাজে ইবনুল খাশিবের খ্যাতি ছিল অবিচার ও গোমস্তগীনের চাটুকারিতার কারণে। শামসুদ্দীন ও শাদবখত তার অন্যায়-অবিচারের কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তারা কিছু বলতেন না। তারা দেশের সামরিক শাখার কর্মকর্তা। কাজীর বিচার-ফয়সালা ও নাগরিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। গোমস্তগীনের উপর কাজী সাহেবের বেশ প্রভাব ছিল। প্রভাব তিনি সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। গোমস্তগীন তাকে কিছু বলতে সাহস করতেন না।

নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর শত শত সৈন্য নিয়ে সুলতান আইউবী যখন দামেস্ক আসেন, তখন তিনি অত্র অঞ্চলগুলোতে তাঁর বহু গুপ্তচর ছড়িয়ে দেন। তাদের একজনের নাম আনতানুন। আনতানুন তুর্কী বংশোদ্ভূত সুদর্শন এক যুবক। তুর্কী ভাষা ছাড়াও আরবীতে কথা বলতে পারে অনর্গল। দায়িত্ব পালনার্থে আনতানুন চলে যায় হাররান। সাক্ষাৎ করে গোমস্তগীনের সঙ্গে। গোমস্তগীনকে নিজের কাহিনী শোনায়– গড়া কাহিনী।

'আমি জেরুজালেমের বাসিন্দা। খৃস্টানরা সেখানকার মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে। তারা আমার দু'টি যুবতী বোনকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে এবং ভাই ও পিতাকে আটক করে রেখেছে। আমি পালিয়ে আপনার নিকট চলে এসেছি। আমি খৃস্টানদের থেকে এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীতে যোগ দিতে চাই।'

আনতানুন এমন একটা বেশ ধারণ করে রেখছিল যে, তাতে মনে হচ্ছিল, সে জেরুজালেম থেকে পায়ে হেঁটে এসেছে এবং ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে শোচনীয় অবস্থা। গোমস্তগীন তার প্রতি সেনানায়কের দৃষ্টিতে তাকান। তার দৈহিক গঠন তার

পছন্দ হয়। তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি ঘোড়সওয়ারী ও তীরান্দাজী জান? জবাবে আনতানুন বলল, এ মুহূর্তে আমার খানিক বিশ্রাম ও খাবার প্রয়োজন। তারপর দেখাব, আমি কী জানি। গোমস্তগীন তাকে খানা খাইয়ে শুইয়ে দেন। দীর্ঘক্ষণ পর ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তাকে গোমস্তগীনের দরবারে হাজির করা হয়। গোমস্তগীন একটি ঘোড়া তলব করেন। আনতানুনকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে এক দেহরক্ষীর ধনুক ও একটি তীর দিয়ে বললেন, তুমি তোমার খুশীমত কোথাও নিশানা করে যোগ্যতার প্রমাণ দাও। তারপর ঘোড়া দৌড়াও।

নিকটেই একটি বৃক্ষ ছিল। তার ডালে নানা প্রজাতির কতগুলো পাখি বসা। সবচে' ছোট পাখিটি হল চড়ুই। আনতানুন চড়ুইটিকে নিশানা করে তীর ছোঁড়ে। তীর পাখিটির গায়ে বিদ্ধ হয়ে তাকে নিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আনতানুন আরো একটি তীর চেয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে এবং বলে, আমি ফিরে আসলে তোমরা কোন একটি বস্তু আকাশে ছুঁড়ে মারবে। গোমস্তগীনের এক দেহরক্ষী সেখানে দাঁড়ান ছিল। সে দৌড়ে গিয়ে তার খাওয়ার থালাটা নিয়ে আসে। আনতানুন ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে যায়। বেশ কিছুদূর গিয়ে আবার পিছন দিকে মোড় নেয়। এবার ধনুকে তীর সংযোজন করে। এক দেহরক্ষী থালাটা শূন্যে নিক্ষেপ করে। আনতানুন ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে থালাটা লক্ষ করে তীর ছোঁড়ে। তীরের আঘাত খেয়ে থালা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে অশ্বচালনার আরো কিছু কৃতিত্ব প্রদর্শন করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। উপস্থিত কারুর-ই জানা ছিল না যে, আনতানুন একজন অভিজ্ঞ গুপ্তচর ও কমান্ডো সেনা।

আনতানুনের দৈহিক কাঠামো, গাত্রবর্ণ ও যোগ্যতা দেখে গোমস্তগীন অত্যন্ত প্রীত ও প্রভাবিত হন এবং তাকে তারই দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেন। গোমস্তগীনের বাসভবন পাহারা দেয়ার দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত হয়।

একবারের ঘটনা। আনতানুন গোমস্তগীনের বাসভবন প্রহরায় নিয়োজিত। এ দায়িত্ব তাকে লাগাতার আট-দশদিন পালন করতে হবে। বিলাসপ্রিয় মুসলিম শাসকদের ন্যায় গোমস্তগীনের হেরেমও জাঁকজমকপূর্ণ। বার-চৌদ্দটি সুন্দরী মেয়ে বাস করে তার হেরেমে। আনতানুন ডিউটিতে গিয়েই প্রথমে ভবনের প্রতিটি দরজা-জানালা ও প্রতিটি কোণ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নেয়। ভবনের সকল চাকর-চাকরানী ও মেয়েদের বলল, যেহেতু এই ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ করা আমার কর্তব্য, তাই এর প্রতিটি স্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া আমার আবশ্যক। ঘরের প্রতিটি কক্ষের কোথায় কী আছে, আমার জানা থাকতে হবে।

আনতানুন অত্যন্ত চতুর মানুষ। কথার যাদু চালাতে পারঙ্গম। হেরেমের সর্বত্র অবাধ যাতায়াতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকতে দিল না সে। বারান্দায় একটি মেয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। মেয়েটি গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে? এখানে কী করছ?'

'আমি এই ভবনের মোহাফেজ সৈনিক'– আনতানুন জবাব দেয়– 'ভবনে প্রবেশ-নির্গমনের দরজা ক'টি, কিরূপ ও কোথায় কোথায়, তা ঘুরে-ফিরে দেখছি। এও দেখছি যে, আপনি ছাড়া এখানে আর কারা থাকে।'

'এখানে মোহাফেজ তো এর আগেও ছিল'– মেয়েটি খানিক বিস্মিত কণ্ঠে বলল– 'তাদের কেউ-ই তো কখনো ভিতরে প্রবেশ করেনি! এই রীতি আমি পছন্দ করি না।'

'এটা আমার কর্তব্য'– আনতানুন বলল– 'হেরেম থেকে একটি মেয়েও যদি হারিয়ে যায়, তার জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

'ও, তার মানে তুমি তোমার বোনের হেফাজতের জন্য এসেছ'– মেয়েটি মুচকি হেসে বলল।

'আজ তার হেফাজত যদি আমি করতে পারতাম, তাহলে আজ একটি মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারত না, তুমি কে? এখানে কী করছ?'– আনতানুন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– 'আমি আমার বোনটাকে রক্ষা করতে পারিনি। তাই আপনার রক্ষণাবেক্ষণে আমি পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করছি। সেও দেখতে আপনার-ই মত ছিল। আপনি আমার কর্মতৎপরতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না।'

আনতানুন অন্ধকারে যে তীর ছুঁড়ল, সেটি নিশানায় গিয়ে আঘাত হানল। সে মেয়েটির আবেগের উপর তীর ছুঁড়েছিল। মেয়েটিও যুবতী। সে জিজ্ঞেস না করে পারল না, তুমি তোমার যে বোনকে রক্ষা করতে পারনি, তার কী হয়েছিল? তোমার বোনকে কি কেউ অপহরণ করেছিল?'

'অপহরণকারীরা যদি মুসলমান হত কিংবা যদি নিজে কোন মুসলমানের সঙ্গে পালিয়ে যেত, তাহলে আমার এত দুঃখ হত না'– আনতানুন বলল– 'অন্তরকে এই বলে সান্ত্বনা দিতাম, কেউ না কেউ তাকে বিয়ে করে নেবে নতুবা কোন মুসলিম আমীরের হেরেমে পৌছে যাবে। আমার বোনটাকে অপহরণ করেছে খৃস্টানরা। একটি নয়– দু'টি বোন। আমি তাদেরকে রক্ষা করতে পারিনি!'

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল– 'তারা কোথা থেকে কিভাবে অপহৃত হয়েছে?' আনতানুন সেই জেরুজালেমের কাহিনী শোনায় এবং নিজের পালিয়ে বাঁচার ও

এখানে আসার কাহিনী এমন আবেগময় ভঙ্গিতে বিবৃত করে যে, মেয়েটির চেহারা বলছে, সে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে, যেন আনতানুনের ছোঁড়া তীর তার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। আনতানুন বলল– 'আমি জেরুজালেম থেকে পায়ে হেঁটে এখানে এই প্রত্যয় নিয়ে এসেছি যে, সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজে যোগ দিয়ে শুধু নিজের বোনদের-ই নয়, ঐ সমস্ত বোনেরও প্রতিশোধ নেব, যাদেরকে খৃস্টানরা অপহরণ করেছে। দুর্গপতি আমাকে তার মোহাফেজ বাহিনীতে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন।'

আনতানুন আরো এমন কিছু আবেগময় কথা বলল, যা মেয়েটির অন্তরে গেঁথে গেছে।

আনতানুন ভালভাবেই জানে, হেরেমের মেয়েদের আবেগ-চেতনা স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। কিন্তু স্বভাব-চরিত্রে তারা দুর্বল। কারণ স্পষ্ট। একজন পুরুষের যদি এক ডজন কিংবা আরো বেশি বউ বা রক্ষিতা থাকে, তাহলে একজনও দাবি করতে পারে না, স্বামী আমাকেই কামনা করে। আর যখন রক্ষিতাগুলোকে বিবাহ ব্যতীত হেরেমে আবদ্ধ করে রাখা হয়, তাহলে তো তারা স্বামীর ভালবাসার কল্পনাও করতে পারে না। যুবতী মেয়েদের আলাদা কিছু আবেগ থাকে। হেরেমের মেয়েরা জানে, বছর কয়েক পর তার কোন মূল্য থাকবে না। আনতানুন জানে, হেরেমের মেয়েরা তাদের স্বপ্ন-সাধ চাপা দিয়ে রাখে এবং স্বামী কিংবা মনিবের কোন যুবক বন্ধু, অন্য কোন যুবক বা কোন সুদর্শন চাকরের সঙ্গে প্রেম-ভালবাসার নেশা পূর্ণ করে।

এই মেয়েটি ঘটনাক্রমে আনতানুনের সম্মুখে এসে পড়ে। তাই সে তার আবেগ নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করে। সফল গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তাকে হেরেমের একটি মেয়ের সঙ্গে খাতির পাতানো আবশ্যকও বটে। প্রশিক্ষণের সময় তাকে জানানো হয়েছে যে, গোমস্তগীনের ন্যায় বিলাসী গভর্নর ও আমীরগণ নাচ-গান ও মদের আসর বসিয়ে থাকে। তাতে হেরেমের মেয়েরাও যোগ দেয়। মদ আর নারীর নেশায় তাদের জবান নিয়ন্ত্রণ হারিয় ফেলে। ফলে এই আসরগুলোতে গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়। আনতানুন আলী বিন সুফিয়ানের হাতেগড়া গুপ্তচর। দায়িত্ব পালনের স্বার্থে সুলতান আইউবী তাকে পর্যাপ্ত অর্থ ও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রেখেছেন।

আনতানুন মেয়েটির উপর এমন প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলে যে, তার চেহারা থেকেই তা প্রতিভাত হচ্ছে। তার মনে আশাবাদ জাগতে শুরু করে, মেয়েটি তার জালে আটকা পড়বে। কথোপকথন শেষে সে স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত

হলে মেয়েটি তাকে চাপাকণ্ঠে বলল–

'মহলের পিছনে একটি বাগান আছে। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে ওখানে গিয়েও তদারকি করে নিও। ওদিক থেকে কেউ মহলে প্রবেশ করতে পারে।' মেয়েটির ঠোঁটে মুচকি হাসি। মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলেছে সে।

রাতে পাহারা দেয়া বডিগার্ডদের দায়িত্ব নয়। তারা মূল্যবান পোশাক পরিধান করে চকমকে তরবারী কিংবা বর্শা হাতে নিয়ে প্রধান ফটকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। বডিগার্ডদের কর্তব্য মনিবকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তাদের আসল কাজ হল যুদ্ধের ময়দানে মনিবের সঙ্গে থাকা।

আনতানুন রাতের দ্বিতীয় প্রহরে মহলের পিছনের বাগিচায় গিয়ে পায়চারি করতে শুরু করে। মহলের ভিতর থেকে গান-বাজনা ও নাচের শব্দ কানে আসছে। আনতানুন আগত মেহমানদেরকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের দু'-তিনজন খৃস্টান। বেশ কিছুক্ষণ বাগিচায় হাঁটাহাঁটি করার পর পিছন দরজা দিয়ে মেয়েটি বের হয়ে তার নিকট চলে আসে।

'আপনি কেন এসেছেন?' আলতানুন যেন কিছু-ই জানে না।

'তুমি কেন এসেছ?'– মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'আপনার নির্দেশ পালন করার জন্য'– আনতানুন জবাব দেয়– 'আপনি আদেশ করেছিলেন, রাতের দ্বিতীয় প্রহরে বাগিচায় এসে দেখতে, মহলের পিছন দিক থেকে অনুপ্রবেশের কোন সুযোগ আছে কিনা। আচ্ছা, আপনি এত সরগরম আসর ছেড়ে বাইরে আসলেন কেন?'

'ওখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'মদের ঘ্রাণে আমার মাথা ধরে যায়।'

'আপনি মদপান করেন না?'– আনতানুন জিজ্ঞেস করে।

'না'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'এখানকার কোন কিছুতে-ই আমি অভ্যস্ত নই। তুমি বস।' মেয়েটি একটি পাথরের উপর বসতে বসতে বলল।

'আমি একজন রাণীর সমান হওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারি না'– আনতানুন বলল– 'কেউ যদি দেখে ফেলে?'

'যারা দেখবে, তারা মদে মাতাল হয়ে আছে'– মেয়েটি বলল– 'তুমি বস এবং বোনদের কাহিনী শোনাও।'

আনতানুন তার বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাতে শুরু করে। মেয়েটি তার ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে। আনতানুনের বোনদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সে নিজের কথা বলতে

শুরু করে। আনতানুন তার মনের সব গরিমা পানি করে দিয়েছে। এক পর্যায়ে আনতানুন তাকে পরিমাপ করার জন্য বলল– 'এবার আপনার চলে যাওয়া উচিত। দুর্গপতি আপনার সন্ধানে লোক পাঠাতে পারেন। তখন চরম বিপত্তি দেখা দেবে।' মেয়েটি বলল– 'আমার অনুপস্থিতি কেউ টের পাবে না। ওখানে মেয়ের অভাব নেই।'

আনতানুন আগামী রাতে আবার দেখা হবে বলে চলে যায়।

মেয়েটি আনতানুনকে নিজের ব্যাপারে যা বলেছে, তা হল, সে মদ-মাদকতাকে ঘৃণা করে। তাকে যে ভোগের উপকরণ বানানো হয়েছে, তাতেও তার ঘৃণা। সে হাল্‌বের বাসিন্দা। তার পিতার এক বন্ধু তাকে গোমস্তগীনের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং নামমাত্র বিবাহ পড়িয়ে পিতা তাকে বিদায় করে দিয়েছেন।

পরদিন রাতেও দু'জনের সাক্ষাৎ হয়। এবার আগে আসে মেয়েটি। এসে আনতানুনকে না পেয়ে অস্থির হয়ে পড়ে সে। কিছু সময় অপেক্ষা করার পর আনতানুন এসে হাজির হয়। মেয়েটি প্রথমেই বলল– 'যদি তুমি আমাকে একটি রূপসী মেয়ে মনে করে অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তাহলে ফিরে যাও। তোমার নিকট আমার এরূপ কোন মনোবাসনা নেই।'

'যদি কখনো আমি তোমার নিকট অসৎ মনোবাসনা প্রকাশ করি, তখন তুমি আমার মুখে থু থু নিক্ষেপ করে চলে যেও'– আনতানুন বলল– 'আমি তোমাকে আমার বোনদের-ই ন্যায় পবিত্র মনে করি।'

'না, আমাকে তুমি তোমার বোনদের সঙ্গে তুলনা কর না'– মুখের গাম্ভীর্যকে মুচকি হাসিতে পরিবর্তন করে মেয়েটি বলল– 'কখন কী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসি বলা যায় না।'

'তার মানে তুমি আমার সঙ্গে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার মতলব আঁটছ?' আনতানুন বলল।

'এটা নির্ভর করে তোমার উপর'– মেয়েটি বলল– 'চিরজীবন তো আর লুকিয়ে চলা যাবে না। এখানে তুমি আট-দশদিনের জন্য এসেছ। চলে যাওয়ার পর তোমার মুখটা মনে পড়লে আমি বেজায় কষ্ট পাব।'

এক রাতেই তারা একজন অপরজনের হৃদয়রাজ্যে আসন গেড়ে ফেলে। পরদিন মেয়েটি এতই অস্থির ও বেচাইন হয়ে পড়ে যে, আনতানুনকে দিনের বেলায়ই তার কক্ষে ডেকে নিয়ে যায়। সেদিন গোমস্তগীন মহলে ছিলেন না। হাররানের বাইরে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎ তাদের উভয়ের জন্য-ই ছিল বিপজ্জনক। মেয়েটি আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে ভুলে গেছে, এই

মহলে ষড়যন্ত্র চলে এবং হেরেমের মেয়েরা একজন অপরজনকে স্বামী থেকে দূরে সরিয়ে রাখার সুযোগের সন্ধানে থাকে। কিন্তু আনতানুনের ব্যক্তিত্ব ও তার যাদুমাখা বক্তব্য তাকে অন্ধ করে ফেলে। এ হল প্রেম-পিপাসার ফল। আনতানুন তাকে কল্পনা করতেও সুযোগ দেয়নি যে, তার দেহ নিয়ে তার কোন আগ্রহ আছে। মেয়েটির জন্য সে আপাদমস্তক হৃদ্যতার রূপ ধারণ করে। আনতানুন যখন কক্ষ থেকে বের হয়, তখন মেয়েটির মানসিক অবস্থা এই ছিল, যেন এক্ষুণি সে তার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।

দুপুর রাতে তাদের পুনরায় মিলন হওয়ার কথা।

আনতানুন যখন মেয়েটির কক্ষ থেকে বের হয়, তখন অপর একটি মেয়ে তাকে দেখে ফেলে। এই মেয়েটি কক্ষে প্রবেশ করার সময়ও তাকে দেখেছিল।

✿ ✿ ✿

গোমস্তগীন রাতেও ফিরে আসেননি। মেয়েটি নির্দিষ্ট সময়ে বাগানে চলে যায়। আনতানুনও এসে পড়ে। এবার তাদের মাঝে কোন অন্তরায় নেই, না কোন প্রতিবন্ধকতা। খোলামেলা কথা বলছে দু'জন।

'তুমি বলেছিলে, তোমার বোনদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তুমি সুলতান আইউবীর ফৌজে যোগ দিতে এসেছ'– মেয়েটি বলল– 'তাহলে এই বাহিনীতে ভর্তি হলে কেন?'

'এটা কি সুলতান আইউবীর ফৌজ নয়?'– আনতানুন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, যেন সে কিছুই জানে না– 'এটাও তো ইসলামী ফৌজ। সুলতান আইউবী ছাড়া আর কার হতে পারে এ বাহিনী?'

'এ ফৌজ ইসলামী বটে'– মেয়েটি বলল– 'কিন্তু এদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।'

'তাই নাকি?'– আনতানুনের কণ্ঠে বিস্ময়, কপালে ভাজ– 'এতো বড় দুঃসংবাদ! তোমার ধারণা কী? যে ফৌজ সুলতান আইউবীর বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, আমার কি সে বাহিনীতে থাকা ঠিক হবে? তুমি হয়ত জান না, খৃস্টানরা জেরুজালেমসহ যেসব অঞ্চল দখল করে আছে, সেসব অঞ্চলের মুসলমানরা সুলতান আইউবীকে মাহদী বলে বিশ্বাস করে। তাদের সর্বক্ষণ খৃস্টানদের অত্যাচারের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। মসজিদের ইমামগণ বলছেন– 'এ জাতি তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করছে। দামেস্ক থেকে সালাহুদ্দীন আইউবীর রূপ ধারণ করে মাহদী আমাদেরকে মুক্ত করতে আসছেন। তুমি বল, এমতাবস্থায় আমি কী করব?'

'যদি সাহস হয়, আমাকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাও'– মেয়েটি বলল– 'আমি তোমাকে সুলতান আইউবীর বাহিনীর নিকট নিয়ে যাব। এই ফৌজে থাকা তোমার ঠিক হবে না। তবে আমাকে এখানে ফেলে তুমি পালিয়ে যাবে, তা হতে দেব না।'

'তুমি এখান থেকে পালাতে চাও কেন?'– আনতানুন জিজ্ঞেস করে– 'স্বামী তোমাকে দাসীর মত করে রেখেছে, সেজন্য, নাকি স্বামী বৃদ্ধ, সেকারণে? নাকি লোকটি সুলতান আইউবীর বিরোধী, সেজন্য?'

'আমি লোকটাকে ঘৃণা করি'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'যে ক'টি কারণে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা তুমি নিজেই বলে ফেলেছ। লোকটা আমাকে দাসীর ন্যায় হেরেমে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া সে বৃদ্ধও। সবচে' বড় কারণ, গোমস্তগীন সুলতান আইউবীর দুশমন, খৃস্টানদের দোস্ত। তার হেরেমে আসার আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি বিয়ে করব না। নুরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট গিয়ে বলব, আপনি আমাকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করুন। আমি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর নাম জানতাম। তীরান্দাজী এবং নিশানামত বর্শা নিক্ষেপ করা শিখেছি। কিন্তু দেশদ্রোহী ও ইসলাম বিরোধী এই লোকটার হেরেমে আবদ্ধ করে আমার সেই চেতনাকে মদের পেয়ালায় ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। আশা করি, তুমি বিশ্বাস করবে, এই দুর্গে এসে প্রথমে আমি খুশী হয়েছিলাম যে, আমি এমন একজন বীর যোদ্ধার স্ত্রী হয়ে এসেছি, যিনি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে নিজের জীবনকে কোরবান করে দিয়েছেন। কিন্তু নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পরক্ষণেই লোকটা সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।'

'তিনি কি কখনো সুলতান আইউবীর মুখোমুখি হয়েছেন?' আনতানুন জিজ্ঞেস করে।

'হন্‌নি– মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'লোকটা গভীর পানির মাছ। খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার দরবারী আমীরগণ তার বন্ধু। তারা সবাই সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। গোমস্তগীন তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন যে, তিনি তাদেরকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন। তিনি চাচ্ছেন, খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে স্বাধীনভাবে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। যুদ্ধ করে বিপুল এলাকা দখল করে নিতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদী। তা-ই যদি হয়, তাহলে তিনি হাররান এবং অন্যান্য বিজিত এলাকার সম্রাট হয়ে যাবেন।'

'তুমি কি কখনো তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছ?'

'বলেছি'– মেয়েটা জবাব দেয়– 'তিনি আমাকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। আমি সুলতানকে আমার পীর বলে মান্য করি। গোমস্তগীনের বক্তব্য আমার মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। ফলে তারপর থেকেই তিনি আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেন। তিনি আমাকে মারধরও করতেন। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন– 'তুমি সুলতান আইউবীর এলাকায় চলে যাও। তুমি যুবতী মেয়ে, রূপসীও। আইউবীর তিন-চারজন সালারকে তোমার রূপের ফাঁদে ফেলে তার বিপক্ষে দাঁড় করাও।' তিনি আরো বললেন– 'আমি তোমার সঙ্গে আরো দু'টি বিচক্ষণ ও সুন্দরী মেয়ে দেব। তারা হবে খৃস্টান। চেষ্টা করলে তিনজন মিলে পাহাড়কেও অনুগত বানিয়ে ফেলতে পারবে। তিনি আমাকে কৌশল শিখিয়ে দিয়ে বললেন– 'যাও, তুমি গিয়ে গোয়েন্দাগিরি কর। যদি সাফল্য দেখাতে পার, তাহলে তোমার পরিবারকে আমি বিপুল সোনা-দানা দান করব। তারা তোমাকে এখন মুক্ত করে নিয়ে সম্ভ্রান্ত কোন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিবে। কিন্তু আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি।'

'কেন, তুমি প্রস্তাবটা মেনে নিতে!' আনতানুন বলল– 'এখান থেকে বেরিয়ে তুমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট চলে যেতে!'

'ঐ শয়তানটা আর তার খৃস্টান বন্ধুরা'– মেয়েটি বলল– 'এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে যে, কোন মেয়ে কিংবা পুরুষ গুপ্তচর যদি তাদের শত্রুর এলাকায় গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে তাকে হয়ত অপহরণ করে নিয়ে আসে নতুবা ওখানেই খুন করে ফেলে। হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতক দলের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক আছে। আমার আত্মা মরে গিয়েছিল। রয়ে গিয়েছিল শুধু দেহটা। একবার ভেবেছিলাম, তুমি যা বলেছ, সে ভাবেই মরব। কিন্তু সাহস হয়নি। অবশেষে আমি তোমাকে দেখলাম। তুমি আমার ঘনিষ্ঠ হয়েছ। এখন আমার আত্মা পুনরায় জীবন লাভ করল। তোমার অনুগ্রহ আমি জীবনেও ভুলব না যে, তুমি আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়েছ। কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট নয়। আস, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই।'

'তুমি এখানেই– এই দুর্গেই খৃস্টান ও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পার।'

'তা কিভাবে?'

'তোমার মনিব গোমস্তগীন যেমন তোমাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এলাকায় পাঠাতে চান, তদ্রূপ সুলতান আইউবীরও গুপ্তচর প্রয়োজন, যারা

এখানে অবস্থান করে তাঁকে এদের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করবে।'

'তুমি কিভাবে জানলে যে, সুলতান আইউবীর গুপ্তচর প্রয়োজন?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'আমি স্বয়ং সুলতান আইউবীর প্রেরিত গোয়েন্দা।' আনতানুন বলল। শুনে মেয়েটি এমনভাবে চমকে উঠে, যেন কেউ তার বুকে খঞ্জরের আঘাত হেনেছে।

'কী , অবাক্ হলে? মিথ্যা বলিনি। আমি জেরুজালেম থেকে নয়- কায়রো থেকে এসেছি। আমার কোন বোনও অপহরণ হয়নি।'

'তাহলে তো যেখানে তুমি এতগুলো মিথ্যা বলেছ, সেখানে তোমার এই দাবিও মিথ্যা যে, তুমি আমাকে ভালবাসা দিয়েছ!'- মেয়েটি বলল- 'তোমার প্রেম, তোমার প্রতিশ্রুতি সবই মিথ্যা!'

'আমি যে তোমাকে ভালবাসি, তার প্রমাণ হল, আমি আমার গোপনীয়তা তোমাকে ফাঁস করে দিয়েছি'- আনতানুন বলল- 'এক কথায় বলতে পার, আমি আমার জীবনটা তোমার দু'হাতে অর্পণ করেছি। এখন তুমি গোমস্তগীনকে আমার আসল পরিচয় বলে দিয়ে আমাকে খুন করাতে পার। কোন গুপ্তচর তার আসল পরিচয় ফাঁস করে না। কিন্তু তোমার আবেগ ও ভালবাসা আমাকে বাধ্য করেছে তোমাকে আমার আসল পরিচয়টা বলে দিতে। আমি তোমার প্রতি আমার ভালবাসার দ্বিতীয় প্রমাণ তখন দেব, যখন আমি এখানকার কর্তব্য সম্পাদন করে ফিরে যাব। আমি একা যাব না- তোমাকে নিয়ে যাব। তবে একটি কথা স্পষ্ট শুনে রাখ, যদি কখনো তোমার ভালবাসা আর আমার কর্তব্যের মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয়- অর্থাৎ যদি আমি এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ি যে, হয়ত তোমাকে বরণ করে নেব, নতুবা দায়িত্ব পালন করব, তাহলে আমি দায়িত্বকেই প্রাধান্য দেব। তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করব না- তোমার ভালবাসাকে কোরবান করে দেব। তুমি হয়ত জান না, একজন গুপ্তচরের কর্তব্য তার নিকট থেকে কিরূপ কোরবানী দাবি করে। একজন সৈনিক যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করে জীবন দেয়। বন্ধুরা তার লাশটাকে পরিজনের নিকট পৌঁছিয়ে দেয় এবং সম্মানের সাথে দাফন করে। কিন্তু গোয়েন্দা নিহত হয় না- বন্দী হয়। দুশমন তাকে কয়েদখানায় নিয়ে এমন সব নির্যাতন করে, যা শুনলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে। গুপ্তচর মরেও না, বাঁচেও না। গুপ্তচরের জন্য লোহার ন্যায় শক্ত ঈমান আবশ্যক। আমি তেমনই ঈমান নিয়ে এসেছি। আমি তোমার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেছি বটে; কিন্তু আমি লোহার ন্যায় শক্ত থাকব, ঈমান থেকে একবিন্দু নড়তে পারব না।'

মেয়েটি আনতানুনের ডান হাতটা নিজের দু'হাতে চেপে ধরে টেনে নিয়ে চুমো খায়। তারপর আবেগজড়িত কণ্ঠে বলল– 'তুমি আমাকেও তদ্রূপ শক্ত পাবে। বল, আমি কী করব?'

আনতানুন মেয়েটিকে সবক দিতে শুরু করে– 'তুমি গান-বাদ্য ও মদের প্রতিটি আসরে উপস্থিত থাকবে। খৃস্টানদের ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের কথা-বার্তা শুনবে। প্রয়োজন হলে দু'-এক চুমুক পানও করবে। তাদের সামনে সুলতান আইউবীকে মন্দ বলবে। এভাবে এই সালারদের মনের কথা বের করে আনবে যে, তাদের সামরিক পরিকল্পনা কী। খৃস্টানদের কথা-বার্তা মনোযোগ সহকারে শুনবে।'

আনতানুন তাকে হিন্দুস্তান থেকে আসা দু'সালার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

'শামসুদ্দীন আলী ও শাদবখত আলীকে আমি ভালভাবেই চিনি'– মেয়েটি বলল– 'গোমস্তগীন তাদের ছাড়া এক পাও হাঁটতে পারেন না। তারা প্রায়ই এখানে আসেন এবং রং-তামাশায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তারা মদপান করেন না।'

'তুমি তাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে যাও'– আনতানুন বলল– 'কথা প্রসঙ্গে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আলরিস্তানে বরফ গলছে কি? তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি আলরিস্তান যাচ্ছ নাকি? তুমি মুচকি হেসে বলবে, ইচ্ছা আছে।। তারপর তারা তোমাকে আরো কিছু কথা জিজ্ঞাসা করবে। সম্ভবত জিজ্ঞাসা করবে, ওদিক থেকে কে এসেছে? তুমি বলবে, তিনি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।'

'আমি কিছুই বুঝলাম না'– মেয়েটি বলল।

'সবই বুঝবে'– আনতানুন বলল– 'আমি তোমাকে কখনো এসব ঝামেলায় ফেলতাম না সাদিয়া! কিন্তু কর্তব্যের দাবি, প্রিয়তম বস্তুটিকেও কর্তব্যের পথে কোরবান করে দেই। তুমি আমাকে কোরবানী করে দাও, আমি তোমাকে কোরবান করে দেব। ভয় পেও না সাদিয়া! জানা নেই, ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য কিরূপ বিপদ ও কিরূপ পরীক্ষা নিয়ে আসছে। আমরা দু'জন যদি বন্দীশালার জাহান্নামে চলে যাই, কিংবা যদি নিহত হই, তবু আমাদের রক্ত বৃথা যাবে না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ভুলবেন না। মনে রেখ, রক্ত ছাড়া ইসলামকে হেফাজত করা যায় না।'

'তুমি আমাকে দৃঢ়পদ পাবে'– সাদিয়া বলল– 'তুমি আমার সেই চেতনাটাও জীবিত করে দিয়েছ, যার ব্যাপারে আমি মনে করতাম, সে মরে গেছে।'

✿ ✿ ✿

আনতানুন ফিরে যায়। সাদিয়া তার প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

আনতানুন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে সাদিয়া অনুভব করল, এখানে সে একা নয়– তার পার্শ্বে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সাদিয়া। হেরেমের-ই একটি মেয়ে দন্ডায়মান। সাদিয়ার-ই ন্যায় রূপসী যুবতী সে। মেয়েটি বলল– 'সাদিয়া! তুমি কি এই ভালবাসার পরিণতি চিন্তা করে দেখেছ? তুমি স্বাধীন নও। আমার আবেগ-চেতনাও তোমারই ন্যায়। আমিও খাঁচা ভেঙ্গে উড়ে যেতে চাই। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। আমাদের ভাগ্যে যা লেখা ছিল, আমরা পেয়ে গেছি। আমাদের মনের বাসনাকে অবদমিত করে চলতে হবে। আর চিত্তবিনোদনের একটা উপায় যদি বের করতেই হয়, তাহলে লোক অনেক আছে। একজন রক্ষীসেনাকে তুমি এত বড় মর্যাদা দিও না।'

'কোন্ রক্ষীসেনার কথা বলছ?'– সাদিয়া মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কী বলছ?'

'দেখ, আমি তোমাদের কথোপকথন পুরোটাই শুনেছি'– মেয়েটি বলল– 'আমার থেকে কিছুই লুকাবার চেষ্টা কর না। তার সঙ্গে তুমি যে সওদা করেছ, তার মূল্য অনেক।'

মেয়েটি চলে যায়। সাদিয়া চিন্তিত মনে ওখানেই অন্ধকারে পায়চারি করতে থাকে।

সাদিয়ার মনে পড়ে যায়, আনতানুন তাকে বলে গেছে, আজ থেকেই কাজ শুরু করে দাও। তার একথাটিও মনে পড়ে যায় যে, সে আনতানুনকে বলেছিল, তুমি আমাকে দৃঢ়পদ পাবে। কিন্তু সাদিয়া একটি অনভিজ্ঞ মেয়ে। তার জানা নেই যে, পাপের এই রহস্যময় ভুবনে সে কত বড় ঝুঁকি মাথায় তুলে নিয়েছে।

দু'-তিনদিন পর সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখত-এর সঙ্গে সাদিয়ার সাক্ষাৎ ঘটে। গোমস্তগীন নাচ-মদের আসরে দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করছেন। সালার, খৃস্টান উপদেষ্টামন্ডলী ও উর্ধ্বতন অফিসারদেরকে হাতে রাখার জন্য গোমস্তাগীন এই আসরের আয়োজন করে থাকেন। এই দু'-তিন দিনের সাক্ষাতে আনতানুন সাদিয়াকে প্রশিক্ষিত করে তুলেছে। বিনোদনের এই আয়োজনটা তাকে করতে হয়।

আজকের আসরে সাদিয়া বেজায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। গোমস্তগীন যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত যে, মেয়েটার মধ্যে পরিবর্তন এসে গেছে। সাদিয়া আসরের বাইরে হাসিমুখে একজনের সঙ্গে কথা বলছে। পরক্ষণে সালার শামসুদ্দীনের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং এ-কথা ও-কথা বলার পর জিজ্ঞেস করে– 'আলরিস্তানে বরফ গলছে কি?'

সালার শামসুদ্দীন চমকে ওঠেন। গোমস্তগীনের ন্যায় অতিশয় বিচক্ষণ ও

কঠিনপ্রাণ দুর্গপতির হেরেমের কোন মেয়ের মুখ থেকে এমন কথা বের হতে পারে, শামসুদ্দীনের ধারণা ছিল না। কেননা, বাক্যটা সুলতান আইউবীর গুপ্তচরদের সাংকেতিক বাক্য। এই কোড বাক্য দ্বারা তারা পরস্পর পরিচয় লাভ করে থাকে। গোয়েন্দা ছাড়া অন্য কারো এই বাক্যটি জানা থাকার কথা নয়। শামসুদ্দীনের এও জানা আছে যে, এই দুর্গে কোন গোয়েন্দা বন্দী নেই, যে এই গোপন সংকেত বলে দিতে পারে। তিনি সংকেতের পরবর্তী বাক্য উচ্চারণ করলেন– 'তুমি আলরিস্তান যাচ্ছ নাকি?'

সাদিয়া মুচকি হেসে বলল– 'ইচ্ছা তো এমনই।'

শামসুদ্দীন কথা বলতে বলতে সাদিয়াকে নির্জনে নিয়ে যায়। অন্য সবাই মদ-নারীতে ডুবে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন– 'তুমি কি জান, আমি সালার?'

'আমি আরো কিছু জানি'– সাদিয়ার হাসিতে তিরস্কার নয়– ঘনিষ্ঠতার ভাব।

'কে এসেছে?'– শামসুদ্দীন অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কি জান, আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে তোমায় কী সাজা হবে?'

'প্রতারণা নয়'– সাদিয়া জবাব দেয়– 'আপনি হাঁটতে হাঁটতে প্রধান ফটকের নিকট চলে যান। সেখানে দু'জন রক্ষীসেনা দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করবেন, জেরুজালেম থেকে কে এসেছে?'

শামসুদ্দীন ফটকের নিকট চলে যান। ওখানে দু'জন মোহাফেজ দাঁড়িয়ে আছে। শামসুদ্দীন তাদেরকে চিনেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন– 'জেরুজালেম থেকে তোমাদের কে এসেছে?' আনতানুন সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি। শামসুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন– 'তুমি যদি আলরিস্তান থেকে এসে থাক, তাহলে ওখানে বরফ গলছে।'

'আপনি আলরিস্তান যাচ্ছেন নাকি?' আনতানুন জিজ্ঞেস করে।

'ইচ্ছা তো এমনই।' শামসুদ্দীন মুচকি হেসে জবাব দেন।

শামসুদ্দীন নিশ্চিত হন যে, আনতানুন সত্যিই আইউবীর গোয়েন্দা। তিনি জিজ্ঞেস করেন– 'মেয়েটি ধোঁকা দিচ্ছে না তো?'

'না'– আনতানুন জবাব দেয়– 'সাক্ষাতের সুযোগ করে দিন, সব কথা খুলে বলব।'

❁ ❁ ❁

সাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়া হল। শামসুদ্দীন একজন সেনা অধিনায়ক। সুযোগ সৃষ্টি করা তার পক্ষে কোন ব্যাপার নয়। তিনি আনতানুনকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি সাদিয়াকে কিভাবে ফাঁদে ফেলেছ এবং তাকে কিভাবে বা

বিশ্বাস করে আমাদের সাংকেতিক বাক্য বলে দিলে? আনতানুন তাকে ঘটনাটা ইতিবৃত্ত শোনায় যে, মেয়েটির সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ কিভাবে হয় এবং তার সঙ্গে কি কি কথা হয়।

'আমি একটি আশংকা অনুভব করছি'– শামসুদ্দীন বললেন– 'তুমি যুবক। সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান। মেয়েটিও যুবতী এবং অতিশয় সুন্দরী। আমি কর্তব্যের উপর আবেগের জয়ী হওয়ার লক্ষণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আবেগের বশবর্তী হয়ে দিনের বেলা এভাবে তার কক্ষে যাওয়া তোমার ঠিক হয়নি। তুমি সাবধানতা অবলম্বন করনি। মেয়েটির মনে ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতার পিপাসা আছে। তুমি তাকে ভালবাসাও দিয়েছ, ঘনিষ্ঠতাও দিয়েছ। এরূপ মেয়েদের আবেগ স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক হয়ে থাকে। আমার ভয় হচ্ছে, তুমি তোমার কর্তব্যকে আবেগের আতিশয্যে ধ্বংস করে দেবে। আমি তোমার ঈমানের পরীক্ষা নিতে চাই।'

'আমি আমার উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষে তাকে আসক্ত বানিয়েছি'– আনতানুন বলল– 'তবে আমি মিথ্যা বলব না। এই মেয়েটি আমার মন জয় করে নিয়েছে। আমি আপনাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শপথ করে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এই ভালবাসা আমার কর্তব্যের উপর জয়ী হতে পারবে না।'

তারপর শামসুদ্দীন ও আনতানুনের মাঝে কিছু কাজের কথা হয়। সালার শামসুদ্দীন গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ দিয়ে আনতানুনকে বিদায় করে দেন।

সেদিনই শামসুদ্দীন তার ভাই শাদবখতকে জানালেন, সুলতান আইউবী এখানে একজন লোক পাঠিয়েছেন। তার নাম আনতানুন। সে এই মহলের-ই মোহাফেজ দলে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়েছে।

শামসুদ্দীন ও শাদবখতের ব্যক্তিগত দুই রক্ষীসেনা, তাদের আরদালী এবং দু'জন চাকরও সুলতান আইউবীর যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা। সালারদ্বয় তাদেরকে জানায়, তোমাদের আরো একজন সঙ্গী এখানে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু লোকটা নিজেই নিজেকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। দুর্গপতির ব্যক্তিগত বাসভবনের একটি 'মৎস' শিকার করে নেয়া তার বিরাট সাফল্য। কিন্তু সে বিপদমুক্ত নয়। শামসুদ্দীন তার সঙ্গীদেরকে বিষয়টা বিস্তারিত বুঝিয়ে দিয়ে বললেন– 'এখন পর্যন্ত হাররানে আমাদের কোন গোয়েন্দা ধরা পড়েনি। আমার ভয় হচ্ছে, আনতানুন ধরা পড়ে যাবে। তার প্রতি আমাদের নজর রাখতে হবে। আর আমাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। লোকটা যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে আমাদের জন্য অপমান। তাছাড়া নির্যাতনে বাধ্য হয়ে সে

আমাদের সকলের নামও বলে দিতে পারে। আমি বেশি চিন্তা করি সুলতান আইউবীর কথা। তিনি বলবেন, দু'জন সালার আর ছয়জন যোদ্ধা গোয়েন্দা একটা লোককে রক্ষা করতে পারলে না!'

'আপনারা এবং আমরা থাকতে আরেকজন লোক পাঠাবার কী প্রয়োজন ছিল?' এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে।

'প্রয়োজন তা-ই ছিল, যা সে পূরণ করেছে'– শামসুদ্দীন জবাব দেয়– 'আমাদের গোমস্তগীনের হেরেম পর্যন্ত পৌঁছানো প্রয়োজন ছিল। যা হোক, এসব বাদ দাও। আমি জানি, এটা হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর সিদ্ধান্ত, যা সম্পূর্ণ সঠিক। আমি তোমাদেরকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম। তোমরা প্রস্তুত থাকবে। মেয়েটিকে অপহরণ করে আমাদের উধাও হওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। তোমরা তার জন্য প্রস্তুত থাকবে।'

'আমরা প্রস্তুত'– সবাই বলল– 'প্রয়োজন শুধু সময়মত সংবাদ পাওয়া।'

'না, সময়মত সংবাদ পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে'– শামসুদ্দীন বললেন– 'এমনও হতে পারে, আমিও তখন টের পাব, যখন আনতানুন পিঞ্জিরায় আবদ্ধ থাকবে এবং তার হাড়-গোড় চুরমার হতে থাকবে।'

❁ ❁ ❁

'কারো থেকে সাহায্য না নিয়ে আমাদের লড়াইটা আমরা স্বাধীনভাবে লড়তে চাই। তোমরা কী বল?'– গোমস্তগীন সালার শাসসুদ্দীন ও শাদবখতকে জিজ্ঞেস করেন– 'তোমরা তো জান, আমরা যারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, সংখ্যায় নগন্য। আমরা বাহ্যত যদিও ঐক্যবদ্ধ; কিন্তু মূলত একজনের মন এক দিকে। খলীফা আল-মালিকুস সালিহ বাচ্চা মানুষ। তিনি কতিপয় আমীরের কথায় উঠাবসা করছেন। তারা সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করো তাকে ছুঁড়ে ফেলতে এবং নিজেরা স্বাধীন শাসকে পরিণত চাচ্ছে। মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন আমার বন্ধু এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রু। কিন্তু তিনি একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের স্বাধীন শাসক হতে চান। আপনারা তো জানেন, আমি হাররানের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বিপুলসংখ্যক সৈন্য রিক্রুট করেছি। আমি খৃস্টান সম্রাট রেজিনাল্ট এবং তার সকল যুদ্ধবন্দীকে এই শর্তে মুক্তি দিয়েছিলাম যে, আমি যখন সালাহুদ্দীন আইউবীর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হব, তখন তারা সরাসরি আমার সহযোগিতা না করলেও পিছন কিংবা পার্শ্ব থেকে সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করবে অথবা তাকে আক্রমণের ধোঁকা দিয়ে তার দৃষ্টি আমার থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দেবে। আমি আশা করছি,

আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করতে পারব। তিনি খৃস্টানদেরকে পিছনে হটিয়ে দিতে পারেন। কেননা, খৃস্টানরা তার রণকৌশল জানে না। আমরা তো বুঝি। আমরাও মুসলমান। তার বাহিনী যদি প্রাণপণ লড়তে পারে, তো আমরাও তদপেক্ষা বেশি বীরত্বের প্রমাণ দিতে পারব। আইউবী প্রথমবার যখন হাল্‌ব আক্রমণ করেছিলেন, তখন হাল্‌বের মানুষ তাকে চরম শিক্ষা দিয়েছিল। তা থেকেই আমার সাহস বেড়ে গেছে।

সালার শাসসুদ্দীন ও শাদবখত গোমস্তগীনকে একথা বললেন না যে, মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের লড়াই না করা উচিত আর খৃস্টানরা মূলত আমাদের দুশমন। তারা আমাদেরকে সাহায্য করার কথা বলে বলে প্রতারণা করবে–সাহায্য দেবে না। তারা একথাও স্মরণ করিয়ে দিল না যে, আল-মালিকুস সালিহ খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডকে সোনা-দানা দিয়ে চুক্তি করেছিল, সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে রেমন্ড আইউবীর উপর পিছন দিক থেকে হামলা করবেন। সুলতান যখন হাল্‌ব অবরোধ করেন, তখন রেমন্ড বাহিনী এসে পড়ে। কিন্তু সুলতান আইউবীর কমান্ডো বাহিনী তাকে প্রতিহত করে এবং তিনি যুদ্ধ না করেই ফিরে যান।

শাসসুদ্দীন ও শাদবখত কোন প্রসঙ্গেই গোমস্তগীনের সঙ্গে দ্বিমত করলেন না। বরং তাকে সমর্থন জানালেন এবং পরামর্শ দিলেন যে, এ সময়ে সুলতান আইউবী আলরিস্তানের পাহাড়ী এলাকায় বসে আছেন। এই পর্বতমালায় 'হামাতের শিং' নামক যে উপত্যকা আছে, তাকে যুদ্ধক্ষেত্র বানানো গেলে আইউবীকে পরাজিত করা যেতে পারে। তারা পরামর্শ দেয়, হ্যাঁ, আমরা স্বাধীনভাবেই লড়াই করব; কিন্তু খৃস্টানদের থেকে সাহায্যও গ্রহণ করব।

'আমি সংবাদ পাচ্ছি, আমার এখানে নাকি সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর আছে এবং তারা আমাদের প্রতিটি সংবাদ তাকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে'– গোমস্তগীন বললেন– 'আপনারা সতর্ক থাকুন, চারদিক কান রাখুন এবং তদন্ত করুন।'

'সে কথা আপনার বলতে হবে না'– শাদবখত বললেন– 'সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কত শক্ত ও বিস্তৃত, আমাদের জানা আছে। এখানে আমরাও আমাদের গোয়েন্দা ছড়িয়ে রেখেছি। কোন সন্দেহ দেখা দিলেই তারা আমাদেরকে অবহিত করবে।'

'এ ক্ষেত্রে আমি বড় কঠিন মানুষ'– গোমস্তগীন বললেন– 'যদি আমার পুত্রের ব্যাপারেও সন্দেহ জাগে যে, সে শত্রুর হয়ে গোয়েন্দাগিরি করছে, তাহলে তাকেও আমি পিঞ্জিরায় বন্দি করব- এক বিন্দু দয়া করব না।'

গোমস্তগীন যে দু'সালারের সঙ্গে এত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, তারা যে সুলতান আইউবীর গুপ্তচর, তা তার কল্পনায়ও নেই। এরা দু'জন অত্যন্ত বিপজ্জনক গোয়েন্দা। অথচ, এরা গোমস্তগীনের সেনা অধিনায়ক। গোমস্তগীনের বাহিনীর কমান্ড তাদের হাতে।

গোমস্তগীন থেকে আলাদা হয়ে শামসুদ্দীন ও শাদবখত পরিকল্পনা ঠিক করেন, তারা যখন ফৌজ নিয়ে সুলতান আইউবীর মোকাবেলায় যাবেন, তখন তারা তাদের অগ্রযাত্রা সম্পর্কে আগেই সুলতানকে জানিয়ে দিবেন। আইউবী উপযুক্ত স্থানে তাদেরকে ঘিরে ফেলবেন এবং তারা আত্মসমর্পন করবে।

দু'ভাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পরিকল্পনা করতে থাকেন এবং খুটিনাটি প্রতিটি দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। গোমস্তগীন কোন্দিন আক্রমণ চালাবেন, তা এখনো তারা জানেন না। তাকে দ্রুত হামলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

❁ ❁ ❁

গোমস্তগীনের বাসভবন প্রহরার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে আনতানুনের। এখন আর এখানে নেই সে। সাদিয়া তাকে কিছু কাজের কথা বলেছিল। এখন সাদিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দুরুহ হয়ে পড়েছে তার। অথচ, মেয়েটির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রতি মুহূর্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটাচ্ছে সে। তার কারণ দু'টি। প্রথমত, কর্তব্য পালন। দ্বিতীয়ত, হৃদয়ের টান।

মহলের এক চাকরানীকে হাত করে নিয়েছে সাদিয়া। একদিন তার মাধ্যমে সে আনতানুনকে সংবাদ পাঠায়, যেন আজ রাতে সে ঠিক আগের সময় উক্ত বাগানে চলে আসে। প্রধান ফটক অতিক্রম করে বাগানে প্রবেশ করা অসম্ভব। বাগানের পিছনে একটি উঁচু দেয়াল আছে। সাদিয়া আলতানুনকে বলে পাঠায়, দেয়ালের বাইরে একটি রশি ঝুলান থাকবে। সেই রশি বেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়বে।

সে রাতে মহলে নিমন্ত্রণের আয়োজন ছিল। যুদ্ধে সহযোগিতা করতে পারে এজাতীয় বহু লোককে গোমস্তগীন দাওয়াত করেছেন। তাদের মধ্যে আছে বেশ ক'জন খৃস্টান কমান্ডার। মসুল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কয়েকজন মুসলিম সেনা অফিসারও এসেছেন। গোমস্তগীন এমন ক'জন বেসামরিক লোককেও দাওয়াত করেছেন, যাদের কাছে বিপুল অর্থ আছে। এই মেহমানদের থেকে যুদ্ধের জন্য সহযোগিতা নিতে চাইছেন গোমস্তগীন। সালার শামসুদ্দীন এবং শাদবখতও ভোজসভায় উপস্থিত। আছেন গোমস্তগীনের কাজী ইবনুল খাশিব আবুল ফজলও।

আসরটাকে পুরোপরি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে সাদিয়া। এজাতীয়

আসর-সভায় তার গুরুত্ব অপরিসীম। সে তার ইচ্ছার বিপরীতে এমনভাবে সাজগোজ করে, যা উপস্থিত মেহমানদেরকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করছে। এমনিতেই মেয়েটির রূপ-যৌবনের স্বতন্ত্র এক আকর্ষণ আছে। তার উপর এত সাজসজ্জা! নারীলোলুপ পুরুষদেরকে পাগল করে তুলছে সাদিয়া। মেয়েটি এখান থেকে সেখানে হরিণীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেক মেহমানের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছে। এরই মধ্য দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলছে সে। কোন খৃস্টান কিংবা মুসলিম সেনা অফিসারকে কথা বলতে দেখলেই তার পার্শ্বে গিয়ে কান পেতে এমনভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে, তারা কিছুই বুঝতে পারছে না। সাদিয়া শামসুদ্দীন এবং শাদবখতের নিকটও গিয়ে দাঁড়ায় এবং একইভাবে হাসিমুখে কথা বলে। তারা সাদিয়াকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন, কোন গোপন তথ্য পেয়ে গেলে আমাদেরকে জানাবে। আনতানুনের সঙ্গে বেশী দেখা-সাক্ষাৎ করবে না। কিন্তু আজ রাতই যে আনতানুনের সঙ্গে বাগানে তার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা এবং সে মিলনটা একটু পরই ঘটতে যাচ্ছে, সে কথা গোপন রাখে সাদিয়া।

এখন গভীর রাত। ঘোর অন্ধকার। সাদিয়া চাকরানীকে দিয়ে দেয়ালের রশিটা বেঁধে রাখে। দেয়ালের ভিতর দিকে একটি গাছ আছে। আনতানুন বাহির থেকে রশি বেয়ে উপরে উঠে আবার সেই রশির অপর মাথা বেয়ে দেয়ালের ভিতর নীচে নেমে গাছটার আড়ালে লুকিয়ে থাকবে।

এই আসরে বাহির থেকে অনেক উন্নত নর্তকী আনা হয়েছে। আমদানী করা হয়েছে অল্প বয়স্ক ক'টি সুশ্রী বালককে। তারা অর্ধ উলঙ্গ হয়ে বিশেষ ধরনের নাচ নাচছে। হেরেমের সব ক'টি মেয়ের প্রতি গোমস্তগীনের নির্দেশ, যে কোন মূল্যে হোক, সব ক'জন মেহমানকে পুরোপুরি আয়ত্বে নিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। তাদেরকে এই আসরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। মদের মটকার মুখ খুলে দেয়া হয়েছে। সাদিয়াও স্বাধীনভাবে যে কারো সঙ্গে মিশছে ও হাসিমুখে কথা বলছে।

আসরের রওনক ও আনন্দ-ফূর্তির মাত্রা বেড়ে চলছে। পাশাপাশি সাদিয়ার অস্থিরতাও বাড়ছে। কারণ, আনতানুনের এসে পড়ার সময় হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে সে একজন খৃস্টান কমান্ডারের সঙ্গে আলাপে মত্ত। এই খৃস্টান লোকটা অনর্গল আরবী বলতে পারে। সাদিয়া সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে কথা বলছে, যাতে তার মনের কথা বের করা যায়। হয়েছেও তা-ই। তারা সুলতান আইউবীকে কিভাবে খতম করবে, তার বিবরণ দেয় সাদিয়াকে। এই সুযোগে

সে সাদিয়ার ঘনিষ্ঠতা লাভ করার চেষ্টা করে। সাদিয়া তাতে বাঁধা দেয়নি। মূল্যবান তথ্য হাসিল করছে সে। খৃস্টান লোকটা কথা বলতে বলতে আসর থেকে উঠে তাকে আড়ালে নিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে সে সাদিয়াকে নিয়ে বাগানে চলে যায়। বাগানটা অন্ধকার। সেখানে গিয়ে সাদিয়া অনুভব করে, আনতানুন এসে পড়েছে। সাদিয়া লোকটাকে বলল, চলুন ফিরে যাই। কিন্তু সে এখনই যেতে চাচ্ছে না।

খৃস্টান লোকটা সাদিয়ার বাহু জড়িয়ে ধরে টেনে ঘাসের উপর বসিয়ে দেয় এবং তার রূপের প্রশংসা করতে শুরু করে। সাদিয়া তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করে। লোকটা নেশাগ্রস্ত। সে সাদিয়ার সঙ্গে যথেচ্ছ আচরণ করার চেষ্টা করলে সাদিয়া হাসিমুখে বলল– 'জান, আমি কার?'

'তার অনুমতি নিয়েই আমি এই দুঃসাহস দেখাচ্ছি'– খৃস্টান বলল এবং সাদিয়াকে টেনে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলল– 'তুমি যাকে তোমার স্বামী বলছ, সে তোমার স্বামী নয়, এই সত্যটা তুমিও জান। সে সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করে নিজে রাজা হওয়ার মানসে তার কথিত সবগুলো স্ত্রীকে এ রাতের জন্য আমাদেরকে হালাল করে দিয়েছে।'

'লোকটার কোন আত্মমর্যাদাবোধ নেই।' সাদিয়া মনের ক্ষোভ দমন করে মুখের হাসি বহাল রেখে মনে মনে বলল। তার জানা আছে, এই খৃস্টান লোকটা যা বলছে, সবই সঠিক।

'যে লোক নিজের ঈমান বিক্রি করতে পারে, সে নিজের স্ত্রী-বোন এবং কন্যার ইজ্জতও নীলাম করতে পারে। তুমি একটা বোকা মেয়ে। ফূর্তি করতে আপত্তি করছ কেন? আবার কিনা বলছ, মদপান কর না!'

দু'টি বিষয় সাদিয়াকে ভাবিয়ে তুলছে। এক. আনতানুন এসে পড়েছে। দুই. এই খৃস্টানটার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। গোমস্তগীন যদি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হতেন, তাহলে সাদিয়া তার নিকট ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিত এবং বলত, অমুক আমার প্রতি হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা তার উল্টো। যে কোন মূল্যে মেহমানদের সন্তুষ্ট করা গোমস্তগীনের হেরেমের মেয়েদের কর্তব্য। কোন মেহমানকে– বিশেষত, কোন খৃস্টান কমান্ডারকে অখুশী করা গোমস্তগীনের নির্দেশ অমান্য করার নামান্তর। লোকটা তার স্ত্রীদের ইজ্জতের বিনিময়ে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করছে। এমতাবস্থায় সাদিয়া খৃস্টান লোকটার মুখে থু থু ছিটাতেও পারছে না, তাকে ত্যাগ করে পালাতেও পারছে না। কিন্তু এসব বাধ্য-বাধকতা সত্ত্বেও সাদিয়া তার সম্ভ্রম বিকাতে পারে না। কি

করবে, সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে সাদিয়ার পক্ষে।

আনতানুনের বিষয়টা প্রচন্ডভাবে ভাবিয়ে তুলছে সাদিয়াকে। চরম আকার ধারণ করেছে সাদিয়ার অস্থিরতা। তার এই মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেই লোকটা তার সঙ্গে অসদাচরণ শুরু করে দেয়। সাদিয়া লাফিয়ে ওঠে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় তার। মেয়েটা ঘাসের উপর বসা ছিল। সে খৃস্টানটাকে সজোরে ধাক্কা মারে। লোকটা চীৎ হয়ে পড়ে যায়।

নারীরা অবলা। কিন্তু যদি তার মধ্যে আত্মমর্যাবোধ জেগে ওঠে, তাহলে সে বিশাল পাথরখন্ডকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে। খৃস্টান লোকটা নেশাগ্রস্ত। সে সাদিয়ার এই আচরণকে ঠাট্টা মনে করে খিলখিল করে হেসে ওঠে। নিকটে মাটির বড় একটি পাত্র রাখা ছিল। রাগে-ক্ষোভে পাগলের মত হয়ে গেছে সাদিয়া। সে পাত্রটি হাতে তুলে নেয়। অত্যন্ত ভারি বস্তু। সাদিয়া সেটা উপরে তুলে লোকটার মুখের উপর ছুঁড়ে মারে। চীৎ হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায়-ই খিলখিল করে হাসছিল সে। ভারি গামলাটা তার কপালে গিয়ে আঘাত হানে। সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি থেমে যায়। সাদিয়া গামলাটা আবার তুলে নেয়। লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সাদিয়া পাত্রটা তার মাথার উপর ধরে আস্তে করে ছেড়ে দেয় এবং নিজে সেখান থেকে সরে গিয়ে পিছনের বাগিচায় চলে যায়।

আসরে মদপানের ধারা চলছে। নাচ-গান এখন তুঙ্গে। কে বেঁচে আছে আর খুন হল, সে খবর কারো নেই। সাদিয়া এখন এই ঝামেলা থেকে মুক্ত। আনতানুনের ভালবাসার নেশা তাকে ভুলিয়ে রেখেছে যে, সে এক ব্যক্তিকে খুন করে এসেছে এবং লোকটা খৃস্টান। সে অত্যন্ত গর্বের সাথে আনতানুনকে এসংবাদটা দেয়ার জন্য উদগ্রীব যে, আমি আমার ইজ্জত রক্ষার্থে একজন খৃস্টানকে খুন করে এসেছি।

আনতানুন যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। সাদিয়া ভাবে, সে এসে তাকে না পেয়ে ফিরে গেছে। সে বৃক্ষটার পিছনে গিয়ে দেখে রশিটা দেয়ালের বাইরে না ভিতরে। রশি দেয়ালের ভিতরে। তার অর্থ হচ্ছে, আনতানুন এসেছে। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়! ফিরে গেলে তো রশি বাইরেই থাকত।

সাদিয়া ওখানেই দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটি ছায়া নড়াচড়া করছে দেখতে পায় সে। সাদিয়া গভীরভাবে লক্ষ করে। বোধ হয় চাকরানী হবে। সে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক দেয়। ওদিক থেকেও ফিসফিস কণ্ঠে জবাব আসে। ও তার চাকরানী-ই। সে সাদিয়ার দিকে ছুটে এসে বলল– 'তাকে এখানে খুঁজে লাভ নেই। তিনি এসেছিলেন। আমি তার অপেক্ষায়

লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি তাকে দেয়ালের উপর দেখেছি। তিনি রশিটা ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে নামতে শুরু করেন। ওদিক থেকে দু'জন লোক আসতে দেখলাম। তখন তিনি নীচে নামছিলেন। লোক দু'জন নিকটে এসে পড়ে। আমি তাকে সতর্ক করার সুযোগ পাইনি। আমি আপনাকে খুঁজতে থাকি। কিন্তু মেহ্মানদের মধ্যে আসরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সাদিয়ার মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। তার মনে পড়ে যায়, সে একজন খৃস্টানকে হত্যা করে এসেছে। তার হুঁশ-জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। এটি আল্‌ফ লায়লার রহস্যময় ও তেলেসমাতি জগত, যা সাদিয়ার মত মেয়ের বোধগম্যের বাইরে। তাকে হেরেমের একটি মেয়ে সাবধানও করেছিল যে, একজন রক্ষীসেনার সঙ্গে এই প্রেমখেলা তোমার জন্য অকল্যাণ ডেকে আনবে।

একটি ভাবনা সাদিয়াকে অস্থির করে তুলতে শুরু করে যে, আনতানুনকে কে গ্রেফতার করাল? যে দু'জন ব্যক্তি তাকে গ্রেফতার করল, তারা নিশ্চয় পূর্ব থেকেই জানত যে, আনতানুন এখানে আসবে। তারা বিষয়টা কিভাবে জানল? সাদিয়ার মনে আশংকা জাগতে শুরু করে, সেও গ্রেফতার হয়ে যাবে। চাকরানীর প্রতিও তার সন্দেহ জাগে যে, সেও গোয়েন্দাগিরি করতে পারে।

সাদিয়ার কিছুই বুঝে আসছে না। চাকরানীকে দিয়ে সে রশিটা খোলায় এবং লুকিয়ে ফেলতে বলে। তারপর চরম উৎকণ্ঠা ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখত-এর উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। নাচ-মদের আসর তখনো গরম। সাদিয়া শাদবখতকে পেয়ে যায়। আসরের অবস্থা দেখে তার মনে হল, খৃস্টান লোকটার খুন হওয়ার বিষয়টা এখনো কেউ টের পায়নি। সাদিয়া পা টিপে টিপে শাদবখত-এর নিকট চলে যায় এবং তাকে ইংগিতে ডাক দেয়। সাদিয়া তাকে আলাদা নিয়ে গিয়ে জানায়, আমি একজন খৃষ্টানকে খুন করে এসেছি। খুনের হেতুও জানায় সাদিয়া।

শাদবখত শংকিত হয়ে উঠেন যে, সাদিয়াকে খৃস্টান লোকটার সঙ্গে যেতে কেউ না কেউ নিশ্চয় দেখেছে! তার ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তিনি বললেন– তোমার আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। যদি তুমি গ্রেফতার হয়ে যাও, তাহলে গোমস্তগীন তোমার ন্যায় রূপসীকেও বন্দিশালায় কি দশা ঘটাবে, তা আমার অজানা নয়। একজন খৃস্টানের খুনী যদি তার পিতাও হন, তবুও তিনি তাকে সামান্য ছাড় দেবেন না। তিনি একজন খৃস্টান কমান্ডারের মৃত্যুর ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

'আমি যাব কোথায়?' সাদিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

'কিছু সময় এখানে ঘোরাফেরা কর'– শাদবখত বললেন– 'শামসুদ্দীন ভাই আসলে তার সঙ্গে কথা বলব।'

'তিনি কোথায় আছেন?' সাদিয়া ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

কিছুক্ষণ আগে আমরা সংবাদ পেলাম, কে একজন রশি বেয়ে পিছনের দেয়াল অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। লোকটা কে এবং কী উদ্দেশ্যে ঢুকেছে, জানতে পারিনি। শামসুদ্দীন তাকে দেখতে এবং তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে না আসলে আমি নিজে যাব। তুমি মনটা শক্ত রাখ। আমরা তোমাকে যেভাবে হোক লুকিয়ে ফেলব।' শাদবখত জবাব দেন।

সাদিয়া ভাবে, ধৃত লোকটা আনতানুন ছাড়া আর কেউ নয়। সে কিছুটা নিশ্চিত হয় যে, আনতানুনকে সালার শামসুদ্দীনের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে এবং তিনি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন।

লোকটা আনতানুন-ই। দু'জন সিপাহী তাকে গ্রেফতার করেছে। এ ধরনের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা শামসুদ্দীনের বিভাগের দায়িত্ব। তাই সংবাদটা তাকেই দেয়া হয়েছে যে, দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করা অবস্থায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শামসুদ্দীন আসর থেকে উঠে বাইরে গিয়ে দেখেন, ধৃত লোকটা আনতানুন। শামসুদ্দীন তাকে চিনেন না ভান ধরে জিজ্ঞেস করেন– 'তুমি সম্ভবত রক্ষী বাহিনীর জওয়ান। দেয়াল অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকলে কেন? সত্য সত্য বলে দাও; অন্যথায় মৃত্যুদন্ড হবে তোমার শাস্তি।'

আনতানুন নীরব। শামসুদ্দীন তার প্রতি এ কারণে ক্ষুব্ধ যে, তিনি বলেছিলেনও, সতর্ক থাকবে এবং আবেগকে কর্তব্যের উপর জয়ী হতে দেবে না।

কিন্তু আনতানুন সিনিয়রের এই নির্দেশনা মান্য করেনি। সে একদিকে যেমন যোগ্যতা দেখিয়েছে যে, এক চেষ্টায়-ই গোমস্তগীনের রক্ষী বাহিনীতে ঢুকে পড়েছে এবং পরক্ষণেই হেরেম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অপরদিকে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে অল্পতেই ধরা পড়ে গেল। আনতানুন যে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ল, একজন গুপ্তচরের জন্য তা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু তাকে সেই অপরাধের শাস্তি এখন দেয়া যাবে না। এ মুহূর্তে তাকে এখান থেকে রক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি সাদিয়াকেও এখান থেকে বের করতে হবে। কেননা, আনতানুন সাদিয়ার ডাকে এসেছে এবং সাদিয়া-ই রশি ঝুলানোর ব্যবস্থা করেছে, এ তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

শামসুদ্দীন সিপাহীদেরকে একটি জায়গার নাম উল্লেখ করে বললেন,

আসামীকে ওখানে নিয়ে যাও; আমি ওকে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। সিপাহীরা আলতানুনকে নিয়ে যায়। শামসুদ্দীন মহলের ভিতরে চলে যান। তিনি তার ভাই শামসুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করেন।

আসরে নাচ-গান চলছে। মেহমানগণ চরম আনন্দ উপভোগ করছেন আর গায়ক-নর্তকীদের বাহবা দিচ্ছেন। মটকার পর মটকা মদ খালি হচ্ছে। মশালের কিরণ আর ফানুসের রং-বেরং আলো নর্তকীদের গায়ের মূল্যবান ফিনফিনে পোশাকে এমন চমক সৃষ্টি করছে যে, তা আল্‌ফ লায়লার যাদুকেও হার মানায়। সবাই অচেতন-মাতাল। খৃস্টান লোকটার মৃতদেহটা ওখানে-ই পড়ে আছে। এমনি তেলেসমাতি পরিবেশে শামসুদ্দীন ও শাদবখতের মাঝে আনতানুন ও সাদিয়ার প্রসঙ্গে কথোপকথন হয়। শাদবখত শামসুদ্দীনকে অবহিত করেন, সাদিয়া এক খৃস্টান মেহমানকে খুন করে ফেলেছে।

তাঁরা সাদিয়াকে তাদের কক্ষে নিয়ে যায় এবং বেশ-ভূষা পরিবর্তন করে সেখান থেকে পালাবার কৌশল শিখিয়ে দেয়। সাদিয়া পরিকল্পনা মোতাবেক ধীর পায়ে মহল থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর দারোয়ান এসে শামসুদ্দীনকে সংবাদ জানায়, বাইরে অমুক কমান্ডার দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আপনাকে ডাকছেন। শামসুদ্দীন বাইরে চলে যায়। ভীত-সন্ত্রস্ত এক কমান্ডার দন্ডায়মান। সে রিপোর্ট দেয়– 'আনতানুন নামক যে রক্ষীসেনাকে দেয়াল ডিঙ্গানো অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছে, সে পালিয়ে গেছে।'

'কী বললে?'– আগুনের মত গরম হয়ে যান শামসুদ্দীন– 'সিপাহী দু'টা কি মরে গিয়েছিল?'

'মনে হচ্ছে, কাজটা একা আনতানুনের নয়– অনেক লোকের'– কমান্ডার বলল– 'সিপাহী দু'জন সেখানে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে।'

শামসুদ্দীন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সিপাহীদ্বয়ের জ্ঞান ফিরে এসেছে। তারা জানায়, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে পিছন দিক থেকে কে যেন আমাদের মাথায় একটি করে আঘাত হানে। আমরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

শামসুদ্দীন দৌড়-ঝাপ শুরু করে দেন। ঠিক সে সময়ে আপাদমস্তক কালো রেশমী চাদরে আবৃত- যার দু'টি চোখ ছাড়া আর কোন অংশ দেখা যায় না–গোমস্তগীনের বাসভবন থেকে প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে রাতে

মেহমানদের আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিল। আপাদমস্তক পোশাকাবৃত করে বের হওয়া লোকটা কে, দারোয়ান ও রক্ষীসেনারা তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজনই অনুভব করল না।

মধ্যরাতের পর যখন আসর ভাঙ্গে, তখন দুর্গের দরজা খুলে যায়। ঘোড়া ও ঘোটকযান ফটক অতিক্রম করতে শুরু করে। এক অশ্বারোহী ফটক অতিক্রম করে, যার মুখটা নেকাবে ঢাকা। তার সঙ্গে অপর একটি ঘোড়ায় সেই চাদরাবৃতা মহিলা, যে গোমস্তগীনের বাসভবন থেকে একাকী বেরিয়ে এসেছিল।

ব্যবস্থাটা শামসুদ্দীন ও শাদবখতের। শামসুদ্দীন উক্ত সিপাহীদ্বয়কে একটি জায়গার নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন, আনতানুনকে ওখানে নিয়ে গিয়ে আমার অপেক্ষা কর। অপরদিকে তিনি তার বডিগার্ডকে বলে দিলেন, তুমি আনতানুনকে মুক্ত করে আমার কক্ষে লুকিয়ে রাখ। আগেই বলেছি, শামসুদ্দীন ও শাদবখতের বডিগার্ড, দু'জন আরদালী ও দু'জন চাকর সুলতান আইউবীর কমান্ডো গোয়েন্দা। তারা যথাসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং আনতানুনকে মুক্ত করে ফেলে। ওদিক থেকে সাদিয়াও সাফল্যের সাথে বেরিয়ে শামসুদ্দীনের ঘরে চলে যায়। সেখানে আয়োজন পূর্ব থেকেই সম্পন্ন করা ছিল। মেহমানরা যখন বের হতে শুরু করে, তখন তাদেরকে দু'টি ঘোড়া দিয়ে সেখান থেকে বের করে দেয়া হল।

নাচ-গান আর মদ-নারীতে রাতটা কেটে যায়। পরদিন সকালে খৃস্টান লোকটার লাশ চোখে পড়ে। গোমস্তগীনের মহলের একটি মেয়েও নিখোঁজ। গোমস্তগীন নির্দেশ দেন, যে দু'জন সিপাহীর প্রহরা থেকে আনতানুন পালিয়েছে, তাদেরকে আজীবনের জন্য কয়েদখানায় নিক্ষেপ কর।

❁ ❁ ❁

আনতানুন ও সাদিয়ার পলায়নের কথা ভুলে গেছে সবাই। গোমস্তগীনের খৃস্টান বন্ধুরা তাদের একজন কমান্ডারের খুনের ঘটনায় তোলপাড় শুরু করে দেয়। তাদের মূলত একজন সহকর্মীর মৃত্যুতে ততটা দুঃখ নেই, যতটা তারা হুলস্থুল সৃষ্টি করেছে। তাদের উদ্দেশ্য হল, অসন্তোষ প্রকাশ করে গোমস্তগীন থেকে আরো সুবিধা আদায় করা এবং অতিশীঘ্র সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর আক্রমণ করার জন্য গোমস্তগীনকে ক্ষেপিয়ে তোলা। খৃস্টানরা জানে, মুসলমানদের হেরেমগুলোতে এমন ড্রামা খেলা হয়ে থাকে, যাতে একটা মেয়ে অপহৃতও হয়, স্বেচ্ছায় উধাও হয়ে যায় এবং দু'-একটা খুনের ঘটনাও ঘটে থাকে। তারা গোমস্তগীনকে অসহায় করে ফেলতে চাইছে, যাতে তিনি তাদের

কাছে সম্পূর্ণরূপে নতি স্বীকার করেন। মানুষ যার প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে, তার দাম বেড়ে যায় এবং সাহায্য প্রার্থনাকারীর অসহায়ত্বের সুযোগে নিজের সব শর্ত আদায় করে নেয়ার এবং অসহায়কে গোলামে পরিণত করার চেষ্টা করে। খৃস্টানরাও সেই একই নীতি অবলম্বন করছে।

ঘটনাটা গোপন রাখা গেল না। হালব পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সংবাদ। সেখানকার দরবারীগণ–যারা সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত–গোমস্তগীনকে তাদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছে। আল-মালিকুস সালিহ-এর পক্ষ থেকে তারা গোমস্তগীনের নিকট দূত প্রেরণ করে। সঙ্গে রীতি অনুযায়ী মূল্যবান উপঢৌকনও পাঠায়। উপহারের মধ্যে আছে দু'টি যুবতী মেয়ে।

গোমস্তগীন বিশ্রাম করছিলেন। দূত এবং মেয়ে দু'টোকে শামসুদ্দীনের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। গোমস্তগীনের পর সালার শামসুদ্দীন-ই রাষ্ট্রীয় কাজ দেখা-শুনা করে থাকেন। শামসুদ্দীন মেয়েগুলোকে তার ঘরে আলাদা বসিয়ে রেখে দূতকে জিজ্ঞেস করেন– 'বল, কী বার্তা নিয়ে এসেছ?'

দূত যে দীর্ঘ বার্তা নিয়ে আসে, তার সারমর্ম হল, সুলতান আইউবী হালব অবরোধ করার পর সম্রাট রেমন্ড বাহিনী নিয়ে আসেন। ফলে আইউবী অবরোধ তুলে নেন। কিন্তু রেমন্ড যুদ্ধ না করেই বাহিনী নিয়ে ফিরে যান। খৃস্টানরা ভবিষ্যতেও আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবে। আমরা যদি এভাবে আলাদা আলাদাভাবে আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করি, তাহলে আমরা প্রত্যেকেই পরাজিত হব। আইউবীকে চিরতরে খতম করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা একান্ত আবশ্যক।

বার্তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার একটি পরিকল্পনাও ছিল। তা এরকম–

আলরিস্তানের পাহাড়ে বরফ গলতে শুরু করেছে। আমরা গুপ্তচর মারফত জানতে পেরেছি, সুলতান আইউবীর সৈন্যরা পাহাড়ের উঁচুতে অবস্থান করতে পারছে না। কারণ, সেখানে গলিত বরফের পানি তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আমাদের জন্য এটি মোক্ষম সুযোগ। আমরা সব দল যদি একত্রিত হয়ে আইউবীর বাহিনীকে ঘিরে ফেলি, তাহলে অতি সহজেই তাকে পরাজিত করতে পারব।

পরিকল্পনায় এ-ও ছিল যে, খৃস্টান সম্রাট রেজিনাল্টকে আমাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে নিতে হবে। তা এভাবে যে, আপনি (গোমস্তগীন) তাকে পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করুন এবং যে প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আপনি তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন, সেকথা স্মরণ করিয়ে দিন।

শামসুদ্দীন পয়গামটা শাদবখতের কানে দেন। দু'ভাই বসে মতবিনিময় করেন। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বার্তাটি গোমস্তগীনকে জানতে দেয়া যাবে না। আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, গোমস্তগীন সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াইটা যেন একাকী করেন। তাহলে তার পরাজয় সহজতর হবে। তারা জানতেন, আইউবীর সৈন্যসংখ্যা কম। তা দিয়ে তিনি গাদ্দার মুসলিম শাসনকর্তাদের আলাদা আলাদাভাবে খতম করতে পারবেন।

শামসুদ্দীন ও শাদবখত নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রাখার ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু এ মুহূর্তে তারা আবেগ-প্রবণ হয়ে পড়েন। তাদের আবেগকে উস্কে দিয়েছে উপহার হিসেবে আসা মেয়ে দু'টো। তারা মেয়েদেরকে তাদের ধর্মপরিচয় জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তারা জানায়, আমরা মুসলমান। বয়সে তারা যুবতী। শামসুদ্দীন ও শাদবখতের মনে অনুশোচনা জাগে, একদিকে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে এই দুর্বলতা সৃষ্টি করে নিয়েছে যে, তারা সুন্দরী মেয়েদের বিনিময়ে ঈমান বিকিয়ে ফেলছে। অপরদিকে যেখানে মুসলিম মেয়েদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের শোভা বর্ধন করার কথা, সেখানে তাদেরকে তাদের-ই বাবা-মা আমীরদের হেরেমে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন।

'তোমরা কোথাকার বাসিন্দা এবং এদের হাতে পড়লে কিভাবে?'– শাদবখত জিজ্ঞেস করেন– তোমাদের পিতারা কি জীবিত? ভাই আছে?

এসব প্রশ্নের জবাবে মেয়েরা যা বলল, তাতেই শামসুদ্দীন ও শাদবখতের চেতনা ক্ষেপে ওঠে। যেসব অঞ্চলে খৃস্টানদের কর্তৃত্ব চলছে, সেসব এলাকার মুসলমানদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। একজন মুসলমানের ইজ্জতেরও কোন নিরাপত্তা ছিল না। ফলে সেসব মুসলমান বাসিন্দারা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে হলে দলবদ্ধভাবে চলত। কাফেলায় মেয়েরাও থাকত এবং মাল-সম্পদও থাকত। অপরদিকে খৃস্টানরা কাফেলা লুট করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকত। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, কোন কোন খৃস্টান সম্রাট– যারা মধ্যপ্রাচ্যের কোন না কোন অঞ্চল শাসন করতেন– সেনাবাহিনী দ্বারা মুসলমানদের কাফেলা লুণ্ঠন করাত। লুটেরারা যুবতী মেয়ে, পশুপাল ও অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যেত। তারা মেয়েদেরকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করত কিংবা মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে মুসলিম আমীরদের হাতে তুলে দিত। কিছু কিছু মেয়েকে খৃস্টানরা নিজেদের কাছে রেখে দিত এবং তাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি ও চরিত্র বিধ্বংসী কাজের জন্য গড়ে তুলত। তাদেরকে তারা মুসলমানদের এলাকায় ব্যবহার করত।

এই মেয়ে দু'টোকেও একটি কাফেলা থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। তখন তাদের বয়স ছিল তের-চৌদ্দ বৎসর। তারা ফিলিস্তীনের কোন এক অধিকৃত অঞ্চল থেকে পরিবারের সঙ্গে কোন নিরাপদ এলাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কাফেলাটা ছিল বিশাল। খৃস্টান দস্যুরা রাতের বেলা কাফেলার উপর হামলা চালায় এবং অনেকগুলো মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়। এরা দু'জন অস্বাভাবিক সুন্দরী ছিল বিধায় এদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে বিশেষ যত্নে লালন-পালন করতে শুরু করে। প্রথম দিকে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হলেও পরে তাদের সঙ্গে এমন সদ্ব্যবহার শুরু হয়, যেন তারা রাজকন্যা। আসলেই তাদেরকে রাজকন্যা রূপে গড়ে তোলা হয়েছিল। তাদেরকে মদপানে অভ্যস্ত করে তোলা হয় এবং অত্যন্ত উন্নত পন্থায় তাদের চিন্তা-চেতনাকে খৃস্টানদের ধাঁচে গড়ে তোলা হয়। চার-পাঁচ বছর পর যখন সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী মৃত্যুবরণ করেন, তখন এদেরকে খৃস্টানদের পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ দামেস্ক প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য, খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমীরদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে এবং নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসা।

মেয়েরা জানায়–

'আমাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে ধর্ম ও চরিত্র বের করে দেয়া হয়েছিল। আমরা এক একটি সুদর্শন খেলনায় পরিণত হয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমাদেরকে দামেস্ক পাঠানো হল, তখন আমাদের মস্তিষ্কে ধর্ম ও সচ্চরিত্রতা পুনরায় জেগে ওঠে। আমাদের রক্তে যে ইসলামী ঐতিহ্য ছিল, তা ফিরে এসে আমাদের আত্মাকে জাগ্রত করে। তখন আর আমাদের পিতা-মাতা ও ভাই-বোনদের ফিরে পাওয়ার সুযোগ ছিল না। আমরা মুসলিম শাসনকর্তা ও রাজা-বাদশাহদেরকে পিতা ও ভাই হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের একজনও আমাদেরকে কন্যা কিংবা বোনের চোখে দেখেনি। খৃস্টানদের হাতে সম্ভ্রম হারিয়ে আমরা ততটুকু কষ্ট পায়নি, যতটুকু কষ্ট এই মুসলিম ভাইদের নিকট এসে পেয়েছি। কারণ, খৃস্টানরা আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তা প্রত্যাশার বাইরে ছিল না। কিন্তু খৃস্টানরা আমাদেরকে যে মুসলমানদের নিকট প্রেরণ করেছিল, আমরা তাদের হাতে ধরেছি পায়ে ধরেছি। ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূলের দোহাই দিয়েছি যে, আমরা আপনাদের কন্যা। আমরা নির্যাতিতা। আমরা আপনাদের মর্যাদার প্রতীক। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। মদ ও শয়তান তাদের চোখে চাঁদ-তারা আর ক্রুশের মাঝে কোন ব্যবধান থাকতে দেয়নি...।'

'আমাদের ভিতরে প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে ওঠে। সুলতান সালাহুদ্দীন

আইউবীর দামেস্ক আগমনের সংবাদ শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দি হই। খৃস্টানদের এলাকায় মুসলমানরা সুলতান আইউবীর পথপানে চেয়ে আছে। আইউবীকে তারা ইমাম মাহ্দী মনে করে। তিনি যখন দামেস্ক আসেন, তখন আমরা প্রতিজ্ঞা নেই, যেভাবে হোক, আমরা তাঁর নিকট যাব। তাঁকে বলব, আপনি আমাদেরকে আপনার ফৌজে রেখে দিন এবং আমাদের কিছু একটা কাজ দিন। কিন্তু আমাদেরকে সেখান থেকে জোরপূর্বক হাল্ব নিয়ে আসা হল। এখন আমরা আপানাদের হাতে। আমরা আপনাদের নিকট এই প্রত্যাশা রাখতে পারছি না, আপনারা আমাদেরকে কন্যা হিসেবে বরণ করে নেবেন। তবে আমরা এটুকু অবশ্যই বলব যে, আমাদের সম্ভ্রম তো ছিন্নভিন্ন, ঈমানটুকু যেন নষ্ট না হয়।

আমরা যখন খৃস্টানদের নিকট ছিলাম, সেখানেও সুলতান আইউবী ও ইসলাম বিরোধী পরিকল্পনা হতে দেখেছি, তেমনি যখন মুসলমানদের নিকট ছিলাম, তখনও আইউবী বিরোধী তৎপরাত-ই দেখেছি। এখন আপনাদের পরীক্ষা নেয়ার পালা। আমরা শুনেছি, খৃস্টান মেয়েরা এখানে গুপ্তচরবৃত্তি করতে আসে। আপনারা আমাদেরকে খৃস্টানদের এলাকায় পাঠিয়ে দিন। আমাদের এ ভয় তো নেই যে, আমাদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হবে। তাতো লুট হয়েই গেছে। আপনারা আমাদেরকে ইসলামের সুরক্ষা ও প্রসারের জন্য সুযোগ দিন।'

মেয়ে দু'টোর উপাখ্যান ও জীবন কাহিনী সালার শামসুদ্দীন ও সাদবখতকে চরম প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে। তাদের আবেগ ও চেতনায় প্রচন্ড একটা ধাক্কা দেয়। সব শুনে তারা মেয়েদেরকে বললেন, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, এখন আর তোমাদেরকে কোন বিলাস পুজারী দুশ্চরিত্র শাসকের হাতে তুলে দেয়া হবে না।

❁ ❁ ❁

শামসুদ্দীন ও শাদবখত বসে কথা বলছেন। হঠাৎ এক দেহরক্ষী ভিতরে প্রবেশ করে বলল, কাজী সাহেব এসেছেন। দু'ভাই অভ্যর্থনা কক্ষে চলে যান। কাজী সাহেব ইবনুল খাশিব আবুল ফজল বসে আছেন। লোকটা মধ্যবয়সী। তিনি বললেন– শুনেছি, হাল্ব থেকে দূত এসেছে এবং পয়গামের সঙ্গে উপহারও এসেছে।'

'হ্যাঁ'– শাদবখত বললেন– 'দুর্গপতি ঘুমিয়ে আছেন বলে দূতকে আমাদের কাছে বসিয়ে রেখেছি।'

'আমি উপহার দু'টো দেখতে এসেছি'– ইবনুল খাশিব চোখ টিপে বললেন–

'তাদেরকে এক ঝলক দেখাও তাড়াতাড়ি।'

কাজী সাহেব কেমন চরিত্রের মানুষ দু'ভাইয়ের জানা আছে। লোকটা গোমস্তগীনকে মুঠোর মধ্যে রেখেছে। শামসুদ্দনি মেয়ে দু'টোকে অভ্যর্থনা কক্ষে ডেকে পাঠান। তাদেরকে দেখে কাজী সাহেবের চোখ আটকে যায়। তিনি বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বললেন– 'শাবাশ! ...এত রূপ!'

শামসুদ্দীন এক ঝলক দেখিয়েই মেয়ে দু'টোকে কক্ষে পাঠিয়ে দেন। কাজী সাহেব বললেন– 'এদেরকে আমার হাতে তুলে দাও। আমি নিজে এদেরকে দুর্গপতির নিকট নিয়ে যাব। মনে হচ্ছে, যেন তার দু'চোখ থেকে দু'টি শয়তান উঁকি মারছে।'

'আপনি একজন বিচারক'– শামসুদ্দীন বললেন– 'জাতির নিকট আপনার মর্যাদা গোমস্তগীনের চেয়েও উচ্চে। মানুষের ন্যায় বিচার আপনার হাতে।'

কাজী সাহেব খিলখিল করে হেসে ফেললেন এবং বললেন– 'তোমরা সৈনিকরা আসলেই বোকা হয়ে থাক। নাগরিক জীবনের ব্যাপার-স্যাপার তোমরা কিচ্ছু বুঝ না। আরে, যে কাজির হাতে আল্লাহর আইন ও আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হত, সেই কাজী মারা গেছেন। তিনি শাসনকর্তাকে নয়– আল্লাহকে ভয় করতেন। শাসনকর্তা বরং তার ভয়ে মানুষের উপর অবিচার করা থেকে বিরত থাকতেন। এখন শাসনকর্তারা সেই ব্যক্তিদেরকে কাজী নিয়োগ করছেন, যারা অবিচারকে বৈধ সাব্যস্ত করেন এবং সংবিধানকে নয়– শাসককে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে থাকেন। আমি আমার আল্লাহর নয়– শাসনকর্তার কাজী।

'আর তারই ফলে কাফেররা তোমাদের হৃদয়ের উপর জেঁকে বসেছে'– শাদবখত বললেন– 'ঈমান নীলামকারী শাসকের কাজী ঈমান নীলামকারীই হয়ে থাকে। তোমাদের ন্যায় বিচারকগণ-ই আল্লাহর রাসূলের উম্মতকে এই অধঃপাতে নামিয়ে এনেছে যে, আমাদের আমীর-শাসকগণ আপন কন্যাদের সম্ভ্রম নিয়ে পর্যন্ত তামাশা করছে। এরা আপনার মুসলিম কন্যা, যাদেরকে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন।'

গোমস্তগীনের এই কাজীটার উপর শয়তান এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, তিনি শামসুদ্দীন ও শাদবখতের বক্তব্যকে বিদ্রূপে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন এবং হেসে বললেন– 'আসলে হিন্দুস্তানী মুসলমানরা হৃদয়মরা মানুষ। আচ্ছা, তোমরা হিন্দুস্তান থেকে এদেশে কেন এসেছ?'

'মন দিয়ে শোন বন্ধু!'– শামসুদ্দীন বললেন– 'আমি তোমাকে শুধু এ কারণে

শ্রদ্ধা করি যে, তুমি বিচারক। অন্যথায় তোমার আসল পরিচয় তো আমার জানা আছে। তুমি আমার একজন অধীন কমান্ডার ছিলে। তুমি এই পদমর্যাদা অর্জন করেছ তোষামোদ আর চাটুকারিতার বলে। তোমার আত্মমর্যাদাকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে আমরা হিন্দুস্তান থেকে কেন এসেছি, তার হেতু বলছি। ছয়শত বছর আগের কথা। মোহাম্মদ বিন কাসিম নামক এক যুবক সেনাপতি একটি নির্যাতিত মেয়ের আর্তনাদে সাড়া দিয়ে এই ভূখণ্ড থেকে হিন্দুস্তান গিয়ে হামলা করেছিলেন। তুমি তো জান, এখান থেকে হিন্দুস্তানের দূরত্ব কতটুকু। তুমি কি অনুমান করতে পারছ, যুবকটি তার বাহিনীকে কিভাবে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন? তুমি নিজেও একজন সৈনিক। লোকটা এত দূরত্ব পথ অতিক্রম করে রসদ ও পিছনের সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ব্যতীত কিভাবে যুদ্ধ করল, তুমি তো তা বুঝ। আবেগের জগত থেকে বেরিয়ে বাস্তবতা একটু ভেবে দেখ... ।'

'মোহাম্মদ বিন কাসিম এমন কঠিন পরিস্থিতিতে বিজয় অর্জন করলেন যে, ঐ পরিস্থিতিতে তার পরাজয় বরণ করার সম্ভাবনা-ই ছিল বেশী। তিনি শুধু রাজ্য জয়-ই করেননি, হিন্দুস্তানীদের হৃদয়গুলোও জয় করে নিলেন এবং কোন জুলুম-নির্যাতন ছাড়া সেই কুফরের মাটিতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলেন। তারপর একদিন তিনি মারা গেলেন। যে লোকগুলো এত পথ অতিক্রম করে একটি মেয়ের ইজ্জতের প্রতিশোধ নিলেন এবং ইসলামের আলো ছড়ালেন, তারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। দেশটা এমন রাজা-বাদশাহদের হাতে চলে যায়, যারা মুজাহিদদের কাফেলায় ছিল-ই না। বিনা মূল্যে প্রাপ্ত দেশটায় তারাও সেসব কর্মকান্ড করতে শুরু করল, যা আজ এখানে চলছে। হিন্দুরা সে দেশের মুসলমানদের উপর জয়ী হতে শুরু করল, যেমন এদেশে খৃস্টানরা জয়ী হচ্ছে। সালতানাতে ইসলামিয়া নিঃশেষ হতে শুরু করল। আমরা যৌবনে পদার্পন করে দেখি, মোহাম্মদ বিন কাসিম ও তার যোদ্ধারা রক্ত দ্বারা যে রাজ্যটিকে জয় করেছিলেন, তার গোড়া শুকিয়ে গেছে। মুসলমান শাসকগণ আরবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে। আমরা দু'ভাই– যাদের বংশ লড়াকু বংশ বলে খ্যাত– নিরাশ হয়ে দেশ ছেড়ে এদেশে চলে এসেছি। আমরা ভারতীয় মুসলমানদের দূত হয়ে এসেছি। ছিন্ন সম্পর্ক জুড়তে এসেছি... ।'

'এসে আমরা সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন, কিভাবে আমি ভারতবর্ষের কথা ভাবতে পারি! কিভাবে আমি ভারত অভিযানের চিন্তা করতে পারি! আমার গোটা আরব ভূখন্ড গাদ্দারদের দ্বারা পরিপূর্ণ!'

মরহুম জঙ্গী দূরের কোন অভিযানে এ কারণে যেতেন না যে, তার অবর্তমানে

এখানে বিদ্রোহ ঘটে যাবে, যার দ্বারা উপকৃত হবে খৃস্টানরা। তিনি বললেন, 'আমার বড় আফসোস হয়, ভারতবর্ষে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর জয়ী হচ্ছে আর এখানে জয়ী হচ্ছে খৃস্টানরা!'

সুলতান জঙ্গী আমাদেরকে তার বাহিনীতে ভর্তি করে নেন। পরে গোমস্তগীন, সাইফুদ্দীন ও ইজ্জুদ্দীন প্রমুখ যখন গোপনে গোপনে খৃস্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে শুরু করেন, তখন জঙ্গী আমাদেরকে এ লক্ষ্যে গোমস্তগীনের বাহিনীতে প্রেরণ করেন, যেন আমরা তার গোপন তৎপরতার প্রতি নজর রাখি।'

'তার মানে তোমরা দু'জন গুপ্তচর।' তিরস্কারের সুরে কাজী ইবনুল খাশিব বললেন।

'তুমি আমার বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা কর'– শামসুদ্দীন বললেন– 'তুমি তো দেখছ, আমাদের মুসলিম আমীরগণ সেই মর্দে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যার লক্ষ্য ইসলামকে ক্রুশের হাত থেকে রক্ষা করা। আজকের দূত অত্যন্ত বিপজ্জনক বার্তা নিয়ে এসেছে।' শামসুদ্দীন বার্তাটি শুনিয়ে বললেন– 'গোমস্তগীনের উপর তোমার প্রভাব আছে। তুমি তাকে ঠেকাতে পার। তুমি যদি আমাদের মতে একমত হও, তাহলে এস, আমরা গোমস্তগীনকে বুঝাবার চেষ্টা করি যে, আপনি গাদ্দারদের সঙ্গে ঐক্য গড়ার পরিবর্তে সুলতান আইউবীর সঙ্গে যোগ দিন। অন্যথায় তিনি এমন শোচনীয় পরাজয়বরণ করবেন যে, তাকে আজীবন কয়েদখানায় কাটাতে হবে।'

'তার আগে আমি তোমাদেরকে কয়েদখানায় আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করছি'– ইবনুল খাশিব বললেন– 'মেয়ে দু'টোকে আমার হাতে তুলে দাও।'

ইবনুল খাশিব বসা থেকে ওঠে মেয়েরা যে কক্ষে অবস্থান করছে, সেই কক্ষের দিকে পা বাড়ায়। শাদবখত তারা বাহু ধরে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে আসেন। বললেন– 'কোথায় যাচ্ছেন?' ইবনুল খাশিব শাদবখতকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করেন। শাদবখত তার মুখের উপর সজোরে এক ঘুষি মারেন যে, ইবনুল খাশিস পেছন দিকে চীৎ হয়ে পড়ে যান। শামসুদ্দীন কক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে ইবনুল খাশিরের ধমনীতে পা রেখে এমনভাবে চেপে ধরেন যে, লোকটা কিছুক্ষণ ছটফট করে নির্জীব হয়ে যান।

ইবনুল খাশিব মারা গেলেন। তাকে হত্যা করা দু'ভাইয়ের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা ভাবলেন, এবার আমাদের ধরা পড়া নিশ্চিত। তারা তাদের আরদালী দু'জনকে ডেকে চারটি ঘোড়া প্রস্তুত করতে বললেন। ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে গেল। শামসুদ্দীন ও শাদবখত মেয়ে দু'টোকে দু'টি ঘোড়ায় বসিয়ে দেন।

আরদালীদেরকে তরবারী ও তীর-ধনুক দিয়ে অপর ঘোড়ায় সাওয়ার হতে বললেন। তারা সঙ্গে গিয়ে দুর্গের ফটক খুলিয়ে চারজনকে পালিয়ে যেতে বললেন। তাদেরকে বলে দেয়া হল, তোমরা সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছে যাবে। তারা আরদালীদেরকে গোমস্তগীনের পরিকল্পনাটা বিস্তারিত বলে দেন।

চারটি ঘোড়া ফটক অতিক্রম করেই ছুটে চলে। শামসুদ্দীন এবং শাদবখতেরও বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি যেন ভেবে তারা ফিরে আসেন।

গোমস্তগীন ঘুম থেকে জেগে বেরিয়ে এসেছেন। দূতকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে এবং কোথা থেকে এসেছ? দূত তার পরিচয় প্রদান করে। দূত উপহারস্বরূপ নিয়ে আসা মেয়ে দু'টোর কথাও বলল। কিন্তু গোমস্তগীন মেয়েদেরকে দেখতে পেলেন না। শামসুদ্দীন ও শাদবখত বললেন– 'তারা চলে গেছে। কারণ, তারা মুসলমান। যেখানে তাদের ইজ্জত নিরাপদ থাকবে, আমরা তাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি।' তারা গোমস্তগীনকে জানালেন, কাজী সাহেবের লাশ ভিতরে পড়ে আছে।

গোমস্তগীন লাশটা দেখলেন। তিনি জ্বলে ওঠলেন। সালার শামসুদ্দীন আলী ও শাদবখত আলীকে বন্দী করে ফেললেন।

চারজন অশ্বারোহী দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য নিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উদ্দেশ্যে ছুটে চলছে। সুলতান আইউবী আলরিস্তানের পাহাড়ী এলাকায় বসে হাসান বিন আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করছেন– 'শামসুদ্দীন ও শাদবখতের পক্ষ থেকে কোন সংবাদ এসেছে কি?'

ভয়ংকর ষড়যন্ত্র

কাজী ইবনুল খাশিবের খুন এবং উপহার স্বরূপ আসা মেয়ে দু'টোকে পালাবার সুযোগ করে দেয়ার অপরাধে যে সময় সালার শামসুদ্দীন ও শাদ বখ্‌তকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, ঠিক তখন অপর এক দূত মসুলে গাজী সাইফুদ্দীনের নিকট গিয়ে পৌঁছে। গাজী সাইফুদ্দীন খেলাফতের অধীনে মসুল ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার গবর্নর হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে মসুলের স্বাধীন শাসক হিসেবে দাবি করে বসেন। তিনি চরিত্র ও চিন্তা-চেতনার দিক থেকে ছিলেন আইউবীর বিপরীত। মসুল ছিল ইসলামী সালতানাতের অঙ্গ। কিন্তু সাইফুদ্দীন তথাকার স্বাধীন শাসকে পরিণত হয়ে বসেন এবং সুলতান আইউবীর শত্রু পক্ষের সঙ্গে যোগ দেন। তার ভাই ইজ্জুদ্দীন একজন অভিজ্ঞ সেনা অধিনায়ক ছিলেন। সেনা বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের কমান্ড ছিল তার হাতে। সাইফুদ্দীন যেহেতু নিজেকে রাজা মনে করতেন, তাই তার চাল-চলনও ছিল রাজকীয়। তিনি দেশ-বিদেশের সুন্দরী নারী ও নর্তকী দ্বারা তার হেরেম পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন। নারী-নর্তকীর পর তার দ্বিতীয় সখের বস্তু ছিল পাখি। তার হেরেমে যেমন একটি অপেক্ষা অপরটি সুন্দরী নারী শোভা পেত, তেমনি তার ঘরে শোভা পেত খাঁচাভর্তি রং-বেরংয়ের পাখি। নারী আর পাখি নিয়েই ছিল তার জীবন।

ভাই ইজ্জুদ্দীনের সামরিক যোগ্যতার উপর পূর্ণ আস্থা ছিল সাইফুদ্দীনের। তার আশা ছিল, ইজ্জুদ্দীন সুলতান আইউবীকে পরাজিত করে তার জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। এ লক্ষ্যে তিনি হাররানের দুর্গপতি গোমস্তগীনের এবং কথিত শাসক আল-মালিকুস সালিহ-এর ন্যায় নিজের জন্য খৃষ্টান উপদেষ্টা নিয়োগ করে রেখেছিলেন, যারা তাকে আশা দিয়ে রেখেছিল, সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে খৃষ্টানরা তাকে সাহায্য করবে। এভাবে মুসলমানদের তিনটি বাহিনী সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। একটি হাল্‌বে, একটি হাররানে এবং একটি মসুলে। তারা ছিল বড় বড় মুসলিম শাসক ও আমীর। ছোট ছোট শেখ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম প্রদেশের নবাবগণ- যাদের সংখ্যা বহু– তারা এই তিন বৃহৎ

শাসকের সমর্থক ও সহযোগি ছিল। তারা এই তিন শাসনকর্তাকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিল এবং দিচ্ছিলও। তাদেরকে বুঝানো হল, সুলতান আইউবী যদি জয়লাভ করে বসেন, তাহলে যেভাবে তিনি মিশর ও সিরিয়াকে একীভূত করে একটি সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন, তেমনি প্রতিটি মুসলিম প্রদেশকে তাঁর সালতানাতে সংযুক্ত করে প্রত্যেককে তাঁর নিজের গোলামে পরিণত করে ফেলবেন।

তারা বাহ্যত ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু ভিতর থেকে ছিল চরম অনৈক্য। আমি অন্যের তুলানায় দুর্বল থাকি এমনটা তাদের কেউ কামনা করত না। তাদের অবস্থা ছিল ছোট ও বড় মাছের মত। প্রতিটি ছোট মাছ বড় মাছকে ভয় করে চলে এবং কামনা করে, আমিও বড় মাছ হয়ে যাই। সুলতান আইউবী গোয়েন্দাসূত্রে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন যে, তার বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কপটতা বিদ্যমান। তথাপি তিনি কোন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না। তিনি সবসময় এই বাস্তবতাকে সামনে রাখতেন যে, তিনটি বৃহৎ বাহিনী তার মুখোমুখি দন্ডায়মান। ফৌজ যেমনই হোক, ফৌজ-ই– তারা ভেড়া-বকরীর পাল নয়। তাঁর এই অনুভূতিও ছিল, এই ত্রিপক্ষের কমান্ডার ও জওয়ানরা মুসলমান এবং আল্লাহ পাক যে পরিমাণ সামরিক যোগ্যতা ও বীরত্ব মুসলমানদেরকে দান করেছেন, অন্য জাতিকে তা দান করেননি। ইতিহাস সাক্ষী, খৃষ্টানরা চার-পাঁচগুণ বেশী শক্তিধর বাহিনী নিয়ে হামলা করা সত্ত্বেও স্বল্পসংখ্যক নিরস্ত্রপ্রায় মুসলিম সৈনিক তাদেরকে পরাজিত করেছে।

সুলতান আইউবী হাল্‌ব অবরোধ করে পরিস্থিতি আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। একদল মুসলিম বাহিনী আরেকদল মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম। হাল্‌বের মুসলিম সৈনিকরা এবং সেখানকার মুসলিম জনসাধারণ যেরূপ উদ্দীপনা ও বীরত্বের সঙ্গে হাল্‌ব রক্ষা করল, তাতে সুলতান আইউবীর পা ফস্‌কে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি এই লড়াইয়ের কথা ভুলতে পারছিলেন না।

সুলতান আইউবীর উপর অভিযোগ আরোপ করা হয়েছিল যে, তিনি মুসলমানদের উপর সেনা অভিযান পরিচালনা করছেন। এই দুর্নাম রটনাকারীদের প্রধান লোকটি ছিলেন আব্বাসী খেলাফতের সমর্থক, যাকে সুলতান আইউবী মিশরে পদচ্যুৎ করেছিলেন। এক কথায় এই মুসলিম শাসক ও আমীরগণ সুলতান আইউবীর ফিলিস্তীন স্বাধীন করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। 'কিন্তু প্রথম কেবলা কাফেরদের দখলে' এই বাস্তবতা সুলতানকে এক

মুহূর্তের জন্যও স্থির হতে দিচ্ছিল না। তিনি ইহুদীদের প্রত্যয়-পরিকল্পনা সম্পর্কেও বে-খবর ছিলেন না। তিনি জানতেন, ইহুদীরা দাবি করে ফিরছে, ফিলিস্তীন তাদের জন্মভূমি এবং প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের নয়– ইহুদীদের উপাসনালয়। ইহুদীরা স্বসৈন্য সামনে আসছে না বটে; কিন্তু তারা খৃষ্টানদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে যাচ্ছে। তারা খৃষ্টানদেরকে সবচে' ভয়াবহ যে সহযোগিতাটা দিয়ে রেখেছিল, তা ছিল, অসাধারণ রূপসী যুবতী, অতিশয় বিচক্ষণ ও চতুর নারীর আকারে। সেসব মেয়েকে গুপ্তচরবৃত্তি এবং মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হত।

সুলতান আইউবীকে আরো একটি বাস্তবতা বেশী অস্থির করে রেখেছিল যে, খৃষ্টান সৈন্যরাও তার বিরুদ্ধে সোচ্চার, যাদের উর্ধ্বতন কমান্ডার ও সম্রাটগণ তার বিরুদ্ধবাদী মুসলদানদেরকে উস্কানী দিয়ে যাচ্ছিল।

এমত পরিস্থিতিতে সুলতান আইউবী অতিশয় সাবধানতার সঙ্গে পা বাড়াচ্ছিলেন। তিনি তার বাহিনীকে অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে বিন্যস্ত করে নেন এবং তাঁর গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনাকে দুশমনদের এলাকায় প্রেরণ করে রাখেন। তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে বেশী ভরসা ছিল কমান্ডো বাহিনী ও গুপ্তচরদের উপর।

❁ ❁ ❁

হাল্‌বের দূত পৌঁছে গেছে মসুলেও। আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমীরগণ মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের জন্য প্রেরিত পয়গামের সঙ্গে উপহার প্রেরণ করেছিলেন। তাতে তেমনি দু'টি মেয়েও ছিল, যেমনটি প্রেরণ করা হয়েছিল হাররানের দুর্গপতি গোমস্তগীনের নিকট। হাররানে তো দু'জন ভারতীয় সেনাপতি শামসুদ্দীন ও শাদবখত মেয়ে দু'টোকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং সে সূত্রে কাজী ইবনুল খাশিবকে হত্যা করে নিজেরা কয়েদখানায় বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু মসুলে প্রেরিত মেয়ে দু'টো সাইফুদ্দীনের হাতে পৌঁছে যায় এবং সাইফুদ্দীন তাদেরকে সাদরে বরণ করে নেন। এই দু'টো মেয়ে তার হেরেমের শোভা আরো বাড়িয়ে তোলে। দূত সাইফুদ্দীনকেও সে একই পয়গাম পৌঁছায়, যা পৌঁছিয়েছিল আরেক দূত গোমস্তগীনকে। তাহল, খৃষ্টানরা হাল্‌ববাসীকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে প্রতারণা করেছে। সে কারণে তাদের উপর বেশী আস্থা রাখা যাবে না। তবে তাদের বন্ধুত্ব থেকেও হাত গুটানো ঠিক হবে না। তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করার উত্তম পন্থা হল, আমরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান আইউবীর উপর হামলা করব। তিনি আলরিস্তানের পর্বতমালায় হামাতের শিং নামক স্থানে অবস্থান করছেন। এ

অবস্থায় যদি আমরা তার উপর হামলা করি, তাহলে খৃষ্টানরা পিছন দিক থেকে তাদের উপর হামলা করবে।

বার্তার সঙ্গে একটি পরিকল্পনাও ছিল। তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আলরিস্তানের বরফ গলছে। গোয়েন্দাদের সংবাদ মোতাবেক বরফের প্রবাহমান পানির তোড়ে সুলতান আইউবীর মোর্চাসমূহ তছনছ হয়ে গেছে। আমরা তিনটি বাহিনী একত্রিত হয়ে তাকে সেই উপত্যকায় অবরুদ্ধ করে অনায়াসে পরাজিত করতে পারি। বার্তায় আরো উল্লেখ করা হয়েছিল, গোমস্তগীনকেও পয়গাম প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করছি, তিনি আমাদের সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করবেন। আপনিও সময় নষ্ট না করে জোটে এসে যোগ দিন। তবেই সালাহুদ্দীন আইউবীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব হবে।

বার্তাটা পেয়েই সাইফুদ্দীন তার ভাই ইজ্জুদ্দীন, দু'জন সিনিয়র সেনা অধিনায়ক ও মসুলের স্বনামধন্য খতীব ইবনুল মাখদুম কাকবুরীকে নিয়ে বৈঠকে বসেন।

তিনি সকলকে দূতের বার্তাটা শুনিয়ে বললেন–

'আপনারা আমার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন যে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর আনুগত্য মেনে নেব না। তার শিরায় যে খুন প্রবাহিত, আমার শিরায়ও সেই একই খুন বিদ্যমান। আপনারা আমাকে শুধু এই পরামর্শ দিন যে, আমরা জোটে যোগ দেব কি-না। আমার ইচ্ছা হল, আমাদের বাহিনী প্রকাশ্যে সম্মিলিত বাহিনীর অধীনে থাকবে। কিন্তু আপনারা লড়াই করবেন আলাদাভাবে। যাতে আমাদের বাহিনী যে যে এলাকা জয় করবে, তার অধিকর্তা আমি ছাড়া কেউ না হতে পারে।'

'আপনি যে সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন, তার চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত আর কিছু হতে পারে না। আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।' এক সালার বললেন।

'সালাহুদ্দীন আইউবী খৃষ্টান ও সুদানীদেরকে পরাজিত করতে পারেন– আমাদেরকে নয়।' আরেক সালার বললেন– 'আপনি আপনার বাহিনীকে সম্মিলিত বাহিনীতে যুক্ত করে নিন। কিন্তু কমান্ড রাখুন নিজের হাতে। আমরা আমাদের সৈন্যদের দ্বারা এমনভাবে যুদ্ধ করাব যে, আমাদের বিজয় হালব ও হাররানের বাহিনী থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা দেখা যাবে।'

'আমরা আপনার আদেশের সামনে নিজেদেরকে কোরবান করে দেব মাননীয় সম্রাট'– প্রথম সালার বললেন– 'আমরা আপনাকে সেই সালাতানাতে ইসলামিয়ার রাজা বানাব, সালাহুদ্দীন আইউবী যার স্বপ্ন দেখছেন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর মাথা কেটে আমরা আপনার পায়ে রাখব'- দ্বিতীয় সালার বললেন- 'তার ফৌজ আলরিস্তানের উপত্যকা থেকে জীবিত বের হতে পারবে না। আপনি এখনি রওনা হওয়ার নির্দেশ দিন। বাহিনী প্রস্তুত।'

উভয় সালার একজন অপরজনের চেয়ে নিজের অফাদারী প্রকাশে ব্যাকুল। ইজ্জুদ্দীন চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছেন কখন তার পালা আসবে। খতীব ইবনুল মাখদুম কখনো সালারদ্বয়ের প্রতি, কখনো সাইফুদ্দীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন। আবার কখনো মাথা নত করে বসে থাকছেন।

'ইজ্জুদ্দীন! তোমার মতামত কী বল।' ভাইকে উদ্দেশ করে সাইফুদ্দীন বললেন।

'আমি আপনার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত যে, আমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে'- ইজ্জুদ্দীন বললেন- 'কিন্তু আমাদের সালারদের এজাতীয় আবেগময় বক্তব্য আমি সমর্থন করি না।' 'আইউবী খৃষ্টান ও সুদানীদের পরাজিত করতে পারেন আমাদেরকে নয়' শুধু এ ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়লেই আইউবীকে পরাজিত করা যাবে না। আমি বরং বলব, যার স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিজেদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী খৃষ্টান সেনাকে পরাজিত করতে পেরেছে, সেই তিনি আপনাকেও পরাজিত করতে পারবেন। যিনি মরুভূমির সৈন্যদের দ্বারা তুষারাবৃত এলাকায় যুদ্ধ করিয়ে চার চারটি দুর্গ জয় করলেন এবং রেমন্ডের বাহিনীকে পিছনে সরে যেতে বাধ্য করলেন, তিনি বরফ গলে যাওয়ার পর আরো ভালভাবে যুদ্ধ করতে পারবেন। আমাদের কোন প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হওয়া উচিত হবে না। শত্রুকে কখনো দুর্বল ভাবতে নেই। কিরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এবং কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা করতে হবে, তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে।'

ইজ্জুদ্দীন সুলতান আইউবীর সৈনিকদের বৈশিষ্ট্যের বিবরণ প্রদান করেন। তারপর আইউবীর লড়াই করার পদ্ধতি বিবৃত করেন এবং সামনের যুদ্ধটা যে ময়দানে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তার উপর আলোকপাত করে বললেন- 'বরফ গলতে শুরু করেছে। এ বছর বর্ষা শুরু হয়েছে বিলম্বে। সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ তাঁবুতে অবস্থান করছে। কিন্তু উট-ঘোড়া তো আর তাঁবুতে রাখা যায় না। এ সময়ে তার ফৌজের উট-ঘোড়াগুলো গাছের তলে কিংবা গুহায় বাস করছে। উট-ঘোড়া এভাবে সুস্থ্য-সবল থাকতে পারে না। তাছাড়া এই আশাও রাখা যায় যে, আইউবীর সৈনিকরা পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থান করে করে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আমাদেরকে এ

বিষয়টাও নজরে রাখতে হবে যে, আমরা যদি আমাদের বাহিনীকে হাল্‌ব ও হাররানের বাহিনীর সঙ্গে একীভূত করে যুদ্ধ করি, তাহলে আইউবীকে ঘিরে ফেলা সহজ হবে। কিন্তু আমাদেরকে একথা ভুলে গেলে চলবে না, মুসলমান সৈনিক যখন মুসলমান সৈনিকের মুখোমুখি হবে, তখন ইসলামের চিরন্তর আত্মীয়তা তাদেরকে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে পারে। যে তরবারী পরস্পর যুদ্ধ করতে কোষমুক্ত হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হবে, তা অবনমিতও হয়ে যেতে পারে এবং রক্ত না ঝরিয়ে-ই কোষে ফিরে যেতে পারে।'

'ইজ্জুদ্দীন!' –ইজ্জুদ্দীনকে থামিয়ে দিয়ে সাইফুদ্দীন বললেন– 'তুমি একজন সৈনিক মাত্র। তুমি রক্ত, তরবারী আর তরবারীর কোষের কথা ভাবতে পার শুধু। মুসলমান সৈনিককে মুসলমান সৈনিকের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াতে হয়, সেই কৌশল তোমাকে আমার নিকট থেকে শিখতে হবে। আগামী পরশু রমযান শুরু হচ্ছে। সালাহুদ্দীন আইউবী নিজে নামায-রোযার যতটুকু পাবন্দ, ততটুকু পাবন্দী তার সৈন্যদের দ্বারাও করিয়ে থাকেন। যুদ্ধটা যখন শুরু হবে, তখন তার সব সৈন্য রোযাদার থাকবে। আমরা আমাদের সৈন্যদেরকে বলে দেব, যুদ্ধের সময় রোযা রাখার পাবন্দী নেই। মাননীয় খতীব সাহেব তোমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমি তার পক্ষ থেকে ঘোষণা করিয়ে দেব যে, যুদ্ধের সময় রোযা মাফ। আমরা হামলা করব দুপুরের পর। সকাল বেলা হামলা করলে তখন আইউবীর সৈন্যরা তরতাজা থাকবে। দুপুরের পর আমাদের সৈন্যদের পেটে খাবার থাকবে আর আইউবীর সৈন্যরা থাকবে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। আমি শুধু এটুকু জানতে চাই যে, সালাহুদ্দীন আইউবীর বিপক্ষে লড়াই করার সিদ্ধান্তটা সঠিক কিনা।'

'আপনার এই সিদ্ধান্ত যথার্থ।' এক সালার বললেন।

'আমরা আপনার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করে প্রমাণ দেব, এই সিদ্ধান্ত সর্বদিক থেকেই সঠিক।' আরেক সালার বললেন।

'আমি আপনার সিদ্ধান্তের বিপক্ষে কোন কথা বলিনি'– ইজ্জুদ্দীন বললেন– 'আপনাকে আমি আরো একটি পরামর্শ দেব। আপনি আমাকে রিজার্ভ রেখে দিন। যদি প্রয়োজন পড়ে, তাহলে আমি পরে সময়মত হামলা করব। প্রথম সংঘর্ষের কমান্ড আপনি নিজের হাতে রাখুন।'

'তা-ই হবে'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'বাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করে নাও এবং দ্রুত প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দাও। রিজার্ভ বাহিনীটিকে তোমার কাছে রাখ।'

❁ ❁ ❁

খতীব ইবনুল মাখদুম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সাইফুদ্দীন তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুচকি হেসে বললেন– 'মহামান্য খতীব! আপনি একাধিকবার কুরআন থেকে ফাল বের করে আমাকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। আপনি মহান আল্লাহর দরবারে আমার নিরাপত্তা ও বিজয়ের জন্য দু'আও করেছিলেন। আপনি জানেন, আমি আপনার অপেক্ষা আর কাউকে বড় বুজুর্গ মনে করি না। মানুষের যদি কোন মানুষকে সেজদা করার অনুমতি থাকত, তাহলে আমি আপনাকে সেজদা করতাম। এ মুহূর্তে আমি এমন এক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছি, যার সফলতার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমি একটি শক্তিশালী দুশমনের মোকাবেলায় যাচ্ছি। যুদ্ধে জয় হয়, নয় পরাজয়। আপনি কোরআন থেকে ফাল বের করে আমাকে বলুন, এ যুদ্ধে আমার ভাগ্যে বিজয় লেখা আছে, না পরাজয়।'

'আমীরে মোহতারাম!' –খতীব বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন– 'একথা সঠিক যে, আপনি আমার দ্বারা কয়েকবার কুরআন থেকে ফাল বের করিয়েছিলেন। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী মরহুমের জীবদ্দশায় আপনি একবার একদল ডাকাতকে ধাওয়া করেছিলেন। তখন আমি কুরআন থেকে ফাল বের করে আপনাকে সাফল্যের সুসংবাদ শুনিয়েছিলাম এবং আপনি সফল হয়ে ঘরে ফিরেছিলেন। আপনি যখন খৃষ্টানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আমি কুরআন থেকে ফাল বের করে আপনাকে বিপদ সম্পর্কে সাবধান করেছিলাম ও কামিয়াবির সুসংবাদ প্রদান করেছিলাম। আল্লাহর শোকর, আমার বের করা প্রতিটি ফাল সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু...।

খতীব প্রথমে ইজ্জুদ্দীনের প্রতি, তারপর সালারদ্বয়ের প্রতি তাকিয়ে বললেন–

'কিন্তু, মসুলের শাসনকর্তা! এবার ফাল বের না করেই আমি আপনাকে বলে দিতে পারব, আপনি যে অভিযানে বের হচ্ছেন, তাতে আপনি জয়লাভ করবেন, নাকি পরাজয়।'

'শীঘ্র বলুন মাননীয় শায়খ!' অস্থির হয়ে সাইফুদ্দিন বললেন।

'আপনি এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করবেন যে, যদি সময়মত পলায়ন না করেন, তাহলে আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবেন' –খতীব বললেন– 'আমার পরামর্শ, এ অভিযানে না আপনি নিজে যাবেন, না ভাইকে প্রেরণ করবেন, না আপনার ফৌজ পাঠাবেন।'

সাইফুদ্দীনের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায়। ইজ্জুদ্দীন এবং সালারদ্বয়ের

মুখও বন্ধ হয়ে যায়। খতীব সাইফুদ্দীনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাকেন।

'আপনি তো কুরআন খুললেনই না'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'কুরআন ছাড়া আপনি ফাল বের করলেন কিভাবে? আমি কিভাবে মেনে নেব যে, আপনি যে দুঃসংবাদ শোনালেন, তা সঠিক?'

'শুনুন মসুলের শাসক!' –খতীব ইবনুল মাখদুম বললেন– 'আমি এতকাল কুরআন থেকে যেসব ফাল বের করে আপনাকে সুসংবাদ শুনিয়ে আসছিলাম, কুরআনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কুরআন কোন জাদুমন্ত্রের বই নয়। কুরআন ঘোষণা করছে যে, এই কুরআনের যেসব বিধিবিধান রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মান্য করবে, সে সফল হবে। আর যে তা অমান্য করবে, সে ব্যর্থ ও পরাজিত হবে। এর আগে আপনি ক্রুশের পূজরীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিলেন। তখন আমি বলেছিলাম, আপনি কামিয়াব হবেন। তারপর আপনি যখনই যে অভিযানে গিয়েছিলেন, আমি আপনাকে সাফল্যের সুসংবাদ শুনিয়েছি এবং বলেছি, এটা কুরআনের ফাল। প্রতিটি ফালই শুভ ছিল। তার কারণ একটি-ই ছিল যে, আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড আল্লাহর বিধানের অনুকূলে ছিল। কিন্তু এখন আপনি যে অভিযানে বের হচ্ছেন, তা আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন ও বিরোধিতা। আপনি কাফেরদের হাতকে শক্তিশালী করছেন। তাদের সহযোগিতা নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিবেদিত ঈমানদান লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছেন।'

'আপনি কিসের ভিত্তিতে বলছেন, সালাহুদ্দীন আইউবী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিবেদিত হয়ে এখানে এসেছেন?'– উত্তেজিত কণ্ঠে সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমি তো বলছি, তিনি একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁর এই স্বপ্ন পূরণ হতে দেব না। তাকে এখানে যমে টেনে এনেছে। আমরা প্রথমে তাকে যমের হাতে তুলে দিয়ে তারপর ক্রুশের পূজারীদের খতম করব।'

'অন্তসারশূন্য শব্দমালা দ্বারা আপনি আমাকে ধোঁকা দিতে পারেন– আল্লাহকে নয়'– খতীব বললেন– 'আমাদের কার অন্তরে কী আছে, আল্লাহ পাকের সবই জানা আছে। বিজয় তার কপালেই জুটবে, যে নিজের নফ্সের উপর জয়ী হতে পেরেছে। এ মুহূর্তে আমি আপনাকে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বানী করছি, পরাজয় আপনার কপালের লিখন হয়ে আছে। আপনি যদি ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য দাঁড়ান, তবেই শুধু আপনার ললাটের লিখন টলতে পারে।'

'মোহতারাম খতীব!' –ইজ্জুদ্দীন বলে উঠলেন– 'আপনি আপনার ধর্ম আর মসজিদ নিয়ে ব্যস্ত থাকুন। সামরিক বিষয়াবলী ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড আপনি বুঝবেন না। আমি আপনাকে আমাদের মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা না করার পরামর্শ দেব। যুদ্ধজয়ের সব উপকরণই আমাদের আছে, আপনার হয়ত তা জানা নেই।'

'আপনি যদি যুদ্ধকে ধর্ম ও মসজিদ থেকে আলাদা করে লড়াই করেন, তাহলে না হৃদয় আপনার সঙ্গ দেবে, না জযবা'– খতীব বললেন– 'আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আমি সামরিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ। কিন্তু আমি এ কথাটা জানি যে, যুদ্ধ শুধু অস্ত্র আর ঘোড়া দ্বারা জয় করা যায় না এবং সেই সামরিক যোগ্যতার বলেও জয় করা যায় না, আপনি যার জন্য গর্বিত এবং যার উপর নির্ভর করে আপনি কুরআনের বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত হচ্ছেন। আরো একটি বিষয় এমন রয়েছে, যা জয়কে পরাজয়ে পরিণত করে দেয়।'

সবাই চকিত নয়নে তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকে। তিনি বললেন–

'যে শাসক চাটুকারিতা পছন্দ করে সে নিজের সঙ্গে দেশ ও জাতিকে নিয়ে একসঙ্গে ডুবে মরে। সে শাসক রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডকে চাটুকার ও দাস মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের হাতে তুলে দিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও দাসানুদাস প্রজায় পরিণত করে ছাড়ে। আর এই শাসক যখন ফৌজের কমান্ড চাটুকার সালারদের হাতে তুলে দেয়, তখন দুশমন দেশটাকে হজম করে ফেলে। চাটুকার সেনা অধিনায়ক তার অধীনদের দ্বারা চাটুকারিতা আদায় করে। তারপর দেশ ও জাতির জন্য লড়াই করার পরিবর্তে শাসকের সন্তুষ্টি অর্জন তাদের লক্ষ্যে পরিণত হয়। আমি এই দরবারেই দেখলাম যে, উপস্থিত দু'সালারই আপনার হ্যাঁ-এর সঙ্গে হ্যাঁ মিলাবার কসরত করেছে এবং এমন আবেগময় কথা-বার্তা বলেছে, যা একজন যোদ্ধা বলে না। তারা উভয়ে আপনার সিদ্ধান্ত ও প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছে বটে; কিন্তু আপনাকে সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেনি। তারা আপনাকে এইকথা জানায়নি যে, খৃষ্টানরা আমাদের সকলকে ঘিরে রেখেছে। আল-আক্সা কাফেরদের দখলে। এমতাবস্থায় ভাল হবে, আপনি গোমস্তগীন ও হাল্‌বের আমীর প্রমুখ সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট গিয়ে যোগ দিন এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দুশমন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করুন। আর যদি আপনি-ই সত্য পথের অনুসারী হয়ে থাকেন, তাহলে আইউবীকে মিথ্যুক ও ক্ষমতালোভী প্রমাণ করুন।'

কিন্তু আপনার সালারগণ আপনাকে এরূপ কোন পরামর্শ দেয়নি। তারা আপনাকে একথাও বলেনি যে, সালাহুদ্দীন আইউবী আলরিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলকে ঘাঁটি বানিয়ে তাঁর বাহিনীকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এমনভাবে ছড়িয়ে রেখেছেন যে, আপনি তাকে অবরোধ করার কল্পনাও করতে পারবেন না। তাঁর গেরিলা সেনাদের সম্পর্কে তো আপনি ভালভাবে অবহিত। কিন্তু আপনার সালারগণ আপনার চোখে পট্টি বেঁধে এ বিষয়টাকে আপনার দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রেখেছে যে, আইউবীর গুপ্তচর ও কমান্ডো সেনারা আপনার অন্তর থেকে তথ্য বের করে নিয়ে যেতে পারে এবং আপনার চোখে ধূলি দিয়ে আপনার হেরেমের মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যেতে পারেন। আপনার ফৌজ এখান থেকে রওনা হওয়া মাত্র আইউবী তাদের গতিবিধি, সংখ্যা ও গন্তব্য জেনে ফেলবেন।'

'মহামান্য সুলতান!'– এক সালার ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন– 'আমরা কি এভাবেই আপনার অপমান সহ্য করে যাব? মসজিদে বসে রাত-দিন আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকিরকারী দরবেশ আমাদের গুরু হওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে! ইনি আমাদের সামনে আপনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ করে আপনাকে অপমান করছেন। আমরা এটা সহ্য করতে পারিনা।'

'আমাকে শুনতে দাও'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমি আমার মোহতারাম খতীবকে এখনো সম্মানের চোখেই দেখছি।'

'বলুন মুহতারাম খতীব!'– 'অবজ্ঞার সুরে ইজ্জুদ্দীন বললেন– 'শেষ পর্যন্ত আপনাকে একথাও বলতে হবে, আপনার আনুগত্য কার প্রতি। আমাদের প্রতি, নাকি সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতি।'

'আমার আনুগত্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেল প্রতি'– ইজ্জুদ্দীনকে উদ্দেশ করে খতীব বললেন– 'আমি আপনার প্রশংসা করব যে, আপনি আপনার ভাইকে দু'-চারটা সত্য কথা শুনিয়েছেন। বাদবাকী কথা আপনিও চোখ-দেমাগ বন্ধ করে বলেছেন। ইমামুদ্দীনও তো আপনার ভাই। আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সুহৃদ কেন এবং কেন আপনার সহযোগিতায় এগিয়ে আসছেন না?'

'আপনি আমাদের পারিবারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না'– ইজ্জুদ্দীন বললেন– 'আপনি আসলে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, সালাহুদ্দীন আইউবী খোদার পয়গাম্বর এবং আমাদের সকলকে তাকে সেজদা করতে হবে। আপনাকে শুধু বলা হয়েছিল, কুরআন থেকে ফাল বের করে বলুন আমাদের এই অভিযান সফল হবে না ব্যর্থ।'

'কুরআন তার বিধি-বিধান স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছে'– জোরালো কণ্ঠে খতীব বললেন– 'আমি আপনাদের সম্মুখে বাস্তব সত্যটা খোলাখুলি ব্যক্ত করেছি। সালাহুদ্দীন আইউবী খোদার প্রেরিত পয়গাম্বর নন। তিনি একটি ঝড়, একটি স্রোত, যা কুফরকে শুষ্ক তৃণলতার ন্যায় ভাসিয়ে নেয়ার জন্য দামেস্ক থেকে উঠে এসেছে। আপনারা সবাই বৃক্ষের ভেঙ্গে পড়া ডাল, যার পাতাগুলো একে একে ঝরে পড়ছে আর সেই স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। আইউবী আপনাদের উপর চড়াও হননি– আপনারাই-ই বরং তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের পরিণতি তা-ই হবে, যা স্রোতের মুখে পড়া পত্র-পল্লবের হয়ে থাকে।'

'খতীব!'– সাইফুদ্দীন গর্জে উঠে বললেন– 'অনুগ্রহপূর্বক আমার অন্তর থেকে আপনার মর্যাদাবোধ বের করে ফেলবেন না।'

'তুমি... সাইফুদ্দীন!'– গম্ভীর কণ্ঠে খতীব বললেন– 'তুমি পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র ভূখন্ডটির রাজা। ভয় কর সেই সত্ত্বাকে, যিনি উভয় জগতের বাদশাহ। আমাকে তোমার শ্রদ্ধা করার প্রয়োজন নেই। তুমি আমার মুখে থু থু নিক্ষেপ কর; তবু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ থেকে সরে যেও না। তোমার উপর রাজত্বের নেশা চেপে বসেছে। এই আত্মমর্যাদাহীন সালার এবং তোমার প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ তোমাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তোমাকে রাজা বানিয়েছে। তুমি বুঝছ না যে, এটা নিছক চাটুকারিতা এবং তুমি রাজা নও। তুমি জান না, এই চাটুকার লোকগুলো তোমার শত্রু, জাতি ও দেশের দুশমন। যখন তোমার পতন ঘনিয়ে আসবে, তখন এরা তোমাকে চিনতেও অস্বীকার করবে এবং সেই ব্যক্তির পাপোষ চাটবে, যে তোমার সিংহাসনে বসবে। আমার প্রতি ক্রুদ্ধ চোখে দৃষ্টিপাত কর না সাইফুদ্দীন! জাহান্নামে ঠিকানা নিও না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। এই গোলাম মানসিকতার লোকগুলো বহু প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাহকে ভিখারীতে পরিণত করেছে। ইতিহাস বলছে, এমনটি অতীতেও হয়েছে এবং হতে থাকবে। দুঃখ হল, রাসূলের উম্মতও এই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে।'

'লোকটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও'– ক্ষোভ-কম্পিত কণ্ঠে গর্জে উঠলেন সাইফুদ্দীন– 'একে এমন জায়গায় আবদ্ধ করে রাখ, যেখান থেকে এর কণ্ঠ আমার কানে এসে না পৌঁছে।'

এক সালারের ডাকে দু'জন দেহরক্ষী ভিতরে প্রবেশ করে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল, খতীবকে কয়েদখানায় নিয়ে যাও।

খতীব ইবনুল মাখদুমকে যখন দু'বাহুতে ধরে কয়েদখানা অভিমুখে নিয়ে

যাওয়া হচ্ছিল, তখন সাইফুদ্দীন তার কণ্ঠ শুনতে পান–

'রাজত্বের মোহ মানুষকে দ্বীন থেকে সম্পর্কহীন করে তোলে। তোষামদপ্রিয় শাসক জাতিকে বিক্রি করে খায়। কাফেরের বন্ধুত্ব শত্রুতা অপেক্ষা বেশী ক্ষতিকর। ফিলিস্তীন আমাদের। ফিলিস্তীন আমার রাসূলের। কাফেররা তোমাদেরকে পরস্পর এজন্য যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছে, যাতে ফিলিস্তীনের উপর তাদের দখল অটুট থাকে। তোমরা যদি আপসে লড়াই করতে থাক, তাহলে প্রথম কেবলা তোমাদেরকে অভিশম্পাৎ করতেই থাকবে।'

খতীব ইবনুল মাখদুমকে টেনে-হেঁচড়ে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তিনি চিৎকার করে এ কথা বলছেন। বহু সৈনিক বাইরে বেরিয়ে আসে এবং মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের ন্যায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, 'খতীব ইবনুল মাখদুম পাগল হয়ে গেছেন এবং তাকে কয়েদখানায় আটকে রাখা হয়েছে।'

সংবাদটা শহরময় ঘুরেফিরে খতীবের বাসগৃহের দরজায় গিয়ে আছড়ে পড়ে। ঘরে আছে খতীবের ষোড়শী এক কন্যা। ঘরে পিতা-কন্যা দু'জনই বাস করতেন। মেয়েটা খতীবের একমাত্র সন্তান। তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। তিনি পরে আর বিয়ে করেননি। এভাবেই বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন বলে তিনি মনস্থির করেছিলেন।

'আশ-পাশের বহু মহিলা খতীবের ঘরে এসে ভীড় জমায়। পরিবারটা সকলের শ্রদ্ধাভাজন। মহিলারা খতীবের কন্যার নিকট জানতে চায়, তোমার পিতার হঠাৎ করে কী হয়ে গেল? তিনি কি সত্যই পাগল হয়ে গেছেন?'

'এমন হওয়ারই কথা ছিল'– মেয়ে বলল– 'এমনটা হওয়ারই কথা ছিল।' তার কণ্ঠে গাম্ভীর্য। ভয়-ভীতির লেশ মাত্র নেই। যত মহিলা তার ঘরে এসেছে, প্রত্যেককে সে একই জবাব দিয়েছে– 'এমনটা হওয়ার-ই কথা ছিল।'

❁ ❁ ❁

মসুলে খতীবকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। হাররানে দু'সেনা অধিনায়ক শামসুদ্দীন ও শাদবখতকে গোমস্তগীন বন্দী করে রেখেছেন। গোমস্তগীন এ-ই প্রথমবার জানতে পারলেন যে, তার এই দু'সালার মূলত সালাহুদ্দীন আইউবীর লোক এবং গোয়েন্দা। দু'জন আটক হওয়ার পর গোমস্তগীন রাতে কয়েদখানায় যান এবং তাদেরকে ওখান থেকে বের করে সে কক্ষে নিয়ে যান, যেখানে আসামীদের মুখ থেকে তথ্য বের করার সব ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান। ওখানে দু'জন লোককে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যে, তাদের উভয় বাহু রশি দ্বারা ছাদের সঙ্গে বাঁধা, পা দু'টো মাটি থেকে কয়েক

ফুট উঁচুতে এবং পায়ের গোড়ালীর সঙ্গে অন্তত দশ সের ওজনের লোহা ঝুলানো। প্রচন্ড শীতের মধ্যেও তাদের সমস্ত শরীর ঘামে জবজবে হয়ে আছে। তাদের বাহু ছিঁড়ে কাঁধ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে যেন। জায়গাটায় রক্ত ও পঁচা-গলা লাশের দুর্গন্ধে এক অসহনীয় পরিবেশ বিরাজ করছে।

'এদেরকে দেখে নাও'– গোমস্তগীন দু'ভাইকে উদ্দেশ করে বললেন– 'এই বন্দীশালায় আসার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা আমার সেনাবাহিনীর মালিক ছিলে। এখন কর্মদোষে এখানে এসে স্থান নিয়েছ। তোমরা গাদ্দার। তোমরা আমার আস্তিনের তলে সাপ হয়ে পালিত হয়েছিলে। তবে আমি তোমাদেরকে এখনো ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত আছি। তোমরা আমাকে শুধু বলে দাও, যে দু'টো মেয়েকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছ এবং তাদের সঙ্গে আরো যে দু'জন পুরুষ গিয়েছে, তারা কোথায় গেছে এবং এখান থেকে কি কি তথ্য নিয়ে গেছে। জবাবে শামসুদ্দীন ও শাদবখত মুচকি হাসি দিয়ে চুপ করে থাকেন। গোমস্তগীন বললেন– 'তারা সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট গেছে। কী, মিথ্যা বললাম? শামসুদ্দীন ও শাদবখত কান দিলেন না। গোমস্তগীন বললেন– এই দু'জনকে দেখে নাও। এরা যুবক বলে এখনো সহ্য করতে পারছে। তোমাদেরকে যদি এভাবে ঝুলিয়ে পায়ে বিশ সের ওজন বেঁধে দেই, তাহলে অল্পক্ষণের মধ্যেই বক্ষ উন্মুক্ত করে আমার সামনে রেখে দেবে। কিন্তু আমার পরামর্শ, এসব বাদেই তুমি আমাকে সব বলে দাও।'

'তারা কোন তথ্য নিয়ে যায়নি'– শামসুদ্দীন বললেন– 'এখানে কোন তথ্য নেই। তোমার ব্যাপারে সালাহুদ্দীন আইউবী ভাল করেই জানেন যে, তুমি খৃষ্টানদের সহযোগিতা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছ। আইউবী পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই তোমাদেরকে পরাজিত করতে এসেছেন। এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার মত কোন তথ্য নেই। তথ্য শুধু এতটুকু ফাঁস হয়েছে যে, আমরা দু'ভাই তোমার ফৌজের সালার ছিলাম। তুমি আমাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করতে। অথচ আমরা আসলে আইউবীর লোক।'

'অপর তথ্যটিও আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি'– শামসুদ্দীনের ভাই শাদবখত বললেন– 'দু'টি মুসলিম মেয়ে উপহার স্বরূপ তোমার কাছে এসেছিল। ঘটনাক্রমে আমরা জানতে পারলাম, তারা মজলুম এবং মুসলমান। তোমার কাজী ইবনুল খাশিব তোমার আগেই তাদেরকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমরা তাদেরকে নিজ কন্যা মনে করে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছি এবং কাজী ইবনুল খাশিব আমাদের জন্য এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাকে খুন

করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। তুমি ঘটনাটা জেনে ফেলেছ এবং আমাদেরকে গ্রেফতার করে বন্দী করে ফেলেছ। আমরা যদি ধরা না পড়তাম, তাহলে আমাদের পরিকল্পনা ছিল, যখন তুমি আমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করতে, আমরা গোটা বাহিনীটিকে সুলতান আইউবীর বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে যেতাম এবং তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করে তোমাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতাম। দুঃখ, আমাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না।'

'তারপরও আমরা সফল'– শামসুদ্দীন বললেন– 'তুমি আমাদেরকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে দাও। আমাদেরকে ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে আমাদের পায়ের সঙ্গে বিশ বিশ সের ওজনের পাথর বেঁধে দাও। আমাদের বাহু কাঁধ থেকে আলাদা করে ফেল। আমরা কষ্ট অনুভব করব না। আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য তীর ফুলে পরিণত হয়ে যায়। তাদের দেহ নিঃশেষ হয়ে যায়; আত্মা মরে না। আল্লাহর পথের পথিকের আত্মা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় বস্তু।'

'আমি তোমাদের ওয়াজ শুনতে আসিনি'– গোমস্তগীন বললেন– 'ওহে বিশ্বাসঘাতকরা! তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট কী গোপন তথ্য প্রেরণ করেছ বল।'

'তুমি আমাদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলছ'– শামসুদ্দীন বললেন– 'এটাই আসল তথ্য, যা তুমি গোপন করতে চাচ্ছ যে, গাদ্দার কে? অনাগত বংশধরদের নিকট থেকে তুমি এ তথ্য গোপন করতে পারবে না যে, তুমি গাদ্দার। ইতিহাস চীৎকার করে করে বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবী ফিলিস্তীনকে খৃষ্টানদের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিলেন; কিন্তু গোমস্তগীন নামক একজন মুসলিম দুর্গপতি তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।'

'তোমরা যদি এতই পাকা মুসলমান হতে, তাহলে হিন্দুস্তানকে হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়ে নুরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট পালিয়ে আসতে না'– গোমস্তগীন অবজ্ঞার সুরে বললেন– 'তোমরা গোলাম দেশ থেকে এসেছ।'

'হিন্দুস্তানকে হিন্দুদের হাতে আমরা তুলে দেইনি'– শাদবখত বললেন– 'ওখানেও তোমাদের মত কিছু মুসলমান ছিল, যারা হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পেতেছিল এবং তোমাদের-ই ন্যায় রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল। রাজত্বের নেশা তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। সে সুযোগে হিন্দুরা মুসলমানদের পরাজিত করে হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। দেশের ভাগ্য যদি সেনা অধিনায়কদের হাতে থাকত, তাহলে আজ হিন্দুস্তান আরবের ভূখন্ডের সঙ্গে মিলিত থাকত। কিন্তু সেখানে সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রনায়করা নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছিল।'

'ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে আরো দু'দিন সময় দিলাম'– গোমস্তগীন বললেন– 'আমার প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব যদি পেয়ে যাই, তাহলে এই নরক থেকে বের করে আমি তোমাদেরকে তোমাদের ঘরে নজরবন্দী করে রাখব। তবে যদি আমাকে নিরাশ কর, তাহলে তোমাদেরকে আমি মৃত্যুদন্ড দেব। তোমরা এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পঁচে-গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তোমরা ভেবে দেখ।'

গোমস্তগীন তার দুর্গে খৃষ্টান উপদেষ্টা নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাদেরকে জানালেন, তাদের যে বন্ধু খুন হয়েছে, সে কারো ষড়যন্ত্রের শিকার হয়নি। বরং সে হেরেমের একটি মেয়ের হাতে খুন হয়েছে। গোমস্তগীন তাকে অবহিত করেন, আমি কাজী ইবনুল খাশিবের খুন ও বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে আমার দু'জন সালারকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেছি। তিনি উপদেষ্টার নিকট থেকে পরামর্শ কামনা করেন, সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে এখনই অভিযান পরিচালনা করব কিনা।

'আমি জানি না সালারদ্বয় কি কি তথ্য সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট সরবরাহ করেছে'– গোমস্তগীন বললেন– 'প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্রস্তুতি নেয়ার আগেই আমাদের হামলা করা উচিত। এ পরিস্থিতিতে আমাকে আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।'

খৃষ্টান উপদেষ্টাগণ গোমস্তগীনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে বলল, আজ রাত-ই আমরা খৃষ্টান ক্যাম্পে লোক পাঠাব।'

সে রাতেই এক খৃষ্টান দূত রওনা হয়ে যায়।

মসুলে খতীব ইবনুল মাখদুম কয়েদখানার একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। তার যুবতী কন্যা– যার নাম সায়েকা– ঘরে একাকী পড়ে আছে। মহিলারা দিনভর তার নিকট আসা-যাওয়া করছে আর সে সবাইকে বলছে– 'এমনটা হওয়ার-ই কথা।' কিন্তু কথাটার অর্থ কী, মহিলারা গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেনি। তবে দু'টি যুবতী মেয়ে বিষয়টা লক্ষ্য করে। তাদের মনে সন্দেহ জাগে।

রাতের বেলা। সায়েকার ঘরে আর কেউ নেই। মেয়ে দু'টো ঘরে প্রবেশ করে। সায়েকা তাদেরকে ভালভাবে চিনে না।

'আচ্ছা, সারাক্ষণ তুমি একথা কী বলছ যে, 'এমনটা হওয়ার-ই কথা?' এক মেয়ে বলল।

'আল্লাহর সিদ্ধান্ত এমনই ছিল'– সায়েকা জবাব দেয়– 'আমি এ ছাড়া আর কী বলতে পারি?'

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করে। শেষে অপর মেয়ে বলল– 'তুমি কথাটার মর্ম বুঝিয়ে বল, দেখি, আমরা তোমার কোন উপকার করতে পারি কিনা।'

'আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ আমার সাহায্য করতে পারবে না'– সায়েকা বলল– 'আব্বাজান কোন অন্যায় করেননি। তিনি সব সময় সত্য কথা বলে থাকেন। সম্ভবত তিনি মসুলের শাসনকর্তাকে কোন কড়া কথা শুনিয়েছেন। সেজন্যই আমি বলছি, এমনটা হওয়ারই কথা। কেননা, তিনি তোষামোদ করবার মত মানুষ নন।'

'তিনি আসলে কী বলেছেন বা কী করেছেন, আল্লাহ-ই ভাল জানেন'– অপর মেয়ে বলল– 'আমার মনে হচ্ছে, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর পক্ষে কথা বলেছেন। তবে তিনি আসলে কার সমর্থক, তুমি-ই ভাল জান।'

'তোমরা যাকে সত্য মনে কর, তিনি তার সমর্থক'– সায়েকা মুচকি হেসে বলল এবং জিজ্ঞেস করল– 'তোমরা কাকে সমর্থন কর?'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর!' উভয় মেয়ে বলল।

'আব্বাজানও আইউবীর সমর্থক'– সায়েকা স্পষ্ট বলে দিল– 'বিষয়টা সম্ভবত সাইফুদ্দীন জেনে ফেলেছেন।'

'তিনি কি আইউবীকে শুধু মৌখিকভাবে সমর্থন করেছেন, নাকি কাজেও?' এক মেয়ে জিজ্ঞেস করে।

'আচ্ছা, তোমরা কি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছ?'– সায়েকা হঠাৎ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে– 'মসুলের তরুণ প্রাণগুলোকে কি কাফেরদের পক্ষে চলে গেল?'

'হ্যাঁ'– এক মেয়ে জবাব দেয়– 'আমরা দু'জনে গুপ্তচরবৃত্তি করতে এবং তোমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে এসেছি যে, মসুলের যুবকরা কাফেরদের সমর্থক নয়। তারা কাফেরদের পদতল থেকে আরবের মাটিকে উদ্ধার করার জন্য অস্থির। তারা তাদের মিশনে সফল হতে বদ্ধপরিকর। তুমি যে বলতে, এমনটা হওয়ার-ই কথা ছিল– একথার অর্থ আমরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেনি। এথেকেই তুমি আমাদেরকে আন্দাজ করে নিতে পার। আমরা তোমার কথা থেকেই বুঝে ফেলেছি, তোমার পিতা সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক ছিলেন এবং সাইফুদ্দীন বিষয়টা জেনে ফেলেছেন।'

দীর্ঘ আলাপ ও মতবিনিময়ের পর সায়েকা নিশ্চিত হয়, মেয়ে দু'টো তাকে ধোঁকা দিচ্ছে না। সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, আমি কী করতে পারি এবং

তোমরা আমার কী সহযোগিতা করবে?

'প্রথমে জানতে হবে, মোহতারাম খতীবকে কয়েদখানায় কষ্ট দেয়া হচ্ছে কিনা'– এক মেয়ে বলল– 'যদি তিনি নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।'

'কয়েদখানায় তাঁর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হচ্ছে, তা জানব কী করে?' সায়েকা জিজ্ঞেস করে।

'আমরা চেষ্টা করব'– অপর মেয়ে বলল– 'তুমি মসুলের শাসনকর্তার নিকট গিয়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আবেদন জানাও। তিনি যদি অনুমতি না দেন, তাহলে অন্য ব্যবস্থা নেব।'

'আমি কাল সকালেই যাব'– সায়েকা বলল– 'আমি তাকে একথাও জিজ্ঞেস করব, আমার পিতার অপরাধ কী?'

'মেয়েরা চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ তাদের মনে পড়ে যায়, সায়েকা ঘরে একা। তারা সায়েকাকে বলল, রাতে তুমি আমাদের সঙ্গে থাক। কিন্তু সায়েকার মনে কোন ভয় নেই। তবু মেয়েরা নিজ নিজ পরিবারের নিকট বলে সায়েকার ঘরে ঘুমাতে আসে।

শীতকাল। তিনজন এক কক্ষে শুয়ে পড়ে। মধ্যরাতের পর এক মেয়ে বাথরুমে যাওয়ার জন্য বাইরে বের হয়। সে দেখতে পায়, ঘরের বাইরে কালোমত একটি ছায়া নড়াচড়া করতে করতে কোন দিকে যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। মেয়েটির গা ছমছম করে ওঠে। সে দ্রুত ঘরে ফিরে গিয়ে বান্ধবীকে জাগিয়ে তোলে এবং ঘটনাটা জানায়। তাদের দু'জনেরই কাছে খঞ্জর ছিল। তারা কক্ষ থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে এদিক-ওদিক তাকায়। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

তারা সায়েকাকে জাগায়নি। কিন্তু সায়েকার চোখ খুলে গেছে। বিছানা থেকে উঠে বান্ধবীদেরকে কক্ষে না পেয়ে বারান্দায় গিয়ে ডাক দেয়। তারা এগিয়ে এসে বলে, এই, বাইরে কালোমত একটি ছায়া নড়াচড়া করছে! মানুষ-টানুষ কিনা কে জানে।

ধুত্তুরি, আস তো শুয়ে থাকি'– সায়েকা বলল– 'ওসব কিছু না। তুমি যখনই বের হবে, এরকম কিছু নড়াচড়া করতে দেখবে। দৌড়ে গিয়ে ছায়াকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত কর না আবার।'

'ছায়া বলছ কেন?'– এক মেয়ে বলল– 'ওটা তো মানুষ। আমি দেখেছি।'

'যা হয় হোক, ওসব আমি ভয় করিনা'– সায়েকা বলল– 'তোমরাও ভয় করনা।'

সায়েকার এসব কথায় মেয়ে দু'টোর গা ছমছম করে ওঠে। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। তারা মানুষকে ভয় করে না। সায়েকার কথা অনুযায়ী যদি ওটা মানুষ না হয়, তাহলে জিন-ভূত তো নিশ্চয়। সায়েকা বলল– 'এটা আমার আব্বাজানের ছায়া। তোমরা তাদেরকে জিন-ই মনে কর। আমি কখনো তাদের কাছে যাইনি। আমার বিশ্বাস, তারা আমার নিরাপত্তার জন্য ঘরের চারপাশে ঘোরা-ফেরা করছে।'

'খতীব সাহেব বড় বুজুর্গ মানুষ'– এক মেয়ে বলল– 'জিনদের মধ্যেও তার ভক্ত আছে।'

'ব্যাপারটা এমনই'– সায়েকা বলল– 'ওদেরকে ভয়ও করনা, ওদের কাছেও যেও না।'

❁ ❁ ❁

সেই রাত। খতীব ইবনুল মাখদুম সাইফুদ্দীনের বন্দীশালায় আবদ্ধ। তিনি এখনো জানে না, তাঁর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হবে। এক সান্ত্রী তাঁর কক্ষের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে। খতীব তাকে থামিয়ে বললেন– 'আমার এক কপি কুরআন প্রয়োজন। জেলখানায় কুরআন শরীফ আছে নিশ্চয়।'

'এখানে? ...কুরআন?'– সান্ত্রী বিস্ময় ও অবজ্ঞার সুরে বলল– 'কুরআন পাঠকারীরা এখানে আসে না। এটা জাহান্নাম। এখানে আসে পাপিষ্ঠরা। আপনি ঘুমিয়ে থাকুন।'

সান্ত্রী হেঁটে সামনের দিকে চলে যায়।

খতীব কুরআনের হাফেজ ছিলেন না। তবে অনেক সূরা ও আয়াত মুখস্ত ছিল। তিনি উচ্চস্বরে সূরা আর-রাহমান তেলাওয়াত শুরু করলেন। খতীবের সুললিত কণ্ঠ গোটা কয়েদখানাকে মাতিয়ে তোলে। তেলাওয়াত শেষ করার পর তিনি দেখলেন, উর্দি পরিহিত এক জেল কর্মকর্তা বিমুগ্ধ মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে।

'তুমি কে?'– কর্মকর্তা খতীবকে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমি ছয় বছর যাবত এই জেলখানায় চাকরি করছি। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত এবং এই সুর এ-ই প্রথমবার শুনলাম, যা আমার হৃদয়ে গেঁধে গেছে। আমি কুরআন পড়া জানি না। অথচ, এটি আমার মাতৃভাষায় লেখা গ্রন্থ।'

'আমি মসুলের খতীব।' খতীব জবাব দেন।

'আপনার অপরাধ?' কর্মকর্তা বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করেন।

'আমার অপরাধ হল, আমি কুরআনের ভাষায় কথা বলি'– খতীব জবাব

দেন– 'আমার অপরাধ, আমি আমার রাজার আদেশ অমান্য করেছি এবং কুরআনের বিধানকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।'

'আবার পড়ুন'– কর্মকর্তা অনুরোধের সুরে বললেন– 'আমার ভিতরে কিছু বিষ আছে, কুরআনের ভাষা ও আপনার সুর যাকে বের করতে শুরু করেছে।'

খতীব পূর্বের চেয়ে অধিক হৃদয়কাড়া সুরে আবারো সূরা আর-রাহমান তেলাওয়াত শুরু করেন। কর্মকর্তা কক্ষের জানালার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছেন। তার দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তেলাওয়াত শেষে খতীব থামলে কর্মমর্তা চক্ষু বন্ধ করে ভাঙ্গা গলায় ক্ষীণ কণ্ঠে সূরা আর-রহমানের দু'একটি আয়াত আবৃত্তি করতে শুরু করেন।

আপনার কণ্ঠে যখন এত যাদু, তো আপনার ভক্তদের মধ্যে জিনও আছে নিশ্চয়'– কর্মকর্তা বললেন– 'আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমি শুনেছি, কুরআন থেকে নাকি ফাল বের করা যায়। বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে প্রশ্ন করলে নাকি জিনরা কুরআনের ভাষায় জবাব দেয়?'

কিন্তু প্রশ্ন হল, তোমার প্রশ্নটা কী?'– খতীব বললেন– 'কুরআন শুধু ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে থাকে।'

'আর যার ঈমান পাকা নয়?' কর্মকর্তা প্রশ্ন করেন।

'তার বক্ষে ঈমানের প্রদীপকে আলোকিত করে'– খতীব বললেন– 'তোমার প্রশ্নটা বল।'

'আমার একটি আকাংখা আছে'– কর্মকর্তা বললেন– 'আমার বুকে আগুন জ্বলছে। জানি না, এটা ঈমানের দীপশিখা, নাকি প্রতিশোধের আগুন। যে ফৌজ জেরুজালেম উদ্ধার করতে মাঠে নেমেছে, আমি সে ফৌজে যোগ দিতে চাই। আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে।'

'জেরুজালেম জয় করাকে যদি তুমি ঈমান মনে করে থাক, তাহলে শীঘ্রই তুমি সেখানে পৌঁছে যাবে'– খতীব বললেন– 'প্রতিশোধ ব্যক্তিগত কাজ। ঈমান আল্লাহর নির্দেশ। আচ্ছা, তুমি কিসের প্রতিশোধ নেয়ার কথা বলছ? আর জেরুজালেম বলছ কেন?– বাইতুল মুকাদ্দাস বল।'

'আমি এর আগে কখনো কোন কয়েদীর সঙ্গে এরূপ কথা-বার্তা বলিনি'– জেল কর্মকর্তা বললেন– 'আপনি খতীব। আমি আমার হৃদয়টা খুলে আপনার সম্মুখে রাখতে চাই। আমার আত্মার প্রশান্তি প্রয়োজন। আমি বাইতুল মোকাদ্দাসের বাসিন্দা। ওখানে খৃষ্টানদের শাসন চলছে। ওখানে মুসলমানদের সঙ্গে বকরী-ভেড়া ও পশুর ন্যায় আচরণ করা হয়। খৃষ্টানরা যে মুসলমানকে

ইচ্ছা খুন করে, যাকে খুশি কারাগারে নিক্ষেপ করে। বেগার খাটানোর প্রচলন তো ব্যাপক। যে পরিবারে যুবতী মেয়ে আছে, সে পরিবারের মুখ সব সময় শুষ্ক থাকে। ওখানকার মুসলমানরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পথপানে তাকিয়ে আছে। সাত বছর আগের ঘটনা। একদিন এক খৃষ্টান আমাকে ধরে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কিছু মাল-পত্র মাথায় করে তার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে বলে। কিন্তু আমি অস্বীকার করি। সে আমার মুখের উপর প্রচন্ড একটা চপেটাঘাত করে বলল, হারামজাদা! মুসলমান হয়ে আমার আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস দেখাচ্ছিস! আমি রাগের মাথায় তার মুখে একটা ঘুষি মারি। লোকটা মাটিতে পড়ে যায়। আমি তার মাথার চুলগুলো মুঠি করে ধরে টেনে দাঁড় করাই এবং আরেকটি ঘুষি মেরে আবারো ফেলে দেই।'

'এমন সময়ে পিছন থেকে কে যেন আমাকে ঝাপটে ধরে। পরক্ষণেই চারদিকে খৃষ্টানরা এসে ভীড় জমায়। সংবাদ পেয়ে পুলিশও ধেয়ে আসে এবং আমাকে বেগার ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আমি সেখানে তিনদিন অতিবাহিত করি। তৃতীয় রাতে আমি এক সান্ত্রীকে পিছন থেকে ঝাপটে ধরে খঞ্জরের আঘাতে তাকে কাবু করে পালিয়ে যাই। পরিকল্পনা ছিল, ঘরে পৌঁছে রাতেই পরিবারের সকলকে নিয়ে বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে পালিয়ে যাব। অন্যথায় ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা প্রবল। কিন্তু ততক্ষণে আমার বাড়ীটা ধ্বংসস্তূপ। সব জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে আছে। আমি এক মুসলিম পরিবারের দরজায় করাঘাত করি। গৃহকর্তা ভয়ে ভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার পরিবারের লোকজন কোথায়? আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে তিনি আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে ফেললেন। তিনি বললেন– 'তোমার পরিবারের পুরুষদেরকে খৃষ্টানরা ধরে নিয়ে গেছে। তোমার দু'কুমারী বোনকে খৃষ্টান সেনারা নিয়ে গেছে। শেষে তারা আগুন দিয়ে ঘরটাকে জ্বলিয়ে দিয়ে গেছে।'

'তখন আমার মানসিক অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল, আপনি তা আন্দাজ করতে পারবেন। আমি জানতাম, আমি আমার বোনদেরকে ফিরে পাব না এবং এখানে বেশী সময় অবস্থান করলে আমি ধরা পড়ে যাব এবং খৃষ্টানরা আমাকে মেরে ফেলবে বা কয়েদখানায় আটক করে রেখে আজীবন নির্যাতন চালাতে থাকবে। কোন মুসলিম পরিবারের ঘরে লুকাবার মত ভুলও আমি করতে পারছিলাম না। কেননা, তার পরিণতিতে সেই পরিবারটা ধ্বংস হয়ে যেত। তাই আমি রাতেই বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে বেরিয়ে আসি। আমার জখম থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। কিন্তু আমি নিরুপায়। ভোর বেলা পথে এক অশ্বারোহী খৃষ্টানের সঙ্গে

দেখা। লোকটা সাধারণ নাগরিক। আমি তার পথ আগলে দাঁড়াই এবং কথার ফাঁদে ফেলে তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচে নামাই। তার এক পা ঘোড়ার রেকাবে, অপর পা মাটিতে- এমন অবস্থায় আমি পেছন দিক থেকে তার ঘাড়টা দু'বাহু দ্বারা ঝাপটে ধরি। তার কোমরে ছোট আকারের একটি তরবারী বাঁধা ছিল। সেটি কেড়ে নিয়ে আমি তাকে খুন করি এবং তার ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত অগ্রসর হতে শুরু করি।'

'এ নিয়ে আমি দু'জন খৃষ্টানকে হত্যা করলাম। তার আগে কয়েদখানায় সান্ত্রীকে হত্যা করে এসেছি। কিন্তু আমার মন শান্ত হল না। আমি সকল খৃষ্টানকে হত্যা করার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। এ অবস্থায় আমি কত সময় পথ চললাম এবং কোথায় কোথায় ঘুরে ফিরলাম, তা আমার স্মরণ নেই। এত দীর্ঘ সময়ে না আমার পেটে ক্ষুধা লাগল, না পিপাসা। একটু পরপর আমার বোনদের কথা মনে পড়ত আর আমি তারবারীটা হাতে নিয়ে বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকতাম। আমার গা কাঁপতে শুরু করত। আমি বেশ ক'বার আল্লাহকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাকে কোন্ পাপের শাস্তি দিচ্ছ? যদি আমি গুনাহ্গার হয়ে থাকি, তাহলে শাস্তি তো শুধু আমার পাওয়া দরকার। বোন এবং অবুঝ ভাইটির তো কোন পাপ ছিল না।' কিন্তু আল্লাহ আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। আমি সেজদাবনত হয়ে আল্লাহকে ডেকেছি এবং নিরাশ হয়েছি। আমি আল্লাহর সমীপে এ ফরিয়াদও করেছি যে, 'তুমি আমাকে শান্ত করে দাও এবং আমার অন্তরের প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে দাও। আমার অনুভূতি মরে যাক।'

'আমি মসুলের এমন একটি জায়গায় এসে পৌছে গেলাম, যেখানে আর খৃষ্টানদের হাতে ধরা পড়ার আশংকা রইল না। কিন্তু একটি নির্দয় হাত আমার হৃদয়টাকে এমনভাবে চেপে ধরে রাখল যে, আমি প্রতি মুহূর্ত অস্থিরতার মধ্যদিয়ে অতিবাহিত করতে বাধ্য হই। আমি মসজিদে চলে গেলাম। ইমাম সাহেবকে বললাম, খোদা কোথায় আমাকে দেখিয়ে দিন। বলুন, আমার অন্তর কোথায় শান্তি পাবে। কিন্তু তিনি আমার কোন সাহায্য করলেন না। সেখান থেকে আমি অন্য এক গ্রামে চলে গেলাম। তারপর সেখান থেকেও চলে গেলাম। তারপর এক এক করে ইমামদের নিকট আমার প্রশান্তি ভিক্ষা করতে থাকি। কিন্তু কেউই আমাকে সাহায্য করল না। কেউ আমাকে আল্লাহর সন্ধান দিল না। কেউ এমন কোন বুদ্ধি আমাকে বলল না, যার বলে আমি আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারি এবং তাঁর নিকট শান্তি প্রার্থনা করতে পারি। আমি

অধিকাংশ রাতে বোনদেরকে স্বপ্নে দেখতাম। দেখতাম, তারা কাঁদছে। জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের ফোঁপানি ও হিচকি শুনতে পেতাম। আমার মনে অনুভূতি জাগে যে, বোনরা আমাকে অভিশম্পাত করছে।'

'এক ব্যক্তি আমাকে বলল, যদি খৃস্টানদের থেকে প্রতিশোধ নিতে হয়, তাহলে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যাও। সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী ফিলিস্তীনকে মুক্ত করার লক্ষ্যে লড়াই করছেন। মুসলমান ও খৃস্টানদের মাঝে যে যুদ্ধ চলছে, তা আমার জানা ছিল। কোন্ যুদ্ধে কারা পরাজিত হচ্ছে, বাইতুল মোকাদ্দেসে বসেই আমি খবর পেতাম। বাইতুল মোকাদ্দাসে যখন খৃস্টানরা সেখানকার মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা হঠাৎ বাড়িয়ে দিত, তখনই আমরা বুঝে ফেলতাম, কোন এক ময়দানে খৃস্টানরা পরাজিত হয়েছে, যার প্রতিশোধ তারা এখানকার নিরস্ত্র-নিরীহ মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করছে। ওখানে বসে আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর নাম শুনতাম। এ নামটা এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, সেখানকার খৃস্টান অদিবাসীরা এ নামে আতংকিত হয়ে উঠে এবং তাকে ঘৃণার সাথে স্মরণ করে। আমরা এও শুনেছি যে, সালাহুদ্দীন আইউবী বানের ন্যায় ধেয়ে আসছেন। কিন্তু তিনি আসলেন না। তার পরিবর্তে উল্টো আমিই বুকে গভীর একটা জখম নিয়ে এখানে চলে এসেছি। আমি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে গেলাম। কিন্তু যুদ্ধের জন্য ময়দানে না পাঠিয়ে আমাকে এই জেলখানার দায়িত্ব দেয়া হয়। ইতোমধ্যে আমি প্রমোশনও পেয়েছি।'

'এখানে আমি মানুষের উপর জুলুম দেখেছি। জুলুম দেখে দেখে আমি কেঁপে উঠি। এখানে মানুষের হাড়-গোড় ভেঙ্গে ফেলা হয়। বাইতুল মোকাদ্দাসে খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে থাকে। এখানে আমি মুসলমানদেরকে মুসলমানের উপর জুলুম করতে দেখেছি। আমি জানতে পেরেছি, এখানে নির্দোষ লোকদেরও আনা হয় এবং অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়। তাদের অপরাধও তা, যা আপনার অপরাধ। আপনাকে এখানে এনে কেন আটক রাখা হল, আমি বুঝে ফেলেছি। এ কাজটা আমাকেও করতে হয়েছে। আমি মানুষকে এমন এমন কষ্ট দিয়েছি, যার বিবরণ দিলে আপনি বেহুঁশ হয়ে যাবেন। আমার সঙ্গীরা পুরোপুরি হিংস্র হায়েনায় পরিণত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মানবতা শুধু এটুকু অবশিষ্ট আছে যে, তারা মানুষের ন্যায় চলাফেরা করে ও মানুষের মত কথা বলে। তাদের থেকে আমার পার্থক্য হল, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কয়েদীদের সঙ্গে সমবেদনার দু'চারটা কথা বলি, তাদের দুঃখ বুঝবার চেষ্টা করি। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, তোমাদের অপরাধ কী? কিন্তু

সমবেদনার এই জযবা আমার হৃদয়ের বোঝা হাল্কা করার পরিবর্তে আরো ভারী করে তুলছে। আমি এক মুহূর্তের জন্যও মনে শান্তি পাই না। আমি আল্লাহকে দেখি না। আমার চোখের সামনে থেকে আমার বোনরা সরছে না। মনে হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি খৃস্টানদের থেকে প্রতিশোধ না নেব, ততক্ষণ এভাবে আমাকে অস্থিরতার মধ্যেই কাটাতে হবে।'

'আজ আমি আপনার কণ্ঠে কুরআনের ঘোষণা শুনেছি–

'পাপিষ্ঠদেরকে তাদের চেহারা দেখেই চিনে নেয়া হবে। তারপর পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে তাদের পাকড়াও করা হবে। তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? এটাই সেই জাহান্নাম, পাপিষ্ঠরা যাকে অবিশ্বাস করত। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও টগবগে গরম পানির মাঝে ছুটাছুটি করবে।'

আপনার কণ্ঠে জীবনে এই প্রথমবার কুরআনের অমোঘ ঘোষণা শুনে আমার মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। আমার মনে হতে লাগল, আমি যে সত্যের সন্ধানে ঘুরে ফিরছি, তা এই ক'টি শব্দের মধ্যেই লুকায়িত আছে।'

জেল কর্মকর্তা জানালার ফাঁক দিয়ে একটা হাত ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে খতীব ইবনুল মাখদুমের পরনের চোগা ধরে ফেলে এবং অস্থির চিত্তে বলে ওঠে– 'বলুন, এ আপনি আমাকে কী শোনালেন। বলুন, আমার মস্তিষ্কে কি খুন চেপেছে? তা-ই যদি হয়, বলুন, আমি কিভাবে প্রতিশোধ নেব? আমি পাগল হয়ে যাব না তো? আল্লাহ যদি সত্যিই থাকেন, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করে আমাকে বলুন, আমার প্রশ্নগুলোর জবাব কী?'

'তোমার মস্তিষ্কে খুন চেপেছে'– খতীব বললেন– 'তুমি আল্লাহর আওয়াজ শুনে ফেলেছ। আমার কণ্ঠে আল্লাহই কথা বলছিলেন। তুমি প্রতিশোধ নিতে অস্থির হয়ে পড়েছ। কিন্তু এখানে তোমাকে এভাবে বেহাল ও বেচাইন হয়েই থাকতে হবে। তুমি যে ফৌজের কর্মকর্তা, তারা কখনো বাইতুল মোকাদ্দাস যাবে না।'

'কেন?'

'কারণ, এ ফৌজ প্রথমে সুলতান আইউবীকে পরাজিত করবে'– খতীব জবাব দেন– 'তারপর তাকে হত্যা করবে। তারপর খৃস্টানদের ক্রীড়নকে পরিণত হবে।'

জেল কর্মকর্তার চোখ খুলতে শুরু করেছে। খতীব তাকে বললেন– 'মুসলিম শাসকরা কী করছে, তা কি তুমি জান?'

কর্মকর্তা বললেন– 'আমি বেশ ক'দিন ধরেই এ জাতীয় কথাবার্তা শুনছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। জাতির যে মেয়েগুলো খৃস্টানদের বর্বরতার শিকার হয়েছে, আমাদের শাসকরা তাদের কথা ভুলে যাবে, আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।'

'তারা ভুলে গেছে'– খতীব বললেন– 'তারা এ কথাও ভুলে গেছে, সেই অপহৃত মুসলিম মেয়েদেরকেই যে তাদেরকে উপহার দেয়া হয় এবং তাদেরকে নিজেদের হেরেমের শোভা বানায়। তারা এ কারণেই সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমনে পরিণত হয়েছে। কারণ, তিনি কুরআনের বিধান অনুসরণ করে চলেন এবং জাতির মর্যাদা রক্ষা করতে চান। তার কোন বাড়ি-ঘর আছে কিনা, তাও তিনি ভুলে গেছেন। জীবনটা কাটছে তার পাহাড়-জঙ্গল আর মরুভূমি ও উপত্যকায়– জিহাদের ময়দানে। আমার অপরাধও এটাই যে, আমি মসুলের শাসনকর্তাকে কুরআনের বিধান স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলাম, একজন মর্দে মুজাহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তুমি পরাজিত হবে। কুরআনের যে পবিত্র বাক্যগুলো একটু আগে তোমাকে জাদুর ন্যায় প্রভাবিত করেছে, সাইফুদ্দীনকে আমি তা-ই স্মরণ করিয়েছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম, তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠদের চেহারা দেখে চিহ্নিত করা হবে এবং মাথার ঝুঁটি ও পায়ে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাকে আমি কুরআনের বিধানও শুনিয়েছি যে, তুমি যদি মস্তিষ্ক থেকে রাজত্বের নেশা দূর না কর, তাহলে তুমি জাহান্নামের অগ্নি ও টগবগে ফুটন্ত পানির মাঝে ছুটাছুটি করবে। কিন্তু সে আল্লাহর বিধান মান্য করতে অস্বীকার করে প্রবৃত্তির কথা মান্য করল এবং সত্য বলার অপরাধে আমাকে গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখল।'

'এখানে আপনাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে'– কর্মকর্তা বললেন– 'তবে আমি আপনার যতটুকু সম্ভব সেবা ও সহযোগিতা করব।'

'এই জাগতিক ও দৈহিক নির্যাতন আমাকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না'– খতীব বললেন– 'তুমি আমার কণ্ঠে যে জ্বলন ও প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছ, তা ছিল আমার আত্মার কণ্ঠ। দুনিয়ার জাহান্নামে আমি নিশ্চিন্ত। আমার আওয়াজ আল্লাহর আওয়াজ। আমার কোন কষ্ট নেই। তবে আমার একটি চিন্তা আছে, যা আমাকে পেরেশান করছে। আমার একটা যুবতী মেয়ে আছে। মেয়েটা আমার একমাত্র সন্তান। স্ত্রী মারা গেছে বহু বছর আগে। এই মেয়েটির স্বার্থে আমি আর বিয়ে করিনি। আমরা একজন অপরজনের জন্য বেঁচে আছি। মেয়েটা ঘরে একা।'

'আমি তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব।' কর্মকর্তা বললেন।

'প্রত্যেকেরই হেফাজতকারী আল্লাহ'– খতীব বললেন– 'আমি তোমাকে আমার ঘরের ঠিকানা দিচ্ছি। কন্যা সায়েকাকে বলবে, যেন সে অটল থাকে এবং আমার ব্যাপারে কোন চিন্তা না করে। এখানে যদি কুরআন পাঠ করার অনুমতি থাকে, তাহলে তার নিকট থেকে আমার কুরআনটা নিয়ে আসবে।'

জেল কর্মকর্তা ভোরেই খতীবের বাড়ি চলে যান এবং তার কন্যাকে সান্ত্বনা দেন যে, পিতার ব্যাপারে কোন চিন্তা করবে না, তিনি ভাল আছেন। কর্মকর্তা সায়েকাকে জানায়, আমি আপনার পিতার দ্বারা অনেক প্রভাবিত হয়েছি। যতটুকু সম্ভব আমি তাকে সাহায্য করব। তবে আমি উপরের আদেশের পরিপন্থী কিছু করতে পারব না। আমি কয়েদখানার একজন নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা। সে সায়েকাকে বলল, মোহতারাম খতীব আপনাকে তাঁর কুরআন শরীফখানা দিতে বলেছেন। সায়েকা কুরআন দেয়ার আগে তার সঙ্গে নানা কথা বলে নিশ্চিত হয় যে, লোকটা আসলেই অন্তর থেকে তার পিতার সহেযাগিতা করতে চাচ্ছে। সায়েকার নিকট লোকটাকে আবেগপ্রবণ বলে মনে হল। কর্মকর্তা যখন বলল, আমি আপনার ও আপনার পিতার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুতি আছি, তখন সায়েকা তাকে বলল, আপনি কি জানেন, আব্বাজানকে কি অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে? আমার মনে হচ্ছে, তথ্য বের করার জন্য সাইফুদ্দীন তার উপর নির্যাতন চালাবে। আপনি কী সহযোগিতা দিয়ে তাকে কয়েকখানা থেকে পালাবার সুযোগ করে দিতে পারেন না? আমরা দু'জন মসুল ছেড়ে চলে যাব।'

কর্মকর্তা মুচকি হেসে বললেন- 'আল্লাহর যা ইচ্ছা। আমি আপনার পিতার কণ্ঠে আল্লাহর কণ্ঠ শুনেছি এবং তার চোখে ঈমানের নূর দেখেছি। আল্লাহর আওয়াজ ও ঈমানের নূরকে কোন মানুষ কয়েদখানায় আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। সম্ভবত এই আওয়াজ ও নূরকে মুক্ত করার শুভ কর্মটি আল্লাহ পাক আমার জন্য লিখে রেখেছেন এবং তার বিনিময়ে আমার মনের আগুন নির্বাপিত হবে। আমি আপনাকে বলতে পারব না যে, আমি কী করব। বিষয়টা অত্যন্ত গোপনীয়।'

'আপনি বসুন, আমি আব্বাজানের জন্য কুরআন নিয়ে আসছি'– বলেই সায়েকা ভেতরে চলে যায় এবং দীর্ঘ সময় পর ফিরে আসে। তার হাতে এক কপি কুরআন। কুরআন শরীফখানা কর্মকর্তার হাতে দিয়ে সায়েকা বলল– 'আব্বাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি নেয়ার জন্য আমি মসুলের

শাসনকর্তার নিকট যাচ্ছি।'

'আচ্ছা যান, আমিও যাচ্ছি।' বলে জেল কর্মকর্তা খতীবের ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

❁ ❁ ❁

সায়েকা প্রস্তুত হয়ে সাইফুদ্দীনের দরবারে চলে যায়। তাকে ফটকের বাইরে থামিয়ে দেয়া হল। সাইফুদ্দীন সালাহুদ্দীন আইউবী নন যে, তার সঙ্গে যে কারো সাক্ষাৎ করার অনুমতি থাকবে। সাইফুদ্দীন রাজা। তার রীতি-নীতিও রাজকীয়। তাকে মদপান করতে হয়। হেরেমের জন্য সময় বের করতে হয়, বাইজি নাচের আসর বসাতে হয় এবং এসব করে যেটুকু সময় বাঁচে তা সুলতান আইউবী থেকে রাজত্বকে বাঁচানোর পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজে ব্যয় করেন। জনসাধারণের কোন খোঁজ-খবর তিনি রাখেন না। ক্ষমতালোভীরা জনগণকে ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে শুধু। জনগণের ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখে তাদের কিছু যায় আসে না। যতটুকু খাবার খেয়ে প্রজারা বেঁচে থেকে তাদের সামনে সেজদাবনত হয়ে থাকবে, ততটুকুর বেশি সুযোগ-সুবিধা তাদের দেয়া হয় না।

সায়েকা সেই প্রজাদেরই একটি মেয়ে। দারোয়ান তাকে জিজ্ঞেস করল– 'আপনি কে?' সায়েকা বলল– 'আমি মসুলের খতীব ইনবুল মাখদুম কাকবুরীর কন্যা।'

অন্যদের ন্যায় দারোয়ানও শুনেছে, খতীব ইবনুল মাখদুম হঠাৎ পাগল হয়ে গেছেন এবং তাকে জেলখানায় আটক করে রাখা হয়েছে। মসুলের সব মানুষই খতীবকে শ্রদ্ধা করে থাকে। তার পাগল হয়ে যাওয়ার কারণে সকলেই মর্মাহত ও অনুতপ্ত। দারোয়ান দরবারের এক কর্মকর্তাকে বলে সায়েকাকে সাইফুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি নিয়ে দেয়।

সায়েকা সাইফুদ্দীনের নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়। মেয়েটির রূপ-যৌবন দেখে সাইফুদ্দীন চমকে ওঠেন। সাইফুদ্দীন নারী-শিকার পুরুষ। তিনি সায়েকাকে স্বস্নেহে নিজের পার্শ্বে বসতে দেন। তিনি বুঝে ফেলেন, মেয়েটা তার পিতার মুক্তির আবেদন নিয়ে এসেছে।

'শোন মেয়ে'– সাইফুদ্দীন সায়েকার বক্তব্য না শুনেই বললেন– 'আমি জানি, তুমি কেন এসেছ। কিন্তু আমি বেজায় বাধ্য হয়েই তোমার পিতাকে বন্দী করেছি। দু'-একদিন পর ছেড়ে দেয়ার মতো অবস্থা হলে আমি তাকে গ্রেফতারই করতাম না। আমি তাকে মুক্তি দিতে পারব না।'

'তার অপরাধ কী?' সায়েকা জিজ্ঞেস করে।

'বিশ্বাসঘাতকতা।' সাইফুদ্দীন জবাব দেন।

'তিনি কি আপনার বিরুদ্ধে খৃস্টানদের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন?' সায়েকা জিজ্ঞেস করে।

'রাষ্ট্রের শত্রু খৃস্টান হোক কিংবা মুসলমান'– সাইফুদ্দীন জবাব দেন– 'তাকে সঙ্গে রেখে রাষ্ট্রের ক্ষতি করা অন্যায়। তোমার পিতা কি সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক ছিলেন না?'

'আমার জানা নেই'– সায়েকা জবাব দেয়– 'তবে আমার বিশ্বাস, সালাহুদ্দীন আইউবীকে সমর্থন করা অন্যায় নয়।'

'এ বিষয়টা তোমার পিতাও বুঝতে পারেননি'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমি ভেবে অবাক হই, বহু মানুষ সালাহুদ্দীন আইউবীকে ফেরেশতা মনে করে থাকে। অথচ তিনি নারীর ক্ষেত্রে হায়েনা। তিনি দামেস্ক এবং কায়রোয় তার হেরেমকে তোমার ন্যায় শত শত রূপসী মেয়ে দ্বারা পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি তার হেরেমের মেয়েদেরকে তিন-চার মাস পর তার সালারদের হাতে তুলে দেন। তার বাহিনী যেখানেই হামলা করে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে অসদাচরণ করে। তারা যে কোন বাড়ি-ঘর লুট করে এবং যে কোন মেয়েকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তোমার ন্যায় সুন্দরী মেয়েরা তার থেকে কখনো রক্ষা পায় না। তোমার ইজ্জতের হেফাজত করা আমার কর্তব্য– তোমাকে আমার ঘরে রেখে হলেও।'

'আমাকে আল্লাহই রক্ষা করবেন'– সায়েকা বলল– 'আপনার নিকট আমার আবেদন এটুকু যে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাকে আব্বাজানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিন।'

'বিচারক তার শাস্তি ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত অনুমতি দেয়া যাবে না।'

'শাস্তি কী হবে?'

'মৃত্যুদণ্ড।'

সায়েকার দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। সাইফুদ্দীন মেয়েটাকে আরো আতংকিত করার জন্য বললেন– 'তবে এই মৃত্যুদণ্ড অত সহজ হবে না যে, তরবারী দ্বারা তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। তাকে ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে মারা হবে। প্রথমে তার চোখ দু'টো তুলে ফেলা হবে। তারপর সাড়াশি দ্বারা টেনে টেনে একটা একটা করে দাঁত তুলে ফেলা হবে। তারপর তার হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো এক এক করে কাটা হবে। তারপরও যদি তিনি

না মরেন, তাহলে গায়ের চামড়া তুলে ফেলা হবে।'

মেয়েটির গা কাঁপতে শুরু করে। সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে। চেহারার রং পিতবর্ণ ধারণ করে। সায়েকা কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'আপনি কি তার প্রতি এতটুকু দয়া করতে পারেন না যে, তরবারী দ্বারা এক কোপে মাথাটা কেটে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবেন? তাকে মৃত্যুদণ্ডই যদি দিতে হয়, স্বল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেললেই তো হয়।'

'তুমি যদি তোমার মূল্যবান যৌবনের প্রতি সদয় হতে পার, তাহলে আমি তোমার পিতার উপর রহম করতে পারি।'

সায়েকা সাইফুদ্দীনের প্রতি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালে সাইফুদ্দীন বললেন– 'পিতার মৃত্যর পর তোমাকে একটা অসহায় ও নিরাশ্রয় মেয়ে হিসেবে জীবনযাপন করতে হবে। তার চেয়ে বরং ভাল, তুমি আমার স্ত্রী হয়ে যাও। তাতে তোমার পিতারও উপকার হবে, তুমিও মসুলের রাণীর মর্যাদা লাভ করবে।'

'আব্বাজান যদি আমাকে আত্মমর্যাদা শিক্ষা না দিতেন, তাহলে আপনার স্ত্রীত্ব বরণ করে মসুলের রাণী হওয়া একটা বিষয় ছিল। তখন আমি আপনার সঙ্গে একটি রাত অতিবাহিত করে গৌরববোধ করতাম'– সায়েকা বলল– 'কিন্তু আমার ইজ্জত রক্ষায় আব্বাজান নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হওয়ার মতো লোক নন। এ সওদা আপনি আব্বাজানের সাথে করুন। আপনি তাকেই জিজ্ঞেস করুন, জল্লাদের হাতে সোপর্দ হওয়া এবং কন্যাকে আমার হাতে তুলে দেয়া এ দু'টি বিষয়ের কোন্‌টি তোমার পছন্দ? আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, জবাবে আব্বাজান বলবেন, আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দাও। আমি আপনার সমীপে শুধু এই আবেদন নিয়ে এসেছিলাম যে, অল্প সময়ের জন্য হলেও আমাকে আব্বাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দিন। এবার আমি আমার আবেদনের সঙ্গে নতুনভাবে এ কথাটা সংযোগ করছি যে, আপনার এ সওদা আমি প্রত্যাখ্যান করলাম।'

'তুমি আমার ঘরে আসবে না, এই কি তোমার সিদ্ধান্ত?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'এ আমার অটল সিদ্ধান্ত'– সায়েকা জবাব দেয়– 'আপনি মসুলের অধিপতি। বল প্রযোগ করেই তো আপনি আমাকে আপনার হেরেমে ঢুকিয়ে ফেলতে পারেন।'

'এমন অন্যায় আমি কখনো করিনি।' সাইফুদ্দীন জবাব দেন।

সায়েকা বসা থেকে উঠে দাঁড়ায়। পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ নয়– তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, কয়েকখানায় তার পিতার সঙ্গে কিরূপ আচরণ হচ্ছে, তা জানা। আর তা সে জেল কর্মকর্তার নিকট থেকে জানতে পেরেছে। তার আশা ছিল, এই কর্মকর্তা তার পিতার পলায়নে সাহায্য করবে। সায়েকা সাইফুদ্দীনকে সালাম করে হাঁটা দেয়। সাইফুদ্দীন তাকে চলে যেতে দেখে বললেন– 'দাঁড়াও, আমি তোমাকে এ কথা বলতে দেব না যে, মসুলের শাসনকর্তা একটি মেয়ের মনোবসনা পূরণ করেননি। তুমি আজ রাতেই তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে। এক লোক তোমার ঘরে যাবে। সে তোমাকে সঙ্গে করে কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। তুমি যত দীর্ঘ সময় ইচ্ছা পিতার সঙ্গে কথা বলতে পারবে।'

সায়েকা সাইফুদ্দীনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নেয়। সাইফুদ্দীনের পেছনে একজন বডিগার্ড দাঁড়িয়ে ছিল। সায়েকা বেরিয়ে গেলে তিনি তাকে বললেন– 'এই সুদর্শনা পাখিটা পিঞ্জিরায় আসা উচিত। আমি তাকে সন্ত্রস্ত করার জন্য বলেছিলাম, তার পিতাকে কিরূপ নির্যাতন দিয়ে হত্যা করার হবে। কিন্তু মেয়েটা বড় শক্ত ধাতুর মানুষ। আমি তাকে বলেছি, এক ব্যক্তি তোমার ঘরে যাবে। সে তোমাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। তুমি কি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ?'

'কি যে বলেন? আপনার ইশারা বুঝতে কি আমার এখনো বাকী আছে?'– বডিগার্ড ঠোঁটে শয়তানি হাসি টেনে বলল– 'সেই ব্যক্তিটি আমিই হব। আজ সন্ধ্যার পরই আমি কয়েকখানায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে তাকে জায়গা মতো নিয়ে আসব।'

'জান তো, কোথায় নিতে হবে?'– সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন– 'খবরদার! মেয়েটার মনে যেন সন্দেহ না জাগে যে, আমি তাকে অপহরণ করিয়েছি?'

'আমি সবই বুঝি'– বডিগার্ড জবাব দেয়– 'এ কাজ আমি এই প্রথমবার তো আর করছি না। আমি তাকে আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরিয়ে এমন অবস্থায় আপনার নিকট নিয়ে আসব যে, সে মনে করবে একমাত্র আপনিই তার হিতাকাঙ্খী ও আপনজন। তারপর এরূপ পক্ষীদের পিঞ্জিরায় কিভাবে আবদ্ধ করতে হয়, তা আপনিই ভাল জানেন।'

সাইফুদ্দীন তার বডিগার্ডের কানে কানে কী যেন বললেন। বডিগার্ডের চোখের তারায় শয়তান পিট পিট হাসতে শুরু করে।

❁ ❁ ❁

রাতের বেলা। কয়েদখানার যে কর্মকর্তা সায়েকার ঘরে গিয়েছিল এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে খতীবের জন্য কুরআন নিয়ে ফিরে গিয়েছিল, সে ডিউটি করছে। লোকটা সন্ধ্যার পর কারাগারে প্রবেশ করে দিনের দায়িত্বশীলকে বিদায় করে দেয় এবং খতীব ইবনুল মাখদুমের কক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক দেখে সে কুরআনখানা খতীবের হাতে দিয়ে বলল– 'আপনি আপনার মেয়ের ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না; সে সব দিক থেকেই ভাল এবং নিরাপদ আছে। সে আমার নিকট একটা আবদার রেখেছে; আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে মেয়েটার আবদার পূরণে তাওফীক দান করেন।'

'কী আবদার করেছে ও?' খতীব কৌতূহলী মনে জিজ্ঞেস করেন।

কর্মকর্তা এদিক-ওদিক তাকিয়ে জানালার সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বলল– 'পলায়ন, আপনার কি সাহস হয়? আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

'যে কাজের সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি জড়িত, তার জন্য আল্লাহ্ সাহসও দিয়ে দেন'– খতীব বললেন– 'কিন্তু আমি তো তোমার সাহায্য নিয়ে পালাব না। তার পরিবর্তে আমি এখানে মৃত্যুবরণ করাকেই বরণ করব।'

'কেন?'– জেল কর্মকর্তা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন– 'আপনি কি আমাকে পাপী মনে করে আমার সাহায্য নিতে অস্বীকার করছেন?'

'না'– খতীব বললেন– 'বরং আমি তোমার সাহায্য এ কারণে নিতে চাচ্ছি না যে, তুমি নির্দোষ। আমি তো তোমার সহযোগিতায় এখান থেকে পালিয়ে যাব। কিন্তু তুমি পেছনে থেকে যাবে এবং ধরা পড়বে। আমার অপরাধের শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে, যা আমার পক্ষে মারাত্মক অন্যায় হবে।'

'আমিও আপনার সঙ্গে যাব'– জেল কর্মকর্তা বললেন– 'আপনার গত রাতের বক্তব্যে এখান থেকে আমার মন উঠে গেছে। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজে গিয়ে যোগ দেব। আর যেহেতু আমি কয়েদী নই, সেহেতু আমি সহজেই পালাতে পারব। কিন্তু আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। এই জগতে আমার কেউ নেই। হৃদয়টা জুড়ে আছে শুধু আগুন। এই আগুন আমাকে নেভাতেই হবে।'

'হ্যাঁ'– খতীব বললেন– 'এভাবে হলে আমি তোমার সাহায্য নিতে পারি।'

'আপনার মেয়ে আমাকে বলেছিল, সে নাকি মসুলের শাসনকর্তার নিকট যাবে'– কর্মকর্তা বললেন– 'তার নিকট সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভের আবেদন জানাবে।'

'না'– খতীব শংকিত হয়ে বললেন– 'তার সাইফুদ্দীনের মতো শয়তান

চরিত্রের লোকটির নিকট যাওয়া উচিত হবে না। তুমি আবার গিয়ে তাকে বলে আস, সে যেন সাইফুদ্দীনের নিকট না যায়।'

'আমি তো সকাল ছাড়া যেতে পারব না'– কর্মকর্তা বললেন।

জেল কর্মকর্তা খতীবের নিকট থেকে চলে যান। খতীব কুরআন শরীফখানায় চুম্বন করেন। তারপর বুকের সঙ্গে লাগিয়ে মনে মনে বললেন– 'এখন আর আমি কারা প্রকোষ্ঠে একা নই।' তিনি গেলাফটা খুলে প্রদীপের আলোতে বসে কুরআন খুললেন। পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ এক টুকরো কাগজ বেরিয়ে আসে। সায়েকার লেখা একখানা চিরকুট– 'আল্লাহ সঙ্গে আছেন– জিনরা আছে– পয়গম্বর সত্য– তার বার্তা শুনুন– ঈমান তাজা আছে।'

খতীবের বিমর্ষ মুখে মুচকি হাসির আভা ফুটে ওঠে। তিনি চিরকুটখানা প্রদীপের আগুনে পুড়ে ফেললেন। চিঠির মর্ম তিনি বুঝে ফেলেছেন। 'পয়গম্বর সত্য' দ্বারা উদ্দেশ্য, লোকটা যা বলছে, সত্য বলে মনে হচ্ছে; আপনি তার পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করুন। 'জিনরা আছে' দ্বারা উদ্দেশ্য সায়েকার নিরাপত্তা দানের জন্য লোক আছে। তারা তাকে পাহারা দিচ্ছে।

যে সময়ে খতীব সায়েকার পত্রখানা পুড়ে ফেলার জন্য আগুনে ধরেন, ঠিক সে সময় সায়েকার ঘরে করাঘাত পড়ে। সায়েকা দরজা খুলে দেয়। তার হাতে প্রদীপ। বাইরে দণ্ডায়মান লোকটাকে সে চিনে ফেলে– সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষী। সে সাইফুদ্দীনের সঙ্গে সায়েকার সাক্ষাতের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। সে সায়েকাকে বলল– 'আমি আপনাকে আপনার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কয়েদখানায় নিয়ে যেতে এসেছি। সাক্ষাতের পর আবার আপনাকে আপনার ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

সায়েকা প্রস্তুত ছিল। সে বিলম্ব না করে বের হয়ে আসে এবং হাঁটতে শুরু করে। দেহরক্ষী তাকে বলল– 'পিতার সঙ্গে শুধু কুশল বিনিময় আর ঘরের খোঁজ-খবর বলার অনুমতি থাকবে। আপনাকে কারা প্রকোষ্ঠের জানালা থেকে তিন পা দূরে রাখা হবে। এমন কোন কথা বলবেন না, যা মসুলের শাসনকর্তা গাজী সাইফুদ্দীনের মর্যাদায় আঘাত হানবে।'

বডিগার্ড সামনে সামনে হাঁটছে। সায়েকা তার দু'-তিন পা পেছনে। দু'জনই চুপচাপ হাঁটছে। অন্ধকার রাত। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তারা গলির পর গলি অতিক্রম করছে। একটি গলিতে মোড় নিতেই বডিগার্ড হঠাৎ থেমে যায়। সে পেছন দিকে তাকায়। সায়েকা জিজ্ঞেস করে– 'কী ব্যাপার?'

'তুমি কি পেছনে কারো পায়ের শব্দ শুননি?' বডিগার্ড জিজ্ঞেস করে।

'না'– সায়েকা জবাব দেয়– 'আমিই তো তোমার পেছনে পেছনে হাঁটছি। সম্ভবত তুমি আমার আওয়াজই শুনতে পাচ্ছ।'

'না, আমি অন্য একটি শব্দ শুনেছি।' বডিগার্ড ফিস ফিস করে বলল এবং সামনের দিকে হাঁটা দিল।

'এত ভয় পাচ্ছ কেন?'– সায়েকা বলল– 'পেছনে পেছনে কেউ যদি এসেই থাকে, আসুক না।'

বডিগার্ড কোন উত্তর দেয় না। এই গলি শেষ হয়ে গেছে। সম্মুখে কোন জনবসতি নেই। মাটি উঁচু-নীচু। খানা-খন্দকও আছে। জেলখানাটা ওদিকেই, বসতির পেছনে কিছু দূরে। দু'জনই পা টিপে টিপে সাবধানতার সাথে অগ্রসর হচ্ছে। এখন চারদিকে ঝোপ-ঝাড় ও গাছপালা। বডিগার্ড আবারো থমকে দাঁড়িয়ে চকিত নয়নে পেছন দিকে তাকায়। সে কারো হাঁটার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তরবারীটা বের করে হাতে নেয় সে। পেছনের দিকে চলে যায়। দু'তিনটি ঝোঁপের চারপাশে ঘুরে-ফিরে দেখে। কিন্তু কিছুই নেই।

'এবারও নিশ্চয়ই পেছনে কারো পায়ের শব্দ শুনেছ?'– বডিগার্ড সায়েকাকে বলল– 'এবারের শব্দটা আমি স্পষ্ট শুনেছি।'

সায়েকা শব্দটা শুনেছে। কিন্তু সে মিথ্যা বলে– 'ওটা আসলে তোমার মনের ভয়। আর যদি কোন শব্দ শুনেই থাক, তাহলে তা খরগোশ কিংবা অন্য কোন জন্তু-জানোয়ার হবে। তুমি ওসব শব্দকে ভয় করছ কেন?'

'আমার ভয় করার কারণ হল'– সাইফুদ্দীনের বডিগার্ড বলল– 'তুমি অতিশয় রূপসী ও যুবতী মেয়ে। তোমার মূল্য সম্ভবত তুমি জান না। কেউ যদি তোমাকে অপহরণ করে কোন আমীর বা শাসনকর্তার নিকট বিক্রি করে, তাহলে সে লাল হয়ে যাবে। এখন তুমি আমার দায়িত্বে। আমার হাত থেকে যদি কেউ তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে মহারাজা আমার মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলবেন। তুমি আমার পাশাপাশি হাঁট।'

সায়েকা বডিগার্ডের পাশে চলে আসে। দু'জন হাঁটতে শুরু করে। একটু সামনে থেকে সরু গলিপথের শুরু। তারা সে পর্যন্ত চলে যায় এবং সরু পথে হাঁটতে শুরু করে। একটু সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর গলির মাথা থেকে অন্য একটি পথ বেরিয়ে আরেক দিকে চলে গেছে। বডিগার্ড সায়েকাকে নিয়ে সে পথে এগুতে শুরু করে। কয়েক পা অগ্রসর হওয়ামাত্র তারা কারো ধাবমান পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়, যা পরক্ষণেই হঠাৎ করে থেমে যায়। পেছন দিক

থেকে কে যেন ছুটে আসে এবং ডানদিকে চলে যায়। বডিগার্ড একটি গাছের পেছনে একটি ছায়া অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে ফেলে। সে তরবারী উঁচু করে গাছটার দিকে ছুটে যায়। অমনি পেছন থেকে সায়েকার ক্ষীণ একটা চীৎকার কানে আসে তার। কে যেন সায়েকার গায়ের উপর একটা বস্তা ছুঁড়ে মেরে ঝাঁপটে ধরে। তার মুখে কাপড় গুঁজে দেয় আগেই। বডিগার্ড অন্ধকারের মধ্যে শুধু এটুকু দেখতে পায়, যে জায়গাটায় সায়েকা একাকী ছিল, এখন সেখানে দু'টি ছায়া ধস্তাধস্তি করছে।

বডিগার্ড সেদিকে ছুটে যেতে উদ্যত হয়। এমন সময় পেছন দিক থেকে কে একজন তাকে ঝাপটে ধরে। তার মুখেও কাপড় গুঁজে দেয়া হয় এবং চাটাইয়ের ন্যায় মোটা একটা কাপড় দ্বারা তাকে পেঁচিয়ে ফেলা হয়। বডিগার্ড স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী যোদ্ধা। কিন্তু তারা সংখ্যায় অধিক এবং একেকজন শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ।

সায়েকাকে বস্তায় ভরে বস্তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। এদিকে বডিগার্ডও বস্তাবন্দী। লোকগুলো তাদেরকে তুলে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ে।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বস্তা দু'টি পিঠে তুলে নেয়া হল। অন্ধকারের মধ্যে পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীদেরও বুঝবার উপায় নেই যে, দু'জন মানুষকে অপহরণ করে বস্তায় ভরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা একটি অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়ে এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে।

ঘরে ঢুকে তারা সায়েকাকে এক কক্ষে এবং বডিগার্ডকে আরেক কক্ষে নিয়ে যায়। আলাদা আলাদা কক্ষে বস্তার মুখ খুলে দেয়া হয়। সায়েকা বস্তা থেকে বেরিয়ে এলে তার মুখের কাপড় বের করে ফেলা হয়। কক্ষে প্রদীপ জ্বলছিল। সায়েকা সামনে দু'ব্যক্তিকে দেখে চমকে উঠে কম্পিত কণ্ঠে বলল– 'তোমরা এ পন্থাটা কেন অবলম্বন করেছ?'

'নিরাপদ পন্থা এটাই ছিল'– একজন জবাব দেয়– 'অন্যথায় কেউ পথে তোমাকে আমাদের সঙ্গে চলতে দেখে ফেলত। তাই তোমাকে লুকিয়ে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল।'

'তাহলে আগে আমাকে বিষয়টা বললে না কেন?'– সায়েকা জিজ্ঞেস করে– 'আমি তো মনে করেছিলাম, লোকগুলো তোমরা নও, দস্যু এবং আমাকে সত্যি সত্যিই বুঝি অপহরণ করা হচ্ছে।'

'আমাদের কাজের পন্থা-পদ্ধতি অনেকটা এরূপই হয়ে থাকে।' অপর ব্যক্তি বলল।

'তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলে যে, লোকটা আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে?' সায়েকা জিজ্ঞেস করে।

'তুমি যখন তার সঙ্গে ঘর থেকে বের হও, তখনই আমরা নিশ্চিত হই যে, সাইফুদ্দীনের লোক তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে'– একজন বলল– 'তোমাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়াই যদি তার উদ্দেশ্য হত, তাহলে তার জন্য সোজা ও সংক্ষিপ্ত পথ ছিল।'

'লোকটা কয়েকবার তোমাদের পায়ের শব্দ শুনেছিল'– সায়েকা বলল– 'এমন অসাবধান হওয়া ঠিক নয়।'

'ব্যাপার তা নয়। আসলে অন্ধকারে আমরা তোমাদের দূরত্বের ব্যবধান আন্দাজ করতে পারিনি। তাছাড়া দূর থেকে তোমাদেরকে দেখা যাচ্ছিল না। ফলে অনুসরণ করার জন্য কাছাকাছি থাকতে হয়েছে।' তারা বলল।

সায়েকার চেহারায় প্রশান্তির আভা। মেয়েটা সাইফুদ্দীনের বডিগার্ডের হাতে অপহরণ ও লাঞ্ছিত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে।

অপর কক্ষে বডিগার্ডকে বস্তা থেকে বের করে তার মুখ থেকে কাপড় বের করা হয়। তার সামনে তিনজন মুখোশধারী দাঁড়িয়ে আছে। তার তরবারীটা মুখোশধারীদের হাতে।

'তোমরা কারা?'– মুখে প্রভাব ও গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বডিগার্ড মুখোশধারীদের জিজ্ঞেস করে– 'আমি মসুলের শাসনকর্তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করব।'

'মসুলের শাসনকর্তার হেফাজত এখন আল্লাহ্ করলে করতে পারেন'– এক মুখোশধারী বলল– 'তুমি তোমার নিজের জীবন বাঁচানোর চিন্তা কর। মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?'

'কয়েদখানায় তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর জন্য'– বডিগার্ড জবাব দেয়– 'মনে রেখ, তোমরা যে মেয়েটাকে অপহরণ করেছ, তাকে তোমরা গিলতে পারবে না। এ খতীব ইবনুল মাখদুমের কন্যা এবং মসুলের শাসনকর্তা তার হেফাজতের জন্য নিজের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকে প্রেরণ করেছেন। এ থেকেই অনুমান করতে পার যে, তোমরা কোথায় হাত দিয়েছ। মসুলের শাসনকর্তা মেয়েটার সন্ধানে শহরের প্রতিটি ঘর অনুসন্ধান করবেন। তোমরা শহর থেকে বের হতে পারবে না। সাইফুদ্দীন এক্ষুণি সংবাদ পেয়ে যাবেন যে, তার এক দেহরক্ষী এবং খতীবের মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে শহর সীল করে দেয়া হবে। আচ্ছা, মেয়েটিকে তোমরা কোথায় রেখেছ?'

'শোন বন্ধু!'– এক মুখোশধারী বলল– 'মেয়েটা এখানেই আছে। তাকে অপহরণ করা হয়নি, বরং তাকে অপহরণের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। আমরা জানি, মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের জন্য এই মেয়েটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সন্ধানে তিনি তার গোটা বাহিনীকে মাঠে নামাবেন। তার কারণ, মেয়েটা অতিশয় রূপসী ও যুবতী এবং তার পিতা কয়েকখানায় বন্দী। মেয়েটা সাইফুদ্দীনের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি তাকে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। আমরা জানি, সাক্ষাতের এই অনুমতিদান একটি প্রতারণা। সাক্ষাতের নামে দূরভিসন্ধি বাস্তবায়নের জন্যই তিনি সময়টা রাতে নির্ধারণ করেছেন। আচ্ছা, তুমি বল তো, খতীবের সঙ্গে তার মেয়ের সাক্ষাৎ দিনে করানো হয়নি কেন? ঘর থেকে বের করেই তুমি তাকে ভুল পথে নিয়ে এসেছ। তখনই আমরা তোমাদের পিছু নিয়েছি। তোমরা দু'-তিনবার থেমে পেছন দিকে তাকিয়েছিলে। তোমরা যাদের উপস্থিতি আন্দাজ করেছিলে, তারা আমরাই। যাদেরকে তুমি ঝোঁপের মধ্যে সন্ধান করতে গিয়েছিলে, তারাও আমরা। কিন্তু তুমি আমাদেরকে দেখনি। দেখবে কিভাবে? আমাদেরকে দিনের আলোতেও কেউ দেখতে পায় না।'

'তোমরা এই মেয়েটার উপর জুলুম করেছ'– বডিগার্ড বলল– 'আমি তাকে তার পিতার নিকট নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

'তুমি মেয়েটাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলে'– এক মুখোশধারী তরবারীর আগাটা তার ধমনির উপর রেখে চাপা কণ্ঠে বলল– 'তুমি তাকে সাইফুদ্দীনের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলে। তোমাদের শাসনকর্তা কত দয়ালু মানুষ, তা আমাদের জানা আছে যে, তিনি খতীব ইনবুল মাখদুমের ন্যায় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে জেলে পুরতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। আর এখন তার কন্যাকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রদান করলেন! তুমি শুধু এতটুকুই জান, খতীব অপরাধী। কিন্তু তোমার একথা জানা নেই যে, এই মহামান্য আলেমে দ্বীন মসুলে নিঃসঙ্গ নন এবং তিনি যখন কয়েকখানায় আবদ্ধ, তখন তার কন্যাও ঘরে একাকী নয়। আমরা সাইফুদ্দীনের সিংহাসন উল্টে দেব। দিন তার শেষ হয়ে এসেছে। আমরা তাকে যে কোন সময় খুন করতে পারি। কিন্তু হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতকদের ন্যায় কাউকে খুন করতে সুলতান আইউবী আমাদের নিষেধ করে দিয়েছেন। আমরা ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ করে শত্রুকে নিধন করি।'

'তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর লোক?' বডিগার্ড জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ'– এক মুখোশধারী জবাব দেয়– 'আমরা আইউবীর কমান্ডো বাহিনীর সদস্য।'

মুখোশধারী বডিগার্ডের ধ্বমনিতে স্থাপন করা তরবারীটায় একটু চাপ দেয়। বডিগার্ডের পিঠ দেয়ারের সঙ্গে গিয়ে ঠেকে। মুখোশধারী বলল– 'তুমি সাইফুদ্দীনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী এবং সবসময় তার সঙ্গে থাক। তার সব গোপন তথ্য তোমার জানা আছে। তুমি তাকে মেয়ে অপহরণ করে নিয়ে দাও। বল, একদম খোলাখুলিভাবে বল, সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে তার পরিকল্পনা কী? যদি বলতে অস্বীকার কর কিংবা যদি বল আমি কিছু জানি না, তাহলে তোমারও সেই দশাই হবে, যা সাইফুদ্দীন বন্দীশালায় তার প্রতিপক্ষের ব্যাপারে ঘটিয়ে থাকে।'

'তোমরা যদি সৈনিকই হয়ে থাক, তাহলে ভালভাবেই জান যে, শাসক ও রাজা-বাদশার সামনে একজন দেহরক্ষীর কোন মূল্য থাকে না'– বডিগার্ড জবাব দেয়– 'মসুলের শাসনকর্তার পরিকল্পনা কী, তা আমি কিভাবে বলব বলল।'

এক মুখোশধারী তার মাথাটা উদোম করে চুলগুলো মুঠি করে ধরে একটা মোচড় দেয় এবং ঝটকা টান দিয়ে একদিকে নত করে ফেলে। অন্য একজন পা ধরে টান দিয়ে তাঁকে মাটিতে উপুড় করে ফেলে দেয়। একজন তার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে যায়। দাঁড়ানো অবস্থায় কয়েকবার চাপ দিলে বডিগার্ডের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তারপর তাকে বিভিন্ন রকম নির্যাতনের একটু একটু স্বাদ উপভোগ করানো হয় এবং তাকে বলা হয়, 'এখান থেকে তুমি জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

'আমাকে উঠতে দাও।' কোঁকাতে কোঁকাতে বডিগার্ড বলল।

তাকে তুলে বসানো হল। সে বলল– 'সাইফুদ্দীন সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান।'

'এটা কোন তথ্য নয়'– এক মুখোশধারী বলল– 'বল, তিনি কখন এবং কিভাবে যুদ্ধ করতে চান? তিনি কি তার বাহিনীকে হাল্‌ব ও হাররানের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে লড়তে চান, নাকি আলাদা লড়বেন?'

'তার বাহিনী অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে'– বডিগার্ড জবাব দেয়– 'কিন্তু তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করবেন যে, তার বিজয় সম্পূর্ণ আলাদা দেখা যাবে। হাল্‌ব ও হাররানের লোকদেরকে তিনি বিশ্বাস করেন না।'

'সালারদের প্রতি তার নির্দেশনা কী?'– মুখোশধারী জিজ্ঞেস করে।

'তার পরিকল্পনা হল, সালাহুদ্দীন আইউবীকে পাহাড়ী এলাকায় ঘিরে ফেলা হবে।' বডিগার্ড জবাব দেয়।

'বাহিনী কোন্ পথে যাবে?'

'হামাত শিং-এর পথে।'

'খৃস্টানরা কী পরিমাণ সাহায্য করছে?'

'খৃস্টানরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে'– বডিগার্ড জবাব দেয়– 'কিন্তু সাইফুদ্দীন তাদেরকেও ধোঁকা দেবেন। খৃস্টান বাহিনীর কয়েকজন কমান্ডার মসুলের বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।'

এই দু'মুখোশধারী এবং অপর কক্ষে সায়েকার কক্ষে উপবিষ্ট দু'ব্যক্তি সুলতান আইউবীর কমান্ডো গুপ্তচর। খতীব ইবনুল মাখদুমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। বরং বলা যায়, খতীব তাদের পৃষ্ঠপোষক ও নেতা ছিলেন। এই দলটি সুলতান আইউবীর জন্য চোখ ও কানের কাজ দিত। মসুলে থেকে যখনই যে তথ্য সংগ্রহ করতে পারত, তা সুলতান আইউবীর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছিয়ে দিত। তারা মসুলে চাকুরি-ব্যবসা ইত্যাদি কাজ নিয়ে অবস্থান করত। খতীব ইবনুল মাখদুম গ্রেফতার হওয়ার পর তারা রাতে পালাক্রমে তার বাসভবন পাহারা দিত। সায়েকার সঙ্গ দেয়ার জন্য দু'টো মেয়ে রাতে ঘুমাতে এসে যে ছায়া দেখে ভয়ে পেয়েছিল, এরাই সেই ছায়া। সায়েকা তাদেরকে বলেনি যে, ছায়াগুলো মানুষ। বরং সে ধারণা দিয়েছিল, এগুলো জিন। লোকগুলোর জানা ছিল, সায়েকা সাইফুদ্দীনের নিকট পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি আনতে গেছে। ফিরে এসে মেয়েটা এদের একজনকে অবহিত করেছিল যে, রাতে এক লোক এসে তাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। সে এও বলেছিল যে, সাইফুদ্দীন তার সঙ্গে আপত্তিকর কথা বলেছেন এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। লোকটি তার দলের সকলকে বিষয়টি অবহিত করে। তারা সবাই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। তাদের মনে সন্দেহ জাগে, কয়েকখানায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে সায়েকাকে অন্য কোন স্থানে উধাও করে ফেলা হতে পারে। তাই সূর্য ডোবার পর পাঁচজন লোক সায়েকার ঘরে ঢুকে লুকিয়ে থাকে। সায়েকা বডিগার্ডের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে তারাও তাদের পিছু নেয়। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাদের সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হয়। তারা সাফল্যজনকভাবে সায়েকাকে রক্ষা করে এবং সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষীকে ধরে ফেলে। তারা তার মুখ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য বের করে। তন্মধ্যে এ তথ্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, সাইফুদ্দীনের ভাই ইজ্জুদ্দীন বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এক অংশকে নিজের কমান্ডে রেখে দিয়েছেন। এই অংশটা রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ তাদেরকে পরে

প্রয়োজন অনুপাতে প্রেরণ করা হবে। প্রথম হামলার নেতৃত্ব দেবেন সাইফুদ্দীন নিজেই। দ্বিতীয়ত, যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পাওয়া গেছে, তাহল, হাল্‌ব থেকে গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনের নিকট দূত এসেছে। বার্তা হল, তিনটি বাহিনীকে যৌথ কমান্ডে রাখা হবে এবং খৃস্টানদের সাহায্যের উপর বেশি ভরসা রাখা যাবে না। প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যও ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

এসব তথ্য প্রদান করে বডিগার্ড দাবি জানায়, 'এবার আমাকে মুক্তি দাও।'

মুখোশধারীরা দেব দেব করে কাল ক্ষেপণ করে। সায়েকাকে সে কক্ষেই থাকতে দেয়া হল। তাকে নিজ ঘরে নিয়ে রাখা নিরাপদ নয়। বডিগার্ডকে ভবনটির একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হল।

❁ ❁ ❁

হাররান ও হাল্‌ব থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে খৃস্টান সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার। এখানকার অধিকাংশ তৎপরতা গোয়েন্দা বিষয়ক। এখানে যে ক'জন খৃস্টান সম্রাট ও কমান্ডার অবস্থান করছেন, তারা সরাসরি নিজেরা সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করার পরিবর্তে তাঁর মুসলিম বিরুদ্ধবাদীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আগেই বলে এসেছি যে, খৃস্টানরা বড় বড় মুসলিম আমীরদেরকে খৃস্টান সামরিক উপদেষ্টা দিয়ে রেখেছিল। তারা তাদেরকে সামরিক পরামর্শ প্রদান ছাড়াও সৈন্যদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করত। নিজেদের আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্য তারা মুসলিম আমীরদেরকে বিলাসিতার উপকরণ সরবরাহ করত। তাদের গুপ্তচররাও এই আমীরদের দরবারে অবস্থান করত এবং তাদের হেডকোয়ার্টারে খবরাখবর প্রেরণ করত।

হাররান থেকে গোমস্তগীনের এক খৃস্টান উপদেষ্টা তাদের এই হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছে। তখন খৃস্টানদের দু'জন বিখ্যাত যুদ্ধবাজ সম্রাট রেমন্ড ও রেজিনাল্ট হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত ছিলেন। রেমন্ড সেই সম্রাট, যাকে সুলতান আইউবী এই অল্প ক'দিন আগে যথাযথ কৌশল প্রয়োগ করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর রেজিনাল্ট হলেন সেই বিখ্যাত খৃস্টান রাজা, যাকে সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী এক যুদ্ধে বন্দী করেছিলেন। তাকে এবং অন্যান্য খৃস্টান কয়েদীদের হাররানে গোমস্তগীনের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। সে সময় গোমস্তগীন বাগদাদের খেলাফতের একজন দুর্গপতি ছিলেন। জঙ্গীর ওফাতের পর গোমস্তগীন কেন্দ্রীয় খেলাফতের সঙ্গে বিদ্রোহ করে স্বাধীন শাসক হিসেবে

আবির্ভূত হন এবং খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় করার লক্ষ্যে রেজিনাল্টের ন্যায় মূল্যবান বন্দীকে অন্য সকল খৃস্টান কয়েদীর সঙ্গে মুক্ত করে দেন। নূরুদ্দীন জঙ্গী ঘোষণা দিয়েছিলেন, রেজিনাল্টের বিনিময়ে তিনি খৃস্টানদের থেকে দাবি-দাওয়া আদায় করে নেবেন। কিন্তু জঙ্গী মৃত্যুবরণ করার পর আমীরগণ বিলাসিতা ও ক্ষমতার নেশায় পড়ে তার সকল পরিকল্পনা উলট-পালট করে দেয় এবং খৃস্টানরা সালতানাতে ইসলামিয়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে।

হাররান থেকে এক খৃস্টান উপদেষ্টা– প্রকৃতপক্ষে সে একজন গোয়েন্দা– রেমন্ড ও রেজিনাল্টের নিকট এসে পৌঁছে এবং হাররানের তাজা ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে। সে বলল– 'হাল্‌ব থেকে আল-মালিকুস সালিহ গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনের নিকট উপহারসহ বার্তা প্রেরণ করেছেন, অরা যেন তাদের সেনাবাহিনীকে তার বাহিনীর সঙ্গে যৌথ কমান্ডে দিয়ে দেন। সেখানে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে যে, গোমস্তগীনের দু'জন সালার হাররানের কাজীকে হত্যা করে ফেলেছে এবং হাল্‌ব থেকে আল-মালিকুস সালিহ বার্তার সঙ্গে উপহার হিসেবে যে দু'টি সুন্দরী মেয়ে প্রেরণ করেছিলেন, সালারদ্বয় তাদেরকে পালাবার সুযোগ করে দেয়। তারপর তারা স্বীকার করে, তারা সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক এবং তারই জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করছিল। এ দু'সালার পরস্পর আপন ভাই। গোমস্তগীন তাদেরকে কয়েদখানায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। তার মাত্র একদিন আগে আমাদের এক সঙ্গী উপদেষ্টা গোমস্তগীনের বাসভবনে নিমন্ত্রণে গিয়ে রহস্যজনকভাবে খুন হয়। পরদিন তথ্য পাওয়া গেল, গোমস্তগীনের হেরেমের এক মেয়ে ও একজন দেহরক্ষী নিখোঁজ রয়েছে।'

খৃস্টানদের এই বৈঠকে অট্টহাসির ধুম পড়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে এই হাসাহাসির ধারা। অবশেষে হাসি থামিয়ে রেমন্ড বললেন– 'এই মুসলিম জাতিটা এতই যৌনবিলাসী হয়ে উঠেছে যে, তার শাসক ও আমীর-উজীরগণ যুদ্ধ ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও যৌনতায় প্রভাবিত অবস্থায় নিয়ে থাকে। একটু ভেবে দেখুন, গোমস্তগীনের ন্যায় একজন প্রতাপান্বিত ও যুদ্ধবাজ দুর্গপতির সেনাবাহিনীর কমান্ড যে দু'জন সালারের হাতে ছিল, তারা তার শত্রু সালাহুদ্দীন আইউবীর সেনা অধিনায়ক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা উপহার হিসেবে আসা মেয়ে দু'টোর খাতিরে কাজীকে খুন করেছে এবং মেয়েগুলোকে সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা ধরা পড়ে গেছে। গোমস্তগীনের হেরেমের যে মেয়েটি নিখোঁজ হয়, তাকে সেই রক্ষীসেনা-ই

ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। তবে আমাদের লোকটা কোন্ চক্করে পড়ে খুন হল, তা অবশ্য বলতে পারব না। মুসলমান আমীর, শাসক ও দুর্গপতিদের হেরেমের অবরুদ্ধ জগত অত্যন্ত রহস্যময়। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, এই জাতি ভোগ-বিলাস ও নারীপূজার কারণেই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'আমি দু'টি কথা বলতে চাই'– খৃস্টান সামরিক বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স প্রধান অপর এক খৃস্টানকে বলল– 'প্রথম কথা হল, আপনি বলেছেন, উপহারস্বরূপ আসা মেয়ে দু'টোকে হাররান থেকে ভাগিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনার এ ধারণা সঠিক নয়। আমি গুপ্তচরবৃত্তিতে অভিজ্ঞ। দুশমনের সামরিক তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া সামরিক নেতৃবর্গ-কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদস্ত কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও রণকৌশল সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করাও আমার বিভাগের দায়িত্ব। আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলছি, নারী ও মদের ব্যাপারে সালাহুদ্দীন আইউবী শক্ত একটা পাথর। এই একটা কারণেই আপনি তাঁকে না পারবেন বিষ খাইয়ে খুন করতে, না পারবেন কোন রূপসী নারীর জালে আবদ্ধ করে ঘাতকদের দ্বারা হত্যা করাতে। প্রকৃতির অমোঘ বিধান হল, যে লোক মানসিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত নয়, তার প্রত্যয় দৃঢ় ও শক্ত হয়ে থাকে। এমন মানুষ যখন যে পরিকল্পনা হাতে নেয়, তা বাস্তবায়ন করেই তবে নিঃশ্বাস ফেলে। আপনার শত্রু সালাহুদ্দীন আইউবীর মধ্যে এই গুণ বিদ্যমান। এ কারণেই তার মাথা পুরোপুরি কাজ করে থাকে এবং তিনি এমন এমন কৌশল প্রয়োগ করেন, যা আপনার কল্পনায়ও আসে না। যার ফলে আপনার পা উপড়ে যায়। আমি আইউবী সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে অনুমিত হচ্ছে, তিনি অনৈতিক চাহিদা ও বিলাসিতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। নিজ সেনাবাহিনীর মধ্যেও তিনি এই গুণ সৃষ্টি করে রেখেছেন। তা না হলে খোলা ময়দানের লড়াইয়ে অভ্যস্ত সৈন্যরা বরফাবৃত উপত্যকা ও পার্বত্য এলাকায় এই তীব্র শীতের মওসুমে যুদ্ধ করতে পারত না। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মধ্যে এই গুণ সৃষ্টি করতে না পারবেন, ততক্ষণ আপনি সালাহুদ্দীন আইউবী নামক আপনার এই শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন না।

'আমার দ্বিতীয় কথা হল, অন্যান্য মুসলিম আমীর, উজীর ও শাসনকর্তাদের মধ্যে যে নারীপূজা শুরু হয়ে গেছে, তা আমার বিভাগেরই কৃতিত্ব। ইহুদী পণ্ডিতগণ এক শতকেরও বেশি সময় ধরে মুসলমানদের চরিত্র বিনষ্টের অভিযান পরিচালিত করে আসছেন। এটা মূলত তাদেরই সাফল্য যে, আমরা নারী, সোনা-দানা ও মনি-মাণিক্যের মাধ্যমে মুসলিম নেতৃবর্গের চরিত্র ধ্বংস

করে দিয়েছি। আমরা চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য রূপসী ও বিচক্ষণ মেয়েদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উপহারের নামে তাদের নিকট প্রেরণ করে থাকি। এখন তারাও একজন আরেকজনকে নারী উপহার দেয়া শুরু করেছে। তাদের জাতীয় চরিত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে। এটা আমাদের সাফল্য যে, আমরা তাদের মাঝে বিভেদ ও রাজত্বের মোহ সৃষ্টি করে দিয়েছি।'

'এই জাতিটাকে আমরা শেষ করে দেব'– রেজিনাল্ট বললেন– 'চরিত্র বিনষ্ট করার মাধ্যমেই তাদের সর্বনাশ ঘটাতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবী এই ভেবে উৎফুল্ল হয়ে থাকবেন যে, তিনি ভাই রেমন্ডকে পিছু হটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি জানেন না, রেমন্ড যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছপা হয়েছেন ঠিক; কিন্তু তার জাতির বুকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছেন। ময়দানে অবতীর্ণ হয়েই লড়াই করব, এটা জরুরী নয়। আমরা অন্য অঙ্গনেও লড়তে পারি।'

'এই অভিযানকে আরো তীব্রতর করে তোলা প্রয়োজন'– হাররান থেকে আগত উপদেষ্টা বলল– 'আমি আপনাদেরদেরকে গোমস্তগীনের ঘরের ঘটনাবলী শুনিয়েছি। তাতে প্রমাণিত হচ্ছে, ওখানে সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর ও নাশকতা কর্মী শুধু অবস্থানই করছে না; গোমস্তগীনের বাসভবন এবং তার সেনাবাহিনীর উচ্চতর পদেও পুরোপুরি তৎপর। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ব্যবস্থা নেয়া দরকার।'

'আমাদের কী ঠেকাটা পড়েছে যে, আমরা সাইফুদ্দীন, আল-মালিকুস সালিহ ও তাদের যৌথ বাহিনীর অপরাপর আমীর প্রমুখকে সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা থেকে রক্ষা করব?'– এক খৃস্টান কমান্ডার বলল– 'আমরা তো তাদের ধ্বংসের গতিকে আরো তীব্রতর ও ত্বরান্বিত করব। হোক তা আমাদের হাতে কিংবা তাদেরই জাতি ভাইয়ের হাতে। এই যেসব মুসলমান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আপনি কি সত্য মনে তাদেরকে আমাদের বন্ধু মনে করে বসেছেন? তা-ই যদি হয়, তাহলে তার অর্থ হবে, আপনি খাঁটি খৃস্টান নন। আপনি বুঝতে পারেননি যে, আমাদের শত্রুতা না ছিল নূরুদ্দীন জঙ্গীর সঙ্গে, না আছে সালাহুদ্দীন আউইবীর সঙ্গে। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি কখনো আমার সম্মুখে এসে পড়েন, তাহলে আমি তাকে শ্রদ্ধা করব। তিনি একজন যোদ্ধা, রণাঙ্গনের রাজা। আমাদের শত্রুতা হচ্ছে সেই ধর্মের সঙ্গে, যার নাম ইসলাম। যারা এই ধর্মের সুরক্ষা ও এর প্রচার-প্রসারে কাজ করবে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। আমাদের এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর মৃত্যুর পরও এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। সে লক্ষ্যে

আমরা মুসলমানদের মধ্যে এমন কু-চরিত্র সৃষ্টি করছি, যা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যেও বিস্তার লাভ করতে থাকবে। আমরা এমন পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করছি যে, মুসলমান তাদের নিজস্ব রীতি-নীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে আমাদের সৃষ্টি করা ও শেখানো চরিত্র-সভ্যতা লালন করবে।'

'আমাদেরকে তাদের আসল ধর্ম ও কালচার বিকৃত করতে হবে'– রেমন্ড বললেন– 'আমাদের এই অভিযান যখন পূর্ণতা লাভ করবে, সে সময়ে আমরা বেঁচে থাকব না। এই অভিযানের ফল আমরা দেখতে পাব না। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, আমরা যদি এই অভিযান অব্যাহত রাখি, তাহলে এমন একটা সময় আসবে, যখন ইসলাম যদিও বেঁচে থাকে, তা হবে ইসলামের বিকৃত রূপ, যা পালনে মানুষ শুধুই বিভ্রান্ত হবে। মুসলমান হবে নামের মুসলমান। তাদের স্বাধীন-স্বতন্ত্র কোন রাজ্য থাকেও যদি, সেটি হবে পাপের আড্ডাখানা। ইহুদী ও খৃস্টান পন্ডিতগণ এই জাতিটার মধ্যে পাপের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

'সে যাই হোক, তারা এখন আমাদের সাহায্যের অপেক্ষায় বসে আছেন'– খৃস্টান উপদেষ্টা বলল– 'গোমস্তগীন আমাকে সে উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন।'

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে মতবিনিময় চলে। শেষে সিদ্ধান্ত হয়, সৈন্য পাঠিয়ে তার কোন সাহায্য করা হবে না। দেই দিচ্ছি বলে কালক্ষেপণ করতে হবে। তাকে এই বলে আশ্বস্ত করতে হবে যে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করে তাকে আলরিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ করতে বাধ্য কর। আমরা তারই কোন একটা স্পর্শকাতর স্থানে সেনা অভিযান চালিয়ে তাকে এমন বেকায়দায় ফেলে দেব যে, তিনি আলরিস্তান ত্যাগ করে পেছনে সরে যেতে বাধ্য হন। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হল, হাল্‌ব, হাররান ও মসুলের সৈন্যদের জন্য এই উপদেষ্টার সঙ্গে তীর-ধনুক ও দাহ্য পদার্থ পাঠিয়ে দেয়া হবে। তাছাড়া পাঁচশত ঘোড়াও প্রেরণ করা হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, অধিকাংশ ঘোড়াই যেন এমন হয়, যেগুলো আমাদের সৈন্যদের কাজে আসে না, কিন্তু বাহ্যিকভাবে সুস্থ ও সবল।'

'আর ভবিষ্যতে সেই আমীর প্রমুখকে অল্প অল্প করে অস্ত্র সরবরাহ করা হবে'– রেজিনাল্ট বললেন– 'সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে তাদেরকে বিলাসিতার দিকে টেনে আনতে হবে। তাদেরকে বুঝ দিয়ে রাখতে হবে যে, যখনই তাদের অস্ত্র কিংবা ঘোড়ার প্রয়োজন পড়বে, তা সরবরাহ করা হবে। এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের ব্যবস্থা গ্রহণে উদাসীন হয়ে পড়বে এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে

থাকবে। এসব সাহায্য-সহযোগিতা এবং আমাদের উপদেষ্টাদের মধ্যস্থতায় আমরা তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর জয়লাভ করে ফেলব।'

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা কিন্তু বলা হয়নি'– এক কমান্ডার বলল– 'শেখ সান্নানের পাঠানো নয় সদস্যের ঘাতক দল রওনা হয়ে গেছে। আশা করছি, এবার তারা সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা না করে ফিরবে না। তারা যে শপথ নিয়ে গেছে, তাতে তারা এ কথাও বলেছে যে, জীবন বাজি রেখে তারা আইউবীকে হত্যা করবে। অন্যথায় তারা জীবিত ফিরে আসবে না।'

সেদিনই পাঁচশত ঘোড়া, কয়েক হাজার ধনুক, লক্ষাধিক তীর ও দাহ্য পদার্থ ভর্তি কয়েকটি মটকা হাল্‌বের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সঙ্গে একখানা বার্তাও দেয়া হয়, যাতে লেখা ছিল– 'এই সাহায্যের ধারা চলতে থাকবে। আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর এক্ষুণি আক্রমণ করুন।'

❁ ❁ ❁

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁর হেডকোয়ার্টারে বসে আছেন। তাঁর নিকট সর্বপ্রথম আনতানুন ও সাদিয়া গিয়ে পৌঁছে। সাদিয়া গোমস্তগীনের হেরেমের সেই মেয়ে, যে একজন খৃস্টান উপদেষ্টাকে খুন করে আনতানুন নামক রক্ষী সেনার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। আনতানুন সুলতান আইউবীর এমন এক গোয়েন্দা, যে আবেগের বশবর্তী হয়ে সীমালংঘন করে ফেলেছিল। যার ফলে সে গ্রেফতার হয়েছিল। সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখত কৌশল করে তাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সুলতান আইউবীর ইন্টেলিজেন্স প্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আনতানুন ও সাদিয়াকে সুলতানের নিকট নিয়ে যান। আনতানুন সুলতানকে তার ইতিবৃত্ত অবিকৃতরূপে শোনায়। আনতানুনের এই কর্মনীতি সুলতানের পছন্দ না হলেও তিনি তাকে এই বলে ক্ষমা করে দেন যে, যেরূপ সাফল্যের সঙ্গে তুমি গোমস্তগীনের রক্ষী বাহিনীতে ঢুকে পড়েছিলে, তা তোমার বিরাট কৃতিত্ব। সাদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে হেরেম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়াও তার আরেক কৃতিত্ব। সুলতান আইউবী আনতানুনের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেন, একে সেনাবাহিনীতে পাঠিয়ে দাও। কারণ, গুপ্তচরবৃত্তির নাজুক কাজের জন্য এর আবেগ নিয়ন্ত্রিত নয়। আর সাদিয়াকে দামেস্ক পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ দেন।

'আমি আনতানুনকে বিয়ে করতে চাই'– সাদিয়া বলল।

'তা-ই হবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কিন্তু বিয়েটা হবে দামেস্কে। যুদ্ধের ময়দান শহীদ হওয়ার স্থান– বিয়ের জায়গা নয়।'

'মহামান্য সুলতান!'– আনতানুন বলল– 'আমি আপনাকে অসন্তুষ্ট করেছি। তার শাস্তিস্বরূপ যতক্ষণ না আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, ততক্ষণ বিয়ে করব না।' সে সাদিয়াকে উদ্দেশ করে বলল– 'তুমি সুলতানের আদেশ মোতাবেক দামেস্ক চলে যাও। সেখানে তোমার বসবাসের ভাল ব্যবস্থা হবে। আমার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।' সে আবার সুলতান আইউবীকে বলল– 'আমি কোন একটা কমান্ডো বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে কাজ করতে চাই; আপনি আমার এই আবেদনটুকু মঞ্জুর করুন। আমি গেরিলা হামলার প্রশিক্ষণ নিয়েছি।'

আনতানুনকে একটি কমান্ডো দলে পাঠিয়ে দেয়া হল। বৈঠক থেকে বিদায় নেয়ার সময় সাদিয়ার প্রতি এক নজর তাকালও না সে।

পরদিন যখন সাদিয়ার দামেস্ক রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখন সেই মেয়েগুলো এসে পৌঁছে, যাদেরকে আল-মালিকুস সালিহ গোমস্তগীনের নিকট উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে রয়েছে সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখতের প্রেরিত দু'ব্যক্তি। হাররানে কী সব ঘটনা ঘটছে, তারা সুলতান আইউবীকে তার কাহিনী শোনায়।

'ফিলিস্তিনের মুসলমানরা যে আপনার পথ পানে তাকিয়ে আছে, তা কি আপনি জানেন?' এক মেয়ে বলল– 'সেখানকার মেয়েরা আপনার নামে গান গায়। মসজিদে মসজিদে আপনার বিজয়ের জন্য দু'আ হয়।'

অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে খৃস্টানরা কিভাবে মুসলমানদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং পৃথিবীটাকে তাদের জন্য জাহান্নামে পরিণত করেছে, মেয়েটা তার বিবরণ প্রদান করে।

'সেখানে শুধু আমাদের মেয়েদের নয়; জাতীয় মর্যাদারও শ্লীলতাহানি চলছে'– অপর এক মেয়ে বলল– 'আমি বরং বলব, জাতির শ্লীলতাহানি আমাদের শাসকরাই করছে। আমাদেরকে গোমস্তগীনের নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল। আমরা তাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলেছি, আমরা আপনাদেরই কন্যা। কিন্তু তারা আমাদের কোনই আবেদন-আর্তি শোনেননি, তারা আমাদেরকে একজন অপরজনের নিকট উপহার হিসেবে দান করা শুরু করেছেন।'

'ফিলিস্তীনের পথের প্রতিবন্ধকও তারাই'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি ফিলিস্তীনের উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। কিন্তু আমার ভাইয়েরা আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেছে। যা হোক, এখন তোমরা

নিরাপদ। তোমাদের আগে আরো একটি মেয়ে এখানে এসেছিল। তাকে দামেস্ক পাঠানো হচ্ছে। তোমরাও তার সঙ্গে চলে যাও।'

'আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই'– এক মেয়ে বলল– 'আমাদেরকে এখানেই রেখে দিন এবং কাজ দিন। আমরা এখন আর কোন হেরেম কিংবা কোন গৃহে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাই না।'

'আমি এখনো জীবিত আছি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমরা দামেস্কে চলে যাও। সেখানে তোমাদেরকে কেউ আবদ্ধ করে রাখবে না। সেখানে আরো কয়েকটি মেয়ে বিভিন্ন উপায়ে আমাদের সাহায্য করছে। সেখানে তোমাদেরকেও কোন একটা দায়িত্ব দেয়া হবে।'

মেয়েগুলোকে বিদায় দিয়ে সুলতান আইউবী অস্থির মনে এদিক-ওদিক পায়চারি করতে শুরু করেন। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তার সঙ্গে আছেন। তিনি বললেন– 'মিশর থেকে রিজার্ভ ফোর্স এখনো এসে পৌঁছেনি। তিনটি বাহিনী যদি আমাদের উপর আক্রমণ করতে এসে পড়ে, তাহলে আমরা সমস্যায় পড়ে যাব। মনে হচ্ছে, আমাদের সৈন্য যে কম এবং আমি সাহায্যের অপেক্ষায় আছি, তা দুশমন জানে না। তাদের স্থলে যদি আমি হতাম, তাহলে এক্ষুণি আক্রমণ করে বসতাম এবং রসদের পথ বন্ধ করে দিতাম।'

'মিশর থেকে সাহায্য আসবে, তাতে সন্দেহ নেই'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'মোহতারাম আল-আদেল এমন লোক তো নন যে, তিনি সময় নষ্ট করবেন। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, দুশমন আমাদের সরবরাহ পথ বন্ধ করেনি।'

সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, সে সময়টা ছিল সুলতান আইউবীর জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও বিপদসংকুল। তিনি মিশর থেকে বিশেষ সাহায্যের অপেক্ষা করছিলেন। সে মুহূর্তে যদি আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগীনের সম্মিলিত বাহিনী সুলতান আইউবীর উপর হামলা করে বসত, তাহলে তাকে সহজেই পরাজিত করতে পারত। কারণ, তার সৈন্য ছিল খুবই কম। তিনি পাহাড়ী অঞ্চলে মরু এলাকার কৌশল প্রয়োগ করতে পারতেন না। কিন্তু তার শত্রুপক্ষ কী ভাবছিল, তা কে জানে। খৃস্টানরা তার উপর আক্রমণ করার পরিবর্তে মুসলিম আমীরদেরকে তার বিরুদ্ধে লড়াতে চাচ্ছিল। তারাও দেখল না যে, সুলতান আইউবী এক অসহায় অবস্থায় বসে বসে আল্লাহর নিকট দু'আ করছেন– 'ইয়া আল্লাহ! এই অসহায় পরিস্থিতিতে দুশমন যেন আমার উপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে; তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

যুদ্ধ বেঁধে গেলে ফৌজের ঘোড়া ও উটগুলাকে যে নদী থেকে পানি পান করাতে হবে, সেটির দখল বজায় রাখার শক্তিও তার ছিল না। খৃস্টান কিংবা তার মুসলিম শত্রুপক্ষ যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করত, তাহলে গেরিলাদের দ্বারা তারা আইউবীর রিজার্ভ বাহিনীর আগমন ও রসদের পথটা বন্ধ কিংবা নতুন বাহিনীর আগমনের গতি শ্লথ করে দিতে পারত। সুলতান আইউবী টহল কমান্ডোদের দ্বারা সে পথটা নিরাপদ করে রেখেছিলেন।

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ– যিনি সে সময়কার প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনার বিশ্লেষক– তার রোজনামচায় 'সুলতান ইউসুফ (সালাহুদ্দীন আইউবী)-এর উপর কি বিভীষিকা নেমে এসেছিল' শিরোনামে লিখেছেন–

'আল্লাহ যদি তাদেরকে (শত্রুপক্ষকে) বিজয় দান করতে ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা তখনই সুলতান আইউবীর উপর হামলা করে বসত। কিন্তু আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করতে চান, সে লাঞ্ছিতই থাকে। তারা সুলতান আইউবীকে এতটুকু সময় ও সুযোগ দিয়ে দেয় যে, মিশর থেকে নতুন ফোর্স এসে পৌঁছে যায়। সুলতান তাদেরকে তার বাহিনীর সঙ্গে একীভূত করে নতুন বিন্যাস তৈরি করে নেন। তিনি হামলার আগে সবক'টি ঘোড়াকে পানি পান করিয়ে নেন এবং প্রচুর পানি রিজার্ভ করে রাখেন।

সুলতান আইউবীর ব্যাকুলতার অবস্থা এই ছিল যে, তিনি রাতে ঘুমাতেন না। তিনি যেখানে যেখানে সেনা স্থাপন করেছেন, সব ক'টি পয়েন্টে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন, ভাবতেন এবং এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা দুশমনের হামলা প্রতিহত করার পরিকল্পনাটা ঝালাই করে নিতেন। হামাত শিংয়ে যে স্থানে একটি পাহাড় শিং-এর ন্যায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, তিনি সেটিকে দুশমনের জন্য ফাঁদ হিসেবে প্রস্তুত করে রাখেন। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, এত স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা তিনি কেবল প্রতিরোধ যুদ্ধই লড়তে পারতেন। যুদ্ধের পটভূমি পাল্টে দেয়ার জন্য যে জবাবী আক্রমণের প্রয়োজন, তার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। তার গোয়েন্দারা তাকে তথ্য প্রদান করেছিল যে, খৃস্টানরা মুসলিম আমীরদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে এমনভাবে লড়াবার চেষ্টা করবে, যাতে যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়, যেন সুলতান আইউবী পাহাড়ী এলাকা থেকে বের হতে না পারেন এবং অবরুদ্ধ থেকে প্রতিরোধ লড়াই করতে করতে শেষ হয়ে যান।

কিন্তু সুলতান আইউবীর গোয়েন্দারা তাকে এ তথ্য জানাতে পারেনি যে, নয় সদস্যের একটি ঘাতক দল তাকে হত্যা করতে আসছে। অপরদিকে সুলতানের

দৃষ্টিও নিজের জীবনের প্রতি নয়, রণাঙ্গনের উপর নিবদ্ধ। তিনি পর্যবেক্ষণের জন্য দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সৈন্য ছড়িয়ে রেখেছেন।

এর পরদিনই হাররান থেকে সুলতান আইউবীর এক দূত এসে পৌঁছে। সে সংবাদ নিয়ে আসে, সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখত কারাগারে আটক রয়েছেন। তারা কাজী ইবনুল খাশিবকে খুন করেছেন। গোয়েন্দা এই হত্যাকাণ্ডের কারণ জানতে পারেনি। সংবাদটা শোনামাত্র সুলতান আইউবীর চেহারার রং বদলে যায়। এই দু'সহোদরের সঙ্গে তিনি অনেক আশা-ভরসা যুক্ত করে রেখেছিলেন। তাদের জানা ছিল, গোমস্তগীনের ফৌজের কমান্ড এই দু'ভাইয়ের হাতে থাকবে এবং তাদের বাহিনী লড়াই না করে স্বেচ্ছায় তার হাতে আত্মসমর্পণ করবে। গোয়েন্দা এ তথ্যও প্রদান করে যে, এখন গোমস্তগীন নিজে ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে ফৌজের কমান্ড করবেন। গোয়েন্দা আরো জানায়, গোমস্তগীন তার বাহিনীকে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে লড়াই করবেন।

'হাসান ইবনে আবদুল্লাহ!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'শামসুদ্দিন ও শাদবখতকে যেন বেশিদিন গোমস্তগীনের কারাগারে থাকতে না হয়। এর নিকট থেকে জেনে নাও, হাররানে আমাদের কতজন লোক আছে এবং তারা তাদেরকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনতে পারবে কিনা। আমার আশংকা হচ্ছে, গোমস্তগীন তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। এরা যে আমার গোয়েন্দা, গোমস্তগীন তা জেনে ফেলেছে। আমি হাররান গিয়ে অবরোধ করে দুর্গ জয় করে তাদেরকে মুক্ত করব, এতটুকু সময় অপেক্ষা করতে পারব না। গোমস্তগীন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই তুমি তাদেরকে কয়েকখানা থেকে মুক্ত করে আন। আমি আমার এই দুই সালারের জন্য দুইশ' কমান্ডোর জীবন খোয়াতেও প্রস্তুত আছি। হাররানে পর্যাপ্ত লোক না থাকলে এখান থেকে কমান্ডো পাঠাও।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।' হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন।

❁ ❁ ❁

হাল্‌ব এখন সুলতান আইউবীর বিরোধী পক্ষের কেন্দ্র। সাহায্য হিসেবে খৃস্টানদের প্রেরিত তীর-ধনুক ও দাহ্য পদার্থের মটকা ও ঘোড়াগুলো হাল্‌ব পৌঁছে গেছে। খৃস্টানরা হাল্‌বের লোকদের মধ্যে একটি গুণ এই প্রত্যক্ষ করেছিল যে, তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে সুলতান আইউবীর অবরোধের মোকাবেলা করেছিল। সালতানাতের রাজধানীও এখন হাল্‌ব। খৃস্টান উপদেষ্টাগণ মসুলে সাইফুদ্দীনকে এবং হাররানে গোমস্তগীনকে সংবাদ

পাঠায় যে, আপনাদের সম্মিলিত বাহিনীর জন্য সাহায্য এসে গেছে, আপনারা বিলম্ব না করে চলে আসুন। ঐতিহাসিকদের বিবরণ মোতাবেক হাল্ব নগরীর বাইরে একস্থানে এই তিন মুসলিম শাসকের সাক্ষাৎ ঘটে এবং সেখানে বসে তাদের মাঝে একটি অলিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি কি ধরনের হবে, তা ঠিক করে খৃস্টান উপদেষ্টাগণ।

সেই রাতের ঘটনা। মসুলের কারাগারে বসে খতীব ইবনুল মাখদুম প্রদীপের আলোতে কুরআন পাঠ করছিলেন। তার কন্যা সায়েকা সেই ভবনটির একটি কক্ষে অবস্থান করছে, বস্তাবন্দী হয়ে যে ভবনে এসে সে পৌঁছেছিল, তার সঙ্গে যে রক্ষী সেনাকে ধরে আনা হয়েছে, সে অন্য কক্ষে। ভবনটিতে তারা ব্যতীত আরো দু'জন লোক আছে, যারা তাদেরকে তুলে এনেছিল। তাদের অবশিষ্ট সঙ্গীরা কয়েদখানার বাইরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেয়ালের উপরিভাগ দুর্গের দেয়ালের মত, যার উপর মোর্চার মত তৈরি করা আছে। উপরে কয়েকজন সান্ত্রী ঘোরাফেরা করছে। তাদের সংখ্যা বেশি নয়। যে জেল কর্মকর্তা খতীবকে পালাবার সুযোগ করে দেয়ার ওয়াদা দিয়েছিলেন, তিনি সান্ত্রীদের প্রতি দৃষ্টি রেখে ঘোরাফেরা করছেন। যে দেয়ালের নীচে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, তিনি তার উপরের সান্ত্রীকে ডেকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

জেল কর্মকর্তা কি যেন একটা ইঙ্গিত করেন। নীচে লুকিয়ে থাকা লোকগুলো উপর দিকে একটি রশি ছুঁড়ে দেয়। রশির এক মাথা একটি লাঠির মধ্যখানে বাঁধা। লাঠিটা কাপড় পেঁচানো, যাতে দেয়ালের উপরে নিক্ষিপ্ত হয়ে শব্দ না করে। লাঠিটা উপরে গিয়ে আটকে যায়। একে তো অন্ধকার, তদুপরি কর্মকর্তা সান্ত্রীকে নিয়ে দূরে চলে গেছেন। চারজন লোক রশি বেয়ে উপরে উঠে যায়। তারা এই রশিটাই টেনে তুলে নিয়ে দেয়ালের অপরদিকে ছেড়ে দেয়। চারজন খঞ্জর বের করে নিজ নিজ মুখে চেপে ধরে রশি বেয়ে নীচে নেমে যায়। জেল কর্মকর্তা তাদেরকে ভেতরের মানচিত্র বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ভেতরে কিছুটা আলো আছে। স্থানে স্থানে প্রদীপ জ্বলছে। জেল কক্ষের সারিতে মাথায় এক স্থানে একটুখানি বারান্দা। এই সান্ত্রী ওখানে পায়চারি করছে। চার ব্যক্তি লুকিয়ে যায়। সান্ত্রী তাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলে একজন বলল, 'এদিকে একটু আসুন তো ভাই।' সান্ত্রী দ্রুতগতিতে তাদের নিকট গিয়ে পৌঁছে। অমনি দু'ব্যক্তি তাকে ঝাপটে ধরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে খঞ্জর মেরে কাজ সমাধা করে দেয়।

চার ব্যক্তি চুপি চুপি সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। একজন একটু বেশি

এগিয়ে যায়। অপর তিনজন বিক্ষিপ্তভাবে চুপিসারে তাকে অনুসরণ করে এগুতে থাকে। সামনের লোকটি কয়েদখানার গোলাকার একটা জায়গায় পৌঁছে যায়। খতীবের প্রকোষ্ঠটা এখানেই। লোকটা খতীবের কুঠুরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। খতীব দরজার দিকে তাকান। তিনি কুরআনখানি বন্ধ করে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে আসেন। লোকটার হাতে বড় একটা চাবি। জেল কর্মকর্তা এক কর্মকার দিয়ে চাবিটা তৈরি করে দিয়েছেন। কয়েকখানার চাবি সম্পর্কে সে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। লোকটি চাবিটা তালায় ঢুকায়। তালা খুলে যায়। খতীব এখন কক্ষের বাইরে। তালাটা খুলে দিয়েই কমান্ডো ফেরত রওনা হয়ে যায়।

পিছন দিকে কতটুকু সরে আসার পর কমান্ডো কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বর– 'কে? দাঁড়াও।' এদিক থেকে জবাব দেয়া হয়– 'কাছে আস দোস্ত!' লোকটি কমান্ডোর নিকটে এগিয়ে আসামাত্র একটি খঞ্জর তার হৃদপিণ্ডে গেঁথে যায়। লোকটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লে পেছন দিক থেকে আরেকটি খঞ্জর তাকে আঘাত হানে। লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কমান্ডো খতীবকে নিয়ে রশির নিকট চলে যায়।

সর্বপ্রথম এক কমান্ডো দেয়ালের উপরে ওঠে। তারপর উঠেন খতীব। জেল কর্মকর্তা সান্ত্রীকে এখনো দূরে কোথাও আলাপে মাতিয়ে রেখেছেন। খতীবসহ একে একে সব কমান্ডো দেয়ালের উপর উঠে যায়। তারপর রশিটা টেনে তুলে বাইরের দিকে ছেড়ে দেয় এবং সকলে নীচে নেমে আসে। জেল কর্মকর্তা কয়েদখানার বাইরের দিক থেকে শিয়ালের হুক্কা হুয়া ডাকের ন্যায় শব্দ শুনতে পায়। সে সান্ত্রীকে আরেক দিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সেই জায়গায় চলে আসে, যেখানে রশি ঝুলানো হয়েছিল। সে দ্রুত রশিটা সরিয়ে ফেলে।

সায়েকা ও বডিগার্ড যে গৃহে অবস্থান করছে, এরা সকলে সেখানে চলে যায়। পিতাকে দেখে সাায়েকা আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

যখন ভোর হল, তখন মসুল থেকে কয়েক মাইল দূরে চারটি ঘোড়া ছুটে চলছিল। একটির আরোহী খতীব। একটিতে সায়েকা। একটিতে সাইফুদ্দীনের কারা কর্মকর্তা এবং চতুর্থটিতে অপর এক ব্যক্তি। এ লোকটি সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। যে দলটি সাইফুদ্দীনের বডিগার্ডকে ধরে এনেছিল, লোকটি তাদের একজন। এ লোকটিই বডিগার্ড থেকে বড় মূল্যবান তথ্য বের করেছিল। তারা যখন মসুল থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছিল, ততক্ষণে বডিগার্ড সমাধিস্থ হয়ে গেছে। রাতে এ দলটি মসুল ত্যাগ করার সময় বডিগার্ডকে খুন করে গিয়েছিল।

সাইফুদ্দীনের কয়েদখানার অবস্থা শোচনীয়। ভেতরে দু'জন সান্ত্রীর লাশ পড়ে আছে। খতীব উধাও। কর্মকর্তার পাত্তা নেই। বডিগার্ড খতীব কন্যা সায়েকাকে নিয়ে যথাসময়ে না পৌঁছায় সাইফুদ্দীন ধরে নিয়েছিলেন, বডিগার্ড গাদ্দারী করেছে। তার ধারণা, মেয়েটার রূপ-সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে লোকটার মাথা বিগড়ে গেছে। তাই সে মেয়েটাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। কিন্তু তার কল্পনায়ও আসেনি যে, তার দেহরক্ষী সায়েকাসহ আইউবীর কমান্ডোদের হাতে ধরা পড়েছে।

❁ ❁ ❁

সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখত গোমস্তগীনের কারাগারে বন্দী। সুলতান আইউবী নির্দেশ প্রদান করেছেন, তাদেরকে ওখান থেকে বের করে আনার ব্যবস্থা কর। কিন্তু তারা হাররানে যেসব লোক তৈরি করে রেখেছেন, তারা সে ব্যবস্থা আগেই করেছে। এই দুই সালার সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে এক একজন ও দু-দু'জন করে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে রেখেছেন। তবে তাদের পলায়নে বড় সমস্যা হল, তারা যেখানে বন্দী রয়েছেন, সেটা কয়েদখানার পাতাল কক্ষ। সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য বিশেষ কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছেন। সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখতের মুক্তির পথ বেরিয়ে এসেছে। হাল্‌ব থেকে গোমস্তগীনের তলব এসেছে। তিনি তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, উপদেষ্টা ও রক্ষীদের নিয়ে হাল্‌বের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। শামসুদ্দীন ও শাদবখতের বন্দী হওয়ার সংবাদ গোমস্তগীনের একান্ত ঘনিষ্ঠ লোকজন ব্যতীত কেউ জানত না। কাজী ইবনুল খাশিবের হত্যাকাণ্ডের খবরও গোপন রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনী পর্যন্ত এখনো জানে না, তাদের ঊর্ধ্বতন দু'জন সালারকে কয়েকখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছে।

গোমস্তগীনের রওনা হয়ে যাওয়ার একদিন পর জেলার দেখতে পান যে, তিনজন অশ্বারোহী কারাগারের দিকে ছুটে আসছে। ঘোড়াগুলো আরো নিকটে আসার পর দেখা গেল, তাদের সঙ্গে আরো দু'টি শূন্য ঘোড়া রয়েছে। ঘোড়াগুলো কয়েদখানার গেটে এসে দাঁড়িয়ে যায়। এক আরোহী হাররানের সামরিক পতাকা উঁচিয়ে রেখেছে। এই পতাকাটা যুদ্ধের ময়দানে প্রধান সেনাপতির হাতে থাকে। অশ্বারোহীদের মধ্যে একজন কমান্ডার। অপর দু'জন সাধারণ সৈনিক। সম্ভবত তারা রক্ষীবাহিনীর সদস্য। জেলার প্রধান ফটকের ফাঁক দিয়ে বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি কমান্ডারকে চিনেন। ফটক খুলে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন। কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করেন 'কেন এসেছ?'

'রাজা-বাদশাদের আদেশ-নিষেধের কোন তাল থাকে না'– কমান্ডার বলল– 'আমাদের শাসনকর্তা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এমন দু'জন সালারকে জেলে পুরে রেখেছেন, যাদের ছাড়া ফৌজ এক পা-ও চলতে পারে না। এখন আবার আদেশ করলেন, তাদেরকে জেল থেকে বের করে আন।'

'তার মানে আপনারা সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখকে নিতে এসেছেন?' জেলার জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ'– কমান্ডার বলল– 'তাদেরকে জলদি নিয়ে যেতে হবে।'

'দুর্গপতি গোমস্তগীনের লিখিত কোন নির্দেশনামা নিয়ে এসেছেন?'– জেলার জিজ্ঞেস করেন– 'তিনি তো বাইরে কোথায় যেন চলে গেছেন?'

'আমি তার নিকট থেকেই এসেছি'– কমান্ডার বলল– 'আমি রাতেই এসে পড়েছি। তখন তার এতটুকু হুঁশ ছিল না যে, নির্দেশনামা লিখে দেবেন। আমাদের ফৌজ হাল্‌ব ও মসুলের ফৌজের সঙ্গে মিলে সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে। সময় নষ্ট করলে আইউবীই উল্টো আমাদের উপর হামলা করে বসবেন। বিপদ বেড়ে গেছে। গোমস্তগীন এ ব্যাপারেই হাল্‌ব গেছেন। মাথার উপর বিপদ দেখার পর এখন তার হুঁশ ফিরে এসেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এ দু'সালার ব্যতীত তিনি লড়াই করতে পারবেন না। তাই আমাকে হাল্‌বের রাস্তা থেকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। পতাকাটা দিয়ে বলেছেন, তাদেরকে এই পতাকা উড়িয়ে পূর্ণ মর্যাদার সাথে নিয়ে আস। আপনি জলদি করুন।'

জেলার কমান্ডারকে ভেতরে নিয়ে যান। সৈনিকদ্বয়ও তাদের সঙ্গে চলে যায়। তারা পাতাল কক্ষে ঢুকে পড়ে। শামসুদ্দীন ও শাদবখত আলাদা আলাদা দু'টি কক্ষে আবদ্ধ। প্রথমে একজনকে বের করে আনা হল। কমান্ডার তাকে সামরিক কায়দায় সালাম করে বলল– 'হাররানের আমীর গোমস্তগীন আপনার মুক্তির নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আপনার ঘোড়া ও ব্যক্তিগত দেহরক্ষী আমাদের সঙ্গে আছে। আপনার জন্য নির্দেশ হল, প্রস্তুতি নিয়ে এক্ষুণি হাল্‌ব পৌঁছে যাবেন।'

'মনে হয়, মদের নেশা কেটে গেছে।' সালার বললেন।

'আমি এমন কেউ নই যে, আপনার অভিমত সমর্থন কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারি'– কমান্ডার বলল– 'আমার কাজ নির্দেশ পৌঁছানো আর আপনার সঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।'

জেলার মনোযোগ সহকারে তাদের কথাবার্তা শ্রবণ করেন। তিনি নিশ্চিত

হন যে, বিষয়টা সঠিক। কিন্তু অপর সালারকে বের করে আনতে গিয়েই জেলারের মনে সন্দেহ জাগে। এই সালার কমান্ডারকে দেখামাত্র আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন– 'তোমরা এসে পড়েছ? সব ঠিক আছে তো?' তিনি জেলারের উপস্থিতি অনুধাবন করে সে অনুপাতে কথা বলতে ব্যর্থ হন। জেলার আনাড়ী লোক নন। তার কর্মজীবনটা পুরোটাই কাটে কারাগারে। তিনি কক্ষের তালা খুলে দিয়েছিলেন। মনে সন্দেহ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তালাটা লাগিয়ে দেন এবং বললেন– 'লিখিত নির্দেশনামা ব্যতীত আমি এদেরকে মুক্তি দিতে পারব না।'

কমান্ডার থাবা দিয়ে তার হাত থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নেয়। সালারদের দেহরক্ষী হিসেবে আসা সৈনিকদ্বয় জেলারের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তারা খঞ্জর বের করে খঞ্জরের আগা জেলারের পিঠের উপর ঠেকিয়ে রাখে। কমান্ডার তাকে কানে কানে বলল– 'এ মুহূর্তে তুমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডোর কব্জায় আটক রয়েছ। তুমি তো জান, আইউবীর কমান্ডোরা কী করতে পারে। আর একটা শব্দও যেন মুখ থেকে বের না হয়।'

কমান্ডার তালা খুলে কক্ষের দরজা খুলে ফেলে। জেলারকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, যাতে আশপাশ থেকে কেউ বুঝতে না পারে যে, এখানে কোন অপরাধ হচ্ছে। ভেতরে ঢুকিয়ে তাকে ছিদ্রওয়ালা দরজার নিকট থেকে সরিয়ে আড়ালে নিয়ে যায়। এক সৈনিক দ্রুত এক টুকরো রশি দ্বারা, যা বড়জোর পৌনে এক গজ লম্বা হবে– তার গলাটা পেঁচিয়ে ধরে রশিটাকে একটা মোড় দেয় এবং দু'-তিনটি ঝটকা টান মারে। জেলারের চোখ দু'টো কোটর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। লোকটি শীতল হয়ে যায়।

নিথর-নিস্তব্ধ জেলারকে পাথরের মেঝেতে ফেলে রাখা হল। লাশের উপর একখানা কম্বল ছড়িয়ে দেয়া হল। সালার আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে এই সমস্যাটা সৃষ্টি করে দিলেন।

শামসুদ্দীন ও শাদবখতকে নিয়ে বের হয়ে কমান্ডার দরজায় তালা লাগিয়ে দেয় এবং চাবিটা নিয়ে নেয়। বাইরের দরজাগুলোর চাবিও জেলারের নিকট ছিল। কমান্ডার সেগুলোও নিয়ে নেয়। এই দলটি সেখান থেকে রওনা হয়। তারা পাতাল কক্ষ থেকে উপরে উঠে আসলে পাতালের সান্ত্রী নীচে গিয়ে শূন্য প্রকোষ্ঠগুলো পর্যবেক্ষণ করে। সে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিল, জেলার দু'জন কয়েদীকে মুক্তি দিচ্ছেন। কয়েদী দু'সালারকে সে বেরিয়ে যেতেও দেখেছে। কিন্তু নীচে গিয়ে দেখতে পায়, এক প্রকোষ্ঠে কে একজন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে

আছে। লোকটা কে, চিনতে পারল না সে। অপর কক্ষটি শূন্য। সে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা লোকটাকে ডাক দেয়। কিন্তু তার কোন সাড়া নেই। দরজা তালাবদ্ধ। সান্ত্রী দেয়ালের ছিদ্রপথে হাতের বর্শাটা ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। বর্শার আগা লোকটি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বর্শার আগা দ্বারা লোকটাকে খোঁচা মারে। তারপরও সে উঠল না। বর্শা দ্বারা গায়ের কম্বলটা সরিয়ে লোকটার মুখমণ্ডল উদাম করে। সহসা চমকে উঠে সান্ত্রী। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাটা দিয়ে উঠে তার। ইনি যে কারাগারের জেলার! চোখ ও মুখমণ্ডলে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, লোকটা মৃত।

সান্ত্রী সেখান থেকেই চিৎকার শুরু করে দেয়– 'সাবধান! সাবধান! আসামী পালিয়ে গেছে।' সে দৌড়ে উপরে উঠে আসে। তার ডাক-চিৎকারের সূত্রে নাকাড়া বাজতে শুরু করে। ততক্ষণে পলায়নরত দলটি প্রধান ফটকে পৌঁছে গেছে। সান্ত্রীরা ছুটে বেড়াচ্ছে। প্রধান ফটকের চাবিগুলো কমান্ডারের নিকট। তারা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয় এবং ভেতরের তালায় চাবি ঢুকায়। সান্ত্রী দূর থেকে চিৎকার করে বলল– 'ওদেরকে ধরে ফেল? ওরা আমাদের জেলারকে খুন করে পালাচ্ছে।'

নাকাড়ার আওয়াজে কয়েদখানার সকল সান্ত্রী যার যার ডিউটিতে পৌঁছে গেছে। বাইরের রক্ষীরাও ছুটে এসেছে। ফটক খুলে গেছে। যে নাকাড়া বাজানো হয়েছে, তা হচ্ছে বিপদ সংকেত। তাই বাইরে থেকে ছুটে আসা রক্ষীসেনারা তাদের প্রশিক্ষণ মোতাবেক দ্রুততার সাথে ফটকে ঢুকে পড়ে। তাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় বিপদ এই হতে পারে যে, হয়ত কয়েদীরা বিদ্রোহ করে বসেছে কিংবা কারাগারের কোথাও আগুন লেগে গেছে। যে সান্ত্রী ডাক-চিৎকার করে ফিরছিল, সে বাইরে থেকে আগত সান্ত্রীদের ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। এই হুলস্থুল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পলায়নপর লোকগুলো ফটক অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। বাইরে ঘোড়া দণ্ডায়মান। তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে।

ঘোড়া ছুটতে শুরু করলে একজন পেছন দিকে থেকে চিৎকার দেয়– 'থাম, অন্যথায় মারা যাবে।' তারা ক্ষিপ্রগতিতে ঘোড়া হাঁকায়। পেছন থেকে একসঙ্গে এক ঝাঁক তীর ধেয়ে আসে। দু'টি তীর কমান্ডারের পিঠে গেঁথে যায় এবং একটি এক সালারের ঘোড়ার পেছন অংশে আঘাত হানে। কমান্ডার দেহে দু'টি তীর নিয়েও আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সালার শামসুদ্দীনের ঘোড়া তীর খেয়ে লাফিয়ে ওঠে। শামসুদ্দীন ঘোড়াটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন এবং তাকে

কমান্ডারের ঘোড়ার পাশে নিয়ে গিয়ে লাফ দিয়ে তার ঘোড়ায় চড়ে বসেন। কমান্ডারের হাত শিথিল হয়ে আসে। শামসুদ্দীন তার হাত থেকে ঘোড়ার লাগামটা নিয়ে নেন। পেছন থেকে আরো তীর আসে। কিন্তু ঘোড়ার গতি দ্রুত থাকায় নিশানা ব্যর্থ হয়।

তারা পেছন দিকে তাকায়। সাইফুদ্দীনের কয়েদখানা এখন তাদের থেকে অনেক দূরে। কিন্তু দশ-বারজন অশ্বারোহী তাদেরকে ধাওয়া করছে। সামনে উন্মুক্ত মাঠ। পলায়নকারীরা তীব্রগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলছে। তাদের অস্ত্রের অভাব। উভয় সালার নিরস্ত্র। কমান্ডার ধীরে ধীরে নিথর হয়ে আসছে। মোকাবেলা করার মত শক্তি তার নেই। সামনে টিলা ও পার্বত্য এলাকা। এক সালার বললেন– 'তোমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাও। একাকী হয়ে যাও।'

ধাওয়াকারীরা এখনো অনেক দূরে। তারা দেখল, পলায়নকারীরা পরস্পর আলাদা হয়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে হারিয়ে গেছে। তাদের গতি শ্লথ হয়ে যায়। পলায়নকারীরা তাদের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

[চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত]

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে আটকিয়ে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

আবাবীল পাবলিকেশন্স

নারীর ফাঁদ-৫
ঈমানদীপ্ত দাস্তান
আলতামাশ

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

নারীর ফাঁদ-৫

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৫
আলতামাস

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

পরশমণি প্রকাশনা-৫
ISBN-984-8925-02-1

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৭৭-১৭৮৮১৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ২০০৫

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার
মালিটোলা, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
কালার সিটি
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৭৮-৫৬৪১৪১

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

-ঃ পরিবেশক ঃ-

এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার (পাঠকবন্ধু মার্কেট)
ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭৬-৬৩১৯৯২

নিউ রব্বানিয়া লাইব্রেরী
৭৩, সাত মসজিদ সুপার মার্কেট
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১-৪৬৪০৭১

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে– বিশেষত মিশর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। ক্রুসেডাররা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয় তারা।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দু:সাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিলো, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দু:সাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হলো সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ কবুল করুন।

বিনীত

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা। মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সূচীপত্রঃ

*পাপের প্রায়শ্চিত্ত...........৭

*দৃষ্টির আড়ালে............৫৯

*তুরের জ্যোতি...........১০১

*সত্য পথের পথিক......১৫৭

*জানবাজ.................২০৯

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

হালবের বাইরে অনুষ্ঠিত তিন মুসলিম আমীরের বৈঠক সমাপ্ত হয়েছে। তারা সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছেন। খৃস্টান উপদেষ্টাদের পরামর্শ বেশী গ্রহণ করা হয়েছে। বাহিনীত্রয়ের বিন্যাস কিরূপ হবে, তারা তা-ও ঠিক করে নিয়েছে। গোমস্তগীনের বাহিনী অগ্রে থাকবে। তার উভয় পার্শ্বের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব হালবের বাহিনীর। প্রথম হামলার পর দ্বিতীয় হামলার দায়িত্ব– যা সুলতান আইউবীর জবাবী হামলাকে প্রতিহত করার জন্য পরিচালিত হবে– সাইফুদ্দীনের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। সাইফুদ্দীন তার বাহিনীর একটি অংশকে তার ভাই ইজ্জুদ্দীনের কমান্ডে রেখে এসেছেন। এটি সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে তার প্রতারণা। সম্মিলিত বাহিনীকে তিনি বুঝ দিয়েছেন যে, আমি তাদেরকে রিজার্ভ রেখে এসেছি এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদেরকে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তিনি ভাইকে বলে গেছেন, তুমি হাররানের বাহিনীর অবস্থা বুঝে সম্মুখে অগ্রসর হবে। যুদ্ধের পরিস্থিতি যদি আমাদের প্রতিকূল হয়ে যায়, তাহলে রিজার্ভ বাহিনীকে মসুলের প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করা হবে। আর যদি জবাবী আক্রমণে অংশগ্রহণ করতেই হয়, তাহলে এই অংশগ্রহণ এমনভাবে করতে হবে যে, আমরা মসুল ও নিজেদের স্বার্থের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখবো।

রমযান মাস শুরু হয়ে গেছে। তিন বাহিনীর মাঝে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে, যুদ্ধের সময় রোযা রাখা ফরজ নয়। তিন-চারদিন পর বাহিনীগুলো আপন আপন শহর ত্যাগ করে রওনা হয়ে যায়। কথা আছে, তারা হামাতের নিকট এসে একত্রিত হবে এবং আক্রমণের বিন্যাসে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

এই তিন বাহিনীর রওনা হওয়ার দু'দিন আগের ঘটনা। সুলতান আইউবী তার মোর্চা পর্যবেক্ষণ করছেন। ইত্যবসরে তিনি সংবাদ পান, হাররান থেকে দু'জন সালার পালিয়ে চলে এসেছেন এবং তাদের সঙ্গে একটি লাশ আছে।

সুলতান আইউবী ঘোড়া হাঁকান। গন্তব্যে গিয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে অবরতণ করেন এবং সালারদ্বয়কে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর সিপাহীদ্বয়ের সঙ্গেও আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। এরা দু'জন তার নামকরা গেরিলা গোয়েন্দা ছিলো।

কমান্ডারও তার গুপ্তচর ছিলো, যিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গোমস্তগীনের সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। সুলতান আইউবী লাশটির গালে চুমো খান এবং লাশটি দামেস্ক পৌঁছে দেয়ার এবং শহীদদের কবরস্তানে দাফন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

'আপনি এখানে বসে কী ভাবছেন?' সালার শামসুদ্দীন নিজের কাহিনী শুনানোর আগেই যুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দেন।

'আমি রিজার্ভ বাহিনীর এসে পৌঁছার অপেক্ষা করছি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'গত রাতে সংবাদ পেয়েছি, বাহিনী আজ রাতে পৌঁছে যাবে। তারা কায়রো থেকে আসবে। সে কারণেই এতোদিন লেগে গেছে।'

সুলতান আইউবী তাঁর সেনাসংখ্যা কত এবং তাদেরকে কিভাবে বিন্যস্ত করে রেখেছেন দু'ভাইকে তার বিবরণ দেন।

সুলতান তখনই তাঁর সকল ইউনিটের কমান্ডারদের ডেকে পাঠান এবং শামসুদ্দীন ও শাদবখত-এর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। পুরাতন অফিসারগণ তাদেরকে চেনেন।

সুলতান আইউবী বললেন–

যে শত্রুবাহিনী আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে, তাদের সামরিক অভিজ্ঞতা কিরূপ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা কেমন আমার কমান্ডারদের তার বিবরণ দিন। তারা বললেন–

সৈন্য সর্বাবস্থায় সৈন্যই হয়ে থাকে। দুশমনকে আনাড়ি ও দুর্বল মনে করা একটি সামরিক পদস্খলন হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, ওরা মুসলিম ফৌজ, যার সেনারা শত্রুকে পিঠ দেখাতে অভ্যস্ত নয়। সৈন্যদের মাঝে একটি সামরিক আত্মা বিরাজ করে থাকে। তারা পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করবে। তাদের মস্তিষ্কে এই বুঝ দেয়া হয়েছে, আপনারা হিংস্র, জংলী ও নারীলোলুপ এবং সুলতান আইউবী এসেছেন তার সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য। খৃষ্টানরা তাদের অন্তরে আপনার বিরুদ্ধে ঘৃণা ভরে রেখেছে। তবে তাদের নেতৃত্ব প্রশংসাযোগ্য নয়। তাদের একজনও সুলতান আইউবী নয়। সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগীন যার যার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করতে আসছেন। তারা আপন আপন হেরেম ও মদের পিপা-পেয়ালা সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। আমাদের স্থলে গোমস্তগীন স্বয়ং তার বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন। তবে এই নেতৃত্ব বাহিনীকে সুশৃঙ্খলভাবে লড়াতে পারবে না। কিন্তু তারপরও আপনাকে সাবধানতার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তারা

আপনাকে পর্বতমালার অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করে ফেলতে চাচ্ছে। বাহিনীত্রয়ের কমান্ড থাকবে যৌথ; কিন্তু মনের দিক থেকে তারা ঐক্যবদ্ধ নয়।

সুলতান আইউবী সালার শামসুদ্দীন, শাদবখত ও অন্যান্য সালার-কমান্ডারদের সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় খতীব ইবনুল মাখদূম, সায়েকা, কারা কর্মকর্তা ও এক গুপ্তচর এসে উপস্থিত। তারা পথ ভুলে গিয়েছিলেন, তাই বিলম্ব হয়ে গেছে। সুলতান আইউবীর জানা আছে, খতীব তাঁর সমর্থক এবং মসুলে তাঁর গোয়েন্দাদের নেতৃত্ব প্রদান ও তত্ত্বাবধান করতেন। সুলতান তাঁকেও বৈঠকে যুক্ত করে নেন এবং বললেন, আপনি মসুলের ফৌজ সম্পর্কে কিছু বলুন।

'সেই নেতা কিভাবে যুদ্ধ করবে, যিনি মদ-নারীতে আসক্ত এবং কুরআন থেকে ফাল বের করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন?'– খতীব বললেন– 'যার বক্ষে ঈমান নেই, সে যুদ্ধের ময়দানে বেশী সময় টিকতে পারে না। তিনি আমাকে বলেছিলেন, কুরআন থেকে ফাল বের করে বলুন, আইউবীবিরোধী যুদ্ধে আমি জিতবো না হারবো। আমি তাকে বললাম, যেহেতু তার এই পদক্ষেপ কুরআনী বিধানের পরিপন্থী, তাই এই যুদ্ধে তার পরাজয় হবে। তিনি আমাকে কারাগারে বন্দী করলেন। তিনি কুরআনকে জাদুর বই মনে করে থাকেন। আমি আপনাকে কুরআনের কারামতের কথা শোনাতে চাই। কুরআনের বদৌলতেই আমার পালিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। সাইফুদ্দীন আমার কন্যাকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটা অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। আমি আপনাকে সুসংবাদ শোনাতে চাই যে, আপনি যদি কুরআনের অনুসারী হয়ে থাকেন এবং যুদ্ধটা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে করে থাকেন, তাহলে জয় আপনারই হবে। এই হলো যুদ্ধের ধর্মীয় দিক। আর কৌশলগত দিক সম্পর্কে আমি আপনাকে পরামর্শ দেবো, আপনি গেরিলা বাহিনীকে অধিকতর ব্যবহার করুন। এই মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে এ পদ্ধতিটা বেশী প্রয়োগ করুন। রাতেও যেন তারা শান্তিতে থাকতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করুন।'

যে জেল কর্মকর্তা খতীবকে পলায়নে সাহায্য করেছিলেন, তিনিও সঙ্গে আছেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে বাহিনীতে যুক্ত করে নেয়া হয়েছে। খতীবকে তার কন্যাসহ দামেস্কে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখতকে নিজের সঙ্গে রাখেন সুলতান আইউবী।

❖ ❖ ❖

হালব, হাররান ও মসুলের বাহিনী এগিয়ে আসছে। এদিকে মিশর থেকে সুলতান আইউবীর জন্য যে রিজার্ভ বাহিনী রওনা হয়েছিলো, তারাও নিকটে চলে এসেছে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, সুলতান আইউবী পর্যন্ত দুমশনের ফৌজ আগে পৌঁছে, নাকি তাঁর রিজার্ভ বাহিনী। সুলতানের মনে অস্থিরতা। অবরোধকে ভয় পাচ্ছেন তিনি। রিজার্ভ বাহিনীর সাহায্য ব্যতীত অবরোধ ভাঙ্গাও সহজ নয়। যদি তিনি অবরোধের মধ্যে পড়েই যান, তাহলে এই সামান্য সৈন্য দ্বারা কিভাবে তিনি অবরোধ ভাঙ্গবেন? তার সবটুকু মেধা তিনি এ সমস্যার সমাধানে ব্যয় করে ফেলেন। তিনি এতোই অস্থির হয়ে পড়েন যে, উর্ধ্বতন কমান্ডারদের নিকট পর্যন্ত তাঁর এই উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করে ফেলেন। তিনি বললেন–

'কমান্ডো ইউনিটগুলোকে পরিপূর্ণরূপে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ও দৃষ্টিতে রাখবে। রিজার্ভ বাহিনীর এখনো কোনো পাত্তা নেই। অবরোধের আশংকা আছে। অবরোধ কেবল গেরিলারাই ভাঙ্গতে পারবে।'

'আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন, তা বাস্তবায়িত হবেই'– এক সালার বললেন– 'এটা দুর্গ নয় যে, অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে আমরা লড়াই করতে পারবো না। এই পার্বত্য এলাকায় আমরা ঘুরেফিরে লড়াই করবো।'

এ রাতেও সুলতান আইউবী ভালোভাবে ঘুমাতে পারেননি। তাঁর তাঁবুতে সারারাত প্রদীপ জ্বালানো থাকে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার যে নকশা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেটি নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তার উপর দাগ দিতে থাকেন। সেই সময়ে কোন বেসামরিক লোক দেখলে সে নির্ঘাত মনে করতো, সুলতান শতরঞ্জ খেলার অনুশীলন করছেন।

সাহরীর সময় যখন নাকাড়া বেজে উঠে এবং সৈনিকরা সজাগ হয়ে যায়, তখন সুলতান আইউবীরও চোখ খুলে যায়। জাগ্রত হয়েই সুলতান একসঙ্গে দু'টি সংবাদ পান। এক. রিজার্ভ বাহিনী পৌঁছে গেছে। দুই. শত্রু বাহিনী আট থেকে দশ মাইল দূরত্বের মধ্যে এসে পড়েছে এবং সম্ভবত আগামীকালের মধ্যে আমাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। সংবাদদাতা কোন এক তত্ত্বাবধায়ক গ্রুপের কমান্ডার। তিনি জানান, দুশমনের অগ্রযাত্রা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এক অংশ সম্মুখে, অপর অংশ পেছনে, তৃতীয় অংশ তারও পেছনে।

সুলতান আইউবীর যেসব তথ্য নেয়া আবশ্যক ছিলো, নিয়ে নিয়েছেন। সংবাদদাতা কমান্ডারকে বিদায় করে দিয়ে তিনি দারোয়ানকে বললেন, তুমি এক্ষুণি গেরিলা ও রিজার্ভ বাহিনীর উর্ধ্বতন কমান্ডারদের ডেকে আনো।

তাদেরকে বলো, তারা যেনো সাহরী আমার সঙ্গে খায়। সুলতান চট জলদি ওজু করে নেন। রিজার্ভ বাহিনী এসে পৌছায় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সকলে নামায আদায় করেন এবং আল্লাহর সমীপে বিজয়ের জন্য দু'আ করেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার এসে উপস্থিত হন এবং পরক্ষণই রিজার্ভ বাহিনীরও চারজন কমান্ডার এসে হাজির হন। সাহরীর খাবারও এসে পড়ে। রিজার্ভ সৈন্য সুলতান আইউবীর আশার তুলনায় কম। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এ-ই যথেষ্ট। আল-আদেল যে পরিমাণ অস্ত্র প্রেরণ করেছেন, তাতে সুলতান আইউবী নিশ্চিন্ত। অস্ত্রগুলোর মধ্যে ছোট-বড় মিনজানিক বেশী। দাহ্য পদার্থও প্রচুর। সেনা সংখ্যার দিক থেকে সাহায্যটা সামান্য হলেও বাহিনীটা যেহেতু অভিজ্ঞ, তাই হতাশার কিছু নেই। তবে সমস্যা হলো, এই ফৌজ আর অশ্বপাল পাহাড়ী যুদ্ধে অভিজ্ঞ নয়।

ইতিমধ্যে ইন্টেলিজেন্স প্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহও এসে পড়েন। তিনি জানান, হাল্‌ব থেকে আমার এক গোয়েন্দা সংবাদ নিয়ে এসেছে যে, খৃষ্টানরা এই যৌথ বাহিনীকে বিপুল পরিমাণ তীর-ধনুক, মটকা ভর্তি দাহ্য পদার্থ এবং পাঁচশত ঘোড়া প্রেরণ করেছে। গোয়েন্দা আরো জানায়, সে তাদের রওনা হওয়ার পর এসেছে। এই কাফেলাটি বাহিনীর সঙ্গে মিশে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের সঙ্গে মিনজানিকও রয়েছে। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে, দুশমন মিনজানীকের সাহায্যে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করবে এবং সলিতাওয়ালা তীর ছুঁড়বে।

সুলতান আইউবী গেরিলা বাহিনীর প্রধানকে বললেন, তোমাকে সবকিছুই অবগত করা হয়েছে। তোমার দায়িত্ব কী, তা তোমার জানা। এবার পরিকল্পনায় এটাও যোগ করে নাও যে, দুশমন আক্রমণ না করা পর্যন্ত কোথাও তাদের উপর গেরিলা হামলা করা হবে না। প্রাপ্ত সংবাদ মোতাবেক শত্রু বাহিনী সোজা হামাত-এর দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের উপর গেরিলা আক্রমণ চালানো হলে তাদের অগ্রযাত্রার গতি শ্লথ হয়ে যাবে। আর তোমার তো জানা আছে, তাদের আক্রমণের পর আমি জবাবী আক্রমণ করবো না। দুশমন আমার আক্রমণের আশংকা করে থাকবে, যা আমি সম্মুখ থেকে নয়, পেছন দিক থেকে পরিচালনা করবো। তোমার কাজ তখন থেকে শুরু হবে, যখন পেছনের আক্রমণে ভীত হয়ে দুশমন এদিক-ওদিক পালাবার চেষ্টা শুরু করবে। এই পার্বত্য এলাকা থেকে একজন শত্রুসেনাও যেনো বেরিয়ে যেতে না পারে। যতো সম্ভব বেশী বেশী শত্রু বন্দী করো। তারা মুসলমান সৈনিক। তোমাদের হাতে বন্দী হলে পরে তাদের সত্য-মিথ্যার বুঝ এসে যাবে। লক্ষ্যও

এই। তবে আমাদের মোকাবেলায় এসে আমাদের তীর-তরবারীর আঘাতে যারা মৃত্যুবরণ করে, আমি তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারি না।'

'আমাদের নিকট তথ্য আছে, দুশমন মটকায় ভরে দাহ্য পদার্থ নিয়ে আসছে। এগুলো আমাদের হস্তগত হলে ভালো হতো। কিন্তু তা সম্ভব হবে না বলেই ধরে নেয়া যায়। তার চেয়ে বরং তুমি একটা কাজ করো, তোমার কোনো একটি ইউনিটের দশ-বারজন গেরিলাকে দায়িত্ব দাও, তারা আক্রমণের সময় অতর্কিত গেরিলা হামলা চালিয়ে মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেলুক এবং দাহ্য পদার্থগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিক। দিনের বেলা দেখে নিতে হবে, মটকা বহনকারী কাফেলার অবস্থান কোথায়। সবচেয়ে জরুরী কথা হলো, দুশমন এখনো নদী পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তোমরা ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাও এবং মশকে পানি ভরে নাও। মওসুম ঠাণ্ডা। এটা মরুভূমি নয়। পিপাসায় কেউ মরবে না। তারপরও এটা যুদ্ধ। পিপাসা তোমাদেরকে অস্থির তো করবেই।'

গেরিলা বাহিনীর কমান্ডারকে বিদায় দিয়ে সুলতান আইউবী রিজার্ভ বাহিনীর কমান্ডারদের বললেন–

'একটা বিষয় তোমরা সবসময় মাথায় রাখবে যে, এটা মিশরের মরু এলাকা নয়। এটা পাহাড়ী এলাকা এবং শীতল। খরতাপের মধ্যে ছুটাছুটি করলে শীত দূর হয়ে যাবে। এখানে 'আঘাত করো আর একদিকে পালিয়ে যাও'– এর সুযোগ অবশ্যই পাবে। তোমাদেরকে এর প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। কিন্তু তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এখানকার মাটি তোমাদের জন্য বিস্তৃত নয়। খোলা ময়দানে তো কয়েক ক্রোশ পথ ঘুরে আবার দুশমনের উপর চড়াও হতে পারো এবং যুদ্ধের কৌশল প্রয়োগ করার জন্য অসীম ভূমি খুঁজে পাও। কিন্তু এখানে আমি দুশমনকে যে স্থানটিতে টেনে আনার বন্দোবস্ত করেছি, সেটি ময়দান বটে, তবে সীমিত। তোমাদেরকে টিলা-পর্বতের সঙ্গে পরিচিত করানোর মতো সময় হাতে নেই। তাই জ্ঞান খরচ করে কাজ করতে হবে। তীরান্দাজদেরকে পর্বতের উপর রাখবে। ঘোড়া নিয়ে পাথুরে এলাকায় ঢুকবে না। তবে ঘোড়া অল্পতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আমাদের ঘোড়াগুলো তো কিছুটা হলেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মিশর থেকে আসা সাহায্যকারী বাহিনীকে সুলতান আইউবী রিজার্ভ রেখে দেন এবং কমান্ডারদেরকে তাদের ঊর্ধ্বতন সালারদের হাতে তুলে দেন। সালারদেরকে যুদ্ধের পরিকল্পনা পূর্বেই দিয়ে রাখা হয়েছে।

❖ ❖ ❖

ফজরের আযান হয়ে গেছে। সুলতান আইউবী গোসল করেন। খাপ থেকে বের করে তরবারীটা হাতে নেন। তরবারীর ঝলক ও ধার পরখ করেন। তারপর অকস্মাৎ তাঁর আবেগ উথলে ওঠে। তিনি তরবারীটা উভয় হাতের উপর রেখে কেবলার দিকে মুখ করে হস্তদ্বয় উপরে তুলে ধরেন। তারপর চক্ষু বন্ধ করে দু'আ করতে শুরু করেন–

'মহান আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি যদি এতে নিহিত থাকে যে, তুমি আমাকে পরাজিত করবে, তাহলে আমি এই লাঞ্ছনা মাথা পেতে বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি তুমি আমাকে বিজয় দান করো, তাহলে আমি তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করবো। আজ আমি তোমার রাসূলের নাম উচ্চরণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এটা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তুমি আমাকে ইঙ্গিত দাও, আমি নিজের তরবারীটা আমার পেটের ভেতর সেঁধিয়ে দেই। আমি সেই কিশোরীদের ডাকে সাড়া দিতে এসেছি, যাদের সম্ভ্রম শুধু এই জন্য লুণ্ঠিত হয়েছে যে, তারা তোমার রাসূলের উম্মত। আমি তোমার সেই অসহায় বান্দাদের আহ্বানে এসেছি, যারা একমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে কাফিরদের নির্মম অত্যাচারের শিকার। আমি তোমার মহান ধর্মের মর্যাদা সংরক্ষণ করার জন্য পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল-মরু ভূমিতে ঘুরে ফিরছি। আমি তোমার রাসূলের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে দখলমুক্ত করার জন্য রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু তোমার রাসূলের একদল উম্মত আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তুমি আমাকে ইশারা দাও, তাদের রক্ত ঝরানো আমার জন্য হালাল না হারাম। আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাইনি তো? আমাকে তুমি তোমার নূরের চমক দেখাও। আমি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, তাহলে তুমি আমাকে সাহস ও দৃঢ়তা দান করো।'

সুলতান আইউবী মাথাটা অবনত করে ফেলেন। এই অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর হঠাৎ তরবারীটা কোষবদ্ধ করে বাইরে বেরিয়ে নামাযের স্থানে চলে যান।

জামাত দাঁড়িয়ে গেছে। সুলতান পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে যান। একদিকে বাবুর্চি, অপরদিকে তাঁর এক কমান্ডারের আরদালী দণ্ডায়মান।

❖ ❖ ❖

নামায আদায় করে সুলতান আইউবী হামাতের দিকে রওনা হয়ে যান। পথে পরপর চারজন দূতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা তাঁকে মৌখিকভাবে রিপোর্ট প্রদান করে। এরা তথ্যানুসন্ধানকারী দলের দূত, যারা হাররান, হাল্‌ব ও মসুলের সম্মিলিত বাহিনীর গতিবিধি ও তৎপরতার সংবাদ নিয়ে এসেছিলো।

এই ধারা দিন-রাত চলতে থাকে। সুলতান আইউবী দূতদেরকে বিদায় করে দেন। সালার শামসুদ্দীন তার সঙ্গে আছেন। শামসুদ্দীনের ভাই শাদবখতকে তিনি অন্য এক স্থানে মোতায়েন করে রেখেছেন।

'শত্রু সম্পর্কে যেসব খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে, সে ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?'– শামসুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন– 'এই সামান্য ফৌজ দিয়ে আমরা এতো বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করতে পারবো কি?'

'দুশমন কতজন সৈন্য নিয়ে এসেছে আর আমার ক'জন সৈন্য আছে, আমার কাছে এটা কোনো বিষয় নয়'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি অস্থির এই জন্য যে, দুশমন আক্রমণ করছে না কেন? আমার সেই মুসলমান ভাইদের নিকট খৃষ্টান গোয়েন্দা আছে, তারা কি এতোই আনাড়ি হয়ে গেলো যে, তারা জানতেই পারলো না, মিশর থেকে আমার সাহায্য আসছে এবং আমি সাহায্য ছাড়া লড়াই করতে পারবো না! দুশমন যদি তৎপর হতো, তাহলে আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। দুশমনের এ পর্যন্ত এসে থেমে যাওয়া এবং আমাকে এতোটুকু সময় দেয়া যে, সাহায্য পেয়ে যাবো, তাদেরকে বিন্যস্ত করে ফেলবো, সকল সৈন্যের সবগুলো ঘোড়াকে পানি পান করাবো এবং পানি রিজার্ভ করে নেবো; আমার জন্য অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার আশংকা হচ্ছে, দুশমন এমন কোনো কৌশল প্রয়োগ করবে, যা কখনো আমার মাথায় আসেনি।ওরা তো তামাশা করতে আসেনি।'

'আমি তাদেরকে যতোটুকু জানি'– শামসুদ্দীন বললেন– 'তাদের হাতে এমন কোনো কৌশল নেই। আল্লাহর উপর আমার ভরসা আছে। আল্লাহ তাদের বিবেকের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন। কেননা, তারা বাতিলের পরিকল্পনা ও সাহায্য নিয়ে সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছে। তাদের চোখের উপর পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে। আমি গভীর কোনো কৌশল-ষড়যন্ত্রের আশংকা করছি না।'

'শামসুদ্দীন ভাই!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমারও আল্লাহর উপর ভরসা আছে। তবে আমি আবেগ ও তত্ত্বের চেয়ে বাস্তবকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। বাতিল হকের উপর একাধিকবার জয়লাভ করেছে। তখন সত্যের অনুসারীরা আল্লাহ ভরসা বলে হাত গুটিয়ে বসেছিলো। সত্য খুন ও কুরবানীর দাবি করে। আমরা যদি সেই কুরবানী দিতে প্রস্তুত থাকি, তাহলেই সত্যের জয় হবে। বাতিলের মধ্যে যে শক্তি আছে, আমাদেরকে তার মোকাবেলা ময়দানে করতে হবে। আমাদেরকে বাস্তবতার উপর চোখ রাখতে হবে। নিজের পূর্ণ যোগ্যতা

ও সর্বশক্তি কাজে লাগাতে হবে। তারপর ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের আত্ম প্রবঞ্চনায় লিপ্ত হওয়া চলবে না।'

সুলতান আইউবী ঘোড়ার পিঠ থেকে অবতরণ করেন। সালার শামসুদ্দীনের দু'উপদেষ্টা এবং রক্ষীসেনারাও ঘোড়া থেকে নেমে যান। সুলতান আইউবী শামসুদ্দীন এবং উপদেষ্টাদ্বয়কে একটি উঁচু টিলার উপর নিয়ে যান। তাদের সম্মুখে পর্বতবেষ্টিত বিশাল এক মাঠ, যেটি শিং-এর ন্যায় টিলাগুলো অতিক্রম করে বিস্তৃত হয়ে সামনের দিকে চলে গেছে। সুলতান আইউবী যে দিকটায় দাঁড়িয়ে আছেন, সেদিকে দু'টি টিলা একটির পেছনে অপরটি দণ্ডায়মান। সেই টিলা দুটোর মধ্যদিয়ে একটি গলি ময়দানের দিকে এগিয়ে গেছে। মাঠে পর্বতগুলোর কোল ঘেঁষে ছোট-বড় শত শত তাঁবু দাঁড়িয়ে আছে। একধারে তাঁবুতে অবস্থানরত সৈনিকদের ঘোড়াগুলো বাঁধা। সৈন্যরা এদিক-সেদিক ঘুরাফেরা করছে। কিছু সৈন্যকে রোদের মধ্যে শুয়ে এবং ঘুমিয়ে থাকতেও দেখা গেলো। তাদের ভাব-গতি দেখে মনে হলো, বিশাল এক শত্রুবাহিনী আক্রমণ করার জন্য তাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা তারা জানেই না। তারা যদি যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকতো, তাহলে তাদের তাঁবুগুলো দঁড়িয়ে থাকতো না এবং তাদের ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন কষা থাকতো।

'আমার ইউনিটগুলোর সালার ও কমান্ডারদেরকে আমি যেসব নির্দেশনা প্রদান করেছি, তা তোমরাও একবার শুনে নাও'– সুলতান আইউবী বললেন– 'হতে পারে, আমি তোমাদের আগে মৃত্যুবরণ করবো এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্রই মারা যাবো। আমার পরে রণাঙ্গনের দায়িত্ব তোমাদেরকেই পালন করতে হবে। আমি তাদেরকে বলেছি, তাঁবুগুলো খাটানো অবস্থায় থাকতে দাও। ঘোড়াগুলোকে জিন ছাড়া বেঁধে রাখো। ভাবনাহীন ভাব প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো এবং এদিক-ওদিক বসে ও শুয়ে থাকো। তবে তাঁবুতে তাঁবুতে অস্ত্র ও জিন প্রস্তুত রাখো। দুশমনের গোয়েন্দারা তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছে। তাদেরকে এই ধারণা দাও যে, দুশমন সম্পর্কে তোমাদের কোনই খবর নেই। দুশমনের বাহিনী এসে পড়লে নিজেদেরকে ভীত বলে প্রকাশ করবে এবং অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। কিন্তু তারপরও তাঁবুগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকবে দেবে। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মোকাবেলা করবে না। দুশমন উপরে উঠে এলে লড়াই করতে করতে এতোটুকু দ্রুত পেছনে সরে যাবে, যেনো দুশমনের আক্রমণকারী বাহিনী তোমাদেরই সঙ্গে এই পার্বত্য এলাকায়

তোমাদের বেষ্টনীতে এসে পড়ে। দুশমনকে বুঝাবে, তোমরা পিছপা হয়ে যাচ্ছ।'

সুলতান আইউবী দুই টিলার মধ্যবর্তী গলিটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন–

'আমি এই বাহিনীগুলোকে বলে দিয়েছি, তোমরা এই গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। তারপর তাদেরকে কোথায় গিয়ে একত্রিত হতে হবে, তাও তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে।'

সুলতান তাঁর বন্ধুদেরকে জায়গাটার কথা উল্লেখ করে বললেন–

'এই বাহিনীগুলোকে দুমশনের পেছনে চলে যেতে হবে। এই পার্বত্য অঞ্চলটিতে আমি দুশমনকে স্বাগত জানোনোর যে ব্যবস্থা করে রেখেছি, তা তোমাদের জানা আছে। স্মরণ রেখো আমার বন্ধুগণ! আমরা এখানে কোনো অঞ্চল বা কোনো দুর্গ জয় করবো না। আমাদের কাজ হলো দুশমনকে অসহায় ও নিষ্ক্রিয় করে তোলা, যাতে তারা আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। আমার মুসলমান ভাইদেরকে দুশমন বলতে আমার লজ্জা হয় কিন্তু কী করবো, পরিস্থিতি আমাকে তা বলতে বাধ্য করছে। আমি তাদেরকে ধ্বংস করতে চাই না। আমি নির্দেশ জারি করে দিয়েছি, যতো বেশী সম্ভব শত্রুসেনাদের জীবিত গ্রেফতার করো আর যুদ্ধবন্দী বানাও। আমি তাদেরকে তরবারী দ্বারা পদানত করে চরিত্র দ্বারা বুঝাবো যে, তোমরা মুসলিম সৈনিক এবং তোমাদের রাজা তোমাদের ধর্মের শত্রুদের হাতে খেলছে।'

'কোনো জাতিকে যদি হত্যা করতে হয়, তাহলে তাদের মাঝে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দাও'– সালার শামসুদ্দীন বললেন– 'খৃস্টানরা সাফল্যের সঙ্গে এই অস্ত্রটা ব্যবহার করেছে।'

'মুসলিম জাতির দৃষ্টান্ত বারুদের ন্যায়'– সুলতান আইউবী বললেন– 'বারুদের এই স্তূপের উপর যদি কোনো দিক থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার এসে পতিত হয়, তাহলে সেটি বিস্ফোরণে ফেটে যায়। জাতির এই দুর্বলতা যদি শিকড় গেড়ে বসে, তাহলে আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। দুশমন তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে পরস্পরে যুদ্ধ করায় এবং জাতির কর্ণধারগণ ক্ষমতার লোভে পরস্পর লড়াই করতে থাকে। এই যে তিনটি গোষ্ঠী স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের নেতারা ঐক্যবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের শত্রু। তারা প্রত্যেকে একে অপরকে ধোঁকা দিয়ে সালতানাতে ইসলামিয়ার রাজা হতে চায়। আমি তাদের দেমাগ থেকে রাজত্বের পোকা বের করে জাতিকে সঠিক পথে তুলে আনার চেষ্টা করছি। আমার লক্ষ্য ইসলামের সুরক্ষা ও প্রসার।'

❖ ❖ ❖

হামাত থেকে সামান্য দূরে হাররানের দুর্গপতি গোমস্তগীন– যিনি স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা দিয়েছিলেন– নিজ সালার ও ছোট-বড় কমান্ডারদেরকে একত্রিত করে বলছিলেন–

'সালাহুদ্দীন আইউবী খৃস্টানদেরকে পরাজিত করতে পারে। কিন্তু যখন সে তোমাদের সামনে আসবে, সব কৌশল ভুলে যাবে। সে আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত নয়– সে কুর্দি। তোমরা পাক্কা মুসলমান, দ্বীনদার ও পরহেজগার। আর সে শুধু নামের মুসলমান। সালাহুদ্দীন প্রতারক ও বদকার মানুষ। এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সে তার রাজা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। আমি তোমাদেরকে তার সামরিক অবস্থাও জানিয়ে দিচ্ছি। তার সৈন্যসংখ্যা অনেক কম এবং সে পাহাড়বেষ্টিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে বসে আছে। এই একটু আগে গোয়েন্দারা আমাকে সংবাদ দিয়ে গেলো যে, সালাহুদ্দীনের ফৌজ তাঁবুর অভ্যন্তরে আরামে সময় কাটাচ্ছে এবং তার ঘোড়াও অলস দাঁড়িয়ে আছে। তার কারণ দু'টি হতে পারে। প্রথমত, সে নিশ্চিত, আমরা তাকে পরাজিত করতে পারবো না। দ্বিতীয়ত, সে এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত থাকবে পারে যে, আমরা তার উপর হামলা করবো না। এমনও হতে পারে, সে সন্ধির জন্য আমাদের নিকট দূত পাঠাবে। কিন্তু এখন আর আমরা তার সঙ্গে কোনো সন্ধি বা সমঝোতা করবো না। সে এখন আমাদের কয়েদী। যদি সে জীবিত অবস্থায় আমাদের হাতে ধরা না দেয়, তাহলে আমি তোমাদেরকে তার লাশ দেখাবো। তোমরা তোমাদের সৈনিকদেরকে বলে দাও, সালাহুদ্দীন আইউবী মাহদী বা নবী-রাসূল নয় এবং তার সৈন্যদের মাঝেও কোনো জিন-ভূত নেই। আমরা তার বাহিনীকে তাদের অজ্ঞাতেই ঝাপটে ধরবো।'

শ্রোতাদেরকে উত্তেজিত করে এবং তাদের সাহস বৃদ্ধি করে গোমস্তগীন তাদেরকে বিদায় করে দিয়ে নিজে তাঁবুতে চলে যান। তাঁবু তো নয় যেন জঙ্গলের মঙ্গল। বিশাল এক তাঁবু, যার ভেতরে জাজিম ও মূল্যবান পালঙ্ক সাজানো। আছে মদের সোরাহী ও কারুকার্য খচিত মদের পেয়ালা। ভেতর থেকে তাঁবুটাকে প্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষ বলে মনে হয়। তার আশপাশে আরো কতগুলো তাঁবু খাটানো, যেগুলো সামরিক তাঁবুগুলো থেকে ভিন্ন ধরনের ও আকর্ষণীয়। এ তাঁবুগুলোতে বাস করছে হেরেমের মেয়েরা এবং গায়িকা-নর্তকীরা। তাঁবুগুলো থেকে দূরে দূরে পাহারাদাররা দাঁড়িয়ে আছে। গোমস্তগীনের তাঁবুর বাইরে এক ব্যক্তি তার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। তাদের

দেখেই গোমস্তগীন দ্রুত হাঁটা দেন এবং নিকটে গিয়ে তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে বলেন। তারা ভেতরে প্রবেশ করামাত্র একদল মেয়ে তশতরি হাতে তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে খাবার এসে হাজির হয়। এসে পড়ে মদের সোরাহীও। গোমস্তগীন এই নয় ব্যক্তির সঙ্গে আহারে যোগ দেন।

নয় ব্যক্তি খাবারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তারা ভুনা গোশতের বড় বড় টুকরো হাতে নিয়ে রাক্ষসের মতো গিলতে শুরু করে। পাশাপাশি মদপান করছে পানির মতো। তাদের চোখগুলো রক্তজবার ন্যায় টকটকে লাল, যেনো তারা জংলী ও রক্তখোর হায়েনা। তিন-চারটি সুন্দরী মেয়ে তাদের পেয়ালায় মদ ভরে দিয়ে চলেছে আর তারা মেয়েগুলোর সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করছে। কখনো কোনো মেয়ের এলো চুলে বিলি কাটছে। কখনো বা বিবস্ত্র বাহু ধরে কাছে টেনে এনে সোহাগ করছে। এক কথায় গোমস্তগীনের তাঁবুতে একসঙ্গে ভুঁড়িভোজন, মদপান আর নারীভোগ করে চলেছে নয় অতিথি। গোমস্তগীন তাদের আচার-আচরণ ও খাওয়ার ধরন দেখে মুচকি হাসছেন। কিন্তু তার হাসিই প্রমাণ করছে, তিনি হাসছেন জোরপূর্বক। এই লোকগুলো তার বিলকুল অপছন্দ।

আহার শেষ হলে গোমস্তগীন মেয়েগুলোকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে মেহমানদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ গল্প-গুজব করার পর গোমস্তগীন বললেন– 'তোমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর উদ্দেশ্যে বিদায় করে দেয়ার সময় হয়ে গেছে। এবারকার আক্রমণ যেনো ব্যর্থ না হয়।'

'আপনি যদি আমাদেরকে থামিয়ে না রাখতেন, তাহলে এতোক্ষণে সুসংবাদ পেয়ে যেতেন যে, অজ্ঞাত ঘাতকের হাতে সালাহুদ্দীন আইউবী খুন হয়েছেন।' এক ব্যক্তি বললো।

এরা হাসান ইবনে সাব্বাহ'র নয় ফেদায়ী, যাদেরকে শেখ সান্নান সুলতান আইউবীকে হত্যা করার জন্য ত্রিপোলী থেকে প্রেরণ করেছিলো। আকার-গঠনে মানুষ হলেও এরা চরিত্রে হায়েনা। তারা নিজ নিজ ডান হাতে মধ্যমা আঙ্গুল থেকে দশ দশ ফোঁটা করে রক্ত বের করে পাত্রে রাখে। তার মধ্যে মদ ও হাশীশ মিশিয়ে শরবত তৈরি করে প্রত্যেকে এক এক চুমুক পান করে বিশেষ শব্দে শপথ নিয়েছিলো যে, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করবোই। শেখ সান্নান তাদেরকে দুনিয়াত্যাগী সুফীর পোশাক পরিয়ে হাতে তাসবীহ ও গলায় কুরআন ঝুলিয়ে এই নির্দেশনা দিয়ে প্রেরণ করেছিলো, তোমরা সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছে যাও এবং তার সম্মুখে আলোচনা

উত্থাপন করো যে, মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই না করা উচিত। তারপর বলবে, আমরা মধ্যস্থতা করে এই আত্মকলহ মিটিয়ে দিতে চাই। এ ব্যাপারে আমরা অন্যান্য মুসলিম আমীরদের সঙ্গে কথা বলেছি। এখন আপনার নিকট আসলাম। এভাবে সুযোগ মতো তোমরা সুলতান আইউবীকে হত্যা করে ফেলবে।

শেখ সান্নান কৌশলটা ঠিক করেছে ভালোই। সুলতান আইউবী আলিম-উলামা ও ধর্মীয় নেতাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কাছে বসাতেন এবং মনোযোগ সহকারে তাদের বক্তব্য শুনতেন। তাঁর আরো একটি দুর্বলতা এই ছিলো যে, তিনি চাচ্ছিলেন, কেউ মাঝে পড়ে বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে তাকে একটা সমঝোতা করিয়ে দিতে, যাতে মুসলমানে-মুসলমানে খুনাখুনি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যথায় খৃস্টানরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার এবং হামলা করে সাফল্য অর্জনের সুযোগ পেয়ে যাবে। তিনি হাল্‌ব প্রভৃতি এলাকায় দূতও প্রেরণ করেছিলেন, যারা অপমানজনক উত্তর নিয়ে ফিরে এসেছে। এবার তাঁর সেই দুর্বলতাকে পুঁজি করে তাকে খুন করার পরিকল্পনা নিয়ে আসছে সূফীবেশী নয় সদস্যের একদল ঘাতক। তাঁর সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ করার নামে চোগার ভেতরে খঞ্জর আর তরবারী লুকিয়ে আনছে তারা। এটা সুলতান আইউবীকে হত্যা করার এক সহজ পন্থা। তারা ত্রিপোলী থেকে রওনা হয়ে হাররান এসে পৌঁছেছিলো। খৃস্টান উপদেষ্টারা গোমস্তগীনকে বলেছিলো, এরা সুলতান আইউবীকে হত্যা করতে যাচ্ছে। তিনি তাদের নিকট হত্যা প্রক্রিয়ার কথা শুনে তা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদা দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেন এবং খৃস্টান উপদেষ্টাদের বলে দেন, আমি সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছি। আপনাদের এই নয় ঘাতককে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো এবং সুযোগ মতো অন্য কোনো পন্থায় সুলতান আইউবীকে খুন করাবো। সে মতে গোমস্তগীন তাদেরকে সঙ্গে করে ময়দানে নিয়ে এসেছেন।

রণাঙ্গনে গোমস্তগীন তাদের জন্য সুযোগও সৃষ্টি করে নিয়েছেন এবং তাদের ছদ্মবেশও প্রস্তুত করে ফেলেছেন। আহার শেষে তিনি তাদেরকে বললেন– 'এবার আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার কী পন্থা আমি ঠিক করে রেখেছি। তোমরা যে সুফীবেশ ধারণ করেছো, তা সন্দেহ জন্ম দিতে পারে। আইউবীর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও গভীর। তার উপর ইতিপূর্বে চারবার সংহারী আক্রমণ হয়েছিলো। ফলে তিনি অধিক সতর্ক হয়ে গেছেন। তাঁর উচ্চ পর্যায়ের অভিজ্ঞ দু'জন গোয়েন্দাও আছে। একজন আলী বিন

সুফিয়ান, অপরজন হাসান বিন আবদুল্লাহ। তারা এক দৃষ্টিতেই মানুষকে আন্দাজ করে ফেলতে পারে। আমাদের গোয়েন্দাদের সংবাদ মোতাবেক এ সময় হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর সঙ্গে আছে। আর আলী বিন সুফিয়ান আছে কায়রো। কোনো অপরিচিত লোক সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেলে দু'তিনজন সালার এবং হাসান বিন আবদুল্লাহ তাকে গভীরভাবে যাচাই-বাছাই করে নেয়। সন্দেহ হলে তল্লাশিও নিয়ে থাকে। আইউবী কিংবা হাসান ইবনে আবদুল্লাহ প্রশ্ন করতে পারেন যে, এই সংঘাত-আত্মকলহ তো কয়েক মাস ধরেই চলে আসছে। তা তোমাদের সন্ধি-সমঝোতার চিন্তাটা আজ আসলো কিভাবে? আইউবী এ-ও জিজ্ঞেস করতে পারেন, তোমরা কোথাকার ধর্মীয় নেতা? কিংবা তিনি এমন কোনো প্রশ্ন করতে পারেন, তোমরা যার উত্তর দিতে পারবে না অথবা এমন উত্তর দেবে, যার ফলে তোমাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে। তিনি নিজে আলিম। ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান রয়েছে। তাছাড়া তোমাদের চেহারায় দাড়ি ব্যতীত সুফীদের আর কোনো লক্ষণ চোখে পড়ছে না। তোমাদের চারজনের দাড়ি এখনো ছোট, যা প্রমাণ করছে, মাসখানেক ধরে তোমরা দাড়ি রেখেছো। তোমাদের চোখে হাশীশ ও মদের ক্রিয়া পরিস্ফুট। এই চেহারাগুলোতে পবিত্রতার লেশও চোখে পড়ছে না।'

নয়জনের একজনও গোমিস্তগীনের বক্তব্যে অসন্তুষ্ট হলো না। তার বক্তব্য ও পরিকল্পনার সঙ্গে বরং একমত পোষণ করলো। দলনেতা বললো– 'আমি আপনার প্রতিটি কথার সঙ্গে একমত। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি আমাদেরকে সুফী কিংবা ইমাম মনে করে সম্মানের সাথে তার তাঁবুতে বসতে দেন আর আমাদের আপ্যায়নের জন্য খাবারের আয়োজন করেন, তাহলে আমার এই বন্ধুরা খাদ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। একজন ইমাম ও খতীব কিভাবে আহার করেন, আমরা একজনও তা জানি না। তা আপনি কী বুদ্ধি ঠিক করেছেন?'

'অত্যন্ত সহজ ও নিরাপদ'– গোমস্তগীন বললেন– 'আমি তোমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর স্বেচ্ছাসেবী রক্ষীসেনা দলে ঢুকিয়ে দেবো। তবে তার জন্য খুব যাচাই-বাছাই করে রক্ষী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তাদের পরিবার-পরিজনেরও খবরাখবর নেয় হয়। তাই যাওয়া মাত্রই তোমরা তার রক্ষী বাহিনীতে ঢুকে যেতে পারবে, এমনটা সম্ভব নয়। আমি যে পন্থাটা ভেবে রেখেছি, আশা করি তোমরা তাতে সফল হবে। তাহলো, গোয়েন্দারা

জানিয়েছে, দামেস্কের লোকদের মাঝে আমাদের বিরুদ্ধে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর পক্ষে এতো বেশী আবেগ ও উদ্দীপনা বিরাজ করছে যে, তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে রণাঙ্গনে ছুটে আসছে। আমি জানতে পেরেছি, আইউবী তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনীতেও ভর্তি করে নিচ্ছেন এবং অন্য কাজেও ব্যবহার করছেন। এই পরিস্থিতি থেকে আমি ফায়দা হাসিল করতে চাই।'

গোমস্তগীন আলাদাভাবে রাখা একটি কাঠের বাক্স টেনে হাতে নেন। তিনি বাক্সটা খুলেন। তার ভেতরে কতগুলো পোশাক। তিনি ঘাতকদের উদ্দেশ করে বললেন–

'তোমরা প্রত্যেকে এই পোশাক পরিধান করে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট যাবে। এটা তাঁর রক্ষী সেনাদের ইউনিফর্ম। তোমাদের একজনের হাতে আইউবীর ঝাণ্ডা থাকবে। অবশিষ্ট আটজনের বর্শার আগায় আইউবীর সৈন্যদের পতাকা থাকবে। তোমরা সোজা আইউবীর নিকট চলে যাবে। এক স্থানে তোমাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। তোমাদেরকে আইউবীর নিকট যেতে দেয়া হবে না। তোমরা আপ্লুত কণ্ঠে বলবে, আমরা স্বেচ্ছাসেবী। আমরা দামেস্ক থেকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হেফাজতের জন্য এসেছি। আরো বলবে, আমরা অত্যন্ত মমতার সঙ্গে রক্ষী বাহিনীর পোশাক প্রস্তুত করে এনেছি এবং অন্তরে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভক্তি নিয়ে এসেছি। আমাদেরকে সুলতানের আশপাশে প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত করুন কিংবা কোনো জানবাজ বাহিনীতে যুক্ত করে দিন। আমরা ফেরত যাবো না।'

গোমস্তগীন বললেন– 'তোমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট যেতে দেয়া হবে না। তোমরা জিদ ধরবে এবং বলবে, আমরা বহুদূর থেকে ভক্তি ও আবেগ নিয়ে এসেছি। সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে আমরা যাবো না। আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আইউবী জযবার খুব মূল্যায়ন করে থাকেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে সাক্ষাৎ দেবেন। বর্শাগুলো তোমাদের হাতে থাকবে। যদি তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন, তাহলে তোমরা ঘোড়া থেকে নামবে না। নিকটে গিয়েই ঘোড়া হাঁকাবে আর তার দেহটা বর্শার আঘাতে ঝাঝরা করে দিয়ে পালিয়ে আসার চেষ্টা করবে। তোমরা প্রত্যেকে জীবনের বাজি লাগানোর শপথ করেছো। তবে আমার আশা, তোমরা প্রত্যেকে নিরাপদে পালিয়ে আসতে সক্ষম হবে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, সুলতানকে আহত অবস্থায় দেখামাত্র রক্ষীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে। ঘটনাটা কী ঘটলো বুঝবার আগেই তোমরা তাদের তীরের আওতা

থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। আমি তোমাদেরকে আরবের এমন উন্নত জাতের ঘোড়া প্রদান করবো, বাতাসও যাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠে না।'

'পন্থাটা অত্যন্ত ভালো'- ফেদায়ী ঘাতকচক্রের প্রধান বললো- 'আমাদের সেই সহকর্মীরা আনাড়ি ও কাপুরুষ ছিলো, যারা আইউবীকে ঘুমন্ত অবস্থায়ও হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং উল্টো তার হাতে প্রাণ হারিয়েছে ও জীবন্ত গ্রেফতার হয়েছে। এবার আমরা যাচ্ছি। আমরা যদি আইউবীর মাথাটা কেটে নাও আসতে পারি, আপনি এ সংবাদ অবশ্যই শুনতে পাবেন যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিহত হয়েছেন।'

'আর যদি আমরা তাকে হত্যা করে ফিরে আসতে পারি, তাহলে?' এক ফেদায়ী হেরেমের মেয়েদের তাঁবুগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে এবং শয়তানী হাসি হাসে।

গোমস্তগীন শয়তানী হাসির সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত। তিনিও ঠোঁটে অনুরূপ হাসি টেনে বললেন- 'তোমাদের যারা জীবিত ফিরে আসবে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করে আসবে, তাদেরকে আমি এক একটি তাঁবুতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। খৃষ্টানরা তোমাদেরকে যে পুরস্কার প্রদান করবে, তার চেয়ে আমি তোমাদেরকে এতো বেশী সোনা-দানা প্রদান করবো, যা তোমরা কখনো স্বপ্নেও দেখোনি। আর যে ব্যক্তি সালাহুদ্দীন আইউবীর মাথা কেটে নিয়ে আসবে, তাকে তার পছন্দ অনুসারে দু'টি মেয়ে আজীবনের জন্য দিয়ে দেবো।'

ফেদায়ীরা পশুর ন্যায় চিৎকার করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। গোমস্তগীন বড় কষ্টে তাদেরকে থামিয়ে বললেন- 'এসো, আমি তোমাদেরকে হামাতের দিকে যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। তবে সাবধান! পথে যদি কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা এবং কোথা থেকে এসেছো, তাহলে শুধু এটুকু বলবে যে, আমরা দাশেস্ক থেকে এসেছি এবং রণাঙ্গনে যাচ্ছি। পথে সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা ও গেরিলা সৈন্যদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে। আজ রাতই তোমাদের রওনা হতে হবে।'

'আজ রাতেই?'- এক ফেদায়ী বললো- 'আগামীকাল দিনে গেলে হয় না?'

'অতো সময় নেই'- গোমস্তগীন বললেন- 'তোমাদের পথ অনেক দীর্ঘ। গন্তব্যে পৌঁছতে দু'দিন সময় লাগবে। ঘোড়াগুলোকে আরাম দিতে দিতে যাবে। দ্রুত চলার দরুন ঘোড়া পথেই ক্লান্ত হয়ে পড়লে পরে গন্তব্যে পৌঁছা কঠিন হবে।'

গোমস্তগীন বাক্স থেকে পোশাকগুলো বের করে তাদের হাতে দিয়ে বললেন- এগুলো এখানেই পরে নাও। তিনি দারোয়ানকে বললেন, সেই নয়টি

ঘোড়া নিয়ে আসো, যেগুলো আমি আলাদা করে রেখেছিলাম।

মধ্যরাতের পর। নয়জন অশ্বারোহী গোমস্তগীনের তাঁবু ত্যাগ করে হামাতের দিকে রওনা হয়ে যায়। সর্বসম্মুখের অশ্বারোহীর হাতে সুলতান আইউবীর ঝাণ্ডা। অপর আটজনের বর্শার আগায় বাঁধা ছোট ছোট পতাকা।

সেদিনের যে সময়টিতে গোমস্তগীন তার সালার ও কমান্ডারদেরকে জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে উৎসাহিত-উদ্দীপ্ত করছিলেন, সেদিন একই সময়ে সাইফুদ্দীন এবং হালবের সৈন্যরাও অনুরূপ উত্তেজনাকর ভাষণ শুনছিলো। হালবের এক সালার নিজ ঘোড়ার পিঠে চড়া অবস্থায় তার সৈনিকদেরকে বলছিলো–

'ইনি সেই সালাহুদ্দীন, যিনি হাল্ব অবরোধ করেছিলেন। তোমরা সালাহুদ্দীনকেই এবং তার এই ফৌজকেই হাল্ব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আমি কা'বার প্রভুর শপথ করে বলছি, সালাহুদ্দীন কোনো দুর্গ বা শহর অবরোধ করলে তাকে জয় না করে ক্ষান্ত হন না, এ কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি হালবের অবরোধে কেন সফল হননি? তিনি কেন অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন? শুধু এ কারণে যে, তোমরা হলে সিংহ। তোমরা জানবাজ মুজাহিদ। তোমরা শহর থেকে বের হয়ে তার উপর যে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলে, তিনি তা সামাল দিতে পারেননি। জয় তারই ভাগ্যে জুটে, যার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন। মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। সালাহউদ্দীন আইউবীর উপর আল্লাহ কেনো খুশী হবেন? তিনি তো লুটেরা। তিনি দামেস্ক দখল করেছেন। পদানত করার পর সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে তিনি কিরূপ আচরণ করেছেন, সেখানে গিয়ে দেখে আসো। সেখানকার একজন নারীর ইজ্জতও অক্ষত নেই। আমরা দামেস্ক ত্যাগ করে হাল্ব চলে এসেছি। কিন্তু আমাদের দামেস্ক ফিরে যেতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবী থেকে আমাদেরকে প্রতিশোধ নিতে হবে। আল্লাহর সৈনিকগণ! তোমরা একথা চিন্তা করো না যে, মুসলমান হয়ে তোমরা মুসলমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছো। সেই মুসলমান কাফিরের চেয়েও নিকৃষ্ট, যে মুসলমানদের শহর-নগর দখল করে বেড়ায়। এমন মুসলমানকে হত্যা করা তোমাদের উপর আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন।

খেলাফতের মোহাফেজগণ! তোমাদের শত্রু খৃস্টানরা নয়– সালাহুদ্দীন আইউবী ও তার বাহিনী। তিনিই খৃস্টানদেরকে আমাদের শত্রুতে পরিণত করেছেন। নূরুদ্দীন জঙ্গী জাতির উপর সবচেয়ে বড় অবিচার এই করেছেন যে,

তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে মিশরের শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন। অন্যথায় লোকটা ক্ষুদ্র একটি সেনাদলের কমান্ড করারও যোগ্য ছিলেন না। আমি তো তাকে আমার বাহিনীতে সাধারণ সৈনিক হিসেবেও নিয়োগ দেবো না। এবার মৃত্যু তাকে এই পার্বত্য এলাকায় টেনে নিয়ে এসেছে। এখন তার সম্মুখে থাকবে তোমাদের তরবারী, বর্শা আর ঘোড়া। পেছনে থাকবে টিলা আর পাহাড়। তোমরা তাকে ও তার সৈনিকদেরকে পিষে মেরে ফেলতে পারবে। হালবের অপমান আর ধ্বংসের প্রতিশোধ তোমাদের নিতেই হবে। তোমরা যদি সালাহুদ্দীন আইউবীকে এখানে এই পার্বত্য অঞ্চলে খতম করতে না পারো, তাহলে তিনি সোজা হাল্‌ব চলে আসবেন। তার দৃষ্টি হালবের উপর নিবিষ্ট। তিনি তোমাদেরকে তার গোলাম বানাতে চাচ্ছেন। তোমাদের বোন-কন্যারা তার সালারদের হেরেমের সৌভায় পরিণত হবে। আমি মিথ্যুক হতে পারি, নূরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র মিথ্যুক নন। গোমস্তগীন তো মিথ্যা বলছেন না। এতোগুলো আমীর যদি মিথ্যুক না হয়ে থাকেন, তাহলে এক সালাহুদ্দীন অবশ্যই মিথ্যুক। আর এ কারণেই ইসলামের তিনটি বাহিনী তাকে পিষে মারতে এসেছে। তোমরা সকলে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তোমরা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান। আজ প্রমাণ করতে হবে, ইসলাম ও আত্মমর্যাদার খাতিরে তোমরা আপন ভাইয়েরও রক্ত ঝরাতে পারো।'

বাহিনী বাহ্যত নীরবে সালারের বক্তব্য শুনছিলো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা চরমভাবে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত। সালার সত্য ও বাস্তবকে মাটিচাপা দিয়ে ফৌজের চেতনাকে উত্তেজিত করে তুলেছে। সৈন্যরা ধ্বনি দিতে শুরু করে– 'আমরা কারো গোলামী বরণ করে নেবো না, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে বেঁচে থাকতে দেবো না।' তারা স্লোগানে স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে।

সাইফুদ্দীনের ক্যাম্পের অবস্থাও উত্তেজনাকর। তিনিও তার বাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলছিলেন। তিনি তার সৈনিকদের জন্য একটি সুযোগ এই করে দেন যে, তিনি দু'জন আলিম থেকে ফতোয়া নিয়ে এসেছেন, যুদ্ধের ময়দানে রোযা রাখা ফরজ নয়। এ ঘোষণায় তার সৈন্যরা সবাই খুশী। সাইফুদ্দীন বললেন, আমরা তখন আক্রমণ করবো, যখন আইউবীর রোযাদার সৈনিকদের দম নাকের আগায় এসে যাবে। তারপর আমাদের গন্তব্য হবে দামেস্ক। দামেস্কের অঢেল সম্পদ হবে তোমাদের।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবী তার সৈনিকদের উদ্দেশে ভাষণ দেননি। তাঁর দৃষ্টি সেই ভূখণ্ডটির উপর নিবদ্ধ, যেখানে তাঁকে লড়াই করতে হবে। এই যুদ্ধে কিভাবে অধিকতর সামরিক স্বার্থ উদ্ধার করা যায়, তা-ই তার ভাবনা। তিনি কথাবার্তা যা বলেছেন, বলেছেন সিনিয়র ও জুনিয়র কমান্ডারদের সঙ্গে। তাও বাস্তবভিত্তিক– কোনো উত্তেজনাকর বক্তৃতা নয়। একটা বিষয় মনে পড়লেই কেবল মাঝে-মধ্যে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতেন যে, মুসলমান বন্ধুরাই তার ফিলিস্তিনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে আর মুসলমানরা মুসলমানের হাতে খুন হচ্ছে! তাঁর কাছে এর কোনো প্রতিকারও ছিলো না। সন্ধি ও শান্তির জন্য প্রতিপক্ষের নিকট দূত প্রেরণ করে তিনি নিজেকেই অপমানিত করেছেন। এখন সংঘাত-সংঘর্ষে তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি মিশর থেকে আসা বাহিনীকে পরিকল্পনা মোতাবেক বিভক্ত করে দিয়ে এখন দুশমনের অপেক্ষায় অস্থিরচিত্তে সময় অতিবাহিত করছেন। তিনি তাঁর উপদেষ্টাদের নিকট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সম্ভবত শত্রু বাহিনী চাচ্ছে, আমরা পাহাড়ি এলাকা থেকে বের হয়ে তাদের উপর আক্রমণ করি। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত, তিনি এ স্থান ত্যাগ করবেন না। তিনি দুশমনকে বিভ্রান্ত করার ফন্দি এঁটে বসে আছেন। তিনি ইচ্ছা করলে কমান্ডো সেনাদের দ্বারা দুশমনের ক্যাম্পে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা-ও করলেন না। তিনি দুশমনের চাল-কৌশল পর্যবেক্ষণ করছেন।

দামেস্কে নূরুদ্দীন জঙ্গী মরহুমের বিধবা স্ত্রী অপর এক রণাঙ্গন চালু করে রেখেছেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন দামেস্ক ত্যাগ করে চলে যান, তখন থেকেই এই মহিয়সী নারী মেয়েদের একটি স্বেচ্ছাসেবক ফৌজ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। মেয়েদেরকে যুদ্ধাহত সৈনিকদেরকে রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে আনা, ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ প্রদান করার নিয়ম প্রচলিত ছিলো। কিন্তু নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী তাঁর বাহিনীর মেয়েদেরকে তরবারী চালনা, বোমাবাজি এবং তীরান্দাজীর প্রশিক্ষণও প্রদান করছেন। এ কাজের জন্য তিনি কয়েকজন অভিজ্ঞ পুরুষকেও দলে রেখেছেন। তিনি জানতেন, সুলতান আইউবী যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের উপস্থিতি পছন্দ করেন না। এমতাবস্থায় তিনি মেয়েদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করবেন, সে কথা তো ভাবাই যায় না। তথাপি তিনি মেয়েদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। তাছাড়া তখনকার পরিস্থিতিটাই এমন ছিলো যে, মানুষ নিজ নিজ মেয়েদেরকে

সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করাকে গর্বের বিষয় মনে করতো। দশ-বার বছরের কিশোরীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাঠের তরবারী তৈরি করে তরবারী চালনার অনুশীলন করতো।

সম্প্রতি জঙ্গীর স্ত্রীর বাহিনীর সদস্য সংখ্যা চারজন বৃদ্ধি পেয়েছে। তন্মধ্যে একজন হলো ফাতেমা, যাকে সুলতান আইউবীর এক গুপ্তচর গোমস্তগীনের হেরেম থেকে বের করে এনেছে। একজন মসুলের খতীব ইবনুল মাখদূমের কন্যা মানসূরা। অপর দু'জন সেই দুই মেয়ে, যাদেরকে হাল্ব থেকে গোমস্তগীনের নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখত হাররানের কাজীকে হত্যা করে সেখান থেকে উদ্ধার করে এনেছিলো। তারা হলো হুমায়রা এবং সাহার। এরা সুলতান আইউবীর নিকট রণাঙ্গনে গিয়েছিলো। সেখান থেকে সুলতান তাদেরকে দামেস্ক পাঠিয়ে দেন। এ ধরনের অসহায় মেয়েদেরকে নূরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করা হতো। এই চারজন মেয়েও তার নিকট পৌঁছার পর তিনি তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণে ভর্তি করে দেন। তাদের স্বপ্নও এটিই ছিলো, যা পূরণ হয়েছে।

তারা জঙ্গীর স্ত্রীকে নিজ নিজ কাহিনী শোনায়। তিনি তাদেরকে তার সংগঠনের মেয়েদের নিকট নিয়ে যান এবং বলেন, তোমরা এদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তোমাদের কাহিনী শোনাও, চার মেয়ে নিজ নিজ কাহিনী শোনায়। খতীব কন্যা মানসূরা অত্যন্ত জ্ঞানী ও সচেতন। সে মেয়েদের উদ্দেশ করে বললো–

'নারী হলো জাতির ইজ্জত। দুশমন যখন কোনো জনবসতি দখল করে, তখন তাদের সৈন্যরা সর্বপ্রথম নারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তোমরা এই মেয়ে দুটোর মুখ থেকে শুনেছ যে, খৃস্টান কবলিত এলাকাগুলোতে খৃস্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে কত ভয়ংকর ও নির্মম আচরণ করে চলেছে। সেখানে একটি মুসলিম মেয়েরও ইজ্জত অক্ষত নেই। আল্লাহ না করুন, দামেস্কও যদি তাদের দখলে চলে যায়, তাহলে তোমাদেরকেও একই পরিণতি বরণ করতে হবে। আমরা যদি রক্তের কুরবানী দিতে অসম্মত হই, তাহলে খৃস্টানরা আমাদের প্রভুতে পরিণত হবে। তারা আমাদের বহু আমীরকে ক্রয় করে নিয়েছে। এখন খৃস্টানরাও আমাদের শত্রু, মুসলিম আমীরগণও আমাদের শত্রু। আমরা যদি বিজয় অর্জন করতে চাই, তাহলে প্রতিশোধের স্পৃহা জীবিত ও শাণিত রাখতে হবে। আমার আব্বাজান বলে থাকেন, যে জাতি কাফিরদের বর্বরতার শিকার ভাইদের কথা ভুলে যায়, সে জাতি বেশিদিন টিকে থাকে না।'

'আমার বোনেরা! আমি মোহতারাম সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভক্ত। আমি আইউবীর নামে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁর একটা নীতি আমি পছন্দ করি না, তিনি নারীকে রণাঙ্গনে যেতে দেন না। তিনি যা চিন্তা করেছেন, হয়ত ঠিকই করেছেন। যুবতী ও সুন্দরী মেয়েদেরকে হেরেমের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। আমাদেরকে পুরুষের বিনোদনের উপকরণ বানানো হয়েছে। এভাবে জাতির অর্ধেক শক্তি বেকারই রয়ে গেছে। দুশমন সৈন্য নিয়ে আসে। তার মোকাবেলায় আমাদের সৈন্যসংখ্যা তাদের অর্ধেকও হয় না। তাই আমরা নারীদের পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধ করে সৈন্যের অভাব পূরণ করবো। আমি মসুলে গোয়েন্দা দলে ছিলাম। এই ময়দানে আমি লড়াই করে এসেছি। আমার পিতার ভুলটা ছিলো, তিনি আবেগতাড়িত হয়ে তাঁর মনের কথা বলে ফেলেছেন। ধরা না খেলে সেখানে আমাদের পরিকল্পনা অন্যকিছু ছিলো। আমরা সেখানে ধ্বংসলীলা চালাতে পারিনি এবং সেখান থেকে আমাদের পালিয়ে আসতে হলো।'

চার মেয়ের জ্বালাময়ী বক্তব্য নূরুদ্দীন জঙ্গীর বাহিনীর মেয়েদের স্পৃহাকে আরো শাণিত করে তুলেছে। এখন তারা পূর্বের তুলনায় অনেক উজ্জীবিত। তাদের চারশত মেয়ে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে প্রস্তুত হয়ে আছে। জঙ্গীর স্ত্রী তাদেরকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করার সব আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছেন। তারা রওনা হবে বলে। নবাগত চার মেয়েও কয়েকদিনের মধ্যে কিছু প্রশিক্ষণ অর্জন করে ফেলেছে। কিন্তু এখনও পূর্ণ দক্ষ হয়ে ওঠেনি বলে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো না। কিন্তু তাদের হৃদয়ে প্রতিশোধস্পৃহা এতোই বেশি যে, তারা এই বাহিনীর সঙ্গে ময়দানে যেতে জিদ ধরে। ফাতেমা, হুমায়রা তো রীতিমতো কেঁদে ফেলে। অগত্যা জঙ্গীর স্ত্রী তাদেরকেও বাহিনীতে যুক্ত করে নেন। একশত পুরুষ যোদ্ধাও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। তাদের কমান্ডার হলেন হাজ্জাজ আবূ ওয়াক্কাস।

নূরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী হাজ্জাজ আবূ ওয়াক্কাসকে একটি লিখিত বার্তা দিয়ে বললেন, এটি সালাহুদ্দীন আইউবীকে দেবে। আমার যা বলার সব লিখে দিয়েছি। তাকে বলবে, এই মেয়েগুলোকে আহতদের সেবা-শশ্রুষার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তুমি ভালোভাবে শুনে নাও, এই মেয়েগুলোকে এবং স্বেচ্ছাসেবী মোহাফেজদেরকে তোমার সঙ্গে রাখবে। এরা প্রত্যেকে গেরিলা হামলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মেয়েরাও যুদ্ধ করতে জানে। আহতদের সেবার বাহানা দেখিয়ে তোমরা লড়াই করবে। সুযোগ পেলেই দুশমনকে দুর্বল করে ফেলবে।

আমি মেয়েদেরকে বলে দিয়েছি, তারা যেন দুশমনের হাতে ধরা না পড়ে। তারা নিজেরাই বলছে, ধরা পড়ার আশংকা দেখা দিলে নিজের তরবারী দ্বারাই নিজেকে শেষ করে ফেলবে।

চারশত মেয়ে ও একশত স্বেচ্ছাসেবী পুরুষ যোদ্ধার এই বাহিনীটি ঘোড়ায় আরোহন করে যখন রওনা হয়, তখন সমগ্র শহর যেনো হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। জনতা ইসলামের এই সৈনিকদেরকে ফুল ছিটিয়ে স্বাগত জানায়। 'নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার', 'ইসলাম জিন্দাবাদ', 'সালাহুদ্দীন আইউবী জিন্দাবাদ' স্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। জনতা তাদেরকে এই বলে উৎসাহিত করে যে, তোমরা ফিরে এসো না, সম্মুখপানে এগিয়ে যাও। সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলবে, দামেস্কের সকল নারী আসবে। আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করুন। ইসলামের একজন শত্রুও বেঁচে থাকতে পারবে না। শহরের বহু মানুষ উট-ঘোড়ায় আরোহন করে বহু দূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গিয়ে বিদায় জানায়।

রমযান মাস। পথে এক রাত অবস্থান করতে হবে। ইফতারের খানিক আগে কাফেলা এক স্থানে যাত্রাবিরতি দেয়। মেয়েরা খাবার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাতে শীত পড়ছে। কাফেলায় ঘোড়ার পাশাপাশি উটও আছে। উটগুলোর পিঠে তাঁবু বোঝাই করা। তাঁবুগুলোর ভেতরে লুকিয়ে রাখা আছে বর্শা, তরবারী ও তীর-ধনুক। সূর্যাস্তের আগ মুহূর্তে কোথা থেকে যেন আটজন অশ্বারোহী এসে হাজির হয়। এরা সুলতান আইউবীর গেরিলা সৈনিক– দামেস্ক থেকে রণাঙ্গনগামী পথের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা কাফেলা দেখে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য এসেছে।

অশ্বারোহীদেরকে কাফেলার দিকে আসতে দেখে কমান্ডার হাজ্জাজ আবূ ওয়াক্কাস এগিয়ে যান। গেরিলাদের কমান্ডার হলেন আনতানূন। তিনি আবূ ওয়াক্কাসকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কারা এবং কোথায় যাচ্ছেন? আবূ ওয়াক্কাস তাকে ঘটনাটা বিস্তারিত অবহিত করেন। আনতানূন নিশ্চিত হয়ে যান।

গেরিলাদের দেখে অনেকগুলো মেয়ে ছুটে এসে তাদের চারপাশে জড়ো হয়। সকলের একই প্রশ্ন, ময়দানের খবর কী? আনতানূন তাকে জানান, যুদ্ধ এখনো শুরু হয়নি এবং কখন শুরু হবে তাও বলা যায় না।

আনতানূন বলতে বলতে থেমে যান। তার দৃষ্টি একটি মেয়ের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। এক সময় বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, ফাতেমা! তুমি কিভাবে এসেছো?

ফাতেমা অস্থিরচিত্তে এগিয়ে এসে আনতানূনের ডান হাতটা ধরে ফেলে। আনতানূন ফাতেমাকে গোমস্তগীনের হেরেম থেকে বের করে এনেছিলো। আবূ ওয়াক্কাস আনতানূনকে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে ইফতার করবেন এবং খানা খাবেন।

সবাই যার যার কাজে চলে যায়। ফাতেমা আনতানূনকে জয় করে ফেলে। আনতানূন তাকে রাতে একত্র হওয়ার জন্য একটা জায়গা ঠিক করে দেয়।

দামেস্ক থেকে দূরবর্তী এই বিজন অঞ্চলে মাগরিবের আযানের সুললিত সুর ভেসে ওঠে। সবাই ইফতার করে নামায আদায় করে। পরে আহারপর্বও সমাপ্ত করে। সারাদিনের ক্লান্ত সবাই। অনেকে শুয়ে পড়ে। আনতানূন ডিউটি করার নাম বলে সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে একদিকে চলে যায়।

মেয়েদের ভেতর থেকে ফাতেমা চুপি চুপি বের হয়ে আসে। তাঁবু এলাকা থেকে দূরে এক স্থানে দাঁড়িয়ে আনতানূনের অপেক্ষা করছে সে। আনতানূন এসে গেছেন। ফাতেমার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল হাররানে। সে সময় আনতানূন সুলতান আইউবীর গুপ্তচর ছিলেন। হাররানের শাসনকর্তা ও সুলতান আইউবীর দুশমন গোমস্তগীনের হেরেমের মেয়ে বলে তাকে হাত করেছিলো আনতানূন। তাকে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু ঘটনাক্রমে ফাতেমা এক খৃস্টান উপদেষ্টাকে খুন করে ফেলে এবং আনতানূন গ্রেফতার হয়ে পরে ফাতেমাকে নিয়ে পালিয়ে আসেন। সুলতান আইউবী ফাতেমাকে দামেস্ক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং আনতানূন তার আবেদন মোতাবেক গেরিলা বাহিনীতে ভর্তি করে নেন। দীর্ঘদিন পর আজ অনাকাঙ্খিতভাবে ফাতেমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেলে তার মনে তীব্র অনুভূতি জাগে যে, ফাতেমাকে ছাড়া তার জীবন অচল এবং মেয়েটা তার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। অপরদিকে ফাতেমার অবস্থাও অনুরূপ।

ফাতেমা ও আনতানূন দু'জনই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। কেউই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কিন্তু এক সময় নিজেকে সামলে নিয়ে আনতানূন বললো– 'ফাতেমা! আমাদের কর্তব্য এখনো পালিত হয়নি। আমি হাররানে আমার দায়িত্ব শেষ করে আসতে পারিনি। তোমাকে সেখান থেকে বের করে আনা আমার কোনো কৃতিত্ব ছিলো না। এটা আমার কর্তব্যও ছিলো না। আমি সুলতান আইউবীর সম্মুখে লজ্জিত। জাতির কাছেও আমার মুখ দেখানোর সুযোগ নেই। দায়িত্ব পালন করতে না পারার কাফফারা স্বরূপ আমি গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছি। সুলতান আইউবী এই সাতজন কমান্ডোর নেতৃত্ব

আমার উপর সোপর্দ করেছেন। তোমাকে আমি অনুরোধ করি, তুমি এরপর পুনরায় আমার গতিরোধ করো না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমাকে কর্তব্য পালনের সুযোগ দাও।'

'আমিও কর্তব্য পালন করতে এসেছি'– ফাতেমা বললো– 'আমি গোমস্তগীনকে হত্যা করতে এসেছি।'

'অসম্ভব'– আনতানূন বললেন– 'মহামান্য সুলতান নারীদেরকে রণাঙ্গন থেকে অনেক দূরে রাখেন। তিনি সম্ভবত তোমাদের প্রত্যেককে ফিরিয়ে দেবেন।'

'আমি ফিরে যাবো না'– ফাতেমা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– 'আমি প্রমাণ করবো, নারী হেরেমের জন্য নয়– জিহাদের জন্য জন্মেছে। আনতানূন! আমাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও। আমার আকাঙ্খাটা তুমি পূর্ণ করো। আমাকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে দাও।'

'এ হতে পারে না'– আনতানূন বললেন– 'আমি যদি তোমাকে সঙ্গে রাখি, তাহলে আমার মনোযোগ তোমার উপর আটকে থাকবে। আমি কর্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হবো। আর যদি ধরা খেয়ে যাই, তাহলে একটি মেয়েকে সঙ্গে রাখার অপরাধে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। আমাদের উদ্দেশ্য যতোই পবিত্র ও সৎ হোক না কেন, এই অন্যায় সামান্য নয়। ফাতেমা! যুদ্ধ আবেগ দ্বারা লড়া যায় না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। তুমি যেদিকে যাওয়ার জন্য এসেছো, চলে যাও। হতে পারে, সুলতান তোমাদেরকে জখমীদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন।'

'তারপর আবার কবে কোথায় দেখা হবে?' ফাতেমা জিজ্ঞেস করে।

'যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে হতে পারে; জীবিত কিংবা মৃত'– আনতানূন জবাব দেয়– 'একজন গেরিলা সৈনিক আগাম বলতে পারে না কখন কোথায় থাকবে এবং তার লাশ কোথা থেকে উদ্ধার করা হবে। তাছাড়া গেরিলাদের লাশ পাওয়া যায় না। তারা দুশমনের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তারপরও যদি আমি বেঁচে থাকি, সোজা তোমার নিকট এসে যাবো।'

'এমনও তো হতে পারে যে, তুমি যুদ্ধে আহত হবে আর আমি তোমার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করবো।' ফাতেমা বললো।

'গেরিলা সৈনিকদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করে শত্রুরা'– আনতানূন জবাব দেয়– 'তুমি আবেগপ্রবণ হয়ো না ফাতেমা! আমাদেরকে আবেগ ত্যাগ করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে ভালবাসাও। তুমি যদি এই কামনা করো যে, তুমি কোনো মুসলমানের হেরেমেও যাবে না, দুশমনের হিংস্রতা থেকেও বেঁচে

থাকবে, তাহলে আমার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলো। যুদ্ধের ময়দানে তোমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, তা-ই শুধু পালন করবে। আর তুমি গোমস্তগীনকে হত্যা করতে পারবে না। এই ভাবনাটাও মাথা থেকে ফেলে দাও।'

আনতানূনের কোনো কথাই ফাতেমাকে প্রভাবিত করলো না। না তার অন্তর থেকে গোমস্তগীন হত্যার চিন্তা দূর হলো, না আনতানূনের ভালবাসা।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবীর তৎপরতা দু'টি। হয় তিনি রণাঙ্গনের মানচিত্র দেখে তাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন, নয়তো ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিজ বাহিনীর মোর্চাগুলো পরিদর্শন করবেন। তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। আসল যুদ্ধটা তিনি হামাতের অভ্যন্তরে লড়তে চাচ্ছেন, যার পরিকল্পনা তাঁর ঠিক করা আছে। কিন্তু একটা সমস্যা হলো, ডান পার্শ্বে টিলার সংখ্যা বেশি নয়। তার পিছনে খোলা মাঠ। দুশমন সেই পথে বেরিয়ে যেতে কিংবা সেদিক থেকে এসে ক্ষতিসাধন করতে পারে। আর তাতে সুলতান আইউবীর সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার আশংকা বিদ্যমান। তাঁর কাছে এতো সৈনিকও নেই যে, তিনি এই ময়দানে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর দেয়াল তৈরি করে ফেলতে পারবেন। পার্শ্ববর্তী টিলার উপর তিনি তীরান্দাজ বসিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এতোটুকু আয়োজন যথেষ্ট নয়। ময়দানের জন্য তিনি দুই ইউনিট আরোহী ও পদাতিক বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছেন। কিন্তু তাদেরকে এখনো লুকিয়ে রেখেছেন। এই ময়দানই সুলতান আইউবীকে বেশি অস্থির করে তুলছে। তাছাড়া আরো একটা বিশেষ বাহিনী তিনি তৈরি করে নিজের কাছে রেখেছেন।

সুলতান আইউবী একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক পর্যবেক্ষণ করছেন। এমন সময় দূরদিগন্তে তিনি ধূলি উড়তে দেখতে পান। একজন সৈনিক এই ধূলির তাৎপর্য ভালোভাবেই বুঝে। সুলতান বুঝে ফেললেন, কোনো অশ্বারোহী বাহিনী এগিয়ে আসছে। ধূলির বিস্তৃতি দেখে বুঝা যাচ্ছে ঘোড়াগুলো এক সারিতে নয়– চার কিংবা ছয় সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে সুবিন্যস্তরূপে অগ্রসর হচ্ছে। এই বাহিনী দুশমন ছাড়া আর কারো হতে পারে না। সুলতান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'এই পথে কি আমাদের একজন লোকও ছিলো না। প্রস্তুতির নির্দেশ দাও।'

প্রস্তুতির ঘণ্টা বেজে ওঠে। প্রতিরক্ষার জন্য যে পদ্ধতিতে প্রস্তুত হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো, তারা সে পদ্ধতিতেই প্রস্তুত হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর ঘোড়া চোখে পড়তে শুরু করে। কিন্তু তাদের চলন শত্রু কিংবা আক্রমণকারীসুলভ নয়। সুলতান আদেশ করেন, দু'-চারজন অশ্বারোহী এগিয়ে গিয়ে জেনে আস, তারা কারা? কয়েকজন অশ্বারোহী ছুটে যায়। ফিরে এসে তারা দূর থেকেই চিৎকার করে বলতে শুরু করে– 'দামেস্ক থেকে স্বেচ্ছাসেবী এসেছে। সঙ্গে নারী ফৌজও আছে।'

'নারী ফৌজ?'– কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে যায় সুলতান আইউবীর। কণ্ঠে বিস্ময়– 'নারী ফৌজ!' কিছুক্ষণ নীরব থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'এই বাহিনী আমার বিধবা বোনটি গঠন করে পাঠিয়ে থাকবেন। জঙ্গী মরহুমের বিধবাই এ কাজ করতে পারেন।'

সুলতান আইউবী হাসতে শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, সুলতান অতীতে কখনো এতো হাসেননি। হাসতে হাসতে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি উৎফুল্লচিত্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মান সালারদের বলতে শুরু করলেন– 'আমার জাতির মেয়েরা তোমাদেরকে সফলকাম না করে নিঃশ্বাস ফেলবে না। এই কিশোরীগুলোর ইজ্জতের জন্য আমরা কেনো জীবন বিলিয়ে দিচ্ছি না। কিন্তু... কিন্তু আমি তাদেরকে ফিরিয়ে দেবো। একটি মেয়েও যদি শত্রুর হাতে চলে যায়, তাহলে আমি মরেও শান্তি পাবো না।'

টিলার উপর থেকে নেমে সুলতান আইউবী সামনের দিকে এগিয়ে যান। নারীফৌজ ও পুরুষ স্বেচ্ছাসেবীদের কাফেলাটি নিকটে চলে আসে। কমান্ডার আবু ওয়াক্কাস ঘোড়া থেকে নেমে সুলতান আইউবীর নিকট চলে যান। তিনি সালাম দিয়ে নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর পত্রখানা সুলতানের হাতে তুলে দেন। সুলতান পত্র পাঠ করতে শুরু করেন–

'আমার ভাই! আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন। আমার স্বামী জীবিত থাকলে আজ আপনাকে এতোগুলো দুশমনের সম্মুখে একা থাকতে হতো না। আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারছি না। যা সম্ভব ছিলো, আপনার সমীপে পেশ করলাম। এই মেয়েগুলোকে আমি আহতদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছি। বিপুল পরিমাণ ঔষধপত্রও পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গে একশত পুরুষ স্বেচ্ছাসেবী প্রেরণ করলাম। প্রবীণ যোদ্ধারা এদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রত্যেককে কমান্ডো আক্রমণের অনুশীলনও প্রদান করেছে। সবাই উদ্দীপ্ত-উজ্জীবিত। আমি জানি, আমার মেয়েগুলোকে ময়দানে প্রেরণ করা আপনি পছন্দ করবেন না। আমি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত আছি। কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে, যদি আপনি এদেরকে ফেরত

পাঠিয়ে দেন, তাহলে দামেস্কবাসীর মন ভেঙ্গে যাবে। এই নগরীর লোকদের মাঝে কিরূপ চেতনা বিরাজ করছে, আপনি তা জনেন না। পুরুষরা ময়দানে যেতে প্রস্তুত। নারীরা আপনার নেতৃত্বে লড়াই করতে অস্থির। এই বাহিনীকে সকল নগরবাসী পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে বিদায় করেছে। এখানকার শিশু-কিশোররাও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। আপনার সৈন্যের অভাব থাকবে না।'

সুলতান আইউবী পত্রখানা পাঠ করেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি মেয়েগুলোর প্রতি চোখ তুলে তাকান। ওরা মেয়ে বটে; কিন্তু ঘোড়ার পিঠে তাদেরকে সৈনিক বলেই মনে হচ্ছে। সুলতান আইউবী তাদের সবাইকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিজের সম্মুখে দাঁড় করান। তিনি বললেন–

'আমি তোমাদের প্রত্যেককে যুদ্ধের ময়দানে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমাদের জযবার মূল্য আমি পরিশোধ করতে পারবো না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপযুক্ত বিনিময় দান করবেন। মেয়েদের যুদ্ধের ময়দানে ডেকে আনবো আমি কখনো ভাবিনি। আমার ভয় হচ্ছে, ইতিহাস বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবী নারীদের দিয়ে যুদ্ধ করিয়েছেন। তবে আমি তোমাদের চেতনাকে বিক্ষতও করতে পারি না। তোমাদের মধ্যে যদি কোনো মেয়ে এমন থাকে যে স্বেচ্ছায় আসেনি, সে আলাদা সরে দাঁড়াও। আর তারাও আলাদা হয়ে যাও, যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ কিংবা ভীতি আছে?'

কিন্তু মেয়েদের কেউই সরে দাঁড়ালো না।

সুলতান আইউবী বললেন–

'আমি তোমাদেরকে নিরাপদ স্থানে রাখবো। যুদ্ধের সময় আমি তোমাদেরকে সামনে যেতে দেবো না। তারপরও ভূখণ্ডটা এমন যে, তোমরা দুশমনের নাগালে এসে যেতে পারো। কেউ বর্শার আঘাতে মারাও যেতে পারো। এমনও হতে পারে, তোমাদের কেউ দুশমনের হাতে ধরা পড়ে যাবে। এ কথাও শুনে রাখো যে, তীর-তরবারী ও বর্শার জখম খুবই গভীর ও গুরুতর হয়ে থাকে।'

এক মেয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো– 'আপনি ইতিহাসকে ভয় করছেন আর আমরাও ইতিহাসকে ভয় করছি। আমরা যদি ফিরে চলে যাই, তাহলে ইতিহাস বলবে, জাতির মেয়েরা সুলতান আইউবীকে একাকী ময়দানে ফেলে ঘরে বসেছিলো।'

অপর এক মেয়ে বললো, 'আল্লাহ্ সালাহুদ্দীন আইউবীর তরবারীতে আরো

শক্তি দান করুন। আমরা হেরেমের জন্য জন্মাইনি।'

আরেক মেয়ে বললো– 'তিন চাঁদ আগে আমার বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। আপনি যদি আমাকে ফেরত দেন, তাহলে আমি আমার স্বামীকে নিজের জন্য হারাম মনে করবো।'

'তোমার স্বামী নিজে কেন আসেনি?' সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন– 'সে তার স্ত্রীকে কেনো পাঠিয়ে দিয়েছে?'

'তিনি আপনার ফৌজেই আছেন।' মেয়েটি জবাব দেয়।

এবার সবগুলো মেয়ে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তারা তাদের জোশ ও জযবার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। হৈ-চৈ কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসলে এক মেয়ে বলে উঠলো– 'মহামান্য সুলতান! আপনি আমাদেরকে যুদ্ধ করার সুযোগ দিন; আমরা আপনাকে নিরাশ করবো না।'

'আমি তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেবো, এ কথা তোমরা ভুলে যাও'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি তোমাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করবো।'

সুলতান আইউবী সেদিনই মেয়েদেরকে চার-চারজনের দলে বিভক্ত করে দেন। প্রতিটি দলের সঙ্গে একজন করে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োজিত করেন। স্বেচ্ছাসেবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছিলো, তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সুলতান আইউবী তাদের সেবা-শশ্রুষার কাজে নিয়োজিত করেন। কেননা, তারা নিয়মিত সৈনিক নয়। ফৌজের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। সুলতান আইউবী তাদেরকে সেই সৈনিকদের হাতে তুলে দেন, যারা শহীদদের লাশ ও আহত সৈনিকদের তুলে আনা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা মেয়ে এবং স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ শুরু করে দেয়।

ফাতেমা, মানসূরা, হুমাইরা ও সাহার পড়ে একদলে। তাদের একদলে একত্রিক হওয়া একটি অলৌকিক ব্যাপার। কেননা, তারা দামেস্কও এসেছিলো একসঙ্গে। হৃদয়ের বাসনা, জ্বলন এবং চেতনাও তাদের অভিন্ন। তাদের দলের স্বেচ্ছাসেবীর নাম আযর ইবনে আব্বাস। আযরের ক্ষুদ্র তাঁবুটি আলাদা। তার সন্নিকটেই স্থাপন করা হয়েছে চার মেয়ের বড় তাঁবু। এই চার মেয়ের মধ্যে খতীবের কন্যা অন্যদের তুলনায় সবল, বুদ্ধিমতি ও চতুর। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মানসূরা দেখতে পেলো, আযর একটি টিলার

উপর উঠে এদিকে-ওদিক তাকাতে শুরু করেছে। দেখে সেও উপরে চলে যায় এবং ইতিউতি তাকায়। উপত্যকা ও পাহাড়ের ঢালুতে সৈনিক দেখা যাচ্ছে। আযর মানসূরাকে বললো, এসো আমরা আরো একটু সম্মুখে যাই। মানসূরা আযরের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। আযর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং পাহাড়ী এলাকার প্রশংসা করতে শুরু করে।

আযর সুদর্শন যুবক। কথাবার্তা বেশ আকর্ষণীয়। মানসূরার সঙ্গে রসালাপ করতে শুরু করে সে। মানসূরাও তাতে স্বাদ নিতে আরম্ভ করে। তারা সূর্যাস্তের আগে আগেই ফিরে আসে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আযর মানসূরার অন্তরে বাসা বেঁধে ফেলে।

ইফতারের পর মেয়েরা তাদের তাঁবুতে বসে আহার করছে। ফৌজের এক কমান্ডার তাঁবুর ভেতর উঁকি দিয়ে তাকায় এবং মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করে– 'কোন অসুবিধা নেই তো?' মেয়েরা জানায়– না, আমাদের কোন সমস্যা নেই। কমান্ডার ফিরে যায়।

সে সময় আযর বাইরে দাঁড়ানো ছিলো। সে কমান্ডারের সাথে কথা বলতে থাকে। মানসূরা তাদের কথোপকথন শুনছিলো। আযর কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করে, 'এই সামান্য ফৌজ দ্বারা সুলতান তিনটি বাহিনীর মোকাবেলা কিভাবে করবেন?'

'দুশমনের জন্য ফাঁদ বসানো আছে। যুদ্ধ সেই ময়দানে হবে না, যে ময়দানে হবে বলে দুশমন মনে করছে। আমরা তাদেরকে টেনে সেই জায়গায় নিয়ে যাবো, যেখানে তাদের জন্য আমরা ফাঁদ প্রস্তুত করে রেখেছি।' কমান্ডার আযরের আবেগে প্রভাবিত হয়ে বলে দেয়, সুলতান আইউবী তার ফৌজকে কোথায় কিভাবে বণ্টন করেছেন এবং তিনি কী করবেন। মিশরের রিজার্ভ বাহিনীর কথাও বলে ফেলে কমান্ডার।

সে রাতের ঘটনা। মধ্যরাতে মানসূরার চোখ খুলে যায়। আযর ইবনে আব্বাসের তাঁবু থেকে কথার শব্দ শুনতে পায়– 'তোমরা এখনই বেরিয়ে যাও। কিছু বিষয় তোমরা নিজেরা জেনে নিয়েছো। বাকি তথ্য আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছি। আমার পক্ষে এখান থেকে বের হওয়া সম্ভব ছিলো না। ভালোই হলো যে, তোমরা এসে গেছো। এবার রাস্তা চিনে নাও।'

আযর পথের বিবরণ দিয়ে বললো– 'তুমি পায়ে হেঁটে যাচ্ছো। পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। ফাঁদ প্রস্তুত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢোকা যাবে না। আল্লাহ হাফেজ।'

মানসূরা এক ব্যক্তির পায়ের শব্দ শুনতে পায়। লোকটি চলে গেছে। মেয়েটি তাঁবুর দরজা সামান্য ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকায়। আযর তার তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে একদিকে চলে যায়। মানসূরা তার তাঁবুর কাউকে না জাগিয়েই সামান থেকে খঞ্জরটা বের করে বেরিয়ে পড়ে।

আকাশে হালকা মেঘ। ফলে জোৎস্না রাত হওয়া সত্ত্বেও কিছুটা অন্ধকার দেখাচ্ছে। আযরকে ছায়ার মতো দেখতে পাচ্ছে মানসূরা। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আড়ালে আড়ালে আযরকে অনুসরণ করছে সে। আযর একটি টিলার কোল ধরে সম্মুখপানে হাঁটতে শুরু করে। মানসূরাও একই পথ ধরে এগুতে থাকে। পথে কোনো সান্ত্রী কিংবা অন্য কোনো সৈনিক চোখে পড়ছে না। তাতে মানসূরা বুঝে ফেলে, নারী সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবীদের তাঁবু সম্মুখের মোর্চাগুলো থেকে অনেক পেছনে স্থাপন করা হয়েছে এবং তার পেছনে আর কোনো ফৌজ নেই। কিন্তু সেখানে কয়েকটি স্থানে যে ফৌজ বিদ্যমান, মানসূরার তা অজানা। কিন্তু আযর আগন্তুককে এমন পথ বলে দিয়েছে, যে পথে কোনো ফৌজ তাকে দেখতে পাবে না। আযর দু'টি টিলার মধ্যকার সরু একটি গলির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। মানসূরা প্রথমে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। সেও তাতে প্রবেশ করে।

সম্মুখে গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ সমতল ভূমি। আযর কোনো একটি গাছের আড়ালে গিয়ে থেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার হাঁটছে। মানসূরাও একই ধারায় অগ্রসর হচ্ছে।

বেশকিছু পথ অতিক্রম করার পর এখন আবার পাহাড়ের পাদদেশ। আযর এগিয়ে চলছে। মানসূরাও তাকে অনুসরণ করছে। পাহাড়টির অভ্যন্তরে একটি গিরিপথ। আযর তাতে ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়ে মানসূরাও।

গিরিপথে ঢোকামাত্র হিমশীতল বাতাসের ঝাপটায় মানসূরার পা উপড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তার দেহ নির্জীব হতে শুরু করে। আযরের মনে কী যেন সংশয় জাগে। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পেছন দিকে ফিরে তাকায়। তৎক্ষণাৎ মানসূরা বিশাল একটি পাথরের আড়ালে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আযর আবার সম্মুখপানে এগুতে শুরু করে। মানসূরা উঠে দাঁড়ায় এবং পাহাড়ের ছায়াটা যেদিকে গিয়ে পড়েছে, মানসূরা সেদিকে এগিয়ে যায়।

গিরিপথ থেকে বের হওয়ার পর এখন খোলা মাঠ। আযর দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। মানসূরাও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সে তো মহিলা। তদুপরি এতোক্ষণ বহু পথ অতিক্রম করেছে সে। একদিকে প্রচণ্ড শীত, অপরদিকে

পায়ের তলে কংকর। মানসূরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

এটা একটা আবেগ, যা মানসূরাকে আযরের পশ্চাতে হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছে। এবার তার মনে ভাবনা জাগে, এই পশ্চাদ্ধাবনের ফল কী দাঁড়াবে। আযর যদি দৌড় দেয়, তাহলে মানসূরা তার সঙ্গে পেরে উঠবে না। কিন্তু আযরের প্রতি মানসূরার সন্দেহ বাস্তব। আযর দুশমনের দিকেই যাচ্ছে। মানসূরা তাকে ধাওয়া করছে ঠিক; কিন্তু তাকে কিভাবে ধরবে বা ধরাবে, ভেবে দেখেনি। এখন তো আযর হাঁটছে খুব দ্রুত। এই পরিস্থিতিতে তাকে ধরতে গেলে মুখোমুখি মোকাবেলা করতে হবে। মানসূরার কাছে খঞ্জর আছে। আছে খঞ্জর ব্যবহারের প্রশিক্ষণও। কিন্তু দুশমনের মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা তার নেই। এই দুশমন স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী। মানসূরা কি পারবে পরাস্ত করে তাকে ধরে ফেলতে!

মানসূরা ভাবছে আর দ্রুত হাঁটছে। হঠাৎ আযর থেমে যায়। সে পেছনে ফিরে তাকায়। মানসূরার নিকটে একটি গাছ ছিলো। সে দ্রুত গাছটির আড়ালে চলে যায়। গাছের স্থানটা সামান্য উঁচু। আশপাশটা পাথরে পরিপূর্ণ। মানসূরা পাথরের পেছনে নেমে পড়ে। রাতের নীরবতায় পাথরের শব্দ কানে আসে আযরের। আযর পেছন দিকে ফিরে আসে। মানসূরা তার আগমন দেখে ফেলে। সে উঠে না দাঁড়িয়ে গাছটির পিছনে শক্ত করে ধারণ করে। আযর গাছটির একেবারে নিকটে চলে আসে। মানসূরা দেখতে পায় তার হাতে খাপখোলা তরবারী। গাছটি অতিক্রম করে আযর সামান্য এগিয়ে গেলে মানসূরা পেছন দিকে থেকে খপ করে তার দু'পায়ের গোড়ালী ধরে ফেলে পূর্ণ শক্তিতে পেছন দিকে ঝটকা টান দেয়। আযর উপুড় হয়ে সম্মুখ দিকে পড়ে যায়। পরক্ষণেই মানসূরা তার পিঠের উপর কনুই চাপা দিয়ে ডান হাতে খঞ্জরের আগাটা তার ঘাড়ে স্থাপন করে। ঘটনাটা দু' থেকে তিন সেকেন্ডের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায়।

কনুই আর দেহের সমস্ত ওজন দিয়েও তাগড়া একটা যুবককে কাবু করা একটা মেয়ের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু ঘাড়ের উপর খঞ্জরের আগা আযরকে নিক্রিয় করে ফেলে। তার তরবারীটা হাত থেকে ছুটে পড়ে যায়।

'তুমি কে?' উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অসহায় অবস্থায় নিজ্ঞেস করে আযর।

'যার হাত থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না।' মানসূরা বললো।

'তুমি কি নারী?'

'হ্যাঁ'– মানসূরা জবাব দেয়– 'আমি নারী, তোমার পরিচিত এক নারী।

আমার নাম মানসূরা।'

'উহ্, পাগলী মেয়ে!' –আযর হেসে বললো– 'তুমি ঠাট্টা করছো? আমি তো ভয় পেয়ে গেছি। ঘাড় থেকে খঞ্জর সরাও। ওটা চামড়ায় ঢুকে যাচ্ছে।'

'এটা ঠাট্টা নয় আযর। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

'আল্লাহর কসম! আমি অন্য কোনো মেয়ের পেছনে যাচ্ছিলাম না'– আযর বন্ধুসুলভ কণ্ঠে জবাব দেয়– 'তোমার চেয়ে ভালো মেয়ে আছে বলে আমি মনে করি না। আমি তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছি না।'

'আমাকে নয়, তুমি আমার জাতিকে ধোঁকা দিচ্ছো'– মানসূরা বললো– 'তুমি আমাকে সবচেয়ে ভালো মেয়ে মনে করছো। আর আমি তোমাকে সবচেয়ে ভালো পুরুষ মনে করতাম। কিন্তু এখন না তুমি আমার কাছে ভালো, না আমি তোমার কাছে ভালো। কর্তব্যের কাছে আবেগ পরাজিত হয়েছে। তুমি তোমার দায়িত্ব পালনে যাচ্ছো আর আমি আমার কর্তব্য পালন করছি। তুমি যদি আমার স্বামী, আমার দেহ ও আত্মার মালিক কিংবা আমার সন্তানদের পিতা হতে, তবুও আমার খঞ্জর তোমার ঘাড় স্পর্শ করতো।'

'আচ্ছা, তুমি আমাকে কী মনে করে ফেলে দিয়েছ?' আযর জিজ্ঞেস করে।

'নামের মুসলমান আর খৃস্টানদের চর মনে করে'– মানসূরা জবাব দেয়– 'তুমি খৃস্টান বন্ধুদের বলতে যাচ্ছো যে, সাবধানে আক্রমণ চালাবে এবং পর্বতমালার অভ্যন্তরে ঢুকবে না।'

'তুমি আসলে জানোই না চর কাকে বলে'– আযর বললো– 'আমি দুশমনকে পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছিলাম।'

'আমি জানি, গুপ্তচর কেমন হয়ে থাকে'– মানসূরা বললো– 'আমি অনেক বড় এক গোয়েন্দার কন্যা। ইব্‌নুল মাখদূম কাকবূরীর নাম কখনো শুনেছো? তিনি মসুলের খতীব ছিলেন। আমি তাঁরই দলের গোয়েন্দা। আমি আমার পিতাকে মসুলের কারাগারের পাতাল কক্ষ থেকে বের করে এনেছি এবং নিজে তাঁর সঙ্গে মসুল থেকে পালিয়ে এসেছি। তুমি আনাড়ী গুপ্তচর। অভিজ্ঞ গুপ্তচররা দূরে গিয়ে কথা বলে। কারো তাঁবুর নিকট দাঁড়িয়ে গোপন কথা বলে না। তুমি স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এসেছিলে। এখন এখানে কী করছো?'

'আমার উপর থেকে সরে যাও'– আযর বললো– 'খঞ্জর সরাও। আমি একটি জরুরী কথা বলতে চাই।'

'তোমার যবান মুক্ত'– মানসূরা বললো– 'বলো, জরুরী কথা বলো। আমি শুনছি।'

আযর চুপ হয়ে যায়। তার দেহটা নির্জীব হয়ে গেছে। নিজের মাথাটা মাটির সঙ্গে লাগিয়ে দেয়। মানসূরার সম্মুখে এখন প্রশ্ন– তাকে বাঁধবে কিভাবে এবং কিভাবেই এখান থেকে তাকে নিয়ে যাবে। আযরকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে তা কঠিন ছিলো না। কিন্তু মানসূরা তাকে জীবিত সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে যেতে চায়। গুপ্তচরদের জীবিত গ্রেফতার করাই নিয়ম মানসূরার তা জানা আছে। হঠাৎ তার মাথায় ভাবনা আসে যে, আশপাশে কোথাও তাদের সৈনিক থাকতে পারে। তাই মানসূরা সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চস্বরে একটা চিৎকার দেয়– 'কেউ থাকলে এদিকে আসো। আসো, আসো, আসো।'

নির্জীব পড়ে থাকা আযর হঠাৎ এতো জোরে নড়ে উঠে যে, তার পিঠের উপর কনুই চাপা দিয়ে বসে থাকা মানসূরা একদিকে পড়ে যায়। আযর তরবারীর প্রতি হাত বাড়ায়। মানসূরা বিদ্যুদ্গতিতে উঠে পেছন দিক থেকে আযরকে এমনভাবে ধাক্কা দেয় যে, সে সামনের দিকে পড়ে যায়। মানসূরা তারবারীটা তুলে নেয়। আযর উঠে দৌড় দেয়। তার পক্ষে এই পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার চেয়ে জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়া বেশী আবশ্যক। মানসূরা চিৎকার করতে করতে তার পেছনে দৌড়াতে শুরু করে। তার পায়ে বিড়ালের শক্তি এসে গেছে। দূরে কোথাও পেট্রোল সেনারা টহল দিচ্ছিলো। তারা মানসূরার চিৎকার শুনতে পেয়ে ছুটে আসে।

সামনে নদী। আযরকে থেমে যেতে হলো। মানসূরা পৌঁছে যায়। দু'জন সান্ত্রীও এসে পড়ে। আযর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানসূরা চিৎকার করে ওঠে– 'ওকে যেতে দিও না, গুপ্তচর। জীবিত ধরে ফেলো।'

সান্ত্রীরাও নদীতে ঝাপ দেয়। তারা আযরকে ধরে ফেলে। কিন্তু একটি মেয়েকে দেখে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা ভাবে এটা অন্য কোন ব্যাপার হবে। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে মানসূরা নিজের পরিচয় প্রদান করে এবং রণাঙ্গনে কিভাবে এসেছে তার বিবরণ দেয়। মানসূরা জানায়, এই লোকটি স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এসেছিলো। কিন্তু লোকটি সন্দেহভাজন। একে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট নিয়ে চলো।

'শোনো বন্ধুগণ!'– আযর সান্ত্রীদের বললো– 'এখানে তোমরা কী পাও? ক'টা টাকা আর দু'বেলার রুটির জন্য এখানে তোমরা মরতে এসেছো। আমার সঙ্গে চলো, তোমাদেরকে রাজপুত্র বানিয়ে দেব। এর মতো মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দেবো। সম্পদ দ্বারা লাল করে দেবো।'

'যাবো'– এক সান্ত্রী বললো– 'তবে তার আগে তুমি আমাদের সঙ্গে চলো।

তুমিও চলো মেয়ে! ওখানে নিয়ে দেখবো, এই লোক গোয়েন্দা, নাকি তুমি। নাকি দু'জন এখানে ফস্টিনস্টি করতে এসেছিলে।'

সুলতান আইউবীর তাঁবুর সামান্য দূরে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর তাঁবু। সান্ত্রীরা আযর ও মানসূরাকে তাদের কমান্ডারের নিকট নিয়ে যায়। কমান্ডার তাদেরকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর নিকট নিয়ে যান। হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে ঘুম থেকে তুলে আযরকে তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়। মানসূরা হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে সমস্ত কাহিনী শোনায়। পশ্চাদ্ধাবনের ঘটনাও সবিস্তারে বিবৃত করে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ মানসূরাকে নিরীক্ষার সাথে দেখে বললেন– 'তোমার চেহারাটা আমার কাছে অপরিচিত নয়। তুমি সম্ভবত মসুল থেকে পালিয়ে এসেছিলে। তোমার সঙ্গে মসুলের খতীব ইবনুল মাখদূমও ছিলেন?'

'আমি তাঁর মেয়ে।' মানসূরা বললো।

'তুমি আমার বিস্ময় দূর করে দিয়েছ'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'আমাদের মেয়েরা তোমার চেয়ে সাহসী হতে পারে; কিন্তু এরকম বুদ্ধিমত্তা কমই পাওয়া যায়, যার প্রমাণ তুমি দিয়েছো।'

'আমাকে আমার আব্বাজান প্রশিক্ষণ দিয়েছেন'– মানসূরা বললো– 'আমার কানে মাত্র দু'টি বাক্য প্রবেশ করে আর আমি বুঝে ফেলি ব্যাপারটা কী ঘটছে।'

আযরের পোশাক তল্লাশি করা হয়। ভেতর থেকে এক খণ্ড কাগজ বেরিয়ে আসে, যাতে এই যুদ্ধে সুলতান আইউবীর বাহিনীর বিন্যাস-পজিশনের নক্শা অংকিত আছে। আঁকা-বাঁকা দাগ টেনে হামাত শিং-এর চিত্র আঁকা আছে এই কাগজে। অস্পষ্ট বুঝা গেলো। সুলতান আইউবীর পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা দুশমনের কাছে যাচ্ছিলো।

'আযর ভাই!'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আযরকে কাগজগুলো দেখাতে দেখাতে বললেন– 'এরপরও যদি সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে, তাহলে বলো, আমি তোমাকে মুক্ত করে দেবো। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাকো, তবে বলো, আমাকে নিশ্চয়তা দাও। আচ্ছা, তুমি কি মুসলমান?

'মহান আল্লাহর কসম।'

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আযরের মুখের উপর সজোরে একটা ঘুষি মারেন। আযর কয়েক পা পেছনে চিৎ হয়ে পড়ে যায়। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ধীর

অথচ রোষ কষায়িত কণ্ঠে বললেন– 'চরবৃত্তি করছো কাফেরদের, আর কসম করছো আমাদের মহান আল্লাহর নামে। আমি তোমাকে একথা জিজ্ঞেস করছি না যে, তুমি গুপ্তচর কিনা। আমি জানতে চাচ্ছি, এখানে তোমার সহকর্মী কারা। তাদের নাম বলো, আস্তানার ঠিকানা বলো।'

'আমি মুসলমান'– আযর অনুনয়ের স্বরে বললো– 'আমি আপনাকে সব[illegible] বলে দেবো। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবো।'

'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'এ মুহূর্তে আমার উপর কোনো শর্ত আরোপ করার অধিকার তোমার নেই।'

'আমি একা, এখানে আমার কোন সহকর্মী নেই।' আযর হঠকারী উত্তর দেয়।

'এই মেয়েটি তোমার তাঁবুতে যে লোকটিকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলো, সে কে?' হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ্ জিজ্ঞেস করে।

'আমি তাকে চিনতে পারিনি'– আযর জবাব দেয়– 'সে অন্ধকারে এসে অন্ধকারেই ফিরে গিয়েছিলো।'

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর দু'জন লোককে ডেকে বললেন– 'একে নিয়ে যাও। এর সহকর্মী কারা, তারা কোথায় অবস্থান করছে জিজ্ঞেস করো।' মানসূরাকে বললেন– 'তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো। ফজরের পর তোমাকে তলব করবো।'

❖ ❖ ❖

ফজর নামাযের পর সুলতান আইউবী এসে উপস্থিত হন। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর সঙ্গে। হাসান সুলতানকে জানান, খতীব ইবনুল খামদূমের কন্যা রাতে একজন গুপ্তচর ধরে নিয়ে এসেছে। তিনি পুরো ঘটনা বিবৃত করলে সুলতান বললেন– 'ইসলামের কন্যাদের কাজ এমনই হয়ে থাকে। আমরা যদি আমাদের কালেমাপড়া দুশমনকে রক্তে লেখা পাঠ না পড়াই, তাহলে তারা জাতির কন্যাদের প্রতিভা নিঃশেষ করে দেবে। আচ্ছা, গুপ্তচর কোথায়?'

'আপনি এখনই তাকে দেখতে পাবেন না'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'তার কক্ষটা শূন্য করার পর আমি তাকে আপনার নিকট নিয়ে আসবো। সুদর্শন এক যুবক। দামেস্কের অধিবাসী বলে দাবি করছে। এখানে স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এসেছিলো।'

আযর একটি বৃক্ষের সঙ্গে ঝুলে আছে। মাথাটা নীচের দিকে আর পা দু'টো উপর দিকে। মাটি থেকে মাথা এক-দেড় গজ উপরে। নীচে অঙ্গার জ্বলছে।

এক সৈনিক কিছুক্ষণ পরপর আগুনের মধ্যে কি যেন নিক্ষেপ করছে, যার ধোঁয়ায় আযর ছটফট করছে ও কাঁশছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে আনেন। চোখ দু'টো ফুলে গেছে। শরীরের সমস্ত রক্ত মুখমণ্ডলে নেমে এসেছে। বাঁধন খুলে দেয়ার পর আযর দাঁড়াতে পারলো না। কিছুক্ষণ অচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়ে রইলো। মুখে পানির ছিটা দেয়া হলো। খানিক পর চোখ খুললে হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'মাত্র শুরু। না বলো যদি, তাহলে এক এক করে দেহের প্রতিটি জোড়া আলাদা করে ফেলবো।'

আযর পানি প্রার্থনা করে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'পানি নয়, দুধ পান করাবো। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।' এক সৈনিককে বললেন– 'এক গ্লাস দুধ আর একটি ঘোড়া ও একখানা রশি নিয়ে আসো। রশির এক মাথা তার পায়ের সঙ্গে, অপর মাথা ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধো।'

আযর দু'ব্যক্তির নাম বলে। দু'জনই স্বেচ্ছাসেবী। এর মধ্যে রাতের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট লোকটিও আছে। সে দামেস্কের আস্তানার ঠিকানাও বলে দেয়। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তৎক্ষণাৎ উভয় স্বেচ্ছাসেবীকে ধরে আনার নির্দেশ দেন এবং আযরকে সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে যান।

'বাড়ী কোথায়?'

'দামেস্ক।'

'কার ছেলে?'

আযর এক জাগিরদারের নাম বলে।

'আমি সম্ভবত তাকে চিনি?' সুলতান আইউবী বললেন– 'তিনি কি দামেস্কে আছেন?'

'আল-মালিকুস সালিহ যখন দামেস্ক থেকে পলায়ন করেন, তখন তিনিও হাল্‌ব চলে গেছেন।' আযর জবাব দেয়।

'আর তোমাকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য রেখে গেছেন।' সুলতান আইউবী বললেন।

'না, আমি নিজেই দামেস্ক থেকে গেছি'– আযর বললো– 'পরে আব্বাজান হাল্‌ব থেকে এক লোকের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করেন, আমি যেন গুপ্তচরবৃত্তি করি। আমি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা এবং দিক-নির্দেশনাও পেয়েছিলাম।' হাতজোড় করে আযর সুলতান আইউবীকে অনুনয়ের সঙ্গে বললো– 'আমি মুসলমান। আমার পিতা আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন। এখন আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখুন। আমি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।'

'আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি

আল্লাহর বিধানে হাত দিতে পারি না। আমি শুধু এটুকু দেখতে চেয়েছিলাম, সেই লোকটা কেমন মুসলমান, একটি নারী যার হাত থেকে ছিনিয়ে তরবারী নিয়ে তাকে ধরে ফেললো। আচ্ছা, তুমি এখানে কী কী দেখেছো?'

'এখানে আমি বহু কিছু দেখেছি'– আযর জবাব দেয়– 'অবশিষ্ট তথ্য আমার সেই দুই সঙ্গী দিয়েছে, যারা পূর্ব থেকেই এখানে অবস্থান করছিলো। আমাকে মিনজানীক এবং তীরান্দাজদের অবস্থান জানবার জন্য বলা হয়েছিলো। আমি তা দেখে নিয়েছি।'

'তোমার আগে তোমার কোনো সঙ্গী কি এখান থেকে তথ্য নিয়ে গেছে?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞাসা করেন।

'না'– আযর জবাব দেয়– 'আমরা তিনজন ছাড়া এখানে আমাদের আর কোনো সঙ্গী নেই।'

'তোমার কি জানা আছে, তুমি কত সুদর্শন ও সুঠাম দেহের অধিকারী?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞাসা করেন– 'আর তুমি কি জানো, মেয়ে হয়েও কিভাবে ও তোমাকে ফেলে দিয়েছিলো?'

'সে যদি পেছন দিক থেকে আমার উভয় পায়ের গোড়ালি ধরে না ফেলতো, তাহলে আমি পড়তাম না।' আযর জবাব দেয়।

'তারপরও তুমি পড়ে যেতে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যাদের ঈমান বিক্রি হয়ে যায়, তারা অনায়াসেই পড়ে যায়। আর তারা তোমার মতো উপুড় হয়েই পড়ে থাকে। তুমি যদি সত্য ও ঈমানওয়ালাদের সঙ্গে থাকতে, তাহলে দশজন কাফির মিলেও তোমাকে ফেলতে পারতো না। আসল শক্তি বাহু আর তরবারীর নয়; আসল শক্তি ঈমানের।'

'আপনি আমাকে একটিবার সুযোগ দিন।' আযর বললো।

'সেই সিদ্ধান্ত দামেস্কের বিচারপতি নেবেন'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি তোমার সঙ্গে এসব কথা এ জন্য বলছি যে, তুমি মুসলমান। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু তুমি ওদিকে চলে গেছো। আমি জানি, দামেস্কের দু'-চারটা মেয়ে তোমার ভালোভাসায় বিভোর। চেহারা-শরীরে তুমি এর উপযুক্ত যে, মেয়েরা তোমাকে ভালোবাসবে। কিন্তু এখন সেসব মেয়ে তোমার মুখে থু থু নিক্ষেপ করবে। আল্লাহও তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। দামেস্কের কাজী তোমাকে কী শাস্তি দেবেন, আমি তা বলতে পারবো না। তিনি যদি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সে পর্যন্ত যে ক'দিন বেঁচে থাকবে, আল্লাহর নিকট পাপের জন্য প্রার্থনা করতে থাকো।

অন্ততপক্ষে মৃত্যুর আগে মুসলমান হয়ে যাও।'

'আমার পিতাকে শাস্তি দেবেন?' আযর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– 'এই পাপের উৎসাহ তো আমাকে তিনিই দিয়েছিলেন। তিনিই আমার অন্তরে প্রলোভন ঢুকিয়েছেন। তিনিই আমার হৃদয় থেকে ঈমান বের করে ফেলেছিলেন।'

'আল্লাহর বিধান তাকে ক্ষমা করবে না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'দৌলতের নেশা অস্থায়ী হয়ে থাকে। ঈমানের শক্তি মৃত্যুর পরও নিঃশেষ হয় না।'

'আমার পিতা সম্পদশালী লোক ছিলেন না'– আযর বললো– 'তিনি সম্পদের পুজারী ছিলেন। আমার দু'টি বোন ছিলো। যৌবনে উপনীত হওয়ার পর তিনি তাদেরকে দু'জন আমীরের হাতে তুলে দিয়ে দরবারে স্থান করে নেন। তিনি তার কন্যাদের বিপুল মূল্য উসুল করেন। তারপর চরবৃত্তি করতে শুরু করেন। আমাকেও তিনি এ কাজে লাগিয়ে দেন এবং আমার অন্তরে সম্পদের মোহ সৃষ্টি করে দেন। নূরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর তিনি দরবারে আরো উচ্চ মর্যাদা পেয়ে যান। এক পর্যায়ে তিনি একজন বিজ্ঞ কুচক্রী ও ভাঙ্গা-গড়ার সুদক্ষ কারিগরে পরিণত হন। এক পর্যায়ে তিনি বিপুল পরিমাণ জায়গীরের মালিক হয়ে যান। আপনার বাহিনী এসে পড়ার পর যখন আল-মালিকুস সালিহ, তার দরবারী আমীর ও জাগিরদারগণ দামেস্ক থেকে পালিয়ে যায়, তখন তাদের সঙ্গে আমার পিতাও ছিলেন। আমি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই দামেস্ক থেকে যাই। কিছুদিন পর হালব থেকে এক ব্যক্তি দামেস্ক আসে। সে আমার পিতার একটি বার্তা নিয়ে আসে, আমি যেন গুপ্তচরবৃত্তির কাজ শুরু করে দেই। সেই লোকটিই আমাকে সেই আস্তানায় নিয়ে যায়, আমি যার ঠিকানা আপনাদেরকে দিয়েছি। সেখানে আমাকে প্রচুর অর্থ দেয়া হয় এবং দু'-তিন দিনের মধ্যেই আমাকে জানিয়ে দেয়া হলো আমাকে কী করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। আমি তাদের দলে ঢুকে পড়ি। একদিন আমাদের দলনেতা বললেন, স্বেচ্ছাসেবীরা রণাঙ্গনে যাচ্ছে। তোমরা তিন থেকে চারজন লোক তাদের দলে ঢুকে পড়ো। আমরা তিনজন ঢুকে পড়লাম। দু'জন আগেই এখানে এসে পৌঁছেছে। আমিও গেলাম। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়, যেনো আমিও এখানে চলে আসি এবং আপনার বাহিনীর পূর্ণ অবস্থা জেনে সকল তথ্য যৌথ বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেই। আমি এসে পড়লাম। আমার সঙ্গীরা এখানকার নক্শা প্রস্তুত করে রেখেছিলো। তারা এও জেনে নিয়েছিলো যে, আপনি শত্রু বাহিনীকে সেই স্থানটিতে নিয়ে এসে লড়াতে চাচ্ছেন, যা চারদিকের পর্বত ও টিলা-বেষ্টিত। আমি টিলার আড়ালে লুকিয়ে

লুকিয়ে আপনার তীরান্দাজ এবং মিনজানীকের অবস্থান দেখে নিয়েছিলাম।'

আযরের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে শুরু করে। সে বললো– 'ধরা পড়ার পর এখন আমি অনুভব করছি, আমি অপরাধ করছিলাম। আপনার বক্তব্য আমার ভেতরে ঈমানের উত্তাপ জাগ্রত করে দিয়েছে। আমার পিতা যদি তার কন্যাদের বিক্রি করে সম্পদশালী না হতেন, তাহলে আমার ঈমান অটুটই থাকতো। অপরাধ আমার পিতার। মহামান্য সুলতান! আপনার মর্যাদা বুলন্দ হোক। আপনি দয়া করে আমাকে এই পাপের কাফফারা আদায় করার সুযোগ দিন।'

সুলতান আইউবী হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে ইঙ্গিত করেন। হাসান আযরকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে যান।

সেদিনই আযরকে দামেস্ক পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার সঙ্গে দু'জন মোহাফেজ দেয়া হয়। তিনজনই অশ্বারোহী। আযরের হাত রশি দ্বারা বাঁধা। সূর্যাস্তের খানিক আগে তারা অর্ধেক পথ অতিক্রম করে ফেলে। রাতে কোথাও যাত্রাবিরতি দিতে হবে। পথে মোহাফেজগণ আযরের অপরাধের বিবরণ শুনতে থাকে। আযর আবেগপ্রবণ কথা বলে বলে তাদেরকে প্রভাবিত করে ফেলে। সন্ধ্যার সময় সে মোহাফেজদের বললো, সামান্য সময়ের জন্য তোমরা আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও। মোহাফেজরা এই ভেবে তার হাত খুলে দেয় যে, নিরস্ত্র পালিয়ে যাবে কোথায়। তারা তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে দেয়। বাঁধনমুক্ত হয়ে আযর মাটিতে বসে পড়ে। মোহাফেজরা তাকে নিয়ে খেতে শুরু করে।

আযর পূর্ব থেকেই ফন্দি এঁটে রাখে। আহাররত অবস্থায় হঠাৎ সে উঠে দৌড়ে গিয়ে দ্রুত ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। মোহাফেজরা উঠে ঘোড়ার পিঠে চড়তে চড়তে আযর বেশ দূরে চলে যায়। তারা পলায়নপর আযরকে ধাওয়া করে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সন্ধ্যা গাঢ় হতে শুরু করে। উঁচু-নীচু ভূমি। মাঝে-মধ্যে টিলা এবং বড় বড় পাথর আছে। মোহাফেজরা তাকে বহুদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে। কিন্তু আযর চলে গেছে দৃষ্টিসীমার বাইরে।

পরদিন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মোহাফেজদ্বয় পরাজিতের ন্যায় অবনত মস্তকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর নিকট এসে হাজির হয়। একজন বললো– 'আমাদের গ্রেফতার করুন; বন্দী পালিয়ে গেছে!' তারা জানালো, বন্দীর দাবিতে তারা

তার হাতের বন্ধন খুলে দিয়েছিলো। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাদেরকে হেফাজতে নিয়ে নেন। কিন্তু ভয়ে-শংকায় তার ঘাম বেরিয়ে আসে। কেননা, আযর সাধারণ কোন বন্দী ছিলো না। সে সুলতান আইউবীর সমস্ত পরিকল্পনা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো। জয়-পরাজয় ঐ পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল ছিলো। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ সুলতান আইউবীকে জানাতে চাচ্ছিলেন না যে, ধৃত গোয়েন্দা হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং আপনার সব পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেছে। তবে সুলতানকে বিষয়টা না জানিয়েও উপায় নেই।

সংবাদটা শোনার পর সুলতানের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখ থেকে কোন কথাই বের হলো না। তিনি বসা থেকে উঠে তাঁবুর ভেতরে পায়চারি করতে শুরু করলেন। তৎকালের ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদী লিখেছেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবী চরম বিপদের সময়ও বিচলিত হতেন না। কিন্তু গুপ্তচরের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ শোনার পর তার চেহারার রক্ত উধাও হয়ে যায় এবং চোখ জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে। তিনি তাঁবুর ভেতরে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থেমে যান এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মহান আল্লাহ! এটা কি ইঙ্গিত যে, আমি এখান থেকে ফিরে যাবো? আপনার মহান সত্ত্বা কি আমার পাপ ক্ষমা করেনি? আমি তো কখনো অস্ত্র ত্যাগ করিনি। আমি কখনো পিছপা হইনি।'

তারপর তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। সম্ভবত তিনি অদৃশ্যের কোনো ইশারা লাভ করতেন, যা সেদিন এই পরিস্থিতিতেও পেয়েছিলেন। তিনি হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে বললেন– 'ঐ মোহাফেজদ্বয়কে বেশী শাস্তি দিও না। শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা পালাতে পারতো। কিন্তু তারা আমাদের নিকট চলে এসেছে। তাদেরকে শুধু ভুলের শাস্তি দেবে। সত্য বলা এবং সরলতার পুরস্কারও প্রদান করবে। সালারদেরকে ডাকো।' তার চেহারায় রওনক এবং চোখে চমক ফিরে আসে।

তিন সালার এসে হাজির হন। সুলতান আইউবী তাদেরকে বললেন– 'সেই গুপ্তচর পালিয়ে গেছে, যার কাছে আমাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ছিলো। সে যে মানচিত্রটা প্রস্তুত করেছিলো, সেটি আমাদের নিকট রয়ে গেছে বটে; কিন্তু সে বহু কিছু চোখে দেখে গেছে এবং আমরা দুশমনকে কোথায় নিয়ে লড়াতে চাই, সেই তথ্যও সে জেনে গেছে। ফলে দুশমনের জন্য আমরা যে ফাঁদ প্রস্তুত করেছিলাম, তা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তারা এখন পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। হয়তো তারা আমাদেরকে

অবরোধ করে ফেলবে এবং আমাদের রসদের পথ বন্ধ করে দেবে। আপনারা পরামর্শ দিন এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী। আমরা কি পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলবো, নাকি বহাল রাখবো।'

তিন সালার ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ব্যক্তি করেন। তারা সকলে একটি ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলা হোক। সুলতান আইউবী তাদের সঙ্গে একমত হলেন। তিনি বললেন- 'পরিকল্পনা পরিবর্তন করার জন্য সময় দরকার। আমাদের হাতে সময় নেই। আশংকা থাকে, এই রদবদলের মধ্যে যদি দুশমন হামলা করে বসে, তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। মুক্ত মাঠে মুখোমুখি লড়াই করার জন্য সৈন্যও অপ্রতুল।'

সিদ্ধান্ত হলো, পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে। গেরিলা বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হলো, যেন তারা ব্যাপকহারে অতর্কিত হামলা চালায় এবং দুশমনের সম্মিলিত কমান্ড ও তিন বাহিনীর কেন্দ্রের উপর গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করে। রসদের পথকে আরো বেশি নিরাপদ করা হবে। তিনি গেরিলা বাহিনীর সালারকে বললেন, আপনি সেই দলটিকে ফিরিয়ে আনুন, যাদেরকে মটকা ভাঙ্গার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিলো।

নতুন আদেশ নিয়ে সালার চলে যান। সুলতান আইউবী এই সিদ্ধান্ত আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রদান করেন বটে; কিন্তু মনটা তার অস্থির। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, পালিয়ে যাওয়া গোয়েন্দা তার সমস্ত পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছে। এখন জানা নেই, কী হবে?

কিছুক্ষণ পর বারোজন গেরিলার একটি বাহিনী সুলতানের সামনে হাজির হলো। খৃস্টানরা হালবের বাহিনীকে দাহ্য পদার্থ ভর্তি যে মটকাগুলো প্রেরণ করেছিলো, সেগুলো রণাঙ্গনে নিয়ে আসা হয়েছে। সুলতান আইউবীর গুপ্তচররা সেগুলোর অবস্থান জেনে নিয়েছে। সুলতান আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন, দুশমন যখন হামলা করবে, তখন মটকাগুলো ধ্বংস করে দেবে। তার জন্য বারোজন জানবাজ এবং উন্মাদ প্রকৃতির কমান্ডো নির্বাচন করা হয়েছিলো। এখন তাদেরকেই সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সুলতান তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এক গেরিলাকে দেখে তিনি মুচকি হেসে বললেন- 'আনতানূন! তুমি এই বাহিনীতে এসে পড়েছো?'

'আমাকে এই বাহিনীতেই আসা প্রয়োজন ছিলো'- আনতানূন বললো- 'আপনাকে বলেছিলাম, আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।'

'আমার প্রিয় বন্ধুগণ!'- সুলতান আইউবী গেরিলাদের উদ্দেশে বললেন-

'তোমরা এ যাবত বহু কুরবানী দিয়েছো। কিন্তু এখন দ্বীন ও জাতির ইজ্জত তোমাদের থেকে আরো বেশী ত্যাগ দাবি করছে। তোমরা যুদ্ধের গতি পাল্টে দিতে পারো। তোমাদেরকে টার্গেট বলে দেয়া হয়েছে। তোমরা যদি এগুলো ধ্বংস করে দিতে পারো, তাহলে অনাগত প্রজন্ম তোমাদেরকে স্মরণ করবে। তোমরা জানো, আমাদের সেনাসংখ্যা কম। দুশমনের বাহিনী তিনটি। তাদের থেকে নিজেদের বাহিনীকে তোমরা রক্ষা করতে পারো।'

'আমরা দ্বীন ও জাতিকে নিরাশ করবো না।' গেরিলাদের কমান্ডার বললো।

সুলতান আইউবী আরো কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়ে তাদেরকে বিদায় জানালেন।

পরদিন ভোর বেলা। এক ব্যক্তি ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে এসে উপস্থিত হয়। সুলতান আইউবী এখনো তাঁবুতে অবস্থান করছেন। অশ্বারোহী সংবাদ দেয়, শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসছে। এখন তারা এখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে। তাদের গতি হামাতের দিকে। ইত্যবসরে আরো এক আরোহী এসে পৌঁছে। তার সংবাদ হলো, ডানদিক থেকেও দুশমন আসছে। এই বাহিনীর গতি থেকে সুলতান আইউবী অনুমান করলেন, এরা ডান পার্শ্ব অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। এই দিকটা নিয়ে সুলতানের পেরেশানী ছিলো। এবার তিনি আরো বেশি অস্থির হয়ে ওঠেন। এই বাহিনীর সম্মুখ ভাগে অবস্থান করছে আযর, যে কিনা এখান থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে পালিয়েছিলো। সুলতান আইউবী বললেন– 'আযর গত রাতেই পৌঁছে গিয়েছিলো এবং তার তথ্য মোতাবেক দুশমন হামলা করে বসেছে।'

সুলতান আইউবী প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তাঁর দূত চারদিকে ছুটে চলে। হামাতের মধ্যস্থানে তাঁবু খাটানো আছে। সৈন্যরা তাঁবুতে অবস্থান করছে কিংবা এদিকে-ওদিক ঘোরাফেরা করছে, যেন দুশমন মনে করে, তারা প্রস্তুত নয়। তীরান্দাজ সৈনিকরা টিলার উপর প্রস্তুত হয়ে যায়।

তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে শত্রুবাহিনী। তাদের অগ্রগামী বাহিনী দেখতে পেলো, সুলতান আইউবীর তাঁবুগুলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তারা এই ভেবে দ্রুত এগিয়ে আসার জন্য পেছনে সংবাদ পাঠায় যে, তারা সুলতান আইউবীর বাহিনীকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গেছে।

সুলতান আইউবী একটি উঁচু টিলার উপর উঠে যান, যেখান থেকে চারদিকের সমস্ত দৃশ্য দেখা যায়। তিনি দেখলেন, গোমস্তগীনের বাহিনী সোজা শিং-এর দিকে এগিয়ে আসছে। সুলতান বিস্মিত হন। তিনি তাঁর সৈনিকদেরকে সেই সময় ঘোড়ায় জিন বাঁধার নির্দেশ দেন, যখন দুশমন একেবারে নিকটে

এসে পড়েছে। দুশমনের পদাতিক বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কয়েকটি তীর নিক্ষেপ করে। ওদিক থেকে ডাক-চিৎকার ভেসে আসে– 'পিষে ফেলো, একজনকেও জীবিত ছেড়ে দিও না, সালাহুদ্দীন আইউবীকে জীবিত ধরে ফেলো। তার মাথাটা কেটে ফেলো।'

সুলতান আইউবীর অশ্বারোহী বাহিনী কিছুটা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আবার পিছনে সরে আসে। পদাতিক ও আরোহী বাহিনী শত্রুবাহিনীর সম্মুখভাগের আক্রমণের মোকাবেলা করতে করতে পিছন দিকে সরে আসতে থাকে। এভাবে আক্রমণকারী প্রত্যেকে হামাতের সেই ফাঁদের ভেতরে এসে পড়ে, যেখানে সুলতান আইউবী তাদেরকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

টিলা-পর্বতবেষ্টিত এই ময়দানটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে দেড় মাইলের মতো। দুমশন যেইমাত্র তার ভেতরে প্রবেশ করলো, অমনি উভয় দিকের টিলার উপর থেকে তাদের উপর তীর বর্ষিত হতে শুরু করলো। দুশমনের ঘোড়াগুলো তীর বিদ্ধ হয়ে নিজেদেরই লোকদেরকে পিষতে পিষতে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে। শত্রু বাহিনীর কমান্ডার বুঝতেই পারলো না, এখানে তাঁবুগুলোর মধ্যে যে সৈনিকরা ছিলো, তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। সামনের টিলাগুলোর ভেতরে দিয়ে একটা পথ, যা উপত্যকার দিকে বেরিয়ে গেছে এবং সুলতান আইউবীর সৈন্যরা সেই পথেই লাপাত্তা হয়ে গেছে, তা তাদের জানা ছিলো না। ময়দানে তাঁবু খাটানো ছিলো, যার রশিগুলো শত্রু বাহিনীর জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিলো।

কিছুক্ষণ পর সলিতাওয়ালা অগ্নিতীর আসতে শুরু করে। এই তীর তাঁবুগুলোকে জ্বালিয়ে দিতে শুরু করে। তারা তাঁবুগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। রণাঙ্গন থেকে অগ্নিশিখা উঠতে শুরু করে। দুশমনের কমান্ডারদের জন্য বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের দলবদ্ধতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ঘোড়াগুলোর হ্রেষারব, আহতদের আর্ত-চিৎকার এবং কমান্ডারদের হাঁক-ডাক এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যেনো এখানে প্রলয় ঘটে গেছে।

প্রায় দু'ঘন্টা ধরে দুশমনের কমান্ডাররা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে তাদের সৈনিকদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু তারা সুলতান আইউবীর তীরান্দাজদের হাতে হতাহত হতেই থাকে। কিন্তু তারা তো মুসলমান সৈনিক। সামরিক চেতনা তাদেরকে পিছপা হতে দিচ্ছে না। তাদের কয়েকজন সৈনিক যে পাহাড়টির উপর থেকে তীর আসছিলো,

তাতে আরোহনের চেষ্টা করে। কিন্তু এটা ছিলো নিছক তাদের সাহসিকতা প্রদর্শন। কিন্তু উপর থেকে ধেয়ে আসা তীর তাদেরকে পাথরের ন্যায় গড়িয়ে নীচে ফেলে দেয়।

অবশেষে শত্রু কমান্ডাররা তাদের সৈনিকদেরকে পেছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু খানিকটা পিছু হটার পর তারা টের পেলো, পেছনে সুলতান আইউবীর ফৌজ দাঁড়িয়ে আছে। ঘোষণা শুরু করলো– 'অস্ত্র ফেলে দাও। তোমরা আমাদের ভাই। আমরা তোমাদেরকে হত্যা করবো না।'

ঘোষণার তালে তালে আইউবী বাহিনীর সেনারা সম্মুখে অগ্রসর হতে এবং চারদিক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। চারদিক থেকে অবরুদ্ধ গোমস্তগীন বাহিনীর এখন আর লড়াই করার সাধ্য নেই। তাদের অর্ধেকই হতাহত হয়েছে। যারা জীবিত আছে, তারাও চরম ভীতসন্ত্রস্ত। তারা এসেছিলো অন্য আশা নিয়ে। তাদের বলা হয়েছিলো, এই জয় অতি সহজে হবে। কিন্তু রণাঙ্গন তাদের জন্য জাহান্নামে পরিণত হলো।

তারা অস্ত্র সমর্পণ করতে শুরু করে।

সুলতান আইউবীর এই কৌশল সফল হয়েছে বটে; কিন্তু অপরদিকে দুশমন তাকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। তা হলো ডান পার্শ্বের সেই ময়দান, যার ব্যাপারে পূর্ব থেকেই তিনি চিন্তিত ছিলেন। ওদিক থেকে শত্রুবাহিনী মরুঝড়ের ন্যায় এগিয়ে আসছে। তার মোকাবেলায় সুলতান আইউবীর ক্ষুদ্র দু'টি ইউনিট। আক্রমণকারীদের পতাকা নজরে পড়তে শুরু করে। এটি হাল্‌বের ফৌজ। সুলতান আইউবী হাল্‌ব অবরোধ করে এই বাহিনীর পরাকাষ্ঠা দেখেছিলেন। তাঁর জানা আছে, এই বাহিনী গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনের বাহিনী থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। সামরিক যোগ্যতা ও বীরত্বের দিক থেকে এই ফৌজ সত্যিই প্রশংসাহ্য। সুলতান আইউবী কখনো আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলেন, তাঁর বাহিনী এই বাহিনীকে প্রতিহত করতে পারবে না। আবার রিজার্ভ বাহিনীকেও তিনি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন না। ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কাছে দণ্ডায়মান সালারকে নির্দেশনা প্রদান করে পাঠিয়ে দেন।

সুলতান আইউবী রিজার্ভ বাহিনী ছাড়াও বাছাইকরা একটি বাহিনীকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি ওদিককার পাহাড়ের উপর

মোতায়েন তীরান্দাজদের কমান্ডারকে নির্দেশ দিলেন, তোমার শিং এলাকা থেকে সরে পেছনদিকে মুখ ফিরাও এবং ঐ পজিশনেই নতুন আক্রমণকারীদেরকে টার্গেট করো। তিনি তাঁর বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডারকে নির্দেশ দিলেন, তোমার বাহিনীকে ময়দানে নিয়ে আসো; আমি নিজে তাদের কমান্ড করবো। স্বল্প সময়ের মধ্যে সুলতান আইউবী পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নেমে আসেন। তাঁর বাহিনী প্রস্তুত দণ্ডায়মান। তিনিও ময়দানে অবতীর্ণ হোন।

সুলতান আইউবী যুদ্ধের ময়দানে তাঁর পতাকা উড়ালেন না, যেন দুশমন বুঝতে না পারে তিনি কোথায় আছেন। কিন্তু আজ তিনি সেই নিয়মে ব্যত্যয় ঘটালেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দেন, 'আমার পতাকা উঁচু করে রাখো।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'এই যুদ্ধে পতাকা উড়িয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁর বাহিনীকে বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, সুলতান স্বয়ং তাদের কমান্ড করছেন। পাশাপাশি হাল্‌বের আক্রমণকারী শত্রুসেনাদেরকে জানান দিতে চেয়েছিলেন, তাদের মোকাবেলায় সুলতান আইউবী স্বয়ং ময়দানে।'

সুলতান আইউবী অতিদ্রুত অশ্বারোহী সৈন্যদের এভাবে বিন্যস্ত করে ফেলেন যে, দু'টি ঘোড়া সম্মুখে, চারটি পিছনে। তার পিছনে ছয়টি। তারপর আটটি। অবশিষ্ট সকল সৈন্য আট আটজন করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে চলন্ত অবস্থায় সম্পন্ন করেছেন। সম্মুখ থেকে দুশমন সারিবদ্ধভাবে বিস্তৃত হয়ে এগিয়ে আসছে। নিকটে গিয়ে সুলতান আইউবীর অশ্বারোহী সেনারাও বিন্যস্ত হয়ে যায়। মোকাবেলাটা এরূপ হয় যে, সুলতান আইউবীর অশ্বারোহীরা একটি পেরেকের ন্যায় দুশমনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। সুলতান আইউবী হলেন এই বিন্যাসের মধ্যখানে। দুশমনের অশ্বারোহীরা ডান-বাম থেকে সম্মুখ দিকে এগিয়ে যায়। পথে যাকেই পেলো আঘাতে আহত করতে থাকে।

শত্রুবাহিনী আরোহী সেনাদের পেছনে পদাতিক বাহিনী। সুলতান আইউবী সম্মুখে বেশ দূরে এবং সঙ্গে সঙ্গে সারির অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে পদাতিক ইউনিটের উপর হামলা করে বসেন। পদাতিক শত্রুসেনারা যথাসাধ্য মোকাবেলা করে। কিন্তু আইউবী বাহিনীর ঘোড়া এবং আরোহী সেনারা তাদের পিষে মারতে মারতে ও তারবারীর আঘাত হানতে হানতে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সুলতান আইউবীর পদাতিক বাহিনীটি ছিলো

সম্মুখে। তারাও দুশমনের অশ্বারোহী বাহিনীর মোকাবেলা করে। পিছন দিক থেকে সুলতান আইউবী হঠাৎ আক্রমণ করে বসেন। নিকটস্থ পাহাড়গুলোর উপর থেকে তীরান্দাজরা তীরবর্ষণ করতে শুরু করে। কিন্তু এতোকিছুর পরও হাল্‌বের সৈন্যদের মনোবল অটুট থাকে। সুলতান আইউবী তাঁর কমান্ড বিক্ষিপ্ত হতে দিলেন না। লড়াই অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী এবং তীব্র আকার ধারণ করলো।

সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'সুলতান আইউবী যদি এই যুদ্ধের কমান্ড নিজে না করতেন, তাহলে এই বাহিনীর দ্বারাই তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যেতো।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ ইতিহাসবিদদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর রোজনামচা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই আক্রমণকারী বাহিনীটি হাল্‌বের নয়– মসুলের ফৌজ ছিলো এবং সালার মুজাফফর উদ্দীন ইবনে যাইনুদ্দীন তার সেনাপতিত্ব করছিলো। তাঁর ভাষ্য মতে, এই কমান্ড এতো নিপুণ ছিলো যে, মুজাফফর উদ্দীন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এই বাহিনীটিকে উপড়ে ফেলে দিয়েছিলো। নেতৃত্বের বিচক্ষণতার কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, মুজাফফর উদ্দীন একসময় সুলতান সালাউদ্দীন আইউবীর সালার ছিলো এবং এই বিদ্যা সে সুলতান আইউবীর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেছিলো। সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের পাশাপাশি তার অতিরিক্ত সুবিধা এই ছিলো যে, সে সুলতান আইউবীর কৌশল ভালভাবেই বুঝতো।

সুলতান আইউবী দূতদের সঙ্গে রাখতেন এবং তাদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি এমন কৌশল প্রয়োগ করেন যে, শত্রু বাহিনীকে তিনি সেই পর্বতের নিকট নিয়ে যান, যার উপর তার তীরান্দাজরা প্রস্তুত ছিলো। তীরান্দাজরা সংখ্যায় কম হলেও কাজ অনেক আঞ্জাম দেয়। সুলতান তাঁর সেনাসংখ্যার স্বল্পতায় এতো অনুভূতি ছিলো যে, তাঁকে তাঁর প্রথম পরিকল্পনাটি পাল্টে ফেলতে হয়। তিনি রিজার্ভ বাহিনীকে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ঠিক এমন মুহূর্তে এক দূত তাঁকে সংবাদ জানায় যে, একদিক থেকে আপনার চার-পাঁচশত অশ্বারোহী আসছে। সুলতান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, তারা কোন্ বাহিনীর এবং কেন আসছে? তিনি যুদ্ধের ময়দানে শৃঙ্খলার অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। অথচ এই ময়দানে তাঁর সাহায্যের তীব্র প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর অনুমতি ও নির্দেশনাবিহীন একটি পদক্ষেপ তার

পছন্দ হয়নি। তিনি দূতকে বললেন– 'এক্ষুণি যাও। জিজ্ঞেস করে আসো, তোমরা কারা?'

দূতের নিয়ে আসা সংবাদ শুনে সুলতান আইউবী হতভম্ভ হয়ে পড়েন। এরা চারশত মেয়ে এবং একশত স্বেচ্ছাসেবীর বাহিনী। হাজ্জাজ আবূ ওয়াক্কাস তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তারা সালার শামসুদ্দীনের অনুমতিক্রমে এসেছে। এ হলো সংবাদ।

সুলতান আইউবী তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এই পাঁচশত অশ্বারোহী যে ধারায় অগ্রসর হয়েছে, তাতে সুলতান বুঝে ফেলেন, কমান্ড সালার শামসুদ্দীন নিজেই করছেন। এই বাহিনীটি শত্রুকে পাহাড়ের দিকে ঠেলে নিয়ে আসছিলো। তারা দুশমনের অগ্রযাত্রা ব্যহত করে দিয়েছে।

মুসলমান মুসলমানের হাতে মারা যাচ্ছে। 'আল্লাহু আকবর' তাকবীর ধ্বনি 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনির সঙ্গে সংঘর্ষিত হচ্ছে। জমিন কাঁপছে। আকাশ নীরব দর্শকের ন্যায় তাকিয়ে আছে। খৃষ্টানরা তামাশা দেখছে। ইতিহাস নির্বিকার হয়ে আছে। মেয়েরা ভাইয়ের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। রক্তের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। জাতির মর্যাদা অশ্বখুরের নীচে পদদলিত হচ্ছে। আল্লাহ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন।

সারাদিনকার যুদ্ধের পরিণতি এই দাঁড়ালো যে, দুশমনের মনোবল নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং তারা অস্ত্র ত্যাগ করতে শুরু করেছে। তারা এখন আঁধা অবরোধে অবরুদ্ধ। তাদের সেনাপতি বেরিয়ে গেছে। আহতদের আর্ত-চিৎকারে রাতের নীরব পরিবেশ প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। সারাদিনের যুদ্ধক্লান্ত নারী সৈনিকরা আহতদের তুলে আনতে থাকে। রাত পোহাবার পর ময়দানের এক ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়লো। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত লাশের পর লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। অসংখ্য মৃত ঘোড়া এদিক-ওদিক পড়ে আছে। যুদ্ধবন্দীদেরকে দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লাশগুলোর মধ্যে নারী সৈনিকদের লাশও আছে। তাদেরকেও তুলে আনা হলো।

'রাজত্বের নেশা মানুষকে এমন এক স্তরে নামিয়ে নিয়ে আসে, সেখানে একজন মানুষ তার জাতিকে দু'টি দেহে বিভক্ত করে তাদেরকে পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে দেয়'– সুলতান আইউবী ময়দানের দৃশ্য দেখে বললেন– 'ভাই তার বোনের সম্ভ্রম হরণ করছে। আমরা যদি রাজত্বের মোহ থেকে মুক্ত হতে না পারি, তাহলে কাফেররা এই জাতিকে আপসে যুদ্ধ করিয়ে জাতিরই কর্ণধারদের হাতে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

হামাত শিং ও তার পার্শ্ব এলাকার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অন্যত্র এখানো যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের রাতে বারো কমান্ডো হাল্‌ব বাহিনীর সেই স্থানটিতে পৌঁছে যায়, যেখানে দাহ্য পদার্থের মটকাগুলো রাখা আছে।

হাল্‌বের একটি বাহিনী এখনো রিজার্ভ অবস্থায় আছে। তারা সংবাদ পেয়ে গেছে, তাদের দুই বাহিনীর হামলা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আক্রমণে সাফল্য অর্জনের জন্য আগুন নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

সুলতান আইউবীর বারো কমান্ডো তাদের টার্গেট ঠিক করে নিয়েছে। তাদের চার-পাঁচজনের নিকট ধনুক এবং সলিতাওয়ালা তীর আছে। তারা ঘোড়া থেকে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সলিতায় আগুন ধরিয়ে তীর নিক্ষেপ করে। আগুন লাগানো সলিতা গিয়ে মটকার ডিপোতে নিক্ষিপ্ত হয়। মটকাগুলোতে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায়। আগুনের লেলিহান শিখায় আকাশ ছেয়ে যায়। শত্রু শিবিরে হৈ-হুল্লোড় পড়ে যায়।

কমান্ডোদের জানানো হয়েছিলো, মটকার সংখ্যা অনেক। সেখানে হুলস্থুল শুরু হয়ে গেলে কমান্ডোরা পুনরায় আঘাত হানে। আগুনের শিখায় স্থানটি আলোকিত হয়ে যায়। কমান্ডোরা নিরাপদ মটকাগুলোর অবস্থান দেখতে পায়। তারা আগেই বর্শার সঙ্গে হাতুড়ীর ন্যায় লোহার টুকরো বেঁধে রেখেছিলো। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসেই তারা মটকাগুলো পিটিয়ে ভাঙ্গতে শুরু করে। শত্রু সেনারা তাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। এ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। বারোজন জানবাজ সেনা হাজার হাজার শত্রুসেনার নাগালের মধ্যে যুদ্ধ করছে। আগুনের শিখা সবদিক ছড়িয়ে পড়ে। শিবিরময় ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। উট-ঘোড়াগুলো রশি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পালাতে শুরু করে।

সুলতান আইউবীর ফৌজের অবস্থান এলাকায় পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি চিৎকার করছে– 'আকাশ জ্বলছে। খোদার গজব নাযিল হচ্ছে।'

সংবাদ পেয়ে সুলতান আইউবী দৌড়ে একটি টিলার উপরে উঠে যান। দুশমনের শিবিরের দিককার আকাশ লালে লাল দেখে তিনি নিজের অজ্ঞাতে বলে ওঠেন– 'শাবাশ! শাবাশ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিনিময় দান করুন।'

এখনই পাল্টা হামলা চালাবে সেই শক্তি মসুলের বাহিনীর শেষ হয়ে গেছে। সুলতান আইউবীর কমান্ডো সেনারা তৎপর হয়ে ওঠেছে। তারা তিন রাত গোমস্তগীন, সাইফুদ্দীন ও আল-মালিকুস সালিহ'র শিবিরগুলোতে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালায় যে, তাদের কেন্দ্র পর্যন্ত হেলে ওঠেছে। অবশেষে তারা অন্য কোন দিক থেকে আক্রমণ করার নির্দেশ

প্রদান করে। ঠিক সে সময় তারা জানতে পারে, পেছনে সুলতান আইউবীর ফৌজ এসে পড়েছে।

এদিকে সুলতান আইউবী তাঁর বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করে দুশমনকে বেহাল করে দেন। তিনি হত্যাও করছেন না, ছেড়ে দিচ্ছেনও না। এই যুদ্ধ 'আঘাত করো আর পালাও' নীতি অনুযায়ী লড়া হচ্ছিলো। শত্রু বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে এবং অস্ত্র ত্যাগ করতে শুরু করে। সুলতান আইউবীর লক্ষ্যও ছিলো এই।

৫৭০ হিজরীর রমযান মোতাবেক ১১৭৫ সালের ১৩ এপ্রিল। সাহরী খাওয়ার পর সুলতান আইউবী তার পরিকল্পনার শেষ অংশটি কার্যকর করেন, যার দিক-নির্দেশনা তিনি একদিন আগেই দিয়ে রেখেছেন। তিনি খোলাখুলি আক্রমণ করে বসেন। উল্লেখযোগ্য সংঘাত হলো না। তিনি গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনের তাঁবু এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যান। কিন্তু তারা দু'জনই উধাও। তারা এমন কাপুষের ন্যায় পালিয়ে গেছে যে, তাদের 'জঙ্গলের মঙ্গল' তাঁবুগুলো যেমনটা তেমন পড়ে আছে। হেরেমের নারী, গায়ক-গায়িকা এবং তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো যথাস্থানে রয়েছে। সুলতান আইউবীর ফৌজ দেখে তারা আতঙ্কিত মনে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করে। তাদেরকে ধরে সুলতান আইউবীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সুলতান তাদের প্রত্যেককে মুক্তি দিয়ে দামেস্ক পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। মসুলের গবর্নর সাইফুদ্দীনের তাঁবুটা সবচেয়ে আকর্ষণীয়। মেয়েদের ছাড়া সেখানে সুন্দর সুন্দর পিঞ্জিরাও ছিলো, যেগুলোতে রং-বেরংয়ের পাখি বাঁধা ছিলো।

সে রাতে আরো একটি মেয়েকে সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, যে কিনা শত্রু বাহিনীর সেই শিবিরটিতে লাশ শনাক্ত করে ফিরছিলো, যার উপর সুলতান আইউবীর কমান্ডো সেনারা রাতে অতর্কিত হামলা করে দাহ্য পদার্থের মটকা ধ্বংস করেছিলো। সুলতান আইউবী মেয়েটিকে চিনে ফেললেন এবং বললেন– 'তুমি আমার গোয়েন্দা আনতানূনের সঙ্গে হাররান থেকে এসেছিলে?'

'জি হ্যাঁ'– মেয়েটি বললো– 'আমার নাম ফাতেমা। আমি নারী ফৌজের সঙ্গে দামেস্কে থেকে এসেছি।' মেয়েটি আহত। সে বলতে লাগলো– 'আমি জানতে পেরেছি আনতানূন এখানে গেরিলা হামলায় অংশ নিয়েছিলো। আমি তাঁর লাশ অনুসন্ধান করছিলাম।'

'লাভ নেই।' সুলতান আইউবী বললেন।

'সে-ও বলতো, গেরিলা সৈন্যের লাশ পাওয়া যায় না'– ফাতেমা উদাস কণ্ঠে বললো– 'সে আমাকে বলেছিলো, আসো, আমরা নিজ নিজ কর্তব্যে কুরবান হয়ে যাই। আমার খুশি লাগছে এ জন্য যে, আনতানূন তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করেছে। কিন্তু আমার কর্তব্য এখনো অনাদায়ী রয়ে গেছে। আমি গোমস্তগীনকে হত্যা করতে এসেছিলাম।'

মেয়েটির আবেগময় অবস্থা দেখার পর কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারলো না। সুলতান আইউবী বললেন– 'দামেস্ক থেকে যে মেয়েগুলো এসেছিলো, তাদেরকে পাঠিয়ে দাও।' তারা দুশমনকে পরাজিত করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। এ সময় সাহায্যের কতো প্রয়োজন ছিলো, আমিই তা জানি। এই মেয়েগুলো যেন অদৃশ্য থেকে এসেছিলো; কিন্তু আমি তাদেরকে সঙ্গে রাখতে পারি না।'

মেয়েদের প্রতিবাদ এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে দামেস্কে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সুলতান আইউবী এখন আর কোথাও থামতে চাচ্ছেন না। তিনি দুশমনকে যে পরাজয় দান করেছেন, তা থেকে তিনি পুরোপুরি ফায়দা তুলতে চাচ্ছেন। তিনি নির্দেশ দেন, সমস্ত ফৌজকে হাল্‌ব অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত করো। তিনি সালারদেরকে পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করছেন।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেলো, এক অশ্বারোহী এদিকে ছুটে আসছে। তার হাতে বর্শা। বর্শার আগায় কি একটি বস্তু গাঁথা। লোকটি নিকটে চলে আসলে সুলতান আইউবীর দেহরক্ষীরা তাকে থামিয়ে দেয়। সুলতান দেখলেন, তার বর্শার আগায় গেঁথে রাখা বস্তুটা মানুষের মাথা। তিনি তাকে সম্মুখে আসার অনুমতি প্রদান করেন।

লোকটি আযর ইবনে আব্বাস। সেই গুপ্তচর, যাকে দামেস্ক নিয়ে যাওয়ার পথে যে রক্ষীদের হেফাজত থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সে বর্শা থেকে মাথাটা খুলে সুলতান আইউবীর পায়ে নিক্ষেপ করে বললো– 'আমি আপনার পলাতক কয়েদী। আমি নিবেদন করেছিলাম, আমাকে ক্ষমা করে দিন; আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করবো। কিন্তু আপনি আমার আবেদন মঞ্জুর করেননি। আমি পথে চিন্তা করলাম, আমাকে ইসলামের বিপক্ষে পথে নামিয়েছেন আমার পিতা।

তিনিই আমার অন্তরে সম্পদের মোহ সৃষ্টি করেছেন। আমি শুধু এই কাজের জন্য পালিয়েছিলাম। আমি হালব গেলাম। পিতাকে হত্যা করলাম। তার মাথা কেটে এনে আপনার পায়ে অর্পন করলাম। এবার বলুন, আমার পাপের কাফফারা আদায় হলো কিনা। না হলে আপনি আমাকে আবারো বন্দী করুন এবং এভাবে আমার মাথাটাও কেটে ছুঁড়ে ফেলুন।'

সুলতান আইউবী আযরকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর হাতে তুলে দিয়ে বললেন– 'এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন। লোকটি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছে। আমি ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না, দুশমনের গুপ্তচর পূর্ণ তথ্য নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা আমাদের ফাঁদে এসে পা দিলো কেন! এবার বুঝলাম, আযর পালিয়ে সংবাদ জানাতে যায়নি– গিয়েছিলো পিতাকে খুন করতে!'

পরদিন। সুলতান আইউবী তাঁবুতে ঘুমিয়ে আছেন। বাইরে অনেকগুলো লোকের কথোপকথনে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। সুলতান দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন– 'বাইরে কী হচ্ছে?' দারোয়ান বললো– 'আপনার মোহাফেজদের উর্দি পরে এবং আপনার ঝাণ্ডা উঁচিয়ে নয়জন লোক এসেছে। বলছে, তারা দামেস্ক থেকে এসেছে। তারা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আপনার রক্ষী বাহিনীতে কাজ করতে চায়। বাঁধা দেয়া হলে তারা বললো, তারা বহুদূর থেকে পরম ভক্তি ও জযবা নিয়ে এসেছে। তারা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।'

এরা শেখ সান্নান ও গোমস্তগীনের প্রেরিত সেই ঘাতকচক্র। কৌশল তাদের সফল। সুলতান আইউবী দারোয়ানকে বললেন– 'তাদেরকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও।'

তাদের হাতের বর্শাগুলো বাইরে রেখে দেয়া হয়েছে। তারা সুলতান আইউবীর তাঁবুতে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে যার যার খঞ্জর ও তরবারী বের করে হাতে নেয়। সুলতান আইউবীর দু'জন রক্ষীও তাদের সঙ্গে প্রবেশ করে। এক ঘাতক সুলতান আইউবীর উপর হামলা করে বসে। সুলতান দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন করে আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি নিজের তরবারীটা হাতে তুলে নেন। প্রথম আঘাতেই আক্রমণকারী দুর্বৃত্তের পেট চিড়ে ফেলেন। তাঁবুর ভেতরের স্থানটা সংকীর্ণ। অন্যান্য ঘাতকরাও সুলতানের উপর আক্রমণ করে। রক্ষীদ্বয় শক্ত হাতে তাদের মোকাবেলা করে। বাহির থেকে অন্যান্য রক্ষীরাও এসে পড়ে।

সুলতান আইউবীর তাঁবুতে তরবারী ও খঞ্জরের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়।

দেহরক্ষীরা ঘাতকদেরকে নিজেদের সঙ্গে ব্যস্ত করে ফেলে। লড়াই করতে করতে তারা তাঁবুর বাইরে চলে আসে। সুলতান আইউবীর লম্বা তরবারী কাউকে কাছে আসতে দিচ্ছে না। পাঁচ-ছয়জন ঘাতক প্রাণ হারায়। অন্যরা টিকতে না পেরে পালাতে উদ্যত হয়। তাদেরকে জীবিত ধরে ফেলা হলো।

ইত্যবসরে তাঁবুর ভেতর থেকে এক ঘাতক সদস্য বেরিয়ে আসে। তার পোশাক রক্তরঞ্জিত। সুলতান আইউবীর পিঠটা ছিলো তার দিকে। সুযোগ বুঝে সে সুলতানের উপর পিছন থেকে আঘাত হানতে উদ্যত হয়। এক দেহরক্ষী যথাসময়ে ঘটনাটা দেখে ফেলে। সে চিৎকার করে ওঠে– 'নীচে সুলতান!' বলেই সে আক্রমণকারীর দিকে ছুটে যায়। সুলতান আইউবী সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েন। ঘাতকের তরবারী বাতাসে আঘাত হেনে সুলতানের উপর আক্রমণ করে। দেহরক্ষী ঘাতক সদস্যের পাজরে বর্শা সেঁধিয়ে দেয়। লোকটা পূর্ব থেকেই আহত ছিলো। এবার আঘাত খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ও মারা যায়।

সুলতান আইউবী এই আক্রমণ থেকেও প্রাণে রক্ষা পেয়ে যান।

শেখ সান্নান ও গোমস্তগীন প্রেরিত এই নয় ঘাতক সদস্য শপথ করে এসেছিলো, হয়তো তারা সুলতান আইউবীকে হত্যা করবে, অন্যথায় জীবন নিয়ে ফিরবে না। তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করতে পারেনি। তবে জীবিতও ফেরত যেতে পারেনি। যারা আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে বেঁচে গিয়েছিলো, সুলতান আইউবী তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

দৃষ্টির আড়ালে

সুলতান সালাউদ্দীন আইউবীর এক সালার আহার পরবর্তী আসরে কোনো এক যুদ্ধের আলোচনা করছিলেন। এক সৈনিকের বীরত্বের আলোচনা উঠলো। সুলতান আইউবী বললেন–

'কিন্তু ইতিহাসে নাম আসবে শুধু আপনার আর আমার। এটা ইতিহাস রচয়িতাদের চরম অবিচার যে, তারা সুলতান আর সালারের নীচের আর কারো প্রতি চোখ তুলেও তাকায় না। জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে বটে; কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের আত্মত্যাগ ছাড়া জয় সূচিত হয় না। আমাদের জানবাজ সৈনিকরা দুশমনের কাছে গিয়ে যদি তাদের আপন হয়ে যায়, তাহলে আমরা তাদের কী করতে পারবো? যুদ্ধের সময় সৈনিকরা লড়াই করার পরিবর্তে যদি নিজের জীবনের চিন্তা বেশী করে, তাহলে আমরা কিভাবে বিজয় অর্জন করবো? ইনসাফের দাবি হলো, ইতিহাসে আমাদের সেই সৈনিকদের কথাও উল্লেখ থাকতে হবে, যারা এক একজন দশ দশজন শত্রুসেনার মোকাবেলা করে বিজয় ছিনিয়ে আনছে এবং জাতীয় পতাকা অবনমিত হতে দিচ্ছে না। এই সৈনিকরা যদি কখনো পরাজিত হয়, হবে আপনার-আমার অযোগ্যতার কারণে। কিংবা তাদেরকে সেই গাদ্দার ও ঈমান নিলামকারীরা পরাজয়ের মুখে ঠেলে দেবে, যারা আপন সেজে শত্রুর হয়ে কাজ করছে।'

'আচ্ছা, আল্লাহ্ আমাদেরকে কোন্ পাপের শাস্তি প্রদান করছেন যে, তিনি আমাদের মাঝে গাদ্দার সৃষ্টি করে দিচ্ছেন?' আসরের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উত্তেজিত কণ্ঠে বলো উঠলো।

'আমি আলিম নই যে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তবে সম্ভবত আল্লাহ গাদ্দারের মাধ্যমে আমাদের সদা শংকিত করে রাখতে চাচ্ছেন, যাতে আমরা প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকি এবং একের পর এক বিজয় অর্জন করে প্রবঞ্চিত না হয়ে পড়ি। তবে আল্লাহর প্রকৃত ইচ্ছা কি, তা তিনিই জানেন। আমার ভয় হচ্ছে, ঈমান-বিক্রেতারা কোন না কোন কালে ইসলামের মর্যাদাকে ডুবিয়ে ছাড়বে। খৃস্টানদের প্রত্যয় আপনার অজানা নয়

যে, তাদের যুদ্ধ আপনার-আমার বিরুদ্ধে নয়– ইসলামের বিরুদ্ধে। তাদের ঘোষণা হলো, যতোদিন পর্যন্ত ক্রুশের অস্তিত্ব থাকবে, তারা চাঁদ-তারার বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকবে। এই প্রত্যয় তারা অনাগত প্রজন্মের জন্যও রেখে যাবে। আমি চাই, আমাদের সেই সাধারণ সৈনিকদের জীবনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকুক, যারা উত্তর মিশরের মরু প্রান্তরে, হামাতের বরফ-ঢাকা উপত্যকায় লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। আমি চাই, সেই জানবাজ গেরিলাদের কথাও ইতিহাসে লিখে রাখা হোক, যারা দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে বিজয় কেড়ে এনেছে, যা সমগ্র বাহিনীর পক্ষেও সম্ভব ছিলো না। এদের ক'জন জীবন নিয়ে ফিরে আসে? দশজনের মধ্য থেকে একজন! তাও আসে আহত হয়ে।'

'হ্যাঁ, মোহতারাম সুলতান!'– সালার বললেন– 'এ এক মূল্যবান সম্পদ, যা আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে যাবো। বীরত্বের কাহিনী পাঠ করে জাতিসমূহ বেঁচে থাকে।'

'তুমি সম্ভবত জানো না, আমাদের সৈনিকরা দেশ থেকে অনেক দূরে জাতির দৃষ্টির আড়ালে এমন যুদ্ধ লড়ে যাচ্ছে, যার নির্দেশ আমরা তাদেরকে দেইনি।'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তাদের উপর তাদের ধর্মের মর্যাদাবোধ জাগ্রত থাকে। তাদের নিজেদের জীবন বলতে কিছু থাকে না। তাদের কোনো ব্যক্তিসত্ত্বা নেই। তারা দুশমনের কব্জায় পড়েও স্বাধীন থাকে। জাতি যখন বিজয় অর্জন করে, তখন তারা তাদের সম্পর্কে অনবহিত থাকে। তারা পর্দার আড়ালে থেকে বিস্ময়কর ও অভিনব পদ্ধতিতে লড়াই করে জাতির নাম উজ্জ্বল করে থাকে।'

সে যুগের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে এরূপ জনাকয়েক সৈনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের আলোচনা সুলতান আইউবী করেছিলেন। তাদের একজনের নাম আমর দরবেশ। লোকটি সুদানী মুসলমান। উপরে উল্লেখিত হয়েছে যে, সুলতান আইউবীর ভাই তকিউদ্দীন সুদানের সেনা অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা দুশমনের প্রতারণার শিকার হয়ে সুদানের মরু অঞ্চলে এতো দূরে চলে গিয়েছিলো যে, সে পর্যন্ত রসদের সরবরাহ বজায় রাখা সম্ভব ছিলো না। দুশমন তাদের রসদের পথ বন্ধ করে দেয় এবং তকিউদ্দীনের বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে তাদের কেন্দ্রীয় কমান্ড থেকে বিচ্ছন্ন করে দিয়েছিলো। তাতে ইসলামী বাহিনীর অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছিলো। অগ্রযাত্রার আশা তো শেষ হয়েই গিয়েছিলো। এমনকি পিছপা হওয়াও সম্ভব ছিলো না। বহু সৈন্য বন্দীত্ব বরণ করে। তাদের মধ্যে তকিউদ্দীনের দু' তিনজন নায়েব, সালার এবং কমান্ডারও ছিলেন।

এই বন্দীদের মধ্যে মিশরী এবং বাগদাদীদের সংখ্যা ছিলো বেশী। কয়েকজন সুদানী মুসলমানও ছিলো। শেষে সুলতান আইউবী তার সামরিক দক্ষতা এবং অস্বাভাবিক বিচক্ষণতার বিনিময়ে তকিউদ্দীনের বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে সুদান থেকে বের করে এনেছিলেন। তারপর তিনি এই বার্তাসহ সুদানীদের নিকট দূত প্রেরণ করেন যে, আমার যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দাও। সুদানীরা আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, সুলতান আইউবীর নিকট তাদের কোনো বন্দী ছিলো না। তারা বন্দীদের বিনিময়ে মিশরের কিছু ভূখণ্ড দাবি করে। সুলতান আইউবী জবাব দেন– 'তোমরা আমাকে ও আমার সন্তানদের ফাঁসি দিয়ে দাও। তবু আমি সালতানাতে ইসলামিয়ার এক ইঞ্চি ভূমি তোমাদেরকে দেবো না। আমার সৈনিকরা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান। তারা জাতির ইজ্জতের জন্য জীবন কুরবান করতে জানে।'

তারপর সুদান সরকার হাবশীদের দ্বারা মিশর আক্রমণ করায়। এই আক্রমণ অভিযানে অংশগ্রহণকারী একজন হাবশীও সুদান ফিরে যেতে পারেনি। যারা জীবিত ছিলো, তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। আশা ছিলো, সুদানীরা বন্দীদের মুক্তির দাবি জানাবে। কিন্তু তারা কোনো দূত প্রেরণ করেনি। এই হাবশীদেরকে তারা ধোঁকা দিয়ে মিশর এনেছিলো। এরা তাদের নিয়মিত সৈনিক ছিলো না। সুলতান আইউবী এই হাবশী কয়েদীদেরকে তার সেনাবাহিনীর শ্রমিক বানিয়ে নেন। তাদের দ্বারা মাটি খনন, বোঝা বহন এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ নেয়া হতো।

সুদানীরা সুলতান আইউবীর সৈন্যদেরকে মুক্তি না দেয়ার মূল কারণ ছিলো, তারা তাদেরকে সুদানী ফৌজে যোগ দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলো। সুদানীদের নিকট খৃস্টান উপদেষ্টা ছিলো। তারাই তাদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছিলো। মিশরী সৈন্যদেরকে ফুঁসলিয়ে সুদানী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার পরিকল্পনাও তাদেরই শেখানো ছিলো। তারা কতজন মিশরী সৈনিককে এভাবে দলে ভেড়াতে সক্ষম হয়েছিলো, ইতিহাস তার সংখ্যা জানাতে অপারগ। তবে সুদানীদের প্রতি ভালোবাসার অস্ত্র যাকেই ঘায়েল করতে ব্যর্থ হয়েছিলো, তাকেই অত্যন্ত নির্দয় ও নির্মম নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে হত্যা করেছিলো, সে তথ্য প্রমাণিত।

এই কয়েদীদের মধ্যে ইসহাক নামক এক সেনা কর্মকর্তা ছিলেন, যিনি সুলতান আইউবীর কোন এক সেনা ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন। তিনি ছিলেন সুদানের অধিবাসী। যৌবনেই মিশরী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। সুদানের

এক পাহাড়ী এলাকায় কিছু মুসলমানের বাস ছিলো। যাদের সংখ্যা চার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে। তাদের বিভিন্ন গোত্র ছিলো। কিন্তু ইসলাম তাদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করে রেখেছিলো। সবক'টি গোত্রের কমান্ডারদের একটি পঞ্চায়েত ছিলো। সকল গোত্রের সব মানুষ এই পঞ্চায়েতের আইন ও সিদ্ধান্ত মেনে চলতো। তারা মিশরী ফৌজে ভর্তি হতো এবং সুদানী ফৌজকে এড়িয়ে চলতো। তারা ছিলো যোদ্ধা এবং সাহসী। তীরান্দাজীতে অভিজ্ঞ ছিলো তারা। সুদানী ফৌজ ও সরকার প্রলোভন দেখিয়ে এবং আক্রমণ করে নিঃশেষ করে দেয়ার হুমকি দিয়েও তাদেরকে ঘায়েল করতে পারেনি। কিন্তু ঈমানী শক্তির পাশাপাশি তাদের একটি সহায়ক শক্তি ছিলো পাহাড়। সুদানীরা তাদের উপর দু'বার আক্রমণ করেছিলো। কিন্তু তীরান্দাজরা পাহাড়ের চূড়া থেকে তীর বর্ষণ করে তাদেরকে প্রতিহত ও পরাজিত করে।

তকিউদ্দীনের সামরিক পদস্খলনের কারণে সুদানীদের হাতে বহুসংখ্যক মিশরী সৈন্য বন্দী হয়েছিলো। ইসহাক তাদের একজন। নিজ গোত্রসমূহের উপর তার ব্যাপক প্রভাব ছিলো। বন্দী হওয়ার পর সুদানীরা তাকে প্রস্তাব করে, তুমি তোমার মুসলিম গোত্রগুলোকে সুদানী ফৌজে যোগ দিতে সম্মত করো, তাহলে তোমাকে শুধু মুক্তিই দেয়া হবে না বরং যে পাহাড়ী অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা মুসলমান, সেই সবগুলো অঞ্চল নিয়ে একটি আলাদা রাজ্য গঠন করে তোমাকে তার গভর্নর বা রাজা নিযুক্ত করা হবে।

'আমি আগে থেকেই সেই রাজ্যের রাজা'– ইসহাক জবাব দেন– 'এটি আমাদের স্বাধীন রাজ্য।'

'ওটা সুদানের ভূখণ্ড'– তাকে বলা হলো– 'একদিন সেখানকার লোকদেরকে বন্দী করে ফেলবো কিংবা ধ্বংস করে দেবো।'

'আগে তোমরা এলাকাটা দখল করো'– ইসহাক বললেন– 'সেখানকার মুসলমানদেরকে নিরস্ত্র করো। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ফৌজে শামিল করতে পারবে না। ঐ এলাকায় তোমাদের পতাকা নিয়ে দেখাও। তারপর দেখো, তারা তোমাদের ফৌজে শামিল হয় কিনা।'

ইসহাককে কয়েদখানায় রাখার পরিবর্তে একটি সুরম্য কক্ষে রাখা হলো, যেটি কোনো এক রাজপুত্রের মহল বলে মনে হলো। এক সুদানী সালার তাকে উক্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়ে নিজের তরবারীটা উভয় হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে তাঁর সম্মুখে বসে তরবারীটা তার সমীপে পেশ করে বললো– 'আপনি আমাদের বন্দী নন, অতিথি।'

'আমি এই তরবারী গ্রহণ করবো না'– ইসহাক বললেন– 'আমি অতিথি নই, বন্দী। আমি পরাজিত। আপনার থেকে আমি তরবারী সেভাবেই নেবো, যেভাবে আপনি আমার থেকে নিয়েছেন। তরবারী তরবারীর জোরে নেয়া হয়।'

'কিন্তু আপনি আমাদের শত্রু নন।' সুদানী সালার বললো।

'আমি আপনার শত্রু'– ইসহাক মুচকি হেসে বললেন– 'তরবারীর বিনিময় এমন সুরম্য কক্ষে নয়– যুদ্ধের ময়দানে হয়ে থাকে। আমি আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি যে, আপনি আমাকে এতোটুকু সম্মান করলেন।'

'আমরা আপনাকে আরো বেশী সম্মান করবো'– সালার বললো– 'আপনার সিংহাসন খার্তুমের সিংহাসনের সমপর্যায়ের হবে।'

'আর কিয়ামতের দিন আমার মসনদ থাকবে জাহান্নামের অতল তলে।' ইসহাক বললেন।

'আমি দুনিয়ার কথা বলছি।'

'কিন্তু মুসলমান কথা বলে আখেরাতের'– ইসহাক বললেন– 'যা হোক, বলুন আপনার পর আর কে আসবেন এবং কী উপহার নিয়ে আসবেন?'

'যে আসে আসুক'– সালার মুচকি হেসে বললো– 'আমিও সৈনিক আপনিও সৈনিক। আমি আপনার সৈনিক সুলভ কীর্তির মূল্যায়ন করতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি আমার মনটা ভেঙ্গে দিলেন।'

'আপনি আমার সৈনিক সুলভ কীর্তি দেখলেন কখন?'– ইসহাক বললেন– 'আমি তো যুদ্ধ করার সুযোগই পেলাম না। আমার সেনাদল মরুভূমির এমন একটি স্থানে গিয়ে উপনীত হয়, যেখানে পানির কোনো চিহ্ন ছিলো না। তিন-চার দিনেই মরুভূমি আমার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিক এবং ঘোড়াগুলোকে হাড্ডিতে পরিণত করে ফেলে। তারা জিহ্বা বের করে পানির অনুসন্ধান করতে শুরু করে। এই অবস্থায় আপনার একটি বাহিনী আমাদের উপর হামলা করে বসে এবং আমরা ধরা পড়ে যাই। মরুভূমি আমাদেরকে পরাজিত করেছে। আপনি আমার তরবারীর পরাকাষ্ঠা কোথায় দেখলেন যে, আমাকে কৃতিত্বের পুরস্কার প্রদান করছেন?'

'আমাকে অবহিত করা হয়েছে, আপনি বীরযোদ্ধা।' সালার বললো।

'শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই'– ইসহাক বললেন– 'কাল সকালে আমাকে একটি তরবারী দেবেন। আপনিও একটি নেবেন। তারপর আপনার আমার মোকাবেলা হবে। তখন আশা করি, আমি আপনার তরবারী গ্রহণ করে নেবো। কিন্তু সে সময়ে আপনি জীবিত থাকবেন না।'

সালার আরো কি যেনো বলতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে ইসহাক বললেন– 'মন দিয়ে শোনো, সম্মানিত সালার! কাল তোমরা আমাকে যে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করবে আজই তা করে ফেলো। তোমার এই সুদর্শন কয়েদখানায় মাতাল হয়ে আমি ঈমান বিক্রি করবো না।'

'কয়েকখানার নোংরা পরিবেশের পরিবর্তে আপনি এই হৃদয়কাড়া পরিবেশেই ভালোভাবে চিন্তা করতে পারবেন'– সালার বললো– 'আমি আশা করি; আপনার সম্মুখে যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, আপনি তা ভেবে দেখবেন। একজন সৈনিক ভাই মনে করে আমার এই পরামর্শটা মেনে নিন যে, নিজের ভবিষ্যৎটা অন্ধকার করবেন না। খোদা আপনার ভাগ্যে রাজত্ব লিখে রেখেছেন। সুযোগটা নষ্ট করবেন না।'

'আমার আল্লাহ আমার ভাগ্যে যা কিছু লিখে রেখেছেন, আমি তা ভালোভাবে জানি'– ইসহাক বললেন– 'আর তোমার খোদা কী লিখে রেখেছেন, তাও জানি। তুমি চলে যাও, আমাকে ভাবতে দাও।'

সালার চলে যায়। কিছুক্ষণ পর খাবার এসে হাজির হয়। খাবার নিয়ে এসেছে তিনটি মেয়ে– অতিশয় রূপসী যুবতী মেয়ে, অর্ধনগ্ন। নানা রকম উন্নতমানের খাবার, যা ইসহাক কখনো স্বপ্নেও দেখেনি। সঙ্গে সুদর্শন সোরাহীতে মদ। ইসহাক তাঁর প্রয়োজন অনুপাতে আহার করে প্রানি পান করে। দস্তরখান তুলে নেয়া হয়। দু'টি মেয়ে চলে যায়। একটি তার কাছে থেকে যায়। ইসহাক মেয়েটির প্রতি তাকায়। মেয়েটি অবজ্ঞা মিশ্রিত মুচকি একটা হাসি দেয়।

'আমাকে কি আপনার ভালো লাগছে না?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'তোমার ন্যায় কুৎসিত মেয়ে আমি এই প্রথম দেখলাম।' ইসহাক বললেন।

মেয়েটির চেহারার রং বদলে যায়। সে তো অত্যন্ত রূপসী মেয়ে। ইসহাক তার বিস্ময় ভাব বুঝতে পেরে বললেন– 'রূপ থাকে লাজে। নারী যদি উলঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে তার আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। উলঙ্গপনা তোমার জাদুময়তা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি এখন আর তোমার মুঠোয় যাবো না।'

'আমাকে দেখেও কি আপনি আমার প্রয়োজন অনুভব করছেন না।' মেয়েটি বললো।

'আমার দেহের তোমার কোনো প্রয়োজন নেই'– ইসহাক বললো– 'আমার আত্মার একটি প্রয়োজন আছে, যা তুমি পূরণ করতে পারবে না। তুমি চলে যাও।'

'আমার প্রতি নির্দেশ, আমি আপনার কাছে থাকবো'– যুবতী বললো– 'ব্যত্যয় করলে শাস্তিস্বরূপ আমাকে হাবশীদের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

'দেখো মেয়ে'– ইসহাক বললেন– 'আমি মুসলমান। আমার চিন্তাধারা ও চরিত্র তোমার চেয়ে ভিন্ন। আমার ধর্ম আমাকে বেগানা মেয়েকে সঙ্গে রাখার অনুমতি দেয় না। আমি তোমাকে আমার এই কক্ষে রাখতে পারি না। যদি তুমি এই কক্ষে রাত কাটানোর আদেশ নিয়ে এসে থাকো, তাহলে তুমি থাকো, আমি বাইরে গিয়ে ঘুমাই।'

'আমার জন্য এটাও অপরাধ বলে বিবেচিত হবে'– মেয়েটি বললো– 'আপনি আমাকে এই কক্ষে থাকতে দিন। আমার প্রতি দয়া করুন।' মেয়েটি বুঝে ফেললো, লোকটি পাথর। তাই সে ইসহাকের নিকট অনুনয়-বিনয় করতে শুরু করলো।

'তোমার কাজ কী?'– ইসহাক জিজ্ঞেস করেন– 'তোমাকে আমার কাছে কী উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে? যদি বলো, থাকতে দেবো।'

'আমার কাজ হলো আপনার ন্যায় পুরষদেরকে মোমে পরিণত করা'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আপনিই প্রথম পুরুষ, যিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি বহু ধর্মীয় কর্ণধারকে আমার অনুরক্ত বানিয়েছি এবং তাদেরকে সুদানের ছাঁচে ঢেলে নিজের মতো করে প্রস্তুত করেছি।' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে– 'আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি আমাকে কুৎসিত ভেবেছেন, নাকি ঠাট্টা করলেন?'

'তোমরা যাকে সুগন্ধি বলো, আমার কাছে তা দুর্গন্ধ'– ইসহাক বললেন– 'আমার দৃষ্টিতে তুমি বাস্তবিকই কুৎসিত। যা হোক, তুমি যেখানে ইচ্ছা শুয়ে পড়ো। আচ্ছা, তুমি খাটে শোও, আমি মেঝেতে শোবো।

মেয়েটি মেঝেতে শুয়ে পড়ে।

'তোমার নাম কী মেয়ে?' ইসহাক জিজ্ঞেস করেন।

'আশি।'

'তোমার ধর্ম?'

'আমার কোনো ধর্ম নেই।'

'তোমার পিতামাতা কোথায় থাকেন?'

'জানি না।'

ইসহাকের চোখে ঘুম এসে যায়। অল্পক্ষণ পরই তিনি নাক ডাকতে শুরু করেন।

❖ ❖ ❖

'আপনারা এমন এক ব্যক্তির পেছনে সময় নষ্ট করছেন'– আশি বললো। তার সম্মুখে সুদানী ফৌজের পদস্থ অফিসারগণ উপবিষ্ট– 'তার মধ্যে চেতনা বলতে কোনো বস্তু নেই। আমি কত কঠিন পাথরকে মোমে পরিণত করেছি,

আপনারা তা জানেন। কিন্তু এর মতো মানুষ আমি আর দেখিনি।'

'বোধ হয় তুমি কোনো ত্রুটি করেছো।' এক অফিসার বললো।

ইসহাককে জালে আটকবার জন্য যা যা করেছে, যতো সব ফাঁদ-ফন্দি অবলম্বন করেছে, মেয়েটি তার সবিস্তার বিবরণ প্রদান করে এবং জানায়– 'আমি যতো যা কিছু করেছি, তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়ে আমার প্রতি নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়েন।'

সুদানী কর্মকর্তাগণ চার-পাঁচদিন পর্যন্ত ইসহাককে তাদের মতে আনার চেষ্টা চালাতে থাকে। তার মানসিকতা পরিবর্তনের কোনো পন্থাই তারা বাদ রাখেনি। কিন্তু ইসহাকের একটাই কথা– আমি মিশরী ফৌজের একটি ইউনিটের কমান্ডার, আমি মুসলমান, আমি একজন বন্দী।

অবশেষে তাকে মহল থেকে বের করে কয়েদখানায় নিয়ে একটি সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখা হলো। কক্ষের ছিদ্রযুক্ত দরজা তালাবদ্ধ করে রাখা হলো। কক্ষটি এতোই দুর্গন্ধময় যে, ইসহাকের মস্তিষ্ক বিগড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

রাতের বেলা। কক্ষটি অন্ধকার। এক সৈনিক একটি বাতি নিয়ে এসে দরজার ছিদ্র দিয়ে ইসহাকের হাতে দেয়। ইসহাক বাতিটি মেঝেতে রেখে দেয়। বাতির আলোতে তিনি কক্ষে পচা-গলা লাশ দেখতে পায়। লাশটির মুখ খোলা। চোখও খোলা। ইসহাক সৈনিককে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এটি কার লাশ?'

'তোমার কোনো এক বন্ধুর'– সৈনিক জবাব দেয়– 'কোনো এক মিশরী। যুদ্ধে ধরা পড়েছিলো। লোকটাকে অনেক নির্যাতন করে খুন করা হয়েছে। পাঁচ-ছয় দিন আগে এই কক্ষে মারা গেছে।'

'তা লাশটা এখানে পড়ে আছে কেন?' ইসহাক জিজ্ঞেস করেন।

'তোমার জন্য'– সৈনিক অবজ্ঞার সুরে বললো– 'তাকে তুলে নেয়া হলে তুমি একা হয়ে যাবে তাই।' সৈনিক অট্টহাসি হেসে চলে যায়।

ইসহাক বাতিটা উপরে তুলে লাশটা পরখ করতে থাকে। পোশাক দেখে বুঝে ফেলেন লোকটা মিশরী ফৌজের সদস্য।

ইসহাক কক্ষে প্রবেশ করার পর যে দুর্গন্ধ অনুভব করেছিলেন, তা উবে যায়। তিনি গলিত লাশটির মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে বললেন– 'তোমার দেহ নিঃশেষ হয়ে যাবে। তোমার আত্মা সতেজ থাকবে। তুমি আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছো। তুমি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি জীবিত আছো এবং জীবিত থাকবে। সৈনিক ঠিকই বলেছে যে, তুমি না থাকলে আমি নিঃসঙ্গ হতাম।'

ইসহাক দীর্ঘক্ষণ সঙ্গীর লাশের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর তার পাশে শুয়ে

ঘুমিয়ে পড়েন। ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি দেখতে পান, সেই সুদানী সালার দাঁড়িয়ে আছে। সৈনিক বললো– 'কিছুর প্রয়োজন হলে বলুন, এনে দেই।'

'আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝি'– ইসহাক বললেন– 'আমি পরাজিত। তুমি আমাকে তিরস্কার করতে পারো। তবে সত্যিই যদি তুমি আমার প্রয়োজন পূরণ করতে আগ্রহী হয়ে থাকো, তাহলে নিশ্চয়ই রণাঙ্গন থেকে তোমরা মিশরের পতাকা কুড়িয়ে পেয়ে থাকবে। আমাকে একটি পতাকা এনে দাও, লাশটা ঢেকে রাখি।'

সালার অট্টহাসি হেসে বললো– 'আমরা কি তোমাদের পতাকা বুকে জড়িয়ে রেখেছি? মিশরের কোনো পতাকায় হাত লাগানোকেও আমরা অপমানবোধ করি।' সে সিপাহীকে বললো– 'একে এখান থেকে বের করে নীচে নিয়ে যাও। লাশ এখানে পড়ে থাকুক।'

ইসহাককে কয়েকদখানার পাতাল কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে অসহনীয় উৎকট দুর্গন্ধ। ইসহাক বুঝে ফেললেন, এখানেও লাশ আছে, অনেকগুলো লাশ। সুদানী সালার আগে আগে হাঁটছে। এক স্থানে ছয়-সাতজন মিশরী উল্টো মুখো ঝুলে আছে। তাদের বাহুর সঙ্গে পাথর বাঁধা। এক ধারে এক ব্যক্তিকে বড় একটি ক্রুশের সঙ্গে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যে, তার দু'হাতের তালুতে একটি করে পেরেক গাঁথা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে।

এখানে আটক শত্রুসেনাদের কিরূপ নির্যাতন-নিপীড়ন করা হচ্ছে, এই পাতাল কক্ষে ঘুরিয়ে ইসহাককে তার দৃশ্য দেখানো হলো। স্থানে স্থানে রক্ত। কোনো কোনো বন্দী বমি করছে। কয়েকজন অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। নির্যাতনের সব ধরন প্রদর্শন করিয়ে সুদানী সালার ইসহাককে জিজ্ঞেস করে– 'এবার বলো কোন্ পন্থাটি তোমার পছন্দ হয়। তবে নির্যাতন-নিপীড়ন ছাড়াই যদি তুমি আমাদের কথা মেনে নাও, তাহলে তোমারই জন্য তা কল্যাণকর হবে।'

'তোমাদের যেমন খুশী আমার উপর নিপীড়ন চালাও। আমাকে যেখানে খুশী নিয়ে যাও। আমি জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।' ইসহাক বললেন।

'তোমাকে দিয়ে আমরা কী করাতে চাই, আমি পুনরায় তোমাকে বলে দিচ্ছি'– সালার বললো– 'তোমাকে বলা হয়েছিলো, সবক'টি মুসলিম কবিলাকে সুদানী বাহিনীতে নিয়ে আসো। বিনিময়ে তোমাকে মুক্তিও দেয়া হবে এবং মুসলিম গোত্রসমূহের শাসকও নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু সেই সুযোগ তুমি হারিয়ে ফেলেছো। এবার প্রস্তাব হলো, আমাদের মতে চলে আসো,

বিনিময়ে তোমাকে নিপীড়ন থেকে রেহাই দেয়া হবে এবং সুদানী ফৌজের সম্মানজনক একটি পদ দেয়া হবে।'

'আমার কোন পদের প্রয়োজন নেই। তোমরা আমার সঙ্গে যেমন খুশী আচরণ করো।' ইসহাক বললেন।

ইসহাকের নিপীড়নের পালা শুরু হলো। পায়ে শিকল পরিয়ে পা দুটো ছাদের সঙ্গে বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হলো। সালার সিপাহীদের বললো– 'একে সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে থাকতে দিও। সন্ধ্যার সময় লাশের কক্ষে ফেলে এসো। আশা করি, এতটুকুতে লোকটার মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

❖ ❖ ❖

সন্ধ্যা নাগাদ ইসহাক সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। যখন জ্ঞান ফিরে পান, তখন তিনি মিশরী সহকর্মীর লাশের নিকট পড়ে আছেন। কক্ষের এক কোণে সামান্য পানি আর কিছু খাবার রাখা ছিলো। ইসহাক পানিটুকু পান করেন এবং খাবার খান। তিনি লাশটিকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি তোমার আত্মার সঙ্গে প্রতারণা করবো না। শীঘ্রই আমি তোমার নিকট চলে আসছি।'

কথা বলতে বলতে ইসহাকের চোখ বুজে আসছে। ইসহাক ঘুমিয়ে পড়েন।

মধ্যরাতে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে চাকার সঙ্গে বাঁধা হলো। সুদানী সালার উপস্থিত। সে বললো– 'হাজার হাজার মুসলমান আমাদের সঙ্গে আছে। তুমি বোধ হয় পাগল হয়ে গেছো। তুমি ইসলামের জন্য ত্যাগ দিচ্ছো; অথচ সালাহুদ্দীন আইউবী নিজের রাজত্ব বিস্তারের জন্য তোমার ন্যায় পাগলদেরকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিচ্ছে। লোকটা মদও পান করে, নারীও ভোগ করে। আর তোমরা কিনা তার নামে জীবন উৎসর্গ করছো।'

'সেনাপতি মহোদয়!'– ইসহাক বললেন– 'তোমাকে আমার ধর্ম ও সুলতানের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখার সাধ্য আমার নেই। আর তুমিও আমাকে আমার ধর্ম ও রাজ্যের জন্য জান কুরবান দেয়া থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। আমার জাতির কোনো গোত্রের একজন মুসলমানও তোমার ফৌজে যোগ দেবে না। মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করে না।'

'তুমি সম্ভবত জানো না আরবে মুসলমান মুসলমানের রক্ত ঝরাচ্ছে'– সালার বললো– 'খৃস্টানরা ফিলিস্তিনে বসে বসে তামাশা দেখছে। সকল আমীর ও মুসলিম শাসকগণ সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।'

'তারা হয়তো করেছে'– ইসহাক বললেন– 'কিন্তু আমি করবো না। যারা

ইসলাম ও ইসলামী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তারা এ জগতেও ভুগবে, পরজগতেও ভুগবে। তুমি তোমার সময় নষ্ট করো না। আমার সঙ্গে যা কিছু করতে চাও করে ফেলো। তারপর আরেকজন সুদানী মুসলমানকে ধরে আনো। তার দ্বারা তোমার কাজ হতে পারে।'

'আমরা জানতে পেরেছি, তুমি শুধু একটা ইশারা করলেই সমস্ত মুসলমান আমাদের সঙ্গে চলে আসবে'– সালার বললো– 'আমরা তোমার দ্বারা এ কাজ বিনামূল্যে করাতে চাই না। আমরা তোমার ভাগ্য বদলে দেবো।'

'আমি শেষবারের মতো বলছি, আমি আমার জাতিকে বিক্রি করবো না।' ইসহাক বললেন।

ইসহাক চাক্কির সঙ্গে বাঁধা। লম্বা যে খুঁটিটা ধাক্কা দিলে চাক্কি নড়তে শুরু করে, তিন-চারজন হাবশী তার সন্নিকটে দণ্ডায়মান। সুদানী সালারের ইঙ্গিত পেয়ে তারা খুঁটিটা ধাক্কা দিয়ে একপা সম্মুখে সরিয়ে দেয়। চাক্কি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে। ইসহাকের দেহটা একবার উপরে একবার নীচে উঠানামা করতে থাকে। তার বাহুদ্বয় কাঁধ থেকে আর পদদ্বয় হাঁটু থেকে ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। শরীর থেকে তার এমন ধারায় ঘাম ঝরতে শুরু করে, যেনো কেউ উপর থেকে পানি ঢেলে দিয়েছে।

'এবার ভেবে-চিন্তে জবাব দাও।' ইসহাকের কানে সুদানী সালারের কণ্ঠ ভেসে আসে।

'আমি ঈমান বিক্রি করবো না।' ইসহাক ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দেন।

চাক্কিটা আরো সম্মুখে টেনে নেয়া হয়। ইসহাকের গায়ের চামড়া ছিলে যেতে শুরু করে।

'এখনও সময় আছে, জবাব দাও।'

'আমার লাশও একই উত্তর দেবে– আমি ঈমান বিক্রি করবো না।' বড় কষ্টে ইসহাক জবাব দেন।

'একে কিছুক্ষণ এভাবে থাকতে দাও'– সালার আদেশ করে– 'তারপর প্রস্তাব মেনে নেবে।'

ইসহাক কুরআন তিলাওয়াত করতে শুরু করেন। সালার চলে যায়। তার দেহের জোড়াগুলো যেনো খুলে যাচ্ছে। চামড়াগুলো ছিলে যাচ্ছে। মুখটা আকাশের দিকে। তিনি কল্পনায় মহান আল্লাহকে সম্মুখে দেখতে পান। বললেন– 'ইয়া আল্লাহ! আমি গুনাহগার। তুমি আমাকে আরো শাস্তি দাও। আমি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি, তাহলে তুমি আমাকে শাস্তিদান

করো। তোমার সম্মুখে আমি লজ্জিত হতে চাই না।'

তারপর চোখ বুজে পুনরায় কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করেন।

'তুমি চিৎকার করছো না কেন?'– ইসহাকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান সিপাহী বললো– 'তুমি উচ্চস্বরে চিৎকার করো; তাতে তোমার কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে।'

'আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না'– ইসহাক বললেন– 'চাক্কিটা আরো সামনের দিকে ঠেলে দাও।'

কয়েদখানার হিংস্র প্রকৃতির এই সিপাহী হাবশীদের বললো– 'চাক্কি আরো চালাও।' হাবশীদের ধাক্কা খেয়ে চাক্কি আরো সম্মুখে চলে যায়। ইসহাকের দেহটা মট মট করে শব্দ করে ওঠে। শুনে অপর এক সিপাহী ছুটে আসে। এসে সঙ্গীকে বললো– 'তোমাকে কে চাক্কি চালাতে বললো? লোকটা তো মরে যাবে। একে আরো কিছু সময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

চাক্কি কিছুটা নীচু করে দেয়া হয়।

'লোকটা বলছে, তার নাকি কোনো কষ্ট হচ্ছে না।' সিপাহী তার সঙ্গীকে বললো।

'তোমার কি চেতন আছে?'– সিপাহী ইসহাককে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কী বলছো?'

'অবচেতন মনে বলছে'– অপর সিপাহী বললো– 'তুমি চাক্কি যে পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেছো, সে পর্যন্ত গেলে মানুষ মারা যায়। লোকটার চেতন থাকতে পারে না।'

আমার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে বন্ধুগণ!'– ক্ষীণ কণ্ঠে ইসহাক বললেন– 'আমি আমার প্রভুর সঙ্গে কথা বলছি।'

সিপাহীদ্বয় বিস্ময়ের সাথে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে। একজন বললো– 'লোকটাকে তো অতোটা শক্তিশালী মনে হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে তো মহিষের ন্যায় হাবশীরাও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। লোকটা বোধ হয় আলিম হবে। তার সঙ্গে আল্লাহর শক্তি আছে।'

'হ্যাঁ, তোমরা ঠিক বলেছো'– ইসহাক বললেন– 'আমার নিকট আল্লাহর শক্তি আছে। আমি তাঁর কালাম পাঠ করছি। তোমরা চাক্কি পুরোপুরি চালিয়ে দেখো, আমার দেহ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং উভয় অংশ থেকে এই আওয়াজই শুনতে পাবে, যা এ মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছো।'

সিপাহী মুসলমান নয়। সুস্থ কোনো আদর্শ তার নেই। কুসংস্কারই তার ধর্ম। পীর-ফকির, পাগল-দেওয়ানারা তার খোদা। মূর্তিপূজাও করে সে। এই চাক্কির মর্ম ভালোভাবে বুঝে সে। ইতিপূর্বে সে দেখেছে, এই চাক্কির সঙ্গে বাঁধা মানুষটি তার সামান্য আন্দোলনেই চিৎকার করে ওঠতো এবং সবকিছু মেনে নিতো। চাক্কির আন্দোলন একটু বাড়িয়ে দিলে অজ্ঞান হয়ে যেতো এবং

কিছুক্ষণ পর মরে যেতো। কিন্তু ইসহাক চাক্কির সর্বশেষ কার্যকারিতা পর্যন্ত বেঁচে রইলো এবং সচেতন রইলো। তাতে সিপাহী বুঝে ফেলেছে এই লোকটি কোনো সাধারণ মানুষ নয়।

'তুমি কি আকাশের অবস্থা জানো?' এক সিপাহী জিজ্ঞেস করে।

'আমার আল্লাহ জানেন।' ইসহাক জবাব দেন।

'তোমার আল্লাহ কোথায়?' সিপাহী জিজ্ঞেস করে।

'আমার অন্তরে'– ইসহাক জবাব দেন– 'এতো নির্যাতনের পরও তিনি আমাকে যন্ত্রণা হতে রক্ষা করছেন। আমার কোনো কষ্টই হচ্ছে না।'

'আমি গরীব মানুষ'– এক সিপাহী বললো– 'এখানে তোমার মতো মানুষদের হাড় ভেঙ্গে স্ত্রী-সন্তানদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করি। তুমি আমার অবস্থার পরিবর্তন করে দিতে পারো।'

'বাইরে গিয়ে'– ইসহাক বললেন– 'আমি যা কিছু পাঠ করছি, তোমাকে শিখিয়ে দেবো; তোমার কিসমত বদলে যাবে।'

'আমরা চাক্কি নীচু করে দিচ্ছি'– এক সিপাহী বললো– 'সালারকে আসতে দেখলে আবার উপরে তুলে দেবো।'

'না'– ইসহাক বললো– 'আমি তোমাকে এই খেয়ানত করতে দেবো না। এটাই আমার শক্তি। একেই আমরা ঈমান বলে থাকি।'

'আমরা তোমাকে সাহায্য করবো'– এক সিপাহী বললো– 'তুমি যখন যা বলবে, তা-ই করে দেবো। সম্ভব হলে তোমাকে কয়েদখানা থেকে বের হতে সাহায্য করবো।'

সালার এসে গেছে।

'কী ব্যাপার, এখনও তোমার জ্ঞান ঠিক আছে?' বিস্ময়ের সুরে সালার জিজ্ঞেস করে।

'আমার আল্লাহ আমার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখেছেন।' ইসহাক জবাব দেন।

সালারের ইঙ্গিতে চাক্কিটা আরো সম্মুখে চালানো হয়। ইসহাক স্পষ্ট অনুভব করেন, তার দেহটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে গেছে এবং তার জীবনের শেষ মুহূর্ত এসে পড়েছে। তিনি কোঁকাতে কোঁকাতে আরো উচ্চস্বরে কালামে পাক তিলাওয়াত শুরু করেন। চাক্কি আরো সম্মুখে এগিয়ে নেয়া হলো। ইসহাকের দেহ থেকে মট মট শব্দ শোনা যায়, যেনো তার হাঁড়গুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে।

'এই ভেবে খুশী হয়ো না যে, আমরা তোমাকে জীবনে মেরে ফেলবো'– সুদানী সালার বললেন– 'তুমি জীবিত থাকবে এবং তোমার সঙ্গে প্রতিদিন

এরূপ আচরণ হতেই থাকবে। মেরে ফেলে আমরা তোমাকে নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেবো না।'

ইসহাক কোনো জবাব দিলেন না। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকেন।

সালারের ইঙ্গিতে চাক্কি কিছুটা নীচে নামিয়ে দেয়া হলো। ফৌজের অপর এক অফিসার সালারের সঙ্গে ছিলো। সালার তাকে সরিয়ে নিয়ে বললো– 'লোকটা বড় কঠিনপ্রাণ মনে হচ্ছে। এতো নিপীড়নের পরও অচেতন পর্যন্ত হলো না। শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলে মারা যাবে। কিন্তু লোকটাকে আরো ক'দিন বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমি অন্য একটি পন্থা ভাবছি। জানতে পেরেছি তার চৌদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ে আছে। স্ত্রীও আছে। তাদেরকে এই বলে এখানে নিয়ে আসবে যে, ইসহাক কয়েদখানায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত। ইচ্ছে হলে তাকে দেখে যেতে পারো। আর যদি মৃত্যুবরণ করে, লাশটা নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ'– অফিসার বললো– 'এভাবে ধোঁকা দিয়েই আনতে হবে। অন্যথায় ওখানকার মুসলমানরা আমাদের কাউকে তাদের এলাকায় ঢুকতে দেবে না।'

'এনে তাদেরকে উলঙ্গ করে এর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাখবো'– সালার বললো– 'তারপর তাকে বলবো, আমাদের শর্ত মেনে নাও, অন্যথায় তোমার যুবতী মেয়ে ও স্ত্রীকে তোমার চোখের সামনে অপদস্ত করা হবে।'

সালারের অনুপস্থিতিতে যে দু'জন সিপাহী ইসহাকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলো, তারা নিকটে দাঁড়িয়ে সালার ও অফিসারের কথোপকথন শ্রবণ করছিলো। সালার তাদের একজনকে পাঠিয়ে ফৌজের কমান্ডারকে ডেকে আনেন। তাকে ইসহাকের গ্রামের ঠিকানা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে ওখানে যেতে বলে এবং দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়। তাকে বিশেষভাবে বলে দেয়া হলো, মুসলমানদের সঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলবে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রশংসা করবে। অন্যথায় মুসলমানরা তোমাকে জীবিত ফিরে আসতে দেবে না।

কমান্ডার তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে যায়।

ইসহাককে নিপীড়নযন্ত্র থেকে নামিয়ে সেই কক্ষে নিক্ষেপ করা হলো, যেখানে একজন মিশরীর গলিত লাশ পড়ে ছিলো। ইসহাক মহান আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন। এতো তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি নিজের মধ্যে শান্তি অনুভব করছিলেন। তার আত্মায় কোনো ব্যথা নেই। শারীরিক ব্যাথা-বেদনার প্রতি তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু তার জানা নেই যে, তাকে এমন এক লাঞ্ছনায় নিক্ষেপ করার আয়োজন চলছে, যা তার আত্মাকে রক্তাক্ত করে দেবে। তিনি জানেন না, তার ষোড়শী কন্যা ও স্ত্রীকে কয়েদখানায় নিয়ে

আসার জন্য এক ব্যক্তি রওনা হয়ে গেছে।

এখান থেকে ইসহাকের গ্রাম ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করলে পুরো এক দিনের পথ। এখন ভোর বেলা। সুদানী সালার তার সঙ্গী অফিসারের সঙ্গে চলে গেছেন। কয়েদখানার সিপাহীদ্বয়ের ডিউটি শেষ হওয়ার পথে। দিনের ডিউটির জন্য অন্য সিপাহীরা আসছে। এই দু'সিপাহী পরস্পর কথা বলে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ইসহাককে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, সরাসরি কোনো এক অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক। এমন একজন বুজুর্গ ব্যক্তির স্ত্রী-কন্যাকে কয়েদখানায় ডেকে এনে অপদস্ত করা হবে, তা তারা সহ্য করতে পারবে না। এক সিপাহী এই আশংকাও ব্যক্ত করে যে, এই লোকটির স্ত্রী-কন্যাকে অপমান করা হলে প্রত্যেকের উপর গজব আপতিত হবে। ইসহাক বের হতে পারলে তাদের ভাগ্য বদলে দেবেন, এমন আশাও তারা পোষণ করছে। এক সিপাহী বললো, সে ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে এই স্থান পর্যন্ত আসতে দেবে না।

❖ ❖ ❖

বার্তাবাহী সুদানী কমান্ডার যখন মুসলমানদের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন সন্ধ্যা। এলাকায় প্রবেশ করে প্রথমে সে জিজ্ঞেস করে, মিশরী ফৌজের কর্মকর্তা, সুদানী মুসলমান, নাম ইসহাক; তার বাড়িটা কোন্ গ্রামে? এলাকায় ইসহাক একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। যে কেউ তাকে চেনে। কমান্ডার জানায়, লোকটি আহতাবস্থায় যুদ্ধবন্দী হয়ে আছে। অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে তাকেও কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। তার একান্ত কামনা, জীবনের শেষ মুহূর্তে স্ত্রী ও কন্যাদের এক নজর দেখে যাবেন। আমি তাদেরকে নিতে এসেছি।

এক ব্যক্তি কমান্ডারের সঙ্গ নেয়। উপত্যকার পর উপত্যকা অতিক্রম করে দু'জন ইসহাকের গ্রামে প্রবেশ করে। তারপর তার বাড়ি গিয়ে পৌঁছে।

ইসহাকের বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে কমান্ডারের সাক্ষাৎ হয়। সুদানী কমান্ডার মাথানত করে তার সঙ্গে করমর্দন করে এবং নেহায়েত আদবের সঙ্গে বলে- 'আপনার পুত্র এতোই বীর পুরুষ যে, আমাদের সালারও তাকে সালাম করেন। তিনি বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন বটে; কিন্তু মরুভূমি তাকে পিপাসায় কাতর করে বেহাল করে তোলে। তিনি আহতাবস্থায় আমাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। আমরা সুদানী সালার ও শাসকদের যেভাবে চিকিৎসা-সেবা দিয়ে থাকি, তারও ঠিক তেমনি সেবা-চিকিৎসা চলছে। তথাপি তিনি সুস্থ হচ্ছেন

না। তার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপই হচ্ছে। তারপরও তাকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। তিনি আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন যে, তার কন্যা ও স্ত্রীকে শেষবারের মতো এক নজর দেখবেন।'

'তোমরা যদি তাকে এতোই ইজ্জত করে থাকো, তো তাকে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছো না কেন?'– ইসহাকের পিতা বললেন– 'হয়তোবা সে আমাদের ডাক্তারদের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে যাবে।'

'সুদানের সেনা প্রধান বলেছেন, তিনি আমাদের মেহমান'– কমান্ডার জবাব দেয়– 'মেহমানকে অসুস্থাবস্থায় বিদায় দেয়া মেজবানের জন্য অপমান। সুস্থ হলেই তাকে স্বসম্মানে আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

'আচ্ছা, এটা কি সম্ভব নয় যে, তার স্ত্রী ও কন্যা তার কাছে থেকে তার সেবা করবে?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করেন।

'এরা যদি ওখানে থাকতে চায়, তাহলে সম্মানের সঙ্গে রাখা হবে'– কমান্ডার বললো– 'আমাদের দেশে বীর-বাহাদুরের সম্মান করা হয়। আমাদের ধর্ম আপনাদের থেকে ভিন্ন। কিন্তু আমরাও সুদানী, আপনারাও সুদানী। দেশ আমাদের এক। আর আমরা দেশকে শ্রদ্ধা করি। ইসহাক যদিও সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈনিক, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। আমরা ভাই ভাই। সালাহুদ্দীন আইউবীকে আমরা বড় যোদ্ধা বলে বিশ্বাস করি। তিনি খৃষ্টানদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছেন।'

'তাহলে তোমরা তাকে শত্রু ভাবছো কেন?'– বৃদ্ধ বললেন– 'তোমরা কেনো খৃস্টানদেরকে বন্ধু মনে করছো?'

'মুহ্তারাম!'– কমান্ডার বললো– 'আমরা যদি কথার পাকে জড়িয়ে পড়ি, তাহলে দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে যাবে। আপনার পুত্রবধূ ও নাতনীকে রাত পোহাবার আগেই আপনার পুত্রের নিকট পৌঁছাতে হবে। আপনার পুত্রের আকাঙ্খা পূরণ করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। তারা এখনই আমার সঙ্গে রওনা হতে প্রস্তুত আছে কি?'

পর্দার আড়াল থেকে এক নারীকণ্ঠ ভেসে আসে- 'হ্যা, আমরা প্রস্তুত।'

'সঙ্গে কোনো পুরুষ যেতে পারবে কি?'– বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করেন– 'আমিও আমার পুত্রকে দেখতে চাই।'

'সফর অনেক দীর্ঘ'– 'কমান্ডার বললো– 'আপনি এতো দীর্ঘ ঘোড়সাওয়ারী বরদাশত করতে পারবেন না। আমি শুধু ইসহাকের স্ত্রী-কন্যাকেই নিয়ে যাওয়ার আদেশ পেয়েছি।

কয়েদখানার সিপাহী ডিউটি শেষ করে বাড়ি চলে যায়। অতিদ্রুত পোশাক পরিবর্তন করে সে। মাথাটা এমনভাবে ঢেকে নেয় যে, মুখমণ্ডলও আবৃত হয়ে গেছে। ঘোড়ার সঙ্গে খাদ্য-পানি বেঁধে নিয়ে কাউকে কিছু না বলেই রওনা দেয়। ইসহাকের বাড়ির পথ আগেই জেনে নিয়েছে সে। সালার যখন কমান্ডারকে ইসহাকের বাড়ির পথ নির্দেশ করেছিলো, এই সিপাহী তখন পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলো। ইসহাকের প্রতি ভক্তিতে পরিপূর্ণ তার হৃদয়। লোকালয় থেকে বের হয়ে দ্রুত ঘোড়া হাঁকায় সিপাহী। কমান্ডার তো চলে গেছে তারও বহু আগে। কাজেই তার আগে ইসহাকের বাড়ি পৌঁছা সিপাহীর পক্ষে সম্ভব নয়।

❖ ❖ ❖

ইসহাকের পিতার নিকট দু'টি ঘোড়া ছিলো। তিনি ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করে দেন। ইসহাকের কন্যা ও স্ত্রী ঝটপট প্রস্তুত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসে। এলাকার আরো কতিপয় লোক এসে জড়ো হয়। তারাও সুদানী কমান্ডারের বক্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করে ইসহাকের কন্যা ও স্ত্রীকে কমান্ডারের সঙ্গে বিদায় করে দেয়।

রাতের সফর। পথে কোথাও যাত্রাবিরতি দেয়া যাবে না। ইসহাকের ভাবনায় দু'মহিলার চোখের নিদ্রা উড়ে গেছে। তাদের পক্ষে ঘোড়সওয়ারী নতুন কিংবা কঠিন বিষয় নয়। এখানকার মুসলমানরা তাদের সন্তানদের অশ্বারোহন ও তীরচালনা শৈশবেই শিক্ষা দিয়ে থাকে।

তিনটি ঘোড়া পাহাড়ী এলাকা থেকে বেরিয়ে গেছে। কমান্ডার এই ভেবে আনন্দিত যে, সে সাফল্যের সাথে ইসহাকের স্ত্রী-কন্যাকে জালে আটকাতে সক্ষম হয়েছে।

ইসহাক সেই প্রকোষ্ঠে বসে আছেন, যেখানে মিশরী সৈনিকের গলিত লাশ পড়ে ছিলো। এই লাশ সেখানে তাকে অস্থির করে তোলার জন্য রাখা হয়েছিলো। কিন্তু ইসহাক তো এখন দৈহিক অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি লাশটির সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছেন, যেনো লাশটি জীবিত। দুর্গন্ধের এক তিল অনুভূতিও তার নেই। তিনি যেনো এখন আর দেহ নন– একটি আত্মা। সারাটা দিন তাকে কক্ষ থেকে বের করা হয়নি। সন্ধ্যার পরও কেউ তাকে বিরক্ত করেনি। তিনি এই ভেবে বিস্মিত যে, তাকে কেনো শান্তিতে থাকতে দেয়া হচ্ছে। সম্ভবত সুদানী সালার তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে।

পাহাড়ী এলাকা থেকে বের হয়ে দুই মহিলাকে নিয়ে কমান্ডার মরু এলাকার দিকে যাচ্ছে। মহিলাদেরকে সে ইসহাক সম্পর্কে ভালো ভালো কথা শোনাচ্ছে। তারা মনোযোগ সহকারে তার বক্তব্য শুনছে।

সুদানী সালার তার সঙ্গীকে বলছে– 'কেউ কি আপন স্ত্রী ও কন্যার অপমান সহ্য করতে পারে? আমি আশাবাদী, কমান্ডার ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে আসবে। । আমি ইসহাককে বলবো, যতোক্ষণ না তুমি মুসলিম গোত্রগুলোকে সুদানী ফৌজে শামিল করে সুদানের অফাদার না বানাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার স্ত্রী ও কন্যা আমাদের হাতে বন্দী থাকবে।'

'আমাদের কমান্ডারকে ভোর নাগাদ এসে পৌঁছা উচিত।' সালারের সঙ্গী বললো।

'তার আগেও এসে পড়তে পারে'– সালার বললো– 'লোকটা বড় চতুর।'

কমান্ডারের পেছনে পেছনে রওনা হওয়া সিপাহী পার্বত্য এলাকার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করছে। অর্ধেকেরও বেশী পথ অতিক্রম করে ফেলেছে সে। আকাশে চাঁদ নেই। তবু মরু এলাকা বলে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। তারকার আলোয় চলার মতো পথ দেখা যায়।

রাতের নীরবতার মধ্যে সিপাহী কারো কথা বলার শব্দ শুনতে পায়। বক্তা তারই দিকে এগিয়ে আসছে। সিপাহী একটি টিলার আড়ালে গিয়ে থেমে যায়। কথা বলার শব্দ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে। এবার একাধিক ঘোড়ার পায়ের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। পরক্ষণেই সিপাহী টিলার আড়াল থেকে তিনটি ঘোড়া অতিক্রম করতে দেখে। সে তরবারী হাতে নেয়। কমান্ডার এখনো ইসহাকের কথা বলে যাচ্ছে। সিপাহী নিশ্চিত হয়, লোকটি তাদের সেই কমান্ডার এবং তার সঙ্গে ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যা।

সিপাহী ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং কমান্ডারের পিছু নেয়। তার ঘোড়ার পদশব্দে কমান্ডার চমকে ওঠে। সে তরবারী উঁচু করে পেছন দিকে ঘুরে যায়। কিন্তু সিপাহী ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে কমান্ডারের উপর এমন এক আঘাত হানে যে, কমান্ডারের একটি বাহু কেটে যায়। পাল্টা আঘাত হানার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কমান্ডার। সিপাহী তার ঘাড়ে আঘাত হেনে তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দেয়।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ভ হয়ে যায় মহিলাদ্বয়। ইসহাকের স্ত্রী তার মেয়েকে বললো– 'পালাও, ডাকাত মনে হচ্ছে।' তারা ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সিপাহী তাদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো– 'এখানে কোনো ডাকাত নেই। আমাকে ভয় করো না। আমি তোমাদেরকে একজন দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছি। আমার সঙ্গে নিজ বাড়িতে চলো। আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো। আমার সঙ্গে আর কোনো মানুষ নেই।'

ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যা অস্থির-পেরেশান যে, এসব কী ঘটছে। সিপাহী

কমান্ডারের ঘোড়ার লাগাম তার ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে রওনা হয়। পথে সে ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে জানায়, ইসহাক কয়েদখানায় বন্দী। মুসলমান গোত্রগুলোকে সুদানী ফৌজে শামিল করে দেয়ার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু তিনি তা মেনে নিতে নারাজ। ইসহাকের সঙ্গে কিরূপ আচরণ চলছে, সিপাহী তাদের তা জানতে দেয়নি। সে বললো, তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে পরিকল্পনা হলো, তোমাদেরকে ইসহাকের সামনে উলঙ্গ দাঁড় করিয়ে লাঞ্ছিত করে ইসহাককে বাধ্য করা। এই যে লোকটিকে আমি খুন করেছি, সে এ লক্ষ্যেই তোমাদেরকে নিতে এসেছিলো। আমি তোমাদেরকে এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার পেছনে পেছনে আসি। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।'

'তুমি কে?'– ইসহাকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কি মুসলমান?'

'আমি কয়েদখানার সিপাহী'– সিপাহী জবাব দেয়– 'আমি মুসলমান নই।'

'তাহলে আমাদের জন্য তোমার হৃদয়ে দয়া জাগলো কেনো?'

'আমি শুনেছি, মুসলমানদের একজন পয়গম্বর আছেন'– সিপাহী বললো– 'তোমার স্বামীকে পয়গম্বর বলে মনে হচ্ছে।'

ইসহাকের স্ত্রী জানতে চায়, তুমি কেন আমার স্বামীকে পয়গম্বর মনে করছো। সিপাহী আসল ঘটনা এড়িয়ে গিয়ে বললো– আমি তাকে সত্য পয়গম্বর মনে করি। তিনি মুসলমান এবং কয়েদখানায় বন্দী। আমি মুসলমান নই। তার স্ত্রী ও কন্যাকে লাঞ্ছিত করার যে আয়োজন চলছে, তা তিনি জানেন না। আমার অন্তরে ইচ্ছা জাগলো, তোমাদের দু'জনের ইজ্জত রক্ষা করবো। আবেগের বশবর্তী হয়ে আমি এমন কাজ করে ফেলেছি, যা আমার সামর্থের বাইরে ছিলো। এ তারই অদৃশ্য শক্তি। আমি তাকে পয়গম্বর মনে করি।'

❖ ❖ ❖

রাতের শেষ প্রহরে চারটি ঘোড়া ইসহাকের ঘরের সম্মুখে গিয়ে থেমে যায়। ঘরের দরজায় করাঘাত পড়ে। পুত্রবধূ ও নাতনীর সঙ্গে ভিন্ন এক পুরুষকে দেখে ইসহাকের পিতা বিস্মিত হন। ভেতরে প্রবেশ করে সিপাহী তাকে পুরো ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে। কিন্তু কয়েদখানায় ইসহাকের সঙ্গে কিরূপ আচরণ চলছে, তা গোপন রাখে। ইসহাকের পিতা তৎক্ষণাৎ গোত্রের লোকদেরকে বিষয়টি অবহিত করে। মানুষ এসে ইসহাকের বাড়িতে ভিড় জমায়। সিপাহী তাদেরকে জানায়, ইসহাককে এই শর্তে মুক্তি দেয়ার কথা বলা হচ্ছে যে, তিনি আমাদের সব মুসলমানকে সুদানী ফৌজে শামিল করে দেবেন এবং আপনারা

সবাই সুদানের অনুগত হয়ে যাবেন। কিন্তু ইসহাকের বক্তব্য– আমাকে জীবনে মেরে ফেলো, তবু আমি আমার স্বজাতির সঙ্গে গাদ্দারী করতে পারবো না।

শুনে সবাই আৎকে ওঠে এবং সুদানকে গালমন্দ করতে শুরু করে। একজন বললো– 'এখানে সালাহুদ্দীন আইউবীর আগমন ঘটবে। এটা আল্লাহর জমিন।'

'আমরা কয়েদখানা আক্রমণ করে ইসহাককে উদ্ধার করবো।' এক ব্যক্তি বললো।

'তোমাদের পক্ষে এ কাজ সহজ নয়'– সিপাহী বললো– 'পাতাল কক্ষ থেকে কাউকে বের করে আনার সাধ্য তোমাদের নেই।'

'তুমি তো কয়েদখানার সিপাহী'– ইসহাকের পিতা বললেন– 'তুমি সহযোগিতা করতে পারো।'

'আমি গরীব এবং সাধারণ একজন সৈনিক'– সিপাহী বললো– 'আমি আপনার পুত্রকে পয়গম্বর মনে করি। আমি তাকে বলেছি, তুমি আমার ভাগ্য বদলে দাও। তিনি বলেছেন, এখান থেকে বের হয়ে আমি তোমার ভাগ্য বদলে দেবো। সময় যতো অতিক্রম করছে, তার প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনারা সবাই তার জন্য জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন। আমার জীবনও কি তেমন হতে পারে না, যেমনটা আপনাদের?'

'তুমি মুসলমান হয়ে যাও এবং এখানেই থাকো'– ইসহাকের পিতা বললেন– 'আমরা সবাই জান্নাতে বাস করি। এখানকার জমি এতো অধিক ফসল উৎপন্ন করে যে, যারা কৃষি কাজ করে না, তাদেরও না খেয়ে থাকতে হয় না। এটা আমাদের আল্লাহর অনুগ্রহ। তুমি আমাদের নিকট এসে পড়ো এবং ভাগ্য পরিবর্তন করো। আমরা স্বাধীন। এখানকার পর্বতমালা আমাদের দুর্গ। এই দুর্গ আল্লাহ আমাদের জন্য বানিয়ে দিয়েছেন।'

সিপাহী ইসহাকের এলাকায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইসহাকের পিতার হাতে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে সেখানেই বসবাস করতে শুরু করে।

এখন ভোর বেলা। সুদানী সালার অস্থিরচিত্তে কমান্ডারের আগমনের অপেক্ষা করছে। কিন্তু তার কোনো খোঁজ নেই। সূর্য মাথার উপর ওঠে আসছে আর সালারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ধারণা, কমান্ডার পথ ভুলে গেছে। সে অপর এক কমান্ডারকে ডেকে দায়িত্ব বুঝিয়ে পথের নির্দেশনা দিয়ে রওনা করিয়ে দেয়।

ইসহাক কক্ষে আবদ্ধ। সারাটা দিন তার এই অবরুদ্ধ অবস্থায় কেটেছে। তার কক্ষে পড়ে থাকা লাশটি গলতে শুরু করেছে। কয়েদখানার যে সান্ত্রী মানুষের হাড় ভাঙ্গা এবং পাতাল প্রকোষ্ঠের দুর্গন্ধ সহ্য করতে অভ্যস্ত, সেও ইসহাকের কক্ষের নিকটে যেতে আপত্তি করছে। এক সান্ত্রী নাকে হাত রেখে

ইসহাককে জিজ্ঞেস করলো– 'হতভাগা! এতো দুর্গন্ধ তুমি কিভাবে সহ্য করছো? এরা তোমার নিকট যা যা দাবি করছে, তুমি মেনে নাও এবং এখান থেকে মুক্তি গ্রহণ করো। তুমি তো এই মুর্দারের গন্ধে পাগল হয়ে যাবে।'

'আমার কোনো দুর্গন্ধ অনুভব হচ্ছে না'– ইসহাক বললেন– 'এটা মুর্দার নয়, ইনি শহীদ। আমি রাতে তার গা ঘেঁষে ঘুমাই।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছো'– সান্ত্রী বললো– 'লাশের দুর্গন্ধের ক্রিয়া এমনই হয়ে থাকে।'

ইসহাকের মুখে মুচকি হাসি ফুটে ওঠে। তিনি লাশটির সন্নিকটে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুরু করেন।

কেটে গেছে এ রাতটিও। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে সালার পরবর্তী যে কমান্ডারকে প্রেরণ করেছিলেন, সে ফিরে আসে। লাগাতার দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত কমান্ডার যা কিছু দেখে এসেছে, তা বিবৃত করতে তার ঠোঁট কাঁপছে। সে সালারকে জানায়, পথে কিছু এলাকা বালির টিলা ও পর্বতময়। দেখলাম, এক স্থানে অনেকগুলো শকুন একটি মুর্দা খাচ্ছে। পার্শ্বেই এক স্থানে পড়ে আছে একটি তরবারী, এক জোড়া জুতা ও কিছু কাপড়-চোপড়। শকুনগুলোকে তাড়িয়ে দেয়ার পর বুঝতে পারলাম, ওরা যা খাচ্ছিলো ওটি একটি মানুষের লাশ। লাশের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে গেছে। পার্শ্বে পরিত্যক্ত খঞ্জর ও চামড়ার বেল্ট ইত্যাদি দেখে আমি নিশ্চিত হই যে, এটি আমাদের সুদানী কমান্ডারের লাশ। আমি কিছুদূর সম্মুখে এগিয়ে মাটি পরখ করে ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখতে পাই। তাতে বুঝা গেলো, এই কমান্ডার পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করছিলো। তবে সে মহিলা দু'জনকে নিয়ে এসেছিলো কিনা এবং তাকে কে খুন করলো, বুঝা গেলো না।

শুনে সালার বললেন– 'সব জানা যাবে।'

মুসলমানদের উক্ত অঞ্চলে সুদানীরা তাদের গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিলো, যারা ওখানকার মুসলমানদেরই একজন। ওখানে তাদের একমাত্র কাজ চরবৃত্তি। তারাই ইসহাক সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিলো, ঐ অঞ্চলে তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

সালারের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। সন্ধ্যার পর দু'জন গুপ্তচর সেখান থেকে এসে পৌঁছে। তারা সালারকে জানায়, কমান্ডার ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু আমাদের কয়েদখানার এক সিপাহী পথে কমান্ডারকে হত্যা করে মহিলা দু'জনকে ফেরত নিয়ে গেছে। গোয়েন্দারা

সিপাহীর নামও জানায়। সালার বিষয়টি সুদানের সম্রাটকে অবহিত করে। সম্রাট জানায় খৃস্টান উপদেষ্টাদের। খৃস্টান উপদেষ্টারা পরামর্শ দেয়, তোমরা চুপ থাকো। মুসলমানদের উপর হামলা করার মতো বোকামী করো না। তাদেরকে কৌশলে বন্ধুতে পরিণত করার চেষ্টা করো। বড়জোর এটুকু করতে পারো যে, উক্ত সিপাহীকে গোপনে হত্যা করাও, যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে, আমাদের হাত সর্বত্র পৌঁছতে পারে। ইসহাক যদি তোমাদের শর্ত মেনে না নেয়, তাহলে অন্য কোনো সুদানী মুসলমানকে টার্গেট করো এবং ইসহাকের নির্যাতন অব্যাহত রাখো।

ইসহাককে পুনায় নিপীড়নের যাঁতাকলে নিক্ষেপ করা হলো। এবার তার থেকে কমান্ডার হত্যার প্রতিশোধও নিতে চাচ্ছে সালার। তাকে এমন পাশবিক নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট করা হলো, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। রাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ইসহাক। অচেতন অবস্থায়ই তাকে একটি কক্ষে নিক্ষেপ করা হলো। যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে, তখন কক্ষে ঘোর অন্ধকার। বাইরে একটি প্রদীপ জ্বলছে। ইসহাক অন্ধকারে একদিকে হাত বাড়ালে হাত কারো গায়ের সঙ্গে লাগে। তার স্মরণে এসে যায়, এতো সেই লাশ, যেটি প্রথম দিন থেকে তার সঙ্গে পড়ে আছে। কিন্তু তার কাছে মনে হলো, লাশটা নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে। তার শরীরের অবস্থা এতোই শোচনীয় যে, উঠে বসার শক্তি নেই।

হঠাৎ লাশটা নড়ে ওঠে। ইসহাক চমকে ওঠে তাকায়। লাশের চেহারায় দৃষ্টিপাত করে। এ্যা, এতো সেই লাশ নয়, এতো অন্য কোনো জীবিত মানুষ এবং এটি অপর একটি কক্ষ। লোকটি সম্ভবত অচেতন। পরে ধীরে ধীরে তার চৈতন্য ফিরে আসে এবং চোখ খুলে। ইসহাক বড় কষ্টে উঠে বসে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কে?'

'আমর দরবেশ।' অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে লোকটি জবাব দেয়।

'আহ! আমর দরবেশ'– ইসহাক চমকে ওঠে বললেন– 'আমি ইসহাক।'

ইসহাক ও আমর দরবেশ একে অপরকে ভালোভাবেই চেনে। আমর দরবেশও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজের একটি ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন। তিনি সেই মুসলমান কবিলার লোক, যারা সুদানী হওয়া সত্ত্বেও সুদানী ফৌজে ভর্তি হওয়া থেকে বিরত থাকছে। আমর দরবেশও এখন যুদ্ধবন্দী। ইসহাকের নাম শুনে তিনি উঠে বসেন।

'তারা তোমাকে কী বলছে?' ইসহাক জিজ্ঞেস করেন।

'তারা বলছে'– আমর দরবেশ জবাব দেন– 'তুমি আলেমের বেশ ধারণ

করে নিজ এলাকায় গিয়ে লোকদের অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টি করো। আমরা তোমাকে কৌশল বলে দেবো, তোমাকে রাজপুত্রের ন্যায় রাখবো এবং যে মেয়েকে পছন্দ হয়, তোমার সঙ্গে দেবো। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমাদের উদ্দেশ কি? তারা বলেছে, তুমি তোমার সবক'টি গোত্রকে সুদানের অনুগত বানিয়ে দাও। বিনিময়ে তারা আমাকে মুসলিম অঞ্চলের আমীর নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এরা মুসলমানদের আলাদা বাহিনী গড়তে চায়।'

'আমি জানতে পেরেছি'– আমর দরবেশ বললেন– 'তারা তোমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। বুঝতে পারছি না, আমাদের দু'জনকে কেনো এক কক্ষে আবদ্ধ করলো। এর মধ্যে কল্যাণ থাকতে পারে। আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছিলাম। আমি একটা পন্থা ভেবেছি। সে মতে কাজ করার আগে তোমার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন ছিলো। ভালোই হলো, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে।'

'কী পন্থা ভেবেছেন?' ইসহাক জিজ্ঞেস করেন।

'তুমি তো বুঝতে পারছো, এরা আমাদেরকে ছাড়বে না'– আমর দরবেশ বললেন– ' আমরা কতকাল নিপীড়ন সহ্য করবো। আজ না হোক কাল তো আমাদের মরতেই হবে। এখানে আরো কয়েকজন সুদানী মুসলমান বন্দী আছে। কেউ না কেউ তাদের হাতে এসে যাবে। আমার আশংকা, এরা আমাদের কোনো না কোনো সহকর্মীকে ফাঁদে ফেলে আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে। একটা পন্থা এই হতে পারে যে, আমরা এদের শর্ত মেনে নিয়ে এখান থেকে মুক্তি লাভ করবো এবং এলাকায় গিয়ে কোনো কাজ করবো না। আমরা রাতের আঁধারে গোপনে মিশর চলে যাবো। আমাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয় পন্থা হলো, আমি এদের সব প্রস্তাব মেনে নেবো। এরা আমাকে যা যা পাঠ শোনাবে, আমি সব পড়ে নেবো। তাদের নির্দেশিত বেশ ধারণ করবো এবং গোত্রের লোকদেরকে সাবধান করে দেবো, যেনো তারা সুদানীদের কারো খপ্পরে না পড়ে। বের হয়ে আমি তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে নেয়ার চেষ্টা করবো।'

'এ-ও তো হতে পারে যে, তখন সুদানীরা আমাদের এলাকার উপর হামলা করে বসবে'– ইসহাক বললেন– 'আমাদের জনগণ অতো তাড়াতাড়ি অস্ত্র সমর্পণ করার মতো লোক নয় বটে; কিন্তু সেনাবাহিনীর শক্তিও অতো দ্রুত নিঃশেষ হবে না। সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়ে সাধারণ জনতার পেরে ওঠা সহজ হবে না।'

'আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমরা মিশর থেকে কমান্ডো বাহিনীর সাহায্য নিতে পারি। এক্ষুণি যা প্রয়োজন, তাহলো, আমাদের একজন বেরিয়ে যাবো। আমরা দু'জনই যদি একসঙ্গে তাদের শর্ত মেনে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি, তাহলে আরও ভালো হবে।'

'আমি এখানেই থাকবো'– ইসহাক বললেন– 'তুমি তাদেরকে ধোঁকা দাও। আমরা দু'জনই যদি একসঙ্গে তাদের দাবি মেনে নেই, তাহলে তারা বুঝে ফেলবে, এক কক্ষে অবস্থান করে আমরা পরামর্শের মাধ্যমে কোনো পরিকল্পনা ঠিক করেছি। আমি তাদের নিপীড়ন ভোগ করতে থাকবো। তুমি বেরিয়ে যাও।'

❖ ❖ ❖

রাত পোহাবা মাত্র কক্ষের দরজা খুলে যায়। এক সিপাহী বর্শার আগা দ্বারা খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলে ধাক্কাতে ধাক্কাতে সঙ্গে করে ইসহাককে নিয়ে যায়। কক্ষের দরজা পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর সুদানী ফৌজের এক কর্মকর্তা এসে হাজির হয়। সে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আমর দরবেশকে জিজ্ঞেস করে– 'আজও যদি তুমি অস্বীকার করো, তাহলে কল্পনা করতে পারবে না তোমার শরীরের দশা কী হবে। আমরা তোমাকে মরতে দেবো না। দুনিয়াতেই তুমি জাহান্নাম দেখতে পাবে। প্রতিদিনই মরবে, প্রতিদিনই জীবিত হবে।'

'আমাকে কোনো একটি ভালো জায়গায় নিয়ে যাও'– 'আমর দরবেশ বললেন– 'আমার দেহটাকে একটু শান্তি দাও। এখানে আমি কিছুই ভাবতে পারি না।'

'আমি তোমাকে জান্নাতে নিয়ে বসাতে পারি'– সুদানী কর্মকর্তা বললো– 'আমি তোমাকে জান্নাতের হুরদের মাঝে বসাবো। কিন্তু সেখানেও যদি আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে যতোদিন বেঁচে থাকবে, আফসোস করবে। কেঁদে কেঁদে আমাদের বলবে, আমি তোমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। কিন্তু তখন আর আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না।'

আমর দরবেশ কোঁকাচ্ছেন। চোখ দুটো পুরোপুরি খুলতে পারছেন না। তিনি কর্মকর্তার কানে ফিসফিসিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন– 'এমনটা হবে না। আমাকে কোথাও নিয়ে চলো এবং বলো, আমাকে কী করতে হবে।'

আমর দরবেশকে তখনই সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হলো এবং ইসহাককে যেরূপ বিলাসবহুল কক্ষে রাখা হয়েছিলো, তেমনি এক কক্ষে রাখা হলো। সামান্য পরে একজন ডাক্তার এসে উপস্থিত হন। তিনি তার দেহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে যান। তাকে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হতো। এ সময়ে ইসহাককে নিপড়িনকারী সেই সুদানী সালার আমর

দরবেশকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কি আমাদের সবগুলো প্রস্তাব মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো?' আমর দরবেশ মাথা নেড়ে সম্মতিসূচক জবাব দেন। তারপর আহার শেষ করেই শুয়ে পড়েন। আমর দরবেশ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

গোটা রাত এবং পরবর্তী দিনের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর আমর দরবেশের ঘুম ভাঙ্গে। তিনি কয়েদখানায় বহুদিন যাবত নিপীড়ন ভোগ করে আসছেন। শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হাড়-চামড়ার মাঝে গোশত নেই। শুলে হাড়ে ব্যথা পান। কিন্তু এখন সুদর্শন কক্ষে মনোরম গালিচায় কয়েক ঘণ্টা ঘুমাবার পর তার দেহে সুস্থতা ও সজীবতার ভাব ফুটে উঠেছে। তাকে ওষুধ সেবন করানো হয়েছে। খাওয়ানো হয়েছে রাজকীয় খাবার।

চোখ খুলে দেখতে পান এক যুবতী তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাসছে। অত্যন্ত রূপসী। মাথাটা উন্মুক্ত। ঝলমলে রেশমী চুল। কাঁধ, বাহু ও বুকের অনেকখানি উদোম।

আমর দরবেশ সৈনিক মানুষ। জন্মেছেন জঙ্গলে। যৌবনে কেটেছে যুদ্ধের ময়দানে। মেয়েটিকে তার কাছে স্বপ্ন মনে হলো। কিন্তু মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলালে তিনি নিশ্চিত হন এটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব।

মেয়েটি কক্ষ থেকে বের হয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনে। ডাক্তার তার স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিয়ে ওষুধ খাইয়ে চলে যান।

খানিক পর এসে উপস্থিত হয় দু'জন খৃস্টান। তারা অনর্গল সুদানী ভাষায় কথা বলছে। নাশকতায় অভিজ্ঞ। তারা আমর দরবেশকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে যে, নিজ এলাকায় গিয়ে বলবে না, তুমি আমাদের হাতে বন্দী ছিলে। বরং বলবে, যুদ্ধের ময়দানে এক বুযুর্গের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো, যিনি বলেছেন মিশরী বাহিনীর সুদান আক্রমণ ভুল প্রমাণিত হবে। মুসলমানদের জন্য উত্তম হলো, তারা সুদানের সঙ্গে যোগ দেবে। অন্যথায় তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি একজন দেওয়ানা আলেমের বেশে মুসলমানদের অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবী ও মিশর সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করবে।

আমর দরবেশ হাসিমুখে সম্মতি প্রকাশ করেন। তৎক্ষণাৎ তার প্রশিক্ষণ ও রিহার্সেল শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর কয়েকটি মেয়ে তার জন্য খাবার নিয়ে আসে। এনে হাজির করে মদও। আমর মদ পান করতে অস্বীকার করেন। আহার শেষে এই মেয়েরা চলে যায়। রাতের পোশাকে এসে উপস্থিত হয় অপর এক মেয়ে। দেহটা অর্ধনগ্ন। চাল-চলন, ভাবভঙ্গী উত্তেজনাকর।

'তুমি কেন এসেছ?' আমর দরবেশ মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন।

'আপনার জন্য'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমি আপনার কাছে থাকবো।'

'তোমার নাম কি?'

'আশি।' নামটা বলেই মেয়েটি আমর দরবেশের পালংকের উপর বসে পড়ে। 'আমি আদেশ পেয়ে এসেছি, আমাকে আপনার সঙ্গে থাকতে হবে।'

'এরা আমার থেকে যা আদায় করতে চাচ্ছে, আমি তা মেনে নিয়েছি'– আমর দরবেশ বললেন– 'তোমার ন্যায় সুদর্শন ফাঁদের কোনো প্রয়োজন নেই।'

'আমি জানি'– আশি বললো– 'আমাকে আপনার সম্পর্কে সবকিছু বলা হয়েছে। আমি পুরস্কার হিসেবে এসেছি। আমি জানি আমাকে আপনার প্রয়োজন রয়েছে। সৈনিক যখন রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসে, তখন তার আত্মা নারীর প্রয়োজন অনুভব করে থাকে।'

'আমি পরাজিত সৈনিক'– 'আমর দরবেশ বললেন– 'আমার আত্মা মরে গেছে। নিজ দেহের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেছে। কোনো প্রয়োজনের অনুভূতি আমার নেই। কয়েদখানায় সিদ্ধ পাতা খেয়েও আমি আনন্দ পেয়েছি। এখানে এতো সুস্বাদু রাজকীয় খাবার খেয়েও তৃপ্ত। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে আমি আনন্দিত নই। আমি পরাজিত।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে। যেনো কোনো রসিক বন্ধু তার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে।

'দু-চার ঢোক মদ আপনাকে আনন্দে উদ্বেলিত করে তুলবে'– মেয়েটি বললো– 'কয়েক ঢোক লাল পানি কণ্ঠনালী অতিক্রম করার পর আমার প্রতি তাকাবেন। তখন আমার মধ্যে ফুলের সৌন্দর্য দেখতে পাবেন।'

'আমার সমস্যাটা হলো, আমি মুসলমান'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমরা সম্ভ্রম নিয়ে খেলা করি না, বরং আমরা সম্ভ্রমের সুরক্ষা করে থাকি।'

'সে তো মুসলমান মেয়েদের সম্ভ্রম'– মেয়েটি বললো– 'আমি মুসলমান নই।'

'তুমি সম্ভ্রান্তও নও'– আমর দরবেশ বললেন– 'তারপরও আমার কর্তব্য, তোমার সম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখবো। নারী মুসলমান হোক কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বী বা ভিন্ন জাতির; মুসলমান যদি পাক্কা ঈমানদার হয়, তার সম্ভ্রমের হেফাজত করবেই। তুমি সারা রাত আমার কাছে বসে থাকো। সকালে সকলের নিকট বলে বেড়াবে, গত রাতটা আমি একটা পাথরের কাছে অতিবাহিত করেছি।

'আমি কি রূপসী নই?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'যেমনই হয়ে থাকো, তুমি আমার কোনো কাজের নও'– আমর দরবেশ

বললেন– 'আমি বরং তোমার কাজে আসতে পারি। তুমি যদি এই লাঞ্ছনাময় জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাও, তাহলে জীবন বাজি রেখে হলেও আমি তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবো এবং কোনো ভদ্র ঘরে পুনর্বাসন করে দেবো।'

'আপনার আগেও এক ব্যক্তি এখানে এসেছিলেন'– আশি বললো– 'তিনিও আপনার ন্যায় কথা বলতেন। তিনিও সুদানী মুসলমান ছিলেন। মুসলমান বিধায় নারীর প্রতি আপনার কোনো আকর্ষণ নেই, আপনার এ দাবি আমি মানতে পারছি না। আমি মিশরের এমন অনেক মুসলমানকে দেখেছি, যারা নারী পেলে ক্ষুধার্ত জন্তুতে পরিণত হয়। আমি এমন তিনজন মিশরী মুসলমানের নাম বলতে পারবো, যাদেরকে আমি এবং সোরাহী বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেছে। তারা কিরূপ মুসলমান?'

'তারা ঈমান বিক্রেতা'– আমর দরবেশ বললেন– 'তুমি যখন কথা বলো, তখন আমি তোমার চেহারা ও চোখে তোমার মাতা-পিতার ঝলক দেখার চেষ্টা করছি। তারা কোথায়? বেঁচে আছেন কি?'

'জানি না'– আশি বললো– 'আপনার পূর্বে যিনি এখানে এসেছিলেন, তিনিও জিজ্ঞেস করেছেন, আমার বাবা-মা বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন।'

আশি ইসহাকের প্রসঙ্গ টেনে আনে। ইসহাককে যখন এই কক্ষে রাখা হয়েছিলো, তখনও এই মেয়েটিকেই তার কাছে এখানে পাঠানো হয়েছিলো। মেয়েটি আমর দরবেশকে বললো– 'ঐ সুদানী মুসলমান আমার পিতা-মাতা সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমাকে অস্থির করে তুলেছিলো। ইতিপূর্বে তিনি ব্যতীত আর কেউ আমাকে আমার পিতা-মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনি। তার এই অপ্রীতিকর প্রশ্নের ফলে আমি রাতভর ভাবতে থাকি, আমার পিতামাতা কারা এবং কিরূপ ছিলেন? ছিলো তো অবশ্যই। কিছু কিছু স্মৃতি মনে আসে আবার অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এখন আমি নিজেকে তাদের স্মরণ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু সফল হইনি। আজ আপনি পুনরায় নতুন করে তাদের কথা মনে করিয়ে দিলেন। আমার পিতা-মাতা থাকতে পারে– এমন ভাবনা যখন আমার থাকে না, তখন আমি ভালো থাকি।

'তোমার কোনো ভাই ছিলো?'

'স্মরণ নেই'– আশি বললো– 'রক্ত সম্পর্ক কী জিনিস, আমি জানি না।'

'তোমার ঘুম আসছে, শুয়ে পড়ো।' আমর দরবেশ বললেন।

'আমার মন চায় বসে বসে আপনার কথা শুনি'– আশি বললো– 'আপনার মতো মানুষগুলোকে আমার খুব ভালো লাগে। আমি যারই সঙ্গে কিছু সময়

অতিবাহিত করি, তার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে যায়। আপনার পূর্বে যে সুদানী মুসলমান এখানে এসেছিলো, তাকে আমার সারাজীবন স্মরণ থাকবে। আর আপনি দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাকে আমি আজীবন শ্রদ্ধা করবো। আপনি আমার মধ্যে আত্মা ও চেতনাকে জাগ্রত করে দিয়েছেন। আপনি সম্ভবত আমাকে হৃদয়ের চোখে দেখছেন। অন্যরা আমাকে দেখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে।'

'আমি তোমাকে সম্ভ্রমহারা নারী মনে করতাম'– আমর দরবেশ বললেন– 'কিন্তু এখন দেখছি তুমি বুদ্ধির কথা বলছো।'

'আমি প্রিয়দর্শিনী ও মধুর বিষ'– আশি বললো– 'আমাকে পাথরকে মোমে পরিণত করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আমি কোনো সহজ-সরল মেয়ে নই। আমি প্রতাপান্বিত শাসকের তরবারী আমার পায়ের উপর রাখাতে জানি। আমি আলেমদের আদর্শ পরিবর্তন করে দিতে পারি। কিন্তু এখন নিজেকে এমন এক মোম বলে মনে হচ্ছে, যা সামান্য তাপেই গলে যাবে, যা কোনো পাথরকে গলাতে সক্ষম নয়।'

'এটা আমার বক্তব্যের ক্রিয়া নয়'– আমর দরবেশ বললেন– 'এটা আমার ঈমানের উত্তাপ, যা তোমাকে বিগলিত করে ফেলেছে। আমি তোমার মাঝে রক্ত সম্পর্ক জাগিয়ে দিয়েছি। তুমি মানুষ। তুমি কারো কন্যা, তুমি কারো বোন। তুমি কোনো একটি জাতির সম্ভ্রম।'

রাত কেটে যাচ্ছে। একদিকে ঘুমের আবেশ, অপরদিকে আমর দরবেশের বক্তব্য আশির উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মেয়েটি পালংকের কোণে বসা ছিলো। সেখানেই এলিয়ে পড়ে সে।

ঘুম ভাঙ্গার পর আশি দেখতে পেলো, সে পালংকে শায়িত আর আমর দরবেশ মেঝেতে। ঘুমন্ত আমরের প্রতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আশি। বুকের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। নিজের গণ্ডদেশে অশ্রুর উপস্থিতি অনুভব করে সে। বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবে, আরে আমার চোখে অশ্রুও তো আছে তাহলে। ইতিপূর্বে আশির চোখ থেকে কখনো অশ্রু বের হয়নি। ধীরে ধীরে আমর দরবেশের নিকটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তার ডান হাতটা উপরে তুলে এনে নিজের চোখের সঙ্গে লাগায়।

আমর দরবেশের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাকিয়ে দেখে, আশি তার পাশে বসা। মুখে কথা নেই, হাসিও নেই। এ কথাও বললো না, মেঝেতে ঘুমানো তোমার পক্ষে ঠিক হয়নি। সে নীরবে বাইরে চলে যায়। পানি নিয়ে ফিরে আসে। আমর দরবেশ এই পানি দ্বারা ওজু করে নামাযে দাঁড়িয়ে যান। আশি কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

নাস্তার পর দু'জন খৃস্টানের সুদানী সালার এসে উপস্থিত হয়।

'আমার একটি কথা মনোযোগ সহকারে শুনে নাও'– আমর দরবেশ সালারকে বললেন– 'যে কোনো সময় আমার ইসহাককে প্রয়োজন হতে পারে। তাকে অস্থির না করে খোলামেলা আরামদায়ক কক্ষে থাকতে দিন। পাতাল কক্ষ থেকে সরিয়ে তাকে উপরে নিয়ে আসা হোক। তিনি আমার বন্ধু। আমি যখন তার প্রয়োজন অনুভব করবো, তখন আমিই তাকে বুঝিয়ে নেবো। প্রয়োজন হলে ধোঁকা দিয়ে হলেও তার থেকে কাজ নেবো। তখন যদি তিনি মতে না আসেন, তখন তার সঙ্গে যা খুশি আচরণ করুন।'

সুদানী সালার বললো– 'তাই হবে।'

খৃস্টান উপদেষ্টাগণ আমর দরবেশকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। তিনি ভালোভাবেই প্রশিক্ষণ রপ্ত করেন। তারা তাকে যা যা বলেছে, তাও তিনি মুখে আওড়াতে থাকেন। চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত তার প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। দিনে তার সঙ্গে থাকে খৃস্টান উপদেষ্টারা, আর রাতে আশি। এই মেয়েটি তার ভক্তে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু দু'একদিন আমর দরবেশের সাহচর্যে থাকার পর এখন তার নিজেকে পবিত্র বলে মনে হচ্ছে।

একটানা ছয় দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর আমর দরবেশ সপ্তম দিন একজন দরবেশের বেশে নিজ এলাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তাকে দরবেশ ও দেওয়ানা আলেমের পোশাক পরিধান করানো হলো। আশি তাকে বলেছিলো, আপনি যখন মিশন নিয়ে রওনা হবেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তার আবদার রক্ষার্থে আমর দরবেশ সুদানী সালারকে বললেন, পুরস্কার স্বরূপ মেয়েটিকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আমি তাকে সঙ্গে রাখতে চাই। সালার তার আবেদন মেনে নেয়। আশিকে তার সঙ্গে দেয়া হলো। প্রদান করা হলো তিনটি উট। একটিতে আমর দরবেশ আরোহন করেন। একটিতে আরোহন করে আশি। অপরটিতে বোঝাই করা হলো তাঁবু ও রসদ-সামান।

রওনা হওয়ার প্রাক্কালে সুদানী সালার আমর দরবেশকে অবহিত করে, ইসহাককে পাতাল কক্ষ থেকে বের করে উপরে আরামদায়ক উন্মুক্ত কক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁকে আরো জানানো হয়, মুসলমানদের এলাকায় আমাদের লোক আছে। তারা নিজ থেকে আপনার সঙ্গে মিলিত হবে এবং আপনাকে সাহায্য করবে।

আমর দরবেশ আশিকে সঙ্গে নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এক মিশনে রওনা হয়ে যান।

আমর দরবেশকে রওনা করিয়েই সুদানী সালার নিজ কক্ষে চলে যায়। সেখানে ছয়জন লোক উপবিষ্ট। তারা সবাই সুদানী মুসলমান এবং পার্বত্য এলাকার বাসিন্দা। সুদান সরকার থেকে বহু সুযোগ-সুবিধা ও মান-মর্যাদা পাচ্ছে। নিজ এলাকায় খাঁটি মুসলমানরূপে জীবন-যাপন করে তারা।

'সে রওনা হয়ে গেছে'– সালার বললো– 'তোমরা অন্য পথে রওনা হও। একজন একজন করে যাবে। নিজ এলাকায় চলে যাও এবং তার উপর দৃষ্টি রাখো। যদি কখনো সন্দেহ হয় যে, সে ধোঁকা দিচ্ছে, তাহলে তাকে এমনভাবে খুন করে ফেলবে, যেনো কেউ টের না পায়। আমি আরো লোক পাঠাচ্ছি। তাদেরকে তোমাদের ঘরে থাকতে দেবে।'

এরা একজন একজন করে রওনা হয়ে যায়। সুদানী সালার অপর দু'জন লোককে ডেকে আনে। তারা সুদানী হলেও মুসলমান নয়। সালার তাদেরকে বললো– 'এই মুসলমানদের উপর ভরসা রাখা যায় না। নিজ এলাকায় গিয়ে কী করে বলা যায় না। এই যে ছয়জন লোক রওনা হয়ে গেলো, ওরা আমাদেরই লোক। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, ওরা মুসলমান। ওখানে গিয়ে তাদের নিয়ত পাল্টে যেতে পারে। আমর দরবেশ যদি ঠিক থাকে, তাহলে তোমাদের দাহ্য পদার্থের প্রয়োজন হতে পারে। সেগুলো এদের ঘরে লুকিয়ে রাখা আছে। এগুলো কখন কোথায় ব্যবহার করতে হবে, তা তোমাদের জানা আছে।'

এই দু'জনও রওনা হয়ে যায়।

যে সিপাহী সুদানী কমান্ডারকে হত্যা করে ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে রক্ষা করেছিলো, এখন সে ইসহাকের ঘরে অবস্থান করছে। আমর দরবেশ যেদিন রওনা হলো, সেদিন বাইরে এক স্থানে ঘোরাফেরা করছিলো। হঠাৎ একদিক থেকে একটি তীর এসে তার গা-ঘেঁষে একটি গাছে গিয়ে বিদ্ধ হয়। সিপাহী দৌড়ে ইসহাকের ঘরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইসহাকের পিতাকে ঘটনাটি অবহিত করে। কিন্তু তীর কে ছুঁড়তে পারে, কেউই বুঝে উঠতে পারলো না। এটা যে তাকে হত্যা করার সুদানীদের প্রথম প্রচেষ্টা, তা কেউ জানে না।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আলী বিন সুফিয়ান কায়রোতে অবস্থান করছেন। অপরদিকে সুলতান আইউবী ক্রুসেডারদের সুহৃদ মুসলিম শাসক সাইফুদ্দীন, গোমস্তগীন ও আল-মালিকুস সালিহ-এর বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের কেন্দ্রীয় শহর হালবের দিকে

অগ্রসর হচ্ছেন। সুলতান আইউবীর এই মুসলিম বিরুদ্ধবাদীরা এমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় পলায়ন করেছিলো যে, পথে কোথাও দাঁড়াতে পারেনি। পথে এমন তিন-চারটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিলো, যেখানে তারা যাত্রাবিরতি দিয়ে বিক্ষিপ্ত সৈনিকদেরকে গুছিয়ে নিয়ে সুলতান আইউবীর মোকাবেলা করতে পারতো। কিন্তু সেসব পথে না গিয়ে তারা পিছু হটার জন্য এমন পথ অবলম্বন করে, যেটি সামরিক দিক থেকে তাদের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। সুলতান আইউবী অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং ঐসব গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে নেন। তাঁর গন্তব্য হাল্ব।

গোয়েন্দা মারফত প্রাপ্ত তথ্যাবলীতে সুলতান জানতে পারছেন মিশরে কখন কী ষড়যন্ত্র মাথা তুলছে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তিনি কখনো পেরেশান হতেন না। কিন্তু ইসলাম ও ইসলামী সাম্রাজ্য বিরোধী ষড়যন্ত্র তাকে বেচাইন করে তুললো। আর এই বাস্তবতা ছিলো তাঁর জন্য বিষের ন্যায় তিক্ত যে, এসব ষড়যন্ত্রের হোতা হলো খৃস্টানরা আর এর ক্রীড়নক মুসলমান। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর ডান হাত। বরং বলা যায় আলী তাঁর চোখ-কান। নিজের অবর্তমানে সুলতান তাকে মিশর রেখে এসেছেন এবং তার সহকারী হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে নিজের সঙ্গে নিয়ে আসেন। মিশরের শাসনক্ষমতা আইউবীর ভাই আল-আদিলের হাতে। নিজ ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে আল-আদিল রাতে ঘুমান সামান্য। আলী বিন সুফিয়ানকে সব সময় সঙ্গে রাখেন। এভাবেই বর্তমানে মিশরের শান্তি, নিরাপত্তা ও এই ভূখণ্ডে ইসলামের মান-অস্তিত্ব সুরক্ষার দায়িত্ব এই দু'ব্যক্তির হাতে ন্যাস্ত।

আল-আদিল ও আলী বিন সুফিয়ানের ভালোভাবেই জানা আছে, সুলতান আইউবীর অবর্তমানে মিশরে নাশকতা বেড়ে চলেছে। তাছাড়া সুদানের দিক থেকে আশংকা বিদ্যমান। মাস চারেক আগে আল-আদিল সুদানীদের ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্রকে অবিশ্বাস্য সাফল্যের সাথে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সুদানীদের ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি। কারণ, তাদের যে হামলাটি ব্যর্থ হয়েছিলো, সেটি তাদের নিয়মিত ফৌজের হামলা ছিলো না। সেই হামলা ব্যর্থ হওয়ার পরও সুদানের নিয়মিত সেনাবাহিনী কোনো প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই প্রস্তুত ছিলো। এই বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলো খৃস্টানরা। এমনকি কোনো কোনো ইউনিটের কমান্ডও ছিলো খৃস্টানদের হাতে।

তার প্রমাণ, সুদানের হামলার মোকাবেলায় সীমান্তে সীমান্ত বাহিনীর সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া আলী বিন সুফিয়ান বিপুলসংখ্যক

গোয়েন্দা সদস্যকে সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারা মরু মুসাফির ও যাযাবরের বেশে সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। সীমান্ত চৌকিগুলোর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়েছে। এসব চৌকিতে তাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত থাকছে। সীমান্ত বাহিনীগুলোর টহলসেনারাও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। পাশাপাশি আছে আরো একটি আয়োজন। আলী বিন সুফিয়ানের কয়েকজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা বণিকের বেশে সুদানের সঙ্গে অবৈধ ব্যবসা করছে, যাকে চোরাচালানী বলা হয়। পণ্য দিয়ে তাদেরকে সীমান্ত পার করিয়ে দেয়া হতো। এরা সুদান গিয়ে বলতো, আমরা মিশরের সীমান্ত বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে এসেছি। সুদানে কিছু কিছু পণ্যের অভাব ছিলো। তন্মধ্যে সবজি উল্লেখযোগ্য। সুলতান আইউবীর পরামর্শে মিশরে অধিক হারে সবজি উৎপাদন করা হতো, যার একাংশ সুদান পাচারের মাধ্যমে সুদানের গোপন তথ্য সংগ্রহ করা হতো।

সুদানের যেসব ব্যবসায়ী মিশরী বণিকদের সঙ্গে কারবার করতো, তাদেরও অধিকাংশ গুপ্তচর, যারা মিশরের পক্ষে কাজ করতো। মিশরী গোয়েন্দারাই তাদেরকে তৈরি করে নিয়েছে। গুপ্তচরবৃত্তির এই পদ্ধতি সফল হলে সুলতান আইউবী নির্দেশ প্রদান করেন, সুদানের জন্য পণ্যের দাম সস্তা করে দাও, যাতে আমাদের এই কর্মপদ্ধতি সমগ্র সুদানে জালের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। সুলতানের নির্দেশ মোতাবেক জাল ছড়িয়ে দেয়া হলো এবং সুদানী ফৌজ ও সরকারের প্রতিটি গতিবিধি কায়রোতে গোচরীভূত হতে লাগলো। আলী বিন সুফিয়ান সীমান্তের কাছাকাছি দু'তিনটি জরুরী কেন্দ্র স্থাপন করে দেন। যখনই ওদিক থেকে কোনো সংবাদ আসতো, সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের কোনো না কোনো কেন্দ্র হয়ে সেই সংবাদ বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়ে কায়রো পৌঁছে যেতো। এ কাজের জন্য যেসব বাহন রাখা হয়েছিলো, তারা দিন-রাত অবিরাম ছুটে চলার ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলো।

সুদানে একটি বিস্তৃত পাহাড়ী এলাকা আছে। সেখানকার অধিবাসীরা সবাই মুসলমান। তাদের অধিকাংশ মিশরী ফৌজের সৈনিক। বিষয়টি সুলতান আইউবী জানেন। তাঁর এ-ও জানা আছে, এ লোকগুলো সুদানী ফৌজে ভর্তি হতে চায় না। সুলতান আইউবীর শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগে মিশরী ফৌজে সুদানী হাবশী ও সুদানী মুসলমান সবাই ভর্তি হতো। তাদের কমান্ডারও ছিলো এক সুদানী। প্রিয় পাঠকদের হয়েতো মনে আছে, সেই কমান্ডারের নাম নাজি। সুলতান আইউবীর আগে নাজিই ছিলো মিশরের

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অথচ, দেশে খেলাফতের মসনদও ছিলো নিয়মতান্ত্রিক। এমারতও ছিলো। খলীফা বলুন কিংবা আমীর, তারা প্রকৃত অর্থে রাজা ছিলেন। খৃষ্টানরা মিশরকে সালতানাতে ইসলামিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে এখানে নাশকতা ও ষড়যন্ত্রের আখড়া প্রতিষ্ঠিত করে। নাজি তাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সে মিশরের সুদানী ফৌজকে নিজের মুঠোয় নিয়ে নেয়। এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিলো পঞ্চাশ হাজার।

মিশরের শাসনক্ষমতা হাতে নেয়ার পর সুলতান আইউবীর সঙ্গে প্রথম সংঘাতটা হয় নাজির সঙ্গে। তিনি নূরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট থেকে বাছাইকৃত জানবাজ সৈন্য এনে মিশরের পঞ্চাশ হাজার সুদানী ফৌজকে ভেঙ্গে দেন। তার কতিপয় সালারকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং নতুন বাহিনী গঠন করে নেন। তার অল্প ক'দিন পরই তিনি আদেশ জারি করেন যে, সুদানের অপসারিত সৈন্যদের যারা আনুগত্যের শপথ নিয়ে নিষ্ঠার সাথে মিশরী ফৌজে শামিল হতে আগ্রহী, তাদেরকে ভর্তি করে নেয়া হোক। ফলে যেসব সুদানী মুসলমান মিশরী ফৌজে ছিলো, তারা সকলে ফিরে আসে। তারা বুঝতে সক্ষম হয়, তাদেরকে অমুসলিম ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নকে পরিণত করা হয়েছিলো। সুলতান আইউবীর ফৌজে শামিল হয়ে যখন তারা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে দু'তিনটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং সুলতানকে কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করে, তখন তাদের ঈমান তাজা হয়ে যায়। সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদেরকে দ্বীন, ঈমান ও জাতীয় মর্যাদার উপদেশও প্রদান করা হতো। তাদেরকে বুঝানো হতো, যারা তাদের ধর্মের শত্রু, তারা তাদেরও শত্রু, যাদের চোখে মুসলিম মা-বোনদের কোনো মর্যাদা নেই। সুলতান আইউবীর যে বাহিনীটি আরবে লড়াই করেছে, তাদের বেশীরভাগ সৈন্যই সুদানী মুসলমান।

সুদান সরকার তথাকার মুসলমানদের নানাভাবে বাধ্য করার চেষ্টা করছে যে, মিশরী ফৌজে ভর্তি হওয়ার পরিবর্তে সুদানী ফৌজে ভর্তি হবে। কায়রোর গোয়েন্দা বিভাগ এ বিষয়ে অবগত। সুদানীরা মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালিয়েও দেখেছে। এর ফলে সুদানের উর্ধ্বতন এক সামরিক অফিসার গুপ্তভাবে খুনও হয়েছে। সুদান সেই এলাকায় যথারীতি সামরিক অভিযানও পরিচালনা করেছিলো। মুসলমানরা সুদানী বাহিনীকে পাহাড়-উপত্যকায় ছত্রভঙ্গ করে হত্যা করেছিলো ও তাড়িয়ে দিয়েছিলো। সেখানকার ভৌগোলিক কাঠামো মুসলমানদের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। পাহাড়-টিলা তাদের নিরাপত্তা বিধান করতো। এই মুসলমানরা যোদ্ধাও ছিলো বটে।

সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে রেখেছিলেন। মিশরী 'বণিক' কাফেলার মাধ্যমে তাদেরকে এতো পরিমাণ অস্ত্র দিয়ে রেখেছিলেন, যার দ্বারা তারা সারাবছর অবরোধের মধ্যেও লড়াই করতে সক্ষম ছিলো। তাদেরকে ক্ষুদ্র মিনজানীক এবং দাহ্য পদার্থও সরবরাহ করা হয়েছিলো। সুদানী মুসলমানরা সেগুলো ঘরে ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলো। সুলতান আইউবীর পরিকল্পনা ছিলো, সামরিক অভিযান কিংবা অন্য কোনো উপায়ে উক্ত অঞ্চলকে মিশরের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন, যাতে সেখানকার মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। এই অবস্থান সীমান্ত থেকে আধা দিনের পথ। আলী বিন সুফিয়ান সেখানে তার গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিলেন, যারা শুধু সংবাদদাতাই নয়– অভিজ্ঞ কমান্ডো যোদ্ধাও ছিলো।

এই মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো পাঁচ হাজার। সংখ্যায় কম হলেও তারা বিরাট এক সামরিক শক্তি। এদের বাদ দিলে সুদানের হাতে থাকে শুধু কতিপয় হাবশী, যাদের কোনো সামরিক ঐতিহ্য নেই। তারা লড়াই করতো বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে। যুদ্ধের ময়দানে তাদের অবস্থা এই দাঁড়াতো যে, যদি তাতে দুশমনের পা উপড়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, তাহলে তারা সিংহে পরিণত হতো। পক্ষান্তরে সামান্য বেকায়দায় পড়ে গেলে তারা পিছু হটতে শুরু করতো।

ইতিমধ্যে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য খৃস্টান বিশেষজ্ঞরা এসে গেছে এবং মিশরী ফৌজের দু'তিনজন গাদ্দার সালার সোনা-দানার লোভে সুদান চলে এসেছে। খৃস্টান বিশেষজ্ঞ দল ও মিশরী সালারদের বদৌলতে সুদানী ফৌজে কিছুটা যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই সুদান সরকার মিশরের উপর প্রকাশ্য হামলা করতে ভয় পেতো এবং এ কারণেই সুদান মুসলমানদেরকে তাদের ফৌজে শামিল করার চেষ্টা করছিলো। খৃস্টান উপদেষ্টারা জানতো, পঞ্চাশ হাজার হাবশীর মোকাবেলায় পাঁচ হাজার মুসলমানই যথেষ্ট।

❖ ❖ ❖

আলী বিন সুফিয়ান সংবাদ পেয়ে গেছেন যে, সুদানের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় সে দেশেরই কয়েদখানার এক সিপাহী সুদানী ফৌজের এক কমান্ডারকে হত্যা করে মুসলমানদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সংবাদদাতা গুপ্তচর আলীকে পুরো ঘটনা শোনায়। এ গুপ্তচর ঘটনাটা সরাসরি সিপাহীর মুখ থেকে শুনে এসেছে এবং এ তথ্যও জেনে এসেছে যে, ইসহাক নামক এক

মিশরী কমান্ডার সুদানের কয়েদখানায় বন্দী আছেন এবং এ উদ্দেশ্যে তার উপর নিপীড়ন চালানো হচ্ছে, যেনো তিনি তার এলাকার মুসলমানদের সুদানের অনুগত বানিয়ে দেন। গোয়েন্দা আলী বিন সুফিয়ানকে এ তথ্যও প্রদান করেন যে, উক্ত কমান্ডারের নিজ এলাকায় বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে।

'ইসহাককে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করা জরুরী মনে হচ্ছে'- রিপোর্টটা মিশরের ভারপ্রাপ্ত গবর্নর আল-আদিলকে অবহিত করে আলী বিন সুফিয়ান বললেন- 'আপনি তো জানেন, কয়েদখানায় কিরূপ নিপীড়ন চলে। সেখানে পাথরও কথা বলতে বাধ্য হয়। নির্যাতনে বাধ্য হয়ে ইসহাক সুদানীদের অনুগত হয়ে যেতে পারে। আমি এ তথ্যও পেয়েছি, আমাদের আরো দু'তিনজন মুসলমান কমান্ডার সুদানের কয়েদখানায় বন্দী আছে। তাদের প্রত্যেকেরই উপর নিপীড়ন চলছে। আমি তো আপনাকে এ পরামর্শ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবো না, আমাদের কয়েকজন কমান্ডো সেনাকে সুদানের মুসলিম এলাকায় প্রেরণ করুন। আমার আশংকা হচ্ছে, কমান্ডার হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ সুদানী বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসবে।'

'অন্য দেশে কমান্ডো প্রেরণ করার আগে আমাদেরকে সবদিক ভালোভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে'- আল-আদিল বললেন- 'এর পরিণতিতে প্রকাশ্য যুদ্ধও বেঁধে যেতে পারে।'

'আমাদের হাতে ভাববার মতো সময় নেই'- আলী বিন সুফিয়ান বললেন- 'এক্ষুণি আমাদেরকে দু'টি অভিযান পরিচালনা করা আবশ্যক। প্রথমত, একজন বিচক্ষণ দূতকে পয়গাম দিয়ে মোহতারাম সুলতানের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং তার সিদ্ধান্ত জানতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমি স্বয়ং সুদানে প্রবেশ করে মুসলমানদের এলাকায় চলে যাবো। ওখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। পরিস্থিতির সঠিক চিত্র শুধু আমার চোখই দেখতে পারে। হতে পারে, ওখানে ফৌজ হামলা করবে না। ওখানে খৃস্টানও আছে। তারা মুসলমানদেরকে কুসংস্কারে লিপ্ত করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। মসজিদে মসজিদে তাদের প্রশিক্ষিত মাওলানা প্রেরণ করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে পারে। তারা মিশরে অনুপ্রবেশ করেও এমন চাল চেলেছে। আমার প্রবল আশংকা, তারা মুসলমানদের বিশ্বাস ও জাতীয় চেতনার উপর হামলা চালাবে। আপনার তো জানা আছে, আমাদের মুসলিম সম্প্রদায় দুশমনের আবেগময় ও উত্তেজনাকর বক্তব্যে দ্রুত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমাদের শত্রুরা বুঝে ফেলেছে, মুসলমানকে

যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করা সহজ নয়। বিকল্প হিসেবে তারা বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার যুদ্ধে এমন অস্ত্র ব্যবহার করে, মুসলমান তাতে কাবু হয়ে যায়। আপনার অনুমতি পেলে আমি ওখানে চলে যাচ্ছি। আপনি সুলতান আইউবীর নিকট একজন দূত পাঠিয়ে দিন।'

'আপনার অবর্তমানে আপনার দায়িত্ব কে পালন করবে?' আল-আদিল জিজ্ঞেস করেন।

'গিয়াস বিলবীস'– আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞাসার জবাব দেন– 'তার সঙ্গে আমার এক সহকারী যাহেদীনও থাকবে। আপনি আমার অনুপস্থিতি টেরই পাবেন না।'

'ভালোভাবেই টের পাবো'– আল-আদিল বললেন– 'আপনি শত্রুর দেশে যাচ্ছেন। যদি ফিরে আসতে না পারেন, তাহলে মিশর অন্ধ ও বোবা হয়ে যাবে।'

'আমি না থাকলে জাতি মরে যাবে না'– আলী বিন সুফিয়ান মুচকি হেসে বললেন– 'ব্যক্তি যখন জাতির জন্য প্রাণ দেয়, তখন জাতি জীবিত থাকে। সুলতান আইউবী যদি মনে করতেন, তিনি মৃত্যুবরণ করলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে, তাহলে তিনি ঘরেই বসে থাকতেন আর সালতানাতে ইসলামিয়া খৃস্টানদের হাতে চলে যেতো। সুলতানের এই নীতিটা আমার বড়ই ভালো লাগে যে, তিনি বলে থাকেন, দুশমনের অপেক্ষায় ঘরে বসে থেকো না। বরং তার উপর দৃষ্টি রাখো। যদি তাকে প্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পাও, তাহলে তার পার্শ্ব কিংবা পেছনে চলে যাও। আমি সেই নীতির ভিত্তিতেই সুদান যাচ্ছি। দুশমন যদি মুসলমানদের এলাকায় সাফল্য অর্জন করেই ফেলে, তাহলে আমরা আমাদের কোন্ কীর্তির জন্য গর্ব করবো?'

'ঠিক আছে, আপনি যান'– আল-আদিল বললেন– 'আমি সুলতানের নামে পয়গাম লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আলী বিন সুফিয়ান সুদান সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে চলে যান। আল-আদিল কাতিবকে ডেকে পয়গাম লেখাতে শুরু করেন। তিনি সুদানের মুসলমানদের খবরাখবর বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করান। এ-ও লিখান যে, এই বার্তা আপনার হাতে পৌছার আগে আলী বিন সুফিয়ান সুদান গিয়ে পৌছবেন। তিনি বার্তায় আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শের কথাও উল্লেখ করেন। অবশেষে সুলতানের নিকট সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করেন।

পত্রখানা দূতের হাতে দিয়ে আল-আদিল বললেন, প্রতিটি চৌকি থেকে ঘোড়া বদল করে নেবে এবং কোনো অবস্থাতেই ঘোড়ার গতি মন্থর হতে দেবে

না। পানাহার ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠেই সমাধা করবে। পথে যদি দুশমনের হাতে পড়ে যাও, তাহলে যে কোনোভাবে হোক পত্রখানা নষ্ট করে ফেলবে।

দূত রওনা হয়ে যায়।

আমর দরবেশ শহর ছেড়ে বহুদূর চলে গেছেন। এখন তার আশপাশে কোনো বসতি নেই। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তিনি রাত যাপনের জন্য উপযুক্ত একটি জায়গার সন্ধান করছেন। দূরে এক স্থানে কিছু গাছ-গাছালী চোখে পড়লো। সেখানে পানিও থাকতে পারে। কিন্তু তার কাছে পানির মজুদ আছে। উটগুলোকেও পানি পান করানোর প্রয়োজন নেই। তিনি মরু দস্যুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বৃক্ষময় এলাকা থেকে দূরে অবস্থান করতে চান। তার সঙ্গে কালো বোরকায় আবৃতা আশি। অত্যন্ত মূল্যবান মেয়ে। ডাকাত দলের চোখে পড়ে গেলে তার রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। ভেবে-চিন্তে আমর দরবেশ পার্শ্বেই এক স্থানে নেমে পড়েন এবং সেখানেই তাঁবু স্থাপন করেন।

হঠাৎ আমর দরবেশ দু'জন উষ্ট্রারোহীকে তাদের দিকে আসতে দেখেন। তিনি আশিকে তাঁবুর ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে পর্দা ফেলে দেন এবং নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর চোগার ভেতরে তরবারী লুকায়িত আছে। আছে খঞ্জরও। তাঁবুতে দু'টি ধনুক ও অনেকগুলো তীর আছে।

উষ্ট্রারোহীদেরকে নিজের দিকে আসতে দেখে আমর দরবেশ ভাবতে শুরু করলেন, ওরা যদি ডাকাত হয়ে থাকে, তাহলে কি আমি তাদের মোকাবেলা করতে পারবো। তবে মোকাবেলা করতে হলে আশিকে তিনি সঙ্গে পাবেন বলে নিশ্চিত। তিনি জানেন, আশি শুধু মনোমুগ্ধকর মেয়েই নয়– লড়াকুও বটে। তার তীর চালনার প্রশিক্ষণ আছে। সে খৃষ্টানদের গড়া এক নাশকতাকারী নারী।

উষ্ট্রারোহীরা এগিয়ে আসছে। আমর দরবেশ তাদের প্রতি মুখ রেখে আশিকে বললেন– 'ধনুকে তীর সংযোজন করো। ওরা যদি ডাকাত প্রমাণিত হয়, তাহলে পেছন থেকে তীর ছুঁড়বে।'

উষ্ট্রারোহীরা তাঁবুর নিকটে এসে দাঁড়িয়ে যায়। একজন উটের পিঠ থেকেই জিজ্ঞেস করে– 'তোমরা কারা? কোথায় যাচ্ছো?'

আমর দরবেশ আকাশপানে হাত তুলে চোখ বন্ধ করে বললেন– 'যার বুকে আসমানের পয়গাম থাকে, তার কোনো গন্তব্য থাকে না। আমি কে? আমিও তো জানি না। আসমান থেকে একটি পয়গাম আসলো। আমার বুকে গেঁথে গেলো। তারপর ভুলে গেলাম, আমি কে, আমি কোথায় যাচ্ছি। সে সত্ত্বা

আমার বুকে আলো প্রজ্বলিত করেছেন, তিনিই বলতে পারেন, আমি কে, কোথায় যাচ্ছি। এখানে আমার ইচ্ছার কোন দখল নেই। আমি এখন সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছি। সকালবেলা হয়তো আবার পেছন দিকে হাঁটা দেবো।

আগন্তুক দু'জন উটের পিঠ থেকে নেমে আসে। একজন বললো- 'আপনাকে তো একজন পীর-পয়গম্বর বলে মনে হচ্ছে। আমরা উভয়ে মুসলমান। আপনি কি গায়েবের খবর বলতে পারেন? আমাদের ন্যায় গুনাহ্গারদেরকে সোজা পথ দেখাতে পারেন?'

'আমিও মুসলমান'- আমর দরবেশ আপ্লুত কণ্ঠে বললেন- 'তোমরাও মুসলমান। আমি তোমাদের ধ্বংস দেখতে পাচ্ছি। আমিও তোমাদের ন্যায় ঘুরেফিরে জিজ্ঞেস করতাম, সোজা পথ কোন্‌টি? কিন্তু কেউ বলতে পারেনি। একদিন রক্তরঞ্জিত কতগুলো লাশের মধ্যে আমি সবুজ বর্ণের চোগা পরিহিত সাদা দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তিনি আমাকে লাশের মধ্য থেকে তুলে এনে সোজা পথের সন্ধান দিলেন। পরক্ষণেই তিনি লাশগুলোর খুনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তো পাহাড়ে-জঙ্গলে বসবাস না করে তোমরা মরু এলাকায় চলে যাও। মিশরের নাম ভুলে যাও। ওটা ফেরাউনদের দেশ। ওখানে যখন যিনি রাজার আসনে আসীন হন, মিশরের মাটি ও বাতাস তাকেই ফেরাউন বানিয়ে দেয়।'

'এখন তো সেখানকার রাজা সালাহুদ্দীন আইউবী'- এক উষ্ট্রারোহী বললো- 'তিনি তো খাঁটি মুসলমান।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী নামের মুসলমান'- আমর দরবেশ এমন ভঙ্গীতে বললেন, যেনো তিনি স্বপ্ন দেখছেন- 'সে-ই তো তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনছে। তোমরা যে মাটির তৈরি, সেই মাটির মর্যাদার জন্য রক্ত ঝরাও। তোমরা সুদানের সন্তান।'

'কিন্তু সুদানের রাজা তো কাফির।' উষ্ট্রারোহী বললো।

'তিনি মুসলমান হয়ে যাবেন'- আমর দরবেশ বললেন- 'তিনি মুসলমানদের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তার ফৌজ কাফিরদের ফৌজ। তাই তিনি ইসলামের নাম মুখে আনেন না। তোমরা চলে যাও। তরবারী, বর্শা, তীর-ধনুক নিয়ে যাও। উট-ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে যাও। তাকে বলো, তোমরা তার মোহাফেজ। তোমরা সুদানের মোহাফেজ।'

তারপর আমর দরবেশ হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন- 'যাও, ওঠো, এখান থেকে চলে যাও।'

আগন্তুক দু'জন উটের পিঠে চড়ে বসে এবং চলে যায়। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একজন অপরজনকে বললো– 'ধোঁকা দেবে না।'

'আমার ধারণাও তাই'– অপরজন বললো– 'পাক্কা মনে হচ্ছে, পাঠ ভুলেনি।'

'আশির মতো রূপসী মেয়ে যদি উপহার হিসেবে পেয়ে যাই, তাহলে পিতা-মাতার বিরুদ্ধে চলে যেতেও কুণ্ঠিত হবো না।' উষ্ট্রারোহী বললো।

'চলো, আমরা ফিরে যাই'– অপরজন বললো– 'গিয়ে বলবো, সব ঠিক আছে...। আচ্ছা, মেয়েটি বোধ হয় তাঁবুতে আছে।'

'লোকটা সতর্ক মনে হচ্ছে। মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছে'– একজন বললো– 'আমাদেরকে তাদের হেফাজত করার প্রয়োজন নেই।'

'প্রয়োজন নেই'– অপরজন বললো– 'সৈনিক মানুষ। সঙ্গে অস্ত্র আছে। তীর-ধনুকও আছে। আশিও সতর্ক মেয়ে।'

এরা দু'জন সুদানী গুপ্তচর। আমর দরবেশ পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করছে কিনা জানবার জন্য তাদেরকে পেছনে প্রেরণ করা হয়েছে। আমর দরবেশও বিচক্ষণতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে তারা নিশ্চিত হয়ে ফিরে গেছে।

'ওরা ডাকাত নয়'– তাঁবুতে প্রবেশ করে আমর দরবেশ আশিকে বললেন– 'চলে গেছে।'

'এরা দস্যু অপেক্ষাও ভয়ংকর'– আশি বললো– 'তুমি তাদেরকে যথার্থই উত্তর দিয়েছো। যারা তোমাকে এদিকে প্রেরণ করেছে, এরা তাদের গুপ্তচর। এরা খোঁজ নিতে এসেছে, তুমি তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছো কিনা।'

'তুমি কি এদেরকে চেনো।'

'আমি এদের গাছের ডাল'– আশি বললো– 'যদি তাদের থেকে কেটে পড়ে যাই, তাহলে শুকিয়ে যাবো।'

'তাহলে তো আমাকে তোমার থেকেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

মেয়েটি হেসে ওঠলো এবং বললো– 'তুমি তো নিজেই আমাকে পুরস্কার স্বরূপ চেয়ে এনেছো।'

তাঁবুতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আহমদ দরবেশ। আশিও ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ আশির চোখ খুলে যায়। বাইরে কতগুলো চিতা হুংকার দিয়ে বেড়াচ্ছে। উটগুলো ভয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এবং ভয়ার্ত চিৎকার করছে। আশি আমর দরবেশকে জাগিয়ে তুলে বললো– 'আমি ভয়ে মরে যাচ্ছি।' আমর দরবেশ

বাইরের হুংকার-চিৎকার শুনতে পান। আশি বললো– 'এগুলো ব্যাঘ্র। নিকটে আসবে না। উটগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। কোনো ভয় নেই। উটের ভয়ে ব্যাঘ্ররা পালিয়ে যাবে।'

হঠাৎ ব্যাঘ্রগুলো পরস্পর হামলে পড়ে। সবগুলো ব্যাঘ্র একসঙ্গে হুংকার ছাড়ে। আশি চিৎকার করে উঠে আমর দরবেশের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আমর বসা ছিলেন। তিনি মেয়েটিকে এমনভাবে কোলে ও বাহুবন্ধনে নিয়ে নেন, যেমনিভাবে মা তার ভয়পাওয়া শিশুকে লুকিয়ে ফেলেন। মেয়েটির সারা শরীর কাঁপছে। তার মুখ থেকে কথা বেরুচ্ছে না। ব্যাঘ্রগুলো পরস্পর লড়াই করতে করতে দূরে চলে যায়।

আমর দরবেশ মেয়েটিকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে বললেন– 'ওরা চলে গেছে। তুমি শুয়ে পড়ো।'

'না'– আশি তার কোল থেকে মাথা সরালো না। ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– 'তুমি আমাকে কিছুক্ষণ এভাবে থাকতে দাও।'

এ দৃশ্য আমর দরবেশের পছন্দ নয়। তাঁর মনে ধারণা জন্মালো, মেয়েটি তাঁকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। তিনি আরো শক্ত পাথর হয়ে যান। এমন রূপসী মেয়ে ইতিপূর্বে তিনি কখনো ছুঁয়ে দেখেননি। এখন তার মনে হতে লাগলো, মেয়েটি এভাবে পড়ে থাকলে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন না। যতো পাথরই হোন, তিনি মানুষ তো বটে। তদুপরি সুদেহী সুপুরুষ। আমর দরবেশ নিজের নফসের মোকাবেলা করতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি মাথা উঠায়। অন্ধকারে তার চেহারার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। সে আমর দরবেশের মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো– 'তুমি এক রাতে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, আমার পিতা-মাতা কারা এবং কোথায়? তোমার যে সঙ্গী তোমার আগে উক্ত কক্ষে এসেছিলো, সেও আমাকে একই প্রশ্ন করেছিলো। তখন আমার এর উত্তর জানা ছিলো না। কিন্তু প্রশ্নটা আমাকে অস্থির করে তুলেছিলো এবং বহু অতীতের স্মৃতিমালা জাগিয়ে তুলেছিলো। কিছু স্মৃতি আমার স্মরণ আসছিলোও। কিন্তু পরক্ষণেই তা স্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিলো। আজ তা স্মরণে এসে গেছে। তুমি যখন বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে আমাকে কোলে তুলে লুকিয়ে ফেলেছিলে, তখন আমার স্মৃতিতে আলোর মতো চমকে উঠেছিলো। তার আলোকে আমি আমার বহু পুরনো স্মৃতি দেখতে পাই। আমি তখন বেশ ছোট ছিলাম। বাবা আমাকে ঠিক এমনি তার বুকে জড়িয়ে নিয়ে নিজ বাহুতে লুকিয়ে ফেলেছিলেন।'

মেয়েটি নীরব হয়ে যায়। চুপচাপ স্মৃতির পাতা উল্টাতে থাকে সে। হঠাৎ শিশুর ন্যায় লাফিয়ে উঠে বললো– 'হ্যাঁ, আমার পিতা ছিলেন। এমনই মরু এলাকা ছিলো। রাত ছিলো না দিন ছিলো মনে পড়ছে না। আমরা একটি কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছিলাম। অনেকগুলো অশ্বারোহী ধেয়ে এসে কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের কাছে তরবারী ছিলো, বর্শা ছিলো। ভয়ানক এক দৃশ্য ছিলো, যা আজ তোমার কোল ও বাহুর উত্তাপে স্মৃতিতে জেগে উঠেছে। আব্বাজান আমাকে তোমারই ন্যায় আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, মায়ের কথাও মনে পড়ছে। মা আমার গায়ের উপর পড়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত, তিনি আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তারপর মনে পড়ছে, তিনি একদিকে পড়ে গিয়েছিলেন। আমার রক্তের কথাও মনে পড়ছে। এক ব্যক্তি আমাকে আমার বাহুতে ধরে তুলে নিয়েছিলো। একজন বলেছিলো– খাঁটি হিরা। জোয়ান হলে দেখবে। আমার সে সময়কার চিৎকারের কথাও মনে পড়ছে। সেদিন আমি আজ রাতের ন্যায় চিৎকার করছিলাম।'

'মস্তিষ্কের উপর বেশী চাপ সৃষ্টি করো না'– আমর দরবেশ মেয়েটির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন– 'আমি তোমার পুরো কাহিনী বুঝে ফেলেছি। তুমি মুসলমানের সন্তান। তুমি আরব কিংবা ফিলিস্তিনের বাসিন্দা। খৃস্টানরা মুসলমানদের কাফেলা লুণ্ঠন করতো। এখনো যেসব অঞ্চল খৃস্টানদের দখলে, সেখানে তারা মুসলমানদের কাফেলা লুট করে থাকে। তারা সোনা-চাঁদি এবং তোমার ন্যায় রূপসী মেয়েদেরকে নিয়ে যায়। আমি বুঝে ফেলেছি, তুমি এ পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছেছো।'

'আমি যখন সবকিছু বুঝতে শুরু করেছি, তখন আমি এমন বহু মেয়েকে দেখেছি'– আশি বললো– 'আমাদেরকে উন্নতমানের খাবার ও দামী দামী পোশাক দেয়া হতো। গৌর বর্ণের পুরুষ-মহিলারা আমাদেরকে আদর করতো। তারা আমার মস্তিষ্ক থেকে সব স্মৃতি মুছে দিয়েছে। আমি ওখানেই বড় হয়েছি। জায়গাটি ছিলো জেরুজালেম। শৈশব থেকেই আমাদেরকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। মদও পান করানো হতো। আমাকে প্রথমে আরবী এবং পরে সুদানী ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। তারপর যখন আমি যৌবনে পা রাখি, তখন আমাকে এই কাজে ব্যবহার করা শুরু হয়, যে কাজে তুমি আমাকে দেখেছো। তীর-তরবারী চালনার তো আমাদেরকে বহু অনুশীলন করা হয়। আজ যখন তুমি আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিজ আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছো, তখন হঠাৎ আমার পিতার কথা মনে পড়ে যায়।

আমার ব্যাপারে তাঁর আবেগ ছিলো পবিত্র। আর তোমার আবেগও পবিত্র। এ কারণেই আমি তোমাকে বলেছিলাম, আরো কিছু সময় আমাকে তোমার কোলে পড়ে থাকতে দাও। তোমার কোলে মাথা রেখে আমি পিতার মমতা অনুভব করছিলাম। আজ আমি শপথ নিলাম, আমি যতোদিন বেঁচে থাকবো, তোমার গোলাম হয়ে থাকবো। এখন আমি সুদানীদের কোনো কাজে আসবো না। এটা তোমারই স্বচ্চরিত্রতা ও সৎ নিয়তের সুফল। আমি মুসলমান। তুমি আমার শিরায় মুসলমান পিতার রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছো। এখন আর আমি তোমাকে সেই কাজ করতে দেবো না, যে কাজের জন্য তুমে এসেছো। তুমি আমার ভেতরটায় ঈমানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছো।'

'কয়েকদিন তোমাকে এ কাজ করতে হবে'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করবো।'

তুরের জ্যোতি

তাঁবু গুটিয়ে সুদানী মুসলমানদের পার্বত্য অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আমর দরবেশ। কিন্তু সফরসঙ্গী রূপসী মেয়েটি নিয়ে তার অন্তহীন ভাবনা। মেয়েটি মুসলমান। এ কারণে আমর দরবেশ তাকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছেন। মেয়েটি চার-পাঁচ বছর বয়সে ক্রুসেডারদের হাতে চলে গিয়েছিলো। তারপর বিশ বিশটি বছর ব্যয় করে তারা তার গায়ে যে রঙের প্রলেপ মাখিয়েছে, তা অপসারণ করা সহজ নয়। ভালো হলো, মেয়েটি নিজেই বুঝে ফেলেছে যে, সে মুসলমান ঘরের সন্তান। এখন তার হৃদয়ে ক্রুসেডারদের প্রতি প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সে আমর দরবেশকে বলে দিয়েছে, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। কিন্তু আমর দরবেশ ভাবছেন, মেয়েটির উপর আস্থা স্থাপন করা যায় কিনা।

একই তাঁবুতে রাত কাটিয়ে ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মেয়েটি আমর দরবেশকে বললো– 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি এখনো আমাকে তোমার শত্রু মনে করছো।'

'নারীর ফাঁদে পড়ে মুসলিম জাতি বহু ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে আশি!'– আমর দরবেশ উত্তর দেন– 'তুমি অত্যন্ত রূপসী মেয়ে। তোমার চলন-বলন ও ভাবভঙ্গী মানুষের মধ্যে পশুত্বকে জাগিয়ে তোলে। আমি এক যুবক। আমি কয়েক বছর যাবত যুদ্ধের ময়দানে আছি। কিছুদিন সুদানের কয়েদখানায় যুদ্ধবন্দী হিসেবে সময় কাটিয়েছি। এই দীর্ঘ সময়টায় আমি আপনজনদের চেহারা পর্যন্ত দেখিনি। রাতে তাঁবুতে তুমি আমার সঙ্গে একাকী ছিলে। আমি রাতভর মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছি, যেনো আমি পশুত্বের মোকাবেলায় জয়ী হতে পারি। আমি সফল হয়েছি। আল্লাহ আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। তারপর ভাবতে শুরু করি, আমি তোমাকে শত্রু ভাববো, না বন্ধু। সেই ভাবনা এখনো ভাবছি। এখনো আমি তোমার এই সন্দেহ দূর করতে পারছি না যে, আমি তোমাকে শত্রু ভাবছি। শেষ পর্যন্ত তোমাকেই প্রমাণ করতে হবে, তুমি বিশ্বাসযোগ্য।'

'আমি আবারও বলছি, তুমি আমার বুকে ঈমানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছো'– আশি বললো– 'আর আমি তোমাকে এ কথাও বলে রাখছি, সুদানীরা তোমাকে যে মিশন নিয়ে প্রেরণ করেছে, তুমি যদি তাতে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চাও, আমি তোমাকে সঙ্গ দেবো। জীবন বিপন্ন হলেও আমি পিছপা হবো না। আমিই তো তোমাকে বলেছিলাম, যে দু'জন লোক এসে তোমার ভক্ত হয়ে চলে গেলো, তারা মূলত্ সুদানীদের গুপ্তচর।'

'আমাকে ভাবতে দাও আশি'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমি বুঝে ফেলেছি, আমার চার পাশে গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমাকে আমি সেই জালের একটি অংশ মনে করি। এখনো তুমি তা-ই করো, যা তোমাকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আমিও সেই পাঠ ও নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করবো, যা আমাকে শেখানো হয়েছে। আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি অন্য কোনো উদ্দেশে যাচ্ছি। কিন্তু এই মিশন থেকে মুখ ফেরানো সম্ভব নয়। আমি এর পরিণাম জানি। দু'তিনটি তীরের গতি সবসময় আমার দিকে থাকে। আমি তাদেরকে তখনই দেখতে পাবো, যখন তীর আমার বুকে এসে বিদ্ধ হবে।'

'আমি সর্বাবস্থায় তোমাকে সঙ্গ দেবো'– আশি বললো– 'আমি প্রমাণ করবো, আমার শিরায় মুসলমানের রক্ত বিদ্যমান।'

আমর দরবেশ ও আশি দু'টি উটে চড়ে মুসলিম ভূখণ্ড অভিমুখে এগিয়ে চলছেন। তৃতীয় উটটিতে তাদের তাঁবু ও অন্যান্য মালপত্র বোঝাই করা। যে আশি এক সময় অর্ধনগ্ন চলাফেরা করতো, এখন সে আপাদমস্তক কালো বোরকায় আবৃত। মুখমণ্ডলও নেকাবে ঢাকা। দেখে বুঝবার কোনো উপায় নেই যে, মেয়েটি ক্রুসেডারদের একটি সুদর্শন তীর, যা পাথরসম শক্ত একজন মানুষের অন্তরে ঢুকে গেলে মানুষটি মোম হয়ে খৃস্টানদের ধাঁচে তৈরি হয়ে যায়।

আমর দরবেশ ও আশি যেদিকে যাচ্ছেন, দূরে এক অশ্বারোহীকে সেদিকেই যেতে দেখা গেলো। আমর দরবেশ ভাবলেন, এই লোকটিও সম্ভবত সেই সুদানী গুপ্তচরদের একজন, যারা তার সঙ্গে ছায়ার মতো লেপ্টে আছে। তার এই ধারণা যদি ভুল হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সে মরুদস্যু। আশপাশে কোথাও তার সাঙ্গরা লুকিয়ে আছে। তাই যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে আমর কী করবেন?'

'আশি'– সফর সঙ্গীকে উদ্দেশ করে আমর দরবেশ বললেন– 'তুমি কি

ঐ অশ্বারোহীকে দেখতে পাচ্ছো?'

'অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি।'

'যদি দস্যু হয়ে থাকে, তাহলে কি আমরা তাদের মোকাবেলা করতে পারবো?'

'আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে'– 'আশি সাহসী জবাব দেয়– 'যদি রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় এসে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে কী হবে বলতে পারবো না। দিনের বেলায় হলে মোকাবেলা করবো। তোমার সঙ্গে স্বয়ং আমি একটি সম্পদ। তারা আমাকে তোমার হাত থেকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমাকে তারা জীবন্ত নিতে পারবে না।'

নানাবিধ শংকার মাঝে দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলে আমর দরবেশ ও আশি। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে অস্ত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ধীরে ধীরে পর্বতমালা চোখে পড়তে শুরু করেছে তাদের। উঁচু পর্বতমালা এখনো বহুদূর হলেও অঞ্চলটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেই স্থান আর বেশী দূরে নয়। উটগুলো এগিয়ে চলছে।

যে অঞ্চল থেকে তার মিশন শুরু করবেন বলে কথা, সেখানে এসে পৌঁছে গেছেন আমর দরবেশ। মুসলমানদের প্রথম গ্রামটায় পৌঁছতে আর অল্প কিছু পথ বাকি। আমর দরবেশ স্বয়ং সেই গ্রামের বাসিন্দা। যে অশ্বারোহী লোকটি দূর পথে অগ্রসর হচ্ছিলো, গতি পরিবর্তন করে সে এদিকে এগিয়ে আসে এবং আমর দরবেশের সঙ্গে মিলিত হয়।

'তোমাদের আস্তানা ঐখানে'– অশ্বারোহী আমর দরবেশকে উদ্দেশ করে বললো– 'তোমরা আমাকে না চিনলেও আমি তোমাদেরকে চিনি।'

লোকটিকে দেখে আশি মুখের নেকাব সরিয়ে হাসতে শুরু করে। অশ্বারোহী তাকে জিজ্ঞেস করে– 'সফর কেমন কাটলো?'

'খুব ভালো'– আশি হাসিমুখে জবাব দেয়।

'তোমরা ভয় পাওনি তো'– আরোহী জিজ্ঞেস করে– 'সফরকালে তোমাদের নিরাপত্তার এমন ব্যবস্থা ছিলো, যা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। অন্যথায় এমন একটি রূপসী মেয়ে নিয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারতে না।'

'তুমি কে?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করেন।

'সুদানী মুসলমান'– আরোহী জবাব দেয়– 'এখন এ ভাবনা ভেবো না, তুমি কে আর আমি কে। তোমরাও আমার ন্যায় এ অঞ্চলেরই বাসিন্দা। তুমি ভালোভাবেই জানো, আমরা যদি সামান্যতম ভুলও করি, তাহলে এখানকার

মুসলমানরা আমাদের চামড়া তুলে ফেলবে।'

আরোহী আমর দরবেশের আরো কাছে এসে কানে কানে বললো– 'এ কথাও মনে রেখো,তুমি যদি দায়িত্ব পালনে সামান্যতম হেরফের করো, তাহলে বিনা নোটিশে খুন হয়ে যাবে। এখানে তোমার কাজ কী তা তোমার ভালোভাবেই জানা আছে। এই রাতটা বিশ্রাম করবে। আগামীকাল থেকে এখানে তোমার নিকট লোকজন আসতে শুরু করবে। আশির জানা আছে, তাকে কী করতে হবে।'

আমর দরবেশের সবকিছু জানা আছে। তার দায়িত্ব এই এলাকার মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো এবং মুসলমানদেরকে সুদানের অফাদার বানিয়ে সুদানী বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা।

সুলতান আইউবী মিশরে অনুপস্থিত। এ মুহূর্তে তিনি আরব ভূখণ্ডে শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধরত। ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা হলো, সুদানী ফৌজকে প্রস্তুত করে মিশরের উপর আক্রমণ করাবে। কিন্তু সুদানী মুসলমানদের যুদ্ধবাজ গোত্রগুলো সুদানের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সুলতান আইউবীর ভক্ত ও অনুসারী। আমর দরবেশ তাদের ভক্তি-বিশ্বাসকে তছনছ করে দিতে এসেছেন।

সূর্য ডুবে গেছে। আমর দরবেশ আগন্তুক অশ্বারোহীর সহায়তায় তাঁবু স্থাপন করেন। আরোহী বিদায় নেয়ার আগে বললো– 'আগামীকাল সম্ভবত তোমাদের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ হবে না। সকাল সকালই লোকজন এখানে আসতে শুরু করবে।' সে একটি পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললো– 'সাঝের আলো আঁধারীতেও পাহাড়টা তোমাদের চোখে ছাতার ন্যায় বৃক্ষ মনে হবে। আগামী রাত ওখানে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে। কাল যে পোশাক পরিধান করবে, ভোরেই তা প্রস্তুত করে রাখবে। আমি যাচ্ছি। এখন থেকে প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করবে।'

আরোহী মেয়েটিকে ইঙ্গিতে বাইরে নিয়ে বললো– 'তোমাকে বেশী সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এখানকার মুসলমানরা জংলী। তোমার হেফাজতের জন্য আমরা প্রস্তুতি আছি। কিন্তু তোমার হেফাজত নিজেকেই বেশী করতে হবে। এই লোকটাকে আয়ত্ত্বে রাখবে।' সে মেয়েটির দু'কাঁকের উপর ছড়িয়ে থাকা চুলে বিলি কেটে ঠোঁটে শয়তানী হাসি হেসে বললো– 'এই সুদর্শন শিকলগুলোয় তো তুমি সিংহকেও আটকে ফেলতে পারো।'

'তুমিও তো এখানকার মুসলমান'– আশি বললো– 'তুমি হিংস্র নও কি?'

'তোমার দর্শনে কে হিংস্র হয়ে ওঠে না?' বলেই আরোহী ঘোড়ার পিঠে চড়ে সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে হারিয়ে যায়।

এই অশ্বারোহী ঈমান নীলামকারী মুসলমানদের একজন। সুদানের সহজ-সরল মুসলমানদের বিশ্বাসের উপর পরিচালিত যুদ্ধের সেনাপতি। এই এলাকারই বাসিন্দা। কিন্তু কেউ জানে না লোকটি জাতির আস্তিনের বিষাক্ত সাপ। এই মিশনে সে একা নয়। তারা আট-দশজন মুসলমানের একটি দল।

ঘোড়ায় চড়ে লোকটি একটি গ্রামের দিকে ছুটে চলে। পথে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তারই পথপানে তাকিয়ে ছিলো সে।

'সব ঠিক তো?' লোকটি আরোহীকে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে'– আরোহী জবাব দেয়– 'তবে যে কোনো সময় পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে। ক্রুসেডাররা যদি আমাকে পরিপক্ক পাঠ শিখিয়ে থাকে, তাহলে আমি বলবো, মেয়েটার চিন্তাধারা পাল্টে গেছে। তাকে কেমন যেনো আনমনা ও নীরব মনে হলো।'

'তা হয় না। আশি অনেক সতর্ক ও বিচক্ষণ মেয়ে।'

'তাহলে বোধ হয় দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে নির্জীব হয়ে পড়েছে'– আরোহী বললো– 'তাছাড়া আমর দরবেশও তো কম হিংস্র নয়।'

কথা বলতে বলতে তারা গ্রামে ঢুকে পড়ে। এক স্থানে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। অশ্বারোহী ও তার সঙ্গী তাদের নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো– 'আমরা ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। এখন গ্রামে ফিরছি। তারপর বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বললো– 'এখান থেকে সামান্য দূরে এক বুযুর্গের আবির্ভাব ঘটেছে। লোকটি শুধু আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন। দিনের বেলায়ও ডানে-বায়ে দু'টি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন। তাকে দেখে আমরা তার কাছে বসে পড়েছিলাম। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। মুখস্ত পড়েন। আমাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলেন না। আমরা তাকে ডাকলাম। তিনি রা করলেন না। তার তাঁবুর নিকট হতে একটি ধোঁয়ার কুণ্ডলী উত্থিত হয়ে উপরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং তার মধ্য হতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। মেয়েটির রূপ আমরা তোমাকে বলে বুঝাতে পারবো না। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। কেননা, মানুষ নয়– মেয়েটিকে পরী বলে মনে হলো। মেয়েটি বুজুর্গের সম্মুখে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লো। পরে সেজদা থেকে ওঠে

বুজুর্গের মুখের সঙ্গে কান লাগালো। বুজুর্গের ওষ্ঠাধর নড়ে উঠলো। মেয়েটি আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেলো।'

'আমরা ভয়ে পালাতে উদ্যত হলাম। কিন্তু মাটি আমাদেরকে ধরে রাখে। সম্ভবত মেয়েটির চোখ আমাদেরকে আটকে রাখে। সে আমাদেরকে বললো- ইনি খোদার দূত। তোমাদের সকলের জন্য পয়গাম নিয়ে এসেছেন। তাকে বিরক্ত করো না। এ মুহূর্তে তিনি খোদার সঙ্গে কথা বলছেন। তোমরা আগামী দিন এসো। যদি তোমাদের প্রতি তার দয়া হয়, তাহলে তিনি তোমাদের প্রত্যেককে তূর পর্বতের দীপ্তি দেখাবেন। আমি এই মাত্র তূর পর্বত থেকে এসেছি। তিনি আমাকে তলব করেছিলেন। আমার কানে কানে তোমাদেরকে বলতে বলেছেন যে, তিনি তোমাদের ভাগ্য বদলে দেবেন। যদি তোমরা অধৈর্য হও, তাহলে তিনি অন্যত্র চলে যাবেন। আমরা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। আমরা সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিলাম। আমরা কিছুই বলতে পারিনি। বুজুর্গের প্রতি তাকালাম, দেখতে পেলাম, তার মাথার উপর নূর চমকাচ্ছে। আমরা সেখান থেকে চলে এলাম।'

লোকগুলোর কণ্ঠস্বর স্পর্শকাতর। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো, তারা বিস্মিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত। মানবীয় ফিতরাতের একটি দুর্বলতা হলো, বিস্ময়কর বক্তব্য চেতনাকে নাড়িয়ে তোলে। স্পর্শকাতরতা আনন্দ দান করে। কাহিনী শ্রবণে দু'এলাকাবাসীর সে অবস্থা-ই সৃষ্টি হলো। তারা দু'টি গৃহের দরজায় করাঘাত করে দু'তিনজন লোককে ডেকে আনে এবং তারা যা শুনেছে, তাদেরকে শোনায়। অশ্বারোহী ও তার সঙ্গী কাহিনী বর্ণনায় একটি বিশেষ আকর্ষণ যুক্ত করে দেয়। তারা মেয়েটির রূপের বিবরণ এমন ভাষায় ও এমন শব্দে প্রদান করে যে, শ্রোতারা খোদা, কুরআন ও উক্ত বুযুর্গের পরিবর্তে মন-মস্তিষ্কে মেয়েটিকেই স্থান দিতে শুরু করে। তারা অশ্বারোহী ও তার সঙ্গীকে মেহমান হিসেবে বরণ করে নেয়। অন্যান্য ঘরের লোকজনও এসে ভিড় জমায়।

❖ ❖ ❖

ভোর বেলা। সূর্য এখনো উদিত হয়নি। গ্রামের সব মানুষ অশ্বারোহী ও তার সঙ্গীর নেতৃত্বে আমর দরবেশের আস্তানা অভিমুখে ছুটে চলে। তাঁবুর সম্মুখে ছোট্ট একটি জাজিমের উপর আমর দরবেশ এলোপাতাড়ি বসে আছেন। চক্ষু বন্ধ করে বিড় বিড় করছেন। একটি লাঠি তার ডানে, একটি

বাঁয়ে। মাটিতে পুঁতে দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। লাঠি দুটোর মাথায় তেলে ভেজা কাপড় জ্বলছে। এগুলো প্রদীপ। আমর দরবেশের আট-দশ পা দূরে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামবাসীরা এসে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে যায়।

তাদের একজন বললো– 'আমি এগিয়ে গিয়ে বুযুর্গের সঙ্গে কথা বলি।' তিন-চার পা অগ্রসর হওয়ার পর লোকটি পেছন দিকে এমনভাবে চিৎ হয়ে পড়ে যায়, যেনো কেউ তাকে সামনের দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ওঠে সে জনতার মাঝে গিয়ে দাঁড়ায়। ভয়ে থর থর করে কাঁপছে লোকটি। সে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো– 'কেউ সম্মুখে যেও না। কে যেনো আমাকে সামনে থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। আমি কাউকে দেখতে পাইনি। বোধ হয় জিন হবে।'

তার অপর দু'সঙ্গী বললো– 'আমরা যাবো। তুমি ভীত হয়ে পড়েছো।' তারা দু'জন একসঙ্গে এগিয়ে যায়। তিন-চার পা অগ্রসর হওয়ার পর তারাও প্রথমজনের ন্যায় পেছন দিকে চিৎ হয়ে পড়ে যায়। তারা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। জনতা ভয় পেয়ে যায়। সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, বুজুর্গ তার প্রহরায় জিন দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, যে কাউকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না।

তাঁবু থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে। মেয়েটি আশি। তার পরনে কালো রেশমী পোশাক। চিবুক ও মুখমণ্ডল হাল্কা নেকাবে আবৃত। চোখ দুটো খোলা। মাথাটা কালো কাপড়ে ঢাকা। মাথার রেশমকোমল চুলগুলো দু'কাঁধের উপর দিয়ে ভাগ হয়ে বুকের উপর এসে ঝুলছে। মেয়েটি আবৃতা বটে; কিন্তু পোশাকটা এমন যে, তাকে অর্ধনগ্ন বলেই মনে হচ্ছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ এমন রূপসী মেয়ে আর কখনো দেখেনি। মেয়েটিকে তারা পরী মনে করছে। তার চাল-চলন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি মায়াময়।

আশি আমর দরবেশের সম্মুখে এসে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। সেজদা থেকে উঠে নিজের একটি কান তার মুখের সঙ্গে লাগায়। আমর দরবেশের ঠোঁট নড়ে ওঠে। আশি উঠে দাঁড়িয়ে যায়।

'তোমরা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো'– আশি জনতাকে উদ্দেশ করে বললো– 'কেউ সামনে অগ্রসর হওয়ার দু:সাহস দেখাবেন না। খোদার দূত জিজ্ঞেস করেছেন, তোমরা এখানে কেনো এসেছো? তোমরা ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারো।'

যে তিন ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পড়ে গিয়েছিলো, তাদের একজন উচ্চ কণ্ঠে বললো– 'হে আল্লাহর দূত! তুমি কি অনাগত ভবিষ্যতের সংবাদ বলতে পারো?'

'জিজ্ঞেস করো কী জানতে চাও?– আমর দরবেশের গুরুগম্ভীর মুখে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন।

'সুদানের অনুগত না হয়ে কি আমরা এই ভূখণ্ডকে ইসলামী রাজ্যে পরিণত করতে পারবো?' লোকটি জিজ্ঞেস করে।

হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আমর দরবেশ। দু'হাত মাটিতে ছুঁড়ে মারেন। আশি ছুটে এসে তার কাছে বসে পড়ে এবং তার মুখের সঙ্গে কান লাগিয়ে রাখে। আমর দরবেশের ঠোঁট নড়ে ওঠে। আশি উঠে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে বললো– 'খোদার দূত বলেছেন, পানিতে যদি আগুন ধরে যায়, তাহলে তোমরা এই ভূখণ্ডকে ইসলামী রাজ্যে পরিণত করতে পারবে।' কারো কাছে পানি থাকলে এই কাপড়টির উপর ঢেলে দাও।'

আমর দরবেশের সামান্য দূরে একটি কাপড় এমনভাবে পড়ে আছে, যেনো কেউ দেহ থেকে খুলে দলা করে রেখে দিয়েছে। যে তিন ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলো, তাদের একজন এগিয়ে আসে। তার হাতে চামড়ার ছোট্ট একটি মশক। সে বললো– 'আমার কাছে পানি আছে। আমি সফরে আছি বিধায় সঙ্গে পানি রেখেছি।' এগিয়ে নিয়ে সে মশকটির মুখ খুলে কাপড়ের উপর পানি ঢেলে দেয়।

আশি মাটি থেকে প্রদীপটি আমর দরবেশের হাতে তুলে দেয়। আমর দরবেশ আকাশের দিকে মুখ করে ঠোঁট নাড়ান, যেনো তিনি কারো সঙ্গে কানে কানে কথা বলছেন। তারপর প্রদীপের শিখা কাপড়ের সঙ্গে লাগান। কারো কল্পনা ছিলো না, পানিভেজা কাপড়ে আগুন ধরে যাবে। কিন্তু তা-ই হলো। আমর দরবেশ যেইমাত্র প্রদীপের শিখা কাপড়ের নিকট নিয়ে যান, অমনি কাপড়টি জ্বলে উঠে এবং পুরো বস্ত্রটি একটি অগ্নিশিখায় পরিণত হয়। জনতার ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি বিস্মিত কণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলে। তারা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে, তাদের সম্মুখে পানি জ্বলছে।

'খোদার ইশারা বুঝে নাও'– আমর দরবেশ বললেন– 'আর ভালো ভাবে চিনে নাও আমি কে। আমি তোমাদেরই একজন।'

তিনি নিজ গ্রামের নাম উল্লেখ করে বললেন– 'আমি ঐ এলাকার বাসিন্দা। আমি হাশেম দরবেশের পুত্র আমর দরবেশ। আমি নবী-রাসূল

নই। খোদা তার শেষ নবীকে প্রেরণ করে ফেলেছেন।'

তিনি নিজের আঙ্গুলে চুমো খেয়ে চোখে লাগিয়ে বললেন– 'আমিও তোমাদেরই ন্যায় আখেরী নবীর একজন উম্মত। খোদা আমাকে আলো দেখিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন, যেনো এই আলোকে আমি সেই লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেই, যারা অন্ধকারে নিমজ্জিত।'

আমর দরবেশ এমন ভঙ্গীতে কথা বলছেন, যেনো তার উপর উন্মত্ততা চেপে আছে। তিনি বললেন–

'আমার গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, আমি সালাহউদ্দীন আইউবীর কমান্ডার। আমি সেই বাহিনীর সঙ্গে ছিলাম, যারা সুদান আক্রমণ করেছিলো। যাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে। আমরা সবাই অনুতপ্ত হলাম। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে মিশরী ফৌজের লাশের মধ্য থেকে তুলে এনেছেন এবং আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছেন সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ কেনো পরাজিত হলো। আমার অনুতাপ আনন্দে রূপান্তরিত হলো। আমি একটি বৃক্ষের ডালে খোদার নূর দেখতে পেলাম। এমন এক আলো, যেনো একটি তারকা আকাশ থেকে নেমে এসে গাছের ডালে আটকে গেছে। সেই তারকার ভেতর থেকে আওয়াজ এলো– সামনে দেখো, পেছনে দেখো, ডানে দেখো, বামে দেখো...।

আমি সব দিক তাকালাম। আওয়াজ এলো– তুমি কি কোনো জীবিত মানুষ দেখতে পাচ্ছো? আমি চতুর্দিকে শুধু লাশ আর লাশ দেখতে পেলাম। সকলের শোচনীয় অবস্থা। আহতদের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ সৈনিক পিপাসায় মারা গেছে। এরা সকলে লড়াই করছিলো। তারকার আলোর মধ্য হতে আওয়াজ এলো– তুমি কি দেখোনি, তোমাদের তরবারী ভোতা হয়ে গিয়েছিলো? তুমি কি দেখোনি, তোমাদের তীরগুলোর কোনো গতিই ছিলো না? তুমি দেখোনি, তোমাদের ঘোড়াগুলোর পা মাটিতে বসে গিয়েছিলো?

তখন আমার মনে পড়লো, আলোর মধ্যকার আওয়াজ আমাকে যা যা বলেছে, আমি সবই দেখেছি। আমার তরবারী কর্তন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলো। আমি দেখেছি, আমার ছোড়া তীরটা বাতাসের মধ্যদিয়ে এমনভাবে যাচ্ছিলো, যেনো বাতাসের তোড়ে শুকনো খড় উড়ছে। আমার ঘোড়া গতি হারিয়ে ফেলেছিলো। বালুকাময় প্রান্তর যেনো সূর্যের সমস্ত উত্তাপ ধারণ করে আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ঝলসে দিয়েছিলো। আমি একটি ভস্মিত লাশে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর তারকার মধ্য হতে একটি স্ফুলিঙ্গ এসে আমার উভয় চোখে ঢুকে পড়ে। পরে সেটি আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে যায়। আওয়াজ এলো– আমি তোমাকে পুনর্জীবন দান করলাম। জিজ্ঞেস করো, আমি তোমাকে এই অনুগ্রহ কেনো করলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম। আওয়াজ উত্তর দিলো– আমি মুসলমানদের ভালোবাসি। মুসলমান আমার রাসূলের কালেমা পাঠ করে। এই লাশগুলো যাদের, আমি তাদেরকে শিক্ষার উপকরণে পরিণত করেছি যে, এরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলো। যারা এখনো পথ হারায়নি, বিপথগামী হওয়ার উপক্রম হয়েছে, আমি তাদেরকে সোজা পথ দেখাতে চাই। আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি। কেননা, তুমি প্রতি সকালে কুরআন পাঠ করে থাকো। যাও, আমি তোমাকে আলো দান করলাম। এই আলো আমার মুসলমান বান্দাদের দেখাও।

কথাগুলো আমি ভালোভাবে বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম– হে আমার প্রভুর আলো! বিষয়টা আমাকে খুলে বলুন এবং বলে দিন, আমার কথা কে গ্রহণ করবে? কিভাবে করবে? বলুন– আমাদের তরবারীগুলো কেনো ভোতা হয়ে গিয়েছিলো? তীরগুলোর গতি কোথায় উঠে গিয়েছিলো? আলোর আওয়াজ বললো– সেই তরবারী ভোতা হয়ে যায়, যার আঘাত নিজ মায়ের উপর করা হয়। সেই তীর খেজুরের শুকনো ডালের ন্যায় হয়ে যায়, যেটি আপন মায়ের বুকের ছোড়া হয়। তুমি জানো না, মা কে? মা হলো সেই ভূখণ্ড, যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে, যার মাটিতে খেলাধুলা করে তুমি যৌবন লাভ করেছো। তুমি সুদানের মুসলমানদেরও জানিয়ে দাও, সুদানের পবিত্র ভূখণ্ড তোমাদের মা। তাকে তোমরা ভালোবাসো। এরই মাটির ভেতর তোমাদের জান্নাত। বাইরে থেকে কোনো মুসলমান যদি এই জান্নাতকে জয় করতে আসে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তুমি তো জাহান্নাম দেখে নিয়েছো। যাও, তোমার কালেমাগো সুদানী ভাইদের বলো, তোমাদের মা, তোমাদের জান্নাত, তোমাদের কাবা হলো সুদান।'

'হযরত'– এক ব্যক্তি বললো– 'তাহলে কি আপনি বলছেন, আমরা সুদানের রাজার অনুগত হয়ে যাবো, যিনি আমাদের রাসূলকে মান্য করেন না?'

এই লোকটিও সেই তিন ব্যক্তির একজন, যারা সম্মুখে অগ্রসর হতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলো।

'খোদার আওয়াজ বলেছেন, সুদানের এই কাফির বাদশাহ মুসলমান হয়ে যাবেন'– আমর দরবেশ পরম গাম্ভীর্যের সাথে বললেন– 'তিনি মুসলমানদের

পথপানে চেয়ে আছেন। তার ফৌজ কাফিরদের ফৌজ। সে কারণে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের নাম উচ্চারণ করেন না। তোমরা চলে যাও। তরবারী, বর্শা ও তীর-ধনুক নিয়ে যাও। উট-ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে যাও। তাকে গিয়ে বলো, আমরা আপনার মোহাফেজ। আমরা সুদানের সন্তান।'

'আমি খোদাকে বললাম, আমি বললে এসব কথা কেউ গ্রহণ করবে না। আমার মুসলমান ভাইয়েরা আমাকে হত্যা করে ফেলবে। উত্তরে খোদার আওয়াজ বললো- 'আমি ব্যতীত আর কে পানিতে আগুন লাগাতে পারে? তুমি যাও, আমি তোমাকে এই শক্তি দিয়ে দিলাম, যাতে মানুষ তোমাকে বিশ্বাস করতে পারে, তোমার কণ্ঠকে আমার কণ্ঠ মনে করে। কোনো মানুষ তো আর পানিতে আগুন ধরাতে পারে না। তারপর আলোর মধ্য হতে আওয়াজ আসলো- তারপরও যদি মানুষ তোমাকে মিথ্যা মনে করে, তাহলে তুমি তাদেরকে রাতে আসতে বলো। আমি তাদেরকে সেই জালওয়া দেখিয়ে দেবো, যা মূসাকে তূর পর্বতে দেখিয়েছিলাম।''

'আচ্ছা তোমরা কি তূর পর্বতের জ্যোতি দেখে সত্যের আওয়াজকে মেনে নেবে?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ, হে খোদার দূত!'- সেই তিন ব্যক্তির একজন বললো- 'আপনি যদি আমাদেরকে তূর পর্বতের জ্যোতি দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার কণ্ঠকে খোদার কণ্ঠ বলে মেনে নেবো।'

'যাও'- আমর দরবেশ ক্ষোভের সাথে মাটিতে হাত ছুঁড়ে বললেন- 'চলে যাও। যখন সূর্যের কিরণমালা পাহাড়ের পেছনে চলে যাবে এবং আকাশে তারকারাজির প্রদীপমালা জ্বলে উঠবে, তখন আবার আসবে।'

জনতা আমর দরবেশের আস্তানা ত্যাগ করে ফিরে যায়। তাদের অন্তরে কোনো সন্দেহ নেই। তারা চার-পাঁচজন করে দল বেঁধে হাঁটছে আর মন্তব্য-মূল্যায়ন করছে। মানবীয় ফিতরাতের দুর্বলতাগুলো ভেসে ওঠেছে। বিশ্বাস চাপা পড়ে গেছে। জযবা শীতল হয়ে গেছে। সহজ-সরল পশ্চাৎপদ মানুষ এরা। একটি স্পর্শকাতর নাটক তাদের বিবেকের গতি ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমর দরবেশের কণ্ঠ ও বাচনভঙ্গী তাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে অপর কেউ না কেউ বলছে- 'তুমি কি পানিতে আগুন ধরাতে পারো?'

এখনো রাতে তূর পর্বতের জ্যোতি দেখার কাজ বাকি আছে। এরা আশিকে জিন মনে করছে। স্পষ্ট ভাষায় তা ব্যক্তও করছে।

এরা সেইসব মুসলমান, যারা সুদানের অমুসলিম বাদশাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছিলো। তারা সুদানী বাহিনীকে এই পার্বত্য অঞ্চলে পরাস্ত করে পিছু হটিয়ে দিয়েছিলো। তারা ছিলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভক্ত-সমর্থক। সুদানী নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের পার্বত্য অঞ্চলকে স্বাধীন ইসলামী রাজ্য মনে করতো। কিন্তু আমর দরবেশের স্পর্শকাতর ও জাদুময় বক্তব্য তাদের সব চিন্তাধারা পাল্টে দিলো। তারা বিপথগামী হয়ে উঠলো। একটি দেশের সেনাবাহিনী যাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো, একজন মানুষের একটি চিত্তাকর্ষী আক্রমণে তাদের সব অস্ত্র হাত থেকে পড়ে গেলো। এখন এরা যে যেখানে যাকে পাচ্ছে, গুজব ছড়াচ্ছে। তারা যা দেখলো, যা শুনলো, তাকে আরো আকর্ষণীয় করে প্রচার করতে লাগলো।

'একটি আশংকা আমাকে অস্থির করে রেখেছে যে, সুদানী মুসলমানরা স্পর্শকাতর, কুসংস্কারের সামনে অস্ত্র ত্যাগ করে বসবে।' সুলতান আইউবী বললেন।

সুলতান এখন সুদান থেকে দূরে– বহু দূরে ফিলিস্তিনের দোরগোড়ায় একটি পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী ও সালারদের মাঝে বসে আছেন। তিনি আল-আদিল-এর পত্রখানা পাঠ করছেন। মিশরের ইন্টেলিজেন্স সুদানী মুসলমানদের সম্পর্কে পুরো তথ্য মিশরের ভারপ্রাপ্ত গবর্নর আল-আদিলকে অবহিত করে। আল-আদিল পত্রে সেসব তথ্য সুলতান আইউবীর নিকট লিখে পাঠিয়েছেন। পত্রে তিনি এ-ও লিখেছেন যে, আলী বিন সুফিয়ান বণিকের বেশে সুদান রওনা হয়ে গেছেন। পত্রে আল-আদিল জানতে চেয়েছেন, সুদানের মুসলমানদের পাহাড়ী এলাকায় কমান্ডো দল পাঠাবেন কিনা। তিনি এই আংশকাও ব্যক্ত করেছেন যে, আমরা যদিও বা গোপনে কমান্ডো দল প্রেরণ করি, তবু সুদান সরকার যদি জানতে পারে, তাহলে অভিযানটা প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। অথচ এখন আমাদের অধিকাংশ ফৌজ আরবে যুদ্ধরত। বার্তায় উল্লেখ করা হয়, সুদানী সরকার মুসলমানদেরকে তাদের অনুগত বানানোর লক্ষ্যে আমাদের যুদ্ধবন্দীদের ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।

সুলতান আইউবী তাঁর সালার ও উপদেষ্টামণ্ডলীকে পত্রখানা পাঠ করে শুনিয়ে বললেন– 'সুদানের এই মুসলমানগুলো সুদান সেনাবাহিনীর জন্য সাক্ষাৎ যম। তোমরা দেখে থাকবে, তাদের যে ক'জন লোক আমাদের

বাহিনীতে আছে, তারা কিরূপ জযবা ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু দুশমন যখন তাদেরকে তেলেসমাতি ভাষায় উস্কে দেয় এবং মস্তিষ্ককে কল্পনা বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট করে, তখন তারা বালির মূর্তিতে পরিণত হয়ে যায়। আল-আদিল একথা লিখেনি যে, খৃস্টানরা সুদানের মুসলিম অঞ্চলে চরিত্র ধ্বংস এবং নাশকতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। কিন্তু তোমরা তো খৃস্টানদেরকে জানো। তারা এই বিদ্যায় পারদর্শী। আমি জানি, সুদানীদের নিকট খৃস্টান উপদেষ্টা রয়েছে। তারা মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ধ্বংসে তৎপরতা চালাবে, তাতে সন্দেহ নেই।'

সুলতান আইউবী আল-আদিলের দূতকে আহার ও বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দেন এবং কাতেবকে ডেকে পত্রের জবাব লেখাতে শুরু করেন–

'প্রিয় ভাই আল-আদিল!

আল্লাহ তাআলা তোমাকে সাহায্য করুন। তোমার পত্র আমার নিকট সুদানের মুসলমানদের বাস্তব চিত্র স্পষ্ট করে দিয়েছে। তুমি বিচলিত হয়ো না। তুমি তো জানো, কাফিররা ইসলামের ধ্বংস কামনা করে। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা কোনো সুযোগই হাতছাড়া করছে না। আলী বিন সুফিয়ানের সুদান গমনকে আমি স্বাগত জানাই। তুমি তাকে অনুমতি দিয়ে ভালোই করেছো। আল্লাহ আলী বিন সুফিয়ানকে সাহায্য করুন। লোকটা অত্যন্ত সতর্ক ও যোগ্য গোয়েন্দা। পাথরে ভেতর থেকেও কথা বের করতে জানে। সে ফিরে এসে তোমাকে জানাবে, সেখানকার আসল পরিস্থিতিটা কী! তুমি তার দেয়া তথ্য মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।'

'তুমি জানতে চেয়েছো, সুদানের মুসলমানদের সাহায্যে কমান্ডো প্রেরণ করবে কিনা? এই আশংকাও ব্যক্ত করেছো, কমান্ডো প্রেরণ করলে সুদানীরা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যা প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। তুমি ভালোই করেছো যে, আমার অনুমতি নেয়া আবশ্যক মনে করেছো। কিন্তু সাবধান! কখনো যদি পরিস্থিতি গুরুতর রূপ ধারণ করে, তাহলে আমার অনুমতির অপেক্ষায় সময় নষ্ট করবে না। তুমি নিশ্চয়ই জেনেছো, সুদানের কয়েদখানার একজন সিপাহী সুদানী ফৌজের একজন কমান্ডারকে হত্যা করে মুসলমানদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তুমি এ-ও জানো যে, সুদানীরা আমাদের কয়েদীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং আমাদের ইসহাক নামক এক কমান্ডারের স্ত্রী ও কন্যাকে পর্যন্ত প্রতারণার মাধ্যমে অপহরণ করার চেষ্টা করেছে।

এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, সুদানী মুসলমানদের মাঝে কিছু গাদ্দারও আছে। এমতাবস্থায় তুমি যত দ্রুত সম্ভব কিছু কমান্ডো সেনাকে ব্যবসায়ী ও পর্যটকের বেশে সুদানী সীমান্তে পাঠিয়ে দাও।

আমার প্রিয় ভাই! এটা সত্য যে, আমাদের সেনাসংখ্যা কম এবং আমরা আরেকটি রণাঙ্গন চালু করতে অক্ষম। কিন্তু আমরা কুরআনের সেই নির্দেশনা কিভাবে উপেক্ষা করতে পারি যে, পৃথিবীর কোনো একটি ভূখণ্ডে যদি কাফেররা মুসলমানদের উপর জুলুম করে কিংবা প্রলোভন বা প্রতারণার মাধ্যমে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, তাদের জাতীয় মর্যাদা ও দ্বীন-ঈমানকে সংকটাপন্ন করে তোলে; তাহলে পৃথিবীর সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়? আমি বহুবার বলেছি, সালতানাতে ইসলামিয়ার কোনো সরহদ-সীমানা নেই। ইসলামের সুরক্ষার জন্য আমরা যে কোনো দেশের সীমানা অতিক্রম করতে পারি। তুমি জানো, আমরা সুদানী মুসলমানদেরকে কমান্ডো দিয়ে রেখেছি, যারা কৃষকের বেশে তাদের সঙ্গে অবস্থান করছে। সুদানী মুসলমানদেরকে আমরা সামরিক সরঞ্জামও দিয়েছি। তুমি যদি প্রয়োজন মনে করো, তাহলে আদেরকে আরো সাহায্য দাও।'

সুদানীরা যদি তাদের সীমান্ত নিরাপদ করার জন্য মিশরে সেনা অভিযান চালায়, তাহলে ভয় পেয়ো না। তোমরা স্বল্পসংখ্যক ফৌজ দ্বারা কয়েকগুণ বেশি ফৌজের মোকাবেলা করতে পারবে। তোমরা তাদের এক আক্রমণ নস্যাৎ করেছো, দ্বিতীয়টিও নস্যাৎ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তবে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঝুঁকি নেবে না। দুশমনকে এমন জায়গায় ঠেলে নিয়ে আসবে, যেখানে তোমরা অল্পসংখ্যক লোকে অধিক ধ্বংসসাধন করতে পারবে। কমান্ডোদের বেশি ব্যবহার করবে এবং দুশমনের রসদ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে। তোমাদের অর্ধেক যুদ্ধ আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দারা জয় করে ফেলবে। তবে আমার মনে আশা জাগছে না, সুদানীরা আক্রমণ করার মতো বোকামী করবে। তাদের খৃস্টান উপদেষ্টারা যদি জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকে, তাহলে তারা আক্রমণের পরিবর্তে তাদের পাহাড়ী এলাকায় মুসলমানদেরকে দলে ভোড়াবারই চেষ্টা করবে। মুসলমানরা যদি তাদের অফাদার হয়ে যায় এবং তাদের ফৌজে শামিল হয়ে যায়, তাহলে তারা যে কোনো ঝুঁকি মাথায় নিতে পারবে। তাই তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, যেনো মুসলমানরা তাদের বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত না

হয়। আমি শতবার যে কথাটা বলেছি, এখনও তারই পুনারাবৃত্তি করবো। মুসলমান যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করে– পরাজিত হয় না। কিন্তু যখন তাদের মধ্যে পাশবিকতা জাগিয়ে দেয়া হয়, তখন তারা তরবারী ছুঁড়ে ফেলে। মুসলিম জাতির যখনই পতন এসেছে, এ কারণেই এসেছে। আমাদের শত্রুরা আমাদের জাতির মাঝে এই আগুনই প্রজ্বলিত করছে। এইভাবে আমরা এক সঙ্গে দু'টি রণাঙ্গনে লড়াই করছি। একটি মাটির উপরে, অপরটি নীচে। আমাদের শত্রুরা আমাদেরকে বিষমাখা তীর দ্বারা হত্যা করতে পারেনি। এখন তারা মিষ্টিমধুর ভাষার জাদুতে আমাদেরকে অকর্মন্য ও পঙ্গু করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটি বড়ই ভয়াবহ যুদ্ধ। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এখানকার পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে। দুশমনরা পরাজিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। আমি তাদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগই দেবো না। আল্লাহর সাহায্য অব্যাহত থাকলে আমি হাল্ব দখল করে ফেলবো। মোকাবেলা সম্ভবত এখনো কঠিন হবে। কিন্তু আমি ব্যবস্থা করে রেখেছি। খৃস্টানরা এখনো মুখোমুখি আসেনি। বোধ হয় আসবেও না। তারা ভাইয়ে-ভাইয়ে সংঘাতে লিপ্ত করে তামাশা দেখছে। তাদের শত্রুরা যদি আপসে লড়াই করেই যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের সামনে আসবার প্রয়োজন কী। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করুন। তুমি ভীত হয়ো না। আল্লাহ হাফেজ।'

আমর দরবেশের আস্তানায় যে তিন ব্যক্তি জনতার ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে গিয়ে চিৎ হয়ে পেছন দিকে পড়ে গিয়েছিলো, তারা এখন আমর দরবেশের তাঁবুতে উপবিষ্ট। জনতা চলে যাওয়ার সময় তারা কিছুদূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গিয়ে মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে এক একজন করে আস্তানায় ফিরে এসে আমর দরবেশের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। এরা আমরের দলেরই লোক এবং অত্র এলাকার বাসিন্দা। সুদানী সরকারের নিকট থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করছে।

আমার ধারণা ছিলো, কাপড় জ্বলবে না'– আমর দরবেশ বলছেন– 'কাপড়টার নীচে দাহ্য পদার্থ কম রাখা হয়েছিলো এবং পানি বেশি ঢালা হয়েছিলো।'

'আপনি জানেন না, এই তেল যদি পানিতেও ঢেলে দেয়া হয়, তাতেও আগুন ধরে যায়'– যে লোকটি কাপড়ের উপর মশক থেকে পানি ঢেলে

দিয়েছিলো, সে বললো– 'আমরা আগেই পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'মানুষের উপর এর কিরূপ প্রভাব পড়লো?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করেন।

'আমরা কিছুদূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম'– একজন জবাব দেয়– 'তারা পানিতে আগুন ধরে যাওয়াকে আপনার মোজেযা মনে করে। তারা কেউই বিশ্বাস করছে না, দুনিয়ার কোনো মানুষ পানিতে আগুন প্রজ্বলিত করতে পারে। আপনি যে ভঙ্গিতে কথা বলেছেন, তাতে আপনার সব কথা তাদের হৃদয়ে গেঁথে গেছে, খোদার কসম।'

'না দোস্ত'– আমর দরবেশ তাকে বাঁধা দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– 'খোদার নামে কসম করো না। আমরা যে খোদার বিরুদ্ধাচরণে নেমেছি, তার কসম খাওয়ার অধিকার হারিয়ে ফেলেছি।'

'মনে হচ্ছে, আপনার অন্তরে এখনো আসল খোদা বিদ্যমান'– একজন বললো– 'আমর দরবেশ! আপনি কিন্তু আপনার আসল খোদা ও ঈমানকে বিক্রি করে এসেছেন।'

অপর একজন পার্শ্বে উপবিষ্ট আশির উরুতে হাত বুলিয়ে বললো– 'আর এই মূল্যবান সম্পদটা কিভাবে পেয়েছেন, তাও স্মরণ করুন। মেয়েটি খৃস্টান রাজাদের মানিক্য, যাকে সুদানের শাসকমণ্ডলী আপনাকে দান করেছেন।'

আমর দরবেশ আশির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আশি তাঁর প্রতি একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তাকে বিচলিত মনে হলো আমর দরবেশের কাছে। আমর দরবেশ তার ইঙ্গিত বুঝে ফেললেন। বললেন– 'নতুন বিদ্যা কিনা; তাই ভুলে গেছি। আসলেই আমি এতো মূল্যবান সম্পদের উপযুক্ত ছিলাম না। যাক গে এসব। আগামী রাতের কথা বলো।'

'সব প্রস্তুতি সম্পন্ন'– এক ব্যক্তি বললো– 'আপনি তো আমাদের যোগ্যতা দেখেছেন। দেখলেন না, আমরা কীভাবে পেছন দিকে পড়ে গেলাম?

'রাতে আপনি তূর পর্বতের জালওয়া দেখাবেন'– অন্য একজন বললো– 'কী করতে হবে, বুঝে নিন। আমাদের লোকজন সব প্রস্তুত।'

'আমাদের চলে যাওয়া উচিত'– তৃতীয় ব্যক্তি বললো– 'এখন আর আপনি তাঁবু থেকে বের হবেন না।'

তারা চলে যায়।

সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন আসতে শুরু করে। দিনের বেলা যেসব লোক আমর দরবেশের বক্তব্য শুনে গেছে এবং পানিতে আগুন

লাগানোর মোজেযা দেখেছে, তারা সর্বত্র প্রচার করে দিয়েছে যে, আমর দরবেশ নামক খোদার এক দূত আজ রাতে তূর পর্বতের সেই জালওয়া দেখাবেন, যা আল্লাহ হযরত মূসাকে (আ.) দেখিয়েছিলেন। আমর দরবেশের আস্তানায় সুদানের গোয়েন্দারাও উপস্থিত। তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও গুরুত্বের সাথে গুজব ছড়ানোর দায়িত্ব পালন করেছে। তারই ফলে সন্ধ্যার পর আমর দরবেশের তাঁবুর সম্মুখে জনতার ভিড় দিনের তুলনায় বেশি। তাঁবুর পেছনে ও ডানে-বাঁয়ে কারো দাঁড়াবার অনুমতি নেই।

আমর দরবেশ এখনো তাঁবুতে অবস্থান করছেন। বাইরে দু'টি প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপগুলো মাটিতে গেড়ে রাখা লাঠির মাথায় বাঁধা। জনতা 'খোদার দূত'কে দেখার জন্য উদগ্রীব।

তাঁবুর পর্দা নড়ে ওঠে। আশি সম্মুখে এগিয়ে আসে। তার পোশাক কালো। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত লম্বিত ফ্রক। ফ্রকটি অভ্রখচিত যা প্রদীপের আলোতে তারকার ন্যায় মিট মিট করে জ্বলছে। আশির মাথার উপর রেশমের পাতলা রুমাল। মাথার চুলগুলোও সেই রেশমের ন্যায় সরু ও কোমল, যেগুলো তার উভয় স্কন্ধের উপর এমনভাবে পড়ে আছে যে, তার মাঝে তার উদোম স্কন্ধের শুভ্রতা তারার ন্যায় জ্বল জ্বল করছে। মেয়েটি এমনিতেই রূপসী, তদুপরি তার এই সাজ-সজ্জা, রং-ঢং তাকে এমন মোহময় করে তুলেছে যে, একজন পুরুষের পশুবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ হারাতে বাধ্য।

পাহাড়-জঙ্গলে বসবাসকারী এই লোকগুলোর নিকট এই মেয়েটি, তার চাল-চলন ও পোশাক একটি বিরল দৃশ্য। তাদের চক্ষু আটকে গেছে। মেয়েটির রূপের জাদুক্রিয়ায় তারা মোহাচ্ছন্ন।

আশির হাতে এক-দেড় গজ লম্বা এবং আধা গজের মতো চওড়া গালিচা। সেটি সে উভয় প্রদীপের মধ্যখানে বিছিয়ে দেয়। মেয়েটি উভয় বাহু বিস্তার করে আকাশের দিকে তাকায়। তাঁবুর পর্দা সরে যায় এবং আমর দরবেশ মাদকাসক্তের ন্যায় হেলে-দুলে হেঁটে এসে গালিচার উপর দাঁড়ায়। তিনিও আশির ন্যায় ডানে-বায়ে বাহু ছড়িয়ে দিয়ে আকাশপানে দৃষ্টিপাত করে বিড় বিড় করতে শুরু করে।

'হে খোদার প্রিয়পাত্র, যাকে শ্রদ্ধা করা আমাদের সকলের উপর ফরয, আমরা আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি'– সেই তিন ব্যক্তির একজন বললো– 'আপনার দিনের বক্তব্য আমাদের হৃদয়ে গেঁথে গেছে। এবার আমাদেরকে তূর পর্বতের জ্যোতি দেখান, আপনি যার ওয়াদা দিয়েছিলেন।'

'মিশর ফেরাউনদের রাষ্ট্র'– আমর দরবেশ উচ্চস্বরে বললেন– 'ফেরাউন মারা গেছে। কিন্তু খোদা মিশরের রাজত্ব যাকেই দান করেছেন, সে-ই ফেরাউন হয়ে গেছে। এটা মিশরের মাটি, পানি ও বাতাসের ক্রিয়া। যে ব্যক্তি এক সময় রাসূলের বন্দনা করতো, ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়ায় সেও ফেরাউন হয়ে গেছে। হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের মোকাবেলা করেছেন এবং নীল নদের রাস্তা তৈরি করে দেখিয়েছেন। বর্তমানে মিশর পুনরায় ফেরাউনের দখলে চলে গেছে। সেখানে এখন মদের নদী প্রবাহিত হচ্ছে এবং পর্দানশীল, সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। তোমরা মিশরকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করো। মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তূর পর্বতের জ্যোতি দর্শন লাভের সৌভাগ্য দান করেছেন।'

আমর দরবেশ দু'বাহু সম্প্রসারণ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে জ্বালাময়ী কণ্ঠে বললেন– 'হে আল্লাহ! তুমি তোমার পথহারা বান্দাদের সেই নূর দেখাও, যে নূর তুমি মূসাকে দেখিয়েছিলে।'

হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে আমর দরবেশ হাতের আঘাতে একটি প্রদীপ মাটিতে ফেলে দেন। অন্ধকার রাত। ঘোর অন্ধকারে পাহাড়-টিলা-বৃক্ষরাজি কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আলো বলতে আছে শুধু সেই প্রদীপ দু'টির কিরণমালা, যাতে শুধু আমর দরবেশ আর আশিকে দেখা যাচ্ছে। আমর দরবেশ প্রদীপটি উপরে তুলে ধরে একদিকে ইশারা করে বললেন– 'ঐদিকে দেখ। ওদিকে একটি পাহাড় আছে। তোমরা পাহাড়টাকে দেখতে পাচ্ছো না। তার জ্যোতি দেখ।'

আমর প্রদীপটা আরো উর্ধ্বে তুলে ডানে-বাঁয়ে নাড়ান। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের পাহাড় থেকে একটি শিখা ভেসে ওঠে এবং অল্প পরেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। জনতা সেই যে বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে ছিলো, এখনো হা করেই আছে। বিস্ময় তাদের বাক্‌শক্তি কেড়ে নিয়ে গেছে।

'তোমরা যদি খোদার এই জ্যোতিকে হৃদয়ে প্রোথিত করে না নাও, তাহলে এই শিখা তোমাদের এই সবুজ-শ্যামল ভূখণ্ডকে মরুভূমিতে পরিণত করে দেবেন'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমি তাকে প্রতিহত করতে পারবো না। সেই জ্যোতিকে তোমরাই তো ডেকে এনেছো।'

আমর দরবেশ তাঁর তাঁবুতে চলে যান। আশি জনতাকে ইঙ্গিত করে, তোমরা চলে যাও। জনতা স্থান ত্যাগ করে ফিরে যেতে শুরু করে। এখন

তারা পরস্পর কথা বলতেও ভয় পাচ্ছে। এখন আর তাদের অন্তরে কোন শোবা-সন্দেহ নেই।

তারা যখন তাঁবু থেকে বেশ দূরে চলে যায়, তখন তাদের মধ্যে থেকে এক যুবক দ্রুত হেঁটে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে সকলের প্রতি মুখ করে দাঁড়িয়ে যায়। যুবক পাশ্ববর্তী এক গ্রামের মসজিদের ইমাম।

'একটু দাঁড়ান'– ইমাম হাত দুটো উঁচু করে বললেন– 'আপনারা আপনাদের ঈমানকে সংযত রাখুন। দরবেশ আপনাদের যা দেখিয়েছে, সবই ভেল্কি। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর না আর কোনো নবী এসেছেন, না আসবেন। আল্লাহ সেই পাপিষ্ঠকে তার জ্যোতি দেখান না, যে একটি বেহায়া মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'এটি মেয়ে নয়– জিন।' এক ব্যক্তি বললো।

'জিন মানুষের আকৃতিতে আসতে পারে না'– ইমাম বললেন– 'জিন মানুষের আনুগত্য করে না। মুসলমানগণ! আপনারা আপনাদের বিশ্বাসকে হেফাজত করুন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ফেরাউন নন। তিনি আল্লাহর সাচ্চা বান্দা। তিনি নবী হওয়ার দাবি করেননি। তিনি ধর্মের প্রহরী এবং খৃস্টানদের দুশমন।'

'সম্মানিত ইমাম!'– এক ব্যক্তি বললো– 'আপনি কি পানিতে আগুন লাগাতে পারবেন?'

'আরে বাদ দাও ওর কথা'– অপর একজন বললো– 'ইমামতি ঠিক রাখার জন্য এসব বলছে।'

'আমরা যা যা দেখেছি, পারলে আপনি সেসব দেখান'– আরেকজন বললো– 'তবেই আমরা আপনার কথা মেনে নেবো।'

'আপনারা আমার সঙ্গে সেই পাহাড়ে চলুন, যেখান থেকে শিখাটা জ্বলে উঠেছিলো'– ইমাম বললেন– 'আমি আপনাদের প্রমাণ করে দেবো, এসবই ভেল্কিবাজি। আপনারা চলুন। যদি আমার দাবি ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে আমাকে সেখানেই খুন করে ফেলুন।'

'আমরা খোদার কাজে হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস দেখাবো না।' এক ব্যক্তি বললো।

দু'-তিনজন লোক এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তারাও ইমামের মতের বিপক্ষে। তারা জনতাকে এমনভাবে উত্তেজিত করে তোলে যে, সব মানুষ হাঁটতে শুরু করে এবং ইমামকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ইমাম একাকী দাঁড়িয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে যুবক ইমাম সেই পাহাড়টির দিকে হাঁটা দেন, যার উপর শিখা জ্বলে ওঠেছিলো। খুব দ্রুতপদে হাঁটছেন তিনি। একটি পাথুরে বিরান ভূমি অতিক্রম করে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলে তিনি টের পেলেন, দু'জন লোক তার থেকে খানিক দূরে তার পেছন দিয়ে একদিকে চলে গেলো। ইমাম পাহাড়ের কোল ঘেঁষে হাঁটছেন। পেছন দিয়ে চলে যাওয়া ব্যক্তিদ্বয় চলার গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। তাদের পায়ের শব্দ শুনে ইমাম দাঁড়িয়ে যান। লোক দু'জন আকস্মাৎ তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের মুখমন্ডল কাপড়ে আবৃত। ইমাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা কারা?' তারা কোন জবাব দেয় না। একজন ইমামের পেছনে চলে যায়। ইমাম তার দিকে মোড় ঘুরে দাঁড়ালে অপরজন ইমামকে ঝাপটে ধরে। ইমাম কোমরবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জরধারী হাতটা অপর ব্যক্তির মুঠোয় চলে যায়। গলায় ঝাপটে ধরার কারণে ইমামের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

ইমাম আক্রমণকারীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার শেষ চেষ্টা চালান। শরীরের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেন। সম্মুখের ব্যক্তি ইমামের লাথি খেয়ে পেছনে গিয়ে ছিটকে পড়ে এবং ইমামের গলায় তার বাহুর বন্ধন শ্লথ হয়ে আসে। ইমাম আরেকটি ঝটকা মেরে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যান। এবার তিনি রক্তক্ষয়ী লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। কিন্তু ইতিমধ্যে আক্রমণকারী দু'জন পালিয়ে গেছে। ইমাম তাদেরকে হাঁক দেন। কিন্তু তারা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। ইমাম আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করলেন না এবং সেখান থেকেই ফিরে আসেন।

আমর দরবেশের তাঁবুতে সেই তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট, যারা দিনের বেলায়ও এসেছিলো। তারা আমর দরবেশকে বললো– 'আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। আমরা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলাম, মানুষ সেই প্রতিক্রিয়া নিয়েই ফিরে গেছে।' তারা আমর দরবেশকে এ-ও বললো যে, আগামী রাত আপনাকে সম্মুখে অপর একটি গ্রামের নিকটে যেতে হবে এবং অন্য এক পাহাড়ের উপর তূর পর্বতের জালওয়া দেখাতে হবে।

লোক তিনজন চলে গেছে। এখন তাঁবুতে আছে আশি আর আমর দরবেশ।

'আপনি কি আপনার সাফল্যে আনন্দিত?' আশি জিজ্ঞেস করে।

'আশি!' আমর দরবেশ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আমি তোমাকে এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় পাচ্ছি।'

'আচ্ছা, আপনি কী চাচ্ছেন? আমি খৃস্টান ও সুদানীদের হাতে খেলনা হয়েই থাকবো?' আশি বললো– 'আপনি আমার অভ্যন্তরে ঈমান জাগ্রত করে দিয়েছেন। আর এখন কিনা আমাকে বিশ্বাস করছেন না।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো তোমার কাজের উপর ভিত্তি করে'– আমর দরবেশ বললেন– 'তোমার কথার উপর ভিত্তি করে নয়।'

'বলুন, আমি কী করবো?' আশি জিজ্ঞাসা করে– 'আপনি যা বলবেন, তা-ই করবো।'

'এখনো সে কাজই করতে থাকো, যা করছো'– আমর দরবেশ বললেন– 'সময় এলেই বলবো তোমাকে কী করতে হবে।'

'হতে পারে সে সময়টা আপনি পাবেন না'– আশি বললো– 'আপনি তো দেখেছেন, আপনার চারপাশে কিভাবে গোয়েন্দার জাল ছড়িয়ে আছে। যখনই আপনার থেকে সামান্যতম সন্দেহজনক আচরণ প্রকাশ পাবে, তখন এই গোয়েন্দারা আপনাকে গুম কিংবা খুন করে ফেলবে। আর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আপনি যদি আগেই বলে রাখেন আপনার উদ্দেশ্যে কী, তাহলে আমি যথাসময়ে সাবধান হতে পারবো। তারা তো আমাকে সন্দেহাতীতরূপে তাদেরই দলের সদস্য মনে করে।'

আশি এমন সহজ-সরল ও নিষ্ঠাপূর্ণ কথাটা বললো যে, আমর দরবেশ নিশ্চিত হয়ে গেলেন মেয়েটি তাকে ধোঁকা দেবে না। তিনি বললেন– 'তোমার যোগ্যতা দেখলে মনে হয়, তুমি আমাকে ধোঁকা দেবে।'

'দক্ষতায় আপনিও কম নন'– আশি বললো– 'তাই তো আমার মনে হচ্ছে, আপনি নিজ জাতিকে ধোঁকা দেয়ার পাক্কা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।'

'আচ্ছা শোন, আমি তোমাকে আমার পরিকল্পনা বলে দিচ্ছি'– আমর দরবেশ বললেন– 'আর এ কথাও বলে রাখছি, তুমি যদি তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণ না করো এবং আমার সঙ্গে প্রতারণা করো, তাহলে তুমি জীবিত থাকতে পারবে না। আমি খুন হওয়াকে যেমন ভয় করি না, তেমনি খুন করাকেও না। আসার পথে তোমাকে বলেছিলাম, আমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমার আশা ছিলো, এখানে নিজ এলাকায় এসে নিজের গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহজে কামিয়াব হবো। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, সুদানীরা আমাকে গুপ্তচরদের বেঈমানীতে আবদ্ধ করে রেখেছে। আমার আরেকটি উৎকণ্ঠা হলো, আমি আমার জাতির পিঠে খঞ্জর বিদ্ধ করে ফেলেছি। মূল লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে আমি নিজেকে গোপন রাখছি বটে;

কিন্তু আমার যে কর্মকাণ্ডকে তুমি আমার দক্ষতা বলছো, তা আমার জাতির ধর্মীয় বোধ-বিশ্বাসকে বিষের ন্যায় খুন করে ফেলছে। আমি যদি আমার এই মিশন অব্যাহত রাখি, তাহলে তা সুদানী মুসলমানদেরকে আজীবনের জন্য গোলামীর শিকলে আবদ্ধ করে ফেলবে এবং তাদের জাতীয় মর্যাদা চিরদিনের জন্য নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'তুমি কী করতে চাও?' আশি জিজ্ঞেস করে।

'আমি ইসহাকের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে চাই'– আমর দরবেশ বললেন– 'ইসহাককে চেনো তো! সেই কমান্ডার, যে যুদ্ধবন্দী হিসেবে কয়েদখানায় পড়ে আছে। তাকে ঘায়েল করার জন্য তোমাকেও এক রাতের জন্য তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিলো।'

'উহ! ঐ লোকটাকে আমি জীবনেও ভুলবো না'– আশি বললো– 'আমি তারও ততোটুকু ভক্ত, যতটুকু ভক্ত তোমার।'

'আমি তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে চাই'– আমর দরবেশ বললেন– 'তারপর নিজ গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। আমি ভেবে এসেছিলাম, এখানে এসে অদৃশ্য হয়ে যাবো এবং এখানকার লোকদেরকে বলবো, তারা যেন সুদানীদের ক্রীড়নকে পরিণত না হয়।'

'আমি কয়েদখানায় নির্মম নির্যাতনের পর বের হয়েছি'– আমর দরবেশ বললেন– 'জ্ঞান বলতে এতোটুকুই ছিলো যে, কয়েদখানা থেকে বের হওয়ার এই পন্থাটা ভাবতে পেরেছি। কিন্তু এখানে এসে এখন মনে হচ্ছে, সফল হওয়া সম্ভব নয়।'

'আপনি আমাকেও ভাবতে দিন'– আশি বললো– 'আমরা যদি আল্লাহর পথে দৃঢ়পদ থাকি, তাহলে উদ্দেশ্য সফল হবে। আগামী দিন আমরা সম্মুখে যাবো। পন্থা একটা বেরিয়ে আসবে। আপাতত এখানকার কোন একজন বিজ্ঞ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন।'

এ অঞ্চলেই আমর দরবেশের তাঁবু থেকে দু'-আড়াই মাইল দূরে মিশরী ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলা এসে অবস্থান নিয়েছে। কাফেলায় চারজন পুরুষ এবং ছয়টি উট। দলনেতা লম্বা শশ্রুমণ্ডিত বুযুর্গ ধরনের ব্যক্তি। তার একটি চোখের উপর সবুজ বর্ণের একখণ্ড কাপড় ঝুলানো, যেনো চোখটি নষ্ট। কাফেলা দু'-রাত আগে সুদানের সীমান্তে প্রবেশ করেছিলো। সীমান্ত অতিক্রমে তাদেরকে কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়নি। রাতের অন্ধকারে

সুদানের সীমান্ত রক্ষীরা টের পায়নি যে, চার ব্যবসায়ী এবং ছয় উটের এই কাফেলাটি কোনো শহরের দিকে না গিয়ে সেই পার্বত্য অঞ্চলের কোনো এলাকার দিকে চলে যায়, যেখানকার বাসিন্দারা মুসলিম। অথচ ওদিকে কোনো বণিক কাফেলার যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। কারণ, সুদান সরকার মুসলমানদেরকে তরিতরকারী ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইতো।

কাফেলা রাতভর চলতে থাকে। রাত পোহালে তারা উটগুলোকে পার্বত্য এলাকায় লুকিয়ে ফেলে। সীমান্ত এখন তাদের থেকে অনেক দূরে– পেছনে। সারাদিন তারা সেখানে লুকিয়ে অতিবাহিত করে।

রাতের অন্ধকার নেমে এলে কাফেলা পুনরায় চলতে শুরু করে এবং মধ্যরাত নাগাদ পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়ে। এই এলাকাই কাফেলার গন্তব্য।

রাতের শেষ প্রহরে কাফেলা একটি গ্রামে প্রবেশ করে। দলনেতা একটি ঘরের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে দরজায় করাঘাত করেন। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে যায়। এক ব্যক্তি প্রদীপ হাতে বেরিয়ে আসে। দলনেতা তাকে কানে কানে কিছু বললেন। গৃহকর্তা 'খোশ আমদেদ' বলে বললেন– 'আপনারা সবাই ভেতরে আসুন। উটগুলোকে আমরা সামলাবো।'

চার ব্যবসায়ী ভেতরে ঢুকে পড়ে। মেজবান তার ঘরের লোকদেরকে এবং আরো দু'-তিনজন প্রতিবেশীকে জাগিয়ে তোলেন। তারা ব্যবসায়ীদের উটগুলোকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তাদের উটপালের সঙ্গে বেঁধে রাখে। মালামাল নামিয়ে মেজবানের ঘরে রাখা হলো। কাফেলা প্রধান বললেন– 'মালগুলো লুকিয়ে ফেলো।'

সবাই ধরাধরি করে মালগুলো খুললো। তার মধ্যে তরিতরকারীর স্থলে বেরিয়ে এলো তীর-তরবারী, খঞ্জর এবং তিন-চারটি চাটাইয়ে মোড়ানো দাহ্য পদার্থ ভর্তি অনেকগুলো পাতিল। মালগুলো লুকিয়ে ফেলা হলো।

'এবার আসলরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারি?' দলনেতা বললেন– 'অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।'

'কোন সমস্যা নেই'– মেজবান বললেন– 'সবাই নিজস্ব লোক।'

দলনেতা মুখের লম্বা দাড়িগুচ্ছ টান দিয়ে খুলে ফেলেন এবং চোখের সবুজ কাপড়ও সরিয়ে ফেলেন। তার আসল দাড়ি ছোট এবং পরিপাটি করে ছাটা। দৃশ্যমান দাড়ি তার কৃত্রিম ছিলো। মালপত্র এখানে-সেখানে লুকিয়ে রেখে লোকজন মেহমানদের নিকট এলে এক ব্যক্তি কাফেলার

নেতাকে দেখে চমকে ওঠে। দলনেতা মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমাকে চেনেননি বুঝি?'

'ও, আলী বিন সুফিয়ান'– লোকটি বললো– 'আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে প্রথমে চিনতে পারিনি।' তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনি নিজে এসেছেন। এখানকার পরিস্থিতি ভালো নয়।'

'আমি সংবাদ পেয়েছি যে, সুদানের কয়েদখানার এক সিপাহী সুদানী ফৌজের দু'জন কমান্ডারকে হত্যা করে ফেলেছে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আর আমি এও জানতে পেরেছি, সুদানীরা আমাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।'

লম্বা দাড়িওয়ালা, চোখে পট্টিবাঁধা, চোগা পরিহিত লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অভিজ্ঞ গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য এখানে এসেছেন। কায়রোতে বসে গোয়েন্দা মারফত যেসব তথ্য পেয়েছিলেন, তারই আলোকে এখন কথা বলছেন। যে ঘরটিতে এখন তিনি বসা আছেন, সেটিই তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দাদের কেন্দ্র। গৃহকর্তা সুদানী নাগরিক। এরা সবাই সুলতান আইউবীর অনুগত। আলী বিন সুফিয়ানকে তারা একটি নতুন সংবাদ শোনালো–

'গুজব প্রচারিত হচ্ছে যে, আল্লাহর এক দূত এসেছেন, যিনি পানিতে আগুন লাগাতে পারেন'– মেজবান আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন– 'তিনি বলছেন, আল্লাহ আমাকে মৃতদের মধ্য থেকে তুলে এনে বলেছেন, তুমি মুসলমানদেরকে বলো, তোমরা সুদানের অনুগত হয়ে যাও। কারণ, এই মাটি তোমাদের মা।'

মেজবান আলী বিন সুফিয়ানকে আমর দরবেশ সম্পর্কিত সব কাহিনী শোনান। কিন্তু তার জানা ছিলো না যে, রাতে আমর দরবেশ তূর পর্বতের জালওয়া দেখিয়ে মানুষের অন্তরে অত্যন্ত ভয়ানক সন্দেহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

'আমি এ আশংকাই করছিলাম যে, দুশমন আমাদের বোধ-বিশ্বাসের উপর আক্রমণ করবে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'সে জন্য আমি নিজেই এসেছি। খৃস্টানরা নাশকতায় ওস্তাদ। আর আমাদের জনগণ হলো আবেগপ্রবণ। খৃস্টানরা হৃদয়গ্রাহী ভাষার ধুম্রজাল ছড়িয়ে দেয় আর আমাদের আবেগপ্রবণ আনাড়ী ভাইয়েরা তার সূক্ষ্ম সুতোয় আটকে পড়ে। যা হোক, কাল বিলম্ব না করে এক্ষুণি আমাকে এই ফেতনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আমার মনে হয় আমর দরবেশকে আমি চিনি। আমাদের

ফৌজের এক ইউনিটের কমান্ডার ছিলো। অত্র এলাকায় মিশরী গোয়েন্দা কমান্ডোও ছিলো।'

আলী বিন সুফিয়ান মেজবানকে বললেন– 'আপনি আমাদের কয়েকজন গোয়েন্দাকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করুন। এর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।'

সকাল বেলা। এখানো সূর্য উদয় হয়নি। গোয়েন্দাদের ডেকে আনার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে। তাদের রওনা হওয়ার পরক্ষণেই একটি ঘোড়া দ্রুতবেগে ছুটে এসে ঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলে সকলে তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান।

ইনি ইমাম। সেই ইমাম, যিনি আমর দরবেশের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। কিন্তু জনতা তার কথা না শুনে তাকে ধাক্কা মেরে চলে গিয়েছিলো। পরে রাতে দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর উপর আক্রমণ করেছিলো। তিনি সেখান থেকেই ফিরে এসেছিলেন। তিনি জানতেন, এই গৃহটি মুসলমানদের গুপ্তচরবৃত্তি ও অন্যান্য তৎপরতার কেন্দ্র। পাবর্ত্য এলাকা থেকে ফিরে এসে ঘরে গিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তিনি এই গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হন। যুবক ইমাম নিশ্চিত, আমর দরবেশ একজন জাদুকর ও ভেল্কিবাজ। তিনি এখানে রিপোর্ট প্রদান এবং ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সহযোগিতা নিতে এসেছেন।

যুবক ইমাম আলী বিন সুফিয়ানকে চেনেন না। পরিচয় লাভ করার পর আমর দরবেশ কী কী ভেল্কি প্রদর্শন করেছেন এবং মুসলমান দর্শনার্থীরা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তিনি তার বিবরণ প্রদান করেন।

'আমরা যদি এই ধারা বন্ধ না করি, তাহলে মুসলমান তাদের বোধ-বিশ্বাস থেকে সরে যাবে'– ইমাম বললেন– 'তাদের আকীদা নষ্ট হয়ে যাবে। আমর দরবেশ নামক এই লোকটি আজ রাত সামনের গ্রামে যাবে এবং ভেল্কি দেখাবে।'

তারা কিছুক্ষণ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেন। একজন আমর দরবেশকে হত্যা করার প্রস্তাব দেন। আলী বিন সুফিয়ান তাতে একমত হলেন না। তিনি আস্থা জ্ঞাপন করেন– 'আমর দরবেশকে হত্যা না করেই সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যাবে এবং তারই মুখে বলানো যাবে, সে যে মোজেযা দেখিয়েছে, তা ছিলো ভেল্কিবাজি।' যুক্তি উপস্থাপন করে তিনি বললেন–

'হত্যা করা হলে মানুষ তাকে আরো বেশি সত্যাশ্রয়ী ভাবতে শুরু করবে।'

আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে বণিকবেশে আরো যে তিন ব্যক্তি এসেছিলেন, তারা মিশরী ফৌজের অতিশয় বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লড়াকু গুপ্তচর। আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে বণিকের বেশে সঙ্গে নেন এবং নিজে মুখে লম্বা দাড়ি স্থাপন করেন ও এক চোখের উপর পট্টি বাঁধেন। নিজেরা ঘোড়ায় চড়ে আরো কয়েক ব্যক্তিকে উট-ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পেছন পেছন আসার জন্য বললেন। সকলকে জরুরী নির্দেশনা প্রদান করে তিনি ইমামের সঙ্গে আমর দরবেশের আস্তানা অভিমুখে রওনা হন।

আমর দরবেশ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সকাল সকাল পরবর্তী আস্তানা অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গীরা স্থানীয় লোকদের পোশাকে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি অপর একটি গ্রামের সামান্য দূরে এক স্থানে যাত্রাবিরতি দেন এবং তাঁবু স্থাপন করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি ও আশি প্রস্তুত হয়ে যান। তাঁবুর সম্মুখে দু'টি প্রদীপ জ্বালিয়ে গেড়ে দেয়া হলো। তার সঙ্গীরা গিয়ে এলাকাবাসীকে জানায়, তোমরা খোদার যে দূতের মোজেযার কথা শুনেছিলে, তিনি এখন তোমাদের মহল্লার অদূরে অবস্থান করছেন।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ছুটতে শুরু করে। একদিন আগে যারা আমর দরবেশকে দেখেছিলো, তারাও দূর-দূরান্ত থেকে এসে উপস্থিত হয়।

আমর দরবেশ প্রদীপ দু'টোর মধ্যখানে ছোট্ট গালিচাটির উপর বসে পড়েন। আশি আগের দিনকার ন্যায় আকর্ষণীয় পোশাকে সজ্জিতা। আমর দরবেশের সম্মুখে একটি কাপড় ছড়িয়ে পড়ে আছে। তিনি সেইসব ভাবভঙ্গি ও আচার-আচরণ দেখাতে শুরু করেন, যা বিগত দিন দেখিয়েছিলেন। গতকাল তাঁকে যে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, এক ব্যক্তি এবারও সেই প্রশ্ন করেন। আমর দরবেশ একই ভঙ্গিতে একই জবাব প্রদান করেন। বললেন– 'কারো কাছে পানি থাকলে এই কাপড়টির উপর ঢেলে দাও।'

আলী বিন সুফিয়ান তাঁর দলবলসহ পৌঁছে গেছেন। তিনি আমর দরবেশকে চিনে ফেলেছেন। তাঁর ভালভাবেই জানা আছে, এই লোকটি মিশরী ফৌজের এক ইউনিটের কমান্ডার ছিলো।

আলী বিন সুফিয়ানকে অবহিত করা হয়েছিলো, আমর দরবেশ পানিতে আগুন লাগাতে পারেন। কিন্তু পানিতে আগুন জ্বলে কিভাবে! বিষয়টির রহস্য উদঘাটনের জন্য তিনি ক্ষুদ্র একটি মশকে করে কতটুকু পানি সঙ্গে

করে নিয়ে আসেন। আমর দরবেশ যেই মাত্র বললেন, কারো নিকট পানি থাকলে এনে এই কাপড়টির উপর ঢেলে দাও, অমনি এক ব্যক্তি দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তার কাছে মশক ছিলো। সে কিছু পানি কাপড়টির উপর ঢেলে দেয়।

আলী বিন সুফিয়ান সামনে এগিয়ে যান। তিনি প্রদীপটি মাটি থেকে তুলে হাতে নিয়ে জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমাদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে আসো।' আলীর সঙ্গে আসা এক ব্যক্তি এগিয়ে আসে। আলী প্রদীপটি তার হাতে দিয়ে বললেন– 'এই কাপড়টায় আগুন ধরাও।' লোকটি ইতস্তত করে। আলী বিন সুফিয়ান জনতার উদ্দেশে বললেন– 'তোমাদের যে কেউ পানিতে আগুন ধরাতে পারবে।'

এগিয়ে আসা লোকটি প্রদীপটা কাপড়ের কাছে ধরামাত্রই কাপড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। এক ব্যক্তি– যে মূলত আমর দরবেশের সঙ্গী– বলে উঠলো– 'নিশ্চয় তুমি জাদু জানো। সরে যাও এখান থেকে। অন্যথায় এই বুযুর্গের অভিশাপে শেষ হয়ে যাবে।'

আমর দরবেশ বিস্মিত নয়নে চুপচাপ আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি তাকিয়ে আছেন। আলী বিন সুফিয়ান নিজের কোমরবন্ধটা খুলে আমর দরবেশের সামনে রেখে তার উপর পানি ঢেলে দিয়ে বললেন– 'তুমি যদি খোদার দূতই হয়ে থাকো, এতে আগুন লাগাও দেখি।' বলেই তিনি প্রদীপটা আমর দরবেশের দিকে এগিয়ে দেন। কিন্তু আমর দরবেশ তার মুখপানে তাকিয়েই আছেন।

জনতার মাঝে কানা-ঘুষা শুরু হয়ে গেছে। তারা আমর দরবেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে। সবচেয়ে উঁচু ইমামের কণ্ঠ। আমর দরবেশের লোকেরা তার পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করে। উভয় পক্ষেরই বক্তারা গোয়েন্দা। সাধারণ মানুষ নির্বাক কিংবর্তব্যবিমূঢ়। এটিও একটি যুদ্ধ। হক-বাতিলের লড়াই। আলী বিন সুফিয়ান জনতাকে ওদিকে ব্যস্ত দেখে আমর দরবেশের সম্মুখে বসে পড়েন।

'আমর দরবেশ!' আলী ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন– 'ঈমান বিক্রি করে কতো মূল্য পেয়েছো?'

'তুমি কে?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করেন।

'বহুদূর থেকে এসেছি'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তোমার সুখ্যাতি শুনে সীমান্তের ওপার থেকে এসেছি।'

আমর অস্থির চিত্তে এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন– 'আমি তোমাকে কিভাবে বিশ্বাস করবো?'

'আমার দাড়িতে হাত বুলাও'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'কৃত্রিম। ঈমান বিক্রি করে যে মূল্য আদায় করেছো, তার চেয়ে দ্বিগুণ দেবো। এই ভেল্কিবাজি বন্ধ করো। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।'

'আমি ঘাতকদের দ্বারা অবরুদ্ধ।' আমর দরবেশ বললেন।

'আমাকে অমান্য করলেও খুন হয়ে যাবে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এখানে আমাদের বহু মানুষ আছে। তোমার সঙ্গে ক'জন আছে?'

'আমি জানি না'– আমর দরবেশ বললেন– 'আপনার নাম কী?'

'বলা যাবে না'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আমি যা যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দাও। তূরের জালওয়া কী? সত্য সত্য বলো। তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।'

'উঠবার সময় ডানে-বাঁয়ে দেখে নেবেন'– আমর দরবেশ বললেন– 'উঁচু পাহাড়টির সামনে উঁচু একটি টিলা আছে। বিশাল একটি গাছ আছে। সন্ধ্যার সামান্য পরে ওখানে দু'-চারজন লোক লুকিয়ে রাখুন। যেভাবে পানিতে আগুন লাগানোর রহস্য জেনেছেন, তেমনি তূরের জালওয়ার ভেদও জেনে যাবেন। আমাকে এই তামাশাটা দেখানোর সুযোগ দিন। আপনি সেখান থেকে শিখা উঠতে দেবেন না। আমার পলায়ন ও নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার। ইসহাককে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে আনতে হবে। উঠুন, ঘোষণা করে দিন, রাতে তুর পর্বতের জালওয়া দেখানো হবে।'

আলী বিন সুফিয়ানের স্থলে অন্য কেউ হলে আমর দরবেশের এই অসম্পূর্ণ বক্তব্য বুঝতেন না। তিনি তো এই ময়দানের একজন দক্ষ খেলোয়াড়। ইশারায় অনেক কিছু বুঝবার যোগ্যতা তাঁর আছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন– 'খোদার এই দূত আজ রাতে তূর পর্বতের জালওয়া দেখাবেন। আমি তার বুযুর্গীর প্রমাণ পেয়েছি। আপনারা এখন চলে যান। সন্ধ্যার পর আবার আসবেন।'

আলী বিন সুফিয়ান উঠে চলে যান। জনতা তাকে ঘিরে ধরে। জিজ্ঞাসা করে, হযরতের সঙ্গে আপনার কী কথা হয়েছে? তিনি উচ্চস্বরে বললেন– 'মহান মানুষটির বুকে একটি পয়গাম ও একটি ভেদ আছে। তার সঙ্গে কথা বলে আমি আমার সন্দেহ দূর করেছি। রাতে এসে আপনারা অবশ্যই তাঁর মোজেযা দেখবেন।'

একজন আমর দরবেশের কাছে গিয়ে বসে এবং জিজ্ঞেস করে, 'লোকটার সঙ্গে আপনার কী কথা হয়েছে?' আমর দরবেশ বললেন– 'আমি তাকে ভক্ত বানিয়ে ছেড়েছি।'

'কিন্তু লোকটা কে?'– আমর দরবেশ মুচকি হেসে বললেন– 'আজ রাতই আমি তার অবশিষ্ট সব সন্দেহ দূর করে দেবো।'

'লোকটা যদি রাতে আবার আসে, তাকে খুন করে ফেলবো।' অপর একজন বললো।

'এখনই নয়'– আমর দরবেশ বললেন– 'ফল উল্টোও হতে পারে। যদি রাতে সে আমার কাছে আসে, তাহলে তাঁবুতে এনে আমার নিকটে বসাবো আর তোমরা বেঁধে তাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

'আমরা তার পিছু নিচ্ছি'– তৃতীয় একজন বললো– 'একে নজরে রাখতে হবে।'

দু'ব্যক্তি উঠে বিদায়ী জনতার সঙ্গে গিয়ে মিশে যায়। তারা আলী বিন সুফিয়ানকে খুঁজতে শুরু করে। কিন্তু তিনি জনতার মাঝে নেই। অনেককে জিজ্ঞেস করেও তারা সন্ধান পেলো না, লম্বা দাড়িওয়ালা চোখে পট্টিবাঁধা লোকটি কোথায়।

আলী বিন সুফিয়ান ঘোড়ায় চড়ে অতক্ষণে বহু দূরে চলে গেছেন।

তাঁবুতে এখন আমর দরবেশের সঙ্গে আশি ছাড়া আর কেউ নেই। আশি জিজ্ঞেস করে– 'লোকটি আসলে কে ছিলো? তোমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বললো, যেনো সে তোমার এবং তোমার ছদ্মরূপ সম্পর্কে অবগত।'

'শোনো আশি!'– আমর দরবেশ বললেন– 'আজ রাতে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমি বলতে পারছি না, কী ঘটবে? লোকটাকে আমি চিনতে পারিনি। সে নিজের পরিচয় দেয়নি। কিন্তু সে অসাধারণ কোনো মানুষ নয়। আজ রাতে পালাবার সুযোগও পেয়ে যেতে পারি, আবার খুনও হতে পারি। আজ রাতেই তোমাকে প্রমাণ করতে হবে, তোমার শিরায় মুসলিম পিতার খুন বিদ্যমান। তুমি যদি ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করো, তাহলে আমার হাতেই তোমার জীবনের অবসান ঘটবে।'

'তুমি যদি আমাকে আরো খুলে বলো, কী ঘটবে এবং আমাকে কী করতে হবে, তাহলে আমি ভালভাবে তোমার সাহায্য করতে পারবো'– আশি বললো– 'তোমার জন্য খুন হতেও আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাতে যদি তোমার লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তাহলে আমার জীবনটাও বৃথা যাবে।'

'আচ্ছা, শোনো'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমাদের লোকদের কোনো কথা তুমি শুনবে না। তারা কখন কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, জেনে আমাকে অবহিত করার চেষ্টা করবে। রাতটায় কী যে ঘটবে, আমি ঠিক বলতে পারছি না। তুমি প্রস্তুত থাকবে।'

'তুমি একাধিকবার বলেছো, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না'– আশি বললো– 'কিন্তু আমি এ কথা একবারও বলিনি। যাই হোক, তুমি যদি এখান থেকে মুক্তিলাভ করো, তাহলে আমাকে সঙ্গে করে নেবে কী?'

'যাবে তুমি?'

'না'– আশি ব্যথিত অথচ প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বললো– 'আমি মরে যাবো।'

'তুমি রাজকন্যা আশি'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমার সঙ্গে গেলে তোমার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা তো আমি ভেবেই দেখিনি। নিশ্চয় বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোকে পছন্দ করবে না। আমি তোমাকে কায়রো নিয়ে যাবো। তোমাকে নিয়ে ভাববার মতো ওখানে ভালো ভালো মাথা আছে।'

'কেনো আমাকে সঙ্গে রাখবে না?' হঠাৎ চমকে উঠে আশি জিজ্ঞেস করে– 'আমাকে তোমার বউ বানাবে না?'

'তোমার এই শর্ত আমি কবুল করবো না'– আমর দরবেশ বললেন– 'মানুষ বলবে, আমি যা করেছি, তোমাকে হাসিল করার জন্য করেছি। আমার গৃহ– যেখানে আমার স্ত্রী থাকে– তোমার যোগ্য নয় আশি। আমি সৈনিক। আমার ঘর হলো যুদ্ধের ময়দান। স্ত্রীর চেহারা দেখেছি তিন বছর হয়ে গেছে। যদি তুমি এই জন্য আমার স্ত্রী হতে চাও যে, আমি তোমার পছন্দের পুরুষ, তাহলে তুমি নিরাশ হবে। তোমার ভালোবাসা আর দোআ সেই তীরকে প্রতিহত করতে পারবে না, যেটি আমার বুকে বিদ্ধ হবে। তুমি তোমার মনোবাঞ্ছা আমাকে বলে দাও।'

'আমি এই লাঞ্ছনার জীবন হতে মুক্ত হতে চাই'– আশি বললো– 'আমাকে তোমার সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রয়োজন। পরে যা হবে, সময়মত দেখা যাবে। আমি তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবো না।'

'আমি যদি বেঁচে থাকি, তোমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও আশ্রয় দেবো।'

'আচ্ছা, লোকটা গেলো কোথায়?'– আমর দরবেশের এক গোয়েন্দার কণ্ঠ। আমর দরবেশের তাঁবু থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আলী বিন সুফিয়ান সম্পর্কে ভাবছে সে। হতে পারে, আমর দরবেশ তার হৃদয়টা কব্জা করার পরিবর্তে নিজের হৃদয়টাই তার কব্জায় তুলে দিয়েছে। এখন আমাকে অনেক

বেশি সতর্ক হতে হবে। আমাকে তো আমর দরবেশের উপর ভরসা রাখতে নিষেধ করা হয়েছিলো।

'লম্বা দাড়িওয়ালা লোকটা আগুনের ভেদ জেনে গেছে'– অপর একজন বললো– 'এখন দেখতে হবে, আমর দরবেশ তার কাছে হার মেনেছে, নাকি সে আমরের কাছে হার মেনেছে।'

'যদি কোন ষড়যন্ত্র থাকে আর আশি তাতে জড়িত থাকে, তাহলে সিদ্ধান্ত স্পষ্ট, তাকে খুন করে ফেলতে হবে।' একজন বললো।

'এমন মূল্যবান সম্পদটাকে এভাবে নষ্ট করে ফেলবে?'– অন্য একজন বললো– 'ওকে তুলে নিয়ে যেতে হবে এবং উচ্চমূল্যের বিনিময়ে কোনো বিত্তশালী লোকের কাছে বিক্রি করে ফেলতে হবে। ওখানে গিয়ে বলবো, আশিকে খুন করে দাফন করে রেখেছি।'

তিন গোয়েন্দা পরস্পর এমনভাবে চোখাচোখি করে যেন এ প্রস্তাবে তারা সবাই একমত। একজন বললো– 'আজ রাতে আমাদেরকে তূর পর্বতের জালওয়া দেখাতে হবে। তখন দেখবো, আমর দরবেশ কিংবা ঐ লোকটির মতলব কী? রাতে আমাদের একজনকে আশির সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। মেয়েটি যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায়, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। আমর দরবেশ ও আশিকে রাতে কে কে পাহারা দেবে তারা ঠিক করে নেয়।

❖ ❖ ❖

'চারজনই যথেষ্ট'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আমি আমর দরবেশের সঙ্গে থাকবো। যে তিন-চারজন লোক আমর দরবেশের পক্ষে কথা বলছিলো, তাদেরকে তো তোমরা চিনে রেখেছো। তারা তোমাদেরই এলাকার সেইসব মুসলমান, যারা সুদানীদের জন্য কাজ করছে। আমর দরবেশ তাদের সম্পর্কেই বলেছে যে, সে খুনী চক্রের বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ। তাদের প্রতি নজর রাখবে। প্রয়োজন হলে শেষ করে দেবে। তবে জীবিত ধরে ফেলতে পারলে ভালো হবে।

আলী বিন সুফিয়ান একটি মসজিদে উপবিষ্ট। যুবক ইমাম এ মসজিদেরই ইমাম। আলী বিন সুফিয়ানের মুখোশ খুলে রেখে দিলেন। তিনি নিজের লোকদেরকে রাত যাপনের জন্য মসজিদের বিভিন্ন কাজে জুড়ে দিয়ে বলছিলেন– 'আমার সন্দেহ ছিলো। কিন্তু লোকটা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আমি আশা করি রাতের মিশনেও আমরা সফল হবো।'

সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত। আমর দরবেশ আলী বিন সুফিয়ানকে যে

পাহাড়টি দেখিয়েছিলেন, এক ব্যক্তি তার উপর আরোহণ করছে। এমন সতর্কতার সাথে আরোহন করছে, যেনো কেউ দেখতে না পায়। তার ঠিক বিপরীত দিক দিয়ে নুয়ে নুয়ে তারই ন্যায় সন্তর্পনে চড়ছে অপর দু'ব্যক্তি। আরেক দিক থেকে উঠছে অন্য একজন। প্রথম ব্যক্তি চূড়ায় উঠে হামাগুড়ি দিয়ে বড় একটি গাছের নিকট পৌছে যায় এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাছটিতে চড়তে শুরু করে। দু'জন বৃহৎ একটি পাথরের পেছনে বসে পড়ে। এই জায়গাটা বৃক্ষ থেকে বেশি দূরে নয়। চতুর্থ ব্যক্তিও উপরে উঠে যায় এবং উপযুক্ত এক স্থানে লুকিয়ে যায়। প্রথম ব্যক্তি গাছে চড়ে মোটা একটি ডালের উপর যুৎসইভাবে বসে থাকে। গাছের ডাল ও পাতা এতো ঘন যে, নীচ থেকে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। খানিক পর সে অনুচ্চ কণ্ঠে পাখির মতো ডেকে ওঠে। জবাবে তার তিন সঙ্গী সাড়া দেয়।

সূর্যটা পাহাড়ের আড়ালে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। আরো তিনজন একসঙ্গে পাহাড়ে আরোহন করছে। তাদের সঙ্গে আগুন জ্বালাবার উপকরণ ও একটি মাটির পাত্রে দাহ্য পদার্থ। প্রত্যেকের সঙ্গে লম্বা খঞ্জর।

সাঝের আলো-আঁধারি গাঢ় হতে চলেছে। এই তিন ব্যক্তির ভাবভঙ্গী এমন যেনো কোনো দিক থেকে তাদের কোনো শংকা নেই। তারা কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। তাদের কথাবার্তা আগে থেকে লুকিয়ে থাকা চার ব্যক্তি শুনতে পাচ্ছে। তারা সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে আছে। সেখান থেকে বেশ দূরে নীচে আমর দরবেশের আস্তানা। সাঝের আঁধারে আস্তানাটি দেখা যাচ্ছে না। শুধু তাঁবুর বাইরে পুঁতে রাখা দু'টি প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে।

'খোদার দূত প্রস্তুত হয়ে গেছেন'– এ তিন ব্যক্তির একজন হেসে বললো– 'মাল-মসলা বের করে প্রস্তুত রাখো।'

'আজ আমার কেনো যেনো ভয় লাগছে'– অন্য একজন বললো– 'কোনো অঘটন ঘটে যায় কিনা বলা যাচ্ছে না।'

'যে লোকটি চোখে সবুজ পট্টি বেঁধে এসেছিলো, তার জন্য আমার কেমন কেমন লাগছে'– তৃতীয়জন বললো– 'কিন্তু যাক গে, ভয় পেয়ে লাভ নেই। আমরা তূর পর্বতের জালওয়া দেখিয়ে সকলের সংশয়-সন্দেহ মুছে ফেলবো। সবাই মেনে নিলে একজনের বিরোধিতায় কিছু আসে-যায় না। তোমরা যার যার দায়িত্ব পালন করো। সময় বেশী নেই। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে।'

একজন পাত্রের মুখ খুলে তেলের ন্যায় একটা তরল পদার্থ মাটিতে ঢেলে

দেয়। জায়গাটা পাথুরে বিধায় এ পদার্থটা চুষে খায়নি। সেখান থেকে সামান্য দূরে সরে গিয়ে একজন ছোট একটি বাতি জ্বালিয়ে বড় বড় পাথরের মাঝে রেখে দেয়, যাতে দূর থেকে সেটি দেখা না যায়। তার আলোতে এই তিনজনকেও দেখা যাচ্ছে।

'এবার ওদিকে প্রদীপের প্রতি দৃষ্টি রাখো'– এক ব্যক্তি বললো– 'যখনই প্রদীপটি উপর-নীচ নড়তে শুরু করবে, তখন বাতিটি তেলের উপর ছুঁড়ে মারবে। জনতা তূর পর্বতের জালওয়া দেখতে পাবে।'

এই আয়োজনটা চলছে সেই বৃক্ষটির নীচে, যার ডালে এক ব্যক্তি বসে আছে। নীচে লোক তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। গাছের লোকটি ঝিঁঝির শব্দ করে ওঠে। বড় একটি পাথরের পেছন থেকেও ঝিঁঝির ডাক শোনা গেলো। নীচের তিন ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ গাছের উপর থেকে একজন ধপাস করে নীচে দাঁড়ানো লোকগুলোর একজনের উপর পড়ে যায়। এতে সে প্রায় চেপ্টা হয়ে যায়। অপর দু'জন ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে এদিক-ওদিক সরে যায়। পরক্ষণেই পাশে লুকিয়ে থাকা আরো তিন ব্যক্তি বেরিয়ে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা খঞ্জর বের করার সুযোগ পেলো না। লোকটি গাছের উপর থেকে যার উপর পড়েছিলো, সে ছিলো খুব শক্তিশালী। ফলে উপর থেকে পড়া লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। আলী বিন সুফিয়ান বলেছিলেন, ওদের জীবিত ধরে আনতে পারলে ভালো হবে। কিন্তু এখন এই লোকটাকে হত্যা না করে উপায় নেই। যে লোকটি তার উপরে পড়েছিলো, সে তার খঞ্জর বের করে শক্তিশালী লোকটির বুকে আঘাত হানে। অপর দু'জনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা হ্যান্ডকাপ পরিয়ে নিয়ে আসা হয়।

আমর দরবেশের তাঁবুর বাইরে জনতার ভিড়। আলী বিন সুফিয়ানও আছেন তাদের মাঝে। আছে তার মিশরী ফৌজের বেশ ক'জন কমান্ডো সেনা, যারা এই অঞ্চলে বিভিন্ন বেশ ধারণ করে বিভিন্ন পরিচয়ে অবস্থান করছিলো। দিনের বেলা একত্রিত করে তাদেরকে তাদের মিশন বুঝিয়ে দেয়া হলো। তাদের কয়েকজন ঘোড়ার পিঠে বসা। তাদের কাছে অস্ত্র আছে।

জনতার মাঝে আমর দরবেশের গতিবিধি পর্যবেক্ষণকারী ও তাকে সহায়তাকারী সুদানী গোয়েন্দাও রয়েছে। তারা পাঁচ-ছয়জনের বেশী হবে না। আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে চিনে রেখেছেন। তারাও মরা ও মারার

প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। কিন্তু তারা জানে না, তাদের প্রতিপক্ষের লোক সংখ্যা কত।

আশি তার বিশেষ তেলেসমাতী পোশাক পরিধান করে ও সাজগোজ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর কর্তব্য সম্পাদন করে। উভয় প্রদীপের মধ্যখানে ছোট গালিচাটি বিছানো। আমর দরবেশ তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন এবং মদ-মাতালের ন্যায় হেঁটে হেঁটে গালিচার উপর এসে উপবেশন করেন। উভয় বাহু প্রসারিত করে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আকাশপানে তাকিয়ে বিড় বিড় করতে শুরু করলেন। আশি তার সম্মুখে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর তার সম্মুখে দোজানু হয়ে বসে পড়ে।

'হে খোদার মহান দূত, যাকে সম্মান করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য ফরজ'– আশি বললো– 'এই বিপুলসংখ্যক লোক তূর পর্বতের সেই জালওয়া দেখতে এসেছে, যা মহান আল্লাহ মূসাকে দেখিয়েছিলেন। আর জিনরাও– যাদের মধ্যে আমিও একজন– তূরের জালওয়া দেখতে এসেছে।'

'তাদের কি সন্দেহ আছে, আমি খোদার যে পয়গাম নিয়ে এসেছি, তা সত্য?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করেন।

'গোস্তাখী মাফ করবেন হে খোদার দূত!'– এক ব্যক্তি বললো– 'তূর পর্বতের জালওয়া দেখিয়ে আমাদের হৃদয়ের সব সন্দেহ দূর করে দিন।'

আলী বিন সুফিয়ান সেই লোকটার প্রতি তাকান। তাকে চিনে রাখেন। আমর দরবেশের দলের লোক।

'হ্যাঁ, পবিত্র সত্ত্বা!'– আলী বিন সুফিয়ান এগিয়ে এসে বললেন– 'আমরা সংশয়ে নিপতিত। আমাদেরকে তূর পর্বতের জালওয়া দেখান। আর এই মেয়েটি যদি জিন হয়ে থাকে, তাহলে সে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাক। তাতে আমাদের সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।'

আমর দরবেশ পাহাড়ের প্রতি ইশারা করে বললেন– 'এদিকে তাকাও। অন্ধকারে তোমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছো না।' তিনি মাটি থেকে একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'মহান খোদা! তোমার সরল ও অজ্ঞ বান্দারা সংশয়ের আঁধারে হাতড়ে ফিরছে। তুমি তাদেরকে সেই জালওয়া দেখাও, যা মূসাকে দেখিয়েছিলে এবং যা দ্বারা ফেরাউনের সিংহাসনকে ভস্ম করে দিয়েছিলে।'

আমর দরবেশ প্রদীপটি ডানে-বায়ে নাড়ান। তারপর উপরে তুলে নীচে নামান। কিন্তু পাহাড়ের উপর কোনো জ্যোতি আত্মপ্রকাশ করলো না। তিনি

পুনরায় প্রদীপটি উপর-নীচ করে নাড়ান। কিন্তু পাহাড়ে ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিঙ্গও চমকালো না।

আমর দরবেশের তিন ব্যক্তির একজন পাহাড়ে মৃত পড়ে আছে। অপর দু'জন হ্যান্ডকাপ পরা। তারা এখন আলী বিন সুফিয়ানের লোকদের হাতে বন্দী। ওখানে তারা আমর দরবেশের প্রদীপের নাড়াচাড়া দেখতে পাচ্ছে। একজন বললো– 'আজ কেউ তূর পর্বতের জালওয়া দেখতে পাবে না।' অন্যরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

'আজ তূরের জালওয়া দেখা যাবে না'– আলী বিন সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে বললেন। তিনি আমর দরবেশকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমর দরবেশ! আজ যদি তুমি পাহাড়ের চূড়ায় অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দেখাতে পারো, তাহলে আমি খোদার বদলে তোমার ইবাদত করবো।'

এক ব্যক্তি খঞ্জর বের করে আলী বিন সুফিয়ানের পেছন দিক দিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে যায়। কেউই দেখতে পেলো না, একজন লোক পেছন দিক দিয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে। তাঁবুর ভেতর থেকে সে আশিকে ডাক দেয়। আশি ভেতরে ঢুকে পড়ে।

'এক্ষুণি পালাও'– লোকটি আশিকে বললো– 'আমাদের রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। যে লোকটা বললো আজ তূর পর্বতের জালওয়া দেখা যাবে না, সে এই অঞ্চলের বাসিন্দা নয়। লোকটা মিশর থেকে এসেছে। আমাদের এক সাথী ধরা পড়েছে। এখানকার মুসলমানরা হিংস্র। তারা হয়তো আমর দরবেশকে খুন করে ফেলবে। আমরা পালিয়ে যাচ্ছি। তুমি এদের হাতে পড়ে গেলে তোমার সঙ্গে এরা পশুরন্যায় আচরণ করবে।'

'আমি যাবো না'– আশি মুচকি হেসে বললো– 'এই হিংস্র ও জংলীদের ব্যাপারে আমার কোনো ভয় নেই।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?'

'আমি পাগল ছিলাম'– আশি বললো– 'এখন আমার মাথা ঠিক হয়েছে। আমি এখন সেখানেই যাবো যেখানে আমর দরবেশ যেতে বলে।'

বাইরে আলী বিন সুফিয়ান ও যুবক ইমাম জনতাকে বলছেন– 'আসো, তোমাদেরকে সেই স্থানে নিয়ে যাবো, যেখান থেকে তূর পর্বতের জালওয়া দেখা যাওয়ার কথা ছিলো। গত রাতে তোমাদেরকে যে জালওয়া দেখানো হয়েছিলো, তার রহস্য দেখাবো।'

আলী বিন সুফিয়ানের কমান্ডাররা তিন ব্যক্তিকে এমনভাবে ধরে ফেলে

যে- 'কেউ টেরই পেলো না। পাজরে খঞ্জরের আগা ঠেকিয়ে তাদেরকে অন্ধকারে নিয়ে আটক করে রাখা হয়েছে। আমর দরবেশ এখনো ওখানেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে আছেন।'

তাঁবুর ভেতর এক সুদানী গুপ্তচর আশিকে বাঁচানোর জন্য তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। লোকটি এই ভেবে বিস্মিত যে, মেয়েটি যেতে চাচ্ছে না কেন! সে বারংবার বলছে, মুসলমান জংলী ও পশু চরিত্রের মানুষ।

আশি বললো- 'তুমি মুসলমান, আমিও মুসলমান। আমি আমার স্বজাতিকে ছেড়ে যাবো না।'

বাইরে হট্টগোল বেড়ে চলেছে। তাঁবুর ভেতরের লোকটি লম্বা একটি খঞ্জর বের করে আশিকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে সঙ্গে যেতে চাপ সৃষ্টি করছে। আশিরও তরবারী আছে। অস্ত্রটা রাখা আছে এমন জায়গায়, যেখান থেকে ঝটপট নিয়ে নেয়া যায়। আমর দরবেশ তাকে প্রতি মুহূর্তে অস্ত্র প্রস্তুত রাখতে বলে রেখেছেন। আশি মুহূর্ত মধ্যে তরবারীটা হাতে নিয়ে বললো- 'আমরা দু'জনের একজনও তোমাদের সঙ্গে যাবো না।'

একজন পুরুষের জন্য এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ যে, একটি নারী তাকে হুমকি দিচ্ছে। সে বুঝে ফেলেছে, সমস্যা একটা আছে এবং এই মূল্যবান মেয়েটা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মেয়েটিকে হত্যা করা কিংবা তুলে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক। আশি যে তরবারী চালাতে জানে, এ ধারণা সুদানী গুপ্তচরের ছিলো না। অগত্যা সে মেয়েটির উপর খঞ্জরের আঘাত হানে। আশি তরবারী দ্বারা তার আঘাত প্রতিহত করে। সুদানী গোয়েন্দার হাত থেকে খঞ্জরটা ছুটে পড়ে যায়। কিন্তু তাঁবুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অস্ত্রটি তার নিকটেই এসে পড়ে। সে খঞ্জরটা তুলে নেয়। আশি তার উপর তরবারী দ্বারা আক্রমণ করে। গোয়েন্দা অভিজ্ঞ তরবারী চালক। আশির আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। আশি বললো- 'তুমি তরবারী চালনা যার কাছে শিখেছো, তিনি এ বিদ্যায় আমারও ওস্তাদ।'

একদিকে সরে গিয়ে সে আশির আরো একটি আক্রমণ প্রতিহত করে এবং নিজেকে সামলে নিতে না নিতেই আশির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার কব্জি চেপে ধরে বললো- 'আশি! আমি তোমাকে খুন করবো না। তুমি আত্মসংবরণ করো।'

আশি ঝট করে তার নাকে একটা সঝোরে ঘুষি মারে। লোকটি পেছনে

ছিটকে পড়লে তরবারীর আঘাতে হাতের খঞ্জরটা তার পুনরায় পড়ে যায়। আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পেছন দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁবু তাকে ঠেকিয়ে দেয়। এখন আশির তরবারীর আগা সুদানী গোয়েন্দার ধমনীর উপর।

'আমি মুসলিম পিতার কন্যা'– তরবারীর আগাটা ধমনীর উপর চাপ দিয়ে আশি বললো– 'বসে পড়ো। হাত পেছনে নিয়ে যাও। আমার শক্তি হলো আমার ঈমান। আমি এখন আর কারো ক্রীড়নক নই।'

বাইরের চিত্র নিম্নরূপ–

আলী বিন সুফিয়ান একটি প্রদীপ হাতে তুলে নেন। অপরটি হাতে নেন যুবক ইমাম। চার-পাঁচজন কমান্ডোসেনা আমর দরবেশকে ঘিরে রেখেছে। আসামী হিসেবে বন্দী করা নয়– তাকে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয়ে দিয়েছে। আশংকা হলো, যেসব সুদানী গুপ্তচর তাকে চোখে চোখে রেখেছিলো, তারা তাকে হত্যা করে ফেলতে পারে। তবে যতোটুকু মনে হচ্ছে, তাদের একজনও মুক্ত নেই। কাজটা আলী বিন সুফিয়ানের পরিকল্পনা মোতাবেক সম্পাদিত হয়েছে।

আমর দরবেশ এক কমান্ডোকে বললেন– 'তাঁবুতে একটি মেয়ে আছে। তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। মেয়েটি মুসলমান।'

তাঁবুতে গিয়ে দেখা গেলো সেখানে অন্যরকম এক দৃশ্য বিরাজ করছে। আশি তরবারীর আগায় এক ব্যক্তিকে বসিয়ে রেখেছে। লোকটাকে গ্রেফতার করা হলো। আলী বিন সুফিয়ান আমর দরবেশকে বললেন– 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার লোকেরা ঐ পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে এবং তারাই সেখান থেকে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা প্রতিহত করেছে। ভালো হবে, যদি জনতাকে এখনই সেখানে নিয়ে দেখানো হয় তূর পর্বতের জালওয়া কিভাবে সৃষ্টি করা হয়, তাহলে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারবে, তাদেরকে যা দেখানো হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভেল্কিবাজি।'

'আরো একটি বিষয় আছে, সেদিকে এখনই দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক'– আমর দরবেশ বললেন– 'ইসহাককে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করতে হবে। এই অঞ্চলে সুদানীদের অনেক গুপ্তচর আছে। তাদের কেউ না কেউ এখানকার পরিস্থিতির আকস্মিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্পর্কে সরকার ও সেনাবাহিনীকে তথ্য দেবে। তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তারা ইসহাককে কয়েদখানার পাতাল কক্ষে নিক্ষেপ করে নিপীড়ন করে মেরে ফেলবে। আমি

সুদানী সালারকে ধোঁকা দিয়ে এসেছি যে, আমি এখানকার মুসলমানদের চিন্তাধারা বদলে দেবো। কয়েদখানায় আমি ইসহাকের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাকে বলে এসেছি, আমি সুদানীদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে নিজ এলাকায় গিয়ে দিনকয়েক তাদের মর্জিমাফিক কাজ করবো। আমার ইচ্ছা ছিলো, এখানে এসে আমি লোকদেরকে আমার আসল উদ্দেশ্যের কথা বলে দেবো এবং কায়রোর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইসহাককে মুক্ত করে আনার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু এখানে এসে আমি বুঝতে পারি যে, বহু সুদানী গুপ্তচর– যারা আমারই অঞ্চলের মানুষ– আমার চারদিকে ঘোরাফেরা করছে এবং আমি স্বাধীন নই। তবে ভাগ্য ভালো যে, শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো, আমার সঙ্গে দেয়া এই মেয়েটি মুসলমান।'

আমর দরবেশ আশির অতীত ইতিবৃত্ত শুনিয়ে বললেন– 'আমার আশা ছিলো না যে, আমি লক্ষ্য অর্জনে সফল হবো। আমি বেজায় অস্থির হয়ে পড়ি। আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা এতোই সরলমনা ও আবেগপ্রবণ যে, তারা আমার বক্তব্য ও ভেল্কিবাজিতে প্রভাবিত হতে শুরু করে। আমি কী করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি প্রতিটি মুহূর্ত সুদানী গুপ্তচরদের চোখে চোখে অতিবাহিত করেছি। আল্লাহ আমার নিয়তের কদর করেছেন। আপনাকে প্রেরণ করে তিনি ধ্বংসের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন। বাকি কথা পরে হবে। আমি ইসহাককে মুক্ত করতে চাই। আপনি আমাকে দু'জন সাহসী ও বিচক্ষণ কমান্ডোসেনা দিন।'

আমর দরবেশ আলী বিন সুফিয়ানকে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন। আলী বিন সুফিয়ান ভেবে-চিন্তে পরিকল্পনায় কিছু রদবদল করে তাকে বললেন– 'তুমি দু'জন কমান্ডো ও আশিকে নিয়ে এখনই রওনা হয়ে যাও এবং ইসহাককে মুক্ত করে আনো। আমি লোকগুলোকে পাহাড়ে নিয়ে দেখিয়ে আনি, তূর পর্বতের জালওয়ার হাকীকত কী ছিলো।'

আমর দরবেশ দু'জন কমান্ডো ও আশিকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে যান।

❖ ❖ ❖

তারা তাঁবুর পেছন দিকে দিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসেন। জনতা চরম বিস্ময় ও হতাশার মধ্যে দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে কানাঘুষা করছে। আলী বিন সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'আপনারা যদি তূর পর্বতের জালওয়ার হাকীকত দেখতে চান, তাহলে আমার সঙ্গে আসুন। আপনারা জানেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর

পর নবুওতের ধারা শেষ হয়ে গেছে। তাঁর পরে আল্লাহ না কাউকে কখনো জালওয়া কিংবা মোজেযা দেখিয়েছেন, না দেখাবেন। ঐ লোকটিকে আপনাদের আকীদা নষ্ট করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিলো। আপনারা ভেবে দেখেননি, লোকটি কেবল একটি কথাই বলতো যে, তোমরা সুদানের ফৌজকে সবসময় এই এলাকা থেকে দূরে রেখেছো। তারা এবার আপনাদের হৃদয় জয় করার জন্য এই অস্ত্রটা ব্যবহার করেছে।'

'আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানগণ! দুশমন যখন এ জাতীয় হীন অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তখন বুঝতে হবে, তারা ময়দানে আপনাদের মুখোমুখি হতে ভয় পায়। আপনারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভূখণ্ড আপনাদের। এখানে ইসলামের শাসন চলছে। কাফেররা আপনাদের অন্তর থেকে জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা নিঃশেষ করার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছে। আজ আপনাদেরকে তূর পর্বতের জালওয়া দেখানো হচ্ছে। কাল খৃস্টান মেয়েদের রূপ দেখিয়ে আপনাদের মাঝে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার জন্ম দেবে। আপনাদেরকে মানুষ থেকে পশুতে পরিণত করবে। তারপর টেরও পাবেন না, আপনারা ইজ্জত, আত্মমর্যাদাবোধ ও জাতীয় চেতনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে গেছেন। আপনারা কাফিরদের গোলামে পরিণত হয়ে যাবেন। সুদানের রাজা মুসলমান নন– তিনি ইসলামের শত্রু ও খৃস্টানদের বন্ধু। আচ্ছা, আপনাদের মেয়েরা খৃস্টান পুরষদের সঙ্গে মদপান করুক, অপকর্মে লিপ্ত হোক, তা কি আপনারা মেনে নেবেন? আপনারা কি মেনে নেবেন যে, আপনাদের মসজিদগুলো বিরান হয়ে যাক এবং কুরআনের অবমাননা করা হোক?'

'কাবার প্রভুর শপথ! আমরা এমনটা চাই না'– 'এক ব্যক্তি বললো– 'ঐ লোকটাকে আমাদের সামনে নিয়ে আসুন, যে নিজেকে খোদার দূত বলে দাবি করছে। বেটা গেল কোথায়?'

'না, সে নির্দোষ'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'সে আপনাদেরই একজন। এখন সে তার আসল রূপে আপনাদের সম্মুখে আসবে এবং আপনাদের অবহিত করবে, কাফেররা কিভাবে আপনাদের শিকড় কাটছে। এখন আপনারা আমার কথা শুনুন। আপনারা মুসলমান। আল্লাহ আপনাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আর কাফেররা আপনাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।'

'আপনি কে?'– এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করে– 'আপনার বক্তব্যে পাণ্ডিত্য আছে। আপনি কি বলতে পারেন, আমাদেরকে যা কিছু দেখানো

হয়েছিলো, সেগুলো আসলে কি?'

'সেই রহস্য দেখাচ্ছি'– বলেই আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুর ভেতর থেকে একটি থালা নিয়ে আসেন, যার মধ্যে তেলের ন্যায় তরল দাহ্য পদার্থ আছে। তিনি তেলগুলো একটি কাপড়ের উপর ঢেলে কাপড়টা মাটিতে রেখে দেন। পরে তাতে পানি ঢেলে দিয়ে প্রদীপটা কাপড়ের সঙ্গে লাগান। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি সকলকে অবহিত করেন, আমর দরবেশ যে কাপড়টিতে পানি ঢেলে আগুন ধরাতো, সেটিতে এই তেল মাখানো থাকতো।

'এবার আপনারা সেই লোকগুলোকে দেখুন, যারা তার সঙ্গী ছিলো'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন। তিনি কাউকে আওয়াজ দিয়ে বললেন– 'ওদেরকে জনতার সামনে নিয়ে আসো।'

আমর দরবেশের দলের লোকগুলোকে ধরে জনতার ভিড় থেকে কিছু দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিলো। আলী বিন সুফিয়ানের কমান্ডোরা তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। হঠাৎ হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। ঘোড়ার দৌড়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো। এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠলো– 'একজন পালিয়ে গেছে।'

এক গোয়েন্দা পালিয়ে গেছে। অন্যদেরকে জনতার আদালতে হাজির করা হলো। প্রদীপ উঁচু করে সকলকে তাদের চেহারা দেখানো হলো।

'এরা মুসলমান'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এই অঞ্চলের বাসিন্দা। এরা ঈমান বিক্রেতা।'

আলী বিন সুফিয়ান এদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে বক্তব্য রাখেন।

'এদেরকে মেরে ফেলা হোক'– জনতার মধ্য থেকে কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো– 'পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হোক।'

উপস্থিত লোকগুলো তাদের দিকে ছুটে আসার চেষ্টা করে। মশালের আলোতে কতগুলো তরবারীর চমক দেখা গেলো।

'থামো'– আলী বিন সুফিয়ান মধ্যখানে এসে দাঁড়িয়ে বললেন– 'আল্লাহর আইন নিজেদের হাতে তুলে নিও না। যথাযথ কর্তৃপক্ষ এদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এদেরকে হেফাজতে নিয়ে যাও। আর আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।'

জনতা আলী বিন সুফিয়ানের পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করে। তিনি

তাদেরকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হন, যেখানে তার লোকেরা এক ব্যক্তিকে খুন করেছে এবং দু'জনকে রশি দ্বারা বেঁধে রেখেছে।

আমর দরবেশ, আশি ও দু'কমান্ডো বহু পথ এগিয়ে গেছেন। তারা সুদানের রাজধানী অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন।

'বন্ধুগণ!'– আমর দরবেশ চলন্ত ঘোড়ার উপর থেকে বললেন– 'আমদেরকে খুব দ্রুত পৌঁছতে হবে। আশি, তুমি যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ো, তাহলে আমার পেছনে এসে বসবে। সফর খুব দীর্ঘ এবং সময় খুবই অল্প। আমার ভয় হচ্ছে, কোনো শত্রু গোয়েন্দা আমাদের আগে পৌঁছে যায় কিনা।'

একজন সুদানী গোয়েন্দাও রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। সেই গোয়েন্দা, যে আলী বিন সুফিয়ানের হেফাজত থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। পেছন থেকে ধাওয়া হতে পারে এই ভয়ে সে একটি উপত্যকার পথ ধরে ছুটছে। একসময় উপত্যকা থেকে বেরিয়ে বহু পথ ঘুরে রাজধানীর পথ ধরে। এদিকে আমর দরবেশও বহুদূর চলে গেছেন।

সুদানী গোয়েন্দা কেন্দ্রকে সংবাদ পৌঁছাবে, আমর দরবেশের ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে। রিপোর্টে আমর দরবেশের উপর সন্দেহও ব্যক্ত করবে বলে তার সিদ্ধান্ত। তার উদ্দেশ্য আমর দরবেশকে পুনরায় কয়েদখানায় আবদ্ধ করানো।

অপরদিকে আমর দরবেশের পরিকল্পনা হচ্ছে, তার আগে পৌঁছে গিয়ে সুদানী সালারকে ধোঁকা দেয়া এবং ইসহাককে মুক্ত করে আনা। আশি এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত এবং সে সাক্ষী হিসেবে সঙ্গে যাচ্ছে।

প্রদীপের আলোতে জনতা পাহাড়ের উপর আরোহন করছে। আলী বিন সুফিয়ান সকলের সামনে হাঁটছেন। তার লোকেরা পাহাড়ের চূড়ায় দু'জন গুপ্তচরকে বেঁধে রেখেছে। তারা দেখতে পাচ্ছে, কয়েকটি প্রদীপ এবং কতগুলো লোক পাহাড়ে আরোহন করছে। তারা বাতি উপরে তুলে ধরে দেখার চেষ্টা করে লোকগুলো কারা এবং তাদের গন্তব্য কোথায়।

'আমাদের সঙ্গে চলো'– হ্যান্ডকাপ পরিহিত এক ব্যক্তি বললো– 'যা চাইবে তাই দেবো, আমাদেরকে ছেড়ে দাও।'

'তোমরা কি সকল মুসলমানকে ঈমান-বিক্রেতা মনে করো?'– আলী বিন সুফিয়ান এক কমান্ডোকে বললেন– 'দুনিয়ার সম্পদ আর জাহান্নামের আগুনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তোমরা স্বজাতিকে ধোঁকা দিয়েছিলে।'

'তিনি আসছেন'– অপর কয়েদী বললো– 'তিনি আমাদেরকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলবেন। আমাদেরকে অতি নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে। বলো, কী দেবো। ছেড়ে দাও, আমরা পাহাড়ের অপরদিক দিয়ে পালিয়ে যাই। হিরা-জহরত দেবো, যতো চাও ততো দেবো।'

প্রদীপগুলো যতোটুকু উপরে উঠছে, কয়েদীদের অস্থিরতা ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন বললো– 'তোমার সঙ্গে তো তরবারী আছে। তা দ্বারা এক আঘাতে আমাদের ঘাড় দ্বিখণ্ডিত করে দাও। আমাদেরকে ঐ লোকগুলো থেকে রক্ষা করো।'

'আল্লাহর নিকট গুনাহর মাফ চাও।'

প্রদীপগুলো তাদের মাথার উপর এসে দাঁড়িয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান জনতাকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। দু'জন লোককে রশিতে বাঁধা দেখে লোকগুলো বিস্মিত হয়ে যায়।

'এরাই হলো তূর পর্বতের জালওয়া প্রদর্শনকারী'– বলে আলী বিন সুফিয়ান মাটিতে চোখ বুলান। একদিকে বাতিটা ইশারা করে বললেন– এই দেখো, এখানে দাহ্য পদার্থ পড়ে আছে। তার পার্শ্বেই পড়ে আছে একটি থালা। আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এই থালায় সেই তেল ছিলো, যা দ্বারা কাপড়ে আগুন ধরানো হতো। এ তেল এখানে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমি চার ব্যক্তিকে সন্ধ্যায় এখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমর দরবেশের প্রদীপের সংকেতে এই বাতি থেকে তেলে আগুন ধরিয়ে দেয়ার কথা ছিলো। এটিই সেই তূরের জালওয়া, যা তোমরা দেখতে পারোনি। কারণ, আমার লোকেরা আগুন জ্বালানোর আগেই এদেরকে পাকড়াও করে ফেলে।'

'এরা তিনজন ছিলো'– এক ব্যক্তি বললো– 'তৃতীয়জন আমাদের মোকাবেলা করেছিলো। তার লাশ গাছের গোড়ায় পড়ে আছে।'

আলী বিন সুফিয়ান প্রদীপের আগুন তেলের কাছে নিয়ে বললেন– 'এই দেখেন'। অমনি তেলে আগুন জ্বলে ওঠে। আগুনের শিখা উপরে ওঠে পরক্ষণেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করে। আলী বললেন– 'এরপর কি সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে যে, আপনাদেরকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অগ্নিপূজারী বানানোর চেষ্টা চলছিলো?'

'আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন'– বন্দীদের একজন বললো– 'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'তোমরা কি এই অঞ্চলের মুসলমান নও?' আলী জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ।' দু'জনই মাথা নাড়ায়।

'খৃস্টান ও সুদানী কাফেররা কি তোমাদেরকে এ কাজের প্রশিক্ষণ দেয়নি?'

'হ্যাঁ, তারাই দিয়েছে। আমরা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।'

'তোমরা কি স্বজাতিকে ধোঁকা দেয়া এবং নিজ ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য পুরস্কার লাভ করতে না?'

'হ্যাঁ'– একজন জবাব দেয়– 'এর বিনিময়ে আমরা বড় অংকের পুরস্কার পেতাম।'

'আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন'– একজন বললো– 'আমরা আমাদের জাতি ও ধর্মের জন্য জীবন বিলিয়ে দেবো।

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ পেছন থেকে এক তোজোদীপ্ত মুসলমান তরবারী দ্বারা এতো তীব্রবেগে আঘাত হানে যে, একসঙ্গে দুজনের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

'আমি যদি খুনের অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে হত্যা করে ফেলো।' আক্রমণকারী লোকটি তরবারীটা জনতার সম্মুখে ছুঁড়ে ফেলে বললো।

'আল্লাহর কসম! এই লোকটি খুনী হতে পারে না।' যুবক ইমাম বললেন।

'এ খুন বৈধ।' জনতার মধ্য থেকে সমস্বরে রব ওঠে।

রাতের শেষ প্রহরে আমর দরবেশ ঘোড়া থামান। আশি ও কমান্ডোদের বললেন– 'কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নেই।' ঘোড়াগুলোকেও বিশ্রামের সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন ছিলো।

রাজধানীগামী গোয়েন্দা আধা রাত চলার পর বিশ্রামরে জন্য এক স্থানে থেমে যায়। তার জানা নেই। আমর দরবেশ আগে আগে যাচ্ছেন। গোয়েন্দা মাটিতে মাথাটা এলিয়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত পোহাবার পরপরই আমর দরবেশ প্রস্তুত হয়ে পুনরায় রওনা হন। তিনি সৈনিক। কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত। আশি প্রাসাদের মেয়ে। তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো বটে; কিন্তু তার সময় কাটছিলো বিলাসিতার মধ্যদিয়ে।

'আশি!'– আমর দরবেশ ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে বললেন– 'তোমার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তোমার রাত জাগার অভ্যাস নেই। আমার ঘোড়ায় পিঠে উঠে বসো।'

আশি মুখ টিপে হাসে। কিন্তু চোখ দুটো তার বন্ধ। আমর দরবেশ তাকে পুনরায় বললেন– 'তোমার ঘোড়াটা ছেড়ে দাও।'

আশি মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়। ঘোড়া ছুটে চলছে। আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর এক কমান্ডো আমর দরবেশকে বললেন– 'মেয়েটি ঝিমুচ্ছে, ঘোড়া থেকে পড়ে যাবে।'

আমর দরবেশ নিজের ঘোড়াটা আশির নিকটে নিয়ে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন। আশি জেগে যায়। আমর দরবেশ বললেন– 'নিজের ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে আমার ঘোড়ায় চলে এসো।'

'সহায়তা নিতে চাই না'– আশি বললো– 'আমি অন্যকে সহায়তা দিতে চাই। আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে হবে। পিতা-মাতার খুন এবং নিজের সম্ভ্রমের প্রতিশোধ নিতে হবে। আমি জেগে থাকার চেষ্টা করছি।'

ঘোড়া এগিয়ে চলে। অনেক পথ এগিয়ে যাওয়ার পরও আশির ঘুমের ভাব কাটছে না। আমর দরবেশ তার পাশে পাশেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। তিনি দেখে না ফেললে আশি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়েই যেতো। তিনি ঘোড়া থামিয়ে কোন কিছু না বলে আশিকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নেন এবং সম্মুখে বসিয়ে দেন। এক কমান্ডো আশির ঘোড়ার লাগাম নিজের জিনের সঙ্গে বেঁধে নেয়। সবগুলো ঘোড়া একসাথে ছুটে চলছে।

আশি নিজের মাথাটা আমর দরবেশের বুকের উপর ছেড়ে দিয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মেয়েটির খোলা চুলগুলো আমার দরবেশের মুখের উপর উড়তে থাকে। এমন কোমল আর রেশম-সুন্দর চুলের পরশের সঙ্গে আমর দরবেশ পরিচিত নয়। কিন্তু মেয়েটির কোনকিছুই তার উপর সেই প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, যা একজন সুপুরুষ যুবকের উপর করার কথা। আশির পূর্বেকার বলা কথাগুলো তার মনে পড়তে শুরু করে।

'তোমার কোলে আমার পিতা-মাতার কোলের আনন্দ অনুভূত হয়েছিলো'– আশি কয়েকদিন আগে সেই মরু এলাকায় বসে বলেছিলো– 'আমার তো এ কথাও স্মরণ নেই যে, আমারও বাবা-মা ছিলেন। আপনি আমার অতীতটা আমার চোখের সামনে এনে দিয়েছেন।'

আমর দরবেশের মনে হতে লাগলো, যেনো আশি বাতাসের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথাগুলো বলছে আর তিনি শুনছেন– 'আমাকে তোমার বক্ষ ও বাহুর আশ্রয়ে নিয়ে রাখো। আমি মুসলমানের কন্যা। আমাকে খৃস্টানদের হাতে তুলে দিও না। রক্ত... রক্ত...। আমি রক্ত দেখতে পাচ্ছি। এগুলো

আমার পিতার রক্ত। এগুলো মায়ের। দু'জনের রক্ত একত্রিত হয়ে বাইতুল মোকাদ্দাসের বালিতে শুকিয়ে যাচ্ছে...। আমর দরবেশ! আপনার শিরায় হাশেমের খুন প্রবাহিত হচ্ছে। আপনি সেই খুনের প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবেন না, যা বাইতুল মোকাদ্দাসের বালি চুষে নিয়েছে। ফিলিস্তিনের সম্ভ্রম আপনাকে ডাকছে। প্রথম কেবলাকে হৃদয় থেকে ফেলে দেবেন না হাশেমের পুত্র।

আমর দরবেশ ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেন। কমান্ডোদেরও নিজ নিজ ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিতে হলো। আশির এলোমেলো চুলগুলো আরো বিক্ষিপ্ত হয়ে বাতাসের তালে তালে আমর দরবেশের মুখের উপর উড়ছে।

'আমর দরবেশ'– এক কমান্ডো তার ঘোড়াটা আমর দরবেশের পাশে এনে বললো– 'সামনে কোনো চৌকি থেকে ঘোড়া বদল করে নেয়ার আশা নেই। ঘোড়াগুলোকে এভাবে মেরে ফেলো না। আরো ধীরে চলো।'

আমর দরবেশ কমান্ডোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুচকি হাসেন। তিনি ঘোড়ার গতি কিছুটা হ্রাস করে বললেন– 'মহান আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। ঘোড়া ক্লান্ত হবে না ইনশাআল্লাহ।'

আমর দরবেশের কথা বলার শব্দে আশির ঘুম ভেঙ্গে যায়। হঠাৎ চমকে উঠে খানিকটা ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'আমি কতক্ষণ যাবত ঘুমিয়ে ছিলাম? আমার ঘোড়া কোথায়?'

'তুমি তো ঘোড়ার পিঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলে'– আমর দরবেশ বললেন– 'কিন্তু আমার ঘুমন্ত ঈমানের শিরা জেগে উঠেছিলো। ওঠো, নিজের ঘোড়ায় গিয়ে চড়ে বসো। সন্ধ্যা নাগাদ গন্তব্যে পৌঁছে যেতে হবে।'

আলী বিন সুফিয়ান সেই গ্রামটিতে চলে যান, যাকে মুসলমানরা তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রভূমি বানিয়ে রেখেছিলো। তিনি তার কমান্ডোসেনা ও গুপ্তচরদের দায়িত্ব প্রদান করেন যে, তোমরা অঞ্চলময় ছড়িয়ে পড়ে আমর দরবেশের ভেল্কিবাজির রহস্য ফাঁস হওয়ার কথা প্রচার করে দাও। তিনি সেখানকার নেতৃবর্গকে বললেন, আপনারা লোকদের প্রস্তুত করুন।

যাই বলি না কেনো, এলাকাটা সুদানের, যেখানে মুসলমানদের স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই। সুদানী ফৌজ প্রয়োজন বোধ করলে হামলা করার অধিকার রাখে। কিন্তু তারপরও মুসলমানরা এলাকায় তাদের বি-

বিধান চালু রেখেছে। তারা যে ক'জন শত্রু গোয়েন্দাকে গ্রেফতার করেছিলো,তাদেরকে নিজেদের তৈরি কয়েদখানায় ফেলে রেখেছে। তাদের শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু এই শাস্তি বিধান সুদানী আইনে অপরাধ। এই আসামীরা যা কিছু করেছে, সবই সুদানের স্বার্থে করেছে। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ান ঝুঁকি মাথায় তুলে নেন। তিনি তার কমান্ডোদের ভাগ করে দু'টি দল গঠন করে নেন।

কয়েদখানায় ইসহাককে উন্নত একটি কক্ষে রাখা হয়েছে। তাকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে উন্নত খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। তিনি ভালোভাবেই বুঝেন, তার সঙ্গে এই সদাচারণ কেনো করা হচ্ছে। আমর দরবেশ তাকে তার পরিকল্পনা পুরোপুরি বলে গিয়েছিলো। ইসহাক একাকী বসে সে নিয়েই ভাবছেন। দু'টি আশংকা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রথমত, আমর দরবেশ কয়েদখানার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে সুদানীদের হাতে খেলতে শুরু করলো কিনা। দ্বিতীয়ত, নাকি নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন।

ইসহাক নিজের পলায়ন সম্পর্কেও ভাবছেন। কিন্তু কোনো পন্থা তার চোখে পড়ছে না। সুদানীদের জন্য তিনি একজন মূল্যবান কয়েদী, যার ফলে তার জন্য অতিরিক্ত পাহারার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। আমর দরবেশের চলে যাওয়ার পর থেকে কেউ তাকে বলেনি, তোমার সম্প্রদায়কে সুদানের অফাদার বানিয়ে দাও। যে সুদানী সালার তার পেছনে ছায়ার মতো লাগা ছিলো, সেও এ যাবত একবারের জন্যও তার সামনে আসেনি।

সূর্য ডুবে গেছে। চারটি ঘোড়া সুদানের রাজধানীতে প্রবেশ করে সোজা সেনা হেডকোয়ার্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আমর দরবেশের জানা আছে, তাকে কোথায় যেতে হবে এবং কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। চিন্তা-চেতনা বিধ্বংসী তৎপরতার প্রশিক্ষণ তিনি এখান থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রক্ষী বাহিনীর কমান্ডারকে সেই সুদানী সালারের নাম বললেন, যে তাকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সালারের বাসভবনে পৌঁছিয়ে দেয়া হলো।

'ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছো নাকি ভালো কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছো।' আমর দরবেশকে দেখেই সুদানী সালার জিজ্ঞেস করে।

'ভালো সংবাদ ওর নিকট থেকে শুনুন'– আমর দরবেশ আশির প্রতি ইশারা করে বললেন– 'আমার বক্তব্যে আপনার বিশ্বাস নাও হতে পারে।'

আশি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বদনে পালংকের উপর ধপাস করে বসে পড়ে। তার দু'ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি হাসি। সে আমর দরবেশকে উদ্দেশ করে বলে– 'বিস্তারিত ঘটনা আপনিই বিবৃত করুন এবং তাড়াতাড়ি করুন। হাতে সময় বেশী নেই।'

'আমাদের মিশন এতো দ্রুত সফল হয়ে গেলো যে, আমি তার কল্পনাও করিনি।' আমর দরবেশ বলেন। তিনি কিভাবে পানিতে আগুন লাগালেন এবং কিভাবে তূর পর্বতের জালওয়া দেখালেন, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

'আর তার কথা বলার ভঙ্গী এতো আকর্ষণীয় ছিলো যে, আমি বিস্মিত হয়ে পড়ি'– আমর দরবেশ সম্পর্কে আশি বললো– 'মানুষ তার ভেল্কিবাজিতে তেমনি প্রভাবিত হয়ে গেছে, যেমনটি হয় তার ভাষায়।'

'আচ্ছা, আমাদের ওখানকার সাফল্যের সংবাদ নিয়ে কি এখনো কেউ আসেনি?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করেন।

'না, কেউ আসেনি'– সালার বললো– 'আমি তো তোমাদের চিন্তায় অস্থির ছিলাম।'

শুনে আমর দরবেশ নিশ্চিত হন যে, এখনো কোনো গুপ্তচর এসে পৌঁছেনি। যে সুদানী গোয়েন্দা মুসলমানদের বন্দীদশা থেকে পালিয়ে এসেছিলো, এখনো সে এসে পৌঁছেনি। তার গতি আমর দরবেশের গতি অপেক্ষা শ্লথ। তার এসে পৌঁছতে রাত পার হয়ে যাবে। আমর দরবেশের যা করার উক্ত গোয়েন্দা পৌঁছানোর আগেই শেষ করতে হবে। সে এসে পৌঁছলেই ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবে। আমর দরবেশ তাড়াতাড়ি কার্যসিদ্ধি করে বের হতে না পারলে তাকে আবারও ভয়ংকর পরিণতি বরণ করতে হবে।

'এবার কাজের কথা বলি'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমাদের ইসহাককে প্রয়োজন। আমি অর্ধেকেরও বেশী মুসলমানের চিন্তা-চেতনাকে ধোলাই করে ফেলেছি। তাদেরকে আমি সুদানের অফাদার হতে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছি। তাদের অন্তরে আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি। আমি প্রমাণ করে দিয়েছি, সালাহুদ্দীন আইউবী ফেরাউনদের উত্তরসূরী। এখন যদি তাদেরকে তাদের কোনো নেতা বলে দেন যে, তোমাদেরকে সুদানের আনুগত্য করতে হবে, তাহলে উক্ত অঞ্চলের সব মানুষই আপনাদের হয়ে যাবে। আমি তথ্য পেয়েছি এবং আগে থেকে নিজেও জানি, এই জননেতা ইসহাক ছাড়া আর কেউ নয়। সেখানকার মুসলমানরা তাকে পীর-পয়গম্বর বলে মান্য করে।'

'কিন্তু ইসহাককে রাজি করাবে কে'– সুদানী সালার বললেন– 'আমি তাকে এই ভূখণ্ডের ক্ষমতার লোভ দেখিয়েছি। এমন এমন নিপীড়ন করেছি, যা একটি ঘোড়াও সহ্য করতে পারে না। অশী পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।'

'এবার আমাকে চেষ্টা করে দেখার সুযোগ করে দিন'– আমর দরবেশ বললেন– 'কয়েদখানা থেকে বের করে তাকে সেই কক্ষে পাঠিয়ে দিন, যেখানে তাকে একবার রেখেছিলেন এবং আমাকেও রেখেছিলেন। আপনি তার দুশমন, আমি বন্ধু– সহকর্মী। আমার কথা তাকে ভাবিয়ে তুলবে পারে।'

'আচ্ছা, তা না করে আশিকে দিয়ে আরেকবার চেষ্টা করে দেখবো নাকি?' সুদানী সালার জিজ্ঞেস করে।

'না'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমি তার উপর আমার ভাষার জাদু প্রয়োগ করবো। এখনই যদি আপনি তাকে উক্ত কক্ষে পাঠিয়ে দেন, তাহলে আশা করি ভোর পর্যন্ত আমি তাকে জালে আটকে ফেলতে পারবো। আমার হাতে সময় বেশি নেই। উক্ত এলাকা থেকে আমার অনুপস্থিতি দীর্ঘ না হওয়া উচিত। আপনি তো জানেন, সেখানে মিশরী গোয়েন্দাও আছে। আমি যে জাদু প্রয়োগ করে এসেছি, আমার অনুপস্থিতিতে মিশরী গোয়েন্দারা তা ব্যর্থ করে দিতে পারে।'

সুদানী সালার আমর দরবেশকে তার সঙ্গের কমান্ডো দু'জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আমর বললেন, এরা আমার রক্ষী ও ভক্ত। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আমার সঙ্গে এসেছে।

ইসহাককে একটি মনোরম ও সুদক্ষ কক্ষে নিয়ে আসা হলো। তাকে নিয়ে আসার জন্য সালার নিজে কয়েদখানায় যায়। গিয়ে তাকে বললো– 'তোমার জাতীয় চেতনা ও ঈমানী শক্তিতে আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। তোমার এক বন্ধু আমর দরবেশ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে। আমি চাই, একটি ভালো পরিবেশে তোমাদের সাক্ষাৎ পর্ব অনুষ্ঠিত হোক।'

'কয়েদখানা অপেক্ষা অধিক নোংরা ও কষ্টদায়ক কিংবা তোমার প্রাসাদ অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী ও মনোরম পরিবেশ কোনোটিই আমাকে আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না'– ইসহাক বললেন– 'আমাকে অন্ধকার পাতাল কক্ষে নিক্ষেপ করো কিংবা বালাখানায় নিয়ে যাও, কোনো অবস্থাতেই আমি আমার ঈমান বিক্রি করবো না।'

সুদানী সালার হেসে পড়ে এবং ইসহাককে সেই কক্ষে নিয়ে যায়,

যেখানে আমর দরবেশ তার অপেক্ষায় বসে আছেন। সালার নিজেও কক্ষে অবস্থান নেয়।

'তোমার চেহারা বলছে, তুমি এই কাফেরদের নিকট নিজের ঈমানটা বিক্রি করে ফেলেছো'– ইসহাক আমর দরবেশকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'তোমার চেহারার রওনক আর চোখের চমক বলছে, তুমি দীর্ঘদিন যাবত কয়েদখানার বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছো। আমার সঙ্গে সাক্ষাতে তোমার উদ্দেশ্য কি?'

'আমি তোমার চেহারায়ও এই রওনক আর চোখে সেই চমক দেখতে চাই, যা তুমি আমার চেহারা ও চোখে দেখতে পাচ্ছো'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমাকে একটু সময় দাও। ক্ষণিকের জন্য তোমার হৃদয় ও মস্তিষ্কটা আমাকে দিয়ে দাও। ধৈর্যের সাথে ও শান্তমনে আমার কথা শোনো।'

সুদানী সালার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সে ঝুঁকি মাথায় নিতে চাচ্ছে না। ইসহাক তার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কয়েদী। আমর দরবেশও তার কয়েদী ছিলো। এটা আমর দরবেশের প্রতারণাও হতে পারে। এই দু'জন লোককে সে এমন একটি কক্ষে একাকী ছেড়ে যেতে চাচ্ছে না, যেটি কয়েদখানার নিরাপদ কক্ষ নয়। পাহারার জন্য সে চারজন প্রহরী নিযুক্ত করে দিয়েছে। দু'জন কক্ষের সামনে আর দু'জন পেছনের দরজায়। বর্শা ও তরবারী ছাড়া তাদের কাছে তীর-ধনুকও আছে, যাতে কেউ পালাবার চেষ্টা করলেও সফল হতে না পারে। আমর দরবেশ চাচ্ছেন, সালার এখান থেকে চলে যাক। কিন্তু লোকটা এক পা-ও নড়ছে না। তার উপস্থিতিতে আমর দরবেশ ইসহাককে বলতে পারেন না তার পরিকল্পনা কী।

সুদানী সালার আশিকে খাওয়া-দাওয়ার জন্য এ ভবনেরই অন্য এক কক্ষে পাঠিয়ে দিয়েছে। সালারকে এই কক্ষ থেকে সরিয়ে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলো। কিন্তু আপাতত তার এদিকে আসবার সম্ভাবনা নেই।

যে সুদানী গুপ্তচর পরিস্থিতি জানানোর জন্য ছুটে আসছে, এখন আর সে শহর থেকে বেশী দূরে নয়। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমর দরবেশের দু'কমান্ডো সঙ্গী এই ভবনেরই বারান্দায় তার সংকেতের অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পর আশি বেরিয়ে আসে। পোশাক পরিবর্তন করে এসেছে আশি। রূপ যেনো ঠিক্‌রে পড়ছে তার। সফরের ক্লান্তিও মুখ থেকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সে কমান্ডোদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে যায়।

'সালার চলে গেছেন?' আশি কমান্ডোদের জিজ্ঞেস করে।

'না'– এক কমান্ডো জবাব দেয়– 'তিনি ভেতরে আছেন।'

'তার চলে যাওয়া দরকার।' বলেই আশি কক্ষের দিকে এগিয়ে যায়।

আশিকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে আমর দরবশের মনে আশার সঞ্চার হয়। সুদানী সালার তার প্রতি তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি দেয়। সেই হাসি, যে হাসি আশির মতো মেয়েদের প্রতি চোখ পড়লে তার মতো পুরুষদের ওষ্ঠাধর গলে বেরিয়ে আসে।

আশি দুলতে দুলতে বিশেষ এক ভঙ্গিমায় সালারের পেছনে চলে যায়। আমর দরবেশের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকায় সে। আমর দরবেশ সুযোগ পেয়ে যান। তিনি আশিকে ইশারা করলেন, সালারকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলো।

'ইসহাক ভাই!'– আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করে– 'আমরা কি সুদানের সন্তান নই?'

'আমরা সর্বাগ্রে ইসলামের সৈনিক'– ইসহাক জবাব দেন– 'আর আমি এখনও মিশরী কমান্ডার ও সুলতান আইউবীর অফাদার। মিশরের ভূখণ্ড যদি আমার মা হয়ে থাকে, তাহলে আমি আমার জননীকে ইসলামের শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারি না। আমর দরবেশ! আমি তোমার ন্যায় ইসলামের মর্যাদা ও নিজের ঈমান বিক্রি করতে পারবো না।'

আশি পেছন থেকে সুদানী সালারের কাঁধে নিজের উভয় বাহু রেখে মুখটা তার কানের সঙ্গে লাগিয়ে বললো– 'দিন কয়েকের মধ্যেই আপনার হৃদয়টা মরে গেছে।'

সুদানী সালার মোড় ঘুরিয়ে তাকালে আশির গাল ও বিক্ষিপ্ত চুলগুলো তার গণ্ডদেশ ছুঁয়ে যায়। আশির মুখে মুচকি হাসি। বললো– 'আমি এতো ঝুঁকিপূর্ণ ও ভয়ংকর মিশন থেকে ফিরে আসলাম, আগামীকাল আবার পাহাড়-জঙ্গলে চলে যেতে হবে, যেখানে পানি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। মদের ঘ্রাণটাও কি আমি ভুলে যাবো?'

'উহ!'– সুদানী সালার চমকে উঠে বললেন– 'আমি তো গল্প শোনায় ব্যস্ত হয়ে তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করছি। তুমি ঐ কক্ষে চলে যাও।'

'নাহ্'– আশি বললো– 'একা একা মজা হবে না। আপনিও চলুন। এখানে কোনো সমস্যা নেই। দু'দিকে সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। প্রয়োজন হলে পরে আবার আসবেন।'

আশি এই বিদ্যায় ওস্তাদ। শৈশব থেকে অদ্যাবধি প্রশিক্ষণই পেয়ে

আসছে। এবার সেই বিদ্যা নিজের বস ও গুরুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। সুদানী সালার তার হাসির ফাঁদে আটকা পড়েছে। লোকটি সবকিছু ভুলে গিয়ে আশির সঙ্গে কক্ষপানে পা বাড়ায়। বাইরে বের হয়ে সে এক কর্মচারীকে মদ আনতে বলে নিজে আশির সঙ্গে কক্ষের দিকে চলে যায়। আশি তাঁকে তার বাহু বেষ্টনীতে নিয়ে নেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ সালারের উপর যুবতী মেয়েটির জাদু ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে মদ এসে গেছে। আশি সালারকে পেয়ালার পর পেয়ালা গেলাতে শুরু করে।

'নিয়ত স্বচ্ছ হলে আল্লাহও সাহায্য করেন'– আমর দরবেশ ইসহাককে বললেন– 'আমার পরিকল্পনা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। বিস্তারিত কথা শহর থেকে বের হয়ে শোনাবো। দু'জন কমান্ডো সঙ্গে এনেছি। দু'-সান্ত্রী এদিকে দাঁড়িয়ে আছে আর দু'জন ওদিকে। আমরা যেদিক দিয়ে বের হবো, সেদিককার সান্ত্রীদের খতম করলেই চলবে। আমাদের চারটি ঘোড়া প্রস্তুত আছে। চারটি প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সান্ত্রীদের, যাতে আমরা পালিয়ে গেলে ধাওয়া করতে পারে। আমাদের ওখানে মিশর থেকে কিছু লোক এসেছেন। একজনকে খুবই বিচক্ষণ মনে হচ্ছে। তিনি নিজের নাম বলেননি। কায়রোতে ওখানকার খবরাখবর পৌঁছে গেছে। সালারকে মেয়েটি নিয়ে গেছে। আমি একটু বাইরের অবস্থাটা দেখে আসি। মেয়েটিকেও সঙ্গে নিতে হবে।'

'কেন?'– ইসহাক জিজ্ঞেস করেন– 'এই বেশ্যাটার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

'এখান থেকে বের হয়ে বলবো'– আমর দরবেশ বললেন– 'মেয়েটি মুসলমান।'

আমর দরবেশ কক্ষ থেকে বের হন। সান্ত্রীরা তাকে সুদানী সালারের সঙ্গে এ কক্ষে আসতে দেখেছিলো। সে কারণে তারা তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তিনি তার কমান্ডোদের নিকট গিয়ে বললেন, সান্ত্রীদের সামলানোর সময় এসে গেছে। তারপর সালারের কক্ষের দরজাটা খানিক ফাঁক করে তাকান। সালার মদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে মুদিত চোখে মাতাল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'কে?' আশি বললো– 'আমি দেখছি।' বলেই উঁকি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললো– 'বাতাস।' মেয়েটি সালারকে ঠেস দিয়ে পালংকের উপর শুইয়ে দেয়। সালার বাহু এগিয়ে দিয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে

বললো– 'তুমিও আসো। নেশা আরো বাড়িয়ে দাও।'

আশি কিছুই না বলে বিড়ালের ন্যায় পা টিপে টিপে শব্দ ছাড়া দরজা খুলে কক্ষ থেকে বের হয়ে বাইরে থেকে আলতোভাবে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। আমর দরবেশ ও আশি কমান্ডো দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে ইসহাকের কক্ষের দিকে যান।

ইতিমধ্যে সুদানী গোয়েন্দা শহরে ঢুকে পড়েছে। গন্তব্য তার গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টার।

আমর দরবেশ দরজার বাইরে দাঁড়ানো সান্ত্রীদের বললেন– 'ভেতরে চলো, কয়েদীকে কয়েদখানায় নিয়ে যাও। সালার নির্দেশ দিয়েছেন, হাত বেঁধে নিতে হবে।'

উভয় সান্ত্রী একসঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দু'কমান্ডো একসঙ্গে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে দু'সান্ত্রীর ঘাড় দু'কমান্ডোর বাহুতে আটকে যায়। কমান্ডোদের খঞ্জর পূর্ব থেকেই বের করা আছে। তারা সান্ত্রীদের হৃদপিণ্ডে আঘাত হানে। সান্ত্রীদ্বয় সাথে সাথেই নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

সুদানী গোয়েন্দা গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। সে এক নায়েব সালারকে রিপোর্ট দিচ্ছে।

আমর দরবেশ ইসহাককে বললেন– 'বেরিয়ে পড়ুন।' বাইরে আটটি ঘোড়া দণ্ডায়মান। চারটি আমর দরবেশের, চারটি সুদানী সান্ত্রীদের। অপর দিকের সান্ত্রীরা টেরই পেলো না, ভেতরে কী ঘটছে। আমর দরবেশ ইসহাককে নিয়ে বেরিয়ে যান।

সুদানী সালারের ভবন ত্যাগ করে তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। গোটা শহর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। পলায়নকারীরা তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হাঁকালো না। আশিও আছে তাদের সঙ্গে। সুদানী সালারের রিপোর্ট শুনে নায়েব সালার তাকে সালারের নিকট নিয়ে যায়। এদিকে আসতে পথে তারা পাঁচটি ঘোড়া যেতে দেখে। পরস্পর কাছাকাছি দিয়েই অতিক্রম করে। কিন্তু অন্ধকারে কেউ কাউকে চিনতে পারেনি।

নায়েব সালার সালারের বাসভবনের সেই বারান্দাটায় এসে এদিক-ওদিক তাকায়, যেখানে একটু আগে দু'জন সান্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলো। কক্ষের দরজা খুলে সে উক্ত সান্ত্রীদের লাশ পড়ে থাকতে দেখে। ভেতরে গিয়ে পেছনের দরজাটাও খুলে। ওদিকে দু'জন সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে

যায়। এক কক্ষে সালার মাতাল অবস্থায় পড়ে থেকে আশিকে ডাকছে। নায়েব সালার তাকে ডেকে তোলে। আশি তাকে পেটপুরে খাইয়ে গেছে। তাকে জানানো হলো, দু'জন সান্ত্রী কক্ষে মৃত পড়ে আছে। এবার তার সম্বিৎ ফিরে পায়। তার কথা বলার ও কথা বুঝার মতো অবস্থা ফিরে আসে যখন, ততোক্ষণে আমর দরবেশ, ইসহাক, দু'মিশরী কমান্ডো ও আশি চলে গেছে বহুদূর। ধাওয়া করা বৃথা।

পরদিন মধ্যরাত আমর দরবেশ কাফেলাসহ পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেন। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর অপেক্ষায় অস্থিরচিত্তে প্রহর গুণছিলেন। এ মুহূর্তে ইসহাক ও আমর দরবেশকে মিশর পাঠিয়ে দেয়া আবশ্যক। কিন্তু তার আগে এ-ও প্রয়োজন যে, তারা অত্র এলাকায় ঘুরেফিরে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন, যাতে মানুষ সুদানীদের যে ভেল্কিবাজি দেখেছিলো, তার হাকীকত পুরোপুরি জানতে পারে। তবে তৎক্ষণাৎ কিছু লোককে নিযুক্ত করা হলো, যাতে সুদানীরা হামলা করলে যথাসময়ে সংবাদ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রয়োজনটি হলো, মিশরী ফৌজের আরো কিছু কমান্ডো সেনাকে এই অঞ্চলে নিয়ে আসা, যাতে সুদানীরা আক্রমণ করলে তারা পেছন দিক থেকে গেরিলা হামলা চালাতে পারে এবং সুদানী ফৌজকে অত্র অঞ্চল থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে।

এভাবে আমর দরবেশ, আলী বিন সুফিয়ান ও তাঁর কমান্ডো সেনারা শত্রুবাহিনী ও জনগণের দৃষ্টির আড়ালে থেকে একটি যুদ্ধ জয় করে ফেলে। এটি ছিলো ব্যক্তিগত লড়াই, যা ঈমান ও জাতীয় চেতনার শক্তিতে লড়া হয়েছিলো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এই গোপন যুদ্ধ সম্পর্কে সব সময় সজাগ থাকতেন। তাঁর ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থা অত্যন্ত দক্ষ ছিলো।

যে সময়টায় সুদানী মুসলমানগণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করে, ঠিক তখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মুসলিম শাসক গোমস্তগীন, সাইফুদ্দীন ও আল-মালিকুস সালিহ'র সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ছোট ছোট দুর্গ দখল করে নেন। তিনি হাল্‌বের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, যেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ও আল-মালিকুস সালিহ'র বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। সুলতান আইউবী এই শহরটিকে অবরুদ্ধ করার পর অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন। সেখানকার মুসলিম অধিবাসীরা এতো কঠিন হাতে তার মোকাবেলা করে যে, সুলতান আইউবী হাঁফিয়ে ওঠেন।

তিন তিনটি মুসলিম বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে সুলতান আইউবী তাদেরকে এমনভাবে পিছু হটিয়ে দেন যে, তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। সুলতান তাদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখেন। তাঁর অধিকতর দৃষ্টি হাল্‌বের বাহিনীর উপর নিবদ্ধ। কেননা, তারা বীর যোদ্ধা। তারা পিছপা হয়ে হাল্‌বের দিকে ফিরে যাচ্ছে। সুলতান আইউবী তাদেরকে পথেই ধ্বংস করে দিতে চাইলেন। কেননা, তাঁর সৈন্যদেরকে হাল্‌ব বাহিনীর পেছনে ধাওয়া করতে বলেননি, বরং তিনি তার বিদ্যুদ্গতিসম্পন্ন বাহিনীটিকে অন্য পথে রওনা করিয়ে কিছু কমান্ডো সেনাকে শত্রু বাহিনীর দু'পার্শ্বে পাঠিয়ে দেন।

হাল্‌বের বাহিনী ছিন্নভিন্নভাবে হাল্‌বের দিকে ছুটে চলেছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তার কমান্ডাররা দেখতে পেলো, সুলতান আইউবীর সৈন্যরা হাল্‌বের পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে। হাসানের বাহিনী থেকে গেলো। তার সৈন্যদের যুদ্ধ করার মতো মনোবল নেই। তাদের সরঞ্জামও এখন অনেক কম। রসদও অপর্যাপ্ত। এরা থেকে গেলে সুলতান আইউবীর কমান্ডোরা গেরিলা আক্রমণ চালাতে শুরু করে। আইউবীর কমান্ডাররা ঘোষণা দেয়– 'হাল্‌বের সৈন্যরা! তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করো।'

সুলতান আইউবী রণাঙ্গন থেকে অনেক পেছনে। তিনি সংবাদ পাচ্ছেন, হাল্‌বের সৈন্যরা অস্ত্র সমর্পণ করার পর্যায়ে এসে যাচ্ছে। তিনি বললেন– 'এই বাহিনীটি যদি খৃস্টানদের হতো, তাহলে আমি তার একজন সৈন্যকেও জীবিত ফিরে যেতে দিতাম না। কিন্তু এটা যে আমার ভাইদেরই বাহিনী। তারা অস্ত্র ত্যাগ করলে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। কিন্তু তারপরও আমি আনন্দ পাবো না। মৃত্যুর পর আমার আত্মা এই ভেবে কষ্ট পাবে যে, আমার শাসনামলে মুসলমানদের তরবারী নিজেদের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলো। আমার এই ভাইয়েরা যদি এখনো বন্ধু-শত্রু চিনতে সক্ষম হয়, তাহলে এই লজ্জাজনক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে।'

আল্লাহ সুলতান আইউবীর দু'আ কবুল করেন। পরদিন-ই তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। তিনি দেখতে পান, দু'জন অশ্বারোহী তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। একজনের হাতে সাদা পতাকা। তাদের ডানে-বাঁয়ে সুলতান আইউবীর ফৌজের দু'জন কমান্ডার। নিকটে এসে ঘোড়া দু'টি থেমে যায়। এক কমান্ডার ঘোড়া থেকে নেমে এসে সালাম করে বললো– 'হাল্‌বের শাসক আস-সালিহ সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এই দূত দু'জন যুদ্ধবিরতি ও সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছে।'

এক দূত বার্তাটি সুলতান আইউবীর হাতে দেয়। সুলতান বার্তাটি পাঠ করে বললেন– 'আস-সালিহকে বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবী যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যখন পয়গাম পাঠিয়েছিলেন, তখন তুমি ফেরাউনের ন্যায় দূতকে অপমান করে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলে। আজ আল্লাহ আমাকে বিজয় আর তোমাকে শোচনীয় পরাজয় দান করেছেন। এখন আমার এতোটুকু শক্তি আছে যে, আমি তোমার বাহিনীকে এমনভাবে পিষে মারতে পারি, যেমনি দু'পাথরের মাঝে গম পেষণ করা হয়। কিন্তু তারপরও আমি মনে করি, আমার শত্রু তোমরা নও। তুমি সেই পিতার সন্তান, যিনি খৃস্টানদেরকে আজীবন তটস্থ রেখেছিলেন। অথচ তুমি কিনা খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে পিতার ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছো। শোন দূত! তাকে বলবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। দু'আ করো, আল্লাহও যেন তোমাদের মাফ করে দেন।'

সুলতান আইউবী কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে আস-সালিহ'র প্রস্তাব মঞ্জুর করে নেন। তিনি এই শর্তে আস-সালিহ'র ফৌজকে হাল্‌ব ফিরিয়ে নেয়ার অনুমতি প্রদান করেন– 'যখন আমার ফৌজ হাল্‌ব আসবে, তখন তোমার ফৌজ আমার ফৌজের মোকাবেলা করতে পারবে না।'

এ সময় আরো একটি মজার ঘটনা ঘটে। আল-মালিকুস সালিহ তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে যায়। সাইফুদ্দীনও পিছপা হয়ে মসুল চলে গিয়েছিলো। আর গোমস্তগীন নিজ দুর্গ হাররানের পরিবর্তে হাল্‌বের অভিমুখে রওনা হয়। সুলতান তাঁর বাহিনীকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। তুর্কমান নামক স্থানে তিনি অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করেন। একদিন হাল্‌বের এক দূত তাঁর নিকট এসে আল-মালিকুস সালিহ'রর একটি পয়গাম তার হাতে দেন। সুলতান পত্রখানা খুলে পাঠ করে চমকে ওঠেন। কারণ, এ পয়গাম তাঁর প্রতি নয়– সাইফুদ্দীনের প্রতি লেখা। আল-মালিকুস সালিহ সাইফুদ্দীন লিখেছেন–

'আপনার পত্র পেয়েছি। আমি সালাহুদ্দীনের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছি বলে আপনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আপনি যা জেনেছেন, ঠিকই জেনেছেন। কারণ, তাছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলো না। আমার ফৌজ তাঁর ফৌজের ঘেরাওয়ে পড়ে গিয়েছিলো। আমার সৈনিকরা ছিলো পরিশ্রান্ত, সন্ত্রস্ত ও আহত। এমতাবস্থায় আমার সালারগণ পরামর্শ দেয়, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে প্রতারণামূলক সন্ধি করে ফেলুন এবং

আপনার ফৌজকে এই বন-বাদার থেকে বের করে নিন। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর এই শর্ত মেনে নিয়েছি যে, তাঁর ফৌজ হাল্‌ব আগমন করলে আমার ফৌজ তাদের প্রতিরোধ করবে না। কিন্তু তিনি যখন আসবেন, তাঁকে অবশ্যই এমন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে, যা তাঁর কল্পনার অতীত। আপনি আপনার বাহিনীকে নতুনভাবে প্রস্তুত করে নিন। আমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং তাঁর সকল শক্তি নিঃশেষ করে দিতে হবে।'

পত্রে আরো অনেক কিছু লেখা ছিলো। ঐতিহাসিকগণ একমত যে, আল-মালিকুস সালিহ সত্যিই সুলতান আইউবীকে ধোঁকা দিয়েছিলো এবং সে বিষয়ে সাইফুদ্দীনের পত্রের জবাবে যে বার্তা প্রেরণ করেছিলো, সেটি ভুলক্রমে সুলতান আইউবীর হাতে পৌঁছে ছিলো। দু'জন ইতিহাসবিদ লিখেছেন, 'পত্রখানা খামে ভরে সীলমোহর করার পর ভুলে তার গায়ে সুলতান আইউবীর নাম লেখা হয়েছিলো।' কয়েকজন মুসলিম ঐতিহাসিক– যাদের মধ্যে সিরাজুদ্দীন অন্যতম– লিখছেন, 'সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ব্যবস্থা এতোই শক্তিশালী ছিলো যে, আল-মালিকুস সালিহ'র দূত মূলত তাঁরই গোয়েন্দা ছিলো। ফলে সে আল-মালিকুস সালিহ'র এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি সুলতান আইউবীর হাতে পৌঁছিয়ে দেয়।'

কাজী বাহাউদ্দীন সাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন– 'এই পত্রটি সুলতান আইউবীকে এতো বিচলিত করে তোলে যে, কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেননি। এসময় তিনি তাঁবুতে একাকী পড়ে ছিলেন। তাতে তিনি আনন্দিতও হয়েছেন যে, দুশমনের পরিকল্পনা তিনি জেনে ফেলেছেন। তিনি নির্দেশ দেন, আল-হামারা, দিয়ার ও বকর থেকে এক্ষুণি সেনাভর্তি শুরু করে দাও। সুলতান আইউবী তাঁর মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে আরেকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেন।

সত্য পথের পথিক

নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র আল-মালিকুস সালিহ, গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীন গাজী– এই তিন মুসলিম শাসক সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মোকাবেলায় এসেছেন। ক্রুসেডাররা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তারা তাদেরকে উট-ঘোড়া, মটকা ভর্তি তরল দাহ্য পদার্থ ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছে। তারা সুলতান আইউবীকে যুদ্ধের ময়দানেই পরাজিত করা আবশ্যক মনে করে না। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, যে কোন প্রকারে হোক আইউবীকে পরাভূত করা এবং আরব ভূখণ্ড কব্জা করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা।

ফিলিস্তিন খৃস্টানদের দখলে। খৃস্টানরা মুসলমানদের তিনটি দুর্বলতা আঁচ করে নিয়েছে। তাহলো– ক্ষমতার মোহ, সম্পদের লোভ ও নারীর প্রতি আসক্তি। খৃস্টানরা ইউরোপ থেকে এই আশা নিয়ে এসেছিলো যে, তারা তাদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য, অস্ত্র ও নৌ–শক্তির বিনিময়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদের খতম করে প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস ও খানায়ে কা'বা দখল করে নিবে এবং পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলবে।

ধর্ম এমন কোনো বৃক্ষ নয়, যাকে গোড়া থেকে কেটে দিলে তা শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। ধর্ম একটি গ্রন্থ কিংবা কতগুলো গ্রন্থের স্তূপের নামও নয়, যাকে আগুনে ভষ্মিভূত করে দেয়া যায়। ধর্ম হলো– বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির নাম, যা মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকে এবং মানুষকে নিজের অনুগত করে রাখে। একজন মানুষকে খুন করে ফেললে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির বিলুপ্তি ঘটে না। একটি ধর্মকে বিলুপ্ত করে দেয়ার উপায় হলো, মন-মস্তিষ্কে বিলাসিতা ও ক্ষমতার মোহ ঢুকিয়ে দেয়া। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির বাঁধন যতো ঢিল হয়, মানুষ ততো স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। ইহুদী ও খৃস্টানরা মুসলমানদের জন্য এ জালই বিছিয়ে রেখেছে। আরব ভূখণ্ড ও মিশরে এই জাল বিছিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসকদের তাতে আটকাতে শুরু করে। মিল্লাতে ইসলামিয়ার দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা ক্ষমতা ও নারীর লোভে ঈমান বিসর্জন দিয়ে থাকে।

নুরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহুদ্দীন আইউবীর আমলে এই মধুমাখা বিষ মুসলিম শাসক ও আমীরদের শিরায় ঢুকে পড়েছিলো এবং খৃস্টানরা ফিলিস্তিন দখল করে নিয়েছিলো। কয়েকটি মুসলিম প্রজাতন্ত্র এমন ছিলো যে, সেগুলোর উপর খৃস্টানদের দখল ছিলো না বটে; কিন্তু সেগুলোর শাসকদের হৃদয়ের উপর তাদের কব্জা ছিলো। খৃস্টান ও ইহুদীরা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস করার কাজে এতো সাফল্য অর্জন করেছিলো যে, একজন মুসলিম সালার সম্পর্কেও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব ছিলো না, ইনি সালতানাতে ইসলামিয়ার অফাদার। জঙ্গী ও আইউবীর জন্য এই গাদ্দাররা একটি মহা-সমস্যার রূপ ধারণ করেছিলো। ১১৭৪ ও ১১৭৫ সালে সুলতান আইউবীও ফিলিস্তিনের মাঝে কালেমাগো ভাইয়েরাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। খৃস্টনরা দূরে বসে তামাশা দেখছিলো। সুলতান আইউবী প্রতিটি রণাঙ্গনে খৃস্টানদেরকে পরাজয়ের পর পরাজয় উপহার দিয়ে ফিরছিলেন। কিন্তু তারা মুসলিম আমীরদেরকেই আইউবীর মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দেয়। তার সবচেয়ে দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনা হলো স্বয়ং নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র আল-মালিকুস সালিহ তাঁর ওফাতের পর সুলতান আইউবীর বিরোধী শিবিরে চলে যায়।

১১৭৫ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা। আল-মালিকুস সালিহ'রই এক মিত্র সাইফুদ্দীন গাজী সুলতান আইউবীর হাতে পরাস্ত হয়ে জনৈক ব্যক্তির এক ঝুঁপড়িতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁর অপর এক মিত্র হলো গোমস্তগীন। সুলতান আইউবী এই তিন রাষ্ট্রনায়কের জোট বাহিনীকে এমন লজ্জাজনকভাবে পরাজিত করেন যে, তারা তাদের হেডকোয়ার্টারের সমুদয় মালামাল ফেলে পালিয়ে যায়। সুলতান আইউবীর সৈন্যরা তাদের যেসব সৈন্যকে বন্দী করেছিলো, মুসলমান মনে করে সুলতান তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই উদারতার মাসুল সুলতানকে কড়ায়-গণ্ডায় গুনতে হয়েছে। এই বন্দীরা ফিরে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় সংগঠিত হয়ে যায়।

যুদ্ধের ময়দান থেকে আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন গাজী ও গোমস্তগীনের পলায়ন ছিলো একটি বিস্ময়কর ঘটনা। তাদের একজনের কাছে অপরজনের খবর ছিলো না। গোমস্তগীন ছিলো হাররানের দুর্গপতি, যা ছিলো বাগদাদের খেলাফতের অধীন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা দেয়। রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে সে হাররানের পরিবর্তে আল-মালিকুস সালিহ'র রাজধানী হালবে চলে গিয়েছিলো। সুলতান আইউবী

ধাওয়া করে ধরে ফেলতে পারেন, এই ভয়ে সে নিজ এলাকা হাররান যাওয়ার সাহস পেলো না।

সাইফুদ্দীন অপর এক শহর মসুল ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের সম্রাট ছিলেন। শুধু সম্রাটই নন, তিনি একজন সেনা অধিনায়কও ছিলেন। রণাঙ্গনের কূটকৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন তিনি। ছিলেন লড়াকু সৈনিক। কিন্তু তিনি নিজের ঈমান বিক্রি করে ফেলেছিলেন, যা কিনা মুমিনের ঢাল-তরবারী। যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত তিনি হেরেমের বাছা বাছা মেয়ে ও নর্তকীদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। মদের মটকা ছাড়াও তার সঙ্গে থাকতো সুন্দর সুন্দর পাখি। এই সকল বিলাস সামগ্রী তিনি রণাঙ্গনে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে পলায়নকারীদের মধ্যে তার নায়েব সালার এবং একজন কমান্ডার ছিলো। যাবেন মসুল। কিন্তু সুলতান আইউবীর গেরিলারা দুশমনের পেছন থেকে ধাওয়া করছিলো। তারা দুশমনের ছত্রভঙ্গ সৈন্যের জন্য পিছু হটাও অসম্ভব করে তুলেছিলো।

সুলতান আইউবীর গেরিলারা সাইফুদ্দীন ও তার সঙ্গীদেরকে সম্ভবত দেখে ফেলেছিলো। তাদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তারা মসুলের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরেছিলো। অঞ্চলটা কোথাও বালুকাময়, কোথাও পার্বত্য, কোথাও সবুজ-শ্যামল। ফলে লুকাবার জায়গা বিস্তর।

সাইফুদ্দীন এখন মসুল থেকে সামান্য দূরে। গভীর রাত। চাঁদের আলোতে তিনি কয়েকটি ঘর দেখতে পান। তিনি প্রথম গৃহটির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে দরজায় করাঘাত করেন। সাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধ বেরিয়ে আসেন। তার সম্মুখে তিনজন অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে। লোকগুলো হাঁপাচ্ছে। বৃদ্ধ বললেন– 'সম্ভবত তোমরাও মসুলের ফৌজের সৈনিক এবং পালিয়ে এসেছো। দু'দিন যাবত আমি সৈনিকদের এই পথে যেতে দেখছি। তারা এখানে এসে পানি পান করার জন্য দাঁড়ায়। তারপর মসুল চলে যায়।'

'মসুল এখান থেকে কত দূরে?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'তোমাদের ঘোড়ার দেহে যদি দম থাকে, তাহলে রাতের শেষ প্রহর নাগাদ পৌঁছে যাবে'– বৃদ্ধ বললেন– 'এ গ্রামটা মসুলেরই অংশ।'

'আমরা কি রাতটা আপনার এখানে কাটাতে পারি? জায়গা হবে?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'অন্তর প্রশস্ত হলে জায়গার অভাব হয় না'– বৃদ্ধ বললেন– 'ঘোড়া থেকে নেমে এসো, ভেতরে চলো।'

❖ ❖ ❖

তিন আগন্তুক একটি কক্ষে গিয়ে বসে। কক্ষে বাতি জ্বলছে। বৃদ্ধ তাদের পোশাক নিরিক্ষা করে দেখেন।

'আমাদেরকে চেনার চেষ্টা করছেন?' সাইফুদ্দীন মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করেন।

'আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা সিপাহী নও'– বৃদ্ধ বললেন– 'তোমাদের পদমর্যাদা সালারের নীচে হবে না।'

'ইনি মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন গাজী'– নায়েব সালার বললেন– 'আপনি যেনতেন লোককে আশ্রয় দেননি। আপনি এর পুরস্কার পাবেন। আমি নায়েব সালার আর ইনি কমান্ডার।'

'আমরা হয়তো আপনার গৃহে অনেকদিন থাকবো'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমরা দিনের বেলা বাইরে বের হবো না, যাতে কেউ জানতে না পারে আমরা এখানে আছি। যদি কেউ জেনে ফেলে, তার শাস্তি আপনাকে ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি আপনি গোপনীয়তা রক্ষা করেন, তাহলে পুরস্কার পাবেন– যা চাইবেন তা-ই দেবো।'

'মসুলের শাসনকর্তাকে আমি আমার আশ্রিত ভাবতে পারি না'– বৃদ্ধ বললেন– 'আপনি বিপদে পড়ে, পথ ভুলে গরীবালয়ে এসে পৌঁছেছেন। যতোদিন ইচ্ছা থাকবেন, আমি আপনার সাধ্যমতো সেবা করবো। আমার এক পুত্র আপনার ফৌজের সৈনিক। আপনাকে আমি অবহেলা করতে পারি না।'

'আমরা তাকে পদোন্নতি দেবো।' নায়েব সালার বললেন।

'আপনি যদি তাকে বাহিনী থেকে অব্যাহতি দান করেন, তবে আমার জন্য তা-ই হবে বড় পুরস্কার।' বৃদ্ধ বললেন।

'ঠিক আছে'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমরা আপনার পুত্রকে অব্যাহতি দিয়ে দেবো। সব পিতাই কামনা করে তার পুত্র বেঁচে থাকুক।'

'না'– বৃদ্ধ বললেন– 'তার শুধু বেঁচে থাকা আমার কাম্য নয়। ফৌজে ভর্তি করিয়ে আমি তাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেছিলাম। আমিও সৈনিক ছিলাম। আমি যখন ফৌজে ভর্তি হই, আপনার তখন জন্মও হয়নি। আল্লাহ আপনার পিতা কুতুবুদ্দীনকে জান্নাত দান করুন। আমি তাঁর আমলে সৈনিক ছিলাম। আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। কিন্তু আমার ছেলেটাকে আপনি ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করেছেন। আমি তার শাহাদাতের পিয়াসী ছিলাম– অপমৃত্যুর নয়।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী নামের মুসলমান'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'তার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েযই নয়, ফরযও বটে।'

'জনাব!'– নায়েব সালার বললেন– 'বিষয়টা আপনি বুঝবেন না। আমরা ভালোভাবেই জানি কে মুসলমান, আর কে কাফের।'

'বৎস!'– বৃদ্ধ বললেন– 'বয়সে আপনারা আমার পুত্রের সমান। অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আমার বয়স পঁচাত্তর বছর। আমার পিতা নব্বই বছর বয়সে মারা গেছেন। দাদা পঞ্চাশ বছর বয়সে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। দাদাজান আমার পিতাকে তার আমলের কাহিনী শোনাতেন। পিতার নিকট থেকে আমি সেসব শুনেছি। এই সূত্রে আমি দাবি করতে পারি, আমি যতোটুকু জানি, আপনারা ততোটুকু জানেন না। রাজত্বের মোহ যাকেই পেয়েছে, যে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়েছে, সে-ই একদিন না একদিন কোনো না কোনো গরীবের ঝুঁপড়িতে গিয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। আপনাদের আগে যারা অতীত হয়েছে, তাদেরও এই একই পরিণতি ঘটেছিলো। আপনাদের তিন তিনটি বাহিনীকে সালাহুদ্দীন আইউবীর একটি মাত্র বাহিনী পরাজিত করেছে। আর তাও এমন শোচনীয়ভাবে যে, আমি তা দু'দিন যাবত অবলোকন করছি। আপনাদের যদি দশটি বাহিনীও থাকতো, তবুও এভাবেই আপনাদের পালাতে হতো। যারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তারাই জয়লাভ করে। কখনো পরাজিত হলে তারা লেজ তুলে পালায় না। তাদের লাশ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুলে নেয়া হয়; তারা আত্মগোপন করে না।'

'তোমাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক মনে হচ্ছে'– সাইফুদ্দীন কিছুটা ক্ষোভ মেশানো কণ্ঠে বললেন– 'তোমার উপর তো আমাদের আস্থা রাখা চলে না।'

'আমি আপনার সমর্থক'– বৃদ্ধ বললেন– 'আমি ইসলামের সহযোগী। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি যে, আপনি আপন ভাইদের শত্রুকে বন্ধু ভেবে বসেছেন। আপনি বুঝতে পারছেন না, তারা আপনার ধর্মের শত্রু। আপনার পরাজয়ের কারণ এটাই। আপনি নিশ্চিন্তে আমার উপর আস্থা রাখুন। সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ যদি আকস্মিকভাবে এখানে এসে পড়ে, আমি আপনাকে লুকিয়ে রাখবো, ধোঁকা দেবো না।'

ইত্যাবসরে একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে খাবার নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। তার পেছনে তদপেক্ষা খানিক বেশি বয়সের আরেক যুবতী। সাইফুদ্দীনের দৃষ্টি প্রথম মেয়েটির উপর নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারা খাবার রেখে চলে গেলে তিনি

বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করেন– 'এরা কারা?'

'ছোটটা আমার কন্যা'– বৃদ্ধ জবাব দেন– 'আর বড়টা পুত্রবধূ– আমার সেই ছেলের স্ত্রী, যে আপনার ফৌজে কাজ করছে। আমার মনে হচ্ছে, বউটা আমার বিধবা হয়ে গেছে।'

'আপনার পুত্র যদি মারা যায়, তাহলে আমি আপনাদের বিপুল অর্থ দান করবো'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আর মেয়ের ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না। এই মেয়ে কোনো সৈনিকের স্ত্রী হয়ে কোনো ঝুঁপড়িতে যাবে না। আমি তাকে আমার স্ত্রী হিসেবে পছন্দ করে ফেলেছি।'

'আমি না আমার পুত্রকে বিক্রি করেছি, না কন্যাকে বিক্রি করবো'– বৃদ্ধ বললেন– 'কুঁড়েঘরে লালিত একটি মেয়েকে একজন সৈনিকের কুঁড়ে ঘরেই ভালো মানায়। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, আমাকে প্রলোভন দেখাবেন না। আপনি আমার মেহমান। আমাকে আতিথেয়তার দায়িত্ব পালন করতে দিন।'

'আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনার উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমি এই জন্য আনন্দিত যে, আমার রাজ্যে আপনার ন্যায় স্পষ্টবাদী ও নীতিবান লোক আছে।' সাইফুদ্দীন বললেন।

বৃদ্ধ চলে যান। সাইফুদ্দীন তার সঙ্গীদের বললেন– 'এ ধরনের মানুষ ধোঁকা দেয় না। আচ্ছা, তোমরা কেউ মেয়েটাকে ভালোভাবে দেখেছিলে?'

'চমৎকার এক মুক্তা।' নায়েব সালার বললেন।

'পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হোক, এই মুক্তা আমার হেরেমে যাবে।' সাইফুদ্দীন ক্রুর হাসি হেসে বললেন। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নায়েব সালারকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমরা মসুলের সংবাদ নাও। বাহিনীকে একাট্টা করো। সালাহুদ্দীন আইউবীর তৎপরতা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করো এবং আমাকে তাড়াতাড়ি জানাও, আমি এখনই মসুল চলে আসবো, নাকি আরো অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে। তারপর কমান্ডারকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি কোথায় আছি, হালববাসীকে জানিয়ে দাও। নিজে যাও কিংবা কাউকে পাঠাও।'

নায়েব সালার ও কমান্ডার রওনা হয়ে যায়। সাইফুদ্দীন– যিনি মদমত্ত হয়ে রূপসী নারী নিয়ে প্রাসাদে ঘুমাতে অভ্যস্ত– বৃদ্ধের কুঁড়েঘরের এক কক্ষের মেঝেতে শুয়ে পড়েন।

❖ ❖ ❖

তার একদিন আগের ঘটনা। এক সৈনিক রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে মসুল যাচ্ছিলো। লোকটি কখনো দ্রুতবেগে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে, কখনো ধীরে ধীরে চলছে, আবার কখনো বা দাঁড়িয়ে থাকছে। মাঝে-মধ্যে ঘোড়া থামিয়ে সন্ত্রস্ত মনে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সাধারণ রাস্তা ত্যাগ করে অন্য পথে চলছে সে। স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে, লোকটি ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। এক স্থানে ঘোড়া থামিয়ে নেমে কেবলামুখী হয়ে লোকটি নামায পড়তে শুরু করে। নামায শেষে দু'আর জন্য হাত তুলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। দু'আ শেষে সেখান থেকে না ওঠে মাথানত করে বসে থাকে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে পরাজয়বরণ করে বাহিনীগুলো যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটে যায়, তখন সুলতান আইউবীর কয়েকজন গুপ্তচর তাদের সঙ্গে মিশে যায়। সুলতান আইউবীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের নিয়মই ছিলো, দুশমন যখন পিছপা হতো, তখন কিছু গুপ্তচর পলায়নপর সৈনিক কিংবা যুদ্ধকবলিত গ্রামগুলোর মুহাজিরদের বেশ ধারণ করে দুশমনের অঞ্চলে চলে যেতো এবং শত্রুপক্ষের পুনর্বিন্যাস, সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এসে তথ্য সরবরাহ করতো।

আল-মালিকুস সালিহ যখন তাঁর দলবলসহ দামেস্ক থেকে পলায়ন করেছিলেন, তখনও বিপুলসংখ্যক গোয়েন্দা ফৌজ ও পলায়নপর নাগরিকদের সঙ্গে চলে গিয়েছিলো। এভাবে সুলতান আইউবী অর্ধেক যুদ্ধ গোয়েন্দা ব্যবস্থার মাধ্যমেই জয় করে নিতেন। গুপ্তচরবৃত্তির জন্য যে লোকদের নির্বাচন করা হতো, তারা অস্বাভাবিক বিচক্ষণ, স্থির ও শান্ত মেজাজের অধিকারী হতো। তারা হতোউপস্থিত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারঙ্গম ও আত্মবিশ্বাসী লড়াকু সৈনিক।

১১৭৫ সালের এপ্রিল মাসে যখন সুলতান আইউবী তাঁর মুসলমান শত্রুদের বাহিনীকে পরাস্ত করেন, তখন তাঁর ইন্টেলিজেন্স প্রধান হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর সুপ্রশিক্ষিত গোয়েন্দাদেরকে দুশমনের ছত্রভঙ্গ বাহিনীতে লুকিয়ে দিয়ে হাল্‌ব, মসুল ও হাররান গিয়ে দুশমনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। তাদের কেউ ছিলো শত্রুসেনার পোশাকে, কেউ সাধারণ পল্লীবাসীর লেবাসে। তাদের এই যাওয়া ছিলো নেহায়েতই জরুরী। কেননা, দুশমন পুনঃ সংগঠিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ করবে, এই আশংকা প্রতি মুহূর্তেই বিরাজমান। সুলতান আইউবী দুশমনের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছিলেন, তাতে তাঁর ধারণা

ছিলো, পুনর্গঠনে দুশমনের বেশ সময় লেগে যাবে।

দুশমনের বাহিনী তিনটি। প্রতি বাহিনীর আকাংখা ছিলো, সুলতান আইউবীকে পরাজিত করে সে সালতানাতে ইসলামিয়ার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও রাজা হয়ে যাবে। তারা পরস্পর বৈরি ভাবাপন্নও ছিলো। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা প্রত্যেকে সুলতান আইউবীকে সকলের শত্রু বিবেচনা করছে। সে কারণে তারা পুনর্গঠিত হয়ে তিনটি বাহিনীকে এক বাহিনীর রূপ দিয়ে পাল্টা আক্রমণ করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

সুলতান আইউবী জানতেন, বিলাস-পাগল মানুষ যুদ্ধের ময়দানে টিকতে পারে না। কিন্তু পাশাপাশি তাঁর এও জানা ছিলো যে, তাঁর শত্রুরা ক্রুসেডারদের সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করছে এবং তাদের কাছে খৃস্টান উপদেষ্টাও রয়েছে। তাছাড়া মুসলিম সালারদের মধ্যে দু'-তিনজন এমন ছিলেন, যারা নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখতো। তন্মধ্যে মুজাফফর উদ্দিন ইবনে যাইনুদ্দীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সুলতান আইউবীর ফৌজের সালার ছিলেন। সেই সূত্রে সুলতান আইউবীর কলাকৌশল তার জানা ছিলো। খৃস্টান উপদেষ্টাবৃন্দ ও মুজাফফর উদ্দীনের ন্যায় সালারগণ সুলতান আইউবীকে অত্যন্ত চৌকান্না করে দিয়েছিলো।

সুলতান আইউবীর ফৌজের অবস্থা সন্তোষজনক হলেও এই মুহূর্তে পুনরায় যুদ্ধ করার অবস্থা তাদের নেই। তারা দুশমনকে পরাজিত করেছিলো বটে; কিন্তু তার জন্য অল্পবিস্তর মূল্যও তাদের পরিশোধ করতে হয়েছিলো। এসব কারণে সুলতান আইউবীর মনে খানিকটা অস্থিরতা বিরাজ করছে। তাঁর একটি সমস্যা এই ছিলো যে, এখন তার কার্যক্রম মূল ঠিকানা থেকে অনেক দূরে। সঙ্গে রসদ আছে ঠিক; কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘ হলে সংকটও দেখা দিতে পারে। সুলতান পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকে সেনাভর্তি শুরু করে দিয়েছিলেন। মানুষ সোৎসাহে ভর্তি হচ্ছিলো। তাদের অধিকাংশ লোক তরবারী চালনা, তীরান্দাজী ও অশ্বারোহনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। কিন্তু নিয়মিত সেনা হিসেবে যুদ্ধ করানোর জন্য তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিলো।

প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি সুলতান আইউবী অগ্রযাত্রাও অব্যাহত রেখেছেন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো দখলে চলে আসে। কিছু কিছু অঞ্চলে প্রতিরোধ ছাড়াই তাঁর হস্তগত হয়। তিনি এমন একস্থানে পৌঁছে যান, যেখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সবুজ-শ্যামলিমা আর পানির প্রাচুর্য বিরাজমান। তাঁর ফৌজ ও পশুপাল পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। এখন তাঁর হালে পানি এসে গেছে।

সুলতান আইউবী সেখানেই তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন। পর্যবেক্ষক ইউনিটগুলো বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গোয়েন্দারা চলে গেছে আগেই। সুলতান আইউবীর নির্দেশ ছাড়াই সব কাজ সম্পাদিত হয়ে যায়। ব্যবস্থাপনা তাঁর এতোই সুশৃংখল যে, মিশন তাঁর মেশিনের ন্যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই যে স্থানটিতে সুলতান আইউবী অবস্থান গ্রহণ করছেন, সেটি তুর্কমান নামে খ্যাত। পুরো নাম হুবাবুত তুর্কমান বা তুর্কমানের কূপ।

'ভর্তি আরো জোরদার করো'– সুলতান আইউবী তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ডের প্রথম কনফারেন্সে বললেন– 'সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দাও। আল্লাহ তোমাদের উপর করুণা করেছেন যে, তোমাদেরকে তিনি অতিশয় বোকা শত্রুর মুখোমুখি করেছেন। তাদের যদি ন্যূনতম বুঝ-বুদ্ধিটুকুও থাকতো, তাহলে তারা পিছপা হয়ে এখানে সমবেত হতো। যুদ্ধের পশু ও সৈনিকদের জন্য এ স্থানটি জান্নাত অপেক্ষা কম নয়। এখানে তোমাদের পশুগুলো এতো ঘাস খেতে পারবে যে, দশদিন পর্যন্ত আর খাওয়া ছাড়া লড়াই করতে পারবে। আমার বন্ধুগণ! শত্রুকে তুচ্ছ মনে করো না। বাহিনীকে বিশ্রামের সুযোগ দাও। কিন্তু সর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় রাখতে হবে। ডাক্তারদের বলে দাও, যেনো তারা রাতে না ঘুমায়। আহতদের খুব দ্রুত সুস্থ করে তুলতে হবে এবং রুগ্নদের দিন-রাত তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। আর স্মরণ রেখো, আমাদের উদ্দেশ্য আপন ভাইদের হত্যা কিংবা তাদের ধিক্কার-সমালোচনা করা নয়। আমাদের গন্তব্য ফিলিস্তিন। আমরা যদি নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধে ব্যস্ত থাকি, তাহলে খৃস্টানরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়ে যাবে। দৃষ্টি ফিলিস্তিনের উপর নিবদ্ধ রাখো এবং পথের প্রতিটি বাঁধা পদদলিত করে এগিয়ে যাও।'

ঠিক এ সময়ই সুলতান আইউবীর নিকট আল-মালিকুস সালিহ'র উক্ত পয়গামটি এসে পৌঁছায়। সুলতান শর্ত সাপেক্ষে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেন। তাতে তিনি নিশ্চিত হন যে, তাঁর দুশমন অস্ত্র সমর্পণ করেছে। তিনি উদারতা প্রদর্শন করে বন্দি সেনাদেরকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কেননা, তাঁর মতে তাঁর মুসলিম ভাইয়েরা তাঁর শত্রু নয়। আল-মালিকুস সালিহ'র সন্ধিপত্রে সীল-স্বাক্ষর করার সময়ও সুলতান আইউবী কঠিন কোনো শর্ত আরোপ করেননি। তিনি তার মুসলিম ভাইদেরকে বুঝাতে চাচ্ছিলেন, তোমাদের শত্রু আমি নই– খৃস্টানরা।

কিন্তু উক্ত বার্তাটি তাকে যে স্বস্তি দান করেছিলো, তা দু'-তিন দিনের বেশী স্থায়ী হয়নি। আল-মালিকুস সালিহ'র অপর এক বার্তা তাকে পুনরায় পেরেশান করে তোলে। তাঁর নামে আসা পত্রখানি খুলে দেখতে পান, সেটি তাঁকে নয়– সাইফুদ্দীন গাজীকে লেখা। দূত ভুলবশত সেটি সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে আসে। পত্রটি প্রমাণ করে, সাইফুদ্দীন আল-মালিকুস সালিহকে লিখেছিলেন, আপনি আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করে ভুল করেছেন এবং তা জোটের অংশীদার শক্তির সঙ্গে প্রতারণার শামিল। তার জবাবে আল-মালিকুস সালিহ লিখেছেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে সন্ধির নামে ধোঁকা দিয়েছি, যাতে তিনি অপ্রস্তুত অবস্থায় পুনরায় আমাদের উপর আক্রমণ না করে বসেন। আমি জানি, সালাহুদ্দীন আইউবীর দৃষ্টি হাল্‌বের উপর। তার বাহিনীও এখনই আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত নয়। আমি কালক্ষেপণের জন্য সন্ধির ফাঁদ পেতেছি। আপনারা নিজ নিজ বাহিনীকে সংগঠিত করে ফেলুন। খৃস্টান উপদেষ্টাগণ আমার বাহিনীকে সংগঠিত ও প্রস্তুত করছে। আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, আমরা এখনই যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত নই।

আল-মালিকুস সালিহ নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র। তার বয়স মাত্র তের বছর। নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর প্রশাসন ও ফৌজের স্বার্থপর পদস্থ কর্মকর্তাগণ আল-মালিকুস সালিহকে নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্থলাভিষিক্ত করে তাকে 'সুলতান' অভিধায় ভূষিত করে। তারপর তাকে তাদের ক্রীড়নকে পরিণত করে। সালতানাতে ইসলামিয়া ভেঙ্গে খান খান হতে শুরু করে। সুলতান আইউবী মিশর থেকে দামেস্ক চলে গেছেন। আল-মালিকুস সালিহ ও তার সাঙ্গরা দামেস্ক শহরটিকে দারুস সালতানাত ঘোষণা করে। সাঙ্গপাঙ্গরা আল-মালিকুস সালিহকে ব্যবহার করে চলে। তারা তাদের খৃস্টান উপদেষ্টাদের পরামর্শেই সুলতান আইউবীকে সন্ধির ধোঁকা দিয়েছিলো। কিন্তু বার্তাটি সাইফুদ্দীনের পরিবর্তে সুলতান আইউবীর হাতে এসে পড়ে। এটি সে যুগের ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, দূত ভুলবশত বার্তাটি সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু মুসলিম ঐতিহাসিকগণ– সিরাজুদ্দীন যাদের অন্যতম– দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন, এই দূত সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ছিলো।

বার্তাটি সুলতান আইউবীকে পেরেশান করে তোলে। কিন্তু আবেগতাড়িত হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ রওনা ও হামলা করার নির্দেশ দেননি। দুশমনের ন্যায় তাঁকেও তাঁর ফৌজকে সুসংগঠিত করার প্রয়োজন ছিলো। তার দৃষ্টিতে

সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ বিষয় হলো, শত্রুবাহিনীর অবস্থান তাদের মূল ঠিকানার কাছে। আর তিনি তাঁর ঠিকানা থেকে অনেক দূরে। তাঁর রসদ সরবরাহের পথ অনেক দীর্ঘ ও অনিরাপদ। তাছাড়া তিনি এলোপাতাড়ি অগ্রযাত্রার পক্ষপাতী নন। গোয়েন্দাদের নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট ছাড়া তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন না। তদস্থলে তিনি দুশমনকে সম্মুখে এগিয়ে আসবার সুযোগ দিয়ে থাকেন। তাই তিনি হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে বললেন, তুমি আরো কিছু গোয়েন্দা দুমশনের এলাকায় পাঠিয়ে দাও। তারা অতি দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসুক। এসব ছাড়াও তিনি আরো কিছু আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তিনি তার কেন্দ্রীয় কমান্ডকে জানিয়ে দিলেন, তিনি হামলা করবেন না। বরং তিনি দুশমনের আক্রমণ করার সুযোগ দেবেন, যাতে তারা তাদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে দূরে চলে আসে। এসব নির্দেশনার পর তিনি নীরিক্ষা করতে শুরু করেন, দুশমনকে কোন্ স্থানে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা যায়।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মসুলের দিকে যাচ্ছিলো সৈনিকটি। সে সাইফুদ্দীন গাজীর ফৌজের সৈনিক। এই বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক একত্রে পিছপা হয়েছিলো। ক্ষুদ্র দলের সৈনিকরা বিক্ষিপ্ত হয়ে একা একা পলায়ন করছিলো। এই সৈনিকও একাকী পলায়নকারীদের একজন। লোকটি অতিশয় পেরেশান। সে একস্থানে ঘোড়া থামিয়ে নামায পড়ে। তারপর দু'আ করতে করতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শেষ পর্যন্ত দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুজিয়ে বসে থাকে। এভাবে কিছু সময় কেটে যায়। হঠাৎ এক অশ্বারোহী তার সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়ে যায়। সৈনিক কল্পনার জগতে এতোই বিভোর যে, একটি ধাবমান ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি তাকে সজাগ করতে পারেনি। আরোহী ঘোড়া থেকে অবতরণ করে ধীর পায়ে আরো এগিয়ে এসে সিপাহীর মাথায় হাত রাখে। এবার সৈনিক চকিত হয়ে মাথা তুলে উপর দিকে তাকায়।

'আমি জানি, তুমি রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছো'– আরোহী তার পাশে বসতে বসতে বললো– 'কিন্তু তুমি এভাবে বসে আছো কেন? আহত হলে বলো, আমি তোমাকে সাহায্য করবো।'

'আমার দেহে কোন জখম নেই'– সিপাহী জবাব দেয় এবং নিজের বুকের উপর হাত রেখে বললো– 'তবে হৃদয়টা আমার ক্ষত-বিক্ষত।'

আগন্তুক অশ্বারোহী সুলতান আইউবীর সেই গোয়েন্দাদের একজন, যাদেরকে দুশমনের পিছপা হওয়ার সুযোগে শত্রু এলাকায় প্রেরণ করা

হয়েছিলো। লোকটার নাম দাউদ। প্রশিক্ষণ অনুযায়ী সে সৈনিককে গভীরভাবে নীরিক্ষা করতে শুরু করে। বিচক্ষণ গোয়েন্দা বুঝে ফেলে, এই সৈনিক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং এটা পরাজয়ভীতির প্রতিক্রিয়া। সে সিপাহীর সঙ্গে এমন সব কথা বলে যে, সিপাহী হৃদয়ের সব বাস্তব কথা খুলে বলতে শুরু করে।

'সৈনিকগিরি আমার বংশের পেশা'– সিপাহী বললো– 'আমার পিতা সৈনিক ছিলেন। দাদাও সৈনিক ছিলেন। এই পেশা আমার উপার্জনের মাধ্যম এবং আত্মার খোরাক। আমি আল্লাহ'র সৈনিক। আমি নিজ ধর্ম ও জাতির জন্য লড়াই করি। আমি জানতাম, খৃস্টানরা আমাদের ধর্মের ঘৃণ্যতম শত্রু। আমি এও জানি যে, আমাদের প্রথম কেবলা খৃস্টানদের কব্জায়। আমার পিতা আমাকে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ইতিহাস শুনিয়েছেন। আমি ইসলামী চেতনা নিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে শুনতে শুরু করলাম, সুলতান আইউবী ইসলামের শত্রু, খৃস্টানদের বন্ধু এবং পাপিষ্ট মানুষ। অথচ তার আগে আমরা শুনতাম, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী খৃস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, খৃস্টানরা তাকে ভয় করে এবং তিনি প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাসকে খৃস্টানদের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ করছেন।'

'আমি আমাদের রাজ্যের শাসক সাইফুদ্দীন গাজীকে সত্য ভেবে আসছিলাম। একদিন আমাদের ফৌজ অভিযানে রওনা হওয়ার নির্দেশ লাভ রে। আমরা এখানে আসলাম। যুদ্ধ হলো। যুদ্ধ চলাকালে জানতে পারলাম, আমরা মুসলমান ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করছি এবং আমাদের প্রতিপক্ষ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ। সে ফৌজের সৈনিকরা আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে বলছিলো– 'তোমরা মুসলমান! তোমরা সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করো না। তোমাদের শত্রু আমরা নই। শত্রু তোমাদের খৃস্টানরা। তোমরা পক্ষ ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে চলে আসো। প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করো। তোমরা বিলাসী শাসকগোষ্টির জন্য যুদ্ধ করো না।'

আমি সেই ফৌজের সৈনিকদের হাতে কালেমা খচিত পতাকা দেখেছি। আমি সেই সৈনিকদের যেভাবে যুদ্ধ করতে দেখেছি, তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন– অগ্নিশিখা কোথা থেকে উত্থিত হচ্ছিলো, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

মৃত্যুর নয়- আল্লাহর ভয়ে আমি এমনভাবে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম যে,

আমার বাহুদ্বয় শক্তিহীন হয়ে পড়লো। আমি তরবারীর ওজনটাও বহন করতে পারছিলাম না। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেললাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কয়েকটি টিলা দেখতে পেলাম। আমি ঘোড়াসহ টিলাগুলোর অভ্যন্তরে ঢুকে লুকিয়ে গেলাম। আমি কাপুরুষ নই। কিন্তু তখন আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিলো। বাইরে দু'পক্ষের তরবারীর সংঘাত চলছিলো। ঘোড়ার ডাক-চিৎকার শোনা যাচ্ছিলো। আমি আহ্বান শুনতে পাচ্ছিলাম– 'রমযান মাসে নিজ ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না।' আমার মনে পড়ে গেলো, আমাদেরকে বলা হয়েছিলো, যুদ্ধের সময় রোযা রাখতে হয় না। আমরা রোযাদার ছিলাম না। আমি বুঝতে পারলাম, সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈনিকরা রোযাদার। ততক্ষণে আমি তাদের তিনজন সৈনিককে হত্যা করে ফেলেছি। তাদের রক্ত আমার তরবারীতে জমাট হয়ে আছে। সৈনিকরা নিজ তরবারীতে রক্ত দেখে আনন্দিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমি আমার তরবারীর প্রতি তাকাতে ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ, আমার তরবারীতে আমার ভাইয়ের খুন লেগে আছে।'

আমার মধ্যে ওখান থেকে বের হওয়ার ও যুদ্ধ করার সাহস ছিলো না। আমি সেখানেই জড়সড় হয়ে লুকিয়ে থাকি। সালাহুদ্দীন আইউবীর এক অশ্বারোহী সৈনিক আমাকে দেখে ফেলে। সে আমাকে বেরিয়ে আসার জন্য হাঁক দেয়। সে আমার প্রতি বর্শা তাক করে। আমি রক্তমাখা তরবারীটা ঘোড়ার পায়ের উপর ফেলে দিয়ে বললাম– 'আমি তোমাদের মুসলমান ভাই। আমি যুদ্ধ করবো না।' ঘোরতর যুদ্ধটা সেখান থেকে খানিক দূরে চলছিলো। এই আরোহী সম্ভবত কমান্ডোসেনা ছিলো এবং লুকিয়ে থাকা শত্রুসেনাদের সন্ধান করছিলো। সে এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো– 'সত্যিই কি তুমি বুঝতে পেরেছো, তুমি প্রকৃত মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করছো?' আমি আমার অপরাধ স্বীকার করে বললাম– 'এই অপরাধ আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে।' সে আমার বর্শাটা নিয়ে নেয়। তরবারী আগেই ফেলে দিয়েছিলাম। সে একদিকে ইঙ্গিত করে বললো– 'আল্লাহর নিকট পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং ওদিকে পালিয়ে যাও। পেছন দিকে তাকাবে না। আমি তোমাকে জীবন দান করলাম।'

'আমার বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় কান্না এসে পড়েছিলো। যুদ্ধের ময়দানে দুশমন জীবন দান করে না। আমি ঘোড়া হাঁকাই এবং তিনি যে পথ দেখিয়েছিলেন, সে পথে ছুটে চলি। পথটা নিরাপদ ছিলো। আমি রণাঙ্গন

থেকে অনেক অনেক দূরে চলে আসি। রাতে এক স্থানে অবতরণ করে শুয়ে পড়ি। যে তিন সেনাকে হত্যা করেছিলাম, তাদের স্বপ্নে দেখি। তাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরছিলো। তারা আমার চার পার্শ্বে ঘোরাফেরা করতে থাকে। তাদের সঙ্গে অস্ত্র ছিলো না। তারা আমার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। ভয়ে আমার গা ছমছম করে ওঠে। আমার জীবনটা বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আমি শিশুর ন্যায় চিৎকার করতে শুরু করলাম। তারপরই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রচণ্ড শীতের রাতে আমার দেহ থেকে ঘাম ঝরতে শুরু করে। আমি ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম। কম্পিত দেহে উঠে ওজু করে নামায পড়তে শুরু করলাম। আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করে।'

আজ তিন-চার দিন যাবত আমি দিগ্বিদিগ ঘুরে ফিরছি। রাতে ঘুমাতে পারি না। দিনে কোথাও শান্তি পাই না। বহু কষ্টে দু'চোখের পাতা বন্ধ করলেই সুলতান আইউবীর সেই তিন সৈনিককে দেখতে পাই, যারা আমার তরবারীর আঘাতে নিহত হয়েছিলো। দিনের বেলা মনে হয় এই বিজন এলাকায় তারা আমার চারপার্শ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে অশ্বারোহী আমাকে টিলার অভ্যন্তরে লুকায়িত অবস্থায় দেখেছিলো, সে যদি আমাকে হত্যা করে ফেলতো, তাহলে ভালো হতো। লোকটা প্রাণভিক্ষা দিয়ে আমার উপর বড় জুলুম করেছে। সঙ্গে তরবারী থাকলে আমি নিজেই নিজেকে খুন করে ফেলতাম। আমি আমার রাসূলের তিনজন মুজাহিদকে হত্যা করেছি।

'তুমি বেঁচে থাকবে'– দাউদ বললো– 'আল্লাহর মর্জিতে তুমি মরবে না। যুদ্ধের ময়দান থেকে তুমি জীবিত বেরিয়ে এসেছো। তোমার সঙ্গে আত্মহত্যা করার কোন অস্ত্র নেই। এতেই প্রমাণিত হয় আল্লাহ তোমার দ্বারা ভালো কোন কাজ নেয়ার জন্য তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ তোমাকে পাপের কাফফারা আদায় করার সুযোগ দিয়েছেন।'

'তুমি বলো, সালাহুদ্দীন আইউবী সম্পর্কে আমাকে যেসব মন্দ কথা শোনানো হয়েছিলো, সেসব সত্য না মিথ্যা?' সিপাহী জিজ্ঞাসা করলো।

'সম্পূর্ণ মিথ্যা'– দাউদ জবাব দেয়– 'সালাহুদ্দীন আইউবী খৃস্টানদের বিতাড়িত করে এই ভূখণ্ডে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন আর সাইফুদ্দীন ও তার দোসররা নিজ নিজ রাজত্ব ধরে রাখার জন্য যুদ্ধ করছে। তারা খৃস্টানদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে নিয়েছে এবং তাদের মদদে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে।'

সালাহুদ্দীন আইউবী কেমন মানুষ এবং কী তার রক্ষ্য, দাউদ বিস্তারিতভাবে

সিপাহীকে অবহিত করে। সে মসুলের শাসক সাইফুদ্দীন সম্পর্কে সিপাহীকে জানালো, লোকটা এতো বিলাসী যে, যুদ্ধের ময়দানে পর্যন্ত তিনি বিলাস-সামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন।

'বলো, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর সেই তিন মুজাহিদের রক্তের মূল্য কিভাবে পরিশোধ করবো?'– সিপাহী দাউদকে জিজ্ঞেস করে– 'হৃদয় থেকে এই বোঝা সরাতে না পারলে আমি শান্তি পাবো না। আমি শান্তিতে মরতে পারবো না। তুমি সম্মতি দিলে আমি মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনকে হত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করবো।'

'এতো বড় ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজন নেই'– দাউদ বললো– 'তুমি বললে আমি তোমার সঙ্গী হয়ে যাবো।'

'তুমি কে?' সিপাহী জিজ্ঞেস করে– 'তোমার নাম কী? কোথা থেকে এসেছো, কোথায় যাচ্ছো, কিছুই তো জানা হয়নি।'

'আমার নাম হারিছ। আমার গন্তব্য মসুল'– দাউদ অসত্য বললো– 'সেখানেই আমার বাড়ি। যুদ্ধের কারণে অন্য পথে যাচ্ছি। তোমার বাড়িটা যদি পথে পড়ে, তাহলে সেখানে বেড়াবো।'

'আমার গ্রাম বেশী দূরে নয়'– সিপাহী বললো– 'জোর করে হলেও আমি তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাবো। তুমি আমার বিক্ষত আত্মাকে শান্তি দিয়েছো। এমন ভালো কথা আমি কখনো শুনিনি। আমি বাড়িতেই চলে যাবো। আর কখনো মসুলের ফৌজে যোগ দেবো না। আমি আশা করি, তুমি আমাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারবে।'

❖ ❖ ❖

বৃদ্ধের কুঁড়ে ঘরের মেঝেতে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন। একটানা কয়েক রাত জাগ্রত থাকার পর তিনি এখন এতো গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছেন যে, গৃহের বাইরের দরজার করাঘাতেও তার চোখ খোলেনি। রাতের অর্ধেকটা কেটে গেছে। বৃদ্ধ গৃহকর্তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তার কন্যা এবং পুত্রবধূও জেগে ওঠেছে। বৃদ্ধ বিরক্ত কণ্ঠে বললেন– 'মনে হচ্ছে, সালাহুদ্দীন আইউবীর তাড়া খেয়ে মসুলের আরো কোনো কমান্ডার কিংবা সিপাহী এসেছে। রাস্তার পাশে বাড়ি না হওয়াই ভালো।'

বৃদ্ধ দরজা খুললেন। বাইরে দু'টি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আরোহীগণ আগেই নেমে গেছে। হারিছ সালাম দিয়ে এগিয়ে গেলে বৃদ্ধ তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'বাবা! আমি এই জন্য আনন্দিত যে, তুমি হারাম মৃত্যু থেকে বেঁচে

এসেছো। অন্যথায় আমাকে জীবনভর শুনতে হতো, তোমার পুত্র ইসলামী ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো।' বৃদ্ধ পুত্রের সঙ্গী দাউদের সঙ্গে মুসাফাহা করে কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

দাউদ কথা বলতে উদ্যত হলে বৃদ্ধ ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে তাকে থামিয়ে দেন। পরে তার কানের কাছে গিয়ে বললেন– 'তোমাদের রাজা ও প্রধান সেনাপতি সাইফুদ্দীন ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। তোমরা ঘোড়াগুলোকে একদিকে নিয়ে বেঁধে রেখে ভেতরে চলে এসো। কোনো শব্দ হয় না যেন।'

'সাইফুদ্দীন?'– হারিছ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে– 'তিনি এখানে কীভাবে আসলেন?'

'পরাজয়বরণ করে'– বৃদ্ধ ফিসফিস করে বললেন– 'তোমরা ভেতরে চলো।'

ঘোড়াগুলোকে একদিকে সরিয়ে নিয়ে আড়ালে বেঁধে রাখা হলো। বৃদ্ধ দাউদ ও হারিছকে ভেতরে নিয়ে যান। হারিছ-ই তার সেই পুত্র, যার কথা তিনি সাইফুদ্দীনকে বলেছিলেন। হারিছ পিতার নিকট দাউদকে পরিচয় করিয়ে দেয়– 'এর নাম দাউদ। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বিতীয়জন হতে পারে না।'

'তোমরাও কি পালিয়ে এসেছো?' বৃদ্ধ দাউদকে জিজ্ঞেস করেন।

'আমি সৈনিক নই'– দাউদ জবাব দেয়– 'আমি মসুল যাচ্ছি। যুদ্ধ আমাকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। পথে হারিছকে পেয়ে তার সঙ্গ নিলাম।'

'বলুন, মসুলের শাসনকর্তা আমাদের ঘরে কীভাবে আসলেন?' হারিছ পিতাকে জিজ্ঞেস করে।

'আজ রাতে এসেছে'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'তার সঙ্গে এক নায়েব সালার ও একজন কমান্ডার ছিলো। তাদেরকে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার কানে যে শব্দগুলো এসেছে, তাহলো, বাহিনীকে একত্রিত করো, তারপর আমাকে জানাও, আমি মসুল আসবো নাকি কিছুদিন লুকিয়ে থাকবো। আমি সেসময় কক্ষের দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'তাদের কথাবার্তা থেকে কি আপনি এই বুঝেছেন যে, মসুলের ফৌজকে একত্রিত করে তিনি এখনই পুনরায় যুদ্ধ করতে চান?' দাউদ জিজ্ঞেস করে।

'লোকটা এখানো এতোই সন্ত্রস্ত যে, আমাকে বলছিলেন, কেউ যেনো টের না পায়, আমি এখানে আছি'– বৃদ্ধ জবাব দেন– 'আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা তার অবশ্যই আছে। কমান্ডারকে তিনি মসুলের স্থলে অন্য একদিকে প্রেরণ করেছেন।'

'আমি তাকে খুন করে ফেলবো'– হারিছ বললো– 'লোকটা মুসলমানকে

মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত করেছে। তারই চক্রান্তে এক আল্লাহু আকবার ধ্বনি দানকারী অপর আল্লাহু আকবার ধ্বনি দানকারীর রক্ত ঝরিয়েছেন। লোকটা আমাকে পাগল বানিয়েছে।'

হারিছ ক্ষোভে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। দেয়ালের সঙ্গে তার পিতার তরবারীটা ঝুলছিলো। ঝট করে সেটা হাতে নিয়ে নেয়।

পেছন থেকে বৃদ্ধ ছেলেকে ঝাপটে ধরে। দাউদ তার বাহু ধরে ফেলে। হারিছ আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ পিতা তাকে বললো– 'আগে আমার কথা শোনো। তারপর যা খুশী করো।' দাউদও তাকে থামিয়ে বললো, 'এ জাতীয় কাজ করার আগে ভেবে নিলে ভালো হয়। আমরা তাকে খুন করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো। কিন্তু তার আগে নিজেরা যুক্তি-পরামর্শ করে পরিকল্পনা ঠিক করে নিতে হবে।'

পিতা ও বন্ধু দাউদের কথায় হারিছ আপাতত নিবৃত্ত হয়েছে বটে; কিন্তু তার তর্জন থামেনি। ক্ষোভের আতিশয্যে তার চোখ দু'টো রক্তজবার ন্যায় লাল হয়ে ওঠেছে।

'তাকে হত্যা করা কঠিন কাজ নয়'– বৃদ্ধ তার ক্ষুব্ধ পুত্রকে বসিয়ে বললেন– 'তিনি গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। এখন আমার এই শক্তিহীন বাহুও তাকে হত্যা করতে পারবে। তার লাশটাও লুকিয়ে ফেলা সম্ভব। কিন্তু তার যে দু'জন সঙ্গী চলে গেছে, তারা আমাদেরকে ছেড়ে দেবে না। তারা সন্দেহভাজন হিসেবে আমাদেরকে গ্রেফতার করবে। তোমার যুবতী স্ত্রী ও তরুণী বোনের সঙ্গে অসদাচরণ করবে। আমরা যদি বলি, তিনি মসুল চলে গেছেন, তারা বিশ্বাস করবে না। কারণ, তিনি তাদেরকে এখানে আসতে বলেছেন।'

'মনে হচ্ছে, আপনি সাইফুদ্দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করছেন'– হারিছ বললো– 'আপনি মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের লড়াইকে বৈধ মনে করছেন।'

'এখানে এসে ওঠার পর আমি তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আমি তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি না'– বৃদ্ধ বললেন– 'নিজের ঘরে তাকে হত্যা না করার এও একটি কারণ। তিনি আমাকে বলেছেন, তোমাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক বলে মনে হচ্ছে। তিনি আমাকে এই প্রলোভনও দিয়েছেন যে, তোমার পুত্র যদি যুদ্ধে নিহত হয়, বিনিময়ে আমাকে প্রচুর অর্থ দান করবেন। আমি তাকে বলেছি, আমি পুত্রের শাহাদাত কামনা করি– অন্যায় পথে মৃত্যু কিংবা অর্থ নয়। সাইফুদ্দীন আমার মনোভাব বুঝে ফেলেছেন। এখন যদি আমরা তাকে হত্যা করে লাশ গুমও করে ফেলি, তবু তার নায়েব এসে নির্দ্বিধায়

আমাকে ধরে ফেলবে এবং বলবে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক বলে মসুলের শাসনকর্তাকে হত্যা করেছো।'

'দাউদ ভাই!'— হারিছ দাউদকে উদ্দেশ করে বললো— 'তুমিই বলে দাও, আমি কী করবো। তুমি আমার আবেগময় অবস্থাটা দেখেছো। তুমি বলেছিলে, আল্লাহ আমাকে আমার গুনাহের কাফফারা আদায় করার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেই শাসনকর্তাকে খুন করা, যিনি হাজার হাজার মুসলমানকে মুসলমানদের হাতে খুন করিয়েছেন। আমি তোমাকে বুদ্ধিমান লোক মনে করি। ভেবে-চিন্তে তুমি আমাকে সঠিক পরামর্শ দাও।'

'এই একজন মানুষকে হত্যা করলে কিছু অর্জিত হবে না'— দাউদ বললো— 'তার সাঙ্গপাঙ্গরা আছে, তারা হাল্‌বেও আছে, হাররানেও আছে। তাদের অনেক সালার আছে। আছে তাদের তিন-তিনটি ফৌজ। কাজেই সাইফুদ্দীন খুন হলেই তারা সালাহুদ্দীন আইউবীর সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করবে না। অস্ত্র সমর্পণ করার জন্য পন্থাও আছে। তা হলো, এদেরকে যুদ্ধের ময়দানে এমনভাবে অসহায় করে ফেলতে হবে, যেনো তারা অস্ত্র সমর্পণ করতে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর শর্ত সম্পূর্ণ মেনে নিতে বাধ্য হয়।'

'এ কাজটা সালাহুদ্দীন আইউবী ছাড়া আর কে করতে পারেন'— হারিছ বললো— 'আমার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলে উঠেছে, তা কিভাবে নিভবে? ইসলামের তিনজন মুজাহিদের রক্তের প্রায়শ্চিত্ত আমি কীভাবে আদায় করবো?'

মসুলের শাসনকর্তাকে এখানে পেয়ে গেছে বলে দাউদ বেজায় খুশি। হারিছ ও তার পিতাকে নিজের গোয়েন্দা পরিচয়টা দিতে ইতস্তত করছে সে। আবেগ-তাড়িত হয়ে গোয়েন্দারা নিজের পরিচয় ফাঁস করে না। কিন্তু এ মুহূর্তে পরিচয় গোপন রেখে তার কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। তার সিদ্ধান্ত, সাইফুদ্দীন যেখানে যাবে, সে তার পিছু নেবে এবং তার তৎপরতা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু ততোদিন পর্যন্ত হারিছের ঘরে অবস্থান করাও সম্ভব মনে হচ্ছে না। তার পিতা-পুত্রের সাহায্যের প্রয়োজন। তাই পরিকল্পনা ঠিক করে সে মোতাবেক কথাবার্তা বলতে শুরু করে দাউদ।

'আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে এমন একটা পন্থা বলে দেই, যার ফলে সাইফুদ্দীন ভবিষ্যতে উঠে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলবে, তাহলে কি আপনি আমার সঙ্গ দেবেন?' দাউদ হারিছের পিতাকে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি যদি আমার পুত্রের ন্যায় আবেগতাড়িত হয়ে না ভাবো, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে আছি।' হারিছের পিতা বললেন।

'আমি কিন্তু খুন ছাড়া আর কোন পরিকল্পনার কথা শুনতে প্রস্তুত নই।' হারিছ বললো।

'আপনারা যদি নিজেদের বিবেক ও আবেগের লাগাম আমার হাতে তুলে দেন, তাহলে আপনাদের হাতে আমি এমন কাজ করাবো, যা আপনাদের আত্মাকে শান্তিতে ভরে দেবে।' দাউদ গম্ভীর দৃষ্টিতে পিতা-পুত্রের প্রতি তাকায়। হারিছের স্ত্রী ও বোন খানিক দূরে বসে তাদের কথোপকথন শুনছিলো। দাউদ তাদের প্রতিও গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে বললো- 'আমাকে একখানা কুরআন দিন।'

হারিছের বোন উঠে গিয়ে একখানা কুরআন হাতে নিয়ে তাতে চোখ লাগিয়ে চুমো খেয়ে এনে দাউদের দিকে এগিয়ে দেয়। দাউদ কুরআনখানা হাতে নিয়ে তাতে চুম্বন করে। তারপর কুরআন খুলে একস্থানে আঙ্গুল রেখে পড়তে শুরু করে, যার মমার্থ হলো ঃ

'শয়তান তাদেরকে তাদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহর স্মরণ তাদের মস্তিষ্ক থেকে উদাও হয়ে গেছে। ওরা শয়তানের দল। তোমরা শুনে রাখো, শয়তানের দলের ক্ষতি অবধারিত। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা লাঞ্ছিত হবে।'

কুরআন খোলামাত্র সূরা হাশরের এই আঠার ও উনিশতম আয়াত দু'টি বেরিয়ে আসে। দাউদ বললো- 'এটি আল্লাহ পাকের বাণী। আমি নিজের মর্জিতে এই পাতাটা খুলিনি। এই আয়াতগুলো আপনা আপনি আমার সামনে এসে পড়েছে। এটি আল্লাহ পাকের ঘোষণা ও তাঁর সুসংবাদ। কুরআন আমাদেরকে বলে দিয়েছে, এরা শয়তানের সৈনিক। কুরআন ঘোষণা করেছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা লাঞ্ছিত হবে। কিন্তু তারা ততোক্ষণ পর্যন্ত লাঞ্ছিত হবে না, যতোক্ষণ না আমরা চেষ্টা চালিয়ে তাদের অপমানের পথ সৃষ্টি করবো। তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করা আমাদের কর্তব্য।'

দাউদ কুরআনখানা দু'হাতের তালুতে রেখে সম্মুখে এগিয়ে ধরে বললো- 'আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ডান হাতখানা এই কুরআনের উপর রেখে বলুন, আমরা আমাদের গোপনীয়তা ফাঁস করবো না এবং দুশমনকে পরাজিত করতে নিজের জীবন কুরবান করে দেবো।'

সকলেই- যাদের মধ্যে দু'জন মহিলাও রয়েছে- কুরআনের উপর হাত রেখে শপথ করে। কুরআন তাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা তাদের

চেহারায় ভেসে ওঠে। কক্ষে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়া নেই। দাউদ প্রতিক্রিয়াটা গভীরভাবে লক্ষ্য করে।

'আপনারা কুরআনে হাত রেখে শপথ করেছেন'– দাউদ বললো– 'আল্লাহ্ তাআলা কুরআনকে আপনাদের ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। এই পবিত্র গ্রন্থটির প্রতিটি শব্দ আপনারা বুঝেন। কৃত অঙ্গীকার থেকে যদি আপনারা সরে যান, তাহলে তার শাস্তিও কুরআনে লেখা আছে। তখন আপনারা সেই লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হবেন, যা শয়তানের বাহিনীর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।'

'তুমি কে?' বৃদ্ধ বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'তোমাকে তো বড় আলেম বলে মনে হচ্ছে।'

'আমার মধ্যে কোন ইলম নেই'– দাউদ বললো– 'আমার নিকট আছে আমল। আমি কুরআনের নির্দেশে জীবন হাতে নিয়ে এ পর্যন্ত এসেছি। এই পাঠ আমাকে কোনো আলিম নয়, সালাহুদ্দীন আইউবী শিক্ষা দিয়েছেন। মসুলের নয়, আমি দামেস্কের বাসিন্দা। আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রেরিত গোয়েন্দা। এই সেই গোপন তথ্য, যা ফাঁস করবেন না বলে আপনারা শপথ করেছেন। আমাকে আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাকে নিশ্চয়তা দিন, আমি যা বলবো, আপনারা বিনা বাক্য ব্যয়ে তা পালন করবেন।'

'আমরা শপথ করেছি'– বৃদ্ধ বললেন– 'তুমি তোমার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ব্যক্ত করো।'

'আল্লাহ্ আমার প্রতি মুখ তুলে তাকিয়েছেন'– দাউদ বললো– 'যার পক্ষ থেকে তথ্য বের করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট পৌঁছানোর কথা, তিনি এখন সেই ছাদের তলে শায়িত, যে ছাদের নীচে আমি বসা আছি। মহান আল্লাহ্ ফেরেস্তাদের মাধ্যমে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আমাকে জানতে হবে, সাইফুদ্দীন ও তার বন্ধুদের পরিকল্পনা কী? তারা যদি পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে প্রস্তুতি গ্রহণের আগেই কিংবা প্রস্তুতি গ্রহণ অবস্থায় ধ্বংস করে দিতে হবে। সময়ের আগেই তাদের পরিকল্পনা জানতে হবে। হতে পারে, সুলতান আইউবী প্রস্তুত থাকবেন না আর এরা হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে। আপনারা জানেন, এমনটি হলে পরিণতি কী হবে।'

'যারা প্রতারণার মাধ্যমে নিজেদের বাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায়, আমি তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি পেতে পারি কী?' হারিছ জিজ্ঞেস করে।

'শোন বন্ধু!' দাউদ বললো– 'কোনো কোনো পরিস্থিতিতে হাতের কাছে পেয়েও শত্রুকে বধ না করা কল্যাণকর হয়ে থাকে। প্রতিটি কদম তোমাকে বুঝে-শুনে ঠাণ্ডা মাথায় ফেলতে হবে। সাইফুদ্দীনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাকে ধাওয়া করতে হবে। ইনি এখানে এসে যেভাবে আত্মগোপন করেছেন, তেমনি আমি ও হারিছ লুকিয়ে থাকবো এবং দেখবো লোকটা কী করে।'

উক্ত গৃহের এক কক্ষে গভীর নিদ্রায় শুয়ে আছেন সাইফুদ্দীন। ভোর হলো। বৃদ্ধ উঁকি দিয়ে তাকান। সাইফুদ্দীন এখনো শুয়ে আছেন। সূর্যটা বেশ উপরে উঠে আসার পর তার চোখ খোলে। হারিছের বোন ও স্ত্রী তার সম্মুখে নাস্তা এনে হাজির করে। তিনি হারিছের বোনের প্রতি কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন– 'তোমরা আমাদের যে সেবা করেছো, আমরা তার এমন প্রতিদান দেবো, যা তোমরা কল্পনাও করোনি। আমরা তোমাদেরকে অট্টালিকায় রাখবো।'

'আমরা যদি আপনাকে এই ঝুপড়িতেই রেখে দেই, তাহলে কি আপনি খুশি হবেন না?' মেয়েটি হেসে জিজ্ঞেস করে।

'আমরা বনে-জঙ্গলেও থাকতে পারি'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'কিন্তু তোমরা তো ফুল দ্বারা সাজিয়ে রাখার মতো বস্তু।'

'আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনার কপালে পুনরায় মহলে যাওয়া লেখা আছে?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'এমনটা বলছো কেন?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করে।

'আপনার অবস্থা দেখে'– মেয়েটি বললো– 'রাজার ঝুপড়িতে আত্মগোপন করা প্রমাণ করে তার রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তার বাহিনী তাকে ত্যাগ করেছে।'

'ফৌজ আমার সঙ্গ ত্যাগ করেনি'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমি একটুখানি বিশ্রাম নেয়ার জন্য এখানে যাত্রাবিরতি দিয়েছি। মহল শুধু আমার নসীবেই নয়, তোমাদেরও ভাগ্যে লেখা আছে। যাবে না আমার সঙ্গে?'

হারিছের স্ত্রী কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। বোন সাইফুদ্দীনের কাছে বসে কথা বলতে শুরু করে– 'আপনার স্থলে যদি আমি হতাম, তাহলে সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত না করে মহলের নামও উচ্চারণ করতাম না। আপনি যদি আমাকে পছন্দ করেই থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি,

আপনার এই পলায়ন ও আত্মগোপন করা আমার মোটেই পছন্দ নয়। যুদ্ধকুশলী রাজার ন্যায় বেরিয়ে পড়ুন। বাহিনীকে একত্রিত করুন এবং সুলতান আইউবীর উপর হামলা করুন।'

মেয়েটি সরল প্রকৃতির মানুষ। তবে তার সরলতায় সৌন্দর্য আছে। সাইফুদ্দীন বিমোহিত নয়নে তার প্রতি তাকিয়ে আছে। ঠোঁটে তার মুচকি হাসি। সেই হাসিতে যেমন আছে ভালোবাসা, তেমনি কু-পরিকল্পনাও।

'আমি রাজকন্যা নই'— মেয়েটি বললো— 'এই পার্বত্য এলাকায় জন্ম এবং এখানেই বড় হওয়া। আমি সৈনিকের কন্যা, সৈনিকের বোন। আপনার সঙ্গে আমি প্রাসাদে নয়, যুদ্ধের ময়দানে যাবো। আপনি কি আমার সঙ্গে তরবারী চালনার প্রতিযোগিতা করবেন? পাহাড়ের নীচ থেকে উপরে, উপর থেকে নীচে আমার সঙ্গে ঘোড়া দৌড়াবেন?'

'তুমি শুধু রূপসীই নও, যোদ্ধাও'— সাইফুদ্দীন মেয়েটির মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন— 'এমন মায়াবী চুল আমি এই প্রথম দেখলাম।'

মেয়েটি সাইফুদ্দীনের বেয়াড়া হাতটা সযত্নে সরিয়ে দিয়ে বললো— 'চুল নয়, বাহু। এই মুহূর্তে আপনাকে চুলের নয়, আমার বাহুর প্রয়োজন। আমাকে বলুন, আপনার ইচ্ছে কী?'

'তোমার পিতা একজন ভয়ংকর মানুষ'— সাইফুদ্দীন বললেন— 'তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক এবং সম্ভবত আমাকে পছন্দ করেন না। আমার আশংকা, তিনি আমাকে ধোঁকা দেবেন।'

'আব্বাজান বৃদ্ধ মানুষ'— মেয়েটি মুখে হাসি টেনে বললো— 'আপনার সঙ্গে তিনি কী কথা বলেছেন, তা অবশ্য আমার জানা নেই। আমাদের সামনে তো আপনার ভূয়সী প্রশংসাই করলেন। তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর নামটাই শুনেছেন। তার সম্পর্কে আর কিছু জানেন না। আপনার তাকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। একজন দুর্বল বৃদ্ধ মানুষ আপনার কিইবা ক্ষতি করতে পারবে। আপনি আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন।'

সাইফুদ্দীন মেয়েটির প্রতি হাত বাড়ায়। মেয়েটি পেছনে সরে গিয়ে বলতে শুরু করে— 'আপনাকে আমি আমার দেহ থেকে বঞ্চিত করবো না। নিজেকে আপনার হাতে তুলে দেবো। কিন্তু তখন দেবো, যখন আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করে ফিরে আসবেন। এ মুহূর্তে আপনি বিপদগ্রস্ত। আপাতত আমার থেকে দূরে থাকুন। বলুন, আপনার পরিকল্পনা কী?'

সাইফুদ্দীন বিলাসী ও নারীপূজারী পুরুষ। রূপসী নারী তার জন্য

অভিনব কিছু নয়। কিন্তু এই মেয়েটির মধ্যে বিস্ময়কর যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করলেন, তাহলো মেয়েটি তার সম্মুখে অবনত হচ্ছে না। এর আগে তো যে কোনো মেয়ে প্রশিক্ষিত জন্তুর ন্যায় তার আঙ্গুলের ইশারায় নেচে বেড়াতো। কিন্তু এই মেয়েটি তার উপর এমনভাবে আঘাত হানলো যে, তার আত্মমর্যাদা জেগে ওঠেছে।

'শোন রূপসী'- সাইফুদ্দীন বললো- 'তুমি আমার পৌরুষের পরীক্ষা নিতে চেয়েছো। শপথ নিলাম, আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমার গায়ে হাত দেবো না, যতোক্ষণ না সালাহুদ্দীন আইউবীর তরবারী আমার হাতে চলে আসবে এবং আমি তার ঘোড়ায় সওয়ার হবো। আমাকে ওয়াদা দাও, তুমি আমার কাছে চলে আসবে।'

'আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে চলুন।' মেয়েটি বললো।

'না'- সাইফুদ্দীন বললেন- 'আমাকে এখনো বাহিনী প্রস্তুত করতে হবে। আমি এক ব্যক্তিকে মসুল পাঠিয়ে দিয়েছি। তাকে বলে পাঠিয়েছি, তোমরা ফৌজকে একত্রিত করো এবং অবিলম্বে সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর আক্রমণ করো, যাতে তিনি আমাদের শহর অবরোধ করতে আসতে না পারেন। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার প্রেরিত উভয় ব্যক্তি ফিরে আসার কথা। তখন জানা যাবে, হাল্‌ব ও হাররানের ফৌজ কী অবস্থায় আছে। আমরা পরাজয় মেনে নেবো না। পাল্টা আক্রমণ করবো এবং অবিলম্বে করবো।'

সাইফুদ্দীন এখন ব্যক্তিত্বহারা মানুষ। নারীপূজা ও ঈমান বিক্রি তার চরিত্রকে এমনই ফোকলা করে দিয়েছে যে, সহজ-সরল একটি মেয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের গোপন তথ্য ফাঁস করতে শুরু করেছে। মেয়েটি তার হাতে চুমো খেয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

'সাইফুদ্দীনের সঙ্গে যে লোকটি এসেছিলো, তাদের একজনকে তিনি মসুল পাঠিয়ে দিয়েছেন, অপরজনকে হাল্‌ব'- হারিসের বোন পিতা, ভাই ও দাউদকে বললো- 'তাঁর পরিকল্পনা হচ্ছে, তিনটি বাহিনীকে একত্রিত করে অবিলম্বে সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করা, যাতে তিনি অগ্রসর হয়ে শহর অবরোধ করতে না পারেন। যে দু'ব্যক্তিকে তিনি প্রেরণ করেছেন, তারা এসে জানাবে, ফৌজ যুদ্ধ করার অবস্থায় আছে কিনা।'

সাইফুদ্দীন হারিছের বোনকে যা যা বলেছেন, মেয়েটি তার পিতা, ভাই হারিছ ও দাউদকে সব শোনায়।

মেয়েটির নাম ফাওজিয়া। গাঁয়ের সরজ-সরল মেয়ে। আল্লাহ্ তাকে দিয়ানত ও জযবা দান করেছেন। দাউদ তাকে সাইফুদ্দীনের বক্ষ থেকে তথ্য বের করার দায়িত্ব অর্পন করেছিলো। কৌশলও বুঝিয়ে দিয়েছিলো মেয়েটিকে। বলেছিলো, লোকটা বিলাসী ও অসৎ। তাই তার ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। ফাওজিয়া অত্যন্ত চমৎকারভাবে কর্তব্য পালন করে। সে সাইফুদ্দীনের হৃদয় থেকে যেসব তথ্য বের করে এনেছে, তাতে দাউদ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সাইফুদ্দীনের পিছু নেয়া আবশ্যক।

মধ্যরাতের খানিক আগে বৃদ্ধের চোখ খুলে যায়। তিনি দরজায় করাঘাতের শব্দ ও ঘোড়ার হেষ্রাধ্বনি শুনতে পান। শয্যা ত্যাগ করে উঠে দরজা খোলেন। বাইরে সাইফুদ্দীনের নায়েব সালার দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ তার ঘোড়াটা একদিকে সরিয়ে নিয়ে যান। নায়েব সালার ভেতরে চলে যায়। বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করে নায়েব সালারের খাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞেস করে। নায়েব সালার প্রযোজন নেই বলে জবাব দেয়। বৃদ্ধ তার সঙ্গে ভৃত্যের ন্যায় আচরণ করেন। সাইফুদ্দীন বললেন, ঠিক আছে, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। বৃদ্ধ প্রজার ন্যায় আদবের সাথে বেরিয়ে যান। তিনি দাউদকে জাগিয়ে তোলেন এবং দু'জনে দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

'গোমস্তগীন সম্পর্কে জানতে পেরেছি, তিনি হাল্‌বে আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে আছেন'– নায়েব সালার বললো– 'মসুলে যে পরিস্থিতি দেখেছি, তা এতো খারাপ নয় যে, আমরা যুদ্ধ করতেই পারবো না। সালাহুদ্দীন আইউবী তুর্কমানে থেমে গেছেন। খৃস্টান গোয়েন্দারা জানিয়েছে, আইউবী আল-জাযিরা, দিয়ার, বকর ও আশপাশের অঞ্চলগুলো থেকে লোকদেরকে ফৌজে ভর্তি করছেন। মনে হচ্ছে, তিনি এক্ষুণি সম্মুখে অগ্রসর হবেন না। তবে তিনি অগ্রসর হবেন অবশ্যই, যা হবে ঝড়ের ন্যায়। তার ফৌজের তাঁবু বলছে, তিনি সেই স্থানে অনেক দিন অবস্থান করবেন। সম্ভবত তিনি এই আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত যে, আমরা যুদ্ধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের যে ফৌজ মসুল গিয়ে পৌছেছে, তাদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের অনেক কম। অন্যরা মৃত্যুবরণ করেছে। অনেকে নিখোঁজ রয়েছে।'

'তাহলে কি এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'শুধু আমাদের ফৌজ হামলার জন্য যথেষ্ট নয়'– নায়েব সালার জবাব দেয়– 'আল মালিকুস সালিহ ও গোমস্তগীনকে সঙ্গে নিতে হবে। আমাদের

উপদেষ্টাগণ (খৃস্টানরা) এ পরামর্শই প্রদান করেছে।'

'তুমি কি তাদেরকে বলেছো, আমি কোথায় আছি?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'না, আমি এ জায়গার কথা বলিনি'– নায়েব সালার জবাব দেয়– 'আমি তাদেরকে বলেছি, আপনি তুর্কমানের উপকণ্ঠে ঘোরাফেরা করছেন এবং নিজ চোখে সালাহুদ্দীন আইউবীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছেন। আমার পরামর্শ, তিন-চার দিন পর আপনাকে মসুল চলে যাওয়া উচিত।'

'তার আগে হাল্‌বের খবরাখবর জানতে হবে'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'কমান্ডার কাল সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসবে। তুমি তো জানো, গোমস্তগীন শয়তান চরিত্রের মানুষ। তাকে তার দুর্গে (হাররানে) চলে যাওয়া উচিত ছিলো। লোকটা হাল্‌বে কী করছে? আমি মসুল যাওয়ার আগে হাল্‌ব যাবো। গোমস্তগীন আমার জোট সদস্য বটে; কিন্তু আমি তাকে বন্ধু ভাবতে পারি না। আল-মালিকুস সালিহ'র সালারদেরকে মতে আনতে হবে, সালাহুদ্দীন আইউবীর এ গড়িমসিকে কাজে লাগাতে হবে এবং সময় নষ্ট না করে হামলা করতে হবে। এখন আমি এ পরামর্শও দেবো যে, তিনটি ফৌজ একটি কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং তার একজন প্রধান সেনাপতি থাকা আবশ্যক। আমরা শুধু এ জন্য পরাজয়বরণ করেছি যে, আমাদের বাহিনীগুলোর কমান্ড পৃথক পৃথক ছিলো। এক বাহিনীর অপর বাহিনীর পরিকল্পনা ও কৌশল জানা ছিলো না। অন্যথায় মুজাফফর উদ্দীন সালাহুদ্দীন আইউবীর পার্শ্বের উপর যে হামলা করেছিলো, তা ব্যর্থ হওয়ার কথা ছিলো না।'

'তখন কেন্দ্রীয় কমান্ড আপনার হাতে থাকতে হবে।' নায়েব সালার বললো।

'আর আমাদেরকে বন্ধুদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে'– সাইফুদ্দীন বললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– 'আচ্ছা, খৃস্টানরা কি আমাদেরকে সাহায্য করবে?'

'তারা সৈন্য তো দেবে না'– নায়েব সালার জবাব দেয়– 'উট-ঘোড়া ও অস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহ করবে। আচ্ছা, এখানে আপনি কোনো সমস্যা অনুভব করছেন কি?'

'না'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'বৃদ্ধকে নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে। তার মেয়ে আমার ফাঁদে এসে গেছে। কিন্তু মেয়েটি আবেগপ্রবণ। বলছে, সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করে তার তরবারী নিয়ে নাও। তারপর তার ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে আসো। আমি তোমার সঙ্গে চলে যাবো।'

নায়েব সালার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। হারিছ, তার পিতা ও দাউদ

দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে তাদের কথোপকথন শুনছে। সাইফুদ্দীন ও তার নায়েব সালারের ফেরেস্তারাও জানে না, এ গৃহে একজন বৃদ্ধ ও দু'টি মেয়ে ছাড়া দু'জন যুবক মুজাহিদও আছে, যারা যে কোন উপযুক্ত সময়ে তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে পারে। সাইফুদ্দীনের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, তিনি ফাওজিয়াকে ফাঁদে ফেলেননি, বরং তিনিই ফাওজিয়ার জালে আটকা পড়েছেন।

দাউদ ও হারিছ ঘরে অবস্থান করছে। সাইফুদ্দীন ও তার নায়েব সালার দেউড়ি সংলগ্ন কক্ষে লুকিয়ে আছে। দিনের বেলা ফাওজিয়া তিন-চারবার উক্ত কক্ষে যাওয়া-আসা করছে। মেয়েটি যেহেতু সাইফুদ্দীনের কাছে গেলেও দু'হাত দূরে থাকছে, সে কারণে তার প্রতি সাইফুদ্দীনের আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি ফাওজিয়াকে বললেন– 'তোমার ভাই আমার ফৌজের সৈনিক। আমি তাকে বাহিনীর কমান্ডার বানিয়ে দেবো।'

'তিনি জীবিত আছেন নাকি মারা গেছেন, আমরা তাও তো জানি না'– ফাওজিয়া বললো– 'যদি মারাই গিয়ে থাকেন, তাহলে আমরা আশ্রয়হীন হয়ে পড়বো।'

'তাই যদি হয়, তাহলে আমি তোমার পিতা এবং ভাবীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।' সাইফুদ্দীন বললেন।

ফাওজিয়ার পিতাও সাইফুদ্দীনের নিকট আসা-যাওয়া করছেন। তিনি কাজে-আচরণে সাইফুদ্দীনকে নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি তার অফাদার।

রাতে পুনরায় দরজায় করাঘাত পড়ে। বৃদ্ধ দরজা খোলেন। বাইরে সাইফুদ্দীনের সেই কমান্ডার দাঁড়িয়ে, যাকে তিনি হাল্‌ব পাঠিয়েছিলেন। বৃদ্ধ তাকে সাইফুদ্দীনের কক্ষে পাঠিয়ে দেন। তার ঘোড়াও অন্য ঘোড়াগুলোর সঙ্গে বেঁধে রেখে ঘরে গিয়ে কমান্ডারের খাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চান। কমান্ডার অনেক দ্রুত এসেছে। পথে কোথাও দাঁড়ায়নি। ফলে পথে খাওয়া সম্ভব হয়নি। বৃদ্ধ খাবার আনার জন্য ভেতরে গেলে ফাওজিয়া বললো– 'আপনার যেতে হবে না, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' তার উদ্দেশ্য, এই সুযোগে কমান্ডারের নিয়ে আসা তথ্যও সে সংগ্রহ করবে।

ফাওজিয়া খাবার নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। বক্তব্যরত কমান্ডার তাকে দেখেই থেমে যায়। সাইফুদ্দীন বললেন– 'অসুবিধা নেই, বলো, ও আমাদেরই মেয়ে।' ফাওজিয়া কমান্ডারের সামনে খাবার রেখে সাইফুদ্দীনের পাশে বসে

পড়ে। এই প্রথমবার মেয়েটি সাইফুদ্দীনের এতো কাছে গিয়ে বসলো। সাইফুদ্দীন তার একটি হাত নিজের মুঠোয় নেয়। ফাওজিয়া হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করেনি। অন্যথায় খৃস্টানদের এই বন্ধু তার হাতছাড়া হয়ে যেতো। এই লম্পট শাসককে মুঠোয় রাখার এ এক মোক্ষম অস্ত্র।

'হাল্‌বের বাহিনীর জযবা প্রশংসার দাবীদার'– কমান্ডার বলা শুরু করে। ফাওজিয়া সাইফুদ্দীনের আঙ্গুলে পরিহিত একটি আংটিতে হাত রেখে নাড়াচাড়া করছে এবং হিরার এই আংটিটার প্রতি শিশুসুলভ আকর্ষণ নিয়ে তাকিয়ে আছে। যেনো কমান্ডারের বক্তব্যের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। কিন্তু কান দুটো তার সেদিকেই খাড়া আছে। কমান্ডার বললো– 'আল মালিকুস সালিহ সালাহুদ্দীন আইউবীকে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন।'

'সন্ধির প্রস্তাব?' সাইফুদ্দীন চমকে ওঠে জিজ্ঞেস করেন।

'জ্বি হ্যা, সন্ধির প্রস্তাব।'– কমান্ডার বললো– 'কিন্তু আমি তথ্য পেয়েছি, তিনি আইউবীকে ধোঁকা দিয়েছেন। তার খৃস্টান বন্ধুরা তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিচ্ছে এবং তাকে উস্কানি দিচ্ছে, যেনো তিনি মসুল ও হাররানের বাহিনীকে একক কমান্ডে নিয়ে এসে অবিলম্বে সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করেন। আইউবী যদি সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে যায় এবং নতুন ভর্তি দিয়ে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করে, তাহলে তাকে প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। গুপ্তচর সংবাদ নিয়ে এসেছে, সালাহুদ্দীন আইউবী তুর্কমানের সবুজ-শ্যামল অঞ্চলে দীর্ঘ সময়ের জন্য ছাউনী ফেলেছেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করছেন। আল-মালিকুস সালিহ'র সালারেরও একই অভিমত যে, তুর্কমান এলাকায়ই সালাহুদ্দীনের উপর এখনই হামলা করা উচিত।

আমি হাল্‌বের বাহিনীর এক খৃস্টান উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছিলাম। আমি তাকে বললাম, আমরা এখনই সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করাতে সক্ষম নই। তিনি বললেন, এটা তোমাদের বিরাট সামরিক ক্রটি বলে বিবেচিত হবে। সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করার উদ্দেশ্য, তাকে এখনই পরাজিত করা নয়। উদ্দেশ্য হলো, তাকে সুযোগ দেয়া যাবে না। তাকে তুর্কমানের এলাকাতেই অস্থির করে রাখতে হবে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ ধরে রাখতে হবে। এই যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে আইউবীরই ধারায়– 'আঘাত করো', 'পালিয়ে যাও', 'গেরিলা হামলা করো' ধরনের। চেষ্টা করতে হবে, তুর্কমানের

যেখানেই পানি আছে, আইউবীকে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে, যাতে খানা-পানির অভাবে সে সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।'

'বড় ভালো বুদ্ধি তো'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'এমন যুদ্ধ আমার সিপাহসালার মুজাফফর উদ্দীন লড়তে পারে। দীর্ঘদিন যাবত সে সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে থেকে এসেছে। তিন ফৌজের একক কমান্ড যাতে আমার হাতে চলে আসে। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে মরু শিয়ালের ন্যায় ধোঁকা দিয়ে মারবো।'

ফাওজিয়া সাইফুদ্দীনের তরবারীটা কোষ থেকে বের করে হাতে নিয়ে দেখতে শুরু করে। মেয়েটা একেবারে অবুঝ শিশুর মতো বসে আছে।

'আমি আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেছি'– কমান্ডার বললো– 'কিন্তু সালার ও কর্মকর্তারা তাকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, তা সম্ভব হলো না। এসব তথ্য আমি তার সালারদের থেকে সংগ্রহ করেছি।'

'তোমাকে আজ পুনরায় হাল্‌ব যেতে হবে'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আল মালিকুস সালিহ্‌কে বার্তা দিয়ে আসবে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছো। তুমি আইউবীর সাহস বাড়িয়ে দিয়েছো। তার হাত শক্ত করে দিয়েছো। সে আমাদের কাউকেই ক্ষমা করবে না। তুমি এখনো বালক। তুমি ভয় পেয়ে গেছো কিংবা তোমার সালারগণ যুদ্ধ এড়ানোর জন্য তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে।'

সাইফুদ্দীন এতদ্বিষয়ে দীর্ঘ বার্তা দিয়ে কমান্ডারকে বললেন– 'তুমি রাত পোহাবার আগেই আলো-আঁধারীতে রওনা হয়ে যাবে। দিনের বেলা যেনো এ এলাকায় কেউ তোমাকে দেখতে না পায়।'

কিছু সময় বিশ্রাম নেয়ার পর কমান্ডার রওনা হয়ে যায়।

ফাওজিয়া যা কিছু শুনলো, দাউদকে বলে দিলো। এসব তথ্যও কাজের। হারিছ ও তার পিতা ঘুমিয়ে পড়েছে। দাউদ কি এক কাজে ঘর থেকে বের হয়। ফাওজিয়াও পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে। দাউদ তার ঘোড়ার নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ফাওজিয়াও সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়।

'আমাকে এর চেয়ে আরো বড় কাজ করতে দিন'– ফাওজিয়া বললো– 'আপনার জন্য আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।'

'আমার জন্য নয়, নিজ জাতি ও ধর্মের জন্য জীবন দিতে হবে'– দাউদ বললো– 'তুমি যে কাজটা করেছো, এটা অনেক বড় কাজ। আমরা যারা গোয়েন্দা, আমরা এ কাজেই নিজেদের জীবন বিলিয়ে থাকি। তোমার দ্বারা যে কাজটা

করাচ্ছি, তা মূলত আমার কাজ। আমি তোমাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিলাম।'

'কেমন ঝুঁকি?'

'তুমি এতোটা চতুর নও'– দাউদ বললো– 'সাইফুদ্দীন রাজা। এ কুঁড়েঘরেও রাজা।'

'তা রাজা আমাকে খেয়ে ফেলবে নাকি?'– ফাউজিয়া বললো– 'আমি চালাক না হতে পারি, সোজাও নই।'

'রাজত্বের চমক দেখলে তোমার চোখ বুজে আসবে'– দাউদ বললো– 'এই মানুষগুলো সেই চমকেই অন্ধ হয়ে ঈমান বিক্রি করেছে এবং ইসলামের মূলোৎপাটন করছে। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে তুমিও সেই ফাঁদে আটকা পড়ে যাও কিনা।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'আমার কোনো ঠিকানা নেই'– দাউদ বললো– 'আমি গুপ্তচর ও গেরিলা। যেখানে দুশমনের হাতে পড়বো, সেখানেই মারা যাবো। আর যেখানে মারা যাবো, সেটাই হবে আমার মাতৃভূমি। শহীদের রক্ত যে ভূখণ্ডে পতিত হয়, সেই ভূখণ্ড সালতানাতে ইসলামিয়ার হয়ে যায়। সেই ভূখণ্ডকে কুফর থেকে পবিত্র করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয হয়ে যায়। আমাদের মা ও বোনেরা আমাদেরকে প্রতিপালন করে আল্লাহর হাতে তুলে দিয়েছেন। তারা নিজেদের অন্তরে পাথর বেঁধে রেখেছেন এবং আমরা পুনরায় তাদের কোলে ফিরে যাবো।'

'আপনার অন্তরে বাড়ি যাওয়ার, মাকে দেখার এবং ভাই-বোনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা জাগে নিশ্চয়ই।' ফাওজিয়া আপ্লুত কণ্ঠে বললো।

'মানুষ যখন কামনার গোলাম হয়ে যায়, তখন কর্তব্য অসম্পাদিত থেকে যায়'– দাউদ বললো– 'ইসলামের একজন সৈনিককে জীবন কুরবান করার আগে আবেগ কুরবান করতে হয়। এই কুরবানী তোমাকেও দিতে হবে।'

ফাওজিয়া দাউদের আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বললো– 'আপনি কি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন?'

'না।' দাউদের সুস্পষ্ট জবাব।

'দিন কয়েক আমার কাছে থাকতে পারবেন?' ফাওজিয়া জিজ্ঞেস করে।

'আমার কর্তব্য যদি প্রয়োজন মনে করে, তাহলে পারবো'– দাউদ জবাবে দেয়– 'তা আমাকে কাছে রেখে কী করবে?'

'আপনাকে আমার ভালো লাগে'– ফাওজিয়া বললো– 'আপনার মুখ থেকে

এমন আবেগমাখা মূল্যবান কথা শুনেছি, যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। আমার মন চায় আপনার সঙ্গে থাকি আর...'

'আমার পায়ে শিকল বেঁধো না ফাওজিয়া'– দাউদ বললো– 'নিজেকেও আবেগের শিকল থেকে মুক্ত রাখো। আমাদের সামনে বড় কঠিন পথ। পরস্পর হাতে হাত ধরে একসঙ্গে চলতে হবে বটে, একজন অপরজনের বন্দী হবো না।' দাউদ খানিক চিন্তা করে বললো– 'ফাওজিয়া! তুমি বেশী দূর আমার সঙ্গ দিতে পারবে না। আমার কাছে তোমার ইজ্জতটা বেশী মূল্যবান। পুরুষদের কাজ পুরুষরাই করবে। তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।'

সহসা ফাওজিয়ার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। দাউদকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক নজর দেখে নিয়ে কোন কথা না বলে মোড় ঘুরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। দাউদ ফাওজিয়ার বাহুতে হাত রাখে এবং তাকে কাছে টেনে চোখে চোখ রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ফাওজিয়া তার গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যায় এবং আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলে– 'যে কাজ পুরুষদের, তা নারীরাও করতে পারে। আমার সম্ভ্রম তো কাচ নয় যে, সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে যাবে। আমি তোমাকে আমার সম্ভ্রম পেশ করছি না। তোমাকে আমার ভালো লাগে। তোমার কথাগুলো ভালো লাগে। আমাকে তুমি যে পথ দেখিয়েছো, তাও আমার কাছে ভালো লেগেছে। আমি তোমার গা-ঘেঁষে এ জন্য দাঁড়িয়েছি, যাতে আমার ছোঁয়ায় তুমি তোমার মা কিংবা বোনের ঘ্রাণ লাভ করতে পারো। তুমি বড্ড ক্লান্ত দাউদ ভাই। আমার ভাবী আমাকে অনেক জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পুরুষরা যখন ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে, তখন নারী ছাড়া কেউ তাদের ক্লান্তি দূর করতে পারে না। নারী না থাকলে পুরুষের আত্মা নির্জীব হয়ে যায়। আমার ভয় হচ্ছে, আপনার আত্মা যদি নির্জীব হয়ে যায়, তাহলে...।'

দাউদ হেসে ওঠে এবং ফাওজিয়ার গালে আলতো হাত বুলিয়ে বললো– 'তোমার এই সরল-সহজ কথাগুলো আমার আত্মাটাকে সজীব করে তুলেছে।'

'আমার কোনো কথা আপনার অপছন্দ হয়নি তো'– ফাওজিয়া বললো– 'ভাইয়াকে বলবেন না কিন্তু।'

'না, বলবো না'– দাউদ বললো– 'তোমার ভাইকে এ ব্যাপারে কিছুই বলবো না। আর তোমার কোনো কথায় আমি কষ্ট পাইনি।'

'আপনার-আমার গন্তব্য একই'– ফাওজিয়া বললো– 'মনের কথা কিভাবে বলতে হয়, আমার জানা নেই।'

'তুমি তোমার মনের কথাই বলে দিয়েছো ফাওজিয়া'– দাউদ বললো– 'আর আমিও বুঝে ফেলেছি, তুমি ঠিকই বলেছো, আমাদের গন্তব্য এক। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, পথে রক্তের নদী আছে, যার উপর কোনো পুল নেই। তুমি যদি চিরদিনের জন্য আমাকে পেতে চাও, তাহলে আমাদের বিয়ে হবে রক্তাক্ত প্রান্তরে। তারপর যদি আমাদের লাশ দুটো একটি অপরটি থেকে দূরে থাকে, তবু আমরা একত্রিত হবো। সত্য পথের পথিকদের বিয়ে পৃথিবীতে নয়, আকাশে হয়ে থাকে। তাদের বরযাত্রী পথ অতিক্রম করে ছায়াপথে। তাদের বিয়ের উৎসবে সমস্ত আকাশকে তারকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়ে থাকে।'

দাউদের সঙ্গে কথোপকথনের শেষে ফাওজিয়া যখন ফিরে যেতে উদ্যত হয়, তখন তার ঠোঁটে হাসির ঝলক দেখা যায়, যে হাসিতে আনন্দের তুলনায় প্রত্যয়ের প্রতিক্রিয়া অধিক বেশী পরিস্ফুট।

আল-মালিকুস সালিহ'র নামে সাইফুদ্দীনের বার্তা নিয়ে যাওয়া কমান্ডার দু'দিন পর ফিরে আসে। আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। ফলে বার্তা পৌঁছিয়ে তার লিখিত জবাব পাঠিয়ে দিতে বলে আসে সে। সাইফুদ্দীন কোথায় আছেন এবং যে গৃহে অবস্থান করছেন, সেখানে কিভাবে আসতে হবে, বলে এসেছে কমান্ডার। সাইফুদ্দীন তার পত্রের জবাবের অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। কিন্তু জবাব আসছে না। তার অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। চারদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি অত্যন্ত পেরেশেন হয়ে পড়েন।

'নাকি আমি নিজেই হাল্ব যাবো'– সাইফুদ্দীন তার নায়েব সালারকে বললেন– 'হাল্বের বাহিনী যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সমঝোতা করেই ফেলে, তাহলে নিজেদের ব্যাপারে ভাবতে হবে। গোমস্তগীনের উপর কোনো ভরসা রাখা যায় না। আমরা একা তো লড়াই করতে পারবো না। তখন খৃস্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অন্য কোনো পরিকল্পনা করতে হবে।'

'আচ্ছা, আল-মালিকুস সালিহ সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে যে সন্ধি করেছেন, তা থেকে কি তিনি ফিরে আসতে পারবেন?' নায়েব সালার জিজ্ঞেস করেন।

'তা পারবেন'– কমান্ডার বললো– 'আমি তাদের যে ক'জন সালার ও কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা বলেছে, আল মালিকুস সালিহ সালাহুদ্দীন আইউবীকে ধোঁকা দিয়েছেন। যদি ধোঁকা নাও দিয়ে থাকেন, তবু অধিকাংশ সালার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা এই সন্ধিকে সমর্থন করে না। খৃস্টান উপদেষ্টারা

তো এক্ষুণি আক্রমণ করার পক্ষপাতী।'

'আপনাকে হাল্ব চলে যাওয়া উচিত'— নায়েব সালার বললেন— 'আমি মসুল চলে যাই।'

'তুমি পুনরায় হাল্ব চলে যাও'— সাইফুদ্দীন কমান্ডারকে বললেন— 'গিয়ে আল-মালিকুস সালিহকে বলো, আমি আসছি। তুমি আজই রওনা হয়ে যাও। কাল রাতে আমিও রওনা হবো। তিনি হয়তো আমাকে সাক্ষাৎ দিতে রাজি হবেন না। নগরীর বাইরে আল-মাবারিক নামক স্থানে যে কূপটি আছে, আমি সেখানে অবস্থান করবো। আল-মালিকুস সালিহকে বলবে, তিনি যেনো আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। যদি তিনি সাক্ষাৎ করতে সম্মত না হন, তাহলে সেখানে এসে তুমি আমাকে অবহিত করবে।'

'আপনার একা যাওয়া কি ঠিক হবে?' নায়েব সালার জিজ্ঞেস করেন।

'এসব এলাকায় কোনো ভয় নেই'— সাইফুদ্দীন বললেন— 'আমি রাতে রওনা হবো। কেউ জানবে না যে, মসুলের শাসনকর্তা যাচ্ছেন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা ও গেরিলাদের ফাঁদে পড়ার আশংকা আছে'— নায়েব সালার বললেন— 'আমাদের এক ইঞ্চি ভূখণ্ডও তাদের থেকে নিরাপদ নয়।'

'আমাকে যেতেই হবে'— সাইফুদ্দীন বললেন— 'ঝুঁকি নিতেই হবে। তুমি আজই মসুল রওনা হয়ে যাও। আমি আগামী রাতে হাল্বের উদ্দেশ্যে রওনা হবো।'

যে সময় সাইফুদ্দীন ও তার সঙ্গীদের মাঝে এসব কথোপকথন চলছিলো, তখন দাউদ ও হারিছের কান দরজার সঙ্গে লাগা ছিলো। এবার তারা সেখান থেকে সরে নিজ কক্ষে চলে আসে। দাউদ চিন্তায় পড়ে যায়। তাকে সাইফুদ্দীনের পিছু নিতে হবে। কিন্তু কিভাবে? দীর্ঘ ভাবনার পর তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে।

'আমরা সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষী সেজে তার সঙ্গে হাল্ব চলে যাবো'— দাউদ হারিছকে বললো— 'আমরা আকস্মিকভাবে তার সামনে গিয়ে হাজির হবো এবং বলবো, আমরা আপনার ফৌজের সিপাহী।'

'তিনি যদি বলে ফেলেন, তোমরা মসুল চলে যাও, তাহলে কি করবো?' হারিছ জিজ্ঞেস করে।

'আমি আমার জাদু চালানোর চেষ্টা করবো।' দাউদ জবাব দেয়।

'এই কৌশলও যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে?' হারিছ প্রশ্ন করে।

'তারপরও আমরা হাল্‌ব যাবো না'– দাউদ বললো– 'আল-মালিকুস সালিহ যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করেই থাকে, তাহলে সাইফুদ্দীন সেই সন্ধিকে বাতিল করানোর জন্য হাল্‌ব যেতে পারবে না।' দাউদ হারিছকে বুঝিয়ে দেয় তাকে কী করতে হবে।

সেই রাত। সাইফুদ্দীন রুদ্ধ কক্ষে তার নায়েব সালার ও কমান্ডারের নিকট বসে তাদেরকে শেষবারের মতো নির্দেশনা প্রদান করছেন। রাতের প্রথম প্রহর। সর্বপ্রথম কমান্ডার সেখান থেকে বের হয়। হারিছের পিতা তার ঘোড়ার বাঁধন খুলে দেয়। কিছুক্ষণ পর নায়েব সালারও বেরিয়ে যায়। সাইফুদ্দীন এখন একা। তিনি শুয়ে পড়েন। হঠাৎ কক্ষের দরজাটা প্রবলবেগে খুলে যায়। তিনি ভয় পেয়ে উঠে বসেন। বিস্ফারিত নয়নে তাকান। ফাওজিয়া আপাদমস্তক উল্লসিত হয়ে ঢুকেই সাইফুদ্দীনের পাশে বসে এবং তার হস্তদ্বয় ঝাঁপটে ধরে।

'ভাইয়া এসে পড়েছেন'– ফাওজিয়া আনন্দে পাগলপারা হয়ে বললো– 'সঙ্গে তার এক বন্ধু এসেছেন।'

'তুমি কি তাদেরকে বলেছো, আমি এখানে আছি?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ'– ফাওজিয়া বললো– 'আমি বলে দিয়েছি। শুনে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। তারা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।'

'নিয়ে আসো।' সাইফুদ্দীন বললেন।

দাউদ ও হারিছ সাইফুদ্দীনের কক্ষে প্রবেশ করে তাকে সামরিক কায়দায় সালাম জানায়। সাইফুদ্দীন ইঙ্গিতে তাদেরকে তার পাশে বসতে বলেন। তারা বসে পড়ে দাউদ ও হারিছ পোশাক ও মুখমণ্ডলে ধূলি মেখে এসেছে। তারা এমনভাবে শ্বাস ফেলছে, যেনো দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার দরুন ক্লান্ত। সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন– 'তোমরা কোন্ ইউনিটের সদস্য ছিলে?'

হারিছ যেহেতু তারই ফৌজের সৈনিক, তাই সে-ই সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। দাউদ চুপচাপ বসে থাকে। তার তো কিছুই জানা নেই।

'তোমরা এতোদিন কোথায় ছিলে?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'আমাদের ফৌজ কিভাবে পিছপা হয়েছে, বলতে লজ্জা লাগছে'– দাউদ মুখ খুলে– 'আমাদের পিছপা হওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু একে সঙ্গে নিয়ে আমি একটি পাথর খণ্ডের পেছনে লুকিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। আমরা লক্ষ্য রাখি, আইউবীর বাহিনী আমাদের ধাওয়া করতে আসছে, নাকি কোথাও ছাউনী ফেলছে। আমি

গোয়েন্দাগিরি করতে শুরু করি। আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে, খৃস্টান উপদেষ্টাদের দ্বারা আপনি গেরিলা বাহিনী গঠন করেছিলেন। আমিও এক বাহিনীতে ছিলাম। আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। যুদ্ধের সময় এই প্রশিক্ষণ বেশ কাজে আসে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমি আমার এই যোগ্যতাকে কাজে লাগাই। ভাবলাম, পালাতেই যদি হয়, তাহলে আপন ফৌজের জন্য দুশমনের কিছু তথ্যও নিয়ে যাবো। ইতিমধ্যে হারিছ ভাইকে পেয়ে গেলাম। তাকে সঙ্গে রেখে দিলাম। সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ অগ্রসর হতে থাকে আর আমরা তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। সে সময় যদি আমাদের সঙ্গে জনাদশেক সৈন্যও থাকতো, তাহলে কমান্ডো হামলা চালিয়ে আমরা তাদের অনেক ক্ষতি করতে পারতাম।'

'আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীকে তুর্কমান অঞ্চলে ছাউনী ফেলতে দেখেছি। তারা যেভাবে তাঁবু স্থাপন করেছে, তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে, সেখানে তারা দীর্ঘ সময় অবস্থান করবে। আমার আফসোস লাগছে যে, আমাদের বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে এসেছে। আপনি একে জিজ্ঞেস করুন, আমরা শত্রু বাহিনীর যে লাশ দেখেছি, তার সংখ্যা কয়েক হাজার হবে। আর আহতদের তো কোনো হিসেবই নেই। আমরা রাতে তাদের ছাউনীর নিকটে গিয়ে দেখেছি। আল্লাহু আকবার! জখমীদের আর্তনাদ সহ্য করার মতো নয়। আমাদের মনে হলো, তাদের অর্ধেক সৈন্যই যেনো আহত।

আমীরে মোহতারাম! আল্লাহ আপনার মর্যাদা বুলন্দ করুন। এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী– আপনিই ভালো জানেন। আমরা আপনার দাসানুদাস– যা আদেশ করবেন, তাই পালন করবো। আমার বিশ্বাস, সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী এ মুহূর্তে পুনরায় যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। আপনি যদি এক্ষুণি আপনার বাহিনীকে একত্রিত করে হামলা করেন, তাহলে আইউবীকে দামেস্ক তাড়িয়ে নিতে সক্ষম হবেন।'

সাইফুদ্দীন মনোযোগ সহকারে দাউদের রিপোর্ট শ্রবণ করেন। পরাজিত বিধায় তিনি এমন সব সান্ত্বনাদায়ক কথাবার্তা শুনতে উদগ্রীব ছিলেন যে, তিনি আসলে পরাজিত হননি কিংবা পলায়ন করেননি। দাউদ তার সেই চাহিদাটাই পূরণ করছে। সাইফুদ্দীনের দুর্বলতাই বলতে হবে যে, দাউদের বক্তব্যে তার হৃদয়ে স্বস্তি ও শান্তি ফিরে আসে।

'আমরা মসুল যাচ্ছিলাম'– দাউদ বললো– 'হারিছের গ্রামটা পথে বিধায় ও ...লা, ক্ষণিকের জন্য বাড়িতে ঢুকে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাবো। কিন্তু

এখানে এসেই শুনতে পেলাম আপনি এখানে আছেন। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। বিষয়টা এতোই অবিশ্বাস্য যে, আপনাকে দেখার পর এখনও যেনো বিশ্বাস হচ্ছে না, আপনি এখানে। রিপোর্ট আপনাকে অবহিত করা প্রয়োজন ছিলো। ভাগ্য ভালো যে, আপনাকে এখানেই পেয়ে গেলাম।'

'তোমাদের বক্তব্য শুনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি'– সাইফুদ্দীন রাজকীয় ভঙ্গীতে বললেন– 'এই বীরত্বের জন্য তোমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।'

'আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে যে, আমরা আপনার পাশাপাশি বসে আপনার সঙ্গে কথা বলছি'– হারিছ বললো– ' আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারলেই আমরা ধন্য হবো।'

'জানতে পারলাম, এখানে আপনার সঙ্গে আরো লোক আছে।' দাউদ বললো।

'তারা চলে গেছে'– সাইফুদ্দীন জবাব দেন– 'আমিও চলে যাবো।'

'বেআদবী মাফ করলে জিজ্ঞেস করবো, আপনি এখানে কতদিন থাকবেন'– হারিছ বললো– 'এবং কোথায় যাবেন? আমি লজ্জিত যে, আমার স্বজনরা আপনাকে এই ভাঙ্গা কক্ষে থাকতে দিয়েছেন এবং মেঝেতে বসিয়ে রেখেছেন।'

'এটাই আমার কামনা ছিলো'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'এখানে আমি আরো দিন কয়েক কাটাতে চাই। তোমরা কিন্তু কাউকে বলবে না, আমি এখানে আছি।'

'আপনি কোথায় যাবেন?' দাউদ জিজ্ঞেস করে।

'আমি হাল্‌ব যাবো'– সাইফুদ্দীন জবাব দেন– 'সেখান থেকে মসুল চলে যাবো।'

'কিন্তু আপনি যে একা'– দাউদ বললো– 'আপনার তো দেহরক্ষী প্রয়োজন।'

'এই অঞ্চলে কোনো আশংকা নেই'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'একা একাই যেতে পারবো।'

'গোস্তাখী মাফ করবেন'– দাউদ বললো– 'এই অঞ্চলকেও আপনি শত্রুমুক্ত ভাববেন না। আমি যা জানি, আপনি তা জানেন না। সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডোরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কেউ যদি আপনাকে চিনে ফেলে, তাহলে আমাদের দু'জনকে আজীবন আক্ষেপ করতে হবে, কেনো আমরা আপনার সঙ্গে গেলাম না। আমরা এখানে ঘটনাক্রমে এসে পড়েছি। আমাদের সঙ্গে ঘোড়া আছে, অস্ত্রও আছে। আপনি বললে আমরা আপনার সঙ্গ দিতে পারি।

তাছাড়া একজন শাসকের একাকী সফর করা বেমানানও বটে।'

সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষীর প্রয়োজন আছে বটে। মুখে যাই বলুন, অন্তরটা তার ভয়ে কাঁপছে। দাউদ তাকে আরো ভীত করে তোলে। তিনি বললেন– 'ঠিক আছে, তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। আমরা আগামী রাতে রওনা হবো।'

দাউদ ও হারিছ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। সাইফুদ্দীন ফাওজিয়ার অপেক্ষায় বসে আছেন। কিন্তু আজ আর ফাওজিয়া তার কক্ষে এলো না। দিনে দাউদ ও হারিছ তাকে খাবার খাওয়ায়। দিন শেষে রাত আসে।

❖ ❖ ❖

আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগীন যে স্থানে বসে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, সেখান থেকে খানিক দূরে খৃস্টান কমান্ডার ও সম্রাটদের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। তারা আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগীনের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় নিয়ে পর্যালোচনা করছে। এদের প্রায় সকলেই সুলতান আইউবীর মোকাবেলায় পরাজিত সৈনিক।

'এই তিনটি মুসলিম ফৌজের পরাজয় মূলত আমাদেরই পরাজয়'– রেমন্ড বললেন– 'আমি যতটুকু জানি, সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীতে সৈন্য বেশী ছিলো না।'

'আপনার মতের সঙ্গে আমি একমত নই'– ফরাসী সম্রাট রেজিনাল্ট বললেন– 'আমাদের উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, মুসলমানরা যখন পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হবে, তখন তাদের কোনো পক্ষ জয়ী কিংবা পরাজিত হবে। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমান পরস্পর লড়তে থাকবে এবং তাদের একটি পক্ষ আমাদের হাতে খেলতে থাকবে। আমাদের ঘৃণ্য ও ভয়ংকর শত্রু হলেন সালাহুদ্দীন আইউবী। আমরা চাই তার মুসলমান ভাইয়েরা তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকুক এবং তার শক্তি বিনষ্ট করতে থাকুক। তার মুসলমান প্রতিপক্ষের শক্তিও যদি নষ্ট হয়, হতে থাকুক। এমনও হতে পারে, সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাস্ত করে তার প্রতিপক্ষ মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।'

'আমি আপনাদের মুসলিম অঞ্চলসমূহ ও শাসকদের পূর্ণ বিবরণ শোনাতে চাই, যা আমাদের উপদেষ্টাগণ প্রেরণ করেছেন'– এক কমান্ডার বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতিপক্ষ তিনটি বাহিনীর অবস্থা হলো, সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধ করার স্পৃহা আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। তাদের

ব্যাপক দৈহিক ক্ষতি হয়েছে এবং বিপুলসংখ্যক অস্ত্র ও মালপত্র খোয়া গেছে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিলো না। আমরা তাদেরকে যে উপদেষ্টা দিয়ে রেখেছি, তারা বড় কষ্টে মুসলিম শাসকদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছেন। সালাহুদ্দীন আইউবী হুবাবুত তুর্কমানের একটি মনোরম জায়গায় ছাউনী ফেলে সেখানে অবস্থান করছেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রযাত্রা স্থগিত রেখেছেন। আমাদের খৃস্টান উপদেষ্টা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, হাল্‌ব, হররান ও মসুলের বাহিনী যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, কাল বিলম্ব না করে পুনরায় আক্রমণ করুক। আমি আশাবাদী, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে অসতর্ক অবস্থায় ঘায়েল করে ফেলতে সক্ষম হবেন। আইউবীকে হত্যা করার এ মুহূর্তে এটাই উপযুক্ত পন্থা।'

'আর এই পন্থা সম্ভবত সফল হবে না'– ফিলিপ অগাস্টাস বললেন– 'কেননা, আইউবী কখনো বেখবর বসে থাকে না। তার গোয়েন্দা বিভাগ সর্বক্ষণ সজাগ ও তৎপর থাকে। যে ঘটনা বা যে হামলা দু'দিন পরে সংঘটিত হবে, তার সংবাদ তিনি দু'দিন আগেই পেয়ে থাকেন। আমাদের যেসব উপদেষ্টা মুসলমানদের সঙ্গে আছেন, তাদেরকে জোরালোভাবে বলে দেয়া প্রয়োজন, যেনো তারা তাদের গোয়েন্দা তৎপরতা তীব্রতর করে। গোয়েন্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তাদেরকে দায়িত্ব অর্পণ করুন, যেনো তারা সমগ্র অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় এবং আইউবীর গোয়েন্দাদের ধরে ফেলে। মুসলমান সৈন্যরা যখন হামলার জন্য যাত্রা করবে, তখন যেনো আমাদের গুপ্তচর ও গেরিলা সৈন্যরা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কোথাও সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে যেনো ধরে ফেলে। পথচারীদেরকে ধরে ফেলতে হবে। উদ্দেশ্য থাকবে, আইউবী যেনো হামলার সংবাদ তখন পায়, যখন তার মুসলমান ভাইয়ের ঘোড়া তার ছাউনী এলাকায় ঢুকে তার সৈন্যদের যমের হাতে তুলে দিতে শুরু করবে।'

'এ সংবাদও এসেছে যে, সালাহুদ্দীন আইউবী তার অধিকৃত এলাকাগুলো থেকে সেনাভর্তি নিচ্ছেন। মানুষ দলে দলে তার বাহিনীতে ভর্তি হচ্ছে'– অপর এক কমান্ডার বললো– 'এই ধারা প্রতিহত করতে হবে। তার একটি পন্থা হলো, যা আমরা পূর্ব থেকেই প্রয়োগ করে আসছি যে, কালবিলম্ব না করে তার উপর হামলা চালাতে হবে, যাতে তিনি প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ না পান। দ্বিতীয় পন্থা হলো, ঐসব এলাকায় চরিত্র বিধ্বংসী সেই অভিযান পরিচালনা করতে হবে, যা আমরা মিশরে পরিচালনা করেছিলাম। এটা সত্য যে, এ ধরনের

অভিযানে আমাদের বহু পুরুষ ও কয়েকটি মূল্যবান মেয়ে ধরা পড়েছিলো এবং মারা গিয়েছিলো। কিন্তু এই কুরবানী তো দিতেই হবে। আমরাও তো মারা যাচ্ছি। ক্রুশের খাতিরে প্রয়োজন হলে আমাদেরকে জীবন দিতে হবে এবং আমাদের সন্তানদেরও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামাতে হবে। যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে হোক, মুসলমানদের চেতনার উপর আঘাত হানতেই হবে। আমি স্বীকার করছি, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে এই ভূখণ্ড থেকে বেদখল করতে পারবো না। লোকটা মিশরেও ঝেঁকে বসেছে এবং এই ভূখণ্ডেও এসে পৌঁছেছে। তার সাফল্যের এক কারণ তো এই যে, তিনি রণাঙ্গনের শাহসাওয়ার। দ্বিতীয় কারণ, তিনি বিচক্ষণ ও দক্ষ সেনানায়ক। তৃতীয় মৌলিক কারণটি হলো, তিনি তার সৈনিকদের মাঝে জাতীয় চেতনা ও ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে রেখেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে তারা পবিত্র ধর্মীয় কাজ মনে করে। সে কারণেই তার কমান্ডো সেনারা আমাদের বাহিনীর উপর সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের এই বিশ্বাস ও উন্মাদনাকে ধ্বংস করতে হবে।'

'আমরা বরাবরই মানুষের সেই দুর্বলতা থেকে উপকৃত হয়েছি, যাকে পলায়নপরতা ও বিলাসপ্রিয়তা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে'– ফিলিপ অগাস্টাস বললেন– 'যেসব মুসলমানের কাছে বিত্ত আছে, তারা শাসক হতে চায়। আমরা তাদের এই দুর্বলতাটাকেই কাজে লাগিয়েছি। আমাদের নতুন কোনো পন্থা আবিষ্কার করার প্রয়োজন নেই। তবে আমাদেরকে আরো একটি অভিযান শুরু করতে হবে। তাহলো, আইউবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির অভিযান। যতোসব অবমাননাকর দুর্নাম আছে, তার নামে প্রচার করতে হবে। কিন্তু এ কাজটা তোমরা করবে না; মুসলমানদের দ্বারা করতে হবে। প্রতিপক্ষ এবং শত্রুপক্ষের দুর্নাম করতে হলে নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা করা চলবে না। সবসময় নিজেদের স্বার্থকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমার শত্রু মর্যাদা ও খ্যাতির দিক থেকে যতো উঁচু মানের, তার বিরুদ্ধে ততো নিচ ও হীন অপবাদ আরোপ করতে হবে। শতজনের মধ্য থেকে কমপক্ষে পাঁচজন তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে।'

'এই ফাঁকে তোমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি অব্যাহত রাখো'– এক কমান্ডার বললো– 'আমরা প্রচুর সময় পেয়ে গেছি। আপনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে মুসলমানদের মাঝে ক্ষমতাপূজার ব্যাধি সৃষ্টি করে তাদেরকে পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত করিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি মুসলমানদের মাঝে আমাদের বন্ধু তৈরী

না করতাম, তাহলে আজ সালাহুদ্দীন আইউবী ফিলিস্তিনে অবস্থান করতেন। আমরা তারই স্বজাতিকে তার পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি।'

'আমি বিস্মিত'— রেমন্ড বললেন— 'যে, এই মুসলমানরাই আবার আইউবীর বাহিনীর সৈনিক। তারা এক একজন আমাদের দশজন সৈনিকের মোকাবেলায়ও শক্তিশালী। আবার এই মুসলমানরাই আইউবীর প্রতিপক্ষ বাহিনীতে যোগ দিয়ে এমন কাপুরুষে পরিণত হয়ে যায় যে, শোচনীয় পরাজয়বরণ করে তারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়। বিষয়টা আমার কাছে সত্যিই বিস্ময়কর।'

'এটা বিশ্বাস ও চেতনার কারসাজি, যাকে মুসলমানরা ঈমান বলে থাকে'— রেজিনাল্ট বললেন— 'যে সৈনিক বা সেনাপতি নিজের ঈমান নিলাম করে দেয়, তার যুদ্ধ করার স্পৃহা নিঃশেষ হয়ে যায়। জীবন আর সম্পদই তার অধিকতর প্রিয় হয়ে থাকে। এ কারণেই আমরা মুসলমানদের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করাকে বেশী আবশ্যক মনে করি। তাদের মধ্যে যৌনতা ও নেশার অভ্যাস সৃষ্টি করে দাও। দেখবে, তোমাদের সব কেল্লা জয় হয়ে যাবে।'

এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তিনটি মুসলিম বাহিনীকে হালবে একত্রিত করে একক কমান্ডে রাখা হবে। তবে কৌশলে তাদের মাঝে পরস্পর বিরোধও জিইয়ে রাখা হবে। তাদেরকে আবশ্যক পরিমাণ সাহায্য সরবরাহ করা হবে।'

❖ ❖ ❖

রাতের দ্বিতীয় প্রহর। হারিছের গ্রামের সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তার ঘর থেকে তিনটি ঘোড়া বের হয়। একটির আরোহী সাইফুদ্দীন, একটিতে হারিছ ও অপরটিকে দাউদ। হারিছ ও দাউদের হাতে বর্শা। তাদের বিদায় জানানোর জন্য হারিছের পিতা, বোন ও স্ত্রী ঘরের দরজায় দণ্ডায়মান। সাইফুদ্দীনের দৃষ্টি ফাওজিয়ার উপর নিবদ্ধ। কিন্তু ফাওজিয়ার দৃষ্টি দাউদের প্রতি। সাইফুদ্দীন ও নিজ ভাইয়ের উপস্থিতি উপেক্ষা করে দাউদের প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফাওজিয়া। কিছুক্ষণের মধ্যে উভয় দিক থেকে 'আল্লাহ হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ' শব্দ ভেসে আসে। তিনটি ঘোড়া সম্মুখপানে চলতে শুরু করে।

ঘোড়াগুলো অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। ফাওজিয়া তাদের পায়ের শব্দ শুনতে থাকে। ধীরে অশ্বক্ষুরধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। পাশাপাশি ফাওজিয়ার কানে দাউদের কণ্ঠ উঁচু হতে শুরু করে— 'সত্য পথের পথিকদের বিবাহ আকাশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে...।'

ফাওজিয়া দরজা বন্ধ করে নিজ কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার আশপাশে দাউদের কণ্ঠ গুঞ্জরিত হয়েই চলেছে। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগে– 'আচ্ছা, আমি কি সত্যিই দাউদকে বিয়ে করতে চাই?' লজ্জায় মাথাটা নুয়ে পড়ে ফাওজিয়ার। নিজের প্রতি রাগ আসে তার। দাউদের বক্তব্য মনে পড়ে যায়– 'পথে রক্তের নদীও আছে, যার উপর কোনো সেতু নেই।' ফাওজিয়ার হৃদয় সাগরে রক্তের ঢেউ শুরু হয়ে যায়। বিয়ে-কল্পনা একটা অর্থহীন ভাবনায় পরিণত হয়ে মাথা থেকে উবে যায়।

সাইফুদ্দীন ও তার দেহরক্ষীরা রাতটা সফরে অতিবাহিত করে। এখন ভোর। সাইফুদ্দীন আগে আগে চলছেন। দাউদ ও হারিছ এতোটুকু পেছনে যে, তাদের কথাবার্তা সাইফুদ্দীনের কানে পৌঁছছে না।

'জানি না, তুমি আমাকে কেনো বারণ করছো?'– হারিছ ঝাঝালো কণ্ঠে বললো– 'এখানে যদি আমরা তাকে খুন করে লাশটা কোথাও পুঁতে রাখি, কেউ টেরও পাবে না।'

'তাকে জীবিত রেখে আমরা তার গোটা বাহিনীকে হত্যা করতে পারবো'– দাউদ বললো– 'ইনি মারা গেলে এর বাহিনীর কমান্ড অন্য কেউ হাতে তুলে নেবে। আমাকে তথ্য জানতে হবে। তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখো।'

বেলা দ্বি-প্রহর। হালবের মিনার দেখা যাচ্ছে। খানিক দূরে প্রাকৃতিক কূপসমৃদ্ধ আল-মাবারিকের সবুজ-শ্যামল এলাকা। কাফেলা সে স্থানে পৌঁছে যায়। সাইফুদ্দীন তার যে কমান্ডারকে আল-মালিকুস সালিহ'র নিকট প্রেরণ করেছিলেন, সে ছুটে এসে জানালো, আল-মালিকুস সালিহ আপনার অপেক্ষা করছেন। আল-মাবারিকের শ্যামলিমায় প্রবেশ করামাত্র সাইফুদ্দীনকে স্বাগত জানানোর জন্য পূর্ব থেকে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন সালার এগিয়ে এসে তাকে অভিবাদন জানায়। সাইফুদ্দীন আশংকা ব্যক্ত করেন, আমার তাঁবুটা কূপের পাড়ে স্থাপন করা হোক। আমি এখানেই অবস্থান করবো। তিনি আল-মালিকুস সালিহ'র মহলে যেতে কেনো অনীহ ছিলেন, ইতিহাসে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। দাউদ ও হারিছকে তিনি নিজের সঙ্গে রাখেন। তার জন্য অত্যন্ত মনোরম ও প্রশস্ত তাঁবু স্থাপন করা হলো। চাকর-বাকরও এসে পড়েছে। প্রাসাদের চিত্র ফুটে ওঠে তার তাঁবুতে। আল-মালিকুস সালিহ তাকে নৈশভোজের জন্য কেল্লায় নিমন্ত্রণ জানান এবং সেখানেই দু'জনের সাক্ষাৎ স্থির হয়।

❖ ❖ ❖

সন্ধ্যার পর সাইফুদ্দীন ও আল-মালিকুস সালিহ'র সাক্ষাৎ ঘটে। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তার রোজনামচায় এই সাক্ষাতের বিবরণ এভাবে উল্লেখ করেছেন–

'অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, আল-মালিকুস সালিহ ও সাইফুদ্দীনের সাক্ষাৎ হবে। সাক্ষাৎ হলো দুর্গে। আল-মালিকুস সালিহ সাইফুদ্দীনকে স্বাগত জানান। সাইফুদ্দীন বালক রাজা আল-মালিকুস সালিহকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠেন। সাক্ষাতের পর সাইফুদ্দীন আল-মাবারিকের কূপের পাড়ে নির্মিত তাঁর তাঁবুতে চলে যান। সেখানে তিনি অনেক দিন অবস্থান করেন।'

দু'জন ঐতিহাসিক লিখেছেন, সাইফুদ্দীন আল-মালিকুস সালিহকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি আমার পত্রের জবাব দিলেন না কেনো? কিন্তু প্রশ্ন শুনে আল-মালিকুস সালিহ বিস্মিত হন, না তো, আমি তো পরদিনই আপনার পত্রের লিখিত জবাব পাঠিয়ে দিয়েছি! তাতে আমি লিখেছি, আপনি চিন্তা করবেন না। এই সন্ধিচুক্তি স্রেফ প্রতারণা। সময় নেয়ার জন্য আমি আইউবীর সঙ্গে এই প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করেছি।'

'আমি আপনার কোনো পত্র পাইনি'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমি তো এই ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম যে, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করে ভুল করেছেন এবং আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন।'

আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে তার দু'জন সালারও ছিলো। যার মাধ্যমে বার্তাটি প্রেরণ করা হয়েছিলো, তারা তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে পাঠায়। সে এসে কোন্ দূত পত্র নিয়েছিলো, তার নাম জানায়। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে জানা গেলো, সে যেদিন বার্তা নিয়ে গিয়েছিলো, সেদিনের পর থেকে আর তাকে দেখা যায়নি। তুমুল দৌড়-ঝাঁপ ও ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু দূতের কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না। লোকটির বাড়ি কোথায় কেউ জানে না। এখানে যে জায়গায় থাকতো, সেখানে তার বিছানাপত্র পড়ে আছে। কিন্তু নিজে নেই। সে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে পৌঁছিয়ে দিতে পারে, এমন কল্পনাও কারো মনে ছিলো না।

বিষয়টি আল-মালিকুস সালিহ'র খৃস্টান উপদেষ্টাকে অবহিত করা হলো। তারা অভিমত ব্যক্ত করে– দূত হয়তো সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর ছিলো কিংবা সাইফুদ্দীনের নিকট যাওয়ার পথে সে আইউবীর গেরিলাদের হাতে ধরা পড়ে গেছে এবং তারা তাকে হত্যা করে ফেলেছে। তবে ঘটনা যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, এই ঘটনার পর সালাহুদ্দীন আইউবী তার যুদ্ধ প্রস্তুতি নিশ্চয় তীব্র করে তুলেছেন। এমনও হতে পারে, এখন তিনিই আগে হামলা করে

বসবেন। এর মোকাবেলায় আমাদের সবক'টি বাহিনীর যতো দ্রুত সম্ভব একত্রিত করে আইউবীর উপর আক্রমণ চালাতে হবে।'

খৃস্টানদের এটাই কামনা যে, মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক। একই দিনে মসুল ও হাররানে বার্তা প্রেরণ করা হলো যে, বাহিনী যে অবস্থায় থাকুক না কেনো, এক্ষুণি হাল্‌ব পাঠিয়ে দেয়া হোক। হাররানের শাসনকর্তা গোমস্তগীন কিছুটা ইতস্তত করলেও বৈঠকে বসে সকলের মঝে প্রকাশ্য বিরোধিতা করলেন না। এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হলো যে, সবক'টি বাহিনী এক হাই কমান্ডের অধীনে কাজ করবে এবং সুপ্রিম কমান্ডার থাকবেন সাইফুদ্দীন। গোমস্তগীন তার বাহিনীকে পাঠিয়ে দিলেন বটে; কিন্তু নিজে হালবে বসে থাকাই ভালো মনে করলেন। তিনি সাইফুদ্দীনের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারলেন না।

দু'-তিন দিনে বাহিনীত্রয় হাল্‌ব এসে একত্রিত হয়ে যায়। খৃস্টানরা অস্ত্র ও অন্যান্য সামানপত্র পাঠিয়ে দেয়। তারা প্রয়োজন অনুপাতে আরো সাহায্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাহিনী রওনা করিয়ে দেয়। তাড়াহুড়ো করে আক্রমণের পরিকল্পনা ঠিক করা হয়। এই অভিযানের সংবাদ গোপন রাখার জন্য রাতে পথচলা এবং দিনে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য বিপুলসংখ্যক কমান্ডোসেনা পথের ডানে-বাঁয়ে এই বলে ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, কোনো পথিকও যদি চোখে পড়ে, ধরে হাল্‌ব পাঠিয়ে দেবে। যাতে অভিযানের সংবাদ গোপন থাকে।

রওনা হওয়ার প্রাক্কালে সাইফুদ্দীন, দাউদ ও হারিছকে ডেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন– 'তোমরা বিপদের সময় আমার সঙ্গ দিয়েছো। যুদ্ধের পর তোমাদের পদোন্নতি দেয়া হবে এবং পুরস্কারও পাবে।' তিনি হারিছকে বললেন– 'আমার মাথার উপর তোমার বোনের একটি কর্তব্য আছে। আমি তার সম্মুখে তখন যাবো, যখন আমি এই কর্তব্য আদায় করার যোগ্য হবো।' হারিছকে বিস্মিত হতে দেখে তিনি বললেন– 'ফাওজিয়া বলেছিলো, আপনি যদি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তরবারী নিয়ে এবং তার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আসতে পারেন, তখন আমি আপনার সঙ্গে চলে যাবো...। হারিছ! আমি যদি জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারি, তাহলে তোমার বোন মসুলের রাণী হবে।'

'ইনশাআল্লাহ'– হারিছ বললো– 'আমরা আপনাকে বিজয়ী বেশেই ফিরিয়ে আনবো। আচ্ছা, তিন বাহিনী কি একত্রে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ'– সাইফুদ্দীন জবাব দেন– 'আর আমি এই সম্মিলিত **বাহিনীর প্রধান** সেনাপতি থাকবো।'

'জিন্দাবাদ'– দাউদ শ্লোগান দিয়ে ওঠে– 'এবার পালাবার পালা আইউবীর।'

দাউদ ও হারিছ ভৃত্যসুলভ কথাবার্তা বলে। সাইফুদ্দীনকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এবং বারবার ফাওজিয়ার নাম উল্লেখ করে তার থেকে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও গতিবিধি জেনে নেয়।

'তোমরা তোমাদের বাহিনীতে চলে যাও'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমার রক্ষী বাহিনী এসে গেছে। আমি তোমাদেরকে আজীবন স্মরণ রাখবো।'

রাতের একটা উপযুক্ত সময়ে রওনা হয় তিন বাহিনী। দাউদ ও হারিছ মসুলের একটি ইউনিটে গিয়ে যোগ দেয়। হারিছ অনেকেরই পরিচিত। আগে সে এ বাহিনীতেই কাজ করেছে। দাউদকে কেউ চেনে না। হারিছ তাকে মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের প্রেরিত লোক বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। ব্যস্ততার কারণে কেউ দাউদকে যাচাই করে দেখার সুযোগ পায়নি।

তিন সারিতে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে তিন বাহিনী। মধ্যরাত পর্যন্ত চলার পর বাহিনী একটি পার্বত্য এলাকায় এসে উপনীত হয়। ফলে সৈন্যদের সারি বিন্যাস অক্ষুণ্ন রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দাউদ হারিছকে বললো– 'এটাই মোক্ষম সুযোগ। চলো, পালাই।'

রাতের অন্ধকারকে পুঁজি করে দু'জন ধীরে ধীরে নিজ নিজ ঘোড়া একদিকে সরিয়ে নিতে এবং বাহিনী থেকে আলাদা হতে থাকে। দাউদের পরিকল্পনা হলো, দূরে গিয়ে তীব্র গতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে পালিয়ে যাবে। দিনে বাহিনীগুলো ছাউনী ফেলে অবস্থান গ্রহণ করবে আর তারা তুর্কমান পৌঁছে সালাহুদ্দীন আইউবীকে আক্রমণের সংবাদ জানাবে। এভাবে সুলতান সংবাদটা একদিন আগেই পেয়ে যাবেন এবং দুশমনকে স্বাগত জানানোর আয়োজন করে ফেলবেন। দাউদের পূর্ণ বিশ্বাস, এই পরিকল্পনা তার সফল হবে। কিন্তু তার জানা ছিলো না, এতদঞ্চলের চারদিকে শত্রুপক্ষের গেরিলা গুপ্তচর ছড়িয়ে রয়েছে।

তারা ডানদিকে অনেক দূরে সরে যায়। এখন আর কোনো সমস্যা নেই মনে করে এবার তারা তুর্কমান অভিমুখে রওনা হয়। এখনও ঘোড়া হাঁকায়নি। গতি কিছুটা তীব্র করেছে মাত্র। দীর্ঘ পথ চলার পর ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সামনের বাকি পথ অতিক্রম করতে হবে অবিরাম গতিতে। তাই

ঘোড়াগুলোকে কিছুক্ষণ আরাম দেয়া আবশ্যক।

রাতের শেষ প্রহর। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দাউদ ঘোড়া থেকে নেমে একটি টিলায় চড়ে সাইফুদ্দীনের বাহিনী যে পথে অগ্রসর হওয়ার কথা, সেদিকে তাকায়। কিন্তু দূরে ধূলি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দাউদ নিশ্চিন্ত হয় যে, তারা বাহিনী থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। এখন তারা নিরাপদ। কিন্তু এই ধারণাটা তার সঠিক নয়। কেউ তাকে দেখছে। তাকে অনুসরণ করছে। তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে।

দাউদ নিশ্চিন্ত মনে নীচে নেমে আসে। ঘোড়ায় চড়ে উভয়ে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয়। এলাকটা টিলায় ঘেরা ও বালুকাময়। দাউদ ও হারিছ দু'টি টিলার মাঝখান দিয়ে পথ চলছে। সামনে মোড়। মোড়ে পৌঁছামাত্র অকস্মাৎ সম্মুখ থেকে চারটি ঘোড়া ছুটে এসে তাদের প্রতি বর্শা তাক করে দাঁড়িয়ে যায়।

'ঘোড়া থেকে নেমে এসো।' এক আরোহী হুংকার দিয়ে বললো।

'আমরা মুসাফির।' দাউদ বললো।

'মুসাফির হলে মসুলের বাহিনী থেকে দূরে থাকতে না'- অশ্বারোহী বললো- 'পথচারীদের সঙ্গে এসব অস্ত্র থাকে না, যেগুলো তোমাদের সাথে আছে। তোমরা যারাই হয়ে থাকো, আমাদের সঙ্গে মসুল যেতেই হবে। আমরা তোমাদের ছাড়তে পারবো না। ঘোড়া ঘুরাও।'

লোকগুলো হাল্‌বের গেরিলা সেনা, যাদেরকে সন্দেহভাজন লোকদেরকে ধরে হাল্‌ব নিয়ে যাওয়ার জন্য সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তারা দাউদ ও হারিছকে ঘিরে ফেলে। দাউদ হারিছকে কানে কানে বললো- 'সময় এসে গেছে ভাই।' হারিছ তার ঘোড়ার লাগাম নাড়া দেয়। ছুটে চলার জন্য তার ঘোড়া সামনের দু'পা উপরে তোলে। ঘোড়া ছুটতে শুরু করলে হারিছ তার সামনের অশ্বারোহীর বুকে বর্শা বিদ্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ততক্ষণে তার বাঁ-দিকের অশ্বারোহীর বর্শা তার কাঁধে এসে গেঁথে যায়। দাউদ অভিজ্ঞ গেরিলা সৈনিক। সে ঘোড়া হাঁকিয়ে মোড় ঘুরিয়ে একটা চক্কর কেটে এক অশ্বারোহীকে ঘায়েল করে ফেলে।

তারা চারজন। আর এরা দু'জন। জায়গাটা ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করার উপযোগী নয়। উভয় দিকে টিলা। কিছুক্ষণ ঘোড়াগুলো লম্ফঝম্ফ করতে থাকে। পরস্পর টক্কর খেতে থাকে বেশক'টি বর্শা। হারিছ ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। দাউদও আহত হয়ে পড়েছে। দেহের দু'তিন স্থানে তার গভীর ক্ষত।

কিন্তু তার চৈতন্য ঠিক আছে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। চার অশ্বারোহীর কেউ নিহত, কেউ গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে আছে। দাউদও গুরুতর আহত।

দাউদ উঠে দাঁড়ায়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে হারিছের গ্রাম অভিমুখে রওনা হয়। হারিছের খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। দাউদ নিশ্চিত, হারিছ মারা গেছে। নিজেও শেষ পর্যন্ত বাঁচবে না বলে তার ধারণা। তার দেহঝরা রক্তে ঘোড়ার জিন ও পিঠ লাল হয়ে গেছে। তার জানা মতে এখান থেকে তুর্কমান অপেক্ষা হারিছদের বাড়ি নিকটে। হারিছের পিতাই এখন তার ভরসা। তার আশা, হারিছদের বাড়ি পর্যন্ত জীবিত পৌঁছতে পারলে বৃদ্ধকে বলবে– 'শহীদ পুত্রের আত্মার শান্তির জন্য এক্ষুণি তুর্কমান চলে যান এবং সুলতান আইউবীকে সতর্ক করুন।

দাউদ ঘোড়া হাঁকায়। কিন্তু ঘোড়া যতোবেশী নড়াচড়া করছে, তার ক্ষতস্থানগুলো থেকে ততোবেশী রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পিপাসায় তার কণ্ঠনালীটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে তার। দাউদ দোআ-কালাম পড়তে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর পর আকাশপানে মাথা তুলে উচ্চস্বরে বলছে– 'জমিন ও আসমানের মালিক! তোমার রাসূলের উসিলা করে বলছি, আমাকে আর অল্প কিছু সময়ের জন্য জীবন দান করো।'

এখন আর দাউদ ঘোড়া হাঁকাচ্ছে না, বরং ঘোড়া তাকে নিয়ে এগিয়ে চলছে। এবার দাউদের মনে হচ্ছে, তার দেহের জোড়াগুলো যেনো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। একবার মাথাটা একদিকে হেলে গিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। দাউদ নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে।

❖ ❖ ❖

আবারো ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় দাউদ। নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু পারলো না। দাউদ তার পায়ের নীচে মাটির অস্তিত্ব অনুভব করে। তার চোখের সম্মুখে শুধুই অন্ধকার।

একসময় যখন খানিক চৈতন্য ফিরে আসে, তখন দাউদ উপলব্ধি করে এখন রাত এবং তাকে কে একজন আগলে রেখেছে। লোকটাকে শত্রু মনে করে তার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা শুরু করে। তার কানে এক নারীকণ্ঠ প্রবেশ করে– 'দাউদ! তুমি ঘরে আছো, ভয় পেও না।' দাউদ কণ্ঠটা চিনে ফেলে– ফাওজিয়ার কণ্ঠ। চেতনাহীন অবস্থায় নিজে নিজেই সে হারিছের বাড়ি এসে

পৌঁছেছিলো। আল্লাহ তাকে পথ দেখিয়ে গন্তব্যে নিয়ে এসেছেন।

'বাপজান কোথায়?' জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দাউদের প্রথম উক্তি।

'তিনি বাইরে চলে গেছেন'– ফাওজিয়া জবাব দেয়– 'আগামীকাল কিংবা পরশু আসবেন।'

ফাওজিয়া ও তার ভাবী দাউদের ক্ষতস্থান মুছতে শুরু করে। এ সময়ে দাউদ পানি তলব করে। ফাউজিয়া পানি এনে দিলে দাউদ তা পান করে বললো– 'ফাওজিয়া! তুমি বলেছিলে পুরুষের কাজ নারীরাও করতে পারে। আমার ক্ষতস্থান ধুয়ে লাভ নেই। ভেতরে রক্ত নেই। আমি সুস্থ থাকলে যতো প্রয়োজনই হোক, তোমাদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দিতাম না। কিন্তু বিষয়টা আমার-তোমার ব্যক্তিগত নয়। তুমি সাহস করলে এবং জীবন ও সম্ভ্রমের ঝুঁকি নিলে একটি জাতীয় স্বার্থ রক্ষা পেতে পারে। অবর্ণনীয় এক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে ইসলামী দুনিয়া।'

দাউদ ফাওজিয়াকে কিভাবে তুর্কমান যেতে হবে বুঝিয়ে দেয়। তারপর হালব, হাররান ও মসুলের বাহিনীসমূহ যৌথ কমান্ডের অধীনে কিভাবে আসছে, কোন্ দিক থেকে আসছে এবং তাদের পরিকল্পনা কী, ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বললো– 'তোমার ভাই এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে শাহাদাতবরণ করেছে।'

ফাওজিয়া প্রস্তুত হয়ে যায়। তার সঙ্গে প্রস্তুতি গ্রহণ করে হারিছের স্ত্রীও। একটি ঘোড়া নিজেদের সংরক্ষণে আছে। আর একটি আছে দাউদের। ফাওজিয়া ও তার ভাবী দাউদকে এই অবস্থায় ঘরে রেখে কিভাবে যাবে ভাবছে।

'ফাওজিয়া'– দাউদ ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– 'আমার কাছে এসো।'

ফাওজিয়া দাউদের নিকট আসে। দাউদ তার ডান হাতটা মুঠো করে ধরে বহু কষ্টে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা টেনে বললো– 'সত্যের পথের পথিকদের বিবাহ আকাশে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তাদের বরযাত্রা গন্তব্যে পৌঁছে কন্টকাকীর্ণ পথ বেয়ে। আমাদের বিয়ের উৎসবে আকাশে তারকার বাতি প্রজ্বলিত করা হবে।'

দাউদের মাথাটা একদিকে কাত হয়ে ঢলে পড়ে। ফাওজিয়া চিৎকার দেয়– 'দাউদ!' ততক্ষণে দাউদের আত্মা ইহজগত ত্যাগ করে চলে গেছে অনন্ত শান্তিময় জান্নাতে। ফাওজিয়ার ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হয় ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ফাওজিয়াকে সবকিছু বলে-বুঝিয়ে দাউদ শাহাদাত বরণ করে। ঘরটা আল্লাহর হেফাজতে তুলে দিয়ে ফাওজিয়া ও তার ভাবী বেরিয়ে পড়ে। পিঠে জিন কষে এক ঘোড়ায় ফাওজিয়া এবং অপর ঘোড়ায় হারিছের স্ত্রী চড়ে বসে। দাউদের ঘোড়ার পিঠে চপচপে রক্তের দাগ। ঘোড়া দু'টো গ্রাম থেকে বেরিয়ে যায়। মেয়ে দু'টো আল্লাহর উপর ভরসা করে গন্তব্যপানে এগিয়ে চলে। পথ তাদের অজানা। দাউদ ফাওজিয়াকে একটি তারকার কথা বলেছিলো। সেই তারকার অনুসরণে তারা এগিয়ে যেতে থাকে।

তিন বাহিনী দিনভর অবস্থান করার পর রাতে আবার রওনা হয়। তুর্কমান এখন আর বেশি দূরে নয়। সুলতান আইউবী তুর্কমান অভিমুখে ধেয়ে আসা ঝড় সম্পর্কে বেখবর। তিনি অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন বটে; কিন্তু এবার তার শত্রুরা ভালো আয়োজন করে রেখেছে। ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন– সালাহুদ্দীন আইউবীর পক্ষে এই সাইমুমের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া বাহ্যত সম্ভব ছিলো না। তাঁর সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে পড়া নিশ্চিত ছিলো। তিনি তার সালারদের সম্মুখে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, হাল্ব, হাররান ও মসুলের যোদ্ধারা এতো দ্রুত আক্রমণ করতে সক্ষম হবে না। অথচ সাইফুদ্দীনের প্রতি আল-মালিকুস সালিহ'র পত্র তার হাতে এসে পৌঁছেছিলো।

ফাওজিয়া ও তার ভাবী ভুলেই গেছে যে, তারা নারী। পথে তারা কী কী সমস্যায় পড়তে পারে, সেই চিন্তা তাদের মাথায় নেই। ভাবনা শুধু একটাই– কখন তুর্কমান পৌঁছে সুলতান আইউবীকে সংবাদ পৌঁছাবেন, আপনার শত্রুরা ধেয়ে আসছে; আপনি প্রস্তুত থাকুন।

তারা রাতটা ঘোড়ার পিঠে কাটিয়ে দেয়। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। তারা টিলা ও বালুকাময় এলাকার কোল ঘেঁষে অগ্রসর হচ্ছে। হঠাৎ ফাওজিয়া দেখতে পায়, একটি পাথরের সঙ্গে হেলান দিয়ে এক লোক উদাস মনে বসে আছে। লোকটার পরিধানের কাপড় রক্তে লাল হয়ে আছে। ফাওজিয়া তার ভাবীকে ডেকে বললো– 'দেখ ভাবী! একজন লোক বসে আছে; জখমী মনে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের থামা যাবে না। কে বলবে, কে না কে?' তবে লোকটার পাশ দিয়েই তাদের যেতে হবে। তারা দেখতে পায়, লোকটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

ঘোড়া লোকটার নিকটে এসে পৌঁছলে ফাওজিয়া চিৎকার করে ওঠে– 'হারিছ! ভাবী!' বেঁচে আছে। তার দেহে অনেকগুলো ক্ষত।

ফাওজিয়াদের সঙ্গে পানি আছে। তারা হারিছকে পানি পান করায়। কিছুটা চৈতন্য আসলে হারিছ জিজ্ঞেস করে– 'আমি কি ঘরে? দাউদ কোথায়?'

ফাওজিয়া ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনায়। দাউদের শাহাদাতের সংবাদ জানায় এবং তারা কী কাজে কোথায় যাচ্ছে, হারিছকে অবহিত করে। হারিছ বললো– 'আমাকেও ঘোড়ায় তুলে নাও এবং সময় নষ্ট না করে তুর্কমান অভিমুখে ঘোড়া হাঁকাও।'

ফাওজিয়া ও তার ভাবী হারিছকে পাজাকোলা করে ঘোড়ার পিঠে তুলে নেয়। ফাওজিয়া তার পেছনে বসে। হারিছের দেহে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। লোকটা বেঁচে আছে শুধু আত্মার শক্তিতে। কর্তব্য এখানো শেষ হয়নি বলেই তার এই বেঁচে থাকা। ফাওজিয়া তার পিঠটা নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নিয়ে তাকে এক বাহু দ্বারা আগলে রাখে। হারিছ অস্ফুট স্বরে ডান-বাম বলে বোনকে পথনির্দেশ করছে।

সাইফুদ্দীনের কমান্ডে আইউবীর শত্রু বাহিনী তুর্কমানের কাছাকাছি পৌঁছতে আর বেশি বাকি নেই। এদিকে ফাওজিয়া, হারিছ ও হারিছের স্ত্রী এক নিরাপদ পথে তুর্কমানের দিকে এগিয়ে চলছে। ধীরে ধীরে দিগন্ত থেকে আকাশ বাদামী বর্ণ ধারণ করছে এবং এই রংটা উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। ফাওজিয়ার ভাবীর দিগন্তপানে চোখ পড়া মাত্র আঁৎকে ওঠে এবং চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে– 'ফাওজিয়া, ওদিকে চেয়ে দেখ।' হারিছ ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'কী ফাওজিয়া!'

'ধূলিঝড়।' ফাওজিয়া বললো। তার অন্তরে ভয় ঢুকে গেলো।

হারিছ এই ভূখণ্ডের এসব ধূলিঝড় সম্পর্কে অবহিত। এলাকাটা পাথুরে বটে; কিন্তু কিছু বালুকাময় অঞ্চলও আছে। ধূলিঝড় শুরু হলে টিলা ও পাথর খণ্ডগুলো বালিতে সমাধিস্ত হয়ে যায়। মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্য তা কেয়ামতের রূপ ধারণ করে। কিন্তু এইমাত্র ফাওজিয়া ও তার ভাবী যে ঝড় দেখতে পেলো, তা অত্র অঞ্চলের আরো পাঁচ-দশটি ভয়ংকর ঝড়ের একটি, যেটি ইতিহাসের পাতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। মেজর জেনারেল আকবর খান তার ইংরেজি গ্রন্থ 'গেরিলা ওয়ার ফেয়ার'-এ কয়েকজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও মুসলিম কাহিনীকারের সূত্রে লিখেছেন– 'যেদিন আল-মালিকুস সালিহ, গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনী সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন, ঠিক সেসময় এমন এক ধূলিঝড় উঠেছিলো যে, নিজের নাকের আধা হাত দূরে কিছু দেখা যাচ্ছিলো

না। সুলতান আইউবীর জানা ছিলো না যে, এই ঝড়ের মাঝে আরো একটি ঝড় ধেয়ে আসছে তাঁর দিকে।'

ইতিহাসে একথাও লিখা আছে– 'এই পরিস্থিতিতে সম্মিলিত বাহিনী সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণে বিলম্ব করে, যা ছিলো মূলত প্রধান সেনানায়কের ভুল সিদ্ধান্ত। সত্যের পথের পথিকদের সাহায্য করা আল্লাহর ওয়াদা। বলা যেতে পারে, এই প্রক্রিয়ায় মহান আল্লাহ দু'টি বীরাঙ্গনা মুসলিম নারীর ঈমানী চেতনার লাজ রক্ষা করেছেন। এক বোন তার আহত মুজাহিদ ভাইকে আগলে ধরে মুজাহিদীনে ইসলামকে কাফিরদের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য ছুটে চলছিলো। মনে তার নিজের কিংবা ভাইয়ের কোনো ভাবনা নেই। ভাবনা তার একটাই– ইসলাম ও সালতানাতে ইসলামিয়া।'

ঝড় এতো দ্রুত ধেয়ে আসে যে, কেউ আত্মসংবরণ করার সুযোগ পায়নি। সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে বড় বড় পাথরের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের উট-ঘোড়াগুলো নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। কমান্ডারদের দৃঢ় বিশ্বাস, অল্প সময়ের মধ্যে ঝড় থেমে যাবে এবং তারা বাহিনীকে সংগঠিত করে নিতে সক্ষম হবে। কিন্তু ঝড় উত্তরোত্তর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলছে।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবীর ছাউনি এলাকার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁবুগুলো উড়ছে। রশিবাঁধা উট-ঘোড়াগুলো প্রলয় সৃষ্টি করে ফিরছে। বালি তো আছেই, পাশাপাশি নুড়ি-কংকরও উড়ে এসে গায়ে বিদ্ধ হচ্ছে। চারদিকের আর্ত-চিৎকার এমন রূপ ধারণ করেছে, যেনো প্রেতাত্মারা চিৎকার করছে। সূর্য এখনো উদিত হয়নি। কিন্তু মনে হচ্ছে, মরুঝড় আকাশের সূর্যটাকেও উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কমান্ডারগণ চিৎকার করে ফিরছেন। সৈন্যরা উড়ন্ত তাঁবুগুলোকে সামলাতে গিয়ে নিজেরাই বেসামাল হয়ে পড়ছে।

তিন-চারজন সৈনিক একটি পাথরের আড়ালে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। ধীর-পদবিক্ষেপে অগ্রসরমান একটি ঘোড়া এসে তাদের উপর উঠে পড়ার উপক্রম হয়। সৈন্যরা এদিক-ওদিক হুমড়ি খেয়ে পড়ে চিৎকার করে ওঠে– 'ঘোড়াটাকে থামাও। হতভাগা! কোথাও আড়াল হয়ে যাও।'

ঘোড়া থেমে যায়। এক সৈনিক তার সঙ্গীদের বললো– 'কিছু বলো না, মহিলা।' অন্য একজন বললো– 'দু'জন।'

তারা ফাওজিয়া ও তার ভাবী। ঝড়ের কবলে পড়ে পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছে মনে করে সৈনিকরা তাদের ঘোড়ার বাগ ধরে ফেলে এবং একটি

পাথরের আড়ালে নিয়ে যায়।

'আমাদেরকে সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছিয়ে দিন'– চারদিকের হট্টগোলের মধ্যে চিৎকার করে ফাওজিয়া বললো– 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কোথায়? আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমাদের তাড়াতাড়ি সুলতানের নিকট নিয়ে যান। অন্যথায় সকলে মারা পড়বেন।'

সৈনিকরা ঘোড়ার উপর একজন রক্তাক্ত জখমীও দেখতে পায়। তারা লাগাম ধরে বড় কষ্টে ঘোড়াটাকে সুলতান আইউবীর তাঁবুর নিকট নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে তাঁবু নেই। উড়ে গেছে। সুলতান কোথায় আছেন, জেনে নিয়ে কমান্ডার মেয়েগুলোকে তাঁর নিকট নিয়ে যায়। সুলতান বৃহদাকার একটি পাথরের আড়ালে বসে আছেন। দু'টি মেয়েকে দেখেই সুলতান দ্রুত দাঁড়িয়ে যান।

সর্বাগ্রে হারিছকে ঘোড়া থেকে নামানো হলো। এখনো সে জীবিত। ফাওজিয়া ও তার ভাবী দ্রুত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কথা বলতে শুরু করে। ফাওজিয়া সুলতান আইউবীকে জানায়, সম্মিলিত বাহিনী আক্রমণের জন্য এসে পড়েছে। হারিছ অস্ফুট স্বরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য প্রদান করে এবং কথা বলতে বলতেই চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর ঝড় প্রশমিত হতে শুরু করে। সুলতান আইউবী তার সালারদেরকে তলব করে নির্দেশ দেন, তাঁবু গুটানোর প্রয়োজন নেই। সৈনিকদেরকে ইউনিটে ইউনিটে একত্রিত করো। কমান্ডো দলটিকে এক্ষুণি ডেকে আনো। কী ঘটতে যাচ্ছে, সুলতান সালারদের তা অবহিত করেন এবং রাতারাতি কী কী মহড়া দিতে হবে ও কী কী কাজ করতে হবে বলে দেন।

ঝড়ের তীব্রতা অনেকটা কমে গেছে। কিন্তু রাতের ঘোর আঁধারে ছেয়ে আছে প্রকৃতি। সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যরা নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক সৈনিক শুয়ে পড়েছে। এই বিশৃঙ্খলার কারণে রাতের আক্রমণ মুলতবী করা হয়েছে। পশুগুলোও এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

মধ্য রাতের পর। সাইফুদ্দীনের সৈন্যরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু সুলতান আইউবীর ক্যাম্প সম্পূর্ণ সজাগ ও কর্মতৎপর। আইউবী সাইফুদ্দীনকে স্বাগত জানানোর জন্য কী কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন, সাইফুদ্দীদের তা অজানা।

❖ ❖ ❖

ভোর হয়েছে। সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর মাঝে চরম বিশৃঙ্খলা

বিরাজ করছে। রসদ উড়ে গেছে। দিশেহারা উট-ঘোড়াগুলো সৈন্যদের পিষে মেরেছে। সবকিছু গুছিয়ে সৈন্যদের সংগঠিত করতে দিনের অর্ধেকটা কেটে গেলো। সাইফুদ্দীন সম্মুখ দিক থেকে প্রকাশ্যে সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করার জন্য তার সালারদের নির্দেশ দেন। তিনি জানেন, সুলতান আইউবী তার এই অভিযান সম্পর্কে বে-খবর।

বিকাল বেলা। সাইফুদ্দীনের বাহিনী আইউবী বাহিনীর উপর আক্রমণ করলো। ডানে-বাঁয়ে টিলা আর বড় বড় পাথর। মুহূর্তের মধ্যে অপ্রস্তুত আইউবী বাহিনী নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা। সাইফুদ্দীনের কামনাও তা-ই। কিন্তু একী! টিলা আর পাথরের আড়াল থেকে উল্টো হামলাকারীদের উপরই তীরবৃষ্টি বর্ষিত হতে শুরু করে। সম্মুখ দিক থেকে ধেয়ে আসতে শুরু করে আগুনের গোলা। দাহ্য পদার্থ ভর্তি পাতিল এসে সৈন্যদের মাঝে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আর ভেতরের তরল পদার্থগুলো ছিটিয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর মিনজানীক দ্বারা নিক্ষিপ্ত অগ্নিগোলা এসে পড়ছে আর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠছে।

সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ থেমে গেছে। সাইফুদ্দীন তার বাহিনীকে পেছনে সরিয়ে নিয়ে যান এবং আক্রমণের বিন্যাস ও পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলেন। কিন্তু তার সৈন্যরা পেছনে সরে যাওয়ামাত্র পেছন দিক থেকেও তাদের উপর এমন তীব্র আক্রমণ আসে যে, তাদের পরিকল্পনা ও মনোবল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

এমনি আক্রমণ হলো বাহিনীর উভয় পার্শ্বের উপরও। সাইফুদ্দীনের কেন্দ্রীয় কমান্ড শেষ হয়ে গেছে। রাতে আক্রমণ অব্যাহত থাকে। সাইফুদ্দীন আরো পেছনে সরে আসেন। এবার শুরু হলো তীরবৃষ্টি। সুলতান আইউবীর বাহিনী সারারাত তৎপর থাকে। শেষ রাতের আলো-আঁধারিতে সুলতান একটি টিলার উপর উঠে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি অবলোকন করেন। তার সম্মুখে এখন যুদ্ধের শেষ পর্ব। তিনি দূত মারফত তাঁর রিজার্ভ বাহিনীর নিকট নির্দেশ প্রেরণ করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ধাবমান অশ্বের ক্ষুরধ্বনিতে মাটি কেঁপে ওঠে। পদাতিক বাহিনী ডান-বাম থেকে বেরিয়ে আসে। আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ মুখরিত হয়ে ওঠে।

এই আক্রমণের ধকল সালমানোর সাধ্য সাইফুদ্দীনের নেই। তারা এখন সম্পূর্ণরূপে আইউবী বাহিনীর বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ। সম্মুখ থেকে তীব্র আক্রমণ এসে পড়ে। শুধু সাইফুদ্দীনের সৈনিকদেরই নয়, স্বয়ং তারও মনোবল ভেঙ্গে

চুরমার হয়ে গেছে। উট-গোড়াগুলো আহত সৈনিকদের পিষে মারছে। অবশেষে তারা যার যার মতো অস্ত্রসমর্পণ করতে শুরু করে।

সুলতান আইউবীর যে বাহিনী সাইফুদ্দীনের পেছনে ছিলো, তারা এগিয়ে আসছে। ডান ও বামদিক থেকে কমান্ডো সেনারা মার মার কাট কাট রবে আঘাতের পর আঘাত হানছে। সাইফুদ্দীনের বাহিনী আইউবীর পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হয়ে গেছে।

সুলতান আইউবীর সৈন্যরা সাইফুদ্দীনের কেন্দ্রে পৌঁছে যায়। সেখানে মদের পিপা-পেয়ালা ছাড়া আর কিছুই নেই। সেখান থেকে যাদেরকে গ্রেফতার করা হলো, তারা বললো– 'আমাদের প্রধান সেনা অধিনায়ককে শেষবারের মতো একটি পাথরের আড়ালে দেখেছিলাম। তারপর থেকে আর তার কোন পাত্তা নেই।'

সুলতান আইউবী তাকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলেন। অনেক অনুসন্ধান করা হলো। কিন্তু পাওয়া গেলো না। তিন বাহিনীর প্রধান সেনা অধিনায়ক তার সৈনিকদেরকে সুলতান আইউবীর দয়ার উপর ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন।

রাতের বেলা। ফাওজিয়া তুর্কমানের সবুজ-শ্যামলিমায় স্থাপিত একটি তাঁবুতে ভাইয়ের লাশের কাছে বসে স্বগতোক্তি করছে– 'আমি রক্তের নদী পার হয়ে এসেছি, যার উপর কোনো পুল ছিলো না। হারিছ! আমি তোমার কর্তব্য পালন করেছি।'

সুলতান আইউবী এসে তাঁবুতে প্রবেশ করেন। ফাওজিয়া জিজ্ঞেস করে– 'খবর কী সুলতান! আমার ভাইয়ের রক্ত বৃথা যায়নি তো?'

'আল্লাহ দুশমনকে পরাজয় দান করেছেন। তুমি জয়ী। তোমার জীবন স্বার্থক। তুমি...।'

সুলতান আইউবীর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে আসে। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করে।

জানবাজ

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিজয়ী কমান্ডারদের সম্মুখে দুশমনের অগনিত লাশ পড়ে আছে। দিশেহারা আহত উট-ঘোড়াগুলো হতাহতদের পিষে চলেছে। শত্রু শিবিরের যেসব সৈনিক পালাতে পারেনি, তারা অস্ত্র ত্যাগ করে একস্থানে জড়ো হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক ঢাল-তরবারী, ধনুক-বর্শা, তাঁবু ও অন্যান্য আসবাবপত্র দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন, যেটি তাঁর শত্রুজোটের প্রধান সেনানায়ক সাইফুদ্দীনের হেডকোয়ার্টার ও বিশ্রামাগার ছিলো। গাজী সাইফুদ্দীন তার বাহিনীর পরাজয় ও সুলতান আইউবীর জয় নিশ্চিত টের পেয়ে কাউকে কিছু না বলে কাপুরুষের ন্যায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। তার পলায়ন যেমন ছিলো গোপনীয়, তেমনি ছিলো লজ্জাজনক। হেরেমের বেশ ক'টি রূপসী মেয়ে তার সঙ্গে ছিলো, ছিল নর্তকী ও সোনাদানা। নিজ সৈন্যদের ভাতা প্রদান ও আইউবীর লোকদের ক্রয় করার জন্য তিনি এই স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহামূল্যবান মনোহরী কাপড়ের তাঁবু ও শামিয়ানার তৈরি বিশ্রামাগারটি যেনো একটি রাজ প্রাসাদ। সে যুগের যুদ্ধবাজ শাসকবর্গ এরূপ মহল ও যতোসব বিলাস সামগ্রী সঙ্গে রাখতেন। গাজী সাইফুদ্দীন তেমনই এক শাসক ছিলেন। তিনি মদের পিপা এবং রং-বেরঙের পেয়ালা-মটকাও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

সুলতান আইউবী মন পাগলকরা এই প্রাসাদটির প্রতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ সাইফুদ্দীনের পালংকটির উপর তাঁর চোখ পড়ে। পালংকের উপর সাইফুদ্দীনের তরবারীটি পড়ে আছে। পালাবার সময় তিনি তারবারীটাও নিতে ভুলে গেছেন। সুলতান আইউবী ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে তারবারীটা হাতে তুলে নেন। ধীরে খাপ থেকে তরবারীটা বের করেন। তারবারীটা ঝিকমিক করছে। সুলতান তারবারীটার প্রতি এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ পর মুখ ঘুরিয়ে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন সালারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'মুসলমানের তরবারীর উপর যখন নারী ও মদের ছায়া পড়ে,

তখন সেটি লোহার অকেজো টুকরায় পরিণত হয়ে যায়। এই তরবারীর ফিলিস্তিন জয় করার কথা ছিলো। কিন্তু খৃস্টানরা একে তাদের পাপ-পংকিলতায় চুবিয়ে কাঠের অকেজো লাঠিতে পরিণত করেছে। যে তরবারী মদ দ্বারা সিক্ত হয়, সেই তরবারী রক্ত থেকে বঞ্চিত থাকে।'

সাইফুদ্দীনের বিশ্রামাগারের পার্শ্বেই আরেকটি প্রশস্ত মনোরম তাঁবু। তার মধ্যে কতগুলো অর্ধনগ্ন রূপসী মেয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তারা তাদের অশুভ পরিণাম চিন্তায় বিভোর। তারা জানে, বিজয়ী বাহিনীর হাতে ধরা খেলে মেয়েদের কী দশা হয়! এমন চিত্তাকর্ষক মেয়েদের মুঠোয় পেলে কে না পশু হয়। কিন্তু সুলতান আইউবীর ঘোষণা শুনে তারা নির্বাক। আইউবী ঘোষণা দিলেন– 'তোমরা মুক্ত। তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো। সসম্মানে ও নিরাপদে সেখানে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।'

সুলতান আইউবীর এই অভাবিত ঘোষণায় তারা আরো সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সুলতানের এই ঘোষণাকে উপহাস মনে করে তারা অধিকতর লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের ভয়ে মুষড়ে পড়ে। সুলতান মেয়েদেরকে নিজের হেফাজতে নিয়ে যান। যুদ্ধের ময়দানে নারীর উপস্থিতিকে সুলতান সহ্য করতেন না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমরা কতজন ছিলে? তারা জানায়, এখন যে ক'জন আছি, আরো দু'জন ছিলো। তারা এখন নিখোঁজ। তারা মুসলমান ছিলো না। তারা দু'জন সাইফুদ্দীনকে কব্জা করে রাখতো। হয়তোবা তারাও সাইফুদ্দীনের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

সেকালের যুদ্ধ-বিগ্রহে সাধারণত যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে বিজয়ী বাহিনীর সৈন্যরা পরাজিত শত্রু বাহিনীর ফেলে যাওয়া সম্পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। পরাজিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতির বিশ্রামাগার তথা হেডকোয়ার্টারের উপর লুটিয়ে পড়তো অধিকাংশ সৈনিক। সেখানে থাকতো সম্পদের খাজানা, মদ আর নারী। এসবের দখল নিয়ে তাদের মাঝে বিবাদ-সংঘাতও বেঁধে যেতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সুলতান আইউবীর নীতি ছিলো খুবই কঠোর। কোন অফিসারের জন্যও– তার পদমর্যাদা যতোই উঁচু হোক না কেন– মালে গনীমতে হাত লাগানোর অনুমতি ছিলো না। তিনি কোনো একটি ইউনিটকে মালে গনীমত কুড়িয়ে এক জায়গায় জমা করার দায়িত্ব প্রদান করতেন। তারপর নিজ হাতে তা বণ্টন করতেন। কিন্তু তুর্কমানের যুদ্ধ শেষে সুলতান আইউবী মালে গনীমত সম্পর্কে কোনো নির্দেশ জারি করলেন না। তিনি নিজ বাহিনী এবং শত্রুপক্ষের আহতদের তুলে সেবা-চিকিৎসা এবং

যুদ্ধবন্দীদের আলাদা করার নির্দেশ প্রদান করেন।

সুলতান আইউবী অত্যন্ত কঠোরভাবে রণাঙ্গনের শৃঙ্খলা বিধান করতেন। এই যুদ্ধে তার শত্রুপক্ষ অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করেছিলো। তার কোনো কোনো ইউনিট পলায়নপর শত্রুসেনাদের ধাওয়াও করেছিলো। এই পশ্চাদ্বাবনেও তারা শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেনি। সুলতান আইউবী ধাওয়াকারীদের ফিরিয়ে আনেন এবং ডান ও বাম পার্শ্বকে ঠিক যুদ্ধ পূর্বের অবস্থার ন্যায় প্রস্তুত রাখেন। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পরও তিনি পার্শ্ব বাহিনীকে প্রত্যাহার করেননি। তাছাড়া তিনি তাঁর রিজার্ভ বাহিনীটিকে তলব করে নিজের কমান্ডে নিয়ে নেন।

'দুশমনের মালপত্র এবং পশুপাল ইত্যাদির ব্যাপারে সুলতানের নির্দেশ কী?'– এক সালার সুলতান আইউবীকে জিজ্ঞেস করেন– 'যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ আমাদের জয়ী করেছেন।'

'না, আমি এখনো এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হইনি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। আমার পাঠ এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যেও না। সবে আমরা দুশমনের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেছি মাত্র। আমাদের কোনো ইউনিট তাদের পার্শ্ব বাহিনীর উপর হামলা করেছে কি? না, করেনি। আমার সন্দেহ, উভয়টি না হলেও তাদের এক পার্শ্ব নিরাপদ আছে। তারা তিনটি ফৌজের যৌথ বাহিনী ছিলো। তাদের সালার ঈমান-বিক্রেতা হতে পারে; কিন্তু এমন আনাড়ী নয় যে, তার যেসব ইউনিট যুদ্ধে অংশ নেয়নি, তাদেরকে জবাবী হামলার জন্য ব্যবহার করবে না। তার রিজার্ভ বাহিনীও অক্ষত এবং প্রস্তুত আছে।'

'তাদের কেন্দ্র খতম হয়ে গেছে মাননীয় সুলতান!' সালার বললেন– 'তাদেরকে নির্দেশ দেয়ার মতো কেউ অবশিষ্ট নেই।'

'না থাকুক, খৃস্টানদের ভয় তো উড়িয়ে দেয়া যায় না'– সুলতান বললেন– 'যদিও আমার কাছে এই তথ্য নেই যে, খৃস্টানরা কাছে-ধারে কোথায় অবস্থান করছে। কিন্তু এই অঞ্চলটা পাহাড়ী। এখানে টিলাও আছে, বিস্তৃত সমতল ভূমিও আছে। কোথাও ঝোপ-জঙ্গলও আছে। কিছু এলাকা বালুকাময়। চোখে বেশী দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। শত্রু আর সাপের উপর কখনো আস্থা রাখা উচিত নয়। ওরা মৃত্যুর সময়ও ছোবল মেরে যায়। সাইফুদ্দীনের সালার মুজাফফর উদ্দীনের কোনো সংবাদ আমার জানা নেই। তোমরা জানো, মুজাফফর উদ্দীন সহজে পালাবার মতো মানুষ নয়। আমি তার অপেক্ষায়

আছি। তোমরা চোখ খোলা রাখো। বাহিনীগুলোকে একত্রিত করো। মুজাফফর উদ্দীন যদি আমার প্রশিক্ষণ না ভুলে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে আমার উপর পাল্টা আক্রমণ চালাবে।'

সুলতান আইউবীর আশংকা ভিত্তিহীন ছিলো না। প্রিয় পাঠক! হামাত যুদ্ধে সাইফুদ্দীনের জনৈক সালার মুজাফফর উদ্দীন ইবনে যাইনুদ্দীনের আলোচনা পড়েছেন। মুজাফফর উদ্দীন এক সময় আইউবী বাহিনীর সালার ছিলেন এবং আইউবীর কেন্দ্রীয় পটভূমিকে সামনে রেখে সুলতান আইউবী যুদ্ধের পরিকল্পনা ঠিক করেন এবং কিভাবে রণাঙ্গনে তাতে রদবদল করেন। মুজাফফর উদ্দীন একে তো জন্মগত যোদ্ধা। অপরদিকে প্রশিক্ষণ অর্জন করেছেন সুলতান আইউবীর নিকট থেকে। সব মিলিয়ে তিনি রণাঙ্গন থেকে পিছপা হওয়ার মতো লোক নন।

মুজাফফর উদ্দীন ছিলেন সাইফুদ্দীনের নিকটাত্মীয় (খুব সম্ভব চাচাতো ভাই)। সুলতান আইউবী যখন মিশর থেকে দামেস্ক আগমন করেন এবং মুসলিম আমীরগণ তার বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান, তখন মুজাফফর উদ্দীন সুলতানকে কিছুই না বলে তার ফৌজ থেকে বের হয়ে শত্রু শিবিরে চলে যান।

তুর্কমানের এই যুদ্ধের আগে হামাত যুদ্ধে মুজাফফর উদ্দীন সুলতান আইউবীর পার্শ্বের উপর এমন তীব্র আক্রমণ করেছিলেন, যার মোকাবেলার জন্য সুলতান আইউবী পার্শ্ব বাহিনীর নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের মতে, সেদিন যদি সুলতান আইউবী নিজে সেনাপতিত্ব না করতেন, তাহলে মুজাফফর উদ্দীন যুদ্ধের গতি পাল্টে দিতেন। সুলতান আইউবী মুজাফফর উদ্দীনকে যুদ্ধবিদ্যার ওস্তাদ বলে স্বীকার করতেন। এবার তুর্কমানের গুপ্তচররা তাকে সম্মিলিত শত্রুবাহিনী সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রদান করেছে, তার মধ্যে একটি হলো, মুজাফফর উদ্দীনও এই বাহিনীতে আছেন। কিন্তু তিনি বাহিনীর কোন্ অংশের সঙ্গে আছেন, তা জানা যায়নি। সুলতান কয়েকজন যুদ্ধবন্দীকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু তারা মুজাফফর উদ্দীনকে বাহিনীতে উপস্থিত থাকার বিষয়টা সত্যায়ন করলেও কেউ বলতে পারেনি তিনি বাহিনীর কোন্ অংশে আছেন।

'হতে পারে বন্দীরা জানা সত্ত্বেও বিষয়টা গোপন রেখেছে'– সুলতান আইউবী তার সালারদের বললেন– 'মুজাফফর উদ্দীন যুদ্ধ না করে ফিরে যাবে আমি বিশ্বাস করি না। সে আমার শিষ্য। আমি তার যোগ্যতা জানি। জানি

তার স্বভাব-চরিত্রও। সে হামলা করবে। পরাজয় নিশ্চিত জানলেও করবে। তবে আমি চাই সে হামলা করুক। অন্যথায় আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী যেনো বলতে না পারে, মুজাফফর উদ্দীনও পালিয়ে গেছে'- সাইফুদ্দীনের সালার মুজাফফর উদ্দীনের কণ্ঠ। তুর্কমান থেকে দু'আড়াই মাইল দূরে ধ্বনিত হচ্ছিলো- 'আমি যুদ্ধ না করে ফিরে যাবো না।'

সুলতান আইউবী যে সময়টায় সাইফুদ্দীনের প্রাসাদোপম বিশ্রামাগারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক সে সময় সাইফুদ্দীনের নিকট সংবাদ পৌঁছে- 'সালাহুদ্দীন আইউবী কিভাবে যেনো আগেই জেনে ফেলেছেন, তার উপর হামলা আসছে। সে কারণেই আমরা তার ফাঁদে আটকা পড়েছি। এখন এখানে যুদ্ধ করা অনর্থক। ভালোয় ভালো আপনারাও ফিরে যান এবং কোনো একটি উপযুক্ত স্থানে যুদ্ধ করানোর জন্য বাহিনীগুলোকে পেছনে সরিয়ে নিন।'

'আপনার যে কোনো আদেশ-নিষেধ মান্য করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই'- মুজাফফর উদ্দীনের এক নায়েব সালার বললো- 'কিন্তু যেখানে আমাদের বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, অনেকে পালিয়ে গেছে, এমতাবস্থায় এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা পাল্টা আক্রমণ করা আমার নিকট যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমার কাছে এখনো যে পরিমাণ সৈন্য আছে, আমি তাদেরকে অপর্যাপ্ত মনে করি না'- মুজাফফর উদ্দীন বললেন- 'আমরা যে বাহিনী নিয়ে এসেছি, এরা তার চার ভাগের এক ভাগ। সুলতান আইউবী এর চেয়েও স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা যুদ্ধ করেন এবং সফল হয়ে থাকেন। আমি তার পার্শ্বের উপর হামলা করবো। এবার আমি তাকে সেই চাল চালতে দেবো না, যেটি তিনি হামাত-এ চেলেছিলেন। তোমরা সবাই আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত থাকো।'

'মসুলের শাসনকর্তা মহামান্য গাজী সাইফুদ্দীন তিনটি ফৌজের এতো বিপুল সৈন্য সত্ত্বেও হেরে গেছেন'- নায়েব সালার বললো- 'আমি আবারো বলবো, এই সামান্য সৈন্য দ্বারা আক্রমণ করা আর তাদেরকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেয়া এক কথা।'

'যারা যুদ্ধের ময়দানে হেরেমের নারী আর মদের মটকা সঙ্গে রাখে, তাদের কাছে তিন নয়, দশটি বাহিনী থাকলেও সেই পরিণতিই বরণ করতে হবে, যা আমাদের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের ভাগ্যে জুটেছে'- মুজাফফর উদ্দীন বললেন- 'আমি মদপান করি। কিন্তু এখানে যদি এক গ্লাস পানিও না জোটে, তবু পরোয়া করবো না। সুলতান আইউবী আমাকে ঈমান নীলামকারী ও

বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করে থাকেন। আমি তাকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছাড়বো না। আমার এই লড়াই হবে দুই সেনাপতির লড়াই। এই যুদ্ধ হবে দুই বীরের যুদ্ধ। এটি হবে দুই অসিবিদের সংঘাত। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ বাহিনীকে প্রস্তুত করো। মনে রাখতে হবে, সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দারা মাটির তলেও দেখতে পায়। তোমাদের ইউনিটগুলোকে আজ রাতে আরো গোপনে নিয়ে যাবে এবং চারদিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত গুপ্তচর ছড়িয়ে দেবে। তারা সন্দেহজনক অবস্থায় কাউকে পেলে ধরে নিয়ে আসবে।'

মুজাফফর উদ্দীন তার সৈন্যদের লুকিয়ে রাখার জন্য একটি স্থান ঠিক করে নেন। আক্রমণের জন্য তিনি কোনো দিন বা সময় নির্ধারন করেননি। তিনি তার নায়েব সালারদের বললেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবী শিয়ালের ন্যায় ধূর্ত এবং খরগোসের ন্যায় গতিশীল। আমি গুপ্তচর মারফত জানতে পেরেছি, তিনি এখনো মালে গনীমত সংগ্রহ করেননি। তার অর্থ হলো, তিনি সম্মুখে অগ্রসর হবেন না এবং আমাদের জবাবী হামলার আংশকা করছেন। আমি তাকে ভালোভাবেই জানি যে, তিনি কোন্ ধারায় চিন্তা করে থাকেন। আমি তাকে ধোঁকা দেবো যে, আমরা সবাই পালিয়ে গেছি এবং এখন আর আক্রমণের কোনো ভয় নেই। এটি হবে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার লড়াই। আমি প্রমাণ করবো, কার বিচক্ষণতা বেশি– আইউবীর না আমার। আইউবী দু'দিনের বেশি অপেক্ষা করবে না। তার মতো আমিও তার গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য আমার গুপ্তচরদের ব্যবহার করবো। যখনই তিনি গনীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন এবং তার দৃষ্টি ডান-বাম থেকে সরে যাবে, আমরা তার পার্শ্বের উপর আক্রমণ চালাবো।'

সুলতান আইউবী এই শংকাই অনুভব করছিলেন।

সুলতান আইউবী তাঁর কিছুসংখ্যক সৈন্যকে সাইফুদ্দীন বাহিনীর ডান-বাম থেকে সরিয়ে পেছনে প্রেরণ করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি কমান্ডোসেনাও রওনা করিয়েছিলেন। এরা তাঁর সেই কমান্ডো ফোর্স, যার প্রত্যেক কমান্ডার ও প্রত্যেক সৈনিক অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দুঃসাহসী। এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচরও। এই ফোর্স চার থেকে বারজন করে এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে দুশমনের বিপুল ক্ষতিসাধন করেছিলো। তন্মধ্যে একটি দলের সদস্য সংখ্যা ছিলো বারজন, যার মাত্র তিনজন সৈনিক আর তার কমান্ডার আন-নাসের জীবিত আছে।

আন-নাসের তার দলের সঙ্গে তুর্কমানের রণাঙ্গনে থেকেই সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর পেছনে চলে গিয়েছিলেন। তার টার্গেট হতো সাধারণত দুশমনের রসদ। এবারও তিনি তার কমান্ডোদের ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যান। তার সঙ্গে আছে সলিতাওয়ালা তীর। সামান্য দাহ্য পদার্থ, বর্শা, তরবারী ও খঞ্জর। শত্রুর রসদ এখান থেকে অনেক দূরে। আন-নাসেরের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা হলো, এই ভুখণ্ডটি না উন্মুক্ত ময়দান, না বালুকাময় প্রান্তর। বরং জায়গাটি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পার্বত্য ও টিলাময়, যার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সহজ। দিনের বেলা লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি ঘোড়া লুকিয়ে রাখা যায়। সম্মিলিত বাহিনীর রসদ– যাতে সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য ও পশুপালের জন্য শুকনা ঘাস, দানাদার খাদ্য ইত্যাদি রয়েছে– পিছনে আসছে। এই মালপত্রে তীর-ধনুক-বর্শাও আছে। আন-নাসের প্রথম রাতেই শত্রু বাহিনীর এই রসদের উপর সফল আক্রমণ পরিচালনা করেন। বিপুল পরিমাণ রসদ অগ্নিতীরে ভষ্ম হয়ে গেছে।

আন-নাসের কমান্ডোদেরসহ দিনের বেলা এক স্থানে লুকিয়ে থাকে। সে দেখতে পায়, শত্রুবাহিনী খানা-খন্দক ও টিলার আড়ালে তাদের অনুসন্ধান করছে। সে তার কমান্ডোদেরকে এদিক-ওদিক উপযুক্ত উঁচু স্থানে বসিয়ে রাখে। তারা ধনুকে তীর সংযোজন করে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। শত্রুসেনারা দূর থেকেই ফেরত চলে যায়। সূর্যাস্তের পর সে চুপি চুপি রসদ বহরের উপর দৃষ্টি রাখে।

কাফেলা একস্থানে ছাউনি ফেলে। কিন্তু এ রাত আক্রমণ করা সহজ মনে হলো না। দুশমন চারদিকে কঠোর টহল প্রহরার ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই প্রহরায় পদাতিকও আছে, অশ্বারোহীও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন-নাসের হামলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। দুশমনের এখনো বহু রসদ অক্ষত আছে। কমান্ডো হামলার মাধ্যমে রসদ ধ্বংস একটি বিশেষ কৌশল। এ কাজের জন্য তিনি এমন বাহিনী গঠন করে রেখেছেন, যারা চেতনার দিক থেকে উন্মাদ ও উগ্র প্রকৃতির। তাদের বীরত্ব অস্বাভাবিক ও বুদ্ধিমত্ত্বা ঈর্ষণীয়। এই জানবাজদের সততা ও ঈমানী চেতনার অবস্থা হলো, তারা এতো দূরে গিয়েও দায়িত্ব পালনে জানবাজির পরাকাষ্ঠা প্রর্দশন করে থাকে। যেখানে তাদের খোঁজ নেয়ার মতো কেউ থাকে না।

আন-নাসের দিনের বেলা যেখানে লুকিয়ে ছিলো, রাতে সেখানেই ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখে। তারপর পায়ে হেঁটে দলের সদস্যদের নিয়ে এক স্থান দিয়ে দুশমনের রসদ বহরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। মালপত্রের স্তূপ দাহ্য

পদার্থ ফেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দলের সদস্যদের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দেয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। শত্রুসেনারা ছুটোছুটি করতে শুরু করে। আন-নাসেরের কমান্ডোরা ছুটন্ত ও পলায়নপর শত্রুসেনাদের উপর তীরবৃষ্টি শুরু করে দেয়। শত্রুসেনারা তাদের সন্ধান করতে শুরু করে। সফল অপারেশনের পর তাদের পক্ষে বেশি সময় লুকিয়ে হামলা করা সম্ভব হলো না। তারা এক একজন করে ধরা পড়তে ও শহীদ হতে শুরু করে। যে তিনজন কমান্ডো আন-নাসেরের সঙ্গে ছিলো, শুধু তারাই বেঁচে থাকে। তারা ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে। রসদের সঙ্গে যেসব পাহারাদার ছিলো, তারা তাদেরকে ঘেরাও করে ধরার চেষ্টা করে। আন-নাসের তার এই তিন সঙ্গীকে তার থেকে আলাদা হতে দেয়নি। তারা ধীরে ধীরে কৌশলে আলো থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্ধকারে ঘোরাফেরা ও তাঁবুর আড়ালে লুকিয়ে শত্রুসেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

আন-নাসের আকশের দিকে তাকায়। আকাশে কোনো তারকা নেই। কমান্ডোসেনাদের তারকা দেখে দিক নির্ণয় করার প্রশিক্ষণ থাকে। কিন্তু আজকের আকাশটা মেঘে ছেয়ে আছে। আন-নাসের শত্রু বাহিনীর রসদের অবস্থান থেকে অনেক দূর চলে এসেছে। তবে এখনো দুশমনের প্রজ্বলমান রসদ ও আসবাবপত্রের আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। তার অপর ৯ সৈনিক বেঁচে আছে নাকি শহীদ হয়েছে, তা সে জানে না। সে মনে মনে তাদের নিরাপত্তার জন্য দু'আ করে তিন সঙ্গীকে নিয়ে যে জায়গায় দলের ঘোড়াগুলো বাঁধা আছে, অনুমান করে সেদিকে এগিয়ে চলে। তারা রাতভর হাঁটতে থাকে। দুশমনের রসদের অগ্নিশিখা এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

পথ হারিয়ে ফেলেছে আন-নাসের। তারা যে পথে হাঁটছে, এটি তাদের গন্তব্যের পথ নয়। হাঁটছে দিক-নির্দেশনাহীন। এখন তারা যে মাটিতে হাঁটছে, তার প্রকৃতি অন্য রকম। তারা যে পথে এসেছিলো, তাতে কোন গাছ-গাছালি ছিলো না। পায়ের নীচে শক্ত মাটির পরিবর্তে বালি অনুভূত হচ্ছে। পানি ও খাদ্যদ্রব্য তাদের ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা। আন-নাসের পিপাসা অনুভব করে। শরীর ক্লান্ত। তার সঙ্গীরাও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছে। চলার গতি ধীর হয়ে আসছে তাদের। আন-নাসের সেখানেই যাত্রাবিরতি দিয়ে বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তার সঙ্গীরা এই আশায় এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয় যে, হয়তো সামনে কোথাও পানি পাওয়া যাবে। তারা আরো কিছুক্ষণ হাঁটে এবং ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে।

❖ ❖ ❖

আন-নাসের চোখ খুলে দেখতে পায়, তার সঙ্গী তিন সৈনিক অচেতন ঘুমিয়ে আছে। সূর্যটা উদায়স্থল ত্যাগ করে উপরে উঠে এসেছে। সে চারদিকে তাকায়। অনুভব করে– সে বালির সমুদ্র মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। মনটা ভেঙ্গে পড়ে আন-নাসেরের। লোকটার লালন-পালন, বড় হওয়া, যুদ্ধ করা সবই মরু অঞ্চলে হয়েছে। বালির সমুদ্রকে ভয় পাওয়ার মতো লোক নয় সে। তার ভয় পাওয়ার কারণ হলো– তার ধারণা ছিলো না, এখানে মরুদ্যান আছে। আরো একটি কারণ হলো, যতদূর পর্যন্ত চোখ যায় পানির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পিপাসায় কণ্ঠনালীতে জ্বালা অনুভব করছে আন-নাসেরের। সঙ্গীদের অবস্থাও আন্দাজ হচ্ছে তার। এখান থেকে তুর্কমান কোন্দিক হতে পারে সূর্য দেখে তা ঠিক করে সেদিকে তাকায়। পর্বতমালার বাঁকা একটা রেখা দেখতে পায়। কিন্তু সোজা সেদিকে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা, পথে দুশমনের ফৌজ রয়েছে।

আন-নাসের তার সঙ্গীদের জাগায়। জাগ্রত হয়ে তারা উঠে বসে। চেহারায় ভীতির ছাপ।

'প্রয়োজন হলে আমরা আরো দু'দিন না খেয়ে থাকতে পারবো'– আন-নাসের তার সঙ্গীদের বললো– 'আর এই দু'দিনে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে না পারলেও পানি পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছে যাবো।'

তিন সৈনিক যার যার অভিমত ব্যক্ত করে। কিন্তু তারা চলে এসেছে বহু দূর। সঙ্গে ঘোড়া থাকলে অনেকটা সহজ হতো। নিদ্রা তাদের পরিশ্রান্ত দেহকে কিছুটা সজীবতা দান করেছে।

'সঙ্গীগণ'– আন-নাসের বললো– 'মহান আল্লাহ আমাদেরকে যে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছেন, তাকে মাথা পেতে বরণ করে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।'

'এখানে বসে থাকা তো কোনো প্রতিকার নয়'– এক সঙ্গী বললো– 'সূর্য মাথার উপর এসে পোড়াতে শুরু করার আগে আগেই রওনা হওয়া দরকার। আল্লাহ আমাদেরকে পথের দিশা দান করবেন।'

স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে দিক নির্ণয় করে তারা হাঁটতে শুরু করে। সূর্য মাথার উপর উঠে আসছে। পায়ের নীচের বালি উত্তপ্ত হয়ে ওঠছে। সামান্য দূরের বালিগুলোকে মরিচিকার ন্যায় পানি বলে মনে হচ্ছে। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা মরুভূমির নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে অবহিত এবং অভ্যস্তও। তাদের

মরিচিকাও চোখে পড়তে শুরু করে। কিন্তু মরুভূমির এই প্রতারণা সম্পর্কে অবগত থাকার সুবাদে তারা প্রতিটি মরিচিকাকে উপেক্ষা করে সম্মুখে এগিয়ে চলছে।

'বন্ধুগণ!'– আন-নাসের বললো– 'আমরা ডাকাত নই, আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। এই অবস্থায় যদি আমাদের মৃত্যু হয় তা হবে শাহাদাত। আল্লাহকে স্মরণ করে হাঁটতে থাকো।'

'যদি এমন কোন পথিক পেয়ে যাই, যার সঙ্গে পানি আছে, তাহলে ডাকাতি করতে পরোয়া করবো না।' এক সৈনিক বললো।

সবাই হেসে ওঠে। তবে এই হাসির জন্য তাদেরকে শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে।

সূর্য তাদের মাথার উপর উঠে এসেছে। উপর থেকে সূর্য আর নীচ থেকে উত্তপ্ত বালি তাদেরকে পোড়াতে শুরু করে। আন-নাসের গুন গুন করে একটি জিহাদী গান গাইতে শুরু করে। গান গাওয়া শেষ হলে সে ভিন্ন এক সুরেলা কণ্ঠে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদর রাসূলুল্লাহ' জপতে শুরু করে। হাল্কা বেগে বাতাস বইছে। চিকচিকে বালিকণা তাদের পদচিহ্নগুলো মুছে দিচ্ছে।

এবার সূর্যটা পশ্চিমাকাশের দিকে নামতে শুরু করেছে। চারজন আদম সন্তানের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হয়ে চলছে। পা ভারি হয়ে যাচ্ছে। হাঁটার গতি কমে গেছে। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। আদ্রতার অভাবে হা করা মুখ বন্ধ হচ্ছে না। একজনের জবান বন্ধ হয়ে গেছে; এখন আর সে কথা বলতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর আরো একজন নীরব হয়ে যায়। আন-নাসের ও তার তৃতীয় সঙ্গী এখনো অস্ফুট স্বরে আল্লাহর নাম জপ করছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তৃতীয় সঙ্গীর কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে যায়।

'সঙ্গীগণ!'– আন-নাসের দেহের অবশিষ্ট শক্তি ব্যয় করে বললো– 'হিম্মত হারাবে না। আমরা ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান। ঈমানের শক্তিতেই আমরা বেঁচে থাকবো।'

আন-নাসের একজন একজন করে সঙ্গীদের চেহারার প্রতি তাকায়। কারো চেহারায় যেনো রক্ত নেই। সকলের চোখ কোঠরে ঢুকে গেছে।

সূর্য ডুবে গেছে। আঁধারে ছেয়ে গেছে প্রকৃতি। পদতলের উত্তপ্ত বালি ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আন-নাসের সঙ্গীদের থামতে দেয়নি। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় পথ চলা সহজ হয়। সাধারণ পথচারী হলে লোকগুলো বহু আগেই হারিয়ে যেতো। এরা সৈনিক এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো। সাধারণ মানুষের তুলনায় এদের দেহ বেশী কষ্ট-সহিষ্ণু। আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আন-নাসের সঙ্গীদের যাত্রা বিরতি দিয়ে শুয়ে পড়তে বললো।

❖ ❖ ❖

আন-নাসের শেষ রাতে জাগ্রত হয়। আকাশ পরিষ্কার। তারকা দেখে অনুমান করে রাত পোহাতে আর কত দেরি। একটি তারকা দেখে দিক নির্ণয় করে সঙ্গীদের জাগিয়ে তোলে। তাদের নিয়ে রওনা হয়। তাদের হাঁটার গতি ভালো। তবে পিপাসার কারণে মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

'এই মরুভূমি এতো বেশি বিস্তীর্ণ নয়'– আন-নাসের বড় কষ্টে বললো– 'আজই শেষ হয়ে যাবে। আমরা আজই পানি পর্যন্ত পৌঁছে যাবো।'

সম্মুখে পানি পাওয়া যাবে এই আশায় তারা এগুতে থাকে। রাত পোহায়ে ভোর হলো। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত হলো। মাইল দশেক দূরে কতগুলো খুটি ও মিনার চোখে পড়ে। এগুলো মাটির টিলা ও পর্বতের চূড়া। দূর থেকে খুঁটি আর মিনারের মতো দেখা যাচ্ছে। একটি গাছও চোখে পড়ছে না। পায়ের তলার মাটি এখন ফেটে চৌচির। মনে হচ্ছে, কয়েক শত বছর ধরে এই মাটি পানির ছোঁয়া পায়নি। শত শত বছরের পিপাসাকাতর মাটি মানুষের রক্ত পেলে পান করতে কুণ্ঠিত হবে না।

আন-নাসের তার সঙ্গীদের চেহারা পর্যবেক্ষণ করে। এক সঙ্গীর জিহ্বা কিছুটা বেরিয়ে এসেছে। লক্ষণটা ভয়ানক। মরু সাহারা ট্যাক্স উসুল করতে শুরু করেছে। অপর দুই সঙ্গীর বাহ্যিক অবস্থা অতোটা সঙ্গীন না হলেও স্পষ্ট যে, দশ মাইল পথ অতিক্রম করে মিনারসদৃশ টিলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আন-নাসের দলের কমান্ডার। দায়িত্ববোধের কারণেই তার হুঁশ-জ্ঞান এখানো ঠিক আছে। তার শারিরিক অবস্থা সঙ্গীদের চেয়ে ভালো নয়। সে কথা দ্বারা সঙ্গীদের সাহস বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ধীরে ধীরে সূর্য উপরে উঠছে আর মাটির উত্তাপ বাড়ছে। আন-নাসের ও তার সঙ্গীগণ পা তুলে হাঁটতে পারছে না। তারা পা হেঁচড়িয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। যে সিপাহীর জিহ্বা বেরিয়ে এসেছিলো, তার বর্শাটা হাত থেকে পড়ে যায়। তারপর সে কোমরবন্ধ থেকে তরবারীটাও খুলে ফেলে দেয়। নিজের অজ্ঞাতে এসব আচরণ করে সে। তার হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব কাজ করে যাচ্ছে। এটি মরুভূমির একটি নির্দয় ক্রিয়া যে, মানুষ যেমন ঘুমের ঘোরে অজ্ঞাতে নানা আচরণ করে থাকে, তেমনি পথভোলা পিপাসার্ত পথিকও নিজের অজান্তে দেহের বোঝা ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করে। সে কোথাও থামে না। লক্ষ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকে আর এক এক করে নিজের সহায়-সম্বল ও পাথেয় ফেলে দিতে থাকে। মরু মুসাফিররা যখন স্থানে স্থানে এরূপ বস্তু পড়ে

থাকতে দেখে, তখন তারা বুঝে ফেলে, আশ-পাশে কোথাও কোন হতভাগা আদম সন্তানের লাশ পড়ে আছে।

মরুভূমি আন-নাসেরের এক সঙ্গীকে এমনি এক অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। আন-নাসের তার বর্শা ও তারবারীটা তুলে নিয়ে তাকে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললো– 'এতো তাড়াতাড়ি পরাজয় মেনে নিও না বন্ধু। আল্লাহর সৈনিকরা জীবনদান করে, অস্ত্রত্যাগ করে না। তুমি তোমার মর্যাদাকে বালির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলো না।'

সঙ্গী অসহায় দৃষ্টিতে আন-নাসেরের প্রতি তাকায়। আন-নাসের তার প্রতি তাকিয়ে থাকে। সিপাহী হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে সামনের দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল উঁচিয়ে ইশারা করে। তারপর নিজের দেহের অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি ব্যয় করে চিৎকার করে ওঠে– 'পানি... ঐ দেখ... বাতাস... পানি পেয়ে গেছি।' লোকটি সামনের দিকে দৌড় দেয়।

সেখানে পানি ছিলো না, না মরিচিকা। ভূমি এমন যে, এরূপ ভূমিতে মরিচিকা দেখা যায় না। মরিচিকা সৃষ্টি হয় বালির চমক থেকে। লোকটির উপর সাহারার দ্বিতীয় নিষ্ঠুর আচরণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। সে দেখতে পায়, তার সম্মুখে পানির ঝিল, বাগ-বাগিচা ও অসংখ্য প্রাসাদ। আসলে কিছুই নেই। একজন অসহায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নির্মম উপহাস। সে আরো দেখতে পায়, মাইল দুয়েক দূরে একটি শহর। দলে দলে মানুষ চলাচল করছে। গায়িকা-নর্তকীরা গাইছে-নাচছে।

জনমানবহীন এই নিষ্ঠুর মরুভূমি আন-নাসেরের এই সঙ্গীকে ধোঁকা দিতে শুরু করে। মরু সাহারা লোকটির জীবন নিয়ে খেলা শুরু করে। তবে এটা সাহারার দয়াও হতে পারে যে, একজন পথিকের জীবন হরণ করার আগে তাকে সুদর্শন ও চিত্তহারী কল্পনায় ব্যস্ত করে দেয়, যাতে মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভূত না হয়।

আন-নাসেরের সঙ্গী দৌড় দেয়। যে লোকটি এতোক্ষণ পা হেঁচড়িয়ে পথ চলচিলো, সে কিনা সুস্থ-সবল মানুষের ন্যায় দৌড়াচ্ছে। কিন্তু এই দৌড় সেই প্রদীপের ন্যায়, যা নির্বাপিত হওয়ার আগে দপ করে ওঠে। আন-নাসের তার পেছন পেছন ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে। তার অপর দুই সঙ্গীর দম এখনো কিছুটা অবশিষ্ট আছে। তারাও দৌড়ে গিয়ে সঙ্গীকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। সিপাহী সঙ্গীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করছে এবং চিৎকার করছে– 'আমাকে ঝিলের কাছে যেতে দাও।

ঐ দেখ, কতো হরিণ ঝিল থেকে পানি পান করছে।'

সঙ্গীরা তাকে ধরে রাখে। সে ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে এগিয়ে চলে। আন-নাসের তার মুখমণ্ডলের উপর একখানা কাপড় রেখে দেয়, যেনো সে কিছু দেখতে না পায়।

সূর্যটা ঠিক মাথার উপর উঠে এসেছে। এবার আরো এক সিপাহী উচ্চস্বরে বলে ওঠে- 'বাগিচায় নর্তকীরা নাচছে। চলো, নাচ দেখি, রূপ দেখি। চলো, বন্ধুগণ! ওখানে পানি পাওয়া যাবে। মানুষ আহার করছে। আমি তাদেরকে চিনি। চলো... চলো... ।' বলেই সিপাহী দৌড়াতে শুরু করে।

যে সিপাহী প্রথমে অলীক দৃশ্য অবলোকন করেছিলো, সে বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত নীরব থাকে। সে কারণে সঙ্গীরা তাকে ছেড়ে দিয়েছিলে। এখন এক সঙ্গীকে দৌড়াতে দেখে সেও তার পেছন পেছন ছুটছে এবং চিৎকার করতে শুরু করে- 'নর্তকীটা অত্যন্ত রূপসী। আমি তাকে কায়রোতে দেখেছি। সেও আমাকে চিনে। আমি তার সঙ্গে খাবো। তার সঙ্গে শরবত পান করবো।'

আন-নাসেরের মাথাটা হেলে পড়েছে। মরুভূমির কষ্ট সহ্য করার মতো শক্তি তার ছিলো। কিন্তু সঙ্গীদের এই পরিণতি ও দুর্দশা সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। তাদের নিয়ন্ত্রণ করা তার সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। নিজের শারীরিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এখন তার একজন মাত্র সঙ্গীর মস্তিষ্ক ঠিক আছে। দৈহিক শক্তি তারও শেষ হয়ে গেছে।

যে দু'সঙ্গী কল্পনার বাগিচা ও নাচ-গানের পেছনে ছুটে চলছিলো, কয়েক পা এগিয়ে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পড়ারই কথা। দেহে তাদের আছেই বা কী। আন-নাসের ও সঙ্গী তাদেরকে বসিয়ে ধরে রাখে এবং গায়ের উপর কাপড় দিয়ে ছায়া দান করে। তাদের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। মাথা হেলে পড়েছে।

'তোমরা আল্লাহর সৈনিক'- আন-নাসের ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে শুরু করে- 'তোমরা প্রথম কেবলা ও কা'বা গৃহের প্রহরী। তোমরা ইসলামের দুশমনের কোমর ভেঙ্গেছো। কাফিররা তোমাদের ভয়ে ভীত ও কম্পিত। তোমরা মরণজয়ী মর্দে মুমিন। এই মরুভূমি, পিপাসা ও সূর্যের উত্তাপকে তোমরা কী মনে করছো? তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হচ্ছে। জান্নাতের ফেরেশতারা তোমাদের পাহারা দিচ্ছে। তোমাদের দেহ পিপাসার্ত হলেও আত্মা পিপাসার্ত নয়। ঈমানদাররা পানির শীতলতায় নয়- ঈমানের

শতীলতায় জীবিত থাকে।'

উভয়ে এক সঙ্গে চোখ খুলে আন-নাসেরের প্রতি তাকায়। আন-নাসের হাসবার চেষ্টা করে। আবেগের আতিশয্যে সে যে বক্তব্য প্রদান করে, তা ক্রিয়া করে বসেছে। উভয় সিপাহী কল্পনার জগত থেকে বাস্তব জগতে ফিরে আসে। তারা উঠে দাঁড়ায় এবং ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করে।

সকালে রওনা হওয়ার সময় তারা টিলা-পর্বতের যে খুঁটি ও মিনার দেখেছিলো, সেগুলো নিকটে এসে গেছে। এখন সেগুলো তখনকার তুলনায় অনেক বড় দেখাচ্ছে। ওখানে পানি থাকতে পারে আশা করা যায়। থাকতে পারে সমতল ভূমি ও খানা-খন্দক। আন-নাসের তার সঙ্গীদের বললো, আমরা পানির নিকটে এসে পড়েছি এবং আজ সন্ধ্যার আগেই পানি পেয়ে যাবো। তারা টিলা-পর্বতের আরো নিকটে পৌঁছে যায়। হঠাৎ এক সিপাহী চিৎকার করে ওঠে– 'আমি আমার গ্রামে এসে পড়েছি। আমি গিয়ে সকলের জন্য খাবার রান্না করি। আমার গ্রামের মেয়েরা কূপ থেকে পানি তুলছে।' বলেই সে দৌড়াতে শুরু করে।

তার পেছনে অপর সিপাহীও দৌড়াতে শুরু করে। হঠাৎ উপুড় হয়ে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে মুঠি করে মাটি ও বালি তুলে মুখে পুরে।

আন-নাসের ও তার তৃতীয় সঙ্গী দৌড়ে গিয়ে তার মুখ থেকে মাটিগুলো বের করে ফেলে। মুখটা পরিষ্কার করে তুলে দাঁড় করায়। কিন্তু তার হাঁটার শক্তি নেই। অপর সিপাহীও পড়ে যায় এবং উপুড় হয়ে পড়ে থেকে বলতে থাকে– 'কূপ থেকে পানি পান করে নাও। আমি তোমাদের জন্য খাবার রান্না করবো।'

আন-নাসের দু'আর জন্য দু'হাত একত্রিত করে আকাশপানে তুলে ধরে বলতে শুরু করে–

'মহান আল্লাহ্! আমরা তোমার নামে লড়তে ও মরতে এসেছিলাম। আমরা কোনো পাপ করিনি। আমরা দস্যু-তস্করও নই। কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করা যদি পাপের কাজ হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। হে মহান আল্লাহ! আমার জীবনটা তুমি নিয়ে নাও। আমার দেহের রক্তকে পানি বানিয়ে দাও। সে পানি পান করে আমার সঙ্গীরা বেঁচে থাকুক। তারা তোমার রাসূলের প্রথম কেবলা জবর-দখলকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমার রক্তকে পানি বানিয়ে তুমি তাদের পান করাও।'

আন-নাসেরের সঙ্গীরা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় এবং অন্ধের ন্যায় হাত

আগে বাড়িয়ে দিয়ে এমনভাবে হাঁটতে শুরু করে, যেনো তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আন-নাসের ও তার চেতনাসম্পন্ন সঙ্গীদের হাঁটতে দেখে তারাও উঠে পা টেনে টেনে এগুতে শুরু করে। হঠাৎ আন-নাসেরের চোখও ঝাপসা হয়ে আসে। অন্যদের ন্যায় সেও সবুজ-শ্যামলিমা দেখতে শুরু করে। আন-নাসের বুঝে ফেলে, মরুভূমি তাকেও ধোঁকা দিতে শুরু করেছে।

❖ ❖ ❖

আন-নাসের অনেকগুলো টিলার মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে। এই টিলাগুলো বেশ চওড়া। কোনটিই তেমন উঁচু নয়। কোথাও বালুকাময় প্রান্তরও চোখে পড়ছে।

আন-নাসের সামনে এবং তার সঙ্গী পেছনে পেছনে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে আন-নাসের হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। তারা দূর থেকে যে খুঁটি ও মিনার দেখেছিলো, সেগুলো এখন সরাসরি তার চোখের সামনে। এক স্থানে দু'টি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। তারই সন্নিকটে দু'টি মেয়ে বসে আছে। তারা উঠে দাঁড়ায়। মেয়েগুলোর বর্ণ গৌর এবং দেহের রূপ-কাঠামো আকর্ষণীয়।

আন-নাসের খানিক দূরে দাঁড়িয়ে গিয়ে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে– 'তোমরা কি দু'টি ঘোড়া আর দু'টি মেয়ে দেখতে পাচ্ছো?'

তার যে দুই সঙ্গী অলীক কল্পনার শিকার হয়েছিলো, তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। একজন বললো– 'না, কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।'

আন-নাসেরের যে সঙ্গীর মানসিক অবস্থা এখনো ঠিক আছে, সে অস্ফুট স্বরে ললো– 'হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'আল্লাহ আমাদের দয়া করুন'– আন-নাসের বললো– 'আমাদের দু'জনেরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমরাও অবাস্তব বস্তু দেখতে শুরু করেছি। জাহান্নামসম এই বিরানভূমিতে এমন রূপসী নারী আসতে পারে না।'

'তাদের পোশাক-আশাক যদি মরু যাযাবরদের ন্যায় হতো, তাহলে বুঝতাম, এটা কল্পনা নয়, বাস্তব'– আন-নাসেরের সঙ্গী বললো– 'চলো, সামনে গিয়ে গাছের ছায়ায় বসে পড়ি। ওরা মেয়ে নয়। এটা আমাদের মানসিক দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ।'

'কিন্তু আমার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে'– আন-নাসের বললো– 'আমি তোমাকে চিনতে পারছি। তুমি যা যা বলেছো, আমি বুঝে ফেলেছি। আমার মস্তিষ্ক এখনো নিয়ন্ত্রণে আছে।'

'আমারও হুঁশ আছে'– সঙ্গী বললো– 'আমরা কি সত্যিই মেয়ে দেখছি, নাকি ওরা জিন-পরী।'

মেয়েগুলো একইভাবে মূর্তির ন্যায় তাদের প্রতি তাকিয়ে আছে। আন-নাসের সাহসী মানুষ। সে ধীরে ধীরে মেয়েগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। মেয়েরা অদৃশ্য হলো না। তারা এখন আন-নাসেরের হাত পাঁচেক দূরে। মেয়েদের একজন অপরজনের তুলনায় বয়সে বড়। এমন রূপসী মেয়ে আন-নাসের জীবনে আর দেখেনি। মাথার ওড়নার ফাঁক দিয়ে যে ক'টি চুল কাঁধের উপর পড়ে আছে, সেগুলো সরু রেশমের ন্যায় মনে হলো। উভয় মেয়ের চোখের রংও বেশ চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর। চোখগুলো মুক্তার ন্যায় ঝিকমিক করছে।

'তোমরা সৈনিক'– বড় মেয়েটি বললো– 'তোমরা কার সৈনিক?'

'সবই বলবো'– আন-নাসের বললো– 'তার আগে বলো, তোমরা মরুভূমির ধাঁ ধাঁ নাকি জিন-পরী?'

'আমরা যাই হই না কেনো, আগে বলো তোমরা কারা এবং এদিকে কী করতে এসেছো?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে– 'আমরা মরুভূমির ধাঁ ধাঁ নই। তোমরা আমাদের দেখতে পাচ্ছো, আমরাও তোমাদের দেখছি।'

'আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর গেরিলা সৈনিক'– আন-নাসের বললো– 'পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছি। তোমরা যদি জিন-পরী না হয়ে থাকো, তাহলে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দোহাই, আমার এই সঙ্গীদের পানি পান করাও এবং তার বিনিময়ে আমার জীবন নিয়ে নাও। এটা আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।'

'অস্ত্রগুলো আমাদের সামনে রেখে দাও'– মেয়েটি বললো– 'হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নামে প্রার্থিত বস্তু আমরা না দিয়ে পারি না। তোমার সঙ্গীদের ছায়ায় নিয়ে আসো।'

আন-নাসের তার অস্তিত্বে একটি ঢেউ খেলে গেছে বলে অনুভব করে, যেনো ঢেউটি মাথা দিয়ে প্রবেশ করে পা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধকারী জানবাজ। তার সকল গেরিলা আক্রমণ সঙ্গীদের অবাক করে তুলতো। কিন্তু এই মেয়ে দু'টোর সামনে সে কাপুরুষ হয়ে গেছে। তার মনে এমন একটা ভীতি চেপে বসেছে, যা পূর্বে কখনো অনুভব করেনি। সে জিন-পরীর গল্প শুনতো; কিন্তু কখনো জিনের মুখোমুখি হয়নি। প্রতি মুহূর্তেই তার আশংকা ছিলো, মেয়ে দু'টো এবং ঘোড়গুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে কিংবা আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলবে। তখন সে কিছুই করতে পারবে না। আন-নাসের মেয়েগুলোর সামনে অসহায় হয়ে পড়ে। সে তার সঙ্গীদের বললো– 'তোমরা ছায়ায় চলে আসো।' তাদের একজন অচেতন পড়ে ছিলো। তাকে টেনে

ছায়ায় নিয়ে আসা হলো।

'বলো, তোমরা কী করতে এসেছো?' –মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'পানি পান করাও'– আন-নাসের অনুনয়ের সাথে বললো– 'শুনেছি, জিনরা যখন-তখন যে কোনো বস্তু উপস্থিত করতে পারে।'

'ঘোড়ার সঙ্গে মশক বাঁধা আছে'– মেয়েটি বললো– 'একটি খুলে নাও।'

আন-নাসের একটি ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা মশক খুলে হাতে নেয়। মশকটি পানিতে পরিপূর্ণ। সবার আগে তার অচেতন সঙ্গীর মুখে পানির ছিটা দেয়। পানির ছোয়া পেয়ে সে চোখ খোলে এবং ধীরে ধীরে উঠে বসে। আন-নাসের মশকের মুখটা তার মুখের সঙ্গে লাগায়। সঙ্গীর সামান্য পানি পান করার পর মশক সরিয়ে নেয়। আন-নাসের তাকে বেশি পানি পান করতে দেয়নি। ভীষণ পিপাসার পর বেশি পানি পান করা ক্ষতিকর। তারপর একজন একজন করে প্রত্যেকে পানি পান করে। সবশেষে আন-নাসের নিজে পানি পান করে। তার মস্তিষ্ক পরিস্কার হয়ে গেছে। এবার তার ভাবনা হচ্ছে, এই মেয়েগুলো যদি বাস্তব না হয়ে তার কল্পনা হতো, তাহলে মস্তিষ্ক পরিস্কার হওয়ার পর এখন তারা অদৃশ্য হয়ে যেতো। কিন্তু তাতো হয়নি। মেয়েগুলো এখানো যথাস্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, পরিস্কার হওয়ার আগে মেয়েগুলোর ন্যায় মশকভর্তি পানিও দেখেছিলো। সেই পানি তার সঙ্গীরা এবং সে নিজে পান করে চাঙ্গা হয়ে ওঠেছে। বিষয়টা যদি অলীক অল্পনা হতো, তাহলে পানি পান করাই সম্ভব হতো না। সব মিলিয়ে আন-নাসের নিশ্চিত যে, সে যা দেখছে, বাস্তব দেখছে। সে মেয়েগুলোর প্রতি তাকায় এবং গভীরভাবে নিরিক্ষা করে। এবার তাদেরকে পূর্বের তুলনায় আরো রূপসী মনে হলো, যেনো তারা মানুষ নয়।

আন-নাসেরের নিজের উপরই নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সে অনুভব করছে, নিজের ইচ্ছায় কিছু ভাববার শক্তি তার নেই। তার সঙ্গীদের চেহারায় জীবন ফিরে এসেছে। এটা সেই যৎসামান্য পানির সুফল, যা তাদের দেহে অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু আন-নাসেরের ন্যায় তাদের উপরও ভীতি চেপে বসেছে। মেয়েগুলো চুপচাপ তাদের প্রতি তাকিয়ে আছে। বাইরের জগত আগুনে জ্বলছে। মাটি এমন অগ্নিশিখা উদগীরণ করছে, যা অনুভব করা যাচ্ছে– দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা যে স্থানটিতে বসে আছে, সেটি এই উত্তাপ থেকে নিরাপদ।

বড় মেয়েটি আন-নাসেরের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয়। মধ্যমা ও শাহাদাত

অঙ্গুলী দ্বারা ঘোড়ার প্রতি ইংগিত করে বললো– 'ঐ থলেটা খুলে এনে সঙ্গীদের দাও।'

আন-নাসের ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা চামড়ার থলেটা এমনভাবে খুলে নিয়ে আসে, যেনো এই কাজটা সে কোনো জাদুর ক্রিয়ায় সম্পন্ন করেছে। থলেটি খুলে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। ভেতরে খেজুর ছাড়াও এমন সব খাবার রয়েছে, যা রাজা-বাদশারা খেয়ে থাকেন। আছে গোশতও। সে বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে মেয়েদের প্রতি তাকায়। বড় মেয়েটি বললো– 'খাও।'

আন-নাসের বস্তুগুলো তার সঙ্গীদের মাঝে বণ্টন করে দেয়। সকলের পেট আর পিঠ এক হয়ে ছিলো। তারা খেতে শুরু করে। মহামূল্যবান হলেও খাবার পরিমাণে কম, যা বড়জোর একজনের জন্য যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু তারা চারজনই পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। তাদের দেহ-মনে সজীবতা ফিরে আসে। এবার মেয়েগুলোর রূপ-সৌন্দর্য আগের তুলনায় আরো মনোহারী ও রহস্যময় হয়ে ওঠে।

'তোমরা আমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবে?'– আন-নাসের বড় মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে– 'জিন মানুষের তো মোকাবেলা হয় না। তোমরা আগুন আর আমরা মাটি। আল্লাহ্ আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা। তোমাদেরই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি বিবেচনা করে আমাদের প্রতি দয়া করো। তোমরা আমাদেরকে তুর্কমানের রাস্তায় তুলে দাও। তোমরা ইচ্ছে করলে তো মুহূর্তের মধ্যে আমাদেরকে তুর্কমান পৌঁছিয়ে দিতে পারো।'

'তোমরা কোথাও গেরিলা আক্রমণ করতে গিয়েছিলে কী?'– বড় মেয়েটি জিজ্ঞেস করে– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডো সেনারাও জিন হয়ে থাকে। বলো কোথায় গিয়েছিলে? কী করে এসেছো?'

আন-নাসের তার পুরো কার্যক্রমের বিবরণ প্রদান করে। তার বাহিনী যে বীরত্বপূর্ণ গেরিলা অভিযান পরিচালনা করে এসেছে এবং শত্রু পক্ষের কী কী ক্ষতিসাধন করেছে, সব বলে দেয়। তারপর ফেরত পথে কিভাবে পথ ভুলে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তারও বিবরণ প্রদান করে।

'তোমাদেরকে তোমাদের বাহিনীর শ্রেষ্ঠ সৈনিক বলে মনে হচ্ছে'– বড় মেয়েটি বললো– 'তোমাদের বাহিনীর সব সৈনিকই কি এ কাজ করতে পারে, যা তোমরা করেছো?'

'না'– আন-নাসের জবাব দেয়– 'আমাদেরকে তোমরা মানুষ মনে করো না। আমাদের ওস্তাদগণ আমাদেরকে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন, তা যে

কোনো সৈনিক সহ্য করতে পারে না। আমরা বনের হরিণের ন্যায় দৌড়াতে পারি। আমাদের চোখ বাজপাখির ন্যায় বহুদূর পর্যন্ত দেখতে সক্ষম এবং আমরা চিতার ন্যায় আক্রমণ করতে পারঙ্গম। আমরা কেউ চিতা দেখিনি। চিতা কী এবং কিভাবে আক্রমণ করে, ওস্তাদগণ আমাদের সেই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এই শারীরিক পারঙ্গমতা ছাড়াও আমাদের মস্তিষ্কও অন্যান্য সৈনিকের তুলনায় বেশী উন্নত ভাবনা ভাবতে পারে। শত্রুর দেশে গিয়ে কিভাবে তাদের সামরিক গোপন তথ্য বের করে আনা যায়, আমাদের ওস্তাদগণ আমাদেরকে সে বিদ্যাও শিক্ষাদান করেছেন। আমরা বেশ বদল করে ফেলি, কণ্ঠ পরিবর্তন করে ফেলি এবং অন্ধ হতে পারি। প্রয়োজন হলে আমরা চোখের অশ্রু ঝরাতে পারি এবং ধরা পড়ার আশংকা দেখা দিলে জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করি এবং বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি। আমরা বন্দী হই না– শহীদ হই।'

'আমরা যদি পরী না হতাম, তাহলে তোমরা আমাদের সঙ্গে কী আচরণ করতে?' –মেয়েটি প্রশ্ন করে।

'তোমরা বিশ্বাস করবে না'– আন-নাসের বললো– 'আমরা সেই পাথর, নারীর রূপ যাকে ভাঙ্গতে পারে না। আমি যদি নিশ্চিত হতে পারি যে, তোমরা মানুষ আর জানতে পারি, তোমরা পথ ভুলে এসেছো, তাহলে তোমাদের দু'জনকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নেবো। আমার ঈমানের ন্যায় তোমাদের মূল্যবান বিবেচনা করবো। কিন্তু তোমরা তো মানুষ নও। তোমাদের অবস্থাই বলছে, তোমরা মানুষ নও। তোমাদের ন্যায় মেয়ে এই ধরায় আসতে পারে না। তোমাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, আমাদেরকে আশ্রয় দাও।'

'আমরা মানুষ নই'– বড় মেয়েটি বললো– 'আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত ছিলাম। আমাদের জানা ছিলো, তোমরা পথ হারিয়ে ফেলেছো। তোমরা যদি গুনাহগার হতে, তাহলে যে বিজন মরু এলাকা অতিক্রম করে এসেছো, সেটি তোমাদের রক্ত চুষে নিতো এবং তোমাদের দেহের গোশ্‌তকে বালিতে পরিণত করে তোমাদের কংকর বানিয়ে ছাড়তো। এই মরূদ্যান কখনো পথভোলা পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করেনি। আমরা দু'জন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। তেমাদেরকে যেসব কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তা এই জন্য করতে হয়েছে, যাতে তোমরা খোদাকে ভুলে না যাও এবং তোমার অন্তর থেকে পাপের কল্পনাটুকুও বের হয়ে যায়। আমাদের ধারণা ছিলো, আমাদের ন্যায় রূপসী মেয়েদের দেখে তোমরা ক্ষুৎপিপাসার কথা

ভুলে যাবে এবং শয়তানের কব্জায় চলে যাবে।'

'তোমরা আমাদের সঙ্গ দিলে কেন?' আন-নাসের জিজ্ঞেস করে।

'আমাদেরকে তিনি প্রেরণ করেছেন, যিনি মরুভূমিতে পথভোলা নেক বান্দাদের পথের দিশা প্রদান করেন'– বড় মেয়েটি বললো– 'খোদা তোমাদের উপর যে রহমত বর্ষণ করেছেন, তোমরা তার হিসাব করতে পারবে না। তিনি আমাদের বলেছেন, মানুষ মৃত্যুর সময়ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। শয়তানের এই অপবিত্র কব্জা থেকে মুক্ত করার জন্য খোদা তোমাদের শাস্তিদান করেছেন। তারপর আমাদের আদেশ করেছেন, এদের সম্মুখে এসে পড়ো এবং এদেরকে আশ্রয় দান করো। আমরা জানতাম, তোমরা দুশমনকে কিভাবে এবং কী পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছো।'

'তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করলে কেনো?' আন-নাসের বললো।

'এটা দেখার জন্য যে, তুমি কতটা মিথ্যা বলো, আর কতটা সত্য'– মেয়েটি বললো– 'তুমি সত্যবাদী।'

'আমরা মিথ্যা বলি না'– আন-নাসের বললো– 'গেরিলা সৈনিকরা আল্লাহকে সাক্ষী বানিয়ে থাকে। আমরা নিজ বাহিনী ও সালারদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে থাকি, আল্লাহ আমাদের দেখছেন। আমরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারি না।' আন-নাসের নীরব হয়ে যায় এবং পরক্ষণেই বলে ওঠে– 'আচ্ছা, আমি যে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের সঙ্গে তোমরা কিরূপ আচরণ করবে, তার তো উত্তর দিলে না।'

'আমরা যে নির্দেশ লাভ করেছি, তার বিপরীত করতে পারি না'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'তোমাদের সঙ্গে আমাদের আচরণ মন্দ হবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। তোমাদের চোখে ক্লান্তি নেমে এসেছে ঠিক; কিন্তু মনের ভয় তোমাদেরকে ঘুমাতে দিচ্ছে না। অন্তর থেকে সব ভীতি দূর করে ফেলো এবং ঘুমিয়ে পড়ো।'

'তারপর কী হবে?' আন-নাসের জিজ্ঞেস করে।

'খোদা যা নির্দেশ করেন'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবো না। যদি পালাবার চেষ্টা করো, তাহলে এই খুঁটিগুলোর ন্যায় খুঁটিতে পরিণত হয়ে যাবে। তোমরা দূর থেকে এই খুঁটিগুলো দেখে থাকবে। এগুলোর উপরে কোন ছাদ নেই। দেখতে এগুলো মিনারের ন্যায়। কিন্তু আসলে এগুলো মানুষ– মানুষ ছিলো। যদি তোমাদেরকে আসল ব্যাপারটা দেখাবার অনুমতি থাকতো, তাহলে

বলতাম, এর কোনো একটি মিনারের গায়ে তরবারীর আঘাত হানো, দেখতে তার দেহ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।'

ভয়ে আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের চোখ কোঠর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়। তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

'এটা হলো পৃথিবীর জাহান্নাম'– মেয়েটি বললো– 'এদিকে সে আসে, যে পথ ভুলে যায় আর আগমন ঘটে তার, যে পথভোলা পথিককে পথ দেখায়। অন্য কাউকে এ পথে দেখা যায় না। তারা হরিণের ন্যায় সুদর্শন প্রাণী কিংবা আমাদের ন্যায় সুন্দরী মেয়ের রূপে এসে পথহারা পথিকের পথের সন্ধান দিয়ে থাকে এবং এই জাহান্নামের কষ্ট থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু মানুষ এতোই অসৎ যে, তীর ছুঁড়ে হরিণকে মেরে ফেলে তার গোশ্‌ত ভক্ষণ করে আর আমাদের মতো নারীদেরকে অসহায় মনে করে ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করার চেষ্টা করে। সে ভুলে যায়, তার জীবনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। এখন আর তার কোনো অন্যায় করা উচিত নয়। সে মেয়েদের প্রলোভন দেখায়, আমার সঙ্গে আসো; আমি তোমাকে বিয়ে করবো আর তুমি আমার হেরেমের রাণী হবে। এই মিনার আর খুঁটিগুলো এমনই মানুষ ছিলো। তবে তোমাদেরকে তাদের পরিণতি বরণ করতে হবে না। তোমরা শুয়ে পড়ো। আমাদের দেখে যদি তোমাদের মনে পাপ প্রবণতা জেগে উঠে, তাহলে সেই কামনাকেও ঘুম পাড়িয়ে রাখো। অন্যথায় তোমাদেরও সেই পরিণতি বরণ করতে হবে, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। মানুষের একটা দুর্বলতা যে, তারা পিতা-মাতার যে আনন্দের মাধ্যমে জন্মলাভ করে, তারই মোহে মোহাবিষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের এই দুর্বলতা বহু সম্প্রদায়ের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত মুছে দিয়েছে।'

মেয়েটির বলার ভঙ্গিতে যাদুর ক্রিয়া। তাকে এই জগতের মেয়ে বলে মনেই হচ্ছে না। তার বুকে আছে এক পবিত্র বার্তা। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা অভিভূত হয়ে পড়ে। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মেয়েটির বক্তব্য শুনতে থাকে। কিছুক্ষণ পর তারা ঝিমুতে শুরু করে এবং একজন একজন করে মাটিতে শুয়ে পড়ে।

আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটির প্রতি তাকায়। দু'জনই মুচকি হাসতে থাকে। তারা প্রশান্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

আন-নাসের যেভাবে তার মিশনে সাফল্য অর্জন করেছে, তেমনি তার বাহিনীও তাদের অভিযানে এক আক্রমণেই সফল হয়েছে। কিন্তু সেই সংবাদ

আন-নাসেরের জানা নেই। সুলতান আইউবী সম্মিলিত বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলেন। বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সাইফুদ্দীন রণাঙ্গন থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছেন। সুলতান আইউবী এখন তার এক সালার মুজাফফর উদ্দীনের অপেক্ষা করছেন। তাঁর আংশকা মুজাফফর উদ্দীন যদি রণাঙ্গনে থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই সে হামলা চালাবে। বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ তার সঙ্গে রয়েছে। সম্মিলিত বাহিনীর এই অংশটি যুদ্ধে অংশ নেয়ার সুযোগই পায়নি। এরা পরাজিত বাহিনীর অক্ষত রিজার্ভ বাহিনী। সুলতান আইউবী তাদের উপস্থিতির সংবাদ নিশ্চিতভাবে জানতেন না। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার আলোকে অনুভব করছিলেন, এখনো সমস্যা রয়েছে। তিনি তার গোয়েন্দাদেরকে রণাঙ্গনের চারদিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যাতে কোথাও কোনো ফৌজের সন্ধান পেলে যেনো সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবহিত করা হয়।

রণাঙ্গন থেকে দু'-আড়াই মাইল দূরে বন ও টিলা পরিবেষ্টিত সমতল ভূমি। সেখানকার তাঁবুতে বসে মুজাফফর উদ্দীন সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। বেশ কর্মব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন তিনি। ইত্যবসরে নায়েব সালার এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করে।

'নতুন কোনো খবর আছে?' মুজাফফর উদ্দীন জিজ্ঞেস করে।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীতে কোন পরিবর্তন আসেনি'– নায়েব সালার বললো– 'বিস্তারিত এর থেকে শুনুন। এ সবকিছু দেখে এসেছে।'

গুপ্তচর বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী এখনো আমাদের পালিয়ে যাওয়া বাহিনীর পরিত্যক্ত সামানপত্র আহরণ করেনি। শুধু তাদের নিহত ও আহতদের তুলে নিয়েছে। তাদের লাশের সঙ্গে আমাদের লাশগুলোও ভিন্ন ভিন্ন কবরে দাফন করছে।'

'মৃতদের নয়– জীবিতদের সংবাদ বলো'– মুজাফফর উদ্দীন বললেন– 'আইউবী কি তার বাহিনীতে কোনো রদবদল করেছেন? তার ডান বাহু সেখানেই আছে, নাকি এদিক-ওদিক হয়ে গেছে?'

'মহামান্য সালার!'– গুপ্তচর বললো– 'আমি সাধারণ সৈনিক নই। আমি আপনাকে যে রিপোর্ট প্রদান করছি, তা কিছু একটা বুঝে-শুনেই দিচ্ছি। আপনাকে সন্তুষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আপনার অসন্তোষকেও ভয় করি না। আমার উদ্দেশ্য ঠিক আপনারই ন্যায় যে, সুলতান আইউবীর

বিজয়কে পরাজয়ে পরিণত করতে হবে। আপনি খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে আছেন বলে মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়িই করতে হবে। তবে আপাতত অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত থাকুন। আমি যা বলছি, বলতে দিন। আমি জানি, আপনার দৃষ্টি সুলতান আইউবীর ডান পার্শ্বের উপর নিবদ্ধ। আপনার এই টার্গেট সঠিক। কিন্তু এই ডান পার্শ্বের উপর হামলা চালালে আইউবী তার অন্যান্য অংশগুলোকে কিভাবে কাজে লাগাবে, আমি তাও পর্যবেক্ষণ করে দেখে এসেছি।'

'তিনি আমাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবেন'- মুজাফফর উদ্দীন বললেন- 'ঘেরাও বিস্তৃত রাখবেন। আমাদেরকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরে ধীরে ধীরে ঘেরাও ছোট করে ফেলবেন। আমি তার কৌশল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি।'

সালাহুদ্দীন আইউবী যে ইউনিটগুলো দ্বারা আমাদের কাল্‌বের উপর আক্রমণ করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তাদেরকে গুটিয়ে নিয়ে সম্মুখের বাহিনীর এক ক্রোশ দূরে প্রস্তুত রেখেছেন। আপনি ঠিকই ধরেছেন যে, আইউবী আমাদের আক্রমণকারী বাহিনীকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবেন। সুলতান আইউবীর ডান বাহু যে স্থানটিতে অবস্থিত, তার থেকে এক-দেড় ক্রোশ পেছনে আমাদের ও আইউবীর সৈন্যদের জন্য কবর খনন করা হয়েছে। তার সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার হবে- দেড় হাজার গর্ত। আপনি তো জানেন, কবরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা কতটুকু হয়ে থাকে। আপনি এমন একদিক থেকে হামলা করবেন, যাতে আইউবীর বাহিনী পিছনে সরে যেতে বাধ্য হয়। আপনি তাদেরকে কবরগুলোর নিকটে নিয়ে যাবেন। হাতাহাতি লড়াই করার পরিবর্তে কবরের নিকট চলে যেতে বাধ্য করবেন। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, ঘোড়া উন্মুক্ত কবরে কিভাবে নিক্ষিপ্ত হবে।'

'আইউবীর ডান বাহুর শক্তি কতটুকু এবং কী প্রকৃতির?' মুজাফফর উদ্দীন জিজ্ঞেস করে।

'অন্তত এক হাজার অশ্বারোহী এবং দেড় হাজার পদাতিক'- গুপ্তচর কমান্ডার উত্তর দেয়- 'এই বাহিনী প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। আপনি তাদেরকে তাদের অজান্তে হামলা করতে পারবেন না।' সে মুজাফফর উদ্দীনের সম্মুখস্থ নকশাটির এক স্থানে আঙ্গুল রেখে বললো- 'এই হলো দুশমনের (আইউবীর) ডান বাহু। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে এর বিস্তৃতি আটশ কদম। তার সম্মুখের জমি খানাখন্দকে পরিপূর্ণ। ডানের এলাকা সমতল ও পরিচ্ছন্ন।

আক্রমণের জন্য এই পথটি উপযুক্ত মনে হয়। কিন্তু হামলা করতে হবে সম্মুখ থেকে। তাহলে দুশমন পেছনে সরে যেতে বাধ্য হবে।'

'আমার আক্রমণ সামনের পরিত্যক্ত রাস্তা থেকেও হবে, ডানদিকে থেকে পরিচ্ছন্ন রাস্তা থেকেও'- মুজাফফর উদ্দীন বললেন- 'আমি কবরের গর্ত এবং মাটির স্তূপকেই কাজে লাগাবো।' তিনি তার নায়েব সালারদের বললেন- 'যে কোনো স্থানে কাউকে পেলে ধরে নিয়ে আসবে। এই অঞ্চল এখন যুদ্ধকবলিত। এদিক থেকে কোনো পথিক পথ অতিক্রম করবে না। এই পথে সে-ই পা রাখবে, যে কোনো না কোনো পক্ষের গুপ্তচর।'

'দু-জন পথিক। বোধ হয় তারা জানে না, এই অঞ্চলটা এখন যুদ্ধকবলিত। একজন উটের পিঠে সাওয়ার পাকা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ। উটের উপর কিছু মালপত্রও বোঝাই করা। অপরজনের হাতে উটের লাগাম। দু'জনেরই পরনে সাদাসিধে পোশাক। তারা সেই পথে অতিক্রম করছে, যেখান থেকে মুজাফফর উদ্দীনের লুকিয়ে থাকা সৈন্যদের দেখা যাচ্ছে। এক সিপাহী তাদের ডাক দেয়। তারা থামেনি। তাদের গতি আরো তীব্র হতে থাকে। মুজাফফর বাহিনীর এক অশ্বারোহী তাদের পিছু নিলে তারা দাঁড়িয়ে যায়। অশ্বারোহী তাদেরকে তার সঙ্গে যেতে বলে।

'আমরা পথিক'- যুবক বললো- 'আপনাদের তো আমরা কোনো ক্ষতি করছি না। আমাদের যেতে দিন।'

'এই পথে যেই যাবে, তাকেই ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আছে।' অশ্বারোহী বললো এবং তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো।

ধৃতদের একটি তাঁবুর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে তাঁবুতে সংবাদ দেয়া হলো। এক কমান্ডার বেরিয়ে এসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে- তোমরা কোথা থেকে এসেছো? তাদের উত্তরে কমান্ডার নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। কিন্তু তাদের বলা হলো, তোমাদেরকে সম্মুখে যেতে দেয়া হবে না। তোমাদেরকে বন্দী করবো না, সম্মানের সঙ্গে রাখা হবে। তবে কতদিন পর্যন্ত এখানে রাখা হবে- এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলো না।

এরাই প্রথম পথচারী, যাদেরকে মুজাফফর উদ্দীনের নির্দেশে আটক করা হলো। তাদেরকে দু'জন সিপাহীর হাতে তুলে দেয়া হলো। তারা তাদের তাঁবুতে অবস্থান করবে।

মধ্যরাত। ধৃত পথিকদের পাহারাদার সিপাহীদ্বয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ জেগে আছে। তাঁবুতে কোন আলো নেই। বৃদ্ধ নাক ডাকার

শব্দ পেয়ে বুঝে ফেলে সিপাহী ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তার সঙ্গীকে চিমটি মারে। দু'জন শুয়ে শুয়েই দরজার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দরজার নিকট পৌঁছেই তারা দাঁড়িয়ে যায় এবং বেরিয়ে পড়ে। বাইরে পিনপতন নীরবতা। তারা পালাতে শুরু করে। তাঁবু থেকে খানিক দূরে পৌঁছে বৃদ্ধ তার সঙ্গীকে বললো– 'তুমি আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও এবং অন্য এক দিক দিয়ে ছাউনি এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও।'

দু'জন আলাদা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিলো, সমগ্র ক্যাম্পই ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু এই ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। প্রহরী জেগে আছে। এক প্রহরী অন্ধকারে ছায়ার নড়াচড়া দেখে কিছু না বলে ছায়ার পিছু ছুটতে শুরু করে।

লোকটি বৃদ্ধ পথিক। প্রহরীকে দেখে সে একস্থানে লুকিয়ে যায়। প্রহরী এগিয়ে এসে তাকে খুঁজতে শুরু করে। সেই জায়গায় কিছু মালামাল ছিলো। বৃদ্ধ তারই আড়ালে লুকিয়ে থাকে। পরে অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ে।

তেমনি অপর এক প্রহরী বৃদ্ধের সঙ্গীকে দেখে ফেলে। গোয়েন্দাদের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখার এবং গ্রেফতার করার কঠোর নির্দেশ মুজাফফর উদ্দীনের। তিনি জানেন, সুলতান আইউবীর গুপ্তচররা অত্যন্ত চৌকস ও তীব্র গতিসম্পন্ন। তাই মুজাফফর উদ্দীনের এই প্রহরীদ্বয় কর্তব্য পালনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। উভয়ে চুপচাপ আপন আপন শিকার ধরার জন্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধের সঙ্গীও চুপ হয়ে আছে। এদিকে বৃদ্ধ এক প্রহরীর সঙ্গে কানামাছি খেলে বেড়াচ্ছে। খানিক পর বৃদ্ধ অপর এক জায়গায় লুকিয়ে যায়। প্রহরী তার পেছন পেছন আসছে। বোকা প্রহরী তার বৃদ্ধ শিকারকে ফেলে সামনে এগিয়ে যায়। বৃদ্ধ খঞ্জর হাতে নেয়। নিজের মুক্তির জন্য খঞ্জরাঘাতে প্রহরীকে খতম করার পরিকল্পনা করে। সে উঠে দাঁড়ায়। আঘাত হেনে পালাবে কোন্ পথে ভাবছে মাত্র। ঠিক এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি তার নিকটে এসে দাঁড়িয়ে যায়। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বৃদ্ধ খঞ্জরটা তারই হৃদপিণ্ডে সেঁধে দেয়। পরক্ষণেই দ্বিতীয় আঘাত হানে। লোকটি ক্ষীণ একটি শব্দ করেই নীরব হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

বৃদ্ধ সেখান থেকে পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু অকস্মাৎ কে একজন পেছন থেকে তাকে ঝাঁপটে ধরে। বৃদ্ধ নিজেকে ছাড়াবার জন্য সজোরে এমন ঝটকা টান মারে যে, লোকটি পড়ে যায়। নিজে দ্রুত পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু

দৌঁড়াতে গিয়ে কি একটা বস্তুর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। বৃদ্ধ যাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে এসেছে, সে উঠে দাঁড়ায়। সে দ্রুত ছুটে এসে আবারো বৃদ্ধকে ঝাঁপটে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক-চিৎকার শুরু করে দেয়। সাথে সাথে কয়েকটি প্রদীপ জ্বলে ওঠে। তিন-চারজন প্রহরী ছুটে আসে। তারা প্রদীপের আলোতে দেখতে পায়, তাদের শিকার একজন শশ্রুমণ্ডিত বয়োঃবৃদ্ধ। কিন্তু তাদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লোকটি এমন শক্তি প্রদর্শন করছে, যা এই বয়সে তার মধ্যে থাকার কথা নয়। প্রহরীদের কবল থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়নি। ধস্তাধস্তির ফলে তার মুখে সাদা দাড়ি উপড়ে যায়। সকলে দেখতে পায় তার মুখমণ্ডলে খোঁচা খোঁচা কালো দাড়ি। লোকটি বলিষ্ঠ নওজোয়ান। সাদা দাড়ি কৃত্রিম। শুভ্র শশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ এখন টগবগে যুবক।

এই যুবক যে স্থানে খঞ্জরের আঘাতে এক প্রহরীকে হত্যা করে এসেছে, ধরে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রদীপের আলোতে সবাই দেখলো, নিহত লোকটি মুজাফফর উদ্দীনের প্রহরী নয়– হত্যাকারী যুবকেরই সঙ্গী। মুখোশধারী বৃদ্ধ প্রহরী মনে করে তারই সঙ্গীকে খুন করে ফেলেছে। তারা দু'জন আলাদা আলাদাভাবে ক্যাম্প থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু প্রহরীরা তাদেরকে দেখে ফেলেছে। প্রহরীদের ধাওয়া থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় ঘটনাক্রমে একত্র হয়ে গিয়েছিলো। বৃদ্ধ তারই সঙ্গীকে প্রহরী মনে করে খঞ্জর দ্বারা আঘাত হানে। পরপর দু'টি আঘাতে যুবক প্রাণ হারায়।

লাশের অনুসন্ধান নেয়া হলো। তার পোশাকের ভেতর থেকে খঞ্জর বেরিয়ে আসে। তাদের উটের পিঠে যে বোঝাটি ছিলো, সেটি খোলা হলো। তাতে কোন মালপত্র নেই। বস্তার ভেতরে ঘাস ভরে রাখা আছে।

ধৃত ব্যক্তিকে এক নায়েব সালারের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। নায়েব সালার ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তিনি লোকটিকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো কথা বের হচ্ছে না। তার মুখের কৃত্রিম সাদা দাড়িগুলো নায়েব সালারকে দেখানো হলো। এ ব্যাপারেও সে কোনো মন্তব্য করলো না। কিন্তু এটা তো একটা জ্বলন্ত প্রমাণ, যা সে অস্বীকার করতে পারে না। তাকে বলা হলো, তুমি স্বীকার করো– তুমি এবং তোমার সঙ্গী সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। কিন্তু এই অভিযোগ স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায় সে। তাকে বেদম প্রহার করা হলো। তাঁকে অস্থির করে তোলা হলো। তারপরও সে স্বীকার করলো না সে গুপ্তচর। রাত কেটে যায়। সকালে তাকে মুজাফফর উদ্দীনের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো এবং তাকে রাতের ঘটনা

শোনানো হলো। তার কৃত্রিম দাড়ি এবং সামানপত্রও মুজাফফর উদ্দীনের সম্মুখে রাখা হলো।

'কার শিষ্য?'– মুজাফফর উদ্দীন জিজ্ঞেস করেন– 'আলী বিন সুফিয়ানের, নাকি হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর?'

'আমি এদের একজনকেও চিনি না।' ধৃত ব্যক্তি জবাব দেয়।

'আমি দু'জনকেই জানি'– মুজাফফর উদ্দীন বললেন– 'আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শিষ্য। ওস্তাদ তার শিষ্যকে ধোঁকা দিতে পারে না।'

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকেও চিনি না, আপনি কে তাও জানি না।' ধৃত ব্যক্তি জবাব দেয়।

'শোনো হতভাগ্য বন্ধু!'– মুজাফফর উদ্দীন তার কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করবো না। আমি এ কথাও বলবো না, তুমি অযোগ্য বা অকর্ম। তুমি বেশ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছো। ধরা পড়া কোনো দোষের নয়। তোমার জন্য দুর্ভাগ্য যে, তোমার সঙ্গী তোমারই হাতে খুন হলো। তুমি আমাকে শুধু এটুকু বলো, এ পথে তোমার আর কোনো সঙ্গী ছিলো কিনা এবং সালাহুদ্দীন আইউবীকে সংবাদ দিয়েছে কিনা যে, এখানে ফৌজ আছে? আর বলো, তোমাদের ফৌজের বিন্যাস কিরূপ এবং বাহিনী কোথায় কোথায় আছে? তুমি আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। আমি তোমাদের কুরআনের নামে ওয়াদা দিচ্ছি, যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্র তোমাকে মুক্তি দেবো। আর সে পর্যন্ত তোমাকে সম্মানের সাথে রাখবো।'

'আপনার শপথে আমার কোনো আস্থা নেই'– ধৃত ব্যক্তি জবাব দেয়– 'কারণ, আপনি কুরআন থেকে সরে এসেছেন।'

'কেনো, আমি কি মুসলমান নই?' মুজাফফর উদ্দীন ধৈর্যের সাথে জিজ্ঞেস করেন।

'আপনি মুসলমান নিশ্চয়ই'– ধৃত ব্যক্তি জবাব দেয়– 'তবে আপনি কুরআনের নয়, ক্রুশের অফাদার।'

'তুমি আমাকে অপমান করছো'– মুজাফফর উদ্দীন বললেন– 'কিন্তু একটি শর্তে আমি এই অপমান সয়ে নেবো যে, আমি যা জানতে চেয়েছি, বলে দাও। তোমার জীবন এখন আমার হাতে।'

'আল্লাহর হাত থেকে আপনি আমার জীবন ছিনিয়ে নিতে পারবেন না'– ধৃত ব্যক্তি বললো– 'আপনি তো জানেন, আমাদের প্রত্যেক সৈন্য নিজেদের জীবন আল্লাহর হাতে তুলে দিয়ে যুদ্ধ করে। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি,

আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর এবং আমার সঙ্গীও গুপ্তচর ছিলো। আপনার আর কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না। আমি জীবিত আছি। আপনি আমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলুন। তারপরও আমার মুখ থেকে আপনার কাঙ্খিত প্রশ্নগুলোর উত্তর বের হবে না। আমি আপনাকে এও বলে রাখছি, পরাজয় আপনারই কপালে লিবিবদ্ধ হয়ে আছে।'

'লোকটার পায়ের সঙ্গে রশি বেঁধে ঐ গাছটার সঙ্গে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখো।' মুজাফফর উদ্দীন একটি গাছের দিকে ইশারা করে নির্দেশ দিয়ে আপন তাঁবুতে ফিরে যান।

❖ ❖ ❖

'তারা দু-জন তো এখনো আসলো না'– হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলছিলেন– 'ওদের তো ধরা পড়ার কোন আশংকা ছিলো না। এখানে আমাদের গুপ্তচরদের ধরার মতো কারা আছে। তাদের বেশি দূরেও তো যাওয়ার কথা ছিলো না।'

'হয়তো বা তারা ধরা পড়ে গেছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যখন তারা সকালে গিয়ে সন্ধ্যার পরও এসে পৌঁছলো না, তো তারা ধরাই পড়ে গেছে। তাদের না আসাই প্রমাণ করে, এখানে ধরার মতো লোক আছে। রাতে আরো কিছু লোক পাঠিয়ে দাও। তারা আরো খানিক দূরে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসুক।'

সুলতান আইউবী ও হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সেই দুই গুপ্তচরের কথাই বলছিলেন। আইউবী সবসময় তার গোয়েন্দা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেছেন এবং এই ব্যবস্থারই দিক-নির্দেশনায় দুশমনকে নাকাকি-চুবানি খাইয়েছেন। কিন্তু এবার তার সেই ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে চলেছে। কারণ হচ্ছে, এখানকার যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষ তারই শিষ্য মুজাফফর উদ্দীন। গত রাতে তুর্কমানের কিছু দূরে এক বিজন এলাকায় আইউবীর এক গোয়েন্দার লাশ পাওয়া গেছে। তার পাজরে তীর গাঁথা ছিলো। মুজাফফর উদ্দীন তার নায়েব সালারদের বলেছিলেন– 'তোমরা যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারো, তাহলে তিনি অন্ধ ও বধির হয়ে যাবেন। তারপর তোমরা তাকে পরাজিত করার কথা ভাবতে পারবে।'

এখন আবার তার দু'জন গোয়েন্দা নিখোঁজ হয়ে গেলো। এ দু'টি ঘটনাকে সুলতান অবহেলা করতে পারেন না। তার নির্দেশে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ ছয়জন কমান্ডো গোয়েন্দা রওনা করিয়ে দেন।

রাতের শেষ প্রহর। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ফজরের আযানের প্রথম ধ্বনি 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিত হওয়ামাত্র সুলতান আইউবীর চোখ খুলে যায়। তিনি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসেন। খাদেম প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁর তাঁবুর সম্মুখে রেখে দেয়। ওদিক থেকে এক আরোহী ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে আসে। লোকটি সুলতানের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে ঘোড়া থেকে অবতরণ করে বললো– 'সুলতানের মর্যাদা বুলন্দ হোক। আপনার বাহিনীর ডান পার্শ্ব যে স্থানে অবস্থান করছে, তার সম্মুখে অন্য কোনো বাহিনীর পদচারণা লক্ষ্য করা গেছে। খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য দু'জন লোক এগিয়ে গিয়েছিলো। তারা তথ্য নিয়ে এসেছে যে, বাহিনী আসছে।'

সুলতান আইউবী তার কেন্দ্রীয় কমান্ডের সালারদের নাম উল্লেখ করে বললেন, ওদেরকে ডেকে আনো। তিনি তায়াম্মুম করেন। তার কাছে অজু করার মতো সময় নেই। তারপর জায়নামায বিছানো ছাড়াই কেবলামুখী হয়ে সেখানেই নামায আদায় করেন। শেষে সংক্ষিপ্ত দু'আ করে ঘোড়া তলব করেন।

'এই বাহিনী মুজাফফর উদ্দীন ছাড়া আর কারো হতে পারে না'– সুলতান আইউবী তার সালারদের বললেন– 'এরা খৃস্টান হতে পারে না। এই তথ্য যদি সত্য না হয় যে, দুশমন আমাদের ডান পার্শ্বের বাহিনীর সম্মুখ দিক থেকে আসছে, তাহলে হামলাটা হবে দু'তরফা। আমাদের কোনো ইউনিটকে পিছু হটতে দেয়া যাবে না। পেছনে দেড় হাজার কবরের গর্ত। এখানো সব লাশ দাফন করা হয়নি। অন্যথায় এইসব গর্ত আমাদের অশ্বারোহীদের কবরে পরিণত হবে।'

সুলতান আইউবী ঘোড়ায় আরোহন করেন। তার রক্ষী বাহিনীর বারজন সেনা তার পেছনে রওনা দেয়। তারাও অশ্বারোহী। তিনি আধা ডজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূতও সঙ্গে নিয়ে নেন। সাথে আছে দু'জন সালারও। ঘোড়া হাঁকিয়ে তিনি এমন একটি টিলার উপর আরোহন করেন, যেখান থেকে তাঁর বাহিনীর ডান পার্শ্বের সম্মুখের এলাকা ও তার বাহিনীকে দেখা যায়। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করলে তিনি টিলার উপর থেকে অবতরণ করে ডান পার্শ্বের বাহিনীগুলোর কমান্ডারদের নির্দেশ দেন– 'আরোহীদেরকে ঘোড়ায় আরোহন করাও। পদাতিকদের মধ্যে যারা তীরান্দাজ, তাদেরকে সম্মুখস্থ অঞ্চলের খানা-খন্দকে ও উঁচু পাথরের আড়ালে গিয়ে মোর্চা তৈরি করতে বলো।'

'এখন থেকে ডান পার্শ্বের সবক'টা ইউনিটের সর্বোচ্চ কমান্ড আমার হাতে থাকবে'– সুলতান আইউবী তার কমান্ডার ও নায়েব সালারদের বললেন– 'যার যার দূতকে সঙ্গে রাখো এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলো।'

মুজাফফর উদ্দীনের বাহিনী এখানো এতো নিকটে এসে পৌঁছায়নি যে, তারা সুলতান আইউবীর বাহিনীর তৎপরতা দেখতে পাবে।

মুজাফফর উদ্দীনের অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ করে। কিন্তু যেইমাত্র তার প্রথম অশ্বারোহী ইউনিটটি সুলতান আইউবীর বাহিনীর সম্মুখস্থ এলাকায় এসে পৌঁছে, সঙ্গে সঙ্গে তার সেনানিবাস লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এলাকাটা অসংখ্য খাদ আর স্তূপের ন্যায় পাথর খণ্ডে পরিপূর্ণ। এসব খানা-খন্দকেই সুলতান আইউবীর তীরান্দাজরা বসে আছে। মুজাফফর উদ্দীনের বাহিনী এসে পৌঁছামাত্র উপর দিয়ে অতিক্রমকারী ধাবমান ঘোড়ার উপর তীর ছুঁড়তে শুরু করে। তীরের আঘাত খেয়ে আরোহীরা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে আরম্ভ করে। যখনই যে ঘোড়ার গায়ে তীর বিদ্ধ হচ্ছে, সেটি বেশামাল হয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করে। সাধারণত এমনটি যে কোনো যুদ্ধেই হয়ে থাকে। মুজাফফর উদ্দীনের জন্য এই পরিস্থিতি বিস্ময়কর কোনো ঘটনা নয়। তার অস্থিরতার কারণ হচ্ছে, তার আশা ছিলো, তিনি সুলতান আইউবীর অজান্তে ও অলক্ষ্যে হামলা করবেন। কিন্তু তার সেই আকাঙ্খার বিপরীতে আইউবীর ডান বাহুর সৈন্যরা সচেতন এবং মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত। এই সংঘাতে সুলতান আইউবীর অসংখ্য তীরান্দাজ ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা গেছে। সৈন্যদের এই ত্যাগের বিনিময়ে সুলতান আইউবীর উপকার এই হলো যে, মুজাফফর উদ্দীনের আক্রমণের তীব্রতা শেষ হয়ে গেছে। এরপর তিনি স্থির হয়ে লড়াই করতে পারবেন। মুজাফফর উদ্দীন যে আশা নিয়ে ময়দানে এসেছিলো, তা পূর্ণ হবে না। তার আশা ছিলো তিনি সুলতান আইউবীর উপর অতর্কিত হামলা চালাবেন এবং আইউবীকে তার কৌশলের ফাঁদে ফেলে পরাস্ত করবেন। কিন্তু তিনি যতোই কুশলী হোন, আইউবী তাঁর ওস্তাদ। ওস্তাদের বিদ্যার কাছে ছাত্রের বিদ্যা হার মানতে বাধ্য। সুলতান আইউবীর নিকট আসার পর মুজাফফর উদ্দীনের বিদ্যা ও কৌশল প্রথমবারের মতো হার মানতে বাধ্য হয়।

সুলতান আইউবীর কিছুসংখ্যক তীরান্দাজ মুজাফফর উদ্দীনের ঘোড়ার পদতলে পড়ে জীবন কুরবান করে দেয়। তাদের এই কুরবানীতে সুলতান

আইউবী লাভবান হন। মুজাফফর উদ্দীনের আক্রমণকারী বাহিনী কিছুসংখ্যক ঘোড়া ও তাদের আরোহীদের নিহত ফেলে সম্মুখে এগিয়ে যায়। সম্মুখে সুলতান আইউবী স্বয়ং। আক্রমণকারীদের বিস্তার দেখে সে অনুপাতে নিজ সৈন্যদের নির্দেশ প্রদান করেন। আক্রমণকারী বাহিনী নিকটে এসে পৌঁছলে সুলতান আইউবীর বাম বাহুর অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের ঘোড়াগুলোকে বামদিকে ঘুরিয়ে ছুটতে শুরু করে। ডান বাহুর অশ্বারোহী সৈন্যরাও তা-ই করে। এখন আক্রমণকারীদের সম্মুখে কোনো প্রতিপক্ষ নেই। তাদের প্রতিপক্ষ ডান ও বামদিকে পালিয়ে গেছে।

আক্রমণকারীদের কিছু ঘোড়া ডানদিকে মোড় নেয়। কিছু বামদিকে। অধিকাংশ সৈন্য নাক বরাবর চলে আসে। এখন আক্রমণকারী বাহিনীর পার্শ্বে আইউবীর সৈন্যদের সম্মুখে তারা প্রবলবেগে ঘোড়া হাঁকায় এবং উভয় দিক থেকে ক্ষীপ্র গতিতে হামলা করে বসে। আক্রমণটা এতোই তীব্র ও কার্যকর প্রমাণিত হয় যে, তাদের একটি বর্শার আঘাতও ব্যর্থ হয়নি। আক্রমণকারীরা তো সামনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। পার্শ্ব বাহিনীকে হেফাজত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সামনের দিকে চলে যেতে পারলেই তারা নিষ্কৃতি পায়। সামনে দেড় হাজার কবরের গর্ত। আক্রমণকারীদের পেছনে পেছনে সুলতান আইউবীর অশ্বারোহী বাহিনী ধেয়ে আসছে। পেছনের ধাওয়া খেয়ে আক্রমণকারীদের ঘোড়া উন্মুক্ত কবরগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করে।

মুজাফফর উদ্দীন ভয় পাওয়ার মতো সেনাপতি নন। প্রথম আক্রমণটা স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা করিয়ে তিনি রণাঙ্গনের ভাবটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। পরিস্থিতিটা বুঝে এবার তিনি সৈন্যের স্রোত ছেড়ে দেন। সুলতান আইউবীর সৈন্যরা খোড়া কবরগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছে। তারা সুলতান আইউবীর দ্বিতীয় নির্দেশ বাস্তবায়ন শুরু করলো বলে, অমনি মুজাফফর উদ্দীনের দ্বিতীয় ইউনিটটি তাদের মাথার উপর এসে পড়ে। তারা আত্মসংবরণ করতেই শত্রু বাহিনীর পেছন দিক থেকে প্রবল বেগে হামলা করে বসে। এই আক্রমণে সুলতান আইউবীর সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। কয়েকজন অশ্বারোহী সামনের দিকে পালিয়ে যায় এবং তাদের ঘোড়াগুলো কবরের গর্তে পড়ে যায়। পরক্ষণেই মুজাফফর উদ্দীন ডানদিক থেকেও আক্রমণ করে বসে।

এই পরিস্থিতি সুলতান আইউবীকে পেরেশান করে তোলে। তিনি এই

নির্দেশসহ দূত পাঠিয়ে দেন যে, রিজার্ভ বাহিনী যেনো পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালায়। ডান বাহুর বিন্যাস বেকার হয়ে পড়ে। মুজাফফর উদ্দীন লড়াই করছে আইউবীরই শেখানো কৌশল অনুপাতে। তবে তার দুর্বলতা হলো, পেছন থেকে তার সাহায্যের কোন ব্যবস্থা নেই। সুলতান আইউবী দূতদের মাধ্যমে তার কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদেরকে ডান ও বাম দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন। যখন তাঁর রিজার্ভ বাহিনী পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে, মুজাফফর উদ্দীন বেকায়দায় পড়ে যান। এবার তার হেডকোয়ার্টারই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু তারপরও তিনি পালাবার চিন্তা করেননি।

ঐতিহাসিকদের মতে, বিকাল পর্যন্ত উভয় বাহিনীর যে লড়াই অব্যাহত থাকে, তা ছিলো অত্যন্ত তীব্র ও অতিশয় রক্তক্ষয়ী। কমান্ড সুলতান আইউবীর হাতে ছিলো। অন্যথায় ফলাফল ভিন্ন রকম হতো। এই যুদ্ধে মুজাফফর উদ্দীন যে দক্ষতা ও সাহসিকতার প্রমাণ দেন, তাতে সুলতান আইউবী তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তবে গুরুর কাছে শিষ্য হার মানতে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সুলতান আইউবী তার একটি বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা আক্রমণ করান। তাতে মুজাফফর উদ্দীনের অবস্থান অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। টিকতে না পেরে তিনি পেছনে সরে যান। তার বহু সৈন্য সুলতান আইউবীর হাতে বন্দী হয়। মুজাফফর উদ্দীনের সামরিক উপদেষ্টা ফখরুদ্দীনও বন্দী হয়।

ফখরুদ্দীন সাধারণ কোনো লোক নয়। সাইফুদ্দীনের মন্ত্রী ছিলো। তুর্কমানের যুদ্ধে সাইফুদ্দীন পালিয়ে গেলে ফখরুদ্দীন মুজাফফর উদ্দীনের নিকট চলে যায় এবং সুলতান আইউবীর উপর হামলা করার জন্য তাকে প্ররোচিত করে।

ঘটনাটা ৫৭১ হিজরী মোতাবেক ১১৭৪ সালের। এই যুদ্ধে মুজাফফর উদ্দীন পরাজয়বরণ করেন এবং সুলতান আইউবী তাঁর মুসলমান দুশমনদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান আইউবীরও এতো বেশি ক্ষতি সাধিত হয়েছিলো যে, পরবর্তী দুই মাস পর্যন্ত তিনি তুর্কমান থেকে নড়ার শক্তি পাননি। তাঁর ডান বাহু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো, যেনো তাঁর নিজের বাহু অবশ হয়ে গেছে। তাঁর নিকট নতুন ভর্তি আসছিলো। কিন্তু এখনই তাদের নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলো না। তিনি সেদিনই দামেস্ক ও মিশর দূত প্রেরণ করে নতুন সৈন্য তলব করেন। ক্ষতিটা যদি এতো বেশি না হতো, তাহলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হাল্ব, মসুল ও

হাররানের উপর আক্রমণ করে তাঁর যেসব মুসলমান দুশমন **ফিলিস্তিনের** পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিলো, তাদেরকে হয়তো সুপথে ফিরিয়ে আনতেন, নতুবা খতম করে দিতেন।

'এটা আমার বিজয় নয়'– যুদ্ধের পর সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের উদ্দেশে বললেন– 'এটা খৃস্টানদের বিজয়।' তারা আমাকে দুর্বল করতে চাচ্ছিলো। এই লক্ষ্যে তারা সফল হয়েছে। তারা আমাদের অগ্রযাত্রার গতি শ্লথ করে ফিলিস্তিনের উপর তাদের কব্জা আরো দীর্ঘতর করে নিলো। আমাদের এই মুসলমান ভাইয়েরা কবে বুঝবে যে, কাফেররা তাদের বন্ধু হতে পারে না এবং তাদের বন্ধুত্বের আড়ালেও শত্রুতা লুকায়িত থাকে। ইতিহাস লেখকরা আমাদের অনাগত বংশধরদের আমাদের এই পারস্পারিক সংঘাতকে কোন্ ভাষায় বুঝাবে, তা আমার জানা নেই।'

আসিয়াত ও তুর্কমানের মধ্যবর্তী সেই নরকসম এলাকায়, যেখানে সুলতান আইউবীর চারজন কমান্ডো সেনা পথ ভুলে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অবস্থায় গিয়ে পৌছেছিলো, সেখানে এখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। কমান্ডার আন-নাসের চোখ খোলে। সে শোয়া থেকে উঠে বসে। মেয়ে দু'টো জেগে আছে। এবার আন-নাসের-এর মনে ভয় ধরে যায়। মেয়েরা তাকে অভয়বাণী শুনিয়েছিলো। তবু সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

'ওদেরকে জাগাও'– বড় মেয়েটি বললো– 'আমাদেরকে বহু দূর যেতে হবে।'

'আমাদেরকে পথে তুলে দিয়ে যাবে তো?' আন-নাসের জিজ্ঞেস করে।

'তোমরা সবাই আমাদের সঙ্গে যাবে'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমাদের ছাড়া তোমরা গন্তব্যে পৌছতে পারবে না।'

আন-নাসের তার সঙ্গীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে কি যেন বললো। সে উঠে অপর একটি ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা থলে থেকে কি যেনো বের করে। তারপর পানির মশক খুলে আনে। মশকের মুখ খুলে থলের বস্তুগুলো মশকের মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর নাড়া দিয়ে মশকটি আন-নাসেরের হাতে দিয়ে বললো– 'পানি পান করে নাও; গন্তব্যে পৌছার আগে পানি না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা পানি পান করে। বড় মেয়েটি তাদের প্রত্যেককে কিছু খাবার খেতে দেয়। পরে মেয়েরা থলে থেকে মশকটিকে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে রাখে। সূর্য নীচের দিকে নামতে থাকে।

'তোমরা এই স্থানটিকে জাহান্নাম বলেছিলে'– আন-নাসের উচ্চস্বরে বলে ওঠে– 'আমি তো এখানে সবুজ-শ্যামলিমা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা এতো তাড়াতাড়ি আমাদেরকে এখানে কিভাবে পৌঁছিয়ে দিলে?'

আন-নাসেরের তিন সঙ্গী বিস্মিত নয়নে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করছে।

'তোমরাও কি সবুজ-শ্যামলিমা দেখতে পাচ্ছ?' বড় মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'আমরা সবুজের মাঝে বসে আছি'– একজন বললো।

'তোমরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে না তো? তোমরা তো পরী!' অপর একজন বললো।

'না'– মেয়েটি মুচকি হেসে বললো– 'আমরা তোমাদেরকে এর চেয়েও সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।'

বড় মেয়েটি আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের তার সম্মুখে পাশাপাশি বসিয়ে দু'হাত দু'জনের কাঁধের উপর রেখে বললো– 'আমার চোখে দৃষ্টিপাত করো।'

ছোট মেয়েটিও আন-নাসেরের অপর সঙ্গীদেরকে অনরূপ সামনাসামনি বসিয়ে নিজের হাত দু'টো তাদের কাঁধে রেখে তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে বললো। সুলতান আইউবীর চার কমান্ডোর কানে বড় মেয়েটির সুরেলা কণ্ঠ প্রবেশ করতে শুরু করে– 'এটি তোমাদের জান্নাত। এই ফুলগুলোর রং দেখো। এর সৌরভ শুকে দেখো। ফুলের মাঝে উড়ন্ত পাখিগুলোকে দেখো। তোমাদের পায়ের নীচে মখমলের ন্যায় ঘাস। কূপ দেখো। কূপগুলোর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানি দেখো।'

মেয়েটির কণ্ঠ চার কমান্ডোর বিবেক, চোখ ও সমস্ত অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। আন-নাসের পরে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা প্রধান হাসান ইব্‌নে আব্দুল্লার নিকট ঘটনার যে বিবরণ প্রদান করেছিলো, তাতে সে বলেছিলো, মেয়ে দু'টোর চোখগুলোকে পানির স্বচ্ছ কূপ মনে হতে লাগলো। সঙ্গে তাদের কাঁধের উপর ছড়ানো রেশমকোমল চুলগুলো চিত্তাকর্ষক ফুলের পাপড়িতে পরিণত হয়ে যায়। আমাদের মনে হচ্ছিলো, আমরা এমন একটি বাগিচায় বসে আছি, যার সৌন্দর্য ও ফুলের রঙের বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। সেখানে বালি ও মাটির লম্বা লম্বা টিলা ছিলো না। ছিলো না মরু অঞ্চল। সর্বত্র গাছ-গাছালি আর সবুজের সমারোহ। পায়ের নীচে মখমলসম ঘাসের ফরাশ আর রং-বেরঙের পাখ-পাখালির কিচির-মিচির শব্দ।

❖ ❖ ❖

আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা মখমলসম যে ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে চলছিলো, সেগুলো ছিলো মূলত বালি। কোথাও কোথাও শক্ত মাটি। তারা সব ক'জন গুন গুন করে একটি গান গেয়ে চলছে। মেয়ে দু'টো তাদের কয়েক পা দূরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের গতি তুর্কমান নয়, যেখানে সুলতান আইউবীর ফৌজ অবস্থান করছে এবং সেটি আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের গন্তব্য। তাদের গতি আসিয়াতের সেই দুর্গ, যেখানে হাশিশিদের নেতা শেখ সান্নান অবস্থান করছে। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা জানে না, তারা কোন্দিকে যাচ্ছে। বরং পথ চলছে কিনা, তাদের সেই অনুভূতিটাই ভোতা হয়ে গেছে। তাদের পেছনে পেছনে সেই মেয়ে দু'টো আপসে কথা বলছে। সেই কথার শব্দ কমান্ডোদের কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। সূর্য ডুবে গেছে।

'তুমি বলছো, রাতে কোথাও অবস্থান করবে না'– ছোট মেয়েটি বড় মেয়েকে বললো– 'লোকগুলো কি সারারাত হাঁটতে পারবে?'

'তুমি পানিতে মিশিয়ে তাদেরকে যে পরিমাণ হাশিশ পান করিয়েছো, তার ক্রিয়া আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবে'– বড় মেয়েটি বললো– 'আর আমি তাদেরকে যা খাইয়েছি, তা তুমি দেখেছো। এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আশা করি, সূর্যোদয়ের আগে আগেই আমরা আসিয়ান পৌঁছে যাবো।'

'আমি তো ওদেরকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম'– ছোট মেয়েটি বললো– 'তোমার কৃতিত্ব যে, তুমি তাদেরকে আয়ত্ত্ব করে ফেলেছো এবং তাদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছো, আমরা পরী। মুসলমানরা জিন-পরী বিশ্বাস করে।'

'এটা ছিলো বুদ্ধির খেলা'– বড় মেয়েটি বললো– 'আমি তাদের মানসিক অবস্থাটা আয়ত্ত্ব করে ফেলেছিলাম। তাদের চেহারা ও চালচলন দেখে আমি বুঝে ফেলেছিলাম, ওরা সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈনিক এবং পথ ভুলে গেছে। আমি এও বুঝে ফেলেছিলাম যে, আমাদেরকে দেখে তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। যদি আমরা ভয় পেয়ে যেতাম এবং নারীর ন্যায় কাপুরুষতা প্রদর্শন করতাম, তাহলে উল্টো তারা আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করতো, যা আমরা জীবনেও ভুলতে পারতাম না। এই বিজন অঞ্চলে কোনো পুরুষ যদি আমাদের ন্যায় মেয়েদের হাতে পেয়ে যায়, তাহলে তারা আমাদের সঙ্গে বোন-কন্যার চোখে দেখবে, এমন আশা করা যায় না। আমি তাদের দৈহিক অবস্থা দেখেছি। তারপরও কৌশল ঠিক করেছি, মুসলমানদের মধ্যে তো এই দুর্বলতা আছে যে, জিনের ব্যাপারে তারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাই আমি বুদ্ধি

করে জিন সেজেছি। এই নরকে আমাদের ন্যায় রূপসী মেয়েদের উপস্থিতিকে তাদের বিবেক মেনে নিতে পারে না। তারা আমাদেরকে হয়তো কাল্পনিক বলে মনে করছে, নয়তো জিন-পরী ভাবছে। আমি তাদের সঙ্গে যে ধারায় কথা বলেছি, তাতে তারা নিশ্চিতভাবে বুঝে নিয়েছে– আমরা পরী। মুসলমান আবেগপ্রবণ জাতি। এটা তাদের দুর্বলতা। বিষয়টা আমার জানা ছিলো। তোমাকে এখনো অনেক কিছু শেখাতে হবে। তাড়াতাড়ি শিখে ফেলো। আমি সাইফুদ্দীনের ন্যায় সুচতুর লোকটাকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচিয়ে ছেড়েছি। এরা তো সৈনিক।'

'জানি না আমি কেনো এই বিদ্যায় সফল হতে পারছি না'– ছোট মেয়েটি বললো– 'আমার অন্তর আমাকে সঙ্গ দেয় না। তোমার মতো কৃতিত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা তো কম করছি না। কিন্তু হৃদয় থেকে আওয়াজ আসে, এটা প্রতারণা।'

'তাহলে তুমি পুরুষদের হাতের খেলনা-ই হয়ে থাকবে'– বড় মেয়েটি বললো– 'তুমি এই প্রথমবার বাইরে বের হয়েছো। আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি সফল হচ্ছো না। এমন হলে তোমাকে পুরুষদের গণিকা হয়েই থাকতে হবে। এভাবে তুমি ক্রুশের কোন সেবা করতে পারবে না। নিজের শরীরটাকে তুমি সময়ের অনেক আগে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলবে আর এই পুরুষরা তোমাকে বাইরে ছুঁড়ে মারবে। আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা মুসলিম আমীর ও শাসকদের বিনোদনের উপকরণ হয়ে থাকবো। একদিন না একদিন আমাদেরকে জাদু হয়ে তাদের বিবেকের উপর জয়ী হতেই হবে। এই চার সৈনিকের মাঝে তুমি যে কুসংস্কার দেখেছো, তা আমাদের খৃস্টান গুরু এবং ইহুদীরা তাদের মাঝে জন্ম দিয়েছে। তুমি দেখেছো, আমি কতো তাড়াতাড়ি তাদেরকে আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি। আমি তাদেরকে একটি কথা বলছিলাম। কথাটা আমাকে আমার ওস্তাদ শিক্ষা দিয়েছেন। তাহলো; মানুষ একটি আনন্দের সৃষ্টি। আর সবসময় তারা সেই আনন্দ ভোগ করার প্রত্যাশী থাকে। আবার তারা এই কামনাকে দমন করারও চেষ্টা করে থাকে। আমাদের মিশন হলো মুসলমানদের মাঝে এই ভোগলিপ্সা জাগিয়ে তোলা। এটাই মানুষের সেই দুর্বলতা, যা তাকে ধ্বংসের দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেয়। তোমার কি সেই রাতের কথা মনে নেই, যে রাতে সাইফুদ্দীন আমাদের উপস্থিতিতে তার এক সালারকে বলেছিলেন– আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করা যায় কিনা ভাবছি। আমি সেই রাতেই তার মস্তিষ্ক

থেকে এই ভাবনা বের করে দিয়েছিলাম।'

'আসিয়াত পৌঁছে আমাকেও এই ওস্তাদী শিখিয়ে দিও'– ছোট মেয়েটি বললো- 'এই কাজগুলো করতে আমার কেমন যেনো অনীহা লাগছে। আমি মুসলমান শাসকদের খেলনা হয়ে আছি। তুমি তো চালাকি করে আঁচল বাঁচিয়ে রাখছো; কিন্তু আমি পারছি না। অনেক সময় মনে চিন্তা আসে, পালিয়ে কোথাও চলে যাই। কোন পথও পাই না, আমার কোন আশ্রয়ও নেই।'

'সবই শিখতে পারবে'– বড় মেয়েটি বললো– 'তোমাকে আমার সঙ্গে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। আমি তোমার দুর্বলতাগুলো বুঝতে পেরেছি। এসব দূর হয়ে যাবে।'

আন-নাসের তার সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে চলছে। মেয়েরা ঘোড়া নিয়ে তাদের সামনে চলে যায়, যাতে তারা পথ হারিয়ে না ফেলে। তারা সমকণ্ঠে গান গেয়ে চলছে। বালি, মাটি ও পাথর তাদের জন্য ঘাস হয়ে আছে।

'ওদেরকে অন্য কোন পথে তুলে দেয়া প্রয়োজন ছিলো'– ছোট মেয়েটি বললো– 'ওদেরকে অসিয়াত নিয়ে কী করবে?'

'আমাদের গুরু শেখ সান্নানের জন্য এর চেয়ে উত্তম উপহার আর কিছু হতে পারে না'– বড় মেয়েটি জবাব দেয়– 'এরা সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডোসেনা এবং গুপ্তচর। আইউবীর একজন গুপ্তচর ধরে তার মস্তিষ্ক ধোলাই করতে পারলে বুঝতে হবে, তুমি তাঁর বাহিনীর এক হাজার সৈনিককে বেকার করে দিয়েছো। আইউবীর একজন গুপ্তচর গেরিলা সৈন্য আমাদের ঊর্ধ্বতন একজন সেনা অফিসারের সমান, বরং তার চেয়েও মূল্যবান। তারা দৈহিক দিকে থেকে অস্বাভাবিক শক্তিশালী ও সহনশীল। আবার মানসিক দিক থেকেও পাহাড়ের ন্যায় অটল। নিজের কর্তব্যকে তারা জীবনের চেয়েও মূল্যবান মনে করে থাকে। এই চার সৈনিক অভিযান পরিচালনা এবং ক্লান্তির পরও মরু অঞ্চলে যে বিপদ ও ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করেছে, তা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের সৈন্যদের মাঝে এই চেতনা ও ক্ষমতা নেই। সুলতান আইউবীর এই চার সৈনিককে আমি শেখ সান্নানের হাতে তুলে দেবো। তুমি সম্ভবত জানো না, সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার জন্য কয়েকবার চেষ্টা চালানো হয়েছিলো। কিন্তু একটি অভিযানও সফল হয়নি। এই চার ব্যক্তিকে হাশিশ ও ওস্তাদীর মাধ্যমে আইউবীকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে। এরা আইউবীর নিজস্ব কমান্ডো। এরা সহজে আইউবী পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে।'

'আচ্ছা, আমরা সাইফুদ্দীন, গোমস্তগীন ও অন্যান্যদেরকে যেভাবে কাবু করেছি, সালাহুদ্দীন আইউবীকে কি সেই প্রক্রিয়ায় কাবু করা যায় না?' ছোট মেয়েটি প্রশ্ন করে।

'না'– বড় মেয়েটি জবাব দেয়– 'যে ব্যক্তি জগতের সুখ-ভোগ ত্যাগ করে একটি পবিত্র লক্ষ্য অর্জনে আত্মনিয়োগ করেছে, আমাদের ন্যায় রূপসী মেয়ে আর সোনার স্তূপ কোনকিছুই তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। আইউবী এক স্ত্রীর প্রবক্তা। নুরুদ্দীন জঙ্গীর এই একটি সমস্যা ছিলো যে, রাজা হয়েও তিনি ঘরে একজন মাত্র স্ত্রী রেখেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তারই অনুরক্ত ছিলেন। এই সমস্যাটা সালাহুদ্দীন আইউবীর মধ্যেও বিদ্যমান। বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু এই পাথরটাকে গলানো যায়নি। অথচ আইউবীকে হত্যা না করে আমাদের ফিলিস্তিনে দখল বজায় রাখা সম্ভব নয়।'

'সেই পুরুষই আমার কাছে ভালো লাগে, যে এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে'– ছোট মেয়েটি বললো– 'আমি ক্রুশের পুজারী। ক্রুশের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানা থাকা সত্ত্বেও আমি মাঝে-মধ্যে ভাবি, আমি এমন একজন পুরুষের হৃদয়ে স্থান করে নেই, যে আমার দেহ-মন ও আত্মার অংশ হয়ে থাকবে।'

'আবেগ ত্যাগ করো'– বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বললো– 'ক্রুশের মহান মিশন বাস্তবায়নে নিবেদিত হয়ে কাজ করো। ক্রুশ হাতে নিয়ে যে শপথ করে এসেছো, সে কথা স্মরণ করো। আমি জানি, তুমি টগবগে এক তরুণী। এই বয়সে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন কাজ। কিন্তু ক্রুশ আমাদের থেকে এই কুরবানীই কামনা করছে।'

রহস্যময় এই কাফেলাটি এগিয়ে চলছে। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা মেয়েদের ঘোড়ার পেছন পেছন হাঁটছে। তারা কখনো সমস্বরে গান গাইছে, কখনো গুন গুন করছে। আবার কখনোবা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। রাত যতো গভীর হচ্ছে, তাদের গন্তব্যও কাছে চলে আসছে।

এরা সেই গোত্রের মেয়ে, যাদের একাধিক কাহিনী আপনারা পেছনে পাঠ করে এসেছেন। ইহুদী-খৃস্টানরা সুন্দরী কিশোরী-তরুণীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা বিনষ্ট, চরিত্র ধ্বংস এবং শত্রুকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করার কলাকৌশল শিক্ষা দিতো। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে শত্রুর চিন্তা-চেতনার উপর কিভাবে প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে, সেই প্রশিক্ষণ তাদের কৈশোরেই প্রদান করা হতো। তাদের মাঝে

চঞ্চলতা ও বেহায়াপনা সৃষ্টি করা হতো। তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে নীতি-নৈতিকতা ও লাজ-শরম কিছুই অবশিষ্ট রাখা হতো না। ইহুদীরা যেহেতু মুসলমানদেরকে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করতো, সে জন্যে তারা তাদের কন্যাদেরকে এ কাজের জন্য খৃস্টানদের হাতে তুলে দিতো। খৃস্টানরা নিজেদের কন্যাদেরকে ব্যবহার করতো। তারা তাদের শাসিত অঞ্চলগুলোতে মুসলমানদের কাফেলার উপর আক্রমণ করতো এবং কোন রূপসী-কিশোরী কন্যা পেলে তাকে তুলে নিয়ে আসতো এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মিশনের জন্য প্রস্তুত করতো।

এই মেয়ে দু'জনকে খৃস্টানরা কিছুদিন আগে মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেছিলো। সাইফুদ্দীন সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন। খৃস্টানরা এ মেয়ে দু'জনকে তিনটি মিশন দিয়ে প্রেরণ করে। প্রথমত, তারা খৃস্টানদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করবে। দ্বিতীয়ত, সাইফুদ্দীন যাতে সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করার ভাবনা ভাবতে না পারে, সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখবে। তৃতীয় মিশন ছিলো, যেসব মুসলিম আমীর সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে গিয়েছিলো, তাদের মাঝে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করে রাখা। এ কাজগুলো শুধু এ দু'টো মেয়ের উপরই ন্যাস্ত করা হয়নি, সেখানকার গোটা খৃস্টান মিশনারীই এ কাজে নিয়োজিত ছিলো। তারা বেশ ক'জন মুসলমানের ঈমান ক্রয় করে ফেলেছে। এখন সেসব মুসলমান তাদেরই হয়ে কাজ করছে।

সাইফুদ্দীন যখন সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে তুর্কমানে সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন, তখন রাজা-বাদশাদের রীতি অনুযায়ী তিনি তার হেরেমের বাছা বাছা মেয়ে এবং গায়িকা-নর্তকীদের রণাঙ্গনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই রূপসী মেয়ে দু'জনও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সাইফুদ্দীন এদেরকে নিষ্পাপ মনে করতেন। কিন্তু বড় মেয়েটি প্রেতাত্মার ন্যায় সাইফুদ্দীনের শিরায় শিরায় মিশে গিয়েছিলো। হেরেমের অন্যান্য মেয়েদেরকে সে তার দাসী বানিয়ে রেখেছিলো।

সাইফুদ্দীন জঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করে নিয়েছিলো। এক সময় সেখানে মরুঝড় হয়, যার বিবরণ আপনারা উপরে পাঠ করে এসেছেন। এই ঝড়ের মধ্যে ফাওজিয়া নাম্মী এক মেয়ে আপন ভাইয়ের মৃতদেহ ঘোড়ার পিঠে করে সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছে দিয়েছিলো এবং সংবাদ প্রদান করেছিলো যে, তিনটি বাহিনী একজোট হয়ে তাঁর উপর আক্রমণ করতে এসে পড়েছে।

সুলতান আইউবী দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সাইফুদ্দীনের বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসেন। অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে সাইফুদ্দীনের বহু সৈন্য প্রাণ হারায়। এই একতরফা লড়াইয়ে রণাঙ্গন ছিলো সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে। সাইফুদ্দীন তার সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ড সামলাতে ব্যর্থ হন। যখন তার ময়দান ছেড়ে পালাবার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন এই মেয়ে দু'টো তার সঙ্গে ছিলো। খৃস্টানদের কয়েকজন মুসলমান এজেন্ট সাইফুদ্দীনের ফৌজের উচ্চপদে সমাসীন ছিলো। এই মেয়ে দু'টোর সঙ্গে তাদের ভালো যোগাযোগ ছিলো। মেয়েরা তাদেরকে খবরাখবর জানাতো আর তারা সেসব সংবাদ খৃস্টানদের নিকট পৌঁছে দিতো।

তারা যখন দেখলো, যুদ্ধ পরিস্থিতি এমন এক রূপ ধারণ করেছে যে, সম্মিলিত বাহিনীকে পিছপা হওয়া ব্যতীত কোন উপায় নেই, তখনই তারা মেয়ে দু'টোকে ওখান থেকে নিয়ে কেটে পড়ার পরিকল্পনা আঁটে। খৃস্টানদের এই মেয়ে দু'জন খুবই মূল্যবান। সাইফুদ্দীন যুদ্ধের ময়দানে ছুটে বেড়াচ্ছেন। হেরেমের মেয়েরা তার বিশ্রামাগারের একটি তাঁবুতে এসে জড়ো হয়। এই খৃস্টান মেয়ে দু'টো এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের লোকেরা এসে পড়েছে। তাদেরকে দু'টি ঘোড়া দেয়া হলো। ঘোড়ার জিনের সঙ্গে পানির চারটি মশক ও খাবারের দু'তিনটি থলে বেঁধে দেয়া হলো। খঞ্জরও দেয়া হলো। কিন্তু তাদের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হচ্ছে হাশিশ আর অনুরূপ এমন একটি নেশাকর দ্রব্য, যার কোনো স্বাদ নেই। এই বস্তুটা কাউকে তার অজান্তে পান করানো ...ল সে টেরই পায় না যে, পানি বা শরবতের সঙ্গে তাকে অন্য কিছু পান করানো হয়েছে। এই নেশাকর পদার্থ দু'টো তাদের সঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে কোনো পুরুষের সঙ্গ ছাড়া সফর করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত যদি পথে কারো হাতে পড়ে যায়, তাহলে অজান্তে এসব পান করিয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলবে।

রাতের বেলা। রণাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। দু'ব্যক্তি মেয়ে দু'টোকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে ছুটতে শুরু করে। তুর্কমান পেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত লোকগুলো তাদের সঙ্গে যায়। তারপর মেয়েদেরকে পথ বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে আসে। মেয়েদের গন্তব্য অসিয়ানের দুর্গ। বড় মেয়েটি অত্যন্ত বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও সাহসী। ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সে যাত্রা শুরু করে। ভোর নাগাদ তারা সবুজ-শ্যামল অঞ্চল ত্যাগ করে বেশ দূরে চলে যায় এবং উক্ত অঞ্চলের নরক বলে পরিচিত ভূখণ্ডে এসে পৌঁছে। মেয়েদের জানা আছে, এ

স্থানে পৌঁছে তরুলতাহীন পাথুরে পথ অতিক্রম করতে হবে। অঞ্চলটা ভীতিকর এবং উত্তপ্ত চুলোর ন্যায় গরম। সূর্য মাথার উপর উঠে এলে তারা পাবর্ত্য এলাকায় এসে পৌঁছে। তারা একটি টিলার আড়ালে অবস্থান নিয়ে পানাহার করে বিশ্রাম করতে থাকে। ঐ সময় তারা আন-নাসেরকে তার তিন সঙ্গীসহ আসতে দেখে।

তাদেরকে দেখেই বড় মেয়েটি বুঝে ফেলে, তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কেমন। মেয়েটির তার বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে শুরু করে, যার ফলে আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা তাদেরকে কাল্পনিক বস্তু কিংবা পরী বলে বিশ্বাস করে ফেলে। মেয়েটির প্রতিটি পদক্ষেপই শতভাগ সফল হয়। প্রথমে সে লোকগুলোকে পানি ও কাবাব খাওয়ায়। তারপর হাশিশ এবং অন্য নেশাকর দ্রব্যটি পান করায়। লোকগুলোকে নেশা পান করিয়ে তারা ফুল, সবুজ-শ্যামলিমা, পাখ-পাখালি ও মখমলসম ঘাসের উল্লেখ করেছিলো, তা লোকগুলোর মস্তিষ্কে জান্নাতের কল্পনা জাগ্রত করে দেয়। হাশিশ পান করিয়ে মানুষের মন-মস্তিষ্কে সুদর্শন কল্পনা সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা হাসান ইবনে সাব্বাহর আবিষ্কৃত পদ্ধতি। শত বছর পরে শেখ সান্নান এখন তার স্থলাভিষিক্ত। এই চক্রটিকে এখন হাশিশি কিংবা ফেদায়ী বলা হয়। বড় মেয়েটির এ বিদ্যার প্রশিক্ষণ আছে।

মেয়েটি আন-নাসের ও তার সঙ্গীদেরকে আয়ত্ত্বে নিয়ে একটি লক্ষ্য তো এই অর্জন করতে চাচ্ছিলো যে, লোকগুলো তাদের প্রতি হাত বাড়াবে না কিংবা অপহরণ করে নিয়ে যাবে না। দ্বিতীয়ত, যদি প্রমাণিত হয় যে, এরা সুলতান আইউবীর গুপ্তচর কিংবা কমান্ডো সেনা, তাহলে কৌশলে তাদেরকে নিয়ে শেখ সান্নানের হাতে তুলে দেবে। এদের দ্বারা তার কোনো না কোনো উপকার আসতে পারে। সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে হাররানের স্বাধীন শাসক গোমস্তগীন আসিয়ান দুর্গে শেখ সান্নানের সঙ্গে সাক্ষাতও করে গেছেন।

❖ ❖ ❖

তুর্কমানে মুজাফফর উদ্দীনের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁর সালারদের বললেন– 'এবার যুদ্ধ শেষ হলো।' তিনি মালে গনীমত সংগ্রহ করার নির্দেশ প্রদান করেন। শত্রু বাহিনীর ফেলে যাওয়া বিপুল পরিমাণ সম্পদ। সাইফুদ্দীনের ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করা হলো বিপুল সোনা ও নগদ অর্থ। শত্রু বাহিনীর সৈন্যদের লাশের দেহ থেকেও নগদ অর্থ,

সোনার আংটি ইত্যাদি সম্পদ পাওয়া যায়। অন্যান্য মালপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের কোনো হিসাব ছিলো না। সালাহুদ্দীন আইউবী যুদ্ধের কাজে আসতে পারে এমন সব মালপত্র সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন। একাংশ মালামাল দামেস্ক এবং সেসব এলাকায় গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দেয়ার আদেশ প্রদান করেন, যেগুলো মিশর ও সিরিয়ার সাম্রাজ্যের আওতায় এসে গেছে। অপর এক অংশ মাদ্রাসা নিজামুল মুল্‌ককে প্রদান করেন। ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ লিন পোলের বর্ণনা মতে– সালাহুদ্দীন আইউবী উক্ত মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ইতিহাসে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সালাহুদ্দীন আইউবী তুর্কমানের গনীমত থেকে নিজে কোনো ভাগ নেননি।

এবার বন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা। বন্দীরা সকলেই মুসলমান। সালাহুদ্দীন আইউবী তাদেরকে একত্রিত করে বললেন– 'তোমরা মুসলমান এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলে। তোমাদের পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, তোমাদের শাসনকর্তা তোমাদের ধর্মের ঘৃণ্যতম শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তার হাত শক্ত করছে। তোমাদের দুনিয়াও নষ্ট হলো, আখেরাতও বরবাদ হলো। এখন তোমাদের সামনে পাপ স্খলনের একমাত্র পথ হচ্ছে, তোমরা ইসলামের সৈনিক হয়ে যাও এবং নিজেদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করো।'

সালাহুদ্দীন আইউবীর এই ভাষণটি ছিলো অত্যন্ত তেজস্বী ও আবেগপ্রবণ। বন্দীদের সমাবেশের মধ্য থেকে শত কণ্ঠে আকাশ কাঁপানো 'নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারিত হতে শুরু করে। তারা সমস্বরে সালাহুদ্দীন আইউবীর আনুগত্যের ঘোষণা দিতে আরম্ভ করে। এভাবে আইউবীর বাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক ও কমান্ডারের সংখ্যা বেড়ে গেলো। তথাপি সুলতান অগ্রযাত্রা মুলতবি রাখেন। বাহিনীর নববিন্যাস আবশ্যক। তিনি দামেস্ক ও কায়রো থেকেও সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। সেখানেই আহতদের চিকিৎসা সেবা চলছে। যুদ্ধে জয়ী হলেও মুজাফফর উদ্দীনের এই আক্রমণ সালাহুদ্দীন আইউবীকে বেশ বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

আসিয়াত দুর্গ ছিলো বর্তমানকার লেবাননের সীমান্ত এলাকায়। মিশরী ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ফরীদ আবূ হাদীদের বর্ণনা মোতাবেক আসিয়াত দুর্গ ছিলো হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ঘাতক চক্র হাশিশিদের কেন্দ্র ও আস্তানা। সেখানে হাসান ইব্‌নে সাব্বাহ'র স্থলাভিষিক্ত শেখ সান্নানের রাজত্ব ছিলো। দুর্গে তার একটি বাহিনীও রাখা ছিলো। দুর্গটা ছিলো বেশ বড়সড়। তার

থেকে দূরে দূরে ছোট আরো তিন-চারটি দুর্গ ছিলো। এই দুর্গগুলোও ছিলো শেখ সান্নানের হাশিশীদের দখলে। খৃস্টানরা তাদেরকে এই দুর্গগুলো দিয়ে রেখেছিলো। খৃস্টানরা এই হাশিশীদের মুসলিম নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা এবং মুসলিম জাতির চরিত্র ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করতো। কিন্তু তাদেরই একটি দল শেষ পর্যন্ত ভাড়াটিয়া খুনী চক্রে পরিণত হয়ে যায়। তারা কতিপয় খৃস্টান নেতৃবর্গকেও হত্যা করেছিলো। বিনিময় পেলেই তারা যে কাউকে খুন করতে প্রস্তুত হয়ে যেতো। সালাহুদ্দীন আইউবীর আমলে খৃস্টানরা তাদেরকে এতো বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে যে, কতগুলো দুর্গ পর্যন্ত তাদেরকে দিয়ে দেয়। তাদের মাধ্যমে খৃস্টানরা সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহুদ্দীন আইউবীকে খুন করাবার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যু সম্পর্কে মেজর জেনারেল আকবর খান কোনো কোনো ঐতিহাসিকের সূত্রে লিখেছেন– এটি ছিলো হাশিশীদের কর্ম। হাশিশীরা তাকে গোপনে কি যেনো খাইয়েছিলো, যার ক্রিয়ায় দিন কয়েক পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারা এখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামছে। হাশিশীরা খৃস্টানদের হাতে খেলছে।

সকাল বেলা। সূর্য এখনো উদিত হয়নি। আন-নাসের ও তার তিন সঙ্গী খৃস্টান মেয়ে দু'টির সঙ্গে আসিয়াত দুর্গের ফটকের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। বড় মেয়েটি একটি সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করে। ক্ষণিক পর দুর্গের দরজা খুলে যায়। শেখ সান্নান সব বিচারেই রাজা। একজন রাজার সব ক্ষমতাই তার আছে। তার চলন-বলন, ভাবগতি ও শান-শওকত রাজকীয়। লোকটার এই অনুভূতিটুকুও নেই যে, সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। বড় মেয়েটি যখন তাকে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলো এবং সাইফুদ্দীনের শোচনীয় পরাজয়ের বিস্তারিত শোনাচ্ছিলো, তখনো তার লোলুপ দৃষ্টি ছোট মেয়েটির উপর নিবদ্ধ ছিলো।

'এদিকে আসো'– শেখ সান্নান বড় মেয়েটি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে ছোট মেয়েটিকে কাছে ডেকে বললো– 'তুমি প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি রূপসী। তুমি আমার কাছে এসে বসো।' শেখ সান্নান মেয়েটির বাহু ধরে টেনে এনে নিজের গা-ঘেঁষে বসায় এবং তার মাথায় হাত দিয়ে আঙ্গুল দ্বারা চুলে বিলি কাটতে শুরু করে। বললো- 'তুমি অনেক ক্লান্ত। আজ আমার কাছে বিশ্রাম করবে।'

মেয়েটি শেখ সান্নানকে এই প্রথমবারের মতো দেখলো। সে লোকটাকে ঘুরে-ফিরে দেখতে থাকে। একবার তার প্রতি, আবার তার সঙ্গী মেয়েটির

প্রতি তাকাতে থাকে। মুখে তার বিরক্তির ছাপ। যেনো বৃদ্ধের এই আচরণ তার ভালো লাগছে না। মেয়েটি লাফ দিয়ে বৃদ্ধের নিকট থেকে সরে যায়। শেখ সান্নান আবারো মেয়েটির বাহু ধরে টেনে কাছে নিয়ে আসে, যেনো সরে গিয়ে সে তাকে অপমান করেছে। সে বড় মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললো- 'মেয়েটিকে বোধ হয় আমাদের রীতি শিক্ষা দেয়া হয়নি। আমাদের অপমান করা কতো বড় অপরাধ!'

'আমি আপনার দাসী নই'- ছোট মেয়েটি উত্তেজিত কণ্ঠে বললো- 'এটা আমার কর্তব্য নয় যে, কেউ আমাকে নিয়ে টানা-হেঁছড়া করতে চাইলেই আমি নিজেকে সপে দেবো।' মেয়েটির উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। সে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললো- 'আমি ক্রুশের গোলাম, আমি হাশিশীদের কেনা দাসী নয়।'

বড় মেয়েটি তাকে ধমক দিয়ে চুপ হতে বললো। কিন্তু মেয়েটি চুপ হলো না। বলতে লাগলো- 'এই লোকটি আমাকে মুসলমানদের হেরেমে দেখেনি। আমি দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি করিনি। আমি তোমার সঙ্গে থেকে সাইফুদ্দীন ও তার পরামর্শকদের বিবেক-বুদ্ধির উপর পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছি। তাই বলে এটা আমার দায়িত্ব নয় যে, আমি এই বুড়োর সাথে রাত কাটাবো।'

'তুমি যদি এতো রূপসী না হতে, তাহলে আমি তোমার এই গোস্তাখি ক্ষমা করতাম না'- শেখ সান্নান বললো এবং বড় মেয়েটিকে উপদেশের ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলো- 'একে নিয়ে গিয়ে আসিয়াত দুর্গের আদব-কায়দা শিখিয়ে দাও।'

বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে বাইরে বের করে রেখে পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করে শেখ সান্নানকে বললো- 'আপনার অসন্তুষ্টি যথার্থ। কিন্তু আমরা বসদের অনুমতি ব্যতীত যে কারো আদেশ পালন করতে পারি না। আমি যেহেতু আপনাকে জানি এবং এই দুর্গে আগেও এসেছি, সেজন্য আপনার কাজে আসতে পারে এমন চার ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছি। আপনাকে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। মেয়েটি শেখ সান্নানকে আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে।

'আমি এদের দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করবো'- শেখ সান্নান বললো- 'কিন্তু ঐ মেয়েটাকে আমি অবশ্যই আমার কক্ষে রাখবো।'

'এ বিষয়টা আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন'- বড় মেয়েটি বললো- 'ওতো আর পালাতে পারবে না। আমি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আপনার কাছে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করবো।'

❖ ❖ ❖

শেখ সান্নানের দু'জন সহযোগী আন-নাসের ও তার সঙ্গীদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। লোকগুলো নেশা অবস্থায় ছিলো বটে; কিন্তু সারাটা রাত পায়ে হেঁটে এখানে এসে পৌঁছেছে। তাদেরকে একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। টলটলায়মান পরিশ্রান্ত লোকগুলো ধপাস করে খাটের উপর পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে। ওদিকে মেয়ে দু'টোও রাতে এক মুহূর্ত ঘুমোতে পারেনি। তারাও একটি কক্ষে শুয়ে পড়ে।

দুপুরের পর আন-নাসেরের চোখ খোলে। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে তার সঙ্গীরা এখানো ঘুমিয়ে আছে। সে আশ-পাশটা চেনার চেষ্টা করে। এটি একটি কক্ষ। কক্ষে পালংক আছে। আন-নাসেরের তিন সঙ্গী পালংকের উপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সবুজ-শ্যামলিমা, রং-বেরঙের ফুল, পাখ-পাখালি ও মখমলসম সবুজ ঘাসের কথা মনে পড়ে তার। মেয়েদের কথাও স্মরণে আসে। বিষয়গুলো তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। মরুভূমির সফরের কথা তার বাস্তবের ন্যায় স্মরণ আছে। কিন্তু দু'টো মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলী তার কাছে স্বপ্ন কিংবা কল্পনা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন সে কোথায়? এই প্রশ্ন তাকে বিব্রত ও বিচলিত করতে শুরু করে।

আন-নাসের তার সঙ্গীদের জাগালো না। নিজে বসা থেকে উঠে দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। এটি একটি দুর্গ। সৈনিকরা চলাফেরা করছে দেখতে পায়। এটা কোন্ বাহিনীর দুর্গ? আন-নাসের বিষয়টা কাউকে জিজ্ঞেস করা সমীচীন মনে করলো না। দুর্গটা দুশমনেরও হতে পারে। তাহলে কি আমি সঙ্গীদেরসহ বন্দী হয়েছি? কিন্তু এই কক্ষটা তো কয়েদখানার প্রকোষ্ঠ নয়। আন-নাসের গুপ্তচর ও গেরিলা সৈনিক। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই সে বিষয়টার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো। ধীরে ধীরে সে আশংকা অনুভব করতে লাগলো। এবার দরজা থেকে সরে পালংকের উপর গিয়ে বসলো। বাইরে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেলো। সাথে সাথে সে ঘুমের ভান করে নাক ডাকতে শুরু করলো।

দু'ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করে।

'এখনো ঘুমিয়ে আছে।' একজন অপরজনকে বললো।

'ঘুমিয়েই থাকতে দাও'— দ্বিতীয়জন বললো— 'মনে হচ্ছে, একটু বেশি খাওয়ানো হয়েছে। আচ্ছা, এদের ব্যাপারে কি কিছু বলা হয়েছে?'

'খৃস্টান মেয়ে দু'টি ফাঁদে ফেলে এদেরকে নিয়ে এসেছে'— প্রথমজন উত্তর

দেয়– 'এরা সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডো গুপ্তচর। অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। এদেরকে প্রস্তুত করতে হবে।'

তারা চলে যায়।

আন-নাসের বুঝে ফেলে, তারা প্রতারণার শিকার এবং শত্রুর হাতে বন্দী। এবার তাকে জানতে হবে, এটি কোন্ দুর্গ, কোন অঞ্চলে অবস্থিত এবং কী উদ্দেশ্যে তাদেরকে এখানে আনা হয়েছে। তার জানা আছে, কোনো দুর্গ থেকে পলায়ন করা শুধু কঠিনই নয়– অসম্ভব।

ছোট মেয়েটি কিছুক্ষণ ঘুমিয়েই জেগে ওঠে। কক্ষের জানালাটা খুলে জানালার কাছে বসে বাইরের দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি সফরের সময় বড় মেয়েটির কাছে তার আবেগের কথা প্রকাশ করেছিলো। সবে তরুণী। এখনো পরিপক্ক হয়নি। সমবয়সী অন্য পাঁচটি মেয়ের ন্যায় এখনো সে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এই প্রথমবারের মতো সে ময়দানে এসেছে। সঙ্গের বড় মেয়েটি অভিজ্ঞ। সে অনুভব করছে, ছোট মেয়েটি সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পারছে না। পুরুষদেরকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচানোর যোগ্যতা-মানসিকতা কোনটিই এখনো তার আয়ত্ত্ব হয়নি। বাঘা বাঘা সালার ও সাইফুদ্দীন তাকে খেলনা বানিয়ে রেখেছিলো। এখন সে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে কঠিন ও কষ্টদায়ক সফর করে এসে এখানে পৌঁছেছে। সারা রাত সফর করেছে; অথচ এসে পৌঁছামাত্র শেখ সান্নানের মতো বৃদ্ধের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে এবং তিনি যা বলবেন শুনতে হবে!

একথা সত্য যে, মেয়েটিকে শৈশব থেকেই এই নোংরা জীবনধারার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু যৌবনে পদার্পন করার পর যখন তার চোখ ফোটে এবং নিজের চোখে দেখতে ও নিজের মাথায় ভাবতে শিখে, তখন দীর্ঘ প্রশিক্ষণের ক্রিয়া এলোমেলো হয়ে যায়। যে মানুষগুলোকে ফাঁসিয়ে রাখতে এবং খৃস্টানদের জালে আটকে রাখতে তাকে প্রস্তুত করা হয়েছিলো, তাদের প্রতি তার মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয় এবং নিজের এই পেশাটিকে হীন ভাবতে শুরু করেছে। জানালার কাছে বসে মেয়েটি নানা তিক্ত কল্পনায় ডুবে আছে। তার চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসে। কিন্তু সে চোখের সামনে না কোনো আশ্রয় দেখতে পাচ্ছে, না পালাবার পথ পাচ্ছে।

বড় মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ খুলে দেখতে পায়, তার সঙ্গী ছোট মেয়েটি জানালার কাছে বসে আছে। সেও উঠে তার পাশে গিয়ে বসে। চোখে অশ্রু দেখে বললো– 'প্রথম প্রথম এমনটা হয়ে থাকে। আমরা যা কিছু করছি

বিলাসিতার জন্য করছি না, করছি ক্রুশের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশের রাজত্ব কায়েম করা। আমাদের সৈনিকরা তাদের অঙ্গনে লড়াই করছে। আমাদেরকে আমাদের অঙ্গনে লড়তে হবে। মনটাকে বড় বানাও। দেহের চিন্তা বাদ দাও, আত্মাটা পবিত্র থাকলেই হলো। তোমার আত্মা পবিত্র।'

'আচ্ছা, আমাদের যেভাবে ব্যবহার করা হয়, মুসলিম মেয়েদেরকে সেভাবে ব্যবহার করা হয় না কেন?'– ছোট মেয়েটি জিজ্ঞেস করে– 'আমাদের বাদশাহ এবং তাদের সৈন্যরা মুসলমানদের ন্যায় লড়াই করে না কেনো? মুসলমানদেরকে তারা চোরের ন্যায় খুন করে কেনো? খৃস্টান বাহিনী সালাহুদ্দীন আইউবীর এই চার কমান্ডোর ন্যায় কমান্ডো তৈরি করে না কেনো? তার কারণ একটাই– আমাদের জাতি কাপুরুষ। যারা চুপি চুপি আক্রমণ করে, তারা কাপুরুষ না তো কী?'

ছোট মেয়েটির বক্তব্য ও প্রশ্নবাণে বড় মেয়েটি চমকে ওঠে বললো– 'এমন কথা অন্য কারো সামনে বলবে না। অন্যথায় খুন হয়ে যাবে। এ মুহূর্তে আমরা শেখ সান্নানের কাছে রয়েছি। তার দ্বারা আমাদের অনেক কাজ নিতে হবে। তাকে নারাজ করা যাবে না।'

'লোকটার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেছে'– ছোট মেয়েটি বললো– 'ইনি তো কোন রাষ্ট্রের সম্রাট নন, ভাড়াটিয়া খুনীদের লিডার মাত্র। আমি তাকে আমার দেহ স্পর্শ করার যোগ্য মনে করি না।'

বড় মেয়েটি দীর্ঘ কথোপকথনের পর বড় কষ্টে ছোট মেয়েটিকে সম্মত করতে সক্ষম হয় যে– সে শেখ সান্নানের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলবে ও সদ্ব্যবহার করবে।

সে মেয়েটিকে পরামর্শ দেয়– 'তুমি তাকে প্রলোভন দেখিয়ে সময় পার করে দেবে। তুমি তো আমার কৌশল দেখেছো। আমি মুসলিম রাজাদেরকে মুঠোয় নিয়ে তাদের গোমরা করতে জানি। শেখ সান্নানকে আমি কোন ব্যক্তিত্বই মনে করি না।'

'তুমি কি আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারো?' ছোট মেয়েটি বললো।

'চেষ্টা করবো'– বড় মেয়েটি বললো– 'আগে আমাদের সংবাদ পৌঁছাতে হবে যে, আমরা এখানে আছি।'

এমন সময় দু'জন লোক কক্ষে প্রবেশ করে। তারা মেয়েদেরকে তাদের

নিয়ে আসা লোকগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। লোকগুলো কারা, কোথা থেকে কিভাবে এবং কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে? বড় মেয়েটি তার বিবরণ দেয়।

'তারা কী অবস্থায় আছে?' বড় মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'এখনো ঘুমিয়ে আছে।' একজন জবাব দেয়।

'তাদেরকে কি কারাগারে আটকে রাখবে?' ছোট মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'কারাগারে নিক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই'– লোকটি জবাব দেয়– 'এখান থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়?'

'আমরা কি তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি?' ছোট মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'অবশ্যই পারবে'– লোকটি জবাব দেয়– 'তারা তোমাদের শিকার। যাও, দেখা করো। তোমরা তাদের কাছে যাও, তাদেরকে তোমাদের জালে আটকে রাখো।'

কিছুক্ষণ পর ছোট মেয়েটি বড় মেয়েটির নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা যে কক্ষে ঘুমিয়ে আছে, সেখানে চলে যায়। আন-নাসের মূলত সজাগ। মেয়েটিকে দেখে সে উঠে বসে এবং জিজ্ঞেস করে– 'আমাদেরকে কোথায় নিয়ে এসেছো? বলো, তোমরা কারা? তোমাদের মিশন কি? এটা কোন্ জায়গা?'

মেয়েটি গভীর দৃষ্টিতে আন-নাসেরের প্রতি তাকায়। মনটা তার আবেগাপ্লুত। আন-নাসেরকে কানে কানে জিজ্ঞেস করে– 'পালাতে চাও?'

'তোমাকে বলবো না আমি কী করতে চাই'– আন-নাসের জবাব দেয়– 'আমার যা করণীয় করে দেখাবো।'

মেয়েটি আন-নাসেরের আরো কাছে এসে বললো– 'আমি জিন নই, মানুষ। তুমি আমার উপর আস্থা রাখতে পারো।'

আন-নাসের রোষ কষায়িত লোচনে মেয়েটির প্রতি তাকায়। মেয়েটি তার পার্শ্বে পালংকের উপর বসে পড়ে।

[পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত]

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে ফেলে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

নারীর ফাঁদ-৬
ঈমানদীপ্ত দাস্তান
আলতামাশ

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৬

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৬

আলতামাশ

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৬
আলতামাশ

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

পরশমণি প্রকাশনা-৬
ISBN-984-8925-03-7

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৬

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার
মালিটোলা, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
কালার সিটি
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৫৬৪১৪১

গ্রাফিক্স
নাজমুল হায়দার
দি লাইট
মোবাইল ঃ ০১৯১-০৩১১৮৪

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

পরিবেশক

এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার (পাঠকবন্ধু মার্কেট)
ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

নিউ রহমানিয়া লাইব্রেরী
৭৩, সাত মসজিদ সুপার মার্কেট
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১-৪৬৪০৭১

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে— বিশেষত মিসর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। ক্রুসেডাররা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয় তারা।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দু:সাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিলো, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দু:সাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হলো সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ কবুল করুন।

বিনীত

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা। মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সূচীপত্রঃ

*মেয়েটি নিজের লাশ দেখল..............৭
*আলোর ঝিলিক...........................৬১
*দায়িত্ব যখন সঙ্গীকে হত্যা করল......১০৭
*দরবেশ..................................১৬৩
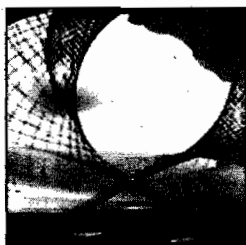
মেয়েটি নিজের লাশ দেখল

সুদর্শন যুবক আন-নাসের সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সেই কমান্ডোদের একজন, যারা মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে কথা বলে। খৃস্টানদের বিশ্বাস, সুলতান আইউবীর কমান্ডোদেরকে মৃত্যুও ভয় করে। মরুভূমির দুর্গমতা, সমুদ্রের উতলা, কণ্টকাকীর্ণ পর্বতমালা কিছুরই পরোয়া করে না তারা। দুশমনের রসদ ইত্যাদিতে অগ্নিসংযোগ করে নিজেরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবন কুরবান করা তাদের পক্ষে একটি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু জিন-পরী আর ভূত-প্রেতে প্রচণ্ড ভীতি সুলতান আইউবীর এই অকুতোভয় জানবাজ গেরিলাদের। তারা কখনো জিন-ভূত দেখেনি; শুধু গল্প-কাহিনী শুনেছে মাত্র, যাতে তাদের শতভাগ বিশ্বাস আছে। জিন-পরীর নাম শুনলেই ভয়ে তাদের গা ছমছম করে ওঠে।

আন-নাসের যদি আসিয়াত দুর্গে আপন মর্জিতে এবং সচেতন অবস্থায় এসে পৌঁছতো, তাহলে এতোটা ভয় পেতো না। তাকে যদি কয়েদি বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, তাহলেও সে নির্ভীক থাকতো এবং পালাবার বুদ্ধি বের করে নিতো। কিন্তু তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে হাশিশের নেশায় মস্তিষ্কে অবাস্তব কল্পনা সৃষ্টি করে। সেই নেশার ঘোরে সে কাল্পনিক সবুজ-শ্যামলিমা এবং বাগ-বাগিচার মধ্যদিয়ে পথ অতিক্রম করে এসেছে।

কিন্তু এখন তার নেশা কেটে গেছে। এই ভূখণ্ডে কোথায় কোথায় সবুজ-শ্যামলিমা থাকতে পারে, তার স্মরণ আসতে শুরু করেছে। এখন সে বুঝে, মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ অঞ্চল এমন স্বর্গীয় হতে পারে না।

আন-নাসের যে রূপসী মেয়েটিকে পরী মনে করেছিলো, এখন সে তার পালঙ্কে বসা। মেয়েটি তার কল্পনার চেয়েও বেশি সুন্দরী। আন-নাসের মেয়েটিকে মানুষ বলে বিশ্বাসই করতে পারছে না। মেয়েটি যখন বললো, 'তুমি আমার উপর আস্থা রাখো', তখন তার ভয় আরো বেড়ে গেলো। সে শুনেছে, জিন-পরীরা চিত্তাকর্ষক প্রতারণার মাধ্যমে মানুষ খুন করে থাকে।

এই দুর্গটি তার কাছে জিন-পরী ও ভূত-প্রেতের আড্ডা বলে মনে হতে শুরু করেছে। তার সঙ্গীরা এখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

'আমি তোমার উপর কেনো ভরসা রাখবো? আমার জন্য তোমার কেনো এতো মায়া হলো? এখানে আমাকে কেনো নিয়ে এসেছো? এটা কোন্ জায়গা?' মনে সামান্য সাহস সঞ্চয় করে আন-নাসের জিজ্ঞেস করে।

'তুমি যদি আমার উপর আস্থা স্থাপন না করো, তাহলে তোমার পরিণতি খুবই মন্দ হবে'– মেয়েটি বললো– 'তুমি ভুলে যাবে, তুমি কে ছিলে। তোমার হাত তোমারই ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হবে আর তুমি সেই রক্তকে ফুল মনে করে আনন্দিত হবে। আমি তোমার প্রতি এতো স্নেহশীল কেনো হলাম, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি এখনই দিতে পারবো না। এটি একটি দুর্গ, যার নাম আসিয়াত। এটি ফেদায়ীদের দুর্গ। এখানে ফেদায়ীদের গুরু শেখ সান্নান অবস্থান করে থাকেন। তুমি কি ফেদায়ীদের সম্পর্কে জানো?'

'হ্যাঁ, জানি'– আন-নাসের জবাব দেয়– 'খুব ভালো করে জানি। এবার আমি বুঝে ফেলেছি তোমরা কারা। তোমরাও ফেদায়ী। আমি জানি, ফেদায়ীদের কাছে তোমাদের ন্যায় রূপসী মেয়েরা থাকে!'

'তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই'– মেয়েটি বললো– 'আমার নাম লিজা।'

'তোমার সঙ্গে আরো একটি মেয়ে ছিলো, সে কোথায়?' আন-নাসের জিজ্ঞেস করে।

'তার নাম থ্রেসা'– লিজা জবাব দেয়– 'সে এখানেই আছে। তোমাদেরকে হাশিশের নেশায় আচ্ছন্ন করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।'

লিজা আর কিছু বলতে পারলো না। হঠাৎ থ্রেসা এসে কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে যায় এবং ইশারায় লিজাকে বেরিয়ে যেতে বলে। লিজা আন-নাসেরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

'এখানে কী করছো?'– থ্রেসা জিজ্ঞেস করে– 'লোকটার এতো কাছাকাছি বসেও তোমার হুঁশ হলো না যে, মুসলমান ঘৃণ্য মানুষ? তুমি কি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হতে চাচ্ছো?'

লিজার মাথায় কিছুই ধরছে না। সে কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। মুসলিম আমীরদের চরিত্রহননের পেশাটার প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে তার। এই ঘৃণা-বিতৃষ্ণা এতোই প্রবল আকার ধারণ করেছে যে, নিজের কর্মকাণ্ডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে লিজা। এখন তার মাথায় একটিই চিন্তা– হয় প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা পলায়ন।

'আমিও একটি যুবতী মেয়ে'– থ্রেসা বললো– 'আমারও এই মুসলিম

গেরিলা আন-নাসেরকে ভালো লাগে। ভালো লাগার মতো সুদর্শন যুবক বটে। যদি বলো, লোকটা তোমার হৃদয়ে বাসা বেঁধে ফেলেছে, তাহলে আমি বিস্মিত হবো না। তোমার অন্তরে বৃদ্ধ মুসলমান আমীর ও সালারদের প্রতি যে ঘৃণা জন্মে গেছে, তাও আমি জানি। সে কারণেই তুমি তাদের খেলনা হয়ে থাকতে চাচ্ছো না। কিন্তু কর্তব্যকে তো আর ভুলে গেলে চলবে না। ক্রুশের মর্যাদাকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই মুসলমানরা তোমার দুশমন।'

'না থ্রেসা!'– লিজা আপ্লুত কণ্ঠে বললো– 'তার প্রতি আমার সেই আকর্ষণ নেই, যা তুমি মনে করছো।'

'তাহলে তার পাশে গিয়ে বসেছিলে কেন?'

'বলতে পারবো না'– লিজা বল্লো– 'জানি না কী ভেবে তার পাশে গিয়ে বসেছিলাম।'

'তার সঙ্গে তোমার কী কী কথা হয়েছে?' থ্রেসা জিজ্ঞেস করে।

'বিশেষ কোন কথা হয়নি।' লিজা বললো।

'তুমি দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করছো'– থ্রেসা বললো– 'এটি বিশ্বাসঘাতকতা, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

'কিন্তু শুনে রাখো থ্রেসা!'– লিজা বললো– 'আমি ঐ বুড়োটার কাছে একা যাবো না। তিনি যদি জবরদস্তি করেন, তাহলে হয় তাকে নয়তো নিজেকে শেষ করে ফেলবো।'

রূপসী কন্যা থ্রেসা তো নিজেকে পাথর বানিয়ে নিয়েছে, যার রং ও চাকচিক্য যে কারো হৃদয়কে আকর্ষণ করে থাকে এবং যে কেউ তার মালিক হতে চায়। পাথরের নিজস্ব কোন পছন্দ-অপছন্দ থাকে না। লিজাও সেই অবস্থান থেকে বহু দূরে সরে এসেছে। সেখানে একজন নারীর আত্মচেতনা, ভালোবাসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ বলতে কিছুই থাকে না।

থ্রেসা তাকে বললো– 'আমার বিলকুল ধারণা ছিলো না, তুমি এতো বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বে। অন্যথায় আমরা এখানে আসতাম না। কিন্তু এটি ছাড়া কাছাকাছি আর কোনো কেল্লা ছিলো না। ত্রিপোলী পর্যন্ত পৌঁছা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আমি তোমাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, শেখ সান্নান থেকে তোমাকে রক্ষা করার পুরোপুরি চেষ্টা করবো এবং এখান থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নেয়ার পন্থা বের করে নেবো। তুমি আবেগ ত্যাগ করো। আমি আমার ওয়াদা রক্ষা করবো।'

'আমি এই মুসলিম কমান্ডোদেরকে এখান থেকে আমাদের পলায়নের কাজে ব্যবহার করতে চাই'– লিজা বললো– 'তুমি না নিজে এখান থেকে বের হতে পারবে, না আমাকে বের করতে পারবে। এরা গেরিলা সৈনিক। আমি এদের বীরত্বের কাহিনী শুনেছি। সামান্য সুযোগ বের করে দিলেই তারা পালিয়ে যাবে এবং আমাকে ও তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। এছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই।'

'আমি তাদের পারঙ্গমতা ও বীরত্ব স্বীকার করি'– থ্রেসা বললো– 'কিন্তু আমরা যদি তাদের সহযোগিতায় পলায়ন করি, তাহলে তারা আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে– আমাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেবে না। তুমি শত্রুর সহায়তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো। গোসল করে পোশাক বদল করে আসো। শেখ সান্নান আজ রাতের আহারে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে, আমি তোমাকে বলে দেবো। প্রকাশ করতে হবে, তুমি তাকে অপছন্দ করো না এবং তার থেকে পলায়নেরও কোন চেষ্টা করছো না। আমি এইমাত্র জানতে পেরেছি, হাররানের স্বাধীন শাসক গোমস্তগীনও এসেছেন। তুমি হয়তো জানো না, গোমস্তাগীন সালাহুদ্দীন আইউবীর সবচেয়ে বড় শত্রু। তুমি তাকে বন্ধুরূপে বরণ করে নেবে। আমি বহু কষ্টে এই মুসলিম শাসকদের হাতে এনেছি এবং তাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছি।'

লিজার চলে যাওয়ার পর আন-নাসের গভীর ভাবনায় ডুবে যায়। এখন সে নিশ্চিত, মেয়ে দুটো পরী নয়। কিন্তু তার প্রতি লিজার দয়াপরবশ হওয়া তাকে অস্থির করে তুলেছে। মেয়েটি বলেছিলো, তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে হাশিশের নেশায় আচ্ছন্ন করে এ পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে। তাতেই সে বুঝে ফেলেছে, এই মেয়েগুলো ফেদায়ী চক্রের সদস্য। তার মনে আরো সংশয় জাগে, হাশিশ ছাড়াও রূপসী যুবতীর দ্বারা তাকে হাত করা এবং আপন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চলছে। আন-নাসের গেরিলা সৈনিক। কর্তব্য পালনে দুশমনের এলাকায় যেতে হবে বিধায় তাকে ফেদায়ী চক্র এবং তাদের রীতি-নীতি এবং হাশিশের ক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করা হয়েছিলো।

আন-নাসের তার সঙ্গীদের জাগিয়ে তোলে। জাগ্রত হয়ে তারাও তাদের কমান্ডারের ন্যায় অস্থির হয়ে ওঠে। তারা আন-নাসেরের মুখপানে তাকিয়ে থাকে।

'বন্ধুগণ!'– আন-নাসের বললো– 'আমরা ফেদায়ীদের ফাঁদে এসে পড়েছি। এই দুর্গের নাম আসিয়াত। এটি ফেদায়ী ও তাদের ফৌজের আস্তানা। এই মেয়েগুলো জিন-পরী নয়। তারা আমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে, আমি এখনই বলতে পারবো না। আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। ফেদায়ীরা কী কী পন্থা অবলম্বন করে থাকে, তোমাদের জানা আছে। আমি যদি এই কক্ষ থেকে বের হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাই, তাহলে দুর্গ থেকে পালাবার কৌশল ভেবে দেখবো। তোমরা চুপচাপ থাকবে। এরা কিছু জিজ্ঞেস করলে সংক্ষেপে উত্তর দেবে। এই শয়তানদের থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ হবে না।'

'এরা কি আমাদেরকে কয়েদখানায় আটকে রাখবে?' আন-নাসেরের এক সঙ্গী জিজ্ঞেস করে।

'কারাগারে নিক্ষেপ করলে তো ভালোই হতো'– আন-নাসের জবাব দেয়– 'কিন্তু এরা হাশিশ আর নারী দ্বারা আমাদের মন-মস্তিষ্ক এমনভাবে বদলে দেবে, আমাদের স্মরণই থাকবে না, আমরা কারা ছিলাম এবং আমাদের ধর্ম কী ছিলো।'

'পলায়ন ছাড়া মুক্তির আর কোনো উপায় আমার চোখে পড়ছে না।' আন-নাসেরের এক সঙ্গী বললো।

'আমরা মৃত্যুকে বরণ করে নেবো; তবু ঈমান বিনষ্ট হতে দেবো না।' অপর একজন বললো।

'তোমরা সাবধান থাকবে'– আন-নাসের বললো– 'আমরা অতো তাড়াতাড়ি তাদের কব্জায় যাবো না।'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এক ব্যক্তি এসে কক্ষে দু'টি প্রদীপ রেখে যায়। লোকটি কোনো কথা বললো না। আসলো আর বাতিগুলো রেখে চলে গেলো। ক্ষুধার জ্বালায় তাদের পেট চোঁ চোঁ করছে। তাদের কক্ষ থেকে বেশ দূরে কেল্লার এক কোণে সান্নানের মহল। সেখানে নারী আর মদের জমজমাট আসর চলছে। সান্নানের খাস কামরায় রকমারী সুস্বাদু খাবার সাজিয়ে রাখা আছে। আছে মদের পিপা-পেয়ালাও। খাবারের গন্ধে মৌ মৌ করছে চারদিক। শেখ সান্নান দস্তরখানে উপবিষ্ট। তার এক পাশে থ্রেসা, অপর পাশে লিজা বসে আছে। সম্মুখে গোমস্তগীন বসে আহার করছেন।

গোমস্তগীন হাররান নামক একটি দুর্গের অধিপতি। নুরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি হাররান দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্তী

অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ছিলেন সুলতান আইউবীর মুসলমান শত্রুদের সমন্বয়কারী ব্যক্তি। তিনিও নিজের বাহিনীকে সেই সম্মিলিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যাকে সুলতান আইউবী পরাজিত করেছেন। গোমস্তগীন নিজে বাহিনীর সঙ্গে যাননি। তিন বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন সাইফুদ্দীন। জোটের শরীক বাহিনীগুলোর ন্যায় গোমস্তগীনও খৃস্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। খৃস্টানরা তাদেরকে সৈন্য দিয়ে এখনো সাহায্য করেনি। তবে উপদেষ্টা, গোয়েন্দা ও সন্ত্রাসী দিয়ে রেখেছে এবং তাদেরকে নিজেদের কব্জায় রাখার জন্য উন্নত মদ, সুন্দরী নারী ও অর্থ সরবরাহ করছে।

গোমস্তগীনের পেটভরা কুটিল বুদ্ধি। ষড়যন্ত্র পাকানোর ওস্তাদ লোকটি। দুশমনের উপর মাটির নীচ থেকে আক্রমণ করা এবং আপনদের বিরুদ্ধে মনে মনে শত্রুতা পোষণ করা ছিলো তার নীতি। ভালবাসা-বন্ধুত্ব ছিলো তার শুধুই ক্ষমতার জন্য। রাজ্যের স্বাধীন সম্রাট হয়ে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। যারা সরল বন্ধুত্বে তাকে অকাতর সাহায্য করতো, তাদের প্রতিও তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হত্যা মিশনে বেশ আগ্রহ-আন্তরিকতা ছিলো তার। তার ভালোভাবেই জানা ছিলো, ক্ষমতালোভী শাসকের সিংহাসন কেবল সামরিক শক্তিই উল্টাতে পারে। সুলতান আইউবীই একমাত্র সালার, যার হৃদয়সমুদ্রে জাতীয় চেতনা তরঙ্গায়িত ছিলো। সমর যোগ্যতার পাশাপাশি ঈমান ছিলো তাঁর বিশেষ এক শক্তি। গোমস্তগীন তাঁর এই শক্তিটাকেই বেশি ভয় করতেন। এবার নিজের বাহিনীকে সাইফুদ্দীনের কমান্ডে দিয়ে তুর্কমান রওনা করিয়ে কাউকে না জানিয়ে তিনি শেখ সান্নানের নিকট আসিয়াত দুর্গে এসে পৌঁছেন। উদ্দেশ্য, সুলতান আইউবীকে হত্যা করার এমন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যা পূর্বেকার পরিকল্পনাগুলোর ন্যায় ব্যর্থ হবে না।

আসিয়াত দুর্গে তিনি আন-নাসের ও থ্রেসা-লিজার আগমণের একদিন আগে পৌঁছে যান। সাইফুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন তার বাহিনীর সুলতান আইউবীর হাতে কী পরিণতি ঘটেছে, এখনো তিনি জানেন না। বাহিনীকে রওনা করিয়েই তিনি আইউবী হত্যার ষড়যন্ত্র মিশন নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং আসিয়াত এসে পৌঁছান।

'গোমস্তগীন ভাই!'– শেখ সান্নান বললো– 'তোমার বন্ধু তো তুর্কমান থেকে পালিয়ে গেছে।' তারপর থ্রেসার প্রতি তাকিয়ে বললো– 'তুমি একে যুদ্ধের বিস্তারিত শোনাও।'

পরাজয়ের সংবাদে গোমস্তগীন অকস্মাৎ এতোই ব্যথিত হয়ে পড়েন যে, বেশ সময় পর্যন্ত তার মুখ থেকে কথা বের হলো না। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিনি ব্যথিত ও বিস্মিত চোখে থ্রেসার প্রতি তাকিয়ে থাকেন। সুলতান আইউবী স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা সম্মিলিত বাহিনীর উপর কীভাবে আক্রমণ করেছেন এবং কীভাবে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন, থ্রেসা গোমস্তগীনকে তার বিবরণ প্রদান করে। থ্রেসা সাইফুদ্দীন সম্পর্কে জানায়– 'আমি তার ওখান থেকে রওনা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি রণাঙ্গন থেকে নিখোঁজ ছিলেন।'

গোমস্তগীন চুপচাপ থ্রেসার বক্তব্য শুনতে থাকেন।

'আমাকে আমার বন্ধুরা অপদস্ত করেছে'– গোমস্তগীন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন– 'আমি সাইফুদ্দীনকে তিন বাহিনীর কমান্ড প্রদানের পক্ষে ছিলাম না। কিন্তু কেউই আমার কথা শুনলো না। জানি না, আমার বাহিনী কী অবস্থায় আছে!'

'খুবই খারাপ অবস্থায়'– থ্রেসা বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর গেরিলারা আপনার বাহিনীকে শান্তিতে ও নিরাপদে পিছপাও হতে দেয়নি।'

'সান্নান ভাই! তুমি জানো, আমি এখানে কেন এসেছি।' গোমস্তগীন বললেন।

'জানি– তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর হত্যার মিশন নিয়ে এসেছো।' সান্নান বললো।

'হ্যাঁ'– গোমস্তগীন বললেন– 'যা চাইবে, দেবো। আইউবীকে খুন করাও।'

'আমি আমাদের খৃস্টান মিত্র এবং সাইফুদ্দীনের পরিকল্পনা মোতাবেক আইউবীকে খুন করার লক্ষ্যে চারজন ঘাতক প্রেরণ করে রেখেছি'– সান্নান বললো– 'কিন্তু তারা আইউবীকে খুন করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।'

'আমার থেকে আলাদা পুরস্কার নিও'– গোমস্তগীন বললেন– 'আমাকে নতুন লোক দাও। এদেরকে আমাকে দিয়ে দাও। কাজটা আমি নিজে করবো।'

'ওরা সর্বশেষ চার ফেদায়ী, যাদেরকে আমি প্রেরণ করেছি'– শেখ সান্নান বললো– 'আমার কাছে ঘাতকের অভাব নেই। কিন্তু আমি সালাহুদ্দীন হত্যার মিশন থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি।'

'কেনো?' গোমস্তগীন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন– 'আইউবী আপনাকে কোন দুর্গ-টুর্গ দিয়ে দিয়েছে নাকি?'

'না'– সান্নান বললো– 'লোকটাকে খুন করাতে আমি আমার বহু মূল্যবান ফেদায়ী নষ্ট করে ফেলেছি। আমার লোকেরা তার উপর ঘুমন্ত অবস্থায় খঞ্জর দ্বারা আক্রমণ করেছে। একবার তার গায়ে তীরও ছোঁড়া হয়েছিলো। তাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছো। আমি যা বুঝেছি, তাহলো, আইউবীর উপর খোদার হাত আছে। তার মধ্যে এমন কোন শক্তি আছে, যার ফলে তার উপর না খঞ্জর ক্রিয়া করে, না তীর-বর্শা। আমার গুপ্তচররা আমাকে বলেছে, আইউবীর উপর যখন সংহারী আক্রমণ হয়, তখন তিনি ভীত কিংবা ক্ষুব্ধ হওয়ার পরিবর্তে মুচকি হাসেন এবং মুহূর্ত মধ্যে ভুলে যান একটু আগে কী ঘটেছিলো।'

'পারিশ্রমিক কতো লাগবে বলো'– গোমস্তগীন গর্জে ওঠে বললেন– 'আমি আইউবীকে জীবিত দেখতে চাই না। তুমি আনাড়ি ঘাতক প্রেরণ করেছো।'

'তারা সবাই ঘাঘু ছিলো'– শেখ সান্নান বললো– 'তাদের হাত থেকে কখনো কেউ বাঁচতে পারেনি। তারা মৃত্যুকে ভয় করার মতো মানুষ ছিলো না। আমার কাছে তাদের চেয়েও দক্ষ ওস্তাদ আছে। তারা এমনভাবে খুন করে, পরে হত্যাকাণ্ডের কোন ক্লু খুঁজে বের করা যায় না। কিন্তু গোমস্তগীন! আমি আমার এই মূল্যবান লোকগুলোকে এভাবে নষ্ট করবো না। তোমরা তিনটি বাহিনী একত্রিত হয়ে আইউবীকে পরাজিত করতে পারলো না। আমার তিন-চারজন লোক কীভাবে তাকে খুন করবে?'

'তুমি আইউবীকে হত্যা করতে ভয় পেয়ে গেছো'– গোমস্তগীন বললেন– 'এর কারণ অন্যকিছু হবে।'

'আরো একটি কারণ হলো'– সান্নান বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। হাসান ইবনে সাব্বাহ পয়গম্বর হতে চেয়েছিলো। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আমার বাহিনীটি পেশাদার ঘাতক হয়ে গেছে। আমিও পেশাদার ঘাতক গোমস্তগীন! আইউবী যদি তোমাকেও খুন করার জন্য আমাকে পারিশ্রমিক দেয়, তোমাকে হত্যা করাতেও আমি দ্বিধা করবো না।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী কাপুরুষের ন্যায় কাউকে হত্যা করান না'– লিজা বললো– 'এ কারণেই বোধ হয় তিনি কাপুরুষদের হাতে খুন হন না।'

'উহ!'– সান্নান লিজাকে বাহুতে চেপে ধরে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললো– 'তুমি এ বয়সেই জেনে ফেলেছো, যারা কাপুরুষ নয়, কাপুরুষরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না!' সে গোমস্তগীনকে উদ্দেশ করে বললো– 'সাইফুদ্দীন, আল-মালিকুস সালিহ এবং খৃস্টানরা শুধু এই জন্য একে

অপরের বন্ধু হয়েছে যে, তারা সকলে সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রু। অন্যথায় তোমাদের মাঝে কোন বন্ধুত্ব নেই। তুমি বলো, আইউবীকে হত্যা করে তোমরা কী অর্জন করতে পারবে? তিনি মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আপসে লড়াই করবে। মন দিয়ে শোন গোমস্তগীন! আইউবীর নিহত হওয়ার পর সাম্রাজ্যের এক বিঘত ভূমিও তোমার কপালে জুটবে না। তার ভাই ও সালারগণ ঐক্যবদ্ধ। তোমার যদি কাউকে খুন করাতেই হয়, সাইফুদ্দীনকে করাও এবং তাকে তুমি নিজেই হত্যা করতে পারবে। সে তোমাকে নিজের বন্ধু ও সহযোগী মনে করে। তুমি তাকে বিষ খাওয়াতে পারো, তার উপর হামলা করাতে পারো।'

গোমস্তগীন গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান। ক্ষণকাল নীরব থেকে পরে বললেন– 'হ্যাঁ, সাইফুদ্দীনকে খুন করিয়ে দাও। বলো, তোমাকে কী দিতে হবে?'

'হাররানের দুর্গ।' শেখ সান্নান বললো।

'তোমার মাথা ঠিক আছে সান্নান?'– গোমস্তগীন বললেন– 'সোনাদানা-অর্থকড়ির কথা বলো।'

'সোনাদানা নয়– আমি বরং তোমাকে চারজন লোক দেবো'– শেখ সান্নান বললো– 'তারা আমার ফেদায়ী নয়, আইউবীর কমান্ডো। এই মেয়ে দুটো তাদেরকে হাশীশের নেশায় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আমি তাদেরকে কারো কাছে হস্তান্তর করতে চাই না। এমন অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যায় না। ভাগ্যক্রমে আমি পেয়ে গেছি। হাশীশ আর আমার পরীরা তাদেরকে আপন রঙে রঙিন করে এমন ঘাতকে পরিণত করবে যে, তারা তাদের পিতা-মাতাকেও খুন করতে দ্বিধা করবে না। আমি তোমাকে নিরাশ করতে চাই না। তুমি এদেরকে নিয়ে যাও। এদেরকে তোমার জান্নাত দেখিয়ে দাও। তোমার হেরেমের রাজপুত্র বানাও। অজান্তে হাশীশ পান করাও। মদপানের অভ্যাস গড়ে তোল। তারপর তারা তোমার ইশারায় নাচবে, উঠ্‌-বস্‌ করবে।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর গেরিলারা অতো কাঁচা নয়, যতটা তুমি মনে করছো।' গোমস্তগীন বললেন।

'তুমি তো জানো গোমস্তগীন!'– সান্নান বললো– 'আমরা ফেদায়ী। আমরা মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা নিয়ে খেলা করে থাকি। আমরা আমাদের শিকারের মস্তিষ্কে চিত্তাকর্ষক কল্পনা ঢুকিয়ে দিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করি যে, তারা কল্পনাকে বাস্তব ভাবতে শুরু করে। কোন মানুষের

মাথায় নারীর সুদর্শন কল্পনা সৃষ্টি করে দাও, সেই সঙ্গে নেশাও পান করাও, দেখবে সে কল্পনার গোলাম হয়ে যাবে। মানুষকে নারীর কল্পনায় হারিয়ে থাকায় অভ্যস্ত করে তোল, তুমি তার ঈমান ও চরিত্র সামান্য মূল্যে ক্রয় করতে পারবে। তুমি এই চার ব্যক্তিকে নিয়ে যাও। এ কথা ভেবো না, তুমি এদেরকে নিজ কাজে ব্যবহার করতে পারবে না।'

সান্নান মুচকি হেসে বললো– 'তুমি নিজের প্রতিই তাকিয়ে দেখো, নারী, মদ আর বিলাসপ্রিয়তা তোমাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছে। মুসলমান হয়ে তুমি মুসলমানের শত্রু হয়ে গেছো।'

শেখ সান্নান গোমস্তগীনকে তার মূল্য জানায়। চুক্তি সম্পাদিত হয়, গোমস্তগীন আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের হাররান নিয়ে যাবেন। সান্নান গোমস্তগীনকে পরামর্শ দেয়, এদেরকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ না করে রাজপুত্র বানিয়ে রাখবে। গোমস্তগীন দু'দিনের মধ্যে সুলতান আইউবীর কমান্ডোদের নিয়ে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে উঠে যান।

গোমস্তগীন কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলে শেখ সান্নানের এক লোক কক্ষে প্রবেশ করে। সে জিজ্ঞাসা করে, আজ যে চার ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে নির্দেশ কী?

'হাররানের গভর্নর গোমস্তগীন এসেছেন'– সান্নান বললো– 'তিনি তাদেরকে নিয়ে যাবেন। তাদের খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। আমি তাদেরকে রাখতে চাই না। তবে বিষয়টা তাদের বলবে না।'

লোকটি চলে যায়। সে আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দেয়। আন-নাসের খেতে অস্বীকার করে। তার সন্দেহ, খাদ্যে হাশীশ মেশানো হয়েছে। সান্নানের লোকেরা বহু কষ্টে তাকে নিশ্চিত করে, খাদ্যে কিছু মেশানো হয়নি। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা ক্ষুধায় অস্থির হয়ে আছে। সম্মুখে এমন উন্নত খাবার দেখে তারা আরো অস্থির হয়ে ওঠে। ঝুঁকি মাথায় নিয়ে খেতে শুরু করে।

শেখ সান্নান থ্রেসাকে বললেন, লিজাকে আমার কাছে রেখে তুমি চলে যাও। থ্রেসা বললো, মেয়েটা লাগাতার তিন-চার দিন সফরে ছিলো। এখন তার বিশ্রামের প্রয়োজন।

সান্নান হিংস্র প্রকৃতির এক অমানুষ-পশু। লোকটা লিজার সঙ্গে আগেও অসদাচরণ করেছে, যা থ্রেসার কথায় লিজা সহ্য করে নিয়েছে। এবারও

থ্রেসার অজুহাত উপেক্ষা করে লিজার প্রতি হাত বাড়াতে শুরু করেছে। ঘৃণায় লিজার শরীরটা রি রি করে ওঠে। মেজাজ চড়ে গিয়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে শুরু করে। ইতিমধ্যে হঠাৎ কক্ষের দরজা খুলে যায়। দারোয়ান এক ব্যক্তির আগমনের সংবাদ জানায়। সান্নান ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো– 'এখন কেউ ভেতরে আসতে পারবে না।' কিন্তু আগন্তুক তার অসম্মতির তোয়াক্কা না করে দারেয়ানকে ঠেলে একদিকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

লোকটা একজন খৃস্টান। এইমাত্র দুর্গে এসে পৌঁছেছে। সান্নান তাকে চেনে। তাকে দেখামাত্র সে তার নাম উল্লেখপূর্বক আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু বললো– 'তুমি এখন গিয়ে বিশ্রাম নাও, সকালে কথা হবে।'

'আপনার সঙ্গে আমার সকালেই সাক্ষাৎ করার কথা ছিলো'– খৃস্টান বললো– 'কিন্তু এখানে এসেই জানতে পারলাম, এই মেয়েরা এসেছে। এদের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, বহু কিছু জানতে হবে। আমি এদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

সান্নান থ্রেসার কাঁধে হাত রেখে বললো– 'একে নিয়ে যাও।' লিজাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললো– 'একে আমি এখানে রাখবো।'

'শেখ সান্নান!'– লোকটি খানিকটা শ্লেষমাখা কণ্ঠে বললো– 'আমি দু'জনকেই নিয়ে যাচ্ছি। তুমি জানো, আমি কী কাজে এসেছি। এই মেয়েগুলোর দায়িত্ব কী, তোমার জানা আছে। তোমার বগলের তলে বসে থাকা এদের কর্তব্য নয়।' সে মেয়েরেদেক বললো– 'তোমরা দু'জনই আমার সঙ্গে আসো।'

মেয়েরা ঝটপট উঠে পড়ে লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

'তোমরা কি আমার সঙ্গে শত্রুতার ঝুঁকি মাথায় নিতে চাচ্ছো?'– শেখ সান্নান বললো– 'তোমরা এখন আমার দুর্গে অবস্থান করছো। আমি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অতিথি থেকে বন্দিতে পরিণত করতে পারি।' সে গর্জে ওঠে লিজার প্রতি অঙুলি নির্দেশ করে বললো– 'একে আমার কাছে রেখে তোমরা বেরিয়ে যাও।'

'সান্নান!'– খৃস্টান লোকটি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো– 'তুমি কি ভুলে গেছো, এই দুর্গ তোমাকে আমরা দিয়েছি? তুমি কি ভুলে গেছো, আমরা যদি তোমার পিঠে হাত না রাখি, তাহলে তুমি এবং তোমার ফেদায়ীরা ভাড়াটে খুনী ছাড়া আর কিছুই থাকবে না?'

শেখ সান্নান এই দুর্গের রাজা। তার এই দক্ষতা আছে যে, কোন রাজা-বাদশাহকে যে কোন সময় এমনভাবে খুন করাতে পারে যে, কারো সন্দেহ করার উপায় থাকে না। বেশ ক'জন খৃস্টান অফিসারকেও সে খুন করিয়েছে। পারস্পরিক শত্রুতার কারণে খৃস্টানরাই তাকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছে। প্রয়োজনে এ কাজে তারা সান্নানকে ব্যবহার করতো।

লিজা থেকে হাত গুটিয়ে নিতে রাজি নয় সান্নান। সে খৃস্টান লোকটিকে বললো— 'আমি তোমাকে চিন্তা করার সময় দেবো। এই দুর্গে খোদার ফেরেশতাদেরও গুম করে ফেলা হয়, যা খোদা নিজেও টের পান না। এই মেয়েটিকে আমি দুর্গ থেকে বের হতে দেবো না। বাড়াবাড়ি করলে তুমিও বেরুতে পারবে না।'

'আমার এক সঙ্গী আগে চলে গেছে'— খৃস্টান বললো— 'সে বলে দেবে আমি এখানে আছি। তুমি জানো, আমি এখানে দু'-তিন দিন থাকতে এসেছি। তারপর আমাকে অন্যত্র যেতে হবে। আমার এখানে থাকার অধিকার আছে। তোমাকে দুর্গ দান করার সময় শর্ত দেয়া হয়েছিলো, প্রয়োজন হলে আমরা এখানে এসে থাকতে পারবো। এটি আমাদের আশ্রয়স্থল এবং অস্থায়ী ক্যাম্প। তুমি আমার হাড়-গোড় গায়েব করে ফেললেও তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমাদের একজন লোক আর মেয়ে দু'টি কোথায়?' খৃস্টান লোকটি কি যেনো ভেবে পুনরায় বললো— 'তুমি যদি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করতে পারো, তাহলে এরূপ এক ডজন মেয়ে তোমার হাতে তুলে দেবো। কিন্তু তুমি আমাদের সোনা আর কড়ি কেবল হজমই করে যাচ্ছো, আইউবীকে হত্যা করতে পারোনি। আমি জানতে পেরেছি, তুমি আইউবীকে হত্যা করার জন্য চারজন ফেদায়ী প্রেরণ করে রেখেছো। কিন্তু আইউবী এখন পর্যন্ত জীবিত এবং বিজয়ী। তোমার অভিযানকে আমার কাছে ধাপ্পা বলে মনে হচ্ছে।'

'ধাপ্পা নয়'— সান্নান নেশার ঘোরে ক্ষোভ-কম্পিত কণ্ঠে বললো— 'আমি সত্যি সত্যিই চার ব্যক্তিকে প্রেরণ করে রেখেছি। দিন কয়েকের মধ্যেই সংবাদ পাবে সালাহুদ্দীন আইউবী খুন হয়ে গেছেন।'

'কাজ হোক। আমি ওয়াদা দিচ্ছি, আমার নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে এর মতো দু'টি মেয়ে উপহার দেবো।' খৃস্টান বললো।

'দেখা যাক'— সান্নান বললেন— 'এখন তুমি একে আমার কক্ষের বাইরে নিয়ে যাও। তবে দুর্গের বাইরে নিতে পারবে না। যাও, নিয়ে যাও। আমি

দুর্গে খৃস্টানদের জন্য স্বতন্ত্র যে কক্ষ দিয়েছি, একে নিয়ে তুমি সেখানে চলে যাও। খাওয়া-দাওয়া করো, ফূর্তি করো। তারপর ভেবে-চিন্তে জবাব দাও, এই মেয়েটিকে আমার হাতে তুলে দেবে কিনা।'

খৃস্টান লোকটি মেয়ে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে সান্নানের শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। লোকটি খৃস্টানদের গোয়েন্দা ও নাশকতা বিভাগের অফিসার। মুসলিম এলাকায় ডিউটি পালন করে নিজ অঞ্চলে ফিরে যাওয়ার পথে এখানে এসেছে। আসিয়াত দুর্গে খৃস্টানদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার ছিলো। খৃস্টানদের যখন যার ইচ্ছে সেখানে যেতে পারতো। থ্রেসাও এই সুযোগের সুবাদেই লিজা এবং আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের নিয়ে এখানে এসেছে। এই খৃস্টান লোকটিরও একই লক্ষ্যে এখানে আগমন। দু'-একদিন পর তার সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে। দুর্গে প্রবেশ করামাত্র কেউ একজন তাকে জানায়, দু'টি খৃস্টান মেয়ে এসেছে, যারা এই মুহূর্তে শেখ সান্নানের কাছে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে দেখার জন্য সে ভেতরে চলে যায় এবং সান্নানের সঙ্গে উচ্চবাচ্যের পর মেয়ে দুটোকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

খৃস্টান লোকটি মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর শেখ সান্নান তার খাস লোকদের ডেকে বললো– 'এই খৃস্টান লোকটি এবং মেয়ে দুটো আমাদের কয়েদি নয়। তবে তাদেরকে আমার অনুমতি ছাড়া দুর্গ থেকে বের হতে দেবে না। তাদের উপর নজর রাখবে। আর গোমস্তগীন যখন ইচ্ছা চার কয়েদিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।'

খৃস্টান লোকটিকে জানানো হলো, হাররানের গভর্নর গোমস্তগীনও এসেছেন এবং তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরে ফিরছেন। তাকে আন-নাসের এবং তার সঙ্গীদের বিষয়টিও অবহিত করা হলো।

লোকটি থ্রেসা ও লিজাকে খৃস্টানদের জন্য নির্ধারিত খাস বিশ্রামাগারে নিয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

মুজাফফর উদ্দীনকে পরাজিত করে সুলতান আইউবী যাদেরকে পাকড়াও করেছেন, তাদের একজন হলেন সাইফুদ্দীনের উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন, যিনি মসুলে সাইফুদ্দীনের মন্ত্রীও ছিলেন।

সুলতান আইউবী ফখরুদ্দীনকে যুদ্ধবন্দিদের থেকে আলাদা করে নিজের তাঁবুতে নিয়ে যান এবং যথাযোগ্য সম্মানের সাথে রাখেন। গনীমতের সম্পদ বন্টন করে সুলতান আইউবী সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত এই গ্রহণ করেন যে,

তিনি পলায়নপর শত্রুদের ধাওয়া করবেন না। কোন কোন ঐতিহাসিক আইউবীর এই সিদ্ধান্তকে তার সামরিক পদস্খলন বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসের এই মর্দে মুজাহিদ বহু দূরের চিন্তা করতেন। এটা বাস্তব যে, তিনি যদি শত্রুসেনাদের ধাওয়া করতেন, তাহলে তাঁর বাহিনী চিরতরে নি:শেষ হয়ে যেতো, যার ফলে দুশমন মোড় ঘুরিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো।

পরাজিত দুশমনকে ধাওয়া না করার একটি কারণ এই ছিলো যে, মুজাফফর উদ্দীনের সঙ্গে তিনি যে যুদ্ধ লড়েছেন, তাতে বিজয় অর্জন করতে তাঁকে চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে। তাঁর ফৌজের ব্যাপক জীবনহানি ঘটেছে। আহতদের সংখ্যাও ছিলো বিপুল। সে কারণে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভবও ছিলো না। অগ্রযাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তিনি তাঁর রিজার্ভ বাহিনীকে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। একটি কারণ এও ছিলো যে, মুসলমানের হাতে মুসলমানের আরো অধিক রক্ত ঝরুক, তা তাঁর কাম্য ছিলো না। তিনি আপন জাতিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রক্তপাত থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন।

এই মুহূর্তে সুলতান আইউবী সেই স্থানটিতে দাঁড়িয়ে আছেন, যেখানে সাইফুদ্দীনের ব্যক্তিগত তাঁবু ছিলো। সাইফুদ্দীনের তাঁবুটা ছিলো খুবই মূল্যবান। রেশমী কাপড়ের মহল। পর্দা ও শামিয়ানা ছিলো রেশমী। ভেতরে দাঁড়িয়ে শীশ মহলের কল্পনা করা যেতো। সাইফুদ্দীনের এক ভাতিজা ইয্যুদ্দীন ফররুখ শাহ সুলতান আইউবীর ফৌজে সালার ছিলেন। বিস্ময়কর যুদ্ধের বিস্ময়কর এক দৃশ্য– ভাতিজা চাচার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে! তিনি ব্যতীত আরো কয়েকজন সৈনিক ছিলো, যারা তাদের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলো। সুলতান আইউবী সাইফুদ্দিনের এই তাঁবু পরিদর্শন করে তার ভাতিজা ইয্যুদ্দীনকে কাছে ডেকে মুচকি হেসে বললেন– 'তোমার চাচার সম্পত্তির ওয়ারিশ তুমি। তার তাঁবুটা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এই সম্পদ তুমি বুঝে নাও।'

সুলতান আইউবী তো হাসিমুখে এই নজরানা পেশ করেছিলেন। কিন্তু ইয্যুদ্দীনের চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসে। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনাচমায় অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় এই কাহিনী উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, সুলতান আইউবী ইয্যুদ্দীনের চোখে অশ্রু দেখে বললেন– 'ইয্যুদ্দীন! আমি তোমরা জযবা ভালো করেই বুঝি। কিন্তু আমার নীতি

হলো, আমার পুত্রও যদি জিহাদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে, আমার তরবারী তাকেও রেহাই দেবে না। এটা ইসলামেরই শিক্ষা। পরাজিত চাচার তাঁবু দেখে তোমার চোখে অশ্রু নেমে এসেছে। কিন্তু আমি আমার ইসলাম ও জিহাদ- বিরোধী পুত্রের কর্তিত মাথা দেখেও অশ্রু ঝরাবো না।'

সুলতান আইউবী উক্ত এলাকা থেকে সামান্য সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে ছাউনী ফেলেন। অঞ্চলটা পাহাড়ি। তার নাম 'সুলতান পর্বত'। ইতিহাসে জায়গাটাকে এ নামেই অভিহিত করা হয়েছে। সেখান থেকে হাল্‌বের দূরত্ব পনের মাইল। আল-মালিকুস সালিহ'র রাজধানী ও আবাসভূমি এই শহরটি এখন যৌথ বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই শহরটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতো শক্ত এবং এখানকার মানুষ (যারা সকলে মুসলমান) এতো সাহসী ও যুদ্ধবাজ ছিলো যে, সুলতান আইউবীর অবরোধ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলো। এখন তিনি পুনরায় এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটি অবরোধ করে দখল করতে চাচ্ছেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি নিজের অবস্থান মজবুত করে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন।

পথে দু'টি দুর্গ। একটির নাম মাম্বাজ, অপরটি বুযা। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে মাম্বাজকে মাম্বাস উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুর্গ দু'টির অধিপতিদ্বয় ছিলেন স্বাধীন মুসলমান। এরূপ আরো কয়েকটি দুর্গ ও জায়গীর ছিলো, যেগুলোতে মুসলমানদের কর্তৃত্ব ছিলো। এভাবেই সালতানাতে ইসলামিয়া দুর্গ, জায়গীর ও প্রদেশে বিভক্ত হয়েছিলো। সুলতান আইউবী এই বিক্ষিপ্ত পরমাণুগুলোকে একত্রিত করে একটি সাম্রাজ্য গঠন করে তাকে এক খেলাফতের অধীনে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, এই আমীর ও জায়গীরদারগণ নিজ নিজ স্বতন্ত্র মর্যাদা ও অবস্থান অটুট রাখতে চাইছেন। তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য খৃস্টানদের থেকে পর্যন্ত সাহায্য নিতে কুণ্ঠবোধ করছেন না।

সুলতান আইউবী বুযার আমীরের নামে একটি বার্তা লিখেন। আরেকটি লিখেন মাম্বাজের আমীরের নামে। বার্তা দিয়ে বুযায় ইয্‌যুদ্দীনকে এবং মাম্বাজে সাইফুদ্দীনের উপদেষ্টা ফখরুদ্দীনকে প্রেরণ করেন। ফখরুদ্দীন সুলতান আইউবীর যুদ্ধবন্দি। কিন্তু তিনি সম্মান প্রদান করে তার মন জয় করে নিয়েছেন এবং ফখরুদ্দীনও তার আনুগত্য বরণ করে নিয়েছেন। সুলতান আইউবী যখন তাকে তাঁর বিশেষ দূত বানিয়ে মাম্বাজ যেতে বললেন এবং তাকে মাম্বাজ দুর্গ জয় করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার

জন্য প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার প্রদান করলেন, তখন ফখরুদ্দীন হতবাক্ হয়ে বিস্ফারিত চোখে সুলতানের প্রতি তাকিয়ে থাকেন।

'আপনি কি মুসলমান নন?'– সুলতান আইউবী ফখরুদ্দীনকে বললেন– 'আপনি আমার প্রতি এমন বিস্মিত চোখে তাকালেন, যেনো আমি একজন কাফেরকে আমার দূত ও প্রতিনিধি নিযুক্ত করে প্রেরণ করছি। আপনার কি আমার উপর ভরসা নেই, নাকি নিজের ঈমানের প্রতি আস্থা নেই? আমি মাম্বাজ দুর্গ দখল করতে চাই। আপনি তার অধিপতিকে আমার বার্তা পৌঁছিয়ে দেবেন এবং তার সম্মতি আদায় করবেন, যেনো রক্তপাত ছাড়াই তিনি দুর্গটা আমাদের হাতে তুলে দেন এবং তার বাহিনীকে আমাদের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে দেন।'

ইয্‌যুদ্দীন ও ফখরুদ্দীন রওনা হয়ে যান। বুযার অধিপতি ইয্‌যুদ্দীনকে সাদরে বরণ করে নেন এবং সুলতান আইউবীর বার্তা পাঠ করেন। তাতে লেখা ছিলো–

'আমার প্রিয় ভাই! আমরা এক আল্লাহ, এক রাসূল ও এক কুরআনের অনুসারী। কিন্তু আমরা এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছি, যেমন একটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ মরুভূমির বালির উপর বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকে। এমন দেহ কি নড়াচড়া করতে পারে? কোনো কাজে আসে? এই সুযোগে খৃস্টানরা স্বার্থ হাসিল করছে। তারা আমাদের কর্তিত অঙ্গগুলোকে শকুনের ন্যায় ভক্ষণ করছে। আমাদেরকে এক জাতির আকারে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় আমরা কেউ-ই বেঁচে থাকতে পারবো না। আমি আপনাকে এক জাতির আকারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি আপনার বর্তমান পদপর্যাদার কথা ভাবুন। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য আপনি শত্রুর প্রতিও হাত প্রসারিত করে থাকেন। আমি আপনাকে কুরআন ও ইসলামের পয়গাম পৌঁছালাম। এই পয়গাম বুঝবার ও তদনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করুন। প্রথম আবশ্যক হলো, আপনার দুর্গটা সালতানাতে ইসলামিয়ার কর্তৃত্বে অর্পণ করুন এবং আপনি আমার আনুগত্য মেনে নিন। এই প্রস্তাব মেনে নিলে আপনার বাহিনী আমার বাহিনীর সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে। আপনি দুর্গের অধিপতি থাকবেন এবং দুর্গের উপর সালতানাতে ইসলামিয়ার পতাকা উড্ডীন থাকবে। তবে যদি আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তাহলে আমার ফৌজ আপনার দুর্গ অবরোধ করবে। আপনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হোন। আমি আপনাকে হাল্‌ব, মসুল ও হাররানের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় ও পিছপা হওয়ার ইতিহাস স্মরণ

করে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। তাতে আপনার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ হবে। আপনি আমার সদাচরণের আশা রাখুন। আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমি যা কিছু করছি, ইসলামের বিধান ও আল্লাহর আইন অনুসারেই করছি।'

বুযার আমীর বার্তাটা পাঠ করে ইয্‌যুদ্দীনের প্রতি তাকান। ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'আপনার দুর্গ মজবুত নয়, আপনার সৈন্যও কম। এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে আমাদের হাতে শেষ করে ফেলবেন না।'

বুযার আমীর প্রস্তাব মেনে নেন এবং সুলতান আইউবী বরাবর পত্র লিখেন যে, আপনি আসুন এবং দুর্গ নিয়ে নিন।

মাম্বাজের আমীরও সুলতান আইউবীর আনুগত্য গ্রহণ করে নেন। ফখরুদ্দীন তার লিখিত বার্তা নিয়ে ফিরে যান।

সুলতান আইউবী স্বয়ং উভয় দুর্গে যান। সেখানে যেসব সৈন্য ছিলো, তাদেরকে দুর্গ থেকে বের করে নিজের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে নেন এবং নিজ বাহিনীকে দুর্গে পাঠিয়ে দেন। তিনি উভয় দুর্গে রসদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম জমা করেন। কিন্তু বাহিনীকে দুর্গে আবদ্ধ করে রাখেননি। হাল্‌বের সন্নিকটে এজাজ নামক একটি মজবুত দুর্গ ছিলো। এই দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হাল্‌বের হাতে ছিলো। তার অধিপতি ছিলেন হাল্‌বের আমীর আল-মালিকুস সালিহ'র অফাদার। সুলতান আইউবী হাল্‌ব অবরোধ করার আগে এই দুর্গটিও বিনা যুদ্ধে দখল করতে চাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর এক সালার আল-হিময়ারীকে লিখিত বার্তাসহ এজাজ রওনা করিয়ে দেন।

এজাজের আমীর সুলতান আইউবীর বার্তাটি পাঠ করে পত্রখানা আল-হিময়ারীর দিকে নিক্ষেপ করে বললেন– 'তোমার সুলতান আল্লাহ ও রাসূলের নামে সারা পৃথিবীর রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তাকে বলবে, তুমি হাল্‌ব অবরোধ করে দেখেছো, এবার এজাজ অবরোধ করে দেখো।'

'আপনি কি সুলতানের হাতে মুসলমানের রক্ত ঝরানো পছন্দ করবেন?'– আল হিময়ারী বললেন– 'আপনি কি চান, আমরা পরস্পর যুদ্ধ করি আর খৃস্টানরা আমাদের তামাশা দেখুক?'

'আপনাদের সুলতানকে খৃস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলুন।' এজাজের আমীর বললেন।

'তা আপনি কি খৃস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না?'– আল-হিময়ারী জিজ্ঞেস করেন– 'আপনি কি তাদেরকে আপনার শত্রু মনে করেন না?'

'এই মুহূর্তে আমরা সুলতান আইউবীকে আমাদের শত্রু মনে করি, যিনি আমাদেরকে হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছেন'— এজাজের আমীর বললেন— 'তিনি আমাদের থেকে এই দুর্গ তরবারীর জোরে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছেন।'

এজাজের আমীর আল-হিময়ারীকে এক তিল মর্যাদা দিলেন না এবং তাকে চলে যেতে বললেন।

আসিয়াত দুর্গে আগন্তুক খৃস্টান গোমস্তগীনের নিকট উপবিষ্ট। থ্রেসালিজাও তার সঙ্গে বসা। গোমস্তগীন ও এই খৃস্টান লোকটি পূর্ব থেকেই পরিচিত। খৃস্টান বললো— 'শুনলাম, আপনি নাকি সালাহুদ্দীন আইউবীকে খুন করাতে করাতে এবার সাইফুদ্দীনকেও হত্যা করার মনস্থ করেছেন?'

'আপনি কি শুনেননি, সাইফুদ্দীন কীরূপ কাপুরুষতা ও সামরিক অদক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন?'— গোমস্তগীন বললেন— 'এই মেয়েরাই বলেছে, সে আমাদের তিন বাহিনীকে এমন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে যে, আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ হারিয়ে ফেলেছি। আমি আমাদের বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে একত্রিত করে আইউবীকে হাল্‌ব থেকে দূরে প্রতিহত করতে চাই। সাইফুদ্দীন যদি জীবিত থাকে, তাহলে আক্রোশ মেটানোর জন্য সে পুনরায় বাহিনীর কমান্ড হাতে নেয়ার জন্য জিদ্‌ ধরে বসবে এবং আমাদেরকে আরেকটি পরাজয়ের মুখে ঠেলে দেবে। আমি তো তাকে হত্যা না করে উপায় দেখছি না।'

'সাইফুদ্দীন অতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নয়, যতোটা আপনি মনে করছেন'— খৃস্টান বললো— 'আমরা যা জানি আপনি তা জানেন না। আমরা আপনার প্রত্যেক বন্ধু ও প্রত্যেক শত্রুকে আপনার চেয়ে ভালো জানি। সে কারণেই আমরা আপনাকে আমাদের উপদেষ্টা দিয়ে রেখেছি। আমি আইউবীর বিভিন্ন এলাকায় ছদ্মবেশ ধারন করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘুরে ফিরছি, তা আপনার অস্তিত্ব এবং আপনার রাজ্যের বিস্তৃতির জন্যই। আমি যে পরিস্থিতি দেখে এসেছি, তার দাবি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করা। নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর সবাই স্বাধীনতা লাভ করেছে। আপনি কেল্লাদার থেকে স্বাধীন শাসক হয়ে গেছেন। আইউবী মরে গেলে আপনি দশগুণ এলাকার শাসক হবেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের আশংকা আজীবনের জন্য দূর হয়ে যাবে। আমি ত্রিপোলী যাচ্ছি। আপনার বাহিনীর উট-ঘোড়ার যে ক্ষতি হয়েছে, আমি অতি শীঘ্র তা পূরণ করে দেবো। অস্ত্রও প্রেরণ করবো।

আপনি সাহস হারাবেন না। আইউবী মারা গেলে আমরা আপনাকে এতো অধিক সাহায্য দেবো যে, সাইফুদ্দীন, আল-মালিকুস সালিহ ও সকল স্বাধীন মুসলমান শাসকের উপর আপনার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে এবং এখন সালাহুদ্দীন আইউবীর যে মর্যাদা, আপনি সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন।

ক্ষমতার মোহ এবং বিলাসপূজা গোমস্তগীনের বিবেকের উপর আবরণ ফেলে দিয়েছে। এতোটুকু বুঝ তার মাথায় ঢুকেনি যে, এই খৃস্টান লোক আপন জাতির প্রতিনিধি এবং সে যা কিছু বলছে ও করছে, তারই জাতির স্বার্থে করছে। লোকটি খৃস্টানদের একজন পদস্থ গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও নাশকতার হোতা। সুলতান আইউবীর অগ্রযাত্রা কীভাবে প্রতিহত করা যাবে, ঘুরে-ফিরে তারই একটা ধারণা নেয়ার চেষ্টা করছে সে। প্রতিটি রণাঙ্গনে পরাজিত হয়ে খৃস্টানরা সমস্যার সমাধানে একটা পথ খুঁজে পেয়েছে। তাহলো, সুলতান আইউবীকে হত্যা করে মুসলিম শাসক গোষ্ঠীকে পরস্পর বিরাগভাজন করে তোলা, যাতে আইউবীর মৃত্যুর পর তারা আপসে লড়াই করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং আরব জগতের রাজত্ব খৃস্টানদের হাতে চলে যায়। এই লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তেই তারা মুসলিম আমীরদের মন-মস্তিষ্কে অর্থপূজা এবং রাজত্বের মোহ ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীকে খুন করা থেকে তো শেখ সান্নানও হাত গুটিয়ে নিয়েছেন'– গোমস্তগীন বললেন– 'তিনি নাকি চারজন ফেদায়ী প্রেরণ করে রেখেছেন। কিন্তু তিনি আশাবাদী নন।'

'এতোগুলো সংহারী আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর সান্নানকে আইউবী হত্যা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়াই উচিত'– খৃস্টান বললো– 'সেই আক্রমণগুলো ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ, ফেদায়ীরা হাশীশের নেশায় অভিযানে গিয়ে থাকে। আইউবীকে কেবল সেই ব্যক্তিই হত্যা করতে পারে, যার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে এবং হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভব করে, জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা থেকেই কাজটা করা উচিত। আপনি বোধ হয় মানবীয় স্বভাব বুঝেন না। আইউবীর উপর যে-ই সংহারী আক্রমণ করতে চায়, সে-ই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। যখনই বিপরীত দিক থেকে মোকাবেলা শুরু হয়, তার নেশা দূর হয়ে যায় এবং সে নিজের জীবন রক্ষা করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। আপনি বরং সান্নানকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে চেতনায় অন্ধ বানিয়ে এবং অন্তরে আইউবীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে প্রেরণ করুন। তাহলে সে আইউবীকে হত্যা করেই ঘরে ফিরবে।'

'শেখ সান্নান আমাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর চারজন গেরিলা দান করেছেন'– গোমস্তগীন বললেন– 'এবং বলেছেন, এদেরকে প্রস্তুত করে আপনি তাদের দ্বারা সাফুদ্দীনকে হত্যা করান। এই গেরিলারা সাইফুদ্দীনকে তাদের শত্রু মনে করে। আমি এদের দ্বারা সাইফুদ্দীনকে হত্যা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'আপনি তাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করছেন না কেন?'– খৃস্টান বললো– 'তবে আপনি তাদেরকে হাশীশ কিংবা অন্য কোন নেশা দেবেন না। তাদের উপর আবেগের নেশা সৃষ্টি করে দিন।'

'এমন নেশা আপনিই সৃষ্টি করতে পারেন।' গোমস্তগীন বললেন।

খৃস্টান লোকটি থ্রেসা ও লিজার প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসে। লিজা বললো– 'আমি গেরিলাদের কমান্ডারকে প্রস্তুত করতে পারি। তার নাম আন-নাসের। অপর তিনজনের দায়িত্ব আপনি নিন।'

'তুমি আন-নাসেরকে প্রস্তুত করো'– খৃস্টান বললো– 'অন্যদেরকে আপাতত এমনিতেই রেখে দাও। আমি মানবীয় স্বভাব যতটুকু জানি, আন-নাসের নিজেই তার সঙ্গীদেরকে তৈরি করে নেবে। তাদেরকে এখানে নিয়ে আসো। আন-নাসেরকে এক কক্ষে এবং অন্যদেরকে আরেক কক্ষে থাকতে দাও। আর তোমরা সতর্ক থাকবে। এই মেয়েটির প্রতি সান্নানের কুদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। এর প্রতি তার আসক্তি প্রবল। একে তার হাতে ফিরিয়ে না দিলে তিনি আমাকে মেহমানখানা থেকে কয়েদখানায় স্থানান্তরিত করবেন। তিনি আমাকে ভাববার সুযোগ দিয়েছেন।'

'আপনি তার ব্যাপারে অস্থির হবেন না'– গোমস্তগীন বললেন– 'আমি এই চার গেরিলাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি এবং এই মেয়েরাও আমার সঙ্গে যাবেন।'

আন-নাসের ও তার তিন সঙ্গীকে খৃস্টান সেনা অফিসারদের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। আন-নাসেরকে আলাদা কক্ষে রাখা হলো। কিন্তু সে আপত্তি জানায়, আমি আমার সঙ্গীদের ছাড়া আলাদা থাকবো না। থ্রেসা ও লিজা তাকে তাদের জালে আটকানোর জন্য আলাদা রাখতে চাইছে।

'তুমি তাদের কমান্ডার'– খৃস্টান লোকটি আন-নাসেরকে বললো– 'তোমাকে তোমার অধীনদের থেকে আলাদা-ই থাকা উচিত।'

'আমাদের কাছে উঁচ্চ-নীচুর ভেদাভেদ নেই'– আন-নাসের বললো–

'স্বয়ং আমাদের সুলতান সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে থাকেন। আমি একজন সামান্য কমান্ডার মাত্র। সঙ্গীদের থেকে আলাদা অবস্থান করে অহংকার দেখালে আমার পাপ হবে।'

'আমরা তোমাকে সম্মান করতে চাই'– খৃস্টান বললো– 'নিজ এলাকায় গিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে থেকো। আমরা অধীনদের সঙ্গে রেখে তোমাকে অপমান করতে চাই না।'

'না, আমাদের গেরিলা কমান্ডানগণ অধীনদের সঙ্গে একত্র থেকেই বাঁচে এবং তাদেরই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে'– আন-নাসের বললো– 'আমরা মৃত্যুপথের সহযাত্রী। আমরা একে অপর থেকে আলাদা হই না। আমরা যদি আপনার মেহমান হতাম, তাহলে আমি আপনার কথা মানতে পারতাম। কিন্তু আমরা আপনার কয়েদি। আমরা একজন আপনাদের থেকে যে কষ্ট-নির্যাতনের শিকার হবো, সকলে তার অংশীদার হতে চাই। এক সঙ্গীর জীবন রক্ষার জন্য আমরা অপর তিন সঙ্গী জীবন কুরবান করে দেবো।'

'তোমরা আমাদের বন্দিদশা থেকে পালাবার চেষ্টা করবে নাকি?'– গোমস্তগীন মুচকি হেসে বললেন।

আমরা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করবো'– আন-নাসের বললো– 'এটা আমাদের কর্তব্য। আমরা নিজেরা মৃত্যুবরণ করে মুক্ত হবো কিংবা আপনাদের সকলকে মেরে। আমাদেরকে যদি কয়েদখানায়ই রাখতে হয়, তো শিকল পরিয়ে দিন। আমাদেরকে ধোঁকা দেবেন না। আমরা ময়দানের পুরুষ। আমরা সাইফুদ্দীন-গোমস্তগীনের ন্যায় ঈমান-বিক্রেতা নই।'

'আমি গোমস্তগীন'– গোমস্তগীন বললেন– 'হাররানের স্বাধীন শাসনকর্তা। তুমি আমাকে ঈমান– বিক্রেতা বলেছো।'

'তাই নাকি! তাহলে আমি আপনাকে পুনরায় ঈমান-বিক্রেতা বলছি?'– আন-নাসের বললো– 'আমি আপনাকে গাদ্দারও বলছি।'

'কিন্তু এখন আমি না ঈমান-বিক্রেতা, না গাদ্দার।'– গোমস্তগীন বললেন। আন-নাসেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য গোমস্তগীন মিথ্যা বললেন– 'দেখো না যুদ্ধ হচ্ছে তুর্কমানে আর আমি এখানে! আমি যদি তোমাদের শত্রু হতাম, তাহলে তোমরা এখন যেরূপ মুক্ত আছো, সেরূপ মুক্ত থাকতে পারতে না। আমি সাইফুদ্দীন ও আস-সালিহ থেকে আলাদা হয়ে গেছি। আমি তোমাদেরকে সম্মানের সাথে এই দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি একজন সাধারণ কমান্ডার। কিন্তু তোমার বুকে সালাহুদ্দীন আইউবীর মর্যাদা ও চেতনা বিরাজমান।'

'কিন্তু আমি আমার সঙ্গীদের থেকে আলাদা থাকবো না'– আন-নাসের বললো– 'আমার দ্বারা আপনারা এই পাপ করাবেন না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে'– খৃস্টান বললো- 'তুমি তোমার সঙ্গীদের সাথেই থাকো।'

আন-নাসেরের তিন সঙ্গী একটি প্রশস্ত ও মনোরম কক্ষে অবস্থান করছে, যেখানে পালঙ্কের উপর নরম গালিচা পাতা আছে। তাদের সেবার জন্য একজন খাদেম দেয়া হয়েছে। তারা খাদেমকে জিজ্ঞাসা করে, এটা দুর্গের কোন্ অংশ এবং এখানে কী হয়? খাদেম বললো, এটা মেহমানদের কক্ষ। এখানে শুধু উচ্চপদস্থ ও মর্যাদাসম্পন্ন মেহমানদেরই রাখা হয়।

আন-নাসেরের তিন সঙ্গী গভীরভাবে লক্ষ করলো, তাদের সঙ্গে বন্দির আচরণ করা হচ্ছে না। তারা ছিলো অতিশয় ক্লান্ত। নরম বিছানায় গা এলিয়ে দেয়ামাত্র তাদের ঘুম এসে যায়। তারা গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

খৃস্টান ও গোমস্তগীন আন-নাসেরকে দীর্ঘ সময় নিজেদের সঙ্গে রাখে। তার সঙ্গে এমন সম্মানজনক কথাবার্তা বলে যে, আন-নাসেরের চেতনার প্রখরতা কিছুটা কমে আসে। এটা তাদের সাফল্যের প্রথম ধাপ। লিজা উক্ত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। আন-নাসের যখন সেই কক্ষ থেকে বের হয়, ততোক্ষণে তার সঙ্গীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আন-নাসের একটা কক্ষের বারান্দায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে, এমন সময় একটি নারীকণ্ঠ ফিস্ ফিস্ শব্দে তাকে ডাক দেয়। জায়গাটা অন্ধকার। আন-নাসের দাঁড়িয়ে যায়। একটি কালোপনা ছায়া এগিয়ে আসে। মেয়েটি লিজা। লিজা আন-নাসেরের বাহু ধরে ফেলে বললো– 'এবার নিশ্চিত হয়েছে তো আমি পরী নই– মানুষ?'

'আমার কিছুই বুঝে আসছে না, এসব কী ঘটছে'– আন-নাসের ঝাঝালো কণ্ঠে বললো– 'আমি একজন বন্দি। অথচ আমার সঙ্গে এমন সব আচরণ করা হচ্ছে, যেনো আমি রাজপুত্র!'

'তোমার বিস্ময় যথার্থ'– লিজা বললো– 'একটু বুঝবার চেষ্টা করো। গোমস্তগীন তোমাকে বলে দিয়েছেন, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রুতা পরিত্যাগ করেছেন। এখন তিনি আইউবীর কোন সৈনিককে বন্দি মনে করেন না। তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের সৌভাগ্য যে, তোমরা যখন এখানে এসেছো, গোমস্তগীন এখানে ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ আমার ব্যক্তিসত্ত্বা। তুমি আমার পদমর্যাদা জানো না। আমি তোমার দৃষ্টিতে একটি

দুশ্চরিত্র মেয়ে, যে কিনা রাজা-বাদশাহ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিনোদন কর্মী। আমার ব্যাপারে এসব তোমার ভুল ধারণা এবং কল্পনা মাত্র।' লিজা আন-নাসেরের বাহুটা আরো শক্ত করে ধরে বললো– 'আসো, আমরা এখান থেকে দূরে কোথাও গিয়ে বসি। আসো, আমি তোমার ভুল শুধরে দিই। তারপরই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর তুমি আমার ব্যাপারে যা খুশি সিদ্ধান্ত নিয়ো।'

দুর্গের এই অংশটা অতিশয় মনোরম ও আকর্ষণীয়। উন্মুক্ত ময়দান। মধ্যখানে বড় বড় টিলা। আশপাশ সবুজ-শ্যামল। স্থানে স্থানে কুল গাছ ও অন্যান্য বৃক্ষ। দুর্গটা বেশ প্রশস্ত ও চওড়া। লিজা আন-নাসেরকে কথায় কথায় কক্ষ থেকে দূরে টিলার আড়ালে নিয়ে যায়, যেখানে ফুলের সৌরভ মৌ মৌ করছে। লিজা যখন সেদিকে যাচ্ছিলো, তখন খৃস্টান লোকটি ও থ্রেসা একটি দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি দেখছিলো।

'লিজা লোকটাকে কাবু করে ফেলবে।' খৃস্টান বললো।

'মেয়েটি আবেগপ্রবণ'– থ্রেসা বললো– 'কর্তব্য পালনে ভীত হয়ে তারই কাছে গিয়ে বসেছিলো। তবে অতোটা কাঁচা এবং আনাড়ীও নয়।'

'তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি তোমার প্রতি এত দয়াপরবশ কেনো হয়েছি।' লিজা বললো– 'আমাকে শত্রু মনে করে তুমি এই প্রশ্ন করেছিলে। তখন আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারিনি যে, শত্রুতা মূলত তোমার ও আমার রাজাদের মাঝে। আমার-তোমার মাঝে শত্রুতার কী কারণ থাকতে পারে?'

'বন্ধুত্বেরই বা কী সূত্র থাকতে পারে?' আন-নাসের বললো।

লিজা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আন-নাসেরের উভয় কাঁধে হাত রেখে বললো– 'তুমি একটা পাথর। আমি শুনেছি, মুসলমানের হৃদয় রেশমের ন্যায় কোমল হয়ে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখো। নিজেকে মুসলমান কিংবা খৃস্টান না ভাবো। আমরা উভয়ে মানুষ। আমাদের বক্ষে হৃদয় আছে। তোমার অন্তরে কি কোনো কামনা, কোনো পছন্দ এবং কোন বস্তুর প্রতি ভালোবাসা নেই? আছে– অবশ্যই আছে। তুমি পুরুষ। তুমি তোমার হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো। আমি নারী। আমি পারি না। আমার অন্তর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। তুমি আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছো। আমরা যখন তোমাদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দুর্গে নিয়ে এসেছি, তখন শেখ সান্নান তোমাদেরকে পাতাল কক্ষে আবদ্ধ করে রাখার

নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি তার সেই নির্দেশ পালিত হতো, তাহলে তোমরা সেখান থেকে লাশ হয়ে বের হতে। তোমার ন্যায় সুদর্শন একটি যুবকের এই পরিণতি আমি মেনে নিতে পারিনি। আমি শেখ সান্নানকে বললাম, এরা তোমার নয়— আমাদের কয়েদি। এরা আমাদেরই হেফাজতে থাকবে। এ প্রসঙ্গে তার সঙ্গে আমার ও থ্রেসার মাঝে কথা কাটাকাটিও হয়। তিনি এক শর্তে আমাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। তিনি বললেন— 'ঠিক আছে, যদি তাদেরকে পাতাল কক্ষ থেকে রক্ষা করতেই চাও, তাহলে তোমরা আমার শয়নকক্ষে এসে পড়ো। আমার অন্তরে বুড়োটার প্রতি ঘৃণা জন্মে যায়। আমি ইতস্তত করলে তিনি বললেন— 'ভিন্ন কোন কথা নেই— হয় তারা পাতাল কক্ষে যাবে, নয়তো তোমরা আমার শয়নকক্ষে আসবে।' আমার গভীরভাবে অনুভূত হলো, যেনো আমি তোমাকে আজ থেকে নয়— শৈশব থেকেই কামনা করছি এবং তোমার খাতিরে 'আমি নিজের দেহ, জীবন ও ইজ্জত সবকিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।'

'তুমি কি তোমার সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছো?' আন-নাসের হঠাৎ চমকে ওঠে জিজ্ঞাসা করে।

'না'— লিজা বললো— 'আমি তাকে লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে কালক্ষেপণ করেছি। তিনি আমাকে এই বলে ছেড়ে দিয়েছেন যে, আমরা দুর্গে মুক্ত থাকবো; কিন্তু তার কয়েদি হয়ে থাকবো।'

'আমি তোমার ইজ্জতের হেফাজত করবো'— আন-নাসের বললো।

'তুমি কি আমার ভালোবাসা বরণ করে নিয়েছো?' লিজা সহজ-সরল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

আন-নাসের কোন জবাব দেয়নি। খৃস্টান মেয়েরা রূপ-যৌবন ও সুদর্শন প্রতারণার জাল কীভাবে বিছিয়ে থাকে, প্রশিক্ষণে তাকে সে বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু সেসব মৌখিক নির্দেশনা আর বাস্তবতা এক নয়। তাকে তো সেই জাল থেকে আত্মরক্ষার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি এবং তা সম্ভবও নয়। এখন একটি খৃস্টান মেয়ে তেমনি জাল বিছালে আন-নাসেরের ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে মানবীয় দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে বসে এবং সেই দুর্বলতা তার বিবেক-বুদ্ধির উপর জয়ী হতে শুরু করে। আন-নাসের পাহাড়-পর্বত ও মরু-বিয়াবানে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করার মতো মানুষ ছিলো। লিজার ন্যায় মনকাড়া মেয়ে কখনো দেখেনি। কোন নারীর রূপ-যৌবন কোনোদিন তাকে আকর্ষণও করেনি। কিন্তু এখন যখন লিজার বিক্ষিপ্ত রেশমকোমল

চুলগুলো তার গন্ডদেশ ছুঁয়ে যাচ্ছে, তখন তার অস্তিত্বে কেমন যেনো একটা ঢেউ খেলে যাচ্ছে এবং দেহে কেমন একটা কম্পন অনুভূত হচ্ছে।

একাধিকবার দুশমনের তীর আন-নাসেরের দেহ স্পর্শ করে অতিক্রম করেছে। বহুবার শত্রুর বর্শার আগা তার গায়ের চামড়া ছিলে দিয়েছে। কিন্তু তবু সে ভয় পায়নি। দেহ স্পর্শ করে চলে যাওয়া তীর-বর্শা তার দেহের উপর এক সেকেন্ডের জন্যও কম্পন সৃষ্টি করেনি। মৃত্যু কয়েকবার তার দেহ ছুঁয়ে অতিক্রম করেছিলো। কিন্তু তার দেহে সামান্যতম আলোড়নও সৃষ্টি হয়নি। নিজ হাতে লাগানো আগুনের মধ্য দিয়েও অতিক্রম করেছে। কিন্তু এখন একটি মেয়ের চুলের পরশে তার অস্তিত্বে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। এই পরশ থেকে বাঁচবার জন্য সেরূপ চেষ্টা করছে না, যেমন চেষ্টা করতো তীর-বর্শা থেকে আত্মরক্ষার জন্য। ভাব জমাতে জমাতে লিজা যখন তাঁর আরো ঘনিষ্ট হয়, তখনো তার মনে হলো, মেয়েটি এখনো তার থেকে দূরে অবস্থান করছে।

শিকারকে কীভাবে হেপটানাইজ করতে হয়, লিজাকে তার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আন-নাসেরের ক্ষেত্রে সেই বিদ্যা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে লিজা। আন-নাসেরের এমন এক ধরনের পিপাসা অনুভূত হতে শুরু করে, যা মরুভূমির পিপাসা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পানি এই পিপাসা নিবারণ করতে পারে না। রাত যতোই গভীর হচ্ছে, আন-নাসের তার আসল পরিচয় হারিয়ে ফেলছে। প্রথম আন-নাসেরের দেহ কেঁপে ওঠেছিলো। তারপর প্রকম্পিত হয়েছিলো ঈমান। চেতনার ভিত নড়ে ওঠেছিলো।

'হ্যা'– আন-নাসের টলায়মান কণ্ঠে বললো– 'আমি তোমার ভালোবাসা কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু এর পরিণতি কী হবে? তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে বলবে? এ কথা কি বলবে, তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করো? বিয়ে করে তোমাকে বউ বানাতে বলবে কি?'

'আমি এসব কিছুই ভাবিনি'– লিজা বললো– 'তুমি যদি আমার সঙ্গ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো এবং আজীবনের জন্য আমাকে তোমার জীবনসঙ্গীনি বানিয়ে নিতে চাও, তাহলে আমিই বরং আমার ধর্ম পরিত্যাগ করবো। তুমি আমার থেকে কুরবানী কামনা করো। বিনিময়ে আমাকে তুমি সেই ভালোবাসা দাও, যা অপবিত্র নয়। সাময়িক ভালোবাস তো চাইলেই পাওয়া যায়। আমার আত্মা তোমার স্থায়ী ভালোবাসার প্রত্যাশী।'

প্রেমের নেশা পেয়ে বসেছে আন-নাসেরকে। রাত অর্ধেকেরও বেশি

কেটে গেছে। আন-নাসের জায়গা থেকে উঠতে চাচ্ছে না। লিজা বললো, তুমি তোমার কক্ষে চলে যাও।.ধরা পড়লে পরিণতি ভালো হবে না।

❖ ❖ ❖

আন-নাসের কক্ষে ফিরে আসে। তার সঙ্গীরা গভীর ঘুমে বিভোর। সে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার ঘুম আসছে না। লিজা আপন কক্ষে প্রবেশ করলে থ্রেসার চোখ খুলে যায়।

'এতো দেরি?' থ্রেসা জিজ্ঞাসা করে।

'পাথর এক ফুৎকারে মোম হয়ে যায় নাকি?' লিজা উত্তর দেয়।

'পাথর বেশি শক্ত নয় তো?'

'আমার ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা ছিলো না'– লিজা উত্তর দেয়– 'তবে তূনীরের শেষ তীরটিও আমাকে ছুঁড়তে হয়েছে। সে আমার পুরোপুরি গোলাম হয়ে গেছে।'

'নাকি নিজেই মোম হয়ে এসেছো?' থ্রেসা সংশয় ব্যক্ত করে।

'তাও হতে পারে– লিজা হেসে বললো– 'সুদর্শন সুপুরুষ কিনা। আমাকে অতো সরল মনে করো না। তবে এ ধরনের সহজ-সরল পুরুষ আমার ভালো লাগে, যাদের চরিত্রে কোন ফাঁকিবাজি নেই। হতে পারে লোকটাকে আমার ভালো লাগার কারণ, আমি সাইফুদ্দীনের ন্যায় বৃদ্ধ ও বিলাসী পুরুষদের থেকে অনীহ হয়ে পড়েছি।'

'আন-নাসের থেকেও অনীহ থাকতে হবে'– থ্রেসা বললো– 'প্রেমের ফাঁদকে আরো বেশি যাদুকরী বানাতে হবে। মনে রাখবে, এর দ্বারা ক্রুশের সবচে' বড় শত্রু সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করাতে হবে।'

থ্রেসা লিজাকে আরো কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করে। নতুন দু'-একটি পন্থা শিখিয়ে দু'জনে শুয়ে পড়ে। আন-নাসের এখনো সজাগ। নির্জনে লিজার কথা-বার্তা এবং প্রেম নিবেদনের ঘটনা নিয়ে চিন্তা করে। তার প্রশিক্ষণের কথা মনে পড়ে যায়, যাতে তাকে খৃস্টান মেয়েদের জাদুময় ফাঁদ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিলো। লিজা তার কাছে একটি সুদর্শন প্রতারণা বলে মনে হলো। আবার ভাবনা জাগে, না, এটা প্রতারণা নয়– বাস্তব সত্য।

আন-নাসের একজন সুদর্শন সুপুরুষ। নিজের এই গুণ সম্পর্কে সে নিজেও অবহিত। মানবীয় চরিত্রের দুর্বলতাগুলো আন-নাসেরকে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত করতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত সে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলো না। তার দু'চোখের পাতা বুজে আসে। আন-নাসের ঘুমিয়ে পড়ে।

এক ব্যক্তি আন-নাসেরকে জাগিয়ে বললো, থ্রেসা আপনাকে তার কক্ষে যেতে বলেছেন।

নাসের চলে যায়। কক্ষে থ্রেসা একা।

'বসো নাসের!'– থ্রেসা বললো– 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক জরুরি কথা আছে।'

আন-নাসের লিজার সম্মুখে বসে পড়ে। থ্রেসা বললো– 'আমি তোমাকে একথা জিজ্ঞেস করবো না, রাতে লিজা তোমাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলো, নাকি তুমি তাকে নিয়ে গিয়েছিলে। আমি বলতে চাচ্ছি, এই মেয়েটা অত্যন্ত সরল ও নিষ্পাপ। আমি জানি, সে তোমাকে ভালোবাসে। কিন্তু আমি তোমাকে ও তাকে এভাবে রাতভর বাইরে বাইরে থাকার অনুমতি দিতে পারি না। তুমি লিজাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করো না।'

'আমি এমন কোনো চেষ্টা করিনি'– আন-নাসের বললো– 'আমরা কথা বলতে বলতে সামান্য দূরে চলে গিয়েছিলাম।'

'আমি লিজাকে থামাতে পারবো না'– থ্রেসা বললো– 'তোমার থেকে আমি এই আশা রাখি, তুমি তার বয়স, রূপ-যৌবন ও আবেগ থেকে সুযোগ নিতে যেও না।'

'লিজা তোমারই ন্যায় রাজকন্যা'– আন-নাসের বললো– 'আর আমি কয়েদি। আমি একজন তুচ্ছ মানুষ। লিজার ধর্ম এক, আমার আরেক। রাজকন্যা আর কয়েদির মাঝে প্রেম হতে পারে না।'

'তুমি বোধ হয় নারীর সহজাত সম্পর্কে অবহিত নও'– থ্রেসা বললো– 'রাজকন্যা যখন স্বীয় কয়েদিকে মন দিয়ে বসে, তখন তাকে রাজপুত্র মনে করে নিজেকেই তার কয়েদি বানিয়ে নেয়। ভালোবাসা ধর্মের শিকল ছিঁড়ে ফেলে। আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। তার একই কথা, আমার জীবন-মরণ দু'-ই আন-নাসেরের জন্য। সে হয়তো বলবে, তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করো, তাহলে আমি আমার গলা থেকে ক্রুশ খুলে ফেলে দেবো। তুমি জানো না আন-নাসের! লিজা শুধু তোমার খাতিরে শেখ সান্নানকে রুষ্ট করেছে। তিনি তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লিজা তার শত্রুতা ক্রয় করে তোমাদেরকে রক্ষা করেছে। সান্নান লিজাকে যে শর্ত দিয়েছেন, তা মেনে নেয়া সেই মেয়ের পক্ষেই সম্ভব, যাকে কারো ভালোবাসা অন্ধ করে তুলেছে। আমরা যদি এই দুর্গ থেকে দ্রুত বের হতে না পারি, তাহলে লিজা সেই শর্ত পালন করতে বাধ্য হবে।'

'আমি তা হতে দেবো না'— আন-নাসের বললো— 'লিজার সম্ভ্রমের জন্য আমি মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে প্রস্তুত।'

'তোমার অন্তরে কি লিজার প্রতি ততোটুকু ভালোবাসা আছে, যতটুকু আছে তোমার প্রতি তার?'

'লিজা মেয়ে হয়ে যদি আমার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে, তাহলে আমি পুরুষ হয়ে পারবো না কেন? আমি লিজাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসি।'

'তোমার প্রতি আমার একটি মাত্র নিবেদন, তুমি তাকে ধোঁকা দিও না'— থ্রেসা বললো— 'তুমি আমাদের কয়েদি নও। গোমস্তগীন তোমাকে তাঁর মেহমান মনে করেন।'

লিজার ব্যাপারে আন-নাসেরের মস্তিষ্ক স্বচ্ছ হয়ে যায়। তার হৃদয় লিজার প্রেমে ভরে ওঠে। এই মুহূর্তে লিজাকে এক নজর দেখার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে আন-নাসের। সে থ্রেসাকে জিজ্ঞাসা করে, লিজা কোথায়? থ্রেসা বললো, সারারাত ঘুমায়নি। অন্য কক্ষে শুয়ে আছে।

থ্রেসার তীর লক্ষ্যে আঘাত হানে। সে লিজার যাদুময়তা আন-নাসেরের বিবেকের উপর পুরোপুরি প্রয়োগ করে দেয়। এটাই তার লক্ষ্য। এই মেয়েগুলো সীমাহীন চতুর। এটাই তাদের দীক্ষা। মানবীয় দুর্বলতা নিয়ে খেলতে পারঙ্গম তারা।

আন-নাসের থ্রেসার সম্মুখ থেকে উঠে যায়। এখন সে বাতাসে উড়ছে যেনো। কক্ষে ফিরে গেলে সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে, কোথায় গিয়েছিলেন? আন-নাসের মিথ্যা জবাব দেয় এবং তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আন-নাসের আপন কর্তব্য থেকে সরে যেতে শুরু করেছে।

খৃস্টান লোকটি গোমস্তগীনের নিকট উপবিষ্ট। গোমস্তগীন তাকে বলেছিলেন, আমি আন-নাসের ও তার সঙ্গীদেরকে এক-দু'দিনের মধ্যে হাররান নিয়ে যেতে চাই। ইত্যবসরে থ্রেসাও এসে পড়ে। সে বললো— 'গেরিলাদের কমান্ডার আমাদের জালে এসে পড়েছে।'

লিজা কীভাবে আন-নাসেরের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং নিজে কীভাবে তাতে পূর্ণতা দান করেছে, তার বিবরণ দেয়। থ্রেসা বললো— 'এই লোকটাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর হত্যার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এখন দেখার বিষয় হলো, নিজের আসল পরিচয় ভুলে গিয়ে এ কাজের জন্য প্রস্তুত হতে তার কতো সময়ের প্রয়োজন হবে।'

'আমি এই চারজনকে এক-দু'দিনের মধ্যে হাররান নিয়ে যেতে চাই'– গোমস্তগীন বললেন– 'তোমরা উভয়ে কিংবা শুধু লিজা আমার সঙ্গে যাবে কি? খুনের জন্য আন-নাসেরকে লিজাই প্রস্তুত করতে পারে।'

'মেয়েদেরকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি'– খৃস্টান বললো– 'আমি বেশিদিন থাকতে পারবো না। সম্রাটদেরকে আমার তাড়াতাড়ি সংবাদ পৌঁছাতে হবে, হাল্‌ব, হাররান ও মসুলের ফৌজ সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েছে এবং সেসব বাহিনীর সালারগণ পলায়ন ছাড়া আর কিছুই জানে না। পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে আমি তাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করার জন্য অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দেবো। হতে পারে, আমাদের পক্ষ থেকে আপনারা যে সহায়তা পাচ্ছেন, তা বন্ধ করে দেয়া হবে।'

'এ কথা বলবেন না'– গোমস্তগীন অনুনয়ের সুরে বললেন– 'আমাকে একটি মাত্র সুযোগ দিন। আমি আইউবীকে হত্যা করিয়ে দেবো। তারপর দেখবেন, কীভাবে আমি বিজয়ী বেশে দামেশ্‌ক প্রবেশ করি। এই মেয়ে দু'টোকে কিংবা শুধু লিজাকে আমাকে দিয়ে দিন। মেয়েটা গেরিলাদের কমান্ডারকে মুঠোয় নিয়ে ফেলেছে। সে-ই তাকে প্রস্তুত করবে। আন-নাসের সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে বিনা বাঁধায় যেতে পারবে। আইউবীকে অনায়াসে হত্যা করা তার পক্ষে সম্ভব। তাছাড়া চিন্তা করে দেখুন, আপনি যদি লিজাকে নিয়ে যান, তাহলে আন-নাসের আমার কোন কাজের থাকবে না।'

খানিক তর্ক-বিতর্কের পর খৃস্টান বললো– হাররান যাওয়ার পরিবর্তে আমরা এখানেই থাকি। মেয়ে দু'টো আন-নাসেরকে প্রস্তুত করুক। হতে পারে তার সঙ্গী তিনজনকেও প্রস্তুত করে নেয়া যাবে। তাদের অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে।'

'আন-নাসের সম্পর্কে আমার অভিমত হলো, লোকটা অপরিপক্ক মানুষ। লিজা তার বিবেক কব্জা করে নিয়েছে। দু'-তিনটি সাক্ষাতের পরই সে লিজার আঙুলের ইশারায় নাচতে শুরু করবে।'

'আজ তাদের চারজনকেই সঙ্গে বসিয়ে আহার করাও।' খৃস্টান বললো।

খাওয়ার সময় হলে আন-নাসের এবং তার সঙ্গীদেরকেও খাওয়ার কক্ষে ডেকে নেয়া হলো। তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ অকৃত্রিম সম্পর্ক গড়ে তোলা হলো। এখনো খাবার এনে রাখা হয়নি। শেখ সান্নানের এক চাকর এসে খৃস্টান লোকটিকে বললো, শেখ সান্নান আপনাকে যেতে বলেছেন।

খৃস্টান চলে যায়।

'ঐ মেয়েটির ব্যাপারে আপনি কী চিন্তা করেছেন?' শেখ সান্নান জিজ্ঞাসা করে।

'আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।' খৃস্টান জবাব দেয়।

'তোমার যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে আমার কাছে থাকবে।' সানান বললো।

'আমি আজই চলে যাবো।'

'যাও'– শেখ সান্নান বললো– 'আর মেয়েটিকে এখানে রেখে যাও। তুমি তাকে দুর্গ থেকে বের করতে পারবে না।'

'সান্নান!' খৃস্টান বললো– 'এই দুর্গের প্রতিটি ইট বালিকণা হয়ে যাবে। আমাকে হুমকি দেয়ার দুঃসাহস দেখিও না।'

'মনে হচ্ছে, তোমার মাথাটা এখনো ঠিক হয়নি'– সান্নান বললো– 'আজ রাত তুমি নিজে লিজাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তারপর তুমি ইচ্ছে হয় থাকো, ইচ্ছে হয় যাও। এর অন্যথা হলে তুমি যাবে আমার পাতাল কক্ষে আর লিজা আসবে আমার শয়নকক্ষে। যাও, ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করো।'

খৃস্টান লোকটি খাওয়ার রুমে প্রবেশ করে। সকলে অস্থিরচিত্তে তার অপেক্ষা করছিলো। কক্ষে প্রবেশ করেই লোকটি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলতে শুরু করে– 'বন্ধুগণ! শেখ সান্নান আমাকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, আজ রাত লিজা তার কাছে থাকবে। তিনি এতোটুকুও বলেছেন, মেয়েটাকে আমি নিজে তার কক্ষে দিয়ে আসবো। অন্যথায় আমাকে পাতাল কক্ষে নিক্ষেপ করে লিজাকে ছিনিয়ে নেবেন।'

'আপনাকে পাতাল কক্ষে নিক্ষেপ করা হবে, আর আমরা বুঝি মরে যাবো!'– আন-নাসের বললো– 'লিজাকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

'মেয়েটা তোমার আবার কী লাগে আন-নাসের?' আন-নাসেরের এক সঙ্গী জিজ্ঞাসা করে।

'তোমরা নিজেদেরকে আমাদের কয়েদি ভেবো না'– গোমস্তগীন বললেন– 'বিপদটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য আসছে।'

'তোমরা আমাদের নয়– শেখ সান্নারের কয়েদি'– খৃস্টান বললো– 'তোমরা আমাদের সঙ্গ দাও। বাইরে গিয়ে আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে দেবো। এখন এখান থেকে বের হওয়ার পন্থা খুঁজে বের করো।'

'শেখ সান্নান আমাকে এই চারজনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন'– গোমস্তগীন বললেন– 'আমি তাদেরকে আজই নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা

তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আমাদেরকে সন্ধ্যার অনেক আগেই রওনা হতে হবে।'

গোমস্তগীনের মেজাজটা বেশ চড়া। খাওয়ার মাঝে তিনি সবাইকে তার পরিকল্পনার কথা বলে দেন। আহার শেষে তিনি তার খাদেম ও দেহরক্ষীদের ডেকে বললেন, আমি এক্ষুনি দুর্গ থেকে রওনা হচ্ছি। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র বেঁধে নাও।

তৎক্ষণাৎ কাফেলা প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। গোমস্তগীনের নিজের ঘোড়া ছাড়াও দেহক্ষীদের চারটি ঘোড়া। চারটি উটও আছে, যেগুলোতে খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও তাঁবু বোঝাই করা। সফর দীর্ঘ। তাই সঙ্গে তাঁবু রাখা আছে।

গোমস্তগীন শেখ সান্নানের নিকট গিয়ে বললেন, আমি যাচ্ছি এবং চার গেরিলাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

সুলতান আইউবীর চার গেরিলার ব্যাপারে গোমস্তগীনের লেন-দেন চূড়ান্ত হয়ে আছে। মূল্য তিনি পরিশোধ করে দিয়েছেন।

'আমার আশা, আমি যে চার ব্যাক্তিতে প্রেরণ করে রেখেছি, তারা সালাহুদ্দীন আইউবীকে শেষ করেই তবে ফিরবে'– শেখ সান্নান বললো– 'তুমি এদের দ্বারা সাইফুদ্দীনকে খুন করাও। তোমরা লড়াই করতে জানো না। তাই শত্রুকে গোপনে হত্যা করা ছাড়া তোমাদের উপায় নেই। ও আচ্ছা, তোমার খৃস্টান বন্ধু আর পরী দু'টি কোথায়?'

'তাদের কক্ষে।' গোমস্তগীন উত্তর দেন।

খৃস্টান মেহমান কি ছোট মেয়েটি সম্পর্কে কিছু বলেনি?'

'হ্যা, শুনলাম তাকে বলছে, আজ রাত তুমি শেখ সান্নানের কাছে থাকো– গোমস্তগীন বললেন– 'লোকটাকে আপনার ভয়ে বেশ ভীত মনে হয়েছে।'

'এখানে বড় বড় প্রতাপশালী লোকও ভয় পেয়ে থাকে'– শেখ সান্নান বললো– 'লোকটা মেয়েটাকে আমার থেকে এমনভাবে লুকাচ্ছিলো, যেনো ও তার কন্যা।'

গোমস্তগীন শেখ সান্নান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। কাফেলা প্রস্তুত দন্ডায়মান। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করেন। তার দেহরক্ষীরাও ঘোড়ায় চড়ে বসে। দু'জন গোমস্তগীনের সম্মুখে চলে যায়। দু'জন পেছনে। তাদের হাতে বর্শা। ঘোড়ার পেছনে আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা এবং তাদেরপেছনে মাল বোঝাই উটের পাল। দুর্গের ফটক খুলে যায়। কাফেলা দুর্গ থেকে বেরিয়ে যায় এবং ফটক বন্ধ হয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

শেখ সান্নানের আসিয়াত দুর্গ আর গোমস্তগীনের কাফেলার মাঝে দূরত্ব বাড়ছে। আকাশের সূর্যটা দিগন্তের পেছনে চলে যাচ্ছে। এক সময়ে সূর্য অস্তমিত হয়ে কাফেলা ও দুর্গকে লুকিয়ে ফেলে। দুর্গে প্রদীপ জ্বলে ওঠে। পুরোপুরি রাত নেমে এলে শেখ সান্নান দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে– 'খৃস্টান লোকটি মেয়েটিকে নিয়ে আসেনি?' সে 'না' সূচক জবাব পায়। পরপর তিন-চারবার জিজ্ঞাসা করার পরও একই উত্তর মিলে। খাস খাদেমকে ডেকে বললো– 'তুমি গিয়ে খৃস্টান মেহমানকে বলো, যেনো সে ছোট মেয়েটিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি আসে।'

খাদেম খৃস্টানদের জন্য নির্ধারিত কক্ষগুলোতে প্রবেশ করে। সেখানে কেউ নেই। মেয়ে দু'টোও নেই। সবগুলো কক্ষ শূন্য। সে ওদিক-ওদিক তাকায়। দুর্গের বাগিচায় ঘুরে-ফিরে দেখে। টিলার আশপাশে ঘুরে দেখে। কোথাও কেউ নেই। ফিরে এসে শেখ সান্নানকে জানায়, কাউকে পাওয়া যায়নি– খৃস্টান মেহমান এবং দুই মেয়ে কাউকেই নয়। সান্নান আকাশটা মাথায় তুলে নেয়। বাহিনীর কমান্ডারকে নির্দেশ দেয়, দুর্গের কোণায় কোণায় তল্লাশী চালাও। খৃস্টান লোকটাকে খুঁজে বের করো। বাহিনীতে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। দুর্গের প্রতি ইঞ্চি জায়গায় অনুসন্ধান শুরু হয়ে যায়। সর্বত্র প্রদীপের ও মশালের আলো ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কোন স্থান থেকে খৃস্টান লোকটাকে বের করা গেলো না।

শেখ সান্নান ফটকের প্রহরীদের তলব করে। তাদের জিজ্ঞাসা করে, গোমস্তগীনের কাফেলা ব্যতীত আর কার জন্য ফটক খোলা হয়েছে? তারা জানায়, আপনার আদেশ ব্যতীত কারো জন্য ফটক খোলা হয়নি এবং গোমস্তগীন ও তার কাফেলা ব্যতীত আর কেউ বেরও হয়নি। তারা গোমস্তগীনের কাফেলার হিসাব প্রদান করে। রেকর্ডে খৃস্টান লোকটি ও মেয়ে দু'টো নেই।

শেখ সান্নান নিজ কক্ষে ফোঁস ফোঁস করছে।

রাতের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। গোমস্তগীনের কাফেলা এগিয়ে চলছে। তিনি এক স্থানে ঘোড়া থামিয়ে উষ্ট্রচালকদের বললেন– 'উটগুলোকে বসাও। ওদেরকে বের করো, আবার মরে যায় না যেনো।'

কাফেলার উটগুলোকে বসিয়ে পিঠ থেকে তাঁবুগুলো নামানো হলো। পুটুলিবাঁধা তাঁবু খোলা হলে সেগুলোর মধ্য থেকে খৃস্টান লোকটি, থ্রেসা ও লিজা বেরিয়ে আসে। ঘামে ভিজে চিপপিপে হয়ে গেছে তারা। গোমস্তগীন তাদেরকে তাঁবুর মধ্যে পেচিয়ে পুটুলির মতো বেঁধে আসিয়াত দুর্গ থেকে বের করে এনেছেন।

এখন তারা দুর্গ থেকে বহুদূর চলে এসেছে। ফেদায়ীদের ব্যাপারে কোন আশংকা নেই। তারা মুখোমুখি যুদ্ধ করার ঝুঁকি বরণ করে না। তথাপি গোমস্তগীন কাফেলাকে যাত্রাবিরতি দেয়ার সুযোগ দেননি। মেয়ে দু'টোকে উটের পিঠে বসিয়ে দেয়া হলো। খৃস্টান লোকটি গেরিলাদের সঙ্গে পায়ে হাঁটছে। তার ও মেয়েদের ঘোড়া দুর্গে রয়ে গেছে। খৃস্টান এই অঞ্চলের ভাষা অনর্গল বলতে পারে। সে আন-নাসেরের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে ,যাতে বন্ধুত্ব-ভালোবাসার রং-ই প্রবল। আন-নাসেরের মন থেকে ভয় দূর হয়ে যায়। লিজাকে কাছে পাওয়াই এখন তার একমাত্র কাম্য।

মধ্যরাতের পর অবস্থানের জন্য কাফেলা এক স্থানে থেমে গেলে এই সুযোগটা হাতে আসে। গোমস্তগীনের জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়। অন্য সকলের জন্য আলাদা আলাদা তাঁবু দাঁড় করানো হয়। চার গেরিলা, গোমস্তগীনের দেহরক্ষী ও অন্যান্যরা খোলা আকাশের নীচে শুয়ে পড়ে। তারা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখে ঘুম এসে যায়।

আন-নাসেরের ঘুম আসছে না। সে ভাবছে, লিজাকে তাবু থেকে ডেকে আনতে হবে নাকি সে নিজেই এসে যাবে। আন-নাসের ভুলে গেছে, সে সুলতান আইউবীর গেরিলা সৈনিক এবং তার বাহিনী কোন এক স্থানে যুদ্ধ করছে। তার মাথায় এই ভাবনাটাও জাগেনি যে, তাকে ফৌজে ফিরে যেতে হবে এবং পলায়নের এটাই মোক্ষম সুযোগ। এখন সবাই অচেতনের ন্যায় ঘুমিয়ে আছে। অস্ত্রও আছে। খাদ্য-পানীয় আছে। তার সঙ্গীরা তারই উপর নির্ভর করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারা তো তাদের কমান্ডারের নির্দেশনা মান্য করতে বাধ্য। তাদের জানা নেই, তাদের কমান্ডার নিজের বিবেক, ঈমান ও চেতনা এক যুবতীর হাতে তুলে দিয়েছে। এক নারী চরম এক বিধ্বংসী পরিকল্পনা নিয়ে তার বিবেক কব্জা করে নিয়েছে।

আন-নাসের একটি ছায়া এগিয়ে আসছে দেখতে পায়। ছায়াটা তারই দিকে আসছে। খানিক পর দু'টি ছায়া পরস্পর একাকার হয়ে যায়।

লিজা আন-নাসেরকে ঘুমন্ত কাফেলার মধ্য থেকে তুলে সামান্য দূরে একটি টিলার আড়ালে নিয়ে যায়। মেয়েটিকে আজ পূর্বাপেক্ষা বেশি আবেগময় মনে হলো। আন-নাসের পাগলের মতো হয়ে যায়- প্রেমপাগল। লিজা তার আবেগের প্রকাশ উচ্চারণের চেয়ে আচরণ দ্বারা বেশি করছে। হঠাৎ সে সামান্য দূরে গিয়ে বলে ওঠলো- 'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও নাসের! তোমার জীবনে কখনো কোন নারী প্রবেশ করেছে কি?'

'মা এবং বোন ব্যতীত আমি কখনো কোন নারীর ছোঁয়া পাইনি'– আন-নাসের উত্তর দেয়– 'যৌবনের শুরুতেই আমি নুরুদ্দীন জঙ্গীর ফৌজে ঢুকে গিয়েছিলাম। অতীতের উপর চোখ বুলালে আমি নিজেকে যুদ্ধের ময়দানে, বালুকাময় প্রান্তরে এবং সঙ্গীদের থেকে দূরে শত্রুর এলাকায় রক্ত ঝরাতে এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় শিকারের সন্ধানে ঘুরে ফিরছি দেখতে পাই। আমি যখন যেখানে ছিলাম, কর্তব্য পালনে ত্রুটি করিনি। কর্তব্যবোধ আমার ঈমানের অংশ।'

হঠাৎ আন-নাসেরের দেহটা ঝাকুনি দিয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো– 'লিজা! তুমি বোধ হয় আমার ঈমানের ভিত টলিয়ে দিয়েছো। বলো, তোমরা আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'

'তার আগে বলো, তোমার হৃদয়ে আমার ভালোবাসা আছে, নাকি আমাকে দেখে তুমি পশু হয়ে যাও?' লিজা এমন এক ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে, যাতে ভালোবাসা এবং রসিকতার বাষ্পও নেই। তার বলার ধরনটা গত রাতের তুলনায় এখন ভিন্ন।

'তুমি বলেছিলে, আমি ভালোবাসাকে যেনো অপবিত্র না করি'– আন-নাসের বললো– আমি প্রমাণ দেবো, আমি পশু নই। তুমি আমাকে একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন অপেক্ষা অপরজন অধিক সুশ্রী, বীর যোদ্ধা, সুঠামদেহী ও মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ আছে। তুমি কোনো রাজার দরবারে ঢুকে পড়লে তিনি সিংহাসন থেকে নেমে এসে তোমাকে স্বাগত জানাবেন। তারপরও তুমি আমার মধ্যে কী দেখেছো?

লিজার মুখে কোন উত্তর নেই। আন-নাসের মেয়েটার কাঁধে হাতে রেখে বললো– 'উত্তর দাও লিজা!' লিজা মাথাটা হাঁটুর উপর রেখে দেয়। আন-নাসের তার হেঁচকি শুনতে পায়। সে অস্থির হয়ে ওঠে। বার বার জিজ্ঞেস করে, কাঁদছো কেনো লিজা! কিন্তু লিজা কাঁদতেই থাকে। আন-নাসের স্বস্নেহে তাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরে। লিজা তার মাথাটা আন-নাসেরের বুকের উপর রেখে দেয়। আন-নাসের বুঝতে পারেনি, যেভাবে তার ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে মানবীয় দুর্বলতা জেগে ওঠে তার বিবেকের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে, তেমিন লিজাও একটি দুর্বলতার কবলে পড়ে গেছে। এ সেই দুর্বলতা, যা একজন রাণীকে তার ক্রীতদাসের সম্মুখে অবনত করে তোলে এবং যার কারণে সম্পদের প্রাচুর্যকে পাথরের স্তূপ জ্ঞান করে হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য মানুষ কুঁড়ে ঘরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

লিজা ভালোবাসার পিয়াসী– সেই ভালোবাসা, যা আত্মাকে প্রশান্ত করে

দেবে। দৈহিক ভালোবাসা পেয়েছে লিজা এবং পেয়েছে সেই পুরুষরে থেকে, যাদের প্রতি তার ঘৃণা ছিলো। আসিয়াত দুর্গে যাওয়ার সময় এবং দুর্গে পৌঁছেও সে থ্রেসার কাছে তার এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলো। তখন কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সে আন-নাসেরের কাছে গিয়ে বসেছিলো এবং বলেছিলো- 'আমার উপর ভরসা রাখো।'

সেসময় তার মনে কোন প্রতারণার পরিকল্পনা ছিলো না। সেটা ছিলো তার হৃদয়ের আওয়াজ। তখন সে তার আত্মার নির্দেশনায় আন-নাসেরের কাছে চলে গিয়েছিলো। থ্রেসা যদি তাকে সেখান থেকে সরিয়ে না নিয়ে যেতো, তাহলে না জানি মেয়েটি আরো কতো কথা বলতো। পরে তাকে আন-নাসেরকে জালে আটকানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। একাজে পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করেছে সে। কিন্তু মন তার সঙ্গ দিচ্ছিলো না। এখন কর্তব্য আর হৃদয়ের মাঝে ঘুরপাক খেয়ে ফিরছে লিজা।

আন-নাসের জানে না, কাফেলা অবতরণ করে এখানে তাঁবু স্থাপনের সময় গোমস্তগীন লিজাকে কানে কানে বলেছিলেন- 'সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আমার তাঁবুতে চলে এসো। আমি তোমাকে তোমার জাতির প্রেরিত উন্নত মদ পান করাবো। আমি বড় কৌশলে তোমাকে শেখ সান্নানের কবল থেকে রক্ষা করে নিয়ে এসেছি।'

লিজা গোমস্তগীনকে কোন উত্তর দেয়নি। তার নিকট থেকে সরে এলে খৃস্টান তাকে বললো- 'খোদা তোমাকে এই বৃদ্ধ হায়েনাটার পাঞ্জা থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন। থ্রেসা ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আমার তাঁবুতে চলে আসবে; ফূর্তি করবো।'

লিজার নিজের রূপ-যৌবন আর দেহটার প্রতি ঘৃণা জন্মাতে শুরু করে। সে নিজের তাঁবুতে চলে যায় থ্রেসা ঘুমিয়ে পড়ে। লিজার দু'চোখের পাতা এক হয় না। সে শয্যা থেকে উঠে পা টিপে টিপে আন-নাসেরের দিকে হাঁটা দেয়। আন-নাসেরও তারই অপেক্ষায় জেগে আছে।

লিজা আন-নাসেরের পার্শ্বে উপবিষ্ট। হঠাৎ আন-নাসের চমকে ওঠে বললো- 'দেখো তো কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছো নাকি? ঘোড়া আসছে!'

'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি'- লিজা বললো- 'সকলকে জাগিয়ে দাও। শেখ সান্নান আমাদের ধরার জন্য সৈন্য পাঠাতে পারে!'

আন-নাসের দৌড়ে টিলার উপর উঠে যায়। সে অনেকগুলো প্রদীপ দেখতে পায়। সেগুলো ধাবমান অশ্বের চলনের সাথে সাথে উপর-নীচ

হচ্ছে। ঘোড়ার পদশব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। আন-নাসের দৌড়ে নীচে নেমে আসে। লিজাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমন্ত কাফেলার দিকে ছুটে যায়। সকলকে জাগিয়ে তোলে। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে টিলার নিকটে চলে যায়। লিজাকে সঙ্গে রাখে। সকলের হাতে বর্শা ও তরবারী আছে। গোমস্তগীনের দেহরক্ষী এবং উষ্ট্রচালকরাও বর্শা-তরবারী হাতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

তারা পনের-ষোলজন। অশ্বারোহী। ছয়-সাতজনের হাতে প্রদীপ। এসেই তারা গোমস্তগীনের কাফেলাটি ঘিরে ফেলে। একজন হুংকার দিয়ে বললো– 'মেয়ে দু'টোকে আমাদের হাতে তুলে দাও। শেখ সান্নান বলেছেন, মেয়েদেরকে দিয়ে দিলে তোমরা নিরাপদে চলে যেতে পারবে।'

আন-নাসের অভিজ্ঞ গেরিলা যোদ্ধা। সে তার সঙ্গীদের আগেই সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। তিন সঙ্গীকে নিয়ে সে হামলাকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা পেছন দিক থেকে সম্মুখের আরোহীদের উপর বর্শার আঘাত হানে। আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আরোহীরা মাটিতে পড়ে যায়। আন-নাসের চীৎকার করে তার সঙ্গীদের বললো– এদের ঘোড়াগুলের পিঠে চড়ে বসো। নিজে একটি ঘোড়া ধরে তাতে চড়ে বসে এবং লিজাকে পিছনে বসিয়ে নেয়। লিজা আন-নাসেরের কোমর শক্ত করে ধরে বসে থাকে।

সান্নানের ফেদায়ীরা এলোপাতাড়ি আক্রমণ শুরু করে। তারা হাতের প্রদীপগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। প্রদীপগুলো জ্বলতে থাকে। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা যথাসাধ্য মোকাবেলা করে। একটি ঘোড়ার ছুটে চলার শব্দ কানে আসে, যা দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। ঘোড়ার আরোহী গোমস্তগীন, যিনি নিজের জীবন রক্ষা করে পালিয়ে যাচ্ছেন। ফেদায়ীরা আন-নাসেরের ঘোড়ার পিঠে লিজাকে দেখে ফেলে। তারা মেয়েটাকে জীবিত ধরে ফেলার চেষ্টা করছে। তিন-চারটি ঘোড়া তাকে ঘিরে ফেলেছে এবং ঘোড়াটাকে আহত করার জন্য বর্শা দ্বারা আঘাত করছে। আন-নাসের অভিজ্ঞ যোদ্ধা। সে ঘোড়াটাকে বাঁচিয়ে রাখে এবং দু'জন ফেদায়ীকে ফেলে দেয়।

ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। দ্রুততার সাথে ঘোড়ার মোড় ঘোরানোর কারণে লিজা পা রেকাবে রাখতে পারছে না। হঠাৎ করে আন-নাসের ঘোড়ার মোড় ঘোরালে লিজা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যায়।

ফেদায়ীরা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে। লিজা উঠে আন-নাসেরের দিকে দৌড় দেয়। কিন্তু দু'জন ফেদায়ী তাকে ধরে ফেলে। আন-নাসের ঘোড়া

হাঁকায় এবং বর্শা দ্বারা আঘাত হানতে উদ্যত হয়। ফেদায়ীরা ঢালস্বরূপ লিজাকে সম্মুখে এনে ধরে।

আন-নাসের তাঁর সঙ্গীদের কোন খোঁজ জানে না। ধাবমান ও পলায়নপর ঘোড়া এবং তরবারী ও বর্শার সংঘর্ষের শব্দ কানে আসছে তার। তিন-চারজন ফেদায়ীর মোকাবেলায় আন-নাসের একা। প্রতিটি আঘাতই ব্যর্থ যাচ্ছে তার। কারণ, সে আঘাত হানলেই ফেদায়ীরা লিজাকে ঢাল হিসেবে সম্মুখে এগিয়ে ধরে। অবশেষে সেও ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। প্রাণপণ লড়াই করে। নিজে আহত হয় এবং দুই ফেদায়ীকে আহত করে ফেলে দেয়। এমনি অবস্থায় লিজা চীৎকার দিয়ে বলতে থাকে– 'নাসের! তুমি বেরিয়ে যাও। তুমি একা।' কিন্তু আন-নাসের দিক-দিশা হারিয়ে ফেলেছে যেনো। সেও চীৎকার করে বলে ওঠে– 'চুপ থাকো লিজা! এরা তোমাকে নিতে পারবে না।'

আন-নাসের তাঁর ঘোষণা সত্যে প্রমাণিত করে দেখায় যে, ফেদায়ীরা লিজাকে নিতে পারেনি। সে ফেদায়ীদেরকে গুরুতর জখম করে অবস্থা শোচনীয় করে তোলে।

এই যুদ্ধ লড়তে গিয়ে আন-নাসের কাফেলার অবস্থান থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো। সে একটি ঘোড়া ধরে লিজাকে তার উপর বসিয়ে ঘোড়া হাঁকায়। কিন্তু পলায়ন করেনি। রণাঙ্গন এখন নীরব। আন-নাসের নিকটে গিয়ে দেখে। ওখানে কয়েকটি লাশ পড়ে আছে এবং দু'-তিনজন ফেদায়ী আহত হয়ে ছটফট করছে। তার সঙ্গী তিনজন মারা গেছে। খৃস্টান লোকটিরও লাশ পড়ে আছে। থ্রেসা নিখোঁজ। আন-নাসের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেনি। সে আকাশের পানে তাকায়। ধ্রুবতারা দেখে দিক নির্ণয় করে ঘোড়া হাঁকায়। অনেকখানি পথ অতিক্রম করে সে ঘোড়ার গতি থামায়।

'এবার বলো তুমি কোথায় যেতে চাও?'– আন-নাসের লিজাকে জিজ্ঞাসা করে– একটি অসহায় মেয়ে বিবেচনা করে আমি তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই না। যদি বলো, তাহলে আমি তোমাকে তোমার এলাকায় পৌঁছিয়ে দেবো। তাতে যদি আমি বন্দিও হই, পরোয়া করবো না। তুমি আমার আমানত।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও'– লিজা বললো– 'আমাকে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে যাও আন-নাসের!'

ঘোড়া রাতভর চলতে থাকে। রাত পোহাবার পর আন-নাসের এলাকা চিনতে পারে। এ অঞ্চলেরই কোন এক স্থানে সে নিজ বাহিনীর সঙ্গে

গেরিলা হামলা করেছিলো। এখানে মাটির টিলা ও বড় বড় পাথর আছে। চলতে চলতে সে একটি কূপের নিকট গিয়ে উপনীত হয়। কূপটি একটি টিলার পাদদেশে অবস্থিত। আন-নাসের নিজের জখম দেখে। কোনো জখমই গুরুতর নয়। রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। পুনরায় রক্ষক্ষরণ শুরু হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে জখম ধৌত করলো না। এই ফাঁকে লিজা হাঁটতে হাঁটতে এক দিকে চলে যায়। আন-নাসের তাকে টিলার অপর প্রান্ত থেকে খুঁজে বের করে। সেখানে গিয়ে লিজা বসে পড়ে। তার পিঠটা আন-নাসেরের দিকে। সেখানে অনেক হাড়-গোড় ছড়িয়ে আছে, যেগুলো মানুষের হাড় বলে মনে হলো। আছে অনেক খুলিও। আছে কংকাল। হাত-পা ও বাহুর হাড়। সেগুলোর মাঝে পড়ে আছে তরবারী ও বর্শা।

লিজা একটি খুলিকে সামনে নিয়ে বসে আছে। কোন এক নারীর খুলি বলে মনে হচ্ছে। মুখমন্ডলে কোথাও কোথাও চামড়া আছে। মাথার দীঘল চুলগুলোর কিছু এখনো মাথার সঙ্গে আঁটা আছে। অবশিষ্টগুলো এদিকে-ওদিকে বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে। বুকের খাচায় চামড়া নেই। পাজরে একটি খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে। গলার হাড়ে একটি সোনার হার লেপ্টে আছে। *লিজা একদৃষ্টে খুলিটার দিকে তাকিয়ে আছে।*

আন-নাসের ধীরপায়ে লিজার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ লিজা তার উভয় হাত কানের উপর রেখে সজোরে একটা চীৎকার দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতবেগে উঠে মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। আন-নাসের তাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নেয়। লিজা তার মুখটা আন-নাসেরের বুকে লুকিয়ে ফেলে। শরীরটা তার থর থর করে কাঁপছে। আন-নাসের তাকে কূপের নিকট নিয়ে যায়।

লিজার চৈতন্য ফিরে আসার পর আন-নাসের জিজ্ঞাসা করে, তুমি চীৎকার দিলে কেন?

'স্বচক্ষে নিজরে পরিণতি দেখে'– লিজা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো– 'তুমি নিশ্চয় সেই শুষ্ক লাশটা দেখে থাকবে– কোনো এক নারীর লাশ। আমার মতো কেউ হবে। সেও আমার ন্যায় রূপের যাদু প্রয়োগ করেছিলো। যে কোন পুরুষের প্রতারণার একটি ফাঁদ ছিলো। বিশ্বাস ছিলো, তার এই রূপ কখনো নিঃশেষ হবে না। এই তরতাজা যৌবন আজীবন টাটকাই থাকবে। তার পাজরের খাচায় খঞ্জর বিদ্ধ দেখেছো? গলায় হার দেখেছো? এই হার

ও খঞ্জর যে কাহিনী শোনাচ্ছে, তা আমারই কাহিনী। অন্য যেসব খুলি আর তাদের সঙ্গে পড়ে থাকা তরবারী-বর্শা পড়ে আছে, সেসব আমাকে শতবার শোনা কাহিনী ব্যক্ত করছে। সেসব কাহিনী আমি কখনো মনোযোগ সহকারে শুনিনি। আজ এই নারীর মাথার খুলি দেখে আমার মনে হলো, যেনো এটি আমার খুলি। শুষ্ক এই খুলিটায় গোশত চড়ানো হলে তা আমার চেহারা হয়ে যাবে। আমি একটি শকুনকে দেখেছি আমার চোখ দু'টো খুলে ফেলছে। একটি সিংহকে দেখেছি, যে আমার গোলাপী গন্ডদেশ খাবলে খাবলে খাচ্ছে। ঐ হায়েনাগুলো আমার মুখমন্ডলটা খেয়ে ফেলেছে। এখন শুধু খুলিটা পড়ে আছে। আমি দেখতে পেলাম, আমার চোয়াল আর ভয়ানক দাঁতগুলো নড়ছে। আমার কানে শব্দ ভেসে আসে– 'এই হলো তোমার পরিণতি।' তারপর আমার হৃদয়টাকে একটি ভয়ংকর হিংস্র প্রাণী দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরেছে।'

'ফেদায়ীরা যেখানে আমাদের উপর আক্রমণ করেছিলো, কয়েকদিন পর সেখানে গিয়ে দেখো'– আন-নাসের বললেন– 'সেখানেও তুমি এ দৃশ্যই দেখতে পাবে। লাশের কংকাল, মাথার খুলি, তরবারী ও বর্শা এবং সম্ভবত তাদের থেকে খানিক দূরে থ্রেসার খুলিও পড়ে আছে দেখবে। তার বুকেও খঞ্জর বিদ্ধ থাকবে। তারা সকলে নারীর জন্য মরেছে। এরাও নারীর জন্যই মরেছে।'

'আমি যদি আমার নীতি পরিবর্তন না করি, তাহলে নিজের যে দেহটা নিয়ে আমি আজ গৌরব করছি, যার প্রাপ্তির জন্য কেউ জীবনের নজরানা পেশ করছে, কেউ সম্পদ পেশ করছে, শৃগাল-শকুনরা একদিন মরুভূমিতে এমনি সেই দেহের গোশতও খাবলে খাবে'– লিজা বললো– কিন্তু মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে না, নিজেদের ধ্বংস চোখে দেখে না। আমি নিজেকে চিনে ফেলেছি। লিজার আসল পরিচয় পেয়ে গেছি। তুমিও শুনে নাও আন-নাসের! খোদা তোমাকে পুরুষের শক্তি ও পুরোষিত সৌন্দর্য দান করেছেন। যে নারীই দেখবে, সে-ই তোমার নিকটে আসবার আকাংখা ব্যাক্ত করবে। যাও, দেখে আসো, তুমিও তোমার পরিণতি দেখো আসো।'

লিজা এমন ভঙ্গিতে বলছিলো, যেনো তার উপর প্রেতাত্মা ভর করেছে। তার সব চতুরতা ও প্রতারণা-ষড়যন্ত্র শেষ হয়ে গেছে। এখন একজন দুনিয়াত্যাগী সূফী-দরবেশের ন্যায় কথা বলছে লিজা।

'আমি কি তোমাকে আমার আসল পরিচয় বলে দেবো?'– লিজা আন-নাসেরকে জিজ্ঞাসা করে– 'আমি কি তোমাকে দেখিয়ে দেবো, আমার

পাজরের খাচায় কী আছে?' মেয়েটি তার বুখে হাত মারে এবং চুপ হয়ে যায়। হাতটা তার সোনার হারের উপর গিয়ে পড়ে, যাতে হীরার মিশ্রণও আছে। সে হারটা মুঠি করে ধরে সজোরে টান দেয়। ছিঁড়ে হারটা হাতে চলে আসে। লিজা হারটা কূপের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়। হাতের আঙুল থেকে হীরার আংটিগুলো খুলে ফেলে। এগুলোও কূপে ছুড়ে ফেলে লিজা। তারপর বলতে শুরু করে– 'আমি একটি প্রতারক ছিলাম আন-নাসের! আমার হৃদয়ে তোমার ভালোবাসাও জন্ম নিয়েছিলো। কিন্তু তার উপর আমার কর্তব্যের প্রেতাত্মারও প্রভাব ছিলো। ফেদায়ীরা আমাদের উপর হামলা করে খুবই ভালো করেছে। তার চেয়েও ভালো হয়েছে, আমি জীবদ্দশায়ই নিজের মাথার খুলি দেখে নিয়েছি। অন্যথায় আমি বলতে পারতাম না, আমরা তোমাদেরকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে তোমাদের পরিণতি কী ঘটতো! আমার ভালোবাসার শেষ ফল কী দাঁড়াতো! তুমি ভয়াবহ একটি প্রতারণার শিকার হতে যাচ্ছিলে। আজ আমি মিথ্যা বলবো না। তোমাদের নিয়ে পরিকল্পনা ছিলো, আমি আমার রূপ ও প্রেমের ফাঁদে ফেলে তোমার বিবেক কব্জা করে নেবো এবং তোমাদের হাতে তোমাদেরই রাজা সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করাবো।' গোমস্তগীন আসিয়াত দুর্গে এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, যেনো শেখ সান্নান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার জন্য তাকে কয়েকজন ঘাতক প্রদান করেন। সান্নান বলেছেন, তিনি চারজন ফেদায়ী প্রেরণ করে রেখেছেন। তারাও যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে ভবিষ্যতে এ কাজের জন্য আর তিনি লোক প্রেরণ করবেন না। কেননা, এই মিশনে তিনি তার অনেক দক্ষ ও মূল্যবান ফেদায়ী খুইয়ে ফেলেছেন। শেষে লেনদেনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে, গোমস্তগীন তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে নিয়ে যাবেন এবং সাইফুদ্দীনকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করবেন। ইতিমধ্যে আমাদের অফিসার এসে পড়েন। তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করাই বেশি জরুরি।'

আমার পক্ষে এটুকুও সম্ভব হবে না যে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর ছায়াকে বক্র চোখে দেখবো– আন-নাসের বললো– 'পৃথিবীর কোন শক্তি আমাকে এমন নির্বোধ বানাতে পারবে না।'

লিজা হেসে ওঠে। বলতে শুরু করে– 'আমি যে দায়িত্ব পালন করছিলাম, তার প্রতি আমার মন ছিলো না। অন্যথায় আমি সীসাকেও পানিতে পরিণত করতে জানি।'

লিজা আন-নাসেরকে অবহিত করে তার কর্তব্য আর চেতনার মাঝে কতোখানি পার্থক্য। সে জানায়, 'আমি সাইফুদ্দীনের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার ন্যায় একটি অপবিত্র মেয়েকে বরণ করে নেবে কি? আমি সত্যমনে ইসলাম গ্রহণ করবো।'

'তুমি যদি সত্যমনে ইসলাম গ্রহণ করে নাও, তাহলে তোমাকে বরণ না করা আমার জন্য পাপ হবে'– আন-নাসের বললো– 'কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অনুমতি ব্যতীত আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।'

'তুমি শান্ত হও। মন থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা ফেলে দাও। তুমি যদি পবিত্র জীবন লাভ করতে চাও, তাহলে এমন জীবন একমাত্র আমাদের ধর্মেই পাবে।' আন-নাসের জিজ্ঞাসা করে– 'তোমার কি জানা আছে, যে চারজন ফেদায়ী সুলতান আইউবীকে হত্যার উদ্দেশ্যে গেছে, তারা কোন্ বেশে গেছে এবং সংহারী আক্রমণ কোন্ পন্থায় করবে?'

'না, জানি না'– লিজা উত্তর দেয়– 'আমার উপস্থিতিতে শুধু এটুকু কথা হয়েছে যে, চারজন ফেদায়ী পাঠানো হয়েছে।'

আমাদেরকে উড়ে তুর্কমান পৌঁছতে হবে'– আন-নাসের বললো– 'সুলতান এবং তাঁর দেহরক্ষীদেরকে সতর্ক করতে হবে।'

আন-নাসের লিজাকে পেছনে বসিয়ে ঘোড়া হাঁকায়। একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে তার বুকের সঙ্গে লেগে আছে। মেয়েটির রেশমকোমল চুলগুলো তার গন্ডদেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ছে। কিন্তু মস্তিষ্কে তার সুলতান আইউবী। কর্তব্যবোধ লোকটার আবেগ– স্পৃহাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। পবিত্র একটি লক্ষ তাকে রণাঙ্গনের পুরুষ এবং পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করেছে। একটি সুন্দরী অসহায় যুবতী হাতের মুঠোয় থাকা সত্ত্বেও তার এই অনুভূতিটুকু যেনো নেই যে, সে পুরুষ এবং তার মধ্যে যৌনতা আছে। একজন খ্যাতিমান বক্তা যদি কয়েক বছরও ওয়াজ করে শোনাতেন, তা লিজার উপর ক্রিয়া করতে না। কিন্তু আন-নাসের ছোট্ট একটি বাক্যে তার হৃদয়ে এই বাস্তবতাকে প্রোথিত করে দিয়েছেন যে, পবিত্র জীবন যাপন করতে চাইলে তাকে ইসলামের ছায়াতলেই আশ্রয় নিতে হবে।

এজাজ দুর্গের অধিপতির জবাব সুলতান আইউবীকে অগ্নিশর্মা করে তোলে। এই দুর্গটা তাঁকে জয় করতেই হবে এবং এক্ষুনি হাল্‌ব অবরোধ করে নগরীটা দখল করে নিতে হবে। তিনি মাম্বাজ ও বুযার দুর্গ দু'টি যুদ্ধ

ছাড়াই পেয়ে গেছেন। সে গুলোতে যেসব সৈন্য ছিলো– তাদেরকে নিজ বাহিনীতে যুক্ত করে তাদের স্থলে আপন বাহিনী মোতায়েন করেছেন। এখন তিনি এজাজ ও হাল্‌বের উদ্দেশ্যে অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। যে স্থান দু'টো অবরোধ করবেন, খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য সেখানে সৈন্য প্রেরণ করে রেখেছেন। গোয়েন্দারা তাঁকে হাল্‌ব ও এজাজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছে। সুলতান আইউবী নিজেও ঘুরে-ফিরে এবং সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে স্বচক্ষে পরিস্থিতি অবলোকন করতেন। এ জাতীয় ভ্রমণের সময় তিনি সঙ্গে পতাক রাখতেন না এবং দেহরক্ষীদেরও সঙ্গে নিতেন না, যাতে দুশমন চিনতে না পারে ইনি সালাহুদ্দীন আইউবী। এ সময় তিনি অন্যের ঘোড়া ব্যবহার করতেন। দুশমনের প্রধান সেনাপতি তাঁর ঘোড়াটা চিনে।

দেহরক্ষী ছাড়া এভাবে দূরে যেতে তাঁকে বারণ করা হতো। কিন্তু তাঁর নিজের নিরাপত্তার কোনোই পরোয়া ছিলো না। এখনো তিনি পুরোপরি ক্ষিপ্ত। তিনি তাঁর মুসলমান দুশমনকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছেন। তাদের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠোকার কাজটা বাকি আছে শুধু। এলাকাটি এমন যে, কোথাও টিলা-পর্বত কোথাও ঝোপালো গাছ-গাছালি। কোথাওবা গভীর খানা-খন্দক। এমন একটি অঞ্চলে রক্ষী বাহিনীর পাহারা ব্যতীত ঘোরা-ফেরা করা সুলতান আইউবীর পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

'সুলতানে মুহতারাম!'– আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ্ একদিন তাঁকে বললেন– 'আল্লাহ্ না করুন আপনার উপর পরিচালিত কোন সংহারী আক্রমণ যদি সফলই হয়ে যায়, তাহলে সালতানাতে ইসলামিয়া আপনার ন্যায় আর কোনো মর্দে মুমিন জন্ম দিতে পারবে না। আমরা জাতিকে মুখ দেখাতে পারবো না। অনাগত প্রজন্ম আমাদের কবরের উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে যে, আমরা আপনাকে রক্ষা করতে পারিনি।'

'আল্লাহর এটাই যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, কোনো ফেদায়ী কিংবা ক্রুসেডারের হাতে আমার মৃত্যু হবে, তা হলে এমন মৃত্যুকে আমি কীভাবে প্রতিহত করতে পারি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'রাজা যখন আপন জীবনের হেফাজত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন আর তিনি দেশ ও জাতির মর্যাদা হেফাজতের যোগ্য থাকেন না। আমি যদি খুনই হতে হয়, তাহলে আমাকে তাড়াতাড়ি দায়িত্ব পালন করে ফেলতে দাও। তোমরা আমাকে রক্ষীদের

কয়েদিতে পরিণত করো না। আমার উপর রাজত্বের নেশা সৃষ্টি করো না। তুমি তো জানো, আমার উপর কতোবার সংহারী আক্রমণ হয়েছে। প্রতিবারই আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করেছেন। এখনো রক্ষা করবেন।'

সুলতান আইউবীর ব্যক্তিগত আমলারা সর্বদা তাঁর নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন থাকতো। তাঁর উপর পরিচালিত প্রতিটি হামলার সময়ই তিনি একাকি ছিলেন। কিন্তু তাঁর রক্ষীসেনারা নিকটেই ছিলো। প্রতিবারই তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলো।

এখন তিনি পন্থা অবলম্বন করেছেন যে, ব্যক্তিগত আমলা ও রক্ষীদের কোনো এক স্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে টিলা ও পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তারপরও হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, রক্ষী বাহিনীর কতক সদস্য দূরে দূরে থেকে সুলতানের উপর দৃষ্টি রাখছে। কিন্তু কেউ জানে না, দীর্ঘদিন যাবত চারজন লোক এই বিজন ভূমিতে ঘোরাফেরা করছে এবং সুলতান আইউবীর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

এরাই সেই চার ফেদায়ী, যাদের সম্পর্কে আসিয়াত দুর্গে শেখ সান্নান গোমস্তগীনকে বলেছিলো, সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার জন্য আমি চারজন ফেদায়ীকে প্রেরণ করেছি।

শেখ সান্নানের এই চার ঘাতক সদস্য জেনে ফেলেছে, সুলতান আইউবী রক্ষী বাহিনী ছাড়া ঘোরাফেরা করে থাকেন। তাদের পরিকল্পনা ছিলো, তারা যুদ্ধকবলিত অঞ্চলের উদ্বাস্তুর বেশে সুলতান আইউবীর নিকট যাবে এবং তাঁকে হত্যা করবে। কিন্তু আইউবীর নিরাপত্তাবিহীন চলাফেলার তথ্য জেনে তারা পূর্বেকার এই পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে।

সুলতান আইউবী ঘাতকদের বড় মোক্ষম সুযোগ দিয়ে চলছেন। চার ঘাতকের পরিকল্পনা যথাযথ। কিন্তু তারা তীর-ধনুক সঙ্গে নিয়ে আসেনি। থাকলে তাদের ধরা পড়ার আশংকা ছিলো। যদি একটি তীর আর ধনুক থাকতো, তাহলে কোনো এক স্থানে বসেই তারা সুলতান আইউবীকে নিশানা বানাতে পারতো। এলাকাটায় লুকিয়ে থাকার জায়গা অনেক। কাজ সমাপ্ত করে অনায়াসে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগও আছে। তাদের সঙ্গে আছে লম্বা খঞ্জর।

ওদিক থেকে আন-নাসের লিজাকে নিয়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে। লিজা আন-নাসেরকে বলে দিয়েছিলো, চারজন ফেদায়ী সুলতান আইউবীকে হত্যা করতে গেছে। আন-নাসের অতি দ্রুত সুলতান

আইউবীর নিকট পৌঁছাতে এবং তাঁকে সতর্ক করতে চাচ্ছে। কিন্তু সফর ছিলো দীর্ঘ। ঘোড়ার পিঠে দু'জন আরোহীর বোঝা। এতো দ্রুত পথ অতিক্রম করা ঘোড়ার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পথে তিনি ঘোড়াকে বিশ্রাম দেন এবং পানি পান করিয়ে আবার ছুটতে শুরু করেন।

সুলতান আইউবী নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। চার ঘাতক লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখছে। এই অঞ্চলে কোন বাহিনী নেই। নেই কোন বসতিও। ফেদায়ীরা বনের হিংস্র পশুর ন্যায় দিনভর শিকারের সন্ধান করে ফিরছে আর রাতে সেখানেই কোথাও লুকিয়ে থাকছে।

সূর্য অস্ত গেছে। আন-নাসের ও লিজার ঘোড়া এগিয়ে চলছে। কিন্তু গতি তার কমে গেছে এবং ক্রমান্বয়ে কমছে। আন-নাসের ওজন কমানোর জন্য ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে। রাত কেটে যাচ্ছে। লিজা কয়েকবার বলেছে, আমি আর আরোহণ করতে পারছি না। মেয়েটা এখন হাড়েও ব্যাথা পাচ্ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চাচ্ছে সে। কিন্তু আন-নাসের নিজে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে বেহাল হয়ে পড়লেও থামলো না। লিজাকে বললো– 'তোমার-আমার জীবন থেকে সালাহুদ্দীন আইউবী অনেক বেশি মূল্যবান। আমি যদি বিশ্রামের জন্য এখানে থেমে যাই আর সুলতান আইউবী শত্রুর ঘাতকদের দ্বারা খুন হয়ে যান, তাহলে আমি মনে করবো, আমিই সুলতান আইউবীর খুনী।'

পরদিন ভোর বেলা। আন-নাসের এখন পা টেনে টেনে হাঁটছে। লিজা ঘোড়ার পিঠে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। ঘোড়া ধীর গতিতে হাঁটছে। এক স্থানে ঘাস-পানি দেখে ঘোড়া দাঁড়িয়ে যায়। লিজা সজাগ হয়ে হঠাৎ চকিত হয়ে বললো– 'আল্লাহর দোহাই, তুমি পশুটাকে টেনে নিও না। একে একটু পানাহার করতে দাও।'

ঘোড়ার পানাহার শেষ হলে আন-নাসের তার লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করে। ছুটে চলার মতো অবস্থা নেই ঘোড়াটার। আন-নাসেরও পরিশ্রান্ত দেহে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। লিজার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। তার মুখ থেকে এখন কথা সরছে না। আন-নাসের জানে না, সুলতান আইউবী কোথায় আছেন। তিনি তুর্কমানের দিকে এগিয়ে চলছেন। সুলতান আইউবী আরো সম্মুখে চলে গিয়েছিলেন। পরে সে স্থানটির 'কোহে সুলতান' তথা 'সুলতান পর্বত' নামকরণ হয়েছিলো। কিন্তু এখন তিনি

সেখানেও নেই। তারও আগে চলে গেছেন তিনি। আন-নাসেরের তুর্কমান ও কোহে সুলতানের টিলা চোখে পড়তে শুরু করে। সূর্য অনেক উপরে উঠে এসেছে।

এই মুহূর্তে সুলতান আইউবী টিলাময় একটি বিজন অঞ্চলে কর্মকর্তাদের নিয়ে এলাকাটার পরিসংখ্যান ঠিক করছেন। তিনি আমলাদেরকে এক স্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে একাকি একদিকে চলে যান। তাঁর মাথায় সম্ভবত বাহিনীর অগ্রযাত্রার কোনো পরিকল্পনা ছিলো। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটি টিলার উপর আরোহণ করেন। চার ফেদায়ী সেখান থেকে সামান্য দূরে এক স্থানে চুপিচুপি তাঁকে দেখছে। তিনি অনেক সময় পর্যন্ত টিলার উপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখতে থাকেন।

'নীচে আসতে দাও।' এক ফেদায়ী তার সঙ্গীদের বললো।

'দেহরক্ষীরা কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে হয়তো।' আরেকজন বললো।

'বেটা আজ রক্ষা পাবে না।' অপর একজন বললো।

'শুধু একজন এগিয়ে যাবে'– চতুর্থজন বললো– 'আক্রমণ পেছন থেকে করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরে অন্যরা এগিয়ে যাবো।'

সুলতান আইউবী টিলার উপর থেকে নেমে আসেন এবং ঘোড়ায় চড়ে অন্য একদিকে চলে যান। ঘাতকদল তাঁর পেছনে পেছনে এগিয়ে যায়। আক্রমণের জন্য এই জায়গাটা উপযোগী নয়।

আন-নাসের এখনো অনেক দূরে। সুলতান আইউবী পুনরায় ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। অন্য একটি টিলায় আরোহণ করেন। খানিক পর সেখান থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে রওনা দেন। ফেদায়ীরা তার থেকে সামান্য দূরে লুকিয়ে আছে। এক স্থানে এসে সুলতান ডান দিকে মোড় নেন। সম্মুখে খোলা মাঠ। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করতে উদ্যত হন। এমন সময় তিনি ধাবমান পায়ের শব্দ শুনতে পান। এক ফেদায়ী এক ফুট লম্বা একটা খঞ্জর হাতে তাঁর থেকে দু'-তিন পা দূরে এসে উপনীত হয়ে। সুলতান তাকে দেখে ফেলেন।

সুলতান আইউবী নিজের খঞ্জরটা বের করে হাতে নেন। দেখতে না দেখতে ফেদায়ী তাঁর উপর আক্রমণ করে বসে। সুলতান নিজের খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। আক্রমণকারী ফেদায়ী স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। আঘাতটা সে শক্তির সাথেই করেছে। সুলতানের আক্রমণ ব্যর্থ যায়। টিলার আড়াল থেকে আরেক ফেদায়ী

বেরিয়ে আসে। সেও আক্রমণ চালায়। সুলতান তার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করেন বটে; কিন্তু আঘাতে তাঁর গায়ের চামড়া কেটে যায়। তিনি টিলার আড়ালে চলে যান। এক ফেদায়ী তাঁর দিকে এগিয়ে এলে তিনি বাঁ হাতে তার মুখে ঘুষি মারেন। লোকটা ধাক্কা খেয়ে পেছনে গিয়ে পড়ে যেতে উদ্যত হয়। সুলতান তার বুকে খঞ্জরের আঘাত হেনে ঠেলা দিয়ে তাকে একদিকে ফেলে দেন। এই ফেদায়ী খতম হয়ে যায়।

অপরজন পেছন দিক থেকে সুলতানের উপর হামলা করে। কিন্তু তিনি যথাসময়ে নিজেকে সামলে নেন। সুলতান আইউবীর এক বাহুতে ফেদায়ীর খঞ্জরের আগার খোঁচা লাগে।

অপর দুই ফেদায়ীও বেরিয়ে এগিয়ে আসে। অপর দিকে ধাবমান কতগুলো ঘাড়ার পদশব্দ কানে আসে, যা মুহূর্তের মধ্যে সুলতান আইউবীর নিকটে এসে পৌঁছে যায়। ফেদায়ীরা পালিয়ে যায়। একজন ধাবমান ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। একজনকে অশ্বারোহীরা ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলে। সর্বশেষ ফেদায়ীকে জীবিত ধরে ফেলা হয়।

আল্লাহ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে এই আক্রমণ থেকেও রক্ষা করেন। ফেদায়ীরা যে সময় তাঁর উপর আক্রমণ চালায়, তখন তাঁর আমলারা তাঁর থেকে সাত-আটশত গজ দূরে এক উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো। সুলতান তাদেরকে সেই স্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমে তাদের একজন আক্রমণটা দেখে ফেলে। অন্যথায় এই আক্রমণ ব্যর্থ যাওয়ার মতো ছিলো না।

এটি ১১৭৬ সালের মে মোতাবেক ৫৭১ হিজরীর যিলকদ মাসের ঘটনা। ইতিহাসে এই ঘটনার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর ডাইরীতে শুধু লিখেছেন– 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এজাজ দুর্গ অবরোধ করতে যাওয়ার পথে চার ফেদায়ী তার উপর সংহারী আক্রমণ চালিয়েছিলো। মহান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন।'

মেজর জেনারেল আকবর খান বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ্য করে লিখেছেন– 'এজাজ দুর্গ অবরোধ করার সময় সুলতান আইউবী দিনের বেলা তাঁর এক সালার জাদুল আসাদীর তাঁবুতে ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন এক ফেদায়ী তাঁবুতে প্রবেশ করে তাঁর উপর খঞ্জর দ্বারা আক্রমণ চালায়। ঘটনাক্রমে সে সময়ে তাঁর মাথায় সেই বিশেষ পাগড়িটা ছিলো, যেটা তিনি রণাঙ্গনে ব্যবহার

করতেন। পাগড়িটার নাম ছিলো তারবুশ। আক্রমণকারীর খঞ্জর তারবুশে আঘাত হানে এবং সুলতান আইউবী সজাগ হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচজন ফেদায়ী ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ সুলতানের দেহরক্ষীরাও এসে পড়ে। তারা আক্রমণ করে ঘাতকদের মেরে ফেলে।'

জনাব আকবর খান লিখেছেন, কিছুদিন আগে এই ফেদায়ীরা প্রতারণার মাধ্যমে সুলতান আইউবীর রক্ষী বাহিনীতে ঢুকে গিয়েছিলো।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আক্রমণকারীরা সুলতান আইউবীরই দেহরক্ষী ছিলো। এই ঐতিহাসিকগণ সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যে, নিজ বাহিনীতে তিনি মোটেও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। এমনকি তাঁর দেহরক্ষীরা পর্যন্ত তাঁর অনুগত ছিলো না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, ঘাতকরা না তার নিজস্ব লোক ছিলো, না তারা কারো প্রতারণার শিকার হয়ে আক্রমণ করেছিলো। তারা ছিলো কাপুরুষ ক্রুসেডারদের মদদপুষ্ট ভাড়াটে খুনী চক্র।

ধৃত ফেদায়ী স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, তারা চারজন আসিয়াত দুর্গ থেকে এসেছে। তাকে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর হাতে তুলে দেয়া হয়। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ জিজ্ঞাবাদ করে তার থেকে আসিয়াত দুর্গের সকল তথ্য জেনে নেন। ভেতরে কতোজন সৈন্য আছে, তাদের লড়াই করার যোগ্যতা ও শক্তি কতখানি, তাও তিনি সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত তথ্যাদি সুলতান আইউবীকে অবহিত করা হয়।

'আগামীকাল রাতের শেষ প্রহরে আমরা আসিয়াতের উদ্দেশ্যে রওনা হবো'– সুলতান আইউবী বললেন। তিনি তাঁর হাই কমান্ডের সালারদের তলব করে বললেন– 'ফেদায়ীদের এই আস্তানাটি গুড়িয়ে দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। দুর্গটি এক্ষুনি দখল করতে হবে। ফৌজের এক তৃতীয় অংশই যথেষ্ট। সৈন্য কতজন যাবে এবং তাদের বিন্যাস কীরূপ হবে সুলতান তা-ও বলে দেন।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা। সুলতান আইউবী সংবাদ পান, আন-নাসের নামক এক গেরিলা কমান্ডার ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ তার থেকে পূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে ফেলেছেন। তাকে সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করা জরুরি।

আন-নাসেরকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। বিরামহীন সফর ও পিপাসা তাকে আধমরা করে

তুলেছে। লিজা তার সঙ্গে। তার গায়ের রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

আন-নাসের সুলতান আইউবীকে বিস্তারিত কাহিনী শোনায়। কোন কথাই সে গোপন রাখলো না। লিজা সম্পর্কেও খোলামেলা তথ্য প্রদান করে। সুলতান লিজাকে বললেন, নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। মেয়েটি সম্ভবত নিজেকে বন্দি মনে করছিলো এবং অসদাচরণের আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিলো। কিন্তু এখন দেখছে তার উল্টোটা। সে আন-নাসেরের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তাকে বলা হলো, তোমাকে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দেয়া হবে। সেখানে তুমি নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর হেফাযতে থাকবে এবং কিছুদিন পর আন-নাসের তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে।

আবেগময় বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে সুলতান আইউবী এরূপ মেয়েদের বিশ্বাস করতেন না। তাদেরকে সম্মান ও শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করতেন এবং গোপনে তাদের উপর নজর রাখতেন।

জখমের চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য আন-নাসেরকে পেছনের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

শেখ সান্নানের মেজাজ এখনো ঠান্ডা হয়নি। গোমস্তগীন তাকে ধোঁকা দিয়ে চলে গেছেন। গোমস্তগীনের কাফেলাকে ধাওয়া করতে যাদের প্রেরণ করেছিলেন, তাদের মাত্র দু'জন ফেরত এসেছে। তারা থ্রেসাকে তুলে নিয়ে এসেছে। লিজাকে আন-নাসের রক্ষা করে নিয়ে গেছে। থ্রেসা শেখ সান্নানের কোপানলে পড়ে যায়। মেয়েটিকে তিনি কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেন। থ্রেসাও রূপসী। কিন্তু শেখ সান্নানের কামনার দৃষ্টি লিজার উপর নিবদ্ধ।

দিবসের শেষ প্রহর। আসিয়াত দুর্গের পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে সান্ত্রীরা দূর দিগন্তে ধূলি-মেঘ দেখতে পায়। মেঘমালা এদিকেই এগিয়ে আসছে। সান্ত্রীরা তাকিয়ে থাকে। পরক্ষণে মেঘের অভ্যন্তরে হাজার হাজার ঘোড়া চোখে পড়তে শুরু করে। সান্ত্রীরা ডংকা বাজায়। কমান্ডারগণ উপরে গিয়ে দেখে। শেখ সান্নানকে সংবাদ জানায়। এসে সে-ও সম্মুখের দেয়ালের উপর উঠে যায়।

এতোক্ষণে ফৌজ দুর্গের কাছাকাছি এসে অবরোধের বিন্যাসে বিন্যস্ত

হতে শুরু করেছে। শেখ সান্নান মোকাবেলার নির্দেশ দেয়। দুর্গের পাঁচিলের উপর তীরন্দাজ বাহিনী পৌঁছে যায়। কিন্তু তারা তীর ছুঁড়ছে না। তারা বাইরের বাহিনীর গতিবিধি অনুধাবন করতে চাচ্ছে। সুলতান আইউবী দুর্গের ভেতরকার সব তথ্য আগেই সংগ্রহ করেছেন। আন-নাসের তাঁর সঙ্গে আছে। দু'টি মিনজানিক স্থাপন করা হয়েছে। শেখ সান্নানের মহল কোথায় এবং কতো দূর আন-নাসের তা জানিয়ে দেয়। তার নির্দেশনা মোতাবেক প্রথমে বড় পাথর ছোঁড়া হয়, যা লক্ষে গিয়ে আঘাত হানে। শেখ সান্নানের শক্ত দেয়াল ফেটে যায়।

দুর্গ থেকে তীর বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সুলতান আইউবীর নির্দেশে মিনজানিকের সাহায্যে দাহ্য পদার্থ ভর্তি পাতিল ভেতরে নিক্ষেপ করা হয়। পাতিলগুলো শেখ সান্নানের মহলের সন্নিকটে গিয়ে ভেঙে যায়। তরল দাহ্য পদার্থগুলো দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তাতে আগুন ধরানোর জন্য সলিতাওয়ালা তীর ছোঁড়া হয়। কিন্তু তীর তরল দাহ্য পদার্থের উপর গিয়ে পড়ছে না। এখান থেকে তীর ছুঁড়ে লক্ষে আঘাত হানা সহজ নয়। দুর্গের দেয়াল টপকে ভেতরে না ঢুকে সুবিধা করা যাবে না। ঘটনাক্রমে এক স্থানে আগুন জ্বলছিলো। একটি পাতিল তার এতো কাছে গিয়ে ফেটে যায় যে, দাহ্য পদার্থগুলো ছড়িয়ে পড়ামাত্র দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। দেখতে না দেখতে শেখ সান্নানের মহলে আগুন ধরে যায়।

প্রজ্বলমান অগ্নিশিখা শেখ সান্নানের মনে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। তার বাহিনী খৃস্টান-মুনাফিক সৈন্যদের ন্যায় দক্ষ যোদ্ধা নয়। মদ্যপ আর চরম অলস সৈনিক তারা।

শেখ সান্নান বাস্তবতাকে মেনে নেয়। সে দুর্গের উপর সাদা পতাকা উড়িয়ে দেয়। সুলতান আইউবী যুদ্ধ বন্ধের আদেশ প্রদান করে বললেন, শেখ সান্নানকে বাইরে আসতে বলো।

সর্বত্র নীরবতা ছেয়ে যায়।

খানিক পর দুর্গের ফটক খুলে যায়। শেখ সান্নান দু'-তিনজন সালারের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে। সুলতান আইউবী তাকে স্বাগত(!) জানানোর জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁর দৃষ্টিতে সান্নান অপরাধী। সান্নান যখন সুলতান আইউবীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, সুলতান তাকে ও তার সালারদেরকে এতোটুকুও বললেন না যে, বসো।

'সান্নান!'– সুলতান আইউবী জিজ্ঞাসা করেন– তুমি কী চাও?'

'জীবনের নিরাপত্তা।' শেখ সান্নান পরাজিত কণ্ঠে বললো।

'আর দুর্গ?' সুলতান জিজ্ঞাসা করেন।

'আমি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেবো।'

'এক্ষুনি বাহিনীসহ দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাও'– সুলতান আইউবী সিদ্ধান্ত প্রদান করেন– 'সঙ্গে কোন মাল-সরঞ্জাম নিতে পারবে না। যাও, প্রস্তুতি গ্রহণ করো। কোন কমান্ডার, কোন সৈনিকের সঙ্গে যেনো কোন অস্ত্র না থাকে। এখান থেকে শূন্য হাতে বেরিয়ে যাও। পাতাল কক্ষে যেসব কয়েদি আছে, তাদেরকে সেখানেই থাকতে দাও। সালতানাতে ইসলামিয়ার কোথাও থাকবে না। খৃস্টানদের নিকট পৌঁছে শ্বাস ফেলবে। আমাকে হত্যা করার লক্ষ্যে সর্বশেষ যে চার ঘাতককে প্রেরণ করেছিলে, তারাও মারা পড়েছে। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি তোমার সাদা পতাকার লাজ রাখলাম। আমি কুরআনের অনুসারী। আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন কিনা, আমি বলতে পারবো না। নিজেকে মুসলমান দাবি করা পরিত্যাগ করো। অন্যথায় আমি তোমাকে এবং তোমার চক্রকে রোম সাগরে ডুবিয়ে মারবো।'

দিনের শেষ বেলা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দূর-দিগন্তে মানুষের দীর্ঘ সারি অবনত মস্তকে পথ চলছে। শেখ সান্নান এই মানব সারির প্রধান পুরুষ। আছে তার সালার, কমান্ডার ও সিপাহীরা। আছে পেশাদার খুনীরাও। সবাই নিঃস্ব। কারো সঙ্গে কোন সামান-সম্পদ নেই। বাহন উট-ঘোড়াগুলোও দুর্গে রেখে এসেছে।

সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সুলতান আইউবীর বাহিনী দুর্গের দখল সম্পন্ন করে ফেলেছেন। পাতাল কক্ষের কয়েদিদের বের করে আনা হয়েছে। উদ্ধারকৃত সোনা-জহরত, মণি-মাণিক্য, অর্থ ও মালপত্রের কোন হিসাব নেই।

সুলতান আইউবী দুর্গটা এক সালারের হাতে তুলে দিয়ে রাতারাতি কোহে সুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। তিনি এখন আর বেশি অপেক্ষা করতে চাচ্ছেন না। দিন কয়েকের মধ্যেই অগ্রযাত্রা শুরু করেন এবং এজাজ দুর্গ অবরোধ করেন। হাল্‌ববাসীরা নিরাপত্তার দিক থেকে এই দুর্গটাকে অতিশয় দুর্ভেদ্যরূপে গড়ে তুলেছিলো। এটা ছিলো মূলত হাল্‌বেরই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তাতে যে বাহিনী ছিলো, তারা একেবারে নবীন। তারা কখনো ময়দানে যায়নি। সুলতান আইউবীর এমন আত্মবিশ্বাস নেই যে, তিনি অনায়াসে দুর্গটা কব্জা করে ফেলবেন। পেছন

থেকে হাল্‌বের ফৌজ আক্রমণ করে বসতে পারে, এই আশংকাও তাঁর মাথায় আছে। তবে এই আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন। তবে আশার কথা হলো, হাল্‌বের বাহিনী এই কিছুদিন আগে তুর্কমানের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এসেছে। তাদের যুদ্ধ করার স্পৃহা-মনোবল ভেঙে পড়েছে।

এজাজ দুর্গের প্রতিরক্ষায় সৈন্যরা প্রাণপণ লড়াই করে। তারা সারাদিন ও সারারাত সুলতান আইউবীর বাহিনীকে দুর্গের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। কোনোদিক থেকে নিকটে গিয়ে দেয়াল ভাঙা যায় কিনা চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্গের তীরন্দাজ সৈন্যরা তাদেরকে এক পা-ও এগুতে দেয়নি। পরদিন বড় মিনজানিকের সাহায্যে দুর্গের ফটকের উপর ভারি পাথর ছোঁড়া হয়। দাহ্য পদাথ্য ভর্তি পাতিল নিক্ষেপ করে অগ্নিতীরও ছোঁড়া হয়। আগুনের লেলিহান জিহ্বা ফটক চাটতে শুরু করে। উপর থেকে দুর্গের তীরন্দাজরা মিনজানিক নিক্ষেপকারীদের উপর বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করে। বড় ধনুক দ্বারা ছোঁড়া এই তীরগুলো অনেক দূরে এসে আঘাত হানছে। তাতে মিনজানিকের দায়িত্বে নিয়োজিত আইউবীর কয়েকজন সৈন্য আহত ও শহীদ হয়। কিন্তু এই কুরবানী ব্যতীত দুর্গ জয় করাও সম্ভব নয়। একজন শহীদ হচ্ছে তো অপর একজন এসে তার স্থান পূরণ করছে।

দুর্গের ফটক জ্বলছে। তার উপর অবিরাম পাথর এসে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ পর ফটক ভেদ করে পাথর ভেতরে গিয়ে আঘাত হানতে শুরু করে। আগুনে ফটকের কাঠ জ্বলে গেছে। লোহার পেরেকগুলো পাথরের আঘাতে বাঁকা হয়ে গেছে।

রাতে আগুন নিভে যায়। ফটকের লোহার কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে শুধু। পুড়ে যাওয়া ফটকের মধ্য দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারলেও ঘোড়া ঢুকতে পারবে না। দুর্গ জয় করতে হলে জীবন বাজির খেলা খেলতে হবে। পদাতিক বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত পোড়া ফটকের কাঠামোর মধ্য দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এটা সুলতান আইউবীর পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ। আদেশ পাওয়ামাত্র সৈন্যরা হুড় হুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু তাদেরকে শোচনীয় পরিণতি বরণ করতে হয়। এজাজের সৈন্যরা তাদের সম্মুখের অংশটাকে সেখানেই খতম করে ফেলে। পেছনের অংশ সঙ্গীদের লাশের উপর দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যায়।

অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে। জীবিত পদাতিক সৈন্যরা ভেতরে ঢুকে

ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণপণ লড়াই করে। তারপর অশ্বারোহী বাহিনী ভিতরে ঢোকার নির্দেশ লাভ করে। সুলতান আইউবী দুর্গের ভেতরে অগ্নি সংযোগের নির্দেশ দেন। এক একটি ইউনিট এক এক স্থানে আগুন লাগাতে শুরু করে। এজাজের সৈন্যরা অস্ত্র সমর্পণ করার কোন লক্ষণ চোখে পড়ছে না।

দুর্গটি হাল্‌ব থেকে দেখা যায়। রাতের বেলা হাল্‌বের মানুষ দেখতে পায়, দুর্গের স্থানে আকাশটা জ্বলছে। আগুনের শিখা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছে। তারা সুলতান আইউবীর এজাজ দুর্গ অবরোধের সংবাদ পেয়ে গেছে। হাল্‌বের হাই কমান্ড পেছন থেকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা আঁটে। কিন্তু সালারগণ জানায়, ফৌজ যুদ্ধের সমর্থ নয়।

এ সময়ে সাইফুদ্দীন হাল্‌বেই অবস্থান করছিলেন। গোমস্তগীনও সেখানে চলে গেছেন। দু'জনের মাঝে এজাজ ও হাল্‌বের প্রতিরক্ষার বিষয়ে উত্তপ্ত বিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে গোমস্তগীন সাইফুদ্দীনকে হত্যা করার হুমকি প্রদান করেন। সাইফুদ্দীন ঐক্য ভেঙে দেন এবং নিজের অবশিষ্ট যৎসামান্য সৈন্যকে হাল্‌ব থেকে বের করে নিয়ে যান। তারা মূলত একে অপরের শত্রু ছিলো। আল-মালিকুস সালিহ'র বয়স এখন তের বছর অতিক্রম করেছে। কিছু বুঝ-বুদ্ধি হয়েছে তার। গোমস্তগীনের বক্তব্য ও আচরণে তিনি বুঝে ফেললেন, তার এই বন্ধুটা কুচক্রী। তিনি গোমস্তগীনকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেন।

ইতিহাসে লিখিত আছে, হাল্‌ব-এজাজের অবরোধ অবস্থায় গোমস্তগীন আল-মালিকুস সালিহ'র বিরুদ্ধে নতুন এক ষড়যন্ত্র এঁটেছিলো, যা ফাঁস হয়ে যায়। আল-মালিকুস সালিহ তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে দু'-তিনদিন পর হত্যা করে ফেলেন।

শেষ পর্যন্ত এজাজের রক্ষীরা অস্ত্র ত্যাগ করে। এর জন্য সুলতান আইউবীকে বহু মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিলো। তাঁর সৈন্যসংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। এজাজবাসীরা প্রমাণ করেছে, তারা কাপুরুষ নয়। সুলতান আইউবী তৎক্ষণাৎ হাল্‌ব অবরোধ করে ফেলেন। হাল্‌বের অবস্থান এজাজের নিকটেই। এজাজের অগ্নিশিখা হাল্‌বাসীদের রাতেই আতঙ্কিত করে ফেলেছিলো। তাদের জানা ছিলো, নগরী রক্ষা করার মতো শক্তি তাদের সৈন্যদের নেই। এই নগরবাসীরাই তাঁকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলো, যার ফলে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এখন এই নগরীটা যেনো এক মৃত্যুপুরী।

অবরোধের দ্বিতীয় দিন আল-মালিকুস সালিহ'র এক দূত সুলতান আইউবীর নিকট আসে। সে যে বার্তা নিয়ে আসে, সেটি সন্ধির প্রস্তাব নয়। সেটি ছিলো একটি আবেগময় পয়গাম, যা সুলতান আইউবীকে নাড়িয়ে তোলে। বার্তাটা হলো, নুরুদ্দীন জঙ্গীর কিশোরী কন্যা সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে। মেয়েটির নাম শামসুন্নিসা। শামসুন্নিসা আল-মালিকুস সালিহ'র ছোট বোন। বয়স দশ-এগারো বছর। আল-মালিকুস সালিহ যখন হাল্ব চলে গিয়েছিলেন, তখন এই বোনটিকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাদের মা রোজী খাতুন বিনতে মঈনুদ্দীন দামেশ্কেই থেকে গিয়েছিলেন। তিনি সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর সমর্থক ছিলেন।

সুলতান আইউবী দূতকে জবাব দেন, মেয়েটাকে নিয়ে আসো।

শামসুন্নিসা সুলতান আইউবীর দরবারে এসে উপস্থিত হয়। তার সঙ্গে আল-মালিকুস সালিহ'র দু'জন সালার। সুলতান আইউবী জঙ্গীর এতীম মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত অঝোরে ক্রন্দন করেন। মেয়েটির হাতে আল-মালিকুস সালিহ'র লিখিত বার্তা।

সুলতান আইউবী পত্রখানা হাতে নিয়ে খুলে পড়েন। আল-মালিকুস সালিহ পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি সুলতান আইউবীকে 'সুলতান' মেনে নিয়েছেন। তাঁর আনুগত্যও বরণ করে নিয়েছেন। পত্রে তিনি এ-ও লিখেছেন, আমি গোমস্তগীনকে হত্যা করে ফেলেছি। তাই আপনি হাররানকেও নিজের রাজ্য ভাবতে পারেন।

'তোমরা মেয়েটাকে কেনো সঙ্গে এনেছো?'– সুলতান আইউবী সালারদের জিজ্ঞাসা করেন– 'এই বার্তা তো তোমরা নিজেরাই নিয়ে আসতে পারতে?'

উত্তর সালারদেরই দেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তারা নিজেরা কিছু না বলে মেয়েটির দিকে তাকায়। জঙ্গীকন্যা সুলতান আইউবীকে বললেন– 'মামাজান! আমাদেরকে এজাজ দুর্গটা দিয়ে দিন এবং আমাদেরকে হাল্বে থাকতে দিন। আগামীতে আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না।'

সুলতান আইউবী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সালারদের প্রতি তাকান। তারা দাবি আদায়ের কৌশল হিসেবে জঙ্গীর মেয়েকে সঙ্গে এনেছে।

'আমি এজাজ দুর্গ ও হাল্ব তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম শামসুন্নিসা!' –সুলতান আইউবী মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ জারি করেন, এজাজ দুর্গ থেকে আমাদের সৈন্যদের বের করে হাল্বের

অবরোধ তুলে নেয়া হোক। তিনি হাল্‌বের সালারদের বললেন– 'আমি এজাজ ও হাল্‌ব এই মেয়েটাকে দান করেছি। তোমরা কাপুরুষ, আত্মমর্যাদাহীন ও বিশ্বাসঘাতক। তোমরা আমার বাহিনীতে থাকার উপযুক্ত নও।'

১১৭৬ সালের ২৪ জুন মোতাবেক ৫৭১ হিজরীর ১৪ যিলহজ চুক্তিতে স্বাক্ষর হয়। সুলতান আইউবী এজাজ ও হাল্‌বকে সালতানাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং আল-মালিকুস সালিহকে স্বায়ত্বশাসন দান করেন।

তার অব্যবহিত পর সাইফুদ্দীনও সুলতান আইউবীর আনুগত্য মেনে নেন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু জাতির অভ্যন্তরে বিশ্বাসঘাতক ও ঈমান বিক্রয়কারীদের তৎপরতা যথারীতি অব্যাহত থাকে।

আলোর ঝিলিক

বিশাল বিস্তৃত এক কবরস্তান। সবগুলো কবর এখনো তরতাজা। মাটির স্তূপগুলো অগোছালো-বিক্ষিপ্ত। কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। কোন কোন কবর একটি অপরটির সঙ্গে লাগোয়া। যুদ্ধক্ষেত্রের কবর এরূপই হয়ে থাকে। হামাত থেকে হাল্‌ব পর্যন্ত এরূপ তিনটি কবরস্তান গড়ে ওঠেছে। এই সেদিনের সবুজ-শ্যামল অঞ্চলটা এখন নির্জন-নিস্তব্ধ। এখানকার বাতাসে এখন শুধুই রক্তের গন্ধ। পাখিরা কিচির মিচির করছে, শুকুনরা উড়ছে।

এমনি একটি কবরস্তান হাল্‌ব শহরতলীর এজাজ দুর্গের সন্নিকটে অবস্থিত। কবরগুলোর মাটি এখনো আর্দ্র। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজের শ্রদ্ধেয় ইমাম জনাকয়েক সৈন্যসহ সেখানে দাঁড়িয়ে ফাতিহা পাঠ করছেন। দু'আ শেষে যখন তিনি মুখমন্ডলে হাত বুলাতে গেলেন, ততোক্ষণে তাঁর দাড়ি অশ্রুতে ভিজে গেছে।

'এই ভূখন্ডটি এখন বন্ধ্যা হয়ে যাবে। এখন আর এখানে সবুজ পাতা গজাবে না'– ইমাম বললেন– 'এখানে এক কুরআনের অনুসারীগণ একে অপরের ঘাতক হয়ে গিয়েছিলো। যে মাটিতে ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্ত ঝরে, সে মাটি শুকিয়ে যায়। এখানে আল্লাহু আকবার ধ্বনি আল্লাহু আকবর ধ্বনির মোকাবেলা করেছে। তারা সবাই মুসলমান ছিলো। তারা একজন অপরজনের হাতে নিহত হয়েছে। হাশরের দিন তারা প্রত্যেকে একত্রিত উত্থিত হবে। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তোমরা এক ভাই অপর ভাইয়ের যে পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছো, সেই পরিমাণ রক্ত যদি তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের শত্রুদের ঝরাতে, তাহলে শুধু ফিলিস্তীন নয়– স্পেনও পুনরায় তোমাদের হাতে চলে আসতো।'

ইতিমধ্যে কতগুলো ঘোড়ার পদশব্দ কানে আসতে শুরু করেছে। ইমামের সঙ্গে দন্ডায়মান এক সেনা বললো– 'সুলতান আসছেন।' ইমাম মোড় ঘুরিয়ে তাকান। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আসছেন। তাঁর সঙ্গে

সালার ও রক্ষী বাহিনীর ছয়জন আরোহী। কবরস্তানের নিকটে এসে সুলতান আইউবী ঘোড়া থামান। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ইমামের কাছে এসে ফাতিহা পাঠ করে ইমামের সঙ্গে মুসাফাহা করেন।

'মহামান্য সুলতান!'– ইমাম সুলতান আইউবীকে বললেন– 'এটা তো ঠিক যে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তারাও মুসলমান ছিলো। কিন্তু তাদের কবরে ফাতিহা পাঠ করা হবে, আমি তাদেরকে এর যোগ্য মনে করি না। তাদেরকে শহীদদের সঙ্গে দাফন না করা উচিত ছিলো। আমাদের মুজাহিদগণ সত্যের পক্ষে লড়াই করেছে। কিন্তু আপনি তাদেরকে দুশমনের নিহতদের সঙ্গে দাফন করিয়েছেন।'

'যারা মিথ্যার পক্ষে লড়াই করেছে, আমি তাদেরকেও শহীদ মনে করি– সুলতান আইউবী বললেন– 'তারা তাদের শাসকদের প্রতারণার শহীদ। আমরা আমাদের সৈন্যদেরকে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছি। আর যারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো, তাদের রাজাগণ আবেগময় স্লোগান ও মিথ্যা বার্তা শুনিয়ে তাদের অন্তরে মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। তাদের ইমামগণ পুরস্কার-উপঢৌকন নিয়ে সৈন্যদেরকে বিভ্রান্ত করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়েছে। আমাদের মুসলমান শত্রুদের যারা পরে বুঝতে পেরেছিলো, তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, এখন তারা আমাদের সঙ্গে আছে। আর এই যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের পর্যন্ত আলো পৌঁছেনি। রাজত্বের নেশায় বুঁদহওয়া শাসকগণ তাদের চোখের উপর পট্টি বেঁধে দিয়েছিলো।

মুসলমান আমীরগণ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন হয়ে গিয়েছিলেন। তারা খেলাফত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন শাসক হতে চেয়েছিলেন। তাদের একজন হলেন নুরুদ্দীন জঙ্গীর বালক পুত্র আল-মালিকুস সালিহ। দ্বিতীয়জন মসুলের আমীর সাইফুদ্দীন গাজী। তৃতীয়জন হাররান দুর্গের কেল্লাদার গোমস্তগীন। শেষোক্তজনতো স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই ফেলেছিলেন। এই তিন নেতা প্রত্যেকের সৈন্যদের দ্বারা একটি বাহিনী গঠন করে নিয়েছিলেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে এসেছিলেন। খৃস্টানরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলো। তাদের সঙ্গে খৃস্টানদের সুসম্পর্কের সূত্র কেবল এটুকু যে, এই প্রক্রিয়ায় মুসলমানরা আপসে লড়াই করে করে শেষ হয়ে যাবে কিংবা দুর্বল হয়ে যাবে, যার ফলে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার যোগ্যতা ও

ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। রাজত্বের নেশা, খৃস্টানদের দেয়া সম্পদ, সামরিক সাহায্য, মদ আর ইহুদীদের রূপসী মেয়েরা এই আমীরদেরকে এমন অন্ধ করে তুলেছিলো যে, তারা এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, যখন নুরুদ্দীন জঙ্গী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এবং সুলতান আইউবী এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে মিসর থেকে এসেছেন যে, তিনি খৃস্টানদেরকে ইসলামী দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করে প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত না করে ফিরবেন না।

দেড় মাস যাবত হামাত থেকে হাল্‌ব পর্যন্ত এই বিশাল সবুজ ভূ-খণ্ডে মুসলমান মুসলমানের রক্ত ঝরাতে থাকে। শেষে বিজয় সত্যেরই হয়েছে। সুলতান আইউবী জয়লাভ করেছেন। দুশমনরা তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছে। কিন্তু সুলতানের চেহারায় খুশির সামান্যতম ঝিলিকও চোখে পড়লো না। জাতির সামরিক শক্তির বৃহৎ অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এই হিসেবে এটা খৃস্টানদেরই জয় আর মুসলমানদের পরাজয়। খৃস্টানরা তাদের লক্ষ অর্জনে সফল হয়েছে। সুলতান আইউবী কয়েক বছরের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।

১১৭৬ সালের জুন মাসের সেই দিনটিতে সুলতান আইউবী যখন এজাজ দুর্গের সন্নিকটস্থ বিশাল কবরস্তানে ইমামের সঙ্গে দন্ডায়মান ছিলেন, তখন তার চেহারাটা ছিলো বিমর্ষ। তিনি ইমামকে বললেন- 'প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর দু'আ করবেন, যেনো আল্লাহ সেই লোকগুলোকে ক্ষমা করে দেন, যাদের চোখে পট্টি বেঁধে তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করানো হয়েছিলো।'

সুলতান ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হন এবং বিস্তৃত কবরস্তানটার প্রতি তাকিয়ে বললেন- 'আল্লাহকে এতো রক্তের হিসাব কে দেবে? এই পাপ আমার আমলনামায় লেখা না হয় যেনো।'

সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন- 'আমাদের জাতি আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করেছে। কাফেররা রাসূলের উম্মতের শক্তি ও চেতনায় এতো বেশি ভীত যে, এই শক্তিটাকে নানা চিত্তাকর্ষক অস্ত্রের মাধ্যমে দুর্বল করে তুলতে বে-পরোয়া হয়ে ওঠেছে। এই একটি ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। তাদের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। মুসলমানদের দুর্বলতাই তাদের শক্তি। আমাদের কোন কোন ভাই তাদের এই মাধ্যমটাকে বরণ করে নিয়েছে এবং গৃহযুদ্ধের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

আমরা যদি সেই পথ এখনই এবং এখানেই রুদ্ধ না করো দেই, তাহলে আমি ভবিষ্যৎকে যতদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, আমি উম্মতে রাসূলকে গৃহযুদ্ধ দ্বারা আত্মহত্যা করতে দেখতে পাচ্ছি। কাফেররা এখনকার ন্যায় অর্থ ও সামরিক সাহায্য দিয়ে দিয়ে উম্মতকে আপসে লড়াতে থাকবে। গুটিকতক মানুষের উপর যখন উন্মত্ততা সওয়ার হয়, তখন তারা জাতিকে ক্রীড়নকে পরিণত করে তাদেরসহ ডুবে মরে। ক্ষমতা ও রাজত্বের মোহে মাতাল এই মানুষগুলো জাতির রক্ত এভাবেই ঝরাতে থাকবে। এই বিস্তৃত কবরস্তানটা দেখো। কবরগুলো গণনা করো। গুণে শেষ করতে পারবে না। আমরা পেছনে যেসব লাশ দাফন করে এসেছি, তাদেরও কোন সংখ্যা নেই। এতো রক্তের হিসাব আমি কার থেকে নেবো? আল্লাহকে আমি কী জবাব দেবো?'

'গৃহযুদ্ধের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে মাননীয় সুলতান!'– এক সালার বললেন– 'এখন সামনের চিন্তা করুন। বাইতুল মুকাদ্দাস আমাদের ডাকছে। প্রথম কেবলা আমাদের পথপানে তাকিয়ে আছে।'

'কিন্তু আমাকে ডাকছে মিসর'– সুলতান আইউবী ঘোড়া হাঁকাতে হাঁকাতে বললেন– 'ওদিক থেকে বড় উদ্বেগজনক খবরাখবর আসছে। ওখানে আমার স্থলাভিষিক্ত আমার ভাই। আমাকে অস্থিরতা থেকে রক্ষা করার জন্য সে পরিস্থিতির ভয়াবহতা আমার থেকে গোপন রাখছে। আলী বিন সুফিয়ান এবং নগর প্রধান গিয়াস বিলবীসও আমাকে বিস্তারিত কিছু জানাচ্ছে না। শুধু এতটুকু সংবাদ প্রেরণ করছে যে, দুশমনের গোপন নাশকতামূলক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে, আমরা যা প্রতিহত করার চেষ্টা করছি। পরশু দিনের দূত আমাকে জানিয়েছে, কায়রোতে নাশকতা দিন দিন জোরদার হচ্ছে। মনে হচ্ছে, যে শেখ সান্নানকে আসিয়াত দুর্গ থেকে উৎখাত করেছি, তার কোন ঘাতক চক্র কায়রোতে নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে। দু'জন কমান্ডার এমনভাবে খুন হয়েছে যে, তাদের শরীরে জখম বা আঘাতের কোন চিহ্ন ছিলো না। মৃত্যুর পর লাশের সুরতহাল থেকে এ প্রমাণও পাওয়া যায়নি যে, তাদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। এটা হাশিশিদের খুনের একটা বিশেষ পদ্ধতি।'

'তা আপনি বাহিনীকে কি এখানেই রেখে যাবেন নাকি সঙ্গে নিয়ে যাবেন?' এক সালার জিজ্ঞাসা করেন।

'এ বিষয়ে আমি এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেইনি'– সুলতান আইউবী

বললেন– 'কিছু সৈন্য নিয়ে যেতে পারি। ফৌজের প্রয়োজন এখানে বেশি। খৃস্টানরা মিসরে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড-তৎপরতা এই জন্য জোরদার করেছে, যেনো আমি ফিলিস্তীন অভিমুখে অগ্রযাত্রা করার পরিবর্তে মিসর চলে যাই। তাদের এই আকাঙ্খা আমি পূর্ণ হতে দেবো না। তবে আমার মিসর যাওয়া জরুরি।'

সুলতান আইউবীর আশঙ্কা অমূলক ছিলো না। ক্রুসেডারদের চিন্তাধারা ও প্রত্যয়-পরিকল্পনা তাঁর চেয়ে বেশি আর কেউ বোঝে না। যে সময়ে তিনি ফাতিহা পাঠ করে কবরস্তান ত্যাগ করে নিজের সামরিক হেডকোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছিলেন, ততোক্ষণে শেখ সান্নান ত্রিপোলি পৌঁছে গেছেন। আপনারা পড়ে এসেছেন, হাসান ইবনে সাব্বাহ'র পর এই চক্রটির যে গুরু সবচে' বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি হলেন শেখ সান্নান। লোকটি ফেদায়ীদের প্রধান নেতা ছিলেন। সুলতান আইউবী বনাম খৃস্টানদের বিগ্রহগুলোর সময় ফেদায়ীদের খুনী চক্রটি এই শেখ সান্নানেরই নেতৃত্বে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে ওঠেছিলো। তার ঘাতকরা একাধিকবার সুলতান আইউবীর উপর সংহারী আক্রমণ চালিয়েছিলো এবং প্রতিটি আক্রমণেরই পরিণতিতে ঘাতকরাই মারা পড়েছে। যারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছে, তারা ধরা পড়েছে। খৃস্টানরা শেখ সান্নানকে আসিয়াত নামক একটি দুর্গ দিয়ে রেখেছিলো, যেটি ১১৭৬ সালের মে মাসে সুলতান আইউবী অবরোধ করে দখল করে নেন। শেখ সান্নান অস্ত্রত্যাগ করে দুর্গ খালি করে দিলে সুলতান তাকে ক্ষমা করে দেন।

শেখ সান্নান ১১৭৬ সালের জুন মাসের একদিন ত্রিপোলী (লেবানন) গিয়ে পৌঁছেন। সঙ্গে তার ফেদায়ী চক্র ও সেনাবাহিনী। কারো সঙ্গে কোন অস্ত্র ছিলো না। সুলতান আইউবী তাদেরকে নিরস্ত্র করে বিদায় করে দিয়েছিলেন। ত্রিপোলী ও তার আশপাশের বিস্তৃত অঞ্চলটি এক খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডের দখলে ছিলো। শেখ সান্নান তার নিকট গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

দু'দিন পর রেমন্ড সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য এদিক-ওদিক থেকে অন্যান্য খৃস্টান সম্রাটদের তলব করেন। তারা যথাসময়ে যথাস্থানে এসে উপস্থিত হয়। খৃস্টান গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হারমানও এসে হাজির হন। সভা শুরু হয়ে যায়।

'আপনারা আমাকে এই সূত্রে তিরস্কার করতে পারেন না, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে পরাজিত হয়ে এসেছি'– শেখ সান্নান বললেন– 'আপনারা জানেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীর ন্যায় লড়াই করতে জানি না। সুলতান আইউবীর মোকাবেলা তো আপনাদের বাহিনীও করতে পারবে না। সেখানে আমার ফেদায়ীরা কীভাবে পারবে? এখন প্রয়োজন হচ্ছে, আপনারা আইউবীর দুশমন মুসলমান আমীরদেরকে সৈন্য দিন। কিন্তু তারা সকলে মিলেও তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না।'

'শেখ সান্নান!'– রেমন্ড বললেন– 'আইউবীর বিরুদ্ধে আমরা কী করবো, সে সিদ্ধান্ত আমাদেরকে নিতে দিন। আপনার এ ব্যাপারে নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। আপনি সর্বশেষ যে চারজন লোক প্রেরণ করেছিলেন, তারাও ব্যর্থ হয়েছে। তারা ধরা পড়েছে এবং মারা গেছে। সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর একটি সংহারী আক্রমণও সফল হয়নি। তাতে প্রমাণিত হয়েছে, আপনি শুধু অকেজো-অকর্মণ্য লোকদেরই প্রেরণ করেছেন, যাদের মারা যাওয়া কিংবা ধরা পড়ায় আপনার কিছুই সমস্যা হতো না। আমরা আপনাকে যেসব সুবিধাদি প্রদান করেছি, সব বিফলে গেছে।

'কেবল একজন সালাহুদ্দীন আইউবীর খুন না হওয়ায় আপনাদের অর্থ বিনষ্ট হয়নি'– শেখ সান্নান বললেন– 'আমি মিসরে সালাহুদ্দীন আইউবীর যে দু'জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে হত্যা করিয়েছি, তাদেরকেও এই অর্থের বিনিয়োগের হিসাবে রাখুন। সুদানে আপনাদের তিনজন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিলো, আমি তাদেরকেও কবরে পাঠিয়ে আপনাদের পথ পরিষ্কার করেছি। হাল্‌বে আল-মালিকুস সালিহের দুই সহযোগি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো। আপনাদের ইঙ্গিতে আমি তাদেরকেও খুন করিয়েছি। সর্বোপরি বর্তমানে মিসরে গোপন হত্যাকাণ্ডের যে ধারা চলছে, সেটি কে চালু করেছিলো? আপনারা একেও কি ব্যর্থতা বলবেন?'

'আইউবী কবে খুন হবে?'– ফরাসী ক্রুসেডার গাই অফ লুজিনান টেবিলে চাপড় মেরে বললেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর হত্যার আলোচনা করুন। আপনি নুরুদ্দীন জঙ্গীকে যে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন, সেই বিষ আইউবীকে কবে গেলাবেন?'

'সেই দিন, যেদিন সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, যেমনটি হয়েছিলো নুরুদ্দীন জঙ্গীর সময়'– শেখ সান্নান বললেন– 'জঙ্গী ভূমিকম্প কবলিত

লোকদের সাহায্যের জন্য একাকি ছুটে চলছিলেন। না তার নিজের কোন চৈতন্য ছিলো, না তার কোন আমলার। তার জন্য খাবার কে রান্না করছিলো, সেই খবর তাদের কারো ছিলো না। এই সুযোগে আমি আপনার কথামত যাদেরকে তাকে হত্যার করার লক্ষে প্রেরণ করে রেখেছিলাম, তারা তার খাদ্যে এ বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। সেই বিষের ক্রিয়ায় জঙ্গীর গলায় রোগ জন্ম নেয়। তিন-চারদিন পর তিনি মারা যান। জঙ্গীর ডাক্তার আজো বলছে, নুরুদ্দীন জঙ্গী গলার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবীর খাবার পর্যন্ত পৌঁছা তো সম্ভব নয়।'

'যে পাচক আইউবীর জন্য খাবার রান্না করে, আপনি কি তাকে ক্রয় করতে পারেন না?'– এক উর্দ্ধতন কমান্ডার জিজ্ঞাসা করে।

'এর উত্তর আমার বন্ধু হারমান ভালো দিতে পারবেন।' শেখ সান্নান বললেন এবং হারমানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

বিগত কাহিনীতে বহুবার হারমানের উল্লেখ এসেছে। লোকটা জার্মানীর বাসিন্দা। আলী বিন সুফিয়ানের ন্যায় একজন চৌকস গোয়েন্দা। নাশকতা ও চরিত্র বিধ্বংসের ওস্তাদ। মিসরে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিলো, সেসব এই হারমানেরই অপকর্ম। এই হারমানই চক্রান্তের মাধ্যমে সুলতান আইউবীর কয়েকজন উর্দ্ধতন আস্থাভাজন কর্মকর্তাতে তাঁর প্রতিপক্ষ বানিয়েছিলেন। লোকটি মুসলিম শাসক– জনগণের মনস্তত্ত্ব ও দুর্বলতাগুলো বেশ ভালো করে বুঝতেন এবং তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার কৌশল জানতেন। এক খৃস্টান সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সুদান, মিসর ও আরবের যে কোন অঞ্চলের ভাষা হুবহু আঞ্চলিক ভঙ্গিতে বলতে পারতেন।

'শেখ সান্নান সঠিক বলছেন'– হারমান বললেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর বাবুর্চিকে কেনো ক্রয় করা যাবে না, সে প্রশ্নের জবাব আমাকেই দিতে হবে। আইউবী মৃত্যুকে পরোয়া করেন না। অন্যথায় এতোদিনে বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করা ব্যাপার ছিলো না। তিনি বিশ্বাসের জোরে বেঁচে আছেন। তাঁর খাদ্য-খাবারের কেউ তত্ত্বাবধান করলো কিনা, তিনি তার কোনই তোয়াক্কা করেন না। নিজের জীবনটাকে তিনি আল্লাহর উপর সোপার্দ করে রেখেছেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, তার মৃত্যু যে দিনটিতে হবে বলে স্থির হয়ে আছে, ঠিক সেদিনই হবে এবং সেদিন কেউ তাকে ধরে

রাখতে পারবে না। তার রক্ষী ইউনিটের কমান্ডার, গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা এবং একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি রীতিমত তার খাবার খেয়ে পরীক্ষা করে দেখে। মাঝে-মধ্যে ডাক্তারও এসে খাদ্য পরীক্ষা করে। এতোসব কঠোর তত্ত্বাবধানের পরও আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, আইউবীর বাবুর্চিসহ সকল কর্মচারি তার শিষ্য। তাদের অন্তরে রয়েছে তার অন্ধ ভক্তি ও অপার শ্রদ্ধা। আইউবী তাদেরকে নিজের চাকর মনে করেন না। তাদের সঙ্গে তিনি বন্ধু ও ভাইয়ের ন্যায় আচরণ করেন। আমি পুরোপুরি একটা পরিসংখ্যান নিয়ে রেখেছি। আইউবীর ব্যক্তিগত পরিমন্ডলের কাউকে ক্রয় করা কিংবা সেই পরিমন্ডলে কাউকে ঢুকানো সম্ভব নয়। তার লোকেরা সর্বক্ষণ তার চার পার্শ্বে মানব প্রাচীর দাঁড় করিয়ে রাখে। এরা হলো আলী বিন সুফিয়ান, গিয়াস বিলবীস, হাসান ইব্ন আব্দুল্লাহ ও যাহেদান। এরা এতোই সুদক্ষ গোয়েন্দা যে, এদের চোখ মানুষের কলিজা পর্যন্ত দেখে ফেলে।'

'ইসলামের পতন'– ফিলিপ অগাস্টাস বললেন– 'আমি শতবার বলেছি, আমাদেরকে ইসলামের পতন ঘটাতে হবে। এটি এমন একটি ধর্ম, যে মানুষের আত্মাকে কব্জা করে নেয়। কেউ ইসলামকে নিজের আদর্শ হিসেবে বরণ করে নিলে পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে পরাজিত করতে পারে না। সালাহুদ্দীন আইউবীর চার পার্শ্বে মুসলমানদের যে বেষ্টনীটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ধর্ম-কর্মে তারা এতোই পরিপক্ক যে, সোনা-দানা, হীরা-জহরত ও রূপসী নারী দ্বারা আপনারা এই বেষ্টনী ভেদ করতে পারবেন না। আপনারা যাদের ক্রয় করেছেন, তারা কাঁচা ঈমানের মুসলমান। দেখেছেন তো, সালাহুদ্দীন আইউবীর কেমন ছোট ছোট বাহিনী আমাদের বিশাল বিশাল শক্তিশালী বাহিনীকে কিরূপ ক্ষতিসাধন করেছে! যেখানে আমাদের ঘোড়া ক্লান্তি ও পিপাসায় নির্জীব হয়ে পড়ে, সেখানে আইউবীর সৈন্যরা বীর বিক্রমে লড়াই চালিয়ে যায়। যেনো তাদের কোন ক্লান্তি নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। এই শক্তিকেই মুসলমানরা ঈমান বলে থাকে। আমাদেরকে তাদের ঈমানটা দুর্বল করতে হবে। তাদের এক দু'জন আমীর কিংবা উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে হাতে আনা নিঃসন্দেহে একটা সাফল্য হারমান! এ থেকে আপনি অনেক স্বার্থ উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এমন একটা পন্থা আবিষ্কার করা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে এই জাতিটার অন্তরে আপন ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রবীণ লোকদের চিন্তাধারা

পরিবর্তন করা সহজ হয় না। তাদের বংশধরকে শৈশব এবং কৈশোরেই টার্গেট করে নাও। কাঁচা মস্তিষ্ককে তুমি নিজের ছাঁচে ঢেলে নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারো। তাদের পশুবৃত্তিটাকে উত্তেজিত করে তোলো।'

'ইহুদীরা এই কাজটা করে যাচ্ছে'– হারমান বললেন– 'আমি এই ময়দানে যা কিছু করছি, তার ফলাফল ধীরে ধীরে সামনে আসছে। আপনি এক-দু'দিনে কারো বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারবেন না। এ কাজে সময়ের প্রয়োজন। একটি যুগ চলে যায়।'

'এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকা উচিত'– ফিলিপ অগাস্টাস বললেন– 'আমি এই কামনা করবো না যে, ফলাফল আমাদের জীবদ্দশাতেই ফলতে হবে। আমি পূর্ণ আশাবাদি, আমরা যদি চরিত্র ধ্বংসের এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখি, তাহলে এমন একটি সময় আসবে, যখন মুসলমান শুধুই নামের থাকবে। তাদের ধর্ম-কর্ম শুধুই একটি রেওয়াজে পরিণত হবে। চিন্তা-চেতনায় তারা হবে আমাদেরই লোক। আমাদের কাজ তারাই আঞ্জাম দেবে। তাদের চিন্তা-চেতনার উপর ক্রুশ জয়লাভ করবে।'

'শেখ সান্নান!'– রেমন্ড বললেন– 'আপনি যদি আসিয়াত দুর্গের পরিবর্তে আমাদের কাছে আরেকটি দুর্গ প্রার্থনা করেন, তাহলে এই মুহূর্তে আমরা তা দিতে পারবো না। আপনার সঙ্গে আমাদের চুক্তি অটুট থাকবে। দুর্গ ছাড়া অন্য সকল সুযোগ-সুবিধা আপনি পেতে থাকবেন। আপনি যদি এসব সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখতে চান, তাহলে সমগ্র মিসরে বিশেষত কায়রোতে সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হত্যা অব্যাহত রাখুন এবং সালাহুদ্দীন আইউবীরও হত্যাচেষ্টা চালু রাখুন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর হত্যা সম্পর্কে আমি আপনাকে স্পষ্ট বলে দিতে চাই, এ কাজে আমি আর একটি লোকও নষ্ট করবো না'– শেখ সান্নান বললেন– 'আইউবীকে হত্যা করা সম্ভব হবে না। আমি আমার বহু মূল্যবান ফেদায়ীদের বিনষ্ট করেছি। আপনারা আমাকে বলার অনুমতি দিন যে, সুলতান আইউবী আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন। আমি যখন তার হাতে অস্ত্র সমর্পণ করি, তখন আমার আশঙ্কা ছিলো, আমি তার উপর একাধিকবার যে সংহারী আক্রমণ করিয়েছি, তার প্রতিশোধে তিনি আমাকে এবং আমার গুরুত্বপূর্ণ ফেদায়ীদের খুন করে ফেলবেন। কিন্তু তিনি আমাকে ও আমার লোকদেরকে জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন। তারপরও আমার ধারণা ছিলো, তিনি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছেন– যেইমাত্র আমরা পিঠ

ফেরাবো, অমনি আমাদের উপর তীর বৃষ্টি চালাবেন কিংবা আমাদের উপর দিয়ে ঘোড়া দাবড়াবেন। এখন আপনারা আমাকে জীবিত দেখতে পাচ্ছেন। আমি আমার সকল কর্মী ও সমগ্র বাহিনীসহ আপনাদের সম্মুখে জীবিত উপস্থিত আছি। আপনারা আমার সব সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দিন। আমি আইউবীর হত্যা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি। তবে কায়রোতে আমাদের লোকদের কর্মতৎপরতা আপনাদের হতাশ করবে না।'

'কায়রোতে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, যা সালাহুদ্দীন আইউবীকে মিসর ফিরে যেতে বাধ্য করবে'– হারমান বললেন– 'আমি অতি তাড়াতাড়ি সুদানীয় মিসরের সীমান্ত চৌকিগুলোর উপর আক্রমণের ধারা শুরু করে দেবো। মিসরের উপর বড় কোনো আক্রমণ করা যাবে না। তবে আক্রমণের ধোঁকা দিতে হবে, যেনো সালাহুদ্দীন আইউবী সিরিয়া ত্যাগ করে মিসর ফিরে যেতে বাধ্য হন।'

হারমান গুপ্তচরবৃত্তিতে অভিজ্ঞ। কিন্তু তার জানা নেই, আজকের এই সভায় যে কর্মচারিরা মদ ও খাদ্যদ্রব্য আনা-নেয়া-পরিবেশন করছে, তাদের মধ্যে একজন সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। ফরাসী বংশোদ্ভুত লোকটির নাম ভিক্টর। তাছাড়া তাদের মধ্যে রাশেদ চেঙ্গিস নামক একজন তুর্কী মুসলমানও আছে, যে নিজেকে গ্রীক খৃস্টান দাবি করে এই চাকরিতে নিয়োগ লাভ করেছিলো। এই লোকটিও সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা। খৃস্টানদের অতিশয় বিচক্ষণ গোয়েন্দা প্রধান হারমান এই যেসব বিশেষ কর্মচারি সভা-সমাবেশ ও ভোজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মদ-খাবার পরিবেশন করছে গভীর যাচাই-বাচাই করে তাদেরকে নিয়োগ দান করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, সুলতান আইউবী সর্বত্র গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে রেখেছিলেন। খৃস্টানদের অনেক ভেতরকার গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো তথ্য সময়ের আগেই তিনি পেয়ে যেতেন। এবার শেখ সান্নানের এই কনফারেন্সের সব কথোপকথন তাঁর দু'জন গুপ্তচর শুনে ফেলেছে। এখন দিন কয়েকের মধ্যেই এসব তথ্য নিয়ে তাদেরকে সুলতান আইউবীর নিকট পৌছে যেতে হবে।

মিসরে নাশকতামূলক তৎপরতা বেড়ে গেছে। সেনাবাহিনীর নায়েব সালার অপেক্ষা এক স্তর নিচু পদমর্যাদার এক কমান্ডারকে নগরীর বাইরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তিনি সন্ধ্যার পর বাসা থেকে বেরিয়েছিলেন।

কিন্তু রাতে আর ঘরে ফেরেননি। সকালে তার লাশ পাওয়া গেলো। তার শরীরে কোন জখম ছিলো না, কোন আঘাতও ছিলো না। তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে নিহতের পায়ের ছাপ ছাড়া অন্য আরো দু'টি ছাপ দেখতে পান। চাল-চলনে এই কমান্ডার সকলের প্রশংসনীয় ছিলেন। তার গতিবিধি ভুল কিংবা সন্দেহভাজন লোকদের ন্যায় ছিলো না। তার একজনই স্ত্রী ছিলো, যে তার ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত ছিলো। তার এই মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোন ক্লুই বের করা সম্ভব হয়নি।

তিন-চারদিন পর একই পদমর্যাদার অপর এক সেনা কমান্ডারকে ঠিক একইভাবে ভোরে নিজ কক্ষে মৃত পাওয়া যায়। তিনি সেনা ব্যারাকের একটি কক্ষে থাকতেন। পুরোপুরি ভালো মানুষ ছিলেন। তার বন্ধু মহলে তারই ইউনিটের কিছু লোক ছিলো। তাদের কারো সঙ্গেই তার কোন দ্বন্দ্ব-বিবাদ ছিলো না। হত্যাকাণ্ডের বাহ্যিক কোনো কারণ ছিলো না। ঘটনাটাকে হত্যাকান্ডও বলা যায় না। শরীরে জখম কিংবা আঘাতের সামান্যতম চিহ্নও নেই।

সরকারী ডাক্তার লাশটা দেখেছেন। লাশের ঠোঁটের এক কোণে একটুখানি লালা ছিলো। ডাক্তার লালাটুকু একটি বাটিতে করে নিয়ে এক টুকরা গোশতের সঙ্গে মিশিয়ে একটি কুকুরকে খেতে দেন। তারপর কুকুরটাকে নিজের ঘরে নিয়ে বেঁধে রাখেন এবং পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু কুকুর অস্বাভাবিক কোনো আচরণ করলো না। ডাক্তার সারা রাত জেগে কুকুরটার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। মধ্য রাতের পর কুকুরটা রশির সীমানা পর্যন্ত চারদিক আরামের সাথে পায়চারি করতে শুরু করে। অনেকক্ষণ পায়চারি করার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় এবং লুটিয়ে পড়ে যায়। ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, কুকুরটা মরে গেছে। ডাক্তার রিপোর্ট করেন, কমান্ডার দু'জনকে এমন বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে, যাতে কোন তিক্ততা থাকে না। যা খেলে মানুষ অতিশয় আরামের সঙ্গে মারা যায়।

গোয়েন্দারা উভয় কমান্ডার সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান চালায়। জানার চেষ্টা করা হয়, জীবনের শেষ দিনটিতে তারা কার কার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, কোথায় কোথায় গেছেন এবং কার সঙ্গে আহার করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন তথ্যই পাওয়া গেলো না। বিবাহিত কমান্ডারের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। কিন্তু তাকেও সন্দেহের চোখে দেখার কোনো

কারণ ছিলো না। উভয় কমান্ডারই পাকা মুসলমান ছিলেন। সুলতান আইউবী স্বয়ং এক যুদ্ধে তাদের কমান্ড ও বীরত্বের প্রশংসা করেছিলেন। তারা ছিলেন সীমান্ত বাহিনীর কমান্ডার। কয়েকজন সুদানীকে তারা সীমান্তের ওপার থেকে গ্রেফতারও করেছিলেন। সুদানীরা তাদেরকে মোটা অংকের ঘুষের অফার দিয়েছিলো। কিন্তু তারা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের নায়েব সালারের পদে উন্নীত হওয়ার কথা ছিলো।

আলী বিন সুফিয়ান সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, হত্যাকান্ডের ঘটনা দু'টি খৃস্টান নাশকতাকারীদের কাজ এবং ঘাতকরা ফেদায়ী চক্রের সদস্য। তিনি বললেন, দুশমন এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হত্যার ধারা শুরু করে দিয়েছে। সকল কমান্ডার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হলো, যেনো তারা অপরিচিত কিংবা সন্দেহভাজন কারো হাত থেকে কিছু না খায় এবং কেউ অযাচিতভাবে বন্ধুত্ব গড়তে শুরু করলে বা কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করলে তাকে ধরিয়ে দেয়।

মিসরের গোয়েন্দা বিভাগ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় কমান্ডারের হত্যাকান্ডের সাতদিন পর একরাতে হঠাৎ সেনা ছাউনিতে আগুন ধরে যায়। হাজার হাজার তাঁবু এক স্থানে স্তূপ করে রাখা ছিলো। প্রহরাও ছিলো। কিন্তু তারপরও অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে যায়। এটিও নাশকতামূলক কাজ। সেখানে আকস্মিকভাবে আগুন ধরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিলো না। এই এলাকায় আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ ছিলো এবং এই নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে পালিত হতো।

এসব ঘটনা ছাড়াও আরো রহস্যময় বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিলো। সীমান্ত বাহিনীগুলোকে অধিকতর সতর্ক করে দেয়া হয়। সুদানের দিকে সীমান্তের ভেতরে গোপনে লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিলো। তাদের বেশ ক'জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

আলী বিন সুফিয়ান তার ইন্টেলিজেন্সকে আরো বেশি ছড়িয়ে দেন এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক সতর্ক করে দেন।

কায়রো থেকে সামান্য দূরে নীল নদের তীরে একটি পাহাড়ি এলাকা। এই অঞ্চলেরই কোন এক স্থানে ফেরাউনী আমলের একটি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। ইতিপূর্বে একাধিক ঘটনায় খৃস্টান ও সুদানী

সন্ত্রাসীরা এই পতিত প্রাসাদগুলোকে তাদের গোপন আস্তানারূপে ব্যবহার করেছিলো। মিসরে এরূপ পরিত্যক্ত পুরনো জীর্ণ প্রাসাদের সংখ্যা অনেক। পাহাড়ি এলাকাটাকে নজরে রাখার জন্য আলী বিন সুফিয়ান তাঁর গোয়েন্দাদেরকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করে নিয়োজিত করেছিলেন। এখানকার খৃস্টান সন্ত্রাসীরা দু-তিন মাসে আলী বিন সুফিয়ানের ছয়-সাতজন দক্ষ গোয়েন্দাকে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় গুম করে ফেলেছে।

এরা মিসরের সেইসব গুপ্তচর, যারা খৃস্টান গুপ্তপরদের পাকড়াও করার যোগ্যতা রাখতো। কিন্তু এখন তাঁরা নিজেরাই ধরা কিংবা মারা পড়ছে। আশংকার ব্যাপার হলো, যদি তারা ধরাই পড়ে থাকে, তাহলে খৃস্টানরা তাদেরকে ফেদায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে তাদেরকে মিসরেরই সরকার ও সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। তার চেয়েও বড় শংকা হলো, দুশমনের গোয়েন্দারা কায়রোর গোয়েন্দাদেরকে চিনে ফেলেছে। গুপ্তচরবৃত্তির এই যুদ্ধে দুশমন জয়লাভ করছে। আলী বিন সুফিয়ান এখন উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। তাদের একজন হলেন মাহদী আল-হাসান, যিনি ফিলিস্তীন ও ত্রিপোলীতে গুপ্তচরবৃত্তি করে এসেছেন। ইনি দুর্দান্ত সাহসী ও বিচক্ষণ গোয়েন্দা। উপকূলীয় এই পাহাড়ি এলাকাটার দেখা-শোনার দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত করেন আলী বিন সুফিয়ান।

এলাকাটার ভেতরে একটি মাত্র পথ আছে। পেছনে নদী। অন্য তিনদিকে পাহাড় আর টিলা। অভ্যন্তরটা সবুজ গাছপালায় পরিপূর্ণ। কোথাও কোথাও পানির ঝিলও আছে।

রিপোর্ট আছে, পাহাড়ের ভেতরে সন্দেহভাজন কিছু মানুষ যাওয়া-আসা করছে। কেউ ফেরাউনদের কোনো ভবন বা তার ধ্বংসাবশেষ দেখেনি। কিন্তু মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস, ভেতরে কোথাও না কোথাও এমন কিছু অবশ্যই আছে। ফেরাউনরা এখানে কিছু না কিছু অবশ্যই নির্মাণ করে থাকবে, যা আজো বর্তমান আছে। মোটকথা, এলাকাটা সন্ত্রাসী আস্তানার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান বটে।

মাহদী আল-হাসান এক-দু'টি উট আর কয়েকটি ভেড়া-বকরী নিয়ে মরু যাযাবর কিংবা রাখালের বেশে সেখানে যাওয়া-আসা করতেন। পশুগুলো এদিক-ওদিক চরে বেড়াতো আর তিনি ঘোরাফেরা করতেন। তিনি কিছুদূর

পর্যন্ত ভেতরকার এলাকা দেখেছেন। সে পর্যন্ত তিনি কিছুই দেখতে পাননি। অনেকখানি ভেতরে একটি পর্বত এমন আছে, যার পাদদেশে বিশ-পঁচিশ ফুট উপরে একটি কুদরতি সুড়ঙ্গ পথের মুখ আছে। মাহ্দী আল-হাসান এই সুড়ঙ্গের ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন। সুড়ঙ্গটি এতো উঁচু ও প্রশস্ত যে, তার মধ্য দিয়ে উট চলাচল করতে পারে। সুড়ঙ্গটি সোজা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। মাহ্দী আল-হাসান সুড়ঙ্গটির অপর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানে সংকীর্ণমত একটি উপত্যকা, যেখানে কোনো আস্তানা তৈরি হতে পারে না। সুড়ঙ্গটি অনেক লম্বা। ভেতরে ডানে--বাঁয়ে দেয়ালের গায়ে গুহার মতো তৈরি হয়ে আছে। এমন বড় বড় পাথরও আছে, যেগুলোর আড়ালে মানুষ দিব্যি লুকাতে পারে।

মিসরী গোয়েন্দা মাহ্দী আল-হাসান, আলী বিন সুফিয়ানকে রিপোর্ট করেছেন, আমি যতোদূর পর্যন্ত গিয়েছি, কোনো সন্দেহজনক স্থান চোখে পড়েনি এবং যতোবার গিয়েছি, একজন মানুষও ভেতরে যেতে কিংবা ভেতর থেকে বের হতে দেখিনি। আলী বিন সুফিয়ান তাকে বলে দেন, যেনো তিনি সারাদিন সেখানে অতিবাহিত করেন এবং বেশি ভেতরে না যান। কারণ, তাতে ক্ষতির আশঙ্কা বিদ্যমান। আলী বিন সুফিয়ান তাকে এও বলে দেন, মাঝে-মধ্যে উটে সওয়ার হয়ে রাতেও চলে যাবেন। যদি কোনো মানুষের মুখোমুখি হয়ে পড়েন, তাহেল বলবেন, আমি কায়রো যাচ্ছি। নিজেকে কৃষাণ বলে দাবি করবেন।

আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশনা মোতাবেক মাহ্দী আল-হাসান রাতেও সেখানে গিয়েছেন। এক রাতে তিনি কারো পলায়নপর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। কোনো বন্য পশুও হতে পারে কিংবা মানুষও হতে পারে। মাহ্দী আল-হাসান আর সম্মুখে অগ্রসর হননি। কিছু সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই মাহ্দী আল-হাসান দু'-তিনটি উট ও গোটা কতক ভেড়া-বকরী নিয়ে সেখানে চলে যান। পশুগুলোকে উন্মুক্ত ছেড়ে দিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে থাকেন। জায়গাটা সবুজ-শ্যামল। ঝোপ-ঝাড়, ঘাস ও বন্য ফল-বীচি সবই আছে। খানিক সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর তার একজন মানুষ চোখে পড়ে। লোকটি এক স্থানে মাথানত করে বসে আছে। পরনে মূল্যবান চোগা। মুখে লম্বা দাড়ি। মাথায় দামি পাগড়ি। মাহ্দী আল-হাসান ধীরে ধীরে লোকটির দিকে এগিয়ে যেতে শুরু

করেন। কারো আগমন আঁচ করে লোকটি মাথা তুলে তাকায়। বেশ-ভুষা ও চলন-বলনে মাহ্‌দী আল-হাসান একজন অশিক্ষিত গেঁয়ো লোক। তিনি ধীর পায়ে লোকটির নিকটে গিয়ে দাঁড়ান।

লোকটির হাতে একটি থলে। থলেটি কাঁচা সবুজ পাতায় ভর্তি। অপর হাতে একটি গাছের তাজা ডাল।

'কী তালাশ করছেন চাচা?'– মাহ্‌দী আল-হাসান বোকার মতো হেসে গেঁয়ো মানুষের ঢংয়ে জিজ্ঞাসা করেন– 'কিছু হারিয়েছেন কি? বলুন, আমিও তালাশ করি।'

'আমি হাকীম'– লোকটি বললো– 'গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, গোটা-দানা এসব খুঁজে ফিরছি। এসব ঔষধ তৈরিতে লাগে।'

চেহারা দেখে মাহ্‌দী আল-হাসান লোকটাকে চিনে ফেলেন। কায়রোর বিখ্যাত হাকীম। তিনি সঠিক উত্তরই দিয়েছেন যে, লতা-পাতা তালাশ করছেন। এসব দিয়েই হাকীমরা ঔষধ বানায়।

'তা তুমি এখানে কী করছো?'– হাকীম জিজ্ঞাসা করেন– 'থাকো কোথায়?'

'ঐতো সামান্য দূরে'– মাহ্‌দী আল-হাসান জবাব দেন– 'পরিবারের সঙ্গে থাকি। এখানে পশু চরাতে এসেছি।'

'দানাগুলো দিয়ে কী রোগের ঔষধ বানাবেন?' মাহ্‌দী আল-হাসান জিজ্ঞাসা করেন।

'কোন কোন রোগ এমন হয়ে থাকে যে, রোগী নিজেও জানেনা, তার কী হয়েছে।'

ইনি দেশের বিখ্যাত হাকীম। দূর-দূরান্ত থেকে রোগী আসে তার কাছে। এখানে তার দেখা পাওয়া মাহ্‌দী আল-হাসানের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।

মানুষের একটি দুর্বলতা হলো, অনেক সময় মানুষ রোগাক্রান্ত না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে রোগী মনে করে। সব মানুষই দীর্ঘ আয়ু, সুস্বাস্থ্য এবং শারীরিক শক্তির প্রত্যাশা রাখে। কোনো মানুষই নিজেকে শক্তিহীন ভাবতে চায় না। মাহ্‌দী আল-হাসানও তেমনি একজন মানুষ। শরীরে হয়তো সাধারণ কোন সমস্যা ছিলো, যা থাকে সব মানুষেরই। এতো বড় একজন হাকীমের সঙ্গে দেখা। সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

মাহ্‌দী আল-হাসান রোগের কথা হাকীমকে জানান। হাকীম তাঁর শিরায় হাত রাখেন। তারপর নিরিক্ষার সাথে চোখ দু'টো দেখেন। এমনভাবে তাকান, যেনো তার চোখে বিস্ময়কর কিছু দেখেছেন। তারপর লোকটার

মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখেন। হাকীমের চেহারায় বিস্ময়ের লক্ষণ।

'তুমি কি আমার দাওয়াখানায় আসতে পারো?'– হাকীম জিজ্ঞাসা করেন– 'শহরে আসো।'

'আমি নিতান্ত গরীর মানুষ'– মাহ্দী আল-হাসান বললেন– 'আপনাকে পয়সা দেবো কোত্থেকে?'

'তুমি এখনই আমার সঙ্গে চলো'– হাকীম বললেন– 'আমার উট ওদিকে চরে বেড়াচ্ছে। তোমারও উট আছে। আমাকে তোমার পয়সা দিতে হবে না। ধনীদের নিকট থেকে অনেক টাকা নিয়ে থাকি। গরীবের চিকিৎসা বিনা মূল্যে করি। তোমার রোগ এখনো সাধারণ। কিন্তু বেড়ে যেতে পারে। আমার অন্য একটি সন্দেহও হচ্ছে।'

মাহ্দী আল-হাসান এখন ডিউটিতে আছেন। বৃদ্ধের কাছে আসা এবং তার সঙ্গে কথা বলাও তার কর্তব্যেরই অংশ। সাধারণ একটা রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি ডিউটি ত্যাগ করতে পারেন না। তিনি হাকীমকে বললেন– 'আমি সন্ধ্যায় আপনার দাওয়াখানায় আসবো। হাকীম মাহ্দী আল-হাসানকে নিজের দাওয়াখানার ঠিকানা বলে দেন। মাহ্দী আল-হাসান পূর্ব থেকেই দাওয়াখানাটা চেনেন। তবু না জানার ভানই দেখান।

❖ ❖ ❖

সন্ধ্যার পর মাহ্দী আল-হাসান এই বেশেই হাকীমের দাওয়াখানায় চলে যান। উটটা সঙ্গে রাখেন, যাতে হাকীম চিনতে পারেন। হাকীমের প্রতি তার কোন সংশয় নেই। হাকীমরা গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা তালাশ করে ফেরেন তা তার জানা আছে। সেই সুবাধে এই হাকীমেরও উক্ত পার্বত্য এলাকায় যাওয়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া বাস্তবিকই তার বিশ্বাস জন্মে গেছে, তার এই সাধারণ রোগটা এক সময় গুরুতর কোন ব্যাধিতে পরিণত হতে পারে। হাকীম তাকে আবারো দেখলেন এবং খুব ভালো করে দেখলেন এবং বললেন– 'আমি তোমাকে ঔষধ দিচ্ছি। যদি এতে ভালো না হও, তাহলে অন্য ব্যবস্থা আছে। তোমার ব্যাপারে আমার অন্য একটি সন্দেহ আছে।'

মাহ্দী আল-হাসান জিজ্ঞাসা করেন– 'কী সন্দেহ?'

'কামনা করি, আমার সন্দেহ সঠিক না হোক'– হাকীম বললেন– 'তুমি সুদর্শন যুবক। পাহাড়-উপত্যকায় ঘুরে বেড়াও। যেখানে আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো, জায়গাটা ভালো নয়। ওখানে প্রেতাত্মরা বসবাস করে। তাদের কতিপয় ফেরাউনী আমলের রূপসী মেয়েদের

প্রেতাত্মা। ফেরাউনরা তাদেরকে জোরপূর্বক নিজেদের কাছে রেখেছিলো এবং ভোগ-বিলাসিতার উপকরণ বানিয়েছিলো। পরে তাদের স্থলে অন্য মেয়েদের পেয়ে তাদেরকে মেরে ফেলেছিলো। আত্মা বৃদ্ধ হয় না– সব সময় যুবকই থাকে। তাদেরই আত্মারা এই সবুজ ভূ-খণ্ডে ঘুরে বেড়ায়। আমার সন্দেহটা হচ্ছে, তোমার আকার-গঠন ফেরাউনদের আমলের এক যুবকের সঙ্গে মিল খায়, যাকে সে কালের এক সুন্দরী যুবতী ভালোবাসতো, কামনা করতো। কিন্তু মেয়েটি কোন এক ফেরাউনের হাতে পড়ে যায়। তুমি ওখানে যাওয়া-আসা করছো। ঐ মেয়েটির প্রেত্মাত্মা তোমাকে দেখে ফেলেছে। সে তোমাকে কামনা করছে।'

'ও আমার কোন ক্ষতি করবে না তো?'– মাহদী আল-হাসান হাকীমের বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে খানিকটা ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন– 'প্রেতাত্মাদের বন্ধুত্ব তো ভালো হয় না। তা আপনি কি আমাকে সেই প্রেতাত্মা থেকে বাঁচাতে পারেন?'

'আমার সন্দেহ ভুলও হতে পারে'– হাকীম বললেন– 'আগে ঔষধ দেবো। তাতে সুস্থ্য না হলে তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিবো। প্রেতাত্মা থেকে মুক্তি লাভের এ-ও একটা পন্থা। তখন আর সে তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'

মাহদী আল-হাসান যোগ্য ও বিচক্ষণ গুপ্তচর বটে; কিন্তু আলেম নন। সাধারণ মানুষের ন্যায় তারও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস আছে। এ জাতীয় শোনা ঘটনাবলীতে তার বিশ্বাস আছে। হাকীমের এক একটি শব্দ তার মনের মাঝে গেঁথে গেছে। প্রেতাত্মার ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

মাহদী আল-হাসান হাকীমের নিকট গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নয়– চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। হাকীম তাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন, যেনো তিনি চিন্তা না করেন। কিন্তু চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। হাকীম তাকে এক ডোজ ঔষধ দিয়ে বলে দেন, এই ঔষধটুকু রাতে শোয়ার আগে খাবে।

মাহদী আল-হাসান ঔষধ সেবন করে শুয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম এসে যায়। তিনি গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যান। এর আগে কখনো এতো তাড়াতাড়ি তার ঘুম আসেনি। সকালে চোখ খোলার পর অনুভব করেন, মনটা তাঁর অস্বাভাবিক উৎফুল্ল। সর্বপ্রথম আলী বিন সুফিয়ানের নিকট যান। কিন্তু হাকীমের ঘটনা কিছুই বললেন না। এটা বলার মতো কোন বিষয় নয়। কেননা, হাকীম সন্দেহভাজন কেউ নন। তিনি কায়রোর বিখ্যাত

ও বড় হাকীম। ফৌজ ও প্রশাসনের বড় বড় অফিসাররাও তাঁর থেকে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। তিনি তাবীজ-কবজও দিয়ে থাকেন এবং জিন-ভূত তাড়ান। আলী বিন সুফিয়ান মাহদী আল-হাসানকে বললেন, আপনি সেখানে যান। কোন সন্দেহভাজন মানুষ অবশ্যই পেয়ে যাবেন। আলী মূলত নাশকতাকারীদের আস্তানা খুঁজে ফিরছেন।

মাহদী আল-হাসান ডিউটিতে চলে যান। যাওয়ার পথে হাকীমের সঙ্গে দেখা করে যান। সেই রাখালের বেশ, রাখালের পোশাক। হাকীমকে বললেন, এই সাত সকালে আপনাকে জানাতে এসেছি, আজ রাত আমার গভীর ঘুম হয়েছে এবং ঔষধ খাওয়ার পর থেকে আমার মনটা এতো উৎফুল্ল ও তরতাজা যে, পূর্বে কখনো এমনটা হয়নি।

'যদি বিকাল পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকে, তাহলে তোমার অন্য কোন সমস্যা নেই'– হাকীম বললেন– 'সন্ধ্যায় আবার আসবে।'

মাহদী আল-হাসান ওঠে ডিউটিতে চলে যান।

মাহদী আল-হাসান এই সবুজ-শ্যামল এলাকায় বহুদিন যাবৎ যাওয়া-আসা করছেন এবং গোটা দিন অবস্থান করছেন। বহুবার রাতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার হাকীমের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তার জায়গাটার নামে ভয় অনুভূত হতে শুরু করেছে। হাকীম তাকে বলেছিলেন, প্রেতাত্মা তার কোন ক্ষতি করবে না। কারণ, প্রেমের টানে সে তার আত্মার কাছে আসা-যাওয়া করছে। তবু অদেখা রহস্যময় সৃষ্টির প্রতি ভীতি সহজাত। মাহদী আল-হাসানের মনে হতে লাগলো, প্রেতাত্মারা তার চার পার্শ্বে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। মাহদী আল-হাসান সাহসী সুপুরুষ। তিনি মন থেকে ভয় দূর করে ফেলার চেষ্টা শুরু করেন এবং হাকীম তাকে যে প্রেতাত্মার উল্লেখ করেছিলেন, তাকে কল্পনায় স্থান দিতে শুরু করেন। এই কল্পনায় তিনি শান্তি লাভ করেন এবং এদিক-ওদিক ঘুরতে শুরু করেন।

হঠাৎ মাহদী আল-হাসান অনুভব করেন, তার মনের প্রফুল্লতা ও আনন্দ নির্জীব হয়ে যাচ্ছে এবং মনটা ভীতিতে ছেয়ে যাচ্ছে। তিনি নিজেকে সামলে নেয়ার বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু ভয় বাড়তেই থাকে এবং হাকীমকে যে সমস্যার কথা বলেছিলেন, তা আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। তিনি তাৎক্ষণাৎ হাকীমের কাছে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডিউটি ত্যাগ করে যাওয়া সম্ভব নয়।

মাহদী আল-হাসান সহ্য করতে থাকেন। বহু সময় পর তার মনের ভয়

দূর হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে গতকাল ওষুধ সেবনের আগে যে অবস্থা ছিলো, সেই অবস্থায় ফিরে আসেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করে, এটা প্রেতাত্মার আছর।

দিন কেটে গেছে। মাহদী আল-হাসান উট ও ভেড়া-বকরীগুলোকে জড়ো করে সেই স্থানে নিয়ে যান, যেখানে প্রতিদিন নিয়ে রাখেন। তারপর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে শহরে হাকীমের নিকট চলে যান। হাকীমকে নিজের মনের এই পরিবর্তনের কথা জানান। হাকীম প্রেতাত্মার সন্দেহের কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু আরো একদিন ওষুধ সেবন করে দেখার পরামর্শ দিয়ে গতকালের ওষুধটাই আরেক ডোজ দিয়ে বিদায় করে দেন। মাহদী আল-হাসান রাতে শোয়ার আগে ওষুধটা সেবন করেন। গত রাতের ন্যায় আজও তার গভীর ঘুম হয় এবং সকালে ঝরঝরা শরীর-মন নিয়ে জাগ্রত হন। নিত্যদিনের ন্যায় তিনি আলী বিন সুফিয়ানের নিকট গমন করেন এবং সেখান থেকে ডিউটিতে চলে যান।

মাহদী আল-হাসানের শরীরটা এখন ভালো। মন-মানসিকতায় প্রেতাত্মার কল্পনা প্রবল। কিন্তু আধা দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রফুল্লতা হ্রাস পেতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তদস্থলে ভীতি ও নির্জীবতা এসে ভর করে। তিনি ভাবনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন এবং পায়চারি করতে শুরু করেন। কিন্তু পরে আবার ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যেতে থাকে। তার কানে এমন শব্দ ভেসে আসে, যেনো দূরে কোথাও এক নারী কাঁদছে। কান্নার শব্দ প্রথমে উঁচু হয়ে পরে আবার ক্ষীণ হতে হতে স্তিমিত হয়ে যায়।

মাহদী আল-হাসান যেখানে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি ভাবেন, এটা কোনো এক প্রেতাত্মার কান্না হবে। হতে পারে এটা সেই প্রেতাত্মা, যার কথা হাকীম বলেছিলেন। তিনি ভয় পেয়ে যান। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু হাকীম তো বলেননি, প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলা উচিত কি উচিত নয়। তিনি যদি অন্য কোথাও কোন নারীর কান্নার শব্দ শুনতেন, তাহলে পরিস্থিতি যেমনই হোক তার সাহায্যে ছুটে যেতেন। কিন্তু এখানে তো জীবন্ত কোন নারীর অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। এটা যে ফেরাউনী আমলের প্রেতাত্মার ক্রন্দন!

সন্ধ্যায় মাহদী আল-হাসান আগের দিনের ন্যায় হাকীমের নিকট চলে

যান এবং তাকে অবস্থা জানান। নারী কণ্ঠের ক্রন্দন শোনার ঘটনাও অবহিত করেন। হাকীম কিছুক্ষণের জন্য গভীর চিন্তায় হারিয়ে যান। পরে মাথা তুলে বললেন– 'আমার সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে। এটা প্রেতাত্মা। তবে তুমি ভয় পেয়ো না। আমি এখনই তোমাকে একটা তাবিজ দেবো। তারপর প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞেস করবো, সে কী চায়? তারপর যা করার করবো। তবে তোমাকে ভয় পাওয়া চলবে না। এই প্রেতাত্মাটা তোমাকে ভালোবাসে। তাই সে তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। তুমি ওখানে যেতে থাকো। তবে তার থেকে পালাবার চেষ্টা করলে সে তোমার ক্ষতি করবে।'

হাকীম মাহদী আল-হাসানকে একটি তাবিজ দেন। তিনি তাবিজটি বাহুতে বেঁধে নেন।

'অবশিষ্ট কাজ রাতে করবো'– হাকীম বললেন– 'কাল সকালে আমার কাছে চলে আসবে। তখন আমি তোমাকে প্রেতাত্মা সম্পর্কে ধারণা দেবো। তুমি যে কান্নার আওয়াজ শুনেছো, তা সেই প্রেতাত্মারই কান্না। এই প্রেতাত্মাটা শয়তান নয়। তারপরও আমি চেষ্টা করবো, তোমাকে তার থেকে রক্ষা করা যায় কিনা।'

মাহদী আল-হাসান হৃদয়ে অস্থিরতা ও উত্তেজনা নিয়ে ফিরে যান।

পরদিন মাহদী আল-হাসান আলী বিন সুফিয়ানের পক্ষ থেকে আরো কিছু নির্দেশনা লাভ করেন। তিনি পালিয়ে পালিয়ে হাকীমের নিকট চলে যান। হাকীম যেনো তারই অপেক্ষায় বসে আছেন। মাহদী আল-হাসানকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে যান এবং তাকে ভেতরে নিয়ে যান।

'সে তোমার সঙ্গে একটিবারের জন্য সাক্ষাৎ করতে চায়'– হাকীম মাহদী আল-হাসানকে বললেন– 'সে তোমার সম্মুখে আসবে এবং নিজের আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করবে। হতে পারে, প্রথম দিন সে তোমার সম্মুখে এসেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। অন্য জগতের সৃষ্টি বলে হয়তো এ জগতের মানুষের কাছে আসতে ইতস্তত করবে। তা-ই যদি করে, তাহলে পরদিন তোমাকে আবার যেতে হবে।'

'কোথায়?' মাহদী আল-হাসান জিজ্ঞাসা করেন।

'সেখানে, যেখানে তুমি প্রত্যহ গিয়ে থাকো'– হাকীম বললেন– 'যেখানে তুমি আমাকে প্রথম দেখেছিলে। সেখানে তুমি রাতে যাবে।'

'আপনিও কি সঙ্গে থাকবেন?' মাহদী আল-হাসান খানিকটা কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন।

'না'– হাকীম উত্তর দেন– 'পরজগতে চলে যাওয়া আত্মাকে সে-ই দেখতে পায়, যাকে সে কামনা করে। কোনো পাপিষ্ঠ প্রেতাত্মা যদি কোন মানুষের উপর দৃষ্টিপাত করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে মারা যায়। এই যে প্রেতাত্মা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে, সে কাউকে কষ্ট দেয় না। তার কান্না বুঝতে চেষ্টা করো। সে মজলুম, ভালোবাসার পিয়াসী। আমি রাতে যখন তাকে হাজির করেছি, তখন সে অঝোরে কাঁদছিলো এবং অনুনয়-বিনয় করে বলছিলো, ঐ লোকটাকে সামান্য সময়ের জন্য হলেও আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তারপর আমি আজীবনের জন্য চলে যাবো।'

কথাগুলো যদি অন্য কেউ বলতো, তাহলে মাহদী আল-হাসান অতোটা প্রভাবিত হতেন না, যতোটা এখন হয়েছেন। সর্বজনমান্য ও দেশের বিখ্যাত হাকীম সাহেবের বক্তব্য অমূলক হতে পারে না। তাছাড়া তিনি বড় মাপের একজন আলেমও বটে। তার বলার ধরনটাই এমন যে, শ্রোতায় হৃদয়ে গেঁথে যায়। তিনি মাহদী আল-হাসানকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন, এই প্রেতাত্মার দর্শনে তোমার উপর কোন ভীতির সঞ্চার হবে না এবং তোমার কোন ক্ষতি হবে না। উল্টো তোমার বিরাট উপকার হতে পারে।

'তবে সাবধানতা অবলম্বন করাও আবশ্যক'– হাকীম বললেন– 'এই প্রেতাত্মা কিংবা তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হওয়ার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না। এই ভেদ যদি ফাঁস করে দাও, তাহলে তোমার ক্ষতির আশঙ্কা আছে। তুমি এই দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিতে পারো। কিন্তু অদৃশ্য জগতে চলে যাওয়া আত্মার ভেদ ফাঁস করে দিলে আমি বলতে পারবো না তোমার শরীরের কোন দুইটি অঙ্গ চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে– দু'পা শুকিয়ে যাবে, না দুই বাহু, নাকি চোখ দুটো দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। তোমাকে আমি আরো একটি গোপন কথা বলবো, যাতে তুমি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো। দেশের সেনাবাহিনীর দু'জন ঊর্ধ্বতন কমান্ডার রাতে মারা গেছে। কেউ জানে না, তারা কীভাবে মারা গেছে। দু'তিনটি প্রেতাত্মা আমাকে বলেছে, তাদেরকে প্রেতাত্মারা মেরে ফেলেছে। তারা হত্যাকারী প্রেতাত্মাদের গোমর ফাঁস করে দিয়েছে।'

'তা তারা কমান্ডারদের কীভাবে খুন করলো?' মাহদী আল-হাসান জিজ্ঞাসা করেন। মাহদী আল-হাসান রাখালের বেশ ধারণ করে আছেন বটে, কিন্তু মূলত তিনি গুপ্তচর। তিনি কমান্ডারদ্বয়ের মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন করতে চাচ্ছেন। তিনি হাকীমের নিকট বিস্তারিত জানতে চান।

'এই রহস্য কাউকে বলা যাবে না'– হাকীম বললেন– 'যতোটুকু অনুমতি ছিলো বলেছি। তুমি একেবারে চুপ থাকবে। যা যা বলছি স্মরণ রেখো। ভেবো না, কোনো স্বার্থ ছাড়া তোমার প্রতি আমার এই হৃদ্যতা কেনো। আমি এই আত্মা ও প্রেতাত্মাদের কামনার কাছে দায়বদ্ধ। আমি যদি তাদেরকে নারাজ করি, তাহলে আমার সব বিদ্যা বেকার হয়ে যাবে এবং প্রেতাত্মারা আমারও সেই দশা ঘটাবে, যেমনটি তাদের শত্রুদের ঘটিয়ে থাকে। এই যে আত্মা তোমাকে দেখে কাঁদে, সে আমাকে বলেছে, সামান্য সময়ের জন্য হলেও যেনো আমি তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিই। এখন তার বাসনা পূর্ণ করা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আচ্ছা, আমি যদি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করি, তাহলে কী হবে?' মাহদী আল-হাসান জিজ্ঞেস করেন।

'তাহলে সে প্রেতাত্মার রূপ ধারণ করে তোমার আত্মার উপর নিজের ছায়া ফেলবে'– হাকীম জবাব দেন– 'তুমি আমাকে যে সমস্যার কথা বলেছিলে, সেটি কোন শারীরিক সমস্যা ছিলো না। এটি তোমার আত্মিক ব্যাধি। তবে তা এখনো তোমার উপর পূর্ণ ক্রিয়া করেনি। তুমি একজন ভালো মানুষ। তোমার নেকী তোমার কাজে এসেছে। সমস্যার কথা ব্যক্ত করে তুমি ভালোই করেছো। মহান আল্লাহ যাকে দয়া করেন, তার জন্য কোন মানুষকে তিনি ওসিলা বানিয়ে দেন। এটা আল্লাহর লীলা যে, তুমি আমাকে এখানে দেখেছো এবং আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। আল্লাহর এই দয়াকে ভয় করো না। তুমি যদি ঐ প্রেতাত্মাটার সঙ্গে মিলিত হওয়ার কামনা করো, তাহলে সে এ জগতে তোমার অনেক উপকার করবে। তোমার একটি উপকার এই হতে পারে যে, সে অতিশয় সুন্দরী নারীর রূপে গোশত-চামড়ার জীবন্ত মানুষ হয়ে যখন খুশি তোমার সঙ্গে মিলিত হবে। তুমি তাকে স্ত্রী বানিয়ে ঘরে রাখতে পারবে। আর যদি সে তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহশীল হয়ে যায়, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে তোমাকে কোনো না কোনো ফেরাউনের গোপন ধনভাণ্ডারের সন্ধান বলে দেবে এবং এমন উপায় সৃষ্টি করে দেবে যে, তুমি সেই ধনভাণ্ডার বের করে এই প্রেতাত্মাকে সঙ্গে করে মিসর থেকে দূরে কোথাও চলে যাবে এবং কোনো একটি ভূখণ্ডের রাজা হয়ে যাবে।'

'সাক্ষাৎ কবে হবে?' মাহদী আল-হাসান জিজ্ঞেস করেন।

'আজ রাতেই চলে যাও।' হাকীম বললেন।

হাকীম মাহদী আল-হাসানকে আরো একটি তাবিজ দেন এবং বহু জরুরি নির্দেশনা প্রদান করেন। আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং উৎসাহিত করে জোরালো ভাষায় বললেন, ভয় পাবে না। তিনি সাক্ষাতের স্থানে পৌঁছার সময়ও বলে দেন, রাত অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়ার খানিক পরে যাবে। মাহদী আল-হাসান বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব এক প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন এবং নিত্যদিনকার ডিউটিতে চলে যান। দিনটা সেখানে অতিবাহিত করেন এবং সূর্যাস্তের আগে আগে ফিরে যান।

রাতের আঁধার নেমে এলে মাহদী আল-হাসান পুনরায় সেখানে চলে যান। এবার ডিউটির জন্য নয়— প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। একাকি এমন ঘোর অন্ধকারে ও সুনসান পরিবেশে তাকে চরম ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু হাকীমের বক্তব্য তাকে সাহস দিয়ে যাচ্ছে। বাহুতে তার দু'টি তাবিজ বাঁধা। নিজের থেকে দু'আ-কালামও পাঠ করছেন।

মাহদী আল-হাসান হাকীমের বলা স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। পর্বতমালার ভেতরকার একটি জায়গা। গাছপালাগুলো দৈত্যের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। পরিবেশটা এতো নিস্তব্ধ যে, মাহদী আল-হাসান বুকের ধড়ফড়ানিও শুনতে পাচ্ছেন।

মাহদী আল-হাসান দিনে যে ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন, এখনো সেই কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। তিনি শব্দের দিকে এগিয়ে যান। কিছুক্ষণ নীরবতা বজায় থাকে। তিনি সামান্য অগ্রসর হয়ে দাঁড়িয়ে যান। এবার ক্রন্দন ধ্বনিটা পেছন দিক থেকে আসছে। তবে দূর থেকে। তিনি মোড় ঘুরিয়ে সেদিকে হাঁটা দেন। স্থানটা সম্পর্কে তিনি অবহিত। তাই অনায়াসে চলতে পারছেন। এই শব্দও থেমে যায়।

মাহদী আল হাসান উচ্চস্বরে বলে ওঠলেন— 'দেখা দেবে, নাকি এভাবেই ভয় দেখাতে থাকবে?'

কিন্তু তিনি নিজের উচ্চারিত শব্দগুলোই স্পষ্ট শুনতে পান। যদি তার জানা না থাকতো, এটা তারই কণ্ঠের প্রতিধ্বনি, তাহলে ভয়ে পালিয়ে আসতেন। পাহাড়গুলো দেয়ালের ন্যায় খাড়া। খাড়া দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মাহদী আল-হাসানের চীৎকারটা তিন-চারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে তার কানে এসে বাজে। তার কণ্ঠটা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বাতাসে সাঁতার কাটতে থাকে।

মাহদী আল-হাসানের শব্দের গুঞ্জরণ অন্ধকার পরিবেশে মিলিয়ে গেলে তিনি একটি নারী কণ্ঠ শুনতে পান– 'আমাকে ভয় করো না। এগিয়ে আসো।'

শব্দটা দূর থেকে এসেছে। তিনি শব্দটা কয়েকবার শুনতে পান। পরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

আবারো আওয়াজ আসে– 'বিশ্বাসঘাতকতা করো না। আমি দু'হাজার বছর যাবত তোমার পথ পানে চেয়ে আছি।'

মাহদী আল-হাসান এই আওয়াজও একাধিকবার শুনতে পান। পরক্ষণে মাহদী আল-হাসানের কথা গুঞ্জরিত হয় এবং প্রতিধ্বনিত হয়ে কয়েকবার কানে বাজার পর থেমে যায়।

এভাবে উভয় দিক থেকে শব্দ উঠতে ও গুঞ্জরিত হতে থাকে। প্রেতাত্মার আওয়াজে আবেদন-অনুনয় বিদ্যমান, যার ফলে মাহদী আল-হাসানের ভীতি দূর হয়ে গেছে। তিনি পর্বতমালার একেবারে ভেতরে চলে যান। সম্মুখে আলোর ঝলকানি দেখতে পান, যা কিনা আকাশের বিজলীর ন্যায় চমকে ওঠেই নিভে যায়। এই বিজলীর চমকে তিনি নিজের অবস্থানটা দেখে নেন। এই চমকে তিনি সেই সুড়ঙ্গের মুখটা দেখতে পান, যার মধ্যদিয়ে একবার অপর প্রান্তে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানেই থেমে যান।

কিছুক্ষণ পর আলোটা আবার চমকায় এবং তার মাধ্যমে মাহদী আল-হাসান সুড়ঙ্গের মুখে একজন মানুষ দণ্ডায়মান দেখতে পান। আলোটা কোথা থেকে আসছে বুঝা যাচ্ছে না। লোকটা মাহদী আল-হাসান থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ কদম দূরে। তিনি গভীর দৃষ্টিতে দেখেন। মুখাবয়বটা অতিশয় রূপসী একটি মেয়ের। শুধু মুখমণ্ডলই দেখা যাচ্ছে। দেহের বাকি অংশ সাদা কাফনে ঢাকা। মাহদী আল-হাসানের গা ছমছম করে ওঠে। তিনি ভয় পেয়ে যান। এবার নারী কণ্ঠ ভেসে আসে– 'আমাকে ভয় করো না। দু'হাজার বছর পর্যন্ত আমি তোমার পথপানে তাকিয়ে আছি।'

মাহদী আল-হাসান সম্মুখে এগিয়ে যান। কয়েক পা অগ্রসর হওয়ার পর কাফনের মধ্য থেকে একটি হাত বেরিয়ে তার প্রতি এগিয়ে আসে। হাতের তালুটা এমনভাবে বাড়িয়ে দেয়া হয়, যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে অগ্রসর হয়ো না। মাহদী আল-হাসান সেখানেই দাঁড়িয়ে যান। আলো নিভে যায়। তিনি এই আশায় দাঁড়িয়ে থাকেন, পুনরায় আলো জ্বলে উঠবে এবং তিনি কাফনের মধ্যকার মেয়েটাকে দেখবেন। কিন্তু তিনি আওয়াজ শুনতে পান– 'তোমাকে আমি কীভাবে বিশ্বাস করি? তুমি চলে যাও। চলে যাও।'

'আমার উপর আস্থা রাখো'– মাহ্‌দী আল-হাসান বললেন এবং সম্মুখপানে এগিয়ে গেলেন। তিনি চীৎকার করে বলছেন– 'আমি তোমারই জন্য এসেছি। তুমি আমার কাছে চলে আসো।'

মাহ্‌দী আল-হাসান সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান। সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে আওয়াজ আসে– 'কাল এসো, আজ চলে যাও। তুমি ধ্বংসশীল জগতের মানুষ। তোমার প্রতিশ্রুতিও ধ্বংসশীল।'

মাহ্‌দী আল-হাসান সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন এবং সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে থাকেন। তিনি সুড়ঙ্গের অপর মুখটাও দেখতে পান।

সুড়ঙ্গের ভেতরের তুলনায় বাইরে অন্ধকার কম। তাই সুড়ঙ্গের মুখটা দেখা যাচ্ছে। সুরমা বর্ণের এই আলোতে লম্বা মতো একটি ছায়া দেখা গেলো, যা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়, যা কিনা দেখতে কাফনে পেঁচানো মেয়েটির ন্যায়। মাহ্‌দী আল-হাসান সামনের দিকে দৌড় দেন। কিসের সঙ্গে যেনো হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। উঠে আবার দৌড় দেন। সুড়ঙ্গের অপর মুখের কাছে গিয়ে হাঁক দেন। কিন্তু নিজের ধ্বনির প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কোন উত্তর মেলেনি। কান্নার শব্দও শুনতে পেলেন না। তিনি হতাশ মনে ফেরত রওনা হন।

এখনো তিনি সুড়ঙ্গের অর্ধেক অতিক্রম করেননি, এমন সময় সুড়ঙ্গের সম্মুখপানে আলো ঝলসে ওঠে। কিন্তু এই আলোতে কাফন জড়ানো লাশ নেই।

আলো নিভে গেছে। মাহ্‌দী আল-হাসান সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসেন। সম্মুখে এবং খানিক বাঁয়ে উঁচুতে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে। কিন্তু সেটা অন্য কোন দিকের আলো, যেনো কেউ কোনো গর্তে কিংবা টিলার পেছনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। মাহ্‌দী আল-হাসান কি যেনো ভাবেন এবং যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে হাঁটা দেন। তিনি এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যান। উটটা বাইরে বাঁধা ছিলো। তিনি উটের পিঠে চড়ে বসে কায়রো অভিমুখে রওনা দেন। মনে তার কোন ভীতি নেই। তবে কেমন যেনো অস্থিরতা ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। তিনি পাহাড়ের অভ্যন্তরে দেখে আসা আলো দু'টির ব্যাপারে ভাবছেন।

মাহ্‌দী আল-হাসান গন্তব্যে পৌছে যান। এখন গভীর রাত। তবু তার ঘুম আসছে না। বারংবার কাফন জড়ানো লাশটা চোখের উপর ভেসে উঠছে।

❖ ❖ ❖

অভ্যাসমত মাহ্দী আল-হাসান ভোরবেলা উঠে পড়েন। যন্ত্রের ন্যায় নিত্যদিনের কাজগুলো সেরে নেন। আলী বিন সুফিয়ানের নিকট গিয়ে নতুন নির্দেশনা লাভ করেন, এই এলাকায় তার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে এবং তাকে শহরের বাইরে অন্য কোথাও যেতে হবে।

'না'– মাহ্দী আল-হাসান বললেন– 'আমাকে এখানে আরো ক'দিন কাজ করতে দিন। আমি আশা করি এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে কিছু একটা পেয়ে যাবো। দু'তিন দিন পর আপনাকে বলতে পারবো অঞ্চলটা নিরাপদ কিনা।'

আলী বিন সুফিয়ান মাহ্দী আল-হাসানের পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারেন না। মাহ্দী সাধারণ কোন গুপ্তচর নন। একটি অঞ্চলের দায়িত্বশীল এবং অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

খানিক আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনার পর আলী বিন সুফিয়ান মাহ্দী আল-হাসানকে উক্ত এলাকায় ফিরে যাওয়ার অনুমিত প্রদান করেন। মাহ্দী আল-হাসান পেতাত্মার মিলন লাভ না করে এলাকা ত্যাগ করতে রাজি নন। এ-ই বোধ হয় প্রথম ঘটনা, যেখানে তিনি ব্যক্তিগত বাসনাকে কর্তব্যের উপর প্রধান্য দিলেন। আলী বিন সুফিয়ান যদি ঘুণাক্ষরে টের পেতেন, মাহ্দী আল-হাসান অন্য কোনো মতলবে ডিউটি পরিবর্তন করতে নারাজ, তাহলে এক মুহূর্তের জন্যও তাকে এই ডিউটিতে বহাল রাখতেন না। একজন অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিজেকে এমন একটা ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করছেন, যাতে তার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে!

মাহ্দী আল-হাসান হাকীমের নিকট চলে যান। তাকে রাতের ঘটনা শোনান। হাকীম চোখ বন্ধ করে মাথানত করে মনে মনে অস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে মাথা তুলে মাহ্দী আল-হাসানের চোখের ভেতর তাকান।

'আজ রাত আবার যাও'– হাকীম বললেন– 'পাক জগতের একটি প্রাণী এই নাপাক দুনিয়ার মানুষের কাছে ঘেঁষতে ভয় পাচ্ছে। তুমি সরলতা প্রদর্শন করবে। হয়তো বা আজো কিছুক্ষণের জন্য দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তুমি অধৈর্য হবে না। সে তোমার সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে আছে। অবশ্যই মিলিত হবে। এই মিলনে যদি তোমার কোনো উপকার না থাকতো, তাহলে আমি তোমাকে সেখানে পাঠাতাম না। তোমার জীবনেরও কোন আশঙ্কা নেই।'

মাহদী আল-হাসান চলে যান। ডিউটির এলাকায় ঘোরাফেরা করেন। সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়েন। অপর প্রান্তে চলে যান। সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে নীচে অবতরণ করেন। মাটিতে এক টুকরা কাপড় পড়ে থাকতে দেখেন। কাপড়টা তুলে নেন। আধা ইঞ্চি চওড়া এবং আধা গজ লম্বা এক খন্ড কাপড়। মাহদী আল-হাসান কাপড়টা নেড়ে চেড়ে দেখতে শুরু করেন। তারপর কাপড়টুকু হাতে করেই পুনরায় সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়ে অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনি উপরের দিকে তাকান, যেখানে গত রাতে আগুন দেখেছিলেন। ওদিকটা ঢালু। মাহদী আল-হাসান সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে ঢালু বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেন। এবার তিনি একটি পুরুষালী কণ্ঠ শুনতে পান— 'উপরে এসো না। তুমি যার জন্য এসেছো, তার সঙ্গে তোমার রাতে সাক্ষাৎ হবে।'

শব্দটি গুঞ্জরিত হয়ে বার বার কানে বাজতে থাকে।

'আমাদের জগতে এসে এভাবে খুঁজে ফিরো না।' কণ্ঠটা পুনরায় ভেসে আসে।

মাহদী আল-হাসান থেমে যান। তার মনে হচ্ছে, শব্দটা তার চার পার্শ্বে ঘুড়ে ফিরছে। তিনি উপরে উঠলেন। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকেন। তিনি সতর্ক থাকার চেষ্টা করছেন, যেনো তার দ্বারা এমন কোনো আচরণ না ঘটে, যার ফলে এখানকার কোনো প্রেতাত্মা তার কোনো ক্ষতি করে বসে।

মাহদী আল-হাসান স্থানটা ত্যাগ করে পেছনে ফিরে আসেন। এক স্থানে বসে ভাবতে শুরু করেন, জায়গাটার আসল রহস্য কী? এই ভাবনার মধ্য দিয়ে দিন কেটে যায়। রাতে আবার আসবেন স্থির করে ফিরে যান।

সূর্যাস্তের পর। মাহদী আল-হাসান রাখালের বেশ পরিবর্তন করে নতুন বেশ ধারণ করেন। দিনের বেলা ডিউটির সময় তার কাছে লম্বা একটা খঞ্জর থাকে। হাকীম তাকে জোরালোভাবে বলে দিয়েছেন, রাতে প্রেতাত্মার সাক্ষাতে যাওয়ার সময় সঙ্গে খঞ্জর বা অন্য কোন অস্ত্র রাখা যাবে না। গত রাতেও খঞ্জর নেননি। এখন তিনি রওনা হবেন। খঞ্জরটা দেয়ালের সঙ্গে ঝুলছে। মাহদী আল-হাসান খঞ্জরটার প্রতি তাকান এবং কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। হাকীমের নির্দেশনা মান্য করলে খঞ্জরটা নেয়া যায় না। কিন্তু মাহদী আল-হাসান ভাবনার জগত থেকে ফিরে এসে সিদ্ধান্ত নেন, যা হয় হবে, আজ খঞ্জর নিয়ে যাবো। তিনি খঞ্জরটা দেয়াল থেকে হাতে তুলে নেন।

পোশাকের ভেতর কোমরের সঙ্গে অস্ত্রটা বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

উটটা গতকালের জায়গায় বসিয়ে রেখে মাহদী আল-হাসান পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন এবং পায়ে হেঁটে সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছেন, যেখান থেকে সুড়ঙ্গের মুখটা দেখা যায়। মাহদী আল-হাসান পেছনে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পান, যা তৎক্ষণাৎ নীরব হয়ে যায়। পরক্ষণেই উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ কানে আসে, যা অতোটা উচ্চ নয়। কিন্তু এমন সুনসান নীরবতার মধ্যে গড়িয়ে পড়া পাথরটি স্থির হওয়ার পরও শব্দটি কানে বাজতে থাকে। তারপর শব্দটি গুঞ্জরণে পরিণত হয়ে শূন্যে সাঁতার কাটতে শুরু করে, যেনো কোন মানুষ কান্নার পর ফোঁপাচ্ছে। এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এবার মাহদী আল-হাসান কারো কান্নার শব্দ শুনতে পান।

'আমার সম্মুখে এসে যাও'– মাহদী আল-হাসান উচ্চস্বরে বললেন– 'আমার জগত অপবিত্র –আমি অপবিত্র নই।'

'তুমি আমাকে আবারো ছেড়ে চলে যাবে'– নিকটের কোনো এক স্থান থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে আসে।

মাহদী আল-হাসানের আওয়াজ আর উক্ত নারীকণ্ঠের আওয়াজ বারংবার কানে আসতে থাকে, যেনো একে অপরের পেছনে ছুটে চলছে। হঠাৎ এক স্থানে আলো ঝলসে ওঠে এবং নিভে যায়। মাহদী আল-হাসান এই আলোতে সুড়ঙ্গের মুখটা দেখতে পান। তিনি লম্বা পায়ে সম্মুখে এগিয়ে যান এবং সুড়ঙ্গের মুখের সামান্য নীচে বড় একটি পাথরের পেছনে লুকিয়ে পড়েন। তিনি গত রাতে উপরে যে স্থানটিতে আগুন দেখেছিলেন, তার প্রতি তাকান। আগুন তো নয়– ছিলো প্রবঞ্চনা। সেই প্রচঞ্চনা আজো বিদ্যমান।

সুড়ঙ্গের মুখটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। মাহদী আল-হাসান উপুড় হয়ে পেটে ভর করে ধীরে ধীরে উপরে উঠে যান। কয়েক মুহূর্ত পরই তিনি সুড়ঙ্গের মুখে ঢুকে পড়েন। সেখান থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে উপরে যেদিক থেকে আগুনের প্রবঞ্চনাটা আসছিলো, সেদিকে তাকান। তিনি আগুনের এমন একটি আলো দেখতে পান, যার শিখা কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

মাহদী আল-হাসান সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে একটি নারীকণ্ঠ শুনতে পান– 'দু'হাজার বছর যাবত আমি তোমার পথ পানে চেয়ে আছি।'

মাহদী আল-হাসান সুড়ঙ্গের দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে আরো ভেতরে চলে

যান। তার মনে পড়ে যায়, হাকীম তাকে বলেছিলেন, সঙ্গে অস্ত্র নেবে না। অন্যথায় মেয়েটির আত্মা তোমার সম্মুখে আসবে না। এখন তার সঙ্গে দেড়ফুট লম্বা একটা খঞ্জর আছে। তথাপি প্রেতাত্মা তার সঙ্গে কথা বলছে। তিনি আরো এগিয়ে যান এবং সুড়ঙ্গের মধ্যস্থলে পৌঁছে যান। সুড়ঙ্গটা বেশ প্রশস্ত। তিনি কারো আগমন অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেয়ালের কোল ঘেঁষে বসে পড়েন। কে একজন তার গা ঘেঁষে অতিক্রম করতে শুরু করে। এতো ঘোর অন্ধকারেও তিনি অনুমান করতে সক্ষম হন, লোকটি সেই মেয়ে এবং কাফনের কাপড়ে জড়ানো।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে যায় এবং কান্নার ভান ধরে। মাহদী আল-হাসান এই শব্দ পূর্বেও কয়েকবার শুনেছেন। তার বুকটা ধড়ফড় করতে শুরু করে। কাফন-জড়ানো মেয়েটি মাথাটা মাহদী আল-হাসানের দিকে এগিয়ে দেয়। ঠিক তখন সুড়ঙ্গের মুখে আলো জ্বলে উঠে ও নিভে যায়। মাহদী আল-হাসান বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যান এবং বিদ্যুদ্গতিতে পেছন থেকে মেয়েটিকে ঝাপটে ধরেন। মেয়েটি বলে ওঠে– 'ওরে হতভাগা! এটা রসিকতার সময় নয়। আমাকে ছেড়ে দাও। অন্যথায় বিপদে পড়বে।'

মাহদী আল-হাসান যে সন্দেহে জীবনের বাজি লাগিয়ে মেয়েটাকে ধরে ফেলেছেন, তা নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বুঝে ফেলেছেন, এটা যদি প্রেতাত্মা হতো, তাহলে তিনি তাকে ধরতে পারতেন না। আর সত্যিই যদি এটা প্রতারণা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি বিরাট কিছু অর্জন করে ফেলেছেন।

কাফন জড়ানো নারীর কণ্ঠ শোনামাত্র মাহদী আল-হাসান তার কানে কানে বললেন– 'উচ্চস্বরে কথা বললে খঞ্জরটা পাজরের এক পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য পাশ দিয়ে বের করবো।'

'আর আমি তোমার হৃদপিন্ড ও কলিজাটা মুখের পথে বের করে চিবিয়ে খাবো'– মেয়েটি বললো– 'আমি আত্মা।'

মাহদী আল-হাসান এক হাতে মেয়েটার বাহু ধরে রেখে অপর হাতে খঞ্জর বের করে তার আগাটা মেয়েটার পাজরে ঠেকিয়ে ধরেন। সুড়ঙ্গের সম্মুখের মুখে আরেকবার আলো জ্বলে ওঠে। ওদিকে যাওয়া মাহদী আল-হাসানের জন্য বিপজ্জনক।

'আমি এ কারণেই তোমাকে আমার কাছে আসতে দিচ্ছিলাম না যে, তুমি প্রতারক এবং ধ্বংসশীল জগতের মানুষ'– মেয়েটি ক্ষীণ অথচ ক্রিয়াশীল ভঙ্গিতে বললো– 'দুই হাজার বছর যাবত আমি তোমার পথপানে তাকিয়ে আছি।'

'তোমার অপেক্ষার দিন শেষ হয়ে গেছে'– মাহ্দী আল-হাসান বললেন– 'এখন আর তুমি পাক জগতে ফিরে যেতে পারবে না। তুমি এখন আমাদের অপবিত্র জগতের নারী।'

'আমি নারী নই'– মেয়েটি বললো– 'আমি তরুণী। আমি রূপসী মেয়ে। আমি উচ্চশব্দে কথা বলবো না। আমার বক্তব্য গভীরভাবে শোনো। আমি জানি তুমি কে এবং এখানে কেনো এসেছো। তোমাকে আমার এতো ভালো লাগে যে, আমি তোমাকে পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এই পন্থা অবলম্বন করেছি।'

'তাহলে আমার সঙ্গে চলো।' মাহ্দী আল-হাসান বললেন।

'না'– মেয়েটি বললো– 'তোমার সঙ্গে গেলে আমরা না খেয়ে মারা যাবো। বরং তুমি আমার সঙ্গে চলো। তাহলে ফেরাউনদের সব ধনভান্ডার আমাদের হবে। তখন আর তোমাকে মরু বিয়াবান ও পাহাড়-বনে ঘুরে ফিরতে হবে না এবং সামান্য বেতন-ভাতার বিনিময়ে কারো গুপ্তচরবৃত্তি করে বেড়ানোর প্রয়োজন হবে না।'

'এখানে তুমি কী করছো?'

'ধনভান্ডার উত্তোলন করছি'– মেয়েটি বললো– 'আমার সঙ্গে অনেক লোক আছে।'

'তারা কোথায়?'

'আমার সঙ্গে চলো'– মেয়েটি বললো– 'সকলে তোমাকে স্বাগত জানাবে। আমাকে আলোতে দেখলে তুমি যতোসব ধনভান্ডার আর নিজের জগতের কথাই ভুলে যাবে।'

মেয়েটির সুরভিত দেহ অন্ধকারের মধ্যে মাহ্দী আল-হাসানকে বিমোহিত করে তুলছে। তার দেহের সৌরভে মাতাল করে তুলছে সুলতান আইউবীর এই পরিপক্ক ঈমানদার গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে। তিনি প্রথম যখন মেয়েটাকে ঝাপটে ধরেছিলেন, তখনই আঁচ করে নিয়েছেন, এই দেহ ঈমান ক্রয়ের ক্ষমতা রাখে। কণ্ঠটাও তার সুরেলা। মাদকতা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে তুলছে মাহ্দী আল-হাসানকে।

ঠিক সে সময়ে সুড়ঙ্গের মুখে আবারো আলো জ্বলে ওঠে। মাহ্দী আল-হাসান চৈতন্য ফিরে পান। তিনি মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করা সমীচীন মনে করলেন না, সুড়ঙ্গের পেছনেও তার লোকেরা আছে কিনা। সম্মুখের মুখে বের হতে চাচ্ছেন না তিনি। কারণ, তিনি নিশ্চিত, ওদিকে মানুষ আছে এবং তারাই আলো জ্বালাচ্ছে ও নেভাচ্ছে।

'ওঠো'– মাহদী আল-হাসান মেয়েটাকে তুলে দাঁড় করালেন এবং বললেন– 'কাফনটা খুলে ফেলো।'

মেয়েটি দেহ থেকে কাফনটাকে খুলে ফেলে। মাহদী আল-হাসান কাপড়টা ছিঁড়ে তিনটি টুকরা বের করেন। একটি দ্বারা মেয়েটির দুই হাত পিঠমোড়া করে বাঁধেন। একটি দ্বারা টাখনুর কাছে দিয়ে পা দুটো বাঁধেন এবং অপর খন্ড দ্বারা মুখটা বেঁধে তাকে কাঁধের উপর তুলে নেন। খঞ্জরটা হাতে আছে। তিনি সুড়ঙ্গের পেছন মুখের দিকে হাঁটা দেন। এখান থেকে তাকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

মাহদী আল-হাসান গতরাতে যখন এখানে এসেছিলেন, তখন প্রেতাত্মার সঙ্গেই মিলিত হতে এসেছিলেন। তখন সুড়ঙ্গের মুখে আলোর ঝলকের মধ্যে তার কাঙ্খিত আত্মাটিকে এক নজর দেখেছিলেন। আজ দিনের বেলা এসে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়েছিলেন। সেখানে তিনি মাটিতে পড়ে থাকা পাতলা এক চিলতে কাপড় দেখতে পেয়েছিলেনে। কাপড়টা দেখামাত্র তার মনে পড়ে যায়, এরূপ কাপড় দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানো হয়। মাহদী আল-হাসান আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণ ও দীক্ষাপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। সামান্য বিষয় এবং সূক্ষ্ম ইঙ্গিতকে তিনি অনেক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে থাকেন। আজ রাত যখন প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হন, তখন হাকীমের বারণ সত্ত্বেও তিনি খঞ্জরটা সাথে করে নিয়ে এসেছেন। এটা পরীক্ষার একটা পদ্ধতি। সঙ্গে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও প্রেতাত্মা তাকে ধরা দিয়েছে। হাকীমের তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

মাহদী আল-হাসান সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি সুড়ঙ্গের মুখে আলোর ঝিলিক দেখামাত্র সেখানে চলে যান এবং সেখান থেকে উপর দিকে তাকিয়ে দেখেন। সেখানেই আগুনের শিখা লুকায়িত ছিলো। সুড়ঙ্গের মুখের আলোটা সেখান থেকেই আসছিলো।

মাহদী আল-হাসানের এ জাতীয় অন্য দু'টি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। সে ঘটনায় বেশ ক'জন খৃস্টান এজেন্ট পাকড়াও হয়েছিলো এবং তাদের প্রতারণার কৌশল ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো। অন্যথায় সরল মানুষেরা এ জাতীয় আলোকে গায়েবের জ্যোতি বলেই বিশ্বাস করতো। উক্ত ঘটনা দু'টোতে অভিযান পরিচালনাকারীদের মধ্যে মাহদী আল-হাসানও ছিলেন। তিনি বুঝে ফেললেন, সুড়ঙ্গের ঠিক বিপরীতে পাহাড়ের উঁচুতে যে অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে, সুড়ঙ্গের মুখে তারই আলো এসে পড়ছে।

প্রশিক্ষণের সময় মাহদী আল-হাসান জানতে পেরেছিলেন, মৃত্যুবরণ করার পর ইহ-জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্ তার আত্মাকে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেন না যে, সে মানুষের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়াবে। যে মৃত্যুবরণ করে, সে না দৈহিকভাবে ফিরে আসে, না আত্মা কিংবা প্রেতাত্মার আকৃতিতে। প্রশিক্ষণের সময় মাহদী আল-হাসানের মনে দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিশ্বাস জন্মানো হয়েছিলো যে, আল্লাহ্ মানুষকে এতো বেশি দৈহিক ও আত্মিক শক্তি দান করেছেন যে, সে পাহাড়-পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। ঈমান যতো শক্ত হবে, এই শক্তি ততো বেশি হবে। ভূত-প্রেতের বিশ্বাস মানুষের মস্তিষ্কের সৃষ্টি। খৃস্টানরা আমাদের ঈমানকে দুর্বল করার লক্ষ্যে অলীক ধ্যান-ধারণা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছে।

এই শিক্ষাটা জাতির প্রতিজন মানুষেরই পাওয়ার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু এটা সম্ভব ছিলো না। সুলতান আইউবী যে লড়াকু গোয়েন্দা তৈরি করেছেন, বহু কষ্টে তাদেরকে ঈমানী শক্তির ধরণ ও প্রকৃতি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। তাদেরকে অলীক ধ্যান-ধারণা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তাদেরকে বাস্তব দীক্ষাও প্রদান করা হয়েছে।

'খৃস্টানরা তোমাদের সম্মুখে হযরত ঈসাকে ধরায় নামিয়ে এনেছিলো– মাহদী আল-হাসানের আলী বিন সুফিয়ানের একটি পাঠ মনে পড়ে যায়– 'তোমাদের সম্মুখে খোদাকেও নামিয়ে এনেছিলো। এখন ধরে এনেছে প্রেতাত্মাদের। এ প্রতারণা তুমি নিজ চোখে দেখেছো। এও দেখেছো, এই প্রতারণার জালকে তারা কীরূপ নৈপুণ্যের সাথে বিছিয়ে থাকে। তুমি তো স্বচক্ষে দেখেছো, ওসব ভেল্কিবাজি ছিলো। সেসব তৎপরতা ছিলো ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য, যা তোমরা ব্যর্থ করে দিয়েছো। আল্লাহ পূর্ব থেকেই পৃথিবীতে আছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে নূর দান করেছেন। খৃস্টানরা মুসলমানদের হৃদয়জগত থেকে সেই নূরকে নিভিয়ে ফেলতে সদা তৎপর।'

সুলতান আইউবী তাঁর ফৌজ, বিশেষত তার জানবাজ সৈন্যদের অন্তরে এই নীতি প্রোথিত করে দিয়েছেন– 'তোমরা আল্লাহর নামে যতো ঝুঁকি মাথায় তুলে নেবে, তা ঝুঁকি থাকবে না। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাহায্য লাভ করবে। আজ যদি তোমরা কুসংস্কারে শিকার হয়ে পড়ো, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান এতো দুর্বল হবে যে, তারা

কুফরের সম্মুখে অস্ত্রসমর্পণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না।'

এমনি আরো কিছু পাঠ মাহদী আল-হাসানের মনে পড়ে যায়। নিজে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, সেই অনুভূতিও তার হৃদয়ে জাগরুক হয়ে ওঠে।

মাহদী আল-হাসান মেয়েটির হাত-পা বেঁধে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সুড়ঙ্গের অপর মুখের দিকে এগিয়ে যান। প্রশিক্ষণের সব পাঠ তার মনে পড়ে যায়। এখন তার চার পার্শ্বে সুলতান আইউবীর কণ্ঠ গুঞ্জরিত হচ্ছে– 'একজন বিশ্বাসঘাতক যেমন সমগ্র জাতিকে অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে, তেমনি একজন স্বাধীনতাকামী ঈমানদার জানবাজও গোটা জাতিকে বড় বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।'

মাহদী আল-হাসানের হৃদয়ে এই অনুভূতিটা এক শক্তিশালী চেতনার রূপ ধারণ করে জেগে ওঠে যে, আমার জাতি– দেশবাসী যে গভীর ঘুম ঘুমায়, তা তারই উপর ভরসা করে ঘুমায়। তিনি গোয়েন্দাদের পাতাল যুদ্ধের জানবাজ সৈনিক। তার জানা আছে, দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিশাল বাহিনী ও অশ্বারোহী সৈন্যদের ঝড় এবং তীর বৃষ্টির মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু দুশমনের গুপ্তচর ও নাশকতাকারীদের মোকাবেলা স্রেফ এক দু'জন গোয়েন্দাই করতে পারে। মাহদী আল-হাসান জাতির প্রহরী ও নিরাপত্তার জিম্মাদার। কিন্তু একটি প্রশ্ন তাকে পেরেশান করে ফিরছে– 'তাহলে হাকীম সাহেবও কি দুশমনের নাশকতাকারী চক্রের সদস্য?'

এতো বড় একজন আলেম, দেশের এমন নামকরা এজন ডাক্তার– প্রশাসনের উচ্চপদস্ত কর্মকর্তাগণ পর্যন্ত যাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন– দুশমনের সঙ্গী হতে পারেন, মাহদী আল-হাসানের মন মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ে যায়, প্রশিক্ষণের সময় বলা হয়েছিলো এবং তার বাস্তব অভিজ্ঞতাও যে, কোনো পদমর্যাদা, সুনাম-সুখ্যাতি ঈমান বিক্রয়ের পথে প্রতিবন্ধক নয়। যার আছে, ঈমান সে-ই বিক্রয় করতে পারে। আর বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ঈমান উচ্চপদের লোকেরাই বেশি বিক্রয় করে থাকেন। তাদের ঈমানের মূল্য অধিক।

এখন মাহদী আল-হাসানের সম্মুখে সমস্যা, মেয়েটাকে নিয়ে তিনি কোন্ পথে বের হবেন এবং উট পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছবেন। মেয়েটার থেকে তিনি পথনির্দেশ নিতে চাচ্ছেন না। কারণ, ভুল নির্দেশনা দিয়ে সে তাকে নতুন

কোন ফাঁদে আটকাতে পারে। যে পথে বের হওয়া প্রয়োজন, সে পথ বন্ধ। সুড়ঙ্গের অপর মুখে বের হয়ে কোন্ পথে যেতে হবে, তার জানা নেই।

মাহদী আল-হাসান মেয়েটাকে নিয়ে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসেন। সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে কিছুদূর নিয়ে এক স্থানে মেয়েটাকে মাটিতে বসিয়ে রাখেন এবং তার মুখ থেকে কাপড়টা খুলে দিয়ে বললেন– 'বলবে কি আমি কোন্ পথে যাবো, যে পথে তোমার কোন লোক নেই?'

'বলবো, যদি একা যাও।'

'তুমিও আমার সঙ্গে যাবে' –মাহদী আল-হাসান বললেন– 'আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করলে তোমাকে বেঁচে থাকতে দেবো না। প্রয়োজন হলে নিজেও জীবন দেবো।'

'তুমি যেসব ভেদ জানতে চাচ্ছো, আমি সব বলে দেবো। তবু তুমি একাকি যাও।'

'সব ভেদই আমার জানা হয়ে গেছে'– মাহদী আল-হাসান বললেন– 'তুমি আমাকে পথ দেখাও।'

'একটিবার মাত্র আমাকে আলোতে দেখে নাও'–মেয়েটি বললো– 'তারপর আমাকে নিজের মনে করো। একটিবারের জন্য আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না।'

মেয়েটি মাহদী আল-হাসানের পৌরুষে সুড়সুড়ি জাগানোর চেষ্টা চালায়, সোনা-জহরতের প্রলোভন দেখায়; কিন্তু রাস্তা দেখাচ্ছে না। মাহদী আল-হাসান পুনরায় কাপড় দ্বারা তার মুখটা বেঁধে ফেলেন এবং আপনা থেকে একটি নিরাপদ রাস্তা আবিষ্কার করে নেন। এই পথটা পর্বতমালার উপর দিয়ে। তিনি হাত-পা বাঁধা মেয়েটাকে সেখানেই বসিয়ে রেখে নিজে উপরে আরোহণ করতে শুরু করেন। কিন্তু নীচে কারো শব্দ শুনে সেখানেই থমকে দাঁড়ান। এক পুরুষ মেয়েটাকে ডাকছে। মাহদী আল-হাসান ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসেন এবং মেয়েটির সন্নিকটে একটি পাথরের আড়ালে বসে পড়েন। লোকটি বোধ হয় মেয়েটাকে দেখে ফেলেছে।

'তুমি কথা বলছো না কেন?'– লোকটি জিজ্ঞেস করে এবং উপরে উঠে আসতে শুরু করে। মেয়েটার মুখ বন্ধ। লোকটি তার একেবারে কাছে চলে এসে বললো– 'কী হয়েছে তোমার? ওদিকে যাওনি কেনো?'

মাহদী আল-হাসান তার পার্শ্বেই বসা। ব্যবধান দু-চার পায়ের। তিনি উঠে সর্বশক্তি ব্যয়ে লোকটির পিঠে খঞ্জরের আঘাত হানেন। পরক্ষণেই

আরেক আঘাত। দু'টি আঘাতই সফল হয়। লোকটি কোনো শব্দ করারও সুযোগ পেলো না। মাহদী আল-হাসান তাকে টেনে নিয়ে সেই পাথরটার নীচে ফেলে দেন, যার তলে তিনি নিজে লুকিয়ে ছিলেন। তিনি মেয়েটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যান। পাহাড়টা তেমন উঁচু নয়। তবে উপরটা চওড়া। তিনি হাঁটতে শুরু করেন।

মাহদী আল-হাসানের জন্য সহজ উপায় এটাই ছিলো যে, তিনি রাতটা কোথাও লুকিয়ে থাকবেন এবং দিনের আলোতে বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু তাকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কায়রো পৌঁছে যেতে হবে, যাতে রাত পোহাবার আগে আগেই হাকীমের গ্রেফতারী এবং এই অঞ্চলটাকে অবরোধ করে ফেলার আয়োজন করা যায়।

এই পার্বত্য ভূখন্ডটির অভ্যন্তরে– যে পর্যন্ত কোন পথচারি কিংবা রাখাল পৌঁছে না– এক পাহাড়ের পাদদেশে একটি গুহার মুখ আছে। মুখটি অপ্রশস্ত। তারই পেছনে এতো প্রশস্ত এক গুহা, যেনো ওটা গুহা নয়– সুপরিসর একটি কক্ষ। তার মধ্যে বসে আছে বহু সংখ্যক মানুষ। দু'টি মেয়েও আছে।

'এ যাবত তো তার ফিরে আসার কথা ছিলো।'একজন বললো।

'এসে পড়বে'– অপর একজন বললো– 'এখানে কোনো বিপদ নেই। আজ সে তাকে নিয়েই আসবে।'

'লোকটা কাজের'– একজন বললো– 'বেটা অনেক অভিজ্ঞ। আমরা তাকে প্রস্তুত করে নেবো।'

এমন সময় এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে ভেতরে ঢুকে বললো– 'গোপাল মৃত পড়ে আছে। মেয়েটির কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। গোপালকে খঞ্জরের আঘাতে মারা হয়েছে!'

'ওহ, মাহদী আল-হাসান কোথায়?' একজন জিজ্ঞাসা করে।

'কোথাও পাওয়া যায়নি'– আগন্তুক জবাব দেয়– 'তার উট এখানেই আছে। কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

দু'টি প্রদীপ হাতে নিয়ে সবাই গুহা থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করে। তারা সুড়ঙ্গের মুখ পর্যন্ত গিয়ে খোঁজাখোঁজি করে। ওখানে তাদের সঙ্গীর লাশ পড়ে আছে। তারা সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে দেখে মেয়েটির কাফনটা পড়ে আছে। দলনেতা বললো, দু'জন লোক বাইরে চলে যাও। বাইরের দিক থেকে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে

সংবাদ দিও। আর তাকে পাওয়া গেলে ধরে ফেলো। মোকাবেলা করলে মেরে ফেলো। অন্যরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ো। লোকটা এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। সকাল পর্যন্ত পাওয়া না গেলে আমাদের এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।

মাহদী আল-হাসান মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে এখন মহা বিপাকে। সুড়ঙ্গওয়ালা পাহাড় থেকে তিনি অনেক দূরে চলে এসেছেন। সামনের পাহাড়টি বেশ উঁচুও বটে। যেন একটি প্রাচীর, যার উপর এক সঙ্গে উভয় পা রাখা অসম্ভব। তিনি এই দেয়ালসম পাহাড়টির উপর ঘোড়ার পিঠে বসার মতো বসে পড়েন। বসে বসে সম্মুখের দিকে এগুতে থাকেন। মেয়েটিকে কাঁধের উপর সামলে রাখা এবং তার ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। মেয়েটিও তার ভারসাম্য ব্যাহত করার জন্য নড়াচড়া করতে শুরু করে। মাহদী আল-হাসান বুঝে, এখান থেকে পড়ে গেলে হাড়-গোড় ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাবে। তারপরও মেয়েটির এই আত্মঘাতি আচরণ। তা থেকেই তিনি অনুমান করে নেন, এই পার্বত্য এলাকায় যে রহস্য আছে– যার সবকিছু এই মেয়েটির বক্ষে প্রোথিত– এতোই মূল্যবান এবং স্পর্শকাতর যে, তাকে লুকাবার স্বার্থে মেয়েটি মাহদী আল-হাসানকেসহ পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে।

মাহদী আল-হাসান এগিয়ে চলছেন। কিন্তু পথ শেষ হচ্ছে না। মেয়েটি তাকে ব্যাঘাত করেই যাচ্ছে। ওদিকে মেয়েটির দলের লোকেরা অনুসন্ধানে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতিটা তাদের জন্য জীবন-মরণের প্রশ্ন। আস্তানা ধরা পড়া তাদের জন্য পরাজয়। ধরা পড়লে অসহনীয় নির্যাতন আর মৃত্যু অনিবার্য।

মাহদী আল-হাসান মেয়েটির একটি বাহু এমন শক্তভাবে ধরে রেখেছেন যে, তার হাড়-গোড় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। এই মুহূর্তে দৈহিক শক্তি ও সাহসিকতা ছাড়াও তিনি আত্মিক শক্তিও প্রয়োগ করছেন। অবশেষ সব শক্তির বিনিময়ে তিনি প্রাচীর অতিক্রম করে অপর প্রান্তে পৌঁছে যেতে সক্ষম হন।

সামনের চূড়াটা বেশ চওড়া। মাহদী আল-হাসান মেয়েটিকে ধপাস্ করে মাটিতে ফেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন– 'তুমি কি আমার পথ আগলেই রাখবে?' ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি মেয়েটিকে চীৎ হওয়া অবস্থায় কয়েক পা হেঁচড়ে নেন এবং বললেন– 'আর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করলে এভাবে টেনে-হেঁচড়েই নিয়ে যাবো। মরতেই যদি চাও, তো মরে যাও।'

মাহদী আল-হাসান দূরে নীচে একটি প্রদীপ দেখতে পান। তিনি অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তবে এই ভেবে আশ্বস্ত হন যে, এখন তিনি আপদমুক্ত। ধরা পড়ার আশঙ্কা আর নেই। কিন্তু এখান থেকে বের হওয়া সহজ হবে না। অথচ, তাকে অতি দ্রুত কায়রো পৌঁছতে হবে। তিনি মেয়েটির পা খুলে দেন। হাত দু'টো পিঠমোড়া করে বাঁধা আছে। তাকে নিজের সম্মুখে নিয়ে এসে খঞ্জরের আগা তার পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে বললেন- 'চলো, আমার কথা ছাড়া ডানে-বাঁয়ে তাকাবে না। মাহদী আল-হাসান ও মেয়েটির সন্ধানে ছড়িয়ে পড়া লোকগুলো সুড়ঙ্গ পথ ও তার আশ-পাশের এলাকায় ঘুরে ফিরছে। তিনি যে পথে ভেতরে যাওয়া-আসা করেছেন, দু'ব্যক্তি সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়।

❖ ❖ ❖

মাহদী আল-হাসান মেয়েটিকে নিয়ে চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে এমন এক টিলায় এসে পৌঁছান, যার সম্মুখে আর কিছু নেই। তার এতোটুকু দক্ষতা আছে যে, তিনি ঘোর অন্ধকারেও অপরিচিত এলাকার ভাব-গতি আন্দাজ করতে পারেন। তিনি বুঝে ফেললেন, নীচে নদী এবং এটাই নীল নদ। তিনি মেয়েটির হাতের বন্ধন খুলে দেন। মুখের কাপড়ও সরিয়ে নেন। টিলার ঢাল খাড়া। তিনি মেয়েটিকে বললেন, বসো এবং নীচে পড়ে যাও।'

উভয়েই নিজেদেরকে টিলার ঢালে ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে আসেন। নদীর পানির কলকল ধ্বনি স্পষ্ট শোনা যেতে শুরু করে। মাহদী আল-হাসান ও মেয়েটি এখন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন।

মাহদী আল-হাসান মেয়েটিকে বললেন -'ঝাপ দাও।' মেয়েটি বললো- 'আমি সাঁতার জানি না।'

মাহদী আল-হাসান খঞ্জরটা কোষবদ্ধ করে কোমরের সঙ্গে বেঁধে নেন। মেয়েটিকে শক্তভাবে বগলদাবা করে নদীতে ঝাপিয়ে পড়েন। নদীর গতি কায়রোরই দিকে। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর হঠাৎ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আস্তে করে মেয়েটিকে ছেড়ে দেন। দেখলেন, মেয়েটি নৈপুণ্যের সাথেই সাঁতার কাটছে।

'আমি জানতাম, তুমি সাঁতার জানো'- মাহদী আল-হাসান সাঁতার কাটতে কাটতে বললেন- 'সব বিদ্যায় পারদর্শী বানিয়েই তোমাদেরকে আমাদের দেশে পাঠানো হয়। বেশি পরিশ্রম করো না। আমরা যেদিকে

যাচ্ছি, স্রোতের গতিও সেদিকেই।'

মেয়েটি সাঁতার কাটা অবস্থায় মাহ্দী আল-হাসানকে নিজের রূপবান টাটকা শরীরটা শেকলে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে; কিন্তু তার প্রচেষ্টা বিফল যায়।

বেশ কিছুদূর পথ অতিক্রম করার পর মাহদী আল-হাসান ভাবলেন বিপদের আর কোনো শঙ্কা নেই। তিনি মুখে দু'টি আঙুল ঢুকিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে শিশ বাজান। এখন তিনি সাঁতার কাটছেন আর কিছুক্ষণ পর পর শিশ বাজান। অল্পক্ষণ পর তিনি দূর থেকে অনুরূপ একটি শিশ শুনতে পান। পরক্ষণেই দু'দিক থেকে শিশ বিনিময় হতে হতে একটি নৌকা তাদের নিকটে এসে পৌঁছে।

মাহদী আল-হাসানের জানা ছিলো, যেভাবে সীমান্ত এলাকায় দেশের সীমান্ত নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে টহল সান্ত্রীরা ঘুরে বেড়ায়, তেমনি নদীতেও টহল প্রহরা থাকে। বিপদ দেখা দিলে একজন অন্যজনকে ডাকার জন্য এভাবে শিশ বাজিয়ে থাকে। এই নৌকাটাও টহল সান্ত্রীদের। মাহদী আল-হাসান তাদেরকে নিজের পরিচয় প্রদান করেন। সান্ত্রীরা তাকে ও মেয়েটিকে নৌকায় তুলে নেয়।

মেয়েটির সাঙ্গরা তাকে পাহাড়ে হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে।

আলী বিন সুফিয়ান গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। এক চাকর তাঁকে জাগিয়ে বললো, মাহদী আল-হাসান নামক এক লোক একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মাহদী আল-হাসান নামটাই যথেষ্ট ছিলো। আলী বিন সুফিয়ান ধড় মড় মরে উঠে দাঁড়ান এবং ছুটে বাইরে চলে আসেন।

মাহদী আল-হাসান ও মেয়েটির পরিধানের কাপড় থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে। আলী বিন সুফিয়ান উভয়কে কক্ষে নিয়ে বসান। কক্ষে বাতি জ্বলছে। প্রদীপের আলোতে প্রথমবারের মতো মাহদী আল-হাসান মেয়েটির মুখাবয়ব দেখলেন এবং ভাবলেন, মেয়েটি তো ঠিকই বলেছিলো– 'আমাকে আলোতে দেখলে তুমি সবকিছু ভুলে যাবে।'

মাহদী আল-হাসান হাকীমের নাম উল্লেখ করে বললেন– 'এক্ষুনি তার ঘরে অভিযান চালান।'

'মাহদী!' –আলী বিন সুফিয়ান হঠাৎ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বললেন– 'কার কথা বলছো?'

'কেনো? ঈমান বিক্রয় নতুন খবর নাকি?'–মাহদী আল-হাসান বললেন এবং মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেন– 'কি, হাকীম তোমাদের সঙ্গী না? এখানে মিথ্যা বললে পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।'

মেয়েটি মাথাটা নত করে ফেলে। আলী বিন সুফিয়ান তার ভেজা মাথায় হাত রেখে বললেন– 'এখানে তোমার সঙ্গে সেই আচরণ করা হবে না, তুমি যার আশঙ্কা করছো। তোমার রূপ-যৌবনের জন্য আমরা পাথর। আর অসহায় নারীর ইজ্জত রক্ষার সময় আমরা রেশমের ন্যায় কোমল। বলো, হাকীম কি তোমাদের সঙ্গী?'

মেয়েটি মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ বাচক উত্তর দেয়।

মাহদী আল-হাসান কী করে এসেছেন এবং কীভাবে হাকীম তাকে প্রেতাত্মার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিলো, সংক্ষেপে তার বিবরণ প্রদান করেন।

আলী বিন সুফিয়ান তার চাকর-নওকর ও রক্ষী সেনাদের তলব করেন। তাদেরকে বিভিন্ন কমান্ডারের নিকট বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেন। কোতোয়াল বিলবীসকেও তলব করেন। তিনি এরূপ বিশেষ পরিস্থিতির জন্য বিপুলসংখ্যক সৈন্যের একটি দল তৈরি করে রেখেছেন, যারা কয়েক মিনিটের মধ্যে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে সক্ষম।

মাহদী আল-হাসানের রিপোর্ট অনুযায়ী বাহিনী তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান গিয়াস বিলবীসকে দায়িত্ব প্রদান করেন, তিনি হাকীমের ঘরে হানা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করবেন এবং তার বাড়ি ও দাওয়াখানা সীল করে দেবেন। গিয়াস বিলবীস এক ঘোড়ায় মাহদী আল-হাসানকে এবং আরেক ঘোড়ায় মেয়েটিকে তুলে নিয়ে বাহিনীসহ রওনা হন।

মেয়েটির দলের লোকেরা এতোক্ষণে তাকে অনুসন্ধান করে নিরাশ হয়ে পড়েছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওখান থেকে বেরিয়ে পালাবে। তাদের আশংকা হলো, মেয়েটি যদি কায়রো পৌঁছে যায়, তাহলে তাদের আস্তানার কথা বলে দিতে বাধ্য হবে। তবে দলে মতবিরোধ হয়ে গেছে। কেউ বলছে, মাহদী আল-হাসানের উট এখনো এখানে। তথাপি যদি সে বেরিয়ে গিয়েই থাকে, তবু অতো তাড়াতাড়ি কায়রো পৌঁছতে পারবে না। এই মতানৈক্যের কারণে তারা এলাকা ত্যাগ করতে বিলম্ব করে ফেলেছে। অবশেষে তারা মালামাল গুটিয়ে গুহাসম

কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। এমন সময় অনেকগুলো ধাবমান ঘোড়ার পদশব্দ তাদের কানে আসতে শুরু করে। বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

আলী বিন সুফিয়ানের সৈন্যরা প্রদীপ জ্বালিয়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েটি তাদের সঙ্গে আছে। সে তার সঙ্গীদের আস্তানা চিহ্নিত করে দেয়। বাহিনী সেখানে গিয়ে পৌঁছে। গুহার ভেতর থেকে চার-পাঁচজন লোক ধরা পড়ে। উদ্ধার হয় নানা রকম জিনিসপত্র– দাহ্য পদার্থ, তীর-ধনুক ও খঞ্জর ইত্যাদি। একটি মজবুত বাক্সে সোনা-রূপার সেই মুদ্রা, যা মিসরে সচল। ধৃতদের মধ্যে একজন মাত্র খৃস্টান। অন্যরা কায়রোর মুসলমান। তাদের নির্দেশনা মোতাবেক অন্য সঙ্গীদের অনুসন্ধান শুরু হয়। সারারাত এবং পরের পুরো দিন তল্লাশী চলে। ধরা পড়ে সব সদস্য। তন্মধ্যে দু'জন মেয়ে– ঠিক মাহদী আল-হাসানের ধৃত মেয়েটির ন্যায়, যাদেরকে আলোতে দেখলে সব ভুলে যেতে হয়।

কায়রোতে হাকীমের বাসভবনটি ঘেরাও করে দরজায় করাঘাত করলে এক চাকর দরজা খুলে দেয়। গিয়াস বিলবীস কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন। তারা হাকীমের বিভিন্ন কক্ষে তল্লাশি চালাতে শুরু করে। তাদের হাতে প্রদীপ। হাকীমের শয়নকক্ষটা ভেতর থেকে বন্ধ। আওয়াজ দিলে অর্ধনগ্ন এক মেয়ে দরজা খুলে দেয়। হাকীম পালঙ্কের উপর অর্ধ-উলঙ্গ পড়ে আছেন। পালঙ্কের কাছে মদের পিপা ও পেয়ালা। হাকীম নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অচেতন পড়ে আছেন। তার একজন রোগী কিংবা ভক্ত বিশ্বাসই করবে না, তিনি এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। মেয়েটি তার স্ত্রী নয়, মুসলমানও নয়– খৃস্টানদের প্রেরিত উপহার। তার গৃহ থেকে উদ্ধারকৃত সম্পদ-ঐশ্বর্য নিঃসন্দেহে তার হালাল পন্থায় উপার্জিত নয়।

হাকীমের যখন চৈতন্য ফিরে আসে, তখন সে আলী বিন সুফিয়ানের কয়েদখানায় শিকলপরা অবস্থায় বন্দি। গিয়াস বিলবীসকে সংবাদ দেয়া হলো, হাকীম জাগ্রত হয়েছেন। তিনি হাকীমের নিকট চলে যান। বললেন, গোপন রাখার চেষ্টা করে লাভ নেই। কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত হাকীম অপরাধ স্বীকার করে নেন। তিনি দু'জন নায়েব সালারের নাম উল্লেখ করে বললেন, তারা সুলতান আইউবীকে ক্ষমতাচ্যুত করার তৎপরতায় লিপ্ত আছে। তারা খৃস্টানদের ক্রীড়নক

হিসেবে কাজ করছে। উপহারস্বরূপ এই মেয়েটিকে এবং আরো বিপুল পরিমাণ সোনা-দানা দিয়ে হাকীমকেও এই দলে যুক্ত করে নেয়া হয়েছে। তিনি শর্ত দিয়েছিলেন, নতুন সরকারে আমাকে মন্ত্রী বানাতে হবে। তার এই শর্তও মেনে নেয়া হয়। দেশের বিখ্যাত ও বড় হাকীম এবং বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি যখন যা বলতেন, নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা হতো। এই গ্রহণযোগ্যতার সুযোগে তিনি সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে বিষোদগার চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কায়রোতে নাশকতার যতো ঘটনা ঘটেছিলো, সবগুলোতে হাকীম জড়িত। ব্যক্তিত্বশীল লোক হওয়ার সুবাদে তিনি আলী বিন সুফিয়ানের বেশ ক'জন গোয়েন্দাকেও কিনে নিয়েছিলেন। মাহদী আল-হাসান তাদের একজন। হাকীম তার সঙ্গীদের নিয়ে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, মাহদী আল-হাসানকে হত্যা করে ফেলবেন। কিন্তু পরে এই ভেবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়, মাহদী অতিশয় সাহসী ও যোগ্য লোক। হত্যা না করে বরং তাকে জালে আটকিয়ে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে হবে। সেই বুদ্ধি তাদের আছে। ইতিমধ্যে আলী বিন সুফিয়ানের কতক গোয়েন্দাকে হাত করে নিজেদের কাজে ব্যবহার করছেও তারা। অথচ, গোয়েন্দা বিভাগে এখনো তারা বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে বিবেচিত। অবশেষে হাকীম মাহদী আল-হাসানকে জালে আটকানোর পন্থা অবলম্বন করেন।

হাকীম পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন, মাহদী আল-হাসান তার সুদর্শন 'প্রেতাত্মার'র ফাঁদে এসে পড়বে। তারপর তাকে হাত করা ও নিজেদের মতো করে প্রস্তুত করার জন্য আছে হাশিশি ও খৃস্টান বিশেষজ্ঞরা।

মিসরের যে দু'জন কমান্ডার রহস্যময় উপায়ে খুন হয়েছিলেন, তাদের সম্পর্কে হাকীম তথ্য প্রদান করেন। ঔষধের নামে হাকীম তাদেরকে এমন বিষ খাইয়ে হত্যা করেছেন, যাতে বিন্দুমাত্র তিক্ততা অনুভূত হয়নি। এমন বিষ, যা সেবন করে মানুষ নিজের মধ্যে কোন প্রকার যন্ত্রণা কিংবা পরিবর্তন অনুভব করে না এবং সেবনের বারো ঘন্টার মাথায় হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

তাদেরকে কেন খুন করা হলো? প্রশ্নের জবাবে হাকীম জানান, তারা সুলতান আইউবী ও তাঁর সরকারের অনুগত এবং দীনদার মুসলমান ছিলেন। তাদের ঈমান ক্রয় করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা

ঈমান বিক্রি করার পরিবর্তে ক্রয়কারীদের জন্য হুমকি হয়ে ওঠেছিলেন। হাকীম প্রথমে তাদের একজনের সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হন, যেনো সাক্ষাৎটা হঠাৎ হয়ে গেছে। কথায় কথায় হাকীম তার মনে কোনো একটি রোগের ভয় ধরিয়ে দেন এবং নিজের দাওয়াখানায় নিয়ে গিয়ে ঔষধের নামে বিষ খাইয়ে দেন। এই বিষ হাশিশিদের আবিষ্কার। দিন কয়েক পর হাকীম অপর কমান্ডারের সাথেও অনুরূপ হঠাৎ সাক্ষাৎ করে বসেন এবং একই কায়দায় তাকেও বিষ প্রয়োগ করেন।

এসব চাঞ্চল্যকর ও হৃদয় কাঁপানো তথ্য হাকীম আপনা থেকে দেননি। পাতাল কক্ষের নির্যাতন তাকে মুখ খুলতে বাধ্য করেছে। তিনি জানান, দেশের সেনা বাহিনীতে একদিকে অস্থিরতা ছড়ানো, অন্যদিকে তাদের মাঝে নেশা ও যৌনতার স্বভাব সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেনা অফিসারদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি দৃঢ় চেতনাসম্পন্ন শক্ত ঈমানদারদেরকে রহস্যময় উপায়ে হত্যা করার ধারা চলছে। সুদানের ফৌজ অতিসত্বর মিসরের সীমান্ত ও সীমান্ত চৌকিগুলোর উপর হামলা চালাতে যাচ্ছে। এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেবে স্বয়ং খৃস্টানরা। সীমান্ত এলাকার অধিবাসীদেরকে সুদানীরা হাত করে নেবে।

আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস তাদের গ্রেফতার অভিযান, অনুসন্ধান ও তথ্য প্রাপ্তির এসব খবরাখবর মিসরের অস্থায়ী গবর্নর আল-আদিলকে অবহিত করতে থাকেন। কিন্তু অন্য কাউকে এসব ব্যাপার-স্যাপার কিছুই জানতে দিচ্ছেন না। হাকীম ও তার অপর সঙ্গীরা যেসব নায়েব সালার ও কর্মকর্তাদের নাম বলেছেন, তাদের গ্রেফতার করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু সুলতান আইউবীর ভাই আল-আদিল সাহস করছেন না। তিনি এই রহস্যকে রহস্যই রাখার নির্দেশ প্রদান করে বললেন, পরিস্থিতিটা এতই স্পর্শকাতর যে, আমি মনে করি, সুলতান আইউবী এসে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তবে ভালো হবে। অবস্থাটা আসলে স্পর্শকাতরই ছিলো। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নিজে সুলতান আইউবীর নিকট যাবেন এবং তাঁকে মিসর ফিরে আসতে বলবেন কিংবা তাঁর থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করবেন।

আল-আদিলের সুলতান আইউবীর নিকট যাওয়ার বিষয়টি গোপন রাখা হলো। সকল সন্দেহভাজন নায়েব সালার প্রমুখদের সঙ্গে একজন

করে গোয়েন্দা ছায়ার ন্যায় জুড়ে রাখা হলো। গোয়েন্দারা তাদের প্রতি মুহূর্তের গতিবিধি অনুসরণ করছে।

'আমি তোমার থেকে কোনো নতুন খবর শুনছি না'– হাল্‌বের সন্নিকটে নিজ হেডকোয়ার্টারে বসে আল-আদিল থেকে বিস্তারিত শুনে সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি জানি না, জাতির মধ্যে ঈমান বিক্রির যে ব্যাধির জন্ম নিয়েছে, তার চিকিৎসা কী হবে। আমার দৃষ্টি বাইতুল মুকাদ্দাস নয়– ইউরোপের উপর নিবদ্ধ। কিন্তু আমার ঈমান নীলামকারী ভাইয়েরা আমাকে মিসর থেকেই বের হতে দিচ্ছে না! সে যা হোক, এই ময়দান তুমি সামাল দাও। আমি দামেশ্‌ক যাচ্ছি। সেখান থেকে মিসর চলে যাবো।'

সুলতান আইউবী আল-আদিলকে রণাঙ্গনের পূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন এবং বললেন, আমার গোয়েন্দারা এতদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে, খৃস্টানরা যদি আক্রমণ করে বসে, তাহলে অন্তত দু'-তিনদিন আগে তুমি সংবাদ পেয়ে যাবে। আমার কমান্ডো সৈন্যরা প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত অবস্থায় থাকে। আমি তাদেরকে আক্রমণের সম্ভাব্য স্থানগুলোতে লুকিয়ে রেখেছি। সর্বশেষ টাটকা সংবাদ হলো, ক্রুসেডাররা হামলা করবে না। যদি আমার অনুপস্থিতি থেকে তারা ফায়দা লুটতে চেষ্টা করে, তাহলে ভয় পেয়ো না। দুর্গে আবদ্ধ থেকে লড়াই করো না। দুশমনকে সামনে আসার এবং আগে হামলা করার সুযোগ দেবে। প্রয়োজনে পেছনে সরে যাবে। এখানকার ভূমি যুদ্ধের জন্য আমাদের উপযোগি। উঁচু স্থানগুলোতে দখল বজায় রাখবে।

'আর বিশেষভাবে স্মরণ রাখবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন এবং যেসব আমীর আমাদের আনুগত্য মেনে নিয়েছে, তাদের মস্তিষ্ক থেকে রাজত্বের মোহ দূর হয়নি। চুক্তি মোতাবেক তারা কোন বাহিনী রাখতে পারে না। আমি তাদের মধ্যে গোয়েন্দা প্রেরণ করে রেখেছি। আর জীবনে এ-ই প্রথম আমি আমার নীতি পরিপন্থী সিদ্ধান্ত দিয়ে রেখেছি, আমার এই মুসলমান ভাইয়েরা যদি সামান্যতম বিরোধিতামূলক আচরণ করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করে ফেলবো।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, ৫৭২ হিজরীর রবিউল আউয়ালে (মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১১৭৬)। সুলতান আইউবী রণাঙ্গন আল-আদিলের হাতে ছেড়ে দিয়ে দামেশ্‌ক চলে গিয়েছিলেন। তাঁর আরেক ভাই শামসুদ্দৌলা তুরান শাহ ইয়ামান থেকে ফিরে আসেন। ইয়ামানেও ক্রুসেডারদের অপতৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং সেখানকার মুসলমানগণ সালতানাতে ইসলামিয়ার বিদ্রোহী হয়ে ওঠতে শুরু করেছিলো। সুলতান আইউবী আপন ভাই শামসুদ্দৌলাকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। শামসুদ্দৌলা সাফল্য নিয়ে এসেছেন। সুলতান আইউবী তাঁকে দামেস্কের গবর্নর নিযুক্ত করে ১১৭৬ সালের অক্টোবর মাসে মিসর রওনা হওয় যান।

সুলতান আইউবী এখন কায়রোতে। কায়রো পৌঁছেই তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গকে পদমর্যাদার তোয়াক্কা না করে গ্রেফতার করার নির্দেশ প্রদান করেন। তালিকা প্রস্তুত। তাদের গ্রেফতারীর আগের দিন পার্বত্য অঞ্চলের গুহা থেকে উদ্ধারকৃত সোনা ও ধনভান্ডার পেরেড ময়দানে এনে স্তূপ করেন। সে পর্যন্ত যতো খৃস্টান মেয়েকে পাকড়াও করা হয়েছিলো এবং সর্বশেষ যাদেরকে ধরা হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে ধনভান্ডারের স্তূপের নিকট এনে দাঁড় করানো হয়। তাদের মধ্যে হাকীম সাহেবও আছেন। নায়েব সালারও আছেন। আছেন অনেক কমান্ডার। সকলে শিকল পরিহিত। মিসরের সকল সৈন্যকে তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করিয়ে ময়দানে এনে দাঁড় করানো হয়।

সুলতান আইউবী ঘোড়ার পিঠে চড়ে ময়দানে এসে বাহিনীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে যান।

'আমি জানতে পেরেছি, তোমাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়া হচ্ছে'– সুলতান আইউবী উচ্চকণ্ঠে গর্জন করে বললেন– 'তোমাদের কেউ যদি আমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, সে ইসলামের মর্যাদা ও আল্লাহর'র রাসূলের খাতিরে তোমাদেরকে আমার ও আমার সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে এবং প্রথম কেবলা মুক্ত করার ও স্পেন আক্রমণ করে দেশটা পুনরায় সালতানাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভূক্ত করার প্রতিজ্ঞা রাখে, তাহলে সে আমার সম্মুখে এসে পড়ুক। সে আমার তারবারীটা নিয়ে নিক এবং আমার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করুক। দেশের শাসন ক্ষমতা তার হাতে তুলে দিয়ে আমি অবসর গ্রহণ করবো।'

সর্বত্র নীরবতা ছেয়ে যায়।

সুলতান আইউবী পেছন দিকে মোড় ঘুরিয়ে আসামীদের উদ্দেশ করে বললেন– 'আমার স্থান দখল করার মতো লোক তোমাদের মাঝে কেউ আছে কি? আসো, সামনে এগিয়ে আসো। কা'বার প্রভুর কসম করে বলছি, আমি আমার ক্ষমতা তোমার হাতে তুলে দেবো এবং নিজে তোমার আনুগত্য মেনে চলবো।'

নীরবতা আরো গভীর হয়ে যায়। নিঃশ্বাসটুকু ফেলার শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

'আল্লাহর সৈনিকগণ!'– সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীর দিকে মোড় ঘুরিয়ে বললেন– 'তোমাদেরকে বিদ্রোহের জন্য না ইসলামের মর্যাদার গাতিরে উত্তেজিত করা হচ্ছে, না রাসূলে খোদা (সা.)-এর আদর্শের স্বার্থে। যে ধনভান্ডার তোমাদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছে, যে মেয়েগুলো তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, সেসব সেই পুরস্কার, যেগুলো এদেরকে প্রদান করা হয়েছে। এগুলো এদের ঈমানের মূল্য। আমি এদের প্রত্যেককে বলছি, তোমরা সম্মুখে এগিয়ে আসো আর বলো, আমি যা বলছি মিথ্যা বলছি।'

'কেউ এগিয়ে আসলো না। সুলতান আইউবী ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন এবং আসামীদের মধ্য থেকে হাকীমকে বাহুতে ধরে টেনে ঘোড়ার নিকটে এনে বললেন– 'আমার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসো আর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দাও, আইউবী মিথ্যা বলছে।'

হাকীম সুলতান আইউবীর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। কিন্তু তিনি মাথাটা নত করে ফেললেন।

'বলো, সুলতান মিথ্যা বলছে।' সুলতান আইউবী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন।

হাকীম মাথা তুলে উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'সুলতান আইউবী যা বলেছেন, সত্য বলেছেন।' বলেই হাকীম ঘোড়া থেকে নেমে আসেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সঙ্গীরা এ-ই প্রথম সুলতান আইউবীকে ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখেছে।

হাকীম ঘোড়া থেকে নেমে মাথানত করে দাঁড়িয়ে আছেন। সুলতান আইউবী তারবারী বের করে এক আঘাতে হাকীমের মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলেন। তারপর ঘোড়ার পিঠে চড়ে অত্যন্ত উঁচু কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠেন– 'আল্লাহ'র সৈনিকগণ! ইসলামের প্রহরীগণ! আমি

যদি অবিচার করে থাকি, তাহলে এই নাও, আমারই তারবারী দ্বারা আমার ঘাড় উড়িয়ে দাও।' সুলতান আইউবী তরবারীটা বর্শা ছোঁড়ার ন্যায় বাহিনীর দিকে ছুঁড়ে মারেন। তরবারীর আগা মাটিতে গেঁথে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

সর্বসম্মুখের সালার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে তরবারীটা তুলে উভয় হাতে করে আদবের সঙ্গে সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন– 'মহামান্য সুলতান! এতো আগেবপ্রবণ হওয়ার প্রয়োজন নেই।' বাহিনীর মধ্যে রব উঠে যায়। তারা অপরাধীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সুলতান আইউবী দু'হাত উপরে তুলে সৈন্যদের শান্ত করেন এবং অপরাধীদের শাস্তি ঘোষণা করেন।

সুলতান আইউবী সেদিনই লিখিত বার্তাসহ সুদানে দূত প্রেরণ করেন– 'সুদানের ফৌজ যদি মিসরের সীমান্তে সামান্যতম অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে, তো আমি তাকে মিসর আক্রমণ বলে বিবেচনা করবো আর তার উত্তরে আমি সুদান আক্রমণের অধিকার সংরক্ষণ করবো। তখন আমরা সুদানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন না করে ক্ষান্ত হবো না।
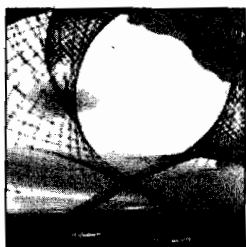
দায়িত্ব যখন সঙ্গীকে হত্যা করল

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তরবারী থেকে যে খুন টপ টপ করে ঝরছিলো, সেগুলো পরিষ্কার না করেই তিনি তরবারীটা খাপে ঢুকিয়ে ফেলেন। এই রক্ত সেই বিশ্বাসঘাতক হাকীমের, যিনি ক্রুসেডারদের চর ও সন্ত্রাসীর ভূমিকা পালন করছিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুর সঙ্গে হাত মেলানোর অপরাধে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিলো, শিকল বেঁধে তাদেরকে কারাগারে আটক করে রাখা হয়। সুলতান আইউবী তাঁর সালার, নায়েব সালার, সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাঝে বৈঠকে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছেন। চোখে রক্ত নেমে এসেছে তাঁর। বৈঠকে সববেতেদের উদ্দেশে তিনি অনেক কথা বলেছেন এবং বলতে বলতে এক পর্যায়ে থেমে গেছেন। বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের সুলতানের আবেগ-উচ্ছ্বাস সম্পর্কে ভালোভাবেই জানা আছে। আইউবীর চোখে চোখ রাখার সাহস কারো নেই।

'মহামান্য সুলতান!' –এক সালার বললেন– 'আমরা খৃস্টানদের কোন ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবো না।'

সুলতান আইউবী হঠাৎ দ্রুততার সঙ্গে কোষ থেকে তরবারীটা বের করেন। অস্ত্রটা রক্তমাখা। তিনি তরবারীটা সমবেতদের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন– 'এই রক্ত কার? এই রক্ত আপনাদের সকলের। এই রক্ত আমার। এই রক্ত আমাদের সেই ভাইয়ের, যে মসজিদে আমাদের সঙ্গে নামায আদায় করতো। তার ঘরে কুরআনও আছে। এই রক্ত যদি গাদ্দার হতে পারে, তাহলে... তাহলে খৃস্টানদের এই ষড়যন্ত্রও সফল হবে। খৃস্টানদের ষড়যন্ত্র সফল হয়ে গেছে। ইসলামের যে সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তীনকে ক্রুসেডারদের দখল থেকে মুক্ত করার কথা ছিলো, আপসে সংঘাতে জড়িয়ে খৃস্টানরা তাদেরকে এমন দুর্বল করে ফেলেছে যে, আমরা দীর্ঘ সময়ের জন্য ফিলিস্তীন অভিমুখে যাত্রা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস ছিলো। আজ আমাদেরকে কায়রো নয়– জেরুজালেম

থাকার কথা ছিলো। কিন্তু ইসলামের সামরিক শক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।'

সুলতান আইউবী তরবারীটা তাঁর দারোয়ানের প্রতি ছুঁড়ে মারেন এবং পরক্ষণেই খাপটাও খুলে তা হাতে দিয়ে বললেন– 'এই রক্ত যদি কোনো কাফিরের হতো, তাহলে আমি তরবারীটা ধৌত করাতাম না। এ এক গাদ্দারের খুন। খাপে এই রক্তের ঘ্রাণও যেনো না থাকে।'

দারোয়ান তরবারী ও খাপ পরিষ্কার করার জন্য বাইরে নিয়ে যায়। সুলতান আইউবী সববেতদের বললেন– 'খৃস্টানদের ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। তারা চাচ্ছিলো, যেনো আমি হাল্‌ব অতিক্রম করে সম্মুখে যেতে না পারি। দেখছো না, সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে আমি কায়রো এসে পড়েছি! আমি আপনাদেরকে প্রবঞ্চনার মধ্যে রাখবো না। ক্রুসেডাররা এখন সম্মুখে অগ্রসর হবে। আমরা যে সময়ে আপসে লড়াই করছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে সিদ্ধান্তমূলক পরাজয় দানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো।'

'আমরা মুসলমানদেরকে আপসে যুদ্ধ করিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর গতি ঘুরিয়ে দিয়েছি।' ত্রিপোলীর খৃস্টান সম্রাট রেমন্ড বললেন। তারা গোয়েন্দা মারফত সংবাদ পেয়ে গেছেন, সালাহুদ্দীন আইউবী হাল্‌ব ছেড়ে মিসর চলে গেছেন এবং তাঁর জায়গায় তাঁর ভাই আল-আদিল রণাঙ্গনে এসেছেন। সংবাদটা জেরুজালেম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বড় ক্রুশ এবং প্রধান পাদ্রীর আস্তানা আক্রায়ও পৌঁছে গেছে খবরটা। তাই তৎক্ষণাৎ তারা ত্রিপোলীতে এসে বৈঠকে বসেছেন।

দু'দিকেই বৈঠক চলছে।

'আইউবী জেরুজালেম জয় করার প্রত্যয় নিয়ে বের হয়েছিলেন'– রেমন্ড বললেন– 'আমরা একটি তীরও না ছুঁড়ে তাকে মিসর ফিরিয়ে দিয়েছি। তারই হাতে আমরা সেই মুসলিম শাসকদের বেকার করে দিয়েছি, যারা যে কোনো সময় আমাদের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারতো। এর চেয়ে বড় সফলতা আর কী চাই! এখন বিজয় অর্জনে আমাদের সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

'সাফল্যটা অতো বিরাট নয়, যতোটা বড় করে আপনি দেখালেন'– 'খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইন বললেন– 'আমরা আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি মাত্র। আসল কাজ তো আক্রমণ। আক্রমণ করে বিজয় অর্জন করলেই তবে তাকে সাফল্য বলবো। দ্রুত বাহিনী প্রস্তুত করো। সম্মুখপানে রওনা হও এবং আইউবীকে আত্মসংবরণ করার সুযোগ দিও না।'

'আমরা যদি নিজেদেরকে খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিতে সক্ষম না হই, তাহলে পরিণতি কী হবে জানি না'– 'সুলতান আইউবী তাঁর সালার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বললেন– 'আজ থেকেই নতুন ভর্তি শুরু করে দাও। আরোহী সৈনিকের সংখ্যা বেশি হওয়া চাই। সেই সুদানী যুবকদেরও ভর্তি করে নাও, সাত বছর আগে বিদ্রোহের অপরাধে পদচ্যুৎ করে শাস্তিস্বরূপ যাদের দ্বারা কৃষি জমি আবাদ করানো হয়েছিলো। এখন আর তারা ধোঁকা দেবে না। যেসব যুবক ঘোড়সওয়ারী ও তরবারী চালনা জানে, তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দাও। আমি তাড়াতাড়ি মিসর থেকে বের হতে চাই। খৃস্টানদের মাথা যদি খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেই আরব জগত তাদের দখলদারিত্ব থেকে রক্ষা পাবে। অন্যথায় আমার অনুপস্থিতির সুযোগে এক্ষুনি তাদের হামলা করা উচিত। তারা আনাড়ি নয়। এই যে আমি মিসর ফিরে আসতে বাধ্য হলাম, পরিস্থিতিটা তাদেরই সৃষ্ট। এতে তাদের উদ্দেশ্য আছে। একটি মাত্র পন্থা অবলম্বন করলে তারা আমাদের থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষা করতে পারবে– অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করে তাদেরকে আমাদের এলাকায় এসে লড়াই করতে হবে। এই যুদ্ধে আমার অনেক সৈন্যের প্রয়োজন।'

'আমি এক্ষুনি দু'শ পঞ্চাশজন নাইট (বর্মপরিহিত কমান্ডার) ময়দানে নিয়ে আসতে পারি'– ত্রিপোলীর কনফারেন্সে বিখ্যাত খৃস্টান সম্রাট রেনাল্ট অফ খুনিন বললেন– 'এই আক্রমণের নেতৃত্ব আমার বাহিনী দেবে। আমি তার পরিকল্পনাও প্রস্তুত করে রেখেছি। আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় চোরের মতো যুদ্ধ করবো না। আমরা ঝড় ও স্রোতের ন্যায় এগিয়ে যাবো। আমরা যখন সবাই একত্রিত হয়ে রওনা হবো, তখন আপনি বুঝতে পারবেন, মানুষ ও ঘোড়ার এই ঝড়-স্রোত আরব দুনিয়াটাকে খড়-কুটোর ন্যায় ভাসিয়ে মিসরকেও পিষে ফেলবে এবং তার গতি সুদান গিয়ে ক্ষান্ত হবে।'

খৃস্টানরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসে, তাহলে আরবের মাটি আমাদের থেকে এতো রক্ত কামনা করবে, যাতে মরুভূমির বালিকণা সাঁতার কাটবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'এবার আমরা মাথায় কাফন বেঁধে যাবো। আমার বন্ধুগণ! আমাদেরকে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং পুরোপুরি সংবরণ করে ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে।'

'আইউবীকে মিসরে আটকে রাখার জন্য আমাদেরকে অরাজক কর্মকাণ্ড তীব্রতর করতে হবে'– রেমন্ড বললেন এবং খৃস্টান ইন্টেলিজেন্স প্রধান

হারমানকে উদ্দেশ করে বললেন– 'হারমান! মিসরের উপর তোমার হামলা আরো জোরদার করো। আইউবী স্থির হয়ে বসে থাকবার কথা নয়। তার বাহিনীর জীবনহানি প্রচুর হয়েছে। বিলম্ব না করে তিনি নতুন ভর্তি শুরু করে দেবেন। তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, যেনো তিনি ভর্তি না পান। যদি তাতে সফল না হও, তাহলে মিসরের বাহিনীকে ধ্বংস করতে থাকো। সেখানকার বাহিনীর উপর দৃষ্টি রাখো। ওখানে আমাদের কর্তব্যরত গোয়েন্দাদের বলো, সালাহুদ্দীন আইউবীর যে কোনো গতিবিধির সংবাদ যেনো দ্রুত আমাদের কাছে পৌছাতে থাকে।'

'আর হারমান!'– এক খৃস্টান কমান্ডার বললেন– 'মিসরের সংবাদ পাওয়া যাক আর না যাক এখানকার কোন সংবাদ যেনো বাইরে যেতে না পারে। আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে, আইউবী যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে আমাদের জন্য আপদ হিসেবে আবির্ভূত হন, তেমনি গুপ্তচরবৃত্তির ময়দানেও তিনি আমাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকেন। আমাদের মাঝে তার চর থাকা বিচিত্র নয়। এখানকার মুসলিম পরিবারগুলোর উপর নজর রাখতে হবে। কারো প্রতি সামান্যতম সন্দেহ সৃষ্টি হলেই তাকে বন্দি করে ফেলো। প্রয়োজনে হত্যা করে ফেলো। আমি তোমাকে এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রদান করলাম।'

'আমি তো কারো অন্তরে প্রবেশ করতে পারি না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'গাদ্দার কারো গায়ে লেখা থাকে না। গাদ্দারদের মাথায় শিংও থাকে না। আমি আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীসকে অনুমতি প্রদান করছি, যাকে খৃস্টানদের চর বলে সন্দেহ হবে, তাকেই হত্যা করে ফেলো। তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে চাইলে কারাগারে ফেলে রাখো। যে সময়টায় খৃস্টানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসছে, সেই সঙ্গিন পরিস্থিতিতে আমি কাউকে ক্ষমা করতে পারি না। আমি তদন্ত ও সুবিচারের ধরণ-পদ্ধতি পরিবর্তন করতে চাই।... আর আলী বিন সুফিয়ান! আমি নিশ্চিত, তুমি অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে তোমার জাল বিছিয়ে রেখেছো। খৃস্টানদের ভেতরে আরো কিছু লোক পাঠিয়ে দাও এবং সেখানকার গোয়েন্দাদের বলে দাও, কোন তথ্য-সংবাদ যেনো বেশি সময় নিজেদের কাছে না রাখে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও যেনো তীর গতিতে কায়রোতে সংবাদ পৌছায়। আমাকে অন্ধ করে দিও না আলী! আর সতর্ক থাকো, এখান থেকে কোনো সংবাদ যেনো বের হতে না পারে।'

'আমাদের বাহিনীর কমান্ড যদি যৌথ হয়, তাহলে আমরা আরো বেশি ভালো ও কার্যকর পন্থায় লড়াই করতে পারবো।' রেমন্ড বললেন।

'আমি ঐক্যের উপর জোর দেবো, যৌথ কমান্ডের উপর নয়'– রেনাল্ট বললেন– 'যৌথ কমান্ডের কিছু ক্ষতিকর দিকও থাকে। যুদ্ধের ময়দানে আমাদেরকে একে অপরের সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং একে অন্যের পথে চলা থেকে বিরত থাকতে হবে। অগ্রযাত্রার জন্য আমরা এলাকা ভাগ করে নেবো। সতর্ক থাকতে হবে, যেনো আমাদের গতিবিধি ফাঁস না হয়ে যায়।'

উভয় দিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। সুলতান আইউবীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা খৃস্টানদের এবারকার প্রত্যয়। সুলতান বিক্ষত। খৃস্টানদের মদদপুষ্ট তিনটি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। প্রায় তিনটি বছর মুসলিম সৈনিকরা পরস্পরের রক্ত ঝরিয়েছে। সুলতান আইউবী তিন মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে এনেছেন এবং তারা সুলতানের আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সুলতানের মতে এই জয় উম্মাহ'র নিকৃষ্টতম বিজয়। কারণ, খৃস্টানদের ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। এই ভ্রাতৃঘাতি গৃহযুদ্ধে আল্লাহর হাজার হাজার সেই সৈনিকরা মৃত্যুবরণ করেছে কিংবা আজীবনের জন্য পঙ্গুত্ববরণ করেছে, যাদের খৃস্টানদের হাত থেকে ফিলিস্তীনকে মুক্ত করার কথা ছিলো।'

ইত্যবসরে খৃস্টানরা তাদের সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করে নিয়েছে। বাহিনীকে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগও দিয়েছে। তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি এখন সম্পন্ন। তাদের দাবি ভিত্তিহীন ছিলো না যে, তারা ঝড়ের গতিতে আসবে এবং আরব বিশ্বকে খড়ের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বিপরীত দিকে সুলতান আইউবীর বাহিনীর অভিজ্ঞ অনেক সৈনিক ও কমান্ডার শাহাদাতবরণ করেছে, যার ফলে সুলতান এখন নতুন ভর্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। অনভিজ্ঞ নতুন সৈনিকদের দ্বারা যুদ্ধ করানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তবু সুলতান আইউবীর এছাড়া উপায় নেই। এ মুহূর্তে মিসরেও অনেক সৈন্য রাখা প্রয়োজন। কারণ, সুদানের দিক থেকেও আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। সর্বোপরি দেশজুড়ে নাশকতা ও বিশ্বাসঘাতকতার সমস্যা তো আছেই।

খৃস্টানরা ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে। কিন্তু সুলতান আইউবী তাঁর নিজস্ব রণকৌশল থেকে সরে আসতে চাচ্ছেন না। তাঁর সিদ্ধান্ত, তিনি 'গেরিলা হামলা চালাও আর পালিয়ে যাও' এই রীতি অনুযায়ীই লড়াই করবেন। খৃস্টানদের বর্তমানকার পরিকল্পনায় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেনো সুলতান আইউবীর কমান্ডো অপারেশন সফল হতে না পারে। তারা আইউবীর বাহিনীকে বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে এসে সামনাসামনি লড়াবার কৌশল ভাবছে। উভয়পক্ষের জোর প্রচেষ্টা, আপন আপন যুদ্ধ প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও গতিবিধি যেনো গোপন থাকে এবং প্রতিপক্ষের গোপন তথ্য বের করে আনা যায়। এ লক্ষ্যে উভয়পক্ষের মধ্যেই প্রতিপক্ষের গুপ্তচর ঢুকে রয়েছে।

খৃস্টান কমান্ডার প্রমুখ মোটের উপর জানে, তাদের মধ্যে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা আছে। কিন্তু ত্রিপোলীর সম্রাট রেমন্ড ও অপরাপর খৃস্টান সম্রাটদের জানা নেই, খোদ তাদের এই কনফারেন্সে দু'জন মুসলমান গোয়েন্দা উপস্থিত রয়েছে। একজন রাশেদ চেঙ্গিস। অপরজন ভিক্টর। রাশেদ চেঙ্গিস তুর্কি মুসলমান। ভিক্টর ফরাসী। এরা খৃস্টানদের উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারি। খৃস্টান সম্রাট ও উচ্চপদস্থ কমান্ডারদের সভা-নিমন্ত্রণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মদ-খাবার ইত্যাদি পরিবেশনের দেখা-শোনা এদের দায়িত্ব। রাশেদ চেঙ্গিস ছদ্মনাম। ঠিক খৃস্টানদের নামের ন্যায়। তুর্কি হওয়ার কারণে গায়ের রংটা ইউরোপিয়ানদের মতো। তাছাড়া অত্যন্ত চালাক ও বাকপটু। ভিক্টরের ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই, সে খৃস্টান। ফ্রান্সের বাসিন্দা। কিন্তু ছদ্মনামটা রেখেছে গ্রীক খৃস্টানদের।

খৃস্টানদের এই কনফারেন্সেও তারা দু'জন তাদের বিশেষ পোশাকে উপস্থিত আছে। কারণ, খৃস্টানরা মদ ছাড়া কোনো কাজই করতে পারে না। এরা মদ পরিবেশন করছে আর সতর্কতার সাথে মনোযোগ সহকারে তাদের কথোপকথন শুনছে। অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা, যা কিনা এই মুহূর্তে কায়রো পৌঁছে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত এখনো চূড়ান্ত হয়নি। খৃস্টানদের পূর্ণ পরিকল্পনা জ্ঞাত হয়ে যে কোনো মূল্যে সেসব তথ্য কায়রো পৌঁছাতে হবে। এই দুই গোয়েন্দার উপর আলী বিন সুফিয়ানের পরিপূর্ণ আস্থা আছে।

মিসরে সেনাভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দু'তিনটি

ইউনিট গঠনও হয়ে গেছে। সামরিক কুচকাওয়াজ ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। দ্রুতগামী দূত মারফত মসজিদের ইমামদের নিকট সুলতান আইউবীর বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে, আপনারা জনগণকে জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন, তাদেরকে বলুন, কাফেররা পূর্ণ শক্তি নিয়ে ইসলামী দুনিয়ার উপর আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে। প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে কাফেরদের দখল থেকে মুক্ত করতে হবে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরয হয়ে গেছে। ইমামদের বলা হলো, আপনারা যুবকদেরকে মিসরের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

ইসলাম ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবা-তরুণরা ভর্তি হতে শুরু করেছে। তাদের সম্মুখে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরিষ্কার। কিন্তু বহু যুবক ভর্তি হয়েছে গনীমতের লোভে। এরা পল্লী অঞ্চলের মানুষ। তাদের কানে ইমামদের আওয়াজ পৌঁছেনি। তারা সাক্ষাৎ পেয়েছে সেনা অফিসারদের, যারা এই লোকগুলোকে এই বলে উদ্বুদ্ধ করেছে, আসো, যুদ্ধ করে। আমরা খৃস্টানদের এমন সব এলাকা জয় করবো, যেখানে বিপুল সম্পদ আছে। তোমাদেরকে সেই সম্পদের ভাগ দেয়া হবে। ফলে তারা জিহাদী জযবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভর্তি হওয়ার পরিবর্তে হাসিমুখে গনীমতের লোভে ভর্তি হয়েছে। এই অনভিজ্ঞ ও আনাড়ী অফিসারগণ সুলতান আইউবীর আকাঙ্খার বিপরীত বিপুলসংখ্যক যুবককে ভর্তি করে নেয়। যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে এই সৈনিকরা সুলতান আইউবীর জন্য বিরাট এক সমস্যারূপে আবির্ভূত হয়।

ওদিকে ত্রিপোলীর সামান্য দূরে খৃস্টান বাহিনী সমবেত হতে শুরু করেছে। ফিলিস্তীনের অধিকৃত শহরগুলোতে দূত প্রেরণ করা হয়েছে যে, তোমরা বাহিনী প্রস্তুত করো। ত্রিপোলীতে খৃস্টান সম্রাট রেনাল্ট সবচে' বেশি তৎপর। তার সেনাসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি, যাদের মধ্যে দুইশত পঞ্চাশজন নাইট রয়েছে। নাইট একটি সম্মানসূচক পদবী। অস্বাভাবিক বিচক্ষণ, সাহসী ও অত্যধিক যোগ্য সামরিক অফিসারদের এই পদবী প্রদান করা হয়। তাদেরকে বিশেষ ধরনের বর্ম দেয়া হয় এবং এরা বিশেষ বিশেষ ইউনিটের কমান্ডার হয়ে থাকেন। প্রতিশোধের আগুন রেনাল্টকে অস্থির করে রেখেছে। প্রিয় পাঠক! আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১১৭৪ সালের শুরুর দিকে খৃস্টানরা সমুদ্রের দিক থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার উপর আক্রমণ করেছিলো। কিন্তু সুলতান আইউবী গুপ্তচর মারফত যথাসময়ে সেই

আক্রমণ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি খৃস্টান হামলাকারীদের স্বাগত জানানোর জন্য এমন বন্দোবস্ত করেছিলেন যে, খৃস্টানদের নৌ-বহর সমুদ্রেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

সেই অভিযানে একটি আক্রমণ হওয়ার কথা ছিলো স্থল পথে, যার নেতৃত্ব ছিলো রেনাল্টের হাতে। কিন্তু যেহেতু মুসলমান গোয়েন্দারা খৃস্টানদের পূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলো, তাই নুরুদ্দীন জঙ্গী স্থলপথে ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন। পেছন এবং উভয় পার্শ্ব থেকেও আক্রমণের ব্যবস্থা করে রাখেন। রেনাল্ট সেই ফাঁদে এসে পা দেন। বাঁচার জন্য তিনি অনেক হাত-পা ছোঁড়েন। কিন্তু এক রাতে জঙ্গীর কমান্ডো সেনারা রেনাল্টের হেডকোয়ার্টারের উপর হামলা চালায় এবং রেনাল্টকে ধরে ফেলে। খৃস্টানদের আক্রমণ অভিযান শুধু ব্যর্থই হয়নি, বরং তাদের শোচনীয় পরাজয়ও ঘটে। তাদের জীবন ও সম্পদের বিপুল ক্ষতি সাধিত হওয়া ছাড়াও উল্লেখযোগ্য বড় একটি ক্ষতি এই হয় যে, রেনাল্টের ন্যায় একজন যুদ্ধবাজ সম্রাট বন্দি হন।

রেনাল্ট নুরদ্দীন জঙ্গীর অতিশয় মূল্যবান একজন বন্দি ছিলেন। তার মুক্তির বিনিময়ে তিনি খৃস্টানদের থেকে বড় শর্ত আদায়ের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু আয়ু তাঁকে সময় দেয়নি। দু'মাস পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পদস্থ কর্মকর্তা ও সালারগণ তারই এগারো বছর বয়সী পুত্র আল-মালিকুস সালিহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। তারা আল-মালিকুস সালিহকে পুতুলের ন্যায় ব্যবহার করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করে নেয় এবং তাঁকে পরাজিত করার লক্ষ্যে খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। এই বন্ধুত্বের প্রথম বিনিময় তারা এই প্রদান করে যে, রেনাল্টের ন্যায় মূল্যবান কয়েদিকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে দেয়। সেই থেকে ওস্তাদ নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে সুলতান আইউবীর যুদ্ধ-সংঘাত শুরু হয়ে যায়। অন্যান্য আমীরগণও খেলাফত থেকে আলাদা হয়ে যান এবং তারা প্রত্যেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী গঠন করে নেন। তাদের এই আত্মঘাতি অবস্থানের ফলে অন্য সব ক্ষতির পাশাপাশি বড় একটি ক্ষতি এই হয়েছিলো যে, রেনাল্ট একটি সামরিক শক্তির রূপ ধারণ করে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধেই নয়– এখন ইসলামী দুনিয়ার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছেন।

আল-মালিকুস সালিহ রেনাল্টের সঙ্গে আরো যে বন্দিদের মুক্তি দিয়েছিলেন, তারাও ইসলামের জন্য বিরাট সমস্যারূপে আবির্ভূত হয়েছে। রেনাল্ট তার পরাজয় এবং অপমানের প্রতিশোধ নিতেও বদ্ধপরিকর। খৃস্টানদের কনফারেন্সে তিনি সকল খৃস্টান বাহিনী যৌথ কমান্ডের অধীনে কাজ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। তার বড় কারণ, তিনি স্বাধীন থেকে নিজের প্রত্যয়-পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন। খৃস্টানদের একটি দুর্বলতা ছিলো, তারা ঐক্যবদ্ধ হতো না– যার যার অবস্থানে থেকে একে অপরকে সহযোগিতা দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইতো। তাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের আকাঙ্খা ছিলো, একাকি যুদ্ধ করে নিজেই বিজিত এলাকার রাজা হবো। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, খৃস্টানদের এই দুর্বলতা আরব বিশ্বে তাদের অনেক ক্ষতি করেছে। এতো অধিক ও বিশাল সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান আইউবীর সারিতে যদি গাদ্দার না থাকতো, খৃস্টানদেরকে আরব দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করে ইউরোপের জন্যও তিনি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতেন।

'আপনারা যদি সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করতে চান, তাহলে আমাদের প্রত্যেকে আপন আপন বাহিনীকে যৌথ কমান্ডের অধীনে ছেড়ে দিতে হবে'– রেমন্ড বললেন– 'অন্যথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আমরা ব্যর্থও হয়ে যেতে পারি। প্রধান সেনাপতি কে হবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেবে জোট।'

'আমি আপনার সঙ্গে দ্বি-মত করবো না'– রেনাল্ট বললেন– 'তবে আমি সেই কমান্ডের অধীনে থেকে যুদ্ধ করবো না। আমাকে আমার বিগত পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই হবে। তার জন্য আমার স্বাধীনতা প্রয়োজন। নুরুদ্দীন জঙ্গী মরে গেছে। জঙ্গী আমাকে বন্দি করে যেভাবে দামেশ্‌ক নিয়েছিলো, ঠিক তেমনি আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে বন্দি করে আপনাদের সম্মুখে এনে হাজির করবো। অন্যথায় ইতিহাস আজীবন আমাকে অভিশম্পাত করতে থাকবে। আমি আপনাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতে চাই, নুরুদ্দীন জঙ্গী যখন আমার উপর গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে আমার সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলো এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিলো, তখন আপনাদের কে তার উপর জবাবী হামলা করেছিলেন? কে আমার জন্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন? কেউ নন। এখন আপনারা আমার পায়ে শিকল পরাবেন না।

আমি এই দিনটির জন্যই বাহিনী প্রস্তুত করেছি। আমার প্রতিশোধের দিন এসে গেছে। আমার ফৌজ আপনাদের কারো ফৌজের পথে প্রতিবন্ধক হবে না। যাকেই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে, সব রকম ঝুকি বরণ করে নিয়ে আমি তাকে সাহায্য করবো। কিন্তু আপনাদের সকলের কাছে আমার নিবেদন, আমাকে শিকলবন্দি করবেন না।'

'আজ এ পর্যন্তই'- বল্ডউইন বললেন- 'আমাদের আজকের এই কনফারেন্স প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো। আপাতত সিদ্ধান্ত হলো, আমাদের গোপন তৎপরতা গৃহযুদ্ধের আদলে মুলমানদের কোমর ভেঙে দিয়েছে এবং সালাহুদ্দীন আইউবী এদিকে আসার পরিবর্তে মিসর চলে গেছেন। তাই অতিশীঘ্র আমাদেরকে জোরদার আক্রমণ চালাতে হবে। আজকের এই সভায় আমরা আক্রমণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এখন দু'-চারদিন আমরা আলাদা আলাদাভাবে চিন্তা-ভাবনা করবো। যারা এ বৈঠকে অনুপস্থিত আছেন, তাদেরকেও তলব করবো। তারপর একদিন বসে আক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নেবো। আমাদের বাহিনীগুলো প্রস্তুত আছে। এই ফাঁকে হারমানকে গোয়েন্দা তৎপরতা আরো জোরদার করতে হবে। আইউবীর গুপ্তচরদের পাতাল থেকে হলেও বের করে এনে আটক করতে হবে। এখানকার প্রত্যেক মুসলমানের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। প্রতিটি মুসলিম পরিবার ও ব্যক্তির প্রতি মুহূর্তের গতিবিধির উপর চোখ রাখতে হবে। হারমান! আপনাকে বিশেষভাবে আরো একটি কাজ করতে হবে। পুরুষ হোক কিংবা নারী, এখান থেকে যে-ই বের হবে নিশ্চিত হতে হবে সে শত্রুর চর কিনা।

'তা-ই হবে'- হারমান বললেন- 'আমাকে না জানিয়ে এখান থেকে পক্ষিটিও বের হতে পারবে না।'

রাশেদ চেঙ্গিস ও ভিক্টর। খৃস্টানদের দুই বিশ্বস্ত পরিচারক। নিয়োগ দেয়া হয়েছে গভীর যাচাই-বাছাইয়ের পর। তারপরও এরা সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। অতিশয় বিচক্ষণ গোয়েন্দা। হারমানের ন্যায় বিজ্ঞ গোয়েন্দা প্রধানকে পরাজিত করে ঢুকে গেছে খৃস্টানদের একেবারে ভিআইপি কক্ষে। খৃস্টানদের এই কনফারেন্সের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগা-গোড়া সব আলোচনা- সকল সিদ্ধান্ত তাদের জানা। মধ্যরাতের পর সভা মুলতবি হয়ে গেলে তারা নিজ কক্ষে চলে যায়।

'ডিউটি থেকে অনুপস্থিত থাকা আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়'– ভিক্টর বললো– 'এসব তথ্য অন্য কারো মাধ্যমে কায়রো পৌঁছাতে হবে। এমন লোক কে আছে?'

'ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখা যাক'– রাশেদ চেঙ্গিস বললো– 'তিনি-ই ভালো জানবেন, কাকে পাঠানো যায়। দ্রুতগতিতে কায়রো পৌঁছার জন্য বিশেষ কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন হবে। তবে তাদের পূর্ণ পরিকল্পনা জানার পরই কায়রোকে সংবাদ দেয়া উচিত। অসম্পূর্ণ সংবাদ জেনে সুলতান ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন।'

'ইমাম সাহেবকে এতোটুকু সংবাদ তো জানানো প্রয়োজন যে, খৃস্টানরা অনেক বড় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে'– ভিক্টর বললো– 'যাতে তথ্য পেয়ে সুলতান অন্তত তাঁর বাহিনীকে প্রস্তুত করতে পারেন এবং অতি দ্রুত ক্ষয়-ক্ষতি পুরণ করে নিতে সচেষ্ট হন।' আর শোন, তারা যখন আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করছিলো, তখন আমি তোমার দিক তাকিয়েছিলাম। তুমি রেমন্ডের সামনে মদের পেয়ালা রাখতে রাখতে থেমে গিয়েছিলে। তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিলো, তুমি মনোযোগ সহকারে আলোচনা শুনছো। আমি তোমার চোহারা দেখেছিলাম। তাতে আমি লক্ষ্য করার মতো ঔজ্বল্য দেখেছি। আমি জানি, এতোটা মূলবান তথ্য প্রাপ্তিতে উত্তেজনা ও আনন্দের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তোমাকে ভুলে গেলে চলবে না, এ জাতীয় সভা-সমাবেশে হারমানও উপস্থিত থাকেন। হারমান আমাদের আলী বিন সুফিয়ানের সমপর্যায়ের গোয়েন্দা। আমি তোমার প্রতি তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ হারমানের প্রতিও তাকিয়েছিলাম। আমার মনে হলো, তিনি তোমাকে লক্ষ্য করছেন। সাবধান থেকো ভাই! জানো তো আমরা দুশমনের পেটের মধ্যে বসবাস করি।'

'হারমানের কাছে আমরা অপরিচিত নই'– রাশেদ চেঙ্গিস বললো– 'আমাদের ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ। ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

'ভয় নয়– সতর্ক থাকা প্রয়োজন'– ভিক্টর বললো– 'হারমান কী কী নির্দেশনা পেয়েছেন, শুনেছো নিশ্চয়। এখন তিনি যে কাউকে সন্দেহের চোখে দেখবেন। আচ্ছা, তুমি একটা কাজ করো– মসজিদে চলে যাও। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। খৃস্টানরা আজ কী কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, ইমামকে জানাও। কেউ কায়রো যাওয়ার থাকলে সংবাদটা আলী বিন সুফিয়ানকে জানাতে বলো। আর ওদিক থেকে কেউ আসলে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে যায় না যেনো।'

নগরীর এক মসজিদের ইমাম সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। মসজিদটি গুপ্তচরবৃত্তির গোপন ঠিকানা। সুলতান আইউবীর গোয়েন্দারা মসজিদে গিয়ে ইমামকে সংবাদ পৌঁছায় এবং তাঁর থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করে। ভিক্টর কখনো মসজিদে যায়নি। লোকটা নামায পড়ার নিয়ম-কানুন ও মসজিদের আদব-কায়দা কিছুই জানে না। তাই তার ভয়, মসজিদে গেলে খৃস্টানদের কোন মুসলমান গুপ্তচর তাকে ধরিয়ে দিতে পারে। আশঙ্কাটা অমূলক নয়। খৃস্টানদের গুপ্তচরদের মধ্যে এমন অনেক মুসলমান ছিলো, যারা মুসল্লি বেশে মসজিদে যাওয়া-আসা করতো এবং মুসলমানদের কথা-বার্তা শুনে তথ্য সংগ্রহ করতো। এভাবে তারা বহু মুসলমানকে খৃস্টানদের হাতে গ্রেফতারও করিয়েছে। রাশেদ চেঙ্গিস যেহেতু নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে রেখেছিলো, তাই দিনের বেলা সে মসজিদে যেতো না। খৃস্টান কমান্ডার প্রমুখ রাতের আসর ও ভোজ-ভাজির অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নেয়ার পর প্রয়োজন হলে মধ্য রাতের পর মসজিদ সংলগ্ন ইমামের বাসায় যেতো।

রাশেদ চেঙ্গিস পোশাক পরিবর্তন করে। জুব্বা ও পাগড়ি পরিধান করে। মুখে কৃত্রিম দাড়ি স্থাপন করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ সময়ে খৃস্টানদের এই কেন্দ্রে রাতেও জাঁকজমক অব্যাহত থাকে। রেমন্ডের বাহিনী তো আছেই, রেনাল্টও তার অনেক অফিসারসহ এখন এখানে অবস্থান করছেন। আছে তার কয়েকটি সেনা ইউনিটও। এই সেনা অফিসার এবং অন্যান্য খৃস্টান কমান্ডাররা আমোদ-বিনোদনের মধ্যদিয়ে রাত অতিবাহিত করছে। পেশাদার মেয়েদের নাচ-গান ও প্রমোদ চলছে। সারারাত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্ত্রী-গণিকারাও সঙ্গে থাকছে। কে কার স্ত্রী, বাছ-বিচার থাকছে না। চলছে নারী বেঁচা-কেনাও।

কক্ষ থেকে বের হয়ে রাশেদ চেঙ্গিসের লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে বেশ বেগ পেতে হয়। কক্ষে কক্ষে ও তাঁবুতে তাঁবুতে তো বেহায়াপনা চলছেই, বাইরেও কোথাও কোথাও একই আচরণ চোখে পড়ে। তাদের এড়িয়ে ভিন্ন পথ ধরতে হলো রাশেদ চেঙ্গিসকে। অবশেষে সে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাটা নিরাপদে অতিক্রম করে ফেলে এবং নগরীর গলিপথে ঢুকে পড়ে। তারপর মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

রাশেদ চেঙ্গিস এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে যখন মসজিদে প্রবেশ করতে শুরু করে, তখন সে অনুভব করে, কে যেনো গলির মধ্যে পা টিপে টিপে

হেঁটে এসে একদিকে মোড় নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে! রাশেদ চেঙ্গিস হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবে। কিন্তু পরক্ষণে কুকুর-বিড়াল বা অন্য কোন প্রাণী হতে পারে মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। সে মসজিদের বারান্দায় ঢুকে পড়ে এবং ইমামের কক্ষের দরজায় বিশেষ পদ্ধতিতে করাঘাত করে। দরজা খুলে যায়। রাশেদ চেঙ্গিস ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ইমামকে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করে।

'খৃস্টানদের বেশির ভাগ সৈন্য এখানে সমবেত হবে'– চেঙ্গিস বললো– 'এরা হবে রেনাল্টের ফৌজ। এখানকার বাহিনী তো পূর্ব থেকেই এখানে উপস্থিত আছে। এই বাহিনীর অভিযান এবং প্রত্যয়ের সংবাদ তো কায়রো পেয়েই যাবে। আমরা চেষ্টা করলে যাত্রার আগেই বাহিনীর কিছু ক্ষতিসাধন করতে পারি এবং তাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে পারি।'

'অর্থাৎ– তুমি বলতে চাচ্ছো, আমাদের কমান্ডো বাহিনীকে বলবো, তারা যেনো খৃস্টান বাহিনীর রসদে আগুন ধরিয়ে নষ্ট করে দেয়'– ইমাম বললেন– 'এ কাজটা আমি করাতে পারি। কিন্তু করাবো না। তুমি নিশ্চয় এমন বহু ঘটনা শুনেছো, যে অধিকৃত অঞ্চলে আমাদের কমান্ডো সেনারা খৃস্টানদের ক্ষতিসাধন করেছে, সেখানকার মুসলমান বাসিন্দাদের জীবন জাহান্নামের চেয়েও কঠিনতর করে তোলা হয়েছে। ঘরে ঘরে তল্লাশী হয়েছে। আমাদের সম্ভ্রান্ত মা-বোনদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে। যুবতী মেয়েদেরকে খৃস্টানরা তুলে নিয়ে গেছে। সর্বোপরি বন্দিত্ব ও হত্যা-নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে। আমি দূত মারফত সুলতান আইউবীকে সমস্যাটা অবহিত করেছি। সুলতান সম্পূর্ণ আমার আশানুরূপ উত্তর প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এখন থেকে মুসলিম অধিবাসীদের মর্যাদা, জীবন ও সম্পদের খাতিরে কোন শহরে গোপন ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা বন্ধ থাকবে। দুশমনের রসদ বাহিনীর সঙ্গে আসতে দাও, আমার গেরিলা সৈনিকরা সেগুলো রণাঙ্গনে যেতে দেবে না।'

'পূর্ণাঙ্গ সংবাদ আমি আপনাকে দু'-চারদিনের মধ্যেই জানাতে পারবো'– চেঙ্গিস বললো– 'আপনি এখন আরো সতর্ক হয়ে যান। এখানকার গুপ্তচররা অস্বাভাবিক রকম তৎপর হয়ে ওঠেছে। এখন থেকে তারা এখানকার পশু-পাখিগুলোকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে।'

একজনকে কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চেঙ্গিস মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়। এখন আর তার মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই, যাতে কেউ

সন্দেহ না করে। গলির দিকে মোড় নেয়ামাত্র আবারো যেনো কারো পায়ের শব্দ কানে এলো। চেঙ্গিস মোড় ঘুরিয়ে তাকায়। গলিটা অন্ধকার। কিছুই দেখতে ফেলো না। চেঙ্গিস সামনের দিকে হাঁটা দেয়। গন্তব্যের কাছাকাছি গিয়ে কৃত্রিম দাড়ি খুলে কাপড়ের নীচে লুকিয়ে ফেলে। পোশাকে তাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। এমন পোশাক খৃষ্টানরাও পরে থাকে।

এখন ভিক্টর ও চেঙ্গিসের প্রচেষ্টা, কীভাবে খৃস্টানদের আক্রমণ পরিকল্পনার বিস্তারিত জানা যায়। খৃস্টান বাহিনী কোথায় কোথায় আক্রমণ করবে এবং তাদের রওনা হওয়ার প্রোগ্রাম কী ইত্যাদি। অধিক থেকে অধিকতর সৈন্য সমাবেশ ঘটানোর জন্য আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। দূতদের দৌড়ঝাপ চলছে। এখানকার জন্য রেমন্ড হলেন মেজবান। এটি তার রাজধানী। এক রাতে তিনি সকল খৃস্টান সম্রাট, উচ্চপদস্থ কমান্ডার ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিমন্ত্রণ করেন। মেহমানগণ ভোজ সভায় উপস্থিত। ভিক্টর ও চেঙ্গিস মহাব্যস্ত– নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ নেই। যেহেতু মেহমানদের মধ্যে সম্রাটগণও আছেন, তাই তাদের মদ ইত্যাদি পরিবেশনের জন্য ভিক্টর-চেঙ্গিসকে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। তবে তাদের জানা আছে, এই সতর্ক প্রস্তুত ততোক্ষণ পর্যন্ত থাকতে হবে, যতোক্ষণ মেহমানদের চেতনা ঠিক থাকে। পরে যখন মদ মাতাল হয়ে তারা অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন চাকর-নকরদের ব্যস্ততা কমে যায়।

আজকের আসরে যতোজন পুরুষ, ততোজন নারী। রূপসী যুবতীরা আছে। আছে এমন নারীও, যারা বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেলেও তরুণী সেজে ধোঁকা দিচ্ছে। ভিক্টর ও চেঙ্গিস খাবার-মদ ইত্যাদি পরিবেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত চাকরদের কাজ তদারকি করছে এবং ছুটোছুটি করছে। এক ইউরোপীয় তরুণী চেঙ্গিসের নিকট দু'-তিনবার মদ চায়। প্রতিবারই চেঙ্গিস কোনো চাকর বা চাকরানিকে ডেকে বলে দেয়, একে মদ দাও। সে সময়ে মেহমানগণ রেমন্ডের মহলে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিলো। মেয়েটি অত্যন্ত রূপসী। চেঙ্গিসকে বারবার চাকরদের ডেকে মদ দিতে বলছে দেখে সে মুচকি হেসে বললো– 'আমি তোমার হাতে পান করতে চাচ্ছি আর তুমি কিনা চাকরদের নির্দেশ দিয়ে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছো।'

'আজ্ঞে, আমিই এনে দিচ্ছি।'– চেঙ্গিস ভৃত্যসুলভ ভঙ্গিতে বললো।

'এখানে নয়'– মেয়েটি বললো– 'আমি বাইরে বাগানে যাচ্ছি। ওখানে নিয়ে আসো।'

মেয়েটি মহল থেকে বের হয়ে বাগানে এক স্থানে গিয়ে বসে। এটি মহলের বাগিচা। রাশেদ চেঙ্গিস আকর্ষণীয় একটি সোরাহীতে করে মদ নিয়ে সেখানে চলে যায়। ওখানেও মেহমানগণ ছড়িয়ে রয়েছে। সকলেই যৌন উন্মাদ। প্রত্যেকের হাতে মদের পেয়ালা আর সঙ্গে একজন করে নারী। এই মেয়েটি একা। এমন রূপসী এক যুবতী একা কেনো ভেবে চেঙ্গিস বিস্মিত হয়। মেহমানদের তো এর দেহের চার পাশে মাছির ন্যায় ভন ভন করার কথা ছিলো। এখানে চলে তো এ সবই। যা হোক, চেঙ্গিস মেয়েটির পেয়ালায় মদ ঢালতে শুরু করে। মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, তোমার বাড়ি কোথায়? চেঙ্গিস ইউরোপের একটি গ্রামের নাম উল্লেখ করে বললো, কৈশোর থেকেই আমি সম্রাট রেমন্ডের রাজ কর্মচারি।

'তুমি কি কিছু সময় আমার কাছে থাকতে পারো?'– তরুণী জিজ্ঞেস করলো এবং পেয়ালাটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো– 'নাও, আমার পেয়ালা তুমি পান করো। আমি পরে পান করবো।' মেয়েটির কণ্ঠে অনুনয় ও তৃষ্ণার সুর।

'দেখুন, আমি একজন ভৃত্য'– চেঙ্গিস বললো– 'আপনি রাজকন্যা। এ মুহূর্তে ডিউটি ছাড়া আমি অন্য কাজে সময় দিতে পারি না। এখনো আমি ডিউটিতে আছি।'

'এ মুহূর্তে আমাকে তোমার চাকরানি মনে করো'– মেয়েটি রাশেদ চেঙ্গিসের হাত ধরে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বললো– 'তুমি রাজপুত্র। মানুষের মনই বলে দেয় কে কী।'

'আপনি একা কেনো?' চেঙ্গিস জিজ্ঞাসা করে।

'কারণ, আমার মন সায় দেয় না, যার প্রতি আমার ঘৃণা, তার সঙ্গে হাসবো, খেলা করবো'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমার যাকে ভালো লাগে, সে এখন আমার সঙ্গে। এখন আমি নিঃসঙ্গ নই, একা নই। কিন্তু তুমি আমার হাত থেকে পেয়ালাটা নাওনি!'

'কেউ দেখে ফেললে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।' চেঙ্গিস বললো।

'তুমি যদি আমার পেয়ালা থেকে এক ঢোকও পান না করো, তাহলে আমিই তোমাকে শূলিতে দাঁড় করাবো'– মেয়েটি বললো। মেয়েটির মুখে মুচকি হাসি। এবার আরো একটু এগিয়ে রাশেদ চেঙ্গিসের একেবারে কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললো– 'পাগল! দেখো, তোমাকে আমার এতোই ভালো লাগে যে, একান্ত বাধ্য হয়েই আমি তোমাকে ডেকে এনেছি। আমাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করো না।'

'আমি মদপান করবো না।' চেঙ্গিস বললো।

'তা না করো'– মেয়েটি বললো– 'কিন্তু আমি যখন এবং যেখানে ডাকি, তোমাকে যেতে হবে।'

রাশেদ চেঙ্গিস বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ মানুষ। উচ্চস্তরের একটি রূপসী মেয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব-ভালোবাসার আকাঙ্খা প্রকাশ করছে বলে সে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয়নি। তার এ-ও মনে হয়, মেয়েটি হয়তো কোনো বৃদ্ধ সেনাপতির স্ত্রী কিংবা এমন এক পুরুষের বউ, যে এই মুহূর্তে অন্য কারো স্ত্রীকে নিয়ে আমোদে মেতে আছে। একটা কারণ তো স্পষ্ট যে, রাশেদ চেঙ্গিস সুদর্শন যুবক, যার দেহে আকর্ষণ আছে। কোন নারীর তাকে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা এটাই প্রথম নয়। খৃস্টান সম্রাট ও উচ্চপদস্ত অফিসারদের ভোজসভায় মদ পরিবেশেনকারী মেয়েরা অতিশয় রূপসী এবং চিত্তহারীই হয়ে থাকে। তাদের দু'জন ইতিমধ্যে রাশেদ চেঙ্গিসের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা করে ফেলেছে। কিন্তু চেঙ্গিস তাদের পাত্তা দেয়নি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাকে যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, তার দাবি ছিলো, নিজের চারিত্রিক পবিত্রতাকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

প্রশিক্ষণের সময় আলী বিন সুফিয়ান তাকে ধারণা প্রদাণ করেছেন, মস্তিষ্ক যদি বিলাসিতার প্রতি ঝুকে পড়ে, তাহলে মন থেকে কর্তব্যবোধ হারিয়ে যেতে শুরু করে। তাকে বুঝানো হয়েছে, নারী এমন এক বিষের ন্যায়, যে মানুষের ঈমান খেয়ে ফেলে। রেমন্ড আর ত্রিপোলীর মহলে তার অবস্থান ছিলো, সে যখন ইচ্ছা যে কোনো চাকর-চাররানিকে চাকুরিচ্যুৎ করতে পারতো। তাছাড়া তার ব্যক্তি চরিত্র ছিলো যাদুর ন্যায় ক্রিয়াশীল। তার এ-ও জানা ছিলো, খৃস্টানদের কোনো চরিত্র নেই। তাদের নারীরা নির্লজ্জতা ও অসচ্চরিত্রকে গৌরব মনে করে থাকে। এসব কারণে চেঙ্গিস-এর নিকট এই মেয়েটি এবং তার খোলামেলা প্রেমনিবেদন বিস্ময়কর বিষয় ছিলো না।

রাশেদ চেঙ্গিস যেহেতু একজন যোগ্য গুপ্তচর, তাই সে ততক্ষণাৎ ভাবে, নিজের গোয়েন্দা পরিচয় গোপন রেখেই মেয়েটাকে চরবৃত্তিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই যে মেয়েটি বললো, আমি তোমাকে যখন এবং যেখানে আসতে বলি, আসতে হবে– তার এই বক্তব্যে কোন নির্দেশ বা হুমকি নেই। আছে বন্ধুসুলভ সরলতা। তার বাচনভঙ্গির ক্রিয়াও চেঙ্গিসের অজানা নয়। মেয়েটির মুচকি হাসির জবাবে রাশেদ চেঙ্গিসও মুখ টিপে

একটা হাসি উপহার দিয়েছিলো। এই হাসির মাধ্যমে শিকারীকে নিজের পাতা জালে আটকানোর প্রচেষ্টা ছিলো।

'এবার যেতে পারি কি?'– রাশেদ চেঙ্গিস বললো– 'আমার ডিউটি এখনো শেষ হয়নি। আপনি মেহমানদের মাঝে চলে যান।' পরক্ষণে চেঙ্গিস খানিকটা ঝাঝালো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'আপিন কার স্ত্রী?'

'স্ত্রী নই–গণিকা'– মেয়েটি বললো এবং একজন উচ্চপদস্থ কমান্ডারের নাম উল্লেখ করে বললো– 'অভাগার কাছে ঢের সম্পদ আছে। এখানে এসে আরেকজন পেয়ে গেছে। এখন আর আমার প্রয়োজন নেই। আমাকে মুক্তও করে দেয় না। আমি নিজের পছন্দের বাইরে কিছু করতে পারি না। লোকটাকে আমার একটুও ভালো লাগে না। নিজের পছন্দ-অপছন্দ এমন একটা বিষয় যে, যার নিজস্ব পছন্দ থাকে, তার যাকে ভালো লেগে যায়, সে রাজা না গোলাম, সেই বিবেচনা করে না। প্রেম প্রেমই। প্রেমের কাছে রাজাও যা, গোলামও তা। তোমার পদমর্যাদায় আমার কোনো কাজ নেই। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। অন্যথায় আমার প্রতি অবিচার হবে। তুমিই প্রথম মানুষ, আমার হৃদয় যাকে পছন্দ করেছে। আমি দৈহিক পরিতৃপ্তির পিয়াসী নই। আমার আত্মা পিপাসু। তোমার চোখের তারাই পারবে আমার আত্মার পিপাসা নিবারণ করতে। এখন যাও। কাল রাত আমিই তোমাকে খুঁজে নেবে।'

রাশেদ চেঙ্গিস যে সময়ে মেয়েটির সঙ্গে বাগিচায় অবস্থান করছিলো, সে সময়ে তার সঙ্গী ভিক্টর মেহমানদের মাঝে ঘোরাফেরা করছিলো। এই ফাঁকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে ফেলেছে সে। খৃস্টানরা অগ্রযাত্রা কোন্‌দিকে করবে, আক্রমণ কোথায় করবে ইত্যাদি সকল তথ্য জেনে ফেলেছে ভিক্টর। কিন্তু বিষয়গুলো এখনো প্রস্তাব ও পরামর্শের পর্যায়েই রয়েছে। রাশেদ চেঙ্গিসও মেহমানদের মাঝে ফিরে গেছে এবং রেনাল্টের আশপাশে ঘুরতে শুরু করেছে। রেনাল্ট সঙ্গীদের সামনে তার সেই প্রত্যয়ের কথাই পুর্নব্যক্ত করছে, যা তিনি কনফান্সে ব্যক্ত করেছিলেন। তার হাতে এতো প্রবল সামরিক শক্তি রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করেই তিনি এতো বড় দাবি করছেন।

রাত কেটে গেছে। পরদিন চেঙ্গিসের নিকট তার দলের এক গোয়েন্দা এসে পৌছে। চেঙ্গিস তাকে মধ্য রাতের পর ইমামের কাছে যেতে বলে।

দিন কেটে রাত এলো। চেঙ্গিস ও ভিক্টর রেমন্ডের ভোজসভায় ডিউটিতে চলে যায়। যখন অবসর হয়, তখন গভীর রাত। চেঙ্গিস ভিক্টরকে এখনো বলেনি, একটি মেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেছে। ডিউটি থেকে অবসর হয়ে সে ভিক্টরকে বললো, আমি পোশাক পরিবর্তন করে ইমামের কাছে যাচ্ছি। ভিক্টর ইমামকে অবহিত করার জন্য তাকে বেশ কিছু তথ্য প্রদান করে।

চেঙ্গিস পোশাক পরিবর্তন করে এবং মুখে কৃত্রিম দাড়ি স্থাপন করে মুখমন্ডলটা ঢেকে কক্ষ থেকে বের হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। ভবনটির খানিক দূরে সবুজ ভূমি, যাতে বিপুল গাছ-গাছালির সমারোহ। আশপাশে কোনো বসতি নেই। এই প্রাকৃতিক বাগিচাটির মধ্য দিয়েই চেঙ্গিসকে যেতে হচ্ছে।

চেঙ্গিস সবে বাগানে ঢুকেছে। অমনি একটি বৃক্ষের আড়াল থেকে এক ছায়ামূর্তি আত্মপ্রকাশ করে তার দিকে এগুতে শুরু করে। চেঙ্গিস ঝটপট মুখমন্ডল থেকে কৃত্রিম দাড়িগুলো খুলে চোগার পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে। তার ধারণা, এখানে এখানকারই তার পরিচিত কোনো চাকর ছাড়া অন্য কেউ আসতে পারে না। সে হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়ে ধীর পায়ে পায়চারি করতে শুরু করে।

ছায়াটা ডান দিক থেকে আসছিলো। নিকটে এসেই বলে ওঠলো– 'বলেছিলাম না, আমিই তোমাকে খুঁজে নেবো।' চেঙ্গিস একটি নারীকণ্ঠ শুনতে পায়। গত রাতের সেই মেয়েটি।

'এতো মেহমান, এতো কাজ– আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে'– চেঙ্গিস বললো– 'হাওয়া খাওয়ার জন্য এদিকে চলে আসলাম'।

'আমি তোমার কক্ষের দিকে আসছিলাম'– মেয়েটি বললো– 'তোমাকে এদিকে আসতে দেখলাম। কিন্তু তোমার পেছনে পেছনে না এসে ওদিক দিয়ে আসলাম। যাতে কেউ দেখতে না পায়। বসবে, নাকি পায়চারিই করবে? আমি সোরাহী আর দু'টি পেয়ালা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।' মেয়েটি হেসে ওঠে।

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো না, তুমি থাকো কোথায় আর এতো রাতে কোথা থেকে লাফিয়ে পড়েছো? এ কথাও জানতে চায়নি, তুমি যার গণিকা, এই গভীর রাতে সে তোমাকে খুঁজবে কিনা। তার বিশ্বাস, মেয়েটি আবেগ দ্বারা তাড়িত এবং মাথায় ঝুঁকি বরণ করে নিচ্ছে। তথ্য নেয়ার জন্য চেঙ্গিস তাকে জিজ্ঞেস করলো– 'তুমি তোমার কমান্ডার প্রভু থেকে মুক্তি পেতে

চাচ্ছো। এটা তখন সম্ভব হবে, যখন তিনি যুদ্ধে চলে যাবেন। কিন্তু এমন সম্ভাবনা চোখে পড়ছে না। আচ্ছা, তিনি কোন্ ফৌজে আছেন?'

'তিনি বল্ডউইনের ফৌজের হাইকমান্ডের সেনাপতি'– মেয়েটি উত্তর দেয়– 'সম্ভবত যুদ্ধে চলে যাবেন। কিন্তু তিনি আমাকে ও অন্যান্য মেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।'

'যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা আছে নাকি?'– চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করে– 'এখানে কেনো এসেছো?

'বল্ডউইন তাকে এখানে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, তিনি যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবেন।' মেয়েটি উত্তর দেয়।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ কোথায়?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করে।

'তা তো জানি না'– মেয়েটি বললো– 'তোমার প্রয়োজন হলে জিজ্ঞেস করে বলবো।'

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটিকে আরো বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে। মেয়েটির যা যা জানা ছিলো বলে দেয় এবং যা জানা ছিলো না, সে সম্পর্কে বলে, আমি জেনে তোমাকে পরে জানাবো।

'আচ্ছা, কে লড়াই করলো আর কে জয়লাভ করলো, তাতে তোমার কী আসে-যায়?'– মেয়েটি আবেগময় ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে– 'তিনি যদি আমাকে যুদ্ধের মাঠে যেতে বলেন, আমি যাবো না। আমি তো তার স্ত্রী নই। আমি না আমার বর্তমান প্রভুর দাসী, না সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে। আমাকে এতোই অপদস্থ করা হয়েছে যে, এদের প্রত্যেককে– যারা নিজেদেরকে ক্রুশের মোহাফেজ মনে করে– বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয়।'

আবেগে আপ্লুত হয়ে মেয়েটি রাশেদ চেঙ্গিসকে ধরে বসিয়ে ফেলে। পেয়ালা দুটো মাটিতে রেখে তাতে মদ ঢালে এবং একটি পেয়ালা চেঙ্গিসের হাতে দিয়ে বললো– 'এমন নির্জন আর গভীর অন্ধকার রাতের রোমাঞ্চকে যুদ্ধের আলাপ দিয়ে নষ্ট করো না, নাও পান করো।'

চেঙ্গিস সমস্যায় পড়ে যায়। দেড় বছর যাবত এই মদ্যপদের মাঝে জীবন অতিবাহিত করছে চেঙ্গিস। নিজ হাতে তাদের মদপান করাচ্ছে। কিন্তু নিজে কখনো এক ঢোকও পান করেনি। এই পাপপূর্ণ পরিবেশে– যেখানে প্রতি মুহূর্তে চলে লোভনীয় পাপের আহ্বান, সেখানেও চেঙ্গিস নিজের ঈমানে কলঙ্কের দাগ পড়তে দেয়নি। এখন এমন একটি মেয়ে তার

হাতে এসে ধরা দিয়েছে, যার মাধ্যমে সে নিজের কর্তব্য ভালোভাবে পালন করতে পারতো। কিন্তু মেয়েটি তার ঠোঁটের সামনে মদের পেয়ালা এগিয়ে ধরলো। আশঙ্কা হচ্ছে, আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে মেয়েটি ফস্‌কে যেতে পারে। চেঙ্গিসের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে– কর্তব্য পালনের খাতিরে পেয়ালাটা হাতে নিয়ে দু'ঢোক পান করে নেবে, নাকি এমন মূল্যবান মেয়েটাকে হাতছাড়া করে ফেলবে।

'আমি মদ পছন্দ করি না।' চেঙ্গিস বললো।

'খোদা তোমাকে পুরুষালী রূপ আর চিত্তাকর্ষক দেহবল্লরী দান করেছেন'– মেয়েটি বললো– 'কিন্তু মদপান না করে প্রমাণ করছো, তুমি পাথরের নিষ্প্রাণ একটি মূর্তি বৈ নও।'

অনেক্ষণ পর্যন্ত পীড়াপীড়ি ও প্রত্যাখ্যানের সংঘাত চলতে থাকে। অবশেষে চেঙ্গিস রূপসী মেয়েটাকে জালে আটকানোর নিমিত্তে তার হাত থেকে মদের পেয়ালাটা নিয়ে নেয়। তারপর পেয়ালায় মুখ লাগায়। মেয়েটি তার পেয়ালায় আরো মদ ঢেলে দেয়। চেঙ্গিস কম্পিত হাতে পেয়ালাটা পুনরায় ঠোঁটের সঙ্গে লাগিয়ে ধীরে ধীরে পেয়ালাটা খালি করে ফেলে। খানিক পর সে অনুভব করতে শুরু করে, যেনো তার কল্পনার জগতে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। তার আশপাশে প্রাচীরসমূহ ভেঙে পড়ছে এবং সে স্বাধীন হয়ে গেছে মনে করে আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে। যেনো তাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি তাকে দেয়া হয়েছে।

রাশেদ চেঙ্গিস নারীর পরশের সাথে পরিচিত ছিলো না। বিয়েও করেনি। অবিবাহিত হওয়া এবং পেছনে লেজুড় না থাকার কারণেই তাকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য বেছে নেয়া হয়েছিলো। এটি তার প্রাথমিক গুণ। কিন্তু একটি অতিশয় রূপসী মেয়ে তাকে মদপান করিয়ে যখন তার গা ঘেঁষে বসে পড়লো, তখন 'অবিবাহিত' পরিচয়টাই তার জন্য দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মেয়েটি তাকে কোন পাপের আহ্বান জানাচ্ছে না। তার কাছে সে সেই ভালোবাসা প্রত্যাশা করছে, যা তার আত্মাকে শান্তি দেবে। যেহেতু চেঙ্গিসের চরিত্রে পাপ প্রবণতা ছিলো না, তাই এ মুহূর্তেও তার মনে কোন বাজে ইচ্ছা জাগ্রত হলো না। কিন্তু রূপসী মেয়েটির রেশমী চুলের পরশ, পিপাসু আবেগময় বক্তব্য, সুডৌল বাহু আর সুকোমল গণ্ডদেশ রাশেদ চেঙ্গিসকে সেই চেঙ্গিস থাকতে দিলো না, যা সে দু'ঢোক মদ কণ্ঠনালীতে প্রবেশের আগে ছিলো।

রাত কেটে যাচ্ছে।

রাশেদ চেঙ্গিস যখন আলাদা হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়, তখন মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি আমাকে যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছিলে। আমার সবকিছু জানা নেই। তুমি যদি সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পেতে চাও, তাহলে এসব প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করে আগামী রাতে আবার দেখা করবো।'

অকস্মাৎ চেঙ্গিসের মধ্যে সেই চেঙ্গিস জেগে ওঠে, সে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ছিলো। তার কর্তব্যের কথা মনে পড়ে যায়। এ অনুভূতিও জেগে ওঠে, তার উপর মদ ও নারীর নেশা আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং তাকে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। সে মেয়েটিকে বললো– 'তোমার মতো আমারও যুদ্ধের প্রতি কোনো আন্তরিকতা নেই। আমি শান্তির জীবনে বিশ্বাসী। ফৌজ অভিযানে রওনা হলে মদ নিয়ে আমাকেও তো যেতে হবে। তাই জানতে চেয়েছিলাম, আসলেই সহসা কোনো যুদ্ধ হচ্ছে কিনা এবং হলে কোথায় হবে এবং ফৌজ কোন্ পথে অগ্রসর হবে।

ফিরে এসে রাশেদ চেঙ্গিস ভিক্টরকে তখনই ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা সমীচীন মনে করলো না। তার কষ্টটা হলো, সে ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রওনা হয়েছিলো; কিন্তু পথে মেয়েটি তাকে আটকে দিলো এবং তাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেলো। সময়টা রাতের শেষ প্রহর। খৃস্টানদের এই বিলাসী জগতে সকাল সকাল জাগ্রত হওয়ার কোনো নিয়ম নেই। চেঙ্গিস ইমামের কাছে যেতে পারতো। কিন্তু মুখে মদের গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করার সাহস হলো না। তার মনে অনুভূতি জাগ্রত হলো, মদপান গুরুতর পাপ। কিন্তু পাপটা সে করে ফেলেছে। তথাপি যখন মেয়েটি তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠলো, তার মধ্যে কোন দোষ দেখতে পেলো না। প্রেমের মাদকতা তাকে নতুন করে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নারীর কল্পনার সঙ্গে কোনো পাপের সংশ্লিষ্টতা ছিলো না। এটি পবিত্র ভালোবাসার আনন্দ, যা ত্যাগ করতে চেঙ্গিস প্রস্তুত নয়।

চেঙ্গিস শুয়ে পড়ে। তার দু'চোখের পাতা বুজে আসে।

ভিক্টর চেঙ্গিসকে জাগিয়ে তোলে। সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসেছে। ভিক্টরই প্রথম কথা বলে– 'ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছো? কী কথা হয়েছে?'

'না'– চেঙ্গিস ভিক্টরকে অবাক্ করে দেয়– 'মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারিনি।'

চেঙ্গিস ভিক্টরকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শুনিয়ে বললো– 'যদি মদপান না করতাম, তাহলে মেয়েটি থেকে আলাদা হওয়ার পরও ইমামের কাছে যেতে পারতাম। সময় ছিলো।'

'মদপান করে ভালো করোনি'– ভিক্টর বললো– 'আগামীতে আর পান করো না। মেয়েটিকে হাত করার জন্য দু'ঢোক পান করেছো বেশ; কিন্তু কর্তব্য পালনে ত্রুটি করা ঠিক হয়নি। ইমামের কাছে যাওয়া তোমার কর্তব্য ছিলো। ইমাম সাহেব তোমার অপেক্ষায় পেরেশান হয়ে থাকবেন। দিনের বেলা যাওয়া ঠিক হবে না। আজ রাতে অবশ্যই যেতে হবে।'

ভিক্টর চেঙ্গিসকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি তো আনাড়ি নও চেঙ্গিস। নিজেই তো বুঝতে পারো মেয়েটির উদ্দেশ্য কী এবং সত্যিই সে অন্তর থেকে তোমাকে ভালোবাসে কিনা? তোমাকে বুঝতে হবে, সে তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে, নাকি তোমাকে মনোরঞ্জনের উপকরণে পরিণত করতে চাচ্ছে। তার ফেরেশতাও তো জানে না তুমি গুপ্তচর। আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া আবশ্যক মনে করি যে, নারীর যাদু ফেরাউনদের ন্যায় রাজাদেরকেও সিংহসান থেকে নামিয়ে খড়-কুটোর মধ্যে গুম করে ফেলেছে। নিজের জাতিটাকেই দেখো না, খৃস্টানদের প্রেরিত চিত্তহারি মেয়েরা মিসরে বিদ্রোহের আগুন পর্যন্ত প্রজ্বলিত করেছে এবং সুলতান আইউবীর অতিশয় বিশ্বস্ত সালারদেরকে গাদ্দারে পরিণত করেছে!'

'আমি এতো কাঁচা নই ভিক্টর'– চেঙ্গিস বললো– 'মেয়েটাকে মজলুম মনে হচ্ছে। ও যে রক্ষিতা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু রাজকন্যা বা বেশ্যা নয়। চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা-অলংকার এসবের উপর ভিত্তি করে আমি তাকে শাহজাদি মনে করি। কিন্তু মনের দিক থেকে সে নির্যাতিতা। মেয়েটা পবিত্র ভালোবাসার প্রত্যাশী। তার সকরুণ নিবেদন প্রত্যাখ্যান করে তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে চাইনি আমি। তুমি ভেবো না আমি তার হয়ে যাবো। তার ভালোবাসা প্রয়োজন– আমি তা তাকে দেবো। আমার তথ্য প্রয়োজন– তা আমি তার কাছ থেকে নেবো।'

'তুমি মন থেকেই তাকে কামনা করছো বুঝি?' ভিক্টর সন্দেহ প্রকাশ করে।

'হ্যাঁ ভিক্টর'– চেঙ্গিস জবাব দেয়– 'আমি তোমার থেকে কিছুই লুকাবো না। মেয়েটি আমার হৃদয়ে ঢুকে পড়েছে।'

'অন্তরে ঢুকে পড়া মেয়েরা পায়ের বেড়িতে পরিণত হয়ে যায় চেঙ্গিস।'– ভিক্টর বললো– 'আমি তোমাকে এর চে' বেশি আর কী বলতে

পারি যে, কর্তব্যই সবার বড় ও সবচে' পবিত্র। কর্তব্য ও প্রেমের মাঝে, নেশা ও চেতনার মাঝে, ঈমান ও আবেগের মাঝে এমন কোনো প্রাচীর থাকে না, যা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। থাকে চুলের ন্যায় সরু একটি রেখা, যা সামান্য পদস্খলনে মুছে যায় এবং মানুষ একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যায়। এমনটা যেনো না হয় রাশেদ! তার থেকে তথ্য নিতে নিতে তুমিই বরং নিজেকে তার সম্মুখে উন্মোচিত করে ফেলো।'

রাশেদ চেঙ্গিস একটা অট্টহাসি দিয়ে ভিক্টরের উরুতে চাপড় মেরে বললো– 'এমনটা হবে না দোস্ত, এমনটা হবে না।'

'আর স্মরণ রেখো বন্ধু!'– ভিক্টর বললো– 'মদের সম্পর্ক শয়তানের সঙ্গে। শয়তানের যতোগুলো গুণ আছে, সব মদের মধ্যে আছে। এই অভ্যাসটা গড়ে না ওঠে যেনো। মেয়েটাকে খুশি রাখার জন্য যতোটুকু পান করে চৈতন্য ঠিক রাখা যায়, তার বেশি পান করো না।'

'আচ্ছা, ইমামকে জানানো দরকার, রাতে বিশেষ কারণে আমি যেতে পারিনি। আজ রাতে আসবো।' চেঙ্গিস বললো।

'বাজারে চলে যাও।' ভিক্টর বললো।

ভিক্টর নিজেই বাজারে চলে যায়। তাদের দু-চারজন সঙ্গী বাজারে ব্যবসার আড়ালে দায়িত্ব পালন করছে। ইমামের কাছে ছোটখাট সংবাদ তাদেরই মাধ্যমে পৌঁছানো যায়। ভিক্টর তাদের একজনকে সংবাদ বলে ফিরে আসে।

পরবর্তী রাত। চেঙ্গিস কাজ-কর্ম সেরে তাড়াতাড়ি অবসর হয়ে যায়। কক্ষে প্রবেশ করে ডিউটির পোশাক খুলে অন্য পোশাক পরে কৃত্রিম দাড়িগুচ্ছ পোশাকের তলে লুকিয়ে নেয়। তার ভয়, মেয়েটি হঠাৎ দেখে ফেললে দাড়ির রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। তার পরিকল্পনা, ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসার পথে মেয়েটির সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হবে। যাবেও সে পথেই। এ পথটি নিরাপদ এবং সংক্ষিপ্ত। চেঙ্গিস গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ এলাকাটিতে ঢুকে পড়ে। মাঝামাঝি স্থানে গিয়ে পৌঁছুলে একদিক থেকে একটি পরিচিত ছায়া এগিয়ে আসতে দেখে। চেঙ্গিসের পালানো সম্ভব নয়। ছায়াটা আত্মপ্রকাশ করেছে নিকট থেকে। তৎক্ষণাৎই তার সম্মুখে এসে পৌঁছে বলে ওঠে– 'আজ তুমি আগে-ভাগে এসে পড়েছো, এটা আমার ভালোবাসার ক্রিয়া।'

'আর তুমি এতো তাড়াতাড়ি এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেনো?'– চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করে– 'মধ্যরাতের ঘণ্টা তো এখনো বাজেনি।'

'আমার মন বলছিলো তুমি ঘণ্টা বাজার আগেই এসে পড়বে।' মেয়েটি বললো।

'কিন্তু আমি ভাবিনি তুমি এতো তাড়াতাড়ি এসে পড়বে'– চেঙ্গিস বললো– 'আমি একটি কাজে যাচ্ছিলাম। এ পথেই ফেরার ইচ্ছা ছিলো।'

'কাজটা যদি বেশি জরুরী হয়, তাহলে যাও'– মেয়েটি বললো– 'প্রয়োজন হলে তোমার অপেক্ষায় আমি সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো।'

'কিন্তু এখন তো আমি এখান থেকে নড়তেই পারবো না'– চেঙ্গিস মেয়েটিকে বাহুতে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বললো।

মেয়েটির উন্মুক্ত রেশমী চুলের সৌরভ এবং গায়ের পোশাকে মাখানো সুগন্ধি চেঙ্গিসকে মাতোয়ারা করে তোলে। চেঙ্গিস ইমামের নিকট যাওয়ার পরিকল্পনা মুলতবী করে দেয়। ভাবে, যা-ই হোক না কেনো মেয়েটি খৃস্টান তো বটে। হৃদয়ে প্রভুর প্রতি অনীহা থাকতে পারে। কিন্তু নিজের জাতি এবং ক্রুশকে তো ধোঁকা দিতে পারে না। চেঙ্গিস আশঙ্কা করে, সে যদি ইমামের নিকট যায়, তাহলে মেয়েটি সন্দেহবশত তার পিছু নিতে পারে। তাই ভালোবাসার তীব্রতা প্রকাশ করে সম্মুখে কাজে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়।

মেয়েটি পেয়ালা দুটো মাটিতে রেখে তাতে সোরাহী থেকে মদ ঢেলে একটি পেয়ালা চেঙ্গিসের দিকে এগিয়ে দেয়। চেঙ্গিস অনিচ্ছা প্রকাশ করে– 'তুমি যদি বিষের পেয়ালাও দাও পান করবো; কিন্তু মদপান করবো না।'

'খৃস্টান হয়ে মদকে ঘৃণা করছো কেনো?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'মদের নেশা তোমার রূপ ও ভালোবাসার নেশার উপর জয়ী হয়ে যায়'– চেঙ্গিস বললো– 'কৃত্রিম ও দৈহিক হওয়ার কারণে তোমার অন্তর যেমন বিত্ত-বৈভব ও ভোগ-বিলাসকে গ্রহণ করেনি, তেমনি আমার হৃদয় মদকে বরণ করছে না। কারণ, এর নেশাও কৃত্রিম। আমার উপর তুমি তোমার নেশা আচ্ছন্ন করে দাও।'

মেয়েটি মাথাটা রাশেদ চেঙ্গিসের কোলের মধ্যে ঢেলে দিয়ে তার উপর নিজের নেশা আচ্ছন্ন করে দেয়। রাশেদ চেঙ্গিস এতোক্ষণ তার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা বলেছে, তা ছিলো কৃত্রিম ও মিথ্যা। কিন্তু এবার সত্যি সত্যি মেয়েটির নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। চেঙ্গিস নারীর স্বাদ অনুভব করতে শুরু করে। এখন সে আসক্ত– নারীর আসক্ত। এই আসক্তির মধ্যে নিজেই

পেয়ালাটা তুলে এক নিঃশ্বাসে সবটুকু গিলে ফেলে।

'আরো দাও।' চেঙ্গিস তৃপ্তি ও আনন্দের ঢেকুর তুলে বললো।

মেয়েটি চেঙ্গিসের হাতে ধরা পেয়ালাটা আবার ভরে দেয়। সে ধীরে ধীরে পান করতে থাকে। তারপর মেয়েটির মধ্যে হারিয়ে যায়।

'আচ্ছা, আমরা এভাবে আর কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে মিলিত হবো?'– মেয়েটি বললো– 'একটু ভেবে দেখো, আমি কতো বড় যন্ত্রণার মধ্যে নিপতিত হয়ে আছি। আমার দেহের মালিক একজন আর হৃদয়ের অধিকারী অন্যজন– তুমি। তোমার ভালোবাসা তার ঘৃণাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন আর লোকটাকে মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চলো এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

'কোথায় যাবে?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করে।

'পৃথিবীটা অনেক প্রশস্ত'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'তুমি আমাকে এখান থেকে বের করো। বৃদ্ধ আমার যৌবনটাকে পিষে ফেলছে।'

'ঠিক আছে, যাবো'– চেঙ্গিস বললো– 'ক'টা দিন অপেক্ষা করো। আচ্ছা, আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর এনেছো?'

'এনেছি'– মেয়েটি বললো– 'আমাদের বাহিনীগুলো সমবেত হচ্ছে'। কার বাহিনী কোথায় সমবেত হবে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী, মেয়েটি চেঙ্গিসকে বিস্তারিত জানায়। তবে শেষ পরিকল্পনাটা এখনো সে জানতে পারেনি। চেঙ্গসি তাকে খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে।

দু'জন আলাদা হয়ে দু'দিকে চলে যায়।

এখন তারা দু'জনে দু'জনার।

'আমি ইমাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি বটে'– চেঙ্গিস ভিক্টরকে বললো– 'তবে মেয়েটির নিকট থেকে নতুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এনেছি। মেয়েটি আমার জালে ধরা পড়েছে এবং আমার হাতে খেলতে থাকবে।'

'আমার মনে হয় তুমিও তার জালে আটকা পড়ে গেছো'– ভিক্টর সন্দেহের আঙুল তোলে– 'তোমার ভাবগতি বলছে, তার হৃদয় তোমার হৃদয়ে ঢুকে গেছে।'

'আমি তো তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি, মেয়েটি আমার হৃদয়ে আসন গেড়ে বসেছে'– চেঙ্গিস বললো– 'এখন সে এমনও বলেছে, সে আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে। আমি তাকে ক'দিন অপেক্ষা করতে বলেছি। তাকে

নিয়ে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, খৃস্টানদের পরিকল্পনা পুরোপুরি জানা হয়ে গেলে এসব তথ্য নিজেই কায়রো নিয়ে যাবো। আর মেয়েটিকেও সঙ্গে নেবো।'

'তাকে কখন বলবে, তুমি মুসলমান এবং এখানে গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য এসেছিলে?'

'মিসরের সীমান্তে প্রবেশ করে'– চেঙ্গিস জবাব দেয়– 'এখানে তাকে সামান্যই বলবো।'

চেঙ্গিস প্রেমের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। খৃস্টানদের তথ্য সংগ্রহের জন্য তার যতোটা না চিন্তা, তার চে' বেশি ভাবনা কখন প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের সময় আসবে। সে নিজেই অনুভব করছে, তার ভাবনার ধরন এবং গতিবিধিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসে গেছে। প্রথমবার মদপান করার পর মনে অনুতাপ জাগ্রত হয়েছিলো। কিন্তু গত রাতে নিজ হাতে পেয়ালা তুলে নিয়ে স্বেচ্ছায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে মদপান করেছে। এখন এ কাজের জন্য তার কোনো অনুতাপ নেই। এ এক বিরাট পরিবর্তন।

সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ জানানো হলো, কয়েকজন খৃস্টান সম্রাট ও কমান্ডার আসবেন। তারা রেমন্ডের মেহমান হবেন। চেঙ্গিস তড়িঘড়ি প্রয়োজনীয় আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলে। তার জানা আছে, এসব মেহমানের আপ্যায়নের এক নম্বর উপকরণ মদ।

রাতে যথাসময়ে মেহমানগণ এসে উপস্থিত হন। অল্প ক'জন বিশিষ্ট মেহমান। চেঙ্গিস ও ভিক্টর বুঝে ফেলে, আজকের অনুষ্ঠানটা মূলত ভোজসভা নয়– গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। ভিক্টর ও চেঙ্গিস আসল কর্তব্য পালনের জন্য বিশেষভাবে তৎপর ও প্রস্তুত। বৈঠকে খৃস্টানদের ইন্টেলিজেন্স বিভাগের প্রধান হারমানও উপস্থিত আছেন। মদপানের পালা এবং আক্রমণ বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়ে যায়। এখনকার কথোপকথন প্রস্তাব নয়– সিদ্ধান্ত। আছে পরিকল্পনার কাঠামোও। তাদের কথাবার্তায় বুঝা গেলো, শীঘ্রই অভিযান শুরু হয়ে যাবে।

হারমানকে তার বিভাগের তৎপরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। যেসব এলাকায় তাদের ফৌজ অবস্থান করছে, সেসব অঞ্চলের দায়িত্বশীলদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেনো সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করে গ্রেফতার করে ফেলে। ত্রিপোলীর যেখানে তাদের সবচে' বৃহৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সেখানে আইউবীর গোয়েন্দাদের ধরার বিশেষ

ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হারমান আরো জানায়, এখানে শত্রু গোয়েন্দাদের একটি চক্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদেরকে ব্যর্থ করে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। একজন লোককে ধরতে পারলে তার মাধ্যমে পুরো গ্যাংটির সন্ধান বেরিয়ে আসবে। কায়রোর গোয়েন্দাদের নিকট নির্দেশনা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ওখান থেকে গতকালই একজন এসেছিলো। সে বলেছে, সালাহুদ্দীন আইউবী জোরেশোরে ভর্তি ও প্রশিক্ষণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি জেরুজালেম অভিমুখে যাত্রা করার ইচ্ছা রাখেন।'

রাশেদ চেঙ্গিস ও ভিক্টর যেটুকু তথ্য পেয়েছে, তা-ই যদি কায়রো পৌঁছিয়ে দেয়া যায়, তা সুলতান আইউবীর জন্য যথেষ্ট ছিলো। খৃস্টানরা অতিসত্বর যাত্রা শুরু করবে এবং হাররান ও হালব তাদের গন্তব্য এই সংবাদটা তাড়াতাড়ি সুলতান আইউবীর কাছে পৌঁছানো দরকার।

বৈঠক ভেঙে যায়। চেঙ্গিস ও ভিক্টর মধ্যরাতের পর ডিউটি শেষ করে। চেঙ্গিসের ইমামের নিকট যাওয়া দরকার। সে প্রতি রাতের ন্যায় পোশাক পরিবর্তন করে এবং কৃত্রিম দাড়িগুচ্ছ পোশাকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে রওনা দেয়। আজ তার যেতে অনেক রাত হয়ে গেছে। তাই পথে মেয়েটির হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা নেই। চেঙ্গিস নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ে।

রাশেদ চেঙ্গিসের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। সবুজঘেরা এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় মেয়েটি ঠিকই তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে যায়। চেঙ্গিস কখনো মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেনি, সে কোথায় থাকে এবং কীভাবে দেখে ফেলে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নটা করার ফোরসত পায়নি সে। কারণ, সাক্ষাৎ মাত্রই দু'জনে প্রেমে মজে যাচ্ছে আর মেয়েটি একথা-ওকথায় তাকে ব্যস্ত রাখছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সে ওখানেই ধারে কাছে কোথাও থাকে এবং চেঙ্গিসের পায়ের শব্দ শুনেই বেরিয়ে আসে। কিন্তু চেঙ্গিস বিষয়টি ভেবে দেখেনি। আজ রাতেও বরাবরের ন্যায় একই ঘটনা ঘটলো। চেঙ্গিস ইমামের কাছে যেতে পারলো না। কিন্তু তার মনে কোন অনুতাপও জাগলো না। মুহূর্ত মধ্যে মেয়েটি তাকে প্রেমে মজিয়ে ফেলে। আজ সে এই প্রথম করুণভাবে নিজের অসহায়ত্ব ও দুঃখের কাহিনী শোনাতে শুরু করে যে, চেঙ্গিসের পা উপড়ে যায়।

'আমাকে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে নাও'– মেয়েটি গভীর আবেগের সাথে কম্পিত কণ্ঠে বললো– 'দর্শকরা আমাকে রাণী-রাজকন্যা মনে করে। কিন্তু

বাস্তবে আমার জীবনটা এমন একটা জাহান্নাম, যাকে কাছে থেকে দেখলে তোমার মাথার চুলের আগা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠবে। আমি মুসলিম পিতা-মাতার সন্তান। কিন্তু রূপ আমাকে এমন এক অত্যাচারের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভের কোন লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার বয়স যখন পনের বছর ছিলো, তখন আমার পিতা আমাকে এক আরব ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করে দেন। আব্বা গরীব ছিলেন না। তবে ছিলেন অর্থের কুমির। আমরা ছয় বোন ছিলাম। তিনি আমাদেরকে একদম দেখতে পারতেন না। আমার বড় দু'বোন পিতার আচরণে বিরক্ত হয়ে দু'ব্যক্তির হাত ধরে চলে যায়। আর আমাকে তিনি বিক্রি করে দেন। এক বছর পর ব্যবসায়ী আমাকে উপহারস্বরূপ এক খৃস্টান অফিসারের হাতে তুলে দেন।

কিছুদিন পর অফিসার যুদ্ধে নিহত হলে আমি তার সংসার থেকে পালিয়ে আসি। কিন্তু যাবো কোথায়! এক খৃস্টান আমাকে আশ্রয় প্রদান করে। কিন্তু আশ্রয়ের নামে সে আমার শরীরকে উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে ফেলে। আমি বেশ্যা ছিলাম না। কিন্তু সে আমাকে কয়েক দিনের জন্য খৃস্টান বাহিনীর উচ্চস্তরের অফিসারদের গণিকা হিসেবে ভাড়া দিতে থাকে। সেই লোকটি এবং সে যাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করতো, সবাই আমাকে অলংকার দিয়ে লাল করে দেয় এবং রাজকন্যার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এদিক থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও সুখী ছিলাম। কিন্তু আত্মিক শান্তি আমার কপালে জুটেনি। এই পেশার সুবাদে বড় বড় সামরিক অফিসার-কর্মকর্তার সঙ্গে আমার উঠাবসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে আমি অভিজ্ঞ হয়ে উঠি। আমি সম্রাট ও শীর্ষ স্তরের কমান্ডারদের শয্যা পর্যন্ত পৌঁছে যাই। তারা আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করে।

একবার আমাকে বাগদাদ পাঠানো হলো। দায়িত্ব দেয়া হলো নূরুদ্দীন জঙ্গীর এক সালারকে তার বিরুদ্ধে উস্কে দেয়া। আমি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্বটা পালন করেছি। আমি যদি তোমাকে আমার গুপ্তচরবৃত্তির পুরো কাহিনী শোনাতে শুরু করি, তাহলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাবে। বোধ হয় বিশ্বাসও করবে না। কাহিনী অনেক দীর্ঘ। যা হোক সেই কমান্ডার আমাকে গণিকা হিসেবে রেখে দেয়। লোকটা বৃদ্ধ। তবে আমাকে নিয়ে বেশ ফূর্তি করতো। সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। সম্ভবত অন্যদের বুঝাতে

চাইতো, সে বৃদ্ধ নয় এবং আমার মতো একটি রূপসী যুবতীকে আনন্দে রাখতে সক্ষম। লোকটি আমার সকল আবদার-আকাঙ্খা পূরণ করতো। চাহিদার কথা মুখ দিয়ে বের করতে দেরি; কিন্তু দিতে বিলম্ব করতো না। আমি তার সঙ্গে আক্রায় ছিলাম। সেখানে ঘটনাক্রমে এক মুসলমান গোয়েন্দার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। সে দামেশ্‌ক থেকে এসেছিলো।'

'তার নাম কী?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করে।

'নাম শুনে তোমার কী লাভ হবে?' মেয়েটি উত্তর দেয়– 'তুমি তো তাকে চেনো না। আমার কথা শোনো। তোমার ভালোবাসা আমার মুখের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে, আমার হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছে। আমি তোমার সম্মুখে এমন সব তথ্যাদি ফাঁস করে দিচ্ছি, যা আমাকে কারাগারে পাঠাতে পারে, যেখানে মানুষরূপী হায়েনারা আমাকে অসহনীয় নির্যাতনে মেরে ফেলবে। কিন্তু আমি তোমার জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করবো না। যা হোক, আমি বলছিলাম দামেশ্‌কের কথা। সেই গোয়েন্দা ধরা পড়েছিলো এবং তাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো।

আমি অনেক বড় একজন অফিসারের রক্ষিতা ছিলাম। সেই গোয়েন্দার তামাশা দেখার জন্য আমি পাতাল কক্ষে চলে গেলাম। তাকে এমন নিষ্ঠুর ও নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছিলো যে, আমার গা শিউরে ওঠে। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিলো, তোমার সঙ্গীরা কোথায় এবং এ যাবত তুমি কী কী তথ্য জ্ঞাত হয়েছো? লোকটির পিঠ থেকে রক্ত ঝরছিলো। চেহারাটা নীল বর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তারপরও সে বলছিলো– আমার শিরায় মুসলমান পিতার রক্ত প্রবাহমান। আমি আমার কোনো সহকর্মীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। শুনে আমার শিরাগুলো সব সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভাবি, আমার শিরায়ও তো মুসলিম পিতামাতার রক্ত আছে। আমার মধ্যে ভূমিকম্পের ন্যায় এক ধরনের দোলা খেলে যায়। আমি সংকল্প করি এই মুসলমানটাকে পাতাল প্রকোষ্ঠ থেকে বের করবো। আমি আমার মনিবের পদমর্যাদা, নিজের রূপের জাল আর তিন-চার টুকরো সোনা ব্যবহার করি। একদিন সকালে আমার মনিব আমাকে খবর শোনালেন পাতাল কক্ষ থেকে মুসলমান গোয়েন্দাটা পালিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ জানতো না লোকটা পালায়নি; বরং আমি তাকে পাতাল থেকে সরিয়ে উপরের এক কক্ষে রেখেছি। আমার মনিব যখন আমাকে লোকটার পলায়নের খবর শোনাচ্ছিলেন, সেই পলাতক গোয়েন্দা উক্ত শহরেই

অবস্থান করছিলো। আমি আমার এক মুসলমান চাকরের মাধ্যমে তার আত্মগোপনের ব্যবস্থা করেছিলাম। সেও তোমারই ন্যায় সুদর্শন যুবক ছিলো। পাতাল কক্ষ তাকে লাশে পরিণত করেছিলো। আমি তাকে ভিটামিন ওষুধ ও পুষ্টিকর খাবার খাইয়ে সুস্থ করে তুলেছিলাম। রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি তার কাছে যেতাম। সে আমার সত্ত্বার মধ্যে ঈমান জাগ্রত করে দিয়েছে। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম, আমি মুসলিম কন্যা। এখন তোমাকে যে কাহিনী শোনাচ্ছি, তাকেও শুনিয়েছিলাম। সে আমাকে বলেছিলো, তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি বললাম, আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির কৌশল শিখিয়ে দাও। আমি নিজের জাতি ও ধর্মের জন্য কিছু করতে চাই। সে আমাকে আক্রার তিনজন লোকের নাম-ঠিকানা বলেছিলো। পরে তাদের সঙ্গে সাক্ষাতেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো।

লোকটা সুস্থ্য হয়ে উঠলে আমি তাকে শহর থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেই। তার চলে যাওয়ার পর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তার সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকি। তারা আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির পাঠ শেখাতে থাকে। কোর্স সমাপ্ত করে একসময় আমি তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কাজ করতে শুরু করি। একে তো আমি উচ্চপদসস্থ একজন সেনা অফিসারের রক্ষিতা, তদুপরি আমার রূপ-যৌবনের কারণে অন্য বহু অফিসার আমার বন্ধুত্বের প্রত্যাশী ছিলো। এগুলোকে আমি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করি। সম্ভ্রম তো আগেই খুইয়ে ফেলেছি। নির্লজ্জতা এবং যার-তার বিছানায় রাত কাটানো আমার স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। পাপী লোকদের সঙ্গে জীবন-যাপন করে আমি একজন প্রতারক হয়ে ওঠেছিলাম। তাদেরকে অনেক সুদর্শন টোপ দিয়েছি এবং মুসলমানদের অনেক দামি দামি তথ্য দিয়েছি। এই যে গোয়েন্দার কাহিনী শোনালাম, সে আমাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কথা শোনাতো। আমি আইউবীকে ফেরেশতা মনে করি। আমার মনে আকাঙ্খা জাগে, আমি জাতির জন্য কিছু করে যাবো এবং একবারের জন্য হলেও সুলতান আইউবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো আর সেই সাক্ষাতকেই আমি আমার হজ্ব মনে করবো। এখন আমি সেই কমান্ডারের সঙ্গে এখানে এসেছি। না এসে পারিনি। খৃস্টানরা বিপুল শক্তি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছে। আমি তাদের সমস্ত তথ্য জেনে নিয়েছি। এখন আমার এমন একজন লোক প্রয়োজন, যে আইউবীর গুপ্তচর।'

'এতো বীরত্বের সঙ্গে তুমি এসব তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছো কেনো?'– চেঙ্গিস মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি সত্যিই যদি গোয়েন্দা হয়ে থাকো, তাহলে তুমি একেবারেই আনাড়ি। তুমি আমার ভালোবাসার উপর নির্ভর করছো। যদি বলি, আমি তোমা অপেক্ষা ক্রুশকে বেশি ভালোবাসি এবং আমার অফাদারী ক্রুশের প্রতি, তাহলে তুমি কী করবে? বুদ্ধিমান গোয়েন্দা কর্তব্যের খাতিরে নিজের সন্তানকেও কুরবান করে থাকে।'

'যদি আসল কথাটা বলি, তাহলে মানতে বাধ্য হবে। আমি আনাড়ি নই'– মেয়েটি বললো– 'আমি জানি, নিশ্চিত করেই জানি, তুমি খৃস্টান নও–তুমি মুসলমান এবং মিসরের চর।'

রাশেদ চেঙ্গিস নিজের অলক্ষ্যেই চমকে ওঠে, যেনো মেয়েটি তাকে দংশন করেছে। মদের নেশা আর রোমাঞ্চকর আবেগের মাদকতা সহসা এমনভাবে উবে যায়, যেনো ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে গেছে। চেঙ্গিস কিছু বলার চেষ্টা করে। কিন্তু মনে হলো যেনো তার কিছুই বলার নেই। মেয়েটি তো ঠিকই বলেছে।

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটির চাপা হাসির শব্দ শুনতে পায়। মেয়েটি বললো– 'বলো, আমি কি আনাড়ি?'

কোন উত্তর দেয়া চেঙ্গিসের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মেয়েটি সত্যিই যদি মুসলমান হয়ে থাকে, তাহলে নিজের পরিচয়টা কি স্বীকার করে নেয়া উচিত? নিয়ম তো ছিলো এক দলের গোয়েন্দা নিজ দেশেরই অপর দলের কাছেও পরিচয় গোপন রাখবে। চেঙ্গিস তো এও জানে না, মেয়েটা কোন্ স্তরের গোয়েন্দা। এমনও তো হতে পারে, সে যা বলেছে সবই মিথ্যা এবং আসলেই সে খৃস্টানদের গুপ্তচর। তাছাড়া সুলতান আইউবীর তো কোন নারীকে গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহার করেন না। এই মেয়েটি যদি মুসলমানদের চরবৃত্তি করেও থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ নিজের থেকেই করছে। এমন একটি মেয়েকে বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি।

'চুপ হয়ে গেলে কেনো?'– মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে– 'আমি কি ভুল বলেছি?'

'সম্পূর্ণ ভুল বলেছো'– রাশেদ চেঙ্গিস জবাব দেয়– 'তুমি আমাকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছো।'

'কীরূপ সমস্যা?' মেয়েটি জানতে চায়।

'এই যেমন আমি তোমাকে গ্রেফতার করাবো, নাকি ভালোবাসার খাতিরে চুপ থাকবো'– চেঙ্গিস বললো– 'আমি খৃস্টান এবং পাক্কা ক্রুসেডার।'

দু'জনই মাটিতে বসা। মেয়েটি নিজের উরুর নীচ থেকে কিছু একটা বের করে চেঙ্গিসের কোলের মধ্যে রেখে দিয়ে বললো– 'এই নাও তোমার দাড়ি। কাল যখন তুমি আমার কাছে ছিলে, তখন তোমার চোগার পকেট থেকে এগুলো বের করেছিলাম। আজো বের করে নিয়েছি। কিন্তু তুমি কালও টের পাওনি, আজও না।'

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটির ভালোবাসা এবং মদের নেশায় এমনই মজে গিয়েছিলো যে, তার কোনো হুঁশ-জ্ঞান ছিলো না।

'এক রাতে এই দাড়ি আমি তোমার মুখে দেখেছিলামও'– মেয়েটি বললো– 'এই দাড়ি স্থাপন করে তুমি কক্ষ থেকে বের হয়েছিলে। আমি তোমাকে পথে থামিয়ে দেই এবং তুমি যখন আমাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরেছিলে, তখন তোমার চোগার উভয় পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছিলাম। আমার হাত দাড়ি অনুভব করেছিলো।'

'কৃত্রিম দাড়ি দেখেই তুমি কীভাবে নিশ্চিত হলে যে, আমি গোয়েন্দা?'

'তুমি যে ধারায় আমার কাছে খৃস্টানদের যুদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে, সে ধারাটা গোয়েন্দাদের'– মেয়েটি বললো– 'আমাকে তুমি যেসব প্রশ্নের উত্তর এনে দিতে বলেছিলে, সেসব প্রশ্ন গোয়েন্দা ছাড়া অন্য কারো জানার বিষয় নয়। আর মদপান করতে অস্বীকার করে শুধু মুসলমানরাই।'

মেয়েটি বলতে বলতে থেমে যায়। নিজের একটা বাহু চেঙ্গিসের কাঁধের উপর রেখে তার গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে বললো– 'তুমি আমাকে ভয় করছো। তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি মুসলমান? আমার অন্তরটা তোমাকে কীভাবে দেখাবো। আমরা দু'জন একই পথের পথিক। আমি তোমাকে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা মনে করে হৃদয়ে স্থান দেইনি। তবে তোমাকে আমার কেনো যে ভালো লাগলো, বলতে পারবো না। আমার এমনটা মনে হয়েছিলো, তুমি আর আমি আকাশেও একত্রে ছিলাম, পৃথিবীতেও একত্রিত হয়েছি এবং দু'জনে এক সাথেই উত্থিত হবো। তুমি বললে আমি তোমার গোয়েন্দা হওয়ার পক্ষে আরো একাধিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারি। কিন্তু আমি তোমাকে রক্ষা করবো। আমি এই সংকল্পও করে রেখেছি, আমরা দু'জন অনেক মূল্যবান তথ্য নিয়ে এখান থেকে একত্রে বেরিয়ে যাবো। এসব তথ্য যদি সময়মতো কায়রো না পৌঁছে, তাহলে হাররান, হাল্‌ব, হামাত, দামেশ্‌ক ও বাগদাদ খৃস্টানদের

সয়লাবে ডুবে যাবে। মিসরকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সুলতান আইউবী এখানকার আয়োজন-প্রস্তুতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর। সময় নষ্ট করো না। আমার পক্ষে এখান থেকে একাকি বের হওয়া সম্ভব ছিলো না। আমাকে তোমার সঙ্গ প্রয়োজন। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণের নামে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো। তুমি আমার রক্ষী সাজবে। তাহলে কেউ আমাদেরকে সন্দেহ করবে না।'

রাশেদ চেঙ্গিসের মুখে কোন কথা নেই। মেয়েটি পেয়ালায় মদ ঢালে। মদভর্তি পেয়ালাটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবেগমাখা কণ্ঠে বললো– 'তুমি ভয় পেয়ে গেছো। মদটা পান করে নাও। এটি মদের শেষ পেয়ালা। এরপর আমরা তওবা করে নেবো।'

মেয়েটি চেঙ্গিসের উপর নিজের রেশমী চুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে পেয়ালাটা তার ঠোঁটের সঙ্গে লাগিয়ে ধরে। চুলের কোমল ছোঁয়া আর সৌরভ, নারী দেহের নরম পরশ আর উত্তাপ এবং মদ সবকিছু মিলে চেঙ্গিসের মুখ খুলে দেয়– 'তুমি সত্যিকার অর্থেই গোয়েন্দা। অন্যথায় দেড়টি বছর সব গোয়েন্দার প্রধান গুরু হারমানের ছায়ায় থাকা সত্ত্বেও তিনি ধরতে পারেননি আমি গোয়েন্দা। আমি তোমার বিচক্ষণতার কাছে হার মানলাম। তুমি ঠিকই বলেছো, আমরা একই পথের পথিক। আমার সঙ্গে তুমি কায়রো চলো।'

'অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে'– মেয়েটি বললো– 'আগামীকাল এখানে এসে সাক্ষাৎ করবো। আমি তোমাকে আরো এমন সব তথ্য জানাবো, যা জানা তোমার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হবে না।'

রাতের শেষ প্রহর। রাশেদ চেঙ্গিস নিজ কক্ষে গিয়ে পৌঁছে। ইতিপূর্বে এতো রাতে ফিরে কখনো সে ভিক্টরকে জাগায়নি। সকালে ঘুম থেকে জেগে তাকে রাতের কাহিনী শোনাতো। কিন্তু আজ রাত চেঙ্গিসের আনন্দের জোয়ার ধৈর্যের বাঁধ মানছে না। অন্যরকম এক উত্তেজনা বিরাজ করছে তার হৃদয় জগতে। নিজেকে একজন সফল সেনানায়ক মনে হচ্ছে তার। যে মেয়েটি তাকে হৃদয় দিয়েছিলো, যে সুন্দরী মেয়েটিকে সে ভালোবেসেছিলো; সে মুসলমান এবং সুলতান আইউবীর একজন অভিজ্ঞ গুপ্তচর। একটি রূপসী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপোলী ত্যাগ করতে যাচ্ছে, এটিও কম আনন্দের বিষয় নয়।

রাশেদ চেঙ্গিস তখনই ভিক্টরকে জাগিয়ে তোলে এবং জানায়, আরে, মেয়েটি তো আমাদেরই গোয়েন্দা সদস্য! চেঙ্গিস ভিক্টরকে মেয়েটির রাতের পুরো কাহিনী শোনায়।

'তুমি কি তাকে বলে দিয়েছো তুমি গোয়েন্দা?' ভিক্টর জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ'– চেঙ্গিস জবাব দেয়– 'বলাই প্রয়োজন ছিলো।'

'আমার কথাও বলেছো?'

'না'– চেঙ্গিস উত্তর দেয়– 'তোমার সম্পর্কে কোনো কথা হয়নি।' ভিক্টরকে চুপচাপ দেখে চেঙ্গিস বললো– 'তুমি কি মনে করছো, আমি ভুল করেছি? আমি আনাড়ি নই ভিক্টর!'

'আমার কথা না বলে তুমি ভালো করেছো'– ভিক্টর বললো– 'আর এ দাবিটা করো না, তুমি আনাড়ি নও।'

'আমি কি ভুল করেছি?' চেঙ্গিস পুনরায় জিজ্ঞেস করে।

'হতে পারে তুমি অনেক ভালো কাজ করেছো'– ভিক্টর বললো– 'আর যদি ভুল করে থাকো, তাহলে এই ভুল সাধারণ ভুল নয়। তুমি সম্ভবত ভুলে গেছো, একজন মাত্র গুপ্তচর একটি বাহিনীর জয়ের কারণ হতে পারে। আবার হতে পারে পরাজয়ের কারণও। তুমি জানো, সুলতান আইউবী খৃস্টানদের এই প্রস্তুতি সম্পর্কে অনবহিত। আমরা যদি ধরা পড়ে যাই আর এই তথ্য আমাদের সঙ্গে কয়েদখানায় চলে যায় কিংবা জল্লাদের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তাহলে 'সকল যুদ্ধে বিজয়ী সেনানায়ক' বলে খ্যাত সুলতান আইউবী ইতিহাসে 'পরাজিত সিপাহসালার' আখ্যায়িত হবেন।'

'না'– চেঙ্গিস পূর্ণ আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো– 'সে আমাকে ধোঁকা দেবে না। সে মুসলমান। আমি আগামী রাতে আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করবো। এখন আর আমাদের ইমামের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই তথ্য আমি নিজেই কায়রো নিয়ে যাবো। আমার হৃদয়ের রাণী আমার সঙ্গে থাকবে। তবে আমার অবর্তমানে কারো মনে সন্দেহ জাগবে না, আমি এখান থেকে তথ্য নিয়ে পালিয়ে গেছি। কারণ, মেয়েটিও যেহেতু আমার সঙ্গে যাবে, তাই প্রচার করে দিও তুমি আমাকে ও তাকে গোপনে মিলিত হতে দেখেছো এবং আমি মেয়েটিকে নিয়ে জেরুজালেমের দিকে চলে গেছি। ঘটনাটিকে প্রেমঘটিত বলে প্রচার করতে হবে।'

ভিক্টর গভীর ভাবনায় হারিয়ে যায়। রাশেদ চেঙ্গিস মদের নেশায় ঝিমুতে শুরু করে।

চেঙ্গিস যখন ভিক্টরের কক্ষে প্রবেশ করে, তখন অদূরে অবস্থিত অফিসারদের বেডরুমগুলোর একটিতে মেয়েটিও প্রবেশ করে। কক্ষের বাসিন্দা ঘুমিয়ে আছে। মেয়েটি কক্ষে ঢুকেই অবলীলায় তার একপা ধরে সজোরে ঝটকা টান দেয়। লোকটি বিড় বিড় করে ওঠে। মেয়েটি হেসে বললো– 'ওঠো, ওঠো, শিকার মেরে এসেছি।'

লোকটি ধড়মড় করে শয্যা ছেড়ে উঠে বসে বাতি জ্বালায়। তারপর মেয়েটিকে বাহুতে জড়িয়ে ধরে বিছানায় ফেলে দেয়। কিছু সময় অশ্লীলতার নগ্ন প্রদর্শনী চলে। তারপর মেয়েটি যে সোরাহীতে করে চেঙ্গিসের জন্য মদ নিয়ে গিয়েছিলো, তার অবশিষ্টটুকু দু'টি পেয়ালায় ঢেলে দু'জনে মিলে পেয়ালা দুটো খালি করে ফেলে।

'এবার বলো, কী সংবাদ নিয়ে এসেছো?'

'লোকটি গোয়েন্দা'– মেয়েটি বললো– 'আর মুসলমান।'

'তাহলে তো হারমানের সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হলো।'

'সম্পূর্ণ সঠিক'– মেয়েটি বললো– 'মদ আর আমার যাদু ক্রিয়া করেছে। অন্যথায় হারমানের ন্যায় অভিজ্ঞ গোয়েন্দাও তাকে ধরতে পারতেন না। যদি তার কৃত্রিম দাড়ি আমার হাতে না পড়তো, তাহলে বোধয় আমিও ব্যর্থ হতাম। আমার সন্দেহ তো সেদিনই দূর হয়ে গিয়েছিলো, যেদিন প্রথম সে মদপান করতে অস্বীকার করে। মুসলমান না হলে মদপান করবে না কেনো। তাতেই আমি বুঝে ফেলেছি, লোকটা মুসলমান। আমি তাকে বলেছি, আমি পবিত্র ভালোবাসার জন্য ছটফট করছি। তখনই সে সরলমনে আমাকে ভালোবেসে ফেলে–পবিত্র ভালোবাসা। এটাও প্রমাণ করে লোকটা মুসলমান। আমাদের লোকেরা তো ভালোবাসার কথা বলে প্রথমে বস্ত্র উদোম করে থাকে।'

'ভালোবাসা পবিত্র হোক কিংবা অপবিত্র নারীর দেহ পাহাড়কেও চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম'– লোকটি বললো– 'এই দুর্বলতা প্রত্যেক মুসলমানের মধেও বিরাজমান। আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার রূপ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দিতে সক্ষম হবে। নারী সশরীরে কাছে থাকুক কিংবা নিছক কল্পনায়, মানুষকে অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে।'

লোকটা খৃস্টানদের ইন্টেলিজেন্স বিভাগের অফিসার এবং হারমানের নায়েব। হারমানের কোনোভাবে সন্দেহ হয়ে গিয়েছিলো, চেঙ্গিস গুপ্তচর। একে তো তিনি একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা; তদুপরি তাকে নির্দেশ দেয়া

হয়েছে, কাউকে গোয়েন্দা বলে সামান্যতম সন্দেহ হলেও তাকে ধরে ফেলো। রাশেদ চেঙ্গিসকে সম্ভবত রাতে তিনি মসজিদে যেতে দেখেছিলেন। তাই নায়েবকে নির্দেশ দেন, কোনো নারীর ফাঁদে ফেলে দেখো লোকটা সন্দেহমুক্ত নাকি সন্দেহভাজন। এ বিভাগে বেশ ক'জন নারী কাজ করছে, যারা একজন অপেক্ষা অপরজন বেশি রূপসী। হারমানের নায়েব এই মেয়েটিকে নির্বাচন করে চেঙ্গিসের পেছনে লেলিয়ে দেয়। মেয়েটি তার বিদ্যায় অভিজ্ঞ। অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে সে একটি নাটক মঞ্চস্থ করে, যার বিস্তারিত আপনারা পড়েছেন। চেঙ্গিস কখনো ভাবেনি, প্রতি রাতে ইমামের নিকট যাওয়ার সময় এই যে মেয়েটি তার পথ আগলে দাঁড়ায়, আসে কোথা থেকে এবং কীভাবে জানে যে সে যাচ্ছে? মেয়েটি ছায়ার মতো তার পিছে লাগা ছিলো। তার প্রতিটি গতিবিধিই সে প্রত্যক্ষ করতো।

'আমি তাকে তোমার গড়ে দেয়া বেদনাদায়ক কাহিনী শোনালে সে আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে'– মেয়েটি বললো– 'তৎক্ষণাৎ সে বিশ্বাস করে নেয়, আমি মুসলমান এবং সত্যি সত্যিই আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করছি।'

'মুসলমান আবেগপ্রবণ জাতি'– হারমানের নায়েব বললো– 'বরং এরা এক বিস্ময়কর ও অভিনব সম্প্রদায়। মুসলমানরা ধর্মের নামে এমন সব ত্যাগ স্বীকার করে বসে, যা অন্য কোন জাতি পারে না। যুদ্ধের ময়দানে একজন মুসলমান দশ-পনেরজন খৃস্টানের মোকাবেলা করতে সক্ষম এবং করছেও। একে তারা ঈমানী শক্তি বলে অভিহিত করে। আটজন, দশজন কমান্ডো সৈনিকের আমাদের পেছনে চলে যাওয়া, গেরিলা আক্রমণ করা, আমাদের খাদ্যসামগ্রীতে অগ্নি সংযোগ করে উধাও হয়ে যাওয়া, ঘেরাও-এর মধ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া, বের হতে না পারলে নিজেদেরই লাগানো আগুনে স্বেচ্ছায় ভষ্মীভূত হওয়া কোন সাধারণ বীরত্ব নয়। এ এক অস্বাভাবিক শক্তি। আমি তাদের এই শক্তিকে অলৌকিক বিষয় মনে করি। আমাদের কিছু বিশেষজ্ঞ আছেন, যারা মানব চরিত্রের দুর্বল শিরাগুলো চেনেন। তারা মুসলমানদের এই শক্তিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে এমন কতিপয় পন্থা আবিষ্কার করে নিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় উন্মাদনাকে তাদের দুর্বলতায় পরিণত করছে। এখন তারা যাকে ধর্মীয় চেতনা বলে মনে করে, সেটাই মূলত তাদের দুর্বলতা। এক্ষেত্রে ইহুদীরা

অনেক কাজ করেছে। আমরা কতিপয় ইহুদী ও খৃস্টানকে মুসলমানদের আলেমের রূপে প্রেরণ করে এই সাফল্য অর্জন করেছি। মুসলিম অঞ্চলের বেশক'টি মসজিদের ইমাম মূলত ইহুদী কিংবা খৃস্টান। তারা কুরআন-হাদীসের এমন ব্যাখ্যা সর্বসাধারণের মাঝে গ্রহণযোগ্য করে দিয়েছেন, যার উপর ভিত্তি করে মুসলমান ভুল বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অনুসারী হয়ে চলেছে। তাদের সফল তৎপরতার ফলে মুসলমান এখন এমন সব কর্মকাণ্ডকে ইসলাম বা দীন বলে বিশ্বাস করে, যা মূলত ইসলাম পরিপন্থী। এখন তাদেরকে ধর্মের নামে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়ানো যায়, আমরা যার মহড়া করিয়ে দেখিয়েছি। মুসলমানদের মাঝে আমরা যৌন উন্মাদনাও সৃষ্টি করে দিয়েছি। এখন যে মুসলমানের হাতে বিত্ত আর ক্ষমতা আসে, আগে সে হেরেম তৈরি করে এবং তাকে সুন্দরী যুবতীদের দ্বারা সাজায়। এই নারীপূজা এখন মুসলমানদের উচ্চস্তর থেকে শুরু করে নিম্নস্তরেও ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা একাধিক পন্থায় মুসলিম মেয়েদের মাঝে কল্পনাপূজা ও মনস্তাত্ত্বিক বিলাসিতা ঢুকিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া মুসলমান একটি আবেগপ্রবণ জাতি। তুমি তো দেখেছো, তোমার শিকার মুসলমানটির আবেগে খোঁচা দিয়েছো আর অমনি সে তোমার জালে ফেঁসে গেলো। আবেগ বড় একটি দুর্বলতা। হারমান বলে থাকেন, অদূর ভবিষ্যতে এই জাতিটা কল্পনার দাস হয়ে যাবে এবং বাস্তব থেকে দূরে সরে যাবে। তখন আর আমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন হবে না। চিন্তা-চেতনার দিক থেকে মুসলমান আমাদের দাসানুদাস হয়ে যাবে। নিজেদের নীতি-আদর্শ ত্যাগ করে তারা আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে গৌরববোধ করবে।'

'আমার ঘুম আসছে'– মেয়েটি বিরক্ত কণ্ঠে বললো– 'আমি তোমাকে একটি শিকার দিয়েছি। তুমি ওটাকে এখনই গ্রেফতার করে নাও।'

'না'– নায়েব বললো– 'তোমার কাজ এখনো শেষ হয়নি। গ্রেফতার করতে চাইলে তার সঙ্গে এ নাটক খেলার প্রয়োজন ছিলো না। তোমাকেও এতো কষ্ট দেয়া হতো না। আমরা তো সামান্যতম সন্দেহেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারি। আমরা এখনই তাকে গ্রেফতার করবো না। তার মাধ্যমে তার সেই সকল সহকর্মীর সন্ধান বের করতে হবে, যারা ত্রিপোলীতে গোয়েন্দাগিরি করছে। তাদের মধ্যে নাশকতাকারী কমান্ডোও থাকতে পারে। তার মাধ্যমে অন্যান্য শহরের শত্রু গোয়েন্দাদেরও চিহ্নিত করা যেতে পারে। তুমি তার সঙ্গে আবারও দেখা করো। তাকে বলবে,

আমি সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি। এখন আরো কয়েকজন গোয়েন্দার প্রয়োজন। এ-ও বলবে, এক স্থানে খৃস্টানরা বিপুল পরিমাণ দাহ্য পদার্থ ও মূল্যবান মালামাল মজুদ করে রেখেছে। আক্রমণে যাওয়ার সময় এগুলো সঙ্গে নিয়ে যাবে। আমাদেরকে এগুলো ধ্বংস করতে হবে। এ কাজের জন্য তুমি আমাদের এখানকার কমান্ডোদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও।'

'আমি বুঝে গেছি'– মেয়েটি বললো– 'কিন্তু এমনও তো হতে পারে, সে তার সঙ্গীদের তথ্য ফাঁস করবে না।'

হারমানের নায়েব মেয়েটির মাথার চুল, নগ্ন কাঁধ ও বুকে হাত বুলিয়ে বললো– 'কেনো, তোমার এসব অস্ত্র কি অকর্মণ্য হয়ে গেছে? নিজের মুখোশ খুলে দিয়ে লোকটা দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এবার তোমাকে ভেতরে ঢুকে কোণায় কোণায় তল্লাশি নিতে হবে। এ কাজটাও তুমি করতে পারবে। আমি সকালে হারমানকে তোমার কৃতিত্বের কথা অবহিত করবো।'

রাতের আহারের পর চেঙ্গিস ও ভিক্টর কর্তব্য পালন করছে। এমন সময় হারমান এসে হাজির হন। তিনি চেঙ্গিসের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ হাত মেলান এবং বললেন– 'তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে, আমাদের বাহিনী ইতিহাসের সর্ববৃহৎ আক্রমণ অভিযানে রওনা হতে যাচ্ছে। আমরা তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করাবো। ভিক্টরও সঙ্গে থাকবে। যেহেতু দু'-তিনজন সম্রাট সঙ্গে থাকবেন, তাই তোমাদেরকেও সঙ্গে থাকা আবশ্যক।'

'আমি প্রস্তুত আছি।' চেঙ্গিস বললো।

হারমান রিপোর্ট পেয়ে গেছেন, রাশেদ চেঙ্গিস গুপ্তচর এবং আজ রাত তার বিভাগের এক রূপসী যুবতী তার গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদেরও নাম-ঠিকানা উদ্ধার করবে। হারমান মেয়েটিকে নতুন কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন এবং নায়েবকে বললেন, চেঙ্গিসের দলের সন্ধান বের না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটি একাকি তার সঙ্গে মিলিত হতে থাকবে। পাশাপাশি সতর্ক থাকবে, যেনো চেঙ্গিসের কোনো সন্দেহ জাগতে না পারে।

চেঙ্গিসের কোনো কাজে মন বসছে না। গুনে গুনে ক্ষণ অতিক্রম করছে। এতো বড় সাফল্য তার কখনো অর্জিত হয়নি। একদিকে এতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পেয়েছে গেছে, অপরদিকে একটি অতিশয় রূপসী তরুণীও তার মুঠোয় এসে পড়েছে। এ এক বিরাট অর্জন। এ রাতটাকে সে ত্রিপোলীতে শেষ রাত

মনে করছে। আগামী রাত তথ্য ও মেয়েটিকে নিয়ে ত্রিপোলী ত্যাগ করছেই। মনে আনন্দের ঠাঁই হয় না রাশেদ চেঙ্গিসের।

অবশেষে ডিউটি শেষ করে রাশেদ চেঙ্গিস কক্ষে চলে যায়। ভিক্টরও তার সঙ্গে আছে। চেঙ্গিস পোশাক পরিবর্তন করে। আজ কৃত্রিম দাড়িগুচ্ছ নেয়নি। প্রয়োজন নেই। খঞ্জরটা চোগার পকেটে লুকিয়ে নেয়।

'আমি তোমাকে শেষবারের মতো বলছি'– ভিক্টর বললো– 'নারী ও মদের নেশা থেকে মুক্ত থেকে মাথা ঠিক রেখে কথা বলবে। আমার ভয় হচ্ছে, পুরোপুরি যাচাই-বাছাই না করে তুমি তাকে আমাদের গোপন তথ্য দিয়ে দেবে।'

'শোনো ভিক্টর'– চেঙ্গিস বিস্ময়কর এক ভঙ্গিতে বললো– 'আমি মেয়েটার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনবো না। আমি তার সঙ্গে একাধিকবার দীর্ঘ সাক্ষাৎ করেছি, তার পুরো কাহিনী শুনেছি। সে এখন আমার ভালোবাসার মানুষ। আমি তাকে শতভাগ বিশ্বাস করি। তার সঙ্গে যেহেতু তোমার কোনো কথা হয়নি, তাই তুমি বুঝবে না। তুমি আমাকে পাগল মনে করো না। এটা আমার জীবনের প্রথম ও শেষ ভালোবাসা।'

ভিক্টর নীরব হয়ে যায়। চেঙ্গিসের বলার ধরণ থেকেই সে বুঝে ফেলেছে লোকটার হুঁশ–জ্ঞান ঠিক নেই। এখন সে একটি মেয়ের প্রেমে মাতোয়ারা। ভিক্টর বুঝে, রাশেদ চেঙ্গিস একটি সুদর্শন যুবক। এই মেয়েটির চেয়েও অধিক রূপসী ও উচ্চস্তরের নারী তার জন্য পাগলপারা হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এই মেয়েটির ব্যাপারে তার ঘোর সন্দেহ, সে চেঙ্গিসকে ধোঁকা দিচ্ছে। আর যদি ধোঁকা নাও দিয়ে থাকে, তবু চেঙ্গিস নিজের আসল পরিচয় বলে দিয়ে নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই মেয়েটি মুসলমান গুপ্তচরও যদি হয়, তবুও তার উপর নির্ভর করা যায় না। কারণ, তাকে তো সরকারীভাবে পাঠানো হয়নি।

ভিক্টরের যোগ-বিয়োগ মিলছে না।

রাশেদ চেঙ্গিস চলে গেছে। ভিক্টর গভীর ভাবনায় হারিয়ে যায়। চেঙ্গিসের চলে যাওয়ার পর ভিক্টরের ঘুমিয়ে যাওয়ার নিয়ম। কিন্তু আজ তার ঘুম আসছে না। ভিক্টর কক্ষে গিয়ে না শুয়ে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করতে থাকে।

মেয়েটি একই স্থানে চেঙ্গিসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তার সন্নিকটে

মাটিতে মদের সোরাহী ও দু'টি পেয়ালা পড়ে আছে। অন্ধকারে চেঙ্গিসকে ছায়ার ন্যায় আসতে দেখে দৌড়ে গিয়ে তাকে ঝাপটে ধরে, যেরূপ ঝাপটে ধরে ছোট্ট শিশু তার মাকে। মেয়েটি এমনভাবে প্রেম নিবেদন ও আত্মসমর্পণের ভাব প্রদর্শন করে যে, চেঙ্গিসের বিবেকের উপর যৌনতার মাদকতা আচ্ছন্ন করে ফেলে। রূপসী মেয়েটি তার রূপ-যৌবনের সেই অস্ত্রগুলো ব্যবহার করে, যেগুলোর উপর হাত বুলিয়ে হারমানের নায়েব বলেছিলো, তোমার এসব অস্ত্র অকর্মণ্য হয়ে যায়নি তো।

'তুমি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছো না তো?'– মেয়েটি চাপা কণ্ঠে চেঙ্গিসকে জিজ্ঞেস করে– 'তোমার ভালোবাসা আমাকে এমন অসহায় বানিয়ে দিয়েছে যে, আমি আমার এমন স্পর্শকাতর তথ্যাবলী তোমাকে দিয়ে দিয়েছি।'

মেয়েটি এক হাতে চেঙ্গিসের কোমর ধরে গায়ে গা মিশিয়ে তাকে সেই জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে মদের সোরাহী ও পেয়ালা রাখা আছে। চেঙ্গিসকে বসিয়ে পেয়ালায় মদ ঢেলে বললো– 'নাও, জয়ের আনন্দে এক পেয়ালা'।

চেঙ্গিস এতোই উৎফুল্ল যে, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালাটা হাতে তুলে নেয় এবং গল গল করে পেয়ালাটা খালি করে ফেলে। মেয়েটি শূন্য পেয়ালায় আবারো মদ ঢালে। চেঙ্গিস তাও পান করে ফেলে।

তাদের থেকে আট-দশ কদম দূরে একটি বৃক্ষ। পেছন থেকে কে যেনো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে গাছটার আড়ালে বসে পড়ে। রাতের নীরবতা খা খা করছে। বৃক্ষের আড়ালে বসা লোকটি চেঙ্গিস ও মেয়েটির কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। তারা খানিকটা উচ্চস্বরেই কথা বলছে।

'এবার বলো, কী খবর নিয়ে এসেছো?' চেঙ্গিস মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে।

'এমন সংবাদ এনেছি, যা সুলতান আইউবী জীবনে স্বপ্নেও শুনেননি'– মেয়েটি বললো– 'আমি খৃস্টানদের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছি।' মেয়েটি চেঙ্গিসকে খৃস্টানদের পরিকল্পনা ও অগ্রযাত্রার পথ বলে দেয়। আক্রমণ কোথায় হবে তাও অবহিত করে। খৃস্টান বাহিনীর রসদ কোন্ পথে যাবে এবং রওনা কবে হবে, সব বলে দেয়।

'এখান থেকে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া দরকার'– চেঙ্গিস বললো– 'কাল রাতেই যাবে?'

'না'– মেয়েটি বললো– 'আমাদের যেসব তথ্যের প্রয়োজন ছিলো, পেয়ে গেছি। কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রতিশোধের যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, তা না নিভিয়ে যাবো না। খৃস্টানরা তাদের বাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ

রসদ সংগ্রহ করেছে। অস্ত্র আর তাঁবুর তো কোনো হিসাবই নেই। তরল দাহ্য পদার্থের মটকাও আছে। আছে তরিতরকারীর সম্ভার। এসব দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এগুলো ধ্বংস করা কঠিন কিছু নয়। পাহারা এটুকু ব্যবস্থা আছে যে, মাত্র সাত-আটজন সিপাহী রাতে টহল দেয়। এই ভাণ্ডার খৃস্টানরা তিন-চার মাসে সংগ্রহ করেছে। আমরা যদি এগুলো ধ্বংস করে দিতে পারি, তাহলে তাদের আক্রমণ তিন-চার মাসের জন্য পিছিয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে সুলতান আইউবী তার প্রস্তুতি পরিপূর্ণ করে নিতে পারবেন। তুমি তো হারমানকে জানো। আমি তার হৃদয় থেকেও তথ্য বের করে এনেছি। তিনি বলেছেন, সুলতান আইউবী নতুন ভর্তি নিচ্ছেন। তার আগেকার বাহিনীটি আপন ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, এখন আর তাদের যুদ্ধ করার শক্তি নেই। এই অভাগা খৃস্টানরা আইউবীর সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছে। এ সময় প্রয়োজন হলো খৃস্টানদের অভিযান বিলম্বিত করে দেয়া। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের রসদ জ্বালিয়ে দেয়া। তাদের যে হাজার হাজার ঘোড়া আছে, সেগুলোও ধ্বংস করার ব্যবস্থা হতে পারে।'

'রসদে আগুন লাগাবে কে?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করে।

'তুমিই বলতে পারো, এখানে তোমাদের কতো লোক আছে'– মেয়েটি বললো– 'এদের মধ্যে কমান্ডোও আছে নিশ্চয়ই। দায়িত্বটা তাদের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। এখানে তোমাদের কতোজন কমান্ডো সেনা আছে?'

'সুলতান আইউবী নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, অধিকৃত অঞ্চলে নাশকতা চালানো যাবে না। কেননা, কমান্ডোরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে এদিক-ওদিক সরে যায়। তার শাস্তি ভোগ করে নিরীহ সাধারণ মুসলমান'– চেঙ্গিস বললো– 'খৃস্টানরা তাদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে নারীদের উপর নির্যাতন চালায়। এ কারণে আমরা আমাদের কমান্ডোদের ফেরত পাঠিয়েছি। যে ক'জন আছে, সবাই গুপ্তচর। তবে তারা নাশকতাও চালাতে জানে। তাছাড়া তারা এখানকার কিছু যুবককেও প্রস্তুত করতে পারে।'

'তাদেরকে কি কোনো এক স্থানে একত্র করার ব্যবস্থা করা যায়?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে এবং চেঙ্গিসের পেয়ালায় মদ ঢেলে পেয়ালাটা তার হাতে ধরিয়ে দেয়।

'আমরা একটি মসজিদকে আমাদের আস্তানা বানিয়ে রেখেছি'– মদের পেয়ালাটা খালি করে চেঙ্গিস বললো। মসজিদের অবস্থান জানিয়ে সে

বললো– 'উক্ত মসজিদের ইমাম আমাদের নেতা। অত্যন্ত যোগ্য ও সাহসী মানুষ। আজ রাতেই আমি এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলবো। কালই তিনি যুবকদেরকে মসজিদে একত্রিত করবেন। তারা সকলে নামাযের নাম করে মসজিদে এসে হাজির হবে।'

'শুধু একজন যোগ্য ও সাহসী লোক দ্বারা কাজ হবে না'– মেয়েটি বললো– 'ইমামের সঙ্গে তুমিও থাকবে। তাছাড়া আরো তিন-চারজন বিচক্ষণ লোকের প্রয়োজন, যাতে এই নাশকতা পরিকল্পনাটা নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করা যায়। আর এই সম্ভার তখন ধ্বংস করতে হবে, যখন আমরা দু'জন এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। কারণ, ঘটনার পরপরই শহর সীল হয়ে যাবে। তখন আর আমরা বেরুতে পারবো না।'

'শুধু ইমাম নন'– চেঙ্গিস বললো– 'এখানে আমাদের একজন থেকে অপরজন অধিক যোগ্য লোক আছে।' চেঙ্গিস কয়েকজন লোকের নাম বললো– 'আমি এদের প্রত্যেককে মসজিদে উপস্থিত করতে পারি।'

চেঙ্গিস থেকে এসব তথ্যই নিতে চাচ্ছে মেয়েটি। সে চেঙ্গিসকে তার দল সম্পর্কে আরো জিজ্ঞাসা করে, যা চেঙ্গিস অকপটে বলে দেয়। অবশেষে বললো– 'জানো, এই প্রাসাদেও আমি একা নই, ভিক্টর নামক যে লোকটি আমার সঙ্গে কাজ করে, সেও আমার দলের সদস্য।'

'ভিক্টরও?' মেয়েটি চমকে ওঠে জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ'– চেঙ্গিস বললো– 'তুমি কি আমাদের ওস্তাদির প্রশংসা করবে না যে, আমরা একজন খৃস্টানকেও আমাদের গুপ্তচর বানিয়ে রেখেছি?'

মেয়েটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরব থাকে। তারপর বললো– 'আগামীকাল দিনের বেলা আমি তোমার কক্ষে আসবো। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।'

মেয়েটি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোকটি নড়ে ওঠে। বসে বসে কটিবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করে এবং আট-দশ কদমের দূরত্বটা দু'লাফে অতিক্রম করে মেয়েটাকে পেছন থেকে এক বাহু দ্বারা ঝাপটে ধরে। তার খঞ্জরধারী হাত উপরে উঠেই তীব্রবেগে নীচে নেমে আসে। খঞ্জর মেয়েটার বুকে গেঁথে যায়। মেয়েটা হাল্কা একটা চীৎকার দিয়ে শুধু বললো– 'আমার বুকে খঞ্জর ঢুকে গেছে।'

চেঙ্গিস ঝটপট নিজের খঞ্জরটা বের করে বীরত্বের সাথে লোকটার উপর আক্রমণ চালায়। লোকটি মোড় ঘুরিয়ে মেয়েটিকে সামনে নিয়ে আসে এবং

বলে– 'আমি ভিক্টর চেঙ্গিস! এই হতভাগীর বেঁচে না থাকাই উচিত।'

মেয়েটি কোঁকাচ্ছে। ভিক্টর তাকে পেছন থেকে এক বাহুতে ঝাপটে ধরে আছে।

'তুমি অপদার্থ খৃস্টান'– মদের নেশায় বুঁদ হওয়া চেঙ্গিস বললো– 'সাপের বাচ্চা!' চেঙ্গিস মোড় ঘুরিয়ে ভিক্টরের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।

ভিক্টর মেয়েটিকে আবার সামনে নিয়ে এসে তাকে ঢাল বানিয়ে বললো– 'চৈতন্যে আসো চেঙ্গিস! মেয়েটাকে সবকিছু বলে দিয়ে তুমি আমাদের খেলাটা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছো। ও যদি জীবিত থাকে, তাহলে রাত পোহাবার পরই আমরা সকলে গ্রেফতার হয়ে যাবো।'

চেঙ্গিস ক্ষ্যাপা সিংহের মতো ভিক্টরের চার পার্শ্বে ঘুরছে আর হুংকার ছাড়ছে। মেয়েটির এখনো চৈতন্য আছে। সে কোঁকাতে কোঁকাতে বললো– 'চেঙ্গিস! আমার রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করলাম। খৃস্টানরা আমাদের বন্ধু হতে পারে না। আমি বাঁচবো না। এই লোকটা আমাদের নয়– খৃস্টানদের গুপ্তচর।'

চেঙ্গিস লাফ দিয়ে ভিক্টরের উপর আক্রমণ করে। ভিক্টর তাকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করে, তুমি প্রতারণার শিকার। চলো, মেয়েটাকে হত্যা করে লাশটা দূরে ফেলে আসি। কিন্তু চেঙ্গিস এখন কারো গোয়েন্দা নয়। এখন সে একজন পুরুষ, যার প্রেয়সীকে অন্য এক পুরুষ ধরে রেখেছে এবং তার বুকে খঞ্জর বিদ্ধ করেছে। সম্মুখ থেকে সে মেয়েটাকে সজোরে এক ধাক্কা মারে যে, ভিক্টর পেছন দিকে পড়ে যায় আর মেয়েটি তার উপর ছিটকে পড়ে। চেঙ্গিস ভিক্টরের উপর খঞ্জরের আঘাত হানে। ভিক্টর পূর্ব থেকেই সতর্ক ছিলো। সে একদিকে সরে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যায়। চেঙ্গিস তার উপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। খঞ্জর তার কাঁধে গিয়ে আঘাত হানে।

ভিক্টর নিজেকে সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে। চেঙ্গিসের বেঁচে থাকাও ঝুঁকিপূর্ণ। ভিক্টরের খঞ্জর চেঙ্গিসের পেটে আঘাত হানে। চেঙ্গিস পাল্টা আঘাত করে। ভিক্টরের বাহু কেটে যায়। ভিক্টর চেঙ্গিসের বুকে খঞ্জর মারে। মদমত্ত চেঙ্গিস দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ভিক্টর তার বুকের উপর আরেকটি আঘাত হানে। চেঙ্গিস লুটিয়ে পড়ে যায়। ভিক্টর মেয়েটার বুকে হাত রাখে। হৃদপিণ্ডটা নীরব। মরে গেছে। চেঙ্গিসও শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে। এখন আর চৈতন্য নেই তার।

ভিক্টরের কাঁধ ও বাহু থেকে রক্ত ঝরছে। মেয়েটির পরিধানের কাপড় ছিঁড়ে বাহুটা বেঁধে নেয় সে। রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য কাঁধের জখমে

কাপড় ঢুকিয়ে দেয়। ভিক্টর হাঁটতে শুরু করে।

ভিক্টর দ্রুত হাঁটছে। জখমের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি। তবু তার কোনো পরোয়া নেই। অবলীলায় হাঁটছে ভিক্টর।

ভিক্টর একটি গলিতে ঢুকে পড়ে। দু'টি মোড় অতিক্রম করে সে একটি প্রশস্ত গলিতে পৌঁছে যায়। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ত্রিপোলী। সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে সর্বত্র। প্রতিটি ঘরের দরজা বন্ধ। একটি মাত্র ঘরের দরজা খোলা– আল্লাহর ঘর মসজিদের দরজা।

ভিক্টর এই মসজিদে এ-ই প্রথমবার এসেছে। তবে কীভাবে আসতে হবে, এসে কী করতে হবে, তার জানা আছে। বাম দেয়ালে একটি দরজা আছে। এটিই ইমামের বাসার দরজা। ভিক্টর পায়ের জুতো খুলে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

রাতের অর্ধেকটা কেটে গেছে। ইমাম গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। দরজার করাঘাত তাকে জাগিয়ে তোলে। জাগ্রত হয়ে তিনি খানিক অপেক্ষা করেন। পুনরায় করাঘাত পড়ে। ঠিক আছে, আমারই গোয়েন্দাদের বিশেষ সাংকেতিক আওয়াজ। তারপরও তিনি লম্বা খঞ্জরটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন– 'চেঙ্গিস?'

'ভিক্টর'– ভিক্টর জবাব দেয়– 'ভেতরে চলুন।'

'রক্তের গন্ধ আসছে কোথা থেকে?' ইমাম অন্ধকারে ভিক্টরের বাহু ধরে জিজ্ঞেস করে।

'আমার রক্ত।' ভিক্টর জবাব দেয়।

ইমাম ভিক্টরকে টেনে ভেতরে নিয়ে যান। বাতি জ্বালালে দেখতে পান ভিক্টরের পরিধেয় রক্তে লাল এবং ভিজা। ইমাম ভিক্টরকে কখনো দেখেননি। পরিচয়টা চেঙ্গিসের মুখে শোনা। ভেতরের খবরাখবর পরিবেশন করা ছিলো তার দায়িত্ব। ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ভিক্টরের কোন প্রয়োজন ছিলো না।

'তুমি এসেছো?'– ইমাম জিজ্ঞেস করেন– 'চেঙ্গিস আসেনি কেনে?'

'চেঙ্গিস আর কখনো আসবে না।' ভিক্টর উত্তর দেয়।

'কেনো?'– ইমাম ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'ধরা পড়েছে?'

'হ্যাঁ, ধরা পড়েছে'– ভিক্টর জবাব দেয়– 'নিজের পাপের হাতে ধরা পড়েছে। আমার খঞ্জর তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে। আপনি আমার রক্ত

দেখতে পাচ্ছেন। সম্ভব হলে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। আপনি ভয় পাবেন না। আল্লাহর শোকর আদায় করুন যে, চেঙ্গিস জীবিত নেই। অন্যথায় আমাদের প্রত্যেককে কয়েদখানার নির্যাতনে জীবন হারাতে হতো।

ইমাম তাড়াতাড়ি ওষুধ বের করেন। পানি আনেন। ভিক্টরের জখম ধুইতে শুর করেন। ভিক্টরকে পোশাক পরিবর্তন করতে বললেন।

'না'– ভিক্টর বললো– 'আমি আমার করণীয় ঠিক করে রেখেছি। এই কাপড়েই আমি ফিরে যাবো। আমি আপনার নুন খেয়েছি। আমার প্রিয় বন্ধু ও অতিশয় বিপজ্জনক সফরের সঙ্গী আমার হাতে খুন হয়েছে। আমি স্থির করেছি, আপনাদের সকলের জন্য নিজেকে কুরবান করে দেবো। নিজের ঘাড়টা জল্লাদের সম্মুখে অবনত করে দিয়ে আপনাদের সকলকে রক্ষা করবো।'

ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ইমাম তাতে ওষুধ প্রয়োগ করছেন আর ভিক্টর ইমামকে সমস্ত ঘটনা বলে শোনাচ্ছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে ভিক্টর বললো– 'আমার সন্দেহ জেগে গিয়েছিলো মেয়েটি প্রতারণা করছে। সে নিজেকে একজন বৃদ্ধ কমান্ডারের রক্ষিতা বলে দাবি করতো; কিন্তু আমি এমন কোনো বৃদ্ধ কমান্ডারকে কখনো দেখিনি। প্রতিদিন তার চেঙ্গিসের পথে দাঁড়িয়ে থাকা প্রমাণ করে, সে নিকটেই কোথাও থাকতো এবং চেঙ্গিসের উপর দৃষ্টি রাখতো। আমি চেঙ্গিসকে যখনই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছি, সে ক্ষেপে ওঠেছে। আমি আপনাকে বলেছি, সে মদপানও করতে শুরু করেছিলো। আমার সন্দেহ, তাকে মদের সঙ্গে হাশিশ মিশিয়ে খাওয়ানো হতো। অন্যথায় চেঙ্গিসের মতো কঠিন ও পাকা ঈমানের মানুষটা এতো তাড়াতাড়ি এবং এতো সহজে এই ফাঁদে পা দেয়ার কথা নয়। অনেক রূপসী নারী তাকে ভালোবাসার জালে আটকানোর চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সব অফারই সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েটি তাকে নিজের রূপ আর হাশিশ মিশ্রিত মদের যাদুতে দৈহিকভাবে নয়– মানসিকভাবে ঘায়েল করে নিয়েছিলো।'

চেঙ্গিস যখন বললো, সে মেয়েটিকে বলে দিয়েছে সে গোয়েন্দা, তখন আমার মনটা কেঁপে ওঠেছিলো। আমি যেনো অদৃশ্য থেকে ইঙ্গিত পেয়ে গেছি, এটি এতো বিরাট পদস্খলন, যার শাস্তি শুধু তার নয়– আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু। তার এই পদস্খলন মিসর-সিরিয়ার আযাদীর অপমৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু মেয়েটি তার বিবেকের উপর যে যাদু প্রয়োগ করে দিয়েছিলো, তা তাকে

আমাদের থেকে এবং নিজের ঈমান ও কর্তব্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছিলো। আমি তখনই সংকল্প করে নিয়েছি, রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র পথ আছে– মেয়েটিকে হত্যা করতে হবে। চেঙ্গিস যদি এই ভয়ঙ্কর পথ থেকে সরে না আসে, তাহলে তাকেও শেষ করে ফেলতে হবে। দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে একজন মানুষকে হত্যা করা কোনো ব্যাপার নয়। তাছাড়া গোয়েন্দা বিধান তো আছেই যে, কারো প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ হলে কিংবা কারো মাধ্যমে তথ্য ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে, তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তারপরও আমি সময় নিয়েছি। তাকে রক্ষা করেই জাতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু লোকটি আমাকে খুন করার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলো।'

'এমনও তো হতে পারে, তুমি তাকে ভুল বুঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে হত্যা করেছো'– ইমাম বললেন– 'হতে পারে মেয়েটি আসলেই মুসলমান এবং সত্যমনেই আমাদের জন্য কাজ করছিলো।'

'হতে পারে'– ভিক্টর বললো– 'কিন্তু আমি নিশ্চিত ঘটনা এমন নয়। আমি প্রমাণ পেয়ে নিশ্চিত হয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমি মেয়েটিকে সেই ভবন থেকে বের হতে এবং ওখানেই ফিরে যেতে দেখেছি; যে ভবনে হারমানের বিভাগের মেয়েরা থাকে। আমি এও জেনেছি, মেয়েটি কোনো কমান্ডারের রক্ষিতা নয়। আজ রাত আমি চেঙ্গিসের পেছনে চলে গেলাম এবং যে স্থানে চেঙ্গিস মেয়েটিকে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলো, আমি সেখান থেকে কয়েক পা দূরে একটি গাছের আড়ালে বসে গেলাম। মেয়েটি চেঙ্গিসের নিকট যেসব তথ্য জানতে চায় এবং যে ধারায় জিজ্ঞেস করে, তা-ই আমাকে নিশ্চিত করার যথেষ্ট ছিলো যে, মেয়েটি খৃষ্টানদের গুপ্তচর। মেয়েটি ত্রিপোলীতে আমাদের কমান্ডো সেনাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। সে চেঙ্গিসকে জানালো, খৃস্টান বাহিনীর জন্য রসদ ইত্যাদির বিপুল সম্ভার সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে দাহ্য পদার্থের অসংখ্য মটকাও আছে। আমিও গুপ্তচর। আমি ভালো করেই জানি, এখানে কোথাও এতো সম্ভার সংগ্রহ করা হয়নি। এই সম্ভার রাখার যে জায়গার কথা বলেছে, সেখানে কিছুই নেই। প্রয়োজন মনে করলে আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন। চেঙ্গিস মেয়েটির কাছে আমাদের সবগুলো স্পট চিহ্নিত করে দিয়েছে। নাম উল্লেখ করে আমাকেও ফাঁসিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি আমার নাম শুনে বিস্ময় লুকাতে পারেনি। এ তথ্য পাওয়ার পর সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকে। তারপর

উঠে দাঁড়িয়ে যায়। মেয়েটি আমাদের অতিশয় বিপজ্জনক তথ্য নিয়ে যাচ্ছিলো। এ তথ্য যাচ্ছিলো সোজা হারমানের কাছে। আপনি এর পরিণতি আন্দাজ করতে পারবেন। আমি উঠে প্রথমে মেয়েটিকে ধরে ফেলি এবং খঞ্জরটা তার বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে দেই। চেঙ্গিস মেয়েটির পক্ষ নিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি তাকে অনেক বুঝালাম, ঘটনার বাস্তবতা বুঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মদ আর নারীর পরশ তাকে পশু বানিয়ে রেখেছিলো। আমি তার খঞ্জরের আঘাত খেয়েও বুঝালাম। কিন্তু কোনো বুঝ নেয়ার মতো অবস্থা তার ছিলো না। আমি অনুভব করলাম, চেঙ্গিস জীবিত থাকলে আমি তাকে কাবুতে রাখতে পারবো না এবং আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে যাবে। আমি তাকেও খতম করে দিলাম।'

'তুমি ভালো করেছো'– ইমাম বললেন– 'আমি তোমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত। এখন তুমি ত্রিপোলী থেকে বেরিয়ে যাও। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'না'– ভিক্টর বললো– 'রাত পোহালে সকলে চেঙ্গিস ও মেয়েটির লাশ দেখবে। আমার বিশ্বাস, হারমান জেনে ফেলেছেন চেঙ্গিস গোয়েন্দা ছিলো। তিনিই মেয়েটিকে তার পেছনে লাগিয়েছিলেন। তাই তিনি ধরে নেবেন এদেরকে মুসলমান গোয়েন্দারা খুন করেছে। তারপর এখানকার মুসলমানদের উপর কেয়ামত নেমে আসবে। আগেই নির্দেশ জারি হয়ে গেছে, কারো উপর চরবৃত্তির সন্দেহ হলে তাকে বন্দি কিংবা হত্যা করে ফেলবে। হারমান এখানকার প্রতিটি গৃহের উপর একজন করে গোয়েন্দা নিয়োগ করে রেখেছেন। তারা মুসলমানদেরকে টার্গেট বানানোর বাহানা খুঁজছে। আমি নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছি। এই খুনের দায় আমি নিজে বহন করবো। কারণ বলবো, আমি আর চেঙ্গিস একই নারীর প্রেম-প্রত্যাশী ছিলাম।'

'তোমার থেকে আমরা এতো কুরবানী গ্রহণ করবো না'– ইমাম বললেন– 'আমি একজন লোক দেবো, যে তোমাকে কায়রো রেখে আসবে।'

'আমি আমার জীবনের কুরবানী দিতে চাই'– ভিক্টর বললো– 'আমার শহরে খৃস্টান বাহিনীর দু'জন অফিসার আমার এক বোনের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলো। সে সময়টার কথা আমার স্মরণ আছে। তারা তাদের সৈনিকদেরকে আমার বোনকে তুলে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলো। কোন খৃস্টান আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তিনজন মুসলমান যুবক খৃস্টান সৈন্যদের মোকাবেলা করেছিলো। তারা আহত হয়েছিলো। তবু

তারা আমার বোনকে রক্ষা করেছে। খৃস্টানদের উচ্চ পর্যায়ে ভালো একজন অফিসার ছিলেন। তিনি আমার অভিযোগ শুনেছিলেন। অন্যথায় শেষ পর্যন্ত আমার বোনও রক্ষা পেতো না, প্রতিরোধকারী মুসলিম যুবকরাও রেহাই পেতো না। এই ঘটনাটাই আমাকে মুসলমানদের গোয়েন্দায় পরিণত করেছে। আমি আপনার জাতিকে এই অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে চাই। নিজের জীবনটা জল্লাদের হাতে তুলে দিয়ে আমি ত্রিপোলীর মুসলমানদের জীবন ও সম্মান রক্ষা করবো।'

ভিক্টর ইমামকে জানায়- 'খৃস্টানরা সৈন্য সমাবেশ শুরু করেছে। তাদের গন্তব্য হাল্ব। প্রথমে তারা সিরিয়া জয় করার ইচ্ছা পোষণ করছে। তবে রওনা কবে হবে এখনো জানা যায়নি। এও জানা সম্ভব হয়নি, তাদের সকল সৈন্য একই এলাকার উপর আক্রমণ চালাবে, নাকি সামনে গিয়ে বিভক্ত হয়ে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে হামলা করবে। এসব সংবাদ খুব তাড়াতাড়ি সুলতান আইউবীর কানে পৌঁছে যাওয়া দরকার, যাতে তিনি মিসরে বসে না থাকেন।

ভিক্টর যা কিছু জানতে পেরেছিলো, ইমামকে জানিয়ে দেয়। সে উঠে দাঁড়ায়। ইমাম যেতে নিষেধ করলে বললো- 'আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাকে কেউ ধরতে পারবে না।'

ভিক্টর বেরিয়ে যায়।

ভিক্টরের ক্ষতস্থানের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। ইমাম তার জখম দুটোতে পট্টি বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে এই ভেবে পট্টিগুলো খুলে ফেলে যে, যাদের নিকট যাচ্ছে, তারা জিজ্ঞেস না করে বসে ব্যান্ডেজ কে করে দিয়েছে?

পট্টি খুলে ফেলার পর আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়। চেঙ্গিস ও মেয়েটির লাশ যেখানে পড়ে আছে, ভিক্টর সেখানে এসে পৌঁছে। রাতের শেষ প্রহরের চাঁদ উপরে উঠে এসেছে। ভিক্টরের মদের সোরাহী ও দু'টি পেয়ালার উপর দৃষ্টি পড়ে। মেয়েটির চেহারার প্রতি গভীর চোখে তাকায়। মৃত্যু মেয়েটির চেহারার রূপ নষ্ট করতে পারেনি। উন্মুক্ত রেশমকোমল চুলগুলো বুকের উপর ছড়িয়ে আছে। ভিক্টর পুনরায় মদের সোরাহীটার প্রতি তাকিয়ে মনে মনে বললো- 'হায়রে মানুষ! নিজের ধ্বংসের জন্য কতোই না উপায় বের করে নিয়েছো!'

ভিক্টর চেঙ্গিসের লাশটার প্রতি তাকায়। খানিক কি যেনো ভেবে এক পার্শ্বে বসে পড়ে। চেঙ্গিসের মরদেহটা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ভিক্টর তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললো– 'তুমি ভালোভাবেই জানতে বন্ধু, নারী পুরুষের জন্য কতো বড় দুর্বলতা আর মদ কতো রাজা-বাদশাহর সিংহাসন উল্টে দিয়েছে। তারপরও জেনে-শুনে তুমি এই দুর্বলতা নিজের মধ্যে স্থান দিয়েছো। যাক গে ওসব, আমিও আসছি বন্ধু! জল্লাদ খুব তাড়াতাড়ি আমাকে তোমার নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। আমরা একই পথের পথিক। আমি আসছি বন্ধু– আমি আসছি।'

ভিক্টর উঠে দাঁড়ায়। দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। খৃস্টান অফিসারদের বাসভবন তার গন্তব্য। জখম থেকে রক্ত ঝরছে। খঞ্জরটা খাপ থেকে বের করে দেখে খঞ্জরের গায়ে রক্ত জমে আছে। নিজের জখমের রক্ত দ্বারা খঞ্জরটা ভিজিয়ে নেয়। খঞ্জর হাতে নিয়েই হাঁটছে ভিক্টর।

অধিক রক্তক্ষরণের ফলে ভিক্টর শরীরে দুর্বলতা অনুভব করছে। অফিসারদের ভবনে এসে পৌঁছে একটি দরজায় করাঘাত করে। তার জানা আছে, এখন তাকে যার নিকট যেতে হবে, তার বাসগৃহ এটিই। কিছুক্ষণ পর এক কর্মচারি দরজা খুলে দেয়। ভিক্টর অফিসারের নাম উল্লেখ করে বললো– 'ওনাকে জাগিয়ে তুলে বলো এক খুনী এসেছে।'

চাকর দৌড়ে ভেতরে চলে যায়।

ভেতর থেকে বকবকানির শব্দ ভেসে আসতে শুরু করে। অফিসার গালাগাল করতে করতে এগিয়ে আসেন। দরজায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'কে তুমি? কাকে খুন করে এসেছো?'

চাকর একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে ছুটে আসে। অফিসার আলোতে ভিক্টরকে দেখে বললেন– 'তুমি? কার সঙ্গে লড়াই করেছো?'

'আমি দু'জন মানুষের খুনের দায় স্বীকার করতে এসেছি'– 'ভিক্টর বললো– 'আমাকে গ্রেফতার করুন।'

অফিসার ভিক্টরের মুখে সজোরে একটা চপেটাঘাত মেরে বললেন– 'খুন করার আর সময় পাওনি? দিনে করলে না কেনো? আমি কি তোমার বাপের চাকর যে, এখন তোমাকে গ্রেফতার করবো? আমার গভীর সুখ নিদ্রাটা তুমি বরবাদ করে দিয়েছো!' পরক্ষণে চাকরকে বললেন– 'যাও, একে নিয়ে কয়েদখানায় বন্দি করে রাখো।'

চাকর ভিক্টরকে বাহুতে ধরে হাঁটতে শুরু করলে অফিসার গর্জন করে

বলে ওঠলেন– 'দাঁড়াও, থামো জংলী কোথাকার! ভেবে দেখলে না লোকটা তো পথে তোমাকেও খুন করে ফেলতে পারে। ভেতরে নিয়ে আসো। শুনি কী করেছে।'

'আমি একজন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে হত্যা করেছি স্যার!' ভিক্টর উচ্চকণ্ঠে বললো।

'হত্যা করেছো?'– অফিসার চমকে ওঠে জিজ্ঞেস করে– 'হত্যা করেছো? যদি কোনো মুসলমানকে হত্যা করে থাকো, তাহলে যাও নিজের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করাও। তুমি তাকে খুন না করলে নিশ্চয়ই সে তোমাকে খুন করে ফেলতো। আর যদি কোনো খৃস্টানকে খুন করে থাকো, তাহলে তোমাকেও খুন হতে হবে। ভেতরে এসে খুলে বলো কী ঘটেছে।'

'আপনি আমার সঙ্গে অতিশয় সুদর্শন এক যুবককে দেখে থাকবেন'– ভিক্টর ভেতরে গিয়ে বসে বললো– 'একটি মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম ছিলো। আমার সেই বন্ধু মেয়েটিকে ফুসলিয়ে আমার সাথে তার সম্পর্ক ভেঙে দেয়। নিজে তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তার দ্বারা আমাকে অপদস্ত করায়। কিন্তু আমি হাল ছাড়তে চাইনি। দু'জনে মিলে আমাকে অনেক যন্ত্রণা দেয়। আজ রাতে আমি তাদেরকে একসঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় বসে থাকতে দেখে ফেলি। আমি মূলত তাদের দেখতেই গিয়েছিলাম। তাদেরকে এমন অবস্থায় দেখলাম যে, আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমি মেয়েটির উপর আক্রমণ করে বসি এবং তাকে খঞ্জরের আঘাতে হত্যা করে ফেলি। তারপর আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আমার সংঘাত হয়। সে আমাকে দু'টি আঘাত করে। আমিও তাকে দু'টি আঘাতই করেছিলাম। কিন্তু আঘাত ছিলো গুরুতর। সেও মারা যায়। আমি কোথাও পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আপনার নিকট এসে পড়েছি।'

'নারীর জন্য খুন করা এবং খুন হওয়া কোনোটিই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' অফিসার বললেন।

ঘটনাটিকে অফিসার মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। এই মুহূর্তে কথা শুনতেই তার ভালো লাগছে না। চোখে তার রাজ্যের ঘুম। কে খুন হলো আর কে খুন করলো, সেদিকে তার কোনোই ভ্রুক্ষেপ নেই। ভিক্টরকে তিনি ছেড়েই দিতেন বোধ হয়। কিন্তু ততোক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। লাশ দু'টো দেখা হলো।

আসল ঘটনা জানতে পেরে হারমান ও তার নায়েব ক্ষোভে পাগলের

মতো হয়ে যান। নিহত মেয়েটি অত্যন্ত মূল্যবান ও সক্রিয় গুপ্তচর ছিলো আর চেঙ্গিস ছিলো তার শিকার, যার মাধ্যমে তার পুরো দলের সন্ধান বের করার পরিকল্পনা ছিলো। তাদের সব পরিকল্পনা ও অর্জন শেষ হয়ে গেলো। সেই সঙ্গে মূল্যবান গোয়েন্দা মেয়েটিকেও হারাতে হলো।

ভিক্টরের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। কেউ তার ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার কথা ভাবলো না। হারমান তাকে প্রহার করতে শুরু করেন। মার খেয়ে ভিক্টর অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর আর কখনো তার জ্ঞান ফিরে আসেনি। পরদিন অচেতন অবস্থায়ই তাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হলো। জল্লাদ কুড়ালের এক আঘাতে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

যে সময়ে ভিক্টরের মাথা ও দেহকে একটি গর্তে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছিলো, ঠিক তখন ইমামের প্রেরিত এক গোয়েন্দা ত্রিপোলী থেকে বহুদূর চলে গিয়েছিলো। তাকে উটের পিঠে চড়িয়ে পাঠানো হয়েছে। কায়রো পর্যন্ত সফর অনেক দীর্ঘ ও দুর্গম, যার ধকল একমাত্র উটই সহ্য করতে পারে।

❖ ❖ ❖

৫৩৭ হিজরীর (১১৭৭ সাল) প্রথম দিকের ঘটনা। কায়রোর সামরিক এলাকায় অস্বাভাবিক জাঁকজমক বিরাজ করছে। কোন মাঠে ঘোড়া ছুটাছুটি করছে। কোথাও পদাতিক সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কায়রো থেকে দূরে পার্বত্য এলাকার দৃশ্যটা এমন, যেনো সেখানে যুদ্ধ চলছে। এসব হলো, সুলতান আইউবীর বাহিনীর সামরিক মহড়া। এক উপত্যকায় দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। অশ্বারোহী সৈনিকরা ছুটে এসে বিশ-পঁচিশ গজ বিস্তৃত এই আগুনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। একটি মহড়া দূরবর্তী বালুকাময় প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোনো সৈনিকের সঙ্গে পানি রাখার অনুমতি নেই।

কঠিন এক প্রশিক্ষণ। এরা সকলে নবাগত যোদ্ধা। ভর্তি এখনো চলছে। ফৌজের সকল সালার ও অন্যান্য অফিসার এই প্রশিক্ষণদানে মহাব্যস্ত। সুলতান আইউবী সালতানাতের অন্যান্য কাজ ও সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেন রাতে। দিন কাটে তাঁর প্রশিক্ষণের তত্ত্বাবধান ও সালারদের দিক-নির্দেশনা প্রদানের মধ্য দিয়ে। তিনি সকলকে বলে রেখেছেন, খৃস্টানরা যদি সিরিয়ার উপর আক্রমণ না করে, তার অর্থ হবে, তারা যুদ্ধ থেকে তাওবা করেছে কিংবা তাদের মস্তিষ্ক সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তার এই দুই ধারণার একটিও সঠিক নয়। তারা অবশ্যই আসবে।'

'এ সময় পর্যন্ত কোন না কোনো অধিকৃত এলাকা থেকে কারো না করো আসবার কথা ছিলো'– সুলতান আইউবী পার্শ্বে দন্ডায়মান এক সালারকে উদ্দেশ করে বললেন। তখন তিনি একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে সামরিক মহড়া দেখছিলেন। তিনি বললেন– 'খৃস্টানরা অবশ্যই আসবে। গোয়েন্দারাই বলতে পারবে, তারা কোন্ দিক থেকে আসবে, কোথায় আসবে এবং তাদের সেনাসংখ্যা কতো হবে।'

সুলতান আইউবী টিলার উপর থেকে নীচে নেমে একদিকে হাঁটতে শুরু করেন। হঠাৎ দেখতে পান, দূরে একস্থানে ধূলি উড়ছে, যা একটি কিংবা দু'টি ঘোড়ার ধূলি হবে। সুলতান দাঁড়িয়ে যান। ধূলি ও সুলতানের মাঝে দূরত্ব কমতে থাকে। দু'টি ঘোড়া তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে যায়। একটির আরোহী আলী বিন সুফিয়ান। অপরজন ত্রিপোলী থেকে ইমামের প্রেরিত গোয়েন্দা। সুলতান তাকে চেনেন না। লোকটি উটের পিঠে করে বেশ ক'দিনে কায়রো গিয়ে পৌঁছে। আলী বিন সুফিয়ান তার থেকে রিপোর্ট নিয়ে তাকে একটি ঘোড়া দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

গোয়েন্দা সুলতান আইউবীকে জানায়– 'খৃস্টানরা ইসলামী দুনিয়ার উপর চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। সেনা সমাবেশ শুরু হয়ে গেছে। খুনিনের সম্রাট রেনাল্টের সৈন্যসংখ্যা সবচে' বেশি। তিনি মহাযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছেন।'

'সেই রেনাল্ট, যাকে মুহতারাম নুরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.) গ্রেফতার করে বন্দি করেছিলেন'– সুলতান আইউবী বললেন– 'জঙ্গী তাকে শর্তের ভিত্তিতে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জঙ্গীর অকাল মৃত্যু রেনাল্টের শর্তহীন মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষমতা আর সোনা-জহরতের লোভী আমীরগণ নুরুদ্দীন জঙ্গীর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে পুতুল শাসক বানিয়ে রেনাল্টকে মুক্তি দিয়ে দেয়। আজ সেই রেনাল্ট ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য আসছে। ...আচ্ছা, তারপর বলো। আক্রমণ তাদের করারই কথা। আর কে থাকবে?'

'ত্রিপোলীর সম্রাট রেমন্ড'– গোয়েন্দা বললো– 'অধিকতর সৈন্য সমাবেশ সেখানেই হচ্ছে। আক্রমণের বিস্তারিত সেখানেই স্থির হচ্ছে। তৃতীয়জন বল্ডউইন। তার সৈন্যও কম নয়। তবে তারা কবে নাগাদ রওনা হবে, জানা যায়নি। আক্রমণ হবে সিরিয়ার উপর। হাল্ব, হাররান ও হামাতের নামও শোনা যাচ্ছে। অভিযানটা খুব তাড়াতাড়ি হবে।'

'আলী বিন সুফিয়ান!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি ত্রিপোলীর সর্বশেষ সংবাদের অপেক্ষায় থাকবো।'

'না'– আপনি আর কোনো সংবাদের অপেক্ষায় থাকবেন না'– আলী বিন সুফিয়ানের পরিবর্তে ত্রিপোলী থেকে আসা গোয়েন্দা উত্তর দেয়– 'খৃস্টানদের সামরিক শাখায় আমাদের দু'জন লোক ছিলো। দু'জনই মারা গেছে।'

গোয়েন্দা সুলতান আইউবীকে রাশেদ চেঙ্গিস ও ভিক্টরের কাহিনী শোনায়। সুলতান আইউবীর চোখ লাল হয়ে যায়। গোয়েন্দা বললো– 'রেনাল্ট দাবি করছেন, তার বাহিনীতে দুইশত পঞ্চাশজন নাইট থাকবে। আমাদের উক্ত দুই গোয়েন্দা মৃত্যুর আগে ইমামকে জানিয়েছিলো, খৃস্টানরা আপনাকে অতর্কিত গেরিলা আক্রমণ পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ দেবে না। তারা এমন কৌশল অবলম্বন করবে, আপনি তাদের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হবেন। আপনার সৈন্য কম এই দুর্বলতা তাদের জানা আছে। আপনি যাতে ঘুরে-ফিরে লড়াই করতে না পারেন, এই লক্ষ্যেই তারা অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আসছে।'

এই গোয়েন্দা রিপোর্টের পর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে এখন বাইরে তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। তিনি কক্ষবদ্ধ হয়ে থাকতে শুরু করেছেন। কাগজে সম্ভাব্য রণাঙ্গনের নকশা এঁকে তার উপর অগ্রযাত্রা ও অন্যান্য কৌশলের দাগ টানছেন। যোগ-বিয়োগ দিয়ে হিসাব মেলাচ্ছেন। কখনো হঠাৎ সালারদের ডেকে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন। সেই সালারদের একজন হলেন ঈসা এলাহকারী ফকীহ, যিনি যোগ্য সেনা অধিনায়ক হওয়ার পাশাপাশি বড় মাপের একজন আলেম এবং ইসলামী আইন বিশারদও। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাকে সুলতান আইউবীর ডান হাত বলে অভিহিত করেছেন।

কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ একদিন সুলতান আইউবী রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বসেন। বাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশকে তিনি সুদানের সীমান্ত ঘেঁষে ছাউনি ফেলতে নির্দেশ দেন। কারণ, ওদিকে থেকেও আক্রমণ আসার সম্ভাবনা আছে। সুলতান আইউবীর জন্য সবচে' বড় আপদ হলো, তিনি যখন কোনো অভিযানে রওনা হন, তখন পেছনেও শত্রু থেকে যায়। খৃস্টানদের জন্য তিনি মিসরের সকল সৈন্য নিয়ে যেতে পারেন না। এবার যখন তিনি রওনা হন, ঐতিহাসিকদের পরিসংখ্যান মোতাবেক তখন তার সঙ্গে সৈন্য ছিলো এক হাজার পদাতিক। এরা সকলে আযাদকৃত দাস।

তবে যুদ্ধবাজ। আর ছিলো আট হাজার অশ্বারোহী, যাদের কেউ মিসরী, কেউ সেই সুদানী, যাদেরকে ১১৬৯ সালে সুলতান আইউবী বিদ্রোহের অপরাধে সেনা বাহিনী থেকে বহিষ্কার করে উর্বর জমি দান করে পুনর্বাসিত করেছিলেন। এখন তারা মিসরের অফাদার ও নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এই এক হাজার পদাতিক সৈন্য নিতান্তই নতুন। তারা এখনো যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ দেখেনি। তাদের প্রশিক্ষণও শেষ করা হয়েছে তাড়াহুড়ো করে।

সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে স্বীয় ভাই আল-আদিলের কমান্ডে হাল্‌বের উপকণ্ঠে রেখে এসেছিলেন। তার অনুমান ছিলো, খৃস্টানরা এতো তাড়াতাড়ি সিরিয়া এসে পৌঁছবে না। তিনি দ্রুত রওনা হয়ে হাল্‌ব পৌঁছে যান। সেখানে পৌঁছে সংবাদ পান, খৃস্টানরা হাররান দুর্গকে অবরোধ করে রেখেছে। সুলতান অবরোধকারী খৃস্টান সৈন্যদেরকে ঘিরে ফেলেন। তাঁর এই কৌশলটা এতোই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ছিলো যে, খৃস্টানরা শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হলো না। সুলতান বহু শত্রুসেনাকে গ্রেফতার করেন এবং খৃস্টানদের অনেক ক্ষতিসাধন করেন। তিনি অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লিডিডয়া ও রামাল্লা দখল করে নেন।

এ বিজয়গুলো ছিলো অপেক্ষাকৃত সহজ। তাতে মিসর থেকে আসা নতুন সৈনিকদের মনোবল বেড়ে যায়। তারা বুঝে নেয়, যুদ্ধ এভাবেই হয়ে থাকে, যাতে বিজয় আমাদেরই হয়। নতুন সৈনিকরা অসতর্ক হয়ে ওঠে। খৃস্টানরা সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবে পিছপা হয়ে সুলতান আইউবীকে ধোঁকা দিয়েছিলো। তাঁরা অল্প ক'জন সৈন্যের মহড়া দিয়েছিলো মাত্র। এরা ফিরিঙ্গি। রেনাল্ট ও বল্ডউইনের বাহিনী এখনো সম্মুখে আসেনি। তারা উক্ত এলাকাতেই অবস্থান করছে। এখন খৃস্টানরা এমন শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যে, সুলতান আইউবীর গুপ্তচররা শত্রুর এলাকা থেকে বেরই হতে পারছে না। ত্রিপোলীর গোয়েন্দার পর ওদিক থেকে আর কেউ আসতেই পারেনি।

রামাল্লার সন্নিকটে একটি নদী আছে। পানি গভীর না হলেও নদীটা বেশ গভীর ও চওড়া। ঈসা এলাহকারী রামাল্লা জয় করে তার বাহিনীকে রামাল্লার আশপাশে ছড়িয়ে দেন। নদীর তীরের আড়াল থেকে খৃস্টান বাহিনী এমনভাবে বেরিয়ে আসে, যেনো পানির স্রোত কূলের বাইরে চলে এসেছে। আল্লাহ জানেন, এই বাহিনী কবে থেকে ওখানে লুকিয়ে বসে ছিলো। ঈসা এলাহকারীর বাহিনী অসতর্কতা হেতু মারা পড়ে। তারা

বিক্ষিপ্ত ছিলো। ফলে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। ত্রিপোলীর গোয়েন্দার রিপোর্ট নির্ভুল প্রমাণিত হলো যে, খৃস্টানরা এমন কৌশল অবলম্বন করবে, যার ফলে সুলতান আইউবীর বিশেষ রণকৌশল অকার্যকর হয়ে পড়বে।

তৎকালের এক ঐতিহাসিক ইবনে আসীর লিখেছেন– 'ফিরিঙ্গিরা নদীর দিক থেকে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যেনো মানুষ আর ঘোড়ার প্লাবন কূল অতিক্রম করে বাইরে এসে জনবসতিগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুলতান আইউবীর বাহিনী অসতর্ক অবস্থায় পুরোপুরি ঘেরাওয়ে চলে আসে।'

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জেম্‌স লিখেছেন– 'সম্রাট বল্ডউইন সালাহুদ্দীন আইউবীর আগেই তার বাহিনীকে রামাল্লার উপকণ্ঠে নিয়ে এসেছিলেন। আইউবীর বাহিনী রামাল্লা জয় করার পর বল্ডউইনের এক সালার শহরে আগুন ধরিয়ে দেয়। খৃস্টানদের কৌশল সফল হয়। আইউবী ঘেরাওয়ে এসে পড়েন। তাঁর বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তিনি কয়েকিট ইউনিটকে একত্রিত করে বিশেষ পদ্ধতিতে জবাবী আক্রমণ করেন। কিন্তু ময়দান খৃস্টানদের হাতেই থাকে। আইউবীর হামলা ব্যর্থ হয়। এমনকি তাঁর পক্ষে পেছনে সরে যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সুলতান আইউবীর নতুন সৈনিকরা– যারা কয়েকটি স্থানে সহজে সাফল্য অর্জন করে ভেবে বসেছিলো, তাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না– এমনভাবে পলায়ন করে যে, তারা মিসরের উদ্দেশ্যেই রওনা হয়ে যায়। পলায়নকারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই বেশি, যাদেরকে অদূরদর্শী সেনা অফিসারগণ গনীমতের প্রলোভন দেখিয়ে ভর্তি করেছিলেন। সবচে' বড় কারণ, এরা অনভিজ্ঞ। পরিশেষে সুলতান আইউবীর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তিনি একটি উটের পিঠে চড়ে রণাঙ্গন থেকে বেরিয়ে যান এবং নিজের জীবন রক্ষা করেন।

কাজি বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ– যিনি এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন– তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'সুলতান আইউবী আমাকে এই যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন– 'খৃস্টানরা আমারই কৌশল প্রয়োগ করে আমার বাহিনীকে সেই সময় রণাঙ্গনে টেনে আনে, তখনো আমি তাদেরকে যুদ্ধের বিন্যাসে সাজাতে পারিনি। আরেক কারণ, আমার বাহিনীর উভয় পার্শ্বে যে ইউনিটগুলো ছিলো, তারা পরিকল্পনাবিহীন স্থান পরিবর্তন করতে থাকে। তাদের মধ্যে কোন সাবধানতা ছিলো না। এই সুযোগে শত্রুরা তাদের

উপর আক্রমণ করে বসে। সেই আক্রমণ এতোই তীব্র ও আকস্মিক ছিলো যে, আমার নতুন যোদ্ধারা ভীত হয়ে পেছনে পালিয়ে যায় এবং মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। তারা পথ হারিয়ে ফেলে এবং এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। আমি তাদেরকে একত্রিত করতে ব্যর্থ হই। দুশমন আমার বাহিনীর বহু সৈনিকদের বন্দি করে ফেলে। তন্মধ্যে ঈশা এলাহকারীও ছিলেন।'

সুলতান আইউবী তাঁর সৈনিকদেরকে জীবনহানি ঘটানোর পরিবর্তে নির্দেশ প্রদান করেন, যার যার মতো ময়দান থেকে সরে যাও এবং কায়রো পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করো।'

খৃস্টানদেরকে ষাট হাজার দিনার পণ আদায় করে সুলতান আইউবী সালার ঈশা ইলাহকারীকে ছাড়িয়ে আনেন। এক মিসরী ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আল-ওয়াহদীদ লিখেছেন– 'সুলতান আইউবী স্বীয় ভাই শামসুদ্দৌলা তুরান শাহকে এই যুদ্ধ এবং নিজের পরাজয়ের চিত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি একটি আরবী পংক্তিও লিখেছেন, যার মর্ম নিম্নরূপ–

'আমি তোমাকে এমন সময়ে স্মরণ করলাম, যখন খৃস্টানদের অস্ত্র কাজ করে চলছে। শত্রুর সরল ও গৌর বর্ণের বর্শাগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করে রক্ত পান করে ফিরছে।'

যুদ্ধটা হয়েছিলো ৫৭৩ হিজরীর (১১৭৬ খৃস্টাব্দে) জুমাদাল আউয়ালে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন কায়রোতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথাটা অবনত। সঙ্গে কোনো সৈন্য নেই। নেই একজন দেহরক্ষীও।

কায়রো পৌঁছেই সুলতান আইউবী পুনরায় সেনাভর্তির নির্দেশ দেন। তিনি সিরিয়ার রণাঙ্গনে স্বীয় ভ্রাতা আল-আদিলকে এবং যোগ্যতম সালারদেরকে হামাত রেখে এসেছেন।
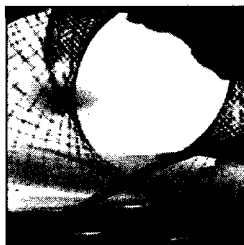
দরবেশ

রামাল্লা। আজকের ইসরাইল কবলিত এই রামাল্লায়-ই খৃস্টানদের হাতে পরাজয়বরণ করেছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে দশ মাইল দূরে উত্তরে জর্ডানে অবস্থিত এই রামাল্লা। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল জর্ডানের এই এলাকাটি দখল করে নিয়েছিলো। জর্ডান নদীর পশ্চিমতীরে ইসরাইলী সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাটা। অঞ্চলটি এখনো ইসরাইলের দখলে। তারা ঘোষণা দিয়েছে, পৃথিবীর কোন শক্তি এই অঞ্চলটি তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। রামাল্লা এবং অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চলকে সেদিনও তারা বধ্যভূমি বানিয়েছিলো এবং আজো সেগুলো বধ্যভূমিই রয়ে গেছে। রামাল্লার মুসলমানরা ইসরাইলের এই অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে আর ইসরাইল তাদের রাইফেলের গুলি দ্বারা মুসলমানদের দমন করছে।

ইসরাইলের হঠকারিতা আর আরব দুনিয়ার নীরবতা-নির্জীবতা প্রমাণ করছে, ইসরাইল এই অঞ্চলটির দখল ছাড়বে না এবং ছাড়তে বাধ্য হবে না। কিন্তু আটশত বছর আগে যখন রামাল্লা খৃস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিলো, তখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী একটি দিনের জন্যও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেননি। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক কষ্টে জীবন রক্ষা করেছিলেন। শোচনীয় পরাজয় বরণ করে তাঁর বাহিনী পিছপা হয়ে সোজা মিসরের দিকে মুখ করতে বাধ্য হয়েছিলো। বিপুলসংখ্যক সৈন্য খৃস্টানদের হাতে বন্দি হয়েছিলো। কিছু সৈন্যরা উপায়-উপকরণ ব্যতীত কায়রো যেতে গিয়ে পথেই প্রাণ হারিয়েছিলো। এরূপ পরাজয় একটি বাহিনীর মনোবল ও উদ্দীপনা ভেঙে দিয়ে থাকে। নিজেদের সামলে নিতে নিতে চলে যায় বহু সময়– বছরের পর বছর। কিন্তু সুলতান আইউবী মিসর পৌঁছে শুধু আত্মসংবরণই করেননি– অল্প কিছুদিনের মধ্যে অভাবনীয়রূপে সেই এলাকায় ফিরে যান, যেখানে তিনি পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন। তিনি ক্রুসেডারদের যম হয়ে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেন।

রামাল্লা আজ আবারো সালাহুদ্দীন আইউবীর অপেক্ষা করছে।

সুলতান আইউবীর সম্মুখে কাজ শুধু এটুকুই নয় যে, পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হবে এবং ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে হবে। তাঁকে বহু বিপদ-শঙ্কা ও সমস্যা বেষ্টন করে রেখেছে। তাঁর সারিতে বিশ্বাসঘাতকদের অভাব নেই। সুদানের দিক থেকে আক্রমণ আশঙ্কা বেড়ে গেছে। সুদানীদের জানা আছে, আইউবীর কাছে ফৌজ নেই। যে ক'জন আছে, তারা পরাজিত ও আহত। বিপরীতে ক্রুসেডারদের সৈন্য দশগুণ বেশি। রামাল্লার জয় তাদের মনোবল ও উন্মাদনা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আরেকটি আশঙ্কা, সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধবাদী আমীরগণ তাঁর এই পরাজয়কে কাজে লাগাতে পারে। তারা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান আইউবীর সেই বাহিনীটির জন্য আপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যাদের তিনি রণাঙ্গনে রেখে এসেছেন। সেই বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক সুলতানের ভাই আল-আদিল, যাঁর উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে।

একটি শঙ্কা খৃস্টান গোয়েন্দাদেরও। পিছপা হওয়ার সময় মিসরী সৈন্যের বেশে খৃস্টান গোয়েন্দাদেরও মিসরে ঢুকে যাওয়া সহজ ছিলো। এ সুযোগটা তারা অবশ্যই গ্রহণ করেছে। তারা মিসরে গুজব ছড়িয়ে জনগণের মনোবল ভেঙে দিতে পারে।

রামাল্লার পরাজয়ের পর আল-আদিল হামাত পর্যন্ত সরে এসেছিলেন। এই স্থানটিতেই সুলতান আইউবী তাঁর প্রতিপক্ষ মুসলিম আমীরদের পরাজিত করেছিলেন। হামাতে দুর্গও আছে। খৃস্টানরা সুলতান আইউবীকে পরাজিত করে হামাতের দিকে এগিয়ে যায়। আল-আদিল নিজেও একজন সালার এবং এখন তাঁর সঙ্গে যেসব সালার আছে, তাঁরাও দুঃসাহসী মুজাহিদ। তাঁদের দীন ও ঈমান সুলতান আইউবীরই ন্যায় পরিপক্ক। আল-আদিল স্বীয় ভাই আইউবীর শিষ্য। তাঁরই নিকট থেকে যুদ্ধকৌশল রপ্ত করেছেন। বিচক্ষণ ও দূরদর্শিতার বলে তিনি বুঝে ফেলেন, এমন একটি সহজ ও বিশাল জয়ের পর ক্রুসেডাররা রামাল্লায় বসে থাকবে না। তিনি পেছনে ছদ্মবেশে গোয়েন্দা রেখে দু'টি ফৌজ নিয়ে হামাত অভিমুখে রওনা হন। তিনি জেনে ফেলেছেন, সুলতান আইউবী মিসর চলে গেছেন।

আল-আদিলের অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। গোয়েন্দারা তাঁকে সংবাদ প্রদান করে, খৃস্টান বাহিনী হামাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আল-আদিল তাঁর বাহিনীর অবস্থা আঁচ করেন। ভালো নয়। সৈনিকদের মনোবল

ভেঙে গেছে। উট-ঘোড়ার সংখ্যাও কমে গেছে। রসদের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। তবে তিনি ফৌজকে খুবই উপযুক্ত একটি স্থানে নিয়ে এসেছেন। সবুজ পাহাড়ি এলাকা। পানি আছে। তিনি সৈনিকদেরকে এক স্থানে সমবেত করে নেন। তিনি দেখলেন, অধিকাংশ উট আহত। গুরুতর আহত উটগুলোকে জবাই করিয়ে ফৌজকে বলে দেন, পেট পুরে গোশ্‌ত খাও। এভাবে একটি প্রশস্ত অঞ্চলে রাতটাকে তিনি উৎসবের আমেজে ভরে দেন। তিনি সন্ধ্যায়ই হাল্‌ব ও দামেশ্‌কে দূত প্রেরণ করেন যে, যতো পারো রসদ, পশু ও অস্ত্র প্রেরণ করো।

রাতের বেলা। সৈন্যরা উটের গোশ্‌ত খেয়ে পরিতৃপ্ত। আল-আদিল একটি পাথরের উপর উঠে যান। তাঁর ডানে ও বাঁয়ে দু' ব্যক্তি প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দিতে শুরু করেন–

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুজাহিদগণ! তোমরা এই বাস্তবতাকে মেনে নাও, আমরা পরাজিত হয়ে এসেছি। তোমরা কি এই পরাজিত অবস্থায়-ই মা-বোন, স্ত্রী-কন্যাদের নিকট ফিরে যাবে এবং বলবে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনের হাতে পরাজিত হয়ে এসেছি? তোমাদের মায়েরা কি দুধের দাবি ক্ষমা করবেন? তারা ঘরে বসে সংবাদের অপেক্ষা করছেন, আমরা প্রথম কেবলাকে কাফেরদের কব্জা থেকে মুক্ত করেছি কিনা! তারা জানে, আমাদের বে-দখল অঞ্চলগুলোতে কাফেররা মুসলিম নারীদের লাঞ্ছিত করছে। ভেবে দেখো, তোমরা তোমাদের মা-বোনদেরকে কী জবাব দেবে। তোমাদের যারা এখান থেকেই পেছনে কেটে পড়তে চাও, তারা মজলিস থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়াও। আমি তাদেরকে বাঁধা দেবো না। তাদের জন্য বাড়ি-ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি আছে।'

আল-আদিল থেমে যান। সমবেত সৈনিকরাও নীরব। একজন সৈনিকও আলাদা হলো না। প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে বসে আছে।

'সালারে আলা!'– এক সৈনিক দাঁড়িয়ে গর্জে ওঠে বললো– 'আমাদেরকে কী করতে হবে বলুন। আপনাকে কে বলেছে, আমরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে বাড়ি চলে যেতে চাই?'

'আমি যদি পিছপা হতে গিয়ে প্রাণ হারাই'– আরেক সৈনিকের উদ্দীপ্ত কণ্ঠ– 'তাহলে আমার অসিয়ত, আমার লাশ দাফন না করে শকুন-নেকড়ের জন্য ফেলে রাখবেন।'

এবার একসঙ্গে কয়েকটি কণ্ঠ গর্জে ওঠে। প্রতিটি কণ্ঠেই চেতনার

জোশ। আল-আদিলের বুকটা প্রশস্ত হয়ে যায়। তিনি বললেন– 'দুশমন তোমাদের পেছনে আসছে। তোমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে, রামাল্লার জয়ই তাদের শেষ জয়। আজ রাত এবং আগামী দিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম নাও। আগামী রাত পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা পাবে।'

আল-আদিল পাথরের উপর থেকে নেমে আসেন। সালার ও কমান্ডারদের তাঁবুতে ডেকে এনে নির্দেশনা প্রদান করেন।

খৃস্টানরা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এটি বল্ডউইনের বাহিনী। তার জানা আছে সম্মুখে হামাতের দুর্গ এবং আল-আদিলের বাহিনী সেখানেই অবস্থান করছে। তিনি গুপ্তচর মারফত এ তথ্যও পেয়েছেন, যে বাহিনীটি হামাতের দিকে সরে গেছে, তার কমান্ডার আল-আদিল এবং আল-আদিল সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই। একজন সাধারণ সৈনিকও বুঝতে পারে, পরাজিত বাহিনী তার নিকটবর্তী দুর্গেই আশ্রয় গ্রহণ করবে।

বল্ডউইন দ্রুত অগ্রসর হয়ে হামাতের দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। তিনি ঘোষণা দেন, দুর্গের ফটক খুলে দাও। অন্যথায় দুর্গটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। তার ধারণা, আল-আদিলের বাহিনী যুদ্ধ করার অবস্থায় নেই। কিন্তু তার ঘোষণার জবাবে দুর্গের পাঁচিলের উপর থেকে তীর বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।

বল্ডউইন পুনরায় ঘোষণা দেন, এই খুনাখুনি অনর্থক। তোমরা লড়াই করতে পারবে না। দুর্গ আমাদের হাতে তুলে দাও। আমি ওয়াদা দিচ্ছি, একজন বন্দির সঙ্গেও অন্যায় আচরণ করা হবে না।

'দুর্গের উপর থেকে আওয়াজ আসে–

'তোমরা এতটুকু দূরে থাকো, যে পর্যন্ত আমাদের তীর পৌঁছুতে না পারে। তোমাদের না দিয়ে বরং দুর্গটা আমরা নিজেরাই গুড়িয়ে ফেলবো। আমাদের রক্ত অনর্থক ঝরবে না। তোমরাই বরং উদ্দেশ্যহীন মৃত্যুবরণ করবে।'

ঘোষক ক্রুসেডার বাহিনীর অবস্থাটা দেখতে পায়। যেনো সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ চারদিক থেকে দুর্গটাকে গ্রাস করে রেখেছে। তার মোকাবেলায় দুর্গে যে সৈন্য আছে, তা না থাকারই সমান। কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের কমান্ডার অস্ত্র সমর্পণ করতে প্রস্তুত নয়।

সূর্য অস্ত্র যাচ্ছে। খৃস্টানরা পরবর্তী কর্মসূচি ভোর পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেছে। তাদের বাহিনী দ্রুতগতিতে পথ চলে এসেছে। সবাই ক্লান্ত। এটি পশ্চাদ্ধাবন। বল্ডউইন এই চেষ্টায় রত যে, তিনি আল-আদিলকে কোথাও

বিশ্রাম করার এবং বাহিনীকে নতুনভাবে সংগঠিত করার সুযোগ দেবেন না। তিনি আল-আদিলকে জীবিত ধরতে চাচ্ছেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই হওয়ার কারণে আল-আদিল অত্যন্ত মূল্যবান কয়েদি। তাঁর বিনিময়ে খৃস্টানরা সুলতান আইউবীর নিকট থেকে কঠিন শর্ত আদায় করে নিতে পারে। বল্ডউইনের পরিপূর্ণ আশা, তিনি দুর্গের বাহিনী ও আল-আদিলকেসহ দুর্গটা নিয়ে নিতে পারবেন।

বল্ডউইন তার বাহিনীকে দুর্গ থেকে এতোটুকু পেছনে সরিয়ে নিয়ে গেছেন যে, দুর্গওয়ালাদের তীর সে পর্যন্ত পৌঁছছে না। বাইরে থেকে কোনো বাহিনী তার উপর আক্রমণ চালাতে পারে এমন আশঙ্কা তার নেই। সুলতান আইউবী এখানে নেই। নেই তাঁর কোন বাহিনীও। হামাত দুর্গটাকে নিজের পায়ের তলেই দেখতে পাচ্ছে বল্ডউইন।

সন্ধ্যার পর পর তিনি তার কমান্ডারদেরকে আগামী দিনের কর্মসূচি-পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে নিজ তাঁবুতে ফিরে যান। তাঁবুটা ফৌজ থেকে সামান্য দূরে পেছনে। সে যুগের রাজা-বাদশাহদের তাঁবু শীশমহল থেকে কম হতো না। বল্ডউইন তো বিজয়ী সম্রাট। তিন-চারটি রূপসী খৃস্টান মেয়ে তার সঙ্গে আছে। চারটি মুসলমান মেয়েও আছে। এই মেয়েগুলোকে খৃস্টান কমান্ডাররা বিজিত অঞ্চল থেকে ধরে এনে বল্ডউইনকে উপহার দিয়েছিলো। মেয়েগুলো আরবের রূপের রাণী।

খৃস্টান মেয়েরা এই মুসলিম মেয়েগুলোকে বুঝিয়েছে, তোমাদের ক্রন্দন ও মুক্তির জন্য ছটফট করা অর্থহীন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের সৌভাগ্য যে, তোমরা ক্রুশের একজন সম্রাটের ভাগে পড়েছো। তারা বুঝায়–

'শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে কোনো মুসলিম আমীর কিংবা শাসকের হেরেমে যেতেই হতো, যেখানে তোমাদেরকে কয়েদির মতো থাকতে হতো। দু'-চার বছর পর যখন তোমাদের যৌবনের আকর্ষণ কমে যেতো, তখন তোমাদেরকে কোনো সওদাগরের কাছে বিক্রি করে দেয়া হতো। যদি তোমরা তোমাদেরই সৈনিকদের হাতে পড়তে, তাহলে তারাও তোমাদের সেই দশা-ই ঘটাতো, যা আমাদের সৈন্যরা ঘটাচ্ছে। নারীর কোনো ধর্ম থাকে না। যখন যার সঙ্গে বিয়ে হয়, সে-ই তার খোদা, সে-ই তার ধর্ম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তোমাদের সেই মানুষটির কাছে থাকতে আপত্তি কোথায়, যিনি রণাঙ্গনের সম্রাট, একটি রাষ্ট্রের ও কোটি মানুষের হৃদয়ের রাজা!'

মেয়েগুলো প্রথম দিনটি খুব ছটফট করে কাটায়। তাদের উপর কোনো অত্যাচার করা হয়নি। কোনো ভয়-ভীতিও দেখানো হয়নি। বল্ডউইন তাদের রূপ-যৌবন দেখে তার হাই কমান্ডের সেনাপতিদের বললেন, মেয়েগুলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে উত্তম পন্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন মূল্যবান মেয়েগুলোকে ভোগ-বিলাসিতার উপকরণ বানিয়ে নষ্ট করা ঠিক হবে না। তিনি মেয়েগুলোকে নিজের কাছে রেখে দেন।

'আমাদেরকে সম্ভ্রমের কুরবানী দিতেই হবে'– নির্জনে কথা বলার সুযোগ পেয়ে চার মেয়ের একজন বললো– 'আমাদের পালানো দরকার।'

'আর প্রতিশোধও নেয়া উচিত'– অন্য একজন বললো।

'তার জন্য আমাদেরকে প্রকাশ করতে হবে, আমরা আন্তরিকভাবেই তাদের দাসত্ব মেনে নিয়েছি'– প্রথম মেয়ে বললো– 'তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে।'

'আমার পিতা সুলতান আইউবীর বাহিনীতে আছেন'– অন্য একজন বললো– 'বর্তমানে মিসরে আছেন। আমি তাঁর নিকট থেকে শুনেছি, কাফেরদের মেয়েরা তাদের ধর্ম, জাতি ও ক্রুশের জন্য নিজের ইজ্জত বিলিয়ে আমাদের বড় বড় শাসকদেরকে ক্রুশের অনুগত বানায়। কাউকে হত্যা করতে হলে করায়। আমাদের ফৌজের গোপন তথ্য সংগ্রহ করে তাদের সম্রাটদের নিকট পৌঁছায়।'

'আমি জানি'– অন্য এক মেয়ে বললো– 'তাদের মেয়েরা সে কাজটাই করে, যা আমাদের পুরুষ গুপ্তচররা শত্রুর দেশে গিয়ে করে থাকে।' মেয়েটি কথা বন্ধ করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গোপনীয়তা বজায় রেখে বললো– 'যদি তাদের বলে দেই, আমরা তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করবো, তাহলে এমন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে যে, আমরা এই সম্রাটকে খুন করে ফেলবো।'

'আর কিছু না হোক, অন্তত পালাবার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।' একজন বললো।

বল্ডউইন বাহিনীর হামাত দুর্গ অবরোধের রাতের দু'রাত আগের ঘটনা। সম্মুখপানে অগ্রসর হতে হতে মুসলিম মেয়েরা খৃস্টান মেয়েদের বললো, আমরা তোমাদের কথা বুঝে ফেলেছি। যে কোনো সময় আমরা ইসলাম ত্যাগ করে তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করে ফেলবো।'

বিষয়টা বল্ডউইনকে অবহিত করা হলো। তিনি তাদেরকে মূল্যবান হার উপহার দিয়ে গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে দেন। কিন্তু তিনি খৃস্টান মেয়েদের আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন– 'আমি এদের কারো হাতে কিছু পানাহার

করবো না। হতে পারে, এটা তাদের কৌশল। মুখের কথায় ধর্ম ত্যাগ-গ্রহণের ঘোষণা দিলেই তো হয়ে যায় না। মনের পরিবর্তন সহজ নয়। তোমরা তাদের মন জয় করার চেষ্টা করো। মুসলমানদের ক্রয় করা কঠিন নয়। তবে তাদের উপর ভরসা রাখাও অনিরাপদ। যেসব মুসলমানের ঈমান পাকা, তারা এমন এমন ত্যাগ দিয়ে বসে, আমরা যার কল্পনাও করতে পারি না। এই মেয়েগুলো পালাতে পারবে না। তবে চোখ রাখবে, যেনো এরা আমার উপর আক্রমণ না করে বসে।

অবরোধের প্রথম রাত। চার মেয়ে আলাদা আলাদা কক্ষে ঘুমিয়ে আছে। বল্ডউইনও তাদের নিয়ে ফূর্তি করার পর ঘুমিয়ে পড়েছেন। ছোট-বড় সকল কমান্ডার অচেতনের ঘুম ঘুমাচ্ছে। সৈন্যদেরও কোনো চৈতন্য নেই। জেগে আছে শুধু সান্ত্রীরা আর বল্ডউইনের দেহরক্ষীদের চার-পাঁচজন সৈনিক। হামাতের একটি উপত্যকা চলে গেছে দুর্গের দিকে। সম্মুখে দুর্গ পর্যন্ত খোলা মাঠ। এই উপত্যকায় অন্তত এক হাজার পদাতিক সৈন্য পা টিপে টিপে হাঁটছে। কমান্ডার তাদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে। বল্ডউইনের বাহিনীর তাঁবু এখন সামান্য দূরে।

এই পদাতিক বাহিনী আল-আদিলের সৈনিক। আল-আদিল দুর্গে নেই। তাঁর অনুমান ছিলো, খৃস্টানরা দুর্গ অবরোধ করবে। তাই তিনি তাঁর সবক'টি ইউনিটকে বলে রাখেন, অবরোধ হলে ভয় পাবে না। আল-আদিল দুর্গপতিকে পরিকল্পনা জানিয়ে রাখেন। সে কারণেই দুর্গপতি অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে তীর বৃষ্টির মাধ্যমে ক্রুসেডারদের হুংকারের যথার্থ জবাব প্রদান করেছেন। দুর্গপতি হলেন আল-আদিলের মামা শিহাব উদ্দীন আল হারেমী।

রাতে আল-আদিলের এক হাজার পদাতিক সৈন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে গেরিলা আক্রমণ চালায়। তারা সর্বপ্রথম তাঁবুগুলোর রশি কেটে ফেলে এবং উপর থেকে খৃস্টানদেরকে বর্শার আঘাতে ঝাঝরা করতে শুরু করে। তাঁবুর তলে আটকেপড়া সৈনিকরা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়।

এটা স্থির হয়ে লড়াই করার যুদ্ধ নয়। এটা সুলতান আইউবীর 'আঘাত করো আর পালাও' ধরনের বিশেষ রণকৌশল। এতো বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে এক হাজার সৈনিকের স্থির হয়ে যুদ্ধ করা সম্ভবও নয়। বিভক্ত ক্ষুদ্র

দলগুলোর দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন। দু'-তিনটি দল ক্রুসেডারদের উট-ঘোড়া ও খচ্চরের বাঁধন খুলে দেয়। এক হাজার সৈনিক চুপিচুপি আসে আর পলকের মধ্যে ডানে-বাঁয়ে বেরিয়ে যায়। খৃস্টান বাহিনীর মধ্যে শোরগোল ও আর্তচীৎকার শুরু হয়ে যায় যে, আসমান-যমিন এক সঙ্গে কেঁপে ওঠে।

বল্ডউইনের চোখ খুলে যায়। তার কমান্ডারগণও জেগে ওঠে। তিনি তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখতে পান, কোথাও আগুন জ্বলছে। আল-আদিলের সৈনিকরা তাঁবুগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে। আক্রমণের সময় তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়েছিলো। এই ধ্বনি মুসলমান মেয়েগুলোও শুনেছিলো। তারা বুঝে ফেলে, এই আক্রমণ মুসলিম সৈন্যদের। এক মেয়ে বলে ওঠে, চলো পালাই। কিন্তু দু'টি মেয়ে আবেগের বশবর্তী হয়ে বল্ডউইনকে খুন করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হলো। বল্ডউইনের দেহরক্ষীরা তার চতুর্পার্শ্বে ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়ে যায়।

হঠাৎ পায়ের তলার মাটি কাঁপতে শুরু করে– প্রচন্ড কম্পন। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি কানে আসতে শুরু করে। এরা আল-আদিলের অশ্বারোহী সৈনিক। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে তাদের সংখ্যা ছিলো দু'হাজার। ইউরোপিয়নদের মতে চার হাজারের অধিক। ধেয়ে এসে এই অশ্বারোহীরা সবদিক ছড়িয়ে গিয়ে এমন তীব্র আক্রমণ করে বসে যে, মুহূর্ত মধ্যে প্রলয় ঘটে যায়। রক্তের বন্যা বইতে শুরু করে। খৃস্টান সৈনিকরা মোকাবেলার অবস্থায় ছিলো না। এখনো তারা বুঝেই ওঠতে পারেনি যে, হচ্ছেটা কী এবং আক্রমণগুলো কোথা থেকে আসছে। তাকবীর ধ্বনি থেকে প্রমাণ মিলছে, তারা মুসলমান। আল-আদিলের আরোহী সৈন্যরা খৃস্টানদের অবরোধ ভেঙে যে-ই মোকাবেলায় আসে, তাকেই ঘোড়ার পদতলে দলিত করে কিংবা তরবারী ও বর্শার নিশানা বানিয়ে দুর্গের দিকে বেরিয়ে যায়। কমান্ডারদের আহ্বানে তারা পেছন দিকে মোড় ঘুরিয়ে আবার ঘোড়া হাঁকায়। তারা পুনরায় ছুটে গিয়ে খৃস্টানদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে চলে যায়।

দুর্গের অপর দিকে যে খৃস্টান বাহিনী ছিলো, তাদের উপর আক্রমণ হয়নি। এদিককার হৈ-হুল্লোড়, আর্ত চীৎকার আর ঘোড়ার আকাশকাঁপানো হ্রেষারবে তাদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এদিককার খৃস্টান সৈন্যরা ওদিকে পালিয়ে যায়। তাদের হাজার হাজার উট-ঘোড়া ও খচ্চরের রশি খুলে দেয়া হয়েছিলো। তারা এলোপাতাড়ি ছুটতে গিয়ে সৈনিকদের পিষে

মারতে এবং আতঙ্কিত করতে শুরু করে। বল্ডউইন বাহিনীর এই অংশটা পালাতে উদ্যত হয়।

ওদিকে মুসলিম মেয়ে চারটি নিখোঁজ হয়ে গেছে। তাদের একজন মুসলিম সৈনিকদের সংবাদ দেয়ার চেষ্টা করছে যে, বল্ডউইন এখানে আছেন। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা সবাই অশ্বারোহী এবং অবিরাম ছুটে চলছে। তারা খৃস্টান বাহিনী থেকে দূরে চলে গেছে। মেয়েটি দু'-তিনজন অশ্বারোহীর পেছনে পেছনে চীৎকার করে ছুটেছে। কিন্তু হট্টগোল এতো বেশি যে, তার চীৎকার কারো কানে পৌঁছেনি। কেউ তার দিকে ফিরে তাকায়নি। মেয়েটি পেছনে অনেক দূরে চলে গেছে।

হঠাৎ এক অশ্বারোহী মেয়েটিকে দেখে ঘোড়া থামায়। মেয়েটি তাকে কম্পিত কণ্ঠে বললো, আমি মুসলমান। আমরা তিনটি মেয়ে খৃস্টান সম্রাটের কব্জায় আছি।

বল্ডউইনের তাঁবু– যেটি তার সামরিক হেডকোয়ার্টারও –ফৌজ থেকে আলাদা এবং দূরে। মেয়েটির ডাকে যে সৈনিক ঘোড়া থামিয়েছে, তিনি একজন কমান্ডার। তিনি মেয়েটিকে নিজের ঘোড়ার পিঠে পেছনে বসিয়ে নিয়ে যান।

আল-আদিলের এক সালার মেয়েটির পুরো কাহিনী শোনেন। মেয়েটি বল্ডউইনের হেডকোর্টারের ঠিকানা বলে। সালার সেখানে গেরিলা আক্রমণ এবং বল্ডউইনকে ধরার জন্য দু'টি সেনাদল প্রস্তুত করেন এবং নিজে তাদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি বল্ডউইনের তাঁবুটা ঘিরে ফেলেন। সালার বল্ডউইনকে হুংকার দেন। তাঁবুতে অগ্নিসংযোগের হুমকি প্রদান করেন। কিন্তু বল্ডউইন তাঁবুতে নেই। নেই তার দেহরক্ষীরাও। যারা অস্ত্র সমর্পণ করে সম্মুখে এগিয়ে আসে, তারা চাকর, কয়েকটি খৃস্টান ও তিন মুসলিম মেয়ে এবং কয়েকজন সাধারণ সৈনিক। তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। বল্ডউইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। কিন্তু কেউ বলতে পারলো না, লোকটা কোথায় আছেন।

বেগতিক অবস্থায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বল্ডউইন সম্মুখে চলে গেছেন। দীর্ঘক্ষণ পর তিনি জেনে ফেলেছেন, এটা মুসলিম বাহিনীর গেরিলা আক্রমণ–পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তিনি নিজ তাঁবু অভিমুখে ফেরত রওনা হন। সঙ্গে দেহরক্ষী আছে। তাঁবু এলাকা থেকে বেশ দূরে থাকতেই একদিক থেকে একটি ঘোড়া ছুটে এসে তার সম্মুখে

দাঁড়িয়ে গিয়েই বললো, আপনি অন্য কোথাও চলে যান। আপনার তাঁবুতে মুসলিম সৈন্যরা হানা দিয়েছে।

বল্ডউইন সেখান থেকেই ঘোড়ার গতি ফিরিয়ে দেন।

আল-আদিল সারা রাত 'আঘাত হানো আর পালিয়ে যাও' নীতিতে অভিযান অব্যাহত রাখেন। রাত পোহাবার পর দেখা গেলো হামাতের দুর্গের চতুর্পার্শ্বে খৃস্টানদের লাশ ছড়িয়ে আছে। আহতরা কাতরাচ্ছে। আল-আদিলের শহীদদের লাশও আছে। খচ্চর-ঘোড়া ও উট দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে চরে বেড়াচ্ছে। এখানকার কোথাও না বল্ডউইন আছে, না তার জীবিত সৈন্যরা। খৃস্টানরা তাদের রসদও ফেলে গেছে। আল-আদিল তার বাহিনীকে নির্দেশ দেন, দুশমনের ফেলে যাওয়া সম্পদগুলো জড়ো করো এবং তাদের পশুগুলোকেও ধরে আনো।

আল-আদিলের এই আক্রমণ বীরত্ব, জযবা ও যুদ্ধবিদ্যার বিচারে প্রশংসনীয় অভিযান ছিলো। কিন্তু সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তার দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারেননি। প্রয়োজন ছিলো, দিশেহারা অবস্থায় পলায়নপর খৃস্টানদের ধাওয়া করে তাদের সামরিক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া। তারপর সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে সেই অঞ্চলে ঢুকে যাওয়া, যেটি খৃস্টানরা জয় করে নিয়েছিলো। যতো বেশি সম্ভব শত্রুসেনাদের বন্দি করাও আবশ্যক ছিলো, যাদেরকে নিজেদের বন্দিদের মুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা যেতো। কিন্তু সফল গেরিলা আক্রমণ থেকে বড় কোনো সফলতা অর্জন করা আল-আদিলের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কারণ, তাঁর সৈন্য ছিলো কম। ধাওয়া করার শক্তি তাঁর ছিলো না। গেরিলা ও কমান্ডো হামলা চালিয়ে দুশমনকে অস্থির ও আধমরা করা যায়। পরাজিত করে ভূ-খন্ড দখল করতে হলে পরিপূর্ণ সামরিক শক্তির প্রয়োজন। আল-আদিল প্রথম কাজটি সাফল্যের সঙ্গে আঞ্জাম দিয়েছেন বটে; কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য কোন সামর্থ তাঁর ছিলো না।

আল-আদিল একটি সাফল্য এই অর্জন করেছেন যে, রামাল্লার পরাজয় তাঁর স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের উপর যে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিলো, সেটি দূর হয়ে গেছে এবং সৈনিকদের জযবা ও মনোবল চাঙ্গা হয়ে ওঠেছে। তাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা জন্মে গেছে, খৃস্টানরা তাদের চে' শক্তিশালী নয় এবং যে কোনো ময়দানে তারা খৃস্টানদের পরাজিত করতে সক্ষম। প্রয়োজন শুধু সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করা। এই সাফল্যও অর্জিত হয়ে গেছে যে, তারা হামাতের

দুর্গটাকে রক্ষা করেছে। অন্যথায় খৃস্টানরা একটি দুর্গও পেয়ে গিয়েছিলো।

আল-আদিল নিজ হেডকোয়ার্টারে বসে আক্ষেপ করছেন। সালারদের আবেগ তাঁর চেয়েও বেশি উত্তেজিত। যদি পর্যাপ্ত সৈন্য থাকতো, তাহলে এ কমান্ডো অভিযানের পর অনেক বড় সাফল্য অর্জন করা যেতো এবং বল্ডউইন তার সৈনিকদেরকে জীবিত নিয়ে যেতে পারতো না।

আল-আদিল স্বীয় বড় ভাই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নামে পত্র লিখেন–

'শ্রদ্ধেয় বড় ভাই এবং মিসর-সিরিয়ার সুলতান! আল্লাহ আপনাকে সালতানাতে ইসলামিয়ার মর্যাদার খাতিরে দীর্ঘায়ু দান করুন। আমি এই আশায় পত্র লিখছি যে, আপনি সুস্থ্য শরীরে নিরাপদে কায়রো পৌঁছে গেছেন। একবার সংবাদ পেয়েছিলাম, আপনি শহীদ হয়ে গেছেন। তারপর খবর এলো, আহত হয়েছেন। আমি ও আমার সালারগণ চিন্তা ও পেরেশানীতে আছি। আপনি বুদ্ধির কাজ করেছেন যে, রাস্তা থেকেই দূত প্রেরণ করে আমাদের অবহিত করেছেন, আপনি নিরাপদ আছেন এবং কায়রো যাচ্ছেন। আমি আশা করছি, আপনি রামাল্লার পরাজয়ে ভেঙে পড়েননি। আমরা ইনশাআল্লাহ এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো, হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধার করবো এবং বাইতুল মুকাদ্দাস অতিক্রম করে সম্মুখেও এগিয়ে যাবো।'

আপনি রামাল্লার পরাজয়ের কারণ নিয়ে চিন্তা করছেন। আমি এর দায় ফৌজের উপর চাঁপাবো না। আমাদের ভাইয়েরাই আমাদেরকে সেইদিন পরাজয়ের পথে নিক্ষেপ করেছে, যেদিন তারা আমাদের বিপক্ষে সারিবদ্ধ হয়েছিলো। দুই ভাই যখন আপসে যুদ্ধ করে, তখন তাদের শত্রুরা সহমর্মিতার আড়ালে একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে। রাজত্বের নেশা আমাদের ভাইদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে। সালতানাতে ইসলামিয়ার যে সম্পদ ছিলো, গৃহযুদ্ধে সব শেষ হয়ে গেছে। আমাদের বাহিনীর ভালো ভালো অভিজ্ঞ সৈন্যগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের ফৌজ আর আমরা একই খেলাফতের সৈনিক ছিলাম। কিন্তু তাদের সেই ফৌজ শুধু এ কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের কতিপয় লোক সিংহাসনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলো। যে জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে সিংহাসনের লোভ সৃষ্টি হবে, সেই জাতিকে তারা দলে দলে ও গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করে আপসে যুদ্ধ করাবে। আমাদেরকে এদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে, যেনো জাতি বিভেদ-বৈষম্যের শিকার না হয়। আমাদের

সিংহভাগ সৈন্য গৃহযুদ্ধে বিনষ্ট হয়েছে। নতুন ভর্তি দ্বারা আমরা সেই অভাব পূরণ করেছি এবং পরাজয়বরণ করেছি। রণাঙ্গন থেকে বিশৃংখলভাবে পলায়নকারী সব সৈন্যই নতুন ছিলো।'

'রামাল্লার পরাজয়ের পরপরই আমি এবং আমার সালারগণ প্রমাণ করে দিয়েছি, আমাদের ফৌজ পরাজিত হয়নি। আমার নিকট সেই পদাতিক ও অশ্বারোহী যোদ্ধারাই ছিলো, আপনি যাদেরকে আমার কমান্ডে রেখে গিয়েছিলেন। আপনি আমাকে রিজার্ভ রেখেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এতো দ্রুত পাল্টে যায় যে, আপনার কোনো নির্দেশ আমার কাছে এসে পৌঁছেনি। আমি এ-ও জানতে পারিনি, সম্মুখে কী হচ্ছে। আর আমি আপনাকে কি-ইবা সাহায্য করতে পারতাম। পেছনে সরে আসা এক কমান্ডার– যে ডান পার্শ্বে ছিলো– আমাকে উদ্বেগজনক সংবাদ জানালো এবং পরামর্শ দিলো, আমি যেনো আমার বাহিনীকে ব্যবহার না করি এবং আক্রমণ করে ভুল না করি। আমি আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমি আমার বাহিনীকে হামাত অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করি।'

'আমার বাহিনীর মনোবল ভেঙে গিয়েছিলো। আমি দু'আ করতে থাকি, যেনো দুশমন আমার সামনে এসে পড়ে আর আমি আমার সৈনিকদের চেতনায় জীবন ফিরিয়ে আনতে পারি। আমি পেছনে লোক রেখে এসেছিলাম। হামাতের পার্বত্য অঞ্চলের সংবাদদাতারা আমাকে মূল্যবান সংবাদ জানালো, বল্ডউইন আমার পশ্চাদ্ধাবনে আসছে। আমি দুর্গে আছি মনে করে তিনি তার পুরো বাহিনীকে হামাতের দুর্গ অবরোধের জন্য নিয়ে আসেন। কিন্তু আমি আপনারই কৌশল মোতাবেক পাহাড়ের অভ্যন্তরে সৈন্যদের লুকিয়ে রাখি এবং দুর্গপতিকে আমার পরিকল্পনা ও পরিস্থিতি অবহিত করে রাখি। আল্লাহ্ আমার আশা পূর্ণ করেছেন। আমার সৈন্যরা বল্ডউইনের বাহিনীর উপর– যাদের সংখ্যা আমার চেয়ে দশগুণ বেশি– অত্যন্ত বীরোচিত ও সফল কমান্ডো আক্রমণ চালায়। এটি আপনার সেই বাহিনীর কমান্ডো অভিযান, যাদের সম্পর্কে ইতিহাস বলবে, এরা পরাজিত হয়েছিলো। আমি মনে করি, এই কমান্ডো অভিযানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখা দরকার, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বলতে না পারে, পরাজয়ের পর জাতি মরে যায়।'

'পরদিন রাত পোহাবার পর আমরা যে দৃশ্যটা দেখলাম, যদি আপনি

দেখতেন, তাহলে রামাল্লার পরাজয়ের সব বেদনা ভুলে যেতেন। আমার আফসোস, বল্ডউইন আমার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি তাকে ধরতে পারিনি। এই মুহূর্তে আমি একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাতেব দ্বারা পত্র লেখাচ্ছি। ঐ যে আমি হামাতের দুর্গটা দেখতে পাচ্ছি। তার উপর মিসর ও সিরিয়ার পতাকা উড়ছে। দুর্গের চতুর্পার্শ্বে খৃস্টানদের লাশ ছাড়া আর যা দেখা যাচ্ছে, তাহলো হাজার হাজার শকুন, যারা লাশগুলো খাবলে খাচ্ছে। আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনের দল নামছে। কোনো কোনো স্থান থেকে ধোঁয়া উঠছে। এই আগুন গত রাতে আমার গেরিলারা লাগিয়েছিলো। বল্ডউইনের জীবিত সৈন্যরা যেরূপ বিক্ষিপ্ত ও জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পলায়ন করেছে, তাতে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, সে পাল্টা আক্রমণ করতে পারবে না। তথাপি আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি।'

'বর্তমানে আমার হাতে যে পরিমাণ সৈন্য আছে, যদি আরো এ পরিমাণ সৈন্য থাকতো, তাহলে আমি খৃস্টানদের ধাওয়া করতাম এবং পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করে দিতাম। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমার সালার, কমান্ডার ও সকল সৈন্যের যুদ্ধের জয্বা চাঙ্গা হয়ে গেছে। আমি জানি, আপনি আরামে বসে নেই। মিসর পৌঁছেই আপনি নতুন ভর্তি ও নববিন্যাসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি শান্তমনে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আমি গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত রাখবো। আমি দুশমনকে কোথাও সুস্থির বসতে দেবো না। এই প্রক্রিয়ায় আমি কোনো অঞ্চলের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারবো না বটে; কিন্তু আপনি প্রস্তুতির সময় পেয়ে যাবেন। আমি দামেশ্‌কে ভাই শামসুদ্দৌলাকে বার্তা প্রেরণ করেছি, যেনো তিনি আমার জন্য কয়েক ইউনিট সৈন্য ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রেরণ করেন। হাল্‌বে আল-মালিকুস সালিহকে পত্র দিয়েছি, যেনো তিনি চুক্তি মোতাবেক আমাকে সাহায্য দেন। আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি আপনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি, আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি ও আমার সালারগণ আপনার কুশল ও তৎপরতা সম্পর্কে জানতে উদগ্রীব। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমি তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।'

–ইতি আল-আদিল।

লেখা শেষ হওয়ার পর আল-আদিল পত্রখানা পাঠ করিয়ে শোনেন। তারপর তাতে স্বাক্ষর করে দূতের হাতে দিয়ে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেন।

❖ ❖ ❖

কায়রোর আকাশে হতাশার কালো মেঘ ছেয়ে গেছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এখন কায়রো। নগরে-প্রত্যন্ত অঞ্চলে সকলের মুখে একটি-ই শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে– পরাজয়, পরাজয়, পরাজয়। সংশয়-সন্দেহও দিন দিন বেড়ে চলছে। পরাজয়ের মতো দুর্ঘটনা এবং অজ্ঞাত-কারণ ঘটনাবলি এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করে, যার থেকে গুজব জন্ম নিয়ে দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হয়ে গেছে কায়রোতে এবং তার আশপাশের অঞ্চলসমূহে, যেখানে শত্রুর নাশকতা কর্মী এবং গুপ্তচরও আছে, যারা ইউরোপের বাসিন্দা– মিসরেরই মুসলমান অধিবাসী। তারা খৃস্টানদের বেতনভোগি হয়ে কাজ করছে। তাদের দায়িত্ব, প্রচার করে বেড়ানো যে, খৃস্টানদের এতোবেশি সামরিক শক্তি আছে, যার সম্মুখে পৃথিবীর কোনো শক্তির দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। সুলতান আইউবীর পরাজিত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হয়ে যায় যে, এরা অথর্ব ও বিলাসী বাহিনী। যেখানে যায় লুট করে ফিরে এবং হাতে পেলেই মেয়েদের সম্ভ্রমহানী ঘটাতেও কুণ্ঠিত হয় না। সুলতান আইউবীর সামরিক যোগ্যতার বিরুদ্ধেও প্রচারণা শুরু হয়ে যায়।

একজন মানুষ যতো বেশি সরল হয়, গুজব ও আবেগময় বক্তব্য দ্বারা সে ততোবেশি প্রভাবিত হয়। সর্বত্র আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। এই কাজটা বেশি করছে নতুন ভর্তি হওয়া সৈন্যরা। আর সাধারণ মানুষ এই অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠছে। আল-আদিল ঠিকই লিখেছেন, রাজত্বের লোভী মুসলিম আমীরগণ নিজেদেরকে এবং সুলতান আইউবীর বাহিনীকে যদি গৃহযদ্ধে জড়িয়ে ধ্বংস না করতো, তাহলে নতুন সৈনিকদের দ্বারা যুদ্ধ করাবার ঝুঁকি মাথায় নিতে হতো না। একটি ভুল ভর্তিসংশ্লিষ্ট কতিপয় কর্মকর্তাও করেছিলেন যে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গনীমতের প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। অথচ, প্রয়োজন ছিলো জিহাদের ফযীলত, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মানুষকে সেনা বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং একথা জানানো যে, তাদের শত্রু কারা, তাদের প্রকৃতি ও লক্ষ্য কী?

রামাল্লায় পরাজয়বরণ করে ফিরে আসা এই সৈন্যরা একাকি কিংবা দু'-দু'জন, চার-চারজনের ছোট ছোট দলে মিসরের সীমানায় প্রবেশ করছিলো। কেউ পায়ে হেঁটে কেউবা উট-ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। কোনো সৈনিক যখন লোকালয়ে প্রবেশ করছে, জনতা তাকে ঘরে নিয়ে পানাহার

করাচ্ছে এবং যুদ্ধের কাহিনী জিজ্ঞাসা করছে। নতুন ও অনভিজ্ঞ বলে তারা পরাজয়ের গ্লানি দূর করার লক্ষ্যে কমান্ডারদেরকে অযোগ্য ও বিলাসী আখ্যায়িত করছে এবং খৃস্টান বাহিনীর শক্তির বর্ণনা দিচ্ছে। কারো কারো কথায় প্রমাণিত হচ্ছিলো, খৃস্টানদের কাছে অলৌকিক এমন কোন শক্তি আছে, যার ফলে তারা যেখানেই যাচ্ছে বিজয় ছিনিয়ে আনছে।

দু'-তিনজন ঐতিহাসিক– যাদের মধ্যে আরনল্ড অন্যতম– লিখেছেন, খৃস্টানরা একটি গোপন অস্ত্র নিয়ে এসেছিলো এবং সেটিই তাদের বিজয়ের কারণ হয়েছিলো। সেই গোপন অস্ত্রটা কী, ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের রোজনামচায় এরূপ কোনো অস্ত্রের উল্লেখ নেই। তৎকালের কাহিনীকারগণও এই 'গোপন অস্ত্র' সম্পর্কে নীরব। সম্ভবত অস্ত্রটি হলো খৃস্টানদের প্রোপাগান্ডার অস্ত্র, যাকে মিসর ও অন্যান মুসলিম অঞ্চলে খৃস্টানদের আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিলো। বোধ হয় এই প্রোপাগান্ডা কৌশলকেই ঐতিহাসিকরা 'অস্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন।

এই গোপন অস্ত্র আসলে প্রোপাগান্ডাই ছিলো। তার উদ্দেশ্য ছিলো চারটি। প্রথমত, জানগণের চোখে সেনা বাহিনীকে অপদস্ত করা, যাতে সুলতান আইউবীর ফৌজ জনগণের সহযোগিতা ও নতুন ভর্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের মনে খৃস্টানদের ভীতি সৃষ্টি করা। তৃতীয়ত, সুলতান আইউবীর প্রতি দেশবাসীর আস্থা নষ্ট করা। চতুর্থত, আরো কিছু লোক রাজত্বের দাবিদার হয়ে যাবে এবং পুনর্বার গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া যাবে।

সুলতার আইউবী দুশমনের এই অস্ত্র সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। তাই কায়রো পৌঁছেই তিনি গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান, নগর প্রধান গিয়াস বিলবীস ও তাদের নায়েবদেরকে ডেকে বলে দেন, দুশমনের এই গোপন তৎপরতা প্রতিরোধের জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এবং আমাদের গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদেরকে আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে জোরদারভাবে কাজে লাগিয়ে দিন।

কিন্তু জনগণ জানতে চায় এই পরাজয়ের কারণগুলো কী, এর জন্য দায়ী কে?

❖ ❖ ❖

রামাল্লা থেকে কায়রোর দূরত্ব অনেক দীর্ঘ এবং সফর অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক। পথে পাহাড়ি এলাকাও আছে, বালির টিলা এবং মরুভূমিও

আছে, যে ভূমি পথভোলা পথিকের রক্ত চুষে খেয়ে থাকে। রামাল্লায় পরাজিত হয়ে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া সুলতান আইউবীর সৈনিকগণ এই দীর্ঘ ও বিপজ্জনক পথেই যাত্রা শুরু করে। তাদের প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য ছিলো ভয়ংকর। যারা মরুভূমির সফরে অভ্যস্ত ছিলো না, তারা কোথাও পড়ে গেলে আর উঠতে পারতো না। মৃতদের লাশ মাত্র একদিন নিরাপদ থাকতো। একদিন পরই মরু শিয়াল আর নেকড়েরা তাদের হাড়-মাংস ছিন্নভিন্ন করে ফেলতো। দলবদ্ধভাবে চলা সৈনিকরা এই পরিণতি থেকে রক্ষা পেতো। যারা উট-ঘোড়া ও খচ্চরে আরোহণ করে চলতো, তাদের জীবিত ফিরে আসার সম্ভাবনা বেশি ছিলো।

এমনই একটি ক্ষুদ্র দল পথ চলছে। তারা উট ও ঘোড়ার আরোহী। পথে পথে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া নিঃসঙ্গ সঙ্গীরা তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। এক পর্যায়ে দলটি ত্রিশ-চল্লিশজনের বড়সড় একটি কাফেলায় পরিণত হয়ে যায়। তারা সেই ভয়ানক মরুদ্যান দিয়ে পথ চলছে, যাকে বর্তমানে সিনাই মরুভূমি বলা হয়। দলবদ্ধতার কারণে তাদের মনোবল অটুট। কিন্তু দিগন্ত পর্যন্ত পানির চিহ্ন চোখে পড়ছে না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত রণাঙ্গন ত্যাগ করে আসা এক একজন, দু'দু'জন এবং তিন তিনজন সৈনিক পা টেনে টেনে হাঁটছে। তারা একে অন্যের কোনোই সাহায্য করতে পারছে না। শুধু এতোটুকু পারছে, কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার কোনো একজন সঙ্গী তাকে বালিতে পুতে রাখছে।

আরোহীদের এই কাফেলাটি এগিয়ে চলছে। এখন সম্মুখে আছে দেয়াল, খুটি এবং গৃহের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকা মাটির উঁচু-নীচু টিলা। এক সৈনিক একটি টিলার উপর একজন মানুষের মাথা ও কাঁধ দেখতে পায়। কিন্তু পরক্ষণেই লোকটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সৈনিক তার সঙ্গীদের বললো, ও পর্যন্ত গিয়ে নেমে যাবো। ওখানে অন্য কিছু আছে। ক্ষুৎ-পিপাসা ও ক্লান্তিতে কাফেলার অধিকাংশ সদস্যেরই দিশেহারা অবস্থা। এতোক্ষণ তারা যুদ্ধের আলোচনা করে চলছিলো। কিন্ত এখন আর কারো মুখ থেকে কথা সরছে না। তাদের পশুগুলোর মধ্যে এখনো প্রাণ আছে। তারা ভালোভাবেই হাঁটছে।

এক মাইল দূরের টিলা শত ক্রোশের দূরত্বে পরিণত হয়ে যায়। কাফেলা সেখানে পৌঁছে যায় এবং দু'টি টিলার মধ্য দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। সকলে বাহনের পিঠ থেকে অবতরণ করে। পশুগুলোকে ছায়ায় ছেড়ে দিয়ে

নিজেরা একটি উঁচু টিলার নীচে বসে পড়ে।

লোকগুলো বসে সবেমাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। হঠাৎ একটি টিলার আড়াল থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে তাদের সম্মুখে এসে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে যায়। লোকটি মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা পোশাকে আবৃত। পোশাকটি কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত চোগা। মুখে কালো দাড়ি। নিপুণভাবে ছাটা খাটো দাড়ি। হাতে একটি লাঠি, যে লাঠি সাধারণত আলিম, বুযুর্গ-দরবেশ ও খতীবদের হাতে থাকে। লোকটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কাফেলার লোকজনও একদম নীরব। খানিক পর একজন ক্ষীণ কণ্ঠে মন্তব্য করে– 'হযরত খিজির বোধ হয়'।

'ইনি এই পৃথিবীর মানুষ নন'– আরেকজন ফিস্ ফিস্ করে বললো।

কাফেলার লোকদের মনে ভয় ধরে যায়। তারা এমনিতেই সন্ত্রস্ত। এই রহস্যময় লোকটি তাদের ভীতি বাড়িয়ে তুলেছে। 'আপনি কে?' জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো নেই। এই নিঠুর মরু অঞ্চলে এ প্রকৃতির কোনো মানুষের উপস্থিতি বিস্ময়করই বটে। সৈনিক হলে ভয়ের কিছু ছিলো না।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটি মেয়ে তার এক পার্শ্বে এমনভাবে দাঁড়িয়ে যায়, যেনো মেয়েটি তার দেহের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরক্ষণে আরো একটি মেয়ে একইভাবে তার অপর পার্শ্বে আত্মপ্রকাশ করে। নিতান্ত বিস্ময়কর ও অলৌকিক ব্যাপারই বটে; কাফেলার ভীতি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। মেয়ে দু'টো আপাদমস্তক পোশাকাবৃত। চোখের উপর জালের ন্যায় পাতলা কাপড়। হাতগুলোও বোরকাসম চাদরে ঢাকা।

'তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক'– দরবেশ মুখ খোলে– 'আমি কি আরো এগিয়ে এসে তোমাদেরকে আমার পরিচয় বলবো?'

সকলে পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর সেই লোকটি ও মেয়ে দু'টোকে নিরীক্ষা করে দেখে। একজন ভয়জড়িত কণ্ঠে বললো– 'আপনি আমাদের নিকটে এসে বলুন আপনি কে এবং আমাদের জন্য আপনার কী নির্দেশ। আমরা আপনার নির্দেশ পালন করবো।'

লোকটি এমনভাবে হেঁটে তাদের নিকটে চলে আসে, যে হাঁটা মানুষ হাঁটে না। লোকটির চলন ও ভাবভঙ্গিতে গাম্ভীর্য ও প্রভাব বিদ্যমান। মেয়ে দু'টোও তার পেছনে পেছনে এগিয়ে আসে। শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কাফেলার সকলে দাঁড়িয়ে যায়। তারা সন্ত্রস্ত। লোকটি টিলাটা পেছনে করে বসে পড়ে। মেয়েরাও দু'পার্শ্বে বসে যায়। জালের মধ্যদিয়ে তাদের চক্ষু

দেখা যাচ্ছে। বুঝা যাচ্ছে, খুবই রূপসী মেয়ে। কিন্তু তাদের চোখে চোখ রাখার সাহস কারো হচ্ছে না। লোকটির এবং মেয়ে দু'টোর পোশাক ধুলামলিন। বোঝা গেলো, তারাও সফরে আছে।

'আমিও সেখান থেকে এসেছি, যেখান থেকে তোমরা এসেছো'– দরবেশ মিসরের পালিয়ে আসা সৈনিকদের বললো– 'পার্থক্য শুধু এটুকু যে, তোমরা যেখানে যাচ্ছো, সেটি তোমাদের আবাস আর আমার আবাস সেটি ছিলো, যেখান থেকে আমি এসেছি।'

লোকটির কণ্ঠে হতাশা।

'আমরা কীভাবে বিশ্বাস করবো, আপনি মানুষ?'– এক সৈনিক জিজ্ঞাসা করে– 'আমরা তো আপনাকে আকাশের প্রাণী মনে করছি?'

'আমি মানুষ'– লোকটি উত্তর দেয়– 'আর এরা দু'জন আমার কন্যা। আমিও তোমাদের ন্যায় রামাল্লা থেকে পালিয়ে এসেছি। আমার মুরশিদ যদি আমার প্রতি দয়া না করতেন, তাহলে খৃস্টানরা আমাকে হত্যা করে ফেলতো এবং আমার মেয়ে দু'টোকে ছিনিয়ে নিতো। এ আমার মুরশিদের মাজারের বরকত। আমি রামাল্লার বাসিন্দা। শৈশব থেকেই আমার ধর্মজ্ঞান অর্জনের আকাঙ্খা ছিলো। আমি বহু মসজিদের ইমামের অনেক খেদমত করেছি এবং তাদের থেকে ইল্‌ম হাসিল করেছি। আল্লাহ তাঁর রাসূলের ধর্মের অনুসারীদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করে থাকেন। এক রাতে আমি স্বপ্নে নির্দেশ পাই, তুমি বাগদাদ চলে যাও এবং সেখানকার খতীবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করো।'

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গে কিছুই ছিলো না। পায়ে হেঁটে রওনা হই। পিতা-মাতা নিতান্ত গরীব ছিলেন। সঙ্গে পানি রাখার জন্য একটি মশকও ছিলো না। ইল্‌মের পিপাসা এই সহায় সম্বলহীন অবস্থায় আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। রওনার সময় সকলে মন্তব্য করলো, ছেলেটা পথেই মরে যাবে। বাবা-মা খুব কান্নাকাটি করলেন। কিন্তু আমি তারপরও বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার পর এই আশায় কোথাও পড়ে থাকতাম যে, এখানেই মরে বাঁচবো। কিন্তু চোখ খুলে দেখতাম, পার্শ্বে পানির একটি পাত্র ও কিছু খাবার পড়ে আছে। প্রথমবার খুব ভয় পেয়েছিলাম। প্রথমে বিষয়টা জিন-পরীদের কারসাজি মনে করেছিলাম। কিন্তু রাতে স্বপ্নে ইঙ্গিত পেলাম, এটা কোনো এক মুরশিদের কারামত।

আমি জানতে পারলাম না, এই মুরশিদ কে এবং কোথায় আছেন। আমি পানাহার করে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে জাগ্রত হয়ে দেখি, পানির পেয়ালাও নেই, খাবারের পাত্রও নেই।

বাগদাদ পৌঁছতে পৌঁছতে দু'টি নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে। সফর অনেক দীর্ঘ ছিলো। প্রতিরাতেই আমি প্রথম দিনের ন্যায় খাদ্য-পানীয় পেতে থাকি। আমি বাগদাদের জামে মসজিদে গিয়ে পৌঁছি। খতীব আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই বললেন, আমি তোমার পথের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি আমাকে তার হুজরায় নিয়ে গেলেন। আমি বিস্মিত হলাম, যে দু'টি পাত্র করে প্রতিরাতে আমার নিকট খাদ্য-পানীয় পৌঁছতো, সেগুলো হজরতের হুজরায় পড়ে আছে। তিনি বললেন, আল্লাহ হযরত মূসাকে (আ.) সাহায্য করতে চাইলেন। তিনি নীলনদকে নির্দেশ দিলেন, পথ দিয়ে দাও। নদীর ডানের পানি ডানে, বাঁয়ের পানি বাঁয়ে সরে গেলো। মধ্যখানটা শুকিয়ে রাস্তা হয়ে গেলো। মূসা (আ.) বেরিয়ে গেলেন। ফেরাউন তাঁকে ধাওয়া করতে গিয়ে যখন নদীর রাস্তায় নেমে পড়লো, অমনি দু'দিকের পানি একত্রিত হয়ে তাকে ডুবিয়ে মারলো। ফেরাউন আল্লাহর গজবে নিপতিত হলো।'

'খতীব বললেন, আমরা সেই সত্ত্বার অনুগত, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর যে বান্দা তাঁর ইল্‌মের প্রেমে পাগল হয়, যেমনটি তুমি হয়েছো; তাকে তিনি মরুভূমিতে পিপাসায় মরতে দেন না; নদী-সমুদ্রেও ডুবিয়ে মারেন না। সেই মহান সত্ত্বাই তোমাকে কয়েক মাসের কঠিন পথ পার করিয়ে নিরাপদে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, তোমার বক্ষে যে ইল্‌ম আছে, সব ঐ বালকটির বক্ষে স্থানান্তরিত করো এবং তোমার খেদমতের জন্য যে দু'টি জিন নিয়োজিত রেখেছি, তাদেরকে বলো, পথে পথে ছেলেটাকে খাদ্য ও পানীয় পৌঁছিয়ে দিক। আমি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করেছি। প্রতিরাতে তোমার জন্য এখান থেকে খাবার যেতো। তুমি বিস্মিত হয়ো না বেটা!, অস্থিরও হওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। অনেক কম লোকেরই হৃদয়ে ইল্‌মের বাতি প্রজ্বলিত হয়ে থাকে, যার আকাঙ্খা তৃমি নিয়ে এসেছো। তোমার নিয়ত ভালো। অন্তরে আল্লাহর খোশনুদির তামান্না আছে। এই তামান্না যার থাকে, সমগ্র মানুষ ও জিন তার গোলাম হয়ে যায়।'

'জিনরা কি আপনার গোলাম?' এক সৈনিক জিজ্ঞেস করে।

'তা নয়'– দরবেশ জবাব দেয়– 'কেউ কাউকে গোলাম বানাতে পারে না। আমরা সকলে এক আল্লাহর বান্দা। উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র বিবেচিত হয় না। ঈমানের পরিপক্কতা আর দুর্বলতা দ্বারা মানুষের মর্যাদা পরিমাণ করা হয়।'

লোকটির বক্তব্যে এমন এক যাদু, যা সকলকে মুগ্ধ করে তোলে। সকলে তন্ময় হয়ে তার বক্তব্য শুনছে। সে বললো– 'বাগদাদের খতীব আমার হৃদয়কে ইল্‌ম দ্বারা আলোকিত করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে বিবাহও করিয়েছেন। সেখানেই আমার এই দু'টি কন্যা জন্ম লাভ করে। বহু সাধনার পর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে দু'-তিনটি ভেদ লাভ করি। এক রাতে খতীব আমাকে বললেন, এবার যাও। গিয়ে সেই লোকগুলোর সেবা করো, যারা ইল্‌মকে সঙ্গে নিয়ে চিরদিনের জন্য কবরে ঘুমিয়ে আছে। তিনি আমাকে রামাল্লায় নিজ বাড়িতে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। আমাকে দু'টি উট দিলেন। পাথেয় দিলেন এবং বললেন, অন্তরে কখনো পাপের কল্পনা জাগ্রত হতে দেবে না। রামাল্লা পৌঁছার পর এক রাতে তুমি অনিচ্ছায় শয্যা থেকে উঠে হাঁটা দেবে। সম্ভবত তোমাকে বেশি দূর যেতে হবে না। তোমার পা আপনা-আপনি থেমে যাবে। সেটি একটি পবিত্র স্থান হবে। সেটিকে তুমি আস্তানা বানিয়ে নেবে। তবে আমি একটি সময়– যা এখনো ভবিষ্যতের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে– দেখতে পাচ্ছি। সেই সময়টায় পাপ হবে এবং তোমাকে অন্যের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। বোধ করি, তোমাকে হিজরতই করতে হবে।

'আমি যখন স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে সফরে ছিলাম, তখন সূর্যের প্রখরতা আমার জন্য শীতল হয়ে গিয়েছিলো। যে মরুভূমিতে পানির নাম-চিহ্ন থাকার কথা নয়, আমি সেখানেও অনায়াসে পানি পেয়ে যেতাম। রামাল্লা পৌঁছে দেখি, আমার পিতা-মাতা দু'জনই মারা গেছেন। আমার স্ত্রী বিরান ঘরটিকে ঝেড়ে-মুছে বাসযোগ্য করে তোলে। আমি বিদ্যার সাগরে ডুবে থাকি। ধীরে ধীরে মেয়েগুলো বেড়ে ওঠে। আল্লাহ্ তাদের মাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে যান। মেয়েরা আমার ঘর-গেরস্থলির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। এক রাতে আমি গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ এমনভাবে আমার চোখ খুলে যায়, যেনো কেউ আমাকে ডেকে তুলেছে।'

'আমি ধড় মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে যাই। বাগদাদের খতীবের কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ে যায়, তুমি আপনা-আপনি জেগে উঠবে এবং কোনো ইচ্ছা-পরিকল্পনা ছাড়াই হাঁটতে শুরু করবে। তা-ই হয়েছে। আমার

মনে কোনো ইচ্ছা, কোনো পরিকল্পনা ছিলো না। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। লোকালয়ও ত্যাগ করে চলে আসি। কোথাও কোথাও মনে হতো, কে যেনো আমার সামনে সামনে হাঁটছে। জানি না, এটা নিছক কল্পনা ছিলো, না বাস্তব।

আমি হাঁটতে থাকি। জানি না তোমরা সেই জায়গাটি দেখেছো কিনা, যেখানে বেশ গভীরতা আছে এবং সেই গভীরতায় নদী প্রবাহিত হচ্ছে। খৃস্টানদের ফৌজ সেখানেই লুকিয়ে ছিলো। আমি শুনেছি, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নাকি মাটির শেষ স্তরে লুকিয়ে থাকা দুশমনকেও দেখতে পান। কিন্তু ওখানে আল্লাহ তাঁর চোখের উপর এমন আবরণ ফেলে দিয়েছিলেন যে, তিনি এটুকুও জানতে পারলে না, তিনি নিজে কোথায় আছেন। খৃস্টান বাহিনী তোমাদের বাহিনীকে ফাঁদে নিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ চালায়। পরে তোমাদের কী পরিণতি ঘটেছিলো, তা তো তোমাদের জানা আছে।'

সেই যুদ্ধের বছর কয়েক আগে এক রাতে আমি আপনা-আপনি কিংবা কোন অদৃশ্য শক্তির জোরে সেই গর্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং এক স্থানে আমার পা আটকে গিয়েছিলো। জোছনা রাত ছিলো। আমি একটি কবর দেখতে পেলাম, যার চার পার্শ্বে দু'হাত উঁচু পাথরের দেয়াল। আমি পরীক্ষার জন্য অন্য একদিকে পা বাড়াতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি আপনা-আপনি কবরের দিকে ঘুরে গেলাম এবং পাথরের দেয়ালের অভ্যন্তরে যাওয়ার যে পথ ছিলো, তাতে ঢুকে পড়ি। ফাতেহা পাঠের জন্য আমার দু'হাত আপনা-আপনি উপরে উঠে যায়। মনে হলো, জায়গাটার জোছনা বেশি ফকফকা। মনে জাগলো, খতীব আমাকে এ স্থানটির কথা-ই বলেছিলেন। আমি কবরের উপর হাত রেখে বললাম, আমি গোলামটার জন্য নির্দেশ কী? কোন উত্তর আসলো না। মনে প্রতীতি জন্মালো, কয়েকটা রাত সেখানেই কাটিয়ে দেই। সকালে নদীতে গিয়ে অজু করে এসে নামায আদায় করি। তারপর যখন সেখান থেকে বিদায় নিলাম, তখন আমার মধ্যে এক রকম মাদকতা বিরাজ করছিলো, যেনো আমি ধনভান্ডার পেয়ে গেছি।'

তারপর উক্ত কবর থেকে আমার প্রতি এমনভাবে দিক-নির্দেশনা আসতে শুরু করে যে, আমি কোনো শব্দ শুনতাম না। অন্তরে যা কিছু জাগ্রত হতো, তা-ই আমার দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হতো। আমি কবরটির দেয়াল আরো উঁচু করে উপরে গম্বুজ নির্মাণ করে দেই। আমি অনেক দূর-

দূরান্ত পর্যন্ত গিয়েছি। হাল্‌ব-মসুল ছাড়াও বাইতুল মোকাদ্দাসও গিয়েছি। কিছুদিন যাবত উক্ত মাজার থেকে যে সব নির্দেশনা পাচ্ছিলাম, সেগুলো সুখকর ছিলো না। এটি যে বুযর্গের মাজার, তার আত্মা ছটফট করছে বলে মনে হচ্ছিলো। আমি কবরের উপর সবুজ চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলাম। এক রাতে হঠাৎ চাদরটি ফড় ফড় শব্দ করে ওঠে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। চাদরের উপর হাত বুলিয়ে বললাম– 'আদেশ করুন মুরশিদ!'

মাজারের ভেতর থেকে আওয়াজ আসে– 'তুমি কি দেখছো না মুসলমান মদপান করছে? তুমি মুসলমানদেরকে মদের অপকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করো।'

আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। কিন্তু মদ পানকারীরা ছিলো আমীর ও শাসক গোষ্ঠী। আমার আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছেনি।

তারপর আরেক রাত মাজারের চাদর ফড় ফড় করে ওঠে আমাকে বললো, মিসর থেকে আসা ফৌজ মুসলিম বসতিগুলোতে মুসলমানদের সঙ্গে সেই আচরণই করছে, যেমনটি খৃস্টানরা করে থাকে। সে সময় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ দামেশ্‌কেও ছিলো। তাছাড়া দামেশ্‌ক থেকে হাল্‌ব পর্যন্ত এবং সেখান থেকে রামাল্লা পর্যন্ত স্থানে স্থানে তাঁরা অবস্থান করছিলো। সেই ফৌজের কমান্ডাররা মুসলমানদের ঘরে মূল্যবান যতো সম্পদ পেয়েছে, লুট করে নিয়ে গেছে। তারা পর্দানশীন মুসলিম নারীদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করেছে। কমান্ডারদের দেখাদেখিতে সৈনিকরাও লুটপাট ও নারীর সম্ভ্রমহানী শুরু করে দিয়েছিলো। এই রিপোর্টও আছে যে, তোমাদের সালার ও কমান্ডারগণ মুসলিম মেয়েদের অপহরণ করে নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে রেখেছিলো। মাজার থেকে আদেশ আসে, তুমি সুলতান আইউবীর নিকট গিয়ে তাঁকে বলো, এই ফৌজ বাগদাদের খেলাফতের– মিসরের ফেরাউনদের নয়। কিন্তু যদি তারা এসব অপরাধ অব্যাহত রাখে, তাহলে তাদের পরিণতি ফেরাউনদের মতোই হবে।'

'সে সময়ে সুলতান আইউবী হাল্‌বের সন্নিকটে এক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলেন। আমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, তাঁর দেহরক্ষীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি সুলতানের সঙ্গে কেনো সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছো? বললাম, আমি রামাল্লা থেকে এসেছি এবং একটি বার্তা নিয়ে এসেছি। তারা জিজ্ঞাসা করলো, কার বার্তা? আমি বললাম, এই পয়গাম যার, তিনি জীবিত মানুষ নন। রক্ষীরা খিল খিল করে হেসে ওঠে। তাদের কমান্ডার উচ্চকণ্ঠে বললো, পাগল কোথাকার! সুলতান

আইউবীর জন্য কবরের বার্তা নিয়ে এসেছো, না? একজন বললো, লোকটি শেখ সান্নারের প্রেরিত ঘাতক। সুলতানকে হত্যা করতে এসেছে– একে আটক করো। কেউ বললো, খৃস্টানদের চর, মেরে ফেলো। অগত্যা গ্রেফতার এড়াবার জন্য আমি প্রকাশ করলাম, আমি পাগল। আমি সেখান থেকে পালিয়ে আসি। আমি স্বচক্ষে দেখেছি , সুলতান আইউবীর রক্ষীদের এক কক্ষে দু'টি মেয়ে বসে আছে।

'আমরা তো আমাদের ফৌজের সঙ্গে কোনো নারী দেখিনি!' এক সৈনিক বললো।

'তারা যখন দামেশ্‌ক গিয়েছিলো, তুমি কি তখন থেকেই ফৌজের সঙ্গে আছো?' লোকটি জিজ্ঞাসা করে।

'আমরা সবাই এই প্রথমবার এসেছি'– সৈনিক জবাব দেয়– 'আমরা নতুন সৈনিক।'

'আমি পুরাতন সৈনিকদের কথা বলছি'– লোকটি বললো– 'সে ফৌজের কমান্ডার ও সৈনিকরা উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে গেছে। তোমরা নতুন। এখনো পাপ করোনি। সে কারণেই তোমরা জীবিত ও নিরাপদে ফিরে এসেছো। যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের ঘর লুট করেছিলো এবং মুসলিম নারীদের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলো, তারা মারা গেছে। যারা বেশি গুনাহগার ছিলো, তাদের কারো পা কাটা গেছে, কারো বাহু। জীবিত পড়ে থাকা অবস্থায় শকুনেরা তাদের চোখ খুলে খেয়েছে। যারা তাদের চেয়েও বড় পাপী ছিলো, তারা খৃস্টানদের হাতে বন্দি হয়ে গেছে। যে বন্দিত্ব তাদের জন্য জাহান্নামের চেয়ে কম হবে না। তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত নির্যাতন। তারা ক্ষুৎ-পিপাসায় ছট ফট করতে থাকবে; কিন্তু মরবে না। মৃত্যুর জন্য দু'আ করবে; কিন্তু কবুল হবে না।'

'এই কি আমাদের পরাজয়ের কারণ?' এক সৈনিক বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

'আমি দু'বছর আগেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, এই বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে'– লোকটি 'বললো– 'আর এই ফৌজ কাফেরদেরকে ইসলামের অবমাননা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। এখন এই বাহিনী আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হলো।'

'আপনি কোথায় যাবেন?'– একজন জিজ্ঞাসা করে।

'আমি তোমাদের ন্যায় আল্লাহর গজব থেকে– যা খৃস্টান বাহিনীর আকারে নাযিল হয়েছিলো– পালিয়ে এসেছি'– লোকটি উত্তর দেয়– 'খৃস্টান

বাহিনী ঝড়ের ন্যায় এসেছিলো। তোমাদের ফৌজ তাকে প্রতিহত করতে পারেনি। আমি যদি একা হতাম, তাহলে মুরশিদের মাজারে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করে দিতাম। কিন্তু আমার এই যুবতী মেয়েগুলোর ইজ্জত তো আমি কুরবান করতে পারি না। খৃস্টানরা দু'টি বস্তু নাগালে পেলে ছাড়ে না। অর্থ আর নারী। আমার প্রতি মাজার থেকে নির্দেশ আসে, মেয়েদের নিয়ে তুমি মিসর চলে যাও। জিজ্ঞাসা করলাম, জীবন নিয়ে নিরাপদে যাবো কীভাবে? উত্তর আসে, তুমি আমার যে খেদমত করেছো, তার বিনিময়ে তোমরা নিরাপদেই কায়রো পৌঁছে যাবে। কিন্তু ওখানে গিয়ে নীরবে বসে থাকলে চলবে না। প্রতিজন মানুষকে বলতে হবে, পাপ করবে তো, এমন শাস্তি ভোগ করবে, যেমনটি ভোগ করছে তোমাদের ফৌজ। মাজার থেকে আমাকে আরো অনেক কিছু বলা হয়েছে, যা আমি মিসর পৌঁছে বলবো। তোমরা পরস্পরকে তাকাও। তোমাদের চেহারা লাশের ন্যায় সাদা হয়ে গেছে। তোমাদের দেহে যেনো প্রাণ নেই। আর আমার দিকে তাকাও। আমি আমার কন্যাদের নিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছি। সঙ্গে কোন খাদ্য-পানীয় ছিলো না। তারপরও আমরা কিরূপ তরতাজা! এটা মহান আল্লাহর'ই অনুগ্রহ।'

'আপনি কি আমাদেরকে মিসর পর্যন্ত আপনার ন্যায় নিয়ে যেতে পারেন?' এক সৈনিক জিজ্ঞাসা করে।

'পারি, যদি তোমরা ওয়াদা করো; অন্তর থেকে পাপের কল্পনা ঝেড়ে ফেলবে'— লোকটি উত্তর দেয়— 'আর এই প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমি যে মিশন নিয়ে মিসর যাচ্ছি, তাতে তোমরা আমার সঙ্গ দেবে।'

'আমরা সত্যমনে ওয়াদা করছি'— অনেকগুলো কণ্ঠ ভেসে ওঠে— 'আপনি বলুন, আমাদের কী করতে হবে। জীবন থাকা পর্যন্ত আমরা আপনার সঙ্গ দেবো।'

'আমি শুধু নিজের জীবন আর মেয়ে দু'টোর ইজ্জত রক্ষা করার জন্য রামাল্লা থেকে পালিয়ে আসিনি'— লোকটি বললো— 'মাজার আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, আমি মিসর গিয়ে বলবো, তোমরা ফেরাউনদের দেশের মানুষ। এই মাটিতে পাপের ক্রিয়া আছে। হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরে নীলাম হয়েছিলেন। মূসা (আ.)-এর সঙ্গে বেআদবী মিসরে হয়েছিলো। ফেরাউনদের হাতে অনেক নবীর গোত্র এই মিসরে খুন হয়েছিলো। হে মিসরবাসী! তোমাদের ধ্বংস ও শাস্তি শুরু হয়ে গেছে। তোমরা আল্লাহর

রশিকে শক্তভাবে আকড়ে ধরো। এই বার্তা আমি মিশরবাসীর জন্য বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা যদি এই বার্তা সারা দেশে প্রচারের কাজে আমাকে সাহায্য করো, তাহলে তোমাদের দুনিয়াও জান্নাতে পরিণত হবে এবং আখেরাতেও তোমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যাবে।'

সূর্য অস্ত যেতে এখনো অনেক বাকি। রামাল্লার দিক থেকে আসা দু'-তিনজন সৈনিক নিকট দিয়ে অতিক্রম করছে। দরবেশ বললো, ওদের থামাও। ওরা রাত পর্যন্ত জীবিত থাকবে না।

তাদের থামানো হলো। তারা পানি প্রার্থনা করছে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। দরবেশ বললো, পানি রাতে পাবে। সে পর্যন্ত সেই আল্লাহকে স্মরণ করো, যিনি তোমাদের রামাল্লা থেকে জীবিত উদ্ধার করে এনেছেন এবং নতুন জীবন দান করেছেন।

কিছুক্ষণ পর আরো দু'ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে এদিক দিয়ে অতিক্রম করে। তারা সৈনিক নয়। তারা প্রথমে কাফেলার প্রতি তাকায়। তারপর কালো চোগা পরিহিত কালো দাড়িওয়ালা লোকটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে। তারা ঘোড়া থামিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘোড়াগুলো ওখানেই রেখে ছুটে আসে। উভয়ে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর তার হাতে চুমো খেয়ে বললো— 'মুরশিদ! আপনি এখানে?' তারা কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই কাফেলার সৈনিকদের উদ্দেশে বললো, আপনাদের খোশনসিব যে, আপনারা এই বুযুর্গের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। ইনি এক বছর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মিসরের গোনাহগার ফৌজ যদি মাজার এলাকায় আসে, তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

'এদিক-ওদিক লক্ষ্য রাখো— 'লোকটি সকলকে বললো— 'যেখানেই পথভোলা কাউকে মিসরের দিকে যেতে দেখবে, এখানে নিয়ে আসবে। রাতে এখানে কেউ ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত থাকবে না।'

মিসর যাওয়ার এই একটিই পথ। অন্য সব জায়গা টিলায় পরিপূর্ণ। এটিই প্রশস্ত জায়গা। তবে এর মধ্যদিয়ে যাওয়াও অনর্থক। বাইরে থেকেই বুঝা যায়, এখানে পানির নাম-চিহ্ন নেই। সবাই মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে। মিসরের সীমান্ত এখনো অনেক দূর। এই লোকগুলোর আশ্রয় প্রয়োজন। কালো দাড়িওয়ালা দরবেশই এখন তাদের ভরসা। লোকটির প্রতিটি কথা

তাদের হৃদয়ে বসে গেছে। কিন্তু পিপাসার আতিশয্যে দু'-তিনজন সৈনিক চৈতন্য হারাবার উপক্রম হয়। দরবেশ তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করছে।

সূর্য ডুবে গেছে। আঁধারে ছেয়ে গেছে রাত। নীরব-নিস্তব্ধ সাহারা। হঠাৎ টিলার মধ্য থেকে একটি পাখির ডাক ভেসে আছে। সবাই চমকে ওঠে। যে জাহান্নামে পানির কল্পনাও করা যায় না, মৃত্যু যেখানে মাথার উপর ঝুলে থাকছে সারাক্ষণ, সেই অঞ্চলে পাখির ডাক! না, এটি পাখির ডাক নয়, হতে পারে না। সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। এটি কোনো প্রেতাত্মার শব্দ হবে।

'শোকর আল্লাহ!'– দরবেশ বললো– 'আমার দু'আ কবুল হয়ে গেছে।' লোকটি তার সম্মুখে উপবিষ্ট দু'জন সৈনিককে বললো– 'তোমরা দু'জনে ওদিকে যাও। চল্লিশ পা গণনা করো। সেখান থেকে ডান দিকে মোড় নাও। চল্লিশ কদম গণনা করো। সেখান থেকে বাঁ দিকে মোড় নাও। সম্মুখে এক স্থানে আগুন জ্বলছে দেখবে। সেই আগুনের আলোতে তোমরা পানি দেখতে পাবে। হয়তো কিছু খাবারও পেয়ে যাবে। যা পাবে তুলে নিয়ে আসবে। এই যে ডাকটা শুনেছো, ওটা পাখির ডান নয়– গায়েবের ইশারা।'

'আমি যাবো না'– এক সৈনিক ভয়জড়িত কণ্ঠে বললো– 'তার গা ছমছম করছে– আমি জিন-পরীর জায়গায় যাবো না।'

যে দু'জন লোক পরে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলো, তারা দাঁড়িয়ে যায়। দরবেশকে একটা সেজদা দিয়ে সৈনিকের উদ্দেশে বললো– 'ভয় করো না। জিন-পরীরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের প্রতি নির্দেশ আছে, এই বুযর্গ যেখানে যাবেন, তাকে খাদ্য-পানীয় পৌঁছাতে থাকবে। আমরা হযরতের কারামত সম্পর্কে অবগত। দু'-তিনজন লোক আমাদের সঙ্গে চলো।

এবার সৈনিকরা যেতে সম্মত হয়। তারা রওনা হয়ে পড়ে। দরবেশের কথামতো পা গননা করে। মোড় ঘুরে। তারপর দু'টি টিলার মধ্যখান দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে একস্থানে আগুন দেখতে পায়। সকলে কালেমা ঝপতে ঝপতে এগিয়ে যায়। আগুনের আলোতে পানিভর্তি চার-পাঁচটি মশক পড়ে আছে দেখতে পায়। আছে একটি কাপড়ের পুটুলিও। থলেটি খেজুরে ভর্তি। তারা মশক ও থলেটি তুলে নেয়। ফিরে গিয়ে বস্তুগুলো দরবেশের সম্মুখে রেখে দেয়। দরবেশ খেজুরগুলো অল্প অল্প করে সকলের

মাঝে বন্টন করে দেয়। পরে দু'টি মশক তাদের হাতে তুলে দিয়ে বললো, প্রয়োজনের বেশি পান করো না। পানি বাঁচানোর চেষ্টা করো। এবার কারো সন্দেহ রইলো না, লোকটি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বড় মাপের একজন বুযুর্গ। সে সকলকে তায়াম্মুম করিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করে।

সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত পোহাতে এখনো অনেক দেরি। লোকটি সকলকে জাগিয়ে তোলে এবং কাফেলা মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। দরবেশ একটি উটের পিঠে এবং তার মেয়ে দু'টো আরেকটি উটের পিঠে চড়ে বসে। পথে তাদের তিন-চারজন সৈনিকের সঙ্গে সাক্ষৎ হয়। তারাও মিসর যাচ্ছে। দরবেশ তাদেরও খেজুর খাওয়ায় ও পানি পান করায়। তারপর তাদেরকে দু'জন উষ্ট্রারোহীর পেছনে বসিয়ে নেয়।

এই কাফেলার ডান দিক দিয়ে আরো একটি কাফেলা যাচ্ছিলো। একজন বললো, ওদেরকেও নিয়ে নিন। দরবেশ বললো, তারা আমাদের ন্যায় পালিয়ে এসেছে বলে মনে হয় না। তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

অনেকদিন পর সৈনিকদের এই কাফেলা দরবেশরূপী কালো দাড়িওয়ালা লোকটির সঙ্গে মিসরের সীমানায় প্রবেশ করে। যে দু'ব্যক্তি পরে এসে দরবেশকে সেজদা করেছিলো, তারা পথে সৈনিকদেরকে দরবেশের কারামতের কাহিনী শোনাতে থাকে। তারা সৈনিকদের ধারণা প্রদান করে, যে ব্যক্তি লোকটিকে নিজ গ্রামে আশ্রয় দেবে, তার জীবিকার কোনো অভাভ থাকবে না এবং খোদা সব সময় তার উপর দয়াপরবশ থাকবেন। একই গ্রামের তিন সৈনিক তাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা দরবেশকে বললো, আপনি আমাদের গ্রামে চলুন। লোকটি তাদেরকে দু'-চারটি প্রশ্ন করে তাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে।

কায়রোর অদূরে বড় একটি গ্রাম। কাফেলা উক্ত গ্রামটিতে প্রবেশ করে। সৈনিকদের দেখে গ্রামের অধিবাসীরা তাদের চার পার্শ্বে ভিড় জমায়। তাদের পশুগুলোকে খেতে দেয় এবং তাদের জন্যও খাবারের ব্যবস্থা করে।

জনতা যুদ্ধের কাহিনী শুনতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। তারা কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তিটি সম্পর্কে বললো, ইনি আল্লাহর নৈকট্যশীল বুযুর্গ মানুষ। আল্লাহ জিনের মাধ্যমে এর নিকট খাবার পৌঁছিয়ে থাকেন।

সৈনিকরা জনতাকে লোকটির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শোনায়। দরবেশ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। দু'চোখ বন্ধ করে ধ্যানে বসে আছে। তার মেয়ে দু'টোকে এই গ্রামেরই অধিবাসী এক সৈনিক নিজ ঘরে নিয়ে যায়।

'রণাঙ্গনের ভেদ আমাকে জিজ্ঞাসা করো'– দরবেশ বললো– 'এরা সৈনিক। এরা কেবল লড়াই করতে জানে। সৈনিকদের জানা থাকে না, যুদ্ধের নেপথ্য নায়কদের উদ্দেশ্য কী। এই যে ক'জন সৈনিককে আমি সাহারার আগুন থেকে রক্ষা করে নিয়ে এসেছি, এরা সেই ফৌজের শাস্তি ভোগ করছিলো, যারা এদের অনেক আগে সিরিয়া গিয়েছিলো। সেই ফৌজ প্রতিটি রণাঙ্গনে বিজয় অর্জন করেছিলো। সেখানকার উপত্যকা-মরুভূমি 'সুলতান আইউবী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখরিত ছিলো। এই বাহিনী সর্বত্র হীরে-জহরত ও নারী দেখতে পায়। ওখানকার নারীরা মিসরের নারীদের চেয়েও বেশি রূপসী। গনীমতের নেশা বাহিনীটির মধ্যে ফেরাউনী চরিত্র সৃষ্টি করে দেয়। তাদের মন-মস্তিষ্কে গনীমত ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। তারপর ফৌজের সালার, কমান্ডার ও সৈনিকরা জাতির ইজ্জত এবং মর্যাদাবোধকেও বিদায় জানায়। তারা মুসলমানদের ঘরে ঘরে লুট-তরাজ শুরু করে দেয়। সুন্দরী মেয়েদের শ্লীলতাহানী ও অপহরণ করতে শুরু করে। এই নারীগুলো সবাই ছিলো সম্ভ্রান্ত ও পর্দানশীল মুসলিম মহিলা। তাদেরকে তারা নিজ তাঁবুতে আটকে রাখে।'

'কেন, সুলতান আইউবী কি অন্ধ ছিলেন?'– এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে– 'তিনি কি দেখলেন না, তাঁর সৈন্যরা কী করছে?'

খোদা যখন কোনো জাতিকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন দেশের ইমাম, আলিম ও শাসকদের বিবেকের উপর পর্দা ফেলে দেন'– দরবেশ বললো– 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী স্বয়ং জয়ের নেশায় মাতাল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বোধ হয় আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর শাস্তি-সাজার কথাও ভুলে গিয়েছিলেন। তার দেহরক্ষী ও বিলাসী সালারগণ তাকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিলো যে, কোনো মজলুমের ফরিয়াদ তাঁর কানে পৌঁছতো না। যে রাজা ফরিয়াদীদের জন্য ইনসাফের দ্বার এবং নিজের কান বন্ধ করে রাখেন, সে রাজা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যান। আমি দু'বছর আগেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, এই বাহিনী পাপের শাস্তিস্বরূপ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি রাতে গায়েবী আওয়াজ শুনতাম। কিন্তু যার জন্য আওয়াজ আসতো, তার কান বন্ধ ছিলো।'

তারপর খোদা তাদের চোখের উপর পট্টি বেঁধে দেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী- যিনি রণাঙ্গনের রাজা ছিলেন এবং যাকে খৃস্টানরা রণাঙ্গনের দেবতা মনে করতো– এমনই জ্ঞানান্ধ হয়ে যান যে, তিনি সকল রণকৌশল ভুলে যান। তাঁর কৌশলে যুদ্ধ করে শত্রুরা। তিনি এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন যে, একাকি মিসর পালিয়ে আসতে বাধ্য হন।'

'আমরা খৃস্টানদের থেকে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো'– এক বেদুঈন তেজস্বী কণ্ঠে বললো– 'আমরা আমাদের পুত্রদেরকে কুরবান করে দেবো।'

'জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে'– দরবেশ বললো– তিনি যদি কারো কপালে পরাজয় লিপিবদ্ধ করেন, তাহলে জয় ছিনিয়ে আনার ক্ষমতা তার থাকে না। তখন বান্দার সব জোশ ঠান্ডা হয়ে যায়। আমিও এখানে এজন্যই এসেছি যে, মিসরের শিশুটিকেও প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত করবো। কিন্তু শাস্তির মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি। তোমরা যদি তোমাদের পুত্রদেরকে এখনই পুনরায় ভর্তি করিয়ে ময়দানে প্রেরণ করো, তাহলে তারা মারা যাবে এবং পরাজয়বরণ করবে। প্রতিটি কাজের একটি উপযুক্ত সময় নির্ধারিত থাকে। খৃস্টানদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের সেই মোক্ষম সময়টি এখনো আসেনি। এখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো এবং তাঁর নিকট তোমাদের সেই পুত্রদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করো, যাদেরকে তোমরা সিরিয়া প্রেরণ করেছিলে।

'পরাজয়ের সব দায় আমার মাথায় রাখো'– সুলতান আইউবী বললেন। তিনি সালার, নায়েব সালার, কমান্ডার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন– 'পরাজয়ের কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। ভুল হয়েছে, আমি নতুন সৈনিকদের ময়দানে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি যদি আরো অপেক্ষা করতাম আর মিসরে বসে থাকতাম, তাহলে দুশমন সমগ্র মিসরে ছড়িয়ে যেতো। আমি ফৌজের যে অভাবটা নতুন সৈনিকদের দ্বারা পূরণ করেছি, তোমরা জানো, তার দায় কার উপর বর্তায়। কিন্তু সেই আলোচনায় জড়িয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। অপরাধ আরোপ যদি করতেই হয়, তাহলে আমার উপর করো। বাহিনী দ্বারা যুদ্ধ আমি করিয়েছি। কৌশলে ভুল থাকলে সেই ভুল আমার। তার কাফফারা আমাকেই আদায় করতে হবে

এবং করবো। জয়-পরাজয় যে কোনো যুদ্ধের শেষ ফল। আজ আমরা এমন একটি পরিণতির মুখোমুখি, যার জন্য আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। সে কারণেই আমি তোমাদের চেহারায় মলিনতা এবং চোখে অস্থিরতা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা যদি আমাকে পরাজয়ের শাস্তি দিতে চাও, আমি তার জন্যও প্রস্তুত আছি। আমার কানে এ আওয়াজও আসছে যে, আমার ফৌজ সিরিয়া গিয়ে নারীর শ্লীলতাহানি, লুণ্ঠন ও মদপানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে, বাগদাদের খলীফার উপর প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে পরাজয়বরণ করেছি এবং আমি এই পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করে খলীফাকে আমার অনুগত বানাবার চেষ্টা করবো। আমাকে ফেরাউনও আখ্যা দেয়া হচ্ছে। আমি এর একটি অপবাদেরও জবাব দেবো না। এসব অপবাদ-অভিযোগের জবাব আমি মুখে দেবো না– দেবে আমার তরবারী। আমি শব্দ দ্বারা নয়, কাজে প্রমাণ করবো এসব কার পাপ, যার শাস্তি আমি এবং আমার মুজাহিদরা ভোগ করেছে।'

ইতিমধ্যে দারোয়ান সংবাদ জানায়, হামাত থেকে দূত এসেছে। সুলতান আইউবী সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভেতরে তলব করেন। সর্বাঙ্গ ধুলায় মাখা ও দীর্ঘ সফর-ক্লান্ত দূত আল-আদিলের একখানা পত্র সুলতানের হাতে তুলে দেন। সুলতান পত্রখানা খুলে পাঠ করেন। তাঁর চোখে অশ্রু নেমে আসে। পত্রখানা এক সালারের হাতে দিয়ে সুলতান বললেন– 'পড়ে সবাইকে শোনাও।'

সালার বার্তাটি পড়তে শুরু করেন। পড়তে পড়তে যতোই অগ্রসর হচ্ছেন, শ্রোতাদের চোখে আনন্দের দ্যোতি ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অজান্তে তাদের মুখ থেকে অস্ফুট জিন্দাবাদ ধ্বনিও উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে।

'এ হলো গুনাহগারদের কীর্তি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমরা যারা কায়রোতে ছিলে, জানো না আল-আদিলের নিকট কতোজন সৈন্য আছে। জানতে না বল্ডউইনের কাছে আমাদের দশগুণ বেশি সৈন্য ছিলো। তার আরোহীরা বর্মপরিহিত। সব পদাতিকের মাথায় শিরস্ত্রাণ। আল-আদিল কি প্রমাণ করেনি, আমরা পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করতে জানি? তোমরা কি ভাবতে পারো, আমি মাথায় হাত রেখে বসে পড়বো? তোমরা পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আমাকে নতুন সেনাভর্তি দাও। বায়তুল মুকাদ্দাস তোমাদের ডাকছে। দুশমনের সঙ্গে আমি কোনো প্রকার চুক্তি-সমঝোতা করবো না।'

আল-আদিলের বার্তা যেমনি সুলতান আইউবীকে উজ্জীবিত করে তোলে, তেমনি তাঁর সালার, কমান্ডার প্রমুখদের বিক্ষত মনোবলকেও চাঙ্গা করে তোলে। যাদের অন্তরে সুলতান আইউবী ও তাঁর ফৌজের বিরুদ্ধে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিলো, তা দূর হয়ে যায়।

ওদিকে আল-আদিলও থেমে নেই। তিনি তাঁর বাহিনীকে ত্রিশ-চল্লিশজনের দলে বিভক্ত করে সেই এলাকায় নিয়ে যান, যেখানে বল্ডউইন ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন। তিনি তাঁর কমান্ডারদেরকে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। উদ্দেশ্য, দুশমনকে অস্থির করে রাখতে হবে। যেনো তারা অগ্রযাত্রা করতে না পারে এবং বসে থাকতেও না পারে।

বল্ডউইন পূর্ব থেকেই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি এতো বিশাল বাহিনী নিয়ে এই আশায় এসেছিলেন যে, তিনি দামেশ্‌ক পর্যন্ত সকল ভূখণ্ড দখল করে ফেলবেন। কিন্তু এখন তার অবস্থা হচ্ছে, প্রতি রাতে বাহিনীর কোনো না কোনো অংশের উপর তীরবৃষ্টি হচ্ছে কিংবা আক্রমণ হচ্ছে। সৈন্যদের সচেতন হতে না হতে আক্রমণকারীরা সটকে পড়ছে।

বল্ডউইন তার বাহিনীকে সমগ্র অঞ্চলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল-আদিলের কমান্ডো বাহিনীর ন্যায় গ্রুপ তৈরি করে দিয়েছেন, যারা রাতে এদিক-ওদিক টহল দিচ্ছে। কিন্তু প্রতিটি ভোরেই বল্ডউইনকে সংবাদ শুনতে হচ্ছে, আজ অমুক ক্যাম্পের উপর আক্রমণ হয়েছে কিংবা অমুক গ্রুপটি মারা পড়েছে।

অঞ্চলটা পাহাড়ি। আল-আদিলের গেরিলাদের জন্য এটি একটি বিশেষ সুবিধা। সুযোগটা তারা ভালোভাবেই কাজে লাগাচ্ছে। তবে এই স্বার্থ উদ্ধার করতে আল-আদিলকে অনেক মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে। কমান্ডোরা এতো দুঃসাহসিকতার সাথে আক্রমণ চালাচ্ছে যে, তারা দুশমনের ক্যাম্পের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে এবং নিজেদের জীবন কুরবান করে সমূহ ক্ষতিসাধন করছে।

এই ধারার যুদ্ধ আর এই কুরবানীর মাধ্যমে কোনো অঞ্চল জয় করা সম্ভব ছিলো না। আল-আদিল দুশমনকে সেখান থেকে পেছনে হঠাতে পারছেন না। কিন্তু উপকারও কম হচ্ছে না যে, খৃস্টানদের এই বিশাল বাহিনীটি সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। বল্ডউইন যদি সম্মুখে অগ্রসর হতেন, তাহলে এই সামান্য সৈন্য নিয়ে আল-আদিল

মুখোমুখি যুদ্ধে দু'ঘণ্টাও টিকতে পারতেন না।

বল্ডউইনের ক্যাম্পে কর্মরত স্থানীয় লোকদের মধ্যে আল-আদিলের গুপ্তচরও আছে। সুযোগমতো তারাও কাজ করছে। খৃস্টানরা ঘোড়াকে খাওয়ানোর জন্য পাহাড়ের উঁচুতে শুষ্ক ঘাসের স্তূপ জড়ো করে রেখেছিলো। আল-আদিলের এক গুপ্তচর তাতে আগুন ধরিয়ে ভস্ম করে ফেলে।

আল-আদিল সংবাদ পান, দামেশ্‌ক থেকে সামান্য সাহায্য আসছে। হাল্‌ব থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। আল-মালিকুস সালিহ বার্তা প্রেরণ করেন, খৃস্টানরা হাররান দুর্গ অবরোধ করার পরিকল্পনা আঁটছে। তা-ই যদি ঘটে যায়, তাহলে হাল্‌বের ফৌজ দ্বারা তাদের মোকাবেলা করতে হবে।

কয়েকজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, রামাল্লার পরাজয়ের পর ইসলামী বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তার ক্ষুদ্র যে ইউনিটগুলো বেঁচে গিয়েছিলো, তারা লুটপাটকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। তারা খৃস্টানদের সেনা কাফেলাগুলোতেও হাইজ্যাক শুরু করে।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, লুট করতো স্বয়ং খৃস্টান সৈন্যরা। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ তথ্য স্বীকার করেছেন। পূর্বেও ঐতিহাসিকদের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, খৃস্টান সৈন্যরা অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে মুসলিম কাফেলাসমূহ লুণ্ঠন করতো। তারা এই লুটতরাজ এমন ধারায় করতো, যেনো এটি তাদের সামরিক ডিউটি। কতিপয় ঐতিহাসিক যেসব মুসলিম সেনাদল সম্পর্কে লিখেছেন, তারা লুটতরাজ করতে শুরু করেছিলো, তারা ছিলো মূলত আল-আদিলের কমান্ডো সেনা, যারা সম্রাট বল্ডউইনের বিশাল বাহিনীকে গেরিলা অপারেশনের মাধ্যমে একই অঞ্চলে আটকে রেখেছিলো।

যা হোক, গেরিলা অপারেশনে আল-আদিলকে অনেক মূল্য গণনা করতে হয়েছে। কিন্তু সৈনিকদের জয্‌বা এতোই তীব্র ছিলো যে, একজন সৈনিকও পেছন দিকে তাকাতে সম্মত ছিলো না। অধিকাংশ সৈন্য অবিরাম উপত্যকা ইত্যাদি অঞ্চলে টহল দিয়ে অপারেশন পরিচালনা করে ফিরছিলো। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ক্ষণিকের জন্য ক্যাম্পে যাওয়ার ফুরসত ছিলো না। ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদীর প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির ভাষ্যমতে, তারা ব্যাঘ্রের ন্যায় শিকারের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাকতো এবং যখনই শিকার চোখে পড়তো, তখন আর নিজের জীবনের কোনো তোয়াক্কা থাকতো না। তারা দুশমনের অধিক থেকে অধিকতর ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে

অবলীলায় শহীদ ও আহত হয়ে যেতো। তাদের রাত কাটতো মরু বিয়াবানে-অঘুম নয়নে।

কিন্তু কায়রোতে এই প্রোপাগাণ্ডা জোরেশোরে বেড়ে চলেছে যে, মিসরের ফৌজ চরিত্রহীন ও বিলাসী হয়ে ওঠেছে এবং রামাল্লার পরাজয় তার শাস্তি। কায়রোর ইন্টেলিজেন্স খুঁজে বের করতে পারছে না, এই অপপ্রচার কোথা থেকে উত্থিত হচ্ছে। এটা নতুন সৈনিকদের অসতর্ক কথাবার্তার প্রতিফল, নাকি দুশমনের এজেন্টরা সুকৌশলে এই প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখন এ-ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মানুষ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে ইতস্তত করছে। রামাল্লার পরাজয়ের আগে মিসরীদের চিন্তা-চেতনা এরূপ ছিলো না। আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'জনগণ ফৌজের দুর্নাম করে বেড়াচ্ছে' এই তথ্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধেও মানুষ মুখ খুলছে বলে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

কালো দাড়িওয়ালা দরবেশ তার দু'কন্যাকে নিয়ে যে গ্রামটিতে অবস্থান নিয়েছিলো, এখন সে সেখানকার বাসিন্দা। গ্রামবাসীরা তাকে একটি ঘর দিয়ে রেখেছে। মিসরীদের গুনাহ মাফ করাবার জন্য তিন মাস চিল্লা করতে হবে বলে সে প্রকাশ্যে উঠাবসা করা ও মানুষের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। উক্ত গৃহ থেকে বাইরে বের হলেও স্বল্প সময়ের জন্য বের হচ্ছে এবং নীরব থাকছে। উপস্থিত জনতাকে হাত নেড়ে ইঙ্গিতে সালাম করছে এবং ভেতরে চলে যাচ্ছে। মাঝপথ থেকে তার সঙ্গে আসা সৈনিকরাই তার ঘনিষ্ঠ সহচর। আর সেই দু'ব্যক্তি– যারা পরে পার্বত্য অঞ্চলে এসে তাকে সেজদা করেছিলো– লোকটাকে এতো প্রচার করে দেয় যে, এখন তাকে এক নজর দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসা-যাওয়া করছে।

❖ ❖ ❖

আলী বিন সুফিয়ানের এক গোয়েন্দা ডিউটির অংশ হিসেবে ছদ্মবেশে কায়রোর উপকণ্ঠে এক স্থানে ঘোরাফেরা করছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাগরিবের নামায আদায় করার জন্য সে মসজিদে প্রবেশ করে। নামাযের পর ইমাম সাহেব দু'আ করেন। মুনাজাত শেষ হলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের কিছুক্ষণের জন্য বসতে অনুরোধ জানিয়ে ভাষণ দিতে শুরু করে। তার ভাষণের বিষয়বস্তু রামাল্লার পরাজয়। সে সুলতান আইউবীর ফৌজের বিরুদ্ধে সেসব কথাবার্তা বলতে শুরু করে, যা কালো দাড়িওয়ালা

দরবেশ বলেছিলো। এই লোকটি দরবেশের সূত্র এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেনো লোকটি গায়েব জানে এবং জিনরা তাকে জীবিকা পৌঁছায়। সে সফরের পূর্ণ কাহিনী শোনায় এবং তারা কীভাবে গায়েব থেকে পানি ও খেজুর লাভ করেছিলো, তার বিবরণ প্রদান করে।

মুসল্লীরা তন্ময় হয়ে তার বক্তৃতা শুনতে থাকে।

বক্তব্য শেষ হলে মুসল্লীরা তাকে দরবেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে– 'তিনি কি মনের আশা পূরণ করতে পারেন? দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকদের আরোগ্য দান করতে পারেন? ভবিষ্যতের খবর জানেন? সন্তান দিতে পারেন?'

উত্তরে বক্তা বললো, তিনি এখনো সকলকে শুধু এ কথাই বলছেন যে, সুলতান আইউবী ও তার বাহিনীতে ফেরাউনী চরিত্র সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং তাদের পরাজয়ের কারণও এটাই। তিনি আরো বলছেন, তোমরা না নিজেরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবে, না অন্যকে ভর্তি হতে দেবে। অন্যথায় তোমাদের বিরাট ক্ষতি হবে। কারণ, গুনাহের শাস্তির মেয়াদ এখনও পূর্ণ হয়নি। তিনি তিন মাসের জন্য মুরাকাবায় বসেছেন। তিন মাস পরে বলবেন, মিসরীদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে কিনা।

লোকটি মসজিদ থেকে বের হয়ে একদিকে হাঁটতে শুরু করে। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা তার পিছু নেয় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি যে বুযুর্গের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে কীভাবে সাক্ষাৎ করতে পারি। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি একজন সৈনিক। আপনার বক্তব্য শুনে মনে ভয় ধরে গেছে যে, ফৌজের পাপের শাস্তি আমাকেও ভোগ করতে হয় কিনা। আমিও দামেশ্‌ক-হালবের রণাঙ্গনে গিয়েছিলাম। সেখানে আমিও সেই পাপ করেছি, যার আলোচনা আপনি করেছেন। আপনি আমাকে বুযুর্গের নিকট নিয়ে চলুন। তিনি যদি বলেন আমি ফৌজ থেকে পালিয়ে যাবো। তিনি আমার থেকে যে সেবা চাইবেন, আমি দেবো। আমি খোদার অসন্তোষকে ভয় করি।

লোকটি এতোই অনুনয়-বিনয় করে যে, তার চোখ থেকে অশ্রু নেমে আসে।

'আমার সঙ্গে চলো'– লোকটি বললো– 'কিন্তু কাউকে বলবে না তুমি তাঁর কাছে গিয়েছিলে। বর্তমানে তিনি চিল্লায় আছেন। তিন মাসের জন্য মুরাকাবায় বসেছেন। কারো সঙ্গে কথা বলছেন না। সাক্ষাতের পর তিনি যা যা জিজ্ঞেস করবেন, কেবল তারই উত্তর দেবে, কোন ফালতু কথা বলবে না।'

'আপনি কি সেই গ্রামেরই বাসিন্দা?'– গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করে– 'বলেছেন আপনি রামাল্লার রণাঙ্গন থেকে আসা সৈনিক?'

'এই জন্যই তো কুরআনে হাত রেখে বলতো পারবো, এই বুযুর্গ আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বান্দাদের একজন'– সৈনিক বললো– 'আমি রণাঙ্গনের রুদ্ররোষ দেখেছি। দেখেছি সফরের গজবও। কিন্তু এই লোকটি মরু প্রান্তরকে ফুল বাগিচায় পরিণত করে দিয়েছিলেন। এখন আর আমি বাহিনীতে যোগ দেবো না।'

গ্রামটা দূরে নয়। দু'জন কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেছে। রাত গভীর হয়ে গেছে। সৈনিক গোয়েন্দাকে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে সেই ঘরে চলে যায়, যেখানে তার পীর অবস্থান করছে। খানিক পর ফিরে এসে বললো, 'আপনি পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে চলে আসুন।' বলেই নিজে তার সম্মুখে সম্মুখে হাঁটতে শুরু করে। দু'জন পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দেউড়ি ও বারান্দা অতিক্রম করে তারা একটি কক্ষে প্রবেশ করে। বারান্দায় আলো ছিলো। দরবেশ যে দুটো মেয়েকে নিজের কন্যা বলে পরিচয় দিয়েছিলো, তারা অন্য এক কক্ষে অবস্থান করছে। বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে তারা কক্ষের জানালা খুলে দেখে। বাইরে চোখ ফেলেই একটি মেয়ে চমকে ওঠে এবং অলক্ষ্যে তার মুখ থেকে 'উহ!' বেরিয়ে আসে।

'কী হলো?' অপর মেয়ে জিজ্ঞেস করে– 'লোকটি কে?'

'মনে হয় আমরা ধরা পড়ে গেছি'– মেয়েটি উত্তর দেয়– 'এই লোকটাকে আমি আগেও কোথাও দেখেছি। গোয়েন্দা মনে হচ্ছে!' মেয়েটি গভীর ভাবনায় হারিয়ে যায়।

গোয়েন্দা কক্ষে প্রবেশ করে দরবেশের সম্মুখে সেজদাবনত হয়। তার পায়ে মাথা ঘষে। দরবেশ মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে বসে আছেন। গোয়েন্দা কান্নাজড়িত কণ্ঠে সবিনয় অনুরোধ জানায়, আপনি আমার গুনাহগুলো মাফ করিয়ে দিন। সে সৈনিকদের সঙ্গে পথে যেসব আবেগময় কথা বলেছিলো, দরবেশের সম্মুখেও সেসব পুনর্ব্যক্ত করে। তার চোখে অশ্রু এসে যায়। দরবেশ নিজের তাসবীহটা তার মাথার উপর বুলিয়ে মুচকি হেসে মাথায় হাত রাখে।

'এতে আমার প্রশান্তি আসবে না'– গোয়েন্দা অশ্রু ঝরাতে ঝরাতে বললো– 'মুখের কথায় আমাকে সান্ত্বনা দিন। আমাকে আদেশ করুন।

আমি আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। আমার একটি মাত্র সন্তান। আপনি আদেশ করলে আমি তাকেও আপনার পায়ের উপর জবাই করে ফেলবো। সুলতান আইউবীকে হত্যা করতে বলুন, আমি আপনার আদেশ পালন করবো। কথা বলুন। আদেশ করে দেখুন আমি মান্য করি কিনা।'

অপর এক ব্যক্তি ভেতরে প্রবেশ করে। সে গোয়েন্দার কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুনছে এবং গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করছে। সে গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করে- 'তুমি এতো অস্থির হচ্ছো কেনো? এখন তো তুমি মুর্শিদের ছায়ায় এসে পড়েছো!'

'আমার পাপ এতো বেশি যে, আমি রাতে ঘুমাতে পারি না'- গোয়েন্দা বললো- 'আমি হামাতের সন্নিকটে এক গ্রামে এক মুসলিম পরিবারের একটি মেয়েকে অপহরণ করতে গিয়ে তার যুবক ভাইকে খুন করেছিলাম। আমি যদি ফৌজের সৈনিক না হতাম, তাহলে আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হতো। কিন্তু এই ঘটনার জন্য কেউ আমাকে কিছু জিজ্ঞেসও করেনি।'

দরবেশ চক্ষু বন্ধ করে ফেলে। ঠোঁট নড়ছে। হাত দুটো উপরে তুলে পরে গোয়েন্দার দিকে ইশারা করে। কিছুক্ষণ পর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে ওঠে। চোখ খুলে যায়। এবার মুখ খোলে। গোয়েন্দাকে বললো- 'অনেক কষ্টে তোমার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি পেয়েছি। মন দিয়ে শোন। আমি তোমার গুনাহ মাফ করিয়ে দেবো বরং তুমি ও তোমার পরিবার এতো বেশি হালাল জীবিকা লাভ করবে, যা তুমি স্বপ্নেও দেখোনি। এখন চলে যাও, কাল আবার এসো।'

দরবেশ পুনরায় মুরাকাবায় আত্মনিয়োগ করে। সৈনিক এবং অপর লোকটি গোয়েন্দাকে বারান্দায় নিয়ে যায়। তারা তাকে দরবেশের এমন সব কারামতের কাহিনী শোনায় যে, গোয়েন্দা অভিভূত হয়ে পড়ে। মেয়ে দুটো জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছে। যে মেয়েটি গোয়েন্দাকে প্রথমবার দেখে চমকে ওঠেছিলো, সে অপর মেয়েকে বললো- 'একে আমি আগে কোথাও দেখেছি। লোকটা ধোঁকা দিচ্ছে না তো! মানুষটা কিন্তু সে-ই।'

❖ ❖ ❖

'ঘটনাটা সেরূপই মনে হচ্ছে, যেমনটি আমরা আগেও একবার ধরেছিলাম'- গোয়েন্দা আলী বিন সুফিয়ানকে রিপোর্ট করছে- 'সেই

মুরাকাবা, সেই চিল্লা সেই জিন ও মানুষের আবেগকে আয়ত্ত্ব করে তাদের উপর যাদু প্রয়োগ করা। আমাদের ফৌজের যে সৈনিক আমাকে তার নিকট নিয়ে গিয়েছিলো, সে কেবল ফৌজের বিরুদ্ধেই কথা বলছিলো। মসজিদে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যেও একই কথা বলেছিলো। লোকটি আমার সঙ্গে যেসব কথা বলেছে, তাতে প্রমাণিত হচ্ছে, তার আরো একাধিক সঙ্গী আছে, যারা তারই মতো মসজিদে মসজিদে গিয়ে মুসল্লীদের আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছে। রণাঙ্গনের অসত্য কাহিনী শোনাচ্ছে এবং বুঝাতে চেষ্টা করছে, ফৌজে ভর্তি হওয়া পাপের কাজ।'

'তাদের এই অভিযান মসজিদেই পরিচালনা করার কথা'— আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'মসজিদে বলা কথাকে মানুষ অহীর সমান মর্যাদা দিয়ে থাকে। মানুষ আবেগের গোলাম। তারা সেই লোককে মুরশিদ-পথের দিশারী বলে বরণ করে নেয়, যে প্রথমে আবেগকে উত্তেজিত করে পরে শব্দ দ্বারা তাকে শান্ত করে। তুমি কাল আবার যাও। আমাকে গ্রাম ও ঘরটা বুঝিয়ে দাও। এদিক-ওদিক দেখে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করো। তোমার তথ্যের ভিত্তিতে আমি সেখানে কমান্ডো অভিযান চালাবো।'

'আমার ভয় হয় কমান্ডো অভিযান চালালে সেখানকার অধিবাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠবে'— গোয়েন্দা বললো— 'সৈনিক আমাকে বলেছে, গ্রামের প্রতিটি শিশুও তার অনুরক্ত এবং দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে।'

'আমাদের অতো কিছু তোয়াক্কা করা চলবে না'— আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'যে শাসক জনগণের উপর শাসন চালাতে চায়, জনগণের আবেগ-উচ্ছ্বাসের তোয়াক্কা তাকে করতে হয়। এই চরিত্রের শাসকরা জনগণের আবেগ নিয়ে খেলা করে থাকে, যাতে প্রজারা খুশি থাকে এবং তাদের আনুগত্য করে। আমাদের কাজ সালতানাতে ইসলামিয়া ও দেশের জনগণের মর্যাদার সুরক্ষা। আমরা এলাকাবাসীকে হাকীকত দেখাবো। আমরা তাদেরকে সুলতান আইউবীর গোলাম বা ভক্ত বানাতে চাই না। আমরা তাদেরকে বলবো, ইসলামের প্রহরী তোমরাও ততোটুকু, যতোটুকু তোমাদের সুলতান। আমরা তাদেরকে ইসলামের দুশমন দেখাবো। আমরা আবেগ-পূজার নেশা জাগিয়ে জাতিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাই না। জাতিকে বাস্তবতার ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে। তুমি যাও। দেখো, বুঝো। তারপর রিপোর্ট করো।'

গোয়েন্দার দরবেশের আস্তানায় যাওয়ার সময় রাতে। আলী বিন সুফিয়ান নিজের বেশভূষা পরিবর্তন করে উক্ত গ্রামে চলে যান। তিনি দরবেশের ঘরটি চিনে নেন এবং তার প্রতি মানুষের ভক্তি-বিশ্বাসের আন্দাজ করেন। মানুষের কথাবার্তা শোনেন। মিসরের ফৌজের বিরুদ্ধে ঝড় তোলা হচ্ছে। আলী বিন সুফিয়ান বাড়ির পেছনটা দূর থেকে দেখে নেন। ওখানে ছোট্ট একটি দরজা। দরজাটা বন্ধ। গাছ-গাছালি আছে। ডানে ও বামে আরো দু'টি ঘরের পশ্চাদ্দেশ। কোন মানুষ দেখা যাচ্ছে না। যতো ভিড় বাড়ির সম্মুখে। হঠাৎ দরজাটা খুলে যায়। পুরাতন চোগা পরিহিত শুভ্র শশ্রুমণ্ডিত এক ব্যক্তি বেরিয়ে আসে। আলী বিন সুফিয়ান আড়াল হয়ে যান। তিনি খোলা দরজাটায় একটি সুন্দরী যুবতীকে দেখতে পান। মেয়েটি দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

লোকটি লাঠি হাতে ঝুঁকে ঝুঁকে ধীর পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে বেরিয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান তাকে অনুসরণ করতে শুরু করেন। বেশ দূরে গিয়ে লোকটি দাঁড়িয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। একদিক থেকে এক অশ্বারোহী ধেয়ে আসে। লোকটি ঘোড়ায় চড়ে বসে এবং কায়রোর দিকে রওনা দেয়। ঘোড়া নিয়ে আসা লোকটি পায়ে হেঁটে গ্রামের দিকে চলে যায়।

আলী বিন সুফিয়ান নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে অশ্বারোহী সাদা দাড়িওয়ালা লোকটির পেছন পেছন এগুতে থাকেন। লোকটি কয়েকবারই পেছন দিকে তাকায়। আলী বিন সুফিয়ান এগুতে থাকেন। লোকটি কায়রোর দিকে এগুতে থাকে। একটি লোক পেছনে পেছনে চলছে বলে সে বেজায় বিরক্ত। কায়রোমুখী হয়ে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয় সে। আলী বিন সুফিয়ানও গতির তাল বজায় রাখেন। তাঁর ঘোড়া আরো দ্রুত চলতে শুরু করে। লোকটি বারবার পেছন দিকে তাকাতে থাকে। আলী বিন সুফিয়ান তার পেছন পেছন যেতে থাকেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে লোকটি কায়রোর রাস্তার পরিবর্তে ঘোড়া অন্য পথে ঘুরিয়ে দেয়। ঘোড়ার গতি স্বাভাবিক। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর ঘোড়াও সেই পথে ঢুকিয়ে দেন।

উভয় ঘোড়া এখন যেখানে, সেখানে এদিক-ওদিক দু'একটি ঝুপড়ি বা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। কোথাও যাযাবরদের অস্থায়ী ডেরা। লোকটি একের পর এক পথ পরিবর্তন করছে এবং বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। আলী বিন সুফিয়ানও তার পেছন পেছন অগ্রসর হচ্ছেন। লোকটির অস্থিরতা বেড়ে

চলছে। অবশেষে সে কায়রোর দিকেই মুখ করে এবং ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয়। আলী বিন সুফিয়ানের ঘোড়ার গতিও বেড়ে যায়। এখন উভয় ঘোড়ার মধ্যখানের ব্যবধান পনের-বিশ কদম। তারা কায়রো নগরীতে ঢুকে যাবে বলে। এমন সময় হঠাৎ শশ্রুমণ্ডিত লোকটি ঘোড়া থামিয়ে মোড় ঘুরে দাঁড়িয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ানও তার সম্মুখে গিয়ে থেমে যান।

'তুমি দস্যু মনে হচ্ছে'– সাদা শশ্রুমণ্ডিত অশ্বারোহী বললো। খঞ্জর বের করে পুনরায় বললো– 'আমার পিছু নিয়েছো কেনো?'

আলী বিন সুফিয়ান দেখলেন, সাদা দাড়ির কারণে লোকটার বয়স সত্তুর বছর মনে হচ্ছে। কিন্তু চেহারা, চোখ ও দাঁত বলছে চল্লিশেরও কম। আলী বিন সুফিয়ানও ছদ্মবেশে। তিনি কটিবন্ধ থেকে সোয়া গজ লম্বা তরবারীটা বের করে হাতে নেন।

'দাড়ি খুলে ফেলো'– আলী বিন সুফিয়ান লোকটির এক পাজরে তরবারী ঠেকিয়ে বললেন– 'আমার সামনে সামনে চলো।'

শুনে লোকটির চোখ দুটো পলকহীন দাঁড়িয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান তরবারীর আগাটা তার কালো পট্টির উপর রেখে দাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঝটকা টান দেন। সঙ্গে সঙ্গে দাড়িগুচ্ছ মুখমণ্ডল থেকে আলাদা হয়ে যায়। ক্লিনসেভ চেহারাটা বেরিয়ে আসে। পরক্ষণে তিনি নিজের কৃত্রিম দাড়িও খুলে ফেলে বললেন– 'আমিও তোমাকে চিনি। তুমিও আমাকে চেনো। চলো রওনা হই।'

লোকটি ক্ষমতাচ্যুৎ আব্বাসী খেলাফতের একজন আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মী। এই খেলাফতকে– যার সিংহাসন কায়রোতে ছিলো– সাত-আট বছর আগে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। তখন খলীফা ছিলেন আল-আজেদ, যিনি হাশিশি, ক্রুসেডার ও সুদানীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছিলেন। সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গীর সঙ্গে কথা বলে এই খেলাফতকে বিলুপ্ত করে এমারতে মেসেরকে খেলাফতে বাগদাদের অধীন করে দেন। কিন্তু খেলাফতে আব্বাসিয়ার পদচ্যুৎ কর্মকর্তারা এখনো গোপন তৎপরতায় লিপ্ত। সুলতান আইউবীর রামাল্লা পরাজয় তাদের জন্য সোনালী সুযোগ এনে দেয়। এই আব্বাসীরা গোপন পন্থায় সুলতান আইউবী এবং তার বাহিনীকে চরিত্রহীন, বিলাসী, লুটেরা এবং পরাজয়ের জন্য দায়ী প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠে।

এই ধৃত লোকটিও তাদেরই একজন।

আলী বিন সুফিয়ান লোকটিকে হেফাজতে নিয়ে নেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েদখানায় আটক করে রাখেন।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা রাতে দরবেশের নির্ধারিত সময়ে গ্রামের বাইরে এক স্থানে গিয়ে দাঁড়ায়। গত রাতের সৈনিক তাকে নিতে চলে আসে। সৈনিক তাকে নতুন কিছু উপদেশ দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তারা পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। কিন্তু গোয়েন্দাকে গত রাতের কক্ষের পরিবর্তে অন্য এক কক্ষে নিয়ে বসায়। এই কক্ষে কালো দাড়িওয়ালা বুযুর্গ নেই– কেউ নেই। তাকে রেখে সৈনিকও বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। গোয়েন্দা দরজায় হাত লাগিয়ে বুঝতে পারে, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কক্ষে কোনো জানালা নেই। গোয়েন্দা বুঝে ফেলে আমি ধরা পড়ে গেছি। এরা জেনে গেছে, আমি গুপ্তচর। পালাবার কোনো পথ নেই। কী করা যায় ভাবতে শুরু করে গোয়েন্দা।

অনেকক্ষণ পর দরজা খুলে যায়। যে দু'টি মেয়েকে দরবেশ নিজের কন্যা পরিচয় দিয়েছিলো, তাদের একজন ভেতরে প্রবেশ করে। এখন সে পূর্বের ন্যায় আপাদমস্তক পর্দাবৃতা নয়। তবে ইউরোপিয়ানদের ন্যায় নগ্নও নয়। তার পোশাক আরব নারীদের পোশাকের ন্যায়। কারুকাজ কিছু এরাবিয়ান, কিছুটা ইউরোপিয়ান। মেয়েটি ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কে যেনো বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। দরজা আবারো বন্ধ হয়ে যায়। কক্ষে প্রদীপ জ্বলছে। মেয়েটির প্রতি চোখ পড়ামাত্র গোয়েন্দার চোখ বিস্ময়ে নিষ্পলক হয়ে যায়।

মেয়েটি মিটি মিটি হাসছে।

'চেনার চেষ্টা করছো, না?'– মেয়েটি বললো– 'এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেছো? তুমি আমার শহর থেকে রক্ষা পেয়ে বেরিয়ে এসেছিলে। কিন্তু এখন নিজ ভূখণ্ডে আমর কয়েদি হয়ে গেছো। এখন আর বেরুতে পারবে না।'

গোয়েন্দা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, যাতে প্রশান্তিও আছে, উদ্বেগও আছে। গোয়েন্দার তিন বছর আগের কাহিনী মনে পড়ে যায়। তাকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আক্রা প্রেরণ করা হয়েছিলো। আক্রা তখন খৃস্টানদের দখলে ছিলো। সেখানে তাদের বড় পাদ্রীর আস্তানা ছিলো, যাকে ক্রুশের মহান মোহাফেজ বলে অভিহিত করা হতো। যেসব খৃস্টান সম্রাট আরব এলাকা দখল করার

জন্য আসতেন, তারা অবশ্যই সেখানে যেতেন এবং বড় পাদ্রীর আশির্বাদ গ্রহণ করতেন। সে কারণে সামরিক দিক থেকে স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো। আলী বিন সুফিয়ান সেখানে গোয়েন্দা প্রেরণ করে রেখেছিলেন। তারা সেখানে খৃস্টানবেশে একটি আস্তানাও গড়ে তুলেছিলো। তাদের তিন-চারজন গোয়েন্দা শত্রুর হাতে ধরা পড়েছিলো এবং দু'জন শহীদ হয়েছিলো। ফলে সেখানকার কমান্ডার আরো গোয়েন্দা চেয়ে বার্তা প্রেরণ করেছিলো। তখন নতুনভাবে যাদের প্রেরণ করা হয়েছিলো, তাদের একজন এই গোয়েন্দা, যে এখন মিসরের একটি কক্ষে শত্রুর হাতে বন্দি।

লোকটির গাত্রবর্ণ, দৈহিক কাঠামো ও মুখাবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। বুদ্ধিমত্তাও অতিশয় প্রখর ও সতর্ক। অশ্বচালনায় এতোই দক্ষ যে, সামরিক মহড়া ও সমর প্রদর্শনীতে নিজের কৃতিত্ব-যোগ্যতা দেখিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিতো। চরিত্রও ফুলের মতো পবিত্র। খৃস্টান নাম ধারণ করে সে আক্রা প্রবেশ করেছিলো এবং নিজের দুর্দশা ও নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়ে বলেছিলো, আমি হাল্‌বের মুসলিম বাহিনীতে নতুন সৈনিকদেরকে অশ্বচালনা প্রশিক্ষণ দিতাম। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা আমার এক যুবতী বোনকে অপহরণ করে আমাকে অন্যায়ভাবে ফৌজ থেকে বের করে দিয়েছে।

খৃস্টানরা তার চাল-চলন ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে অশ্বচালনার প্রশিক্ষণের জন্য রেখে দেয়। কিন্তু তার শিষ্যরা সৈনিক নয়। তারা যুবতী মেয়ে এবং বড় বড় অফিসারদের পুত্র। গোয়েন্দা জানতে পারে, এই মেয়েগুলোকে মুসলমানদের বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। পরে কতিপয় পুরুষকেও তার হাতে তুলে দেয়া হয়। এরা সকলে খৃস্টান গোয়েন্দা। মুসলিম গোয়েন্দা তাদের মধ্যে একাকার হয়ে যায়। খৃস্টানদের থেকে সে মোটা অংকের ভাতাও পেতে শুরু করে।

এই মেয়েটি– যে এখন তার সঙ্গে কক্ষে কথা বলছে– আক্রায় তার শিষ্য ছিলো। মেয়েটির গুপ্তচরবৃত্তির যোগ্যতা ছিলো; কিন্তু অশ্বচালনা জানতো না। আলী বিন সুফিয়ানের এই গোয়ন্দার মেয়েটিকে ভালো লাগতে শুরু করে। প্রথমে ভালো লাগা, তারপর ভালোবাসা। অবশেষে দু'জনের মাঝে গভীর প্রণয় জমে যায়। এক পর্যায়ে গুরু-শিষ্য নয়– প্রেমিক-প্রেমিকা পরিচয়ই মুখ্য হয়ে ওঠে। মেয়েটি এমনও সিদ্ধান্ত নিয়ে

ফেলে, এই লোকটির খাতিরে গুপ্তচরবৃত্তির মতো হীন পেশাটা ছেড়ে দেবে এবং তার স্ত্রী হয়ে সম্মানের জীবনযাপন করবে। মুসলমান গোয়েন্দা তার ভালোবাসার উত্তর ভালবাসা দ্বারাই দিয়েছিলো বটে; কিন্তু কর্তব্য পরিত্যাগ করতে পারেনি। মেয়েটি কাজ-কর্মে অবহেলা করতে শুরু করেছিলো। প্রেমিক গুরুকে ছাড়া তার কিছুই ভালো লাগছিলো না।

একদিন আক্রায় দু'জন মুসলমান গোয়েন্দা ধরা পড়ে যায়। তাদের একজন তার জানামতো সকল সহকর্মীর ঠিকানা বলে দেয়। এই গোয়েন্দাও তাদের একজন ছিলো। খোঁজাখোঁজি শুরু হয়ে যায়। মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি গুপ্তচর নও তো? মুসলমান নও তো? শুনেছি, এখানকার গোয়েন্দা বিভাগ তোমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছে এবং তোমার উপর নজর রাখছে।'

জবাবে গোয়েন্দা হেসে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু মনটা তার অস্থির হয়ে ওঠে। রাতে কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কমান্ডার বললো, আমাদের বহু লোক চিহ্নিত হয়ে গেছে। সম্ভব হলে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

গোয়েন্দা কমান্ডারের গৃহ থেকে বের হয়ে টের পায়, দু'ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করছে। সে এগিয়ে গিয়ে আস্তাবলে ঢুকে পড়ে। একটি ঘোড়ায় জিন কষে। অমনি দু'জন লোক এসে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছো? লোকটি অত্যন্ত চৌকস ও সতর্ক। অবস্থা বেগতিক দেখে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়েই ঘোড়া হাঁকায়। একজন তাঁর ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। অপরজন কিছু বুঝতে না বুঝতে সে ছুটতে শুরু করে। গোয়েন্দা আক্রা থেকে বেরিয়ে আসে।

'আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি'– গোয়েন্দা মেয়েকে বললো। তিন বছর পর তাদের এই সাক্ষাৎ– 'আমি বিস্মিত হয়নি। তুমি যে গোয়েন্দা, আমি জানি।'

'তিন বছর আগে তোমার প্রেমের ফাঁদে পড়ে আমি গুপ্তচরবৃত্তি ত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম– মেয়েটি বললো– 'তুমি যদি বলতে, তুমি মুসলমান এবং গোয়েন্দা, তবু আমি তোমাকে ধোঁকা দিতাম না। আমি তোমার সঙ্গে এসে পড়তাম। তোমার পালিয়ে আসার পর আমি যখন জানতে পারলাম, তুমি মুসলমান গুপ্তচর ছিলে, তখন আমি ব্যাথিত হয়নি। আমার বেদনাটা ছিলো তোমার বিরহের।'

'এখন কি তোমার হৃদয়ে আমার ভালোবাসা নেই?'– গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করে– 'তুমি এখন আমার দেশে। আমার সঙ্গে আসো। এখানে আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না।'

'আছে'– মেয়েটি উত্তর দেয়– 'তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা এখনো আছে। কিন্তু কর্তব্য তার উপর বিজয়ী হয়ে গেছে। এটা তোমার অপরাধ। তোমার ভালোবাসার খাতিরে আমি গোয়েন্দাগিরি পরিত্যাগ করার সংকল্প নিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সংকল্পকে দলিত করে আমাকে গুপ্তচরবৃত্তির নোংরামিতে ডুবিয়ে দিয়েছো। তিনটি বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়টায় আমি নিজেকে জঘন্যরূপে নাপাক করে ফেলেছি। ইসলামের প্রতি ঘৃণা আমার আত্মায় মিশে গেছে। এখন আর প্রেম নয়। এখন তুমি আমার বন্দি। আমি আমার জাতিকে ধোঁকা দিতে পারি না। আমি যে লোকটির সঙ্গে এসেছি, তাকে বলে দিয়েছি, তুমি গুপ্তচর। তাকে আমি আক্রার সব ঘটনা খুলে বলেছি। বারান্দা দিয়ে অতিক্রম করার সময় যদি আমি তোমাকে না দেখে ফেলতাম, তাহলে আমরা সকলে গ্রেফতার হয়ে যেতাম। তোমাকে আমিই ধরিয়েছি।'

'তোমাদের যে লোকটি পীর সেজেছে, সে মুসলমান না খৃস্টান?' গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করে।

'জেনে কী করবে?' মেয়েটি পাল্টা প্রশ্ন করে।

'গোয়েন্দাগিরি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে'– গোয়েন্দা বললো– 'মৃত্যুর প্রাক্কালে আরো তথ্য জানতে চাই আর কি। এই ভেদ তো এখন আর বাইরে নিতে পারবো না।'

'মুসলমান'– মেয়েটি বললো– 'মুসলমানদের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত ওস্তাদদেরও ওস্তাদ।'

কক্ষের দরজা খুলে যায়। কলো দাড়িওয়ালা দরবেশ এক ব্যক্তির সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করেই মেয়েটিকে বললো– 'তোমার কথা-বার্তা শেষ হয়ে থাকলে বেরিয়ে যাও।'

মেয়েটি গোয়েন্দার প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে যায়।

দরবেশ গোয়েন্দাকে বললো– 'শুধু এটুকু বলো, আমার ভেদ কার কার জানা আছে। তুমি কি আলী বিন সুফিয়ানকে বলে দিয়েছো, আমি সন্দেহভাজন?'

'না'– গোয়েন্দা জবাব দেয়– 'আমি গোয়েন্দা বটে; কিন্তু এখানে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য আসিনি।'

দরবেশের হাতে হান্টার (চামড়ার চাবুক) ছিলো। সে পূর্ণ শক্তিতে গোয়েন্দাকে প্রহার করতে করতে বললো– 'আমি সত্য কথা শুনতে চাই।'

কক্ষের দরজাটা সজোরে খুলে যায়। মেয়েটি ভেতরে প্রবেশ করে। সে দরবেশের উভয় হাত ধরে বিনয়ের সাথে বললো– 'একে মেরো না, সব বলে দেবে।'

'না, আমি কিছুই বলবো না।' গোয়েন্দা বজ্রকণ্ঠে বললো।

দরবেশ আবারো প্রহার করতে উদ্যত হয়। মেয়েটি ছুটে গিয়ে গোয়েন্দার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। চীৎকার করে বলে ওঠে– 'মেরো না। এর দেহের আঘাত আমার হৃদয়ের জখমে পরিণত হবে।'

'তুমি কি একে রক্ষা করতে চাচ্ছো?' অপর ব্যক্তি গর্জে ওঠে জিজ্ঞেস করে।

'না'– মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললো– 'লোকটি যদি কোনো তথ্য না দেয়, তাহলে তরবারীর এক আঘাতে এর মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলো। নির্যাতন দিয়ে হত্যা করো না।'

মেয়েটিকে টেনে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। গোয়েন্দার উপর অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। সারাটা রাত তাকে শয্যায় পিঠ লাগাতে দেয়া হলো না। তাকে বহু কিছু জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। নির্যাতনের পর নির্যাতন চলছে; তবু কোন তথ্য দিচ্ছে না।

রাতের শেষ প্রহর। মেয়েটি তার কক্ষে প্রবেশ করে। গোয়েন্দা অর্ধ অচেতন অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। দরবেশের লোকেরা তরবারীর আগা দ্বারা তার শরীরে খোঁচাচ্ছে। দেখে মেয়েটি তার গায়ের উপর শুয়ে পড়ে চীৎকার করতে শুরু করে– 'এ আমি সহ্য করতে পারবো না। আমি তোমাকে বলে দিয়েছি, এটা আমার জীবনের প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। এর কষ্ট আমার কষ্ট। লোকটি তার কর্তব্য পালন করছে আর আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি। আমাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। একে তোমরা প্রাণে মেরে ফেলো– নির্যাতন করো না।'

গোয়েন্দা অর্ধ অচেতন অবস্থায় নিজ গায়ের উপর পড়ে থাকা মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট স্বরে বললো– 'তুমি চলে যাও। পাছে আমি আমার কর্তব্য থেকে ছিটকে না পড়ি। এই অত্যাচার আমার কর্তব্যেরই অংশ। তুমি তোমার ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করো আর আমাকে আমার দীনের জন্য জান কুরবান করতে দাও।'

মেয়েটি পাগলের মতো হয়ে গেছে। তাকে পুনরায় টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো।

দরবেশ আদেশ করে– 'এই হতভাগীকে একটি কক্ষে আটকে রাখো।'

❖ ❖ ❖

দিনের অর্ধেকটা কেটে গেছে। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর গোয়েন্দার ফিরে আসার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে ওঠেছেন। তাঁর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে। সেই রাতে গেলো; এখনো ফিরলো না কেনো! গতকাল তিনি শুভ্র শশ্রুমন্ডিত যে লোকটিকে পাকড়াও করেছিলেন, কয়েদখানায় রাতে নির্যাতনের মাধ্যমে তার থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে, কালো দাড়িওয়ালা দরবেশটা কে, তার আসল পরিচয় কী এবং তার মিশন কী।

দিবসের শেষ বেলা আলী বিন সুফিয়ান একটি কমান্ডো সেনাদল প্রস্তুত করেন। এখন তাঁর প্রবল ধারণা, তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দা ধরা পড়ে গেছে। আস্তানাটি যে শত্রুর নাশকতাকারী গোয়েন্দাদের আড্ডাখানা, তা এখনা প্রমাণিত।

আলী বিন সুফিয়ান-এর কমান্ডোরা এতো দ্রুততার সঙ্গে এসে পৌঁছে যে, এলাকাবাসি কিছুই বুঝে ওঠতে পারেনি। তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বানরের ন্যায় লাফিয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। পলকের মধ্যে ভেতরের সবগুলো লোককে ধরে ফেলে।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা একটি কক্ষে অচেতন পড়ে আছে। তার মুমূর্ষু অবস্থা। তার প্রেমিকা মেয়েটি এক কক্ষে মেঝেতে পড়ে আছে। তার বুকে একটি খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে। 'আমি আত্মহত্যা করেছি' বলেই মেয়েটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এলাকাবাসী ঘটনাটা টের পেয়ে গেছে। তারা দরবেশের আস্তানার বাইরে ভিড় জমায়। পরস্পর কানাঘুষা চলছে।

দরবেশকে বের করে জনতার সম্মুখে দাঁড় করানো হলো। তাকে বলা হলো, আসল পরিচয় নিজ মুখে শোনাও। জনতাকে বলো, কী উদ্দেশ্যে মিসরের ফৌজ ও সুলতান আইউবীর দুর্নাম রটনা করছো।

দরবেশ সত্য সত্য বলে দেয়। মানুষ তার যে পরিচয় জানে, সব ভুয়া। আসল পরিচয়, সে খৃস্টানদের চর এবং নাশকতার হোতা। ইদানিংকার দেশময় অপপ্রচারের মূল নায়ক।

এক মেয়ে মারা গেছে। অপর মেয়েকে জনতার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো এবং বলা হলো, এই মেয়েটি মুসলমান নয়– খৃস্টান। জনতাকে আরো অবহিত করা হলো, রামাল্লা থেকে আশার পথে পার্বত্য এলাকায় আগুনের কাছে যে পানি ও খেজুর পড়ে ছিলো, সেগুলো এদেরই লোকেরা রেখেছিলো।

আলী বিন সুফিয়ান তাঁর পাতাল কক্ষে ধৃত দরবেশ ও সাঙ্গপাঙ্গদের থেকে যেসব তথ্য লাভ করেছেন, তাতে জানা গেলো, লোকটি রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা নতুন সৈন্যদেরকে ফন্দি করে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিলো। সঙ্গে তার নিজেরও লোক ছিলো। এরা বিভিন্ন মসজিদ ও নানা লোক সমাগমের স্থানে মিসরের ফৌজের বিরুদ্ধে কথা বলতো। উদ্দেশ্য ছিলো, দেশের জনগণ ও ফৌজের মাঝে সংশয় ও ঘৃণার প্রাচীর দাঁড় করানো। এই মিশনে মিসরের প্রশাসনের জনাকয়েক কর্মকর্তা এবং ক্ষমতাচ্যুৎ আব্বাসী খেলাফতের গোপন কর্মীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। মোটকথা, দুশমনের পরিচালিত এই অভিযানে স্বার্থপূজারী ঈমান বিক্রেতা মুসলমানও অংশীদার ছিলো।

'যখন দেশের সেনা বাহিনী ও জনগণের মাঝে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন বুঝে নিও সালতানাতে ইসলামিয়ার পতন শুরু হয়ে গেছে'– সুলতান আইউবী বললেন। তিনি নির্দেশ জারি করেন– 'দেশের সমস্ত মসজিদের ইমামদেরকে রামাল্লার পরাজয়ের প্রকৃত কারণ অবহিত করার ব্যবস্থা করো। ইমামগণ বিষয়টি দেশের মানুষকে অবহিত করবেন। কাউকে দায়ী কিংবা অভিযুক্ত করে যদি কেউ শান্তি লাভ করে থাকে, তাহলে সব দায়-দায়িত্ব আমার উপর চাপাও। ফিলিস্তিনের রণাঙ্গনে জীবন দিয়ে আমি জাতির সেই লোকগুলোর গুনাহের কাফফারা আদায় করবো, যারা ক্ষমতার নেশায় আমার ফৌজ ও ফিলিস্তীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তখন আমার রক্তের প্রতিটি ফোঁটা চীৎকার করে করে জানান দেবে, রামাল্লার পরাজয়ের জন্য ফৌজ দায়ী ছিলো না এবং মিসরের একজন ফৌজও কোনো অনৈতিক কাজে জড়িত ছিলো না।

[ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত]

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে ফেলে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

৭

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৭

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৭

আলতামাশ
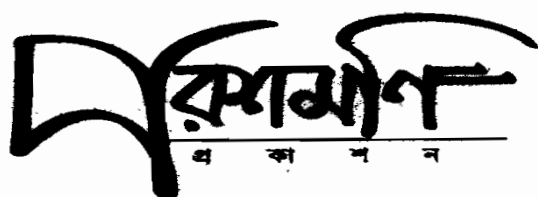
অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪

মোবাইল : ০১৫৬-৩৬৭২২১, ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৭
আলতামাশ

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

পরশমণি প্রকাশনা-৯
ISBN-984-8925-08-0

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৫৬-৩৬৭২২১, ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর ২০০৬

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার
মালিটোলা, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
কালার সিটি
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৫৬৪১৪১

গ্রাফিক্স
নাজমুল হায়দার
দি লাইট
মোবাইল ঃ ০১৯১-০৩১১৮৪

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

পরিবেশক

এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার (পাঠকবন্ধু মার্কেট)
ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

নিউ রহমানিয়া লাইব্রেরী
৭৩, সাত মসজিদ সুপার মার্কেট
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১-৪৬৪০৭১

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে–বিশেষত মিশর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। ক্রুসেডাররা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয় তারা।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দু:সাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিলো, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দু:সাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হলো সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ কবুল করুন।

বিনীত

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা। মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সূচীপত্রঃ

*একই গন্তব্যের মুসাফির......................৭
*আল-মালিকুস সালিহ.........................৫৩
*সাপ ও খৃস্টান মেয়ে..........................৮১
*শরাব নয় শরবত..........................১০৯
*সারা..১৬৭
*হেজাজের কাফেলা........................২১১

একই গন্তব্যের মুসাফির

হালবের উত্তরে আজকের সিরিয়া ও লেবাননের সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত ক্ষুদ্র একটি শহর। নাম হেম্‌স। যুদ্ধ এখনও গ্রাস করেনি বলে শহরটি শান্ত। খৃস্টান সৈন্যরা মাঝে-মধ্যে তার আশপাশ দিয়ে অতিক্রম করছে। শহরটির কোল ঘেঁষে বয়ে চলছে ছোট্ট একটি নদী। সে কারণেই শহরটি সৈন্যদের বিচরণ থেকে নিরাপদ রয়েছে। অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা এতো বেশি। ফলে এটি মুসলমানদের নগরী বলেই পরিচিত। অল্প ক'টি খৃস্টান পরিবারও আছে। আছে ক'টি ইহুদী পরিবারও। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য ইহুদী-খৃস্টানদের দখলে। বাণিজ্যের সুবাদে তাদের দূর-দূরান্ত অঞ্চলে যাওয়া-আসা আছে। তারা বহিঃজগতের যে খবরাখবর নিয়ে আসে, হেম্‌সের মানুষ তা-ই সত্য বলে বিশ্বাস করে। তারা ক্রুসেডার ও ইসলামী বাহিনীর যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে আসে। তাতে মুসলমানদের পরাজয়ের উল্লেখই বেশি থাকে। খৃস্টান বাহিনী সম্পর্কে তারা ভীতিকর কথাবার্তাই শুনিয়ে থাকে।

তাদের উদ্দেশ্য, মুসলমানদের উপর খৃস্টান বাহিনীর আতঙ্ক বিরাজিত থাকুক এবং অন্তত এই নগরীর কোন মুসলমান ইসলামী বাহিনীতে অংশগ্রহণ না করুক। কিন্তু তার ক্রিয়া হচ্ছে উল্টো। মুসলমানগণ ভীত হওয়ার পরিবর্তে উল্টো প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। আইন করে বা নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাদের এই সামরিক প্রস্তুতি রুখবার শক্তি কারো নেই। এখানে খৃস্টানদের শাসন চলে না।

হেম্‌সের মুসলমানগণ অশ্বচালনা, বর্শা ছোঁড়া, তরবারীচালনা ও তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন করছে। এই প্রশিক্ষণ মেয়েরাও গ্রহণ করছে। তাদের নেতা নগরীর বড় মসজিদের খতীব, যাঁর সকল ইল্‌ম ও আমল জিহাদের জন্য নিবেদিত। তিনি প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস শত্রুমুক্ত করার এবং খৃস্টানদেরকে আরব দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে মুসলমানদের প্রস্তুত করছেন।

'...আর এই যুদ্ধটা কেন লড়া হচ্ছে?'– খতীব তাঁর ভাষণে ব্যাখ্যা প্রদান করছেন– 'খৃস্টানরা আরব দুনিয়ার উপর দখলদারিত্ব কায়েম করে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে আর আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার জন্য জান-মালের কুরবানী দিয়ে চলেছি। তারা আরব দুনিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করলো কেন? তার একমাত্র কারণ, মহান আল্লাহর মহান পয়গাম আরবদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই বার্তা আরবদের উপর কর্তব্য আরোপ করে দিয়েছে যে, হেরা গুহায় বসে প্রিয়নবীর প্রাপ্ত এই বার্তা আমরা সমগ্র মানবতার নিকট পৌঁছিয়ে দেবো। তারিক ইবনে যিয়াদ রোম উপসাগরের মিসরীয় তীরে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহকে বলেছিলেন– 'তুমি যদি আমাকে সাহস ও দৃঢ়তা দান করো, তাহলে আমি তোমার নাম সমুদ্রের ওপারে নিয়ে যাবো।' সে সময় তাঁর বক্ষ থেকে ঈমানী চেতনার যে শিখা উত্থিত হয়েছিলো, তা-ই তাঁর ঘোড়াকে সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিলো। নৌকায় করে তার বাহিনী ইউরোপের কূলে পৌঁছে যায়। যিয়াদপুত্র তারিক আদেশ দিলেন– 'নৌকাগুলোতে আগুন ধরিয়ে দাও। আমরা ফিরে যাওয়ার জন্য আসিনি।'

'আর আজ খৃস্টানরা আল্লাহর ভূখণ্ডে এই প্রত্যয় নিয়ে এসেছে যে, তারা ফিরে যাবে না। এই ভূখণ্ডকে তারা করায়ত্ত্ব করার সিদ্ধান্ত নিলো কেন? তারা চাচ্ছে, আল্লাহ পাক যে ইসলামকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন, তাকে এখানেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে। মনে রেখো মুসলমান! ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যে পাথরকে মোমে পরিণত করে দেয়। আমাদের ধর্মের মূলনীতিগুলো সহজে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে যায়। কারণ, এটি মানব স্বভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল জীবনব্যবস্থা। হাক্কুল ইবাদ (মানবাধিকার) এমন একটি মৌল বিধান, যা মানবজাতিকে একমাত্র ইসলামই উপহার দিয়েছে। ইসলাম একটি ধর্মই নয়– এটি একটি মতবাদ। ইসলাম বিশ্ব মানবতার পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।'

'ক্রুশের ধ্বজাধারীরা জানে, ইসলাম যদি বিস্তার লাভের সুযোগ পেয়ে যায়, তাহলে পৃথিবী নামক এই গ্রহটি ইসলামের ছায়াতলে চলে আসবে এবং ক্রুশের নাম-চিহ্ন মুছে যাবে। এ কারণেই ক্রুসেডাররা তাদের পূর্ণ সমর শক্তি নিয়ে এখানে এসেছে। তারা ইসলামের উৎসমুখ বন্ধ করে দিতে এসেছে। ইহুদীদের সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়েছে, বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে

তাদের হাতে তুলে দেবে, যাতে ইহুদীরা আমাদের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসাকে হাইকেলে সুলায়মানীতে পরিণত করতে পারে। এটি ইহুদীদের একটি প্রাচীন স্বপ্ন, যাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা অস্থির হয়ে আছে। এই লক্ষ্য অর্জনে তারা তাদের রূপসী মেয়েদেরকে এবং তাদের ধন-সম্পদ খৃস্টানদের হাতে তুলে দিয়েছে। এই নারী আর অর্থই আমাদের সারিতে গাদ্দার জন্ম দিয়েছে।'

'আমি তোমাদেরকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পয়গাম শোনাচ্ছি। তোমরা তাঁকে হৃদয়ে অঙ্কন করে নাও। ইসলামের সৈনিক সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁর ফৌজ ও জাতিকে বলে রেখেছেন, চলমান লড়াই দু'টি বাহিনীর যুদ্ধ নয়, এটি প্রথম কেবলা ও হাইকেল সুলাইমানীর যুদ্ধ। আজ যদি আমরা বাতিলকে চিরতরে খতম করতে না পারি, তাহলে বাতিল একদিন আমাদের ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমাদের আত্মা দেখবে, ইতিহাস দেখবে, ফিলিস্তীন ইহুদীদের দখলে আর মসজিদে আকসা হাইকেলে সুলাইমানীতে পরিণত হচ্ছে।'

'হেম্‌সের মুসলমানগণ! তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজের সৈনিক নও বটে; তবে অবশ্যই আল্লাহর সৈনিক। তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করে দেয়া হয়েছে। কুরআন নির্দেশ দিয়েছে, নিজের মাতৃভূমি ও ধর্মের সুরক্ষার জন্য ঘোড়া ও অস্ত্র প্রস্তুত রাখো এবং জিহাদের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত থাকো। তবে মনে রেখো, তোমাদের শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে শুধু রণাঙ্গনেই যুদ্ধ করে না। তাদের যুদ্ধক্ষেত্র আরো আছে। তারা অপপ্রচারের মাধ্যমে তোমাদের উপর তাদের বাহিনীর ভীতি ও ইসলামী ফৌজের বিরুদ্ধে কুধারণা সৃষ্টি করছে। তারা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে সুন্দরী মেয়ে আর সোনার চাকচিক্য দ্বারা নিজেদের অনুগত বানিয়ে নিচ্ছে। এই দু'টি বস্তু মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এই দুয়ের সঙ্গে যখন মদ যোগ হয়, তখন মুসলমান তার ঈমানকে ঈমানের শত্রুর পায়ের উপব অর্পণ করে। এমনটি অতীতে হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে। খৃস্টানরা আমাদেরকে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে আমাদের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমাদের কতক আমীর খৃস্টানদের কাছে ঈমান নীলাম করে সালতানাতে ইসলামিয়া ও মুসলিম উম্মাহর এই ক্ষতিটা করেছে। কিন্তু তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করেছে জাতি, দেশ ও সেনাবাহিনী। যারা অন্যের মাঝে গৃহযুদ্ধ বাঁধায়, তারা দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীকে আবেগে ফেলে একদলকে অপর দলের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়

এবং একদল দ্বারা অপর দলকে খুন করায়। আর নিজেরা প্রাসাদে বসে ফূর্তি করে। তোমরা স্মরণ রেখো, এই পাথরগুলো সব যদি সোনা হয়ে যায় আর সেগুলো তোমাদের দান করা হয়, তবুও তা জিহাদের প্রতিদান হবে না। জিহাদের পুরস্কার লাভ করে আত্মা। আত্মা হীরা-জহরতে খুশি হয় না। জিহাদের পুরস্কার আল্লাহর হাতে। তোমরা যদি আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দাও, তবু জীবিত থাকবে। তোমরা দৈহিক সুখ-ভোগকে লক্ষ্য স্থির করো না। এই দৈহিক সুখ-ভোগকে যে-ই লক্ষ্য বানিয়েছে, সে-ই আপন ঈমানদার ভাইয়ের গলা কেটেছে, জাতির গলায় ছুরি চালিয়েছে। কুরআন তোমাদেরকে আত্মিক শান্তিতে ধন্য করতে চায়।'

এভাবে খতীব হেম্‌সের মুসলমানদের ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত করে রাখেন। তারই তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা মোতাবেক সামরিক প্রশিক্ষণ চলছে। তিনি স্বয়ং তরবারী ও খঞ্জর চালনায় অভিজ্ঞ। হেম্‌সে এই প্রশিক্ষণ পুরোদমে চলছে। সকলের হৃদয়ে একটিই সুর অনুরণিত হচ্ছে– জিহাদ জিহাদ জিহাদ চাই, জিহাদ করে বাঁচতে চাই।

হেম্‌স নগরীতে তিনটি মসজিদ আছে। এই মসজিদগুলো জিহাদের আলোচনায় মুখরিত থাকে। কিন্তু এখানকার খৃস্টান ও ইহুদী অধিবাসীরা সহানুভূতিশীল সেজে দুঃসংবাদ শুনিয়ে শুনিয়ে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করছে। সাধারণ মুসলমানগণ মসজিদের খতীব ও ইমামদের নিকট এসব সংবাদের সত্যতা জিজ্ঞেস করছে এবং উদ্বেগ প্রকাশ করছে। ক্রুশ ও চাঁদ-তারার যুদ্ধের সঠিক ও বাস্তব চিত্র জেনে হেম্‌সের মুসলমানদের কৌতূহল নিবারণের জন্য খতীব তাবরিজ নামক এক যুবককে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দিয়েছে।

যুদ্ধের সঠিক চিত্র সংগ্রহ করে হেম্‌স ফিরে আসছে তাবরিজ। সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাকে দামেশ্‌ক পর্যন্ত যেতে হয়নি। পথেই তার কাজ হয়ে গেছে। খৃস্টান বাহিনী হামাত থেকে বহু দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলো। তাবরিজ তাদের দেখে ফেলে। দূর থেকে পতাকা দেখে চিনে ফেলে, ওরা খৃস্টান সৈন্য। তাবরিজ অগ্রসর হতে থাকে। পথে দু'জন উষ্ট্রারোহীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তারা মুসলমান। তাবরিজ তাদের থেকেও জানতে পারে, ওরা খৃস্টান বাহিনী। উষ্ট্রারোহীরা আরো জানায়, এই বাহিনী মুসলমানদের হাতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এসেছে। তাবরিজ

তাদের বললো, আমি হেম্‌স থেকে জানতে এসেছি, খৃষ্টান বাহিনী কোন্ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে এবং আরবের ক'টি অঞ্চল জয় করেছে।

'ঐ যে পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছো'– উষ্ট্রারোহীরা একটি পার্বত্যময় এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করে বললো– 'এই পথটিই তোমাকে পর্বতমালার অভ্যন্তরে নিয়ে যাবে। ওখানে গেলেই আমাদের ফৌজ দেখতে পাবে। দামেশ্‌ক এখনো অনেক দূর। বাহিনীর যে কোন একজন সৈনিককে জিজ্ঞেস করলেই তুমি সবকিছু জানতে পারবে। আমরা শুধু এটুকু জানি, রামাল্লায় যে যুদ্ধ হয়েছিলো, তাতে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত ও পরাজিত হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গেছে। তারপর খৃষ্টানদের সঙ্গে হামাতের দুর্গের সন্নিকটে লড়াই হয়েছে, যাতে খৃষ্টানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করেছে। তুমি সম্মুখে চলে যাও। তবে কোন খৃষ্টান সৈন্যের কাছে ঘেঁষবে না। তারা যখনই টের পাবে তুমি মুসলমান, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে হত্যা করে ফেলবে।'

দিবসের শেষ বেলা। তাবরিজ হামাতের পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়েছে। ভেতরে সুপরিসর একটি উপত্যকা। সম্মুখ দিক থেকে জনাকয়েক অশ্বারোহী এগিয়ে আসে। তাবরিজ মাঝপথ দিয়েই হাঁটছে। এক আরোহী ছুটে এসে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– 'পথ ছাড়ো মিয়া! প্রধান সেনাপতি আসছেন।'

তাবরিজ সামান্য সরে দাঁড়ায়। আরোহী তাকে আরো দূরে সরে যেতে বলছে। প্রধান সেনাপতি ও তাঁর সহকর্মীরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছেন।

প্রধান সেনাপতি সুলতান আইউবীর ভ্রাতা আল-আদিল। এসে পৌঁছেই তিনি দেখতে পান তাঁর এক রক্ষীসেনা একজন পথিকের সঙ্গে ক্ষুব্ধ ভাষায় কথা বলছে। বোধ হয় পথিক পথ ছাড়ছিলো না। আল-আদিল নিকটে এসে দাঁড়িয়ে যান। তাবরিজকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? রক্ষীর সঙ্গে বচসা করছো কেন?

তাবরিজ জবাব দেয়, আমি হেম্‌স থেকে জানতে এসেছি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী কী অবস্থায় আছে এবং খৃষ্টান বাহিনী কী পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে। সে আল-আদিলকে জানায়, হেম্‌সের মুসলমানরা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে এবং সুলতান আইউবীর ফৌজের অপেক্ষা করছে। আমাদের বোনরাও যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। প্রস্তুত শিশু-কিশোর-বৃদ্ধরাও।

আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আল-আদিলের সঙ্গে আছেন। তিনি তাবরিজকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষা করছেন। তাবরিজ

শত্রুপক্ষের চর হতে পারে। তবে তার সরলতা প্রমাণ করছে লোকটা গুপ্তচর নয়। তবু সন্দেহ করা আবশ্যক। গোয়েন্দারা এর চেয়েও বেশী সরলতা প্রকাশ করতে পারে।

'তোমাদের খতীবের নাম কী?' হাসান ইবনে আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করেন।

তাবরিজ খতীবের নাম বলে। তৎকালের অপ্রকাশিত লিপিতে খতীবের নামটা স্পষ্ট উল্লেখ নেই। প্রকাশিত কোন ইতিহাস গ্রন্থেও হেম্‌সের এই খতীবের নাম পাওয়া যায় না। তাই অগত্যা আমরা তাকে 'খতীব' বলেই ডাকবো।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আল-আদিলকে বললেন, আমি নিশ্চিত হয়েছি লোকটি আমাদেরই। তার কথা-বার্তায় বুঝা যাচ্ছে, সে আন্তরিকতার সঙ্গেই নিজ দায়িত্ব পালন করছে।

আল-আদিলের নির্দেশে তাবরিজকে মেহমান হিসেবে তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ রাতে তাবরিজকে নিজ তাঁবুতে তলব করেন এবং খতীবের নামে একখানা পত্র লিখে দেন–

'পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গীন। তবে এতোটা নয়, যতোটা আপনারা শুনেছেন। জনগণকে বলুন, তারা যেনো তা-ই বিশ্বাস করে, যা তারা নিজ চোখে দেখে এবং যা ইমামগণ মসজিদে মসজিদে বলে থাকেন। এদিক-ওদিকের কথা-বার্তায় যেনো তারা কান না দেয়, সত্য বলে বিশ্বাস না করে। আপনারা একটি মহা-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করছেন। এলাকার ইহুদী-খৃষ্টানদের প্রতি দৃষ্টি রাখুন আর সতর্ক থাকুন, যেনো তারা আপনাদের তৎপরতা জানতে না পারে। আপনাদের তৎপরতা ও কর্মসূচী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপন রাখতে হবে।'

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ খতীবের নামে এমন একটি বার্তা প্রেরণ করেন, যা হেম্‌সের মুসলমানদের জন্য উদ্দীপক। কিন্তু তাতে তিনি উল্লেখ করেননি, সেসব কিরূপ তৎপরতা, যেগুলো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপন রাখতে হবে। ব্যাপার হলো, হেম্‌সের মুসলমানদেরকে সুলতান আইউবীর নির্দেশ মোতাবেক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো, যখনই প্রয়োজন হবে, তারা খৃষ্টান বাহিনীর উপর পেছন থেকে গেরিলা অপারেশন চালাবে। তবে উপরে উপরে খৃষ্টানদের অনুগত থাকবে। এ লক্ষ্যে হেম্‌সে তিন-চারজন অভিজ্ঞ কমান্ডো প্রেরণ করে রাখা হয়েছে, যারা সেখানে পরিকল্পনা মোতাবেক প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। খতীব তাদের কমান্ডার।

পরদিন সকালে তাবরিজ হেম্‌সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

যুগটা কাফেলাবদ্ধ হয়ে সফর করার। আবার কেউ একাকীও সফর করে। একাকী সফরকারীরা পথে দু'চারজন লোক দেখলে গন্তব্য এক হলে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এভাবে এক একটি কাফেলার রূপ ধারণ করে এবং ধীরে ধীরে কাফেলার বহর বাড়তে থাকে।

তাবরিজ এসেছিলো একাকী। ফেরার সময় পথে ক্ষুদ্র একটি কাফেলা পেয়ে যায়, যার গন্তব্যও হেম্‌স নগরী। কাফেলায় ইহুদী ব্যবসায়ীও আছে। দু'টি খৃস্টান পরিবার উটের উপর সওয়ার। কিছু লোক পায়ে হেঁটে চলছে।

তাবরিজ এই কাফেলায় যুক্ত হয়ে যায়। কাফেলা এগিয়ে চলছে। দীর্ঘ পথ। পথে দু'রাত অবস্থান করতে হয়। তৃতীয়দিন সফরের শেষ দিন। মধ্যরাতের পর কাফেলার হেম্‌স পৌঁছে যাওয়ার কথা। সম্মুখে একটি নদী। নদীটি তেমন বড় নয়। গভীরতা বড়জোর এক কোমর। মানুষ তার মধ্যদিয়ে অনায়াসেই চলাচল করে থাকে।

সফরের শেষ দিন। সূর্য মাথার উপর উঠে এসেছে। কাফেলা দেখতে পায়, দিগন্ত আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। কাফেলা চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। তারা চেষ্টা করছে, বর্ষণ শুরু হওয়ার আগে আগেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। না পারলেও কোন পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে লুকানোর স্থান খুঁজবে। আর যদি সম্ভব হয়, তাহলে ফুলে উঠার আগেই নদী পার হয়ে যাবে।

ভাবতে না ভাবতে গোটা আকাশ ঘোর কালো মেঘে ছেয়ে যায়। সঙ্গে দমকা বাতাস। এলাকাটা পাহাড়ী। তারা যখন নদীর কূলে গিয়ে পৌঁছে, ততক্ষণে মেঘ দুনিয়াটাকে ঘোর তমশাচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং এমন মুষলধারায় বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে যে, চোখ খুলে হাঁটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কাফেলার এক বৃদ্ধ খৃস্টান বললো, নদী ফুসছে। তবে এখনো অতিক্রম করা সম্ভব। তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাও।

বৃদ্ধের সঙ্গে উটের উপর বসা একটি সুন্দরী যুবতী। খৃস্টান মেয়ে। কাফেলা নদীর কিনারায় পৌঁছে গেছে। নদীর পানি ঘোলা হয়ে গেছে। গতিতে উচ্ছ্বাসের জোশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। গভীরতা এখনো বাড়েনি। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। সময়টা সকাল হলেও মেঘ প্রকৃতিতে সন্ধ্যার পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছে। আকাশে সূর্য দেখা যাচ্ছে না। যেন দিবসের কর্তব্য পালন করে যথা সময়ে অস্তমিত হয়ে গেছে। একজন তার ঘোড়াটা নদীতে নামিয়ে দেয়। কয়েক পা এগুতেই চীৎকার করে বলে ওঠে– 'এসে

পড়ো। পদাতিকরাও আসো। পানি গভীর নয়।'

কেউ দেখলো না উজানের দিকে থেকে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে তীব্র ও ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস ধেয়ে আসছে। পাহাড়ী অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস তীব্র হয়ে থাকে। উপর থেকে এমন মুষলধারায় বৃষ্টি নামছে, যেনো আকাশটা চালনি হয়ে গেছে, পানি আটকে রাখতে পারছে না। কাফেলার উট-ঘোড়াগুলো বোধ হয় এই শংকাই অনুভব করছিলো। এমন একটি নদী অতিক্রম করা যে প্রাণীগুলোর পক্ষে কোন ব্যাপার ছিলো না, তারা এখন নদীতে বেয়াড়ার ন্যায় আচরণ করছে। সম্মুখে অগ্রসর হতে যেনো তাদের মন সায় দেয় না। অথচ পানি এখনো গভীর নয়।

হঠাৎ- নিতান্তই হঠাৎ নদীটি পানিতে ভরে যায়। পর্বতসম উঁচু বিশাল বিশাল ঢেউ এসে আঘাত হানতে শুরু করে। পানি গভীরতর হয়ে যায়। নদীর পাড় উপচে পানি উপরে উঠে আসে- আরো উপরে। কাফেলার পদাতিক সদস্যরা সাঁতার কাটতে শুরু করে। উটগুলো চীৎকার জুড়ে দেয়। কাফেলা নদীতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। নদীর অপর পার দূরে নয়। কিন্তু তীব্র স্রোত কাউকে আড়াআড়ি এগুতে দিচ্ছে না। কাফেলার সকল সদস্য আপন আপন জীবন রক্ষার চেষ্টা করছে।

খৃস্টান মেয়েটির চীৎকার শোনা গেলো। তাবরিজ নিকটেই কোথাও আছে। মেয়েটির চীৎকার তার কানে আসে। তাবরিজ দেখতে পায়, মেয়েটি যে উটের পিঠে সওয়ার ছিলো, সেটি স্রোতের মোকাবেলা করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তার পা উপড়ে গেছে এবং তীব্র স্রোত তাকে ফেলে দিয়েছে। তার পিঠের উপর বসা মেয়েটি নদীতে ছিটকে পড়ে যায়। পানির স্রোত-উচ্ছ্বাসের অবস্থা হলো, কখনো ঢেউ উপরে উঠে ঠায় দাঁড়িয়ে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার কখনো ঘূর্ণিপাকের রূপ ধারণ করছে। হৈ-হুল্লোড়, আর্তচীৎকার এতো তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, কেউ কারো শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। তাবরিজ যদি নিকটে না থাকতো, তাহলে মেয়েটির চীৎকারও কেউ শুনতো না। তাবরিজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। ঘোড়াটা স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না বটে, তবে স্রোত-ঢেউয়ের মোকাবেলা করে চলেছে। তাবরিজ মেয়েটিকে পানিতে ছিটকে পড়তে দেখে নিজের ঘোড়াটা স্রোতের অনুকূলে ছেড়ে দেয়। কিন্তু ঘোড়া তেমন দ্রুত সাঁতার কাটতে পারছে না।

তাবরিজ ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে দ্রুতগতিতে সাঁতার কেটে

মেয়েটির পেছনে চলে যায়। একটি ঢেউ মেয়েটিকে উপরে তুলে ফেললে তাবরিজ তাকে দেখে ফেলে। তাবরিজের তরুণ বাহুতে শক্তি আছে। সে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে ধরে ফেলে। মেয়েটি এখনো ডুবে যায়নি বটে; কিন্তু সে সাঁতরাতে পারছে না। তাকে সামলে রাখা তাবরিজের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। উত্তাল নদীতে নিমজ্জমান একটি খৃষ্টান মেয়েকে বাঁচানোর জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করছে তাবরিজ। এরই মধ্যে স্রোত তাদেরকে অনেক দূর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তাবরিজ মেয়েটিকে নিজের পিঠের উপর তুলে নিয়ে কূলের দিকে সাঁতরাতে শুরু করে। কিন্তু স্রোতের তোড়ে মেয়েটি তাবরিজের পিঠ থেকে ছিটকে যায়। মেয়েটির এখন চৈতন্য নেই। যদি মুসলিম যুবক তাবরিজের দেহে শক্তি আর হৃদয়ে মানবতাবোধ না থাকতো, তাহলে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে সে নিজের জীবন রক্ষারই চেষ্টা করতো।

কাফেলা যে স্থান থেকে নদীতে অবতরণ করেছিলো, তার থেকে অন্তত দু'মাইল দূরে তাবরিজ মেয়েটিকে নিয়ে কূলে ভিড়ে। কূলে বিস্তৃত প্রান্তর। তাবরিজ মেয়েটিকে উপরে তুলে মাটিতে শুইয়ে দেয়। মেয়েটি জীবিত। তবে অচেতন। অচেতন মানুষের চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে কী করতে হয়, তাবরিজ জানে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ মেয়েটি মুদিত চক্ষেই নড়ে ওঠে এবং আপনা-আপনি উপুড় হয়ে যায়। পেটে চাপ পড়লে মুখ দিয়ে নদীর ঘোলা পানি বের হতে শুরু করে। তাবরিজ মেয়েটির কটিতে হাত রেখে চাপ দেয়। এবার আরো পানি বেরিয়ে আসে। উদ্দীপ্ত তাবরিজ এবার আরো জোরে চাপ দেয়। মেয়েটির পেট পানিশূন্য হয়ে যায়।

আকাশ মেঘমুক্ত হতে শুরু করেছে। বৃষ্টির জোর কমে গেছে। মেঘের ফাঁক গলে কিছু আলোও পৃথিবীতে এসে পড়ছে। তাবরিজ মেয়েটিকে সোজা করে শোয়ায়। মেয়েটি পলকের জন্য সামান্য চোখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেলে। তাবরিজের শরীরটা অবশ হয়ে গেছে। নিজের ঘোড়াটা নদীতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। এখন আর তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। ঘোড়ার পরিণতি কী ঘটেছে, তাবরিজ জানে না। হয়তো মরে গেছে, নয়তো পানিতে জীবিত ভাসছে।

তাবরিজের ক্লান্তি কমে এসেছে। শরীরটা এখন মোটামুটি চাঙ্গা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা অস্ত গেলো বলে। তার মনে পড়ে যায় রাত আসছে। এখন একটা আশ্রয় খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু আশা

আছে, অঞ্চলটা যেহেতু পাহাড়ী, তাই কোথাও না কোথাও একটা গুহা পেয়ে যাবে। দীর্ঘ পথের পথিকরা মাটির টিলা এবং বালুকাময় প্রান্তরে গুহা তৈরি করে রাখে, যা অন্য পথিকদেরও কাজে আসে।

❖ ❖ ❖

তাবরিজ মেয়েটিকে পিঠে তুলে নিয়ে দু'টি টিলার মধ্যদিয়ে হাঁটতে শুরু করে। আশ্রয় পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকলেও আশা আছে তার। যুবক মনে মনে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে করতে এগিয়ে চলে। বেশকিছু সময় হেঁটে ডান-বাম ঘুরে একটি প্রশস্ত স্থানে গিয়ে পৌঁছে। তাবরিজ দেখতে পায়, একটি টিলার কোল ঘেঁষে তিন-চারটি উট দাঁড়িয়ে আছে। উটগুলোর পিঠে যিন নেই। কাজেই এগুলো কোন মুসাফিরের বাহন নয়।

তাবরিজ উটগুলোর নিকটে পৌঁছে যায়। এবার সে মানুষের কথা বলার শব্দ শুনতে পায়। শব্দটা যেদিক থেকে ভেসে আসে, তাবরিজ সেদিকে তাকায়। টিলার অভ্যন্তরে একটি উঁচু ও সুপরিসর গুহা দেখতে পায়। ভেতরে তের-চৌদ্দ বছর বয়সের দু'টি বালক দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় ওরা বৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গুহায় ঢুকে আশ্রয় নিয়েছে।

'তোমরা নদী থেকে বেরিয়ে এসেছো বুঝি?'– এক ছেলে বললো– 'এখানে এসে পড়ো, বেশ ভালো জায়গা।'

জায়গাটা সত্যিই চমৎকার। প্রশস্ত কক্ষের ন্যায়। ভেতরটা একেবারে শুকনো-ঝরঝরে। কোন মুসাফির দল কিংবা ধারে-কাছের কোন রাখাল নিপুণভাবে কেটে কেটে কক্ষটি তৈরি করেছে। ছেলে দুটো ভেতরে আগুনও জ্বালিয়ে রেখেছে। তাবরিজ মেয়েটিকে পিঠ থেকে নামিয়ে গুহার মেঝেতে শুইয়ে দেয়। মেয়েটির এখনো জ্ঞান ফেরেনি। গুহার একদিকে কতগুলো শুষ্ক ঘাস ও গাছের শুক্‌নো ডালের স্তূপ পড়ে আছে।

'তোমরা এখানে কী করছো?' তাবরিজ ছেলে দুটোকে জিজ্ঞেস করে।

'আমাদের বাড়ি নদীর ওপারে'– এক ছেলে উত্তর দেয়– 'মাঝে-মধ্যে আমরা উট নিয়ে এখানে আসি। ঘাস ওখানেও প্রচুর আছে। কিন্তু এখানে খেলতে আসি আর চরাবার জন্য উটগুলোও সাথে নিয়ে আসি। এক জায়গায় নদীটা বেশ চওড়া। ওখানে পানি কম– এক হাঁটুর বেশি থাকে না। আমরা ওখান দিয়ে আসা-যাওয়া করি। আজো আসলাম আর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। আমরা এখানে আগুন জ্বালিয়ে খেলছি।'

'এখন বাড়ি যাবে কীভাবে?'– তাবরিজ জিজ্ঞেস করে– 'নদী তো

পানিতে ভরে গেছে। নদী এখন উত্তাল।'

'এই নদীর জোর বেশিক্ষণ থাকে না'– এক ছেলে নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললো– 'আমরা যেখান দিয়ে আসা-যাওয়া করি, সেখানে নদী উত্তাল হয় না। পানি ছড়িয়ে যায় বলে বেশি স্রোত হয় না।'

বৃষ্টি থেমে গেছে। সূর্য অস্ত্র যাচ্ছে। বালক দু'টি উট নিয়ে চলে গেছে। তাবরিজ তাদের কোন সহায়তা কামনা করেনি। এও ভাবেনি, ওদেরকে বলে মেয়েটিকে নিয়ে ওদের গ্রামে চলে যাবে কিনা।

ছেলেদের চলে যাওয়ার পর তাবরিজ নিভু নিভু আগুনে শুকনো ডাল ছুঁড়ে দেয়। আগুন জ্বলে ওঠে। তাবরিজ গায়ের টাখনু পর্যন্ত লম্বা ভিজা কাপড়টা খুলে আগুনের উপর ধরে শুকাতে শুরু করে। মনে মনে শোকর আদায় করছে তাবরিজ। এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তার জন্য আগুন জ্বালাতে আল্লাহ এই ছেলেগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

ইত্যবসরে মেয়েটি চোখ মেলে তাকায়। তার চেহারায় ভীতির ছাপ। মেয়েটি এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে। তাবরিজকে দেখামাত্র মুখটা আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তাবরিজের ঊর্ধ্বাংশ নগ্ন। নদীর ঘোলা পানি তার মাথার চুল ও চোহরাকে ভয়ঙ্কর বানিয়ে রেখেছে।

'ভয় পেও না'– তাবরিজ মেয়েটিকে বললো– 'আমাকে চেনো না? আমি তোমার সফর সঙ্গী ছিলাম।'

'কিন্তু তুমি মুসলমান'– মেয়েটি উঠে বসে। তার সর্বাঙ্গে ভীতির ছাপ। বললো– 'তোমার উপর ভরসা রাখা আমার উচিত হবে না। আমাকে চলে যেতে দাও।'

'যাও'– তাবরিজ বললো– 'পারলে চলে যাও।'

মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। চলে যাওয়ার জন্য সম্মুখে পা বাড়ায়। গুহার বাইরে এক পা রেখে বাইরে রাতের ঘোর অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। ভেতরে আলো জ্বলছে। মেয়েটি মোড় ঘুরিয়ে তাবরিজের দিকে তাকায়। শুক্‌নো বৃক্ষ ডালের আগুনে তাবরিজকে একজন রহস্যময় মানুষ বলে মনে হলো। তাবরিজও মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ভেতর দিকে এক-দু'পা এগিয়ে এসে লুটিয়ে পড়ার মতো করে বসে পড়ে এবং অসহায়ের ন্যায় তাবরিজের মুখপানে তাকিয়ে থাকে।

'তোমার চেয়ে সেই ঘোড়াটি আমার বেশি প্রিয় ছিলো, যাকে নদীতে

ছেড়ে দিয়ে তোমাকে ডুবে মরা থেকে রক্ষা করেছি।' তাবরিজ বললো।

'আমার দাম বিশ-পঞ্চাশটি ঘোড়ার চেয়েও বেশি'- মেয়েটি অস্ফুট ও কম্পিত কণ্ঠে বললো- 'আমার বিশ্বাস, তুমি আমার ন্যায় রূপসী মেয়ে কখনো দেখোনি। তুমি আমার শ্লীলতা বিনষ্ট করে আমাকে বিক্রি করে ফেলবে। তোমার হাতে আমি অসহায়। তোমাকে ঠেকাবার কেউ নেই!'

'আছে'- তাবরিজ উত্তর দেয়- 'তোমার থেকে আমাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ আছেন। এ যাবত তিনিই ঠেকিয়ে রেখেছেন। অন্যথায় তোমার ন্যায় একটি সুন্দরী যুবতীকে এভাবে হাতে পেয়ে কোন পুরুষ ঠিক থাকতে পারে না। আমি পারলাম কীভাবে! আমি তোমাকে সেই উত্তাল নদীর গ্রাস থেকে রক্ষা করেছি, যাতে শক্তিশালী প্রাণী উট পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। তারপর এখানে মাথার উপর ছাদ আর জ্বলন্ত আগুন পেয়ে গেলাম। এসব অলৌকিক ব্যাপার নয় কি? আমি আল্লাহর সমীপে দু'আ করেছি। আল্লাহ কেবল সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করেন, যার নিয়ত স্বচ্ছ। দু'টি বালক এই আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ওরা ফেরেশতা ছিলো। আমি আমার ধর্মের আলোকে কথা বলছি। তুমি এ কারণে ভয় পাচ্ছো যে, তোমার ধর্ম মিথ্যা। আর এই জন্য যে, তোমার দৃষ্টি তোমার দেহের উপর নিবদ্ধ, যা অতিশয় আকর্ষণীয়। আর তোমার চোখে আছে শুধুই তোমার মুখাবয়ব, যেটি অত্যন্ত সুন্দর। বিপরীতে আমার দৃষ্টি হচ্ছে আমার আত্মার প্রতি, যা তোমার দেহ অপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয় এবং তোমার চেহারার চেয়ে অধিক সুন্দর। আমি জানি, কিছুক্ষণ পর তুমি আমাকে তোমার দেহটা সপে দিয়ে বলবে, বিনিময়ে আমাকে গন্তব্যে পৌছিয়ে দাও। কান খুলে শুনে নাও সুন্দরী! আমি আমার আত্মাকে নাপাক হতে দেবো না। তুমি বলেছো, আমি তোমার ন্যায় রূপসী মেয়ে আর দেখিনি। এ কথা বলে তুমি আমার যৌনতাকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করো না।'

তাবরিজের বক্তব্যের এতোই ক্রিয়া যে, মেয়েটির মুখ বন্ধ হয়ে যায়। সে অবাক্ ও বিহ্বল দৃষ্টিতে তাবরিজের প্রতি তাকিয়ে থাকে। তাবরিজের বক্তব্যে মেয়েটি পরিষ্কার নিষ্ঠা ও প্রত্যয় আঁচ করছে।

'আগুনের কাছে চলে আসো'- তাবরিজ আগুনের উপর ধরে জামাটা শুকাতে শুকাতে বললো। মেয়েটি উঠে এমন ধারায় আগুনের কাছে এসে বসে, যেনো তার মধ্যে আদেশ অমান্য করার কোনই সাহস নেই। তাবরিজ জামার এক কোণটা মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো- 'ধরো,

আগুনের উপর ধরে রাখো।' নিজে অপর প্রান্তটা ধরে জামাটা আগুনের উপর নাড়াতে লাগলো। মেয়েটির জামাও ভেজা। তাবরিজ বললো– 'শুকানোর পর এটি পরিধান করে তোমারটা এভাবে শুকিয়ে নিও।'

'না'– মেয়েটি সন্ত্রস্ত হয়ে বললো– 'আমি গায়ের পোশাক খুলবো না।'

'গায়ের চামড়াটাও খুলে আগুনে রাখবে'– তাবরিজ বললো– 'আমার কর্তব্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করো না মেয়ে! আমি তোমাকে প্রমাণ দেবো, মুসলমানরা জংলী, নাকি খৃস্টানরা। আমি জানি, তুমি কতটুকু পবিত্র। এখন তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছো। আমি তোমাকে কোন শক্ত কথা বলতে পারি না। তুমি নারী। অসহায় নারীর প্রতি হাত না বাড়ানো আমার ধর্মের নির্দেশ।'

'আচ্ছা, আমাকে তুমি ঢেউয়ের মধ্য থেকে কীভাবে তুলে এনেছো?'– মেয়েটি জিজ্ঞেস করে– 'অন্যরা কি নদী পার হতে পেরেছে?'

তাবরিজ মেয়েটিকে ঘটনার বিস্তারিত শুনিয়ে বললো, অন্যদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

এতোক্ষণে মেয়েটির ভয় সম্পূর্ণ দূর না হলেও কিছুটা কমেছে। শারীরিক অবস্থাও ভালো হতে চলেছে। তাবরিজের প্রশ্নের জবাবে সে বললো– 'আমি আমার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে হেম্‌স যাচ্ছিলাম। যে এলাকায় আমাদের বাড়ি, সেটি মুসলিম শাসিত। মুসলমানদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা হেম্‌স চলে যাচ্ছি। ওখানে আমাদের প্রভাবশালী আত্মীয় আছে।'

মেয়েটি তার পিতার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে।

কাফেলার সব ক'জন সদস্য নদীর গ্রাস থেকে বেরিয়ে গেছে। একেকজন একেক স্থানে গিয়ে কূলে ভিড়েছে। তারা পরস্পর ডাকাডাকি করে একত্রিত হতে শুরু করেছে।

এখন তারা সবাই একত্র। নেই শুধু তাবরিজ আর খৃস্টান মেয়েটি। মেয়েটি যে উটের পিঠে আরোহী ছিলো, সেটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাবরিজের ঘোড়া কূলে এসে ঠেকেছে। ঘোড়াটি দূরে এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। কাফেলার এক সদস্য ঘোড়াটা ধরে নিয়ে আসে। সকলে নিশ্চিত হয়ে যায়, হেম্‌সের সুদর্শন ও তাগড়া যুবক ঘোড়া থেকে পড়ে ডুবে গেছে।

তাবরিজ উড়ে এসে জুড়ে বসা মানুষ। তদুপরি মুসলমান। তার জন্য কারো দুঃখ নেই। দুঃখ মেয়েটির জন্য। মেয়েটির বৃদ্ধ পিতা, দু'জন খৃস্টান

ও এক ইহুদী মেয়েটির জন্য মুষড়ে পড়েছে। তারা সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে নদীর কূলে কূলে অনুসন্ধান করার কথা ভাবছে। অন্যরা অভিমত ব্যক্ত করে, প্রয়োজন নেই। মেয়েটি ডুবেই গেছে। তবু চারজন ঘোড়ার পিঠে আরোহন করে নদীর কূল ঘেঁষে চলতে শুরু করে। সে সময়ে তাবরিজ মেয়েটিকে নদী থেকে তুলে উপরে এনে পেটের পানি বের করছিলো। ওখানে নদীর বাঁক ছিলো। ছিলো টিলাও। সে কারণে মেয়েটির অনুসন্ধানকারীরা তাবরিজ ও মেয়েটিকে দেখতে পায়নি। বাঁক ঘুরে যখন তারা ওখানে পৌঁছে, ততক্ষণে তাবরিজ মেয়েটিকে পিঠে করে গুহায় পৌঁছে গেছে। অনুসন্ধানকারীরা সম্মুখে চলে যায়। তারপর সূর্য অস্ত্র গেলে তারা মেয়েটির আশা ত্যাগ করে ব্যথিত মনে হেম্‌সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

'এমন মূল্যবান একটা মেয়েকে হারিয়ে ফেলার দায়ে যদি তারা আমাদেরকে মৃত্যুদণ্ড না দেয়, তাহলে মনে করবো, তারা অনেক দয়ালু হয়ে গেছে'– বৃদ্ধ বললো– 'মেয়েটি কীভাবে ডুবলো জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দেবো?'

'বলবো, আমরা প্রবল তরঙ্গের মধ্যে নিপতিত হলে মেয়েটি খামখেয়ালী করেছে'– ইহুদী বললো– 'আমাদের কথা অমান্য করতে গিয়ে তার এই পরিণতি ঘটেছে। জিদ্‌ ধরে বললো, আমি আলাদা উটে চড়ে একাকী নদী পার হবো। হঠাৎ একটি ঢেউ এসে তাকে আমাদের থেকে দূরে নিয়ে গেছে। তারই হঠকারিতার কারণে আমরা তাকে রক্ষা করতে পারিনি।'

'যা খুশি বলো'– এক খৃস্টান বললো– 'আমাদের এ বিচ্যুতি যদি ক্ষমাও করে দেয়া হয়, তবুও কি অনুতাপের কথা নয় যে, এমন একটা দক্ষ ও কর্মঠ মেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে?' অন্য মেয়ে এনে তার স্থান পূরণ করতে এক মাসেরও বেশী সময় লেগে যাবে।'

'আমি কতবার পরামর্শ দিয়েছিলো, এ কাজে আমাদের দু'টি মেয়ের প্রয়োজন'– বৃদ্ধ বললো– 'হেম্‌সের মুসলমানরা উত্তেজনায় ফেটে যাচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই, তারা যে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, তা সাময়িক কিংবা আবেগতাড়িত নয়। আমি গভীরভাবে তাদের প্রশিক্ষণ লক্ষ্য করেছি। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, এটা গেরিলা অপারেশন ও কমান্ডো হামলার নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ। আমি তাদের চারজন প্রশিক্ষক দেখেছি। তাদের কায়রো কিংবা দামেশ্‌ক থেকে পাঠানো হয়েছে। লোকগুলোকে কমান্ডো মনে হচ্ছে।'

'তারা যদি আমাদের শাসনাধীন হতো, তাহলে আমরা দেখে নিতাম কীভাবে তারা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।' এক খৃস্টান বললো।

'তুমি কি মনে করো এখানে তারা প্রশিক্ষণ পরিপূর্ণ করতে পারবে?' ইহুদী বললো– 'আমরা তাদের মাঝে আপসে সংঘাত বাঁধিয়ে দেবো।'

'এ লক্ষ্যেই তো আমি মেয়েটিকে দামেশ্ক থেকে এনেছিলাম'– বৃদ্ধ বললো– 'হেম্সে অরাজকতা সৃষ্টি করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আমি এই মেয়েটির কথা বললাম। তারা বললো, তুমি মেয়েটির পিতা হয়ে যাও এবং তাকে নিয়ে হেম্স চলে যাও। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, বসতি স্থানান্তর করছি।'

লোকগুলো রাতের অন্ধকারে পথ চলছে আর নিজেদের গোপন মিশন সম্পর্কে কথা বলছে। বৃদ্ধ খৃস্টানদের অভিজ্ঞ গুপ্তচর এবং ঈমান ও চেতনা বিধ্বংসের ওস্তাদ। সে তার সঙ্গীদের বললো– 'মুসলমান সর্বত্র সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। দামেশ্কে নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী মেয়েদেরকে যথারীতি সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। আমি সবখানে মুসলমানদের মাঝে এই জোশ দেখতে পেয়েছি। তবে হেম্স ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো আমাদের জন্য এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, এসব অঞ্চলে মুসলিম গেরিলাদের ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ না পাওয়া উচিত। আমি জানতে পেরেছি, এটি সালাহুদ্দীন আইউবীর একটি গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা সফল না হওয়া দরকার।'

'হেম্স সীমান্তবর্তী শহর'– ইহুদী বললো– 'যদি মুসলমানরা এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারে, তাহলে আমাদের জন্য বিপজ্জনক হবে। এখানকার মুসলমাদেরকে বরং সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে তাদেরকে দলে ভিড়িয়ে নেয়া প্রয়োজন।'

'এটা সম্ভব নয়'– বৃদ্ধ বললো– 'আমাকে অবহিত করা হয়েছে, আমাদের লোকেরা নাকি অনেক গুজব ছড়িয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা তাতে কান দিচ্ছে না। আমাকে এও বলা হয়েছে, তাদের খতীব নাকি বেশ প্রভাবশালী মানুষ এবং মুসলমানদের সামরিক প্রশিক্ষণ তারই নির্দেশনা ও পরিকল্পনা মোতাবেক চলছে। মেয়েটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর এখন আমার হেম্স না যাওয়াই উচিত ছিলো। কিন্তু তারপরও এই জন্য যাবো যে, দেখতে হবে খতীব লোকটি কে এবং সে আলেম নাকি কোন সেনা কমান্ডার। আমাদেরকে হেম্সের খৃস্টান ও ইহুদী পরিবারগুলো থেকে দু'-

একটি মেয়ে সংগ্রহ করতে হবে, যারা এই মিশনে আমাদের সাহায্য করবে। মেয়েদের কাজ কী, তা তোমাদের জানা আছে।'

'আমি তোমাদেরকে দামেশ্‌কেও বলেছিলাম, এখানকার মুসলমানরা পাকা ঈমানদার'– এক খৃস্টান বললো– 'এ পর্যন্ত আমরা তাদের একজনকেও ক্রয় করতে পারিনি।'

আমি সারা জীবন সেই নদীটির উপর অভিশম্পাত করবো, যে আমাদের দিরাকে আমাদের থেকে কেড়ে নিয়েছে।

'আমার নাম দিরা'– তাবরিজের প্রশ্নের জবাবে মেয়েটি বললো– 'আমরা গরীব মানুষ। মুসলমানরা দামেশ্‌কে আমাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব করে দিয়েছে। খোদা যেনো গরীবের মেয়েকে রূপ না দেন। বড় বড় আমীরগণ আমাকে ক্রয় করার চেষ্টা করেছে। একজন আমাকে অপহরণ করতে চেয়েছিলো। আমার পিতা আমাকে কাজীর নিকট নিয়ে যান। তিনি আমার ফরিয়াদ শুনেন এবং আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেখানকার শাসন মুসলমানদের হাতে। আমাদের ভয় দূর হয়নি। আমার পিতা দামেশ্‌ক থেকে বের হয়ে যাওয়াই শ্রেয় ভাবলেন। হেম্‌সে আমাদের আত্মীয় আছে। এখন আমরা তাদের নিকট যাচ্ছিলাম। জানি না আব্বা বেঁচে আছেন কিনা। আচ্ছা, তুমি কি একটি অসহায় নিরাশ্রয় নারীর উপর দয়া করবে না?'

রাত অতিক্রান্ত হতে থাকে। বৃদ্ধ খৃস্টান– দিরা যাকে পিতা বলে দাবি করছে– সঙ্গীদেরসহ বহুদূর এগিয়ে গেছে।

'আমার জামা শুকিয়ে গেছে'– তাবরিজ জামাটা দিরার প্রতি ছুঁড়ে দিয়ে বললো– 'আমি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি। ওঠো, গায়ের ভেজা জামাটা খুলে এটা পরে নাও। লম্বা আছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে যাবে। পরে নিজেরটা শুকিয়ে বদলে ফেলো।'

'তোমার হাতে আমি অসহায়'– দিরা ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– 'শিকার মারার আগে তার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়, তুমি আমার সঙ্গে সেই পশুসুলভ আচরণ করো না।'

'বলছি, ভেজা পোশাকটা খুলে ফেলো।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেই তাবরিজ বাইরে বেরিয়ে যায়।

তাবরিজ আড়ালে চলে গেছে। সেখান থেকে দিরাকে দেখা যায় না।

দিরা সামান্য এগিয়ে গিয়ে তাকায়। তাবরিজ গুহার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গুহার অভ্যন্তরে প্রজ্বলমান আগুন এতো বেশী জ্বলছে যে, আলোটা তাবরিজের পিঠে গিয়ে পড়েছে।

দিরা বুকের ভেতর হাত ঢুকায়। ভেতরে কোমরের সঙ্গে কাপড় বাঁধা আছে। সেই বস্ত্রের মধ্যে খঞ্জর লুকানো। খঞ্জরটা বের করে দিরা পা টিপে টিপে সম্মুখে এগিয়ে যায়। তাবরিজ সম্পূর্ণ অসতর্ক দাঁড়িয়ে আছে। দিরা তার থেকে মাত্র এক পা দূরে। মেয়েটি খঞ্জরটা ডানদিকে নিয়ে তাবরিজের ডান পাজরে সেঁধিয়ে দেয়ার লক্ষে আঘাত হানে। তাবরিজ বিদ্যুদ্গতিতে মোড় ঘুরিয়ে দিদার ডান হাতটা ধরে ফেলে এতো জোরে মোচড় দেয় যে, দিরা ঘুরে যায় এবং তার হাত থেকে খঞ্জরটা পড়ে যায়।

তাবরিজ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, তার কয়েক পা সামনেই আরেকটি টিলা। আগুন তাবরিজের পেছনে। তাবরিজ সম্মুখের টিলার গায়ে নিজের ছায়া দেখতে পায়। মেয়েটি আঘাত হানতে উদ্যত হলে তাকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ছায়ার ডান বাহু ডানে বিস্তৃত হয়ে যাওয়া মাত্র তাবরিজ খঞ্জরের ছায়াটা স্পষ্ট দেখে ফেলে। দিরা তাবরিজের পাজরে আঘাত হেনে তার পেটটা ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলো। ছায়ার নড়াচড়া দেখে তাবরিজ পেছন দিকে ঘুরে গিয়ে মেয়েটির হাতের কব্জি ধরে ফেলে। মেয়েটির হাত থেকে খঞ্জরটি তুলে নেয়। তাবরিজ খঞ্জরের আগাটা মেয়েটির দিকে তাক করে ধরলে মেয়েটি হাঁটু গেড়ে তার সম্মুখে বসে পড়ে এবং হাতজোড় করে অনুনয় করতে শুরু করে– 'যা বলবে শুনবো; আমাকে খুন করো না।'

'অন্য কোন কথা নেই। বলছি গায়ের ভেজা পোশাকটা খুলে আমার জামাটা পরে নাও'– তাবরিজ আদেশের ভঙ্গিতে বললো– 'দেখেছো তো, আমাকে খুন করার সাধ্য তোমার নেই! আমার চোখ তো সামনেই আছে, পেছনে নয়। তাহলে তোমার আক্রমণটা দেখলাম কীভাবে? আত্মার চোখে দেখেছি। ইচ্ছা করলে কি আমি আমার সামনে তোমাকে পোশাক খোলাতে পারি না? কিন্তু আমি তোমাকে উলঙ্গ দেখতে চাই না। নাও, কাপড়টা বদলে নাও।'

তাবরিজ পুনরায় বেরিয়ে গিয়ে পূর্বের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। দিরা গুহার এক কোণে চলে যায়। তাড়াতাড়ি করে গায়ের ফ্রকটা খুলে। তারপর সেমিজটাও খুলে ফেলে তাবরিজের জামাটা পরিধান করে। দিরার সর্বাঙ্গ ঢেকে যায়। এবার তাবরিজকে ডাক দিয়ে বললো– 'কই এসে পড়ো।'

তাবরিজ ভেতরে প্রবেশ করে। দিরার ফ্রকটা আগুনের উপর ধরে শুকাতে শুরু করে। দিরা লুকিয়ে লুকিয়ে তাবরিজকে দেখতে থাকে। তাবরিজ কোন কথা বলছে না। তার নীরবতা দিরাকে অস্থির করে তুলছে। তার বিশ্বাস হচ্ছে না, এই তাগড়া সুদর্শন যুবকটা তাকে ক্ষমা করবে। এখন তো খঞ্জর তার হাতে।

তাবরিজ চুপচাপ দিরার পোশাক শুকাতে থাকে। শুকিয়ে গেলে ফ্রকটা মেয়েটির হাতে দিয়ে বললো, পরে নাও। বলেই তাবরিজ গুহা থেকে বেরিয়ে যায়। মেয়েটি আবারও সভয়ে পোশাক পরিবর্তন করে তাবরিজকে ভেতরে ডেকে আনে।

'তোমার কাছেই রাখো'– তাবরিজ খঞ্জরটা দিরার দিকে ছুঁড়ে মেরে বললো– 'ঘুমিয়ে পড়ো। সকালে রওনা হবো।'

'তুমি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছো'– দিরা বললো– 'নাকি তুমি অনুভূতিহীন ও মৃত মানুষ?'

'আমি অনুভূতিহীন মৃত কিনা প্রমাণ করবো তোমার বাহিনীর সামনে'– তাবরিজ উত্তর দেয়– 'আমার অন্তরে তোমার বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নেই। আমি তোমাদের সেই সম্রাটদের শত্রু, যারা আমার মাতৃভূমি দখল করতে এসেছে এবং যারা আমাদের প্রথম কেবলা দখল করে আছে।'

'তোমাদের ভুল তথ্য দিয়ে উত্তেজিত করা হচ্ছে'– দিরা বললো– 'তুমি অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ। যাকে তুমি প্রথম কেবলা বলছো, ওটা ইহুদীদের উপাসনালয়। ওটা হাইকেলে সুলায়মানী। সালাহুদ্দীন আইউবী তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করতে চাচ্ছেন। তিনি তোমাদের ন্যায় সহজ-সরল যুবকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে বলে বেড়াচ্ছেন– 'ওটা প্রথম কেবলা, ওটা মসজিদ।'

'আমরা আমাদের খতীব ছাড়া আর কারো কথা শুনে না'– তাবরিজ বললো– 'তুমি শুয়ে পড়ো। আমি তোমার কোন কথা শুনবো না।'

'আমার ঘুম আসছে না'– দিরা বললো– 'তোমাকে আমার ভয় লাগছে। আচ্ছা, তোমাদের খতীব হেম্‌সেরই লোক, নাকি অন্য কোথাও থেকে এসেছেন?'

'তিনি হেম্‌সেরই নাগরিক'– তাবরিজ উত্তর দেয় এবং জামাটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে।

দিরার গুপ্তচরবৃত্তি এবং চরিত্র ধ্বংসের প্রশিক্ষণ আছে। দামেশ্‌কে তাকে এ লক্ষ্যেই পাঠানো হয়েছিলো। আর এখনো একই উদ্দেশ্যে হেম্‌স যাচ্ছিলো। মেয়েটি হেম্‌সের খতীব এবং সেখানকার মুসলমানদের তথ্য

নেয়ার জন্য অনেক প্রশ্ন করছে। কিন্তু তাতে তাবরিজের কোন আগ্রহ নেই। এসব আলাপচারিতায় অনীহা প্রকাশ করে চলেছে সে। মেয়েটি চেষ্টা করছে, যাতে চোখে ঘুম না আসে। কিন্তু এক সময় তার দু'চোখের পাতা বুজে আসে। দিরা ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দিরা চোখ দুটো কচলাতে কচলাতে ধড়মড় করে উঠে বসে। বাইরে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দিরা অর্ধ মুদিত ফ্যাল ফ্যাল চোখে এদিক-ওদিক তাকায়। দেখে, তাবরিজ বিশেষ এক ভঙ্গিতে নিজ মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বসে। আবার মাথা মাটিতে ঠেকায়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে যায়।

তাবরিজ ফজর নামায আদায় করছে। তাবরিজের নামায পড়ার দৃশ্যটাই দেখে ফেলেছে খৃস্টান মেয়ে দিরা।

দিরা পরিধানের পোশাকটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেয়। রাতে না ঘুমানোর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিদ্রা তাকে জড়িয়ে ধরেছিলো। ঘুম ভাঙ্গার পর সর্বপ্রথম তাবরিজের কথা মনে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে গাটা ছমছম করে ওঠে। কিন্তু মেয়েটি বুঝতে পারে, যে অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো সেই অবস্থায়ই জেগেছে। সব ঠিক আছে তার।

মেয়েটি তাবরিজকে মহান আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত দেখতে পায়। পরিস্থিতিটা আগাগোড়া স্বপ্ন বলে মনে হলো তার কাছে। দিরা জানতো, মুসলমান জংলী জাতি। কিন্তু তাবরিজের মতো একজন সুঠাম দেহের অধিকারী যুবকের তার মতো এক রূপসী যুবতীর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই নেই! এ কেমন জংলীপনা! তাবরিজকে স্বপ্ন জগতের মানুষই মনে হচ্ছে তার।

দিরা পবিত্র মেয়ে নয়। শৈশব থেকেই তাকে চরিত্রহীনতা ও শয়তানি কর্মের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। রূপ এবং দেহের আকর্ষণকে জাদুর ন্যায় ক্রিয়াশীল বানানোর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। যৌবনে পদার্পন করা পর্যন্ত যৌনতা আর অসচ্চরিত্রতা স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু মানব স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যতোই চেষ্টা করা হোক না কেন মানুষের সৃষ্টিগত মৌলিকত্ব ধ্বংস করা যায় না। মানুষ অনৈতিকতা ও আদর্শহীনতার যতোই গভীরে নিমজ্জিত হোক, কোন দিন সুযোগ পেলে তার আসল রূপটা ভেসে ওঠে। মানুষ সুপথে ফিরে আসে। দিরা যেভাবে মৃত্যুর মুখে চলে গিয়েছিলো, সেখান থেকে উদ্ধার লাভের পর এখন তার

মন-মস্তিষ্কে নতুন ভাবনা জাগতে শুরু করেছে। মেয়েটি জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে নিরাপদে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু ভয় এখনো কাটেনি। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে তাবরিজ ভীতি। এই মুসলমান যুবকটির ব্যাপারে তার অন্য কোন ভয় নেই। একটিই ভয়, লোকটি যদি যাযাবর কিংবা বেদুইন হয়ে থাকে, তাহলে তাকে কারো নিকট বিক্রি করে দেবে। মেয়েটি বিক্রি হওয়ার পরের কষ্টদায়ক জীবনের ভয় করছে।

রাত কেটে গেছে। তাবরিজ মেয়েটির এই মনোহারী দেহটার প্রতি কামনার দৃষ্টিতে একবারের জন্যও তাকায়নি। মেয়েটি অবচেতনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তারপরও তাবরিজ তার থেকে দূরে থেকেছে। সকালে যখন পূর্ব আকাশে সূর্য উদিত হয়, ততোক্ষণে মেয়েটির সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। বিদূরিত হয়েছে তাবরিজের ভয়ও। রাত নাগাদ মেয়েটি তাবরিজকে বেরসিক, অনুভূতিহীন ও মৃতপ্রাণ কাপুরুষ মনে করছিলো। কিন্তু লোকটাকে তার গভীর দৃষ্টিতে দেখতে ইচ্ছে হলো। তাবরিজের ঠোঁট দু'টি নড়ছে। দিরার মনে হচ্ছে, লোকটা সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছে। তার তাবরিজের একটি উক্তি মনে পড়ে যায়– 'আল্লাহ কেবল তাদেরকে সাহায্য করেন, যাদের নিয়ত ও আত্মা পবিত্র।'

তৎক্ষণাৎ দিরার মনে পড়ে যায়, তার নিয়ত তো পবিত্র নয়। তাবরিজের জাতির জন্য সে আপাদমস্তক একটি প্রতারণা। মেয়েটি রাতে এই সিদ্ধান্ত ঠিক করে রেখেছিলো, নিজেকে তাবরিজের হাতে তুলে দিয়ে বলবে, তুমি যা খুশি করো, বিনিময়ে আমাকে হেম্‌স পৌঁছিয়ে দাও।'

আর আত্মা? দিরা জীবনে এই প্রথমবার অনুভব করলো, তার দেহ আত্মা থেকে বঞ্চিত। আর থেকেও যদি থাকে, তা অপরাধ-অশ্লীলতার আবর্জনায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু মরে যায়নি। দিরার উপর দিয়ে যে ঝড় অতিক্রান্ত হয়েছে, তাতে তার আত্মা জেগে ওঠেছে, যা এখন তাকে লজ্জিত করে চলছে। তাবরিজের দেহাবয়বটা এখন তার কাছে অন্য রকম মনে হচ্ছে। তাবরিজকে ফেরেশতা বলে মন হচ্ছে। ফেরেশতা না হলে খোদার সঙ্গে কথা বলতে পারে নাকি। দিরার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। অশ্রু যতোই ঝরছে, মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে নিজের অস্তিত্বটা তাবরিজের অস্তিত্বের মধ্যে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

তাবরিজ দু'আর জন্য হাত উত্তোলন করে। বোধ হয় সে ভুলে গেছে, গুহায় আরো একজন মানুষ আছে। তাবরিজ কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে দু'আ করছে–

'মহান আল্লাহ! তুমি আমাকে সব রকম পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকার হিম্মত দান করো। আমাকে তুমি এমন পবিত্রতা ও সচ্চরিত্র দান করো, যেনো তোমার এই সুন্দর আমানতটা কোন প্রকার খেয়ানত ব্যতীত গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিতে পারি। তোমার এই বান্দা দুর্বল, অসহায়। তুমি আমাকে শয়তানের মোকাবেলা করার সাহস দান করো।'

তাবরিজ আকাশের ফেরেশতা নয়– মাটির মানুষ, রক্ত-মাংসের মানুষ। লোকটি আল্লাহর নিকট মানবীয় দুর্বলতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। দু'আ শেষ করে মুখে হাত বুলিয়ে পেছনে ঘুরে তাকায়। দিরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তাবরিজ কিছুক্ষণ মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে থাকে। মেয়েটিও মূর্তির ন্যায় তার প্রতি তাকিয়ে আছে।

'বাইরে যাও'– তাবরিজ দিরাকে বললো– 'ওদিকে পরিষ্কার পানির ঝরনা আছে। হাত-মুখ ধুয়ে এসো।' তাবরিজ নিজের মাথায় জড়ানো মোটা কাপড়ের হাত দুয়েক লম্বা রোমালটা নামিয়ে দিরাকে দিতে দিতে বললো– 'ভালোভাবে হাত-মুখ ধুয়ে মাথার চুলগুলোও ঝেড়ে-মুছে নাও। জলোচ্ছ্বাসে নিপতিত হওয়ার আগে তুমি যে অবস্থায় ছিলে, আমি ঠিক সেইরূপ তোমাকে তোমার স্বজনদের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে চাই।'

দিরা তাবরিজের হাত থেকে রোমালটা নিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে যায়, যেনো একজন বোবা ও বধির শিশু কারো ইঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করেছে। তাবরিজের সঙ্গে যে খাদ্য-পানীয় ছিলো, তা ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা ছিলো। এখন তার কাছে খাওয়ার কিছুই নেই।

তাবরিজ দিরার অপেক্ষায় বসে আছে।

দিরা হাত-মুখ ধুয়ে আসে। দেখে তাবরিজ হঠাৎ চমকে ওঠে, যেনো নতুন কাউকে দেখছে। এতোক্ষণ দিরার মাথার চুলগুলো মাটিমাখা ও এলোমেলো ছিলো। আপন রূপটা তার চাপা ছিলো। ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হওয়ার পর এখন মেয়েটির আসল রূপ ফুটে উঠেছে। এখন তাবরিজ তাকে চিনতেই পারছে না। এমন যাদুকরী চুল মাথায় নিয়ে ফিরছে দিরা, যা তাবরিজ কল্পনাও করেনি। এমন রূপ অতীতে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি তাবরিজ। দিরার সুদর্শন মুখাবয়ব এবং মনোহরী আঁখিযুগল তাবরিজকে হতবাক করে দেয়। তাবরিজ সেই তাবরিজের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে, যে খানিক আগে আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান

ছিলো। সে অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে বললো– 'খাওয়ার কিছু নেই। আমাদের উপোস করেই সফর করতে হবে। চলো রওনা হই।' বলেই তাবরিজ দাঁড়াতে উদ্যত হয়।

দিরা তার কাঁধে হাত রেখে বললো– 'একটু বসো, আমি তোমাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, কিছু জানতে চাই।'

সারাটা রাত তাবরিজ মেয়েটির জন্য মহা এক আতঙ্ক হয়ে ছিলো। কিন্তু এখন তার মানসিক অবস্থা এমন, যেনো মেয়েটি তার উপর জয়ী হয়ে গেছে। তাবরিজ কিছু না বলে উঠতে উঠতে বসে পড়ে।

'আচ্ছা, তুমি যখন খোদার সঙ্গে কথা বলছিলে, তখন কি তুমি খোদাকে দেখতে পাচ্ছিলে?' দিরার প্রথম প্রশ্ন।

'আমি আল্লাহকে দেখি না'– তাবরিজ উত্তর দেয়– 'আমি আলেম নই, তাই বলতে পারবো না দেখা না দিয়েই আল্লাহ কীভাবে নিজের অস্তিত্বের অনুভূতি দান করে থাকেন। আমি শুধু এটুকু জানি, আল্লাহ আমার কথা ও দু'আ শোনেন।'

'তুমি কি নিশ্চিত, যিনি আমাকে উত্তাল নদীর নিমজ্জন থেকে রক্ষা করেছেন, তিনি খোদা-ই ছিলেন?' দিরা জিজ্ঞেস করে।

'খতীব আমাদেরকে বলেছেন, আত্মা যদি পবিত্র হয়, তাহলে আল্লাহ যে কোন বিপদে-সমস্যায় সাহায্য করে থাকেন'– তাবরিজ উত্তর দেয়– 'আমি যদি এই নিয়তে তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতাম যে, তুমি অতিশয় রূপসী মেয়ে। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে ডুবে মরতাম।'

'কিন্তু আমার আত্মা তো পবিত্র নয়'– দিরা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো– 'আল্লাহ আমাকে কেন সাহায্য করেছেন? তিনি আমাকে কেন নিমজ্জন থেকে রক্ষা করেছেন?'

'হেম্‌স গিয়ে খতীবকে জিজ্ঞেস করবো– 'তাবরিজ উত্তর দেয়– 'আমার অতো জ্ঞান নেই।'

'আচ্ছা, তুমি আমার দেহটাকে এভাবে উপেক্ষা করলে কেন?' দিরা জিজ্ঞেস করে।

'একজন নারী হিসেবে তুমি আমার যে আচরণের ভয়ে শঙ্কিত ছিলে, আমি যদি তা-ই করতাম, তাহলে আমি তোমার খঞ্জর থেকে রক্ষা পেতাম না'– তাবরিজ উত্তর দেয়– 'আমার হাতে তুমি আল্লাহর আমানত। আর...'

তাবরিজ চুপ হয়ে যায়। খানিক পর অলক্ষ্যে বলে ওঠে– 'তুমি অতিশয় সুন্দর এক আমানত। চলো রওনা হই।'

তাবরিজ অস্থির মনে উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হয়। দিরা তাকে ধরে রাখে। তাবরিজ বললো– 'আমাকে নিজের কাছে বসিয়ে রেখো না দিরা। এমন কঠিন পরীক্ষায় আমাকে ফেলো না বোন! তুমি আমাকে মহান আল্লাহর সমীপে অবনত থাকতে দাও।'

'তোমার আল্লাহর কসম'– দিরা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললো– 'আমাকেও তোমার আল্লাহর সম্মুখে অবনতমস্তক হওয়ার যোগ্য বানিয়ে দাও। তুমি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। তুমি খোদার দূত।'

দিরার চোখে অশ্রু এসে যায়।

'তুমি কাঁদছো কেন?' তাবরিজ জিজ্ঞেস করে।

'আমি একটি পাপী মেয়ে'– দিরা উত্তর দেয়– 'খোদা আমার প্রতি রুষ্ঠ। আমার উট যখন আমাকেই স্রোতের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো, তখনও আমার খোদার কথা মনে আসেনি। আমি মনে করতাম, দেহটাই সব। এই দেহটা আমাকে রক্ষা করতে হবে। পরে নদীর গ্রাস থেকে রক্ষা করে তুমি যখন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে, তখনও আমার একই ভাবনা ছিলো, তোমার থেকে আমার দেহটা রক্ষা করতে হবে। নিজের শরীরটা রক্ষা করার লক্ষ্যেই আমি তোমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি ব্যর্থ হলাম। আমি নদীর তরঙ্গ থেকেও বেঁচে গেলাম, তোমার থেকেও রক্ষা পেয়ে গেলাম। কিন্তু তোমার ইবাদত আর দু'আ আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, আমাকে রক্ষাকারী শক্তি অন্য কিছু ছিলো। বলো, সেই শক্তিটা কী? কোথায়?'

'এটি আল্লাহর শক্তি'– তাবরিজ উত্তর দেয়– 'এটি আত্মার পবিত্রতার সুফল।'

'আমার গোটা জীবন একটি পাপ।'

'স্পষ্ট বুঝিয়ে বলো'– তাবরিজ বললো– 'তুমি কি নর্তকি? আমীর-উজিদের কাছে থাকো? আমি শুনেছি, এ ধরনের মেয়েরা খুবই সুন্দরী হয়ে থাকে। তোমার মতো রূপসী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি।'

দিরার মুখে কথা নেই। চোখে অশ্রু নেমে এসেছে। হঠাৎ জায়গা থেকে সরে তাবরিজের ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। কিন্তু তাবরিজ দূরে সরে বসে। দিরা বললো– 'আমাকে ভয় পাচ্ছো? ঝড়-জুলোচ্ছাসের ভীতি এখনো আমাকে তাড়া করে ফিরছে। তুমি আমাকে তোমার কাছে রাখো।'

'না'– তাবরিজ এক বিস্ময়কর হাসি হেসে বললো– 'তুমি আমার এতো কাছে এসো না। আমি বিচ্যুৎ হয়ে যাবো।'

'দেখছো তো আমি কতো বড় গুনাহগার'– দিরা বললো– 'তুমি এ কারণে আমার থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছো যে, তুমি বিচ্যুৎ হয়ে যাবে। আমি বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছি।'

দিরা বুঝে ফেলে তাবরিজের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা আছে; কিন্তু ভাবনায় গভীরতা নেই। ইচ্ছে করলে নতুন যে কোন ছাঁচে তাকে গড়ে নেয়া সম্ভব। দিরা তার সঙ্গে খোলামেলা কথা বলতে শুরু করে। বললো– 'আমি যদি বলি, আসো আমরা সারা জীবনের সফরে একত্রে থাকি, তাহলে তুমি কী উত্তর দেবে?'

তাবরিজ মেয়েটির মুখ পানে তাকায়। মুচকি একটা হাসি দিয়ে খানিকটা উজ্জীবিতের ন্যায় বললো– 'চলো, রওনা হই। সূর্য উঠে গেছে। দেরি করলে সমস্যায় পড়বো।'

দিরা নিজের অস্তিত্বে একটি বিপ্লব অনুভব করে, যার তাৎপর্য সে ভালোভাবে বুঝতে পারছে না। উঠে তাবরিজের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। তার দৃষ্টি যতোটা না পথের দিকে, তার চেয়ে বেশি তাবরিজের প্রতি। গত রাতে তাবরিজকে খুন করে হেম্স পালিয়ে যাওয়ার চিন্তায় বিভোর ছিলো। কিন্তু এখন তার দ্রুত পথ চলতে ভালো লাগছে না। যতো দীর্ঘ সময় সম্ভব তাবরিজের সঙ্গে থাকার বাসনা বিরাজ করছে তার মনে। চলতে চলতে একবার তাবরিজের হাত চেপে ধরে দিরা বললো– 'আস্তে হাঁটো।'

'না, আমাদের দ্রুত হাঁটা উচিত'– তাবরিজ বললো– 'অন্যথায় আরো একটি রাত এসে পড়বে।'

'আসতে দাও'– দিরা বললো– 'আমি দ্রুত হাঁটতে পারছি না।'

'এখন তাড়াতাড়ি হাঁটো'– তাবরিজ বললো– 'পরে হাঁটতে না পারলে পিঠে করে নেবো।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই আল-আদিল খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনকে হামাতের বাইরে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেছিলেন, যার ফলে বল্ডউইনের বাহিনী দিশা হারিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পেছনে সরে গিয়েছিলো। সেই যুদ্ধের কাহিনী আপনারা পাঠ করেছেন। বল্ডউইন অনেক কষ্টে তার বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে একত্রিত করেছিলেন। খুঁজে-পেতে জীবিত সৈন্যদের

একত্রিত করার পর সম্রাট বুঝতে পারেন, তার কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। এখন বেঁচে আছে অর্ধেকের সামান্য বেশি সৈন্য। তিনি দামেশ্ক দখল করতে এসেছিলেন। তার বিপুলসংখ্যক সৈন্য আল-আদিলের কমান্ডো আক্রমণে মারা গেছে। পিছপা হয়ে পালাবার পর অনেকে বিভিন্ন উপত্যকা ও বিজন অঞ্চলে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কতিপয়কে মুসলমান রাখাল, যাযাবর ও গ্রামবাসীরা মেরে ফেলেছে এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও ঘোড়াগুলো কেড়ে নিয়েছে।

বল্ডউইন যখন তার অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে হামাত থেকে দূরে এক স্থানে একত্রিত করেন, তখন তাকে অবহিত করা হলো, আপনার ফৌজের যেসব সৈন্য ও কমান্ডার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো, তারা মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে। পরাজয়ের কারণে বল্ডউইনের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। বল্ডউইন বেজায় ক্ষুব্ধ। এই সংবাদে তার ক্ষোভ আরো বেড়ে গেছে। তিনি নির্দেশ প্রদান করেন, যেখানেই মুসলমানদের কোন বসতি চোখে পড়বে, লুট করো, যুবতী মেয়েদের তুলে নিয়ে আসো এবং কাজ সমাধা করে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দাও।

নির্দেশমতো বল্ডউইনের বাহিনী পুনঃপ্রস্তুতি গ্রহণ করার লক্ষ্যে পিছপা হতে গিয়ে পথের মুসলিম বসতিগুলো একের পর এক ধ্বংস করে ফেলে।

এই বাহিনীটি এখন হেম্স থেকে ছয়-সাত মাইল দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে। বল্ডউইন চেষ্টা করছেন, কোন খৃষ্টান সম্রাট তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন, যাতে তিনি আল-আদিল থেকে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারেন এবং নিজের শাসন ক্ষমতাকে– যাকে তিনি ক্রুশের শাসন বলে দাবি করতেন– দামেশ্ক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় বাস্তবায়িত করতে পারেন। এ সুবাদেই তিনি অপর এক খৃস্টান সম্রাট রেজিনাল্ট অফ শাইতুনের নিকট গিয়েছিলেন।

দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর দিরার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে বৃদ্ধ খৃস্টান ও তার সঙ্গীরা রাতভর পথ চলতে থাকে এবং সকাল বেলা হেম্স গিয়ে পৌঁছে। কাফেলার অন্যান্য লোকেরাও পৌঁছে গেছে। তাদের একজনও হেম্সের অধিবাসী নয়। তাদের গন্তব্য আরো সম্মুখে। তাবরিজের ঘোড়া তাদের সঙ্গে। তারা ঘোড়াটা এক মসজিদের ইমামের হাতে তুলে দিয়ে বললো, এটির মালিক হেম্সের এক ব্যক্তি। লোকটি জলস্রোতে ঘোড়া থেকে পড়ে ডুবে গেছে এবং ঘোড়াটা তীরে উঠে এসেছে। ইমাম সাহেব ঘোড়াটা বুঝে

নেন। কিছুক্ষণ পরই জানা গেলো ঘোড়াটা কার। ঘোড়া তাবরিজের ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়া হলে ঘরে মাতম শুরু হয়ে যায়।

হেম্‌সে এক ইহুদী ব্যবসায়ীর বাড়ি ছিলো। অত্যন্ত ধনশালী মানুষ। যে লোকটি নিজেকে দিরার পিতা বলে দাবি করতো, সে সঙ্গীদেরসহ এই ইহুদীর ঘরে উপবিষ্ট। সে সংবাদ জানায়, দিরা পানিতে ডুবে মারা গেছে।

শুনে সকলে আক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু আক্ষেপে তো আর তাদের সমস্যার সমাধান হবে না। বৃদ্ধ ইহুদী মেজবানকে জিজ্ঞেস করে, হেম্‌সের মুসলমানদের তৎপরতা ও পরিকল্পনা কী?

'খুবই ভয়ঙ্কর'– মেজবান উত্তর দেয়– 'তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এই নগরী সুলতান আইউবীর কমান্ডো সেনাদের আস্তানায় পরিণত হতে যাচ্ছে। মুসলমানদের বড় মসজিদের খতীব শুধু খতীবই নয়, ফৌজের কমান্ডার এবং প্রশিক্ষক মনে হচ্ছে।'

'আচ্ছা, লোকটাকে খুন করে ফেললে কী লাভ হবে?' বৃদ্ধ খৃস্টান জিজ্ঞেস করে।

'কোন লাভ হবে না'– ইহুদী উত্তর দেয়– 'বরং ক্ষতি হবে। আমাদের উপর মুসলমানদের সন্দেহ সৃষ্টি হবে এবং তারা আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেবে। জানেন তো, এই নগরী মুসলমানদের শাসনাধীন এলাকা।'

'এখানকার ইহুদী-খৃস্টান পরিবারগুলোর মেয়েরা কি কিছু করতে পারে না?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে।

'আপনি জানেন, এ কাজের জন্য কী পরিমাণ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়ে থাকে'– মেজবান উত্তর দেয়– 'আমাদের কোন মেয়েই এতোটা চতুর নয়।'

'সে যাই হোক, এখানকার মুসলমানরা সামরিক প্রশিক্ষণ না গ্রহণ করুক, এটা জরুরী বলে স্বীকার করেন তো?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে।

'আপনি কী নির্দেশ নিয়ে এসেছেন?' মেজবান জিজ্ঞেস করে।

'নির্দেশ খুবই স্পষ্ট'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'রামাল্লায় সালাহুদ্দীন আইউবীর পরাজয় হয়েছে। কিন্তু এই পরাজয় তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। ইতিমধ্যে তিনি সব সামলে নিয়েছেন। তিনি ফৌজ প্রস্তুত করে ফেলেছেন। আমাদের গোয়েন্দারা কায়রো থেকে যে খবরাখবর প্রেরণ করছে, তা সুখকর নয়। সালাহুদ্দীন আইউবী কায়রো ত্যাগ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু এখনো জানা যায়নি তিনি কোন্ দিকে রওনা হবেন এবং কোথায় আক্রমণ

চালাবেন। এদিকে তার ভাই আল-আদিল দামেশ্‌ক থেকে সাহায্য পেয়ে গেছেন। তিনি সম্রাট বল্ডউইনকে এমনভাবে পরাজিত করেছেন যে, এতো সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তিনি পুনর্গঠিত হতে পারেননি। আপনি তো জানেন, সালাহুদ্দীন আইউবী গেরিলা ও কমান্ডো যুদ্ধ লড়ে থাকেন। আমাদের ফৌজের রসদ তার থেকে নিরাপদ থাকে না। হেম্‌সের মুসলমানরা যদি তার গেরিলাদের জন্য আস্তানা করে দেয়, তাহলে এরা রসদ ও অগ্রসরমান সেনাদলের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।

এমনি পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদের দ্বারা মুসলমানদের মাঝে ফাটল ধরানো এবং তাদের চরিত্র ধ্বংসের কৌশল ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। এসব কাজের জন্য স্থান-কাল স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। সব ক্ষেত্রে সকল কৌশল কার্যকরী হয় না। আমি আমাদের সেই অফিসারদের জন্য বিস্ময় প্রকাশ করছি, যারা এখানে একটি মেয়েকে প্রেরণ করেছিলেন।'

'তাহলে কী করা যায়?'

'একদম ভিনিস'– মেজবান তার ডান হাতটা তরবারীর ন্যায় ডানে-বাঁয়ে দুলিয়ে বললো– 'পুরো নগরটাকে মানুষজনসহ একদম নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তখন আমরাও এখানে থাকতে পারবো না। আমরা প্রথমে আমাদের স্ত্রী-সন্তান ও সহায়-সম্পদ এখান থেকে সরিয়ে ফেলবো। আমি আশা করি, খৃষ্টান সম্রাট আমাদেরকে অন্যত্র পুনর্বাসিত হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন এবং আমাদের আর্থিক ক্ষতি পূরণ করে দেবেন। আমি ইহুদী। হাইকেলে সুলাইমানীর জন্য আমি আমার ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিতে প্রস্তুত আছি।'

'কিন্তু নগরী ধ্বংসের ব্যবস্থা কী হবে?'– বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে– 'এ কাজের জন্য তো সেনাবাহিনীর প্রয়োজন।'

'ফৌজ আছে'– ইহুদী বললো– 'সম্রাট বল্ডউইনের ফৌজের অবস্থান এখান থেকে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় মাইল দূরে। আপনি সম্ভবত জানেন না, এই ফৌজ পিছপা হওয়ার পথের সমস্ত মুসলিম বসতি ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের দ্বারা হেম্‌স ধ্বংস করানো যাবে। আমি আজই রওনা হয়ে যাবো এবং সম্রাট বল্ডউইনকে বলবো, আমাদের এই নগরীটি তার বাহিনীর জন্য কতটুকু বিপজ্জনক।'

'নগরী ধ্বংস করা তো উদ্দেশ্য নয়'– বৃদ্ধ বললো– 'আমাদের উদ্দেশ্য তো হচ্ছে এখানকার একজন মুসলমানকেও বেঁচে থাকতে দেয়া যাবে না।'

'আর মেয়েদেরকে ফৌজ তুলে নিয়ে যাবে।'

সকলে একমত হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, মেজবান ইহুদী আজ রাতেই সম্রাট বল্ডউইনের ছাউনীর উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

ইহুদী রওনা হয়ে যাওয়ার সময় এক অশ্বারোহীকে নগরীতে প্রবেশ করতে দেখে। লোকটি অপরিচিত। খতীবের বাড়িটি দেখা যাচ্ছে। আরোহী খতীবের বাড়ির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে খতীবের গৃহের দরজায় করাঘাত করে। খতীব বেরিয়ে এসে লোকটির সঙ্গে হাত মেলান এবং তাকে ভেতরে নিয়ে যান।

'লোকটি কায়রোর দূত।' ইহুদী বললো।

ঈশার নামাযের পর। মুসল্লীরা চলে গেছে। পাঁচ-ছয়জন লোক খতীবের কাছে বসে আছে। তাদের মধ্যে অশ্বারোহী আগন্তুকও আছে। খতীব একজনকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করতে বললেন।

'আমার বন্ধুগণ!'– খতীব বললেন– 'আমাদের এই বন্ধু আল-আদিলের তরফ থেকে সংবাদ নিয়ে এসেছে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অতি তাড়াতাড়ি কায়রো থেকে রওনা হবেন। আপনারা সবাই সৈনিক এবং গেরিলা অপারেশনে দক্ষ। আপনাদের করণীয় কী বলা প্রয়োজন মনে করি না। প্রশিক্ষণ ও মহড়া জোরদার করুন। আল-আদিল এ সংবাদও প্রেরণ করেছেন যে, খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনের যে বাহিনী হামাত থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো, তারা আমাদের কাছাকাছি কোথাও ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে। তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাদের গতিবিধির সংবাদ আল-আদিলকে পৌঁছাতে হবে। তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন, আমরা খৃস্টানদের এই বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালাবো এবং কমান্ডো অভিযান অব্যাহত রাখবো, যাতে তারা স্থির হয়ে বসতে না পারে.। সেই সঙ্গে আল-আদিল এ-ও বলেছেন, এই বাহিনী মুসলমানদের বহু জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছে। সৈন্য স্বল্পতার কারণে তিনি তাদের ধাওয়া করতে পারেননি। তিনি আরো বলেছেন, বল্ডউইনের বাহিনী যদি পেছনে নিজ অঞ্চলে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, তবে তাদের ঘাটাবে না। আমি আশঙ্কা করছি, লোকটা ক্ষিপ্ত হয়ে হেম্‌স নগরীকে ধ্বংস করে দেবে। তিনি আমাদেরকে প্রশিক্ষণ ও মহড়া জোরদার করার আদেশ প্রদান করেছেন। হতে পারে, সুলতান আইউবী কোনদিকে আক্রমণ চালালে বল্ডউইন তাদের উপর পেছন কিংবা পার্শ্ব থেকে আক্রমণ করবেন। তখন

আমাদেরকে বল্ডউইনের পেছন অংশের উপর গেরিলা হামলা চালাতে হবে এবং তাকে এখানেই আটকে রাখতে হবে।'

খতীব এক ব্যক্তিকে বল্ডউইনের ফৌজের অবস্থান ও গতিবিধি দেখে আসার জন্য প্রেরণ করেছেন। এ সময় তাবরিজ ও দিরা নগরীতে প্রবেশ করে। তাবরিজ দিরাকে পিঠে করে নিয়ে এসেছে। পথে পানি পাওয়া গিয়েছিলো বটে, কিন্তু খাবার জোটেনি। দিরা খৃস্টানদের রাজকন্যা। পায়ে হেঁটে সফর করায় অভ্যস্ত নয়। তাবরিজ রাতের জন্য কোথাও বিরতি দিতে চাচ্ছিলো না। তাই দিরাকে পিঠে তুলে নিয়ে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করে এসেছে। নিজ গৃহের সম্মুখে এসে তাবরিজ দিরাকে পিঠ থেকে নামিয়ে তাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। ঘরের লোকদের বিশ্বাস হচ্ছে না, তাবরিজ জীবিত আছে। তার ঘোড়াটা আগেই ঘরে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাবরিজ পরিজনকে ঘটনার বিস্তারিত শোনায়।

দিরার জানা আছে, তার গন্তব্য ইহুদী ব্যবসায়ীর ঘর। মেয়েটি এখনই সেখানে পৌছে যেতে চাচ্ছে। পিতার চিন্তায় উদগ্রীব সে। তার আশা, পিতা হয়তো জীবনে রক্ষা পেয়ে পৌছে গেছেন। তাবরিজের ইহুদীর ঘর জানা ছিলো। সে মেয়েটিকে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য রওনা হয়।

দু'জনে পথ চলছে। অন্ধকার পথ। এক স্থানে দিরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় এবং তাবরিজকে জড়িয়ে ধরে। মেয়েটি তাবরিজের প্রতি হৃদতা ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে শুরু করে।

'আমাদের গন্তব্য আলাদা– তোমার এক আমার আরেক'– দিরা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো– 'কিন্তু কোন এক দোরাস্তায় আমরা আবার মিলিত হবো। আমি আমার আত্মার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছিলাম। এখন তা পেয়ে গেছি। ভালোবাসা কী বস্তু আমি জানতাম না। তুমি আমাকে তা দিয়েছো। আমি হৃদয়ে তোমার স্মরণ নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে যাবে।'

'না দিরা!'–তাবরিজের মানসিক অবস্থা দিরার চেয়েও বেশি নড়বড়ে। বলতে শুরু করে– 'আমি তোমাকে ভুলতে পারবো না। তুমি এতোদিন যাবত একটি মিথ্যা ধর্মের অনুসরণ করে এসেছো। অবশিষ্ট জীবন ইসলামের ছায়াতলে কাটিয়ে দাও। আমি তোমার অপেক্ষা করবো। আমার হৃদয়ে এখন অন্য কোন নারী স্থান পাবে না। এখন তো তুমি এই নগরীতেই অবস্থান করবে। সময়-সুযোগ মতো সাক্ষাৎ হবে। তবে সাবধান থাকতে হবে কেউ যেনো না দেখে ফেলে।'

তাবরিজ আমানতের খেয়ানত করেনি। সফরকালেই মেয়েটি তার অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিলো। পরে সে তাবরিজের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছিলো। এখন তাবরিজ মেয়েটিকে ইহুদী ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছে।

তাবরিজ দিরাকে নিয়ে ইহুদীর গৃহে পৌঁছে যায়। দিরার পিতা দাবিদার বৃদ্ধ খৃস্টান ইহুদীর ঘরে বসা। দিরাকে দেখে লোকটি আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ উঠে এগিয়ে এসে মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ইহুদী ব্যবসায়ী ঘরে ছিলো না। সিদ্ধান্ত অনুসারে সে সম্রাট বল্ডউইনের সেনা ছাউনির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। বৃদ্ধের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাবরিজ দিরাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আর বিলম্ব করেনি। সেখান থেকেই মসজিদে চলে আসে। মসজিদের দরজা বন্ধ ছিলো। তাবরিজ বিশেষ পদ্ধতিতে দরজায় করাঘাত করে। দরজা খুলে গেলে তাবরিজ ভেতরে ঢুকে পড়ে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এক বছরের মধ্যে বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলেন। তিনি বেশি অপেক্ষা করলেন না। যে রাতে হেম্‌সের ইহুদী ব্যবসায়ী সেনা অভিযান পরিচালনা করে হেম্‌সের মুসলমানদের ধ্বংস করার আবেদন নিয়ে সম্রাট বল্ডউইনের নিকট রওনা হয়ে গিয়েছিলো, সে রাতেই সুলতান আইউবীর ফৌজ কায়রো ত্যাগ করে। তাঁর গন্তব্য দামেশ্‌ক। বাহিনী দ্রুত এগিয়ে চলছে। সুলতান আইউবী সময় নষ্ট করতে চাচ্ছেন না। তৎকালের ঐতিহাসিকদের মতে, সুলতান আইউবী দামেশ্‌ক অবস্থান করে সেখানকার পরিস্থিতি, বিশ্বাসঘাতক ও কুচক্রীদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে এবং তাদের প্রতিহত করে আল-আদিলের সঙ্গে মিলিত হতে চাচ্ছেন। তারপর সেখান থেকে সামরিক অভিযান শুরু করবেন। কিন্তু পথেই তিনি রাস্তা পরিবর্তন করে ফেলেন।

পথে ইয্‌যুদ্দীনের এক দূতের সঙ্গে আইউবীর সাক্ষাৎ ঘটে। দূত আইউবীর নামে কায়রোতে বার্তা নিয়ে যাচ্ছিলো। সুলতান যে কায়রো থেকে রওনা হয়ে এসেছেন, সে জানে না। মধ্যপথে সে একটি বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে। পতাকা দেখে বুঝে ফেলে এটি সুলতান আইউবীর ফৌজ। দূত বাহিনীর সম্মুখে চলে যায়। সুলতান আইউবী বাহিনীর সম্মুখ অংশে অবস্থান করছেন।

দূত ইয্‌যুদ্দীনের পত্রখানা সুলতান আইউবীর হাতে দেয়। ইয্‌যুদ্দীন নূরুদ্দীন জঙ্গী মরহুমের উপদেষ্টাদের একজন। পদমর্যাদায় একজন

আমীরের সমান। লোকটি নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোক। তাই তার প্রতি জঙ্গীর বিশেষ দৃষ্টি ছিলো। জঙ্গী তাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করতেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে সুলতান জঙ্গী তাকে হাল্‌ব প্রদেশে কারাহেসার নামক একটি দুর্গ দান করে তার অধিপতি নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। বেশকিছু অঞ্চল এই দুর্গের অধীনে ছিলো। ইবনে লাউনের প্রদেশটিও তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো, যিনি খৃস্টানদের সঙ্গে খৃস্টান আর মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমান হয়ে যেতেন। খৃস্টানদের মদদে তিনি ইয্‌যুদ্দীনের অঞ্চলে সীমান্তের উপর হানা দিতে শুরু করেন। ইয্‌যুদ্দীন একাকী তার মোকাবেলায় পেরে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু হাল্‌ব ও মসুল থেকেও তিনি সাহায্য নিতে চাচ্ছিলেন না। কারণ, হাল্‌ব ও মসুলের শাসনকর্তা আল-মালিকুস সালিহ ও সাইফুদ্দীন প্রমুখ যখনই সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন থেকেই তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিলেন।

ইয্‌যুদ্দীন সুলতান আইউবীর নিকট যে বার্তা প্রেরণ করেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ–

'মহামান্য সুলতান! আপনার এবং সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার অফাদারী সম্পর্কে আপনার কোন সংশয় নেই বলেই আমার বিশ্বাস। আমি তালখালেদের দিক থেকে খৃস্টানদের পথ বন্ধ করে রেখেছি। সমস্ত অঞ্চল এবং অগ্রযাত্রার রাস্তা আমার কমান্ডো সেনাদের দৃষ্টিতে থাকছে। খৃস্টানরা আমাকে রাস্তা থেকে হঠানোর জন্য ইবনে লাউনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। আপনি জানেন, আমার সীমান্ত সেই অঞ্চলের সঙ্গে লাগোয়া, যেটি মূলত আর্মেনিয়ার এলাকা। আর্মেনীয়রা আমার সীমান্ত চৌকিগুলোর উপর আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমার সৈন্য কম। খৃস্টান ও আর্মেনীয়রা দু'বার মূল্যবান উপঢৌকনসহ আমার নিকট দূত প্রেরণ করেছে। তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, যেনো আমি তাদের জোটে যোগদান করি এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে তারা আমাকে হামলার হুমকি দিয়েছে। আমার স্থলে অন্য কেউ হলে নিজের ভূখণ্ড রক্ষার জন্য এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিতো। জায়গাটা এতোই দূরে যে, প্রয়োজন হলে কারো সাহায্য নিয়ে সময় মতো পৌঁছানো সম্ভব নয়। তথাপি আমি তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে তাদের হুমকিকে বরণ করে নিয়েছি। এই পদক্ষেপ আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে নিয়েছি। আমি আমার দুর্গ, অঞ্চল এবং সেই সঙ্গে নিজের জীবনটাও কুরবান করে দিতে

প্রস্তুত আছি। তবু আমি খৃস্টানদের সঙ্গে জোট বাঁধবো না, কাফিরদের সঙ্গে হাত মেলাবো না। আমাকে নূরুদ্দীন জঙ্গীর আত্মার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আমাকে সেই লাখো শহীদের সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে, যারা প্রথম কেবলার জন্য জীবনদান করেছে। আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে আমার জানা নেই। আমি কেবল এটুকু জানি, রামাল্লার দুর্ঘটনার পর আপনি পুনর্গঠন ও অন্যান্য আয়োজন-প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছেন। আমি এও জানি, মুহতারাম আল-মালিকুল আদিল আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। আমি আপনাকে আমার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা আবশ্যক মনে করছি। আপনি যদি আদেশ করেন, তাহলে আমি আমার অঞ্চল ও কারাহেসার দুর্গের দখল ত্যাগ করে বাহিনীসহ আপনার নিকট চলে আসবো। অন্যথায় বলুন, আমি কী করবো। কোন মূল্যেই আমি ক্রুসেডার ও আর্মেনীয়দের সঙ্গে সমঝোতা করবো না।'

সুলতান আইউবী বার্তাটি পাঠ করেন। তৎক্ষণাৎ সালার ও উপদেষ্টাদের তলব করেন। বার্তাটি পড়ে তাদের শোনান এবং নির্দেশ প্রদান করে সকলকে বিস্মিত করে দেন যে, রাস্তা পরিবর্তন করো। আমরা ইবনে লাউনের অঞ্চলে আক্রমণ করবো।

একনায়কের ন্যায় আদেশ করা সুলতান আইউবীর নীতি নয়। তিনি আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে কোন সামরিক অভিযান পরিচালনা করতেন না। কিন্তু এবারকার আদেশের পেছনে সমর কৌশলের পাশাপাশি আবেগও কার্যকর ছিলো।

'কারাহেসার মুহতারাম ওস্তাদ নূরুদ্দীন জঙ্গীর স্মৃতি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আর ইয্‌যুদ্দীনের ভাষায় আমি জঙ্গী মরহুমের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। আমি সেই লোকটিকে নিঃসঙ্গ ফেলে রাখতে পারি না, যে আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার সঙ্গে একমত, যে আমাদের একই পথের অভিযাত্রী।'

'মহামান্য সুলতান!'– এক সালার বললেন– 'আমরা যদি বাস্তবতার আলোকে বিবেচনা করি, তাহলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবো।'

'বাস্তবতা হলো, আমাদেরকে সর্বাগ্রে দামেশ্‌ক পৌঁছে সেখানকার পরিস্থিতি অনুধাবন করা আবশ্যক ছিলো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কিন্তু এখন যদি আমরা দামেশ্‌ক চলে যাই, তাহলে ইবনে লাউন তালখালেদের উপর আক্রমণ করে বসবে এবং ইয্‌যুদ্দীন তার হাতে পরাজয় বরণ করবে। সম্মুখে হাল্‌ব। তোমরা আল-মালিকুস সালিহ এবং

তার উপদেষ্টাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানো। আমাদের সঙ্গে তারা যে চুক্তি করেছে, তা এখনো বহাল আছে বটে; কিন্তু চুক্তি লোহার প্রাচীর নয় যে, ভাঙ্গা যাবে না। খৃস্টানদের সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বিচিত্র নয়। আমি খৃস্টানদেরকে হালব দখল করতে দেবো না, আমি ইয্‌যুদ্দীনকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে রাখতে পারবো না।'

কিছুক্ষণ পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, বাহিনী তালখালেদ অভিমুখেই এগিয়ে যাবে। সুলতান আইউবী ইয্‌যুদ্দীনের দূতকে মৌখিক বার্তা প্রদান করেন, ইয্‌যুদ্দীনকে বলবে, তিনি যেনো ইবনে লাউনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের ফাঁদ পাতেন। বলবে, আপনি বন্ধুত্বের টোপ দিয়ে আলাপ-আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করুন। তাকে এই আশ্বাসও দিন যে, আমার বাহিনীকে আপনার হাতে তুলে দেবো। আমি আমার বাহিনীকে তালখালেদ অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।'

দূত বিদায় নিয়ে চলে যায়।

খৃস্টান গুপ্তচররা সুলতান আইউবীর গতিবিধির প্রতি নজর রাখছে এবং খৃস্টানদের নিকট সংবাদ পৌঁছাচ্ছে। তারা রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের দুর্গ ও অঞ্চলগুলোর প্রতিরক্ষা সংহত করছে। তারা জানে, সুলতান আইউবীর পদক্ষেপ-পরিকল্পনা সম্পর্কে আগাম কিছু বলা যায় না। খৃস্টান হেডকোয়ার্টার যখন গোয়েন্দা মারফত সংবাদ পায়, সুলতান আইউবীর ফৌজ দামেশ্‌কের পথ ত্যাগ করে অন্যদিকে যাচ্ছে, তখন তাদের সেনাপতিরা বললো, আইউবী তার পরীক্ষিত ময়দানে যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন।

হেম্‌সের ইহুদী ব্যবসায়ী– যে হেম্‌সকে ধ্বংস করার জন্য সম্রাট বল্ডউইনের নিকট নিয়েছিলো– ফিরে এসেছে। বল্ডউইনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি তার খৃস্টান বন্ধুদের নিকট সাহায্যের আবেদন করতে গিয়েছেন। তার সেনাপতিরা ইহুদীকে বললো, আমরা সম্রাটের নির্দেশ ব্যতীত কিছু করতে পারি না। তবে কাজ হবে।

ইহুদী ফিরে আসার পর তাকে জানানো হলো, দিরা জীবিত ফিরে এসেছে এবং তাবরিজ নামক এক মুসলমান তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। খৃস্টান ও ইহুদীরা তাবরিজকে নগদ পুরস্কার পেশ করে। কিন্তু তাবরিজ এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।

ইহুদী ব্যবসায়ী দিরাকে অকর্মণ্য মনে করছে। কারণ, নগরী ধ্বংস করার আয়োজন সম্পন্ন হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, দিরাকে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু দিরা চতুর মেয়ে। বললো, আমি খতীবকে ঘায়েল করবো এবং যেসব মুসলমান সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, তাদের মাঝে ফাটল ধরাবো। সে আরো বললো, এখানকার মুসলমানদের পরিকল্পনা জ্ঞাত হওয়ার জন্য আমাকে প্রয়োজন।

দিরাকে হেম্‌সেই রেখে দেয়া হলো। কিন্তু কেউ জানে না, তার এই থাকার আগ্রহ একমাত্র তাবরিজের জন্য।

দিরা তাবরিজের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকে। রাতে নগরী থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে এবং দীর্ঘসময় বসে থাকছে। দিরা উঁচু স্তরের একটি সুন্দরী খৃস্টান মেয়ে। তার মোকাবেলায় তাবরিজের কোন মর্যাদাই নেই। দিরা আমীর-উজীর ও রাজা-বাদশাহদের প্রাসাদে বসবাস করার মতো মেয়ে। দামেশ্‌কে প্রশাসনের দু'জন পদস্থ কর্মকর্তাকে সে তার ...গত বানিয়ে ফেলেছিলো এবং তাদের দ্বারা এমন সব ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিলো, যার জন্য সুলতান আইউবীকে দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হয়েছিলো। কিন্তু জলোচ্ছ্বাসের ভীতি আর তাবরিজের চরিত্র তাকে এমন এক ধাক্কা দিয়েছে যে, মেয়েটির ব্যক্তি সত্ত্বায় আত্মা ও আবেগ জেগে ওঠেছে। দিরা তাবরিজের পূজা করতে শুরু করে দিয়েছে এবং তাবরিজ তার ভালবাসার জালে আটকা পড়েছে।

'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তাবরিজ'– দিরা বললো– 'খতীব এবং অন্যান্য যারা তোমাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, তারা কোথা থেকে এসেছেন?'

তাবরিজ উত্তর দিতে শুরু করলে দিরা বলে ওঠে– 'রাখো, ওসব বাদ দাও তাবরিজ! তাতে আমাদের কিছু আসে-যায় না। যার যা খুশি করুক। এমন সুন্দর রাতটাকে আমি যুদ্ধের আলোচনা দ্বারা কলঙ্কিত করবো কেন!'

দিরা দু'মুখো চরিত্রের মেয়েতে পরিণত হয়ে যায়। যখন তাবরিজের সঙ্গে থাকে, তখন নিষ্পাপ ও পবিত্র মেয়ের রূপ ধারণ করে। তখন তার মনেই থাকে না সে গুপ্তচর। গুপ্তচরবৃত্তির মানসে তাবরিজকে খতীব ও তার সহযোগীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেও শেষ পর্যন্ত তাবরিজকে জবাব দিতে বারণ করে দেয়। আবার এই দিরাই যখন ইহুদী ব্যবসায়ীর ঘরে গিয়ে বসে, তখন সে মুসলমানদের ধ্বংস সাধন বিষয়ে কথা বলে।

❖ ❖ ❖

দেড়-দুই মাস সময় চলে গেছে। একদিন সন্ধ্যায় দিরা তাবরিজের ঘরে গিয়ে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। কথার ফাঁকে দিরা তাবরিজকে বিশেষ ভঙ্গিতে ইশারা করে, যার মর্ম তাবরিজ বুঝে ফেলে। তাবরিজ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সাঁঝের আঁধার গভীর হওয়া মাত্র তাবরিজ তাদের সাক্ষাতের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে যায়। দিরাও এসে পৌঁছে। দিরা তাবরিজকে নগরী থেকে দূরে নিয়ে যায়। মেয়েটি কেমন যেনো আতঙ্কিত। তাবরিজ তার ভীতির কারণ জানতে চায়। কিন্তু দিরা কোন উত্তর দেয় না। হঠাৎ একটি শব্দ তাদের কানে ভেসে আসে। কে যেন দিরাকে ডাকছে। তাবরিজ জিজ্ঞেস করে, কে ডাকছে? দিরা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়, আমার লোকেরা আমাকে খুঁজছে। চলো, আরো দূরে চলে যাই। বলেই তাবরিজকে টেনে দ্রুতপায়ে আরো দূরে চলে যায়। দিরাকে কে যেন এখনও ডাকছে।

'এসব ডাকাডাকিতে কান দিও না তো তাবরিজ!'– দিরা বিরক্তি প্রকাশ করে বললো– 'আমি যখন তোমার সঙ্গে থাকি, তখন অন্য কারো আওয়াজ শুনতে চাই না।'

সম্মুখে ছোট-বড় অনেকগুলো টিলা। তাবরিজ খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে দিরার সঙ্গে হাঁটতে থাকে। দিরা এক স্থানে দাঁড়িয়ে যায়। এখানে কারো শব্দ এসে পৌঁছাচ্ছে না। হঠাৎ তাবরিজ চমকে উঠে কান খাড়া করে বললো– 'কেমন একটা শোরগোলের মতো শোনা যাচ্ছে! তুমিও শুনতে চেষ্টা করো। মনে হচ্ছে, অনেক লোকজন একসাথে চীৎকার করছে আর ঘোড়া ছুটাছুটি করছে।'

'কিছু না, তোমার কান বাজছে'– দিরা অট্টহাসি হেসে বললো– 'বাতাসের তীব্র ঝাপ্টা টিলার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে অতিক্রম করছে। এটা সেই বাতাসের শব্দ।'

নিজের সুকোমল বাহু আর রেশমী চুলের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিরা তাবরিজের চোখ, কান ও বিবেক কব্জা করে নেয়। তাবরিজ দিরার ব্যাখ্যা মেনে নেয়, এই শব্দ বাতাসের, যা দূর থেকে আসা শোরগোলের ন্যায় শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তার জানা নেই, এই হৈ-হুল্লোড় তার অঞ্চলের মানুষদের এবং সেখানে সেই প্রলয় ঘটে গেছে, যা ইহুদী ব্যবসায়ী ঘটাতে চেয়েছিলো। ঘটনাটা দিরা জানে। এই প্রলয়ের শব্দ তাবরিজের কানে পৌঁছুক, দিরার তা কাম্য নয়।

প্রথমবার ফিরে আসার পর ইহুদী ব্যবসায়ী আবারো বল্ডউইনের নিকট গিয়েছিলো। হেম্‌সের মুসলমানরা কী করছে এবং কিভাবে খৃস্টান বাহিনীর জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, ইহুদী বল্ডউইনকে তা অবহিত করে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করে। মুসলমান বল্ডউইনের প্রিয় শিকার। তিনি ইহুদীর প্ররোচনা ও প্রস্তাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি ইহুদীকে দিনক্ষণ জানিয়ে দেন। তিনি বলে দেন, সে রাতে হেম্‌সের ইহুদী ও খৃস্টানরা যেন আগে-ভাগে এলাকা থেকে সরে যায়। কাজটা করবে তারা রাতে। দিনে এলাকা ত্যাগ করতে গেলে মুসলমানরা সন্দেহ করে ফেলবে, কিছু একটা সমস্যা আছে। ইহুদী ফিরে এসে যখন তার লোকদেরকে পরিকল্পনা জানালো, তখন দিরা বললো, আমি তাবরিজ এবং তার পরিবারকে রক্ষা করতে চাই।

'আমরা একে ক্রুশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করবো।' বৃদ্ধ খৃস্টান বললো।

'সাপের বাচ্চাকে রক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' ইহুদী বললো।

'এখানে মুসলমানদের দু'টি পরিবার আছে, যাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে'– হেমসের এক খৃস্টান অধিবাসী বললো– 'কিন্তু আমি তাদেরকে রক্ষা করার কথা ভাবি না। আমি মুসলমানদের রক্ত চাই। কোন মুসলমানের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু তারপরও সে আমার ধর্মের শত্রু।'

'যে লোকটি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে এনেছে, আমি তাকে বাঁচাতে চাই।' দিরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো।

'আমরা তাকে এতো পরিমাণ পুরস্কার পেশ করেছিলাম, যা সে কখনো স্বপ্নেও দেখেনি'– ইহুদী বললো– 'কিন্তু সে বললো, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। আমরা পুরস্কার পেশ করে আমাদের দায়িত্ব আদায় করেছি। এখন সে আমাদের শত্রু, আমরাও তার শত্রু।'

'আমি তাকে শত্রু মনে করি না'– দিরা ঝাঝালো কণ্ঠে বললো– 'আমি এই একজন পুরুষ পেয়েছি, যে আমার দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হয়নি। তোমরা সকলে পাপী। তোমাদের মধ্যে একজন লোকও এমন আছে কি, আমার ব্যাপারে যার নিয়ত পরিচ্ছন্ন? আমার চোখে নিজের চেহারাটা দেখে জবাব দাও।'

'আচ্ছা, তুমি শুধু তাবরিজকে রক্ষা করো'– ইহুদী বললো– 'কিন্তু বাঁচাবে কী করে? কী ঘটতে যাচ্ছে, যদি তুমি তাকে বলে দাও, তাহলে সে

সকলকে বলে দেবে না? তুমি যদি তার পরিবারকে নগরী থেকে বেরিয়ে যেতে বলো, তাহলে কি তারা এর কারণ জিজ্ঞেস করবে না? তখন তুমি কী উত্তর দেবে? একজন মুসলমানকে উপকারের প্রতিদান দিতে গিয়ে তুমি সেই সকল মুসলমানকে সতর্ক করে দেবে, যারা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আমাকে আনাড়ি মনে করো না'– দিরা বললো– 'আমি ক্রুশকে ধোঁকা দেবো না।'

আক্রমণের দিন সন্ধ্যায় দিরা তাবরিজের ঘরে গিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে আসে। দিরা রাতে প্রায়ই কোথায় চলে যায়, তার লোকেরা জানে। তারা জানে, প্রেমের ধোঁকা দিয়ে দিরা তাবরিজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে।

দিরা তাবরিজকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে নগরীর ইহুদী ও খৃস্টানরা পা টিপে টিপে বের হতে শুরু করে। তারা দিরার সন্ধানে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, যে তাকে ডাকতে থাকে। কিন্তু দিরা তাবরিজকে নিয়ে দূরান্তে চলে যেতে থাকে। মেয়েটি তাবরিজকে এতোটুকু দূরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, যেখান থেকে নগরীর হৈহুল্লোড় শোনা যাবে না। দিরার অনুসন্ধানে বের হওয়া লোকটি নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সমগ্র নগরী। খৃস্টান বাহিনীর পদাতিক সৈন্যরা পা টিপে টিপে নগরীর একেবারে নিকটে এসে পৌঁছুলে পেছন থেকে অশ্বারোহীরাও এসে পড়ে। নগরীর মুসলমানরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। খৃস্টান বাহিনী হঠাৎ ঝড়ের ন্যায় আক্রমণ করে বসে। খৃস্টান সৈন্যদের হাতে মশাল। অধিক আলোর জন্য তারা দু'তিনটি ঝুপড়িতে অগ্নি সংযোগ করে দেয়। খৃস্টান সৈন্যরা প্রাচীর টপকে মুসলমানদের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ে। অধিকাংশ মুসলমান সজাগ হওয়ার আগেই মারা যায়। যারা সময় মতো জাগ্রত হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে সক্ষম হয়, তারা মোকাবেলা করে। অনেক মেয়ে খৃস্টানদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করে। খৃস্টান অশ্বারোহীরা নগরীটি ঘেরাও করে রেখেছিলো। তারা কাউকে পালাতে দেখামাত্র বর্শা কিংবা তরবারীর শিকারে পরিণত করে।

এই সেই হট্টগোল ও ডাক-চীৎকার, যা তাবরিজ টিলার অভ্যন্তরে বসে শুনেছিলো। তার গৃহটি ধ্বংস হয়ে গেছে। সম্রাট বল্ডউইন মুসলমানদের এই বসতিটি অধিবাসীদেরসহ ধ্বংস করে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

'আজ তুমি আমাকে এতো দূর নিয়ে এসেছো কেন?'– তাবরিজ দিরাকে

জিজ্ঞেস করে– 'আজ তুমি কথা বলছো না কেন? তুমি সন্ত্রস্ত কেন?'

'কারণ, তুমি আমার সঙ্গ দেবে না'– সুচতুর মেয়ে দিরা বললো– 'আমি তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছি। আগামীকাল ফিরে আসবো।'

'কোথায়?'

'কেন, আমার উপর কি তোমার আস্থা নেই?' দিরা তাবরিজকে উভয় বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে মুখটা তাবরিজের এতো নিকটে নিয়ে যায় যে, তার বিক্ষিপ্ত রেশমী চুলগুলো তাবরিজের গণ্ডদেশ ছুয়ে যায়। এই সেই চুল, গুহায় থাকাবস্থায় যাকে দেখে তাবরিজ যুগপৎ রোমাঞ্চ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো। এখন তো মেয়েটির ভালোবাসা তার হৃদয় জুড়ে বাসা বেঁধে বসেছে– 'আমরা আর কতোদিন চোরের ন্যায় এভাবে মিলিত হবো? এখন আর আমি তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারছি না। তোমার হৃদয়ে যদি আমার ভালোবাসা থাকে, তাহলে জিজ্ঞেস করো না আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। মনে করো, সেখানে গিয়ে উপনীত হবো, যেখানে আমাদের মাঝে ধর্মের দেয়াল অন্তরায় হবে না। তুমি পুরুষ। আমাকে দেখো, আমি অবলা নারী হয়ে তোমার ভালবাসার খাতিরে কত বড় ঝুঁকি বরণ করে নিচ্ছি।'

দুর্বল মূলত তাবরিজ। দিরা তার বিবেকের উপর জয়ী হয়েছে। এখন তার প্রচেষ্টা তাবরিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে না যাক। দিরা জানে, ফিরে গিয়ে তাবরিজ তার ভিটায় ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষ আর স্বজনদের অগ্নিদগ্ধ লাশ ছাড়া আর কিছুই পাবে না। তখন লোকটা পাগল হয়ে যাবে। হয়তো সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দিরাকে খুন করে ফেলবে। তাবরিজ দিরাকে জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে স্বসম্মানে হেম্‌স এনে পৌঁছানোর বিনিময়ে এবং ভালবাসার খাতিরে তাবরিজকে খৃস্টানদের হাতে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। এবার তাকে নিজ গৃহ এবং স্বজনদের ধ্বংস ও করুণ পরিণতি দেখার যন্ত্রণা থেকেও বাঁচাতে চায়।

মেয়েটি তাবরিজকে নিয়ে একদিকে হাঁটা দেয়। তাবরিজ তার সঙ্গে কথা বলে চলেছে, যেনো দিরা তাকে যাদু করেছে।

রাত পোহায়ে ভোর হলো। গোটা হেম্‌স নগরী একটি ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই নয়। এখানকার একজন মুসলমানও জীবিত নেই। বড় মসজিদের মিনারটি কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খতীব ও সঙ্গীরা কোন প্রকার মোকাবেলা ছাড়াই শহীদ হয়ে গেছেন। এতক্ষণে

দিরা তাবরিজকে নিয়ে খৃস্টান বাহিনীর সেনা ছাউনির নিকট পৌছে গেছে। এবার তাবরিজের মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে উঠেছে। দিরাকে জিজ্ঞেস করে, আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছো? দিরা চাপার জোরে তাবরিজকে বুঝ দিয়ে দেয়। তাবরিজকে একধারে দাঁড় করিয়ে দিরা এক কমান্ডারের সাথে কথা বলে। কমান্ডার তাকে একটি পথের নির্দেশনা প্রদান করে। দিরা তাবরিজকে নিয়ে সেদিকে চলে যায়।

দিরা সম্রাট বল্ডউইনের প্রাসাদোপম তাঁবুর নিকট গিয়ে পৌছে। রক্ষীরা অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে তাকে বল্ডউইনের তাঁবুতে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে। তাবরিজকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে দিরা তাঁবুতে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পর তাবরিজকেও তাঁবুতে ডেকে নেয়া হয়।

বল্ডউইন তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন– 'এই মেয়েটি তোমাকে সঙ্গে রাখতে চাচ্ছে। আমরা তার আবদার উপেক্ষা করতে পারি না। তোমার ভয় কিংবা সন্দেহ পোষণ করার কোন কারণ নেই।'

'আমি আমার ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবো না।' তাবরিজ বললো।

'ধর্ম পরিবর্তন করতে তোমাকে কে বলেছে?' দিরা বললো।

'তারপর কী হবে?'– তাবরিজ জিজ্ঞেস করে– 'এখানে অবস্থান করে আমি কী করবো? আমাকে ফিরে যেতে দাও।'

'তাবরিজ!'– দিরা নিজের প্রতি তাবরিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার চোখে চোখ রেখে বললো– 'আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমিও সেখানে যাবো, যেখানে তোমাকে যেতে হবে।'

তাবরিজ কিছুই বুঝতে পারলো না।

ইয্‌যুদ্দীনের দূত সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জবাব নিয়ে ইয্‌যুদ্দীনের নিকট পৌছে গেছে। সুলতান আইউবীর নির্দেশনা মোতাবেক ইয্‌যুদ্দীন ইবনে লাউনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন যে, আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবো এবং সালাহুদ্দীন আইউবীকে ধোঁকা দেবো। তিনি ইবনে লাউনকে এমন এক সবুজ বাগিচা প্রদর্শন করেন, যেনো ইবনে লাউন তার ফাঁদে পড়ে যায়। পরক্ষণেই ইবনে লাউন ইয্‌যুদ্দীনের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে কারাহেসার এসে হাজির হয়। কারাহেসার একটি উষ্ণ ও সবুজ-শ্যামল অঞ্চল, যার দর্শনে ইবনে লাউনের চেহারায় আনন্দের ঢেউ খেলে যায়।

দিন কয়েক পর সুলতান আইউবী বাহিনী নিয়ে কারাহেসারের সন্নিকটে এসে ছাউনি ফেলেন। বাহিনী ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। কিন্তু তিনি বিশ্রাম নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছেন না। এই আশঙ্কাও ছিলো যে, আক্রমণে বিলম্ব করলে ইবনে লাউন বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে যাবে। সুলতান আইউবীর ধারণা, ইবনে লাউনের সঙ্গে তার কঠিন মোকাবেলা হবে। এই আশঙ্কার ভিত্তিতেই তিনি হাল্‌বের বাহিনীকেও ডেকে এনেছেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সহযোগিতা করবেন বলে সুলতান আইউবীর সঙ্গে আল-মালিকুস সালিহের চুক্তি ছিলো।

মধ্য রাতের খানিক পর সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে আক্রমণের জন্য রওনা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। আর্মেনীয়দের চৌকিগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত এবং কোন্ চৌকিতে কতোজন করে সৈন্য আছে, সুলতান আইউবী গোয়েন্দা মারফত সেসব তথ্য জেনে নিয়েছেন। সেনাসংখ্যা যতোই হোক না কেন তারা সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে আছে। ইযযুদ্দীনের পক্ষ থেকে আক্রমণের কোন আশঙ্কাই তাদের ছিলো না এবং সুলতান আইউবীর এতো নীরবে সেখানে পৌঁছে যাওয়া ছিলো তাদের কল্পনার অতীত।

আইউবীর এই আক্রমণ ছিলো তিনতরফা। হামলাকারী প্রতিটি গ্রুপের সঙ্গে ইযযুদ্দীনের গঠন করা গাইড ছিলো। যে গ্রুপটি কৃষ্ণসাগরের দিক থেকে আক্রমণ করেছিলো, সুলতান আইউবী ছিলেন তাদের সঙ্গে।

কৃষ্ণসাগর ইবনে লাউনের রাজ্যের সীমান্ত। ইবনে লাউন তার উপর নৌকার পুল তৈরি করে রেখেছেন। নদীর কূলে আর্মেনীয়দের দুর্গ মুখাযাতুল আহযানের অবস্থান। ইবনে লাউন সেই দুর্গেই অবস্থান করছেন। এই দুর্গটি জয় করতে পারলে সমগ্র এলাকার জয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। সে কারণেই সুলতান আইউবী নিজের বাহিনীর এই গ্রুপের সঙ্গে থাকেন। এই গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুলতান আইউবীর ভ্রাতুষ্পুত্র ফররুখ শাহ, যিনি বীরযোদ্ধা ও যুদ্ধাভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। অপর দু'টি গ্রুপ চৌকিগুলোর উপর আক্রমণ করে দুশমনের সৈন্যদেরকে হতাহত ও বন্দী করে ফেলে এবং চৌকিগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য কয়েকটি জনবসতিতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

সুলতান আইউবীর জানবাজ সৈন্যরা যখন দড়ি বেয়ে দুর্গের প্রাচীরের উপর উঠে যায় এবং মিনজানিকের সাহায্যে ভারি ভারি পাথর নিক্ষেপ করে

দুর্গের দরজা ভেঙ্গে ফেলে, তখন ইবনে লাউনের চোখ খোলে। দুর্গে বাহিনী ঘুমিয়ে ছিলো। টের পেয়ে জাগ্রত হয়ে ইবনে লাউন দৌড়ে দুর্গের একটি মিনারের উপর উঠে যান। তিনি দূরে আগুনের শিখা দেখতে পান। কী ঘটছে এবং তার করণীয় কী, ভাবতে না ভাবতে সুলতান আইউবীর একদল জানবাজ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার রক্ষীরা যথাসাধ্য মোকাবেলা করে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আইউবীর সৈন্যরা ইবনে লাউনকে বন্দী করে ফেলে।

ভোরে সূর্যোদয়ের আগে ইবনে লাউনকে সুলতান আইউবীর সম্মুখে দাঁড় করানো হয়। সুলতান দুর্গটি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার আদেশ প্রদান করেন। এ কাজের জন্য তার এই বাহিনী যথেষ্ট ছিলো না। ইয্‌যুদ্দীনও সুলতানের সঙ্গে আছেন। সুলতান আইউবীর পরামর্শ মোতাবেক ইবনে লাউন চতুর্দিকে এই নির্দেশসহ দূত প্রেরণ করেন, যেনো সকল সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ করে দুর্গের নিকটে এসে জড়ো হয়। ইতিমধ্যে সুলতান আইউবী ইবনে লাউনের সঙ্গে সন্ধির শর্তাবলী ঠিক করে নেন। একটি শর্ত হলো, ইবনে লাউন তার অর্ধেক বাহিনীকে সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দেবেন। আরেকটি হলো, ইবনে লাউন সুলতান আইউবীকে বাৎসরিক কর প্রদান করবেন। এরূপ আরো কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদিত হয়, যা ইবনে লাউনকে একজন অথর্ব শাসকে পরিণত করে।

ইবনে লাউনের বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করে দুর্গের নিকট এসে সমবেত হয়। সুলতান আইউবী তাদের আদেশ করেন, দুর্গটা এমনভাবে ধ্বংস করে দাও, যেনো এখানে দুর্গের কোন চিহ্ন না থাকে। পরাজিত বাহিনীটি সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ ধ্বংসের কাজ শুরু করে দেয় এবং সুলতান আইউবী তার বাহিনীকে মাসাফা নামক একটি পল্লীর নিকট নিয়ে যান। তিনি হাল্‌বের বাহিনীকে ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং নিজ বাহিনীকে বিশ্রামের জন্য দীর্ঘ সময় প্রদান করেন। ইবনে লাউনের যে অর্ধেক বাহিনীকে নিয়েছিলেন, তাকে তিনি ইয্‌যুদ্দীনকে দিয়ে দেন। কিন্তু সুলতান আইউবীর জানা ছিলো না, তার বাহিনীর ছাউনি যে পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত, তার ভেতরে ও চূড়ায় বল্ডউইনের বাহিনী এসে পৌঁছেছে এবং তার উপর ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। সুলতান আইউবী সেই এলাকাটিতে খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। সেখানে কোন শত্রু বাহিনীর আগমন ঘটতে পারে, তা তাঁর ধারণা ছিলো না।

প্রায় সকল ঐতিহাসিক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, সুলতান আইউবী ইয়্যুদ্দীনের পয়গামের ভিত্তিতে কেন নিজের এত্তো বিশাল পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ইবনে লাউনের ন্যায় একজন অগুরুত্বপূর্ণ শাসকের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা করলেন! সে যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন বটে; কিন্তু যে পরিমাণ সময় ও সৈন্য নষ্ট হয়েছে, তার মূল্যও অনেক ছিলো। আরনল নামক এক ঐতিহাসিক লিখেছেন, সুলতান আইউবী আশপাশের সমস্যাগুলোকে দূর করতে চাচ্ছিলেন। তৎকালের ইতিহাসবেত্তাগণ– যাদের মধ্যে আসাদুল আসাদী উল্লেখ্যযোগ্য– লিখেছেন, ইয়্যুদ্দীনের বার্তা পাঠ করে সুলতান আইউবী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন।

মোটকথা, সমর বিশেষজ্ঞরা সুলতান আইউবীর এই অভিযানকে যৌক্তিক বলে মেনে নেননি। তারা লিখেছেন, সুলতান আইউবী জানতেন, নিকটেই কোথাও সম্রাট বল্ডউইনের ফৌজ অবস্থান করছে, যারা তাঁর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসতে পারে। সুলতান আইউবীর ফৌজ যখন পর্বতমালার পাদদেশে ছাউনি স্থাপন করছিলো, ঠিক তখন বল্ডউইন তার বাহিনীকে যুদ্ধ বিন্যাসে পাহাড়ের অভ্যন্তরে ও উপরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এর জন্যও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, বল্ডউইন সময়মতো আক্রমণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই বলতে পারেননি, এটা তার রাজকীয় নির্বুদ্ধিতা নাকি অপারগতা ছিলো। তিনি যদি তখনই আক্রমণ করতেন, তাহলে সুলতান আইউবীর সেই পরিণতিই ঘটতো, যা রামাল্লায় ঘটেছিলো– পরাজয় আর পিছুহটা।

এখানে ছাউনি স্থাপনের পরও সুলতান আইউবী জানতে পারলেন না, সম্রাট বল্ডউইন তার মাথার উপর বসে দাঁতে ধার দিচ্ছেন। উপর থেকে বল্ডউইনের পর্যবেক্ষকরা সুলতান আইউবীর তাঁবুর প্রতি নজর রাখছে এবং বল্ডউইনকে আইউবী বাহিনীর গতিবিধির সংবাদ অবহিত করছে। সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ব্যবস্থার দুর্বলতার এটিই বোধ হয় প্রথম ঘটনা।

তাবরিজও আইউবীর এই বাহিনীর সঙ্গে আছে। দিরা এখনো বলেনি তাকে সঙ্গে করে কেন নিয়ে এসেছে। মেয়েটি সম্ভবত তাকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে গুপ্তচর বানাতে চাচ্ছে। তার মধ্যে দু'টি চরিত্র সমানভাবে কাজ করছে– এক. ক্রুশের অফাদারি। দুই. তাবরিজের ভালবাসা। তাবরিজকে নিয়ে বল্ডউইনের কোন ভাবনা না থাকলেও দিরার প্রতি তার দুর্বলতা রয়েছে। দিরা অতিশয়

রূপসী মেয়ে। একদিন দিরা বল্ডউইনকে বললো, আমাকে সম্মুখের ছাউনিতে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু বল্ডউইন তাকে ধরে রাখেন।

একদিন বল্ডউইনের গোয়েন্দারা সংবাদ প্রদান করে, সুলতান আইউবীর ফৌজ তালখালেদ অভিমুখে রওনা হয়েছে। বল্ডউইনের কল্পনায় ছিলো না, সুলতান আইউবী ইবনে লাউনের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার বাহিনীকে মাসাফার পার্বত্য অঞ্চল অভিমুখে রওনা হওয়ার আদেশ প্রদান করেন। তার পরিকল্পনা হলো, তিনি সুলতান আইউবীকে এই পার্বত্য অঞ্চলে টেনে এনে লড়াবেন। এই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি তার সৈন্যদের পাহাড়ের উপযুক্ত এলাকা এবং গোপন স্থানে ছড়িয়ে দেন। আউইবীর জন্য বিশাল এক ফাঁদ পাতেন বল্ডউইন।

বল্ডউইনের এই আদেশ শুনে দিরা বললো, আমি আপনার নিকট আশ্রয় নিতে এসেছিলাম। তাবরিজের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিরা অবহিত করেছিলো, কেন সে তাবরিজকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। এখন যখন বল্ডউইন যুদ্ধ করার জন্য যাচ্ছেন, তো দিরার তার সঙ্গে থাকায় কোন লাভ নেই। কিন্তু বল্ডউইন দিরাকে ছাড়তে নারাজ।

'আমার কাছে মেয়ের অভাব নেই'– বল্ডউইন বললেন– 'কিন্তু তুমিই প্রথম নারী, যে আমার হৃদয়টাকে জয় করে নিয়েছে। তুমি কাছে থাকলে আমার আত্মা শান্তি পায়। তুমি আরো ক'দিন আমার কাছে থাকো।'

দিরা তার সম্রাটদের ভালভাবেই জানে। বল্ডউইনের উদ্দেশ্য বুঝা তার পক্ষে কঠিন নয়। সে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়, বিষয়টা যদি আত্মার শান্তি হয়ে থাকে, তাহলে আমি তা সেই মুসলিম যুবকের নিকট থেকেই লাভ করছি, যার গোটা পরিবারকে হত্যা করিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ফিরছি। জানি না তার পরিজনকে হত্যা করিয়ে এবং সেই সংবাদ তার থেকে গোপন রেখে আমি যে পাপ করেছি, আমার হৃদয় আমার থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে আদায় করবে।'

'তোমারও আত্মা আছে?'– বল্ডউইন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন– 'তোমার মন আছে? মুসলিম আমীরদের সঙ্গে রাত্রি যাপনকারী নারী পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করারও ভাবনা ভাবতে পারে?'

'আপনার সম্মুখে আমি শুধু একটি দেহ– একটি মনোহরী শরীর'– দিরা বললো– 'আর যখন আমি তাবরিজের সম্মুখে থাকি, তখন আমি আত্মা হয়ে যাই– প্রেমপিয়াসী আত্মা।'

বল্ডউইন রাজা। তিনি রাজাদের ন্যায় আদেশ করলেন– 'তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে।' দারোয়ানকে ডেকে বললেন– 'আমাদের তাঁবুতে যে মুসলমানটা থাকে, তার পায়ে শিকল পরিয়ে দাও।'

বল্ডউইন যখন মাসাফার পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছে, তখন তাবরিজ শিকলপরা কয়েদী। আর দিরা বন্দী শিকল ছাড়া। রক্ষীদের নজরে দু'জনই বন্দী।

বল্ডউইন বাহিনীর বিন্যাসে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অবসর হয়ে তিনি দিরাকে মানসিকভাবে যন্ত্রণা দিতে শুরু করেন। তাবরিজকে উপস্থিত করিয়ে তিনি দিরাকে তার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে তাবরিজকে বেত্রাঘাত করতে আদেশ করেন। তাবরিজের পিঠে হান্টারের আঘাত পড়লে চীৎকার বের হচ্ছে দিরার মুখ থেকে। বল্ডউইন দিরাকে বললেন– 'তুমি আমার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি তোমাকে আমার মুখের উপর কথা বলার শাস্তি দিচ্ছি।'

তাবরিজ বোবা ও বধির হয়ে গেছে যেনো। তার কিছুই বুঝে আসছে না, এসব কী ঘটছে। তার বিশ্বাস হচ্ছে না, এই শাস্তি তাকে দিরা দেয়াচ্ছে। দিরার চীৎকার-আহাজারিতে সে বুঝে ফেলেছে, মেয়েটিও মজলুম।

তাবরিজ অত্যাচার সহ্য করতে থাকে।

কিন্তু একদিন দিরার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। মেয়েটি বল্ডউইনের নিকট গিয়ে তার পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো– 'আপনি যতোদিন বলবেন এবং যেভাবে বলবেন, আমি আপনার সঙ্গে থাকবো। আমি তাবরিজকে ত্যাগ করেছি।'

বল্ডউইনের নির্দেশে তাবরিজের হাত-পায়ের শিকল খুলে দেয়া হলো এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। দিরা সম্রাট বল্ডউইনের একাকীত্বের রওনকে পরিণত হয়ে যায়।

দিন কয়েক পর এক রাতে বল্ডউইন মদ ও দিরার রূপে মত্ত হয়ে দিরাকে বললো– 'আমি যদি সালাহুদ্দীন আইউবীকে তাবরিজের ন্যায় শিকল পরিয়ে তোমার সম্মুখে এনে দাঁড় করাই, তবে কি স্বীকার করবে আমি এতো বৃদ্ধ নই, যতোটা তুমি মনে করছো?'

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলবো, আমি রাজা বল্ডউইনের রাণী'– দিরা বললো– 'তোমার তরবারীটা আমার পায়ে রেখে দাও।'

'দুটা দিন অপেক্ষা করো। আমি কাজটা করে দেখাবো।' বল্ডউইন বললেন।

'মনে হয় পারবেন না।' দিরা বললো।

'তুমি দেখোনি, সালাহুদ্দীন আইউবী আমার পায়ের উপর ছাউনি ফেলে রেখেছে'– বল্ডউইন বললেন– 'পরশু ভোরের আঁধারে আমরা তার উপর আক্রমণ চালাবো। কী ঘটছে, তা জানতে না জানতেই তিনি আমার কয়েদী হয়ে যাবেন। এখানে আমার উপস্থিতির কথা তার জানা নেই।'

তাবরিজ এখন মুক্ত। বল্ডউইন তার ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেননি। এখন সে রাজ অতিথি। সকালে দিরা তার তাঁবুতে প্রবেশ করে। তাবরিজ হঠাৎ চমকে ওঠে কথা বলতে শুরু করে।

'কথা বলার সময় নেই'– দিরা বললো– 'আজ আমি তোমার উপকারের প্রতিদান এবং তোমার ভালোবাসার উত্তর দিতে চাই। আমি যা বলি, তা-ই করবে। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। আমি অনেক পাপ করেছি। তোমার হেম্‌স ধ্বংস হয়ে গেছে। তুমি ওখানে যাবে না। তোমার জন্মভূমিটা এখন শুধুই ধ্বংসস্তূপ। তোমার পরিবারের লোকদের হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই।'

দিরা তাবরিজকে এই ধ্বংসযজ্ঞের এবং তাকে রক্ষা করার বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললো– 'তোমাদেরকে বল্ডউইনের বাহিনী থেকে প্রতিশোধ নিতে হবে। আজ এই পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাও, যেনো কেউ দেখতে না পায়। সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট যাও এবং তাঁকে বলো, খৃস্টান বাহিনী তার মাথার উপর বসে আছে এবং পরশু তারা আক্রমণ করবে।'

দিরা তাবরিজকে বল্ডউইনের আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যক্ত করে বললো– 'এখন আর আমার দিকে দৃষ্টিপাত করো না। অন্যথায় এখান থেকে নড়তে পারবে না। আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমাদের গন্তব্য আলাদা। আজ আমরা উভয়ে আপন আপন গন্তব্য পেয়ে গেছি।'

দিরা যদি হেম্‌সের ধ্বংসলীলা এবং গণহত্যার কাহিনী না শোনাতো, তাহলে তাবরিজ ওখান থেকে এতো তাড়াতাড়ি উঠতো না। তাবরিজ চোখে অশ্রু নিয়ে দিরা থেকে আলাদা হয়ে যায়।

রাতের আঁধার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাবরিজ চুপি চুপি হাঁটতে শুরু করে এবং সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে পার্বত্য এলাকা থেকে বেরিয়ে যায়।

তাবরিজ সুলতান আইউবীর বাহিনীর ছাউনিতে এসে বললো, 'আমি সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

তাবরিজকে সুলতানের নিকট পৌছিয়ে দেয়া হলো। সুলতান আইউবী

ধৈর্যের সাথে তার কাহিনী শোনেন এবং তার থেকে বল্ডউইনের ফৌজ ও তার পরিকল্পনার তথ্য জ্ঞাত হন। তিনি তৎক্ষণাৎ তার সালারদের তলব করে তাদেরকে জরুরী নির্দেশনা প্রদান করেন।

সম্রাট বল্ডউইন তৃতীয় রাতে সুলতান আইউবীর ছাউনি এলাকায় আক্রমণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁবুর সারি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তাঁবুতে সৈন্য নেই। হঠাৎ আকাশে সলিতাওয়ালা তীরের স্ফুলিঙ্গ উড়তে এবং তাঁবুগুলোর উপর এসে পড়তে শুরু করে। তাঁবুগুলোতে শুক্‌নো ঘাস ভরে তাতে তরল দাহ্য পদার্থ ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো এসে নিক্ষিপ্ত হওয়ামাত্র ভয়ানক অগ্নিশিখায় পরিণত হয়ে যায়।

এই অবস্থা দেখে বল্ডউইন আক্রমণের জন্য আরো সৈন্য প্রেরণ করেন। তাদের উপর ডান ও বাঁ-দিক থেকে তীর এসে আঘাত হানতে শুরু করে। রাত পোহাতে না পোহাতে বল্ডউইনের উপত্যকায় লুকিয়ে থাকা সৈন্যদের উপর আক্রমণ হয়ে যায়। এবার বল্ডউইন বুঝতে পারে, সে সুলতান আইউবীর উপর অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ চালাতে পারেনি। বরং সে নিজেই আইউবীর ফাঁদে এসে পড়েছে।

বল্ডউইন একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে নিজ বাহিনীর পরিণতি দেখতে শুরু করেন। পেছন থেকে শাঁ করে তার প্রতি একটা তীর ধেয়ে আসে। কিন্তু তীরটি তার দু'জন দেহরক্ষীর গায়ে বিদ্ধ হয়। তিনি পালিয়ে নীচে নেমে এলে সম্মুখ থেকে সুলতান আইউবীর সৈনিকরা ছুটে আসে।

বল্ডউইন একটি সরু পথে পালিয়ে যায়।

১১৭৯ সালের অক্টোবর মাসের এই যুদ্ধে বল্ডউইন বন্দী হওয়া থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যান। সুলতান আইউবী রামাল্লার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে নেন। তাঁর বাহিনীর মনোবল ও আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আর তাবরিজ ও দিরা ইতিহাসের আঁধারে হারিয়ে যায়।
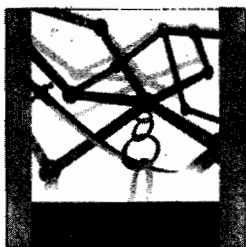
আল-মালিকুস সালিহ

জোহর নামায আদায় করে জায়নামাযে বসে তাসবীহ ঝপ করছেন রোজি খাতুন। খাদেমা কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে সমাহিত কণ্ঠে বললো– 'খালাম্মা! আপনার মেয়ে শামসুন্নিসা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। সঙ্গে আরো লোক আছে।'

রোজি খাতুন প্রথমে অপলক নেত্রে খাদেমার প্রতি তাকিয়ে থাকেন। পরক্ষণে তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করে।

মা-মেয়ের মাঝে যখন বিরহ ঘটে, তখন মেয়ের বয়স ছিলো ৯ বছর। এখন পনের। সংবাদ পাওয়া মাত্র মায়ের 'কই আমার বাছা' বলে ছুটে বেরিয়ে এসে কলজেছেঁড়া ধন মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরার কথা ছিলো। কিন্তু মা কঠিন গলায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন– 'ও কেন এসেছে?'

'আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে খালাম্মা!'– খাদেমা বললো– 'বোধ হয় ও আপনার কোলে ফিরে এসেছে।'

রোজি খাতুন চুপ হয়ে যান। খাদেমা অপেক্ষমান দাঁড়িয়ে আছে। খানিক পর মাথা তুলে বললেন– 'ওকে ফিরে যেতে বলো। বলো, বিশ্বাসঘাতক ভাইয়ের নিকট চলে যাক। আমার চোখের সামনে আসবার দুঃসাহস যেনো ও না দেখায়।'

'আপনার ছেলে যখন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, ও তো তখন অবুঝ ছিলো– মাত্র ৯ বছর'– খাদেমা বললো– 'অবুঝ মেয়েটি কি জানতো ভাই তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!'

'আমি জানি, ওকে তার ভাই পাঠিয়েছে'– রোজি খাতুন বললেন– 'কেন পাঠিয়েছে তাও বলতে পারি। আমার পুত্র গাদ্দার এবং আত্মমর্যাদাহীন। আমি মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো না।'

রোজি খাতুন নূরুদ্দীন জঙ্গী মরহুমের স্ত্রী। আপনারা পড়ে এসেছেন, ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী নূরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর তার আমীর-উজির ও কতিপয় আমলা তাঁর পুত্র আল-মালিকুস সালিহকে রাজার আসনে আসীন

করেন। তখন তার বয়স ছিলো এগার বছর। শামসুন্নিসা তার ছোট বোন। বয়স ৯ বছর। নূরুদ্দীন জঙ্গীর শাসনকালের কতিপয় আমীর ও দুর্গপতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাগদাদের খেলাফত থেকে মুক্ত হয়ে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। সুলতান আইউবী সে সময়ে মিসর ছিলেন। জঙ্গী মরহুম ও সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ছিলো, তাঁরা তাদেরকে ভোগ-বিলাসিতা করতে দিচ্ছেন না। জীবনের সকল সুখ-আহলাদ পরিত্যাগ করে খৃস্টানদের প্রত্যয়-পরিকল্পনাকে চুরমার করে ফিলিস্তীনকে মুক্ত করা এবং সালতানাতে ইসলামিয়ার সম্প্রসারণ ঘটানোই তাদের একমাত্র ব্রত। নূরুদ্দীন জঙ্গী ও সুলতান আইউবীর এই নিরানন্দ জিহাদী জীবনধারাকে বরণ করে নিতে পারেননি তাদের এই বিলাসী আমীর-উজীরগণ।

বিদ্রোহী এই আমীরদের উপর ক্রুসেডারদের প্রভাব ছিলো বিস্তর। সে কারণে ভোগ-বিলাসিতা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য চরিত্রে পরিণত হয়ে যায়। খৃস্টানদের প্রেরিত নারী আর সোনা-মাণিক্য তাদের ঈমান ক্রয় করে ফেলেছিলো। নূরুদ্দীন জঙ্গী মৃত্যুবরণ করেছেন। এবার এই লোকগুলো সুলতার আইউবীকে পরাজিত করে তার শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছেন। তারা জঙ্গী মরহুমের অর্ধেক ফৌজকে বিদ্রোহী বানিয়ে ফেলেছেন। সংবাদ পেয়ে সুলতান আইউবী মাত্র সাতশ' অশ্বারোহী নিয়ে দামেশ্‌ক প্রবেশ করেন। জনগণ তাঁকে স্বাগত জানায়। নগরীর বিচারক তাঁকে ফটকের চাবি দিয়ে দেন। কিন্তু দামেশ্‌কের ফৌজের বিদ্রোহী অংশটি তাঁর মোকাবেলা করে। এটা ছিলো গৃহযুদ্ধ। নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী সুলতান আইউবীর সমর্থক ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে চাচ্ছিলেন।

এক রাতেই বিদ্রোহী বাহিনীর পরাজয় ঘটে। রাতেই আল-মালিকুস সালিহ, তার আমীর-অনুচরবৃন্দ, দু'-তিনজন সালার এবং বিদ্রোহী বাহিনী দামেশ্‌ক থেকে পালিয়ে হাল্‌ব চলে যায়। আল-মালিকুস সালিহ স্বীয় বোন শামসুন্নিসাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। যেসব আমীর ও দুর্গপতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, তন্মধ্যে হাররানের দুর্গপতি গোমস্তগীন এবং মসুলের আমীর সাইফুদ্দীন অন্যতম।

আল-মালিকুস সালিহ হাল্‌বকে নিজের রাজধানী বানিয়ে নেন। পরে এই নগরীটি তার, গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর

হেডকোয়ার্টারে পরিণত হয়ে যায়। সকলের নিকট খৃস্টান উপদেষ্টা এসে পড়ে। তাদের সঙ্গে মদ আর এমন নারীও আসে, যারা শুধু অপরূপা সুন্দরীই নয়– গুপ্তচরবৃত্তি এবং চিন্তা-চেতনা বিধ্বংসের ওস্তাদও বটে। খৃস্টানরা তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে প্রোপাগান্ডা মিশনকে এমনভাবে ব্যবহার করে যে, তাদের অন্তরে সুলতান আইউবীর বিরোধিতা ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে যায়।

সুলতান নূরুউদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী দামেশ্‌ক থেকে যান। সেখানে তিনি মেয়েদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। বয়সে তিনি এখনও বার্ধক্যে উপনীত হননি। দু'টি মাত্র সন্তান। দু'জনই অপ্রাপ্তবয়স্ক। দু'জনই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি বুকে পাথর বেঁধে নেন এবং এই বলে সান্ত্বনা নেন যে, স্বামীর সঙ্গে আমার সন্তানরাও মরে গেছে। কিন্তু মাঝে-মধ্যে মমতা উথলে ওঠছে এবং চোখে অশ্রু নেমে আসছে। মায়ের মন বলে কথা।

সুলতান আইউবী হাল্‌ব ও হাররানে গোয়েন্দা প্রেরণ করেছেন। তারা ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রিপোর্ট প্রেরণ করছে। ওখানে খৃস্টানরা জোরে-শোরে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

সুলতান আইউবী মিসর থেকে ফৌজ তলব করেন। দামেশ্‌কের বাহিনীর বৃহৎ অংশটি তাঁর সঙ্গে। তিনি প্রথমে বিদ্রোহী আমীরদের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন, তোমরা ইসলামের মর্যাদার খাতিরে খৃস্টানদের হাতে খেলো না এবং তাদের সঙ্গ দিও না। এসো, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদেরকে ইসলামী দুনিয়া থেকে উৎখাত করে ইউরোপ দখল করে নেই। কিন্তু ঈমান নিলামকারী আমীরগণ সুলতান আইউবীর দূতদের লাঞ্ছিত করে বিদায় দেন। গোমস্তগীন সুলতান আইউবীর দু'জন দূতকে বন্দি করে ফেলেন।

সুলতান আইউবী তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হাল্‌বের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রোজি খাতুন তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য দামেশ্‌ক থেকে অনেক দূর পর্যন্ত তার সঙ্গে যান। বিদায় জানিয়ে ফিরে আসার সময় বললেন– 'আমার পুত্র যদি আপনার তীর-তরবারী-বর্শার আয়ত্ত্বে এসে পড়ে, তাহলে ভুলে যাবেন ও আমার সন্তান। ও বিশ্বাসঘাতক। ওর লাশ পাওয়া গেলে দাফন করবেন না। শৃগাল-শকুনদের জন্য ফেলে রাখবেন।'

মায়ের চোখ শুষ্ক। কিন্তু সুলতান আইউবীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে

শুরু করে। রোজি খাতুন বয়সে সুলতানের ছোট। তিনি সুলতানের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বিগলিত কণ্ঠে বললেন– 'আল্লাহ্ আপনাকে বিজয় দান করুন।'

রোজি খাতুন অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাহিনীর যাওয়া প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।

এখান থেকেই মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের দীর্ঘ ও খুনরাঙা যুগের সূচনা হয়। সুলতান আইউবীকে মুসলিম আমীরদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুদ্ধ লড়তে হয়েছিলো, আপনারা সে কাহিনী বিস্তারিত পড়েছেন। খৃস্টানদের পরিকল্পনা ছিলো, তারা নিজেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে তাদেরকে আপসে লড়াবে এবং ঐক্যের সঙ্গে তাদের সামরিক শক্তিটাকেও নিঃশেষ করে দেবে। পাশাপাশি তারা হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ঘাতকদের দ্বারা বহুবার সুলতান আইউবীর উপর সংহারী আক্রমণও করিয়েছিলো। প্রতিবারই আল্লাহ্ ইসলামের এই অতন্দ্র প্রহরীটাকে রক্ষা করেছেন।

তিন-চার বছর যাবত মুসলমানরা আপসে যুদ্ধ করে করে মরতে থাকে। ...হান আল্লাহ্ প্রতিটি যুদ্ধে সুলতান আইউবীকে বিজয় দান করেন। এক যুদ্ধে নূরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রীর প্রেরিত কয়েকশ' মেয়েও যুদ্ধ করেছিলো এবং যুদ্ধের পট-পরিবর্তন করে দিয়েছিলো। কিন্তু সুলতান আইউবী কঠোর নির্দেশ জারি করে দেন, আগামীতে কোন নারী রণাঙ্গনে আসবে না।

সর্বশেষ যুদ্ধে সুলতান আইউবী হাল্‌ব পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং হাল্‌বের প্রতিরক্ষা দুর্গ এজাজ দখল করে নেন। আল-মালিকুস সালিহ্ স্বীয় বোন শামসুন্নিসাকে কয়েকজন দূতের সঙ্গে সন্ধির প্রতিশ্রুতিসহ সুলতান আইউবীর নিকট প্রেরণ করেন এবং বোনের মাধ্যমে সুলতানের নিকট আর্জি পেশ করান, এজাজ দুর্গটা আমাদেরকে ফিরিয়ে দিন। সুলতান আইউবী জঙ্গীর মেয়েটিকে স্বস্নেহে গলায় জড়িয়ে ধরেন এবং আবেদন মঞ্জুর করে নেন। তিনি এজাজ দুর্গটি জঙ্গীর মেয়েকে দান করেন। কতিপয় শর্ত আরোপ করে আল-মালিকুস সালিহ্‌কে হাল্‌বের আধা স্বায়ত্বশাসন প্রদান করেন। তন্মধ্যে একটি শর্ত ছিলো, সুলতান আইউবীর যখন সৈন্যের প্রয়োজন হবে, আল-মালিকুস সালিহ্ তাঁকে সৈন্য দেবেন। গোমস্তগীনকে আল-মালিকুস সালিহ্ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হত্যা করেন। বাদ বাকি আমীরগণ সুলতান আইউবীর আনুগত্য মেনে নেন।

সুলতান আইউবী কারাহেসারের শাসক ইবনে লাউনকে পরাজিত করেছিলেন। সে কাহিনী আপনারা পাঠ করেছেন। সে যুদ্ধে চুক্তি অনুযায়ী

হাল্‌ব থেকেও ফৌজ এসেছিলো। তার অব্যবহিত পরই সুলতান আইউবী খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনকে– যিনি সুলতানের উপর আক্রমণ করতে এসেছিলেন– অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। বল্ডউইন অল্পের জন্য বন্দি হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে যান এবং তার বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

এখন সুলতান আইউবী উক্ত অঞ্চলেরই কোন এক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন। খৃস্টানরা তাদের গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করছে, আইউবীর পরবর্তী অগ্রযাত্রা কোন্ দিকে হবে।

নবেম্বর ১১৮১ মোতাবেক রজব ৫৭৭ হিজরীর ঘটনা। আল-মালিকুস সালিহ'র বোন শামসুন্নিসা হাল্‌ব থেকে দামেশ্‌কে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। মেয়েটি যখন মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তার বয়স ছিলো ৮-৯ বছর। এখন সে পনের বছরের তরুণী। আল-মালিকুস সালিহ'র বয়স সতের-আঠার। শামসুন্নিসার সঙ্গে রক্ষী সেনারা আছে। খাদেমা নূরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রীকে সংবাদটি জানায়। কিন্তু তিনি মেয়েকে সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকৃতি জানান। খাদেমাও নারী। সে রোজি খাতুনকে মত করার জন্য বললো– 'মেয়েটা এতোদূর থেকে এতোদিন পর আসলো। আপনি তাকে ভেতরে ডেকে এনে বলে দিন, সে যেনো চলে যায়। স্নেহ বলতে একটা কথা তো আছে খালাম্মা!'

'আমার স্নেহ মরে গেছে।' রোজি খাতুন বললেন।

এমন সময় এক তরুণী রোজি খাতুনের নামায কক্ষে প্রবেশ করে। মেয়েটার মাথার চুল, মুখমণ্ডল ও পরিধানের পোশাকে ধূলির স্তর জমে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, দীর্ঘ সফর করে এসেছে। রোজি খাতুন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করেন– 'তুমি কে?'

মেয়েটি নীরব দাঁড়িয়ে আছে। খাদেমা এক ধারে সরে গেছে। রোজি খাতুন ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর বাহুদ্বয় আপনা-আপনি প্রসারিত হচ্ছে। মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এলো– 'তুমি আমার কন্যা, আমার শামসুন্নিছা।' রোজি খাতুন ধীর পদবিক্ষেপে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছেন আর ক্ষীণ গলায় বলছেন– 'তুমি এতো বড় হয়ে গেছো!' শামসুন্নিসা দরজা ঘেঁষে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে।

এখন মা-মেয়ের মধ্যখানে ব্যবধান দু'-তিন পা। রোজি খাতুন থেমে

যান। তার প্রসারিত বাহু গুটিয়ে আসে। এতোক্ষণ ঠোঁটে যে মুচকি হাসির আভা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, তা উবে গেছে। দু'-তিন পা অগ্রসর হওয়ার স্থলে দু'-তিন পা পিছিয়ে যান। হাসি হাসি দাঁতগুলো রাগে কড়মড় করতে শুরু করে। মায়ের হৃদয়সাগরে মমতার যে ঢেউ উত্থিত হতে শুরু করেছিলো, তা মিলিয়ে যায়।

'তুমি এখানে কেন এসেছো?' মা চাপা অথচ রোষান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

'মা!'– শামসুন্নিছা দু'বাহু প্রসারিত করে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– 'আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হতে এসেছি। আমি বারো দিনের পথ তিন দিনে অতিক্রম করে এসেছি মা!'

'কিন্তু কেন এসেছো?' রোজি খাতুন উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন এবং বললেন– 'কাছে এসো না, দূরে দাঁড়িয়ে উত্তর দাও। আমি ক্রুসেডারদের ছায়ায় লালিত একটি মেয়েকে আমার কাছে ঘেঁষতে দিতে পারি না।'

'মা! আগে আমার দু'টো কথা শোনো'– শামসুন্নিছা অতিশয় মিনতির স্বরে বললো– 'আমার গায়ের ধুলোবালি দেখো।'

'এই ধুলা থেকে আমি মুজাহিদীনে ইসলামের রক্তের ঘ্রাণ পাচ্ছি'– রোজি খাতুন বললেন– 'সেই মুজাহিদদের রক্ত, যারা আমার পুত্রের বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছে। এটা গৃহযুদ্ধের রক্ত।'

'মা!'– শামসুন্নিছা সম্মুখে এগিয়ে এসে মায়ের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে। শামসুন্নিছা কাঁদছে আর বলছে– 'ভাইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত মা। হয়তো এতোক্ষণে মারা গেছে। তিনি মা মা করে আপনাকে ডাকছেন। ভাইয়া বড় কষ্টে আছেন মা। তিনি আমাকে আপনাকে নিতে পাঠিয়েছেন। বলেছেন, তুমি মাকে নিয়ে আসো। আমি তার থেকে দুধের দাবি আর গুনাহ্ মাফ করাবো।'

'আমি তার দুধের দাবি ক্ষমা করতে পারি'– রোজি খাতুন বললেন– কিন্তু তার সেই খুন কে ক্ষমা করবে, যা সে মুসলমানের সন্তান হয়ে মুসলমানদের ঝরিয়েছে? মা স্বীয় পুত্রের গাদ্দারীর অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন না।'

'ভাইয়া আপনার একমাত্র পুত্র মা'– শামসুন্নিছা বললো– 'তিনি আপনার মহান স্বামীর একমাত্র স্মৃতি।'

'কিন্তু সে পিতার মহত্ত্ব-মর্যাদাকে ক্রুসেডারদের পায়ের তলে নিক্ষেপ করেছে।' রোজি খাতুন বললেন।

'তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছেন'–

শামসুন্নিছা বললো– 'এখন আর তাদের আপসে কোন যুদ্ধ হবে না।'

'তুমি কি আমাকে কসম খেয়ে বলতে পারবে, তার কাছে কোন খৃস্টান নেই'– রোজি খাতুন গর্জে ওঠে মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন– 'তার হেরেমে কি কোন ইহুদী-খৃস্টান মেয়ে নেই? এখন সে আঠার বছর বয়সের যুবক। তার নীচের ঘোড়াও অনুভব করতে পারে পিঠের আরোহী একজন পুরুষ। তুমি যদি আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারো, আমার পুত্রের দরবার থেকে খৃস্টানদের অশুভ ছায়া সরে গেছে, তাহলে বারো দিনের যে দূরত্ব তুমি তিন দিনে অতিক্রম করে এসেছো, সে পথ আমি দেড় দিনে অতিক্রম করে আমার মুমূর্ষু পুত্রের নিকট পৌঁছে যাবো।'

'ভাইয়ার এখন কোন নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকাবারও শক্তি নেই মা'– শামসুন্নিছা বললো– 'আপনি তার জন্য দু'আ করুন।'

'আমি দু'আ করবো না'– রোজি খাতুন বললেন– 'অভিশাপও দেবো না।'

আবেগে রোজি খাতুনের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। তবু থামছেন না। থামতে পারছেন না। বললেন– 'আমি কাউকে বদ দু'আ দেই না। কিন্তু কোন মায়ের 'আহ' মহান আল্লাহ উপেক্ষা করেন না। আমার ছেলে ক্ষমতার লোভে খৃস্টানদের ক্রীড়নক হয়ে হাজার হাজার মুসলমানকে শহীদ করেছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদের মা, স্ত্রী ও কন্যাদের সম্মুখে লজ্জিত হতে পারবো না। আমার হৃদয় উজাড়করা মমতা তাদের জন্য নিবেদিত। খুনী পুত্রের প্রতি আমার একবিন্দু মমতা নেই।'

'ভাইয়া নিজের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছেন মা।' শামসুন্নিছা কান্না বিজড়িত কণ্ঠে চীৎকার করে বললো।

'এও এক প্রতারণা মনে হচ্ছে'– রোজি খাতুন বললেন– 'আমি জানি, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী হাল্‌ব দখল করে নেয়ার পর সে তোমাকে এজাজ দুর্গ ভিক্ষা চাওয়ার জন্য আইউবীর নিকট পাঠিয়েছিলো। মহান সুলতান তোমাকে নিজের কন্যা মনে করে তোমাদেরকে দুর্গটা দান করেছেন। সে আগেই নিজে সুলতানের দরবারে আসলো না কেন? পরাজিত হওয়ার পর তো তাকে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন ছিলো। নিজে এসে তরবারীটা আইউবীর পায়ে রাখা দরকার ছিলো। আইউবী তার শত্রু ছিলেন না। সে তো তাঁকে মামা ডাকতো। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, গাদ্দারদের ঈমানদারদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সাহস হয় না। যারা নিজেদের ঈমান নীলাম করে দেয়, তারা কাপুরুষ ও প্রতারক

হয়ে থাকে। আমার পুত্র মালিকুস সালিহ্ গাদ্দার, কাপুরুষ, প্রতারক।'

'এতো পাষাণ হয়ো না মা।' শামসুন্নিছা মিনতির সুরে বললো।

'এই গৃহযুদ্ধে যতো মুসলমান শহীদ হয়েছে, তাদের মায়েরা অন্তরে পাথর বেঁধে রেখেছে'– রোজি খাতুন বললেন– 'তারা বলতে লজ্জাবোধ করছে, তারা যে সন্তানদেরকে ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রেরণ করেছিলো, তারা আপসে যুদ্ধ করে মারা গেছে। সেই মায়েদের দায়িত্ব কে বহন করবে? আমার ছেলে!'

'তখন তো তিনি অনেক ছোট ছিলেন মা।'

'তাহলে আমার কাছেই থাকতো'– রোজি খাতুন বললেন– 'আমি যা বলি শুনতো। যখনই তার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছিলো, আমার নিকট ফিরে আসতো। হাল্বকে সুলতান আইউবীর হাতে অর্পণ করে দিতো। তাতো সে করেনি।... তুমি চলে যাও। ইসলামের মায়েরা যদি মমতার জালে আটকা পড়ে যায়, তাহলে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মতো কেউ থাকবে না। আমি মমতাকে গলাটিপে মেরে ফেলেছি। আমার দেহ শহীদ হয়ে গেছে।'

'মায়েরা কি গর্ভজাত কন্যাদেরকে এভাবে বিদায় করে দেয়! বলো মা, বলো!' শামসুন্নিছা বললো।

'তুমি আমার কাছে থাকো'– রোজি খাতুন মেয়েকে বললেন– 'তবে শর্ত থাকবে, আমার সামনে কখনো ভাইয়ের নাম উচ্চারণ করবে না।'

'এটা সম্ভব নয় মা! এটা সম্ভব নয়'– শামসুন্নিছা বললো– 'যে ভাইটি তার বোনকে অপত্য স্নেহে লালন-পালন করে বড় করেছে, সে তার নাম মুখে নেবে না কেন মা!'

'তাহলে সেই ভাইয়ের কাছেই চলে যাও'– রোজি খাতুন বললেন– 'তুমি খৃস্টানদের ছায়ায় বড় হয়েছো। এখানকার মেয়েদের দেখো, তারা ইসলামের জন্য জান কুরবান করতে প্রস্তুত। আমি যখন তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করি, তাদের রাগ-ধমক দেই, তখন ভয় লাগে কেউ বলে বসে কিনা, নিজের মেয়ের খবর নেই, আমাদেরকে ধমকায়। তুমি কি এই নোংরা বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবে যে, আমার ছেলে খৃস্টানদের সঙ্গে মদপান করে এবং তার হেরেমে খৃস্টান ও ইহুদী মেয়েরা আছে?'

শামসুন্নিছা মস্তক অবনত করে ফেলে। অভিযোগটা সে অস্বীকার করতে পারলো না।

'যাও, হাত-মুখ ধুয়ে মায়ের ঘরে কিছু খেয়ে চলে যাও'– রোজি খাতুন

বললেন– 'ফিরে গিয়ে যদি আমার ছেলেটাকে জীবিত পাও, তাহলে বলবে, মা তোমার দুধের দাবি ক্ষমা করে দিয়েছেন; কিন্তু শহীদের রক্তের দাবি ক্ষমা করেননি। তাকে বলবে, তোমার বুকে যদি খৃস্টানদের তীর বিদ্ধ হতো আর তুমি সালতানাতে ইসলামিয়ার পতাকাতলে জীবন কুরবান করে দিতে, তাহলে তোমার মা উড়ে এসে পৌঁছে যেতেন এবং তোমার মৃতদেহ বুকে করে দামেশ্‌ক নিয়ে যেতেন এবং গর্বভরে বলতেন, এই আমার শহীদ পুত্রের মাজার। এখন আমি কী বলবো? মায়ের গর্ব তো পুত্র কেরে নিয়ে গেছে।'

শামসুন্নিছা অনেকক্ষণ যাবত নীরব দাঁড়িয়ে থাকে। তার মাথাটা অবনত। পরক্ষণে যখন সে মাথা উঠায়, ততোক্ষণে উভয় গণ্ডদেশে ধূলির যে স্তর জমাট হয়েছিলো, তার মধ্যদিয়ে অশ্রুর নদীর ন্যায় রাস্তা হয়ে গেছে। হঠাৎ মেয়েটি হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে হাঁটু গেড়ে বসে মায়ের আঁচল ধরে চুমো খেয়ে চোখের সঙ্গে লাগায়। সচেতন মেয়ে শামসুন্নিছা মাকে বুকে জড়িয়ে ধরেনি। কারণ, মায়ের নিষেধ আছে, খৃস্টানদের ছায়ায় লালিত মেয়ে যেনো তার কাছে না ঘেঁষে। শামসুন্নিছা খৃস্টানদের ছায়ায় লালিত মেয়েই বটে। এই মহাসত্য শামসুন্নিছা অস্বীকার করতে পারে না। শামসুন্নিছা উঠে দাঁড়িয়ে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বললো– 'তিনি আমার ভাই, আমার শৈশবের সঙ্গী। তিনি বোধ হয় বাঁচবেন না। আমি তার কাফন-দাফনের পর আপনার কাছে ফিরে আসবো মা।'

'কী জন্য?' রোজি খাতুন নিরতিশয় কঠিন ও তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন।

'আমি এমন একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেবো, যে আল্লাহর পথে শহীদ হবে'– শামসুন্নিছা বললো– 'আপনার পুত্রের বিনিময়ে আমি এমন একটি পুত্রের জন্ম দেবো, যার কবরের উপর স্বস্নেহে হাত বুলিয়ে আপনি গর্বের সাথে বলবেন, এটি আমার নাতির মাজার।... আমি ফিরে আসবো মা। আমি ফিরে আসবো। আপনি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে রাখুন। আমি চোখ বন্ধ করে এসেছিলাম। এখন চোখ খুলে ফিরে যাচ্ছি। আমাকে অনুমতি দিন, আমি নিজ হাতে ভাইয়ার কাফন পরাতে পারি।... বিদায় মা, বিদায়।'

শামসুন্নিছা পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে স্বভয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিলো। এখন বের হয়ে গেলো বুক ফুলিয়ে, ঘাড় উঁচু করে লম্বা পদক্ষেপে।

রোজি খাতুন মেয়ের প্রতি তাকিয়ে থাকেন। তিনি উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যান। তাঁর মুখ থেকে চীৎকার বেরিয়ে এলো– 'মেয়েটি আমার।' তিনি দরজাটা সামান্য ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকান। বাইরে থেকে

শামসুন্নিছার কণ্ঠ ভেসে আসে। মেয়েটি গর্জন করে বলছে- 'ইবনে আজর! সকল আরোহীকে ডাকো। জলদি করো। হাল্‌ব অভিমুখে রওনা হও। তাড়াতাড়ি করো।'

মা দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছেন। মেয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে অশ্বারোহী কাফেলার সকলের সম্মুখে চলে যাচ্ছে। কাফেলার গতি তার আদেশে উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে।

রোজি খাতুন দরজা বন্ধ করে দেন। চোখ তার অশ্রু-আবিল। খাদেমা ভেতরে প্রবেশ করলে তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন- 'আহা, মেয়েটা না খেয়েই চলে গেলো।'

মা-মেয়ের এই সাক্ষাতের ঘটনা ১১৮১ সালের নবেম্বর মাসের। সুলতান আইউবীর ইবনে লাউনকে পরাজিত করে তারই বাহিনীর সৈন্যদের দ্বারা তার দুর্গকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া এর দু'বছর আগের ঘটনা। দুর্গের ধ্বংসাবশেষগুলো নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছিলো। তার পরপরই সুলতান আইউবী খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনকে পরাজিত করেছিলেন। কৃতিত্বটা ছিলো মূলত একজন মুসলিম গোয়েন্দার। তারই সময়োচিত রিপোর্টের ভিত্তিতে সুলতান আইউবী এই সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

এটি বল্ডউইনের দ্বিতীয় পরাজয়। এর আগে তিনি সুলতান আইউবীর ভাই আল-আদিলের হাতে এমনিভাবে পরাস্ত হয়েছিলেন। এবার আইউবী তার কোমর ভেঙ্গে দিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন। এখন আর তার উঠে দাঁড়াবার শক্তিটুকু অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু ওখানে তিনি খৃস্টান সম্রাট একা তো নন। ইসলামী দুনিয়ায় একাধিক খৃস্টান বাহিনীর উপস্থিতি বিদ্যমান। তারা অন্তরের দিক থেকে একে অপরের প্রতিপক্ষ। কিন্তু সকলের শত্রু অভিন্ন। এ কারণে তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতেন। সকলেরই কামনা, কীভাবে একাকী অধিকতর অঞ্চলে দখল প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এ লক্ষ্যেই বল্ডউইন একাকী আল-আদিল ও সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তার সৈন্য ও উপকরণের অভাব নেই। অস্ত্রও আছে বিস্তর। আছে বিপুলসংখ্যক শক্তিশালী উট-ঘোড়া। কিন্তু তারপরও হেরে গেলেন।

বিক্ষিপ্ত সৈনিকদেরকে একত্রিত করতে কিছু সময় লেগে যায় বল্ডউইনের। ইতিমধ্যে সংবাদ পান, সুলতান আইউবী ইবনে লাউনকে

পরাজিত করে তার রাজত্ব ও সামরিক শক্তি দুর্বল করে দিয়েছেন। ইবনে লাউন আর্মেনীয় নাগরিক। আর্মেনীয়রা খৃস্টানদের মিত্র। তাদের পরাজয় খৃস্টানদের হৃদয়ে বেশ আঘাত হানে। সেই সঙ্গে বল্ডউইন আরো সংবাদ পান, ইবনে লাউনের রাজ্য তালখালেদ ও তার দুর্গ কারাহেসার আক্রমণে সুলতান আইউবীর ফৌজের সঙ্গে আল-মালিকুস সালিহ'র বাহিনীও ছিলো। এটি বল্ডউইনের জন্য একটি অতিরিক্ত দুঃসংবাদ। বল্ডউইন অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি এবং অন্যান্য খৃস্টান সম্রাটগণ অবশ্য জানেন, সুলতান আইউবী আল-মালিকুস সালিহকে পরাজিত করে তাকে নিজের অধীন করে নিয়েছেন। কিন্তু আল-মালিকুস সালিহ চুক্তি অনুযায়ী কাজ করবেন, তা তাদের ভাবনায় ছিলো না। না করাটা আস-সালিহ'র চরিত্র। তাদের ধারণা ছিলো, লোকটা উপরে উপরে সুলতান আইউবীর অনুগত হয়ে গেলেও খৃস্টানদের সঙ্গে বাঁধা গাঁটছড়া অটুট থাকবে। কিন্তু তাদের সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

বল্ডউইন জেরুজালেমে খৃস্টান সম্রাটদের হেডকোয়ার্টারে ফিরে যান। খৃস্টানদের আরেকটি হেডকোয়ার্টার আছে আক্রায়।

'আপনারা কি জানেন, মুসলমানরা আবারও ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে?' বল্ডউইন কমফারেন্সে খৃস্টান সম্রাট ও সেনানায়কদের উদ্দেশে বললেন- 'আল-মালিকুস সালিহকে আপনারা আপনাদের জোটভুক্ত মিত্র মনে করছেন আর তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে তার বাহিনী প্রদান করেছেন।'

'ইবনে লাউনের পরাজয় আমাদেরই পরাজয়'- ফিলিপ অগাস্টাস বললেন- 'আপনারা যদি ওৎ পেতে বসে থাকার পরিবর্তে ইবনে লাউনের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন এবং পেছন থেকে সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর আক্রমণ করতেন, তাহলে পরাজয় আইউবীরই হতো।'

'দেখুন, সালাহুদ্দীন আইউবীর অগ্রযাত্রার গতি পরিবর্তন করে তালখালেদ অভিমুখে মুখ করার সংবাদ যেমন আপনারা কেউ জানতেন না, তেমনি আমিও জানতে পারিনি।'

'এটা আপনার গোয়েন্দা ব্যবস্থার দুর্বলতা'- গাই অফ লুজিনান বললেন- 'আমরা অনেক দূরে ছিলাম। খোঁজ-খবর নেয়া এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থা সম্পন্ন করার দায়িত্ব আপনার ছিলো। আপনি নিকটে ছিলেন। আইউবীর বাহিনী আপনার সন্নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছে। কিন্তু আপনি টেরও পেলেন না। আপনি ওঁৎ পেতে চুপটি মেরে বসে রইলেন।'

'আমি জানতাম না, আমার সঙ্গে একজন মুসলমান আছে'– বল্ডউইন বললেন– 'আমি তাকে গুরুত্বহীন লোক মনে করতাম। সে আমার কয়েদী ছিলো। পরে পালিয়ে গিয়ে সুলতান আইউবীকে আমার তথ্য প্রদান করে। সে যা হোক এখন আমাদের ভাবনার বিষয়, আইউবী– আস-সালিহ'র ঐক্য কীভাবে ভেঙ্গে দেয়া যায়।'

'আপনি কি মুসলমানদের দুর্বলতাগুলো ভুলে গেছেন নাকি উপেক্ষা করছেন?'– এক খৃস্টান সম্রাট বললেন– 'আমরা যখন আস-সালিহ'র উপদেষ্টা, আমীর এবং সালারদেরকে উপঢৌকন ও বিলাস উপকরণ দিয়ে আমাদের হাতে এনেছিলাম, আস-সালিহ তখন কিশোর ছিলো। এখন যুবক হয়েছে। এখন তাকে হাতে আনা অধিকতর সহজ। আমরা আমাদের অস্ত্র ব্যবহার করি এবং বিশেষ উপহারটা দূত মারফত পাঠিয়ে দিই। আপনি যদি সামরিক শক্তির মাধ্যমে তাকে অনুগত বানাতে মনস্থ করে থাকেন, তাহলে এই ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। সুলতান আইউবীর বাহিনী এই অঞ্চলে উপস্থিত আছে। আপনারা যদি হাল্‌ব আক্রমণ করেন, তাহলে সুলতান আইউবী তার সমগ্র বাহিনীর কমান্ড নিজ হাতে তুলে নেবেন। তিনি যদি আমাদের উপর জয়ী নাও হতে পারেন, তবু আমাদের এই ক্ষতিটা অবশ্যই হবে যে, আস-সালিহ আমাদের হাত থেকে আজীবনের জন্য বেরিয়ে যাবে। ফিলিস্তীন আমাদেরকে রক্ষা করতেই হবে। আমরা আমাদের বাহিনীকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছি এবং লক্ষ্য রাখছি, সালাহুদ্দীন আইউবী কোন্‌দিকে মুখ করেন এবং তার পরিকল্পনা কী। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না। আপনি নিজের মতো করে আস-সালিহকে হাত করে নিন।'

১১৮০ সালে মসুলের গবর্নর সাইফুদ্দীন মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলে ইয্‌যুদ্দীন মাসউদ শাসন ক্ষমতা হাতে নেন। একই বছর সুলতান আইউবীর ভাই শামসুদ্দৌলা তুরান শাহ ইস্কান্দারিয়ায় মারা যান। সুলতান মিসরে চলে যান। সেখানকার পরিস্থিতি খারাপ হতে চলেছে। তিনি নিজ বাহিনীকে স্বীয় ভাই আল-আদিলের কমান্ডে পেছনে রেখে যান।

এখন ১১৮১ সাল। বল্ডউইন তার বাহিনীর সেনা সংখ্যা পূরণ করে নিয়েছেন। তাদের প্রশিক্ষণও সম্পন্ন করেছেন। তিনি নিজ বাহিনীকে সুলতান আইউবীর কৌশল মোতাবেক সামরিক মহড়াও করিয়ে নিয়েছেন।

এখন তিনি পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তার আগে তাকে আল-মালিকুস সালিহকে হাতে নেয়া আবশ্যক।

আল-মালিকুস সালিহ এখন কিশোর নয়– পরিণত যুবক। রাষ্ট্র পরিচালনা বুঝতে শুরু করেছেন। তার উপদেষ্টা ও সালারগণ হচ্ছেন তার দুর্বলতা, যারা তলে তলে খৃস্টানদের সহযোগী-সমর্থক। সুলতান আইউবীর সঙ্গে তিনি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন বটে; কিন্তু রাজত্বের পোকা এখনো মাথা থেকে বের হয়নি। এখনো তিনি স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।

একদিন তার নিকট সংবাদ আসে, খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনের দূত এসেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভেতরে নিয়ে আসার অনুমতি প্রদান করেন। এই দূত নাশকতার ওস্তাদ এবং মানবীয় দুর্বলতা বিষয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি। সে আল-মালিকুস সালিহকে জানায়, আপনার জন্য কিছু উপহারও নিয়ে এসেছি।

কী উপহার? মহা মূল্যবান হীরা-জহরত ও স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি বাক্স। দু'টি তরবারী। পঁচিশটি উন্নত জাতের ঘোড়া। আর? আর একটি মেয়ে।

আস-সালিহ বাইরে গিয়ে ঘোড়াগুলো দেখেন। হীরা-জহরত-স্বর্ণমুদ্রাগুলোও দেখেন। কিন্তু যে উপহারটির উপর তার চোখ আটকে যায়, সেটি হলো মেয়ে।

আস-সালিহ অনেকক্ষণ যাবত মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে থাকেন। তার উঠতি যৌবনের সবগুলো দুর্বলতা একটি যাদুর রূপ ধারণ করে বিবেকের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। তিনি হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন, তিনি যৌবনে পদার্পণ করেছেন এবং তিনি টগবগে এক যুবক।

দূত আস-সালিহ'র হাতে বল্ডউইনের একটি বার্তা প্রদান করে। পত্রখানা আরবীতে লেখা। কিন্তু খৃস্টান সম্রাটের পত্রের প্রতি তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। মেয়েটি তার কল্পনার চেয়েও বেশি রূপসী।

দূত পত্রখানা খুলে অন্য চিন্তায় বিভোর আস-সালিহ'র সম্মুখে রেখে দেয়। এবার তার চৈতন্য ফিরে আসে। তিনি পত্রখানা পাঠ করেন। বল্ডউইন লিখেছেন–

'প্রিয় হাল্‌বের গবর্নর আল-মালিকুস সালিহ! আমি দূত ও উপহারের পরিবর্তে বাহিনী প্রেরণ করতে পারতাম। কিন্তু আমি আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ প্রয়োজন অনুভব করি না। আপনি আমার বন্ধু ও সন্তানতুল্য। আপনি যখন কিশোর ছিলেন এবং সালাহুদ্দীন আইউবী আপনার

সালতানাতের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন, তখন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছিলাম। আমি আক্ষেপে ফেটে যাচ্ছি, গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীন আপনাকে বন্ধুত্বের ধোঁকায় রেখেছে। আমরাও তাদের প্রতারণা ধরতে পারিনি। আপনি যদি একা হতেন, তাহলে আপনার বাহিনী পরাজিত হতো না। আপনি দেখেছেন, গোমস্তগীন কত বড় ধোঁকাবাজ ছিলো, যার ফলে আপনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। সাইফুদ্দীনও আপনাকে বরাবরই ধোঁকার মধ্যে রেখেছে। সে হাল্বের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলো। আমরা তাকে তার প্রত্যয়-পরিকল্পনা থেকে বিরত রেখেছি।....

অবশেষে আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট পরাজয়বরণ করেছেন, যা আপনাকে তার আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য করেছে। আপনি এতোই অসহায় হয়ে পড়লেন যে, আপনি ইবনে লাউনের উপর আক্রমণ করার জন্য তাকে সৈন্য দিতে বাধ্য হলেন। আমি ভালো করেই জানি, আপনার ন্যায় একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যোদ্ধা এই অপমান সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু আপনি তো সঙ্গীহীন ছিলেন। আমি নিজেও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। অন্যথায় আমি আপনার সাহায্যে ধেয়ে আসতাম। এখন আমি আপনাকে নিয়ে ভাববার সুযোগ পেয়েছি। আপনার ভুলে গেলে চলবে না, সালাহুদ্দীন আইউবী আপনাকে এমন এক স্বায়ত্তশাসন দান করেছেন, যার অর্থ দাসত্ব। তিনি আপনাকে ধীরে ধীরে গোলামে পরিণত করছেন। তিনি ইযযুদ্দীনের সাহায্যার্থে আর্মেনীয়দের পরাজিত করেছেন এবং তাকে নিজের অনুকম্পার শিকলে বেঁধে ফেলেছেন। সমস্ত ছোট ছোট আমীর তার আনুগত্য মেনে নিয়েছে। এখন তার দৃষ্টি আপনি ছাড়াও মসুল ও হাররানের উপর নিবদ্ধ।...

ভেবে দেখুন, তিনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মিসর থেকে সৈন্য নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তালখালেদের উপর গিয়ে আক্রমণ করলেন এবং আপনার থেকেও সৈন্য নিলেন। এখন আবার মিসর ফিরে গেছেন। তার এই যাওয়ার রহস্য কী? গোয়েন্দারা আমাদেরকে অবহিত করেছে, তিনি বিপুল পরিমাণ ধন-ভাণ্ডার নিয়ে গেছেন। সেগুলো কায়রোতে রেখে আবার ফিরে আসবেন। বলুন তো, আপনাকে তিনি কী দিয়েছেন? আপনার বাহিনীকে তিনি গনীমতের সম্পদের কতো অংশ দিয়েছেন? তিনি জেরুজালেম অভিমুখে কেন অগ্রযাত্রা করলেন না? আপনি কি জানেন, তিনি আর্মেনীয়দের কয়েকটি মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন?...

আমি জানি, এসব প্রশ্ন আপনার মস্তিষ্ককে আউলা-ঝাউলা করে দেবে। আপনার নিকট সালাহুদ্দীন আইউবীর চরিত্র এবং তার নিয়তের প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমরা এই ভূখণ্ডে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছি। আমরা এও জানি, সুলতান আইউবী আমাদেরকে এখান থেকে উৎখাত করে ইউরোপের উপর আক্রমণ করার এবং নিজের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটানোর ভাবনা ভাবছেন। তিনি আপনাকে এবং অন্যান্য আমীরদেরকে নিজের থলের মুদ্রা জ্ঞান করেন। আপনি যদি নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করেন, তাহলে আপনার নাম-চিহ্ন মুছে যাবে। এখানে আমরা ইউরোপের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করছি। আমার বক্তব্য যদি আপনার বুঝে এসে থাকে, তাহলে আমাকে উত্তর দিন। আমি আপনাকে উপদেষ্টা পাঠিয়ে দেবো, যে আপনার আর্থিক ও সামরিক প্রয়োজনের পরিসংখ্যান নিয়ে আমাকে অবহিত করবে। আমি যে ঘোড়াগুলো প্রেরণ করেছি, এগুলো আপনার জন্য উপহার। আপনার ফৌজের জন্য আমি এমন হাজার হাজার ঘোড়া দিতে পারি। ইউরোপ থেকে আমি নতুন অস্ত্র চেয়ে পাঠিয়েছি। তাও আপনাকে দিয়ে দেবো। আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করবেন না। উপরে উপরে তার অনুগত থেকেই আপনি নিজের প্রতিরক্ষা শক্ত করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি।'

ইহুদীদের চিত্তহারী রূপসী এই মেয়েটি শুরুতেই আল-মালিকুস সালিহ'র তরুণ মস্তিষ্কটা কব্জা করে ফেলে। বার্তার প্রতিটি শব্দ যাদুর ন্যায় তার হৃদয়ে গেঁথে যায়। তিনি দূতের বিশ্রাম ও খাওয়ার এমন আয়োজনের নির্দেশ প্রদান করেন, যেনো বল্ডউইন নিজেই এসে হাজির হয়েছেন। তারপর তিনি নিজেকে মেয়েটির হাতে সপে দেন। আল-মালিকুস সালিহ এর চেয়েও অধিক রূপসী মেয়ে দেখেছেন। কিন্তু এই মেয়েটি অপূর্ব ভাবভঙ্গি আর মুচকি হাসি তার রূপে অবিশ্বাস্য এক যাদুকরি ক্রিয়া সৃষ্টি করে রেখেছে।

আস-সালিহ অন্ধ হয়ে যান।

রাতে যখন মেয়েটি আল-মালিকুস সালিহ'র শয়নকক্ষে প্রবেশ করে, তখন তার হাতে পিপা ও পেয়ালা। এগুলোও তার সঙ্গে উপহার হিসেবে আসা। মেয়েটি তাকে বললো, এগুলো ফ্রান্সের মদ, যা কিনা শুধু সম্রাটদের জন্যই প্রস্তুত হয়ে থাকে।

'আপনার হেরেমে কিছুই তো নেই'– মেয়েটি বললো– 'আপনি কি প্রয়োজন মনে করেন না আপনার হেরেমটা সজ্জিত হোক?'

'আমার হেরেমের জন্য তুমি একাই যথেষ্ঠ।' আস-সালিহ্ বললেন।

'আমি আমার ন্যায় আরো মেয়েদের দ্বারা হেরেম ভরে দেবো'– মেয়েটি মদের পেয়ালাটা আস-সালিহ'র হাতে দিতে দিতে বললো– 'এটা কি সত্য, সালাহুদ্দীন আইউবীর একজনই স্ত্রী এবং তিনি কাউকে হেরেমে নারী রাখার অনুমতি দেন না?'

'হ্যাঁ'– আস-সালিহ্ জবাব দেন– 'এটাও ঠিক, তিনি মদপানের অনুমতি দেন না।'

'আপনি তাহলে জানেন না তার একটি গোপন হেরেম আছে, যাতে অসাধারণ সুন্দরী মেয়েরা আছে। তাদের মধ্যে মুসলমান আছে, ইহুদী-খৃষ্টানও আছে।' মেয়েটি বললো।

ঝাড়বাতির রঙিন ও হাল্কা মিষ্টি আলো আর ফ্রান্সের মদের নেশার মধ্যে এই মেয়েটি আপাদমস্তক যাদুর রূপ ধারণ করে আস-সালিহ্কে প্রভাবিত করে চলেছে। ক্ষণিকের মধ্যেই তিনি মেয়েটির রেশমী চুলের শিকলে বন্দী হয়ে যান।

রাত পোহাবার পর চোখ মেলে আল-মালিকুস সালিহ মেয়েটিকে বললেন– 'এখানে আমার এক বোন আছে। তুমি তার মুখোমুখি হবে না। বিবাহ ছাড়া কোন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া সে পছন্দ করে না। তোমার-আমার এই সম্পর্ক সে মেনে নেবে না। সুযোগ মতো আমি তাকে বলে দেবো, তুমি মুসলমান এবং আমার সঙ্গে বিয়ে বসতে এসেছো।'

'বোনকে মুক্ত করে দেন না কেন?'– মেয়েটি বললো– 'তাকে পুরুষদের সঙ্গে উঠা-বসা করতে দিন। সে রাজকন্যা। আপনি রাজা। সালাহুদ্দীন আইউবী আপনার পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করছেন। আমরা আপনার বোনকে আলাদা একটা রাজ্য দিয়ে রাণী বানিয়ে দেবো।'

আল-মালিকুস সালিহ্ স্বপ্নের রাজা হয়ে যান।

'কী সংবাদ এনেছো?' বল্ডউইন মদমাতাল কণ্ঠে দূতকে জিজ্ঞেস করেন।

'আমি কখনো ব্যর্থ হয়ে ফিরেছি নাকি?' দূত জবাব দেয়। সে আল-মালিকুস সালিহ'র প্রাসাদে চার দিনের দীর্ঘ সফর শেষে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে। সে বললো– 'মুসলমানদের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করে আপনারা অযথা জীবন ও সম্পদহানি করছেন। একটি মেয়েই তো মুসলমানদের শাসকদের হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে আনতে যথেষ্ঠ।'

'মেয়ে নয়'– বল্ডউইন বললেন– 'মুসলমানকে যদি তুমি একটি মেয়ের শুধু কল্পনা দাও, তাতেই সে নিজের নেক-বদ ভুলে গিয়ে সেই কল্পনার গোলাম হয়ে যায়। এবার বলো, তুমি কী করে এসেছো?'

'তিনি লিখিত উত্তর দেননি'– দূত বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা ও কমান্ডো সেনারা সর্বত্র গিজ গিজ করছে। লিখিত উত্তর দিলে পাছে ধরা পড়ে যায় কিনা। তিনি আপনার সব বক্তব্য মেনে নিয়েছেন। তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক নন। তবে সন্ত্রস্ত এবং আইউবীর মোকাবেলায় নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করছেন। আপনার বার্তা তাকে অনেক সাহস যুগিয়েছে। তিনি বলেছেন, আপনি আপনার উপদেষ্টা পাঠিয়ে দিন, তবে তাকে যেতে হবে বণিকের বেশে। ওখানকার সকলকে বলবে, সে উচ্চ পর্যায়ে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা করতে এসেছে।'

'তার মনে কোন সন্দেহ নেই তো?' বল্ডউইন দূতকে জিজ্ঞেস করেন।

'আপনি তাকে ইহুদীদের যে উপহারটা প্রদান করেছেন, সে সন্দেহ করার কোন অবকাশ থাকতে দেয়নি'– দূত জবাব দেয়– 'আমি সেখানে চারদিন অবস্থান করেছি। এ সময়টায় আমি তার সালারদের ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, কথাবার্তা বলেছি ও মতবিনিময় করেছি। তাদের অনেকে আইউবীর সমর্থক। আমি তাদের দু'জনকে হাত করে নিয়েছি। তাদেরকে আমি বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং লুকিয়ে লুকিয়ে উপহারও দিয়েছি। ওখানে সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দাও আছে। সে কারণে কোন কথাই গোপন রাখা সম্ভব হয় না। তথাপি আল-মালিকুস সালিহকে আপনারই লোক মনে করুন। যে দু'জন সালারকে হাত করে এসেছি, মেয়েটির সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। সে তার দায়িত্ব পালন করবে। আপনি তাড়াতাড়ি উপদেষ্টা পাঠিয়ে দিন।'

এই দূত শুধু দূতই নয়; মানুষের মনস্তত্ব নিয়ে খেলা করার দক্ষ ওস্তাদ। সে বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবী তার অফিসার-কর্মকর্তা ও দেশের জনগণকে উপদেশ দিয়ে থাকেন, রাজত্বের স্বপ্ন-মোহ, সম্পদ ও নারী এই তিনটি বিষয় মানুষের ঈমানকে নিঃশেষ করে দেয়। এই তিনটি বস্তু যখন একজন বিজ্ঞ আলেমেরও সম্মুখে এসে হাজির হয়, তারও ঈমানের পা উপড়ে যায়। এটা মানবীয় দুর্বলতা। তখন তাকে ওয়াজ শুনিয়েও কোন লাভ হয় না।'

বল্ডউইন তখনই তিনজন উপদেষ্টা ঠিক করে ফেলেন। তারা রওনা হয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

ব্যবসার পণ্য বোঝাই অনেকগুলো উটের একটি কাফেলা হাল্‌বে আল-মালিকুস সালিহ'র প্রাসাদের সামান্য দূরে এসে দাঁড়িয়ে যায়। কাফেলায় জনাকতক লোক। তন্মধ্যে তিনজন এ্যারাবিয়ান পোশাক পরিহিত। উটগুলোকে দাঁড় করিয়ে রেখে এই তিনজন প্রাসাদের দিকে হাঁটা দেয়। দারোয়ান তাদের থামিয়ে দেয়। তারা নিজেদের ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে আলোচনার জন্য আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে বলে জানায়। বললো, আমরা হীরা এবং অন্য আরো মহা-মূল্যবান কিছু পণ্য নিয়ে এসেছি, যেগুলো রাজা-বাদশাগণ ক্রয় করে থাকেন। তাছাড়া আমরা আপনাদের রাজার সাথে হাল্‌বের সঙ্গে ব্যবসা করার ব্যাপারেও আলোচনা করবো। রক্ষী কমান্ডার ইবনে খতীব তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে। আলাপ জমিয়ে তাদেরকে মুক্তমনে কথা বলার সুযোগ করে দেয়। সে লোকগুলোর চোখের সবুজ ও নীলাভ বর্ণ এবং মুখশ্রীটা গভীরভাবে পরখ করে দেখে। তার জানা আছে, ব্যবসা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা কখনো সরাসরি রাজার সঙ্গে হয় না।

ইবনে খতীব লোকগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

'আপনাদের আসল উদ্দেশ্যটা বলুন।' ইবনে খতীব বললো।

'বলেছি তো আমরা ব্যবসায়ী। পণ্য বিক্রি করতে এবং আপনাদের রাজার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি।' লোকগুলো বললো।

'জেরুজালেম থেকে এসেছেন, নাকি আক্রা থেকে?' ইবনে খতীব জিজ্ঞেস করে।

'আমরা ব্যবসায়ী'– একজন উত্তর দেয়– 'আমরা সব দেশেই যাই। জেরুজালেম-আক্রায়ও যাই। আপনার সন্দেহটা কী?'

'না, আমার কোন সন্দেহ নেই'– ইবনে খতীব বললো– 'আমি নিশ্চিত, আমি আপনাদের তিনজনকেই চিনি। তবে আপনারা আমাকে চেনেন না। আমি আপনাদেরই লোক। আমার নাম ইবনে খতীব। এটা আমার আসল নাম নয়। হারমান আমাকে ভালো করেই জানেন।'

ইবনে খতীব কিছু সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করে, যেগুলো খৃস্টানদের গুপ্তচররা পরস্পর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকে। ব্যবসায়ীগণ– যারা মূলত বল্ডউইনের প্রেরিতে উপদেষ্টা– মুচকি হাসে। তাদের বলে দেয় হয়েছিলো, আল-মালিকুস সালিহ'র দরবারে খৃস্টান

গোয়েন্দা আছে। ইবনে খতীব নিশ্চিত করে দেয়, সে তাদেরই গুপ্তচর।

'আপনারা কি সেই উদ্দেশ্যেই এসেছেন?'– ইবনে খতীব জিজ্ঞেস করে– 'আমাকে বলতে সমস্যা নেই। অন্যথায় আপনাদের ভেতরে যেতে দেয়া হবে না।'

'হ্যাঁ'– একজন অস্ফুট স্বরে বললো– 'সে উদ্দেশ্যেই। আচ্ছা, এই প্রাসাদে সালাহুদ্দীন আইউবীর চর আছে কি?'

'আছে'– ইবনে খতীব উত্তর দেয়– 'তবে তাদের উপর আমরা নজর রাখছি। আমরা আপনাদেরকে তাদের থেকে লুকিয়ে রাখবো। কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্য এবং তৎপরতা সম্পর্কে আমাকে পুরোপুরি অবহিত করতে হবে।'

গোপন সাঙ্কেতিক শব্দ এবং বর্ণনাভঙ্গি থেকে আগন্তুক তিন খৃস্টান নিশ্চিত হয়ে যায়, ইবনে খতীব তাদেরই লোক। তারা ইবনে খতীবকে তাদের উদ্দেশ্য খোলাখুলি ব্যক্ত করে। ইবনে খতীব ভেতরে ঢুকে আল-মালিকুস সালিহকে সংবাদ জানায়– 'তিনজন ব্যবসায়ী আপনার সাক্ষাৎ কামনা করছে।'

'তুমি কি রক্ষী বাহিনীর নতুন কমান্ডার?' আল-মালিকুস সালিহ জিজ্ঞেস করেন।

'জ্বি হুজুর।' ইবনে খতীব জবাব দেয়।

'বাড়ি কোথায়?'

ইবনে খতীব একটি গ্রামের নাম বলে। আল-মালিকুস সালিহ বললেন– 'আমি যখন তখন যার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি না। ভবিষ্যতে খেয়াল রাখবে। আচ্ছা, তাদেরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

ইবনে খতীব বেরিয়ে গিয়ে আগন্তুকদের ভেতরে যেতে বলে এবং বিশেষ ভঙ্গিতে চোখ টিপে বলে দেয় অনেক সাবধানে কথা বলবেন।

এখন রাত। ঈশার নামাযের পর। ইবনে খতীব জামে মসজিদের ইমামের নিকট উপবিষ্ট। আরো দু'জন লোক আছে।

'এখন আর কোন সন্দেহ থাকলো না যে, আল-মালিকুস সালিহ পুনরায় খৃস্টানদের ফাঁদে চলে আসছেন'– ইবনে খতীব বললো– 'আমি আপনাকে প্রথমে একজন দূতের আগমন এবং উপহারের সংবাদ অবহিত করেছিলাম। সেসব খৃস্টানদের পক্ষ থেকে এসেছিলো। উপহারের মধ্যে একটি অপরূপা সুন্দরী মেয়েও ছিলো। আজ প্রমাণিত হয়ে গেলো, সেই

দূত বদ্দুইনের পক্ষ থেকে এসেছিলো। আজ তিনজন ব্যবসায়ী আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা করতে এসেছে। আপনি জানেন, আমি দুই বছর বায়তুল মুকাদ্দাসে খৃস্টানদের মাঝে অবস্থান করে গুপ্তচরবৃত্তি করেছি। আজ যে তিন ব্যক্তি এসেছে, তাদের চেহারা এবং বর্ণনাভঙ্গি প্রমাণ করছে, তারা যে এ্যারাবিয়ান পোশাক পরিধান করেছে, এটা তাদের ছদ্মবেশ। আমি তাদেরই লোক দাবি করে তাদের আসল রূপ দেখে নিয়েছি। বায়তুল মুকাদ্দাসের চরবৃত্তি আজ আমাকে অনেক উপকার করেছে। আমি তাদের সঙ্কেত জানি, বিশেষ ইঙ্গিতও বুঝি। মুহ্তারাম আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণের সুফল আজ আমি চোখে দেখেছি।'

ইবনে খতীব সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর। অল্প ক'দিন হলো হাল্‌বে এসেছে এবং আল-মালিকুস সালিহ'র এমন একজন নায়েব সালারের মাধ্যমে এখানকার রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছে, যিনি মূলত সুলতান আইউবীর সমর্থক। ইবনে খতীব আলী বিন সুফিয়ানের একজন বিচক্ষণ ও নির্ভীক গোয়েন্দা। বায়তুল মুকাদ্দাসে খৃস্টান সম্রাট ও সেনা অধিনায়কদের হেডকোয়ার্টারে দু'বছর অবস্থান করে সফল গুপ্তচরবৃত্তি করে এসেছে।

হাল্‌বের জামে মসজিদের এই ইমাম সে সকল গোয়েন্দাদের কমান্ডার, সুলতান আইউবী যাদেরকে হাল্‌বে প্রেরণ করে রেখেছেন। যার রিপোর্ট দেয়ার প্রয়োজন হয়, ঈশার নামাযে মসজিদ গিয়ে ইমামকে দিয়ে আসে। ইমাম এই সময়টায় গোয়েন্দাদের রিপোর্ট নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। সেসব রিপোর্টের সত্যতা ও বাস্তবতা যাচাই করে তিনি সুলতান আইউবীর নিকট প্রেরণ করেন। এখন ইবনে খতীব অতিশয় মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে ইমামের সম্মুখে বসা।'

এমন সময় এক মধ্যবয়সী মহিলা এসে হাজির হয়। মহিলা মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো বোরকায় ঢাকা। ভেতরে প্রবেশ করেই সে বোরকাটা খুলে ফেলে। বোরকার ভেতরের মানুষটাকে দেখেই সকলে হেসে ওঠে। মহিলা আল-মালিকুস সালিহ'র চাকরানী। আস-সালিহ'র শয়ন কক্ষের দেখাশোনা করা তার দায়িত্ব। তার সকল গোপন তথ্য এই মহিলার পেটে। সেদিনই সে ইমামকে রিপোর্ট করেছিলো, খৃস্টানদের পক্ষ থেকে আল-মালিকুস সালিহ'র নিকট একটি মেয়ে এসেছে, যে কিনা আকার, গঠন, শরীর এবং অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখের ভাষায় আপাদামস্তক একটা যাদু, যার

থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তি ইয়া বড় অলি-দরবেশেরও নেই। রূপের এক মূর্ত প্রতীক মেয়েটি। চাকরানী ইমামকে জানিয়ে রেখেছে, আস-সালিহ'র নিয়মতান্ত্রিক হেরেম নেই। কিন্তু নারী ছাড়া তার রাত কাটে না। নারী তার দুর্বলতায় পরিণত হয়েছে।

'... কিন্তু আমার কাছে মেয়েটা ইহুদী মনে হচ্ছে'– চাকরানী বললো– 'আস-সালিহকে সে নিজের গোলাম, বরং কয়েদী বানিয়ে নিয়েছে। লোকটা এমনই পাগল হয়ে গেছে যে, গর্বভরে আমাকে জিজ্ঞেস করে– মেয়েটাকে কি তোমার পছন্দ হয়?' আমি কি ওকে বিয়ে করে নেবো?' আমি একবার বলেছিলাম, আপনার বোনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সে কী বলে। কিন্তু তিনি আমাকে শক্তভাবে বলে দেন, খবরদার ওকে কিছু বলবে না।'

আস-সালিহ'র চাকরানীও গোয়েন্দা। সে ইমামকে বিস্তারিত জানায়, আল-মালিকুস সালিহ পুরোপুরি মেয়েটির জালে আটকা পড়ে গেছেন। এখন আর অন্য কোন নারী তার শয়নকক্ষে ঢুকতে পারে না। কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো, এখনই সুলতান আইউবীকে রিপোর্ট করবো নাকি দেখবো খৃস্টানরা কী করে কিংবা আস-সালিহকে দিয়ে কী করায়।'

ইমাম বললেন– 'আমার অভিমত হচ্ছে, আস-সালিহ যদি চুক্তি পরিপন্থী কোন আচরণ করে, তবেই সুলতানকে বিস্তারিত জানাবো।'

'সুলতান আইউবী মিসর চলে গেছেন'– অপর একজন বললো। লোকটি বৃদ্ধ এবং মনে হচ্ছে বিচক্ষণ– 'এদিকে আল-আদিল আছেন। সুলতানের সিদ্ধান্ত না নিয়ে তিনি কোন অভিযান পরিচালনা করবেন না। ততোক্ষণে এখানকার পরিস্থিতি এমন রূপ ধারণ করতে পারে, যা হয়তো আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। আমাদের এমন কিছু করা দরকার, যার ফলে এই ধারাটি এখানেই শেষ হয়ে যায়।

'আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি'– চাকরানী ইমামকে উদ্দেশ্য করে বললো– 'আস-সালিহ'র মনোযোগ শুধু মেয়েটির প্রতি। মেয়েটি ছাড়া তিনি এখন কিছুই বোঝেন না। ভাল-মন্দ ভাববার শক্তি তার নেই। মেয়েটি দিনের বেলায়ও তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে রাখে। হতভাগা আগেও মদপান করতেন. তবে শুধু রাতে পান করতেন। তাছাড়া এতো বেশি করতেন না। নেশা অবস্থায় বোনের মুখোমুখি হতেন না। বোনের সঙ্গে দিনে সাক্ষাৎ করতেন। এখনকার অবস্থা হলো, এই মেয়েটি আসার পর থেকে এ যাবত ভাই-বোনের সাক্ষাৎ ঘটেনি। বোনের মাঝে পিতার

কৌলিন্য আছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলি, রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম এতো বেড়ে গেছে যে সময় পান না।... যা হোক, আমার পরামর্শ হলো, মেয়েটিকে গুম করে ফেলা দরকার। তবেই আস-সালিহ্ দিকদিশা হারিয়ে ফেলবেন।'

প্রস্তাবের উপর দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। ইবনে খতীব বললো, আমি বণিক তিনজনকেও গায়েব করে ফেলতে পারবো। কাজটা সহজ না হলেও অসম্ভব নয়।

১১৮১ সালের নবেম্বর মাস। উটের কাফেলা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ কেনাকাটা করছে। তিন খৃস্টান উপদেষ্টা আল-মালিকুস সালিহ্'র সঙ্গে সাক্ষাৎ-যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। তারা আস-সালিহ্‌কে বল্ডউইনের পরিকল্পনা মাফিক ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করছে। দিনটা নবেম্বর মাসের ১৬ কি ১৭ তারিখ। ৫৭৭ হিজরীর ৭ কিংবা ৮। রাতে আল-মালিকুস সালিহ্ বিরাট এক ভোজের আয়োজন করেছেন। কারণটা বাহ্যত বুঝা যাচ্ছে না। বিষয়টা জানেন আস-সালিহ্'র দু'জন সালার। আস-সালিহ্ খৃস্টান উপদেষ্টাদের সঙ্গে গোপন চুক্তি সম্পন্ন করেছেন। সে উপলক্ষেই এই ভোজের আয়োজন। মেহমান অসংখ্য। তন্মধ্যে বণিকবেশী তিন খৃস্টান উপদেষ্টাও আছে। কাফেলার উষ্ট্রচালকরাও আজকের এই ভোজসভার বিশিষ্ট মেহমান। কিন্তু আসলে তাদের উপস্থিতি উষ্ট্রচালকের বেশে নয়; তারা উষ্ট্রচালকও নয়। তাদের কেউ গোয়েন্দা, অন্যরা খৃস্টান বাহিনীর অফিসার। উষ্ট্রচালক তাদের ছদ্ম পরিচয়। ভোজের আসরে ইহুদী মেয়েটিও আছে। আছে আস-সালিহ্'র বোনও। কিন্তু তার দায়িত্ব আয়োজন তদারকি করা।

আজ রাত রক্ষীসেনাদের তৎপরতা কম। মেহমানগণ দলে দলে আসছে। কোন আশঙ্কা বোধ হচ্ছে না। অন্তত আস-সালিহ্'র মনে কোন শঙ্কা নেই। মদপানের ধারা চলছে। আস্ত খাসীর রোস্ট তৈরি করা হয়েছে। খোলা মাঠে জাঁকজমকপূর্ণ প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে। রাত যতো গভীর হচ্ছে, আসরের রং ততোটা উজ্জ্বল হচ্ছে। সর্বত্র মেহমানদের পদচারণা বিরাজ করছে।

ইহুদী মেয়েটি ফাং ফাং করে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। মেয়েটি কার সঙ্গে যেনো সাক্ষাৎ করে এদিকে আসছিলো। এমন সময় চাকরানী তাকে দাঁড় করিয়ে একজন সালারের নাম করে বললো, কি এক প্রয়োজনে তিনি আপনাকে

যেতে বলেছেন। মেয়েটি জানে, সালার তাদের লোক। সে সালারের নিকট চলে যায়। কিন্তু আর ফিরে আসেনি। কী হলো, কোথায় গেলো, কেউ বলতে পারছে না। ঘটনাটা আস-সালিহ্ এখনো জানতে পারেননি।

ইবনে খতীব আজ রাত ডিউটিতে নেই। সুযোগ সৃষ্টি করে সে তিন বণিকের একজনের সঙ্গে কথা বলে বললো– 'আপনারা তিনজন এখান থেকে বেরিয়ে যান। অন্যথায় মারা পড়বেন। বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। সুলতান আইউবীর কমান্ডোরা জেনে ফেলেছে, আপনারা মেহমানের বেশে এখানে আছেন।'

ইবনে খতীব একটি জায়গার নাম বলে বললো– 'আপনারা ওখানে চলে আসুন।'

'আমাদের চলে যাওয়ার সময়ও হয়ে গেছে'– খৃস্টান বললো– 'আমাদের কাজ হয়ে গেছে।'

'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন'– ইবনে খতীব বললো– 'অন্যথায় সকালে এখান থেকে আপনাদের লাশ বের হবে।'

তৎক্ষণাৎ খৃস্টান লোকটি কথাটা তার সঙ্গীদের কানে দেয়। তারা একজন একজন করে প্রাসাদ থেকে এমনভাবে বেরিয়ে পড়ে, যেনো কারো মনে সন্দেহ না জাগে। প্যান্ডেলের ভেতর থেকে সাবধানে বের হয়েই তারা অন্ধকার পথে ঢুকে পড়ে। ইবনে খতীব তিনটি ঘোড়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। সেও একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। আসরে নাচ-গান চলছে। আমোদে উন্মাতাল অতিথিগণ। হট্টগোল এতো যে, চারটি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ কারো কানেই প্রবেশ করেনি। আস-সালিহ্ টেরই পাননি যে, তার বিশিষ্ট তিন মেহমান কাল্পনিক বিপদ থেকে পলায়ন করে প্রকৃত বিপদের মধ্যে চলে গেছে।

লোকালয় থেকে দূরে ঝুপড়ির মতো একটি ঘর। তিন খৃস্টান সেই ঘরে বসা। ইবনে খতীব মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে যে, তাদের জীবন রক্ষা পেয়ে গেছে। তারা তাদের উষ্ট্রচালকদের সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ইবনে খতীব তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করে। তাদেরকেও বের করে আনা হলে ইবনে খতীব বললো, আস-সালিহ্'র সঙ্গে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমার জানা দরকার। আমাকেও তো সতর্ক থাকতে হবে। তারা বললো, আমরা আস-সালিহ্কে নেপথ্য থেকে সমর সরঞ্জাম ও ঘোড়া দেবো। তার বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবো। গোয়েন্দা দেবো। আর যখন তিনি সুলতান

আইউবীর উপর আক্রমণ করবেন, তখন আমরা আইউবী বাহিনীর উপর পেছন থেকে আক্রমণ করবো। মোটকথা, আস-সালিহ আইউবীর সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলবেন। কিন্তু যুদ্ধ তখন করবেন, যখন আমরা তাকে সবুজ সঙ্কেত দেবো।

'এখনই কি আমাদের রওনা হওয়া উচিত না?' এক খৃস্টান বললো।

'হ্যাঁ'– ইবনে খতীব বললো– 'আপনাদের রওনা হওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে আসুন।'

ইবনে খতীব কক্ষের দরজা খোলে। এটি অন্য এক দরজা। বললো, 'চলুন।'

তারা দরজা পেরিয়ে একটি কক্ষে ঢুকে পড়ে। কক্ষটা অন্ধকার। কিন্তু ঢোকামাত্র হঠাৎ কি যেনো ঘটে গেলো। তিন খৃস্টানের প্রত্যেককে একজন করে লোক ঝাপটে ধরে এবং পরক্ষণেই প্রত্যেকের হৃদপিণ্ডে খঞ্জর ঢুকে যায়। আগেই কক্ষের এক কোনে একটি গভীর গর্ত খুড়ে রাখা হয়েছিলো। আল-মালিকুস সালিহ'র তিন খৃস্টান উপদেষ্টাকে তাতে পুঁতে রাখা হলো।

সেই কক্ষেরই এক কোণে আল-মালিকুস সালিহ'র উপহার ইহুদী মেয়েটি উপবিষ্ট। অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হাত-পা বাঁধা। মুখে কাপড় গোজানো। তাকেও ভোজসভা থেকে চাকরানীর মাধ্যমে সফলভাবে অপহরণ করা হয়েছে। কক্ষে ইবনে খতীব ছাড়া আরও পাঁচ ব্যক্তি। তারা মেয়েটির হাত-পা খুলে দেয় এবং মুখের কাপড় বের করে ফেলে। মেয়েটি তার সহকর্মী খৃস্টানদের পরিণতি দেখেছে। বললো, আমাকে অপর কক্ষে নিয়ে চলো। তাকে অপর কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে একটি প্রদীপ জ্বলছে।

'তোমরা কি আমার চেয়ে রূপসী মেয়ে কখনো দেখেছো?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'তুমি কি আমাদের অপেক্ষা বেশি ঈমানদার কোন দিন দেখেছো?'– ইবনে খতীব পাল্টা প্রশ্ন করে– 'আমরা তোমাকে এতোটুকু সুযোগ দেবো না যে, তুমি আস-সালিহ'র ন্যায় আমাদের ঈমানও ক্রয় করে ফেলবে।'

'আমি তোমাদের নিকট জীবন ভিক্ষা চাচ্ছি'– মেয়েটি বললো– 'তোমাদের যদি আমাকে ভালো না-ই লাগে, তাহলে কী পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা তোমাদের দরকার বলো; আমি সকালেই সেসব তোমাদের নিকট এনে হাজির করবো। তারপর আমি এখান থেকে সোজা জেরুজালেম চলে যাবো।'

ইবনে খতীব সঙ্গীদের প্রতি তাকায়। দু'জনের চেহারায় বিস্ময়কর

প্রতিক্রিয়া দেখতে পায়। সে অতি দ্রুততার সাথে খঞ্জর বের করে অস্ত্রটা মেয়েটির বুকে সেঁধিয়ে দেয়। মেয়েটি লুটিয়ে পড়ে গেলে মাথার চুলে ধরে টেনে-হেঁচড়ে অপর কক্ষে নিয়ে গর্তে ছুঁড়ে ফেলে। সকলে মিলে গর্তটা মাটিতে ভরে দেয়।

ইমামকে রাতেই জানানো হলো, কাজ সমাধা হয়ে গেছে।

ওদিকে আস-সালিহ্ তিন উপদেষ্টা ও রক্ষিতা মেয়েটির জন্য অস্থির-বেচাইন হয়ে ওঠেছেন। কী ব্যাপার, ওরা গেলো কোথায়? ওদের দেখছি না কেন?

মধ্য রাতের খানিক পর যখন শেষ মেহমানটিও বিদায় নিয়ে গেলো, তখন আস-সালিহ্ ঘনিষ্ঠদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, ওরা গেলো কোথায়? অনেক খোঁজাখুঁজি করে কোথাও পাওয়া গেলো না। আস-সালিহ্ বিশেষত মেয়েটির জন্য বেশি অস্থির ছিলেন। এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছেন আর চাকরানীকে বকছেন। অবশিষ্ট রাত নিজেও ঘুমালেন না, চাকর-নকরদেরও ঘুমাতে দিলেন না। চাকরানী ইমামকে বলেছিলো, মেয়েটি হাতছাড়া হয়ে গেলে আস-সালিহ্ হুঁশ হারিয়ে ফেলবেন। এখন তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তার মন্তব্য সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আল-মালিকুস সালিহ্ পাগল হয়ে যাচ্ছেন।

রাত পোহাবার পর আল-মালিকুস সালিহ্'র অবস্থা এখন পাগলের চেয়েও শোচনীয়। তিনি দু'জন ঘনিষ্ঠ সালারকে সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তারা ইবনে খতীবকে ডেকে নিয়ে আসে। খতীবকে জিজ্ঞেস করা হয়– 'একটি মেয়ে এবং আরবীয় ব্যবসায়ীদের বের হতে দেখেছো কি?'

'হ্যাঁ দেখেছি'– ইবনে খতীব উত্তর দেয়– 'আমি তো বাহিনীসহ বাইরে প্রস্তুত দণ্ডায়মান ছিলাম। মধ্য রাতের আগে ব্যবসায়ী তিনজন বাইরে আসে। তাদের সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়েও ছিলো। তারা এখান থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি ছুটন্ত ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পেয়েছি। পরে আর তাদেরকে ফিরে আসতে দেখিনি।'

সুলতান আইউবীর সমর্থক সালারও এসে পড়েছেন। তিন খৃস্টান ও মেয়েটির সন্ধান তার জানা আছে। তিনি আস-সালিহকে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করেন। তারা এমন একটি রূপসী মেয়েকে আপনার কাছে রেখে যাওয়া সমীচীন মনে করেনি। আপনাকে ধোঁকা দিয়ে তারা

আপনার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য নিয়ে পালিয়েছে। হয়তোবা আপনিও জানেন না, কী সে মূল্যবান তথ্য।

আস-সালিহ'র উপর নীরবতা ছেয়ে গেছে। বোধ হয় তার চৈতন্য ফিরে এসেছে যে, মেয়েটি তাকে দিনের বেলায়ও মদপান করিয়ে অচেতন করে রাখতো। সে সময় কে জানে সে তার মুখ থেকে কী সব কথা বের করে নিয়েছে। এখন ভাবটা এমন, যেনো আল-মালিকুস সালিহ কৃতকর্মে মর্মাহত। গত রাতে একটুও ঘুমাননি। অনেক দিন যাবত মদপান করে আসছেন। একদিকে তার ক্রিয়া, অন্যদিকে আক্ষেপ-অনুশোচনা। হঠাৎ মুখ খুলে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আদেশ করেন- 'লোকগুলোর সঙ্গে যে কাফেলা এসেছিলো, তাদের প্রত্যেককে বন্দী করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করো, তাদের উট ও অন্যান্য মালপত্র ক্রোক করে নাও।'

সেদিনই সন্ধায় আস-সালিহ'র পেট ব্যথা শুরু হয়। ডাক্তার দেখে ওষুধ দেন। কিন্তু রোগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। রাত নাগাদ পেট ফুলে ওঠে। ৫৭৭ হিজরীর ৯ই রজব অর্থাৎ পরদিন অবস্থা আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করে। ডাক্তার এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকছেন। কিন্তু আস-সালিহ'র অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না। পরবর্তী রাতও একইভাবে অতিবাহিত হয়। দ্বিতীয় দিন তার সংজ্ঞা হারিয়ে যেতে শুরু করে। ডাক্তার তাকে কিছু বুঝেত না দিয়ে সালার প্রমুখদের জানিয়ে দেন, মহারাজের সেরে ওঠার সম্ভাবনা নেই। জামে মসজিদের ইমামকে ডেকে আনা হলো। তিনি শিয়রে বসে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন। রাতে আস-সালিহ চোখ খোলেন। ইমামের প্রতি তাকিয়ে অনুচ্চ স্বরে বললেন- 'কুরআন যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তার বরকতে আমাকে সারিয়ে তুলুন।'

'আমার একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করা আপনার মিশনে পরিণত হয়েছে'- ইমাম বললেন- 'এই সংক্ষিপ্ত জীবনের পুরোটাই আপনি কুরআন ও ইসলামের বিপক্ষে ব্যয় করেছেন। কুরআনের বরকত সেই ব্যক্তির জন্য, যে তার আনুগত্য করে চলে। আপনি আল্লাহর সমীপে পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করুন। তার নিকট থেকে ক্ষমা নেয়ার চেষ্টা করুন।'

আস-সালিহ'র বোন পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আস-সালিহ বলে ওঠেন- 'যাও আমার মাকে ডেকে আনো। তাকে বলো, তোমার পুত্র মৃত্যুবরণ করছে; তুমি এসে তার দুধের দাবি এবং জীবনের পাপ ক্ষমা করে দাও।'

ইমাম শামসুন্নিসার প্রতি তাকান। শামসুন্নিসা ভাইয়ের মাথায় স্বস্নেহে

হাত বুলিয়ে বললো– 'আমি এক্ষুনি দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। আমি মাকে নিয়েই তবে আসবো। সে পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাকো ভাইয়া!'

শামসুন্নিসা দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে যায়। অল্পক্ষণ পরই সে রক্ষীদের সঙ্গে দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন– 'রজবের ১৩ তারিখ আস-সালিহ'র অবস্থা এতোই গুরুতর রূপ ধারণ করে যে, দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। এক পর্যায়ে সামান্য চৈতন্য ফিরে এলে আস-সালিহ ইয্‌যুদ্দীনকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। ইয্‌যুদ্দীন সাইফুদ্দীনের মৃত্যুর পর মসুলের গবর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সময় তিনি মসুল অবস্থান করছিলেন। এখন তাকে হালবেরও গবর্নর নিযুক্ত করা হলো। আস-সালিহ সকল আমীর ও সালারদের ডেকে বললেন, শপথ নাও, তোমরা ইয্‌যুদ্দীনকে গবর্নর হিসেবে বরণ করে নেবে এবং তার অনুগত হয়ে কাজ করবে। সবাই শপথ করে।

৫৭৭ হিজরীর ২৫ রজব আল-মালিকুস সালিহ অচেতন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মসুলে দূত প্রেরণ করে ইয্‌যুদ্দীনকে ডেকে আনা হলো। তাকে অবহিত করা হলো, আপনাকে হাল্‌বের গবর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে।

❖ ❖ ❖

যে সময়ে শামসুন্নিসা দামেশ্‌কে মায়ের পায়ের উপর বসে বলছিলো, আপনার একমাত্র পুত্র মৃত্যুবরণ করছে, আপনার দুধের দাবি মাফ করানোর জন্য তিনি আপনাকে নিতে পাঠিয়েছেন আর মা বলেছিলেন, আমি তার দুধের দাবি ক্ষমা করতে পারি; কিন্তু গুনাহের ক্ষমা আল্লাহর নিকট থেকে নিতে হবে, তখন আস-সালিহ'র জীবনের চির অবসান ঘটে। শামসুন্নিসা হাল্‌বে ফিরে এসে দেখতে পায়, দুর্গ থেকে তার ভাইয়ের জানাযা বের হচ্ছে।

দূত ইয্‌যুদ্দীনকে আস-সালিহ'র মৃত্যুর সংবাদ জানায়। ইয্‌যুদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যান। দ্রুত এসে পৌঁছানোর জন্য তিনি অন্য পথ ধরেন। সুলতান আইউবীর ভাই আল-আদিলের সেনা ছাউনীর পাশ দিয়ে তার অতিক্রম ঘটে। তিনি আল-আদিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আল-আদিল আস-সালিহ'র মৃত্যুর খবর জানতেন না। ইয্‌যুদ্দীন তাকে সংবাদটি জানান। সঙ্গে এও অবহিত করেন যে, তাকে হাল্‌বের গবর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে। আল-আদিল বললেন– 'তবে তো তুমি ইচ্ছে করলে গৃহযুদ্ধের

অবসান ঘটাতে পারো এবং হাল্‌বকে দামেশ্‌কের সঙ্গে একীভূত করে ফেলতে পারো। গাদ্দার মরেছে। তুমি তো গাদ্দার নও।'

ইয্‌যুদ্দীন ক্ষণিকের জন্য গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান। পরক্ষণে আল-আদিলকে বললেন– 'হ্যাঁ, আমি হাল্‌ব ও দামেশ্‌কে এমন এক সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারি, যা কখনো ছিঁড়বে না। কিন্তু...। কিন্তু সেই সম্পর্কটা অটুট রাখার জন্য আপনি একটি কাজ বরং আমার একটি আকাঙ্খা পূরণ করে দিতে পারেন।... আমি নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবাকে বিয়ে করতে চাই– যদি ভদ্র মহিলা রাজি হয়।'

'আমি আজই দামেশ্‌ক চলে যাবো'– আল-আদিল বললেন– 'আমি আশা করি তিনি সম্মত হবেন।'

আল-আদিল দামেশ্‌ক পৌঁছে যান। রোজি খাতুনকে পুত্রের মৃত্যুর সংবাদটা জানান। শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

আল-আদিল রোজি খাতুনকে জানালেন– 'আস-সালিহ ইয্‌যুদ্দীনকে হাল্‌বের গবর্নর নিযুক্ত করে গেছে। আর... আর ইয্‌যুদ্দীন আপনাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে।'

রোজি খাতুন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

'এই পরিণয় আপনার আর ইয্‌যুদ্দীনের নয়'– আল-আদিল বললেন– 'এই বিবাহটা হবে দামেশ্‌ক ও হাল্‌বের। এই সম্পর্কের সূত্র ধরে আগামীতে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং ক্রুসেড বিরোধী অভিযান আরো জোরদার হবে।'

'ঠিক আছে'– রোজি খাতুন বললেন– 'ইসলামের মর্যাদার খাতিরে আমি এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। আমার ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা বলতে কিছু নেই।'

৫৭৭ হিজরীর ৫ শাওয়াল মোতাবেক ১১৮২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইয্‌যুদ্দীন ও রোজি খাতুনের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।
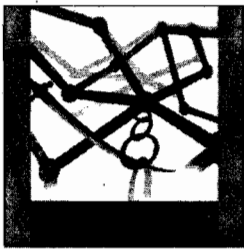
সাপ ও খৃস্টান মেয়ে

সাপটা দেড় বিঘতের বেশি লম্বা হবে না। কিন্তু প্রাণীটা ইসহাক তুর্কির এমন শক্তিমান ঘোড়াটাকে উপুড় করে ফেলে দিলো। গন্তব্য এখনো বহুদূর। সিনাই মরুদ্যানের অর্ধেক পথ এখনো বাকি।

ইসহাক তুরস্কের নাগরিক। সুঠাম দেহ, সুদর্শন চেহারা, আকর্ষণীয় গাত্রবর্ণ, নীলরঙা চোখ। দেখে কেউ বলতে পারবে না লোকটা মুসলমান না খৃস্টান। যেমন সুঠাম, তেমনি সুদর্শন। তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীতে যখন যোগ দেয়, তখন ইসহাক তুর্কির বয়স আঠার বছর। সৈনিকগিরি করে অর্থ উপার্জন তার উদ্দেশ্য ছিলো না। ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত এক সত্যিকার মর্দে মুমিন ইসহাক। ক্রুশের অনুসারীদের ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ইসহাক ইসলামের জন্য কাজ করতে দামেশ্‌ক এসেছিলো। এসেই ভর্তি হয়ে যায় সুলতান আইউবীর বাহিনীতে। সুলতান আইউবী মিসরের গবর্নর নিযুক্ত হলে ইসহাক তুর্কিকে মিসর পাঠিয়ে দেয়া হয়। গর্বের সাথে নিজেকে তুর্কি দাবি করতো ইসহাক।

তুরস্কের বহু নাগরিক সুলতান আইউবীর বাহিনীর সৈনিক ছিলো। তাদের উপর সুলতান আইউবীর পরিপূর্ণ আস্থা ছিলো। সুলতান যখন কমান্ডো ফোর্স গঠন করেন, তখন তুর্কিদেরই বেশি নিয়োগ দান করেন। সেই ফোর্স থেকে গোয়েন্দা বাহিনীও গঠন করা হয়েছিলো। ইসহাক তুর্কি তাদেরই একজন।

বাহিনীতে যোগ দেয়ার পরপরই ইসহাক তুর্কি নিজেকে অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ ও দুঃসাহসী কমান্ডো প্রমাণিত করে। তাকে কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। তারপর তাকে খৃস্টানদের বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তির লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়।

অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ ও দুঃসাহসী মানুষ ইসহাক তুর্কি। জীবনটা হাতে নিয়ে মাটির কয়েক স্তর নীচ থেকেও তথ্য বের করে আনার সাহস-যোগ্যতা আছে তার।

কিন্তু এই মুহূর্তে সিনাই মরুদ্যানে দেড় বিঘত লম্বা সামান্য একটা সাপ কঠিন এক পরীক্ষায় ফেলে দিলো লোকটাকে।

ইসহাক তুর্কি খৃস্টান অধ্যুষিত মুসলিম অঞ্চলে কর্মরত ছিলো। সেখান থেকে চলে যায় হাল্‌ব। এখন একটি নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে কায়রোর পথে। সুলতান আইউবী এখন কায়রো। অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে হবে ইসহাককে। তাই অবিশ্রাম পথ চলছে লোকটা।

সবুজ-শ্যামল এলাকা থেকে বেরিয়ে এসেছে ইসহাক তুর্কি। সম্মুখে বালির সমুদ্র, যার ভেতর থেকে কোন পথভোলা পথিক কখনো জীবিত বের হয়নি।

মরুভূমি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর শত্রু। ইসহাক তুর্কি মরু বিশেষজ্ঞ। সবুজ অঞ্চল থেকে পানি সংগ্রহ করে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে সে। পথটা তার জানাশোনা ছিলো। কোথায় কোথায় পানি আছে জানতো।

এই মরু অঞ্চলে একাধিকবার যুদ্ধও করেছে ইসহাক তুর্কি। হাল্‌ব থেকে রওনা হয়ে এ পর্যন্ত নির্ভয়ে-নিরাপদেই এসে পৌঁছেছে। খৃস্টান আর মরু যাযাবরদের ভয় করে না ইসহাক। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ আর অবিরাম পথচলাকেই জীবন মনে করে লোকটা। তার বিশ্বাস, আল্লাহর সন্তুষ্টি এই জিহাদের মধ্যেই নিহিত।

সম্মুখে বিশাল মরু অঞ্চল। স্থানে স্থানে টিলা-পর্বত। ঘোড়াটাকে সামান্য বিশ্রাম দেয়ার জন্য একটি টিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে যায় ইসহাক। দুপুরের সূর্যটা খানিকটা পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। ইসহাক একটি টিলার আড়ালে ছায়ায় বসে পড়ে। তার চোখের পাতা বুঝে আসে।

খানিক পর ঘোড়াটা উচ্চস্বরে ডেকে ওঠে। ইসহাকের চোখ খুলে যায়। ঘোড়াটা সামান্য জায়গার মধ্যে চারদিক ঘুরে ঘুরে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু বেশি দৌড়াতে পারলো না। থেমে গেলো। সমস্ত শরীর কাঁপছে প্রাণীটার।

কী হলো? ইসহাক এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পায়, সে যে জায়গাটায় শুয়েছিলো, তার চার-পাঁচ পা দূরে দেড় বিঘত লম্বা একটা সাপ। সাপটার রং কালো। কালোর মধ্যে সাদা সাদা গোলাকার দাগ। সাপটা ছটফট করছে। লেজের দিক থেকে দেহের অর্ধেকটা থেতলানো।

ঘোড়াটা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ইসহাক বুঝতে পারে, দংশনের আগে কিংবা পরে সাপটা ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়েছে। এখন তার চলচ্ছক্তি অবশিষ্ট নেই। ইসহাক তুর্কি সাপটার মাথাটা পায়ের নীচে পিষে ফেলে।

ঘোড়াটা বাঁচার আশা নেই। মরুভূমির বিচ্ছু আর এ জাতের সাপ এতোই বিষাক্ত যে, যাকে দংশন করে, সে পানি পান করারও সুযোগ পায় না। মরুভূমির পথিকরা প্রখর সূর্যতাপ এবং দস্যুদেরও এতো ভয় করে না, যতোটা করে এই সাপ-বিচ্ছুকে। এই সাপ মেঠো ও পাহাড়ী অঞ্চলের সাপের ন্যায় বুক টেনে সামনের দিকে অগ্রসর হয় না। এরা পাশের দিকে এক বিস্ময়করভাবে চলাচল করে থাকে।

ইসহাক হতাশ নয়নে ঘোড়াটার প্রতি তাকায়। ঘোড়াটা সজোরে কেঁপে ওঠে। মুখটা হা হয়ে গেছে। পাগুলো বাইরের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে কোন সাহায্য করার ক্ষমতা ইসহাকের নেই। উন্নত জাতের যোদ্ধাঘোড়া। ঘাস-পাতা, তরুলতাহীন মরু বিয়াবান, ক্ষুৎপিপাসা কিছুই আমলে নেয় না।

এরূপ একটি ঘোড়ার মৃত্যুতে ইসহাকের বিরাট ক্ষতির মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হলো, এখন তাকে পায়ে হেঁটে কায়রো পৌঁছতে হবে। তাকে অতি দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছার কথা ছিলো। বুকে করে যে মূল্যবান তথ্য ইসহাক নিয়ে যাচ্ছিলো, তা যদি যথাসময়ে সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছানো না যায়, তাহলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

ইসহাক অনুতপ্ত চোখে ঘোড়াটার দিকে তাকায়। ঘোড়ার একটা পায়ের উপর তার দৃষ্টি পড়ে। ক্ষুরের সামান্য উপরে কয়েক ফোঁটা রক্ত জমে আছে। সাপটা এখানেই দংশন করেছে।

ঘোড়া মরে গেছে। ইসহাক ঘোড়ার যিন থেকে খেজুরের থলে এবং পানির মশক খুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। মৃত সাপটার প্রতি তাকিয়ে ঘৃণার সাথে বললো– 'সাপ আর খৃস্টানের স্বভাব একই।'

ইসহাক টিলাময় এলাকা থেকে বেরিয়ে গেছে। উপর থেকে সূর্যটা যেনো আগুন ঢালছে। ১১৮২ সালের এপ্রিল মাস। বসন্তকাল। কিন্তু মরু এলাকায় কখনো বসন্ত আসে না। ইসহাক তুর্কির সামনে এখন বালির সমুদ্র। বালি এমনভাবে চিক চিক করছে, যেনো এই আধা মাইল পথ অতিক্রম করলেই পানি পাওয়া যাবে।

ইসহাক এখনো সজীব-তরতাজা। খেজুরের থলে, মশক, তরবারী আর খঞ্জরের ভার তার অনুভবই হচ্ছে না। চলার গতি তীব্র। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কায়রো পৌঁছে যাওয়ার প্রত্যয় এখনো বিদ্যমান।

ইসহাক হাঁটছে। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা ডুবে গেছে।

একস্থানে সামান্য সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি দেয় ইসহাক। কয়েকটা খেজুর খেয়ে পানি পান করে। মিনিট কয়েক শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে উঠে বসে।

ইসহাকের মনে বেজায় আনন্দ যে, এক মহা-মূল্যবান তথ্য নিয়ে সুলতান আইউবীর নিকট যাচ্ছে সে। পানাহারের প্রয়োজনটা বেশি অনুভব করছে না ইসহাক। তার আত্মা পরিতৃপ্ত। কর্তব্যপরায়ণ মানুষ যখন কর্তব্য আদায় করে ফেলে, তখন তার আত্মা আনন্দিত হয়। ইসহাক তুর্কিও আত্মিক আনন্দে পরিতৃপ্ত।

ইসহাক উঠে দাঁড়ায়। তারকার দিকে তাকায়। দিক নির্ণয় করে হাঁটতে শুরু করে।

মরুভূমির রাত ততোটা শীতল হয়ে থাকে, যতোটা উত্তপ্ত থাকে দিন। তাই মরু অঞ্চলে রাতের সফর আরামদায়ক।

ইসহাক হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে তার মনের পাতায় অনেক কিছু ভেসে ওঠে। চিন্তা করে, এতো দীর্ঘ পথ এই সামান্য সময়ে অতিক্রম করতে পারবে কি। কোন নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী-উষ্ট্রারোহী যদি পাওয়া যায়, তাহলে তার বাহনটা কেড়ে নিয়ে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কিংবা যদি কোথাও অবস্থানরত কাফেলা পাওয়া যায়, তাহলে তাদের একটা উট বা ঘোড়া চুরি করে একটা বিহিত করা যায়। এছাড়া আর কোন উপায় দেখছে না ইসহাক।

ইসহাক আশায় বুক বেঁধে পথ চলতে থাকে। রাত অতিক্রান্ত হচ্ছে। ইসহাকের পায়ের তলা থেকে মরুভূমি ধীরে ধীরে পেছনে সরে যাচ্ছে। এখন তার ক্লান্তি অনুভব হতে শুরু করেছে। কিন্তু ক্লান্তি, ঘুম, ক্ষুধা ও পিপাসা কয়েকদিন পর্যন্ত সহ্য করার প্রশিক্ষণ তার আছে। ইসহাক ক্লান্তির প্রথম অনুভূতিটা একটা সঙ্গীতের কাছে পরাজিত করে দেয়। সে গান গাইতে শুরু করে– যুদ্ধের গান।

রাতের শেষ প্রহরে ইসহাক এক স্থানে বসে পড়ে। সামান্য পানি পান করে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে।

এখনো সূর্য উদিত হয়নি। ইসহাক সজাগ হয়ে যায়। ক্ষিধেয় পেটটা চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু এই ক্ষুধাটাকেও জয় করে নেয় ইসহাক। এক ঢোক পানিও পান না করে হাঁটতে শুরু করে। গন্তব্য এখনো অনেক দূর। তাই যে সামান্য খেজুর-পানি আছে, তা এখনই শেষ করা যাবে না।

দূর থেকে আরেকটি বিপদ চোখে পড়ছে ইসহাকের। বালির গোল গোল

অসংখ্য টিলা। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে টিলাগুলো। দেখতে সবগুলো এক রকম। সবগুলোর উচ্চতাও প্রায় সমান। অপরিচিত কোন লোক তার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লে বের হতে পারবে না। এলাকাটা একটা মরণ ফাঁদের রূপ ধারণ করে আছে। কারণ, অনেক পথিক একই টিলার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে মনে করে সে পথ অতিক্রম করছে। আসলে সে গন্তব্যের দিকে না গিয়ে টিলার চতুর্দিকেই ঘুরছে। মরু বিশেষজ্ঞরাও এরূপ অঞ্চলকে ভয় করে।

ইসহাক তুর্কি প্রথমে ভাবে, দিক অনুযায়ী এই টিলাময় অঞ্চলটা তার অতিক্রম করার কথা ছিলো না। তাহলে কি সে ভুল পথে এসেছে? ইসহাক অস্থির হয়ে ওঠে। এখন তাকে সামনের দিকেই অগ্রসর হতে হবে। ইসহাক সম্মুখে এগিয়ে যায় এবং টিলার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।

সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসেছে। পায়ের তলার বালি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। ইসহাক টিলাময় অঞ্চলে পথ চলছে। ডান-বাম মোড় ঘুরে ঘুরে হাঁটছে ইসহাক। অঞ্চলটির বালুময় জমিন প্রমাণ করছে এ পথে ইসহাক ছাড়া অন্য কোন মানুষের আগমন ঘটেনি।

ইসহাক হাঁটছে তো হাঁটছেই। এই ডানে মোড় তো পরক্ষণেই বামে। আসলেই কি সে পথ অতিক্রম করছে কিছুই বুঝতে পারছে না ইসহাক।

এভাবে এক স্থানে মোড় ঘুরতে গিয়েই হঠাৎ চমকে ওঠে দাঁড়িয়ে যায় ইসহাক। মাটিতে পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। চিহ্নটা তারই পায়ের, যা অপর একটি টিলার পাশ হয়ে মোড় ঘুরে গেছে। ইসহাক বুঝে ফেলে, সে মরুভূমির নিঃসীম বিপজ্জনক ধোঁকায় পড়ে গেছে। যতোই হাঁটছে, একটুও অগ্রসর হচ্ছে না। কারণ, এতোক্ষণ যাবত হাঁটার পরও সে টিলাময় অঞ্চল থেকে বের হতে পারেনি।

ইসহাক পার্শ্বের টিলার উপর উঠে যায়। চতুর্দিকে চোখ মেলে তাকায়। তার মনে হচ্ছে, পৃথিবীটা গোল গোল উঁচু উঁচু বালির স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সূর্যের আগুন আর বালির উত্তাপ ইসহাকের দেহের রস চুষে নিতে শুরু করেছে। পা দুটো যেনো কয়েক মণ ওজন হয়ে গেছে।

ইসহাক পানি পান করে। দিকটা আন্দাজ করে নীচে নেমে আসে। কিন্তু পরিস্থিতি যাই হোক, মাথাটা ঠিক রেখে কাজ করতে হবে। প্রতিটি মোড় মুখস্ত করে রাখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে তার প্রশিক্ষণও আছে। এখন প্রশিক্ষণটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে সে।

ইসহাক আবার হাঁটতে শুরু করে। এখন সে প্রতিটি টিলা, প্রতিটি মোড় হিসেব করে করে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু মরুভূমির নির্মমতা তার মাথাটা ঘুলিয়ে ফেলছে। ইসহাকের সহনশক্তি অস্বাভাবিক। অন্যথায় বহু আগেই তাকে বালির বিছানায় শুয়ে পড়তে হতো।

এখন বিকাল। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। ইসহাক মরুভূমির ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু এখন তার দেহের ভার বহন করার শক্তি নেই। কর্তব্যের অনুভূতিটাই তাকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

ইসহাক সম্মুখপানে তাকায়। দেখে, কতগুলো ঘোড়া সারিবদ্ধ হয়ে তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ঘোড়ায় একজন করে আরোহী। ইসহাক হাঁক দেয়। আবার উচ্চকণ্ঠে ডাকে। কিন্তু কোন সাড়া নেই। ঘোড়াগুলো আপন গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইসহাক তুর্কি দাঁড়িয়ে যায়। চোখ দুটো বন্ধ করে মাথাটা সজোরে একটা ঝাঁকুনি দেয়। সে বুঝে ফেলে, আসলে ওগুলো ঘোড়া নয়– কল্পনা। ওগুলো মরিচিকা, যা কিনা মরুভূমির ভয়ানক এক প্রতারণা।

এখন পা টেনে টেনে হাঁটছে ইসহাক।

ইসহাক অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। এখন দিন না রাত সে বুঝতে পারছে না। এক স্থানে তার পা ফস্‌কে যায়। পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে চলে যায়। তার খানিকটা চৈতন্য ফিরে আসে। সে এদিকে-ওদিক তাকায়। তীব্র পিপাসা অনুভব করে। পিপাসায় কণ্ঠনালীতে কাঁটা বিঁধছে যেনো। ঠোঁট দুটো শুকনো কাঠের ন্যায় খসখসে হয়ে গেছে। কিন্তু তার কাছে না আছে পানির মশক, না আছে খেজুরের থলে। ওগুলো কোথায় হারিয়ে এসেছে খবর নেই।

ইসহাক এখন অনেকটা অসহায় ও হতাশ। তবুও চলার চেষ্টা করছে। যেদিকে তাকায় শুধু সাদা সাদা পরিচ্ছন্ন অগ্নিশিখা দেখতে পাচ্ছে। শিখাগুলো যেনো তাকে গোল বৃত্তের ন্যায় ঘিরে রেখেছে।

সে দাঁড়িয়ে যায়। এক স্থানে তিনজন লোক দেখতে পায়। দু'জন পুরুষ, একজন নারী। তিনজনই এক নাগাড়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকগুলোর পেছনে সামান্য দূরে খেজুর গাছও চোখে পড়ে ইসহাকের। তাদের সন্নিকটে টিলা। ইসহাক তুর্কি এসবকেও কল্পনা জ্ঞান করে এবং

মরিচিকা বলে ধারণা করে। তার হতাশা আরো বেড়ে যায়। তাতে দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায়। ডাকাডাকি করে লাভ নেই। কাল্পনিক দৃশ্য আর মরিচিকারা তো সাড়া দিতে পারে না। মরিচিকার কাজ পথচারীদের লোভ দেখিয়ে কাছে টানা আর নিজে পেছনে সরে যাওয়া। এক সময় তার পেছনে পেছনে ছুটে চলা মানুষটি পরাজিত হয়ে লুটিয়ে পড়ে আর মরুভূমির বালি তার চামড়া-মাংস চুষে চুষে কংকালে পরিণত করে।

ইসহাক তুর্কির মধ্যে এতোটুকু জীবন অবশিষ্ট আছে, সে লোকগুলোকে কল্পনা বলে স্থির করেছে। কিন্তু চলার জন্য সম্মুখপানে পা ফেলা মাত্র পা দুটো নিথর হয়ে দু'দিকে সরে যাচ্ছে। তার চোখের সামনে মরুভূমির মরিচিকা-কল্পনা সব ঘন অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

ইসহাক চৈতন্য হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আবার ধীরে ধীরে তার চৈতন্য ফিরে আসে। কারো কথপোকথন কানে আসছে তার। ইসহাক বালির উপর লুটিয়ে পড়েছিলো। তখন পায়ের নীচের বালিগুলো আগুনের উপর রাখা লোহার পাতের ন্যায় গরম ছিলো। কিন্তু এখন জ্ঞান ফিরে আসার পর ইসহাক শীতলতা অনুভব করছে।

'ওখানেই মরতে দেয়া ভালো ছিলো'– ইসহাক পুরুষালী কণ্ঠ শুনতে পায়– 'এখন তুলে বাইরে ফেলে দাও। লোকটা পথভোলা কোন পথিক হবে হয়তো।'

'না, লোকটা কোন সাধারণ পথচারী মনে হচ্ছে না।' আরেকটি পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেলো।

'হুঁশ ফিরে আসুক'– এবার নারীকণ্ঠ- 'আমার সন্দেহ হচ্ছে। লোকটা অচেতন অবস্থায় বিড় বিড় করছিলো। বলছিলো, কায়রো আর কতো দূর? সুলতান...। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী! আপনি সতর্কতার সঙ্গে কায়রো থেকে বের হবেন। আমি অনেক মূল্যবান সংবাদ নিয়ে এসেছি। লোকটাকে আমি একটু যাচাই করে দেখবো।'

এই কথোপকথনকেও ইসহাক তুর্কির কল্পনা মনে হতে লাগলো। কিন্তু সে জানে না, এই কণ্ঠ সেই দুই পুরুষ ও এক মেয়ের, যাদেরকে সে মরুদ্যানে নিজের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখেছিলো। তাদেরকে সে কল্পনা বলে মনে করেছিলো। কিন্তু আসলে তারা বাস্তবে মানুষ ছিলো- কল্পনা নয়।

'তুমি এর কাছে বসে থাকো'– একজন বললো– 'জ্ঞান ফিরে এলে পানি

পান করতে এবং কিছু খেতে দিও। তারপর তার পরিচয় জানা যাবে।' লোকটি বাইরে বেরিয়ে যায়।

ইসহাক ধীরে ধীরে চোখ খুলে। ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি তার কানে আসে। সে পুরোপুরি সজাগ হয়ে যায় এবং উঠে বসে। অলক্ষ্যে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে– 'এই ঘোড়াটা আমাকে দিয়ে দাও।'

'নাও, সামান্য পানি পান করো'– ইসহাক একটি নারীকণ্ঠ শুনতে পায়। এক মেয়ে এক পেয়ালা পানি হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটি বললো– 'সামান্য পান করে নাও। একসঙ্গে সবটুকু পান করো না, অন্যথায় মারা পড়বে।'

পিপাসাকাতর ইসহাকের পানির বড্ড প্রয়োজন। মেয়েটির পরিচয় জানার চেষ্টা করে ইসহাক। পানির পেয়ালাটা হাতে নিয়ে ঠোঁট লাগিয়ে কয়েক ঢোক পান করে। তারপর পেয়ালাটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে বললো– 'আমি জানি, এরূপ অবস্থায় বেশি পানি পান করা ঠিক নয়।'

ইসহাক মেয়েটাকে পরখ করে। যুবতী মেয়ে। পোশাক-আশাকে এই অঞ্চলের মরু যাযাবরদের মতো হলেও গঠন-আকৃতি ও চেহারায় এখানকার মেয়েদের মতো নয়। মাথায় পেঁচানো রোমালের ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান চুলও যাযাবর মেয়েদের মতো মনে হলো না। ইসহাক ভাবে, এই অঞ্চলে তো কোন সম্ভ্রান্ত ধনী ঘরের মেয়েদের আসার কথা নয়। এখানে সাধারণত যাযাবররাই আসে।

'তুমি কি কোন কাফেলার সঙ্গে আছো?' ইসহাক মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমি এক বণিক কাফেলার সঙ্গে আছি। আমরা ব্যবসায়ী। তুমি কোথা থেকে এসেছো এবং কোথায় যাচ্ছো?'

ইসহাক তুর্কি উত্তর দেয়ার পরিবর্তে পানির পেয়ালাটা আবার ঠোঁটে লাগায়। কয়েক ঢোক পান করে। আস্তে আস্তে তার শরীরে সজীবতা ফিরে আসছে। চিন্তা করার শক্তি ফিরে পেয়েছে ইসহাক। তার মনে পড়ে যায়, সে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা এবং নিজের আসল পরিচয় যাবে বলা না।

'আমিও একটি বণিক কাফেলার সঙ্গে ছিলাম'– ইসহাক চিন্তা করে উত্তর দেয়– 'এক রাতে এখান থেকে দূরবর্তী এক স্থানে একদল দস্যু আমাদের কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে। উট-ঘোড়াগুলোও নিয়ে গেছে। আমি একা ওখান থেকে পালিয়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'আমি তোমার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করছি।' বলেই মেয়েটি বেরিয়ে যায়।

ইসহাক তুর্কি একটি তাঁবুতে বসা। প্রদীপ জ্বলছে। ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকায়। জোৎস্না রাত। বাইরে ফকফকা চাঁদের আলো। তিন-চারজন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখতে পায় ইসহাক। মেয়েটির গাল ভরা হাসি শুনতে পায় সে। পরক্ষণে মেয়েটিকে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। ইসহাক পেছনে সরে গিয়ে নিজ জায়গায় বসে পড়ে। তাঁবুতে প্রবেশ করে মেয়েটি ইসহাকের সামনে খাবার রাখে। ইসহাক খেতে শুরু করে।

'তুমি কি এখন কায়রো যাচ্ছো?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'না'– ইসহাক মিথ্যা উত্তর দেয়– 'আমি ইস্কান্দারিয়া যাচ্ছি।'

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তো কায়রোতে আছেন'– মেয়েটি মুচকি হেসে বললো– 'ইস্কান্দারিয়া গিয়ে কী করবে?'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে আমার আবার কী সম্পর্ক!' ইসহাক বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বললো।

'আমাদের তো আছে'– মেয়েটি বললো– 'তিনি আমাদের সুলতান। তাঁর নির্দেশে আমরা জীবন কুরবান করতেও প্রস্তুত আছি।'

'ভালো কথা'– ইসহাক বললো– 'কিন্তু আইউবী কায়রোতে আছেন সে কথা আমাকে বললে কেন?'

'শোন'– মেয়েটি ইসহাকের মাথায় হাত রেখে বললো– 'তোমার একটি ঘোড়া দরকার। তুমি সুলতান আইউবীর নিকট যাচ্ছো। আমরা তোমাকে সাহায্য করবো। তোমাকে ঘোড়া দেবো। তুমি অনেক তাড়াতাড়ি সুলতানের নিকট পৌঁছে যাবে।'

'এসব তুমি কীভাবে জানলে?' ইসহাক বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

'ও কথা জিজ্ঞেস করো না'– মেয়েটি বলছে– 'তুমি তোমার কর্তব্য পালন করছো। আমাদের দায়িত্ব আমাদেরকে পালন করতে দাও। তোমাকে ঘোড়া দিয়ে প্রমাণ করবো, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি।'

মেয়েটি এমন ধারায় কথা বললো যে, ইসহাক চিন্তায় পড়ে যায়। বললো– 'হ্যাঁ, আমাকে অনেক তাড়াতাড়ি সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছতে হবে।'

'জরুরী কোন সংবাদ আছে মনে হয়?'

'ওসব জিজ্ঞেস করো না'– ইসহাক উত্তর দেয়– 'সব কথা বলাও যায় না। সবকিছু সকলের জানারও প্রয়োজন নেই।'

'আমি তোমার ঘোড়ার ব্যবস্থা করছি'– মেয়েটি উঠতে উঠতে বললো– 'তুমি বিশ্রাম নাও। রাত সবে মাত্র শুরু হয়েছে। শেষ প্রহরে রওনা হলেই চলবে।'

মেয়েটি তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়। ইসহাক তুর্কি বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

❖ ❖ ❖

'কে না বলেছিলে ওকে ওখানেই মরতে দিলে ভালো হতো?'– মেয়েটি তাঁবুর বাইরে গিয়ে দলের লোকদের বললো– 'ওস্তাদ মানো আমাকে? লোকটা আইউবীর গুপ্তচর। বলছে কি জানো, বলছে, আমাকে একটা ঘোড়া দাও, সুলতান আইউবীর নিকট তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। লোকটা যখন অচেতন অবস্থায় বিড় বিড় করছিলো, তখন আমি কান পেতে শুনছিলাম, সে আইউবীর নাম উচ্চারণ করে বলছে, আমি বড় মূল্যবান তথ্য নিয়ে এসেছি।'

ইসহাকের সঙ্গে মেয়েটির যেসব কথাবার্তা হয় এবং তার মুখ থেকে যেসব কথা বের করে, মেয়েটি দলের লোকদেরকে সব জানায়।

এটি বণিক কাফেলা নয়। এরা সবাই খৃস্টানদের গুপ্তচর এবং নাশকতার কর্মী। মিসরে দায়িত্ব পালন করে এখন ফিরে যাচ্ছে কিংবা অন্য কোন অঞ্চলে যাচ্ছে। সঙ্গে রক্ষীও আছে। দশ-বারোজন পুরুষ। দু'টি মেয়ে। মেয়ে দু'টি অত্যন্ত রূপসী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।' ছদ্মবেশ ধারণ করেছে বণিকের। তাদের সঙ্গে উট আছে, ঘোড়া আছে। ছায়া-পানি দেখে এখানে অবস্থান নিয়েছে। সন্ধ্যার খানিক আগে তারা দূর থেকে ইসহাককে দেখতে পায়। দু'জন পুরুষ ও একটি মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসে।

ইসহাক তুর্কি তাদেরকে দেখেছিলো। কিন্তু এই দেখাকে সে কল্পনা এবং মরিচিকা মনে করেছিলো। তার পরক্ষণেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। খৃস্টান পুরুষ দু'জন আর মেয়েটি তার কাছে যায়। মেয়েটি বললো, লোকটা সাধারণ মুসাফির মনে হয় না। পুরুষ দু'জন অভিমত ব্যক্ত করে, আনাড়ি কোন পথচারীই হবে। অন্যথায় এ দশা ঘটতো না। তথাপি ইসহাকের শারীরিক গঠন-আকারে তাদেরও কিছুটা সন্দেহ জাগে, অন্য কিছু হতে পারে। কিছুটা সন্দেহ, কিছুটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তারা ইসহাককে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসে এবং এই তাঁবুতে শুইয়ে দেয়।

ফোঁটা ফোঁটা করে ইসহাকের মুখে পানি ও মধু ঢালে। ইসহাক বিড় বিড় করে ওঠে। ইসহাক অচেতন ছিলো। এই অচেতন অবস্থা আর ঘুমের মধ্যেই মানুষের মস্তিষ্ক জেগে ওঠে। গোয়েন্দাদের বিশেষভাবে নির্দেশনা দেয়া থাকে, যেনো তারা শত্রুর এলাকায় অচেতন না হয়। অজ্ঞান অবস্থায় অনেক সময় তার কাছ থেকে গোপন তথ্য বেরিয়ে আসে। মরুভূমি ইসহাককে অসহায় ও অচেতন করে দিয়েছিলো। অন্যথায় তার যথেষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিলো। অচেতন অবস্থায় যদি তার মুখ থেকে বিড় বিড় শব্দ বের না হতো, তাহলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারতো না।

ইসহাক বিচক্ষণ ও কৌশলী হওয়া সত্ত্বেও চেতনা ফিরে পেয়ে এখন সে খৃস্টান মেয়ের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। মেয়েটি সুদক্ষ খৃস্টান গোয়েন্দা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মেয়েটি নিশ্চিত হয়ে যায়, লোকটি মুসলমান এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর। তাঁবুর বাইরে গিয়ে সে সঙ্গীদের জানায়, আমার সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। এই সুদর্শন লোকটি সুলতান আইউবীর গোয়েন্দাই বটে।

'বড় শিকার'– দলনেতা বললো– 'এখন জানতে হবে, লোকটা কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছে এবং কোথায় কার নিকট যাচ্ছে।'

'তথ্য কোথা থেকে এনেছে জানার পর আরো জানতে হবে, ওখানে তারা কতোজন আছে এবং তাদের আস্তানা কোথায়।' দলের একজন বললো।

'কিন্তু আমাদের পরিচয় সে যেনো বুঝতে না পারে'– দলনেতা বললো– 'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দাদের ভালো করে জানি। তারা মৃত্যুকে বরণ করে নেবে; তবু তথ্য দেবে না। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'ঐ মুসলমানগুলোকে আমিও ভালোভাবেই জানি'– মেয়েটি অর্থবহ মুচকি হেসে বললো– 'তথ্য তো দেবেই, নিজের খঞ্জর দ্বারা নিজের হৃদয়টাও বের করে আমার পায়ের উপর রাখবে।'

'তুমি সেই মুসলমানদের জানো, যারা ক্ষমতা আর বিত্তের নেশায় মাতাল হয়ে গেছে'– অপর এক খৃস্টান বললো– 'সাধারণ মুসলমান আর সাধারণ সৈনিকের পাল্লায় তুমি পড়োনি। তোমাদের দ্বারা বিভ্রান্ত মুসলমানরাই সম্পদ ও মর্যাদার গোলাম হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব মুসলমানের নিকট ঐশ্বর্যের স্থলে ঈমান বড়, তাদের কাছে গিয়ে দেখো।'

দলে আরো একটি খৃস্টান মেয়ে আছে। সেও এই বৈঠকে উপস্থিত।

এ পর্যন্ত সে কোন কথা বলেনি। দলনেতা তার প্রতি তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বললো– 'তুমি এই মুসলমানটার কাছ থেকে তথ্য বের করতে পারবে না বারবারা?'

মেয়েটি মুখ তুলে দলনেতার প্রতি তাকায়।

দলনেতা আবার বললো– 'তুমি কায়রোতে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছো। মেরিনার দক্ষতা দেখো এবং তার থেকে শেখো। আমি তোমাকে আর সুযোগ দেবো না। মেরিনার দক্ষতার কথা চিন্তা করো। আমরা সবাই লোকটাকে পথভোলা পথিক মনে করেছিলাম। কিন্তু মেরিনা ঠিকই ধরে ফেলেছে, লোকটা মূল্যবান শিকার হবে। আমি তোমাকে এ জন্য মিসর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি যে, তুমি ক্রুশের উপকার করার পরিবর্তে ক্ষতি করছো।'

'তোমার পরিণতি খুবই মন্দ হবে বারবারা'– অপর এক খৃস্টান বললো– 'এই পেশায় তোমরা একজন রাজকন্যার মর্যাদ পেয়ে থাকো। কিন্তু তুমি এই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তারপর কারো গনিকা কিংবা বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া তোমার আর কোন উপায় থাকবে না।'

'উহ্!'– পাশ থেকে মেরিনা ঘৃণা প্রকাশ করে বারবারার উদ্দেশে বললো– 'এ তো যোগ্যই এ কাজের।'

বারবারা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে মেরিনার প্রতি তাকায়। রাগে-ক্ষোভে তার চেহারা লাল হয়ে গেছে। কিন্তু কোন কথা বলছে না। মেয়েটি মেরিনার মতোই রূপসী ছিলো। কিন্তু মিসর যাওয়ার পর তার দক্ষতায় ভাটা পড়ে যায়। সমস্যাটা সৃষ্টি করেছে দলনেতা। লোকটা পদস্থ অফিসার এবং সুদর্শন যুবক। বারবারাকে তার ভালো লাগতো। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা দু'জনে দু'জনার হয়ে যায়। কিন্তু এই দৃশ্য মেরিনার সহ্য হয় না। সে তার কূটচাল প্রয়োগ করে দলনেতাকে বারবারা থেকে সরিয়ে নিজের মুঠোয় নিয়ে আসে। তার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা শুরু করে দেয়। বারবারার সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বারবারা বিষণ্ন হয়ে ওঠে এবং কর্তব্য পালনে অবহেলা শুরু করে। এই সুযোগে মেরিনা এমনও পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় যে, বারবারার সন্দেহে নিপতিত হয়ে ধরা পড়ার উপক্রম হয়। কিন্তু শেষমেশ রক্ষা পেয়ে যায়।

মেয়েটিকে সুলতান আইউবীর উচ্চপদস্থ একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার পেছনে নিয়োজিত করা হয়েছিলো। কিন্তু সে উদ্দেশ্যে সফল হতে

পারেনি। দলনেতা টের পেয়ে যায়, বারবারা ও মেরিনার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। পরস্পর সহকর্মী হয়ে কাজ করার পরিবর্তে এখন তারা একজন অপরজনকে ঘায়েল করার সুযোগটাই কাজে লাগায়। এই পরিস্থিতি মিশনের জন্য খুবই ক্ষতিকর। মেয়েটি এই দল ত্যাগ করে অন্য দলে যাওয়ার চিন্তা করে।

বারবারা দলনেতার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মেরিনা তার সঙ্গে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায়। নিজের অশুভ পরিণতি চোখের উপর ভাসছে মেয়েটির। আর এখন কিনা মেরিনা বলে ফেললো, বেশ্যাবৃত্তিই বারবারার মানানসই পেশা। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে বারবারার মনে।

'এই লোকটার কাছ থেকে তথ্য কেবল আমিই বের করতে পারবো'— মেরিনা বললো— 'এ কাজ বারবারার সাধ্যের অতীত।'

বারবারা ক্ষুব্ধ মনে নিজের তাঁবুতে চলে যায়।

'রাতে লোকটা পালাবার কোন সুযোগ পাবে না'— দলনেতা বললো— 'এ যাবত পালাবার কোন কারণও নেই। তথাপি সতর্ক থাকতে হবে। লোকটাকে অজ্ঞান করে রাখো।'

খানিক পর মেরিনা ইসহাকের তাঁবুতে প্রবেশ করে। ইসহাক শুয়ে আছে। প্রদীপটা জ্বলছে। মেরিনার হাতে একটি রোমাল। রোমালটি অচেতনকারী ওষুধে ভেজা। মেরিনা পা টিপে টিপে ইসহাকের নিকট গিয়ে বসে পড়ে। রোমালটি ইসহাকের নাকের উপর রেখে কিছুক্ষণ পর সেটি সরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। মেরিনা সঙ্গীদের জানালো— 'আগামীকাল সূর্য উঠার সামান্য পর হুঁশ ফিরে পাবে।'

'এবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো'— দলনেতা বললো— 'আগামী দিন সালাহুদ্দীন আইউবীর এই গোয়েন্দাকে তার চাহিদা মোতাবেক ঘোড়া ঠিকই দেবো, তবে সেই ঘোড়ায় সে কায়রো নয়— আমাদের সঙ্গে বৈরুতে যাবে। লোকটা আমাদের সফরসঙ্গী হবে।'

সুলতান আইউবীর একজন গোয়েন্দাকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসা তাদের জন্য বিরাট সাফল্য। তারা উৎসবে মেতে ওঠে। মদের আসর বসায়। সাফল্যের আনন্দে মেরিনার পা যেনো মাটিতে পড়তে চাচ্ছে না।

কিন্তু আজ বারবারার মনে আনন্দের পরিবর্তে তুষের আগুন জ্বলছে। স্ফূর্তিতে যোগ না দিয়ে নিজ তাঁবুতেই ব্যথিত মনে অবস্থান করছে।

দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আমোদ-ফূর্তিতে কাটিয়ে প্রত্যেকে যার যার তাঁবুতে চলে যায়। দলনেতা মেরিনাকে নিয়ে একসাথে চলে যায়।

ব্যর্থ ও বেদনাহত বারবারা নিজ তাঁবুতে বসে অস্থির সময় অতিবাহিত করছে। অন্তরে তার প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাইরের আসরের হৈ-হুল্লোড় তার আগুনকে আরো উত্তেজিত করে তুলেছে। বারবারা উঠে তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকায়। দেখে, তাদের দলনেতা আর মেরিনা টিলার দিকে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে তারা টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বারবারার কানে মেরিনার কণ্ঠ বাজছে– 'একমাত্র আমিই তার কাছ থেকে তথ্য বের করতে পারবো।' বারাবারার মাথায় চিন্তা জাগে, ইচ্ছে করলে আমি মেরিনাকে ব্যর্থ করতে পারি। একটা পন্থা এই হতে পারে, আমি ইসহাককে বলে দেবো আমরা সকলে খৃস্টান গোয়েন্দা, তুমি সতর্ক হয়ে যাও। আবার সহযোগিতা দিয়ে লোকটাকে ভাগিয়েও দিতে পারি। প্রতিশোধ আগুনে প্রজ্জ্বলমান বারবারার মাথায় নানা ভাবনা জাগে।

সকলের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে বারবারা। তার চোখে ঘুম আসছে না। এমন সময় তাঁবুর পর্দা সরে যায়। কে যেনো ফিসফিস শব্দে তাকে ডাকছে।

বারবারা বুঝতে পারে কে এসেছে।

'চলে যাও মার্টিন'– বারবারা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো– 'চলে যাও এখান থেকে।'

মার্টিন চলে যাওয়ার পরিবর্তে তাঁবুতে ঢুকে পড়ে এবং বারবারার পাশ ঘেঁষে বসে– 'তোমার হয়েছেটা কী বলো তো? তুমি কি মনে করো, দলনেতা মেরিনাকে হৃদয় থেকে ভালোবাসে? তুমি কি বিশ্বাস করো, তোমাকে সে মন দিয়ে ভালোবেসেছিলো? এ সবকিছুই তার বদমায়েশী ও ফষ্টিনষ্টি। বারবারা! তুমি অযথা হৃদয়ের উপর অস্থিরতার বোঝা চাপিয়ে কর্তব্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছো। তুমি যদি সত্যিকার ভালোবাসার প্রত্যাশী হয়ে থাকো, তাহলে সেটা তুমি আমার কাছ থেকেই আশা করতে পারো। আমি তোমাকে অন্তর থেকে কামনা করি। তুমিই বলো, আমি কি তোমাকে কখনো ধোঁকা দিয়েছি?'

'তোমরা আপাদমস্তক প্রতারক'– বারবারা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো– 'তোমরা প্রত্যেকেই ধোঁকাবাজ। আমি আমার কর্তব্য থেকে সরে যাইনি। তবে আমার হৃদয় জগতটার প্রতিই অনীহা এসে গেছে। আমাদেরকে শৈশব

থেকেই প্রতারণার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে যে, আমরা মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে ক্রুশের মোকাবেলায় তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দেবো। কিন্তু সেই বিদ্যা আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছি। গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে আমরা অপকর্ম করছি এবং একে অপরকে ধোঁকা দিচ্ছি। মুসলমানরা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান। তারা গুপ্তচরবৃত্তি-নাশকতার কাজে মেয়েদের ব্যবহার করে। আমাদের নেতা আমাকে ভালোবাসার টোপ দিলেন। কিন্তু মেরিনা বেশি চালাক বলে তাকে হাত করে নিলো। তুমি আমাকে দখল করার চেষ্টা করছো। ফল দাঁড়াচ্ছে, এখন আমরা পুরো দলটিই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। তোমাদের সঙ্গে যদি আমরা দুটি মেয়ে না থাকতাম, তাহলে তোমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হতে। নারীর উপস্থিতি পুরুষদের মধ্যে শত্রুতার জন্ম দিয়ে থাকে।'

'এ লক্ষ্যেই তো আমরা মুসলমানদের মাঝে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদের ছেড়ে দেই'– মার্টিন বললো– 'তাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা কাজটা এ জন্য করি, যাতে ইসলামের পতন ঘটে এবং ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।'

মার্টিন বারবারাকে নিজের দিকে টেনে এনে ফিসফিস করে বললো– 'এমন রাতটাকে নিরামিষ আলাপে বিস্বাদ করো না বারবারা! এসো বাইরে যাই। দেখো, চাঁদটা কতো সুন্দর!'

'আমার মনটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে'– বারবারা বললো– 'আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমার হৃদয়ে ঘৃণা জন্ম নিয়েছে। আমি কোথাও যাবো না। তুমি যেতে পারো।'

'একদিন এমন আসবে, তুমি আমার পায়ের উপর পড়ে কাকুতি-মিনতি করে বলবে, মার্টিন আমাকে বাঁচাও; ওরা আমাকে কুকুরের মুখে তুলে দিচ্ছে। তখন কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করবো না।'

'এখনো আমি কুকুরের মুখেই আছি'– বারবারা তাচ্ছিল্যের সুরে বললো– 'আমি কোনদিন তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবো না। তুমি এখান থেকে চলে যাও।'

মার্টিন ক্ষুব্ধ মনে উঠে দাঁড়ায় এবং তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

বারবারা মার্টিন চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং অপেক্ষা করতে থাকে মার্টিন কখন ঘুমিয়ে পড়ে। সে জানে, দলনেতা আর মেরিনার ফিরতে অনেক দেরি হবে।

খানিক পর বারবারা তাঁবু থেকে বের হয়। বসে বসেই সামনের দিকে এগুতে থাকে। সম্মুখের জায়গাটা সামান্য গভীর। বারবারা সেখানে নেমে পড়ে। সেখান থেকে ঝুঁকে ঝুঁকে কূপের পেছনে চলে যায়। অনেক দূর ঘুরে ইসহাক যে তাঁবুতে অবচেতন পড়ে আছে, সেখানে পৌঁছে যায়। বারবারা জানে না, ইসহাককে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে। সে তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়ে। বাতিটা জ্বলছে। বারবারা পা ধরে ইসহাককে নাড়া দেয়। কিন্তু ইসহাক জাগলো না। মাথা ধরে নাড়ায়। হাত ধরে টানে। কিন্তু না, কিছুতেই লোকটা নড়ছে না।

'ওঠো হতভাগা!'– বারবারা ইসহাকের গালে চড় মেরে বিরক্তির সাথে বললো– 'তুমি প্রতারণার জালে আটকা পড়েছো। আমরা সবাই গোয়েন্দা। তুমি কায়রো যেতে পারবে না। বৈরুতের কারাগারের অন্ধকার পাতাল প্রকোষ্ঠে নির্যাতনের মুখে ধুকে ধুকে মরবে।'

ইসহাক অচেতন পড়ে আছে। যেনো মরে গেছে। বারবারা তাঁবুর বাইরে হাল্কা হাসির শব্দ শুনতে পায়। কিন্তু ভয় পায় না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা কিনা। শব্দগুলো নিকটে চলে আসার পরও মেয়েটি ইসহাকের নিকট বসে থাকে। হাসি আর ফিসফিস কথোপকথনের শব্দ তাঁবু পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। একটি কণ্ঠ মেরিনার। নেতার সঙ্গে কয়েদী দেখতে এসেছে।

'আমরা মুসলমান'– বারবারা ইসহাককে উদ্দেশ্য করে উচ্চস্বরে বললো– 'তোমাকে আমরা এমন একটি ঘোড়া দেবো, যে তোমাকে দু'দিনের মধ্যে কায়রো পৌঁছিয়ে দেবে।'

'বারবারা! বারবারা!' বারবারা দলনেতার কণ্ঠ শুনতে পায়। পেছন ফিরে তাকায়। দলনেতা ও মেরিনা দাঁড়িয়ে আছে। নেতা বললো– 'এই মুহূর্তে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করতে পারবে না। লোকটাকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে।'

'এটা আমার শিকার বারবারা'– মেরিনা তাচ্ছিল্যভরা হাসি হেসে বললো– 'এর থেকে কীভাবে তথ্য বের করতে হবে, সেটা শুধু আমিই জানি।'

দলনেতা ও মেরিনা হেসে ওঠে। এই তিরস্কারের হাসি বুঝতে পারে বারবারা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বললো– 'আমি কোন ভুল করিনি, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম।'

'যাও, ঘুমিয়ে পড়ো।' দলনেতা আদেশের সুরে বললো।

বারবারা উঠে দাঁড়ায়। তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

দলনেতা ইসহাকের শিরায় হাত রাখে। তারপর মেরিনাকে নিয়ে চলে যায়।

ইসহাক তুর্কি সুলতান আইউবীর জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে।

'আলী বিন সুফিয়ান!'– কায়রোতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁর ইন্টেলিজেন্স প্রধান আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন– 'ওদিক থেকে এ যাবত কোন সংবাদ আসেনি। তার অর্থ হচ্ছে, ওখানে কোন পরিবর্তন ঘটেনি, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আমি বিষয়টা মানতে পারছি না।'

'আর আমিও মানতে পারছি না'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'ওখানে কোন পরিবর্তন আসবে, সমস্যা দেখা দেবে অথচ আমাদের নিকট কোন খবর আসবে না। ওখানে আমাদের যে লোক আছে, তারা সাধারণ গোয়েন্দা নয়। ইসহাক তুর্কিকে আপনি তো ভালো করেই জানেন। মাটির বুক চিরে তথ্য বের করে আনার মতো হিম্মত ও যোগ্যতা তার আছে। অন্যরাও তার মতোই বিচক্ষণ।'

'ওদিকে যেসব ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, খৃস্টানরা তা দ্বারা স্বার্থ উদ্ধার করবেই'– সুলতান আইউবী বললেন– 'বল্ডউইন তার ফিরিঙ্গি বাহিনীকে নিয়ে হাল্‌ব ও মসুলের আশপাশে অবস্থান করছে।'

'কিন্তু আল-মালিকুস সালিহ তো মারা গেছে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'হাল্‌বের শাসক এখন ইয্‌যুদ্দীন। তিনি তো খৃস্টানদের আনুগত্য করার মতো লোক নন।'

'আলী!'– সুলতান আইউবী মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন– 'তুমি কি তাহলে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত? তুমি সম্ভবত এ জন্য ইয্‌যুদ্দীনকে পরিপক্ব মুসলমান মনে করছো যে, আমি তাকে বন্ধু ভাবি এবং তার সাহায্যার্থে পরিকল্পনা বদল করে তালখালেদের উপর আক্রমণ করেছিলাম আর্মেনীয়দের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিলাম। তাই না? কিন্তু শুনে রাখো আলী! আমি আমার মুসলমান শাসক ও আমীরদের উপর ভরসা রাখতে পারি না। ইয্‌যুদ্দীন আমাদের পক্ষভুক্ত শাসক হতে পারে। কিন্তু তার আমীর-উজীরদের মধ্যে খৃস্টানদের অনুগত লোকও আছে। আলী! তুমি কি দেখোনি, একজন ঈমানদার শাসকও মন্ত্রী-উপদেষ্টাদের তোষামোদমূলক পরামর্শের জালে এসে মুমিন থেকেও দেশ-জাতিকে ভুল সিদ্ধান্ত দ্বারা ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করে থাকে? আমি পরামর্শ-

পরামর্শকের বিরোধী নই। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পরামর্শ নেয়া কুরআনের নির্দেশ। কিন্তু যিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তার এতোটুকু বুদ্ধি-বিচক্ষণতা থাকতে হবে, যেনো পরামর্শকদের উদ্দেশ্য ও চরিত্র বুঝতে সক্ষম হন। তোষামোদ-চাটুকারিতা রাজত্বের মোহকে চাঙ্গা করে তোলে। একসময় শাসক তোষামোদের সুর লহরীতে সুখনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত বুদ্ধির শাসক যতো বড় যোদ্ধা কিংবা দুনিয়াবিমুখই হোক না কেন, জাতি ও মাতৃভূমিকে নিয়ে সাগরে ডুবে মরে। এমনি আশঙ্কা আমার ইয্যুদ্দীনের ব্যাপারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।'

'আমি আশাবাদী এই জন্য যে, নূরুদ্দীন জঙ্গী মরহুমের বিধবা মুহতারামা রোজি খাতুন ইয্যুদ্দীনকে বিয়ে করেছেন'— আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন, মুহতারামা রোজি খাতুন এই বিবাহ এ জন্য কবুল করেছেন, যেনো হালব ও মসুলের শাসক ও সেনাবাহিনী আমাদের পক্ষে কাজ করে। ভদ্র মহিলার এছাড়া বিবাহের আর কী প্রয়োজন থাকতে পারে?'

'তথাপি আমার সন্দেহ হচ্ছে'— সুলতান আইউবী বললেন— 'সন্দেহের কারণটা হলো, ইয্যুদ্দীন খৃস্টানদের দ্বারা সরাসরি বেষ্টিত। নিজের নিরাপত্তার জন্য তিনি তলে তলে খৃস্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারেন। ওখানকার খবরাখবর আমার তাড়াতাড়ি জানা দরকার। আমি কখনো অন্ধকারে পথ চলি না তুমি তো জানো।'

'আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন মহামান্য সুলতান।' আলী বিন সুফিয়ান পরামর্শ দেন।

'আমি বেশি দিন অপেক্ষা করবো না'— সুলতান আইউবী বললেন— 'তুমি জানো, আমি বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছি। এতো তোমার সম্মুখের ঘটনা, আমি দিন-রাত অবিশ্রাম বাহিনীকে মহড়া করাচ্ছি। গোপন কথাটা শুনে নাও, আমি হালব-মসুলের দিকে যাবো না। আমার টার্গেট এখন বৈরুত। এখন আর আমি প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়বো না। হালব, মসুল প্রভৃতি অঞ্চলে যাওয়ার অর্থ হবে, আমি প্রতিরক্ষা লড়াই করতে যাচ্ছি। কিন্তু এখন আমার যুদ্ধ হবে আক্রমণাত্মক-মারমুখী। বৈরুত ফিরিঙ্গিদের হৃদপিণ্ড। হাত-পায়ে আঘাত হানার পরিবর্তে কেন দুশমনের হৃদপিণ্ডে এক আঘাত হেনে নিঃশেষ করে দেবো না? এখন আমি বাহিনীকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। নিজ এলাকায় যুদ্ধে জড়িয়ে থাকলে আমি কোনদিন

বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছতে পারবো না। বুঝতে চেষ্টা করো আলী। ওদিক থেকে কোন সংবাদ এখনো না আসার কারণ কী। আমার দু'টি তথ্যের প্রয়োজন। প্রথমত, বৈরুতে ফিরিঙ্গি বাহিনীর তৎপরতা। দ্বিতীয়ত, হাল্‌বে ইয্‌যুদ্দীনের উদ্দেশ্য কী। আমার জানার প্রয়োজন, আমরা আরেকটি গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না তো।'

'বৈরুতে ইসহাক তুর্কি আছে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'নিজে না আসলে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেবে। আমি এখান থেকে কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি বেশি দিন অপেক্ষা করতে পারবো না আলী'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তুমি এখান থেকে কাউকে পাঠাবে। সে খবর নিয়ে যাবে, তারপর আসবে। এই যাওয়া-আসার মাঝে সময় ব্যয় হবে কমপক্ষে তিন মাস। না, আমি এতোদিন অপেক্ষা করতে পারবো না। দিন কয়েকের মধ্যেই আমি বাহিনীকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেবো।'

'তা এই অগ্রযাত্রা কি অন্ধকারের পথচলা হবে না?' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'কমান্ডো ইউনিটগুলোকে অগ্রগামী বাহিনীরও অনেক সম্মুখে ছড়িয়ে রাখবো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি আল্লাহর আদেশে তাঁরই পবিত্র ভূমির মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছি। নিজের নিরাপত্তার জন্য আমি মিসরে আরামে বসে থাকতে পারি না আলী।'

১১৮২ সালের কোন একদিন সুলতান আইউবী খৃস্টানদের অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় অস্থির প্রহর গুনছেন। আপনারা পেছনে পড়ে এসেছেন, তার দু'মাস আগে নূরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র আল-মালিকুস সালিহ– যিনি হাল্‌বের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে সুলতান আইউবীর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন– মৃত্যুবরণ করেছেন। সুলতান আইউবীর সঙ্গে তার যুদ্ধ না করা এবং সুলতানের জোটভুক্ত হয়ে কাজ করার চুক্তি থাকা সত্ত্বেও গোপনে গোপনে খৃস্টানদের সঙ্গে মিত্রতা রেখেছিলেন। তার মৃত্যু সংবাদ খৃস্টান ও সুলতান আইউবী উভয় পক্ষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। আল-মালিকুস সালিহ মৃত্যুর পূর্বে ইয্‌যুদ্দীন মাসউদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যান। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে ঘটনাটি, সেটি হচ্ছে ইয্‌যুদ্দীন-রোজি খাতুনের বিবাহ। নূরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী এবং আল-মালিকুস সালিহ'র মা এই বিয়ে সংসার পাতার জন্য বরণ

করেননি। সুলতান আইউবীর ভাই আল-আদিল ইয্যুদ্দীনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, এই বিবাহ হবে দামেশ্‌ক ও হাল্‌বের বিবাহ।। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে গৃহযুদ্ধের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং খৃস্টানদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান শক্ত হবে। রোজি খাতুন শেষ পর্যন্ত এই বলে সম্মতি প্রদান করেন যে, তার ব্যক্তিগত সব কামনা-বাসনা মরে গেছে। তিনি শুধুমাত্র ইসলামের মর্যাদার খাতিরে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন।

রোজি খাতুন ত্যাগ স্বীকার করে নেন এবং ইয্যুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। হাল্‌ব এবং মসুলের প্রজাতন্ত্রগুলোর উপর বহুদিন যাবত খৃস্টানদের প্রভাব কাজ করে আসছিলো। যার ফলে এই প্রজাতন্ত্রগুলো সুলতান আইউবীর বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং তিন বছর পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। আপনারা তার বিস্তারিত কাহিনী পড়ে এসেছেন। এখন রোজি খাতুন ইয্যুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে খৃস্টানরা চিন্তায় পড়ে যায়, রোজি খাতুন খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় শত্রু জঙ্গীর স্ত্রী। বিচক্ষণ এই মহিলা তো হাল্‌ব-মসুল ও অন্যান্য মুসলিম অঞ্চলসমূহ থেকে খৃস্টানদের প্রভাব নস্যাৎ করে দেবেন। ওদিকে মিসরে সুলতান আইউবী এই ভাবনায় অস্থির যে, খৃস্টানরা সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফেলে কিনা। সুলতান আরো ভাবছেন, আরবে তার অনুপস্থিতিতে খৃস্টানরা স্বার্থ উদ্ধার করার অপচেষ্টা করতে পারে।

সুলতান আইউবী বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতের একটা সম্ভাব্য চিত্র এঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন, খৃস্টানরা অগ্রযাত্রা করে হাল্‌ব-মসুল অবরোধ করে নেয়ার আগে তিনি দ্রুতগতিতে অগ্রযাত্রা করবেন এবং বৈরুত অবরোধ করে ফেলবেন।

সুলতান আইউবীর এ এক চরম স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত। বৈরুত অবরোধ করতে হলে তাকে শত্রুর এলাকা অতিক্রম করে যেতে হবে। পথেই সংঘাতের আশঙ্কা বিদ্যমান।

যা হোক, সুলতান আইউবী সম্ভাব্য সব ধরনের সকল শঙ্কা-বিপদের পরিসংখ্যান মাথায় নিয়ে সবরকম পরিস্থিতির মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গোয়েন্দা রিপোর্ট ব্যতীত অভিযান-অগ্রযাত্রা তিনি কমই করেছেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতির দাবি ভিন্ন। ইয্যুদ্দীনের নিয়ত

কী এবং ওখানে রোজি খাতুনের প্রতিপত্তি আছে কিনা জানা খুবই প্রয়োজন ছিলো তাঁর।

আলী বিন সুফিয়ানের প্রেরিত গোয়েন্দারা আনাড়ি কিংবা ভীতু নয়। তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা কায়রোতে পৌঁছানোর জন্য জীবন বাজি রাখা তাদের জন্য মামুলি ব্যাপার। একটা দীক্ষা তারা সবসময় মনে রাখে যে, অর্ধেক যুদ্ধ লড়াই শুরু হওয়ার আগেই গোয়েন্দারা জয় করে থাকে। তারা এও জানে, একজন গোয়েন্দার কর্তব্য অবহেলা কিংবা ভুল তথ্য গোটা বাহিনীকে শেষ করে দিতে পারে। আবার একজন মাত্র গুপ্তচর দুশমনকে অস্ত্র সমর্পণ করাতে বাধ্য করতে পারে।

ইসহাক তুর্কির উপর আলী বিন সুফিয়ানের পরিপূর্ণ আস্থা আছে। লোকটি যেমন যোগ্য, তেমনি সাহসী। তদুপরি পরিপক্ব ঈমানদার মুসলমান। আলীর এই আস্থা যথার্থ। ইসহাক তুর্কি দক্ষতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলো। সে সুলতান আইউবীকে অবহিত করতে আসছিলো যে, বল্ডউইনের ফিরিঙ্গি বাহিনী বৈরুতের আশপাশে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইয্যুদ্দীনের ঝোঁক খৃস্টানদের প্রতি। কাজেই সুলতান যেনো বৈরুতের দিকে পা না বাড়ান। তদুপরি সুলতান যদি অগ্রযাত্রা করেনই, তার অনুকূলে ইসহাক ফিরিঙ্গি বাহিনীর বিস্তার ও অবস্থানের নকশা তৈরি করে আসছিলো। কিন্তু পথেই ইসহাক খৃস্টান গোয়েন্দাদের জালে আটকা পড়ে গেলো।

'বলো, সেই তথ্যটা কী, যা তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট নিয়ে যাচ্ছো?'– খৃস্টান গোয়েন্দা ইসহাককে জিজ্ঞেস করে। বললো– 'আমরাও মুসলমান। সুলতান আইউবীর সমর্থক ও অনুগত। তোমার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত আছে। খাদ্য-পানীয়ও ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।'

'আল্লাহ আমাদের সুলতানকে এরূপ সমর্থক-অনুগতদের থেকে নিরাপদ রাখুন'– ইসহাক বললো– 'আমি এই মেয়েটাকে বলেছিলাম, মধ্যরাতে পর আমাকে তুলে দিও, আমি রাত থাকতেই রওনা হয়ে যাবো। কিন্তু তোমরা আমাকে জাগালে না। রাত কেটে দিনেরও অর্ধেকটা চলে গেছে। সময় তো নষ্ট হয়েছেই, তদুপরি এখন রওনা হলে ঘোড়া অতোটা পথ অতিক্রম করতে পারবে না যতোটা রাতে পারতো।'

'তুমি অনেক ক্লান্ত ছিলে'– মেরিনা স্বস্নেহে বললো– 'এমন গভীর ঘুম ঘুমিয়েছিলে যে, আমি তোমাকে জাগিয়ে তোলা অবিচার হবে মনে করেছি। আমরা তোমার জন্য যে ঘোড়াটা প্রস্তুত করে রেখেছি, ওটা এতো ভালো যে, সময় যেটুকু নষ্ট হয়েছে তা পুষিয়ে দেবে।'

ইসহাক তুর্কি এখনো বুঝতে পারেনি, যাকে ওরা ক্লান্তির পর গভীর নিদ্রা বলছে, আসলে তা কোন ওষুধের ক্রিয়ার অচেতনতা। এতো দীর্ঘ সময় ঘুমানোর পরও তার শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। ইসহাক শারীরিকভাবে এখনো ভ্রমণে সমর্থ নয়। তবু এক্ষুনি রওনা হওয়ার জন্য ব্যাকুল সে।

ইসহাকের যখন চোখ খুলেছিলো, তখন সূর্য মাথার উপরে উঠে এসেছে। খৃস্টান দলনেতা ও মেরিনা তার চৈতন্য ফিরে আসার আগেই তার কাছে এসে বসেছিলো। ইসহাক চোখ খুললে তারা তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তারা এমন ধারায় কথা বলে যে, ইসহাক তুর্কির মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। সে তার সকল পরিকল্পনার কথা বলে যাচ্ছে। তবে ইসহাক সুলতান আইউবীর জন্য কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছে তা বলছে না।

খৃস্টান দলনেতা তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়। ইসহাককে কুপোকাত করার জন্য রেখে যায় মেরিনাকে। চিত্তহারী মেয়ে মেরিনা ইসহাককে উত্তেজিত করে তোলার লক্ষ্যে বললো– 'আমি তোমাকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসি।' তাকে প্রেমের আহ্বানসহ আরো অনেক কথা বলতে থাকে মেরিনা।

'কায়রো পৌঁছে প্রেমালাপের জন্য সময় বের করে নেবো'– বললো ইসহাক– 'তুমি যদি আমাকে হৃদয় থেকেই কামনা করো, তাহলে আমাকে কর্তব্য পালনে সাহায্য করো।'

ইসহাক উঠে দাঁড়ায়। লম্বা পায়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়। বলতে শুরু করে– 'আমাকে ঘোড়া দাও, এক্ষুনি দাও।'

'কিছু খেয়ে নাও'– মেরিনা ইসহাকের বাহু ধরে তাঁবুতে ফিরিয়ে নিতে নিতে বললো– 'আমি তোমাকে না খাইয়ে যেতে দিতে পারি না।'

মেরিনা ইসহাককে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ ইসহাককে কোন কিছুই গলাতে পারছে না। তাঁবুতে নিয়ে মেরিনা ইসহাককে বসিয়ে দেয় এবং তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দেয়– 'খাবার তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো, সময় নেই। উনি এক্ষুনি চলে যাবেন।'

বারবারা খাবার নিয়ে এসে ইসহাকের সামনে রেখে পেছনে সরে দাঁড়ায়। মেরিনা ইসহাকের পার্শ্বে উপবিষ্ট। বারবারা মেরিনাকে পেছন করে দাঁড়ায়। ইসহাক খেতে শুরু করে। খাওয়ার মধ্যে ইসহাক বারবারার প্রতি তাকায়। বারবারা হাতে ক্ষুদ্র একটি ক্রুশ লুকিয়ে রেখেছিলো। অতি সতর্কতার সাথে সেটি ইসহাককে দেখায়। নিজের বুকে হাত রেখে মেরিনার প্রতি ইঙ্গিত করে। তারপর বাইরের দিকে ইশারা করে আঙ্গুল নাড়ায় এবং আঙ্গুলটি নিজের ঠোঁটের উপর রাখে। বারবারা তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

বারবারার ইশারা-ইঙ্গিতে ইসহাক বুঝে ফেলে এরা খৃস্টান এবং এদের আর কোন তথ্য দেয়া যাবে না। ব্যাপারটা অনুধাবন করে ইসহাক মনে মনে চমকে ওঠে বটে; কিন্তু অভিজ্ঞ গুপ্তচর বলে কিছুই প্রকাশ পেতে দেয়নি। তার সন্দেহ দৃঢ় সত্যে পরিণত হয়। সে বুঝতে পারে, সুলতান আইউবীর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া তথ্য জানার এদের এতো আগ্রহ কেন। তার চেতনা আসে, সে তো ঘুমকাতর নয়। তবে কি তাকে বেহুঁশ করে রাখা হয়েছিলো। ঘুম থেকে জেগে সে বিস্ময়কর এক ঘ্রাণ অনুভব করেছিলো। তার আর সন্দেহ রইলো না তাকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছিলো? কিন্তু একটি প্রশ্ন তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, দ্বিতীয় মেয়েটি তাকে ইশারা করে গেলো কেন? তবে কি মেয়েটি মুসলমান, এদের ফাঁদে আটকা পড়ে আছে?

মিষ্টিমধুর কথা, পাগলকরা মুচকি হাসি আর মনকাড়া ভাবভঙ্গিতে ইসহাককে তথ্য প্রকাশের জন্য কসরত চালিয়ে যাচ্ছে মেরিনা। ইসহাকের মাথাটাও কাজ করে যাচ্ছে দ্রুত– কীভাবে এদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবে।

ইসহাক মেরিনাকে জিজ্ঞেস করে– 'তোমাদের কাফেলায় কতোজন লোক আছে?' মেরিনা সংখ্যা বলে। ইসহাক আরো কিছু প্রশ্ন করে শেষে বললো– 'দাও, আমাকে ঘোড়া দাও।'

ইসহাক বাইরে চলে আসে। এদের সংখ্যা যাচাইয়ের চেষ্টা করে। কীভাবে এদের কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সে ফন্দি করতে থাকে। তার জন্য যে ঘোড়া প্রস্তুত করে রাখার কথা বলা হয়েছিলো, বাইরে এসে সে কোন ঘোড়া দেখতে পায় না।

মেরিনা ইসহাকের পাশে এসে দাঁড়ায়।

'ঘোড়া কোথায়?' ইসহাক জিজ্ঞেস করে।

'আমি দেখছি।' বলেই মেরিনা চলে যায়।

❖ ❖ ❖

'তুমি ঠিকই বলেছিলে'– মেরিনা দলনেতাকে বললো– 'লোকটা পাথর, ঘোড়া ছাড়া কোন কথাই বলছে না। আমার কথার কোন পাত্তাই দিচ্ছে না।'

'তার কোন সন্দেহ জাগেনি তো?' খৃস্টান দলনেতা বললো।

'এ পর্যন্ত না'– মেরিনা বললো– 'তবে তার মুখ থেকে আসল তথ্য বের করা যাচ্ছে না।'

'তার মানে তোমরা ব্যর্থ!' খৃস্টান দলনেতা বললো।

দলনেতা জানে না, বারবারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে। সে প্রমাণ করে দিয়েছে, মেরিনা জাদুকর নয় যে, অসম্ভব কাজও করে দেখাবে। সুলতান আইউবীর এই গোয়েন্দাকে পলায়নের কাজে সহায়তা করার ইচ্ছা তার আছে। পারলে মজাটা জমতো ভালো। মেরিনার দম্ভ মাঠে না যেতো। কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

ইসহাক আবারও তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। মেরিনা ও তাদের নেতা দূরে একস্থানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ইসহাক দৌড়ে তাদের নিকট চলে যায়। জিজ্ঞেস করে– 'ঘোড়া কোথায়?'

'কোথাও নেই'– দলনেতা রাগান্বিত কণ্ঠে বললো– 'তোমার যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ।'

ইসহাক কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। তার সঙ্গে না আছে তরবারী, না খঞ্জর। ইসহাক তাদের আসল পরিচয় জেনে গেছে। তথাপি বললো– 'আমার অবাক লাগছে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তোমরা আমার পথ আগলে দাঁড়াচ্ছো কেন?'

'যদি লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পেতে চাও, তাহলে তাড়াতাড়ি বলো, তোমার সুলতানের জন্য কী বার্তা নিয়ে যাচ্ছিলে?' খৃস্টান দলনেতা বললো।

'শুধু এটুকু যে, আমাদের এক আমীর ইয্‌যুদ্দীন নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবাকে বিয়ে করেছেন।' ইসহাক উত্তর দেয়।

'এই সংবাদ বাসি হয়ে গেছে'– খৃস্টান দলনেতা বললো– 'তোমাদের সুলতান এ সংবাদ পেয়ে গেছেন দু'মাস আগে। এখন তিনি সিরিয়ায় যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আসল কথা বলো।'

'তোমরা কি আসল কথা বলে থাকো?' ইসহাক জিজ্ঞেস করে।

'আসল তথ্য, সঠিক তথ্য তোমাকে দিতেই হবে'– খৃস্টান দলনেতা বললো– 'আর তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তোমার সাথে অস্ত্র থাকলেও আমাদের লোকগুলোর মোকাবেলা করতে পারতে না। আমি তোমার বেঁচে থাকার এবং রাজপুত্রের ন্যায় বেঁচে থাকার বুদ্ধি দিতে পারি। আমার প্রস্তাব মেনে নাও। আমাদের সঙ্গে চলো। আমাদের জন্য সেই কাজ করো, যা সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য করেছো আর বিত্ত-বৈভবের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করো।'

খৃস্টান দলনেতা মেরিনার প্রতি ইঙ্গিত করে বললো– 'এর মতো মেয়েরা তোমার সেবার জন্য একপায়ে খাড়া থাকবে। কী দরকার এভাবে বনে-বাদারে মরুবনে ঘুরে মরবে!'

'আমি ক্রুশের জন্য কাজ করবো?'

'না করবে তো আমাদের কয়েদখানার অন্ধকার পাতাল কক্ষে বন্দি হয়ে থাকবে'– খৃস্টান দলনেতা বললো– 'সেটাই হবে তোমার জন্য জাহান্নাম। তুমি মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। আমরা তোমাকে এমন শাস্তি দেবো, যার কল্পনাও হবে তোমার জন্য ভয়ঙ্কর। আমাদের সঙ্গে চলো। ফিরে তো আর যেতে পারবে না।'

'তা তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে কীভাবে?'– ইসহাক বললো– 'আমি তোমাদের দলভুক্ত হওয়ার পর তোমরা আমাকে আমারই এলাকায় প্রেরণ করবে। তোমরা কীভাবে নিশ্চিত হবে, আমি নিজ এলাকায় থেকে যাবো না কিংবা তোমাদের ধোঁকা দেবো না?'

'আমাদের নিকট তার ব্যবস্থা আছে'– খৃস্টান দলনেতা বললো– 'তুমি নিজ অঞ্চলের কথা বলছো। আমরা ইচ্ছে করলে তোমাকে তোমার ঘরের গোপন ঠিকানা থেকেও বের করে আনতে পারবো। সেই বিদ্যা আমাদের আছে। তোমার ধারণা কী, তোমাদের দেশে আমাদের যতো গুপ্তচর আছে, তাদের মধ্যে তোমাদের দেশের কোন লোক কি নেই? দশজন গোয়েন্দার একটি দলে আমাদের লোক থাকে মাত্র দু'জন। বাকিরা তোমাদেরই ভাই। আমাদেরকে ধোঁকা দেবে এমন সাহস তাদের কারো নেই। এমন দুঃসাহস দেখানোর পরিণতি কী তা তারা জানে। কেউ এমন অপরাধ করলে আমরা শুধু তাকেই হত্যা করি না, প্রথমে তার স্ত্রী-সন্তানদের এক এক করে হত্যা করে লাশগুলো তার সামনে রাখি। তারপর তাকে হত্যা করি। আর যে আমাদের অনুগত থেকে কাজ করে, তার জন্য জগতটাকে স্বর্গ

বানিয়ে দেই। কেউ ধরা পড়ে গেলে তার পরিজনের সম্পূর্ণ দায়ভার আমরা বহন করে নেই।'

'আমাকে ভাবতে দাও'– ইসহাক বললো– 'এখান থেকে কবে রওনা হবে?'

'আজই'– খৃষ্টান দলনেতা বললো– 'মধ্যরাতের পর। তুমি চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নাও। মনে রাখবে, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।'

'আমি জানি।' ইসহাক বললো।

'আর তোমাকে বলতে হবে, তুমি আইউবীর নিকট কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছিলে।' খৃষ্টান দলনেতা বললো।

'বলবো'– ইসহাক জবাব দেয়– 'পরে বলবো। মথাটা আউলা-ঝাউলা হয়ে আছে। একটু স্থির হয়ে নিই।'

'যাও, এখন বিশ্রাম নাও।' খৃষ্টান দলনেতা বললো।

ইসহাক তুর্কি তাঁবুর দিকে চলে যায়।

❖ ❖ ❖

নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী রোজি খাতুন এখন ইয্‌যুদ্দীনের স্ত্রী। মহিলার ব্যক্তিগত কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। নেই কোন জৈবিক চাহিদাও। তবু এই বিয়েতে তিনি আনন্দিত। আনন্দিত এ জন্য যে, স্ত্রী হওয়ার সুবাদে ইয্‌যুদ্দীনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন এবং হাল্‌বের বাহিনীকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সহযোগি হয়ে কাজ করাবেন। তার আশা ছিলো ইয্‌যুদ্দীন তাকে নিজের উপদেষ্টা নিযুক্ত করবেন।

কিন্তু বিবাহের প্রথম দিনই যখন রোজি খাতুন এ জাতীয় আলাপের অবতারণা করেন, দেখা গেলো তাতে ইয্‌যুদ্দীনের কোন আগ্রহ নেই। কেমন যেনো বিরক্তি ভাব তার মধ্যে। তিনি রাতে রোজি খাতুনের সঙ্গে এক শয্যায় ঘুমালেনও না। থাকলেন মহলের অন্য এক কক্ষে।

রোজি খাতুন প্রাথমিকভাবে ধরে নিলেন, নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিধায় ঝামেলার কারণে মন-মানসিকতা ভালো নেই। দু'চারদিন গেলে হয়তো স্বাভাবিক হয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় ঝক্কি-ঝামেলার প্রতি তার কোন অনুযোগ নেই। তিনি নিজেও তো রাষ্ট্রের ভাবনাই ভাবেন। নূরুদ্দীন জঙ্গীর জীবদ্দশায় তিনি বহু কাজ করেছেন। করেছেন জঙ্গীর মৃত্যুর পরও। দামেশ্‌কের যুবতী মেয়েদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে রীতিমতো একটি মহিলা বাহিনী গঠন করে ফেলেছিলেন।

রাত পোহাবার পর রোজি খাতুন কক্ষ থেকে বের হন। হাঁটতে হাঁটতে মহলের ভেতরেই এক স্থানে চলে যান। বিশাল প্রাসাদ। তিনি দূরে একটি বাগিচা দেখতে পান। তাতে পাঁচ-ছয়টি যুবতী হাসি-তামাশা করছে।

রোজি খাতুন এখনো তাদের থেকে বেশ দূরে। এক মধ্যবয়সী মহিলা ধেয়ে এসে তাঁকে বললো– 'আপনি আপনার কামরায় চলে যান।'

'কেন?'

'মুহতারাম আমীরের এটাই নির্দেশ'– মহিলা বললো– 'চলুন, আপনার জায়গায় আপনাকে পৌঁছিয়ে দেই। ওখানেও আপনি ঘোরাফেরা করতে পারবেন। মাননীয় আমীরের কড়া নির্দেশ, আপনাকে যেনো এখানে আসতে না দেই।'

'আমি যদি সেই নির্দেশ অমান্য করি, তাহলে কী হবে।' রোজি খাতুন পাল্টা প্রশ্ন করেন।

'আমাকে গোস্তাখী করার সুযোগ দেবেন না'– মহিলা অনুরোধের সুরে বললো– 'মনিবের আদেশ আমাকে মানতেই হবে।'

আরেক মধ্যবয়সী মহিলা এসে হাজির হয়। সে রোজি খাতুনের পাশে এসে দাঁড়ায়। রোজি খাতুনকে সঙ্গে করে তার কক্ষে নিয়ে যায়। মহিলা বলতে শুরু করে– 'আমি আপনার সেবিকা। সর্বক্ষণ আপনার কাছে থাকার নির্দেশ পেয়েছি। আরো নির্দেশ পেয়েছি, আপনাকে যেনো নির্ধারিত সীমানার বাইরে যেতে না দেই।'

রোজি খাতুন চমকে ওঠেন। সেবিকা বললো– 'আপনি ভয় পাবেন না। আমি জানি, আপনি কী স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে এসেছেন। আপনার প্রতিটি স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। আমাকে আপনার সহকর্মী মনে করুন। এই মহল খৃস্টানদের কড়া নজরদারির মধ্যে আছে। আপনার পুত্র তাদের হাতের খেলনা ছিলেন। বর্তমান আমীরও– যিনি এখন আপনার স্বামী– খৃস্টানদের মদদপুষ্ট ও অনুগত হয়েই থাকবেন। এখানকার বহু উজির ও উপদেষ্টা খৃস্টানদের কেনা দাসে পরিণত হয়েছে।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর ব্যাপারে মহলের লোকদের অভিমত কী?'– রোজি খাতুন জিজ্ঞেস করেন– 'এখানে তার কোন প্রভাব আছে কি?'

'এতোটুকু নেই, যতোটুকু আছে খৃস্টানদের'– সেবিকা গোপনীয়তা রক্ষা করে বললো– 'মহলে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা আছে। আমি নিজে সেই গ্রুপের সদস্যা। আমি আপনাকে ভালো করেই জানি। তাই নিজের

পরিচয়টা দিয়েছিলাম। তবে সব কথা এখনই বলবো না। আপনি ইয্যুদ্দীনের নিকট আপত্তি জানান। তিনি আপনাকে এই কক্ষের কয়েদী বানাবেন কেন।'

'তাতো করবোই।'

'তার উদ্দেশ্যটা আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে'– সেবিকা বললো– 'পরবর্তী পরিস্থিতিই প্রমাণ করবে, আমি মিথ্যা বলিনি। সত্য হলো, ইয্যুদ্দীনের আপনাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্য হলো, তিনি আপনাকে কয়েদী বানাবেন। আপনাকে নিজের মতো করে কাজ করতে দেবেন না। সুলতান সালাহুদ্দিন আইউবীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক চিরদিনের জন্য নষ্ট করা দিতে এবং আপনাকে দামেশ্‌ক থেকে বের করে আনাই তার উদ্দেশ্য। দামেশ্‌কের মানুষ সুলতান আইউবীর সমর্থক ও অনুগত এ জন্য যে, আপনি ওখানে ছিলেন। এখন শত্রুরা দামেশ্‌কের জনগণকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। ফলে মুসলমানরা পুনরায় গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং খৃস্টানরা অনায়াসে আমাদের ভূখণ্ডগুলো দখল করে নেবে।'

'এই তথ্যগুলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট পৌঁছানো যায় না?' রোজি খাতুন জিজ্ঞেস করেন।

'সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে'– সেবিকা উত্তর দেয়– 'আমাদের দলের কমান্ডার অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সাহসী এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তার নাম ইসহাক তুর্কি। আমি তাকে ভালো করে জানি। আপনার ছেলের মৃত্যুর পর খৃস্টানদের পরিকল্পনা জানতে খৃস্টানদের অঞ্চলে চলে গেছে। শীঘ্রই এসে পড়বে।'

'আমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবো?' রোজি খাতুন জিজ্ঞেস করেন।

'অবশ্যই।' সেবিকা জবাব দেয়।

শরাব নয় শরবত

ইয্যুদ্দীনের মহলের আভ্যন্তরীণ জগতের গোপন তথ্যাদি অবহিত করে রোজি খাতুনের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিয়েছে খাদেমা। রোজি খাতুন যেসব স্বপ্ন দেখে হাল্‌বের গভর্নর ইয্যুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেসব স্বপ্ন থেকে তিনি জাগ্রত হয়ে গেছেন।

রোজি খাতুন এক মহান নারী। ইসলামে ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক বীর মুজাহিদা। মৃত স্বামী নূরুদ্দীন জঙ্গী এবং পাসেবানে ইসলাম সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় রোজি খাতুনও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং সালতানাতে ইসলামিয়ার ঐক্য সম্প্রসারণের জন্য জন্মেছিলেন। খাদেমা তাকে যেসব তথ্য অবহিত করেছে, সেসব যদি সত্য ও বাস্তব হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ হচ্ছে— এই বীর নারীর স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এবং তার তরবারীটাকে ভোতা বানিয়ে তাঁকে কয়েদীতে পরিণত করা হয়েছে। তার যুবতী কন্যা শামসুন্নিসা এ মহলেই অবস্থান করছে। অথচ, এখনো মেয়ের সঙ্গে তার দেখা মেলেনি।

পিতা নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর সময় শামসুন্নিসার বয়স ছিলো আট-নয় বছর। তার বড় এবং একমাত্র ভাই আল-মালিকুস সালিহ'র এগারো। জঙ্গীর মৃত্যুর পর ক্ষমতালোভী চাটুকাররা তাঁর এই এগারো বছরের বালক পুত্রটাকে খলীফা নিযুক্ত করে পুতুল রাজায় পরিণত করে। সুলতান সালাহুদ্দীন এই ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে দেশ রক্ষার জন্য মিসর থেকে দামেশ্‌ক এসেছিলেন। তার আগমনের ধরনটা ছিলো একরকম সেনা অভিযানের মতো। জঙ্গীর বিধবা রোজি খাতুনের প্রচেষ্টা ও সর্বাত্মক সহযোগিতায় দামেশ্‌কের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল-মালিকুস সালিহ বিপুলসংখ্যক সৈন্যসহ পালিয়ে হাল্‌ব চলে যান। বোন শামসুন্নিসাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। মা রোজি খাতুন দামেশ্‌কে থেকে যান এবং খৃস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদে রত থাকেন। শামসুন্নিসা পনের বছরে উপনীত হলে ভাই আল-মালিকুস

সালিহ রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। তিনি মাকে এক নজর দেখার আকাঙ্খা ব্যক্ত করলে শামসুন্নিসা দাসেশ্বকে মায়ের নিকট গিয়ে আর্জি পেশ করে, আপনার একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তিনি আপনার সাক্ষাৎ কামনা করছেন।

রোজি খাতুন স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন– 'তোমার ভাই যেদিন সুলতানের আসনে আসীন হয়েছিলো এবং সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করেছিলো, সেদিনই তার মৃত্যু হয়ে গেছে। শামসুন্নিসা ফিরে যায়। ততোক্ষণে ভাই আল-মালিকুস সালিহ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।

আজ রোজি খাতুন পুত্র যে মহলে মৃত্যুবরণ করেছিলো, তার স্থলাভিষিক্ত ইযযুদ্দীনের স্ত্রী হয়ে সেই মহলে আগমন করেছেন। কন্যা শামসুন্নিসা– যে কিনা এই মহলেই অবস্থান করছে– তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেনি। রোজি খাতুন খাদেমাকে জিজ্ঞেস করেন– 'শামসুন্নিসা কোথায়? আমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবো?'

'সে এখানেই আছে'– খাদেমা জবাব দেয়– 'মনিবকে জিজ্ঞেস করুন, তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন কিনা। যদি কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়ে থাকে, তাহলে আমি গোপনে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবো।'

'তুমি তোমার দলের যে কমান্ডারের কথা বলছো, তার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে পারবো কি?' রোজি খাতুন জিজ্ঞেস করেন।

'ক'টা দিন যাক'– খাদেমা উত্তর দেয়– 'দেখি আপনার উপর কী কী বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। পরিস্থিতি অনুপাতে সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আপনার বিয়েটা হঠাৎ হয়েছে এবং এতো দ্রুত যে, আমরা আগে জানতেই পারিনি। অন্যথায় এ বিয়ে হতে দিতাম না।'

'আচ্ছা, আমি কীভাবে বিশ্বাস করবো, তুমি আমার সমর্থক এবং আমার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করছো না?' রোজি খাতুন সরল মনে জিজ্ঞেস করেন।

খাদেমার ঠোঁটে হাসি দেখা দেয়। রোজি খাতুনকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে বললো– 'আমি যদি কোন ধনাঢ্য নারী হতাম, কোন প্রাসাদের রাজকন্যা হতাম কিংবা আমার মর্যাদা যদি আপনার ন্যায় হতো, তাহলে আপনি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করতেন না। আপনি প্রতিটি মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে প্রতারণার শিকার হতেন। আমার অবস্থান তো এমন যে, আমার সত্যটাও মিথ্যা বলে মনে হবে। এখনো কি আপনার এই

অভিজ্ঞতা হয়নি, সততা, বিশ্বস্ততা ও চেতনা শুধু গরীবদেরই হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে? অনাগত ভবিষ্যৎই বলে দেবে আপনাকে কার উপর আস্থা রাখা উচিত– একজন গরীব সেবিকার উপর, নাকি হালবের রাজার উপর, যিনি আপনার স্বামীও বটে। আপনি আমাকে বিশ্বাস করার ঝুঁকি বরণ করে নিন আর দু'আ করুন, আল্লাহ যেনো আপনার ও আমাদের সাহায্য করেন।'

খাদেমা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। রোজি খাতুন চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খেতে শুরু করেন। রাজকীয় এই কক্ষটা তার কাছে মনে হচ্ছে আস্ত একটা জাহান্নাম।

দু'-তিন দিন হয়ে গেলো রোজি খাতুন ইয্যুদ্দীনের দেখা পাচ্ছেন না। কক্ষে খাবার-পানীয় ইত্যাদি সব এসে যাচ্ছে যথারীতি। তার কখন কী প্রয়োজন হয়, সমাধার জন্য সেবিকাগণ মহাব্যস্ত। যেনো তিনি এই মহলের রাণী। কিন্তু এই রাজকীয় আয়োজন তাঁকে মানসিকভাবে নিদারুণ পীড়া দিয়ে যাচ্ছে। তিনি একজন সুলতানের বিধবা। স্বামীর জীবদ্দশায় কখনো তিনি নিজেকে রাণী কিংবা রাজকন্যা ভাবেননি। তার প্রত্যয় ছিলো, তিনি পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হবেন, মাঠে-ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি যুদ্ধ করবেন এবং একদিন শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন।

হঠাৎ একদিন ইয্যুদ্দীন তার কক্ষে এসে প্রবেশ করেন এবং ব্যস্ততার কারণে এতোদিন আসতে পারেননি বলে ওজরখাহী করেন।

'আপনি আসেননি বলে আমার কোন অভিযোগ নেই'– রোজি খাতুন বললেন– 'আমি এখানে মূলত বধূ হয়ে আসিনি। আপনি প্রতি মুহূর্তে আমার সঙ্গে থাকুন কিংবা প্রতিরাত আমার সাথে সময় অতিবাহিত করুন, এরূপ আকাঙ্খা আমার নেই। আমার দাম্পত্য জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় নিঃসঙ্গ কেটেছে। মরহুম নূরুদ্দীন জঙ্গী রণাঙ্গনে থাকতেন আর আমি তাঁর নয়– তাঁর লাশের অপেক্ষায় থাকতাম। যে সময়টা তিনি যুদ্ধের ময়দানে থাকতেন না, সে সময়টা রাজ্যের বিভিন্ন কাজ এবং ফৌজের প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকতেন। আমাকে দেয়ার মতো সময় তিনি তেমন একটা পেতেন না। কিন্তু সেখানে আমিও ব্যস্ত থাকতাম। সালতানাতের কিছু কিছু কাজের তত্ত্বাবধান ও শহীদ পরিবারের দেখাশোনা আমার উপর ন্যস্ত ছিলো। আমি মেয়েদেরকে

আহত যোদ্ধাদের ব্যান্ডেজ, তরবারী চালনা, তীরন্দাজি ও অশ্বচালনার প্রশিক্ষণ দিতাম। ওখানে আমি এক কক্ষে বন্দী ছিলাম না, যেমনটা এখানে আছি। এই বন্দিদশা আমি পছন্দ করি না।'

রোজি খাতুন খাদেমার নিকট থেকেই ইয়্যুদ্দীনের মতলব জানতে পেরেছেন। তাই এই দ্বিতীয় স্বামীর মনভোলানো প্রেমনিবেদনে প্রবঞ্চিত হতে প্রস্তুত নন তিনি। একবার মাত্র এবং আজই তিনি নিজের উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে ফেলবেন মনস্থ করেন রোজি খাতুন। রোজি খাতুন ছোট্ট খুকি নয়– একজন পরিপক্ক অভিজ্ঞ নারী।

'কিন্তু আমাকে এই কক্ষে যেভাবে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এটা আমার পছন্দ নয়'– রোজি খাতুন বললেন– 'আমি আপনার হেরেমের দাসী-গোলাম নই। আপনি আমাকে এভাবে রাখতে পারেন না।'

'রোজি খাতুন!'– ইয়্যুদ্দীন কক্ষে পায়চারি করতে করতে বললেন– 'নূরুদ্দীন জঙ্গীর সংসারে তুমি যে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছো, সেই ধারা এখানে তোমাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। তিনি তোমাকে যে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন, তা আমার পছন্দ নয়। আর কোন স্বামীই এই জীবনধারা মেনে নিতে পারে না। তুমি যদি বাইরে বেড়াতে যেতে চাও তো তোমার জন্য ঘোড়াগাড়ি প্রস্তুত আছে। যখন খুশি তুমি বেড়িয়ে আসতে পারো।'

'যার মহলের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি নেই, সে আবার বাইরে বেড়ানোর অনুমতি কী করে পেতে পারে?'– রোজি খাতুন প্রশ্ন করেন– 'আপনি কি সত্যিই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি মহলের ভেতর ঘোরাফেরা করতে পারবো না?'

'এই আদেশ আমি তোমার নিরাপত্তার জন্য দিয়েছি'– ইয়্যুদ্দীন উত্তর দেন– 'তুমি তো জানো, হাল্‌ব ও দামেশ্‌কে কিরূপ গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। সুলতান আইউবী তোমার পুত্রকে পরাজিত করে তাকে আনুগত্যের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকজন অন্তর থেকে আইউবীর শত্রুতা ভুলতে পারেনি। মহলে এমন লোকও থাকতে পারে, যে তোমাকে এবং সুলতান আইউবীকে শত্রু মনে করে। সুলতান আইউবীর ফৌজের হাতে তাদের বাস্তুভিটা ধ্বংস হয়েছে এবং তাদের যুবক ছেলেরা নিহত হয়েছে। তারা জানে, তুমি আইউবীর সমর্থক এবং তার দামেশ্‌ক দখলে সহায়তা

করেছো। তাদের কেউ তোমাকে খুন কিংবা অপহরণ করতে পারে।'

'তারা আপনাকেও হত্যা করতে পারে। কারণ, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর বন্ধু ও জোটভুক্ত শাসক'– রোজি খাতুন বললেন– 'তো যে লোকগুলো ইসলামী ঐক্যের বিরোধী তাদেরকে গ্রেফতার করা আবশ্যক নয় কি? আপনার নিকট কি এমন কোন গুপ্তচর নেই, যারা খুঁজে বের করে এদেরকে ধরিয়ে দিতে পারে?'

'আমি সকল ব্যবস্থাই করছি'– ইয্‌যুদ্দীন এমনভাবে কথাটা বললেন যেনো তার কাছে এ প্রশ্নের উপযুক্ত কোন জবাব নেই– 'আমি তোমার জীবনটা ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করতে চাই না।'

'এই ঝুঁকি কি শুধু মহলের ভেতরে?'– রোজি খাতুন জিজ্ঞেস করেন– 'আপনি আমাকে ঘোড়াগাড়িতে চড়ে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি প্রদান করেছেন। বাইরেও তো কেউ আমাকে খুন কিংবা গুম করতে পারবে।'

ইয্‌যুদ্দীন উত্তর দিতে চাইলে রোজি খাতুন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন– 'আমি আপনাকে শুধু এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করেছি যে, নূরুদ্দীন জঙ্গী যে কাজ অসমাপ্ত রেখে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন; আমি, সালাহুদ্দীন আইউবী আর আপনি মিলে কাজটা সমাপ্ত করবো। তার জন্য এখনো যদি আপনার পোষ্যদের মধ্যে আমাদের মিশন বিরোধী কেউ থেকে থাকে, তাদের নির্মূল করা এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই ভূখণ্ড থেকে খৃস্টানদের উৎখাত করা জরুরি।'

'তোমার কি সন্দেহ আছে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর দলভুক্ত নই?' ইয্‌যুদ্দীন বললেন।

'আপনি কি আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারবেন, আমার পুত্র এই মহলের উপর খৃস্টানদের যে প্রভাব জন্ম দিয়ে গেছে, সব নির্মূল হয়ে গেছে?'– রোজি খাতুন জিজ্ঞেস করেন– 'আপনার সকল আমীর ও সালার কি বাগদাদের খেলাফতের অনুগত?'

'এখানে তুমি আমার স্ত্রী হয়ে এসেছো– দূত হয়ে নয়।' ইয্‌যুদ্দীন খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন।

'আমি এখানে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, তা আপনাকে ব্যক্ত করেছি'– রোজি খাতুন বললেন– 'আমি আমার পেটে আপনার সন্তান ধারণ করতে আর শুধু স্ত্রী হয়ে এই কক্ষে আবদ্ধ থাকতে আসিনি। আমি

মহলের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে এবং হাল্‌ব খৃস্টানদের অপচ্ছায়া থেকে নিরাপদ আছি কিনা জানতে চাই। যদি না থাকে, তাহলে নগরকে নিরাপদ বানাতে হবে। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।'

'আমি তোমাকে আরেকবার বলছি'- ইয্‌যুদ্দীন বললেন- 'আমার কাজে তুমি কোন বাঁধার সৃষ্টি করো না। তুমি আমার স্ত্রী। স্ত্রীর মর্যাদা নিয়েই থাকো। যদি মুক্ত হতে চেষ্টা করো, তাহলে বাইরে গিয়ে ঘুরে বেড়ানোর যে অনুমতি আমি তোমাকে দিয়েছি, সেটাও প্রত্যাহার করে নেবো।'

'আমি যদি আপনার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করি, তাহলে?'

'তাহলে তুমি এই কক্ষে বন্দী হয়ে থাকবে'- ইয্‌যুদ্দীন বললেন- 'তালাক পাবে না। আমি তোমাকে তালাক দেবো না।' বলেই ইয্‌যুদ্দীন বেরিয়ে যান।

'আপনি ভুল করেছেন'- খাদেমা রোজি খাতুনকে বললো। এতোক্ষণ পেছন দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে ইয্‌যুদ্দীন ও রোজি খাতুনের কথোপকথন শুনছিলো খাদেমা। ইয্‌যুদ্দীন বেরিয়ে যাওয়ার পর খাদেমা পেছন দরজায় ভেতরে ঢুকে পড়ে।

খাদেমা বললো- 'আপনি যদি হটকারিতা দেখান, তাহলে লোকটা সত্যি সত্যিই আপনাকে এমন এক কারাগারে নিক্ষেপ করবে, যা হবে স্বাধীনতা; কিন্তু কয়েদ থেকে নিকৃষ্ট। আপনি মনিবের মনোভাব নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন। এখন আর তার সঙ্গে এ ধারায় কথা বলবেন না। তার সামনে হাসি-খুশি থাকবেন এবং বাহ্যত অনুভূতিহীন হয়ে যাবেন। আপনি যে ইচ্ছা ও স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন, আমরা তা পূরণ করবো। মনিব আপনাকে বাইরে বের হয়ে ঘোড়াগাড়িতে চলে বেড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন শুনে আমার আনন্দ লাগছে। আমি আপনাকে আমাদের কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবো। আর ইসহাক তুর্কি যদি এসে পড়ে, তার সঙ্গেও সাক্ষাতের সুযোগ করে দেবো।'

কে যেনো আস্তে করে দরজাটা ঠেলা দেয়। উভয়ে চাতক নয়নে দরজার দিকে তাকায়। আগন্তুক রোজি খাতুনের কন্যা শামসুন্নিসা। মেয়েটা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। ঠোঁটে মুচকি হাসি। কিন্তু চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। ঠোঁটের হাসি ভেসে যাচ্ছে চোখের পানিতে। রোজি খাতুন উঠে এগিয়ে এসে মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন। মা-মেয়ে দু'জনই কাঁদছেন।

হেঁচকি শোনা যাচ্ছে উভয়ের। খাদেমা বাইরে বেরিয়ে যায়। বেশ সময় ধরে দু'জনে আল-মালিকুস সারিহ'র কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকেন।

'তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে?' রোজি খাতুন বললেন।

'চাচাজান (ইয্যুদ্দীন) আমাকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেননি।'

'কী কারণে সাক্ষাৎ করতে দেননি, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'করেছিলাম'– শামসুন্নিসা উত্তর দেয়– 'তিনি স্পষ্ট কোন উত্তর দেননি। এইমাত্র বললেন, যাও মায়ের সঙ্গে দেখা করো। বলেছেন, তিনি অনেক ব্যস্ত থাকেন, তাই আমাকে বেশি বেশি সময় দিতে বলেছেন।

'একথা কি বলেননি যে, মায়ের উপর দৃষ্টি রাখো আর আমাকে রিপোর্ট করো, তার কাছে কারা আসে এবং কী কী কথা হয়?' রোজি খাতুন বললেন।

'বলেছেন'– শামসুন্নিসা সরল মনে উত্তর দেয়– 'তিনি এমন কিছু কথাও বলেছেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। আমি তাকে বলেছি, ঠিক আছে বলবো। তিনি বলেছেন, তোমার মা খুব জেদি, সন্দেহপ্রবণ এবং ঝগড়াটে মনে হচ্ছে। তাকে বলবে, আমি খুব ব্যস্ত ও পেরেশান থাকি।'

'শোনো মেয়ে'– রোজি খাতুন বললেন– 'তুমি বড় হয়েছো। সরল-সিধা মন ত্যাগ করতে হবে। আমি বলছি না এখনই তোমার বিয়ে হওয়া দরকার। মুজাহিদদের মেয়েরা হাতে রক্তের মেহেদী ব্যবহার করে। জীবন্ত জাতির মেয়েদের পালকি কমই বহন করা হয়। যুদ্ধের ময়দান থেকে তাদের লাশ বহন করা হয়ে থাকে। তোমার দুর্ভাগ্য হলো, তুমি তোমার ভাই এবং তার উপদেষ্টাদের ছায়ায় লালিত হয়ে বড় হয়েছো। এরা সবাই গাদ্দার। তোমার ভাইও গাদ্দার ছিলো। তুমি তোমার ভাইয়ের বাহিনীকে তোমার পিতার বাহিনী এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখেছো। তোমার ভাই– আমি যাকে পুত্র বলতে লজ্জাবোধ করতাম– ক্রুসেডারদের বন্ধু ছিলো। তাদের বন্ধু, যারা তোমার ধর্মের শত্রু। তোমার পিতা সারাটা জীবন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন।'

'ভাইয়া বলতেন, খৃস্টানরা খুব ভালো মানুষ'– শামসুন্নিসা বললো– 'তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে কথা বলতেন।'

রোজি খাতুন কন্যা শামসুন্নিসাকে খৃস্টানদের চক্রান্ত-পরিকল্পনার কথা অবহিত করে বললেন– 'ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুতায় তারা

এতো কট্টর যে, তাদের বন্ধুত্বের মধ্যেও শত্রুতা থাকে।' রোজি খাতুন বলে যাচ্ছেন আর শামসুন্নিসার চোখ খুলে যাচ্ছে। মায়ের মুখনিসৃত প্রতিটি শব্দ ও বাক্য তার মনের পর্দা খুলে দিচ্ছে। মায়ের মমতামিশ্রিত কথাগুলো মেয়ের মনে গেথে যাচ্ছে।

'মুসলমানের কোন বন্ধু নেই'– রোজি খাতুন বললেন– 'জগতের প্রতিটি বেঈমান জাতি মুসলমানের শত্রু। আর তাদের শত্রুতার সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর পন্থা বন্ধুত্ব। খৃস্টানরা হাল্‌ব, মসুল, হাররানের আমীরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে আমাদের জাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। তোমার ভাই তাদের হাতের পুতুল ছিলো। উম্মতের ঐক্য বিনষ্ট করে জাতিকে বিভক্ত করা ছিলো তার মহা-অপরাধ। কেননা, এই বিভক্তি জাতির এক সদস্য দিয়ে অপর সদস্যকে খুন করায়। কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে কাফেরদের মোকাবেলায় সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকো। আমরা ছিলামও তাই। কিন্তু কাফেররা বিলাসিতার উপকরণ আর নারীদের ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের সেই দেয়ালে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। শয়তানের কাজে যাদুর ক্রিয়া থাকে। নারী, মদ, স্বর্ণমুদ্রা ও ক্ষমতার লোভ মানুষকে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে রাখে। আমাদের বিপক্ষে শয়তানের এ কাজটা খৃস্টানরা করছে।'

'এসব আমি এই মহলে নিজ চোখে দেখেছি'– শামসুন্নিসা বললো– 'আমি তখন ছোট ছিলাম। কিছুই বুঝতাম না। ভাইয়া যখন আমাকে এজাজ দুর্গ ভিক্ষা চাওয়ার জন্য সুলতান আইউবীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন, তখন আমি হেসে-খেলে এখানকার সালারদের সঙ্গে সুলতানের নিকট গিয়েছিলাম। কেউ আমাকে বলেনি, এসব কী ঘটছে। আমার জানা ছিলো না, এটা গৃহযুদ্ধ, যা মূলত খৃস্টানদের কারসাজি। আমি কিছুই বুঝতাম না। আমার কিছু জানা ছিলো না মা! বলুন মা বলুন।'

'মনোযোগ দিয়ে শোনো'– রোজি খাতুনের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে– 'এই মহলে এখনো শয়তানের রাজত্ব চলছে। আমি এখন বুঝতে পারছি, ইয়ুদ্দীন বিয়ে করে আমাকে স্ত্রী নয়– কয়েদী বানিয়েছে। অথচ আমি এই বিয়েতে শুধু এ জন্যই রাজি হয়েছিলাম যে, আমরা সুলতান আইউবীর বিরোধী যুদ্ধের সকল সম্ভাবনাকে দূর করে জাতির মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করবো এবং খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বো। কিন্তু জীবনে এই প্রথম আমি ধোঁকায়

পড়েছি, যেটি কোন সাধারণ ধোঁকা নয়। তথাপি আমি আমার প্রত্যয়-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবোই। আর এ কাজে তোমার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।'

'বলুন আম্মা, আমাকে কী করতে হবে'- শামসুন্নিসা বললো- 'আপনি এই প্রথমবার ধোঁকা খেয়েছেন আর আমি এই প্রথমবারের মতো বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হলাম। আমি ধোঁকা আর প্রতারণার মধ্যেই এতোদিন বড় হয়েছি। বলুন, আমার এখন করণীয় কী?'

'গুপ্তচরবৃত্তি।' রোজি খাতুন মেয়েকে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দিতে শুরু করেন।

শামসুন্নিসা যখন মায়ের কক্ষে প্রবেশ করে, তখন ছিলো বেপরোয়া ও উদাসীন মেয়ে। আর যখন বের হলো, তখন সে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী এক মুজাহিদ নারী। তার ব্যক্তিসত্তা ও ভাবনার জগতে এসেছে বিরাট বিপ্লব।

'আপনাকে কে বললো, আমার মা ঝগড়াটে ও সন্দেহপ্রবণ'- শামসুন্নিসা ইয়্যুদ্দীনকে বললো- 'আপনি তো জানেন তার জীবনটা কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি তো আপনাকেও আমার পিতা নূরুদ্দীন জঙ্গীর ন্যায় বিখ্যাত যোদ্ধা ও মুজাহিদে ইসলাম বানাতে চাচ্ছেন।'

'তোমার মা আমার কাজে হস্তক্ষেপ করতে চায়'- ইয্যুদ্দীন বললেন- 'তার সন্দেহ, আমরা খৃস্টানদের বন্ধু।'

'আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করতে আমি তাকে বারণ করেছি'- শামসুন্নিসা বললো- 'আপনি খৃস্টানদের সুহৃদ এই সন্দেহও তার থেকে দূর করে দিয়েছি। আপনি তাকে ভুল বুঝবেন না। আর তার উপর অপ্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করবেন না।'

'আমি কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিনি'- ইয্যুদ্দীন বললেন- 'ঘোড়াগাড়ি সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকে, তোমরা যখন খুশি ভ্রমণ করতে পারো।'

ইয্যুদ্দীন শামসুন্নিসার রিপোর্ট সত্য বলে মেনে নেয়। কথোপকথন হচ্ছে ইয্যুদ্দীনের দফতরে। আলাপ শেষে শামসুন্নিসা বেরিয়ে এসে দেখে, আমের ইবনে ওসমান দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার বয়স এখনো ত্রিশের নীচে। সুঠাম আকর্ষণীয় এক যুবক। তীরন্দাজ ও তরবারী চালনায় তার জুড়ি নেই। মেধাও খুব প্রখর। আল-মালিকুস সালিহ'র

বিশেষ রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার ছিলো। বাসগৃহ মহলেরই ভেতরে। অল্প ক'দিন হলো শামসুন্নিসাকে ভালো লাগতে শুরু করেছে তার। সহজ-সরল রূপসী মেয়ে শামসুন্নিসা। পিতার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে কেউ কোনদিন তাকে ধারণা দিতে হয়নি। মহলের একজন বিশ্বস্ত মেয়ে হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিলো। ভাইয়ের মৃত্যুর পর সরল মেয়ে মনে করে ইয্যুদ্দীন তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সুযোগে আমের ইবনে ওসমানের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হতো।

এখন শামসুন্নিসা ষোল বছরের যুবতী। সে যুগের মেয়েরা উচ্চতা ও আকার-গঠনে বয়সের চেয়ে বড় মনে হতো এবং অনেকে এই বয়সেই দু'একটি সন্তানের মা হয়ে যেতো। শামসুন্নিসা শাসক পরিবারের কন্যা। অর্থাৎ রাজকন্যা। আল্লাহ্ তাকে যে রূপ দান করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় মনে হতো তাকে। তার এই রূপসাগরে সাঁতার কাটতে শুরু করেছে আমের ইবনে ওসমান। তাদের মাঝে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ হতো। তবে এই প্রেম ছিলো পবিত্র। যার তীব্রতা দু'জনকে গভীরভাবে একে অপরের অনুরক্ত বানিয়ে রেখেছিলো। পরস্পর বিয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে তারা। তবে সমস্যা হচ্ছে, আমের ইবনে ওসমান শামসুন্নিসার বংশের একজন নিম্ন পর্যায়ের চাকর। তাকে স্ত্রীরূপে লাভ করার স্বপ্ন তার পক্ষে ছিলো কল্পনা মাত্র। তথাপি শামসুন্নিসাকে পাওয়ার আশায় বাবা-মার পছন্দ করা মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে।

শামসুন্নিসা যখন ইয্যুদ্দীনের দফতর থেকে বের হয়, তখন আমের ইবনে ওসমান বাইরে দণ্ডায়মান। শামসুন্নিসা তাকে দেখে একটা মুচকি হাসি দিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে ইশারা করে চলে যায়। আমের তার ইঙ্গিতের মর্ম ভালোভাবে বুঝে। সে মাথ দুলিয়ে জবাব দেয়– যাও, আসছি।

❖ ❖ ❖

জায়গাটা গাছপালা, লতাপাতায় সুশোভিত। উপরটা রাতের আঁধারের চাদরে ঢাকা। মহলের জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ ছেড়ে আমের ইবনে ওসমান ও শামসুন্নিসা এখানে উপবিষ্ট। যৌবনদীপ্ত উন্মাতাল ভালেবাসার মাদকতায় আচ্ছন্ন দু'জন।

'আমি আজ মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি'– শামসুন্নিসা বললো– 'এখন থেকে তাঁর সঙ্গে থাকবো।'

'তোমার মা-ও তো রাজ পরিবারের মেয়ে'— আমের বললো— 'তিনি তোমাকে রাজপুত্র ছাড়া কারো সঙ্গে বিয়ে দেবেন না নিশ্চয়ই।'

'না'— শামসুন্নিসা বললো— 'মা রাজ পরিবারের মেয়ে বটে: কিন্তু তিনি সেই তাঁবুকে বেশি পছন্দ করেন, যেটি রণাঙ্গনের একেবারে সন্নিকটে স্থাপিত হয়। আমাকে তিনি সৈনিক বানাতে চান।'

'আমি কি আশা করতে পারি, তুমি তাঁর সঙ্গে আমার ব্যাপারে কথা বলবে এবং তিনি বিষয়টা মেনে নেবেন?' আমের জিজ্ঞেস করে।

'আমার উপর তিনি যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, আমি যদি তা পালন করতে সক্ষম হই, তাহলে তিনি অবশ্যই আমার সকল মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন'— শামসুন্নিসা উত্তর দেয়— 'তাঁর এই বাসনা পূরণে তোমাকেও দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

'কেন, তিনি আমার নাম নিয়ে কিছু বলেছেন কি?' আমের জিজ্ঞাসা করে।

'না'— শামসুন্নিসা উত্তর দেয়— 'আমাকে তিনি তার উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, যার বাস্তবায়নে তার আমাকে প্রয়োজন। আর আমার প্রয়োজন তোমাকে। কিন্তু তার আগে শপথ নিতে হবে, আমাকে সাহায্য করো আর না করো, আমাদের তৎপরতার কথা গোপন রাখবে।'

'যদি শপথ না নেই, তাহলে?' আমের মুচকি হেসে শামসুন্নিসাকে টেনে কাছে এনে বসায়।

শামসুন্নিসা দূরে সরে যায়। প্রেম-পিপাসায় মাতাল আমের ইবনে ওসমান। শামসুন্নিসা বললো— 'আমি আগেও ওয়াদা করেছি এবং আজো প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি, আমার যদি বিয়ে হয় তোমার সঙ্গেই হবে। কিন্তু তার আগে আম্মা আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেটি সম্পাদন করতে হবে।'

আমের ইবনে ওসমান এই ভেবে বিস্মিত হয় যে, শামসুন্নিসাকে ইতিপূর্বে কখনো এতো কর্তব্যপরায়ণ ও আবেগপ্রবণ দেখা যায়নি। সে মুখে বিস্ময়ভাব টেনে বললো— 'তোমার হৃদয়ে আমাকে ভালোবাসার এই কি নমুনা যে, তুমি আমার থেকে শপথ নেয়া প্রয়োজন মনে করছো?'

'কাজটা এমনই যে, শপথ নেয়া জরুরি'— শামসুন্নিসা উত্তর দেয়— 'আমি তো আম্মার আদেশ পালনার্থে জীবন কুরবান করতেও প্রস্তুতি আছি। তখন বোধ হয় আমার সঙ্গ দেয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।'

'তোমার ভালোবাসার খাতিরে আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত।'

'না'– শামসুন্নিসা বললো– 'ভালোবাসার খাতিরে নয়, জীবন দিতে হবে ইসলামের মর্যাদার খাতিরে। তবে সেই ইসলাম নয়, যে ইসলাম আমরা এই মহলে দেখতে পাচ্ছি। আমি সেই ইসলামের কথা বলছি, যার খাতিরে আমার পিতা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং সুলতান আইউবীও তারই জন্য লড়াই করছেন।'

'আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি, এ কাজে আমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, জীবন বাজি রেখেও তা পালন করবো'– আমের ইবনে ওসমান শামসুন্নিসার ডান হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে বললো– 'আমি যদি এই শপথ ভঙ্গ করি, তাহলে আমাকে জীবনে মেরে ফেলো এবং আমার লাশটা কুকুর-শিয়ালকে খেতে দিও। এবার বলো, আমাকে কী করতে হবে?'

'গোয়েন্দাগিরি'– শামসুন্নিসা বললো– 'সুলতান আইউবী মিসরে আছেন। তিনি এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত যে, তিনি আমার ভাই আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ না করার যে চুক্তি করেছিলেন, তার মৃত্যুর পরও তা বহাল আছে। কিন্তু তুমি হয়তো অবগত আছো, এই চুক্তি থাকা সত্ত্বেও হাল্‌বের শাসন ক্ষমতা ক্রুসেডারদের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সুলতান আইউবী ইয্‌যুদ্দীনকে বন্ধু মনে করলেও আমার মা অন্য আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।'

'মনিবের সাথে তোমার মায়ের বিয়ের পর এখন তো কোন শঙ্কা থাকার কথা নয়।' আমের বললো।

'আসল বিপদ তো সেখান থেকেই শুরু'– শামসুন্নিসা বললো– 'এই বিবাহ মূলত বন্দী জীবন, আমার মাকে যার শিকলে বাঁধা হয়েছে। ইয্‌যুদ্দীন বিবাহটা এই উদ্দেশ্যে করেছেন, যাতে দামেশ্‌কবাসীকে সঠিক পথ দেখানোর মতো কেউ না থাকে। আমাদেরকে এই মহলের সকল গোপন তথ্য সংগ্রহ করে কায়রো পৌঁছাতে হবে। এও জানতে হবে, খৃস্টানদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা কী? তারা কি পুনরায় আমাদের বাহিনীকে গৃহযুদ্ধের আগুনে পোড়াতে চায়, নাকি অন্য কোন সামরিক পদক্ষেপ নিতে চায়। তুমি এমন এক অবস্থানে আছো, যেখান থেকে অনেক কিছুই দেখতে পাও। কারণ, তুমি ইয্‌যুদ্দীনের খাস রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি'– আমের বললো– 'তুমি ঠিকই বলেছো, আমি এমন এক অবস্থানে আছি, যেখান থেকে অনেক কিছু

দেখি। শোনে শামসী! আমি এযাবত যা কিছু দেখে আসছি, বিষয়গুলো কখনোই গভীরভাবে চিন্তা করিনি, যার ফলে মুজাহিদ থেকে চাকরে পরিণত হয়েছি। সৈনিক যখন মুজাহিদ থেকে বেতনভোগী কর্মচারিতে পরিণত হয়, তখন এমনই ঘটে। আমাদের মহলে এখন তাই ঘটছে। সৈনিক যখন চাকরি নেয়, তখন সে শত্রুর রক্ত ঝারানোর পরিবর্তে চাটুকারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, যাতে মনিব তার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। খুন আর তোষামোদে সেই পার্থক্য, যে পার্থক্য জয় আর পরাজয়ের মাঝে। আমাকে কখনো কেউ বলেনি, একজন সৈনিকের কর্তব্য শুধু বাইরের আক্রমণ প্রতিহত করাই নয়, ভেতরের সমস্যার মোকাবেলা করাও তার দায়িত্ব। কেউ আমাকে বলেনি, সৈনিকের এটাও কর্তব্য যে, দেশ ও জাতির জন্য যদি শাসকের পক্ষ থেকে সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে তার বুকটা তীরের আঘাতে ঝাঝরা করে দুর্গের বাইরে ছুড়ে ফেলতে হবে। তুমি আমাকে দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছো। বলো, কাউকে খুন কতে হবে নাকি ভেতরের গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করলেই চলবে?'

'দুটোই করতে হবে'– শামসুন্নিসা বললো– 'তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যদি কোন গাদ্দারকে খতম করতে হয় পরোয়া করবে না।'

'শোনো শামসী'– আমের ইবনে ওসমান বললো– 'এখন আমি সরকারি কর্মচারি হিসেবে নয় একজন মুজাহিদ হিসেবে কথা বলবো। হাল্‌বের শাসকমণ্ডলী এবং কতিপয় সালারের উপর আস্থা রাখা যায় না। ইয্‌যুদ্দীন যদি নিষ্ঠাবান এবং সত্যমনে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বন্ধু হতেন, তবুও তিনি হাল্‌বের বাহিনীকে মিসরের সহযোগি বানাতে পারবেন না। তার প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপদেষ্টা ও উজির-মন্ত্রীবর্গের ঈমান খৃস্টানরা ক্রয় করে নিয়েছে। তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর তারা ইয্‌যুদ্দীনকে এমনভাবে পেরেশান করতে শুরু করেছে যে, কারণে-অকারণে তারা কোষাগারের অর্থে হাত দিতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার দ্রুত শূন্য হয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা, এটি একটি ষড়যন্ত্র। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোষাগার শূন্য করে ইয্‌যুদ্দীনকে বাধ্য করা যেনো তিনি খৃস্টানদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আর ইয্‌যুদ্দীনও যে যা চাইছেন, দিয়ে দিচ্ছেন।'

'তার অর্থ হচ্ছে, ইয্‌যুদ্দীন দুর্বল শাসক।' শামসুন্নিসা বললো।

'তাঁর দুর্বলতা হলো, তিনি ক্ষমতার মসনদ ছাড়তে চাচ্ছেন না'–

আমের ইবনে ওসমান বললো– 'আমি তার যেসব বক্তব্য শুনেছি তাতে প্রমাণিত হয়, ক্ষমতা অটুট রাখতে তিনি খৃস্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছেন। আমি তার এবং তার উপদেষ্টাদের কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুনবো আর তোমাকে জানাতে থাকবো।'

'এও মাথায় রাখতে হবে যে, এখানে খৃস্টানদের গুপ্তচর তৎপর রয়েছে'– শামসুন্নিসা বললো– 'আর আমাদের গোয়েন্দারাও কাজ করছে। তোমার সাথে হয়তো তাদের সাক্ষাৎও ঘটবে।' শামসুন্নিসা মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে– 'তোমার সুদানী পরীটা কি হালে আছে, খবর-টবর কি রাখো?'

'রাখে'– আমের জবাব দেয়– 'পরশু তার সাথে দেখা হলে সে কেঁদে ফেললো। বললো একটিবারের জন্য হলেও তার কক্ষে যেনো যাই। শোনো শামসী! মেয়েটাকে আমার ভয় করছে। তার জালে আটকা পড়লে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হবে না। আমি তাকে এ জন্য ভয় করছি না যে, মেয়েটা রূপসী। ভয় হলো, মেয়েটা হাল্‌বের গভর্নর ইয্‌যুদ্দীনের হেরেমের অধিপতি। তার নাম আনুশি। মহলের লোকেরা তাকে 'সুদানী পরী' বলে ডাকে। ইয্‌যুদ্দীন কিংবা তার কোন আমীর-উজির যদি জেনে ফেলে আমাকে সে ভালোবাসে, তাহলে মাশুল দিতে হবে আমাকে। আমার ভয়, আমি তার কথায় রাজি না হলে সে হয়তো মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে জেল খাটাবে।'

'সে বোধ হয় তোমার-আমার ভালোবাসার কথা জানে না, না?' শামসুন্নিসা জিজ্ঞেস করে।

'যেদিন জানতে পারবে, সেই দিনটা তোমার-আমার জীবনের শেষ দিন হবে'– আমের জবাব দেয়– 'তোমাকে ক্ষমা করা হলেও, আমি ক্ষমা পাবো না।'

'আনুশি মূলত খৃস্টানদের প্রেরিত উপহার। মেয়েটি হাল্‌বে এসে পৌঁছার পরপরই আল-মালিকুস সালিহ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে মারা যান। ইয্‌যুদ্দীন এসে হাল্‌বের শাসন ক্ষমতা হাতে নিতেই খৃস্টানরা আনুশিকে তার খেদমতে পেশ করে। সেই সঙ্গে ইয্‌যুদ্দীন রোজি খাতুনকেও বিয়ে করে ঘরে তোলেন। সে যুগের নিয়ম ছিলো, বিবাহিত স্ত্রী ও হেরেমের মেয়েরা আলাদা থাকতো। ইহুদী-খৃস্টানরা তাদের এই রীতিকে পাকাপোক্ত করার জন্য মেয়ে উপহার দিতো। তারা এভাবে

উপহারের নামে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী চর প্রেরণ করতে থাকে।'

আনুশি তেমনি এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়ে। সে ইয্‌যুদ্দীনের ভোজসভায় মদ পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করছে। নিজেও মদপান করে। সে হাল্‌বের এমন দু'জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে নিজের প্রতারণার ফাঁদে আটক করেছিলো, যাদের হাতে ছিলো হাল্‌বের অস্তিত্ব। মেয়েটি ইয্‌যুদ্দীনকে কব্জা করে নিয়েছিলো। আমের ইবনে ওসমান ইয্‌যুদ্দীনের কাছে থাকতো। কেননা, সে ছিলো তার ব্যক্তিগত রক্ষী। তার দৃষ্টি ছিলো ঈগলের ন্যায় প্রখর ও দূরদর্শী। আনুশি দেখলো, লোকটি যেমন সুদর্শন, তেমনি স্মার্ট।

সে আমেরকে ভালোবেসে ফেলে। আমেরের সঙ্গে প্রেম নিবেদন করতে শুরু করে। কিন্তু আমের তাতে সাড়া দেয়নি। কারণ, তার জানা ছিলো, হেরেমের হীরাটার সঙ্গে যদি কেউ কথা বলতেও দেখে, তাহলে তার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। কিন্তু আনুশি তার পিছু ছাড়লো না।

'আমি এই মহলের একজন কর্মচারি মাত্র'- আমের একদিন মেয়েটিকে বললো- 'তোমার অন্তরে যদি আমার সত্যিকার ভালোবাসা থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দয়া করো, আমার থেকে দূরে থাকো।'

'তোমার প্রতি চোখ তুলে তাকাবার সাহস কেউ পাবে না'- আনুশি বললো- 'একটিবারের জন্য আমার কক্ষে আসো।'

ঐ সময় আমের ও শামসুন্নিসার গোপন অভিসার চলছিলো।

সে সময়কার ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন-

'ইয্‌যুদ্দীন অনুভব করেন, মসুল ও সিরিয়ার শাসকদের নিজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবেন না। তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে প্রচণ্ড ভয় করতেন। তার অধীন আমীর-উজীরগণ তার নিকট যখন-তখন কারণে-অকারণে এতো বেশি অর্থ দাবি করতে শুরু করে, যা দিতে তিনি ব্যর্থ হন। কেননা, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ততো সম্পদ ছিলো না। আয়ের উৎসও ছিলো সীমিত।'

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ আরো লিখেছেন-

'ইয্‌যুদ্দীনের ভয় ছিলো, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অবশ্যই হাল্‌ব দখল করে নেবেন। তিনি আইউবীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করা থেকে

বিরত থাকতেন। তিনি তার এক সুযোগ্য ও দুঃসাহসী সালার মুজাফফর উদ্দীন কাকবুরীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। এই পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত ছিলো সাত স্তর মাটির নীচে লুকানো এক গোপন রহস্য। মসুলের গভর্নর ছিলেন ইয্যুদ্দীনের ভাই ইমাদুদ্দীন, যিনি ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ঘোর বিরোধী। ইয্যুদ্দীন মসুলের শাসনক্ষমতা হাতে নেন আর ইমাদুদ্দীন হাল্ব এসে হাল্বের গভর্নর হয়ে যান। ক্ষমতার এই হাতবদল ছিলো উভয় নগরীর বাসিন্দাদের জন্য একটি রহস্যজনক ঘটনা।'

কতিপয় ঐতিহাসিক এই ক্ষমতার রদবদল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। একেকজন একেক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সে সময়কার কাহিনীকারদের লেখনী থেকে কিছু গোপন বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইয্যুদ্দীন যখন মসুলের দুর্গে গমন করেন, তখন রোজি খাতুন ও কন্যা শামসুন্নিসা তার সঙ্গে ছিলেন। তার ব্যক্তিগত রক্ষী বাহিনীও ছিলো, যার কমান্ডার ছিলো আমের ইবনে ওসমান। বিশাল এক বহর ছিলো। বহরে কয়েকটি উটের পাল্কি ছিলো, যেগুলো চারদিক থেকে পর্দাঘেরা ছিলো। রোজি খাতুন ও শামসুন্নিসার উট ছিলো সকলের সামনে। রোজি খাতুনের খাদেমাও সঙ্গে ছিলো। রাতে এক স্থানে অবস্থান করতে হয়েছিলো।

মসুল পৌঁছতে তাড়া ছিলো ইয্যুদ্দীনের। সে কারণে কাফেলার জন্য একজন দলনেতা নিযুক্ত করে নিজে অবস্থান না করে কয়েকজন রক্ষী ও দু'তিনজন উপদেষ্টাসহ সফর অব্যাহত রাখেন ইয্যুদ্দীন। আমের ইবনে ওসমানকে কাফেলার সঙ্গে রেখে দেয়া হয়। সূর্য অস্ত যাওয়ামাত্র তাঁবু স্থাপন করা হলো। রোজি খাতুনের তাঁবু সেই তাঁবুগুলো থেকে অনেক দূরে স্থাপন করা হলো, যেগুলোতে রাতে হেরেমের মেয়েরা অবস্থান করবে। ইয্যুদ্দীন রোজি খাতুন ও শামসুন্নিসাকে হেরেমের তাঁবু থেকে দূরে রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে যান। অবস্থানের জায়গাটা ছিলো সবুজ-শ্যামল বনানীতে সুশোভিত।

রাত। আমের ইবনে ওসমান ঘুরে ঘুরে ছাউনি এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। ভয়ের কোন কারণ ছিলো না। সে সময় কোথাও যুদ্ধ ছিলো না। সুলতান আইউবী মিসরে আছেন। খৃস্টানরা দূরে এক জায়গায় বসে সুলতান আইউবীর পরবর্তী রণ-পরিকল্পনা মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তবু অবস্থানস্থল ও পশুপালের

আশপাশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমেরের কর্তব্য। সে হেরেমের তাঁবুগুলো থেকে সামান্য দূরে ঘোরাফেরা করছে। সঙ্গে কেউ নেই। তাঁবু থেকে আরো কিছুটা দূরে চলে যাওয়ার পর সম্মুখে একটি ছায়া দেখতে পায়। ছায়াটার নিকট গিয়ে ঘোড়া থামায়।

'অন্ধকারে এতোদূর থেকে আমি তোমাকে চিনে ফেললাম, আর তুমি কিনা নিকটে এসেও চিনতে পারলে না।' কণ্ঠটা আনুশির।

আমের ইবনে ওসমান কণ্ঠ চিনে বললো– 'এখনো অনেক কাজ করতে হবে। এতো বিস্তৃত তাঁবু অঞ্চল আর এতোগুলো পশুর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত। তুমি আমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না আনুশি।'

আনুশি আমেরের ঘোড়ার সামনে এসে লাগাম ধরে রেখেছিলো। বললো– 'ঘোড়া থেকে নেমে এসো আমের। যে লোকটাকে তোমার ভয় ছিলো, সে মসুল চলে গেছে। এবার নেমে এসো।'

আমের ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। আনুশি তার বাহু ধরে টেনে নিয়ে একটি গাছের আড়ালে গিয়ে বসে। আমের অনুগত পশুটির ন্যায় বসে পড়ে।

'আমের!'– আপ্লুত কণ্ঠে বললো আনুশি– 'আমাকে চরিত্রহীনা ও খারাপ মেয়ে মনে করে তুমি আমার থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছো। আমি জানি, আমার আসল পরিচয় সম্পর্কে তুমি অবহিত। তুমি নিজেকে সাধু ও পবিত্র মনে করছো। যৌবন আর আকর্ষণীয় দেহটার জন্য তোমার বেজায় গর্ব। কিন্তু ভেবে দেখেনি কখনো, এই দেহখানা যে কোন মুহূর্তে লাশে পরিণত হতে পারে। এটা যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগ। একদল লোক যুদ্ধের মাঠে প্রাণ নিচ্ছে ও প্রাণ দিচ্ছে। আরেক শ্রেণীর জন্য অনুরূপ ঘটনা ঘটছে দুর্গ ও রাজপ্রাসাদে– গোপনে। তোমার পরিণতিও এমনটি হতে পারে। নিজের পুরোম্বিত রূপ আর দেহের আকর্ষণটাকে স্থায়ী ভেবো না।'

'তুমি কি আমাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছো?' আমের বললো।

'না'– আনুশি জবাব দেয়– 'আমি তোমাকে বুঝাতে চেষ্টা করছি, তুমি যদি মনে করে থাকো আমি তোমার রূপ-যৌবনের জন্য পাগল, তাহলে এ ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। আমার নিজের শরীরটাও ভোগের একটা উৎকৃষ্ট উপকরণ। কিন্তু আমি দেহ আস্বাদনের প্রতি সম্পূর্ণ অনীহ। মানুষ যতো শক্ত পাথরে পরিণত হোক, হৃদয়টাকে যতো শক্ত পাথর মনে করুক না কেন, হৃদয় কখনো পাথর হয় না।

মানুষের আত্মা মুর্ছা যেতে পারে– মরে না। ভালোবাসা হৃদয় ও আত্মাকে জীবিত রাখে– যার সম্পর্ক দেহের সঙ্গে নয়। তুমি আমাকে আরো গভীর চোখে নিরীক্ষা করো। আমার ও তার যাদুময়তা দেখো। আমি নিজে পাপ করি এবং অপরকে পাপের প্রতি উৎসাহিত করি। মানুষ আমাকে রাজকন্যা নয়– পরী বলে ডাকে। তোমাদের রাজা ও আমীরগণ আমার পায়ের নীচে তাদের ঈমান ও মাথা রাখতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু আমি এমন একটি পিপাসায় কাতর ছিলাম, যা কখনো অনুভব করতে পারিনি। তোমাকে দেখলাম, ভালো লাগলো। প্রথমবার যখন আমি তোমার কাছে এলাম,তখন আমার উদ্দেশ্য পবিত্র ছিলো না। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে এবং পরে এমনভাবে তাড়িয়ে দিলে যে, আমি বুঝে ফেললাম সেই পিপাসাটা আসলে কী, যেটি আমাকে অস্থির করে রেখেছে। আমি তোমাকে হৃদয়ের গভীর থেকে কামনা করতে শুরু করলাম। এটা তোমার ব্যক্তিত্বের নয়– চরিত্রের ক্রিয়া ছিলো। আর ক্রিয়াটা এমন যে, আমার হৃদয়ে সেই লোকদের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি করে, যারা আমাকে বিলাসিতার খেলনা মনে করতো এবং নিজেদের ঈমান ও জাতীয় মর্যাদাকে আমার হাত থেকে নেয়া মদের পেয়ালায় ডুবিয়ে দিতো।'

আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলে যাচ্ছে আনুশি। চুপচাপ শুনতে থাকে আমের ইবনে ওসমান। কিন্তু মনে তার ভয়, দৃশ্যটা কেউ দেখে ফেললে রেহাই পাওয়া কঠিন হবে। আরো ভয়, শামসুন্নিসা যদি তার সন্ধানে এদিকে এসে পড়ে, তবে তো ভালোবাসাটা খুন হয়ে যাবে। আনমনে শুধু শুনেই যাচ্ছে আনুশির কথা। রূপসী কন্যা আনুশির এমন আবেগময় কথাগুলো তার হৃদয়ে কোনই রেখাপাত করছে না।

'তুমি কি ভয় পাচ্ছো আমের! নাকি তোমার অন্তরটা মরে গেছে?'– আনুশি আমেরের গালে হাতের পরশ বুলিয়ে বললো– 'আমার হৃদয়টা যদি মরে গিয়ে না থাকে, তাহলে আমি মানতেই পারছি না তোমার অন্তর মরে গেছে।'

আনুশি তার মাথাটা আমেরের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে ধরে। তার রেশম কোমল বিক্ষিপ্ত চুলগুলো আমেরের তরুণ গণ্ডদেশ ছুঁয়ে যেতে শুরু করে। চরিত্র যেমনই হোক, যুবক তো! আমেরের দেহটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। কেমন যেনো একটা তোলপাড়া শুরু হয়ে গেছে তার হৃদয় জগতে। আমের আনুশির চাপা হাসির শব্দ শুনতে পায়। মেয়েটি

হাসতে হাসতে বললো– 'হৃদয়টা জীবিত আছে। ধুক ধুক করছে। আমি তোমার থেকে কিছুই চাই না। তুমি আমার কাছে চাও। হীরা, জহরত, মণিমুক্তা, স্বর্ণমুদ্রা– যা খুশি চাও দেবো।'

'আমার কিছুই প্রয়োজন নেই সুদানী পরী।' আমের বললো।

'আমাকে আনুশি বলো'– মেয়েটি বললো– 'আমাকে যারা সুদানী পরী ডাকে, তাদের অন্তরে ভালোবাসা নেই, তারা পাপিষ্ঠ। তুমি তাদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে, পবিত্র। আমার থেকে ধন-ভাণ্ডার নিয়ে নাও। বিনিময়ে তুমি আমাকে ভালোবাসা দাও।'

আনুশি নিজের চিবুকটা আমেরের চিবুকের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়। আমের চমকে ওঠে পেছনে সরে যায়। এখন তার অবস্থাটা পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখিটির মতো। ছটফট করতে শুরু করে দেয় আমের।

'আমার মনে হয়, তোমার অন্তরে অন্য কারো ভালোবাসা আছে'– আনুশি বললো– 'আমার যাদুতে কখনো কেউ এভাবে ছটফট করে না। তুমি বলে, কোন্ শক্তি তোমাকে আমার প্রতি ভালোবাসার বাঁধার সৃষ্টি করছে।'

আনুশি দাঁত কড়মড় করে বললো– 'তুমি এটুকুও বুঝছো না যে, একটা গুনাহগার মেয়ে তোমার থেকে পবিত্র ভালোবাসা প্রার্থনা করছে। হতে পারে সে পাপ থেকে তাওবা করে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আশ্চর্য পুরুষ বটে তুমি। শুনে রাখো হতভাগা, তুমি এমন একটি মেয়েকে তাড়িয়ে দিচ্ছো, দু'চারটি দেশের সিংহাসন উল্টে দেয়ার ক্ষমতা যার আছে। তুমি এমন একটি মেয়েকে রুষ্ট করছো, যে ইচ্ছা করলে ভাইকে ভাইয়ের হাতে খুন করাতে পারে। আমার সম্মুখে তোমার একটা পোকার চেয়ে বেশী মর্যাদা নেই।'

'তাহলে আমাকে পিষে ফেলো'– বললো আমের– 'আমি তোমার যোগ্য নই।'

আমের উঠে দাঁড়ায়।

'আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না আমের'– আনুশি আমেরের উভয় হাত নিজের হাতে নিয়ে বললো– 'তুমি শুধু আমার পাশে বসে থাকো।'

আমের কথা না বাড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে।

আমের ইবনে ওসমানের ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটছে। আমেরের মাথাটা অবনত। নাকে আনুশির চুলের ঘ্রাণ আর গালে মেয়েটির হাতের কোমল ছোঁয়া এখনো অনুভব করছে। ভাবে, মেয়েটি যদি অন্ধকারে

নির্জনে তাকে ধরে বসে, তাহলে শামসুন্নিসার সাথে কৃত শপথ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। তার কাছে আর ঠাঁই মিলবে না। আমের ভাবনার মোড় শামসুন্নিসার দিকে ঘুরিয়ে দেয়। তার মনে পড়ে যায়, সন্ধ্যায় তাঁবু স্থাপনের সময় স্বল্প সময়ের জন্য সে শামসুন্নিসার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। দু'জনে সাক্ষাতের সময় ও স্থান ঠিক করে এসেছিলো। সে ওদিকেই যাচ্ছিলো; কিন্তু পথে আনুশি পথরোধ করে দাঁড়ায়।

ঘোড়ার পিঠে বসে পেছনের দিকে তাকায় আমের। অন্ধকারে আনুশিকে আর দেখা যাচ্ছে না। পথের মোড় ঘুরে আমের সেই জায়গায় এসে পৌঁছে, যেখানে শামসুন্নিসার আসার কথা ছিলো। আমের যেভাবে আনুশির ছায়া দেখেছিলো, তেমনি শামসুন্নিসার ছায়াও দেখতে পায়। ছায়াটা ঘোড়ার দিকে এগিয়ে আসে। আমের ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে।

'এত্তোক্ষণ কোথায় ছিলে?'– শামসুন্নিসা প্রশ্ন করে– 'অনেকক্ষণ যাবত অপেক্ষা করছি।'

'কী করেছি, কোথায় থাকতে পারি, তুমি তো সব জানো'– আমের মিথ্যা বলে– 'এদিকেই তো আসছিলাম। পথে এক স্থানে থামতে হলো। তাতেই দেরি হয়ে গেলো।'

'নিজেদের লোকদের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে'– শামসুন্নিসা বললো– 'তারা প্রত্যেকে সতর্ক। তাদের প্রতি কারো সন্দেহ জাগবে না।'

শামসুন্নিসা সেই লোকদের কথা বলছে, যারা হালবে সুলতান আইউবী ও রোজি খাতুনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছে। যারা মহলে কর্মচারি ছিলো, এই বহরে তারা একই পদে দায়িত্ব পালন করছে। রোজি খাতুনের খাদেমা শামসুন্নিসা ও আমের ইবনে ওসমানকে তাদের চিনিয়ে দিয়েছে।

'এসো, এখানে কিছুক্ষণ বসি।' শামসুন্নিসা আমেরের কোমর জড়িয়ে ধরে বললো।

দু'জনে দু'জনার হয়ে একান্ত ঘনিষ্ঠে সামনের দিকে হাঁটতে থাকে আমের ইবনে ওসমান ও শামসুন্নিসা। শামসুন্নিসা এক পা অগ্রসর হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। নিজের নাকটা আমেরের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে শুকতে শুকতে তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বলে ওঠে– 'তুমি কোথায় ছিলে? কার কাছে ছিলে?'

'আমি পশুগুলো দেখাশোনা করে আসছিলাম।' আমের উত্তর দেয়।

'পশুরা সুগন্ধি ব্যবহার করছে কবে থেকে'– শামসুন্নিসা চাপা অথচ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'তোমাকে তো কোনদিন সুগন্ধি ব্যবহার করতে দেখিনি!'

আমের চুপসে যায়। তার মুখে কোন উত্তর নেই। শামসুন্নিসা কেইসটা ঠিকই ধরেছে। বলতে থাকে– 'রূপসী ডাইনীটা তোমাকে পেয়ে বসেছে। তুমি ফাঁদে আটকে গেছো।'

'এখনো আটকাতে পারেনি'– আমের বললো– 'পথে হঠাৎ দেখা হয় আনুশির সাথে। বিষয়টা তোমাকে জানাতে চাচ্ছিলাম না। সন্দেহের কোন কারণ নেই। আমি এতোটা আনাড়ি নই। আমার বক্ষে যে ঘ্রাণ পেয়েছো, সে আনুশির তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বুকের ভেতরটা শুকে দেখার চেষ্টা করো।' আমেরের কণ্ঠে ভীতির হাল্কা একটা কম্পন অনুভব করে শামসুন্নিসা। আমের বলতে থাকে– 'আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন শামসী। আমি কোন আমীর-শাসক কিংবা সালার নই। আমি একজন সাধারণ কর্মচারি মাত্র। আনুশি আমাকে অতি সহজে প্রতিশোধের নিশানা বানাতে পারে।'

'মনে হচ্ছে, মেয়েটা আজ তোমাকে বেশি পেরেশান করেছে।' শামসুন্নিসা বললো।

'খুব বেশী'– আমের জবাব দেয়– 'মেয়েটা আজ নিজে থেকে বলেছে, সে পাপিষ্ঠা এবং চরিত্রহীনা। বেহায়াপনা ছড়ানো এবং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধানোর জন্যই সে এসেছে। আমার থেকে সে পবিত্র ভালোবাসার বিনীত আবেদন জানিয়ে বলেছে, তার বিনিময়ে আমি যা চাই তাই সে দেবে। আমি বড় কষ্টে তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এসেছি। শামসী! মেয়েটা যদি তার সমুদয় সম্পদও আমার সামনে হাজির করে, তবুও আমি তোমাকে ধোঁকা দিতে পারবো না।'

'তারপরও তাকে ধোঁকা দাও'– শামসুন্নিসা বললো– 'তাকে সেই ভালোবাসা দাও, যা সে কামনা করছে। বিনিময়ে সেই তথ্য নাও, যা আমাদের প্রয়োজন। এখানে তাকে কী উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে, তা তোমাকে বলে দিয়েছে। তুমি অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। তোমার মহলের গোপন তথ্য প্রয়োজন একথা বলে কাজ আদায় করবে, নাকি কিছু না জানিয়ে কৌশলে তথ্য বের করবে, তা তুমিই ভালো বুঝো।'

'আমি বিষয়টা ভেবেছি'– আমের বললো– 'কিন্তু ভয় পাচ্ছি এ জন্য যে, একদিন হয়তো তুমি আমাকে ভুল বুঝবে।'

'তোমার-আমার ভালোবাসা আমি আল্লাহর উপর সোপর্দ করেছি'– শামসুন্নিসা বললো– 'আম্মার নির্দেশমূলক কথাগুলো আমার আত্মায় গেঁথে আছে। আমার ভালোবাসার মৃত্যু হতে পারে না। হৃদয়ের ভালোবাসাকে আমি সেই মহান লক্ষ্য অর্জনে কুরবান করতে চাই, যে দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়েছে। আল্লাহর নামে শপথ নেয়ার যদি আমি স্মরণ রাখি, তাহলে কোন ভুল বুঝাবুঝির জন্ম নিতে পারবে না।' শামসুন্নিসা প্রশ্ন করে– 'মেয়েটি কি জানতে পেরেছে তোমার-আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়?'

'তাতো সে বলেনি'– আমের উত্তর দেয়– 'বোধ হয় নিশ্চিত জানে না।'

'একটা কাজের কথা বলি'– শামসুন্নিসা বললো– 'আমরা হালব থেকে রওনা হওয়ার কিছু আগে কায়রো থেকে একজন লোক এসেছিলো। সে জানতে চাচ্ছিলো, ইয্যুদ্দীনের উদ্দেশ্য এবং খৃস্টানদের পরিকল্পনা কী। আমরা তাকে সঠিক কোন উত্তর দিতে পারিনি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাড়াতাড়ি কায়রো থেকে ফৌজ নিয়ে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। লোকটি বলেছে, আইউবীর এই তাড়াহুড়ার কারণ হলো, খৃস্টান বাহিনী মসুল, হালব ও দামেশ্কের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর কায়রো থেকে ফৌজ নিয়ে এখানে সময় মতো পৌঁছানো সম্ভব হবে না। সমস্যা হলো, সুলতান যদি বাহিনী নিয়ে এসে পড়েন আর খৃস্টানদের কৌশল অন্যকিছু হয়, তাহলে সুলতানকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের অতি দ্রুত মুসলমান আমীর ও খৃস্টানদের সম্বন্ধে জানতে হবে।'

'আমি শুনেছি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দারা কিনা আকাশ থেকে তারকাও ছিঁড়ে আনতে পারে'– আমের ইবনে ওসমান বললো– 'খৃস্টান অঞ্চলগুলোতে কি তাঁর কোন লোক নেই?'

'আম্মা আমাকে বলেছেন, ইসহাক তুর্কি নামে অত্যন্ত বিচক্ষণ একজন গোয়েন্দা আছে'– শামসুন্নিসা উত্তর দেয়– 'তিনি বৈরুত গেছেন। সঠিক সংবাদ তো তিনি নিয়েই আসবেন। কিন্তু কায়রো থেকে তার কোন সংবাদ আসেনি। দেখো আমের! সোনাবাহিনী তৎপরতা চালালে কিছু একটা আন্দাজ করা যায়। এখানে তো তেমন কোন তৎপরতা দেখছি না। যা কিছু গোপন তথ্য আছে, সব ইয্যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীনের পেটে। আর এসব তথ্য মহলের ভেতর থেকে উদ্ধার করা

যেতে পারে। আর সেই সংবাদ তুমি একমাত্র আনুশির কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে পারো।'

'কিন্তু সে যে বিনিময় দাবি করছে, তা তো আমি দিতে পারবো না।' আমের বললো।

'এই মূল্য তোমাকে দিতেই হবে'– শামসুন্নিসা বললো– 'আমি আমার ভাইয়ের পাপের কাফফারা আদায় করতে চাই। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের কাছে ভালোবাসা ও কামনা-বাসনার কোন মূল্য নেই। আমাদেরকে সেই শহীদদের ঋণ শোধ করতে হবে, যারা ইসলামের জন্য স্ত্রীদের বিধবা করে গেছেন।'

ইসহাক তুর্কি এখন বৈরুতে। এখানে খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনের ফিরিঙ্গি বাহিনীর বিশাল সেনাক্যাম্প। বল্ডউইন এক পরাজয়বরণ করেছিলেন সুলতান আইউবীর ভাই আল-আদিলের হাতে। তার পরপরই সুলতান আইউবীর বাহিনীকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে নিজেই সুলতান আইউবীর ফাঁদে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হন এবং বন্দি হতে হতে অল্পের জন্য রক্ষা পান। উভয় বারই তার বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে পেছনে সরে যায়।

এখন দিন-রাত সমানে কাজ করছেন বল্ডউইন। রাতে ঘুমান না। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনায় মহাব্যস্ত। তিনি আল-মালিকুস সালিহকে অনুগত বানিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তার কোন উপকার না করেই আস-সালিহ মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন ইযযুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীনকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের ফন্দি আঁটছেন বল্ডউইন। কায়রোতে তার গোয়েন্দারা সুলতান আইউবীর পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত।

বৈরুতে গিয়ে ইসহাক তুর্কি প্রথমে বল্ডউইনের হাইকমান্ড পর্যন্ত পৌঁছোনোর বুদ্ধি ঠিক করে নেয়। নিজেকে মুসলিম অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা খৃস্টান বলে পরিচয় দেয়। এভাবে সে তাদের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হয়। ইসহাক তুরস্কের নাগরিক। গায়ের রং ফর্সা। সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান যুবক। অশ্ব চালনা, বর্শা নিক্ষেপ, তীরন্দাজি ও তরবারী চালনায় বিশেষ পারদর্শী। দীর্ঘ বাহুতে বেজায় শক্তি। মস্তিষ্কটা প্রখর ও সূক্ষ্মদর্শী। অপরের মন জয় করে প্রভাব বিস্তার ও অনুরক্ত বানানোর কলাকৌশল তার জানা। প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ রূপ ধারণ করায়

ওস্তাদ। সঙ্গীদের বলতো, তার আসল শক্তি হলো তার ঈমান ও চরিত্র।

বৈরুতে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। দেশের নাগরিকদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সমর মেলা বসানো হয়েছে। মেলায় সৈন্যদের কৃতিত্ব প্রদর্শন, তরবারী ইত্যাদি অস্ত্র চালনার প্রতিযোগিতা চলছে।

ইসহাক তুর্কি এরকম এক মেলায় হাজির হন। খৃস্টানদের একটি প্রাচীন খেলা চলছে। দু'জন অশ্বারোহী লম্বা বর্শা হাতে বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা বর্শার সাহায্যে একে অপরকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। প্রথমবার কেউ কাউকে ফেলতে না পারলে পুনরায় সুযোগ দেয়া হচ্ছে। আরোহীরা বর্ম পরিহিত।

প্রতিযোগিতা চলছে। একের পর এক গ্রুপ আসছে। পরাজিত আরোহী ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছে। বিজয়ী হুংকার দিয়ে বলছে– আর কি কেউ আছে লড়াই করার? কেউ আসলো না। ইসহাকের গায়ে মরু পোশাক। সে মাঠে নেমে যায়। মোকাবেলাকারী অশ্বারোহী সৈনিক বর্ম পরিহিত। ইসহাককে সাধারণ পোশাকে ময়দানে নামতে দেখে দর্শকরা টিটকারি মারতে থাকে। মেলায় খৃস্টান সেনাপতি ও অন্যান্য কমান্ডাররা উপস্থিত। তারাও ইসহাককে দেখে অবজ্ঞার হাসি হাসে। একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিতকারী অশ্বারোহী শেষবারের মতো হুংকার ছেড়ে ঘোড়াকে এদিক-ওদিক হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে, যেনো শিকার খুঁজছে। ঘোড়সওয়ার খৃস্টান বাহিনীর ইউনিট কমান্ডার। ঠাট্টার ছলে সে ঘোড়াটা ইসহাক তুর্কির দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং নিকটে এসে বর্শাটা তার গায়ে নিক্ষেপ করে। ইসহাক বর্শার আঘাত প্রতিহত করে। দর্শনার্থীরা আবারও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। রব উঠে– পাগল, পাগল। ওকে মেরে ফেলো।

অশ্বারোহী কমান্ডার ঘোড়াটা পেছন দিকে মোড় ঘুরায়। তার সঙ্গী কমান্ডারদের একজন বললো– 'বর্শায় গেঁথে পাগলটাকে এদিকে নিয়ে এসো। অন্য একজন বললো– 'লোকটা বর্শা প্রতিরোধ করে তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছে।'

অশ্বারোহী ঘোড়া হাঁকায়। ইসহাক নিরস্ত্র। ঘোড়াটা নিজের দিকে আসতে দেখে গায়ের চোগাটা খুলে বর্শার আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অশ্বারোহী সামান্য নত হয়। বর্শাটা হাতে তুলে নেয়। নিকটে এসে ইসহাকের উপর আঘাত হানে। ইসহাক কিছুদূর

পর্যন্ত ঘোড়ার সঙ্গে এমনভাবে দৌড়াতে থাকে, যেনো বর্শা তার দেহে গেঁথে গেছে। দর্শকরা উল্লাস করতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই নীরবতা থেমে যায়। সকলে অবাক বিস্ময়ে দেখতে পায়, ইসহাক দৌড়ের মধ্যে অশ্বারোহী কমান্ডারের ঘোড়ার পেছনে বসে পড়েছে। বর্শা তার গায়ে বিদ্ধ হয়নি। সে বরং বর্শাটা ধরে রেখেছে। আরোহীও ধরে রেখেছে বর্শার এক মাথা। সে ঘোড়ার মোড় ঘুরায়। ঘোড়া এক চক্কর ছুটতে শুরু করে। ইসহাক তার থেকে বর্শাটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে।

ইসহাক বর্শাটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে যায়। বর্শাটা চারদিক ঘুরিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে– 'আমাকে একটা ঘোড়া দাও। সাহস থাকে তো আমার মোকাবেলা করো।'

অশ্বারোহী কমান্ডার ঘোড়া থেকে নেমে ইসহাকের কাছে চলে আসে। এখন তার হাতে কোন অস্ত্র নেই। উভয় বাহু সম্প্রসারিত করে রেখেছে। ইসহাক বর্শাটা মাটিতে গেড়ে দেয়। খৃস্টান অশ্বারোহী তাকে গলায় জড়িয়ে ধরে। ইসহাক বললো– 'আমি মোকাবেলা করবো, আমাকে ঘোড়া দাও।'

ইসহাককে একটি ঘোড়া আর একটি বর্শা দেয়া হলো। সে কমান্ডারের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়। দর্শনার্থীরা অপলক চোখে অনিঃশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিশ্চিত ছিলো, হতভাগ্য লোকটি বর্শার আঘাতে শোচনীয়ভাবে মারা পড়বে।

উভয় ঘোড়া খানিক দূরত্বে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। ইঙ্গিত পেয়ে ঘোড়া ছুটতে শুরু করে। কমান্ডার তার বর্শাটা ইসহাকের পেট বরাবর তাক করে রেখেছিলো। চলন্ত ঘোড়া থেকে আঘাত হানে সে। ইসহাক সামান্য মোড় ঘুরিয়ে কমান্ডারের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। সেই সঙ্গে তার বর্শাটা গিয়ে কমান্ডারের পেটে গেঁথে যায়। কমান্ডার ঘোড়ার অপরদিকে পড়ে যায়। কমান্ডার ওদিককার পা রেকাব থেকে সরাতে ভুলে গিয়েছিলো। তাই পড়তে গিয়ে পা রেকাবে আটকে যায়। ঘোড়া কমান্ডারকে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে শুরু করে।

প্রতিযোগিতায় কোন প্রতিযোগিকে দর্শনার্থীদের সাহায্য করার অনুমতি নেই। কোন প্রতিযোগিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিলেও নয়।

ঘোড়া কমান্ডারকে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইসহাক পেছন ফিরে

দেখতে পেয়ে ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ঘোড়া হাঁকায়। কমান্ডারের ঘোড়ার পার্শ্বে গিয়ে এক লাফে তাতে চড়ে বসে। লাগাম টেনে ধরে ঘোড়ার গতি থামিয়ে দেয়। কমান্ডার বর্ম পরিহিত। দেহটা অক্ষত আছে। অন্যথায় এতোক্ষণ চামড়া ছিলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতো।

কমান্ডার ইসহাককে বাহুতে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কে? তোমার পরিচয় কী?'

ইসহাক উত্তর দেয়– 'আমি মুসলমানদের অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা খৃস্টান। এখন তো আর নিজেকে সাধারণ খৃস্টান দাবি করতে পারছি না।'

ইসহাক কৃতিত্বটা দেখিয়েছে অসাধারণ। এমন অশ্বচালক, বর্শাবাজ হয়তো কোন সুদক্ষ সৈনিক কিংবা কোন উচ্চ বংশের যোগ্য সন্তান। ইসহাক কমান্ডারকে জানায়, মুসলমানরা তাকে জোরপূর্বক ফৌজে ভর্তি করাতে চেয়েছিলো। তাই সে পালিয়ে এসেছে।

কমান্ডার ইসহাককে সঙ্গে নিয়ে যায়। কমান্ডার বল্ডউইন বাহিনীর একজন নাইট। নাইট হওয়ার কারণেই তার আপাদমস্তক বর্ম দ্বারা আবৃত। সামরিক যোগ্যতা ও দুঃসাহিসকতার কারণে খৃস্টানদের নাইটরা আজো বিখ্যাত। তাদেরকে এতো মর্যাদা দেয়া হতো যে, সম্রাটগণ তাদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলতেন।

ইসহাক তুর্কি বর্ম ছাড়াই খালি গায়ে এই বর্ম পরিহিত নাইটকে ধরাশায়ী করে এবং তাকে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। রতনে রতন চেনে। বল্ডউইনের এই নাইট ইসহাককে চিনে ফেলে। বুঝে ফেলে লোকটার দাম কতো। সঙ্গে করে নিজ গৃহে নিয়ে ইসহাককে মদ খেতে দেয়।

ইসলামে মদ হারাম। মুসলমান মদপান করে না। ইসহাক তুর্কি মুসলিম গোয়েন্দা। ছদ্মবেশে ভিন্ন পরিচয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে এরকম সমস্যায় পড়তে হয় আইউবীর গোয়েন্দাদের। খৃস্টান পরিচয়ে খৃস্টানদের মাঝে ঢুকে পড়ার পর তাদের সামনে মদ আসে। তাদের বিব্রত হতে হয়। বাধ্য হয়ে হারাম খেতে হয়। মদ না খেলে তাদেরকে সন্দেহে পড়তে হয়, খৃস্টান হলে মদ খাবে না কেন?

এই মুহূর্তে ইসহাক তুর্কি তেমনি এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন। সামনে মদের পেয়ালা। ইসহাক পরিপক্ব ঈমানদার মুসলমান। সে মদপান করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো– 'আপনি আমার শক্তি দেখেছেন। এই

শক্তি অর্জন করতে গেলে মদপান থেকে বিরত থাকতে হয়। এটা মদপান না করার সুফল। আমার ওস্তাদ বলেছেন, তোমার পেটে যদি মদ ঢুকে, তাহলে তোমার ঘোড়াটা অনুভব করবে তার পিঠে একজন দুর্বল লোক সওয়ার হয়েছে। ফলে ঘোড়া তোমার নির্দেশ মান্য করবে না।'

ইসহাক গলায় ঝুলানো তাগাটা টেনে বের করে। শার্টের ভেতর থেকে ছোট একটা ক্রুশ বেরিয়ে আসে। বললো– 'আমি নিজের শক্তিটা ক্রুশের সুরক্ষার জন্য ব্যয় করার লক্ষ্যে ক্রুশ হাতে শপথ করেছিলাম, মদপান আর চরিত্রহীন কাজ থেকে বিরত থাকবো। আমি শপথটা ভঙ্গ করতে পারি না।'

'তুমি কোথায় থাকো'– নাইট জিজ্ঞেস করে– 'পরিজন সঙ্গে আছে কি?'

'না'– ইসহাক উত্তর দেয়– 'আমি আমার পরিবার-পরিজনকে বলে এসেছি, নিরাপদ কোন ঠিকানা পেলে তাদেরকে নিয়ে আসবো।'

'ঠিকানা পেয়ে গেছো'– নাইট বললো– 'আমি তোমার মূল্য বুঝি। আজ থেকে তুমি আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব পালন করবে। আমার মতো প্রত্যেক কমান্ডারের সঙ্গে দু'চারজন করে রক্ষী থাকে। তুমি হলে আমার একজনই যথেষ্ট। আমি তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

সময়টা যুদ্ধের। ইসহাকের ন্যায় শক্তিশালী সাহসী লোকদের খুব দাম। বল্ডউইনের নাইট সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ইসহাকের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। তার জন্য আরবীয় ঘোড়া ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা হয়। মাসিক ভাতাও নির্ধারিত হয়।

আল্লাহ ইসহাককে প্রখর মেধা দান করেছেন। সেই মেধাকে কাজে লাগাতে শুরু করে সে। দু'দিনেই ইসহাক খৃস্টান নাইটের বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

'আমার একটি মাত্র আকাঙ্খা'– ইসহাক নাইটকে বললো– 'মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের ন্যায় খানায়ে কাবাও আমাদের দখল করে নেয়া দরকার। তাহলে ইসলাম অল্প দিনেই মৃত্যুবরণ করবে। সারা পৃথিবীতে না হলেও কমপক্ষে আরব বিশ্বের উপর ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার।'

'তুমি স্বপ্ন দেখছো বন্ধু'– নাইট বললো– 'মুসলমানদের এতো তাড়াতাড়ি পরাস্ত করা সহজ নয়। আমরা যদি মুসলমানদের কাবা গৃহ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করি, তাহলে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান

ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। সকল মুসলমানের মোকাবেলা করে জয়লাভ করা তো দূরের কথা, এক সালাহুদ্দীন আইউবীকেও তো এখন পর্যন্ত পরাজিত করতে পারলাম না।'

'আপনি তাহলে হীনম্মন্যতায় ভুগছেন'– ইসহাক বললো– 'মুসলমানদের ঐক্য ভেঙ্গে গেছে। সালাহুদ্দীন আইউবী সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছেন। মুসলমানরাই এখন তার শত্রু। হালব ও মসুলের নতুন শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীন-ইমামুদ্দীন কি আপনার সমর্থক সহযোগি নন? তারা কি আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। আপনাদের গোয়েন্দারা মুসলমানদের ফোকলা করে দিয়েছে। আমি আপনাকে সেখানকার বাস্তব চিত্র তুলে ধরছি।'

ইসহাকের বক্তব্যে নাইটের চোখ ছানাবড়া। ইসহাক নাইটকে এমন সব পরার্শ দেয় যে, একজন সেনাপতির পক্ষেই এ ধরনের পরামর্শ দেয়া সম্ব। নাইটের চোখ খুলে যায়।

'তুমি তো আমাকে অবাক করে দেয়ার মতো কথা বলছো'– নাইট বললো– 'আমরা তো এমন পরিকল্পনাই প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কিনা তোমার আকাঙ্খা ও প্রত্যয়ের অনুকূল।'

'আপনাকে আমি আরেকটি পরামর্শ দিতে চাই'– ইসহাক বললো– 'আপনারা সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় কমান্ডো বাহিনী গঠন করুন। একটা বাহিনী আমার হাতে তুলে দিন। আমি মুসলিম ভূখণ্ড এবং তাদের স্পর্শকাতর শিরাগুলো সম্পর্কে অবগত আছি। আমি তাদের হাড়ির খবর পর্যন্ত জানি। রসদ প্রভৃতির ডিপো কোথায় থাকে, সব খবর আমার কাছে আছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাদের কোন ভাণ্ডার থাকতে দেবো না।'

'তা-ই হবে'– নাইট বললো– 'আমি তোমাকে সুযোগ করে দেবো।'

❖ ❖ ❖

'আমি তোমাকে শামসুন্নিসার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।' আনুশি আমের ইবনে ওসমানকে বললো।

তারা এখন মসুলে। ভালোবাসার ডালি নিয়ে এগিয়ে এসেছে আমের। আনুশি মধ্য রাতের পর তার কক্ষে চলে আসে। বললো– 'শামসুন্নিসা কি আমার চেয়ে বেশি রূপসী?'

'ওর নামও উচ্চারণ করো না'– আমের বিরক্তির সুরে বললো– 'ও রাজকন্যা। তাকে আমি তোমার চেয়েও বেশী ভয় করতাম। তোমাকেও

আমি রাজকন্যা মনে করতাম। কিন্তু তুমি আমার ভয় দূর করে দিয়েছো। তারপরও মাঝে-মধ্যে ভয় এসে যায় তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করো কিনা। তাছাড়া তোমার-আমার সম্পর্কটা জানাজানি হলে কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে, সে জন্যও ভয় হচ্ছে।'

'কেউ যদি তোমার এক বিন্দু ক্ষতি করে, তাহলে আমার ইঙ্গিতে প্রাসাদের প্রতিটি ইট খসে পড়বে'– বলেই আনুশি আমেরকে কাছে টেনে নিয়ে বললো– 'কেউ তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে এ আশঙ্কা যথার্থ। আমার অস্তিত্ব একটা চিত্তাকর্ষক প্রতারণা। কিন্তু তুমি আমাকে মানুষরূপে দেখো। আমাকে আমার ইবাদত করতে দাও।'

আবেগ চেপে বসে আনুশির উপর। তার মাথার চুলে বিলি কাটছে আমের ইবনে ওসমানের আঙ্গুলগুলো। রাত কেটে যাচ্ছে। আনুশির কণ্ঠ ও বাচনভঙ্গিতে মাদকতা। আমেরের জন্য এটা একটা কঠিন পরীক্ষা। সে একজন অবিবাহিত যুবক। একাধিকবার আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপথগামী হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। প্রতিবারই আল্লাহকে স্মরণ রেখে প্রার্থনা করেছে– হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দাও, আমার চরিত্রকে পবিত্র রাখো।'

রাত আর বেশি বাকি নেই। আনুশি আমেরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। এভাবে আরো তিন-চার রাতে দু'জনের গোপনে কথাবার্তা চলে। আনুশি আমেরের অস্তিত্বে একাকার হয়ে যায়। সে দেখেছে, আমেরের মধ্যে একটা ভালো মানুষী আছে। কিন্তু তার সত্তায় যে কম্পন সৃষ্টি হতে চলেছে, আনুশি তা টের পায়নি।

'মুসলিম শাসকদের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেছে'– এক রাতে আমের আনুশিকে বললো– 'আমি খৃস্টান সম্রাটদের দেখিনি। আমাদের রাজাদের চেয়ে ভালো তো হবে নিশ্চয়ই।' আমের গোপন কথা বের করতে বললো– 'আচ্ছা, এটা কি সম্ভব যে, খৃস্টানরা এসে এই অঞ্চলটা দখল করে ফেলবে?'

আনুশি অত্যন্ত চালাক মেয়ে। শৈশব থেকেই ওস্তাদি শিখে আসছে। তার রূপ-যৌবন দুর্ভেদ্য দুর্গের শক্ত প্রাচীর ভাঙ্গার ক্ষমতা রাখে। প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাহদের গোলাম বানিয়ে রাখার মতো যোগ্যতা তার আছে। কিন্তু সে মানবিক দুর্বলতা এবং স্বভাবজাত চাহিদা ও দাবি থেকে মুক্ত নয়। একজন মানুষ স্বভাব-চরিত্রে হিংস্র পশুতে পরিণত হোক

না কেন, সৃষ্টিগত স্বভাবের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারে না। আনুশি আমের ইবনে ওসমানকে তার পিপাসার কথা ব্যক্ত করেছিলো। সত্য প্রেমের পিপাসা আর আমেরের অস্তিত্ব তাকে অক্টোপাসের ন্যায় জড়িয়ে রেখেছে। মদের নেশা তার জানা ছিলো। কিন্তু প্রেমের নেশা সম্পর্কে ছিলো অনবহিত। এই নেশা যখন তাকে পেয়ে বসলো এবং দুর্বল মুহূর্তটায় আমের খৃস্টান শাসকদের পক্ষে কথা বললো, তখন মেয়েটির প্রশিক্ষণ-দীক্ষা বেকার হয়ে পড়লো। সে আমেরের সঙ্গে এমন সব কথাবার্তা বলতে শুরু করে, যা কোন গুপ্তচর সাধারণত প্রকাশ করে না।

আমেরের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে সে। এ মুহূর্তে যদি আনুশির খৃস্টান গুরু, ইয্যুদ্দীন কিংবা অন্য কোন কর্মকর্তা তাকে এই অবস্থায় দেখতে পায়, তাহলে তারা বিশ্বাসই করবে না, এই সেই মেয়ে, যাকে তারা সুদানী পরী বলে ডাকেন। নিষ্পাপ মেয়ের মতো লাজুক হয়ে বসে আছে আনুশি। তার একবিন্দু অনুভূতি হৈ নেয়, এই মুহূর্তে এখানে বসে সে সালতানাতে ইসলামিয়ার মূলোৎপাটনের পরিবর্তে ক্রুশকেই বরং ফোকলা করে ফেলছে। আমের আনুশিকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করছে।

আজ যখন আনুশি আমেরের কক্ষ থেকে বের হয়, তখন রাতের শেষ প্রহর। আমেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে গেছে আনুশি।

অনেক দিন কেটে গেছে। ইসহাক তুর্কি এখন বৈরুতে খৃস্টান নাইটের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীই নয়– অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। খৃস্টান নাইটের এমন কোন গোপন তথ্য নেই, যা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা ইসহাক তুর্কি জানে না। ইসহাক একটা বিষয় অনুভব করে, তার এই কমান্ডার ক্রুশের জন্য এতোটা আন্তরিক নয়– যতোটা আন্তরিক পরবর্তী যুদ্ধে জয়লাভ করে সম্রাট বল্ডউইন থেকে আরবের কোন একটা ভূখণ্ড পুরস্কার হিসেবে অর্জন করার। একটি ভূখণ্ডের স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন চেপে বসেছে তার মাথায়। ওস্তাদ আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণ মোতাবেক ইসহাক তুর্কি তার মনস্তত্ত্ব নিয়ে খেলতে শুরু করে। যেভাবে আনুশির ন্যায় একটি ভয়ঙ্কর মেয়ে মানবীয় দুর্বলতা ও চাহিদার সামনে অসহায় হয়ে পড়েছিলো, তেমনি খৃস্টানদের এই নাইটও আপন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে গিয়ে এবং কামনা-

বাসনার কাছে পরাজিত হয়ে ভাবনার প্রযোজনীয়তা হারিয়ে ফেলেছে যে, অচেনা লোকটিকে সে নিজের অন্তরঙ্গ বানিয়ে নিলো। সে শুধু তারই নয়– তার সম্রাট ও তার ক্রুশের পরাজয়ের বার্তাবাহক।

একদিন নাইট ইসহাক তুর্কিকে বৈরুত থেকে দূরে একস্থানে নিয়ে যায়। ইসহাক জানে, নাইটের সেনা ইউনিট রাতে বেশ তড়িঘড়ি রওনা হয়ে গেছে। সে তার বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানের জন্য বন্টন করার লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে। দেহরক্ষী হিসেবে ইসহাক তার সঙ্গে আছে। বাহিনীর অবস্থান স্থলে পৌঁছে ইসহাক দেখতে পেলো, তাঁবু স্থাপন করা হয়নি। বাহিনীতে অশ্বারোহীও আছে, পদাতিকও আছে। নাইট তার অধীন কমান্ডারদের ডেকে কয়েকটি জায়গার নাম উল্লেখ করে উক্ত স্থানগুলোতে তাঁবু স্থাপন করতে এবং প্রস্তুত অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দেয়। ইসহাক পাশে দাঁড়িয়ে সব পর্যবেক্ষণ করে।

'হতে পারে তোমাদেরকে এক মাস পর্যন্ত এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে'– নাইট তার অধীন কমান্ডারদের বললো– 'কিন্তু বিরক্ত হতে পারবে না। গতকাল কায়রো থেকে আসা এক গোয়েন্দা সংবাদ জানিয়েছে, সালাহুদ্দীন আইউবী বৈরুত অবরোধ করে নগরীটা দখল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমাদের আশা ছিলো, তিনি এখনো দামেশ্‌কের দিক থেকেই আসবেন এবং সর্বপ্রথম তার মুসলিম আমীরদেরকে –যাদের মধ্যে হাল্‌ব, মসুল এবং হাররানের আমীরগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– সঙ্গে নেবেন। তারপর আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন। কিন্তু এখন নির্ভরযোগ্য তথ্য পেলাম, তিনি সর্বাগ্রে আমাদের হৃদপিণ্ডের উপর আঘাত হানবেন এবং তারপর তার যেসব আমীরকে আমরা আমাদের বন্ধু বানিয়ে রেখেছি, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন। আমরা যদি এ সংবাদ না পেতাম, তাহলে আমরা বৈরুতের অভ্যন্তরে তার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়তাম। তোমরা অনেকে হয়তো জানো না, সালাহুদ্দীন আইউবী অবরোধে অভিজ্ঞ। কোন ভূখণ্ড তার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। ক্রুশের আশির্বাদে আমরা সময় থাকতে ইঙ্গিত পেয়ে যাই।'

ইসহাক শুনছে। শরীরটা ঘেমে ওঠছে তার। মনে রাগ আসে, সালাহুদ্দীন আইউবীর আভ্যন্তরীণ জগতেও খৃস্টানদের চর আছে! এতো ভেতরের খবর শত্রুর হাতে চলে আসলে চলবে কী করে? তার মনে

পড়ে যায়, তার মুসলমান ভাইদের ঈমান বিক্রি করতে সময় লাগে না। সুলতান আইউবীর ব্যক্তিগত বলয়ে কোন খৃস্টান ঢুকতে পারে না। এটা কোন ঈমান নিলামকারী মুসলমানেরই কাজ। ইসহাক তুর্কি তীব্রভাবে অনুভব করে, তাকে এই মুহূর্তে কায়রো পৌঁছে আলী বিন সুফিয়ানকে বলতে হবে, সুলতান সত্যিই যদি বৈরুতের উপর সেনা অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে যেনো তিনি সরাসরি বৈরুত না যান।

সময় মতো সংবাদটা পাওয়ায় আমাদের লাভ হয়েছে। যেভাবে আমাদের এই বাহিনীকে ওঁৎ পেতে থাকার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে, তেমনি আরো কয়েকটি ইউনিটকে– যাদের মধ্যে অশ্বারোহী সৈনিকের সংখ্যাই বেশি– বৈরুতের আশপাশে এবং দূর-দূরান্তে প্রেরণ করা হয়েছে। যে বাহিনীটি বৈরুতে প্রস্তুত আছে, তারা সালাহুদ্দীন আইউবীকে স্বাগত জানাবে। আইউবী অতর্কিত আক্রমণ করে বৈরুত দখল করে নিতে চাইবেন। তিনি যখন অবরোধ সংকীর্ণ করবেন, তখন আমরা পেছন থেকে তার উপর আক্রমণ চালাবো। তারপর তিনি বৈরুতের অভ্যন্তরে আমাদের বাহিনীর এবং বাইরের বাহিনীগুলোর গ্যাড়াকলে আটকে যাবেন।'

'জনাব!'– এক প্রবীণ কমান্ডার বললো– 'জানতে পেরেছেন কি তিনি কোন্ দিক থেকে আসবেন?'

এখনো তা জানতে পারিনি'– নাইট উত্তর দেয়– 'মনে হচ্ছে তিনি আমাদের অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে আসার ঝুঁকি বরণ করবেন। সম্রাট বল্ডউইন নির্দেশ জারি করেছেন, পথে যেনো তাকে না ঘাটানো হয়। আমরা তাকে আমাদের ভেতরে এবং বৈরুত পর্যন্ত পৌঁছতে দেবো। এখানে আমরা তার বাহিনীকে রসদ থেকে বঞ্চিত করে মারবো।'

'আপনি তো জানেন, বৈরুত সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত'– প্রবীণ কমান্ডার বললো– 'তিনি তো তার নৌশক্তিও ব্যবহার করতে পারেন।'

'তিনি নৌশক্তি ব্যবহার করবেন'– নাইট বললো– 'তার বিপুলসংখ্য সৈন্য সমুদ্র জাহাজে করে আসছে। আমরা তারও ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমরা সমুদ্রে তার মোকাবেলা করবো না। তার বাহিনীকে কূলে অবতরণ করার সুযোগ দেবো। এভাবে আমরা তার জাহাজগুলোকে ধ্বংস কিংবা তাদেরকে পালানোর সুযোগ না দিয়ে জাহাজগুলোকে দখল

করবো। আমার বন্ধুগণ! তোমরা তো জানো, সেনাবাহিনীর এসব গোপন তথ্য বলা যায় না। কেননা, মুসলমানদের অঞ্চলে যেমন আমাদের গুপ্তচর আছে, তেমনি আমাদের অঞ্চলেও মুসলমান চর তৎপর রয়েছে। আমাদের সৈনিকদের মুখনিঃসৃত যে কোন কথা সালাহুদ্দীন আইউবীর কানে পৌছে যাওয়া বিচিত্র নয়। তবে কোন কোন সময় অন্তত কমান্ডারদের জানা থাকা দরকার, অনাগত পরিস্থিতি কিরূপ হবে এবং তার পটভূমি কী হবে। সাবধান থাকবে, সৈনিকরা যেনো জানতে না পারে, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর কোন সংবাদ পেয়েছি। অন্যথায় আইউবী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলবেন।'

'মুসলমান আমীরদের মনোভাব কি আপনার জানা আছে?'- অপর এক কমান্ডার জিজ্ঞেস করে- 'এমনও তো হতে পারে,তারাও আমাদের উপর আক্রমণ করবে।'

'তাদের পক্ষ থেকে আমাদের কোন আশঙ্কা নেই'- নাইট বললো- 'হাল্‌বের গভর্নর ইয্‌যুদ্দীন মসুলে এসে পড়েছেন আর আমীর চলে গেছেন হালবে। ক্ষমতার এই হাতবদল আমাদের কারসাজিতে হয়েছে। ওখানকার পরিস্থিতি সম্পূণরূপে আমাদের নিয়ন্ত্রণে। এতোটুকু আশা করা যায় যে, তাদের কেউ না কেউ সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর আক্রমণ করবে কিংবা তাকে রসদ সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। মোটকথা, এটা নিশ্চিত, আইউবী তার মুসলমান আমীরদের থেকে কোন সাহায্য পাবেন না।'

রাতে ইসহাক তুর্কি নাইটের সঙ্গে সুলতান আইউবীর সম্ভাব্য আক্রমণ এবং বৈরুত অবরোধ সম্পর্কে মতবিনিময় করে এবং সন্তোষ প্রকাশ করে বলে- 'এবার আমি আমার বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ পাবো। সে আরো কিছু জরুরি তথ্য জেনে নেয়। তার সামনে এখন কাজ, তাকে ওখান থেকে পালিয়ে কায়রো পৌছতে হবে। সে ভাবে, হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেলে নাইট সন্দেহ করে বসবে, আমি গোয়েন্দা ছিলাম এবং তাদের সবকিছু দেখে-শুনে চলে গেছি। ফলে সে পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলবে। তাই ইসহাক নাইটকে বলে, ছুটি নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। অজুহাত তার আছে। ঠিক করে, বলবে, পরিবার-পরিজনকে মুসলমানদের অঞ্চলে রেখে এসেছি, আপনি তা

জানেন। এখন যেহেতু আমি মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে গেছি, তাই এদেরকে উদ্ধার করে আনতে চাই। অন্যথায় মুসলমানরা তাদেরকে উত্যক্ত করতে থাকবে।

অজুহাত উপস্থাপন করে ইসহাক নাইটকে বলে– 'এক-আধ মাস পর তো আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বোই। তারপর কে জানে কতোদিন আমাদের যুদ্ধের মাঠে থাকতে হয়। পরিবারের লোকদেরকে এখনই নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো। তাছাড়া এমনও তো হতে পারে, আমি যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলাম আর ওদিকে তাদের কোন সহায় রইলো না।'

অজুহাতটা যৌক্তিক। নাইট তাকে যে ঘোড়াটি দিয়েছিলো, সেটি দেখিয়েই বললো– 'তুমি এখনই রওনা হয়ে যাও। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো।'

ইসহাক তুর্কির তাড়া খৃস্টান নাইটের চেয়ে বেশি। কারণ, তাকে দ্রুত কায়রো পৌঁছুতে হবে। তবে তার আগে তাকে হাল্‌ব ও মসুল যাওয়া আবশ্যক। কেননা, ওখানকার শাসকদের সম্পর্কে তার কানে কিছু কথা এসেছে। সে জানে না, সুলতান আইউবী যখন অভিযান পরিচালনা করবেন, তখন মসুলের শাসনকর্তা ও সেনা অধিনায়কদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে। হাল্‌বে তার সহকর্মী কারা আছে এবং কোথায় আছে, তার জানা আছে। কিন্তু সে নাইটের মুখ থেকে শুনেছে, ইয্‌যুদ্দীন মসুল এবং ইমাদুদ্দীন হাল্‌বে চলে গেছেন। তার অর্থ হচ্ছে, রোজি খাতুনও এখন মসুলে অবস্থান করে থাকবেন। তা-ই যদি হয়, তাহলে তার খাদেমাও তার সঙ্গে থাকবে। মহলের ভেতরের যোগাযোগ এই খাদেমার মাধ্যমেই হতে পারে।

ইসহাক তুর্কি সে রাতেই রওনা হয়ে যায়। ঘোড়াটা উন্নত জাতের। ইসহাক দক্ষ অশ্বারোহী। মাসের দূরত্ব কয়েক দিনে অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা তার আছে। ইসহাক পথ চলতে থাকে আর আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকে, যেনো তার কায়রো পৌঁছার আগে সুলতান আইউবী রওনা না হন। ছুটতে ছুটতে ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লেও ইসহাক থামছে না। ধীরে ধীরে ঘোড়ার গতি কমতে শুরু করে। ইসহাক নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে সামনের দিকে ঝুঁকে পেটটা যিনের সঙ্গে লাগিয়ে চলন্ত ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে।

শেষ রাতে ইসহাকের চোখ খোলে। হন্তদন্ত হয়ে আকাশের দিকে

তাকায়। তার পথ প্রদর্শনকারী তারকাটা জ্বল জ্বল করছে। ঘোড়া সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে। ভোরের আলোতে ইসহাক এক স্থানে ঘোড়াটাকে পানি পান করায় এবং ঘাস খাওয়ায়। নিজেও খানিকটা বিশ্রাম নেয়। তারপর আবার চলতে শুরু করে।

এ দিনটিও কেটে গেলো। রাতও অতিক্রান্ত হলো। খৃষ্টান নাইটের প্রদত্ত ঘোড়াটা ইসহাককে খুব কাজ দিচ্ছে। সূর্য অস্ত যেতে এখনো বেশ দেরি। মসুলের মিনারের চূড়াটা দেখতে পাচ্ছে ইসহাক। ইসহাক এই নগরী সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছে। দু'সঙ্গী গোয়েন্দার ঠিকানাও তার কাছে আছে। তবে তারা কোন তথ্য দিতে পারবে কিনা তার জানা নেই। এমনও হতে পারে, তারা তাকে হাল্‌বের পথ দেখিয়ে দেবে।

❖ ❖ ❖

ইয্‌যুদ্দীন নিশ্চিন্ত হয়েছেন, রোজি খাতুন তার প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি রোজি খাতুনের কোন কর্মকাণ্ডে আর হস্তক্ষেপ করেন না। রোজি খাতুন এ কথাও জিজ্ঞেস করলেন না যে, সে ইমামুদ্দীনের সঙ্গে ক্ষমতা রদবদল কেন করলেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি ইয্‌যুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা পূরণ হয়নি। তথাপি তিনি এই ভেবে সান্ত্বনা পান যে, তিনি এই রহস্যময় জগতটার অভ্যন্তরে ঢুকতে পেরেছেন এবং সুলতান আইউবী এখানে যে গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে রেখেছেন, তাকে আরো কার্যকর করতে পারছেন। তিনি শামসুন্নিসাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং মেয়েটি বিভ্রান্ত জীবনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে মুজাহিদ নারীতে পরিণত হয়েছে। সে ইয্‌যুদ্দীনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী আমের ইবনে ওসমানকে সংবাদদাতা ও গুপ্তচর বানায়। আর নিজের প্রেমাস্পদ হওয়া সত্ত্বেও গুপ্তচরবৃত্তির স্বার্থে তাকে এমন একটি চতুর ও রূপসী মেয়ের পেছনে নিয়োজিত করে, যে তাকে আজীবনের জন্য ছিনিয়ে নিতে সক্ষম।

আমের ইবনে ওসমান আনুশি থেকে যেসব তথ্য উদঘাটন করছে, তা সব শামসুন্নিসার মাধ্যমে রোজি খাতুনের নিকট পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। এ এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যা কায়রোতে পৌঁছিয়ে দেয়া একান্ত জরুরি। হাল্‌ব থেকে সুলতান আইউবীর যে গোয়েন্দা এসেছিলো, তাদের কমান্ডারকে কায়রো যাওয়ার জন্য একজন লোক ঠিক করে রাখতে বলা হলো। সে বলেছিলো, ইসহাক তুর্কি বৈরুত থেকে এসে

পড়বে। ওখানকার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত রিপোর্ট অসম্পূর্ণ থাকবে। সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে বারবার বলছেন খৃষ্টানদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহ করো।

আনুশি আমের ইবনে ওসমানকে যেসব তথ্য দিয়েছে, সবই ছিলো সত্য। মেয়েটি ইয্‌যুদ্দীন ও তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টাদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলো যে, তারা তার উপস্থিতিতে যারপরনাই স্পর্শকাতর কথাবার্তা বলতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। লোকগুলোর প্রতি আনুশির কোনো হৃদ্যতা ছিলো না। সে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতো। শুধুমাত্র নিজের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার জানা ছিলো, যে যুবকটিকে সে মনে-প্রাণে ভালোবাসে, সেই আমের ইবনে ওসমানও নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আনুশির প্রেমের ফাঁক গলিয়ে অনেক অজানা তথ্য বের করতে সক্ষম হয় আমের।

ইয্‌যুদ্দীন রোজি খাতুনের ভ্রমণ বিহারের জন্য ঘোটযান দিয়ে রেখেছেন। এক সন্ধ্যায় রোজি খাতুন শামসুন্নিসাকে সঙ্গে করে বাইরে বেড়াতে যান। নগরীর সন্নিকটে একটি সবুজ বাগিচা। ভেতরে মনোরম একটি কূপ। জায়গাটা এতো সুন্দরও মন ভোলানো যে, রাজ পরিবারের সদস্যরা ব্যতীত অন্য কেউ এখানে আসতে পারে না। রোজি খাতুনের সঙ্গে খাদেমাও আছে। রক্ষী হিসেবে সঙ্গে এসেছে আমের ইবনে ওসমান। আমের ইয্‌যুদ্দীনের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তার প্রতি নির্দেশ রয়েছে, রোজি খাতুন যখন বাইরে বেড়াতে যাবেন, সে তার সঙ্গে থাকবে।

গন্তব্যে পৌঁছে গাড়িটা দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। রোজি খাতুন ও শামসুন্নিসা কূপের দিকে চলে যায়। আমের ইবনে ওসমানও সঙ্গে আছে। আসলে এটা তাদের শুধু ভ্রমণ নয়, ভ্রমণের বাহানায় রোজি খাতুনের আমের থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা বটে।

ইসহাক তুর্কি মসুলে তার এক সহকর্মীর নিকট পৌঁছে গেছে। সঙ্গী তাকে জানায়, রোজি খাতুনও তাদের দলে যোগ দিয়েছেন। বরং বলা যায়, তিনি তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন। উভয়ের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন ও তথ্য আদান-প্রদান হয়। ইত্যবসরে তাদের আরেক সঙ্গী এসে পড়ে। সে ইসহাককে জানায়, রোজি খাতুনের খাদেমাকে এ মুহূর্তে অমুক কূপের নিকট পাওয়া যাবে। ভালো হবে, তুমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করো। ইসহাক সঙ্গীদের তার ব্যস্ততার কথা জানায়। সম্ভব হলে রাতেই

আবার সে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওয়া হয়ে যাবে।

কূপের কিনারায় বসে আমের ইবনে ওসমান রোজি খাতুন ও শামসুন্নিসাকে বলছে, আনুশির কথা অনুযায়ী সে নিশ্চিত হয়েছে, খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে ইয্যুদ্দীন সুলতান আইউবীকে বন্ধুত্বের ধোঁকায় ফেলে প্রতারণা করবেন। সুলতান আইউবী যদি রসদ দিতে বলেন, তিনি সময়মতো রসদ সরবরাহ করবেন না। সুলতান যদি সৈন্য তলব করেন, তাহলে এই অজুহাতে ব্যর্থতা প্রকাশ করবেন যে, ইমাদুদ্দীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নেই। সে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ চালাতে পারে। তাই আমাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনাকে আমি সৈন্য দিতে অপারগ। ইমাদুদ্দীনের দৃষ্টিভঙ্গিও একই রকম। ব্যাপারগুলো সুলতান আইউবী অবহিত হওয়া দরকার। কারণ, তিনি তো দু'শাসককেই তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ মনে করছেন।

খাদেমা এদিক-ওদিক টহল দিচ্ছে। ভ্রমণস্থলের নিকট থেকে কারো গানের শব্দ তার কানে আসে। কে যেনো গাইছে– 'পথভোলা পথিক হে! তারকাটা দেখে নে'। খাদেমা কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে যায়। এই গান তো তাদের গোয়েন্দাদের গোপন সংকেত। তারা একজন অপরজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে এই গান গাইতে থাকে। খাদেমা ঝোপের আড়ালে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সে ইসহাক তুর্কিকে চিনে ফেলে। তাকে দাঁড় করায়। ইসহাক বললো– 'আমার সময় নেই, তুমি পায়চারি করতে থাকো।' বলেই রোজি খাতুনের নিকট চলে যায়।

সূর্য ডুবে গেছে। ভ্রমণ স্থলের উপর আঁধার নেমে আসছে। ইসহাক তুর্কি এমন এক জায়গায় রোজি খাতুন, শামুসন্নিসা ও আমেরের সঙ্গে বসে আছে, যেখানে তাদের দেখার সাধ্য কারো নেই।

রোজি খাতুন ইসহাক তুর্কির কাছে হাল্ব ও মসুলের যাবতীয় গোপন রহস্য ও প্রতারণার চিত্র তুলে ধরে। তিনি ইসহাককে বললেন– 'তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলবে, আমি নূরুদ্দীন জঙ্গীর আসনটা ইয্যুদ্দীনকে দিয়েছিলাম। হৃদয়ে পাথর বেঁধে আমি ইয্যুদ্দীনকে এজন্য গ্রহণ করেছিলাম যে, তাকে জঙ্গীর যথাযথ উত্তরাধিকার বানাবো এবং তিনি জঙ্গীর ন্যায় তোমার ডান হাত হয়ে কাজ করবেন। কিন্তু বিয়ের পর তার আসল রূপ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। এই বিয়ে করে আমি

জীবনে একটি মারাত্মক ভুল করেছি। বিয়ের বাহানায় আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এখন দামেশ্‌কের মর্যাদা তোমার হাতে। বৈরুতে তোমাকে কীভাবে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি চলছে, তা তুমি ইসহাকের নিকট থেকে জেনে নেবে। তোমার বৈরুত অবরোধের পরিকল্পনার সংবাদ বৈরুত পৌঁছে গেছে। এমতাবস্থায় কী করতে হবে তুমিই ভালো বুঝো। ভেবে দেখো, সরাসরি বৈরুতই যাবে, নাকি পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলবে। তথ্যটা বৈরুতে কে পৌঁছালো, এ প্রশ্নের উত্তর আলী বিন সুফিয়ান দিতে পারবে। আমাদের জাতির মধ্যে ঈমান বিক্রি একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরবের আমীরদের বিলাসিতার এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে তারা খানায়ে কা'বাকেও বিক্রির চেষ্টা করবে। বিলাসিতা আর ক্ষমতার মোহ এই দুই মিলে আমাদের রাজ্যগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে এবং জাতিগুলোর নাম-চিহ্ন মুছে ফেলছে। তুমি ইযযুদ্দীন ও ইমামুদ্দীনের উপর আস্থা রাখবে না। এরা তোমাকে সাহায্য নয় বরং ধোঁকা দেবে। আমার পরামর্শ হলো, বৈরুতের পরিবর্তে হাল্‌ব ও মসুল অবরোধ করে আগে ঈমান নিলামকারী শাসকদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করো এবং এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করো। এটা ইসলামের অনেক বড় খেদমত হবে। ইতিহাসের উপর একবার চোখ বুলাও সালাহুদ্দীন! আমাদের রাজা-বাদশাগণ আজীবন দেশ-জাতি-রাষ্ট্রকে বিক্রিই করেছে। দেশ-জাতির লাজ রক্ষা করেছে ইসলামের সৈনিকরা। সৈনিক ছাড়া কেউ শত্রু দেখে না। আর শত্রুর হাতে জীবন দেয় শুধু সৈনিক। সে কারণে দেশ ও জাতির মূল্য-মর্যাদা শুধু সৈনিকরাই বুঝে। যে সময় এই বিলাসী শাসকরা শত্রুর প্রেরিত মদ, সুন্দরী নারী আর বিত্তের নেশায় মাতাল পড়ে থাকে, তখন আল্লাহর সৈনিকগণ মরু বিয়াবান, পাহাড়-জঙ্গল আর নদী-সমুদ্রে জীবন অতিবাহিত করে। ভাই সালাহুদ্দীন! তোমার জীবনটাও তেমনি মরু বিয়াবানে, পাহাড়-জঙ্গলে লড়াইরত অবস্থায় অতিবাহিত হচ্ছে। আমার প্রথম স্বামী নূরুদ্দীন জঙ্গীও সারা জীবন ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন। কিন্তু তুমি যখন ঈমান বিক্রিকারী শাসকদের বিরুদ্ধে বুকটান করে দাঁড়াও, তখন তারা তোমাকে জাতির ঘাতক ও গাদ্দার আখ্যা দেয়। আমাদেরকে এসব ফতোয়ার পরোয়া করা চলবে না। এ সব ইহুদী-খৃষ্টানদের ফতোয়া, যা আমাদের ভাইয়েরা

তোমার বিরুদ্ধে আরোপিত করছে। তুমি আসো- ঝড়ের ন্যায় আসো। আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন। আমি তোমার জন্য ভূমি সমতল করছি। এখানকার প্রতিটি শিশু, বৃদ্ধ ও নারী তোমার সঙ্গে থাকবে। বাকি সংবাদ ইসহাকের নিকট থেকে জেনে নিও।'

ইসহাক তুর্কিকে প্রাপ্ত সকল তথ্য অবহিত করা হলো। সে উঠে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যদিয়ে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়ে। এ সময় তার অনুভব হতে লাগলো, কার যেনো পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ইসহাক এদিক-ওদিক তাকায়। তার সন্দেহ জাগে, খানিক দূরে ছায়ার মতো একটা কি যেনো চলে গেছে এবং ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিষয়টার প্রতি মনোযোগ দেয় না ইসহাক। মাথায় তার ভাবনা, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে কায়রো পৌঁছতে হবে। এমন যেনো না হয়, তার পৌঁছার আগেই সুলতান আইউবী রওনা হয়ে গেছেন। এখান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে বলে অত্যন্ত আনন্দিত সে। ইসহাক তার সঙ্গীদের নিকট যায়। খুব তাড়াতাড়ি করে চারটা খেয়ে রওনা হয়ে যায়। সামনে তার আরো কাজ আছে। হাল্‌ব গিয়ে কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ইসহাক হাল্‌ব পৌঁছে যায়। কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কমান্ডার ইসহাককে অতিশয় উন্নত জাতের একটি তাগড়া ঘোড়া প্রদান করে। পানির ছোট একটি মশক ও খাদ্যভর্তি থলে ঘোড়ার সাথে বেঁধে দেয়। ইসহাক কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

যে রাতে ইসহাক ভ্রমণস্থলে রোজি খাতুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলো, সে রাতে মন ভালো না থাকার অজুহাতে আনুশি ইয্‌যুদ্দীন ও সাঙ্গপাঙ্গদের আসরে যায়নি। মেয়েটি অসুস্থ ভেবে ইয্‌যুদ্দীন ডাক্তার তলব করেন। ডাক্তার দেখে ওষুধ দেন। কিন্তু আনুশি ওষুধ খেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো- 'বিরক্ত করো না, আমাকে একটু শান্তিতে একা থাকতে দাও।'

রাত জাগরণ ও অধিক মদ্যপানের কারণে তার এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ইয্‌যুদ্দীন ও ডাক্তার চলে যায়। আনুশি কক্ষের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে কক্ষে ভেতরে পায়চারি করতে থাকে। মনটা তার বেজায় অস্থির। বার কয়েক জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকায় আবার

পায়চারি করতে শুরু করে।

আনুশি তার অলঙ্কারের বাক্সটা খোলে। একটি আংটি বের করে। আংটির নগিনার জায়গাটা ডিবার মতো। অত্যন্ত সুন্দর ও ভারী একটি আংটি। আনুশি আংটির ডিবাটা খুলে। তার মধ্যে সাদা পাউডার ভর্তি। সে পাউডারগুলোর প্রতি খানিক তাকিয়ে ডিবাটা বন্ধ করে আংটিটা আঙ্গুলে পরিধান করে। এবার তাকে কিছুটা শান্ত মনে হলো, যেনো অস্থিরতা দূর করার চেষ্টা করছে।

রাত অর্ধেক কেটে গেছে। আনুশির সেবিকা তার কক্ষের কাছাকাছি অপর এক কক্ষে ঘুমিয়েছিলো। তাকে বলে দিয়েছিলো, আজ রাতে আর তাকে প্রয়োজন নেই। কিন্তু মধ্যরাতের পর আনুশি সেবিকার কক্ষে গিয়ে তাকে জাগিয়ে বললো, আমের ইবনে ওসমানকে ডেকে আনো।

সেবিকা আনুশি–আমরের প্রেমের ঘটনা জানতো। সে উঠে গিয়ে আমেরকে ডেকে আনে। আনুশি সেবিকাকে বললো– 'তুমি কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো।'

'আমের!'– আনুশি এমন এক ভঙ্গিতে বললো, যেনো তার সঙ্গে আমেরের পরিচয় নেই– 'আজ ভ্রমণস্থলে তোমাদের সঙ্গে যে লোকটা বসা ছিলো, সে কে?'

'কেউ নয়'– আমের অজ্ঞতা প্রকাশ করে উত্তর দেয়– 'আমার নিকট কেউ আসেনি তো। আমি তো বেগমের সঙ্গে রক্ষী হিসেবে যাই এবং তার থেকে দূরে থাকি।'

'আমের!'– আনুশি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত কণ্ঠে বললো– 'আমার সাত স্তর মাটির নীচের গোপন খবরও জানা আছে। তোমাকে আমি হৃদয়ের গভীর থেকে কামনা করি। কিন্তু তুমি আমাকে বোকা ভেবো না। তুমি, রোজি খাতুন, শামসুন্নিসা ও তার খাদেমা একসঙ্গে বসেছিলে আর একজন অপরিচিত লোক তোমাদের মাঝে বসা ছিলো। অতি গোপনীয় কথপোকথন হচ্ছিলো। প্রমাণ চাইলে তাও দিতে পারি। তোমরা কানে কানে কথা বলছিলে। শেষে অপরিচিত লোকটা সেখান থেকে চলে যায়। আমি তখন ফিরে আসি।'

ইসহাক তুর্কি সেখান থেকে ওঠে চলে যাওয়ার সময় কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলো। খানিক দূরে একটি ছায়াও দেখেছিলো। আসলে সে ছিলো আনুশি। মেয়েটি চুপি চুপি রোজি খাতুন, শামসুন্নিসা

ও আমের ইবনে ওসমানের পিছু নিয়েছিলো।

আমের ইবনে ওসমান উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। আমতা আমতা করে কিছু বলার চেষ্টা করে, যার কোন অর্থ দাঁড়ায় না। আনুশি দক্ষ গোয়েন্দা। তার সন্দেহটা ভিত্তিহীন নয়। বললো– 'শামসুন্নিসা যদি একা হতো তাহলে মনে করতাম, রাজকন্যা তোমাকে দখল করে রেখেছে। কিন্তু বিষয়টা ছিলো ভিন্ন। আচ্ছা বলো তো, তুমি আমাকে গোপন বিষয়াদি কেন জিজ্ঞেস করো?'

'এমনিই'– আমের মুচকি হেসে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে– 'এমনিতেই জিজ্ঞেস করি। ওসব রাজকীয় ব্যাপারের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক থাকতে পারে। মনে কৌতূহল জাগে, আমরা রাজা-বাদশাহদের কী ভাবি, আর আসলে তারা কী।'

'আমের!'– আনুশি অত্যধিক ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো– 'তুমি জানো না আমি কে। আমার এক ইশারায় এই নগরীর প্রতিটি ইট খসে পড়তে বাধ্য। আমার পিপাসু আবেগ আমাকে ধোঁকা দিলো। আমি তোমার প্রেমের নেশায় নিজের কর্তব্য ভুলে গেলাম আর তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছো। তারপরও আমার হৃদয়ে তোমার প্রতি দুর্বলতা কাজ করছে। তার প্রমাণ, তুমি এখানে নিরাপদে অবস্থান করছো। আমি চাইলে তোমাকে সেই কয়েদখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা রাখতে পারতাম, যেখানে নির্যাতনের পর গাদ্দার ও গোয়েন্দাদের ফেলে রাখা হয়। তোমাকে আমি সেই জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছি। শুধু এটুকু স্বীকার করো, আমার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে ঐ অচেনা লোকটাকে দিয়েছো এবং সংবাদ নিয়ে লোকটা কায়রো চলে গেছে। তুমি আমার নিষ্ঠা আর ভালোবাসার প্রমাণ দেখো, আমি তোমাদের দেখে ফেলার পরও লোকটাকে চলে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছি। আমি ইচ্ছা করলে তাকে গ্রেফতার করাতে পারতাম। কিন্তু তোমার ভালোবাসা আমাকে এ কাজে বাধার সৃষ্টি করেছে।'

আনুশির চোখে অশ্রু এসে যায়– 'যে আমি নিজেই চিত্তাকর্ষক প্রতারণা, সেই আমি ধোঁকায় পড়ে গেলাম। তুমি জিতে গেছো আমের, তুমি জিতে গেছো। ভালোবাসার কাছে আমি পরাজিত। বলো, সত্য বলো আমের!'

'হ্যাঁ, আনুশি'– আমের বললো– 'তুমি তোমার কর্তব্য পালন

করেছো, আর আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আমাকে তুমি কয়েকখানায় বন্দী করে রাখো।'

আনুশির গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়াতে থাকে। হঠাৎ সে অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'ব্যস, এতোটুকুই জানবার প্রয়োজন ছিলো, যা তুমি স্বীকার করেছো। আমি তোমাকে বন্দী করাতে পারবো না। এখন আমিও এই পিঞ্জিরা থেকে মুক্ত হতে চাই। তুমি মদপান করো না। আমাদের সম্রাটগণ যে শরবত পান করেন, আমি তোমাকে সেই শরবত পান করাবো।'

আনুশি বসা থেকে ওঠে টেবিলটার নিকট গিয়ে দাঁড়ায়। টেবিলের উপর একটি সোরাহি রাখা আছে। তার পিঠটা আমেরের পিঠের দিকে। আনুশি দু'টি পেয়ালা নিয়ে নখের সাহায্যে আংটিতে স্থাপন করা ডিবাটা খোলে। ডিবার কিছু পাউডার এক পেয়ালায়, কিছু অপর পেয়ালায় ঢেলে দেয়। বিষয়টা আমের দেখতে পায়নি। আনুশি উভয় পেয়ালায় সোরাহি থেকে শরবত ঢেলে একটি আমেরের হাতে তুলে দেয়, অপরটি নিজের হাতে রাখে।

'শুকে দেখো'– আনুশি বললো– 'এগুলো শরাব নয় শরবত। এ আমার প্রিয় পানীয়। নাও পান করো।'

আনুশি নিজের পেয়ালাটা ঠোঁটে লাগায়। আমেরও পান করতে শুরু করে। ঢক ঢক করে পান করে উভয়ে পেয়ালা শূন্য করে ফেলে। আনুশি আমেরের হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমেরের গলাটা নিজের বাহুতে জড়িয়ে ধরে বললো– 'এখন আমরা স্বাধীন।'

আনুশি হঠাৎ লাফিয়ে আমের থেকে আলাদা হয়ে বলে ওঠে– 'তুমি তন্দ্রা অনুভব করছো?'

'হ্যাঁ'– আমের উত্তর দেয়– 'তোমার ডাক পেয়ে আমি ঘুম থেকে উঠে এসেছি। নিদ্রা আমাকে অস্থির করে তুলছে।'

'এখন আমরা উভয়ে এমন গভীর ঘুম ঘুমাবো যে, কেউ আমাদের জাগাতে পারবে না'– আনুশি আচ্ছন্ন কণ্ঠে বললো– 'আমি তোমার চেয়ে বেশি ক্লান্ত। পাপের বোঝা আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে।

মেয়েটির মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়তে শুরু করে। সে আত্মসংবরণ করে বললো– 'বেশি কথা বলার সময় নেই আমের। তুমি আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। এখন আমরা পরকালে একসঙ্গে উত্থিত হবো। আমি আমার কর্তব্য আদায় করেছি। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন

করেছো। এই শরাবে আমি সেই বিষ মিশিয়েছি, যে বিষ দিয়ে আমাদেরকে বিদেশ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। বস্তুটা প্রয়োজনের সময়কার জন্য দেয়া হয়। এই বিষপানে কোন তিক্ততা অনুভব হয় না। অত্যন্ত মিষ্টি আবেশের মধ্যে মানুষ চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। আমি এই জন্য জীবিত থাকতে চাই না, যদি জীবিত থাকি, তাহলে তোমাকে শাস্তি দিতে হবে। তোমাকে এ কারণে জীবিত থাকতে দেইনি, যেনো অন্য কোন মেয়ে বলতে না পারে আমেরের সঙ্গে আমার ভালোবাসা আছে।'

আমের ইবনে ওসমান শুয়ে পড়েছে। যেনো সে আনুশির বক্তব্য শুনতেই পাচ্ছে না। তার চোখ দুটো বুজে আসছে। আনুশির মাথাটা দুলছে। সে নড়বড়ে পায়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। সেবিকা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভেতরে ডেকে এনে বললো– 'আমরা দু'জনে বিষপান করেছি। তুমি সকলকে বলে দেবে, আমরা স্বেচ্ছায় বিষপান করেছি। অন্য কেউ পান করায়নি। কোন খৃস্টানের দেখা পেলে বলবে, তাদের সুদানী শত্রী তার কর্তব্য পালন করে চিরবিদায় নিয়েছে।'

আনুশির কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসছে। পড়তে পড়তে আমেরের নিকট চলে যায়। সেবিকা দৌড়ে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দু'জন লোক কক্ষে প্রবেশ করে। তারা দেখতে পায়, আমের ইবনে ওসমান পালঙ্কের উপর পড়ে আছে আর আনুশি তার গা ঘেঁষে এমনভাবে শুয়ে আছে যে, তার মাথা আমেরের বুকের উপর আর একহাত মাথার উপর। এক হাতের আঙ্গুলগুলো আমেরের চুলের ভেতর ঢুকে আছে, যেনো মেয়েটি আমেরের মাথায় বিলি কাটছে। দু'জনই মৃত।

ইসহাক তুর্কি এখন মসুল থেকে বেরিয়ে গেছে। অপরিচিত লোকটা সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর হতে পারে সন্দেহ করেও আনুশি তাকে ধাওয়া করেনি, গ্রেফতার করাবার চেষ্টা করেনি। ভালোবাসার প্রতারণার মধ্যে যে সামান্য সময়টা আমেরের সঙ্গে অতিবাহিত করেছে, এ সময়টুকুতে সে আত্মিক প্রশান্তি পেয়েছিলো। সেই ভালোবাসার বিনিময় হিসেবে মেয়েটি ইসহাককে নিরাপদে চলে যেতে দিয়েছে।

কায়রো পৌঁছতে আরো দিন কয়েকের পথ বাকি থাকতেই সাপটা ইসহাকের ঘোড়াটাকে দংশন করে। অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে কায়রো যাচ্ছিলো ইসহাক, যার সঙ্গে ইসলামের মর্যাদা ও সুলতান

আইউবীর অস্তিত্বের সম্পর্ক। ইসহাক এক মর্দে মুজাহিদ। জীবনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এই বিস্তৃত নির্দয় মরুদ্যান অতিক্রম করে সেই তথ্য নিয়ে কায়রো পৌঁছুতে চাচ্ছিলো। কিন্তু সাপ ঘোড়াটাকে দংশন করায় ইসহাক মরুর নির্মম আচরণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। যখন জ্ঞান ফিরে, সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ইসহাক তখন খৃস্টানদের তাঁবুতে পড়ে আছে। ইসহাক চোখ খুলে দেখতে পায়, দু'টি মেয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বিস্তারিত কাহিনী আপনারা পেছনে পড়ে এসেছেন।

ইসহাক তুর্কি অচৈতন্য অবস্থায় বিড় বিড় করতে থাকে। অজ্ঞাতসারে তার উচ্চারিত শব্দগুলো থেকে খৃস্টান দলটি বুঝে ফেলে লোকটি মুসলমান গোয়েন্দা এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে কায়রো যাচ্ছে। দুই মেয়ে মেরিনা ও বারবারার মধ্যে মন কষাকষি ছিলো। তারা উভয়ই কমান্ডারকে পেতে চাচ্ছিলো। কিন্তু কমান্ডার বারবারাকে প্রেমের ধোঁকা দিয়ে মেরিনার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। বারবারা প্রতিশোধ ...র লক্ষ্যে ইসহাককে বলে দেয়, তুমি খৃস্টান গোয়েন্দাদের জালে এসে পড়েছো। ইসহাক তাদের এই জালে এমনভাবে ফেঁসে যায় যে, সে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়, আমি সুলতান সালাহুদ্দীনের গোয়েন্দা এবং হাল্‌ব থেকে এসেছি। খৃস্টানদের দলনেতা তাকে জিজ্ঞেস করে, কী সংবাদ নিয়ে যাচ্ছিলে? ইসহাক বললো, নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী রোজি খাতুন ইয়্যুদ্দীনকে বিয়ে করেছেন। দলনেতা বললো, এ খবর বাসি হয়ে গেছে। তোমাদের সুলতান এখন সিরিয়া অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

খৃস্টান দলনেতা জানতে চায়, বলো, তুমি কী কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছিলে। বৈরুতে তোমাদের মুসলমান গোয়েন্দারা কারা এবং তাদের আস্তানা কোথায়। যদি না বলো, তাহলে খৃস্টান অঞ্চলে নিয়ে তোমাকে কয়েদখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখা হবে। ইসহাক এই ভেবে নমনীয়তা প্রদর্শন করেছিলো যে, পালানোর একটা সুযোগ বের করে নিতে হবে। খৃস্টান দলনেতা তাকে খৃস্টানদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করার প্রস্তাব করলে ইসহাক তাতেও সম্মত হয়ে যায়। কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছিলে এই প্রশ্নের উত্তরে ইসহাক আসল তথ্য ফাঁস না করে তাদের বুঝ দেয়ার চেষ্টা করে। সিরিয়ার মুসলিম আমীদের সম্পর্কে কিছু কথা বললেও বৈরুতের বিষয়টা সম্পূর্ণ চেপে যায় ইসহাক।

খৃস্টান দলটির সদস্য সংখ্যা আট। তারা কায়রোতে দায়িত্ব পালন

করে বৈরুত ফিরে যাচ্ছে। দলনেতা ইসহাককে বললো, আমরা রাতে রওনা হবো। তারা বৈরুত যাচ্ছে এবং তাকেও ধৃত হয়ে বৈরুত যেতে হবে শুনে ইসহাকের পিলে চমকে ওঠে। ওখানে গেলে নাইটের সঙ্গেও তার দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইসহাকের জন্য এটা আসল সমস্যা নয়– আসল সমস্যা হচ্ছে সুলতান আইউবীকে বল্ডউইনের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজন ছিলো এবং তাকে সতর্ক করার আবশ্যক ছিলো, যেনো তিনি বৈরুত অভিযান মুলতবী রাখেন। এ দায়িত্ব পালন করতে পারলে ইসহাকের জীবন দিতেও পরোয়া ছিলো না। কিন্তু এখন তো সে শত্রুর হাতে বন্দি এবং নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে।

কাফেলা রাতে রওনা হয়। হাত দুটো পিঠমোড়া করে বেঁধে ইসহাককে একটা উটের পিঠে বসিয়ে দেয়া হয়। এই উটের উপর মালামালও বোঝাই করা। সুলতান আইউবীর এই গোয়েন্দা বৈরুত থেকে কায়রো রওনা হয়েছিলো। কিন্তু কায়রো না পৌঁছেই মাঝপথ থেকে এখন পুনরায় বৈরুত যেতে হচ্ছে। দূরত্ব অনেক দীর্ঘ। কাফেলা এগিয়ে চলছে। ইসহাক তুর্কি পালানোর পথ খুঁজে ফিরছে।

'আমি আর একটা দিনও অপেক্ষা করতে পারি না'– সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের বললেন– 'ফৌজ প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। ফৌজকে এভাবে বেশি দিন রাখা উচিত নয়। অন্যথায় সৈনিকদের স্নায়ু ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়বে। আর এই অবস্থাটা যুদ্ধের জন্য ক্ষতিকর হয়। তাছাড়া আমি খৃস্টানদেরকে প্রস্তুত অবস্থায় ঝাপটে ধরতে চাই। অতীতে আমরা যখনই যুদ্ধ করেছি, নিজেদের অঞ্চলে করেছি। আর এই ভেবে আনন্দিত হয়েছি যে, আমরা দুশমনকে পিছু হটিয়ে দিয়েছি। দুশমন আমাদেরই ভূখণ্ডে আক্রমণ করলো আবার পিছপা হয়ে আমাদেরই মাটিতে অবস্থান নিয়ে থাকলো। এখন আমার প্রতিটি পদক্ষেপ আক্রমণাত্মক ও হিংস্র হবে। ফিরিঙ্গি বাহিনী বৈরুতে অবস্থান করছে। তাদের ব্যাপারে আমি কোন সংবাদ পাইনি। বল্ডইউন যদি তৎপরতা চালাতো, তাহলে আমি সংবাদ পেতাম। আমার অনুমান হচ্ছে, সে আর অন্যান্য খৃস্টানরা মুসলমান আমীরদেরকে তাদের সমর্থক ও আমাদের শত্রু বানানোর কাজে ব্যস্ত। তারা আমাদেরকে আরেকবার গৃহযুদ্ধে জড়াতে চায়। তারা গোপন তৎপরতায় ব্যস্ত রয়েছে। আমরা

বৈরুত অবরোধ করবো। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ডটি আমাদের দখলে এসে যাবে।'

সালরদের এই বৈঠকে সুলতান আইউবীর নৌ-বাহিনী প্রধানও উপস্থিত আছেন। এক মিসরী কাহিনীকার মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ তার নাম হুসামুদ্দীন লুলু লিখেছেন। তিনি নৌ-যুদ্ধের বিশেষজ্ঞ এবং অতিশয় যোগ্য নৌ-বাহিনী প্রধান হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। বৈরুত যেহেতু রোম উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিলো, তাই সুলতান আইউবী ঘেরাও পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সমুদ্রের দিক থেকেও বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

'যে ইউনিটগুলোর নৌযানে যাওয়ার এবং তীরে অবতরণ করার কথা, তারা ইসকান্দারিয়া পৌঁছে গেছে। হুসামুদ্দীনকে যাবতীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'নৌপথে গমনকারী বাহিনী খুব তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। সে জন্য এই বাহিনী কিছুদিন পর রওনা হবে। নৌ-বাহিনী তীরে অবতরণ করবে। দ্রুতগামী দূত এসে আমাদেরকে তাদের অবতরণের সংবাদ জানাবে। নগরীর উপর তাদের আক্রমণ হবে ঝড়গতিতে। ফিরিঙ্গিরা যদি অস্ত্র সমর্পণ না করে, তাহলে আপনাদের সকলের জন্য অনুমতি আছে নগরীটা ধ্বংস করে দিন। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্নদের গায়ে হাত তুলবেন না। তাদেরকে আশ্রয়ে নিয়ে নেবেন। সৈনিকদেরকে হত্যা নয়– বন্দী করবেন। কোন অবস্থাতেই লুটতরাজ করা যাবে না। আপনাদের জন্য অনুমতি থাকবে, যে কেউ আমার নীতি-নির্দেশনা অমান্য করবে, পদমর্যাদায় সে যতোই উচ্চ হোক না কেন, তাকে হত্যা করে ফেলবেন। স্থলপথে গমনকারী বাহিনীর অগ্রযাত্রা শান্তির ধারায় নয়– যুদ্ধের গতিতে হবে। বিরতি হবে তাঁবু ছাড়া। বিরতির সময় মালামাল খোলা ও নামানো যাবে না। সকলে পানি পাবে সীমিত পরিমাণে। খাদ্য রান্না হবে না। খেজুর ইত্যাদি শুকনো খাবার সঙ্গে যাচ্ছে। পশুগুলোকে পর্যাপ্ত খাবার দেয়া হবে।'

সুলতান আইউবী চওড়া একখণ্ড কাপড়ের উপর কায়রো থেকে বৈরুত পর্যন্ত ভূখণ্ডের মানচিত্র আঁকিয়ে রেখেছিলেন। এখন সেটিকে দেয়ালের সঙ্গে ঝুলিয়ে অগ্রযাত্রার পথের উপর আঙ্গুল রেখে বললেন– 'এটি হবে আমাদের অগ্রযাত্রার রাস্তা।'

বৈঠকের নীরবতা আরো অধিক গভীর হয়ে যায়। সুলতান আইউবী সকলের চেহারার প্রতি তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন– 'আপনারা নীরব কেন? বলছেন না কেন, আমরা তাহলে শত্রুর অঞ্চলের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করছি?... আমার বন্ধুগণ! আমরা সাবধানতার নীতির ভিত্তিতে যুদ্ধ করছি। যাত্রা শুরু করার আগে আমরা পার্শ্বের নিরাপত্তা ও পিছু হটার পথ দেখে আসছি। তার ফল হচ্ছে, খৃস্টানরা আমাদের ফিলিস্তীন দখল করে আছে এবং দামেশ্‌ক-বাগদাদ দখল করে মক্কা-মদীনা অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা এঁটে রেখেছে। যিয়াদের পুত্র তারেক যদি মিসরের উপকূলে বসে থাকতেন, তাহলে ইউরোপ পর্যন্ত ইসলামের পতাকা কোনদিন পৌঁছতো না। কাসেমের পুত্র মুহাম্মদ এতো বিপজ্জনক ও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভারত পৌঁছেছিলেন। খৃস্টানরা বহু দূর থেকে আমাদের ভূখণ্ডে এসেছিলো। ইসলামের সমুন্নতি যদি কাম্য হয়, তাহলে আমাদেরকে আগুনের মধ্যদিয়েও অতিক্রম করতে হবে। আর যদি রাজ্য শাসন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আসুন মিসর-সিরিয়াকে ভাগ করে নিয়ে আমরা প্রত্যেকে রাজা হয়ে যাই। তারপর আপন আপন রাজত্বকে অটুট রাখার জন্য নিজেদের দ্বীন ও ঈমান বন্ধক রেখে ইহুদী-খৃস্টানদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করি।'

'মহামান্য সুলতান!'– এক সালার দাঁড়িয়ে বললো– 'আমরা আপনার আদেশ-নির্দেশনার অপেক্ষায় অপেক্ষমান। দুশমনের অঞ্চলের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে বলে আমরা একজনও ভীত নই। আপনি বলুন এই পথ অতিক্রমে আমাদের বিন্যাস কী হবে? বাহিনী কি যার যার হেফাজত নিজে করবে?'

'না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি সেই দিক-নির্দেশনার দিকেই আসছিলাম। প্রতিটি ইউনিট অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে। ডানে-বাঁয়ে, আগে-পিছে কী ঘটছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। রসদ একসঙ্গে যাচ্ছে না। রসদগুলো কয়েকভাবে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে, যাতে শত্রুরা এগুলো ধ্বংস করতে না পারে। গেরিলা বাহিনী পুরো বাহিনীর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করবে। গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার সায়েম মিসরী এখানে উপস্থিত আছে। তাকে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি তার গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও মহড়া সম্পন্ন করে ফেলেছেন। অন্য সকলে বৈরুতের উপর দৃষ্টি রাখবে।'

সব রকম দিক-নির্দেশনা প্রদান করে সুলতান আইউবী বললেন- 'রওনা আজ রাতের প্রথম প্রহরে হবে। সবচেয়ে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে- এখন এই কক্ষে আমরা যে ক'জন আছি, তার অতিরিক্ত একজনও যেনো না জানে আমাদের গন্তব্য কী। সৈনিক-কমান্ডাররাও যেনো জানতে না পারে আমরা কোথায় যাচ্ছি।'

সুলতান আইউবীর কল্পনায়ও নেই যে, বৈরুতে তাকে স্বাগত জানানোর আয়োজন সম্পন্ন করে রাখা হয়েছে এবং ফিরিঙ্গিদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ঝাপটে ধরা তাঁর সম্ভব হবে না।

রাতের প্রথম প্রহর। বাহিনী রওনা হচ্ছে। সুলতান আইউবী তাঁর হাই-কমান্ডের সালারদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি ইউনিটের সালাম গ্রহণ করছেন এবং দু'আ দিচ্ছেন। তাঁর পার্শ্বে তাঁর এক পুত্রের ওস্তাদ আতালীক দণ্ডায়মান। সুলতান আইউবী ওস্তাদ ও আলেমদের বেশ মর্যাদা দিতেন। মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ লিখেছেন, বাহিনীর শেষ ইউনিটটি অতিক্রম করে যাওয়ার পর সুলতান আইউবী রওনা হতে উদ্যত হন। এমন সময় পুত্রের ওস্তাদ আতালীক একটি আরবী পংক্তি আবৃত্তি করেন, যার অর্থ হচ্ছে- আজ নজদের আরার ফুলের সুগন্ধি উপভোগ করে নাও। সন্ধ্যার পর এই ফুল পাওয়া যায় না।

মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ লিখেছেন, সে সময় পর্যন্ত সুলতান আইউবীর মেজাজ উৎফুল্ল ছিলো। কিন্তু পংক্তিটা কানে আসার পর তিনি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। তার চেহারার দ্যোতি উবে যায়। বিদায়কাল এই পংক্তিটা তার কাছে অশুভ বলে মনে হলো। তিনি বাহিনীর পেছনে পেছনে রওনা হয়ে যান। পথে সালারদের বললেন- 'আমার আশা ছিলো বিদায়কালে লোকটা আমাকে দুআ দেবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে এমন একটা পংক্তি শোনালেন, যেটি আমার হৃদয়ের উপর ভার সৃষ্টি করে দিয়েছে।

ঘটেছেও তাই। এই রওনার পর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আর মিসর ফিরে আসতে পারেননি। পরবর্তী বাকি জীবন তার আরব ভূখণ্ডের যুদ্ধের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। মিসরবাসী আরার ফুল আর কখনো দেখতে পায়নি।

সুলতান আইউবী ১১৮২ সালের মে মাসে মিসর থেকে রওনা হয়েছিলেন।

খৃস্টান গোয়েন্দা ও নাশকতা কর্মীদের কাফেলা ইসহাককে নিয়ে

এগিয়ে চলছে। ইসহাক তাদের কয়েদী। এখন তার হাত-পা বন্ধনমুক্ত। ইতিপূর্বে দু'দিন দু'রাত খাওয়ার সময় ছাড়া সারাক্ষণ তার হাত-পা বাঁধা থাকতো। ইসহাক দলনেতাকে বললো, আমি পালাবো না। বস্তুত তার পালাবার সুযোগও নেই আর পালিয়ে যাবেওবা কোথায়। বড়জোর দু'ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে পারবে। তারপর নির্দয় মরুভূমি তাকে এমন অবেচতন করে নিঃশেষ করে ফেলবে, যেমনটি অজ্ঞান অবস্থায় সে ধরা পড়েছিলো। দলনেতা সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করে ইসহাকের বাঁধন খুলে দিয়ে সকলকে বলে রাখে, এর প্রতি নজর রাখবে। ইসহাক কথাবার্তা ও হাবভাবে তাদের আস্থা অর্জন করে নয়। সে সুলতান আইউবী এবং অন্যান্য মুসলিম শাসকদের গালমন্দ করতে শুরু করে। ইসহাক খৃস্টান দলনেতাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, আমি আপনাদের গোয়েন্দা হয়ে যাবো। কিন্তু দলনেতা যখনই তাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছিলে, তখন সে সঠিক উত্তরদানে বিরত থাকছে।

দুই খৃস্টান মেয়ের শত্রুতা যথারীতি চলছে। মেরিনা তার নেতার প্রিয়পাত্রী হয়ে আছে। আর বারবারা এমনভাবে বিতাড়িত হয়ে আছে যে, দলনেতা যখনই তার সঙ্গে কথা বলছে, বলছে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার সাথে। রাগে-ক্ষোভে ফুঁসে আছে বারবারা। ইসহাক যে তথ্য নিয়ে কায়রো যাচ্ছিলো, মেরিনা তার পক্ষ থেকে সেসব বের করে নেয়ার তালে ব্যস্ত। এই রূপসী মেয়েটি রাতের পর রাত ইসহাকের পাশে বসে তাকে উত্তেজিত করার সব রকম প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু ইসহাক যেনো পাথরের মূর্তি। বারবারার ঐকান্তিক কামনা ইসহাক বারবারাকে কোন তথ্য না দিক।

দলনেতার পরের অবস্থান মার্টিন নামক এক ব্যক্তির। এই লোকটি বারবারার প্রেমের প্রিয়াসী। কিন্তু বারবারা তাকে কোন সুযোগ দিচ্ছিলো না। মার্টিন তাকে হুমকিও প্রদান করেছিলো, এ শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে। এই হুমকি তাকে দলনেতাও দিয়েছিলো। মেয়েটি পূর্ব থেকেই নিরাশ। এবার সে ভয়ও পেতে শুরু করেছে।

মেরিনার অবজ্ঞামূলক কথাবার্তায় বারবারার রক্ত চড়ে যায়। একদিন মেরিনা তাকে বললো– 'বারবারা! তুমি এ কাজের যোগ্য নও। তোমার খুলিতে মগজই নেই। তোমাকে নাচ-গানের আর বেশ্যালয়েই বেশ মানায়। আমি মরু অঞ্চলে এসেও একটি মুসলমান গোয়েন্দাকে ধরে

ফেলেছি। এটি আমার শিকার। তুমি তার কাছে ঘেঁষবে না। বৈরুতে গিয়ে আমি এই কৃতিত্বের পুরস্কার লাভ করবো।'

বারবারা জ্বলে ওঠে। আজ ক্ষোভের জোয়ারে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। মার্টিন তো তার পেছনে ঘুর ঘুরই করছে। বারবারা রাতে তার নিকট গিয়ে বললো, আমি মেরিনা থেকে প্রতিশোধ নিতে চাই। সে আশঙ্কাও প্রকাশ করে, বৈরুত পৌঁছার পর মেরিনা যে কোন কৌশলে তাকে শাস্তি দেয়াবে। মার্টিনের সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে। মার্টিনকে মেয়েটির এমন একটি দুর্বল পরিস্থিতিরই প্রয়োজন ছিলো। সুযোগটা হাতে এসে যায় তার। সে বারবারাকে সর্বাত্মক সাহায্য দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। বিনিময় দাবি করে শুধু এটুকু যে, তুমি আমার হয়ে যাবে। বারবারা ভদ্র মেয়ে নয়। মার্টিন তার নিকট যা দাবি করেছে, তা দেয়া মেয়েটির পক্ষে কোন ব্যাপার নয়। সে সম্মত হয়ে যায়। বারবারা পাপের মাঝে প্রতিপালিত এবং পাপের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি নষ্টা মেয়ে। মার্টিন তৎক্ষণাৎ একটা পরিকল্পনা ঠিক করে নেয় এবং বারবারাকে অবহিত করে। পরিকল্পনাটা আগামী রাতে বাস্তবায়ন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখে।

পরবর্তী রাত। আজ যে স্থানটায় অবস্থান গ্রহণ করা হলো, এটি মরুভূমির এক ভয়ঙ্কর এলাকা। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্ময়কর ও অভিনব আকৃতির অসংখ্য টিলা দাঁড়িয়ে আছে। কোনটি দেখতে স্তম্ভ ও মিনারের ন্যায়। কোনটি আঁকাবাঁকা দেয়ালের মতো। কোনটি যেনো আস্ত একটা প্রাণী। টিলাগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। পানি ও গাছ-গাছালির চিহ্নও নেই। রাতের বেলা টিলাগুলোকে মনে হচ্ছে যেনো কতগুলো দানব দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসার পর কাফেলা এই ভূখণ্ডে এসে যাত্রাবিরতি নেয়। মার্টিন অন্ধকারে নিজের ঘোড়াটা নিজ তাঁবুর সঙ্গে বেঁধে যিনটা খুলে কাছেই এক স্থানে রেখে দেয়।

ইসহাকের তাঁবুটা মার্টিনের তাঁবুর কাছে স্থাপন করা হয়েছে। দলনেতা এখন ইসহাক সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। রাতে উট-ঘোড়ার আশপাশে রক্ষীরা ঘুমায়। ইসহাক ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যাবে এমন আশঙ্কা নেই। ঘোড়ার পিঠে যিন কষে পালাতে গেলে কেউ না কেউ টের পাবেই। কাফেলার সদস্যরা সকলেই ক্লান্ত। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে ইসহাকও। মধ্যরাতে গায়ে কারো আলতো পরশ অনুভব করে জেগে ওঠে ইসহাক। ফিসফিস কণ্ঠ শুনতে পায়—

'ওঠো, পাশের তাঁবুর সঙ্গে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই যিন পড়ে আছে। দেরি করো না, পালাও।'

'কে তুমি?'

'বারবারা'– মেয়েটি উত্তর দেয়– 'তোমার প্রতি আমার এই সহানুভূতি কেন সে প্রশ্ন করো না। আমিই তোমাকে বলে দিয়েছিলাম, আমরা খৃষ্টান গোয়েন্দা। তুমি সময় নষ্ট করো না। সকলে ঘুমিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ওঠো। যে তাঁবুর সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা আছে, তার ডানদিকে যাবে। সামনে পথ পরিষ্কার। আমি আমার তাঁবুতে চলে যাচ্ছি।'

বারবারা নিজ তাঁবুতে চলে যায়। ধনুক ও তূনীরটা হাতে নিয়ে আবার বেরিয়ে যায়। বারবারা সেই পথের এক ধারে বসে যায়, সে পথে ইসহাককে পালাতে বলেছিলো।

ইসহাক দ্রুততার সাথে যিন বেঁধে ঘোড়াটা খুলে পা টিপে টিপে এগুতে শুরু করে। বালুর কারণে ঘোড়ার পায়ের কোন শব্দ হচ্ছে না। কাফেলার সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ইসহাক তাঁবু এলাকা থেকে বেশ দূরে গিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয় এবং কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে এবার জোরে ঘোড়া হাঁকায়। হঠাৎ মরুর শীতল রাতের নীরবতা ভেদ করে একটা শাঁ শব্দ কানে ঢুকে ইসহাকের। সেই সঙ্গে একটা তীর এসে গেঁথে যায় তার পিঠে। পরক্ষণে এসে বিদ্ধ হয় আরেকটা তীর। সঙ্গে নারী কণ্ঠের চীৎকার– 'পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে, ওঠো, জাগো, বন্দি পালিয়ে গেছে।'

সবাই ধড়মড় করে জেগে ওঠে। বারবারা চীৎকার করে বেড়াচ্ছে- 'বন্দি পালিয়ে গেছে।' তার হাতে ধনুক। তাড়াতাড়ি করে ঘোড়া ছুটানো হয়। বেশি দূর যেতে হলো না। ইসহাক দু'টি তীর পিঠে নিয়ে পড়ে আছে। ঘোড়াটা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তীর নিকট থেকে ছোঁড়া হয়েছে। দেহের গভীরে গেঁথে আছে তীর দু'টি। তবে এখনো হুঁশ আছে ইসহাকের। তাকে তুলে নেয়া হলো। দলনেতা তাকে জিজ্ঞেস করে– 'পলায়নে কি তোমাকে কেউ সহায়তা করেছিলো?' ইসহাক বললো– 'না, আমি ঘোড়া আর যিন দেখতে পেলাম। সকলে ঘুমিয়ে ছিলো। আমি পালিয়ে এলাম।' এটুকু বলার পরই ইসহাক চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। আর তার জ্ঞান ফিরে আসেনি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা ইসহাক তুর্কী শহীদ হয়ে যায়।

'আমি লোকটাকে ঘোড়ায় আরোহণ করতে ও পালাতে দেখি'– বারবারা

বললো– 'ঘটনাক্রমে আমার তাঁবুতে ধনুক ও তূনীর ছিলো। আমি তূনীর-ধনুক তুলে নিয়ে তার পিছনে ছুটে গেলাম। পরপর দু'টি তীর ছুঁড়লাম। তীরটি ছুটেই গেঁথে যায়। অন্যথায় লোকটা পালিয়ে গিয়েছিলো।'

'আজই এমন কী ঘটলো যে, তোমার তাঁবুতে তীর-ধনুক ছিলো?' মেরিনা বারবারাকে জিজ্ঞেস করে।

'আর মার্টিন! এই ঘোড়াটা তোমার ছিলো'– দলনেতা বললো– 'এটা কোথায় ছিলো? এর যিন কোথায় ছিলো?'

'ঘোড়াটা বন্দির তাঁবুর নিকট বাঁধা ছিলো।' এক রক্ষী উত্তর দেয়।

'তোমরা আমার এ কৃতিত্বটা মাটি করে দেয়ার চেষ্টা করছো।' বারবারা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– 'লোকটা কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে কায়রো যাচ্ছিলো। আমি তাকে প্রতিহত করেছি। তাকে নয়– আমি বরং আমাদের স্বার্থ পরিপন্থী একটি গোপন তথ্য কায়রো পৌছানো ঠেকিয়েছি।'

ঘটনাটা মূলত একটা নাটক। মেরিনার শক্রতা উদ্ধারের লক্ষ্যে বারবারার পক্ষে প্রস্তুত করে দেয়া মার্টিনের ষড়যন্ত্র। মার্টিন এভাবেই উপকার করে বারবারাকে পেতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাদের দলনেতা একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। সে বারবারা ও মার্টিনের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো– 'মার্টিন! এ পেশায় আমি তোমার অনেক আগে এসেছি। বৈরুতে পৌছানোর আগে আগে যথার্থ একটা উত্তর ঠিক করে ফেলো।"

ঘটনাটা লোকগুলোর ব্যক্তিগত শক্রতার ও বন্ধুত্বের রাজনীতি। যার শিকার হতে হলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একজন মূল্যবান গুপ্তচরকে।

দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে সুলতান আইউবীর বাহিনী। অর্ধেক পথ অতিক্রম করে তারা এখন যে অঞ্চলে এসে উপনীত হয়েছে, সেটি খৃস্টান কবলিত এলাকা। বাহিনীর সকল সৈন্যের আকৃতি-গঠন এখন একই রকম। ধূলি-বালির স্তর জমে জমে এখন আর কাউকে চেনা যাচ্ছে না।

এখন মে মাস। মরুভূমি পোড়ানো লোহার ন্যায় উত্তপ্ত। সকলের মুখ-মাথা কাপড়ে আবৃত। অনুমতি ছাড়া পানি পান করতে পারছে না কেউ। বাহিনীর কোন বিন্যাস নেই। উট-ঘোড়ার আরোহীরা পদাতিকদের পালাক্রমে সওয়ার করিয়ে পথ চলছে। আকাশটা জ্বলছে। আর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' মুখরিত ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কয়েকজন সৈনিক মিলে সম্মিলিত কণ্ঠে আবেগময় গান গাইছে আর

তার তালে তালে সুর লহরীতে মুগ্ধ হয়ে ফৌজ এগিয়ে চলছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ফৌজের মধ্যস্থলে অবস্থান নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি নিজের জন্য পানি পান নিষিদ্ধ করে রেখেছেন। হঠাৎ তিনি ঘোড়ার গতি পরিবর্তন করে অন্য একদিকে ছুটে যান। তাঁর হাইকমান্ডের সালার ও অপরাপর আমলাগণ– যাদের মধ্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন দূতও ছিলো– তার পেছনে চলে যান। সম্মুখেই সেই জায়গা, যেখানে ইসহাক তুর্কি শহীদ হয়েছিলো। ভয়ানক আকৃতির কতগুলো টিলা। সুলতান আইউবী টিলাগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে যান এবং গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার সারেমকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'দোস্ত! এখান থেকেই তোমার কাজ শুরু হচ্ছে। ইউনিটগুলোকে ছড়িয়ে দাও। প্রতিটি বাহিনী অন্য অপর বাহিনী থেকে দূরে থাকবে। প্রথম বাহিনীটিকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও।'

'আর বাকি ফৌজ এভাবেই চলতে থাকবে'– সারেম মিসরীর চলে যাওয়ার পর সুলতান আইউবী অন্যদের বললেন– 'যে কোন পরিস্থিতিতে ফৌজ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে। আমরা শত্রুর অঞ্চলে এসে পড়েছি।'

জরুরী দিক-নির্দেশনা প্রদান করে সুলতান আইউবী ধীরে ধীরে ঘোড়া চালাতে শুরু করেন। হঠাৎ এক ধারে তিনি এমন কিছু চিহ্ন দেখতে পান, যাতে প্রমাণিত হয় এখানে কোন পথিক অবস্থান নিয়েছিলো। সেখানেই একটি লাশ পড়ে আছে দেখা গেলো, যার অধিকাংশ বালিতে ঢেকে আছে। সুলতান আইউবী দাঁড়িয়ে যান। লাশটা অক্ষত নেই। হাড়গুলো দেখা যাচ্ছে শুধু। একজন কঙ্কলটা সোজা করে দেখায়। পিঠে দু'টি তীর গেঁথে আছে। চেহারার গোশত শুকিয়ে গেছে।

'বাদ দাও এসব'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কোন কাফেলার কেউ নিহত হয়েছে মনে হয়। মরুভূমিতে এসে মানুষ পাগল হয়ে যায়।'

সুলতান আইউবী জানেন না, এই কঙ্কাল তাঁরই একজন মূল্যবান গোয়েন্দা ইসহাক তুর্কির, যে বলতে যাচ্ছিলো, আপনি বৈরুত যাবেন না। ওখানে খৃস্টানরা যেভাবে তাদের সৈন্যদের ছড়িয়ে রেখেছে, তার নকশা বক্ষে এঁকে মিসর যাচ্ছিলো ইসহাক। এখন সুলতান আইউবীর সঙ্গে ইসহাকের সাক্ষাৎ হয়েছে বটে; কিন্তু তার কংকাল সুলতানকে কিছুই জানাতে পারলো না।

সুলতান আইউবীর গেরিলা বাহিনীটি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, তারা

অগ্রসরমান মূল বাহিনীর উভয় পার্শ্বে দু'তিন মাইল দূর পর্যন্ত চলে গেছে। কয়েকটি ইউনিট চলে গেছে পেছনে। বৈরুত থেকে অনেক দূরেই তাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তারা ভয়ানক অঞ্চলটা অতিক্রম করে চলে গেছে।

ফৌজ এগিয়ে চলছে।

মধ্যরাতে ছাউনি ফেলার আদেশ জারি হয়। বাহিনী দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু গেরিলা ইউনিটগুলো সক্রিয় ও তৎপর থাকে। তাদের জন্য নির্দেশ হলো, সন্দেহভাজন কাউকে দেখা গেলে এবং সে পালাবার চেষ্টা করলে মেরে ফেলবে। কোন কাফেলার দেখা পেলে তাদেরও গতিরোধ করে তল্লাশি নেবে।

বাহিনী এগিয়ে চলছে ও যাত্রাবিরতি দিচ্ছে। সূর্য উদিত হচ্ছে এবং মুজাহিদ বহরটিকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে অস্ত যাচ্ছে। সুলতান আইউবীর নিকট প্রথম সংবাদ আসে, তাঁর একটি গেরিলা ইউনিট খৃস্টানদের একটি সীমান্ত চৌকির উপর হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। মরু অঞ্চল শেষ হতে চলেছে। গাছ-গাছালি চোখে পড়তে শুরু করেছে। কোথাও সবুজের সমারোহ দেখা যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম-জনবসতিও চোখে পড়ছে।

বৈরুতে বল্ডউইন তার বিভিন্ন সামরিক শাখা থেকে রিপোর্ট গ্রহণ করছেন। তার নিকট সংবাদ এখনো সেটিই যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বৈরুত অবরোধ করবেন। তিনি সুলতানকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করে রেখেছেন বটে; কিন্তু পরবর্তী আর কোন সংবাদ পাননি, সুলতান আইউবী কায়রো থেকে রওনা হয়েছেন কিনা।

এতোক্ষণে খৃস্টান গোয়েন্দা কাফেলাটিও বৈরুত পৌঁছে গেছে। কিন্তু তারাও সম্রাট বল্ডউইনকে কোন সংবাদ জানাতে পারেনি। বল্ডউইন তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশ-পঁচিশজনের একটি অশ্বারোহী দলকে সম্মুখে প্রেরণ করেছিলেন। তারাও ফেরত আসেনি। তারা ফেরতে আসতে পারবেও না।

বল্ডউইনের অশ্বারোহী বাহিনীটি অনেক দূর চলে গিয়েছিলো। তারা দূর থেকে এক স্থানে এমন ধারায় ধূলি উড়তে দেখে, যা কোন কাফেলার হতে পারে না। মাটি থেকে উত্থিত এই ধূলিমেঘ কোন সৈন্য বাহিনীর ছাড়া অন্য কারো হতে পারে না। তারা টিলার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। কমান্ডার একটি টিলার উপর উঠে দেখতে শুরু করে। হঠাৎ একদিক থেকে একটি তীর এসে তার ঘাড়ে বিদ্ধ হয়। অন্যান্য আরোহীরা নীচে ছিলো। হঠাৎ তাদের উপরও তীরবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। তাদের কয়েকজন পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সারেম মিসরীর গেরিলারা

তাদেরকে জীবিত পালাতে দিলো না। সব ক'জনকে খুন করে তাদের অস্ত্র ও ঘোড়াগুলো দখল করে নেয়।

কোন সংবাদ না পাওয়া সত্ত্বেও বল্ডউইন ও তার প্রধান সেনাপতি নিশ্চিন্ত। তারা বৈরুতকে অবরোধ থেকে রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাদের চিন্তামুক্ত হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, সুলতান আইউবী এখনো কায়রো থেকে রওনা হননি এবং যুদ্ধ এখনো বহুদূর। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সুলতান আইউবী যতোই সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন, গেরিলাদের আক্রমণ ও তৎপরতার সংবাদ ততোই বেশি আসছে। এখন তো এমন সংবাদও আসতে শুরু করেছে যে, এতো মাইল দূরে দুশমনের একটি বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে এতোজন গেরিলা শহীদ ও এতোজন আহত হয়েছে। এ ধরনের প্রতিটি সংবাদে সুলতান আইউবী একই উত্তর দিচ্ছেন– 'শহীদদেরকে কোথাও দাফন করে রাখো আর আহতদের পেছনে পাঠিয়ে দাও।'

সুলতান আইউবী তার বাহিনীকে এমন অঞ্চল দিয়ে নিরাপদে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে স্থানে স্থানে শত্রুর উপস্থিতি বিদ্যমান। এটা তার পরম সামরিক যোগ্যতার প্রমাণ। তার স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের গেরিলা ইউনিট আক্রমণ চালাতে চালাতে এবং শত্রুর শক্তি খর্ব ও ব্যর্থ করতে করতে এগিয়ে চলছে। কোথাও গেরিলা আক্রমণ শেষ পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধের রূপ ধারণ করছে। কিন্তু গেরিলারা একস্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে না। এই রক্তপাত সুলতান আইউবীর বাহিনী থেকে দূরে দূরে ঘটে চলছে।

হুসামুদ্দীন লুলুর নৌ-বহর ইসকান্দারিয়ায় প্রস্তুত অপেক্ষমান। প্রস্তুত নৌ-সেনারাও। হুসামুদ্দীন সুলতান আইউবীর দূরত্ব ও গতি অনুমান করে রেখেছেন। একদিন তিনি বাহিনীকে জাহাজে আরোহণ করার আদেশ প্রদান করেন এবং রাতের বেলা জাহাজের নোঙ্গর তুলে পাল উড়িয়ে দেন। নদীর বুক চিরে জাহাজ এগুতে শুরু করে। মুক্ত সমুদ্রে গিয়ে হুসামুদ্দীন জাহাজগুলোকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেন। তিনি একজন সুদক্ষ নৌ-প্রধান। তার জাহাজে করে ফৌজ যাচ্ছে, তার সালার ও নায়েব সালারগণ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা অন্ধকারে যাচ্ছে না। খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তারা মৎস্য শিকারীর বেশে ছোট ছোট নৌকায় করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু সৈনিককে আগেই পাঠিছে রেখেছে।

কয়েকদিন ও কয়েক রাতের পথ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। দিগন্তে বৈরুত চোখে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু এখনো কোন নৌকা ফিরে আসেনি। হুসামুদ্দীন জাহাজের গতি থামিয়ে দেন এবং খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য অপর একটি নৌকা নামিয়ে দেন। রাতে তার দণ্ডায়মান জাহাজের সন্নিকটে সমুদ্র থেকে এক ব্যক্তি চীৎকার করে বললো– 'রশি ফেলো, রশি ফেলো।' রশি ছুঁড়ে ফেলা হলো। রশি বেয়ে এক নৌ-সেনা উপরে উঠে আসে। লোকটা অর্ধমৃত। সে বললো, খৃস্টানদের একটি নৌকা তাদের নৌকার গতিরোধ করেছিলো। তাতে সৈন্য ছিলো। উভয়পক্ষে তীর বিনিময় হয়। আমি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমার সঙ্গীরা ধরা কিংবা মারা পড়েছে। আমি সংবাদ জানাতে এসেছি যে, দুশমন সজাগ রয়েছে।

এই ঘটনায় বুঝা গেলো, খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য প্রথমে যে লোকদের প্রেরণ করা হয়েছিলো, তারা ধরা পড়েছে এবং সম্ভবত তাদের মাধ্যমে দুশমন নৌ-বহর আগমনের তথ্যও পেয়ে গেছে।

হুসামুদ্দীন লুলুর নৌ-বহর আর বৈরুতের মাঝে এখন দূরত্ব এতোটুকু যে, সূর্যাস্তের পর পর পাল তুললে জাহাজ মধ্যরাত নাগাদ কূলে ভিড়তে পারবে। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, খৃস্টানরা অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করার জন্য কূলে মিনজানিক স্থাপন করে রাখতে পারে। তা-ই যদি হয়, তাহলে জাহাজগুলোকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এই ভয়ে পিছিয়ে থাকাও উচিত হবে না। সুলতান আইউবীর সমুদ্রের দিক থেকে সাহায্যের খুবই প্রয়োজন। এমন সময়ে তারা একটা নৌকা দেখতে পায়। নৌকাটা তাদের বহরের। তার সৈনিকরা সমুদ্র থেকে দু'জন খৃস্টান সৈন্যকে ধরে নিয়ে এসেছে। খৃস্টানদের যে নৌকাটি হুসামুদ্দীনের বহরের নৌকার উপর আক্রমণ করেছিলো, এরা তার মধ্যে ছিলো। তারা আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর মুসলিম সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে যায়। প্রথমে কোন তথ্য দিতে সম্মত না হলেও হাত-পা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেয়ার হুমকি দেয়া হলে তারা তথ্য দেয়, কূলে বল্ডউইনের সৈন্যরা ওঁৎ পেতে আছে এবং বহরে আগুন ধরানোর জন্য মিনজানিক প্রস্তুত রয়েছে। এই ধৃত সৈন্যদের থেকে আরো তথ্য পাওয়া গেলো, বৈরুতের ফৌজ ভেতরে কম এবং বাইরে শহর থেকে দূরে দূরে বেশি।

সংবাদটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সুলতান আইউবীর নৌ-বাহিনী প্রধান

হুসামুদ্দীন রীতিমতো ভাবনায় ডুবে যান। তারা পরস্পর মতবিনিময় করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ফিরিঙ্গিরা আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে গেছে। বিষয়টা সুলতান জানেন কিনা কে জানে। সিদ্ধান্ত হলো, সুলতানকে সংবাদটা পৌঁছানো হবে। এ সময় তার বৈরুতের কাছাকাছি থাকার কথা।

তৎক্ষণাৎ জাহাজ থেকে দু'টি নৌকা নামানো হলো। দু'জন দূতকে দু'টি ঘোড়া দিয়ে তীরে কোথায় অবতরণ করবে এবং কোন্দিকে যাবে বলে দেয়া হলো। দূতরা সুলতান আইউবীকে সংবাদ জানানোর জন্য রওনা হয়ে যায়।

দূতরা রাতারাতি গন্তব্যে পৌঁছে যায়। কিন্তু ততোক্ষণে সুলতান আইউবী ফিরিঙ্গিদের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছেন। তিনি বৈরুত অবরোধ করেছিলেন। স্থলের সবদিকে সৈন্য ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। রিজার্ভ ফোর্সের একটি ইউনিটকেও জবাবি আক্রমণের লক্ষ্যে ব্যবহার করে ফেলেছেন সুলতান। ফিরিঙ্গিরা কঠোরভাবে তার মোকাবেলা করে। পরদিন অবরোধের অপর একটি অংশের উপর আক্রমণ হয়। সুলতান আইউবী তাদের বিরুদ্ধেও রিজার্ভ ফোর্স প্রেরণ করেন। এবার তিনি ভাবনায় পড়ে যান, আমি তো রিজার্ভ ফোর্স ব্যবহার করা ছাড়াই যুদ্ধ জয় করে নিতাম। কিন্তু এখানে তো রিজার্ভ ফোর্সের অর্ধেক শক্তি শুরুতেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। তিনি অবরোধকে দুর্বল করতে চাচ্ছিলেন না। এবার তার মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করে।

সুলতান আইউবীর অনুসন্ধান ও গেরিলা ব্যবস্থাপনা ছিলো খুবই উন্নত। তিনি সংবাদ পেতে শুরু করেন, পেছনে সবদিকে শত্রুর উপস্থিতি বিদ্যমান। একটি গেরিলা ইউনিটের একজন মাত্র সৈনিক রক্তরঞ্জিত অবস্থায় ফিরে এসেছে। লোকটি মাত্র এটুকু বলে শহীদ হয়ে গেছে যে, তার পুরো বাহিনী ফিরিঙ্গিদের বেষ্টনীতে এসে পড়েছিলো। সে ছাড়া আর একজনও জীবন রক্ষা করতে পারেনি এবং আমাদের এই অবরোধ ফিরিঙ্গিদের বিপুলসংখ্যক সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

তার পরক্ষণেই নৌ-দূতরা এসে পৌঁছে। তারা সুলতান আইউবীকে সংবাদ জানায় এবং হুসামুদ্দীনের জন্য নির্দেশ কামনা করে।

'খৃস্টানদেরকে আমি এরূপ প্রস্তুত অবস্থায় কখনো দেখিনি'– সুলতান আইউবী তার হাইকমান্ডের সালার প্রমুখদের বললেন– 'স্পষ্ট বুঝতে

পারছি, তারা সময়ের আগেই সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলো যে, আমরা বৈরুত অবরোধ করতে যাচ্ছি। এখন আমরা নিজেরাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছি। ঠিকানা থেকে এতো দূরে এসে পরাজিত যুদ্ধ লড়া যায় না।' তিনি হুসামুদ্দীনের দূতদেরকে বললেন– 'তোমরা হুসামুদ্দীনকে বহর নিয়ে ফিরে যেতে এবং তার সৈন্যদেরকে ইসকান্দারিয়া নেমে দামেশ্‌ক রওনা হতে বলো।'

দূতরা চলে গেলে সুলতান আইউবী মসুল অভিমুখে পিছপা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু পিছপা হওয়াও সহজ নয়। এ কাজেও গেরিলাদের ব্যবহার করা হয়। রাতে বাহিনীকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে এনে বের করে দেয়া হলো। কিছু সংঘাতের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু গেরিলা ও পশ্চাৎ বাহিনী জীবন ও রক্তের নজরানা দিয়ে বাহিনীকে সেখান থেকে বের করে আনে। ফিরিঙ্গিরা ধাওয়া করেনি।

মসুলের পথে সুলতান আইউবীর মসুল থেকে আসা এক গোয়েন্দার সাক্ষাৎ ঘটে। সে ইসহাক তুর্কির রওনা হওয়া এবং মসুলের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীনের পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি তথ্য প্রদান করে। সুলতান ক্ষোভে লাল হয়ে যান। তিনি মসুল অবরোধ করার আদেশ জারি করেন।

কাজী বাহউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন– সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ১১৮২ সালের ১০ নবেম্বর মোতাবেক ৫৭৮ হিজরীর ১১ রজব বুধবার মসুলের নিকটে গিয়ে পৌঁছেন। আমি তখন মসুল ছিলাম। ইয্‌যুদ্দীন আমাকে বললেন, আপনি গিয়ে খলীফার নিকট থেকে সাহায্য নিন। আমি দজলার কোল ঘেঁষে ঘেঁষে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মাত্র দু'দিন দু'ঘণ্টায় বাগদাদ পৌঁছে যাই। খলীফা আমাকে বললেন, তিনি শাইখুল উলামাকে বলে মসুল ও সুলতান আইউবীর মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেবেন। মসুলের গবর্নর আজারবাইজানের শাসনকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি যে শর্ত আরোপ করেন, তার চেয়ে ভালো ছিলো ইয্‌যুদ্দীন সুলতান আইউবীর হাতে অস্ত্র সমর্পণ করবেন।'

সন্ধি-সমঝোতার আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যায়। ১১৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর মোতাবেক ১৬ শাবান ৫৭৮ হিজরী সুলতান আইউবী মসুলের অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন এবং নাসীবা নামক স্থানে ফৌজকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ছাউনি স্থাপনের নির্দেশ দেন।

সারা
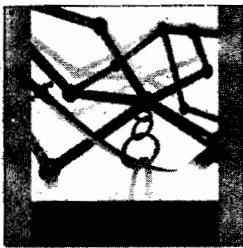
'বৈরুতের অবরোধ খৃস্টানরা নয়, আমার ঈমান নিলামকারী ভাইয়েরা ব্যর্থ করেছে'— সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের বললেন— 'আমি পারস্পরিক খুনাখুনি, রক্তারক্তি থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সম্ভব মনে হচ্ছে না।'

বৈরুত অবরোধের ব্যর্থতা ছিলো সুলতান আইউবীর দ্বিতীয় পরাজয়। এই ব্যর্থতায় তিনি কিছুই হারাননি বটে, তবে অর্জনও হয়নি কিছুই। এ কারণে এই ব্যর্থতাকে তিনি পরাজয় বলেই ধরে নেন। তিনি না হোন, তার ইন্টেলিজেন্স এখানে অবশ্যই পরাজিত হয়েছে। বৈরুতের খৃস্টান বাহিনী সময়ের আগেই তথ্য পেয়ে গিয়েছিলো, সুলতান আইউবী বৈরুত অবরোধ করতে আসছেন। খৃস্টানরা এ সংবাদ পেয়েছে কায়রো থেকে। অথচ সুলতান তাঁর হাইকমান্ডের সালারগণ ব্যতীত কাউকে তাঁর পরিকল্পনা জানতে দেননি।

'একে আপনি পরাজয় বলবেন না'— সুলতান আইউবীর হতাশা দেখে এক সালার বললেন— 'বৈরুত যেখানে ছিলো সেখানেই আছে এবং সেখানেই থাকবে। আমরা নগরীটা পুনরায় আক্রমণ করবো।'

'এতো বড় একটা শিকার আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেছে'— সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন— 'আমি নগরীটা অবরোধ এবং দখল করতে এসেছিলাম। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। আমি নিজেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়লাম এবং অবরোধ প্রত্যাহার করে পেছনে সরে আসতে বাধ্য হলাম। এটা পরাজয় নয় তো কী? আমাদেরকে মেনে নেয়া উচিত এটা পরাজয়। আমার সালার-উপদেষ্টাদের মধ্যেও গাদ্দার আছে।'

তাঁবুতে নীরবতা নেমে আসে। কারো মুখে টু-শব্দটি নেই। সে সময়ে সুলতান আইউবী নাসীবা নামক স্থানে সেনা ছাউনিতে অবস্থান করছিলেন। বহু দিন কেটে গেছে। বাহিনী অনেক ক্লান্ত। বহু জখম ও আছে। সুলতান তাঁর এই বাহিনীকে কায়রো থেকে বৈরুতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিয়ে

এসেছিলেন। বাহিনী কয়েক মাসের পথ কয়েক দিনে অতিক্রম করে এসেছে। গন্তব্যে এসে পৌঁছানোর পরপরই খৃস্টানদের অবরোধ থেকে বের হওয়ার জন্য তাদেরকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লড়তে এবং পরক্ষণেই দ্রুতগতিতে পিছনে সরে আসতে হয়েছিলো। বাহিনীকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দেয়ার জন্য সুলতান আইউবী নাসীবা নামক স্থানে ছাউনি স্থাপনের নির্দেশ দেন। কিন্তু বিশ্রাম ছিলো শুধু বাহিনীর জন্য। সুলতানের নিজের কোন বিশ্রাম নেই। চোখে ঘুমটি পর্যন্ত নেই তাঁর। দিনে হয় তাঁবুতে পায়চারি করছেন কিংবা বাইরে বের হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছেন। সালারদের সাথেও তেমন কথা বলছেন না। ঠিক এমন এক অবস্থায় এক সালার তাকে বললেন, আপনি একে পরাজয় বলবেন না। সুলতানের উত্তর শুনে সালার নিশ্চুপ হয়ে যান। সুলতান তাঁবুতে পায়চারি করতে থাকেন। সেখানে আরো একজন সালার ছিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে নীরব থাকেন। সুলতান আইউবীর মেজাজে রাগ বলতে ছিলো না। তথাপি সালারগণ তার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেতেন।

'তোমরা দু'জনে কী চিন্তা করছো?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

'আমি ভাবছি, আপনি যদি এভাবে হতাশা ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকেন, তাহলে আপনার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত আরো ক্ষতিকর হতে পারে'– এক সালার বললেন– 'রামাল্লার পরাজয়ের সময়ও আমি আপনাকে এই অবস্থায় দেখিনি। আপনি ঠাণ্ডা হোন এবং এই আবেগময় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন।'

'আর আমি ভাবছি'– অপর সালার বললেন– 'কাফেররা আমাদের মূলে ঢুকে পড়েছে। এই মুহূর্তে আমরা যে ভূখণ্ডে অবস্থান করছি, এটি আমাদেরই ভূমি। আমাদের যুদ্ধ খৃস্টানদের সঙ্গে। আর আমাদের লক্ষ্য ফিলিস্তীনের স্বাধীনতা। অথচ মুসলিম আমীরদের একজনও আমাদের সঙ্গে আসেনি। ইয্যুদ্দীন-ইমাদুদ্দীন কোথায়? তারা কি আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়নি যে, প্রয়োজনের সময় তারা আমাদেরকে সৈন্য দেবে? তাদের এই আচরণ প্রমাণ করে, এখনো তারা খৃস্টানদের হাতের পুতুল। তো আমরা কি এভাবেই পরস্পর লড়াই করতে থাকবো?'

সুলতান আইউবী তাঁবুতে পায়চারি করছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে যান। আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আমার রাসূলের উম্মতের পতন শুরু হয়ে গেছে। মুসলমান যখন বিজাতির অনুসরণ শুরু

করে, তার পরিণতি এটাই হয়, আমরা এখন যা প্রত্যক্ষ করছি ও ভুগছি। ইহুদী-খৃস্টানরা মুসলমানদেরকে তাদের গোলাম বানানোর জন্য মানব স্বভাবের সবচেয়ে বড় দুর্বলতাটাকে কাজে লাগায়। তা হচ্ছে লোভ। ক্ষমতার লোভ, রাজা-রাজপুত্র হওয়ার লোভ এবং আমি তুলার ন্যায় নরম পালিচার উপর দিয়ে হাঁটবো আর সাধারণ মানুষ খালি পায়ে আমার সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকবে এই লোভ। এসব লোভ যখন মানুষের অন্তরে ঢুকে পড়ে, তখন হৃদয় থেকে ঈমান চলে যায়। বিবেকের উপর এমন আবরণ পড়ে যায় যে, তার কাছে জাতীয় চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু থাকে না। এমন মানুষ অর্থ, ক্ষমতা আর বিলাসিতা ছাড়া কিছুই বুঝে না। একজন মানুষ যখন এই চরিত্র ধারণ করে, তখন সে নিজ ধর্ম ও দেশ-জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকে গৌরবজনক চরিত্র মনে করে। খৃস্টানরা আমাদের অধিকাংশ আমীরকে এই স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তারা তাদের সভ্যতার বেহায়াপনাকে মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের সভ্যতা যখন বদলে যায়, তখন ধর্ম একটা দুর্বল খোলসে পরিণত হয়, যা খুলে ছুঁড়েও ফেলা যায় এবং জাতিকে ধোঁকা দেয়ার জন্য গায়ে জড়িয়েও নেয়া যায়।'

উভয় সালার চুপচাপ সুলতান আইউবীর বক্তব্য শুনছেন। সুলতান থেমে থেমে বলছিলেন। এবার থেমে যান। আবার গভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন– ' তোমরা বুঝতে পারছো না, আমি কর্মক্ষেত্রের পুরুষ, এখন কিনা তাঁবুতে দাঁড়িয়ে নারীর ন্যায় কথা বলছি। এটিও আমার পরাজয়। এই মুহূর্তে আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাস থাকার কথা ছিলো। আমার কপাল মসজিদে আকসায় সেজদা করতে ছটফট করছে। যেসব মুজাহিদ ফিলিস্তীনের মর্যাদা ও আযাদীর জন্য জীবন ত্যাগ করেছে, আমাকে তাদের রক্তের বদলা নিতে হবে।'

সুলতান আইউবীর কণ্ঠে আক্রোশ চড়ে গেছে। তিনি পায়চারি করতে করতে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন– 'তোমরা কি সেই শিশুদের মুখ দেখাতে পারবে, যাদেরকে আমার নির্দেশ ও প্রত্যয় এতীম করেছে? তোমরা কি সেই নারীদের সম্মুখে গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে, যাদের স্বামীরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে আমাদের সঙ্গে এসেছিলো এবং তাদের রক্তাক্ত দেহ ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়েছে? তোমরা সেই সুদর্শন যুবকদের কীভাবে ভুলতে পারবে, যারা আমাদের থেকে বহু দূর দুমশনের অঞ্চলে গিয়ে শহীদ

হয়েছে? আমি তো তাদের মায়েদের সম্মুখে যেতে ভয় পাই। ভয়টা এই জন্য যে, যদি কেউ বলে বসে, হয় আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও, নতুবা আমাকে প্রথম কেবলায় নিয়ে চলো। ওখানে গিয়ে আমি আমার পুত্রের শাহাদাতের শুকরিয়া নামায আদায় করবো। তখন আমি সেই মাকে কী জবাব দেবো?'

'শহীদদের রক্ত বৃথা যাবে না মাননীয় সুলতান'– কণ্ঠটা কমান্ডো বাহিনীর অধিনায়ক সারেম মিসরীর, যিনি সুলতান আইউবীর তাঁবুর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ভেতরের কথোপকথন শুনছিলেন।

'কোন শহীদের মা নিজ পুত্রের রক্তের হিসাব চাইবেন না। রাসূলের কালেমা পাঠকারী মায়েদের দুধ যমযমের পানির চেয়ে পবিত্র ও মর্যাদাবান। সেই দুধে প্রতিপালিত পুত্ররা আপনার নির্দেশে নয়– আল্লাহর আদেশে যুদ্ধ করছে। তাদের রক্তের দায় আপনি নিজ কাঁধে তুলে নেবেন না। আপনি গাদ্দারদের রক্তের কথা বলুন। আমাদের তারবারী গাদ্দারদের রক্তের পিয়াসী।'

'তুমি আমার মনোবলে জীবনদান করেছো সারেম'– সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন– 'আমার এই দুই বন্ধুও আমাকে বলছিলো, আপনার হতাশ ও আবেগপ্রবণ হওয়ার প্রয়োজন নেই।'

'কোনই প্রয়োজন নেই'– সারেম মিসরী বললেন– 'পরাজয় পরাজয়ই। কিন্তু স্থায়ী নয়। আমরা এই পরাজয়কে বিজয়ে পরিবর্তন করে ফেলতে পারি এবং তা করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ।'

'বিষয়টা যদি রণাঙ্গনের হতো, তাহলে একটি বাহু কাটা গেলেও আমি নিরাশ ও পেরেশান হতাম না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'সমস্যা তো হলো দুশমন মাটির নীচে চলে গেছে। ইহুদী-খৃস্টানরা আমাদের জাতির মাঝে এমন সব বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার করছে, যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও যাদুময়। দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। সৈনিক ও সাধারণ জনগণ এসব প্রভাব গ্রহণ করে না। এই বিষ বরণ করে নিচ্ছে এমন গুটিতক মানুষ, জাতির উপর যাদের প্রভাব বিদ্যমান। এরা হচ্ছে আমীর ও শাসক গোষ্ঠী। কতিপয় ধর্মীয় নেতাও এদের অন্তর্ভুক্ত। আছে কিছু সালারও, যারা প্রজাতন্ত্রের শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এরা ঈমান নিলামকারীদের দল, যারা সহজ-সরল মানুষগুলোকে ধর্মের ধোঁকা দিয়ে তাদের মাঝে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করছে এবং তাদের মুসলমান

ভাইদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে এবং নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। বিজাতিরা এ জাতীয় মুসলিম আমীর ও শাসকদেরকে তাদের অনুগত বানিয়ে নিচ্ছে এবং তাদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী কাজ করাচ্ছে। এরা সাধারণ মানুষকে ধর্মের ধোঁকা দিয়ে নিজেদের চরিত্রটাকে আড়াল করে রাখছে।'

'কিন্তু আমরা আলেম নই'– এক সালার বললেন– 'আমরা মসজিদের খতিব-ইমাম নই যে তরবারী ফেলে দিয়ে আমরা জনসাধারণকে ওয়াজ করে বেড়াবো। আমাদেরকে এই সমস্যার সমাধান তরবারির মাধ্যমেই করতে হবে। এই পাথরগুলোকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে হবে।'

'এরা কুরআন অস্বীকারকারী'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কুরআনের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু ভেবো না। তাদের কথা শোনো না। তোমরা জানো না, তাদের অন্তর আমাদের বিরুদ্ধে পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ।'

'এরা নামের মুসলমান'– সারেম মিসরী বললেন– 'কুরআনের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

'এই পরিস্থিতি অত্যন্ত ক্ষতিকর যে, তারা কুরআনও হাতে তুলে রেখেছে, আবার কাফেরদের ইশারায়ও নাচছে'– সুলতান আইউবী বললেন- 'জাতি সবসময় এমন নেতাদের হাতেই প্রতারিত হয়েছে, যাদের হাতে কুরআন আর অন্তরে ক্রুশ। এরা আযানের শব্দ শুনে নিশ্চুপ হয়ে যায়। কিন্তু তাদের হৃদয়ে বাজে গীর্জার ঘণ্টা। জাতি তাদের আসল রূপ দেখতে পায় না, তাদের হৃদয়ের আওয়াজ শুনতে পায় না। এ কারণেই আমরা একটি গৃহযুদ্ধে একে অপরের রক্ত ঝরিয়েছি এবং আরেকটি গৃহযুদ্ধের তরবারী আমাদের ঘাড়ের উপর ঝুলছে।'

'এই তুফান আমরা প্রতিহত করবোই'– এক সালার বললেন– 'আপনি আমাকে এ কথা বলার অনুমতি দিন যে, এখন আর আমরা কোন সন্ধি-চুক্তি করবো না। আমাদেরকে আপন ভাইদের রক্ত ঝরাতে হবে এবং তাদের হাতে আমাদেরকে প্রাণও দিতে হবে।'

সুলতান আইউবীর চেহারা মলিনতায় ছেয়ে যায়। তার চোখ দুটো যেনো দিগন্তে কিছু একটা দেখছে। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, তাঁর দৃষ্টি অনাগত শতাব্দীগুলোর বুক বিদীর্ণ করে ফিরছে। তাঁবুতে পুনরায় গভীর নীরবতা

নেমে আসে। তিন সালার তাদের সুলতানের এই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন।

'আমার প্রিয় বন্ধুগণ!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার রাসূলের উম্মত আপসে লড়াই করে করে নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইহুদী-খৃস্টানরা তাদেরকে আজীবন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করে রাখবে। ক্ষমতার মোহ ভাইকে ভাইয়ের শত্রুতে পরিণত করে রাখবে। ফিলিস্তীন রক্তে লাল হতে থাকবে। মুসলিম শাসকগণ শতধা বিভক্ত হয়ে বিলাসিতায় ডুবে থাকবে। আমাদের প্রথম কেবলা আল্লাহর রাসূলের উম্মতকে চীৎকার করে ডাকতে থাকবে; কিন্তু কোন মুসলমান সাড়া দেবে না। কেউ যদি ফিলিস্তীনের মাটিকে মুক্ত করাতে উঠে দাঁড়ায়, তো সে হবে আমাদেরই ন্যায় কোন এক পাগল। এই পাগলদেরকে তাদেরই মুসলিম শাসকগণ ধোঁকা দেবে এবং তলে তলে বন্ধু হয়ে থাকবে। তোমরা বলেছো, আমরা এই ঝড় প্রতিহত করতে পারবো। কিন্তু আমাদের মৃত্যুর পর এই ঝড় পুনরায় উত্থিত হবে।'

'তখন আবার আরেকজন সালাহুদ্দীন জন্মলাভ করবেন'– সালার সারেম মিসরী বললেন– 'তখন আরেকজন নূরুদ্দীন জঙ্গীর আবির্ভাব ঘটবে। মুসলিম মায়েরা মুজাহিদ জন্ম দিতে থাকবে।'

'আর এই মুজাহিদরা বিলাসী শাসকদের হাতের খেলনা হয়ে থাকবে'– সুলতান আইউবী খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন– 'আর সেই সময়টাও এসে যাবে, যখন সেনাবাহিনীও বিলাসী সৈনিকে পরিণত হবে এবং তাদের সালার কাফেরদের হাতে খেলতে থাকবে।'

বলতে বলতে সুলতান আইউবী এমন ধারায় থেমে যান, যেনো তার কিছু মনে পড়ে গেছে। তিনি পালাক্রমে তিন সালারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'কিন্তু আমরা কতোক্ষণ পর্যন্ত এভাবে কথা বলতে থাকবো? আমরা চারজন একে অপরকে বক্তব্য শোনাচ্ছি। আল্লাহর সৈনিকরা বক্তৃতা করে বেড়ায় না। আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আমরা কর্মক্ষেত্রের পুরুষ। সারেম! তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রথম নির্দেশনা মোতাবেক তোমার গেরিলা বাহিনীকে আমার বর্ণিত স্থানগুলোতে ছড়িয়ে রেখেছো। আর তুমি তো জানো, আমাদের এই ছাউনি অঞ্চল কিরূপ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।'

'ভালোভাবেই জানি, মুহ্তারাম সুলতান!'– সারেম মিসরী উত্তর দেন– 'আমরা বৈরুতের অবরোধ প্রত্যাহার করে যখন এদিকে চলে আসি, তখন

আমাদের প্রত্যাশার বিপরীতে খৃস্টানরা আমাদের ধাওয়া করতে ফৌজ প্রেরণ করেনি। কিন্তু আমরা এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হইনি যে, খৃস্টানরা আমাদেরকে ক্ষমা করবে। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, তারা আমাদের উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ করবে না। আমাদের উপর তারা আমাদেরই ধারায় গেরিলা আক্রমণ চালাবে। বরং তাদের গেরিলা ও কমান্ডো আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। ছাউনি অঞ্চলের অনেক দূর থেকে ফিরিঙ্গি ও আমাদের টহল বাহিনীগুলোর ছোট ছোট সংঘাতের সংবাদ আসতে শুরু করেছে। আমি আমার গেরিলা ইউনিটগুলোকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রেখেছি। আমার সন্দেহ, কাফেরদের আস্তানা বাইরে কোথাও নয়, মসুলেই বিদ্যমান এবং মসুলের গবর্নর ইয্যুদ্দীন তাদের আশ্রয় ও সাহায্য প্রদান করছেন।'

'তা-ই যদি হয়ে থাকে, আমি সংবাদ পেয়ে যাবো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'ক্রুসেডারদের গোপন আস্তানা যদি মসুলেই হয়ে থাকে, তাহলে আমি তার ব্যবস্থা করবো।'

সুলতান আইউবী অন্যান্য সালারদের উদ্দেশে বললেন– 'মুসলিম আমীরদের দুর্গগুলো মসুল ও হাল্‌বের মধ্যখানে অবিস্থত। আমাদেরকে সেগুলো দখল করতে হবে। আমি এই শহর দু'টিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই। তাহলে তারা একে অপরকে সহযোগিতা দিতে পারবে না। তাদের দূতরাও চলাচলের পথ পাবে না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, যাতে আমার তরবারী কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে খাপ থেকে বের না হয়। কিন্তু তাতে আমি সফল হইনি। আমি সেই শাসক ও আমীরদের খতম করে ছাড়বো, যারা খৃস্টানদেরকে বন্ধু বানিয়ে রেখেছে। যেসব আমীর-শাসক জাতিকে বিভ্রান্ত করছে, আমি তাদের ঘাড় মটকে তবে ক্ষান্ত হবো।'

সুলতান আইউবী মানচিত্রটা বের করে সালারদের দেখাতে শুরু করেন।

❖ ❖ ❖

সম্রাট বল্ডউইন বৈরুতে তার প্রাসাদে সকল সেনা অধিনায়ক এবং জনাচারেক খৃস্টান সম্রাটকে নিমন্ত্রণ করেছেন। সকলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বিশাল ভোজের আয়োজন। অসংখ্য খৃস্টান অতিথির মাঝে দু'জন মুসলমানও মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে। মদ পরিবেশনকারী মেয়েগুলো এরূপ পাতলা পোশাক পরিহিত, যেনো তারা বিবস্ত্র। মদের ক্রিয়া যতোটা বাড়ছে, মেয়েগুলোর সঙ্গে

অতিথিদের অসদাচরণ ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মেয়েগুলোও ধীরে ধীরে অধিক থেকে অধিকতর বেহায়াপনা প্রদর্শন করে চলছে। অন্যদের তুলনায় মুসলিম অতিথি দু'জনের প্রতি মেয়েদের মনোযোগ বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষভাবে দু'টি মেয়ে তাদের আশপাশে ফাং ফাং করে ঘুরে বেড়াচচ্ছে। পোশাক ও আকার-গঠনে এই অতিথিদেরকে রাজপরিবারের সদস্য বলে মনে হচ্ছে।

এক খৃস্টান এসে বললো, সম্রাট বল্ডউইন আপনাদেরকে তার কক্ষে যেতে বলেছেন। মদের পেয়ালা রেখে দিয়ে তারা বল্ডউইনের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে। তাদেরকে যে সরু গলিটি অতিক্রম করে বল্ডউইনের কক্ষে যেতে হয়েছে, তাতে এক ব্যক্তি বর্শা হাতে সামরিক কায়দায় টহল দিচ্ছিলো। বিশেষ ধরনের পোশাক পরিহিত লোকটা। কোমরে তরবারী ঝুলছে। মাথায় সীসার চকমকে শিরোস্ত্রাণ। প্রাসাদে এ ধরনের আরো কয়েকজন লোক বুক টানটান করে বিশেষ ভঙ্গিতে টহল দিয়ে ফিরছে দেখা যাচ্ছে। এরা প্রাসাদের খাস কর্মচারি, যাদের দায়িত্ব সালারদের কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত থেকে পাহারা দেয়া এবং নিমন্ত্রণের সময় বারান্দা ও গলিপথে টহল দেয়া। প্রদীপের আলোতে তাদের পোশাক ও চাল-চলন ভালোই লাগছে। এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকও বটে।

এই যে লোকটি মুসলমান দু'জনকে বল্ডউইনের কক্ষের দিকে যেতে দেখলো, তার গায়ের রং গৌর। সে দাঁড়িয়ে গিয়ে লোকগুলোর যাওয়া দেখতে থাকে। তারা বল্ডউইনের কক্ষে ঢুকে পড়লে কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দরজার সামনে তারই ন্যায় পোশাকের আরো দু'জন লোক দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। তাদের একজন তাকে বললো– 'হ্যালো জ্যাকব! এদিকে ঘোরাফেরা করছো কেন? ওদিকে গিয়ে পরীদের নাচ দেখো। আমরা তো এখান থেকে এক পাও নড়তে পারছি না।'

জ্যাকব রসিকতার ছলে উত্তর দেয়– 'এই যে দু'জন লোক ভেতরে প্রবেশ করলো, মুসলমান বলে মনে হচ্ছে। এরা কারা?'

'তোমার প্রয়োজন কী?'

'প্রয়োজন তেমন কিছু নেই'– জ্যাকব উত্তর দেয়– 'মুসলমানদের প্রতি আমাদের প্রচণ্ড ঘৃণা তো। কেউ আবার ঠুস করে দেয় কিনা। তাই জিজ্ঞেস করলাম। অতিথি হিসেবে তো আমাদের তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আছে।'

'এরা মুসলমান অঞ্চলের মুসলমান'– সঙ্গী উত্তর দেয়– 'আমি যতোটুকু

জানি, এরা মসুল থেকে এসেছে। খুব সম্ভব ইয্‌যুদ্দীনের দূত।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য এসেছে বোধ হয়'– জ্যাকব বললো– 'এই দূতদের কে বলবে সালাহুদ্দীন আইউবীর শেষ হয়ে গেছে। রামাল্লায় পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসে বৈরুত অবরোধ করতে এসেছে। তার নৌ-বহর সামনে অগ্রসর হওয়ারই সাহস পায়নি। আমার আজীবন আক্ষেপ থাকবে, আমাদের বাহিনী আইউবীর বাহিনীকে ধাওয়া করেনি। অন্যথায় আইউবী আজ আমাদের কারাগারে থাকতো।'

'নিজের কাজ করো দোস্ত'!– এক প্রহরী তাচ্ছিল্যের সুরে বললো– 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বন্দি হলে তার সাম্রাজ্যের তুমি মালিক হবে না। সম্রাট বল্ডউইন মৃত্যুবরণ করলেও বৈরুতের রাজত্ব তোমার নামে লিখে দেয়া হবে না।'

জ্যাকব ওখান থেকে সরে আসে। কিন্তু ঘুরেফিরে সেই বদ্ধ কক্ষটি দেখতে থাকে, যার অভ্যন্তরে মুসলমান অতিথি দু'জন হারিয়ে গেছে।

❖ ❖ ❖

লোক দু'জন মসুলের গভর্নর ইয্‌যুদ্দীনেরই দূত। পূর্বে উল্লেখ করেছি, সুলতান আইউবী যখন বৈরুতের অবরোধ প্রত্যাহার করে মসুলের দিকে চলে গিয়েছিলেন, তখন ইয্‌যুদ্দীন কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদকে বাগদাদের খলীফার নিকট এই আবেদন নিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, যেনো তিনি সুলতান আইউবীর সঙ্গে তাকে সন্ধি করিয়ে দেন। সহজ কথায়, ইয্‌যুদ্দীন আবেদন করেছিলেন, যেনো তাকে সুলতান আইউবী থেকে রক্ষা করা হয়। খলীফা দায়িত্বটা শাইখুল উলামার হাতে অর্পণ করেন এবং সুলতান আইউবী ইয্‌যুদ্দীনকে ক্ষমা করে দেন। ইয্‌যুদ্দীন বাহ্যত সুলতান আইউবীর সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করে চুক্তি করে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তলে তলে খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনের নিকট দু'জন দূত পাঠিয়ে দেন। সেই দূত দু'জনই এখন বল্ডউইনের কক্ষে উপবিষ্ট।

'মসুলের গভর্নর বলেছেন, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে ধাওয়া না করে বিরাট ভুল করেছেন'– বল্ডউইনের উদ্দেশে এক দূত বললো– 'আপনি তার বাহিনীকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাদের গবর্নর বলেছেন, আমি ইচ্ছে করলে লিখিত বার্তা দিতে পারতাম। কিন্তু পথে ধরা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি দামেশ্‌ক অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করুন এবং নগরীটা অবরোধ করে

দখল করে নিন। আপনার বাহিনী যেনো এমন পথে এবং এতা দ্রুত দামেশ্‌ক পৌঁছে যায় যে, সালাহুদ্দীন আইউবী সময় মতো দামেশ্‌ক পৌঁছুতে না পারে। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার আক্রমণের সংবাদ শুনে সালাহুদ্দীন আইউবী যখন এখান থেকে রওনা হবে, তখন মসুল ও হালবের বাহিনী মুখোমুখি এসে লড়াই করার পরিবর্তে আইউবীর বাহিনীর উপর কমান্ডো আক্রমণ চালাতে থাকবে। এতে আইউবীর অগ্রযাত্রা অনেক মন্থর হয়ে যাবে আর আপনি সহজে দামেশ্‌ক জয় করে ফেলতে পারবেন। আমাদের অঞ্চলগুলোতে ছোট ছোট যে ক'জন আমীর আছেন, আমি তাদেরকে দলে ভিড়িয়ে নেবো। আপনি তাদের দুর্গ ব্যবহার করতে পারবেন। আমি আপনার বাহিনীকে মসুলের অভ্যন্তরে অবস্থান করার অনুমতি দিতে পারি না। কারণ, তাতে প্রমাণিত হয়ে যাবে আপনার ও আমার মাঝে ঐক্য আছে। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে বুঝ দিয়ে রেখেছি, আমি তার বন্ধু।'

দূত যখন বার্তাটা বলে শোনাচ্ছিলেন, তখন বল্ডউইনের সঙ্গে তার দু'জন সেনাপতিও ছিলো। ইযুদ্দীনের দূতও সামরিক উপদেষ্টা। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপার-স্যাপার তার ভালোভাবেই জানা আছে। বল্ডউইন তার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। তিনি বুঝে ফেলেছেন, এই মুসলমানরা তার জালে এসে পড়েছে। তিনি শর্ত আরোপ করতে শুরু করেন।

'ইযুদ্দীনের বোধ হয় খবর নেই, সালাহুদ্দীন আইউবীকে অসতর্ক অবস্থায় ঝাপটে ধরা তার পক্ষে সম্ভব হবে না'– বল্ডউইন বললেন– 'আমরা দামেশ্‌ক অবরোধ করে ফেললে তিনি বিদ্যুদগতিতে অগ্রযাত্রা করে আমাদের উপর পেছনে এদিক থেকে আক্রমণ করবেন। আমরা দামেশ্‌ক অভিমুকে অভিযান পরিচালনা করবো আর আইউবী তা জানবে না এ হতে পারে না। আইউবী চিল-শকুনের ন্যায় বহুদূর থেকে শিকার দেখে ফেলেন এবং এমনভাবে ছোঁ মারেন যে, পেছনে সরে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমরা এখনো মুখোমুখি যুদ্ধ করার ঝুঁকি মাথায় নিতে পারি না। আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে। আপাতত ব্যবস্থা এটুকু করেছি যে, আমরা কমান্ডো বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা সালাহুদ্দীন আইউবীকে শান্তিতে বসতে দেবে না। এসব বাহিনীর জন্য আমাদের স্বতন্ত্র আস্তানা দরকার। আপনারা যদি এই ব্যবস্থাটা করে দেন, তাহলে সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীকে এদের দ্বারাই হেস্তন্যাস্ত করে দিতে পারি। তখন তিনি না যুদ্ধ

করতে সক্ষম হবেন, না পালাতে পারবেন। আপনারা আমাদের বাহিনীগুলোকে আশ্রয়, সাহায্য ও খাদ্য ইত্যাদি সরবরাহ করতে থাকবেন। আমরা সরবরাহ করবো অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম। হাল্‌বের গবর্নর ইমাদুদ্দীনকেও বলে দেবেন, তিনি যেনো আমাদের উপর আস্থা রাখেন এবং আমাদের গেরিলা ইউনিটগুলোকে প্রয়োজনের সময় আশ্রয় ও সাহায্য দিতে থাকেন। অন্যান্য আমীর ও দুর্গপতিদেরও আপনাদের সঙ্গ দেয়া উচিত। নজর রাখতে হবে, তাদের কেউ যেনো সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে ঐক্য গড়তে না পারে।'

ঐক্যের শর্তাদি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। ইয্‌যুদ্দীন তার দূতদের পূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন যেনো তারা শর্ত চূড়ান্ত করে আসে এবং খৃস্টানদের যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া সমীচীন মনে হবে দিয়ে আসবে। তারা একটি মাত্র স্বার্থে তাদের ঈমান একজন খৃস্টান সম্রাটের নিকট বন্ধক রেখে এসেছে, তাদের শাসন ক্ষমতা নিরাপদ থাকবে। কাজ সমাধান করে দূতরা ভোজসভায় অংশগ্রহণের জন্য উঠে চলে যায়। মনটা তাদের মূলত মদ আর মদ পরিবেশনকারী মেয়েদের সঙ্গেই ঝুলে আছে।

'এই মুসলমানদের উপর বেশি আস্থা রাখবেন না'– এক সেনাপতি বল্ডউইনকে বললো– 'প্রয়োজন হলে তারা আপনাকে কিছু না জানিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে ঐক্য গড়তে সময় লাগবে না।'

'আমার একটা আস্তানা দরকার'– বল্ডউইন বললেন– 'মসুল আমার আস্তানা হয়ে গেলে আমি ধীরে ধীরে পুরো বাহিনীই সেখানে নিয়ে যাবো এবং ইয্‌যুদ্দীনকে সেখান থেকে উৎখাত করবো। আমাদের সকলের পরিকল্পনা এই হওয়া উচিত, আমরা মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেবো না। আমরা তাদেরকে আপসে লড়াতে থাকবো এবং ধীরে ধীরে তাদের ভূখণ্ডগুলো দখল করে নেবো। আমরা দেখেছি, মুসলমানদেরকে ভোগ-বিলাসিতার ও ক্ষমতার লোভ দেখালে তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও ধর্ম আমাদের পায়ের উপর রেখে দেয়। ইয্‌যুদ্দীন-ইমাদুদ্দীন ও অন্যান্য ছোটখাট মুসলমান আমীরগণ শুধু এ কারণে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরোধী যে, তারা প্রত্যেকে স্বাধীন শাসক হতে এবং বিলাসী জীবন লাভ করতে আগ্রহী। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবীর মধ্যে ভোগ-বিলাসিতা ও ক্ষমতার লোভ নেই। তিনি সকলকে এক রণাঙ্গনে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদেরকে ফিলিস্তীন থেকে উৎখাত করার পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু

তিনি যাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাচ্ছেন, তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে ভয় পায়। আমি আশাবাদী, ইয়্যুদ্দীন ও সাঙ্গরা আমাদের হাত থেকে বের হবে না। কেউ যদি বের হওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে আমরা তাকে হাশিশিদের দ্বারা হত্যা করিয়ে ফেলবো।'

বল্ডউইন তার সেনাপতিদের আরো কতিপয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বললেন– 'ইয্যুদ্দীনের এই দূতদেরকে এতো খাতির-যত্ন করো, যেনো তাদের বিবেক মরে যায় এবং তাদের জাতি-ধর্মের কথা ভুলে যায়।' বল্ডউইন যে বিষয়টি কঠোরভাবে পালন করতে আদেশ করেন তাহলো, এই কক্ষে দূতদের সঙ্গে যা যা আলোচনা, কথোপকথন ও সিদ্ধান্ত হয়েছে, যেনো তা কক্ষের বাইরে না যায়। বল্ডউইন বললেন– 'বৈরুতে সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা আছে।'

উভয় দূত মদ ও নারীর নেশায় মাতাল হতে চলেছে। অতিথিগণ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে মদপান ও গালগল্প করছে। জ্যাকব এই দূত দু'জনকে খুঁজে ফিরছে। হঠাৎ সে তাদের একজনকে আলাদা পেয়ে যায়। জ্যাকব তাকে সামরিক কায়দায় সালাম জানায় এবং জিজ্ঞেস করে– 'আপনি বোধ হয় মসুলের মেহমান? আমরা মসুলবাসীদের অনেক ভালোবাসি।'

'আমরা মসুলের শাসক ইয্যুদ্দীনের দূত'– দূত মদমাতাল ঢুলু ঢুলু কণ্ঠে বললো– 'আমরা জানতে এসেছি, বৈরুতের খৃস্টানদের অন্তরে মসুলের মুসলমাদের কী পরিমাণ ভালোবাসা আছে।' দূতের কণ্ঠটা যেমন টলমল করছে, তেমনি পা দুটোও কাঁপছে। লোকটা এতো বেশি পান করেছে যে, পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সে জ্যাকবের কাঁধের উপর সজোরে হাত মেরে বললো– 'মদের এই এক গুণ যে, মানুষের অন্তর থেকে ধর্ম বেরিয়ে যায় এবং তদস্থলে ভালোবাসা এসে স্থান করে নেয়। আমি ক্রুশ ভালোবাসি। তোমার এই বর্শাটার প্রতি আমার ভালোবাসা আছে। যেদিন এই বর্শা সালাহুদ্দীন আইউবীর বুকে বিদ্ধ হবে, সেদিন আমি প্রধান সেনাপতি হয়ে যাবো।'

জ্যাকব ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ডিউটি তো তার টহল দেয়া। সে ইয্যুদ্দীনের দূতকে নড়বড়ে অবস্থায় ফেলে সরে আসে। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পায়, দূতকে দু'জন লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ইয্যুদ্দীনের মুসলমান দূত অধিক মদপান করে চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে।

❖ ❖ ❖

এখন মধ্যরাত। জ্যাকবের ডিউটি শেষ। নাচ-গান চলছে। জ্যাকব ও তার সঙ্গীদের স্থানে অন্য লোক এসে পড়েছে। জ্যাকব নিজ কক্ষে চলে যায়। ডিউটির পোশাক খুলে সাধারণ পোশাক পরিধান করে। লোকটা অনেক ক্লান্ত। এখনই তার শুয়ে পড়া উচিত। কিন্তু জ্যাকব বাইরে বেরিয়ে যায়। গতি তার অন্যদিকে। কিন্তু হঠাৎ কী যেনো ভেবে মহলের মেয়েরা যেখানে থাকে, সেদিকে চলে যায়।

এটি একটি ভবন। এর একটি অংশ এতোই সুন্দর ও মনোরম, যেনো এটি রাজকন্যাদের আবাস। এটি সেই মেয়েদের আবাস, যাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা এবং মুসলিম আমীর-সালার ও শাসকদেরকে ক্রুশের জালে ফাঁসানোর জন্য মুসলমানদের অঞ্চলে প্রেরণ করে থাকে। খৃস্টানদের দখলকৃত মুসলিম ভূখণ্ডের মুসলমান গোয়েন্দাদের ধরার জন্যও এদেরকে ব্যবহার করা হয়।

এই ভবনেরই অপর এক অংশে নর্তকী-গায়িকারা বাস করে। তাদের মূল্য-মর্যাদা গোয়েন্দা মেয়েদের সমান না হলেও রূপ-সৌন্দর্যে কোন অংশেই কম নয়। মহলে নিমন্ত্রণ ও ভোজসভায় নেচে-গেয়ে অতিথিদের মনোরঞ্জন করা তাদের দায়িত্ব। বাইরে থেকে মেহমান আসলে নাচ-গান ছিলো অবধারিত। আজ রাত মসুলের দূতদের সম্মানে যে ভোজের আয়োজন হয়েছিলো, তাতেও নাচ-গানের ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু সারা এই অনুষ্ঠানে ছিলো না। অত্যন্ত সুন্দরী এক মেয়ে সারা। মেয়েটার গাত্রবর্ণ ও চুল-চোখের রং ইউরোপিয়ান মেয়েদের মতো নয়। বোধ হয় বৈরুতের মেয়ে। মিসর কিংবা ইউনানেরও হতে পারে। তবে কেউ জানে না, সারার বাড়ি কোথায়।

জ্যাকব যাচ্ছিলো অন্য একদিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় আজ যারা নাচ-গান করলো, তাদের মধ্যে তো সারা ছিলো না। ব্যাপার কী! হতে পারে মেয়েটা অসুস্থ কিংবা এই পেশায় সে বিরক্ত, তাই পালিয়ে রয়েছে। জ্যাকব জানে, এই পেশায় সারা খুশি নয়। কারণ, এ কাজে সে নিজে আসেনি, ভুল বুঝিয়ে আনা হয়েছে। জ্যাকবও এই ভবনের কাছেই এক স্থানে থাকে এবং মহলে ডিউটি করে। একদিন এমনি এক ভোজসভায় হঠাৎ সারার সঙ্গে জ্যাকবের দেখা হয়েছিলো। সকলের দৃষ্টিতে সারা অহংকারী মেয়ে। কারো সঙ্গে কথা বলে না। কী কারণে কে জানে জ্যাকবকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। জ্যাকবেরও সারাকে বেশ ভালো লাগে।

এক রাতে সারা মহলের কাজ-কর্ম শেষ করে নিজ কক্ষের দিকে

যাচ্ছিলো। পথে জ্যাকবের দেখা পেয়ে যায়। সারা বললো– 'একাকী যাচ্ছি, আমাকে কক্ষে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসো।'

'একা যেতে ভয় পাচ্ছো বুঝি?'– জ্যাকব বললো– 'এখান থেকে তোমাকে কেউ অপহরণ করে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'এখন আর আমি অন্যের দ্বারা অপহৃত হওয়ার ভয় করি না'– সারা বললো– 'আমার নিজেই নিজেকে অপহরণ করার পালা এসে গেছে। আমার সঙ্গে চলো। একা যেতে ভয় করি না বটে, তবে তোমার সঙ্গ কামনা করি।'

সারার মতো একটি সুন্দরী মেয়ের জ্যাকবকে ভালোবাসা বিস্ময়কর কোন ঘটনা নয়। এমন সুশ্রী, সুদর্শন যুবককে কার ভালো না লাগে। আরো কয়েকটি মেয়ে ভালোবাসার ডালি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো। কিন্তু জ্যাকব কাউকে পাত্তা দেয়নি। কারণ, জ্যাকব জানে এরা অপবিত্র ও সম্ভ্রমহারা মেয়ে। জ্যাকব তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজের দাম বাড়িয়ে নিয়েছে। প্রথম সাক্ষাতে জ্যাকব সারাকেও তেমনি চরিত্রহীন মেয়ে মনে করেছিলো। কিন্তু সারার চাল-চলন, রং-ঢং তার ভালো লেগে যায়। সারা যখন জানতে পারে জ্যাকব মদপান করে না, তখন তাকে আরো ভালো লাগতে শুরু করে। একদিন সারা জ্যাকবের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শোনার জন্য বললো– 'তুমি কোনদিন আমার নাচের প্রশংসা করোনি। অন্যরা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমার বিদ্যা ও দেহের তারিফ করে।'

'তুমি আমার মুখ থেকে তোমার বিদ্যার প্রশংসা কখনো শুনবে না'– জ্যাকব উত্তর দেয়– 'তবে তোমার দেহে যাদুর ন্যায় ক্রিয়া আছে। ভালো শরীর। খোদা তোমার চেহারায় যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন, তা তার বান্দাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে ফেলে। কিন্তু নাচের অবস্থায় এই দেহটা মোটেও ভালো লাগে না। তুমি যখন কাউকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচাও, তখনো তোমাকে ভালো লাগে না। তোমার এই দেহটা যদি কোন একজন পুরুষের মালিকানায় চলে যেতো, সে ছয় কালেমা পাঠ করে এই দেহটা সম্মান ও মমতার সঙ্গে আবৃত করে নিয়ে যেতো,তাহলে এর উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হতো। তুমি তো খোদাকে অপমান করছো।'

'জ্যাকব!'– সারা বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কোন্ ছয় কলেমার কথা বলছো? তাছাড়া খৃস্টানরা তো বধূদেরকে আবৃত করে নেয় না! তুমি কী বললে?'

জ্যাকব ভয় পেয়ে যায়। পরক্ষণে হঠাৎ খিল খিল হেসে ওঠে বললো–

'আমার মন-মস্তিষ্কে সবসময় মুসলমান সাওয়ার থাকে। নিজে তো বিয়ে করিনি, মুসলমানদের বিয়ে দেখেছি।'

জ্যাকব বুঝাতে চেষ্টা করে 'ছয় কলেমা' কথাটা তার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সারা তার প্রতি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েই থাকে। তারপর সারা চুপসে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল চোখে শূন্যে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর অস্থিরের ন্যায় জ্যাকবের কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি মুসলমান নও তো জ্যাকব? আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তুমি গুপ্তচর। হতে পারে চাকরির খাতিরে নিজেকে খৃস্টান পরিচয় দিয়ে রেখেছো কিংবা ইসলাম ত্যাগ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছো।'

'জ্যাকব নামের মানুষ মুসলমান হয় না সারা'– জ্যাকব বললো– 'আমার নাম গলবার্ট জ্যাকব। তুমি এতো অস্থির হয়েছো কেন সারা! মনে হচ্ছে, তোমার হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি এতো ঘৃণা যে 'ছয় কলেমা' উচ্চারণটাও শুনতে চাচ্ছো না।'

'আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলে দিচ্ছি'– সারা বললো– 'বিষয়টা হয়তো তোমার ভালো লাগবে না। আমার কাছে মুসলমান খুবই ভালো লাগে। তার কারণটা বোধ হয় এই যে, মুসলমান ছয় কলেমা পড়িয়ে বধূদেরকে আবৃত করে নিয়ে যায়।' সারা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো– 'নারীকে যখন বিবস্ত্র করে ফেলা হয়, তখন সে অনুভব করে আবৃত হওয়ার মধ্যে তার যে আত্মিক শান্তি ও স্থিরতা ছিলো, তা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। নারীর নাচে কোন স্বাদ নেই এবং রূপের যাদু প্রয়োগ করে পুরুষদেরকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচানোর মধ্যেও শান্তি নেই। আমি যখন একাকী আয়নার সামনে দাঁড়াই, তখন আয়নায় নিজেকে একজন ঘৃণ্য নারী বলে মনে হয়। নিজের প্রতিবিম্বকে আমি আবৃত করতে পারি না। তার উপর পর্দা চড়াতে পারি না। তবে আমার আত্মার উপর কালো আবরণ পড়ে গেছে।'

'পেশাটার প্রতি তোমার এতোই যখন ঘৃণা, তো পালিয়ে যাও না কেন?' জ্যাকব বললো।

'কোথায় যাবো?'– সারা বললো– 'এখান থেকে পালাবো তো বেশ্যালয়ে চলে যাবো। আচ্ছা, তুমি আমাকে ভালোবাসো, নাকি আমার নাচ?'

'আমার সেই সারাকে ভালো লাগে, যে নাচ-গানের পেশাকে ঘৃণা করে এবং এর জন্য বেজায় বিরক্ত ও অস্থির থাকে'– জ্যাকব বললো– 'আমি তো বলেছি, তুমি খোদাকে অপমান করছো।'

'আচ্ছা, তুমি ফৌজে এসেছো কীভাবে?'– সারা বললো– 'তোমাকে গ্রামগঞ্জের কোন এক গীর্জার পাদ্রী হওয়ার প্রয়োজন ছিলো। প্রতিদিন কী পরিমাণ মদপান করো?'

'মদের ঘ্রাণকেও আমি ঘৃণা করি।'

'তাহলে তুমি মুসলমান'– সারা দৃঢ়কণ্ঠে বললো– 'তুমি নও তো তোমার পিতা মুসলমান ছিলেন। তুমি নারীকে আবৃত দেখতে চাও। নাচ পছন্দ করো না। মদের প্রতি তোমার প্রচণ্ড ঘৃণা। আর সম্ভবত এ কারণেই আমাকে তোমার ভালো লাগে। আমাকে তো যেই দেখে ভোগের চোখে দেখে। তুমি আমর হৃদয়ের ব্যথা বুঝো না?"

'বুঝি সারা'– জ্যাকব বললো– 'এই ব্যাথাটা আমার হৃদয় অনুভব করেছে।'

এরপর কয়েকবার সারা-জ্যাকবের সাক্ষাৎ ঘটে। সারা জ্যাকবের সঙ্গে হৃদয়ের কথা বলতে থাকে। মেয়েটি জ্যাকবকে একাধিকবার বলেছে, তোমার চাল-চলন ও চিন্তা-চেতনা মুসলমানদের মতো। জ্যাকব সারাকে জিজ্ঞেস করেছে, মুসলমানদের তুমি এতো বেশি পছন্দ করো কেন? সারা কখনো সন্তোষজনক উত্তর দেয়নি। তবে উভয়ে এটুকু অবশ্যই অনুভব করেছে, তারা একে অপরের হৃদয়ে ঢুকে পড়েছে।

জেয়াফতের রাতে জ্যাকব যখন ডিউটি শেষ করে একদিকে যাচ্ছিলো, তখন মাঝপথে সে গতি পরিবর্তন করে সারার বাসভবনের দিকে হাঁটা দেয়। জেয়াফতে সারার অনুপস্থিতির কারণ হতে পারে, সে অসুস্থ। তাই খবরটা নেয়া দরকার। উক্ত ভবনে কারো যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। তারপরও জ্যাকব ঝুঁকিটা এ জন্য বরণ করে নেয় যে, মেয়েরা সকলে আসরে চলে গেছে। চাকরানী মহিলারাও এ সময়ে ভবনে নেই। জ্যাকব অন্ধকার দিক থেকে হাঁটা দেয়। সারার কক্ষ তার জানা ছিলো। পা টিপে টিপে সে কক্ষের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দরজায় হাত লাগালে কপাট খুলে যায়। একটি কক্ষ অতিক্রম করে অপর কক্ষে চলে যায় জ্যাকব। ওখানে একটি বাতি জ্বলছে, যার ক্ষীণ আলোতে সারা শুয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। এ মুহূর্তে মেয়েটাকে একটা দুগ্ধপোষ্য নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় মনে হলো জ্যাকবের। জানালাটা খোলা। রোম উপসাগারের শীতল বায়ুর তীব্র ঝাপটায় সারার মাথার বিক্ষিপ্ত চুলগুলো ধীরে ধীরে নড়ছে। গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে সারা। জ্যাকব সারার কপালে হাত রাখে। এই বয়সের একটা

ঘুমন্ত মেয়ের কপাল যতোটুকু গরম থাকার কথা, তার চেয়ে বেশি গরম নয়। অতএব, সারার জ্বর হয়নি।

'তুমি গুলবাগিচার ফুল, যে ফুল রাজা-বাদশাহদের শয়ন কক্ষে এসে শুকিয়ে যায়'— জ্যাকব মনে মনে সারাকে উদ্দেশ করে বললো— 'তুমি ভোরের তারকা, যেটি সূর্যের আলোতে নির্বাপিত হয়ে যায়, রাত এলে আবার জ্বলে ওঠে। তোমার জীবন রাতের আঁধারে ঘুরপাক খাচ্ছে। তোমার ভাগ্য অন্ধকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তোমাকে আমার ভালো লাগে কেন? তুমি আমাকে বারবার কেন জিজ্ঞেস করছো, আমি ছয় কলেমার উল্লেখ কেন করেছি? তুমি কোন মুসলিম মায়ের কোলে জন্মলাভ করোনি তো? তোমার শিরায় কোন মুসলমান পিতার রক্ত নেই তো? এই রহস্য উন্মোচন করবে কে? আমি তোমার জন্য রহস্য। তুমিও আমার জন্য রহস্য।'

জ্যাকবের মনে পড়ে যায়, খৃস্টান সৈন্যরা মুসলমানদের কাফেলা লুণ্ঠন করে থাকে। মুসলিম মেয়েদের তুলে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে নিজেদের রঙে রঙিন করে গুপ্তচরবৃত্তি, বেহায়াপনা ও নাচ-গানের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সারাও এমনি এক হতভাগী মেয়ে হতে পারে। অন্যথায় এই খৃস্টান জাতিটা তো অনুভূতি ও চেতনার দিক থেকে মৃত হয়ে এবং বেহায়াপনার মধ্যে পুরোপুরি জীবিত থাকতে পারে। কিন্তু সারা পারছে না কেন? জ্যাকব ভুলে যায়, সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। কোন পুরুষের এই ভবনের দিকে পা বাড়ানোর অনুমতি নেই। কিন্তু জ্যাকব এখন সারার কক্ষে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে। সারা তার হৃদয়ে এমনভাবেই ঢুকে পড়েছে যে, কোন ঝুঁকিই ঝুঁকি বলে মনে হচ্ছে না জ্যাকবের। জ্যাকব বাতিটা নিভিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সারার চোখ খুলে যায়।

জ্যাকব সারার সন্ত্রস্ত কণ্ঠ শুনতে পায়— 'কে?'

'জ্যাকব।'

'এ সময়ে তুমি এখানে কেন?'— সারা এমন কণ্ঠে বললো যাতে প্রেমও আছে, সমবেদনাও আছে— 'কেউ দেখে ফেললে সোজা কারাগার, ছাড়া উপায় থাকবে না। আমাকে বাইরে ডেকে নিলেই পারতে!'

'জেয়াফতে তোমাকে না দেখে ভাবলাম, তোমার অসুখ-টসুখ হলো কিনা। তাই ঝুঁকি মাথায় নিয়ে চলে এলাম'— জ্যাকব অন্ধকারে সারার খাটের উপর বসতে বসতে বললো— 'কেউ যাতে দেখতে না পায় তাই বাতিটা নিভিয়ে দিলাম। অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিনি সারা। জানি না, কী

আকর্ষণ আছে, যা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। তোমার কোন অসুখ হয়নি তো?'

'আমার আত্মা অসুস্থ'– সারা বললো– 'আমি যখনই আসরে–জেয়াফতে নাচি, আমার হৃদয় সঙ্গে থাকে না। আমার দেহ নাচে বটে; কিন্তু আত্মা মরে যায়। আজ যখন আমাকে জানানো হলো মসুল থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'জন মেহমান এসেছেন, শুনে আত্মার সঙ্গে আমার দেহটাও নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। শুনে আমার মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। এই রাজা-বাদশাহদের যুদ্ধ, শান্তি ও বন্ধুত্বের চুক্তিতে আমার কোন আন্তরিকতা নেই। কিন্তু যখন কানে আসলো, মসুল থেকে দু'জন মেহমান আসছেন, তখন আমার মনে হলো, খৃস্টান ও মুসলমানদের দু'পক্ষের কোন এক পক্ষের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এখন পর্যন্ত আমি ঠিক করে ওঠতে পারিনি, আমার আত্মিক সম্পর্কটা আসলে কার সঙ্গে। শুধু এই অনুভূতিটা জেগে ওঠলো, আমি এই আসরে নাচতে পারবো না। আমি মসুলের মেহমানদের মুখোমুখি হতে পারবো না। হতে পারে আমাকে দেখে তারা ওখান থেকেই পালিয়ে যাবে।'

'কেন?'– জ্যাকব জিজ্ঞেস করে– 'মসুলের লোকদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?'

'বলতে পারবো না'– সারা বললো– 'আমি তো নিজেকেও বলতে ভয় পাচ্ছি, মসুলবাসীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

'সারা'– জ্যাকব সারার একটা হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বললো– 'আমার থেকে মনের কথা কেন গোপন করছো?' তোমাকে কি কোন কাফেলা থেকে অপহরণ করা হয়েছিলো? তুমি কোন্ পিতার কন্যা?'

সারা কোন উত্তর দিতে পারে না। হঠাৎ জ্যাকব খানিকটা চকিত হয়ে ওঠে। উভয়ে খোলা জানালার দিকে তাকায়। জানালায় একটা ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। সারা জ্যকবের কানে কানে বললো– 'খাটের নীচে চলে যাও।' জ্যাকব অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে মেঝেতে বসে পড়ে। তারপর নিঃশব্দে ধীরে ধীরে খাটের নীচে চলে যায়। সারা শুয়ে পড়ে।

'সারা'– জানালায় দণ্ডায়মান ছায়াটির কণ্ঠ ভেসে আসে। এক বৃদ্ধ মহিলার কণ্ঠ। নর্তকী-গায়িকাদের দেখাশোনা করা তার দায়িত্ব।

সারা কোন উত্তর দেয়নি যেনো ডাকটা শোনেনি। মহিলা আবারো ডাক দেয়– 'সারা!' সারা এবারও নিশ্চুপ। যেনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এবার

মহিলা বিক্ষোভিত কণ্ঠে বললো-- 'আমি জানি সারা! তুমি সজাগ আছো। উত্তর দাও। বাতি নেভানো কেন?'

সারার মুখ থেকে এমন শব্দ বেরিয়ে আসে, যেনো সে বিড় বিড় করে জেগে ওঠেছে। কণ্ঠটাকে ঘুমজড়িত করে বললো- 'কে? কী হয়েছে?'

'ওদিক থেকে এসে বলছি কী হয়েছে'- মহিলার ছায়াটা জানালা থেকে সরে যায়। দরজার দিক থেকে আসতে চাচ্ছে সে। সারা অবনত হয়ে জ্যাকবকে বললো- 'বেটি অন্যদিক থেকে আসছে। তুমি বেরিয়ে এসে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ো।'

'না সারা'- জ্যাকব খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে বললো- 'আমি তাকে জানি। আসতে দাও। আমি ওর মুঠো গরম করে দেবো; তো খুশি মনে চলে যাবে।'

'না, বড় বজ্জাত মহিলা'- সারা বললো- 'গোপনে গোপনে মেয়েদের দালালী করে বেড়ায়। তুমি এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। অন্যথায় আমার মিথ্যাচার আমাকে মেরে ফেলবে। তুমি চলে যাও, আমি ওকে সামলে নেবো।'

মহিলা সবেমাত্র দরজায় এসে পৌঁছেছে। জ্যাকব জানালা দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে যায়। সারা বাতি জ্বালিয়ে দেয়। মহিলা ভেতরে প্রবেশ করে। দৈহিক দিক থেকে মহিলা যতোটা না নারী, তার চেয়ে বেশি পুরুষ। এসেই সারার সঙ্গে বুঝাপড়া শুরু করে দেয়। সারা তাকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে, এই কক্ষে অন্য কেউ ছিলো না। সম্ভবত ঘুমের ঘোরে কথা বলছিলো। মহিলা বললো, স্বপ্নে নারীর কণ্ঠ পুরুষের ন্যায় হয়ে যায় না। আমি তোমার কক্ষে পুরুষ কণ্ঠও শুনেছি।'

'এটা কী?' মহিলা ঝুঁকে খাটের সন্নিকটে মেঝেতে পড়ে থাকা একটা রোমাল তুলে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে। রোমালটা হাত দুয়েক লম্বা এবং ততোখানি চওড়া একখণ্ড কাপড়, যা কিনা পুরুষরা গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথায় ব্যবহার করে থাকে। লোকটা কে ছিলো? তার থেকে তুমি কতো মূল্য নিয়েছো?'

'আমি বেশ্যা নই'- সারা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো- 'আমি নর্তকী। তুমি জানো, আমি কোন পুরুষের গায়ে মুখ লাগাই না।'

'শোন সারা!'- মহিলা সারার পাশে বসে পড়ে এবং তার কাঁধে হাত রেখে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললো- 'আমিও জানি, তুমি নর্তকী। কিন্তু তুমি

জানো না একজন নর্তকী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কিংবা দেশের শাসক-সম্রাট নয়। আমি শুধু এটুকু বলে দেবো, রাতে তোমার কাছে একজন পুরুষ এসেছিলো। ফল কী হবে তুমি ভালোভাবেই জানো। এমন ধারায় কথা বলো না যে তুমি শাহী নর্তকী। এখানে তোমার কোন মর্যাদা নেই।'

'আসল কথা বলো'- সারা বরলো- 'যে দয়াটা করতে চাচ্ছো, তার বিনিময় কী নেবে বলো, আমি এখনই পরিশোধ করে দিচ্ছি।'

'তোমার থেকে আমি কিছুই নেবো না'- মহিলা বললো- 'বিনিময়টা আমি অন্য কারো থেকে উসুল করবো। তুমি শুধু হ্যাঁ বলো।'

সারা মহিলার মতলব বুঝে ফেলে। বাইরে থেকে শাহী মেহমান আসছেই কেবল। তাদের মধ্যে খৃস্টানও আছে। আছে মুসলমানও। এই সম্মানিত অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য মেয়েরা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যে আমলারা আসে, তাদের জন্য এ জাতীয় কোন বিলাসী আয়োজন হয় না। এই মহিলা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তাদের নিকট মেয়ে সরবরাহ করে থাকে এবং মোটা অংকের পুরস্কার লাভ করে থাকে। এটা তার গোপন ব্যবসা। কোন কোন রাজ অতিথি সরকারীভাবে প্রদত্ত মেয়ের দ্বারা তৃপ্ত না হয়ে এই মহিলার শরণাপন্ন হয়। মহিলা তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। সারা এ যাবত কখনো তার হাতে আসেনি। কিন্তু এখন মেয়েটি তার জালে ফেঁসে গেছে। যদি বলে, তার কাছে জ্যাকব এসেছিলো এবং তাদের দু'জনের সম্পর্কটা পবিত্র, তো মহিলা বিশ্বাসও করবে না এবং জ্যাকবও বিপদে পড়ে যাবে।

'সারা!'- মহিলা বললো- 'যদি নিজের ভয়ানক পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে চাও, তাহলে আমার প্রস্তাব মেনে নাও। বাইরে থেকে দু'জন মেহমান এসেছেন। অনেক ধনী। পরশু থেকেই তারা কর্মচারিদের বলে আসছেন, তাদের ভালো দুটো মেয়ে দরকার। এটা মূলত তাদের অভ্যাস। নিজেদের হেরেমে তাদের বিশ-ত্রিশটি করে মেয়ে থাকে। কাল তুমি তাদের একজনের কাছে চলে যাবে।'

'তারা কারা?'- সারা জিজ্ঞেস করে- 'মুসলমান হলে আমি যাবো না।'

'তাহলে কয়েদখানায় যাও'- মহিলা বললো- 'মাথা ঠিক রেখে চিন্তা করে কথা বলো। নিজের প্রতি তাকাও। তুমি কী? নিজের পেশাটা দেখো। ভদ্র সাজবার চেষ্টা করো না। তারা মন খুলে পুরস্কার দেবে। তুমিও ভাগ পাবে।'

'আর যদি ধরা পড়ে যাই, তাহলে?' সারা বললো।

'যারা তোমাকে ধরবে আমি তাদের হাত বেঁধে রাখি'– মহিলা বললো– 'কাল রাতে প্রস্তুত থাকবে। আমার আর জানবার প্রয়োজন হবে না, তোমার কাছে কে এসেছিলো।'

মহিলা চলে যায়। সারার চোখ থেকে অশ্রু বেরুতে শুরু করে।

জ্যাকব পালিয়ে যাওয়ার মানুষ নয়। কিন্তু সারা বিপদে পড়ে যাবে ভয়ে বেরিয়ে গেলো। তার আশা ছিলো সারা মহিলাকে সামলে নিতে সক্ষম হবে। কারণ, সে নিজেও নোংরা জগতের মেয়ে। জানালা টপকে বেরিয়ে জ্যাকব শহরের দিকে যাচ্ছে। তার মন-মস্তিষ্কে শুধুই সারা। সারার সঙ্গে এখন তার আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক। থেকে থেকে তার কেবলই ধারণা হচ্ছে, সারা কোন মুসলমান পিতার কন্যা। জ্যাকব হাঁটতে হাঁটতে নগরীর সরু ও অন্ধকার গলিপথে ঢুকে পড়ে। গলির মোড় ঘুরে ঘুরে একটি গৃহের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং দরজায় করাঘাত করে।

খানিক পর দরজা খুলে যায়।

'কে?'

'হাসান।' জ্যাকব উত্তর দেয়।

'এতো রাতে কেন?'– যে লোকটি দরজা খুললো সে জিজ্ঞেস করে– 'ভেতরে এসে পড়ো। কেউ দেখেনি তো?'

'না'– জ্যাকব উত্তর দেয়– 'কাফেরদের জেয়াফত থেকে এই মাত্র অবসর হলাম। জরুরি এক সংবাদ নিয়ে এসেছি।'

জ্যাকব ভেতরে ঢুকে পড়ে। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এখন সে জ্যাকব নয়– হাসান আল-ইদরীস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর। এক বছর আগে নিজেকে খৃস্টান পরিচয় দিয়ে এবং গলবার্ট জ্যাকব নাম ধারণ করে খৃস্টান বাহিনীতে চাকরি নিয়েছিলো। গৌর বর্ণের যুবক। প্রশিক্ষণ মোতাবেক অত্যন্ত চতুর ও বাকপটু। দেহের আকার-গঠনের সুবাদে উক্ত প্রাসাদের বিশেষ দায়িত্বের জন্য নিযুক্ত হয়। এখান থেকে কায়রোতে তথ্য সরবরাহ করতে থাকে। তার দলনেতার নাম হাতেম। জ্যাকব এসে এখন যে ঘরে প্রবেশ করলো, হাতেম এ ঘরেই থাকে।

'মসুলের দু'জন দূত বল্ডউইনের নিকট এসেছে'– হাসান আল-ইদরীস তার নেতাকে বললো– 'আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, তারা মসুল থেকে এসেছে এবং মুসলমান। বল্ডউইন তাদেরকে নিজ কক্ষে নিয়ে যান। তারা যে মসুলের

গবর্নর ইয্যুদ্দীনের বার্তা নিয়ে এসেছে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'আর সেই বার্তাটা হচ্ছে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে চুক্তির বার্তা'– নেতা বললো– 'তা উভয় পক্ষের মাঝে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে তা কি জানতে পেরেছো? সুলতান তো এখন পর্যন্ত ধোঁকায় রয়েছেন যে, ইয্যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীন আমাদের বন্ধু কিংবা অন্তত পক্ষে আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করবে না।'

'তাদের আলাপ-আলোচনা রুদ্ধ কক্ষে হয়েছে'– হাসান বললো– 'আমার ধারণা, যা কিছু সিদ্ধান্ত হওয়ার ছিলো হয়ে গেছে। আমি তাদের একজনের সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে বেশ আনন্দিত দেখা গেছে। অভাগা এতো মদপান করেছিলো যে, নেশার ঘোরে বলে দিয়েছে, তারা মুসলমান এবং মসুল থেকে এসেছে। আমাকে বলেছিলো, সে আমাদের অর্থাৎ খৃষ্টানদের ভালোবাসা দেখতে চায়। লোকটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, লুটিয়ে পড়লো।'

'মসুল থেকে দু'জন লোক এসেছিলো' সুলতানকে শুধু এটুকু সংবাদ প্রেরণ করা যথেষ্ট হবে না'– হাতেম বললো– 'আমরা সুলতানের নিকট অত্যন্ত লজ্জিত, তাঁর কাছে এই সংবাদটা পৌঁছাতে পারলাম না যে, আপনি বৈরুত অবরোধের পরিকল্পনা ত্যাগ করুন। কেননা, বল্ডউইন আপনার এই পরিকল্পনার সংবাদ জেনে গেছে।'

'তাতে আমাদের কোন ত্রুটি ছিলো না',– হাসান বললো– 'ইসহাক তুর্কি যথাসময়ে রওনা হয়ে গিয়েছিলো। সে তো ধোঁকা দেয়ার মতো মানুষ ছিলো না। পথে হয়তো মরুভূমির নির্মম আচরণের শিকার হয়েছে, নয়তো ধরা পড়েছে।'

'বৈরুত অবরোধে সুলতান আইউবীর যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, আমাদের তার প্রতিকার করতে হবে'– হাতেম বললো– 'তার জন্য এই সংবাদটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, মসুল বৈরুতের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করছে। কিন্তু চুক্তিতে কী কী শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা কী ঠিক হয়েছে, পুরো তথ্যই সুলতানকে জানানো প্রয়োজন। এ মুহূর্তে সুলতান আইউবী বড় ঝুঁকির মধ্যে বসে আছেন। হয়তো ভাবছেন, তিনি বন্ধুদের মাঝে নিরাপদ রয়েছেন। কিন্তু আসলে তিনি শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে ছাউনি ফেলেছেন।' হাতেম হাসানকে জিজ্ঞেস করে– 'ভেতরের সংবাদ সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা করা যায় না?'

'আলোচনা হয়েছে রুদ্ধ কক্ষে'– হাসান উত্তর দেয়– 'বল্ডউইন তার সালার কিংবা উপদেষ্টাদের তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না। মসুলের

দু'ব্যক্তির বক্ষ থেকে তথ্য বের করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমি উপায় বের করার চেষ্টা করবো। তাতে কাজ না হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করবো। তারা যখন ফেরত রওনা হবে, তখন তাদের অপহরণ করে কথা বের করবো। তারপর প্রয়োজন হলে মেরে ফেলবো।'

'তাদের মেরে ফেললে তো আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না'– হাতেম বললো– 'আমাদের বল্ডউইন ও ইয্যুদ্দীনের পরিকল্পনা জানা আবশ্যক।'

'আমি সে চেষ্টাই করবো'– হাসান বললো– 'তথ্য বের করতে না পারলে তাদেরকে সুলতান আইউবীর নিকট পাঠিয়ে দেবো।'

'ঠিক আছে চেষ্টা চালাও'– হাতেম বললো– 'সফল হলে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে জানাও। আমি ভোরেই সুলতানের নিকট লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। তুমি যতো স্বল্প সময়ে সম্ভব তথ্য নেয়ার চেষ্টা করো।'

'দুআ করুন যেনো সফল হতে পারি।' হাসান উঠে বেরিয়ে যায়।

'খৃস্টান কমান্ডোদের জীবিত ধরার চেষ্টা করবে'– সালার সারেম মিসরী তার গেলিরা বাহিনীর কমান্ডারদের নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন– 'তবে নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলো না। যেখানেই আক্রমণ করবে, কার্যকর আঘাত হানবে এবং নিরাপদে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে। আক্রান্ত হলে দৃঢ়পদে লড়াই করবে এবং শত্রুকে বেরিয়ে যেতে দেবে না। এই এতোগুলো সৈনিক তোমাদের উপর ভরসা করে ঘুমায় আর এতোগুলো খাদ্য-সামগ্রীর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব তোমাদেরই।'

নিজ কর্তব্যের পুরোপুরিই অনুভূতি আছে সারেম মিসরীর সৈন্যদের। সুলতান আইউবী তাঁবু অঞ্চল থেকে বেশ দূরে বিভিন্ন টিলার উপর বিশ থেকে চল্লিশজন সৈনিকের কয়েকটি চৌকি স্থাপন করে রেখেছেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও তাঁবু অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান করা তাদের দায়িত্ব। এমনি একটি চৌকি দুশমনের নিশানায় পরিণত হয়ে যায়। চৌকিটির পেছনে কয়েকটি উঁচু পর্বত এবং একটি উপত্যকা। এই উপত্যকার মধ্যদিয়ে বাহিনী অতিক্রম করতে পারে। এই লুকানো পথটির উপর দৃষ্টি রাখার জন্যই এই চৌকিটি স্থাপন করা হয়েছিলো। দু'জন আরোহী দু'টি ঘোড়া নিয়ে সেখানে সর্বদা প্রস্তুত থাকতো। এখন সেখানে নিত্যদিনের রুটিন হয়ে গেছে যে, প্রতিদিন সূর্য অস্ত্র যাওয়ার পর তিন-চারটি তীর ছুটে আসছে এবং এক-দু'জন সৈনিককে শেষ করে দিচ্ছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা

একটি ঘোড়ার গায়ে একসঙ্গে তিনটি তীর এসে বিদ্ধ হয় এবং ঘোড়াটি ছটফট করে মারা যায়। তীর নিকটের পাহাড় থেকে আসতো এবং পরক্ষণেই অন্ধকার ছেয়ে যেতো। সে কারণে তীর নিক্ষেপকারীদের খুঁজে বের করা যেতো না।

একদিন সন্ধ্যার আগে চৌকির দু'জন সৈনিক পাহাড়ের এক স্থানে লুকিয়ে বসে যায়। সূর্য অস্ত যাচ্ছে বলে। দু'টি তীর ধেয়ে আসে। দু'টিই এই দু'সৈনিকের গায়ে-পিঠে আঘাত হানে। দু'জনই শহীদ হয়ে যায়। ভোরে তাদের আধখাওয়া লাশ তুলে আনা হলো। রাতে নেকড়েরা লাশের অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে। স্পষ্ট বুঝা গেলো, এটা খৃস্টান গেরিলাদের কাজ।

একদিন দশ সৈনিকের একটি টহল দল অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করা হলো। তারা পার্বত্য অঞ্চলে ঢুকে পড়ে চারজনের দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। একস্থানে দশ-বারো বছরের একটি কিশোর দেখা গেলো। ছেলেটা সৈনিকদের দেখে দৌড়ে একটি উঁচু টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ছেলেটা রাখাল হতে পারে। কিন্তু ওখানে কোন ভেড়া-বকরি বা উট কিছুই ছিলো না। সৈনিকরা সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুলে টিলার অভ্যন্তরে ছোট্ট একটি গুহা দেখতে পায়। ছেলেটি তারই ভেতরে ঢুকে গিয়ে থাকবে।

সৈনিকরা গুহার মুখে কান লাগায়। ভেতর থেকে ফিস ফিস কথা বলার শব্দ শুনতে পায়। একটি কিশোরের গুহার ভেতরে ঢুকে যাওয়া বিস্ময়কর কোন ঘটনা ছিলো না। কিন্তু সৈনিকরা ছেলেটাকে খৃস্টান গেরিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলো। তারা অনেক ডাকাডাকি করে। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া আসছে না। সৈনিকরা হুমকি দেয়, ভেতরে যে-ই আছো বেরিয়ে আসো। অন্যথায় আমরা ভেতরে ঢুকে সবাইকে হত্যা করে ফেলবো। এবার ভেতর থেকে এক যুবতী বেরিয়ে আসে। সে স্থানীয় ভাষায় সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। পরে কেঁদে ফেলে বললো, আপনারা আমাকে হত্যা করে ফেলুন। বিনিময়ে আমার সন্তানদের ক্ষমা করে দিন। মেয়েটির দু'টি সন্তান। একটির বয়স দশ-বারো বছর, যে বাইরে থেকে ছুটে এসে গুহায় ঢুকেছে। অপরটির বয়স কয়েক মাস। মহিলা তাকে ভেতরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছে।

সৈনিকরা তাকে বললো, আমরা মুসলিম সৈনিক। আমরা তোমার কোন ক্ষতি করবো না। কিন্তু মেয়েটি একদিকে তাদের গালাগাল করছে,

অপরদিকে অনুনয়-বিনয় করছে। সে জানালো, দু'দিন আগে এই পাড়ায় পনের-ষোলজন সৈনিক আসে এবং পাড়াটা দখল করে নেয়। তারা পাড়ার প্রতিটি ঘর তল্লাশি করে। আমার স্বামীকে তারা হত্যা করে ফেলে। খৃস্টান সৈন্যরা পাড়ার সকল শিশু-যুবক-বৃদ্ধ ও মহিলাদের এক স্থানে একত্রিত করে বললো, কেউ যেনো জানতে না পারে এই গ্রামে সৈন্য আছে। তারা তাদের এবং তাদের ঘোড়াগুলোর পানাহারের দায়িত্ব গ্রামবাসীর উপর চাপিয়ে দেয়। তাদের কমান্ডার তরবারী বের করে। আমার স্বামী সকলের সামনে দাঁড়ানো ছিলো। কমান্ডার তাকে বাহু ধরে টেনে আরো সম্মুখে নিয়ে তরবারীর এক আঘাতে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তারপর কমান্ডার সকলকে হুঁশিয়ার করে দেয়, কেউ আমার আদেশ অমান্য করলে তাকেও এমনি পরিণতি বরণ করতে হবে।

খৃস্টানরা গ্রামবাসীকে তাদের জন্য তিন-চারটি ঘর খালি করে দিতে বাধ্য করে এবং মেয়েদের ডেকে নিয়ে তাদের সেবা করাতে শুরু করে। এই মেয়েটি রাতে সুযোগ পেয়ে বাচ্চাদের নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। এখন সে জানে না, খৃস্টান সৈনিকরা এখনো এখানে আছে কিনা।

গ্রামটির অবস্থান এখান থেকে খানিক দূরে। মুসলিম সৈনিকরা মেয়েটিকে এখানেই রেখে গ্রামের দিকে চলে যায়। পাহাড়ী অঞ্চলের বাইরে বিস্তৃত একটি মাঠ। ওখানেই পনের-বিশটি কুঁড়ে ঘরের একটি পল্লী। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এই টহল দলটি অশ্বারোহী। তারা ঘোড়া হাঁকিয়ে গ্রামে গিয়ে উপনীত হয়। দখলদার খৃস্টান সৈনিকরা এখনো গ্রামে অবস্থান করছে। তারা সম্ভবত পাহারার ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। অশ্বারোহী মুসলিম সৈনিকরা গ্রাম থেকে সামান্য দূরে থাকতেই সকল খৃস্টান সৈন্য বেরিয়ে আসে। তাদের সম্মুখে কয়েকটি শিশু ও অনেকগুলো মহিলা। তারা শিশু ও নারীদেরকে একস্থানে একত্রিত করে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং নিজেরা উন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে তাদের চতুর্পার্শ্বে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে যায়। একজন সুলতান আইউবীর সৈনিকদের উদ্দেশে চীৎকার করে বললো– 'তোমরা যদি আর এক পা অগ্রসর হও, তাহলে আমরা এই শিশু ও নারীদের হত্যা করে ফেলবো।'

মুসলিম সৈনিকরা বিশ-পঁচিশ পা দূরে দাঁড়িয়ে যায়। তারা মুসলিম শিশু ও নারীদেরকে খৃস্টানদের হাতে খুন করাতে চাচ্ছে না।

'ওহে কাপুরুষগণ!'– সুলতান আইউবীর গেরিলা দলটির কমান্ডার

বললো– 'তোমরা যদি ক্রুশের খাতিরে লড়াই করতে এসে থাকো, তাহলে পুরুষের ন্যায় সম্মুখে এসে লড়াই করো। কাপুরুষের ন্যায় নারী ও শিশুদের ঢালের পেছনে দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

'তোমরা ফিরে যাও'– খৃস্টান কমান্ডার বললো– 'আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবো।'

খৃস্টান সৈনিকরা যে শিশু ও নারীদের পণ বানিয়ে রেখেছিলো, তাদের মধ্যে থেকে এক মহিলা সুলতান আইউবীর সৈনিকদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বললো– 'ইসলামের সৈনিকগণ! তোমরা দাঁড়িয়ে গেলে কেন? আমাদেরকে তোমাদের ঘোড়ার পদতলে পিষে ফেলো। এই কাফেরদের একজনকেও জীবিত ফিরে যেতে দিও না। আমরা শিশুদেরসহ মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত আছি।'

খৃস্টান কমান্ডার পূর্ণ শক্তিতে তরবারীর এক আঘাত হানে। মহিলার মাথাটা কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়। সুলতান আইউবীর টহল সেনাদলের কমান্ডার তার সৈনিকদেরকে তীর-ধনুক বের করে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেয়। তারা মুহূর্ত মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। সব ক'জন খৃস্টান সৈনিক নারী ও শিশুদের পেছনে বসে পড়ে।

'মিথ্যা ধর্মের পুজারীগণ!'– মুসলিম কমান্ডার বললো– 'সৈনিকরা নারী-শিশুদের পেছনে লুকায় না।'

খৃস্টান সৈনিকরা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলো, পাড়ায় পুরুষ মানুষও আছে। তারা লোকগুলোকে অনেক সন্ত্রস্ত করে রেখেছিলো। তারাও তাদের নারী-শিশুদের জীবনহানির ভয়ে তটস্থ। ইতিমধ্যে এক নারী হুংকার ছেড়ে বললো– 'এই কাফেরগুলো তো কাপুরুষ। তোমরা আমাদের জীবনের ভয় করছো কেন?' মহিলা তার সম্মুখে দণ্ডায়মান তিন-চার বছর বয়সের একটা শিশুকে তুলে সম্মুখে মাটিতে ছুঁড়ে বললো– 'আমি সন্তুষ্টচিত্তে আমার এই সন্তানটিকে কুরবানী দিচ্ছি। তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়ো। দশজন কাফেরের জীবন হরণ করার লক্ষ্যে আমি আমার এই সন্তানকে কুরবান করছি।'

এক খৃস্টান তরবারী উঁচু করে মহিলাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু অতটুকু সুযোগ সে পেলো না। পেছন থেকে পাড়ার সকল পুরুষ বর্শা, লাঠি এবং যে যা হাতে পেয়েছে নিয়ে এসে খৃস্টান সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খৃস্টান সেনারা আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নারী ও শিশুদের পেছনে বসেছিলো। এবার তারা গ্রামবাসীদের মোকাবেলার জন্য উঠে দাঁড়ায়। অমনি মুসলিম সৈনিকরাও তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দু'তিনজন সৈনিক চীৎকার করে বলতে থাকে– 'মহিলারা পালিয়ে যাও। শিশুদেরকে একদিকে সরিয়ে নাও। মুসলিম সৈনিকদের ঘোড়াগুলো মরুঝড়ের ন্যায় ধেয়ে আসে। মহিলারা শিশুদের তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যে দু'খৃস্টান সৈনিক ছাড়া সকলে মারা যায়। গ্রামবাসীরা তাদের লাশগুলো ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। তারা জীবিত খৃস্টানদেরকেরও নিজ হাতে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। কিন্তু মুসলিম সেনাদলের কমান্ডার তাদের বড় কষ্টে বুঝাতে সক্ষম হয়, এদের মাধ্যমে এদের অন্যান্য সঙ্গীদের তথ্য বের করতে হবে। কাজেই এদের জীবিত বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন।

জীবিত দু'খৃস্টান সেনাকে সুলতান আইউবীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহর হাতে তুলে দেয়া হলো। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাদের বললেন, ভালোয় ভালোয় তোমাদের অন্যান্য গেরিলাদের সব তথ্য বলে দাও। তারা ধরা খাওয়া পরাজিত সৈনিক। হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে সকল তথ্য বলে দেয়। এরা বল্ডউইনের বাহিনীর গেরিলা সৈনিক। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক কমপক্ষে এক হাজার গেরিলা সুলতান আইউবীর ফৌজ ও রসদের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে বৈরুত থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো তাদের স্থায়ী কোন আস্তানা গড়ে ওঠেনি। তারা সমগ্র অঞ্চলে দলে দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এভাবে ছোট পাড়া-পল্লী দখল করে সেখান থেকে খাদ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করতে এবং সুলতান আইউবীর সৈনিকদের কোণঠাসা করে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জীবিত দুই সেনাকে সুলতান আইউবীর সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হলো। সুলতান তাদের বক্তব্য শুনেন এবং নির্দেশ দেন– 'দূরে কোথাও নিয়ে এদের হত্যা করে ফেলো। এরা খুনী ও লুটের অপরাধে অপরাধী।'

সুলতান তার সালারদের বললেন– 'এতে প্রমাণিত হচ্ছে খৃস্টান গেরিলাদের মসুল কিংবা অন্য কোন দুর্গে অবস্থান গ্রহণের অনুমতি মেলেনি। অন্যথায় এই গ্রামটাকে আস্তানা বানাতো না।' সুলতান নির্দেশ দেন– 'এ ধরনের প্রতিটি গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করে খোঁজ নাও। সৈনিকদেরকে কঠোরভাবে বলে দেবে, যেনো তারা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার না করে। তারা তাদের ও ঘোড়ার খাদ্য ফৌজের রসদ থেকে সংগ্রহ করবে। গ্রামবাসীদের থেকে একটি দানাও যেনো গ্রহণ না করে।'

❖ ❖ ❖

গোয়েন্দাদেরকে ঝুঁকি মাথায় নিয়েই কাজ করতে হয়। তথ্য সংগ্রহে তাদের অসাধ্য সাধনও করতে হয় আবার চেষ্টা করতে হয়, যাতে ধরা না পড়ে। হাসান গোয়েন্দা। এ মুহূর্তে তাকে যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। তার সারার সেই কথাগুলো মনে পড়ছে, যার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ মিলছে, মেয়েটা মুসলমানদের ভালোবাসে। হাসান এও অনুভব করেছে যে, সারার মনে সন্দেহ জেগে গেছে, হাসান মুসলমান। ভাবতে ভাবতে হাসানের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

দূর থেকে ফজরের আযান কানে আসতে শুরু করেছে । আযানের অর্থবহ সুললিত বাক্যগুলো তার মন-মস্তিষ্কে ইসলাম ও মহান আল্লাহর মহত্ত্ব জাগিয়ে তোলে। আল্লাহই তাকে সাহায্য করতে পারেন। হাসান ওঠে অজু করে কক্ষের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। খৃস্টানদের এই জগতে হাসান মুসলমান নয়– খৃস্টান। হাসান আল ইদরীস নয়– গলবার্ট জ্যাকব।

ছোট্ট একটি কক্ষে একা থাকে হাসান। কক্ষে ক্রুশের সঙ্গে হযরত ঈসার প্রতিকৃতি ঝুলানো থাকে। দেয়ালে কোন চিত্রকরের আঁকা মেরির ছবি। হাসান প্রতিকৃতি, ছবি ও ক্রুশ দেয়াল থেকে সরিয়ে খাটের নীচে রেখে দেয়। দরজার ভেতর দিকের শেকলটা আটকে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করে। হাসান প্রতিদিনই এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়ে থাকে। কিন্তু আজ ফজরের নামাযে যে আবেগময় অবস্থার সৃষ্টি হলো, তেমনটি অতীতে কোনদিন হয়নি। হাসানের চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসে। হাসান তেলাওয়াত করছে। আজ আবেগ তার নিয়ন্ত্রণ মানছে না। 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন' (আমি কেবল তোমারই ইবাদত করছি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি) বলার সময় তার কণ্ঠটা বেশ উঁচু হয়ে যায়। জীবনে তার এই প্রথমবার অনুভব হলো যেনো আল্লাহ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং এতো নিকটে যে ইচ্ছা করলে সে আল্লাহকে স্পর্শ করতে পারে।

নামায শেষ করে হাসান দু'আর জন্য হাত তুলে। চক্ষু বন্ধ হয়ে যায়। মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে– 'মুসলমানের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসার খোদা! তোমার নাম উচ্চারণকারী, তোমার রাসূলের কালেমা পাঠকারী মুসলমান কাফেরদের ভয়ে তোমার মসজিদে আকসায় তোমার সমীপে সেজদাবনত হতে ভয় পাচ্ছে। তোমার প্রথম কেবলা আজ

বিরান হয়ে গেছে। যে ভূখণ্ড তোমার রাসূলের পদধূলিতে পবিত্র ও বরকতময় হয়েছিলো, তার উপর আজ ক্রুশের ছায়া পড়ে আছে। যে বনী ইসরাইলকে তুমি বিতাড়িত করে দিয়েছিলে, তারা আজ তোমার প্রথম কেবলাকে হাইকেলে সুলায়মানী বলছে। হে আমার আল্লাহ! আমাকে তুমি তোমার বড়ত্বের প্রমাণ দাও। বলো, তুমি মহান নাকি ইহুদীদের খোদা মহান। বলো, ঈসা তোমার কাছে আছেন নাকি ক্রুসেডারদের ক্রুশের উপর ঝুলছেন। আমাকে তোমার মহত্ত্বের প্রমাণ দাও। তোমার কুরআনের মহত্ত্বের প্রমাণ দাও। তোমার রসূলের মহত্ত্বের প্রমাণ দাও। আমাকে, ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে তোমার রাসূল ও কুরআনের মহত্ত্ব বুঝাবার যোগ্যতা দান করো। যে পাহাড়গুরো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এবং তোমার প্রথম কেবলার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে, আমাকে সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার শক্তি ও সাহস দান করো। আমাকে তুমি আলো দান করো, যেনো এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমি আমার কর্তব্যের গন্তব্য দেখতে পাই। আমাকে তুমি এমন কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করো, যেনো আমার জীবন তোমার নামে কুরবান হয়ে যায়। তবে প্রতিশ্রুতি দাও, আমার জীবন বৃথা যাবে না। আমাকে তুমি সেই সাহস ও আলো দান করো, যার মাধ্যমে আমি তোমার জন্য শাহাদাতবরণকারী মর্দে মুজাহিদদের প্রতি ফোঁটা রক্তের প্রতিশোধ নিতে পারি। আমাকে তুমি সাহস দান করো, যেনো আমি কুফরের প্রতিটি দুর্গকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারি। তুমি আমাদের সকলকে সাহস ও হেদায়াত দান করো, যেনো আমরা আমাদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারি, যেনো অনাগত প্রজন্ম বলতে না পারে আমরা আত্মমর্যাদাহীন মানুষ ছিলাম। আজ পাথরের মূর্তিরাও তোমার নামে ঠাট্টা করছে। তুমি আমাকে বীরত্ব দান করো, যেনো আমি এই মূর্তিগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তোমার নাম সমুন্নত করতে পারি। হে আমার আল্লাহ! অন্যথায় তুমি আমার দেহের রক্তগুলো পানি করে দাও। আমাকে এমন আত্মমর্যাদাহীন করে দাও, যেনো আমি ভুলেই যাই আত্মমর্যাদা কাকে বলে। তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে নিয়ে নাও, যেনো আমি ইসলামের কন্যাদের নির্লজ্জ ও বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে না পাই। তুমি আমার শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে নাও, যেনো আমি তোমার নাম শুনতে না পাই। যেনো আমি সেই মুসলমানদের ফরিয়াদ শুনতে না পাই, যারা ফিলিস্তীনে ইহুদী-খৃস্টানদের গোলাম হয়ে আছে।'

হাসানের কণ্ঠ উঁচু হয়ে যায়– 'তুমি কোথায়? তুমি কি আছো, নাকি নেই? বলো আমার আল্লাহ! বলো, আমাকে বাক্‌শক্তিদানকারী আল্লাহ! বলো, ইসলাম সত্য, নাকি ক্রুশ সত্য। অন্যথায় আমাকেই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দাও, সত্য কে– ইসলাম না ক্রুশ। বলো, বলো।'

কণ্ঠটা ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে হাসান আল-ইদরীসের। খোদার দরবারে আকুতির চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে লোকটা। এখন মনে হচ্ছে যেনো ছাদটা দুলছে। পরক্ষণেই এমন বিকট শব্দে আকাশে বজ্রপাত ঘটে, যেনো হাসানের কক্ষটা দুলে ওঠে। হাসান কক্ষের দরজায় বিজলির ঝলকানি দেখতে পায়। এবার সে কণ্ঠটা আরো উঁচু করে বলে ওঠে– 'হে আল্লাহ! এই বজ্র দ্বারা আমাদের মসজিদে আকসাকে ভস্ম করে দাও। মুসাফির-মনযিল উভয়কে তুমি ধ্বংস করে দাও।'

আবারো বজ্রপাত ঘটে। বৈরুতের সমুদ্রোপকূল নিকটেই ছিলো। ঋতুটা নদ-নদীর শান্ত থাকার। কিন্তু এক্ষুণে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের পাহাড়সম ঊর্মিমালার ভয়ানক গর্জন এমন ধারায় হাসানের কানে এসে প্রবেশ করছে, যেনো রোম উপসাগরের ক্ষেপে যাওয়া ঢেউগুলো তার কক্ষের দেয়ালের সঙ্গে আছড়ে পড়ছে। বিজলীর চমক, বজ্রের গর্জন এবং সমুদ্রের উতলা একত্রিত হয়ে মহাপ্রলয়ের রূপ ধারণ করেছে। হাসানের কণ্ঠ আরো বেশি উঁচু হয়ে যায়।

'এমনি একটি ঝড় আমার মধ্যে তুলে দাও, যেনো আমি কুফরের প্রতিটি চিহ্নকে উড়িয়ে ও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারি। মসজিদের আকসার আঙ্গিনায় তুমি আমার খুন বইয়ে দাও। আমি লজ্জিত যে, প্রথম কেবলার মহান প্রহরী সুলতান সালাহুদ্দীন এখানে তোমাদের সৈনিকদের নিয়ে এলেন আর আমি তাকে সতর্ক করতে পারলাম না, আপনি আসবেন না; বৈরুতে আপনার জন্য ফাঁদ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আমি অক্ষম ছিলাম। তবুও স্বীকার করি, এটা আমার মস্তবড় গুনাহ। তুমি আমাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সাহস ও বীরত্ব দান করো। অন্যথায় আমার বিবেক আমাকে দংশন করবে যে, তোমার খোদা বলতে আসলে কেউ নেই। আমাকে তুমি এই মূর্তিগুলোর সম্মুখে লজ্জিত করো না। তুমি যদি আমার দুআ কবুল না করো, তাহলে কেয়ামতের দিন আমার মৃতদেহে জীবন দিও না। অন্যথায় আমি তোমার কলার ধরে ফেলবো এবং তোমার সৃষ্টিকে বলবো, এই সেই খোদা যিনি আপন রাসূলের লাজ রক্ষা করেননি।

ইনি এমন এক খোদা, যদি রাসূলের অনুসারীদেরকে এতো অক্ষম ও অসহায় করে তুলেছিলেন যে, প্রথম কেবলা বিরান হয়ে গিয়েছিলো এবং তার উপর ক্রুশের অপচ্ছায়া পতিত হয়েছিলো।'

আকাশটা আবারো গর্জে ওঠে। হাসানের কক্ষের দরজা-জানালা ও ছাদ সজোরে কেঁপে ওঠে। ছাদের উপর এমন শব্দ হতে শুরু করে, যেনো ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঝড়-বৃষ্টিতে আকাশ-জমিন কাঁপছে। ভয়ে আবেগে হাসানের পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছে না। মাঝে-মধ্যে মনে হচ্ছে, যেনো সে স্বপ্ন দেখছে। হাসান আল্লাহর সঙ্গে এভাবে কখনো কথা বলেনি। চুপচাপ নামায আদায় করে সংক্ষেপে দুআ করে জ্যাকবে পরিণত হয়ে যেতো হাসান।

আজ রাত হাতেমকে রিপোর্ট করে যখন হাসান ফিরে এলো, তখন তার মনের অবস্থা ছিলো অন্যদিনের চেয়ে ব্যতিক্রম। তার ঘুম পাচ্ছিলো। কিন্তু সম্মুখে এমন একটি সমস্যা যে ভাবতে ভাবতে হাসান পাগলের মতো হয়ে যেতে শুরু করে। তার জন্য সহজ পথ এই ছিলো, যে সমস্যার কোন সমাধান নেই, তা মাথা থেকে ফেলে দিতো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী, আলী বিন সুফিয়ান এবং তার নেতা হাতেম তো জানতেন না ইযযুদ্দীনের দূত বল্ডউইনের নিকট এসেছে এবং কিছু একটা চুক্তি হচ্ছে। নিজে চুপ থাকলেই হতো। চাকরির বেতন-ভাতাটা তো ঘরে বসে পিতা-মাতা ঠিকই পেয়ে যাচ্ছেন। বৈরুতে নিজে থাকছে রাজার হালে। কিন্তু হাসান আল-ইদরীস একজন মর্দে মুমিন। কর্তব্যকে নামায-রোযারই মতো গুরুত্বপূর্ণ আমল মনে করে হাসান। হাসান মনে করে, জাতির প্রতিজন সদস্য যদি ভাবে কাজটা অন্য কেউ করবে, আমি না করলেও চলবে, তাহলে পরাজয়ই জাতির ভাগ্যলিপি হয়ে যেতে বাধ্য।

হাসান রাতে একতিল ঘুমায়নি। এখন জায়নামাযেই ঘুম চেপে ধরেছে তাকে। এই আবেগময় অবস্থায় তার ঘুম না পাবারই কথা ছিলো। কিন্তু এই নামায ও দুআর পর হাসান এমন শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে যে, তার শান্তিময় আত্মা অস্থির দেহ ও মস্তিষ্ককে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। হাসান সেখানেই কাৎ হয়ে পড়ে থাকে। জায়নামাযটা লুকিয়ে ঈসার মূর্তি, মরিয়মের ছবি এবং ক্রুশটা খাটের নীচ থেকে তুলে এনে আপন আপন জায়গায় রেখে দেবে, সেই সুযোগটাও পেলো না। একটা সুখনিদ্রা এসে

ঝাপটে ধরেছে যেনো তাকে। প্রয়োজন ছিলো, ভেতরে সব ঠিকঠাক করে দরজাটা খুলে রেখে জ্যাকবের বেশে শুয়ে পড়া।

হাসান স্বপ্নের জগতে চলে যায়। স্বপ্নে মসজিদে আকসা দেখে। এই মসজিদটা সে একবার দেখেছিলো। যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়েছিলো, তখন। মসজিদটা অনাবাদ ছিলো। তার উন্মুক্ত দরজাগুলো চোখ মেলে নামাযীদের চেয়ে চেয়ে দেখছিলো। কিন্তু মুসলমানরা নামায পড়ছে অন্যান্য মসজিদে কিংবা নিজ নিজ ঘরে। ইহুদী-খৃস্টানদের সন্তানরা মসজিদের আঙ্গিনাটাকে খেলার মাঠ বানিয়ে রেখেছিলো। সেখানে অসংখ্য ছেলেমেয়ে জুতা পায়ে খেলা করছিলো। খৃস্টানরা সেখানকার মুসলমানদের সন্ত্রস্ত করে রেখেছিলো। হাসান মসজিদে আকসার পবিত্র ভূমি এবং মুসলমানদের জন্য তার গুরুত্ব ভালোভাবেই জানতো। সেখানে তার নাম ছিলো রেল্ফ নেকালসন।

এখন হাসান বৈরুতে স্বপ্নে মসজিদে আকসা দেখছে। মসজিদের গম্বুজের উপর অনেকগুলো পায়রা বসে আছে। সবগুলো পায়রা একসঙ্গে উড়ে শূন্যে উঠে স্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়ে যায়। স্ফুলিঙ্গগুলো মসজিদে আকসার আশপাশে পড়তে শুরু করে। খৃস্টান ও ইহুদীদের একটি ভিড় বেরিয়ে আসে। তাদের প্রত্যেকের গায়ের পোশাকে আগুন ধরে গেছে। তারা সকলে এদিক-ওদিক পালিয়ে যাচ্ছে। তারা চীৎকার ও হৈ-হুল্লোড় করছে। কিন্তু কারো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ স্ফুলিঙ্গগুলো রং-বেরঙের পাখিতে পরিণত হয়ে যায়। পাখিগুলো মসজিদে আকসার সবুজ গম্বুজের উপর গিয়ে বসতে শুরু করে। এখন মসজিদে না কোন ইহুদী আছে, না খৃস্টান।

হাসান ধীরে ধীরে মসজিদের দিকে হাঁটা দেয়। আকাশটা নীল। দিনের আলোতেও নীল। মসজিদের দরজায় এমন চাকচিক্য দেখা যাচ্ছে যেনো বড় একটি আয়নার উপর সুর্যের কিরণ এসে পড়েছে।

হাসানের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সে চোখ দুটো বন্ধ করে আবার খোলে। কিন্তু এখন আর সেখানে সেই আলোর ঝিলিক নেই। দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। সারা। সারা মিটিমিটি হাসছে। হাসান বিস্ময়াভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাঁদের ন্যায় সাদা চাদরে আবৃতা। শুধু মুখমণ্ডল আর হাত দুটো দেখা যাচ্ছে। তার হাসি মুখের দাঁতগুলো এতো শ্বেত-শুভ্র দেখাচ্ছে, যে শুভ্রতা এই পৃথিবীর মানুষ কখনো দেখেনি। সারা

তার বাহু দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দেয়। ঠোঁট দুটো বন্ধ। কিন্তু হাসান তার সুরেলা কণ্ঠ শুনতে পায়– 'এসো পড়ো, মসজিদে আকসা আমাদের। যে কাফের এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আকাশ তার উপর আগুন বর্ষণ করবে। যে মুসলমান এই মসজিদের পবিত্রতা ভুলে গেছে, তারও উপর আগুন বর্ষিত হবে। আমি তার আঙ্গিনাকে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে দিয়েছি। আমার সব পাপ মুছে গেছে। আসো- আসো।'

হাসানের চোখ খুলে যায়। সে আবার চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলে। এই সুখময় স্বপ্ন থেকে ফিরে আসতে চাইছে না হাসান। কিন্তু মুদিত চোখে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। হাসান বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে। ছাদের উপরে এবং এদিক-ওদিক মুষলধারা বৃষ্টির কানফাটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে উত্তাল সমুদ্রের ভয়ানক গর্জন। সমুদ্রটা এখন পূর্বের তুলনায় বেশি ক্ষিপ্ত। ঝড়-বৃষ্টি এবং রোম উপসাগরের এই তর্জন-গর্জনের মধ্যেই হঠাৎ হাসানের মনে হলো, কে যেনো দরজায় করাঘাত করেছে। এটা তার কল্পনাও হতে পারে। তবু হাসান শয্যা ছেড়ে ওঠে দাঁড়ায়। ক্রুশ ও ঈসা-মরিয়মের প্রতিকৃতি দুটো নিজ নিজ স্থানে ঝুলিয়ে রাখে। দরজায় আবারো করাঘাত পড়ে। হাসান জায়নামাযটা ভাজ করে লুকিয়ে রেখে দরজা খুলে দেয়।

দরজায় দাঁড়িয়ে সারা হাসছে। এতো মুষলধারা বৃষ্টি পড়ছে যে, বারান্দার বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সারার গায়ের পোশাক আর মাথার চুল থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে।

'এই ঝড়ের মধ্যে তুমি আমার নিকট এসেছো?' সারাকে ভেতরে আসতে বলে হাসান বললো।

'না, জ্যাকব!'– সারা উত্তর দেয়– 'আমি অন্য একজনের নিকট গিয়েছিলাম। পাইনি। গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। সারাটা রাত মদপান করেছে আর ফস্টি-নস্টি করেছে। এখন লাশের মতো ঘুমাচ্ছে। জাগবে সেই সন্ধ্যায়। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিরাশ মনে এদিকে চলে এসেছি। ঝড় আমাকে সামনের দিকে হাঁটতে দিচ্ছিলো না। তোমার কাছে দিনের বেলা আসতে তো কেউ আমাকে ঠেকাতে পারে না।'

হাসান একটা কাপড় হাতে নিয়ে সারার মাথার উপর ছড়িয়ে দেয়। তারপর নিজ হাতে সেই কাপড় দ্বারা তার চুলগুলো মুছে দিতে শুরু করে। হাসানের এই অকৃত্রিম আচরণ সারার ভালো লাগে। হাসান তার মুখটাও

মুছে দেয়। তারপর একটা চাদর ধরিয়ে দিয়ে বললো– 'আমি ওদিকে ফিরে থাকছি, তুমি ভেজা কাপড়টা খুলে এটা পেঁচিয়ে নাও।'

সারা পরিধানের ভেজা পোশাকটা খুলতে গিয়ে ভাবে, আমার প্রতি লোকটার ভালোবাসা এতোই আত্মিক যে, আমার দেহটার সঙ্গে এই প্রেমের কোনই সম্পর্ক নেই নাকি– তার অন্তরটা একেবারেই মৃত? সারা যখন হাসানকে বললো, আমি কাপড় পরিবর্তন করেছি, তখন হাসান অন্যদিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে আনে এবং সারার ভেজা কাপড়টা বারান্দায় নিয়ে চিপে শুকাতে দেয়।

'এবার বলো, কোথায় গিয়েছিলে?'– হাসান জিজ্ঞেস করে– 'আর রাতে আমার চলে যাওয়ার পর কী হয়েছিলো? মহিলা কি ভেতরে এসেছিলো?'

'সে সূত্রেই এদিকে এসেছিলাম'– সারা উত্তর দেয়– 'মহিলা কক্ষে প্রবেশ করে শর্ত সাপেক্ষে আমাকে ক্ষমা করার প্রস্তাব দেয়। তুমি আমার কক্ষে এসেছিলে আমি স্বীকার করিনি। তার শর্তটা শুধু এই জন্য মেনে নিয়েছি যে, না হলে তোমার কথা বলতে হতো। তখন আমার সঙ্গে তোমাকেও শাস্তি ভোগ করতে হতো। আর তুমি জানো, শাস্তিটা কতো ভয়ানক হতো। আমি কোন পবিত্র মেয়ে নই। তারপরও মসুলের অতিথি কিংবা অন্য কারো শয়নকক্ষে যাওয়া আমার ভালো লাগে না। আমি নর্তকী ঠিক, কিন্তু বুড়িটা আমাকে যেভাবে খেলনা বানিয়ে রাখতে চায়, আমি তা মেনে নিতে পানি না। আমার নিজের একটা পছন্দ-অপছন্দ আছে। জীবনে বহু পাপ করেছি। কিন্তু কারো উপার্জন কিংবা অন্য কারো পাপের মাধ্যম হতে পারি না। মহিলা আমাকে বললো, এ কাজে তুমিও বিনিময় পাবে। চুপি চুপি দেবো, কেউ টের পাবে না। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, ঠিক আছে, তোমার কথামতো আজ রাতে আমি মসুলের একজন মেহমানের নিকট চলে যাবো। কিন্তু এখন চেষ্টা করছি, সম্রাটদের বলে দেবো, এই মহিলা মহলে গোপন ব্যবসা চালু করেছে।'

'আর সে বলে দেবে, রাতে তোমার কক্ষে পুরুষ মানুষ যাওয়া-আসা করছে।' হাসান বললো।

'বলুক'– সারা বললো– 'আমি এখন যে কোন শাস্তি মাথা পেতে বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি। প্রয়োজনে আত্মহত্যা করতেও প্রস্তুত। মহিলাটার মুখোশ আমি খুলেই ছাড়বো। আমি নর্তকী। বেশ্যাবৃত্তি আমি করবো না।'

'আচ্ছা, নাকি আমিই এগিয়ে গিয়ে বলে দেবো, রাতে তোমার কক্ষে

আমি গিয়েছিলাম?'– হাসান বললো– 'বলবো, তোমার সঙ্গে আমার দৈহিক নয়– আবেগের সম্পর্ক রয়েছে।'

'এ কথাটা যদি বলা যেতো, তাহলে আমি নিজেই বলে দিতাম, আমার কক্ষে জ্যাকব এসেছিলো'– সারা বললো– 'কিন্তু এ তথ্য স্বীকার করা আর নিজেকে ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ঘোড়া হাঁকানো সমান। কেউই মেনে নেবো না, তোমার-আমার মাঝে আত্মিক সম্পর্ক আছে। এরা মানুষের আবেগ-চেতনা সম্পর্কে অবহিত হয়। এদের কাছে সম্পর্ক মানেই দৈহিক। তুমি এ্যালবার্তুকে চিনে থাকবে। ইতালির নাগরিক। একজন সৎ ও হৃদয়বান অফিসার। বল্ডউইনের উপর তার বেশ প্রভাব আছে। শুধু এই একজন অফিসার আছেন, যিনি আমার প্রতি পবিত্র চোখে তাকিয়ে থাকেন। আমি তাকে রাতের ঘটনা শোনাবো এবং নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করার চেষ্টা করবো। যদি আমার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবো। সমুদ্র যদি আমার লাশটা উগরে দেয়, তাহলে হয়তো তুমি আমাকে দেখবে। অন্যথায় এখনই বিদায়। রোম উপসাগরের মাছ খেলে তাতে আমার দেহের ঘ্রাণ পাবে।'

'সারা!'– হাসান বললো– 'তুমি খৃস্টান নও। তোমার সহকর্মীদের মধ্যে একটি মেয়েও এমন নেই, যে দৈহিক বিলাসিতা এবং উপহার-উপঢৌকনের প্রস্তাবকে তোমার ন্যায় প্রত্যাখ্যান করবে। আজ অবধি তুমি আমার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা বলেছো, তাতে আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি, তোমার শিরায় মুসলমানের রক্ত আছে। সেই রক্তই আজ তোমার মধ্যে টগবগ করছে। বলো, আমি কি মিথ্যে বলছি?'

সারা হাসানের প্রতি তাকায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো– 'শোনো জ্যাকব!...'

'আমি জ্যাকব নই সারা!'– হাসান বললো– 'আমার নাম হাসান আল-ইদরীস। বাড়ি সিরিয়া। এখানে এসে জ্যাকব গলবার্ট হয়েছি।'

'গোয়েন্দা?'

'অন্য কোন কারণও হতে পারে'– হাসান বললো– 'গুপ্তচরবৃত্তিই একমাত্র কারণ নয়। দেখো, আমরা দু'জন একজন অপরজনের আত্মায় ঢুকে পড়েছি। তার কারণ, আমরা উভয়ে মুসলমানের সন্তান।' জ্যাকব গোপন একটা জায়গা থেকে জায়নামাযটা বের করে। একস্থান থেকে একটি পাথর সরিয়ে তার পেছন থেকে ছোট্ট এক কপি কুরআন হাতে

নেয়। জায়নামায ও কুরআনখানা সারাকে দেখিয়ে বললো– 'এগুলো ছাড়া আমি থাকতে পারি না। এই মূর্তি, এই ছবি, এই ক্রুশ প্রতারণা মাত্র।'

'আমি যদি কাউকে বলে দিই, তুমি খৃস্টান নও মুসলমান, তাহলে কী করবে?'– সারা হেসে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি গোয়েন্দা হতে পারো না। গোয়েন্দারা নিজেদেরকে এভাবে প্রকাশ করে না।'

'বলে দাও'– হাসান বললো– 'আমি তোমার চোখের সামনে এই ঝড়-তুফানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবো। তবে সারা! আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তুমি বলবে না।'

হাসান আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নিজের হাত দুটো পেয়ালার মতো করে সারার মুখমণ্ডলটা তাতে নিয়ে কাছে টেনে আনে। তার চোখে চোখ রেখে ক্ষীণ অথচ ক্রিয়াশীল ও যাদুময় কণ্ঠে বললো– 'আমি জানি, তুমি কাউকে বলবে না লোকটা জ্যাকব নয়– হাসান। তুমি বলতে পারবেই না। আমাদের শিরায় আল্লাহর রাসূলের প্রেমিকদের রক্ত আছে। এই রক্ত সাদা হতে পারে না। এই রক্ত কাউকে ধোঁকা দিতে পারে না।'

হাসানের চোখ দুটো সারার চোখে আটকে যায়। সারা অনুভব করতে শুরু করে, যেনো এই সুদর্শন যুবকটা সুন্দর একটা ভূতের ন্যায় তার মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের উপর জেঁকে বসেছে। হাসান বলছে– 'তুমি নাচের জন্য নয়– মসজিদে আকসাকে কাফেরদের দখল থেকে মুক্ত করতে জন্মলাভ করেছো। আল্লাহ আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন। এখন আর বলো না তুমি মুসলমান নও। বলতে পারবেই না। কথা বলো সারা! আমি তোমাকে আমার তথ্য দিয়েই দিয়েছি। আমাকে তুমি তোমার তথ্য দিয়ে দাও। তোমার দেহের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তোমার আত্মাটাকে আমি পবিত্র দেখতে চাই।'

সারার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। টল টল করে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। ক্ষীণ স্বরে বললো– 'হ্যাঁ হাসান! আমি মুসলমান। আমি আমার পিতার পাপের শাস্তি ভোগ করছি। আমি সারা নই– সায়েরা।'

'পাপটা যারই থাকুক'– হাসান বললো– 'আজ পর্যন্ত আমি তোমার যেসব কথাবার্তা শুনেছি এবং তুমি যে ধারায় কথা বলছিলে, তাতেই আমি ধরে নিয়েছি সেই পাপ তোমাকে দংশন করছে। তুমি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছিলে। তাতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে এই দংশন তোমাকে অস্থির করে রাখছে।'

'যখন থেকে তুমি আমার আত্মাটাকে পবিত্র ভালোবাসায় ধন্য করেছো, আমার কাছে ভোগ-বিলাসিতার এই জীবনটা জাহান্নামের চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক অনুভব হতে শুরু করেছে। আমি পাপের মধ্যে লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়েছি এবং পাপের মধ্যেই যৌবন লাভ করেছি। সেই পাপের সৌন্দর্য আজ বিষাক্ত নাগিনী হয়ে আমাকে দংশন করছে। এখন আর আমি বেঁচে থাকতে চাই না।'

নিজের জীবন হরণ করাও পাপ'– হাসান বললো– 'আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। এটা তার ওয়াদা। তুমি পাপের কাফফারা আদায় করো। তোমার সকল অস্থিরতা-অশান্তি শান্তিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে।'

'বলো, কী করবো?'– সারা চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে বললো– 'নামায পড়বো? দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাবো? বলো হাসান! আমি কিভাবে পাপের কাফফারা আদায় করবো?'

'গুপ্তচরবৃত্তি'– হাসান উত্তর দেয়– 'মাত্র একবার– প্রথম ও শেষবার। আগে লক্ষ্য বুঝে নাও। মানুষের লক্ষ্য যতো মহৎ হয়, মানুষ ততো মহান হয়। জানো, নূরুদ্দীন জঙ্গীর লক্ষ্য কী ছিলো? সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর লক্ষ্য কী? এতো অনেক বড় লোকদের কথা। তাদের মোকাবেলায় আমি কিছুই না। তারপরও তুমি আমার ব্যক্তিসত্ত্বায় এবং আমার চোখে এমন প্রভাব দেখে থাকবে, যা তোমার থেকে সত্য বের করিয়ে ছেড়েছে। এটা মূলত আমার ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া নয়। এটা আমার জীবনের লক্ষ্যের ক্রিয়া, যা আমার নিকট ঈমানের চেয়েও বেশি প্রিয়। আমার লক্ষ্যের মহত্ব এবং পবিত্রতার কারণেই তোমার এই রূপ-যৌবন আমার উপর ক্রিয়া করতে পারেনি। কেন পারেনি? কারণ, আমি মানুষ ও বস্তুকে আত্মার চোখে দেখে থাকি।'

'আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর লক্ষ্য ভালোভাবে জানি'– সারা বললো– 'আমি এও জানি, খৃস্টান শাসকবর্গ মুসলিম আমীর ও শাসকদেরকে সাহায্য এবং বিলাসিতার উপকরণ দিয়ে তাদেরকে সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছে। আমি আরো জানি, ক্রুসেডাররা ইসলামী জগতটাকে ক্রুশের ছায়ায় নিয়ে আসতে চাচ্ছে। হাসান! সুলতান সালাহুদ্দীন ও খৃস্টানদের এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আমি এখানে এসে জানতে পেরেছি। অন্যথায় আমিও ক্রুশের বানে ভেসে গিয়েছিলাম। এই বান আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। শোনো হাসান! আজ কিছুদিন হলো

মসজিদে আকসা আমার হৃদয়ের উপর জয়ী হয়ে আছে। দু'রাত আমি স্বপ্নে মসজিদে আকসা দেখেছি। আমি এ যাবত চর্মচক্ষে এই মসজিদটি দেখিনি। আমি জানি না, মসজিদে আকসা দেখতে কেমন। স্বপ্নে দেখেছি। ভেতরে গিয়েছি। মসজিদটা শূন্য এবং বিরান। আমি একটি কণ্ঠ শুনতে পেলাম– 'এটি তোমার খোদার ঘর। তুমি একে আবাদ করো।' আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে শুরু করলাম, শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসলো। এমন সময় আমার চোখ খুলে যায়। শব্দটা আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। আচ্ছা, আমি কি একেই আমার লক্ষ্য বানাতে পারি না?'

'এটা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য'– হাসান বললো– 'কিন্তু এর জন্য বহু কুরবানী দিতে হবে। আমি বৈরুতে প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকি। যেদিন ধরা পড়বো, সেদিনটি হবে আমার জীবনের শেষ দিন।'

'আমি কুরবানী দিতে প্রস্তুত আছি'– সারা বললো– 'আমাকে কর্তব্য বুঝিয়ে দাও।'

ঐ বৃদ্ধা তোমাকে মসুলের যে দূতের বিনোদনের জন্য যেতে বলেছে, তুমি তার নিকট চলে যাও।' হাসান বললো।

সারা বিস্ময়াভিভূত অপলক নয়নে হাসানের প্রতি তাকিয়ে থাকে, যেনো তার চোখ দুটো আটকে গেছে।

'হ্যাঁ সারা!'– হাসান বললো– 'এই ত্যাগ তোমাকে দিতেই হবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী গুপ্তচরবৃত্তির জন্য মেয়েদের কোথাও প্রেরণ করেন না। তিনি বলে থাকেন, এক নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমি একটি শক্ত দুর্গ শত্রুকে দিয়ে দিতে রাজি। আমরা নারীর সম্ভ্রমের সংরক্ষক। কিন্তু সারা! তুমি এখানে উপস্থিত আছো। এই মুহূর্তে আমাদেরকে যে কাজটি না করলেই নয়, সেটি কেবল তোমার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হতে পারে। কোন পুরুষের বিনোদনের উপকরণ হওয়া তোমার পক্ষে নতুন কোন বিষয় নয়। আমি তোমাকে দু'একটি কৌশল বলে দেবো, যার মাধ্যমে তুমি বৃদ্ধের বক্ষ থেকে তথ্য বের করে আনতে পারবে এবং নিজের সম্ভ্রমও রক্ষা করতে পারবে। তোমার লক্ষ্য অতিশয় পবিত্র ও মহান। আমি আশাবাদী, আল্লাহ তোমার ইজ্জতের হেফাজত করবেন।'

'বলো কী করতে হবে'– সারা বললো– 'আমি একটা কুলটা মেয়ে। আল্লাহ যদি আমার থেকে এই কুরবানী নিয়ে খুশি হন, তাহলে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।'

'মনোযোগ সহকারে শোনো'– হাসান বললো– 'এই দূত দু'জন মসুলের

শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীনের পক্ষ থেকে এসেছে। আমি নিশ্চিত, তারা বল্ডউইন থেকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে সাহায্য নিতে এসেছে। এ সময়ে আমাদের বাহিনী নাসীবা নামক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে। সুলতান এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের মাঝে অবস্থান করছেন। কিন্তু আসলে তিনি তাঁর মুসলিম শত্রুদের বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছেন। খৃস্টানরা কিরূপ সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং মসুল, হাল্‌ব ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি কী হতে পারে, এসব ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে সুলতানকে জানাতে হবে।'

হাসান বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে সারাকে কর্তব্য বুঝিয়ে দেয় এবং শেষে বললো– 'তুমি আত্মহত্যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না। আমি তোমাকে পবিত্র ও আনন্দময় জীবনে অনুপ্রবেশ করাচ্ছি। তুমি নির্যাতিত মেয়ে। সম্ভবত শৈশবে কোন কাফেলা থেকে খৃস্টানরা তোমাকে অপহরণ করে এনেছিলো। তারাই তোমাকে পাপের জীবনে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

না হাসান!'– সারা বললো– 'আমি নিজেই নিজেকে অপহরণ করেছিলাম। সেই কাহিনী পরে একসময় শোনাবো। এখন আমাকে কাজ করতে দাও। দু'আ করো আল্লাহ যেনো আমাকে সফল করেন এবং আমি আমার জীবনের সব পাপের কাফফারা আদায় করতে পারি।'

বৃষ্টি থেমে গেছে। সারা নিজের পোশাক পরিধান করে হাসানের কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। যে ভবনটিতে তার কক্ষ, সেই ভবনে প্রবেশ করামাত্র বৃদ্ধাকে পেয়ে যায়। বৃদ্ধা সারাকে দেখে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বললো– 'রাতে প্রস্তুত থাকবে। আমার লোকেরা মসুলের এক দূতের সঙ্গে কথা পাকা করেছে। আজ রাত না কোথাও নাচ-গান হবে, না জেয়াফত আছে। আমি তোমাকে তার কক্ষে দিয়ে আসবো।'

'আমি প্রস্তুত থাকবো।' সারা হাসিমুখে বললো।

মসুলের দূত দু'জন যেনো ক্ষুধার্ত নেকড়ে। তারা নিজেদের ও ইয্‌যুদ্দীনের ঈমান বিক্রি করতে এখানে এসেছে। এসেছে গাদ্দারীতে সফল হওয়ার জন্য খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইনের সাহায্য নিতে। এই সম্রাট নিজের স্বার্থ এবং মুসলিম শাসকদেরকে পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে রাখার লক্ষ্যে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। এই মুসলমান দূতদের মাঝে

না ঈমান অবশিষ্ট আছে, না ব্যক্তিগত ও জাতীয় মর্যাদার অনুভূতি। সম্রাট বল্ডউইনের মদদে পুষ্ট হয়ে বিলাসী জীবন লাভ করাই এখন তাদের একমাত্র সাধনা। বল্ডউইনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের পর বৈরুত নগরী এবং সমুদ্র ভ্রমণের জন্য এখনো তারা রয়ে গেছে। এই সময়ে মহলের মেয়েদের নেত্রী বৃদ্ধা মহিলা একজন লোক মারফত প্রস্তাব পাঠায়, আপনারা চাইলে এমন এক রূপসী মেয়ের ব্যবস্থা করে দেবো, যেমনটি জীবনে কখনো দেখেননি। প্রস্তাব পেয়ে তাদের জিভে পানি এসে যায়। বিনিময় নির্ধারণের মাধ্যমে চুক্তি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। তাদের একজনের নিকট পাঠানোর জন্য সারাকে প্রস্তুত করা হয়।

রাতে কালো চাদরে আবৃত করে সারাকে মসুলের এক দূতের কক্ষে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। দূত– যে কিনা মসুলের গবর্নর ইয্যুদ্দীনের সামরিক উপদেষ্টাও পঞ্চাশোর্ধ বৃদ্ধ– গত রাতে মাত্রাতিরিক্ত মদপান করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আজ নিজ কক্ষে বসে ধীরে ধীরে অল্প অল্প পান করছেন। কক্ষে বসে বসে সে এমন এক নর্তকীর আগমনের অপেক্ষা করছে, যার রূপের বিবরণ শুনে তার মাথাটা গরম হয়ে আছে।

দূতের কক্ষের দরজা খুলে যায়। একটি মেয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। মেয়েটি আপাদমস্তক কালো চাদরে আবৃত। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দূত মেয়েটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম হয় এবং তার মুখমণ্ডল আবরণমুক্ত হওয়ার আগেই অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে তাকে জড়িয়ে ধরে। নিজের বয়সের কথা ভুলে যায় বৃদ্ধ।

সারা তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গায়ের কালো চাদরটা খুলে দূরে ফেলে দেয়। দূতের মুখের প্রতি তাকায়। সহসা মেয়েটির মুখ বিস্ময়ে পাংশু হয়ে যায়। মাথাটা অবনত করে পেছন দিকে সরে যেতে শুরু করে। সরতে সরতে তার পিঠ দেয়ালের সঙ্গে ঠেকে যায়। সারার অনাবৃত মুখটা দেখার পর দূতও হঠাৎ চমকে ওঠে মনে মনে বলে উঠে– 'সায়েরা!'

সারার মুখে কোন কথা নেই, যেনো তার বাক্শক্তি হারিয়ে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধের প্রতি। দূত ভয়জড়িত এবং বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলে ওঠে– 'সায়েরা! তুমি সায়েরা?' পরক্ষণে মুখে জোরপূর্বক হাসি টেনে বললো– 'না, মানে আমার এক মেয়ে দেখতে ঠিক তোমার মতো। তার নাম সায়েরা। তোমাকে দেখে হঠাৎ মনে হলো, তুমিই বুঝি সায়েরা।'

'আমিই আপনার কন্যা সায়েরা'– হঠাৎ সারার জবান খুলে যায়। ঘৃণায়

দাঁত কড়মড় করে বললো– 'আমিই আপনার কন্যা। যারা মহলে মহলে অন্যের মেয়েদের নাচিয়ে বেড়ায়, তাদের মেয়েরাও নাচতে পারে। আমি এক আত্মমর্যাদাহীন পিতার আত্মমর্যাদাহীন কন্যা।'

ইয্যুদ্দীনের দূত অকস্মাৎ কেঁপে ওঠে। খাটের উপর লুটিয়ে পড়ার মতো করে বসে পড়ে। মুখে কোন কথা নেই। সারা তার কন্যা। পিতা-কন্যার বিরহ ঘটেছে দু'বছর হয়েছে।

'ঈমান নিলামকারীদের কন্যারা ঈমান নিলামকারীই হয়ে থাকে'– সারা অগ্রসর হয়ে পিতার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘৃণায় দাঁত কড়মড় করতে শুরু করে। বললো– 'আজ নিজের আত্মমর্যাদা ও ইয্যতের পরিণতি দেখো। আজ তুমি নিজ কন্যার সম্ভ্রমের খদ্দের। তোমার মেয়ে তোমারই শয্যায় ভাড়ায় রাত কাটাতে এসেছে।' সারা বিদ্যুদ্গতিতে নিজের একটা হাত সম্মুখে এগিয়ে ধরে বললো– 'দাও, আমার পারিশ্রমিক বের করো। আমি তোমার সঙ্গে রাত কাটাতে এসেছি।'

'তু... তু...'– সারার পিতার মুখ দিয়ে কথা সরছে না– 'তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলে। আমি নই– তুমিই আত্মমর্যাদাহীন।'

'যে পিতা নিজ যুবতী কন্যার সামনে কন্যার বয়সী মেয়েদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করতে পারে এবং আপন কন্যার বয়সী মেয়েদেরকে নাচাতে ও মদপান করে মাতাল হয়ে তার সঙ্গে কন্যার সম্মুখে অসদাচরণ করতে পারে, সেই পিতার কন্যা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না। তার কন্যাও নর্তকী কিংবা বেশ্যা হতে বাধ্য। পিতা যদি সেই কন্যাকে বিবাহও দিয়ে দেয়, তো সে স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা করে এবং তলে তলে একাধিক পুরুষের শয্যায় রাত কাটায়। আমি তোমাকে তোমার অতীত আর আমার নিজের বর্তমান বলছি। আমি দামেশ্‌কে তোমার ঘরে যখন বুঝমান হই, তখনই তোমাকে নারী নিয়ে ফূর্তি করতে দেখি। নূরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর তুমি আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে হাল্‌ব পালিয়ে গিয়েছিলো। আমাকে ও মাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে। হালবে গিয়ে মদও পান করতে শুরু করেছিলে। তখন আমি কিশোরী ছিলাম। তোমার নিকট খৃস্টানরা আসতে শুরু করেছিলো। তোমার ঘরে মদ এবং নাচ-গানের আসর বসতে শুরু হয়েছিলো। খৃস্টানরা আমার সঙ্গে অসদাচরণ শুরু করলে তুমি খুশি হয়েছিলো।'

তারপর আল-মালিকুস সালিহ মারা গেলেন। তোমার নিকট খৃস্টানদের আনাগোনা আরো বেড়ে গেলো। তুমি আগের চেয়ে বেশি বিলাসী হয়ে

উঠেছিলে। ইয়্যুদ্দীন তোমাকে অনেক বড় পদমর্যাদা দান করলেন। আমি তোমার নর্তকী মেয়েদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে লাগলাম। তাদের থেকেই আমি নাচ শিখেছি। তুমি জানতে পেয়ে খুশি হয়েছিলে। খৃস্টানরা তোমার সামনে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। তুমি আপত্তি করোনি। তার কারণ, তারা আমার পরিবর্তে তোমাকে ইউরোপের একটি মেয়ে দান করেছিলো। তুমি তোমার ঈমান বিক্রি করে ফেলেছো। সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছো। তোমার নীতি-নৈতিকতা সব শেষ হয়ে গেছে। নিজের মেয়েটাকে পর্যন্ত পাপের পথে ছেড়ে দিয়েছো। তারপর খৃস্টানরা আমাকে সবুজ বাগান দেখায়। আমি তোমার গৃহকে বিদায় জানিয়ে স্বপ্নের স্বর্গের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আজ রাতের ন্যায় এরূপ আর ক'জনের শয়নকক্ষে রাত কাটিয়েছি আমাকে সে প্রশ্ন করো না। সেই খৃস্টান আমাকে ভালোবাসার ধোঁকা দিয়ে বিক্রি করে ফেলে। আমি তোমার ন্যায় বিপুল সম্পদের মালিকদের বিনোদনের উপকরণ হয়ে বৈরুত এসে পৌঁছি। এখানে আমি রাজ নর্তকী। আজ আমার পিতা আমার সম্ভ্রমের গ্রাহক।'

ইয়্যুদ্দীনের দূত মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। শরীরটা তার কাঁপছে।

'আজ তুমি তোমার ঈমানের মূল্য উসূল করতে এসেছো'– সারা তাচ্ছিল্যমাখা কণ্ঠে বললো– 'তুমি ফিলিস্তীন ও প্রথম কেবলা বিক্রি করতে এসেছো। নিজ কন্যার মূল্য আদায় করতে এসেছো।' সারার কণ্ঠ তুঙ্গে উঠে যায়– 'এটি আমার জীবনের শেষ রাত। আমি পিতার পাপের শাস্তি ভোগ করে এই জগত থেকে বিদায় নিচ্ছি।'

সারার পিতা ধীরে ধীরে মাথা উঠায়। তার দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে গণ্ডদেশ ভিজিয়ে ফেলেছে। উঠে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে ঝুলন্ত তরবারীটা খুলে হাতে নেয়। খাপ থেকে বের করে তরবারীটা সারার দিকে এগিয়ে ধরে বলে– 'এই নাও, নিজ হাতে আমাকে শেষ করে দাও। সম্ভবত এতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে।'

সারা পিতার হাত থেকে তরবারীটা নিয়ে নেয় এবং বলে– 'আজ আল্লাহর রাসূলের উম্মত এমন এক অবস্থানে এসে উপনীত হয়েছে যে, পিতা কন্যার হাতে তরবারী দিয়ে 'যাও প্রথম কেবলাকে এই তরবারী দ্বারা মুক্ত ও আবাদ করো' না বলে বলছেন, নাও, এই তরবারী দ্বারা আমাকে খুন করো, আমার পাপের কাফফারা আদায় করো।' পিতার আবেগময় অবস্থা এবং অশ্রুসজল চোখ দেখে সারার বলার ধরন পাল্টে যায়। হৃদয়ে

পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ফিরে আসে। কণ্ঠটা শান্ত করে বললো- 'মৃত্যুবরণ করে গুনাহের কাফফারা আদায় করা যায় না। একটা পন্থা এও আছে, বেঁচে থাকুন এবং দুশমনকে হত্যা করুন। বলবো কী করবেন?'

পিতা পরাজিতের ন্যায় মেয়েরে প্রতি তাকায়।

'সম্রাট বল্ডউইনের সঙ্গে আপনার যে চুক্তি হয়েছে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করার লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত ও স্থির হয়েছে, তা আমাকে বলে দিন'- সারা বললো- 'আমি সুলতানকে এই তথ্য পৌঁছিয়ে দেবো। এর চেয়ে বড় পুণ্য আর কিছু হতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন।'

পিতা নীরবে কথা শুনছে। সারা বললো- 'অন্যথায় আসুন আমরা উভয়ে এখান থেকে পালিয়ে মুক্তি লাভ করি এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট গিয়ে আপনি তাকে সব খুলে বলবেন।'

'আমি প্রস্তুত'- পিতা বললো- 'কিন্তু এখান থেকে আমরা বের হবো কীভাবে?'

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' সারা বললো।

পিতা কন্যাকে বুকে জড়িয়ে নেয় এবং ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

বৃদ্ধা বেজায় আনন্দিত, সে অনেক মোটা একজন খদ্দের পেয়ে গেছে এবং সারার মতো রূপসী মেয়ে তার শয্যায় রাত কাটাতে চলে গেছে। এখন মনে তার শুধুই আনন্দ। মহিলা জানে, সারা সকালে ফিরে আসবে। কিন্তু সারা রাতের বাকি অংশটুকু অতিবাহিত করেছে হাসান আল-ইদরীসের কক্ষে- পরিকল্পনা প্রণয়নে। সারা হাসানকে বললো- 'রাত কাটাতে যার নিকট গিয়েছিলাম, তিনি আমার পিতা। শুনে হাসানের মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। সারা হাসানকে তার পিতার চরিত্র ও নিজের ইতিবৃত্ত শোনায়। সারা জানায়, তিনি এখান থেকে পালিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট চলে যেতে প্রস্তুত আছেন।'

'আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার লক্ষ্য পবিত্র'- হাসান বললো- 'আমি আশাবাদী আল্লাহ তোমার সম্ভ্রম রক্ষা করবেন। আমি তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো এবং প্রস্তুত থাকতে বলবো।'

দিনের বেলা হাসান সারার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সাবধানে কথা বলে। তার আত্মমর্যাদা উস্কে দেয়। হাসান অনুভব করলো, লোকটা অত্যন্ত অনুতপ্ত। হাসান তাকে পালাবার সহজ পন্থা বলে দেয়।

সারার পিতাকে পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে হাসান সারার সঙ্গে দেখা করে।

সারার পিতা তার মেজবানদের কাছে আকাঙ্খা ব্যক্ত করে, আমি একাকী একটু বেড়াতে যেতে চাই। তাকে ঘোড়া দেয়া হলো। সঙ্গী দূতকে বলে যান, আমি সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসবো। ঘোড়ায় চড়ে তিনি শহর থেকে বেরিয়ে যান। হাসান ঘোড়ায় চড়ে এক স্থানে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সারা লুকিয়ে আছে অন্য এক স্থানে। তিনজন একত্রিত হয়। সারার পিতা তাকে নিজের ঘোড়ায় বসিয়ে নেন। তিনজন নাসীবা অভিমুখে রওনা হয়ে যায়।

তারা অতি সাবধানে পথ চলতে থাকে। অনেক পথ অতিক্রম করার পর এবার দ্রুতবেগে ঘোড়া হাঁকায়। সফর অনেক দীর্ঘ ছিলো। কিন্তু এই পথ তারা একদিন ও একরাতে অতিক্রম করে ফেলে।

সম্রাট বল্ডউইন আকাশটা মাথায় তুলে নেন। বৈরুতের গোয়েন্দাদের জন্য তিনি গজবরূপে আবির্ভূত হন। মসুলের এক দূত পালিয়ে গেছে। এক রাজ নর্তকী– যার সঙ্গে বল্ডউইনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিলো– নিখোঁজ। গলবার্ট জ্যাকব নামক এক নিরাপত্তা কর্মীও উধাও। তিনজনের একজনেরও কোন সন্ধান মিলছে না। বৃদ্ধার জবানও বন্ধ। সারাকে সে রাতে পালিয়ে যাওয়া দূতের কক্ষে প্রেরণ করেছিলো, এ তথ্য দিতে ভয় পাচ্ছে মহিলা।

বৈরুতে মাত্র এক ব্যক্তি জানে এই তিন ব্যক্তির কী হয়েছে এবং কোথায় আছে। তার নাম হাতেম। কিন্তু হাতেম তো অখ্যাত একজন মুচি। তাকে তারাই চেনে, যারা তার দ্বারা ছেঁড়া জুতায় তালি লাগায়। আর চেনে মুচি হিসেবে। কেউ কি জানে, এই ছা-পোষা নিরীহ মানুষটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একজন গোয়েন্দা নেতা, যিনি বৈরুতের সব খবরাখবর পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন আইউবীর কানে? কোন কিনারা করতে ব্যর্থ হয় বৈরুতের গোয়েন্দারা।

হেজাজের কাফেলা

হাসান আল-ইদরীস, সারা এবং সারার পিতা সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছে গেছে। সুলতান তাঁর অভ্যাস মতো তাঁবুতে পায়চারি করছেন। সারার পিতা আইউবীকে বল্ডউইনের সঙ্গে তাদের চুক্তি ও পরিকল্পনার বিবরণ প্রদান করে। সুলতান আইউবী তৎক্ষণাৎ তার সালারদের তলব করেন। মানচিত্রটা সামনে মেলে নিয়ে তাদেরকে খৃস্টানদের পরিকল্পনা বুঝাতে শুরু করেন এবং তার বিপরীতে নিজের পরিকল্পনা ঠিক করে নেন।

হাল্ব ও মসুলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীন খৃস্টানদের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে এই সংবাদে সুলতান আইউবী বিচলিত বা বিস্মিত হননি। খৃস্টানদের সঙ্গে তলে তলে খাতির পাতানো সে কালের ছোট-বড় মুসলিম আমীরদের রেওয়াজে পরিণত হয়েছিলো। তার একমাত্র কারণ ছিলো সুলতান আইউবী তাদের সকলকে এক খেলাফতের অধীনে এনে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু এই আমীরগণ আপন আপন রাজ্য বহাল রেখে তার শাসক হয়ে থাকাকে জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিলো, এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততে হবে।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন ইয্যুদ্দীন ও ইমামুদ্দীন। ভৌগোলিক অবস্থান, বিস্তৃতি এবং নিরাপত্তার দিক থেকে এদের রাজ্য মসুল ও হাল্ব ছিলো বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। খৃস্টানদের সর্বাত্মক চেষ্টা ছিলো, কীভাবে মুসলমানদের এই অঞ্চল দু'টি দখল করা যায় কিংবা সুলতান আইউবীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা যায়। সুলতান আইউবী যদি এই অঞ্চল দু'টি দখল করে নিতে পারেন, তাহলে সৈন্য ও রসদ ইত্যাদির জন্য তা এমন দু'টি আস্তানা হয়ে যায়, যেখান থেকে তিনি অতি সহজে বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন।

'কাবার প্রভুর কসম! আমি হাল্ব ও মসুল দখল করতে চাই না'—

সুলতান আইউবী বার কয়েক বললেন– 'আমি কোন মুসলিম প্রজাতন্ত্রের উপর দিয়ে বাহিনী অতিক্রম করাতেও পছন্দ করি না। আমার একটাই কামনা, এই আমীর ও শাসকগণ খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক। তারা সকলে বাগদাদের খেলাফতের অফাদার হয়ে যাক, যা কিনা কুরআনেরই নির্দেশ। আমি তাদেরকে আমার পদানত করে রাখবো না। আমি খলীফা নই– খলীফার একজন অনুসারী এবং সেবক মাত্র।'

তাদের ভয় হলো, খেলাফতের অধীনে চলে এলে তাদের বিলাসিতা এবং এখন খৃস্টানদের পক্ষ থেকে নারী ও মদের যে উপহার-উপঢৌকন পেয়ে আসছে বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ক্ষমতা আর জগতের মিথ্যা আড়ম্বর ও ভোগ-বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের দৃষ্টিতে সালতানাতে ইসলামিয়ার কোন মর্যাদা নেই।

১১৮৩ সালের শুরুর দিক। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নাসীবার সেনা ছাউনিতে অবস্থান করছেন। এখান থেকে তার বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রা করার কথা। কিন্তু তিনি মুসলিম আমীর-শাসকদের নিয়তে গড়বড় লক্ষ্য করছেন। তিনি জানবার চেষ্টা করছেন, হাল্ব ও মসুলের দুই গবর্নরের গোপন তৎপরতাটা কী এবং খৃস্টানরা কী পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে।

গোয়েন্দা হাসান আল-ইদরীস বৈরুত থেকে এসে তাঁকে পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে। সুলতান আইউবী এখন ইয্যুদ্দীন-ইমাদুদ্দীনের অবস্থান এবং খৃস্টানদের পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। হাসান আরো একটি কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছে যে, সে ইয্যুদ্দীনের এক সামরিক উপদেষ্টা এবং তার এক কন্যাকে– যে কিনা এক সময় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে খৃস্টানদের ওখানে নর্তকীর কাজ করছিলো– সঙ্গে নিয়ে এসেছে। হাসান আল-ইদরীস সুলতান আইউবীর নিকট এসে জানালো, ইয্যুদ্দীন বৈরুতে খৃস্টানদের নিকট সাহায্যের জন্য দু'জন দূত প্রেরণ করেছেন। এই তথ্যে সুলতান বিস্মিত হননি। তবে এই তথ্যটা ছিলো তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তৎক্ষণাৎ সালারদের ডেকে পাঠান এবং মানচিত্রটা সামনে নিয়ে তাদেরকে খৃস্টানদের পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দেন।

ইয্যুদ্দীনের যে দূত বৈরুতে খৃস্টানদের থেকে সাহায্য নিতে গিয়েছিলো, তার নাম এহতেশামুদ্দীন। সুলতান আইউবীর নিকট তার মর্যাদা একজন বন্দির সমান হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু সুলতান তাকে

সম্মানের সাথে তার সালারদের সঙ্গে বসালেন। এহ্‌তেশামুদ্দীনকে প্রায় সকল সালারই চিনতেন। কেউ তার প্রতি তাচ্ছিল্যের চোখে তাকাচ্ছেন। আবার কারো চেহারায় আনন্দের দ্যোতি যে, এহতেশামুদ্দীন তাদের মাঝে উপবিষ্ট এবং তাদের কয়েদী হয়েছে। সুলতান আইউবী হাসান আল-ইদরীসের রিপোর্ট শুনেছেন।

'আমি আশা করি আমাদের বন্ধু এহতেশামুদ্দীন নিজেই আপনাদেরকে বলবে, ইয্‌যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীনের নিয়ত কী'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি এহতেশামুদ্দীনের উপর এই অভিযোগ আরোপ করবো না যে, সে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য খৃস্টানদের সাহায্য নিতে গিয়েছিলো। তাকে মসুলের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীন প্রেরণ করেছিলো। এতো ইয্‌যুদ্দীনের কর্মচারি।'

'সুলতানে মুহতারাম!'– এক সালার বললেন– 'আমি আশা করি, আপনি আমাকে বলতে নিষেধ করবেন না, এহতেশামুদ্দীন তার সরকারের সাধারণ কোন কর্মচারী নয়। লোকটা ইয্‌যুদ্দীনের সামরিক উপদেষ্টা। একজন সেনা অধিনায়ক। গবর্নরকে খৃস্টানদের থেকে সাহায্য নেয়ার পরামর্শ তার না দেয়া উচিত ছিলো।'

'আমাকে আদেশ করা হয়েছিলো'– এহ্‌তেশামুদ্দীন উত্তর দেয়– 'আমি যদি আদেশ অমান্য করতাম, তাহলে...।'

'তাহলে আপনাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হতো'– এক নায়েব সালার বললেন– 'আপনি মৃত্যুর ভয়ে আপনার রাজার এমন একটি আদেশ মান্য করেছেন, যা কিনা নিজ জাতি ও আপন ধর্মের অপদস্তের কারণ। আমরা কি বাড়ি–ঘর, পরিবার-পরিজন থেকে দূরে এবং স্ত্রী-সন্তানদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে ইসলাম ও দেশ-জাতির জন্য কাজ করছি না? দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত আমরা এই পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে ফিরছি এবং এই পাথুরে জমিনের উপর শুয়ে রাত কাটাচ্ছি। অথচ আপনার কিনা হালবের প্রাসাদে রাজা-রাজপুত্রদের ন্যায় জীবন-যাপন করছেন। আপনি মদপান করছেন, ইহুদী-খৃস্টান ও মুসলমান রূপসী নর্তকীরা আপনাদের মনোরঞ্জন করছে। আপনারা পালঙ্কের উপর নরম গালিচায় ঘুমাচ্ছেন। আর আমরা কিনা এই বন-বাদাড়ে, পাহাড়-জঙ্গল মরু বিয়াবানে মরতে বসে আছি। আমাদের সহকর্মীদের লাশ কোথায় কোথায় হারিয়ে গেছে আমরা জানি না। আমাদের সৈনিকদের হাড়-

কঙ্কাল সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। কোন শহীদের হাড় চোখে পড়লে আপনি বলবেন, এটা মানুষের নয়– পশুর হাড়। ভোগ-বিলাসিতা আপনাদের হৃদয়ে শহীদদের প্রতি কোন শ্রদ্ধা থাকতে দেয়নি। আপনারা শত্রু-বন্ধুকে এক করে ফেলেছেন। আমরা যখন মরতে এসেছি তো আপনাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

'আহরাম!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'এহতেশামুদ্দীন আমার নিকট এসে জীবনের সব পাপের কাফফারা আদায় করে দিয়েছে। তাকে তিরস্কার করতে হলে আমিও করতে পারতাম।'

'মহান সুলতান!' অপর এক সালার বললেন।

'আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা আমাকে শুধু সুলতান নামে ডাকো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমাকে শান-শওকত থেকে দূরে থাকতে দাও। আমাকে রাজা বানাবার চেষ্টা করো না। আমি একজন সৈনিক। তোমরা আমাকে সৈনিকই থাকতে দাও। আচ্ছা বলো, কী যেনো বলতে চেয়েছিলে?'

'আমি উপস্থিত সকলকে, বিশেষভাবে এহতেশামুদ্দীনকে বলতে চাই, সালার তার শাসনকর্তার এতোটুকু গোলাম হয়ে যায় যে, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার ভুল নির্দেশও মান্য করে, সেই সালার আপন জাতির মর্যাদার ঘাতকে পরিণত হয়। জাতির মর্যাদার মোহাফেজ আমরা। সালতানাতের মালিক রাজা কিংবা সুলতান নয়– দেশের জনগণ। বর্তমানে আমরা যে কাল অতিক্রম করছি, এটা সৈনিকের যুগ। এটা জিহাদের যুগ। খলীফা এবং সুলতান যদি নৈতিকতার সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা না করেন, তাহলে আল্লাহর সৈনিকগণ তাদেরকে এমন শত্রু মনে করবে, যেনো তারা ইহুদী-খৃস্টান। আর যখন এহতেশামুদ্দীনের ন্যায় আল্লাহর সৈনিকদের উপরও সুলতান হওয়ার নেশা চেপে বসবে, তখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর লাশের উপর গীর্জার ঘণ্টা বাজতে শুরু করবে।'

'ইসলামের প্রতিটি যুগই সৈনিকের যুগ'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যতোদিন পর্যন্ত ইসলাম জীবিত আছে, কাফেররা ইসলামের শত্রুই থাকবে। আজ আমাদের সালারদের অন্তরে সম্মান-সুখ্যাতির যে বাসনা জন্মলাভ করেছে, তা কোন একদিন ইসলামকে নিয়ে ডুবে মরবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, ইসলাম বেঁচে থাকবে তবে সেই সিংহের ন্যায়, যে ভুলে গেছে সে বনের রাজা। এরূপ সিংহ ভেড়া-বকরিকেও ভয় করে থাকে। মুসলমান কাফেরদের আঙ্গুলের ইশারায় নাচবে।

পৃথিবীতে আল্লাহর সৈনিক থাকবে; কিন্তু তার হাতে তরবারী থাকবে না। থাকেও যদি তা হবে কোন খৃস্টানের উপহার, যার কোষ থেকে বের হতে হলে খৃস্টানদের অনুমতির প্রয়োজন হবে।'

সুলতান বলতে বলতে থেমে যান। তিনি চোখ ঘুরিয়ে সকলকে এক নজর দেখে নেন এবং বললেন– 'আমিও আলাপচারিতায় জড়িয়ে পড়েছি। আমার বন্ধুগণ! আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আমরা যদি এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি যে, এই পাপ কার, এই ভুল কার এবং কে সত্য, কে মিথ্যা– তাহলে আমরা কথাই বলতে থাকবো। কথা শেষ হবে না। এখন হাল্‌ব ও মসুলের গবর্নরদ্বয় খৃস্টানদের সঙ্গে কী চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং আমাদেরকে কোন্ জাতীয় শত্রুর সঙ্গে কী রকম যুদ্ধ করতে হবে, এহতেশামুদ্দীন তার বিবরণ প্রদান করবে।'

এহতেশামুদ্দীন উঠে সকলের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। সকলের প্রতি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বলতে শুরু করে–

'আমার বন্ধুগণ! আমি তোমাদের দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য ও রোষ দেখতে পাচ্ছি। আমি যে অপরাধ করেছি, তার জন্য তোমরা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারো। কিন্তু আমি তোমাদের জন্য একটা শিক্ষার উপকরণ। আমি একটা নমুনা। কথা ঠিক যে, আমি মসুলের শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীনের সন্তুষ্টির জন্য নিজের ঈমান ক্রয় করেছি, তার দূত হয়ে বৈরুত গিয়েছি এবং খৃস্টানদের নিকট সাহয্যি কামনা করেছি। তবে এ কথাও ঠিক, যে যাদু আমার বিবেক ও ঈমানকে কব্জা করে নিয়েছে, তোমরাও তার থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদের কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সেনা অধিনায়ক কি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ধরা পড়েনি? তাদের অনেকে তো এমন ছিলো, যাদের উপর সুলতান আইউবীর এতোটুকু আস্থা ছিলো, যতোটুকু আস্থা আছে তার নিজের উপর। কিন্তু তারা ঈমান নিলামকারী প্রমাণিত হয়েছে। আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, মানবীয় স্বভাবে এমন একটি দুর্বলতা আছে, যেটি মানুষকে বিলাসিতার পথে ঠেলে দেয়। আর যেখানে দিন-রাত সারাক্ষণ ক্ষমতা আর সমাজে অপরাধ বিস্তারের উৎসাহ দানকারী আলোচনা চলে, সেখানে একজন অতি বুযুর্গও বিলাসপ্রিয় এবং পাপাচারী হয়ে ওঠেন। তখন যে কেউ আমীর এবং সুলতান হওয়ার স্বপ্ন

দেখতে শুরু করে। তোমরা যদি আমাকে অপরাধী মনে করো, তাহলে আমার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। তবে যদি আমাকে তওবা করার সুযোগ দান করো, তাহলে ইসলামের মর্যাদার সুরক্ষা এবং সালতানাতে ইসলামিয়ার সম্প্রসারণে আমি তোমাদের অনেক সহযোগিতা করতে পারি।'

'খৃস্টানরা সম্ভবত তোমাদের মুখোমুখি যুদ্ধ করার ঝুঁকি নেবে না'– এহতেশামুদ্দীন বললো– 'তারা আমাদেরকে আমাদেরই তরবারী দ্বারা হত্যা করার আয়োজন সম্পন্ন করেছে। আমাদেরকে নিঃশেষ করতে তাদের একজন সৈন্যকেও প্রাণ দিতে হবে না। তারা মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াবার জন্য একদলকে সাহায্য দিচ্ছে। এই ছোট-বড় মুসলিম এমারত ও প্রজাতন্ত্র– যেগুলো মূলত বাগদাদের খেলাফতের প্রদেশ– সকলে তলে তলে খৃস্টানদের গোলাম হয়ে গেছে, যাতে তারা স্বাধীন থাকতে পারে। কেন্দ্র থেকে সটকে স্বাধীন তখনই থাকা যায়, যখন শত্রুর সাহায্য মিলে। তাদের নীতি হলো, শত্রুর নিকট থেকে সাহায্য নাও আর নিজের ভাইকে শত্রু বলো। গৃহযুদ্ধে যে কোন এক পক্ষ সঠিক ও দেশপ্রেমিক হয়ে থাকে। অপরপক্ষ হয় শত্রুর বন্ধু। শত্রু তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা দেয় না। তারা নিজেদের স্বার্থে ও নিজেদের মতলবে একদল মুসলমানকে সাহায্য দিয়ে থাকে। খৃস্টানরা তোমাদের প্রতিপক্ষকে সাহায্য দিচ্ছে। তারা মসুলে তাদের গেরিলা বাহিনীর আস্তানা গড়তে যাচ্ছে। বহুদিন পর্যন্ত তারা গেরিলা ও কমান্ডো যুদ্ধ লড়বে। এভাবে পর্যায়ক্রমে হাল্‌বকে এবং অন্য সকল মুসলিম প্রজাতন্ত্রকে আস্তানা বানিয়ে সেগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। মসুল থাকাকালে আমি জানতে পেরেছি, খৃস্টানরা মসুলের সামান্য দূরে পাহাড়ী এলাকায় বিপুল অস্ত্র ও সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখবে। তাতে অনেক দাহ্য পদার্থ থাকবে। সেগুলোকে তারা গেরিলা অপারেশনে ব্যবহার করবে এবং পরে প্রকাশ্য যুদ্ধেও। তারা অনেকগুলো মুসলিম প্রজাতন্ত্রে নিজেদের শক্ত ঘাঁটি স্থাপনের পর প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। সেই অস্ত্র ও দাহ্য পদার্থগুলো ঠিক কোন্ স্থানে রাখা হবে, তা অবশ্য আমি জানতে পারিনি। এ তথ্য সংগ্রহ করা আপনাদের গোয়েন্দাদের কাজ।'

বৈঠক শেষ হলো। সুলতান আইউবী গোয়েন্দা উপ-প্রধান হাসান

ইবনে আবদুল্লাহ এবং গেরিলা বাহিনীর অধিনায়ক সারেম মিসরী ছাড়া অন্যদের বিদায় করে দেন।

'আমার অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয়েছে'– সুলতান আইউবী তাদেরকে বললেন– 'আমার জানা ছিলো, খৃস্টানরা মসুল ও হালবে গোপনে তাদের ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করবে এবং আমাদের ভাইয়েরা তাদের পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। তোমরা এহতেশামুদ্দীনের জবানবন্দি শুনেছো যে, বল্ডউইন ও অন্যান্য খৃস্টানরা অদূরে কোথাও যুদ্ধ সরঞ্জাম ও দাহ্য পদার্থ ইত্যাদির সমাবেশ ঘটাচ্ছে। তোমরা জানো, আমাদের যেমন রসদ প্রয়োজন, তেমনি তাদেরও আবশ্যক। দু'পক্ষের যাদের রসদ নিঃশেষ কিংবা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা অর্ধেক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যাবে। আমাদের কতিপয় সৈন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মসুল ও হালবের মাঝে বসে আছে। আমি তাদেরকে ইয্যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য বসিয়েছি। এখন বৈরুতের সঙ্গেও এই দুই অঞ্চলের পথ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। এই অভিযান খানিকটা কঠিন ও বিপজ্জনক হবে। কেননা, গেরিলাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে বেশ দূরে চলে যেতে হবে।'

'আমি চিন্তা করে দেখবো, অভিযানটা কঠিন না সহজ'– সারেম মিসরী বললেন– 'তাছাড়া কঠিনকে সহজ করা আমার কর্তব্যও তো বটে। আপনি আদেশ করুন।'

'কোন কাফেলা চোখে পড়লে গতিরোধ করবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তল্লাশি নেবে। সংঘাত হলে রীতিমতো যুদ্ধ করবে। বেশি বেশি কয়েদী বানাবার চেষ্টা করবে।'

'আর হাসান!'– সুলতান হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তুমি আমাকে একটা কাজ করে দেখাও। তথ্য নাও, খৃস্টানরা দাহ্য পদার্থ এবং অস্ত্রের ডিপো কোথায় সমবেত করছে। হতে পারে কাজটা তারা করেও ফেলেছে। তুমি স্থানটা চিহ্নিত করো, সেগুলো ধ্বংস করার ব্যবস্থা আমি করবো।'

'সেই ব্যবস্থাও আমিই করবো ইনশাআল্লাহ।' সারেম মিসরী বললেন।

'একটা বিষয় মাথায় রাখবে, কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধ কানামাছি খেলার ন্যায় হবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'খৃস্টানরা মুখোমুখি যুদ্ধ করার পরিবর্তে গেরিলা ও নাশকতামূলক যুদ্ধ লড়বে। তারা সম্ভবত

তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি সেই বোকামী করবো না। তারা আমার জন্য কয়েকটি স্থানে ওঁৎ পাতবে। আমি সর্বাগ্রে সেই আমীরদেরকে সঙ্গে জুড়ে নেবো, যারা খৃস্টানদের বন্ধুতে পরিণত হতে যাচ্ছে। তাদের কাছে আমি সাহায্য ভিক্ষা চাইবো না। এখন আমি তরবারীর আগা দ্বারা তাদের থেকে সাহায্য নেবো। তাদের যে কারো রক্ত ঝরাতে আমি কুণ্ঠিত হবো না। এরা নামের মুসলমান। যে মুসলমান কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে, সেও কাফের হয়ে যায়। এখন আর আমি এই পরোয়া করি না, ইতিহাস আমাকে কী বলবে। আজ যদি কেউ বলে, অনাগত বংশধর আপনাকে ভাইয়ের ঘাতক বলবে কিংবা গৃহযুদ্ধের অপরাধে অপরাধী বলবে, তবু আমি আমার প্রত্যয় থেকে ফিরে আসবো না। আমি ইতিহাস ও অনাগত বংশধরদের নিকট নয়– আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করবো। আল্লাহ ছাড়া নিয়তের খবর আর কেউ জানে না। আমার পুত্রও যদি আমার ও ফিলিস্তীনের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়, তবে আমি তাকেও খুন করে ফেলবো। আজ যদি আমরা প্রথম কেবলাকে খৃস্টানদের হাত থেকে মুক্ত না করি, তাহলে কাল তারা কাবা গৃহকেও দখল করে নেবে। আমাদের আমীর ও শাসকদের গতিবিধি প্রমাণ করছে, তারা রাজা হবে এবং তাদের সন্তানরাও রাজা হবে। এই লোকগুলো ফিলিস্তীনকে ইহুদীদের দখলে নিয়ে দেবে। এখন তরবারী ছাড়া আমার কাছে আর কোন প্রতিকার নেই।'

'আমরা আপনার আদেশের অপেক্ষায় অপেক্ষমান'– সারেম মিসরী বললেন– 'আপনি যদি আমাকে মতামত প্রদানের অনুমতি দেন, তাহলে আমি বলবো, যারা কেন্দ্র থেকে স্বায়ত্তশাসন কিংবা আধা-স্বায়ত্তশাসনের আবেদন করছে, তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেয়া উচিত।'

'আমি তাদেরকে শাস্তি দেবো।' সুলতান বললেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সারেম মিসরী ও হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে যুদ্ধ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বিদায় করে দেন।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ও সারেম মিসরী বিদায় গ্রহণ করেন। সুলতান আইউবী অপর একটি বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তিনি যখন বৈরুত থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করে নাসীবায় ছাউনি স্থাপন করেছিলেন, তার কিছুদিন আগে লোহিত সাগরের পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে

রিপোর্ট পেয়েছিলেন, খৃস্টান সৈন্যরা উক্ত অঞ্চলে কাফেলা লুণ্ঠন করে ফিরছে। তারা শুধু মুসলমান কাফেলাগুলো লুট করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, ধন-সম্পদ ছাড়া উট-ঘোড়াও নিয়ে যাচ্ছে এবং স্বল্পবয়সী ও যুবতী মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। মিসরের হজ্ব কাফেলাগুলো যাওয়ার সময় এই লুটতরাজের প্রবণতা বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই দস্যুদের প্রতিহত করতে হলে রীতিমতো সামরিক অভিযান প্রয়োজন। কিন্তু অতো সৈন্য তো সুলতান আইউবীর নেই। তাছাড়া তার এসব নিয়ে ভাববারই বা সময় কোথায়। তার মাথায় তো চেপে বসে আছে ফিলিস্তীন আর সেইসব মুসলিম আমীর, যারা তলে তলে খৃস্টানদের সঙ্গে আপোস ও সাহায্যের চুক্তি করে বসে আছে।

আপনারা পড়ে এসেছেন, বৈরুত অবরোধে সুলতান আইউবী নৌ-বহরও ব্যবহার করেছিলেন, যার সেনাপতি ছিলেন হুসামুদ্দীন লুলু। অবরোধ শুরুতেই ব্যর্থ হয়ে গেলে সুলতান হুসামুদ্দীনকে বার্তা প্রেরণ করেন যেনো বহরটা ইস্কান্দারিয়া নিয়ে যান। তার পরপরই কায়রো থেকে সংবাদ আসে, খৃস্টানরা কাফেলা লুণ্ঠন করাকে রীতিমতো পেশা বানিয়ে নিয়েছে এবং এখন একটি কাফেলাও গন্তব্যে পৌঁছতে পারছে না। সুলতান আইউবী কায়রোকে কোন জবাব দেয়ার পরিবর্তে নৌ-বাহিনী প্রধান হুসামুদ্দীনকে আদেশ প্রেরণ করেন, যেনো তিনি তার বহরের যে অংশটি লোহিত সাগরে অবস্থান করছে, তার নেতৃত্ব হাতে তুলে নেন।

সুলতান আইউবীর আদেশ ছিলো এরকম– 'লোহিত সাগরে দুশমনের নৌ-বহরের সঙ্গে তোমার মোকাবেলা হবে না। তুমি বরং স্থলে ওঁৎ পেতে সেই দস্যুদের পাকড়াও করে ফেলবে, যারা মুসলমানদের কাফেলাগুলো লুণ্ঠন করছে। আমি জানতে পেরেছি, এই দস্যুরা খৃস্টান সৈন্য, যারা সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে এবং উপরের আদেশে এই লুটতরাজ চালাচ্ছে। এরা নদীর কূলে কূলে থাকে। তুমি বাছাই করে একদল সৈন্য নিয়ে যাও এবং নদীতে টহল দিতে থাকো। যেখানেই ডাকাতরা আছে বলে সন্দেহ হবে, সেখানেই সৈন্যদেরকে নৌকায় করে নামিয়ে ডাঙ্গায় পাঠিয়ে দেবে এবং ডাকাতদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবে। আমার পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ওখানে থাকবে।'

আদেশ পাওয়ামাত্র হুসামুদ্দীন চলে যান। সে যুগে রোম উপসাগর ও এর মাঝে সংযোগের জন্য সুইজ খাল ছিলো না। আপনি মধ্যপ্রাচ্যের

মানচিত্রে এবং তার উপর সুইজ উপসাগর দেখতে পাবেন। এই নদীটির পশ্চিম তীরে মিসর এবং পূর্ব তীরে সৌদি আরবের অবস্থান। উত্তরে সিনাই মরু এবং দক্ষিণে লোহিত সাগরের অবস্থান। মিসরের অনেক হজ্ব কাফেলা উট-ঘোড়াসহ নৌকায় করে এই সুইজ উপসাগর অতিক্রম করে থাকে। তবে অধিকাংশ কাফেলাই স্থল পথেই গমনাগমন করে থাকে এবং লোহিত সাগরের কূল ঘেঁসে সফর করে। কেননা, গরমের দিনে সমুদ্রতীর ঠাণ্ডা থাকে।

হুসামুদ্দীন সেখানে পৌঁছেই স্থলে হানা দিতে শুরু করেন এবং কয়েকজন ডাতাতকে ধরে হত্যা করে ফেলেন। কিন্তু তাদের একজনও খৃস্টান সৈন্য নয়।

❖ ❖ ❖

একদিন হুসামুদ্দীন সংবাদ পান, মিসর থেকে বিশাল একটি কাফেলা রওনা হয়েছে। এতোক্ষণে কাফেলাটির আরব সাহারায় এসে পৌঁছানোর কথা। হুসামুদ্দীন যাযাবরের বেশে জনাচারেক সৈন্যকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তারা কোথাও কোন কাফেলার সন্ধান পেলো না।

এটি একটি হতভাগ্য কাফেলা। তারা নদীর কূল থেকে অনেক দূর দিয়ে পথ চলছিলো। একদিন কাফেলা এক স্থানে যাত্রাবিরতি দেয়। কাফেলায় হজ্বযাত্রীও ছিলো, ব্যবসায়ীও ছিলো। অনেকে গোটা পরিবার নিয়ে যাচ্ছিলো। সদস্যদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, কিশোর এবং যুবতী মেয়েও ছিলো। উট-ঘোড়ার সংখ্যা ছিলো অনেক। লোকসংখ্যা কমপক্ষে ছয়শত। সবাই খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ে।

কাফেলা রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হয়। এখনো অন্ধকার। একজন আযান দেয়। সকলে তায়াম্মুম করে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করে এবং রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে। হঠাৎ একদিক থেকে উচ্চকণ্ঠে হুঙ্কার ভেসে আসে– 'সামান বেঁধো না। সকলে একধার হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। কেউ মোকাবেলা করার চেষ্টা করলে মেরে ফেলবো।'

কাফেলার মধ্যে এক ভীতিকর গুঞ্জরণ শুরু হয়ে যায়– 'ডাকাত! ডাকাত!'

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। কাফেলার লোকেরা দেখলো, মরু পোশাক পরিহিত শত শত মানুষ তাদের ঘিরে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে ঘোড়ায় সওয়ার। কারো হাতে বর্শা। কারো হাতে তলোয়ার। কাফেলার লোকদের সংখ্যা অনেক। ফলে অবস্থানের

জায়গাটাও বেশ বিস্তৃত। ডাকাতরা ঘেরাও সংকীর্ণ করতে শুরু করে। কাফেলার সদস্যরা মুসলমান। মোকাবেলা ছাড়া অস্ত্র ফেলে দেয়া তাদের রীতি নয়। তারা জানে, এ ধরনের কাফেলার উপর আক্রমণ হয়ে থাকে। সে কারণে তারা সকলে সশস্ত্র এবং যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত।

'নারী ও শিশুদেরকে মধ্যখানে এক স্থানে একত্রিত করে ফেলো'– এক ব্যক্তি অনুচ্চস্বরে বললো। এক কান দু'কান করে এই নির্দেশনা সব কানে পৌঁছে গেলো।

মহিলা ও শিশুরা অবস্থান স্থলের মধ্যখানে যেতে শুরু করে। কাফেলার ভেতর থেকে তরবারী বেরিয়ে আসে। কিছু বর্শাও দেখা যাচ্ছে। ডাকাতরা চতুর্দিক থেকে একযোগে কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরক্ষণেই ঘোড়ার ছুটাছুটি, হাঁক-ডাক ও তরবারীর সংঘাতের শব্দ শোনা যেতে শুরু করে। নারী ও শিশুদের আর্ত–চীৎকার ভেসে ওঠে হট্টগুলোর মধ্যে মিশে যাচ্ছে। দস্যুরা অধিকাংশ অশ্বারোহী। সকলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ সৈনিক। কাফেলা মোকাবেলায় তাদের সঙ্গে পেরে ওঠছে না। তবু তারা দৃঢ়পদে লড়ে যাচ্ছে এবং মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনি দিয়ে চলছে। একটি শব্দ বারংবার শোনা যাচ্ছে– 'মেয়েদেরকে মধ্যখানে রাখো। মেয়েদেরকে আলাদা হতে দিও না।'

একটি মেয়ে উচ্চস্বরে হাঁক দেয়– 'তোমরা আমাদের চিন্তা করো না, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি।'

কাফেলার লোকেরা যদি ঘোড়ায় আরোহণ করার সুযোগ পেতো, তাহলে তারা ভালোভাবে লড়াই করতে পারতো। কিন্তু তাদের ঘোড়াগুলোয় তখনো যিন বাঁধা হয়নি। ফলে তারা দস্যুদের ঘোড়ার নীচে পিষে যেতে থাকে। সংঘর্ষে কাফেলার লোকদেরই বেশি ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া নারী-শিশুদেরকে আগলে রাখতে হচ্ছে বলে তারা প্রয়োজন অনুসারে ঘুরে-ফিরে মোকাবেলা করতে পারছে না।

কাফেলায় সাত-আটটি যুবতী মেয়ে ছিলো। তন্মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী এক নর্তকীও ছিলো। তার নাম রাদী। পেশার প্রতি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হয়ে আত্মার শান্তি লাভের জন্য মেয়েটি হজ্বে যাচ্ছিলো। সঙ্গে তার প্রেমিক। এই লোকটিকেই আশ্রয় করে মেয়েটি তার মনিবদের থেকে পালিয়ে এসেছে। এখনো তারা বিয়ে করেনি। কথা ছিলো পবিত্র মক্কায় গিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করে হজ্ব পালন করবে।

রাদী অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রেমিক সহযাত্রীর সঙ্গে অবস্থান করে। লোকটার সঙ্গে তরবারী নেই। আছে একটা খঞ্জর। রাদীকে সঙ্গে রেখে তার মাথা ও মুখমণ্ডলটা এমনভাবে ঢেকে রাখে, যেনো কেউ বুঝতে না পারে এটি মেয়ে। সে পদাতিক দস্যুকে পেছন থেকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত হানে। আঘাত এতো তীব্র হয় যে, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রটা বের করে আনা সম্ভব হলো না। দস্যু মোড় ঘুরিয়ে লোকটির পাজরে বর্শার ন্যায় তরবারীর আঘাত হানে। তারপর দু'জনই লুটিয়ে পড়ে যায়। দস্যু ও রাদীর সহযাত্রী প্রেমিক মারা যায়।

দস্যুর পিঠে তীরভর্তি তূনীর বাঁধা ছিলো এবং কাঁধে ধনুক ঝুলছিলো। রাদী তূনীর ও ধনুকটা খুলে নেয়। এরা তিনজন অবস্থান স্থলের একধারে ছিলো। নিকটেই কিছু সরঞ্জাম পড়ে ছিলো। তন্মধ্যে তাঁবুও ছিলো। রাদী মালামাল ও তাঁবুর স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে যায়। তার সম্মুখ দিয়ে খৃস্টান দস্যুদের ঘোড়াগুলো ছুটে অতিক্রম করছে। রাদীর ধনুক থেকে এক একটি তীর বেরিয়ে যাচ্ছে আর অশ্বারোহী দস্যুরা উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছে। এভাবে মেয়েটি কয়েকজন অশ্বারোহী দস্যুকে ফেলে দেয় এবং তার তীর খেয়ে অনেকগুলো ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহীন ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে।

রাদীকে এতোক্ষণ কেউ দেখতে পায়নি। এবার সে এক আরোহীর গায়ে তীর ছুঁড়লে তীরটা ঘোড়ার ঘাড়ে গিয়ে বিদ্ধ হয়। ঘোড়াটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোড় ঘুরিয়ে চক্কর খেয়ে খেয়ে রাদী যে মালপত্র ও তাঁবুর আড়ালে লুকিয়ে ছিলো; সেগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। পিঠের আরোহী ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে। স্তূপের ভেতর থেকে একটা চীৎকার ভেসে আসে। ঘোড়াটা রাদীর ঠিক উপরে পড়েছে। তবে পশুটা এখনো মরেনি। তার ঘাড়ে তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। পরপরই উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করে। আরোহী উঠে দাঁড়াবার পর তাঁবু ও মালপত্রের স্তূপের মধ্যে একটা মাথা দেখতে পায়– নারীর মাথা। আরোহী তাঁবু সরিয়ে দেখে অতিশয় এক রূপসী লুকিয়ে আছে। মেয়েটা উঠে দাঁড়াতে পারছে না। তবে সংজ্ঞাহীনও নয়। খৃস্টান দস্যু তাকে তুলে দাঁড় করালে সে কোঁকাতে শুরু করে।

❖ ❖ ❖

দু'দিন পর। হুসামুদ্দীন এক নৌ-জাহাজে কেবিনে বসে আছেন।

দরজায় করাঘাত পড়ে। স্থল বাহিনীর এক ইউনিট কমান্ডার দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে। তার সঙ্গে অপর এক ব্যক্তি, যার চেহারা ফ্যাকাশে এবং লাশের ন্যায় সাদা।

'খৃস্টান দস্যুরা বিশাল এক কাফেলা লুট করে ফেলেছে'— কমান্ডার হুসামুদ্দীনকে বললো— 'এই লোকটি তাদের বন্দিদশা থেকে পালিয়ে এসেছে। বিস্তারিত এর নিকট শুনুন।'

কাফেলার উপর কিভাবে আক্রমণ হলো, ক্ষয়ক্ষতি কী হলো, এখন কী অবস্থা লোকটি হুসামুদ্দীনকে বিস্তারিত শুনিয়ে বললো— 'আমরা অনেক মোকাবেলা করেছি। কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলো তখনো যিনছাড়া বাঁধা ছিলো। অন্যথায় আমরা তাদেরকে সফল হতে দিতাম না। কাফেলার অল্প ক'জন মানুষ জীবিত আছে। তারা সকলে দস্যুদের হাতে বন্দী। আমার মনে হচ্ছে, এতোক্ষণে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। আমিও তাদের হাতে বন্দি ছিলাম। আমরা না হয় পুরুষ। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের পাঁচটি যুবতী মেয়ে এবং দশ-বারোটি কিশোরী তাদের আয়ত্তে রয়েছে। কাফেলায় বহু মূল্যবান মালামাল ছিলো। সকলের কাছে নগদ অর্থ ছিলো। নব্বইটি ঘোড়া এবং প্রায় দেড়শত উট ছিলো।'

'এখন তারা কোথায়?' হুসামুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'সেখানে ভয়ানক খাড়া খাড়া টিলা আছে'— লোকটি উত্তর দেয়— 'টিলাগুলোর মধ্যে দস্যুরা কক্ষের ন্যায় গুহা তৈরি করে রেখেছে। তাদের কাছে পানির সম্ভার আছে। মনে হচ্ছে, সেটা তাদের স্থায়ী ঘাঁটি। বিজন-বিরান হওয়া সত্ত্বেও জায়গাটা বিরান মনে হচ্ছে না।'

আগন্তুক যে জায়গাটার কথা বললো, সেটির অবস্থান সমুদ্র থেকে বিশ মাইল দূরে। সে বললো— 'কয়েকজন দস্যুও আমাদের তরবারী-বর্শার আঘাতে মারা গেছে। কিন্তু বেশি ক্ষয়ক্ষতি আমাদের হয়েছে। আমরা যে ক'জন জীবিত ছিলাম, তাদেরকে তারা ওখানে নিয়ে গেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের সমস্ত উট-ঘোড়া ও সমুদয় মালপত্র তুলে তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে যায়। তারা রাতে মদপান করে এবং আমাদের সমস্ত মালপত্র খুলে খুলে দেখতে শুরু করে। তাদের একজন নেতাও আছে। মেয়েগুলোকে তার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। আমি মেয়েগুলোকে পরে আর দেখিনি। তারা আমাদের দ্বারা মালামাল বহন করিয়ে প্রশস্ত একটি

গুহায় রাখা ছিলো। অনেকগুলো প্রদীপ জ্বলছিলো। আমার অধিকাংশ সঙ্গী আহত ছিলো। আমি তাদের বলে রেখেছিলাম, আমি পালাবার চেষ্টা করছি। তাদেরই একজন আমাকে বললো, নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারলে সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সেখানে আমাদের বাহিনীর টহল নৌকা পেয়ে যাবে। তাতে আমাদের সৈন্য থাকবে। আমাদের ঘটনাটা তাদেরকে অবহিত করে ব্যবস্থা নিতে বলবে। আমার মনে পড়ে যায়, আমরা যখন মিসরের সীমান্ত অতিক্রম করছিলাম, তখন সেখানে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। তারা আমাদেরকে বলেছিলো, পথে কোন সমস্যায় পড়লে নদীর তীরে চলে যাবে। সেখানে আমাদের বাহিনী আছে। তারা তোমাদের সাহায্য করবে। যা হোক, দস্যুরা মদে মাতাল হয়ে উঠতে শুরু করলো। আমরা মালপত্র সরিয়ে গুহায় রাখছিলাম। আমি অন্ধকারে পালাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। কিন্তু টিলা এলাকাটায় পথ পাচ্ছিলাম না। দু'বার ঘুরে-ফিরে যেখান থেকে পলায়ন করলাম, সেখানেই পৌঁছে গেলাম। আমি আল্লাহকে স্মরণ করলাম। কুরআন তেলাওয়াত করতে শুরু করলাম এবং মধ্য রাতের অনেক পর টিলাময় অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এলাম। নদীটা কোন্ দিকে আন্দাজ করতে পারলাম না। আমি এলোপাতাড়ি হাঁটতে শুরু করলাম। ভোর নাগাদ এতোটুকু দূরে চলে এলাম যে, এখন আর দস্যুরা আমাকে খুঁজে পাবে না। সারাটা দিন আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকি। সঙ্গে পানির ছোট্ট একটি মশক ছিলো। অল্প ক'টা খেজুরও ছিলো। আল্লাহর ইচ্ছায় এই পানি আর খেজুর আমাকে বাঁচিয়ে রাখলো। দুপুর পর্যন্ত পা টেনে টেনে হাঁটলাম। ক্লান্তিতে শরীরটা অবশ হয়ে আসে। এখন আর পা চলছে না। আমি একটি বালির টিপির পাদদেশে পড়ে গেলাম। আমার ঘুম এসে গেলো। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আমার চোখ খুলে। আকাশে তারকা উজ্জ্বল হলে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হলাম। আমি হাঁটতে শুরু করলাম। দীর্ঘক্ষণ পর আমি সমুদ্রের ঘ্রাণ অনুভব করতে শুরু করলাম। আমি বাতাসের বিপরীত পথে এগুতে শুরু করলাম এবং সম্ভবত রাতের শেষ প্রহরে নদীর তীরে এসে পৌঁছি। এবার গন্তব্যে এসে পৌঁছেছি ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ্রামের জন্য অবসন্ন দেহটা মাটিতে এলিয়ে দেই। আমার দু'চোখের পাতা বুজে আসে। যে লোকটি আমাকে

জাগিয়ে তুললো, তাকে সৈনিক বলে মনে হলো। আমি কূলে একটি নৌকা বাঁধা দেখলাম। তার মধ্যে সৈন্য দেখলাম। তারা সকলে আমার নিকট চলে আসে। আমি তাদের ঘটনাটা শোনালাম। তারা আমাকে নৌকায় তুলে নিয়ে আহার করায় এবং এখানে নিয়ে এসে এই কমান্ডারের হাতে তুলে দেয়। কমান্ডার আমাকে আপনার কাছে নিয়ে আসে।'

'পথ দেখানোর জন্য তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাওয়া প্রয়োজন'– 'হুসামুদ্দীন বললেন– 'কিন্তু এই শরীরে যাবে কী করে? চেহারাটা তোমার লাশের ন্যায় সাদা হয়ে গেছে। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

'আমি এক্ষুনি আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত'– লোকটি বললো– 'আমি বিশ্রাম করতে পারি না। এই সফরে যদি ক্লান্তিতে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তো আমি প্রস্তুত আছি। ডাকাতদের কবলে আমাদের মেয়েদের না জানি কী পরিণতি ঘটেছে। এই নিষ্পাপ মেয়েগুলাকে হায়েনাদের কবল থেকে উদ্ধার করা আমার ঈমানী কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে আমি জীবন বিলিয়ে দিতে চাই।'

'দস্যুদের সংখ্যা কত?' হুসামুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'পাঁচশ'রও বেশি হবে।' লোকটি উত্তর দেয়।

'পাঁচশত লোক যথেষ্ট হবে?'– হুসামুদ্দীন স্থল বাহিনীর কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করেন– 'আমারও সঙ্গে থাকা প্রয়োজন।'

'হবে'– কমান্ডার উত্তর দেয়– 'তন্মধ্যে অন্তত একশত অশ্বারোহী এবং অবশিষ্টরা পদাতিক হবে। আমাদেরকে কমান্ডো অভিযান চালাতে হবে। সে জন্য গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত নীরবতা বজায় রাখতে হবে। ঘোড়া যতো বেশি হবে, শোরগোলের আশঙ্কা ততো বেশি হবে। আমি এর থেকে জায়গাটার অবস্থান ভালোভাবে বুঝে নিয়ে এখনই রওনা হয়ে যাবো। এমনিতেই এর এসে পৌঁছতে বিলম্ব হয়ে গেছে। আমাদের যতো দ্রুত সম্ভব পৌঁছে যাওয়া দরকার। আমি দিকটা অনুমান করে নিয়েছি। আশা করি সন্ধ্যায় রওনা হলে মধ্যরাত নাগাদ পৌঁছে যেতে পারবো।'

'ছোট মিনজানিক সঙ্গে নেবে'– হুসামুদ্দীন বললেন– 'তরল দাহ্য পদার্থের পাতিল এবং সলিতাওয়ালা তীরও রাখবে। আর একে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্রাম করতে দাও। সকলকে বলে দেবে, মোকাবেলা দস্যুর সঙ্গে নয়– অভিজ্ঞ খৃস্টান সৈন্যদের সঙ্গে হবে।'

স্থল বাহিনীর কমান্ডার লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়।

❖ ❖ ❖

দস্যুদের ঘাঁটিটা দুর্গের মতো শক্ত ও দুর্ভেদ্য। টিলাগুলো আঁকাবাঁকা এমন দুর্গম পথ তৈরি করে রেখেছে যে, চির চেনা না হলে ঢুকলে আর বের হওয়া সম্ভব নয়। মধ্যখানে বিস্তৃত একটা মাঠ। মাঠের চতুর্পার্শ্বের টিলাগুলোর ভেতরে খৃস্টানরা অসংখ্য উঁচু ও লম্বা-চওড়া কক্ষ তৈরি করে রেখেছে। উট-ঘোড়ার থাকার জায়গা আলাদা। হুসামুদ্দীনের স্থল বাহিনীর নির্বাচিত ইউনিটটি পুরোপুরি নীরবতা বজায় রেখে মধ্যরাতের আগেই উক্ত অঞ্চলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। খৃস্টানরা ধরা পড়ার কিংবা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বোধ হয় কখনো অনুভব করেনি। অন্যথায় এদিক-ওদিক প্রহরার ব্যবস্থা করে রাখতো।

হুসামুদ্দীন ঘোড়াগুলোকে পেছনে রাখেন, যাতে তাদের হ্রেষারব দুমশনের কানে না পৌঁছে। বাহিনীর কমান্ডার চারজন সৈনিক নিয়ে একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। এদিক-ওদিক মোড় ঘুরিয়ে অনেক ভেতরে চলে যায়। এবার ঘোড়ার ক্ষীণ শব্দ তার কানে আসতে শুরু করে। কমান্ডার একটা উঁচু টিলার উপর উঠে যায়। কমান্ডো আক্রমণ এবং লুকিয়ে লুকিয়ে টার্গেটে পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার ওস্তাদ কমান্ডার। টিলার উপরটা চওড়া। কমান্ডার সেখান থেকে নেমে আরেকটি টিলার উপর চড়ে। মানুষের হাঙ্গামার মতো শব্দ শুনতে পায়। সে সেখান থেকেও নেমে পড়ে। এবার অপর এক গলিতে ঢুকে হাঁটতে শুরু করে। হঠাৎ নিকট থেকে কারো কথা বলার শব্দ শুনতে পায়। কমান্ডার তার সৈনিকদের ইশারা করে। সকলে অস্ত্র তাক করে টিলার সঙ্গে গা ঘেঁষে এগুতে থাকে। সামনে মোড়।

দু'জন লোক কথা বলতে বলতে মোড়ে এসে পৌঁছে। কণ্ঠে বুঝা যাচ্ছে, লোকগুলো মদ খেয়ে এসেছে। সৈনিকদের অতিক্রম করে পা চারেক অগ্রসর হওয়া মাত্র পেছন থেকে সৈনিকরা তরবারীগুলো তাদের পার্শ্বে ঠেকিয়ে ধরে। কমান্ডার বললো– 'শব্দ করবে তো মেরে ফেলবো।'

সেখান থেকে তাদেরকে দূরে এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। তারা জীবন বাঁচাতে তাদের ঘাঁটির কথা বলে দেয় এবং সেখানে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেয়। মুসলিম কমান্ডার তাদের একজনকে সঙ্গে করে উপরে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দস্যুদের আস্তানা দেখা যায়। উপর থেকে দেখে কমান্ডার অবাক্ হয়ে যায়। এই জাহান্নামসম অঞ্চলটাকে খৃস্টানরা

জান্নাতের দৃশ্য বানিয়ে রেখেছে। যেখানে পথিকরা পিপাসায় জীবন হারায়, সেখানে এরা মদপান করছে। মদ খেয়ে অনেকে এদিক-ওদিক বেহুঁশ পড়ে আছে। লোকগুলো প্রশস্ত মাঠটায় দলে দলে বিভক্ত হয়ে নানা কাজে ব্যস্ত। কোন দল মদপান করছে। কোন দল গল্প-গুজবে মেতে আছে। কোন দল বসে বসে গান গাইছে। এক স্থানে একটি মেয়ে নাচছে। তার চার পাশে অসংখ্য দর্শকের ভিড়। স্থানে স্থানে প্রদীপ জ্বলছে।

'যখন বড় কোন কাফেলা লুট করা হয়, এরূপ উৎসব তখনই পালন করা হয়। তিন-চার রাত চলে।' খৃস্টান বন্দি বললো।

'কতজন আছে?'

'প্রায় ছয়শত'— বন্দি জবাব দেয়— 'কমান্ডার একজন নাইট। এ সময়ে তার মেয়েদের নিয়ে পড়ে থাকার কথা।'

কমান্ডার টিলার চূড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাঠের পরিসংখ্যানটা নিয়ে নেয়। প্রদীপের আলোতে যা কিছু দেখা যাচ্ছিলো, দেখে নেয়। যা কিছু দেখা যাচ্ছে না, বন্দি তার তথ্য দেয়। লোকগুলোকে হঠাৎ ঘিরে ফেলে কীভাবে কাবু করে ফেলা যায়, কমান্ডার সেই পরিকল্পনাই ঠিক করছে। পরে কয়েদীটাকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নেমে আসে। অপর কয়েদীও সঙ্গীদের নিয়ে হুসামুদ্দীনের নিকট চলে যায় এবং অভিযান কিরূপ হতে পারে ধারণা দেয়।

মাঠে প্রদীপের আলোতে গল্প-গুজবকারী খৃস্টান দস্যুদের সংখ্যা কমে গেছে। অনেকেই যার যার অবস্থানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে অল্প ক'জন। হুসামুদ্দীন বলে দেন যতো বেশিসংখ্যক সম্ভব দস্যুকে ধরে নিয়ে আসবে। কমান্ডার তাতে আপত্তি উত্থাপন করে বললো— 'আমি এদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাই। হত্যা করে করে আমি এদের মৃতদেহগুলো শৃগাল-শকুন ও মরু শিয়ালের আহারের জন্য এখানে ফেলে রাখতে চাই। আপনি তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করে তাদের সম্রাটদের সঙ্গে কোন সওদা করতে চাচ্ছেন কি?'

'না'— হুসামুদ্দীন বললেন— 'আমারও প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা আছে। আমাদের সেই মুসলমান কয়েদীদের রক্তের বদলা নিতে হবে, যাদেরকে খৃস্টানদের এক যুদ্ধবাজ সম্রাট অর্নাথ আক্রা নিয়ে হত্যা করেছিলো। যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা আইনত অবৈধ। কিন্তু অর্নাথ প্রথমে আমাদের

সকল বন্দিকে উপোস রাখে, তাদের দ্বারা কঠিন কঠিন কাজ করায়। তারপর এক সারিতে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে। ঘটনাটা সাত বছর আগের। আমি জীবনেও এই স্মৃতি ভুলতে পারবো না। আজ প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেয়ে গেছি। আমি এ কথা শুনতে প্রস্তুত নই যে, খৃস্টান দস্যুরা আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে এসে মারা গেছে। তাদেরকে জীবিত ধরে নিয়ে আসো। তবে আমি তাদেরকে জীবিত রাখবো না। খৃস্টানরা আমাদের বন্দিদেরকে যেভাবে হত্যা করেছিলো, আমি তাদেরকে ঠিক সেভাবেই হত্যা করবো।'

হুসামুদ্দীনের সৈন্যরা তিনটি পথে এগিয়ে গিয়ে মাঠে ঢুকে পড়ে। তারা মাঠের স্থানে স্থানে প্রজ্বলমান প্রদীপ থেকে নিজেদের বাতিগুলো জ্বালিয়ে নেয়। যে ক'জন জাগ্রত ছিলো, তারা নেশার ঘোরে গালাগাল করতে শুরু করে। তারা যুদ্ধ করার পজিশনে নেই। আক্রমণকারী সৈন্যরা তাদেরকে জীবিত বন্দি করার পরিবর্তে তরবারীর আঘাতে হত্যা করতে শুরু করে। হট্টগোল শুনে ঘুমন্তরা জেগে ওঠে। কী ঘটছে বুঝে ওঠার আগেই অধিকাংশ বর্শাবিদ্ধ হয়ে যায়। তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার সুযোগ পেলো না। গুহাসম কক্ষগুলো থেকে কয়েকজন বর্শা ও তরবারী নিয়ে বেরিয়ে আসে। তাদের কতিপয় মারা পড়ে এবং বাকিরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। তাদের নাইট এমনভাবে অচেতন পড়ে আছে যে, তার পরিধানে পোশাক নেই। সে গালাগাল করতে শুরু করে। মুসলিম সৈন্যদেরকে, সে নিজের সৈন্য মনে করেছে। তার কক্ষ থেকে তিনটি মুসলিম মেয়ে বেরিয়ে আসে।

অন্যান্য কক্ষগুলো থেকেও আরো কয়েকটি মেয়ে বের হয়। তারা সকলে মুসলমান। অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তারা মুসলিম সৈন্যদেরকে সম্ভবত দস্যুদের অন্য কোন দল মনে করেছে। সে কারণে তারা ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলো, এরা মুসলিম সৈনিক, তখন তারা পাগলের ন্যায় আচরণ করতে শুরু করে। তারা কাঁদছে এবং দাঁত কড়মড় করে খৃস্টান দস্যুদের গালাগাল করছে। কেউ কেউ মুসলিম সৈন্যদেরকে কাপুরুষ বলে ভর্ৎসনা করছে যে, তোমরা যদি বীর মুসলমান হয়ে থাকো, তাহলে এদেরকে হত্যা করছো না কেন? তোমাদের কি বোন-কন্যা নেই? আমাদের সম্ভ্রম কি তোমাদের বোন-কন্যাদের ন্যায় মূল্যবান নয়?'

হুসামুদ্দীন ও স্থল বাহিনীর কমান্ডার কক্ষে কক্ষে তল্লাশি নিতে শুরু করেন। এখন বাইরে কোন যুদ্ধ নেই। দস্যুদেরকে আলাদা এক জায়গায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। সশস্ত্র সৈন্যরা তাদের ঘিরে রেখেছে।

সকালে যখন খৃস্টানদের নেশার ঘোর কাটে, তখন তারা সমুদ্রের কূলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উপবিষ্ট। হুসামুদ্দীন মেয়েগুলোকে জাহাজে তুলে রাখেন। বন্দিদের সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচশত। অন্যরা মারা গেছে। তারা টিলার অভ্যন্তরে যেসব মালামাল ও নগদ অর্থ জমা করে রেখেছিলো, সেগুলো খৃস্টান বন্দীদের দ্বারা বহন করিয়ে সমুদ্রকূলে নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কমান্ডার থেকে যেসব তথ্য বেরিয়ে আসে, তাতে জানা গেলো, এটি বিখ্যাত খৃস্টান সম্রাট রেনাল্ড ডি শাইতুনের বাহিনী। মুসলিম কাফেলাগুলো লুণ্ঠন করার জন্য এদেরকে এখানে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। কিছুদিন পর সেনা বদল হয়। নতুন একদল আসে তো আগের দল চলে যায়। লুণ্ঠিত অর্থ-সম্পদের একটা অংশ সৈন্যদেরকে দেয়া হয়। অবশিষ্টগুলো সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। উট-ঘোড়াগুলো সব রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে যায়।

মেয়েদের ব্যাপারে নির্দেশ ছিলো, অল্পবয়স্ক অসাধারণ রূপসী মেয়েদেরকে খৃস্টানদের হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে হবে। সেখানে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর গুপ্তচরবৃত্তি এবং নাশকতার জন্য মুসলমানদের অঞ্চলে প্রেরণ করা হতো। কোন যুবতী মেয়ে যদি অতিশয় সুন্দরী হতো, তাহলে তাকেও হেডকোয়ার্টারের হাতে তুলে দেয়া হতো। অন্যান্য মেয়েদেরকে এই খৃস্টান সৈন্যরা নিজেদের কাছে রেখে দিতো।

'এই কাফেলায়ও কিশোরী মেয়ে ছিলো নিশ্চয়ই। ক'টা ছিলো?' হুসামুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'বারো-চৌদ্দটা'– খৃস্টান কমান্ডার বললো– 'মাত্র একটাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'আর অন্যরা?'

'সব ক'টা খুন হয়েছে।'

'কাফেলার যে ক'জন পুরুষকে নিয়ে এসেছিলো তাদেরকে মালপত্র বহন করার জন্য আনা হয়েছিলো। পরে তাদেরকেও হত্যা করা হয়েছে।'

খৃষ্টান কমান্ডার যুবতী মেয়েদের সম্পর্কে জানায়– 'তাদের মধ্যে একজন নর্তকী ছিলো। অতিশয় রূপসী মেয়ে। তার দেহ-রূপ ও নাচ ঠিক সেই মানের ছিলো, যার জন্য আমরা মেয়ে সংগ্রহ করে থাকি। মেয়েটাকে সেদিন সন্ধ্যায়ই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেয়ার কারণ হচ্ছে, এমন মূল্যবান ও আকর্ষণীয় একটি মেয়ের সৈনিকদের মাঝে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ। যে কোন সৈনিক তাকে মুক্ত করার টোপ দিয়ে ভাগিয়ে নিতে পারতো।'

'মুসলমানদের হজ্বযাত্রী কাফেলাকে তারা হত্যা করে ফেলেছে'– হুসামুদ্দীন কমান্ডারকে বললেন– 'কাফেলা হেজাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলো না। সেই হতভাগাদের পরিবর্তে আমি তাদের ঘাতকদেরকে হেজাজ প্রেরণ করবো এবং সেখানেই তাদেরকে হত্যা করাবো।'

দস্যুরা কাফেলাটা যেখানে লুণ্ঠন ও গণহত্যা করেছিলো, হুসামুদ্দীন বন্দিদেরকে সেখানে নিয়ে যান। ঘটনাস্থলে শিয়াল, নেকড়ে ও শকুনের খাওয়া লাশগুলো ছড়িয়ে আছে। হুসামুদ্দীন বন্দিদের দ্বারা কবর খনন করান। জানাযা পড়িয়ে সবক'টি লাশ দাফন করে ফেলেন। তিনি কায়রোর নির্দেশ ছাড়াই বন্দিদেরকে একটি জাহাজে করে জেদ্দার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। জেদ্দায় নামিয়ে তাদের এই বার্তাসহ হেজাজের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেয়া হয়, এদেরকে যেনো মিনার মাঠে হত্যা করা হয়। বার্তায় তিনি এদের অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এই খৃষ্টান দস্যু সৈনিক এবং তাদের কমান্ডারের হত্যাকাণ্ডে বেশ মাতামাতি করেছেন এবং ইতিহাসের পাতায় অনেক বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাদেরকে তারা যুদ্ধবন্দি আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কোন্ যুদ্ধে বন্দী হয়েছে, সে কথা উল্লেখ করেননি। তারা কোন দুর্গ কিংবা রণাঙ্গন থেকে বন্দি হয়নি– বন্দী হয়েছিলো কাফেলা লুণ্ঠণকারী ডাকাতদের ঘাঁটি থেকে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের লেখনী থেকে প্রমাণিত হয়, এই সিদ্ধান্তটা ছিলো নৌ-বাহিনী প্রধান হুসামুদ্দীন লুলুর একান্তই নিজস্ব, যার সম্পর্কে সুলতান আইউবী সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন।

❖ ❖ ❖

খৃষ্টান দস্যু কমান্ডার যে নর্তকী সম্পর্কে বলেছিলো, তাকে সেদিন সন্ধ্যায়ই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সে হলো রাদী। কমান্ডারের জবানবন্দী

মোতাবেক মেয়েটাকে এতো দ্রুত পাঠিয়ে দেয়ার একটি কারণ হলো, মেয়েটি ঘোড়ার নীচে পড়ে আহত হয়েছিলো। যেহেতু তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাই তার চিকিৎসারও প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া কমান্ডার তাকে কাছে রেখে কোন প্রকার দুর্নাম মাথায় নিতে চাচ্ছিলো না।

যে সময়ে কমান্ডার হুসামুদ্দীনকে এসব জবানবন্দী দিচ্ছিলো, ততোক্ষণে রাদী চারজন খৃস্টান সৈন্যের সঙ্গে সেখান থেকে বহুদূর পৌঁছে গিয়েছিলো। সে ঘোড়ায় চড়া। এতোক্ষণে তার শারীরিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। পথে সে সৈন্যদের কয়েকবারই বলেছিলো, তোমরা আমাকে কায়রো দিয়ে আসো, আমি তোমাদেরকে বিপুল পুরস্কার দেবো। কিন্তু সৈন্যরা তাতে সম্মত হয়নি। অবশেষে এক সৈনিক বললো– 'তুমি দেখতে পাচ্ছো আমরা তোমাকে রাজকন্যার ন্যায় নিয়ে যাচ্ছি। তুমি এতো রূপসী এবং তোমার শরীরে এমন যাদু আছে যে, যাকেই ইঙ্গিত করবে, সে-ই তোমার পায়ে এসে জীবন দেবে। তথাপি আমরা তোমর দেহ থেকে চার পা দূরে থাকছি। কারণ, তুমি আমাদের কাছে আমানত। আর এই আমানত আমাদের সম্রাটদের, যারা কিনা ক্রুশের রাজা। আমরা যদি তোমার প্রস্তাব মেনে নেই কিংবা তোমাকে আমাদের সম্পদ মনে করি, তাহলে আমাদেরকে না সম্রাটগণ ক্ষমা করবেন, না ক্রুশ।'

'আমাদের গন্তব্য কোথায়? রাদী জিজ্ঞেস করে।

'অনেক দূর'– একজন উত্তর দেয়– 'সফর অনেক কঠিন ও দীর্ঘ। আমাদেরকে এমন সব অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, যেগুলো মুসলমানদের দখলে।'

চার খৃস্টান সৈনিক রাদীকে আসলেই রাজকন্যার ন্যায় নিয়ে যাচ্ছিলো। এক সৈনিক জিজ্ঞেস করে– 'তোমাকে কোন শাসনকর্তা কিংবা বড় কোন ব্যবসায়ীর মেয়ে মনে হচ্ছে। পরিবারের সঙ্গে হজ্বে যাচ্ছিলে, না?'

'কেউ কি তোমাদেরকে বলেনি, আমি নর্তকী?'– রাদী উত্তর দেয়– 'আমার পিতা নেই। কোন ভাই নেই। আমার মা ইসমাঈলার বিখ্যাত নর্তকী ও গায়িকা। আমি তার কোন্ খদ্দেরের কন্যা আমার জানা নেই। মা শৈশবেই আমাকে নাচের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। নাচ-গান আমার ভালো লাগতো। ষোল-সতের বছর বয়সে মা আমাকে বড় এক ধনী

লোকের ঘরে পাঠিয়ে দেন। লোকটা বৃদ্ধ ছিলো। মদে মাতাল ছিলো। আমাকে বললো, আমি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে যাচ্ছি। বৃদ্ধের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে যায়। আমার হৃদয়ে অনুভূতি জাগে, আমার পিতা নেই। বৃদ্ধকে দেখে আমার মনে পিতার কল্পনা এসে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ আমার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করতে শুরু করে। তাতে আমি বুঝে ফেললাম, এই লোক আমার পিতা নয়– খদ্দের। আমি বৃদ্ধের কবল থেকে পালিয়ে গেলাম। মাকে বললাম। মা বুঝালেন, এটা তোমার পেশা। আমি মানলাম না। মা আমাকে মারধর করলেন। আমি বললাম, আমি নাচবো, গাইবো, কিন্তু কারো ঘরে যাবো না। মা আমার শর্ত মেনে নেন।

এবার বিত্তশালীরা আমাদের ঘরে আসতে শুরু করে। কারো ঘরে যাচ্ছি না বলে আমার দাম বেড়ে যায়। তিন বছর কেটে গেছে। এ সময় আমার মনে বাসনা জাগে, যদি এমন একজন সচ্চরিত্রবান পুরুষ পেয়ে যেতাম, যে আমার রূপ উপভোগ এবং নাচানোর পরিবর্তে আমাকে ভালোবাসবে, যার মধ্যে কোন বিলাসিতা ও বদমায়েশী থাকবে না। অবশেষে আমি একজন পুরুষ পেয়ে গেলাম। লোকটা দু'বার আমার ঘরে এসেছিলো। আমার তাকে ভালো লাগতো। বয়সে আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড়। আমরা ঘরের বাইরে মিলিত হতে শুরু করলাম। দু'জনের মাঝে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠলো। লোকটা রাজপুত্র ছিলো। মদপান করতো।

একদিন সন্ধ্যায় আমি তাকে বললাম, তুমি মদ ছেড়ে দাও। সে শপথ করে বললো, ভবিষ্যতে আমি আর কখনো মদপান করবো না। আর খায়নি। একদিন সে আমাকে বললো, তুমি নাচ ছেড়ে দাও। আমি কসম খেয়ে বললাম, এই পেশার প্রতি আমি অভিসম্পাত করবো। কিন্তু মায়ের ঘরে বাস করে তো এই পেশা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। সে বললো, আমি বিলাসী পিতার বিলাসী পুত্র। আমার পিতার হেরেমে তোমার চেয়েও অল্পবয়সী মেয়েরা আছে। সেই ঘরে বাস করে আমিও পুণ্যবান হতে পারবো না। আমি বললাম, আমি নর্তকী মায়ের নর্তকী মেয়ে আর তুমি বিলাসী পিতার বিলাসী পুত্র। তোমার পিতার চরিত্র তোমাকে নষ্ট করছে আর আমার মায়ের পেশা আমাকে নষ্ট করছে। চলো আমরা দূরে কোথাও পালিয়ে যাই এবং স্বামী-স্ত্রী হয়ে পবিত্র জীবন-যাপন করি। সে আমার প্রস্তাবটা মেনে নেয়।

ছেলেটা মুসলমান ছিলো। আমার কোন ধর্ম নেই। আমার জনক মুসলমান ছিলো নাকি ইহুদী-খৃস্টান তাও আমি জানি না। আমি তাকে বললাম, আমাকে মুসলমানই মনে করো এবং বুঝাও ধর্ম কী। তুমি আমাকে ভালোবাসা দাও, পবিত্র জীবন দাও। সে অনেক চিন্তা করে বললো, পবিত্র যদি হতে চাও, তাহলে হেজাজ চলে যাও। আমি হেজাজের অনেক গান শুনেছি। যে গানে হেজাজ এবং হেজাজের কাফেলার কথা থাকে, সেই গান আমার খুব ভালো লাগে। একটা গান আমি একাকী গুন গুন করে থাকি– 'চলে কাফেলে হেজাজ কে'। ছেলেটা হেজাজের নাম উচ্চারণ করে আমার কামনাকে উত্তেজিত করে তোলে। বললাম, আমি প্রস্তুত। তুমি সাহস করো, আমার আকাঙ্খা পূর্ণ করো। সে জিজ্ঞেস করে, জানো, হেজাজ কেন যাবো? আমি বললাম, শুনেছি জায়গাটা অত্যন্ত সুন্দর। সে বললো, শুধু সুন্দরই নয়– পবিত্রও। ওখানেই কাবা ঘর। ওখানেই যমযমের কূপ। ওখানে যে যায়, তার আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। সেখানে গিয়ে আমরা হজ্ব করবো এবং পবিত্র হয়ে বিয়ে করবো। তারপর সেখানেই বসবাস করবো।

আমি সে সময়টার কথা ভুলতে পারবো না, যখন ছেলেটা আমার সঙ্গে শিশুর ন্যায় কথা বলছিলো আর আমি যেনো চোখের পথে তার আত্মায় ঢুকে গিয়েছিলাম। আমার ব্যক্তিসত্ত্বা তার সত্ত্বায় মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। আমি তাকে বললাম, যাবোই যখন সময় নষ্ট না করে আজই চলো– এখনই। সে বললো, কোন কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে হবে। দেখি কাফেলা কবে পাই। একাকী যাওয়া যাবে না।

একদিন সন্ধ্যায় সে আমাকে বললো, আজ রাতেই এখানে চলে আসবে। একটা কাফেলা রওনা হয়েছে। আমরা তার সঙ্গে মিশে যাবো। আমি বললাম, এখন ঘরে গেলে রাতে আর বেরুতে পারবো না। এখনই রওনা হও। সে বললো, ঠিক আছে, আসো। সন্ধ্যা গভীর হয়ে গেলে সে আমাকে এক স্থানে লুকিয়ে রেখে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর দু'টি ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসে। একটির উপর নিজে চড়ে বসেছে, অপরটি শূন্য। উভয়টির সঙ্গেই পানি ও খাবার বাঁধা আছে। আমরা পরদিন সন্ধ্যায় কাফেলার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হই এবং রাতে সেখানে গিয়ে পৌঁছাই, যেখানে তোমরা আমার স্বপ্নটাকে আমার ভালোবাসার লহুতে ডুবিয়ে দিয়েছো। লোকটা মারা গেছে। আমি ধরা পড়ে গেলাম। হেজাজের কাফেলাটা লুণ্ঠিত হলো

আর মনের মানুষটি স্বপ্নের পুরুষটি কাবা গৃহে না পৌঁছেই আল্লাহর নিকট চলে গেলো। আল্লাহ আমার পাপ ক্ষমা করেননি। আমার কপালের ভাগ্যে কাবা ঘরে সেজদা লিপিবদ্ধ হয়নি। আমার অস্তিত্ব নাপাক ছিলো। সে কারণেই আল্লাহ আমাকে কবুল করেননি।'

'তোমার যদি কোন ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় নিতেই হয়, তাহলে আমাদের ধর্মকে কাছে থেকে দেখে নিও।' এক সৈনিক বললো।

'তোমরা আমার একটা পবিত্র স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছো'– রাদী বললো– 'এটা কি তোমাদের ধর্মের আদেশ, যা তোমরা তামিল করেছো? এ ধরনের বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আমার রওনা হওয়ার সময়ও ছিলো। কিন্তু শঙ্কাটা এতো ভয়ানক ছিলো না।'

'এটা আমাদের ধর্ম নয়'– সৈনিক বললো– 'এটা সেই মানুষদের নির্দেশ, আমরা যাদের চাকরি করি।'

'তোমাদের চেয়ে আমি অনেক ভালো'– রাদী বললো– 'রাজা-রাজপুত্তরা হিরা-জহরত নিয়ে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে থাকে। আর তোমরা তাদের দাসত্ব করছো। যে আদেশটা আত্মা থেকে আসে, সেটা মান্য করো। আমি সেই ব্যক্তির ধর্মের ভক্ত, যে আমাকে পবিত্র ভালোবাসা দান করেছে এবং পবিত্র চিন্তার অধিকারী করেছে। এর থেকেই ধরে নিয়েছি, তার ধর্মই মহান হবে। লোকটা আমাকে আমার স্বপ্নের ভূমি হেজাজ নিয়ে যাচ্ছিলো। তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'

'আমরা মানুষের আদেশের কাছে দায়বদ্ধ।' সৈনিক বললো।

'আমি আল্লাহর হুকুমের পাবন্দ।' রাদী বললো।

'তোমার আল্লাহ তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন'– অপর এক সৈনিক বললো– 'এখন তুমি আমাদের কাছে দায়বদ্ধ। গন্তব্যে পৌঁছে ভেবো খোদাকে কীভাবে খুশি করবে। প্রয়োজন হলে কোন নেক কাজ করবে। হয়তো খোদা তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন।'

'আমি জানি, তোমরা আমাকে কোথায় এবং কেন নিয়ে যাচ্ছো'– রাদী বললো– 'আমার অস্তিত্বটা আপাদমস্তক পাপ হয়ে যাবে এবং আমি কোন নেক কর্ম করতে পারবো না।'

'কোন পুণ্যের কল্পনাও তুমি করতে পারবে না'– এক সৈনিক বললো– 'তুমি পাপের সৃষ্টি। পাপের মাঝে লালিত-পালিত। একজন পাপিষ্টের সঙ্গে ঘর পালিয়েছো। কী পুণ্য করবে তুমি?'

'সেই নিরপরাধ মানুষগুলোর রক্তের প্রতিশোধ নেবো, তোমরা যাদেরকে হত্যা করেছো।' রাদী দাঁত কড়মড় করে বললো।

চার সৈনিক উচ্চকণ্ঠে একটা অট্টহাসি দেয়। একজন বললো– 'তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। আমরা এমনই আদেশ পেয়েছি। অন্যথায় এ ধরনের উক্তি তোমার মুখ থেকে দ্বিতীয়বার বের হতে পারতো না।'

রাদী লোকগুলোর প্রতি তাকিয়ে থাকে। তার হৃদয়ে এই অমানুষগুলোর প্রতি ঘৃণা বাড়তে থাকে।

মসুলে একজন দরবেশ এসেছেন। এক মুখ দু'মুখ করে সংবাদটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে মুহূর্ত মধ্যে। অশীতীপর এক বৃদ্ধ। মানুষ বলাবলি করছে, তিনি যে কোন ভাগ্যবান লোকেরই সঙ্গে কথা বলেন। আর যার সঙ্গে কথা বলেন, তার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যায়। নগরীর প্রাচীরের বাইরে একটি ঝুপড়িতে থাকেন। তার কারামতের কাহিনী নগরীর মানুষের মুখে মুখে।

জনতা দরবেশের আস্তানার চারদিকে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। তিনি সামান্য সময়ের জন্য বাইর এসে হাতের ইশারায় অপেক্ষমান জনতাকে নীরব থাকতে বলছেন। জনতা নিশ্চুপ হয়ে গেলে তিনি মুখে কিছু না বলে ইঙ্গিতে তাদের সান্ত্বনা প্রদান করে ঝুপড়িতে ঢুকে পড়ছেন। তার সঙ্গে সাদা-গোলাপী বর্ণেল চার-পাঁচজন সুশ্রী লোকও রয়েছে। দরবেশের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবুজ চাদরে আবৃত।

এবার আরেক খবর। দরবেশ মসুলবাসীর জন্য কী একটা সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন। নগরীতে অপরিচিত লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গেছে। তারা জনতাকে দরবেশের কল্প-কাহিনী শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। শুনে মানুষ আপ্লুত হয়ে পড়ছে। সকলে এই দরবেশের দ্বারা নিজে সকল সমস্যা দূর করাতে এবং সকল কামনা পূরণ করাতে উদগ্রীব হয়ে উঠছে। অল্প ক'দিন পর খবর ছড়িয়ে পড়ে দরবেশ আসলে ইমাম মাহদী। কেউ কেউ বলছে ঈসা। ঐ যে আসমান থেকে দুনিয়াতে নেমে আসার কথা ছিলো, এসে পড়েছেন।

একদিন জনতা দেখলো, দরবেশ মসুলের গবর্নর ইয্যুদ্দীনের ঘোড়াগাড়িতে করে তার প্রাসাদ অভিমুখে যাচ্ছেন। ইয্যুদ্দীনের রক্ষী

সেনারা তাকে স্বাগত জানায় এবং তিনি মহলে ঢুকে পড়েন। ঘণ্টা কয়েক পর বেরিয়ে রাষ্ট্রীয় গাড়িতে করে চলে যান। জনতা তার আস্তানায় গিয়ে দেখে, আস্তানা উধাও। সেই গাড়িটিই দরবেশকে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে। সন্ধ্যায় গাড়ি ফিরে আসে। ভেতরে গাড়োয়ান আর দু'জন রক্ষী। জনতা গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, দরবেশ কোথায়?

'আমরা বলতে পারবো না তিনি কোথায় গেছেন'– এক রক্ষী বললো– 'একটা পাহাড়ের নিকট গিয়ে গাড়ি থামাতে বললেন। গাড়ি থেমে গেলে আমাদেরকে বললেন, তোমরা চলে যাও। আমরা তার এক সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর কোথায় যাচ্ছেন? তারা বললো, তিনি পাহাড়ের চূড়ায় ধ্যানে বসবেন। দিগন্তে একটি নিদর্শন দেখতে পাবেন। তারপর পর্বতচূড়া থেকে নেমে এসে মসুলের গবর্নরকে বলবেন তার করণীয় কী। তারপর মসুলের বাহিনী যেদিকেই যাবে, পাহাড় তাদেরকে পথ করে দেবে। মরুভূমি শ্যামলিমায় ভরে ওঠবে। দুশমনের ফৌজ অন্ধ হয়ে যাবে এবং মসুলের গবর্নর যে পর্যন্ত পৌছবেন, সে পর্যন্ত তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সালাহুদ্দীন আইউবী ইয্‌যুদ্দীনের সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করবে। খৃষ্টানরা তার গোলাম হয়ে যাবে এবং মসুলের অধিবাসীরা অর্ধ পৃথিবীর রাজা হয়ে যাবে। তারা সোনা-রূপার মধ্যে খেলা করবে। তবে আমরা বলতে পারবো না, তিনি কোন্ পাহাড়ে ধ্যানে বসবেন।'

মসুল থেকে খানিক দূরে একটি পার্বত্য অঞ্চল। সেখানে কোন বসতি নেই। একস্থানে একটা মাঠ আছে। মাঠটা পাহাড়বেষ্টিত। সেখানে দু'চারটি কুঁড়েঘর চোখে পড়ে। অঞ্চলটা সবুজ-শ্যামল। রাখালরা পশু চড়াতে নিয়ে যায়।

একদিন রাখালদেরকে সেদিকে পশু নিয়ে যেতে বারণ করা হলো। মসুলের সেনারা টহল দিয়ে ফিরছে। তাদের সঙ্গে বহিরাগত অচেনা লোকও আছে। পার্বত্য অঞ্চলটার বিস্তীর্ণ এলাকায় মানুষের যাতায়াত নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে অঞ্চলটার প্রতি মানুষের কৌতূহল জন্মে গেছে। সকলের মনে প্রশ্ন– ব্যাপারটা কী? মানুষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করে দেয়। নানা রকম বিস্ময়কর ও অভিনব কাহিনী ছড়াতে শুরু করে। একদিনের মধ্যেই সকলের কানে কানে পৌছে যায়, দরবেশ আকাশ থেকে একটি নিদর্শন লাভ করবেন। তারপর আধা পৃথিবীর উপর মসুলবাসীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

❖ ❖ ❖

ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর। তাতে বসে ভিন্ন ধরনের কথা বলছে চার ব্যক্তি। তাদের একজন হাসান আল-ইদরীস। হাসান আল-ইদরীস সুলতান আইউবীর গুপ্তচর, যে কিনা বৈরুত থেকে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য নিয়ে এসেছিলো এবং সঙ্গে এনেছিলো মসুলের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীনের দূত এহতেশামুদ্দীন ও তার নর্তকী কন্যা সায়েরাকে। সে নজিরবিহীন সাফল্য ছিলো হাসানের। এহতেশামুদ্দীন সুলতান আইউবীকে তথ্য দিয়েছিলো, খৃস্টানরা মসুলের সন্নিকটে কোন এক পার্বত্য অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, দাহ্য পদার্থ এবং রসদ জমা করবে। তার থেকে প্রমাণিত হয়, তারা এ পার্বত্য অঞ্চলটাকে তাদের সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করবে। মসুলকে তো গেরিলাদের ঘাঁটি আগেই বানিয়ে নিয়েছে। সুলতান আইউবী ও তাঁর সালারগণ জানেন, যে বাহিনীর ঘাঁটি ও রসদ নিকটে থাকে, তারা অর্ধেক যুদ্ধ আগেই জিতে নেয়। খৃস্টান বাহিনীর একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যখনই তারা কোন অগ্রযাত্রা কিংবা আক্রমণ করেছে, আইউবীর কমান্ডো সৈন্যরা পেছনে গিয়ে তাদের রসদ ধ্বংস করে দিয়েছে কিংবা রসদ ও বাহিনীর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ফেলেছে। তাছাড়া যুদ্ধের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে সুলতান আইউবী আগে-ভাগে ঘাস-পানির জায়গাটা দখল করে নিতেন এবং পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তীরন্দাজদের বসিয়ে রাখতেন।

যা হোক, এহতেশামুদ্দীন থেকে তথ্য পাওয়ার পর সুলতান আইউবী গোয়েন্দা উপপ্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে আদেশ করেন, খুঁজে বের করো খৃস্টানরা কোন্ পাহাড়ে ঘাঁটি গেড়েছে। গেরিলা বাহিনীর প্রধান সারেম মিসরীকে বললেন, জায়গাটা চিহ্নিত হয়ে গেলে সব ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা করবে। সুলতান আইউবীর দূরদর্শী চোখ দেখতে পেয়েছে, খৃস্টানরা এখন পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

সুলতান এহতেশামুদ্দীনের মুখে খৃস্টানদের প্রত্যয়-পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর পরিকল্পনা ঠিক করেন, খৃস্টানদের কোথাও দাঁড়াতে দেবেন না। তিনি এক আদেশ তো এই প্রদান করেন যে, খৃস্টানরা কোথায় ঘাঁটি গাড়ছে খোঁজ নাও। আরেকটি আদেশ জারি করেন, সানজার অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করো এবং দুর্গটা অবরোধ করে ফেলো।

সানজার মসুল থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ।

তার অধিপতি শরফুদ্দীন ইবনে কুতুবদ্দীন। সানজার দুর্গ দখল করার অভিযান সুলতান আইউবীর সেই পরিকল্পনারই ধারাবাহিকতা, তিনি বলেছেন– 'এখন আর আমি কারো নিকট সাহায্য ভিক্ষা করবো না, বরং তরবারীর আগা দ্বারা সাহায্য আদায় করবো।' তাঁর জানা ছিলো, ছোট ছোট মুসলিম আমীরগণ স্বাধীন শাসক থাকতে চাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে তারা তলে তলে খৃস্টানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। সানজারের অধিপতি শরফুদ্দীন সম্পর্কে সুলতানের নিকট নিশ্চিত তথ্য ছিলো, তিনিও ইয্যুদ্দীনের সুহৃদ। আর সেই হৃদ্যতার সূত্রে তিনিও সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে কাজ করছেন।

মসুলে মুসলিম গোয়েন্দা উপস্থিত ছিলো। তবু হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ভাবলেন, এ কাজের জন্য আরো বিচক্ষণ ও সাহসী গোয়েন্দা প্রেরণ করা আবশ্যক। খৃস্টানদের গোপন ঘাঁটি ও অস্ত্রের ডিপো আবিষ্কার করা সহজ হবে না। এরূপ গোয়েন্দা কে আছে? হ্যাঁ, হাসান আল-ইদরীস। তার কৃতিত্ব চোখের সামনে বিদ্যমান। কিন্তু হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাকে প্রেরণ করতে চাচ্ছেন না। কারণ, হাসান দীর্ঘ সময় বৈরুত অবস্থান করে এসেছে। শত্রুরা তাকে চিনে ফেলতে পারে। হাসান বেশ-ভূষা, কণ্ঠ ও বলার ভঙ্গিমা পরিবর্তন করার ওস্তাদ। সে হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে বললো, অসুবিধা নেই। আপনি আমাকে প্রেরণ করুন। আমি এমন এক রূপ ধারন করবো, চির পরিচিতরাও আমাকে চিনতে পারবে না। হাসানকে মসুলের কেউ চিনে না। অবশেষে তাকেই প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সুলতান আইউবী স্বয়ং দিক-নির্দেশনা প্রদান করে হাসান আল-ইদরীসকে প্রেরণ করেন।

'প্রিয় বন্ধু আমার!'– সুলতান আইউবী হাসান আল-ইদরীসের মাথায় হাত রেখে বললেন– 'ইতিহাসে নাম সালাহুদ্দীন আইউবীর আসবে। পরাজয়বরণ করবো তো ইতিহাস আমাকে লজ্জা দেবে। জয়লাভ করে মৃত্যুবরণ করবো তো মানুষ আমার কবরের উপর ফুল ছিটাবে। আর অনাগত প্রজন্ম আমার ভূয়সী প্রশংসা করবে। এটা খুবই অবিচার হবে। আমি বিজয়ের কৃতিত্ব তোমাকে এবং তোমার সেই সঙ্গীদের দিতে চাই, যারা দুশমনের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে আনছে এবং আমার বিজয়ের পথ সুগম করছে। আল্লাহ সাক্ষী, এটাই বাস্তব। আল্লাহ নিজ হাতে তোমাদের বিজয় মাল্য পরাবেন। তবে যদি পরাজিত হই,

তাহলে তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। তখন ধরে নেবো, আমি তোমাদের এনে দেয়া তথ্য অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছি। তোমরা আমার চোখ। তোমরা আমার কান। আমার আত্মা তোমাদের কবরের উপর ফুল ছিটাতে থাকবে। অতি মহান তুমি ও তোমার সঙ্গীরা। আমার কোন মর্যাদা নেই। আমি সমগ্র বাহিনী নিয়ে সানজার যাচ্ছি। আর তুমি যাচ্ছো একা। গোটা বাহিনীকে ব্যবহার করে আমি যে বিজয় অর্জন করবো, তুমি একাই তা করে ফেলবে। যাও বন্ধু, যাও। আল্লাহ্ হাফেজ।'

হাসান আল-ইদরীস একজন গরীব মুসাফিরের বেশে একটি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে নাসীবার তাঁবু থেকে বের হয়। সূর্য ডুবে গেছে। বেশ পথ অতিক্রম করার পর সে অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পায়। হাসান দাঁড়িয়ে যায়। তার জানা আছে এসব ঘোড়া কার। সুলতান আইউবী সানজার অভিযানে রওনা হয়েছেন। এটি তাঁরই বাহিনী। তিনি নাসীবা থেকে ক্যাম্প প্রত্যাহার করেননি। হেডকোয়ার্টার ও কতিপয় আমলাকে সেখানে রেখে এসেছেন। রিজার্ভ বাহিনীটিকেও প্রস্তুত অবস্থায় রেখে এসেছেন।

'তুমি জানতে এসেছো, খৃস্টানরা পার্বত্য অঞ্চলের কোন্ জায়গাটায় অস্ত্রের সমাবেশ ঘটাচ্ছে'– মসুলে কর্মরত মুসলিম গোয়েন্দাদের কমান্ডার বললো– 'আর আমরা এখানে জানবার চেষ্টা করছি, এই দরবেশটা কে, যিনি সেই পাহাড়গুলোরই কোন একটির চূড়ায় গিয়ে বসেছেন। কেউ তাকে ইমাম মাহদী বলছে। কেউ বলছে ঈসা।'

কমান্ডার হাসান আল-ইদরীসকে দরবেশের পূর্ণ কাহিনী শুনিয়ে বললো– 'ঐ পাহাড়গুলোর ধারে-কাছে ঘেঁষবারও অনুমতি নেই। ফৌজের কিছু সান্ত্রী এবং কতিপয় অপরিচিত লোক পাহারা দিচ্ছে। তারা কাউকে ওদিকে যেতে দিচ্ছে না। দরবেশ কোন একটি পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছেন। খোদা আকাশ থেকে তাকে কোন একটা ইঙ্গিত দেবেন। রাতে মানুষ ঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। মানুষ আল্লাহ-রাসূলকে ভুলে যাচ্ছে।'

এরা চারজন। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। তারা জানে, কুরআন-হাদীসে ভিত্তি নেই এমন বিশ্বাস-ধারণা সম্পূর্ণ হারাম। দরবেশকে কেন্দ্র করে এখন মানুষ যে বিশ্বাস পোষণ করছে, সবই কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন

কল্পনা মাত্র। ইসলামে এগুলো হারাম। চার গোয়েন্দা বসে বসে ভাবছে, কিভাবে দরবেশের রহস্য উদঘাটন করা যায়।

'বন্ধুগণ! যদি হেসে উড়িয়ে না দাও, তাহলে বলবো'– হাসান আল-ইদরীস বললো– 'দরবেশ যেখানে গিয়ে ধ্যানে বসেছেন, খৃস্টানদের অস্ত্রের ডিপো সেখানে। আর দরবেশ নাটক মঞ্চস্থ করা এবং উক্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা প্রমাণ করছে এই ডিপো বিপুল এবং এর পেছনে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বিদ্যমান। তোমরা জানো, এতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চার পার্শ্বে একটা পুরো বাহিনীর প্রহরা বসালেও কোন না কোন দিক থেকে মানুষ ভেতরে ঢুকে যেতে পারতো। সেই জন্য তারা দরবেশ নাটক মঞ্চস্থ করে প্রচার করেছে, পাহাড়ের চূড়ায় একজন দরবেশ বসে আছেন। তিনি চাচ্ছেন না কেউ উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করুক। ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এখন আর সেদিকে পা বাড়াতে সাহস পাচ্ছে না।'

'ঘোষণা করা হয়েছে, কেউ যদি উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করার এবং দরবেশকে দেখার চেষ্টা করে, তাহলে সে নিজে অন্ধ হয়ে যাবে এবং তার সন্তানরাও অন্ধ হয়ে যাবে'– হাসান আল-ইদরীসের এক সঙ্গী বললো– 'খৃস্টানরা ওখানে কিছু রেখে থাকতে পারে তথ্য দিয়ে তোমরা আমাদের অর্ধেক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছো। রহস্য উদঘাটনে এখন আমাদেরকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।'

'দরবেশকেসহ অস্ত্রের ডিপোটা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে হবে।' হাসান আল-ইদরীস বললো।

'আর জনগণকে তাদের এই অলীক বিশ্বাস থেকে রক্ষা করতে হবে'– কমান্ডার বললো– 'খৃস্টানদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হবে। বেটারা অস্ত্রের ডিপোটা মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখার জন্য এক ব্যক্তিকে দরবেশ বানিয়ে পাহাড়ে নিয়ে বসিয়ে রেখেছে! সেই সঙ্গে মসুলের ফৌজ ও জনগণকে খোদার ইশারার টোপ দিয়ে সামরিক প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখার কৌশল অবলম্বন করেছে। অবস্থাটা দেখো, তাদের কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে ফৌজ এবং সাধারণ মানুষ সকলে সব বাদ দিয়ে খোদার ইশারার অপেক্ষায় বসে আছে।'

'দরবেশ সম্পর্কে মসুলের গবর্নরের দৃষ্টিভঙ্গী কী?' হাসান জিজ্ঞেস করে।

'দরবেশ তার মহলে তারই ঘোড়াগাড়িতে করে গিয়েছিলেন'–

কমান্ডার উত্তর দেয়– 'আবার সেই গাড়িতে করেই পার্বত্য এলাকায় চলে গেছেন। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, মসুলের গবর্নর ইয্যুদ্দীনও এই চক্রান্তে জড়িত কিংবা তিনিও এই ষড়যন্ত্রের শিকার। বাদ বাকি তথ্যও আমরা জেনে যাবো। রোজি খাতুন মহলে আছেন। তার থেকেই জানা যাবে, মহলে দরবেশের অবস্থান কী?'

সুলতান আইউবীর চার গোয়েন্দা উক্ত পার্বত্য অঞ্চল ও মহলে দরবেশের অবস্থান জানতে তৎপরতা শুরু করে দেয়।

সানজার দুর্গের প্রধান ফটকের প্রহরীরা ঘুম ঘুম চোখে শুয়ে আছে। যুগটা যুদ্ধ-বিগ্রহের হলেও সানজারের অধিপতি শরফুদ্দীন ইবনে কুতুবুদ্দীন কোন শঙ্কা অনুভব করছেন না। খৃস্টানদের আনুগত্য বরণ করে নিরাপত্তা বোধ করছেন তিনি। মসুলের গবর্নর ইয্যুদ্দীন এবং হালবের গবর্নর ইমাদুদ্দীন তাকে বলে রেখেছেন, চিন্তা করবেন না, প্রয়োজন হলে আমরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবো। তিনি এই আত্মপ্রবঞ্চনায়ও লিপ্ত, সুলতান আইউবী তার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত নন। তিনি মদ-নারীতে মাতাল হয়ে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। খৃস্টানরা তাকে দু'টি অতিশয় সুন্দরী মেয়ে উপহার দিয়েছিলো। এই মেয়ে দুটো তাকে সবসময় স্বপ্নে বিভোর করে রাখছে।

দুর্গের প্রাচীরের উপর দিয়ে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় একটা বস্তু উড়ে যায়। পরক্ষণেই আরো একটা। তারপর আরো। প্রহরীরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এই স্ফুলিঙ্গগুলো দুর্গের ভেতরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং ভয়ানক শিখায় পরিণত হয়ে যায়। নিকটেই মালপত্র পড়া আছে। কাছাকাছি একটি গৃহ। দুটোতেই আগুন ধরে যায়। বস্তুগুলো তরল দাহ্য পদার্থের পাতিল। সুলতান আইউবীর সৈন্যরা মিনজানিকের সাহায্যে সেগুলো নিক্ষেপ করেছে। সঙ্গে বাঁধা ছিলো প্রজ্জ্বল্যমান সলিতা। পাতিলগুলো ছিলো মাটির তৈরি। পড়েই ভেঙ্গে গেলো। আর অমনি ভেতরের তরল দাহ্য পদার্থগুলো ছড়িয়ে পড়লো এবং সঙ্গে থাকা সলিতা থেকে আগুন ধরে গেলো।

দুর্গে প্রলয় ঘটে গেছে। যে যেখানে ছিলো জেগে ওঠেছে। দুর্গপতি শরফুদ্দীনকে জানানো হলো। তিনি কক্ষের জানালার ফাঁক দিয়ে আগুনের শিখা দেখে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন। শরফুদ্দীন এক সময় ময়দানের পুরুষ ছিলেন। কিন্তু খৃস্টানরা মদ-নারী দিয়ে তাকে এখানে

এনে পৌঁছিয়েছে। আজ রাতে তার পা চলছে না। রাতের পর রাত মরুভূমি ও দুর্গম পাহাড়ে ছুটে বেড়ানো যুদ্ধবাজ লোকটা এখন দুর্গের সমতল পথেও হাঁটতে পারছেন না।

খানিক পর উপর থেকে কমান্ডার দৌড়ে এসে শরফুদ্দীনকে জানালো, দুর্গ অবরোধ হয়েছে।

'কোন্ হতভাগা অবরোধ করলো?' শরফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'সালাহুদ্দীন আইউবী'– কমান্ডার উত্তর দেয়– 'তিনি বাইরে থেকে হুঙ্কার দিচ্ছেন, ফটক খুলে দাও। অন্যথায় দুর্গ জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবো।'

শরফুদ্দীনের নেশা কেটে গেছে। তিনি ভাবনায় পড়ে যান। অনেকক্ষণ পরে বললেন– 'ফটক খুলে দাও। আমি নিজে বাইরে যাবো।'

দুর্গের ফটক খুলে গেছে। শরফুদ্দীন বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। ওদিক থেকে সুলতান আইউবী এক সালারকে বললেন, এগিয়ে গিয়ে শরফুদ্দীনকে আমার কাছে নিয়ে আসো। সুলতান নিজে এক পা-ও অগ্রসর হলেন না। শরফুদ্দীন সুলতান আইউবীর সম্মুখে এসে ঘোড়া থেকে নেমে দু'বাহু প্রসারিত করে সুলতানের দিকে ছুটে আসেন। সুলতান এমন একটা ভাব ধারণ করেন, যেনো তিনি শরফুদ্দীনের সঙ্গে হাত মেলাতেও রাজি নন।

'শরফুদ্দীন!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'ফৌজ আর সামরিক সরঞ্জাম ব্যতীত যা কিছু নিতে চাও, রাত পোহাবার আগেই নিয়ে বেরিয়ে যাও। তারপর আর এদিকে মুখ ফেরাবে না।' সুলতান তার এক সালারকে বললেন– 'কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ো এবং দেখো এরা নিষিদ্ধ কোন বস্তু নেয় কিনা। কতজন সৈন্য আছে গণনা করো এবং তাদেরকে আমাদের ফৌজে অন্তর্ভুক্ত করে নাও।'

'আমি আপনার গোলাম মহামান্য সুলতান'– শরফুদ্দীন বললেন– 'দুর্গ ও ফৌজ আপনারই থাকবে। আমাকে দুর্গে থাকতে দিন।'

'দুর্গের প্রয়োজন থাকলে মোকাবেলা করতে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমার ন্যায় এমন কাপুরুষ ও ঈমান নিলামকারীর এতো বড় দুর্গের অধিপতি হওয়ার অধিকার নেই।'

'আমি কীভাবে আপনার মোকাবেলা করবো!'– শরফুদ্দীন বললেন– 'শুনলাম আপনি এসেছেন আর অমনি বেরিয়ে এলাম। মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়ে কি করে!'

'যেমনটা আগে লড়েছো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'শরফুদ্দীন! তুমি খৃষ্টানদের বন্ধু এবং নামের মুসলমান। নিজের চরিত্রটা একটু দেখে নাও। তুমি সৈনিক থেকে কী হয়েছো। ঈমান বিক্রি করে বিলাসিতা ক্রয়কারীদের এ দশাই হয়। মদ আর নারী তোমার সব শক্তি-সাহস নিঃশেষ করে দিয়েছে। তুমি মিথ্যাও বলছো। তোমার মধ্যে যদি এতোটুকু আত্মমর্যাদাবোধও থাকতো, তাহলে নিজের দুর্গটা এভাবে বিনা যুদ্ধে আমার হাতে তুলে দিতে না।'

'মহামান্য সুলতান!'– শরফুদ্দীন অনুনয়-বিনয় করেন– 'আমাকে দুর্গে থাকতে দিন।'

সুলতান আইউবী এক সালারকে বললেন– 'একে দুর্গে নিয়ে যাও এবং বন্দি করে ফেলো। এর বাসনা পূর্ণ করো।'

তিন-চারজন লোক সম্মুখে এগিয়ে আসলে শরফুদ্দীন সুলতান আইউবীর আরো নিকটে এসে মিনতির স্বরে বললেন– 'আমি মসুল যেতে চাই।'

'হ্যাঁ, ইয্যুদ্দীন তোমার বন্ধু'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তার কাছে চলে যাও।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সানজার দুর্গের দখল বুঝে নিয়ে তকিউদ্দীনকে অধিপতি নিযুক্ত করেন।

সম্মুখে আরেকটি দুর্গ আছে। তার নাম আমিদ। সুলতান অবশিষ্ট রাত সানজার দুর্গে অতিবাহিত করে সকালে আমিদ অভিমুখে রওনা হন। দুর্গটার বর্তমান নাম উমিদা। দজলার তীরে বিখ্যাত এক পল্লী ছিলো। তার আমীরও ছিলেন মুসলমান। এই পল্লীটাই একটা দুর্গ। সুলতান আইউবী সেটি অবরোধ করে ফেলেন। সেখানকার সেনা ও জনসাধারণ মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। কিন্তু অবরোধের অষ্টম দিন আমীর অস্ত্র সমর্পণ করেন। সুলতান আইউবী নূরুদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে এই দুর্গের অধিপতি নিযুক্ত করেন।

চার খৃস্টান সৈনিকের সঙ্গে রাদী এখনো সফরে আছে। তার শরীরিক অবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। খৃস্টান সৈনিকরা পথে তার বিশ্রাম ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি বেশ লক্ষ্য রেখে চলছে। কিন্তু যে রাতে সে তাদেরকে নিজের জীবন-কাহিনী শুনিয়েছিলো, তারপর আর তাদের সঙ্গে কথা বলেনি। খৃস্টান সৈনিকের 'খোদা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তুমি পুণ্য

করো, খোদা তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন' উক্তিটি তার হৃদয়ে তোলপাড় করে চলেছে। মেয়েটার শারীরিক অবস্থা ভালো থাকলেও মানসিক অবস্থা ভালো নয়। যে লোকটির সঙ্গে হজ্বে যাচ্ছিলো, তার স্মরণে সে ছটফট করছে। মনটা বেশি অস্থির হয়ে গেলে ভাবে– আল্লাহ আমাকে আমার পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। তার জানা ছিলো না, আল্লাহর সমীপে কীভাবে পাপের ক্ষমা চাইতে হয়।

চার রক্ষীর সঙ্গে রাদী গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। এখন তারা মসুলের সীমানার ভেতরে। একদিন তারা এক উষ্ট্রারোহীকে দেখতে পায়। আরোহী তাদের দেখে উট থামিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। লোকটার মাথা ও মুখমণ্ডল কালো পাগড়িতে পেঁচানো। শুধু চোখ দুটো খোলা। রাদীর উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। খৃস্টান সৈনিকরা সামরিক পোশাক পরিহিত ছিলো না। তাই তারা যে খৃস্টান সৈনিক বুঝবার উপায় নেই।

'উষ্ট্রারোহীর চোখ দুটো দেখেছো?' এক খৃস্টান তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে।

'অনেক গভীরভাবে দেখেছি'– একজন জবাব দেয়– 'এসব দৃষ্টির অর্থ আমি বুঝি। এখন আমাদেরকে বেশি সতর্ক থাকতে হবে। মেয়েটা এতোই রূপসী যে, কোন দস্যুর চোখে পড়ে গেলে বিপদ হয়ে যাবে। সামনের অঞ্চলটা পাহাড়ী।'

তারা দিনভর চলতে থাকে। সন্ধ্যার পর দু'টি টিলার মধ্যখানে উপযুক্ত একটা জায়গা দেখে অবতরণ করে এবং খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে শুরু করে। খাওয়ার পর সকলে ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু প্রতিদিনকার ন্যায় একজন জেগে পাহারা দিতে থাকে। খানিক পর সে কিছু একটার শব্দ শুনতে পায়। শিয়াল কিংবা অন্য কোন প্রাণীর হাঁটার সময় ধাক্কা খেয়ে একটা পাথর খণ্ড ঢালু বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়েছে হয়তো। তথাপি সৈনিক সর্তক হয়ে যায়। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। শব্দটা আবারো শোনা গেলো। সৈনিক তার এক সঙ্গীকে জাগিয়ে তোলে এবং কানে কানে তাকে বিষয়টা অবহিত করে। সেও উঠে দাঁড়ায়। উভয়ে ধনুকে তীর সংযোজন করে একজন একদিকে অপরজন আরেক দিকে দাঁড়িয়ে যায়।

রাতটা অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখন কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু পরক্ষণেই পরপর দু'বার দুটো শব্দ ভেসে এলো। শব্দটা কোন দিক থেকে এলো বুঝে ওঠার আগেই একটি করে তীর

ধেয়ে এসে দু'জনের পাজরে গেঁথে যায়। তাদের অন্য সঙ্গীরা সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছিলো। জাগ্রত দু'জন তীর খেয়ে তাদের হাঁক দিলে তারা ধড়মড় করে উঠে বসে। তারা পলায়নপর পায়ের শব্দ শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রদীপ জ্বলে ওঠে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। পরক্ষণেই তারা সাত-আটজন লোকের অবরোধে চলে আসে। তাদের একজনের মাথা ও মুখমণ্ডলে কালো পাগড়ী পেঁচানো। দিনের বেলা যে উষ্ট্রারোহীকে দেখা গিয়েছিলো এবং রাদীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো, এই লোকটা সে-ই বলে মনে হলো।

দু'জনই সৈনিক। তারা তরবারী দ্বারা মোকাবেলা করে। কিন্তু সাত-আটটা বর্শা তাদের দেহ দুটোকে ঝাঝরা করে দেয়। রাদী আক্রমণকারীদের কব্জায় চলে আসে। মেয়েটি আলাদা এক স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার চেহারায় ভয়ের সামান্যতম ছাপও নেই। প্রদীপের কম্পমান আলোয় তার রূপটা এমন রহস্যময় মনে হচ্ছে, যেনো সে এ জগতের প্রাণী নয়।

রাদীকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নেয়া হলো। কালো পাগড়িওয়ালাও ঘোড়ায় চড়ে বসে। দু'জন পাশাপাশি চলতে শুরু করে। লোকটা রাদীকে জিজ্ঞেস করে– 'নিজের সম্পর্কে কিছু বলবে কি?' রাদী সব কিছু বলে দেয়।

রাদীকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো, সেটি কোন প্রাসাদ কিংবা ঘর নয়– একটি তাঁবু। তাঁবুর অর্ধেকটা মাটির উপরে, অবশিষ্টটুকু নীচে। পার্টিশন ও শামিয়ানা ফুলদার রেশমি কাপড়ের। ভেতরে সুপরিসর একটি পালঙ্কের উপর জাজিম বিছানো। ঝাড়বাতির উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে ভেতরটা। মনেই হচ্ছে না এটি তাঁবু। থরে থরে সাজানো মদের পিপা-পেয়ালা। ভেতরে তিনজন লোক উপবিষ্ট। রাদী তৎক্ষণাৎই বুঝে ফেলে, লোকগুলো খৃস্টান। তারা রাদীকে দেখে অপলক চোখে তার প্রতি তাকিয়ে থাকে। কালো নেকাব পরিহিত লোকটা তার সঙ্গে। ভেতরে প্রবেশ করে মুখোশটা খুলে ফেলে দিয়েই বলে ওঠে– 'এমন উপহার আগে কখনো দেখেছো? তাছাড়া মেয়েটা নর্তকীও।'

রাদী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ঝাড়বাতির আলোতে তার রূপ অধিক যাদুময় মনে হচ্ছে। মেয়েটার মুখে ভয়-ভীতির কোন ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

রাদীকে পালঙ্কের উপর বসিয়ে দেয়া হলো। জিজ্ঞেস করা হলো–

'তুমি কে এবং কোথায় যাচ্ছিলে?'

রাদী তার জীবনের সকল বৃত্তান্ত শোনায়। তবে তাতে কারো মনে কোন প্রতিক্রিয়া জাগলো না। একজন নির্যাতিতা নারীর করুণ কাহিনীতে প্রভাবিত হওয়ার জন্য যে চেতনার প্রয়োজন, তা তাদের কাছে নেই। কোথায় যাচ্ছিলে? প্রশ্নের উত্তরে রাদী বললো- 'আমাকে এক খৃস্টান সম্রাটের নিকট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো।'

'তার মানে তুমি চারজন খৃস্টানকে হত্যা করেছো?' যে লোকটি রাদীকে নিয়ে এসেছে, একজন ক্ষুব্ধকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করে।

'তাদেরকে খৃস্টান মনে হচ্ছিলো না'- লোকটি উত্তর দেয়- 'তোমরা আমাকে বলেছিলে, দু'তিনটি মেয়ে নিয়ে আসো, যাদের নিয়ে আমরা এই বিজন ভূমিতে ফূর্তি করবো। আমি বেরিয়ে পড়লাম। ঘটনাক্রমে একে পেয়ে গেলাম। লোকগুলোকে সন্দেহভাজন মুসলমান মনে হলো। আমি তাদের পিছু নিলাম। লোকগুলোকে হত্যা করে মেয়েটাকে নিয়ে এলাম।'

'তোমার সঙ্গে কে কে ছিলো?'

'আমাদের মাত্র দু'জন ছিলো'- লোকটি উত্তর দেয়- 'অবশিষ্ট পাঁচজন মসুলের মুসলমান, যারা এখানে প্রহরার দায়িত্ব পালন করে থাকে।'

'চারজন খৃস্টানকে হত্যা করে তোমাদেরই এক সম্রাটের একটি উপহার ছিনিয়ে এনেছো, এই তথ্য যদি ফাঁস হয়ে যায় তাহলে জানো তার পরিণতি কী হবে?'

লোকটি কথা বলছে না। হঠাৎ এক ব্যক্তি ভেতরে প্রবেশ করে বললো- 'এই তথ্য ফাঁস হবে না। আপনি ভয় করছেন, আমরা যে মুসলমানরা সঙ্গে আছি এ তথ্য ফাঁস করে দেবো। না এমনটা হবে না।'

'এ লোকটি কে?'

'আমার ঘনিষ্ঠ সহচর'- আগের লোকটি বললো এবং মসুলের বড় এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বললো- 'তিনি দিয়েছেন। বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিমান।'

'আমি আপনাদেরই লোক'- নবাগত লোকটি বললো- 'মসুলের যেসব তথ্য আপনারা লাভ করছেন, সব আমার ও আমার সঙ্গীদেরই সংগ্রহ করা তথ্য।'

লোকটাকে আরো অনেক প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে সে এমন ধারায় কথা বলে যে, সবাই তাকে বিশ্বস্ত বলে নিশ্চিত হয়ে যায়। কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগলো না, লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর

ভয়ঙ্কর একজন গুপ্তচর, যার নাম হাসান আল-ইদরীস। আল্লাহ লোকটার মুখাবয়ব ও দৈনিক গঠনে এমন এক আকর্ষণ দান করেছেন, যে কেউ এক নজর দেখার পর তার ভক্ত হয়ে যায়। লোকটার মুখের ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিতে এমন এক যাদু যে, তার বক্তব্যে শ্রোতারা মুগ্ধ হতে বাধ্য। তাছাড়া যেকোন সময় যেকোন রূপ ও যেকোন ভাব ধারণ করায় বড় পারঙ্গম। মসুলে সুলতান আইউবীর যে ক'জন গোয়েন্দা ছিলো, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত তাদের যাতায়াত ও যোগাযোগ ছিলো। তারা তথ্য সংগ্রহ করেছে, মসুলের গবর্নর ইয্যুদ্দীনও উক্ত দরবেশ দ্বারা প্রভাবিত। মসুলের জনসাধারণের ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করে নিয়েছেন, দরবেশ আসমান থেকে ইশারা লাভ করবেন এবং পরে যখনই তার বাহিনী অভিযানে অবতীর্ণ হবে, তখন জয়ের পর জয়লাভ করতে থাকবে।

গোয়েন্দাদের এ তথ্য সরবরাহ করেছেন নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী রোজি খাতুন। তিনি আইউবীর গোয়েন্দাদের তথ্য সরবরাহ করেছেন, ইয্যুদ্দীন অত্যন্ত কঠোরভাবে খৃস্টানদের জালে আটকে গেছেন। খৃস্টানরা যেনো তাকে যাদু করে ফেলেছে। দরবেশটা যদি খৃস্টানদের সাজানো নাটক না হয়ে দরবেশই হয়ে থাকে, তাহলে লোকটা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্ত। আল্লাহ তাকে জয়ের ইঙ্গিত দান করবেন, তার এই আগাম ঘোষণা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম পরিপন্থী।

এসব তথ্য সরবরাহ করে রোজি খাতুন গোয়েন্দাদের পরামর্শ প্রদান করেন, তোমরা দরবেশটার মুখোশ উন্মোচন করো এবং সম্ভব হলে তাকে হত্যা করে ফেলো। রোজি খাতুন এই সন্দেহও ব্যক্ত করেন যে, খৃস্টানরা উক্ত পাহাড়ের অভ্যন্তরে কিছু একটা করছে। তোমরা তথ্য নাও কী করছে এবং সুলতান আইউবীকে অবহিত করো।

হাসান আল-ইদরীস দরবেশের রহস্যময় জগতে ঢুকে পড়েছে। এই পার্বত্য অঞ্চলে কর্তব্যরত খৃস্টানদের বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে হাসান। কিন্তু একটা সীমানার পরে আর অগ্রসর হওয়ার এখনো অনুমতি পাচ্ছে না সে। রহস্য এই সীমানারও পরে। পাহাড়গুলো বেশ উঁচু। স্থানে স্থানে উঁচু উঁচু অনেক টিলা। হাসান আল-ইদরীস দরবেশের দর্শন লাভে উদগ্রীব। কিন্তু তার দেখা মিলছে না। সন্দেহ জাগতে পারে ভয়ে কাউকে জিজ্ঞেসও করছে না। লোকটা খৃস্টানদের এতোই

আস্থাভাজন হয়ে গেছে যে, তারা তাকে রাদীর অপহরণে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো।

রাদী তাঁবুতে অবস্থানকারী দু'তিনজন খৃস্টানের বিনোদনের উপকরণে পরিণত হয়েছে। মেয়েটার প্রতি দলনেতার লোভ ও আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। তাই মেয়েটাকে সে যে কারো খেলনা হয়ে থাকতে দিতে চাচ্ছে না। এক রাতে দলনেতা রাদীকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কি আমাদের সন্তুষ্টির জন্য নাচছো? আমার সঙ্গে রাত যাপন করে কি তুমি আনন্দ অনুভব করছো?'

'না আপনাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, না আমি আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট'– রাদী গম্ভীর কণ্ঠে বললো– 'নিরুপায় হয়েই আমি আপনাদের খেলনা হয়ে আছি। মনের কথা বলতে আমি ভয় করবো না। আপনাদেরকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। আপনাদের আদেশ আমি অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পালন করি।'

'তুমি কি জানো, এই অপমানজনক বক্তব্যের জন্য আমি তোমার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারি'– দলনেতা বললো– 'ইচ্ছে করলে আমি তোমার এই সুন্দর চেহারাটা শৃগাল-শকুনের সম্মুখে নিক্ষেপ করতে পারি?'

'যদি করেন, তাহলে এটা হবে আমার জন্য বিরাট এক পুরস্কার'– রাদী বললো– 'আমার মাথাটা দেহে থাকা আমার জন্য কঠিন এক শাস্তি। আপনার ন্যায় শেয়ালটা তো আমার আত্মাটাকে খাবলে খাবলে খাচ্ছেনই। আপনি নিজেকে যুদ্ধবাজ ও বীর মনে করে থাকেন। একটা অসহায় মেয়েকে বন্দি করে গর্ব করছেন। পৌরুষ আর তরবারীর জোরে আপনি আমাকে দাসীতে পরিণত করতে চাচ্ছেন। পারেন যদি আমার হৃদয়ের উপর এমনভাবে শাসন করেন, যেনো জিজ্ঞেস করতে না হয়, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য আপনার আদেশ মান্য করছি কিনা। বরং আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো, আমার নাচ ও অস্তিত্বে আপনি আনন্দ লাভ করছেন কিনা?'

'আচ্ছা, আমি যদি তোমার সম্মুখে সোনার স্তূপ রেখে দেই, তাহলে কি তুমি আমাকে হৃদয় থেকে মনিব বলে মেনে নেবে?'

'না'– রাদী উত্তর দেয়– 'আমার যে পুরস্কারের প্রয়োজন, তা তোমাদের কাছে নেই। যার কাছে ছিলো, সে মারা গেছে। লোকটা

মানুষ ছিলো, দেহের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিলো না। আর তোমরা! তোমরা শিয়াল-শকুন-নেকড়ে।'

'লোকটা তোমাকে ভালোবাসা দিয়েছিলো'– দলনেতা বললো– 'আমি যদি তোমাকে সেই ভালোবাসা দেই, তাহলে?'

'আমি নই– আমার আত্মা ভালোবাসার পিয়াসী।' রাদী উত্তর দেয়। দলনেতা মদের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে মুখের সঙ্গে লাগাতে উদ্যত হয়। রাদী খপ করে পেয়ালাটা ধরে ফেলে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে বললো–'কথা বলতে যখন বাধ্য করেছো, শুনে নাও। মদপান করবে তো তোমার বিবেক ও চেতনার উপর পর্দা পড়ে যাবে। তুমি জিজ্ঞেস করেছো, তুমি যদি আমাকে সেই ভালোবাসা প্রদান করো, তাহলে আমি বরণ করবো কিনা? আগে আমাকে ভালোবাসা দেখাও। যদি পারো, তাহলে যদি তুমি আমাকে উত্তপ্ত মরুভূমিতেও নিয়ে যাও, আমি খুশিমনে তোমার সঙ্গে যাবো এবং জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবো।'

দলনেতা মেয়েটির প্রতি তাকায়। লোকটা মেয়েটির সর্বাঙ্গ খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে থাকে। দেখে আসছে তো কয়েকদিন ধরেই। মেয়েটার বিক্ষিপ্ত রেশম কোমল চুলের পরশও উপভোগ করেছিলো। উন্মুক্ত বক্ষ তার উন্মুক্ত পিঠের উপর ছড়িয়ে থাকা অবস্থায়ও এই চুলের যাদু প্রত্যক্ষ করেছে লোকটা। মেয়েটার দেহ সম্পর্কে এতোটাই অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেছে যে, অতোটা অভিজ্ঞতা তার নিজ দেহ সম্পর্কেও ছিলো না। কিন্তু রাদী যখন লোকটার প্রতি নির্লিপ্তভাবে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলো এবং হাত থেকে মদের পেয়ালাটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলো, তখন তার পৌরুষ যেনো হারিয়ে গেলো। লোকটা নিজের মধ্যে এমন অসহায়ত্ব অনুভব করলো, যেনো মেয়েটা তাকে যাদু করে ফেলেছে। একজন পুরুষ দশজন পুরুষের মোকাবেলা করতে পারে। লড়তে পারে হিংস্র প্রাণীর সঙ্গেও। কিন্তু ভালোবাসার নারীটা যখন বলে বসে, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, তখন সে বালির স্তূপে পরিণত হয়ে যায়। এই খৃস্টান লোকটির অবস্থাও হয়েছে তা-ই।

'আমি তোমাকে আমার কোন সঙ্গীর খেলনায় পরিণত হতে দেবো না।'

'আমি হুকুমের গোলাম'– রাদী বললো– 'আমি আত্মহত্যা করবো না। আত্মহত্যা করা কাপুরুষতা। পালাবারও চেষ্টা করবো না। এটা প্রতারণা। আমি আত্মহত্যা করে ফেলেছি। নিজের আত্মাটাকে আমি মেরে ফেলেছি।'

লোকটি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে এমনভাবে পা ফেলে রাদীর দিকে এগিয়ে যায়, যেনো রাদী তাকে যাদু করেছে। কাছে এসে ধীরে ধীরে ডান হাতটা উপরে তুলে রাদীর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো– 'তুমি আমার কল্পনার চেয়েও বেশি রূপসী।' বলেই হাতটা পেছনে সরিয়ে নিয়ে বললো– 'আজ আমি প্রথমবার অনুভব করেছি, তোমার কণ্ঠে জ্বলন আছে। তুমি নর্তকী– গায়িকা নও তো?'

'আমি গানও গাই'– রাদী বললো– 'কিন্তু গান সেটি শোনাবো, যেটি আমার ভালো লাগে, যার মধ্যে আমার ব্যথা আছে।'

রাদী গুন গুন করতে শুরু করে– 'চলে কাফেলে হেজাজ কে।'

তাঁবুর ভেতরের পরিবেশটা এখন আবেগময়। রাদীর প্রতিটি শব্দ হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে আসছে। এই গানটায় তার ভালোবাসার স্বাক্ষর আছে। হৃদয়ের কান্না আছে। কামনার জ্বলন আছে। আছে তার সেই স্বপ্নমালার সৌন্দর্য, যা হেজাজের পথে শহীদ হয়ে গেছে।

রাদীর চোখে অশ্রু সাঁতার কাটতে শুরু করে। তার গানের লয়-তাল আরো জ্বালাময়ী হয়ে ওঠে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এই গানেও খৃস্টান দলনেতার এমন ঝিমুনি আসতে শুরু করে, যা তার জীবনে কখনো আসেনি। প্রতি রাতেই মদপান করে অচেতন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়া ছিলো তার স্বভাব।

রাদীর গানের তালে তালে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে খৃস্টান দলনেতা।

পালঙ্কের সন্নিকটে তেপাইর উপর পড়ে থাকা লোকটার উপর চোখ পড়ে রাদীর। রাদী ধীরে ধীরে খঞ্জরটা খাপ থেকে বের করে। খঞ্জরের আগায় আঙ্গুল রাখে এবং অস্ত্রটা শক্ত করে ধরে ঘুমিয়ে থাকা খৃস্টানের নিকট চলে যায়। খঞ্জরের আগাটা লোকটার ধমনীর কাছে নিয়ে যায়। তারপর হৃদপিণ্ডটা কোথায় থাকতে পারে ঠিক করে হাতটা উপরে তোলে। অমনি একটা শব্দ ভেসে আসে কানে– 'শী'। হঠাৎ চমকে ওঠে হাতটা সরিয়ে নিয়ে রাদী ওদিকে তাকায়। তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে সেই সুদর্শন যুবকটা দাঁড়িয়ে, যে বলেছিলো আমি খৃস্টানদের গুপ্তচর মুসলমান হাসান আল-ইদরীস।

হাসান আল-ইদরীস হাতের ইশারায় রাদীকে ডাক দেয়। রাদী খঞ্জরটা খাপে ঢুকিয়ে উঠে এগিয়ে যায়। হাসান রাদীকে বাহুতে ধরে

বাইরে নিয়ে যায়। বললো– 'আজ রাত লোকটা একা। অন্যরা অনেক দিনের জন্য চলে গেছে। এই লোকটা আমার দায়িত্ব ও নিরাপত্তায় রয়েছে। কিন্তু আমি একজন ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করবো না। আমার দায়িত্ববোধ আছে। কেউ তাকে খুন করতে এলে সে আমার হাতে মারা যাবে। তুমি তাকে বলেছিলে আমি আত্মহত্যা করবো না। কারণ, এটা কাপুরুষতা। আর আমি পালাবোও না, কারণ এটা প্রতারণা। কিন্তু তুমি একজন ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করতে চেয়েছিলে, এটা কি প্রতারণা নয়?'

'তুমি কি তাকে বলে দেবে, আমি তার ধমনি ও হৃদপিণ্ডের উপর খঞ্জর রেখেছিলাম'– রাদী জিজ্ঞেস করে এবং দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো– 'যদি বলে দাও, তাহলে লোকটা আমাকে মেরে ফেলবে। তাতে আমার ভালো হবে। তোমারও উপকার হবে। তিনি তোমাকে পুরস্কার দেবেন।'

'এই লোকটার প্রতি আমার ততোখানি ঘৃণা, যতোখানি তোমার অন্তরে রয়েছে'– হাসান আল-ইদরীস বললো– 'আমি তাকে কিছুই বলবো না।'

'বিনিময়ে আমার থেকে তার পুরস্কার দাবি করবে?'– রাদী জিজ্ঞেস করে– 'বরং পুরস্কার হিসেবে আমাকেই চেয়ে বসবে, না।'

'না'– হাসান আল-ইদরীস বললো– 'আমার কোন পুরস্কারের প্রয়োজন নেই।'

হাসান মেয়েটাকে খানিক আড়ালে নিয়ে গিয়ে মমতার সুরে বললো– 'আমি তোমার ন্যায় হেজাজেরই যাত্রী। যে রাতে আমরা তোমাকে অপহরণ করে এনেছিলাম, সে রাতে তুমি আমাদেরকে তোমার বৃত্তান্ত শুনিয়েছিলে। তুমি তোমার হৃদয়ের আবেগ এবং একটি বাসনার কথা ব্যক্ত করেছিলে। তখন থেকেই আমি ভাবছি, তোমাকে কোন্ পুণ্যের কথা বলবো, যার মাধ্যমে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।'

হাসান আল-ইদরীসের মুখের যাদু রাদীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। হাসান বলতে থাকে আর রাদী শুনতে থাকে। সুলতান আইউবীর এই গোয়েন্দা এই রূপসী মেয়েটার হৃদয়টা জয় করে ফেলেছে। এখন আর রাদী সেখান থেকে উঠতে চাচ্ছে না। হাসান আল-ইদরীস তাকে চলে যেতে বাধ্য করে।

এভাবে তিন-চার রাত দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটে। হাসান আল-ইদরীস মেয়েটাকে তার আবেগময় বক্তব্য ও সৎ উদ্দেশ্যের যাদুতে আটকে ফেলে। রাদী তার কাছে হেজাজের কথা জিজ্ঞেস করতে থাকে আর সে অত্যন্ত

আবেগময় ভঙ্গিতে তাকে হেজাজের চিত্তাকর্ষক কথা-বার্তা শোনাতে থাকে। দিনের বেলা হাসান জানার চেষ্টা করছে, যে স্থানটায় তাকে যেতে দেয়া হচ্ছে না, সেখানে কী আছে। কিন্তু সে কিছুই জানতে পারছে না।

এক রাতে হাসান মেয়েটাকে বললো– 'আচ্ছা, লোকগুলো ঐ পাহাড়টায় কী লুকিয়ে রেখেছে বলতে পারো?' রাদী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়– 'যুদ্ধের সরঞ্জাম। ঐ লোকটা (দলনেতা) আমাকে বলতো, তার মধ্যে দাহ্য প্রদার্থ এতো পরিমাণে আছে যে, মুসলমানদের সমগ্র নগরীকে পুড়িয়েও শেষ হবে না। আমি লোকটার দাসী কিংবা গনিকা ঠিক, কিন্তু সে আমার সম্মুখে দাসের ন্যায়ই আচরণ করে থাকে।'

'তুমি কি আনন্দিত যে, তুমি উচ্চপদস্থ একজন খৃস্টানের গনিকা আর তিনি তোমার গোলাম?'

'না'– রাদী উত্তর দেয়– 'আমি দেহের কথা বলছি। আমার আত্মা কখনো আনন্দিত হবে না। যারা আমাকে হেজাজের পথ থেকে অপহরণ করে এনেছিলো, তারা বলতো, খোদা তোমার উপর অসন্তুষ্ট। এমন একটি পুণ্য করো, যার উসিলায় খোদা তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যে লোকটি আমাকে হেজাজ নিয়ে যাচ্ছিলো, আমি যাকে কামনা করছিলাম, সে বলতো, আমরা হজ্ব করে পবিত্র হয়ে যাবো। তারপর সেখানেই বিয়ে করবো। আমি পাপের সাগরে ডুবে যাচ্ছি। খোদা আমাকে শাস্তি দিয়ে চলেছেন।'

'শুধু যমযমের পানিই নয়– আগুনও তোমাকে পবিত্র করতে পারে'– হাসান আল-ইদরীস হেসে বললো– 'তুমি হেজাজ যেতে পারোনি। এখন হেজাজের প্রহরীকে সন্তুষ্ট করো, খোদা তোমার আত্মাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবেন। তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে।'

'হেজাজের প্রহরী কে?'– রাদী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে– 'আর সে কোন্ আগুন, যে আমাকে পবিত্র করতে পারবে?'

'হেজাজের প্রহরী সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী'– হাসান আল-ইদরীস বললো– 'আর আগুন হচ্ছে, এই পাহাড়ী অঞ্চলে মটকা ও পাতিলে ভর্তি যে বিপুল তেল আছে, সেগুলো, যে তেলের মাধ্যমে হেজাজ পর্যন্ত পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া সম্ভব। পাহাড়ী অঞ্চলের যে জায়গাটায় আগুন ও যুদ্ধ সরঞ্জাম আছে, তুমি আমাকে সেই পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।

রাদী কিছুই বুঝতে পারলো না। হাসান আল-ইদরীস তাকে দীর্ঘ কাহিনী শোনায়। সুলতান আইউবীর প্রত্যয়-পরিকল্পনা ও চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করে। খৃস্টানদের পরিকল্পনার কথাও জানায় এবং এমন এমন কথা শোনায়, যার ফলে তার হৃদয়ে খৃস্টানদের প্রতি ঘৃণা জন্মে যায় এবং হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব তার বুঝে এসে যায়।

❖ ❖ ❖

পরদিন আল-ইদরীস দেখে রাদী ঘোড়ায় চড়ে তার মনিব খৃস্টান দলনেতার সঙ্গে পাহাড়ের সেই অংশটায় ঢুকে পড়েছে, যেখানে হাসান ও খৃস্টান প্রহরীদের যাওয়ার অনুমতি নেই। রাতে দলনেতা রাদীকে নিয়ে মনোরঞ্জন করে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। হাসান আল-ইদরীস তাকে কিছু পাউডার দিয়েছিলো। রাদী সেগুলো মদের সঙ্গে মিশিয়ে লোকটাকে খাইয়ে অচেতনের ন্যায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। গোয়েন্দারা চেতনানাশক পাউডার সঙ্গে রাখে। প্রয়োজন হলে ব্যবহার করে। রাদী ফিরে এসে নির্ধারিত স্থানে হাসান আল-ইদরীসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

'ওখানে বিশাল এক গুহা'– রাদী বললো– 'এরা খনন করে করে গুহাটাকে আরো প্রশস্ত করে নিয়েছে। এতো চওড়া ও দীর্ঘ যে, একদিক দাঁড়ালে অপরদিক দেখা যায় না। বিশাল এক গুদাম। ভেতরে দাহ্য পদার্থ ভর্তি হাজার হাজার মটকা। বর্শা, তীর-ধনুক, খাদ্যদ্রব্য, তাঁবু ও অন্যান্য সরঞ্জামের কোন হিসেব নেই। আমি খৃস্টান লোকটাকে শিশুর ন্যায় বললাম, আমি ঐ পাহাড়ী এলাকাটায় একটু বেড়াতে যেতে চাই। তিনি বললেন, কাল দিনে নিয়ে যাবো। তুমি আমার রাণী। তবে কাউকে বলবে না ওদিকে গিয়েছিলে। তিনি আমাকে নিয়ে যান।'

রাদী জানালো– গুহার সম্মুখে দু'জন লোক প্রহরায় দাঁড়িয়ে থাকে। মুখটা খোলা থাকে। শ' দেড়েক গজ দূরে প্রহরীদের তাঁবু। গুহা থেকে সামান্য দূরে অপর একটি তাঁবু, যার বাইরে দুর্বল এক বৃদ্ধ বসে ঝিমুচ্ছিলো। দলনেতা তাকে পা দ্বারা খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে বললো– 'ঐ দরবেশ! কোন কষ্ট হচ্ছে না তো? ভাত-পানি পাচ্ছো ঠিক মতো?' বৃদ্ধ দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'জনাব! আমাকে কবে মুক্তি দেবেন? এবার আমাকে যেতে দিন।' নেতা তাচ্ছিল্যের সুরে বললো– অপেক্ষা করো, অনেক পুরস্কার পাবে। এই লোকটাই বোধ হয় সেই দরবেশ, তুমি যার কথা বলেছিলে।'

'হ্যাঁ'– হাসান আল-ইদরীস বললো– 'এ খৃস্টানদের সেই নাটক, যেটি মসুলের জনসাধারণ ও তাদের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীনকে পর্যন্ত মাতাল বানিয়ে রেখেছে। আসো রাদী। দু'জনে মিলে আল্লাহর নিকট তোমার জীবনের সব পাপের ক্ষমা আদায় করে নিই।'

দু'জন রওনা হয়ে যায়। তবে চুপিসারে। রাতের আঁধার তাদের সহায়তা করছে। দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী সরুপথে কান খাড়া রেখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলে। যে স্থানটায় দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে, সে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। প্রহরীদের নিকট একটি প্রদীপ জ্বলছে, যার লাঠিটা মাটিতে গাড়া। হাসান আল-ইদরীস ও রাদী তাদের থেকে পনের-বিশ পা দূরে লুকিয়ে থাকে। দু'জনই জীবন বাজি রাখতে এসেছে। আল্লাহ দেখছেন। হাসান আল-ইদরীস রাদীকে এক ধারে সরিয়ে দিয়ে নিজে বসে পড়ে। এক সান্ত্রী 'কে?' হাঁক দিয়ে এদিকে এগিয়ে আসে। অন্ধকারে লোকটা কিছুই দেখলো না। হাসান আল-ইদরীস পেছন থেকে তার ঘাড়টা এক বাহুতে জড়িয়ে ধরে অপর হাতে তার হৃদপিণ্ডের উপর খঞ্জর দ্বারা তিন-চারটা আঘাত হানে। সান্ত্রী লুটিয়ে পড়ে যায়।

হাসান আল-ইদরীস অপেক্ষা করতে থাকে। অপর সান্ত্রী তার সঙ্গীকে ডাক দেয়। কোন সাড়া না পেয়ে সে ধীর পায়ে এদিকে এগিয়ে আসে। মৃত সঙ্গীর লাশের নিকট এসেই অন্ধকারে মাটিতে কিছু একটা পড়ে আছে অনুভব করে। নত হয়ে দেখে। অমনি সেও হাসান আল-ইদরীসের পাঞ্জায় এসে পড়ে।

রাদী অপেক্ষা না করে গুহার দিকে ছুটে যায়। মাটি থেকে প্রদীপটা তুলে হাতে নিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়ে। হাসান আল-ইদরীস অপর সান্ত্রীকেও শেষ করে দেয়।

অন্যান্য প্রহরীরা তাঁবুতে ঘুমিয়ে আছে। হাসান আল-ইদরীস রাদীকে ডাক দেয়। কিন্তু রাদী ওখানে নেই। হাসান গুহার দিকে ছুটে যায়। সেখানেও প্রদীপ জ্বলছে না।

ইতিমধ্যে গুহায় একটা শিখা জ্বলে ওঠে। রাদী দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তার পরিধানের কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। গুহায় ঢুকে মেয়েটা তরল দাহ্য পদার্থের একটা মটকা উপড় করে ফেলে দিয়ে প্রদীপ থেকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তার জানা ছিলো না, এই পদার্থ কিভাবে খপ

করে জ্বলে ওঠে। শিখা ছড়িয়ে গিয়ে তাকেও জড়িয়ে ফেলে। হাসান আল-ইদরীস যখন তার কাছে গিয়ে পৌঁছে, ততোক্ষণে তার রূপময় মুখমণ্ডলটা ঝলছে গেছে। রেশমের ন্যায় চুলও পুড়ে গেছে রাদীর। তার কাপড়ের আগুন নেভাতে গিয়ে হাসান আল-ইদরীস নিজের হাতও পুড়ে ফেলে। রাদীর কাপড়ের আগুন নিভে গেছে ঠিক; কিন্তু তার চৈতন্য হারাবার উপক্রম হয়ে পড়েছে।

হাসান আল-ইদরীস রাদীকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করে। নিষিদ্ধ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে। সামনের অঞ্চলটা তার পুরোপুরি চেনা। গুহায় লাগানো আগুনের তাপে মুখবন্ধ তেলের মটকাগুলো এমন ভয়ানক শব্দে বিস্ফোরিত হতে শুরু করে যে, জমিন ভূমিকম্পের ন্যায় কেঁপে ওঠে। হাজার হাজার মটকা একসঙ্গে ফেটে যায়। তাতে খৃস্টানদের সংগৃহীত বিধ্বংসী সকল যুদ্ধ সরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে যায়।

বিস্ফোরণ মসুল নগরীকে জাগিয়ে তোলে। মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কী ঘটেছে কেউ বলতে পারছে না।

হাসান আল-ইদরীস নগরীতে ঢুকতে পারছে না। কারণ, নগরীর ফটক বন্ধ। সে মসুলের পরিবর্তে নাসীবা অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ে।

হাসান এখন বিপদমুক্ত। রাদী তার কাঁধে। অনেক দূর যাওয়ার পর হাসান ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দাঁড়ায়। রাদীকে মাটিতে শুইয়ে দেয়। রাদী ফিসফিসিয়ে বলে– 'আগুন আমাকে পবিত্র করে দিয়েছে।' মেয়েটা বিড় বিড় করতে শুরু করে– 'কাফেলা হেজাজ যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে আমরা বিয়ে করবো।'

'রাদী! রাদী!' হাসান আল-ইদরীস রাদীকে ডাকে।

'আল্লাহ আমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন, না?' রাদী জিজ্ঞেস করে। মেয়েটা উঠে বসে বাহু দুটো সম্মুখে এগিয়ে ধরে বললো– 'আমি যাচ্ছি। কাফেলা হেজাজ যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি।'

রাদী একদিকে পড়ে যায়। হাসান আল-ইদরীস তাকে ডাকে। ধরে নাড়ায়। শেষে শিরায় হাত রাখে। রাদীর আত্মা হেজাজের কাফেলার সঙ্গে চলে গেছে।

হাসান আল-ইদরীস খঞ্জর দ্বারা কবর খনন করে। দু'আড়াই ফুট গভীর আর রাদীর সমান লম্বা একটা কবর খুঁড়তে তার ভোর হয়ে যায়। রাদীকে সেই কবরে শুইয়ে রেখে উপরে মাটি চাপা দেয়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন খৃস্টানদের অস্ত্র ও দাহ্য পদার্থের ডিপো ধ্বংস হওয়ার সংবাদ পান, তখন তিনি তালখালেদ অভিমুখে অগ্রযাত্রা করছিলেন। তালখালেদ বিশাল একটি সাম্রাজ্য, যার শানসকর্তা সুকমান আল-কিবতী শাহ আরমান। সে সময় তিনি মসুলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য হারযাম নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শাহ আরমানের ইয্যুদ্দীনকে সাহায্য দেয়ার কথা। সে বিষয়ে আলোচনার জন্যই তাদের এই সাক্ষাৎ। সুলতান আইউবী সময়ের আগেই এক বৈঠকের সংবাদ পেয়ে গেছেন। তিনি শাহ আরমানের রাজধানী তালখালেদ অবরোধ করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন।

[সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত]

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে ফেলে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

ISBN. 984-8925-08-0

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

৮

আলতামাশ

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৮

আলতামাশ

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪

মোবাইল : ০১৫৬-৩৬৭২২১, ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৮
আলতামাশ

পৃষ্ঠা ঃ ২৫৬ (ফর্মা ১৬)

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

পরশমণি প্রকাশনা-১২
ISBN-984-8925-09-9

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৫৬-৩৬৭২২১, ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার
মালিটোলা, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
কালার সিটি
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৫৬৪১৪১

গ্রাফিক্স
নাজমুল হায়দার
দি লাইট
মোবাইল ঃ ০১৯১-০৩১১৮৪

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

পরিবেশক

এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার (পাঠকবন্ধু মার্কেট)
ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

নিউ রহমানিয়া লাইব্রেরী
৭৩, সাত মসজিদ সুপার মার্কেট
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১-৪৬৪০৭১

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে–বিশেষত মিশর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। ক্রুসেডাররা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয় তারা।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দু:সাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিলো, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দু:সাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হলো সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ কবুল করুন।

বিনীত

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা। মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সূচীপত্রঃ

*দ্বিতীয় দরবেশ................৭
*হাবীবুল কুদ্দুস...............৩৭
*হিত্তীন........................৭৭
*আল-ফারেস...................১১৭
*বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়...১৪৭
*রানী সাবীলা.................১৯৯
*পায়রাটি.......................২৩১
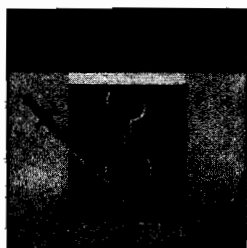
দ্বিতীয় দরবেশ

ক্রুসেডাররা মসুলের সন্নিকটে পাহাড়ের অভ্যন্তরে যে বিপুল অস্ত্র ও তরল দাহ্য পদার্থ মজুদ করেছিলো, তদ্বারা সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্যকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা সম্ভব ছিলো। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দারা মুহূর্ত মধ্যে সব ধ্বংস করে দিলো। ক্রুসেডারদের জন্য সে ছিলো এক প্রচণ্ড আঘাত। তাদের সব আয়োজন, সব নাটক তছনছ হয়ে গেলো।

সংগ্রহটা ছিলো পাহাড়ের বিস্তীর্ণ গুহার অভ্যন্তরে। আগুন লাগার পর বিস্ফোরণে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মাটি কেঁপে ওঠে, যেনো ভূমিকম্প হয়েছে। কিন্তু কেউ জানে না, ঘটনাটা কীভাবে ঘটলো।

এ ঘটনায় ক্রুসেডারদের বড় মিত্র ইয্‌যুদ্দীনের কোমর ভেঙে গেছে। ক্রুসেডাররা নিশ্চিত, এটা দুর্ঘটনা নয়– বরং সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচরদের কাজ।

ক্রুসেডাররা মসুলের শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীনকে মিত্র বানিয়ে মসুলের পার্বত্য অঞ্চলে অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও রসদপাতি সংগ্রহ করে সুলতান আইউবীর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে চেয়েছিলো। কিন্তু রাদী নামক একটি মাত্র মেয়ে সঙ্গী হাসান আল-ইদরীসের পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় সব ধ্বংস করে দিয়েছে।

জন গকে এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ক্রুসেডাররা এক দরবেশের নাটক মঞ্চস্থ করে প্রচার করেছে, এই দরবেশ উক্ত পাহাড়ে ধ্যানে বসবেন এবং খোদা তাকে মসুলের বিজয়ের ইঙ্গিত প্রদান করবেন। তারপর মসুল তথা ইয্‌যুদ্দীনের সাম্রাজ্য দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু পরিণামে দরবেশও অস্ত্র গুদানের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে।

একদিন কেটে গেছে। মসুলের জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত। রাতে যে বিস্ফোরণটা ঘটলো এবং এই যে মাঠ কেঁপে কেঁপে ওঠেছিলো, ঘটনাটা কী ঘটেছিলো তারা জানে না। বিষয়টা তাদের বলবার মতোও কেউ নেই। দাহ্য পদার্থগুলো কয়েকদিন পর্যন্ত জ্বলতে থাকে। সেই সঙ্গে সুপরিসর

গুহায় যেসব রসদ রাখা হয়েছিলো, সেগুলোও পুড়ে যায়। ভয়ে কেউ ওদিকে পা বাড়াচ্ছে না। সকলের ধারণা, এটা হয় দরবেশের কেরামত, নয়তো আল্লাহর গজব। এমনি ভীতিকর এক পরিস্থিতিতে তাদের কানে একটি শব্দ ভেসে আসে– 'তিনি জাহান্নামে চলে গেছেন। জাহান্নামের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন।'

ইনি সবুজ আবা পরিহিত আরেক দরবেশ। মাথায় লম্বা সাদা চুল। মুখে আবক্ষ-লম্বিত সাদা দাড়ি। মুখে বার্ধক্যের বলিরেখা। এক হাতে কাঁধ পর্যন্ত লম্বা একটা লাঠি, অপর হাতে পাক কুরআন। প্রথম দরবেশের ন্যায় ইনিও হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেন এবং বাজারে ঢুকে পড়েন। উৎসুক জনতা ভক্তি গদ গদ চিত্তে তার চারপার্শ্বে এসে ভিড় জমায়। মাঝ বাজারে দাঁড়িয়ে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন– 'তিনি জাহান্নামের আগুনে পুড়ে গেছেন, যিনি বলতেন খোদা তাকে ইশারা দেবেন। যদি তার পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করো, তাহলে তোমরাও সেই জাহান্নামের আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে। খোদা রাতের বজ্রনিনাদে তোমাদেরকে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। আকাশ ছেয়ে যাওয়া সেই কালো ধোঁয়ার কথা মনে করো। আল্লাহর রোষকে ভয় করো। আমার হাতে যে পত্রখানা দেখতে পাচ্ছো, এটি মান্য করো। এটি আল্লাহর কালাম। এটি পাক কুরআন।'

'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদেরকে বলুন'– 'এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে– 'এসব কী ছিলো? তিনি কে ছিলেন? আপনি কে? বলুন, রাতে মাটি কেনো কেঁপে ওঠেছিলো? কালো ধোঁয়াগুলো কী ছিলো?'

'তিনি আত্মহারা ছিলেন'– নতুন দরবেশ বললেন– 'পাগল ছিলেন। তিনি আল্লাহর রহস্যের জগতে হস্তক্ষেপ করেছেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বিজয় কিংবা অন্য কোন আগাম সংবাদ দিতে পারেন না। জয়-পরাজয়, আনন্দ-বেদনা সবই আল্লাহর হাতে। নিজেকে আল্লাহর দূত দাবি করে তিনি গুনাহগার হয়েছেন। তিনি তার শাস্তি পেয়ে গেছেন। তোমরা গিয়ে দেখে আসো, পাহাড় এখনো জ্বলছে। সেই মিথ্যাবাদী দরবেশকে এখনো যদি তোমরা সত্য বলে মান্য করো, তাহলে তোমরাও পুড়ে মরবে।'

'বলুন সঠিক কে?'– জনতা জিজ্ঞেস করে– 'আপনি কি সত্য?'

'না'– দরবেশ উত্তর দেন এবং কুরআনখানা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বললেন– 'আল্লাহর এই কালাম সত্য। সেই দরবেশকে ভুলে যাও। এই কিতাবের

কথা মান্য করো। আল্লাহ এর মধ্যে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা কোনো মানুষ দিতে পারে না।'

দরবেশ সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করেন।

দরবেশ দিনভর মসুলের অলি-গলিতে ঘুরে ঘুরে ঘোষণা দিতে থাকেন– তিনি জাহান্নামে ভস্ম হয়ে গেছেন, তিনি নিজের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন।

জনতা যেখানেই তাকে ঘিরে ধরছে, দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন– 'কোনো মানুষ গায়েব জানে না। কুরআনে যা কিছু আছে, তা-ই খোদার ইঙ্গিত।'

দরবেশ এক মসজিদে জোহর নামায আদায় করেন। আসর পড়েন অন্য মসজিদে। মাগরিব আরেক মসজিদে। মসজিদে ঢুকলেই মুসল্লীরা তাকে ঘিরে ধরছে। তিনি ওয়াজ করছেন– 'লোক সকল! একমাত্র কুরআনই সত্য। তোমরা কুরআনের ইঙ্গিত অনুযায়ী আমল করো।'

মাগরিবের নামায আদায় করে দরবেশ এক মসজিদ থেকে বের হন। এক বিরান অঞ্চল অভিমুখে হাঁটতে শুরু করেন। জনতাও তার পেছনে পেছনে হাঁটছে। তিনি সকলকে দাঁড় করিয়ে বললেন– 'এখন আর তোমরা আমার পেছনে এসো না। আমি সারা রাত ঐ বিজন এলাকায় ইবাদত করবো। আমি তোমাদের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করবো।'

নতুন দরবেশ মানুষের উপর এমন প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলেন যে, তাদের মন থেকে প্রথম দরবেশের ভীতি দূর হয়ে গেছে। জনতাকে নিয়ে তিনি হাত তুলে দু'আ করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যান। মানুষ ওখানেই দাঁড়িয়ে কানাঘুষা শুরু করে। নিষেধ করার পর একজন মানুষও দরবেশের পেছনে যেতে সাহস করলো না।

কিন্তু এক ব্যক্তি দরবেশের পিছু নেয়। অন্ধকারে কেউ তাকে দেখেনি। দরবেশ জনতার চোখের আড়ালে গিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করেন। তাকে অনুসরণকারী লোকটিও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। হঠাৎ দরবেশ কার যেনো পায়ের শব্দ শুনতে পান। দাঁড়িয়ে পেছন পানে তাকান। অন্ধকারে ছায়ার মতো কী যেনো দেখতে পান। তৎক্ষণাৎ ছায়াটা থেমে যায় এবং বসে পড়ে। দরবেশ ইতিউতি তাকান আর কিছু না দেখে হাঁটতে শুরু করেন। কিন্তু তার মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে। এখন বারবার তিনি পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন।

দরবেশ আরো কিছু পথ এগিয়ে যান। এবার পেছনের লোকটা দরবেশের কাছাকাছি চলে এসেছে। দরবেশ কুরআন তিলাওয়াত করতে শুরু করেন। তিনি হাঁটার গতি মন্থর করে দেন। পেছনের লোকটা কটিবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করে বেড়ালের ন্যায় পা টিপে টিপে দরবেশের একেবারে কাছে চলে যায়। খঞ্জরধারী হাতটা উপরে তুলে ধরে। পেছন থেকে আঘাত হেনে দরবেশকে শেষ করে ফেলা তার পরিকল্পনা। খঞ্জরটা এখনো তার উপরে ঝুলছে। এমন সময় দরবেশ বিদ্যুতের ন্যায় মোড় ঘুরে দাঁড়ান। হাতের মোটা লাঠিটা উর্ধ্বে তুলে চারদিক ঘোরান। লাঠি আক্রমণোদ্যত লোকটির খঞ্জরধারী বাহুতে গিয়ে আঘাত করে। সেই সঙ্গে লোকটার পেটে এমন এক লাথি মারেন যে, লোকটা চিৎ হয়ে পেছন দিকে পড়ে যায়। দরবেশের এক হাতে কুরআন। লড়তে হবে অপর এক হাতেই। তিনি লোকটার মাথায় লাঠি দ্বারা আঘাত হানেন। তার খঞ্জর হাত থেকে ছুটে পড়ে যায়।

দরবেশ খঞ্জরটা তুলে নেন। আক্রমণকারী লোকটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। দরবেশ তাকে বললেন– 'খঞ্জর আমার হাতে। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকো।'

লোকটি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। দরবেশ মুখে পশুর ডাকের ন্যায় শব্দ করেন। দূর এক স্থান থেকেও অনুরূপ শব্দ ভেসে আসে। দরবেশ পুনরায় শব্দ করেন। অন্ধকারে ধাবমান পায়ের শব্দ শোনা যায়। দু'জন লোক দরবেশের কাছে এসে দাঁড়িয়ে যায়। দরবেশ হেসে বললেন– 'আমরা যে বিপদের আশঙ্কা করেছিলাম, এই হতভাগা তা-ই ঘটাতে যাচ্ছিলো। আমার তো ধারণা ছিলো, দিনেই মসুলের কোনো এক স্থান থেকে তীর এসে আমার হৃদপিণ্ডে গেঁথে যাবে। কিন্তু তারা আমাকে রাতে এর দ্বারা খুন করাবার চেষ্টা করেছে। এই নাও তার খঞ্জর।'

দরবেশ মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা লোকটাকে লাঠি দ্বারা হাল্কা খোঁচা দিয়ে বললেন– 'ওঠ্ শয়তান। তুই কি মুসলমান?'

'হ্যাঁ হযরত!'– লোকটি আদবের সঙ্গে উত্তর দেয়– 'আমি মুসলমান।'

দরবেশ ও তার সঙ্গী দু'জন খিল খিল করে হেসে ফেলেন। দরবেশ বললেন– 'আমাকে হযরত বলো না বন্ধু! আমি তোমার চেয়েও বেশি যুবক।'

'তোমার ছদ্মবেশ সার্থক হয়েছে।' দরবেশের এক সঙ্গী বললো।

তিনজন আক্রমণকারী লোকটাকে সঙ্গে করে দূরে এক তাঁবুতে নিয়ে

যায়। তাঁবুর সন্নিকটে চার-পাঁচটি উট বাঁধা আছে। আশপাশ টিলায় ঘেরা। লোকটাকে তাঁবুতে বসিয়ে রাখা হলো। তাঁবুতে বাতি জ্বলছে। দরবেশকে আশি বছরের বৃদ্ধ বলে মনে হয়েছিলো। এখন কথা বলছেন ঠিক একজন নওজোয়ানের ন্যায়। দরবেশ মুখের সাদা দাড়ি এবং মাথার কৃত্রিম চুল খুলে আসল রূপে আবির্ভূত হন। ভেজা কাপড়ে মুখমণ্ডলটা ভালোভাবে চলে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেন। এখন তিনি বৃদ্ধ নন— পঁচিশ বছর বয়সের তাগড়া যুবক।

'তুমি আসলে কে?' আক্রমণকারী জিজ্ঞেস করে।

'যাকে তুমি হত্যা করতে এসেছো'— যুবক উত্তর দেয়— 'আমাকে খুন করতে তোমাকে কে পাঠিয়েছে? লুকাবার চেষ্টা করলে তোমাকে বড় কষ্টদায়ক মৃত্যু ভোগ করতে হবে।'

'আমার কাছে লুকাবার মতো কিছুই নেই'— লোকটি উত্তর দেয়— 'মহলের এক কর্মকর্তা আহমদ ইবনে আমর আমাকে বললেন, শহরে এক দরবেশ ঘুরে ফিরছে। তিনি আমাকে আপনার গঠন-আকৃতি ও বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে বললেন, লোকটাকে অন্ধকারে হত্যা করতে হবে। কেউ যেনো টের না পায়। কাজটা করে গেলে আমাকে দু'শ' দিনার পুরস্কার দেবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন।'

'আহমদ ইবনে আমর কি আমাকে বৃদ্ধ এবং দরবেশই মনে করেছিলেন?'

'তা বলেননি'— লোকটি উত্তর দেয়— 'আমাকে শুধু বললেন, দরবেশটাকে খুন করতে হবে।'

ছদ্মবেশী এই দরবেশ ও তার সঙ্গী দু'জন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর আন্ডারগ্রাউন্ড দলের সদস্য। মসুলে কর্মরত। গত পর্বের কাহিনীর দরবেশের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দূর করার লক্ষ্যে আইউবী পক্ষের লোকেরা এই লোকটিকে দরবেশ সাজিয়ে নগরীতে ঘুরিয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত মানুষগুলো দরবেশদেরকে খোদার কণ্ঠ বলে বিশ্বাস করতো। প্রথম দরবেশকে ক্রুসেডাররা তাদের এক প্রতারণার সাফল্যের জন্য ব্যবহার করেছিলো। সুলতান আইউবীর লোকেরা তাদের এক যুবক সহকর্মীকে দরবেশের রূপে উপস্থাপন করে বিভ্রান্ত জনতাকে কুসংস্কার ও কল্পনাপূজা থেকে সরিয়ে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করার সফল প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

আহমদ ইবনে আমর মসুলে ইবনে আমর নামে পরিচিত। মসুলের শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীনের প্রশাসনের মন্ত্রী পদমর্যাদার এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি সংবাদ পান, এক দরবেশ শহরে প্রথম দরবেশের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিয়ে ফিরছেন। তিনি বুঝে ফেললেন, এই দরবেশ সুলতান আইউবীর পক্ষের লোক তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই তাকে খুন করা আবশ্যক। অন্যথায় মানুষের কাছে প্রথম দরবেশের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং পাহাড়ের অভ্যন্তরে কী সব জ্বলছে জেনে ফেলবে।

সুলতান আইউবীর এই লোকটাকে হত্যা করার জন্য মহলের নিরাপত্তা বিভাগের এক সৈনিককে নির্বাচন করা হয়। তাকে দু'শ' দিনার পুরস্কারের প্রলোভন দিয়ে দরবেশকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করা হয়। এই ভাড়াটে খুনী যাকে বৃদ্ধ মনে করছিলো, সে এক তাগড়া যুবক বলে আত্মপ্রকাশ করলো। তার জানা ছিলো না, বৃদ্ধরূপী এই যুবক এক অভিজ্ঞ লড়াকু গোয়েন্দা ও গেরিলা সৈনিক।

ইবনে আমর প্রেরিত এই ঘাতককে তাঁবুতে দীপের আলোতে বসিয়ে বহু কিছু জিজ্ঞেস করা হলো। কিন্তু কোনো তথ্য পাওয়া গেলো না। সে ক্রুসেডারদের নিয়মতান্ত্রিক গুপ্তচর কিংবা নাশকতাকারী গ্রুপের লোক নয়। সে ভাড়ায় খুন করতে এসেছিলো। দরবেশরূপী লোকটি তার উভয় সঙ্গীর প্রতি তাকায়। তিনজন চোখে চোখে কথা বলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। একজন উঠে তাঁবু থেকে এক গজ লম্বা এক টুকরো রশি নিয়ে আসে। লোকটার পেছন থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ধরে রাখে। লোকটা ছটফট করতে শুরু করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিথর হয়ে যায়।

পরদিন। আহমদ ইবনে আমর মসুলের শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীনের দেউড়িতে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান। ক্ষোভে বুকটা ফেটে যাচ্ছে তার। ইয্‌যুদ্দীনেরও চেহারায় অস্থিরতার ছাপ। ইবনে আমরের হাতে এক চিলতে কাগজ। সম্মুখে মেঝেতে পড়ে আছে একটি মৃতদেহ, যার গলায় রশি পেঁচানো। সেই রশির সঙ্গেই এই চিরকুটটা বাধা ছিলো।

লাশটা নিরাপত্তা বাহিনীর সেই সৈনিকের, যাকে নতুন দরবেশকে হত্যা করতে প্রেরণ করা হয়েছিলো। ইবনে আমর সারাটা রাত তার অপেক্ষায় নির্ঘুম অতিবাহিত করেছেন। ভোরে তার নিকট সংবাদ আসে, তার বাসভবনের সামনে একটি লাশ পড়ে আছে। তিনি দ্রুত ছুটে আসেন। ভবনের সম্মুখে মাটিতে তার সেই সৈনিকেরই লাশ পড়ে আছে। চোখ দুটো

খোলা। জিহ্বাটা বেরিয়ে আছে। গলায় রশি পেঁচানো। রশির সঙ্গে এক টুকরো কাগজ বাঁধা।

কাগজে লেখা আছে–

'মসুলের তথাকথিত শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীন! তোমার এক কর্মকর্তা আহমদ ইবনে আমর এই ব্যক্তিকে আমাকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেছিলো। আমি তার মৃতদেহটা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে আহমদ ইবনে আমরের আঙ্গিনায় রেখে গেলাম। হতভাগা আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি। তুমিও তেমনি এক হতভাগা যে, আজো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এতোটুকু ক্ষতি করতে পারোনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। কাফেরদের বন্ধুত্ব থেকে তুমি লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না। আমরা তোমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবো না। একদিন তোমার লাশটাও তোমার প্রাসাদের আঙ্গিনায় পড়ে থাকবে। আহমদ ইবনে আমরের ন্যায় কর্মকর্তা-উপদেষ্টাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলো। এরা চাটুকারের দল। কখনোই তোমার অনুগত নয়। এরা তোমাকে পতনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের শক্তিটা দেখো। তোমার সামরিক উপদেষ্টা এহতেশামুদ্দীন বৈরুতে ক্রুসেডারদের সঙ্গে চুক্তি করতে গিয়েছিলো। কিন্তু আমরা তাকে গুম করে ফেলেছি। এখন সে সুলতান আইউবীর কাছে অবস্থান করছে। তোমার খৃস্টান বন্ধুরা পর্বতমালা খনন করে তার অভ্যন্তরে সামরিক সরঞ্জাম মজুদ করেছিলো। আমরা সেসব ভস্ম করে তোমার সিংহাসনে কম্পন ধরিয়ে দিয়েছি। তুমি তোমার এক সৈনিককে আমাকে খুন করতে প্রেরণ করেছিলে। আমরা নৈতিকতার সঙ্গে তার লাশটা তোমাদের হাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আমরা জিন-ভূতের ন্যায় তোমাদের উপর সওয়ার হয়ে থাকবো। কিন্তু তোমরা আমাদেরকে দেখতে পাবে না। তোমার পতন শুরু হয়ে গেছে। মুক্তি যদি পেতে চাও, তো সালাহুদ্দীন আইউবীর আনুগত্যের বিকল্প নেই। যাও সুলতান আইউবীর পায়ে লুটিয়ে পড়ো এবং বাহিনীটাকে তার হাতে তুলে দাও। আমাদেরকে প্রথম কেবলা মুক্ত করতে হবে। এই জাগতিক ভোগ-বিলাস, রং-তামাশা ত্যাগ করো। রাজ্য-সিংহাসন কোনোদিন কারো সঙ্গে কবরে যায়নি।'

আহমদ ইবনে আমর লাশটা নিজ গৃহের সম্মুখ থেকে তুলে ইয্‌যুদ্দীনের সামনে নিয়ে রাখেন। ইয্‌যুদ্দীন পত্রখানা পাঠ করে আহমদ ইবনে আমরের হাতে ফেরত দিয়ে গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান। ইবনে আমর ক্ষোভ প্রকাশ

কয়লেও ইয্‌যুদ্দীন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করছেন।

'আমি সংবাদ পেয়েছি, মসজিদে মসজিদেও নাকি এই নতুন দরবেশের আলোচনা চলছে'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'এখন এই পত্র দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেলো দরবেশ আসলে দরবেশ নয়– সালাহুদ্দীন আইউবীর লোক।'

ইয্‌যুদ্দীন ইবনে আমরের হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে পেঁচিয়ে লাশটার উপর ছুঁড়ে মারেন।

'আমি তাকে খুঁজে বের করবো'– ইবনে আমর ক্ষোভের সাথে বললো– 'ধরে এনে জনসম্মুখে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো।'

'আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'এই একটা লোককে হত্যা করে তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমাদেরকে অন্যকিছু করতে হবে। অন্যকিছু ভাবতে হবে। আমি চাচ্ছিলাম, ক্রুসেডাররা আইউবীর উপর আক্রমণ করুক। কিন্তু জানি না তারা কেনো সামনে আসছে না। তারা চাচ্ছে প্রকাশে আমি আইউবীর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হই। পরে তারা আমাকে এভাবে সাহায্য করবে যে, তাদের গেরিলা বাহিনী আইউবীর পার্শ্ব, পেছন এবং রসদের উপর কমান্ডো আক্রমণ চালাতে থাকবে। এ প্রক্রিয়ায়ও আমি যুদ্ধের ময়দানে সাফল্য অর্জন করতে পারি।'

'আর হবেও নিশ্চয়ই।' ইবনে আমর মেঝেতে পা দ্বারা আঘাত হেনে বললো।

'এই পত্রে সঠিক লেখা হয়েছে যে, তোমরা চাটুকার'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'আমি এক মহাসংকটে নিপতিত আর তোমরা আমাকে খুশি করার জন্য শিশুর ন্যায় কথা বলছো। তোমরা কি আমাকে ভালো কোন পরামর্শ দিতে পারো না?'

ইয্‌যুদ্দীন হাত তালি দেন। এক যুবতী সেবিকা ছুটে এসে অবনত মস্তকে সালাম করে দাঁড়িয়ে যায়। ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'দারোয়ানকে বলো, লাশটা তুলে নিয়ে কোথাও দাফন করে রাখুক।' বলেই তিনি নিজের খাস কক্ষে চলে যান। আহমদ ইবনে আমরও সঙ্গে আছেন। ইয্‌যুদ্দীন পুনরায় বেরিয়ে এসে সেবিকাকে বললেন– 'সোরাহি-পেয়ালা নিয়ে আসো। দারোয়ানকে বলে দাও, এদিকে যেনো কাউকে আসতে না দেয়।'

সেবিকা লাশটা দেখে ভয় পেয়ে যায়। মোচড়ানো কাগজটার উপর তার চোখ পড়ে। মেয়েটা আরবী জানে। খুলে লেখাগুলো পড়েই কাগজটা কাপড়ের ভেতরে লুকিয়ে ফেলে। তারপর এক দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে

দারোয়ানকে বললো, লাশটা তুলে দাফন করিয়ে ফেলো। বলেই একটা সোনার থালায় করে একটা সোরাহি আর দুটো পেয়ালা নিয়ে ইয়্যুদ্দীনের কক্ষে ফিরে যায়।

'আর্মেনীয় সম্রাট আমার বার্তার উত্তর দিয়েছেন'– ইয়্যুদ্দীন ইবনে আমরকে বলছেন– 'তিনি আমাকে তাঁর রাজধানী তালখালেদের পরিবর্তে হারযাম যেতে বলেছেন। নিজে তালখালেদ থেকে রওনা হয়ে গেছেন। আমি দু'দিন পর যাচ্ছি।'

সেবিকা পেয়ালায় দ্রুত মদ ঢালার পরিবর্তে ধীরে ধীরে কাপড় দ্বারা পেয়ালাগুলো মুছতে থাকে। মেয়েটা ইয়্যুদ্দীনের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনছে।

'আমার মনে হচ্ছে আর্মেনীয় সম্রাটের তালখালেদ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল।' ইবনে আমর বললো।

'কারণ সালাহুদ্দীন আইউবী তালখালেদ অভিমুখে অগ্রযাত্রা করছেন, তাই না?'– ইয়্যুদ্দীন বললেন– 'তুমি ভয় করছো, আর্মেনীয় সম্রাটের অবর্তমানে সালাহুদ্দীন আইউবী তালখালেদ অবরোধ করে ফেলবেন। না, এমনটা হবে না। হয়ও যদি আমরা আইউবীর উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালাবো। এই যুদ্ধকে আমরা দীর্ঘ করে তুলবো এবং ক্রুসেডারদের অবহিত করবো। তারাও আইউবীর উপর আক্রমণ চালাবে। আমি নিশ্চিত, এমনটা হলে সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী পিষে যাবে।'

'আপনি কবে যাচ্ছেন?' ইবনে আমর জিজ্ঞেস করে।

'দু'দিন পর।' ইয়্যুদ্দীন উত্তর দেন।

মদ পরিবেশনে আর বিলম্ব করা যাচ্ছে না। সেবিকা পেয়ালা দুটোয় মদ ঢেলে দু'জনের সামনে পেশ করে। ইয়্যুদ্দীন বললেন, এবার তুমি চলে যাও। সেবিকা দেউড়িতে গিয়ে দেখে লাশটা তুলে নেয়া হয়েছে। মেয়েটি এখনই বাইরে বেরুতে পারছে না। ডিউটি আছে। সে বসে বসে ভাবতে শুরু করে। হঠাৎ তার মুখ থেকে সশব্দে 'আহ!' বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে পেটটা চেপে ধরে। মাথাটা নত করে ফেলে। দারোয়ান ও অন্যান্য চাকররা ছুটে আসে। সেবিকা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো– 'হঠাৎ পেট ব্যথা শুরু হয়ে গেছে।' তৎক্ষণাৎ অন্য এক সেবিকাকে ডেকে তার জায়গায় বসিয়ে দেয়া হলো এবং তাকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তারকে বলা হলো, পেটে হঠাৎ ব্যাথা শুরু হয়ে গেছে– প্রচণ্ড

ব্যথা। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে বললেন, তোমাকে দু'দিন বিশ্রামে থাকতে হবে।

অল্প পরই সেবিকার সব ঠিক হয়ে যায়। ডাক্তার তাকে দু'দিনের ছুটি দিয়ে বললেন, নিজের কক্ষে গিয়ে আরাম করো। সেবিকা নিজ কক্ষে না গিয়ে অলি-গলি ঘুরে ইয্যুদ্দীনের স্ত্রী রোজি খাতুনের কক্ষে চলে যায়।

রোজি খাতুন কক্ষে উপবিষ্ট। ইয্যুদ্দীনের সেবিকা কক্ষে প্রবেশ করে।

'পেট ব্যথার বাহানা করে এসেছি'– সেবিকা বললো– 'ডাক্তার আজ এবং কালকের ছুটি দিয়েছেন।'

মেয়েটি লাশের উপর থেকে যে কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়েছিলো, সেটি কামিজের ভেতর থেকে বের করে রোজি খাতুনের হাতে দিয়ে বললো– 'এই কাগজটা এক সৈনিকের লাশের সঙ্গে ছিলো।'

রোজি খাতুন কাগজটা খুলে পাঠ করে বললেন– 'শাবাশ! আমাদের মুজাহিদরা কাজ করছে। তো এর অর্থ হচ্ছে, হতভাগ্যরা আমাদের এই লোকটাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো। আমি সংবাদ পেয়েছি, আমাদের এই দরবেশ মানুষের অন্তর থেকে ক্রুসেডারদের দরবেশের ভীতি ও প্রভাব বের করে দিয়েছে।'

'এই পত্র তারই'– সেবিকা বললো– 'আমি তার হাতের লেখা চিনি।'

রোজি খাতুন হেসে বললেন– 'আমি জানি। তুমি তার হাতের লেখা-ই নয়– হৃদয়টাও চেনো। তবে খেয়াল রাখবে, হৃদয়ের জালেই আটকে থেকো না। কর্তব্য সকলের আগে।'

সেবিকা লজ্জা পেয়ে যায়। লাজুক কণ্ঠে বললো– 'এ পর্যন্ত নিজের আবেগ-উচ্ছ্বাসকে কর্তব্যের পথে আসতে দেইনি। ফাহ্দকেও এ কথাই বলি, আমি তোমাকে ভালোবাসি ঠিক; কিন্তু কর্তব্য যেনো সবার উপরে থাকে।'

ফাহ্দ সেই যুবক, যে দরবেশের রূপ ধারণ করেছিলো। বাড়ি বাগদাদ। গোয়েন্দা হওয়ার জন্য যতোগুলো গুণের প্রয়োজন, সবই তার মধ্যে বিদ্যমান। রূপবান যুবক। দু'বছর যাবত মসুলে অবস্থান করছে এবং সফলতার সাথে গুপ্তচরবৃত্তি করছে। এই সূত্রেই ইয্যুদ্দীনের এই সেবিকার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ। দু'জন দু'জনের হৃদয়ে ঢুকে গেছে।

সেবিকা শহরে থাকে। তবে তার বেশিরভাগ সময় কাটে রাজপ্রাসাদে ডিউটিতে। গুপ্তচরবৃত্তির গোপন তৎপরতা ছাড়াও অন্য প্রয়োজনে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ চলতে থাকে।

'আমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছি, এখনো তা বলা হয়নি'– সেবিকা রোজি খাতুনকে বললো– 'ইয্‌যুদ্দীন দু'দিন পর আর্মেনিয়ার সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হারযাম যাচ্ছেন। মদ পরিবেশনের সময় আমি তাকে একথা বলতে শুনেছি। তিনি আহমদ ইবনে আমরকে বলছিলেন, আর্মেনিয়ার সম্রাট বার্তা পঠিয়েছেন, তিনি তালখালেদ থেকে হারযাম অভিমুখে রওনা করেছেন এবং আমার সঙ্গে ওখানে সাক্ষাৎ করবেন। আমি বের হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তাই পেট ব্যথার অজুহাত তৈরি করে আপনার কাছে এসেছি।'

রোজি খাতুন নিজ উরুতে চাপড় মেরে বললেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবী তালখালেদ অভিমুখে এগিয়ে আসছেন। আমার জানা নেই, তালখালেদে আমাদের গুপ্তচর আছে কিনা। সংবাদটা আইউবীকে জানানো আবশ্যক। হতে পারে তিনি দু'জনকে হারযামেই পাকড়াও করে ফেলবেন। কাজটা তুমিও করতে পারো। ফাহ্‌দ কিংবা তার কোনো একজন সঙ্গীর নিকট যাও। সংবাদটা অবহিত করে আমার পক্ষ থেকে বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবী এই মুহূর্তে তালখালেদের পথে থাকবেন। সংবাদটা যেনো তাঁকে পৌঁছিয়ে দেয়। তুমি এক্ষুনি যাও।'

সেবিকা চলে যায়।

পরক্ষণেই ইয্‌যুদ্দীন রোজি খাতুনের কক্ষে প্রবেশ করেন। চেহারায় প্রচণ্ড ভীতির ছাপ। রোজি খাতুন তার এই পেরেশানীর কারণ জানেন। তথাপি জিজ্ঞেস করেন– 'আপনাকে বেশ অস্থির দেখাচ্ছে। কারণ কী?'

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রুতা আর ক্রুসেডারদের বন্ধুত্বের শিল-পাটায় পিষে যাচ্ছি।' ইয্‌যুদ্দীন পরাজিত কণ্ঠে বললেন।

'আমার পূর্ণ আন্তরিকতা, হৃদ্যতা আপনার সঙ্গে'– রোজি খাতুন বললেন– 'কিন্তু যখন আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর পক্ষে কথা বলি, তখন আপনার সন্দেহ জাগে, আমি তার সমর্থক এবং আপনার বিরোধী। আপনার প্রকৃত সমস্যা এই নয় যে, আপনার ও সালাহুদ্দীন আইউবীর মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রকৃত কারণ হচ্ছে, আপনি সেই জাতিকে বন্ধু ভেবে বসেছেন, যারা আপনার বন্ধু হতে পারে; কিন্তু আপনার ধর্মের আপন হতে পারে না। ক্রুসেডাররা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনাকে ধোঁকা দেবে এবং অবশ্যই দেবে।'

'তবে কি আমি আইউবীর নিকট গিয়ে আত্মসমর্পণ করবো?'– ইয্‌যুদ্দীন

তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন– 'তা-ই যদি করি, তাহলে নিজ বাহিনীকে কীভাবে মুখ দেখাবো!'

'সালাহুদ্দীন আইউবী আপনাকে প্রজা নয়– মিত্র বানাতে চান।' রোজি খাতুন বললেন।

'তুমি লোকটার মতলব বুঝতে পারোনি'– ইয্যুদ্দীন বললেন– 'তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের কথা বলেন। আসলে তিনি ক্ষমতালোভী।'

'তার অর্থ হচ্ছে, আপনি তার সঙ্গে লড়াই করবেন'– রোজি খাতুন বললেন– 'এ-ই যদি আপনার সংকল্প হয়ে থাকে, তাহলে অস্থির না হয়ে আপনি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করুন।'

'আমার পেরেশানীর কারণ হচ্ছে, সালাহুদ্দীন গোয়েন্দা এবং নাশকতাকারীদের জাল বিছিয়ে রেখেছেন'– ইয্যুদ্দীন বললেন– 'তুমি বোধ হয় জানো, আমার এমন যোগ্য সামরিক উপদেষ্টা এহতেশামুদ্দীন বৈরুতে বল্ডউইনের সঙ্গে চুক্তি করতে গিয়ে সেখান থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমি সংবাদ পেয়েছি, সে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট আছে। আমার সকল গোপন তথ্য তার কাছে। আমি খৃস্টানদের দ্বারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, তরল দাহ্য পদার্থ ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়েছিলাম। কিন্তু সব ধ্বংস হয়ে গেছে। আজ আমার এক নিরাপত্তা কর্মীর লাশ আমার নিকট এসেছে!'

'তাই নাকি? কেউ তাকে খুন করেছে নাকি? রোজি খাতুন কিছুই জানেন না ভান ধরে জিজ্ঞেস করেন।'

'হ্যাঁ'– ইয্যুদ্দীন আসল কথা গোপন রেখে বললেন– 'তাকে কেউ হত্যা করেছে। তাকে বিশেষ এক কাজে পাঠানো হয়েছিলো। ঘাতক সালাহুদ্দীন আইউবীরই লোক মনে হচ্ছে।'

লাশের সঙ্গে থাকা ফাহ্দের পত্রখানা রোজি খাতুনের কাছে। কিন্তু তিনি ভান ধরেছেন, কিছুই জানেন না। ভাবেন, ইয্যুদ্দীন এমনিতেই ভীত। আরো ভয় ধরিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

'আপনার ভালোভাবে জানা আছে, সালাহুদ্দীন শুধু রণাঙ্গনেই লড়েন না'– রোজি খাতুন বললেন– 'তিনি যখন নিজ গৃহে ঘুমিয়ে থাকেন, তখনো তার শত্রুরা মনে করে, তিনি তাদের মাথার উপর বসে আছেন। এই মুহূর্তে তিনি তালখালেদ অভিমুখে অগ্রযাত্রা করছেন। কিন্তু মনে হচ্ছে, যেনো তিনি মসুলে বসে বসে নিজ তত্ত্বাবধানে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করছেন।

ক্রুসেডারদের বাহিনীর অবস্থাটা দেখুন। আইউবীর বাহিনীর তুলনায় তারা দশ গুণ। তবু তারা মুখোমুখি এসে যুদ্ধ করার সাহস পাচ্ছে না। খৃষ্টানদের তুলনায় আপনার যে সৈন্য আছে, তাতো আপনি জানেন। তাছাড়া আপনার বাহিনীতে এমন সব কমান্ডারও আছে, যারা আপনার অনুগত নয়। তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে পারে।'

ইয্‌যুদ্দীনের ভীতি আরো বেড়ে যায়। বললেন– 'আমি এমন এক অবস্থানে এসে পৌঁছেছি, যেখান থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারবো না। দু'দিন পর আমি বাইরে এক জায়গায় যাবো। ভাগ্য প্রসন্ন হলে সফল হবো।' তিনি নিশ্চুপ হয়ে গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান। খানিক পর বললেন– 'রোজি! আমি তোমার সঙ্গে আমার একটা বাসনা সম্পৃক্ত করে রেখেছি।'

'আমি আপনার প্রতিটি আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ করবো'– রোজি খাতুন বললেন– 'আপনি যদি আমাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযান পরিচালনা করতে বলেন, তা-ও করবো। আমি আপনার এক সন্তানের মা হয়েছি। আপনার বাসনা আমি পূরণ না করলে কে করবে বলুন। বলুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি। আপনি আমাকে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করুন।'

'আমি বাইরে যাচ্ছি'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'এখনই জিজ্ঞেস করো না কোথায় যাচ্ছি। বিষয়টা এখনো গোপন রাখতে হবে। ফিরে এসেই আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবো। তবে পরিস্থিতি যদি আমার বিপক্ষে চলে যায়, তাহলে আমি তোমার কাছে আশা রাখবো, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাকে সমঝোতা করিয়ে দেবে। হতে পারে তখন আমি গেলে তিনি আমাকে গ্রাহ্য করবেন না।'

রোজি খাতুন ইয্‌যুদ্দীনকে এই পরামর্শ দিলেন না যে, তার চেয়ে বরং পরাজিত হওয়ার আগেই আপনি আইউবীর সঙ্গে আপস করে নিন। ইয্‌যুদ্দীন কোথায় যাচ্ছেন, তাও তিনি জিজ্ঞেস করলেন না। সব তো তাঁর জানাই আছে। তাছাড়া ইয্‌যুদ্দীন যখন বিষয়টা এখনো গোপনই রাখতে চাচ্ছেন, তাহলে অযথা ঘাটানোর প্রয়োজন কী। তিনি জানেন না, তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একজন বিজ্ঞ গোয়েন্দা নারীর সঙ্গে কথা বলছেন। যা হোক, রোজি খাতুন ইয্‌যুদ্দীনকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন,

যখনই প্রয়োজন হবে আমি সুলতান আইউবীর সঙ্গে আপনাকে সমঝোতা করিয়ে দেবো। ইয্যুদ্দীনের ভীতিকর অবস্থা দেখে রোজি খাতুনের হৃদয় সাগরে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়।

ইয্যুদ্দীন অবনত মস্তকে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। রোজি খাতুনের ব্যক্তিগত সেবিকা কক্ষে প্রবেশ করে। মহিলা রোজি খাতুনেরই সমান বয়সী। প্রবেশ করেই রোজি খাতুনকে জিজ্ঞেস করে, সম্রাটকে অনেক পেরশান দেখা গেলো। এই সেবিকাও রোজি খাতুনের গোপন মিশনের সহকর্মী।

'ঈমান আর চরিত্র ত্যাগ করলে মানুষের এই দশাই ঘটে'– রোজি খাতুন বললেন– 'এই যে শাসকরা জাতি ও ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে আপন সাম্রাজ্যের রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, এরা বৃক্ষ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া ডালের মতো। ডালের পাতাগুলো ঝরে যাবে। তারপর বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। শেষে ডালগুলো শুকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। যে বস্তুটা আমার স্বামীকে মদ-নারীর আসক্তে পরিণত করেছে, সে হলো ক্ষমতার লোভ। লোকটি ক্রুসেডারদের মধুর বিষ শিরায় ঢুকিয়ে নিয়েছে। আমার স্বামী ইয্যুদ্দীন রণাঙ্গনের রাজা ছিলেন। তার তরবারী ক্রুশের হৃদপিণ্ড কর্তন করতো। কিন্তু আজ তিনি নিজ ঘরে ভয়ে কাঁপছেন। তার বীরত্ব হারিয়ে গেছে। আমার কাছে– একজন নারীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। রাজত্বের নেশা আর মদ-নারী মানুষের এ দশাই ঘটায়। তার ভাগ্যে পরাজয় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। একজন সেনাপতি যখন সিংহাসনের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন তার গোটা বাহিনী দীন ও ঈমান থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। তারপর দেশ ও জাতির মর্যাদা মাটিতে মিশে যায়। দুশমন মাথার উপর চড়ে বসে।'

ফাহ্দকে তথ্য সরবরাহ করতে রওনা হয়ে গেছে ইয্যুদ্দীনের সেবিকা। ফাহ্দ যেখানে থাকার কথা, সে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সে। কিন্তু ফাহ্দের ঘরে তালা। সাধারণত উষ্ট্রচালকের বেশে থাকে ফাহ্দ। দু'টি উট সঙ্গে রাখে আর ব্যবসায়ীদের মালপত্র ভাড়া টানে। ভাড়ার অপেক্ষায় যেখানে উট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মেয়েটি সেখানে যায়। ফাহ্দ সেখানেও নেই। উষ্ট্রচালক হিসেবে ফাহ্দের নাম অন্য। সেই নাম নিয়ে এক উষ্ট্রচালককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে ফাহ্দ ভাড়া নিয়ে এক জায়গায় গেছে।

সেবিকা জায়গাটার নাম জেনে নিয়ে সেদিকে হাঁটা দেয়। কিন্তু মেয়েটি জানে না এক ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করছে।

লোকটা মসুলের মুসলমান। কিন্তু খৃস্টানদের চর। ইয্যুদ্দীনের মহলের কর্মচারি। সেবিকাকে সে ডাক্তারের নিকট দেখেছিলো। মেয়েটিকে চিনতো সে। ডাক্তারের ব্যবস্থা নিয়ে যখন সে মহল থেকে বের হচ্ছিলো, তখনো তাকে সে দেখেছিলো। তবে জানতো না, মেয়েটা রোজি খাতুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছে। সে দেখলো, মেয়েটি এতো দ্রুত হাঁটছে, যেনো তার কোনো অসুখ নেই। লোকটা খৃস্টানদের তৈরিকরা গুপ্তচর। মেয়েটিকে তার সন্দেহ হয়। ইয্যুদ্দীনের গোয়েন্দা ব্যবস্থা অতোটা উন্নত নয়। খৃস্টানরা তার মহলে চর ঢুকিয়ে রেখেছে তা তিনি জানেন না। তাদের কাজ দুটো– এক. ইয্যুদ্দীনের প্রতি চোখ রাখা, পাছে তলে তলে তিনি সুলতান আইউবীর বন্ধু হয়ে যান কিনা। দুই. ইয্যুদ্দীনের মহলে এবং মসুলে আইউবীর যেসব লোক গোয়েন্দাগিরি করছে, তাদের চিহ্নিত করা।

খৃস্টানদের এই চরটা মেয়েটার অনুসরণ শুরু করে। যখন দেখলো, মেয়েটা আরো দ্রুত হাঁটছে এবং কাউকে খুঁজে ফিরছে, তখন তার সন্দেহ আরো পোক্ত হয়ে গেলো। এবার দেখতে হবে, মেয়েটা কাকে তালাশ করছে। মেয়েটা সত্যিই যদি গোয়েন্দা হয়ে থাকে, তাহলে তার মাধ্যমে অন্য গোয়েন্দাদেরও ধরা যাবে। ফাহ্দ ভাড়া নিয়ে যেখানে গেছে, মেয়েটি সেদিকে হাঁটা দেয়। খৃস্টানদের চরটাও তার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করে।

এক স্থানে উটের পিঠ থেকে মালপত্র নামানো হচ্ছে। ফাহ্দও মালপত্র নামাচ্ছে। ফাহ্দ মেয়েটিকে দেখে ফেলে। কাছ ঘেঁষে অতিক্রম করতে করতে মেয়েটি ফাহ্দের চোখে চোখ রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ফাহ্দ তাড়াতাড়ি উটের পিঠ থেকে মালামাল খালাস করে মেয়েটির পেছনে চলে যায়। এক উটের লাগাম হাতে ধরা। অপরটির লাগাম এটির পেছনে বাঁধা। মানুষ আসছে, যাচ্ছে। ফাহ্দ মেয়েটির কাছে চলে যায়। মেয়েটি দাঁড়াচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আনমনে হাঁটছে। আশপাশের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ফাহ্দেরও বাহ্যত সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। মেয়েটি ফাহ্দকে তথ্য দিচ্ছে।

মেয়েটির ফাহ্দকে যা বলবার বলা হয়ে গেছে। শেষে বললো, কাজ শেষ করে জায়গামতো আসো– গল্প করবো। তবে কর্তব্য সকলের আগে।

আচ্ছা, সুলতান আইউবীর ফৌজ এখন কোথায় জানো তো, না?'

'জানি'– ফাহ্‌দ উত্তর দেয়– 'আমি এখনই রওনা হয়ে যাচ্ছি।'

'আল্লাহ হাফেজ।'

'ফী আমানিল্লাহ।'

মেয়েটি একদিকে মোড় নেয়। সেদিকে একটি গলিপথ। দেখে, এক ব্যক্তি তার পেছনে পেছনে আসছে। তার মনে পড়ে যায়, ফাহ্‌দের সন্ধানে আসবার সময় লোকটাকে তিন-চারবার দেখেছিলো। এই লোকটাকে সে মহলেও দেখেছে। লোকটা কে হতে পারে, খানিক চিন্তা করার পর স্মরণ আসে, লোকটা মহলের কর্মচারি। মেয়েটির মনে সন্দেহ জাগে। লোকটার মতিগতি বুঝবার জন্য মেয়েটি কয়েকবার তার প্রতি তাকায়। লোকটা তার পিছু ছাড়ছে না। মেয়েটি লোকালয় থেকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যায় তাকে অনুসরণকারী লোকটিও। খানিক দূরে এক স্থানে ঝোপ-জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি সেখানে গিয়ে বসে পড়ে। লোকটি তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। তাতে বোধ হয় তার সন্দেহ জাগে, মেয়েটা কারো অপেক্ষায় বসে পড়েছে। লোকটি বেশ সম্মুখে চলে যায়।

মেয়েটি অত্যন্ত চতুর ও সতর্ক। সে দ্রুত ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে যায়। সেখান থেকে বসে বসে ঝোপ থেকে বেরিয়ে একটি গলিপথে অদৃশ্য হয়ে যায়। লোকটি বেশ দূরে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে। অন্য এক পথে মেয়েটি যে ঝোপের আড়ালে বসে পড়েছিলো, সেখানে চলে আসে। তার ধারণা, ওখানে অন্য কেউও আছে। কিন্তু কাছে এসে দেখে, কেউ নেই। মেয়েটিও নেই। সে এদিক-ওদিক তাকায়। মেয়েটির নাম-চিহ্নও নেই।

লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে বুদ্ধিমতী মেয়ে নিজ গৃহে চলে যায়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আর্মেনিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। জীবনের সবচে' বড় ঝুঁকিটা মাথায় তুলে নিয়েছেন তিনি। খৃস্টান বাহিনী যে কোন সময় ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর উপর আক্রমণ করে বসতে পারে। অথচ তিনি একা। মুসলমান আমীরগণ তাঁর প্রতিপক্ষ। নিজ নিজ রাজ্য ও শাসন ক্ষমতা আলাদা আলাদাভাবে মুঠোয় রাখার জন্য তারা নিজেদের ঈমান খৃস্টানদের হাতে বিক্রি করে ফেলেছেন। গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যা ছিলো মূলত খৃস্টানদেরই ষড়যন্ত্রের ফল। এখন সুলতান আইউবী সে সকল মুসলিম শাসককে তরবারীর জোরে নিজের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার

পরিকল্পনা হাতে নিয়ে মাঠে নেমেছেন। তিনি ঘোষণা করে দিয়েছেন, যে শাসক আমার দলে ফিরে আসবে না, সে স্বাধীনও থাকতে পারবে না। ইতিমধ্যে কয়েকটি দুর্গ তিনি দখলও করে নিয়েছেন এবং সেগুলোর অধিপতিরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছেন। এবার তিনি সেই শাসকদের প্রতি অগ্রসর হচ্ছেন, যারা অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী। তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের মাঝে বাহিনী নিয়ে ঘুরে ফিরছেন, যা মূলত বিরাট এক ঝুঁকি।

'তোমাদের লক্ষ্য যদি মহৎ হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদেরকে ভয় করা চলবে না'– সুলতান আইউবী তালখালেদের পথে এক ছাউনিতে বসে নিজ সালারদের বলছেন– 'আমি জানি, তোমরা কী ভাবছো। আমি খৃস্টানদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর অবস্থায় ভুল পথে বাড়িয়েছি, আমার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি তোমাদের কেউ একমত না হয়ে থাকো, তাহলে আমি তাকে সঙ্গতই মনে করবো। আমি তাকে বলবো না, আমার সিদ্ধান্ত মান্য করে তুমি আমার ভুল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করো। আমি বরং তাকে বলবো, তুমি আমার লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করো, অন্তর থেকে সমস্ত ভীতি ও কুমন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলে দাও। আমাদের গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস– মুসলমানের প্রথম কেবলা। আল্লাহ আমাদেরকে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছেন যে, আমাদেরই কতিপয় ভাই ঈমান বিক্রি করে ফেলেছেন। প্রথম কেবলা নয়– তাদের ক্ষমতার প্রয়োজন। স্মরণ রেখো আমার বন্ধুরা! যখন ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবে, তখন লেখা হবে, আমাদের কালের সৈন্যরা কাপুরুষ ও অযোগ্য ছিলো। পরাজয়ের অভিশাপ সর্বদা সৈন্যদের ভাগেই ফেলা হয়। শাসক গোষ্ঠী যদিও তলে তলে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতে, তবু অনাগত বংশধর সৈন্যদেরই উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে।'

'আমাদের একদিন আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। তিনি আমাদের উপর যে কর্তব্য আরোপ করেছেন, তা পালন করতে হবে। সেই কর্তব্য পালনে প্রয়োজনে আমাদেরকে জীবন বিলিয়ে দিতে হবে। ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যারা কেন্দ্র থেকে আলাদা হয়ে গেছে, আমার হৃদয়ে তাদের প্রতি কোনো মমতা নেই। আজ যদি আমরা এই বিভক্তির ধারা রুখে না দেই, তাহলে একদিন এই প্রবণতা ইসলামের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। রাজ্যগুলো নামে ইসলামী হবে; কিন্তু তার শাসকরা নিজেদের

রাজত্ব ও ভোগ-বিলাসিতা অটুট রাখার জন্য আপন শত্রুর সঙ্গে সমঝোতা করবে এবং ঈমান নিলাম করে বেড়াবে। আপন শত্রুকে তুষ্ট করার জন্য তারা তলে তলে একে অপরের শিকড় কাটতে থাকবে। দুর্বল শত্রুটাও তাদের কাছে শক্তিশালী মনে হবে। একজন শাসক তার সকল প্রজাকে লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দেবে। কাজেই জাতির এই বিক্ষিপ্ত শক্তিটাকে এখনই নিয়ন্ত্রিত করে ফেলার চেষ্টা করতে হবে।'

'আমি কথাগুলো বারবার এ জন্য ব্যক্ত করছি, যাতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা– যা কিনা সময়ের বড় প্রয়োজন– তোমাদের হৃদয় জগতে অংকিত হয়ে যায় এবং পাছে আপন ভাইকে সামনে দেখে– যে কিনা আমাদের ধর্মের শত্রু– তোমাদের তরবারী অবনত না হয়ে পড়ে। জাতির কেন্দ্র ও ঐক্য বিনষ্টকারী ভাই শত্রু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। আমি তোমাদেরকে বলেছি, আমরা তালখালেদ অবরোধ করতে যাচ্ছি এবং এটি আমাদের সর্বশেষ বিরতি। এর পরেই তালখালেদের অবস্থান। অবরোধে কার কার ইউনিট অংশগ্রহণ করবে, আমি তোমাদেরকে অবহিত করেছি। রিজার্ভ ফোর্স আমার সঙ্গে থাকবে। কমান্ডো বাহিনীটি ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত হয়ে সেই পথগুলোকে আয়ত্ত্বে নিয়ে নেবে, যেসব পথে খৃস্টান বাহিনীর আসবার আশঙ্কা আছে কিংবা আর্মেনীয় বাহিনী অবরোধ ভাঙতে আসতে পারে। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট মোতাবেক খৃস্ট বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা নেই। তারপরও সতর্ক থাকা আবশ্যক।'

'আমরা আর্মেনিয়া দখল করতে চাই না। আর্মেনীয় সম্রাটকে আমাদের শর্ত মান্য করতে বাধ্য করতে হবে। আমি তোমাদেরকে বলেছি, ইয্যুদ্দীন আর্মেনীয় সম্রাটের সাহায্য প্রত্যাশী। আমাদেরকে আর্মেনিয়ার উপর আপদরূপে আবির্ভূত হতে হবে, যাতে আর্মেনিয়ার সম্রাট ইয্যুদ্দীনকে সাহায্য দিতে না পারে। তবে আমি তোমাদেরকে কোনো প্রকার আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত করতে চাই না। এমনো হতে পারে, আর্মেনীয় বাহিনী ও জনসাধারণ আমাদের এমন কঠোর মোকাবেলা করবে যে, আমাদেরকে পিছপা হতে হবে। আর তখন ইয্যুদ্দীনও আমাদের উপর আক্রমণ করে বসতে পারে। আক্রমণ করতে পারে হাল্‌বের শাসনকর্তা ইমাদুদ্দীনও। আমাদের পতন দেখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমীরগণও আমাদেরকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষ্ট করার চেষ্টা করবে। এসব ফলাফল এবং আশঙ্কাসমূহকে সামনে রেখেই আমাদেরকে লড়াই করতে হবে। আমি তোমাদেরকে

মানচিত্র দেখিয়েছি। কারো মনে কোনো সংশয় থাকলে দূর করে নাও। এই অবরোধ ও আক্রমণ আমাদেরকে এমন মহাবিপদে ফেলে দিতে পারে যে, আমরা পরাজয়ও বরণ করতে পারি।'

সুলতান আইউবী যখন তাঁর শেষ ছাউনীতে নিজ সালারদেরকে পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশনাবলী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন রাতের শেষ প্রহর। মানচিত্রটা তাঁর সম্মুখে পড়ে আছে। দারোয়ান তাঁবুতে প্রবেশ করে সুলতানের কানে কী যেনো বললো। সুলতান বললেন– 'এক্ষুনি ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

দারোয়ান তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে মাথায় ইঙ্গিত করে। ফাহ্‌দ তাঁবুতে প্রবেশ করে। সে পথে কোথাও না থেমে মসুল থেকে এখানে এসে পৌঁছেছে। চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ঠোঁট শুষ্ক। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। গোয়েন্দা উপনেতা হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁবুতে উপস্থিত।

'মনে হচ্ছে বিশ্রাম ছাড়াই তুমি পথ অতিক্রম করেছো'– সুলতান আইউবী ফাহ্‌দকে উদ্দেশ করে বললেন– 'বসে পড়ো।' সুলতান দারোয়ানকে ডাক দিয়ে বললেন– 'এর খাবার এখানেই নিয়ে আসো।'

'সংবাদটা এমন ছিলো যে, বিশ্রামের সুযোগ নেয়া অপরাধ মনে হচ্ছিলো'– ফাহ্‌দ ক্ষীণকণ্ঠে বললো– 'আমার ঘোড়াটা বোধ হয় জীবিত নেই।'

'খবর বলো।'

'আর্মেনিয়ার সম্রাট তার রাজধানীতে নেই'– ফাহ্‌দ রিপোর্ট প্রদান করে– 'তিনি হারযামে তাঁবু গেড়েছেন। ইয্‌যুদ্দীন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হারযাম যাচ্ছেন। বুঝাই যাচ্ছে, তারা আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ হবে। আর্মেনীয় সম্রাটের সঙ্গে তার দু'প্লাটুন সৈন্যও থাকবে। ইয্‌যুদ্দীনও দু'তিন প্লাটুন সৈন্য নিয়ে আসছেন।'

'এই রাজারা রাজকীয় ধারায় একত্রিত হচ্ছে'– সুলতান আইউবী মুচকি হেসে বললেন– 'মসুলে খৃস্টানদের মতিগতি কী?'

'ক্রুসেডারদেরকে কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে'– ফাহ্‌দ উত্তর দেয়– 'তাদের অস্ত্র ডিপোর ধ্বংসের সংবাদ আপনি শুনেছেন। আমরা ওখানকার লোকদের অন্তর থেকে প্রথম দরবেশের প্রভাব-প্রবঞ্চনা দূর করে দিয়েছি।'

'আর্মেনীয় সম্রাট ও ইয্‌যুদ্দীনের হারযামে সাক্ষাৎ ঘটবে এ সংবাদ তোমরা কোথা থেকে পেয়েছো?'– সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন–

'আমি কীভাবে বিশ্বাস করবো এ তথ্য সঠিক?'

'রোজি খাতুনের তথ্য ভুল হতে পারে না।' ফাহ্দ উত্তর দেয়।

'আল্লাহ এ মহিয়সী নারীকে হেফাজত করুন।' সুলতান আইউবী বললেন। আবেগের আতিশয্যে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

'রোজি খাতুন আপনাকে সালাম বলেছেন'– ফাহ্দ বললো– 'বলেছেন, ইয্যুদ্দীনের পা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই উপড়ে গেছে। ভয় তাকে পেয়ে বসেছে। একটা আঘাত হানতে পারলে তার হাঁটু ভেঙে যাবে।'

'মসুলে কোনো সামরিক তৎপরতা চোখে পড়ছে কি?'– সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন– 'কোনো যুদ্ধ প্রস্তুতি?'

'খৃস্টান গুপ্তচর ও উপদেষ্টারা তৎপর'– ফাহ্দ উত্তর দেয়– 'কোনো যুদ্ধ প্রস্তুতি চোখে পড়েনি। ইয্যুদ্দীন খৃস্টানদের থেকে যে ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করছেন, তাতো আপনি ভালোভাবেই জানেন। নগরীতে আমাদের লোকেরা পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে এবং রোজি খাতুন ও তাঁর কন্যা শামসুন্নিসার প্রচেষ্টায় দুর্গ ও প্রাসাদের প্রতিটি কোণ্ ও প্রতিটি গোপন তথ্য আমাদের নজরে থাকছে।'

'শাবাশ! বন্ধু শাবাশ!'– সুলতান আইউবী দাঁড়িয়ে ফাহ্দের গালে হাতের পরশ বুলিয়ে বললেন– 'তুমি জানো না, তুমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছো তা কতো মূল্যবান! আমি আশাবাদী, এখন আর অতো রক্তারক্তি হবে না, যতোটুকু অবরোধ ও আক্রমণে হয়ে থাকে।' সুলতান সালারদের উদ্দেশ করে বললেন– 'এখন আর আমরা তালখালেদ অবরোধ করবো না। ফৌজ ওদিকেই যাবে। গেরিলাদের একটি মাত্র ইউনিট আমার সঙ্গে হারযাম অভিমুখে যাবে।'

হারযাম একটি মনোরম জায়গা। চারদিকে সবুজের সমারোহ। ঝর্নাধারা ও ঘন গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ। আছে সবুজে ঢাকা টিলা-পর্বতও। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপর আরো রং চড়িয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে জায়গাটাকে জান্নাতে পরিণত করে নিয়েছেন আর্মেনিয়ার সম্রাট। ক্যানভাসে-শামিয়ানায় তৈরি তাঁবুটা যেনো এক রাজপ্রাসাদ। ভেতরে রঙিন আলোর ঝাড়-লণ্ঠন। সম্মুখে দণ্ডায়মান ছয়টি ঘোটকযান ও রক্ষী বাহিনী। নাচ-গানের বিশেষ আয়োজন করা আছে। আর্মেনিয়ার সবচে' রূপসী গায়িকাদের এনে হাজির করা হয়েছে। হেরেমের নির্বাচিত মেয়েদের জন্য

আলাদা তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। আর্মেনীয় সম্রাট মারদীনের আমীরকেও আমন্ত্রণ করেছেন। মারদীন আর্মেনিয়ারই সন্নিকটস্থ একটি অঞ্চল, যার আমীর কুতুবুদ্দীন গাজী। মারদীন তার জমিদারী। শামিয়ানা-ক্যানভাস ও তাঁবু থেকে সামান্য দূরে আর্মেনীয় সম্রাটের দু'প্লাটুন সৈন্য তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান নিয়েছে।

আর্মেনীয় সম্রাট মারদীনের আমীরের সঙ্গে দু'তিন দিন যাবত শিকার খেলতে থাকেন। তারপর একদিন মসুলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীন এসে পৌঁছেন। তিনিও সঙ্গে করে দু'প্লাটুন নির্বাচিত সৈন্য নিয়ে আসেন। রাতে নাচ-গানের আসর বসে। সোরাহির পর সোরাহি মদ শূন্য হতে থাকে। মদ আর নারী এমনই এক অবস্থার সৃষ্টি করে যে, এই মুসলিম আমীর-উজীর ও সালারগণ প্রথম কেবলার সঙ্গে খানায়ে কা'বাকেও ভুলে গেছেন। রাতটা বিলাসিতার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করে তারা দিনভর গভীর ঘুম ঘুমান। অপরদিকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সেখান থেকে দু'আড়াই মাইল দূরে এক স্থানে একটি গেরিলা ইউনিটের সঙ্গে পাথুরে মাটির উপর ঘুমিয়ে আছেন। তিনি ছোট্ট একখানা সফরী তাঁবু সঙ্গে রেখেছেন, যাতে স্থাপন করতে ও গুটাতে বেশি সময় না লাগে। এখানে তিনি সুলতান নন— গেরিলা সৈনিক হয়ে এসেছেন।

সুলতান আইউবী হারযামের উক্ত রাজকীয় ক্যাম্পটার পরিসংখ্যান নেয়া এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য যাযাবরের বেশে গুপ্তচর পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফাহ্দও আছে তাদের মধ্যে। ফাহ্দের পরণে পুরাতন ছেঁড়া কাপড়। তিন-চারজন গোয়েন্দা আপন আপন উটের লাগাম ধরে ক্যাম্পের চতুর্পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। কেউ তাদেরকে সরে যেতে বললে তারা হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাচ্ছে। ফাহ্দ রাজকীয় শামিয়ানার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে সেই যুবতী সেবিকাকে দেখতে পায়, যে তাকে রোজি খাতুনের বার্তা পৌঁছিয়েছিলো। ফাহ্দ মেয়েটিকে চিনে ফেলে। মেয়েটি ইয্যুদ্দীনের খাস সেবিকা। এখানে তাঁরই সঙ্গে এসেছে।

ফাহ্দ ভিখারীর ন্যায় হাঁক দেয়— 'শাহজাদী! আপনার গোলাম সফরে আছে। কিছু খেতে দিন না।'

'ভাগো এখান থেকে'— মেয়েটি দূর থেকে ধমক দেয়— 'অন্যথায় ধরা খাবে।'

'ফাহ্দকে মসুলে কেউ ধরতে পারেনি'— ফাহ্দ আসল কণ্ঠে বললো— 'এখানে তুমি ধরিয়ে দেবে!'

'উহ!'– মেয়েটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে লোকটির নিকটে চলে আসে– 'তুমি এসে পড়েছো? দেখলে তো, আমার সংবাদ মিথ্যা ছিলো না। কিন্তু এখানে আর একদণ্ডও দাঁড়িয়ে থেকো না। রাতে কোথায় থাকবে? আজ ক্লান্ত আশা করি তাড়াতাড়ি অবসর হয়ে যাবো।'

'তুমিই তো বলেছিলে, কর্তব্যের উপর আবেগকে জয়ী হতে দিও না'– ফাহ্‌দ বললো– 'আমাদের কর্তব্য এখনো পালিত হয়নি। বেঁচে থাকলে দেখা হবে।'

'সবকিছু দেখে নিয়েছো?'– মেয়েটি জিজ্ঞেস কর– 'সুলতান কোথায়?'

'সুলতান শীঘ্রই এসে পড়বেন।' ফাহ্‌দ উত্তর দেয়।

'ঐ, লোকটা কে রে?'– কারো কণ্ঠ শোনা যায়– 'হতভাগাকে তাড়িয়ে দাও ওখান থেকে।'

মেয়েটি ফাহ্‌দকে ধমকাতে শুরু করে। ফাহ্‌দ সেখান থেকে চলে যায়। মেয়েটি একটি তাঁবুর আড়ালে আড়ালে ফাহ্‌দের চলে যাওয়া দেখতে থাকে। ভাবে, ফাহ্‌দের দায়িত্ব কতোই না ঝুঁকিপূর্ণ, কতোই না কষ্টকর! মেয়েটির চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসে। এই সুঠাম যুবকটাকে মনে-প্রাণে কামনা করে মেয়েটি। কিন্তু যখন তার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে সাক্ষাৎ করে, তখন আলোচনা আবেগের কম এবং কর্তব্যের বেশি করে থাকে। সুলতান আইউবী যে ক'টি যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, সেসব এই ফাহ্‌দ আর মেয়েটির ন্যায় গোয়েন্দাদের বদৌলতেই জিতেছেন। এরা শত্রুর ঘরে অবস্থান করে গোপন যুদ্ধ লড়ে থাকে। এদের জীবন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর মুখে থাকে। এই যুবক ফাহ্‌দ আর সেবিকা মেয়েটির মাঝে ভালোবাসা আছে। কর্তব্য যদি প্রতিবন্ধক না হতো, তাহলে মেয়েটি তাকে এভাবে জীবন হাতে নিয়ে ঘুরে-ফিরতে বারণ করে দিতো। মেয়েটি জানে, ফাহ্‌দ এই পাথুরে ভূমিতে রাতে কোথায় ঘুমায়।

'যাক গে, আমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে মিলিত হবো।' মেয়েটি মনে মনে বলে নিজ কাজে চলে যায়।

রাতের প্রথম প্রহর। হারযামের শাহী ক্যাম্পে আজ নাচ-গানের কোনো প্রোগ্রাম নেই। সর্বত্র নীরবতা বিরাজ করছে। আর্মেনীয় সম্রাটের শামিয়ানায় তার সঙ্গে ইয্‌যুদ্দীন ও মারদীনের আমীর কুতুবুদ্দীন গাজী উপবিষ্ট। ইয্‌যুদ্দীন বলছেন–

'সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, সালাহুদ্দীন তার সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত

করছে। আমরা যদি তার জোটভুক্ত হয়ে যাই, তাহলে সে আমাদেরকে তার গবর্নর নিযুক্ত করে রাখবে। আমরা স্বাধীন থাকতে পারবো না। ইতোমধ্যে তিনি মুসলিম আমীরদের বেশ ক'টি দুর্গ দখল করে নিয়েছেন এবং তার সামরিক শক্তিতে ভীত হয়ে সে সকল আমীর ও দুর্গপতি তার আনুগত্য বরণ করে নিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমি যদি তাকে প্রতিহত না করি, তাহলে তিনি মসুল দখল করেই ক্ষান্ত হবেন না— হাল্‌বের উপরও চড়াও হয়ে বসবেন। কিন্তু আমি একা তো আর তার সঙ্গে লড়াই করতে পারবো না। ইয্‌যুদ্দীন আমার সঙ্গে আছেন। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে সালাহুদ্দীন বাহিনী নিয়ে লুটেরার ন্যায় ঘুরে ফিরছে, সেই পরিস্থিতিতে ইমাদুদ্দীনকে তার বাহিনী হাল্‌ব থেকে বের হতে দেয়া সমীচীন হবে না। হাল্‌বের প্রতিরক্ষা অধিক জরুরি। কারণ, অঞ্চলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমি জানি'— আর্মেনীয় সম্রাট বললেন— 'খৃস্টানদের দৃষ্টিও হাল্‌বের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে।'

'সে কারণেই আমি খৃস্টানদের সঙ্গে কোনো চুক্তি করছি না'— ইয্‌যুদ্দীন বললেন— 'সাহায্যের বিনিময়ে আমাদের থেকে তারা হাল্‌ব দাবি করবে।'

'অবশ্যই করবে'— কুতুবুদ্দীন গাজী বললেন— 'আমি মনে করি আপনাদের আপসে সন্ধি করে নেয়া উচিত। আপনাদের দু'জনের বাহিনী একত্রিত হলে সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করতে পারে।'

'আমি জানতে পেরেছি, আইউবীর বাহিনী তালখালেদ অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে।' ইয্‌যুদ্দীন বললেন।

'আইউবীর সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই'— আর্মেনীয় সম্রাট বললেন— 'আমার বিশ্বাস, তিনি আমার সীমান্তের কাছে ঘেঁষবেন না। আমি তার অগ্রযাত্রা পর্যবেক্ষণ করেছি। তিনি অন্য কোনো দিকে যাচ্ছেন।'

'আমার ক্রুসেডারদের উপর কোনো আস্থা নেই'— ইয্‌যুদ্দীন বললেন— 'তারা আমাকে সব ধরনের সাহায্য প্রদান করছে বটে; কিন্তু যুদ্ধ শুধু সরঞ্জাম আর উপদেষ্টাদের দ্বারা লড়া যায় না। তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি, আমি আইউবীকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলি আর তোমরা তার উপর আক্রমণ করো। তাদেরকে আমি এই পরামর্শও দিয়েছিলাম যে, তোমরা দামেশ্‌ক এবং বাগদাদকে অবরোধ করে ফেলো। যদি তারা আমার এই পরামর্শ মোতাবেক কাজ করে, তাহলে সালাহুদ্দীন আমাদের সীমানা ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু জানি না তারা কী চিন্তা করছে।'

'তারা আমাদের প্রত্যেককে তাদের প্রজা বানানোর চিন্তা করছে'– আর্মেনীয় সম্রাট বললেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবী না থাকলে ক্রুসেডাররা আমাদেরকে খেয়ে ফেলতো। তাদের উপর আমাদের আস্থা না রাখা উচিত।'

'তাহলে আপনি আমাকে সাহায্য দিন'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'আমি এগিয়ে গিয়ে আইউবীর উপর আক্রমণ করি। আপনিও তার উপর হামলা করুন।'

এ বিষয়টির উপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মতবিনিময় হয়। শেষে আর্মেনীয় সম্রাট এই শর্তে ইয্‌যুদ্দীনের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন যে, তার বাহিনীর সেনা সদস্য এবং পশুদের খাদ্যের দায়িত্ব ইয্‌যুদ্দীন বহন করবেন। ইয্‌যুদ্দীন শর্তটা মেনে নেন এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তিনি সুলতান আইউবীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হবেন এবং আর্মেনীয় সম্রাটের বাহিনী সুলতান আইউবীর বাহিনীর উপর পেছন থেকে আক্রমণ করবে। ইয্‌যুদ্দীন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোদ্ধা। তিনি যুদ্ধ লড়তেও জানেন, লড়াতেও জানেন। তিনি সেখানে বসেই যুদ্ধের পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেন।

❖ ❖ ❖

এখন রাত দ্বি-প্রহর। ইয্‌যুদ্দীন ও আর্মেনীয় সম্রাট যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। হঠাৎ কতগুলো ঘোড়ার পদশব্দে রাতটা যেনো কেঁপে ওঠে। আর্মেনীয় সম্রাট দারোয়ানকে ডেকে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন– 'যেসব সৈন্যের ঘোড়া রশি খুলে ছুটে বেড়াচ্ছে, সকালে তাদেরকে এখানে নিয়ে আসবে। গাঁধাগুলো কেমন অসচেতনের ঘুম ঘুমাচ্ছে।'

কিন্তু এই ঘোড়া তার ফৌজের নয়। এরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গেরিলা সৈনিক। সংখ্যায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজনের মধ্যে। এটা তাদের কমান্ডো অপারেশন।

খানিক পরেই বাইরে প্রলয় শুরু হয়ে যায়। আইউবীর গেরিলারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ধেয়ে এসে ক্যাম্প অতিক্রম করে চলে যায়। তাদের হাতে প্রদীপ ছিলো। এই প্রদীপের আগুন দ্বারা ফৌজের তাঁবুগুলো ভস্ম করে চলে যায়। কয়েকটি তাঁবুতে আগুন ধরে যায়। ঘুমন্ত সৈনিকরা বিড়বিড়িয়ে ওঠে। পরক্ষণেই বাহিনীর আরেকটি ঢেউ ধেয়ে আসে, যারা বর্শা ও তরবারী দ্বারা যাকেই সামনে পাচ্ছে, কেটে কেটে অতিক্রম করে যাচ্ছে। প্রজ্জ্বলমান তাঁবুগুলো আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। এবার শুরু হয় তীরের

বর্ষণ। জ্বলন্ত সলিতাওয়ালা তীরও আছে। রশিবাঁধা উট-ঘোড়াগুলোর মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের আর্তচিৎকার কেয়ামতের বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এবার পশুগুলোর বাঁধন খুলে যায় এবং উট-ঘোড়াগুলো ছুটে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করে। এই ঘটনাযজ্ঞ ও হাঁক-চিৎকারের মধ্যে ক্যাম্পের আশপাশ থেকে উচ্চকণ্ঠের শব্দ ভেসে আসে– 'অস্ত্র ফেলে দাও। ইয্যুদ্দীন! তুমি আমাদের হাতে এসে ধরা দাও। আর্মেনিয়ার সম্রাট! তোমার তালখালেদ আমাদের অবরোধে আছে।'

কিন্তু একজনও এসে ধরা দিচ্ছেন না। ইয্যুদ্দীন তার এক অনুগত কমান্ডারকে বললেন, আমাকে একটা ঘোড়া দাও। কমান্ডার বড় কষ্টে তাকে একটা ঘোড়া এনে দেয়। তিনি তাতে আরোহণ করে সুযোগ বের করে এই কেয়ামতের মধ্য থেকে বেরিয়ে যান। নিজ বাহিনী, ব্যক্তিগত আমলা-কর্মকর্তা এবং সঙ্গে করে আনা মেয়েদের কী হবে, তার কোনো ভাবনাই ভাবলেন না। আপন জীবনটা রক্ষা করে কোনো মতে পালিয়ে যান।

সেকালের এক ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদী লিখেছেন, সুলতান আইউবী ঘেরাও সংকীর্ণ করে সেই শাসকগুলোকে ধরে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তার একটি কারণ এই হতে পারে, তিনি সেই শাসকমণ্ডলীকে নিজের জোটভুক্ত করে ফিলিস্তীন জয়ে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন। তবে কারণ যাই থাকুক, ১১৮৩ সালের এই যুদ্ধটা সুলতান আইউবী তাঁর গেরিলাদের দ্বারা এভাবেই লড়িয়েছেন। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কাউকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেননি। এই গেরিলা অভিযানটা সুলতান আইউবী নিজে পরিচালনা করেছেন।

আর্মেনীয় সম্রাট পালানোর পরিবর্তে সেখানেই অবস্থান করা সঙ্গত মনে করলেন। রাত কেটে যায়। ভোর হলে এবার দেখা গেলো আসল চিত্র। ক্যাম্পে ভস্মীভূত তাঁবুমালার ছাই-ভস্ম ছড়িয়ে রয়েছে। মৃতদেহগুলো এখানে-সেখানে পড়ে আছে। আহতরা ছটফট করছে। উট-ঘোড়াগুলো ওদিক-ওদিক ঘুরে ফিরছে। যারা আক্রমণ করলো, তারা কোথায় গেলো পাত্তা নেই। আর্মেনীয় সম্রাট জানতেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এখানেই কোথাও অবস্থান

করে থাকবেন। আইউবীকে কোথায় পাওয়া যাবে ভাবতে শুরু করেন। ইত্যবসরে তিনি দু'জন আরোহীকে দেখতে পান। তারা এগিয়ে আর্মেনীয় সম্রাটের সম্মুখে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সালাম করে। লোক দু'জন সুলতান আইউবীর সামরিক কর্মকর্তা।

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আপনাকে সালাম বলেছেন'– একজন বললো– 'তিনি বলেছেন, তাঁর কাউকে গ্রেফতার করার ইচ্ছে নেই। ইয্যুদ্দীন ফেরত যান এবং মসুল চলে যান এবং ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুন। আর আর্মেনীয় সম্রাটের জন্য সুলতানের বার্তা হচ্ছে, সুলতানের ফৌজ তালখালেদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আপনি সন্ধ্যা নাগাদ সংবাদ পেয়ে যাবেন। আপনার ফিরে পৌঁছার আগে আপনার রাজধানী আমাদের দখলে চলে আসবে। আপনি যদি মিসর-সিরিয়ার সুলতানের শর্তাবলী কবুল করে নেন, তাহলে তালখালেদ থেকে ফৌজ ফিরে আসতে পারে। তবে আপনার যদি মোকাবেলার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনার জন্য আগে পরিণতি ভেবে দেখার পরামর্শ আছে। আপনি উত্তর দিন। এই মুহূর্তে আপনি আমাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে অবস্থান করছেন।'

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে আমার সালাম বলবে'– 'আর্মেনীয় সম্রাট বললেন– 'আমি বিকাল নাগাদ আমার এক মন্ত্রীকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করছি।'

উভয় আরোহী ফিরে যায়। আর্মেনীয় সম্রাটের যে মন্ত্রী এ মুহূর্তে তার সঙ্গে আছে, তার নাম বকতিমোর। সম্রাট তাকে বললেন, আমাদের আইউবীর সঙ্গে শত্রুতায় জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। ওদিকে তালখালেদ অবরুদ্ধ, এদিকে আমরা। তুমি যাও, সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলো, আপনি আপনার ফৌজ প্রত্যাহার করে নিন। আমরা আপনার কোনো শত্রুর সঙ্গে কোনো সন্ধি বা ঐক্য গড়বো না।

বকতিমোর বিচক্ষণ মন্ত্রী। তিনি সুলতান আইউবীর সঙ্গে কথা বলেন। সুলতান কঠিন কঠিন শর্ত আরোপ করেন। বকতিমোর সকল শর্ত মেনে নেন। তিনি লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, আর্মেনীয় সম্রাটের বাহিনী সুলতান আইউবীর কোনো শত্রুকে সাহায্য করবে না।

সুলতান আইউবী অবরোধ তুলে নেন এবং আর্মেনীয় সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই তালখালেদ অভিমুখে রওনা হয়ে যান।

❖ ❖ ❖

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ারে বকর। সে যুগে জায়গাটার নাম ছিলো উমাইদা। সামরিক দিক থেকে জায়গাটার অপরিসীম গুরুত্ব ছিলো। তার আশপাশের অঞ্চলে যারা বসবাস করতো, তাদের অনেকেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলো। সুলতান আইউবীর বহু সৈনিক অত্র অঞ্চলের বাসিন্দা। সেনা সংকট দেখা দিলে সুলতান আইউবী এখান থেকে লোক নিয়ে তা পূরণ করতেন। এখানকার সাধারণ মানুষ সুলতান আইউবীর সমর্থক ছিলো বটে; কিন্তু শাসকরা নিজ নিজ ক্ষমতার স্বার্থে আইউবীর বিরোধী ছিলো এবং মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টায় রত ছিলো।

সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে দিয়ারে বকর অভিমুখে যাত্রা করার আদেশ দেন। অগ্রযাত্রা ছিলো বিদ্যুদ্গতিসম্পন্ন। সুলতান আইউবী তাঁর সালারদেরকে শুধু এতোটুকু অবহিত করেন যে, দিয়ারে বকর অবরোধ করে জায়গাটা দখল করে নিতে হবে। বিজয় অর্জিত হলে তার আমীরের কোনো শর্ত মান্য করা হবে না এবং তার প্রতি কোনো প্রকার মমতা প্রদর্শন করা হবে না।

'আমার অভিমত হচ্ছে ঐ আমীরদের উপর কোনো প্রকার জুলুম না করাই উচিত হবে'– এক সালার বললেন– 'তাদের বাহিনীকে আমাদের বাহিনীতে যুক্ত করে নিয়ে তাদেরকে নামমাত্র আমীর থাকতে দিন।'

'এখন আর আমি জাতির আস্তিনে কোনো সাপই পুষবো না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি সংবাদ পেয়েছি, এই লোকটি তার অঞ্চলের লোকদেরকে আমাদের বাহিনীতে যোগ দিতে বাধা সৃষ্টি করছে এবং খেলাফতের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছে। একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, যে শাসক কেন্দ্র থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন হতে চায়, তারা অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত। তাদের এই গাদ্দারী খুবই ভয়ানক হয়ে থাকে। কেননা, তারা জাতির শত্রু থেকে সাহায্য নিয়ে সেই সাহায্য জাতিরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে। আমি এ জাতীয় ব্যক্তিদের মস্তক পিষে ফেলতে চাই। যাতে আমার প্রকৃত শত্রু তথা খৃস্টানরা যখন আমার মুখোমুখি লড়াইয়ে লিপ্ত হবে, তখন পেছন থেকে আমার উপর আক্রমণ করার মতো কেউ না থাকে

এবং মাটি ফুড়ে বেরিয়ে কোনো সাপ যেনো আমাকে দংশন করতে না পারে। দিয়ারে বকর আল্লাহর সৈনিকদের ভূখণ্ড। আমাদের বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ সৈনিক এই ভূখণ্ডের লোক। আমরা যদি আমাদের সেই যোদ্ধাদের বিশ্বাসঘাতক শাসকদের ক্ষমা করি, তাহলে অত্র ভূখণ্ডের সাধারণ লোকদের ঈমানও নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের যুদ্ধবিদ্যাও হারিয়ে যাবে।'

'সমগ্র জাতি তথা কোনো দেশের সকল মানুষ গাদ্দার কিংবা বেঈমান হয় না। শাসক যদি ঈমান বিক্রেতা হয়; তাহলে জাতির ঈমানও নষ্ট হয়ে যায়, উন্নততর জাতিও মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে। তাদের চেতনা মরে যায়। পরিণতিতে জাতি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জীবিত থাকে না। আমাদেরকে এ জাতীয় শাসকদের পতন ঘটিয়ে সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। আপনারা দেখেছেন, বাগদাদের খেলাফত পঙ্গু হয়ে গেছে। খেলাফতের আদেশ-নিষেধ পালিত হলে আমাদেরকে এসব সেনা অভিযান পরিচালনা করে ফিরতে হতো না। দেশের অস্থিতিশীলতা দূর করা এবং ঈমান নিলামকারী শাসকদের নির্মূল করা সেনাবাহিনীর কর্তব্য। আমি পুনর্ব্যক্ত করতে বাধ্য যে, ইতিহাস বলবে, হিজরী ষষ্ঠ শতকের বাহিনী অকর্মণ্য ছিলো। তারা না তাদের খেলাফতের মর্যাদা অটুট রেখেছে, না শত্রুকে দমন করেছে।'

দিয়ারে বকর অবরোধের কাজটা এতো দ্রুত সম্পন্ন হয় যে, ভেতরের লোকেরা মোকাবেলা করার সুযোগই পায়নি। সুলতান আইউবী ঘোষণা করেছেন, চেষ্টা করবে সাধারণ নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতি যতো কম হয়। ভেতরে আইউবীর গোয়েন্দা ছিলো। তাছাড়া সুলতান নিজেও নগরীর শাসকদের মহল ও হেডকোয়ার্টার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কাজেই মিনজানিকের সাহায্যে যেসব তরল দাহ্য পদার্থের পাতিল নিক্ষেপ করা হলো, সবই সরকারি ভবনগুলোর উপরই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বাইরে থেকে ঘোষণা করা হয়েছে– 'দিয়ারে বকরের আমীর! অস্ত্র ত্যাগ করে বেরিয়ে আসো।' কিন্তু দুর্গের পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে আমীর পাল্টা ঘোষণা দেন, অস্ত্র ত্যাগ করা হবে না। পারো যদি যুদ্ধ করে শহর দখল করে নাও।

দিয়ারে বকরের বাহিনী দৃঢ়পদে মোকাবেলা করে। সুলতান আইউবী অবরোধের অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু প্রতিরোধ দেখে তিনি বুঝে ফেললেন, এই অবরোধ দীর্ঘ হবে এবং এর জন্য অপেক্ষাকৃত বেশিই কুরবানী দিতে হবে।

পাঁচিল ভাঙার দায়িত্বে নিয়োজিত সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে পাঁচিলের নিকট পৌঁছে যায়। কিন্তু উপর থেকে তাদের উপর আগুন ও ভারি পাথর নিক্ষেপ করা হয়। প্রধান ফটকের উপর মিনজানিকের সাহায্যে দাহ্য পদার্থ ভর্তি পাতিল নিক্ষেপ করে সলিতাওয়ালা তীর ছোঁড়া হয়। তাতে ফটকের কাঠের অংশটা পুড়ে যায় বটে; কিন্তু লোহার অংশ অটুট থাকে, যার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তথাপি ফটক অতিক্রম করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। আকাশে তীর উড়ছে।

সুলতান আইউবী বিস্মিত যে, ভেতরের লোকেরা এতো কঠোর মোকাবেলা কেনো করছে! রহস্যটা পরে উন্মোচিত হয় যে, অবরোধের সংবাদ প্রকাশ পাওয়ামাত্র শহরে ঘোষণা করে দেয়া হয়, ক্রুসেডাররা শহর অবরোধ করেছে। এই ঘোষণায় নগরবাসী জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা ফৌজের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখা গেছে, চারদিকে ফৌজের সঙ্গে সাধারণ মানুষও যুদ্ধ করছে। কিন্তু সুলতান আইউবী তারপরও নির্দেশ দেননি, নগরীর উপরও গোলা নিক্ষেপ করো।

অবরোধ আট দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বেশি ক্ষতি আইউবীর বাহিনীর হচ্ছিলো। কেননা, তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল একের পর এক সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছিলো আর তীরের নিশানায় পরিণত হচ্ছিলো। কিন্তু পরে বিস্ময়কর ঘটনা এই ঘটে যে, হঠাৎ একদিন নগরীর পাঁচিলে ধ্বনিত হয়ে ওঠে– 'এরা ক্রুসেডার নয়– ইনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী! তার পতাকা দেখো। মুসলমানগণ! তোমরা আপসে লড়াই করছো।' পরক্ষণে সুলতান আইউবীর বাহিনীতে দিয়ারে বকরের যেসব সৈন্য ও কমান্ডার ছিলো, তারা উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিতে শুরু করে– 'আমরা তোমাদেরই সৈন্য– তোমাদেরই ভাই! দুর্গের ফটক খুলে দাও।'

নগরীর ভেতরে সুলতান আইউবীর যে গুপ্তচর ও আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মী ছিলো, অবস্থা বেগতিক দেখে তারাই ছুটে গিয়ে জনতার কানে

দিয়েছে, অবরোধকারীরা খৃস্টান বাহিনী নয়– মুসলমান এবং ইনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। কাজটা সহজ ছিলো না। একজন শত্রুর গোয়েন্দা জনগণকে স্বাধীনতা ও সরকারী ঘোষণার পরিপন্থী কথা বলতে পারে না। এই অভিযানে দু'চারজন গোয়েন্দা ধরাও পড়েছে। তারা সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে। অবরোধের ৯ দিনের মাথায় ফৌজ ও সাধারণ নাগরিকদের চিন্তা-চেতনা বদলে যায়। জনগণ প্রশাসনের বাধা ও হুমকি উপেক্ষা করে নগরীর ফটক খুলে দেয়। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নগরীতে প্রবেশ করলে জনগণ তাকবীর ধ্বনি তুলে তাঁকে স্বাগত জানায়। নারীরা বাড়ির ছাদ ও বারান্দা থেকে মাথার ওড়না ছুঁড়ে ফেলে সুলতানকে স্বাগত জানায়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী দিয়ারে বকরের আমীরকে নগরী ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। তিনি নুরুদ্দীন ইবনে কারা আরসালানকে নগরীর আমীর নিযুক্ত করেন। সুলতান আইউবী তাকে জরুরি নির্দেশনা প্রদান করে উক্ত অঞ্চল থেকে আরো সৈন্য সংগ্রহের নির্দেশ প্রদান করেন।

১১৮৩ সালের মে মাসে সুলতান আইউবী দিয়ারে বকরের ক্ষমতা দখল করে হাল্‌ব অভিমুখে রওনা হন। হাল্‌বের শাসনকর্তা ইমাদুদ্দীন এবং মসুলের শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীন তাঁর সবচে' বড় মুসলিম দুশমন। তাই হাল্‌ব-মসুল এখন তাঁর টার্গেট।
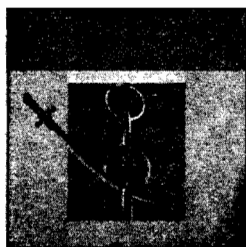
হাবীবুল কুদ্দুস

বিজয়া অর্জন করে কে না আনন্দিত হয়? সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কোনো যুদ্ধ কিংবা অবরোধে জয়ী হলে তাঁরও চেহারায় আনন্দের দ্যুতি ভেসে ওঠতো। তাঁর বাহিনী উল্লাস করতো, উট-বকরি-দুম্বা জবাই করে ভালো খাবারের আয়োজন করতো এবং আরামে একটা ঘুম দিতো। কিন্তু ১১৮৩ সালের এই দিনগুলোতে তাঁর চেহারায় আনন্দের কোনো ছাপ ছিলো না। তাঁর সৈন্যদেরও উল্লাস করতে দেখা যায়নি। অথচ এক বছর সময়ে তিনি বেশক'টি দুর্গ জয় করে নেন এবং আর্মেনীয় সম্রাটের ন্যায় শক্তিশালী শাসক থেকে পরাজয়ের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর নিয়ে তাকে কঠিন থেকে কঠিনতর শর্ত মান্য করতে বাধ্য করেন।

ঐতিহাসিকগণ এ সময়টাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিজয়ের কাল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তার মানসিক অবস্থাটা ছিলো, যেনো প্রতিটি জয়ের পর তার চেহারায় একটা করে রেখা জন্ম নিচ্ছে– বার্ধক্য ও হতাশার বলিরেখা। এর একটি বিজয়েও তিনি আনন্দিত নন। তার গেরিলা বাহিনীর অধিনায়ক সারেম মিসরী বিজয়ীর ঢংয়ে একের পর এক রিপোর্ট দিচ্ছেন, গত রাতে আমার বাহিনী অমুক স্থানে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে দুশমনের এ পরিমাণ ক্ষতি করেছে, অমুক সময় আমরা এই সাফল্য অর্জন করেছি ইত্যাদি। কিন্তু রিপোর্ট শুনে সুলতান আইউবী শুধু মাথা দুলিয়ে তাকে সাধুবাদ জানিয়েই মাথাটা নত করে ফেলছেন, যেনো তাঁর হৃদয়ের ওপর এমন এক বোঝা এসে চেপেছে, যা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

'আমাকে মোবারকবাদ সেদিন জানাবে; যেদিন তোমরা ক্রুসেডারদের পরাজিত করে বিজয়ী বেশে ফিরে আসবে।' একদিন সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের বললেন। তারা দিয়ারে বকরের বিজয়ের পর সুলতানকে মোবারকবাদ জানাতে এসেছিলো। শুনে তাঁর

চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে ওঠে, যেনো তিনি উদ্গাত অশ্রুধারা প্রতিহত করার চেষ্টা করছেন– 'তোমরা হয়তো ভুলে গেছো, আমরা ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করতে এবং তাদেরকে আমাদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করতে ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। কর গণনা করে বলো, তোমরা ক' বছর যাবত আপন ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো? হিসাব করো, আমরা একে অপরের কী পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছি। একে কি তোমরা বিজয় বলবে? এই গৃহযুদ্ধে আমি যে বিজয় অর্জন করছি, তা আমার-তোমার বিজয় নয়– সেসব ক্রুসেডারদেরই বিজয়। দু'ভাই যখন আপসে লড়াই করে, তখন তাদের উভয়ের শত্রু সফল হয়। আমরা আপন ভাইদের উপর যে বিজয় অর্জন করেছি, আমি তাকে বিজয় বলতে প্রস্তুত নই।'

'ক্রুসেডাররা দমে গেলো কেনো?'– এক সালার বললেন– 'আমরা আপনাকে তাদের উপরও বিজয় অর্জন করে দেখাবো।'

'তারা যেখানে থমকে বসে রয়েছে, সেখান থেকে তাদের বের হওয়ার এবং যুদ্ধ করার প্রয়োজন কী?'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যুদ্ধের প্রথম নীতি কী? শত্রুর সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করা। খৃস্টানরা আমাদের সামরিক শক্তিকে আমাদের ভাইদের হাতে ধ্বংস করানোর সকল ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমরা আপসে যুদ্ধ করে করে দুর্বল হয়ে চলেছি আর ক্রুসেডাররা সেই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে দিন দিন শক্তিশালী হয়ে ওঠছে। ফিলিস্তিনীদের উপর তাদের কব্জা শক্ত হয়ে চলছে। শাসন-রাজত্ব মূলত আল্লাহর। মানুষের উপর যখন রাজত্বের নেশা চেপে বসে, তখন ধর্ম ও জাতির মর্যাদা মূল্য হারিয়ে ফেলে। ক্ষমতালিপ্সু মানুষ আপন কন্যাদেরকে উলঙ্গ নাচাতে শুরু করে। মিথ্যা ও প্রতারণাকে বৈধ ও জরুরি মনে করে। ক্রুসেডাররা উম্মতে রাসূলকে রাজ্যে রাজ্যে বিভক্ত করে চলেছে আর আল্লাহর সৈনিকদেরকে এই রাজ্যে রাজ্যে ভাগ করে ইসলামের সামরিক শক্তিকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে।'

'আমরা এসব অঞ্চল থেকে ফৌজের জন্য অনেক ভর্তি পাচ্ছি'– এক সালার বললেন– 'ভালো ভালো সৈনিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ভর্তি হচ্ছে।'

'কিন্তু আমি এতে আনন্দিত নই'– সুলতান আইউবী সকলকে চমকে দিয়ে বললেন– 'এরা আমাদের বাহিনীতে শুধু এই জন্য ভর্তি হচ্ছে যে,

তারা জানে, আমরা যে শহর জয় করি, আমাদের বাহিনী সেখানে লুট করে বেড়ায় এবং সেখানকার রূপসী মেয়েরা তাদের হয়ে যায়।'

'আমরা তো আমাদের বাহিনীকে এমন লুটতরাজ ও নারীর শ্লীলতাহানির অনুমতি কখনো দেইনি!' অপর এক সালার বললেন।

কিন্তু আমাদের শত্রুরা আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, সালাহুদ্দীন আইউবী তার বাহিনীকে লুটতরাজ ও বিজিত অঞ্চলের যুবতী মেয়েদের তুলে এনে উপভোগ করার অনুমতি দিয়ে রেখেছে। আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে তাদের এই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে স্বয়ং মুসলমানদেরই অন্তরে ইসলামী ফৌজের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আমরা কোথাও থেকে জনগণের সাহায্য না পাই। বরং কোনো নগরী অবরোধ করলে সেখানকার মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যেনো আমাদের বাহিনীর মোকাবেলা করে। মনে রেখো আমার বন্ধুরা! সেনাবাহিনী ব্যতীত জনগণ আর জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ব্যতীত সেনাবাহিনী দুশমনের জন্য সহজ হয়ে যায়। তোমরা আপন শত্রুর পরিচয় লাভ করো। তোমাদের শত্রু বুদ্ধিমান। তারা আমাদের জাতি ও ফৌজের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি করার উত্তম ব্যবস্থা করে রেখেছে। কুরআন সীসাঢালা প্রাচীরের রূপ ধারণ করার আদেশ শুধু জনগণকে কিংবা শুধু সেনাবাহিনীকে প্রদান করেনি। সীসাঢালা প্রাচীর জনগণ ও সেনাবাহিনী মিলেই কেবল গড়তে পারে। এই প্রাচীরে ফাটল ধরানোর সকল পন্থা হচ্ছে সেনাবাহিনীকে অযোগ্য, কাপুরুষ ও দস্যুতে পরিণত করা, যাতে তারা জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলে।'

'দিয়ারে বকরের মানুষদের উপর তো এমন কোনো ক্রিয়া দেখা যায়নি'— সারেম মিসরী বললেন— 'তারা যখনই জানতে পারলো, অবরোধকারী আমরা এবং তাদের শাসকরা তাদের বাহিনীকে ইসলামী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ তারা আমাদের জন্য নগরীর ফটক খুলে দিয়েছে।'

'সেখানে আমাদের অনেক গোয়েন্দা ছিলো'— সুলতান আইউবী বললেন— 'সেখানকার সবক'টি বড় মসজিদের ইমাম আমাদের লোক ছিলেন। তারা সেখানকার মানুষদেরকে শুধু নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাতের ওয়াজই শোনাননি। সেই সঙ্গে তাদেরকে ক্রুসেডারদের প্রত্যয়-পরিকল্পনা এবং নিজেদের ঈমান নিলামকারী আমীর-শাসকদের

সম্পর্কেও সম্যক ধারণা প্রদান করেছেন। তারা জনসাধারণকে এই ধারণা প্রদান করেছেন যে, কোনো মুসলমান যখন অপর মুসলমানের রক্ত ঝরায়, তখন আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে এবং আল্লাহ সেই লোকালয়টির উপর গজব নাযিল করেন। তোমরা বোধ হয় জানো না, দিয়ারে বকরে দরবেশ, সুফী ও আলেমের বেশে ক্রুসেডারদের গোয়েন্দারা অবস্থান করছিলো এবং মুসলমানদের চেতনা ধ্বংসের জন্য কাজ করছিলো। কিন্তু আমাদের লোকেরা তাদের কতিপয়কে গোপনে অপহরণ করে হত্যা করেছে এবং তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা এখন যে ভূখণ্ডে অবস্থান করছি, এখানে ক্রুসেডারদের নাশকতা–অরাজকতা সফল হয়ে চলছে।'

'এই যেসব সৈনিক লুটতরাজের লোভে ভর্তি হচ্ছে, এরা কি গোটা বাহিনীকে নষ্ট করবে না?' সালার জিজ্ঞেস করেন।

'তুমি কি দেখোনি তাদেরকে কী ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে?'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি তোমাদেরকে প্রশিক্ষণে সামরিক মহড়ার যে নতুন পদ্ধতি শিখিয়েছি, তা-ই তাদেরকে সঠিক চিন্তা-চেতনার উপর নিয়ে আসবে। আমি বাহিনীতে তাদেরকে এমনভাবে বণ্টন করছি যে, তারা বাহিনীর উপর নয়– বরং বাহিনী তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। আমি অনতিবিলম্বে এই মর্মে লিখিত আদেশ জারি করতে যাচ্ছি যে, আমাদের কোনো সৈনিককে লুটতরাজ কিংবা কোনো নারীর প্রতি হাত বাড়াতে দেখলে তাকে ঘটনাস্থলেই শায়েস্তা করে ফেলবে। দুশমনের অভিযোগসমূহকে ভুল ও মিথ্যা প্রমাণের একটা পন্থা হলো, ফৌজ আপন চরিত্র বলে বিজিত লোকদের উপর এবং স্বজাতিরও মন জয় করে নেবে। আমাদেরকে সবসময় স্মরণ রাখতে হবে, ইহুদী-খৃষ্টানরা সর্বকালে ইসলামের সৈনিক ও জনগণের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে থাকবে। তারা যেমন আমাদের জনসাধারণের চরিত্র ধ্বংসের চেষ্টা করবে, তেমনি সেনাবাহিনীরও। এভাবে উভয় পক্ষের ঈমান ও জাতীয় চেতনা বিনষ্ট করে একে অপরের শত্রুতে পরিণত করে রাখবে। কাজটা তারা মুসলমানদের হাতে করাবে।'

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ফোরাত নদীর তীরে তাঁবুতে অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি মুসলিম প্রজাতন্ত্রের

শাসকদেরকে অনুগত বানিয়ে নিয়েছেন এবং বেশক'টি দুর্গও জয় করে ফেলেছেন। এরা সেসব মুসলিম শাসক, যারা গোপনে গোপনে ক্রুসেডারদের বন্ধু এবং সুলতান আইউবীর বিরোধী ছিলেন। সুলতান আইউবীর গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস, যাকে খৃস্টানরা দখল করে 'জেরুজালেম' নাম রেখেছে। কিন্তু আপন মুসলিম শাসক ও আমীরগণ তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ফৌজকে দিন কয়েকের বিশ্রাম দেয়ার লক্ষ্যে সুলতান ফোরাতের তীরে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এখানে বসে বসে তিনি ঘোড়া, খচ্চর, উট ও রসদের অভাব পূরণ করে নিচ্ছেন।

অল্প পরেই সূর্যটা অস্ত যাবে। সুলতান আইউবী ফোরাতের তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর সালার এবং গেরিলা বাহিনীর অধিনায়ক সারেম মিসরী উপস্থিত আছেন। তাদের থেকে সামান্য দূরে সাদা জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। লোকটি দু'আর জন্য হাত উত্তোলন করে রেখেছেন। সুলতান আইউবী ওদিকে এগিয়ে যান। নিকটে পৌঁছে দেখেন, সেখানে চারটি কবর বিদ্যমান। একটি কবরের শিয়রে একটি লাঠি প্রোথিত আছে। তার সঙ্গে একখানা তক্তা বাঁধা। তক্তায় লাল বর্ণে আরবীতে লেখা আছে–

"ওমর আল-মামলুক!

আল্লাহ তোমার শাহাদাত কবুল করুন।

–নাসরুল মামলুক"

তার পার্শ্বের কবরের উপর তেমনি অপর এক তক্তায় অনুরূপ লাল হরফে লেখা আছে–

"নাসরুল মামলুক!

আল্লাহ আমার শাহাদাত কবুল করুন।"

সুলতান আইউবী লেখা দু'টি পড়ে কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যে লোকটি ফাতিহা পাঠ করছিলেন, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। পোশাকে-ধরনে লোকটাকে বিজ্ঞ আলেম মনে হলো। সুলতান তার প্রতি তাকালে তিনি সামান্য অবনত হয়ে বললেন– 'আমি এ মহল্লার মসজিদের ইমাম। যখনই জানতে পাই অমুক স্থানে শহীদের কবর আছে, সেখানে ছুটে গিয়ে ফাতিহা পাঠ করি। আমার বিশ্বাস, যে স্থানে শহীদের রক্ত ঝরে, সে জায়গা মসজিদের ন্যায় পবিত্র হয়ে যায়। আমি মানুষকে বলে থাকি, মুজাহিদ এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর ঘোড়ার

ক্ষুরের উড়ানো ধূলিকে আল্লাহও সম্মান করেন। মহান আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকে সর্বোত্তম ইবাদত আখ্যা দিয়েছেন।'

'কিন্তু যারা আল্লাহর পথে জীবন কুরআন করে শাহাদাতবরণ করে থাকে, তাদের কেউ চেনে না। ইতিহাসে তাদের নয়– আমার নাম আসবে। অথচ যাদের মাধ্যমে আমি মর্যাদা লাভ করেছি, তারা হচ্ছে এরা, আপনি যাদের কবরে ফাতিহা পাঠ করছেন।' সুলতান তাঁর সালারদের প্রতি তাকান এবং কবরের ফলক দুটোতে হাত বুলিয়ে বললেন– 'এই শব্দগুলো লাল রঙে আঙুল চুবিয়ে লেখা হয়েছে। উভয় ফলকের লেখক একই ব্যক্তি মনে হচ্ছে।'

'লাল রং নয়, সুলতানে মুহতারাম!'– গেরিলা বাহিনীর সালার সারেম মিসরী বললেন– 'এ রক্ত। ওমর আল-মামলুকের ফলকের লেখাটা নাসরুল মামলুক নিজ দেহের রক্ত দ্বারা লিখেছেন। আর নিজ কবরের ফলকও নিজের রক্তে লিখে শাহাদাতবরণ করেছেন। ষোল-সতের দিন আগে আমরা নদী থেকে বড় একটা নৌকা পাকড়াও করেছিলাম। তাতে দুশমনের গেরিলাদের জন্য রসদ বহন করা হচ্ছিলো। সে তথ্য আপনি জানেন। নৌকাটা আমাদের আটজন গেরিলা পাকড়াও করেছিলো। তাদের এ চারজন শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা প্রথমে সংবাদ পাই, রাতে নদীপথে বড় একটি নৌকা অতিক্রম করবে, তাতে দুশমনের রসদ ও অস্ত্র থাকবে। আমি আমার আটজন সৈনিক প্রেরণ করি। তারা ছোট্ট একটি নৌকায় করে অভিযান পরিচালনা করে।'

'মধ্যরাতের দিকে নদীর অপর তীর ঘেঁষে ঘেঁষে নৌকাটা যাচ্ছিলো। আমাদের কাছে তথ্য ছিলো, তাতে চার-পাঁচজন লোক থাকবে। কিন্তু আমাদের গেরিলাদের নৌকা তার কাছে গিয়ে পৌঁছুলে দেখা গেলো, তারা অন্তত বিশজন। আমাদের গেরিলারা দুশমনের নৌকায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই দুশমনের তরবারীধারী সৈনিকরা আমাদের নৌকায় লাফিয়ে এসে পড়ে। আমাদের গেরিলাদের নৌ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিলো। তারা নৌকা থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দুশমনের নৌকায় উঠে গিয়ে তার পালের রশি কেটে দেয়। উভয় নৌকায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। আমাদের গেরিলারা দুশমনের বড় নৌকা থেকে আমাদের নৌকায় অবস্থানরত দুশমনের প্রতি তীর ছোঁড়ে। মোটকথা, আমাদের সৈনিকরা

বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলে যুদ্ধ করে উভয় নৌকা নিয়ে ফিরে আসে। দুশমনের প্রাণে রক্ষা পাওয়া সৈন্যরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ওপারে পৌঁছে যায়।'

'নৌকা দু'টি কূলে এসে ভিড়ে। সংবাদ পেয়ে আমি তাদের দেখতে যাই। সূর্য উদিত হচ্ছিলো। এক নৌকায় ওমর আল-মামলুক এবং তার দু'সঙ্গীর লাশ। অন্যরা সকলে আহত। নাসরুল মামলুক বেশি আহত। তার গায়ে দু'টি গভীর জখম বর্শার আর দু'টি তরবারীর। তার সংজ্ঞা ছিলো। ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার পর বললেন, আমাকে একখানা তক্তা এনে দিন। আমি তাকে তক্তা এনে দিলাম। এ সময় তিনি আর তার চিকিৎসা করতে দেননি। তক্তা পেয়ে তাতে তিনি নিজের রক্তে শাহাদাত অঙ্গুলি ডুবিয়ে ডুবিয়ে ওমর আল-মামলুকের নাম ও এই লেখাগুলো লিখেন। তারপর তক্তাটা আমাকে দিয়ে বললেন, এটি ওমর আল-মামলুকের কবরের উপর স্থাপন করে দেবেন। আমি তক্তাখানা একটি লাঠির মাথায় বেঁধে ওমর আল-মামলুকের শিয়রে গেড়ে রাখি।'

'নাসরুল মামলুকের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরুতেই থাকে। কোনোক্রমেই রক্ত বন্ধ হচ্ছিলো না। তৃতীয় দিন তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। আমি তাকে দেখতে আসলে ডাক্তার নিরাশা প্রকাশ করেন। স্বয়ং নাসরুল মামলুক অনুভব করতে শুরু করেছেন, তিনি বাঁচবেন না। তিনি অনুরূপ আরেকখানা তক্তা দিতে বললেন। তক্তার ব্যবস্থা করে দিলে তিনি তক্তাখানা নিজের কাছে রেখে দেন। রাতে সংবাদ পাই, নাসরুল মামলুক শহীদ হয়ে গেছেন। আমি গেলাম। তার এক আহত সঙ্গী তক্তাখানা আমাকে দিয়ে বললো, নাসর নিজের এক জখম থেকে পট্টি খুলে ফেললে ক্ষতস্থান থেকে দর দর করে রক্ত বের হচ্ছিলো। তিনি নিজ রক্তে আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে এই লেখাটা লিখেছেন— "নাসরুল মামলুক! আল্লাহ আমার শাহাদাত কবুল করুন।" সঙ্গী জানায়, নাসরুল মামলুক বলেছিলেন, তাকে যেনো তার বন্ধু ওমর আল-মামলুকের পার্শ্বে দাফন করা হয়। এভাবে এই দু'টি ফলক একই শহীদের রক্তে লেখা হয়েছে।'

'এরা দু'জন মামলুক ছিলো মহামান্য ইমাম!'— সুলতান আইউবী ইমামকে উদ্দেশ করে বললেন— 'আপনি জানেন, মামলুক কোন্ বংশের মানুষ। এরা সেই গোলাম বংশের মানুষ, যাদেরকে মুক্ত করা হয়েছিলো। আমাদের প্রিয়নবী (সা.) দাস প্রথা নিষিদ্ধ করে বলেছেন,

মানুষ মানুষের গোলাম হতে পারে না। দেখছেন না, এই গোলামরা কিরূপ কীর্তি দেখালো। এরা আটজন ছিলো। কিন্তু বিশজন সৈনিকের হাত থেকে এতো বড় নৌকাটা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। আমার ফৌজে মামলুক আর তুর্কিদের প্রতি আমার যতোটুকু আস্থা আছে, অন্যদের প্রতি ততো নেই।'

'এখন মানুষ পুনরায় মানুষের গোলামে পরিণত হতে যাচ্ছে'– ইমাম বললেন– 'সিংহাসনের মালিক হওয়ার কসরত এ জন্যই করা হচ্ছে যে, মানুষকে গোলাম বানানো হবে। কিন্তু মানুষ বোঝে না, সিংহাসন কোনদিন কারো সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেনি। ফেরাউনও মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। আল্লাহ সেই সকল মানুষকে শিক্ষামূলক শাস্তি দান করেছেন, যারা সিংহাসনে আসীন হয়ে মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে।'

সুলতান আইউবীর রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে। লোকটির অবস্থা বলছে, সে দীর্ঘ সফর করে এসেছে। কমান্ডার নিকটে এসে বললো– 'কায়রো থেকে দূত এসেছে।'

'কী সংবাদ নিয়ে এসেছো?' সুলতান আইউবী দূতকে জিজ্ঞেস করেন।

'সংবাদ ভালো নয়।' বলেই দূত কটিবন্ধ থেকে ভাঁজকরা একখানা কাগজ বের করে সুলতান আইউবীর হাতে দেয়। সুলতান নিজ তাঁবুতে চলে যান।

তাঁবুতে বসে সুলতান কাগজের ভাঁজ খোলেন। গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানের লেখা চিঠি। আলী লিখেছেন–

'আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশি দীনদার ও দুঃসাহসী নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস দশদিন যাবত নিখোঁজ। ক্রুসেডারদের নাশকতা ও অপতৎপরতা দিন দিন বেড়ে চলছে। এখানে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড যুদ্ধ লড়ছি। ঈমান বিক্রেতাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তবে এ সমস্যায় আপনাকে পেরেশান হওয়ার আবশ্যক নেই। আমরা দুশমনকে সফল হতে দেবো না। পেরেশানী সৃষ্টি করেছেন হাবীবুল কুদ্দুস। তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তার শুধু নিখোঁজ হওয়াই অস্থিরতার কারণ নয়। আমরা আরো একটি আশঙ্কা অনুভব করছি। আপনি জানেন, হাবীবুল কুদ্দুসের অধীনে যে ক'টি সেনা ইউনিট রয়েছে, প্রতিজন সৈনিক তার এতোই অনুরক্ত যে, তারা তার ইঙ্গিতে জীবন কুরবান করে

দিতে প্রস্তুত থাকে। আশঙ্কা হচ্ছে, যদি তিনি নিজ থেকে দুশমনের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়ে থাকেন, তাহলে অধীন সৈন্যদেরকে তিনি সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উস্কে দিতে পারেন। আমি তার অনুসন্ধানে এখনো নিরাশ হইনি। আপনার নিকট আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি, অনুসন্ধানকালে যদি তিনি সামনে এসে পড়েন আর আমার তাকে হত্যা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে হত্যা করবো কিনা। আপনার স্থলাভিষিক্ত আমীরে মেসের আমাকে এর অনুমতি দেননি। তিনি এই অনুমতি সরাসরি আপনার থেকে নিতে বলেছেন। আমি যদি তাকে খুঁজে বের করতে না পারি, তাহলে আপনি আমার নিকট জবাব চাইবেন। আর যদি তিনি আমার হাতে খুন হন, তা-ও হয়তো আপনি পছন্দ করবেন না। এই নায়েব সালারের দুশমনের কাছে থাকা আমাদের জন্য বড় বিপজ্জনক।'

সুলতান আইউবী তৎক্ষণাৎ কাতেব ডেকে পত্রের উত্তর লেখাতে শুরু করেন–

'প্রিয় আলী বিন সুফিয়ান!

তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। হাবীবুল কুদ্দুসের উপর আমার যতোটুকু আস্থা ছিলো, ততোটুকু আছে তোমারও উপর। যে লোক নিজের ঈমান বিক্রি করতে সম্মত হয়ে যায়, সে আল্লাহকে ভয় করে না। এমতাবস্থায় সে আমার ন্যায় একজন সামান্য মানুষকে ভয় করবে কেনো? হাবীবুল কুদ্দুসের মতো মানুষও ধোঁকা দিতে পারে, এর জন্য তোমাদেরকে বিস্মিত না হওয়া উচিত। ঈমান একটা শক্তি, একটা সম্পদ। কিন্তু এই শক্তি-সম্পদ হীরা-জহরতের ন্যায় চিক চিক করে না। এর মধ্যে নারীর রূপের আকর্ষণ নেই। তাছাড়া ঈমান ক্ষমতার মসনদও নয়। মানুষের মধ্যে যখন দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা ও হীরা-জহরতের লোভ সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তার ঈমান পরিত্যাগ করতে সময় লাগে না। হাবীবুল কুদ্দুসকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। প্রয়োজন মনে করলে আমি তাকে হত্যা করে ফেলার অনুমতি দিলাম। তবে জানবার চেষ্টা করো, তাকে অপহরণ করা হয়েছে কিনা। পরিস্থিতি তুমি ভালো জানো। যা ভালো মনে হয় করো। সালতানাতের স্বার্থ আর ধর্ম অগ্রগণ্য। যেখানে হাজার হাজার সৈনিক শত্রুর হাতে জীবন দিচ্ছে, সেখানে একজন মানুষের জীবন-মৃত্যু বড় কোনো বিষয় নয়। হাবীবুল কুদ্দুস গাদ্দার প্রমাণিত হলে তার পেছনে বেশি সময় ব্যয় করো না।

সময় অনেক মূল্যবান। আল্লাহর নিকট গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো। আমরা সকলে গুনাহগার। একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সত্ত্বাই পবিত্র। তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

সুলতান আইউবী পত্রের নীচে সীল-মোহর এঁটে দূতের হাতে দিয়ে বললেন, রাতটা বিশ্রাম করে সকাল সকাল রওনা হয়ে যাও।

সময়টা ছিলো ইসলামের ইতিহাসের এক সংকটময় কাল। এদিকে আরব ভূখণ্ড মুসলমানদের রক্তে লাল হয়ে চলেছে। খৃস্টান ও ইহুদীরা মুসলমানদের মাঝে গাদ্দার ও কুচক্রী সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে গৃহযুদ্ধে উস্কে দিয়েছে। ওদিকে মিসরে এই কাফেররাই মুসলিম কর্মকর্তাদের মাঝে গাদ্দার জন্মদানে ব্যস্ত রয়েছে। জনসাধারণের মাঝে সুলতান আইউবীর শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করছে এবং আইউবীর বাহিনীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত লজ্জাজনক সব অপবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তারা এসব তৎপরতা চালাচ্ছে গোপনে– অতি সন্তর্পণে। আলী বিন সুফিয়ান এবং কায়রোর কোতওয়াল গিয়াস বিলবীস এসব অভিযান-অপপ্রচারের প্রতিক্রিয়া দূর এবং অপরাধীদের পাকড়াও করার কাজে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন।

একজন নায়েব সালারের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সাধারণ ঘটনা নয়। কিন্তু তার কোনই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। হাবীবুল কুদ্দুস বিশ্বাসঘাতকের দলে যোগ দিতে পারেন, কেউ ভাবতেই পারছেন না। কিন্তু সময়টাও এমন যে, গাদ্দারী একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস নিখোঁজ হওয়ার পর অনেকে মন্তব্য করেন, কেনো, তিনি ফেরেশতা তো আর নন। তার তিনজন স্ত্রী আছে। এটা কোনো দোষের বিষয় ছিলো না। তার পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের ঘরে চার-চারজন করে স্ত্রী আছে। হাবীবুল কুদ্দুস জীবনে কোনদিন মদ ছুঁয়ে দেখেননি। নামায-রোযার পাবন্দ মানুষ। যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের জন্য আতঙ্ক হয়ে আবির্ভূত হওয়ার মতো দুঃসাহসী ও সমর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব।

তার সবচে' বড় গুণটি হচ্ছে, বাহিনীর প্রতিজন সৈন্যের তিনি প্রিয় মানুষ। তার অধীন কমান্ডার ও সৈনিকরা এমন ধারায় লড়াই করে, যেনো তার নির্দেশে নয়– ভক্তি-শ্রদ্ধার বলে যুদ্ধ করছে। অনেক সময় মনে হতো, এই বাহিনী তার নিজস্ব ফৌজ এবং তারা সুলতান

আইউবীর নয়– হাবীবুল কুদ্দুসের ইঙ্গিতে লড়াই করছে। তার ইউনিটে তিন হাজার পদাতিক ও দু'হাজার অশ্বারোহী সৈনিক আছে। তারা তীরন্দাজিতে এতো দক্ষ যে, অন্ধকারে শব্দ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লে তীর ব্যক্তির গায়ে গিয়ে আঘাত হানে।

আলী বিন সুফিয়ান অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। গিয়াস বিলবীস পুলিশ প্রধান এবং সিভিল ইন্টেলিজেন্সে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এই দু'জনেরই অভিমত হচ্ছে, দুশমন হাবীবুল কুদ্দুসকে জালে আটকে ফেলেছে। উদ্দেশ্য হতে পারে, তার মাধ্যমে তারা আমাদের পাঁচ হাজার সৈন্যকে বিদ্রোহী বানাতে চাচ্ছে। পাঁচ হাজার সৈন্য কম কথা নয়। হাবীবুল কুদ্দুসের নিখোঁজ হওয়ার পর এই সৈনিকদেরকে নিরস্ত্র করে ফেলার প্রস্তাব করা হয়েছিলো। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস এই বলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন যে, এটা করা হলে তারা বিদ্রোহ করার না হলেও বিদ্রোহী হয়ে যাবে। তদস্থলে তাদের মাঝে নানা বেশে গোয়েন্দা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা ব্যারাকে সৈনিকদের সঙ্গে মিশে গপশপ শুনতে থাকে। কমান্ডারদের প্রতিও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়।

গভীর নজরদারি রাখা হয়েছে হাবীবুল কুদ্দুসের ঘরের উপর। তার তিন স্ত্রীর একজনের বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। দু'জন চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সী। জিজ্ঞাসাবাদে তারা শুধু এটুকু বললো যে, একদিন সন্ধ্যায় তার নিকট দু'জন লোক এসেছিলো। তিনি তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যান; পরে আর ফিরে আসেননি। চাকর-বাকরদের কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। তাদের থেকেও কোন তথ্য পাওয়া গেলো না। গোপনে স্ত্রীদের সম্পর্কে তথ্য নেয়া হলো। তাদের একজনও সন্দেহভাজন প্রমাণিত হলো না। শুধু এটুকু তথ্য পাওয়া গেলো যে, কম বয়সী দু'জনের একজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশি ছিলো। তার নাম যোহরা। মেয়েটি এক আরোহী প্লাটুন কমান্ডারের কন্যা।

কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করা হলো, নিজের সমান বয়সী একজন পুরুষের কাছে যুবতী মেয়েকে বিয়ে দিলে কেনো? হাবীবুল কুদ্দুস কি তোমাকে বাধ্য করেছিলো?

'না'– কমান্ডার উত্তর দেয়– 'নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস ইসলাম ও জিহাদের অতোটুকু অনুরক্ত, যতোটুকু আমি। আমি তাঁর সঙ্গে অনেক যুদ্ধে লড়েছি। তিনি বলতেন, মুমিনের তরবারী খাপ থেকে বের

হওয়ার পর দুশমনের সর্বশেষ সৈনিকটিকে শেষ না করা পর্যন্ত খাপে ফিরে না আসা উচিত। তিনি আরো বলতেন, কুফরের ফেতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকে। তিনি গাদ্দারদের এতো ঘৃণা করতেন যে, এক সীমান্ত লড়াইয়ে সুদানীরা আকস্মিকভাবে হামলা করলে আমাদের দু'জন অশ্বারোহী সেনা পালাতে উদ্যত হয়। নায়েব সালার ঘটনাটা দেখে ফেলেন। তিনি তাদেরকে ধরে আনতে আদেশ করেন। তাদেরকে ধরে আনা হলো। নায়েব সালার তাদের কিছু জিজ্ঞেস করা বা কিছু বলা ব্যতিরেকেই তাদেরকে ঘোড়ার পেছনে বেঁধে পিঠে একজনকে বসিয়ে ঘোড়া হাঁকাতে নির্দেশ দেন। ঘোড়া যখন তাদের নিয়ে ফিরে আসে, তখন ঘোড়ার দেহ থেকে অঝোরে ঘাম ঝরছিলো এবং তাদের নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। পেছনে বাধা সৈনিকদের অবস্থা এই ছিলো যে, তাদের পরনে কাপড় ছিলো না এবং গায়ের চামড়া ছিলে ছিলে গোশত পর্যন্ত খসে পড়েছে। যখন যুদ্ধ শেষ হয়, ততোক্ষণে সুদানীদের অধিকাংশ সৈনিক মারা গেছে। কিছু ধরা পড়েছে এবং বাদ বাকিরা পালিয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস বাহিনীর সকল সৈন্যকে একত্রিত করে নিজের সৈনিক দু'জনের লাশ দেখিয়ে বললেন, আল্লাহর পথে লড়াই করা থেকে পলায়নকারীদের এই শাস্তি ইহকালীন। পরকালে তাদের দেহ অক্ষত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'

'আমরা সকলে জিহাদ ও শাহাদাতের জযবায় উদ্দীপ্ত। একদিন আমার এই মেয়েটা আমার সঙ্গে ছিলো। আমার পিতা আমাকে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন, আমিও মেয়েকে সেই প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছি। আমার এক পুত্র এই মুহূর্তে সুলতান আইউবীর ফৌজের সঙ্গে সিরিয়ায় অবস্থান করছে। আমি মেয়েকে বলতাম, আমাদের নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় এক মর্দে মুজাহিদ। সেদিন নায়েব সালার আমার মেয়েটাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, এ কে? বললাম, আমার মেয়ে এবং মুজাহিদা। অনেক দিন পর তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমার সেই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাই। আমি মেয়ের মায়ের সঙ্গে আলাপ করি। সে বললো, মেয়ে তো আগে থেকেই বলছে, সে ইসলামের একজন সৈনিকের স্ত্রী হতে ইচ্ছুক। এভাবে আমি খুশি মনে আমার এই মেয়েকে নায়েব সালারের নিকট বিয়ে দিই। এখন

শুনেছি, তার নাকি কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আপনাকে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, এই দুর্ঘটনায় কেউ যদি অন্তর থেকে ব্যথা পেয়ে থাকে, তো সে শুধু আমার কন্যা। তার অপর দুই স্ত্রী বলছে, মরে গেলে অন্য কাউকে বিয়ে করে নেবো।'

'আমি এখন নিশ্চিত, তার মস্তিষ্ক আমাদের কব্জায় এসে পড়েছে'– এই কণ্ঠ কায়রো থেকে বহু দূরে সেসব ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে উত্থিত হলো, যেখানে কোনো এক ফেরাউন তার আমলে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলো। সে যুগে জায়গাটা অত্যন্ত সুন্দর, মনোরম ও সবুজ-শ্যামল ছিলো। অঞ্চলটা পাহাড়ি এবং নীল নদের কূলে অবস্থিত। পর্বতমালা গাছ-গাছালি ও সবুজ-শ্যামলে ঢাকা। নদীটা খানিক পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে ঢুকে গেছে। এখন এলাকাটা এক ভীতিময় জায়গা। প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের গায়ে শেওলার আস্তর জমে আছে। চিলের ন্যায় বড় বড় চামচিকারা দল বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে। ধ্বংসাবশেষের অলিন্দ ও কক্ষগুলোতে মানুষের অসংখ্য হাড়-খুলি পড়ে আছে। সেকালের নানা রকম অস্ত্রও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। এখন কেউ সেদিকে মুখ করে না। জনশ্রুতি আছে, জায়গাটায় এখন জিন-পরী ও ভূতেরা বাস করে, যারা জীবিত মানুষদেরকে শিকার করে বেড়ায়।

সেই ভয়ংকর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বসে এক ব্যক্তি বলছে– 'আমি নিশ্চিত, তার মস্তিষ্ক আমাদের কব্জায় এসে পড়েছে। তবে না-ই যদি আসে, তাহলে এখান থেকে জীবিত যেতে দেবো না।'

'আমরা লোকটাকে হত্যা করতে এখানে আনিনি'– অন্য একজন বললো– 'হত্যা করাই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ঘর থেকে বের করে এখানে তুলে আনার প্রয়োজন ছিলো না। আমরা তাকে বিশেষ এক কাজের জন্য এনেছি। সে কাজের জন্য তাকে প্রস্তুত করতে হবে।'

'হাশিশ ক্রিয়া করছে।'

হাশিশ দ্বারা তোমরা কারো ঈমান ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে পারবে না। এই লোকটি পাঁচ হাজার সৈনিকের সামরিক শক্তির মালিক। শুধু তাকে নয়– আমাদেরকে তার গোটা বাহিনীকে হাতে আনতে হবে এবং তাদেরকে মিসরের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে হবে। তারপর মিসর আমাদের হয়ে যাবে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর

অবস্থা সেই সিংহের ন্যায় হয়ে যাবে, যে বহু শিকারের বেষ্টনীতে আবদ্ধ থেকে গর্জন করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার ভাগ্যে মৃত্যু অবধারিত হয়ে আছে। সালাহুদ্দীন আইউবীর এই নায়েব সালার যদি তার বাহিনীকে একটু ইশারা করে, তো কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তারা তার আদেশ মান্য করবে।'

হাবীবুল কুদ্দুস উক্ত ধ্বংসাবশেষের এক কক্ষে উপবিষ্ট। নীচে নরম গালিচা বিছানো, পেছনে গোল তাকিয়া। আয়েশের সকল উপকরণই সেখানে বর্তমান। এক ব্যক্তি সম্মুখে বসে তার চোখে চোখ রেখে আছে এবং বলছে– 'মিসর আমার রাজ্য। সালাহুদ্দীন আইউবী ইরাকী কুর্দি। তিনি আমার রাজ্য দখল করে আছেন। আইউবী আমার রাজ্যের রূপসী মেয়েদের দ্বারা নিজ হেরেম পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। আমার পাঁচ হাজার জানবাজ সৈন্য সমগ্র মিসর দখল করে নেবে।'

হাবীবুল কুদ্দুসের ঠোঁটে মুচকি হাসি। চেহারায় খুশির আভা। তিনি বিড় বিড় করে ওঠেন– 'আমার তরবারী কোথায়? আমার ঘোড়া প্রস্তুত করো। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করবো। আমার পাঁচ হাজার জানবাজ সৈন্য একদিনে মিসরের বাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করে ফেলবে।'

'ক্রুসেডাররা আমার বন্ধু'– লোকটি তার চোখে চোখ রেখে বললো– 'তারা আমাকে সাহায্য করবে। বন্ধু তো সে, যে বিপদের সময় সাহায্য করে।'

'আমার তরবারী কোথায়?'– হাবীবুল কুদ্দুস খানিক স্পষ্ট কণ্ঠে বলতে শুরু করেন– 'মিসর অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। মিসরের মেয়েরা অত্যন্ত রূপসী হয়ে গেছে। মিসর আমার, মিসর আমার।'

একটি মেয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। মেয়েটার পরিধানের পোশাক এমন, যেনো উলঙ্গ। মাথার রেশম-কোমল চুলগুলো খোলা। হাল্কা গোলাপী বর্ণের সুঠৌল দেহ। মেয়েটা হাবীবুল কুদ্দুসের গা-ঘেঁষে বসে পড়ে। একটা বাহু হাবীবুল কুদ্দুসের কাঁধের উপর আলগোছে রেখে দেয়। তার রেশমী চুলগুলো হাবীবুল কুদ্দুসের গণ্ডদেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তিনি আচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন– 'মিসর অনেক সুন্দর হয়ে গেছে।'

মেয়েটি এক ধারে সরে গিয়ে বললো– 'কিন্তু আমাকে সুলতান আইউবী দখল করে আছেন।'

হাবীবুল কুদ্দুস অকস্মাৎ মেয়েটিকে টেনে কাছে এনে বাহুতে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'তোমাকে কেউ দখল করতে পারবে না। তুমি আমার। মিসর আমার।'

যে যাবত সালাহুদ্দীন আইউবী জীবিত আছেন কিংবা যতোক্ষণ পর্যন্ত মিসরের উপর তার রাজত্ব আছে, সে যাবত না আমি তোমার, না মিসর তোমার।'

'আমি তাকে খুন করে ফেলবো'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আমি আইউবীকে হত্যা করবো।'

'থামো'– কক্ষে একটি ক্ষুব্ধ কণ্ঠ গর্জে ওঠে। লোকটা খৃস্টান। মিসরী ভাষায় কথা বলছে– 'তোমরা হাসান ইবনে সাব্বাহর অনুসারীরা হাশিশ আর গুপ্তহত্যা ব্যতীত কিছুই জানো না। মেয়েটাকে তার কাছে থাকতে দাও। তুমি আমার সঙ্গে আসো।'

লোকটি তাকে সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে বললো– 'এখন আর ওকে হাশিশ দিও না। তার নেশা কেটে যেতে দাও। তার হাতে সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করাতে হবে। তার মাধ্যমে তার বাহিনীকে বিদ্রোহে উস্কে দিতে হবে। আমার এসে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। অন্যথায় আমি তার এই অবস্থা হতে দিতাম না। সংজ্ঞা ঠিক রেখে তাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রু বানাতে হবে। তোমরা লোকটাকে যেরূপ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে অপহরণ করে এনেছো, আমি অন্তর থেকে তার জন্য তোমাদের প্রশংসা করি। এর বিনিময়ে তোমাদেরকে এতো পরিমাণ পুরস্কার দেয়া হবে, যা তোমরা অতীতে কখনো পাওনি। কিন্তু হাশিশ প্রয়োগ করে তোমরা আমাদের কাজ কঠিন করে দিলে। এখন তার নেশা দূর করার ব্যবস্থা নাও।'

ক্রুসেডারদের গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা এবং মুসলিম যুবকদের চরিত্র ধ্বংসের পন্থা-পদ্ধতি অত্যন্ত পরিপক্ক। তাদের এই বিদ্যার বিশেষজ্ঞগণ মানবীয় স্বভাবের দুর্বলতা ও চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাদের দৃষ্টি সুলতান আইউবীর ফৌজ ও প্রশাসনের প্রতিজন অফিসার-কর্মকর্তার উপর নিবদ্ধ। অপরদিকে আরবের আমীর-উজির এবং বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের মুসলিম শাসকদের দুর্বলতা সম্পর্কেও তারা অবহিত। তাদের প্রচেষ্টা, অধিক থেকে অধিকতর শাসক ও কর্মকর্তা তাদের অধীন হয়ে যাক এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াক। ইহুদীরা সম্পদ ও নারী দিয়ে তাদের পুরোপুরি সাহায্য করে যাচ্ছে। কাফেরদের বিশেষজ্ঞগণ মুসলিম শাসক প্রমুখদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে রেখেছে।

একদল সুন্দরী নারী, মদ আর হীরা-জহরতের বিনিময়ে নিজেদের ঈমান বিক্রি করে ফেলেছে। একটি দল তাদের, যারা স্বতন্ত্র রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করে তার স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তৃতীয় দলে আছে তারা, যারা দেশ ও জাতির অফাদার এবং পরিপক্ব মুসলমান। এই তৃতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হাত করা ক্রুসেডারদের স্বতন্ত্র একটি মিশন। সুলতান আইউবীর গোপন পলিসি-পরিকল্পনা সময়ের আগে অবগত হওয়া এবং তাঁর সৈন্যদের দ্বারা তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করানো ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যে তারা এই মিশন পরিচালনা করছে। এই পরিপক্ব দীনদার ও নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের হাত করার জন্য তাদের নিকট কয়েকটি পন্থা আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে অপহরণ করে দলে ভেড়ানো। একটি হচ্ছে হত্যা করা। প্রয়োজন হলে হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতকদের ভাড়া নেয়া হতো।

নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস এমন একজন কর্মকর্তা, যাকে হত্যা করায় ক্রুসেডারদের কোনো লাভ নেই। বরং তাকে হাত করে তার বাহিনীকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে উস্কে দিতে হবে। ক্রুসেডাদের মুসলিম এজেন্টরা তাদের অবহিত করেছে, হাবীবুল কুদ্দুস ঈমান নয়-জীবন দেয়ার মতো মানুষ এবং তার মধ্যে এমন জযবা ও অস্বাভাবিক যোগ্যতা আছে, যদি তাকে তার বাহিনীসহ এক লাখ শত্রুসেনার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়, তাহলে মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য দ্বারা এই বিশাল শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে না।

ক্রুসেডাররা বিষয়টা যাচাই করে দেখেছে। কখনো করেছে অস্বাভাবিক রূপসী যুবতীকে নিরাশ্রয় এতীম নির্যাতিতার বেশে সাহায্যের জন্য কিংবা কোনো মেয়েকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রেরণ করে। কখনো বা ভোজসভা কিংবা খেলাধুলার অনুষ্ঠানে কোনো সুন্দরী মেয়েকে তার পেছনে লেলিয়ে দিয়ে। কিন্তু হাবীবুল কুদ্দুস কখনোই তাদের জালে আটকা পড়েননি, যেনো তিনি পাথর।

মিসরে বিদ্রোহ করানো ক্রুসেডারদের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা, সালাহুদ্দীন আইউবী সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের অঞ্চলগুলোতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মুসলিম আমীদেরকে যুক্তি-প্রমাণ কিংবা তরবারীর মাধ্যমে নিজের অনুগত বানিয়ে চলেছেন। এরপরই তিনি ফিলিস্তীন অভিমুখে যাত্রা করবেন। ফিলিস্তীন থেকে তার মনোযোগ সরানোর একটা পন্থা এই হতে পারে যে, মিসরে তাঁর যে ফৌজ আছে, তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য উস্কে দেয়া হবে।

ইতিপূর্বে ক্রুসেডাররা সুদানীদেরকে মিসরী ফৌজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলো। সুদানী বাহিনী হামলাও করেছিলো। কিন্তু সুদানী বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক ছিলো হাবশী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দ্বিতীয়ত তারা ছিলো হুজুগে মাতাল। এই একযোগে লড়াই করে তো এই একসঙ্গে পালিয়ে যায়। ক্রুসেডাররা তাদেরকে মিসরের বিরুদ্ধে উস্কে রাখে; কিন্তু যুদ্ধ করাবার কথা ভাবেনি। এখন তারা মিসরী বাহিনীরই দ্বারা বিদ্রোহ করানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তাদের বিবেচনায় হাবীবুল কুদ্দুসই এ কাজের জন্য যথোপযুক্ত ব্যক্তি। তাই খৃস্টান গোয়েন্দা ও বিশেষজ্ঞগণ তাকে অপহরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদায়ীদের দ্বারা কর্মটা করিয়ে ফেলে।

এক সন্ধ্যায় দু'জন লোক হাবীবুল কুদ্দুসের ঘরে যায়। তারা একটি গ্রামের নাম উল্লেখ করে বললো, ওখানকার একটি মসজিদের ছাদ ধসে গেছে। এখন পুরো মসজিদটিই নতুন করে নির্মাণ করতে হবে। এলাকাবাসী আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে কাজটা করে ফেলতে প্রস্তুত। এখন আমাদের একজন মুরুব্বীর প্রয়োজন। আপনি এলে কাজটা সহজে হয়ে যাবে। এ মর্মে তারা বেশকিছু আবেগময় কথা বলে হাবীবুল কুদ্দুসের হৃদয়টা গলিয়ে ফেলে। তিনি তাদের সঙ্গে রওনা হয়ে যান। নগরী থেকে বেরিয়ে গেলে আরো চার ব্যক্তি তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। হঠাৎ ছয়জন মিলে তাকে ঝাপটে ধরে ফেলে উল্লিখিত স্থানে নিয়ে যায়। ওখানে পৌঁছেই তার অজান্তে তারা তাকে হাশিশ খাইয়ে দেয়।

কায়রোতে মিসরী গোয়েন্দারা হাবীবুল কুদ্দুসের অনুসন্ধানে গলদঘর্ম সময় অতিবাহিত করছে। সকলেরই ধারণা, তিনি সুদানী কিংবা ক্রুসেডারদের নিকট চলে গেছেন। নিজ বাহিনীর উপর হাবীবুল কুদ্দুসের কী পরিমাণ প্রভাব বিদ্যমান, আলী বিন সুফিয়ানের তা জানা আছে। সে কারণে তিনি মিসরের ভারপ্রাপ্ত গভর্নরের অনুমতিক্রমে বিষয়টা সুলতান আইউবীকে অবহিত করে রেখেছেন। ধারণা ছিলো, তিনি তার নির্ভরযোগ্য কমান্ডারদের নিকট কোন বার্তা প্রেরণ করবেন। গোয়েন্দারা চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাখে। কিন্তু কারো প্রতি তার কোনো বার্তা আগমনের কোনো তথ্য পাওয়া গেলো না। তার বাহিনীর কোনো কমান্ডার উধাও হয়ে যায় কিনা সেদিকেও কড়া নজর রাখা

হচ্ছিলো। কিন্তু এতোদিনে একজন কমান্ডারও উধাও হয়নি।

খৃস্টান লোকটি গোটা রাত হাবীবুল কুদ্দুসের নেশার ক্রিয়া দূর হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে। পরদিন সে হাবীবুল কুদ্দুসের পাশে গিয়ে বসে। হাবীবুল কুদ্দুস এখনো ঘুম থেকে জাগ্রত হননি। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে তিনি এদিক-ওদিক তাকান। খৃস্টান লোকটির উপর চোখ পড়ামাত্র তিনি উঠে বসেন এবং গভীর দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকিয়ে থাকেন।

'আমি দুঃখিত যে, লোকগুলো আপনার সঙ্গে অনেক খারাপ আচরণ করেছে'– খৃস্টান বললো– 'আপনি এতো বিস্মিত ও অস্থির হবেন না। অভাগারা আপনাকে হাশিশ পান করিয়ে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিলো। আপনি হাশিশ আর ফেদায়ীদের পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। তারা আপনাকে অপমান করেছে। এর জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আপনাকে কোনো স্বপ্ন দেখাবো না। আমি আপনার সম্মুখে অত্যন্ত সুদর্শন এক বাস্তবতা উপস্থাপন করবো। আপনি নিজেকে কয়েদি ভাববেন না। আমি আপনার মর্যাদা উঁচু করে দেবো। আপনার একবিন্দু অপমান হতে দেবো না।'

'এরা প্রতারণার মাধ্যমে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলো'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'পরে বোধ হয় অন্য কোথাও নিয়ে গিয়েছিলো।' তিনি দৃষ্টি ঘুরিয়ে চারদিকে তাকান এবং বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– 'সেটা অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম জায়গা ছিলো। আমাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে?'

'আপনি নিজেকে জাগ্রত করুন'– খৃস্টান বললো– 'এসব হাশিশের ক্রিয়া। আপনি প্রথম দিন থেকেই এখানে আছেন।'

'আমাকে অপহরণ করা হয়েছে?'– হাবীবুল কুদ্দুস বাস্তবতায় ফিরে আসতে শুরু করেছেন। খানিক ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'তুমি কে?'

'আমি আপনার এক মুসলমান ভাই'– খৃস্টান বললো– 'আমার আপনার থেকে নেয়ার মতো কিছু নেই। আমি আপনাকে কিছু দিতে চাই।'

'আমি যদি এই লেনদেন অস্বীকার করি, তাহলে?'

'তাহলে আপনি জীবিত ফেরত যেতে পারবেন না'– খৃস্টান বললো– 'আপনি কায়রো থেকে এতো দূরে আছেন যে, আমরা আপনাকে মুক্ত করে দিলেও আপনি মরে যাবেন।'

'সেই মৃত্যুকেই আমি বরণ করে নেবো'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আমি শত্রুর কয়েদখানায় মৃত্যুবরণ করতে চাই না।'

'আপনি না আটক আছেন, না আপনি আমাদের শত্রু'– খৃস্টান বললো– 'অপদার্থগুলো আপনার সঙ্গে অপমানজনক আচরণ করে আপনার মধ্যে কুধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে। আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কিছু কথা আছে।'

'কথাগুলো বলার জন্য অপহরণ করে আমাকে এতো দূরে নিয়ে আসার কী প্রয়োজন ছিলো?'

'আমি যদি কায়রোতে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলতাম, তাহলে আমরা উভয়ে এতোদিনে কয়েদখানার পাতাল প্রকোষ্ঠে চলে যেতাম'– খৃস্টান বললো– 'ওখানে আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস পায়ে পায়ে গোয়েন্দা দাঁড় করিয়ে রেখেছে।'

হাবীবুল কুদ্দুসের মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেমাগ তার ভাববার যোগ্য হয়ে গেছে। তিনি বুঝে ফেলেছেন, তিনি খৃস্টান নাশকতাকারীদের কবলে এসে পড়েছেন। জিজ্ঞেস করেন– 'তুমি ক্রুসেডারদের লোক, নাকি সুদানীদের?'

'আমি মিসরের লোক'– খৃস্টান জবাব দেয়– 'আপনিও মিসরী। আপনি বাগদাদী, শামী কিংবা আরবী নন। মিসর মিসরীদের। এ দেশটা নুরুদ্দীন জঙ্গী-সালাহুদ্দীন আইউবীর পৈতৃক জমিদারি নয়। এটা ইসলামী রাষ্ট্র। এখানে আল্লাহর রাজত্ব চলবে। এবার শাসন করবে মিসরী মুসলমানরা। আপনি কি কখনো ভেবে দেখেননি, যারা আমাদের উপর রাজত্ব করছেন, তারা বাগদাদ ও দামেশ্‌ক থেকে এসেছেন এবং মিসরকে সিরিয়ার সঙ্গে একীভূত করে এক রাজ্য গঠন করেছেন?'

'তুমি কি আমাকে মিসরকে সালাহুদ্দীন আইউবী থেকে মুক্ত করার জন্য উস্কানি দিচ্ছো?'

'আমি জানি, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে পয়গম্বর না হলেও পীর-মুরশিদ অবশ্যই মনে করেন'– খৃস্টান বললো– 'আমি তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবো না। আইউবীর মধ্যে অনেক গুণ আছে। আপনি তাকে যতোটুকু পছন্দ করেন, আমি তার চেয়ে কম করি না। কিন্তু আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে, লোকটা আর কতোদিন বেঁচে থাকবেন। তারপর মিসর তার যে ভাই কিংবা পুত্রের হাতে আসবে, তার মধ্যে তো আর আইউবীর গুণাবলী থাকবে না। তখন মিসর আরেক ফেরাউনের কব্জায় চলে যাবে।'

'আমার দ্বারা তুমি কী কাজ করাতে চাও?'

'আপনি যদি আমার বক্তব্য বুঝে থাকেন, তাহলে আমি বলতে পারি, আপনি কী কাজ করতে পারেন'– খৃস্টান উত্তর দেয়– 'আপনার মনে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করুন। আগে সন্দেহ দূর করুন। আমি আপনাকে চিন্তা করার সুযোগ দিলাম। আপনি এইমাত্র ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছেন। হতভাগ্যদের দেয়া হাশিশের ক্রিয়া এখনো দূর হয়নি। আমি আপনার জন্য নাস্তা পাঠাচ্ছি। এতোদিনে লোকগুলো আপনাকে গোসল করার সুযোগটা পর্যন্ত দেয়নি। আমি আপনাকে একটি কূপে নিয়ে যাবো।'

খৃস্টান লোকটি উঠে বাইরে বেরিয়ে যায়। সামান্য পরে অপর এক ব্যক্তি এসে বললো– 'আমার সঙ্গে চলুন। নাস্তার আগে গোসলটা সেরে নিন।'

জীর্ণ ভবন থেকে হাবীবুল কুদ্দুসকে অন্য এক পথে বের করে নেয়া হয়। পথটি পার্বত্য অঞ্চলের ভেতরের দিকে চলে গেছে। খানিক দূরে একটি ঝরনা, যার স্ফটিকস্বচ্ছ পানি ক্ষুদ্র একটি প্রাকৃতিক পুষ্করিনীতে গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে। হাবীবুল কুদ্দুস কয়েকটি পর্বত ঘুরে ঘুরে ঝরনার নিজট গিয়ে পৌছুলে দেখতে পান, দু'টি মেয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করছে আর একে অপরের গায়ে পানি ছিটাচ্ছে। হাবীবুল কুদ্দুস অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। মেয়ে দুটো হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। এই বিজন ভূমিতে মেয়ে দুটোকে জিন-পরী বলে মনে হলো। হাবীবুল কুদ্দুস এদিক-ওদিক তাকান। সবদিকেই পাহাড়। তিনি পেছন দিকে দৃষ্টপাত করেন। তার সঙ্গে আসা লোকটি তার সামনে সামনে হাঁটছে।

হাবীবুল কুদ্দুস হঠাৎ ছোঁ মারার মতো করে এক বাহু দ্বারা লোকটার ঘাড় ঝাপটে সাধ্য পরিমাণ চেপে ধরে অপর হাত দ্বারা পূর্ণ শক্তিতে তার পেঁটে তিন-চারটি ঘুষি মারেন। লোকটি দম আটকে মরে যায়। হাবীবুল কুদ্দুস লাশটা টেনে-হেঁচড়ে একটি ঘন ঝোঁপের পেছনে ফেলে দিয়ে নিজে পালাতে উদ্যত হন। এক পাহাড়ের মধ্যকার পথটা আগেই দেখে নিয়েছেন। সেখানে পৌছে দেখতে পান, এক ব্যক্তি বর্শা তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি শুধু বললো– 'ফেরত'। হাবীবুল কুদ্দুস নিরস্ত্র। অগত্যা মাথানত করে পেছন পানে মোড় ঘোরান। কয়েক পা অগ্রসর হয়েছেন মাত্র। হঠাৎ উক্ত খৃস্টান লোকটি তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে যায়। লোকটি মিটি মিটি হাসছে।

'আমি আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করি'– খৃস্টান বললো– 'আপনি এই অঞ্চল থেকে বের হতে পারবেন না। অযথা বোকা সাজবেন না। গোসল করে আমার সঙ্গে আসুন।'

হাবীবুল কুদ্দুস সুবোধ বালকটির ন্যায় পুকুরে নেমে গোসল করে কাপড় পরিধান করেন। খৃস্টান লোকটি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। পথে তিনি খৃস্টানকে জিজ্ঞেস করেন– 'এই মেয়েগুলো কি তোমাদের সঙ্গে থাকে?'

'হ্যাঁ, এমনি বিজন অঞ্চলে এমন চাকচিক্য সঙ্গে রাখতে হয়'– খৃস্টান বললো– 'আপনারও তো ওখানে তিনটি বউ ছিলো। এখন প্রয়োজন হলে আপনিও এদের যাকে পছন্দ হয়, সঙ্গে রাখতে পারেন।'

এমন সময় এক মেয়ে নাস্তা নিয়ে আসে। হাবীবুল কুদ্দুস তার প্রতি তাকিয়ে থাকেন। মেয়েটি তার পাশে বসে পড়ে। খৃস্টান লোকটি বেরিয়ে যায়। মেয়েটি কথা ও আচরণে হাবীবুল কুদ্দুসকে পাগল করে তোলে। অনেক পরে যখন খৃস্টান ফিরে আসে, তখন মেয়েটি চলে যায়। তখন হাবীবুল কদ্দুসের মনে আক্ষেপ জাগে।

'আপনি স্বাধীন মিসরের প্রধান সেনাপতি হবেন'– খৃস্টান বললো– 'আপনার বাহিনীতে যে তিন হাজার পদাতিক এবং দু'হাজার অশ্বারোহী আছে, তারা প্রত্যেকে আপনার অনুগত ও অনুরক্ত। আপনি তাদেরই সাহায্যে মিসরের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিতে পারেন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী যদি আক্রমণ করেন, তাহলে কি আমি এই বাহিনী দ্বারা মিসরকে তার থেকে রক্ষা করতে পারবো?'

'মিসরের বাহিনীতে যেসব সুদানী মুসলমান রয়েছে, তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে'– খৃস্টান বললো– 'আইউবীর বাহিনীতে যেসব মিসরী আছে, আমরা তাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়ে দেবো, এটা গৃহযুদ্ধ নয়– মিসরীয়দের মিসরকে মুক্ত করার লড়াই। আপনি আপনার বাহিনী দ্বারা বিদ্রোহ করাবেন। আপনাকে সামরিক শক্তি সরবরাহ করার দায়িত্ব আমাদের।'

খৃস্টান লোকটি স্ববিস্তার হাবীবুল কুদ্দুসকে তাদের পরিকল্পনা ব্যক্ত করে। হাবীবুল কুদ্দুস এখন আর আপত্তি করছেন না। বরং এমনভাবে প্রশ্ন করছেন, যেনো তিনি সম্মত হয়ে গেছেন।

'আমি কায়রো ফিরে না গেলে বিদ্রোহ কীভাবে করাবো?' হাবীবুল কুদ্দুস জিজ্ঞেস করেন।

'আপনাকে কায়রো যেতে হবে না'– খৃস্টান বললো– 'আপনি এখান থেকেই আপনার নির্ভরযোগ্য সঙ্গীদেরকে বার্তা প্রেরণ করবেন। বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা আমরা করবো। আপনি আমাদের একজন মূল্যবান লোককে হত্যা করে ফেলেছেন। সেই অপরাধে আমরা আপনাকে মেরে ফেলতে পারি। আমাদের বাহু এতো লম্বা যে, আপনার বংশের প্রতিজন সদস্যকে আমরা খুন করতে পারি। আপনি যদি আমাদেরকে ধোঁকা দেন, তাহলে আমরা তা-ই করে দেখাবো।'

'তার মানে, এখানে আমাকে বহুদিন থাকতে হবে।' হাবীবুল কুদ্দুস বললেন।

'কিছুদিন তো থাকতেই হবে।' খৃস্টান উত্তর দেয়।

'আমার একটি প্রয়োজন পূরণ করে দাও'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'তুমি আমাকে দু'টি মেয়ে পেশ করেছো। আমি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে চাই। এমনও হতে পারে, এরূপ রূপসী মেয়েদের জালে আটকা পড়ে আমি নিজের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যাবো। তার চেয়ে বরং আমার ছোট স্ত্রীকে এখানে এনে দাও। তার নাম যোহরা। আমি তাকে বার্তা আদান-প্রদানেও ব্যবহার করতে পারবো।'

'তাহলে তো তাকে অপহরণ করতে হবে'– খৃস্টান বললো– 'আমরা যদি বলি, আপনি তাকে আসতে বলেছেন, তাহলে তিনি বিশ্বাস করবেন না। তাছাড়া তিনি আমাদেরকে ধরিয়েও দিতে পারেন। বরং আমি আপনাকে যে উত্তম বিকল্প পেশ করেছি, আপনি তাই বরণ করে নিন। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য অন্য কারো ঠিকানা দেন।'

'তাহলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আমাকে কায়রো পৌঁছিয়ে দাও। আমি এক মাসের মধ্যে বিদ্রোহ করিয়ে দেবো।'

'এ হতে পারে না'– খৃস্টান বললো– 'আমরা যা কিছু করছি মুহতারাম! মিসরের স্বার্থেই করছি। আর তাতে আপনারও স্বার্থ আছে। আমি কিংবা আমার সংগঠনের কোন সদস্য মিসরের শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখি না। আপনি বুঝবার চেষ্টা করুন।'

'আমি বুঝে ফেলেছি'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আর আমি বুঝে-শুনেই কথা বলছি। তোমরা আমার স্ত্রী যোহরাকে আমার নিকট চলে আসতে সংবাদ পাঠাও। সে যে কাজ করতে পারবে, অন্য কেউ তা পারবে না। তার চলে আসার পর দেখবে, আমি কীভাবে পরিকল্পনা সফল করে তুলি।'

❖ ❖ ❖

যে মহিলা যোহরার পথ আগলে দাঁড়ালো, সে এক ভিখারিনী। মহিলা দু'তিন দিন যাবতই দেখে আসছে, প্রতি দিন দুপুরের পর যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসের ঘর থেকে বের হয়ে পিতার ঘরে যাচ্ছে। ভিখারিনী তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো– 'নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস আপনাকে যেতে বলেছেন। এই নিন তার নিজ হাতে লেখা চিঠি।'

যোহরা কাগজখানা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়ে। তার স্বামীরই হাতের লেখা। ভিখারিনী বললো– 'তিনি যেখানেই আছেন নিজে গেছেন। এতো বড়ো ব্যক্তিত্বটাকে কেউ তুলে নিয়ে যেতে পারে না। তিনি কেবলই আপনাকে কামনা করছেন এবং বলছেন, আমি যোহরাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না। আমি আপনাকে এও বলে দিচ্ছি, যদি আপনি আমাকে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন কিংবা পুলিশে খবর দেন, তাহলে দু'জনকেই হত্যা করা হবে। আপনার হাবীবুল কুদ্দুসের নিকট যাওয়া খুবই জরুরি।'

'আমি তোমাকে কীভাবে বিশ্বাস করবো?' যোহরা জিজ্ঞেস করে।

'আমি ভিখারিনী নই'– মহিলা জবাব দেয়– 'এটা আমার ছদ্মবেশ। আমিও আপনার ন্যায় রাজকন্যা। আমাদের উদ্দেশ মহৎ ও পবিত্র। আপনি মনে কোনো সংশয় রাখবেন না।'

মহিলা আরো এমন অনেক কথা বলে, যদ্বারা যোহরা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সে মহিলার কথা মতো রাতে একস্থানে চুপি চুপি উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সে এই ভয়ে কাউকে কিছু বলেনি যে, মহিলা বলেছিলো বিষয়টা আপনার ও আপনার স্বামীর জীবন-মরণের এবং মিসরের স্বাধীনতা ও গোলামীর সাথে সম্পৃক্ত।

রাতে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে যোহরাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ভিখারিনীর সঙ্গে দু'জন পুরুষ এসে হাজির হয়। অন্ধকারে যোহরা লোক দু'জনকে চিনতে পারেনি। ভিখারিনীকে চিনেছে তার কণ্ঠে। কিন্তু এখন তার ভিখারিনীর বেশ নেই– এক রূপসী তরুণী। সে যোহরাকে বললো– 'আল্লাহর উপর ভরসা করে এদের সঙ্গে চলে যান। অন্তরে কোনো ভয় রাখবেন না।'

যোহরাকে একটি ঘোড়ায় তুলে বসানো হয়। তারাও ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। যোহরা এমন এক সফরে রওনা হয়, যার গন্তব্য তার জানা

নেই। মহিলা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। শহর থেকে দূরে এক স্থানে পৌঁছে আরোহীরা যোহরাকে বললো, তোমার চোখে পট্টি বাঁধতে হবে। যোহরা একা। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শক্তি তার নেই। তার চোখে পট্টি বেঁধে দেয়া হলো।

দু'দিন পরে খবর হলো, নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুসের ছোট স্ত্রীও নিখোঁজ হয়ে গেছে। প্রাথমিক তদন্ত করা হলো। গোয়েন্দারা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় তাকে অপহরণ করা হয়েছে। হাবীবুল কুদ্দুস সম্পর্কেও সকলের ধারণা, তিনি ক্রুসেডার কিংবা সুদানীদের নিকট চলে গেছেন। এখন মানুষ বলছে, তার স্ত্রীও তার কাছে চলে গেছে। কেউ জানে না, মহিলা কখন কীভাবে গেছে।

এতোক্ষণে যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসের নিকট পৌঁছে গেছে। সেই কক্ষে তার চোখ খোলা হলো, যেখানে তার স্বামী তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। মেয়েটা এই গোটা রাত এবং আগের আধা দিন সফরে ছিলো। পথে খাওয়া-দাওয়ার সময় শুধু তার চোখ খুলে দেয়া হয়েছে। অপহরণকারীরা তার সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কথা বলেনি। তারা তাকে অভয় দিয়ে দিয়ে নিয়ে আসে।

হাবীবুল কুদ্দুসকে দেখার পর যোহরার দেহে প্রাণ ফিরে আসে। খৃস্টান লোকটা সঙ্গে আছে। হাবীবুল কুদ্দুস যোহরাকে বললো– 'ইনি আমাদের বন্ধু। আমরা এখানে কারো কয়েদি নই। তুমি অনেক ক্লান্ত। আজ রাতটা বিশ্রাম নাও। কাল সকালে বলবো, তোমাকে কী করতে হবে। তুমি অনেক সময় বলতে, তোমার পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ করতে ইচ্ছে হয়। আমার এই বন্ধু তোমার জন্য বেশ ভালো সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

খৃস্টান দু'জনকে একাকি রেখে বাইরে বেরিয়ে যায়।

যোহরা এখনো তরুণী। রূপে আকর্ষণ আছে। ছেলেবেলার চাঞ্চল্য, দুরন্তপনা এখনো পুরোপুরি বিদ্যমান। হাবীবুল কুদ্দুস যে দু'টি মেয়েকে পুকুরে গোসল করতে দেখেছিলেন, সন্ধ্যার খানিক আগে তারা যোহরার কক্ষে এসে পড়ে। এসেই এমনভাবে আলাপ জমিয়ে ফেলে, যেনো যোহরা তাদের বহুদিনের চেনা। তারা যোহরাকে অন্তরঙ্গ বান্ধবীর ন্যায় সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এলাকাটা ভয়ংকর এক ধ্বংসাবশেষ বটে, কিন্তু মেয়েগুলো যেখানে থাকে, সেটি এখন সাজানো-গোছানো কক্ষ। রঙিন

ঝাড়বাতি জ্বলছে। এই কক্ষে প্রবেশ করলে ধ্বংসাবশেষের কল্পনাও মনে আসে না। যোহরা অল্প সময়ে তাদের সঙ্গে মিশে যায়। এক মেয়ে যোহরাকে বললো– 'তোমার বাবা-মা কতো নিষ্ঠুর, তারা তোমার ন্যায় ফুটন্ত কলিটাকে এই বৃদ্ধের পায়ে নিক্ষেপ করেছে। লোকটা তোমাকে ক্রয় করেনি তো?'

'হ্যাঁ'– যোহরা বেদনামাখা কণ্ঠে বললো– 'তিনি আমাকে ক্রয় করেছেন। আমি পালিয়েও কোথাও যেতে পারছি না। আমার অন্য কোন আশ্রয়ও নেই।'

'আশ্রয় পেলে পালিয়ে যাবে?'

'সেই আশ্রয় যদি আমার বর্তমান জীবন থেকে উন্নত হয়, তাহলে অবশ্যই পালাবো'– যোহরা বললো এবং জিজ্ঞেস করলো– 'তিনি আমাকে এখানে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন? তোমরা কারা? তিনি আমাকে বিক্রি করছেন নাকি?'

'তুমি যদি আমাদের নিকট এসে পড়ো, তাহলে রাজকন্যা হয়ে থাকবে'– এক মেয়ে বললো– 'তোমাকে বলে দেবো, আমরা কারা। তবে তার আগে দেখতে হবে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকার যোগ্য কিনা। তুমি কি আমাদের সঙ্গে বাইরে গিয়ে আমাদের ন্যায় উলঙ্গ হয়ে পুকুরে গোসল করতে পারবে?'

'ঐ পশুটা থেকে আমাকে মুক্ত করে দাও, তো যা বলবে তা-ই করবো।' যোহরা উত্তর দেয়।

এক ব্যক্তি যোহরাকে খাওয়ার জন্য ডাকতে আসে। বললো, নায়েব সালার খাবার সামনে নিয়ে আপনার অপেক্ষা করছেন।

যোহরা চলে গেলে যে খৃস্টান লোকটি হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলো, সে কক্ষে প্রবেশ করে। মেয়েরা আনন্দ প্রকাশ করে বললো– 'মেয়েটা আমাদের কাজের এবং বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি তার প্রচণ্ড ঘৃণা। তুমি অনুমতি দিলে আমরা তাকে নিজেদের রঙে রঙিন করে নিতে পারি। দেখেছো তো, কতো রূপসী। চঞ্চলতা, দুরন্তপনা আছে। দেহ কঠোরতা সহ্য করতে পারবে। প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।'

'কিন্তু আমি ভাবছি লোকটা বলতো, এই স্ত্রীর উপর তার আস্থা আছে। বার্তা আদান-প্রদান করতে পারবে'– খৃস্টান বললো– 'মেয়েটা সত্যিই যদি লোকটাকে ঘৃণা করে থাকে, তাহলে তো সে তাকে ধোঁকা

দেবে এবং আমাদের প্রত্যেককে ধরিয়ে দেবে। তার অর্থ হচ্ছে, এ কাজে আমাদেরকে তাড়াহুড়া করা যাবে না। লোকটা আমাদের জালে এসে পড়েছে। আমাকে সে মিসরী মুসলমান ও দেশপ্রেমিক বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। সে আমাদের হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। মেয়েটা যদি তাকে ধোঁকা দিতে রাজি হয়, তাহলে আমরা তাকে ব্যবহার করতে পারি। আমি তাকে যাচাই করে দেখবো। তোমরা রাতে অল্প সময়ের জন্য তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমার কাছে রেখে কোনো এক বাহানায় তোমরা বেরিয়ে যাবে।'

আহারের কিছুক্ষণ পর মেয়েরা পুনরায় গল্প করার নাম করে যোহরাকে নিয়ে আসে। তারা তাকে পূর্বের চেয়ে বেশি ফ্রি বরং বলা চলে অনেকটা বেহায়া বানিয়ে ফেলেছে। খৃস্টান এসে উপস্থিত হলে যোহরাকে রেখে মেয়ে দুটো বেরিয়ে যায়। মেয়েরা যোহরার সঙ্গে যে ধারায় কথা বলেছিলো, পুরুষটিও একই ধারায় কথা বলে। খৃস্টান তাকে যাচাই যা করার করে এক পর্যায়ে বাহুতে আকড়ে ধরে কাছে টানতে শুরু করে। যোহরা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো– 'আমি এমন সস্তা নই যে, একটু ইঙ্গিত করলেই কারো কোলে লুটিয়ে পড়বো।'

উত্তরটা খৃস্টান লোকটার ভালো লাগে। যে কারো হাতে আসবার মতো মেয়ে নয়। তাদের গোয়েন্দা ও নাশকতাকারী মেয়েদের যেসব গুণ থাকে, এর মধ্যেও সেসব বিদ্যমান। সামান্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। যোহরা তাকেও বলেছে, স্বামীটার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা। কিন্তু যেহেতু সে বাধ্য এবং ঘৃণার কথা প্রকাশ করতে পারে না, তাই তিনি মনে করেন, আমি তাকে ভালোবাসি।

'এখনো ঘৃণা প্রকাশ করবে না'– খৃস্টান বললো– 'আমি তোমাকে তার থেকে মুক্ত করিয়ে দেবো। তুমি রাজকন্যাদের ন্যায় জীবন-যাপন করবে। তুমি এখানেই বসে থাকো। আমি তোমার বান্ধবীদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

খৃস্টান কক্ষ থেকে বেরিয়ে মেয়েদের নিকট চলে যায়। বললো– 'মেয়েটা কাজের। নিজেদের ছায়ায় নিয়ে নাও। হাবীবুল কুদ্দুস মেয়েটাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে। আমরা তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে নিয়ে সংবাদ আদান-প্রদানে কাজে লাগাবো। তাকে জালে আটকানো তোমাদের কাজ। রাজকীয় জীবনের মুলা দেখাও। আর তাকে কী উদ্দেশ্যে কীভাবে প্রস্তুত করতে হবে, তোমরা জানো।'

যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা প্রকাশ করতে থাকে এবং খৃস্টান পুরুষ ও মেয়ে দুটোকে বলতে থাকে, স্বামীর প্রতি আমার অন্তহীন ঘৃণা। মেয়ে দুটো তাকে সঙ্গে রাখতে এবং বাইরে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। ঝরনার পুকুরে নিয়ে গেলে যোহরা অবলীলায় পরিধানের সমুদয় কাপড় খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পুকুরে নেমে মেয়ে দুটোর সঙ্গে খেলতে শুরু করে। তারপর এটা তার নিত্যদিনের কর্মসূচিতে পরিণত হয়ে যায়। যোহরা রাত কাটাচ্ছে স্বামীর সঙ্গে। আর দিবস অতিবাহিত করছে মেয়ে দুটোর সাথে। মাঝে-মধ্যে দিনের বেলা খৃস্টান পুরুষও তার সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ কথাবার্তা বলছে। চার-পাঁচ দিনেই যোহরা সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে মেয়ে দুটোর রঙে রঙিন হয়ে যায়। তার চাঞ্চল্য ও দুরন্তপনা বেহায়াপনার রং ধারণ করতে শুরু করেছে। মেয়েরা ধীরে ধীরে তাকে তাদের রহস্যময় জীবন সম্পর্কে ধারণা দিতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যে খৃস্টান লোকটি হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলেছে। পরিকল্পনা প্রণয়নে হাবীবুল কুদ্দুস তাকে বেশ সাহায্য করেছেন। হাবীবুল কুদ্দুস এখন তার পূর্ণ আস্থাভাজন ব্যক্তি। সে হাবীবুল কুদ্দুসকে মিসরী ফৌজের দু'জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ দু'জন অফিসারের নাম বলে, যারা গোপনে গোপনে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরোধিতা করছে এবং বিদ্রোহের কথা চিন্তা করছে। হাবীবুল কুদ্দুসকে হাত করার চিন্তা প্রথমে তাদেরই মাথায় আসে। এই খৃস্টান লোকটি নিজেকে দেশপ্রেমিক মিসরী মুসলমান পরিচয় দিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। তার দায়িত্ব মিসরে সেনা বিদ্রোহ ঘটানো।

যোহরা মেয়ে দুটোর সঙ্গে এমনভাবে একাকার হয়ে যায় যে, এখন বলার উপায় নেই, মেয়েটা কোনো সম্ভ্রান্ত পিতা-মাতার কন্যা এবং একজন মুসলিম নায়েব সালারের স্ত্রী। হাবীবুল কুদ্দুস তাকে নিজের অনুগত স্ত্রী মনে করতেন।

একদিন যোহরা মেয়েদের বললো, এই জীর্ণ ভবন আর পর্বতবেষ্টিত জগতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছি। মেয়েরা বললো, ঠিক আছে, আমরা তোমাকে এই বাইরের জগত দেখানো ব্যবস্থা করবো। তারা এক পার্বত্য পথে তাকে একটি ঝিলের কিনারায় নিয়ে যায়। কূল বেয়ে বেয়ে আরো অগ্রসর হলে সে নীলনদ দেখতে পায়। এই নীল নদেরই পানি

পার্বত্য অঞ্চলে ঢুকে ঝিলের সৃষ্টি হয়েছে। এক স্থানে এক পাহাড়ের আড়ালে একটি নৌকা বাঁধা আছে। তাতে বৈঠা ও দু'টি দাঁড় আছে। জায়গাটা খুবই সুদৃশ্য ও মনোরম। যোহরা মেয়েদের সঙ্গে সেখানে হাসি-তামাশা করতে থাকে।

'এখানে ফেরাউনদের রাজকন্যারা খেলা করতো।' এক মেয়ে বললো।

'আর তোমরা দু'জন তাদের প্রেতাত্মা।' যোহরা রসিকতা করে।

'তোমার তুলনায় আমরা প্রেতাত্মা-ই।' অপর মেয়ে বললো।

'শোনো যোহরা!'– এক মেয়ে বললো– 'তুমি কি বুঝতে পেরেছো, তোমার এই বৃদ্ধ স্বামী এখানে কেনো লুকিয়ে বসে আছে এবং তোমাকে কেনো ডেকে এনেছে?'

'সে তো প্রথম দিনই আমাকে বলে দিয়েছেন'– যোহরা বললো– 'আমি কাজটা করে দেবো। কিন্তু তিনি কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে বলছেন।'

'আর তুমি কি জানো, আমরা স্বাধীন মিসরের রাজকন্যা হবো?'

'আমাকে যদি এই স্বামী থেকে মুক্ত করিয়ে দিতে পারো, তাহলে আমি তোমাদেরকে রাজকন্যা মনে করবো।' যোহরা বললো।

'সে পরিকল্পনা ঠিক হয়ে আছে'– এক মেয়ে বললো– 'কিন্তু তোমার স্বামী বিষয়টা জানে না। এ ক্ষেত্রে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে তুমি কি তার জন্য প্রস্তুত আছো?'

'সময় আসলেই দেখবে'– যোহরা বললো– 'আমার যদি এ কাজটা করতে না হতো, তাহলে স্বামীকে এখানেই খুন করে ফেলতাম। ভালোই সুযোগ ছিলো।'

যোহরা পরদিনও মেয়েদের সঙ্গে নদীর কূলে চলে যায়। মেয়েরা তাকে যে পথে নদী পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে, একা গেলে এ পর্যন্ত যোহরা পথ খুঁজে পেতো না। পথটা প্রাকৃতিক এবং গোপন। যোহরা আবদার জানায়, চলো আমরা নৌকায় চড়ে নদীতে বেড়িয়ে আসি। কিন্তু মেয়েরা তাতে অসম্মতি জানায়।

হাবীবুল কুদ্দুসের উপরও এখন আগের মতো পাবন্দি নেই। তিনি নিশ্চিত করেছেন, তিনি স্বাধীন মিসরের সমর্থক এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর মসনদ না উল্টিয়ে ক্ষান্ত হবেন না। এখন তিনি আগ বাড়িয়ে কথা বলছেন। এক অভাবিতপূর্ব বিপ্লব এসে গেছে তার মধ্যে।

এক-দু'দিন পর ভগ্ন প্রাসাদে আরো দু'জন লোক আসে। একজন সুদানী, অপরজন মিসরী। তাদেরকে হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো হলো। তিনি তাদেরকে চেনেন না। তাদের সঙ্গে সুদান, মিসর ও আরবের মানচিত্র আছে। আছে কিছু কাগজপত্রও।

তারা হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে বিদ্রোহের বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘ আলাপ করে। হাবীবুল কুদ্দুস শুধু আন্তরিকতাই প্রকাশ করেননি– বরং তাদেরকে এমন সব পরামর্শ প্রদান করেন, যা ইতিপূর্বে তাদের মাথায় আসেনি। তারা হাবীবুল কুদ্দুসকে আরো কয়েক ব্যক্তির নাম জানায়, যারা মিসরের ফৌজ ও প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং গোপনে গোপনে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে পরিবেশ সৃষ্টি করছে। লোক দু'জন আরো জানায়, মিসরের সীমান্ত এলাকায় মিসরী ফৌজের যে বাহিনীটি কর্তব্য পালন করছে, তাদেরকে ভুল নির্দেশ দিয়ে সীমান্ত প্রতিরক্ষায় এমন একটা ফাঁটল ধরাতে হবে, যার সুযোগে সুদানের কিছু সৈন্য ভেতরে অনুপ্রবেশ করে বিদ্রোহে সহযোগিতা দিতে পারে।

'বিদ্রোহ সফল হলে মিসরের আমীর কে হবেন?' হাবীবুল কুদ্দুস জিজ্ঞেস করেন।

'সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, স্বাধীন সেনাপতি আপনি হবেন। সেই সুবাদে আমীরও হবেন আপনিই।' মিসরী বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবী আক্রমণ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই এবং যুদ্ধ দীর্ঘরূপ লাভ করতে পারে। সে কারণে স্বাধীন মিসরের প্রথম আমীর প্রধান সেনাপতিই হওয়া যুক্তিযুক্ত। কেননা, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অসামরিক লোককে ক্ষমতার গদিতে বসানো ঠিক হবে না। আর আপনার মধ্যে যে গুণাবলী আছে, অন্য কোন সালারের মধ্যে তা নেই।'

হাবীবুল কুদ্দুসের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে যায়। বুকটা ফুলে যায়। ঘাড়টা মোটা হয়ে যায়। মিসরের আমীর হওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

'প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা খৃষ্টানদের থেকেও সাহায্য নেয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি। আশা করি, এতে আপনার কোনো আপত্তি থাকবে না।' সুদানী বললো।

'তাদেরকে বিনিময়টা কীভাবে দেবেন?' হাবীবুল কুদ্দুস জিজ্ঞেস করেন।

'তাদের জন্য বিনিময় এটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো এবং মিসরকে তার থেকে মুক্ত করবো'–

মিসরী বললো– 'তারা মিসর চায় না। তারা ফিলিস্তীনকে আইউবীর হাত থেকে রক্ষা করার কাজে ব্যস্ত। মিসর হাতছাড়া হয়ে গেলে আইউবী মিসরের সেনাবাহিনী, এখানকার রসদ ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বেন। তিনি মিসরের উপর আক্রমণ চালালে তার সঙ্গে যেসব মিসরী সৈন্য আছে, তারা তাদের মিসরী ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। খৃস্টানদের জন্য এ এক বিরাট পাওয়া।'

হাবীবুল কুদ্দুস তাদেরকে চমৎকার চমৎকার সব বুদ্ধি শিখিয়ে দেন এবং তাদের নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, আমার অধীনে যে পাঁচ হাজার সৈন্য আছে, তারা আমার এক ইঙ্গিতে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য রাজি করানোর পন্থা কী হবে।

'এক হতে পারে, আমি ফেরত চলে যাবো'-- হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'এটিই উত্তম পন্থা। তবে আমার ফেরত না যাওয়াই উচিত। কারণ, গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোথায় ছিলাম। যোহরা আমাকে বলেছে, আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস বলছেন, আমি আপন মর্জিতে শত্রুর নিকট চলে এসেছি। ফিরে গেলে এই সন্দেহের ভিত্তিতে তারা আমাকে হেফাজতে নিয়ে নেবেন। তারপর শুরু হওয়ার আগেই আমাদের খেল খতম হয়ে যাবে। আমি আসলে স্ত্রীকে এখানে ডেকে এনে ভুল করেছি। যদি তাকেও ফেরত পাঠিয়ে দেই, তার সঙ্গেও অসদাচরণ করা হবে। আমাকে এখানেই থাকতে হবে। আপনারা আমাকে ভাববার সুযোগ দিন, আমি কোন্ কোন্ কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করবো।'

হাবীবুল কুদ্দুসের অফাদারিতে আর কোনো সন্দেহ থাকলো না।

❖ ❖ ❖

'হাল্‌বের অবরোধ তামাশা হবে না'– সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ফোরাতের তীরে বসে তাঁর সালারদের বলছেন– 'তোমাদের প্রত্যেকের স্মরণ থাকবে, পূর্বেও একবার আমরা এই নগরীটা অবরোধ করেছিলাম। কিন্তু হাল্‌বের মানুষ এমন প্রাণপণ লড়াই করে যে, আমরা অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে ছিলো হাল্‌ববাসীদের বীরত্ব, যা আমাদেরকে ফিরে আসতে বাধ্য করেছিলো। এখন সেই পরিস্থিতি নেই। তথাপি আমাদেরকে প্রতিটি আশঙ্কার মোকাবেলা করার প্রস্তুতি

নিয়ে রাখতে হবে। এখান থেকে ফৌজে যে ভর্তি নেয়া হয়েছে, তাদের উপর এখনো ভরসা করা যাবে না। মিসর থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠানোর প্রয়োজন হতে পারে। আমি নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুসের বাহিনীটাকে নিয়ে আসবো।' বলেই সুলতান নীরব হয়ে যান। তার চেহারার রং বদলে যায়। তিনি চাপা চাপা কণ্ঠে বললেন– 'আমি মানতে পারছি না, হাবীবুল কুদ্দুস আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। লোকটা গেলো কোথায়? আমি যখন মিসর থেকে রওনা হই, তখন সে আমাকে বলেছিলো, আপনি মিসরের চিন্তা মাথা থেকে ফেলে দিন। ক্রুসেডার কিংবা সুদানীদের যদি আপনার অনুপস্থিতিতে মিসরের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে আমার তিন হাজার পদাতিক আর দুই হাজার অশ্বারোহী তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে দেবে। আর যদি মিসরের ভেতর থেকে কেউ মাথা জাগায়, তাহলে তার মাথা ধড়ের সঙ্গে থাকতে পারবে না। আমরা আল্লাহর সৈনিক। কিন্তু হাবীবুল কুদ্দুস তো আল্লাহর সিংহ ছিলো।'

'মনে হয় তার এসব গুণাবলী দেখেই দুশমন তাকে গুম করে ফেলেছে'– এক সালার বললেন– 'আমাদের অর্ধেক ফৌজের উপর তার গভীর প্রভাব রয়েছে। এদিক থেকে তিনি স্বয়ং একটি শক্তি। দুশমন আমাদেরকে সেই শক্তি থেকে বঞ্চিত করে দিলো।'

'তাকে যদি খুঁজে না-ই পাওয়া গেলো, তাহলে তার বাহিনীকে এখানে নিয়ে আসবো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তবে এতো তাড়াতাড়ি ডাকবো না। মিসরের প্রতিরক্ষা বেশি জরুরি। আশঙ্কার ব্যপার হচ্ছে, মিসরের বাইরে থেকে অতোটুকু সমস্যা নেই, যতোটুকু ভেতর থেকে আছে। ঈমান বিক্রেতারা আমাদের ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারা ফিলিস্তীনকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পরম বিশ্বস্ত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন নায়েব সালার কায়রো থেকে দূরে পাহাড়বেষ্টিত এক ভীতিকর জীর্ণ প্রাসাদে বসে মিসরে বিদ্রোহ করার সকল আয়োজন-পরিকল্পনা সম্পন্ন করে ফেলেছেন। এখন রাত। জীর্ণ প্রাসাদে উৎসব চলছে। বাইরে থেকে কোনো লোক এখানে এলে ভয়ে পালিয়ে যেতো। এই গোটাকতক পুরুষ আর রূপসী মেয়েদের দেখলে জিন-পরী মনে করতো।

এরা আট-দশজন পুরুষ। হাবীবুল কুদ্দুস প্রথম দিন থেকে পরিচিত খৃস্টান লোকটা আর পরে আসা মিসরী ও সুদানী লোক দু'জনকে ছাড়া

আর কাউকে চেনেন না। অন্যদেরকে এই আজই প্রথমবার দেখলেন। তারা সকলে এই প্রাসাদে হাবীবুল কুদ্দুসের আগমনের পূর্ব থেকেই অবস্থান করছে। কিন্তু তারা পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে লুকিয়ে পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। হাবীবুল কুদ্দুস পালাতে গিয়ে যে লোকটাকে হত্যা করেছিলেন, এরা তারই সহকর্মী। এখন আর পাহারার প্রয়োজন নেই। হাবীবুল কুদ্দুস তাদের বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেছেন। তারা গোপনে গোপনে তাকে পরীক্ষাও করে দেখেছে।

আজ রাত পুরো দলটি উৎসবে উপস্থিত। কোনো রাজপ্রাসাদে যেরূপ নিমন্ত্রণের আয়োজন করা হয়, আজ এখানেও অনুরূপ আয়োজন করা হয়েছে। একের পর এক মদের সোরাহি শূন্য হচ্ছে। মেয়ে দুটো নাচ দেখিয়েছে। হাবীবুল কুদ্দুস অনুষ্ঠানে শরীক ছিলেন। কিন্তু তিনি মদপান করতে অস্বীকার করেন। তাকে বাধ্য করা হলো না। যোহরা অন্য মেয়েদের ন্যায় মদ পরিবেশন করে। কিন্তু নিজে পান করেনি। খৃস্টান লোকটি সুদানী ও মিসরীয়কে যোহরা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলে দিয়েছে। অন্যথায় হাবীবুল কুদ্দুস বিগড়ে যেতে পারে। যোহরা অনুষ্ঠানের আনন্দ-উল্লাসে অংশগ্রহণ করলেও অন্য মেয়েদের ন্যায় অশ্লীলতা প্রদর্শন করেনি।

মধ্যরাত নাগাদ সকলে মদে মাতাল হয়ে অচেতন হয়ে পড়ে। মিসরী ও সুদানী লোকটি মেয়ে দুটোকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসকে চোখে ইশারা করে। হাবীবুল কুদ্দুস উঠে যান। মিসরী ও সুদানী মেয়ে দুটোকে নিয়ে যে কক্ষে গিয়েছিলো, যোহরা সেই কক্ষে উঁকি দিয়ে তাকায়। চারজনই বিবস্ত্র পড়ে আছে। একজনেরও সংজ্ঞা নেই। ওদের অস্ত্র কোথায় থাকে, যোহরার জানা আছে। সে একটা বর্শা, একটা তরবারী, দুটো ধনুক ও তীর ভর্তি দু'টিকে তূনীর তুলে নেয়। হাবীবুল কুদ্দুস তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। যোহরা এলে তিনি তার হাত থেকে তরবারীটা নিয়ে নেন। একটা ধনুক ও একটা তূনীর কাঁধে ঝুলিয়ে নেন। আরেকটা তূনীর ও বর্শা যোহরার কাছেই থেকে যায়।

'এদের সব ক'জনকেই হত্যা করবো?' যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসকে জিজ্ঞেস করে।

'আমাদের এক্ষুনি বেরিয়ে যাওয়া আবশ্যক'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আমাকে নদী পর্যন্ত নিয়ে চলো।'

যোহরা পথটা দেখে রেখেছে। আগে না দেখলে এ পথে বের হওয়ার সাধ্য তাদের ছিলো না। যোহরা আগে আগে হাঁটতে শুরু করে। তারা পা টিপে টিপে হাঁটছে। কান চারটা একদম খাড়া। যোহরা বর্শা আর হাবীবুল কুদ্দুস তরবারী তাক করে রেখেছে।

যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসকে নৌকার কাছে নিয়ে যায়। এটি খৃষ্টানদের লুকিয়ে রাখা নৌকা। দু'জনে বাঁধন খুলে নিয়ে নৌকায় চড়ে বসে। হাবীবুল কুদ্দুস আস্তে আস্তে দাড় বাইতে শুরু করে, যাতে শব্দ না হয়। প্রতি মুহূর্তে এবং প্রতি পদে ভয়, কোনো না কোনো দিক থেকে কেউ বেরিয়ে আসে কিনা কিংবা কোনো দিক থেকে তীর ছুটে আসে কিনা। কিন্তু কিছুই হলো না। নৌকা পর্বতমালার সরু পথে বেরিয়ে যায়। নদীর শোর কানে আসতে শুরু করে।

'আল্লাহর নাম নাও যোহরা!'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আর একটা দাড় তুমিও হাতে নাও। তুমি জিহাদে অংশ নেয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিলে। আল্লাহ তোমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা এখনো বিপদ থেকে বের হইনি। নৌকাটা নদীর মাঝে নিয়ে চলো।'

দু'জনে দাড় বাইতে শুরু করে। নৌকা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। পর্বতমালার কালো দৈত্যগুলো পেছনে সরে যেতে এবং ধীরে ধীরে ছোট হতে শুরু করেছে।

পানিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ নীলনদ। সময়টা নদ-নদীর ভর যৌবনের। কূল ঘেঁষে ঘেঁষে স্রোতের গতিতে চলা নিরাপদ। মাঝে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা একটির উপর একটি আছড়ে পড়ছে। কাজেই, মাঝ নদী অনিরাপদ। কিন্তু কূল ঘেঁষে চলায় অন্যদিকে ঝুঁকিপূর্ণ। শত্রুর তীর এসে ইহলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে দু'জনের। অগত্যা কূল ত্যাগ করে মাঝ পথেই যাওয়াই শ্রেয় মনে করলেন হাবীবুল কুদ্দুস।

নৌকার গতি ঘুরিয়ে দিলেন মাঝের দিকে। শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে হঠাৎ অনুভব করলেন, কোনো একটা শক্তি তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। শক্তিমান ঢেউ মাথায় করে নৌকাটা উপরে তুলছে, আবার আছড়ে ফেলে দিচ্ছে। স্রোতের গতিতে নৌকা এগিয়ে চলছে তর তর করে। হাবীবুল কুদ্দুস যোহরাকে বললেন– 'ভয় পেও না। আমরা ডুববো না। আমি দিকটা একটু নির্ণয় করে নিই।'

'আপনি আমার চিন্তা করবেন না'– যোহরা বললো– 'ডুবে যদি যাই তো কী হবে? কাফেরদের কবল থেকে তো বেরিয়ে এসেছি।'

হাবীবুল কুদ্দুস চোখ তুলে পর্বতমালার দিকে তাকান। উঁচু উঁচু পর্বতগুলো এখন মাটির টিপির ন্যায় মনে হচ্ছে। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন– 'আমি এ জায়গাটা চিনি। এই অঞ্চলেরই এক স্থানে আমি আমার বাহিনীকে পাহাড়ি যুদ্ধের মহড়া করিয়েছিলাম। এদিকে নদীর দিকটা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না। আমরা সোজা কায়রোই যাচ্ছি। নীলনদ আমাদেরকে অতি দ্রুততার সাথে কায়রো নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর শোকর আদায় করো যোহরা। এটা আল্লাহর সাহায্য। আল্লাহ মানুষের নিয়ত বোঝেন। তবে আমাদেরকে কায়রোর আগে অন্য এক স্থানে থামতে হবে। কিছুদূর আগে নদীর বাঁক আছে। তারই সন্নিকটে আমাদের ফৌজের চৌকি। সামুদ্রিক টহলের জন্য তাদের কাছে অনেক নৌকা আছে। এ চৌকির সৈন্যদের দ্বারাই আমরা ওদের সকলকে পাকড়াও করাতে পারবো। কিন্তু তারা সজাগ হয়ে যাবে।'

'আমি আশা করি, কাল দুপুর পর্যন্ত তাদের একজনেরও ঘুম ভাঙবে না'– যোহরা বললো– 'তারা আমার হাতে মদ খানিকটা বেশিই পান করেছে। আমি ভরা সোরাহী থেকে তাদেরকে যে এক এক পেয়ালা করে পান করিয়েছিলাম, তাতে খাকি বর্ণের সামান্য পাউডার মিশিয়ে দিয়েছি।'

'ওটা কী জিনিস?'

'মেয়ে দুটোর হৃদয়ে আমি কী পরিমাণ আস্থা অর্জন করে নিয়েছিলাম, তাতো আমি প্রতি রাতে আপনাকে অবহিত করেছি'– যোহরা বললো– 'গতকালের ঘটনা। তারা আমাকে হাশিশ দেখিয়ে তার ব্যবহার প্রণালী বুঝিয়ে দিয়েছে। পড়ে একটি ডিবা খুলে আমাকে এই পাউডারগুলো দেখিয়ে বললো, কোনো কোনো লোককে অনেক সময় অজ্ঞান করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এখান থেকে সামান্য পাউডার শরবত পানি কিংবা খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর তাকে যেখানে খুশি তুলে নিয়ে যাও। আজ রাত যখন আমি মটকা থেকে সোরাহী ভরতে গেলাম, তখন ওখান থেকে অর্ধেক পাউডার তাতে মিশিয়ে নিয়েছিলাম। বস্তুটার ক্রিয়া যদি সেরূপই হয়, যেরূপ মেয়েরা বলেছে, তাহলে কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের সংজ্ঞা ফিরে আসবার কথা নয়।'

হাবীবুল কুদ্দুসের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করে। এ অশ্রু আনন্দের। এ অশ্রু আবেগের। এ অশ্রু যোহরার কৃতিত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসার। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বললেন– 'আমি তোমাকে অনেক কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলাম যোহরা। তোমাকে আমি যে জগতের রহস্য উদঘাটনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, সে হচ্ছে পাপের, নোংরা অথচ অত্যন্ত সুদৃশ্য জগত। আমার জন্য তুমি অনেক কুরবানী দিয়েছো।'

'আপনার জন্য নয়– ইসলামের জন্য'– যোহরা বললো– 'আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, আপনি আমাকে এই পবিত্র কর্তব্য পালনের সুযোগ দিয়েছেন। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, আমি পাপের সেই চিত্তাকর্ষক জগতে গিয়েও নিজের আঁচলকে পাপ থেকে পবিত্র রেখেছি। ভালোই হলো যে, এখানে নিয়ে আসার পর তারা আমাকে আপনার সঙ্গে নির্জনে থাকতে দিয়েছে। অন্যথায় আপনি আমাকে জানাতে পারতেন না, তারা আপনাকে বিদ্রোহ করার জন্য অপহরণ করেছে। আচ্ছা, আপনি কি আমাকে এ কাজের জন্যই ডেকে পাঠিয়েছিলেন?'

'না'– হাবীবুল কুদ্দুস উত্তর দেন– 'এ পন্থাটা তোমার আসার পরে আপনা থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি অন্য কিছু চিন্তা করেছিলাম। তোমাকে আমার মুক্তির জন্য ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিলো। ইচ্ছা ছিলো, তোমাকে বার্তাবাহক বানাবো। কিন্তু এখানে এসে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার পর আমার মাথায় এ বুদ্ধিটা আসে। তোমার বুদ্ধিমত্তা ও সাফল্যে এখন আমরা মুক্ত। আমরা বাড়াবাড়ি না করে লোকগুলোর প্রতি আস্থা ও সমর্থন জ্ঞাপন করি। আমি জানতাম, ওরা অস্বাভাবিক চালাক হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা যদি ঈমান ও হুঁশ-জ্ঞান অটুট রাখি, তাহলে ওরা নির্বোধ। আমার সঙ্গে তুমি যে লোকটাকে দেখেছিলে, সে নিজেকে মিসরী মুসলমান দাবি করতো। আমি প্রথম দিনই বুঝে ফেলেছি, লোকটা খৃস্টান এবং আমি খৃস্টানদের জালে এসে পড়েছি।'

❖ ❖ ❖

পাহাড়ি অঞ্চল থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছেন হাবীবুল কুদ্দুস ও যোহরা। মাঝ নদীটা এখন পূর্বের চেয়ে বেশি উত্তাল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নৌকাটা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নীলের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়েছে। দাড়-বৈঠা কোনো কাজ করছে না। নদীর উতলার তীব্রতায় বোঝা যাচ্ছে, এ

স্থানটায় এসে নদী সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এই সেই বাঁক, যার সম্মুখে মিসরের সামরিক চৌকির অবস্থান। হঠাৎ নৌকা দাঁড়িয়ে গিয়ে চক্কর কেটে ঘুরে যায়। হাবীবুল কুদ্দুস বৈঠাটা শক্ত করে ধরে রেখেছেন। নদীর শোর আরো বেড়ে গেছে। নৌকা ঘূর্ণিপাকে পড়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস নৌকার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম হলেন না। দুই আরোহীসহ নৌকা নীলের অতলে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

'যোহরা'– হাবীবুল কুদ্দুস চীৎকার করে বললেন– 'আমার পিঠে চড়ে বসো।'

যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসের পিঠে সওয়ার হয়ে উভয় বাহু দ্বারা শক্তভাবে গলায় জড়িয়ে ধরে রাখে। হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আরো শক্ত করে ধরো। আমার থেকে আলাদা হয়ো না।' বলেই পাকের উপর সাঁতরাতে সাঁতরাতে নৌকা থেকে এমনভাবে লাফিয়ে পড়েন, যেনো ঘূর্ণিপাক থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন।

হাবীবুল কুদ্দুস যোহরাকে নিয়ে পানির ভেতর চলে যান এবং দেহের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে আবার ভেসে ওঠেন। তিনি ঘূর্ণিপাক থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু জায়গাটা বাঁক। উভয় দিকে চড়া। ফলে তরঙ্গ অত্যন্ত উঁচু এবং বিক্ষুব্ধ। যোহরা সাঁতার জানে না। সে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে শুরু করে। হাবীবুল কুদ্দুস তাকে পিঠে বহন করে তরঙ্গমালার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তার ও যোহরার মুখ যাতে পানির বাইরে থাকে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ ঢেউ বারংবার তাকে ডুবিয়ে উপর দিয়ে অতিক্রম করছে।

ঊর্মিমালা হাবীবুল কুদ্দুসকে নদীর বাঁক থেকে বের করে নিয়ে যায়। এবার নদীটা চওড়া হয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুসের বাহু ও পা অবশ হয়ে গেছে। তিনি শক্তির শেষ বিন্দুটুকু একত্রিত করে এই স্রোত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জোর চেষ্টা চালাতে শুরু করেন। তিনি অনুভব করেন, যোহরার বন্ধন ঢিলা হয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস বুঝে ফেলেন, যোহরার মুখ ও নাকের পথে পানি ঢুকে গেছে। তাকে রক্ষা করা ও নিজে সাঁতার কাটা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তিনি এক হাতে যোহরাকে ধরে সর্বশক্তি ব্যয় করে সাঁতার কেটে খরস্রোত থেকে বেরিয়ে যান। কূল এখনো অনেক দূরে। এখন সাঁতার কাটা সহজ হয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে শুরু করেন।

হাবীবুল কুদ্দুসের দেহটা নিস্তেজ হয়ে আসে। যোহরাও তার হাত

থেকে ছুটে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমন সময় একটা নৌকা তার নিকটে এসে যায়। কানে শব্দ ভেসে আসে– 'কে?' হাবীবুল কুদ্দুস শেষবারের মতো অবশ হাতটা উপরে তোলে খপ করে নৌকার কিনারা ধরে ফেলে বলে ওঠেন– 'ওকে আমার পিঠ থেকে তুলে নাও।' নৌকার লোকেরা যোহরাকে টেনে উপড়ে তুলে নেয়। মেয়েটা চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে। নৌকাটা তারই বাহিনীর। এখানেই তাদের চৌকি। তারা হাবীবুল কুদ্দুসের ডাকে এদিকে এসেছে।

চৌকিতে পৌঁছে হাবীবুল কুদ্দুস জানান, আমি নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস। চৌকির কমান্ডার তাকে চিনে ফেলেন এবং অত্যন্ত বিস্মিত হন। যোহরা অচেতন পড়ে আছে। হাবীবুল কুদ্দুস তাকে উপুড় করে শুইয়ে পিঠ ও পাজরে সজোরে চাপ দেন। তাতে মুখ ও নাকের পথে অনেক পানি বেরিয়ে আসে। তবে এখনো তার সংজ্ঞা ফিরে আসেনি। হাবীবুল কুদ্দুস কমান্ডারকে বললেন, দু'টি বড় নৌকায় দশ দশজন করে সৈনিক আরোহণ করাও এবং পার্বত্য অঞ্চলের দিকে রওনা হও। তিনি জানান, পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে যে পুরাতন জীর্ণ প্রাসাদ আছে, তাতে দশ-বারোজন খৃস্টান সন্ত্রাসী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। তাদেরকে তুলে আনতে হবে। আমার স্থল পথের রাস্তাটা জানা নেই।'

'আমি চিনি'– কমান্ডার বললো– 'স্থল পথেই যাওয়া সহজ হবে।'

বিশজন অশ্বারোহীর সম্মুখে হাবীবুল কুদ্দুস ও চৌকির কমান্ডার। ভোরের আলো এখনো ফোটেনি। আবছা অন্ধকার। তারা পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়েছে। নীরবতার খাতিরে ঘোড়াগুলো বাইরেই রেখে তারা পায়ে হেঁটে এগিয়ে যায়। নদী হাবীবুল কুদ্দুসের দৈহিক শক্তি চুষে নিয়েছিলো। তারপরও হাঁটছেন তিনি। স্ত্রীকে অচেতন অবস্থায় চৌকিতে রেখে এসেছেন। স্ত্রীকে সারিয়ে তোলার চেয়ে বেশি প্রয়োজন সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার। পাহাড়-টিলার সরু অলি-গলি অতিক্রম করে এগিয়ে যায় তারা। কিছুক্ষণ পর প্রাসাদ চোখে পড়তে শুরু করে।

সবার আগে হাবীবুল কুদ্দুস খৃস্টানকে দেখতে পায়। তার পা দুটো টলমল করছে। মাথাটা এদিক-ওদিক দুলছে। তাকে পাকড়াও করা হলো। সে বিড় বিড় করে ওঠে। সাত-আটজন লোক রাতে যেখানে শুয়েছিলো, সেখানেই অচেতন পড়ে আছে। এক কক্ষে সুদানী, মিসরী এবং মেয়ে দুটো বিবস্ত্র ও বেহুঁশ পড়ে আছে। সৈনিকরা তাদের

প্রত্যেককে তুলে নেয়। তাদের মালামাল তুলে নেয়া হলো। সব ক'জনকে ঘোড়ার পিঠে তুলে চৌকিতে নিয়ে আসা হলো। অতোক্ষণে যোহরার চৈতন্যও ফিরে এসেছে।

দুপুরের পর থেকে বন্দিদের হুঁশ ফিরে আসতে শুরু করেছে। এখন তারা কায়রোর পথে। লোকগুলো ঘোড়ার সঙ্গে বাধা। বিশজন সৈনিক তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হাবীবুল কুদ্দুস তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলছেন না। কাফেলা চলতে থাকে।

মধ্যরাতের পর আলী বিন সুফিয়ানের চাকর তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে বললো, গবর্নর আপনাকে ডেকেছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গবর্নরের কক্ষে চলে যান। গিয়াস বিলবীসও সেখানে উপস্থিত। হাবীবুল কুদ্দুসকে উপবিষ্ট দেখে আলী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। হাবীবুল কুদ্দুস সেই সকল সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নাম বললেন, যাদের ব্যাপারে খৃস্টান সন্ত্রাসীদের আস্তানা থেকে জেনে এসেছেন। এরা বিশ্বাসঘাতক। এদের বিদ্রোহ সফল করে তোলার কাজে অংশগ্রহণের কথা ছিলো। ভারপ্রাপ্ত গবর্নর তকিউদ্দীনের নির্দেশে লোকগুলো ঘরে ঘরে তৎক্ষণাৎ হানা দেয়া হলো এবং সব ক'জনকে গ্রেফতার করা হলো। তাদের ঘর থেকে যেসব হীরা-জহরত, সোনা-মাণিক্য উদ্ধার হয়েছে, তা-ই তাদের অপরাধ প্রমাণ করছিলো।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী হাল্‌ব অবরোধের লক্ষ্যে নগরীর সন্নিকটে আল-আখদার নামক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন। তিনি সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে নিজ বাহিনীর কিছু কিছু সৈন্য তলব করে এনেছেন। হাল্‌ব সম্পর্কে সালারদের বলে রেখেছেন, এই নগরীর সাধারণ মানুষ মরণপণ লড়াই করবে, যেমনটি প্রথমবারের অবরোধে করেছিলো। যদিও ভেতর থেকে তাঁর গোয়েন্দারা রিপোর্ট করেছিলো, কয়েক বছরের গৃহযুদ্ধে হাল্‌বের অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। সুলতান সতর্ক থাকার পক্ষপাতি। ওখানকার শাসক এখন ইমাদুদ্দীন, যিনি শাসক হিসেবে জনগণের প্রিয় নন। তারপরও সুলতান আইউবী আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হতে চাচ্ছেন না। তিনি এদিক-ওদিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আল-আখদারে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের সর্বশেষ নির্দেশনা প্রদান করছেন।

তাদের জানান কায়রো থেকে দূত এসেছে। দূতের নিয়ে আসা পত্রখানা পাঠ করার পর সুলতানের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি উচ্চস্বরে বলে ওঠেন– 'আমার মন বলছিলো হাবীবুল কুদ্দুস আমাকে ধোঁকা দেবে না। আল্লাহ্ ইসলামের প্রতিজন কন্যাকে যোহরার জযবা ও ঈমান দান করুন।'

আলী বিন সুফিয়ান নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুসের ফিরে আসার সমস্ত কাহিনী লিখে পাঠিয়েছেন। পত্রে তার স্ত্রী যোহরার কথাও উল্লেখ করেছেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ পত্রের উত্তর লেখান। তাতে গ্রেফতারকৃত গাদ্দারদের শাস্তির কথাও উল্লেখ করেন– 'তাদেরকে ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ঘোড়া শহরে শহরে হাঁকাও। গাদ্দারদের গায়ের গোশত হাড্ডি থেকে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়া যেনো না থামে।'

দু'দিন পর সুলতান আইউবী হাল্‌বের উপর চড়াও হন। অবরোধ নয়– আক্রমণ অভিযান। বড় মিনজানিকের সাহায্যে নগরীর ফটকের উপর পাথর ও তরল দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করা হয়। নগরীর পাঁচিলের উপর এবং ভেতরেও পাতিল নিক্ষেপ করে অগ্নিতীরের বৃষ্টিবর্ষণ করা হয়। দেয়াল ভাঙার জন্য নিয়োজিত সেনারা দেয়াল ভাঙতে শুরু করে। কিন্তু নগরবাসী ও ফৌজের পক্ষ থেকে তেমন শক্ত প্রতিরোধ এলো না। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, হাল্‌বের শাসনকর্তা ইমাদুদ্দীনের আমীর-উজীরগণ তাঁর সহযোগিদের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি খৃস্টানদের থেকে সামরিক সাহায্য ছাড়াও বহু সোনা-জহরত গ্রহণ করেছিলেন। তার আমীর-উজীরদের লোভাতুর দৃষ্টি সেই সম্পদের উপর নিবদ্ধ। ভাগ দাও তো যুদ্ধ করবো। অন্যথায় নয়। তারা এমন দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে বসে যে, সুলতান আইউবীর আক্রমণের ভয়ে পূর্ব থেকেই তটস্থ ইমাদুদ্দীন আরো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন।

ইমাদুদ্দীন হাল্‌বের দুর্গপতি হুসামুদ্দীনকে এই আবেদন নিয়ে আইউবীর নিকট প্রেরণ করেন যে, আপনি আমাকে মসুলের সামান্য একটু অঞ্চল দান করুন। সুলতান আইউবী তার আবেদন মঞ্জুর করে নেন। এ সংবাদ নগরীতে ছড়িয়ে পড়লে জনতা ইমাদুদ্দীনের বাসভবনের সম্মুখে এসে জড়ো হয়। ইমাদুদ্দীন ঘোষণা করে দেন, হ্যাঁ, আমি হাল্‌বের ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। তোমরা প্রতিনিধি প্রেরণ করে আইউবীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নাও।

নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইয্‌যুদ্দীন জুরদুক এবং যাইনুদ্দীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে সুলতান আইউবীর নিকট প্রেরণ করেন। তারা ১১৮৩ সালের ১১ জুন মোতাবেক ৫৭৯ হিজরীর ১৭ সফর সুলতান আইউবীর নিকট গিয়ে পৌছেন। তারা হাল্‌বের সকল সৈন্যকে নগরীর বাইরে ডেকে এনে সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দেন। ফৌজের সঙ্গে হাল্‌বের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমীর-উজীরগণও বেরিয়ে আসেন। সুলতান আইউবী তাদের প্রত্যেককে মূল্যবান পোশাক উপহার দেন।

আক্রমণের ষষ্ঠ দিন। সুলতান আইউবী জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল। এমন সময় সংবাদ আসে, স্বীয় ভাই তাজুল মুল্‌ক– যিনি এই যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন– শাহাদাতবরণ করেছেন। সুলতানের আনন্দ বেদনায় পরিণত হয়ে যায়। তাজুল মুল্‌কের জানাযায় ইমাদুদ্দীনও অংশগ্রহণ করেন। তারপর তিনি হাল্‌ব থেকে বেরিয়ে যান। সুলতান আইউবী হাল্‌বের শাসন ক্ষমতা বুঝে নেন।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের ভাষ্যমতে, যেসব সৈন্য দীর্ঘদিন যাবত লাগাতার যুদ্ধ করে আসছিলো, সুলতান তাদেরকে ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। নিজে হাল্‌বের প্রশাসনিক কার্যক্রম গোছানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গন্তব্য তাঁর বাইতুল মুকাদ্দাস।
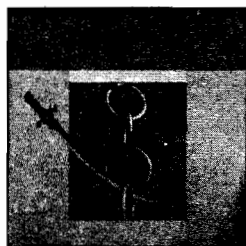
হিত্তীন

৫৩৮ হিজরীর মহররম মাস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী দামেশ্‌কে অবস্থান করছেন। আজ তাঁর চেহারাটা উজ্জ্বল। চোখে আনন্দের ঝিলিক বিরাজ করছে। তাঁর চেহারার এই ঔজ্জ্বল্য আর চোখের এই ঝিলিক তাঁর হাইকমান্ডের সালার ও ঘনিষ্ঠজনরা ভালোভাবে জানেন। তিনি যখন কোনো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন তাঁর চোখে-মুখে এই ভাবটা ফুটে ওঠে। যেসব মুসলিম আমীর, শাসক ও দুর্গপতি ক্রুসেডারদের বন্ধু হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সুলতান তাদের প্রত্যেককে নিজের অনুগত ও পক্ষভুক্ত করে নিয়ে ফেলেছেন। তাদের মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ হলেন হাল্‌ব ও মসুলের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীন। তারা কয়েক বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সুলতান আইউবীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছেন। তাদের বাহিনী এখন আইউবীর যৌথ বাহিনীর অধীন।

সুলতান আইউবী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ফিলিস্তীন অভিমুখে যাত্রা করার আগে তিনি ঈমান বিক্রেতা মুসলিম আমীর-শাসকদের পদানত করবেন, যাতে তারা তাঁর ও প্রথম কেবলার মাঝে প্রতিবন্ধক হতে না পারে। এই প্রতিজ্ঞা পালন করে এখন তিনি দামেশ্‌কে অবস্থান করছেন। তিনি তরবারীর জোরে গাদ্দারদের সোজা পথে এনে বলেননি আমি বিজয়ী। বরং তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, ইসলামের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি খুবই লজ্জাজনক বিবেচিত হবে, যাতে বর্ণনা করা হবে সালাহুদ্দীনের শাসনামল কালো যুগ ছিলো। সে যুগে ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করেছিলো আর মুসলমানরা আপসে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। অবশ্য সুলতান বলতেন, গাদ্দারদেরকে পক্ষভুক্ত করে আমি ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছি।

আজ যখন তিনি দামেশ্‌কে তাঁর হাইকমান্ডের সালার-উপদেষ্টা এবং

অসামরিক কর্মকর্তাদের বৈঠকে তলব করেন, তখন সকলে তাঁর চেহারায় বিশেষ এক দীপ্তি ও চোখে সেই ঝিলিক দেখতে পান, যা মাঝে-মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। সকলে বুঝে ফেলে, সুলতান তাঁর গন্তব্য অভিমুখে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছেন। আর সকলের জানা, সুলতানের গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস। এখন তাদেরকে তাঁর মুখ থেকে শুনতে হবে, কবে কোন্ সময় যাত্রা শুরু হবে, বিন্যাস কীরূপ হবে এবং পথ কোন্‌টা হবে।'

'আমার বন্ধুগণ!'– সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ভাষণ শুরু করেন– 'আপনারা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই এ কথা বলে আমাকে সমর্থন যোগাবেন যে, আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা করতে প্রস্তুত আছি। আজ আমি আপনাদের উদ্দেশে যে বক্তব্য দান করবো, সন্দেহ নিরসনের লক্ষ্যে আপনারা আমাকে যেসব প্রশ্ন করবেন, আপত্তি উত্থাপন করবেন, সব আমাদের ইতিহাস হয়ে থাকবে। আমাদের শব্দ-ভাষা, আমাদের অঙ্গীকার ইতিহাসের লিপিতে পরিণত হবে। এই লিপি আমাদের সর্বশেষ প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আমরা জগতে এই ইতিহাসের লেখা রেখে যাবো আর মহান আল্লাহর সমীপে নিজেদের আমল নিয়ে উপস্থিত হবো। আমরা আমাদের অনাগত প্রজন্ম এবং মহান আল্লাহর সমীপে লজ্জিত হবো, নাকি সম্মানিত সে সিদ্ধান্ত আমাদেরকেই নিতে হবে। বিজয়ের গ্যারান্টি আমরা কেউ দিতে পারবো না। তবে আমরা প্রত্যেকে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি যে, আমরা লড়াই করবো, জীবন দেবো– ফিরে আসবো না।'

সুলতান আইউবী সকলের প্রতি তাকান। তাঁর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে ওঠেছে। তিনি বললেন– 'আমি আপনাদেরকে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত করবো না। আপনাদের কারো কারো মনে ভয় থাকতে পারে, আমাদের সৈন্য সংখ্যা ক্রুসেডারদের তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া আমরা নিজ ভূমি থেকে বহু দূরে যুদ্ধে যাচ্ছি। আমি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমরা সব সময় অল্প কম নয়– অনেক কম সৈন্য দ্বারা কয়েকগুণ বেশি দুশমনের সঙ্গে লড়াই করেছি ও বিজয় অর্জন করেছি। যুদ্ধ সংখ্যা দ্বারা নয়– চেতনা ও বুদ্ধি দ্বারা লড়া হয়। ঈমান শক্ত হলে বাহু, তরবারী এবং মনও শক্ত হয়ে যায়। আমাদের কাছে ঈমানের কমতি নেই। বুদ্ধির অভাব নেই। আপনারা ঈমান অটুট রাখুন। শক্তিকে ব্যবহার করুন।'

'আমাদের একজনও নিজেদের ও দুশমনের সামরিক শক্তির তুলনা করছি না'– কমান্ডো বাহিনীর সালার সারেম মিসরী দাঁড়িয়ে বললেন। তিনি

সঙ্গীদের উপর দৃষ্টি বুলান। এক এক করে সকলের প্রতি তাকান। প্রত্যেকে তাকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি বললেন– 'তবে দেখা আবশ্যক, আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত কোন্ দিক থেকে এবং কোন্ ধারায় পৌঁছবো। সাবধানতা অবশ্যম্ভাবী। আত্মান্তরিকতা পরিহার করে আমাদেরকে বাস্তবতাকে স্বীকার করে কাজ করতে হবে।'

'আমি আপনাদেরকে এ কথাটাই বলার জন্য তলব করেছি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি অগ্রযাত্রা ও যুদ্ধের পরিকল্পনা আপনাদের পরামর্শেই প্রস্তুত করেছি। আর আমি কয়েক রাত ভাবনা-চিন্তার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, আমাদের প্রথম মনজিল হবে হিত্তিন। আপনারা সকলে হিত্তিনের সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত আছেন। সেখানে সেই ভূখণ্ড পেয়ে যাবো, যেই ভূখণ্ডে আমি ক্রুসেডারদের লড়াই চাই। যুদ্ধে আপনাদের উত্তম বন্ধু সেই ভূখণ্ড, আপনারা যেখানে দুশমনকে টেনে এনে যুদ্ধ করিয়ে থাকেন। এ কথা আমি আপনাদের আগেও বহুবার বলেছি। কথাটা আপনারা হৃদয়ে অংকন করে নিন। যুদ্ধের জন্য এমন অঙ্গন বেছে নিন, যা আপনাদেরকে উপকার দেবে এবং শত্রুর ক্ষতি করবে। এ অঙ্গন আমরা হিত্তিনের অঞ্চলে পেয়ে যাবো। শর্ত হলো, আমাদেরকে গোপনীয়তা বজায় রেখে দ্রুত গতিতে আগে-ভাগে সেখানে পৌঁছে যেতে হবে এবং দুমশনকে সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে ফেলতে হবে।'

'হিত্তিনের অঞ্চলে উঁচু ভূমি আছে, পানিও আছে। আপনারা যদি উঁচু পাহাড় এবং পানির উৎসগুলো দখল করে নিতে পারেন, তাহলে ভাবতে পারেন আপনারা অর্ধেক যুদ্ধ জিতে গেছেন। তবে দুশমনকে সেখানে টেনে নেয়া সহজ হবে না। আমাদের পরিকল্পনার একটি অংশও যদি অবাস্তবায়িত থাকে, তাহলে গোটা পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যাবে এবং ধ্বংস আমাদেরকে যে পর্যন্ত নিয়ে যাবে, সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা অসম্ভব হবে। আমার ইচ্ছা, এ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ আমরা দামেশ্‌ক থেকে রওনা হবো। আমি হাল্‌ব ও মিসরে দূত পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা দ্রুততার সঙ্গে যথাসম্ভব কম বিরতি দিয়ে পৌঁছে ফৌজ প্রেরণ করবে, যাদের সঙ্গে আমাদের পথে দেখা মিলবে। আমাদের সকল সৈন্যকে একস্থানে সমবেত করতে হবে। বাইরে থেকে আসা এবং এখানকার সৈন্যদের একত্রিত করে এবং তাদের সালারদেরকে পরিপূর্ণ পরিকল্পনা

বুঝিয়ে দিয়ে বণ্টন করতে হবে। আমাদের অগ্রযাত্রা বিভিন্ন অংশের অগ্রযাত্রা হবে। প্রতিটি অংশের পথ আলাদা হবে।'

'আমি যথারীতি গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যবস্থা করে রেখেছি। আপনাদের ব্যতীত অন্য কারো কোনো কমান্ডার বা সৈনিকের জানবার প্রয়োজন নেই, আমরা কোথায় যাচ্ছি। দুশমনের অঞ্চলে আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে। তারা দুশমনের খুঁটিনাটি সকল গতিবিধি ও সিদ্ধান্তের সংবাদ আমাদের পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। এখন আবশ্যক হলো, আমাদের অঞ্চলে শত্রুর যেসব গোয়েন্দা আছে, তাদেরকে অন্ধ, বধির ও বিভ্রান্ত বানিয়ে ফেলতে হবে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তারও ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমি আপনাদেরকে আরো একটি বিষয় বলে দিতে চাই। তা হচ্ছে, ফৌজের একটি অংশ আমার সঙ্গে থাকবে। আমি তাদের কার্ক নিয়ে যাবো।'

সুলতান আইউবী হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে যান। তার মাথাটা নুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর মাথাটা ঝটকা দিয়ে উপরে তুলে বললেন– 'চার বছর কেটে গেছে আমি একটি কসম খেয়েছিলাম, আমাকে সেই কসম পূরণ করতে হবে।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সেই কসম ছিলো এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি কনফারেন্সে চার বছর আগের সেই ঘটনাটি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। আপনারা পড়ে এসেছেন, খৃস্টান শাসকগণ এমনই চরিত্রহীন মানুষ ছিলেন যে, তারা মুসলমানদের কাফেলা লুণ্ঠন করতেন। তারা কাজটা সৈন্যদের দ্বারা করাতেন। হজ্ব যাত্রীদের কাফেলা হেজাজ যাওয়া এবং আসার সময় তারা পথে পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকতো। এক খৃস্টান সম্রাট প্রিন্স অর্নাত– যিনি সে সময় কার্কের শাসক ছিলেন– নিজ আদেশে এবং নিজের বিশেষ বাহিনী দ্বারা এ কাজ করাতেন। এই অপকর্মের জন্য তিনি গর্বও করে বেড়াতেন। কোন হজ্ব কাফেলা লুণ্ঠন করাতে পারলে তিনি এমনভাবে উল্লাস প্রকাশ করতেন, যেনো বড় ধরনের বিজয় করে ফেলেছেন। শুধু মুসলমান ঐতিহাসিকগণই নন– ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকগণও তার এই দস্যুবৃত্তির কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

১১৮৩ অথবা ১১৮৪ সালের ঘটনা। অর্নাতের বাহিনী হেজাজ থেকে মিসরগামী একটি হজ্ব কাফেলার উপর আক্রমণ চালায় এবং কাফেলা লুণ্ঠন

করে। মিসরী কাহিনীকার মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ লিখেছেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এক কন্যাও উক্ত কাফেলায় ছিলো। তবে আর কোন ঐতিহাসিক উক্ত কাফেলার সুলতান আইউবীর কন্যা থাকার কথা উল্লেখ করেননি। একজন ঐতিহাসিক শুধু এটুকু লিখেছেন যে, সুলতান আইউবী যখন অর্নাতের বাহিনীর হজ্ব কাফেলা লুণ্ঠনের এবং কয়েকটি মেয়ের অপহরনের সংবাদ পান, তখন তিনি গর্জে ওঠে বলেছিলেন– 'ওরা আমার কন্যা। আমি এর প্রতিশোধ নেবো।'

কাফেলায় কয়েকটি যুবতী মেয়ে ছিলো। খৃস্টানরা তাদেরকে তুলে নিয়ে যায়। তখনই সুলতান আইউবী কসম খেয়েছিলেন– 'অর্নাতকে আজ থেকে আমি আমার ব্যক্তিগত শত্রু মনে করছি। আমি কসম খাচ্ছি, তার থেকে আমি নিজ হাতে এর প্রতিশোধ নেবো।'

সকলে জানেন, তাদের সুলতান এই ধারায় এবং এই ভঙ্গিতে কখনো কথা বলেননি। তিনি উত্তেজিত হয়ে কথা বলা এবং আবেগ পছন্দ করেন না। তাঁর প্রতিটি উক্তি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। আজ যখন তিনি প্রতিশোধের কসম খেলেন, সকলে বুঝে ফেললেন, এটা সুলতানের প্রত্যয় এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এমনিতে প্রত্যেক খৃস্টান সম্রাটই ইসলামের দুশমন। কিন্তু অর্নাতের অতিরিক্ত একটি অপরাধ হলো, তিনি ইসলাম ও রাসূলে পাক (সা.) সম্পর্কে অপমানজনক উক্তি করে থাকেন। মুসলিম বন্দিদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাসূলে আকরামকে (সা.) গালাগাল করেন এবং বলেন– 'ডাকো তোদের কাবার প্রভূকে, এসে তোদের সাহায্য করুক। পাঠ করো তোদের রাসূলের কালেমা, তোমরা মুক্ত হয়ে যাও।' তারপর তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। তার এই চরিত্র সম্পর্কে সুলতান আইউবী অবহিত ছিলেন। তাই যখনই তিনি অর্নাতের নামোচ্চারণ করতেন, তার প্রতি মন ভরে ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

আজ চার বছর পর সুলতান আইউবী যখন খৃস্টানদের বিরুদ্ধে সেনাভিযানের জন্য সালারদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করছেন, তখন তাদের উক্ত ঘটনাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন– 'ঐ হতভাগ্য কাফেরটা থেকে আমাকে নিজ হাতে প্রতিশোধ নিতে হবে। আল্লাহ আমাকে আমার রাসূলের অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার সাহস ও সুযোগ দান করুন।' তিনি সালারদেরকে আরো দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বললেন– 'আমি আশা করছি, আমরা তিন মাস পর সেই মওসুমে হিত্তিনের অঞ্চলে গিয়ে উপনীত

হবো, যখন সূর্যের কিরণ পানির ফোটাকে বালিকণায় পরিণত করে দেয় এবং যখন বালির সেই জ্বলন্ত কণাগুলো মানুষকে সিদ্ধ করে ফেলে এবং বালুকাময় প্রান্তরে মরিচিকা আর আকাশে উড়ন্ত বালুকণা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আমি ক্রুসেডারদেরকে সেই সময় যুদ্ধ করতে বাধ্য করবো, যখন সূর্যটা মাথার উপর থাকবে। ক্রুসেডাররা লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রাণে ঝলসে যাবে। তারা আমাদের তীর-তরবারী-বর্শার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে লোহার পোশাকটা পরিধান করে থাকে, তা প্রত্যেক ক্রুসেডারের জন্য জাহান্নামে পরিণত হয়ে যাবে।'

যুদ্ধের জন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী জুন-জুলাই মাসকে নির্বাচন করেছেন। ইতিহাসবিদ এবং ইউরোপীয় যুদ্ধ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকগণ সুলতান আইউবীর এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। এই সময়টায় মরুভূমি চুল্লি থেকে বের করা লোহার ন্যায় গরম থাকে। ক্রুসেডার সৈন্যরা লোহার পোশাকের নীচে সংরক্ষিত থাকে। তাদের নাইটরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্মপরিহিত থাকে। তীর-তরবারী তাদের উপর কোন ক্রিয়া করতে পারে না। কিন্তু সুলতান আইউবী তাদের এই নিরাপত্তা পোশাকটাকে তাদের বিরাট এক দুর্বলতায় পরিণত করে দেন। একে তো তিনি গেরিলা ধরনের যুদ্ধ করতেন। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা দুশমনের পার্শ্বের উপর বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালাতেন। তারা কাজ সেরে চোখের পলকে উধাও হয়ে যেতো। তার এই কৌশলের কারণে দুশমনকে ছড়িয়ে যেতে হতো এবং চলার গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে হতো। কিন্তু এ বর্ম-শিরস্ত্রাণের কারণে তারা প্রয়োজন অনুপাতে দ্রুত দৌড়াতে পারতো না। বিপরীতে সুলতান আইউবীর সৈন্যদের এ সমস্যাটা ছিলো না।

সুলতান আইউবী আরেকটি কৌশল এই অবলম্বন করেছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ তখন শুরু করবেন, যখন সূর্য মাথার উপর থাকবে এবং মরুভূমি স্ফুলিঙ্গে পরিণত হবে। এ সময়টায় বর্ম চুলার ন্যায় উত্তপ্ত হয়ে যায়। পিপাসায় দেহ শুকিয়ে যায়। অথচ পানি থাকবে সুলতান আইউবীর দখলে। মরুভূমির ঝলসানো উত্তাপ ইসলামী বাহিনীর জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করতো। কিন্তু তাদের পোশাক হতো হাল্কা-পাতলা। তাছাড়া সুলতান আইউবীর প্রশিক্ষণ ছিলো অত্যন্ত কঠিন। তিনি উট-ঘোড়া এবং সমস্ত বাহিনকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মরুভূমিতে রেখে দিতেন এবং নিজেও তাদের সঙ্গে অবস্থান করতেন। তিনি তাঁর ফৌজকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকারও

প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছেন। তিনি রমযান মাসে প্রশিক্ষণ ও মহড়া বেশি করাতেন এবং বলতেন– এই পবিত্র মাসে মহান আল্লাহ আপন হাতে আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

দৈহিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও তিনি সৈনিকদের মানসিক বরং আত্মিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি সৈনিকদেরকে বুঝ প্রদান করতেন, তোমরা আল্লাহর সৈনিক এবং ইসলামের সংরক্ষক। তোমরা কোনো রাজা কিংবা সুলতানের কর্মচারি নও। তিনি গনীমতের সম্পদ সৈনিকদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। কিন্তু বুঝ দিতেন, যুদ্ধ গনীমতের জন্য লড়া হয় না এবং গনীমত জিহাদের পুরস্কারও নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা ছিলো আত্মমর্যাদাবোধ, যা তিনি সমগ্র বাহিনীর মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। যেসব মুসলিম মেয়েকে খৃস্টানরা তুলে নিয়ে যেতো, সুলতান আইউবী তাদের কথা বেশি বেশি স্মরণ করতেন এবং সেই মুসলিম নারীদেরও, যারা খৃস্টান অধিকৃত অঞ্চলে তাদের হিংস্রতার শিকার হয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলো।

'যে জাতি জাতির শহীদ ও মজলুম কন্যাদেরকে ভুলে যায়, সে জাতির ভাগ্যে কাফেরদের গোলামি লিপিবদ্ধ হয়ে যায়'– কথাটা সুলতান আইউবী সব সময় মুখে আওড়াতেন। তিনি সৈনিকদের মাঝে ঘোরাফেরা করতেন, তাদের গল্প-গুজব ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতেন। তাদেরকে বলতেন– 'প্রতিশোধ সৈন্যরাই নিয়ে থাকে। ফৌজ যদি দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে তাদের জন্য এ জগতেও অপমান, পরজগতেও অপমান।'

বড় ক্রুশটা সম্মুখে রাখা। পার্শ্বে দণ্ডায়মান ক্রুশের মোহাফেজ, যিনি আক্রার পাদ্রী। খৃস্টানদের বিশ্বাস মোতাবেক এটি সেই আসল ক্রুশ, যার উপর হযরত ঈসাকে (আ.) শূলি দেয়া হয়েছিলো। তারা মনে করে, এ ক্রুশটার গায়ে এখনো হযরত ঈসা (আ.)-এর রক্তের দাগ বিদ্যমান। একে 'বড় ক্রুশ' বলা হয়। এ কারণেই আক্রার পাদ্রীকে 'বড় ক্রুশের মোহাফেজ' বলা হয়ে থাকে এবং তার আদেশ-নিষেধ সম্রাটদের আদেশ-নিষেধ অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। খৃস্টান সম্রাটগণও তার আদেশ-নিষেধ মান্য করে থাকেন। খৃস্টান ও ইহুদী মেয়েদেরকে তারই অনুমতিক্রমে মুসলমানদের অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তি, চরিত্র হনন ইত্যাদি কাজের জন্য প্রেরণ করা হতো। যে মেয়ে এ কাজের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে দায়িত্ব পালনে রওনা

হতো, তাকে ক্রুশের মহান মোহাফেজ দু'আ দিয়ে বিদায় জানাতেন। সেই মেয়েদের থেকে বড় ক্রুশের উপর হাত রাখিয়ে অফাদারি এবং ক্রুশকে ধোঁকা না দেয়ার প্রতিজ্ঞা নেয়া হতো। এরূপ প্রতিজ্ঞা খৃস্টান ফৌজের প্রতিজন অফিসার ও সৈনিকের থেকেও নেয়া হতো। শেষে এমনি ছোট্ট একটি ক্রুশ তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হতো।

নাসেরা নামক এক স্থানে খৃস্টান সম্রাটগণ সমবেত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গাই অফ লুজিনান, রেমন্ড অফ ত্রিপোলী, গ্র্যান্ড মাস্টার জেরাড, মাউন্ট ফেরাত, হামফ্রে অফ তুরান, এমালৃরিক এবং প্রিন্স অর্নাত অফ কার্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কনফারেন্সে আক্রার পাদ্রী 'বড় ক্রুশের মোহাফেজ'ও উপস্থিত আছেন। হলঘরটা কাপড়ের তৈরি একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ। প্রাসাদের ন্যায় তার কক্ষ, বারান্দা, গলি। রং-বেরঙের বাতির আলো বিদ্যমান। সব মিলে হলটা মর্মর নির্মিত প্রাসাদের চেয়েও বেশি সুদৃশ্য ও মনোরম। তারই আশপাশে মেহমানদের থাকার জায়গা, নাইট ও সৈন্যদের তাঁবু। মদের মটকার সঙ্গে আছে সেসব রূপসী মেয়ে, যাদের যাদুকরী রূপ ভাইকে ভাইয়ের এবং পিতাকে পুত্রের শত্রুতে পরিণত করে থাকে।

পাকা প্রাসাদের কক্ষের ন্যায় এক শামিয়ানার নীচে বড় ক্রুশটা রাখা আছে। তার সামনে তার সম্রাটগণ, তাদের সেনাপতি ও নির্বাচিত নাইটগণ উপবিষ্ট। সকলেই জানেন, এটি একটি ঐতিহাসিক সমাবেশ এবং ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় রচিত হতে যাচ্ছে। এই অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'সালাহুদ্দীন আইউবীকে চিরতরে খতম করে দাও'।

'ক্রুশের মোহাফেজগণ!'– আক্রার পাদ্রী বললেন– 'এ হচ্ছে সেই ক্রুশ, যার গায়ে হাত রেখে তোমরা সকলে শপথ নিয়েছিলে। আজ এই ক্রুশ তোমাদের সম্মুখে এ কারণে আক্রা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে তার সঙ্গে তোমরা যে অঙ্গীকার করেছিলে, তা যেনো তাজা হয়ে যায়। আজ তোমাদেরকে এক রক্তক্ষয়ী ও সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই যুদ্ধ তোমাদেরকে লড়তেই হবে। তোমরা সকলে যোদ্ধা, সেনাপতি। তোমাদের জীবন যুদ্ধের ময়দানে অতিবাহিত হয়েছে। আমি সেই ময়দানের লোক নই। আমি তোমাদের ধর্মের নেতা। আমি তোমাদেরকে বলতে এসেছি, সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করে আরব বিশ্বে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জেরুজালেম আমাদের আছে এবং থাকবে।

আমাদেরকে মক্কা-মদীনাও দখল করতে হবে এবং এই পবিত্র ক্রুশকে মুসলমানদের কা'বা ঘরে স্থাপন করতে হবে। তাকে ঈসা মসীহর উপাসনালয় বানাতে হবে।'

'মনে রেখো, তোমরা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে পৌঁছে গিয়েছিলে। কিন্তু মুসলমানরা তোমাদেরকে আর এগুতে দেয়নি। মুসলমানরা তাদের পবিত্র ভূমির সুরক্ষার জন্য যে উন্মাদনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলো, তোমাদেরকেও সেই উন্মাদনার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবীর দৃষ্টি জেরুজালেমের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। সে বলছে, এটা বাইতুল মুকাদ্দাস। এটা নাকি তাদের প্রথম কেবলা। তোমরা যদি তার থেকে জেরুজালেমকে রক্ষা করতে চাও, তাহলে মক্কার উপর দৃষ্টি রাখো। মনে এ কথাটা জাগরুক রাখো, আমাদের যুদ্ধ সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে নয়– এটা ক্রুশ ও ইসলামের লড়াই। এটা দু'টি ধর্মের, দু'টি বিশ্বাসের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমরা যদি জয়ী হতে না পারি, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম লড়াই করবে। তারাও যদি ইসলামের বিনাশ ঘটাতে না পারে, তাহলে তাদের পরের প্রজন্ম যুদ্ধ করবে। দু'টি ধর্মের একটির পতন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে। তবে পতন ইসলামেরই হবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।'

'আমরা মুসলমানদের পরাজয় ঘটানোর জন্য অন্য পন্থাও অবলম্বন করে রেখেছি। কিন্তু সেটি এখনো সফল হয়নি। তোমাদের সকলেরই জানা থাকবে, সেই অভিযানে আমরা কী পরিমাণ মেয়ে নষ্ট করেছি। বিপুল সম্পদ এবং অস্ত্রও হারিয়েছি। এসব সম্পদ ও অস্ত্র আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে মুসলিম আমীরদের পেছনে ব্যয় করেছি। সেসব মেয়ে ও হীরা-জহরতের বিনিময়ে আমরা এটুকু অর্জন করেছি যে, মুসলমানদের মাঝে মদ ও বিলাসিতার স্বভাব গড়ে ওঠেছে। তারই বদৌলতে আমরা তাদেরকে ছয়-সাত বছর যাবত আপসে যুদ্ধ করিয়ে চলছি। তাদের গৃহযুদ্ধ থেকে আমরা এটুকু লাভবান অবশ্যই হয়েছি যে, মুসলমানদের সামরিক শক্তি বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গেছে এবং আইউবীর বহু অভিজ্ঞ ও ভালো ভালো সৈনিক ও কমান্ডার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এই গৃহযুদ্ধ থেকে আমরা এ স্বার্থও উদ্ধার করেছি যে, সাত-আট বছর যাবত আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে নিজ অঞ্চল থেকে বের হতে দেইনি। এই সময়টায় আমরা যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি এবং জেরুজালেমের প্রতিরক্ষা এতো শক্ত করে তুলেছি যে, সালাহুদ্দীন

আইউবীর পক্ষে জেরুজালেমের পথে পা রাখাই অসম্ভব হয়ে গেছে।'

'কিন্তু গৃহযুদ্ধের আগে আইউবীর যে অবস্থাটা ছিলো, এখন সেই অবস্থা পুনরায় অর্জন করে নিয়েছে। সে হাল্‌ব এবং মসুলের সৈন্যদেরও পেয়ে গেছে। সকল মুসলিম আমীর তার সমর্থক হয়ে গেছে। মুজাফফর উদ্দীন ও কাকবুরীর ন্যায় সালার– যারা তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো এবং আমাদের বন্ধু হয়ে গিয়েছিলো– তার নিকট চলে গেছে। সে গাদ্দারদেরকে এমন দুর্বল ও অসহায় করে তুলেছে যে, এখন আর তারা আমাদের কোন কাজে আসছে না, এখন এমন কোন মুসলিম শাসক অবশিষ্ট নেই, যে সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর পেছন থেকে হামলা করবে। আমরা হাশিশিদেরকেও পরীক্ষা করে দেখেছি। চার-পাঁচটি সংহারী আক্রমণেও তারা আইউবীকে হত্যা করতে পারেনি। এখন আমাদের এ ছাড়া আর কোন গতি আর কোনো পথ নেই যে, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আইউবীর উপর আক্রমণ চালাবো। কিন্তু আমাদের সেনাপতিরা পরামর্শ দিয়েছে, আক্রমণটা তাকে যেনো আগে করতে দেই। তারা আমাকে এর দু'টি কারণ বলেছে। এক হচ্ছে, তার বাহিনীকে এতো দূরে নিয়ে যাওয়া দরকার, যেখানে রসদের পদ রুদ্ধ এবং বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় কারণ, সালাহুদ্দীন আইউবী যে ধারায় যুদ্ধ করে, তাতে আমরা আমাদের সৈন্যদেরকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়ে পড়ি। এখন যেহেতু দুশমনের অঞ্চলে আমাদের কোনো সহযোগি রইলো না, তখন আক্রমণের ঝুঁকি আমাদেরকে বুঝে-শুনে নিতে হবে।'

'আমাদেরকে বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট মোতাবেক সালাহুদ্দীন আইউবী জেরুজালেম অভিমুখে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছে। এখন তোমাদেরকে দেখতে হবে, সে কোন্ পথে আসে। সোজা জেরুজালেমের দিকে আসে, না কী করে। আমাদেরকে এই বাস্তবতা স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা একাকি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পেরে ওঠবো না। এখন তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছো। বড় ক্রুশকে এখানে টেনে আনার উদ্দেশ্য হলো, তোমরা সকলে একসঙ্গে ক্রুশের উপর হাত রেখে শপথ নাও, তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে একপ্রাণ হয়ে যুদ্ধ করবে এবং ইসলামের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবে না।'

সকলে উঠে দাঁড়ায়। ক্রুশের গায়ে হাত রাখে। আক্রার পাদ্রীর উচ্চারিত বাক্যগুলো উচ্চারণ করে শপথ গ্রহণ করে।

❖ ❖ ❖

পরদিন সম্রাটগণ বেশ বেলা হলে জাগ্রত হন। রাতে পাদ্রী ছুটি দেয়ার পর তারা মদ-নাচে মগ্ন হয়ে পড়েন। প্রত্যেকে আপন আপন পছন্দের মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। তাদের রূপ, অর্ধনগ্ন দেহ, বিক্ষিপ্ত রেশমি চুল, হৃদয়কাড়া নাচ আর মদ এই ভূখণ্ডটাকে ভূস্বর্গে পরিণত করে ফেলেছে। পরদিন সূর্যোদয় হয়ে গেছে। কিন্তু নিদ্রা খৃস্টানদের এই রাজকীয় ক্যাম্পে কবরের নীরবতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

প্রিন্স অর্নাতের তাঁবু থেকে এক তরুণী বের হয়। অতিশয় রূপসী ও দীর্ঘকায় মেয়ে। আকর্ষণীয় গাত্রবর্ণ। টানা টানা কাজলকালো চোখ দুটোয় যেনো যাদুর ক্রিয়া। এই রং আর এই চোখ খৃস্টান কিংবা ইহুদী মেয়েদের নয়। সুদান, মিসর কিংবা দামেশ্‌কের মেয়ে বলে মনে হলো। মেয়েটা অবর্ণনীয় রূপসী হওয়ার পক্ষে এ প্রমাণটাই যথেষ্ট যে, প্রিন্স অর্নাত তাকে পছন্দ করে সঙ্গে এনেছেন।

মেয়েটাকে দেখে এক বৃদ্ধা চাকরানি দৌড়ে তার নিকট চলে আসে। এখানে সম্রাটদের চাকর-চাকরানিদের সংখ্যা এখানকার সেনাসংখ্যা অপেক্ষা বেশি। অর্নাত মেয়েটাকে প্রিন্সেস লিলি বলে ডাকেন। আকারে-গঠনে-উচ্চতায়-অবয়বে মেয়েটাকে রাজকন্যাই মনে হলো। সে চাকরানিকে বললো– 'স্রেফ আমার জন্য তাড়াতাড়ি নাস্তা নিয়ে আসো আর গাড়ি প্রস্তুত করো। আমি ভ্রমণে বের হবো।'

অর্নাত গভীর ঘুম ঘুমিয়ে আছেন। জাগ্রত হতে তার কোন তাড়া নেই। শুধু পাদ্রী সকাল সকাল জাগ্রত হয়ে উপাসনা করে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। লিলির এখন কোনো কাজ নেই। নাস্তা আসতে আসতে সে প্রস্তুত হয়ে যায়। নাস্তা সারতে না সারতে গাড়িও এসে হাজির। দুই ঘোড়ার সুদৃশ্য গাড়ি। কার্ক থেকে অর্নাতের সঙ্গে সে এ গাড়িতে করেই এসেছিলো।

গাড়িতে চড়ে বসার আগে মেয়েটি গাড়োয়ানকে বললো– 'এই এলাকাটা খুবই সুদৃশ্য ও মনোরম লাগছে। আমি ভ্রমণে যেতে চাই। তুমি কি অঞ্চলটা চেনো?'

'ভালোভাবেই চিনি প্রিন্সেস'– গাড়োয়ান উত্তর দেয়– 'আপনি যদি ভ্রমণে যেতে চান, তাহলে তীর-ধনুক-তূনীরও নিয়ে নিই। শিকারও খেলতে পারবেন। এ অঞ্চলে হরিণ বেশি নেই বটে; তবে কোথাও কোথাও দেখাও যায়। অনেক খরগোশ আছে। পাখিও আছে।'

লিলি মুচকি হেসে বললো– 'তুমি কি আমাকে তীরন্দাজ মনে করছো? আচ্ছা যাও। নিয়ে আসো।'

'কোন সমস্যা নেই'– গাড়োয়ান বললো– 'আপনি যুদ্ধে তো আর যাচ্ছেন না। শিকারের গায়ে তীর ছোঁড়ার পর যদি ব্যর্থ যায়, তাহলে সমস্যার তো কিছু নেই।'

গাড়োয়ান ছুটে গিয়ে তীর-ধনুক-তূনীর নিয়ে আসে।

গাড়ি তাঁবু অঞ্চল থেকে অনেক দূরে চলে যায়। এলাকাটা সবুজ-শ্যামল। গাছ-গাছালিও আছে বেশ। আছে উঁচু উঁচু টিলা-টিপি। সময়টা মার্চ-এপ্রিল। বসন্ত কাল। তাতে এলাকাটা অধিকতর সুদৃশ্য হয়ে ওঠেছে। গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। লিলির কথায় একটি ঝাড়ের নীচে গাড়ি থেমে যায়। লিলি নেমে পড়ে। গাড়োয়ানের নাম সায়বাল। ধর্মে খৃস্টান এবং উক্ত অঞ্চলেরই অধিবাসী। বয়স ত্রিশের কিছু বেশি। সুদর্শন ও দীর্ঘকায় যুবক। এসব দেখেই অর্নাত তাকে নিজের গাড়ির গাড়োয়ান হিসেবে নির্বাচন করেছেন। লিলিরও লোকটা বেশ পছন্দ। প্রাণোচ্ছল ও অনুগত লোক। লিলির অর্নাতের নিকট আসার এক বছর পর সায়বাল তাদের কাছে এসেছিলো।

'আচ্ছা, মুসলমানদের সীমান্ত কোথা থেকে শুরু হয়েছে?' লিলি গাড়ি থেকে নেমে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করে।

'কোন ফৌজ যে স্থানে পৌছে ছাউনি ফেলে বসে, সেটাই তাদের সীমানা হয়ে যায়'– গাড়োয়ান উত্তর দেয়– 'আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারবো, এখান থেকে আট-দশ মাইল দূরে সমুদ্রের দিকে বিস্তীর্ণ একটি ঝিল আছে। তার নাম গ্যালিলি। তারই কূলে তাবরিয়া নামক একটা পল্লী আছে। তার থেকে খানিক এদিকে হিত্তিন নামে বিখ্যাত একটি গ্রাম আছে। ঐ ঝিলটা অতিক্রম করে গেলেই মুসলমানদের অঞ্চল শুরু হয়ে যায়।'

'তার মানে মুসলমানদের অঞ্চল এখান থেকে বেশি দূরে নয়'– লিলি বললো– 'আমরা কি গাড়িতে করে ঝিল পর্যন্ত যেতে পারবো?'

'আমরা কার্ক থেকে ঘোড়াগাড়িতে করে এসেছি'– সায়বাল বললো– 'ঝিল অনেক কাছের এলাকা। এই ঘোড়া দুটো ক্লান্তি ছাড়াই সে পর্যন্ত পৌছে যেতে পারবে।'

লিলি শিশুদের ন্যায় পথ-ঘাট জিজ্ঞেস করতে শুরু করে। গাড়োয়ান মাটিতে রেখা টেনে নকশা এঁকে তাকে রাস্তা বোঝাতে শুরু করে।

'এখান থেকে দামেশ্‌ক যাওয়ারও তো পথ আছে, না?' লিলি জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ আছে' বলে গাড়োয়ান তাকে দামেশ্‌কের পথটাও বুঝিয়ে দেয়।

❖ ❖ ❖

লিলি তূনীর থেকে তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করে গাছে পাখি দেখতে শুরু করে। ঐ এক গাছে কি একটা পাখি যেনো বসে আছে। লিলি তীর ছোঁড়ে। কিন্তু তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। লিলি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। গাড়োয়ান এগিয়ে এসে নিশানা ঠিক করার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়। লিলি এদিক-ওদিক কয়েকটা তীর ছোঁড়ে।

'আরো সামনে চলো'– লিলি গাড়িতে চড়ে বসতে বসতে বললো– 'কোথায় হরিণ আছে, সেখানে চলো। হরিণ তো মারতে পারবো।'

সায়বাল লিলিকে দেড়-দু'মাইল দূরে নিয়ে যায়। এক স্থানে গড়ি থামিয়ে বললো, একটু অপেক্ষা করুন, হরিণ কিংবা খরগোশ পেয়ে যাবেন। বলেই সায়বাল একদিকে চলে যায়। পা বিশেক দূরে একটা গাছ আছে। সায়বাল তার সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সে প্রিন্সেস লিলির জন্য হরিণ-খরগোশ খুঁজতে শুরু করে। তার পিঠটা লিলির দিকে। লিলি ধনুকে তীর সংযোজন করে। সায়বালের পিঠটাকে নিশানা বানায়। কেউ দেখলে এটাই ভাবতো, সে ঠাট্টা করছে। সে ধনুক টেনে ধরে। তার হাতে ধনুকটা কাঁপছে। একটা চোখ বন্ধ করে সায়বালের পিঠটা নিশানা বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লিলি ধনুকটা আরো টেনে ধরে তীরটা ছুড়ে দেয়। তীর সায়বালের কাঁধ ঘেঁষে গাছটার ডালে গিয়ে গেঁথে যায়। সায়বাল হটাৎ ঘাবড়ে ওঠে মোড় ঘুরিয়ে তাকায়। প্রথমে গাছের ডালে গেঁথে যাওয়া তীরটার প্রতি এবং পরে লিলির দিকে তাকায়। লিলি হাসছে না। তার চেহারায় গাম্ভীর্য। যেমনটি সায়বাল ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি। তবু সে হেসে বললো– 'আপনি বুঝি আমার উপর তীর অনুশীলন করছেন?' বলেই সে লিলির দিকে এগিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

লিলি ঝটপট তূনীর থেকে আরো একটি তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করে বলে ওঠে– 'থামো, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। এদিক-ওদিক হবে না।'

সায়বাল দাঁড়িয়ে যায়। লিলি ধনুকটা সামনে নিয়ে টেনে ধরে। সায়বাল চীৎকার করে বলে ওঠে– 'প্রিন্সেস! আপনি একী করছেন!'

লিলির ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। সায়বালের দৃষ্টি তার উপর

নিবদ্ধ। সে বসে পড়ে। তীরটা শা-শব্দ তুলে তার পার্শ্ব ঘেঁষে অতিক্রম করে যায়। সায়বাল লিলির মর্যাদা ও নিজের অবস্থানের কথা ভুলে যায়। লিলি তূনীর থেকে আরো একটি তীর বের করতে উদ্যত হয়। সায়বাল অতি দ্রুততার সাথে তার দিকে ছুটে যায়। অতো তাড়াতাড়ি তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করার অভিজ্ঞতা লিলির নেই। সায়বাল তার দিকে এগিয়ে এলে সে দৌড়ে আড়ালে চলে যায়। কিন্তু সায়বাল তো পুরুষ এবং তাগড়া যুবক। পৌঁছে গিয়ে সে লিলিকে ধরে ফেলে। লিলির হাত থেকে ধনুকটা কেড়ে নেয়। কাঁধ থেকে তূনীরটাও ছিনিয়ে নেয়।

'আমি সেই দাস শ্রেণীর মানুষ নই, যাদের উপর তাদের মনিবরা সব রকম জুলুম করে থাকে'– সায়বাল বলে এবং ধনুকে একটা তীর সংযোজন করে লিলির প্রতি তাক করে ধরে। বললো– 'আপনি কি আমার উপর তীর অনুশীলন করতে চাচ্ছেন? নাকি এটা আমার আন্তরিক সেবা ও আনুগত্যের প্রতিদান?'

লিলির মুখে কোন উত্তর নেই। মেয়েটির ওষ্ঠাধর কাঁপছে। তার চোখে অশ্রু নেমে এসেছে। সায়বাল ধনুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধীর পায়ে লিলির দিকে এগিয়ে যায়।

'আমি বুঝতে পারলাম না, আপনি আমার উপর কেনো তীর চালালেন এবং কেনোই বা আপনার চোখে অশ্রু নেমে এলো?' সায়বাল জিজ্ঞেস করে।

'তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো?' লিলি এমন এক কণ্ঠে বললো, যেটি কোন রাজকন্যার কণ্ঠ নয়। এটি একটি ভয়পাওয়া সাধারণ মেয়ের কণ্ঠ।

'আপনার জন্য আমি জীবনও দিতে পারি'– সায়বাল বললো– 'বলুন আপনার কীরূপ সাহায্যের প্রয়োজন?'

'পুরস্কার দিয়ে লাল করে দেবো'– লিলি বললো– 'পুরস্কার হিসেবে আমাকে দাবি করবে, তো তাও মেনে নেবো। তুমি আমাকে গ্যালিলি ঝিলের ওপারে মুসলমানদের অঞ্চলে গিয়ে চলো। আমাকে দামেশ্‌ক দিয়ে আসো। তারপর এই গাড়ি আর ঘোড়া দুটো তোমার হবে। পুরস্কার আলাদা পাবে।'

'আমার মনে হচ্ছে, আপনার মাথায় কোনো গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে'– সায়বাল বললো– 'চলুন, আমরা ফিরে যাই।'

'যদি আমার কথা না শোনো, তাহলে ফিরে গিয়ে প্রিন্স অর্নাতকে বলবো, এখানে তুমি আমার প্রতি হাত বাড়িয়েছো।' লিলি সায়বালের কানে কানে বললো।

'ভালোই হলো, কথাটা বলে ফেলেছেন'– সায়বাল বললো– 'এখন না আপনি ফিরে যেতে পারবেন, না আমি ফিরে যাবো। হাত-পা বেঁধে আমি আপনাকে গাড়িতে করে কোন এক নগরীতে নিয়ে কোনো ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করে ফেলবো। আচ্ছা, বলুন তো, মুসলমানদের অঞ্চলে যেতে চাচ্ছেন কেনো?'

এবার লিলি টের পেয়েছে, সে জালে আটকা পড়েছে। মেয়েটি বসে পড়ে এবং মাথাটা উভয় হাঁটুর মধ্যখানে গুজিয়ে কোঁকাতে শুরু করে। সায়বাল তার প্রতি তাকিয়ে আছে। লিলি তার অপরিচিত মেয়ে নয়। কিন্তু এখন তাকে গভীর চোখে দেখতে শুরু করেছে, যেনে নতুন কাউকে দেখছে। মেয়েটার মাথার চুল, গায়ের রং, চলন-বলন কোনটিই খৃস্টান মেয়েদের মতো নয়। তার জানা আছে, খৃস্টানদের কাছে অনেক অপহৃতা মুসলিম মেয়েও আছে। এই মেয়েটিও তেমনি অপহৃতা হতে পারে। কিন্তু– কিন্তু একে তো সে আজ তিন-চার বছর যাবত হাসি-খুশিই দেখতে পাচ্ছে। সায়বাল লিলির পাশে বসে পড়ে।

'যদি মুসলমান হয়ে থাকো, তো বলো'– সায়বাল বললো–'সম্ভবত তোমাকে অপহরণ করা হয়েছিলো।'

'আর তুমি প্রিন্স অর্নাতকে বলে দিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করবে'– লিলি বললো– 'আর তাকে বলে দেবে, আমি পালাবার চেষ্টা করেছিলাম।'

লিলি দেখতে পায়, সায়বালের গলায় একটা ফিতা ঝুলছে। সে ফিতাটা ধরে টান দিলে ক্ষুদ্র একটি ক্রুশ বেরিয়ে আসে। লিলি বললো– 'এটা হাতে নিয়ে কসম খাও, আমাকে ধোঁকা দেবে না। অর্নাতকে বলবে না আমি তোমার গায়ে তীর ছুঁড়েছিলাম।'

সায়বাল মেয়েটির আসল পরিচয় জেনে ফেলে। বললো– 'ক্রুশ হাতে খাওয়া কসম মিথ্যা হবে। সে ফিতাটা গলা থেকে খুলে ফেলে এবং ক্রুশটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বলে– 'মুসলমান ক্রুশ হাতে কসম খায় না।'

লিলি চমকে ওঠে সায়বালের দিকে তাকায়, যেনো লোকটার কথায় তার বিশ্বাস হচ্ছে না। সে দূরে মাটিতে পড়ে থাকা ক্রুশটার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। কোনো খৃস্টান সে যতোই পাপিষ্ঠ হোক না কেনো,

ক্রুশের অবমাননা করে না। সায়বাল নিশ্চিত হয়ে গেছে, লিলি কোনো মুসলমান পিতার কন্যা।

'আমি তোমার কাছে আমার গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছি'- সায়বাল বললো- 'তুমি বলো, তোমাকে কখন এবং কোথা থেকে অপহরণ করা হয়েছিলো?'

'আমি হজ্ব করে পিতা-মাতার সঙ্গে মিসর ফিরে যাচ্ছিলাম'- লিলি ভয় পাওয়া শিশুটির ন্যায় বললো- 'অনেক বড় কাফেলা ছিলো। তখন আমার বয়স ছিলো ষোল-সতের বছর। চার-সাড়ে বছর কেটে গেছে। কার্কের সন্নিকটে এই কাফেররা কাফেলার উপর আক্রমণ চালায় এবং মালপত্র লুটে নেয়। তারা অনেক রক্ত ঝরায়। আমি জানি না, আমার পিতা-মাতা মারা গেছেন, নাকি জীবিত আছেন। কাফেররা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। বোধ হয় আমার দুর্ভাগ্যই ছিলো, আমি এতো রূপসী ছিলাম যে, কার্কের শাসনকর্তা প্রিন্স অর্নাত আমাকে পছন্দ করেন এবং নিজের কাছে রেখে দেন।'

'প্রিন্স অর্নাতের সামনে আমি অনেক কান্নাকাটি করি। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। তিনি বললেন, আমি রাজত্ব ত্যাগ করবো তবু তোমাকে ছাড়বো না। তারপর তিনি আমাকে বিবাহ করেননি এবং নিজের ধর্মও গ্রহণ করে নিতে বলেননি। আমি তার ভোগের উপকরণ হয়ে থাকি। তার নিকট আরো কয়েকটি রূপসী মেয়ে ছিলো। তারা আমার শত্রু হয়ে যায়। কিন্তু অর্নাত শুধু আমাকেই সঙ্গে রাখেন এবং আমি যা বলি শোনেন। আমি এই অবস্থাটা মেনে নিই। এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিলো না। নারীর ভাগ্যই এমন যে, যখন যার কব্জায় এসে পড়ে, তখন তার মালিকানা ও গোলাম হয়ে যায়।'

লিলি বলতে বলতে নীরব হয়ে যায়। সায়বালকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বললো- 'তুমি কি আমার সমস্ত কথা প্রিন্স অর্নাতকে বলে দেবে? শুনে তিনি আমাকে কী শাস্তি দেবেন?'

'আমি যদি সত্যি সত্যি সায়বাল হতাম, তাহলে তা-ই করতাম, তুমি যার ভয় করছো'- গাড়োয়ান বললো- 'আমি সিরীয় মুসলমান। আমার নাম বকর ইবনে মুহম্মদ।'

'তুমি সেই গোয়েন্দাদের একজন তো নও, যাদের সম্পর্কে অর্নাত বলে থাকেন, আমাদের দেশে মুসলমান গোয়েন্দা লুকিয়ে আছে?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে এবং বলে- 'আমার নাম ছিলো কুলসুম।'

'আমি যা কিছু হই না কেনো'– বকর উত্তর দেয়– 'আমি মুসলমান। আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না। এটা কোনো নতুন বিষয় নয় যে, একটি অপহৃতা মুসলিম মেয়ের এমন এক মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে, যে কিনা খৃস্টান বেশে খৃস্টানদের কর্মচারি হয়ে কাজ করছে। এরূপ ঘটনা আগেও বহু ঘটেছে। এমনও হয়েছে ভাই গোয়েন্দা হয়ে খৃস্টানদের শহরে ঢুকে পড়েছে তো সেখানে তার সেই বোনের সাক্ষাৎ পেয়ে গেছে, যে বহু বছর আগে অপহৃতা হয়েছিলো। বিস্মিত হয়ো না কুলসুম। তুমি হজ্ব সম্পাদন করে ফিরে যাচ্ছিলে। আল্লাহ্ তোমার হজ্ব কবুল করে নিয়েছেন। আমি আলিম নই যে, তোমাকে বলবো, আল্লাহ্ তোমাকে এই শাস্তিটা কেনো দিলেন? তবে এখন মনে হচ্ছে, আল্লাহ তোমার দ্বারা বড় কোনো মহৎ কাজ করাবার জন্যই এ জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছিলেন। তা তুমি কি শুধুই পালাতে চাও, নাকি পালাবার পেছনেও কোনো উদ্দেশ্য আছে?'

'অনেক বড় উদ্দেশ্য'– কুলসুম বললো– 'তুমি বোধ হয় জানো না, আক্রার পাদ্রী এই খৃস্টান সম্রাটদেরকে এখানে কেনো তলব করেছেন। রাতে অর্নাত যখন তার তাঁবুতে আসে, তখন তিনি নেশায় ঢুলু ঢুলু করছিলেন। তিনি আমাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি অনেক বড় একটা রাজ্যের রাণী হতে যাচ্ছো। সালাহুদ্দীন আইউবী দিন কয়েকের মেহমান মাত্র। তিনি আমাদের জালে এগিয়ে আসছেন। খুব দ্রুত আসছেন। আমি আনন্দ প্রকাশ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের পরিকল্পনা কী? তিনি বিস্তারিত বলে শেষে বললেন, এখানে যে ক'জন খৃস্টান সম্রাট এসেছেন, তারা ক্রুশের গায়ে হাত রেখে ঐক্য এবং পরস্পর অফাদারির শপথ নিয়েছেন।'

'তারা কি সালাহুদ্দীন আইউবীর কোনো অঞ্চলের উপর আক্রমণ করবেন?' বকর জিজ্ঞেস করে।

'আমার পলাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি সুলতান আইউবীর নিকট সংবাদ পৌঁছাবো, ক্রুসেডারদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা কী, তারা কী পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং তাদেরকে কোথায় কোথায় বণ্টন করে ছড়িয়ে রেখেছে। অর্নাত আমাকে বলেছেন, তারা আক্রমণ করতে যাবেন না। বরং সালাহুদ্দীন আইউবীকে আক্রমণ করার সুযোগ দেবেন, যাতে তিনি নিজ অবস্থান থেকে দূরে সরে যান এবং তার রসদের পথ দীর্ঘ হয়ে যায়। তাদের আরো পরিকল্পনা, আইউবী যদি সহসা আক্রমণ না করেন, তাহলে

তারা তিন দিক থেকে এগিয়ে গিয়ে হামলা চালাবে।'

'হঠাৎ তোমার চিন্তাটা আসলো কোনো, সংবাদটা সুলতান আইউবীকে পৌঁছানো দরকার?' বকর ইবনে মুহাম্মদ জিজ্ঞেস করে এবং বলে– 'কুলসুম! আমি এই ময়দানের মুজাহিদ। আমি যদি বলি, তুমি অর্নাতের কথায় ভুল তথ্য পৌঁছিয়ে সুলতান আইউবীকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছো, তাহলে কী উত্তর দেবে?'

'বলবো, তুমি স্বল্প বুদ্ধির মানুষ'– কুলসুম উত্তর দেয়– 'তুমি যদি সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা হয়ে থাকো, তাহলে তুমি নির্বোধ গোয়েন্দা। তুমি নিজ বাহিনীকে ক্রুসেডারদের হাতে খুন করিয়ে ফেলবে। অর্নাত যদি সুলতান আইউবীকে বিভ্রান্ত করতে চাইতেন, তাহলে কি অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারতেন না? যদি কাজটা আমাকে দিয়েই করাতে চাইতেন, তাহলে রাতে আমাকে গাড়িতে বসিয়ে মুসলমানদের অঞ্চলের নিকটে রেখে আসতে পারতেন না? শোনো বকর! মনোযোগ সহকারে শোনো! আমি তোমার গায়ে প্রথম যে তীরটি ছুঁড়েছিলাম, সে চিন্তাটা বিদ্যুতের ন্যায় হঠাৎ করেই আমার মাথায় এসেছিলো। আমি আসলেই শুধু ভ্রমণের জন্য বের হয়েছিলাম। তীর-ধনুক এনেছো তুমি।'

'এখানে এসে আমি মুসলমানদের সীমান্ত এখান থেকে কতো দূর জানবার জন্য তোমাকে সীমান্ত ও দামেশ্‌কের পথের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তুমি যখন বললে অঞ্চলটা এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে, তখন মনে ভাবনা জাগে, কোনো প্রলোভন দেখিয়ে তোমাকে নিয়েই যাবো কিনা। কিন্তু আবার ভাবি, তুমি তো খৃস্টান, আমাকে সাহায্য করবে কিনা কীভাবে বিশ্বাস করি। পরে এই আশঙ্কাই প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে, বললে হিতে বিপরীত হবে এবং তুমি আমাকে মুসলমানদের গুপ্তচর সাব্যস্ত করে অর্নাতের নিকট থেকে পুরস্কার লাভ করবে আর আমি ফেঁসে যাবো। আমার সামনে কোনো পথ ছিলো না। তুমি খানিক দূরে গাছের সঙ্গে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে আমি গাছের উপর একটা পাখির গায়ে ছোঁড়ার জন্য ধনুকে তীর সংযোজন করি। তখন আমার দৃষ্টি তোমার পিঠের উপর নিবদ্ধ ছিলো।'

'তখনই মাথায় ভাবনা আসে, একটা কাজ করি না কেনো! লোকটা যখন এতো কাছাকাছি পজিশন মতো দাঁড়িয়ে আছে, তো তীরটা তাকেই বিদ্ধ করি না কেনো। একটার বেশি দুটো ছুঁড়তে হবে না। তুমি মরে

যাবে। আমি গাড়িতে চড়ে তোমার দেখানো পথে পালিয়ে যাবো। অন্য কোনো সমস্যার কথা আমি চিন্তাই করিনি। বোধ হয় আমার মধ্যে বিবেক কম আর আবেগ বেশি ছিলো। আর আবেগের মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহাই অধিক ছিলো। আমি কম্পিত হাতে তীর চালিয়ে দেই। পরে আমার মাথায় এই বুদ্ধিটুকুও আসলো না যে, বলবো, তীর ভুলবশত বেরিয়ে গেছে। বললে তো তুমি অজুহাতটা মেনে নিতে। কারণ, তোমার জানা আছে, আমি কোনোদিন ধনুক হাতে নেইনি। মোটকথা, তোমাকে হত্যা করে মুসলমানের এলাকায় পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার মুক্তির আর কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু আমি সফল হইনি।'

'এর আগে, কখনো পালাবার চিন্তা মাথায় এসেছিলো কি?' বকর জিজ্ঞেস করে।

'প্রথম প্রথম অনেক চিন্তা করেছি'– লিলি উত্তর দেয়– 'কিন্তু পরে বাস্তবতাকে মেনে নিতে বাধ্য হই যে, পালাতে পারবো না। অর্নাত আমাকে সত্যিকার অর্থেই রাজকন্যা বানিয়ে রেখেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বলতেন, তোমার প্রতি আমার যতোটুকু ভালোবাসা জন্মে গেছে, ইতিপূর্বে অন্য কোনো মেয়েকে আমি ততোটুকু ভালোবাসিনি। আমি তার সঙ্গে মদও পান করতে থাকি। না করে উপায় ছিলো না। দৈহিকরূপে আমি তার জীবনে একাকার হয়ে গিয়েছিলাম। এমন রাজকীয় জীবন তো আমি কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু একাকি হলেই আমি মুসলমান হয়ে যেতাম এবং আমার মনে হতো, এই মাত্র আমি হজ্ব করে এসেছি। মাঝে-মধ্যে আমি আল্লাহকে গালাগালিও করে ফেলতাম। অনেক সময় মনে হতো, আমি আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছি।'

'এমনি সময়ে সুলতান আইউবী কার্ক অবরোধ করলেন এবং অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে নগরীর বিপুল অংশ ধ্বংস করে দিলেন। আমি প্রস্তুত হয়ে যাই, আমাদের বাহিনী শহরে ঢুকে পড়বে আর আমি অর্নাতকে নিজ হাতে হত্যা করে ফেলবো। কিন্তু এক মাস পর সুলতান অবরোধ তুলে নিলেন এবং ফেরত চলে গেলেন। অর্নাত অট্টহাসি হাসতে হাসতে আমার নিকট বললো, আমি লোকটাকে আবারো বোকা ঠাওরে দিলাম। আমি তার সঙ্গে চুক্তি করেছি, আগামীতে হাজীদের কাফেলার প্রতি হাত বাড়াবো না। আমি তার সঙ্গে আর যুদ্ধ না করারও চুক্তি করেছি।'

'আমি খুব ব্যথা পেলাম। সুলতান আইউবীর ফেরত না যাওয়া দরকার

ছিলো। আমাকে মুক্ত না করে তার অবরোধ তুলে নেয়া ঠিক হয়নি।'

'সুলতান আইউবীর সামনে এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে'– বকর বললো– 'তাঁকে বরং আমাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করতে হবে, যা কিনা আমাদের প্রথম কেবলা। আমাদেরকে ফিলিস্তিনীনের মাটি দখলমুক্ত করতে হবে, যেটি আমাদের নবী-রাসূলগণের জন্মভূমি। সুলতান আইউবী যদি এক একটি মুসলিম নারীর মুক্তির জন্য বেরিয়ে পড়েন, তাহলে তিনি স্বীয় পবিত্র লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাবেন এবং লড়াই করতে করতেই নিঃশেষ হয়ে যাবেন। জাতি আপন পবিত্র লক্ষ্যের খাতিরে আপন সন্তানদের কুরবান করে থাকে।'

'অর্নাতের একটি মন্দ স্বভাব আমাকে ভুলতে দেয়নি যে, আমি মুসলমান'– কুলসুম বললো– 'তিনি আমাদের রাসূলে খোদার শানে গোস্তাখি করে থাকেন। আরো বলেন, সালাহুদ্দীন আইউবী তার প্রথম কেবলা দখল করার জন্য হাত-পা ছুঁড়ছে আর আমরা তার খানায়ে কাবাকে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে আমাদের উপাসনালয় গড়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি।'

ক্রুসেডারদের এই প্রতিজ্ঞা-পরিকল্পনার উল্লেখ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরাও করেছেন। একবার তারা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে পৌঁছেও গিয়েছিলো। সুলতান আইউবীর কার্ক অবরোধ করে এক মাস পরে তুলে নেয়াও এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অর্নাত যুদ্ধ এবং ভবিষ্যতে হাজীদের কাফেলা লুণ্ঠন না করার চুক্তি করেছিলেন বলে সুলতান অবরোধ প্রত্যাহার করেছিলেন, তা নয়। সুলতানের তো জানাই ছিলো, খৃস্টানরা চুক্তি করেই ভঙ্গ করার জন্য। অবরোধ তুলে নেয়ার আসল কারণ ছিলো, সুলতান বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। অর্নাত এই চুক্তির দু'বছর পর আরেকটি হজ্ব কাফেলার উপর আক্রমণ করেছিলেন। চুক্তির মেয়াদ ছিলো ১১৮৮ সাল পর্যন্ত। সুলতান আইউবী ১১৮৭ সালে হিত্তীন অভিমুখে অগ্রযাত্রা করেন এবং অর্নাতকে নিজ হাতে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে দামেশ্‌ক থেকে বের হয়েছিলেন।

কুলসুম বকর ইবনে মুহাম্মদকে নিজের ইতিবৃত্ত শোনাতে থাকে–

'অর্নাতের সঙ্গে আমি হাসি-খুশিও থাকি এবং আমার হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুনও জ্বলতে থাকে। তিনি আমাকে মাঝে-মধ্যে বলতেন, সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দারা বেশ-ভূষা বদল করে আমাদের ভেতরে ঢুকে পড়ে

এখানকার তথ্য নিয়ে যায়। তিনি আরো বলেছেন, অতিশয় রূপসী খৃস্টান ও ইহুদী মেয়েরা মুসলমানদের অঞ্চলে মুসলমান নাম-পরিচয় ধারণ করে তাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে ফাঁদে ফেলে তাদেরকে ক্রুশের স্বার্থে ব্যবহার করছে। অর্নাত আমাকে ঐ মেয়েদের কাহিনী শোনাতেন। শুনে কয়েকবার আমার মাথায় চিন্তা আসে, এই মেয়েরা আপন ধর্মের জন্য নিজেদের সম্ভ্রম বিসর্জন দিচ্ছে! সম্ভ্রম তো সেই সম্পদ, যার সুরক্ষার জন্য নারীরা জীবনের ঝুঁকি বরণ করে থাকে। অথচ এই মেয়েরা কিনা ধর্মের জন্য সম্ভ্রম বিসর্জন দিচ্ছে। এ কেমন ধর্ম! এরা কেমন নারী!'

'আমার সম্ভ্রম সুরক্ষিত নেই– লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। আমি মনে মনে সংকল্প করি, আমিও আমার ধর্মের জন্য কুরবানী দেবো। কিন্তু তার জন্য সুযোগের তো প্রয়োজন। আমি সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এখন এখানে এসে অর্নাত আমাকে এমন সব মহামূল্যবান সম্পদ দান করেছেন যে, সেই সম্পদ নিয়ে আমাকে সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছুতেই হবে। বোধ হয় আল্লাহ এই পুণ্যের জন্যই আমাকে এই জাহান্নামে প্রেরণ করেছিলেন। তুমি কি বলতো পারবে, এই সংবাদে সুলতানের কোনো উপকার হবে কিনা?'

'অনেক'– বকর বললো– 'কিন্তু এ সংবাদ নিয়ে তোমাকে যেতে দেবো না। তুমি যাবে না। তুমি কিংবা আমরা দু'জনই নিখোঁজ হয়ে গেলে প্রিন্স অর্নাত অমনি ধরে নেবেন, আমরা গোয়েন্দা ছিলাম। ফলে তারা তাদের পরিকল্পনায় রদবদল করে ফেলবে আর আমরা সুলতান আইউবীর নিকট যে সংবাদ পৌঁছাবো, তা তাঁর পরাজয়ের সূত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'তার মানে, এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সুলতানের নিকট পৌঁছুবে না!' কুলসুম বললো।

'পৌঁছুবে এবং অবশ্যই পৌঁছে যাবে'– বকর বললো– 'কিন্তু ব্যবস্থাটা কার্কে গিয়ে করবো।'

'তুমি যাবে?'– কুলসুম জিজ্ঞেস করে– 'আমি তো এখান থেকে পালাতেও চাই।'

'আমি যাবো না'– বকর বললো– 'তুমিও যাবে না। কার্কে আমাদের সহকর্মীরা আছে। তথ্য পৌঁছানোর দায়িত্ব তাদের। আমার কাজ তথ্য সংগ্রহ করা। এখন এ কাজ তুমিও করবে। তোমার কাজ শেষ হয়নি। সবে শুরু হয়েছে মাত্র। সুলতানের জন্য কী ধরনের তথ্যের প্রয়োজন, আমি তোমাকে বলে দেবো। সেসব তথ্য তুমি আমাকে দেবে আর আমি দামেশ্‌ক পৌঁছাবো।'

'তো এই নরকে আমাকে থাকতেই হচ্ছে, না?' কুলসুম ক্ষুণ্নমনে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ'– বকর উত্তর দেয়– 'তোমাকে এই নরকে আর আমাকে মৃত্যুর মুখে পড়ে থাকতে হবে– এ ত্যাগ তোমাকে দিতেই হবে কুলসুম। সুলতান আমাদেরকে বলে থাকেন, একজন গোয়েন্দা কিংবা একজন কমান্ডো তার গোটা বাহিনীর জয় কিংবা পরাজয়ের কারণ হতে পারে। কিন্তু একজন গুপ্তচর সবসময় মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। গুপ্তচর দুশমনের হাতে পড়ে গেলে তাকে তৎক্ষণাৎ খুন করে ফেলা হয় না, তাকে নির্যাতন করা হয়, কষ্ট দেয়া হয়। আপন ধর্ম ও মাতৃভূমির জন্য কাউকে না কাউকে জীবন্ত চামড়া খসানোর মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হয়। একটি জাতির নাম-চিহ্ন তখন মুছে যেতে শুরু করে, যখন তাদের মধ্যে কুরবানীর জযবা নিঃশেষ হয়ে যায়। তুমি এখানে চারটি বছর কাটিয়ে দিয়েছো। আর চারটা মাস কাটাও। এখন আর অর্নাতকে মনিব মনে করো না। তার সঙ্গে আগের চেয়ে বেশি ভালোবাসা দেখাও। মনে মনে বুঝ রাখো, তুমি এমন একটা বিষাক্ত নাগকে কব্জা করে রেখেছো, যে তোমার হাত থেকে ছুটে গেলে ইসলামী দুনিয়াকে দংশন করবে।'

'বলে যাও বকর, বলে যাও'– কুলসুম বললো– 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলো, আমি মহান আল্লাহর দরবারে কীভাবে মুখ দেখাতে পারবো।'

বকর বলতে শুরু করে। লিলিকে পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়ে বললো– 'তোমার এবং আমার মাঝে অন্য কোনো সম্পর্ক আছে বিষয়টা কাউকে বুঝতে দেবে না। এখানে আমাদের গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করার জন্য নানা বেশে খৃস্টান গোয়েন্দারাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ-ও স্মরণ রাখবে, এখানে আমরা দু'জনই গোয়েন্দা নই। আমাদের আরো অনেক সহকর্মী আছে। খৃস্টান সম্রাট ও সেনাপতিগণ যে নগরীতে অবস্থান করছেন, তারা সেখানে দায়িত্ব পালন করছে। তাদের একজন অপরজন থেকে অধিক সাহসী ও বুদ্ধিমান। অন্তরে প্রবঞ্চনা রাখবে না যে, আমরা দু'জনে মিলে বিরাট কাজ করে ফেলেছি। ভাবো না আমরা আল্লাহর বিরাট উপকার করে ফেলেছি। এসব আমাদের কর্তব্য, যা আমাদেরকে পালন করতে হবে। তার জন্য যতো কষ্টই করতে হয়, আমরা বরণ করে নেবো।'

ফিরে এসে কুলসুম যখন তাঁবু এলাকায় নিজ তাঁবুর সামনে গাড়ি থেকে অবতরণ করে, তখন সে প্রিন্সেস লিলি আর বকর ইবনে মুহাম্মদ সায়বাল। কুলসুম যখন গাড়ি থেকে অবতরণ করছিলো, তখন সায়বাল

গাড়ির পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গোলামের ন্যায় মাথানত করে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটি যখন তাঁবুতে গিয়ে প্রবেশ করে, তখন প্রিন্স অর্নাত একটি মানচিত্রের উপর ঝুঁকে রয়েছেন। ঢুকেই কুলসুম বলে ওঠে– 'ভ্রমণে গিয়েছিলাম, শিকারও খেলেছি।'

'কী মেরেছো?' অর্নাত মানচিত্র থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই জিজ্ঞেস করেন।

'কিছুই না'– কুলসুম উত্তর দেয়– 'সব ক'টা তীরই ব্যর্থ গেছে। তবে সত্বর শিকার মারার যোগ্যতা এসে যাবে।' বলে সেও মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে– 'অগ্রযাত্রার চিত্র, নাকি প্রতিরক্ষার?'

'অগ্রযাত্রা সালাহুদ্দীন আইউবী করবেন'– অর্নাত অন্যমনস্কের ন্যায় বললেন– 'আর প্রতিরক্ষাও তাকেই করতে হবে। আমরা তাকে জালে টেনে আনছি। তার নিঃশ্বাস নাকের ডগায় এনেই তবে আমরা অগ্রযাত্রা করবো। তখন আমাদেরকে ঠেকাবার মতো কেউ থাকবে না। তুমি নিজ তাঁবুতে চলে যাও লিলি। আমাকে বহু কিছু ভাবতে হবে। আজ রাত আমাদের কনফারেন্স বসবে। তাতে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও মানচিত্র প্রস্তুত করা হবে। আমাকে সম্পূর্ণ ঠিক ঠিক পরামর্শ দিতে হবে। আমি এই অভিযানের হিরো হতে চাই।'

'তার নাম কুলসুম। বকর ইবনে মুহম্মদ তার সহকর্মী।' সুলতান আইউবীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের উপ-প্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহ সুলতানকে কার্কের গুপ্তচরদের প্রেরিত রিপোর্ট শোনান।

সুলতানের চোখ লাল হয়ে গেছে। তিনি বললেন– 'কে বলতে পারবে, আমাদের কতো কন্যা ঐ কাফেরদের কব্জায় আটক আছে এবং তাদের বিলাসিতার উপকরণে পরিণত হয়ে আছে। অর্নাতকে আমি ক্ষমা করবো না। মনে রাখবে হাসান! এই মেয়েটাকে ওখান থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তবে এখনই নয়।'

'কার্কে আমাদের যে লোক আছে, তারাই উপযুক্ত সময়ে তাকে উদ্ধার করে আনবে।' হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন।

আক্রার পাদ্রী এবং খৃষ্টান সম্রাটগণ তিন দিন নাসেরায় অবস্থান করেন। তারা যুদ্ধের পরিকল্পনা নকশা প্রস্তুত করে ফেলেছেন। কুলসুম অর্নাত থেকে সবকিছু জ্ঞাত হয়ে বকরকে অবহিত করেছে। ক্রুসেডাররাও সুলতান আইউবীর কিছু কিছু তথ্য জেনে ফেলেছে। মসুল, হাল্‌ব ও দামেশ্‌ক,

কায়রো সব অঞ্চলে তাদের গোয়েন্দা আছে। তারা ক্রুসেডারদেরকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করছে। ক্রুসেডাররা এ-ও জেনে গেছে যে, মিসর থেকেও ফৌজ আসছে। সুলতান আইউবী খুব তাড়াতাড়ি অগ্রযাত্রা করবেন, তা-ও তারা জেনে ফেলেছে। ফলে তারা প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ে পরে আইউবীকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা ঠিক করেছে। এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন স্থানে সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছে। তবে তারা এখনো জানতে পারেনি, সুলতান আইউবী কোন্ দিক থেকে আসবেন এবং যুদ্ধের অঙ্গন কোন্‌টা হবে। তারা অনুমানের ভিত্তিতে আইউবীর সেনাসংখ্যা, কতোজন আরোহী, কতোজন পদাতিক হতে পারে, ঠিক করে নিয়েছে।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ কার্ক থেকে আগত তাঁর লোকদের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন। তারাই তাকে কুলসুম ও বকর সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছে। হাসান সেই রিপোর্ট সুলতানকে অবহিত করেছেন।

'এ সংবাদ সেই সকল সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করেছে, যেগুলো অন্যান্য অঞ্চলের গোয়েন্দারা আমাদের প্রেরণ করেছে'– সুলতান আইউবীর বললেন– 'এ তো আমি আগেই বলেছি, ক্রুসেডাররা আমাদের অপেক্ষা করছে। এবার কার্কের রিপোর্ট তার সত্যায়ন করলো। এই রিপোর্টে নতুন তথ্যটি হচ্ছে ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তির পরিমাণ। তাদের সঙ্গে দু'হাজার নাইট থাকবে। এটা নিঃসন্দেহে বিরাট শক্তি। নাইট মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্মপরিহিত এবং সুরক্ষিত থাকে। তাদের ঘোড়া সাধারণ জঙ্গী ঘোড়ার তুলনায় বেশি শক্তিশালী ও কর্মচঞ্চল হয়ে থাকে। রৌদ্রতাপের ব্যারোমিটার যখন উচ্চাঙ্গে থাকবে, আমি তাদেরকে তখন যুদ্ধ করতে বাধ্য করবো।'

'আর সেই বর্ম পরিহিত নাইটদের সঙ্গে আট হাজার অশ্বারোহী সৈনিক থাকবে'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা ত্রিশ হাজারের বেশি জানানো হয়েছে।'

'আমার জন্য একটি নতুন সুসংবাদ হচ্ছে, আর্মেনিয়ার সম্রাটের বাহিনীও ক্রুসেডারদের সঙ্গে আসছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'এরা ক্রুসেডারদের ত্রিশ-বত্রিশ হাজার সৈনিকের অতিরিক্ত। এদেরসহ দুশমনের সেনাসংখ্যা চল্লিশ হাজার হয়ে যাবে। কার্কের রিপোর্ট এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদিতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, ক্রুসেডাররা প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়বে এবং আমাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে। সে মোতাবেক আমার

এই সিদ্ধান্ত সঠিক বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমি হিত্তীনের উপকণ্ঠে লড়াই করবো। আমি এই অঞ্চল সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত।

'বন্ধুগণ! মহান আল্লাহ্ আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেসব পালনে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবার সময় এসে গেছে'– সুলতান আইউবী দামেশ্কে নিজ কক্ষে সালার ও নায়েব সালারদের উদ্দেশে বললেন– 'আমাদেরকে ক্ষমতার জন্য লড়াই করার এবং ক্ষমতার জন্য মৃত্যুবরণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তারপরও আমরা আপসে অনেক খুনাখুনি করেছি। সেই সুযোগে দুশমন ফিলিস্তীনের মাটিতে জেঁকে বসেছে। জাতি আমাদের হাতে তরবারী তুলে দিয়েছিলো এবং এই ভরসায় সঙ্গ দিয়েছিলো যে, আমরা ইসলামের দুশমনদের নির্মূল করবো এবং আরবের পবিত্র ভূখণ্ডকে কাফেরদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করবো।'

'আপনারা কয়েক বছর যাবত অবিরাম যুদ্ধ করে আসছেন। কিন্তু আসল যুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। মস্তিষ্কে এই যুদ্ধের লক্ষ্য তাজা করে নিন। সিদ্ধান্ত নিন, আমাদেরকে একটি স্বাধীন ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে জীবিত থাকতে হবে এবং আল্লাহ্ পাকের মহান ধর্মকে কুফরের অশুভ ছায়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ও তারিক ইবনে যিয়াদ সালতানাতে ইসলামিয়াকে যে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদেরকেও ইসলামী সাম্রাজ্যকে সে পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। তাদের পরে আগত বংশধরদের কর্তব্য ছিলো, আল্লাহ্র পয়গামকে সেখান থেকেও সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার পরিবর্তে আমাদের ধর্মের শত্রুরা আমাদের ঘরে এসে জেঁকে বসেছে এবং তারা খানায়ে কাবা ও রওজায়ে মুবারককে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। কেনো, এমনটা কীভাবে সম্ভব হলো? যেখানে মস্তিষ্কে রাজত্বের উন্মাদনা চেপে বসে, সেখানে সীমান্ত অনিরাপদ হয়ে পড়ে এবং আমীর-শাসকরা ক্ষমতার খাতিরে আপন ধর্ম ও আত্মমর্যাদাবোধকে বিসর্জন দিয়ে দেন।'

'আমাদের পতনের কারণ ক্ষমতার গদির নেশা এবং সম্পদের মোহ। তারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর এখন পৃথিবী আমাদের উপর রাজত্ব করছে। আমরা আখেরাতকে ভুলে বসেছি। আমরা শত্রু-বন্ধুর পরিচয় জানি না। আমাদের সামরিক চেতনার উপর ধ্বংসশীল জগতের স্বপ্নের যাদু প্রভাব বিস্তার করে বসেছে। মনে রাখুন আমার বন্ধুগণ! আমি

আপনাদেরকে বহুবার বলেছি, জাতির ভাগ্য তরবারীর আগা দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। সেনাপতি যখন সিংহাসনে বসে মাথায় মুকুট পরিধান করে, তখন তাঁর হাতে কোষ থেকে তরবারীটা বের করার শক্তি তাঁকে না। তাদের হৃদয়ে আপন বোধ-বিশ্বাস ও স্বজাতির মর্যাদা সুরক্ষার চেতনা থাকে না। শেষে ধর্মটা প্রতারণার কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত আর কোনো কাজের থাকে না।'

'আজ আমরা ইসলামের মর্যাদার খাতিরে শুধু এ জন্য আপন ঘর-পরিজন ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে এবং দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছি যে, আমরা ক্ষমতার পূজারীদের খতম করে দিয়েছি। আমরা আস্তিনের সাপগুলোর মস্তক পিষে ফেলেছি। তারপরও আমরা যদি হেরে যাই, তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের নিয়ত ঠিক ছিলো না।'

সুলতান আইউবী এরূপ আবেগময় এবং দীর্ঘ ভাষণদানে অভ্যস্ত নন। কিন্তু যে লক্ষ্যে তিনি বের হচ্ছেন, তার জন্য সকলকে মানসিক ও আত্মিকরূপে প্রস্তুত করা জরুরি। এরা তাঁর অনুগত ও বিশ্বস্ত সালার-নায়েব সালার। তাদের মধ্যে মুজাফফর উদ্দীনের ন্যায় সুযোগ্য ও দুঃসাহসী সালারও উপস্থিত আছেন, যিনি এক সময় সুলতানের সঙ্গ ত্যাগ করে তাঁর বিরোধী শিবিরে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিলেন। তকিউদ্দীন, আফজালুদ্দীন, ফররুখ শাহ এবং আল-মালিকুল আদিলের ন্যায় সালারগণও তার সঙ্গে আছেন, যারা তার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়। সালার কাকবুরী তাঁর ডান হাত। সামরিক যোগ্যতা এবং চেতনার দিক থেকে তারা একজনও কম নন। কিন্তু সুলতান আইউবী এই প্রথমবার ফিলিস্তীনের মাটিতে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন এবং তার গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস।

অভিযানটা সহজ নয়। ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তি যেমন পরিমাণে বেশি, তেমনি মানে উন্নত। তাদের জন্য সুবিধাটা হচ্ছে, তারা প্রতিরক্ষার জন্য নিজ ভূমিতে লড়াই করবে, যেখানে তাদের রসদের কোনো সমস্যা নেই এবং তারা নিজ অবস্থানের নিকটে। সুলতান আইউবী নিজ অবস্থান থেকে বহু দূরে অভিযানে যাচ্ছেন, যেখানে পর্যন্ত তার রসদ পৌঁছার পথ ঝুঁকিপূর্ণ এবং দূরে। যুদ্ধবিদ্যার হিসাব মোতাবেক আক্রমণকারী পক্ষই বেশি সমস্যা-অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। সে কারণে আক্রমণকারী পক্ষের সেনাসংখ্যা প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনগুণ না হোক দ্বিগুণ তো বেশি

হতেই হয়। কিন্তু সুলতান আইউবী আক্রমণকারী হওয়া সত্ত্বেও তার সেনাসংখ্যা প্রতিপক্ষের তুলনায় কম। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এই যুদ্ধ দীর্ঘতা লাভ করবে এবং ঘরে ফিরে আসা সম্ভব হবে না। তাই তিনি সালারদেরকে তারিক ইবনে যিয়াদের সেই অভিযানের কথা স্মরণ রাখতে বলে দিলেন, যাতে তিনি রোম উপসাগর অতিক্রম করে নৌকাগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে ফিরে যাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে বেরিয়ে যায়।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় 'সুলতান আইউবীর উপর কী বিভীষিকা নেমে এসেছিলো' শিরোনামে লিখেছেন–

'সুলতানের বিশ্বাস ছিলো, আল্লাহ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ প্রদান করেছেন। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁর প্রথম কর্তব্য। কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। অধিক থেকে অধিকতর রাজ্যকে আল্লাহর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিশ্ব মানবতাকে আল্লাহর অনুগত বানানো তাঁর প্রধান ব্রত। তিনি যেখানে তাঁর যতো বাহিনী ছিলো, সকলকে এশতরা নামক স্থানে সমবেত হওয়ার আদেশ জারি করেন। আদেশনামায় আল্লাহ পাকের নির্দেশের উদ্ধৃতিও উল্লেখ করেছেন।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দৃষ্টিভঙ্গী ভবিষ্যতের ঘন আঁধারের উপর উঁকি মারছে। তিনি হিত্তীনের অঞ্চলকে যুদ্ধের অঙ্গন বানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হিত্তীন ফিলিস্তীনের একটি অখ্যাত গাঁ। কিন্তু সুলতান আইউবী গ্রামটাকে এতোই মর্যাদা দান করেন যে, খৃস্টজগতের সমর বিশ্লেষকগণ আজো পর্যালোচনা করে চলেছেন, ক্রুসেড যুদ্ধের এই হিরো কীরূপ কৌশল-স্ট্রাটেজি প্রয়োগ করে এমন শক্তিমান ও উন্নত অস্ত্রসজ্জিত শত্রুপক্ষকে এমন লজ্জাজনক পরাজয়ের মুখে নিপতিত করলেন, খৃস্টানদের একজন ব্যতীত বাকি সব ক'জন সম্রাট যুদ্ধবন্দি হয়ে গেলেন!

যুদ্ধবিদ্যার খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলী বোঝেন এমন সব সামরিক বিশ্লেষক ও ঐতিহাসিকগণ সুলতান আইউবীর অন্যান্য গুণাবলী ছাড়াও তাঁর ইন্টেলিজেন্স, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ও কমান্ডো অপারেশনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বকর ইবনে মুহম্মদের ন্যায় গোয়েন্দাদের আপন জীবনকে মৃত্যুর মুখে রেখে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেসব তথ্য সুলতানের নিকট পৌঁছানো সে আরেক বাস্তবতা। কুলসুমের ন্যায়

নির্যাতিতা মেয়েরা রাজকীয় বিলাসী জীবন পরিত্যাগ করে নিজ নিজ উদ্যোগে ইসলামী বাহিনীর সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিলো। ইতিহাস এই অখ্যাত গাজী ও শহীদদের নাম জানাতে অপারগ, যারা পর্দার আড়ালে এবং মাটির নীচে যুদ্ধ করে হিত্তীনকে ইসলামের মর্যাদার সুমহান প্রতীকে পরিণত করেছিলো।

সুলতান আইউবী সবসময় যুদ্ধের জন্য জুমার দিন রওনা হতেন। কারণ, এটি পুণ্যময় ও বরকতময় দিন। এই মুবারক দিনে প্রত্যেক মুসলমান মহান আল্লাহর সমীপে সেজদাবনত হয়ে থাকে। আর সৈনিক যখন আপন জাতিকে ইবাদতে নিমগ্ন রেখে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন সমগ্র জাতির দু'আ তাদের সঙ্গ নেয়। হিত্তীন অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্যও সুলতান এই জুমার দিনটিকে নির্বাচন করেন। ১১৮৭ সালের ১৫ মার্চ। সুলতান আইউবী ফৌজের মাত্র একটি অংশকে সঙ্গে নিয়ে কার্কের সন্নিকটে এক স্থানে গিয়ে ছাউনি ফেলেন।

খৃস্টান গুপ্তচররা তৎক্ষণাৎ তাদের জোট বাহিনীকে সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়, সুলতান আইউবী কার্কের সন্নিকটে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তা থেকে বুঝে নেয়া হয়, সুলতান কার্ক অবরোধ করবেন। কিন্তু আসলে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মিসর ও সিরিয়ার হজ্ব কাফেলা। হাজীরা হজ্ব সম্পাদন করে ফিরে আসছে। তাদের উপর কার্কের অদূরেই আক্রমণ হয়ে থাকে। কার্কের শাসনকর্তা প্রিন্স অর্নাত এ কাজে বেশ পারঙ্গম। কাফেলাগুলোকে নিরাপদে এলাকাটা পার করিয়ে দেয়ার জন্যই সুলতান আইউবী এখানে এসে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি ক্রুসেডারদের ধোঁকা দিতে চান, যেনো তারা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়। তিনি তাঁর সালারদেরকে সকল পরিকল্পনা অবহিত করে রেখেছেন।

কার্কের রাজপ্রাসাদে যেনো কম্পন শুরু হয়েছে। প্রিন্স অর্নাতকে মধ্যরাতে ঘুম থেকে জাগ্রত করে বলা হলো, বিশাল এক বাহিনী নগরীর অনতিদূরে ছাউনি ফেলছে। অর্নাত ধড়মড় করে উঠে বসেন। সালাহুদ্দীন আইউবী ছাড়া আর কে হতে পারে! কুলসুমও অর্নাতের শয্যায় শায়িত ছিলো। কথার শব্দে জাগ্রত হয়ে সেও অর্নাতের সঙ্গে দৌড়ে নগরীর প্রধান ফটকের উপর দিককার প্রাচীরের উপর উঠে যায়। ওখানে হাজার হাজার

প্রদীপ জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। তাঁবু স্থাপন করা হচ্ছে। রাতের নিস্তব্ধতায় ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনির শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

অর্নাত তার বাহিনীকে অবরোধের মধ্যে যুদ্ধ করার জন্য প্রাচীরের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। ফটকের উপর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করা হয়। অর্নাত ছুটে বেড়াচ্ছেন। কুলসুমের কোনো খেয়াল নেই তার। কুলসুম ফিরে গিয়ে দেখতে পায়, অর্নাতের রক্ষী বাহিনী জাগ্রত হয়ে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এক স্থানে সেই ঘোটকযানটি দণ্ডায়মান, যেটিতে করে কুলসুম নাসেরা গিয়েছিলো এবং ভ্রমণে বের হয়েছিলো। তার পার্শ্বে বকর ইবনে মুহম্মদ প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। ওখানকার প্রতিজন মানুষ যার যার ডিউটিতে চলে গেছে।

কুলসুম আদেশের সুরে বকরকে বললো– 'সায়বাল! গাড়িটা এদিকে নিয়ে আসো।'

বকর গাড়ি নিয়ে এলে কুলসুম তাতে চড়ে বসে এবং তাকে একদিকে নিয়ে যায়। অর্নাতের হেরমের নারীরাও জাগ্রত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। তারা তাদের ভাষায় প্রিন্সেস লিলিকে গাড়োয়ানকে আদেশ দিতে এবং গাড়িতে চেপে বসে যেতে দেখেছে। একজন দাঁত কড়মড় করে বললো– 'এই হতভাগী মুসলমানের বাচ্চাটা নিজেকে রাণী ভাবতে শুরু করেছে! ওকে নিশানা বানাতেই হবে।'

'সময় এসে গেছে'– আরেকজন বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর অবরোধ খুব ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। তিনি আগুন নিক্ষেপ করবেন, মিনজানিকের সাহায্যে পাথর ছুঁড়বেন। ভেতরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবেন। এরূপ অস্থিতিশীল মুহূর্তের কোনো এক সুযোগে আমরা ডাইনিটাকে ঠিকানা লাগিয়ে দেবো।'

'তোমার প্রেমিক প্রবর সেনাপতিটাও তো কিছু করতে পারলো না।' তৃতীয়জন বললো।

'কিছু করবার লোক আরো বহু আছে'– সে উত্তর দেয়– 'কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের অবস্থা দেখো। তারপরে প্রিন্স অর্নাত অন্য কোনো প্রিন্সেসকে খুঁজে বেড়াতে বাধ্য হবেন।'

কুলসুম গাড়িটা এক অন্ধকার স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখে। বকর গাড়ির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। কুলসুম তাকে জিজ্ঞেস করে– 'আমাদের লোকেরা কি ভেতর থেকে ফটক খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারে না?'

'চেষ্টা করা হবে'– বকর বললো– 'এই ফৌজ যদি আমাদের হয়ে থাকে, তাহলে আমার বিস্ময় লাগছে, আমাদেরকে আগে অবহিত করা হলো না কেনো! সুলতান আইউবী তো এমন ভুল করেন না। আমার সন্দেহ হচ্ছে। সকালে জানতে পারবো, এ কার ফৌজ।'

'আমরা কি এখান থেকে পালাতে পারবো?' কুলসুম জিজ্ঞেস করে।

'পরিস্থিতি বলবে।' বকর উত্তর দেয়।

'এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আমি অর্নাতকে হত্যা করতে পারি।' কুলসুম বললো।

'এমন যেনো না করো'– বকর ইবনে মুহম্মদ বললো– 'ফৌজ নগরীতে ঢুকে পড়লে আমরা চোখ রাখবো, যেনো তিনি পালাতে না পারেন। নতুন কোনো খবর?'

'অর্নাত নজর রাখছিলেন, সুলতান আইউবী কোন্ দিকে অগ্রযাত্রা করেন'– কুলসুম বললো– 'এখন পরিস্থিতি অন্য কিছু হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম বলতেন, আইউবী ফৌজ নিয়ে গ্যালিলি ঝিলের দিকে যাচ্ছেন।'

'বেশিক্ষণ থাকা যাবে না'– বকর বললো– 'চলো, ফিরে যাই।'

❖ ❖ ❖

পরদিন ভোর বেলা। কার্কের পাঁচিলের উপর দূরপাল্লার ধনুক হাতে তীরন্দাজগণ দণ্ডায়মান। পাথর ও অগ্নিগোলার পাতিল নিক্ষেপকারী মিনজানিক স্থাপন করা হয়েছে। ফৌজ প্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রিন্স অর্নাত পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে সুলতান আইউবীর বাহিনীর প্রতি তাকিয়ে আছেন। এতোক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীরই বাহিনী। তবে সুলতান নিজে সঙ্গে আছেন কিনা জানা যায়নি। কিন্তু বাহিনীর মধ্যে অবরোধ জাতীয় কোনো তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাঁবু স্থাপন করা আছে। সৈনিকরা স্বাভাবিক ক্রিয়া-কর্মে রত।

এ দিনটি কেটে গেছে। তারপর অতিবাহিত হয়ে গেছে আরো ছয় দিন। অর্নাতের অপেক্ষার পালা যতো দীর্ঘ হচ্ছে, অস্থিরতা ততো বাড়ছে। তিনি যে বিষয়টি জানতে পারেননি, তা হচ্ছে, রাতে সুলতান আইউবী তার অশ্বারোহী কমান্ডো বাহিনীটিকে সে পথে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন, যে পথে হাজীদের কাফেলার আসবার কথা। দিন কয়েক পর প্রথম কাফেলাটি আসতে দেখা গেলো। এটি মিসরের কাফেলা। সুলতান আইউবীর অশ্বারোহী বাহিনীটি তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কাফেলা

সুলতানের তাঁবু অঞ্চলের সন্নিকটে পৌঁছুলে তিনি ছুটে এগিয়ে গিয়ে হাজীদের সঙ্গে মুসাফাহা করেন। পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে সকলের হাতে চুমো খান এবং বিশ্রাম ও আহারের জন্য তাঁবুতে নিমন্ত্রণ জানান। আইউবীর কমান্ডোরা বহুদূর পর্যন্ত কাফেলার সঙ্গে গমন করে। একদিন পরই সিরীয় হাজীদের কাফেলাও এসে পড়ে। সুলতান তাদেরও স্বাগত জানান, আপ্যায়ন করেন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিদায় জানান।

এ সময়ে কার্কের অভ্যন্তরে খৃস্টান বাহিনী প্রস্তুত অবস্থায় অবস্থান করে। জনমনে আতঙ্ক ছেয়ে গেছে। সুলতান আইউবীর গোয়েন্দারা নিজ নিজ কর্তব্য পালনে ব্যস্ত থাকে। এক সকালে অর্নাত সংবাদ পান, সুলতান আইউবীর ফৌজ চলে যাচ্ছে। অর্নাত শুধু এটুকু দেখলেন যে, হাজীদের দু'টি কাফেলা সুলতান আইউবীর বাহিনীর হেফাজতে অতিক্রম করে গেছে। শুধু সুলতান আইউবীর গোয়েন্দারাই জানে, আসল কাহিনী কী ছিলো। সুলতান রওনা দেয়ার আগে গোয়েন্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা অন্যত্র যাচ্ছি। গোয়েন্দারা সুলতানকে অর্নাতের গতিবিধির খোঁজ-খবর জ্ঞাত করতে থাকে।

১১৮৭ সালের ২৭ মে। সুলতান আইউবী এশতরা নামক স্থানে ছাউনি স্থাপন করেন। সেখানে মিসর ও সিরিয়ার ফৌজ তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-মালিকুল আফজাল– যার বয়স ষোল বছর– প্রখ্যাত সেনাপতি মুজাফফর উদ্দীনের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। এভাবে তাঁর সমস্ত বাহিনী একত্রিত হয়ে যায়। তিনি সকল সালার ও নায়েব সালারদের সর্বশেষ দিক-নির্দেশনার জন্য একত্রিত করেন। সুলতান বললেন–

'আমার বন্ধুগণ! আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন। অন্তর থেকে আপন-পরিজন ও বাড়ি-ঘরের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিন। হৃদয়ে প্রথম কেবলার ভাবনা ঠাঁই করে নিন এবং যে মহান আল্লাহ আমাদেরকে মুসলমানের প্রথম কেবলাকে ক্রুসেডারদের অপবিত্র দখল থেকে মুক্ত করার এবং কাফেরদের হাতে সম্ভ্রম হারানো বোন-কন্যাদের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেয়ার তাওফীক দান করেছেন, তাকে স্মরণ রাখুন।'

'আজ আমরা বাস্তব কথা বলবো। আমাদের সংখ্যা শত্রুর মোকাবেলায় কম। আমাদের মোকাবেলা সাতজন খৃস্টান সম্রাটের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে থাকবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্মাবৃত দু'হাজার দু'শত নাইট। বাদ বাকি সৈন্যরাও আধা-বর্মাচ্ছাদিত। তদুপরি এই বাহিনীর জন্য সুবিধাটা হচ্ছে,

তাদের ঠিকানা নিকটে এবং এই সমগ্র অঞ্চল নিজেদের, যেখানে তাদের রসদের সমস্যায় পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমাদের দু'টি যুদ্ধ লড়তে হবে। সরাসরি শত্রুর মোকাবেলায় এবং আমাদের যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তার মোকাবেলায়। এই সংকট-সমস্যা আমাদেরকে শত্রুর দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

নকশাটা সামনে মেলে ধরে সুলতান আইউবী যুদ্ধক্ষেত্র কোন্‌টা হবে তরবারীর আগা দ্বারা সকলকে দেখিয়ে দেন। যেসব সালার অঞ্চলটা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তারা চমকে ওঠে সুলতান আইউবীর দিকে তাকান। তাদের চোখে বিস্ময়। সুলতান তাদের বিস্ময়ভাব বুঝে ফেলে মুচকি হাসলেন।

'এটা হিত্তীনের উপকণ্ঠীয় ময়দান'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আপনারা ভাবছেন, এ অঞ্চল তো শুকিয়ে যাওয়া গাছের বাকলের ন্যায় শুষ্ক, উঁচু-নিচু এবং ঋতুর নির্মমতায় চৌচির। আরো ভাবছেন, এই এলাকার মাটি এতোই পিপাসু যে, মানুষ-ঘোড়া যাকেই পাবে, রক্ত চুষে খাবে। আপনারা দেখেছেন, তার এখানে-সেখানে উঁচু-নিচু পাথরখণ্ড ছড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, জায়গাটা ঠিকই ঘাস-পাতা, তরুণতাহীনই এবং পিপাসাকাতরও। রোদের সময় লোহার ন্যায় উত্তপ্ত থাকে। আপনাদের জিজ্ঞাসু চোখে যে প্রশ্নটি উঁকি-ঝুঁকি মারছে, আমি তা বুঝি। আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছেন, সে কোন্ বাহিনী, যারা নরকময় এই অঞ্চলে যুদ্ধ করতে পারবে? হ্যাঁ, সে আমাদের বাহিনী। আপনাদের হাল্কা-পাতলা আরোহী সৈন্যরা এই অঞ্চলে প্রজাপতির ন্যায় উড়ে বেড়াবে আর লোহার ভারি পোশাকে আবৃত নাইট আর অধ-বর্মপরিহিত খৃস্টান সৈন্যদের নাচাতে থাকবে। দুশমনের এই আরোহী ও পদাতিক সৈন্যরা লোহার উত্তাপে অল্প সময়ে পিপাসায় বেহাল হয়ে যাবে এবং লোহার ভার তাদেরকে অতোটুকু ছুটে বেড়াতে দেবে না, যতোটুকু ছুটে বেড়াবে আমাদের সৈন্যরা।'

'আপনারা জানেন, আমি প্রতিটি অভিযান পবিত্র জুমা দিবসে শুরু করে থাকি। আমি সেই সময়ে রওনা হবো, যখন মসজিদগুলোতে মুসলমানরা খুতবা শ্রবণ করবে। এটা দু'আ কবুল হওয়ার সময়। আমি প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় নির্দেশনা প্রেরণ করেছি, জুমার দিবসের দু'আয় যেনো মুসল্লিরা সেই মুজাহিদদের কথা স্মরণ রাখে, যারা জুমার নামায থেকে বঞ্চিত হয়ে

যুদ্ধের ময়দানে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে, আবার উঠে দাঁড়ায় এবং জুমা না পড়তে পারার কাফফারা রক্তের নজরানা দ্বারা আদায় করে। আর এ সময়টা ঠিক সেই সময়, যখন সূর্যটা মাথার উপরে থাকবে এবং লোহাকে কামানের চুল্লির ন্যায় উত্তপ্ত করে তুলবে।'

'আর এই দেখুন, এটা গ্যালিলির ঝিল আর এটা হচ্ছে নদী'– তরবারীটাকে লাঠির ন্যায় নকশার উপর মেরে মেরে সুলতান আইউবী বললেন– 'আর এটা হলো অত্র অঞ্চলের একমাত্র পুকুর, যাতে পানি আছে। বাদ বাকি সব পুকুর-কূপ শুকিয়ে গেছে। এই সেই মাস, যাকে ক্রুশের পূজারীরা জুন বলে থাকে। আমাদেরকে পানি আর দুশমনের মধ্যখানে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। আমি মুখের ভাষায় দুশমনকে পানি থেকে বঞ্চিত করে ফেলেছি। বাস্তবে তাদেরকে পিপাসায় মারা আপনাদের কাজ। দুশমন হিত্তীনের এই অঞ্চলে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি তাদেরকে এখানেই যুদ্ধ করাবো। আমি ফৌজকে চার ভাগে বিভক্ত করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মুজাফফর উদ্দীন এবং আমার পুত্র আল-আফজাল আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই। তারা বাহিনীর একটি অংশকে নিয়ে গ্যালিলি ঝিলের দক্ষিণ দিয়ে জর্ডান নদী পার হয়ে গেছে। এই বাহিনীটি তুর পর্বত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। বোধ হয় পৌঁছে গেছেও। এটা একটা ধোঁকা, যা আমি দুশমনকে প্রদান করছি।'

সুলতান আইউবী ফৌজের অবশিষ্ট তিন অংশের বিস্তারিত এবং তাদের মিশন বর্ণনা করেন। তার একটি অংশ সুলতান নিজের সঙ্গে রাখেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এই বাহিনীকে রিজার্ভ এবং টাস্কফোর্স হিসেবে ব্যবহার করার কথা ছিলো। শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত অপারেশনে অংশ নেয়া এদের দায়িত্ব ছিলো। সবগুলো অংশকে বিভিন্ন স্থান দিয়ে নদী পার করিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্রুসেডাররা তাদের গুপ্তচর ও সোর্সদের মাধ্যমে এই গতিবিধি প্রত্যক্ষ করছিলো। কিন্তু বুঝে ওঠতে পারছিলো না, আইউবীর পরিকল্পনাটা কী। সুলতান আইউবী নিজে গ্যালিলি ঝিলের পশ্চিম তীর হয়ে তাবরিয়া নামক স্থানে এক পাহাড়ের উপর গিয়ে ছাউনি ফেলেন।

❖ ❖ ❖

ক্রুসেডাররা আরো একটি প্রতারণার শিকার হয়। সুলতান আইউবী সাধারণত কমান্ডো ধরনের যুদ্ধ লড়তেন, গেরিলা আক্রমণ চালাতেন। স্বল্প থেকে স্বল্পতর সংখ্যক সৈন্য দ্বারা দুশমনের বিপুল সৈন্যের উপর 'আঘাত

করো, পালিয়ে যাও' নীতি অনুযায়ী হামলা করতেন এবং দুশমনকে ছড়িয়ে দিতেন। ক্রুসেডাররা সুলতান আইউবীর এ ধারার যুদ্ধেরই মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতো। তাঁর বাহিনীর যে অংশটি মুজাফফর উদ্দীন ও আল-আফজালের কমান্ডে নদী পার হয়ে গিয়েছিলো, সেটি ক্রুসেডারদের সেনা চৌকিগুলোর উপর গেরিলা হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে। এতে ক্রুসেডাররা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে যে, সুলতান আইউবী তার বিশেষ ধারায়ই যুদ্ধ করবেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁর পরিকল্পনা ভিন্ন। কমান্ডো সেনাদের তিনি যথারীতি সেই মিশনই বুঝিয়ে দেন, যা প্রতিটি যুদ্ধে দিয়ে থাকেন।

খৃস্টান ফৌজ দুর্গের ভেতরেও আছে, বাইরেও আছে। সুলতান আইউবী দ্রুতগতিতে তাঁর বাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে ফেলেন যে, গ্যালিলি ঝিলের এবং উক্ত অঞ্চলের একমাত্র পানির পুকুরটি তাঁর দখলে এসে যায়। খৃস্টান বাহিনীর একটি অংশ সাইফুরিয়া নামক স্থানে সমবেত হয়। কিন্তু সুলতান আইউবী সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে তাবরিয়ায় বসে থাকেন। তিনি দুশমনকে হিত্তীনের নিকটে নিয়ে আসতে চাইছেন। যখন দেখলেন, ক্রুসেডাররা সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে না, তখন তিনি পদাতিক বাহিনীকে খানিক সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে তাবরিয়ার উপর আক্রমণ করে বসেন এবং আদেশ জারি করেন, তাবরিয়াকে ধ্বংস করে নগরীতে আগুন লাগিয়ে দাও। তাঁর আদেশ পালিত হয়।

তাবরিয়ার দুর্গ নগরী থেকে সামান্য দূরে। ফৌজ দুর্গে ছিলো। নগরীকে রক্ষা করার জন্য ফৌজ দুর্গ থেকে বেরিয়ে নগরীর উদ্দেশে রওনা হয়। সুলতান আইউবী তাদের পথরোধ করে ফেলেন। তিনি বাহিনীর অপর অংশকে বিভিন্ন দিকে রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রুসেডারদের যে বাহিনী দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার কমান্ডার হলেন সম্রাট রেমন্ড। তাবরিয়ার পাথুরে অঞ্চলে তার ও সুলতান আইউবীর মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ সেই যুদ্ধের চোখে দেখা চিত্র এভাবে অংকন করেছেন–

'উভয় বাহিনীর আরোহী সেনারা প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমে সম্মুখের অংশটি তীর চালাতে চালাতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যায়। পরে পদাতিক বাহিনীকেও মাঠে নামানো হয়। ক্রুসেডাররা চোখে মৃত্যু দেখতে শুরু করে। মুসলমানদের পেছনে নদী এবং সামনে শত্রু। পেছনে সরে যাওয়ার জন্য তাদের কোনো জায়গা নেই। সে কারণে উভয়

বাহিনী এমন উন্মাদের ন্যায় লড়াই করে, যার বিবরণ বলে বুঝানো সম্ভব নয়।'

সারাটা দিন যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। রাতে মুসলমান কমান্ডোরা দুশমনকে অস্থির করে রাখে। দুশমনের ফৌজ ও ঘোড়া পিপাসার্ত। পানি মুসলমানদের দখলে। গেরিলারা দুশমনকে পানির সন্ধানে যেতে দিচ্ছে না। পরদিন ক্রুসেডাররা টিলায় চড়ে যুদ্ধ করে। মুসলমানরা এগিয়ে এসে এসে আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু উপরে থাকায় ক্রুসেডাররা আজ বেশি সুবিধা ভোগ করছে। মুসলমানরা টিলা ঘেরাও করে উপরে উঠতে শুরু করে। পদাতিক তীরন্দাজরা উপর থেকে তাদের উপর তীর ছুঁড়তে শুরু করে। এমন সময়ে ক্রুসেডাররা দেখে, তাদের কমান্ডারের ঝাণ্ডা দেখা যাচ্ছে না। তখনই জানা গেলো, কমান্ডার রেমন্ড যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছেন। অথচ, তিনি বড় ক্রুশের উপর হাত রেখে জোটের শরীকদের অনুগত থাকার এবং রনাঙ্গনে পিঠ না দেখানোর শপথ নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হিত্তীনের এই যুদ্ধে বড় ক্রুশটা নিয়ে আসা হয়েছিলো।

ক্রুসেডারদের পলায়নের পথ বন্ধ। এখন তারা প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ছে। উঁচু স্থানগুলো তাদের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ঐদিনটিও কেটে গেছে। মুসলিম সৈন্যরা বিপুল পরিমাণ শুষ্ক ঘাস ও কাঠ সংগ্রহ করে ক্রুসেডারদের চারপার্শ্বে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাতে আইউবীর সৈন্য ঘাস-লাকড়ি সংগ্রহ করে আগুনের তেজ বৃদ্ধি করতে থাকে। সারাদিনের পিপাসাকাতর ও ক্লান্ত খৃস্টান সৈন্যরা টিলার উপর ঝলসে যেতে থাকে। তাদের একটি ইউনিট পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলমানরা তাদের একজনকেও জীবন নিয়ে যেতে দেয়নি। পরদিন ক্রুসেডাররা অস্ত্র সমর্পণ করে এবং সেনাপতিগণসহ সকলে সুলতান আইউবীর হাতে বন্দি হয়ে যায়।

সুলতান আইউবীর বাহিনীর অপর তিন অংশ বিভিন্ন স্থানে কখনো ক্রুসেডারদের পার্শ্বের উপর আক্রমণ করছে ও বেরিয়ে যাচ্ছে, কখনো পেছনের উপর হামলা চালিয়ে এদিক-ওদিক সরে যাচ্ছে। এক-দু'টি প্লাটুন এমন ধারায় দুশমনের সম্মুখে অবস্থান নিয়ে আছে যে, তারা এই সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছে, তো এই পিছিয়ে আসছে। এভাবে দুশমন হিত্তীনের ময়দানে এসে পড়ে। কিন্তু ততোক্ষণে তারা এবং তাদের ঘোড়াগুলো পিপাসায় আধমরা হয়ে গেছে।

১১৮৭ সালের ৩ জুলাই। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী হিত্তীনের জন্য

যে পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন, এদিনে সে অনুপাতে অভিযান শুরু করেন। এ দিনটিও ছিলো পবিত্র জুমার বরকতময় দিন। ইতিপূর্বে গোয়েন্দারা– যাদের মধ্যে কুলসুম ও বকর উল্লেখযোগ্য– রিপোর্ট করেছিলো, সাত খৃস্টান জোট বেঁধেছেন। মোকাবেলায় সুলতান আইউবীর সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করার তো সুযোগ ছিলো না। কিন্তু তিনি যুদ্ধকৌশল, বাহিনীর বণ্টন, বিন্যাস, কমান্ডো গেরিলাদের ব্যবহার, তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা, রণাঙ্গনে দ্রুত চলাচলের ধরণ ইত্যাদিতে রদবদল করে নিয়েছেন এবং নতুন করে কিছু কার্যকর কৌশল ঠিক করে রেখেছেন। তিনি দুশমনকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হিত্তীনে নিয়ে এসেছেন। আশপাশের দুর্গ এবং বসতিগুলোও দখল করে নিয়েছেন। পানির উৎস তাঁর নিয়ন্ত্রণে। ঋতুর রুদ্ররোষও তাঁর পক্ষে।

শত্রু বাহিনী যখন হিত্তীন এসে উপনীত হয়, তখন তারা জানতো না, তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিপুণভাবে পাতা জালে এসে অনুপ্রবেশ করেছে। আইউবীর গেরিলা বাহিনী দুশমনের পাহারা চৌকি, টহল সেনা, আউটপোস্ট এবং রসদের জন্য প্রলয় সৃষ্টি করে রেখেছে। রাতে তারা না শত্রুসেনাদের আরাম করতে দিচ্ছে, না সেনাপতিদের ভাবনা-চিন্তার সুযোগ দিচ্ছে।

১১৮৭ সালের ৪ জুলাই সুলতান আইউবীর বাহিনীর মধ্যম অংশ মুখোমুখি আক্রমণ করে বসে। টিলা-টিপির কারণে যুদ্ধের অঙ্গনটা সংকীর্ণ। ক্রুসেডাররা এদিক-ওদিক থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে মুসলিম সেনারা তৎপর হয়ে ওঠছে। তীরন্দাজগণ উঁচুতে অবস্থান গ্রহণ করে ক্রুসেডারদের উপর তীর ছুঁড়ছে। সুলতান আইউবী একবার উপরে উঠছেন, আবার নীচে অবতরণ করছেন। তাঁর দূত সংবাদ-বার্তা আদান-প্রদান করছে। লোহার বর্ম খৃস্টান নাইটদের পুড়ে মারছে। তাদের ঘোড়াগুলো পিপাসায় কাতর। সম্মুখে পানি দেখা যাচ্ছে, যা তাদের পিপাসাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। কিন্তু পানির দখল আইউবীর হাতে।

ক্রুসেডাররা হেডকোয়ার্টারে সাহায্যের আবেদন পাঠায়। অল্প সময়ে সাহায্য তথা নতুন সৈন্য এসে পড়ে। শেষবারের মতো তারা একটা জবাবি আক্রমণ চালায়।

তারা মুসলিম বাহিনীর যে অংশটির উপর আক্রমণ চালায়, তার সেনাপতি তকিউদ্দীন। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি তার বাহিনীকে

অর্ধ বৃত্তাকারে বিন্যস্ত করে দেন। দুশমন সোজা ধেয়ে আসে। তকিউদ্দীন বৃত্তের মুখ বন্ধ করে দেন। ক্রুসেডাররা তার বেষ্টনীতে আটকা পড়ে যায়। মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের কেটে-পিষে ফেলে।

এখন যুদ্ধের অবস্থাটা হলো, ক্রুসেডাররা হিত্তীনের ময়দানে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ছে। হিত্তীন থেকে দূরে কোথাও তাদের যদিও কোনো ইউনিট থেকে গিয়ে থাকে, তাহলে মুসলমানরা তাদের সেখানেই বেকার করে দিয়েছে। এই প্রথম ও শেষবারের মতো আক্রার পাদ্রী 'বড় ক্রুশ'সহ রণাঙ্গনে উপস্থিত রয়েছেন। তিনি মনে বড় আশা নিয়ে এসেছিলেন। খৃস্টান সম্রাটগণ এই ক্রুশেই হাত রেখে আমৃত্যু অটল থেকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সম্রাটগণ তার আশার গুড়ে বালি ছিটিয়ে পিঠ দেখাতে শুরু করেছেন। গাই অফ লুজিনান দু'জন সঙ্গীসহ পালাতে শুরু করলে মুসলিম সৈনিকরা দেখে ফেলে এবং তাকে জীবিত ধরে ফেলে।

আক্রার পাদ্রী মৃত্যুবরণ করেছেন। 'বড় ক্রুশ' মুসলমানদের হাতে এসে পড়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ এই ক্রুশ সম্পর্কে কিছু লিখেননি। সে কালের লিপি থেকে প্রমাণিত হয়, বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পর সুলতান আইউবী ওখানকার খৃস্টানদের সম্মানার্থে ক্রুশটা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত হিত্তীন যুদ্ধ চূড়ান্তে পৌঁছে যায়। ক্রুসেডারদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ ছিলো না। অসংখ্য-অগণিত সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে। অবশিষ্টরা অস্ত্র সমর্পণ করে আইউবীর হাতে বন্দি হয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষে সুলতান আইউবীর সম্মুখে যেসব বন্দিকে হাজির করা হলো, তাদের মধ্যে রেমন্ড ব্যতীত জোট বাহিনীর ছয় সম্রাটই আছেন। আছেন প্রিন্স অর্নাতও, সুলতান যাকে নিজ হাতে হত্যা করার কসম খেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছে এবং কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদও বর্ণনা করেছেন, সুলতান আইউবী খৃস্টান সম্রাট জেফ্রেকে শরবত পান করতে দিয়েছিলেন। জেফ্রে অর্ধেক পান করে গ্লাসটা অর্নাতকে দিয়ে দেন।

অর্নাত শরবত পান করতে শুরু করেন। সুলতান আইউবী দোভাষীর মাধ্যমে গর্জে ওঠে বললেন– 'ওকে (অর্নাতকে) বলো, ওকে আমি নই– তার সম্রাট শরবত দিয়েছে। আরবী মেজবান শুধু সেই শত্রুকে শরবত পান করতে দেয়, যার জীবন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি অর্নাতকে শরবত দেইনি।'

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, সে সময় সুলতান আইউবীর চোখ থেকে যেনো স্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিলো।

সুলতান চাকরদের বললেন, এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো। সকলে তাঁবুতে বসে আহার করেন। সুলতান পুনরায় জেফ্রে এবং অর্নাতকে নিজ তাঁবুতে ডেকে পাঠান। অর্নাতকে বললেন– 'তুমি সবসময় আমার রাসূলকে অবমাননা করতে। এখন ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তোমার মুক্তির আর কোন পথ নেই।'

অর্নাত অস্বীকৃতি জানান।

সুলতান আইউবীর এটাই কামনা ছিলো। তিনি ঝট করে তরবারীটা বের করে এক আঘাতে অর্নাতের একটা বাহু দেহ থেকে আলাদা করে ফেলেন এবং চীৎকার করে বলে ওঠেন– 'শয়তান! আমার প্রিয় রাসূলের অবমাননা করেছিস্! গালিগুলো যদি আমাকে দিতে, তবু জীবনটা রক্ষা পেতো।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান আইউবীর তাঁবুতে তাঁর যে দু'তিনজন সালার ছিলেন, তারা তরবারীর আঘাতে অর্নাতকে খতম করে দেন। সুলতান শ্লেষমাখা কণ্ঠে বললেন– 'এই নাপাক মরদেহটাকে বাইরে ফেলে দাও।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন– 'সুলতান আইউবী অর্নাতের দেহটা তাঁবুর বাইরে এবং তার আত্মাটা জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেন।'

সহকর্মীর এই পরিণতি দর্শনে সম্রাট জেফ্রের মুখ শুকিয়ে যায়। তিনি বুঝে নেন, এবার আমার পালা। সুলতান আইউবী তার দিকে এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বললেন– 'রাজা রাজাকে হত্যা করে না। কিন্তু লোকটার অপরাধ এমন ছিলো যে, আমাকে এক সময় তাকে নিজ হাতে হত্যা করার শপথ করতে হয়েছিলো। আপনি ভয় পাবেন না।'

বন্দি সম্রাটদেরকে বন্দিদের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

এখন রাত। কার্কের রাজপ্রাসাদ নীরব-নিস্তব্ধ। প্রিন্স অর্নাত সেখানে নেই। নেই তার সেনাপতি-দরবারিগণও। আছে কেবল হেরেমের নারীরা। কুলসুমও আছে। তার চাকর-চাকরানিরাও আছে। দুর্গে অল্প ক'জন সৈন্য আছে। এখনো সেখানে অর্নাতের মৃত্যু সংবাদ পৌছেনি। রাতের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এতোক্ষণে কুলসুমের শুয়ে পড়ার কথা।

এক মহিলা পা টিপে টিপে কুলসুমের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। তার হাতে খঞ্জর। সে কুলসুমের পালঙ্কের নিকটে পৌঁছে যায়। কক্ষে আলো নেই। কিছু দেখা যাচ্ছে না। মহিলা খঞ্জরধারী হাতটা উঁচু করে পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হানে। কিন্তু কেউ চীৎকার করেনি। খঞ্জর পালঙ্কে গেঁথে যায়। সে বিছানা হাতড়ায়। কুলসুম নেই। মেয়েটি কোথাও গেছে মনে করে মহিলা পালঙ্কের পাশ ঘেঁষে লুকিয়ে বসে থাকে।

খানিক পর চাপা পায়ে কে একজন কক্ষে প্রবেশ করেছে শোনা যায়। শব্দটা পালঙ্কের নিকটে চলে আসে। মহিলা উঠে তার উপর খঞ্জরের আঘাত হানে। পরক্ষণেই উল্টো তার পেটে খঞ্জর গেঁথে যায়। তারপর কিছুক্ষণ দু'খঞ্জরের সংঘর্ষ চলে। আঘাত-পাল্টা আঘাত চলে। তারপর দু'জনই বাইরে বেরিয়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে। হেরেমের অন্যান্য মেয়েরা ছুটে আসে।-দেখে। আঘাতপ্রাপ্ত দু'জন মারা গেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কুলসুম নেই। এরা দু'জনই হেরেমের নারী– দু'জনই কুলসুমকে হত্যা করতে গিয়েছিলো। সেদিনই তারা কুলসুমকে খুন করার পরিকল্পনা এঁটেছিলো। কিন্তু খুনটা কে গিয়ে করবে, তাতে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে যায়। ফলে অন্ধকার কক্ষে তারাই কুলসুম মনে করে একে অপরকে হত্যা করে ফেলে।

ততোক্ষণে কুলসুম প্রাসাদ থেকেই নয় শুধু– কার্ক থেকেও বেরিয়ে গেছে। সেদিনই বকর তার গোয়েন্দা সঙ্গীদের মারফত জানতে পারে, হিত্তীনে ক্রুসেডারদের অত্যন্ত শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। কার্কের গোয়েন্দারাই তাকে পরামর্শ দিয়েছে, তুমি কুলসুমকে নিয়ে পালিয়ে যাও। রাতে দুর্গের ফটক খোলানো কুলসুমের পক্ষে ব্যাপার নয়। সকলেই জানে, এই মেয়েটি প্রিন্স অর্নাতের প্রেপাস্পদ। বকর ইবনে মুহম্মদ সায়বাল সেজে তাকে ঘোটকযানে করে নিয়ে যাচ্ছে। হেরেমের কোনো নারী কুলসুমকে যেতে দেখেনি।

শহর থেকে দূরে এক স্থানে পৌঁছে তারা দু'টি ঘোড়া পেয়ে যায়। এগুলো তাদেরই গোয়েন্দাদের ব্যবস্থাপনায় সেখানে অপেক্ষমান দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা সেখানেই ছেড়ে দেয়া হলো। কুলসুম ও বকর ঘোড়া দুটোতে আরোহণ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরদিন পথে নিজ বাহিনীর এক দূত তাদের জানায়, ক্রুসেডাররা পরাজয়বরণ করেছে। অর্নাত মৃত্যুবরণ করেছে। সুলতান আইউবী এখনো হিত্তীন ও নাসেরার অঞ্চলে অবস্থান করছেন। কুলসুম সুলতান আইউবীর নিকট যেতে চাচ্ছে।

তারা গ্যালিলি ঝিলে পৌঁছে গেছে। কুলসুমকে যখন সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো, তখন মেয়েটি সুলতানের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে।

'আমার কন্যা'– সুলতান আইউবী মেয়েটিকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে স্বস্নেহে বললেন– 'আমার এই বিজয়ে না জানি তোমার মতো আরো কতো মেয়ের হাত রয়েছে।'

'আমি অর্নাতের লাশটা দেখতে চাই'– কুলসুম বললো।

'সব ক'টার লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'অর্নাতকে আমি নিজ হাতে শাস্তি দিয়েছি। আগামীকাল তোমাকে কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হবে। আমাকে এখনো বহুদূর যেতে হবে। যেখানে থাকবে, আমার জন্য দু'আ করবে, যেনো আমি কেবলই সম্মুখে অগ্রসর হতে পারি। দু'আ করবে সূর্য যেখানে অস্ত যায়, সে পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিতে পারি।'

হিত্তীনের জয় ছিলো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই জয়ের মাধ্যমে সুলতান আইউবী ফিলিস্তীনের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন এবং তাতে ঢুকে পড়েছিলেন। এতো বিশাল একটা অঞ্চল জয় করার ফলে সুলতানের জন্য ফিলিস্তীন জয় সহজ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি এই অঞ্চলটাকে আস্তানা বানিয়ে নেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রার প্রস্তুতি ও অস্ত্র-রসদ ইত্যাদি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন।
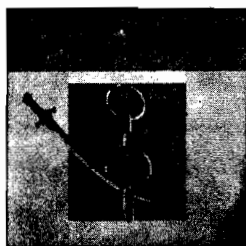
আল-ফারেস

হিত্তীনে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যে বিজয় অর্জন করেছেন, তা কোনো সাধারণ বিজয় ছিলো না। সাত সাতজন খৃস্টান সম্রাট ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান আইউবীর সামরিক শক্তিকে চিরতরে খতম করতে এবং তারপরে পবিত্র মক্কা-মদীনা দখল করতে এসেছিলেন। কিন্তু ফল ফলেছে উল্টো। মরুর টিলা যেমন ঝড়ের কবলে পড়ে বালিকণার ন্যায় মরুভূমিতে মিশে যায়, তেমনি তাদের নিজেদের সামরিক শক্তিই বরং নিঃশেষ হয়ে গেছে। চারজন বিখ্যাত ও শক্তিমান সম্রাট আইউবীর হাতে বন্দি হয়েছেন, যাদের মধ্যে জেরুজালেমের (বাইতুল মুকাদ্দাস) শাসনকর্তা গাই অফ লুজিনান অন্যতম। খৃস্টান বাহিনীর মনোবল ভেঙে গেছে এবং আইউবী বাহিনীর মনোবল চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তবে গেরিলা অপারেশন এখনো চলছে। আইউবীর গেরিলারা পলায়নপর খৃস্টান সৈন্যদের পাকড়াও করছে। ক্রুসেডারদের মনোবল এমনভাবে ভেঙে গেছে যে, কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের ভাষায়– 'এক ব্যক্তি– যার সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আছে, লোকটা সত্য বলে– আমাকে বলেছে, সে নিজ চোখে দেখেছে, মুসলিম বাহিনীর এক সৈনিক ত্রিশজন খৃস্টান সৈন্যকে এক রশিতে বেঁধে নিয়ে আসছিলো।' এমন তো একাধিক দৃশ্য দেখা গিয়েছিলো, এক একজন মুসলিম সৈনিক কয়েকজন করে খৃস্টান সৈন্যকে নিরস্ত্র করে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। কোনো কোনো ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ক্রুসেডারদের পরাজয়ের এরূপ একাধিক কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সামরিক যোগ্যতার প্রশংসা করেছেন।

হিত্তীন এবং তার আশপাশে এবং আরো দূরে যেখানে যেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, সেই মাইলের পর মাইল বিস্তৃত অঞ্চলে ক্রুসেডারদের লাশ পড়ে আছে। গুরুতর আহতরা ছটফট করে করে প্রাণ হারিয়েছে।

সাধারণ আহতরাও মারা গেছে। তার কারণ জখম নয়– পিপাসা। লোহা পরিহিত নাইটদের নিরাপত্তা বর্মগুলো উত্তপ্ত চুলায় পরিণত হয়ে তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ কালের এক ঐতিহাসিক এ্যান্থনি ওয়েস্ট সেকালের ঐতিহাসিকদের সূত্রে লিখেছেন, হিত্তীনের রণাঙ্গনে লাশের সংখ্যা ছিলো ত্রিশ হাজারেরও অধিক। লাশগুলো তুলে আনার কোনো ব্যবস্থা করা হলো না। তাদের যেসসব সহকর্মী জীবিত ছিলো, তারা হয়তো বন্দি হয়ে গিয়েছিলো, নতুবা ছিন্নভিন্ন হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। অ্যান্থনি ওয়েস্ট লিখেছেন, তাদের লাশগুলো চিল-শকুন ও শিয়াল-কুকুররা খেয়ে ফেলেছিলো। দিন কয়েকের মধ্যেই লাশগুলো হাড়ের কংকালে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। যারা উপর থেকে দৃষ্টিপাত করেছেন, তারা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ভূখণ্ডটাকে হাড়ের কারণে সাদা দেখেছেন। সেই কংকালগুলোর মাঝে হাজার হাজার ছোট ছোট ক্রুশ ছড়িয়ে পড়েছিলো, যেনো পাকা ফসল থেকে ফলগুলো ছিড়ে পড়ে শুকিয়ে গেছে।

সুলতান আইউবী লাশগুলো সরিয়ে অঞ্চলটাকে পরিষ্কার করার গরজ বোধ করেননি। কারণ, তিনি সেখানে অবস্থান করবেন না। তাঁর গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস। কিন্তু তিনি আলোচনা করছেন আক্রার। আক্রার বড় ক্রুশটা সুলতানের তাঁবুর বাইরে পড়ে আছে। তার মহান মোহাফেজ পাদ্রী মৃত্যুবরণ করেছেন। ক্রুসেডারদের মনোবল ভেঙে যাওয়ার এটিও একটি কারণ।

'আমাদেরকে এখন সোজা আক্রায় আক্রমণ চালাতে হবে'– সুলতান আইউবী তাঁর সালার ও নায়েবদের উদ্দেশে বললেন– 'আমি মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি যে, আমার রিজার্ভ বাহিনীটা গোটাই অক্ষত রয়ে গেছে– ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েনি।' তিনি সকলের উপর চোখ বুলিয়ে মুচকি হেসে বললেন– 'মনে করো না আমার নিজের ও বন্ধুদের ক্লান্তির অনুভূতি নেই। তোমাদেরকে এর বিনিময় আল্লাহ দান করবেন। তোমাদের বিশ্রাম হবে মসজিদে আকসায়। আমরা যদি এখানে বিশ্রামের জন্য বসে পড়ি, তাহলে ক্রুসেডাররা জড়ো হয়ে সতেজ ও প্রস্তুত হয়ে যাবে। আমি তাদেরকে জখম পরিষ্কার করারও সুযোগ দিতে চাই না।'

সালারগণ খানিকটা বিস্মিত হন। তাদের আশা ছিলো, এবার সুলতান

আইউবী বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রার আদেশ দেবেন। অথচ, তিনি কিনা আক্রা আক্রমণের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। খৃস্টানদের বড় ক্রুশটা তাঁর পেছনে রাখা আছে। তিনি ক্রুশটার প্রতি তাকান এবং কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। উপস্থিত লোকজন চুপচাপ বসে আছে। হঠাৎ তিনি দ্রুত সালারদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলে ওঠেন– 'আমার বন্ধুগণ! এটা দু'টি বিশ্বাসের যুদ্ধ। এটা হক ও বাতিলের সংঘাত। এই ক্রুশটার উপর জমাট হয়ে থাকা রক্ত দেখো। এই রক্ত হযরত ঈসার নয়। এই রক্ত সেই পাদ্রীরও নয়, যাকে খৃস্টান জগত এই ক্রুশের মোহাফেজ বলে বিশ্বাস করে। এই রক্ত সেই পাদ্রীদেরও নয়, যারা এতো বড় ক্রুশটাকে যুদ্ধের ময়দানে এনে রেখেছিলো। এরা সকলে আল্লাহর সৈনিকদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু এই রক্ত তাদের একজনেরও নয়। এই রক্ত অসত্যের রক্ত। এই রক্ত ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও মানুষের গড়া চিন্তা-চেতনার রক্ত।'

সুলতান আইউবীর কণ্ঠে আবেগের জোশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। তিনি বললেন– 'আমি প্রতিটি যুদ্ধাভিযান জুমার দিন শুরু করে থাকি। অগ্রযাত্রা জুমার দিন করি। জুমা বরকতময় দিবস। আমি প্রতিটি অভিযান জুমার খুতবার সময় শুরু করি। কারণ, এই সময়টা দু'আ কবুলের সময়। তোমরা যখন দুশমনের সঙ্গে লড়াইরত থাকো, তোমাদের উপর তীরবৃষ্টি হতে থাকে, দুশমনের মিনজানিকগুলো তোমাদের উপর আগুন ও পাথর বর্ষণ করতে থাকে, সে সময় জাতির প্রতিজন মানুষের হাত মহান আল্লাহর দরবারে তোমাদের নিরাপত্তা ও বিজয়ের জন্য উত্তোলিত থাকে। তোমরা কি দেখোনি, আমি এই যুদ্ধের জন্যও রওনা জুমার দিন করেছিলাম এবং জুমার দিন যুদ্ধ শুরু করেছিলাম? এখন তোমরা বিজয়ী। তোমাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে। এটা আমাদের সুমহান বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার জয়। এই যুদ্ধ ছিলো চাঁদ-তারা বনাম ক্রুশের যুদ্ধ। চাঁদ-তারা জয়লাভ করেছে। আমি তোমাদেরকে কথাগুলো কেনো বলছি? এই জন্য বলছি যে, তোমাদের কারো মধ্যে যদি বিশ্বাস সংক্রান্ত কোনো শোবা-সন্দেহ থাকে, তাহলে দূর হয়ে যাবে। তোমরা আল্লাহর রশিকে আরো শক্তভাবে ধারণ করো।'

'তোমাদের বোধ হয় অবাক লাগছে, আমি আক্রা আক্রমণের সিদ্ধান্ত কেনো নিয়েছি। আবেগের কথা বলতে হলে তার কারণ, ক্রুসেডাররা একবার আমাদের পবিত্র মক্কা ও মদীনা অভিমুখে অগ্রযাত্রা করেছিলো।

প্রিন্স অর্নাত মক্কা থেকে মাত্র দু'ক্রোশ দূর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো। আমি অর্নাত থেকে পবিত্র মক্কার প্রতি কু'নজরে তাকাবার প্রতিশোধ নিয়ে ফেলেছি। এবার অন্যান্য সম্রাট ও নাইটদের থেকে প্রতিশোধ নেবো। আক্রা তাদের মক্কা। আমি নগরীটা পদানত করবো। মসজিদের আকসার যে অবমাননা চলছে, তার প্রতিশোধ নেবো। আর সামরিক বিচারে বাইতুল মুকাদ্দাসের আগে আক্রা জয় করা এ কারণেও জরুরি যে, তাতে ক্রুসেডারদের মনোবল ভেঙে যাবে।'

সুলতান আইউবী বিশাল একটা নকশা– যেটি তিনি নিজ হাতে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন– খুলে সকলের সামনে মেলে ধরেন এবং হিত্তীনের উপর আঙুল রেখে বললেন– 'এখন তোমরা এখানে'। তিনি আঙুলটা এমনভাবে দ্রুত আক্রার দিকে নিয়ে যান, যেনো কিছু কর্তন করার জন্য খঞ্জরের আগা চালালেন। বললেন– 'ক্রুসেডারদের শাসনক্ষমতাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে আমি তার মধ্যখানে এসে পড়বো। আক্রায় দখল প্রতিষ্ঠিত করে টায়ের, বৈরুত, হীফা, আসকালান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল উপকূলীয় নগর ও পল্লীকে ধ্বংস করে দেবো। সামরিক-বেসামরিক কোনো খৃস্টানকে সেসব অঞ্চলে থাকতে দেবো না। উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর দখল এ কারণেও জরুরি যে, ইউরোপের আরো কতিপয় সম্রাট তাদের খৃস্টান ভাইদের সাহায্যার্থে সৈন্য, অর্থ ও সামরিক সরঞ্জাম প্রেরণ করবে। উপকূল তোমাদের দখলে থাকলে দুশমনের কোনো রণতরী কূলে ভিড়তে পারবে না। এখান থেকে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হবো। আমাদেরকে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে হবে।'

ফিলিস্তীন ও লেবাননের মানচিত্র দেখলে আপনি গ্যালিলি ঝিলের পাড়ে হিত্তীন এবং তার বিপরীত দিকে সমুদ্রের কূলে আক্রা দেখতে পাবেন। দক্ষিণে বাইতুল মুকাদ্দাস। হিত্তীন থেকে আক্রার দূরত্ব পঁচিশ মাইল আর বাইতুল মুকাদ্দাস সত্তর মাইল। আজকের লেবানন ও ফিলিস্তীনের উপর সেদিন খৃস্টানদের দখল ছিলো। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরিকল্পনা ঠিক করেছিলেন, তিনি হিত্তীন থেকে আক্রা পর্যন্ত এমনভাবে অগ্রযাত্রা করবেন যে, পথে পড়া প্রতিটি অঞ্চল দখল করতে থাকবেন এবং সেসব অঞ্চল থেকে খৃস্টানদের বিতাড়িত করে শুধু মুসলমানদের থাকতে দেবেন। সামরিক বিশেষজ্ঞগণ একে অতিশয় উত্তম এক পরিকল্পনা বলে অভিহিত করেছেন। সুলতান আইউবী এই পরিকল্পনা

ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তিকে দু'ভাগে বিভক্ত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত করেছিলেন। ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় তাঁর বাহিনী ক্রুসেডারদের এতো বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও কম ছিলো। কিন্তু তাঁর যুদ্ধ-কৌশলগুলো ক্রুসেডারদের অপেক্ষা উন্নত এবং চলাচলের গতি অত্যন্ত তীব্র ছিলো।

❖ ❖ ❖

'আক্রার প্রতিরক্ষা অনেক শক্ত'– সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের উদ্দেশে বললেন– 'আমাদের গোয়েন্দারা জানিয়েছে, ওখানে শক্ত-সামর্থ যুবক মুসলমানরা কারাগারে আটক রয়েছে। নারী-শিশুরাও বন্দি অবস্থায় রয়েছে। ওখানকার খৃস্টান নাগরিকরা নগরীর প্রতিরক্ষায় জীবনের বাজি লাগিয়ে যুদ্ধ করবে। মুসলিম যুবকরা যেহেতু বন্দি, তাই ভেতর থেকে তারা আমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। আমি দীর্ঘ অবরোধ করতে চাই না। তোমাদের আক্রমণ ঝড়গতির হওয়া চাই। আক্রা পর্যন্ত আমাদের অগ্রযাত্রার নিরাপত্তা বিধান করবে আমাদের কমান্ডোরা। অগ্রযাত্রা হবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। পথে কোন লোকালয় অক্ষত থাকবে না। তবে সৈনিকগণ গনীমত কুড়ানোর জন্য থামবে না। এ কাজের জন্য আলাদা বাহিনী নিযুক্ত করা হয়েছে।'

আক্রায় মুসলমানদের অবস্থা হচ্ছে, দু'-চারজন বৃদ্ধ ও পঙ্গু ছাড়া সবাই মানবতের ও আতঙ্কের জীবন-যাপন করছে। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ কারাগারে আটক মুসলমানদের সংখ্যা চার হাজারের অধিক লিখেছেন। সে যুদ্ধের অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ পাঁচ থেকে ছয় হাজারের মধ্যে লিখেছেন। মোটকথা, আক্রা মুসলমানদের জন্য কারাগারে পরিণত হয়েছিলো। কোনো মুসলমানের বোন-কন্যা নিরাপদ ছিলো না। ক্রুসেডারদের উদ্দেশ্য ছিলো, মুসলমানরা চলমান লাশে পরিণত হয়ে যাক এবং তাদের শিশুদের মধ্যে ধর্ম ও জাতীয়তার অনুভূতিই জাগ্রত না হোক। সেখানকার মসজিদগুলো বিরান হয়ে গিয়েছিলো।

১১৮৭ সালের ৪ জুলাইয়ের পর ক্রুসেডাররা সেখানকার মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিলো। এতোদিন যেসব মুসলমান নিজ ঘরে অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছিলো, তাদেরও ধরে ধরে উন্মুক্ত কারাগারে নিক্ষেপ্ত করা হলো। সে ছিলো এক ধরনের বেগার ক্যাম্প। ওখানে মুসলমানদের দ্বারা পশুর ন্যায় কাজ করানো হতো। ১১৮৭ সালের ৪ জুলাইয়ের পর আর তাদের বের হতে দেয়া হয়নি। তাদের কঠোর

পাহারা বসিয়ে দেয়া হলো। তা থেকেই হতভাগ্যরা অনুমান করে নিয়েছিলো, খৃস্টানদের কোথাও পরাজয় ঘটেছে কিংবা ইসলামী ফৌজ তাদের নগরী অবরোধ করেছে। মহিলারা আল্লাহর দরবারে মিনতি করতে শুরু করলো। কারাগারের বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন মাত্রায় বেদনার ছায়া নেমে হলো। মায়েরা দু'আর জন্য অবুঝ সন্তানদের হাত উঁচে তুলে ধরে বলতে শুরু করে– 'বেটা! বলো, হে আল্লাহ! আপনি ইসলামকে বিজয় দান করুন। বলো, হে আমার আল্লাহ! আপনি বাইরের মুসলমানদেরকে হিম্মত দান করুন, যেনো তারা আমাদেরকে জালেমদের এই লোকালয় থেকে বের করে নিতে পারেন।'

হাজার হাজার শিশু হাজার হাজার নারী আল্লাহর সমীপে হাত তুলে দু'আ করছে, আকুল ফরিয়াদ জানাচ্ছে। শিশুরা তাদের মায়েদের কান্না দেখে তারাও কাঁদতে শুরু করে। তবে অবলা নারী আর অবুঝ শিশুদের এই ক্রন্দনরোলের সঙ্গে হান্টারের শব্দও ভেসে আসছে। তারা তাকিয়ে দেখে, বিপুলসংখ্যক নতুন কয়েদি নিয়ে আসা হচ্ছে। এরা নগরীর সেইসব মুসলিম বাসিন্দা, যারা এতোদিন আপন আপন বাড়িঘরে বসবাস করছিলো। তাদের নারী এবং শিশুদেরকেও নিয়ে আসা হয়েছে। তাদেরই উপর হান্টারের আঘাত হানা হচ্ছে।

ছয় কি সাত জুলাই মধ্যরাতের পর হঠাৎ নগরীতে হট্টগোল শুরু হয়ে যায় এবং কোনো কোনো স্থান থেকে অগ্নিশিখা উত্থিত হতে শুরু করে। শা শা করে তীর এসে এই মুক্ত কারাগার পর্যন্ত আঘাত হানতে শুরু করে। এই কারাগারের চারদিকে শুষ্ক কাঁটা এবং রশির জালের বেড়া দেয়া। রাতে চারদিকে স্থানে স্থানে বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে বন্দিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। এক বন্দি বাইরে থেকে আসা একটি তীর তুলে হাতে নিয়ে বাতির আলোতে নিরিক্ষা করে দেখেই চীৎকার দিয়ে ওঠে– 'আমি এই তীর চিনি! এটি ইসলামী ফৌজের তীর।'

এমন সময় বেড়ার জালের ফাঁক গলিয়ে শা করে অপর একটি তীর ধেয়ে এসে লোকটার বুকে গেঁথে যায়। কোন এক খৃস্টান সান্ত্রী বন্দিকে চুপ করানোর জন্য তীরটা ছুঁড়েছে। শহর জেগে ওঠেছে। নগরী ও দুর্গের পাঁচিলের উপর দৌড়-ঝাপ, হট্টগোল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধনুক থেকে তীর বের হওয়ার শব্দও বেড়ে চলেছে। বাইরে আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে। একটু পরপর ধ্রাম ধ্রাম শব্দ কানে

ভেসে আসছে। এগুলো বড় বড় পাথর পতনের শব্দ, যা কিনা সুলতান আইউবীর সৈন্যরা মিনজানিকের সাহায্যে পাঁচিলের উপর নিক্ষেপ করছে।

❖ ❖ ❖

এটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অবরোধ। তবে অবরোধের চেয়ে আক্রমণটাই বেশি। শহরে অগ্নিগোলা নিক্ষেপক মিনজানিক ছাড়াও ফটক ও পাঁচিলের উপর ভারি পাথর নিক্ষেপকারী বড় মিনজানিকও ব্যবহার করা হচ্ছে। উঁচু উঁচু মাচান সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। এক একটি মাচানের দশ থেকে বিশজন করে সৈনিক দাঁড়াতে পারে। সেগুলোর নীচে চাকা লাগানো। উট এবং ঘোড়া এগুলো টেনে এনেছে। এই চলমান মাচানগুলো দেয়াল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু খৃস্টানরা নগরীর প্রতিরক্ষায় প্রাণান্ত যুদ্ধ লড়ছে। সাধারণ জনগণও সৈনিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে। তারা সুলতান আইউবীর চলন্ত মাচানগুলোর উপর বৃষ্টির মতো তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মুসলিম সৈনিকদের খতম করে চলেছে। যে মাচানগুলো পাঁচিলের সন্নিকটে পৌঁছে গেছে, খৃস্টান সৈনিকরা সেগুলোর উপর জ্বলন্ত প্রদীপ এবং তরল দাহ্য পদার্থের পাতিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের ভস্ম করে দিচ্ছে।

ভেতরে বন্দিশালায় হাজার হাজার কয়েদি সমকণ্ঠে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করছে। মহিলারা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে হাত তুলে মহান আল্লাহর দরবারে আকুতি করছে। হঠাৎ একজন অতি উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে— 'নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব'। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটে। সঙ্গে সকল নারী, শিশু ও পুরুষের কণ্ঠ এক কণ্ঠে পরিণত হয়ে যায়, যা যুদ্ধের হট্টগোল থেকে অধিক উচ্চ হয়ে দেখা দেয় এবং বিকট শব্দের রূপ ধারণ করে শহরময় ছড়িয়ে পড়ে।

দু'-তিনজন সান্ত্রী ভেতরে প্রবেশ করে বন্দিদের চুপ করানোর চেষ্টা করতে শুরু করে। তিন-চারজন উত্তেজিত কয়েদি উঠে সান্ত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফটক খোলা ছিলো। অবশিষ্ট কয়েদিরা কারাগার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তীর বৃষ্টি সামনের লোকগুলোকে মাটিতে ফেলে দেয়। পরক্ষণে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে আসে। আরোহীদের হাতে বর্শা ছিলো। পলায়নপর কয়েদিরা ভেতরে ঢুকে পড়ে। যারা পেছনে রয়ে যায়, তারা আরোহীদের বর্শার আঘাতে শহীদ হয়ে যায়। বন্দিদের পলায়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। নারী ও শিশুরা আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর সমস্বরে কালেমা তায়্যেবার জিকির করতে শুরু করে।

রাতভর সুলতান আইউবীর জানবাজ সৈন্যরা পাঁচিল পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার এবং পাঁচিলে ছিদ্র করার কিংবা সুড়ঙ্গ খনন করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে আর উপর থেকে খৃস্টানরা তাদের উপর তীর, পাথর ও আগুন নিক্ষেপ করতে থাকে। সুলতান আইউবী অনুপম কুরবানী দিয়ে যাচ্ছেন। নগরীর পাঁচিলের এক স্থানে বড় মিনজানিকের সাহায্যে ভারি ভারি পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। রাত পোহাবার পর দেখা গেলো, পাঁচিলের উপর সবখানে সবদিকে আক্রার সাধারণ মানুষ ও সৈনিকরা মাছির ন্যায় ছেয়ে আছে। তারা তীর বর্ষণ করছে। আরো দেখা গেলো, প্রাচীরের এক স্থানে ফাটল ধরেছে। সুলতান আইউবী ঘোড়ার পিঠে চড়ে সামান্য পেছনে একস্থানে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি অবলোকন করছেন। তিনি আদেশ করেন, যেখান থেকে দেয়াল ফাটছে, তার উপর ও ডান-বাম থেকে দুশমনের উপর তীর বর্ষণ করো। তিনি অপর দিককার তীরন্দাজদেরও তলব করে উক্ত স্থানে নিয়োজিত করেন। সুড়ঙ্গ খননকারী বাহিনীকে বললেন, তোমরা দৌড়ে পাঁচিলের কাছে পৌঁছে যাও।

জানবাজরা পৌঁছে গেছে। প্রাচীরের উপর এতো অধিক ও এতো তীব্র গতিতে তীর বর্ষিত হচ্ছে যে, উপরের লোকদের পক্ষে মাথা তোলাও কঠিন হয়ে পড়েছে। জানবাজরা প্রাচীরে এতোটুকু ছিদ্র করে ফেলেছে যে, সেই ছিদ্র পথে দু'জন লোক এক সঙ্গে অতিক্রম করতে পারবে। মুসলিম সৈনিকরা এতো আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেছে যে, তারা কোনো আদেশ ছাড়াই ছুটে একজন একজন করে ভেতরে ঢুকে যেতে শুরু করেছে। খৃস্টানরা প্রাচীরের উপর থেকে নীচে নেমে আসতে এতোটুকু সময় ব্যয় করে ফেলে যে, ইতিমধ্যে বহু মুসলমান সৈন্য ভেতরে ঢুকে পড়েছে। খৃস্টানরা প্রাণপণ মোকাবেলা করে। কিন্তু আক্রার নির্যাতিত মুসলিম নারী-শিশুদের ফরিয়াদ আরশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সুলতান আইউবীর শক্তি মূলত এটিই ছিলো।

❖ ❖ ❖

নগরীর ভেতরে হুলস্থূল শুরু হয়ে গেছে। খৃস্টানদের বড় ক্রুশ মুসলমানদের কব্জায় চলে গেছে এবং তার প্রধান মোহাফেজ মারা গেছেন এ সংবাদ সেখানে আগেই পৌঁছে গিয়ছিলো। হিত্তীনের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া খৃস্টান সৈন্যও এই নগরীতে এসে পৌঁছেছে। কিছু জখমীও এসেছে। তারা নিজেদের পরাজয় এবং পিছুহটার ঘটনাকে যৌক্তিক প্রমাণিত করার জন্য অত্যন্ত ভীতিকর গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে। সুলতান আইউবীর

জানবাজরা যখন নগরীর প্রাচীর ভেঙে ফেলে এবং অপ্রতিরোধ্য বানের ন্যায় ভেতরে ঢুকতে শুরু করে, তখন সেই গুজবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সৈন্যরা মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছে বটে; কিন্তু জনসাধারণের মাঝে হুলস্থুল শুরু হয়ে গেছে। তারা নগরী ছেড়ে পালানোর জন্য ফটকগুলোর উপর আছড়ে পড়ে এবং সৈনিকদের বাধা সত্ত্বেও দু'-তিনটি দরজা খুলে ফেলে।

মুসলিম আরোহী সেনারা কমান্ডারদের আদেশে দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকায়। দলে দলে ফটক অতিক্রমকারী জনসাধারণকে পিষে পিষে ঘোড়াগুলো ভেতরে ঢুকে পড়ে। এবার মুজাহিদদের স্রোত কেউ ঠেকাতে পারলো না। নগরীর প্রতিটি দ্বার খুলে গেছে। ক্রুসেডাররা অস্ত্র সমর্পণ করতে শুরু করেছে। এখনো সূর্য অস্ত যায়নি। আক্রার শাসনকর্তা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি খৃস্টান বাহিনীর সেনাপতি-কমান্ডারদের এক স্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে সেই জায়গাটিতে চলে যান, যেখানে হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলমান বন্দি অবস্থায় পড়ে আছে। প্রহরীরা পালিয়ে গেছে। বন্দিরা ফটক ও দড়ির জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

সুলতান আইউবী তাদের থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে যান। ওগুলো মানুষ তো নয়– মানুষের লাশ। নারী ও শিশুদের দেখে তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

'যাও, রশিগুলো কেটে দাও। ওদেরকে মুক্ত করে দাও'– সুলতান আইউবী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আর তাদেরকে বলো না, আমি শহরে আছি। আমি তাদেরকে মুখ দেখাতে পারবো না।'

সুলতানের আদেশ পেয়ে কয়েকজন অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে ছুটে যায়। তারা কারাগারের কাঠের বেড়া ভেঙে ফেলে। কয়েক স্থানে রশির জাল কেটে পেছনের ঝোপ-কাঁটা সরিয়ে দেয়। কয়েদিরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। ওটা যেনো এক মুহূর্তও থাকার জায়গা নয়। আরোহীরা তাদের নিয়ন্ত্রণে আসার জন্য চীৎকার করে করে বলছে– 'ধীরে সুস্থে বের হও। এখন আর তোমাদেরকে কেউ ধরতে আসবে না। ঐ দেখো, দুর্গের উপর তোমাদের পতাকা উড়ছে।'

'তারা আমাদেরই পাপের শাস্তি ভোগ করছে'– সুলতান আইউবীর কাছে দণ্ডায়মান এক সালারকে বললেন– 'এ ছিলো বিশ্বাসঘাতকদের পাপ,

যার শাস্তি এই নিরপরাধ মানুষগুলো ভোগ করলো। যারা আপন দীনের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে বরণ করলো, তারা একটুও ভাবলো না, তাদের জনগণের পরিণতি কী হবে। ক্ষমতালোভী গাদ্দাররা যদি আমার পথ আগলে না দাঁড়াতো, তাহলে আমাদের এই হাজার হাজার শিশু ও কন্যার এমনি দশা ঘটতো না। হযরত ঈসা (আ.) প্রেম-ভালোবাসা ও শান্তির পাঠ শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রুশের পূজারীদের হৃদয়-মন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এতো ঘৃণায় পরিপূর্ণ যে, তারা আপন পয়গম্বরের নীতি-আদর্শেরও পরোয়া করছে না। পৃথিবীতে দু'টি মাত্র ধর্ম টিকে থাকবে। ইসলাম ও খৃস্টবাদ। আমরা যদি হৃদয় থেকে ক্ষমতার লোভ ও ভোগ-বিলাসিতার মোহ দূর করতে না পারি, এই দুর্বলতার সুযোগে খৃস্টবাদ ইসলামের পতন ঘটিয়ে ছাড়বে।'

খৃস্টান সেনাপতি ও কমান্ডারদের যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, সুলতান আইউবী সেখানে যান। তিনি বললেন– 'এদের সকলকে নদী তীরে নিয়ে যাও এবং প্রত্যেককে হত্যা করে নদীতে ফেলে দাও। অন্যান্য যুদ্ধবন্দিদের বাছাই করো। যাদেরকে জীবিত রাখা আবশ্যক মনে হবে, তাদের দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দাও আর বাকিদের খতম করে দাও। কোনো নিরস্ত্র নাগরিকের গায়ে হাত তুলবে না। তাদের যারা নগরী ত্যাগ করে চলে যেতে চায়, তাদের যেতে দাও। যারা এখানে থাকতে চাইবে তাদেরকে সসম্মানে থাকতে দাও।'

১১৮৭ সালের ৮ জুলাই আক্রার দখল সম্পন্ন হয়ে যায়।

রাতে যখন সুলতান আইউবী আহার থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তখন তাকে সংবাদ দেয়া হলো, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একজন কয়েদিকে আপনার সামনে হাজির করা হচ্ছে।

'সে কে?'– সুলতান আইউবী খানিক বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করেন।

'হারমান– ক্রুসেডারদের আলী বিন সুফিয়ান।'

হারমান খৃস্টানদের গোয়েন্দা প্রধান। আলী বিন সুফিয়ানের ন্যায় অত্যন্ত বিচক্ষণ গোয়েন্দা এবং মানুষের চরিত্র ধ্বংসে অভিজ্ঞ। যেসব খৃস্টান ও ইহুদী মেয়েকে মুসলিম অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তি ও চরিত্র ধ্বংসের জন্য প্রেরিত করা হতো, তাদের প্রশিক্ষণ দিতেন এই হারমান। মিশনের বেশক'টি মেয়েসহ তিনি আক্রায় অবস্থান করছিলেন এবং ধরা পড়ে গেলেন। তিনি নগরী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আইউবীর এক গোয়েন্দা পিছু নিয়ে

তাকে ধরে ফেলে। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও গোয়েন্দা তাকে চিনে ফেলে। সঙ্গের মেয়েগুলোকে কৃষাণীর পোশাক পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গোয়েন্দা এক কমান্ডারকে বিষয়টা অবহিত করে।

কমান্ডার দু'তিনজন সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে হারমানের কাফেলাটি ঘিরে ফেলে। হারমান মেয়েদের ছাড়া সঙ্গে সোনা-দানাও নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মেয়েগুলোকে কমান্ডারের ও সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেন এবং সোনাগুলোও তার সামনে রেখে দিয়ে বললেন– 'যার যে মেয়েকে পছন্দ হয় নিয়ে নাও। আর এই সোনাগুলোও ভাগ করে নাও।'

'আমার সব ক'টা মেয়েই পছন্দ হয়'- কমান্ডার বললো– 'আর সোনাগুলোও সব নিয়ে নেবো। তুমিও আমার সঙ্গে চলো।'

কমান্ডার সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সোনাসহ সব ক'জনকে সুলতান আইউবীর ব্যক্তিগত আমলার হাতে তুলে দেয়। হারমান সুলতান আইউবীর জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কয়েদি। তাকে সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়।

'তুমি আমার ভাষা জানো'– সুলতান আইউবী হারমানকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তাই আমার ভাষায় কথা বলো। আমি তোমার বিদ্যা ও বিচক্ষণতার স্বীকৃতি প্রদান করছি। আমি তোমার যতোটুকু কদর করতে পারবো, ততোটুকু তোমার সম্রাটরা পারেনি। আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

'আপনি যদি আমার সঙ্গে কোনো কথা বলা ছাড়া আমার হত্যার আদেশ প্রদান করেন, তবেই ভালো হবে'– হারমান বললেন– 'আমাকে যদি আক্রার সেনাপতি-কমান্ডারদের ন্যায় খুনই হতে হয় এবং আমার মৃতদেহটা মাছের আহারে পরিণত হতেই হয়, তাহলে কথা বলে লাভ কী?'

'তোমাকে হত্যা করা হবে না হারমান!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি যাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তার সঙ্গে কথা বলি না।'

সুলতান আইউবী দারোয়ানকে ডেকে হারমানকে শরবত পান করাতে বললেন। হারমানের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি আরবের রীতি সম্পর্কে অবহিত আছেন যে, আরবী মেজবান যদি দুশমনকে পানি বা শরবত পান করতে দেয়, তো তার অর্থ দাঁড়ায় তিনি অন্তর থেকে শত্রুতা দূর করে ফেলেছেন এবং তার জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন। দারোয়ার শরবত এনে দিলে হারমান তা পান করেন।

'আপনি বোধ হয় জানতে চাইবেন, আমাদের কোন্ কোন্ অঞ্চলে কী পরিমাণ সৈন্য আছে'– হারমান বললেন– 'আপনি এ-ও জানতে চাইবেন, তাদের লড়াই করার যোগ্যতা কীরূপ?'

'না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'এ তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের কোন্ অঞ্চলে কী পরিমাণ সৈন্য আছে। আমার গোয়েন্দারা তোমাদের বুকের উপর বসে থাকে। তাছাড়া তোমাদের কোন্ অঞ্চলে কতো সৈন্য আছে, তা আমার জানবার গরজও নেই। হিত্তীনে তোমাদের সৈন্য কম ছিলো না। কম ছিলো আমার। এখন আরো কমে গেছে। কোনো বাহিনীই এখন আমাকে পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে পারবে না। তুমি সংবাদ শুনবে, সালাহুদ্দীন আইউবী মারা গেছেন– পিছপা হননি।'

'যে কমান্ডার আমাকে ধরে এনেছে, আপনার সকল কমান্ডারের চরিত্র যদি তার মতো হয়, তাহলে আমি আপনাকে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলবো, যতো বৃহৎই হোক কোনো শক্তিই আপনাকে এখান থেকে তাড়াতে পারবে না'– হারমান বললেন– 'আমি তাকে যে মেয়েদের পেশ করেছিলাম, তারা আপনার পাথরসম সালার ও দুর্গপতিদের মোমে পরিণত করেছে এবং তাদেরকে ক্রুসেডারদের ছাঁচে ঢেলে তৈরি করেছে। আর সোনা এমন এক বস্তু, যার চমক চক্ষুকে নয়– বিবেককেও অন্ধ কে তোলে। আমি সোনাকে শয়তানের সৃষ্টি বলে থাকি। অথচ আপনার কমান্ডার সোনাগুলোর প্রতি চোখ তুলেও তাকালো না। আমার দৃষ্টি সব সময় মানবীয় স্বভাবের দুর্বলতাগুলোর উপর নিবদ্ধ থাকে। ভোগ-বিলাসিতা ঈমানকে খেয়ে ফেলে। আপনার বিরুদ্ধে আমি এই অস্ত্রটাই ব্যবহার করেছিলাম। কোনো সেনা অধিনায়কের মধ্যে যখন এসব দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা সৃষ্টি করে দেয়া হয়, তখন পরাজয় তার কপালের লিখন হয়ে যায়। আমি আপনার বলয়ে যে ক'জন গাদ্দার জন্ম দিয়েছি, তাদের মধ্যে প্রথমে এই দুর্বলতাগুলোই সৃষ্টি করেছি। ক্ষমতার নেশা মানুষকেসহ ডুবে মরে থাকে।'

'আমার বাহিনীর চরিত্র সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

'আপনার বাহিনীর চরিত্র যদি তেমন হতো, যেমনটি আমি তৈরি করার চেষ্টা করছিলাম, তাহলে আপনার বাহিনী আজ এখানে থাকতো না'– হারমান বললেন– 'আপনি যদি দুশ্চরিত্র আমীর, সালার, শাসক ও উজিরদের উৎখাত না করতেন, তাহলে তারা সেই কবে আপনাকে

আমাদের কারাগারে নিক্ষেপ করতো। আমি আপনার প্রশংসা করছি যে, আপনি অন্তরে ক্ষমতার মোহ স্থান দেননি।'

'হারমান!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি তোমাকে জীবনদান করেছি। তোমাকে আমার বন্ধুরূপে বরণ করে নিয়েছি। বলো, আমার বাহিনীর চরিত্রকে আমি কীভাবে অটুট ও উচ্চ রাখতে পারি। আর আমার মৃত্যুর পর এই চরিত্র কীভাবে অটুট থাকতে পারে।'

'মহামান্য সুলতান!'– আমরা এই যে যুদ্ধ লড়ছি, এটা আমার-আপনার কিংবা আমাদের সম্রাটদের আর আপনার যুদ্ধ নয়। এটা কালিমা ও কাবার যুদ্ধ। এই যুদ্ধ আমাদের মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকবে। আমরা রণাঙ্গনে লড়বো না। আমরা কোন দেশ জয় করবো না। আমরা মুসলমানদের মন ও মস্তিষ্ক জয় করবো। আমরা মুসলমানদের কোনো ভূখণ্ড অবরোধ করবো না– অবরোধ করবো মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা। আমাদের এই মেয়েরা, আমাদের ধন-ঐশ্বর্য ও আমাদের সভ্যতার আকর্ষণ– আপনি যাকে বেহায়াপনা বলেন– ইসলামের প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে দেবে। তারপর মুসলমানরা আপন সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ঘৃণা করবে আর ইউরোপের রীতি-নীতিকে ভালোবাসবে। সেই সময়টা আপনি দেখবেন না। আমিও দেখবো না। আমাদের আত্মারা দেখবে।'

সুলতান আইউবী জার্মান বংশোদ্ভূত খৃস্টান গোয়েন্দা প্রধান হারমানের বক্তব্য গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছেন। হারমান বলছেন–

'আমরা পারস্য, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানের উপর কেনো দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিনি। কেনো আমরা আরবকে যুদ্ধক্ষেত্র বানালাম? একমাত্র কারণ, সমগ্র পৃথবীর মুসলমান এই ভূখণ্ডটার প্রতি মুখ করে ইবাদত করে এবং এখানে মুসলমানদের কাবা অবস্থিত। আমরা মুসলমানদের এই কেন্দ্রটা ধ্বংস করছি। আপনার বিশ্বাস, আপনার রাসূল মসজিদে আকসা থেকে 'আকাশ ভ্রমণে' গিয়েছিলেন। আমরা তার মিনারের উপর ক্রুশ স্থাপন করেছি এবং সেখানকার মুসলমানদের বুঝাচ্ছি, তোমাদের বিশ্বাস ভুল যে, তোমাদের রাসূল কখনো এখানে এসেছিলেন এবং এখান থেকে মেরাজে গিয়েছিলেন।'

'হারমান!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি তোমার দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রত্যয়-পরিকল্পনার প্রশংসা করছি। নিজ ধর্মের প্রতি এমনই অনুগত ও নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত, যেমন তুমি হয়েছো। সে জাতিই জীবিত থাকে,

যারা আপন ধর্ম ও সভ্যতা লালন ও সংরক্ষণ করে এবং তার আশপাশে এমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর স্থাপন করে রাখে, যাতে কোনো মিথ্যা ধর্ম-কালচার তার কোনো ক্ষতিসাধন করতে না পারে। আমি জানি, ইহুদীরা আমাদের এখানে আমাদের চরিত্র-চেতনা ধ্বংসের মিশন নিয়ে কাজ করছে এবং তোমাদের সঙ্গ দিচ্ছে। আমি বাইতুল মুকাদ্দাস যাচ্ছি- সেই লক্ষ্যে যাচ্ছি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা এখানে এসেছিলে। এটা আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি। আমার রাসূলকে আল্লাহ পাক এখান থেকে মেরাজের সৌভাগ্য দান করেছিলেন। আমি তাকে ক্রুশের দখল থেকে মুক্ত করবো।'

'তারপর কী হবে?'- হারমান বললেন- 'তারপর আপনি এই জগত থেকে চলে যাবেন। মসজিদে আকসা পুনরায় আমাদের উপাসনালয়ে পরিণত হবে। আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী করছি, আপনার জাতির স্বভাব-চরিত্রকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেই করছি। আমরা আপনার জাতিকে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভক্ত করে তাদেরকে একে অপরের শত্রু বানিয়ে দেবো। তারপর ফিলিস্তীনের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলবো। ইহুদীরা আপনার জাতির যুবক-যুবতীদের মধ্যে যৌন পূজার বীজ বপণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে এখন আর কোনো নুরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহুদ্দীন আইউবী জন্ম নেবে না।'

সুলতান আইউবী মুচকি হাসি হেসে হারমানের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন- 'তোমার কথাগুলো অনেক মূল্যবান। আমি তোমাকে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে তোমাকে সম্মানের সঙ্গে রাখা হবে।'

'আর আমার সঙ্গের মেয়েগুলো?'

সুলতান আইউবী গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর বললেন- 'আমি নারীদের যুদ্ধবন্দি বানাই না। তোমার মেয়েগুলোকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিতে পারি।'

'মহামান্য সুলতান!'- হারমান বললেন- 'এরা অত্যন্ত রূপসী মেয়ে। এক নজর দেখলে আপনি তাদেরকে হত্যা করতে পারবেন না, বন্দিশালায়ও নিক্ষেপ করতে পারবেন না। আপনার ধর্মে দাসীকে বিয়ে করার অনুমতি আছে। দাসীদেরকে হেরেমে রাখা যায়।'

'আমার ধর্ম এই বিলাসিতার অনুমতি দেয় না'- সুলতান আইউবী বললেন- 'আমি নিজের ঘরে কিংবা কোনো মুসলমানের ঘরে সাপ পুষতে পারি না।'

'কিন্তু তাদের তো কোনো অপরাধ নেই'– হারমান বললেন– 'এ কাজের জন্য তাদেরকে শৈশব থেকেই প্রস্তুত করে নেয়া হয়েছিলো।'

'এ কারণেই আমি তাদের হত্যার নির্দেশ দিচ্ছি না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি তাদেরকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। আমি তোমার এই ভাবনার প্রশংসা করছি যে, তুমি এই মধুর বিষ আমার জাতির মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছো। কিন্তু আমি তোমার ন্যায় ভাবনা ভাবতে পারি না। ওদের বলে দাও, আক্রা থেকে বেরিয়ে যাক। আমার আওতার ভেতরে কোথাও তাদের কাউকে পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা হবে।

সুলতান আইউবী দু'-তিন দিনের মধ্যে আক্রায় তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন। মসজিদগুলোকে পাক-পরিষ্কার করিয়ে নামাযের উপযোগী করে তোলেন। গনীমতের সম্পদ যা হাতে এসেছে, তার সিংহভাগ সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এতোদিন যারা খৃস্টানদের কারাগারে আবদ্ধ ছিলো, একটা অংশ তাদেরকে দান করেন। কিন্তু সুলতানের সব ভাবনা-চিন্তা ফিলিস্তীনের মানচিত্রটার উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। তাঁর অঙুলি লেবানন ও ইসরাইলের কূল ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চলছে। তাঁর মন-মস্তিষ্কের উপর বাইতুল মুকাদ্দাস চেপে বসে আছে। এদিক-ওদিককার কোনো খবর তাঁর নেই। বাহিনীর কোন্ ইউনিট কোথায় অবস্থান করছে, তাঁর জানা আছে। কমান্ডো সেনাদের বণ্টন-বিন্যাস বেশ উন্নত ও যুৎসই ছিলো। প্রতিটি ইউনিটের সঙ্গে তাঁর যথারীতি যোগাযোগ আছে।

'সুলতানে আলী মাকাম!' সুলতান আইউবী হাসান ইবনে আবদুল্লাহর কণ্ঠ শুনতে পান।

'হাসান!'– মানচিত্র থেকে চোখ না সরিয়েই সুলতান আইউবী বললেন– যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেলো। আমার হাতে সময় নেই যে, প্রতিটি কথা রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করে শুনবো, বলবো। আর আমার 'মাকাম' সেদিন উচ্চ হবে, যেদিন আমি বিজয়ী বেশে বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করবো।'

'ত্রিপোলী থেকে খবর এসেছে, রেমন্ড মারা গেছে।'

'আহত ছিলো?'

'না সুলতান!'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ উত্তর দেন– 'লোকটা অক্ষত এবং সুস্থই ত্রিপোলী পৌছে গিয়েছিলো। পরদিন নিজ কক্ষে তার লাশ পাওয়া গেছে। বোধ হয় আত্মহত্যা করেছে।'

'লোকটা অতেটা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিলো না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আগেও কয়েকবার পরাজয়বরণ করে ময়দান থেকে পালিয়েছিলো। যাক গে, আমি তার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করছি। লোকটা আমাকে হত্যা করার জন্য হাশিশিদের দ্বারা তিনবার আক্রমণ করিয়েছিলো।'

ঐতিহাসিকগণ রেমন্ড অব ত্রিপোলীর মৃত্যুর নানা কারণ উল্লেখ করেছেন। কাজী বাহউদ্দীন শাদ্দাদ ফুসফুসের ব্যাধি লিখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন, হাশিশিরা তাকে বিষ খাইয়েছিলো। রেমন্ড অসচ্চরিত্র এবং কুটিল মনের খৃস্টান শাসক ছিলেন। মুসলমানদেরকে গৃহযুদ্ধে জড়ানোর হীন কারসাজিতে তারও হাত ছিলো। খৃস্টান শাসকদের মাঝেও পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তার সখ্য ছিলো হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদায়ীদের সঙ্গে। সুলতান আইউবীর উপর একাধিক সংহারী আক্রমণ করিয়েছিলেন। এক-দু'জন খৃস্টান সম্রাটকেও ফেদায়ীদের দ্বারা হত্যা করাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হননি। সে যুগের কাহিনীকারদের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, রেমন্ড জোটের শরীক সম্রাটদের সঙ্গে বড় ক্রুশে হাত রেখে শপথ করে পরে হিত্তীনের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ত্রিপোলী পৌঁছার পরদিনই তাকে তার কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। জীবনের শেষ রাতে হাশিশিদের নেতা শেখ সান্নান তার নিকট গিয়েছিলো।

তার আগে অপর খ্যাতিমান খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইন মৃত্যুবরণ করেন। এই লোকটি ফিরিঙ্গিদের যুদ্ধবাজ সম্রাট ছিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের তত্ত্বাবধান তার দায়িত্বে ছিলো। বল্ডউইন যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি জানতেন, সুলতান আইউবী বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে চাচ্ছেন। তাই বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করার জন্য তিনি তার বাহিনীকে নিয়ে মুসলিম অঞ্চলগুলোতে ঘুরে-ফিরে যুদ্ধ করতে থাকেন। এটা তার যোগ্যতার প্রমাণ যে, তিনি ইয্যুদ্দীন, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগীনকে ঐক্যবদ্ধ করে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজের এই রণময়দানকে যুদ্ধ সরঞ্জাম, মদ, সোনা-মাণিক্য ও সুন্দরী মেয়েদের দ্বারা সুসংগঠিত করতে থাকেন। বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন। হিত্তীন যুদ্ধের দিন কয়েক আগে মারা যান। তার স্থলে গাই অফ লুজিনান বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষমতা হাতে নেন।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইঊবীর সৈনিকরা যে ধরনের গেরিলা ও কমান্ডো অভিযান পরিচালনা করেছিলো, ইতিহাস আজও তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারেনি। গেরিলারা শত্রু অঞ্চলে ধ্বংসলীলা চালাতে পারে; কিন্তু কোনো ভূ-খণ্ড দখল করতে পারে না। ভূখণ্ড দখল করে সেনাবাহিনী। সুলতান আইউবী তাঁর গেরিলা ও ফৌজকে যে পরিকল্পনা প্রদান করেছিলেন, তা হচ্ছে, বাইতুল মুকাদ্দাসের আশপাশে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত অঞ্চল থেকে খৃস্টান বাহিনীকে উৎখাত ও ধ্বংস করা, উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের দুর্গগুলো জয় করা এবং দুশমনের যেসব অস্ত্র ও রসদ হস্তগত হবে, সেগুলো নিরাপদ স্থানে এনে জমা করা।

সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দিয়ে রেখেছিলেন। এটাই ছিলো তার আসল শক্তি। সুলতান তাঁর সালারদের বলে রেখেছেন, যখন যে নগরী কিংবা পল্লী জয় করবে, সৈনিকদেরকে সেখানকার নির্যাতিত মুসলমানদের করুণ চিত্র দেখাবে। তাদেরকে সেইসব মসজিদ দেখাবে, যেগুলোকে খৃস্টানরা বিরান ও অবমাননা করেছে। তাদেরকে সেই মুসলিম নারীদের দেখাবে, খৃস্টানদের হাতে যাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছিলো, তাদেরকে ভালোভাবে দেখাও, আমাদের শত্রু কীরূপ এবং তাদের পরিকল্পনা কী।

এ কারণেই সুলতান আইউবীর ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সেনাদল বৃহৎ থেকে বৃহত্তর শত্রু সেনাদলের উপর গজব হয়ে আপতিত হতো। সুলতান আইউবী যা যা দেখাতে চেয়েছিলেন, সৈনিকরা সব দেখে নিয়েছিলো। সে ছিলো এক উন্মাদনা। এখন সুলতান প্রতিনিয়ত একটিই শব্দ শুনতে পাচ্ছেন– 'অমুক অঞ্চল দখল হয়ে গেছে। অমুক ক্যাম্প থেকে খৃস্টানরা পিছু হটে গেছে ইত্যাদি। আইউবীর বাহিনীর অবিশ্রাম ও অবিরাম যুদ্ধ করছে আর সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একদিনের এক ঘটনায় সুলতান আইউবীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।

সুলতান কক্ষে বসে মানচিত্রের উপর ঝুঁকে বসে হাইকমান্ডের সালার ও উপদেষ্টাদের দ্বারা পরবর্তী পরিকল্পনা প্রস্তুব করাচ্ছেন। হঠাৎ বাইরে শোর ওঠে– 'আমি তোমাদের সুলতানকে হত্যা করবো, তোমরা ক্রুসেডারদের তাবেদার... আমাকে ছেড়ে দাও। নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার।' কণ্ঠটা একই ব্যক্তির। সেই সঙ্গে আরো কিছু মানুষের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে–

'ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও... সুলতান রুষ্ট হবেন... মেরে ফেলো বেটাকে... মুখে পানি ছিটাও... পাগল হয়ে গেছে।'

সুলতান আইউবী দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁর ধারণা ছিলো, কোনো খৃস্টান সৈনিক হবে হয়তো। কিন্তু এসে দেখেন তারই ফৌজের এক কমান্ডার, যার হাত দুটো রক্তে লাল হয়ে গেছে। গায়ের কাপড়-চোপড়ও রক্তে ভেজা। চোখ দুটোও রক্তের ন্যায় লাল। ঠোঁটের দু'কোণ থেকে ফেনা বেরুচ্ছে। চারজন লোক তাকে ঝাঁপটে ধরে আছে। তারপরও আটকে রাখতে পারছে না।

'এই ওকে ছেড়ে দাও।' সুলতান আইউবী গর্জে ওঠে বললেন।

'সুলতান!'– কমান্ডার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– 'এখানে এসে তোমার সকল সৈন্য আত্মমর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। কাফেররা কেনো জীবিত বেরিয়ে যাচ্ছে? তুমি আমাদের সুলতান সেজে বসে আছো! যেসব মুসলিম নারী ও শিশু কারাগারে পড়ে ছিলো, তুমি কি তাদেরকে দেখেছো?'

সুলতান আইউবীর রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার ছুটে গিয়ে উক্ত কমান্ডারের মুখে হাত চেপে ধরে। সে কমান্ডারের বাহু ধরে এতো জোরে ধাক্কা মারে যে, লোকটা তার কাঁধের উপর হয়ে সুলতান আইউবীর সম্মুখে গিয়ে পড়ে।

'বাঁধা দিও না– ওকে বলতে দাও'– সুলতান আইউবী পুনরায় গর্জে ওঠে বললেন– 'এদিকে আসো বন্ধু! আমাকে বলো, তারা তোমাকে কেনো ধরে রেখেছে?'

তথ্য বের হয়, লোকটা এক বাহিনীর কমান্ডার ছিলো। তাকে সদ্য কারামুক্ত মুসলিম পরিবারগুলোতে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি রিলিফ পৌঁছানোর এবং রুগ্নদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। এ কাজের জন্য একশত সৈনিকের দু'টি বাহিনী তৈরি করা হয়েছিলো। এই কমান্ডার মজলুম মুসলমানদের ঘরে ঘরে যেতে থাকে। সেই সূত্রে খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর কীরূপ নির্যাতন করেছিলো, তার বিবরণ জানতে পারে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও লজ্জাকর কাহিনী। কমান্ডার তার বাহিনীর সৈনিকদেরকে কার্কের মসজিদগুলো পরিষ্কার করতে দেখে। এক মসজিদ থেকে দু'জন নারীর বিবস্ত্র গলিত লাশ উদ্ধার হয়। এই কমান্ডার তা-ও নিজ চোখে দেখতে পায়।

সৈনিকরা লাশ দুটো মসজিদ থেকে বের করে আনে। তাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে শুরু করে। একজন বললো– 'ওরা আমাদের বোন-

কন্যাদের সঙ্গে এরূপ অমানুষিক আচরণ করলো আর আমাদের সুলতান কিনা তাদেরকে পরিবার-পরিজনসহ এখান থেকে নিরাপদে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন!'

কমান্ডারের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। কিছুদূর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর সে পনের-বিশটি মেয়েকে যেতে দেখে। তার এক সহকর্মী কমান্ডার কয়েকজন সৈনিকসহ তাদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কমান্ডার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করে- 'এরা কারা, তোমরা এদের সঙ্গে হাঁটছো কেনো?'

'এরা সেই মেয়ে, যারা মিসর ও সিরিয়ায় গাদ্দার তৈরি করেছিলো'- সঙ্গী উত্তর দেয়- 'এদের নেতা হারমান ধরা পড়েছে। সবাই খৃস্টান। সুলতান এদের নেতাকে কারাগারে আটক করে এদের ব্যাপারে আদেশ করেছেন, নগরী থেকে বের করে দূরে কোথাও সেই খৃস্টানদের হাতে তুলে দিতে, যারা আক্রা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।'

'আর তোমরা এদেরকে জীবিত রেখে আসবে?' কমান্ডার জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, আদেশ তো এমনই পেয়েছি।'

'এরা কি আমাদের সেই বোনদের চেয়েও বেশি পবিত্র, যাদের উলঙ্গ লাশ মসজিদ থেকে উদ্ধার হচ্ছে এবং যাদেরকে কারাগারে আটক রেখে নিগৃহীত করা হয়েছিলো?'

সঙ্গী কমান্ডার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো- 'আমি তো হুকুমের পাবন্দ।'

কমান্ডার দাঁড়িয়ে যায় এবং কাফেলার গমন দেখতে থাকে। হঠাৎ তরবারী বের করে তাদের দিকে ছুটে যায়। সে চীৎকার করে বলে ওঠে- 'আমি কারো অনুগত নই।' সে এতো তীব্রগতিতে তরবারী চালায় যে, মুহূর্ত মধ্যে তিন-চারটি মেয়ের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রক্ষী কমান্ডার তাকে ধরার জন্য ছুটে যায়। মেয়েরা চীৎকার করে করে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ধাওয়া করে করে কমান্ডার আরো তিন-চারটি মেয়েকে হত্যা করে ফেলে। এক সৈনিক তাকে ধরার জন্য এগিয়ে গেলে বর্শার ন্যায় তরবারীটা তার পেটে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর আর কেউ তার কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

এই মানসিক অবস্থা নিয়েই কমান্ডার নগরী থেকে বেরিয়ে যায়। সে কয়েকজন খৃস্টানকে শহর ত্যাগ করে চলে যেতে দেখে তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। সামনে যাকে পেলো হত্যা করে ফেললো এবং তাকবীর ধ্বনি দিতে থাকে- 'আমি আত্মমর্যাদাহীন নই- আল্লাহু আকবার।'

কমান্ডারের ডাক-চীৎকার শুনে কয়েকজন সৈনিক এগিয়ে আসে। তারা সকলে মিলে ঘেরাও করে কমান্ডারকে ধরে ফেলে। তাকে টেনে-হেঁচড়ে সুলতান আইউবী যে ভবনে অবস্থান করছিলেন, তার নিকট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। একজন বললো, একে সুলতানের আমলাদের হাতে তুলে দাও। ব্যবস্থা যা নেয়ার তারাই নেবেন। অপরাধ গুরুতর- সুলতানের আদেশ লংঘন। সুলতান নিরস্ত্র নাগরিকের উপর হাত তুলতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কমান্ডার চীৎকার করতে থাকে। তার চীৎকার শুনে সুলতান আইউবী বাইরে বেরিয়ে আসেন।

সুলতান ঘটনাটা বিস্তারিত শোনেন। বিক্ষুব্ধ কমান্ডারের অভিযোগ-অনুযোগও ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করেন। সকলে আশঙ্কা করেছিলো, সুলতান তাকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু না, সুলতান লোকটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে যান। তাকে শরবত পান করান এবং বুঝিয়ে দেন, আমাদের উদ্দেশ্য খৃস্টানদের হত্যা করা নয়। আমাদের লক্ষ্য প্রথম কেবলাকে মুক্ত করে এই পুণ্যভূমি থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করা।

কমান্ডারের মানসিক অবস্থা ভালো নয়। সুলতান তাকে ডাক্তারের হাতে অর্পণ করেন।

'সৈনিকদের এতো আবেগপ্রবণ হওয়া উচিত নয়'- সুলতান আইউবী তাঁর সালার ও উপদেষ্টাদের বললেন- 'কিন্তু ঈমান উন্মাদনার পরিসীমা পর্যন্ত পোক্ত হওয়া দরকার। আমাদের এই কমান্ডার হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। মুসলমান যদি আপন দীনের শত্রুদের দেখে উন্মাদ হয়ে যায়, তাহলে ইসলামের পতাকা সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যেখানে গিয়ে এই ভূখণ্ডের পরিসীমা সমাপ্ত হয়েছে।'

হারমানের যে মেয়েরা এই কমান্ডারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, তাদের দু'জন সমুদ্রের কূলে পৌঁছে যায়। সমুদ্র দূরে ছিলো না। তারা ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। তারা আশ্রয় সন্ধান করছে। তারা এক স্থানে চুপচাপ বসে পড়ে। খানিক পর একখানা নৌকা কূলে এসে ভিড়ে। মাল্লা দু'জন। তৃতীয়জন অফিসার গোছের লোক। ইনি সুলতান আইউবীর নৌ-বাহিনীর অফিসার আল-ফারেস বায়দারীন। নৌ-বাহিনীর প্রধান হলেন আবদুল মুহসিন। তার পরবর্তী পদের আমীর হলেন হুসামুদ্দীন লুলু।

সুলতান আইউবীর আদেশে নৌবহর- যার হেডকোয়ার্টার

আলেকজান্দ্রিয়ায়– রোম উপসাগরে টহল দিচ্ছিলো, ইউরোপের খৃস্টানদের জন্য যদি সেনা সাহায্য, রসদ-সরঞ্জাম ইত্যাদি আসে, তাহলে তাদের জাহাজগুলোকে পথেই যেনো প্রতিহত করা হয়।

হুসামুদ্দীন লুলু ভারত মহাসাগরে অবস্থান করছিলেন। সুলতান আইউবী যেহেতু উপকূলীয় অঞ্চলগুলো দখল করতে চাচ্ছিলেন, তাই মিসরী নৌ-বহরকে নির্দেশ প্রেরণ করেন, যেনো ছয়টি সামুদ্রিক জাহাজ কূলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এগুলো যুদ্ধজাহাজ, যাতে মিনজানিক ছাড়াও অভিজ্ঞ তীরন্দাজ এবং লড়াকু সৈনিক ছিলো।

নৌবাহিনী প্রধান আবদুল মহসিন আল-ফারেসকে কমান্ডার নিযুক্ত করে ছয়টি জাহাজ প্রেরণ করেন। আল-ফারেস তারই একটি জাহাজ থেকে নেমে নৌকায় করে কূলে চলে আসেন। তিনি নির্দেশনা গ্রহণের জন্য সুলতান আইউবীর নিকট যাচ্ছিলেন। কূলে অবতরণ করে তিনি কৃষাণীর পোশাক পরিহিত দু'টি মেয়েকে দেখতে পান। আল-ফারেস তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কারা? এখানে কী করছো? তারা উত্তর দেয়, আমরা যাযাবর গোত্রের মেয়ে, যুদ্ধের কবলে পড়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছি। আমাদের বহু পুরুষ মারা গেছে। অন্যরা এদিকি-ওদিক পালিয়ে গেছে।

'আর আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি'– এক মেয়ে বললো– 'খৃস্টানদের এই জন্য ভয় করি, তারা আমাদের মুসলমান মনে করে আর মুসলমানরা মনে করে খৃস্টান। আমরা এখন নিরুপায়-নিরাশ্রয়।'

'তোমরা মুসলমান না খৃস্টান?'

'আমাদের যিনি মালিক হবেন, তার ধর্ম যা, আমাদের ধর্মও তা-ই হবে'– অপর মেয়ে বললো– 'আমাদেরকে কারো না কারো হাতে বিক্রি হতেই হবে।'

আল-ফারেস নৌযুদ্ধে অভিজ্ঞ এবং অস্বাভাবিক সাহসী কমান্ডার। তদুপরি তিনি খোশ মেজাজের প্রাণবন্ত পুরুষ। এসব গুণের কারণে তিনি সকলের প্রিয়ভাজন। সেকালে তার মতো একজন পুরুষ একসঙ্গে দু'তিনটি করে স্ত্রী রাখতো। কিন্তু তিনি এখনো বিয়েই করেননি। সময়টা ছিলো যুদ্ধ-বিগ্রহের। আল-ফারেসকে মাসের পর মাস সমুদ্রে কাটাতে হচ্ছে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থল চোখে দেখাই কপালে জুটছে না। প্রতিটি নৌ-জাহাজের কাপ্তান স্ত্রীকে সঙ্গে রাখছে।

মেয়েগুলোর রূপ-যৌবন আল-ফারেসকে এতোটা প্রভাবিত ও

বিমোহিত করে তোলে যে, তার ভেতরে অনুভূতি জাগ্রত হয়ে যায়, তিনি আজ তিনটি মাসেরও বেশি সময় সমুদ্রে ঘুরে ফিরছেন। তিনি মেয়েদের বললেন, তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে জাহাজে রাখতে পারি।

'আমরা অসহায় অবলা নারী। আশা রাখি, আমরা প্রতারণার শিকার হবো না।'

'আমি তোমাদেরকে বিক্রি করবো না'– আল-ফারেস বললেন– 'মিসর নিয়ে যাবো এবং দু'জনকেই বিয়ে করে নেবো।'

মেয়েরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। চোখে চোখে কথা বলে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। তারা আল-ফারেসের আশ্রয় গ্রহণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

আল-ফারেস মেয়ে দুটোকে নৌকার মাল্লাদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন– 'এদেরকে আমার জাহাজে নিয়ে আমার কক্ষে খাবার খাওয়ায়। পরে এদের ওখানেই রেখে ফিরে এসে আমার অপেক্ষা করো।'

মেয়ে দুটোকে নৌকায় তুলে দিয়ে আল-ফারেস প্রেমের গান গাইতে গাইতে আক্রা অভিমুখে রওনা হয়ে যান।

'আল-ফারেস!'– সুলতান আইউবী আর-ফারেসকে বললেন– 'আমি তোমার নাম জানি। তোমার দু'-তিনটি সামুদ্রিক অভিযানের কীর্তির কথাও শুনেছি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। আগে তুমি একাকি ছোট-খাট অভিযান পরিচালনা করতে। এখন বড় মাপের বৃহৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা বিরাজ করছে। আমি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে এসেছি। কিন্তু তার আগে সকল বড় বড় বন্দর এলাকা দখল করতে হবে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোকে দখলে নিতে হবে। এই উপকূলীয় শহরগুলোর মধ্যে টায়ের ও আসকালান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ দূতদের মাধ্যমে হবে। তোমার দু'-তিনটি নৌকা সবসময় কূলে ভেড়ানো থাকতে হবে। আমি স্থলপথে যেখানেই যাবো, তোমাকে অবহিত রাখবো। তোমার জাহাজ সমুদ্রে টহল দিতে থাকবে। তোমার জাহাজগুলোতে অস্ত্র ও রসদের ঘাটতি নেই তো?'

'আমরা সবদিক থেকে প্রস্তুত হয়ে এসেছি।' আল-ফারেস উত্তর দেন।

'বৃহৎ যুদ্ধেরও সম্ভাবনা আছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'ক্রুসেডাররা হিত্তীনে যে পরাজয় বরণ করেছে এবং যেরূপ শোচনীয়ভাবে

পলায়ন করেছে, তা খৃষ্টজগতের জন্য এক অসাধারণ ঘটনা। তাদের চার-চারজন সম্রাট আমার হাতে বন্দি। একজনকে আমি হত্যা করেছি। রেমন্ড মরে গেছে। তাদের অতিশয় যোগ্য ও দুঃসাহসী সম্রাট বল্ডউইনও মারা গেছে। তার ফিরিঙ্গিরা বিশাল এক শক্তি। কায়রো থেকে আলী বিন সুফিয়ান সংবাদ প্রেরণ করেছে, ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড এবং জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক ফিলিস্তীনে ক্রুশের রাজত্ব অটুট রাখার লক্ষ্যে নিজ নিজ বাহিনী ও নৌ-বহরসহ আগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তারা আসলে পরে সিদ্ধান্ত নেবো, তাদেরকে ডাঙ্গায় আসতে দেবো, নাকি নদীতেই প্রতিহত করার চেষ্টা করবো। শুনেছি, ইংল্যান্ডের নৌ-বাহিনী নাকি অনেক শক্তিশালী। সংবাদ পেয়েছি, তারা বারুদ প্রস্তুত করে এমন খোলসে ভরে নিয়েছে, যেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলে উড়ে এসে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমি এ জাতীয় খোলস সংগ্রহ করে এরূপ অস্ত্র তৈরি করে নেয়ার চেষ্টা করবো। যা হোক, তুমি তোমার জাহাজগুলোকে কূলের কাছাকাছি রাখবে। নৌ-বাহিনী প্রধান আবদুল মুহসিন সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবে।'

আল-ফারেস প্রয়োজনীয় সব দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে বিদায় নিয়ে চলে যান। রেখে আসা নৌকা তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। নিজের জাহাজে পৌঁছে অন্যান্য জাহাজের কাপ্তানদের তলব করেন। তাদেরকে জরুরি নির্দেশনা প্রদান করে বিদায় করে দেন। নিজে আপন কেবিনে চলে যান, যেখানে আশ্রিতা মেয়ে দুটো তার অপেক্ষায় বসে আছে। অত্যন্ত সরল-সোজা সেজেছে মেয়েগুলো। কিছুই জানে না ভান ধরে জিজ্ঞেস করে, আপনারা সমুদ্রে কী করেন? আল-ফারেস অনেক দিন যাবত সমুদ্রে নিরানন্দ জীবন-যাপন করছেন। আজ একটু হাসি-আনন্দের পরিবেশ পেয়েছেন। পুরুষদেরকে আঙুলের ইশারায় নাচানোর দীক্ষা মেয়ে দুটোর আছে।

১১৮৭ সালের ২০ জুলাই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আক্রা ত্যাগ করেন। তাঁর গেরিলা সৈনিকরা তাঁর জন্য পথ পরিষ্কার করে রেখেছে। সমুদ্রের কূলবর্তী কয়েকটি দুর্গ ও জনপদ তিনি জয় করে ফেলেছেন। ৩০ জুলাই তিনি বৈরুত অবরোধ করেন। খৃষ্টানরা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ নগরীটা রক্ষা করার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু সুলতান আইউবী পরম ত্যাগের বিনিময়ে নগরীটা দখল করে ফেলেন। আক্রার মুসলমানদের ন্যায় করুণ অবস্থা এখানকার মুসলমানদেরও।

২৯ জুলাই নাগাদ বৈরুতের শাসনক্ষমতা সুসংহত করে সুলতান আইউবী আরেক বিখ্যাত উপকূলীয় শহর টায়ের অভিমুখে যাত্রা করেন। সুলতান গোয়েন্দা রিপোর্ট ব্যতীত অগ্রযাত্রা করতেন না। তাঁকে অবহিত করা হলো, আপনার ফৌজ অনেক বেশি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এদিক-ওদিক পলায়নকরা খৃস্টান সৈন্যরা টায়েরে একত্রিত হয়ে সংগঠিত হচ্ছে। সকল ফিরিঙ্গিও উপকূলীয় অঞ্চল থেকে পিছপা হয়ে টায়ের চলে গেছে। সুলতান আইউবী টায়ের আক্রমণ মুলতবী করে দেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের জন্য সৈন্যদের বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন।

এ সময়ে আল-ফারেস বায়দারীনের নৌ-জাহাজটি কূল থেকে দূরে দূরে টহল প্রদান করতে থাকে। মেয়ে দুটোও তার জাহাজে অবস্থান করছে। ইতিমধ্যে তারা আল-ফারেসের হৃদয়ে জেঁকে বসতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আল-ফারেস কর্তব্যে অবহেলা করছেন না। একটা নিয়ম আছে, যখনই কোনো রণতরী কূলে এসে নোঙ্গর ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট অনেক নৌকা তার চারদিকে ঘুরতে শুরু করে। এগুলো গরীব পল্লীবাসীদের নৌকা। তারা নৌকায় করে এসে নানা রকম ফল-মূল, ডিম, মাখন ইত্যাদি মাল্লা ও সৈনিকদের নিকট বিক্রি করে থাকে। জাহাজের কাপ্তানরা তাদের কাউকে কাউকে রশির সিঁড়ি ফেলে জাহাজে তুলে নিয়ে তাদের থেকে স্থল জগতের খবরাখবর সংগ্রহ করেন।

একদিন আল-ফারেসের জাহাজ কূলে এসে ভিড়ে। স্থল বাহিনীর কোনো এক কমান্ডারের সঙ্গে তার কথা বলার প্রয়োজন। মেয়ে দুটো ছাদের উপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট তিনটি নৌকা এগিয়ে আসে। সেগুলোতে ফল ইত্যাদি পণ্য দেখা যাচ্ছে। তাদের থেকে কিছু ক্রয় করার জন্য তারা জাহাজের লোকদের নিকট অনুনয় করতে শুরু করে। এক নৌকায় মাঝবয়সী এক বৃদ্ধ ছিলো। লোকটির গায়ে গেঞ্জি ছাড়া আর কিছু নেই। নিতান্ত গরীব মনে হচ্ছে। সে দুটো মেয়েকে দণ্ডায়মান দেখে নৌকা জাহাজের একেবারে নিকটে নিয়ে আসে।

'কিছু নিন না শাহজাদী!'– লোকটি বিনয়ের সুরে বললো– 'আমরা নিতান্ত গরীব মানুষ। আপনাদের মতো লোকদের দয়ায়ই তো আমরা বাঁচি।'

মেয়েরা তার দিকে গভীর চোখে তাকালে সে বাঁ চোখে হাল্কা একটু ইঙ্গিত করে। উভয় মেয়ে খানিক বিস্মিত হয়ে একে অপরের দিকে তাকায়। লোকটি এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একটি আঙুল বুকের উপর

উপর-নীচ ও ডান-বাম করে ক্রুশের চিত্র আঁকে। এক মেয়ে নিজের ডান হাতের তর্জনী বাঁ হাতের তর্জনীর উপর আড়াআড়ি রেখে ক্রুশ তৈরি করে। বৃদ্ধ মুচকি হাসে। এক মেয়ে জাহাজের মাল্লাদের বললো, ঐ লোকটাকে উপরে তুলে আনো।

মাল্লাদের জানা আছে, এই মেয়ে দুটোর মালিক জাহাজের কাপ্তান, যিনি সবক'টি জাহাজের কমান্ডার। তারা সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি ফেলে। বৃদ্ধ টুকরিতে বিভিন্ন পণ্য ভরে উপরে নিয়ে আসে এবং টুকরিটা মেয়েদের সম্মুখে রাখে। মেয়েরা নেড়ে-চেড়ে পণ্য দেখতে শুরু করে। অন্য কারো তাদের কাছে ঘেঁষবার সাহস নেই।

'তোমরা এখানে আসলে কীভাবে?' মাঝি জিজ্ঞেস করে।

'দৈবক্রমে'– এক মেয়ে উত্তর দেয়– 'হারমান ধরা পড়েছেন।' মেয়েটি লোকটাকে পূর্ণ ঘটনা শোনায় এবং আল-ফারেস সম্পর্কে জানায়, তিনি আমাদেরকে যাযাবর মনে করে আশ্রয় দিয়েছেন।

'কিছু ভেবেছো, কী করবে?'– মাঝি জিজ্ঞেস করে– 'যাবে কোথায়?'

'আপাতত জান বাঁচানোর ব্যবস্থা করেছি'– মেয়েটি উত্তর দেয়– 'আমরা কমান্ডার আল-ফারেসের মন-মস্তিষ্ক কব্জা করে ফেলেছি। সুযোগ পেলেই পালাবার চেষ্টা করবো। তবে তুমি দিক-নির্দেশনা দিলে এখানে থেকেই অন্য কিছু করতে পারি।'

গরীববেশী এই ব্যবসায়ী মাঝিটা ক্রুসেডারদের গুপ্তচর এবং মেয়েদেরকে ভালো করে জানে। মেয়েরাও তাকে বেশ চিনে। সে বললো, কূলে অবতরণ করে পালাবার চেষ্টা করো না। অন্যথায় শোচনীয় মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। বৈরুত পর্যন্ত মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠি হয়ে গেছে। আমাদের খৃস্টান সৈনিরা প্রতিটি স্থান থেকে পিছু হটে যাচ্ছে। একটিমাত্র অঞ্চল টায়ের অবশিষ্ট আছে, যেখানে আমাদের আশ্রয় মিলতে পারে। এখনো এই জাহাজেই থাকো। আমি তোমাদের খোঁজ-খবর নেবো। পরিস্থিতি আমাদের জন্য খুবই বিপজ্জনক হয়ে ওঠেছে। সর্বত্র মুসলিম সৈনিকরা গিজ গিজ করছে।

'তুমি এখানে কী করছো?'

'ক্রুশের গায়ে হাত রেখে যে শপথ নিয়েছিলাম, তা পূর্ণ করার চেষ্টা করছি'– মাঝি উত্তর দেয়– 'এই ছয়টি রণতরীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছি। এগুলো ধ্বংস করার ব্যবস্থা করবো।'

'নিজেদের তরী কোথায়?'

'টায়েরের নিকটে'– মাঝি উত্তর দেয়– 'এই বহর যদি সেদিকে রওনা হয়, তাহলে আগে-ভাগে সংবাদ বলে দেবো। ভাগ্যক্রমে তোমরা এখানে এসে পৌছে গেছো। এ কাজে তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমিও তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে টায়ের পৌছিয়ে দিতে পারবো। আচ্ছা, এবার আমাকে যেতে হবে। সংকেত ঠিক করে নাও। আমি এই জাহাজগুলোর সঙ্গে ছায়ার ন্যায় লাগা আছি। এই জাহজ যেখানেই নোঙ্গর ফেলবে, আমি এই বেশে সেখানে হাজির হয়ে যাবো।'

তারা সংকেত ঠিক করে নেয়। মেয়েরা লোকটির টুকরি থেকে কিছু জিনিস নিয়ে দাম দিয়ে দেয়। লোকটি টুকরি মাথায় করে সিঁড়ি বেয়ে ডিঙ্গিতে নেমে পড়ে।

১১৮৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সুলতান আইউবী আরো একটি বিখ্যাত উপকূলীয় শহর আসকালান অবরোধ করেন। এখানেও ভারি পাথর নিক্ষেপকারী মিনজানিক ব্যবহার করা হয়। সুরঙ্গ খননকারী বাহিনী রাতে প্রাচীর ভাঙার চেষ্টা করতে থাকে। নিকটেই একটি উঁচু জায়গা ছিলো। সেখান থেকে মিনজানিকের সাহায্যে শহরের ভেতরে পাথর ও অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করা হয়। দ্বিতীয় দিনই অবরুদ্ধরা নগরীর ফটক খুলে দেয় এবং অস্ত্র সমর্পণ করে।

১১৫৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ফ্রিংক্ এই নগরীটা দখল করেছিলেন। পুরো চৌত্রিশ বছর পর শহরটি আবার স্বাধীন হলো।

আসকাল থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস চল্লিশ মাইল পূর্বে অবস্থিত। দূরত্বটা সুলতান আইউবীর দ্রুতগামী বাহিনী জন্য দু'দিনের পথ। তাঁর কোনো কোনো ইউনিট ও গেরিলা বাহিনী আগেই বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটে পৌছে গিয়েছিলো। তারা ক্রুসেডারদের বাইরের চৌকিগুলো ইতিমধ্যেই ধ্বংস করে দিয়েছে। জীবনে রক্ষাপাওয়া অবশিষ্ট খৃস্টান সৈন্যরা বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছাচ্ছে। সুলতান আইউবী তাঁর বিক্ষিপ্ত বাহিনীগুলোকে আসকালানে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।

সুলতান আইউবীর অব্যাহত জয় এবং ঝড়গতির অগ্রযাত্রার সংবাদ দামেশ্ক, বাগদাদ, হাল্ব, মসুল এবং ওদিকে কায়রো পর্যন্ত পৌছে গেছে।

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ– যিনি এসব আক্রমণ অভিযানে সুলতান আইউবীর সঙ্গে ছিলেন– তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, লাগাতার জয়ের ফলে সুলতান আইউবীর বাহিনী ক্লান্তির কথা ভুলেই গিয়েছিলো। তারা একের পর এক অঞ্চল জয় করছিলো আর বিজিত অঞ্চলের মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে দেখে বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে অধিক থেকে অধিকতর উদগ্রীব হয়ে উঠছিলো। এ-ই তো ছিলো সুলতান আইউবীর সামরিক শক্তি। কাজী বাহাউদ্দীন আরো লিখেছেন, আসকালানে সুলতান আইউবীর নিকট রূহানী শক্তিও পৌছুতে শুরু করেছিলো। তাঁরা হলেন দামেশ্‌ক, বাগদাদ ও অন্যান্য বড় বড় শহরের আলেম, দরবেশ ও সুফীগণ। তাঁরা সুলতান আইউবীর সাথে বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করতে এসেছিলেন। তারা এসে সুলতান আইউবীকে দু'আ দেন এবং তাঁর বাহিনীকে বাইতুল মুকাদ্দাসের গুরুত্ব ও পবিত্রতা অবহিত করেন। মুসলিম বাহিনীকে উত্তেজিত করে তোলেন। সুলতান আইউবী আলেম-দরবেশদের বেশ শ্রদ্ধা করতেন। এবার তাদেরকে সঙ্গে পেয়ে তাঁর ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন– 'এবার পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাকে পরাজিত করতে পারবে না।'

আসকালান থেকে রওনা হওয়ার চার দিন আগে সুলতান আইউবীর নিকট হাল্‌ব থেকে একজন মেহমান আসেন, যাকে দেখে সুলতান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মেহমান নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা রোজি খাতুন। রোজি খাতুন ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে গিয়ে সুলতান আইউবীকে জড়িয়ে ধরেন। দু'জনেরই আবেগ উথলে ওঠে। দু'জনই ভারাক্রান্ত হয়ে যান।

খানিক পর অনেকগুলো উটের দীর্ঘ এক সারি এসে দাঁড়িয়ে যায়। আরোহীরা শ' দুয়েক মেয়ে।

'এ কী?' সুলতান আইউবী পরম বিস্ময়ের সাথে রোজি খাতুনকে জিজ্ঞেস করেন।

'আহতদের সেবা-চিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকটি মেয়ে'– রোজি খাতুন উত্তর দেন– 'আমি এদেরকে যুদ্ধেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছি। তীরন্দাজির বেশ অনুশীলন আছে। আমি জানি, তুমি মেয়েদেরকে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে চাও না। কিন্তু আমার ও এদের জয্‌বা বিনষ্ট করার চেষ্টা

করে না। তুমি জানো না, সিরিয়ায় তরুণীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা কতো কষ্টকর হয়ে ওঠেছে। যে কোনো মেয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে যাওয়ার জন্য অস্থির-উদগ্রীব। তুমি অনুমতি দিলে আমি এক হাজার মেয়েকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেবো। তারা পুরুষ সৈনিকদের ন্যায় লড়াই করবে। এখানে যারা যুদ্ধ করছে, তাদের মায়েরা তাদের নিরাপত্তা নয়- জয়ের সংবাদ শুনতে অপেক্ষা করছে। লোকালয়ে একই কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে- 'সংবাদ কী?' বলো সালাহুদ্দীন কতো মেয়ে পাঠাবো?'

'আমি এদেরকে আমার সঙ্গে রেখে দেবো'- 'সুলতান আইউবী বললেন- 'আর কাউকে পাঠাবেন না।'

'উটের পিঠে করে আমি একটি মিম্বর এনেছি'- রোজি খাতুন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে অশ্রু নেমে আসে। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন- 'তোমার বোধ হয় মনে নেই, আমার মরহুম স্বামী নুরুদ্দীন জঙ্গী এই শপথ নিয়ে মিম্বরটি তৈরি করিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাসকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করে এটি মসজিদে আকসায় স্থাপন করবেন। অনেক সুন্দর মিম্বর। দামেশ্‌কে রাখা ছিলো। আমি বহন করে এনেছি। আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করুন সালাহুদ্দীন। আমি দেখার অপেক্ষায় আছি, তুমি এই মিম্বরকে মসজিদে আকসায় স্থাপন করে আমার মরহুম স্বামীর শপথ পূরণ করেছো।'

সুলতান আইউবী আপ্লুত হয়ে ওঠেন। তাঁর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন- 'আল্লাহ যেনো এই শপথ আমার দ্বারা পূর্ণ করান।'

এক যুবতী মেয়ে সুলতানের সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে সুলতানকে সালাম করে। রোজি খাতুন বললেন- 'চেনোনি? আমার কন্যা শামসুন্নিসা।' সুলতান আইউবী মেয়েটাকে যখন দেখছিলেন, তখন ও অনেক ছোট ছিলো।

'শামসুন্নিসা তোমার সঙ্গে ময়দানে থাকবে'- রোজি খাতুন বললেন- 'মেয়ে সৈনিকরা তার কমান্ডে কাজ করবে। আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবীর নিকট যে আলেম-দরবেশগণ এসেছিলেন, তারা ইবাদত-বন্দেগী, তাসবীহ-তাহলীল, জিকির-অযীফা ও দু'আ-দরূদে নিমগ্ন। মাঝে-মধ্যে সৈনিকদের মাঝে ঘোরাফেরা করছেন এবং তাদের

জিহাদী চেতনাকে শাণিত করার চেষ্টা করছেন। আসকালানের বাইরে যেখানে সৈনিকরা ডিউটি করছে, তারা সে পর্যন্তও ঘুরে এসেছেন। তাদের ভাষণ-বক্তৃতার সারমর্ম মোটামুটি এরূপ–

'নব্বই বছর যাবত কাফেররা তোমাদের প্রথম কেবলা দখল করে আছে। কুরআন অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারবে, প্রথম কেবলাকে কাফেরদের নাপাক কব্জা থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত কোনো মুসলমানের ঘুম আসার কথা নয়। যে মসজিদে আকসা থেকে আমাদের প্রিয়নবী আল্লাহর আমন্ত্রণে মিরাজে গমন করেছিলেন, সেটি এখন কাফেরদের উপাসনালয়ে পরিণত। রাসূলে মকবুল (সা.)-এর পবিত্র আত্মা আমাদেরকে অভিশম্পাত করছে। আহার-নিদ্রা, স্ত্রী সব আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাওয়া দরকার ছিলো। কিন্তু নব্বইটি বছর যাবত আমরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছি এবং ভোগ-বিলাসিতায় লিপ্ত রয়েছি।'

'আল্লাহর সৈনিকগণ! ইহুদী-খৃস্টাদের সুদর্শন চক্রান্তজালে ফেঁসে আমাদের শাসকগণ তাদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো, যারা প্রথম কেবলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। বাইতুল মুকাদ্দাস সেই পবিত্র ভূমি, যেখানে আমাদের প্রিয়নবীর মুবারক পা পড়েছিলো এবং তাঁর পবিত্র কপাল সিজদা করেছিলো। হযরত ইবরাহীম ও হযরত সুলায়মানসহ (আ.) না জানি কতো নবী-রাসূল এখানে ইবাদত করেছিলেন। কিন্তু নব্বইটি বছর যাবত এখানকার মুসলমানদের উপর যে বিভীষিকা চলছে, সেই চিত্র তোমরা নগরীতে প্রবেশ করে দেখে নিও। মসজিদে আকসার উপর ক্রুশ দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদগুলা ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়ে আছে। মুসলমানদের এমন গণহত্যা হয়েছে যে, নগরীর অলি-গলিতে রক্তের নদী বইয়ে গেছে। মুসলমানরা বন্দিত্বের জীবন-যাপন করছে এবং মেয়েরা কাফেরদের দাসীতে পরিণত হয়ে আছে।'

'হে ইসলামের জানবাজ সৈনিকগণ! আল্লাহ তোমাদের বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত ও পবিত্র করার সৌভাগ্য দান করেছেন। তোমাদের ভাগ্য প্রসন্ন যে, তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর আমলে জন্ম নিয়েছো। তোমরা যদি ব্যর্থ হও, তাহলে সেখান থেকে তোমাদের লাশ তুলে আনা হবে। আর তোমরা শুনে বিস্মিত হবে, যে বাইতুল মুকাদ্দাসে হযরত ঈসা (আ.) প্রেমের পাঠ শিখিয়েছিলেন, সেখানে ক্রুসেডাররা

জঘন্যতম নিষ্ঠুরতার মহড়া দিচ্ছে। শুনলে তোমাদের কান্না পাবে, আবেগ উথলে উঠবে, কোনো যুদ্ধে জয়লাভ করলে খৃষ্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাসে উৎসবের আয়োজন করে থাকে। সেই উৎসবে তারা আমাদের যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে বিবস্ত্র করে নাচায় এবং সুঠাম সুদেহী মুসলিম যুবকদের জবাই করে তাদের গোশত রান্না করে খায়। আজ তোমাদেরকে প্রতিজন নিরপরাধ মজলুম মুসলমানের প্রতি ফোঁটা রক্তের প্রতিশোধ নিতে হবে। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী মসজিদে আকসায় স্থাপন করার জন্য একটি মিম্বর তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। এখন তাঁর বিধবা সেটি এখানে এনে দিয়ে গেছেন। এই বিদূষী বীর মহিলা দু'শ' মেয়ে নিয়ে বহুদূর থেকে এসেছেন। নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে পূরণ করতেই হবে।'

সুলতান আইউবী গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট মোতাবেক বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধের পরিকল্পনা প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন।
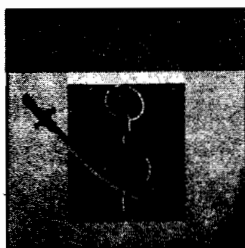
বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়

সমুদ্রের নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ জীবনে মেয়ে দুটো আল-ফারেসকে নব-জীবন দান করতে শুরু করেছে। কিন্তু একদিকে মেয়ে দুটো যেমন আল-ফারেসের জন্য রহস্যময় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তেমনি আল-ফারেসও তাদের কাছে এক বিস্ময়কর পুরুষে পরিণত হয়েছেন। মেয়েরা বলেছিলো, তারা যাযাবর। তাদের গোত্রের সব মানুষ যুদ্ধের কবলে পড়ে মারা গেছে এবং তারা অনেক কষ্টে লুকিয়ে লুকিয়ে নদীর তীর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। কিন্তু আল-ফারেস দেখতে পাচ্ছেন, তাদের স্বভাব-চরিত্র, চলন-বলন ও রীতি-নীতি যাযাবরদের মতো নয়। যাযাবর মেয়েরা রূপসী হতে পারে; কিন্তু এদের মধ্যে যে রুচিশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। তাছাড়া এদের মধ্যে যেটুকু অশ্লীলতা দেখা যাচ্ছে, যাযাবর মেয়েরা সাধারণত এমন বেহায়া হয় না।

মেয়েদের জন্য আল-ফারেস এক বিস্ময়কর পুরুষ। তাদের আশা ছিলো, তিনি তাদের সঙ্গে সেই আচরণই করবেন, যেমনটি অন্য পাঁচ-দশজন মুসলমান করেছিলো। ফলে মেয়ে দুটো প্রথম প্রথম নিরাশই হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা আল-ফারেসের অন্য একটি দুর্বলতা আন্দাজ করে নেয়। তা হচ্ছে, লোকটা দায়িত্বের ক্ষেত্রে যতোটা কর্তব্যপরায়ণ, অবসরে ততোটা অবোধ শিশুতে পরিণত হয়ে যান। তিনি মেয়েদের সঙ্গে সমবয়সী বান্ধবীর ন্যায় খেলতে শুরু করেন এবং তাদের রূপ-লাবণ্য থেকে স্বাদ উপভোগ করেন। তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত রেশমি চুলে বিলি কাটেন, তাদের মাঝে হারিয়ে গিয়ে দুনিয়ার কথা ভুলে যান।

একদিনের ঘটনা। এক মেয়ে আর আল-ফারেস কক্ষে উপবিষ্ট। অপরজন বাইরে কোথাও গেছে। মেয়েটি আল-ফারেসের চেতনাকে উত্তেজিত করতে কিংবা লোকটার মধ্যে চেতনা বলতে কিছু আছে কিনা, জানবার চেষ্টা করে। আল-ফারেস তার খোঁচাটা বুঝে ফেলে বললেন–

'প্রথম দিন যখন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, আমি জাহাজে তোমাদেরকে আশ্রয় দিতে পারি, তখন তোমরা বলেছিলে, দয়া করে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবেন না। আমি বলেছিলাম, তোমাদেরকে মিসর নিয়ে যাবো এবং বিয়ে করবো। আমি আমার সেই প্রতিশ্রুতির উপর অটল থাকতে চাই। বিবাহ না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করবো না, যা থেকে তোমাদের মনে সন্দেহ জাগ্রত হবে। আমি সাময়িকভাবে মনোরঞ্জনের জন্য তোমাদেরকে এখানে এনেছি। আমি তোমাদের অসহায়ত্ব থেকে লাভবান হতে চাই না। মিসর রওনা হওয়া পর্যন্ত তোমরা চিন্তা করো। যদি আমার সঙ্গে থাকা পছন্দ না করো, তাহলে যেখানে বলবে পৌঁছিয়ে দেবো।'

সহসা মেয়েটি আবেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে আল-ফারেসের গলা জড়িয়ে ধরে এবং তার গালে নিজ গালের পরশ বুলিয়ে বলে ওঠে—'আমরা তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। তোমাকেই প্রথম পুরুষ পেলাম, যার হৃদয়ে মানবতার পবিত্রতা আছে এবং যার মনোজগত শয়তানি চরিত্র ও পশুত্ব থেকে মুক্ত।'

মেয়েটি এমন ভাষায় ও এমন ধারায় প্রেম নিবেদন করে যে, পানির উপর সন্তরমান জাহাজটা আল-ফারেসের নিকট শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে বলে মনে হলো। এটিই তার দুর্বলতা, যা মানবীয় স্বভাবের সবচে' বেশি বিপজ্জনক দোষ। দীর্ঘ সময় দিনরাত সমুদ্রে টহল দান এবং মাঝে-মধ্যে ছোটখাটো সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার ফলে তার দেহে যে ক্লান্তি ও হৃদয়ে যে অবসাদ নেমে এসেছিলো, এক রূপসী যুবতীর দেহের পরশ ও প্রেম নিবেদনে সব দূর হয়ে গেছে। আল-ফারেসের দেহ-মন এখন চাঙ্গা ও ঝরঝরে। এখন দায়িত্ব তার আগের তুলনায় বেশি। হাতে ছয়টি জাহাজের কমান্ড এবং ফিলিস্তীন কূলের সামান্য দূরে সতর্ক টহল দিয়ে ফিরছেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বিদ্যুতের ন্যায় ফিলিস্তীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং তীরবর্তী অঞ্চলগুলো দখল করে নিয়েছেন। আর এখন আসকালানে এসে বাইতুল মুকাদ্দাস দখলে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। আল-ফারেসের দায়িত্ব, সমুদ্র পথে খৃস্টানদের জন্য কোনো সাহায্য কিংবা রসদ ইত্যাদি আসলে তাকে তীর পর্যন্ত পৌঁছুতে না দেয়া। এই দায়িত্ব তার ঘুম হারাম করে রেখেছে। এখন মেয়ে দুটো তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

আল-ফারেস একদিন মেয়ে দুটোকে বললেন– 'তোমাদের মধ্যে যাযাবরের স্বভাব নেই। তার স্থলে আমি তোমাদের মাঝে ভদ্রতা ও সামাজিকতা দেখতে পাচ্ছি। এসব কোথা থেকে আসলো?'

'আমরা উচ্চমানের খৃস্টান পরিবারে চাকুরি করেছি'– এক মেয়ে উত্তর দেয়– 'তারা আমাদেরকে আতিথেয়তার রীতি-নীতি এবং উঁচু স্তরের মেহমানদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের পন্থা-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি যদি সাধারণ মানুষ হতেন, তাহলে আপনার সঙ্গে যাবাবরের ন্যায়ই আচরণ করতাম। আমাদের কথা-বার্তা ও চাল-চলন যাযাবরেরই মতো হতো। আপনি একটি দেশের নৌ-বাহিনীর এতো বড় একজন কমান্ডার এবং আপনার হৃদয়ে আমাদের এতো অধিক ভালোবাসা যে, আমরা আপনার সঙ্গে গেঁয়োর ন্যায় আচরণ করতে পারি না।'

অপর পাঁচ জাহাজের ক্যাপ্টেনগণ জেনে গেছেন, তাদের কমান্ডার আল-ফারেস নিজ জাহাজে দুটি মেয়ে নিয়ে এসেছেন। শুনে সবাই মুখ টিপে হাসেন ও টিপ্পনি কাটেন। কিন্তু সবাই অনুভব করেন, যুদ্ধের সময় জাহাজে অচেনা-অপরিচিত মেয়েদের রাখা নিরাপদ নয়। প্রয়োজন হলে নিজ স্ত্রীকেই তো রাখা যায়। তারা বিষয়টি নিয়ে আল-ফারেসের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেন। আল-ফারেস তাদের আশ্বস্ত করে দেন যে, কোনো সমস্যা হবে না। এদেরকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে মাত্র। সকলে জানেন আল-ফারেস চরিত্রহীন মানুষ নন এবং কর্তব্যপরায়ণ কমান্ডার। আল-ফারেসের উত্তরে তারা সহজেই সন্দেহমুক্ত হয়ে যান।

বাইতুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে বিরাজ করছে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। এখানকার মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার-নিপীড়ন চলছিলো, তার তুলনা অন্তত ফিলিস্তীনের অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে নেই। এই নিপীড়নের ইতিহাস অনেক পুরনো। খৃস্টানরা ১০৯৯ সালে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করেছিলো। মুসলমানদের অনৈক্য, ক্ষমতার মোহ ও গাদ্দারীর ফল ছিলো এটা। ইতিহাসে বহু হানাদার শক্তির এর চেয়েও অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড দখলের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে তাকে এতো অধিক গুরুত্ব প্রদান করে, যেনো তারা অর্ধেক দুনিয়া জয় করে ফেলেছে। সমগ্র ইউরোপ এমনকি সমগ্র খৃস্টজগত ও পৃথিবীর তাবৎ গীর্জার দৃষ্টি বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর নিবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এই গুরুত্বের এক কারণ ছিলো, খৃস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে তাদের পবিত্র স্থান মনে করতো। তাদের বিশ্বাস মতে, হযরত ঈসাকে (আ.) এ অঞ্চলেরই কোথাও শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিলো। আরেক কারণ, বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কেবলা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এখান থেকেই মি'রাজে গমন করেছিলেন। এ কারণে মসজিদে আকসার গুরুত্ব ও মাহাত্ম খানায়ে কা'বার চেয়ে কম ছিলো না। মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে তাদের ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র মনে করতো। এখনও এটি আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল। খৃস্টানরা আমাদের এই কেন্দ্রটার উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে চেয়েছিলো। খৃস্টানদের গোয়েন্দা প্রধান হারমান ভুল বলেননি যে, এই ক্রুসেড যুদ্ধ মুসলমান ও খৃস্টানদের রাজাদের লড়াই। এটা কালেমা ও কা'বার লড়াই, যা সেদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যেদিন দুয়ের একটির পতন ঘটবে।

হিন্দুরা যেভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে, মুসলমানদের পরাজিত করাকে এবং যুদ্ধের ময়দানে তো বটে, যে কোনো অবস্থায় ধোঁকায় ফেলে হলেও মুসলমানদেরকে হত্যা করাকে ধর্মীয় কর্তব্য স্থির করে রেখেছে, তেমনি খৃস্টানদের পাদ্রীরাও মুসলমানদের খুন করাকে পুণ্যের কাজ সাব্যস্ত করে রেখেছিলেন। খৃস্টানরা যুদ্ধের বিধান লাভ করতো পোপের (প্রধান পাদ্রী) নিকট থেকে। আপনারা পড়েছেন, হিত্তীনের যুদ্ধে আক্রার পাদ্রী সেই বড় ক্রুশটি নিয়ে রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন, যাতে তাদের বিশ্বাস মতে হযরত ঈসাকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিলো। এই ঘটনাই প্রমাণ করছে, কা'বার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করেছিলো গীর্জা এবং ক্রুসেড যুদ্ধ দু'টি ধর্ম ও দু'টি সভ্যতার লড়াই ছিলো।

ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণকারী সম্রাট, সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিক প্রত্যেকের থেকে বড় ক্রুশের উপর হাত রেখে ক্রুশের অফাদারী এবং জীবন ও সম্পদের কুরবানীর শপথ নেয়া হতো। এই শপথের কারণেই তাদেরকে 'সলীবি' তথা 'ক্রুসেডার' বলা হতো এবং বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষায় যেসব যুদ্ধ লড়া হয়েছিলো, সেগুলোকে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' আখ্যা দেয়া হয়েছিলো। খৃস্টজগতে মুসলমান বিরোধী যুদ্ধ এবং আরব ভূখণ্ড দখল করাকে এমন উন্মাদনার রূপ দান করা হয়েছিলো, মহিলারা পর্যন্ত তাদের সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ ও অলংকারাদি অকুণ্ঠচিত্তে গীর্জার হাতে

অর্পণ করতে শুরু করেছিলো। এই উন্মাদনার চূড়ান্ত রূপ এই ছিলো যে, যুবতী মেয়েরা উদার মনে তাদের সম্ভ্রম-সতীত্ব ক্রুশের বিজয় ও মুসলমানদের পরাজয়ের লক্ষ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলো। মুসলমানদের চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা ধ্বংসের জন্য যেভাবে প্রয়োজন গীর্জার পক্ষ থেকে খৃস্টান মেয়েদের ব্যবহার করার অনুমোদন দিয়ে রাখা হয়েছিলো। মেয়েদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছিলো, গীর্জার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের খাতিরে সম্ভ্রম উৎসর্গকারী মেয়েরা স্বর্গ লাভ করবে।

এই বিশ্বাসেরই অনুকূলে রূপসী খৃস্টান মেয়েদেরকে নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে প্রেরণ করা হয়েছিলো। এরা মুসলিম আমীরদের হেরেমে ঢুকে গিয়ে একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করে, যার বিস্তারিত কাহিনী আপনারা পেছনে পড়ে এসেছেন। তাদেরই কারসাজিতে মুসলমানরা পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে এবং খৃস্টানদের পাতা এই সুদৃশ্য ফাঁদে এমনভাবে আটকে যায় যে, তারা আপন চিন্তা-চেতনা, স্বকীয়তা ও বোধ-বিশ্বাসকে ছুঁড়ে ফেলে সিংহাসনের জন্য পাগল হয়ে যায়। তারা তাদের ঈমান নিলাম করে দেয়। তবে তারপরও এমন কিছু লোক অবশিষ্ট থাকে, যাদের আত্মা ঈমানের আলোতে আলোকিত ছিলো। তারা বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারে রক্তের নজরানা দিতে থাকে। কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধান হচ্ছে, একজন গাদ্দারই সমগ্র জাতিকে আত্মমর্যাদাহীন করে তোলার জন্য যথেষ্ট। আর সেই গাদ্দার যখন ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়, তখন তার শত্রু অপেক্ষা দশগুণ বেশি সৈন্যও পরাজয়বরণ করে।

মুসলিম শাসকদের এই গাদ্দার চরিত্রেরই ফলে ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই মোতাবেক ৪৯২ হিজরীর ২৩ শাবান খৃস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নিতে সক্ষম হয়। খৃস্টানদের এই বিজয়ে যেসব মুসলিম আমীর ও শাসক খৃস্টানদেরকে সহযোগিতা দান করে এবং যেভাবে করে, সে এক দীর্ঘ ও লজ্জাকর উপাখ্যান। উপমাস্বরূপ এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, খৃস্টান বাহিনী যখন বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলো, তখন শাহজার আমীর তাদের প্রতিহত করা থেকে বিরত থেকেই ক্ষান্ত হননি; বরং তাদেরকে রসদ সরবরাহ করেন এবং গাইড দিয়েও সহযোগিতা করেন। হামাত-ত্রিপোলীর আমীরগণও খৃস্টান বাহিনীকে নিরাপদ রাস্তা, রসদ ও উপঢৌকন দিয়ে তাদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের

জন্য রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। পথে তাদের আরো কয়েকটি মুসলিম রাজ্য অতিক্রম করতে হয়েছিলো। তারা তাদের রাজ্য ও ক্ষমতার নিরাপত্তার খাতিরে খৃস্টানদের চিত্তাকর্ষক ও সুদৃশ্য উপঢৌকন সাদরে গ্রহণ করে এবং খৃস্টান বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে।

আরাকার আমীর ছিলেন একজন ঈমানদার পুরুষ, যার সামরিক শক্তি খৃস্টানদের মোকাবেলায় কিছুই ছিলো না। তবু তিনি খৃস্টান সেনাপতিদের দাবি পূরণ করতে অস্বীকৃত জানান এবং তাদেরকে মোকাবেলার জন্য হুংকার ছাড়েন। খৃস্টান বাহিনী আরাকা অবরোধ করে ফেলে। ১০৯৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মে পর্যন্ত আরাকার মুসলমানরা এমন প্রাণপণ মোকাবেলা করে যে, খৃস্টান বাহিনী বিপুল প্রাণহানির ক্ষতি মাথায় করে অবরোধ তুলে নিয়ে পথ পরিবর্তন করে সম্মুখে চলে যেতে বাধ্য হয়। সকল মুসলিম আমীর যদি নিজ নিজ এলাকায় বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রসরমান খৃস্টান বাহিনীকে এভাবে প্রতিহত করতো, তাহলে ফোটায় ফোটায় নিঃসরিত হয়ে খৃস্টানদের রক্ত পথেই নিঃশেষ হয়ে যেতো, তাদের বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যেতো এবং ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতো।

যা হোক, মুসলমান আমীরগণ খৃস্টানদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে নিরাপদে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো। তার শাস্তি সেই মুসলমানরা ভোগ করে, যারা বাইতুল মুকাদ্দাসে বসবাস করছিলো। সে সময়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে যেসব মুসলিম পর্যটক অবস্থান করছিলেন, তারাও খৃস্টানদের পদতলে নিষ্পৃষ্ট হন। ১০৯৯ সালের ৭ জুন খৃস্টানরা এই মহান ও পবিত্র শহরটি অবরোধ করে। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের গবর্নর ছিলেন ইফতেখারুদ্দৌলা। তিনি পরম বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করেন। মুসলিম সৈন্যেরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে খৃস্টানদের উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু খৃস্টানদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো যেমন অগণিত, তেমনি সরঞ্জামও ছিলো প্রচুর। ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই খৃস্টান বাহিনী শহরে ঢুকে পড়ে।

সমগ্র ইউরোপ ও সকল খৃস্টান রাজ্যে এই বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করা হয়। কিন্তু সবচে' ভয়ংকর ও ভয়াবহ উৎসবটি পালিত হয় বিজিত বাইতুল মুকাদ্দাসে। খৃস্টান সৈন্যরা মুসলমানদের ঘরে ঘরে ঢুকে লুটপাট

করে। কোনো গৃহে কাউকে– সে অশীতিপর বৃদ্ধ হোক কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশু– জীবিত ছাড়েনি। জীবিত রাখে শুধু সুন্দরী যুবতী মেয়েদের, যারা পরে তাদের পাশবিকতার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলো। অলি-গলিতে পলায়নপর মুসলিম শিশু, নারী ও পুরুষদেরকে অমানুষিক পন্থায় হত্যা করেছে। অবুঝ শিশুদেরকে জীবন্ত বর্শার আগায় গেঁথে উর্ধ্বে তুলে ধরে উৎসবে মেতে ওঠেছে। প্রকাশ্যে নারীর সম্ভ্রমহানি এবং নিহতদের মাথা কেটে কেটে ফুটবল খেলেছিলো খৃস্টানরা।

অবশেষে মুসলমানরা একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করে। তারা নিশ্চিত ছিলো, অন্তত এখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে এবং যে কোনো ধর্মেরই অনুসারীরা এখানে তাদের উপর অত্যাচার করাকে পাপ মনে করবে। সে ছিলো মসজিদে আকসা। মুসলমানরা পরিবার-পরিজনসহ মসজিদে আকসায় চলে যায়। কিন্তু এখানে তারা পা রাখারও জায়গা পায়নি। তারা বাবে দাউদ ও অন্যান্য মসজেদ চলে যায়। স্বয়ং খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই উদ্বাস্তু মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ৭০ হাজার। খৃস্টানরা যে মসজিদে আকসাকে তাদের উপাসনালয় দাবি করতো, তার মর্যাদার একবিন্দু তোয়াক্কাও তারা করেনি। তারা আশ্রয় প্রার্থীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজনকেও জীবিত রাখেনি। মসজিদে আকসা, বাবে দাউদ এবং অন্য সকল মসজিদ লাশে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। রক্ত বেয়ে বেয়ে মসজিদের বাইরে গড়িয়ে পড়েছিলো। ঐতিহাসিকদের ভাষায়, খৃস্টানদের ঘোড়ার পা গোড়ালি পর্যন্ত মুসলিম নাগরিকদের রক্তে ডুবে গিয়েছিলো।

মেয়েদেরকে মসজিদে মসজিদে এবং মুসলমানদের অন্যান্য পবিত্র স্থানে নিয়ে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। সবচে' বেশি হতভাগ্য ছিলো এই মেয়েরা আর যুদ্ধবন্দিরা। বন্দিদের সঙ্গে পশুর ন্যায় আচরণ করা হয়েছে। তাদের আহার অল্প দেয়া হতো এবং কাজ বেশি নেয়া হতো। সেকালে যেসব কাজে উট-ঘোড়া ব্যবহার হতো, সেসব কাজে এই মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের ব্যবহার করা হয়। তাদের হাতে মসজিদগুলো গুড়িয়ে দেয়া হয়। যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এক হিংস্র খৃস্টান এক যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করে তার দেহের গোশত কেটে রান্না করে খায়। পরে সঙ্গীদের জানায়, গোশতগুলো খেতে বেশ স্বাদ লেগেছে। তারপর থেকে খৃস্টানরা মানুষ খেতে শুরু করে। যখন কোনো

উৎসব কিংবা অনুষ্ঠান হতো, তারা সুস্থ-সবল মুসলমানদের ধরে এনে যবাই করে তাদের গোশত রান্না করে খেতো।

খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ এসব ঘটনা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু স্বয়ং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণই খৃস্টানদের মানবখোরীর ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

মসজিদগুলোকে অবৈধ কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও খৃস্টানরা সেগুলোতে ঘোড়া বাঁধতো। মসজিদে আকসায় বিভিন্ন মুসলিম রাজা এবং সৌখিন পর্যটকগণ সোনা-চাঁদির ঝাড় ইত্যাদি স্থাপন করেছিলেন। উপহার হিসেবে প্রাপ্ত কয়েকটি সোনার বস্তু রাখা ছিলো। খৃস্টানরা সেসব সামগ্রী তুলে নিয়ে যায় এবং মসজিদের মিনারের উপর ক্রুশ স্থাপন করে দেয়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে বাইতুল মুকাদ্দাসের অবমাননা ও সেখানকার মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের এই কাহিনী তাঁর পিতা নাজমুদ্দীন আইউব শৈশব থেকেই শোনাতে শুরু করেছিলেন। নাজমুদ্দীন আইউব উপাখ্যানটা শুনেছেন তার পিতা শাদীর নিকট। এই কাহিনী সুলতান আইউবীর রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো। এক সময়ে তিনি শপথ করে ফেলেন, যে কোনো মূল্যে বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করে ছাড়বেন। আজ যখন তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে বের হলেন, তার দুই যুবক পুত্র আল-মালিকুল আফজাল ও আল-মালিকুয যাহিরও তাঁর বাহিনীতে রয়েছে। বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে যে কাহিনী তিনি স্বীয় পিতা থেকে শুনেছিলেন, সেসব নিজ পুত্রদেরও শুনিয়ে দেন, যেনো একটি মূল্যবান পৈতৃক সম্পত্তি বংশ পরম্পরায় হাত বদল হচ্ছে।

'লক্ষ্যহীন বেঁচে থাকার চেয়ে সময়ের আগে মরে যাওয়াই ভালো'– পুত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে ফৌজে অন্তর্ভুক্ত করার সময় সুলতান আইউবী বললেন– 'এই উক্তি তোমাদের মরহুম দাদার। আমি যখন আমার চাচা শেরেকোহর সঙ্গে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে রওনা হয়েছিলাম, তখন আব্বাজান আমাকে কথাটা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি কোনো একটি ভূখণ্ডের শাসক হবে। হতে পারে তুমি সুলতান হয়ে যাবে। স্মরণ রেখো বেটা! আজ থেকে তুমি আমার পুত্র নও– জাতির পুত্র। কুরআন মানুষকে পিতা-মাতার সেবা করার নির্দেশ দিয়েছে। এখন থেকে দেশের জনগণ ও সালতানাত

তোমার পিতা-মাতা। আল্লাহ্ সন্তানকে পিতার উপর শাসন করতে এবং তাদের কষ্ট দিতে বারণ করেছেন। সাবধান ইউসুফ! দেশের জনগণকে কষ্ট দেবে না। দেখবে তোমার উপর জাতির কী কী হক আছে। সেসব আদায় করতে সচেষ্ট হবে।'...

'আর আমার প্রিয় পুত্রগণ! তোমাদের দাদা বলেছেন, ঘাড় সেদিন উঁচু করবে, যেদিন মসজিদে আকসাকে কাফেরদের থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। আরামের ঘুম সেই রাত ঘুমাবে, যে রাতে মসজিদে আকসায় বিজয়ের নফল নামায আদায় করবে। আর আমাদের প্রিয় রাসূল যে মসজিদের আঙ্গিনা থেকে আল্লাহর দরবারে মি'রাজে গমন করেছিলেন, তাকে নিজ চোখের অশ্রু দ্বারা ধৌত করবে। আমার পুত্রগণ! যেসব শিশু বাইতুল মুকাদ্দাসের অলি-গলিতে ও মসজিদে মসজিদে খুন হয়েছিলো এবং জাতির যে মেয়েরা লাঞ্ছিত-নিগৃহীত হয়েছিলো, তারা আমাকে রাতে ঘুমাতে দেয় না। যে মসজিদে আমার প্রিয় রাসূলের পবিত্র পা পড়েছিলো, যে মসজিদে রাসূলে পাকের পবিত্র কপাল সেজাদবনত হয়েছিলো, তার ইটগুলো রাতভর আমার উপর পতিত হতে থাকে। আমি ব্যাথায় কুকিয়ে উঠি। মুখ থেকে এমন চীৎকার বেরিয়ে আসে, যেনো মসজিদে আকসায় খুন হওয়া শিশুরা কান্নার সুরে আযান দিচ্ছে। তারা তোমাদের ডাকছে আমার পুত্রগণ! তারা আমাকে ডাকছে।'...

'তোমাদের দাদা বার্ধক্যে কম্পমান হাত দুটো আমাকে দেখিয়ে বলতেন, আমি আমার যৌবন তোমাদের দিয়ে দিলাম। যে কাজ আমি করতে পারিনি, তা তোমরা সম্পন্ন করো। বাইতুল মুকাদ্দাস যাও। বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারই হয় যেনো তোমাদের জীবনের লক্ষ্য। ক্ষমতার মসনদে বসে যদি নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে জাতির উপর শাসন করার জন্য শত্রুকে উপেক্ষা করে চলো, তাহলে এই মসনদের আয়ু দীর্ঘ হবে না। শহীদদের আত্মা জিনের রূপ ধারণ করে তোমার ক্ষমতার মসনদ উল্টে দেবে। আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিই যেনো তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়।'...

'আমার প্রিয় পুত্রগণ! আজ আমি আমার পিতার উত্তরাধিকার তোমাদের হাতে অর্পণ করছি। আজ থেকে তোমরা আমার নও— মিল্লাতে ইসলামিয়ার সন্তান। আমি তোমাদের মাকে বলে দিয়েছি, তোমার কোলে কোনো সন্তান জন্মলাভ করেছিলো, সে কথা ভুলে যাও। যদি না পারো,

তাহলে অন্তত তাদের বেঁচে থাকার দু'আ করো না। আমি তাদেরকে সেই জায়গায় জবাই করতে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে আল্লাহর পথে কুরবান করতে গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন। দু'আ যদি করতেই হয়, আল্লাহর সমীপে ফরিয়াদ জানাবে, এই সন্তানদের তুমি যে দুধপান করিয়েছো, তা যেনো নূরান্বিত রক্তে পরিণত হয়ে মসজিদে আকসার মেঝে ধৌত করে দেয়। আর আল্লাহ করুন, যেনো এমনই হয়। শপথ করো আমার পুত্রগণ! আমি যদি বেঁচে না থাকি, তাহলে তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করবে।'...

সুলতান আইউবী তাঁর পুত্রদ্বয়কে ১০৯৯ সালের রক্তাক্ত কাহিনী শোনান। শেষে যখন তিনি তাদের চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন, তখন তারা সুলতানকে সে নিয়মে সালাম করেনি, যেভাবে পুত্ররা পিতাকে সালাম করে থাকে। তারা উঠে দাঁড়ায়। আল-আফজল বললো— 'মহান সুলতান! শুধু শহীদ হওয়া কোনো কৃতিত্ব নয়। আমরা শহীদ হওয়ার আগে বাইতুল মুকাদ্দাসের অলি-গলিতে দুশমনের এতো রক্ত প্রবাহিত করবো যে, আপনার ঘোড়ার পা পিছলে যাবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো, আপনি মসজিদে আকসা থেকে ক্রুশটা নিজ হাতে খুলে ক্রুসেডারদের নাপাক রক্তের মাঝে ছুঁড়ে ফেলছেন।'

'আর সেই রক্ত নিরস্ত্র নাগরিকদের না হওয়া চাই আল-আফজাল!' সুলতান আইউবী বললেন।

'এই রক্ত বর্মপরিহিত ক্রুসেডারদের হবে'— আল-আফজল বললো— 'এই রক্ত সেই লোহা থেকে ঝরবে, যদ্বারা ক্রুসেডাররা তাদের দেহকে আবৃত করে রাখে। ঈমানের তরবারী মিথ্যার ইস্পাতকেও কেটে ফেলার ক্ষমতা রাখে।'

'আল্লাহ তোমার মুখ রক্ষা করুন।' সুলতান আইউবী বললেন।

পুত্রগণ সামরিক কায়দায় পিতাকে সালাম করে বেরিয়ে যায়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এখন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে চল্লিশ মাইল দূরে রোম উপসাগরের তীরে আসকালানে সেই ব্যাঘ্রের ন্যায় ওঁৎ পেতে বসে আছেন, যে আপন শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। আবেগের দিক থেকে তিনি এক্ষুনি বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রা করতে প্রস্তুত আছেন বটে; কিন্তু আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে তিনি

যুদ্ধের বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। এই চল্লিশ মাইলের দূরত্বটা যেনো আগুন-গরম পাথরে পরিপূর্ণ। এ হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। শুধু নগরীটাই প্রাচীরঘেরা নয়– নগরীর চারদিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত অঞ্চলেও ছোট ছোট দুর্গ ও খৃস্টান বাহিনীর অসংখ্য চৌকি বিদ্যমান। টহল প্রহরার ব্যবস্থাও বাদ নেই। বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে অশ্বারোহী সেনারা দলে দলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আগের তুলনায় বেশি শক্ত করা হয়েছে। বাইতুল মুকাদ্দাসের ভেতরে যে ফৌজ আছে, তার সেনাপতিরা সুলতান আইউবীর প্রতিটি গতিবিধি সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তাদের এতোটুকু হিম্মত নেই যে, তারা সুলতান আইউবীকে আসকালানে প্রতিহত করবে কিংবা তাঁর উপর জবাবী আক্রমণ চালাবে। হিত্তীন থেকে আসকালান পর্যন্ত সুলতান আইউবী তাদের সামরিক শক্তির অনেক রক্ত চুষে নিয়েছেন।

বাইতুল মুকাদ্দাসের সম্রাট গাই অফ লুজিনান– যিনি হিত্তীনের যুদ্ধে বন্দি হয়েছেন এবং এখন দামেশ্‌কের কারাগারে আটক রয়েছেন যে বাহিনীটি সঙ্গে নিয়েছিলেন, তার কিছু অংশ মারা গেছে। কিছু বন্দিত্ববরণ করেছে। অবশিষ্টরা এমনভাবে পলায়ন করেছে যে, এখন তার অফিসার, সৈনিক ও বর্মপরিহিত নাইটরা আহত কিংবা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। নাইটদের মনোবলে কিছুটা প্রাণ আছে। কারণ, পদমর্যাদার লাজ তো রাখতে হবে। অন্যান্য সৈন্যরা শহরে ঢুকে ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছে। সেনাপতিগণ নাইটদেরকে নতুন করে সংগঠিত করে নিয়েছে। এখন বাইতুল মুকাদ্দাসের ভেতরের সেনাসংখ্যা ষাট হাজারে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু নাগরিক সাধারণ জেনে ফেলেছে, সালাহুদ্দীন আইউবী নগরী জয় করতে আসছেন, তাই তারাও যুদ্ধ লড়া ও মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। নগরীর প্রতিরক্ষাকে আরো বেশি শক্ত করা হয়েছে।

নগরীর এক-দু'টি ফটক দিনের বেলা খোলা রাখতে হচ্ছে। কেননা, রণাঙ্গন থেকে পলাতক খৃস্টান সেনারা একজন-দু'জন-চারজন করে এসে নগরীতে প্রবেশ করছে। সুলতান আইউবীর গোয়েন্দারা আগে থেকেই নগরীতে উপস্থিত। এবার পলায়নপর খৃস্টানদের বেশে আরো কিছু গুপ্তচর এসে নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও প্রাচীর ভালোভাবে দেখে বেরিয়েও গেছে। মুসলমানদের উপর কড়াকড়ির মাত্রা আগের চেয়ে বেশি কঠোর করে দেয়া হয়েছে।

বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে দশ-বারো মাইল দূরে আসকালানের দিকে খৃস্টানদের একটি চৌকি ছিলো। তাতে প্রায় একশ' খৃস্টান সৈন্য অবস্থান করতো। তারা তাঁবু স্থাপন করে রেখেছিলো। ১১৮৭ সালের সেপ্টেম্বরের এক রাতে তাদের সেই চৌকির সন্নিকটে একটি বিস্ফোরণের মতো ঘটনা ঘটে। পরে অনুরূপ আরো দু'তিনটি বিস্ফোরণ ঘটে। পরক্ষণেই আগুন জ্বলে ওঠে এবং তিন-চারটি তাঁবু জ্বলতে শুরু করে। সৈনিকরা জাগ্রত হয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে যায়। যেইমাত্র সৈন্যদের মাঝে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়, অমনি তাদের উপর চতুর্দিক থেকে তীর আসতে শুরু করে। জ্বলন্ত তাঁবুগুলোর আলোতে এই তীরবৃষ্টি চোখে পড়তে শুরু করে। এ ছিলো দাহ্য পদার্থের সেসব পাতিলের কৃতিত্ব, যেগুলো সুলতান আইউবীর একটি কমান্ডো দল মিনজানিকের সাহায্যে নিক্ষেপ করেছিলো। পাতিলগুলো চৌকিগুলোতে এসে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিস্ফোরিত হওয়ার পর পর সেখানে সলিতাওয়ালা অগ্নিতীর ছোঁড়া হয়। এই তীর এসে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাহ্য পদার্থে আগুন ধরে যায়।

খৃস্টানরা এদিক-ওদিক পালিয়ে যাওয়ার পর টের পায়, তারা শত্রুবাহিনীর ঘেরাওয়ে পড়ে গেছে এবং এই ঘেরাও থেকে জীবিত বের হওয়া সম্ভব নয়। কমান্ডোরা হুংকার ছাড়তে শুরু করে– 'যদি জীবনে রক্ষা পেতে চাও, তাহলে অস্ত্র ত্যাগ করে একদিকে সরে দাঁড়িয়ে যাও।' আগুনের ধ্বংসলীলার পর সুলতান আইউবীর কমান্ডোদের এই হুংকার ক্রুসেডারদের অবশিষ্ট দমটুকুও নিঃশেষ করে দেয়। তারা অস্ত্র ত্যাগ করে কমান্ডোদের হাতে আত্মসমর্পণ করে। এখন তাদের সংখ্যা পঁচিশ থেকে ত্রিশজন। তাদের ঘোড়া ও অস্ত্র ইত্যাদি দখল করে পেছনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ভোর নাগাদ ভস্মিভূত চৌকিটিতে সুলতান আইউবীর সম্মুখ বাহিনীর একটি ইউনিট পৌঁছে যায়। এতে বাহিনীর অগ্রযাত্রা বেশ দূর অঞ্চল পর্যন্ত নিরাপদ হয়ে যায়। গেরিলাদের অবস্থা বনের হায়েনাদের ন্যায় হয়ে যায়। দু'জন দু'জন করে জানবাজ ঝোঁপ-ঝাড়, পাথরখণ্ড ও টিলার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে। যেখানেই টহল অশ্বারোহী কিংবা পদাতিক সৈন্যদের শব্দ কানে আসছে, তারা চুপসে যাচ্ছে এবং যখনই খৃস্টানরা নিকটে এসে পৌঁছছে, অমনি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। দু'জন লোক যদি ছয় ব্যক্তির উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে

দু'জনের পরিণতি কী হয় সহজেই বোঝা যায়। কাজেই এই অভিযানে কমান্ডোরা শহীদ এবং জখমীও হয়ে চলছে।

এ ছিলো তাদের এক স্বতন্ত্র যুদ্ধ। তাদের কোনো কমান্ডার নেই। এদিক-ওদিক কোথাও লুকিয়ে বসে থাকলে তাদের জিজ্ঞেস করার কেউ ছিলো না। কিন্তু দৈহিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের যে আত্মিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিলো, তা তাদেরকে আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত করে রেখেছিলো। হিত্তীনের জয়ের পর সুলতান আইউবী যে বড় শহরটি জয় করেছিলেন, সেখানকার মুসলমানদের করুণ অবস্থা ফৌজকে দেখানো হয়েছিলো। তাদেরকে মসজিদের অবমাননা ও ধ্বংসলীলা দেখানো হয়েছিলো। তাদের বলা হয়েছে, এই যুদ্ধ কোনো রাজার রাজত্বের নিরাপত্তা বা পুনরুদ্ধারের জন্য লড়া হচ্ছে না, বরং এই যুদ্ধ লড়া হচ্ছে ইসলামের সুরক্ষা ও এই মহান ধর্মের দুশমনের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে। প্রশিক্ষণের পর এই যুদ্ধ তাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে।

আসকালানে সুলতান আইউবী রাতে ঘুমাবার তেমন সময় পাচ্ছেন না। গেরিলাদের পক্ষ থেকে দূতরা যাওয়া-আসা করছে ও সংবাদ আদান-প্রদান করছে। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকেও দূতরা আসছে-যাচ্ছে। এরা রাতেও আসছে। সুলতান আইউবী নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, কোথাও থেকে কোনো সংবাদ আসলে যখনই আসুক তৎক্ষণাৎ যেনো তাঁকে অবহিত করা হয়। যদিও তিনি গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকেন। গেরিলারা রিপোর্ট নিয়ে আসছে, অমুক স্থানে খৃস্টানদের একটি চৌকির উপর আক্রমণ হয়েছে, এতোজন খৃস্টান সেনা মারা গেছে, এতোজন গেরিলা শহীদ ও এতোজন আহত হয়েছে। অমুক রাস্তাটি নিরাপদ করে ফেলা হয়েছে ইত্যাদি। সে মোতাবেক সুলতান আইউবী নকশায় অগ্রযাত্রার পথের চিহ্নে রদবদল করে নিচ্ছেন।

সুলতান আইউবী সালার ও নায়েব সালারদের সর্বশেষ বৈঠকের আয়োজন করেন। তাতে নৌ-বাহিনীর ক্যাপ্টেন আল-ফারেসকেও তলব করা হয়। দূত যখন আল-ফারেসের নিকট পৌঁছে, তখন তার জাহাজ আসকালান থেকে বিশ মাইল দূর খোলা সমুদ্রে অবস্থান করছিলো। ডিঙি সে পর্যন্ত পৌঁছুতে আধা দিন সময় লেগে যায়। আল-ফারেস সেই ডিঙিতে

করে রাতেই আসকালান পৌঁছে যান। দূত তাকে বলেছিলো, সুলতান সকল সালারকে তলব করেছেন। তাতেই তিনি বুঝে ফেলেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ সম্পর্কে বৈঠক হবে। দূতের সঙ্গে জাহাজ থেকে রওনার সময় মেয়ে দুটোকে বললেন– 'আমি আসকালান যাচ্ছি।'

'সুলতান ডেকেছেন?' এক মেয়ে জিজ্ঞেস করে।

'কেনো ডেকেছেন?' অপরজন জানতে চায়।

'আমার রাষ্ট্রীয় কাজে তোমরা এতো মাথা ঘামাচ্ছো কেনো?'– আল-ফারেস বিরক্তি প্রকাশ করেন– 'তোমাদের কয়েকবার বলেছি, আমার ব্যক্তিগত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করো না।'

দু'জনেই হেসে ওঠে। একজন বললো– 'যোগ্যতা থাকলে আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ করতাম এবং দুশমনরা আক্রমণ করলে মোকাবেলা করতাম।'

'তোমরা যার যোগ্য, আমি তোমাদের থেকে সে কাজই নেবো'– আল-ফারেস বললেন– 'আমার অবর্তমানে বেশিরভাগ সময় নীচে কাটাবে। উপরে গিয়ে মাল্লা ও সৈনিদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।'

'আপনি কবে ফিরবেন?'

'আজ রাতে বোধ হয় আসতে পারবো না'– আল-ফারেস উত্তর দেন– 'কাল সন্ধ্যা নাগাদ এসে পড়বো।'

আল-ফারেস মেয়ে দু'টির মাঝে পুরোপুরি একাকার হয়ে গেছেন। মেয়েরা তাকে সুলতান আইউবীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতো। জানতে চাইতো, রোম উপসাগরে মিসর ও সিরিয়ার নৌ-বহর বন্দরে আছে, নাকি সমুদ্রে। মোট জাহাজ কয়টি। এগুলোতে কতোজন সৈন্য আছে। আল-ফারেস তাদের পরিষ্কার বলে দিতেন, আমাকে এসব ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করবে না। তথাপি তারা নিজেদের রূপ-লাবণ্য ও ভাবভঙ্গির যাদু প্রয়োগ করে তার নিকট এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করে বসতো, যা একটি বাহিনীর গোপন সামরিক বিষয়। আল-ফারেস আবেগময় অবস্থা থেকে সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে যেতেন এবং তাদেরকে প্রীতির সাথে শাসিয়ে দিতেন।

নেশার অবস্থায় মানুষ হৃদয়ে লুকায়িত গোপন তথ্য উগরে দিয়ে থাকে। চাই নেশাটা মদের হোক কিংবা অন্য কোন ওষুধের। কিন্তু আল-ফারেস মদপান করতেন না। না জাহাজে মদ কিংবা অন্য কোনো

নেশাকর দ্রব্য রাখার অনুমতি ছিলো। তিনি চরিত্রহীন মানুষও নন। কিন্তু এখন দু'টি মেয়ের নেশা তাকে জেঁকে ধরেছে, যাদের সাহায্যে তার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং তিনি চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। এই মেয়ে দুটো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা দেখলো, আল-ফারেসের মধ্যে না মদের অভ্যাস আছে, না তার চরিত্রে কোনো কলুষতা আছে। তারা তার উপর প্রেম-ভালোবাসার নেশা জাগিয়ে তুলতে শুরু করে। কিন্তু আল-ফারেস নিজ কর্তব্যে এতোই পরিপক্ক যে, আবেগের উপর মাদকতা ছেয়ে গেলেও তিনি কর্তব্যে একবিন্দু ত্রুটি করছেন না।

এক রাত। আল-ফারেস গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। মেয়ে দুটো কেবিন থেকে বেরিয়ে উপরে চলে যায় এবং ছাদের রেলিং ধরে জোৎস্না রাতের হিমেল হাওয়া উপভোগ করতে শুরু করে।

'রোজি!'– এক মেয়ে অপরজনকে বললো– 'আমি সামনে অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি। আল-ফারেস দেখতে মোম। কিন্তু এটা-ওটা জিজ্ঞেস করলে পাথর হয়ে যান। আমার মনে হচ্ছে, এখানে আমরা কোনো কাজ করতে পারবো না। এন্ড্রু আসলে বলবো, সম্ভব হলে তুমি আমাদেরকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে যাও। কী বলো, ভালো হবে না?'

ক্ষুদ্র ডিঙিতে করে জাহাজের নিকট এসে জাহাজের মাল্লা ও সৈনিকদের নিকট এটা-ওটা বিক্রি করতো যে বৃদ্ধ, আসলে মেয়ে দুটো যাকে জাহাজে তুলে নিয়ে কেনা-কাটার ভান ধরে কথা বলতো, এন্ড্রু সেই ব্যক্তি। লোকটার সঙ্গে মেয়ে দুটোর ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। লোকটি গরীব হকারের বেশে নিজের ডিঙিতে করে আল-ফারেসের জাহাজের নিকট পণ্য বিক্রয় করতে এসেছিলো। সে মেয়ে দুটোকে এবং মেয়ে দুটো তাকে চিনে ফেলে। মেয়েরা পণ্য ক্রয়ের কথা বলে তাকে জাহাজে তুলে নিয়েছিলো। সে মেয়েদের বলেছিলো, তারা আল-ফারেসের এই ছয়টি জাহাজের সঙ্গে ছায়ার ন্যায় লেগে আছে এবং সুযোগ পেলেই জাহাজগুলোকে ধ্বংস করে দেবে। মেয়েরা তাকে বলেছিলো, আশ্রয়ের বাহানায় আমরা তোমাদের জন্য গোয়েন্দাগিরি করবো।

এন্ড্রু একজন নাশকতাকারী গোয়েন্দা। প্রথম সাক্ষাতের পর সে দু'বার আপন বেশে এসেছিলো এবং মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলো। মেয়েরা তাকে জানায়, আল-ফারেস তাদের জালে আসছেন না এবং কোনো

তথ্যও দিচ্ছেন না। এন্ড্রুর জানবার প্রয়োজন ছিলো, জাহাজগুলো কতোদিন এই ডিউটিতে থাকবে এবং টায়েরের দিকে যাবে কিনা? সে মেয়েদের বললো, মনে হচ্ছে তোমরা বিদ্যা ভুলে গেছো। এই জাহাজে তো আল-ফারেস একজনই লোক নয়। তার নায়েবও তো আছে এবং তার নীচে আরো একজন অফিসারও আছে। তোমরা তাদের একজনকে হাত করে নাও। তাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দাও। আল-ফারেসের নায়েবকে তার শত্রু বানিয়ে দাও। যাদু প্রয়োগ করো। কী করতে হবে জানো না? সবই তো জানো।'

সে রাতে এক মেয়ে অপরজনকে হতাশা ব্যক্ত করে বললো, রোজি! এন্ড্রু আসলে বলবো, আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও।

'শোন ফ্লোরি!'– রোজি উত্তর দেয়– 'এন্ড্রু এখান থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না। এটি যুদ্ধজাহাজ। দেখছো না, রাতে ছাদের উপর বরং আরো উপরে মাস্তুলে মাচান পেতে এক সৈনিক দাঁড়িয়ে থাকে। পালাবার চেষ্টা করলে আমাদের সঙ্গে এন্ড্রুরও ধরা পড়ার আশঙ্কা আছে। আমাদেরকে এতো তাড়াতাড়ি নিরাশ হওয়া ঠিক হবে না।'

'তাহলে কি অন্য কোনো অস্ত্র ব্যবহার করবে?' ফ্লোরি জিজ্ঞেস করে।

'করতে হবে'– রোজি বললো– 'আল-ফারেসের নায়েব তো পূর্ব থেকেই আমাদেরকে কামনার চোখে দেখছে এবং মুচকি হাসছে। এই লোকগুলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সমুদ্রে অতিবাহিত করছে। মৃত্যু সব সময় এদের মাথার উপর অপেক্ষমান থাকে। খোদা পুরুষের মধ্যে নারীর যে দুর্বলতা সৃষ্টি করেছেন, তা এমনি পরিস্থিতিতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইঙ্গিত করতে দেরি, সাড়া আসতে দেরি হয় না। বলো, কাজটা আমি করবো, নাকি তুমি? আমার তুলনায় অবশ্য তোমার অভিজ্ঞতা ভালো।'

'আচ্ছা আমিই করি।' ফ্লোরি বললো।

'কিন্তু এ কাজের নিয়ম-নীতি মনে রাখতে হবে'– রোজি বললো– 'তথ্য নেবে; তবে তার মূল্যটা শুধু দেখাবে– পরিশোধ করবে না। লোকটার মধ্যে এমন পিপাসা সৃষ্টি করবে, যেনো সে আল-ফারেসকে হত্যা করার ভাবনা ভাবতে বাধ্য হয়।'

আল-ফারেসের নায়েবের নাম রউফ কুর্দি। আগে থেকেই লোকটি মেয়েগুলোর প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে আসছে। এদের প্রতি তাকাতো আর মিটি মিটি হাসতো। তার জানা ছিলো, এরা আল-ফারেসের স্ত্রী

কিংবা গণিকা নয়– আশ্রিতা যাযাবর। আল-ফারেস এদেরকে নিজ জাহাজে আশ্রয়দান করেছেন। মেয়ে দুটো রউফ কুর্দির হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে দিয়েছিলো। সে রাতে যখন তারা ছাদে রেলিং ধরে কথা বলছিলো, রউফ কুর্দি দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিলো। আল-ফারেস তো সুলতান আইউবীর বৈঠকে যোগ দিতে চলে গেছেন। জাহাজের কর্তৃত্ব এখন রউফ কুর্দির হাতে।

ফ্লোরি ছাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রোজি পায়চারি করার ভান ধরে সেখান থেকে সরে যায় এবং রউফ কুর্দির পাশ দিয়ে যেতে যেতে মুচকি একটা হাসি দেয়। রউফ কুর্দি 'শোন' বলে তাকে কাছে ডেকে নেয় এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে শুরু করে। দু'চারটি কথার উত্তর দিয়ে রোজি চলে যেতে উদ্যত হলে রউফ কুর্দি তাকে বসতে বলে।

'আমি আপনার কাছে বসে থাকলে ও (ফ্লোরি) ক্ষেপে যাবে।' রোজি বললো।

'কেনো?' রউফ কুর্দি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'এ যার যার মনের ব্যাপার'– রোজি বললো– 'আল-ফারেস একদিন নীচে ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি উপরে এসে আপনার কাছে দাঁড়ালাম। ও দেখে ফেলে। পরে আমাকে বললো, আমার মালিকানায় ভাগ বসাতে চেষ্টা করো না। রউফ আমার। মিসর গিয়ে আমি তার সঙ্গে চলে যাবো। ও আবার আল-ফারেসকে পছন্দ করে না। কিন্তু পাছে আল-ফারেস অসন্তুষ্ট হন কিনা সে ভয়ে আপনার কাছে ঘেঁষে না।'

রউফ কুর্দির আবেগের সমুদ্রে জোয়ার এসে যায়। পুরুষিত স্বভাবের দুর্বলতা তাকে কাবু করে ফেলে। ফ্লোরি-রোজি অপেক্ষা বেশি রূপসী মেয়েও রউফ দেখেছে। কিন্তু এদের রূপ ও অঙ্গভঙ্গিতে যে আকর্ষণ রয়েছে, তা অন্যদের মধ্যে দেখেনি। এখন যখন জানতে পারলো, এদের একজন তাকে কামনা করছে, তখন তার মস্তিষ্ক আবেগের উপর সেই পথে চলতে শুরু করে দিয়েছে, যে পথে একজন পুরুষের যাওয়া দেখা যায়; কিন্তু ফিরে আসা দেখা যায় না। রোজি তাকে আত্মহারা এক ঘোরের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যায়। কেবিনে অবতরণের জন্য সিঁড়িতে পা রেখে সে পেছন পানে তাকায়। দেখে, রউফ কুর্দি ধীরে ধীরে ফ্লোরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'আজ রাত ঘুমাবে না জুয়াশি!' ফ্লোরি আল-ফারেসকে নিজের যে নাম বলেছিলো, রউফ কুর্দি কাছে গিয়ে তাকে সেই নামে ডাকে।

রোজি নিজের নাম বলেছিলো আজমির। যাযাবরদের নাম এমন অদ্ভুতই হয়ে থাকে।

রউফ কুর্দিকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখে ফ্লোরি প্রশিক্ষণ অনুযায়ী এমন ধারায় লজ্জা প্রকাশ করে, যেমনটি নববধূও করে না। রউফ কুর্দি মেয়েটির কাঁধে হাত রাখলে সে সলাজ নতমুখে একদিকে সরে যায়।

'আজমির আমাকে তোমার সম্পর্কে কিছু কথা বলেছে'– রউফ কুর্দি বললো– 'এসব কি সত্য?'

ফ্লোরি রউফের প্রতি একবার মুখ তুলে তাকিয়েই অমনি ঘাড় ঘুরিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখতে থাকে। রউফ কুর্দি প্রশ্নটা পুনর্ব্যক্ত করে ফ্লোরি যে হাতে রেলিং ধরেছিলো, সে হাতের উপর নিজের একটা হাত রাখে। ফ্লোরি ধীরে ধীরে নিজের হাত উল্টো করে আঙুলগুলো রউফ কুর্দির আঙুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।

অল্পক্ষণ পর। ফ্লোরি এখন রউফ কুর্দির সঙ্গে তার ডিউটির স্থলে উপবিষ্ট। জাহাজ নোঙ্গরকরা। গোটা চারেক বাতি সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। এগুলো আল-ফারেসের জাহাজ, সমুদ্রে টহল দিয়ে ফিরছে।

মধ্যরাতে রউফ কুর্দির স্থলে তার এক অধীন অফিসার ডিউটিতে আসবার কথা। রউফ কুর্দি ফ্লোরিকে বললো, তুমি আমার কেবিনে চলে যাও, আমি আসছি।

ফ্লোরি চলে যায়।

জাহাজের ছাদ থেকে ফজরের আযান ভেসে আসলে ফ্লোরি রউফ কুর্দির কেবিন থেকে বের হয়। মেয়েটি আল-ফারেসের নায়েবকে নিশ্চিত করে, তাকে সে মনে-প্রাণে কামনা করছে এবং কোনো দিনই আল-ফারেসকে স্বামী হিসেবে বরণ করবে না। সে রউফ কুর্দিকে জানালো, আল-ফারেস আমাকে বলেছিলেন, তুমি রউফের সঙ্গে কথা বলবে না। লোকটা বড্ড খারাপ মানুষ। আসলে তিনি নিজেই বদমাশ। আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন বটে; কিন্তু আমাদের অসহায়ত্ব থেকে পুরোপুরিই সুযোগ নিচ্ছেন। আমরা যদি অসহায়-নিরাশ্রয় না হতাম, তাহলে এতো বেশি মূল্য কখনো দিতাম না।'

রউফ কুর্দির অন্তরে নিজের ভালোবাসার প্রতারণা ও আল-ফারেসের প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি করে ফ্লোরি তার কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়। আল-ফারেস যে তথ্য কখনো তাদের দেননি, রউফ তার সব উগরে দেয়।

সুলতান আইউবীর চোখে ঘুম নেই। গোটা রাত বৈঠকে কেটেছে। তিনি এমন কোনো ঝুঁকি মাথায় নিতে চাচ্ছেন না, যার ফলে বাইতুল মুকাদ্দাসের অবরোধ ব্যর্থ হতে পারে। তিনি মানচিত্রে সালার ও অন্যান্যদের বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা দেখিয়ে দেন। যেসব স্থানে এই ক'দিন খৃস্টানদের চৌকি ছিলো আর এখন সেখানে তাঁর গেরিলা কিংবা সম্মুখ বাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল অবস্থান করছে কিংবা ওখানে কিছুই ছিলো না, সেসব জায়গার উপর চিহ্ন দিয়ে রাখেন। এমন স্থানগুলোও চিহ্নিত করে রাখেন, যেখানে এখনো ক্রুসেডারদের চৌকি বহাল আছে এবং তাতে অনেক সৈন্য বিদ্যমান রয়েছে। সুলতান সকলকে অবহিত করেন, তিনি এসব চৌকি দখল করার চেষ্টা-ই করেননি। কারণ, তিনি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত নিজের সামরিক শক্তি নষ্ট করতে চাচ্ছেন না। এই চৌকিগুলো সব উঁচুতে অবস্থিত। তাই এগুলো এড়িয়ে সামান্য দূর দিয়ে পথ অতিক্রম করার কৌশল অবলম্বন করেছেন তিনি। সেগুলোতে যে সৈন্য আছে, তারা বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের পথরোধ করার সাহস করবে না।'

'কিন্তু দূর থেকে আমাদেরকে দেখে তাদের দূত বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়ে সংবাদ পৌঁছাবে'— এক সালার বললেন— 'ফলে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে অসতর্ক অবস্থায় ঝাপটে ধরতে ব্যর্থ হবো।'

'অসতর্ক অবস্থায় ঝাপটে ধরার আশা মন থেকে ফেলে দাও'— সুলতান আইউবী বললেন— 'ক্রুসেডাররা ভালোভাবেই জানে, আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস যাচ্ছি। তাদের গতিবিধি প্রমাণ করছে, তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে আমাদের মোকাবেলায় আসবে না। একে তো নগরীতে এমন বাহিনী আছে, যারা কখনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তাদেরকে নগরীর নিরাপত্তার জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছে। সেখান থেকে গুপ্তচর রিপোর্ট নিয়ে এসেছে, এই বাহিনী দিনরাত অবরোধে লড়াই করার ও অবরোধ ভাঙার মহড়া দিচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা যেসব অঞ্চল জয় করেছি, সেখানকার পালিয়ে যাওয়া সৈন্যরাও বাইতুল মুকাদ্দাস চলে গেছে। তাদের মধ্যে বর্মপরিহিত নাইটও আছে। আমাদের গোয়েন্দারা জানিয়েছে, অবরোধ চলাকালে এই নাইটরা ফটকের বাইরে এসে আক্রমণ করবে এবং প্রতিটি আক্রমণের পর নগরীতে ঢুকে পড়বে। এই পদ্ধতি তারা আমাদের থেকে শিখেছে। আঘাত হানো আর অদৃশ্য হয়ে

যাও। কাজেই দুশমনকে অসতর্ক অবস্থায় ঝাপটে ধরার আশা বাদ দাও। দুশমন তোমাদের অপেক্ষায় প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। তারপরও খৃস্টানদের কোনো চৌকি থেকে কোনো দূত যেনো বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছতে না পারে, আমি সেই ব্যবস্থা করে রেখেছি। বাইতুল মুকাদ্দাস ও তাদের চৌকিগুলোর মাঝে আমাদের গেরিলাদের বসিয়ে রেখেছি। তারা কাউকে জীবিত যেতে দেবে না।'

'তাদের সেনাসংখ্যা সম্পর্কে গোয়েন্দারা বিভিন্ন তথ্য বলেছে। সে থেকে আমি অনুমান করেছি, বাইতুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে খৃস্টানদের নিয়মতান্ত্রিক সেনাসংখ্যা ষাট হাজারেরও কিছু বেশি হতে পারে। আমাদেরকে এ কথাটাও মাথায় রাখতে হবে যে, ওখানে মুসলমানরা কয়েদ ও নজরবন্দি অবস্থায় আছে। ফলে ভেতর থেকে তারা আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে না। বিপরীতে খৃস্টান জনসাধারণ তাদের বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। খৃস্টানরা তাদের কিশোরদেরকেও তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছে। নগরীর প্রাচীরের উপর থেকে আমাদের উপর তীর সঠিক অর্থেই মুষলধারার বৃষ্টির ন্যায় আসবে। তীর ছোঁড়ার জন্য খৃস্টানরা নতুন ধরনের একটি ধনুক নিয়ে এসেছে, যেটি দেখতে ক্রুশের ন্যায়। তা দ্বারা ছোঁড়া তীর বেশ দূরেও যায় এবং নিশানাও অব্যর্থ হয়।'

সুলতান আইউবী নকশা ধরে ধরে উপস্থিত সকলকে প্রতিটি স্থান ও রাস্তা ইত্যাদি দেখিয়ে দেন। পরে অবরোধ সম্পর্কে জরুরি দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বললেন, এটি শেষ বৈঠক। কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকলে দূর করে ফেলো। কোনো প্রশ্ন থাকলে তা যতো অর্থহীন হোক না কেনো জিজ্ঞেস করে উত্তর জেনে নাও। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ– যিনি সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধাভিযানে সুলতান আইউবীর সঙ্গে ছিলেন– তাঁর রোজনামচায় 'সুলতান ইউসুফের উপর কী বিভীষিকা নেমে এসেছিলো' শিরোনামে লিখেছেন– 'সুলতান আইউবী (উক্ত শেষ বৈঠকে) রাসূলে আকরাম (সা.)-এর একটি হাদীস শোনান– 'যার জন্য সফলতার দরজা খুলে যায়, তাতে তার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে যাওয়া উচিত। বলা যায় না, এই দরজা কখন বন্ধ হয়ে যায়।' সুলতান আইউবী দ্রুত অধিকৃত অঞ্চল ও দুর্গ জয় করতে আসছিলেন। তাই তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণে বিলম্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন- 'আল্লাহ আমাদের সফলতার দরজা

খুলে দিয়েছেন। বন্ধ হওয়ার আগেই তাতে ঢুকে পড়ো।'...

'আমার বন্ধুগণ!'– সুলতান আইউবী নকশাটা একধারে সরিয়ে রাখতে রাখতে বললেন– 'হিত্তীন যুদ্ধের আগে আমি তোমাদেরকে কয়েকটি কথা বলেছিলাম। সে কথাগুলোই আবার বলছি। এরপর আর কথা বলার সুযোগ পাবো না। পরস্পর জীবিত সাক্ষাৎ হবে কিনা, তাও বলতে পারি না। ইতিপূর্বে আমরা শুধু যুদ্ধ লড়েছি। গৃহযুদ্ধে একে অপরের রক্ত ঝরিয়েছি আর শত্রুকে আমাদের অঞ্চলে দুর্গ সুসংহত করতে ও বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষা শক্ত করতে সময় ও সুযোগ দিয়েছি। তারপর আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড লড়াই লড়তে থাকি। খৃস্টানরা আপন রূপসী কন্যাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের আমীর-উজির ও সামরিক-বেসামরিক অফিসারদের নিকট প্রেরণ করতে থাকে। তারা আমাদের সারিতে বিশ্বাসঘাতক ও কুচক্রী ঢুকিয়ে দেয়। এই নারী আর গাদ্দাররা যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, সেসব তোমাদের কারুরই অজানা নয়। আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস এবং তাদের বিভাগ বড় দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সঙ্গে সেই অদৃশ্য অঙ্গনে দুশমনের মোকাবেলা করেছে। বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে আমার হাতে আমার অভিজ্ঞ অনেক কর্মকর্তা ও সালার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। একের পর এক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে আর আমরা সেগুলো দমন করি।'...

'দুশমনের উদ্দেশ্য কী ছিলো? আমাদের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করা, ধর্ম ও ঈমানকে দুর্বল করা এবং আমাদের নতুন প্রজন্মকে মানসিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা। আমাদের মাঝে দুশমন গাদ্দার তৈরি করেছে। তাদের লক্ষ্য ছিলো, প্রথম কেবলার দখল অটুট রেখে আমাদের ঈমান-বিক্রেতা ভাইদের সাহায্যে পবিত্র মক্কাও দখল করে নেবে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, পাঁচটি বছর আমি দক্ষিণাঞ্চলে দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে ছিলাম। রেজিনাল্ড (প্রিন্স অর্নাত) পবিত্র মদীনার সামান্য দূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। আমার ভাই আল-মালিকুল আদিল ও নৌবাহিনী প্রধান হুসামুদ্দীনের কৃতিত্ব যে, তারা সময়মতো তৎপর হয়ে ওঠে এবং ঐ খৃস্টানটাকে পেছনে হটিয়ে দেয়। আমি লোকটাকে নিজ হাতে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছি।'...

'দুশমনের টার্গেট আমাদের উৎসগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে সেগুলোকে খৃস্টানদের উৎসে পরিণত করা। আমাদের লক্ষ্য দুশমনের এই টার্গেটকে

বানচাল করা। যুদ্ধের এদিকটাকে তোমরা সবসময় স্মরণ রাখবে। এটি আমাদের নৈতিকতার যুদ্ধ। ইসলাম তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করেছিলো কিনা সে বিতর্ক ভিন্ন। কিন্তু আমি ইসলামের সুরক্ষার জন্য তরবারীকে জরুরি মনে করি। জাতি সেই তরবারী সৈনিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। ইতিহাস আমাদের পানে তাকিয়ে আছে। মহান আল্লাহর দৃষ্টিও জাতির সৈনিকদের উপর নিবদ্ধ। আল্লাহর রাসূলের পবিত্র আত্মা আমাদের দেখছেন। ভেবে দেখো, আমাদের দায়িত্ব কতো মহান ও কতো পবিত্র। আল্লাহর সৈনিকরা শাসন করে না– আল্লাহর শাসন ও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করে মাত্র।'...

বলতে বলতে সুলতান আইউবী আবেগময় হয়ে ওঠেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আহ্ আমার বন্ধুগণ! ষোল হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের কথা স্মরণ করো। সেদিন হযরত উমর ইবনুল 'আস ও তাঁর সঙ্গী সেনাপতিগণ বাইতুল মুকাদ্দাসকে কাফেরদের থেকে মুক্ত করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) তখন খলীফা ছিলেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস গমন করেন। হযরত বিলাল (রা.) তাঁর সঙ্গে। তাঁরা সকলে মসজিদে আকসায় নামায আদায় করেন। সেই নামাযের আযান দীর্ঘ সময় পর হযরত বিলাল (রা.) দিয়েছিলেন। হযরত বিলাল রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ওফাতের পর এমন নীরব হয়ে গিয়েছিলেন যে, মানুষ তাঁর জ্বালাময়ী কণ্ঠ ভুলে গিয়েছিলো। তিনি আযান দেয়া ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু মসজিদে আকসায় এসে হযরত উমর (রা.) তাঁকে বললেন, বিলাল! মসজিদে আকসা ও বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজা-দেয়াল বহুদিন যাবত আযান শোনেনি। আযাদীর প্রথম আযানটা তুমিই দাও। রাসূলে মকবুল (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত বিলাল এ-ই প্রথম আযান দিলেন।'...

'আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমাদের আমলে মসজিদে আকসা পুনরায় আযানের সুর ভুলে গেছে। নব্বইটি বছর যাবত এই মহান মসজিদের দরজা-দেয়াল একজন মুয়াজ্জিনের পথপানে তাকিয়ে আছে। স্মরণ রেখো, মসজিদে আকসার আযান সমগ্র পৃথিবীতে শোনা হয়। খৃস্টানরা সেই আযানের গলা টিপে ধরে রেখেছে। এই পবিত্র লক্ষ্যটাকে সামনে রেখে অগ্রসর হও। আমরা সাধারণ কোনো যুদ্ধ লড়তে যাচ্ছি না। আমরা আপন রক্তের ইতিহাসের সেই অধ্যায়টি পুনরায় লিখতে যাচ্ছি, যা আমর ইবনুল 'আস ও তাঁর সঙ্গীরা লিখেছিলেন। যদি কামনা করো, মাথায় আলো নিয়ে

মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, যদি কামনা করো ,অনাগত বংশধর তোমাদের কবরের উপর ফুল ছিটাক; তাহলে তোমাদেরকে সেই মিম্বরটি বাইতুল মুকাদ্দাসে স্থাপন করতে হবে, যেটি বিশ বছর আগে নুরুদ্দীন জঙ্গী মরহুম ওখানে স্থাপনের জন্য তৈরি করিয়েছিলেন।'

সুলতান আইউবী মিম্বরটি সকলকে দেখালেন এবং বললেন– 'এই মিম্বর জঙ্গী মরহুমের বিধবা ও কন্যা বয়ে নিয়ে এসেছে। আমাদেরকে সেই নারীর লাজ রক্ষা করতে হবে, যে জাতির দু'শ' মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছে। উদ্দেশ্য, আমাদের কেউ যেনো যুদ্ধের ময়দানে পিপাসার মারা না যাই, কেউ যাতে আহত হয়ে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না থাকি। তোমরা জানো, আমি কখনো যুদ্ধের ময়দানে নারীর উপস্থিতির পক্ষে ছিলাম না। কিন্তু এই মেয়েগুলোকে এ জন্য রেখে গিয়েছি, যেনো আত্মমর্যাদা ও জাতীয় মর্যাদার এই চিহ্নটা আমাদের সম্মুখে থাকে এবং আমাদের স্মরণ থাকে, আমাদের এদেরই ন্যায় কন্যারা বাইতুল মুকাদ্দাসে কাফেরদের হিংস্রতা ও পাশবিকতার শিকার হয়ে আছে। মনে রেখো আমার বন্ধুগণ! যে জাতি জাতির কন্যা ও শহীদদের কথা ভুলে যায়, আল্লাহও সে জাতিকে ভুলে যান এবং তাদের ভাগ্যে আজীবনের জন্য অভিশাপ লিখে দেয়া হয়। কিয়ামতের দিন তোমরা অভিশপ্তদের মাঝে উত্থিত হবে, নাকি আল্লাহর রহমত ও রাসূলের সুপারিশপ্রাপ্তদের মাঝে, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তোমাদের।'

সুলতান আইউবী এরূপ আবেগময় কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসের ব্যাপারে তিনি এতোই আবেগপ্রবণ ছিলেন যে, যখনই ইতিহাসের এ ভূখণ্ডটি আলোচনায় উঠে আসতো, তাঁর চোখে অশ্রু নেমে আসতো এবং তিনি অস্থির হয়ে উঠে পায়চারি করতে শুরু করতেন। এই শেষ বৈঠকে তিনি তাঁর সালার প্রমুখদের মাঝে এমন আবেগ জাগিয়ে তোলেন যে, তিনি এজলাস ত্যাগ করে বেরিয়ে যাওয়ার পরও কারো মুখ থেকে কোনো কথা ফোটেনি। তাদের গতি-প্রকৃতিই বদলে গেছে। তারা সোজা নিজ নিজ বাহিনীর নিকট চলে যায় এবং স্ব স্ব কমান্ডারদেরকেও অনুরূপ আবেগময় করে তোলে।

সকলে চলে গেলে সুলতান আইউবী নৌবাহিনীর কমান্ডার আল-ফারেস বায়দারীনকে ডেকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, সমুদ্রের খবর কী? আল-ফারেস জানান, আমার জাহাজ টহল দিয়ে ফিরছে এবং আমি

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে যথারীতি বার্তা পেয়ে আসছি, যা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে ক্রুসেডারদের নৌবহরের কোনো চিহ্ন নেই। টায়েরের বন্দর এলাকায় আমার রণতরী অবস্থান করছে এবং ছোট ছোট পালতোলা ডিঙিতে করে মৎস্যজীবির বেশে আমার গোয়েন্দারা সেখানে যাওয়া-আসা করছে। টায়ের এবং তার আগে ক্রুসেডারদের বহরে কোনো সংযোজন হয়নি। যে তরীগুলো বিদ্যমান আছে, সেগুলো প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। তারা জাহাজে এমন অগ্নিগোলার ব্যবস্থা করে রেখেছে, যেগুলো দূর থেকে উড়ে এসে পালে আগুন ধরিয়ে দিতে সক্ষম।

'এই গোলা এতো দূর থেকে আসতে পারে, যতোটুকু দূর পর্যন্ত তোমাদের প্রজ্বলমান সলিতাওয়ালা তীর যেতে পারে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'ভয় পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।'

'আমাদের কারো অন্তরে কোন ভীতি নেই'– আল-ফারেস বললেন– 'নৌ-কমান্ডোরা এতোটুকু প্রস্তুত যে, নৌ-যুদ্ধের সময় তারা ছোট ছোট ডিঙিতে করে দুশমনের জাহাজের নিকটে গিয়ে তাতে ছিদ্র করে ফেলবে এবং তার উপর আগুনের গোলা নিক্ষেপ করবে।'

'যদি যুদ্ধটা রাতে হয়'– সুলতান আইউবী বললেন– 'দিনের বেলা কোন কমান্ডো যেনো সমুদ্রে না নামে। আবেগতাড়িত হয়ে কাজ করলে জীবনই নষ্ট হবে। সাবধান থাকতে হবে আল-ফারেস! তোমরা যেমন মৎস্য শিকারীর বেশে টায়ের পর্যন্ত গোয়েন্দা প্রেরণ করো, তেমনি দুশমনের গোয়েন্দাও কোনো না কোনো ছদ্মবেশে তোমাদের জাহাজের নিকট এসে থাকবে। জাহাজগুলোকে একটি অপরটি থেকে দূরে রাখবে, যাতে হঠাৎ আক্রমণ হলে সবগুলো একসঙ্গে ঘেরাওয়ে পড়ে না যায়। এমনভাবে ছড়িয়ে রাখবে, যেনো প্রয়োজনে দুশমনকে ঘিরে ফেলতে পারো। দিনে পতাকা আর রাতে বাতির মাধ্যমে পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করবে।'

আল-ফারেস যখন সুলতান আইউবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন রাতের শেষ প্রহর। সেখানেই তিনি ফজর নামায আদায় করেন।

'আল-ফ্লারেস!'– আল-ফারেস সন্নিকটেই কারো ডাক শুনতে পান। মোড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখেন ইন্টেলিজেন্সের কমান্ডার হাসান ইবনে আবদুল্লাহ। হাসান এগিয়ে কাছে এসে আল-ফারেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞেস করেন– 'ধন্যবাদ ভাই! একই সঙ্গে দু'টি মেয়েকে বিয়ে করেছো বুঝি? দু'জনকেই সঙ্গে রেখেছো? নিজের সঙ্গে তাদেরও খুন করতে চাও নাকি?'

'উহ হাসান ভাই!'– আল-ফারেস অন্ধকারে কণ্ঠে হাসানকে চিনতে পেরে বললেন– 'ওরা তো আশ্রিতা মেয়ে দোস্ত! কূলে একস্থানে লুকিয়ে ছিলো। বলছে যাবাবর। সমগ্র গোত্র নাকি যুদ্ধের কবলে পড়ে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে মরেছে।

আর ভাগ্যক্রমে শুধু তারা বেঁচে রয়েছে এবং সমুদ্রের তীর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'খৃস্টানরা অন্যসব যাবাবরদের ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষে মারলো আর এমন রূপসী দু'টি মেয়েকে জীবিত ছেড়ে দিলো! তুমি বোধ হয় সমুদ্রে থেকে থেকে স্থলের মানুষগুলোর স্বভাব-চরিত্র ভুলে গেছো দোস্ত!'

আল-ফারেস হেসে ওঠে বললেন– 'হাসান ভাই! গোয়েন্দাগিরি করতে করতে এখন তুমি কাক-চিলকেও ক্রুসেডারদের গোয়েন্দা ভাবতে শুরু করেছো। বলতে চাচ্ছো, এই মেয়ে দুটো দুশমনের গোয়েন্দা হতে পারে, তাই না?'

'হতে পারে'– হাসান বললেন– 'তুমি খানিকটা বেশি প্রাণোচ্ছল মানুষ আল-ফারেস! ভালো হবে, তুমি মেয়ে দুটোকে টায়েরের নিকট কূলে রেখে আসো। অপরিচিত মেয়েদের জাহাজে রাখা ঠিক হবে না।'

'কেনো, মিসর নিয়ে ওদের বিবাহ করে নেয়া কি পুণ্যের কাজ হবে না?'– আল-ফারেস বললেন– 'কিংবা আমি তাদের একজনকে বিয়ে করে নেবো আর অপরজনকে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবো। এরা গরীব মেয়ে। এদেরকে কূলে কোথাও ফেলে আসলে জানো তো খৃস্টানরা এদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে!'

'হতে পারে তারাও খৃস্টান'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– শোনো আল-ফারেস! তুমি অবুঝ শিশু নও। সাধারণ সৈনিকও নও। তুমি নৌ-বাহিনীর একজন অভিজ্ঞ ও গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার। ভাবতে ও বুঝতে চেষ্টা করো। আমি রিপোর্ট পেয়েছি, অবসর সময়টা তুমি ওদের সঙ্গে হেসে-খেলে অতিবাহিত করো। এক হাজার কসম খেলেও আমি মেনে নেবো না, তুমি ওদেরকে পবিত্র মেয়ে বানিয়ে রেখেছো। তারা যদিও তোমাকে না দেয়, তুমি তো নিজেকে ধোঁকা দিতে পারো। সুন্দরী ও যুবতী মেয়েদের যাদু যে কোন পুরুষকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুৎ করতে পারে। অনেক কিছু হতে পারে আল-ফারেস! বলছি, মেয়েগুলোকে তুমি কোথাও রেখে আসো।'

'যদি আমি তোমার পরামর্শ মান্য না করি, তাহলে?'

'তখন আমাকে দেখতে হবে মেয়েগুলো আসলে কারা ও কেমন'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'যদি সন্দেহভাজন বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে জাহাজ থেকে নামিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসতে বাধ্য হবো। কিন্তু বিষয়টা নিষ্পত্তির ভার আমি তোমারই উপর অর্পণ করতে চাই। তুমি আমার পুরনো বন্ধু। তুমি নিজেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হও, যাতে আমাকে কর্তব্য পালনে বন্ধুত্বকে বিসর্জন দিতে না হয়।'

'আমার দিক থেকে কোনো অন্যায় আচরণের আশংকা করো না হাসান!'– আল-ফারেস বললেন– 'তুমি বন্ধুত্বের কথা বলছো। আমি তো কর্তব্য পালনে নিজের জীবনও কুরবান করে দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, মেয়ে দুটো আমার কোনো ক্ষতি করবে না। তাদের প্রতি যদি আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগ্রত হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদেরকে কূলে নিয়ে রেখে আসবো কিংবা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলবো।'

'জাহাজে কখন ফিরবে?' হাসান ইবনে আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করেন।

'নামায পড়ে কিছুক্ষণ ঘুমাবো। অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি'– আল ফারেস বললেন– 'তারপর চলে যাবো। সন্ধ্যা নাগাদ জাহাজে গিয়ে পৌঁছবো।'

আল-ফারেস থেকে বিদায় নিয়ে হাসান ইবনে আবদুল্লাহ সেই কক্ষে চলে যান, যেখানে তার বিভাগের লোকেরা থাকে। তাদের একজনকে বাইরে ডেকে এনে বললেন, আল-ফারেস বায়দারীনের জাহাজ অমুক জায়গায় নোঙ্গর ফেলে অবস্থান করছে। তুমি জাহাজে গিয়ে আল-ফারেসের নায়েব রউফ কুর্দিকে বলবে, আমাকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহ প্রেরণ করেছেন।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ রউফ কুর্দির নামে বার্তা প্রদান করেন– 'এই লোকটিকে কোনো কাজে জুড়িয়ে দাও। জাহাজে আশ্রিতা মেয়ে দুটো সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে হবে, জাহাজে ওদের কোনো গোপন তৎপরতা আছে কিনা। যদি থাকে, তাহলে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি এ কাজে তোমার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।'

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ লোকটিকে জরুরি দিক-নির্দেশনা প্রদান করে একটি পালতোলা নৌকায় তুলে বিদায় করে দেন। বাতাসের গতি অনুকূল ও তীব্র ছিলো। নৌকা অল্প সময়ের মধ্যে জাহাজের সঙ্গে গিয়ে

ভিড়ে। জাহাজ থেকে সিঁড়ি ফেলে তাকে উপরে তুলে নেয়া হলো। লোকটি রউফ কুর্দির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর বার্তা প্রদান করে এবং নিজেও মৌখিকভাবে উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু রউফ কুর্দির চেহারা বলছে, লোকটাকে তার ভালো লাগেনি। তবে বিপক্ষে কিছু বলাও তো সম্ভব নয়। তার জানা আছে, সুলতান আইউবীর অন্তরে একজন গুপ্তচরের ততোটুকু মর্যাদা আছে, যতোটুকু একজন সালারেরও নেই। একজন গোয়েন্দার রিপোর্ট একজন সালারকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। অগত্যা রউফ কুর্দি উপরে উপরে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর এই গোয়েন্দা লোকটিকে বরণ করে নেয় এবং খাতির-যত্ন করতে শুরু করে।

'আপনি মেয়ে দুটোকে প্রথম দিন থেকেই দেখে আসছেন'– গোয়েন্দা রউফ কুর্দিকে বললো– 'তাদের ব্যাপারে আপনার সামান্যতম সন্দেহ থাকলে বলুন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমি তাদেরকে আসকালান নিয়ে যাবো।'

'না, এ যাবত তাদের মধ্যে সন্দেহজনক কোনো আচরণ দেখিনি'– রউফ কুর্দি উত্তর দেয়– 'বেশিরভাগ সময় তারা আল-ফারেসের কক্ষেই থাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে রউফ কুর্দির ফ্লোরির কথা মনে পড়ে যায়। গোয়েন্দা লোকটা যদি একদিন আগেও আসতো, তাহলে রউফ কুর্দি বলতো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাও। কারণ, আমাদের কমান্ডার সারাক্ষণ এদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু এই গত রাতই ফ্লোরির সঙ্গে তার ভাব গড়ে ওঠেছে। রোজি তাদের এই গোপন সম্পর্কের সব জানে। রউফ কুর্দি এখন কোনো মূল্যে ফ্লোরিকে হারাতে চাচ্ছে না। তার অন্তরে আল-ফারেসের শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো বটে; কিন্তু ফ্লোরির ভাবনায় এখন আসল কথা বলা যাচ্ছে না।

'আমি আপনার সঙ্গে থাকবো'– গোয়েন্দা বললো– 'আল-ফারেস যেনো জানতে না পারে আমি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছি। আপনি আদেশনামা পাঠ করেছেন। আমি নিজ চোখে দেখবো, মেয়ে দুটো কেমন এবং কী করে। মেয়েগুলো শত্রুর গোয়েন্দা হতে পারে। নাও যদি হয়, যদি শুধু এটুকু প্রমাণ পাই যে, আল-ফারেস কাজের সময়েও এদের নিয়ে নিমগ্ন থাকে, আমি তাদেরকে এখানে থাকতে দেবো না। আল-ফারেস যদি টের পেয়ে যান আমি এখানে গোয়েন্দাগিরি করছি, তাহলে ধরে নেবো, তাকে বিষয়টা আপনি বলে দিয়েছেন। কারণ, আপনি ছাড়া আমার উদ্দেশ্য আর কেউ জানে না।'

এটি যুদ্ধজাহাজ। জাহাজে আমলা-কর্মচারি আছে। আছে নৌযুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থল বাহিনীও। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রান্না-বান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য আছে অনেক কর্মচারি। কাজেই একজন লোকের পক্ষে নিজের আসল রূপ গোপন রেখে অবস্থান করা কঠিন নয়। আল্-ফারেস কমান্ডার। প্রত্যেককে আলাদা ডেকে ডেকে বলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় যে, ঐ লোকটি বহিরাগত। ওর সঙ্গে কথা বলবে না।

গোয়েন্দা সেদিনই মেয়ে দুটোকে দেখে রউফ কুর্দিকে জানিয়ে দেয়– 'এরা যাযাবর মেয়ে নয়, বিপদগ্রস্তও নয়। আমার সন্দেহ জেগে গেছে।'

'ওরা অনেক দিন যাবত আমাদের সঙ্গে থাকছে'– রউফ কুর্দি বললো– 'আমরা তো সন্দেহ করার মতো কিছু দেখিনি।'

'আমার গোয়েন্দা চোখ যা দেখে, আপনার চোখ তা দেখে না'– গোয়েন্দা বললো– 'শীতল অঞ্চলের যাযাবর নারীর গায়ের রং এমনই হয়ে থাকে; কিন্তু তাদের চোখের রং এরূপ হয় না। তাছাড়া তাদের মধ্যে এমন সাজগোজ-পরিপাটিও থাকে না। মুহতারাম! আমরা এরূপ মেয়েদের সঙ্গেই যুদ্ধ করে থাকি। এই মেয়েগুলো এখানে থাকবে না।'

'ঠিক আছে, কিছুদিন দেখেন'– রউফ কুর্দি বললো– 'পাছে এমন না হয়, মেয়েগুলো আসলেই বিপদগ্রস্ত আর আপনি তাদেরকে আরেক বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন।'

'হ্যাঁ'– গোয়েন্দা বললো– 'আমি তাড়াহুড়া করবো না। কয়েক দিন দেখেই তবে সিদ্ধান্ত নেবো।'

সুলতান আইউবী তাঁর সালাদের ঠিকই বলেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত খৃস্টান সেনাপতিরা জানে, ইসলামী ফৌজ বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করতে আসছে। এদিকে সুলতান আইউবী তাঁর সালারদেরকে সর্বশেষ দিক-নির্দেশনা প্রদান করছেন, ওদিকে বাইতুল মুকাদ্দাসে খৃস্টান হাইকমান্ড আপন সেনাপতিদেরকে অবরোধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করছে।

'আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে পথে প্রতিহত করবো না'– খৃস্টানদের কমান্ডার ইন চীফ বললেন– 'তার বাহিনী সংখ্যায় আমাদের চেয়ে কম অবশ্যই। কিন্তু তার অস্ত্র ও রসদের কোন ভাবনা নেই। সাহায্য ব্যবস্থাপনা তার খুবই মজবুত ও বিশ্বস্ত। লোকটাকে বাইতুল মুকাদ্দাস

অবরোধ করতে দাও। আমাদের কাছে দীর্ঘ সময়ের জন্য খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি মজুদ রয়েছে। অবরোধ দীর্ঘ হতে হতে যদি খাদ্য সামগ্রীর অভাব দেখা দেয়, তাহলে আমরা নগরীর মুসলমানদেরকে না খাইয়ে মারবো। তাতে আমাদের অনেক খাদ্য বেচে যাবে। আমার সবচে' বেশি ভরসা নাইটদের উপর। তারা বাইরে বেরিয়ে আক্রমণ করবে এবং ফিরে আসবে। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইউবীর অবরোধ ব্যর্থ হবে।'

'আপনি বাহিনীর অবস্থাকে বিবেচনায় আনেননি'— এক সেনাপতি বললো— 'নগরীতে অবস্থানরত বাহিনীর অর্ধেক এমন যে, তারা হিত্তীন থেকে আসকালান পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধগুলো থেকে পালিয়ে এসেছে এবং তাদের যুদ্ধ করার স্পৃহায় ভাটা পড়ে গেছে। বরং এ কথা বললেও ভুল হবে না, এদের উপর সালাহুদ্দীন আইউবীর ভীতি সঞ্চারিত হয়ে গেছে। যেসব সৈন্য বাইরের রণাঙ্গনগুলোতে যায়নি, তাদেরই শুধু মনোবল চাঙ্গা রয়েছে।'...

'আমরা এ সমস্যার সমাধান বের করে নিয়েছি'— কমান্ডার ইন চীফ বললেন— 'মহামান্য পাদ্রী ফৌজের মাঝে ঘোরাফেরা করছেন। তিনি ইঞ্জিলের উদ্ধৃতি দিয়ে সৈন্যদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন, ইসলামী বাহিনীকে পরাজিত করা জরুরি। কেনো জরুরি তারও ব্যাখ্যা প্রদান করছেন। এ-ও বোঝাচ্ছেন, এটা তোমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। সেনাপতি ও অন্যান্য কমান্ডারগণ যদি একে ধর্মযুদ্ধ জ্ঞান করে লড়াই করে, তাহলে সাধারণ সৈন্যরা ধর্মীয় চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবে। আমরা যদি বাইতুল মুকাদ্দাসের যুদ্ধে পরাজয়বরণ করি, তাহলে রোম উপসাগরও আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। সালাহুদ্দীন আইউবী সফল হয়েছেন কেনো? কারণ, তিনি পাকা ধার্মিক। আমরা তাকে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করার চেষ্টা করছি। কিন্তু তিনি সে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। যেসব মুসলিম শাসককে আমরা তার বিরোধি বানিয়েছিলাম, তারা তার অনুগত হয়ে গেছে। আমরা আমাদের মেয়েদের দ্বারা তার সামরিক শক্তি ও সাম্রাজ্যকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের এই ত্যাগও বৃথা গেছে। এটা বোধ হয় আমাদের ভুলই ছিলো যে, আমরা মেয়েদের ব্যবহার করেছি এবং এই আশায় বসে ছিলাম যে, সালাহুদ্দীন আইউবী ঘরে বসেই মরে যাক।'...

'আমাদের কোনো ত্যাগ ব্যর্থ যায়নি'– সভায় উপস্থিত পোপ বললেন– 'আপনার এই চিন্তা ভুল যে, দু'টি ধর্মের যুদ্ধ শুধু সৈন্যরাই লড়ে থাকে। আপন ধর্মের বিজয়-প্রতিষ্ঠা এবং শত্রু ধর্মের ধ্বংসের জন্য তরবারী আবশ্যক বটে। কিন্তু শত্রুর চিন্তা-চেতনা বিনষ্টের জন্য সেই পদ্ধতিটি আবশ্যকীয় ছিলো, আপনি যার ব্যাপারে বলেছেন, আমাদের সেই ত্যাগ বৃথা গেছে। উঁচুমানের রূপের বদৌলতে আমাদের যে মেয়েদের পদস্থ শাসক-অফিসারদের স্ত্রী হয়ে রাজকীয় জীবন-যাপন করার কথা ছিলো, তারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎকে ক্রুশের জন্য কুরবান করে মুসলমানদের হেরেমে অপদস্ত-লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা মুসলমানদের মাঝে গৃহযুদ্ধ ঘটিয়েছে, মুসলিম শাসকদের ঈমান ক্রয় করে এনেছে। একই দেশের গুরুত্বপূর্ণ শাসকদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে একজনকে অপরজনের শত্রুতে পরিণত করেছে। এসব কীর্তির জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'...

'ক্রুশের সেনাপতিগণ! তোমরা ভুলে যেয়ো না, দুশমনকে খুন করার উত্তম পন্থা হচ্ছে তাদের মাঝে মানসিক বিলাসিতা ও যৌনতা সৃষ্টি করে দেয়া। তাদেরকে রাগ-রং ও কল্পনার সুখ-সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও। তাদের শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতার মোহ ও বিত্তের গোলাম বানিয়ে তোলো। মুসলমান দুঃসাহসী সৈনিক। সামরিক চেতনা ও ধর্মযুদ্ধের (জিহাদের) উন্মাদনা মুসলমানদের মাঝে যতোটুকু আছে, ততোটুকু আমাদের মাঝে নেই। মুসলমান যে পরিমাণ সুদক্ষ সেনাপতি জন্ম দিয়েছে, আমরা তা পারিনি। এটা তাদের ধারা। আমরা যদি তাদের চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন করতে না পারি, তাহলে তাদের এই চেতনা ও ধর্মীয় উন্মাদনার এই ধারা অব্যাহত থাকবে। আর তা-ই যদি থাকে, তাহলে ক্রুশের পতন ঘটবে। ইসলাম ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ভারতবর্ষ পার হয়ে চীন পর্যন্ত চলে গেছে। চীনের নৌ-বাহিনী প্রধান একজন মুসলমান। ওখানকার অনেক সেনাপতি এখনো মুসলমান। হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চলে বড় বড় দ্বীপে গিয়ে দেখে আসো, সেখানেও আরব তথা মুসলমানদের শাসন দেখতে পাবে।'...

'আপনি এই প্লাবন শুধু তরবারী দ্বারা রুখতে পারবেন না। এর জন্য আপনাকে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ইসলামের যে কেন্দ্রটাকে মুসলমানরা খানায়ে কা'বা বলে থাকে, তাকে নিষ্প্রাণ করে দিতে হবে।

বাইতুল মুকাদ্দাসের দখল অটুট রাখতে হবে। মুসলমান শাসক ও রাজা-বাদশাহগণ যে যেখানে থাকুন না কেনো, সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদেরকে অথর্ব করে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে তাদের হেরেমে আমাদের অভিজ্ঞ মেয়েদেরকে ঠিক সেভাবে ঢুকিয়ে দিতে হবে, যেভাবে আরবের রাজ্যগুলোতে ঢুকিয়ে রেখেছে। এই পন্থাটা আমরা ইহুদীদের নিকট থেকে শিখেছি। তারা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস ও ধর্মের মূলোৎপাটনে বেশ চমৎকার পরিকল্পনা তৈরি করে নিয়েছে এবং সে অনুপাতে কাজও করছে। তারা আমাদেরকে সাহায্য প্রদান করছে। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, অনতিবিলম্বে বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আমাদের একক দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তার আশপাশের দূর-দূরান্তের অঞ্চলও আমাদের দখলে এসে যাবে। মুসলিম রাজ্যগুলো খণ্ডিত হয়ে হয়ে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে। অন্তত তারা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে না। ইহুদীদের বিশেষজ্ঞরা ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমান নিজেদেরকে রাজার আসনে আসীন ভাববে বটে; কিন্তু রাজত্ব ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বাগডোর আমাদের হাতে থাকবে। এ কাজটা আপনি আমাদের উপর ছেড়ে দিন। এই গোপন ও আন্ডারগ্রাউন্ড কাজ আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব বিশেষজ্ঞজন ও ধর্মী নেতাদের। আপনি সৈনিক। যুদ্ধের ময়দানের কথা বলুন। আপনার অতিশয় ভয়ঙ্কর এক শত্রু বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করতে আসছে। তাকে কীভাবে পরাজিত করবেন চিন্তা করুন।'

এক রবিবারের সকাল বেলা। ১১৮৭ সালের সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখ। সুলতান আইউবী বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে যান। হিজরী ক্যালেন্ডার মোতাবেক দিনটি ৫৮৩ হিজরীর ১৫ রজব। ক্রুসেডাররা সুলতান আইউবীর জন্য অপেক্ষমান ছিলো। কিন্তু সুলতান এতো দ্রুত এসে পড়বেন তারা ভাবেনি। তিনি পথে উঁচুতে অবস্থিত ক্রুসেডারদের দুর্গ ও পোস্টগুলোকে এড়িয়ে এগিয়ে যান। দুর্গগুলো থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে সময়ের আগে সংবাদ পৌঁছোনোর জন্য দূত প্রেরণ করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা একজনও গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। তার প্রমাণ, রাতভর পথ চলে ভোরবেলা সুলতান আইউবীর সম্মুখ ইউনিট যখন শহর গিয়ে পৌঁছে, তখন নগরীর প্রাচীরের উপর দু'-চারজন

সান্ত্রী দণ্ডায়মান ছিলো মাত্র। নগরীর ফটক বন্ধ ছিলো। ভেতর থেকে গীর্জার ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।

নাকাড়া ও বিউগল বেজে ওঠে। প্রাচীরের উপর চতুর্দিকে একের পর এক মাথা উত্থিত হতে শুরু করে। লোহার টুপি পরিহিত মাথাগুলো। সকলের হাতে ধনুক। ধীরে ধীরে মাথার সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে মনে হলো, যেনো প্রাচীরের উপর মানবমুণ্ডের আরেক প্রাচীর দাঁড় করানো হয়েছে। নগরীর পশ্চিম দিকে খোলামেলা একটি অঞ্চল। সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে সেখানে ছাউনি স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে নিজে দেখতে চলে গেছেন, প্রাচীর কোন্দিক থেকে দুর্বল, কোন্ স্থানে ছিদ্র করা যায় এবং কোথাও থেকে সুড়ঙ্গ খনন করা যায় কিনা। শত্রুর দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে ছিদ্র করার জন্য সুলতান আইউবীর আছে একদল বিখ্যাত জানবাজ সৈনিক।

ইসলামী ফৌজ নগরীর চারদিকে অবস্থান করছে। বড় সমাবেশটা পশ্চিম প্রান্তে। সুলতান আইউবী নগরীর চারদিকে ঘুরে-ফিরে প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করছেন। পশ্চিম দিকে অবস্থানরত বাহিনীর সালার আগুন ও পাথর নিক্ষেপকারী মিনজানিক স্থাপন করতে শুরু করেছে। ক্রুসেডাররা তাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা মোতাবেক নগরীর একটি ফটক খুলে দেয়। প্রথমে বর্মপরিহিত নাইটরা ঘোড়ায় চড়ে হাতে বর্শা তাক করে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে পড়ে এবং মিনজানিক স্থাপনরত মুসলিম সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে বসে। তারা বেরিয়ে আসামাত্র ফটক বন্ধ হয়ে যায়।

বেশ প্রশস্ত জায়গা। ঘোড়ার ছুটে চলতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। নাইটরা বর্মপরিহিত। তীর তাদের গায়ে কোনো ক্রিয়া করতে পারছে না। তাছাড়া তাদের এই আক্রমণ এতোই আকস্মিক, তীব্র ও অপ্রত্যাশিত ছিলো যে, মুসলিম সৈন্যরা কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। বেশ ক'জন মুসলিম সৈন্য নাইটদের বর্শার আঘাতে আহত ও শহীদ হয়ে যায়। অনেকে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে কার্যসিদ্ধি করে উল্কার ন্যায় ছুটে আসা নাইটরা ঝড়ের ন্যায় কেটে পড়ে। ফটক খুলে যায়। তারা নগরীতে ঢুকে পড়ে। আবার ফটক বন্ধ হয়ে যায়।

ময়দানে আহত মুসলিম সৈন্যরা ছট্‌ফট্ করছে। অক্ষত সৈনিকরা তাদের তুলে আনতে ছুটে যায়। এমন সময় দু'-তিনটি নারীকণ্ঠ ভেসে

ওঠে– 'সরে যাও, এ কাজ আমাদের।' সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো মেয়ে ছুটে আসে। তারা গাছের ডালের তৈরি স্ট্রেচার নিয়ে আসে। কয়েকজনের কাঁধে পানির মশক। উপর থেকে খৃস্টানদের তীর ছুটে আসছে। সেই তীরের আঘাতে দু'-তিনটি মেয়ে লুটিয়ে পড়ে। দেখে মুসলিম তীরন্দাজ সৈন্যরা এগিয়ে আসে। তারা পাল্টা তীর ছুঁড়তে শুরু করে। এবার নগরীর প্রাচীরের উপর থেকে আসা তীরবৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। উভয় দিকের তীরের ছায়ায় মেয়েরা জখমীদের তুলে পেছনে গাছের ছায়ায় নিয়ে যায়।

সে যুগের কাহিনীকার আসাদুল আসাদী তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন, সৈনিকরা যে কোনো যুদ্ধেই আহত হতো, তাদের তুলে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাওয়া হতো। কিন্তু এই সেবাটা করতো তাদেরই ন্যায় পুরুষ সৈনিকরা। এ কাজে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করতো না। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসের এই অবরোধ যুদ্ধে এ কাজের জন্য কয়েকটি মেয়ে এগিয়ে আসে। তারা জখমীদের তুলে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যায়। নিজ হাতে ক্ষতস্থানে পট্টি বাধে এবং আহতদের মাথা কোলে তুলে নিয়ে পানি পান করায়। কয়েকজন জখমী উঠে দাঁড়িয়ে হুংকার ছেড়ে বলে ওঠে– 'এই জখম আমাদেরকে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না।' কেউ বলে– 'আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করেই তবে জখমে পট্টি বাঁধবো।' আহতরা যখন দেখলো, তিন-চারটি মেয়েও তীরবিদ্ধ হয়েছে, তখন তাদেরকে সামলে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। মেয়েরা সৈনিকদের জোশ-জযবায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

উক্ত স্থানেই মিনজানিক স্থাপন করার জন্য আরেকটি বিশেষজ্ঞ সেনাদল এগিয়ে আসে। তীরন্দাজি তীব্র করে দেয়া হয়। মিনজানিক স্থাপিত হয়ে যায়। সেগুলোর সাহায্যে ভারি পাথর ও আগুনের গোলা নিক্ষেপ শুরু হয়ে যায়। পাথর-গোলা প্রাচীরের উপর এবং প্রাচীর অতিক্রম করে ভেতরেও নিক্ষিপ্ত হতে থাকে।

ফটক আরেকবার খুলে যায়। নাইটদের ঘোড়াগুলো মিনজানিকের দিকে বাতাসের গতিতে ধেয়ে আসে। এবার এক পার্শ্ব থেকে মুসলিম অশ্বারোহী দল শকুনের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। পেছন থেকে আরেকটি দল তাদের পলায়নের পথ বন্ধ করার জন্য এগিয়ে আসে। মুসলমানরা বর্শা ও তরবারীর সাহায্যে নাইটদের ঘোড়াগুলোকে আহত করতে শুরু করে।

কিন্তু লোহার বর্ম-শিরস্ত্রাণ নাইটদেরকে অক্ষত ও নিরাপদ রাখে।

আহত ঘোড়াগুলোর সঙ্গে অক্ষত নাইটরাও ভূ-তলে লুটিয়ে পড়তে শুরু করে। এ অবস্থায় তাদেরকে ঘায়েল করা কঠিন ছিলো না। কিন্তু তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ সৈনিক। ঘায়েল করা সম্ভব হলো না। উল্টো তারা কয়েকজন মুসলিম সৈন্যকে ধরাশায়ী করে ফেলে। এবার ফিরে যেতে উদ্যত হলে মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বহাল থাকা নাইটরা মুসলমানদের প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। ফটক বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর এই ধারা চলতে থাকে। বাইতুল মুকাদ্দাস নগরীর পশ্চিমে প্রাচীরের বাইরে এরূপ যে যুদ্ধ লড়া হয়েছিলো, গতি, তীব্রতা, রক্তক্ষরণ ও উভয় পক্ষের বীরত্বের দিক থেকে তাকে 'নজিরবিহীন' আখ্যা দেয়া হয়েছে। এই সংঘাত-সংঘর্ষ থেকে উভয় বাহিনীর প্রত্যয় ও দৃঢ়তা অনুমান করা যায়। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলিম-খৃস্টান উভয় পক্ষের উপর উন্মাদনা সৃষ্টি করে রেখেছিলো। যেসব খৃস্টান অশ্বারোহী আহত হয়ে বাইরে পড়েছিলো, তারা ছিলো হতভাগ্য। তাদের তুলে নিয়ে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করাবার মতো কেউ ছিলো না। একে তো সেপ্টেম্বর মাস– গরমের মওসুম, তদুপরি সময়টা দ্বি-প্রহর। আহত খৃস্টান নাইটরা লোহার পোশাকের ভেতর পুড়ে মরতে শুরু করে। বিপরীতে মুসলিম জখমীদেরকে নারী স্বেচ্ছাসেবীরা আহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে পানি পান করাতো, মুখ-মাথা ধুয়ে দিতো এবং পোশাক পরিবর্তন করে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করতো। কয়েকটি মেয়ে মশক ভরে কোথাও থেকে পানি এনে এনে আধমরা হয়ে গিয়েছিলো।

খচ্চর গাড়িগুলো ভারি ভারি পাথর কুড়িয়ে এনে সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত। মিনজানিকগুলো রাতেও প্রাচীরের উপর এবং ভেতরে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। তাদের দিকেও পাথর ও আগুনের গোলা আসতে শুরু করে। পেছনে সলিতাওয়ালা তীর এসে আগুন ধরিয়ে দেয়। দু'-তিনটি মিনজানিক আগুনের কবলে এসে পড়ে। সেগুলোর প্রকৌশলীগণ আগুনে ঝলসে যায়। তবু পাথর নিক্ষেপ অব্যাহত থাকে।

প্রাচীরের অন্যান্য দিক থেকেও পাথর ও আগুনের গোলা নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। বাইরে কোথাও কোথাও ভূমি উঁচু ছিলো। সেখান থেকে নিক্ষিপ্ত পাথর-গোলা প্রাচীর অতিক্রম করে ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে

যেতো। তার পেছনে পেছনে সলিতাওয়ালা অগ্নিতীরও চলে যেতো। মুসলিম সৈন্যরা নগরীতে কয়েক স্থানে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাইরে থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা যাচ্ছিলো।

যেসব খৃস্টান সৈন্য পূর্ব থেকে নগরীর ভেতরে ছিলো, তাদের মনোবল শক্ত। অন্যান্য অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যদের কতিপয়ের অবস্থা হচ্ছে, তারা পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর এবং কতিপয় ভীত-সন্ত্রস্ত। কিন্তু এখন সকলে কোমর বেঁধে মোকাবেলা করছে। তাদের জোশ ও মনোবল দেখে মনে হচ্ছে, তারা সুলতান আইউবীকে পিছু না হটিয়ে ছাড়বে না। অপর একটি ফটক অতিক্রম করেও একটি অশ্বারোহী বাহিনী বাইরে গিয়ে অবরোধের উপর আক্রমণ করতে শুরু করে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা সৈনিকদের চেয়ে ভিন্ন। তাদের মাঝে আক্রা-আসকালান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আসা উদ্বাস্তুও রয়েছে। তারা আপাদমস্তক ত্রাসের প্রতীক হয়ে আছে। শহরময় তারা আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছে। সুলতান আইউবীর সৈন্যরা তাদের চোখের সামনে কয়েকটি জনবসতিকে পুড়িয়ে দিয়েছিলো।

বাইতুল মুকাদ্দাসের সবক'টি গীর্জার ঘণ্টা অনবরত বেজে চলছে। দিন-রাত এক হয়ে গেছে। খৃস্টানরা গীর্জায় গিয়ে ভিড় জমিয়েছে। পাদ্রীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রার্থনার গান গাইছে। নগরীর বাইরে সুলতান আইউবীর সৈন্যদের তাকবীর ধ্বনি নগরীর ভেতরে এমন শোনা যাচ্ছে, যেনো অনবরত বজ্রপাত হচ্ছে। প্রজ্বলমান অগ্নিশিখা খৃস্টানদের দম নাকের আগায় এনে রেখেছে। সুলতান আইউবীর যেসব গোয়েন্দা খৃস্টান বেশে নগরীতে অবস্থান করছে, তারা ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। একটি গুজব এই ছড়ানো হয় যে, সুলতান আইউবী বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করবেন না। নগরীটা ধ্বংস করে তিনি সকল খৃস্টানকে হত্যা করে ফেলবেন এবং তাদের যুবতী মেয়ে ও সকল মুসলিম অধিবাসীদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। আতঙ্কের সবচে' বড় কারণ ছিলো, খৃস্টানদের বড় ক্রুশটা সুলতান আইউবীর দখলে। তার অর্থ হচ্ছে, যীশুখৃস্ট খৃস্টানদের প্রতি নারাজ। তাছাড়া দীর্ঘদিন যাবত তারা মুসলমানদের উপর যে অকথ্য, নির্মম ও অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিলো, সেই অপরাধবোধ তাদের তাড়া করে ফিরছিলো। তারা

তাদের বিশ্বাস মোতাবেক গীর্জায় গিয়ে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছে

বর্তমান শতাব্দীর এক আমেরিকান ইতিহাসবিদ এ্যান্থনি ওয়েস্ট বেশ ক'জন ঐতিহাসিকের সূত্রে লিখেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের অবরুদ্ধ খৃস্টানরা এতোই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে যে, বহু খৃস্টান রাস্তায়-গলিতে বেরিয়ে আসে। কেউ হায় হায় করে বুক চাপড়াতে শুরু করে এবং কেউ কেউ নিজেই নিজেকে বেত্রাঘাত শুরু করে। তাদের বিশ্বাস মতে, এটি খোদার নিকট পাপের ক্ষমা লাভের একটি পন্থা। খৃস্টান যুবতী মেয়েদের মায়েরা তাদের মাথার চুল ন্যাড়া করে দেয় এবং তাদের পানিতে নামিয়ে ডুব দেয়াতে শুরু করে। তাদের বিশ্বাস ছিলো, এভাবে মেয়েরা সম্ভ্রম খোয়ানো থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। পাদ্রীরা তাদেরকে এই ভীতি ও শঙ্কা থেকে মুক্তি দেয়ার বহু চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের অভয় বাণী কোনো ক্রিয়া করতে ব্যর্থ হয়।

মুসলমান অধিবাসীদের অবস্থা ছিলো ভিন্ন রকম। তিন হাজারের অধিক মুসলিম পুরুষ, নারী ও শিশু বন্দি ছিলো। যারা বাড়ি-ঘরে ছিলো, তারা নজরবন্দির জীবন-যাপন করছিলো। খৃস্টানদের ভয়ে তারা মসজিদে যেতো না। সকল মুসলমান জেনে ফেলেছে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেছেন। খৃস্টানদের ভীতি ও কাপুরুষতা দেখে কয়েকটি উত্তেজিত মুসলিম যুবক বাড়ির ছাদে ওঠে আযান দিতে শুরু করে। মহিলারা ঘরে-কারাগারে যে যেখানে ছিলো, মহান আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি ও দুআ-দরূদ পাঠ করতে শুরু করে।

খৃস্টানরা তাদের দেখেও নিশ্চুপ থাকে। কেউ কিছু বলছে না। কারণ, তারা বুঝে গেছে, তারা মুসলমানদের উপর যে নিপীড়িন চালিয়েছিলো, তার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে। এখন অনাগত শাস্তির ভয়েই তারা কাঁপছে। তাই এখন মুসলমানদের কোনো কাজে বাঁধা দেয়ার হিম্মত তাদের নেই। খৃস্টানদের এই মনোভাব আন্দাজ করে মুসলিম যুবকরা অলি-গলিতে চীৎকার করতে শুরু করে– 'ইমাম মাহদী এসে পড়েছেন। আমাদের মুক্তিদাতা এসে গেছেন। তিনি নগরীর দেয়ালের উপর দিয়ে আসছেন। ফটক ভেঙে আসছেন।'

নগরীর ভেতরে হক ও বাতিলের, গীর্জার ঘণ্টা ও আযান ধ্বনির সংঘর্ষ চলছে। বাইরে চলছে ঘোড়া, তরবারী ও তীর-বর্শার যুদ্ধ। খৃস্টানদের

গীর্জাগুলোতে প্রার্থনা গীতও উচ্চ হচ্ছে। সেই তালে তালে কুরআন তিলাওয়াতের সুরও উঁচু হচ্ছে। অবুঝ শিশুরাও মহান আল্লাহর দরবারে সেজদায় অবনত হয়ে আছে।

কিন্তু বাইরে সুলতান আইউবী এখনো কোথাও থেকে প্রাচীর ভাঙার কিংবা সুড়ঙ্গ খনন করার ব্যবস্থা করে ওঠতে পারেননি। প্রাচীরের উপর থেকে বাইরের দিকে মুষলধারা বৃষ্টির ন্যায় তীর আসছে। মিনজানিক চালনাকারী ও পাথর বহনকারী মুসলিম সৈনিকদের হাত থেকে রক্ত ঝরছে। বর্মপরিহিত নাইটরা এখনো থেকে থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করছে এবং যানপরনাই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লড়ে ফিরে যাচ্ছে।

চল্লিশ মাইল দূরে রোম উপসাগরে আল-ফারেস বায়দারীনের ছয়টি জাহাজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে টহল দিয়ে ফিরছে। উদ্দেশ্য, যাতে টায়েরে অবস্থানরত খৃস্টানদের নৌবহর সৈন্য ও সরঞ্জামাদি নিয়ে আসতে না পারে। মেয়ে দুটো তার জাহাজে আছে। কিন্তু বর্তমানে তিনি তাদের প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। নৌ-বাহিনী প্রধান আল-মুহসিন তার উপর অতিশয় স্পর্শকাতর দায়িত্ব অর্পণ করে রেখেছেন। কখনো কখনো নিজে মাস্তুলের উপর পাতা মাচানে উঠে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত গভীর চোখে সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করছেন। অন্যান্য জাহাজে গিয়েও খোঁজ-খবর নিচ্ছেন, যাতে কেউ দায়িত্বে অবহেলা না করে।

এদিকে নায়েব রউফ কুর্দি ফ্লোরির সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, যা এখন অনেকটা গোপন অভিসারের রূপ লাভ করেছে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর গোয়েন্দা উভয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখে চলছে।

মিসরে নৌবহর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিচ্ছে। আশঙ্কা আছে, ইউরোপ থেকে বিশেষত ইংল্যান্ড থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করার জন্য সাহায্য আসবে। সুলতান আইউবীর ঝড়গতির অগ্রযাত্রা এবং খৃস্টানদের প্রতিটি দুর্গ ও নগরীর উপর সফল আক্রমণের প্রেক্ষিতে তারা জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক ও ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ডকে এ মর্মে পত্র লিখেছে যে, আরব থেকে ক্রুশের পতন ঘটছে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করা কঠিন মনে হচ্ছে। তোমরা আসো, আমাদেরকে সাহায্য করো। বাইতুল মুকাদ্দাসের যুদ্ধ রোম উপসাগরেও অনুষ্ঠিত হোক এবং যুদ্ধ অনেক ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করুক, তা সুলতান আইউবীর

কাম্য। কিন্তু জার্মানি ও ইংল্যান্ড থেকে কোনো তৎপরতার সংবাদ আসছে না। পরাজিত খৃস্টান বাহিনীর নৌবহর টায়েরের বন্দর অঞ্চলে চুপচাপ বসে আছে। তথাপি সুলতান আইউবীর নৌবাহিনী প্রধান দুশমনের নৌবাহিনীর এই নীরবতাকে বিপদের পূর্ব সংকেত মনে করছেন। তাই তিনি পূর্ণ সতর্ক রয়েছেন।

অবরোধের চতুর্থ রাত। এখনো কোনো সফলতা অর্জিত হয়নি। খৃস্টান ও অন্যান্য অশ্বারোহী সেনারা বাইরে এসে অত্যন্ত দুঃসাহসী আক্রমণ চালাচ্ছে এবং মানুষ ও পশুদের জীবনহানির ঝুঁকি বরণ করছে। চার দিনের আহত ও শহীদদের হিসাব নেয়ার পর সুলতান আইউবীর মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। তার অস্ত্র ও সরঞ্জামের অভাব নেই। বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে তিনি দীর্ঘ যুদ্ধ লড়ার জন্য বিপুল অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করে নিয়েছেন। তার অভাব শুধু লোকের। সেনাসংখ্যা দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রাচীর তার জন্য যথারীতি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্চাম দিন সুলতান আইউবী পশ্চিম দিককার ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নেন এবং সেখানকার যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। দক্ষিণ দিকে এক স্থানে প্রাচীর দুর্বল পেয়েছেন। পশ্চিম দিক থেকে মিনজানিকগুলো সরিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং দূরে পেছনে যে তাঁবু স্থাপন করা ছিলো, সেগুলো তুলে নেয়া হয়েছে। চিত্রটা এমন, যেনো সুলতান আইউবী অবরোধ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। প্রাচীরের উপর যেসব খৃস্টান নাগরিক ছিলো, তারা নগরীতে সংবাদ ছড়িয়ে দেয়, অবরোধ উঠে গেছে এবং মুসলিম সৈন্যরা পেছনে সরে যাচ্ছে। সুলতান আইউবী প্রাচীর থেকে দূরে বাহিনীকে স্থানান্তরিত করছেন।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নগরীতে খৃস্টানরা ভীতি, শঙ্কা, হা-হুতাশ ও প্রার্থনার স্থলে উল্লাসে মেতে ওঠে। সারারাত তারা গীর্জায় সমবেত হয়ে খোদাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে শুরু করে। এই সন্ধ্যা পর্যন্ত যারা নিজেদের কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করছিলো, তারা নবউদ্যমে মুসলমান নাগরিকদের উপর নিপীড়ন চালানোর পরিকল্পনা আঁটতে বসে গেছে। তিরস্কার ও গালাগাল দ্বারা তারা তার উদ্বোধন করে। মুসলমানরা স্তব্ধ, হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

পরদিন শুক্রবার। ১১৮৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। খৃস্টানরা প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো, দক্ষিণ দিকে যাইতুন পর্বতের উপর সুলতান আইউবীর পতাকা উড়ছে এবং তার সম্মুখে প্রাচীর থেকে সামান্য দূরে মুসলমানরা মিনজানিক স্থাপন করেছে ও অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলে কমপক্ষে দশ হাজার সৈন্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। পজিশন ও প্লান পরিবর্তন করে সুলতান আইউবী জুমার দিন বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ চালান।

নগরীর উপর পাথর ও আগুনের গোলা পূর্বাপেক্ষা বেশি নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করেছে। তৎক্ষণাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ে, মুসলমানদের আরো বেশি ফৌজ এসে পড়েছে এবং নগরী এখন এক-দু'দিনের মেহমান মাত্র। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, নগরীতে আতঙ্কের নতুন ধারা শুরু হয়ে যায়। খৃস্টানরা ঘর থেকে বের হয়ে অলি-গলি ও হাট-বাজারে হা-হুতাশ শুরু করে দেয়। মুসলমানদের আযান পুনর্বার ধ্বনিত হতে শুরু করে। খৃস্টানদের করুণ অবস্থায় স্বয়ং পাদ্রীও প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তিনি ক্রুশ হাতে অলিতে-গলিতে ঘুরতে শুরু করেন। তিনিও কাঁদছেন এবং প্রার্থনা করছেন।

খৃস্টান অশ্বরোহীগণ পুনরায় বের হয়ে মুসলমানদের মিনজানিকগুলোর উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু এই যুদ্ধ এখন সুলতান আইউবী নিজে তদারক করছেন। তাঁর অশ্বারোহী সেনারা তিন দিক থেকে খৃস্টান সৈনিকদের উপর দ্রুতগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের পিষে ফেলে। পরে খৃস্টানরা আরো দু'বার বেরিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিম সৈনিকরা তাদেরকে ফটক থেকে বেশি এগুতে দেয়নি। সুলতান আইউবী প্রথমবারের মতো সুড়ঙ্গ খনন ও প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য সম্মুখে বাহিনী প্রেরণ করেন। প্রত্যেকের হাতে একটি করে ঢাল। তারা এই ঢালের পেছনে মাথা থেকে পা পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে যায়। তাছাড়া প্রাচীরের যে অংশটির নীচে সুড়ঙ্গ খনন কিংবা প্রাচীর ভাঙা হবে, সুলতান আইউবীর তীরন্দাজ সৈন্যরা অত্যন্ত তীব্রতার সাথে তার উপর তীর ছুঁড়তে শুরু করে।

সেখানে একটি ফটক আছে, যার উপর ভবন নির্মিত আছে। সে ফটকের পেছনে অনুরূপ আরো একটি মজবুত ফটক আছে। দুই ফটকের মাঝে দেউড়ি। এই দেউড়ির উপরও একটি ভবন। সুলতান আইউবী

তারই নীচে সুড়ঙ্গ খনন করাতে চাচ্ছেন। এই ফটকের একটু দূরে প্রাচীর খানিকটা দুর্বল মনে হলো। বড় মিনজানিকগুলো তার উপর কয়েক মণ ওজনের পাথর নিক্ষেপ করে চলছে। প্রাচীরটা বেশ চওড়া। কিন্তু অনবরত একই স্থানে পাথর নিক্ষেপের ফলে তাতে ফাটল ধরে যায়। পাথরের বিস্ফোরণ নগরবাসীদের রক্ত শুকিয়ে ফেলতে শুরু করে।

দিনের বেলা বাহিনী ঢালের আড়ালে ও তীরের ছায়ায় ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এখন উপর থেকে তাদের উপর তীর ছোঁড়া হচ্ছে না। রাতে কয়েকশ' জানবাজ মিলে দেউড়ির নীচে ত্রিশ গজ লম্বা সুড়ঙ্গ খনন করে ফেলে, যা দেউড়িরই সমান চওড়া। এই সুরঙ্গের মধ্যে ঘাস ও শুকনো কাঠ ভরে তার উপর তরল দাহ্য পদার্থ ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। জানবাজ সেনারা সেখান থেকে সরে আসে।

আগুনে সবকিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। উপর থেকে ভবনটাও ধসে পড়তে শুরু করে। একসময় ভয়ঙ্কর শব্দ করে ভবনটি পড়ে গুড়িয়ে যায়। ওদিকে প্রাচীরের উপর যে স্থানে ভারী ভারী পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো, সেখানেও প্রাচীর ভেঙে পথ বেরিয়ে আসে। এবার ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে অতিক্রম করে নগরীতে প্রবেশ করার পালা। কিন্তু এ বড় বিপজ্জনক পদক্ষেপ। ধ্বংসাবশেষ সরানোর অভিযান শুরু হয়ে যায়।

নগরীর গীর্জাগুলোর ঘণ্টা আরো জোরে বাজতে শুরু করেছে। সুললিত আযানের পবিত্র ও জয়সূচক ধ্বনিও তীব্র হয়ে ওঠেছে। খৃস্টান সেনাপতি-সম্রাটদের মনোবলেও ভাটা এসে পড়েছে। তারা বৈঠকে বসেছেন। সেনাপতিরা প্রস্তাব পেশ করেছে, সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবী জনসাধারণ সকলে মিলে একযোগে বাইরে বেরিয়ে সুলতান আইউবীর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু পোপ এ প্রস্তাব এই বলে নাকচ করে দেন যে, এ পন্থা অবলম্বন করলে নগরীতে শুধু নারী ও শিশুরা রয়ে যাবে, যারা মুসলমানদের প্রতিশোধের শিকারে পরিণত হবে। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তারা সুলতান আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করবে। এক খৃস্টান নেতা বালিয়ানকে এ কাজে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়।

বাইরে থেকে সুলতান আইউবীর সৈন্যরা দেখে, ফটকের বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসাবশেষের উপর সাদা পতাকা উড়ছে। তীরন্দাজদের থামিয়ে দেয়া হলো। পতাকার সঙ্গে তিন-চারজন লোকও আত্মপ্রকাশ করে।

একজন উচ্চস্বরে বললো– 'আমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।' সুলতান আইউবী ঘোষণাটা শুনলেন। বললেন– 'ওদেরকে নিয়ে আসো।'

সুলতান আইউবী তাদের স্বাগত জানান এবং তাঁবুতে নিয়ে বসান। দলনেতা বালিয়ান কথা শুরু করে– 'আপনি অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে যান।' সুলতান আইউবী শর্ত আরোপ করেন। আসলে খৃস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দখল ছাড়তে চাচ্ছে না। আর সুলতান আইউবীও বাইতুল মুকাদ্দাস না নিয়ে নড়তে রাজি নন। অথচ তাঁর একজন সৈনিকও এ পর্যন্ত নগরীতে প্রবেশ করতে পারেনি। তিনি এখনো দাবি করতে পারছেন না, তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে ফেলেছেন। খৃস্টানরা এখনো বলতে পারে, বাইতুল মুকাদ্দাস তাদের দখলে।

একদিকে সন্ধির আলোচনা চলছে, অপরদিকে অবরোধ যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। সুলতান আইউবী আলোচনা ও সন্ধি চুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি আলোচনার সঙ্গে যুদ্ধও অব্যাহত রেখেছেন। প্রাচীরের ছিদ্র এখন বিস্তৃত হয়ে গেছে। মুসলিম জানবাজরা বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করে এবং প্রাচীরভাঙা পথে ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে। কিন্তু খৃস্টানদের দৃঢ় প্রত্যয়, তারা নগরী হাতছাড়া করবে না। তারা উভয় স্থান থেকে আক্রমণকারীদের বাইরে ঠেলে দেয়। বাইরে থেকে সৈন্যরা স্রোতের ন্যায় এগিয়ে যায়। সম্মুখভাগের সৈনিকরা খৃস্টানদের তীব ও বর্শার আঘাতে লুটিয়ে পড়ে। পেছনের সৈনিকরা তাদের পদপৃষ্ঠ করে করে সম্মুখে এগিয়ে যেতে থাকে। অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে এক জানবাজ নগরীর প্রধান ফটকের উপর লাল ক্রস খচিত পতাকাটা সরিয়ে সেখানে ইসলামী পতাকা উড়িয়ে দেয়। খৃস্টান জনসাধারণ এমন হুলস্থূল শুরু করে দেয় যে, তারা সৈন্যদের জন্য প্রতিবন্ধক ও সমস্যারূপে আবির্ভূত হয়।

সুলতান আইউবীর জানবাজরা পাগলের মতো হয়ে গেছে। তাদের কতিপয় মসজিদে আকসায় ঢুকে উপর থেকে ক্রুশটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে। সেখানেও ইসলামী পতাকা উড়তে শুরু করে। কিন্তু নগরীতে উভয় বাহিনী ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। তবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, ক্রুসেডারদের হিংস্রতা ও প্রতিরোধ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবী খৃস্টান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সন্ধির আলোচনা করছেন। বাইরের এবং নগরীর ভেতরের নতুন কোনো সংবাদ এখনো তিনি জানেন না। তিনি বালিয়ানকে বললেন- 'আমি বাইতুল মুকাদ্দাসকে শক্তির জোরে মুক্ত করবো বলে কসম খেয়েছি। আপনারা যদি নগরীটা আমাকে এমনভাবে দিয়ে দেন, যেনো আমি জয় করেছি, তাহলে সন্ধি করা যেতে পারে।'

'সালাহুদ্দীন!'- বালিয়ান খানিকটা হুমকির সুরে বললো- 'এ নগরীর নাম এখনো জেরুজালেম- বাইতুল মুকাদ্দাস নয়। আপনি যদি সন্ধি করতে সম্মত না হন, তাহলে আমরা আপনাকে বাধ্য করবো না। তবে শুনে রাখুন, এই নগরীতে আপনার চার হাজার সৈনিক আমাদের যুদ্ধবন্দি আছে। আমাদের কাছে আটক সাধারণ মুসলমান কয়েদির সংখ্যা তিন হাজার। আমরা এই প্রত্যেক কয়েদি এবং নগরীর প্রতিজন মুসলিম অধিবাসীকে- চাই সে নারী হোক কিংবা শিশু, যুবক হোক বা বৃদ্ধ- হত্যা করে ফেলবো।'

রাগে-ক্ষোভে সুলতান আইউবীর চোখ দুটো লাল হয়ে যায়। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। কিছু বলতে উদ্যত হলেন। এমন সময় তাঁবুর পর্দা ফাঁক হয়ে যায়। তাঁর এক কমান্ডার এসেছে। সুলতান তাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে নেন। কমান্ডার সুলতানের কানে ফিসফিস শব্দে বললো- 'নগরী জয় হয়ে গেছে। প্রধান ফটক ও মসজিদে আকসার উপর ইসলামী পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

সুলতান আইউবী বালিয়ানের হুমকির জবাব পেয়ে গেছেন। তাঁর রক্তজবার ন্যায় লাল চোখে অস্বাভাবিক এক ঝিলিক ভেসে ওঠে। তিনি সজোরে নিজের উরুতে চাপড় মেরে খৃস্টান নেতা বালিয়ানকে বললেন- 'বিজেতা পরাজিতের সঙ্গে সন্ধি আলোচনা করে না। একজন মুসলমানও আর তোমাদের কয়েদি নেই।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান আইউবী সব সময় অত্যন্ত সহনশীলতার সঙ্গে কথা বলতেন। সেদিনও একই নিয়মে বলছিলেন। কিন্তু বালিয়ানের হুমকির সঙ্গে সঙ্গে জয়ের সংবাদে তাঁর কণ্ঠে রোষ ও গর্জন সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনি বললেন- 'তোমরা সকলে আমার বন্দি। তোমাদের সমস্ত ফৌজ আমার কয়েদি। নগরীতে অবস্থানরত প্রতিজন খৃস্টান আমার কয়েদি। এই নগরী থেকে এখন একজন খৃস্টানও আমার

নির্ধারিত ফি আদায় না করে বের হতে পারবে না। যাও, ভেতরে গিয়ে দেখো, ওটা জেরুজালেম নয়– বাইতুল মুকাদ্দাস।'

বালিয়ান ও তার সঙ্গের খৃস্টানরা ভয় পেয়ে যায়। তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখে। সুলতান আইউবীর অধিকাংশ সৈন্য ভেতরে ঢুকে গেছে। প্রধান ফটকের উপর ইসলামী পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ৫৮৩ হিজরীর ২৭ রজব মোতাবেক ১১৮৭ খৃস্টাব্দের ২ অক্টোবর শুক্রবার বিজয়ী বেশে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। হতে পারে ঘটনাটা কাকতালীয় কিংবা সুলতান আইউবী পরিকল্পনাটাই এভাবে প্রণয়ন করেছিলেন অথবা মহান আল্লাহর ইচ্ছাই এমন ছিলো। একে তো শুক্রবার, সুলতান আইউবীর মহৎ কাজের মহান দিবস। তদুপরি রজবের সাতাশতম রাত। এ রাতে রাসূলে আকরাম (সা.) উক্ত স্থান থেকেই পবিত্র মিরাজে গমন করেছিলেন। সকল মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিক বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের এ তারিখই লিখেছেন।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবী যখন নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন মুসলমানরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। মহিলার মাথার ওড়না খুলে খুলে সুলতানের চলার পথে ছুঁড়ে দিয়ে সুলতানকে স্বাগত জানায়। সুলতানের দেহরক্ষীরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওড়নাগুলো রাস্তা থেকে তুলে নেয়।

দীর্ঘ অমানুষিক নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট মুসলমানরা চীৎকার করে করে তাকবীর ধ্বনি দিতে থাকে। অনেকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। অশ্রু নেমে আসে সকলেরই চোখে। সে এক আবেগঘন ও বেদনাবিধূর দৃশ্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ মোতাবেক সুলতান আইউবী এতোটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন যে, জনতার ধ্বনির উত্তরে তিনি হাত দুটো উঁচু করে নাড়াতে থাকেন ঠিক, কিন্তু ঠোঁটে হাসির বাষ্পও ছিলো না। বরং তিনি উভয় ঠোঁট একত্রিত করে দাঁতে চেপে ধরে আবেগ দমন করার এবং হেঁচকি প্রতিহত করার চেষ্টা করছিলেন।

খৃস্টান নাগরিকরা নিজ নিজ ঘরে নিস্তব্ধ বসে ভয়ে কাঁপতে থাকে। তারা তাদের যুবতী কন্যাদেরকে লুকিয়ে ফেলে। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, অনেকে মেয়েদেরকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস ছিলো, মুসলিম সৈনিকরা মুসলিম নারীদের অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদের মেয়েদের লাঞ্ছিত করবে। কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহাসিক

লেনপোল লিখেছেন, সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী যখন খৃস্টান বাহিনী থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস নগরীর দখল বুঝে নিচ্ছিলো, তখন তিনি যে পরিমাণ উদারতা ও উন্নত চরিত্রের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তেমনি অতীতে কখনো করেননি। তাঁর নির্দেশে তাঁর বাহিনীর সৈন্য ও অফিসারগণ নগরীর শান্তি ও সকলের নিরাপত্তার জন্য রাস্তায়-গলিতে টহল দিতে নেমে পড়েছিলো। কোনো মুসলিম নাগরিক যেনো কোনো খৃস্টান নাগরিকের উপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ না করে বসে, সেদিকে তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তবে কোনো খৃস্টান নাগরিকের নগরী থেকে বের হওয়ার অনুমতি ছিলো না।

সুলতান আইউবী সর্বপ্রথম মসজিদে আকসায় গমন করেন। আবেগের আতিশয্যে তিনি মসজিদের বারান্দায় যেনো উপুড় হয়ে পড়ে যান। তিনি মসজিদের বারান্দাতেই সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ ও আহমদ মিসরীর বর্ণনা মোতাবেক সুলতান আইউবীর চোখ থেকে এমন ধারায় অশ্রু ঝরতে শুরু করে, যেনো তিনি এই মহান মসজিদটি চোখের পানিতে ধৌত করছিলেন।

মসজিদের অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। কয়েকজন মুসলিম শাসক আপন আপন শাসনামলে মসজিদে সোনা-রূপার ঝাড়বাতি ও দীপাধার স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ মসজিদে নানা রকম মূল্যবান উপহার সামগ্রীও রেখেছিলেন। খৃস্টানরা সে সকল ঐতিহ্যবাহী মূল্যবান সম্পদ ও স্মৃতি চিহ্নগুলো তুলে নিয়ে গেছে। মসজিদের মেঝে থেকে স্থানে স্থানে মর্মরের পাত উধাও হয়ে গেছে। মেরামত ছাড়া মসজিদটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিলো।

মসজিদ মেরামতের প্রতি মনোনিবেশ করার আগে সুলতান আইউবী পরাজিত খৃস্টানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি মনে করেন। তিনি উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করেন, প্রতিজন খৃস্টান পুরুষ দশ দিনার, মহিলারা পাঁচ দিনার এবং শিশুরা এক দিনার করে পণ আদায় করে নগরী থেকে বেরিয়ে যাবে। একজন খৃস্টানও সেখানে থাকতে প্রস্তুত ছিলো না। দীর্ঘদিনের অপরাধবোধ তাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বেরিয়ে যেতে তাড়া করে ফিরছিলো। পশ্চিম দিককার ফটক খুলে দিয়ে সেখানে পণ আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খৃস্টানরা বেরিয়ে যেতে শুরু করে। সর্বপ্রথম খৃস্টান নেতা বালিয়ান

নগরী থেকে বের হয়। তার নিকট ইংল্যান্ডের রাজা হেনরির প্রেরিত বিপুল অর্থ ছিলো। সেখান থেকে ত্রিশ হাজার দিনারের বিনিময়ে সে দশ হাজার খৃস্টানকে মুক্ত করে নেয়।

ফটকে বাইতুল মুকাদ্দাস ত্যাগকারী খৃস্টানদের ভিড় জমে যায়। তারা গোটা পরিবারের পণ আদায় করে করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বিজিত নগরীকে বিজয়ী বাহিনীর নির্বিচার লুণ্ঠন করা একটি সাধারণ নিয়ম। বাইতুল মুকাদ্দাস তো সেই নগরী, যেখানে জয়লাভের পর খৃস্টানরা মুসলমানদের গণহত্যা করেছিলো, তাদের বাড়ি-ঘর লুট করেছিলো, যুবতী কন্যা ও মসজিদগুলোর অবমাননা করেছিলো। কিন্তু সেই বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করার পর লুটপাটের পরিবর্তে সুলতান আইউবীর বাহিনী এবং বাইরে থেকে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যাওয়া মুসলিম ব্যবসায়ীগণ খৃস্টানদের ঘরের মালামাল ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করে নেয়, যাতে তারা পণ আদায় করে বেরিয়ে যেতে পারে। এতে সেই খৃস্টান পরিবারগুলোও মুক্তি পেয়ে যায়, যাদের নিকট পণ আদায় করার মতো নগদ অর্থ ছিলো না।

বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রধান প্যাট্রিয়ক হারকিডলেস দেখান ভিন্ন এক চরিত্র। তিনি সকল গীর্জার সঞ্চিত অর্থ একা কুক্ষিগত করে ফেলেন। গীর্জাগুলোর সোনার পেয়ালা ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু-সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যান। বর্ণিত আছে, এই সম্পদ এতো বেশি ছিলো যে, তার বিনিময়ে কয়েক হাজার গরীব খৃস্টান পরিবারকে মুক্ত করা যেতো। কিন্তু তাদের বড় পাদ্রী একজনেরও পণ আদায় করেননি। শুধু নিজের পণটুকু আদায় করে বেরিয়ে যান। একজন মুসলিম সৈনিক টের পেয়ে যায়, লোকটা বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে। তার রিপোর্ট মোতাবেক এক কর্মকর্তা সুলতান আইউবীকে বিষয়টি অবহিত করেন। কিন্তু সুলতান আইউবী বললেন– 'সে যদি পণ আদায় করে থাকে, তাহলে তাকে বাধা দিও না। আমি কারো থেকে অতিরিক্ত মূল্য নিতে বারণ করে দিয়েছি। আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি না।'

সুলতান আইউবী এই পণ আদায় করে বাইতুল মুকাদ্দাস ত্যাগ করার মেয়াদ চল্লিশ দিন নির্ধারণ করেন। চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কয়েক হাজার গরীব-অসহায় খৃস্টান নগরীতে রয়ে যায়। নব্বই বছর আগে খৃস্টানরা যখন বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করেছিলো, তখন

দূর-দূরান্ত থেকে খৃস্টানরা সেখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলো। কোনদিন আবার সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, তাদের কল্পনায়ও ছিলো না। এই অবস্থা দেখে সুলতান আইউবীর ভাই আল-আদিল সুলতানের নিকট আসেন।

'সুলতানে মুহ্তারাম!'- আল-আদিল বললেন- 'আপনি জানেন এই নগরী জয়ে আমার ও আমার সেনা ইউনিটের অবদান কতোখানি। তার বিনিময়ে গোলাম হিসেবে আমাকে এক হাজার খৃস্টান দান করুন।'

'এতো গোলাম কী করবে?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

'আমি যা খুশি করবো।'

সুলতান আইউবী আল-আদিলকে এক হাজার খৃস্টান দিয়ে দেয়ার আদেশ দেন। অনুমোদন পেয়ে আল-আদিল এক হাজার খৃস্টান নির্বাচন করে তাদেরকে ফটকের নিকট নিয়ে মুক্ত করে দেন।

'মহামান্য সুলতান!'- আল-আদিল ফিরে এসে সুলতান আইউবীকে বললেন- 'আমি সে সকল নাগরিককে নগরী থেকে বিদায় করে দিয়েছি। তাদের কাছে পণ আদায় করার মতো অর্থ ছিলো না।'

'আমি জানতাম তুমি এমনই করবে'- সুলতান আইউবী বললেন- 'অন্যথায় আমি তোমাকে একটি গোলামও দিতাম না। মানুষ মানুষের গোলাম হতে পারে না। আল্লাহ্ তোমার এই পুণ্য কবুল করুন।'

এসব কাহিনী রূপকথা নয়। ঐতিহাসিকদের বর্ণিত বাস্তব সত্য। তারা লিখেছেন, একদল খৃস্টান মহিলা সুলতান আইউবীর নিকট আসে। জানা গেলো, এরা নিহত কিংবা বন্দি হওয়া খৃস্টানদের স্ত্রী, কন্যা, বোন। এদের কাছে পণ আদায় করার অর্থ নেই। সুলতান আইউবী তাদেরকে শুধু মুক্তই করে দেননি, বরং প্রত্যেককে কিছু কিছু করে অর্থ দিয়ে বিদায় করে দেন। তারপর তিনি ঘোষণা দেন, এখনো যেসব খৃস্টান নগরীতে রয়ে গেছে, তাদের পণ মাফ করে দেয়া হলো। তারা এমনিতেই চলে যেতে পারে। বাইতুল মুকাদ্দাসে শুধু খৃস্টান বন্দিরাই অবশিষ্ট থাকে।

ইতিমধ্যে সুলতান আইউবী মসজিদ পরিচ্ছন্ন ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে ফেলেন। ঐতিহাসিক সূত্রমতে, মেরামত কাজে সুলতান স্বয়ং ইট-পাথর বহন করেছিলেন। ১১৮৭ সালের ১৯ অক্টোবর শুক্রবার সুলতান আইউবী জুমার নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আকসায় গমন করেন। নুরুদ্দীন জঙ্গীর প্রস্তুতকৃত মিম্বরটি তাঁর সঙ্গে। তিনি নিজ হাতে

মিম্বরটি মসজিদে রাখেন। দামেশ্ক থেকে আসা এক খতীব জুমার খুতবা পাঠ করেন।

এবার সুলতান আইউবী মসজিদের সাজসজ্জার প্রতি মনোনিবেশ করেন। মেঝেতে মর্মর পাথর স্থাপন করেন এবং মনের মতো করে মসজিদটি সুদৃশ্য করে তোলেন। সুলতান আইউবী নিজ হাতে যে সুন্দর সুন্দর পাথরগুলো স্থাপন করেছিলেন, আজও সেসব মসজিদে আকসায় বর্তমান রয়েছে এবং তার সৌন্দর্য এতোটুকুও বিনষ্ট বা বিকৃত হয়নি। এখনো সেদিনেরই ন্যায় চকচক করছে।

বায়তুল মুকাদ্দাস জয় ইসলামের ইতিহাসের বিরাট এক ঘটনা এবং এক সুমহান কীর্তি। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জিহাদ এখনো শেষ হয়নি। তাঁর আরব ভূখণ্ড ও ফিলিস্তীনকে খৃষ্টানদের থেকে মুক্ত করতে হবে। বাইতুল মুকাদ্দাসকে তিনি একদিকে যেমন ইসলামী শক্তির শক্ত এক ঘাঁটিতে পরিণত করেন, তেমনি এই পবিত্র স্থানটিকে ইসলামী জ্ঞানের কেন্দ্রের রূপদান করেন। ৫৮৩ হিজরীর ৫ রমযান মোতাবেক ১১৮৭ খৃষ্টাব্দের ৮ নবেম্বর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রওনা হন। গতি তাঁর উত্তর দিকে। তিনি পুত্র আল-মালিকুয যাহিরকে– যিনি অন্য কোথাও অবস্থান করছিলেন– বার্তা প্রেরণ করেন, তুমি তোমার সঙ্গীদেরসহ আমার নিকট চলে আসো। সুলতান টায়েরের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। এটি ক্রুসেডারদের একটি শক্ত ক্যাম্প এবং বন্দর অঞ্চল। সুলতান নৌবাহিনীর কমান্ডার আল-ফারেসকে বার্তা পাঠান, যেনো তিনি টায়েরের খানিক দূরে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সুলতান যখন এই নগরীটা আক্রমণ করবেন, তখন যেনো তিনি খৃস্টান নৌবহরের উপর আক্রমণ চালান। সুলতান আইউবী আল-ফারেসকে যে দিনটির কথা বলেন, সেটি ডিসেম্বরের শেষ কিংবা জানুয়ারির শুরুর দিককার কোনো একটি দিন ছিলো।

মেয়ে দুটো আল-ফারেসের জাহাজে অবস্থান করছে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর প্রেরিতে গোয়েন্দা জাহাজে নেই। হাসান বাইতুল মুকাদ্দাসের যুদ্ধ এবং বিজয় পরবর্তী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এদিক থেকে অবসর হলে তার মনে পড়ে, আল-ফারেসের জাহাজে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলেন। লোকটি কী করছে জানার জন্য তিনি রউফ কুর্দির

নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। দূতের জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছুতে কয়েকদিন লেগে যায়। রউফ কুর্দি দূতকে জানায়, সেই গোয়েন্দা অনেক দিন হলো চলে গেছে।

কিন্তু গোয়েন্দা এতোক্ষণে রোম উপসাগরে মাছের পেটে হজম হয়ে গেছে। রউফ কুর্দি তার এই পরিণতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। দিন কয়েক আগে গোয়েন্দা রউফ কুর্দিকে বলেছিলো, আমি এই মেয়েগুলোকে এখানে থাকতে দেবো না। সে দেখেছে, জাহাজ যখন কূলে গিয়ে নোঙ্গর ফেলে, তখন ছোট ছোট অনেক ডিঙ্গি তার নিকটে এসে পড়ে এবং মৎস্য শিকারীরূপী অনেক লোক নানা জিনিস বিক্রি করে। তাদের একজনকে সে কয়েক জায়গায় দেখেছে। মেয়ে দুটো তাকে রশির সিঁড়িতে করে উপরে তুলে আনে এবং কিছু ক্রয় করার পরিবর্তে তার সঙ্গে কথা বলে। জাহাজ যখন দশ-পনের মাইল দূরে কূলে কোথাও অবস্থান করে, তখনো এই লোকটি ডিঙি নিয়ে এসে পড়ে। এই লোকটার প্রতি গোয়েন্দার সন্দেহ জন্মে যায়।

ফ্লোরি রউফ কুর্দির বিবেক মেরে ফেলেছে। সে তাকে নানা গোপন তথ্য জিজ্ঞেস করছে এবং অবলীলায় সব বলে দিচ্ছে। আল-ফারেস অনেক ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তিনি মাঝে-মধ্যে অন্যান্য জাহাজেও চলে যাচ্ছেন এবং খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। একদিন রউফ কুর্দি ফ্লোরির যাদুতে বিমোহিত হয়ে আবেগের আতিশয্যে বলে দেয়, জাহাজে একজন বিপজ্জনক লোক আছে। তার সঙ্গে কোনো কথা বলো না। রউফ কুর্দি এখনো মেয়েগুলোকে যাযাবরই মনে করছে এবং তাদের আসল নাম ফ্লোরি ও রোজি সম্পর্কে অনবহিত। মেয়েগুলো মূলত অভিজ্ঞ গুপ্তচর। ফ্লোরি বুঝে ফেলে, রউফ কুর্দি যার কথা বলছে, সে একজন গোয়েন্দা। ফ্লোরি জাহাজ থেকে চলে যাক, রউফ কুর্দি মেনে নিতে পারছেন না। তাই সে মেয়েগুলোকে জানিয়ে দেয়, এই লোকটি গোয়েন্দা, তোমরা তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

এক রাতে আল-ফারেস অন্য এক জাহাজে যান। মধ্যরাতে রউফ কুর্দি ও ফ্লোরি জাহাজের ছাদের উপর রেলিংয়ের সঙ্গে এমন এক স্থানে লুকিয়ে যায়, যার পেছনে ও ডানে-বাঁয়ে অনেক মালপত্র পড়ে আছে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর গোয়েন্দা জ্ঞাতসারে কিংবা ঘটনাক্রমে ওদিকে চলে যায়। সে দু'জনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে। রউফ কুর্দি ভীত

হওয়া কিংবা মিথ্যা বুঝ দেয়ার পরিবর্তে তাকে সরিয়ে খানিক আড়ালে নিয়ে যায় এবং বলে, মেয়েটাকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলাম, তোমরা আসলে কারা। আমি চলে যাচ্ছি, তুমি তার পাশে বসে যাও এবং নিজের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যা অনুসারে কথা বলে তার থেকে তথ্য উদ্ধার করো, তারা কারা।

গোয়েন্দাকে ফ্লোরির কাছে বসিয়ে দিয়ে রউফ কুর্দি কক্ষে গিয়ে রোজিকে জাগিয়ে তোলে। বলে, শিকার অমুক জায়গায় আছে। তুমিও চলে যাও। আমি কেউ এসে পড়ে কিনা এদিক-ওদিক দেখতে থাকি।

রোজি ছাদে আসে। রউফ কুর্দি তাকে হাত দুয়েক লম্বা একটা রশি দিয়ে দেয়। গোয়েন্দা ও ফ্লোরি যেখানে বসা আছে, রোজি সেখানে চলে যায়। জায়গাটায় অন্ধকার। রোজি আস্তে করে তাদের কাছে বসে পড়ে : গোয়েন্দার গল্প-গুজবের এক ফাঁকে রোজি রশিটা তার গলায় পেঁচিয়ে ধরে। মেয়ে দুটো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফ্লোরি সঙ্গে সঙ্গে রশির অপর মাথা ধরে ফেলে। গোয়েন্দা নিজেকে রক্ষা করার জন্য হাত-পা ছোঁড়ার আগেই মেয়েরা দু'দিক থেকে টান দিয়ে তার গলার ফাঁস শক্ত করে ফেলে। ক্ষণকাল ছটফট করে করে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর গোয়েন্দা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

রউফ কুর্দি খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো। এক কর্মচারি ওদিকে আসতে চাইলে কাজের কথা বলে তাকে সরিয়ে দেয়। মেয়ে দুটো গোয়েন্দার মৃতদেহটা সমুদ্রে ফেলে দেয়। রোজি চলে যায়। ফ্লোরি ওখানেই বসে থাকে। রউফ কুর্দি তার নিকট ফিরে আসে এবং দু'জনে দু'জনের মাঝে হারিয়ে যায়।

আল-ফারেস জানেনই না তার জাহাজে কোনো গোয়েন্দা এসেছে কিংবা রউফ কুর্দি নতুন কাউকে চাকরিতে নিয়োগদান করেছে। গোয়েন্দার হত্যাকাণ্ডের তিন-চার দিন পর আল-ফারেসের মনে ভাবনা জাগে, নিজের ও অন্যান্য জাহাজের মাল্লা ও সৈনিকরা মাসের পর মাস সমুদ্রে নিরানন্দ জীবন-যাপন করছে এবং এতো দিনে সবাই ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠেছে। অন্যান্য জাহাজে গিয়ে তিনি মাল্লা ও সৈনিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। কারোরই মন ভালো নেই। মাঝে-মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলেও তাদের মনের অবস্থা অন্তত এরূপ হতো না। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেন, কোনো এক রাতে সবাইকে একত্রিত করে একটা বিনোদন ও ভোজসভার আয়োজন করবেন।

আল-ফারেস রউফ কুর্দি এবং অন্যান্য অধীন অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনার সময় মেয়ে দুটোও উপস্থিত ছিলো। তারা খুশিতে আটখানা হয়ে বললো, আমরা নাচবো। আল-ফারেস প্রাণোচ্ছল-ফূর্তিবাজ মানুষ। তিনি মেয়েদের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেন। তবে অনুষ্ঠান কোন্ রাতে হবে এখনো ঠিক করেননি। কারণ, তিনি স্থল থেকে সুলতান আইউবীর দূতের অপেক্ষা করছেন। সময়টা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ।

দু'দিন পর দূত এসে পৌঁছে। জানায়, সুলতান আইউবী টায়ের থেকে সামান্য দূরে এসে অবস্থান নিয়েছেন। আপনি বহর নিয়ে টায়েরের কাছাকাছি চলে যান, যাতে প্রয়োজনের সময় দ্রুত টায়ের পৌঁছে যেতে পারেন। দূত বিশেষভাবে সতর্ক করে, এখন দিন-রাত সব সময় চৌকস থাকতে হবে। কেননা, খৃস্টান রণতরীগুলো নিকটেই অবস্থান করছে। আল-ফারেস দূতকে বিদায় দিয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় বিক্ষিপ্ত জাহাজগুলোকে এক স্থানে একত্রিত করার ইঙ্গিত দিয়ে দেন। তিনি রউফ কুর্দিকে জানান, সম্ভবত দিন কয়েকের মধ্যেই আমাদেরকে নৌযুদ্ধ লড়তে হবে। কাজেই, অনুষ্ঠানটা দু'রাত পরই আয়োজন করে ফেললে ভালো হয়।

রউফ কুর্দি মেয়েদেরকে জানিয়ে দেয়, অমুক রাত জাহাজগুলো একত্রিত হবে এবং আমাদের বিনোদন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

এন্ড্রুর আসা-যাওয়া অব্যাহত রয়েছে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর গোয়েন্দা তাকে কয়েক জায়গায় দেখেছিলো। এখন যখন জাহাজগুলো কূলে এসে ভিড়ে, তো এন্ড্রু এসে পড়ে। মেয়েরা যথারীতি তাকে উপরে তুলে আনে এবং কেনাকাটার ছলে তার কানে তথ্য দিয়ে দেয়, অমুক রাত জাহাজগুলো একত্রিত হবে এবং এই জাহাজের ছাদে বিনোদন অনুষ্ঠান হবে। সে এই বলে চলে যায় যে, সে রাতে আমার ডিঙ্গি আসবে। তোমরা সিঁড়ি ফেলে আমাকে উপরে তুলে নেবে।'

আজ সেই রাত। ছয়টি জাহাজ পাল খুলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজগুলোর ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য অফিসার– আল-ফারেসের জাহাজে এসে সমবেত হয়েছে। উন্নতমানের সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত হচ্ছে। মাল্লা ও সৈনিকগণ নিজ নিজ জাহাজে উৎসব করছে। আল-ফারেসের জাহাজে

মেয়ে দুটো নাচছে। দফ ও সারেন্দার বাজনা চলছে। জাহাজে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে। রাতকে দিনে পরিণত করা হয়েছে।

উৎসব যখন তুঙ্গে ওঠে, তখন রাত অনেক কেটে গেছে। খৃস্টানদের দশ-বারোটি রণতরী আল-ফারেসের জাহাজের দিকে বাতি নিভিয়ে এগিয়ে আসছে। নবচন্দ্রের বিন্যাসে আসছে জাহাজগুলো। নিকটে এসে পৌঁছার পরও কারো খবর হয়নি, শত্রুর নৌবহর আসছে। এদিকে ছোট একটি ডিঙি নৌকা আল-ফারেসের জাহাজের দিকে এগিয়ে আসে। হঠাৎ আল-ফারেসের জাহাজগুলোর উপর জ্বলন্ত গোলা এসে পড়তে শুরু করে এবং এমন মুষলধারায় তীর আসতে শুরু করে যে, মুহূর্ত মধ্যে কয়েকজন মাল্লা ও সৈনিক লুটিয়ে পড়ে। আল-ফারেস ও তার কাপ্তানগণ এই অতর্কিত আক্রমণ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু জাহাজ বের করে নেয়া সম্ভব হলো না। সৈনিকরা তীর ছুঁড়ে আক্রমণের উত্তর দেয়। মিনজানিক দ্বারা গোলা নিক্ষেপ করা হয়। একটি খৃস্টান জাহাজে আগুন ধরে যায়। কিন্তু খৃস্টানরা তাদের কার্যসিদ্ধি করে ফেলে। তাদের জাহাজ ফিরে চলে যায়।

যুদ্ধ যেরূপ হঠাৎ শুরু হয়েছিলো, তেমনি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের বিবরণ তোমাবেক আল-ফারেসের পাঁচটি জাহাজ পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এ ঘটনা ৫৮৩ হিজরীর ২৭ শাওয়াল মোতাবেক ১১৮৭ খৃস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ঘটে।

জাহাজগুলো জ্বলছিলো। প্রজ্বলমান জাহাজের আলোতে এক ব্যক্তি দেখে একটি ডিঙি চলে যাচ্ছে, যাতে দু'জন পুরুষ ও দু'জন নারী। আল-ফারেস জাহাজ দেখে নৌকা নামিয়ে দিয়ে ধাওয়া করে তাদের ধরার চেষ্টা করেন। এদিক থেকেও তীর ছোঁড়া হয়। ডিঙিটি ঘিরে ফেলা হয়। পুরুষ দু'জন ও এক নারী তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। এক মেয়ে রক্ষা পেয়েছে। পরে তার থেকে প্রাপ্ত তথ্যে এই ধ্বংসযজ্ঞের প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হয়েছে।

সে সময় সুলতান আইউবী টায়ের থেকে সামান্য দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকেই তাঁর সোজা টায়ের আক্রমণ করার পরিকল্পনা। রওনার একদিন আগে তিনি সংবাদ পান, ছয় জাহাজের পাঁচটি ধ্বংস হয়ে গেছে। শুনে তিনি স্তব্ধ হয়ে যান। এ মুহূর্তে এরূপ দুঃসংবাদ শুনতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অগ্রযাত্রা মুলতবি করে

দেন এবং আল-ফারেস ও জাহাজের কাপ্তানদের ডেকে পাঠান। আল-ফারেস সোজাসাপ্টা উত্তর দেন, সৈনিকদের বিনোদনের জন্য আমরা একটু উৎসবের আয়োজন করেছিলাম। সবাই আনন্দে মেতে ছিলো। সে ফাঁকে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে।

সুলতান আইউবী তাঁর সালার ও উপদেষ্টাদের বৈঠক ডাকেন। সকলকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। সবাই পরামর্শ দেয়, প্রচণ্ড শীত পড়ছে। বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। এ মওসুমে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া অবিরাম যুদ্ধে সৈনিকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় তাদের দ্বারা যুদ্ধ করানো অবিচার হবে। পরিণামে পরাজয় আসতে পারে। তারা নৌবহরের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সুলতান আইউবীকে বুঝাবার চেষ্টা করে, এতো দীর্ঘ সময় সৈনিকদেরকে বাড়ি-ঘর থেকে দূরে রাখার প্রতিক্রিয়া এমনই হয়ে থাকে। এমন না হয় যেনো, বাইতুল মুকাদ্দাসের মহান বিজয়ও আমাদের জন্য নতুন কোনো দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুলতান আইউবী একনায়ক শাসক নন। তিনি নায়েব-উপদেষ্টাদের পরামর্শ গ্রহণ করে নেন এবং আদেশ জারি করেন, বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে যে অস্থায়ী বাহিনী গঠন করা হয়েছিলো, সেগুলো ভেঙে দেয়া হোক এবং কিছু অর্থ প্রদান করে তাদের বাড়ি-ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হোক। তিনি তার নিয়মতান্ত্রিক সৈন্যদের একাংশকেও অল্প ক'দিনের ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন এবং নিজে ১১৮৮ সালের ২০ জানুয়ারি আক্রার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। মার্চ পর্যন্ত সুলতান আইউবী আক্রায় অবস্থান করেন।

রানী সাবীলা

ক্রুসেড যুদ্ধ তুঙ্গে পৌছে গিয়েছিলো। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাইতুল মুকাদ্দাস জয় সমগ্র ইউরোপকে তীব্র এক ভূ-কম্পনের ন্যায় কাঁপিয়ে তোলে। সুলতান আইউবী জীবনের মিশন বাস্তবায়িত করে ফেলেছেন। বাইতুল মুকাদ্দাস জয় ছিলো তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য। তবে বাইতুল মুকাদ্দাসকে ক্রুসেডারদের দখল থেকে মুক্ত করাই যথেষ্ট ছিলো না। এই পবিত্র নগরীটির প্রতিরক্ষা সৃদুঢ় করাও আবশ্যক ছিলো। তার জন্য নগরীর চারদিকে শক্ত প্রাচীর নির্মাণের পাশাপাশি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আশপাশের অঞ্চল এবং উপকূলীয় এলাকাগুলো দখলে আনাও জরুরি। ইতিমধ্যে সুলতান আইউবী অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করেও ফেলেছেন। অবশিষ্টগুলোর উপর সুলতানের বাহিনী আক্রমণ করছে আর দখল করে নিচ্ছে।

বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে খৃস্টান নাগরিকরা পালিয়ে যাচ্ছে। যেসব অঞ্চলের উপর খৃস্টানদের দখল ছিলো, সেখানে তারা মুসলমানদের বেঁচে থাকাকে হারাম করে রেখেছিলেন। তাদের জন্য মুসলমানদের গণহত্যা দৈনন্দিন কর্মসূচি ও ধর্মীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তার বিপরীতে সুলতান আইউবী যখন যে অঞ্চল জয় করতেন, সেখানকার খৃস্টান অধিবাসীদেরকে নিজ বাহিনীর নিরাপত্তায় বের করে দিতেন, যাতে বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এখন ফিলিস্তীনেও তিনি একই নীতি অবলম্বন করেন। একজন খৃস্টান নাগরিকও যাতে নিগ্রহের শিকার না হয়, সুলতান আইউবী তার নিশ্চয়তা বিধান করেন।

হেডকোয়ার্টার থেকে যতোই দূরে থাকুক না কেনো, সুলতান আইউবী তাঁর প্রতিটি ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখছেন এবং তাদেরকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছেন। নিয়ন্ত্রণের বাইরে কাউকে কিছু করতে দিচ্ছেন না। গেরিলা বাহিনী শকুন ও ব্যাঘ্রের ন্যায় পাহাড়-পর্বত ও বন-বিয়াবানে

ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানেই খৃস্টান বাহিনীর কোনো ইউনিট কিংবা রসদের বহর চোখে পড়ছে, অমনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কমান্ডো আক্রমণ করছে, হতাহত করছে ও বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের ঘোড়া, অস্ত্র ও রসদ সরঞ্জামাদি তুলে আনছে।

এই গেরিলারা যেসব কমান্ডো অভিযান পরিচালনা করেছে, ইসলামের ইতিহাসে সে এক বিস্ময়কর, ঈমানদীপ্ত ও অস্বাভাবিক বীরত্বের কাহিনী। তার প্রতিটি কাহিনী লিখতে গেলে এই সিরিজ শেষ হবে না। তারা ছিলো ফিলিস্তীনের মাটির প্রহরী। তারা একজন একজন দু'জন দু'জন ও চারজন চারজনের দলে বিভক্ত হয়ে শত শতজনের শত্রুসেনা দল ও ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালিয়ে রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেতো কিংবা নিজেদেরই রক্তে ডুবে যেতো। নিজেদের লাগানো আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হতো। শহীদ হওয়ার পর তাদের কপালে কাফন জোটেনি। কেউ তাদের জানাযা পড়েনি। কাউকে সসম্মানে কবরস্ত করা হয়নি।

তারা শত্রুর উপর গজবরূপে আবির্ভূত হতো। তাদেরই উপর নির্ভর করে বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পর সুলতান আইউবী সমগ্র ফিলিস্তীনে সিংহের ন্যায় হুংকার দিয়ে চলছিলেন। সুলতান আইউবীর এই গেরিলা ও কমান্ডো বাহিনীগুলো সম্পর্কে প্রখ্যাত ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লেনপোল লিখেছেন–

'এই বিধর্মীরা (মুসলমানরা) আমাদের নাইটদের ন্যায় ভারি বর্ম পরিধান করতো না। অথচ তারা আমাদের বর্মপরিহিত নাইটদেরকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে দিতো। তাদের উপর আক্রমণ হলে তারা পালাতো না। তাদের ঘোড়াগুলো সমগ্র পৃথিবীতে সবচে' দ্রুতগামী ঘোড়া বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তারা যখন দেখতো, খৃস্টানরা তাদের পেছন থেকে সরে গেছে, তখন তারা পুনরায় ফিরে আসতো। এরা ছিলো সেই ক্লান্তিহীন মাছির ন্যায়, যাদেকে উড়িয়ে দিলে মুহূর্তের জন্য উড়ে আবার ফিরে এসে গায়ে বসে। সারাক্ষণ দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখলে সরে থাকে। যখনই এই প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেয়া হয়, অমনি কমান্ডো হামলা করে বসে। তারা পার্বত্য অঞ্চলের ঝড়-বৃষ্টির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে এসে খৃস্টান বাহিনীর বিন্যাস চুরমার করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতো। তারা আমাদের নাইটদেরকে পায়ে পায়ে অস্থির এবং বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে শ্লথ করে রাখতো।'

❖ ❖ ❖

বর্তমানে যে ভূখণ্ডটিকে 'ইসরাইল' বলা হয়, এটিই সেই পবিত্র ভূমি, যাকে খৃস্টানদের থেকে মুক্ত করার জন্য সুলতান আইউবীর আমলে আল্লাহর এক একজন সৈনিক সেখানে নিজ দেহের রক্তের নজরানা দিয়েছিলো। সুলতান আইউবী কয়েকটি বসতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মাঝে-মধ্যে মনে হতো তাঁর হৃদয়ে একবিন্দু মমতা নেই। কিন্তু তিনি মমতার এমন এক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যে, খৃস্টান ঐতিহাসিকরাও তার প্রশংসা করেছেন। তার নিকট দয়া ভিক্ষার জন্য খৃস্টানদের এক রানীও এসেছিলেন। এসেছিলো এক অসহায় গরীব খৃস্টান মহিলাও।

খৃস্টান রানীর নাম ছিলো সাবীলা। মহিলা প্রখ্যাত খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডের স্ত্রী ছিলেন। হিত্তীন যুদ্ধের সময় তিনি তাবরিয়ার দুর্গের রানী ছিলেন। রেমন্ড হিত্তীনের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার স্ত্রী তাবরিয়ার দুর্গ সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সুলতান আইউবী তাকে বন্দি করেননি। সেই যুদ্ধে বাইতুল মুকাদ্দাসের সম্রাট গাই অফ লুজিনান সুলতান আইউবীর হাতে বন্দি হয়েছিলেন।

বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পর সুলতান আইউবী আক্রায় ক্যাম্প স্থাপন করে অবস্থান করছেন। তার নিকট সংবাদ আসে, রানী সাবীলা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। সুলতান তাকে বারণ করেননি। বরং এগিয়ে গিয়ে রানীকে স্বাগত জানান।

'সালাহুদ্দীন!'— রানী সাবীলা বললেন— 'আপনি কি জানেন, কতো হাজার নাকি কতো লাখ খৃস্টান গৃহহীন হয়ে পড়েছে? তাদের উপর এই অবিচার আপনার নির্দেশে হয়েছে।'

'আর আপনারা যে নিরপরাধ মুসলমানদের গণহত্যা করিয়েছেন এবং করিয়ে যাচ্ছেন, সেটা কার আদেশে হয়েছিলো?'— সুলতান আইউবী তার উত্তরের অপেক্ষা না করে বললেন— 'আমি যদি রক্তের বদলা রক্ত দ্বারা গ্রহণ করি, তাহলে একজন খৃস্টানও রক্ষা পাবে না। তা আপনি কেনো এসেছেন? আমার নিকট এই অভিযোগ দায়ের করতে?'

'না'— রানী সাবীলা উত্তর দেন— 'আমি একটি আবেদন নিয়ে এসেছি। গাই অফ লুজিনান আপনার হাতে যুদ্ধবন্দি হয়ে আছেন। আমি তাঁকে মুক্ত করতে এসেছি।'

'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো না, তাকে কেনো মুক্ত করতে

চাচ্ছেন'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তবে জানতে চাই, তাকে কোন্ শর্তে মুক্তি দেবো?'

'আপনার পুত্র কিংবা ভাই যদি শত্রুর হাতে বন্দি হয়, তাহলে কি আপনি তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন না?' রানী সাবীলা পাল্টা প্রশ্ন করেন।

'আপনাদের নিকট আমার যতো কমান্ডার ও সৈনিক বন্দি আছে, তারা সকলে আমার পুত্র-ভাই'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যদি স্বয়ং আমিও বন্দি হয়ে যাই, তবু আপনার নিকট আমি মুক্তি ভিক্ষা চাইবো না। আমার কোনো পুত্র কিংবা ভাই আমাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য আপনার নিকট যাবে না।'

'সালাহুদ্দীন!'– রানী সাবীলা বললেন– 'আপনি নিজে রাজা। নিশ্চয়ই বোঝেন, একজন রাজার কারাগারে পড়ে থাকা তাঁর জন্য কতো বড় অপমান। তিনি তো জেরুজালেম এবং আশপাশের দূর-দূরান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন।'

'জেরুজালেম নয়– বায়তুল মুকাদ্দাস'– সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন– 'তোমাদের গাই এই ভূ-খণ্ডটির লুটেরা ছিলেন। আমরা কোনো লুটেরাকে সম্রাট বলি না। যদি বলতেন, তিনি ইসলামের মূলোৎপাটন করে এখানে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন, তাহলে আমি আপনাকেও শ্রদ্ধা করতাম এবং তাকেও। আমি সেই লোকদের মন-প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করি, যারা আপন ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। হোক তার ধর্ম ভিত্তিহীন বা মিথ্যা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি না নিজেকে রাজা মনে করি, না কারো রাজত্ব স্বীকার করি। রাজত্ব শুধুই আল্লাহর। আমরা তাঁর রাজত্বের পাহারাদার ও সংরক্ষক মাত্র। আমরা আল্লাহর সৈনিক।'

'আমরাও খোদার রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ করছি।' রানী সাবীলা বললেন।

'আমি যে খোদায় বিশ্বাসী, আপনিও যদি সেই একই খোদায় বিশ্বাসী হতেন, তাহলে রাজার নয়– রাজার সাধারণ সৈনিকদের মুক্তির আবেদন নিয়ে আসতেন'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আপনার অস্বীকার না করা উচিত, এই ভূখণ্ড আমাদের– আপনাদের নয়। খৃস্টানরা এখানে শান্তিপ্রিয় নাগরিকের ন্যায় থাকতে পারে– রাজা হয়ে নয়। আপনার খৃস্টান বন্ধুদের বলে দিন, তারা মানুষের খুন ও লুটপাট থেকে ফিরে আসুক এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাক। আপনাদের প্রতিটি অস্ত্রই ব্যর্থ হয়েছে। আপনারা আপন নিষ্পাপ মেয়েদেরকে পাপের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন এবং তাদের

সম্ভ্রম বিকিয়ে দিয়েছেন। আপনারা আমাদের ধর্মনেতাদের ছদ্মবেশে নাশকতাকারী সন্ত্রাসী প্রেরণ করে আমার জাতির বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন। আপনারা হীরা-জহরত, মদ ও রূপসী মেয়েদের দ্বারা আমার জাতির মাঝে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করেছেন এবং গৃহযুদ্ধ করিয়েছেন। আপনারা হাশিশিদের দ্বারা আমাকে হত্যা করাবার একাধিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। হ্যাঁ, ক্রুশের রানী! একটি কাজে আপনারা সফল হয়েছেন যে, আপনারা ইসলামী সাম্রাজ্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের দ্বারা মুসলমানের রক্ত ঝরিয়েছেন।'

'আমার প্রিয় সুলতান!'– রানী সাবীলা বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার মানসে বললেন– 'আমি এতো দীর্ঘ ও জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। আমি একটি আবেদন নিয়ে এসেছি। আপনি গাই অফ লুজিনানকে মুক্তি দিন।'

'আমি জানি, এরপর আপনি আর আমার কাছে আসবেন না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কেবল আমার এই তাঁবুতেই নয়– এরপর আপনাকে কোনোদিন এই ভূখণ্ডের কোথাও দেখা যাবে না। আমি আপনাকে আলোচনায় জড়িয়ে রাখতে চাই না। আপনাকে আমি একটি বার্তা দিচ্ছি। এই বার্তাটি আপনি আপনার ক্রুশের সকল পূজারীর কানে পৌঁছিয়ে দেবেন।'...

'কোথায় আপনাদের সেই বড় ক্রুশ, যার উপর হাত রেখে আপনারা শপথ নিয়েছিলেন যে, আরব ভূমিকে পদানত করবেন, মসজিদে আকসা ও খানায়ে কা'বাকে নিশ্চিহ্ন করে নিজেদের উপাসনালয় বানাবেন? সেই ক্রুশ আমার কজায়। আর আপনাদের সেই প্রত্যয় এখন আমার অনুগ্রহ-অনুকম্পার প্রত্যাশী। যে ভূখণ্ডটিকে আপনারা জেরুজালেম বলেন, সেটি এখন বাইতুল মুকাদ্দাস এবং চিরদিন বাইতুল মুকাদ্দাসই থাকবে।'

'আপনার বাহিনী উন্নত এবং সংখ্যায় বেশি'– রানী সাবীলা বললেন– 'আমাদের বাহিনীর নেতৃত্ব ত্রুটিপূর্ণ।'

'বাস্তবকে লুকাবার চেষ্টা করবেন না রানী সাবীলা!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'নিজেকে ধোঁকা দেবেন না। আত্মপ্রতারণা পরাজয়ের লক্ষণ। আমার সেনাসংখ্যা কোনোদিন খৃস্টান বাহিনীর চেয়ে বেশি ছিলো না। উন্নতও নয়। আমার ফৌজের কপালে কখনো বর্ম জোটেনি। আপনাদের

সালারদের তাঁবুতে যেরূপ রূপসী নারীরা শোভা পায়, আমার সালাররা সেরূপ নারী কখনো পায়নি। আমার সৈন্যদের অস্ত্র আপনাদের চেয়ে উন্নত নয়। তবে আমি আপনাকে আমাদের গোপন কথাটা বলে দিচ্ছি, আমার বাহিনীর কাছে একটি শক্তি আছে, আপনাদের বাহিনীর যার থেকে বঞ্চিত। আমরা তাকে ঈমান ও নবীপ্রেম বলি। আপনাদের বিশ্বাস যদি সঠিক হতো,তাহলে খোদা আপনাদের জাতির প্রিয়ভাজন হতেন। কিন্তু তারা তো অদ্বিতীয় এক খোদাকে এক পুত্রের জনক বানিয়ে রেখেছে। আপনারা খোদাকে মানুষের কাতারে নামিয়ে এনেছেন এবং তাঁর রাজত্বের কাছে নতি স্বীকারের পরিবর্তে নিজেদেরকে রাজার আসনে বসিয়েছেন।'

'আপনি কি আমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছেন?' রানী সাবীলা জিজ্ঞেস করেন।

'রানী সাবীলা!'– সুলতান আইউবী রানী সাবীলার কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর আঁচ করে বললেন– 'আমার আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, আমি তাদেরকে বিবেক দিয়েছি, কিন্তু তারা চিন্তা করে না। আমি তাদেরকে চোখ দিয়েছি; কিন্তু তারা দেখে না। আমি তাদের কান দিয়েছি; কিন্তু তারা শোনে না। মহান আল্লাহ আরো বলেছেন, আমি যখন তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত করি, তখন তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর মোহর এঁটে দেই। আপনি ইসলাম গ্রহণ না করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, বিজয় সে-ই লাভ করে, যার অন্তরে ঈমান থাকে। আমার জাতির কর্ণধারদের হৃদয় থেকে যখন আপনারা সম্পদ, নারী ও মদের মাধ্যমে ঈমান বের করে দিয়েছিলেন, তখন আমরা আপসে যুদ্ধ ও রক্তারক্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। আল্লাহ আমাদের শাস্তিদান করেছেন। সমগ্র জাতি পাপে লিপ্ত হয় না। পাপ করে কর্ণধাররা। কিন্তু শাস্তি ভোগ করে দেশের প্রতিজন নিরীহ মানুষ। জাতি পাপ করে না– তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়।'

'আমার আসল শক্তি হচ্ছে, আমি যখন পরাজিত হই, তখন তার দায়ভার নিজের মাথায় তুলে নেই। তখন জাতি পরাজয়কে জয়ে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়ে যায়। পরাজয়ের দায়ভার যদি একজন অপরজনের উপর চাপাতে চেষ্টা করে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে থাকে, তাহলে এক পরাজয়ের পর আরেক পরাজয় সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। আমি যদি তা-ই করতাম, তাহলে দ্বিধাবিভক্ত সালতানাতে ইসলামিয়া বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়তো। মুহতারামা! আমাদের গৃহযুদ্ধের জন্য দায়ী আস-সালিহ

ছিলো কিংবা সাইফুদ্দীন, আপনি ছিলেন অথবা গোমস্তগীন। কিন্তু আমি আমার সালারদের বলে দিয়েছি, এ দায়-দায়িত্বও আমার। তার মোকাবেলায় আমি প্রতিটি অস্ত্র ব্যবহার করেছি এবং আল্লাহর সৈনিকগণ রক্তের বিনিময়ে খণ্ডিত সাম্রাজ্যকে এক সুতোয় গেঁথে নিয়েছি। রক্তের আঁঠায় জোড়া লাগানো খণ্ড পরে কোনোদিন আলগা হয় না রানী সাবীলা! আপনি স্মরণ করুন, আপনাদের বাহিনী মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। অথচ আজ আপনি আমার নিকট আপনার একজন সম্রাটের মুক্তি ভিক্ষা চাচ্ছেন। এ কোন্ কাজের ফল? সে কাজটি হচ্ছে, মহান আল্লাহ আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমি জীবনের বাজি লাগিয়ে সে কর্তব্য পালন করেছি। আল্লাহ আমাকে তার জন্য পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।'

রানী সাবীলা মনোযোগ সহকারে সুলতান আইউবীর বক্তব্য শুনছিলেন। কিন্তু যৌবনদীপ্ত চিত্তাকর্ষক রূপসী নারী সাবীলার রাঙা ঠোঁটে অবজ্ঞার মুচকি হাসি, যে হাসির মর্ম সুলতান আইউবী ভালোভাবেই বোঝেন।

'আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি না'— সুলতান আইউবী বললেন— 'আপনার মুখের হাসি বলছে, এই তাঁবু থেকে বের হয়েই আপনি আমার কথাগুলো মস্তিষ্ক থেকে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলবেন, যেভাবে হিত্তীন ও বাইতুল মুকাদ্দাসে আপনাদের বাহিনী অস্ত্র ত্যাগ করেছিলো। কথাগুলো আমি আপনাকে এ জন্য বলছি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ আছে, যাদের চোখে আবরণ পড়ে গেছে, তাদের আবরণ খুলে দাও এবং তাদের হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও। ভেবে দেখুন সম্মানিতা রানী! আপনার স্বামী আমাকে হত্যা করার লক্ষ্যে চারবার সংহারী আক্রমণ করিয়েছিলো। একবার আমি গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিলাম। সে অবস্থায় তারা আমার উপর হামলা চালিয়েছিলো। কিন্তু হলো কী? তারা নিজেরাই খুন হলো। একবার আমি একাকি তাদের ঘেরাওয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি রক্ষা পেয়ে গেলাম আর তারা মারা গেলো। আপনার সেই স্বামী নিজেই শেষ পর্যন্ত সেই ফেদায়ীদের হাতে খুন হলো। কেউ তাকে রক্ষা করতে পারলো না। বিষয়টা একবার ভেবে দেখুন।'...

'মন দিয়ে শুনুন রানী! হিত্তীনের রণাঙ্গন থেকে আপনার স্বামী যুদ্ধ না করে পালিয়ে গিয়েছিলো। আপনিও বিনাযুদ্ধে তাবরিয়ার দুর্গ আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আপনারা সকলে যে বড় ক্রুশটির উপর হাত রেখে যুদ্ধ করার ও জীবন দেয়ার শপথ করেছিলেন, সেটি সেই রণাঙ্গনেই আপনাদের

সেই পাদ্রীর রক্তে ডুবে গিয়েছিলো, যাকে আপনারা ক্রুশের প্রধান মোহাফেজ বলে থাকেন। সেই ক্রুশ এখন আমার দখলে। আর আপনি আমার নিকট গাই অফ লুজিনানের মুক্তির আবেদন নিয়ে এসেছেন।'

'এ বিষয়গুলো আপনি আমাকে স্মরণ করাচ্ছেন কেনো?' রানী সাবীলা ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন।

'যাতে আপনি মহান আল্লাহর এই ইঙ্গিতগুলো বুঝতে পারেন'- সুলতান আইউবী উত্তর দেন- 'আপনার চোখের উপর রাজত্বের পট্টি বাঁধা আছে। রাজত্ব ও ক্ষমতা আপনার জন্য বিরাট এক গৌরবের বিষয়। তাছাড়া আশা করি, আপনি এই সত্যটাকেও অস্বীকার করবেন না যে, একজন রূপসী নারী হওয়ার জন্য আপনি গর্বিত। আমি একথা বলে আপনাকে খুশি করতে পারি যে, বাস্তবিকই আপনি সুন্দরী। তবে এ কথা বলে নিরাশও করবো যে, আপনার রূপে প্রভাবিত হয়ে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নেবো না। আপনার অর্ধনগ্ন দেহ আমাকে সরল-সঠিক পথ থেকে সরাতে পারবে না।'

রানী সাবীলা একজন সাধারণ মহিলার ন্যায় হেসে ওঠেন এবং বলেন- 'আমাকে বলা হয়েছিলো আপনি পাথর।'

সুলতান আইউবী মুচকি হেসে বললেন- 'আপনার জন্য আমি অবশ্যই পাথর। কিন্তু আসলে আমি এমন এক মোম, যা ঈমানের উত্তাপে গলে যায় এবং মমতার জযবাও তাকে গলিয়ে দেয়। দৈহিক সুখভোগ ও বিলাসিতা মানুষকে অকর্মণ্য করে তোলে। এমন ব্যক্তি না নিজের কোনো কাজে আসে, না জাতির। খোদার দরবারেও তার কোনো স্থান থাকে না।'

'আমি আপনার হৃদয়ে মমতার জযবা সৃষ্টি করতেই এসেছিলাম'- রানী সাবীলা বললেন- 'গাইকে মুক্তি দিন। আমি শুনেছি সাচ্চা মুসলমানের ঘরে যদি দুশমন ঢুকে পড়ে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।'

এবার রানী সাবীলা অনুনয়-বিনয়ের সুরেই কথা বলতে থাকেন। সুলতান আইউবী বললেন, গাইকে এক শর্তে মুক্তি দিতে পারি। সে আমাকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেবে, জীবনে কখনো আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না।

রানী সাবীলা বললেন, লিখিত শপথনামা দেয়া হবে। এ-ও লেখা হবে, যদি তিনি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং পরে কখনো গ্রেফতার হোন, তাহলে আপনি তাকে হত্যা করে ফেলবেন।

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যায়। রানী সাবীলা চলে যান।

সুলতান আইউবী সেদিনই গাই অফ লুজিনানের মুক্তির আদেশনামা দিয়ে দামেশ্‌কে দূত পাঠিয়ে দেন। তিন-চারদিন পর গাইকে সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে আসা হলো। সুলতান বললেন, চুক্তিনামাটি তাকে তার ভাষায় শোনাও। যদি সে প্রয়োজন মনে করে, তাহলে তার ভাষায়ও লিখে স্বাক্ষর নিয়ে নাও।

'আর তাকে বলে দাও, আমি তার সঙ্গে কোনো কথা বলবো না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তাকে বলে দাও, আমি জানি সে এই চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। তাকে আরো বলে দাও, রানী সাবীলার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আমি তাকে মুক্তি দেইনি। তাকে জানাতে চাই, আমি তার মতো অপরাধীকেও ক্ষমা করতে জানি। আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছি। কারো নিকট থেকে আমি ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে চাই না। আর সে যেখানে যেতে চায়, নিরাপত্তা প্রহরায় পৌঁছিয়ে দাও।'

গাই অফ লুজিনান– যিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনকর্তা ছিলেন এবং হিত্তীন যুদ্ধে যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন– শপথনামায় স্বাক্ষর করে সুলতান আইউবীর সম্মুখে এসে দাঁড়ান। সুলতান তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন। গাই আগ্রহের সঙ্গে সুলতানের সঙ্গে হাত মেলান এবং বললেন– 'আইউবী! তুমি মহান।'

গাই অফ লুজিনান মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে সুলতান আইউবীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে যান।

❖ ❖ ❖

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ গাই অফ লুজিনানের মুক্তির ঘটনা উল্লেখ করে একে রানী সাবীলার কৃতিত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। তারা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী রানী সাবীলার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং গাইকে নিজের মতো একজন রাজা জ্ঞান করে মুক্তি দিয়েছিলেন। তারা এও বুঝানোর কসরত করেছেন যে, সাধারণ ও গরীব লোকদের প্রতি সুলতান আইউবীর কোনো সমবেদনা ছিলো না। অথচ তাদের এই মূল্যায়ন সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় এক গরীব খৃষ্টান মহিলার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

গাই অফ লুজিনানের মুক্তির পর যখন খৃষ্টানরা উপকূলীয় নগরী আক্রা অবরোধ করে রেখেছিলেন, সে সময়কার ঘটনা। খৃষ্টান বাহিনীর ক্যাম্পের সঙ্গেই সেই খৃষ্টান নাগরিকদের আশ্রয় শিবির ছিলো, যারা বাইতুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য স্থান হতে বেরিয়ে এখানে এসে সমবেত হয়েছিলো।

অবরোধের বয়স দু'বছর হয়ে গেছে। একদিকে সুলতান আইউবীর গেরিলা সৈনিকরা অবরোধকারী খৃস্টান সৈনিকদের কোনো না কোনো অংশের উপর গেরিলা আক্রমণ চালাচ্ছে, উক্ত অঞ্চলের অসামরিক মুসলমানরাও তাদের নানাভাবে বিরক্ত ও অস্থির করে চলেছে। খৃস্টান নাগরিকরা সৈন্যদের সঙ্গে ছিলো বলে সৈন্যদের অনেক সাহায্য দিচ্ছে।

অসামরিক মুসলমানরা উক্ত অসামরিক খৃস্টানদেরও উত্যক্ত-পেরেশান করতে থাকে। তারা রাতে তাদের ক্যাম্পে ঢুকে যেতো এবং তাদের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে আসতো। কখনো কখনো এক-দু'জন খৃস্টানকেও তুলে নিয়ে আসতো এবং তাদেরকে যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে ঢুকিয়ে দিতো। সাধারণ খৃস্টানরা নিজ বাহিনীর কাছে অভিযোগ জানাতে থাকে যে, মুসলমান চোর-ডাকাতরা রাতে তাদের মালপত্র চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। বাহিনী পাহারার ব্যবস্থা করে। তথাপি এই চুরি ও অপহরণের ধারা অব্যাহত থাকে।

এক রাতে এক ব্যক্তি খৃস্টানদের ক্যাম্প থেকে তিন মাস বয়সের একটি শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে আসে। মায়ের একমাত্র কন্যা এবং দুগ্ধপোষ্য শিশু। মহিলা হাউমাউ শুরু করে দেয়। খৃস্টান কমান্ডারদের নিকট যায়। সে পাগলের মতো হয়ে গেছে। খৃস্টানদের সেনাপতি পর্যন্ত গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে। সেনাপতি তাকে পরামর্শ দেয়, সুলতান আইউবীর ক্যাম্প কাছেই আছে; তুমি গিয়ে বিষয়টা তাকে জানাও। সকলের দৃঢ় বিশ্বাস, শিশুটিকে কোনো মুসলমানই তুলে নিয়ে গেছে।

পাগলপারা মা জিজ্ঞেস করে করে সুলতান আইউবীর ক্যাম্পে এসে হাজির হয়। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, তিনি তখন সুলতান আইউবীর পার্শ্বে দাঁড়ানো ছিলেন এবং সুলতান কোথাও যাওয়ার জন্য ঘোড়ায় চড়ে বসেছেন। এক ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসে, এক গরীব খৃস্টান মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। সে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে। সুলতান আইউবী বললেন, তাকে এক্ষুনি নিয়ে আসো। নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষ থেকে তার উপর বাড়াবাড়ি হয়ে থাকবে।

মহিলা সুলতান আইউবীর সামনে এসে ঘোড়ার সন্নিকটে ধপাস করে বসে পড়ে এবং মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। সুলতান বললেন, ওঠে বলো তোমার উপর কে জুলুম করেছে?

'আমাদের বাহিনীর সেনাপতি বললেন, তুমি সুলতান আইউবীর

নিকট চলে যাও, তিনি খুব দয়ালু মানুষ। তিনি তোমার ফরিয়াদ শুনবেন'– মহিলা বললো– 'আপনার লোকেরা আমার একমাত্র দুগ্ধপোষ্য শিশু কন্যাটিকে তুলে এনেছে।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, মহিলার ফরিয়াদ-ক্রন্দনে সুলতান আইউবীর চোখে অশ্রু নেমে আসে। শিশুটি অপহৃতা হয়েছে সাত দিন হয়ে গেছে। সুলতান আইউবী ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আসেন। তিনি আদেশ করেন, এক্ষুনি খোঁজ নাও, শিশুটিকে কে এনেছে। তিনি মহিলাকে আহার করাতে বললেন এবং যেখানে যাওয়ার কথা ছিলো পরিকল্পনা মুলতবি করে দেন।

যেসব সাধারণ মুসলমান খৃস্টান ক্যাম্প থেকে মালপত্র নিয়ে আসতো, তারা বাহিনীর সঙ্গেই থাকতো। তাদের যে লোকটি শিশুটিকে তুলে এনেছে, সে ক্যাম্পেই অবস্থান করছে। সংবাদ শুনে সে সুলতান আইউবীর নিকট ছুটে গিয়ে বললো, মহামান্য সুলতান! শিশুটিকে আমি এনেছি এবং বিক্রি করে ফেলেছি। সুলতান আইউবী আদেশ করেন, যাও, মূল্য ফেরত দিয়ে শিশুটিকে নিয়ে আসো।

সুলতান আইউবী শিশুটির এসে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজ তাঁবুতে অবস্থান করেন। শিশুটি বেশি দূরে যায়নি। ফলে পেতে তেমন সময় লাগেনি। তার মূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। সুলতান নিজ হাতে শিশুটিকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেন। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে কলিজার টুকরোটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং এমন আবেগের সাথে আদর করে যে, (শাদ্দাদের ভাষায়) আমাদের সকলের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সুলতান আইউবী মহিলাকে একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে বিদায় করে দেন।

বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং ফিলিস্তীনের প্রতি ইঞ্চি মাটি থেকে খৃস্টানরা উৎখাত হয়ে গেছে। খৃস্টান জগতে কম্পন ও হতাশা নেমে এসেছে। সে যুগে সামরিক দিক থেকে তিনটি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী জ্ঞান করা হতো– ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ড। তাদের পোপ স্বয়ং প্রতিটি দেশের সম্রাটদের নিকট গিয়ে গিয়ে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। যুদ্ধে উদ্বুদ্ধকরণে তার বক্তব্য ছিলো নিম্নরূপ–

'তোমরা যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে উঠে না দাঁড়াও, তাহলে সমগ্র ইউরোপ থেকে ক্রুশ উৎখাত হয়ে যাবে এবং সর্বত্র ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়ে যাবে। এই যুদ্ধ সালাহুদ্দীন আইউবীর ব্যক্তিগত যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধ খৃস্টবাদ

ও ইসলামের যুদ্ধ। আমাদের বড় ক্রুশ মুসলমানদের দখলে। জেরুজালেমের উপর মুসলমানদের পতাকা উড়ছে। হাজার হাজার খৃস্টান নারী মুসলমানদের কবলে চলে গেছে। তাদেরকে মুসলিম সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হচ্ছে। তোমরা কি ঘরে বসে ইসলামের ক্রমবর্ধমান এই ঝড়কে প্রতিহত করতে পারবে? তোমরা কী করে সহ্য করছো, যে ক্রুশের উপর হযরত ঈসাকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিলো, সেটি মুসলমানদের হাতে চলে যাবে?'

এ জাতীয় উত্তেজনাকর সত্য-মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে পোপ বড় বড় খৃস্টান কমান্ডারদের উত্তেজিত করে তোলেন। জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক দু'লাখ সৈন্য নিয়ে সকলের আগে চলে আসেন। তিনি কারো সঙ্গে জোট বাঁধবার প্রয়োজন মনে করেননি। সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন তিনি। সে অনুযায়ী তিনি দামেশ্‌কের উপর আক্রমণ চালান। তার জন্য দুর্ভাগ্য ছিলো যে, তিনি সুলতান আইউবীর রণকৌশল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। দু'লাখ সৈন্যের উপর ভরসা করে তিনি আরব ভূখণ্ডকে দখল করতে এসেছিলেন। তার দামেশ্‌ক আক্রমণকে দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ বলা হয়। কিন্তু ফ্রেডারিক এই দু'লাখ সৈন্য দ্বারা দামেশ্‌কের একটি ইটও খসাতে সক্ষম হননি। মুসলমান গেরিলারা তার রসদের উপর এমন দুঃসাহসী কমান্ডো আক্রমণ চালায় যে, তারা তার হাজার হাজার ঘোড়া ও ঘোড়াগাড়ি নিয়ে আসে। রসদগুলো তাদের বাহিনীর হাতে তুলে দেয়।

ফ্রেডারিক শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। তার রসদের অভাব দেখা দেয়। বিপুলসংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারায়। তিনি পেছনে সরে গিয়ে নতুন উদ্যমে দামেশ্‌ক আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। কিন্তু মুসলিম গেরিলারা তার বাহিনীকে স্থির হয়ে বসতে দেয়নি। পানির উৎসগুলোও মুসলমানরা দখল করে নেয়। ঘটনাটা ১১৯১ সালের ২০ জানুয়ারি মোতাবেক ৫৮৬ হিজরীর ২২ যিলহজ্বের। শোকাহত হয়ে জার্মানিরা তাদের ক্যাম্পে স্থানে স্থানে কাঠ সঞ্চয় করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়, যেনো ক্যাম্প জ্বলছে। এদিকে মুসলিম সৈন্যরাও নিজ ক্যাম্পে উল্লাসে মেতে ওঠে।

ফ্রেডারিকের এক পুত্র জার্মানি বাহিনীর কমান্ড হাতে তুলে নেয়। তার জানা ছিলো, ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ডও আসছেন। তারা রণতরী নিয়ে আসছেন। ফ্রেডারিকের পুত্র বাহিনীকে ফিলিস্তীনের উপকূলীয় নগরী আক্রার দিকে রওনা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। সুলতান আইউবী তার সালারদেরকে পূর্বেই দিক-নির্দেশনা দিয়ে

রেখেছিলেন। সে মোতাবেক তারা খৃস্টান বাহিনীর উপর আক্রমণ না করে যেতে দেয়। সালারদের জানা ছিলো, পথে তাদের কমান্ডো বাহিনী উপস্থিত রয়েছে। তাদের কৌশল ছিলো, তারা শত্রু বাহিনীর একেবারে পেছন অংশের উপর আক্রমণ করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলো। তারা সংখ্যায় ছিলো অনেক। রাতে জার্মানরা প্যারেড করার সময় কমান্ডোরা ছোট মিনজানিকের সাহায্যে তরল দাহ্য পদার্থ ভর্তি পাতিল এবং পরক্ষণেই জ্বলন্ত সলিতাওয়ালা তীর ছুঁড়ছিলো। তাতে ক্যাম্পে আগুন ধরে যেতো।

জার্মান বাহিনী যখন আক্রা পৌঁছে, তখন তাদের সেনাসংখ্যা কমে বিশ হাজারে নেমে এসেছিলো। অথচ এই বাহিনী যখন পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন সংখ্যা ছিলো দু'লাখ। তাদের কিছু দামেশ্‌ক আক্রমণের সময় নিহত হয়েছে। কিছু রোগ ও ক্ষুৎ-পিপাসায় মারা গেছে। কিছু দামেশ্‌ক থেকে আক্রা যাওয়ার সময় পথে মুসলিম গেরিলাদের আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। সেই সৈনিকদের সংখ্যাও কম ছিলো না, যারা ফৌজ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। শেষমেষ যে বিশ হাজার রক্ষা পেয়েছিলো, তারা সম্পূর্ণরূপে মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলো। তাদের অন্তর থেকে ক্রুশের শ্রদ্ধা ও নিজেদের শপথ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো।

ওদিক থেকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সম্রাটদ্বয় নদীপথে এগিয়ে আসছেন। ইংল্যান্ডের ফৌজ– যারা কাবরাস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে– কীরূপ এবং সংখ্যা কতো, সুলতান আইউবী গোয়েন্দা মারফত সময়মতো জেনে ফেলেছেন। তারা ষাট হাজার। ফ্রান্সের বাহিনীর সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ। আছে বিশ হাজার জার্মান ফৌজ। খৃস্টানদের আরো কিছু সৈন্য পূর্ব থেকেই পবিত্র ভূমিতে রয়েছে।

সুলতান আইউবী গোয়েন্দা মারফত সংবাদ পান, যে সম্রাট গাই অফ লুজিনান ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন, কাউন্ট অফ কনড়াডের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি বাহিনী গঠন করেছেন, যাতে সাতশ' নাইট, নয় হাজার ফিরিঙ্গ সৈন্য এবং বারো হাজার ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় অফিসার-সৈন্য রয়েছে। এভাবে শুধু তার বাহিনীরই সেনা সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার হয়ে গেছে। আনুমানিক হিসেবে খৃস্টান যৌথ বাহিনীর সেনাসংখ্যা ৬ লাখে দাঁড়িয়েছে, যারা অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের দিক থেকে ইসলামী ফৌজ থেকে উন্নত।

সুলতান আইউবীর সঙ্গে দশ হাজার মামলুক ছিলো। এটি তার একটি নির্বাচিত বিশেষ বাহিনী, যাদের উপর তার পূর্ণ আস্থা ছিলো। আক্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এটি বন্দর এলাকাও। প্রাকৃতিকভাবেই অঞ্চলটা এমন যে, নৌবাহিনীর এক বিশাল ও নিরাপদ ক্যাম্পরূপে গড়ে উঠতে পারে। আক্রা নগরীতে সুলতান আইউবীর সৈন্যসংখ্যা ছিলো দশ হাজার। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সাহায্য নিতে পারছেন না। কেননা, এটিই সেই ভূখণ্ড, যার জন্য খৃস্টানদের এই মহা-সমরের আয়োজন-প্রস্তুতি। এর প্রতিরক্ষা এতোটুকুও দুর্বল করা সম্ভব নয়। ইংল্যান্ডের নৌ-বহর অনেক শক্তিশালী ও ভয়ংকর। সুলতান আইউবী ভালোভাবেই জানেন, তাঁর মিসরী নৌ-বহর ইংল্যান্ডের বহরের মোকাবেলা করতে পারবে না।

সুলতান আইউবীর জন্য এ এক বিশাল ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ, যা তাকে বরণ করে নিতে হলো। কিন্তু তিনি এই ঝড়ের মোকাবেলা কীভাবে করবেন। তাঁর বাহিনী চারটি বছর অবিরাম যুদ্ধ করছে। গেরিলা ও কমান্ডো সেনারা পাহাড়-জঙ্গলে যুদ্ধ করেছে আর জীবন বিলাচ্ছে। নিজেও অনুরূপ জীবন অতিবাহিত করছেন। কাজেই বাহ্যিক বিবেচনায় এখন তাঁর এই বাহিনী যুদ্ধ করার উপযোগী নয়। কতো আর পারা যায়। শুধু ঈমানী চেতনার জোরে এই স্বল্প ও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বাহিনীটির ৬ লাখ তরতাজা খৃস্টান বাহিনীর মোকাবেলা করা কীভাবে সম্ভব?

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, সুলতান আইউবীর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিলো যে, তিনি রাতে ঘুমাতেন না। প্রতি মুহূর্ত গভীর ভাবনায় ডুবে থাকতেন এবং মাথায় যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে থাকতেন। তার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছিলো। একবার অসুস্থও হয়ে পড়েন। তিন দিন বিছানায় পড়ে থেকে চতুর্থ দিন ওঠে বসেন। কিন্তু শরীরে পূর্বের শক্তি আর ফিরে আসেনি। তখন বয়স হয়েছিলো ৫৪ বছর। যৌবনে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং এখনো পাহাড়-বন-বিয়াবনে যুদ্ধ করছেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করবেন বলে কসম খেয়েছিলেন। সে কসম তিনি পূর্ণ করেছেন। তারপর প্রতিজ্ঞা নেন, যে ক'দিন বেঁচে থাকবেন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ইসলামের পতাকা অপসারিত হতে দেবেন না। এই প্রতিজ্ঞাই তাঁর আরামের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলো।

❖ ❖ ❖

আমেরিকান ইতিহাসবিদ ও সমর বিশেষজ্ঞ এ্যান্থনি ওয়েস্ট হ্যারল্ড

ল্যাম্ব, লেনপোল, গিবন ও আরনল্ড প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের সূত্রে লিখেছেন– 'সুলতান আইউবী একদিন মসজিদে গিয়ে বসেন। সারাদিন আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে দু'আ করতে থাকেন, যেনো এই নাজুক পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাঁকে ইসলামী বাহিনীকে সঠিক ও নির্ভুল নেতৃত্বদানের তাওফীক দান করেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। সন্ধ্যা হয়ে গেলে তিনি মসজিদ থেকে বের হন। তখন তাঁর চেহারায় স্থিরতা ও প্রশান্তি ছিলো।'

এ কথা ঠিক যে, সুলতান আইউবী মসজিদে গিয়ে সিজদাবনত হয়েছিলেন এবং কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর দরবারে সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু সে সময়কার প্রত্যক্ষদর্শী ও কাহিনীকারগণ লিখেছেন, সুলতান দিনে নয়– রাতে মসজিদে আকসায় গিয়েছিলেন। তিনি সারারাত নামায, দু'আ, দরূদ ও অজীফা পাঠে অতিবাহিত করেন এবং ফজর নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হন।

সে রাতে মসজিদে তিনি একা ছিলেন না। মসজিদের বারান্দায় এক কোণে এক ব্যক্তি গায়ে কম্বল জড়িয়ে বসে ছিলো। লোকটি কখনো সিজদা করছিলো, কখনো হাত তুলে দু'আ করছিলো। লোকজন ঈশা'র নামায আদায় করে মসজিদ থেকে চলে যাওযার পর লোকটি মসজিদে এসে বসেছিলো। মুখটা তার কম্বলে ঢাকা ছিলো।

মুআজ্জিন যখন ফজরের আযান দেন, তখন সে নিজেকে কম্বলে ঢেকে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করার সময় তাকে দেখে দাঁড়িয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকে। তারপর লোকটার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করে। কম্বলওয়ালা ব্যক্তি ঘুরে পেছন পানে এক নজর তাকিয়েই দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। তাকে অনুসরণকারী লোকটিও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। সামনে একস্থানে অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলো। কম্বলওয়ালা তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং কী যেনো বলে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তৃতীয় ব্যক্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। অনুসরণকারী লোকটি তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, লোকটি কে ছিলো?

'উহ্ তুমি!'– লোকটি বললো– 'তুমি ওকে অনুসরণ করছিলে?'

'আমি তার পা দেখেছি'– অনুসরণকারী লোকটি বললো– 'লোকটি পুরুষ নয়– নারী। তোমার আত্মীয়? তুমি তাকে চেনো?'

'এহতেশাম!'– লোকটি বললো– 'আমি জানি, তুমি তোমার কর্তব্য পালন করছো। যে কারো উপর নজর রাখা তোমার কর্তব্যের অংশ। আমি তোমার থেকে কিছুই গোপন রাখবো না। কিন্তু একজন নারীর মসজিদে যাওয়া গুনাহ্ তো নয়।'

'তা ঠিক'– এহতেশাম বললো– 'আমার সন্দেহটা হচ্ছে, সে নিজেকে কম্বলে মুড়িয়ে রেখেছে কেনো? শোনো আল-আস! রাতে আমরা তিনজন লোক মসজিদের চারদিকে পাহারার জন্য ঘোরাফেরা করতে থাকি। কারণ, সুলতান ভেতরে ছিলেন। তবে তিনি বিষয়টা জানতেন না। তিনি কাউকে কিছু না বলে মসজিদে এসেছিলেন। তিনি জানেন না, তাঁর পোশাকী রক্ষীদের ছাড়াও কেউ তার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। এটা হাসান ইবনে আবদুল্লাহর ব্যবস্থাপনা। তুমি স্বয়ং ফৌজের একজন কমান্ডার। আমাকে তুমি ভালোভাবেই জানো। সে কারণে কথাগুলো এতো খোলাখুলি বলছি।'

'বলো এহতেশাম!– আল-আস বললো– 'বাইতুল মুকাদ্দাসে এবং মসজিদে আকসার এতো নিকটে দাঁড়িয়ে কোনো মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না। আমি তোমাকে বলে দেবো, মেয়েটা কে। তার আগে তুমি বলো, তার উপর কেনো তোমার সন্দেহ জেগেছে।'

'আমি রাতে তাকে বারান্দার কোণে দেখেছি'– এহতেশাম উত্তর দেয়– 'সুলতানের নিরাপত্তার খাতিরে তাকে ওখান থেকে তুলে দেয়া আবশ্যক ছিলো। ঈশার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। লোকটার চলে যাওয়া উচিত ছিলো। তখন সুলতান মিম্বরের সামনে ইবাদত ও অজীফায় মগ্ন ছিলেন। এই লোকটি কম্বলে ঢাকা ছিলো। সুলতানের উপর সংহারী আক্রমণ হতে পারতো। কিন্তু মসজিদ থেকে তো কাউকে বের করে দেয়া যায় না। আমি এ-ও দেখলাম, লোকটা অভিনব এক পন্থায় ইবাদত করছে। সিজদা করছে, উঠছে আর দু'আর জন্য হাত উত্তোলন করছে। সে নিয়ম অনুযায়ী নামায পড়েনি। আমি আমার সঙ্গীদের বিষয়টা জানালাম। তারা একজন একজন করে ভেতরে গিয়ে এমনভাবে দেখে যে, সে টের পায়নি কেউ তাকে দেখছে। তারা বেরিয়ে এসে বললো, সন্দেহভাজন– নজর রাখতে হবে। কিন্তু তুলে দেয়া যাবে না। কারণ, আমি তার একেবারে পেছনে বসে তার হেঁচকি শুনেছি এবং কিছু শব্দও শুনেছি। যেনো সে নিজ পাপের ক্ষমা এবং খৃস্টানদের পরাজয়ের দু'আ করছিলো।'...

'আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। এমনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রাত কেটে গেছে। ফজরের আযানের সঙ্গে সঙ্গে লোকটি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়। আমরা সারারাত পালাক্রমে তার উপর নজর রাখি। আযানের পর বেরিয়ে আসবার সময় মসজিদের বাতির আলোতে কম্বলের ফাঁক দিয়ে আমি তার পা দেখেছি। হাতও দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে সে হাতখানা কম্বলে ঢেকে ফেলে। আমি তাকে অনুসরণ করতে শুরু করি।'

'হ্যাঁ, বন্ধু!'– আল-আস বললো– 'তুমি ঠিক দেখেছো। লোকটি পুরুষ নয়– নারী। আর খুবই রূপসী ও যুবতী। আমি তোমাকে আরো বলে দিচ্ছি, মেয়েটি একজন গুনাহগার নারী, যে কিনা বিগত দশ বছর আমাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করেছিলো।'

'খৃস্টান?'

'খৃস্টান ছিলো'– আল-আস উত্তর দেয়– 'এখন মুসলমান। আমি তাকে এক মুসলমানের ঘরে রেখেছি। তুমি তাকে দেওয়ানা বলতে পারো। দরবেশদের ন্যায় কথা বলে।'

'আর তুমি তার কথায় বিশ্বাস করেছো'– এহতেশাম বললো– 'তুমি রণাঙ্গনের যোদ্ধা। এই নারীদের ছলনা বুঝবে না।'

'আমার সঙ্গে আসো'– আল-আস বললো– 'তাকে দেখো, তার সঙ্গে কথা বলো। সন্দেহ দূর করো। এটা তোমারই কাজ। বিষয়টা তুমিই ভালো বুঝবে। এটা সত্য যে, আমি তার কথায় বিশ্বাস করেছি। তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা আমিই করেছি। তুমি আমার সঙ্গে আসো।'

এহতেশাম আল-আসের সঙ্গে চলে যায়।

সেটি এক বুযুর্গের ঘর, যিনি দীর্ঘদিন যাবত বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছেন। এহতেশাম ও আল-আস তাঁর দেউড়িতে গিয়ে বসে। বুযুর্গ নামায পড়তে মসজিদে গেছেন। এহতেশাম আল-আসকে বললো, আচ্ছা, উনি আসুন। এই ফাঁকে বলো তো, মেয়েটি কোথা থেকে কীভাবে এসেছে। তার ব্যাপারে আরো যা জানো বলো।'

'গত গ্রীষ্মের ঘটনা'– আল-আস বলতে শুরু করে– 'আমি মিসরের সীমান্ত থেকে সামান্য দূরে গেরিলাদের একটি ইউনিটে ছিলাম। বাইতুল মুকাদ্দাস জয় হয়ে গেছে। টিলা-পাথর ও মরুভূমিতে আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। ওখানে আমাদের কোনো কাজ ছিলো না। একসময়

আমাদেরকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়। আমার হাতে একটি সেনাদলের কমান্ড অর্পণ করা হয়। সঙ্গে ষোলজন গেরিলা ছিলো। প্রতিটি দল নিজ নিজ গতিতে ফিরে আসছিলো। একস্থানে অনেকগুলো টিলা স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলো। কোনো কোনোটি অতিশয় ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়কর লাগছিলো। আমার এক গেরিলা রসিকতা করে বললো, এগুলো জিন-পরীদের প্রাসাদ। এখানে রূপসী ও দুশ্চরিত্র নারীর প্রেতাত্মাও থাকতে পারে। শুনে আমাদের হাসি পায়। আমরা টিলাগুলোর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ি।'

'সেগুলোর চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর স্থানেও আমরা রাত যাপন করেছি। এমন এমন জায়গায়ও বহু রাত ঘুমিয়েছি, যেখানে মানব কংকাল, মাথার খুলি ইত্যাদি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিলো। কিন্তু এই টিলাগুলোর ভেতরে ঢোকামাত্র ভয়ে আমাদের সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমরা দাঁড়িয়ে যাই। আমি জীবনে এই প্রথমবার ভয় কী জিনিস অনুভব করি। আমার গোটা বাহিনী দাঁড়িয়ে গিয়ে দু'আ-দরুদ পড়তে শুরু করে। সামনে এক টিলার ছায়ায় এক মহিলা বসে আছে। মহিলার সর্বাঙ্গ বিবস্ত্র– একদম জন্মকালীন পোশাক পরিহিত। তার সম্মুখে আরেক নারী চিৎ হয়ে শুয়ে আছে– সেও উলঙ্গ। উপবিষ্ট মহিলাকে যুবতী বলে মনে হলো। তার গায়ের রং গৌর। ওষ্ঠাধর মরুভূমির বালির ন্যায় শুষ্ক ও ফাটা ফাটা। মুখটা খোলা। মাথার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত। উলঙ্গ দেহের হাড়গোড় দেখা যাচ্ছে। তবে এই অবস্থায়ও বুঝা যাচ্ছে, মেয়েটি অত্যন্ত রূপসী।'...

'মনে প্রশ্ন জাগে– এরা মানুষ না অন্যকিছু। মাথায় উত্তর আসে– না, মানুষ হতে পারে না। এটা তো চলাচলের পথ নয় যে, এখান দিয়ে মানুষ গমনাগমন করছে আর দস্যু-তস্করা তাদের লুটে নিয়ে গেছে এবং এরা রক্ষা পেয়ে এখানে এসে লুকিয়ে রয়েছে। আমি আমার সৈনিকদেরকে ভয় দেখাতে চাইলাম না। কিন্তু তারা নিজেরাই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। আমার হৃদয়েও প্রত্যয় জন্মে গেছে, এরা পাপিষ্ঠ নারীর প্রেতাত্মা বৈ নয়। আমি এই আশায় দূরেই দাঁড়িয়ে থাকি যে, ওরা অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু উপবিষ্টজন বসেই থাকলো আর শায়িতজন শুয়েই রইলো। উপবিষ্টজন পিট পিট চোখে আমাদের দেখতে থাকে। আমার এক সঙ্গী আমাকে কানে কানে বললো, চলুন পেছনে ফিরে যাই। পাশের থেকে একজন বললো, হ্যাঁ চলে যাওয়াই ভালো হবে। তবে এদের দিকে পিঠ দেয়া যাবে না। ভয়ে সকলের গা ছম ছম করছে।'

'তাদের ও আমাদের মাঝে ব্যবধান বড়জোর পনের পা। আমরা সকলে খুব ধীরে একপা-একপা করে পেছনে সরে যেতে থাকি। এবার বসা মেয়েটি মাথায় ইঙ্গিত করে, যেনো আমাদের ডাকছে। আমি পেছন পানে আরো একপা তুললে সে আবারো মাথা দ্বারা ইশারা করে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই, তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। আমি বাস্তবিক কোনো শব্দ শুনেছিলাম, নাকি মনে কল্পনা এসেছিলো ঠিক বলতে পারবো না। আমার কানে শব্দ আসে– পলায়ন করো না আল-আস! ওরা মানুষ বৈ নয়। হঠাৎ আমার ডান হাতটা কোমরে চলে যায়। তরবারীটা খুলে এনে কোষমুক্ত করে ফেলি। আমার পা আপনা-আপনি সামনের দিকে এগুতে শুরু করে। আমি সঙ্গীদের কথা শুনতে পাই। তারা আমাকে সম্মুখে যেতে বারণ করছে। আমি আয়াতুল কুরসী পাঠ করতে শুরু করি।'....

'আমি মেয়েটি থেকে তিন-চার পা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাই। সে ধীরে ধীরে ওঠে দাঁড়ায়। তারপর আমার দিকে পা বাড়ায়। তার মাথাটা দুলছে। একপা এগিয়ে আরেক পা তুলতে উদ্যত হয়। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ এমনভাবে পড়ে যায় যে, তার মাথাটা আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে এবং মাথার চুলগুলো আমার পায়ের উপর ছড়িয়ে পড়ে। আমি উলঙ্গ নারীর গায়ে হাত লাগাতে ইতস্তত করছিলাম। তাছাড়া ভয় তো আছেই। আমার দেখবার ছিলো, মেয়েটি মানুষ না অন্যকিছু। আমি বসে তার শিরায় হাত রাখি। শিরা চলছে। মনে ধারণা জন্মে, জিন-পরীদের হয়তো শিরা থাকে না। এবার তার থেকে সরে আমি শুয়ে থাকা মেয়েটির শিরা দেখি। কাঠফাটা গরম সত্ত্বেও তার দেহটা রাতের মরুভূমির বালির ন্যায় অস্বাভাবিক শীতল। তার শিরায় প্রাণ নেই। মুখটা খোলা। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে। শরীরটা সাদা। আমি তার মধ্যে মৃত্যুর সব লক্ষণ প্রত্যক্ষ করি।'...

'আর বসা থেকে ওঠে এসে যে মেয়েটি আমার পায়ের কাছে পড়ে গিয়েছিলো, তার দেহ গরম। এ প্রেতাত্মা কিংবা পরী হতে পারে না। আল্লাহ আমাকে বিবেক ও সাহস দান করেছেন। আমি আমার বাহিনীকে ডাক দেই। আমাদের সঙ্গে খাবার-পানি সবই ছিলো। সঙ্গীদের বললাম, তাড়াতাড়ি দু'টি চাদর আর কিছু পানি নিয়ে আসো। তারা চাদর ও পানি নিয়ে আসে। সূর্য এখনো মাথার উপর আসেনি। এখানে উঁচু টিলার ছায়া ছিলো। আমি একখানা চাদর টিলার পাদদেশে ছায়ায় বিছিয়ে তার উপর

সংজ্ঞাহীন মেয়েটিকে শুইয়ে দেই এবং অপর চাদর দ্বারা ভালোভাবে ঢেকে রাখি। তার মুখে পানির ছিটা দেই। মুখটা খোলা ছিলো। তাতে ফোটা ফোটা পানি ঢেলে দেই। পানি তার কণ্ঠনালী গড়িয়ে ভেতরে চলে যায়।'...

'সঙ্গীরা আমাকে বারণ করছে, অহেতুক বিপদ ডেকে এনো না। কিন্তু এখন আর আমার কোনো ভয় লাগছে না। সঙ্গীদের কথাও কোনো ক্রিয়া করছে না। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি ধীরে ধীরে চোখ মেলে। ঠোঁট দুটো একত্র হয়ে আবার খুলে যায়। আমি আবারো তার মুখে পানি দেই। তারপর আটি বের করে একটি খেজুর তার মুখে রাখি। সে খেতে শুরু করে। এবার মেয়েটি উঠে বসবার চেষ্টা করে। আমি তাকে ধরে তুলে বসিয়ে দেই।'

আল-আস এহতেশামকে কাহিনী শোনাচ্ছে–

'আমি তাকে খাবার খেতে দেই। খাবার খেয়ে সে পানি পান করে। আরো খেতে চাইলে খালি পেটে অতো খাওয়া ঠিক হবে না বলে বারণ করি। সে ক্ষীণকণ্ঠে বললো, আমি তোমার ভাষা বুঝি ও বলতে পারি। ঐ মেয়েটি মারা গেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কারা? বললাম, আমরা ইসলামী ফৌজের কমান্ডো সেনা। বাইতুল মুকাদ্দাস যাচ্ছি। সে বললো, তাহলে তো তোমাদের থেকে কোনো করুণা আশা করতে পারি না। আমি বললাম, তুমি বোধ হয় মুসলমান নও। সে বললো, আমি মিথ্যা বলবো না। তবে সত্য বললেও তুমি আক্ষেপ করবে, কেনো বাঁচিয়ে রাখলাম। আমি বললাম, তুমি শুধু এটুকু নিশ্চিত করো, তুমি মানুষ। শুনে মেয়েটি ফিক্ করে হেসে ওঠে। আস্তে আস্তে তার চেহারার রং বদলে যেতে শুরু করে। দেহে রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়ে গেছে।'...

'সহসা মেয়েটির দু'চোখের পাতা বুজে আসে। তার ঘুম পাচ্ছে। হঠাৎই সে অবোধ শিশুর ন্যায় একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে গিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

আমরা অনেক খুন ও লুণ্ঠন করেছি। বহু কমান্ডো আক্রমণ চালিয়েছি। কয়েকজন সঙ্গী আমাদের চোখের সামনে শহীদ হয়েছে। মরা আর মারা আমাদের জন্য ছিলো শিশুর খেলার ন্যায়। কিন্তু একজন নারীর উপর হাত তোলা– হোক সে আমাদের শত্রু– আমরা মহাপাপ মনে করেছি। আমি সঙ্গীদের বললাম, সূর্য মাথার উপর উঠে আসছে। একটু পর এখানে ছায়া থাকবে না। আশপাশে ছায়া খুঁজে বের করে বিশ্রাম নাও। মেয়েটি জাগ্রত হলে তাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হবো।'..

'আমার এক-দু'জন সঙ্গী বললো, মেয়েটি গুপ্তচর মনে হচ্ছে। অন্যরা ভিন্নমত পোষণ করে বললো, এখানে নারী গুপ্তচরের কী কাজ থাকতে পারে? এরা গুপ্তচরও নয়– মানুষও নয়। আমি বললাম, আমরা গেরিলা সৈনিক। মিসর ও ফিলিস্তীনের সীমান্ত অঞ্চলে তৎপর ছিলাম। আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এদেরকে এখানে পাঠানো হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পরক্ষণে নিজের মধ্যেই সন্দেহ জাগে, তা-ই যদি হতো, তাহলে কমপক্ষে এক-দু'জন পুরুষও তো থাকতো।'

'সূর্যাস্তের খানিক আগে মেয়েটির ঘুম ভেঙে যায় এবং উঠে বসে। আমি তার নিকটে গিয়ে বসি। সে পানি পান করে আরো কিছু খেতে চায়। আমি তাকে খাবার দেই। এবার সে ভালোভাবে কথা বলতে পারছে। মৃত মহিলার প্রতি ইঙ্গিত করে বললো, ওকে দাফন করে ফেলো। আমার সৈনিকরা ধার্মিক ছিলো। একজন নিজের চাদরটা দিয়ে দেয়। আমরা একটা কবর খনন করে চাদরে পেঁচিয়ে লাশটা দাফন করে রাখি।'

আল-আস এহতেশামকে জানায়–

'মেয়েটি তারা কারা, কোথা থেকে আসলো, কোথায় যাচ্ছে– এসব বলার পরিবর্তে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি কখনো খোদাকে দেখেছো? উত্তরে আমার যা বুঝে আসলো বললাম। সে বললো, আমি তোমার খোদাকে দেখেছি। এই এইমাত্র দেখেছি। বলবে, তুমি স্বপ্ন দেখেছো। খোদা আমাকে বলেছেন, আমি তোমাকে চোখ দিয়েছি। অন্ধকারেও তুমি আমাকে দেখতে পাবে। তিনি আরো বলেছেন, তুমি পাপ করেছো। এরপর যদি কখনো পাপের চিন্তা করো, তাহলে তোমার নিজ হাতেরই খঞ্জর দ্বারা তোমার চোখ দুটো তুলে ফেলবো। খোদা আমাকে এ কথাও বলেছেন, আমি তোমাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাবো, যেখান থেকে আমি আমার প্রিয় রাসূলকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছিলাম।'...

'মেয়েটি এমন অনেক কথা বলে, যাদ্বারা প্রমাণিত হয়, মরুভূমির কষ্টকর সফর আর নানাবিধ বিপদাপদ তার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। যেমন, সে বললো, তোমরা আমার দেহটা ঢেকে দিয়েছো কেনো? তাকে উলঙ্গই থাকতে দিলে কী হতো? আমি এখন শরীর নই– আত্মা। আত্মা যদি পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে দেহের পাপরাশি মুছে যায় ইত্যাদি। সে বেশিরভাগ এ জাতীয় কথা-বার্তাই বলতে থাকে। তাতে আমি নিশ্চিত হই, মেয়েটি অন্যকিছু নয়– মানুষই। আর তার বলা ছাড়াই আমার জানা হয়ে

গেছে, এরা সেই খৃস্টান মেয়েদের দলভুক্ত, যাদেকে আমাদের আমীর-উজির ও সালারদেরকে গাদ্দার বানানোর লক্ষ্যে আমাদের দেশে প্রেরণ করা হয়। আমার মনে সন্দেহ জাগে, মেয়েটি আমাদেরকে বোকা ঠাওরানোর চেষ্টা করছে। তার মাথাটা আসলে সম্পূর্ণ ঠিক আছে।'...

'আমি তাকে বললাম, ঠিক ঠিক বলে দাও, তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে? সত্য বের করার জন্য আমি তাকে হুমকি-ধমকিও দেই। কিন্তু তার বলার ধরণ ও দেওয়ানা জাতীয় কথা-বার্তায় কোনো পরিবর্তন আসলো না। সূর্যাস্তের পর আমি তাকে আমাদের মালবাহী ঘোড়ার উপর বসিয়ে গন্তব্যপানে রওনা হই।'...

'আমার বাহিনী সামনের দিকে এগুতে থাকে। আমি মেয়েটির ঘোড়ার সঙ্গে অনেক পেছনে পড়ে যাই। এখন সে নিজেকে সামলাতে পারছে। কিন্তু কথা-বার্তা ঐ দরবেশদের ন্যায় বলছে। মধ্যরাতের পর আমরা যাত্রা বিরতি দেই। আমি মেয়েটিকে সকলের থেকে আলাদা রাখি এবং নিজে তার সঙ্গে থাকি। আমি একবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথায় যেতে চাও? সে বললো, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। বললাম, আমি তোমাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাচ্ছি। সে বললো, অসুবিধা নেই। শুনেছি খোদা কয়েদখানায়ও থাকেন। তারপর আমি অন্য পন্থা অবলম্বন করি। আমি তার বেশ আপন ও অন্তরঙ্গ হয়ে যাই। ভাবলাম, হয়তো সে আমার সঙ্গে সওদাবাজি শুরু করবে এবং প্রলোভন দেখিয়ে বলবে, আমাকে খৃস্টানদের কোনো এক অঞ্চলে পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হলো না। এসবের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করলো না। পরবর্তী রাতে সে নিজের আসল পরিচয় প্রদান করে।'...

'মেয়েটি বললো, সে দেড় বছর কায়রোতে ছিলো। সেখানে তার পরিচয় ছিলো, সে বড় এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা। এক মুসলিম শাসকের গণিকা ছিলো। মিসর সরকারের দু'জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে তার শত্রুতে পরিণত করে। তারপর তিনজনকে আপসে দ্বন্দ্বে লিপ্ত করে। কায়রোর রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। দু'জন খৃস্টান গোয়েন্দাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করায়। একজন বিপজ্জনক খৃস্টান গোয়েন্দা ও নাশকতাকারীকে– যার মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা ছিলো– সেই মুসলিম কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ফেরার করায়। অবশেষে মিসরের গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যা করার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলো।'...

‘সেই মুহূর্তে সে হিত্তীন যুদ্ধের ফলাফলের কথা জানতে পারে। এ-ও অবহিত হয় যে, তাদের বড় ক্রুশ সুলতান আইউবীর হাতে চলে গেছে আর সেই ক্রুশের প্রধান মোহাফেজ যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছেন। মেয়েটি এ সংবাদও পায় যে, কয়েকজন খৃস্টান সম্রাট মারা গেছেন। কতিপয় যুদ্ধবন্দি হয়েছেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনকর্তা গাই অফ লুজিনানও বন্দি হয়েছেন। এ সংবাদগুলো তার মাথায় হাতুড়ির ন্যায় আঘাত করতে থাকে। তারপর সে আরো দু'টি সংবাদ পায়, তাদের চরবৃত্তি ও নাশকতার গুরু হারমান বন্দি হয়েছে এবং বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাতে চলে গেছে। এসব সংবাদ তার মাথাটা উলোট-পালট করে দিয়েছে। তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রস্তুত করে কায়রো পাঠানো হয়েছিলো। পাপের প্রশিক্ষণটা শৈশবেই হয়েছিলো। তার ভেতরে চেতনার স্থলে ধোঁকা ও প্রতারণা ভরে দেয়া হয়েছিলো। তাকে জানানো হয়েছিলো, তোমাকে বড় ক্রুশ এবং যীশুখৃস্টের সন্তুষ্টির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের পর আক্রার বড় গীর্জায় ক্রুশের প্রধান পাদ্রী তাকে আশির্বাদ করেছিলেন।’...

‘বিদায়ের প্রাক্কালে পাদ্রী তাকে বলেছিলেন, ক্রুশের রাজত্ব অজেয় এবং তার কেন্দ্র জেরুজালেম, যার সন্নিকটে হযরত ঈসাকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিলো। তাকে আরো বলা হয়েছিলো, ইসলাম কোনো ধর্ম নয় এবং মুসলমানদেরকে খৃস্টধর্মে দিক্ষিত করা কিংবা তাদের হত্যা করে পৃথিবীকে মুসলমানমুক্ত করা পুণ্যের কাজ। আর এই যে মেয়েরা ক্রুশের নামে সম্ভ্রম বিসর্জন দিচ্ছে, তাদেরকে পরজগতে স্বর্গের হুর বানানো হবে। এভাবে পাপকে পুণ্যরূপে উপস্থাপন করে মেয়েটিকে প্রস্তুত করা হয়েছিলো।’...

‘পরে যখন সে জানতে পারলো বড় ক্রুশও তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন তার বিশ্বাস লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। সে দেখতে পায়, কায়রোতে তার যে পুরুষ সহকর্মীরা ছিলো, তারা ওখান থেকে পালাতে শুরু করেছে। একদিন এক সঙ্গীর সন্ধানে গিয়ে জানতে পারে, সে উধাও হয়ে গেছে। অপর এক সঙ্গী তাকে বললো, এখন আমাদেরকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো কেউ নেই। ভালো হবে, মুসলমান হয়ে কোনো একজন মুসলমানকে বিয়ে করে নাও। নতুবা এখান থেকে পালিয়ে যাও।’...

‘মেয়েটি পাগলের মতো হয়ে যায়। সে তার এক বান্ধবীকে সঙ্গে নেয়। এক মুসলমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার প্রেমিক ছিলো। ফাঁকি দিয়ে তার থেকে দু'টি ঘোড়া নিয়ে সন্ধ্যার সময় দু'জন বেরিয়ে পড়ে। অন্ধকার গাঢ়

হলে নগরী থেকে বেরিয়ে আসে। তারা খাবার-পানির কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। কিন্তু মরুভূমির সফর সম্পর্কে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না। কোথায় যাবে, তাও তারা জানতো না। আশা ছিলো, পথে কোথাও খৃস্টান সেনাদল পেয়ে যাবে। কিন্তু তাদের নির্বুদ্ধিতা ছিলো, পথঘাট সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা না নিয়েই রওনা হয়েছিলো।'...

'রাতটা কেটে গেছে। তারা ঘোড়া দ্রুত হাঁকিয়েছিলো। পরদিন সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসে যখন মরুভূমিকে ঝলসে দিতে শুরু করে, তখন ঘোড়া ক্লান্তি ও পিপাসায় বেহাল হয়ে যেতে শুরু করে। তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তারা মরুভূমিতে পানি ও শ্যামলিমা দেখতে শুরু করে। সেগুলোর পেছনে পেছনে তারা ঘোড়া হাঁকিয়ে চলতে থাকে। সেদিনটি ঘোড়া কিছুটা সঙ্গ দেয় বটে; কিন্তু পরদিনও যখন পানাহারের জন্য কিছু জোটেনি, তখন ঘোড়া দুটো প্রথমে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর লুটিয়ে পড়ে। অতপর আর ওঠে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়।'...

'তারপর মেয়ে দুটোর যে সফর শুরু হয়েছিলো, এহতেশাম ভাই! তুমি তা ভালোভাবেই জানো। নির্দয় মরুভূমি এ ধরনের পথিকদের কোন্ পরিণতিতে নিয়ে পৌঁছায়, তোমার তা জানা আছে। মেয়েটি আমাকে বলেছে, আমরা মানুষকে যেসব ধোঁকা দিয়েছিলাম, মরুভূমি আমাদেরকে তার চেয়েও বেশি নির্মম ধোঁকা দিয়েছে। আমি মরুভূমিতে নদী প্রবাহিত হতে দেখলাম। নিকটে গেলাম, তো নদী দূরে সরে গেলো। আমরা তাদের পেছনে পেছনে ছুটতে থাকি। আমি হাত উপরে তুলে নাড়াতাম, চীৎকার করতাম ও তাদের পেছনে পেছনে দৌড়াতাম। বহু জায়গায় আমরা পানি পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আসলে সেগুলো পানি ছিলে না।'...

'মেয়েটি আমাকে বলেছে, তার যে অস্তিত্ব কায়রোর সরকারি কর্মকর্তাদের উপর যাদু প্রয়োগ করেছিলো, মরুভূমিতে সেই অস্তিত্ব মরে গেছে। তার হৃদয়ে আমাদের খোদার ভাবনা এসে গেছে এবং তার মধ্যে এই অনুভূতি কাঁটার ন্যায় বিদ্ধ হতে শুরু করেছে যে, ক্রুশের প্রধান মোহাফেজ তাকে ধোঁকা দিয়েছেন আর এখন সে অন্যদের পাপের শাস্তি ভোগ করছে। তার মধ্যে বুঝ আসে, নিজের সম্ভ্রম উপস্থাপন করে কাউকে ধোঁকা দেয়া পুণ্যের কাজ নয়। মনে এই ভাবনাও জাগে যে, মুসলমানরা তাদের মেয়েদেরকে এভাবে ব্যবহার করে না। একদিন মরুভূমিতে তার এই অনুভূতিও জাগে, যেনো সে ও তার বান্ধবী মরে গেছে এবং নরকে

নিক্ষিপ্ত হয়েছে কিংবা প্রেতাত্মায় পরিণত হয়ে গেছে এবং নরকের ন্যায় প্রজ্বলমান প্রান্তরে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে ফিরছে।'...

'এক রাতে সে তার বান্ধবীকে বললো, আজীবনের লালিত বিশ্বাস থেকে আমার মন উঠে গেছে এবং এখন থেকে আমি মুসলমানের খোদাকে ডাকবো। উভয়ের ঠোঁট ও জিহ্বা কাঠের ন্যায় শুকিয়ে গিয়েছিলো। কণ্ঠনালীতে কাঁটা বিদ্ধ হচ্ছিলো। কথা বলতে তাদের কষ্ট হচ্ছিলো। আপন বিশ্বাস থেকে সরে আসা এবং শত্রুর বিশ্বাস ধারণ করার বিষয়টি তার বান্ধবী ভালো চোখে দেখেনি। তাই সে তার মতে সায় দেয়নি। একসময় বান্ধবী শুয়ে পড়লে সে দূরে এক স্থানে চলে যায়। সে সিজদা করে ও হাত তুলে মহান আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। মেয়েটি সমগ্র রাত ক্রন্দন করে কাটায়। সিজদা ছাড়া ইবাদতের আর কোনো পন্থা তার জানা ছিলো না।'...

'তার ভাষ্য মতে, সে রাতেই হঠাৎ ধোঁয়ার ন্যায় শশ্রুমণ্ডিত এক ব্যক্তি তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। সে বললো, তুমি যদি অন্তর থেকে তাওবা করে থাকো, তাহলে তুমি যে খোদার সমীপে প্রার্থনা করেছো, তিনি এই মরুভূমি থেকে তোমাকে উদ্ধার করে নেবেন।'...

'আমরা দশ-বারো দিন পর বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছি। এতোদিনে তার স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে গেছে। দেহের রূপ-লাবণ্য ফিরে এসেছে। কিন্তু কথা-বার্তা সেই দেওয়ানার ন্যায়ই বলতে থাকে। সেরূপ কথা যদি তোমার সঙ্গেও বলতো, তুমি প্রভাবিত হয়ে যেতে। সে বহুবার বলেছে, বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আর কোনদিন খৃস্টানদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। খোদা তাদেরকে পথেই ডুবিয়ে মারবেন। মেয়েটি এরূপ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে। রাতে তার ইবাদত শুরু হতো। পন্থা একটাই– সিজদা করা, ক্রন্দন করা ও প্রার্থনা করা।'...

'মেয়েটি এখন এই যাঁর ঘরে থাকছে, আমি বহুদিন যাবত তাঁকে জানি। অনেক বড় আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি। আমি তাঁর ভক্ত। আমি মেয়েটিকে তাঁর হাতে তুলে দেই।'...

❖ ❖ ❖

বুযুর্গ নামায পড়ে ফিরে এসেছেন। তিনি এহতেশামকে উদ্দেশ করে বললেন– 'যার কাছে ইল্‌ম আছে, আল্লাহ এই ফজীলত তাকেই দান করবেন এটা জরুরি নয়। জানিনা কখন কোন্ ফরিয়াদ মেয়েটির মুখ থেকে

বের হয়েছিলো, আল্লাহ যা কবুল করে নিয়েছেন এবং মেয়েটিকে এই মর্যাদা দান করেছেন। মেয়েটি পাগল নয়, কাউকে ধোঁকাও দিচ্ছে না। নিজের ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমি তাকে নামায পড়াতে ও শেখাতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার ইবাদতের সেই একই পদ্ধতি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করছে আর যখন কথা বলছে, মনে হচ্ছে সে গায়েব থেকে কোনো ইঙ্গিত পেয়েছে।'

'ও কি মসজিদে আকসায় সবসময়ই যাওয়া-আসা করে?' এহতেশাম জিজ্ঞেস করে।

'না'– বুযুর্গ বললেন– 'রাতে এ-ই প্রথমবার মসজিদে গেলো। আল-আস সকালে এসে জিজ্ঞেস করলো, বললাম ও মসজিদে গেছে। আল-আস তার পেছনে চলে যায়। সম্ভবত সে পথেই তাকে পেয়ে যায়।'

'সন্দেহটা এখান থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে যে, যে রাতে সুলতান আইউবী মসজিদে উপস্থিত ছিলেন, কেবল সেই রাতে কেনো ও মসজিদে গেলো?'

'আমি তার উত্তর দিতে পারবো না।' বুযুর্গ বললেন।

এহতেশাম বললো, আমি মেয়েটিকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর নিকট নিয়ে যাবো। এটা আমার কর্তব্য। তারপর যা করার তিনি করবেন।

মেয়েটিকে যখন জানানো হলো, তোমাকে এহতেশামের সঙ্গে যেতে হবে, সে চুপচাপ তার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। আল-আসও সঙ্গে যায়। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ এহতেশাম ও আল-আস থেকে বৃত্তান্ত শোনে মেয়েটিকেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মেয়েটি উত্তর দেয়– 'এখন সমুদ্র থেকে আসা নৌবহর তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমাকে কেনো ভয় করছো? আমাকে তোমাদের সুলতানের নিকট নিয়ে চলো। তিনি রাতে যে দু'আ করেছেন, খোদা সব কবুল করে নিয়েছেন।'

অনেক চেষ্টার পরও তার থেকে কোনো কথা বের করা গেলো না। সুলতান আইউবীকে অবহিত করা হলো। সেদিনই সুলতানের আক্রা যাওয়ার কথা ছিলো। তিনি বললেন, মেয়েটাকে নিয়ে আসো। মেয়েটি সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সুলতানের ডান হাতটা চুম্বন করে। তারপর মাথা তুলে এগিয়ে উঁকি দিয়ে সুলতানের চোখে কী যেনো দেখে। তারপর স্বগতোক্তি করার মতো করে বললো, এই চোখগুলো থেকে রাতে সিজদার মধ্যে অশ্রু বের হয়েছিলো। তোমাদের শত্রুর রণতরীগুলো এই অশ্রুতে ডুবে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। বাইতুল

মুকাদ্দাসের প্রাচীরের কাছেও কেউ ঘেঁষতে পারবে না। রক্তের নদী বয়ে যাবে। তারা পথেই মারা যাবে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। যে অশ্রু আল্লাহর সমীপে প্রবাহিত হয়, ফেরেশতারা মুক্তা জ্ঞান করে সেগুলো তুলে নেয়। খোদা সেই মুক্তাগুলোকে বিনষ্ট করেন না। নিয়ত পরিষ্কার হলে পথও পরিষ্কার হয়ে যায়।'

মেয়েটিকে আসলরূপে ফিরিয়ে আনার বহু চেষ্টা করা হলো। কিন্তু সে এমন ধারায় কথা বলতে থাকে, যেনো অনাগত দিনগুলো দেখতে পাচ্ছে। অবশেষে দেওয়ানা সাব্যস্ত করেই মেয়েটিকে বুযুর্গের হাওয়ালা করে দেয়া হলো এবং বুযুর্গকে তার প্রতি নজর রাখতে বলা হলো।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মসজিদে আকসায় আল্লাহর সমীপে যে অশ্রু প্রবাহিত করেছিলেন, ফেরেশতারা মুক্তা মনে সেগুলো তুলে নিয়ে যায়। তিনি সর্বপ্রথম সংবাদ পান, সম্রাট ফ্রেডারিক মারা গেছেন। তার দিন কয়েক পর অপর এক খৃস্টান সম্রাট কাউন্ট হেনরির মৃত্যুর সংবাদ আসে। ইনিও খৃস্টানদের যৌথ বাহিনীর এক শরীক ছিলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানদের দখল থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, খৃস্টানরা কাউন্ট হেনরির মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ পেতে দেয়নি। সুলতান সংবাদটা জানতে পেরেছেন অন্যভাবে।

সুলতান আইউবীর নৌ-কমান্ডোরা খৃস্টানদের দু'টি জঙ্গী নৌকা পাকড়াও করেছিলো, যেগুলো ফিলিস্তীনের তীর থেকে সামান্য দূর দিয়ে অতিক্রম করছিলো। তাতে পঞ্চাশজন খৃস্টান নৌ-সেনা ছিলো। তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো।

পরদিন খৃস্টানদের আরো একটি নৌকা ধরা পড়ে। তাতে একটি কোট ছিলো, যার গায়ে মনি-মুক্তা খচিত ছিলো। এটি কোনো এক সম্রাট ছাড়া কারো কোট হতে পারে না। জিজ্ঞাসাবাদে খৃস্টান সৈন্যরা বললো, এটি কাউন্ট হেনরির কোট এবং তিনি মারা গেছেন। এই নৌকায় নৌবাহিনীর কমান্ডার গোছের এক ব্যক্তি ছিলো। জানা গেলো, লোকটি কাউন্ট হেনরির ভাতিজা। তাদের সকলকে বন্দি করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হলো।

সম্রাট কাউন্ট হেনরি কীভাবে মারা গেলেন? কেউ বলেন, তিনি নদীতে ডুবে মারা গিয়েছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, তিনি মাত্র তিন

ফুট গভীর পানিতে পড়ে মারা গেছেন। এক বর্ণনা মতে, নদীতে গোসল করতে নামবার পর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং মারা যান।

সুলতান আইউবী যার ব্যাপারে বেশি চিন্তিত ছিলেন, তিনি হলেন ইংল্যান্ডের যুদ্ধবাজ সম্রাট রিচার্ড, যিনি 'ব্ল্যাক প্রিন্স' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাকে সিংহ-হৃদয় রিচার্ডও বলা হতো। লোকটি অভিজ্ঞ ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। উচ্চতায় যেমন দীর্ঘ ছিলেন, তেমনি তার বাহুও ছিলো লম্বা। তাতে তার তরবারী দুশমন পর্যন্ত পৌঁছে যেতো; কিন্তু দুশমনের তরবারী তাকে স্পর্শ করতে কষ্ট হতো। খৃস্টজগতে সকলের দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ ছিলো। তার সামরিক শক্তিও ছিলো বেশি। তার নৌ-শক্তি ছিলো তৎকালীন পৃথিবীর সবচে' বেশি শক্তিশালী। এ ব্যাপারটিই এখন সুলতান আইউবীর ভয়ের কারণ।

সুলতান আইউবীর এক নৌ-কর্মকর্তার নাম হুসামুদ্দীন লুলু। নৌ-বাহিনী প্রধান আবদুল মুহসিন। সুলতান আইউবী যখন সংবাদ পেলেন, রিচার্ড তার নৌ-বহর নিয়ে আসছে, তখন আবদুল মুহসিনকে আদেশ প্রেরণ করেন, যেনো তিনি রিচার্ডের বহরের মুখোমুখি না হন এবং নিজের রণতরীগুলো ছড়িয়ে রাখেন। সুলতান আইউবী হুসামুদ্দীন লুলুকে কয়েকটি জাহাজ ও নৌকাসহ আসকালান তলব করেন। তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন, দুশমনের জাহাজগুলোর উপর দৃষ্টি রাখবে। তবে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িত হবে না। তদস্থলে নৌ-গেরিলাদেরকে দুশমনের বিচ্ছিন্ন জাহাজগুলোকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করবে।

সুলতান আইউবী দেখতে পাচ্ছেন, সমুদ্রেও তাকে গেরিলা যুদ্ধ লড়তে হবে। সময়টা ছিলো সুলতান আইউবীর জন্য খুবই কষ্টকর। রাতে ঘুমাতেন না। তিনি মজলিশে শূরায় বলেছিলেন, আমাদেরকে একটি উপকূলীয় নগরী কুরবান করতে হবে। হতে পারে সেটি আক্রা। আমি দুশমনকে বুঝাতে চাই, আমাদের যা কিছু আছে সব আক্রায় এবং আক্রা হাতছাড়া হয়ে গেলে মুসলমানদের কোমর ভেঙে যাবে। তারপর বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানদের দখলমুক্ত করা সহজ হবে। সুলতান আইউবী মজলিশে শূরাকে জানালেন, আমরা যদি দুশমনকে আক্রা টেনে আনতে সক্ষম হই, তাহলে দুশমন আক্রার প্রাচীরের সঙ্গেই মাথা ঠুকতে থাকবে। মজলিসে শূরা অনুমোদন প্রদান করে, আপনি যা ভালো মনে করেন, করুন।

❖ ❖ ❖

এখন বাইতুল মুকাদ্দাস ও পবিত্র ভূমিকে সুলতান আইউবীর সেই অশ্রুই রক্ষা করতে পারে, যা তিনি মসজিদে আকসায় ঝরিয়েছিলেন। পারে সেই দু'আ, যা সুলতান আইউবী মসজিদে আকসায় সিজদাবনত হয়ে করেছিলেন। উক্ত মেয়েটিও মসজিদে আকসায় দু'আ করেছিলো। পরে সে সুলতান আইউবীর চোখে উঁকি দিয়ে বলেছিলো– 'তোমার দুশমনের জাহাজ তোমার চোখের অশ্রুতে নিমজ্জিত হতে দেখতে পাচ্ছি।'

কোনো ঐতিহাসিক বলতে পারছেন না, সে রাতে সুলতান আইউবী কী দু'আ করেছিলেন। তবে সব ঐতিহাসিকই বর্ণনা করেছেন, সুলতান আইউবীর ন্যায় মর্দে-মুজাহিদ রিচার্ডের যে নৌ-বহরে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, ইংল্যান্ড থেকে রওনা হয়ে রোম উপসাগরে প্রবেশ করামাত্র সেই বহর ভয়াবহ এক ঝড়ের কবলে পড়ে গিয়েছিলো। সবগুলো জাহাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক পরিসংখ্যান মোতাবেক সেই বহরে ৫২০টি ছোট জাহাজ ছিলো। বড় জাহাজ ছিলো একাধিক। বহরটি সৈন্য, ঘোড়া, রসদ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিতে বোঝাই ছিলো।

ঝড়ের কবলে পড়ে বহরটি এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় যে, রিচার্ডের নিজের জীবনই বিপন্ন হয়ে যায়। ঝড় থামার পর কয়েক দিনে যখন জাহাজগুলোকে একত্রিত করা হলো, তখন জানা গেলো, পঁচিশটি বড় জাহাজ ডুবে গেছে। দু'টি বিশাল মালবাহী জাহাজও পানিতে তলিয়ে গেছে। সেগুলোতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ছিলো। রিচার্ডকে সবচে' বেশি ক্ষতিটির শিকার হতে হলো, সে হলো বিপুল নগদ অর্থ, যেগুলো তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসছিলেন, সেই বিশাল অর্থ ভাণ্ডারটি তার রোম উপসাগরের অঞ্চলে হারিয়ে গেলো।

কারবাসের দ্বীপে এসে নোঙ্গর ফেলে রিচার্ড জানতে পারেন, ঝড় তার বহরের তিন-চারটি জাহাজকে কারবাসের কূলে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তার একটিতে তার যুবতী বোন জুয়ানা এবং বোনের হবু স্বামী বেরঙ্গারিয়াও রয়েছে। এ দু'জনের ব্যাপারে তিনি ধরে নিয়েছিলেন, তারা ডুবে মারা গেছে। এখন জানতে পারলেন তারা জীবিত ও নিরাপদ আছে। কিন্তু কাবরাসের সম্রাট আইজেক জাহাজগুলোর সমুদয় মালামাল বের করে নিয়ে গেছেন এবং বোন ও বোনের হবু স্বামীকেসহ সকলকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। রিচার্ডকে আইজেকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে

হলো। পরাজিত করে তিনি আইজেককে একটি তাঁবুতে আটকে রাখেন। কিন্তু আইজেক রাতে বন্দিদশা থেকে পালিয়ে যান। রিচার্ড পনের-বিশ দিন পর্যন্ত তাকে খুঁজতে থাকেন। অবশেষে তাকে পাওয়া গেলো। রিচার্ড তার ঘোড়াটা নিয়ে নেন। সে এক অস্বাভাবিক দ্রুতগামী ঘোড়া। রিচার্ড যখন পবিত্র ভূমিতে যুদ্ধ করতে আসেন, তখন এই ঘোড়াটি তার সঙ্গে ছিলো।

রিচার্ড যখন পবিত্র ভূমির কূলে এসে ভিড়েন, ততোক্ষণে তার জোটভুক্ত খৃস্টানরা আক্রা অবরোধ করে ফেলেছে। সর্বপ্রথম যার বাহিনী অবরোধে অংশগ্রহণ করে, তিনি হচ্ছেন গাই অফ লুজিনান, যাকে রানী সাবীলা এই শর্তে মুক্ত করিয়েছিলেন যে, তিনি সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। তার সঙ্গে ফিলিপ অগাস্টাসের বাহিনী এসে যুক্ত হয় এবং অবরোধ শক্ত হয়ে যায়। শহরের ভেতরে মুসলিম বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিলো দশ হাজার। রসদ-পাতি যা ছিলো, তা এক বছরের জন্য যথেষ্ট ছিলো। অবরোধ ১১৮৯ সালের ১৩ আগস্ট শুরু হয়। আক্রা নগরীর অবস্থান হচ্ছে, তার একদিকে এল আকৃতির প্রাচীর। তিনদিকে নদী। নদীতে খৃস্টানদের নৌ-বহর বর্তমান। জাহাজগুলোকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। প্রাচীর থেকে দূরে খৃস্টান বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করেছে। এভাবে স্থলের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সুলতান আইউবী নগরীতে নেই। তিনি বাইরে কোথাও অবস্থান করছেন। তিনি তাঁর গোয়েন্দাদের মাধ্যমে এবং ভাবগতি দেখিয়ে দুশমনকে আক্রায় টেনে এনেছেন। খৃস্টানরা যখন অবরোধ শুরু করে, তখন তাদের জানানো হয়েছিলো, আইউবী ভেতরে আছেন। কিন্তু অবরোধ সম্পন্ন হওয়ার পর যখন তাদের একটি অংশের উপর পেছন থেকে আক্রমণ হলো, তখন তাদের খবর হয়, আইউবী ভেতরে নয়– বাইরে আছেন এবং তিনি খৃস্টানদের আক্রা অবরোধকারী বাহিনীকে অবরোধ করে রেখেছেন।

সুলতান আইউবীর সমস্যা হচ্ছে, তাঁর সৈন্য কম। তথাপি আশা করছেন, তিনি অবরোধ ভেঙে ফেলতে সক্ষম হবেন। কিন্তু তার কামনা, অবরোধ বেশিদিন স্থায়ী হোক, যাতে খৃস্টানদের শক্তি এখানেই ব্যয় হতে থাকে। ১১৮৯ খৃস্টাব্দের ৪ অক্টোবর তিনি খৃস্টানদের উপর জোরদার আক্রমণ চালান। খৃস্টানরা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিলো। ভয়াবহ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৯ হাজার খৃস্টানসেনা মারা যায়। কিন্তু তাদের ছিলো দু'লাখ সৈন্য। ৯ হাজারের মৃত্যুতে তাদের কোনো ক্ষতি হলো না।

কীভাবে শহর জয় করবে, তার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে তারা। তাদের বাহিনী প্রাচীরের কাছে ঘেঁষতে ভয় পাচ্ছে। কারণ, প্রাচীরের উপর থেকে মুসলমানরা তাদের উপর তীর ছাড়াও অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করছে।

খৃস্টানরা প্রাচীরের নিকটে পৌঁছে যায়। নগরীর অভ্যন্তরে পাথর ও আগুনের গোলা নিক্ষেপ ও প্রাচীর অতিক্রমের জন্য কাঠ দ্বারা চাকাওয়ালা উঁচু মাচান তৈরি করে নিয়েছে। এতো বিশাল মাচান যে, তাতে কয়েকশ' সৈনিক দাঁড়াতে পারে। তাকে মুসলমানদের নিক্ষিপ্ত দাহ্য পদার্থ ও গোলা থেকে রক্ষা করার জন্য তার ফ্রেমগুলোতে তামার পাত চড়ানো হয়েছে। তারা যখন মাচানটি প্রাচীরের সন্নিকটে নিয়ে যায়, তখন মুসলমানরা প্রাচীরের উপর থেকে তার উপর দাহ্য পদার্থের পাতিল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। পদার্থগুলো মাচানের উপর গিয়ে পতিত হয় এবং অবস্থানকারী সৈনিকদের গায়েও গিয়ে পড়ে। পরপর কয়েকটি পাতিল এসে পতিত হওয়ার পর যখন মাচানটি ভিজে যায়, এবার এক এক করে প্রজ্বলমান কাঠ ছুটে আসতে শুরু করে। আগুনধরা কাঠগুলো তেলভেজা মাচানে এসে পতিত হওয়ামাত্র মাচানে আগুন ধরে যায়। মাচান জ্বলে যায় এবং তাতে অবস্থানকারী সৈন্যরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়।

প্রাচীরের বাইরে একটি পরিখা ছিলো, যেটি পার হওয়া খৃস্টানদের জন্য দুঃসাধ্য ছিলো। তারা মাটি দ্বারা পরিখাটি ভরাট করতে শুরু করে। কিন্তু নগরীর ভেতরের সৈনিকরা এতোই দুঃসাহসী যে, তাদের একটি অংশ বাইরে বেরিয়ে এসে খৃস্টানদের উপর আক্রমণ করে করে ফিরে যাচ্ছে। পরিখা ভরাট করার জন্য খৃস্টানরা একটি পন্থা অবলম্বন করে যে, তারা তাদের মৃত সৈনিকদের লাশগুলো তাতে ছুঁড়ে মারছে। তখন থেকে তাদের যতো সৈনিক প্রাণ হারায়, সকলের মরদেহ উক্ত পরিখায় নিক্ষেপ করা হয়। পেছন থেকে সুলতান আইউবী তাদের উপর অনবরত গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু খৃস্টানদের অবরোধ দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে আরো দৃঢ় হতে থাকে।

নগরীর সঙ্গে সুলতান আইউবী বার্তাবাহী কবুতরের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখেন। অপর মাধ্যমটি ছিলো এক ব্যক্তি, যার নাম ঈসা আল-আমওয়াম। লোকটি চামড়ার গায়ে বার্তা লিখে কোমরের সঙ্গে বেঁধে সমুদ্রে সাঁতার কেটে সংবাদ আদান-প্রদান করতো। কাজটা সে রাতে করতো। দুশমনের নোঙ্গরকরা জাহাজের তলে দিয়ে যাওয়া-আসা করতো। এক

রাতে সে এভাবেই আসে। নগরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি থলে এবং লিখিত বার্তা দেয়া হয়েছিলো। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন– লোকটি যখন নিরাপদে নগরীতে গিয়ে পৌঁছতো, তখন একটি কবুতর উড়িয়ে দেয়া হতো। কবুতরটি আমাদের নিকট উড়ে আসতো। তাতে আমরা বুঝে নিতাম, ঈসা নিরাপদে পৌঁছে গেছে। আমরা কবুতরটি ফেরত উড়িয়ে দিতাম। যে রাতে সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে গেলো, তার পরদিন কবুতর আসলো না। আমরা বুঝে ফেললাম, ঈসা ধরা পড়েছে। কয়েকদিন পর আমাদের নিকট সংবাদ আসে, ঈসার লাশ আক্রার কূলে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে। সোনাভর্তি থলেটি তার দেহের সঙ্গে বাধা ছিলো। লোকটি সোনার ওজন বহন করে সাঁতার কাটতে না পেরে ডুবে গিয়েছিলো।

মীর কারাকুশ ছিলেন আক্রার শাসনকর্তা। প্রধান সেনাপতি আলী ইবনে আহমাদ আল-মাশতুব। তারা বারংবার সুলতান আইউবীকে পয়গাম প্রেরণ করতে থাকেন, আমরা অস্ত্র ত্যাগ করবো না। আপনারা বাইরে থেকে খৃস্টানদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখুন এবং যে কোনো প্রকারে হোক নগরীতে ফৌজ, অস্ত্র ও রসদ পৌঁছাতে থাকুন।

কিন্তু সুলতান আইউবী নগরীতে সাহায্য পৌঁছাবেন কীভাবে? জ্বরে তার শরীর পুড়ে যাচ্ছে। লাগাতার রাত জাগা, মানসিক অস্থিরতা আর চারদিকে পঁচা-গলা লাশের দুর্গন্ধ এসব সুলতান আইউবীর শারীরিক অবস্থা আরো শোচনীয় করে তুলেছে। তিন-চারদিন পর্যন্ত তিনি উঠে দাঁড়াতে পারেননি। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, আক্রা তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।
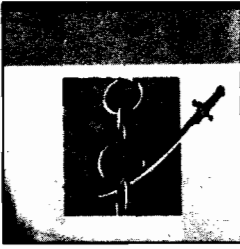
পায়রাটি

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁবুতে অসুস্থ পড়ে আছেন। তাঁর থেকে সামান্য দূরে আক্রার বাইরে তাঁর জানবাজরা আক্রা অবরোধকারী খৃস্টান বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তীনের ইতিহাসে সবচে' বেশি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। কিন্তু অবরোধ ভাঙার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

নগরীর ভেতরে সুলতান আইউবীর সৈন্যসংখ্যা দশ হাজার। আর বাইরে নগরী অবরোধকারী খৃস্টানরা ৫ লক্ষাধিক। সুলতান আইউবী নগরীর বাইরে খৃস্টানদের পেছনে। তাঁর কাছে আছে দশ হাজার মামলুক, যাদের উপর তার অনেক ভরসা ছিলো। তারা পেছন থেকে খৃস্টানদের উপর অত্যন্ত দুঃসাহসী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো সাফল্য আসছে না। শত্রুর সংখ্যা বেশি হওয়ার পাশাপাশি অবরোধ না ভাঙার আরেকটি কারণ হচ্ছে, খৃস্টানরা আক্রার চতুর্দিকে স্থানে স্থানে গর্ত খনন করে রেখেছে। এই গর্তগুলো সুলতান আইউবীর বাহিনীর জন্য বিপজ্জনক রূপে দেখা দিয়েছে। অশ্বারোহী সৈন্যরা আক্রমণ করতে এলে ঘোড়া গর্তে পড়ে যাচ্ছে।

আক্রার বাইরে বিস্তৃত অঞ্চল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। লাশের কোনো সংখ্যা নেই। আক্রার প্রাচীরের বাইরে নগরীর প্রাচীরসম দীর্ঘ ও চওড়া পরিখা ছিলো, যেটি পার হওয়া দুষ্কর ছিলো। খৃস্টানরা তাদের মৃত সৈন্য ও ঘোড়া দ্বারা সেই পরিখা ভরাট করে চলেছে। যুদ্ধের ডামাডোল এতো বেশি যে, আকাশে শকুন ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী উড়ছে না। শুকনরা নীচে নামছে এবং পেট পুরে লাশ খেয়ে খেয়ে উড়ে যাচ্ছে।

শকুন ছাড়া আছে আর একটি পাখি– একটি কবুতর। কবুতরটি প্রায় প্রতিদিন আক্রা থেকে উড়ে এসে সুলতান আইউবীর ক্যাম্পে অবতরণ করছে এবং বহুক্ষণ পর ক্যাম্প থেকে উড়ে আবার আক্রা ফিরে যাচ্ছে। অবরোধ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাঝে এই কবুতর একদিন আক্রা থেকে উড়াল দেয়। ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড তাঁবুর বাইরে দণ্ডায়মান। সঙ্গে তাঁর বোন জুয়ানাও আছে।

'এই পায়রাটার উপর দৃষ্টি রাখবে'– রিচার্ড আদেশ করেন– 'দেখামাত্র তার উপর বাজ ছেড়ে দেবে। এই একটি পায়রাই আমাদের পরাজয়ের কারণ হতে পারে।'

বোন জুয়ানা এবং তার হবু স্বামী বেরঙ্গারিয়া রিচার্ডের নিকট দণ্ডায়মান। এই অল্প ক'দিন আগেও জুয়ানা সিসিলির সম্রাটের স্ত্রী ছিলো। সম্রাট মারা গেলে জুয়ানা ভর যৌবনেই বিধবা হয়ে যায়। ফিলিস্তীন জয় করে সঙ্গের ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্য রিচার্ড তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। জুয়ানা এতো রূপসী যে, কেউ বলবে না মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। ইংল্যান্ড থেকে আসার সময় পথে সিসিলি থেকে রিচার্ড তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

রিচার্ড জুয়ানার হাসি শুনতে পান। বোনের দিকে ফিরে তাকালে সে জিজ্ঞেস করে– ভাইজান! এই পায়রাটি মরে গেলে কি সালাহুদ্দীন আইউবীও মরে যাবেন?'

'এই পায়রাটি পিয়ন জুয়ানা!'– রিচার্ড বললেন– 'পায়ের সঙ্গে বার্তা বেঁধে ও সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট আক্রাবাসীদের চিঠি নিয়ে যায়। আইউবী এরই মাধ্যমে সেই চিঠির উত্তর আক্রায় পৌঁছিয়ে দেন। আইউবী বাইরে থেকে আমাদের উপর যে আক্রমণ চালাচ্ছেন, আক্রাবাসীদের বার্তা মোতাবেকই করে থাকেন। আক্রাবাসীদের জোশ-চেতনা এবং অস্ত্র ত্যাগ না করার প্রত্যয় এই পায়রাটির কারণেই অটুট রয়েছে জুয়ানা। অন্যথায় কোনো অবরুদ্ধ বাহিনী এতো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এমন তীব্র আক্রমণ সহ্য করতে পারে না। তুমি তো দেখেছো, আমরা মিনজানিকের সাহায্যে পাথর ছুঁড়ে কয়েক স্থান থেকে প্রাচীরের উপরের অংশ ফেলে দিয়েছি এবং আমাদের নিক্ষিপ্ত গোলা নগরীতে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করেছে। তারপরও তারা অস্ত্র ত্যাগ করছে না।'

'আপনার আসল উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য তো জেরুজালেম, যার থেকে আপনি এখনো অনেক দূরে'– জুয়ানা বললো– 'আক্রা জয় করতে যদি কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে জীবনেও জেরুজালেম পৌঁছতে পারবেন কি? আমাদের গোয়েন্দা ও মুসলিম যুদ্ধবন্দিরা বলছে, নগরীর ভেতরে মাত্র দশ হাজার সৈন্য আছে। আমাদের সংখ্যা প্রথমে ৬ লাখ ছিলো। এখন ৫ লাখ। অবরোধ ১১৮৯ সালের আগস্টে শুরু হয়েছিলো। এখন ১১৯১ সালের আগস্ট চলছে। দুই বছর ভাইজান! এখনো আপনি দশ হাজার অবরুদ্ধ সৈন্যকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারেননি। আমি জানি, আপনি এই অবরোধ অভিযানে এসে যোগ দিয়েছেন মাস কয়েক হলো। কয়েক মাস সময়ও কম

নয় ভাইজান। কিন্তু এই কয়েক মাসে আক্রা নগরীর সামান্য প্রাচীর ভাঙা আর মিনজানিকের সাহায্যে নগরীর কিছু অংশে আগুন লাগানো ব্যতিরেকে আপনি কোনো সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন কি? আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নগরীর ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আপনি কিছুই অর্জন করতে পারবেন না।'

রিচার্ড তার হবু ভগ্নিপতিকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন। সে চলে যায়। রিচার্ড বোনকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু করেন–

'বড় ক্রুশ এবং জেরুজালেমের মর্যাদা ও পবিত্রতার দাবি হচ্ছে, তুমি ভুলে যাও, তুমি আমার বোন। তুমি সেই ক্রুশের কন্যা, যেটি মুসলমানদের দখলে চলে গেছে এবং যে জেরুজালেম আমাদের নবীর উপাসনালয় ছিলো, সেটিও এখন মুসলমানদের দখলে। তুমি জানো, আমাদেরকে ইসলামের বিনাশ সাধন করতে হবে। আর তুমি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছো, মুসলমানরা আত্মহত্যার ন্যায় যুদ্ধ করছে। এরা মৃত্যুর পরোয়া করে না। এরা বিজয় অর্জন করার লক্ষ্যে লড়াই করে। আমি এই প্রথমবার তাদের যুদ্ধ দেখলাম। এখানে আমি এই প্রথম এসেছি। মুসলমানদের উন্মাদনার যে কাহিনী কানে শুনেছিলাম, এখন তা চোখে দেখলাম। আমাকে ধারণা দেয়া হয়েছিলো, মুসলমানদেরকে ঘায়েল করার উত্তম পন্থা নারী। একজন নারী নাকি একজন ক্ষমতাধর ও যুদ্ধবাজ মুসলমানকে কুপোকাত করে ফেলতে পারে। তাদের মাঝে যে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, সেটি আমাদের সম্রাটগণ তাদেরকে ক্ষমতার মোহ, সোনা-মাণিক্য এবং মদ ও নারীর নেশায় আচ্ছন্ন করে সংঘটিত করিয়েছিলেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী লোকটা এমন পাথর যে, তাকে কোনো কিছুতেই গলানো সম্ভব হয়নি। তার যে ভাইয়েরা আমাদের সঙ্গে এসে পড়েছিলো, তরবারীর জোরে তিনি তাদেরকে নিজের অনুগত বানিয়ে নিয়েছেন কিংবা তাদের অন্তরে ইসলামী চেতনা জাগিয়ে তুলেছেন।'

'হ্যাঁ, এসব আমিও শুনেছি'– জুয়ানা বললো– 'মুসলিম আমীর ও শাসকদের নিকট গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতার জন্য আমাদের যে মেয়েদের প্রেরণ করা হতো, তাদের আত্মত্যাগের কাহিনীও শুনেছি। আমার মনে হচ্ছে, এ পদ্ধতিটা সফল হয়নি।'

'ব্যর্থও যায়নি'– রিচার্ড বললেন– 'মুসলমানদের জাতীয় চেতনা বিনষ্ট করার জন্য যদি এই মেয়েগুলোকে ব্যবহার না করা হতো, তাহলে তারা বহু আগে শুধু জেরুজালেমই নয়– অর্ধেক ইউরোপ দখল করে নিতো। আমরা নারীর দেহের রূপ-যাদু প্রয়োগ করে এবং তাদের কতিপয় উজির-সালারকে

সুলতান বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের ঐক্য ভেঙে দিয়েছিলাম। তাদেরকে আপসে যুদ্ধ করিয়ে করিয়ে তাদের সামরিক শক্তি খর্ব করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে।'

'আপনি এসব কথা আমাকে কেনো শোনাচ্ছেন?' জুয়ানা বললো– 'আপনার বর্ণনা ভঙ্গিতে হতাশা কেনো? আমি আপনার কী সাহায্য করতে পারি?'

'আমি তোমাকে বলেছি, তুমি ভুলে যাও তুমি আমার বোন'– রিচার্ড বললেন– 'তুমি ক্রুশের কন্যা। ক্রুশের বিজয়ের জন্য তুমি বহু কিছু করতে পারো। তুমি দেখতে পাচ্ছো, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করছি আবার পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎও হচ্ছে। আমরা এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট দূত প্রেরণ করছি। সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই আল-আদিলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। আমি তাকে আমার কতিপয় শর্ত মান্য করতে বাধ্য করার চেষ্টা করছি; কিন্তু সে মানছে না। তাকে বলেছি, তোমরা জেরুজালেম ও বড় ক্রুশটা আমাদের দিয়ে দাও আর তোমরা এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাও। সালাহুদ্দীন আইউবীও আমার দাবিগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন।'

'আপনি নিজে সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন না কেন?'

'তিনি আমাকে সাক্ষাৎ দিতে রাজি হচ্ছেন না'– রিচার্ড উত্তর দেন– 'তাছাড়া তিনি অসুস্থ। মনে হচ্ছে তার ভাই আল-আদিল তারই ন্যায় পরিপক্ব মুসলমান ও দৃঢ়প্রত্যয়ী। সে সালাহুদ্দীন আইউবীর স্থান দখল করছে। আমি তার মাঝে একটি দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেছি। লোকটি যুবক এবং প্রাণোচ্ছল মনে হচ্ছে। আমি লোকটার হৃদয় জয় করার চিন্তা করছি। আমি তাকে বন্ধু বানাতে সক্ষম হবো। কিন্তু তোমার কাজ আমি কীভাবে করবো বলো। তোমার কি লোকটাকে পছন্দ হয়?'

'তাঁর মানে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েরা দীর্ঘদিন যাবত যে কাজটা করে আসছে, আপনি আমার দ্বারা সেই কাজ নিতে চাচ্ছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ'– রিচার্ড বললেন– 'তার হৃদয়টা জয় করে নাও। পাগলকরা ভালোবাসা প্রকাশ করো। তুমি তাকে বিয়ে করার আগ্রহ ব্যক্ত করো। আমি মধ্যখানে এসে সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলবো, যদি উপকূলীয় অঞ্চলটা আপনার ভাই আর আমার বোনকে দিয়ে দেন, তাহলে আমি আল-আদিলের সঙ্গে আমার বোনের বিয়েতে প্রস্তুত আছি। তুমি আল-আদিলকে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণে প্রস্তুত করবে। তাকে প্রলোভন দাও, এই সুবিশাল উপকূলীয় অঞ্চলের তুমি সুলতান হয়ে যাবে। আমি আশাবাদী, তুমি

তাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতিপক্ষ বানাতে সক্ষম হবে।'

জুয়ানা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। রিচার্ড উত্তরের অপেক্ষায় তার প্রতি তাকিয়ে আছে। অবশেষে জুয়ানা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো- 'আমি চেষ্টা করবো।'

'মুসলমানদেরকে এই প্রক্রিয়ায় পরাজিত করা যেতে পারে'- রিচার্ড বললেন- 'আমি যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে পরাস্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাবো। কিন্তু তার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। সে সময় পর্যন্ত সম্ভবত আমি বেঁচে থাকবো না। তাছাড়া আমাকে ইংল্যান্ডও ফিরে যেতে হবে। ওখানকার পরিস্থিতি ভালো নয়। বিরোধীরা আমার অনুপস্থিতিতে সুযোগ নিচ্ছে।'

রিচার্ডের মাথার উপর দিয়ে উড়ে আসা পায়রাটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তাঁবুর সম্মুখে পাতা মাচানটার উপর এসে বসে। দারোয়ান ছুটে এসে তার পা থেকে বাঁধা বার্তাটি খুলে তাঁবুতে নিয়ে যায়। সুলতান আইউবী শরীরে বেশ দুর্বলতা অনুভব করছেন। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। তথাপি তিনি উঠে বসে বার্তাটি পড়তে শুরু করেন। বার্তাটি আক্রার শাসনকর্তা মীর কারাকুশ এবং সেনাপতি আল-মাশতুব প্রেরণ করেছেন। পত্রে তারা নতুন কোনো সংবাদ দেননি। অবস্থা শোচনীয়, নগরী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা অস্ত্র সমর্পণ করতে প্রস্তুত নই ইত্যাদি। তারা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন, আপনি এই আশঙ্কা রাখবেন না, জীবন থাকতে আমরা অস্ত্র সমর্পণ করবো। কিন্তু খৃস্টানদের উপর বাইরে থেকে আরো জোরদার আক্রণ করে আমাদের সাহায্য করা আপনার পক্ষে অধিক জরুরি হয়ে পড়েছে। সৈনিকদেরকে বলুন, নগরবাসীরা যেরূপ জযবার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তোমরাও তেমনি জযবার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাও। অর্ধেক নগরীর পুড়ে গেছে। সৈন্যও অর্ধেক কমে গেছে। কিন্তু জনসাধারণের জোশ-জযবা এতো প্রবল যে, তারা পানাহার ছেড়ে সৈন্যদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে। মহিলারও আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে। তারা নিজেরা কম খেয়ে সৈন্যদের খাওয়াচ্ছে।

তারা প্রাচীরের বিবরণ এভাবে প্রদান করে যে, খৃস্টানদের মিনজানিকের অনবরত পাথর নিক্ষেপের ফলে কয়েক স্থান থেকে প্রাচীর ভেঙে গেছে। উপরের অংশ শেষ হয়ে গেছে। শত্রুরা তাদের নিহত সৈনিক ও মৃত ঘোড়ার লাশ দ্বারা বাইরের পরিখা ভরাট করে দেয়ালের নিকটে আসার চেষ্টা করছে। আপনি যখন দফের শব্দ শুনতে পাবেন, তখন পেছন থেকে খৃষ্টানদের উপর অত্যন্ত তীব্র আক্রমণ চালাবেন। খৃস্টানরা যখন প্রাচীরের উপর আক্রমণ

চালাবে, আমরা তখন দফ বাজাবো। আপনি এমন জানবাজ প্রস্তুত করুন, যারা সমুদ্র পথে আমাদের কাছে অস্ত্র পৌঁছিয়ে দেবে।

সুলতান আইউবী জ্বর ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ান। তিনি পত্রের উত্তর লেখান। তাতে তিনি আক্রাবাসীদের প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং সাহস প্রদান করেন। লিখেছেন, জানবাজরা আগেই নগরীতে অস্ত্র পৌঁছানোর জন্য চলে গেছে। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। ইসলামের বড়ই দুর্দিন যাচ্ছে। খৃস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পরিবর্তে আক্রা আসুক এটা আমারই প্রচেষ্টা ছিলো, যাতে আমি এখানেই আটকে রেখে তাদের সামরিক শক্তি দুর্বল করে দিতে পারি। তোমরা আক্রার প্রতিরক্ষার জন্য নয়– মসজিদে আকসার সুরক্ষার জন্য লড়াই করছো।

পত্রখানা পায়ে বেঁধে কবুতরটিকে রওনা করিয়ে সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের তলব করেন। বললেন, প্রতিজন কমান্ডার ও প্রত্যেক সৈনিকের নিকট গিয়ে কথা বলার সময় ও সুযোগ আমার নেই। শরীরে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে, তাকে আমি এই জিহাদে ব্যয় করতে চাই। আমার কমান্ডার ও সৈনিকদের বলো, তোমরা আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের জন্য যুদ্ধ করো। এখন আর চিন্তা করো না, তোমরা তোমাদের সুলতানের নির্দেশে যুদ্ধ করছো। এ-ও ভেবো না, তোমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তোমাদেরকে বিনিময় দান করবেন।

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, সুলতান আইউবী অতীতে কখনো এমন আবেগপ্রবণ হননি। মা কোলের শিশুটিকে হারিয়ে ফেললে যেমন আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে, সুলতান আইউবীও সেদিন তেমনি আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেছিলেন। তিনি ঘুমাতেন না। বিশ্রাম করতেন না। আমি তাঁকে বহুবার বলেছি, সুলতান! স্বাস্থ্যটার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখুন। এভাবে শরীরটা একেবারে শেষ করে ফেলছেন। আল্লাহকে স্মরণ করুন। জয়-পরাজয় তাঁরই হাতে। সুলতানের চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এসেছিলো। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন– 'বাহাউদ্দীন! আমি খৃস্টানদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস দেবো না। সেই পবিত্র ভূ–খণ্ডটির অবমাননা আমি হতে দেবো না, যেখান থেকে আমার প্রিয় রাসূল আল্লাহর দরবারে মিরাজে গমন করেছিলেন। যেখানে আমার রাসূল সিজদা করেছিলেন।' হঠাৎ তিনি গর্জে ওঠে বললেন, 'না বাহাউদ্দীন! না। আমি মৃত্যুবরণ করেও ক্রুসেডারদের বাইতুল মুকাদ্দাস দেবো না।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, এক রাতে সুলতান আইউবী এতো

অস্থির ছিলেন যে, আমি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকি। তাঁর ঘুম আসছিলো না। আমি তাঁকে কুরআনের দু'টি আয়াত স্মরণ করিয়ে বললাম, আয়াতগুলো পড়তে থাকুন। তিনি চক্ষু বন্ধ করে নেন এবং তার ঠোঁট দুটো নড়তে থাকে। আয়াতগুলো পাঠ করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে ওঠেন– 'ইয়াকুবের কোনো খবর আসেনি? সে নগরীতে ঢুবে যাবে।' বলে আবারো ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করি, সুলতান ঘুমের মধ্যেও অস্থিরতা প্রকাশ করছেন।

সুলতান আইউবীর তাঁবু থেকে আক্রার প্রাচীরটাকে এমন দেখা যেতো, যেনো পিঁপড়েরা কোনো বস্তুর উপর দলা বেঁধে আছে। রাতে আক্রার প্রাচীরের উপর প্রদীপ হাঁটা-চলা করতো। অন্ধকারে প্রাচীরের উপর দিয়ে আগুনের গোলা ভেতরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হতো। প্রাচীর টপকে ভেতর থেকে বাইরেও তেমনি গোলা আসতো। সুলতান আইউবীর কমান্ডো সেনারা প্রতি রাতে দুশমনের উপর গেরিলা হামলা চালাতো।

ঘুমের ঘোরে সুলতান আইউবী যে ইয়াকুবের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তিনি হলেন তার নৌ-বাহিনীর একজন অতিশয় দুঃসাহসী কাপ্তান। আক্রা নগরীতে রসদ ও অস্ত্র পৌছানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। নগরীর যেদিকটায় নদী, সেদিকে খৃস্টানদের নৌ-বহর ছড়িয়ে ছিলো। অথচ নগরবাসীদের জন্য সরঞ্জাম পৌছানো খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিলো। সুলতান আইউবী ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য নৌ-বাহিনী থেকে স্বেচ্ছাসেবক তলব করেন। দুঃসাহসী কাপ্তান ইয়াকুব সুলতানের ডাকে সাড়া দেন। তৎকালের কাহিনীকার কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ এবং আরো দু'জন ঐতিহাসিক ইয়াকুবের কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। তিনি হালবের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াকুব নৌ ও স্থল বাহিনী থেকে ৬৫০ জন সৈন্য বেছে নেন। তাদেরকে তিনি নিজ জাহাজে তুলে বৈরুত চলে যান। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ রসদ ও অস্ত্র বোঝাই করে আক্রার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেই অস্ত্র ও রসদের পরিমাণ এতো বেশি ছিলো যে, হাতে পেলে আক্রাবাসীরা দীর্ঘদিন যাবত যুদ্ধ করতে সক্ষম হতো।

ইয়াকুব তার সৈনিকদেরকে বলে রাখেন, প্রয়োজনে জীবন কুরবান করে দিতে হবে। যে কোনো মূল্যে হোক জাহাজ আক্রা পৌছাতে হবে। কিন্তু জাহাজটি আক্রার সামান্য দূরে থাকতেই খৃস্টানদের চল্লিশটি জাহাজ তাকে ঘিরে ফেলে। ইয়াকুবের জানবাজরা প্রাণপণ মোকাবেলা করে। জাহাজ চলতে

থাকে এবং ইয়াকুব জাহাজটিকে আক্রার কুলের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। জানবাজরা দুশমনের জাহাজগুলোর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এক ফরাসী ঐতিহাসিক দ্য উইনসোফ লিখেছেন, তারা জিন ও প্রেতাত্মার ন্যায় লড়াই করে। তবু দুশমনের ঘেরাও থেকে বেরুতে সক্ষম হয়নি। অর্ধেকেরও বেশি মুসলিম সৈন্য খৃস্টানদের তীর খেয়ে মারা যায়।

ইয়াকুব যখন দেখলেন, পাল ছিঁড়ে গিয়ে জাহাজ আপন গতিতে মাঝের দিকে এবং দুমশনের কজায় চলে যাচ্ছে, তখন তিনি তার জানবাজদের চীৎকার করে বললেন– 'আল্লাহর কসম! আমরা মর্যাদা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবো। দুশমনকে না জাহাজ দখল করতে দেবো, না তার থেকে কোনো বস্তু ছিনিয়ে নিতে দেবো। জাহাজে ছিদ্র করে দাও। সমুদ্রকে জাহাজের ভেতর ঢুকে যেতে দাও।'

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে, ইয়াকুবের যে ক'জন জানবাজ তখনো জীবিত ছিলো, তারা ডেকে গিয়ে জাহাজের তলদেশ ফুটো করতে শুরু করে। ছিদ্র হয়ে গেলে সাগরটা জাহাজে ঢুকতে শুরু করে। একজন জানবাজও জাহাজ থেকে লাফিয়ে জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করেনি। সকলে জাহাজসহ সমুদ্রের তলদেশে হারিয়ে যায়। এটি ১১৯১ সালের ৮ জুনের ঘটনা।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে সুলতান আইউবী তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর ঘোড়া সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতো। তিনি উচ্চশব্দে আদেশ করেন– 'দফ বাজাও।' দফ বেজে ওঠে। এটা আক্রমণের সংকেত। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর বাহিনী আক্রমণের জন্য সমবেত হয়ে যায়। সুলতান আইউবী বললেন– 'আজ দুশমনকে ভেদ করে প্রাচীরের নিকট পৌঁছে যেতে হবে।' তিনি ঘোড়া হাঁকান। তাঁর সবক'টি ইউনিট, আরোহী ও পদাতিক বাহিনী তাঁর পেছনে পেছনে রওনা দেয়। বাহ্যত এটি ছিলো এলোপাতাড়ি আক্রমণ। কিন্তু সুলতান আইউবী বাহিনীকে আগেই বিন্যস্ত করে রেখেছেন। খৃস্টানরা মুসলমানদের এরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আসতে দেখে তাদের পদাতিক বাহিনী তীর-ধনুক নিয়ে প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যায়। তারা তীর বর্ষণ করতে শুরু করে দেয়।

আক্রমণের নেতৃত্ব সুলতান আইউবী স্বয়ং দিচ্ছিলেন। তাঁর মামলুকরা বিদ্যুতের ন্যায় ক্রুসেডারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ক্রুসেডারদের সৈন্য ছিলো অনেক বেশি। মুসলমানরা এমনভাবে যুদ্ধ করে, যেনো তাদের জীবিত পেছনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছো নেই। অশ্বারোহীরা ঘোড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে আর আক্রমণ করছে। এই যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হয়, ততোক্ষণে সাঁঝের

আধার নেমে এসেছে। ক্রুসেডারদের ক্ষয়ক্ষতি ছিলো বিপুল– সংখ্যাতীত। কিন্তু সুলতান আইউবী যে উদ্দেশ্যে আক্রমণটা করেছিলেন, তা সাধিত হয়নি।

এরূপ হামলা এটিই প্রথম ও শেষ আক্রমণ ছিলো না। আক্রা দু'টি বছর অবরুদ্ধ থাকে। এই সময় সুলতান আইউবী পেছন থেকে এরূপ কয়েকটি আক্রমণ করিয়েছেন। প্রতিটি আক্রমণেই তাঁর জানবাজরা বীরত্বের এমন সব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে, যেমনটি অতীতে তারাও দেখাতে পারেনি। এই সময়ে সুলতান আইউবী মিসর থেকেও সাহায্য পেয়ে যান এবং কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র তাকে সৈন্য ও সরঞ্জাম প্রেরণ করে। পুরো কাহিনী লিখতে গেলে শেষ হবে না। শুধু জিহাদের স্পৃহা নয়– সে ছিলো উন্মাদনা। সেসব আক্রমণে আক্রার অবরোধ ভাঙা যায়নি বটে; কিন্তু ক্রুসেডারদের হৃদয়ে ভয় ধরে যায় যে, মুসলমানরা এখান থেকে তাদেরকে জীবিত বেরিয়ে যেতে দেবে না। খৃস্টানদের সৈন্য বেশি ছিলো বিধায় তাদের প্রাণহানিও ঘটেছে বিপুল। এই সুবিপুল লাশ আর আহতদের দেখে খৃস্টানদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছিলো। মুসলমানদের অভাবিতপূর্ব এই বীরত্বে স্বয়ং রিচার্ডও প্রভাবিত হতে শুরু করেছেন।

এ সময়ে রিচার্ড সুলতান আইউবীর নিকট সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দূত প্রেরণ করতে থাকেন। দূত আল-আদিলের নিকট যেতো আর আল-আদিল প্রস্তাবটা সুলতানের নিকট পৌঁছিয়ে দিতেন। তার দাবি ছিলো, আমাদের জেরুজালেম আমাদেরকে দিয়ে দাও, আমাদের ক্রুশটা ফিরিয়ে দাও এবং হিত্তীন যুদ্ধের আগে যেসব অঞ্চল আমাদের দখলে ছিলো, সেগুলো আমাদেরকে দিয়ে দাও। সুলতান আইউবী 'জেরুজালেম' নাম শুনে আঁৎকে ওঠতেন। তথাপি তিনি আল-আদিলকে রিচার্ডের সঙ্গে সন্ধি বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখার অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। প্রায় সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, রিচার্ড ও আল-আদিল যখন রিচার্ডের নিকট যেতেন কিংবা রিচার্ড আল-আদিলের নিকট আসতেন, তখন রিচার্ডের বোন জুয়ানাও সঙ্গে থাকতো। এই বন্ধুত্ব সত্ত্বেও আল-আদিল রিচার্ডের শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এই সাক্ষাৎ-যোগাযোগের এবং আলাপ-আলোচনার মধ্যেও যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো। রক্তক্ষয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিলো এবং আক্রাবাসীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠেছিলো। অবরোধকারীদের মধ্যে অন্যান্য খৃস্টান সম্রাটও ছিলেন। তন্মধ্যে ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড সকলের নেতৃত্ব প্রদান করছিলেন।

❖ ❖ ❖

'আমি এতোটুকু সফলতা অর্জন করেছি যে, তিনি আমার ভালোবাসা বরণ করে নিয়েছেন'– জুয়ানা ভাই রিচার্ডকে বললেন– 'কিন্তু সকল মুসলমান আমীর-শাসকদের মাঝে যে দুর্বলতাটি পাওনা যায় বলে আপনি জানিয়েছেন, সেটি তার মধ্যে পাইনি। তিনি আমাকে বিবাহ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন বটে; কিন্তু তার জন্য নিজের ধর্ম ত্যাগ করার পরিবর্তে আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলছেন।'

'মনে হচ্ছে, এ বিদ্যায় পারদর্শী মেয়েরা যেভাবে যাদু প্রয়োগ করে, তুমি তেমনটি প্রয়োগ করতে সক্ষম হওনি'– ভাই রিচার্ড বললেন– 'আল-আদিল চরিত্রে পরিপক্ব সে আমিও দেখেছি। ইতিমধ্যে আমি তাকে বলে ফেলেছি, সে (তুমি) যদি আপনাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়, তাহলে আপনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে নিন, আর ভাইকে বলুন যেনো তিনি উপকূলীয় অঞ্চলটা আপনাকে দিয়ে দেন, যেখানে আপনারা স্বামী-স্ত্রী দু'জন মিলে রাজত্ব করবেন। তিনি উত্তর দিয়েছেন, ধর্মই যদি পরিবর্তন করলাম, তাহলে এতো খুন-খারাবির আবশ্যক কী ছিলো? আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি আমার বোনকে পছন্দ করেন? তিনি উত্তর দেন, সে আপনার বোনকে জিজ্ঞেস করুন। তাকে আমি ততোটুকু কামনা করি, যতোটুকু সে আমাকে কামনা করে। আমি তাকে বললাম, আপনাদের এই প্রেম-ভালোবাসায় আমার কোনো আপত্তি নেই।... শিকার জালে এসে পড়েছে। এখন ধরে বোতলে ভরার দায়িত্ব তোমার।'

'আচ্ছা!'– জুয়ানার হঠাৎ মনে পড়ে যায়– 'আমার সেবিকা দুটিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রাতে এখানেই ছিলো। সকাল থেকে উধাও!'

'আমার মনে হচ্ছে, ওরা উধাও-ই থাকবে'– রিচার্ড বললেন– 'ওরা মুসলমান ছিলো।

'ওরা সিসিলির মুসলমান ছিলো'– জুয়ানা বললো– 'আমার বিয়ের সময় থেকে ওরা আমার সঙ্গে ছিলো।'

'মুসলমান যেখানকারই বাসিন্দা হোক, সকলের চেতনা একরকমই হয়ে থাকে।'– রিচার্ড বললেন– 'সে কারণেই আমরা এ জাতিটাকে বিপজ্জনক মনে করি এবং ঐক্য বিনষ্ট করে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ওরা এখানে এসে দেখলো, আমরা তাদের জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, অমনি তাদের কাছে চলে গেলো।'

রিচার্ড ঠিকই বলেছিলেন। ততোক্ষণে তারা সুলতান আইউবীর নিকট

পৌঁছে গেছে। তারা সুলতান আইউবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে বললো, এমন কিছু কথা আছে, যা সুলতানকেই বলতে হবে। তারা সুলতান আইউবীকে জানায়, আমরা সিসিলিতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সেখানেই লালিত-পালিত হয়েছি। শৈশব থেকেই চাকরানি হয়ে রাজমহলে সময় অতিবাহিত করেছি। সম্রাট রিচার্ডের বোন জুয়ানা রাজার স্ত্রী হওয়ার পর বয়স, রূপ-সৌন্দর্য ও দৈহিক আকার-গঠনের সুবাদে আমাদেরকে তার খাস চাকরানি নিযুক্ত করা হয়। সিসিলিতে মুসলমান ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। সে জন্য সেখানে ইসলাম জিন্দা ছিলো। আমরাও ধর্মের কথা ভুলিনি। জুয়ানা বিধবা হয়ে যাওয়ার পর সম্রাট রিচার্ড ক্ষমতার মসনদে আসীন হন। এখানে আসবার সময় তিনি বোনকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। এখানে এসে আমরা খৃস্টানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখে চাকরি থেকে আমাদের মন ওঠে গেছে।

মেয়ে দুটো দৈহিকভাবে মানানসই হওয়ার পাশাপাশি যেমন চালাক, তেমনি সতর্ক। তারা সুলতান আইউবীকে জানালো, জুয়ানা রিচার্ডকে বলছিলো, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই আল-আদিলকে ফাঁসিয়ে ফেলেছি। আল-আদিল যদি ধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টান হয়ে যান, তাহলে তাদের বিয়ে হয়ে যাবে। তারপর সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করা ও জেরুজালেম দখল করা সহজ হয়ে যাবে। মেয়ে দুটো এই সন্দেহও ব্যক্ত করে যে, জুয়ানা ও আল-আদিল গোপনে কোথাও মিলিত হয়ে থাকেন। তথ্যটা সুলতান আইউবীকে জানানোর জন্যই তারা ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে। কাজী বাহউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় এই মেয়ে দুটোর নাম উল্লেখ করেননি। শুধু লিখেছেন, সুলতান আইউবী তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মেয়ে দুটোর রিপোর্টে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন বটে; কিন্তু তাঁরই সহোদর তাকে ধোঁকা দিচ্ছে, এ তথ্য তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। প্রতিজন সালারের উপর তার পূর্ণ আস্থা ছিলো। কিন্তু ভাই আল-আদিল ও দু'পুত্র আল-আফজাল ও আয-যাহিরের উপস্থিতিতে তিনি বহু পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকতেন। খৃস্টানদের উপর যখন পেছন থেকে আক্রমণ হতো, তার নেতৃত্ব হয় তিনি নিজে দিতেন কিংবা এই তিনজন। তাছাড়া খৃস্টান সম্রাট বিশেষত রিচার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার দায়িত্ব আল-

আদিলের উপর ন্যস্ত ছিলো। সুলতান এ বিষয়ে আল-আদিলের সঙ্গে কথা বলা আবশ্যক মনে করলেন। কিন্তু আক্রার যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিলো। মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য আসছিলো। আল-আদিলকে কোথাও দেখা যাচ্ছিলো না। তাঁর সম্পর্কে সুলতান আইউবী শুধু এটুকু সংবাদ পাচ্ছিলেন যে, আজ তিনি অমুক স্থানে আক্রমণ করেছেন, আজ অমুক স্থানে। সুলতান তাঁর পুত্রদেরও দেখা পাচ্ছেন না। তিনি এখন স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন।

অনবরত পাথর নিক্ষেপের ফলে আক্রান্ত প্রাচীর একস্থান থেকে ভেঙে যায়। খৃস্টানরা সে পথে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে মুসলমানরা জীবন বাজি রেখে তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিলো, জায়গাটা উভয় পক্ষের লাশে ভরে যাচ্ছে। অবশেষে কবুতর ভেতর থেকে পয়গাম নিয়ে আসে– 'কাল নাগাদ যদি আমাদের কাছে সাহায্য এসে না পৌঁছায় কিংবা আপনি যদি বাইরে থেকে অবরোধ ভাঙার চেষ্টা না করেন। তাহলে আমরা অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হবো। কারণ, নগরীর শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছে। নগরী জ্বলছে। অল্প ক'জন সৈন্য বেঁচে আছে। যারা বেঁচে আছে, তারাও দু'বছর যাবত অবিরাম যুদ্ধ করে করে জীবন্ত লাশ হয়ে গেছে।'

সুলতান আইউবীর চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসে। তৎক্ষণাৎ সকল বাহিনীকে একত্রিত করে একযোগে তীব্র আক্রমণ চালান। এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় যে, ইতিহাসের পাতা কেঁপে উঠতে শুরু করে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মানব-মস্তিষ্ক এরূপ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কল্পনাও করতে অক্ষম। মুসলমানরা রাতেও খৃস্টানদেরকে স্থির থাকতে দেয়নি। মধ্যরাতের পর সুলতান আইউবী তাঁবুতে ফিরে এসে এমনভাবে পালংকের উপর পড়ে যান, যেনো তাঁর দেহটা জখমে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তিনি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আদেশ দেন, সকালেও এরূপ আক্রমণ হবে। কিন্তু ভোরের আলো তাঁকে যে দৃশ্য দেখালো, তাতে তাঁর মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। আক্রার প্রাচীরের উপর ক্রুসেডারদের পতাকা উড়ছে। খৃস্টান সৈন্যরা স্রোতের ন্যায় নগরীর ভেতরে অনুপ্রবেশ করছে। দিনটি ছিলো জুমাবার। ৫৮৭ হিজরীর ১৭ জমাদিউস সানি মোতাবেক ১২ জুলাই ১১৯২ খৃস্টাব্দ।

আল-মাশতুব ও কারাকুশ শর্তের ভিত্তিতে চুক্তিতে সই করেছিলেন। তথাপি সুলতান আইউবীকে দেখতে হলো, ফিরিঙ্গিরা প্রায় তিন হাজার মুসলমানকে কয়েদি বানিয়ে রশিতে বেঁধে আক্রার বাইরে নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে

সামরিক লোকও আছে, বেসামরিক লোকও আছে। তাদেরকে এক স্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। চারদিক থেকে খৃস্টান বাহিনীর আরোহী ও পদাতিক সৈন্যরা সেই হাত-পা বাঁধা নিরস্ত্র মানুষগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। খৃস্টানরা এতো পৈশাচিকতা ও অমানবিকতা প্রদর্শন করবে, মুসলিম বাহিনীর সে ধারণা ছিলো না। যখন খৃস্টানরা মুসলিম বন্দিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, মুসলিম সৈন্যরা কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করে ছুটে গিয়ে খৃস্টানদের উপর পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ করে বসলো। কিন্তু ততোক্ষণে হাত-পাবাঁধা বন্দিরা শহীদ হয়ে গেছে। উভয় বাহিনীর মধ্যে আবারো তীব্র রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হলো।

❖ ❖ ❖

ইতিমধ্যে রিচার্ডও সুলতান আইউবীর ন্যায় গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তার উপর খৃস্টজগতের অনেক নির্ভরতা ছিলো। লোকটি সিংহ-হৃদয় ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আক্রার অবরোধে যেখানে তিনি সফল হয়েছিলেন, সেখানে তার মনোবলও ভেঙে গিয়েছিলো। মুসলমানরা এতো প্রাণপণ লড়াই করে থাকে তার ধারণা ছিলো না। তার গন্তব্য ছিলো বায়তুল মুকাদ্দাস। আক্রা জয় করার পর রোম উপসাগরের কূল ঘেঁষে রওনা হয়েছিলেন। সম্মুখে আসকালান ও হীফা ইত্যাদি বৃহৎ নগরী ও দুর্গের অবস্থান। সুলতান আইউবী তার মতলব বুঝে ফেলেন। এই নগরী ও দুর্গগুলোকে দখল করে এখানে ক্যাম্প স্থাপন করে বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ করার মতলব এঁটেছেন।

সুলতান আইউবী বাইতুল মুকাদ্দাসের খাতিরে যতো বড় ও যতো বেশি প্রয়োজন কুরবানী দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তিনি আদেশ প্রদান করেন– 'আসকালানকে ধ্বংস করে দাও। দুর্গ ও নগরীটা ধ্বংস্তূপে পরিণত করে দাও।' শুনে সালার ও উপদেষ্টাদের মাথায় যেনো বাজ পড়ে। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এতো বিশাল নগরী! এতো শক্ত দুর্গ! সুলতান আইউবী গর্জে ওঠে বললেন– 'নগরী আবার গড়ে ওঠবে। মানুষ জন্ম নিতে থাকবে। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করার জন্য বোধ হয় সালাহুদ্দীন আইউবী আর জন্মাবে না। নিজেদের সকল নগরী এবং শিশুদেরসহ সব মানুষ মসজিদে আকসার জন্য কুরবান করে দাও।'

সুলতান আইউবী বাস্তবিকই আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেছিলেন। তিনি বাস্তবতাকে লুকাবার চেষ্টা করেননি। গেরিলা ইউনিটগুলোকে খৃস্টান বাহিনীর পেছনে লেলিয়ে দেন। তারা লুকিয়ে লুকিয়ে অগ্রসরমান রিচার্ড বাহিনীর পেছন

অংশের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। ফলে রিচার্ডের অগ্রযাত্রা মন্থর হয়ে যায়। তাদের রসদ অনিরাপদ হয়ে পড়ে। রিচার্ড আসকালান যাচ্ছিলেন। তিনি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছেন, ততোক্ষণে নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। সেখানে যে মুসলিম ফৌজ ছিলো, তাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রিচার্ডের পথে যে ক'টি দুর্গ জয় করার কথা ছিলো, সবগুলো আগেই ধুলিসাৎ করে দেয়া হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুসলমানরা এমন ত্যাগও স্বীকার করতে পারে ভেবে রিচার্ডের মাথা খারাপ হয়ে যেতে শুরু করেছে। তিনি বুঝে ফেলেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করা সহজ হবে না।

ফ্রান্সের সম্রাট রিচার্ডকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। এ রিচার্ডের জন্য বিরাট এক ধাক্কা। তিনি আক্রা জয় করেছেন ঠিক; কিন্তু এই সফলতার মধ্যেও মুসলমানরা তার কোমর ভেঙে দিয়েছে। আক্রা হাত থেকে ছুটে যাওয়া সুলতান আইউবীর জন্য আক্ষেপের বিষয় ছিলো। কিন্তু তাঁর কৌশল সফল হয়েছে যে, তিনি ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তির ভিত নড়বড়ে করে দিয়েছেন। এবার তিনি পুনরায় নিজের বিশেষ পদ্ধতির যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন। সে হচ্ছে, গেরিলা ও কমান্ডো আক্রমণের ধারা। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুসলমান গেরিলারা রাতের অন্ধকারে ঝড়ের ন্যায় আসতো এবং খৃস্টান বাহিনীর পেছন অংশের উপর কমান্ডো আক্রমণ চালিয়ে বিপুল ক্ষতিসাধন করে অদৃশ্য হয়ে যেতো। ফলে খৃস্টানদের এক মাসের পথ অতিক্রম করতে তিন মাস সময় লেগে যেতো। ইতিমধ্যে সুলতান আইউবী ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রার গতি মন্থর করে দিয়ে নিজে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষা শক্ত করে ফেলেন।

'কিছু করো জুয়ানা! ক্রুশের খাতিরে কিছু একটা করো'– রিচার্ড তার বোনকে বললেন– 'আল-আদিলকে হাত করে নাও। যুদ্ধ করে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস নিতে পারবো না।'

'তিনি আমাকে চাচ্ছেন'– জুয়ানা উত্তর দেয়– 'রওনার সময়ও তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। আমি বলতে পারি, তিনি আমাকে মনে-প্রাণে কামনা করছেন। কিন্তু বলছেন, আমি মুসলমান হয়ে যাই। আমার কোন শর্তই মানতে রাজি হচ্ছেন না।'

ওদিকে সুলতান আইউবী ভাই আল-আদিল, পুত্রদ্বয় এবং সালারদের সঙ্গে

কথা বলছেন। তাঁর মুখে এখন দু'টি মাত্র বুলি– ইসলাম, বাইতুল মুকাদ্দাস। তিনি সকলকে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। সভা শেষে আল-আদিল সুলতান আইউবীর সঙ্গে একাকীত্বে মিলিত হন এবং বললেন– 'রিচার্ড আমাকে তার বোনকে বিয়ে করতে বলছেন। শর্ত দিচ্ছেন, ইসলাম ত্যাগ করে আমাকে খৃস্টান হতে হবে।'

'তোমার ইসলামের সঙ্গে বেশি ভালোবাসা, নাকি রিচার্ডের বোনের সঙ্গে?'

'উভয়ের সঙ্গে।'

'তাহলে তাকে তোমার ধর্মে দিক্ষিত করো এবং বিয়ে করে নাও'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি অনুমতি দিচ্ছি।'

'আমি আপনার নিকট বিয়ের অনুমতি নিতে আসিনি'– আল-আদিল বললেন– 'আমি আপনাকে বলতে এসেছি, রিচার্ডের ন্যায় একজন সাহসী এবং যুদ্ধবাজ সম্রাটও এতো নীচে নামতে পারলেন! আমি স্বীকার করছি, তার বোনটাকে আমার ভালো লাগছে। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি আপন ধর্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।'

'আর সেও নিজ ধর্মের সঙ্গে গাদ্দারী করবে না।'

'জাহান্নামে যাক'– আল-আদিল বললেন– 'এই অস্ত্র দ্বারা রিচার্ড বাইতুল মুকাদ্দাস নিতে পারবে না।'

সুলতান আইউবীর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ রিচার্ডের এই হীন আচরণটাকে লুকাবার চেষ্টা করেছেন। তারা লিখেছেন, রিচার্ড খৃস্টধর্ম গ্রহণের শর্তে আল-আদিলকে তার বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু রিচার্ডের বোন আল-আদিলকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

রিচার্ড বাইতুল মুকাদ্দাসের সন্নিকটে গিয়ে ছাউনি স্থাপন করেন। এখানে আক্রা অপেক্ষা বেশি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হওয়ার আশংকা ছিলো। তিনি পূর্বে যেসব শর্ত আরোপ করে সন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন, এখানে এসেও সুলতান আইউবীকে সেসব শর্ত আরোপ করতে শুরু করেন। বারংবার এক কথা কারুরই ভালো লাগে না। একবার সুলতান আইউবী বিরক্ত হয়ে রিচার্ডের দূতকে অপমান করে তাঁবু থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

এ সময়ে সুলতান আইউবী সংবাদ পান, রিচার্ডের অসুখ হয়েছে। এমন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে, বাঁচবার আশা নেই। সুলতান রাতে তাঁবু থেকে বের হয়ে রিচার্ডের তাঁবু অভিমুখে রওনা হন। কোথায় যাচ্ছেন আল-আদিল ছাড়া কাউকে বলেননি। আল-আদিল বললেন, অমুক স্থানে

রিচার্ডের বোন আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার কথা। আপনি তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

জুয়ানা যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে দৌড়ে এসে বলে ওঠে– 'তুমি এসে পড়েছো আল-আদিল?' সুলতান আইউবী ঘোড়া থেকে নেমে জুয়ানাকে ঘোড়ায় বসিয়ে চুপি চুপি রিচার্ডের তাঁবুর দিকে রওনা দেন। জুয়ানা সুলতানকে কিছু বলছিলো। সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমার ভাষা আমার ভাই বোঝে– আমি বুঝি না।' জুয়ানা কী বললো সুলতান বুঝতে পারেননি।

সুলতান আইউবী রিচার্ডের তাঁবুতে প্রবেশ করেন। রিচার্ড সত্যিই গুরুতর অসুস্থ। সুলতান আইউবীর সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি দোভাষী ডাকেন। সুলতান আইউবী প্রথম কথাটা বললেন– 'বোনকে সামলাও। আমার ভাই আপন ধর্ম ত্যাগ করবে না। বলো তোমার কষ্টটা কী? আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। এমন ভেবো না, তোমাকে মুমূর্ষু দেখে গিয়ে আমি আক্রমণ করবো। সুস্থ হও, যুদ্ধ পরে করবো।'

রিচার্ড বিস্ময়াভিভূত হয়ে ওঠে বসেন এবং সম্ভবত অলক্ষ্যেই বলে ওঠেন– 'তুমি মহান সালাহুদ্দীন আইউবী! তুমিই সত্যিকার যোদ্ধা!'

রিচার্ড সুলতান আইউবীকে কষ্টের কথা জানান। সুলতান বললেন– 'আমাদের অঞ্চলে রোগাক্রান্ত মানুষকে আমাদের ডাক্তারই সুস্থ করে তুলতে পারে। ইংল্যান্ডের বাহিনী যেমন এখানে এসে অথর্ব হয়ে যায়, তেমনি তোমাদের ডাক্তারও এখানে এসে আনাড়ি হয়ে যায়। আমি ডাক্তার পাঠাবো।'

'সালাহুদ্দীন! আমরা আর কতোকাল একে অপরের রক্ত ঝরাতে থাকবো?'– রিচার্ড বললেন– 'আসো, সন্ধি ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে ফেলি।'

'কিন্তু তুমি বন্ধুত্বের যে মূল্য দাবি করছো, আমি তা পরিশোধ করতে পারবো না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমরা খুন-খারাবিকে ভয় করছো। আমার জাতি বাইতুল মুকাদ্দাসের খাতিরে নিজেদের প্রতি ফোঁটা রক্ত কুরবান করে দেবে।'

ফিরে এসে সুলতান আইউবী তাঁর প্রাইভেট ডাক্তারকে রিচার্ডের চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর সেরে ওঠতে বহুদিন কেটে গেছে। সুলতান আইউবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আক্রমণের পরিবর্তে রিচার্ডের পক্ষ থেকে সন্ধির নতুন নতুন শর্ত আসে। রিচার্ড বাইতুল মুকাদ্দাস থেক হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। শুধু এতোটুকু সুবিধা প্রার্থনা করেন যে, খৃস্টান পর্যটকদের

বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হোক এবং উপকূলীয় কিছু অঞ্চল খৃস্টানদের দিয়ে দেয়া হোক। সুলতান আইউবী রিচার্ডের এই দু'টি দাবি মেনে নেন। তাঁর বাহিনীও যুদ্ধে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো। নিজেও একদিকে যেমন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অপরদিকে অসুস্থ। তাই এ মুহূর্তে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করলেন।

রিচার্ড মুসলমানদের চেতনা ও নির্ভীকতায় ভয় পেয়ে গেছেন। তার স্বাস্থ্যও হাল ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া নিজ দেশে বিরুদ্ধবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠছিলো। তাই তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাওয়া তার আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো।

৫৮৮ হিজরীর ২২ শাবন মোতাবেক ১১৯১ খৃস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ১১৯২ সালের ৯ অক্টোবর রিচার্ড বাহিনীসহ ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছিলো ৩ বছর। রিচার্ড রওনার আগে সুলতান আইউবীকে বার্তা পাঠান, চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের পর আমি জেরুজালেম জয় করতে আসবো। কিন্তু তারপর কোন খৃস্টান আর বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে পারেনি। অবশেষে ১৯৬৭ সালে আরবদের অনৈক্য এবং তাদের সেসব দুর্বলতা, যেগুলো সুলতান আইউবীর আমলে খৃস্টানরা মুসলিম আমীরদের মাঝে জন্ম দিয়েছিলো বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইহুদীদের হাতে তুলে দেয়।

রিচার্ডের রওনার পর সুলতান আইউবী ঘোষণা দেন, বাহিনীর যেসব সৈন্য হজ্বে যেতে চাও নাম লেখাও। তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় হজ্বে পাঠানো হবে। তালিকা প্রস্তুত হয়ে যায়। আগ্রহী সকলকে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওনা করা হয়। স্বয়ং সুলতান আইউবীর নিজের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা ছিলো হজ্ব করবেন। কিন্তু জিহাদ তাকে সুযোগ দেয়নি। আর যখন অবসর পেলেন, তখন তাঁর নিকট হজ্বে যাওয়ার অর্থ ছিলো না। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ নিতে বলা হলো। তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এই অর্থ আমার নয়। সুলতান আইউবী নিজেকে হজ্ব থেকে বঞ্চিত করলেন। রাজকোষ থেকে কোন অর্থ নিলেন না। মিসরী কাহিনীকার মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ লিখেছেন, মৃত্যুর সময় সুলতান আইউবীর সর্বমোট সম্পদ ৪৭ দেরহাম রুপা এবং এক টুকরো সোনা ছিলো। নিজস্ব কোনো বাসগৃহ ছিলো না।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবী ১১৯২ সালের ৪ নবেম্বর বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে

দামেশ্‌ক গিয়ে পৌঁছেন। তার চার মাস পর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ এই বীর মুজাহিদ মহাকালের মহানায়ক ইহলোক ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। দামেশ্‌ক পৌঁছার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর স্বচক্ষে দেখা পরিস্থিতি কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ এভাবে বর্ণনা করেছেন–

'... তাঁর শিশু সন্তানরা দামেশ্‌কে ছিলো। একটানা পরিশ্রম ও সর্বশেষ অসুস্থতার পর বিশ্রামের জন্য তিনি এ নগরীকেই পছন্দ করেন। সন্তানরা তাঁকে দেখে বেশ আনন্দিত হয়েছিলো। দামেশ্‌ক ও আশপাশের মানুষ তাদের বিজয়ী সুলতানকে দেখার জন্য দলে দলে আসতে শুরু করে। স্বজাতির এই ভক্তি ও আন্তরিকতা দেখে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরদিনই জনসভার আয়োজন করেন, যেখানে সুলতানের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করার এবং কারো কোনো অভিযোগ কিংবা দাবি-দাওয়া থাকলে পেশ করার অনুমতি প্রদান করেন। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু, ধনী-গরীব, শাসক-জনতা সকলে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসে ভিড় জমায়। কবিরা সুলতানের শানে কবিতা আবৃত্তি করেন।

'বিরামহীন যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রের নানাবিধ ব্যস্ততা সুলতান আইউবীকে না দিনে কখনো বিশ্রাম নিতে দিয়েছে, না রাতে একটু শান্তির ঘুম ঘুমাতে দিয়েছে। তিনি শারীরিকভাবেও ভেঙে পড়েছিলেন এবং মানসিকভাবেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই ক্লান্ত শরীর-মনকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য তিনি দামেশ্‌কে হরিণ শিকার করাকে ব্যস্ততা বানিয়ে নেন। তিনি ভাই ও সন্তানদের সঙ্গে শিকার খেলায় মেতে ওঠেন। তার ইচ্ছা ছিলো, দিন কয়েক বিশ্রাম করে মিসর চলে যাবেন। কিন্তু দামেশ্‌কের রাষ্ট্রীয় কাজ তাঁকে আটকে রাখে।'...

'আমি সেসময় উজিরের দায়িত্ব নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছিলাম। একদিন দামেশ্‌ক থেকে সুলতান আইউবীর একখানা পত্র এসে পৌঁছে। তিনি আমাকে দামেশ্‌ক যেতে বলেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কিন্তু লাগাতার মুষলধারা বৃষ্টির কারণে পথঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছিলো। ঊনিশ দিন পর্যন্ত আমি বেরই হতে পারলাম না। অবশেষে ২৩ মহররম শুক্রবার রওনা হয়ে ১২ সফর মঙ্গলবার দামেশ্‌ক গিয়ে পৌঁছি। সে সময় বৈঠকখানায় আমীর ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ সুলতানের অপেক্ষা করছিলেন। সুলতানকে আমার আগমনের সংবাদ জানালো হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে তার খাস কামরায় যেতে বললেন। আমি তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দু'বাহু প্রসারিত

করে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁর চেহারায় এমন প্রশান্তি ও স্থিরতা আমি অতীতে কখনো দেখিনি। তার দু'চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে।'...

'পরদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর খাস কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলে জিজ্ঞেস করেন, বৈঠকখানায় কারা আছে? আমি বললাম, আপনার পুত্র আল-মালিকুল আফজাল, কয়েকজন আমীর এবং আরো অনেক লোক। তারা আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় বসে আছেন। তিনি জামালুদ্দীন ইকবালকে বললেন, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ওজরখাহি করে বলে দাও, আজ আমি কাউকে সাক্ষাৎ দিতে পারবো না। তিনি আমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা বলেন। আমি চলে যাই।'...

'পরদিন তিনি অতি প্রত্যুষে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি যখন গেলাম, তখন তিনি বাগানে সন্তানদের নিয়ে খেলা করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, বৈঠকখানায় কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থী আছে কি? তাকে জানানো হলো, ফিরিঙ্গিদের দূত এসে বসে আছে। সুলতান বললেন, তাদেরকে এখানেই পাঠিয়ে দাও। সন্তানরা সেখান থেকে চলে যায়। সর্বকনিষ্ঠ সন্তান আমীর আবু বকর– সুলতান যাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন– সেখানে থেকে যায়। ফিরিঙ্গিরা এলে শিশুটি লোকগুলোর দাড়িবিহীন চেহারা এবং তাদের পোশাক দেখে ভয়ে কাঁদতে শুরু করে। শিশুটি এর আগে কখনো দাড়িবিহীন পুরুষ দেখেনি। সুলতান আইউবী বললেন, আমার পুত্র আপনাদের দাড়িবিহীন চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু এই সমস্যার মোকাবেলায় সুলতান শিশুটিকে ঘরে পাঠিয়ে দেয়ার পরিবর্তে দূতদের বললেন, আজ আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবো না। তিনি তাদেরকে আলাপ-আলোচনা ব্যতিরেকেই বিদায় করে দেন।'...

'তাদের চলে যাওয়ার পর তিনি বললেন, খাবার যা আছে নিয়ে আসো। তাঁর সম্মুখে হাল্কা কিছু খাবার এনে হাজির করা হলো। তাতে ক্ষিরও ছিলো। তিনি সামান্যই খেলেন। আমি অনুভব করলাম, যেনো তাঁর ক্ষুধা মরে গেছে। তাঁর সঙ্গে আমিও খেলাম। তিনি বললেন, মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কথাবার্তা কম করছি। ক্ষুধামান্দ্য এবং দুর্বলতা অনুভব করছি।'...

'আহারের পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন– হাজীরা ফিরে এসেছে কি? আমি বললাম, রাস্তায় অনেক কাদা। চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে। আশা করি, কাল নাগাদ এসে পৌঁছবে। সুলতান বললেন, আমরা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে যাবো। বলেই তিনি একজন কর্মকর্তাকে ডেকে বললেন, হাজীরা

আসছে। রাস্তায় কাদা ও পানি আছে। এখনই লোক পাঠাও, পথের কাদা-পানি পরিষ্কার করাও। আমি তাঁর থেকে অনুমতি নিয়ে চলে আসি। আমি দেখলাম, সুলতানের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতায় বেশ ভাটা পড়ে গেছে।'...

'পরদিন ঘোড়ায় আরোহণ করে তিনি হাজ্বীদের অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে পড়েন। আমিও ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিছু নেই। পুত্র আল-মালিকুল আফজাল সঙ্গ নেয়। মানুষের মাঝে দাবানলের ন্যায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, সুলতান বাইরে এসেছেন। জনতা কাজ-কর্ম ত্যাগ করে ছুটে আসে। তারা তাদের বিজয়ী সুলতানকে কাছে থেকে দেখার এবং তাঁর সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। সুলতান তাঁর এই পাগলপারা ভক্তদের মাঝে হারিয়ে যান। পুত্র আল-মালিকুল আফজাল সন্ত্রস্ত কণ্ঠে আমাকে বললো, সুলতান তো বর্ম পরিধান করে বের হননি! আমার ভয় লাগছে। দুর্ঘটনা ঘটে যেতে কতোক্ষণ! সে সময় সুলতানের সঙ্গে দেহরক্ষী ছিলো না। আমি ভিড় ঠেলে সুলতানের নিকট গিয়ে বললাম, হযরত! আপনি বিশেষ পোশাক পরে বের হননি। শুনে তিনি এমনভাবে চমকে ওঠেন, যেনো তাঁকে হঠাৎ ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। তিনি বললেন, পোশাকটা এখানেই নিয়ে আসো। কিন্তু পোশাক এনে দেয়ার মতো সেখানে কেউ ছিলো না। আমার বেশ ভয় লাগছিলো।'...

'আমার মনে হতে লাগলো, যেনো কোনো অঘটন ঘটে যাবে। আমি তাকে বললাম, আমি এখানকার পথঘাট চিনি না। অন্য কোনো রাস্তা আছে কি, যেখানে লোকজন কম হবে এবং আপনি ফিরে যেতে পারবেন? তিনি বললেন, একটি রাস্তা আছে। তিনি ঘোড়ার মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দেন। জনতার ভিড় ছিলো গণনাতীত। সুলতান আইউবী ঘোড়াটা বাগ-বাগিচার মধ্যকার এক রাস্তায় তুলে দেন। আমি ও আল-মালিকুল আফজাল তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি তাঁর জীবনেরও আশংকা অনুভব করছিলাম এবং স্বাস্থ্যেরও। আমরা আল-মাইবানার কূপ হয়ে দুর্গে এসে প্রবেশ করি।'...

'শুক্রবার সন্ধ্যায় সুলতান আইউবী অস্বাভাবিক দুর্বলতা অনুভব করেন। মধ্যরাতের সামান্য আগে তাঁর গায়ে জ্বর আসে– চোরা জ্বর। শরীরের ভেতরে বেশি ছিলো, বাইরে কম অনুভব হচ্ছিলো। সকাল নাগাদ তিনি বেশ কাহিল হয়ে পড়েন। কিন্তু গায়ে হাত দিলে তেমন গরম অনুভব হচ্ছিলো না। আমি তাকে দেখতে গেলাম। পুত্র আল-মালিকুল আফজাল শিয়রে বসা ছিলো। সুলতান বললেন, রাত অনেক কষ্টে কাটিয়েছি। তিনি এদিক-ওদিকের কথা শুরু করে দেন। আমরা গল্প-গুজবে তাঁকে সঙ্গ দেই। তাতে তার মন-মেজাজে

প্রফুল্লতা ফিরে আসে। দুপুর নাগাদ বেশ সুস্থ হয়ে ওঠেন। আমরা বিদায় নিতে উদ্যত হলে তিনি বললেন, বসুন, খানা খেয়ে যাবেন। আমার সঙ্গে কাজী আল-ফজলও ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া অন্য কারো কাছে আহারে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাই ওজরখাহি করে চলে যান। আমি খাওয়ার রুমে চলে যাই। সুলতানের সঙ্গ ছেড়ে উঠতে মন সরছিলো না। অন্তরটা তাঁর নিকট রেখেই খাওয়ার রুমে চলে যাই। দস্তরখান বিছানো হয়েছে। অনেক লোক বসে আছে। আল-মালিকুল আফজাল পিতার জায়গায় বসা। আফজাল সুলতান আইউবীর পুত্র বটে, কিন্তু সুলতানের স্থানে তাকে উপবিষ্ট দেখে বেশ কষ্ট লাগলো। অন্য যারা বসা ছিলেন, তাদেরও প্রতিক্রিয়া আমারই ন্যায় ছিলো। অনেকের চোখ বেয়ে অশ্রু বেরিয়ে আসে।'...

'সেদিনের পর থেকে সুলতান আইউবীর স্বাস্থ্য খারাপই হতে থাকে। আমি ও কাজী আল-ফজল প্রত্যহ কয়েকবার তাঁকে দেখতে যেতাম। একটু সুস্থতাবোধ করলেই আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন। অন্য সময় চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকতেন। আমরা তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকতাম। তাঁর জীবনের জন্য সবচে' বড় আশংকাটা ছিলো, তাঁর ব্যক্তিগত ডাক্তার অনুপস্থিত ছিলেন। চারজন ডাক্তার মিলে তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু রোগ দিন দিন বেড়েই চলছিলো।'...

'অসুখের চতুর্থ দিন সুলতানের অবস্থা বেশি খারাপ হয়ে যায়। কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ জোড়া বেকার হয়ে যায়। দেহের ভেতরে রস শুকিয়ে যেতে শুরু করে। সুলতান আইউবী দুর্বলতার শেষ পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হন। ষষ্ঠ দিন আমরা তাঁকে ধরে তুলে বসাই। তাঁকে একটি ওষুধ সেবন করানো হলো, যার পর গরম পানি পান করার প্রয়োজন ছিলো। পানি আনা হলো। পানিটা হাল্কা গরম হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু গ্লাসটা মুখের সঙ্গে লাগিয়ে সুলতান বললেন, পানি অনেক গরম। তিনি পানি পান করলেন না। পানি ঠাণ্ডা করে আনা হলো। সুলতান বললেন, এবার একেবারে ঠাণ্ডা। সুলতান সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। শুধু হতাশা প্রকাশার্থে বললেন– 'ইয়া আল্লাহ! কেউ কি নেই, যে আমাকে হাল্কা গরম পানি এনে দিতে পারবে?'...

'আমার ও আল-ফজলের চোখে অশ্রু নেমে আসে। আমরা অন্য এক কক্ষে চলে আসি। কাজী আল-ফজল বললেন, জাতি কতো মহান এক ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে! তাঁর স্থলে অন্য কেউ হলে পানির গ্লাসটা মাথায় ছুঁড়ে মারতেন।'...

'সপ্তম ও অষ্টম দিন সুলতান আইউবীর অবস্থা এতো খারাপ হয়ে যায় যে, তাঁর জ্ঞান হারিয়ে যেতে শুরু করে। নবম দিন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পানিও পান করতে পারলেন না। নগরীতে খবর ছড়িয়ে পড়ে, সুলতান আইউবীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়েছে। সমগ্র নগরীতে মৃত্যুর বেদনা ছেয়ে যায়। সব জায়গায় এবং সকলের মুখে তাঁর সুস্থতার জন্য দু'আ চলছে। ব্যবসায়ী ও সওদাগররা এমন ভয় পেয়ে যায় যে, তারা বাজার থেকে পণ্য তুলে নিতে শুরু করে। প্রতিজন মানুষ কিরূপ হতাশ ও অস্থির হয়ে ওঠেছিলো, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো ছিলো না।'...

'আমি ও আল-ফজল রাতের প্রথম প্রহর তাঁর কাছে থাকতাম এবং দেখাশোনা করতাম। তিনি কথা বলতে পারতেন না। অবশিষ্ট রাত আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ভেতর থেকে কেউ আসলে জিজ্ঞেস করতাম, সুলতানের অবস্থা কেমন। প্রত্যুষে যখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতাম, তখন বাইরে জনতার ভিড়। দণ্ডায়মান দেখতে পেতাম। তারা আমাদের নিকট সুলতানের অবস্থা জিজ্ঞেস করার সাহস পেতো না। আমাদের চেহারা দেখেই বুঝে নিতো, সুলতানের অবস্থা ভালো নয়। জনতা চুপচাপ আমাদের প্রতি তাকাতো আর আমরাও তাদের প্রতি এক নজর তাকিয়ে মাথানত করে বেরিয়ে যেতাম।'...

'দশম দিন ডাক্তারগণ তাকে নাড়ি পরিষ্কার করার ঔষধ সেবন করান। তাতে কিছুটা চৈতন্য ফিরে আসে। তারপর যখন জানতে পারলাম, সুলতান যবের পানি পান করেছেন, তখন আমরা সকলে আনন্দ অনুভব করলাম। সে রাতে তাঁর নিকট যাওয়ার জন্য কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে থাকি। জামালুদ্দীন ইকবালের নিকট সুলতানের অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ভেতরে গিয়ে তুরান শাহকে জিজ্ঞেস করে এসে আমাদেরকে জানালেন, সুলতানের উভয় ফুসফুসে বাতাস চলাচল করতে শুরু করেছে। আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। জামালুদ্দীনকে বললাম, আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন অবশিষ্ট শরীরে ঘামের লক্ষণ আছে কিনা। তিনি ভেতরে গিয়ে দেখে ফিরে এসে জানালেন, অনেক ঘাম আসছে। এটি শুভ সংবাদ ছিলো। আমরা নিশ্চিন্ত মনে চলে আসি।'...

'পরদিন মঙ্গলবার। সফরের ২৬ তারিখ। সুলতান আইউবীর অসুস্থতার একাদশ দিবস। আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। ভেতরে ঢুকতে পারলাম না। আমাদেরকে জানানো হলো, ঘাম এতো বেশি ঝরছে যে, বিছানা বেয়ে

মেঝেতে গিয়ে পড়ছে। সংবাদটা ভালো ছিলো না। শরীরের রস-আদ্রতা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলো। ডাক্তারগণ বিস্ময়ের সঙ্গে জানালেন, শরীর ভেতর থেকে শুকিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সুলতানের দেহে শক্তি বহাল রয়েছে।'...

'সুলতান আইউবী পুত্র আল-মালিকুল আফজাল দেখলেন, সুলতানের সেরে ওঠার কোনো আশা করা যাচ্ছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ আমীর-উজিরদের থেকে আনুগত্যের শপথ নেয়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি সকল বিচারপতিকে রেজওয়ান মহলে সমবেত করে বললেন, আপনারা কাগজ প্রস্তুত করে দিন, যাতে সুলতান আইউবী যতোদিন বেঁচে থাকবেন তাঁর আনুগত্যের হলফনামা থাকবে এবং তাঁর ওফাতের পর আল-মালিকুল আফজাল। আল-আফজাল ওজরখাহি করে বললেন, এ হলফনামা কখনো প্রস্তুত করাতাম না। কিন্তু সুলতানের অবস্থা বিপজ্জনক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে বিধায় কাজটা না করে পারলাম না।'...

'হলফনামা প্রস্তুত হয়ে গেছে। পরদিন হলফ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আমীর-উজিরদের তলব করা হলো। সর্বপ্রথম দামেশ্কের গবর্নর সা'দুদ্দীন মাসউদ শপথ করেন। তারপর সাহয়ুনের গবর্নর নাসরুদ্দীন আসলেন। তিনি এই শর্তে হলফ করেন যে, তিনি যে দুর্গের গবর্নর, সুলতান আইউবীর মৃত্যুর পর সেটি তার ব্যক্তি মালিকানা বলে গণ্য হবে। সকল আমীর-উজির ও গবর্নর আনুগত্যের শপথ করলেন। দু'-তিনজন হলফ করার আগে শর্ত আদায় করে নেন। হলফনামার ভাষ্য ছিলো নিম্নরূপ–

'এই মুহূর্ত থেকে বৃহত্তর ঐক্যের খাতিরে আমি আল-মালিকুন নাসির (সালাহুদ্দীন আইউবী)-এর অনুগত থাকবো, যতোদিন তিনি জীবিত থাকেন। তাঁর শাসন ক্ষমতাকে অটুট রাখার লক্ষ্যে অক্লান্ত ও অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাবো। তাঁর খাতিরে নিজের জীবন, সম্পদ, তরবারী, সৈন্য এবং প্রজাদের ওয়াক্ফ করে দেবো। আমি তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ–নিষেধ মান্য করবো এবং তাঁর প্রতিটি আকাঙ্খা পূর্ণ করবো। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, সুলতান আইউবীর পর এই আনুগত্য তাঁর পুত্র আল-মালিকুল আফজালের জন্য ওয়াক্ফ করে দেবো এবং তারপরে আল-মালিকুল আফজালের পুত্রদের জন্য। আমি আল্লাহকে হাজির-নাজির জ্ঞান করে প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পালন করবো। তার জন্য নিজের জান-মাল, তরবারী ও সৈন্যদের ওয়াক্ফ করে রাখবো। এই আনুগত্যের শপথে আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি।'...

হরফনামার অপর অংশ ছিলো–

'আমি যদি আমার এই হলফের বিরুদ্ধাচরণ করি, তাহলে এই শপথ ভঙ্গের দায়ে আমার স্ত্রী-স্ত্রীগণ তালাক হয়ে যাবে, আমি সকল ব্যক্তিগত ও সরকারি চাকরদের থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো এবং আমি খালি পায়ে পদব্রজে হজ্ব করতে বাধ্য থাকবো।'...

'৫৮৯ হিজরীর ২৬ সফর মোতাবেক ১১৯৩ খৃস্টাব্দের ৩ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অসুখের একাদশ দিবস। তাঁর শরীরের শক্তি-সামর্থ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর বেঁচে থাকার আশা নেই। রাতে এমন এক সময়ে আমার ও কাজী আল-ফজল ইবনে যকির ডাক পড়ে, যে সময়ে পূর্বে কখনো ডাকা হয়নি। ইবনে যকির পুরো নাম আবুল মাআলী মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন। হযরত ওসমান (রা.)-এর বংশের লোক। আইন ও বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁকে বেশ শ্রদ্ধা করতেন। বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করার পর সুলতান আইউবী মসজিদ আকসায় প্রথম জুমার খুতবা দেয়ার জন্য তাঁকেই মনোনীত করেছিলেন। পরে তাঁকে দামেশ্‌কের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছিলো।'...

'আমরা গেলে আল-মালিকুল আফজাল বললেন, আপনারা তিনজন বাকি রাত সুলতানের সঙ্গে থাকুন। তিনি শোকাহত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কাজী আল-ফজল আপত্তি তুলে বললেন, রাতভর মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে সুলতানের স্বাস্থ্যের সংবাদ শোনার অপেক্ষা করে। আমরা যদি সারারাত ভেতরে থাকি, তাহলে তারা অন্য কিছু ভেবে বসবে এবং নগরীতে ভুল সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে। আল-আফজাল যুক্তিটা মেনে নেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে আপনারা চলে যান। তিনি আমাদের পরিবর্তে ইমাম আবু জাফরকে ডেকে পাঠান। ইমাম আসলে আল-ফজল বললেন, আপনি সুলতানের কাছে থাকুন। আল্লাহ না করুন যদি রাতে মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়, তাহলে তাঁর শিয়রে বসে কুরআন তিলাওয়াত করুন। আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি।'...

'পরে ইমাম আবু জাফর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জীবনের শেষ রাতের যে বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন, আমি তা লিপিবদ্ধ করছি। তিনি বলেছেন, আমি সুলতান আইউবীর শিয়রে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। সে সময় সুলতান কখনো অচেতন হয়ে পড়ছিলেন, কখনো জ্ঞান ফিরে পাচ্ছিলেন। আমি বাইশতম পারার সূরা আল-হজ্ব তিলাওয়াত করছিলাম। যখন পড়লাম– 'আল্লাহই সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী ও সত্য। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন

এবং প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতা রাখেন।' তখন আমি সুলতানের কণ্ঠ থেকে ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি বলছিলেন– 'এটা সত্য কথা। এটা সত্য কথা।' এই ছিলো সুলতান আইউবীর জীবনের শেষ উচ্চারণ। তাঁর অল্পক্ষণ পরেই কানে ফজরের আযান ভেসে আসে। আমি কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। আযান শেষ হওয়ামাত্র সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অতি নীরবে ও শান্তিতে ইহজগত ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যান। ইমাম আবু জাফর আমাকে আরো বলেছেন, যখন আযান শুরু হয়, তখন সুলতান একটি আয়াত পড়ছিলেন– "আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আমরা তাঁরই নিকট সাাহয্য প্রার্থনা করি।" সে সময়ে তাঁর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে ওঠেছিলো। চেহারাটা তাঁর জ্বলজ্বল করছিলো। সেই অবস্থাতেই তিনি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যান।'...

'আমি যখন গিয়ে পৌঁছি, ততোক্ষণে সুলতান আইউবী ইহজগত ত্যাগ করে পরজগতে চলে গেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর জাতির গায়ে কোনো কারণে সত্যিকার অর্থে যদি কোনো আঘাত লেগে থাকে, সে ছিলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মৃত্যু। দুর্গ, নগরী, জনতা ও তাবৎ পৃথিবীর মুসলমানদের উপর এমন এক কালো মেঘ ছেয়ে যায় যে, একমাত্র আল্লাহই জানতেন, তা কতো গভীর ও গাঢ় ছিলো। সাধারণত মানুষ প্রিয়জনের জন্য জীবন দেয়ার কথা বলে থাকে। কিন্তু কাউকে জীবন দিতে দেখা যায়নি। কিন্তু আমি কসম খেয়ে বলতে পারবো, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জীবনের শেষ রাতে কেউ যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতো, সুলতানের পরিবর্তে কে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত আছো, তাহলে আমাদের মধ্যে বহু মানুষ নিজেদের জীবন কুরবান করে সুলতানকে বাঁচিয়ে রাখতো।'...

'সেদিন নগরীতে প্রতিজন মানুষকে অশ্রুসিক্ত দেখা গেছে। জনতা ক্রন্দন ছাড়া সব ভুলে গিয়েছিলো। কোনো কবিকে শোকগাঁথা শোনাবার অনুমতি দেয়া হয়নি। কোনো ইমাম, বিচারপতি কিংবা কোনো আলিম জনতাকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেননি। তাঁরা নিজেরাই ডুকরে কাঁদছিলেন। সুলতান আইউবীর সন্তানরা কাঁদতে ও চীৎকার করতে করতে রাস্তায় নেমে পড়েছিলো। তাদের দেখে মানুষের কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিলো।'...

'যোহর নামাযের সময় হয়ে গেছে। ততোক্ষণে সুলতানকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হয়ে গেছে। আদালতের এক কর্মকর্তা আদ-দালায়ী সুলতানকে জীবনের শেষ গোসল করান। আমাকে বলা হয়েছিলো। কিন্তু আমার মন

অতোটা শক্ত ছিলো না। আমি অস্বীকার করি। মাইয়েতকে বাইরে রাখা হয়েছে। যে কাপড়খানা দ্বারা লাশ ঢেকে রাখা হয়েছিলো, সেটি কাজী আল-ফজল দিয়েছিলেন। যখন জানাযা জনতার সম্মুখে রাখা হলো, তখন পুরুষদের ক্রন্দনরোল আর মহিলাদের চীৎকারে আকাশের কলিজাও বুঝি ফেঁটে যেতে শুরু করেছিলো।'...

'কাজী মুহিউদ্দীন ইবনে যাকী নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। সুলতান আইউবীর নামাযে জানাযায় কতো মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলো, আমি তার সংখ্যা বলতে পারবো না। শুধু এটুকু বলতে পারবো, কান্না আর ফোঁপানির কারণে কেউ দু'আ-কালাম পাঠ করতে পারছিলো না। অনেকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চীৎকার করে করে কাঁদছিলো। জামাতের চারদিকে মহিলারা জড়ো হয়ে মাতম করছিলো। নামাযে জানাযার পর লাশের খাটিয়া বাগিচার সেই ঘরটিতে রাখা হলো, যে ঘরে সুলতান আইউবী অসুস্থতার দিনগুলো অতিবাহিত করেছিলেন। আসরের সামান্য আগে মহাকালের মহানায়ক সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দাফন সম্পন্ন করা হয়। জনতা যখন নিজ নিজ ঠিকানায় ফিরে যাচ্ছিলো, তখন মনে হয়েছিলো যেনো কতগুলো লাশ হেঁটে যাচ্ছে। আমি সঙ্গীদের নিয়ে কবরে কুরআন পাঠ করতে থাকি।'...

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জীবনে দু'টি বাসনা ছিলো। ফিলিস্তীনকে খৃস্টানদের থেকে মুক্ত করা এবং হজ্ব করা। তাঁর প্রথম বাসনাটি পূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয়টি অর্থের অভাবে পূরণ হয়নি। তাঁর কাছে হজ্ব করার মতো অর্থ ছিলো না। ব্যক্তিগত পকেট শূন্য ছিলো। নবচন্দ্রের কাঁচি দ্বারা ক্রুসেডীয় ফসল কর্তনকারী মর্দে-মুজাহিদ, মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের সম্রাট এমন গরীব ছিলেন যে, অর্থাভাবে হজ্ব করতে পারেননি! তাঁকে যে কাফন পরানো হয়েছিলো- সে আমি, কাজী আল-ফজল ও ইবনে যাকী চাঁদা করে ক্রয় করেছিলাম।'...

আজো ফিলিস্তীন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য তেমনি মাতম করছে, যেমন করেছিলো ১১৯৩ সালের ৪ মার্চ দামেশ্‌কের নারীরা।

[সমাপ্ত]

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে ফেলে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

ISBN. 984-8925-09-9